নতুন সিলেবাস
৩৫তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষা

২০০ নম্বরের জন্য

প্রফেসর'স

বিসিএস
বাংলাদেশ বিষয়াবলি

১০ম-৩৪তম বিসিএস-এর প্রশ্ন সমাধান

নতুন সিলেবাসে মডেল প্রশ্ন ও উত্তর সংযোজিত

প্রফেসর'স প্রকাশন

প্রফেসর'স
বিসিএস বাংলাদেশ বিষয়াবলি

প্রকাশক : জসিম উদ্দিন
প্রফেসর'স প্রকাশন
৩৭/১ দ্বিতীয় তলা, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মুদ্রক : সুবর্ণ প্রিন্টার্স, ৩/ক-খ পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা ১১০০
ফোন : ৯৫৩৩০২৯

প্রচ্ছদ : রফিক উল্যাহ, দি ডিজাইনার

পরিবেশক : বর্ণালী বইঘর, ৫৩ নীলক্ষেত, ঢাকা ১২০৫
ফোন : ০১৭১২ ২২৩৮৮৩

মূল্য : ৯০০ টাকা

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : জুন ১৯৯৭

পঞ্চদশ সংস্করণ
মে ২০১৫

Professor's BCS Bangladesh Bisoeaboli
Published by Jashim Uddin
Professor's Prokashon, 37/1 (1st Floor)
Banglabazar, Dhaka 1100
Phone : Office 9584436
Sales Center 7125054, 9533029
Email : pp@professorsbd.com
/professorsprokashonbd
Price : 900.00 Taka

পঞ্চদশ সংস্করণের প্রসঙ্গ কথা

সিলেবাস উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। সময় ও সমাজের চাহিদার প্রেক্ষিতে এর পরিবর্ধন ও উন্নয়নও একটি স্বাভাবিক বিষয়। বিসিএস পরীক্ষা পদ্ধতিকে আধুনিক, মানসম্মত ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ৩৫তম বিসিএস থেকে নতুন নিয়মে নতুন সিলেবাসের নির্দেশনায় পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ৩৫তম বিসিএস থেকে জেনারেল ও প্রফেশনাল/টেকনিক্যাল উভয় ক্যাডারের পরীক্ষার্থীদের ২০০ নম্বরের বাংলাদেশ বিষয়াবলি পরীক্ষা ৩ ঘন্টা করে মোট ৬ ঘন্টার পরিবর্তে একদিনে ৪ ঘন্টায় অনুষ্ঠিত হবে। ফলে বাংলাদেশ বিষয়াবলির জন্য প্রকাশিত বইটির গুরুত্বও বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। অথচ বিষয়টির গুরুত্বের দিকে লক্ষ্য না রেখে বাজারে যেসব বই প্রকাশিত হয়েছে সেগুলোতে গৎবাঁধা কিছু বিষয়কে এলোমেলোভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে মাত্র। পরীক্ষার্থীদের উচিত বই ক্রয়ের আগে সিলেবাসের সাথে সূচিপত্র মিলিয়ে অতঃপর বইটি ক্রয় করা। একমাত্র আমরাই বিষয়টির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রেখে প্রকাশ করেছি প্রফেসর'স বিসিএস বাংলাদেশ বিষয়াবলি বইটি।

বইটির বিশেষত্ব

- ১০ম থেকে ৩৪তম বিসিএস রচনামূলক প্রশ্ন, সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও টীকার সমাধান।
- নতুন সিলেবাসের আলোকে মডেল প্রশ্ন ও উত্তর।
- বিগত বছরের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন পর্যালোচনায় সাল নির্দেশ।
- বিষয় বিশেষজ্ঞ ও বিসিএস ক্যাডারদের দ্বারা অধ্যায় বিন্যাস।
- সিলেবাস অনুযায়ী প্রতিটি অধ্যায়ে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন সংযোজন।
- নতুন সিলেবাস ও বিগত বিসিএস প্রশ্ন পর্যালোচনায় অধ্যায়ভিত্তিক টীকা সন্নিবেশ।
- প্রতিটি প্রশ্নে সর্বশেষ ও নির্ভুল তথ্যের সন্নিবেশের চেষ্টা।
- বিসিএস ও পদোন্নতি পরীক্ষাসহ বিভিন্ন উচ্চতর চাকরি পরীক্ষার মান অনুযায়ী প্রশ্ন নির্বাচন।
- অধ্যায়ের গুরুত্ব ও সাম্প্রতিক আলোচিত বিষয়াবলির প্রশ্ন সন্নিবেশ।

প্রফেসর'স প্রকাশন-এর বিসিএস সিরিজের বইগুলো বিগত প্রায় দুই যুগ ধরে পরীক্ষার্থীদের কাছে সাফল্যের চাবিকাঠি হিসেবে বিবেচিত। পূর্বের জনপ্রিয়তা এবং আপনাদের সাফল্যে কার্যকর ভূমিকা রাখতে নতুন সিলেবাস অনুযায়ী প্রণীত আমাদের এ বইগুলোতেও সমাবেশ ঘটানো হয়েছে বহু মেধাবী, সফল ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির অভিজ্ঞতার ছাপ। আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের অন্যান্য বইয়ের মতো এ বইটি আপনাদের সাফল্য অর্জনে যথাযথ সাহায্য করবে। আপনাদের জন্য রইল আমাদের শুভ কামনা, সাফল্য ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রত্যাশা।

Syllabus

BANGLADESH AFFAIRS

Total Marks 200

(For both General and Technical/Professional Cadres)

This paper is designed to cover various issues/topics concerning Bangladesh affairs which include history, geography, environment, society, culture, economy and politics.

The topics/areas that should be covered are stated below :

1. Geography of Bangladesh that should include topographical features of different areas/regions and their developments over time.
2. Demographic features including ethnic and cultural diversity.
3. History and culture of Bangladesh from ancient to recent times.
4. Economy, society, literature and culture of Bangladesh with particular emphasis on developments including Poverty Alleviation, Vision-2021, GNP, NNP, GDP etc. after the emergence of the country.
5. Bangladesh's environment and nature and challenges and prospects with particular emphasis on conservation, preservation and sustainability.
6. Natural resources of Bangladesh with focus on their sustainable harnessing and management.
7. The Constitution of the People's Republic of Bangladesh : Preamble, Features, Directive Principles of State Policy, Constitutional Amendments.
8. Organs of the Government :
   a) Legislature : Representation, Law-making, Financial and Oversight functions: Rules of Procedure, Gender Issues, Caucuses, Parliament Secretariat.
   b) Executive : Chief and Real executive e.g., President and Prime Minister, Powers and Functions; Cabinet, Council of Ministers, Rules of Business, Bureaucracy, Secretariat, Law enforcing agencies; Administrative setup- National and Local Government structures, Decentralization Programmes and Local Level Planning.
   c) Judiciary : Structure : Supreme, High and other Subordinate Courts, Organization, Powers and functions of the Supreme Court, Appointment, Tenure and Removal of Judges, Organization of Sub-ordinate Courts, Separation of Judiciary from the Executive, Judicial Review, Adjudication, Gram Adalat, Alternative Dispute Resolution (ADR).
9. Foreign Policy and External Relations of Banglades : Goals, Determinants and policy formulation process: Factors of National Power; Security Strategies; Geo-Politics and Environment Issues; Economic Diplomacy; Man-power exploitation, Participation in International Organizations: UNO and UN Peace Keeping Missions, NAM, SAARC, OIC, BIMSTEC, D-8 etc. and International Economic Institutions, Foreign Aid, International Trade.
10. Political Parties : Historical development : Leadership: Social Bases; Structure; Ideology and Programmes; Factionalism; Politics of Alliances; Inter and Intra-Party Relations; Electoral Behaviour; Parties in Government and Opposition.
11. Elections in Bangladesh. Management of Electoral Politics : Role of the Election Commission; Electoral Law; Campaigns; Representation of People's Order (RPO); Election Observation Teams.
12. Contemporary Communication; ICT, Role of Media; Right to Information (RTI), and E-Governance.
13. Non-formal Institutions; Role of Civil Society; Interest Groups; and NGOs in Bangladesh.
14. Globalization and Bangladesh : Economic and Political Dimensions; Roles of the WTO, World Bank, IMF, ADB, IDB and other development partners and Multi National Corporations (MNCs).
15. Gender issues and Development in Bangladesh.
16. The Leiberation War and its Background : Language Movement 1952, 1954 Election, Six-Point Movement 1966, Mass Upsurge 1968-69, General Elections 1970, Non-cooperation Movement, 1971, Bangabandhu's Historic Speech of 7th March. Formation and Functions of Mujibnagar government, Role of Major Powers and of the UN, Surrender of Pakistani Army, Bangabandhu's return to liberated Bangladesh. Withdrawal of Indian armed forces from Bangladesh.

চাকরির বাজারে অনন্য সহায়িকা
প্রফেসর'স-এর গ্রন্থমালা

- BCS MCQ Review Series (বিসিএসসহ যে কোনো MCQ পরীক্ষার শ্রেষ্ঠ সহায়িকা)
- বিসিএস প্রিলিমিনারি ডাইজেস্ট
- বিসিএস লিখিত সিরিজ
- বিসিএস লিখিত ডাইজেস্ট
- বিসিএস ভাইভা সহায়িকা
- Job Solution (PSC সহ সব ধরনের নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নাবলী ও সমাধান)
- Bank Math Solution
- English for Competitive Exams. (চাকরি ও ভর্তি পরীক্ষার ইংরেজি সহায়িকা)
- 100 Articles on National & International Issues
- Selected Basic Essays
- Key to Govt. Bank Job
- Key to Private Bank Job
- Bankers Recruitment Text (সকল ব্যাংকে নিয়োগের পরিপূর্ণ টেক্সট)
- Viva For Bank Job
- ইসলামী ব্যাংক নিয়োগ সহায়িকা
- উচ্চতর রচনাসম্ভার
- গণিত স্পেশাল
- সিলেকটেড মডেল টেস্ট (যে কোনো MCQ পরীক্ষা-পূর্ব প্রস্তুতির বিশেষ সহায়িকা)
- পিএসসি নন-ক্যাডার জব (যে কোনো লিখিত নিয়োগ পরীক্ষার সংকলন)
- সাইকোলজিক্যাল অ্যান্ড আই কিউ টেস্ট
- মাধ্যমিক শিক্ষক নিয়োগ সহায়িকা
- প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ সহায়িকা
- বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন
- বেসরকারি প্রভাষক নিবন্ধন
- উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার নিয়োগ
- সহকারী জজ নিয়োগ সহায়িকা
- খাদ্য অধিদপ্তর নিয়োগ সহায়িকা
- স্বাস্থ্য সহকারী নিয়োগ সহায়িকা
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর নিয়োগ
- কমিউনিটি হেলথকেয়ার প্রোভাইডার নিয়োগ
- সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা নিয়োগ সহায়িকা
- পুলিশ সার্জেন্ট ও সাব-ইন্সপেক্টর রিক্রুটমেন্ট টেস্ট
- সিনিয়র স্কেল সহায়িকা

সাধারণ জ্ঞানের সব বিষয়ের আপডেট তথ্য জানতে সঙ্গে রাখুন নির্ভুল এবং সর্বশেষ তথ্যপূর্ণ বই
নতুন বিশ্ব

বিসিএস । বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি । বিভিন্ন চাকরি ও ভাইভাসহ সকল প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের শ্রেষ্ঠ বই

প্রফেসর'স প্রকাশন
Phone : 7125054, 9533029
Web : www.professorsbd.com

সূচি

BCS প্রশ্ন ও সমাধান : ১০ম - ৩৪তম

৩৪তম বিসিএস ২০১৪	০৩
৩৩তম বিসিএস ২০১২	১৫
৩২তম বিসিএস ২০১২ (বিশেষ)	৩১
৩১তম বিসিএস ২০১১	৩৪
৩০তম বিসিএস ২০১১	৩৫
২৯তম বিসিএস ২০১০	৩৭
২৮তম বিসিএস ২০০৯	৩৯
২৭তম বিসিএস ২০০৬	৪৭
২৫তম বিসিএস ২০০৫	৫০
২৪তম বিসিএস ২০০৩	৫৩
২৩তম বিসিএস ২০০১ (বিশেষ)	৫৭
২২তম বিসিএস ২০০১	৬২
২১তম বিসিএস ১৯৯৯	৬৫
২০তম বিসিএস ১৯৯৯	৬৯
১৮তম বিসিএস ১৯৯৮	৭৪
১৭তম বিসিএস ১৯৯৬	৭৮
১৫তম বিসিএস ১৯৯৪	৮০
১৩তম বিসিএস ১৯৯২	৮২
১১তম বিসিএস ১৯৯১	৮৪
১০ম বিসিএস ১৯৯০	৮৬

বাংলাদেশ বিষয়াবলি

অধ্যায় - ০১

বাংলাদেশের ভূগোল : প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ও এর পরিবর্তন
Geography of Bangladesh : Topographical Features & Its Developments

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১. বাংলাদেশকে পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ বলা হয় কেন? সংশ্লিষ্ট ভৌগোলিক তথ্যসমূহ উল্লেখপূর্বক বর্ণনা করুন। *[৩৩তম; ৩২তম বিসিএস]* ০৪

০২. বাংলাদেশের অবস্থান ও ভূপ্রকৃতির বর্ণনা দিন। অর্থনৈতিক কার্যাবলী ও মানুষের জীবনধারায় বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতির প্রভাব আলোচনা করুন। *[৩০তম বিসিএস]*
অথবা, বাংলাদেশের ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করুন। আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে এদের গুরুত্ব আলোচনা করুন। *[২৮তম বিসিএস]* ০৭
অথবা, বাংলাদেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করুন। *[৩৪তম বিসিএস]*

০৩. বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি এবং বাংলাদেশের জলবায়ুতে এর প্রভাব আলোচনা করুন। *[৩০তম বিসিএস]*
অথবা, বিশ্ব উষ্ণায়ন প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে? এই ক্ষতি মোকাবিলায় সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ কি? *[৩০তম বিসিএস]* ১৩
অথবা, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বাংলাদেশে কি কি বিরূপ প্রভাব পড়েছে এবং পড়তে পারে বর্ণনা করে সরকারের গৃহীত প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থার বর্ণনা দিন। *[৩২তম বিসিএস]*

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

০৪. বাংলাদেশের সমাজ-সংগঠনে ভৌগোলিক উপাদানের প্রভাব আলোচনা করুন। ১৮

০৫. গ্রিন হাউস ইফেক্ট কি? ভবিষ্যতে বাংলাদেশে এর কি কি প্রভাব পড়তে পারে এবং তা প্রতিকারের উপায় কি বর্ণনা করুন। ২২

০৬. প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার কতটুকু প্রস্তুত বলে আপনি মনে করেন? বর্তমান অবস্থার উন্নয়নে কি কি পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন— সুপারিশসহ আলোচনা করুন। ২৬

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

০১. বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমারেখা ও অবস্থান বর্ণনা করুন। ৩২
০২. বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতিকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে ও কি কি? ৩২
০৩. বাংলাদেশের ওপর দিয়ে কোন ভৌগোলিক রেখা চলে গেছে? বাংলাদেশের জলবায়ুতে এর গুরুত্ব কি? ৩২
০৪. বাংলাদেশ সীমান্তে ভারতের কয়টি রাজ্য আছে? এগুলোর নাম লিখুন। ৩২
০৫. ছিটমহল সমস্যা কি? দহগ্রাম ছিটমহল কোন জেলায় অবস্থিত? ৩২

অধ্যায়-০২

জনমিতিক বৈশিষ্ট্য : নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য
Demographic Features : Ethnic and Cultural Diversity

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১. ১৮৭১ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত জনগণনাসমূহে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী এ দেশের ডেমোগ্রাফিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন। *[৩৪তম বিসিএস]* ৩৪

০২. বাংলাদেশের জনাধিক্যের কারণ এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের বিষয়গুলো আলোচনা করুন। *[৩২তম বিসিএস]* ৩৭
অথবা, বাংলাদেশের জনাধিক্যের কারণ ও জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের উপায় এবং সরকারি নীতিমালা ও পদ্ধতিসমূহ আলোচনা করুন। *[২০তম বিসিএস]*

০৩. জনসংখ্যা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নতির পথে অন্যতম অন্তরায়—উক্তিটি কি সম্পূর্ণভাবে সঠিক? জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়? *[২৮তম বিসিএস]* ৪২

অথবা, মানবসম্পদ বলতে কি বোঝায়? বাংলাদেশে মানবসম্পদ উন্নয়নে কি কি পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন? বর্তমানে বাংলাদেশের যে জনসংখ্যা তাকে আপনি সম্পদ নাকি বোঝা *(Liability)* হিসেবে দেখেন? *[২৯তম; ১৫তম বিসিএস]*
অথবা, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নতির প্রধান কৌশল হওয়া উচিত জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করা—আলোচনা করুন।

০৪. বাংলাদেশের প্রধান প্রধান উপজাতি কতটি ও কি কি? প্রধান তিনটি উপজাতি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন। *[৩৩তম বিসিএস]* ৪৭

০৫. 'বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ'– আপনি এটা কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন? *[৩২তম বিসিএস]*
অথবা, বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নিয়ে আলোচনা করুন। *[১১তম বিসিএস]* ৫০
অথবা, সংক্ষেপে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্য আলোচনা করুন। *[৩৪তম বিসিএস]*

০৬. বাংলাদেশের হাওর অঞ্চলের প্রধান সমস্যাসমূহ কি কি এবং কিভাবে ঐ এলাকার অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মানের উন্নতি দ্রুততর করা যায়? *[৩১তম বিসিএস]* ৫৪

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

০৭. বাংলাদেশের উপজাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোকপাত করুন। ৫৮

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

০১. সম্প্রদায় ও সাম্প্রদায়িক বলতে কি বুঝায়? *[২৭তম বিসিএস]* ৬২
০২. বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা লিখুন। *[২১তম বিসিএস]* ৬২
০৩. বিগত দুই দশকে বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির প্রভাব আলোচনা করুন। ৬২
০৪. মণিপুরী নাচ কি? ৬৩
০৫. ভাওয়াইয়া কি? ৬৩
০৬. গম্ভীরা কি? ৬৩

অধ্যায়-০৩

বাংলাদেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতি : প্রাচীন থেকে বর্তমান
History & Culture of Bangladesh : Ancient to Present

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১. আওয়ামী মুসলিম লীগের নাম কেন আওয়ামী লীগ করা হয়? কত সালে আওয়ামী লীগ নামকরণ করা হয়? *[৩৩তম বিসিএস]* ৬৫

০২. পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার প্রতিক্রিয়া ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের উদ্ভব সম্বন্ধে আলোচনা করুন। *[২০তম বিসিএস]* ৭০
অথবা, ১৯৪৭ সালের পর হতে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উদ্ভব সম্পর্কে আলোচনা করুন। *[৩২তম বিসিএস]*
অথবা, বাঙালি জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

০৩. বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে সংস্কৃতির অবদান আলোচনা করুন। *[৩৩তম বিসিএস]*
অথবা, বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে বাঙালি সংস্কৃতি কিভাবে প্রাণশক্তি হিসেবে কাজ করছে বর্ণনা করুন। *[৩৪তম বিসিএস]* ৭৪

সূচি

০৪. বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পেছনে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কি কারণ ছিল তা বিশ্লেষণ করুন। *[২৭তম বিসিএস]* ৭৮

০৫. স্বাধীনতা-পূর্ববর্তীকালের তুলনায় স্বাধীন বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নয়নের বিবরণ দিন। *[২৭তম বিসিএস]* ৮৩
অথবা, ১৯৪৭ উত্তর সময়ে বাংলাদেশ অঞ্চলে বাংলা সাহিত্যের যে বিকাশ সাধিত হয়েছে এর বর্ণনা দিন। *[৩৪তম বিসিএস]*

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

০৬. প্রাচীন বাংলার শাসনকাল বর্ণনাপূর্বক বাংলার প্রাচীন জনপদগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন। ৯০

০৭. মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে সম্রাট বাবরের কৃতিত্ব মূল্যায়ন করুন। ৯৩

০৮. সম্রাট আকবরের বাংলা বিজয়ের একটি ধারাবাহিক বর্ণনা উপস্থাপন করুন। ৯৫

০৯. মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণসমূহ বিশ্লেষণ করুন। ৯৮
অথবা, মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণগুলো কি কি? বর্ণনা করুন।

১০. পলাশী যুদ্ধের পটভূমি আলোচনা করুন। পরবর্তী ইতিহাসে এই যুদ্ধের ফলাফল কি হয়েছিল? তা বর্ণনা করুন। ১০০

১১. ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের কারণসমূহ আলোচনা করুন। এটা ব্যর্থ হয়েছিল কেন? ১০২

১২. বাংলাদেশের লোকশিল্প সম্পর্কে আলোকপাত করুন। লোকশিল্প সংগ্রহের গুরুত্ব এবং সংগ্রহের সমস্যার ওপর আলোকপাত করুন। ১০৫

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

০১ বাংলার প্রাচীন জনপদগুলোর নাম লিখুন। ১১২
০২. বার ভূঁইয়াদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? তার রাজধানী কোথায় ছিল? ১১২
০৩. আলীগড় আন্দোলন কি? ১১২
০৪. কে, কখন বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন? ১১২
০৫. কখন বঙ্গভঙ্গ কার্যকরী হয়? বঙ্গভঙ্গ রদের কারণ কি? ১১২
০৬. দ্বি-জাতি তত্ত্ব কি? ১১২
০৭. লোকশিল্পের সংজ্ঞা দিন। *[২৮তম বিসিএস]* ১১৩
০৮. ময়মনসিংহ গীতিকার ওপর আলোচনা করুন। *[১৮তম বিসিএস]* ১১৩
০৯. ম্যাডোনা-৪৩ কি? ১১৩
১০. লালনগীতি কি এবং এর প্রভাবই বা কি? *[১৮তম বিসিএস]* ১১৩
১১. মহাস্থানগড় কি জন্য বিখ্যাত? ১১৪
১২. চরমপত্র খ্যাত ব্যক্তিত্ব কে? ১১৪
১৩. শালবন বিহার কোথায় অবস্থিত? ১১৪
১৪. চর্যাপদ কত সালের মধ্যে রচিত হয়? ১১৪
১৫. লোকসাহিত্যের সংজ্ঞা দিন। ১১৪

সূচি

অধ্যায় - ০৪

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন
Economy, Social, Literature & Culture Development of Bangladesh

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১. সামাজিক অস্থিরতা বলতে কি বোঝায়? বাংলাদেশে সামাজিক অস্থিরতা বৃদ্ধির কারণ ও এর প্রতিকার আলোচনা করুন। *[৩৩তম বিসিএস]* ১১৯
অথবা, বাংলাদেশের সামাজিক অস্থিরতার কারণ উদঘাটন করুন। কিভাবে সামাজিক অস্থিরতা দূর করা সম্ভব বলে আপনি মনে করেন? *[সিনিয়র স্কেল ২০০৫]*

০২. বাংলাদেশে সামাজিক মূল্যবোধের পূর্ণ অবক্ষয় ঘটেছে বলে কি আপনি মনে করেন? এর কারণ ও প্রতিকার সম্পর্কে আপনার মতামত দিন। *[১৭তম বিসিএস]* ১২৩

০৩. দুর্নীতি আমাদের জাতীয় উন্নয়নের অন্যতম প্রধান অন্তরায়। এক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন প্রকৃত কার্যকরি ভূমিকা গ্রহণ করতে পারছে না কেন? *[৩৩তম বিসিএস]* ১২৭
অথবা, 'দুর্নীতি জাতীয় উন্নয়নের অন্যতম প্রধান অন্তরায়।'—আপনি কি এই বক্তব্যের সাথে একমত? আলোচনা করুন। *[২৭তম বিসিএস]*
অথবা, 'দুর্নীতি প্রতিরোধে বহুমুখী ও দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া গ্রহণ জরুরি।' —উক্তিটির ব্যাখ্যা করুন।

০৪. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের গুরুত্ব আলোচনা করুন। এক্ষেত্রে বোয়েসেল *(Bangladesh Overseas Employment and Service Ltd)* ও বায়রা *(Bangladesh Association of International Recruiting Agencies)*-এর ভূমিকা আলোচনা করুন। *[৩৩তম বিসিএস]* ১৩১
অথবা, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে জনশক্তি রপ্তানির ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করুন। এ ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাবলী চিহ্নিত করে তা সমাধানের পথ নির্দেশ করুন।

০৫. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষিখাতের ভূমিকা আলোচনা করুন। ভবিষ্যতে বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থার ধরন কি হতে পারে বলে আপনি মনে করেন? *[২১তম বিসিএস]* ১৩৮
অথবা, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষিখাতের অবদান তুলে ধরুন। কৃষিতে বিদ্যমান সমস্যাগুলো কি? বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে কি কি পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

০৬. বাংলাদেশের বৈদেশিক বিনিয়োগের সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোকপাত করুন। *[১৭তম; ১৮তম; ২৫তম বিসিএস]* ১৪৩

০৭. টেকসই উন্নয়ন বলতে কি বোঝায়? বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়নের অন্তরায়গুলো কি কি? *[৩৩তম বিসিএস]*/১৫০ ১৫০

০৮. খাদ্য নিরাপত্তা বলতে কি বোঝায়? কিভাবে বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়? *[২৮তম বিসিএস]* ১৫৫
অথবা, খাদ্য নিরাপত্তা বলতে কি বোঝেন? খাদ্য নিরাপত্তার ধারণাটি বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করুন।

০৯. সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসমূহ *(MDG)* কি কি এবং তা অর্জনে বাংলাদেশের অনুসৃত কৌশল ও অর্জিত সাফল্যসমূহ আলোচনা করুন। *[৩৩তম (আন্তর্জাতিক); ৩১তম বিসিএস]* ১৬০

১০. বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের সমস্যাসমূহ উপস্থাপন করুন। তৈরি পোশাক শিল্পের সমস্যা থেকে উত্তরণের ক্ষেত্রে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় বলে আপনি মনে করেন? *[৩০তম বিসিএস]* ১৬৩

সূচি

১১. বাংলাদেশে শিল্পায়নের প্রধান প্রধান প্রতিবন্ধকতাসমূহ নিরূপণ করুন। এসব প্রতিবন্ধকতা কিভাবে দূর করা যায় বলে আপনি মনে করেন? *[১১তম; ২২তম; ২৩তম বিসিএস]* ১৬৭

১২. রপ্তানি বাণিজ্যে বাংলাদেশের সাফল্য ও ব্যর্থতা আলোচনা করুন। *[১১তম বিসিএস]* ১৭১

১৩. ইপিজেড কি? ইপিজেড কিভাবে শিল্প উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে? *[৩২তম বিসিএস]* ১৭৬

১৪. অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বলতে কি বোঝায়? বাংলাদেশে গৃহীত বিভিন্ন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা উল্লেখ করুন। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সমস্যা ও সমাধানের পথ চিহ্নিত করুন।
অথবা, বাজার অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রাসঙ্গিকতা, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করুন। *[২৯তম বিসিএস]* ১৭৯

১৫. বাংলাদেশে শেয়ার বাজারের সম্ভাবনা কতটুকু? শেয়ার বাজারে বিদ্যমান সমস্যা কিভাবে দূর করা যায় বলে আপনি মনে করেন? *[৩২তম বিসিএস]* ১৮৪

১৬. জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মৌলিক সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করুন এবং এর সম্ভাব্য প্রতিকারের পরামর্শ দিন। *[৩০তম; ১৭তম বিসিএস]*
অথবা, বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মৌলিক সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করুন এবং এর সম্ভাব্য প্রতিকারের পরামর্শ দিন। *[১৫তম বিসিএস]* ১৮৯

১৭. বাংলাদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে সমস্যাসমূহ ও সুপারিশ আলোচনা করুন। *[২৭তম; ১৫তম বিসিএস; সিনিয়র স্কেল ২০০২]*
অথবা, বাংলাদেশের নিরক্ষরতা ২০২১ সালের মধ্যে দূরকরণে কি কি কৌশল ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে মনে করেন? *[৩২তম বিসিএস]* ১৯৩

১৮. মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় কি পরিবর্তন আনয়ন করা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন।
অথবা, বাংলাদেশে মানবসম্পদ বিকাশে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন। *[৩৪তম বিসিএস]* ১৯৭

১৯. 'শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড'—উক্তিটির ব্যাখ্যা দিন। আপনি কি মনে করেন দেশের প্রয়োজনীয় দক্ষ জনশক্তি উন্নয়নে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা যথেষ্ট? *[২৭তম বিসিএস]* ২০০

২০. জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করুন। এই শিক্ষানীতি বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় কি ধরনের সংস্কার নিশ্চিত করতে পারে? *[৩১তম বিসিএস]*
অথবা, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ নিয়ে আলোচনা করুন। ২০৪

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

২১. বাংলাদেশের বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করুন এবং এর প্রতিকারে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে বিস্তারিত লিখুন। ২০৯

২২. 'স্বাধীনতার চার দশক অতিক্রান্ত হলেও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান রয়েছে'— এ উক্তির পক্ষে-বিপক্ষে আপনার সুচিন্তিত মতামত তুলে ধরুন। ২১৫

২৩. 'একটি দুর্ঘটনাই সারা জীবনের কান্না।'—এ প্রসঙ্গে সড়ক দুর্ঘটনার কারণসমূহ উল্লেখপূর্বক তা সমাধানের উপায় তুলে ধরুন।/২১৯
অথবা, 'নিরাপদ সড়ক চাই।'– এ দাবি বাস্তবায়নে কি কি পদক্ষেপ নেয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন। এ প্রসঙ্গে আপনার মতামত প্রদান করুন। ২১৯

সূচি

২৪. রাজনৈতিক সংস্কৃতি কি? বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক সংস্কৃতি গণতন্ত্র বিকাশে কতটা সহায়ক বলে আপনি মনে করেন?
অথবা, বাংলাদেশে সাম্প্রতিক বিদ্যমান রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণসমূহ উদঘাটন পূর্বক এ থেকে উত্তরণের উপায় আলোচনা করুন। ২২২

২৫. পরিবার পরিকল্পনা বলতে কি বুঝায়? জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে পরিবার পরিকল্পনার গুরুত্ব আলোচনা করুন। ২২৫

২৬. রাজধানীর যানজট সমস্যার কারণ এবং এর উত্তরণে কি কি পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে বলে আপনি মনে করেন? ২২৮

২৭. বাংলাদেশে নগরায়ন সম্পর্কে আলোচনা করুন। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নগরায়নের গুরুত্ব ও নগরায়ণের বিভিন্ন সমস্যার উপর আলোকপাত করুন। ২৩৩

২৮. 'ঢাকা শহরকে প্রকৃতির সাথে সঙ্গতি রেখে পরিচ্ছন্ন, বাসযোগ্য ও আধুনিক ঢাকায় রূপান্তরের রূপরেখা ডিটেইলড এরিয়া প্ল্যান (ড্যাপ)'—এ প্রসঙ্গে ড্যাপের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আলোচনা করুন। ২৩৮

২৯. পল্লী উন্নয়ন ধারণার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ আলোচনা পূর্বক বাংলাদেশের পল্লী উন্নয়ন কৌশলসমূহ আলোচনা করুন। ২৪০

৩০. ভূমি সংস্কার বলতে কি বোঝায়? বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভূমি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করুন। ২৪৪

৩১. অর্পিত সম্পত্তি আইন কি? অর্পিত সম্পত্তি আইনের পটভূমি এবং বাংলাদেশে এই আইনের কথিত বৈধ প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনা করুন। ২৪৮

৩২. 'বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে প্রয়োজন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়ন'—এ উক্তির আলোকে আপনার মতামত প্রদান করুন। ২৫২

৩৩. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে দুর্নীতি কিভাবে বাধাগ্রস্ত করছে? দুর্নীতি দূরীকরণে কি ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণযোগ্য বলে আপনি মনে করেন? ২৫৭

৩৪. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে বেসরকারি বিনিয়োগকে কেন এত গুরুত্ব দেয়া হয়? এরূপ বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ আলোচনা করুন। ২৬০

৩৫. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় কি কি? কিভাবে অন্তরায়সমূহ থেকে উত্তরণ সম্ভব? ২৬৪

৩৬. পোশাক শিল্প কারখানায় অগ্নিকাণ্ড ও ধসের কারণ এবং বিশ্ববাজারে এর প্রভাব আলোচনা করুন। এ থেকে উত্তরণের উপায় নির্দেশ করুন। ২৬৯

৩৭. বাংলাদেশের জাতীয় আয় পরিমাপের পদ্ধতিগুলো কি কি? জাতীয় আয় বৃদ্ধির উপায় আলোচনা করুন।
অথবা, বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের পরিমাপকগুলো কি কি? জাতীয় আয় কিভাবে বৃদ্ধি করা যায় তা আলোচনা করুন। ২৭৩

৩৮. '*GDP*-তে শিল্প খাতের অবদান যথেষ্ট নয়।'—এই উক্তির আলোকে বাংলাদেশের শিল্প খাতে বিদ্যমান সমস্যা ও তা সমাধানে আপনার সুপারিশ তুলে ধরুন। ২৭৬

৩৯. *GDP*-তে কৃষি খাতের অবদান তুলে ধরুন। কৃষির বিদ্যমান সমস্যাগুলো কি? বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে কি কি পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে বলে আপনি মনে করেন? ২৮০

সূচি

৪০. বাংলাদেশের শ্রমিক অসন্তোষের কারণসমূহ কি কি? শ্রমিক অসন্তোষের প্রেক্ষিতে পোশাক শিল্পের ভবিষ্যৎ নিয়ে আপনার মতামত প্রদান করুন। ২৮৫

৪১. বাংলাদেশের চামড়া শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা করুন। ২৮৯

৪২. ভিশন-২০২১ কি? ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিকল্পনাগুলো উল্লেখ করুন। ২৯২

৪৩. পদ্মা সেতু নির্মাণের অর্থনৈতিক গুরুত্ব আলোচনাপূর্বক পদ্মা সেতু বাস্তবায়নের অগ্রগতি বিষয়ে আলোকপাত করুন। পদ্মা সেতু নির্মাণের সাম্প্রতিক পরিস্থিতির বিবরণ দিন। ২৯৫

৪৪. বর্তমান বিশ্বে টেকসই উন্নয়ন প্রক্রিয়া চালু হওয়ায় বাংলাদেশের পদক্ষেপ কি হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন? ২৯৮

৪৫. জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ কি? জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ নির্বাহী কমিটি (একনেক)-এর গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা করুন। ৩০২

৪৬. বাংলাদেশের উন্নয়নে বেসরকারি ব্যাংকের ভূমিকা আলোচনা করুন। ৩০৪

৪৭. বাংলা সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধের প্রভাব আলোচনা করুন।
অথবা, বাংলা সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধের কিরূপ প্রতিফলন ঘটেছে– বিশ্লেষণ করুন। ৩০৮

৪৮. কর্মমুখী শিক্ষা কি? দক্ষ জনশক্তি গঠনে কর্মমুখী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করুন। ৩১৩

৪৯. দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা কতখানি? এক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা আলোচনা করুন। ৩১৬

৫০. সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন কি? মানবসম্পদ উন্নয়নে এর গুরুত্ব আলোচনা করুন। ৩২০

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

০১. বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যাগুলো কি কি? ৩২৭

০২. বেকারত্ব কি? ৩২৭

০৩. সামাজিক অবক্ষয়ের কারণ এবং প্রতিকারের উপায় লিখুন। ৩২৭

০৪. ঢাকা মহানগরের যানজট সমস্যার প্রতিকার কি হতে পারে? ৩২৭

০৫. ঢাকা মহানগরের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সমন্বয় সমস্যা কতটা এবং কেন? ৩২৮

০৬. শহরমুখী গ্রামীণ জনস্রোতের কারণ ও প্রতিকার সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন। ৩২৮

০৭. জিএসপি ও কোটামুক্ত বিশ্ব বলতে কি বোঝেন? ৩২৮

০৮. ভ্যাট (*VAT*) কি? ৩২৮

০৯. হরতালের কারণে আমাদের অর্থনীতি কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়? আলোচনা করুন। ৩২৯

১০. বাংলাদেশে কৃষিক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ কি কি? ৩২৯

১১. কি কারণে বাংলাদেশে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন সম্ভব হয়েছে? ৩৩০

১২. বাংলাদেশের কোথায় সর্বাধিক বোরো ধান উৎপন্ন হয়? ৩৩১

১৩. বাংলাদেশের কোন স্থানে (নির্দিষ্ট স্থানের নাম দিতে হবে) প্রথম চা চাষ করা হয় এবং কোন সনে? ৩৩১

১৪. পিআরএসপি (*PRSP*) কি? ৩৩১

১৫. বাংলাদেশের উন্নয়ন সমস্যা চিহ্নিত করুন। ৩৩১

১৬. ব্যাপক দারিদ্র্যের প্রেক্ষিতে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণে করণীয় কি? ৩৩১

সূচি

১৭. GDP ও GNP কি? ৩৩২

১৮. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সেক্টরে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে এ পর্যন্ত কি কি পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে? ৩৩২

১৯. রাজস্ব বাজেট ও উন্নয়ন বাজেট বলতে কি বোঝেন? সংক্ষেপে আলোচনা করুন। ৩৩২

২০. মোট জাতীয় উৎপাদন (*GNP*) ও মোট দেশজ উৎপাদন (*GDP*)-এর মধ্যে পার্থক্য কি? ৩৩২

২১. বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের বিভিন্ন খাতগুলো কি কি? ৩৩৩

২২. প্রয়োজনীয় কাঁচামালের অভাবই বাংলাদেশের শিল্পায়নের পথে প্রধান অন্তরায়—আপনার মতামত লিখুন। ৩৩৩

২৩. প্রাইভেটাইজেশন কমিশন সম্পর্কে কি জানেন? ৩৩৪

২৪. বাংলাদেশের কোন সরকারি প্রতিষ্ঠান পরিকল্পনা প্রণয়ন করে? ৩৩৪

২৫. অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কাকে বলে? ৩৩৪

২৬. প্রকল্প কি? পূর্বাচল প্রকল্প কোথায় অবস্থিত? ৩৩৪

২৭. মানবসম্পদ বলতে কি বোঝায়? ৩৩৪

২৮. মানবসম্পদ উন্নয়নের উপায় কি? ৩৩৫

২৯. অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন ও জনগণের অংশীদারিত্ব নিশ্চিতকরণে শিক্ষার ভূমিকা কি? ৩৩৫

৩০. বাংলাদেশের পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানকোষের নাম কি? এর সম্পাদক কে? ৩৩৬

৩১. বাংলা সাহিত্যের গবেষণাকারী সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠানের নাম কি? ৩৩৬

৩২. 'বাংলাদেশে স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র' ও 'একুশে ফেব্রুয়ারি' প্রথম সংকলনের সম্পাদক কে? ৩৩৬

৩৩. জাতীয় স্মৃতিসৌধ কোথায় এবং এর স্থপতি কে? ৩৩৬

৩৪. উত্তরা গণভবন কোথায় অবস্থিত? ৩৩৬

৩৫. বাংলা সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতিফলন সম্পর্কে লিখুন। *[২০তম; ২৩তম বিসিএস]* ৩৩৬

৩৬. উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষার সুবিধা-অসুবিধা বিষয়ে আপনার মতামত কি? ৩৩৭

৩৭. বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলা ও ভাস্কর্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতিফলন কতটা? ৩৩৭

৩৮. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কখন গঠিত হয়? ৩৩৭

৩৯. বাংলাদেশে এ পর্যন্ত কয়টি শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি গঠিত হয়েছে? ৩৩৭

৪০. নিরক্ষরতা কি? ৩৩৮

৪১. গ্রেডিং পদ্ধতি কি? ৩৩৮

৪২. NAPE কি এবং কোথায় অবস্থিত? ৩৩৮

অধ্যায়-০৫

বাংলাদেশের পরিবেশ ও প্রকৃতি এবং চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা : রক্ষণাবেক্ষণ, সংরক্ষণ ও টেকসইকরণ

Bangadesh's Environment & Nature and Challenges & Prospects : Conservation, Preservation & Sustainablity

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১. প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিশেষত বন্যা সমস্যা ও এর সম্ভাব্য সমাধান সম্পর্কে আলোচনা করুন। *[২২তম বিসিএস]*
অথবা, বাংলাদেশের বন্যা সমস্যা ও এর সম্ভাব্য সমাধান সম্পর্কে আলোচনা করুন। *[১১তম বিসিএস]* ৩৪০

০২. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও প্রশমনে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে? *[২৮তম বিসিএস]* ৩৪৫

০৩. বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে বাংলাদেশের সাফল্য ও ব্যর্থতা কি? *[৩৪তম বিসিএস]* ৩৪৯

সূচি

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

০৪. 'কৃষির আধুনিকায়ন জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত, কিন্তু জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার পূর্বশর্ত'–ব্যাখ্যা করুন। ৩৫২
০৫. বাংলাদেশের অর্থনীতি ও পরিবেশের ওপর বনায়নের গুরুত্ব সম্পর্কে একটি নিবন্ধ রচনা করুন। ৩৫৬
০৬. বাংলাদেশের পরিবেশ ও অর্থনীতিতে সুন্দরবন ও উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনীর প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করুন। ৩৫৯
০৭. ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প, বাংলাদেশে এর প্রভাব এবং বাংলাদেশের করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করুন।
অথবা, ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পে বাংলাদেশ কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে তা আলোচনা করুন। ৩৬৪
০৮. 'টিপাইমুখ বাঁধ বাংলাদেশের জন্য ভবিষ্যৎ ফারাক্কা'– আলোচনা করুন।
অথবা, টিপাইমুখ বাঁধ ও এর সম্ভাব্য পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করুন। ৩৭০
০৯. বাংলাদেশের পর্যটনশিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা আলোচনা করুন। ৩৭৫
১০. বাংলাদেশে পরিবেশ সংরক্ষণ নীতি কি? পরিবেশ সংরক্ষণে আর কি কি উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে বলে আপনি মনে করেন? ৩৭৯
১১. বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষায় বাংলাদেশের গৃহীত কার্যক্রম আলোচনা করুন। ৩৮২
১২. বাংলাদেশের পরিবেশ ও প্রকৃতি কিরূপ? বাংলাদেশের পরিবেশের চ্যালেঞ্জসমূহ সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। ৩৮৭

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

০১. বিশ্ব পরিবেশ আন্দোলনে বাংলাদেশের ভূমিকা বর্ণনা করুন। *[৩০তম বিসিএস]* ৩৯০
০২. কি কি কারণে বাংলাদেশের পরিবেশ দূষিত হচ্ছে— আলোচনা করুন। ৩৯১
০৩. ম্যানগ্রোভ বন কি? ৩৯২
০৪. বাংলাদেশের জাতীয় বন কোন অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত? এর মোট আয়তন কত? ৩৯২
০৫. দেশের প্রধান নদীসমূহের গতিপথ নিয়ন্ত্রণে রাখতে করণীয় পদক্ষেপ লিখুন। *[২২তম বিসিএস]* ৩৯২
০৬. ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প এবং বাংলাদেশে এর প্রভাব কি? ৩৯২
০৭. আগুনমুখা কি? ৩৯৩
০৮. বাংলাদেশে নদীর তলদেশ পলিতে ভরাট হওয়ায় উদ্ভূত সমস্যা ও সমাধানের ব্যাপারে বক্তব্য রাখুন। ৩৯৩
০৯. বাংলাদেশ-ভারত নদী কমিশন সম্পর্কে কি জানেন? ৩৯৪

অধ্যায়-০৬

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ : টেকসই ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা
Natural Resources of Bangladesh : Sustainable Harnessing & Management

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে জ্বালানি সমস্যা, বিশেষত বিদ্যুৎ সমস্যা কতটুকু অন্তরায় সৃষ্টি করছে? বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানে আশু কি কি পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন? *[২৯তম বিসিএস]* ৩৯৬
০২. বর্তমানে গ্যাস সংকট মোকাবিলায় সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে? সম্প্রতি বাংলাদেশ কর্তৃক সমুদ্র বিজয় এতে কি প্রভাব ফেলবে বলে মনে করেন? *[৩২তম বিসিএস]* ৩৯৮
০৩. পাটের জিনোম ডিকোড উদ্ভাবন বাংলাদেশের পাট চাষ এবং পাটজাত পণ্য উৎপাদনে কি সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছে বলে আপনি মনে করেন। *[৩১তম বিসিএস]* ৪০১

সূচি

০৪. বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ এবং এর উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে আলোকপাত করুন। *[৩০তম বিসিএস]* ৪০৪
০৫. বাংলাদেশে কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যাসমূহ এবং এগুলোর সম্ভাব্য সমাধান সম্পর্কে আলোচনা করুন। *[২০তম; ১৩তম বিসিএস]* ৪০৯
০৬. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে জ্বালানি সেক্টরের ভূমিকা আলোচনা করুন। বাংলাদেশের কি গ্যাস রপ্তানি করা উচিত? *[২৩তম বিসিএস]*
অথবা, বর্তমানে গ্যাস সংকট মোকাবিলায় সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে? সম্প্রতি বাংলাদেশ কর্তৃক সমুদ্র বিজয় এতে কি প্রভাব ফেলবে বলে মনে করেন? *[৩২তম বিসিএস]* ৪১২
০৭. ভূমিহীনদের মাঝে 'খাসজমি' বন্টনের সরকারি নীতিমালা পর্যালোচনা করুন। নিরপেক্ষ বন্টনের জন্য কি কি পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে বলে আপনি মনে করেন? *[২২তম বিসিএস]* ৪১৬
০৮. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নদীর ভূমিকা বর্ণনা করুন। *[৩০তম বিসিএস]* ৪১৮
০৯. পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের সাফল্য-ব্যর্থতা আলোচনা করুন। এ প্রসঙ্গে আর্সেনিকমুক্ত পানি সরবরাহে বাংলাদেশ সরকারের ভূমিকা আলোচনা করুন। *[২৭তম বিসিএস]* ৪২২
১০. বাংলাদেশে জলসেচন কর্মে জলসম্পদের অপচয় সম্পর্কে বিশদভাবে লিখুন। *[৩৪তম বিসিএস]* ৪২৮
১১. বাংলাদেশের কৃষি জমি অকৃষি কাজে স্থানান্তরিত হবার স্বরূপ ও সংকট বিশ্লেষণ করুন। এই সংকট মোচনের উপায়গুলি কি কি? *[৩১তম বিসিএস]* ৪৩০
১২. সংক্ষেপে বাংলাদেশের খনিজসম্পদের বিবরন দিন। *[৩০তম বিসিএস]* ৪৩৩

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

১৩. বাংলাদেশে কয়লা শক্তির মজুদের বিস্তারিত বিবরণ দিন। এ প্রসঙ্গে কয়লার ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করুন। ৪৩৯
১৪. বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে সরকারের ভর্তুকি কি অব্যাহত রাখা উচিত? নাকি আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে মূল্যের সমন্বয় করা উচিত? আপনার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দিন। ৪৪১
১৫. বিকল্প জ্বালানি হিসেবে বাংলাদেশে জৈবগ্যাস প্রযুক্তির সম্ভাবনা ও সুবিধা পর্যালোচনা করুন। ৪৪৪
১৬. 'জ্বালানি নিরাপত্তা : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ' শিরোনামে একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন লিখুন। ৪৪৭
১৭. 'পরমাণু জ্বালানি ও বাংলাদেশ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখুন। ৪৫১
১৮. নবায়নযোগ্য শক্তি কি? বাংলাদেশের নবায়নযোগ্য শক্তিসম্পদের সম্ভাবনা কতটুকু? ৪৫৫

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

০১. কালো সোনা কি? ৪৫৯
০২. রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস (*CNG*) কি? ৪৫৯
০৩. বাংলাদেশের খনিজসম্পদের ওপর আলোকপাত করুন। ৪৫৯
০৪. বাংলাদেশের কোথায় সাদা মাটি পাওয়া যায়? ৪৬০
০৫. বাংলাদেশে কয়টি গ্যাসক্ষেত্র রয়েছে? সবচেয়ে বৃহৎ গ্যাসক্ষেত্র এবং বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত গ্যাসক্ষেত্রের নাম লিখুন। ৪৬০
০৬. বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি কোথায়? ৪৬০
০৭. বাংলাদেশের বৃহৎ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের নাম কি? এটি কোথায় অবস্থিত? ৪৬০

সূচি

অধ্যায়-০৭

বাংলাদেশের সংবিধান : প্রস্তাবনা, বৈশিষ্ট্য, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ও সংবিধানের সংশোধনী
Constitution of Bangladesh : Preamble, Features, Directive Principles of State Policy & Constitutional Amendments

বিগত বিসিএস পরীক্ষায় প্রশ্ন ও উত্তর

০১. ১৯৭২ সালের সংবিধানে বিধৃত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ বর্ণনা করুন। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনের প্রেক্ষিতে কি কি পরিবর্তন সাধিত হয়েছে? *[৩২তম বিসিএস]* ৪৬৩

০২. বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন সম্বন্ধে কি জানেন? ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সংবিধানকে কেন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংবিধান হিসেবে বিবেচনা করা হয়? *[২৩তম বিসিএস]* ৪৬৬

০৩. ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সংবিধানে উল্লিখিত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ বা নির্দেশাত্মক নীতিগুলো আলোচনা করুন। *[৩০তম বিসিএস]* ৪৬৯

০৪. মৌলিক অধিকার বলতে কি বোঝেন? ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ সংবিধানে উল্লিখিত মৌলিক অধিকারসমূহ আলোচনা করুন। মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকারের মধ্যে পার্থক্য কি? *[৩০তম বিসিএস]* *অথবা,* গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান কোন সালের কোন তারিখ হতে কার্যকর হয়? এতে বিধৃত মৌলিক অধিকারসমূহ বর্ণনা করুন। *[২৯তম বিসিএস; ৩৪তম বিসিএস]* ৪৭৩

০৫. বিভিন্ন শাসনামলে সাধিত বাংলাদেশের সংবিধানের সংশোধনীসমূহ আলোচনা করুন। *[১৮তম; ২১তম; ২৪তম বিসিএস]* *অথবা,* বাংলাদেশের সংবিধানের সংশোধনীসমূহ আলোচনা করুন। *[১৩তম বিসিএস]* *অথবা,* বাংলাদেশ সংবিধানের প্রধান সংশোধনীগুলো আলোচনা করুন। *[২৭তম বিসিএস]* ৪৭৬

০৬. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত 'সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী'। — ব্যাখ্যা করুন। *[২৭তম বিসিএস]* ৪৮০

০৭. সংবিধান বলতে কি বুঝায়? বাংলাদেশ সংবিধানের ৪র্থ সংশোধনীর মাধ্যমে কি কি পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল, তা আলোচনা করুন। *[২৭তম বিসিএস]* ৪৮৩

০৮. 'রাষ্ট্রের পছন্দকৃত জীবন পদ্ধতিই সংবিধান।' বাংলাদেশ সংবিধানের সংশোধনীর আলোকে উক্তিটি ব্যাখ্যা করুন। *[২৭তম বিসিএস]* ৪৮৬

০৯. সংবিধান অনুযায়ী অর্থ বিলে কোন বিষয়াবলী সম্বলিত থাকে? কোন মন্ত্রী/মন্ত্রণালয় এটা প্রণয়ন ও অনুমোদন প্রক্রিয়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং এর সার্বিক অনুমোদন প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন। *[২৯তম বিসিএস]* ৪৮৯

১০. ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে কি বোঝেন? বিভিন্ন শাসনামলে এক্ষেত্রে আনীত পরিবর্তনগুলো পর্যালোচনা করুন। *[২২তম বিসিএস]* ৪৯০

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

১১. সংবিধান কাকে বলে? সংবিধান প্রণয়নের পদ্ধতি আলোচনা করুন। বাংলাদেশের সংবিধান কোন পদ্ধতিতে প্রণয়ন করা হয়েছে? ৪৯৪

১২. বাংলাদেশ সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী সম্পর্কে বিস্তারিত লিখুন। ৪৯৬

১৩. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে কি কি সংশোধনী আনা যুক্তিযুক্ত বলে আপনি মনে করেন? ৫০০

সূচি

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

০১. সংবিধানের সংজ্ঞা দিন? *[৩৩তম বিসিএস]* ৫০২

০২. বঙ্গবন্ধু (শেখ মুজিবুর রহমান)-এর প্রতিকৃতি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে? *[৩৩তম বিসিএস]* ৫০২

০৩. বাংলাদেশ সংবিধান কখন প্রণীত হয়? ৫০২

০৪. বাংলাদেশের সংবিধানের চার মূলনীতি কি কি? *[৩৩তম বিসিএস]* ৫০৩

০৫. চতুর্দশ সংশোধনীতে সংবিধানের কোন কোন বিষয় সংশোধন করা হয়? ৫০৩

০৬. পঞ্চদশ সংশোধনীতে সংবিধানের কোন কোন বিষয় সংশোধন করা হয়? ৫০৩

০৭. বাংলাদেশ সংবিধানে কয়টি অনুচ্ছেদ আছে? ৫০৪

০৮. বাংলাদেশ সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি কিরূপ? ৫০৪

০৯. সাংবিধানিকভাবে গঠিত প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার নাম লিখুন। ৫০৪

১০. সংবিধানের প্রথম ও চতুর্থ সংশোধনী সম্পর্কে কি জানেন? ৫০৫

১১. সংবিধানে উল্লিখিত নারী অধিকারগুলো লিখুন। ৫০৫

১২. বাংলাদেশ সংবিধানে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও এখতিয়ার আলোচনা করুন। ৫০৬

১৩. "প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ।" –সংবিধানের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ অনুসরণে ব্যাখ্যা করুন। *[২৮তম বিসিএস]* ৫০৬

১৪. কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তি বলতে কি বোঝায়? সংবিধানের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ অনুসরণে লিখুন। *[২৮তম বিসিএস]* ৫০৭

১৫. গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লব বলতে কি বোঝায়? সংবিধানের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদে বর্ণিত মতে ব্যাখ্যা করুন। *[২৮তম বিসিএস]* ৫০৮

১৬. "কোর্ট অব রেকর্ড" বলতে কি বোঝায়? এ প্রেক্ষিতে সংবিধানের ১১২ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত মতে আলোচনা করুন। *[২৮তম বিসিএস]* ৫০৮

১৭. সুপ্রিমকোর্ট এবং হাইকোর্ট বিভাগের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কি? থাকলে বর্ণনা করুন (সংবিধান অনুসরণে)। প্রধান বিচারপতির নিয়োগ দেন কে? *[২৮তম বিসিএস]* ৫০৮

১৮. বাংলাদেশের অস্থায়ী সংবিধান আদেশ আলোচনা করুন। ৫১০

১৯. বাংলাদেশের গণপরিষদ আদেশ সম্পর্কে আলোচনা করুন। ৫১০

২০. সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনীতে কোন কোন বিষয় সংশোধন করা হয়? ৫১০

অধ্যায়-০৮

সরকারের অঙ্গ-সংগঠন : আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ
Organs of the Goverment : Legislature, Executive & Judiciary

ক. আইন বিভাগ (Legislature)

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১. বাংলাদেশে জাতীয় সংসদের সদস্য হবার যোগ্যতা এবং অযোগ্যতা সম্পর্কে বর্ণনা করুন। সংসদ সদস্যদের আসন কেন এবং কখন শূন্য ঘোষণা করা হয়? *[৩১তম বিসিএস]* ৫১২

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

০২. সরকারের বিভাগসমূহ কি কি? আধুনিক রাষ্ট্রে আইনসভার ক্ষমতা ও কার্যাবলী আলোচনা করুন। ৫১৪

সূচি

০৩. বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলী আলোচনা করুন। ৫১৬
০৪. বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের সমস্যা ও সম্ভাবনা আলোচনা করুন। ৫১৮
০৫. সংবিধানের কোন সংশোধনীর দ্বারা নারীদের জন্য জাতীয় সংসদে আসন সংরক্ষণ করা হয়েছিল এর মূল বক্তব্য কি ছিল? বর্তমান সংসদে নারীদের আসন সংখ্যা কত? এর মেয়াদ কবে শেষ হবে? এ আসন সংরক্ষণ অব্যাহত রাখা কি যুক্তিযুক্ত? আলোচনা করুন। ৫২২

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

০১. বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির অভিশংসন পদ্ধতি কি রূপ? ৫২৭
০২. অর্থবিল কি? ৫২৭
০৩. সংসদের কার্যপদ্ধতির বিবরণ দিন। ৫২৭
০৪. আইন বিভাগ কিভাবে নির্বাহী বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে? ৫২৭
০৫. বাংলাদেশে মোট কতবার গণভোট অনুষ্ঠিত হয়? ৫২৭
০৬. মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকারের পার্থক্য লিখুন। ৫২৮
০৭. বাংলাদেশের আইনসভার নাম কি? ৫২৮
০৮. ককাস কি? ৫২৮

খ. নির্বাহী বিভাগ (Executive)

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১. 'বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী অতিমাত্রায় ক্ষমতার অধিকারী'–এ উক্তির পক্ষে ও বিপক্ষে আপনার বক্তব্য উপস্থাপন করুন। *[৩২তম বিসিএস]*
অথবা, বর্তমানে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলী আলোচনা করুন।
অথবা, বাংলাদেশের বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলী আলোচনা করুন। ৫৩০
০২. সুশাসন বলতে কি বুঝায়? সুশাসনের সাথে দুর্নীতি দমনের কোনো সম্পর্ক আছে কি? সুশাসন প্রতিষ্ঠায় মৌলিক বিষয়গুলো কি কি– আলোচনা করুন। *[২৮তম বিসিএস]*
অথবা, 'সুশাসন জনপ্রশাসনের জন্য একটি নব্য সংস্কৃতি'— প্রত্যয়টি ব্যাখ্যাপূর্বক সুশাসন-এর উপরে বিস্তারিত আলোচনা করুন। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের সাফল্য-ব্যর্থতা আপনার সুপারিশসহ আলোচনা করুন। *[২৯তম বিসিএস]*
অথবা, সুশাসন জনপ্রশাসনের একটি সর্বগৃহীত বৈশিষ্ট্য হিসেবে স্বীকৃত। বিষয়টি ব্যাখ্যাপূর্বক সুশাসন-এর উপরে বিস্তারিত আলোচনা করুন। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের সাফল্য ব্যর্থতা এবং আপনার মতামত বর্ণনা করুন। *[৩৪তম বিসিএস]* ৫৩৩
০৩. বাংলাদেশে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে এ ব্যবস্থা বাতিলের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করুন। *[২৯তম বিসিএস]* ৫৩৭
০৪. স্থানীয় সরকার পর্যায়ে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ব্যতীত সত্যিকার অর্থে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ সম্ভব নয়— বিশ্লেষণ সহকারে ব্যাখ্যা করুন। *[৩২তম বিসিএস]*
অথবা, বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ সম্পর্কে যা জানেন লিখুন। ৫৪০
০৫. কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে স্থানীয় সরকারের সম্পর্ক সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কি হওয়া উচিত? *[৩১তম বিসিএস]* ৫৪৪
০৬. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের দুর্বল দিকগুলো উল্লেখ করুন। *[৩১তম বিসিএস]* ৫৪৬

সূচি

০৭. উপজেলা পদ্ধতির ভালো-মন্দ দিকগুলো উল্লেখ করুন। উপজেলা পদ্ধতির স্থানীয় সরকার পুনরায় চালু করা উচিত কিনা যুক্তি সহকারে আলোচনা করুন। *[২৪তম বিসিএস]*
অথবা, প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ কি? উপজেলা পদ্ধতির ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলো তুলে ধরে এর বাস্তবায়নে আপনার মতামত তুলে ধরুন। ৫৪৮
০৮. স্থানীয় সরকার বলতে কি বোঝেন? দেশে কয়টি স্থানীয় সরকার গঠন এবং কোন স্তরে কি কি ক্ষমতা ও দায়িত্ব থাকা সমীচীন বলে আপনি মনে করেন? *[১৮তম বিসিএস]*
অথবা, স্থানীয় সরকারকে আরও কার্যকর করার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট পরামর্শ দিন। *[২৭তম বিসিএস]*
অথবা, গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার গুরুত্ব কতটুকু? সংক্ষেপে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বর্ণনা দিন। *[২৯তম বিসিএস]* ৫৫১
০৯. বাংলাদেশে প্রশাসনিক সংস্কারের আবশ্যকতা কত দূর? এক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়সমূহ দূরীকরণে আপনার সুপারিশ আলোচনা করুন। *[২০তম বিসিএস]*
অথবা, বাংলাদেশের প্রশাসন ব্যবস্থাকে একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার উপযোগী করে তুলতে হলে কি করা উচিত বলে আপনি মনে করেন? ৫৫৬

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

১০. নির্বাহী বিভাগ বা শাসন বিভাগের ক্ষমতা ও কার্যাবলী আলোচনা করুন।
অথবা, আধুনিক রাষ্ট্রে নির্বাহী বিভাগের ক্ষমতা ও কার্যাবলী আলোচনা করুন। ৫৬১
১১. বাংলাদেশের আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাসমূহ কি কি? দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় বাংলাদেশ পুলিশের ভূমিকা বর্ণনা করুন। ৫৬৩
১২. বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা, ক্ষমতা ও কার্যাবলী আলোচনা করুন। ৫৬৭
১৩. বাংলাদেশের উন্নয়নে আমলাতন্ত্রের ভূমিকা বর্ণনা করুন। ৫৭০
১৪. বর্তমানে কয়টি স্তরে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে? গ্রামীণ উন্নয়নে স্থানীয় সরকারের ভূমিকা আলোচনা করুন। ৫৭২
১৫. স্থানীয় সরকার বলতে কি বোঝায়? বাংলাদেশের সংবিধানে স্থানীয় সরকার সম্পর্কে কি বলা হয়েছে? গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও সুশাসনের জন্য স্থানীয় সরকারের ভূমিকা আলোচনা করুন। ৫৭৬
১৬. বাংলাদেশের প্রশাসনিক সংস্কার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন। ৫৮০

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

০১. রাষ্ট্রপতি কখন অধ্যাদেশ (Ordinance) জারি করেন? ৫৮৫
০২. বাংলাদেশে প্রথম কখন জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়? ৫৮৫
০৩. প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল সম্পর্কে কি জানেন? ৫৮৫
০৪. বিশেষ ক্ষমতা আইন চালু রাখার যৌক্তিকতা কি? ৫৮৬
০৫. রুলস অব বিজনেস কি? ৫৮৬
০৬. মহামান্য রাষ্ট্রপতি পদাধিকার বলে কোন কোন সংস্থার প্রধান? *[৩৩তম বিসিএস]* ৫৮৬
০৭. প্রশাসনিক স্বচ্ছতা কি? ৫৮৬
০৮. বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোর বর্ণনা দিন। ৫৮৬
০৯. বাংলাদেশ সচিবালয়ের পদবিন্যাস কিরূপ? ৫৮৭
১০. বাংলাদেশে বর্তমানে কয় স্তরবিশিষ্ট স্থানীয় সরকার রয়েছে? ৫৮৭

সূচি

১১. গ্রাম আদালত কি? ৫৮৭
১২. উপজেলা পদ্ধতি সম্পর্কে কি জানেন? ৫৮৮
১৩. স্থানীয় সরকারে নারীর অংশগ্রহণ নারীর ক্ষমতায়নে কতটুকু সহায়ক? ৫৮৮
১৪. প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ বলতে কি বোঝেন? *[২৭তম বিসিএস]* ৫৮৯
১৫. বাংলাদেশের জনপ্রশাসন সম্পর্কে যা জানেন লিখুন। ৫৮৯
১৬. স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার কি? ৫৮৯
১৭. পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ সম্পর্কে কি জানেন? ৫৮৯

গ. বিচার বিভাগ (Judiciary)

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১. সংবিধানের অনুচ্ছেদ উল্লেখপূর্বক সুপ্রিম কোর্টের প্রতিষ্ঠা, এর গঠন, কার্যপ্রণালী ও এখতিয়ার আলোচনা করুন। *[২৯তম বিসিএস]* ৫৯০

০২. বিচার বিভাগ ও নির্বাহী বিভাগ কি? এ বিভাগসমূহের দায়িত্ব আলোচনা করুন। বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা রক্ষার শর্তসমূহ কি কি? *[২৮তম বিসিএস]*
অথবা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে কি বুঝায়? বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা রক্ষার শর্ত কি? *[২৭তম বিসিএস]*
অথবা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে কি বোঝায়? বিচার বিভাগের স্বাধীনতা কিভাবে রক্ষা করা যায়? ৫৯৩

০৩. সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকারের বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ করা দরকার বলে কি আপনি মনে করেন? বিশ্লেষণ করুন। *[২৫তম বিসিএস]*
অথবা, নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথককরণ সম্পর্কে আপনার মতামত লিখুন। আপনি কি মনে করেন নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথককরণ প্রয়োজন? *[১৮তম বিসিএস]* ৫৯৮

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

০৪. গ্রাম আদালত কি? গ্রাম এলাকায় বিরোধ ও বিবাদ নিষ্পত্তিতে গ্রাম্য আদালতের ভূমিকা বর্ণনা করুন।
অথবা, গ্রাম আদালতের সংজ্ঞা দিন। গ্রাম এলাকায় বিরোধ ও বিবাদ নিষ্পত্তিতে গ্রাম আদালতের বিচার প্রক্রিয়া আলোচনা করুন। ৬০০

০৫. বাংলাদেশে বিচারপতিদের নিয়োগ প্রক্রিয়া, যোগ্যতা, মেয়াদকাল ও অপসারণ পদ্ধতি বর্ণনা করুন। ৬০৩

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

০১. সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিল কি? ৬০৬
০২. বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের গঠন কিরূপ? ৬০৬
০৩. হেবিয়াস কার্পাস কি? ৬০৬
০৪. বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের সর্বোচ্চ শাস্তি কি? ৬০৬
০৫. অ্যামিকাস কিউরি বলতে কি বোঝেন? ৬০৬
০৬. রাষ্ট্রপতির রেফারেন্স কাকে বলে? ৬০৭
০৭. মহামান্য রাষ্ট্রপতি কাদেরকে শপথবাক্য পাঠ করান? *[৩৩তম বিসিএস]* ৬০৭
০৮. বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (*ADR*) কি? ৬০৭
০৯. গ্রাম আদালত কি? ৬০৮

সূচি

অধ্যায় - ০৯

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি ও বহিঃসম্পর্ক
Foreign Policy & External Relation of Bangladesh

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১. বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও রেমিটেন্স আয়বর্ধনে বাংলাদেশের বর্তমান সাফল্য এবং তা ধরে রাখার জন্য ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জের চিত্র তুলে ধরুন। *[৩১তম বিসিএস]* ৬১০

০২. বৈদেশিক নীতি কি? বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন সাধিত হয় তা আলোচনা করুন। *[২১তম বিসিএস]*
অথবা, পররাষ্ট্রনীতি বলতে কি বোঝায়? আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশ কি কি ভূমিকা নিতে পারে বলে মনে করেন? বর্ণনা করুন। *[২৮তম বিসিএস]*
অথবা, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করুন। *[৩৩তম; ১৩তম বিসিএস]*
অথবা, পররাষ্ট্রনীতি বলতে কি বুঝায়? বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূলনীতিগুলোর বর্ণনা দিন। *[২৭তম বিসিএস]*
অথবা, বৈদেশিক নীতি কি? বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি বা পররাষ্ট্রনীতির উদ্দেশ্য ও বিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করুন। ৬১৩

০৩. 'সার্ক ও বাংলাদেশ' শিরোনামে একটি নিবন্ধ রচনা করুন। *[৩০তম; ১৫তম বিসিএস]*
অথবা, সার্কের প্রতিষ্ঠা, উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম এবং বাংলাদেশের ভূমিকা আলোচনা করুন।
অথবা, আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তুতে 'সার্ক' (*SAARC*)-এর গুরুত্ব ও অর্জন কতটুকু? আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সার্ক (*SAARC*)-এর আওতায় কি কি করা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন? *[২৯তম বিসিএস]*
অথবা, 'আঞ্চলিক দেশসমূহের উন্নয়নে সার্কের ভূমিকা অপরিহার্য।' আলোচনা করুন। *[২৫তম বিসিএস]* ৬১৯

০৪. রাষ্ট্রীয় সমুদ্রসীমা কিভাবে নির্ধারিত হয়? সমুদ্র সংলগ্ন উপকূলীয় রাষ্ট্রের সমুদ্র অধিকারগুলো কি কি? এ প্রেক্ষাপটে গভীর সমুদ্রে বাংলাদেশের তেল-গ্যাস সম্পদ প্রতিবেশী দেশ ভারত-মিয়ানমার থেকে কতটুকু নিরাপদ? আলোচনা করুন। *[৩০তম বিসিএস]* ৬২৫

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

০৫. বাংলাদেশ-মিয়ানমার সমুদ্রসীমা নির্ধারণী মামলার রায়ের প্রেক্ষাপটের বিবরণ দিন এবং এ মামলার রায় বিশ্লেষণ করুন। ৬৩০

০৬. রোহিঙ্গা সমস্যা উদ্ভবের কারণ উল্লেখপূর্বক সমাধানের উপায় নির্দেশ করুন। মিয়ানমার থেকে বিতাড়িত রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে আশ্রয় দেয়া উচিত বলে মনে করেন কি? ৬৩৬

০৭. জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ সম্পর্ক আলোচনা করুন। ৬৪১

০৮. জাতিসংঘ ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করুন। ৬৪৭

০৯. বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের বিভিন্ন দিক আলোচনা করে এক্ষেত্রে বিদ্যমান বিবদমান ইস্যুগুলো চিহ্নিত করুন।
অথবা, সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের বিস্তারিত আলোচনা করুন।
অথবা, বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের সাম্প্রতিক গতিবিধি ব্যাখ্যা করুন এবং বিদ্যমান বিবদমান ইস্যুগুলো চিহ্নিত করুন। ৬৫১

সূচি

১০. বৈদেশিক সাহায্য কি? বাংলাদেশ কি কি উপায়ে বৈদেশিক সাহায্য আসে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন। ৬৫৫

১১. বাংলাদেশ বর্তমানে যেসব আন্তর্জাতিক সংস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে তার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করুন। ৬৫৭

১২. এ পর্যন্ত জাতিসংঘের কতটি শান্তিরক্ষী মিশন গঠিত হয়েছে? বর্তমানে বাংলাদেশ কোন কোন মিশনে শান্তিরক্ষায় কাজ করছে? ৬৬১

১৩. জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশনে বাংলাদেশের সফলতা আলোচনা করুন। ৬৬৫

১৪. স্বাধীনতা-উত্তরকাল থেকে সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অর্জনগুলো সম্পর্কে আলোচনা করুন। ৬৬৯

১৫. অভ্যন্তরীণ নানামুখী প্রতিবন্ধকতার পাশাপাশি বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের জন্য চ্যালেঞ্জসমূহের বর্ণনা দিন। ৬৭২

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

০১. বাংলাদেশ কখন জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে? ৬৭৬
০২. কত সালে সার্ক গঠিত হয়? এর উদ্যোক্তা কে? ৬৭৬
০৩. বাংলাদেশ কখন সিডও সনদ স্বাক্ষর করে? ৬৭৬
০৪. অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের মহাসচিবের নাম কি? ৬৭৬
০৫. বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার ও মার্কিন রাষ্ট্রদূতের নাম লিখুন। ৬৭৬
০৬. বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূলনীতিগুলো কি? ৬৭৭
০৭. জাতিসংঘে বাংলাদেশের ভূমিকা লিখুন। ৬৭৭
০৮. বাংলাদেশের আসিয়ান (*ASEAN*) জোটে অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয়তা লিখুন। ৬৭৭
০৯. জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের ভূমিকা লিখুন। ৬৭৮

অধ্যায়-১০

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল
Political Parties in Bangladesh

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১. 'সরকারি দলের সহনশীলতা ও বিরোধী দলের দায়িত্বশীলতা উভয়ই গণতন্ত্র বিকাশের জন্য অপরিহার্য।'—যুক্তিসহ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আলোচনা করুন। *[২৪তম বিসিএস]* *অথবা,* বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও গণতন্ত্র বিকাশে সরকারি ও বিরোধী দলের ভূমিকা আলোচনা করুন। ৬৮০

০২. গণতান্ত্রিক পরিবেশ উন্নয়নে রাজনৈতিক দলসমূহের ভূমিকা কি হওয়া উচিত? গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি চর্চায় সিভিল-সেনাবাহিনী সম্পর্ক কতটা প্রয়োজনীয়? আলোচনা করুন। *[৩১তম বিসিএস]* ৬৮৩

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

০৩. সংসদীয় রাজনীতিতে সরকারি দল ও বিরোধী দলের ভূমিকা এবং এক্ষেত্রে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর আচরণ সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ রচনা লিখুন। ৬৮৬

০৪. 'বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি দেশীয় উন্নয়নে সহায়ক নয়'—উক্তিটির পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি প্রদান করুন। ৬৯১

সূচি

০৫. স্বাধীনতা-উত্তর বিভিন্ন সময়ে কারা কিভাবে এ দেশে অবৈধ উপায়ে ক্ষমতা দখল করেছিল তা বর্ণনা করুন। ভবিষ্যতে এরূপ অসাংবিধানিক প্রক্রিয়া বন্ধের কার্যকর পদক্ষেপ সম্পর্কে আলোচনা করুন। ৬৯৩

০৬. জোট রাজনীতি কি? বাংলাদেশে জোট রাজনীতির বৈশিষ্ট্যাবলি বর্ণনা করুন। ৬৯৮

০৭. কোয়ালিশন সরকার বলতে কি বুঝায়? বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকট দূরীকরণে কোয়ালিশন সরকারের গঠন নিয়ে আপনার মতামত উপস্থাপন করুন। ৭০২

০৮. বাংলাদেশের প্রধান কয়েকটি রাজনৈতিক দলের আদর্শ ও কার্যাবলী বর্ণনা করুন। ৭০৪

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

০১. বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির সাম্প্রতিক প্রবণতা সম্পর্কে লিখুন। ৭১১
০২. বাংলাদেশের দলব্যবস্থাকে কি দ্বিদলীয় বলা যায়? ৭১১
০৩. গণতন্ত্র বিকাশে রাজনৈতিক দলসমূহের ভূমিকা লিখুন। ৭১২
০৪. রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা কি? ৭১২
০৫. বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংহতির সমস্যাগুলো তুলে ধরুন। ৭১৩
০৬. অসাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় ক্ষমতা দখল বন্ধের কার্যকর পদক্ষেপগুলো কি হতে পারে? ৭১৪

অধ্যায়-১১

বাংলাদেশের নির্বাচন
Elections in Bangladesh

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১. অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে কমিশনের ভূমিকা কি? বাংলাদেশে নির্বাচন কমিশনের দুর্বল দিকগুলো আলোচনা করুন। *[৩৩তম বিসিএস]* ৭১৬

০২ সংবিধানের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন গঠন ও এর কার্যাবলী আলোচনা করে এতে কোনো পরিবর্তন সুপারিশ করেন কি? *[৩২তম বিসিএস]* *অথবা,* বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা করুন। একে অধিকতর কার্যকর করতে আপনার প্রস্তাবনা উপস্থাপন করুন। ৭১৯

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

০৩. নির্বাচনী আইন কি? জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। ৭২২

০৪. বাংলাদেশের নির্বাচনের ক্ষেত্রে নির্বাচন পর্যবেক্ষক দলসমূহের ভূমিকা উল্লেখ করুন। ৭২৫

০৫. গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও) কি? ২০১৩ সালে পাসকৃত 'গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) বিল ২০১৩' এর উল্লেখযোগ্য ধারাগুলো আলোচনা করুন। ৭২৯

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

০১. বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন কতজন সদস্য নিয়ে গঠিত? বর্তমান নির্বাচন কমিশনের নাম কি? .. ৭৩২
০২. সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসমূহ কি কি? ৭৩২
০৩. নির্বাচন কমিশনের দায়িত্বাবলি বর্ণনা করুন। ৭৩২
০৪. সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর পর জাতীয় নির্বাচনকালে সরকারের রূপরেখা লিখুন? ৭৩৩
০৫. নির্বাচন কমিশনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারদের কে নিয়োগ প্রদান করেন? এ পদগুলোকে সাংবিধানিক পদ বলা হয় কেন? ৭৩৩

সূচি

অধ্যায়-১২

সমকালীন যোগাযোগ
Contemporary Communication

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১. দারিদ্র্য বিমোচন ও মানবসম্পদ উন্নয়নে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন? এক্ষেত্রে শিক্ষা ও তথ্যপ্রযুক্তির ভূমিকা মূল্যায়ন করুন।
অথবা, বাংলাদেশের মানবসম্পদ উন্নয়নে তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষার গুরুত্ব নিরূপণ করুন। *[২৮তম বিসিএস]* ৭৩৫

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

০২. 'তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলা ভাষার ব্যবহার জীবনকে করেছে সহজ'— আলোচনা করুন। ৭৩৯
০৩. বাংলাদেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও দায়বদ্ধতা কিরূপ? সংবাদপত্রের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখপূর্বক সমাজজীবনে এর স্বাধীনতার বিরূপ প্রভাব নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করুন। ৭৪৩
০৪. জনগণের ক্ষমতায়নে তথ্য অধিকার আইনের ভূমিকা বর্ণনা করুন। ৭৪৮
০৫. ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে সরকারের এ পর্যন্ত গৃহীত পদক্ষেপসমূহ আলোচনা করুন।
অথবা, ডিজিটাল বাংলাদেশ বলতে কি বোঝায়? ডিজিটাল বাংলাদেশ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন। ৭৫১
০৬. ব্লগ কি? ব্লগের প্রকারভেদ আলোচনাপূর্বক ব্লগার হওয়ার নিয়মসহ বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে ব্লগিং ধারণা সম্পর্কে আলোচনা করুন। ৭৫৬
০৭. আউটসোর্সিং বা ফ্রি ল্যান্সিং কি? বাংলাদেশে এই খাতের সম্ভাবনা উল্লেখপূর্বক এর সমস্যাগুলো চিহ্নিত করুন। ৭৫৮

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

০১. ICT এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে লিখুন। ৭৬২
০২. সরকারের চতুর্থ অঙ্গ হিসেবে বাংলাদেশের সংবাদ মাধ্যম কি ধরনের ভূমিকা পালন করছে? ৭৬২
০৩. তথ্য অধিকার কি? ৭৬৩
০৪. ই-গর্ভনেন্স কি? ৭৬৩

অধ্যায়-১৩

অনানুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান : সুশীল সমাজ, স্বার্থবাদী গোষ্ঠী ও বাংলাদেশের এনজিও
Non-formal Institutions : Civil Society, Interest Group & NGO in Bangladesh

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১. NGO কি? বাংলাদেশের মানবাধিকার ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে NGO-এর ভূমিকা আলোচনা করুন। *[৩০তম বিসিএস]*
অথবা, বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এনজিও'র ভূমিকা আলোচনা করুন। *[৩০তম বিসিএস]*
অথবা, "বাংলাদেশের গ্রামীণ উন্নয়নে এনজিও'র ভূমিকা" প্রসঙ্গে বাস্তবভিত্তিক আলোচনা করুন। ৭৬৫
০২. বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রমে এনজিওদের ভূমিকা লিখুন। *[৩১তম বিসিএস]* ৭৬৯

সূচি

০৩. সিভিল সোসাইটির বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখুন। সিভিল সোসাইটির সাথে সরকারের সম্পর্ক কি হওয়া উচিত? বর্ণনা করুন। *[৩১তম বিসিএস]*
অথবা, সিভিল সোসাইটি কি? এর বৈশিষ্ট্যসমূহসহ লিখুন। বাংলাদেশে সিভিল সোসাইটির সঠিক রূপ, কার্যক্রম এবং সরকারের সাথে এর সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা করুন এবং এর কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা বাংলাদেশে কি হতে পারে বলে আপনি মনে করেন তাও উল্লেখ করুন। *[৩৪তম বিসিএস]* ৭৭২
০৪. বাংলাদেশে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে সুশীল সমাজের ভূমিকা আলোচনা করুন। *[২৭তম বিসিএস]*
অথবা, বাংলাদেশে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটি নিবন্ধ রচনা করুন। *[১৫তম বিসিএস]* ৭৭৪
০৫. সুশাসন বলতে কি বোঝায়? বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অন্তরায়সমূহ আলোচনা করুন। *[৩০তম বিসিএস]* ৭৭৭

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

০৬. বাংলাদেশে কর্মরত একটি এনজিও'র সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মসূচি পর্যালোচনা করুন।
অথবা, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে 'ব্র্যাক'-এর ভূমিকা পর্যালোচনা করুন। ৭৮২
০৭. 'এনজিওরা দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন নয়, জনগণকে বাঁচিয়ে রেখে শোষণ করে'— এ বক্তব্যের আলোকে এনজিওদের উন্নয়ন কার্যক্রম মূল্যায়ন করুন। ৭৮৬

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

০১. NGO কি? ৭৮৯
০২. বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এনজিওর ভূমিকা কি? ৭৮৯
০৩. পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) কি? ৭৮৯
০৪. এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কি? ৭৯০
০৫. ব্র্যাক (BRAC) কি? ৭৯০
০৬. ব্র্যাকের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যগুলো কি কি? ৭৯০
০৭. কেয়ার (CARE) কি? ৭৯১
০৮. অন্যান্য বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর সাথে গ্রামীণ ব্যাংকের পার্থক্য কি? ৭৯২
০৯. সুশীল সমাজ বলতে কি বোঝেন? *[২৭তম বিসিএস]* ৭৯২

অধ্যায়-১৪

বিশ্বায়ন ও বাংলাদেশ
Globalization and Bangladesh

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১. বাংলাদেশে ঋণপ্রদানে আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক ও এডিবির সমধর্মী শর্তগুলো কি কি? শর্তযুক্ত ঋণ পরিহার করা সম্ভব কি? যৌক্তিক পরামর্শ দিন। *[৩১তম বিসিএস]*
অথবা, বাংলাদেশে ঋণ প্রদানে আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক ও এডিবির সমধর্মী শর্তগুলো কি কি? সকল শর্তই কি পরিহার করতে পারলে তা পরিহার করা উচিত এবং শর্তগুলো সঠিক বা আংশিক জনস্বার্থের অনুকূল কি? মতামত দিন। *[৩৪তম বিসিএস]* ৭৯৪
০২. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (IMF) ভূমিকা পর্যালোচনা করুন। *[৩০তম বিসিএস]* ৭৯৮

০৩. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB)-এর ভূমিকা পর্যালোচনা করুন। *[৩০তম; ২৭তম বিসিএস]* ৮০২

০৪. বাংলাদেশের সাথে অন্যান্য দেশের কতটি আঞ্চলিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি আছে? বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি নিরসনে আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তিগুলো কি ধরনের ভূমিকা রাখতে পারে? আলোচনা করুন। *[৩১তম বিসিএস]* ৮০৪

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

০৫. মুক্তবাজার অর্থনীতি সম্পর্কে বিশদ আলোচনাপূর্বক বাংলাদেশে এর গ্রহণযোগ্যতা তুলে ধরে করণীয় কি আলোকপাত করুন। ৮০৬

০৬. সারা বিশ্বে মুক্ত ও উদার বাণিজ্য নীতি প্রবর্তনে বাংলাদেশের শিল্প হুমকির সম্মুখীন হতে পারে। এ পরিস্থিতি মোকাবিলায় কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত—আলোচনা করুন। ৮১১

০৭. বাংলাদেশের পণ্য বাণিজ্যে বিপুল ঘাটতি কমানোর কার্যকর পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করুন। ৮১৫

০৮. উন্নত রাষ্ট্রগুলো বাংলাদেশে উন্নয়ন ও বিনিয়োগের নামে আধিপত্য বিস্তার করছে—আলোচনা করুন। ৮১৯

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

০১. আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF) কি? ৮২৪
০২. আইএমএফ-এর গঠন ও ব্যবস্থাপনা বর্ণনা করুন। ৮২৪
০৩. আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ব্যাংক (IBRD) বা বিশ্বব্যাংক কি? ৮২৪
০৪. বিশ্বব্যাংকের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী লিখুন। ৮২৫
০৫. এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB) কি? ৮২৬
০৬. এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী লিখুন। ৮২৬
০৭. ভাসমান মুদ্রা বা ফ্লোটিং এক্সচেঞ্জ রেট বলতে কি বোঝেন? ৮২৭
০৮. বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের সমস্যাগুলো লিখুন। ৮২৭
০৯. বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের সমস্যা ও সম্ভাব্য করণীয় কি? ৮২৭
১০. কোটামুক্ত বিশ্বে তৈরি পোশাক শিল্পের অবস্থা পর্যালোচনা করুন। ৮২৮
১১. শুল্কমুক্ত বিশ্ব বলতে কি বোঝেন? ৮২৯
১২. বাংলাদেশ পুঁজি বিনিয়োগ সংস্থা (ISB) সম্পর্কে কি জানেন? ৮২৯
১৩. সাফটা চুক্তি বাস্তবায়নে বাংলাদেশের কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত? ৮২৯
১৪. বহুজাতিক সংস্থা কি? ৮৩০

অধ্যায়-১৫

বাংলাদেশের জেন্ডার ইস্যু ও উন্নয়ন
Gender Issues and Development in Bangladesh

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১. বাংলাদেশের নারীর ক্ষমতায়নে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ সংক্ষেপে উল্লেখ করুন। গৃহীত পদক্ষেপগুলো CEDAW (Convention on the Elimination of Discrimination Against Women) সনদকে সমর্থন করে কি? *[৩১তম বিসিএস]*
অথবা, নারীর ক্ষতায়ন বলতে কি বুঝায়? এ কার্যক্রমে কি কি ব্যবস্থা ফলপ্রসূ অবদান রাখতে পারে বলে মনে করেন? সুপারিশসহ লিখুন। *[২৮তম বিসিএস]* ৮৩২

০২. বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়নের প্রধান সীমাবদ্ধতা ও প্রতিকারসমূহ আলোচনা করুন। *[১৭তম বিসিএস]* ৮৩৪

০৩. নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপসমূহে সংবিধান ও ধর্ম প্রণীত নারীর অধিকারসমূহের কতটুকু বাস্তবায়ন হয়েছে বলে আপনি মনে করেন। *[২৫তম বিসিএস]*
অথবা, সাম্প্রতিক নারী মুক্তি আন্দোলন এবং নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ মূল্যায়ন করুন। *[১০ম বিসিএস]* ৮৩৯

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

০৪. বাংলাদেশে নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সমস্যা ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সম্পর্কে আলোচনা করুন। ৮৪৪

০৫. নারী নির্যাতন বলতে কি বোঝায়? নারী নির্যাতনের ধরন উল্লেখপূর্বক ইভটিজিং-এর কারণ ও প্রতিকার বর্ণনা করুন। ৮৪৭

০৬. বর্তমানে বাংলাদেশে নারী সহায়তাকল্পে কি কি পদক্ষেপ বিদ্যমান রয়েছে? জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১-তে নারীর রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতায়নের উপর কিরূপ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে? ৮৫১

০৭. বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উত্থান ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নারীর অবদান মূল্যায়ন করুন। ৮৫৪

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

০১. সার্বিক উন্নয়নে নারীর ক্ষমতায়নের ভূমিকা লিখুন। *[২৭তম বিসিএস]* ৮৫৮
০২. বাংলাদেশের নারীসমাজের এগিয়ে যাওয়ার প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে লিখুন। ৮৫৮
০৩. জাতি গঠনে নারীসমাজের ভূমিকা লিখুন। ৮৫৮
০৪. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে নারীসমাজের ভূমিকা লিখুন। ৮৫৯
০৫. বাংলাদেশের নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণের প্রতিবন্ধকতাগুলো কি কি? ৮৫৯
০৬. জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১-এর লক্ষ্যসমূহ কি কি? ৮৬০
০৭. বাংলাদেশের প্রথম নারী স্পিকার কে? ৮৬০

অধ্যায়-১৬

মুক্তিযুদ্ধ এবং এর পটভূমি
The Liberation War & Its Background

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১. 'বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়' শিরোনামে একটি নিবন্ধ রচনা করুন। *[১১তম বিসিএস]*
অথবা, ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন এবং ১৯৭১-এর স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র রয়েছে— আলোচনা করুন।
অথবা, ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন বাঙালির সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণ ও আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের বীজ বপনে কি ভূমিকা রেখেছিল? *[৩১তম বিসিএস]* ৮৬৩
অথবা, 'ভাষা আন্দোলনই ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি।'—উক্তরের সপক্ষে মতামত প্রদান করুন।

০২. বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে ছয় দফা কর্মসূচির ভূমিকা ও গুরুত্ব মূল্যায়ন করুন। *[১৩তম বিসিএস]* ৮৬৬

সূচি

০৩. বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে ভাষা আন্দোলন ও ছয় দফা কর্মসূচির ভূমিকা আলোচনা করুন। *[১৮তম বিসিএস]*
অথবা, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিভিন্ন পর্যায়ের ওপর আলোকপাত করুন। *[২৮তম বিসিএস]*
অথবা, বাংলাদেশের জনগণের স্বাধীনতার স্পৃহা, ক্রমবিকাশমান স্বাধীনতার চেতনা, রাজনৈতিক সংগঠন, ১৯৪৭ হতে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ পর্যন্ত এবং বিশেষভাবে ২৬ মার্চ ১৯৭১ এর ঘটনাপ্রবাহ সমন্বিত করে কিভাবে স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটলো তা বর্ণনা করুন। *[২৯তম বিসিএস]* ৮৭০
অথবা, সংক্ষেপে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি বর্ণনা করুন। মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি রচনায় ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব কতটুকু? সংক্ষেপে ভাষা আন্দোলনের পটভূমি ব্যাখ্যা করুন। *[২৯তম বিসিএস]*

০৪. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের বৈরী মনোভাবের কারণ কি ছিল? আমাদের পররাষ্ট্রনীতির মূল বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন। *[৩৩তম বিসিএস]*
অথবা, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পরাশক্তির ভূমিকা আলোচনা করুন। ৮৭৬
অথবা, স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে বিশ্ব সমাজের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করুন। *[৩০তম বিসিএস]*

০৫. জনগণের নেতা বলতে কি বোঝায়? বিশ্বের অন্য আরো অন্তত ২ জন নেতার সাথে তুলনা করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জননেতা এবং সফল স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতীক হিসেবে বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করুন। *[২৯তম বিসিএস]* ৮৮১

০৬. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের এগারটি সেক্টরের অবস্থান ও সেক্টর কমান্ডারদের নাম লিখুন। *[৩০তম বিসিএস]* ৮৮৪

০৭. যুদ্ধাপরাধ কি? যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য কয়টি ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছে? যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের যৌক্তিকতা বর্ণনা করুন। *[৩৩তম বিসিএস]* ৮৮৮

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

০৮. বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের পটভূমি আলোচনা করুন এবং সেই সাথে বাংলা ভাষার বিশ্বায়ন সম্পর্কে আলোচনা করুন। ৮৯৫

০৯. ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা উল্লেখ করুন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয়ের কারণ কী? ৮৯৬

১০. ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের কারণ ও ফলাফল আলোচনা করুন।
অথবা, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের এবং স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ভূমিকা আলোচনা করুন। ৮৯৯

১১. ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফল ও গুরুত্ব আলোচনা করুন। ৯০৬

১২. ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ কেন অপরিহার্য ছিল? এ যুদ্ধে কি প্রমাণিত হয়েছিল? ৯০৯

১৩. বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের মূল বিষয়বস্তুর আলোচনা করুন। ৯১৩

১৪. মুজিবনগর সরকারের গঠন প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন। ৯১৬

১৫. মুজিবনগর সরকারের কার্যাবলী আলোচনা করুন। ৯১৮

১৬. বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করুন। ৯২১

১৭. বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রত্যাহার কার্যক্রম আলোচনা করুন। ৯২৩

সূচি

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

০১. লাহোর প্রস্তাব কি? এটি কে উত্থাপন করেন? ৯২৭
০২. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে কোন দল জয়ী হয়? ৯২৭
০৩. ভাষা আন্দোলন/অমর একুশে কি? ৯২৭
০৪. '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন। ৯২৮
০৫. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে কয়টি ব্রিগেড গঠিত হয়? ৯২৯
০৬. স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে বিশ্ব জনমতের ভূমিকা কি ছিল? ৯২৯
০৭. অসহযোগ আন্দোলন ১৯৭১ সম্পর্কে লিখুন। ৯২৯
০৮. মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের ভূমিকা বিশ্লেষণ করুন। ৯৩০

টীকা

০১. বাংলাদেশের ভূগোল : প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ও এর পরিবর্তন

- ডিজিটাল ভূ-প্রাকৃতিক মানচিত্র ৯৩১
- ছিটমহল ৯৩১
- দহগ্রাম-আঙ্গরপোতা ছিটমহল ও করিডোর ৯৩২
- সীমান্ত বিরোধ খাদ্য ৯৩২
- দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ ৯৩৩
- ভূমিকম্প ও বাংলাদেশ ৯৩৪

০২. জনমিতিক বৈশিষ্ট্য : নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য

- স্বাস্থ্যনীতি *[৩০তম বিসিএস]* ৯৩৪
- পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি *[২৯তম বিসিএস]* ৯৩৫
- সম্প্রদায় ও সাম্প্রদায়িক *[২৭তম বিসিএস]* ৯৩৬
- জনবিজ্ঞান *[২৭তম বিসিএস]* ৯৩৬
- জুমচাষ *[১৭তম ও ১০ম বিসিএস]* ৯৩৬
- জাতীয় গৃহায়ন নীতি ১৯৯৩ *[১৭তম বিসিএস]* ৯৩৭
- গারো উপজাতি *[১৩তম বিসিএস]* ৯৩৭
- চাকমা উপজাতি *[১১তম বিসিএস]* ৯৩৮
- জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে নারী সমাজ ৯৩৮
- রোহিঙ্গা সমস্যা ৯৩৯
- শ্রমশক্তি : জরিপ ২০১৩ .... ৯৩৯
- জনসংখ্যা ও বাংলাদেশ ৯৪০
- বাংলাদেশের জনসংখ্যা সুবিধা ও বোনাস যুগ ৯৪০
- জনসংখ্যা সুবিধার দিক ৯৪১
- জনসংখ্যা সুবিধার চ্যালেঞ্জ ৯৪১

সূচি

০৩. বাংলাদেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতি : প্রাচীন থেকে বর্তমান

- রামসাগর *[৩৩তম বিসিএস]* ৯৪১
- হযরত খান জাহান আলী (র) *[৩৩তম বিসিএস]* ৯৪২
- জাতীয় প্রতীক *[৩১তম বিসিএস]* ৯৪৩
- লালন শাহ *[৩১তম বিসিএস]* ৯৪৩
- তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা *[৩১তম বিসিএস]* ৯৪৩
- বাংলা একাডেমি *[৩০তম বিসিএস]* ৯৪৪
- জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ *[২৯তম বিসিএস]* ৯৪৫
- ওয়ারি-বটেশ্বর *[২৮তম বিসিএস]* ৯৪৫
- ঢাকাই মসলিন *[১৭তম বিসিএস]* ৯৪৬
- আহসান মঞ্জিল *[১৫তম বিসিএস]* ৯৪৬
- জাতীয় আর্কাইভস *[১৫তম বিসিএস]* ৯৪৭
- ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব (১৯৪০) *[১৩তম বিসিএস]* ৯৪৭
- পাহাড়পুর *[১১তম বিসিএস]* ৯৪৮
- ময়নামতি *[১১তম বিসিএস]* ৯৪৮
- ষাটগম্বুজ মসজিদ *[১১তম বিসিএস]* ৯৪৮
- নবাব সলিমুল্লাহ *[১১তম বিসিএস]* ৯৪৯
- লালমাই পাহাড় *[১০ম বিসিএস]* ৯৪৯
- দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা ৯৪৯
- চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ৯৫০
- অসহযোগ আন্দোলন ৯৫০
- ফরায়েজী আন্দোলন ৯৫০
- বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি ৯৫১
- বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (BKSP) ৯৫১
- বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর ৯৫২
- অমর একুশে বইমেলা ৯৫৩
- ২১'র জাতিসংঘ স্বীকৃতি ৯৫৩
- লোকগীতি *[৩৪তম বিসিএস]* ৯৫৪
- ললিতকলা *[৩৪তম বিসিএস]* ৯৫৪
- নগরসভ্যতা *[৩৪তম বিসিএস]* ৯৫৪
- জাতীয় সংস্কৃতি *[৩১তম বিসিএস]* ৯৫৫
- মানব পতাকার বিশ্ব স্বীকৃতি ৯৫৫
- গিনেজ বুকে সোনার বাংলা ৯৫৫

সূচি

০৪. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাহিত্যবিষয়ক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন

- ডেসটিনি ২০০০ লি. *[৩৩তম বিসিএস]* ৯৫৬
- হলমার্ক গ্রুপ লি. *[৩৩তম বিসিএস]* ৯৫৬
- আয়কর মেলা *[৩৩তম বিসিএস]* ৯৫৬
- ষষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা *[৩১তম বিসিএস]* ৯৫৬
- উৎসে আয়কর *[৩১তম বিসিএস]* ৯৫৭
- সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (PPP) *[৩১তম ও ২৯তম বিসিএস]* ৯৫৮
- জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিলের নির্বাহী কমিটি (ECNEC) *[৩০তম বিসিএস]* ৯৫৯
- জাতীয় শিশু দিবস *[৩০তম বিসিএস]* ৯৫৯
- খাদ্য নিরাপত্তা *[২৯তম বিসিএস]* ৯৬০
- রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা *[২৯তম ও ১১তম বিসিএস]* ৯৬১
- দুর্নীতি দমন কমিশন *[২৯তম বিসিএস]* ৯৬১
- দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র *[২৯তম বিসিএস]* ৯৬১
- জাতীয় আয়কর দিবস *[২৯তম বিসিএস]* ৯৬২
- সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য *[২৮তম বিসিএস]* ৯৬২
- আর্সেনিক সমস্যা *[২৮তম বিসিএস]* ৯৬৩
- সমাজ *[২৭তম বিসিএস]* ৯৬৩
- জিএনপি *[৩৪তম; ২৭তম বিসিএস]* ৯৬৪
- গার্মেন্ট শিল্পপার্ক ৯৬৪
- জিএসপি ৯৬৫
- ট্রেড ইউনিয়ন ৯৬৫
- তৃতীয় জাতীয় শ্রমনীতি ৯৬৬
- বাংলাদেশের সবুজ অর্থনীতি ৯৬৬
- স্বাস্থ্য খাতের নতুন পঞ্চবার্ষিক কর্মসূচি ৯৬৭
- জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ .... ৯৬৭
- উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ৯৬৮
- ইভটিজিং ৯৬৮
- কালো টাকা ৯৬৯
- রূপকল্প ২০২১ .... ৯৬৯
- কাব্যসাহিত্য *[৩৪তম বিসিএস]* ৯৬৯
- বাজার অর্থনীতি *[২৯তম বিসিএস]* ৯৭০
- কুমিল্লা মডেল *[১৭তম বিসিএস]* ৯৭০
- আইসিডিডিআর,বি *[১১তম বিসিএস]* ৯৭০
- জাতীয় অর্থনীতিতে হরতালের প্রভাব ৯৭১
- পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক ৯৭১
- সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ৯৭১

সূচি

০৫. বাংলাদেশের পরিবেশ ও প্রকৃতি এবং চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা : রক্ষণাবেক্ষণ, সংরক্ষণ ও টেকসইকরণ

- সামাজিক বনায়ন *[২৮তম বিসিএস]* ৯৭২
- ঘূর্ণিঝড় 'মহাসেন' ৯৭৩
- ভয়াবহতম ভবন ধস ও সাভার ট্রাজেডি ৯৭৩
- হাওর মহাপরিকল্পনা ৯৭৩
- কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত ৯৭৪
- সেন্টমার্টিন দ্বীপ ৯৭৪
- ম্যানগ্রোভ অরণ্য *[৩৪তম বিসিএস]* ৯৭৫
- বিপন্ন প্রাণীকুল *[৩৪তম বিসিএস]* ৯৭৫
- পর্ণমোচি বৃক্ষের বন *[৩৪তম বিসিএস]* ৯৭৫
- স্পারসো (SPARRSO) *[১৭তম বিসিএস]* ৯৭৬
- তামাক নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা ২০১৫ পাস ৯৭৬

০৬. বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ : টেকসই ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা

- ফ্লাড অ্যাকশন প্ল্যান (FAP) *[১৭তম বিসিএস]* ৯৭৯
- গঙ্গা-কপোতাক্ষ *[১০ম বিসিএস]* ৯৭৯
- নিরাপদ পানি ৯৭৭
- তিতাস গ্যাসক্ষেত্র *[৩৪তম বিসিএস]* ৯৭৮
- ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশন *[১৫তম বিসিএস]* ৯৭৮
- বাংলাদেশের সমুদ্র জয় ৯৭৮
- জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ৯৭৯
- প্রথম পানি জাদুঘর ৯৭৯

০৭. বাংলাদেশের সংবিধান

- ন্যায়পাল *[৩৩তম, ৩২তম, ৩০তম ও ২৮তম বিসিএস]* ৯৮০
- সার্বভৌমত্ব *[২৭তম বিসিএস]* ৯৮০
- মানবাধিকার *[২৭তম বিসিএস]* ৯৮১
- সংযুক্ত তহবিল *[৩২তম, ৩০তম ও ২৯তম বিসিএস]* ৯৮১
- ধর্মীয় স্বাধীনতা *[৩২তম বিসিএস, ৩১তম ও ২৮তম বিসিএস]* ৯৮১
- সম্পূরক মঞ্জুরি *[৩২তম, ৩১তম ও ২৮তম বিসিএস]* ৯৮২
- অর্থ বিল *[৩২তম, ৩০তম, ২৯তম ও ২৮তম বিসিএস]* ৯৮২
- সম্পত্তির অধিকার *[৩১তম বিসিএস]* ৯৮২
- প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল *[৩১তম বিসিএস]* ৯৮৩
- গ্রেফতার ও আটক সম্পর্কে রক্ষাকবচ *[৩০তম বিসিএস]* ৯৮৩

সূচি

- গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লব *[৩০তম বিসিএস]* ৯৮৪
- সাংবিধানিক সংস্থা *[৩০তম বিসিএস]* ৯৮৪
- প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব *[২৯তম বিসিএস]* ৯৮৫
- সুযোগের সমতা *[২৮তম বিসিএস]* ৯৮৫
- চুক্তি ও দলিল *[২৮তম বিসিএস]* ৯৮৫
- পদের শপথ *[২৮তম বিসিএস]* ৯৮৫
- নাগরিকত্ব *[২৮তম বিসিএস]* ৯৮৫
- জনশৃঙ্খলা রক্ষা *[২৮তম বিসিএস]* ৯৮৬
- সংবিধান প্রণয়নের ইতিহাস ৯৮৬
- সংবিধান প্রণয়ন কমিটি ৯৮৭
- প্রথম সংশোধনী ৯৮৭
- দ্বিতীয় সংশোধনী ৯৮৭
- তৃতীয় সংশোধনী ৯৮৮
- চতুর্থ সংশোধনী ৯৮৮
- পঞ্চম সংশোধনী ৯৮৮
- ষষ্ঠ সংশোধনী ৯৮৮
- সপ্তম সংশোধনী ৯৮৯
- অষ্টম সংশোধনী ৯৮৯
- নবম সংশোধনী ৯৮৯
- দশম সংশোধনী ৯৯০
- একাদশ সংশোধনী ৯৯০
- দ্বাদশ সংশোধনী *[১৫তম বিসিএস]* ৯৯০
- ত্রয়োদশ সংশোধনী ৯৯১
- চতুর্দশ সংশোধনী ৯৯২
- পঞ্চদশ সংশোধনী ৯৯৩
- ষোড়শ সংশোধনী ৯৯৪

০৮. সরকারের অঙ্গ-সংগঠন : আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ

ক. আইন বিভাগ

- এসিড অপরাধ দমন আইন ৯৯৪
- সংসদীয় কার্যাবলি *[৩১তম বিসিএস]* ৯৯৫
- বাংলাদেশের প্রথম নারী স্পীকার ৯৯৬
- ব্লাসফেমি আইন ৯৯৬
- গণপরিষদ ৯৯৭

সূচি

খ. শাসন বিভাগ

- রাষ্ট্রপতির দায়মুক্তি *[৩২তম ও ২৮তম বিসিএস]* ৯৯৭
- রাষ্ট্রপতির অভিশংসন *[৩১তম বিসিএস]* ৯৯৮
- অধ্যাদেশ *[৩০তম বিসিএস]* ৯৯৮
- নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার *[২৯তম বিসিএস]* ৯৯৯
- মন্ত্রিসভা *[২৯তম ও ২৮তম বিসিএস]* ১০০০
- জরুরি অবস্থা *[২৮তম বিসিএস]* ১০০০
- ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণ *[২৭তম বিসিএস]* ১০০০
- আমলাতন্ত্র *[২৭তম বিসিএস]* ১০০১
- স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা *[২৭তম বিসিএস]* ১০০১
- পিএটিসি (PATC) *[১৭তম বিসিএস]* ১০০২
- উপজেলা পরিষদ *[১১তম বিসিএস]* ১০০২
- পিপার স্প্রে ১০০৩

গ. বিচার বিভাগ

- সুপ্রিম কোর্টের আসন *[২৮তম বিসিএস]* ১০০৩
- এটর্নি জেনারেল *[২৮তম বিসিএস]* ১০০৩
- গ্রাম সরকার *[১৩তম বিসিএস]* ১০০৪
- বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (ADR) ১০০৪

০৯. বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি ও বহিঃসম্পর্ক

- সার্কের সাফল্য *[২৭তম বিসিএস]* ১০০৫
- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) ১০০৬
- টেকসই উন্নয়ন ও বাংলাদেশ ১০০৬
- টিকফা ১০০৭
- শান্তির সংস্কৃতি ১০০৭
- বাংলাদেশ-ভারত নৌ ট্রানজিট চুক্তি ১০০৮
- ঢাকায় BIMSTEC সচিবালয় ১০০৮
- IPU'র প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ ১০০৯
- CPA'র চেয়ারপার্সন বাংলাদেশ ১০০৯

১০. বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলসমূহের গঠন, আদর্শ ও ভূমিকা

- বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ১০১০
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ১০১০
- জাতীয় পার্টি ১০১১
- বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ১০১২

সূচি

- জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) ১০১৩
- বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি ১০১৪
- বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ১০১৪

১১. বাংলাদেশের নির্বাচন

- নির্বাচন কমিশন ১০১৪
- নির্বাচনী আইন ১০১৫
- নির্বাচন পর্যবেক্ষক দল ১০১৫
- গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও) ১০১৬

১২. সমকালীন যোগাযোগ

- মানবসম্পদ উন্নয়ন ও তথ্যপ্রযুক্তি *[৩০তম বিসিএস]* ১০১৭
- বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (BCSIR) *[৩০তম বিসিএস]* ১০১৮
- এশিয়ান হাইওয়ে *[২৮তম বিসিএস]* ১০১৮
- যমুনা সেতু প্রকল্প *[১১তম বিসিএস]* ১০১৯
- মেট্রোরেল প্রকল্প ১০১৯
- বেশতো : প্রথম বাংলা সামাজিক মাধ্যম ১০২০
- বিকল্প গণমাধ্যম ব্লগিং ১০২০
- নতুন বাংলা ইউনিকোড ১০২১
- জাতিসংঘ রেডিও বাংলা ১০২১
- কান্ট্রি ব্র্যান্ডিং ও বিউটিফুল বাংলাদেশ ১০২২
- বাংলাদেশের প্রথম স্যাটেলাইট ১০২৩
- পদ্মা সেতু ১০২৩
- ই-পেমেন্ট ১০২৪
- শিক্ষা বিস্তারে গণমাধ্যম ১০২৪
- নিরাপদ সড়ক ১০২৫
- বাংলাদেশে মোবাইল ব্যাংকিং ১০২৬
- জাতীয় ই-তথ্যকোষ ১০২৬
- প্রিন্টমিডিয়া *[৩৪তম বিসিএস]* ১০২৭
- ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার ১০২৭
- সাইবার ক্রাইম ট্রাইব্যুনাল ১০২৭
- বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন ১০২৮

১৩. অনানুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান : সুশীল সমাজ, স্বার্থবাদী গোষ্ঠী ও বাংলাদেশের এনজিও

- সুশীল সমাজ *[৩৪তম বিসিএস]* ১০২৯
- NGO *[২৮তম বিসিএস]* ১০২৯

সূচি

১৪. বিশ্বায়ন ও বাংলাদেশ
- বাংলাদেশে এডিবি-এর ভূমিকা *[২৭তম বিসিএস]* ১০২৯

১৫. বাংলাদেশের জেন্ডার ইস্যু ও উন্নয়ন
- নারী শিক্ষা ১০৩০
- নারীর ক্ষমতায়ন *[২৭তম বিসিএস]* ১০৩১
- নারী নির্যাতন ১০৩২

১৬. মুক্তিযুদ্ধ ও এর পটভূমি
- ভাষা আন্দোলন/অমর একুশ ১০৩২
- ছয় দফা কর্মসূচি ১৯৬৬ *[২৮তম বিসিএস]* ১০৩৩
- একুশ দফা ১০৩৪
- আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ১০৩৫
- ঐতিহাসিক এগার দফা ১০৩৫
- '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান ১০৩৫
- '৭০-এর সাধারণ নির্বাচন ১০৩৬
- অপারেশন সার্চলাইট ১০৩৬
- অস্থায়ী সরকার/মুজিবনগর সরকার ১০৩৭
- বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ *[৩১তম বিসিএস]* ১০৩৭
- অসমাপ্ত আত্মজীবনী ১০৩৮
- যুদ্ধাপরাধ ১০৩৮
- কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার ১০৩৮
- মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ ১০৩৯
- শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ ১০৩৯
- অপরাজেয় বাংলা ১০৩৯
- শাবাশ বাংলাদেশ ১০৪০
- জাতীয় স্মৃতিসৌধ ১০৪০

মডেল প্রশ্ন ও উত্তর

- মডেল টেস্ট-০১ .... ১০৪২
- মডেল টেস্ট-০২ .... ১০৪৩
- মডেল টেস্ট-০৩ .... ১০৪৪
- মডেল টেস্ট-০৪ .... ১০৪৫
- মডেল টেস্ট-০৫ .... ১০৪৭

৩৫তম বিসিএস

BCS প্রশ্ন ও উত্তর

৩৪তম বিসিএস ২০১৪
৩৩তম বিসিএস ২০১২
৩২তম বিসিএস ২০১২
৩১তম বিসিএস ২০১১
৩০তম বিসিএস ২০১১
২৯তম বিসিএস ২০১০
২৮তম বিসিএস ২০০৯
২৭তম বিসিএস ২০০৬
২৫তম বিসিএস ২০০৫
২৪তম বিসিএস ২০০৩
২৩তম বিসিএস ২০০১
২২তম বিসিএস ২০০১
২১তম বিসিএস ১৯৯৯
২০তম বিসিএস ১৯৯৯
১৮তম বিসিএস ১৯৯৮
১৭তম বিসিএস ১৯৯৬
১৫তম বিসিএস ১৯৯৪
১৩তম বিসিএস ১৯৯২
১১তম বিসিএস ১৯৯১
১০ম বিসিএস ১৯৯০

BCS প্রশ্ন ও উত্তর

৩৪তম বিসিএস ২০১৪

বাংলাদেশ বিষয়াবলি-প্রথম পত্র

সময় : ৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ১০০

[দ্রষ্টব্য : প্রার্থীদিগকে ১ নং থেকে ৬ নং প্রশ্নের মধ্য হতে চারটি এবং অবশিষ্ট প্রশ্নের যে কোনো চারটির উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।] নম্বর

১. ১৮৭১ সাল হতে ২০০১ সাল পর্যন্ত জনগণনাসমূহে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এ দেশের ডেমোগ্রাফিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন। ১৫

উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৩৪।

২. বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে বাঙালি সংস্কৃতি কিভাবে প্রাণশক্তি হিসেবে কাজ করেছে? বর্ণনা করুন। ১৫

উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৭৪।

৩. ১৯৪৭ উত্তর সময়ে বাংলাদেশ অঞ্চলে বাংলা সাহিত্যের যে বিকাশ সাধিত হয়েছে এর বর্ণনা দিন। ১৫

উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৮৩।

৪. বাংলাদেশে জলসেচন কর্মে জলসম্পদের অপচয় সম্পর্কে বিশদভাবে লিখুন। ১৫

উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৪২৮।

৫. বাংলাদেশে মানবসম্পদ বিকাশে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন। ১৫

উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ১৯৭।

৬. বাংলাদেশের অর্থনীতির বিকাশের জন্য এ যাবত গৃহীত কৌশল ও নীতিসমূহের সমালোচনামূলক পর্যালোচনা করুন। ১৫

উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ১৭৯।

৭. টীকা লিখুন (যে কোনো পাঁচটি) : ২×৫ =১০

ক. GNP

একটি নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে একটি দেশে মোট যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা উৎপাদিত হয় তার অর্থমূল্যকে মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP—Gross National

Product) বলে। মোট জাতীয় উৎপাদনের মধ্যে বিদেশে অবস্থানরত দেশী নাগরিকদের দ্বারা সৃষ্ট উৎপাদন বা আয় অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু দেশে অবস্থানরত বিদেশী নাগরিক কর্তৃক সৃষ্ট উৎপাদন বা আয় মোট জাতীয় উৎপাদনে ধরা হয় না। অর্থাৎ মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) = মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন + বিদেশে দেশীয় নাগরিকদের আয় – দেশে বিদেশী নাগরিকদের আয়। মোট জাতীয় উৎপাদন বা জিএনপির প্রবৃদ্ধির হার একটি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থানের প্রাথমিক নির্দেশক। মোট জাতীয় উৎপাদন মূলত দুই দিক থেকে বিবেচনা করা যায়। যথা– ১. ব্যয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে এবং ২. আয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে। ব্যয়ের দিক থেকে জিএনপি হলো চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবার উপর ব্যয়ের যোগফল। যেমন : ক. ভোগ ব্যয়, খ. বিনিয়োগ ব্যয়, গ. সরকারের ক্রয়/ব্যয়, ঘ. রপ্তানি/বিদেশীদের ক্রয়। অন্যদিকে আয়ের দিক থেকে জিএনপি হলো নিম্নোক্ত উপাদানসমূহের যোগফল– ক. শ্রমিক ও উদ্যোক্তার মজুরি ও বেতন, খ. অর্থনৈতিক খাজনা, গ. মূলধন ব্যবহারের জন্য প্রদত্ত সুদ, ঘ. অর্জিত মুনাফা, ঙ. পরোক্ষ কর, চ. মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি বাবদ বা ব্যবহারজনিত এলাউন্স, ছ. হস্তান্তর পাওনা।

খ. লোকগীতি

লোকসংগীত বা লোকগীতি বাংলা লোকসাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। এসব লোকসংগীতের মধ্যে গ্রামবাংলার আবেগ-অনুভূতি, তাদের দুঃখ-বেদনা-আনন্দ লুকিয়ে আছে। এসব গানের সুরের মূর্ছনা এখনও আমাদের পাগল করে।

মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে
আমি আর বাইতে পারলাম না।
আবার বিরহের গান, যেমন—
বিদেশ গিয়া বন্ধু তুমি আমায় ভুইলো না
কিংবা হালকা রসের গান–
বন্ধু তিনদিন তোর বাড়িত গেলাম
দেখা পাইলাম না। বন্ধু তিন দিন–

এসব গান আমাদের মনকে নাড়া দেয়। এরপর রয়েছে বাংলার জারি, সারি, মুর্শিদি, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, বাউল, গাজীর গান। এগুলো লোকসাহিত্যের ভাণ্ডারকে করেছে সমৃদ্ধ। দীর্ঘদিন ধরে এসব রচনা লোকচিত্তে আনন্দের সামগ্রী হয়ে রস যুগিয়ে আসছে।

গ. প্রিন্টমিডিয়া

প্রায় প্রতিটি দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের ভূমিকা অপরিসীম। গণমাধ্যমকে রাষ্ট্রের তৃতীয় স্তম্ভ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সঠিক গণতন্ত্র চর্চায় গণমাধ্যমের কোনো বিকল্প নেই। একই সঙ্গে ব্যাপক সংখ্যক জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমই হলো গণমাধ্যম। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাহিত্য ও দর্শন, শিক্ষা-দীক্ষা, ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন ও বিস্তারে গণমাধ্যম অনবদ্য ভূমিকা পালন করে। গণমাধ্যমকে দুভাগে ভাগ করা হয়। ১. প্রিন্টমিডিয়া ও ২. ইলেকট্রনিক মিডিয়া। বর্তমানে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়ছে। কিন্তু প্রিন্ট মিডিয়ার ইতিহাস অনেক পুরোনো এবং সমান জনপ্রিয়। ছাপার অক্ষরে কাগজ, বই ম্যাগাজিন, সাময়িকী আকারে যেসব সংবাদপত্র প্রকাশ হয় তাকেই প্রিন্টমিডিয়া বলে। দৈনিক পত্রিকা যেমন- প্রথম আলো, যুগান্তর, ইত্তেফাক প্রভৃতি হলো প্রিন্ট মিডিয়া। তেমনিভাবে সাপ্তাহিক, অর্ধ-সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈ-মাসিক, ষান্মাসিকসহ বিভিন্ন ধরনের পত্রিকা, সাময়িকী যা ছাপার অক্ষরে বের হয় তাও প্রিন্টমিডিয়া।

ঘ. ললিতকলা

গীতবাদ্য বা নৃত্য, চিত্রাঙ্কন, সাহিত্য রচনা বিশেষ করে কাব্য-নাটকাদি প্রভৃতি চারুকলা বা চারুকলা বা চারুশিল্পের অধীন। ললিতকলা একটি শিল্পকলা, যার মধ্যে রয়েছে সংগীত, আবৃত্তি, অভিনয়, নৃত্য ইত্যাদি। বহু সুধীনজনের মতে ললিতকলা চারু ও কারুকলার অন্তর্ভুক্ত। ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত পাঁচটি ললিতকলা হলো– ১. অঙ্কন, ২. ভাস্কর্য, ৩. স্থাপত্য, ৪. সংগীত ও ৫. কাব্য (যার মধ্যে রয়েছে মঞ্চনাটক এবং নৃত্য)।

অঙ্কন ও চিত্রকলাকে বলা যায় বস্তু-আশ্রিত মানস ফসল। যেমন– আলপনা, পটচিত্র, ঘটচিত্র, দেয়ালচিত্র, অঙ্গচিত্র প্রভৃতি। ভাস্কর্য শিল্পের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পোড়ামাটি, পাথর, কাঠ, হাড়ে তৈরি শিল্পই ভাস্কর্য। তাছাড়া বিভিন্ন ধাতব ভাস্কর্য (মূর্তি) দেখা যায়। স্থাপত্য প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত। গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্য একটি দেশের শিল্পরুচির পরিচয় বহন করে। সংগীত সারা বিশ্বে একটি জনপ্রিয় মাধ্যম। গীত, বাদ্য ও নৃত্য এই তিনের সমন্বিত রূপই হচ্ছে সংগীত। কাব্য নাটক বিশেষ করে মঞ্চনাটক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গণমাধ্যম। খ্রিষ্টপূর্বেও গ্রিক সভ্যতায় নাট্যচর্চা লক্ষ্য করা যায়। মঞ্চনাটক অভিনয়ের পাশাপাশি নৃত্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নাটক একটি যৌথ শিল্প। নাটকের একটি বড়গুণ উৎকণ্ঠা অর্থাৎ দর্শককে উৎকণ্ঠিত করে রাখবে বিভিন্ন কলা-কৌশলে। একটি পূর্ণাঙ্গ নাটকে পাঁচটি পর্যায় থাকে। যেমন– প্রারম্ভ, প্রবাহ, উৎকর্ষ (Action), গ্রন্থিমোচন, ও উপসংহার। নাটকে যন্ত্রসংগীত খুবই গুরুত্বপূর্ণ অত্যাধুনিক যন্ত্রাদি অবাধে ব্যবহার হচ্ছে। তাছাড়া উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে অত্যাধুনিক যান্ত্রিক কলাকুশলতার সহায়তা গ্রহণ করা হয়।

সংস্কৃতি চর্চা কণ্ঠসংগীত, যন্ত্রসংগীত, নৃত্যকলা, নাট্যকলা বিশেষ করে শিল্প-সাহিত্য-সংগীত ললিতকলার মূল উপজীব্য। বর্তমানে চলচ্চিত্র, ফটোগ্রাফি, ধারণাগত শিল্প ও পেইন্ট মেকিং যুক্ত হয়েছে ললিতকলায়।

ঙ. কাব্যসাহিত্য

কবিতাকে কেন্দ্র করে যে সাহিত্য রচনা হয় তাই কাব্যসাহিত্য। কবির মনের ভাবকল্পনা যখন অনুভূতিরঞ্জিত যথাবিহিত শব্দ সম্ভারে বাস্তব সুষমামণ্ডিত চিত্রাত্মক ও ছন্দোময় রূপ লাভ করে তখনই তাকে কবিতা বলে। অন্যদিকে চিন্তাধারা ও কল্পনার সুবিন্যস্ত ও সুপরিকল্পিত রূপ হলো সাহিত্য। বাংলা সাহিত্য বলতে এক সময় কেবল কাব্য সাহিত্যকেই বুঝানো হতো। কাব্য সাহিত্যের ইতিহাস হাজার বছরেরও অধিক। এ ইতিহাসকে তিনভাগে ভাগ করা হয়। প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগ। প্রাচীন যুগে পাওয়া যায় বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন চর্যাপদ। মধ্যযুগে রচিত হয়েছে বড় বড় কাব্য সাহিত্য। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও মঙ্গলধারার কাব্য গ্রন্থগুলো বাংলা কাব্য সাহিত্যকে অনেকগুণে সমৃদ্ধ করেছে। আধুনিক যুগে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ছিল গদ্যের রাজত্ব। তারপর মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা কবিতায় নিয়ে আসেন আধুনিকতা। রবীন্দ্রনাথ ও তার পরবর্তী কবিদের দ্বারা আমাদের কাব্য সাহিত্য বিশ্বময় পরিচিতি লাভ করে। বাংলার অপরূপ প্রকৃতি আর্থ-সামাজিক অবস্থা, নারীর প্রেম, বাংলা ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা হলো বাংলা কাব্য সাহিত্যের মূল উপজীব্য বিষয়।

চ. সুশীল সমাজ

সুশীল সমাজের ধারণাটি নতুন হলেও এর প্রচ্ছন্ন ধারণা পাওয়া যায় জন লক, রুশোসহ আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তাবিদদের লেখনীতে। তবে এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশি স্পষ্ট আলোচনা পাওয়া যায় এন্টোনিও গ্রামসির লেখায়। বিশেষ করে সমাজতন্ত্রের পতনের প্রাক্কালে পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সুশীল সমাজকে আপনরূপে বিকশিত হতে দেখা যায়। কেননা এ অঞ্চলের সমাজতান্ত্রিক সরকারের নির্যাতন, নিপীড়ন ও কড়া বিধি-নিষেধের কারণে সেখানে কোনো

রাজনৈতিক ও বেসরকারি ব্যবসায়িক কিংবা বাণিজ্যিক সংগঠন গড়ে উঠতে পারেনি। কমিউনিজমকে টিকিয়ে রাখার জন্য কমিউনিস্ট মডেলে সাংস্কৃতিক বিনির্মাণের চেষ্টাও করা হয় দীর্ঘকাল। কিন্তু কোনো কিছুতেই শেষ রক্ষা হয়নি। কমিউনিস্টবিরোধী আন্দোলনে এক সময় লাখ লাখ লোক রাস্তায় নেমে আসে। তখনই প্রশ্ন আসে, কোন শক্তি তাদেরকে এতো বাধা-নিষেধ আর নির্যাতনের পরও ঐক্যবদ্ধ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে সাহায্য করলো? এটি মূলত সুশীল সমাজ। এরা সরকারে থাকে না, আবার কর্পোরেট গ্রুপেও থাকে না। এরা সরকার এবং প্রাইভেট সেক্টরের মাঝামাঝি একটি গ্রুপ। এদের ধর্ম হলো এরা সরকার ও প্রাইভেট সেক্টর উভয় ক্ষেত্রেই তাদের প্রভাব বিস্তার করতে পারে। এরা সরকারকে সহযোগিতাও করতে পারে আবার সরকারবিরোধী অবস্থান নিয়ে সরকারের ভিতও নাড়িয়ে দিতে পারে।

ছ. নগরসভ্যতা

সভ্যতা হলো সংঘবদ্ধ মানুষের আচার-আচরণ, ভাষা- সংস্কৃতি, উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রভৃতির মিলন। প্রাগৈতিহাসিক যুগ হলো ইতিহাসের পূর্বের যুগ অর্থাৎ যখনকার ইতিহাস জানা যায়, তারও পূর্বের যুগ। প্রাগৈতিহাসিক যুগের অবসানের মধ্য দিয়ে সভ্যতার সূত্রপাত হয়। সভ্যতার যুগের দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রথমটি ছিল লিপির আবির্ভাব। মানুষ তাদের জীবন আচরণের কথা লিখে রাখত পাথরের গায়ে, কাদার শ্লেটে এবং আরও পরে কাগজে। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, এ সময় গ্রাম সংস্কৃতির অবসান ঘটিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে মানুষ গড়ে তুলতে থাকে নগর সভ্যতা ও সংস্কৃতি। তাই নগর সভ্যতা হলো গ্রাম সংস্কৃতির অবসান ঘটিয়ে নদীর তীরে শহরকেন্দ্রিক সভ্যতা, যেখানে ছিল উন্নত অবকাঠামো আধুনিক পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ও উন্নত জীবনযাত্রা। খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০০ অব্দে প্রাচীন সভ্যতা তথা নগর সভ্যতার সূত্রপাত হয়। মেসোপটেমীয় সভ্যতা, মিশরীয় সভ্যতা, সিন্ধু সভ্যতা, গ্রীক সভ্যতা প্রভৃতি ছিল নগরসভ্যতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

৮. ক. **সমুদ্রজলস্ফীতি জনিত কারণে বাংলাদেশের কি বিপদ ঘটতে পারে?** ৫

উত্তর : বিশ্ব উষ্ণায়নের একটি সম্ভাব্য পরিণতি হলো সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি বা সমুদ্রজলস্ফীতি। বায়ুমণ্ডলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে সমুদ্রের পানির উত্তাপ বৃদ্ধি পাবে এবং পানি সম্প্রসারিত হয়ে সমুদ্রের আয়তন ও পরিধিকে বাড়িয়ে তুলবে। উষ্ণায়নের ফলে হিমালয়সহ অন্যান্য পর্বতচূড়ায় জমে থাকা বরফ গলে যাবে এবং সমুদ্রের পানির উচ্চতা বেড়ে যাবে। এর ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সাথে প্লাবিত এলাকার পরিমাণও বেড়ে যাবে। উত্তর ও দক্ষিণমেরুর গ্রিনল্যান্ড, অ্যান্টার্কটিকাসহ অন্যান্য ভূ-ভাগের বরফ গলে যাবে, যা সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা আশঙ্কাজনকভাবে বাড়িয়ে তুলবে। এভাবে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে।

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ ব-দ্বীপ, যেখানে অসংখ্য নদ-নদী বয়ে চলেছে। পৃথিবীর তাপমাত্রা ১° সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেলে বাংলাদেশের ১৯ শতাংশ ভূমি সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে যাবে। এর ফলে ৫৫ মিলিয়ন লোক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বাংলাদেশে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা প্রতিবছর ৭ মিমি হারে বাড়ছে, যেখানে ভূ-পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির হার ৫-৬ মিমি/বছর। এর ফলে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির হার ১-২ মিমি/বছর। Intergovernmental Panel of Climate Change (IPCC)-এর এক সমীক্ষায় বলা হয় বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা প্রতি দশকে ৩.৫ থেকে ১৫ মিমি বৃদ্ধি পেতে পারে। এমন কি ২১০০ সাল লাগাদ তা ৩০ সেমি থেকে ১০০ সেমিতে এ পৌঁছাতে পারে। তাই সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি বাংলাদেশের জন্য ভয়াবহ বিপর্যয় সৃষ্টি করবে।

খ. **বৃষ্টিপাত হ্রাসজনিত কারণে বাংলাদেশে এর কি প্রভাব পড়তে পারে?** ৫

উত্তর : বৃষ্টিপাত নির্ভর করে ঋতু ও মহাকাশগত অবস্থার ওপর। বাংলাদেশের ভূখণ্ডের দিকে সমুদ্র থেকে আর্দ্র মৌসুমি বায়ুর কারণে জুন থেকে অক্টোবর পর্যন্ত প্রচুর পরিমাণ বৃষ্টিপাত সংঘটিত হয়। বর্ষা মৌসুমেও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অধিকমাত্রায় বৃষ্টিপাতের ক্ষেত্রে মেঘালয় পর্বতের প্রভাব রয়েছে। কিন্তু মধ্য অক্টোবরের পর আর্দ্র মৌসুমি বায়ু প্রবাহ স্তিমিত হয়ে আসলে বাংলাদেশে দ্রুত বৃষ্টিপাত হ্রাস পেতে থাকে।

কোনো দেশে বা অঞ্চলে বৃষ্টিপাত সংঘটিত হওয়ার জন্য সে স্থানে বিপুল পরিমাণ গাছপালা বা বন-বনানী থাকা আবশ্যক। তাছাড়া প্রাকৃতিক কিছু নিয়ামক আছে যেগুলো বৃষ্টিপাত সংঘটিত হওয়ার জন্য অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের বঙ্গোপসাগরের প্রভাবে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। ভারতের মেঘালয় রাজ্যের উঁচু পাহাড়ের বদৌলতে বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে।

বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোতে বেশিমাত্রায় বৃষ্টিপাতের স্বল্পতা পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল থেকে আসা পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে বাংলাদেশের উত্তরের এ অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের অপর্যাপ্ততা ব্যাপকভাবে লক্ষণীয়। বৃষ্টিপাতের ক্রমহ্রাসের কারণে উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতে খরা এখন নিত্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। খরার সময় খরা পীড়িত অঞ্চল তপ্ত হয়ে ওঠে আর কুয়া, খাল, বিলগুলো শুকিয়ে যাওয়ায় ব্যবহার্য পানির অভাব ঘটে। নদীর প্রবাহ হ্রাস পায়, ভূগর্ভস্থ জলস্তর নিচের নেমে যায়, মাটির আর্দ্রতায় ঘাটতি দেখা দেয়, ক্ষেতের ফসল শুকিয়ে শস্য বিপর্যয় ঘটে এবং গবাদি পশুর খাদ্যসংকট দেখা দেয়। খাবার পানি, চাষাবাদ ও পশুপালনের ক্ষেত্রে সরাসরি বৃষ্টির ওপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর জন্য খরা একটি বিরাট সমস্যা।

বাংলাদেশে যেভাবে নির্বিচারে মরুকরণ চলছে বা বন-বনানী ধ্বংস করে মানব বসতি গড়ে উঠছে তাতে করে অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল মরুভূমিতে পরিণত হবে এবং সমগ্র দেশে কৃষিভিত্তিক উৎপাদনশীলতা মারাত্মকভাবে হ্রাস পাবে যা দেশের অর্থনীতিকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করবে।

৯. ক. **বাংলাদেশে পরমাণু বিদ্যুতের সম্ভাবনা কি?** ৫

উত্তর : নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ব্যবস্থা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান নিয়ামক। তবে বাংলাদেশের বর্তমানে যে সমস্যাগুলো রয়েছে তার মধ্যে বিদ্যুৎ সমস্যা প্রকট হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ সমস্যার কারণে ব্যাহত হচ্ছে শিল্প-কারখানা চালু রাখা। স্থাপন করা হচ্ছে না নতুন নতুন শিল্প-কারখানা। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বাংলাদেশে পর্যাপ্ত কাঁচামাল (Raw Materials) না থাকার কারণে, এমন কি যেগুলো আছে, সেগুলো অতিমাত্রায় পরিবেশ দূষক (যেমন : কয়লা থেকে বিদ্যুৎ পাওয়ার ক্ষেত্রে) হওয়ার কারণে নতুন করে সম্ভাবনা সৃষ্টি করে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র।

পরমাণু বিদ্যুৎ বলতে সাধারণত বুঝায়, পরমাণু বিদ্যুৎ প্লান্ট স্থাপনের মাধ্যমে পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা। এ প্রক্রিয়াজাত ইউরেনিয়াম $^{235}_{92}U$ অথবা থোরিয়াম $^{232}_{90}th$ এর নিউক্লিয়াস ভেঙে দুটি ক্ষুদ্রতম অংশে বিভক্ত হয়ে শক্তি সৃষ্টি করে (200 এম ইভি) এবং দুটি বা তিনটি ইলেকট্রন নির্গত করে। এ ফিশন পদ্ধতির মাধ্যমে চেইন বিক্রিয়া সৃষ্টি করা যায়। ফলে এই শক্তি এক বিরাট তাপের সৃষ্টি করে থাকে, যাকে পরবর্তী সময়ে বিদ্যুতে পরিণত করা যায়। এর শক্তি এত বেশি যে এক কিলোগ্রাম ইউরোনিয়ামে যে শক্তি তা ২,৫০০ টন কয়লা পোড়ালে যে শক্তি হবে তার সমান।

তুলনামূলক স্বল্প পরিবেশ দূষক [যেমন : কয়লা অধিক দূষক) হওয়া এবং অধিক পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন সরকারের একটি নতুন চ্যালেঞ্জ। এ লক্ষ্যে সরকার রাশিয়ার সাথে ২০০৯ সালের ১৩ মে একটি প্রাথমিক চুক্তি স্বাক্ষর করে। যাতে বলা হয় ১,০০০ মেগাওয়াটের পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করা হবে, পাবনার রূপপুরে। এর জন্য আনুমানিক ব্যয় ১৫০ কোটি মার্কিন ডলার ধরা হয়েছে। পরীক্ষামূলকভাবে স্থাপিত রূপপুরের পারমাণকি বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি স্থাপনে সরকার সফল হতে পারলে, পরবর্তীতে সরকার যে আরো অধিক পরিমাণে পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। অর্থাৎ বাংলাদেশের পরমাণু বিদ্যুতের সম্ভাবনা অতি আসন্ন।

খ. বাংলাদেশের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো ভবিষ্যতে কি সঙ্কটে পড়তে পারে? ৫

উত্তর : দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান নিয়ামক হলো নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ব্যবস্থা। যা বর্তমান বাংলাদেশের প্রধান সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম। এ সমস্যার কারণে ব্যাহত হচ্ছে শিল্প কারখানা চালু রাখা। যার কারণে বেকার সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে।

বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। যেমন : (i) তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র (ii) হাইড্রোলিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, (iii) বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র ইত্যাদি। উপরে উল্লিখিত বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ সরকার সাধারণত তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্রের উপর বেশি নির্ভরশীল। তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্রের কাঁচামাল (Raw Materials) হলো, সাধারণত কয়লা, পারমাণবিক শক্তি, প্রাকৃতিক গ্যাস ইত্যাদি। এই কয়লা ও প্রাকৃতিক গ্যাস পুড়িয়ে এবং পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয় পরমাণুকে (যেমন ${}^{235}_{92}U$) ফিশন বিক্রিয়ার মাধ্যমে ভেঙে ক্ষুদ্রতর পরমাণু সৃষ্টি করে এবং উভয় প্রক্রিয়ায় অধিক পরিমাণ তাপ উৎপন্ন হয়। এ উৎপন্ন তাপ স্থাপিত টারবাইনকে ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ তৈরি করে।

কিন্তু তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনের কাঁচামালগুলো (যেমন : কয়লা, গ্যাস, পারমাণবিক শক্তি) মানুষ তৈরি করতে পারে না। এ সম্পদগুলো বাংলাদেশে পর্যাপ্ত পরিমাণ না থাকায়, এমন কি যতটুকু আছে ব্যবহারের উপযুক্ত প্রযুক্তির অভাবে বাংলাদেশ সরকারকে অন্যদেশের উপর নির্ভর করতে হয়। যেমন : কয়লা বিশেষজ্ঞ (Prof. Md. Khalequzzaman Ph. D. Dept. Geology and Physics, Lock Haven University, USA) এর মতে,

(i) বাংলাদেশের বর্তমানে আবিষ্কৃত কয়লা খনিতে মজুদ কয়লার পরিমাণ আগামী ৫০ বছরের জন্য পর্যাপ্ত নয়।
(ii) বাংলাদেশের জনসংখ্যার চাহিদা অনুসারে Fuel Energy বা জ্বালানি শক্তির পরিমাণ অপ্রতুল। এটি ১০-১৫ বছরের জন্য পর্যাপ্ত হতে পারে। এ অবস্থায় বাংলাদেশ সরকার যেসব সংকটে পরতে পারে বলে মনে হয়—
 ক. তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর প্রয়োজনীয় জ্বালানি সংকটে পড়তে পারে বলে আমার মনে হয়।
 খ. প্রয়োজনীয় টেকনোলজি এর সংকটে পড়তে পারে।
 গ. বিদেশিদের উপর নির্ভরশীলতা অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে যা একটি স্বাধীন দেশের ক্ষেত্রে মোটেও মঙ্গলজনক নয়।
 ঘ. তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্র দ্বারা সৃষ্ট দুর্ঘটনা (যেমন : পারমাণবিক প্লান্টের বিস্ফোরণ) এর শিকার হতে পারে।
 ঙ. পরিবেশ বিপর্যয় সংকটে পড়তে পারে।

১০. ক. বাংলাদেশে কি কি পরমাণু খনিজ আছে? ২

উত্তর : পারমাণবিক শক্তি বর্তমান বিশ্বে এক বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে। বিশ্বের যাবতীয় কল্যাণ ও অকল্যাণকর শক্তির মূল আধারে পরিণত হয়েছে পারমাণবিক শক্তি। পারমাণবিক প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে যে আণবিক শক্তি উৎপন্ন হয় তা খরচের তুলনায় অনেক বেশি এমনকি পানি বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনেও এর চেয়ে বেশি খরচ হয়। তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন করা যায়। বাংলাদেশে আণবিক শক্তি সম্পর্কে গবেষণা করার জন্য একমাত্র সরকারি প্রতিষ্ঠান হলো বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশন।

বাংলাদেশে কোনো তেজস্ক্রিয় পদার্থ ছিল না। ইদানীং বাংলাদেশের উপকূলীয় বলয় এবং উপকূলীয় দ্বীপসমূহের মাটি ও বালিতে প্রচুর পরিমাণে মূল্যবান তেজস্ক্রিয় পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেছে। এসব পদার্থের মধ্যে রয়েছে ইলমেনাইট, ম্যাগনেটাইট, জিরকন, রুটাইল, গারনেট, মোনাজাইট, লিউকক্সিন এবং কায়ানাইট। পারমাণবিক শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে বহির্বিশ্বে এসব পদার্থের চাহিদা প্রচুর। বাংলাদেশে এ যাবৎ প্রাপ্ত প্রায় পাঁচ কোটি মার্কিন ডলার মূল্যের ছাব্বিশ লাখ টন আকরিক খনিজ পদার্থ রয়েছে। একটি অস্ট্রেলীয় কোম্পানি এসব বালি উত্তোলনের জন্য সম্ভাব্য জরিপ চালানোর অনুমতি চেয়ে বাংলাদেশ সরকারের নিকট আবেদন করেছে।

দেশে খনিজ পদার্থ ইউরেনিয়ামের সন্ধান পেয়েছে বাংলাদেশ ভূতত্ত্ব জরিপ অধিদপ্তর। পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, যমুনা এবং বৃহত্তর সিলেট ও ময়মনসিংহে নদীবাহিত বালিতে অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ আরও কয়েক প্রকার ভারী খনিজ ও রাসায়নিকের পাশাপাশি বাণিজ্যিকভিত্তিতে আহরণযোগ্য ইউরেনিয়াম রয়েছে। উপর্যুক্ত নদীগুলোর বালিতে সাড়ে ৯ শতাংশ ভারী খনিজ ও রাসায়নিক পদার্থ আছে। অথবা ৭ শতাংশ থাকলেই তা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আহরণযোগ্য বিবেচিত হয়।

শেষে বলা যায় যে, উপর্যুক্ত খনিজ পদার্থগুলো বাংলাদেশে সরাসরি ব্যবহার করা না গেলেও এগুলো বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব।

খ. অ্যাপারেলস্ উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান কি? ২

উত্তর : অ্যাপারেলস বা পোশাক উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান বর্তমানে দ্বিতীয়। প্রথম অবস্থানে রয়েছে চীন। তবে বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের মধ্যে অ্যাপারেলস হলো প্রথম, যা মোট রপ্তানির ৮০ শতাংশের বেশি।

অ্যাপারেল বা পোশাক শিল্প হলো বাংলাদেশের দুটি শিল্পের সমষ্টি। একটি হলো তৈরি পোশাক (ওভেন) এবং অন্যটি হলো নীট পোশাক। বর্তমানে তৈরি পোশাক ও নীট পোশাকে রপ্তানির ক্ষেত্রে সমান অবদান রাখছে। যদিও শুরুতে তৈরি পোশাকের উৎপাদন-ই বেশি ছিল। গত অর্থবছরে (২০১৩-১৪) বাংলাদেশের পোশাক খাত থেকে রপ্তানি আয় হয়েছে ২৪.৪৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। যার মধ্যে তৈরি পোশাক থেকে হয়েছে ১২,৪৪২.০৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং নীট পোশাক খাত থেকে হয়েছে ১২০৪৯.৮১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। পোশাক শিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ এর মতে, বর্তমানে দেশে পোশাক শিল্পের কারখানা রয়েছে ৪,২২২টি এবং সেখানে ৪০ লাখ লোক কর্ম করে নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করছে।

বাংলাদেশের পোশাকের সবচেয়ে বড় বাজার হলো ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং একক দেশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে উক্ত দু বাজারে বাংলাদেশের পোশাকের বাজারের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৪,৭৪৫.৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (মোট পোশাক রপ্তানির ৬০.২১ শতাংশ) এবং ৫,১৪১.৩৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (মোট পোশাক রপ্তানির ২০.৯৯ শতাংশ)। বাংলাদেশ প্রধানত পাঁচটি পোশাক পণ্য উৎপাদন করে। সেগুলো হলো– শার্ট, টি-শার্ট, জ্যাকেট, সুয়েটারস এবং ট্রাউজার।

গ. চিনি শোধন শিল্পে বাংলাদেশের সাফল্য কি? ২

উত্তর : বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের (বিএসএফআইসি) আওতায় বাংলাদেশের একটি অন্যতম শিল্পখাত হলো চিনি শিল্প। ১৯৪৭ সালে পূর্ব পাকিস্তান উত্তরাধিকারসূত্রে ছয়টি চিনিকল লাভ করলেও বর্তমানে বাংলাদেশে চিনিকলের সংখ্যা ১৫টি। বিএসএফআইসির নিয়ন্ত্রণাধীন ১৫টি চিনিকলের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ২.১০ লাখ মেট্রিক টন। দেশে বর্তমানে চিনির বার্ষিক চাহিদা প্রায় ১৪.০০ লাখ মেট্রিক টন। দেশে চিনির প্রকৃত চাহিদার তুলনায় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন ইক্ষুভিত্তিক চিনিকলগুলোতে চিনি উৎপাদন অপ্রতুল। ফলে দেশে বেসরকারি খাতে স্থাপিত সুগার রিফাইনারিতে উৎপাদিত চিনি এবং আমদানিকৃত চিনি দ্বারা ঘাটতি পূরণ করা হয়। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ১ লাখ ৩৮ হাজার মেট্রিক টন চিনি উৎপাদন ও বিক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় এবং এর বিপরীতে ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত ৯৮,২৭০.৪০ মেট্রিক টন চিনি উৎপাদিত হয়েছে। এ ঘাটতি পূরণে বিদেশ থেকে চিনি আমদানি করলেও বাংলাদেশের বেসরকারি চিনিকলগুলোর পরিশোধিত চিনি এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সম্প্রতি নর্থবেঙ্গল সুগারমিলে চিনি পরিশোধনের একটি কম্পোনেন্ট চালু করা হচ্ছে। এতে সারা বছর অপরিশোধিত চিনি এনে কারখানা সচল রাখা সম্ভব। চিনি শোধন সাফল্যের পাশাপাশি এ সম্ভাবনাময় খাত থেকে বাংলাদেশ বৈদেশিক মুদ্রাও আয় করতে পারে। তবে এক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারকে কতগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। যেমন : কারখানাগুলোর আধুনিকীকরণ, পূর্ণমাত্রায় আখ উৎপাদন, সহজশর্তে আখচাষীদের ঋণ প্রদান, রিফাইনারিগুলোকে পূর্ণমাত্রায় চিনি উৎপাদনের জন্য অনুমতি প্রদান, আখ চাষে ও চিনি উৎপাদনে আধুনিক প্রযুক্তি ও উপকরণ ব্যবহার, অব্যবস্থাপনা প্রতিরোধ, মিল কর্মচারীদের অপকর্ম থেকে বিরত রাখা এবং চিনিকলগুলো থেকে উৎপাদিত উপজাত পণ্যের (by-products) সঠিক ও ব্যাপক ব্যবহার নিশ্চিত করা।

ঘ. বণ্যপ্রাণী সংরক্ষণে বাংলাদেশের সাফল্য ও ব্যর্থতা কি? ৪

উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৩৪৯।

১১. ক. বাংলাদেশে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা ব্যবস্থার অগ্রগতি কতটুকু? ৪

উত্তর : ২০১৫ সালের মধ্যে দেশে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। এ প্রেক্ষাপটে সরকার প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে এ খাতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ দিয়ে আসছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে প্রাথমিক শিক্ষা খাতে মোট সংশোধিত বরাদ্দের পরিমাণ ১১,৮৫৩.০৯ কোটি টাকা। সকলের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার ইতোমধ্যে যে সকল কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে তন্মধ্যে বিদ্যালয়ে ভর্তি, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, উপবৃত্তি ও ছাত্র-শিক্ষক সংযোগ ঘণ্টা বৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া উপবৃত্তি প্রকল্প, তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৩), রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন প্রকল্প, দারিদ্র্য পীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি, শহরের কর্মজীবী শিশুদের জন্য মৌলিক শিক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়) এবং মানব উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা-উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প-২ সহ আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। ১৯৯১ সালে বাংলাদেশে মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৪৯,৫৩৯টি। এ সংখ্যা বেড়ে বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ১,০৬,৮৫৮টি (ব্রাক সেন্টার, শিশু কল্যাণ ও মাদরাসাসহ)। প্রাথমিক শিক্ষায় ছাত্রী ভর্তির সংখ্যা ও হার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯১ সালে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির অনুপাত ছিল ৫৫ : ৪৫। বর্তমানে তা প্রায় ৪৯.৯ : ৫০.১ এ উন্নীত হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে গৃহীত/গৃহীতব্য উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :

প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নের লক্ষ্যে তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি ৩ বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি ও উপস্থিতির হার বৃদ্ধি, ভর্তিকৃত ছাত্রছাত্রীদের ঝরে পড়া রোধ এবং সংযোগ ঘণ্টা (Contact Hour) বৃদ্ধির বিষয়ে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে ;

বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে মহিলা ও পুরুষ শিক্ষকের অনুপাত ৬০ : ৪০ অনুসরণ করা হয়। বর্তমানে মহিলা ও পুরুষ শিক্ষকের অনুপাত হলো ৬৪. ২ : ৩৫.৮;

প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে স্কুল লেভেল ইমপ্রুভমেন্ট প্ল্যান (SLIP) ও উপজেলা এডুকেশন প্ল্যান (UPEP) পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে ;

দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে দেশের ৩.৩ লাখ নব্যসাক্ষরের জীবনযাত্রার মনোন্নয়নের লক্ষ্যে নব্য-সাক্ষরদের ক্রমান্বয়ে স্থানীয় বাজার চাহিদাভিত্তিক বিভিন্ন ধরনের আয় সৃজনী প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে ;

ছয়টি বিভাগীয় শহরের ১০-১৪ বছর বয়সী ১.৬৬ লাখ কর্মজীবী শিশুকে মৌলিক শিক্ষা প্রদানসহ জীবনভিত্তিক ব্যবহারিক শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে ;

প্রতিবছর সারা দেশে পঞ্চম শ্রেণির মূল্যায়ন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ২০০৯ সাল হতে সারা দেশে অভিন্ন প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে পঞ্চম শ্রেণিতে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে ;

বিদ্যালয় পর্যায়ে ইংরেজি শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে 'ইংলিশ ইন অ্যাকশন' প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে ;

উপবৃত্তি ৪০ শতাংশ হতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করাসহ সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৪৮ লাখ থেকে ৭৮ লাখে উন্নীত করা হয়েছে। স্কুল ফিডিং কার্যক্রম, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, বিদ্যালয়বিহীন গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন, চর, হাওর-বাওড় এলাকায় শিখনকেন্দ্র স্থাপন এবং দেশের সকল উপজেলাকে মৌলিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আনয়ন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে ;

ভর্তির হার বৃদ্ধি এবং শিক্ষার্থীদেরকে স্কুলে ধরে রাখার লক্ষ্যে স্কুল ফিডিং কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ৯৬টি উপজেলার ২৮ লাখ শিশুর মধ্যে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে স্কুল খোলার দিন দৈনিক ৭৫ গ্রাম ফর্টিফাইড বিস্কুট বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে ৭৪টি উপজেলায় প্রায় ২৭ লাখ শিক্ষার্থীর মধ্যে এ কার্যক্রম চলছে ;

দেশের নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর মধ্যে সাক্ষরতার আলো পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে মৌলিক সাক্ষরতা (৬৪ জেলা) প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে ;

বিদ্যালয় বহির্ভূত এবং ঝরে পড়া ৭-১৪ বছর বয়সী প্রায় ৪.৫ লাখ সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে পিইডিপি-৩ এর আওতায় 'সেকেন্ড চান্স এডুকেশন' প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন আছে ;

দেশের ২৬,১৯৩টি রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ এবং কর্মরত শিক্ষকদের চাকরি বিধিমালার আলোকে সরকারিকরণ করা হয়েছে।

খ. বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষা বিকাশে অ-সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন। ৬

উত্তর : উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে অনেক দেশে বহু আগে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিকাশ লাভ করলেও বাংলাদেশে এর প্রচলন গত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকে। ১৯৯২ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা দানের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের একতরফা ভূমিকা ছিল। ১৯৯৩ সাল অবধি বেসরকারি খাতে যে ভালো মানের উচ্চশিক্ষা প্রদান করা সম্ভব তা হাতে গোনা অল্প কিছু

মানুষ বিশ্বাস করতেন। বেসরকারি খাতকে মানসম্মত উচ্চশিক্ষা প্রদানের দায়িত্ব প্রদান ঝুঁকিপূর্ণ বলে আশঙ্কা রয়ে যায়। কিন্তু ১৯৯৬ সালে প্রথম বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ব্যাচের গ্র্যাজুয়েটরা পাস করার পরপরই তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি বেতনে চাকরি পেয়ে যায়, তখন অবশ্য আশঙ্কা কিছুটা দূর হয়।

বাংলাদেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা : প্রতিবছর যে হারে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীর পাশের হার ও সংখ্যা বাড়ছে, সে হারে কিন্তু সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়েনি বা যেগুলো বিদ্যমান আছে সেগুলোর অবকাঠামোগত পরিধি বাড়েনি। আর এ কারণে প্রতিবছর অনেক শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি সামনে চলে আসে। যেসব প্রয়োজনে বাংলাদেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিকাশ ঘটেছিল সেসবের মধ্যে দুটি প্রণিধানযোগ্য :

১. উচ্চশিক্ষার বর্ধিত চাহিদা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পক্ষে মেটানো সম্ভব হচ্ছিল না; এবং
২. সরকারি তহবিলের অভাব অর্থাৎ দ্রুত বর্ধনশীল চাহিদা পূরণে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন ছিল, সরকারের পক্ষে বাজেটে তা বরাদ্দ দেওয়া সম্ভব না হওয়া।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাস : রাষ্ট্রীয় সম্পদের সীমাবদ্ধতার বিষয়টি স্বীকার করে দেশের বর্ধিতসংখ্যক ছাত্রের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির জন্য সরকার ১৯৯২ সালে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯২ (১৯৯৮ এ সংশোধিত) পাশ করে। এ আইনের আওতায় যে কোনো বেসরকারি ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ এবং ট্রাস্ট বা ফাউন্ডেশনের মতো জনহিতৈষী সংগঠন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনে উল্লিখিত শর্ত পূরণ সাপেক্ষে নিজস্ব অর্থে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা ও ডিগ্রি প্রদানের সুযোগ পেলেন।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সামগ্রিক অবস্থা : প্রয়োজনের বিষয়টি মাথায় না রেখে অন্যান্য দেশের মতো ব্যাঙের ছাতার মতো গড়ে উঠা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ২০১৪ সালের শেষ নাগাদ ৮৩টি। গুটিকতক বিশ্ববিদ্যালয় বাদে অধিকাংশেরই নিজস্ব কোনো ক্যাম্পাস নেই। তারা ভাড়া করা ভবনে শিক্ষাদান কার্যক্রম চালালেও ১৯৯২ সালের আইন অনুযায়ী পাঁচ বছরের মধ্যে নিজস্ব ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠার বিধান থাকলেও অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ই সে শর্ত পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। এ ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে প্রায়ই অভিযোগ পাওয়া যায় যে, মূলত অর্থ রোজগারের বিষয়টিই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আরাধ্য বিষয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অধিক ফিতে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করানো, মানসম্মত শিক্ষক নিয়োগ না করা, নানা অজুহাতে ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট থেকে অর্থ আদায় করা, মানসম্মত শিক্ষা প্রদান না করে শুধু সনদ বিক্রি করার মতো শিক্ষা কার্যক্রম চালানোর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে একটি সঠিক কাঠামোর মধ্যে আনতে ২০১০ সালে ১৯৯২ সালের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন বাতিল করে নতুন আইন প্রণয়ন করা হয়।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষাদান পদ্ধতি : বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সাধারণত যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে। এতে ডিগ্রি প্রোগ্রাম চার বছরে সম্পন্ন করাও হয়। অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় চাকরি বাজারে চাহিদা রয়েছে এমন সকল বিষয় উচ্চ বেতনে পড়িয়ে থাকে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বাণিজ্যিক বিষয়গুলোকে যেভাবে মূল্যায়ন করা হয় বিজ্ঞান বা মানবিক বিষয়গুলোকে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় না।

পরিশেষে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, গুণগত বা মানসম্মত উচ্চশিক্ষায় দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষিত করার ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের হয়তো সবগুলোর খারাপ অবস্থা পরিদৃষ্ট হয় না। তবে যেগুলো সম্পর্কে প্রায়শই সংবাদপত্রের মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থার বেহাল অবস্থার কথা জানা যায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের মাধ্যমে সঠিক তদারকির মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য হয়তো লাভ করা সম্ভব।

১২. সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন : ২×৫ = ১০

ক. ম্যানগ্রোভ অরণ্য

লোনা পানি বা কাদার মধ্যে জেগে থাকা খুঁটির মতো এক ধরনের শ্বাস গ্রহণকারী শিকড়বিশিষ্ট উদ্ভিদকে ম্যানগ্রোভ বলে। আর যে বনে প্রচুর পরিমাণে এ ধরনের গাছ জন্মে সে বনকে ম্যানগ্রোভ বন বলে। ম্যানগ্রোভ বন বিশ্বের গ্রীষ্মমণ্ডলীয় উপকূলে জন্মায়। শান্ত সাগর, খাড়ি ও নদীর মোহনা এ বনের উপযুক্ত স্থান। ম্যানগ্রোভ বনে গাছপালা-লতাগুল্ম লবণাক্ত সাগরের তীরে আপনা আপনিই গড়ে ওঠে এবং গাছপালা-লতাগুল্মের রয়েছে বিশেষ বৈশিষ্ট্য। গাছের বীজ থেকে প্রায় ৩০ সেন্টিমিটার লম্বা মূল গজায়। জলে বা ডাঙায় বীজ পড়েই মূলকে ওপর দিকে রাখে। কাদা বা মাটি পেলে মূল বীজের সহায়তায় জীবন্ত প্রাণীর মতো তা আঁকড়ে ধরে। মূল কাজ করে শ্বাসমূল হিসেবে। স্রোতে বালুকণা ভেসে যাবার সময় শ্বাসমূল বালু ও পলি জমা করে। ম্যানগ্রোভ এভাবে ভূখণ্ড তৈরি করে। গাছের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কিছু শিকড় মাটির তলায়, কিছু ওপর দিকে থাকে। একে বলে 'শূল'। এটি খুব ধারালো। বিশ্বের সেরা প্রজাতির গাছপালাসমৃদ্ধ ম্যানগ্রোভ জঙ্গলকে বলা হয় লাল ম্যানগ্রোভ (Rhitophoramangle)। এ বন রয়েছে ফ্লোরিডা থেকে শুরু করে দক্ষিণ আমেরিকা ও পশ্চিম আফ্রিকা উপকূলে। এ বনে গুল্ম ও ফার্ন জাতীয় ছোট গাছ জন্মে। কিছু প্রজাতির গাছ ২৫ মিটার লম্বা হয়। গাছের বাকলে ট্যানিক এসিড থাকে। এটি চামড়া ট্যান করতে ব্যবহৃত হয়। সুন্দরবন পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন।

খ. বিপন্ন প্রাণীকুল

মানুষ, প্রাণী ও উদ্ভিদজগৎ, মাটি, পানি, বায়ু, নদী, সাগর ইত্যাদি সবকিছু নিয়েই পরিবেশ। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় উপরের প্রতিটি উপাদানেরই ভূমিকা অনস্বীকার্য। বলা যায় এসব পরিবেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং একটি অন্যটির সাথে গভীরভাবে যুক্ত। কিন্তু আজ নানাভাবে পরিবেশের ক্ষয়সাধন হওয়ায় বিশেষভাবে উদ্ভিদজগতের উপর বিভিন্ন ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের কারণে প্রাণীকুল আজ অস্তিত্বের হুমকির সম্মুখীন। নির্বিচারে বনাঞ্চল ধ্বংসসাধন, পাহাড় কর্তন, নদী দূষণসহ পরিবেশের উপর নানাবিরূপ কর্মকাণ্ডের ফলে ইতিমধ্যেই অনেক প্রাণীর পৃথিবী থেকে বিলুপ্তি ঘটেছে, অনেক প্রাণী বিলুপ্তির সম্মুখীন। বিশ শতকের শুরুতে পৃথিবীতে বাঘের সংখ্যা ছিল লক্ষাধিক। কিন্তু পরিবেশের উপর নানাবিরূপ কর্মকাণ্ড ও বাঘ শিকারের কারণে আজ বাঘের সংখ্যা সারা বিশ্বে ছয় হাজারেরও কম। বাংলাদেশে বনাঞ্চল ও পাহাড়ী ভূমি কমে যাওয়া ও মানুষের হাতে নির্বিচারে মারা যাওয়ায় বাঘ, হাতি, হরিণের মতো প্রাণীর সংখ্যা দিন দিন কমছে। খাদ্যের খোঁজ এই প্রাণীগুলো লোকালয়ে নেমে আসছে এবং মানুষের হাতে নির্বিচারে মারা পড়ছে।

গ. পর্ণমোচি বৃক্ষের বন

যে বনাঞ্চলের উদ্ভিদগুলোর পাতা বছরের কোনো না কোনো সময় ঝরে পড়ে, ঐগুলোকে ক্রান্তীয় পর্ণমোচি বা পত্রঝরা বনাঞ্চল বলা হয়। এ বনের প্রধান বৃক্ষ হলো শাল। প্লাইস্টোসিন যুগে উত্থিত বাংলাদেশের বরেন্দ্রভূমি, মধুপুর গড় ও লালমাই পাহাড়ে পত্রঝরা বনাঞ্চল দেখা যায়। চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী, নওগাঁ, জয়পুরহাট ও দিনাজপুরের অংশবিশেষ নিয়ে বরেন্দ্রভূমি গঠিত। টাঙ্গাইল, জামালপুর, গাজীপুর, ঢাকা ও নরসিংদীর কিছু অংশ নিয়ে মধুপুর গড় গঠিত। লালমাই পাহাড় কুমিল্লায় অবস্থিত।

ঘ. পরমাণু শক্তি কমিশন

বাংলাদেশের একমাত্র পরমাণু শক্তি গবেষণা ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান হলো বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন। কল্যাণধর্মী কাজে পরমাণু শক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতেই কমিশনের প্রতিষ্ঠা হয়। স্বাধীনতার ২ বছর পর ১৯৭৩ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন। প্রথমে শেরে বাংলা নগরের পাট গবেষণা কেন্দ্রে এর কার্যক্রম শুরু হলেও পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের ৪নং কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউতে স্থানান্তর করা হয়। ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত এটি আণবিক শক্তি কমিশন নামে পরিচিত ছিল। কমিশনের গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যাবলি মূলত ভৌতবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান ও প্রকৌশল এই তিনটি শাখায় পরিচালিত হয়। কমিশনের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের মধ্যে অন্যতম হলো ধানের দুটি উচ্চ ফলনশীল প্রকারভেদ IRATOM-24 ও IRATOM-38 এবং ডালের একটি উচ্চ ফলনশীল জাত HYPROSOLA-এর মান উন্নয়ন ঘটানো। এছাড়াও প্রতিষ্ঠানটি তেজস্ক্রিয় খনিজ অনুসন্ধান, জ্বালানি চাহিদা পূরণে পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন, পরমাণু চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন, কৃষি, শিল্প, প্রাকৃতিক সম্পদ উন্নয়ন প্রভৃতির সাথে যুক্ত আছে।

ঙ. তিতাস গ্যাসক্ষেত্র

তিতাস গ্যাসক্ষেত্রটির অবস্থান ঢাকা থেকে উত্তর-পূর্বদিকে ১০০ কিমি দূরে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায়। এটি বাংলাদেশের বৃহত্তম গ্যাসক্ষেত্র। যেখানে ৮.০৫ টিসিএফ পরিমাণ গ্যাস মওজুদ রয়েছে। এখান থেকে প্রতিদিন ৪৫০ মিলিয়ন কিউবিক ফিটেরও বেশি গ্যাস উত্তোলন করা হচ্ছে, যা সমগ্র দেশে গ্যাস উত্তোলনের ২০শতাংশ। ঢাকা শহরের বিতরণকৃত গ্যাসের অধিকাংশই তিতাস গ্যাস থেকে সরবরাহকৃত। তিতাস গ্যাসক্ষেত্রটি আবিষ্কার হয় ১৯৬২ সালে। কিন্তু বাণিজ্যিকভাবে গ্যাস উত্তোলন শুরু ১৯৬৮ সালে। দেশের অর্থনীতিকে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে তিতাস গ্যাসের ভূমিকা অপরিসীম।

৩৪তম বিসিএস ২০১৪ | বাংলাদেশ বিষয়াবলি-দ্বিতীয় পত্র

সময় : ৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ১০০

[দ্রষ্টব্য : প্রার্থীদিগকে ১নং প্রশ্নের এবং অবশিষ্ট প্রশ্নের যে কোনো চারটির উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান সমান।]

১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান কোন সালের কোন তারিখ হতে কার্যকর হয়? এতে বিধৃত মৌলিক অধিকারসমূহ বর্ণনা করুন এবং কি পরিস্থিতিতে এবং কোন অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মৌলিক অধিকার সাময়িকভাবে স্থগিত করা যায়?
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৪৭৩।

২. সুশাসন জনপ্রশাসনের একটি সর্বগৃহীত বৈশিষ্ট্য হিসেবে স্বীকৃত। বিষয়টি ব্যাখ্যাপূর্বক সুশাসন এর উপরে বিস্তারিত আলোচনা করুন। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের সাফল্য ব্যর্থতা এবং আপনার মতামত বর্ণনা করুন।
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৫৩৩।

৩. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের আলোকে নিচের যে কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর লিখুন :
ক. সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম সম্পর্কিত বিধান কি?
খ. সংবিধানের প্রাধান্য বলতে কি বোঝায় তা অনুচ্ছেদ উল্লেখপূর্বক বর্ণনা করুন।
গ. সংবিধানে রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব হিসেবে নাগরিকদের জন্য কি কি বিষয়সমূহ অর্জন নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে?
ঘ. চলাফেরার ও সমাবেশের স্বাধীনতা সম্পর্কিত সংবিধানের বিধানদ্বয় কি কি এবং তা কোন কোন অনুচ্ছেদে রয়েছে?
ঙ. জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা উল্লেখ করুন।
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৫১২।

৪. জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করুন। এই শিক্ষানীতি বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় কি ধরনের সংস্কার নিশ্চিত করতে পারে—বিস্তারিত বর্ণনা করুন।
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ২০৪।

৫. বাংলাদেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করুন। সংক্ষেপে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্য আলোচনা করুন।
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ০৭ ও ৫০।

৬. বাজার অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রাসঙ্গিকতা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করুন।
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ১৭৯।

৭. সিভিল সোসাইটি কি? এর বৈশিষ্ট্যসমূহসহ লিখুন। বাংলাদেশে সিভিল সোসাইটির সঠিক রূপ, কার্যক্রম এবং সরকারের সাথে এর সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা করুন এবং এর কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা বাংলাদেশে কি হতে পারে বলে আপনি মনে করেন তাও উল্লেখ করুন।
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৭৭২।

৮. বাংলাদেশে ঋণ প্রদানে আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক ও এডিবির সমধর্মী শর্তগুলো কি কি? সকল শর্তই কি পরিহার করতে পারলে তা পরিহার করা উচিত এবং শর্তগুলো সঠিক বা আংশিক জনস্বার্থের অনুকূল কি? মতামত দিন।
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৭৯৪।

৩৩তম বিসিএস ২০১২ | বাংলাদেশ বিষয়াবলি-প্রথম পত্র

সময় : ৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ১০০

[দ্রষ্টব্য : প্রার্থীদিগকে যে কোনো আটটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান সমান।]

১. যুদ্ধাপরাধ কি? যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য কয়টি ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছে? যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের যৌক্তিকতা বর্ণনা করুন।
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৮৮৮।

২. টেকসই উন্নয়ন বলতে কি বুঝায়? বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়নে অন্তরায়গুলো কি কি?
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ১৫০।

৩. দুর্নীতি আমাদের জাতীয় উন্নয়নের অন্যতম প্রধান অন্তরায়। এক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন প্রকৃত কার্যকরি ভূমিকা গ্রহণ করতে পারছে না কেন?
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ১২৭।

৪. বাংলাদেশকে পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ বলা হয় কেন? সংশ্লিষ্ট ভৌগোলিক তথ্যসমূহ উল্লেখপূর্বক বর্ণনা করুন।
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ০৪।

৫. সামাজিক অস্থিরতা বলতে কি বুঝায়? বাংলাদেশে সামাজিক অস্থিরতা বৃদ্ধির কারণ ও এর প্রতিকার আলোচনা করুন।
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ১২৩।

৬. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে চীনা ও যুক্তরাষ্ট্রের বৈরী মনোভাবের কারণ কি ছিল? আমাদের পররাষ্ট্রনীতির মূল বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৮৭৬।

৭. বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে সংস্কৃতির অবদান আলোচনা করুন।
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৭৪।

৮. বাংলাদেশের প্রধান প্রধান উপজাতি কতটি এবং কি কি? প্রধান তিনটি উপজাতি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৪৭।

৯. অবাধ, সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা কি? বাংলাদেশে নির্বাচন কমিশনের দুর্বল দিকগুলো আলোচনা করুন।
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৭১৬।

১০. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের গুরুত্ব আলোচনা করুন। এক্ষেত্রে বোয়েসেল (Bangladesh Overseas Employment and Service Ltd) ও বায়রা (Bangladesh Association of International Recruiting Agencies)-এর ভূমিকা আলোচনা করুন।
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ১৩১।

১১. আওয়ামী মুসলিম লীগের নাম কেন আওয়ামী লীগ করা হয়? কত সালে আওয়ামী লীগ নামকরণ করা হয়?
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৬৫।

১২. টীকা লিখুন (যে কোনো চারটি) :

ক. ডেসটিনি ২০০০ লি.

উত্তর : বাংলাদেশে পরিচালিত একটি এমএলএম (মাল্টি লেভেল মার্কেটিং) কোম্পানি 'ডেসটিনি ২০০০ লি.'। ২০০০ সালে 'ডেসটিনি' ও 'নিওয়ে' এমএলএম কোম্পানিরূপে ব্যবসা শুরু করে। ২০০২ সালে কোম্পানিটি RJSC থেকে নিবন্ধন নেয়। সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও ডেসটিনি শেষ পর্যন্ত বিতর্কিত ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ে। নতুন সদস্য ভর্তির উপর কমিশন প্রাপ্তিসহ নানা উদ্ভট ও কঠিন সব শর্তের বেড়াজালে আবদ্ধ এ নিষিদ্ধ এমএলএম কোম্পানির প্রধান বৈশিষ্ট্য। নিজে সদস্য হওয়ার পর অন্যকে সদস্য করানোর বিনিময়ে কমিশন প্রাপ্তি পদ্ধতি 'ডেসটিনি ২০০০ লি'. এর মূল বিষয়। নানা অপ্রয়োজনীয় বিলাসী দ্রব্য বা সেবাসামগ্রীর মার্কেটিংয়ের জোর চেষ্টায় এর প্রতি সৃষ্টি হয়েছে জনআস্থার প্রবল সংকট। এর সাথে নগদ অর্থের বিনিময়ে তথাকথিত সাইকেলভিত্তিক কমিশন প্রদান এ ব্যবসাকে আরও বিতর্কিত করেছে।

খ. হলমার্ক গ্রুপ লি.

উত্তর : বাংলাদেশে 'হলমার্ক গ্রুপ লি.'-এর ব্যাংক লোন প্রসঙ্গটি একটি বড় ধরনের কেলেঙ্কারি হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। সোনালী ব্যাংকের রূপসী বাংলা হোটেল শাখা থেকে হলমার্ক গ্রুপের নামে টাকা আত্মসাৎ বাংলাদেশে ব্যাংকিং সেক্টরের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় অর্থ কেলেঙ্কারি। হলমার্ক গ্রুপসহ ৬টি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা আত্মসাতের ঘটনা ২০১২ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের এক প্রতিবেদনে বেরিয়ে আসে। প্রতারণার মাধ্যমে ব্যাংক থেকে ৩,৬০৬ কোটি ৪৮ লাখ টাকা হাতিয়ে নেয় হলমার্ক গ্রুপসহ ৬টি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। এর মধ্যে শুধু হলমার্ক গ্রুপই অবৈধভাবে উত্তোলন করে ২,৬৬৮ কোটি ৩৮ লাখ টাকা।

গ. রামসাগর

উত্তর : প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত রামসাগর দীঘি দিনাজপুর জেলায় অবস্থিত। এর গভীরতা গড়ে ১০ মিটার। দিনাজপুরের বিখ্যাত জমিদার রামনাথ এ দীঘিটি খনন করেন। এটি খনন করা হয় ১৭৫০ থেকে ১৭৫৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। এ দীঘির প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামনাথ ছিলেন দিনাজপুর রাজবংশের শ্রেষ্ঠ নৃপতি। আজও খরা মৌসুমে এ জেলার নদ-নদী, খাল-বিল শুকিয়ে গেলেও রামসাগর শুকায় না। পাড়ভূমিসহ এ দীঘির মোট আয়তন ১৬ লক্ষ ২৮ হাজার ১২০ বর্গফুট। এটি উত্তর-দক্ষিণে লম্বা। জল ভাগের আয়তন ৬০ একর। রামসাগরে একটি চিড়িয়াখানা স্থাপন করা হয়েছে, যা দর্শক ও শিশু-কিশোরদের মনে প্রচুর আনন্দ দেয়।

ঘ. আয়কর মেলা

উত্তর : মানুষকে কর প্রদানের উৎসাহ এবং কর প্রদান সংস্কৃতি গড়ে তুলতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আয়কর মেলার আয়োজন করে। ২০১২ সালে তৃতীয়বারের মতো আয়োজিত হয় এ মেলা। দেশের সাতটি বিভাগীয় শহরে ৭ দিনব্যাপী এবং প্রথমবারের মতো ১১টি বৃহৎ জেলা শহরে ৫ দিনব্যাপী আয়কর মেলা ২০১২ শুরু হয় ১৬ সেপ্টেম্বর। আয়কর মেলার উদ্দেশ্য ছিল করদাতাদের অনলাইনে আয়কর প্রদানে উৎসাহ প্রদান করা। রাজস্ব আদায়ে নতুন রেকর্ডের মধ্য দিয়ে শেষ হয় আয়কর মেলা ২০১২। মেলায় রাজস্ব আদায় হয় ৮৩৮,৭৯,৩২,৫৮১ টাকা। এছাড়া এবারের মেলায় আয়কর বিবরণী দাখিল করেন ১,০২,১৯৮ জন করদাতা। আর কর শনাক্তকরণ নম্বর (TIN) নেন ১৬,৪০২ জন নতুন কর দাতা এবং কর সংক্রান্ত সেবা নিতে মেলায় আসেন ৩,৪৬,৮৬৭ জন ব্যক্তি।

ঙ. ন্যায়পাল

উত্তর : সুইডিশ শব্দ 'Ombudsman'-এর বাংলা প্রতিশব্দ ন্যায়পাল। 'দুর্নীতিবাজ প্রশাসনযন্ত্রের কবল থেকে নাগরিক অধিকার রক্ষার জন্য যে ব্যক্তি অভিযোগ গ্রহণকারী কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করেন তাকে ন্যায়পাল বলে। ১৮০৯ সালে প্রথমে সুইডেনে ন্যায়পাল নিয়োগ করা হয়। ন্যায়পাল একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হলেও দেশভেদে এর কার্যক্রমে ভিন্নতা রয়েছে। অসমতা, আমলাতান্ত্রিকতা, মানবাধিকার লঙ্ঘন, নানাবিধ দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনা দূর করতে এবং আকীর্ণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সচল রাখতে সুশাসন ও আইনের কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে ন্যায়পাল পদ সৃষ্টি করা হয়। এসব দিক বিবেচনা করে বাংলাদেশের সংবিধানেও ন্যায়পাল গঠনের বিধান রাখা হয়েছে। সংবিধানের ৭৭ নং অনুচ্ছেদে ন্যায়পাল সম্পর্কে বিস্তারিত বলা আছে।

৩. **দুর্নীতি আমাদের জাতীয় উন্নয়নের অন্যতম প্রধান অন্তরায়। এক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন প্রকৃত কার্যকরি ভূমিকা গ্রহণ করতে পারছে না কেন?**
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ১২৭।

৪. **বাংলাদেশকে পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ বলা হয় কেন? সংশ্লিষ্ট ভৌগোলিক তথ্যসমূহ উল্লেখপূর্বক বর্ণনা করুন।**
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ০৪।

৫. **সামাজিক অস্থিরতা বলতে কি বুঝায়? বাংলাদেশে সামাজিক অস্থিরতা বৃদ্ধির কারণ ও এর প্রতিকার আলোচনা করুন।**
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ১২৩।

৬. **বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে চীনা ও যুক্তরাষ্ট্রের বৈরী মনোভাবের কারণ কি ছিল? আমাদের পররাষ্ট্রনীতির মূল বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।**
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৮৭৬।

৭. **বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে সংস্কৃতির অবদান আলোচনা করুন।**
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৭৪।

৮. **বাংলাদেশের প্রধান প্রধান উপজাতি কতটি এবং কি কি? প্রধান তিনটি উপজাতি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।**
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৪৭।

৯. **অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা কি? বাংলাদেশে নির্বাচন কমিশনের দুর্বল দিকগুলো আলোচনা করুন।**
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৭১৬।

১০. **বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের গুরুত্ব আলোচনা করুন। এক্ষেত্রে বোয়েসেল (Bangladesh Overseas Employment and Service Ltd) ও বায়রা (Bangladesh Association of International Recruiting Agencies)-এর ভূমিকা আলোচনা করুন।**
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ১৩১।

১১. **আওয়ামী মুসলিম লীগের নাম কেন আওয়ামী লীগ করা হয়? কত সালে আওয়ামী লীগ নামকরণ করা হয়?**
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৬৫।

১২. **টীকা লিখুন (যে কোনো চারটি) :**

ক. **ডেসটিনি ২০০০ লি.**

উত্তর : বাংলাদেশে পরিচালিত একটি এমএলএম (মাল্টি লেভেল মার্কেটিং) কোম্পানি 'ডেসটিনি ২০০০ লি.'। ২০০০ সালে 'ডেসটিনি' ও 'নিওয়ে' এমএলএম কোম্পানিরূপে ব্যবসা শুরু করে। ২০০২ সালে কোম্পানিটি RJSC থেকে নিবন্ধন নেয়। সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও ডেসটিনি শেষ পর্যন্ত বিতর্কিত ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ে। নতুন সদস্য ভর্তির উপর কমিশন প্রাপ্তিসহ নানা উদ্ভট ও কঠিন সব শর্তের বেড়াজালে আবদ্ধ এ নিষিদ্ধ এমএলএম কোম্পানির প্রধান বৈশিষ্ট্য। নিজে সদস্য হওয়ার পর অন্যকে সদস্য করানোর বিনিময়ে কমিশন প্রাপ্তি পদ্ধতি 'ডেসটিনি ২০০০ লি'. এর মূল বিষয়। নানা অপ্রয়োজনীয় বিলাসী দ্রব্য বা সেবাসামগ্রীর মার্কেটিংয়ের জোর চেষ্টায় এর প্রতি সৃষ্টি হয়েছে জনআস্থার প্রবল সংকট। এর সাথে নগদ অর্থের বিনিময়ে তথাকথিত সাইকেলভিত্তিক কমিশন প্রদান এ ব্যবসাকে আরও বিতর্কিত করেছে।

খ. **হলমার্ক গ্রুপ লি.**

উত্তর : বাংলাদেশে 'হলমার্ক গ্রুপ লি.'-এর ব্যাংক লোন প্রসঙ্গটি একটি বড় ধরনের কেলেঙ্কারি হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। সোনালী ব্যাংকের রূপসী বাংলা হোটেল শাখা থেকে হলমার্ক গ্রুপের নামে টাকা আত্মসাৎ বাংলাদেশে ব্যাংকিং সেক্টরের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় অর্থ কেলেঙ্কারি । হলমার্ক গ্রুপসহ ৬টি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা আত্মসাতের ঘটনা ২০১২ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের এক প্রতিবেদনে বেরিয়ে আসে। প্রতারণার মাধ্যমে ব্যাংক থেকে ৩,৬০৬ কোটি ৪৮ লাখ টাকা হাতিয়ে নেয় হলমার্ক গ্রুপসহ ৬টি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। এর মধ্যে শুধু হলমার্ক গ্রুপই অবৈধভাবে উত্তোলন করে ২,৬৬৮ কোটি ৩৮ লাখ টাকা।

গ. **রামসাগর**

উত্তর : প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত রামসাগর দীঘি দিনাজপুর জেলায় অবস্থিত। এর গভীরতা গড়ে ১০ মিটার। দিনাজপুরের বিখ্যাত জমিদার রামনাথ এ দীঘিটি খনন করেন। এটি খনন করা হয় ১৭৫০ থেকে ১৭৫৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। এ দীঘির প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামনাথ ছিলেন দিনাজপুর রাজবংশের শ্রেষ্ঠ নৃপতি। আজও খরা মৌসুমে এ জেলার নদ-নদী, খাল-বিল শুকিয়ে গেলেও রামসাগর শুকায় না। পাড়ভূমিসহ এ দীঘির মোট আয়তন ১৬ লক্ষ ২৮ হাজার ১২০ বর্গফুট। এটি উত্তর-দক্ষিণে লম্বা। জল ভাগের আয়তন ৬০ একর। রামসাগরে একটি চিড়িয়াখানা স্থাপন করা হয়েছে, যা দর্শক ও শিশু-কিশোরদের মনে প্রচুর আনন্দ দেয়।

ঘ. **আয়কর মেলা**

উত্তর : মানুষকে কর প্রদানের উৎসাহ এবং কর প্রদান সংস্কৃতি গড়ে তুলতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আয়কর মেলার আয়োজন করে। ২০১২ সালে তৃতীয়বারের মতো আয়োজিত হয় এ মেলা। দেশের সাতটি বিভাগীয় শহরে ৭ দিনব্যাপী এবং প্রথমবারের মতো ১১টি বৃহৎ জেলা শহরে ৫ দিনব্যাপী আয়কর মেলা ২০১২ শুরু হয় ১৬ সেপ্টেম্বর। আয়কর মেলার উদ্দেশ্য ছিল করদাতাদের অনলাইনে আয়কর প্রদানে উৎসাহ প্রদান করা। রাজস্ব আদায়ে নতুন রেকর্ডের মধ্য দিয়ে শেষ হয় আয়কর মেলা ২০১২। মেলায় রাজস্ব আদায় হয় ৮৩৮,৭৯,৩২,৫৮১ টাকা। এছাড়া এবারের মেলায় আয়কর বিবরণী দাখিল করেন ১,০২,১৯৮ জন করদাতা। আর কর শনাক্তকরণ নম্বর (TIN) নেন ১৬,৪০২ জন নতুন কর দাতা এবং কর সংক্রান্ত সেবা নিতে মেলায় আসেন ৩,৪৬,৮৬৭ জন ব্যক্তি।

ঙ. **ন্যায়পাল**

উত্তর : সুইডিশ শব্দ 'Ombudsman'-এর বাংলা প্রতিশব্দ ন্যায়পাল। 'দুর্নীতিবাজ প্রশাসনযন্ত্রের কবল থেকে নাগরিক অধিকার রক্ষার জন্য যে ব্যক্তি অভিযোগ গ্রহণকারী কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করেন তাকে ন্যায়পাল বলে। ১৮০৯ সালে প্রথমে সুইডেনে ন্যায়পাল নিয়োগ করা হয়। ন্যায়পাল একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হলেও দেশভেদে এর কার্যক্রমে ভিন্নতা রয়েছে। অসমতা, আমলাতান্ত্রিকতা, মানবাধিকার লঙ্ঘন, নানাবিধ দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনা দূর করতে এবং আকীর্ণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সচল রাখতে সুশাসন ও আইনের কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে ন্যায়পাল পদ সৃষ্টি করা হয়। এসব দিক বিবেচনা করে বাংলাদেশের সংবিধানেও ন্যায়পাল গঠনের বিধান রাখা হয়েছে। সংবিধানের ৭৭ নং অনুচ্ছেদে ন্যায়পাল সম্পর্কে বিস্তারিত বলা আছে।

চ. **হযরত খান জাহান আলী (র)**

উত্তর : হযরত খান জাহান আলী (র) ছিলেন বিখ্যাত ইসলাম প্রচারক ও শাসক। তিনি সুলতানী আমলে এ দেশে (বাংলাদেশ) আসেন। তিনি প্রথমে যশোর এবং পরে বাগেরহাটে ইসলাম প্রচার করেন এবং বাগেরহাটের নাম 'খলিফাতাবাদ' রাখেন। তার জনহিতকর কাজের মধ্যে অন্যতম অমর কীর্তি বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদ। তিনি ১৪৫৯ খ্রিস্টাব্দে বাগেরহাটে মৃত্যুবরণ করেন। তার কবর বা মাজার ষাট গম্বুজ মসজিদের অদূরে দীঘির পাড়ে অবস্থিত।

৩৩তম বিসিএস ২০১২ | বাংলাদেশ বিষয়াবলি-দ্বিতীয় পত্র

সময় : ৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ১০০

দ্রষ্টব্য : বাংলা অথবা ইংরেজি যে কোনো একটি ভাষায় উত্তর দেওয়া যাবে। প্রার্থীদিগকে ১ নম্বর প্রশ্নের এবং অবশিষ্ট প্রশ্নের যে কোনো সাতটির উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।]

নম্বর

১. **যে কোনো আটটি প্রশ্নের উত্তর দিন :** ২ × ৮ = ১৬

ক. **বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গের নাম কি?**

উত্তর : তাজিং ডং, যার অপর নাম 'বিজয়' বা 'মদক মুয়াল'।

খ. **বাংলাদেশের ক্ষুদ্রতম বিভাগ কোনটি?**

উত্তর : সিলেট; যার আয়তন ১২,৬৩৬ বর্গকিমি। *[সূত্র : পঞ্চম আদমশুমারি রিপোর্ট ২০১১]*।

গ. **আয়তনে বাংলাদেশের বৃহত্তম জেলা কোনটি?**

উত্তর : রাঙামাটি। এর আয়তন ৬,১১৬.১১ বর্গ কিমি *[সূত্র : পঞ্চম আদমশুমারি রিপোর্ট ২০১১]*।

ঘ. **বঙ্গদেশে কবে আর্যদের আবির্ভাব ঘটে?**

উত্তর : সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব ১৪০০ বা ১৫০০ অব্দে আর্যগণ প্রথম উপমহাদেশে আগমন করে। আর্যদের উপমহাদেশে আগমনের অন্তত চৌদ্দশ বছর পর বঙ্গদেশে আর্যদের আবির্ভাব ঘটে।

ঙ. **কোন মুসলিম সর্বপ্রথম সমগ্র বাংলাদেশের অধিপতি হন?**

উত্তর : সুলতান ইলিয়াস শাহ সর্বপ্রথম সমগ্র বাংলার অধিপতি হন।

চ. **মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে?**

উত্তর : মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা জহিরউদ্দীন মুহম্মদ বাবর।

ছ. **পলাশীর যুদ্ধ কবে সংঘটিত হয়?**

উত্তর : ২৩ জুন ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

জ. **বাংলাদেশের সর্বোচ্চ খেতাব কোনটি?**

উত্তর : বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বীরত্বসূচক খেতাব 'বীরশ্রেষ্ঠ' (মুক্তিযুদ্ধকালীন/পরবর্তীকালে)। ২৮ নভেম্বর ২০১১ নতুনভাবে নামকরণ করা হয় চারটি বীরত্বসূচক পদক/খেতাবের, যার মধ্যে সর্বোচ্চ খেতাব 'বীর সর্বোত্তম'।

ঝ. **DPT-এর পূর্ণরূপ কি?**

উত্তর : DPT-এর পূর্ণরূপ Diptheria-Pertussis-Tetanus.

ঞ. **TT-এর পূর্ণরূপ কি?**

উত্তর : TT-এর পূর্ণরূপ হলো Tetanus Toxoid.

২. **বাংলাদেশের দশটি সুন্দরতম পর্যটন কেন্দ্রের নাম কি?** ১২

উত্তর : সপ্তদশ শতাব্দীতে বার্নিয়ার নামক ফ্রান্স থেকে আগত একজন পর্যটক বাংলাদেশের প্রশংসায় বলেছিলেন, 'এ দেশে প্রবেশ করার জন্য শত শত রাস্তা রয়েছে কিন্তু বের হবার জন্য একটি রাস্তাও নেই।' সপ্তম শতাব্দীতে চীনের পর্যটক হিওয়েন সাং বাংলাদেশ ভ্রমণকালে বলেছিলেন, 'কুয়াশা ও জলের ভেতর থেকে উদ্ভাসিত এক সুপ্ত সৌন্দর্য।'

বাংলাদেশে সাতশোর বেশি আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট স্থাপনা যেমন– সমুদ্র সৈকত, সবুজ উপত্যকা, বন, প্রভৃতি এবং মানবসৃষ্ট প্রত্নতাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিক স্থান, নান্দনিক ধর্মীয় স্থাপনা। আধুনিককালের মানবসৃষ্ট আশ্চর্যজনক স্থাপনা যেমন– জাতীয় সংসদ ভবন ও জাতীয় স্মৃতিসৌধ প্রভৃতি। বাংলাদেশের দশটি সুন্দরতম পর্যটন কেন্দ্র সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো :

১. **কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত :** বন্দরনগরী চট্টগ্রাম হতে প্রায় ১৫৫ কিমি. দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের তীরে অবস্থিত কক্সবাজার। এটি একটি জেলা শহর। কক্সবাজার বাংলাদেশের তথা পৃথিবীর অন্যতম মনোরম ও স্বাস্থ্যকর স্থান। কক্সবাজারের সমুদ্র সৈকত পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত। এর দৈর্ঘ্য ১২০ কিলোমিটার। কক্সবাজারের সুদীর্ঘ বালুকাময় সমুদ্র সৈকত পৃথিবীর খুব কম স্থানেই আছে। এই সুদীর্ঘ সৈকতের মনোরম দৃশ্য দেশী-বিদেশী পর্যটকদের নিকট খুবই আকর্ষণীয়। এখানকার মনোরম দৃশ্য উপভোগ করার জন্য দেশী-বিদেশী হাজার হাজার পর্যটক এখানে বেড়াতে আসেন। বর্তমানে এ কক্সবাজার আধুনিক সাজে সজ্জিত হয়েছে। এটি বাংলাদেশের এখন সবচেয়ে বড় পর্যটন কেন্দ্র। এখানে বহু অত্যাধুনিক পর্যটন আবাসিক হোটেল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া আরও কিছু অত্যাধুনিক আবাসিক হোটেল, শপিং সেন্টার নির্মিত হচ্ছে। কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত ধরে ৮/১০ কিলোমিটার দক্ষিণে গেলেই রয়েছে হিমছড়ি নামক অতি মনোরম স্থান। এ স্থানটি চলচ্চিত্র স্যুটিং স্পট হিসেবে খুবই প্রসিদ্ধ। এছাড়াও কক্সবাজারের আশেপাশে বৌদ্ধ যুগের অনেক প্রাচীন কীর্তি এখনও বিদ্যমান। এখানকার প্যাগোডাগুলো খুবই দর্শনীয়। এখানে একটি আবহাওয়া অফিস ও একটি বাতিঘর আছে। এখানে বৌদ্ধ ও রাখাইনসহ অনেক উপজাতির বসবাস রয়েছে।

২. **সুন্দরবন :** বন ও বন্যপ্রাণীর ব্যাপারে উৎসুক যে কোনো পর্যটকের পছন্দের তালিকার শীর্ষে রয়েছে সুন্দরবন। এটি বিশ্বের একক বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন এবং ইউনেস্কো ঘোষিত ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট। এ বনের পর্যটকগণ বিশ্বখ্যাত বিরল রয়েল বেঙ্গল টাইগার এক পলক দেখার জন্য উন্মুক্ত হয়ে থাকেন। এটি রয়েল বেঙ্গল টাইগারের প্রাকৃতিক আবাসস্থল। ছয় হাজারেরও বেশি বর্গকিলোমিটার আয়তনের এ বনে রয়েছে জালের মতো ছড়ানো অসংখ্য নদ-নদী ও খাল। সুন্দরবনের ৬২ শতাংশ বাংলাদেশে পড়েছে, বাকি অংশ ভারতের মধ্যে পড়েছে। বাংলাদেশের ৫টি জেলা– খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, পটুয়াখালী ও বরগুনা বিস্তৃত এ বন। বাঘ ছাড়াও বনে রয়েছে হরিণ, বানর, সাপ এবং বিভিন্ন প্রজাতির পাখি। সুন্দরী, গেওয়া, কেওড়া, ধুন্দল, গোলপাতা ইত্যাদি গাছের দেখা মিলবে এ বনে।

৩. **সোনারগাঁ :** প্রাচীন রাজধানী সোনারগাঁ ঢাকা শহর হতে প্রায় ২৬ কিলোমিটার দূরে এবং নারায়ণগঞ্জ হতে মাত্র ৫ কিলোমিটার দূরে মেঘনা নদীর তীরে অবস্থিত। সোনারগাঁয়ের পূর্ব নাম 'সুবর্ণ গ্রাম'। এটি বাংলাদেশের স্বাধীন শাসক ঈশা খাঁর রাজধানী ছিল। ঈশা খাঁর স্ত্রী সোনাবিবির নামে এর নাম রাখা হয় সোনারগাঁ। চারদিকে নদী দ্বারা বেষ্টিত হওয়ায় সোনারগাঁ খুবই নিরাপদ ছিল।

বার ভূঁইয়াদের অন্যতম ঈশা খাঁর শাসনামলে সোনারগাঁর গৌরব ও ঐতিহ্য ছিল। কিন্তু কালের স্রোতে বিভিন্ন উত্থান-পতনের ফলে সোনারগাঁর সে গৌরবময় অতীতের কোনো চিহ্নই এখন দেখা যায় না। সোনারগাঁয়ের প্রাচীন রাজধানীর বদলে এখন সেখানে কতগুলো গ্রামই চোখে পড়ে। ধ্বংস চিহ্নের মধ্যে বিরাট দীঘি, মাটির স্তূপ ও কেল্লা দেখা যায়।

মুঘল আমলের পূর্বেও এখানে বাংলাদেশের মুসলমান শাসকদের রাজধানী ছিল। পরে গৌড় এবং পাণ্ডুয়াতে রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ায় সোনারগাঁয়ের গৌরব ম্লান হয়ে যায়। অতীতের অসংখ্য ইমারতের অস্তিত্ব সোনারগাঁয়ের সর্বত্র বিদ্যমান, বিশেষ করে পানাম এলাকায় দেখতে পাওয়া যায়। এখান থেকেই শেরশাহের বিখ্যাত গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড আরম্ভ হয়। এখানে গিয়াসউদ্দীন আজম শাহের কবর এবং পাঁচ পীরের মাজার আছে। বর্তমানে সোনারগাঁয়ে একটি লোকশিল্প জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যার নাম 'শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন জাদুঘর'।

৪. **মাধবকুণ্ড :** দেশের আন্তর্জাতিক মানের একটি পর্যটন স্পট হওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনার নিদর্শন হচ্ছে মাধবকুণ্ড জলপ্রপাত। বাংলাদেশের একমাত্র নৈসর্গিক জলপ্রপাত হলো সিলেট জেলার এ মাধবকুণ্ড। যুগ যুগ ধরে এ পাহাড়ী জলকন্যা সৌন্দর্য পিপাসু পর্যটকদের কাছে টেনেছে অকৃত্রিমভাবে, অথচ বর্তমানে চরম অবহেলার দরুণ ধীরে ধীরে শীর্ণ হচ্ছে এর জলস্রোত সঙ্কুচিত হচ্ছে পাহাড়ি আবরণ, আর বদলে যাচ্ছে নৈসর্গিক পটভূমি।

মাধবকুণ্ড জলপ্রপাত শুধু যে পর্যটকদের আকর্ষণীয় স্থান তাই নয়, হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছে এটি তীর্থস্থানও। তবে কবে মাধবকুণ্ড জলপ্রপাত মানুষের নজর কাড়ে তা বলা মুশকিল। পাথারিয়া পাহাড়ের বুক চিরে বেরিয়ে আসা ঝরনাধারায় জলপতনের গুরুগম্ভীর শব্দ হয়তো এক সময় কেবল বুনো প্রাণীদের কাছেই পরিচিত ছিল। এলাকাটিও ছিল বন্যপ্রাণীর অভয়ারণ্য। লোকশ্রুতিতে শোনা যায়, এককালে সেখানে বুনো হাতি, গণ্ডার, বাঁদর, ভালুক এসব প্রাণী ছিল প্রচুর। সুদূর দিল্লী-কলকাতা থেকে গণ্ডার শিকারে আসতেন রাজ-রাজারা। কথিত আছে রাজা গৌড় গোবিন্দের বংশীয় শ্রীহট্ট রাজা গঙ্গাধ্বজ ওরফে গোবর্ধন পাথারিয়া পাহাড়ে এসেছিলেন শিকার করতে। পাহাড়ে একটি বিশ্রামাগার স্থাপনের ইচ্ছা হলো তার। তখন মাটি খুঁড়তে গিয়ে উপবিষ্ট পাওয়া গেল ধ্যানরত এক সন্ন্যাসীকে। রাজা এ সন্ন্যাসীর পদসেবা ও স্তুতি বন্দনা করতে থাকেন। সন্ন্যাসী রাজাকে বিভিন্ন উপদেশ দিয়ে বলেন, মধুকৃষ্ণা ত্রয়োদশীয় তিথিতে তাকে কুণ্ডে বিসর্জন দিতে। রাজা তাই করলেন। এ সময় পরপর তিনবার মাধব, মাধব, মাধব ধ্বনি উচ্চারিত হলো। আর সেই থেকেই এর নাম 'মাধবকুণ্ড'। তারপর অনেক সন্ন্যাসী এখানে এসেছেন। তারা নানা-আচার-উপচার পালন করেছেন। এখন প্রতিবছর চৈত্রের মধুকৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে বারুণী স্নান করতে আসেন শত শত পুণ্যার্থী। তখন বিরাট বারুণী মেলাও বসে কুণ্ড প্রাঙ্গণে। এখানে একটি শিবমন্দির ও মাধবমন্দির রয়েছে। বিশেষ করে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা এটিকে দর্শন করে যায়।

৫. **সীতাকোট বিহার :** পুরাতত্ত্ববিদদের মতে, আমাদের দেশে এ যাবৎ আবিষ্কৃত বিহারগুলোর মধ্যে প্রাচীনতম সীতাকোট বৌদ্ধবিহার। শালবন বা পাহাড়পুর বিহারের চেয়ে এর বয়স ৩০০ বছরের বেশি। দিনাজপুর শহর থেকে ৬০ কিলোমিটার দূরে দক্ষিণ-পূর্বে নবাবগঞ্জ থানার গোলাপগঞ্জ ইউনিয়নের ফতেহ আসামপুর গ্রামে রয়েছে এ বিহারের ধ্বংসাবশেষ। এ টিবিকে নিয়ে অনেক কিংবদন্তির মধ্যে একটি হচ্ছে ত্রেতা যুগে রামের স্ত্রী সীতা এখানে

অনেক দিন বনবাসে কাটিয়েছিলেন। তার স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্যই এর নামকরণ করা হয় সীতাকোট বা সীতাকুঠুরী। অবশ্য খননের পর জানা যায় যে, স্থানটির সাথে রাম বা সীতার কোনো সম্পর্ক নেই। প্রকৃতপক্ষে এটি একটি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের বিহার। ১৯৬৮ সালে দিনাজপুর জেলা পরিষদের আর্থিক সহায়তায় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এর খনন কাজে হাত দেয়। ১৯৭১-৭২ সালে খনন কাজ শেষ হয়। এ বিহার পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় ৬৫ মিটার দীর্ঘ এবং উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ৬৫ মিটার প্রস্থ। বিহারের উত্তর ব্লকে ৬ ফুট প্রশস্ত প্রবেশ পথ এবং ছোট বড় সব মিলিয়ে প্রায় ৪১টি প্রকোষ্ঠ রয়েছে।

৬. **সেন্টমার্টিন দ্বীপ :** দেশের কক্সবাজার জেলার টেকনাফের সমুদ্র উপকূল থেকে প্রায় ৪৮ কিলোমিটার দূরে বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত একটি ছোট প্রবাল দ্বীপ হলো সেন্টমার্টিন দ্বীপ। এটিই বাংলাদেশের একমাত্র সামুদ্রিক প্রবাল দ্বীপ। চারদিকে সমুদ্র সৈকত দ্বারা পরিবেষ্টিত রাশি রাশি পাথর আর শৈল জমে তৈরি হয়েছে এ প্রবাল দ্বীপ। এর আয়তন ১২ বর্গ কিলোমিটার এবং আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ ৫০০ একর। লোকসংখ্যা প্রায় ৪ হাজার। দ্বীপটিতে রয়েছে অসংখ্য নারিকেল গাছ, কেয়াবন ও কাঁটাযুক্ত গুল্মের ঝোঁপ। তাই দ্বীপটির আঞ্চলিক নাম 'নারিকেল জিঞ্জিরা। দ্বীপটিতে পাঁচ শতাধিক পরিবার, ৬টি গ্রাম, ১টি ইউনিয়ন, ১টি প্রাইমারি স্কুল, ১টি জুনিয়র হাই স্কুল এবং ১টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র রয়েছে। এখানে রয়েছে প্রচুর চুনাপাথর ও নুড়িপাথর। তাছাড়া অর্থনৈতিক দিক থেকে দ্বীপটির রয়েছে প্রচুর সম্ভাবনা এর খনিজ সম্পদের জন্য। এর চারপাশে সমুদ্র তলদেশের প্রচুর প্রবাল রয়েছে। দ্বীপের অধিবাসীদের প্রায় ৯৫% মৎস্যজীবী এবং একমাত্র যোগাযোগ ব্যবস্থা হলো নৌ-পথ।

৭. **শিলাইদহ :** দেশের এক ঐতিহাসিক দর্শনীয় স্থান কুষ্টিয়ার শিলাইদহ। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার জীবনের অনেকাংশ কাটিয়েছেন এ শিলাইদহে। এখানে রয়েছে তার কুঠিবাড়ি। প্রত্নতাত্ত্বিক ও পর্যটকদের কাছে এ স্থানটির গুরুত্ব উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। এখানে রয়েছে মনোমুগ্ধকর ফুলের বাগান, আম্রকানন, বকুলতলা, শান বাঁধানো পুকুরঘাট ইত্যাদি। এছাড়া কুঠিবাড়িতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যচর্চার সব নিদর্শন রয়েছে। গ্রীষ্মকালে বিভিন্ন জাতের ছায়াদানকারী বৃক্ষ, প্রাকৃতিক আলো-বাতাস দর্শনার্থীদের বিমোহিত করে তোলে। শিলাইদহ কুষ্টিয়া শহর থেকে ৬/৭ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। শহরের পাশ দিয়ে গড়াই নদী পার হয়েই এ কুঠিবাড়ীর স্থান। এর দু'পাশে রয়েছে বিস্তীর্ণ ছায়াঘেরা সুনিবিড় গ্রাম। শিলাইদহের কারণেই কুষ্টিয়া শহর সাংস্কৃতিক রাজধানী হিসেবে খ্যাত রয়েছে। বর্তমানে এখানে বেসরকারি উদ্যোগে একটি আধুনিক দ্বিতল পার্ক ও পিকনিক স্পট নির্মাণ করা হচ্ছে। কুষ্টিয়ার আয়কর আইনজীবী আলাউদ্দিন আহমদের অর্থায়নে 'আলো পিকনিক পার্ক ও রেস্ট হাউস নির্মিত হচ্ছে। সরকার প্রতি বছর ২৫ বৈশাখ শিলাইদহে জাতীয়ভাবে রবীন্দ্রনাথের জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন করে থাকে। এ উপলক্ষে সেখানে একটি মেলাও বসে। প্রায় প্রতিদিনই নির্মল আনন্দের সন্ধানে শত শত সংস্কৃতিমনা লোকজন এখানে আগমন করে।

৮. **ষাট গম্বুজ মসজিদ :** বাগেরহাটের খান জাহান আলীর মাজার হতে প্রায় ২.১৪ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে ঘোড়াদীঘির পূর্ব তীরে ষাট গম্বুজ মসজিদ অবস্থিত। এটি মহান সাধক খান জাহান আলী কর্তৃক নির্মিত। গঠন প্রণালী ও স্থাপত্যকৌশলে এটি একটি অনন্য সৃষ্টি। বাংলাদেশের মুঘল আমলের মসজিদগুলোর মধ্যে এটি বৃহত্তম। মসজিদটির উপরে ৭৭টি

এবং চারকোণে ৪টি মোট ৮১টি গম্বুজ সত্ত্বেও এ মসজিদকে কেন ৬০ গম্বুজ মসজিদ বলা হয় তার কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায়নি। অনেকের অনুমান মসজিদের অভ্যন্তরে ৬০টি স্তম্ভ আছে বলে মসজিদটির নাম ষাট গম্বুজ মসজিদ। আবার অন্যদের মতে, মসজিদের উপর সাত সারি গম্বুজ আছে বলে সাত থেকে ষাট গম্বুজ নামকরণ হয়েছে। মসজিদের বাইরে এক বিরাট এলাকা জুড়ে একটি বেষ্টনী প্রাচীর ছিল। এর পূর্বদিকে প্রধান প্রবেশ তোরণ ছিল। তোরণের দু'পাশে দুটি কক্ষ ও বেষ্টনী প্রাচীর নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। শুধু প্রবেশ তোরণটি টিকে আছে। এ মসজিদটি খান জাহান আলী তাঁর দরবার কক্ষ হিসেবে ব্যবহার করতেন বলে জনশ্রুতি আছে।

৯. **কুয়াকাটা :** দেশের যে কয়টি পর্যটন কেন্দ্র দেশী ও বিদেশী পর্যটকদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে কুয়াকাটা তাদের মধ্যে অন্যতম। ঢাকা থেকে প্রায় ৩০০ কিমি দূরে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে পটুয়াখালী জেলায় এটি অবস্থিত। নৈসর্গিক সৌন্দর্যের এক অপরূপ শোভায় সজ্জিত হয়ে সমুদ্র সৈকতে অবস্থিত এই স্থানটি সহজেই পর্যটকদের মনে বিনোদনের খোরাক জোগাতে পারে। ১৮ কিমি সমুদ্র সৈকতের অধিকারী এ মনোহর স্থানটিতে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত গভীরভাবে অবলোকন করার সৌভাগ্য জোটে পর্যটকদের। এছাড়া কুয়াকাটার মহিপুর থেকে সুন্দরবনের একটি অংশও চোখে পড়ে যা পর্যটকদের নিকট বিনোদনের এক নতুন মাত্রা যোগ করে। চারদিকে পাখির ডাক আর মুক্ত আকাশে তুলার মত ভাসমান মেঘ দেখে সহজেই যে কেউ অবিভূত হয়ে পড়বে। পাশাপাশি রাখাইন সম্প্রদায়ের নাচ-গানের উৎসব, নারকেল কুঞ্জ, প্যাগোডা এরকম অনেক কিছুই সৌন্দর্য পিপাসু মানুষকে কিছু সময়ের জন্য হলেও হারিয়ে ফেলবে অন্যজগতে। পর্যটকদের বিশেষ সুবিধার কথা চিন্তা করে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন সেখানে অত্যাধুনিক হোটেল নির্মাণ করেছে।

১০. **পাহাড়পুর :** বাংলাদেশের বৌদ্ধ ও হিন্দু সংস্কৃতির এক আকর্ষণীয় নিদর্শন নওগাঁর পাহাড়পুর। পাহাড়পুর রাজশাহী বিভাগের নওগাঁ জেলায় অবস্থিত। এর প্রাচীন নাম 'সোমপুর'। পাহাড়পুর ধ্বংসাবশেষের নামকরণ করা হয়েছে নওগাঁ জেলার পাহাড়পুর নামক এক গ্রামের নামানুসারে। নওগাঁ সমতল পলিমাটির অঞ্চল, অথচ এই এলাকায় ব্যতিক্রমধর্মী অসমতল উচ্চ পাহাড়ের অস্তিত্ব লক্ষণীয়। তাই যুক্তি দেখানো হয়েছে ব্যতিক্রমধর্মী অসমতল এলাকার জন্য 'পাহাড়পুর' নামটি গৃহীত হয়েছে। বাংলাদেশে প্রাক-ইসলামী যুগের সর্বাপেক্ষা দর্শনীয় ঐতিহাসিক নিদর্শনটি হল পাহাড়পুরে অবস্থিত সোমপুর বৌদ্ধ বিহার। তবে এ পর্যন্ত সারা বিশ্বে আবিষ্কৃত বৌদ্ধ বিহারগুলোর মধ্যে এটি সর্ববৃহৎ একক বৌদ্ধ বিহার।

পরিশেষ : বাংলাদেশে পর্যটনের আকর্ষণের অভাব নেই। একজন পর্যটক যা চায় তার সবই এ দেশে আছে। পর্যটন শিল্পে বাংলাদেশের সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল। পর্যটন শিল্পে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ সমাধান করতে পারলে এবং উপযুক্ত পর্যটন পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারলে বাংলাদেশের পর্যটন কর্মসংস্থান, বিনিয়োগ ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের অন্যতম প্রধান উৎস হতে পারে।

৩. ক. **বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি কিরূপ?** ৬

উত্তর : বাংলাদেশ পলল গঠিত একটি আর্দ্র অঞ্চল। উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বের সামান্য পাহাড়ি অঞ্চল এবং উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাংশের সীমিত উঁচুভূমি ব্যতীত সমগ্র বাংলাদেশ

নদীবিধৌত এক বিস্তীর্ণ সমভূমি। বাংলাদেশ ভূখণ্ড মূলত গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা নদীগঠিত সুবৃহৎ বদ্বীপের সমন্বয়ে সৃষ্ট। এ দেশের ভূখণ্ড উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্বে ক্রমশ ঢালু। বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি প্রধানত তিনটি ভাগে বিভক্ত। ১. দেশের উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ টারশিয়ারি যুগের। ২. বরেন্দ্রভূমি, মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় এবং লালমাই পাহাড় সোপান বা চত্বর অঞ্চলসমূহ ২৫,০০০ বছর পূর্বে প্লাইস্টোসিনকালে আন্তঃবরফগলা পানির প্লাবনে সৃষ্টি হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। ৩. টারশিয়ারি যুগের পাহাড় এবং প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ ছাড়া সমগ্র বাংলাদেশ নদীবিধৌত এক বিস্তীর্ণ সমভূমি। বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি এ দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাকে নানাভাবে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হতে বঙ্গোপসাগরের ওপর দিয়ে আগত বায়ু এ দেশের পাহাড়ি অঞ্চলে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ব্যাপক বৃষ্টিপাত ঘটায়। এ বৃষ্টির ফলে বাংলাদেশ কৃষিকার্যে যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেছে। এছাড়া অধিক বৃষ্টিবহুল পাহাড়ি অঞ্চলে বনভূমির সৃষ্টি হয়েছে। অন্যদিকে নদীবাহিত উর্বর পলল মৃত্তিকা ও অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্য এ অঞ্চলের অধিকাংশ স্থানেই কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, পরিবহন, জনবসতি ইত্যাদির বিশেষ উন্নতি হয়েছে। এছাড়া ভগ্ন উপকূলের প্রভাবে এ দেশে দুটি স্বাভাবিক সমুদ্র বন্দর গড়ে উঠেছে।

খ. **বাংলাদেশের কোন কোন এলাকা নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম গঠিত?** ৬

উত্তর : খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান জেলা ও চট্টগ্রাম জেলার পূর্বাংশ এবং কক্সবাজার জেলার অংশবিশেষ নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম গঠিত। এ অঞ্চলের পাহাড়গুলোর গড় উচ্চতা ৬১০ মিটার। বাংলাদেশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ তাজিং ডং (বিজয়), যার উচ্চতা ১২৩১ মিটার, এটা বান্দরবানে অবস্থিত এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ শৃঙ্গ কিওক্রাডাং বান্দরবানের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত। এ অঞ্চলের অপর দুটি উচ্চতর পাহাড় চূড়া হচ্ছে মোদকমুয়াল (১০০০ মিটার) ও পিরামিড (৯১৫ মিটার)। এসব পাহাড় বেলে পাথর, শেল ও কর্দম শিলা দ্বারা গঠিত। এ অঞ্চলের পাহাড়গুলোর মধ্যবর্তী উপত্যকা দিয়ে কর্ণফুলী, সাঙ্গু, মাতামুহুরী, হালদা প্রভৃতি নদী প্রবাহিত হয়েছে।

প্রচুর বৃষ্টিপাতের কারণে এ অঞ্চলে বনভূমির সৃষ্টি হয়েছে যা চিরহরিৎ বন নামে পরিচিত। বাংলাদেশে এরূপ পাহাড়ি বনাঞ্চলের আয়তন ০.৬৭ মিলিয়ন হেক্টর। গর্জন, জারুল, সেগুন, চাপালিশ, গামাইর, বাঁশ ও রাবার এ অঞ্চলের প্রধান বৃক্ষ। বাংলাদেশের সবচেয়ে উঁচু বৃক্ষ বৈলাম (উচ্চতা ২৪০ ফুট প্রায়) চট্টগ্রাম ও রাঙামাটির গহীন অরণ্যে পাওয়া যায়। অঞ্চল হিসেবে বাংলাদেশের বৃহত্তম বনভূমি পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বনভূমি। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বনভূমির আয়তন প্রায় ১২ হাজার বর্গকিলোমিটার।

৪. ক. **ছিটমহল কি?** ৬

উত্তর : একটি স্বাধীন দেশের অভ্যন্তরে পার্শ্ববর্তী বা সীমান্তবর্তী অন্য কোনো স্বাধীন দেশের বিচ্ছিন্নভাবে থেকে যাওয়া ভূখণ্ডকে ছিটমহল বলে।

বাংলাপিডিয়ার তথ্যমতে, বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে অবস্থিত ছিটমহলগুলোর মধ্যে ১১৯টি ভারতের ভিতর, যা বাংলাদেশ দাবি করে, আর ৭৩টি বাংলাদেশের ভিতর, যা ভারত দাবি করে। বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ভারতীয় সীমানায় অবস্থিত বাংলাদেশী ৭৫টি ছিটমহলের মধ্যে ৪১টি লালমনিরহাট জেলায়। এর মধ্যে ২টি হাতিবান্ধা উপজেলায়, ১টি

লালমনিরহাট সদরে, ৪টি কালীগঞ্জে, ৩টি আদিতমারীতে, ২৮টি পাটগ্রামে এবং ৩টি ফুলবাড়িতে। কুড়িগ্রাম জেলায় অবস্থিত ১৬টি ছিটমহলের সবকটিই ভুরুঙ্গামারি উপজেলায়। এছাড়া পঞ্চগড়ের সদরে ২টি, বোদায় ১২টি এবং দেবীগঞ্জে ৪টি ছিটমহল রয়েছে।

এসব ছিটমহলের উৎপত্তি নিয়ে বিভিন্ন জনশ্রুতি রয়েছে। ব্রিটিশ আমলে এ অঞ্চলে সীমান্ত নির্ধারণের সময়ে সীমানা অঙ্কনকারী নেশাগ্রস্ত অবস্থায় থাকায় সীমান্তে ভুলবশত কিছু দাগ পড়ে। যার ফলে ছিটমহল সৃষ্টি হয়। অন্য মতে, সীমান্তের সংশ্লিষ্ট জমিদারগণ জুয়াখেলায় গ্রাম বাজি ধরতেন। এভাবে এক জমিদারের অঞ্চলের অংশবিশেষ অন্য জমিদারের মালিকানায় চলে যায়। এভাবে ছিটমহল সৃষ্টি হয়।

খ. স্ট্রিপ ম্যাপ কি? ৬

উত্তর : বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত এলাকার অর্ধ মাইল এলাকাজুড়ে তৈরি করা বিশদ তথ্যসংবলিত মানচিত্রকে 'স্ট্রিপ ম্যাপ' (সূক্ষ্ম রেখাভিত্তিক মানচিত্র) বলা হয়। এ মানচিত্রের স্কেল ১৬ ইঞ্চিতে এক মাইল। বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যকার বিদ্যমান সীমান্ত সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে বাংলাদেশের ভারতীয় সীমান্ত অঞ্চলের স্ট্রিপ ম্যাপ স্বাক্ষরের উদ্যোগ নেয়া। এ স্ট্রিপ ম্যাপগুলো দুই পর্বে স্বাক্ষরিত হয়। প্রথম পর্বে বাংলাদেশে কিছু স্ট্রিপ ম্যাপ স্বাক্ষরিত হয়। পরবর্তীতে বাকি স্ট্রিপ ম্যাপগুলো ভারতে স্বাক্ষরিত হয়।

সীমান্ত সমস্যা সমাধান বাংলাদেশ-ভারত উভয় দেশের জন্যই জরুরি। কেননা এর ফলে উভয় দেশই বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাই এ অনাকাঙ্ক্ষিত সমস্যা সমাধানে ১৯৭৪ সালে স্বাক্ষরিত ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে। অদ্যাবধি অমীমাংসিত ৬.৫ কিমি সীমান্ত দ্রুত চিহ্নিত করে এ ব্যাপারে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। স্ট্রিপ ম্যাপের মাধ্যমে ভারত-বাংলাদেশের জরিপ কর্মকর্তাগণ সীমান্ত জরিপ করেছেন যার মাধ্যমে সঠিক সীমানা চিহ্নিত করে সীমান্ত সমস্যা লাঘব করা যেতে পারে।

৫. ক. আবহাওয়া বলতে কি বুঝায়? ৪

উত্তর : ভূপৃষ্ঠের কোনো স্থানের কয়েক দিনের (কমপক্ষে এক সপ্তাহ) বায়ুর তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টিপাত প্রভৃতির গড় অবস্থাকে উক্ত স্থানের আবহাওয়া বলে।

বাংলাদেশে মোট ছয়টি ঋতু উপলব্ধি করা যায়। এগুলো হচ্ছে– গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত। বাংলাদেশের বার্ষিক গড় তাপমাত্রা ২৬.০১°। মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে জুন মাস থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত এখানে বৃষ্টিপাত ঘটে। শীতকালে বাংলাদেশে বায়ুর আর্দ্রতা কম থাকে। বাংলাদেশে গড় বৃষ্টিপাত ২০৩ সেন্টিমিটার। বাংলাদেশ ক্রান্তীয় অঞ্চলের অন্তর্গত। তাই এ দেশের জলবায়ু সমভাবাপন্ন।

খ. ঢাকায় শায়েস্তা খানের নির্মিত কীর্তিগুলো কি কি? ৪

উত্তর : ঢাকায় শায়েস্তা খানের নির্মিত কীর্তি হচ্ছে– ছোট কাটরা, চকবাজারের মসজিদ, সাত গম্বুজ মসজিদ, চক মসজিদ ও চম্পাতলীতে বিবি চম্পার মকবরার।

শায়েস্তা খানের পূর্ণ নাম মির্জা আবু তালিব ওরফে নবাব শায়েস্তা খান। তিনি ছিলেন বাদশাহ শাহজাহানের প্রধানমন্ত্রী আসফ খানের ছেলে। শায়েস্তা খান ১৬৬৪ সালে সুবাদার হয়ে বাংলায় আসেন। পরী বিবি ও বিরান বিবি যথাক্রমে শায়েস্তা খানের কন্যা ও বোন ছিলেন। শায়েস্তা

খান সর্বমোট ২১ বছর বাংলায় ছিলেন। তিনি লালবাগ কেল্লার নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করেন। চকবাজারে অবস্থিত ছোট কাটরা ১৬৬৩-৬৪ সালে নির্মিত হয় এবং এখানে সুবাদার শায়েস্তা খান বসবাস করতেন। ১৬৭৫ সালে চক মসজিদ নির্মিত হয়। তবে ঢাকার মোহাম্মদপুরের সাত গম্বুজ মসজিদটি শায়েস্তা খানের পুত্র উমিদ খাঁ নির্মাণ করেন বলে জানা যায়।

গ. পলাশীর যুদ্ধ কবে সংঘটিত হয়? ৪

উত্তর : ২৩ জুন ১৭৫৭ সালে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা ও ইংরেজদের মধ্যে পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মীরজাফরের চক্রান্ত, ইংরেজদের ষড়যন্ত্র ও ক্ষমতা লোভের কারণে সিরাজ-উদ-দৌলা ইংরেজদের কাছে পরাজিত হন। পরাজিত নবাবকে মুর্শিদাবাদ থেকে পলায়ন পথে রাজমহলের নিকট থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতি ছিল লর্ড ক্লাইভ। এ যুদ্ধে সিন ফ্রে নামক ফরাসি সেনাপতি নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাকে সাহায্য করেছিলেন। পরে মীরজাফরের পুত্র মীরনের নির্দেশে মোহাম্মদী বেগ নবাবকে হত্যা করে। নবাবের পরিবারের সদস্যদেরকে বুড়িগঙ্গা তীরের একটি স্থানে আটক রাখা হয় এবং পরবর্তীতে নৌকাডুবির মাধ্যমে হত্যা করা হয়। এ যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে প্রায় দুইশ বছর এ উপমহাদেশ ব্রিটিশ শোষকদের অধীনে থাকে।

৬. ক. বঙ্গভঙ্গ কি? ৪

উত্তর : বঙ্গভঙ্গ হলো অবিভক্ত বাংলাকে বিভক্ত করা। উত্তর ও পূর্ব বাংলাকে আসামের সাথে যুক্ত করে 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' নামক প্রদেশ সৃষ্টি।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম রাজনৈতিক ঘটনা ছিল 'বঙ্গভঙ্গ'। ১৯০৫ সালের ১ সেপ্টেম্বর বাংলাকে বিভক্ত করে রাজশাহী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগসহ আসামকে নিয়ে 'পূর্ববাংলা' ও আসাম নামে একটি প্রদেশ গঠন করা হয়। নতুন প্রদেশটির রাজধানী হয় প্রাচীন শহর ঢাকা। ভারতের তদানীন্তন বড়লাট লর্ড কার্জন বুঝেছিলেন, ৭ কোটি অধিবাসী অধ্যুষিত বাংলাকে একটি মাত্র কেন্দ্র থেকে কার্যকরভাবে শাসন করা সম্ভব নয়। স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার ও স্যার এন্ড্রু ফ্রেজার প্রমুখ প্রশাসকগণ ছিলেন এ পরিকল্পনার প্রধান উদ্যোক্তা। নতুন প্রদেশের আয়তন হয় ১,০৬,৬৫০ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ছিল ৩ কোটি ১০ লক্ষ। বঙ্গভঙ্গের পেছনে কতিপয় রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণ ছিল।

প্রথমত, এ শতকের প্রথমদিকে বঙ্গ-ভারতে রাজনৈতিক চেতনা ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন চাঙ্গা হয়ে উঠলে ইংরেজ সরকার বাংলাকে বিভক্ত করে এই আন্দোলনের গতিধারা স্তিমিত করতে চেয়েছিলেন।

দ্বিতীয়ত, উনিশ শতকের শেষ দিকে মুসলমানরা নিজেদের স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলে ব্রিটিশ সরকারও মুসলিম স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠে।

তৃতীয়ত, ব্রিটিশ সরকার বুঝতে পেরেছিলেন বঙ্গভঙ্গ হলে এ অঞ্চলে মুসলমানদের অবস্থার উন্নতি হবে। এসব কারণে বঙ্গভঙ্গের দাবি মুসলমানদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

বঙ্গভঙ্গের ফলশ্রুতিতে ঢাকা হাইকোর্ট, আইন পরিষদ ভবন, সেক্রেটারিয়েট ও আরও অনেক সুরম্য অট্টালিকা এ সময় নির্মিত হয়। লর্ড কার্জন ঢাকায় এসে ঘোষণা করেন, 'ঢাকা হবে নতুন শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু'। এ অঞ্চলে মুসলমানদের বিপুল সংখ্যাধিক্য থাকায় নতুন প্রদেশের প্রদেশপাল হন স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার।

খ. রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা পরিষদ কবে গঠিত হয়? ৪

উত্তর : ৩১ জানুয়ারি ১৯৫২ সালে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। ১৯৪৭ সালে নভেম্বরে করাচিতে কেন্দ্রীয় পর্যায়ের এক সম্মেলনে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত হয়। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারিতে এ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে। ঢাকায় সর্বপ্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। ১৯৪৮ সালের ১৯ মার্চ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণার পর ছাত্ররা সরাসরি প্রতিবাদ জানায়। পাকিস্তান সরকার এরপর দমন নীতি গ্রহণ করে। ১৯৫০ সালে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এবং ১৯৫২ সালের ৩০ জানুয়ারি খাজা নাজিমুদ্দিন পুনরায় একই ঘোষণা দেন যে উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। এ ঘোষণার প্রতিবাদে ৩০ জানুয়ারি ১৯৫২ ঢাকায় সর্বাত্মক ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। ৩১ জানুয়ারি ১৯৫২ এক জনসভায় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়। এ কমিটিতে আওয়ামী লীগ থেকে ২ জন, পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ থেকে ২ জন, খিলাফত-ই-রব্বানী থেকে ২ জন, ছাত্রলীগ থেকে ২ জন এবং বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি থেকে ২ জন সদস্য গৃহীত হয়।

গ. বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের নায়ক কে? ৪

উত্তর : বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের নায়ক জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। বঙ্গবন্ধু গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার দাবিতে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের অধিকার আদায়ে একের পর এক সফল কর্মসূচি দেয়, যা ছিল সময়োপযোগী। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৬২-র শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬-র ছয় দফা, ১৯৭০-র সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ পরিকল্পনা প্রভৃতি বঙ্গবন্ধুকে জননেতায় পরিণত করে। তিনি ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ ও জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেন, যা বিশ্বের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা বলে স্বীকৃত এবং আব্রাহাম লিংকনের গেটিসবার্গের ভাষণের সাথে তুলনীয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তার অসামান্য অবদানের জন্য তাকে স্বাধীনতা সংগ্রামের নায়ক বলা হয়।

৭. ক. স্বাধীনতা যুদ্ধকালে বাংলাদেশকে কয়টি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছিল? ৪

উত্তর : স্বাধীনতা যুদ্ধকালে বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধকালীন অপারেশন পরিচালনার সুবিধার্থে এ সেক্টরসমূহ গঠন করা হয়েছিল।

মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিকটা ছিল গেরিলাভিত্তিক। কিন্তু এভাবে গেরিলা যুদ্ধ পাকিস্তানি সুশিক্ষিত সৈন্যদের পদানত করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে পারছিল না। ফলে যুদ্ধক্ষেত্রে গতিশীলতা আনয়ন ও মুক্তাঞ্চল গঠনের লক্ষ্যে সেনাবাহিনীর গঠন বিন্যাসের পরিবর্তন আনার পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এপ্রিল মাসে মুজিবনগর সরকার গঠিত হলে প্রধান সেনাপতি এমএজি ওসমানী সেনাবাহিনীর সদস্যদের নিয়ে নিয়মিত বিগ্রেড গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার সামরিক কৌশল হিসেবে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সমগ্র ভৌগোলিক এলাকাকে ১১টি সেক্টর বা রণাঙ্গনে ভাগ করা হয়। প্রতি সেক্টরে একজন সেক্টর কমান্ডার বা অধিনায়ক নিযুক্ত করা হয়। যুদ্ধ পরিচালনার জন্য প্রতিটি সেক্টরকে কয়েকটি সাব-সেক্টরে বিভক্ত করা হয় এবং প্রতিটি সাব-সেক্টরে একজন করে কমান্ডার নিয়োজিত হন।

খ. কবে কোথায় স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠার শপথ নেয়া হয়? ৪

উত্তর : ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ সালে মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলায় (পরবর্তীতে মুজিবনগর) আমবাগানে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার শপথ নেয়া হয়। এ দিন ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠনের ঘোষণা দেন। মুজিবনগর সরকার বা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠিত হয় ১০ এপ্রিল ১৯৭১ সালে। ১৭ এপ্রিল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন অধ্যাপক ইউসুফ আলী। এর আগে ৩ মার্চ ১৯৭১ সালে পল্টন ময়দানে স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ করা হয়।

গ. শহীদ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস কবে? ৪

উত্তর : শহীদ ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২১ ফেব্রুয়ারি। ১৭ নভেম্বর ১৯৯৯ ইউনেস্কো ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করে। ইউনেস্কোর ৩০তম সাধারণ অধিবেশনে এবং নির্বাহী পরিষদের ১৫৭তম অধিবেশনে এ ঘোষণা দেয়া হয়। ২০০০ সালে ১৮৮টি দেশে সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হয়। ৫ ডিসেম্বর ২০০৮ জাতিসংঘ ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন ছাত্র সমাজ মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে মিছিল করেছিল। সে মিছিলে পুলিশ গুলি করলে বহু ছাত্র প্রাণ হারান। অবশেষে পাক সরকার নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয় এবং ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের সংবিধানে বাংলা অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মর্যাদা লাভ করে।

৮. ক. নদী কাকে বলে? ৪

উত্তর : পাহাড়, হ্রদ, প্রস্রবণ প্রভৃতি উচ্চ ভূমিতে সৃষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতধারার মিলিত প্রবাহ নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক খাত দিয়ে প্রবাহিত হয়ে যখন অপর কোনো জলাশয়, হ্রদ বা সাগরে মিলিত হয় তখন ঐ প্রবাহকে নদী বলা হয়।

বাংলাদেশের নদীব্যবস্থা : বাংলাদেশের নদীগুলো সমভাবে প্রবাহিত নয়। দেশের উত্তর-পশ্চিম অংশের চেয়ে দক্ষিণাঞ্চলের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে নদীর সংখ্যা অনেক বেশি। এগুলো আকার-আয়তনেও বড়। এ দেশের নদীগুলো অধিকাংশই উত্তর-দক্ষিণে দক্ষিণমুখী হয়ে প্রবাহিত। প্রায় ২৪,১৪০ কিমি মোট দৈর্ঘ্যের বাংলাদেশের নদীগুলো চারটি নদীপ্রণালী বা নদীব্যবস্থায় বিভক্ত। যথা : ১. ব্রহ্মপুত্র-যমুনা, ২. গঙ্গা-পদ্মা, ৩. সুরমা-মেঘনা ও ৪. চট্টগ্রাম অঞ্চলের নদীসমূহ। গঠন ও প্রবাহ বৈশিষ্ট্যে বাংলাদেশের নদীগুলো কয়েকটি ভাগে বিভক্ত। যথা : প্রধান নদী, উপনদী, শাখা নদী, স্বাধীন নদী ও নদী মোহনা। এর মধ্যে গঙ্গা-পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র-যমুনা এবং সুরমা-মেঘনা দেশের প্রধান নদী। তবে বড় বড় কোনো নদীর উৎপত্তিস্থল বাংলাদেশে নয়। বাংলাদেশের নদ-নদীর প্রকৃত সংখ্যার কোনো সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। মাধ্যমিক ভূগোল ও বাংলাপিডিয়ার তথ্যানুযায়ী নদীর সংখ্যা প্রায় ৭০০টি। তবে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান পকেট বুক এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের 'বাংলাদেশের নদী-নদী' শীর্ষক বইয়ের তথ্য অনুযায়ী দেশে মোট নদ-নদীর সংখ্যা ৩১০টি।

খ. বাংলাদেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ কোনটি? ৪

উত্তর : কক্সবাজার জেলার টেকনাফের সমুদ্র উপকূল থেকে ৪৮ কিলোমিটার দূরে বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত একটি ছোট প্রবাল দ্বীপ সেন্টমার্টিন। এটিই বাংলাদেশের একমাত্র

সামুদ্রিক প্রবাল দ্বীপ। চারদিকে সমুদ্র সৈকত দ্বারা পরিবেষ্টিত রাশি রাশি পাথর আর শৈল জমে তৈরি হয়েছে এই প্রবাল দ্বীপ। এর আয়তন ৮ বর্গ কিলোমিটার এবং আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ ৫০০ একর। লোকসংখ্যা প্রায় ৪ হাজার। দ্বীপটিতে রয়েছে অসংখ্য নারিকেল গাছ, কেয়াবন ও কাঁটাযুক্ত গুল্মের ঝোঁপ। তাই দ্বীপটির আঞ্চলিক নাম হয়েছে নারিকেল জিঞ্জিরা। দ্বীপটিতে ৪৯০টি পরিবার, ৬টি গ্রাম, ৩টি ওয়ার্ড, ১টি প্রাইমারি স্কুল, ১টি জুনিয়র হাই স্কুল এবং ১টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র রয়েছে। এখানে রয়েছে প্রচুর চুনাপাথর ও নুড়ি পাথর। তাছাড়া খনিজ সম্পদের জন্য অর্থনৈতিক দিক থেকে দ্বীপটির রয়েছে প্রচুর সম্ভাবনা। এর চারপাশে সমুদ্র তলদেশে প্রচুর প্রবাল রয়েছে, যেগুলো প্রক্রিয়াজাত করে বিদেশে রপ্তানি করা যেতে পারে। দ্বীপের অধিবাসীদের প্রায় ৯৫% মৎস্যজীবী এবং একমাত্র যোগাযোগ ব্যবস্থা হলো নৌ-পথ। দ্বীপটিকে একটি পর্যটন স্পট হিসেবে গড়ে তোলার উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে।

গ. বাংলাদেশের বৃহত্তর ব-দ্বীপ কোনটি? ৪

উত্তর : বাংলাদেশের বৃহত্তর ব-দ্বীপ হচ্ছে সুন্দরবন। এটি দেশের দক্ষিণাংশে অবস্থিত। এ দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমের সমভূমিকে সাধারণত ব-দ্বীপ বলে। এ ব-দ্বীপ অঞ্চলটি বৃহত্তর কুষ্টিয়া, যশোর, ফরিদপুর, বরিশাল, পটুয়াখালী অঞ্চলের সমুদয় অংশ জুড়ে বিস্তৃত। এ ব-দ্বীপ অঞ্চলের দক্ষিণ ভাগের যে অংশে বঙ্গোপসাগরের জোয়ার-ভাটার প্রভাব পরিলক্ষিত হয় সে অংশকে স্রোতজ সমভূমি বলে। এ অঞ্চলে ছোট ছোট বহু নদী-নালা রয়েছে যা অসংখ্য শাখা-প্রশাখা ও খাঁড়িতে বিভক্ত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। এ স্রোতজ সমভূমি অঞ্চলের অধিকাংশ অঞ্চল জুড়ে ম্যানগ্রোভ বা গরান বৃক্ষের বনভূমি রয়েছে। এ বনভূমি সুন্দরবন নামে সুপ্রসিদ্ধ। এ অঞ্চলের নদীতে প্লাবন খুব কম কিন্তু নিয়মিত জোয়ার-ভাটা হয়।

৯. ক. ঢাকায় অবস্থিত এশিয়ার বৃহত্তম ডায়াবেটিক হাসপাতাল কোনটি? ৪

উত্তর : বাংলাদেশ তথা এশিয়ার বৃহত্তম ডায়াবেটিক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের নাম BIRDEM (Bangladesh Institute of Research and Rehabilitation in Diabetes Endocrine and Metabolic Disorders). জাতীয় অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইব্রাহীম ১৯৮০ সালে এ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। এটি ঢাকার শাহবাগে অবস্থিত। ডায়াবেটিস ছাড়াও এখানে হৃদরোগের উন্নতমানের চিকিৎসা করা হয়। এখানে DAB (Diabetic Association of Bangladesh) নামে একটি সংস্থা রয়েছে যা ১৯৫৬ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি গঠিত হয়েছিল।

খ. বঙ্গোপসাগর কোন মহাদেশের অংশবিশেষ? ৪

উত্তর : বঙ্গোপসাগর এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত এবং ভারত মহাসাগরের অংশবিশেষ। এটি বাংলাদেশের দক্ষিণ উপকূলে অবস্থিত। বঙ্গোপসাগরের গড় গভীরতা ২৬০০ মিটার বা ২.৬ কিমি এবং সর্বোচ্চ গভীরতা ৫২৫৮ মিটার বা ৫.২৫৮ কিমি। ভারতের কলকাতা, মাদ্রাজ, শ্রীলংকার কলম্বো, মিয়ানমারের রেঙ্গুন, আকিয়াব এবং বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও মংলা বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী বিখ্যাত বন্দর। বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত কয়েকটি দ্বীপ হচ্ছে সেন্টমার্টিন, মহেশখালী, কুতুবদিয়া, হাতিয়া, সন্দ্বীপ, মনপুরা, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ।

গ. বঙ্গোপসাগরের সীমারেখা কি? ৪

উত্তর : বঙ্গোপসাগরের উত্তরে বাংলাদেশ ও ভারত, পশ্চিমে ভারত ও শ্রীলংকা, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর এবং পূর্বে মিয়ানমার ও আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। এ উপসাগরের ঠিক দক্ষিণে ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপ। আন্তর্জাতিক মাপ অনুযায়ী বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ সীমানার পূর্ব প্রান্ত সুমাত্রা দ্বীপের সর্ব উত্তর বিন্দু এবং পশ্চিম প্রান্ত শ্রীলংকার সর্ব দক্ষিণ বিন্দু ডন্ড্রা হেড। বঙ্গোপসাগর ৫° উত্তর ও ২২° দক্ষিণ অক্ষাংশ এবং ৮০° পূর্ব ও ১০০° পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত।

১০. ক. পৃথিবীর মানুষ সবচেয়ে বেশি মাত্রায় আক্রান্ত হয় কোন দূষণ প্রক্রিয়ায়? ৪

উত্তর : পৃথিবীর মানুষ সবচেয়ে বেশি মাত্রায় আক্রান্ত হয় বায়ু দূষণে। পরিবেশ দূষণে শব্দ, পানি, তেজস্ক্রিয়তা ইত্যাদির ভূমিকা থাকলেও বায়ু দূষণের ভূমিকাই মুখ্য। বায়ু দূষণের পিছনে প্রধানত দুটি কারণ রয়েছে। প্রথমত, কলকারখানার ধোঁয়া এবং দ্বিতীয়ত, যানবাহনের ধোঁয়া। ক্রমবর্ধমান নগরায়ন, অধিক হারে যানবাহন বৃদ্ধি বায়ু দূষণে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। বায়ু দূষণের প্রভাব শুধু এক দেশে পড়ে না, বিশ্বব্যাপী এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। বায়ু দূষণের ফলে আমাদের স্বাস্থ্য স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি দুভাবে আক্রান্ত হতে পারে। কেউ বায়ু দূষণ থেকে মুক্ত নয়, তবে শিশু ও বৃদ্ধরা বেশি ক্ষতির শিকার। পরিবেশ দূষণ সমস্যা নিয়ে আজ সব দেশই চিন্তিত। সভ্যতার অস্তিত্বই আজ এক সংকটের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ পৃথিবী গড়ে তোলার লক্ষ্যে যে কোনো মূল্যে পরিবেশ দূষণ রোধ করার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

খ. নিসর্গ কর্মসূচি কি? ৪

উত্তর : নিসর্গ কর্মসূচি হচ্ছে দেশের বিপন্ন বনাঞ্চল ও জীববৈচিত্র্য রক্ষার উদ্দেশ্যে বন বিভাগের একটি কর্মসূচি। বাংলাদেশের বিপন্ন বনাঞ্চল ও বন্যপ্রাণী রক্ষায় সরকার এ পর্যন্ত বহু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশে প্রথম জাতীয় বননীতি গৃহীত হয় ১৯৭২ সালে। ১৯৮১ সাল থেকে সামাজিক বনায়নের কাজ শুরু হয়। ১৯৭২ সাল থেকে জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান শুরু হয়। ১৯৯৪ সালে জাতীয় বৃক্ষমেলা প্রবর্তন করা হয়। এছাড়াও ১৯৯২ সালে বাংলাদেশে পরিবেশ নীতি ঘোষিত হয়।

গ. বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা কত ধরনের এবং কি কি? ৪

উত্তর : দেশে বর্তমানে ১১ ধরনের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে। এগুলো হচ্ছে— ১. সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২. রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৩. নন-রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৪. কমিউনিটি বিদ্যালয়, ৫. প্রাইমারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট স্কুল (পরীক্ষণ বিদ্যালয়), ৬. উচ্চ বিদ্যালয় সংযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৭. কিন্ডারগার্টেন, ৮. এনজিও পরিচালিত (আনন্দ) স্কুল, ৯. স্যাটেলাইট স্কুল ১০. স্বাধীন এবতেদায়ী মাদ্রাসা, ১১. উচ্চ মাদ্রাসা সংযুক্ত এবতেদায়ী মাদ্রাসা।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এসব কটি ধারার মধ্যে একটি মৌলিক ঐক্য নিয়ে এসে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে কিছু বিষয়কে বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করেছে। এসব বিষয় হলো– বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বাংলাদেশ স্টাডিজ, তথ্য প্রযুক্তি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা। অবশ্য প্রত্যেক ধারার আবশ্যিক ও ঐচ্ছিক বিষয় পড়ানো যাবে। তৃতীয় শ্রেণী থেকে বাধ্যতামূলকভাবে ইংরেজি পড়াতে হবে। তবে প্রতিষ্ঠান চাইলে তা প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ানো যাবে।

১১.ক. সংবিধান কি? ৪

উত্তর : সাধারণত সংবিধান বলতে আমরা এমন কিছু নিয়ম-নীতি, বিধি-বিধান বা অনুশাসনকে বুঝি যা রাষ্ট্র পরিচালনার মূলসূত্র হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ রাজনৈতিক ব্যবস্থা এসব নিয়ম-কানুনকে অনুসরণ করেই তার কার্য পরিচালনা করে থাকে।

লেখক ও গবেষকদের মতে সংবিধান

এরিস্টটল, কে সি হুইয়ার, হারমান এইচ ফাইনার, লেসলি লিপসন, লর্ড ব্রাইস, সি এফ স্ট্রং, স্টিফেন লিকক, বিলিংব্রোক, উলসি, ডাইসি প্রমুখ সংবিধান বিশেষজ্ঞ এবং গবেষকগণ সংবিধানের সংজ্ঞা দেয়ার প্রয়াস পেয়েছেন। এদের মধ্যে এরিস্টটল, ডাইসি, কে সি হুইয়ার এবং লেসলি লিপসনের সংজ্ঞা সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটল সংবিধানের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে, 'A Constitution is the way of life the state has chosen for itself.'

আধুনিক মার্কিন সংবিধান বিশারদ ডাইসির মতে, 'সকল প্রকার নিয়ম-কানুন যা রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার অনুশীলন বা ক্ষমতার বণ্টনকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে তাকে সংবিধান বলে।'

কে সি হুইয়ার তার 'The English Constitution' গ্রন্থে সংবিধানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, সংবিধান হলো সেসব নিয়মের সমষ্টি যা কি উদ্দেশ্য এবং কোন বিভাগের সরকার কর্তৃক পরিচালিত হবে তা নির্দেশ করে।'

তবে সংবিধানের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা দিয়েছেন লেসলি লিপসন। মার্কিন এই সংবিধান বিশেষজ্ঞ তার 'Democratic Civilization' গ্রন্থে সংবিধানের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে, "সংবিধান হচ্ছে রাষ্ট্রের প্রশাসনগত নিয়ম-প্রণালী ও তার সঙ্গে নাগরিকদের সম্পর্ক সংবলিত একটি রাজনৈতিক প্রকল্প। বলা বাহুল্য, এই প্রকল্পের মূল কাঠামো হলো লিখিত সংবিধান।'

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌছতে পারি যে, সংবিধান হলো কতিপয় নিয়ম-কানুন যা সরকার গঠন, দেশ পরিচালনা, সরকার ও জনগণের অবস্থান নির্ণয় এবং সর্বোপরি পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে মূলসূত্র হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

খ. বাংলাদেশ সংবিধানের মূল চার নীতি কি কি? ৪

উত্তর : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের ৮ম অনুচ্ছেদ থেকে ২৫তম অনুচ্ছেদ পর্যন্ত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা রয়েছে। জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা— এ চারটি বিষয়কে রাষ্ট্রের মৌলস্তম্ভ বা মৌলিক আদর্শ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। এতে আরো বলা হয় যে, অন্যান্য মৌলিক নীতিগুলো উপরোক্ত ৪টি আদর্শ থেকে উৎসারিত হবে। নিচে চারটি মৌলিক আদর্শ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো :

১. জাতীয়তাবাদ : ভাষাগত এবং সংস্কৃতিগত একক সত্তাবিশিষ্ট যে বাঙালি জনগোষ্ঠী ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করেছে, সেই জনগোষ্ঠীর ঐক্যবদ্ধতা বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি। (অনুচ্ছেদ ৯)

২. সমাজতন্ত্র : মানুষের ওপর মানুষের শোষণ থেকে মুক্ত ন্যায়ানুগ সমাজ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হলো রাষ্ট্রের লক্ষ্য। (অনুচ্ছেদ ১০)

২. ক. বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের সদস্য হবার যোগ্যতা এবং অযোগ্যতা সম্পর্কে বর্ণনা করুন। ৫

উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৫১২।

খ. মন্ত্রিসভা গঠন প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের সংবিধানের বিধান উল্লেখ করুন। ৫

৩. ক. কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে স্থানীয় সরকারের সম্পর্ক সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কি হওয়া উচিত? ৫

উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৫৪৪।

খ. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের দুর্বল দিকগুলো উল্লেখ করুন। ৫

উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৫৪৬।

৪. সিভিল সোসাইটির বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখুন। সিভিল সোসাইটির সাথে সরকারের সম্পর্ক কি হওয়া উচিৎ? বর্ণনা করুন।

উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৭৭২।

৫. ক. বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রমে এনজিওদের ভূমিকা লিখুন। ৫

উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৭৬৯।

খ. বাংলাদেশের নারীর ক্ষমতায়নে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ সংক্ষেপে উল্লেখ করুন। গৃহীত পদক্ষেপগুলো CEDAW (Convention on the Elimination of Discrimination Against Women) সনদকে সমর্থন করে কি?

উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৮৩২।

৬. 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০' এর মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করুন। এই শিক্ষানীতি বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় কি ধরনের সংস্কার নিশ্চিত করতে পারে? ১০

উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ২০৪।

৭. বাংলাদেশের কৃষি জমি অকৃষি কাজে স্থানান্তরিত হবার স্বরূপ ও সংকট বিশ্লেষণ করুন। এই সংকট মোচনের উপায়গুলি কি কি? ১০

উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৪৩০।

৮. বাংলাদেশের সাথে অন্যান্য দেশের কতটি আঞ্চলিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি আছে? বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি নিরসনে আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তিগুলি কি ধরনের ভূমিকা রাখতে পারে? আলোচনা করুন। ১০

উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৮০৪।

৯. বাংলাদেশে ঋণপ্রদানে আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক ও এডিবির সমধর্মী শর্তগুলো কি কি? শর্তযুক্ত ঋণ পরিহার করা সম্ভব কি? যৌক্তিক পরামর্শ দিন। ১০

উত্তর : পৃষ্ঠা ৭৯৪।

১০. গণতান্ত্রিক পরিবেশ উন্নয়নে রাজনৈতিক দলসমূহের ভূমিকা কি হওয়া উচিত? গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি চর্চায় সিভিল-সেনাবাহিনী সম্পর্ক কতটা প্রয়োজনীয়? আলোচনা করুন। ১০

উত্তর : পৃষ্ঠা ৬৮৩।

৩০তম বিসিএস ২০১১ | বাংলাদেশ বিষয়াবলি-প্রথম পত্র

সময় : ৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ১০০

দ্রষ্টব্য : ইংরেজি অথবা বাংলা যে কোনো একটি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজিতে লেখা চলবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান সমান। প্রার্থীদিগকে ১ এবং ২ নম্বর প্রশ্নের এবং অবশিষ্ট প্রশ্নের যে কোনো তিনটির উত্তর দিতে হবে।

১. টীকা লিখুন (যে কোনো চারটি) :

ক. ন্যায়পাল; খ. জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিলের নির্বাহী কমিটি (ECNEC); গ. মানবসম্পদ উন্নয়ন ও তথ্যপ্রযুক্তি; ঘ. বাংলা একাডেমী; ঙ. স্বাস্থ্যনীতি; চ. বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (BCSIR); ছ. জাতীয় শিশু দিবস

উত্তর : *টীকা অংশে দেখুন।*

২. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নদীর ভূমিকা বর্ণনা করুন।
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৪১৮।

৩. বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও সীমানার বিবরণ দিন। মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশকে কয়টি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছিল? প্রত্যেক সেক্টর কমান্ডারের নাম লিখুন।
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ০৭ ও ৮৮৪।

৪. সংবিধানের কোন সংশোধনীর বলে বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ঘোষণা করা হয়? মূল সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ কি ছিল? মৌলিক অধিকারসমূহ কিভাবে বলবৎযোগ্য? কখন এগুলো বলবৎযোগ্য নয়?
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৪৬৩ ও ৪৭৩।

৫. আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'সার্ক-এর আওতায় কি কি করা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন? আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে সূচনালগ্ন থেকে এ যাবৎ SAARC-এর অর্জন কতটুকু?
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৬১৯।

৬. বিশ্ব পরিবেশ আন্দোলনে বাংলাদেশের ভূমিকা বর্ণনা করুন। বিশ্ব উষ্ণায়ন প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে? এই ক্ষতি মোকাবিলায় সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ কি?
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ১৩।

৭. বিদেশে আমাদের তৈরি পোশাক রপ্তানি বৃদ্ধিকরণে কি কি ব্যবস্থা নেয়া দরকার? আমাদের অর্থনীতিতে পোশাক শিল্পের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ১৬৩।

৮. জাতীয় শিক্ষানীতির গুরুত্ব বর্ণনা করুন। 'দিন বদলের বইছে হাওয়া, শিক্ষা আমার প্রথম চাওয়া'– কথাটি ব্যাখ্যা করুন।
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ১৮৯।

৩০তম বিসিএস ২০১১ | বাংলাদেশ বিষয়াবলি-দ্বিতীয় পত্র

সময় : ৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ১০০

[দ্রষ্টব্য : ইংরেজি অথবা বাংলা যে কোনো একটি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দাবলী ইংরেজিতে লেখা যাবে। প্রার্থীদিগকে ১নং প্রশ্নের এবং অবশিষ্ট প্রশ্নের যে কোনো চারটির উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।]

১. সংক্ষেপে বর্ণনা করুন (প্রয়োজনে সংবিধানের আলোকে) যে কোনো চারটি। $৫ \times ৪ = ২০$
ক. ন্যায়পাল; খ. সংযুক্ত তহবিল; গ. অধ্যাদেশ; ঘ. গ্রেফতার ও আটক সম্পর্কে রক্ষাকবচ ঙ. গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লব; চ. সাংবিধানিক সংস্থা; ছ. অর্থবিল
উত্তর : *টীকা অংশে দেখুন।*

২. বাংলাদেশের সংবিধানে বিধৃত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ কি কি? আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক নীতির বিস্তারিত আলোচনা করুন। $১২ + ৮ = ২০$
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৪৬৩।

৩. জরুরি অবস্থা কি প্রেক্ষাপটে জারি করা যায়? জরুরি অবস্থা জারি সংক্রান্ত সংবিধানে বিধৃত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী আলোচনা করুন। $৫ + ১৫ = ২০$

৪. জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাব এবং এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রমের বিবরণ দিন। $১২ + ৮ = ২০$
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ১৩।

৫. ক. NGO কি? বাংলাদেশের মানবাধিকার ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে NGO-এর ভূমিকা আলোচনা করুন। ১০
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৭৬৫।
খ. রাজনীতির সাথে অর্থনীতির সম্পর্ক আলোচনা করুন। ১০
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৪৬ (প্রশ্ন সমাধান অংশ)।

৬. বাংলাদেশসহ স্বল্পোন্নত দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নে IMF, ADB এবং World Bank-এর ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করুন। ২০
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৭৯৪।

৭. স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে বিশ্ব সমাজের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করুন। ২০
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৮৭৬।

৮. সংক্ষেপে বাংলাদেশের খনিজ সম্পদের বিবরণ দিন। একই সাথে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা নিয়ে বিরোধ নিষ্পত্তির হাল অবস্থার বিবরণ দিন।
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৪৩৩ ও ৬২৫।

৯. সুশাসন বলতে কি বুঝায়? সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের সাফল্য ও ব্যর্থতা আপনার সুপারিশসহ আলোচনা করুন।
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৭৭৭।

২৯তম বিসিএস ২০১০ | বাংলাদেশ বিষয়াবলি-প্রথম পত্র

সময় : ৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ১০০

[দ্রষ্টব্য : ইংরেজি অথবা বাংলা যে কোনো একটি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজিতে লেখা চলবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান সমান। প্রার্থীদিগকে ১ এবং ২ নম্বর প্রশ্নের এবং অবশিষ্ট প্রশ্নের যে কোনো তিনটির উত্তর দিতে হবে।]

১. টীকা লিখুন (যে কোনো চারটি) :
ক. খাদ্য নিরাপত্তা; খ. রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা; গ. দুর্নীতি দমন কমিশন; ঘ. দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র; ঙ. জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ; চ. জাতীয় আয়কর দিবস; ছ পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি।
উত্তর : *টীকা অংশে দেখুন।*

২. সংক্ষেপে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি বর্ণনা করুন। মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি রচনায় ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব কতটুকু? সংক্ষেপে ভাষা আন্দোলনের পটভূমি ব্যাখ্যা করুন।
উত্তর : পৃষ্ঠা নং ৮৬৩।

৩. গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় স্থানীয় সরকারব্যবস্থার গুরুত্ব কতটুকু? সংক্ষেপে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারব্যবস্থার বর্ণনা দিন।
উত্তর : পৃষ্ঠা নং ৫৫১।

৪. বিদেশে আমাদের জনশক্তির কর্মসংস্থান বৃদ্ধিকল্পে কি কি ব্যবস্থা নেয়া দরকার? অর্থনীতিতে বিদেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : পৃষ্ঠা নং ৬১০।

৫. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে জ্বালানি সমস্যা, বিশেষত বিদ্যুৎ সমস্যা কতটুকু অন্তরায় সৃষ্টি করছে? বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানে আশু কি কি পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন?

উত্তর : পৃষ্ঠা নং ৩৯৬।

৬. মানবসম্পদ বলতে কি বোঝায়? বাংলাদেশে মানবসম্পদ উন্নয়নে কি কি পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন? বর্তমানে বাংলাদেশের যে জনসংখ্যা তাকে আপনি সম্পদ নাকি বোঝা (Liability) হিসেবে দেখেন?

উত্তর : পৃষ্ঠা নং ৪২।

৭. বাংলাদেশে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করুন। এ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার প্রয়োজন কতটুকু বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর : পৃষ্ঠা নং ৫৩৭।

৮. আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তুতে 'সার্ক' (SAARC)-এর গুরুত্ব ও অর্জন কতটুকু? আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সার্ক (SAARC)-এর আওতায় কি কি করা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর : পৃষ্ঠা নং ৬১৯।

২৯তম বিসিএস ২০১০ | বাংলাদেশ বিষয়াবলি-দ্বিতীয় পত্র

সময় : ৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ১০০

দ্রষ্টব্য : ইংরেজি অথবা বাংলা যে কোনো একটি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজিতে লেখা চলবে। প্রার্থীদিগকে ১ নং প্রশ্নের এবং অবশিষ্ট প্রশ্নের যে কোনো চারটির উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।]

১. সংক্ষেপে বর্ণনা করুন (প্রয়োজনে সংবিধানের আলোকে) যে কোনো চারটি : ৫ × ৪ = ২০

ক. নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার; খ. সংযুক্ত তহবিল; গ. পিপিপি; ঘ. বাজার অর্থনীতি; ঙ. অর্থবিল; চ. প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব; ছ. মন্ত্রিসভা

উত্তর : *টীকা অংশে দেখুন।*

২. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান কোন সালের কোন তারিখ হতে কার্যকর হয়? এতে বিধৃত মৌলিক অধিকারসমূহ বর্ণনা করুন। ২০

উত্তর : পৃষ্ঠা নং ৪৭৩।

৩. বাংলাদেশের জনগণের স্বাধীনতার স্পৃহা, ক্রমবিকাশমান স্বাধীনতার চেতনা, রাজনৈতিক সংঘটন, ১৯৪৭ হতে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ পর্যন্ত এবং বিশেষভাবে ২৬ মার্চ ১৯৭১ এর ঘটনাপ্রবাহ সমন্বিত করে কিভাবে স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটলো তা বর্ণনা করুন। ২০

উত্তর : পৃষ্ঠা নং ৮৬৩।

৪. জনগণের নেতা বলতে কি বোঝায়? বিশ্বের অন্য আরো অন্তত ২ জন নেতার সাথে তুলনা করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জননেতা এবং সফল স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতীক হিসেবে বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করুন। ২০

উত্তর : পৃষ্ঠা নং ৮৮১।

৫. বাজার অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রাসঙ্গিকতা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি সম্পর্কে আলোকপাত করুন। বাংলাদেশের বাস্তবায়িত মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনাসমূহের ইতিবৃত্ত উপস্থাপনা করুন। ২০

উত্তর : পৃষ্ঠা নং ১৭৯।

৬. 'সুশাসন জনপ্রশাসনের জন্য একটি নব্য সংস্কৃতি' প্রত্যয়টি ব্যাখ্যাপূর্বক সুশাসনের উপরে বিস্তারিত আলোচনা করুন। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের সাফল্য-ব্যর্থতা আপনার সুপারিশসহ আলোচনা করুন। ২০

উত্তর : পৃষ্ঠা নং ৫৩৩।

৭. সংবিধান অনুযায়ী অর্থ বিলে কোন বিষয়াবলি সম্বলিত থাকে? কোন মন্ত্রী/মন্ত্রণালয় এটা প্রণয়ন ও অনুমোদন প্রক্রিয়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং এর সার্বিক অনুমোদন প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন। ২০

উত্তর : পৃষ্ঠা নং ৪৮৯।

৮. সংবিধানের অনুচ্ছেদ উল্লেখপূর্বক সুপ্রিম কোর্টের প্রতিষ্ঠা, এর গঠন, কার্যপ্রণালী ও এখতিয়ার আলোচনা করুন। ২০

উত্তর : পৃষ্ঠা নং ৫৯০।

৯. সংক্ষেপে বাংলাদেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করুন। সংক্ষেপে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্য আলোচনা করুন। ১০ + ১০ = ২০

উত্তর : পৃষ্ঠা নং ০৭ ও ৫০।

২৮তম বিসিএস ২০০৯ | বাংলাদেশ বিষয়াবলি-প্রথম পত্র

সময় : ৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ১০০

দ্রষ্টব্য : ইংরেজি অথবা বাংলা যে কোনো একটি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজিতে লেখা চলবে। প্রার্থীদিগকে ১০ নং প্রশ্নের এবং অবশিষ্ট প্রশ্নের যে কোনো চারটির উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।] নম্বর

১. বাংলাদেশের ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করুন। আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে এদের গুরুত্ব আলোচনা করুন। ২০

উত্তর : পৃষ্ঠা নং ৭০।

২. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিভিন্ন পর্যায়ের ওপর আলোকপাত করুন। ২০

উত্তর : পৃষ্ঠা নং ৮৭০।

৩. বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উপজেলা নির্বাচনের গুরুত্ব আলোচনা করুন। ২০

উত্তর : পৃষ্ঠা নং ৫৪৮।

৪. জনসংখ্যা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নতির পথে অন্যতম অন্তরায়– উক্তিটি কি সম্পূর্ণভাবে সঠিক? জনসংখ্যা সমস্যার সমাধানে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়? ২০

উত্তর : পৃষ্ঠা নং ৪২।

৫. খাদ্য নিরাপত্তা বলতে কী বোঝায়? কিভাবে বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়? ২০

উত্তর : পৃষ্ঠা নং ১৫৫।

৬. বাংলাদেশের মানব সম্পদ উন্নয়নে তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষার গুরুত্ব নিরূপণ করুন। ২০

উত্তর : পৃষ্ঠা নং ৭৩৫।

৭. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও প্রশমনে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে? ২০

উত্তর : পৃষ্ঠা নং ৩৪৫।

৮. দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন। ২০

৯. নিচের প্রশ্নসমূহের উত্তর লিখুন : ৫ × ৪ = ২০

ক. লোকশিল্পের সংজ্ঞা দিন।

উত্তর : লোকশিল্প সাধারণ লোকের জন্য সাধারণ লোকের সৃষ্টি। এর পরিধি এত ব্যাপক ও প্রকৃতি এত বিচিত্র যে, এককথায় এর সংজ্ঞা নিরূপণ করা যায় না। অগাস্ট প্যানিয়েলা (August Panyella) বলেন, লোকশিল্পের কেবল 'শিল্প' শব্দ বোঝা কঠিন নয়, 'লোক' শব্দও সমান সমস্যাপূর্ণ। তার ভাষায়, 'In the expression 'Folk art' it is not only the word 'art' that is difficult to understand, the word 'Folk' is equally problematic.'

নৃতাত্ত্বিক অভিধানে 'লোক'-এর সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে এভাবে : Folk in ethnology is the common people who share a basic store of old tradition. অর্থাৎ পুরাতন ঐতিহ্যের অংশীদার যেসব সাধারণ মানুষ, নৃতত্ত্বের পরিভাষায় তারাই Folk বা লোক নামে অভিহিত। আর 'শিল্প' হলো মানব মনের আনন্দিত উপলব্ধির বহিঃপ্রকাশ। শিল্প মানুষের মানবিক সত্তার গভীরতম প্রকাশ।

বিশেষজ্ঞরা লোকশিল্পের সংজ্ঞা এড়িয়ে যান এ বলে যে, দেখলেই তাকে চেনা যাবে। 'Know it when you see it. Material will define itself if one would allow it to so.'

লোকশিল্পের অপর একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন হ্যারল্ড ওসবোর্ন (Harold Osborne)। তিনি লিখেছেন, 'Objects and decorations made in a traditional fashion by craftsmen without formal training, either for daily use and ornament or for special occasion such as wedding and funerals are called folk art.'

অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ পায়নি এমন কারুশিল্পী প্রথাগত যেসব বস্তু ও সরঞ্জাম প্রাত্যহিক জীবনের ব্যবহার, অলংকরণ, বিবাহ বা মৃতের সৎকারের জন্য তৈরি করে, সেসব শিল্পবস্তুকে লোকশিল্প বলে।

সুতরাং বলা যায়, লোকশিল্পী পূর্বপুরুষের কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করে সমাজের মানুষের চাহিদা ও উপযোগিতার কথা বিবেচনায় রেখে মনের মাধুরী মিশিয়ে প্রথাগতভাবে যে শিল্প গড়ে, তাই লোকশিল্প।

খ. জুমচাষ পদ্ধতি কি?

উত্তর : বাংলাদেশের পাহাড়ি অঞ্চলে প্রচলিত চাষাবাদ পদ্ধতি। এর প্রকৃত অর্থ হলো স্থান পরিবর্তনের মাধ্যমে চাষাবাদ করা। এ ধরনের চাষাবাদে শুষ্ক মৌসুমে বনভূমি কেটে বা পুড়িয়ে স্বল্পসময়ের জন্য (১-৩ বছর) ফসল চাষাবাদের পর প্রাকৃতিক বনভূমির পুনর্জন্ম ও মৃত্তিকার উর্বরতার ক্ষয়পূরণের জন্য দীর্ঘসময় (১০-৪০ বছর) পতিত রাখা হয়। জুম বা স্থানান্তর চাষাবাদ সাধারণভাবে 'সুইডেন চাষাবাদ' বা 'জঙ্গল পরিষ্কার ও পোড়ানো চাষাবাদ' হিসেবে পরিচিত। এ ধরনের প্রাচীন চাষাবাদ অধিকাংশ উপজাতীয় অধিবাসীদের অতি পরিচিত। সংরক্ষিত বনাঞ্চলের বাইরে ঢালু পাহাড়ের ওপর জুমচাষ করা হয়। বর্তমানে প্রতি বছর প্রায় ২০,০০০ হেক্টর ভূমি জুমচাষের আওতায় নিয়ে আসা হচ্ছে, এতে প্রতি হেক্টর ভূমিতে ১০০ থেকে ২৫০ মে. টন মাটি ক্ষয় হয়।

জুমচাষের নিবিড়তা বৃষ্টিপাত, ভূমির বন্ধুরতা, অভিগম্যতা ও জনসংখ্যার ঘনত্বের পার্থক্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন হয়। এ চাষপদ্ধতির নির্ভরতার ওপর ভিত্তি করে জুমিয়া পরিবারকে প্রধানত তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় ১. সার্বিকভাবে নির্ভরশীল, ২. আংশিকভাবে নির্ভরশীল ও ৩. প্রান্তিকভাবে নির্ভরশীল। জুম উপজাতীয়দের জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হওয়ায় জুমচাষে তাদের অনুসৃত পদ্ধতি স্থানভেদে এবং কৃষকদের শ্রেণীভেদেও পৃথক হয়। মূলত চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলের উপজাতীয়দের জীবন ও সংস্কৃতি বহুলাংশে জুমচাষের ওপর নির্ভরশীল। এছাড়া সিলেটের পাহাড়ি অঞ্চলেও কিছু কিছু জুমচাষ হয়।

গ. সমুদ্রসীমা সমস্যা কি?

উত্তর : পৃষ্ঠা নং ৬২৫।

ঘ. ইন্টিগ্রেটেড কোস্টাল জোন ম্যানেজমেন্ট কি?

উত্তর : ভৌগোলিকভাবে নির্দিষ্ট উপকূলীয় এলাকা, উপকূলীয় পরিবেশ এবং আনুষঙ্গিক প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম কাঠামোগুলোর সংরক্ষণে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি, প্রকল্প প্রভৃতি ব্যবস্থাপনাকে বলা হয় ইন্টিগ্রেটেড কোস্টাল জোন ম্যানেজমেন্ট। এসব উন্নয়ন কর্মসূচি ও প্রকল্প পরিকল্পনায় উপকূলীয় অঞ্চলের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে উপকূলীয় জমির ব্যবহার, উপকূলীয় অঞ্চলের সম্পদের ব্যবহার, পানির মান, জনগণের জীবিকা অর্জন, বনাঞ্চল, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় উপযুক্ত ব্যবস্থা প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত থাকে। বাংলাদেশে ১৯৯২ সালে প্রবর্তিত পরিবেশ আইন ও বিদ্যমান নীতিমালার অনুপুঙ্খ পরীক্ষা এবং সেই সাথে উপকূলীয় অঞ্চলের চাহিদা ও উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিসহ বাংলাদেশে ইন্টিগ্রেটেড কোস্টাল জোন ম্যানেজমেন্ট কাজ শুরু করে। বাংলাদেশের ১৯টি জেলার ১৪৭টি উপজেলা উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত। ১৯৯২ সালে রিওডি জেনেরিওতে অনুষ্ঠিত ধরিত্রী সম্মেলনে ইন্টিগ্রেটেড কোস্টাল জোন ম্যানেজমেন্ট ধারণার উদ্ভব ঘটে। ধরিত্রী সম্মেলনে অনুষ্ঠিত ২১ দফা কর্মসূচির ১৭তম অধ্যায়ে এ ব্যাপারে উল্লেখ করা হয়।

১০. টীকা লিখুন (যে কোনো চারটি) : ৫ × ৪ = ২০

ক. সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য; খ. ওয়ারি-বটেশ্বর; গ. আর্সেনিক সমস্যা; ঘ. এশিয়ান হাইওয়ে; ঙ. ছয় দফা কর্মসূচি ১৯৬৬; চ. সামাজিক বনায়ন।

উত্তর : *টীকা অংশে দেখুন।*

২৮তম বিসিএস ২০০৯ | বাংলাদেশ বিষয়াবলি-দ্বিতীয় পত্র

সময় : ৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ১০০

১. ক. "প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ।" –সংবিধানের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ অনুসরণে ব্যাখ্যা করুন। ৫

উত্তর : সংবিধান হলো বিশ্বের সকল স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশেষভাবে অপরিহার্য একটি দলিল। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সংবিধানে রাষ্ট্রের সকল নিয়ম-নীতি সংক্ষেপে উল্লেখ থাকে। ঠিক তেমনি ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর কার্যকরকৃত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানে বাংলাদেশকে একটি একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করে সংবিধানের প্রথম ভাগের ৭(১) অনুচ্ছেদে 'সংবিধানের প্রাধান্য' শিরোনামে বলা হয়েছে "প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ; এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে।" প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাষ্ট্রের সরকারপ্রধান বা রাষ্ট্রপ্রধান জনগণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভোটে নির্বাচিত হন। আইন পরিষদের সদস্যরা জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। তারা তাদের সকল কাজের জন্য জনগণের নিকট দায়ী থাকেন। তাদের সকল কাজের জন্য জনগণের নিকট জবাবদিহি করতে হয়। আর এ জবাবদিহিতা হয় ভোটের মাধ্যমে। জনগণ যাকে ভোট দিয়ে তার প্রতিনিধি বানায়, সে প্রতিনিধি যদি জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা বা চাহিদা পূরণ করতে না পারে বা ব্যর্থ হয় তাহলে পরবর্তী নির্বাচনে জনগণ তাকে আর ভোট দিবে না। আর এভাবেই জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। জনগণ হয়ে ওঠে রাষ্ট্রের চরম বা চূড়ান্ত ক্ষমতার মালিক। তাছাড়া সত্যিকার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় জনগণকে সরকারি অধিকাংশ কাজের ব্যাপারে অবহিত করা হয়, জনগণের মতামত গ্রহণ করা হয় রাষ্ট্রীয় কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে, প্রয়োজনে গণভোটের আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশের সংবিধানে এরূপ গণভোট গ্রহণের ব্যবস্থা রয়েছে। সরকার তার কাজের জন্য জবাবদিহি করে থাকে, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা আছে। সরকার চরম স্বৈরাচার বা একনায়ক হলে সরকারকে জনগণ আন্দোলনের মাধ্যমে পতন ঘটায় অথবা একটি নির্দিষ্ট সময় (৫ বছর) অতিক্রান্ত হবার পর সরকার পদত্যাগ করে।

খ. জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন বলে মনে করেন? আলোচনা করুন। ৫

উত্তর : পৃষ্ঠা নং ৮৩৪।

গ. কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তি বলতে কি বোঝায়? সংবিধানের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ অনুসরণে লিখুন। ৫

উত্তর : সংবিধান হলো একটি রাষ্ট্রের দর্পণস্বরূপ। সংবিধানে থাকে রাষ্ট্র পরিচালনার নিয়ম-কানুন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে ১৪ অনুচ্ছেদে 'কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তি' শিরোনামে বলা হয়েছে, "রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতী মানুষকে ও কৃষক শ্রমিকের— এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা।" কৃষিপ্রধান বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল ৮০ ভাগ লোক। কৃষি খাত বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একটি অন্যতম

গুরুত্বপূর্ণ খাত। ২০১২-১৩ অর্থবছরের জিডিপিতে এ খাতের অবদান ছিল ১৯.৩৮ শতাংশ। দেশের মোট শ্রমশক্তির মোট ৪৭.৫ শতাংশ কৃষি খাতে নিয়োজিত। ২০১২-১৩ অর্থবছরে বিস্তৃত কৃষিজাত পণ্য রপ্তানি আয় ছিল মোট রপ্তানি আয়ের ১১.৯ শতাংশ। কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বহুলাংশে কৃষিখাতে উন্নয়নের ওপর নির্ভরশীল। কৃষির অগ্রগতির সাথে বাংলাদেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ইত্যাদি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত বিধায় কৃষিখাতের উন্নয়নে কৃষকের দারিদ্র্য ও অসহায়ত্ব থেকে মুক্তির জন্য সরকারের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। কৃষিখাতের সর্বাধিক উন্নতি সাধনের জন্য জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি, জাতীয় বীজ নীতি এবং সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা নীতি কার্যকর রয়েছে। এছাড়া জাতীয় কৃষি নীতি '৯৯ সংশোধন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষির আধুনিকায়ন, প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং কৃষি গবেষণার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। উপরন্তু, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি উপকরণে ভর্তুকি বৃদ্ধি, কৃষি উপকরণ সহজলভ্য করা, সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ ও সুলভ করা, ফসল সংরক্ষণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেয়া, ফসল ও সকল কৃষিজাত পণ্যের ন্যায্য মূল্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করা হচ্ছে। কৃষকদের মুক্তি তথা দরিদ্র বা অসহায় অবস্থা থেকে পরিত্রাণের উপায় হিসেবে কৃষিঋণের আওতা বৃদ্ধি ও প্রাপ্তি সহজীকরণের উদ্দেশ্যে কৃষিঋণ খাতে পুনঃঅর্থায়নের জন্য ২০১২-১৩ অর্থবছরে ১০,২০০.৬ কোটি টাকা কৃষি ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া কৃষি প্রবাহ সচল ও শক্তিশালী করার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক কাঠামো শক্তিশালী করার জন্য ১৫০০ কোটি টাকা পুনঃ মূলধনীকরণ-এর জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। কৃষি উন্নয়নে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলেও কৃষকদের রয়েছে বহুবিধ সমস্যা। যেমন— সেচ সমস্যা, ঋণ সমস্যা, জলাবদ্ধতা সমস্যা, কৃষিপণ্যের মূল্য নির্ধারণ সমস্যা, উন্নত বীজ সরবরাহ সমস্যা, মূলধনী সমস্যা প্রভৃতি বিদ্যমান। কাজেই কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তি বলতে যে ব্যবস্থাকে বলা হয়েছে প্রকৃত অর্থে এখনো বাংলাদেশে তা সম্ভব হয়নি।

ঘ. গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লব বলতে কি বোঝায়? সংবিধানের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদে বর্ণিত মতে ব্যাখ্যা করুন। ৫

উত্তর : ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় অর্জন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংবিধান উপহার দেয়া। ১৯৭২ সালে প্রবর্তিত সংবিধানের ১৫৩ অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ ৮ থেকে ২৫ অনুচ্ছেদে সংযোজন করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৬ অনুচ্ছেদে 'গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লব' শিরোনামে বলা হয়েছে, "নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করিবার উদ্দেশ্যে কৃষি বিপ্লবের বিকাশ, গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিকরণের ব্যবস্থা, কুটির শিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের আমূল রূপান্তর সাধনের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।" শিরোনামে বলা 'গ্রামীণ উন্নয়ন' বলতে গ্রামীণ অবকাঠামোগত উন্নয়ন তথা রাস্তা-ঘাট, সেতু, হাসপাতাল, দালানকোঠা, ঘরবাড়ি, পানি ও শক্তি সম্পদ, প্রশাসনিক ব্যবস্থা, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশ ত্বরান্বিত করাকে বোঝায়। অপরদিকে,

'কৃষি বিপ্লব' বলতে কৃষি ক্ষেত্রে উন্নত বীজ ও সার সরবরাহ, ভূমি চাষে উন্নত ও আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার, নদী ভাঙন রোধ, জমির উর্বরতা বৃদ্ধি উন্নয়ন, কৃষির যথাযথ মূল্য নির্ধারণ, সঠিক কৃষিনীতি ঘোষণা ও ভূমির সঠিক মালিকানা নির্ধারণ প্রভৃতি ব্যবস্থাকে বোঝায়।

২. টীকা লিখুন (সংবিধানের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ অনুযায়ী) ১০ × ২ = ২০

ক. সুযোগের সমতা; খ. দায়মুক্তি; গ. ন্যায়পাল ; ঘ. অর্থ বিল; ঙ. সুপ্রিম কোর্টের আসন; চ. জরুরি অবস্থা; ছ. চুক্তি ও দলিল; জ. পদের শপথ; ঝ. মন্ত্রিসভা; ঞ. এটর্নি জেনারেল

উত্তর : *টীকা অংশে দেখুন।*

৩. ক. 'কোর্ট অব রেকর্ড' বলতে কি বোঝায়? এ প্রেক্ষিতে সংবিধানের ১১২* নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত মতে আলোচনা করুন। ৫

উত্তর : বাংলায় 'কোর্ট অব রেকর্ড'-এর অর্থ হলো লেখ্য আদালত। বাংলাদেশ সংবিধানের ১০৮ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, "সুপ্রীম কোর্ট একটি 'কোর্ট অব্ রেকর্ড' হইবেন এবং ইহার অবমাননার জন্য তদন্তের আদেশদান বা দণ্ডাদেশদানের ক্ষমতাসহ আইন-সাপেক্ষে অনুরূপ আদালতের সকল ক্ষমতার অধিকারী থাকিবেন।" সাধারণ বিচার ব্যবস্থায় 'কোর্ট অব রেকর্ড' বলতে বোঝায় জুডিসিয়াল ট্রাইব্যুনাল আরোপ করা, স্বাধীনভাবে ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যক্রম পরিচালনা করা, সাধারণ আইন অনুযায়ী কাজ চালিয়ে যাওয়া এবং তার চিরস্থায়ী প্রমাণস্বরূপ নথিভুক্ত বা তালিকাভুক্ত করা। সব বিচার ব্যবস্থাতেই বিচারকার্যক্রম রেকর্ড করা হয়। আর এ কাজটি করে থাকেন অফিস সহকারী। যার প্রাথমিক কর্তব্যই হচ্ছে চিরস্থায়ী নথিভুক্ত করে সীলমোহর করা এবং রেকর্ড কপি সংগ্রহে রাখা।

নিম্নতর আদালত যেমন— বিচারিক আদালতে (Justice court) রেকর্ড রাখা হয় না। ডাটা সংগ্রহ করে রাখা আধুনিক যুগে খুবই সহজ। কম্পিউটারে সহজেই ডাটা সংগ্রহ করে রাখা যায়। যদিও কোনো কোনো কোর্টে রেকর্ড রাখার নিয়ম নেই তা সত্ত্বেও সুবিধার জন্য স্থায়ী রেকর্ড রাখা হয়। যাই হোক, বিচার পার্থক্যের দিক দিয়ে দুই ধরনের কোর্টকে চিহ্নিত করা হয়। নিম্নতর আদালত কোনো মামলা রেকর্ড করে আপিল বিভাগের প্রয়োজনে পুনঃবিবেচনার জন্য। এটা অডিও বা ভিডিও যে কোনো প্রকৃতির হতে পারে। বিচারকরা সাধারণত তথ্য, প্রমাণ, যুক্তি, আইন প্রভৃতির ভিত্তিতে বিচারকার্য সমাধা করে থাকেন।

** প্রশ্নে অনুচ্ছেদ নম্বরটি ভুল আছে। 'কোর্ট অব রেকর্ড' সম্পর্কে সংবিধানের ১০৮নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে।*

খ. সুপ্রিমকোর্ট এবং হাইকোর্ট বিভাগের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কি? থাকলে বর্ণনা করুন (সংবিধান অনুসরণে)। প্রধান বিচারপতির নিয়োগ দেন কে? ৫

উত্তর : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ষষ্ঠভাগের 'বিচার বিভাগ' অধ্যায়ের ১ম পরিচ্ছেদের (সুপ্রীমকোর্ট) ৯৪ (১) নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট' নামে বাংলাদেশের একটি সর্বোচ্চ আদালত থাকিবে এবং আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ লইয়া তাহা গঠিত হইবে।"

সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্টের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

সুপ্রিমকোর্ট বিভাগ : সুপ্রিমকোর্ট বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত এবং আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ নিয়ে এটি গঠিত। প্রধান বিচারপতি এবং প্রত্যেক বিভাগে আসন গ্রহণের

জন্য রাষ্ট্রপতি যত সংখ্যক বিচারক নিয়োগের প্রয়োজন বোধ করিবেন তত সংখ্যক অন্যান্য বিচারক নিয়ে সুপ্রিমকোর্ট গঠিত হবে। প্রধান বিচারপতি ও আপিল বিভাগে নিযুক্ত বিচারকগণ কেবল উক্ত বিভাগের এবং অন্যান্য বিচারক কেবল হাইকোর্ট বিভাগে আসন গ্রহণ করবেন। রাজধানীতে সুপ্রিমকোর্টের স্থায়ী আসন থাকবে, তবে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন নিয়ে প্রধান বিচারপতি সময়ে সময়ে অন্য যে স্থান বা স্থানসমূহ নির্ধারণ করবেন, সে স্থান বা স্থানসমূহে হাইকোর্ট বিভাগের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হতে পারে। যদি কোনো সময় রাষ্ট্রপতির মনে কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যা এমন যে সুপ্রিমকোর্টের মতামত গ্রহণ করা প্রয়োজন, তাহলে তিনি প্রশ্নটি আপিল বিভাগের বিবেচনার জন্য প্রেরণ করতে পারবেন এবং উক্ত বিভাগ স্বীয় বিবেচনায় উপযুক্ত শুনানির পর প্রশ্নটি সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে স্বীয় মতামত জ্ঞাপন করতে পারবেন। সংসদ কর্তৃক প্রণীত যে কোনো আইন সাপেক্ষে সুপ্রিমকোর্ট রাষ্ট্রপতির অনুমোদন নিয়ে প্রত্যেক বিভাগের এবং অধস্তন যে কোনো আদালতের রীতি ও পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণের জন্য বিধিসমূহ প্রণয়ন করতে পারবেন। প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানার অন্তর্ভুক্ত সকল নির্বাহী ও বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ সুপ্রিমকোর্টের সহায়তা করবেন।

হাইকোর্ট বিভাগ : রাষ্ট্রপতির অনুমোদন নিয়ে প্রধান বিচারপতি সময়ে সময়ে অন্য যে স্থান বা স্থানসমূহ নির্ধারণ করবেন, সেই স্থান বা স্থানসমূহে হাইকোর্ট বিভাগের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হতে পারবে। সংবিধানের বা অন্য কোনো আইনের দ্বারা হাইকোর্ট বিভাগের ওপর যেরূপ আদি, আপিল ও অন্য প্রকার এখতিয়ার, ক্ষমতা ও দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে বা হতে পারে উক্ত বিভাগের সেরূপ এখতিয়ার, ক্ষমতা ও দায়িত্ব থাকবে। হাইকোর্ট বিভাগের রিট অব প্রোহিবিশন, সারলিওরারি (cerliorari), হেবিয়াস কর্পাস জাতীয় ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। হাইকোর্ট বিভাগের অধস্তন সকল আদালতের ওপর উক্ত বিভাগের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকবে। হাইকোর্ট বিভাগের নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত বিভাগের কোনো অধস্তন আদালতের বিচারাধীন কোনো মামলায় এ সংবিধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত আইনের এমন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বা এমন জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয় জড়িত রয়েছে, সংশ্লিষ্ট মামলার মীমাংসার জন্য যার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা আবশ্যক, তাহলে হাইকোর্ট বিভাগ উক্ত আদালত হতে মামলাটি প্রত্যাহার করে নিবেন এবং স্বয়ং মামলাটি মীমাংসা করবেন অথবা উক্ত আইনের প্রশ্নটি নিষ্পত্তি করবেন এবং উক্ত প্রশ্ন সম্পর্কে হাইকোর্ট বিভাগের রায়ের নকলসহ যে আদালত হতে মামলাটি প্রত্যাহার করা হয়েছিল, সে আদালতে মামলাটি ফেরত পাঠাবেন এবং তাহা প্রাপ্ত হওয়ার পর সে আদালত উক্ত রায়ের সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে মামলাটি মীমাংসা করবার উদ্যোগী হবেন।

প্রধান বিচারপতির নিয়োগ : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৬ষ্ঠ ভাগে ৯৫(১) অনুচ্ছেদে 'বিচারক নিয়াগ' শিরোনামে বলা হয়েছে, প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারকগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন।

গ. বিচার বিভাগ ও নির্বাহী বিভাগ কী? এ বিভাগসমূহের দায়িত্ব আলোচনা করুন। বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা রক্ষার শর্তসমূহ কি কি? নির্বাহী বিভাগের প্রধান কে? ১০

উত্তর : পৃষ্ঠা নং ৫৯৩।

৪. ক. সুশাসন বলতে কি বুঝায়? সুশাসনের সাথে দুর্নীতি দমনের কোন সম্পর্ক আছে কী? সুশাসন প্রতিষ্ঠায় মৌলিক বিষয়গুলো কি কি– আলোচনা করুন। ১০
উত্তর : পৃষ্ঠা নং ৫৩৩।

খ. পররাষ্ট্রনীতি বলতে কি বোঝায়? আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশ কি কি ভূমিকা নিতে পারে বলে মনে করেন? বর্ণনা করুন। ১০
উত্তর : পৃষ্ঠা নং ৬১৩।

৫. ক. বাংলাদেশের প্রশাসনিক কঠামো (কেন্দ্র থেকে মাঠ পর্যন্ত) বর্ণনা করুন। প্রশাসনিক কাঠামোর সাথে স্থানীয় সরকার কাঠামোর (কেন্দ্র থেকে মাঠ পর্যন্ত) পার্থক্যগুলো লিখুন। ৫

খ. বেসামরিক ও সামরিক প্রশাসন বলতে কি বোঝায়? উভয়ের মধ্যে পার্থক্য ও সম্পর্ক আলোচনা করুন। ৫

গ. সুশীল সমাজ কি? সুশাসন ও দুর্নীতি দমনে তাদের ভূমিকা থাকলে আলোচনা করুন। ৫
উত্তর : পৃষ্ঠা নং ৭৭৪।

ঘ. দেশের অর্থনীতির সাথে রাজনীতির কোনো সম্পর্ক আছে কি? হ্যাঁ/না হলে তা যুক্তিসহ আলোচনা করুন। ৫
উত্তর : হ্যাঁ, অর্থনীতির সাথে রাজনীতির ওতপ্রোত সম্পর্ক রয়েছে। বলা হয়ে থাকে রাজনীতি ও অর্থনীতি একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। অর্থাৎ রাজনীতি ছাড়া অর্থনীতি যেমন সচল নয়, তেমনি অর্থনীতি ছাড়া রাজনীতি সচল নয়। যে কোনো দেশের অর্থনীতির ওপর রাজনীতি নির্ভর করে। অর্থনীতি যদি ভালো হয়, তবে জনগণের আর্থিক সচ্ছলতার কারণে জনগণ শিক্ষিত হবে, সচেতন হবে, তাদের যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন করতে পারবে, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা ভোগ করতে পারবে, পরনির্ভরশীলতা হ্রাস পাবে প্রভৃতি। অন্যদিকে, কোনো দেশের রাজনীতি যদি ভালো হয় তবে ঘন ঘন হরতাল, ধর্মঘট, মারামারি, কাটাকাটি, সন্ত্রাস তথা অপরাজনীতি থাকবে না। এভাবে রাজনীতির অস্থিতিশীলতা দূর হলে কলকারখানা ঠিকমতো চলবে, জনগণ ঠিকমতো কাজ করতে পারবে এবং উৎপাদনের গতি ত্বরান্বিত হবে। ফলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়বে। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট রাজনীতিবিদ, অক্টোবর বিপ্লবের প্রধান নেতা ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন এর মতে, 'Politics must take precedence over economics.' লেনিন অন্যত্র বলেন 'It is necessary to have less politics and more economics.'

৬. ক. নারীর ক্ষমতায়ন বলতে কি বুঝায়? এ কার্যক্রমে কি কি ব্যবস্থা ফলপ্রসূ অবদান রাখতে পারে বলে মনে করেন? সুপারিশসহ লিখুন। ১০
উত্তর : পৃষ্ঠা নং ৮৩২।

খ. বাংলাদেশে আইএমএফ, এডিবি এবং বিশ্বব্যাংকের কার্যাদি আলোচনা করুন। বিশ্বব্যাংকের প্রধান কার্যালয় কোথায়? এ প্রতিষ্ঠানে বাংলাদেশের কোনো প্রতিনিধি আছে কি? থাকলে এ পদের নাম লিখে দায়িত্ব আলোচনা করুন।
উত্তর : পৃষ্ঠা নং ৭৯৪।

৭. সংক্ষেপে বর্ণনা করুন (প্রয়োজনবোধে সংবিধানের আলোকে) : ৪ × ৫ = ২০
ক. ধর্মীয় স্বাধীনতা; খ. সম্পূরক ও অতিরিক্ত মঞ্জুরি; গ. নাগরিকত্ব; ঘ. জনশৃঙ্খলা রক্ষা; ঙ. NGO.
উত্তর : *টীকা অংশে দেখুন।*

২৭তম বিসিএস ২০০৬ | বাংলাদেশ বিষয়াবলি-প্রথম পত্র

সময় : ৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ১০০

[দ্রষ্টব্য : ইংরেজি অথবা বাংলা যে কোনো একটি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজিতে লেখা চলবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে। ৭নং প্রশ্নসহ মোট ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিন] নম্বর

১. বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পেছনে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কি কারণ ছিল তা বিশ্লেষণ করুন। ২০
উত্তর : পৃষ্ঠা নং ৭৮।

২. স্বাধীনতা পূর্ববর্তীকালের তুলনায় স্বাধীন বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও সাহিত্যের উন্নয়নের বিবরণ দিন। ২০
উত্তর : পৃষ্ঠা নং ৮৩।

৩. পানি এবং আণবিক শক্তি ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের সাফল্য ও ব্যর্থতা সম্পর্কে আলোচনা করুন। এ প্রসঙ্গে আর্সেনিকমুক্ত পানি সরবরাহে বাংলাদেশ সরকারের ভূমিকা নিরূপণ করুন। ১০ + ১০
উত্তর : পৃষ্ঠা নং ৪২২।

৪. 'শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড' উক্তিটির ব্যাখ্যা দিন। আপনি কি মনে করেন দেশের প্রয়োজনীয় দক্ষ জনশক্তি উন্নয়নে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা যথেষ্ট? ৮ + ১২
উত্তর : পৃষ্ঠা নং ২০০।

৫. বাংলাদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কি কি সমস্যা আছে? কিভাবে এসব সমস্যা দূর করা যায়? ২০
উত্তর : পৃষ্ঠা নং ১৯৩।

৬. বাংলাদেশ সংবিধানের প্রধান সংশোধনীগুলো আলোচনা করুন। ২০
উত্তর : পৃষ্ঠা নং ৪৭৬।

৭. টীকা লিখুন : যে কোন ৪টি (৫×৪) = ২০
ক. সমাজ, খ. সার্বভৌমত্ব, গ. সম্প্রদায় ও সাম্প্রদায়িক, ঘ. জিএনপি, ঙ. সার্কের সাফল্য, চ. জনবিজ্ঞান, ছ. মানবাধিকার।
উত্তর : *টীকা অংশে দেখুন।*

৮. অর্থনৈতিক উন্নয়নে তৈরি পোশাক শিল্পের ভূমিকা আলোচনা করুন। এই শিল্পের বর্তমান সমস্যাগুলো কিভাবে সমাধান করা যায়? ২০
উত্তর : পৃষ্ঠা নং ১৬৩।

৯. 'দুর্নীতি উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়'– কিভাবে এই সমস্যার সমাধান করা যায়? ২০
উত্তর : পৃষ্ঠা নং ১২৭।

১০. নিম্নের প্রশ্নসমূহের উত্তর লিখুন : ২০
ক. 'SAARC' এর ভূমিকা কি?
উত্তর : ১৯৮৫ সালের ৭-৮ ডিসেম্বর ঢাকা শীর্ষ সম্মেলনের মাধ্যমে সার্কের (SAARC—South Asian Association for Regional Co-operation) বা দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। যে আটটি দেশের সমন্বয়ে সার্ক গঠিত সেগুলো হচ্ছে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ভুটান, মালদ্বীপ ও আফগানিস্তান।

সার্কের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : সার্কের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ :

১. সদস্য দেশগুলোর সব মানুষের জীবনমান উন্নয়ন।
২. এ অঞ্চলের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির ধারা ত্বরান্বিত করা।
৩. দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের জাতীয় আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
৪. এ অঞ্চলের রাষ্ট্রসমূহের সাধারণ স্বার্থে সহানুভূতি ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।
৫. অন্যান্য আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন করা।

সার্কের মূলনীতি : সার্কের মূলনীতিসমূহ নিম্নরূপ :

১. সার্কের যে কোনো সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত হবে।
২. দ্বিপক্ষীয় বিরোধপূর্ণ বিষয়গুলো এ সংস্থায় তোলা হবে না।
৩. আঞ্চলিক অখণ্ডতা, সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ না করার নীতি এবং পারস্পরিক লাভালাভের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার নীতিকে সহযোগিতার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হবে।
৪. এ অঞ্চলের দেশগুলোর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি লক্ষ্য রেখে সার্ক ভূমিকা রাখবে।

১৯৮৫ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত সার্কভুক্ত দেশের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানগণ ১৮ বার শীর্ষ বৈঠকে মিলিত হয়েছেন। ১৮তম শীর্ষ বৈঠক ২৬–২৭ নভেম্বর ২০১৪ নেপালের কাঠমান্ডুতে অনুষ্ঠিত হয়। সার্কের সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহ শীর্ষ বৈঠকে নির্ধারিত হয়। এ পর্যন্ত নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহ নির্ধারিত হয়েছে : ১. কৃষি, ২. স্বাস্থ্য ও জনসেবা, ৩. আবহাওয়া, ৪. ডাকসেবা, ৫. মাদকদ্রব্যের পাচার ও অপব্যবহার রোধ, ৬. পল্লী উন্নয়ন, ৭. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ৮. ক্রীড়া, শিল্প ও সংস্কৃতি, ৯. টেলিযোগাযোগ, ১০. যাতায়াত ও যানবাহন, ১১. নারী উন্নয়ন, ১২. অডিও-ভিজুয়াল বিনিময়, ১৩. সংগঠিত পর্যটন, ১৪. ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র, ১৫. ফেলোশিপ ও স্কলারশিপ, ১৬. দারিদ্র্য বিমোচন, ১৭. পরিবেশ, ১৮. সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধ, ১৯. যুব স্বেচ্ছাসেবক বিনিময়, ২০. আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক বিষয় ও ২১. এনজিওবিষয়ক।

আঞ্চলিক সহযোগিতার যে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি দেশ ১৯৮৫ সালে সার্ক গঠন করেছিল, সে উদ্দেশ্য এখন পর্যন্ত অর্জিত হয়নি, সে কথা বলা যায় নিশ্চিতভাবেই। বিশেষজ্ঞদের মতে, সার্কের ব্যর্থতার মূল কারণ পাক-ভারত রাজনৈতিক বিরোধ এবং সে কারণে সার্কের গ্রহণযোগ্যতাও দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। এমতাবস্থায় সার্ককে গ্রহণযোগ্য এবং কার্যকর করে তুলতে হলে সার্ক সনদের ব্যাপক পরিবর্তন আনতে হবে, দ্বিপাক্ষিক বিরোধপূর্ণ বিষয় সার্কের আলোচনায় স্থান দিতে হবে, পাক-ভারত বিরোধের অবসান ঘটাতে হবে এবং সর্বোপরি ভারতের প্রভুসুলভ মানসিকতার পরিবর্তন করতে হবে।

খ. 'CIRDAP' কি?

উত্তর : CIRDAP-এর পূর্ণরূপ Centre on Integrated Rural Development for Asia and the Pacific. গঠিত হয় ৬ জুলাই, ১৯৭৯। এর সদস্য সংখ্যা ১৫টি। এগুলো হলো বাংলাদেশ, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলংকা, নেপাল, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, ফিলিপাইন, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইরান, লাওস, মালয়েশিয়া এবং মিয়ানমার। সংস্থাটির সদর দপ্তর বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায়। এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের পল্লীর জনগণের দারিদ্র্য বিমোচন ও ভাগ্যোন্নয়ন।

গ. 'GDP ও GNP' এর মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর : একটি নির্দিষ্ট সময়ে, সাধারণত এক বছরে একটি দেশে বৈদেশিক আয় ছাড়া দেশের অভ্যন্তরে বাজার দরে সকল উৎপাদিত পণ্য ও সেবার মূল্যকে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (GDP) বলে। GDP হিসাবের সময় দেশের ভেতর দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগ থেকে উৎপাদিত সকল প্রকার দ্রব্য ও সেবাকর্মকে ধরা হয়। কিন্তু বিদেশে অবস্থানরত দেশীয় নাগরিকদের দ্বারা সৃষ্ট উৎপাদন GDP-তে অন্তর্ভুক্ত হয় না। অন্যদিকে একটি নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে একটি দেশে মোট যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা উৎপাদিত হয় তার অর্থমূল্যকে GNP বলে। অর্থাৎ GNP বা মোট জাতীয় উৎপাদন হচ্ছে = মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন + বিদেশে দেশী নাগরিকদের আয় – দেশে বিদেশীদের সৃষ্ট আয়।

ঘ. সাংবিধানিক সংস্থা কাকে বলে? বাংলাদেশে কতগুলো সাংবিধানিক পদ রয়েছে এবং কি কি?

উত্তর : সংবিধানে বর্ণিত সুস্পষ্ট বিধি মোতাবেক গঠিত প্রতিষ্ঠানকে সাংবিধানিক সংস্থা বলে। বাংলাদেশের সাংবিধানিক সংস্থাগুলো হচ্ছে—

১. **মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক :** এ সংক্রান্ত বিধান রয়েছে সংবিধানের অষ্টম ভাগের ১২৭ থেকে ১৩২নং অনুচ্ছেদ পর্যন্ত।
২. **নির্বাচন কমিশন :** এ সংক্রান্ত বিধান রয়েছে সংবিধানের সপ্তম ভাগের ১১৮-১২৬ নং অনুচ্ছেদ পর্যন্ত।
৩. **সরকারি কর্ম-কমিশন :** বাংলাদেশ সংবিধানের নবম ভাগের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ১৩৭ থেকে ১৪১ নং অনুচ্ছেদ পর্যন্ত রয়েছে সরকারি কর্ম-কমিশন সংক্রান্ত বিধানাবলি।
৪. **প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল :** ষষ্ঠ ভাগের তৃতীয় পরিচ্ছেদের ১১৭ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল গঠিত।
৫. **অ্যাটর্নি জেনারেল :** সংবিধানের চতুর্থ ভাগের পঞ্চম পরিচ্ছেদের ৬৪ নং অনুচ্ছেদে রয়েছে অ্যাটর্নি জেনারেল সংক্রান্ত বিধান।

এছাড়াও রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, জাতীয় সংসদের স্পিকার-ডেপুটি স্পিকার, প্রধান বিচারপতির পদও সাংবিধানিক পদ।

২৭তম বিসিএস ২০০৬ | বাংলাদেশ বিষয়াবলি-দ্বিতীয় পত্র

সময় : ৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ১০০

দ্রষ্টব্য : ইংরেজি অথবা বাংলা যে কোনো একটি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজিতে লেখা চলবে। ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রার্থীদিগকে ৮নং প্রশ্নের এবং অবশিষ্ট প্রশ্নের যে কোনো চারটির উত্তর দিতে হবে।

নম্বর

১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত 'সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী'। — ব্যাখ্যা করুন। ২০

উত্তর : পৃষ্ঠা নং ৪৮০।

২. স্থানীয় সরকারকে আরও কার্যকর করার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট পরামর্শ দিন। ২০

উত্তর : পৃষ্ঠা নং ৫৫১।

৩. সংবিধান বলতে কি বুঝায়? বাংলাদেশ সংবিধানের ৪র্থ সংশোধনীর মাধ্যমে কি কি পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল, তা আলোচনা করুন। $৬ + ১৪ = ২০$

উত্তর : পৃষ্ঠা নং ৪৮৩।

৪. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে কি বুঝায়? বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা রক্ষার শর্ত কি? $৮ + ১২ = ২০$

উত্তর : পৃষ্ঠা নং ৫৯৩।

৫. পররাষ্ট্রনীতি বলতে কি বুঝায়? বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূলনীতিগুলোর বর্ণনা দিন। $৫ + ১৫ = ২০$

উত্তর : পৃষ্ঠা নং ৬১৩।

৬. গণতন্ত্র কি? বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে গণতন্ত্রের সুষ্ঠু কার্যকারিতার অন্তরায়সমূহ চিহ্নিত করুন। $৫ + ১৫ = ২০$

৭. উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সামরিক হস্তক্ষেপের কারণ কি কি? আলোচনা করুন। ২০

৮. টীকা লিখুন (যে কোনো চারটি) : $৫ \times ৪ = ২০$

ক. বাংলাদেশে এডিবি-এর ভূমিকা; খ. সুশীল সমাজ; গ. নারীর ক্ষমতায়ন; ঘ. ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণ; ঙ. আমলাতন্ত্র; চ. স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা।

উত্তর : *টীকা অংশে দেখুন।*

৯. 'রাষ্ট্রের পছন্দকৃত জীবন পদ্ধতিই সংবিধান।' বাংলাদেশ সংবিধানের সংশোধনীর আলোকে উক্তিটি ব্যাখ্যা করুন। ২০

উত্তর : পৃষ্ঠা নং ৪৮৬।

১০. বাংলাদেশে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে সুশীল সমাজের ভূমিকা আলোচনা করুন। ২০

উত্তর : পৃষ্ঠা নং ৭৭৪।

২৫তম বিসিএস ২০০৫

সময় : ৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ১০০

[দ্রষ্টব্য : *ইংরেজি অথবা বাংলা যে কোনো একটি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজিতে লেখা চলবে। প্রার্থীগণকে ১ ও ৭ নম্বর প্রশ্নের এবং অবশিষ্ট যে কোনো ৪টির উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান সমান।*]

১. "১৯৭২ সালের বাংলাদেশ শাসনতন্ত্রের মূলনীতিসমূহে বাংলাদেশের ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতিফলন ছিল" ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : পৃষ্ঠা নং ৪৬৯।

২. ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ব্যতীত সত্যিকার অর্থে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ সম্ভব নয়। বিশ্লেষণ সহকারে উক্তিটি ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : পৃষ্ঠা নং ৫৪০।

৩. নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপসমূহে সংবিধান ও ধর্ম প্রণীত নারীর অধিকারসমূহের কতটুকু বাস্তবায়ন হয়েছে বলে আপনি মনে করেন।

উত্তর : পৃষ্ঠা নং ৮৩৯।

৪. সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকারের বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ করা দরকার বলে কি আপনি মনে করেন? বিশ্লেষণ করুন।

উত্তর : পৃষ্ঠা নং ৫৯৮।

৫. "আঞ্চলিক দেশসমূহের উন্নয়নে সার্কের ভূমিকা অপরিহার্য" আলোচনা করুন।

উত্তর : পৃষ্ঠা নং ৬১৯।

৬. "বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের সমস্যা ও সম্ভাবনা" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখুন।

উত্তর : পৃষ্ঠা নং ১৪৩।

৭. নিম্নের প্রশ্নসমূহের উত্তর লিখুন :

ক. স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন

উত্তর : ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে পাস হয় 'স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন' বিল। পূর্বতন দুর্নীতি দমন ব্যুরোকে অধিকতর কার্যকর ও স্বাধীনতা প্রদানের উদ্দেশ্যে গঠন করা হয় এ কমিশন। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত একজন চেয়ারম্যান ও দুইজন কমিশনারের সমন্বয়ে এ কমিশন গঠিত হয়। দুর্নীতি দমন কমিশন অপরাধসমূহ অনুসন্ধান ও তদন্ত পরিচালনা, মামলা দায়ের ও পরিচালনা, দুর্নীতি প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণ, রাষ্ট্রপতিকে সুপারিশ প্রদান, গণসচেতনতা গড়ে তোলা, দেশে বিদ্যমান বিভিন্ন প্রকার দুর্নীতির উৎস চিহ্নিত করাসহ দুর্নীতি সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যাদি করে থাকে। স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন কার্যকর হয় ২১ নভেম্বর ২০০৪ এবং প্রথম চেয়ারম্যান বিচারপতি সুলতান হোসেন খান। বর্তমান চেয়ারম্যান এম বদিউজ্জামান। পরবর্তীতে ২০০৯ সালে নবম জাতীয় সংসদে স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশনের ক্ষমতা সংক্রান্ত কমিশন আইন পাস হয়।

খ. জাতিসংঘের শান্তি মিশনে বাংলাদেশের ভূমিকা

উত্তর : বর্তমানে বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার্থে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সবচেয়ে সক্রিয় অংশীদার। বিশ্বব্যাপী শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের বলিষ্ঠ ভূমিকার প্রেক্ষিতে প্রাক্তন জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনান বলেন, 'বাংলাদেশ জাতিসংঘের এক মডেল সদস্য। উন্নয়নশীল দেশসমূহের নেতৃত্ব প্রদানকারী দেশ হিসেবে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ও অন্যান্য সংগঠনে এবং শান্তিরক্ষা মিশন ও অন্যান্য মানবিক কার্যক্রমে বাংলাদেশের অবদান উল্লেখযোগ্য।' ১৯৮৮ সালে জাতিসংঘের ইরান-ইরাক সামরিক পর্যবেক্ষণ (UNIIMOG) মিশনে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর ১৫ জন সামরিক পর্যবেক্ষক প্রেরণের মাধ্যমে শান্তিরক্ষা মিশনে পদযাত্রা শুরু করে জানুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত জাতিসংঘের ৭২টি মিশনের মধ্যে ৬৩টি মিশনে অংশ নিয়েছে। এরমধ্যে ৩৭টি মিশন বাংলাদেশ সফলতার সাথে শেষ করেছে। ৩৭টি মিশনে বাংলাদেশের ১,২১,৪০৭ জন শান্তিরক্ষী অংশ নেন। এর মধ্যে সেনাবাহিনীর ১,০২,৪৯৯ জন, নৌবাহিনীর ২,৭৬৭ জন, বিমানবাহিনীর ৩,৫৯০ জন, পুলিশবাহিনীর ১২,৫৫১ জন এসব মিশনে অংশ নেন।

গ. ICT এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন

উত্তর : ICT (Information and Communication Technology) বা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বর্তমান বিশ্বের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে থাকে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে পৃথিবীর প্রতিটি দেশের উন্নয়নে তথ্যসমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২০০৩ সালে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় প্রথম তথ্যপ্রযুক্তি শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ

সম্মেলনে বাংলাদেশ 'গ্লোবাল সলিডারিটি ফান্ড' গঠনের প্রস্তাব করে। এছাড়াও বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং এ লক্ষ্যে সারা দেশে আইসিটি অবকাঠামো গড়ে তোলার অঙ্গীকার করেছেন। এর ফলে ই-কমার্স, ই-ব্যাংকিংসহ বিভিন্ন অর্থনৈতিক কার্যক্রমে তথ্যপ্রযুক্তির ছোঁয়া লাগার ফলে সময় ও শ্রমের ব্যাপক সাশ্রয় হবে, যা অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে।

ঘ. গণতন্ত্রায়নে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভূমিকা

উত্তর : বাংলাদেশের রাজনীতিতে 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার' প্রপঞ্চটি অপেক্ষাকৃত নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। ২৭ মার্চ ১৯৯৬ সালে জাতীয় সংসদে তত্ত্বাবধায়ক সরকার আইন পাশ হয়েছিল। গণতন্ত্রের অপরিহার্য উপাদান নির্বাচন ব্যবস্থা। সুষ্ঠু, স্বচ্ছ ও অবাধ নির্বাচন ছাড়া গণতন্ত্রের উন্নয়ন সম্ভব নয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকার হচ্ছে এমন একটি ব্যবস্থা, যেখানে নির্দলীয়, নিরপেক্ষ এবং গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত হয় অন্তর্বর্তীকালীন সরকার, যার প্রধান এবং একমাত্র কাজ অবাধ ও সুষ্ঠ নির্বাচন পরিচালনার মাধ্যমে নির্বাচিত প্রার্থীদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা। সুতরাং গণতন্ত্রের অপরিহার্য উপাদান নির্বাচন ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে ২০১১ সালের ৩০ জুন তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিলুপ্ত করা হয়।

ঙ. ইকোনমিক ডিপ্লোমেসি ও বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া

উত্তর : দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে বিশেষ প্রতিনিধি মারফত যে সম্পর্ক রক্ষা বা আলোচনা চালানো হয় তাকে 'ডিপ্লোমেসি' বলা হয় এবং এ বিশেষ প্রতিনিধিদের রাষ্ট্রদূত বা রাষ্ট্রপ্রতিনিধি বলা হয়। 'ইকোনমিক ডিপ্লোমেসি' বলতে বিদেশে দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষা, বাণিজ্য সম্পর্ক বৃদ্ধি প্রভৃতি স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ ও কার্যক্রম পরিচালনাকে বোঝায়। পক্ষান্তরে, বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া বলতে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির জ্যামিতিক অগ্রগতি এবং তথ্য যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে পণ্যের বিপুলতর লেনদেন এবং সর্বোপরি কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট, ফ্যাক্স, ইন্টারনেট, ই-মেইল ইত্যাদির বিস্ময়কর উন্নয়নের ফলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষের পারস্পরিক নিবিড় সম্পর্ককে বোঝায়। এ বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষার জন্য 'ইকোনমিক ডিপ্লোমেসি' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

চ. আমরাও পারি

উত্তর : বাংলাদেশের বেসরকারি স্যাটেলাইট চ্যানেল এটিএন বাংলার শিশু-কিশোরদের অনুষ্ঠান 'আমরাও পারি'। চাঁদপুরের বালক আবুল খায়ের ১৯৯৬ সালে রেল লাইন কাটা দেখে লাল কাপড় উড়িয়ে বাঁচিয়েছিলেন হাজার হাজার মানুষের জীবন। তার জীবনের কাহিনী নিয়েই নির্মিত হয়েছে প্রামাণ্য চিত্র 'আমরাও পারি'। ২০০৩ সালের ১২ ডিসেম্বর এটিএন বাংলায় প্রচারিত অনুষ্ঠানটি অ্যামি অ্যাওয়ার্ডের প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে বিশ্বের ২৬টি দেশের ৩১টি ছবির সঙ্গে লড়াইয়ে জিতে অ্যামি অ্যাওয়ার্ড লাভ করে। ২২ অক্টোবর, ২০০৪ যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের হিল্টন হোটেলে এ পুরস্কার ঘোষণা করা হয়।

ছ. মানব উন্নয়নসূচক ও বাংলাদেশ

উত্তর : জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি বা ইউএনডিপি (United Nations Development Programme) প্রতি বছর বিশ্বের মানব উন্নয়ন রিপোর্ট প্রণয়ন ও প্রকাশ করে। বিভিন্ন দেশে জীবনের নিরাপত্তা, জীবনযাত্রার মান, মানব উন্নয়নে সরকারের ভূমিকা প্রভৃতি বিশ্লেষণ করে মানব উন্নয়ন সূচক প্রণয়ন করে থাকে। UNDP ২৪ জুলাই ২০১৪ বিশ্বের মানব উন্নয়ন রিপোর্ট প্রকাশ করে। এতে বাংলাদেশের অবস্থান ১৪২তম। এ রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রত্যাশিত গড় আয়ু ৭০.৭ বছর। মাথাপিছু আয় ২,৭১৩ (মা. ড.), সাক্ষরতার হার ৫৭.৭ জনসংখ্যা ১৫ কোটি ৬৬ লাখ, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.২%, চরম দারিদ্র ২১.০%।

জ. শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন

উত্তর : আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রতিভাবান শিল্পী। অসাধারণ শিল্প মানসিকতা ও কল্পনাশক্তির জন্য তিনি শিল্পাচার্য উপাধিতে ভূষিত হন। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের জন্ম ১৯১৪ সালে কিশোরগঞ্জ জেলায়। ১৯৩৮ সালে ব্রহ্মপুত্র নদের নৈসর্গিক দৃশ্যের ছবি এঁকে সর্বভারতীয় অঙ্কন প্রতিযোগিতায় লাভ করেন 'গভর্নর গোল্ড মেডেল অব ফাইন আর্টস'। ১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষের ছবি 'ম্যাডোনা ৪৩' এঁকে তিনি রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। তার তুলির অবাক করা টানে গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষের প্রবহমান জীবন কাহিনী আশ্চর্যজনকভাবে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তার চিত্রকর্মের বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে সাধারণ মানুষ। এছাড়াও বাংলাদেশের প্রকৃতি, নদী ও মাটির কথাও তিনি বলেছেন তার শিল্পকর্মে। দেশ বিভাগের পর ১৯৪৮ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'চারু ও কারুকলা ইনস্টিটিউট'। ১৯৬০ সালে অবসর গ্রহণ করে ঢাকার অদূরে সোনারগাঁওয়ে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন বাংলাদেশের একমাত্র 'লোকশিল্প জাদুঘর'। তার বিখ্যাত চিত্রকর্মগুলো হচ্ছে 'দাড়টানা', 'গ্রামীণ রমনী', 'দুই জিপসী রমনী', 'মনপুরা সত্তর' ইত্যাদি। ১৯৭৬ সালের ২৮ মে তিনি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। ২০১৪ সালে শিল্পাচার্যের শততম জন্মবার্ষিকী পালিত হয়।

২৪তম বিসিএস ২০০৩

সময় : ৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ১০০

দ্রষ্টব্য : ইংরেজি অথবা বাংলা যে কোনো একটি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজিতে লেখা চলবে। প্রার্থীগণকে ৭নং প্রশ্নসহ যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান সমান।

১. বাংলাদেশের সংবিধান ক'বার সংশোধন হয়েছে? কেন ৮ম সংশোধনী গুরুত্বপূর্ণ ছিল? আলোচনা করুন।
উত্তর : পৃষ্ঠা নং ৪৭৬।

২. 'গণতন্ত্রের সফলতার জন্য ক্ষমতাসীন দলের সহনশীলতা এবং বিরোধী দলের দায়িত্বশীল ব্যবহার উভয়ই সমান প্রয়োজন।'—বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আলোচনা করুন।
উত্তর : পৃষ্ঠা নং ৬৮০।

৩. উপজেলা পদ্ধতির ভালো-মন্দ দিকগুলো উল্লেখ করুন। উপজেলা পদ্ধতির স্থানীয় সরকার পুনরায় চালু করা উচিত কিনা যুক্তিসহকারে আলোচনা করুন।
উত্তর : পৃষ্ঠা নং ৫৪৮।

৪. আইন শৃঙ্খলার কাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি ব্যতিরেকে বিনিয়োগ ও প্রবৃদ্ধির হার বাড়ানো সম্ভব নয়। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আপনার সুচিন্তিত মন্তব্য দিন।

৫. 'মিয়ানমার, থাইল্যান্ড ও চীনের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক আরো গভীর হওয়া প্রয়োজন।' আপনার মতামত দিন।

৬. জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য আসন পূর্বের ন্যায় সংরক্ষিত রাখা উচিত হবে কি না যুক্তিসহ আলোচনা করুন।

উত্তর : পৃষ্ঠা নং ৫২২।

৭. নিচের প্রশ্নসমূহের উত্তর লিখুন :

ক. বাংলাদেশে বিহারী সমস্যা

উত্তর : ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পূর্বে ও পরে বিহারে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখা দেয়। এ দাঙ্গার মুখে বিহার, উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিপুল সংখ্যক মুসলিম অভিবাসী পূর্ববাংলায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। তাদের সবাইকে সাধারণভাবে বিহারি বলা হয়। পাকিস্তানি বিহারিদের মোহাজির হিসেবে পূর্ববাংলায় পুনর্বাসিত করা হয়। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধকালে অধিকাংশ বিহারিই পাকিস্তানের পক্ষ অবলম্বন করে। স্বাধীনতার পর তাদের একটি বিরাট অংশ পাকিস্তানে যাওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করে। কিন্তু তাদের পাকিস্তানে ফিরে যাওয়া জটিল হয়ে পড়ার কারণে বাংলাদেশ একটি বড় সমস্যার সম্মুখীন হয়। বর্তমানে উদ্বাস্তু বিষয়ক যেসব সমস্যা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে, তার মধ্যে বাংলাদেশে আটকে পড়া বিহারি সমস্যা অন্যতম।

একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশকালে বাংলাদেশে ১০ লাখেরও বেশি অবাঙালি (উর্দুভাষী), অস্থানীয় লোক ছিল। বাংলাদেশ এদের রাজনৈতিক পরিচয় বেছে নেওয়ার সুযোগ দেয়। সে সময়ে বাংলাদেশে সাধারণ নাগরিক হিসেবে বসবাস করতে ইচ্ছুক ৬ লাখ অস্থানীয়কে এ দেশের নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়। কিন্তু প্রায় ৫ লাখ বিহারি পাকিস্তানে ফিরে যাওয়ার জন্য ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অব রেডক্রস-এ তাদের নাম তালিকাভুক্ত করে। প্রাথমিকভাবে পাকিস্তান মাত্র এক লাখের কিছু বেশি বিহারিকে সে দেশে ফিরিয়ে নিতে সম্মত হয় এবং তাদের অধিকাংশই পাকিস্তানে প্রত্যাবাসিত হয়েছে। অনেকে আবার প্রত্যাবাসিত হতে না পেরে ক্যাম্প থেকে পালিয়ে যায় এবং অজানা পথে বাংলাদেশ ত্যাগ করে। বর্তমানে বাংলাদেশে বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা ৮১টি ক্যাম্পে প্রায় ২ লাখ ২০ হাজার আটকে পড়া বিহারি বসবাস করছে।

খ. সংসদীয় রাজনীতিতে বিরোধী দলের ভূমিকা

উত্তর : বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রচলিত রয়েছে। আর সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধী দলকে বিকল্প সরকার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাই গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের জন্য বাংলাদেশের বিরোধী দলকে নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।

১. **গঠনমূলক সমালোচনা :** গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় বিরোধী দলের প্রধান কাজ সরকারি দলের কাজকর্মের গঠনমূলক সমালোচনা করে সরকার যন্ত্রকে স্থিতিশীল রাখা।

২. **বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা নয় :** বিরোধী দল বলেই বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা করা দায়িত্বশীল বিরোধী দলের পরিচয় বহন করে না। সরকারি দলের যেসব কাজকর্মে সর্বজনীন কল্যাণ নিহিত থাকে, বিরোধী দলকে সরকারের সেসব কাজকর্মের প্রতি সমর্থন জানাতে হবে।

৩. **আপোষকামী মনোভাব :** গণতন্ত্র বিকাশের জন্য সরকারি দল এবং বিরোধী দলকে আপোষকামী মনোভাব সম্পন্ন হতে হবে। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে হবে।

৪. **পরমতসহিষ্ণুতা :** বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় পরমতসহিষ্ণুতা ও যুক্তিসঙ্গত সমঝোতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। কিন্তু গণতন্ত্রের সফলতার অন্যতম শর্ত হচ্ছে পরমতসহিষ্ণুতা এবং সমঝোতা। তাই বাংলাদেশের সরকারি এবং বিরোধী দলসমূহকে আরো অধিকমাত্রায় পারস্পরিক মতামতের প্রতি সহিষ্ণু ও শ্রদ্ধাবান হতে হবে।

৫. **কাদা ছোঁড়াছুড়ি বন্ধ করা :** সংসদীয় গণতন্ত্র বিকাশের স্বার্থে বাংলাদেশের সরকারি ও বিরোধী দলসমূহকে পারস্পরিক কাদা ছোঁড়াছুড়ি বন্ধ করে গঠনমূলক সমালোচনার আশ্রয় নিতে হবে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ব্যক্তিজীবন নিয়ে গবেষণা না করে তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করতে হবে।

৬. **সংসদীয় সংস্কৃতি গড়ে তোলা :** সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংসদে বসেই সরকারি এবং বিরোধী দলের সকল বিরোধ-বিতর্কের অবসান ঘটাতে হবে। অর্থাৎ সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু হবে জাতীয় সংসদ। এক্ষেত্রে বিরোধী দলকে যথাযথ দায়িত্ব পালন করতে হবে।

৭. **ঐকমত্য অর্জন করতে হবে :** বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এখন পর্যন্ত রাজনৈতিক বিরোধিতা সহ্য করার মতো ধৈর্য ও পরিপক্কতা অর্জন করতে পারেনি। সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করে বিরোধী দলকে জাতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট ইস্যুতে সরকারি দলের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং আরো সহনশীল হতে হবে।

সুতরাং বাংলাদেশের গণতন্ত্র বিকাশের ক্ষেত্রে সরকারি এবং বিরোধী উভয় দলেরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। উভয় দলকে রাজনৈতিক সহিংসতা বর্জন করতে হবে। রাজনৈতিক সহিংসতা গণতন্ত্র বিকাশের ক্ষেত্রে অন্যতম বাধা। সর্বোপরি তাদের আরো অধিকমাত্রায় সহনশীল ও দায়িত্বশীল হতে হবে।

গ. বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ফোরাম

উত্তর : বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ফোরাম (বিডিএফ) বাংলাদেশের উন্নয়নে সহায়তাদানকারী কতিপয় দেশ ও সংস্থার সমন্বিত সংস্থা। এর প্রতিষ্ঠাকালীন নাম এইড ক্লাব। ১৯৭৩ সালে দাতা দেশ ও সংস্থার উদ্যোগেই এ সংস্থাটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৯৭ সালে এইড ক্লাব নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ফোরাম (বিডিএফ) নামকরণ করা হয়। বিডিএফ-এর অন্য নাম এইড কনসোর্টিয়াম। সংস্থাটির প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৩ সালে প্যারিসে। বিডিএফ-এর বৈঠকস্থল বিশ্বব্যাংকের ইউরোপীয় দপ্তর প্যারিসের অ্যাভিনিউ দ্য ইয়েনায়। এর প্রধান সমন্বয়কারী বিশ্বব্যাংক। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধি। মোট সদস্য সংখ্যা ২৬টি (১৬ দেশ ও ১০টি সংস্থা)। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এটি বাংলাদেশের উন্নয়নে কমবেশি ভূমিকা রেখে চলছে। বর্তমানে এর নাম পিআরএসপি বাস্তবায়ন ফোরাম।

ঘ. ডি-৮

উত্তর : D 8-এর পূর্ণরূপ Developing-8 বা উন্নয়নশীল-৮। এটি গঠিত হয় ১৫ জুন, ১৯৯৭। এর সদস্য রাষ্ট্র ৮টি। সদস্য দেশগুলো হলো তুরস্ক, ইরান, পাকিস্তান, মিশর, ইন্দোনেশিয়া, বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া ও নাইজেরিয়া। এ সংস্থার উদ্যোক্তা হলেন তুরস্কের সাবেক প্রধানমন্ত্রী নাজমুদ্দিন আরবাকান। অস্থায়ী সদর দপ্তর তুরস্কের ইস্তাম্বুলে। সংগঠনটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সদস্য দেশগুলোর জনগণের শান্তি, সংলাপ, সহযোগিতা, ন্যায়বিচার, গণতন্ত্র ও সমতার ভিত্তিতে পারস্পরিক উন্নয়ন সাধন।

ঙ. বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের রিজার্ভ

উত্তর : এ যাবত দেশে আবিষ্কৃত মোট গ্যাস ক্ষেত্রের সংখ্যা ২৬টি। এ ২৬টি গ্যাস ক্ষেত্রে মোট প্রাক্কলিত গ্যাস মজুদের পরিমাণ ৩৭.৬৮০ ট্রিলিয়ন ঘনফুট এবং উত্তোলনযোগ্য মজুদের পরিমাণ ২৭.০৩৮ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। বর্তমানে ১৯টি গ্যাস ক্ষেত্রের ৮৩টি কূপ থেকে গ্যাস উৎপাদিত হচ্ছে। এ ১৯টি গ্যাস ক্ষেত্র হচ্ছে : তিতাস (১৪টি কূপ), বাখরাবাদ (৪টি কূপ), হবিগঞ্জ (৯টি কূপ), রশিদপুর (৫টি কূপ), কৈলাশটিলা (৬টি কূপ), সিলেট (২টি কূপ), নরসিংদী (২টি কূপ), মেঘনা (১টি কূপ), সালদানদী (২টি কূপ), সাঙ্গু (৬টি কূপ), জালালাবাদ (৪টি কূপ), মৌলভীবাজার (৪টি কূপ), বিয়ানীবাজার (২টি কূপ), ফেঞ্চুগঞ্জ (১টি কূপ), ফেনী (৩টি কূপ), বাঙ্গুরা (২টি কূপ), শাহবাজপুর (২টি কূপ), সেমুতাং (২টি কূপ) এবং বিবিয়ানা (১২টি কূপ)। ছাতক ও কামতা গ্যাস ক্ষেত্র দুটিতে উৎপাদন স্থগিত রয়েছে। এছাড়া বেগমগঞ্জ, কুতুবদিয়া, সেমুতাং ও শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্র চারটি এখনো উৎপাদনে যায়নি। ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত প্রকৃত গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ১১.৭২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। ফলে জানুয়ারি ২০১৪ সময়ে উত্তোলনযোগ্য নিট মজুদের পরিমাণ ১৫.৩২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট (অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০১৪)। বর্তমানে দেশে উৎপাদিত প্রায় ৬০% বিদ্যুৎ তৈরি হয় গ্যাস নির্ভর বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহে।

চ. সংবিধানের প্রথম সংশোধনী

উত্তর : *টীকা অংশে দেখুন।*

ছ. বাংলাদেশের ছিটমহল সমস্যা

উত্তর : বাংলাদেশের সীমানার মধ্যে ভারতের কিংবা ভারতের সীমানার মধ্যে বাংলাদেশের বিচ্ছিন্নভাবে থেকে যাওয়া ভূখণ্ডই ছিটমহল নামে পরিচিত। মূলত ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তানের সীমানা চিহ্নিতকরণের জন্য গঠিত র‍্যাডক্লিফ কমিশনের রিপোর্টের প্রেক্ষিতেই বাংলাদেশের উপর ছিটমহল সমস্যা বর্তেছে। বাংলাদেশের ভেতরে ভারতের ১১১টি এবং ভারতের অভ্যন্তরে বাংলাদেশের ৫১টি ছিটমহল রয়েছে।

দেশ বিভাগের এক বছরের মধ্যে ছিটমহল ইস্যু নিয়ে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার প্রকাশ ঘটে। অবস্থা সামাল দিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ফিরোজ খান নুন কর্তৃক ১৯৫৮ সালে দুই দেশের মধ্যে ছিটমহল দক্ষিণ বেরুবাড়ির (৭.৩৯ বর্গ কিমি) একটি অংশ পূর্ববাংলার কাছে হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নিলে ভারতের বিরোধী রাজনৈতিক শিবির এর কঠোর বিরোধিতা করে এবং ভারতে এ নিয়ে লড়াই শুরু হলে এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হতে পারেনি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৭৪ সালের ১৬ মে ইন্দিরা-মুজিব স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুসারে বাংলাদেশ সরকার ভারতকে দক্ষিণ বেরুবাড়ির সংশ্লিষ্ট অংশ হস্তান্তর করে। কিন্তু ভারতীয় পক্ষ সাংবিধানিক ও আইনগত বিতর্কের কারণে ১৭৮ × ৮৫ বর্গ মিটার আয়তনের স্থায়ী করিডোরটুকুর হস্তান্তর বিলম্বিত হয়। এই বিতর্ক ৭ অক্টোবর ১৯৮২ সালে আরেকটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। চুক্তিতে স্থায়ীভাবে 'তিন বিঘা' হস্তান্তরের বিষয়টি ভারতের অবশিষ্ট সিদ্ধান্ত হিসেবে ছাড় দিয়ে বাংলাদেশের নাগরিকদের ছিটমহল থেকে মূল ভূমিতে চলাচলের ব্যবস্থা রাখা হয়। কিন্তু ভারতের বিরোধী দলের এ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আইনগত পদক্ষেপ নেয়ায় চুক্তিটি বাস্তবায়নে আরো এক দশক বিলম্বিত হয়। অতঃপর ১৯৯২ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশ ও ভারত করিডোর ব্যবহার, ছিটমহল সংক্রান্ত একটি আচরণ বিধি-সম্বলিত প্রোটোকল স্বাক্ষর করে। এই সংযোগ স্থানের ওপর নিয়ন্ত্রণ এখনও মূলত ভারতই ধরে রেখেছে। অন্যান্য সমস্যাক্রান্ত ছিটমহলগুলো এখনও সমাধানের বাইরে রয়ে গেছে।

জ. বাংলাদেশে সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থা

উত্তর : সংসদকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে সংসদীয় কমিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ সংবিধানে সংসদীয় কমিটির উল্লেখ থাকলেও তা কখনো নিরপেক্ষভাবে গঠিত হয়নি এবং সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে পারেনি। অবশ্য এ জন্য ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দল উভয়েই সমান দায়ী। সংসদীয় কমিটির ধারণা জাতীয় সংসদের কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট। সংসদ সদস্যদের নিয়েই সংসদীয় কমিটি গঠিত হয়।

সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থার ধরন : বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে ৩ ধরনের কমিটি রয়েছে। এগুলো হলো :

১. **সিলেক্ট (বাছাই) কমিটি :** সাধারণত সংসদের বিলগুলো বাছাই করার জন্য সিলেক্ট কমিটি গঠিত হয়।

২. **স্পেশাল (বিশেষ) কমিটি :** সংসদে স্পেশাল কমিটির গঠন ও কার্যাবলি এর নিয়োগের উপর নির্ভর করে।

৩. **স্ট্যান্ডিং (স্থায়ী) কমিটি :** স্ট্যান্ডিং কমিটি দু ধরনের। যথা : ১. স্পিকার কর্তৃক মনোনীত এবং ২. সংসদ কর্তৃক নিয়োগকৃত।

সংসদীয় কমিটির কার্যাবলি :

১. আইনের খসড়া প্রস্তাব (বিল) পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা।
২. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলি ও অভিযোগ তদন্ত করা।
৩. কমিটির রিপোর্ট পার্লামেন্টে পেশ করা।
৪. মন্ত্রীদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।
৫. প্রধানমন্ত্রী, স্পিকার ও জাতীয় সংসদের কার্যাবলি সংক্রান্ত বিভিন্ন সুপারিশ করা।

বহু রক্তক্ষয়ী আন্দোলন-সংগ্রামের পর বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিন্তু আজও সংসদ সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়নি। বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের লক্ষ্যে সংসদীয় কমিটিগুলোকে আরো কার্যকর করা প্রয়োজন। এ জন্য সরকার ও বিরোধী দল উভয়কেই যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে।

২৩তম বিসিএস (বিশেষ) ২০০১

সময় : ৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ১০০

[দ্রষ্টব্য : ইংরেজি অথবা বাংলা যে কোনো একটি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজিতে লেখা চলবে। প্রার্থীদিগকে ৭নং প্রশ্ন এবং অবশিষ্ট প্রশ্নের যে কোনো চারটির উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান সমান।]

১. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে জ্বালানি সেক্টরের ভূমিকা আলোচনা করুন। বাংলাদেশের কি গ্যাস রপ্তানি করা উচিত? ২০

উত্তর : পৃষ্ঠা নং ৪১২।

২. বাংলাদেশে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে অন্তরায়সমূহ কি কি? কিভাবে তা উত্তরণ সম্ভব? ২০

উত্তর : পৃষ্ঠা নং ১৬৭।

৩. প্রশাসনিক সংস্কারের আবশ্যকতা কি? এ ব্যাপারে জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের সুপারিশ সম্বন্ধে আপনার মত কি? আলোচনা করুন। ২০

উত্তর : পৃষ্ঠা নং ৫৫৬।

৪. বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন সম্বন্ধে কি জানেন? ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সংবিধানকে কেন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংবিধান হিসেবে বিবেচনা করা হয়? ২০

উত্তর : পৃষ্ঠা নং ৪৬৬।

৫. নারীর ক্ষমতায়ন কি? এ ব্যাপারে শেখ হাসিনার সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ আলোচনা করুন। ২০

উত্তর : পৃষ্ঠা নং ৮৩৯।

৬. একটি দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিচার বিভাগের গুরুত্ব কি? বাংলাদেশে বিচার বিভাগের ভূমিকা আলোচনা করুন। ২০

উত্তর : পৃষ্ঠা নং ৫৯৩।

৭. নিচের প্রশ্নসমূহের উত্তর লিখুন (যে কোনো আটটি) : $২\frac{১}{২}\times ৮=২০$

ক. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সেক্টরে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে এ পর্যন্ত কি কি পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে?

উত্তর : বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সেক্টরে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে এ পর্যন্ত যেসব পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো :

১. রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের লোকসানি প্রতিষ্ঠানসমূহকে বেসরকারি খাতে হস্তান্তর।
২. ব্যাংকিং ক্ষেত্রে ব্যাপক সংস্কার সাধন।
৩. খেলাপী ঋণ আদায়ের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ।
৪. বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাসমূহের অবসান ও বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদান।
৫. নীতিমালা সংক্রান্ত পদক্ষেপ।

খ. কি কারণে বাংলাদেশে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন সম্ভব হয়েছে?

উত্তর : বাংলাদেশে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের প্রধান প্রধান কারণসমূহ নিম্নরূপ :

১. চাষাবাদের আধুনিকীকরণ।
২. কৃষি ঋণ মওকুফ ও ঋণ সরবরাহ।
৩. স্বল্পমূল্যে রাসায়নিক সার ও কৃষি উপকরণাদির সরবরাহ।
৪. উন্নতজাতের বীজের ব্যবহার।
৫. কৃষকদের কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্যের নিশ্চিতকরণ।
৬. কৃষকদের পর্যাপ্ত পরিমাণে ভর্তুকি প্রদান।
৭. কৃষি খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধিকরণ।
৮. সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ।
৯. সরকারি পর্যায়ে খাদ্য সংগ্রহ ও মজুদ।

উপরিউক্ত কারণে বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পাশাপাশি খাদ্য উদ্বৃত্তের দেশে পরিণত হয়েছে।

গ. বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ কি কি?

উত্তর : বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির কতগুলো বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা গত তিন দশক ধরে কূটনৈতিক ক্ষেত্রে দিকনির্দেশকের ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো :

১. জাতিসংঘের সনদ ও নীতিমালা, রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা, সকল জাতির সার্বভৌমত্ব ও সকল বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান নীতির প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধতা।
২. জাতিসংঘ, EEC, EU, ASEAN, OPEC, OIC, GEC, আরব লীগ, কমনওয়েলথ প্রভৃতির সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন।
৩. বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনকে সমর্থন করা।
৫. জোট নিরপেক্ষতা।
৬. সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে শত্রুতা নয়।
৭. অর্থনৈতিক কূটনীতির (Economic Diplomecy) ওপর গুরুত্বারোপ।

ঘ. বাংলাদেশের দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা গড়ে ওঠার প্রবণতা কতদূর?

উত্তর : বাংলাদেশে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু থাকলেও এ দেশের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল। সর্বশেষ অনুষ্ঠিত ৫ জানুয়ারি ২০১৪ দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রধান বিরোধী দল বিএনপি'র অংশগ্রহণ ছাড়াই ৩০০টি আসনের মধ্যে (১৫৩টি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত) ১৪৭টি আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল অনুযায়ী দলীয় ব্যবস্থায় মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলের প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার ছিল যথাক্রমে–

রাজনৈতিক দলের নাম	প্রাপ্ত ভোট
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৪৯.০১%
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	৩২.৭৪%
জাতীয় পার্টি	৬.৬৫%
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	৪.৫৫%

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফলে বাংলাদেশে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা গড়ে ওঠার সম্ভাবনা বেশ উজ্জ্বল হলেও দশম সংসদ নির্বাচনে তা ম্লান হয়ে যায়।

ঙ. জননিরাপত্তা আইনের আবশ্যকতা কি?

উত্তর : সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, ছিনতাই, মুক্তিপণ আদায়, দরপত্র জমাদানে বাধা প্রদান, গাড়ি ভাঙচুর প্রতিরোধ ও জনগণের সম্পদ রক্ষার জন্য জননিরাপত্তা আইন করা হয়েছে। প্রচলিত আইনের বিচার ব্যবস্থা বিলম্বিতকরণ ও আইনের ফাঁক ফোকর দিয়ে অপরাধী বের হয়ে পুনরায় অপরাধ কর্মে লিপ্ত হওয়ায় প্রচলিত আইন পর্যাপ্ত নয় বিধায় আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং উল্লিখিত বিশেষ অপরাধের বিচার ত্বরান্বিত করার জন্য এ আইন করা হয়েছে। এ আইনের মাধ্যমে ৯০ দিনের মধ্যে বিচারকার্য নিষ্পত্তি হবে। এ আইনের ১৬ নং ধারায় জামিনের যেমন ব্যবস্থা আছে আবার আপিলেরও সুযোগ আছে। তাই মানুষের স্বার্থ ও মানবাধিকার রক্ষায় জননিরাপত্তা আইন আবশ্যক।

চ. আপনি কি তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সমর্থন করেন? কেন সমর্থন করেন?

উত্তর : তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা হলো একটি নির্দলীয় বা নিরপেক্ষ সরকার ব্যবস্থা। এক কথায়, যখন জাতীয় নির্বাচনের সময় ঘনিয়ে আসে তখন সেই নির্বাচনের সমস্ত দায়-দায়িত্ব

একটি নিরপেক্ষ উপদেষ্টা পরিষদের হাতে তুলে দিয়ে ক্ষমতাসীন সরকারের পদত্যাগ ব্যবস্থাকেই বলা হয় Caretaker Government System বা তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা। আমাদের দেশে কোনো রাজনৈতিক দলই অন্য রাজনৈতিক দলকে বিশ্বাস করে না, ক্ষমতাসীন দল তো নয়ই। তাই ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর গণঅভ্যুত্থানের মুখে এরশাদ সরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে পদত্যাগ করে। ঠিক একইরূপে ১৯৯৬ সালে, ২০০১ সালে এবং সর্বশেষ ২০০৬ সালে যথাক্রমে বিএনপি, আওয়ামী লীগ ও বিএনপির নেতৃত্বে চারদলীয় জোট সরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে পদত্যাগ করে। দেখা যায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে প্রতিটি নির্বাচনই অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়। তাই আমি মনে করি সুষ্ঠ নির্বাচনের স্বার্থেই মূলত আমাদের দেশে এই সরকার ব্যবস্থা আবশ্যকীয়। উল্লেখ্য, ৩০ জুন ২০১১ বাংলাদেশ সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলুপ্ত হয়।

ছ. বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর গঠন-কাঠামো আলোচনা করুন।

উত্তর : বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনী এই তিন বাহিনী নিয়ে গঠিত। প্রধানমন্ত্রী প্রতিরক্ষামন্ত্রীর এবং রাষ্ট্রপতি সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব পালন করেন।

গঠন-কাঠামো ও নিয়ন্ত্রণ : বাংলাদেশের সামরিক বাহিনী তিনটি শাখা নিয়ে গঠিত, যথা– ১. সেনাবাহিনী, ২. নৌ-বাহিনী এবং ৩. বিমানবাহিনী। বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি এর সর্বাধিনায়ক। সংবিধানের ৬২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জাতীয় সংসদ কর্তৃক আইনের দ্বারা প্রতিরক্ষা বাহিনীর বিভিন্ন শাখার গঠন ও রক্ষণাবেক্ষণ, কমিশন মঞ্জুরি, প্রধানের নিয়োগদান এবং তাদের বেতন ও ভাতা, পেশাগত শৃঙ্খলা ও অন্য আনুষঙ্গিক বিষয়াদি নিয়ন্ত্রিত হবে। তবে, সংসদ আইনের দ্বারা বিধান না করা পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা এসব বিষয়ে বিধান করতে পারবেন।

সেনাবাহিনী : মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈনিকদের সাথে পাকিস্তান প্রত্যাগত বাঙালি সৈন্য, বিলুপ্ত রক্ষীবাহিনীর সদস্য, নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত অফিসার ও জোয়ানদের নিয়ে বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর সেনা বা স্থল বাহিনী শাখা গড়ে ওঠে। এর কয়েকটি বিভাগ রয়েছে, যেমন– ১. সাধারণ বিভাগ, ২. অ্যাডজুট্যান্ট জেনারেল বিভাগ, ৩. অস্ত্র সংগ্রহ বিভাগ, ৪. ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, ৫. মেডিকেল বিভাগ এবং ৬. মিলিটারি সেক্রেটারিয়েট। ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, বগুড়া, রাজশাহী, যশোর, রংপুর ও সৈয়দপুরে স্থায়ী সেনানিবাস রয়েছে।

নৌবাহিনী : পাকিস্তান নৌবাহিনী ত্যাগ করে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বাঙালি নৌ সেনা, পাকিস্তান প্রত্যাগত এবং বিভিন্ন সময় নিয়োগপ্রাপ্ত নতুন সদস্যদের সমন্বয়ে বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর নৌবাহিনী শাখা গড়ে ওঠে। কয়েকটি রণতরী নিয়ে নৌবাহিনীকে সজ্জিত করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে : বিএনএস বঙ্গবন্ধু, বিএনএস ওসমান, কর্ণফুলী, দুর্বার, আবু বকর, ঈশা খাঁ, ওমর ফারুক ও বিএনএস শহীদ রুহুল আমিন। চট্টগ্রাম ও খুলনায় নৌবাহিনীর ঘাঁটি আছে। ঢাকায় এর সদর দপ্তর অবস্থিত।

বিমানবাহিনী : মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন পাকিস্তান বিমানবাহিনী ত্যাগ করে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানকারী কিছু বাঙালি সদস্য এবং বিশেষ সূত্রে পাওয়া দুটি বিমান নিয়ে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর যাত্রা শুরু। স্বাধীনতা উত্তর নতুন সদস্য নিযুক্তির মাধ্যমে এর বিস্তৃতি ঘটে। বর্তমানে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীতে কয়েকটি স্যাবর জেট, মিগ ও হেলিকপ্টার রয়েছে। যশোরে বিমানবাহিনীর একটি বেস আছে। এর সদর দপ্তর ঢাকায়।

জ. বাংলা সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধের প্রভাব কতখানি প্রতিফলিত?

উত্তর : বাংলা সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতিফলন অনন্যসাধারণ। মুক্তিযুদ্ধ অনুষঙ্গটি বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। এর মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের ভাব, ভাষা, প্রকাশভঙ্গি আমূল পরিবর্তিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে যোগ হয়েছে নতুন মাত্রা। মুক্তিযুদ্ধের মহান চেতনা যেসব লেখকের গ্রন্থে সুনিপুণভাবে উপস্থাপিত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'চিলেকোঠার সেপাই', সৈয়দ শামসুল হকের 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়', 'নীল দংশন', 'নিষিদ্ধ লোবান', আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর 'বাংলাদেশ কথা কয়', শওকত ওসমানের 'নেকড়ে অরণ্য', 'জাহান্নাম হইতে বিদায়', জাহানারা ইমামের 'একাত্তরের দিনগুলি' এবং সেলিনা হোসেনের 'হাঙর নদী গ্রেনেড'। এসব গ্রন্থে মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসের ভয়াবহতা, হিংস্রতা, ঐক্যবদ্ধতা ও বাঙালি জাতির প্রত্যাশার অনুপম প্রকাশ ঘটেছে। সুতরাং বাংলা সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতিফলন অপরিসীম।

ঝ. বাংলাদেশের উন্নয়ন সমস্যা চিহ্নিত করুন।

উত্তর : বাংলাদেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে বহুবিধ সমস্যা বিরাজমান। এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য সমস্যাসমূহ হলো :

১. রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা।
২. প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অনুপস্থিতি।
৩. দুর্নীতি।
৪. প্রতিকূল আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি।
৫. বিদেশি পণ্যের আধিপত্য।
৬. অবকাঠামোগত দুর্বলতা।
৭. মাত্রাতিরিক্ত খেলাপী ঋণ।
৮. শর্তপূর্ণ বৈদেশিক সাহায্য।
৯. আমদানি নির্ভরতা।
১০. গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের অনুপস্থিতি।

ঞ. স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে বিশ্ব জনমতের ভূমিকা কি ছিল?

উত্তর : বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সারা বিশ্বকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। ফলে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে বিশ্ব জনমতের ভূমিকা ছিল অতীব গুরুত্বপূর্ণ। যুক্তরাষ্ট্র মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে অবস্থান নিলেও সে দেশের জনগণ, রাজনীতিবিদ, শিল্পী-সাহিত্যিক এবং বুদ্ধিজীবীরা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অবস্থান নেন। ১৪ এপ্রিল ১৯৭১ ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকায় পুরো পৃষ্ঠা জুড়ে ইয়াহিয়াকে গণহত্যা বন্ধ করতে আহবান জানায়। সেপ্টেম্বর ১৯৭১ নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয় একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন। সম্মেলনে ৩৩টি দেশের শতাধিক প্রতিনিধি অংশ নেন। এর মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী দেশের প্রতিনিধিও ছিল। এ সম্মেলনে ফরাসি সাহিত্যিক আন্দ্রে মারলো অংশ নিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন। ফলে সেপ্টেম্বর '৭১-এর পর মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্ব জনমত ক্রমশ বাড়তে থাকে। মুক্তিযুদ্ধে ভারতবাসীর সহযোগীমূলক ভূমিকা ছিল রীতিমত বিস্ময়কর। ফলশ্রুতিতে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়েছে ত্বরান্বিত।

২২তম বিসিএস ২০০১

সময় : ৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ১০০

[দ্রষ্টব্য : ইংরেজি অথবা বাংলা যে কোনো একটি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজিতে লেখা চলবে। প্রার্থীদেরকে ৭নং প্রশ্নসহ যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান সমান।]

১. ভূমিহীনদের মাঝে 'খাস জমি' বণ্টনের সরকারি নীতি পর্যালোচনা করুন। নিরপেক্ষ বণ্টনের জন্য কি কি পদক্ষেপ যথার্থ বলে আপনি মনে করেন? ২০

উত্তর : পৃষ্ঠা নং ৪১৬।

২. 'ধর্মনিরপেক্ষতা' বলতে কি বোঝায়? বিভিন্ন শাসনামলে এ ক্ষেত্রে আনীত পরিবর্তনসমূহ পর্যালোচনা করুন। ২০

উত্তর : পৃষ্ঠা নং ৪৭০।

৩. সম্প্রতি 'ফতোয়া' সংক্রান্ত জটিলতা বিষয়ে আপনার অভিমত দিন। নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এটি কিভাবে অন্তরায় সৃষ্টি করছে? ২০

৪. স্থানীয় সরকার কি? বাংলাদেশে নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে এর কি ভূমিকা হতে পারে? ২০

৫. বাংলাদেশে শিল্প উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতাগুলো চিহ্নিত করুন। ২০

উত্তর : পৃষ্ঠা নং ১৬৭।

৬. প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বিশেষত বন্যা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে? ২০

উত্তর : পৃষ্ঠা নং ৩৪০।

৭. নিচের প্রশ্নসমূহের উত্তর লিখুন : $২\frac{১}{২} \times ৮ = ২০$

ক. উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষার সুবিধা-অসুবিধা বিষয়ে আপনার মতামত কি?

উত্তর : আমাদের মাতৃভাষা বাংলা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন করলেও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালত সর্বত্র বাংলা ব্যবহার হলেও উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষার একাধিক সুবিধার পাশাপাশি বহুবিধ অসুবিধাও রয়েছে। উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষা ব্যবহার হলে ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষা সহজসাধ্য ও সুলভ হবে, তাই এর সুবিধা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু এর অসুবিধাও বিস্তর। কারণ উচ্চ শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়ে প্রয়োজনীয় বই, জার্নাল, গবেষণাকর্ম ইত্যাদি বাংলাভাষায় পাওয়া দুষ্কর। এক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের বাধ্যতামূলক ইংরেজির ওপর নির্ভরশীল হতে হচ্ছে। তাছাড়া দীর্ঘদিন এ অঞ্চলে ইংরেজ শাসন অব্যাহত থাকায় অদ্যাবধি অধিকাংশ জায়গায় ইংরেজিই প্রাধান্য বিস্তার করে চলছে। অফিসিয়াল বিভিন্ন কাজ বাংলার চেয়ে ইংরেজিতে সহজবোধ্য হয়। এমতাবস্থায় নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলার পাশাপাশি ইংরেজির প্রতি সমান গুরুত্ব প্রদান করা উচিত।

খ. আমাদের প্রধান নদ-নদীসমূহের গতিপথ নিয়ন্ত্রণে রাখতে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত?

উত্তর : আমাদের প্রধান নদ-নদীসমূহের গতিপথ নিয়ন্ত্রণে রাখতে নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা উচিত :

১. প্রধান নদী ও শাখা নদীগুলোর মুখ খনন করা, যাতে বর্ষাকালে অতিবৃষ্টির পানি দ্রুত নিষ্কাশিত হতে পারে।
২. নদীর তীর বরাবর উঁচু করে বাঁধ নির্মাণ করা, যাতে পানি নদী খাতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে।
৩. নদীর তলদেশ খনন করা, যাতে পানি বেশি পরিমাণে ও দ্রুত সাগরে চলে যেতে পারে।
৪. নদী ছোট বড় যাই হোক না কেন, নদীর মুখ বন্ধ না করেই রাস্তাঘাট ও সেতুর নির্মাণ করা।
৫. নদীর উৎস স্থলে ও অববাহিকায় ব্যাপক ঘন অরণ্য সৃষ্টি করে বৃষ্টির বা বরফ গলা পানি ধীরে ধীরে প্রবাহিত হওয়ার ব্যবস্থা করা।

গ. প্রশাসনে স্বচ্ছতা বলতে আপনি কি বোঝেন?

উত্তর : সরকারি প্রশাসন ব্যবস্থাকে অধিকতর গণমুখী ও দুর্নীতিমুক্ত করার প্রচেষ্টা থেকেই প্রশাসনিক স্বচ্ছতার ধারণার উদ্ভব ঘটেছে। প্রশাসনিক স্বচ্ছতা এমন একটি ধারণা, যা নাগরিক এবং প্রশাসনের মধ্যকার সম্পর্ক প্রকাশ করে। স্বচ্ছতা জনসাধারণের দৈনন্দিন চাহিদার ব্যাপারে প্রশাসনের যথাযথ সাড়া দান নিশ্চিত করে। যার ফলে সরকার নাগরিকদের জন্য যা করছে নাগরিকগণ তা জানতে পারে, অন্যদিকে সরকারও অনুমান করতে পারে যে, জনসাধারণ তার থেকে কি আশা করছে। প্রশাসনিক স্বচ্ছতার মৌলনীতি হচ্ছে তথ্য সামগ্রীতে ভোক্তা সাধারণের প্রবেশাধিকার যাতে করে তারা তাদের বৈধ স্বার্থ মেটাতে পারেন।

ঘ. বাংলাদেশের সর্বত্র এবং সর্বক্ষেত্রে দুর্নীতি বিরাজমান –এই সর্বগ্রাসী দুর্নীতি দমনে আপনার পরামর্শ দিন।

উত্তর : বর্তমানে বাংলাদেশের সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতিসহ জীবনযাত্রার প্রায় সকল ক্ষেত্রে দুর্নীতি এক মহাবিপর্যয়কর পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটিয়েছে। এ কালো ব্যাধির করালগ্রাসে সম্ভাবনাময় বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ ক্রমশ হয়ে উঠেছে অনিশ্চিত। এমতাবস্থায় এই সর্বগ্রাসী দুর্নীতি দমনে নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে :

১. সংবিধানের ৭৭ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ন্যায়পাল পদ সৃষ্টি করলেই হবে না তার কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে হবে।
২. প্রশাসনে মেধাভিত্তিক নিয়োগ ও দক্ষতাভিত্তিক পদোন্নতি নিশ্চিত করতে হবে।
৩. স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসন ব্যবস্থা চালু করতে হবে।
৪. রাজনীতিবিদদের মধ্যে সততা ও দেশাত্মবোধ জাগ্রত করতে হবে।
৫. রাজনীতি ও প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে নৈতিকতার বিকাশ সাধন করতে হবে।
৬. রাষ্ট্রীয় Audit System এবং Public Accounts Committee-কে আরো কার্যকর করতে হবে।
৭. সর্বোপরি দুর্নীতি দমন কমিশনকে আরো শক্তিশালী ও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে।

ঙ. বাংলা সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতিফলন আলোচনা করুন।

উত্তর : বাংলা সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতিফলন অনন্যসাধারণ। মুক্তিযুদ্ধ অনুষঙ্গটি বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। এর মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের ভাব, ভাষা, প্রকাশভঙ্গি আমূল

পরিবর্তিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে যোগ হয়েছে নতুন মাত্রা। মুক্তিযুদ্ধের মহান চেতনা যেসব লেখকের গ্রন্থে সুনিপুণভাবে উপস্থাপিত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'চিলেকোঠার সেপাই', সৈয়দ শামসুল হকের 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়', 'নীল দংশন', 'নিষিদ্ধ লোবান', আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর 'বাংলাদেশ কথা কয়', শওকত ওসমানের 'নেকড়ে অরণ্য','জাহান্নাম হইতে বিদায়' জাহানারা ইমামের 'একাত্তরের দিনগুলি' এবং সেলিনা হোসেনের 'হাঙর নদী গ্রেনেড'। এসব গ্রন্থে মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসের ভয়াবহতা, হিংস্রতা, ঐক্যবদ্ধতা ও বাঙালি জাতির প্রত্যাশার অনুপম প্রকাশ ঘটেছে। সুতরাং বাংলা সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতিফলন অপরিসীম।

চ. মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের ভূমিকা বিশ্লেষণ করুন।

উত্তর : বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের ভূমিকা ছিল খুবই বন্ধুত্বসুলভ। মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকেই মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে ভারত বিপুলসংখ্যক শরণার্থীদের আশ্রয়দান, তাদের ভরণপোষণ, মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র সরবরাহ, বহির্বিশ্বে এবং জাতিসংঘে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শুধুমাত্র শরণার্থীদের পিছনেই ভারতের খরচ হয়েছে ৭০০ মিলিয়ন ডলার। এভাবে সরকারি ভূমিকার পাশাপাশি ভারতবাসী, রাজনৈতিক দল ও পেশাজীবীদের ভূমিকা ছিল রীতিমত বিস্ময়কর। ফলে বাঙালির বিজয় ত্বরান্বিত হয়েছিল। পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হলে উভয় রণাঙ্গনে ভারতের ব্যাপক বিমান হামলা পাকিস্তানি বাহিনীকে চরমভাবে পর্যুদস্ত করে। ফলে মাত্র ১৩ দিনের মাথায় পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

ছ. ঢাকা মহানগরের যানজট সমস্যার প্রতিকার কি হতে পারে?

উত্তর : যানজট ঢাকা মহানগরের অন্যতম বহুল আলোচিত সমস্যা। এ সমস্যার সমাধান কল্পে নিচের ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে :

১. রাস্তার উভয় পার্শ্বে অবৈধ দোকানপাট, গাড়ি পার্কিং, আসবাবপত্র ও বস্তি উচ্ছেদ সাধন করা।
২. রাস্তার সংস্কার ও প্রশস্তকরণ করা।
৩. ট্রাফিক সিগন্যাল ব্যবস্থা আরো কার্যকর করা।
৪. পর্যায়ক্রমে রিকশার উচ্ছেদ করা।
৫. অত্যধিক যানজট পূর্ণ রাস্তায় ফ্লাইওভার নির্মাণ করা ও
৬. জনসচেতনা বৃদ্ধি করা।

জ. বিগত দুই দশকে বাংলাদেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির প্রভাব আলোচনা করুন।

উত্তর : বিগত দুই দশকে বাংলাদেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির নিম্নোক্ত ইতিবাচক প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে :

১. মাত্রাতিরিক্ত জনসংখ্যার কুফল সম্পর্কে জনগণ অধিক মাত্রায় সচেতন হয়েছে।
২. বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে।
৩. দুটো সন্তানে সীমাবদ্ধ দম্পত্তি সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৪. পরিবার-পরিকল্পনা কার্যক্রম ও জন্মনিয়ন্ত্রণ সরঞ্জামাদি সহজলভ্য হয়েছে।
৫. জনসাধারণের মধ্যে ধর্মীয় কুসংস্কার হ্রাস পেয়েছে।

উপরিউক্ত ইতিবাচক প্রভাবের ফলশ্রুতিতে বর্তমানে বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.২% এ এসে দাঁড়িয়েছে (ইউএনএফপিএ-২০১৪)।

২১তম বিসিএস ২০০০

সময় : ৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ১০০

[দ্রষ্টব্য : ইংরেজি অথবা বাংলা যে কোনো একটি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজিতে লেখা চলবে। প্রার্থীদিগকে ৭নং প্রশ্নসহ যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান সমান।]

১. বাংলাদেশের ভূমি-মানুষ সম্পর্ক আলোচনা করুন। এ সম্পর্ক কি ইতিমধ্যে কাম্য-পরিস্থিতি অতিক্রম করে গেছে বলে আপনি মনে করেন? ২০

২. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়সমূহ কি? কিভাবে তা উত্তরণ সম্ভব? ২০
উত্তর : পৃষ্ঠা নং ২৬৪।

৩. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষিখাতের ভূমিকা আলোচনা করুন। ভবিষ্যতে বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থার ধরন কি হতে পারে বলে আপনি মনে করেন? ২০
উত্তর : পৃষ্ঠা নং ১৩৮।

৪. স্থানীয় সরকার কি? বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নে স্থানীয় সরকারের ভূমিকা কি হতে পারে? ২০
উত্তর : পৃষ্ঠা নং ৫৫১।

৫. বিভিন্ন শাসন আমলে সাধিত বাংলাদেশের সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনসমূহ আলোচনা করুন। ২০
উত্তর : পৃষ্ঠা নং ৪৭৬।

৬. বৈদেশিক নীতি কি? বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন সাধিত হয় তা আলোচনা করুন। ২০
উত্তর : পৃষ্ঠা নং ৬১৩।

৭. নিচের প্রশ্নসমূহের উত্তর লিখুন (যে কোনো আটটি) : $২\frac{১}{২} \times ৮ = ২০$

ক. 'বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ২১ ফেব্রুয়ারির আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য অনুসন্ধানে একটু গভীর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অগ্রসর হলেই স্পষ্ট বুঝা যায়, এটা শুধুমাত্র মায়ের ভাষায় কথা বলার অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ছিল না। ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদে হারিয়ে যাওয়া একটা সুপ্ত জাতিসত্তার পুনর্জাগরণ ও পুনঃপ্রতিষ্ঠাই ছিল ভাষা আন্দোলনের মূল লক্ষ্য। '৪৮-এ শুরু হওয়া ভাষা আন্দোলন '৫২-তে শহীদ বরকত, সালাম, রফিক, জব্বারের রক্তে স্নাত হয়ে চূড়ান্ত রূপ লাভ করতে পেরেছিল ঠিকই কিন্তু বাঙালির গোলামির জিঞ্জির ভাঙতে প্রয়োজন হয়েছিল '৫৪-এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, '৬০-এর দশকের উত্তুঙ্গ শিক্ষা আন্দোলন, '৬৬-এর ছয়দফা আন্দোলন, আগরতলা ষড়যন্ত্রমূলক মামলার বিরুদ্ধে বাঙালির সমুদ্র গর্জন, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান ও '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ। এ দীর্ঘ সংগ্রামের পথ বেয়ে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ধর্মের বিভেদ ঘুচে গিয়েছিল এবং ধর্মনিরপেক্ষতা পরিণত হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম চেতনায়। ভাষা আন্দোলনের পথ ধরে দীর্ঘ নয় মাসের সশস্ত্র যুদ্ধ, ত্রিশ লক্ষ মা-বোনের ইজ্জত এবং এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয় আমাদের মহান স্বাধীনতা

১৭ নভেম্বর '৯৯ আমাদের জাতীয় চেতনার ধারক ২১ ফেব্রুয়ারি জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা ইউনেস্কো কর্তৃক 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। বাংলাদেশসহ বিশ্বের ১৮৯টি দেশ ২০০০ সাল থেকে ২১ ফেব্রুয়ারিকে পালন করেছে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে। বাংলাভাষা ও বাঙালির জাতি জন্য এ প্রাপ্তি সহস্র মর্যাদার প্রতীক।

ইউনেস্কো গৃহীত প্রস্তাবে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' পালনের প্রয়োজনীয়ত; ব্যাখ্যা করে বলা হয়, 'সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে ভাষা হচ্ছে সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার। মাতৃভাষার প্রচলন কেবল ভাষাগত বৈচিত্র্য ও বহুভাষাভিত্তিক শিক্ষাকেই উৎসাহিত করবে না, তা ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উন্নয়ন ও অনুধাবনের ক্ষেত্রে অবদান রাখবে। পারস্পরিক বোঝাপড়া, সহনশীলতা ও সংলাপের ওপর ভিত্তি করে বিশ্ব সংহতি আরো জোরদার হবে।'

ভাষা যে কোনো জাতির ঐতিহ্যের ধারক, মর্যাদার প্রতীক। মায়ের সঙ্গে যেমন নাড়ীর যোগ থাকে, তেমনি ভাষার সাথে থাকে প্রাণের যোগ। একটি জাতির স্বাতন্ত্র্য ধারণ করে তার ভাষা। 'বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ২১ ফেব্রুয়ারির আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পৃথিবীর সকল ক্ষুদ্র জাতি ও তাদের ভাষা গোষ্ঠীকে আরো সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী হতে উদ্বুদ্ধ করবে। সুতরাং এ স্বীকৃতির গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম।

খ. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব কি?

উত্তর : ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশকে নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করতে হয়। অবস্থানগত কারণেই আমাদের পক্ষে কখনো সম্পূর্ণরূপে বন্যামুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। অর্থনীতিতে এ ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে।

'ফ্লাড : ১৯৯৮ : এ র‍্যাপিড ইকনমিক অ্যাপ্রাইজাল' শীর্ষক গবেষণাপত্রে ফ্লাডের যে ড্যামেজ ম্যাপ তৈরি করা হয়েছে তাতে দেখা যায়, ১৯৯৮ সালের ভয়াবহ বন্যায় মোট ১০ হাজার ২২৮ কোটি ২২ লাখ টাকার সমপরিমাণ আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। এ ক্ষতির পরিমাণ ১৯৯৮–৯৯ অর্থবছরের জাতীয় উৎপাদনের ৬.৬৪ শতাংশ। ১৫ নভেম্বর ২০০৭ সালে আঘাত হানা 'সিডর'-এর ভয়াবহ তাণ্ডবের ফলে প্রাথমিকভাবে ক্ষতি হয় ২০ হাজার কোটি টাকার সম্পদ ও মারা যায় চার হাজার প্রাণ। এ ছাড়া পরোক্ষভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব হয় দীর্ঘমেয়াদি। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে প্রবৃদ্ধি কমে যায়, জাতীয় রপ্তানি প্রবৃদ্ধি অনিবার্যভাবে মন্থর হয়ে পড়ে।

গ. বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের সাম্প্রতিক প্রবণতা কি?

উত্তর : অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৪ অনুযায়ী জুলাই '১৩-মার্চ '১৪ পর্যন্ত মোট রপ্তানি আয় ২৪,৬৫৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং আমদানি ব্যয় ২৯,৭৭৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। প্রধান প্রধান পণ্যভিত্তিক রপ্তানি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, পূর্ববর্তী অর্থবছরের এ সময়ের তুলনায় তৈরি পোশাক, নিট পোশাক, কৃষিজাত পণ্য, সার ও রাসায়নিক দ্রব্য, হিমায়িত খাদ্য, চামড়া, সিরামিক সামগ্রী, জুতা এবং প্রকৌশল দ্রব্যাদি বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরদিকে চা, কাঁচা পাট, পাটজাত পণ্য এবং পেট্রোলিয়াম উপজাত খাতে রপ্তানি আয় কিছুটা হ্রাস পেয়েছে।

ঘ. জাতিসংঘে বাংলাদেশের ভূমিকা সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

উত্তর : বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে জাতিসংঘের তেমন কোনো সহায়ক ভূমিকা না থাকলেও স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশ জাতিসংঘের নীতি ও আদর্শের প্রতি গভীর আস্থা ও আনুগত্য প্রকাশ

করে। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভের জন্য আবেদন করে। কিন্তু চীনের ভেটো প্রদানের কারণে সদস্যপদ লাভে ব্যর্থ হয়। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ পুনরায় আবেদন করে এবং কোনো ভেটো না পড়ায় ১৭ সেপ্টম্বর ১৯৭৪ বাংলাদেশ ১৩৬তম দেশ হিসেবে সদস্যপদ লাভ করে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে থাকে। ২৫ সেপ্টম্বর ১৯৭৪ বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান সাধারণ পরিষদে প্রথম মাতৃভাষা বাংলায় ভাষণ প্রদান করেন। ১০ নভেম্বর ১৯৭৮ বাংলাদেশ জাপানকে পরাজিত করে নিরাপত্তা পরিষদের ১৯৭৮-৭৯ সেশনের জন্য অস্থায়ী সদস্য নির্বাচিত হয়। ১৯৮৬-৮৭ সালে বাংলাদেশ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সাধারণ পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হয়। তৎপরবর্তী বাংলাদেশ জাতিসংঘের একাধিক সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ পদে সমাসীন হয়। ২০০০-২০০১ সালের জন্য বাংলাদেশ পুনরায় নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য নির্বাচিত হয়। ৮ সেপ্টেম্বর ২০০০ তিন দিনব্যাপী জাতিসংঘ মিলেনিয়াম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জাতিসংঘের ৫৫তম সাধারণ অধিবেশন উপলক্ষে আয়োজিত এ শীর্ষ সম্মেলনে জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত ১৮৯টি (বর্তমান সদস্য ১৯৩) দেশের মধ্যে ১৫০টি দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান অংশগ্রহণ করেন। এ অধিবেশনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর ভাষণে মানুষের কল্যাণে জাতিসংঘকে আরো শক্তিশালী ও কার্যকর ভূমিকা পালনের আহ্বান জানিয়ে বলেন, আমরা আশা করি, সহস্রাব্দ শীর্ষ সম্মেলন জাতিসংঘের কাজে এমন এক গতি সঞ্চার করবে, যার ফলে এ সংস্থা দারিদ্র্য বিমোচন, জনগণের ক্ষমতায়ন, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, অংশীদারিত্বমূলক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, পরিবেশ সংরক্ষণ, পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত বিশ্ব প্রতিষ্ঠা ও শান্তির সংহতি বিকাশে আমাদের অধিকতর সহায়তা প্রদান করতে পারবে। ইতিপূর্বে ৭ সেপ্টেম্বর ২০০০ নিরাপত্তা পরিষদের শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। এ ভাষণে তিনি 'জনগণের ভোটে নির্বাচিত কোনো সাংবিধানিক সরকারকে অসাংবিধানিক উপায়ে উৎখাত করে ক্ষমতা দখলকারীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন, এ ব্যাপারে কমনওয়েলথের অনুরূপ ভূমিকা নেয়া যেতে পারে। শান্তি, গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য এটি অপরিহার্য।' নিরাপত্তা পরিষদের শীর্ষ সম্মেলনে দেয়া এ ভাষণ জাতিসংঘে বাংলাদেশের ভূমিকার ক্ষেত্রে একটি মাইলস্টোন।

ঙ. বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে নারীর ক্ষমতায়ন কিভাবে সহায়ক হতে পারে?

উত্তর : ১৯৭২ সালে নবগঠিত রাষ্ট্র বাংলাদেশের সংবিধানে নারীর অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করার বিধান সন্নিবেশিত হয়েছে। সংবিধানের ২৭ ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে, 'সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান ও আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী'। বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে নারীর ক্ষমতায়ন নিম্নলিখিতরূপে সহায়ক হতে পারে :

১. রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা,
২. দারিদ্র্য বিমোচন ও জীবনযাত্রার মান উন্নত করা,
৩. মানব সম্পদের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করা,
৪. নারী শিক্ষা ও সার্বিক শিক্ষার প্রসার ঘটানো,
৫. উন্নয়ন পরিকল্পনার মূল স্রোতধারায় ভূমিকা রাখা,
৬. সাংগঠনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক উত্তরণ ঘটানো,

৭. প্রশাসনিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা,
৮. লিঙ্গগত বৈষম্য দূর করা,
৯. নারীর মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা,
১০. নারীর প্রতি সকল প্রকার নির্যাতন দূর করা,
১১. জাতীয় অর্থনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

চ. উত্তম পরিচালন (গুড গভর্ন্যান্স)-এর শর্তসমূহ কি?

উত্তর : সাধারণত উত্তম পরিচালন বলতে আদর্শ বা সুশাসন ব্যবস্থাকে বোঝায়, যা একটি দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। উত্তম পরিচালন-এর শর্তসমূহ নিম্নরূপ :

১. রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতা,
২. গণমাধ্যমসমূহের মুক্ত প্রবাহ অধিকার,
৩. অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা,
৪. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা,
৫. আইনের শাসন নিশ্চিত করা,
৬. মাত্রাতিরিক্ত সামরিক ব্যয় হ্রাস করা,
৭. মানবাধিকার সুরক্ষা করা,
৮. দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি রোধ করা,
৯. সরকারের আয়তন সীমিত রাখা।

ছ. ঢাকা মহানগরের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সমন্বয় সমস্যা কতটা এবং কেন?

উত্তর : ঢাকা মহানগরের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সমন্বয় সমস্যা সবচেয়ে বেশি, কেননা নির্ধারিত আয়তনের ঢাকা মহানগরীতে প্রতিনিয়ত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে চলছে। এক হিসাবে দেখা গেছে, বর্তমানে ঢাকা মহানগরীতে মাত্রাতিরিক্ত পঞ্চাশ লক্ষ লোক বসবাস করছে। এ মাত্রাতিরিক্ত জনসংখ্যা ঢাকা মহানগরীর অবকাঠামো, পরিবেশ ও জীবনযাত্রার ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে। জনজীবন ক্রমশ হয়ে উঠছে দুর্বিষহ এবং মহানগরের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সমন্বয় সমস্যা হচ্ছে ক্রমশ ব্যাহত উল্লেখ্য, উন্নয়ন প্রচেষ্টার সমন্বয় বাধা দূর করতে ঢাকা মহানগরকে উত্তর ও দক্ষিণ নামে বিভক্ত করা হয়।

জ. বিশেষ ক্ষমতা আইন চালু রাখার যৌক্তিকতা কি?

উত্তর : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে বিশেষ ক্ষমতা আইন বা জরুরি বিধানাবলির সারমর্ম ছিল যুদ্ধ বা বহিরাক্রমণ অথবা অভ্যন্তরীণ গোলযোগের দ্বারা বাংলাদেশ বা তার যে কোনো অংশের নিরাপত্তা বা অর্থনৈতিক জীবন বিপন্ন হবার আশঙ্কা দেখা দিলে রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারবেন। জরুরি আইন বলবৎ থাকাকালীন সময়ে জনগণের মৌলিক অধিকারসমূহ স্থগিত রাখার বিধানও এ আইনের আওতাভুক্ত। পরবর্তীতে সামরিক ও বেসামরিক স্বৈরশাসকগণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে নিজেদের দলীয় স্বার্থে এ আইনের অপপ্রয়োগ করছে। জাতীয় সঙ্কটময় মুহূর্তে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ব্যতিরেকে আটকের ব্যবস্থা সম্বলিত বিশেষ ক্ষমতা আইন এবং ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৫৪ ধারার প্রয়োগ যেমন অপরিহার্য, তেমনি রাজনৈতিক হীন স্বার্থে রাজনৈতিক বিরোধী ও অন্যান্য নাগরিককে হয়রানির উদ্দেশ্যে এ আইনে নিবর্তনমূলক আটক অবাঞ্ছিত।

ঝ. বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ আবশ্যকীয় কেন?

উত্তর : মাত্র ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৫ কোটি ৫৮ লাখ (অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৪)। মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩১.৫% দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করে। জনসংখ্যার বর্তমান বৃদ্ধির হার ১.৩৭% (অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৪)। বিশ্বব্যাংকের এক রিপোর্টে বলা হয়েছে বর্তমান হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি অব্যাহত থাকলে আগামী এক দশকে আরো ৫ কোটি অতিরিক্ত জনসংখ্যা যোগ হবার সম্ভাবনা রয়েছে। মূলত কৃষির ওপর নির্ভরশীল ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে বংশ পরম্পরায় আবাদযোগ্য কৃষি জমির ৫ ভাগ বাটোয়ারার ফলে কৃষিনির্ভর জনগোষ্ঠী আজ দিশেহারা। বেকার সমস্যা, সামাজিক অস্থিরতা, মাদকাসক্তি, চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি ও বিভিন্নমুখী সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে যে সামাজিক অবক্ষয়ের সৃষ্টি হয়েছে, তার মূলে রয়েছে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত জরুরি।

ঞ. বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলা ও ভাস্কর্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতিফলন কতটা?

উত্তর : বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম তথা মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছিল ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ। এ যুদ্ধের ইতিহাস একদিকে যেমন করুণ, শোকাবহ, লোমহর্ষক, তেমনি ত্যাগের মহিমান্বিত ও বীরত্বপূর্ণ। দীর্ঘ নয়মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম এবং লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে বিজয় সূর্য উদিত হয় ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর। এ দিন পৃথিবীর মানচিত্রে অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের।

বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলা ও ভাস্কর্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় প্রতিফলন অপরিসীম। জাতীয় স্মৃতিসৌধ, মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ, জাগ্রত চৌরঙ্গী, অপরাজেয় বাংলা, স্বোপার্জিত স্বাধীনতা, বিজয়োল্লাস, মুক্তবাংলা, সংশপ্তক, বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ, সাবাস বাংলাদেশ, স্মারক ভাস্কর্য, চেতনা '৭১ ইত্যাদি ভাস্কর্যসমূহ মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম নিদর্শন। এ সমস্ত চিত্রকলা ও ভাস্কর্য যতোদিন থাকবে ততোদিন মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রতিফলিত হতে থাকবে।

২০তম বিসিএস ১৯৯৮-৯৯

সময় : ৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ১০০

[দ্রষ্টব্য : ইংরেজি অথবা বাংলা যে কোনো একটি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজিতে লেখা চলবে। ১ থেকে ৬ নম্বর প্রশ্নের মধ্যে যে কোনো চারটি এবং ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দেয়া আবশ্যক। প্রত্যেক প্রশ্নের মান সমান।]

১. পাকিস্তানে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে পূর্ব-বাংলার প্রতিক্রিয়া ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের উদ্ভব সম্বন্ধে আলোচনা করুন। ২০

উত্তর : পৃষ্ঠা নং ৭০।

২. বাংলাদেশের সংবিধানে নাগরিকদের যেসব মৌলিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে তার একটি বিবরণ দিন। ২০

উত্তর : পৃষ্ঠা নং ৪৭৩।

৩. বিভিন্ন শাসন আমলে গৃহীত বাংলাদেশের উন্নয়ন কৌশল পর্যালোচনা করুন। ২০

উত্তর : পৃষ্ঠা নং ১৭৯।

৪. বাংলাদেশে প্রশাসনিক সংস্কারের আবশ্যকতা কতদূর? এক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়সমূহ কি? আলোচনা করুন। ২০

উত্তর : পৃষ্ঠা নং ৫৫৬।

৫. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির (২ ডিসেম্বর, ১৯৯৭) গুরুত্ব আলোচনা করুন। ২০

৬. বাংলাদেশের জনসংখ্যাধিক্যের কারণ এবং জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের নীতিমালা ও পদ্ধতি আলোচনা করুন। ২০

উত্তর : পৃষ্ঠা নং ৩৭।

৭. নিচের প্রশ্ন থেকে আটটি প্রশ্নের উত্তর লিখুন : $২\frac{১}{২}\times৮=২০$

ক. 'ইনডেমনিটি' কি? ১৯৭৫ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর জারিকৃত 'ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ' কখন ও কি কারণে বাতিল হয়ে যায়?

উত্তর : Indemnity-এর শাব্দিক অর্থ হলো ক্ষতি বা শাস্তি এড়াবার আইনি ব্যবস্থা। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা এবং একই বছরের ৩ নভেম্বর কারাগারে চার জাতীয় নেতাকে হত্যা করা হয়। এই সকল হত্যাকাণ্ডের বিচার সংক্রান্ত ব্যাপারে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে বৈধ করে নেয়া একটি অগণতান্ত্রিক ও মৌলিক মানবাধিকারবিরোধী ব্যবস্থা হলো ১৯৭৫ সালের 'ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ'। The Indemnity Ordinance, 1975 (Ordinance No, 2 of 1975) জারি করে উপর্যুক্ত হত্যাগুলোর বিচার কার্য রহিত করা হয়। ১৯৯৬ সালের ১২ জুনের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল করে।

খ. স্থানীয় সরকার সংস্থায় মহিলাদের অংশগ্রহণ নারীর ক্ষমতায়নে কতদূর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর : স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় বাংলাদেশ সরকার নারীদের জন্য বিশেষ আসনের ব্যবস্থা করেছে। যেমন–ইউনিয়ন পরিষদের মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ। পৌরসভা নির্বাচনেও সে রকম ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এতে করে একদিকে যেমন নারীদের দাবি ও সমর্থনের সুযোগ প্রদান করা হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি তাদের ক্ষমতায়নেও বিশেষ ভূমিকা রাখা হয়েছে। এতে নারীরা প্রশাসনে তাদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে বিশেষ সুযোগ পাচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে নারীর সচেতনতা এবং ক্ষমতায়নে এটি ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে, এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

গ. তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা কি? আমাদের দেশে কেন তা আবশ্যকীয় হয়?

উত্তর : তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা হলো একটি নির্দলীয় বা নিরপেক্ষ সরকার ব্যবস্থা। এক কথায়, যখন জাতীয় নির্বাচনের সময় ঘনিয়ে আসে তখন সেই নির্বাচনের সমস্ত দায়-দায়িত্ব একটি নিরপেক্ষ উপদেষ্টা পরিষদের হাতে তুলে দিয়ে ক্ষমতাসীন সরকারের পদত্যাগ ব্যবস্থাকেই বলা হয় Caretaker Government System বা তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা। আমাদের দেশে কোনো রাজনৈতিক দলই অন্য রাজনৈতিক দলকে বিশ্বাস করে না, ক্ষমতাসীন দলকে তো নয়ই। তাই ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর গণঅভ্যুত্থানের মুখে এরশাদ সরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে। ঠিক একইরূপে ১৯৯৬ সালের ৩০ মার্চ বিএনপি সরকার প্রধান বিচারপতি হাবিবুর রহমানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে পদত্যাগ

করে। অতঃপর ২০০১ সালের ১৩ জুলাই আওয়ামী লীগ সরকারের পাঁচ বছরের মেয়াদ পূর্তি হয়। ১৫ জুলাই প্রধান বিচারপতি লতিফুর রহমানের নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়। এই নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার সফলভাবে অষ্টম সংসদ নির্বাচন সম্পন্ন করে। নবম জাতীয় সংসদের প্রাক্কালে ২০০৬ সালের ২৯ অক্টোবর রাষ্ট্রপতি প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরো জটিল হলে তিনি রাষ্ট্রপতি হিসেবে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার পদ থেকে পদত্যাগ করেন। ১২ জানুয়ারি ২০০৭ প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণ করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. ফখরুদ্দীন আহমদ। তার নেতৃত্বে ২৯ ডিসেম্বর ২০০৮ অনুষ্ঠিত হয় অবাধ ও সুষ্ঠু নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন। সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থেই মূলত আমাদের দেশে এই সরকার ব্যবস্থা আবশ্যকীয়। তবে কিছু বিতর্কের কারণে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বর্তমানে এ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলুপ্ত করা হয়।

ঘ. বাজার অর্থনীতি কি? বাংলাদেশের জন্য তা কতদূর সমর্থনযোগ্য–যুক্তি দিন।

উত্তর : বাজার অর্থনীতি বা মুক্তবাজার অর্থনীতি বর্তমানে বহুল আলোচিত একটি বিষয়। Macmillan Dictionary of Economics-এর সংজ্ঞায় অর্থনীতির সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে এভাবে— "An economic system in which decisions about the allocation of resources and production are made on the basis of prices generate by voluntary exchanges between producers, consumers, workers and owners of factors of production. Decision making in such an economy is decentralized ...i.e. decisions are made independently by groups and individuals in the economy, rather than by central planers."

সুতরাং বলা যায়, বাজার অর্থনীতি হলো কেন্দ্রীয়ভাবে পরিকল্পিত অর্থনীতির বিপরীত একটি প্রত্যয়, যা কি না অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বাজার শক্তি তথা চাহিদা ও সরবরাহের নেতৃত্বকে প্রচার করে থাকে। বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে এটা মোটামুটি সমর্থন করা যায়। তবে বর্তমানে অনেক রাষ্ট্রই মিশ্র অর্থনীতির পথ অনুসরণ করছে।

ঙ. কি কি কারণে বাংলাদেশে পরিবেশ দূষণ হচ্ছে আলোচনা করুন।

উত্তর : নিম্নলিখিত কারণে বাংলাদেশের পরিবেশ দূষিত হচ্ছে—

১. শিল্প কলকারখানার বিষাক্ত বর্জ্য; ২. যানবাহনের কালো ধোঁয়া; ৩. ব্যাপক হারে বৃক্ষ নিধন; ৪. মাটির ক্ষয় ও অব্যবহার; ৫. পলিথিনের ব্যাপক ব্যবহার; ৬. পানি দূষণ; ৭. বর্জ্য ও আবর্জনা যত্রতত্র ফেলা এবং ৮. কীটনাশক ও রাসায়নিক পদার্থের অপরিকল্পিত ব্যবহার।

চ. বাংলাদেশে নারী ও শিশু নির্যাতনের প্রকৃতি আলোচনা করুন। কিভাবে এর প্রতিকার সম্ভব?

উত্তর : বাংলাদেশে ব্যাপকহারে প্রতিনিয়ত নারী অপহরণ, নির্যাতন প্রভৃতি বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনেক নারী দারিদ্র্য, ক্ষুধা, নির্যাতন ও সমাজচ্যুতি প্রভৃতির ফলে পতিতাবৃত্তিতে নামছে। এছাড়া এক শ্রেণির দালাল গ্রামের সহজ-সরল মেয়েদের চাকরি ও থাকা-খাওয়ার ভালো ব্যবস্থা করে দেয়ার নামে শহরে এনে বিদেশে পাচার করে দিচ্ছে, নতুবা পতিতাবৃত্তিতে নামতে বাধ্য করছে। অনেকে মোটামুটি ভালো পরিবেশে থেকেও জড়িয়ে পড়ছে এসবে।

এর প্রতিকার করতে হলে প্রথমে প্রয়োজন পতিতা পুনর্বাসন। তাছাড়া গ্রামের সহজ-সরল

নারীদের কর্মসংস্থানসহ সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। নারী পাচারকারী সংঘবদ্ধ দালাল, সর্দারনীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে। নারীদের ক্ষুধা, দারিদ্র্য দূরসহ স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। বর্তমানে দেশে শিশু নির্যাতনও বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিশু চুরি, অপহরণ ও পাচার এর মধ্যে অন্যতম। এছাড়া শিশুশ্রম নিষিদ্ধ হলেও বাংলাদেশে এটা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না। এ থেকে বাঁচতে হলে যথাযথ আইন প্রণয়ন ও তার সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিতসহ গণসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

ছ. হরতালের কারণে আমাদের অর্থনীতি কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়? আলোচনা করুন।

উত্তর : আমাদের দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব একটা ভালো নয়। বর্তমানে এই অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার প্রধান হাতিয়ার হিসেবে দেখা দিয়েছে হরতাল। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর ঘন ঘন হরতালে দেশের অর্থনীতি এখন ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছে। দেশে বর্তমানে প্রতিমাসে দু থেকে তিনটি হরতাল থাকে। এছাড়াও একটানা ২/৩ দিন বা তারও বেশি হরতাল তো রয়েছেই। একদিনের হরতালে দেশের কোটি কোটি টাকার লোকসান হয়। কলকারখানা সব বন্ধ থাকে। জনগণের দুর্ভোগ পোহাতে হয়। হরতালের ফলে বিদেশীরা এ দেশে বিনিয়োগ করতে আগ্রহ প্রকাশ করে না। এতে আমাদের অর্থনীতি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

জ. আমাদের সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধের প্রভাব পর্যালোচনা করুন।

উত্তর : আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি ৪৩ বছর অতিক্রান্ত। এই মুক্তিযুদ্ধ আমাদের সাহিত্যে বেশ প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছে। আমাদের জীবনের হাসি-কান্না, উত্থান-পতন, দেশ গঠন ও পরিকল্পনা, সর্বোপরি স্বাধীনতার চেতনা আমাদের চারপাশ ঘিরে আছে বলা যায়। আমাদের সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় মুক্তিযুদ্ধের ইঙ্গিত ও প্রভাব স্পষ্ট। নাটকে, গল্পে, উপন্যাসে, কবিতায়, ছড়ায়, কাব্যনাট্যে, এমনকি মঞ্চনাট্যেও মুক্তিযুদ্ধের একটা বড় প্রভাব রয়েছে। এ দেশের অধিকাংশ লেখক, কবি, সাহিত্যিক, রচনাকার আমাদের মুক্তিযুদ্ধ প্রভাবিত মানসিকতার অধিকারী। মুক্তিযুদ্ধের লালন ও তার ঐতিহ্য ধারণে এখনো সাহিত্যের ক্ষুরধার তার কলমে প্রবাহমান। এ দেশের মা, মাটি, মানুষ, সাহিত্য আর মুক্তিযুদ্ধ কোনোটিই যেন কখনোই আলাদা নয়। একাত্ম এক প্রতীক মাত্র।

ঝ. জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনে বাংলাদেশের ভূমিকা তুলে ধরুন।

উত্তর : বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জনের এক বছরের মধ্যেই জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন বা Non Aligned Movement (NAM)-এ যোগ দিতে সক্ষম হয়। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির সাথে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের মূলনীতির একাত্মতা থাকায় এ আন্দোলনে বাংলাদেশের ভূমিকা একটি অন্যতম বিষয় হিসেবে পরিগণিত হয়। এই মূলনীতির মধ্যে রয়েছে।

১. শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি।
২. স্বাধীনভাবে পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা।
৩. কোনো শক্তি জোটের অন্তর্ভুক্ত না হওয়া।
৪. আন্তর্জাতিক কোনো প্রশ্নে স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করা।
৫. নিজ অঞ্চলকে কোনো বৃহৎ শক্তির প্রয়োজনে ব্যবহৃত হতে না দেয়া।
৬. পরস্পরকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা।
৭. কোনো সমস্যা দেখা দিলে আলোচনার মাধ্যমে তার সমাধান নিশ্চিত করা।

ঞ. বাংলাদেশের বিদেশ নীতিতে সাম্প্রতিক প্রবণতাগুলো ব্যাখ্যা করুন।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর যে প্রেক্ষাপট ও আবহকে পুঁজি করে রচিত হয়েছিল, তার অনেক কিছুই এখন পরিবর্তিত হয়েছে। তাই পরিবর্তিত বিশ্ব রাজনীতি, অর্থনীতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে মাথায় রেখে এ দেশের পররাষ্ট্রনীতি, কৌশল ও সম্পর্কের ক্ষেত্রে ছোটখাট পরিবর্তন আনতে হচ্ছে। তবে দেশে সরকার পরিবর্তনের পালাবদলে এক্ষেত্রে খুব একটা হেরফের না হলেও ভারতসহ অনেক দেশই এ বিষয়টিকে অযাচিতভাবে মাথায় নিয়ে আসে। তাছাড়া বিভিন্ন সরকারের বিভিন্ন নীতি ও কৌশলের ভিন্নতাও এমনটা ঘটাতে সহায়তা করে। ২৯ ডিসেম্বর ২০০৮ নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন হয় আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার। এ সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে ৬ জানুয়ারি ২০০৯। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির নির্বাচনে এ মহাজোট সরকার আবার ক্ষমতায় আসে। বর্তমান সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের এ স্বল্প সময়ে প্রতিবেশী ভারতের সাথে সম্পর্ক জোরদার, দক্ষিণ এশীয় টাস্কফোর্স গঠন বিষয়ক আলোচনা ছাড়া পররাষ্ট্রনীতিতে তেমন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়নি। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির সাম্প্রতিক প্রবণতা নিচে উল্লেখ করা হলো :

প্রথমত, বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, ভূ-কৌশলগত অবস্থান ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনায় এনে বাংলাদেশ তার পররাষ্ট্রনীতিকে পুনর্বিন্যাস করছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক জোরদার করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং এক্ষেত্রে অনেকটা সফলতাও অর্জন করেছে।

দ্বিতীয়ত, অত্যন্ত যৌক্তিক কারণেই বাংলাদেশ অর্থনৈতিক কূটনীতিতে জোর দিচ্ছে। কেননা বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরশীলতা কমিয়ে একটি স্বনির্ভর অর্থনীতি বিনির্মাণের জন্য এটা খুব জরুরি।

তৃতীয়ত, বাংলাদেশ প্রতিবেশীদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার মূলনীতি থেকে এখনো সরে যায়নি। এমতাবস্থায় ভারতের শত উসকানি এবং বৈরী আচরণের পরও বাংলাদেশ অনেক ধৈর্যের সাথে তা মোকাবিলা করে আসছে। অন্যদিকে প্রতিবেশী মিয়ানমারের সাথে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

চতুর্থত, বিশ্বব্যাপী নির্যাতিত স্বাধীনতাকামী মুসলমানদের প্রতি নৈতিক সমর্থনের পাশাপাশি যে কোনো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে নিজেদের সুস্পষ্ট অবস্থান বাংলাদেশ বজায় রেখেছে। এক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ এবং বহির্দেশীয় নানা অপপ্রচার, বিশেষ করে আল-কায়েদা সম্পর্কে ভারতের অপপ্রচারকে কূটনৈতিকভাবে মোকাবিলা করে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিকভাবে একটি মডারেট মুসলিম দেশ হিসেবে স্বীকৃত হচ্ছে।

পঞ্চমত, বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সার্কের স্বপ্নদ্রষ্টা এবং বাংলাদেশ সার্ক প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্যোক্তা হলেও বর্তমান এ দেশটি এ সংগঠনটির কার্যকারিতা সম্পর্কে সন্দিহান। তাই বাংলাদেশের অনেক বিশেষজ্ঞই সাম্প্রতিককালে সার্কের বিকল্প কোনো আঞ্চলিক সংগঠনে বাংলাদেশের অবস্থান করে নেয়ার বিষয়টির ওপর জোর দিচ্ছেন। এক্ষেত্রে প্রথমেই আসছে বাংলাদেশের আসিয়ানে যোগ দেয়ার কথা।

১৮তম বিসিএস ১৯৯৭-৯৮

সময় : ৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ১০০

দ্রষ্টব্য : ইংরেজি অথবা বাংলা যে কোনো একটি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজিতে লেখা চলবে। প্রার্থীদেরকে ৭ নং প্রশ্নের এবং ১ থেকে ৬ নং প্রশ্নের যে কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান সমান।]

১. বাংলাদেশের সংবিধানের সংশোধনীসমূহের ব্যাপারে আলোচনা করুন। ২০

উত্তর : পৃষ্ঠা নং ৪৭৬।

২. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৈদেশিক বিনিয়োগের সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোকপাত করুন। ২০

উত্তর : পৃষ্ঠা নং ১৪৩।

৩. বাংলাদেশের নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ সম্পর্কে মতামতসহ আপনার বক্তব্য তুলে ধরুন। ২০

উত্তর : পৃষ্ঠা নং ৫৯৩।

৪. কি কি কৌশল/পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে আগামী দশ বছরের মধ্যে দেশ থেকে নিরক্ষরতা সম্পূর্ণ দূর করা সম্ভব বলে আপনি মনে করেন? এ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন। ২০

উত্তর : পৃষ্ঠা নং ১৯৩।

৫. স্থানীয় সরকার বলতে আপনি কি বোঝেন? দেশে কয়টি স্তরে স্থানীয় সরকার গঠন এবং কোন স্তরে কি কি ক্ষমতা ও দায়িত্ব থাকা সমীচীন বলে আপনি মনে করেন? ২০

উত্তর : পৃষ্ঠা নং ৫৫১।

৬. বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে ভাষা আন্দোলন ও ছয় দফা কর্মসূচির ভূমিকা আলোচনা করুন। ২০

উত্তর : পৃষ্ঠা নং ৮৬৩ ও ৮৬৬।

৭. প্রদত্ত দশটি প্রশ্নের মধ্যে আটটি প্রশ্নের উত্তর লিখুন : ১০×২=২০

ক. বাঙালি জাতিকে সঙ্কর জাতি বলা যায় কি? আপনার বক্তব্যের সপক্ষে যুক্তিসহ আলোচনা করুন।

উত্তর : আমাদের বাঙালি জাতিকে মূলত সঙ্কর জাতি বলা হয়। কারণ, এই বাঙালি জাতি গঠনে রয়েছে নানা জাতির সংমিশ্রণ। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে মুসলমান অধিকারের পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত এই বাঙালি জনগোষ্ঠীকে দুভাগে ভাগ করা যায়। তা হলো— (ক) প্রাক আর্য বা অনার্য নরগোষ্ঠী ও (খ) আর্য নরগোষ্ঠী।

এ দেশে আর্যদের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত অনার্যদের বসতি ছিল। তাই প্রাক আর্য নরগোষ্ঠী বাঙালি জীবনের এক মেরুদণ্ড। এ দেশের আর্যপূর্ব জনগোষ্ঠী নেগ্রিটো, অস্ট্রিক, দ্রাবিড় এবং ভোটচীনীয় এই চার ভাগে বিভক্ত ছিল। কালের বিবর্তনে তাদের স্বাতন্ত্র্য এখন বিলুপ্ত। তাই বাঙালি জাতিকে নিঃসন্দেহে 'সঙ্কর জাতি' বলা যায়।

খ. বাংলাদেশে ভূমি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার ওপর সংক্ষেপে মতামত দিন।

উত্তর : বর্তমানে বাংলাদেশে ভূমি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান হলেও এখনো আমাদের কৃষি, চাষাবাদ প্রভৃতি ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবস্থার সর্বোচ্চ প্রয়োগ হয়নি। ব্রিটিশ শাসনামলে জমির মালিক ছিল কতিপয় জমিদার। ১৯৫০ সালে জমিদারী প্রথাকে বিলোপ করা হয়। এতে করে কৃষি ও ভূমিক্ষেত্রে বেশ পরিবর্তন সূচিত হয়। পাকিস্তান আমলে জমিতে কৃষকের স্বত্ব প্রতিষ্ঠার দাবি তেমন কার্যকর হয়নি। এমনকি স্বাধীন বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকার এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় তেমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। তাই বর্তমানে কৃষির উন্নতিকল্পে ভূমি সংস্কার আবশ্যক হয়ে পড়েছে।

গ. লালনগীতি কি এবং এর প্রভাবই বা কি?

উত্তর : বাংলার বাউল সাধক ফকির লালন শাহের রচিত আধ্যাত্মিক গানগুলো 'লালনগীতি' নামে পরিচিত। বর্তমানে সর্বমহলে এই গান সমাদৃত। এই লালনগীতিতে রয়েছে বেশ ভাবগাম্ভীর্যতা, মাধুর্যতা ও সুরের মোহ। এ সকল গীতি কামনা-বাসনা, আশা, আনন্দ-বেদনা প্রাণে এক আন্দোলন ও আবেগের সৃষ্টি করে। এ গানের অনুভূতি মন কেড়ে নেয়। সকল গান থেকে এ গানের গতি, সুর, স্বচ্ছতা একেবারে স্বকীয়। বাংলায় অন্য সকল গানের তুলনায় এ গানের প্রভাব সবচেয়ে বেশি।

ঘ. মৈমনসিংহ গীতিকার ওপর আলোচনা করুন।

উত্তর : মৈমনসিংহ গীতিকার সংগ্রহ করেন ড. দীনেশচন্দ্র সেন। এটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'মৈমনসিংহ গীতিকা' ও 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' নামে চার খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ব্রহ্মপুত্র নদ দ্বারা দ্বিধাবিভক্ত সাবেক ময়মনসিংহ জেলার পূর্বাংশে নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জের বিল, হাওড় ও বিভিন্ন নদ-নদী প্লাবিত বিস্তৃত ভাটি অঞ্চলে বাংলার শ্রেষ্ঠ গীতিকা'র যে শতদলগুলো বিকশিত হয়েছিল তাই 'মৈমনসিংহ গীতিকা' নামে দেশ-বিদেশে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মৈমনসিংহ গীতিকায় এসব অঞ্চলের মাতৃতান্ত্রিক সমাজের বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠেছে। এই সমাজে নারীর স্বাধীন প্রেমের যে স্বীকৃতি রয়েছে তার অনুসরণে গীতিকাগুলোতে নারী চরিত্রের রূপায়ণ লক্ষ্য করা যায়। মৈমনসিংহ গীতিকার কাহিনীগুলো প্রেমমূলক এবং তাতে নারী চরিত্রই প্রাধান্য পেয়েছে। নারীর ব্যক্তিত্ব, আত্মবোধ, স্বাতন্ত্র্য, সতীত্ব প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য এসব গীতিকায় বিশেষভাবে স্থানে পেয়েছে।

ঙ. জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন প্রসঙ্গটি পর্যালোচনা করুন।

উত্তর : প্রথম জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন ছিল মাত্র ১৫টি। দ্বিতীয় জাতীয় সংসদে তা বৃদ্ধি করে করা হয় ৩০টি। তবে মহিলাদের সংরক্ষিত এই আসনগুলোতে সরাসরি ভোটের মাধ্যমে সংসদ সদস্য নির্বাচিত না হয়ে তারা নির্বাচিত সংসদ সদস্য কর্তৃক মনোনীত হন। এতে করে দেখা যায় সংসদে যে দল ক্ষমতায় থাকে সে দল থেকে সংরক্ষিত আসনে মহিলারা মনোনীত হন। মহিলাদেরকে রাজনীতিতে সচেতন করে তোলার জন্যই এ ব্যবস্থা। ইতোমধ্যে বাংলাদেশের সংসদের এই ব্যবস্থা বিশ্বে প্রশংসিত হয়েছে। মহিলা সদস্যরা তাদের দাবি ও সমস্যা সমাধানে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হচ্ছেন এবং নানা ধরনের সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে পারছেন। অবশ্য সপ্তম জাতীয় সংসদে এর মেয়াদ শেষ হওয়ায় অষ্টম জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসন ছিল না। এ প্রেক্ষিতে নারীদের জন্য ৪৫টি আসন সংরক্ষণ করে সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী পাস হয়েছে ২০০৪ সালের ১৬ মে। এতে বলা হয়েছে, এই আইন প্রবর্তনকালে বিদ্যমান সংসদের অব্যবহিত পরবর্তী সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ থেকে শুরু করে ১০ বছর অতিবাহিত হওয়ার অব্যবহিত পরবর্তীকালে সংসদ ভেঙে না যাওয়া পর্যন্ত মহিলাদের জন্য ৪৫টি আসন সংরক্ষিত থাকবে।

সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন ৫০-এ উন্নীত করা হয়। সংসদে রাজনৈতিক দলের নির্বাচিত সদস্যের দ্বারা আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতিতে এসব আসনে নির্বাচন হবে। এ সংশোধনের পরও সরাসরি নির্বাচনে যে কোনো আসনে নারীরা অংশ নিতে পারবেন।

চ. বাংলাদেশের খনিজসম্পদের ওপর আলোকপাত করুন।

উত্তর : বাংলাদেশ খনিজসম্পদে ততটা সমৃদ্ধ নয়। গ্যাস, তেল, কয়লা, কঠিন শিলা, চুনাপাথর, কাচবালি, চীনামাটি প্রভৃতি খনিজ সম্পদ এ দেশে পাওয়া যায়। এদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দেয়া হলো :

১. **প্রাকৃতিক গ্যাস :** বাংলাদেশে এ পর্যন্ত প্রাপ্ত প্রাকৃতিক গ্যাসের খনি অনুসন্ধানে জানা গেছে, এসব খনিতে প্রায় ৩৭.৬৮০ ট্রিলিয়ন ঘনফুট প্রাকৃতিক গ্যাস মজুদ রয়েছে। এপ্রিল ২০১৫ পর্যন্ত ২৬টি গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হলেও বর্তমানে ১৯ গ্যাসক্ষেত্রের ৮৩টি কূপ থেকে গ্যাস উত্তোলন করা হচ্ছে।

২. **কঠিন শিলা :** দিনাজপুর জেলার মধ্যপাড়ায় কঠিন শিলা আবিষ্কৃত হয়েছে। এখান থেকে পাথর উত্তোলিত হচ্ছে।

৩. **চীনামাটি :** নেত্রকোনা জেলার বিজয়পুরে ৮ লাখ মেট্রিক টন চীনামাটি সঞ্চিত আছে। এছাড়া নওগাঁর পত্নীতলা ও চট্টগ্রামের পটিয়াতেও চীনামাটি মজুদ আছে।

৪. **চুনাপাথর :** সিলেটের টেকেরহাট, লালঘাট ও বাগালী বাজার এবং জয়পুরহাটে, কক্সবাজারের সেন্টমার্টিনে এবং নওগাঁ জেলার জাহানপুর ও পরানগরে চুনাপাথর পাওয়া গেছে।

৫. **খনিজ তেল :** ১৯৮৬ সালে সিলেটের হরিপুরে তেলের সন্ধান পাওয়া যায়। এছাড়া কৈলাশটিলা ও ফেঞ্চুগঞ্জে তেলবাহী শিলাস্তরের সন্ধান পাওয়া গেছে।

৬. **অন্যান্য :** এছাড়া আরো অনেক খনিজ সম্পদ আমাদের দেশে রয়েছে। তার মধ্যে কয়লা ও কাচবালি অন্যতম।

ছ. বাংলাদেশের নদীর তলদেশ পলিতে ভরাট হওয়ায় উদ্ভূত সমস্যা ও সমাধানের ব্যাপারে বক্তব্য রাখুন।

উত্তর : বর্তমানে বাংলাদেশে ছোট-বড় সব মিলে ৩১০টি নদনদী রয়েছে। এর মধ্যে পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, কর্ণফুলী, ব্রহ্মপুত্র উল্লেখযোগ্য। একসময় এ সকল নদী নাব্য ছিল। কিন্তু কালের বিবর্তনে নদীগুলোর তলদেশ পলিতে ভরে গেছে। এর ফলে নদীগুলোর পানি ধারণক্ষমতা অনেক কমে গেছে। যার কারণে অধিক বৃষ্টিপাত ও বন্যা হলেই নদীর দু'কূল প্লাবিত হয়ে পড়ে। এতে করে ফসল ও সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষতি হয়। বাংলাদেশে বন্যা এখন একটি নৈমিত্তিক ব্যাপার। প্রতিবছরই দেশের কোনো না কোনো অঞ্চলে বন্যা হয়ে থাকে। নদীর তলদেশ ভরাট হয়ে যাওয়ায় শীত মৌসুমে পর্যাপ্ত পানি সেচের ব্যাঘাত ঘটে। নদীতে যাত্রী ও পণ্যবাহী পরিবহনে সমস্যা দেখা দেয়। এ পরিস্থিতিতে ড্রেজারের মাধ্যমে নদীর গভীরতা বৃদ্ধি করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। ইতিমধ্যে সরকার এ ব্যাপারে কিছু ব্যবস্থা নিলেও তা পর্যাপ্ত নয়। এ সমস্যার আশু সমাধান করতে না পারলে দেশের কৃষি ব্যবস্থা অচিরেই ভেঙ্গে পড়বে। নৌপথে মালামাল পরিবহনও অসম্ভব হয়ে পড়বে।

জ. বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যমুনা ব্রিজের প্রভাব আলোচনা করুন।

উত্তর : সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের পাশাপাশি বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে

যমুনা সেতুর গুরুত্ব অপরিসীম। যমুনা সেতুকে তাই বলা যায় উন্নয়নের নব দিগন্ত। যমুনা সেতু আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নিম্নলিখিত ভূমিকা রাখছে :

১. দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের শিল্পসমৃদ্ধ কাঁচামাল বাজারজাতকরণে যমুনা সেতু বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

২. দেশের কৃষিপণ্য পরিবহন ও বাজারজাতকরণে যমুনা সেতু বিশেষ কৃতিত্বের দাবিদার।

৩. যমুনা সেতুর মাধ্যমে বিদ্যুৎ ও গ্যাস ওপারে নেয়া সম্ভবপর হয়েছে। ফলে পরিবেশ রক্ষা এবং জ্বালানি সম্পদ হিসেবে কাঠ ও কাঠজাত দ্রব্যের সাশ্রয় হয়েছে।

৪. বাণিজ্যিক লেনদেন বৃদ্ধি পাওয়ায় বহুলোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। এতে করে বেকার সমস্যার অনেকটা সমাধান হয়েছে।

৫. উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে আজ অবধি তেমন কোনো বড় শিল্প কলকারখানা গড়ে ওঠেনি। যমুনা ব্রিজ এলাকাভিত্তিক এ সমতা রক্ষা করতে ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

ঝ. শহরমুখী গ্রামীণ জনস্রোতের কারণ এবং প্রতিকার সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

উত্তর : বর্তমানে বাংলাদেশের ৭৭% লোক গ্রামে বাস করে। বিশাল জনসংখ্যার একটি ক্ষুদ্রতম অংশ শহরে বসবাস করে। কিন্তু প্রতিদিন শহরের জনসংখ্যা আশাতীত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে শহর এখন হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। শহর অঞ্চল নানাভাবে দূষিত হচ্ছে। শহরমুখি গ্রামীণ জনস্রোতের কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে—

১. গ্রামের জনসাধারণের খাদ্যাভাব;
২. মহাজনদের শোষণ;
৩. নদী ভাঙ্গন;
৪. অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ও বন্যার ফলে খাদ্যাভাব;
৫. গ্রাম্য দালালদের অত্যাচার;
৬. বেকারত্বের চরম বৃদ্ধি;

এ থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে—

১. প্রশাসনকে বিকেন্দ্রীকরণের মধ্য দিয়ে গ্রামে চাকরির পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টি।
২. গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নতকরণ।
৩. প্রাকৃতিক দুর্যোগ রোধে সরকারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া।
৪. গ্রামের মানুষের মধ্যে সুষ্ঠু যোগাযোগের ব্যবস্থা করা।
৫. গ্রামে স্কুল, কলেজ প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি।

ঞ. রাজস্ব বাজেট ও উন্নয়ন বাজেট বলতে কি বোঝায়? সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

উত্তর : দেশের অভ্যন্তরীণ ও বহিঃউৎস থেকে কি পরিমাণ সম্পদ পাওয়া যেতে পারে তার প্রাক্কলন চূড়ান্ত করা এবং এক বছরের হিসাব-নিকাশ করা রাজস্ব সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। এ সম্পদকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা— রাজস্ব খাত ও খ. উন্নয়ন খাত।

রাজস্ব খাতের ব্যয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট অর্থ উন্নয়নের খাতে বরাদ্দ দেয়া হয়। বিভিন্ন রাজস্ব ব্যয় প্রাক্কলনের আলোকে এবং অর্থসংস্থান বিবেচনা করে অর্থ মন্ত্রণালয় রাজস্ব ব্যয় বিবরণী তৈরি করে। উন্নয়ন খাতে বরাদ্দের ভিত্তিতে পরিকল্পনা কমিশন বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন করে থাকে।

১৭তম বিসিএস ১৯৯৫-৯৬

সময় : ৩ ঘন্টা; পূর্ণমান : ১০০

[দ্রষ্টব্য : *ইংরেজি অথবা বাংলা যে কোনো একটি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজিতে লেখা চলবে। ১ থেকে ৬ নম্বর প্রশ্নের যে কোনো তিনটির উত্তর এবং ৭ ও ৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।*]

১. বাংলাদেশের বন্যা ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন কৌশল ব্যাখ্যা করুন। ২০

উত্তর : পৃষ্ঠা নং ৩৪০।

২. বাংলাদেশে নারী ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে প্রধান সীমাবদ্ধতাসমূহ আলোচনা করুন। ২০

উত্তর : পৃষ্ঠা নং ৮৩৪।

৩. বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও পরিবেশের প্রভাব আলোচনা করুন। ২০

উত্তর : পৃষ্ঠা নং ০৭।

৪. বাংলাদেশের বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধিকল্পে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করতে হলে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন? বিশদভাবে আলোচনা করুন। ২০

উত্তর : পৃষ্ঠা নং ১৪৩।

৫. বাংলাদেশে মূল্যবোধের পূর্ণ অবক্ষয় ঘটেছে বলে কি আপনি মনে করেন। এর কারণ সম্পর্কে আপনার মতামত দিন। ২০

উত্তর : পৃষ্ঠা নং ১২৩।

৬. বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মৌলিক সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করুন এবং এর সম্ভাব্য প্রতিকারের পরামর্শ দিন। ২০

উত্তর : পৃষ্ঠা নং ১৮৯।

৭. যে কোনো দশটির উত্তর দিন ১০×২=২০

ক. মধুপুরের গড় কোন কোন জেলায় বিস্তৃত?

উত্তর : মধুরপুর গড় টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহ জেলায় অবস্থিত।

খ. মেঘনা-ধনগোদা প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য কি?

উত্তর : চাঁদপুর জেলার মতলব উপজেলাকে মেঘনা নদীর ভাঙ্গন থেকে রক্ষা করাই মেঘনা-ধনগোদা প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য।

গ. কোন জেলায় বার্ষিক বৃষ্টিপাত সর্বাধিক ও কত?

উত্তর : মৌলভীবাজার জেলায় সর্বাধিক বৃষ্টিপাত হয়। এ জেলায় বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৫০০ সেন্টিমিটার।

ঘ. প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধন বাংলাদেশের কোন অংশ?

উত্তর : উত্তরবঙ্গের বৃহত্তর বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর এবং রাজশাহী জেলা নিয়ে গঠিত হয়েছিল প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধন।

ঙ. বাংলাদেশের কোথায় সর্বাধিক বোরো ধান উৎপন্ন হয়?

উত্তর : বাংলাদেশের কিশোরগঞ্জ জেলায় সর্বাধিক বোরো ধান উৎপন্ন হয়। এ জেলায় বার্ষিক উৎপাদন প্রায় ৬ লাখ মেট্রিক টন।

চ. বাংলাদেশের প্রাচীনতম নগরের কি নাম এবং বর্তমানে তা কোথায়?

উত্তর : বাংলাদেশের প্রাচীনতম নগরের নাম পুণ্ড্রনগর, যার বর্তমান নাম মহাস্থানগড়। এটি বর্তমানে বগুড়া জেলায় অবস্থিত।

ছ. বাংলাদেশের এক বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন এবং সেখানেই প্রাণত্যাগ করেন। তিনি কে এবং তার জন্মস্থান কোথায়?

উত্তর : অতীশ দীপঙ্কর। তার জন্মস্থান মুন্সীগঞ্জ জেলায়।

জ. দিনাজপুর ও কুষ্টিয়া শহর কোন কোন নদীর তীরে?

উত্তর : দিনাজপুর পুনর্ভবা এবং কুষ্টিয়া গড়াই নদীর তীরে অবস্থিত।

ঝ. NAPE কি এবং কোথায় অবস্থিত?

উত্তর : NAPE-এর পূর্ণনাম হলো National Academy for Primary Education। এটি ময়মনসিংহ শহরে অবস্থিত।

ঞ. বাংলাদেশে কুষ্ঠরোগের চিকিৎসা কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত?

উত্তর : ঢাকার মহাখালী, টাঙ্গাইলের মধুপুর এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের চন্দ্রঘোনাতে কুষ্ঠরোগের চিকিৎসা কেন্দ্র অবস্থিত।

ট. বাংলা শিক্ষামূলক কার্টুন সিরিজ 'মীনা'র নির্মাতা কে?

উত্তর : বাংলা শিক্ষামূলক কার্টুন 'মীনা'র নির্মাতা হলেন শিল্পী মুস্তাফা মনোয়ার।

ঠ. একুশে ফেব্রুয়ারির বাংলা তারিখ ও মাস কি?

উত্তর : ফাল্গুন মাসের ৮ তারিখ।

ড. লালবাগ কেল্লার নির্মাতার নাম ও নির্মাণকাল উল্লেখ করুন।

উত্তর : সম্রাট আওরঙ্গজেবের পুত্র শাহজাদা আযম ১৬৭৮ সালে লালবাগ কেল্লার নির্মাণ কাজ শুরু করেন এবং সুবাদার শায়েস্তা খাঁ এর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করেন।

ঢ. আন্তর্জাতিক পুরস্কারপ্রাপ্ত বাংলাদেশের দুটি ছায়াছবির নাম ও এদের পরিচালকের নাম লিখুন।

উত্তর : ১. সূর্যদীঘল বাড়ি, পরিচালক — শেখ নিয়ামত আলী; ২. শঙ্খনীল কারাগার, পরিচালক — মুস্তাফিজুর রহমান।

ণ. নির্মীয়মাণ যমুনা বহুমুখী সেতুর প্রস্তাবিত দৈর্ঘ্য কত কিলোমিটার?

উত্তর : ৪.৮ কিলোমিটার (এটির নির্মাণ কাজ ১৯৯৭ সালে শেষ হয়)।

৮. নিম্নলিখিত যে কোনো পাঁচটি সম্পর্কে টীকা লিখুন : ৫×৪=২০

ক. জুম চাষ;

খ. ঢাকাই মসলিন;

গ. জাতীয় গৃহায়ন নীতিমালা-১৯৯৩;

ঘ. পিএটিসি (PATC);

ঙ. স্পারসো;

চ. কুমিল্লা মডেল এবং

ছ. 'ফ্লাড অ্যাকশন প্ল্যান' (FAP)

উত্তর : *টীকা অংশে দেখুন।*

১৫তম বিসিএস ১৯৯৩-৯৪

সময় : ৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ১০০

[দ্রষ্টব্য : ইংরেজি অথবা বাংলা যে কোনো একটি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজিতে লেখা চলবে। ১ থেকে ৬ নম্বর প্রশ্নের যে কোনো তিনটির উত্তর এবং ৭ ও ৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।]

১. বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের কারণ ও দমনের উপায় চিহ্নিত করুন। ২০

২. 'সার্ক ও বাংলাদেশ' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখুন। ২০

উত্তর : পৃষ্ঠা নং ৬১৯।

৩. বাংলাদেশের সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক অবস্থার মূল্যায়ন করুন। ২০

৪. বাংলাদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কি কি সমস্যা রয়েছে? আলোচনা করুন। ২০

উত্তর : পৃষ্ঠা নং ১৯৩।

৫. বাংলাদেশে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটি নিবন্ধ রচনা করুন। ২০

উত্তর : পৃষ্ঠা নং ৭৭৪।

৬. বাংলাদেশে জনসংখ্যা সমস্যা এবং মানব সম্পদের সদ্ব্যবহার বিষয়ে আলোচনা করুন। ২০

উত্তর : পৃষ্ঠা নং ৪২।

৭. যে কোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দিন : ১০ × ২ = ২০

ক. বাংলাদেশের ডাক বিভাগের মনোগ্রাম কি?

উত্তর : বাংলাদেশের ডাক বিভাগের মনোগ্রাম হলো একজন ধাবমান রানারের কাঁধে ঝোলানো চিঠির ব্যাগ, হাতে একটি বল্লম এবং বল্লমের মাথায় প্রজ্জ্বলিত লণ্ঠন।

খ. বাংলাদেশের বার্ষিক খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন এবং ঘাটতির পরিমাণ কত?

উত্তর : অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৪ অনুযায়ী বাংলাদেশ ২০১৩-১৪ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন ৩৭৭.৮২ লক্ষ মেট্রিক টন এবং ঘাটতির পরিমাণ ২৩.৪৪ লক্ষ মেট্রিক টন।

গ. বাংলাদেশের মৃত্তিকাকে ক'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে এবং তা কি কি?

উত্তর : বাংলাদেশের মৃত্তিকাকে ৪ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা— ১. পাললিক মৃত্তিকা, ২. পাহাড়িয়া মৃত্তিকা, ৩. লোহিত মৃত্তিকা এবং ৪. লবণাক্ত মৃত্তিকা।

ঘ. বাংলাদেশের জাতীয় স্মৃতিস্তম্ভ কয়টি ও কি কি?

উত্তর : বাংলাদেশের জাতীয় স্মৃতিস্তম্ভ মোট ৫টি। যথা— ১. জাতীয় স্মৃতিসৌধ, ২. কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, ৩. মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ, ৪. শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ এবং ৫. তিন নেতার মাজার।

ঙ. কোন পানিতে চিংড়ি চাষ করতে হয়?

উত্তর : স্বাদু ও স্বচ্ছ পানিতে গলদা চিংড়ি এবং লবণাক্ত পানিতে বাগদা ও চাকা চিংড়ির চাষ করতে হয়।

চ. বাংলাদেশে বসবাসরত প্রধান পাঁচটি উপজাতীদের নাম লিখুন।

উত্তর : বাংলাদেশে বসবাসরত প্রধান পাঁচটি উপজাতি হলো—১. চাকমা, ২. গারো, ৩. সাঁওতাল, ৪. টিপরা ও ৫. মারমা।

ছ. বাংলাদেশ ব্যাংক-এর শাখা অফিস কয়টি এবং তা কোথায় কোথায় অবস্থিত?

উত্তর : বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা অফিস ১০টি। সেগুলো অবস্থিত– ১. ঢাকার মতিঝিল, ২. সদরঘাট, ৩. চট্টগ্রাম, ৪. খুলনা, ৫. রাজশাহী, ৬. বগুড়া, ৭. সিলেট, ৮. রংপুর, ৯. বরিশাল এবং ১০. ময়মনসিংহ।

জ. সৈয়দ মুজতবা আলী এবং জহির রায়হানের একটি করে উপন্যাসের নাম লিখুন।

উত্তর : শবনম— সৈয়দ মুজতবা আলী, আরেক ফাল্গুন— জহির রায়হান।

ঝ. বাংলাদেশের কোন স্থানে (নির্দিষ্ট স্থানের নাম দিতে হবে) প্রথম চায়ের চাষ করা হয় এবং কোন সনে?

উত্তর : বাংলাদেশে প্রথম চা চাষ শুরু হয় ১৮৫৪ সালে। সিলেট থেকে ৬.৪৩ কিলোমিটার দূরে 'মালনীছড়া' নামক স্থানে।

ঞ. বাংলাদেশে মোট কত মাইল সমুদ্র উপকূল রয়েছে?

উত্তর : বাংলাদেশে মোট ৪৫০ মাইল সমুদ্র উপকূল রয়েছে।

ট. 'বার ভুঁইয়া' কারা ছিলেন?

উত্তর : মোঘল সম্রাট আকবরের সময় বাংলায় ১২ জন প্রভাবশালী হিন্দু ও মুসলমান জমিদার স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতেন। এদেরকে বলা হতো বারো ভুঁইয়া। এরা হলেন—

১. সোনারগাঁওয়ের ঈশা খাঁ ও মুসা খাঁ ২. ভাওয়ালের ফজল ও বাহাদুর গাজী, ৩. মানিকগঞ্জের বিনোদ রায় ও মধু রায় ৪. বরিশালের কন্দর্প নারায়ণ ও রামচন্দ্র, ৫. নাটোরের কংস নারায়ণ, ৬. বাকুড়ার বীহামির ৭. ভূষণার মুকুন্দরাম ও রঘুনাথ, ৮. বিক্রমপুরের চাঁদ রায় ও কেদার রায়, ৯. যশোহরের প্রতাপাদিত্য, ১০. দিনাজপুরের গণেশ রায় ও প্রমথ রায়, ১১. ভুলুয়ার লক্ষ্মণ মানিক্য ও অনন্ত মানিক্য এবং ১২. পুটিয়ার পীতাম্বর রায় ও রামচন্দ্র।

ঠ. সুন্দরবনের মোট আয়তন কত?

উত্তর : বাংলাদেশ অংশে সুন্দরবনের মোট আয়তন ৬,০১৭ বর্গ কিলোমিটার।

ড. গ্রামীণ ব্যাংক-এর প্রতিষ্ঠাতা কে?

উত্তর : গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা হলেন অর্থনীতিবিদ ড. মুহম্মদ ইউনূস।

ঢ. বাংলাদেশের কোথায় সাদা মাটি পাওয়া যায়?

উত্তর : বাংলাদেশের নেত্রকোনা জেলার বিজয়পুরে সাদামাটি (White clay) পাওয়া যায়।

ণ. জুটন কি?

উত্তর : প্রখ্যাত কৃষিবিজ্ঞানী ড. মুহাম্মদ সিদ্দিকুল্লাহ আবিষ্কৃত ৭০ ভাগ পাট ও ৩০ ভাগ তুলা মিশ্রণে তৈরি বিশেষ ধরনের কাপড়কে বলা হয় জুটন।

ত. ইরাটম কি?

উত্তর : ইরাটম এক ধরনের ধানের নাম। বাংলাদেশে বর্তমানে ব্যাপক হারে এর আবাদ হচ্ছে। ফলনও খুব বেশি।

থ. বাংলাদেশের জাতীয় প্রতীক কি?

উত্তর : বাংলাদেশের জাতীয় প্রতীক হলো উভয় পাশে ধানের শীষ বেষ্টিত পানিতে ভাসমান জাতীয় ফুল শাপলা, তার মাথায় পাটগাছের পরস্পর সংযুক্ত তিনটি পাট পাতা এবং উভয় পাশে দুটি করে তারকা।

৮. নিম্নলিখিত যে কোনো পাঁচটি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টিকা লিখুন : ৪×৫=২০

ক. এডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যান্ড সার্ভিসেস রিঅর্গানাইজেশন কমিটি (এএসআরসি), ১৯৭২;

খ. কমিটি ফর এডমিনিস্ট্রেটিভ রিঅর্গানইজেশন/রিফর্ম (সিএআরআর), ১৯৮২;

গ. আহসান মঞ্জিল; ঘ. জাতীয় আর্কাইভস;

ঙ. পঞ্চম সার্ক সম্মেলন;

চ. সংবিধানের ১২তম সংশোধনী;

ছ. বাংলাদেশ-ভারত যৌথ নদী কমিশন;

জ. ১০ নভেম্বর, ১৯৮৭ এবং

ঝ. বীরশ্রেষ্ঠ।

উত্তর : *টীকা অংশে দেখুন।*

১৩তম বিসিএস ১৯৯১-৯২

সময় : ৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ১০০

[দ্রষ্টব্য : ইংরেজি অথবা বাংলা যে কোনো একটি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজিতে লেখা চলবে। ১ থেকে ৬ নম্বর প্রশ্নের যে কোনো তিনটির উত্তর এবং ৭ ও ৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।]

১. বাংলাদেশে কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা এবং এগুলোর সম্ভাব্য সমাধান আলোচনা করুন। ২০

উত্তর : পৃষ্ঠা নং ৪০৯।

২. বাংলাদেশে পররাষ্ট্রনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করুন। ২০

উত্তর : পৃষ্ঠা নং ৬১৩।

৩. ছয় দফা আন্দোলনের পটভূমি ও এর গুরুত্ব আলোচনা করুন। ২০

উত্তর : পৃষ্ঠা নং ৮৬৬।

৪. বাংলাদেশে নিরক্ষরতার সমস্যা সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখুন। ২০

উত্তর : পৃষ্ঠা নং ১৯৩।

৫. বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রের প্রধান সংশোধনীগুলো আলোচনা করুন। ২০

উত্তর : পৃষ্ঠা নং ৪৭৬।

৬. স্বাধীনতা-উত্তরকালে বাংলাদেশের নাট্য আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি আলোচনা করুন। ২০

৭. যে কোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দিন : ১০ × ২ = ২০

ক. 'শেষের কবিতা' ও 'কালের কলস' কোন শ্রেণীর সাহিত্যকর্ম?

উত্তর : শেষের কবিতা— উপন্যাস, কালের কলস— কাব্যগ্রন্থ।

খ. জসীমউদদীন ব্যতীত এমন দুজন কবির নাম লিখুন যাঁদের কবিতায় বাংলার গ্রাম জীবন রূপায়িত হয়েছে।

উত্তর : ১. জীবনানন্দ দাশ ও ২. বন্দে আলী মিয়া।

গ. শামসুর রাহমান ও আলাউদ্দিন আল-আজাদের একটি করে কবিতার শিরোনাম লিখুন।

উত্তর : শামসুর রাহমান— স্বাধীনতা তুমি, আলাউদ্দীন আল আজাদ— আমার মাকে যখন।

ঘ. 'পদ্মাবতী' ও 'জমিদার দর্পণ'-এর রচয়িতার নাম কি?

উত্তর : পদ্মাবতী— আলাওল, জমিদার দর্পণ— মীর মশাররফ হোসেন।

ঙ. বাংলাদেশের দুজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক বা সমাজবিজ্ঞানীর নাম লিখুন

উত্তর : ঐতিহাসিক— ড. আবদুল করিম ও মুনতাসীর মামুন।

সমাজবিজ্ঞানী— ড. নাজমুল করিম ও বদরুদ্দিন উমর।

চ. শওকত ওসমান ও রশীদ করিমের একটি করে উপন্যাসের নাম লিখুন।

উত্তর : শওকত ওসমান— জননী, রশীদ করিম— উত্তমপুরুষ।

ছ. বাংলাদেশের জাতীয় স্মৃতি সৌধের স্থপতি কে?

উত্তর : সৈয়দ মাইনুল হোসেন।

জ. পাকিস্তান কখন বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল?

উত্তর : ১৯৭৪ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করেছিল।

ঝ. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কখন প্রতিষ্ঠিত হয়?

উত্তর : ১৯৫৩ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

ঞ. (১) অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীনের শাসনামলে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা কে ছিলেন?

উত্তর : অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক রেহমান সোবহান।

(২) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্যের নাম কি?

উত্তর : স্যার পি. জে. হার্টজ।

ট. (১) কার্জন হল কখন নির্মিত হয়?

উত্তর : ১৯০৪-০৫ সালে কার্জন হল নির্মিত হয়।

(২) ময়নামতি বিখ্যাত কেন?

উত্তর : প্রাচীন বৌদ্ধ সভ্যতার নিদর্শনের জন্য ময়নামতি বিখ্যাত।

ঠ. (১) ১৯০৫ সালে ঢাকাকে রাজধানী করে যে নতুন প্রদেশ গঠিত হয় তার নাম কি?

উত্তর : পূর্ববঙ্গ ও আসাম।

(২) নতুন প্রদেশের গর্ভনর কে ছিলেন?

উত্তর : ১৯০৫ সালে গঠিত নতুন প্রদেশের প্রধানের পদবি ছিল লেফটেন্যান্ট গভর্নর এবং প্রথম লেফটেন্যান্ট গভর্নর ছিলেন ব্যামফিল্ড ফুলার।।

ড. (১) বাংলাদেশের প্রধান দুটি রপ্তানি পণ্যের নাম লিখুন।

উত্তর : গার্মেন্টস ও পাটজাত দ্রব্য।

(২) বাংলাদেশ কোন দেশ থেকে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ পণ্য আমদানি করে থাকে?

উত্তর : ২৯ ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি পরিমাণ পণ্য আমদানি করে চীন থেকে এ সময় পর্যন্ত আমদানির পরিমাণ ৭.৫৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

ঢ. (১) বাংলাদেশে কয়টি ক্যাডেট কলেজ আছে?

উত্তর : বাংলাদেশে মোট ১২টি ক্যাডেট কলেজ রয়েছে। এর মধ্যে ৯টি বালকদের জন্য এবং ৩টি বালিকাদের জন্য।

(২) বাংলাদেশে মেডিক্যাল কলেজের সংখ্যা কত?

উত্তর : বাংলাদেশে সরকারি মেডিক্যাল কলেজের সংখ্যা সাধারণ এম.বি.এস এর ক্ষেত্রে ২৯টি (২০১৪ অনুযায়ী)। আর অন্যান্য সরকারি মেডিকেল কলেজ হলো ৮টি (২০১৪ অনুযায়ী) এবং বর্তমান ২০১৫ সালে আরও দুটি মেডিকেল কলেজ স্থাপন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

গ. (১) বাংলাদেশ ক্রিকেট দল সর্বশেষ কোন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে?
উত্তর : বাংলাদেশ ক্রিকেট দল সর্বশেষ ১১ম (১৪ ফেব্রুয়ারি-২৯ মার্চ ২০১৫) বিশ্বকাপ ক্রিকেটে অংশগ্রহণ করে।
(২) ঢাকায় সর্বশেষ কোন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।
উত্তর : ঢাকায় অনুষ্ঠিত সর্বশেষ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা হলো 'আইসিসি ওয়ার্ল্ড টুয়েন্টি ২০' টুর্নামেন্ট (১৬ মার্চ-৬ এপ্রিল ২০১৪)।

৮. নিম্নলিখিত যে কোনো পাঁচটি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন : ৪ × ৫ = ২০
(ক) আইসিভিটিআর; (খ) ডিইএসএ; (গ) গারো উপজাতি; (ঘ) গ্রাম সরকার; (ঙ) লাহোর প্রস্তাব (১৯৪০); (চ) মৌলিক গণতন্ত্র; (ছ) ইসিএনইই; (জ) অঙ্গরপোতা দহগ্রাম; (ঝ) গ্রীন হাউস প্রভাব এবং (ঞ) বিএএএস।
উত্তর : *টীকা অংশে দেখুন।*

১১তম বিসিএস ১৯৯০-৯১
সময় : ৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ১০০

[দ্রষ্টব্য : ইংরেজি অথবা বাংলা যে কোনো একটি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজিতে লেখা চলবে। ১ থেকে ৬ নম্বর প্রশ্নের যে কোনো তিনটির উত্তর এবং ৭ ও ৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।]

১. বাংলাদেশের বন্যা সমস্যা ও এর সম্ভাব্য সমাধান সম্পর্কে আলোচনা করুন। ২০
উত্তর : পৃষ্ঠা নং ৩৪০।
২. বাংলা ভাষার উদ্ভব ও বিকাশ আলোচনা করুন। ২০
৩. 'বাহান্নর ভাষা আন্দোলন ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়' শিরোনামে একটি নিবন্ধ রচনা করুন। ২০
উত্তর : পৃষ্ঠা নং ৮৬৩।
৪. বাংলাদেশে শিল্পোন্নয়নের প্রধান প্রধান প্রতিবন্ধকতা নিরূপণ করুন। ২০
উত্তর : পৃষ্ঠা নং ১৬৭।
৫. বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আলোচনা করুন। ২০
উত্তর : পৃষ্ঠা নং ৫০।
৬. রপ্তানি বাণিজ্যে বাংলাদেশের সাফল্য মূল্যায়ন করুন। ২০
উত্তর : পৃষ্ঠা নং ১৭১।
৭. যে কোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দিন : ১০ × ২ = ২০
ক. 'তোরা সব জয়ধ্বনি কর।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর।
ঐ নতুনের কেতন ওড়ে কাল-বৈশাখীর ঝড়' –কবির ও কবিতার নাম লিখুন।
উত্তর : কবিতা— প্রলয়োল্লাস, কবি — কাজী নজরুল ইসলাম।
খ. 'দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে না জুয়ায়
নিজ দেশ ত্যাগী কেন বিদেশ না যায়' –কবি ও কবিতার নাম লিখুন।
উত্তর : কবিতা —বঙ্গবাণী, কবি —আবদুল হাকিম।

গ. 'হারামণি' কি? সংকলক কে?
উত্তর : 'হারামণি' লোকসাহিত্যের সংগ্রহ গ্রন্থ। সংকলক — মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন।
ঘ. বড়ু চণ্ডীদাস ও জয়দেবের কাব্যের নাম লিখুন।
উত্তর : বড়ু চণ্ডীদাস —শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, জয়দেব—গীতগোবিন্দ।
ঙ. শিল্প ও সাহিত্যের কোন কোন শাখায় হুমায়ূন আহমদ ও এস এম সুলতান বিখ্যাত?
উত্তর : হুমায়ূন আহমেদ— উপন্যাস, এস এম সুলতান— চিত্রকলা।
চ. (১) 'দুরন্ত'-এর ভাস্কর কে?
উত্তর : সুলতানুল ইসলাম।
(২) 'জননী' শিল্পকর্মটি কার?
উত্তর : ভ্যান।
ছ. (১) 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসটির রচয়িতা কে?
উত্তর : জহির রায়হান।
(২) 'অশ্রুমালা'র রচয়িতা কে?
উত্তর : কায়কোবাদ।
জ. সর্বপ্রথম কোন দেশ এবং কবে বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল?
উত্তর : ভারত বাংলাদেশকে সর্বপ্রথম ৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে স্বীকৃতি দিয়েছিল।
ঝ. কোন সনের কোন তারিখে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে?
উত্তর : ১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে।
ঞ. (১) ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য কে?
উত্তর : ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য হলো অধ্যাপক ড. আব্দুল হাকিম সরকার।
(২) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলমান উপাচার্য কে ছিলেন?
উত্তর : স্যার এ এফ রহমান।
ট. (১) ঢাকার বিখ্যাত তারা মসজিদের নির্মাতা কে ছিলেন?
উত্তর : তারা মসজিদের নির্মাতা হলেন মির্জা গোলাম পীর (অন্য নাম মির্জা আহমদ জান)।
(২) ঢাকার বড় কাটরার নির্মাতা কে?
উত্তর : বড় কাটরার নির্মাতা হলেন সম্রাট শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র যুবরাজ মুহাম্মদ সুজা।
ঠ. শাহ সুলতান বলখী ও বাবা আদম শহীদের মাজার কোথায়?
উত্তর : মহাস্থানগড় (বগুড়া) ও বিক্রমপুর (মুন্সিগঞ্জ)।
ড. (১) আয়তনের দিক থেকে বাংলাদেশের বৃহত্তম জেলা কোনটি?
উত্তর : বৃহত্তম জেলা—পার্বত্য রাঙামাটি (আয়তন ৬১১৬ বর্গ কিমি)।
(২) আয়তনের দিক থেকে বাংলাদেশের ক্ষুদ্রতম জেলা কোনটি?
উত্তর : পঞ্চম আদমশুমারি রিপোর্ট অনুসারে, ক্ষুদ্রতম জেলা— নারায়ণগঞ্জ (আয়তন ৭০০ বর্গ কিমি)।
ঢ. (১) বাংলাদেশের নগরভিত্তিক কতগুলো থানা রয়েছে, যেগুলোকে উপজেলায় উন্নীত করা হয়নি?
উত্তর : নগরভিত্তিক থানা ৮৭টি (ঢাকা ৪৯, চট্টগ্রাম ১৬, খুলনা ৮, রাজশাহী ৪, বরিশাল ৪, সিলেট ৬)।

ঞ. নিম্নলিখিত সংস্থার নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়ের নাম কি?

(১) বাংলাদেশ বিমান; (২) চিনি ও খাদ্য সংস্থা।

উত্তর : (১) বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

(২) শিল্প মন্ত্রণালয়।

ট. (১) কমনওয়েলথ গেমস (১৯৯০)-এর বাংলাদেশের স্বর্ণপদক অর্জনকারীর নাম কি?

উত্তর : আতিকুর রহমান ও আবদুস সাত্তার।

(২) বাংলাদেশ পুলিশ কমিশনের চেয়ারম্যান কে ছিলেন?

উত্তর : বিচারপতি আমিনুর রহমান খান।

ঠ. (১) বাংলাদেশে ক্যাডেট কলেজ কয়টি?

উত্তর : বাংলাদেশে ক্যাডেট কলেজ ১২টি (৯টি বালক ও ৩টি বালিকা)।

(২) বাংলাদেশে মেডিক্যাল কলেজ কয়টি?

উত্তর : বাংলাদেশে সরকারি মেডিক্যাল কলেজের সংখ্যা সাধারণ এম. বি. এস. এর ক্ষেত্রে ২৯টি (২০১৪ অনুযায়ী) আর অন্যান্য সরকারি মেডিকেল কলেজ হলো ৮টি (২০১৪ অনুযায়ী) এবং বর্তমান ২০১৫ সালে আরও দুটি মেডিকেল কলেজ স্থাপন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ড. (১) মুঘলরা ঢাকা শহরের কি নাম দেন?

উত্তর : মুঘলরা ঢাকা শহরের নাম দেন জাহাঙ্গীরনগর।

(২) মুঘলদের চট্টগ্রাম বিজয়ের পর এর কি নামকরণ করা হয়?

উত্তর : মুঘলদের চট্টগ্রাম বিজয়ের পর এর নামকরণ করা হয় ইসলামাবাদ।

ঢ. নিচের দুটি জায়গা সাম্প্রতিককালে সংবাদপত্রে প্রাধান্য পায় কেন?

(১) শিমুলিয়া; (২) শান্তিডাঙ্গা।

উত্তর : (১) শিমুলিয়ায় কথিত পীর মতিউর রহমানের সাথে পুলিশের লড়াই সংঘটিত হয়েছে।

(২) গাজীপুরের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়টি কুষ্টিয়ার শান্তিডাঙ্গায় স্থাপিত হয়েছে।

ণ. পূর্ণ অভিব্যক্তি কি?

(১) বিআইইএসএস;

(২) বিআইআরডিইএম (বারডেম)

উত্তর : BIISS— Bangladesh Institute of International and Strategic Studies.

BIRDEM—Bangladesh Institute of Research and Rehabilitation in Diabetic Endocrine and Metabolic Disorders.

৮. নিচের যে কোনো পাঁচটি সম্পর্কে টীকা লিখুন :

(ক) বরেন্দ্র ভূমি; (খ) গঙ্গা-কপোতাক্ষ; (গ) বাকল্যান্ড বাঁধ; (ঘ) নির্মলেন্দু গুণ; (ঙ) লালমাই পাহাড়; (চ) জুম চাষ; (ছ) বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি; (জ) চলন বিল; (ঝ) বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ-১৯৭৩ এবং (ঞ) বহিঃসম্পদ বিভাগ।

উত্তর : *টীকা অংশে দেখুন।*

বাংলাদেশ বিষয়াবলি

পূর্ণমান ২০০

সিলেবাসভিত্তিক অধ্যায় বিন্যাস

অধ্যায় ০১	বাংলাদেশের ভূগোল : প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ও এর পরিবর্তন
অধ্যায় ০২	জনমিতিক বৈশিষ্ট্য : নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য
অধ্যায় ০৩	বাংলাদেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতি : প্রাচীন থেকে বর্তমান
অধ্যায় ০৪	বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাহিত্যবিষয়ক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন
অধ্যায় ০৫	বাংলাদেশের পরিবেশ ও প্রকৃতি এবং এর চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা : রক্ষণাবেক্ষণ, সংরক্ষণ ও টেকসইকরণ
অধ্যায় ০৬	বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ : টেকসই ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা
অধ্যায় ০৭	বাংলাদেশের সংবিধান : প্রস্তাবনা, বৈশিষ্ট্য, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ও সাংবিধানিক সংশোধনী
অধ্যায় ০৮	সরকারের অঙ্গ-সংগঠন : আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ
অধ্যায় ০৯	বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি ও বহিঃসম্পর্ক
অধ্যায় ১০	বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল
অধ্যায় ১১	বাংলাদেশের নির্বাচন
অধ্যায় ১২	সমকালীন যোগাযোগ
অধ্যায় ১৩	অনানুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান : সুশীল সমাজ, স্বার্থবাদী গোষ্ঠী ও বাংলাদেশের এনজিও
অধ্যায় ১৪	বিশ্বায়ন ও বাংলাদেশ
অধ্যায় ১৫	বাংলাদেশের জেন্ডার ইস্যু ও উন্নয়ন
অধ্যায় ১৬	মুক্তিযুদ্ধ এবং এর পটভূমি

বাংলাদেশের ভূগোল : প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ও এর পরিবর্তন

Geography of Bangladesh : Topographical Features & Its Developments

Syllabus *Geography of Bangladesh that should include topographical features of different areas/regions and their developments over time.*

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১. বাংলাদেশকে পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ বলা হয় কেন? সংশ্লিষ্ট ভৌগোলিক তথ্যসমূহ উল্লেখপূর্বক বর্ণনা করুন। [৩৩তম; ৩২তম বিসিএস]

০২. বাংলাদেশের অবস্থান ও ভূপ্রকৃতির বর্ণনা দিন। অর্থনৈতিক কার্যাবলী ও মানুষের জীবনধারায় বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতির প্রভাব আলোচনা করুন। [৩০তম বিসিএস]
অথবা, বাংলাদেশের ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করুন। আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে এদের গুরুত্ব আলোচনা করুন। [২৮তম বিসিএস]
অথবা, বাংলাদেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করুন। [৩৪তম বিসিএস]

০৩. বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি এবং বাংলাদেশের জলবায়ুতে এর প্রভাব আলোচনা করুন। [৩০তম বিসিএস]
অথবা, বিশ্ব উষ্ণায়ন প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে? এই ক্ষতি মোকাবিলায় সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ কি? [৩০তম বিসিএস]
অথবা, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বাংলাদেশে কি কি বিরূপ প্রভাব পড়েছে এবং পড়তে পারে বর্ণনা করে সরকারের গৃহীত প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থার বর্ণনা দিন। [৩২তম বিসিএস]

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

০৪. বাংলাদেশের সমাজ-সংগঠনে ভৌগোলিক উপাদানের প্রভাব আলোচনা করুন।

০৫. গ্রিন হাউস ইফেক্ট কি? ভবিষ্যতে বাংলাদেশে এর কী কী প্রভাব পড়তে পারে এবং তা প্রতিকারের উপায় কী বর্ণনা করুন।

০৬. প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার কতটুকু প্রস্তুত বলে আপনি মনে করেন? বর্তমান অবস্থার উন্নয়নে কি কি পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন— সুপারিশসহ আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

০১. বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমারেখা ও অবস্থান বর্ণনা করুন।
০২. বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতিকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে ও কি কি?
০৩. বাংলাদেশের ওপর দিয়ে কোন ভৌগোলিক রেখা চলে গেছে? বাংলাদেশের জলবায়ুতে এর গুরুত্ব কি?
০৪. বাংলাদেশ সীমান্তে ভারতের কয়টি রাজ্য আছে? এগুলোর নাম লিখুন।
০৫. ছিটমহল সমস্যা কি? দহগ্রাম ছিটমহল কোন জেলায় অবস্থিত?

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১ । বাংলাদেশকে পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ বলা হয় কেন? সংশ্লিষ্ট ভৌগোলিক তথ্যসমূহ উল্লেখপূর্বক বর্ণনা করুন। *[৩৩তম; ৩২তম বিসিএস]*

উত্তর : প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নদীবিধৌত দেশ বাংলাদেশ। দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক অসংখ্য নদ-নদী এ দেশে জালের মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। যে সকল প্রাকৃতিক কারণে ভূমিরূপ পরিবর্তিত হয় এদের মধ্যে নদ-নদীর ভূমিকা অন্যতম। নদ-নদী ধীরগতিতে কোথাও ভূমির ক্ষয়সাধন করে আবার কোথাও শিলাচূর্ণ, পলিমাটি সঞ্চয়ের মাধ্যমে নতুন ভূমির সৃষ্টি করে। নদী সৃষ্ট এমনই এক ভূমিরূপ হলো ব-দ্বীপ। আর বাংলাদেশ হলো পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ।

ব-দ্বীপ : স্রোতের গতিবেগ হ্রাসের ফলে নদীর মোহনায় নদীবাহিত কাদা, পলি, বালি, কাঁকর, নুড়ি প্রভৃতি স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয়ে যে ত্রিকোণাকৃতি ভূমিরূপ গঠিত হয় তাকে ব-দ্বীপ বলে। গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস নীল নদের মোহনায় তিন কোণাকৃতি নদীর সঞ্চয়জাত ভূমিকে গ্রিক অক্ষর ডেল্টার মতো কল্পনা করে একে ডেল্টা (Δ) নামে অভিহিত করেন। ব-দ্বীপ দেখতে মাত্রাহীন বাংলা 'ব'-এর মতো। তাই বাংলায় এর নাম ব-দ্বীপ নামকরণ করা হয়েছে।

ব-দ্বীপ সৃষ্টির কারণ : নদী যখন মোহনার কাছাকাছি আসে তখন স্রোতের বেগ এতই হ্রাস পায় যে, নদীবাহিত তলানি আর পরিবাহিত হতে না পেরে নদীর মোহনায় সঞ্চিত হয় এবং চর জেগে ওঠার ফলে নদীর স্রোত বাধাপ্রাপ্ত হয়ে চরের দুপাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়। এতে চরের দুপ্রান্ত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে ত্রিকোণাকৃতি লাভ করে। ত্রিকোণাকৃতির এ নতুন সমতল ভূমিই ব-দ্বীপ। তবে সব নদীর মুখে ব-দ্বীপ সৃষ্টি হয় না। নদীর মোহনায় যদি প্রবল সামুদ্রিক স্রোত থাকে কিংবা প্রবল জোয়ার-ভাটা ঘটে, তবে পলি জমতে পারে না এবং ব-দ্বীপও সৃষ্টি হয় না। মোহনা শান্ত হলে শুধু ব-দ্বীপ তৈরি হয়। ব-দ্বীপ গঠনকালে প্রথমে মোটা পলিকণা ও পরে সূক্ষ্মকণাসমূহ সঞ্চিত হয়। এ জটিল প্রক্রিয়ায় ব-দ্বীপ গঠনকালে প্রধান নদীখাত একাধিক নদীখাত, শাখানদী, বিভিন্ন উপহ্রদ, জলাভূমি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাধারার সমন্বয়ে গঠিত নেটওয়ার্কে বিভক্ত হয়। অধিকাংশ ব-দ্বীপই জটিল ও বহুমাত্রিক।

বাংলাদেশকে পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ বলার কারণ : দুটি হিমালয়ী নদী গঙ্গা (পদ্মা) ও ব্রহ্মপুত্র (যমুনা) সম্মিলিত স্রোতধারায় বিশ্বের যে কোনো নদী-ব্যবস্থার তুলনায় সবচেয়ে বেশি অবক্ষেপ বঙ্গোপসাগরে এনে ফেলেছে। এই দুই নদী অপর অহিমালয়ী নদী মেঘনার সহযোগে যে ব-দ্বীপটির সৃষ্টি করেছে, সেটি গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা ব-দ্বীপ বা বঙ্গীয় ব-দ্বীপ নামে পরিচিত। আর এই বঙ্গীয় ব-দ্বীপটিই বিশ্বের সর্ববৃহৎ ব-দ্বীপ। তাই বাংলাদেশকে পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ বলা হয়। বাংলাদেশে অবস্থিত ব-দ্বীপের আয়তন প্রায় ৮০,০০০ বর্গকিমি। অন্যদিকে দক্ষিণ-পশ্চিম ভিয়েতনামের মেকং

নদীর মেকং ব-দ্বীপের আয়তন প্রায় ৩৯,০০০ বর্গকিমি এবং নাইজেরিয়ার নাইজার ব-দ্বীপের আয়তন প্রায় ৩৬,০০০ বর্গকিমি। নিচে সংশ্লিষ্ট ভৌগোলিক তথ্য উল্লেখপূর্বক বাংলাদেশকে পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ বলার কারণ আলোচনা করা হলো :

১. **বঙ্গীয় ব-দ্বীপের অবস্থান :** বঙ্গীয় ব-দ্বীপ বঙ্গীয় অববাহিকার এক বিরাট অঞ্চল জুড়ে রয়েছে, যা সমগ্র বাংলাদেশের প্রায় ৩৫%। পশ্চিমে ভারতীয় শিল্ড, উত্তরে বরেন্দ্র ভূমির দক্ষিণ প্রান্ত ও পূর্বে

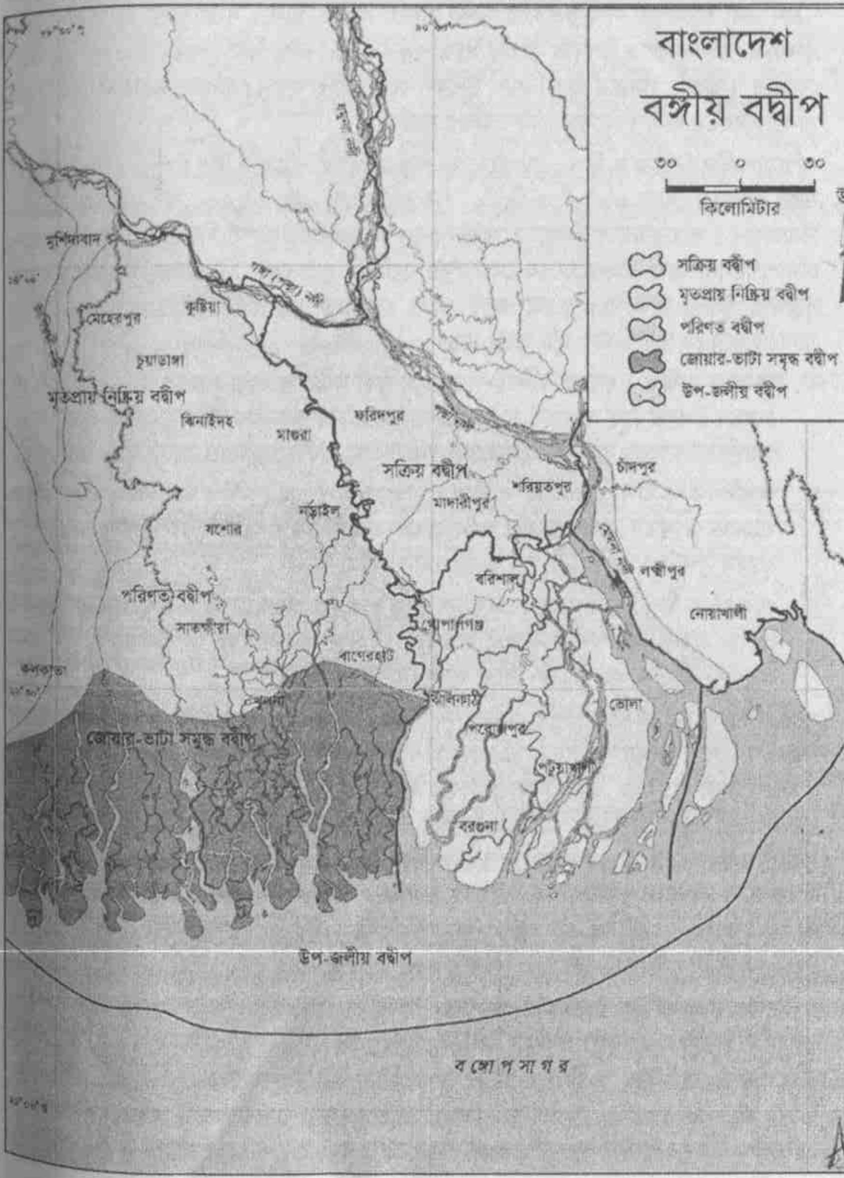

তিপারাপৃষ্ঠের সীমানা। ব-দ্বীপটির মূল বিকাশের মাত্রা দক্ষিণ দিকে বঙ্গোপসাগরে অব্যাহত আছে। ব-দ্বীপের এ ধরনের আয়তন ও অবস্থানের দরুন বাংলাদেশকে পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ বলা হয়।

২. **উপকূল গঠন :** জেমস রেনেলের মানচিত্রানুযায়ী, ব্রহ্মপুত্র নদের গতিপথ ছিল পূর্বমুখী, যা ময়মনসিংহের কাছে আদি ব্রহ্মপুত্র ব-দ্বীপ গঠন করেছিল। বর্তমানে এর গতিপথ সোজা দক্ষিণমুখী। পূর্বে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদী আলাদা আলাদাভাবে বঙ্গোপসাগরে পতিত হতো, বর্তমান গঠনে এরা পরিশেষে সম্মিলিতভাবে সাগর সঙ্গমে মিলিত হচ্ছে। নদীসমূহের এ ব-দ্বীপ গঠন কার্যক্রম বাংলাদেশের উপকূল রেখার প্রায় শতকরা ৬০ ভাগ গঠনে অবদান রেখেছে। অন্য কোথাও ব-দ্বীপের সমন্বয়ে এত বিশাল উপকূল রেখা গঠিত হয়নি। সুতরাং এটাও বাংলাদেশকে পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ হিসেবে চিহ্নিত হবার কারণ।

৩. **পশ্চিমাঞ্চলীয় নিষ্ক্রিয় ব-দ্বীপ :** বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চলীয় নিষ্ক্রিয় ব-দ্বীপ (২১°১৫′ ও ২৪°৪০′ উত্তর অক্ষাংশ থেকে ৮৮°০′ ও ৯০°০′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ) প্রায় ৩১,৫০০ বর্গকিমি এলাকাজুড়ে বিরাজমান। সাধারণভাবে ভারতের মুর্শিদাবাদ (শুধু ভাগীরথীর পূর্ব দিকের অংশ), নদীয়া ও চব্বিশপরগনা এবং বাংলাদেশের মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, মাগুরা, যশোর, নড়াইল, খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলা এর অন্তর্গত। পশ্চিমাঞ্চলীয় নিষ্ক্রিয় ব-দ্বীপকে সাধারণভাবে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

ক. **মৃতপ্রায় ব-দ্বীপ :** দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে গঙ্গা নদীর দক্ষিণে মৃতপ্রায় ব-দ্বীপের অবস্থান, যেখানে উপনদীসমূহ অত্যধিক পলিভরাটের শিকার এবং নদ-নদীর গতিপথ আবদ্ধ হয়ে অসংখ্য অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদের সৃষ্টি হয়েছে। যশোর, কুষ্টিয়া এবং ফরিদপুর মৃতপ্রায় ব-দ্বীপাঞ্চলে অবস্থিত।

খ. **অপরিণত ব-দ্বীপ :** মৃতপ্রায় ব-দ্বীপের দক্ষিণে অপরিণত ব-দ্বীপ অবস্থিত। এই এলাকা প্রধানত সমুদ্রতট এবং জোয়ার ভাটা প্রভাবিত ভূমি নিয়ে গঠিত। অপরিণত ব-দ্বীপজুড়ে রয়েছে সুন্দরবন। এই ব-দ্বীপের ভূ-অবনমনের মাত্রা অধিক।

গ. **পরিণত ব-দ্বীপ :** দক্ষিণবঙ্গের কেন্দ্রভাগ জুড়ে অবস্থিত পরিণত ব-দ্বীপ। পটুয়াখালী, বরগুনা প্রভৃতি এলাকা পরিণত ব-দ্বীপের অন্তর্গত, যেখানে এলাকাসমূহ ভূ-প্রকৃতিগতভাবে এবং জোয়ার-ভাটার প্রভাবের দিক থেকে পার্থক্য প্রদর্শন করে থাকে।

৪. **পূর্বাঞ্চলীয় সক্রিয় ব-দ্বীপ :** পূর্বে মেঘনা নদীর মোহনা থেকে পশ্চিমে গড়াই-মধুমতি নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ব-দ্বীপ সমভূমির পূর্বাংশকে সক্রিয় ব-দ্বীপ বলে। পূর্বাঞ্চলীয় সক্রিয় ব-দ্বীপ ২৩°৫০′ উত্তর অক্ষাংশ থেকে ২১°৫৫′ উত্তর অক্ষাংশ পর্যন্ত এবং ৮৯°১০′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ থেকে ৯০°৫০′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। এর আওতাধীন এলাকার পরিমাণ প্রায় ১৫,০০০ বর্গকিমি। এ পূর্বাংশীয় অঞ্চল প্রতি বছর বর্ষাকালে প্লাবিত হয়। রাজবাড়ী, ফরিদপুর, শরীয়তপুর, মাদারীপুর, লক্ষ্মীপুর, গোপালগঞ্জ, পিরোজপুর, বরিশাল, ঝালকাঠি, পটুয়াখালী, বরগুনা ও ভোলা জেলা এ ব-দ্বীপের অন্তর্গত। ব-দ্বীপের এই অংশ উত্তর-দক্ষিণ মুখে প্রায় ৩০০ কিমি লম্বা এবং ব-দ্বীপটির ঊর্ধ্ব ও মধ্যমুখ যথাক্রমে প্রায় ১০০ কিমি ও ১৩০ কিমি চওড়া।

৫. **ব-দ্বীপের ভূ-প্রাকৃতিক বিভাগ ও বৈশিষ্ট্য :** গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র ব-দ্বীপ বাংলাদেশের অন্যতম ভূ-প্রাকৃতিক বিভাগ। এলাকাটি প্রধানত একটি সমভূমি, যার উচ্চতার মাত্রা উত্তরে ১৫ মিটার থেকে দক্ষিণে প্রায় এক মিটার। ব-দ্বীপটির পৃষ্ঠদেশের নতিমাত্রা প্রতি কিলোমিটারে প্রায় ০.০১৬ মিটার। ব-দ্বীপের গড় উচ্চতা খুলনা, বরিশাল, ফরিদপুরের দক্ষিণাঞ্চল ও নোয়াখালী জেলার পূর্বাঞ্চলে ২ মিটারেরও কম। ব-দ্বীপটির দক্ষিণাঞ্চলে এ উচ্চতা আরো কম, মাত্র কয়েক সেন্টিমিটার।

৬. **জনবসতি ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিন্যাসে ব-দ্বীপের প্রভাব :** বাংলাদেশে ব-দ্বীপীয় মাটির উচ্চ উর্বরতার কারণে কৃষি কার্যক্রমের প্রাধান্য অঞ্চলটিকে ঘন বসতিপূর্ণ করে তুলেছে। অধিকাংশ লোকের জীবিকা জমি চাষ, মাছ ধরা, নৌ-পরিবহন, সাধারণ সম্পদের সদ্ব্যবহার (যেমন–সুন্দরবনের গরান বনভূমি) ও অন্যান্য অর্থনৈতিক কার্যক্রমের নিরিখে ব-দ্বীপের পরিবেশগত অবস্থার ওপর নির্ভর করে। এই সুবৃহৎ ও সদা বিবর্তিত ব-দ্বীপে অব্যাহত ভূমি পরিবৃদ্ধি ও ভূমিক্ষয় বাংলাদেশের জনবসতির ধরন ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিন্যাসকে প্রভাবিত করছে।

উপসংহার : বাংলাদেশ পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ। গঙ্গা (পদ্মা), ব্রহ্মপুত্র (যমুনা) ও মেঘনা নদী পশ্চিম, উত্তর ও উত্তর-পূর্ব দিক থেকে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে একযোগে বিশ্বের বৃহত্তম ব-দ্বীপের সৃষ্টি করেছে। তবে, জলবায়ুগত পরিবর্তনের কারণে এ ব-দ্বীপের আধা মিটার সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে যেতে পারে বলে পরিবেশ বিজ্ঞানীরা আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন এবং এ কারণে লাখ লাখ লোক ক্ষতির সম্মুখীন হবে। তাই বিশ্বের বৃহত্তম এ ব-দ্বীপের পলি সঞ্চয়ন, ভূমি পুনরুদ্ধার, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নৌচলাচল এবং ব-দ্বীপ এলাকায় প্রাপ্য প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কিত বিষয়াদি ও সমস্যাবলির ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালু, প্রসার ও সংগঠিতকরণের জন্য আমাদের সকলেরই সচেষ্ট হওয়া উচিত।

০২। বাংলাদেশের অবস্থান ও ভূপ্রকৃতির বর্ণনা দিন। অর্থনৈতিক কার্যাবলী ও মানুষের জীবনধারায় বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতির প্রভাব আলোচনা করুন। *[৩০তম বিসিএস]*

অথবা, বাংলাদেশের ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করুন। আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে এদের গুরুত্ব আলোচনা করুন। *[২৮তম বিসিএস]*

অথবা, বাংলাদেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করুন। *[৩৪তম বিসিএস]*

উত্তর : বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। এ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য অনেক প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছে। তাছাড়া এ দেশের সীমানা নিয়েও কম বিরোধ ছিল না। এ বিরোধের মীমাংসা শেষে বাংলাদেশের আয়তন নির্ধারিত হয়েছে ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার। এ দেশ পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ। এ দেশের ভূপ্রকৃতিও অনেক বৈচিত্র্য বহন করে চলেছে। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি অসংখ্য নদ-নদী এ দেশের উপর দিয়ে বয়ে গেছে। সীমিত উচ্চভূমি ছাড়া সমগ্র দেশ নদ-নদীর পলল দ্বারা গঠিত এক বিস্তীর্ণ সমভূমি।

অবস্থান : বাংলাদেশ এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণে অবস্থিত। ২০°৩৪ থেকে ২৬°৩৮ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°০১ থেকে ৯২°৪১′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ পর্যন্ত বাংলাদেশের বিস্তৃতি। এ দেশের প্রায় মধ্যভাগ দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা অতিক্রম করেছে। বাংলাদেশের উত্তরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয় ও আসাম; পূর্বে ভারতের আসাম, ত্রিপুরা ও মিজোরাম এবং মিয়ানমার; দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ।

বাংলাদেশের সর্বমোট সীমারেখা ৫,১৩৮ কিমি। এর মধ্যে বাংলাদেশ-ভারত সীমারেখার দৈর্ঘ্য ৪,১৫৬ কিলোমিটার। বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমারেখার দৈর্ঘ্য ২৭১ কিলোমিটার এবং বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা বা তটরেখার দৈর্ঘ্য ৭১১ কিমি।

বাংলাদেশের মোট আয়তনের মধ্যে নদ-নদী অঞ্চলের আয়তন প্রায় ৯,৩৮০ বর্গকিলোমিটার এবং বনাঞ্চলের আয়তন ২২,৫৮৪ বর্গ কিলোমিটার। নদী ও বনাঞ্চল বাদে বাংলাদেশের আয়তন প্রায় ১,১৫,৬০৬ বর্গ কিলোমিটার। এ দেশের রাজনৈতিক সমুদ্রসীমা ১২ নটিক্যাল মাইল এবং অর্থনৈতিক সমুদ্রসীমা ২০০ নটিক্যাল মাইল। বাংলাদেশের অবস্থান প্রান্তীয় অর্থাৎ এর একদিক সমুদ্রবেষ্টিত। এরূপ অবস্থানের জন্য এর দক্ষিণের ভগ্ন উপকূলে সমুদ্রবন্দর গড়ে উঠেছে। এ কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে সুলভ জলপথে বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য গড়ে উঠেছে। এর ফলস্বরূপ বাংলাদেশ কৃষি, ব্যবসায়, শিল্প ইত্যাদি ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করতে সক্ষম হয়েছে।

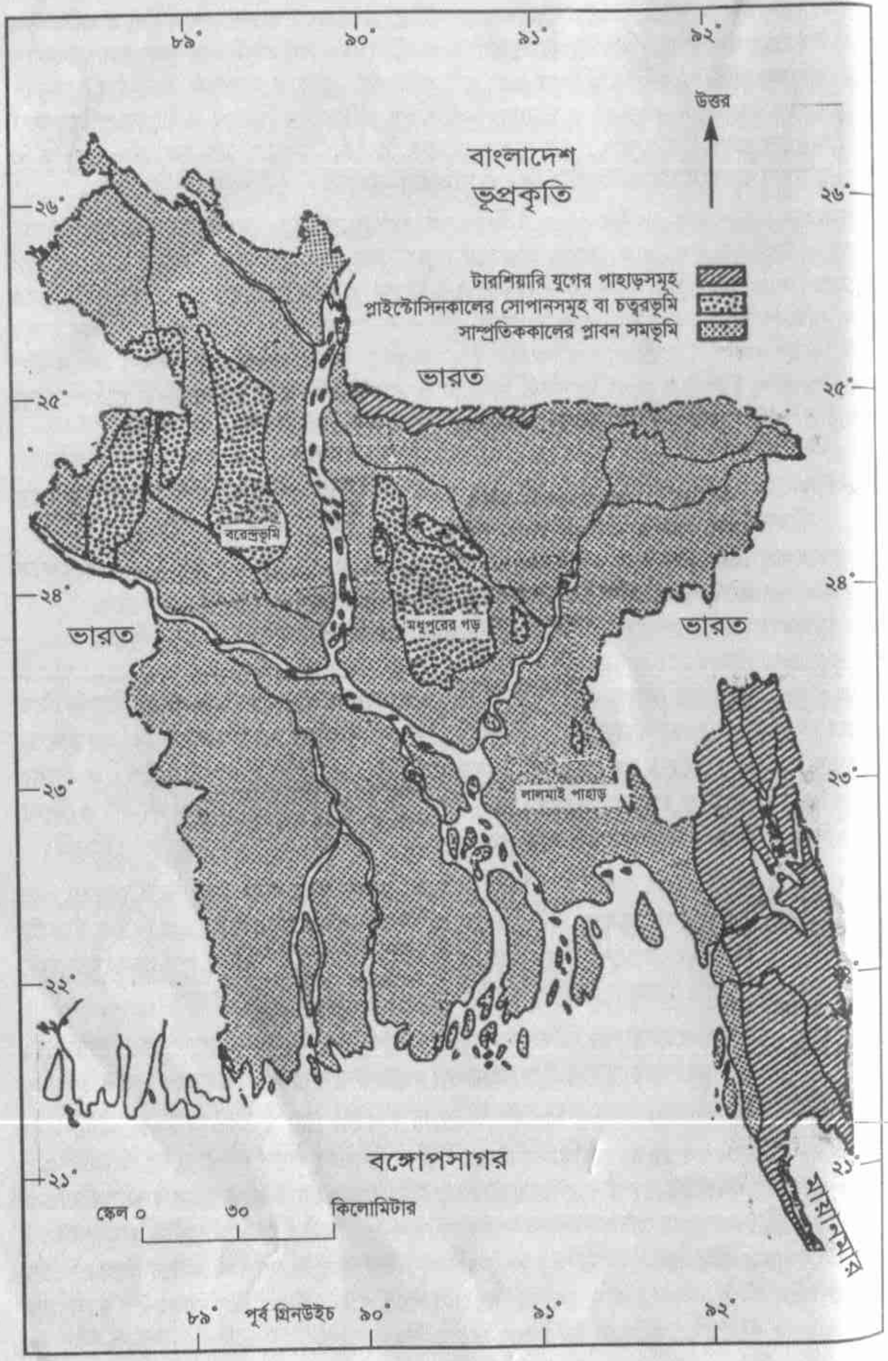

ভূপ্রকৃতি : বাংলাদেশ পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ। পদ্মা, যমুনা ও মেঘনা নদী পশ্চিম, উত্তর ও উত্তরপূর্ব দিক থেকে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে একযোগে এ সুবিশাল ব-দ্বীপের সৃষ্টি করেছে। সীমিত উচ্চভূমি ছাড়া সমগ্র দেশ এক বিস্তীর্ণ বৈচিত্র্যহীন সমভূমি। এ দেশের ভূখণ্ড উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ক্রমশ ঢালু। ভূমির বন্ধুরতার পার্থক্য ও গঠনের সময়ানুক্রমিক দিক থেকে বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতিকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

১. **টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ :** রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, চট্টগ্রাম, সিলেট, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জের পাহাড়ি এলাকাগুলো নিয়ে এ অঞ্চল গঠিত। এ পাহাড়গুলো বেলে পাথর, স্লেট জাতীয় প্রস্তর এবং কর্দমের সংমিশ্রণে গঠিত। পাহাড়গুলোর গায়ে ক্ষুদ্র বৃহৎ বৃক্ষরাজির বন এবং অসংখ্য ঝোপজঙ্গল রয়েছে। সংক্ষেপে বলা যায় যে, টারশিয়ারি যুগের হিমালয় পর্বত গঠনের সময় এসব পাহাড় সৃষ্টি হয়েছিল বলে এগুলোকে টারশিয়ারি পাহাড় বলে। এ পাহাড়ি অঞ্চলকে দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

ক. **উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ :** ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনা জেলার উত্তরাংশ, সিলেট জেলার উত্তর ও উত্তরপূর্বাংশ এবং মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জের দক্ষিণাংশের ছোট-বড় বিচ্ছিন্ন পাহাড়গুলো এ অঞ্চলের অন্তর্গত। মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জের দক্ষিণের পাহাড়গুলোর উচ্চতা ২৪৪ মিটারের বেশি নয়। শেরপুর ও ময়মনসিংহের উত্তর সীমানায় কিছু কিছু পাহাড় আছে। উত্তরের পাহাড়গুলোর মধ্যে চিকনাগুল, খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া উল্লেখযোগ্য।

সিলেট জেলার পাহাড়ি অঞ্চল সিলেট শহরের উত্তরপূর্ব দিকে ১৮৬ বর্গকিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত। এ পার্বত্যভূমির উচ্চতা ৬০ থেকে ৯০ মিটারের বেশি নয়। সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক শহরের উত্তরে প্রায় ৪০ বর্গকিলোমিটার স্থান নিয়ে একটি টিলা পাহাড় অবস্থিত। এটি ছাতক পাহাড় নামে পরিচিত। এ পার্বত্যভূমির গড় উচ্চতা ৪০ থেকে ৬০ মিটার।

মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সীমানায় অবস্থিত পাহাড়গুলো কোনোরূপ গিরিশ্রেণী গঠন করেনি। এসব পাহাড়ের ঢালগুলো খাড়া এবং উপরিভাগ অসমান। এদেরকে ত্রিপুরার পাহাড় বলা হয়। শেরপুর ও ময়মনসিংহ জেলার উত্তর সীমানায় ভারতের মেঘালয় রাজ্যের গারো পাহাড়ের সামান্য বিচ্ছিন্ন অংশ দেখা যায়।

এ পার্বত্য অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। তাই এখানকার পাহাড়ের ঢালে প্রচুর চা উৎপন্ন হয়। বাংলাদেশের অধিকাংশ চা বাগান এ অঞ্চলেই অবস্থিত। এ অঞ্চলে আনারসও উৎপন্ন হয়। এছাড়া এ পার্বত্য অঞ্চলে প্রচুর বাঁশ ও বেত পাওয়া যায়। এ অঞ্চল প্রাকৃতিক গ্যাস, খনিজ তেল, চুনাপাথর, কয়লা প্রভৃতি খনিজসম্পদে সমৃদ্ধ।

খ. **দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ :** খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি ও বান্দরবান জেলা এবং চট্টগ্রামের অংশবিশেষ এ অঞ্চলের অন্তর্গত– এ পাহাড়গুলোর গড় উচ্চতা ৬১০ মিটার। বাংলাদেশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ তাজিং ডং (বিজয়), যার উচ্চতা ১২৩১ মিটার। এটা বান্দরবানে অবস্থিত এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ শৃঙ্গ কিওক্রাডং বান্দরবানের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত। এ অঞ্চলের অপর দুটি উচ্চতর পাহাড় চূড়া হচ্ছে মোদকমুয়াল (১০০০ মিটার) ও পিরামিড (৯১৫ মিটার)। এসব পাহাড় বেলে পাথর, শেল ও কর্দম শিলা দ্বারা গঠিত। এ অঞ্চলের পাহাড়গুলোর মধ্যবর্তী উপত্যকা দিয়ে কর্ণফুলী, সাঙ্গু, মাতামুহুরী, হালদা প্রভৃতি নদী প্রবাহিত হয়েছে।

২. **প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ বা চত্বরভূমি :** ২৫,০০০ বছর পূর্বে প্লাইস্টোসিনকালে আন্তঃবরফগলা পানিতে প্লাবনের সৃষ্টি হয়ে এসব চত্বরভূমি গঠিত হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। এ অঞ্চলের মাটির রং লাল ও ধূসর। নিচে এ উচ্চভূমিগুলোর বর্ণনা দেয়া হলো :

ক. **বরেন্দ্রভূমি :** বরেন্দ্রভূমি রাজশাহী বিভাগের প্রায় ৯৩২০ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে আছে। প্লাবন সমভূমি থেকে এর উচ্চতা ৬ থেকে ১২ মিটার। বঙ্গ অববাহিকায় এটি সর্ববৃহৎ প্লাইস্টোসিন যুগের উচ্চভূমি। এ এলাকার ভূমি অসমতল এবং মাটি লাল ও কাঁকরময়। এটি পশ্চিমে মহানন্দা ও পূর্বে করতোয়া নদী দ্বারা বেষ্টিত। সমগ্র অঞ্চলটি পুনর্ভবা, আত্রাই ও যমুনা নদী দ্বারা চারটি অংশে বিভক্ত। এর পূর্বদিকের তিনটি অংশ বাংলাদেশের অন্তর্গত। মহানন্দা ও পুনর্ভবা মধ্যবর্তী অপর অংশটি ভারতের পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত। বরেন্দ্র অঞ্চল কৃষিকার্যের জন্য বিশেষ উপযোগী। ধান এখানকার প্রধান কৃষিজ ফসল। এছাড়া পাট, ভুট্টা, পান প্রভৃতিও এ অঞ্চলে কিছু কিছু উৎপন্ন হয়।

খ. **মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় :** উত্তরের ব্রহ্মপুত্র নদী থেকে দক্ষিণে বুড়িগঙ্গা নদী পর্যন্ত অর্থাৎ ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল ও গাজীপুর অঞ্চল জুড়ে এর বিস্তৃতি। এর মোট আয়তন প্রায় ৪,১০৩ বর্গ কিলোমিটার। মাটি কংকর মিশ্রিত ও লাল। বরেন্দ্রভূমির মতো এখানকার মাটির রঙ দেখতে লাল এবং কঙ্করময় বলে কৃষিকাজের পক্ষে বিশেষ উপযোগী নয়। এখনও ভূভাগ বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ এবং বাংলাদেশের গজারি বৃক্ষের কেন্দ্র। মধুপুর এলাকায় আনারস ও নানা ধরনের সবজি উৎপন্ন হয়। পানি সেচের মাধ্যমে এ অঞ্চলে কিছু ধানের চাষ হয়।

গ. **লালমাই পাহাড় :** কুমিল্লা শহর থেকে ৮ কিমি দক্ষিণে লালমাই থেকে ময়নামতি পর্যন্ত এটি বিস্তৃত। এর আয়তন প্রায় ৩৪ বর্গ কিলোমিটার এবং গড় উচ্চতা ২১ মিটার। এর মাটি লালচে নুড়ি এবং বালি ও কংকর দ্বারা গঠিত। এ পাহাড়ের পাদদেশে আলু, তরমুজ ইত্যাদির চাষ হয়।

৩. **সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি :** টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ এবং প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ ছাড়া সমগ্র বাংলাদেশ নদীবিধৌত এক বিস্তীর্ণ সমভূমি। এর আয়তন প্রায় ১,২৪,২৬৬ বর্গ কিলোমিটার। সমগ্র সমভূমি অঞ্চলের মৃত্তিকার স্তর খুব গভীর এবং ভূমি অতি উর্বর এবং মনুষ্য বাসের উপযোগী। এ অঞ্চলটি সর্বত্র একই রূপ নয় বলে, একে আবার কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা :

ক. **কুমিল্লার সমভূমি :** চাঁদপুর-কুমিল্লা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অধিকাংশ এবং লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী, ফেনী ও হবিগঞ্জ জেলার কিছু অংশ জুড়ে এ সমভূমি অবস্থিত। এর মোট আয়তন ৭৪০৪ বর্গ কিলোমিটার এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে উচ্চতা ৩.৬ মিটার, অন্য মতে ৬ মিটার। এ সমভূমির বন্ধুরতা অনুচ্চ এবং বর্ষাকালে এটি প্রায়ই ডুবে থাকে। এ অঞ্চলের ভূমি উর্বর বলে প্রচুর ধান, পাট ও অন্যান্য ফসল জন্মে থাকে।

খ. **সিলেট অববাহিকা :** সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার অধিকাংশ এবং কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা জেলার পূর্বদিকের সামান্য অংশ নিয়ে এ অঞ্চল গঠিত। এটি সংলগ্ন প্লাবন সমভূমি হতে অপেক্ষাকৃত নিচু। সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে এ অববাহিকার উচ্চতা প্রায় ৩ মিটার। এ অঞ্চল বর্ষাকালে পানিতে ডুবে যায় এবং শীতকালে পানি নেমে গেলে এখানে বোরো ও ইরি ধানের চাষ হয়। সর্বনিম্ন স্থানগুলোতে প্রকাণ্ড জলাশয়ের মতো পানি জমে থাকে। এগুলো হাওর নামে পরিচিত। এ অঞ্চলে বড় ধরনের পাঁচটি হাওর রয়েছে।

গ. **পাদদেশীয় পলল সমভূমি :** দেশের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর জেলার অধিকাংশ স্থান জুড়ে এ সমভূমি বিস্তৃত। হিমালয় পর্বত থেকে আনিত পলল দ্বারাই এ অঞ্চল গঠিত। তিস্তা, আত্রাই, করতোয়া প্রভৃতি নদীবাহিত পলি জমা হয়ে এ ঢালু ভূমির সৃষ্টি হয়েছে। এ সমভূমি পাদদেশীয় পলল সমভূমি নামে পরিচিত। বর্ষাকালে এর সামান্য অংশ পানিতে প্লাবিত হয়। ধান, পাট, ইক্ষু, তামাক প্রভৃতি এ অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে জন্মে।

ঘ. **গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা প্লাবন সমভূমি :** এটিই বাংলাদেশের মূল প্লাবন সমভূমি। পদ্মা নদীর উত্তরে প্লাবন সমভূমির বাকি অংশই গঙ্গা (পদ্মা)-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনার প্লাবন সমভূমি নামে পরিচিত। এ প্লাবন সমভূমি বৃহত্তর ঢাকা, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, পাবনা ও রাজশাহী অঞ্চলের অংশবিশেষ নিয়ে বিস্তৃত। এ অঞ্চলের অধিকাংশ স্থানই বর্ষার পানিতে প্রতি বছরই ডুবে যায়। নদীর দু পাড় বরাবর অনুচ্চ নদী পাড়ের প্রাকৃতিক বাঁধ, পশ্চাৎ ঢাল, অগভীর জলাভূমি বা বিল, অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ, চর ইত্যাদি হচ্ছে প্লাবন সমভূমির উল্লেখযোগ্য ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য।

ঙ. **ব-দ্বীপ অঞ্চলীয় সমভূমি :** বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমের সমভূমিকে সাধারণত ব-দ্বীপ বলা হয়। এ ব-দ্বীপ অঞ্চলটি বৃহত্তর কুষ্টিয়া, যশোর, ফরিদপুর, বরিশাল, পটুয়াখালী অঞ্চলের সমুদয় অংশ এবং রাজশাহী, পাবনা ও ঢাকা অঞ্চলের কিছু অংশ জুড়ে বিস্তৃত। এ ব-দ্বীপ অঞ্চলটি পদ্মা এবং এর শাখানদীগুলো দ্বারা বিধৌত।

নদী, বিল এবং দ্বীপগুলো এ অঞ্চলের প্রধান প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য। এছাড়া খুলনা থেকে ফরিদপুর ও বরিশাল পর্যন্ত বৃহৎ অথচ অগভীর একসারি গহ্বর রয়েছে। এরা 'ঝিল' নামে পরিচিত। ব-দ্বীপ অঞ্চলীয় সমভূমিকে আবার তিনটি ভাগে পৃথক করা যায়। যথা :

i. **সক্রিয় ব-দ্বীপ :** পূর্বে মেঘনা নদীর মোহনা থেকে পশ্চিমে গড়াই-মধুমতি নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ব-দ্বীপ সমভূমির পূর্বাংশকে সক্রিয় ব-দ্বীপ বলে। এর পূর্বাংশীয় অঞ্চল প্রতি বছর বর্ষাকালে প্লাবিত হয়। ধান, পাট, ইক্ষু প্রভৃতি ফসল প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হয়। এ অঞ্চলের বরিশাল, পটুয়াখালী, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুরের বিল বা হাওরগুলোতে প্রচুর মাছ পাওয়া যায় এবং শীতকালে বোরো ও ইরি ধানের চাষ হয়।

ii. **মৃতপ্রায় ব-দ্বীপ :** বাংলাদেশের ব-দ্বীপ সমভূমির মধ্যে গড়াই-মধুমতি নদীর পশ্চিমাংশকে মৃতপ্রায় ব-দ্বীপ বলা হয়। এটা বৃহত্তর কুষ্টিয়া ও যশোর অঞ্চলের অধিকাংশ স্থানব্যাপী বিস্তৃত। এ অঞ্চলের অধিকাংশ নদী ভরাট হয়ে মৃতপ্রায় অবস্থায় রয়েছে। শুষ্ক ঋতুতে নদীগুলো প্রায় শুকিয়ে যায়। বর্ষাকালেও এসব নদীর পানি প্রবাহের পরিমাণ খুব বেশি বৃদ্ধি পায় না।

iii. **স্রোতজ সমভূমি :** বাংলাদেশের ব-দ্বীপ অঞ্চলীয় সমভূমির দক্ষিণ ভাগের যে অংশে বঙ্গোপসাগরের জোয়ার-ভাটার প্রভাব পরিলক্ষিত হয় সে অংশকে স্রোতজ সমভূমি বলে। এ অঞ্চলে ছোট ছোট বহু নদীনালা আছে। এরা অসংখ্য শাখা-প্রশাখা ও খাঁড়িতে বিভক্ত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। এ সমভূমি অঞ্চলের অধিকাংশ অঞ্চল জুড়ে ম্যানগ্রোভ বা গড়ান বৃক্ষের বনভূমি রয়েছে। এ বনভূমি সুন্দরবন নামে সুপ্রসিদ্ধ। এ অঞ্চলের নদীতে প্লাবন খুব কম কিন্তু নিয়মিত জোয়ার-ভাটা হয়।

চ. **চট্টগ্রামের উপকূলীয় সমভূমি :** এ সমভূমি ফেনী নদী হতে কক্সবাজারের কিছু দক্ষিণ পর্যন্ত বিস্তৃত। এটি গড়ে প্রায় ৯.৬ কিলোমিটার প্রশস্ত। কিন্তু কর্ণফুলী নদীর মোহনায় এর দৈর্ঘ্য

২৫.৬ কিলোমিটার। এ সমভূমি কর্ণফুলী, সাঙ্গু, মাতামুহুরী, বাঁশখালি প্রভৃতি নদীবাহিত পলল দ্বারা গঠিত। এছাড়া সমুদ্রতট, বালুসৈকত, বালিয়াড়ী, কর্দমভূমি ইত্যাদি উপকূলীয় প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহও এখানে পরিলক্ষিত হয়। এর কোনো কোনো স্থানে সমুদ্রের পানি থেকে লবণ তৈরি হয়। এ অঞ্চলে প্রচুর কৃষিজ ফসলও হয়।

অর্থনৈতিক কার্যাবলীর ওপর ভূপ্রকৃতির প্রভাব : বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি এ দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাকে নানাভাবে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে বঙ্গোপসাগর থেকে আগত দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু এসব পাহাড়ে বাধা পেয়ে ব্যাপক বৃষ্টিপাত ঘটায়। এ বৃষ্টির ফলে বাংলাদেশ কৃষিকার্যে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছে। শীতকালের উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু এসব পাহাড়ে বাধা পেয়ে সামান্য বৃষ্টিপাত ঘটায়, যার ফলে শীতকালে বাংলাদেশে প্রচুর রবিশস্য জন্মে। এছাড়া অধিক বৃষ্টিবহুল পাহাড়ি অঞ্চলে বনভূমির সৃষ্টি হয়েছে। এসব বনভূমি থেকে প্রচুর মূল্যবান কাঠ ও অন্যান্য বনজসম্পদ সংগ্রহ করা হয়। এছাড়া পাহাড়ের ঢালে চা, রবার, আনারস ইত্যাদির চাষ হয়। মধুপুর অঞ্চলের গজারি বৃক্ষ বিখ্যাত। অন্যদিকে নদীবাহিত উর্বর পলল মৃত্তিকা ও অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্য এ অঞ্চলের অধিকাংশ স্থানেই কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, পরিবহন, জনবসতি ইত্যাদির বিশেষ উন্নতি হয়েছে। এখানে সমতল ভূমি ও বহু নদ-নদী থাকায় সড়ক, রেল ও জলপথে পরিবহনের বিশেষ উন্নতি হয়েছে। দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় সমভূমির লবণাক্ত ভূমির প্রভাবে বিশাল স্রোতজ বনভূমির সৃষ্টি হয়েছে। এ বনভূমির অর্থনৈতিক গুরুত্ব খুবই বেশি। কারণ দেশের মোট উৎপাদিত কাঠের ৬০% এ বনভূমি থেকে সংগ্রহ করা হয়। এছাড়া ভগ্ন উপকূলের প্রভাবে এ দেশে দুটি স্বাভাবিক সামুদ্রিক বন্দর গড়ে উঠেছে, যা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে সহায়তা করছে।

মানুষের জীবনধারা, সাংস্কৃতিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ওপর ভূপ্রকৃতির প্রভাব : পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীগণ সাধারণত বলিষ্ঠ, স্বাস্থ্যবান, সাহসী, পরিশ্রমী, উৎসাহী ও কষ্টসহিষ্ণু হয়ে থাকে। পার্বত্য পরিবেশ তাদের দেহ, মন ও চরিত্রের ওপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। পার্বত্য অঞ্চলে সমভূমির ন্যায় সুন্দর যাতায়াত ব্যবস্থা না থাকায় উঁচু-নিচু স্থান দিয়ে কায়িক পরিশ্রম করে যাতায়াত করতে হয় বলে অধিবাসীগণ বলিষ্ঠ। পার্বত্য কর্মীদের প্রায় বন্যজন্তুর সম্মুখীন হতে হয় বলে তারা খুবই সাহসী। এ কারণে বাংলাদেশের পাহাড়ি অধিবাসীরা অপেক্ষাকৃত বলিষ্ঠ, পরিশ্রমী ও সাহসী। খাদ্যাভাব তাদের দারিদ্র্য করেছে বটে কিন্তু তারা সৎ। আবার সমভূমি অঞ্চলগুলো সবদিক দিয়ে মানুষের বসবাসের উপযোগী বলে এখানকার জনবসতি ঘন হয়েছে, তেমনি অল্প পরিশ্রমে জীবিকা নির্বাহ করা যায় বলে এ অঞ্চলের অধিবাসীরা অলস প্রকৃতির এবং শ্রমবিমুখ হয়ে থাকে। তবে জীবিকা নির্বাহের জন্য অধিক সময় ব্যয় করতে হয় না বলে এখানকার অধিবাসীরা সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞান ইত্যাদি চর্চা করার অধিক সময় পায়।

উপসংহার : ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশের অবস্থান দেশটির অস্তিত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। যেমন, এ দেশের সীমানা নিয়ে সামান্য উত্তেজনা বিরাজ করলেও তা অনেক সহজেই মীমাংসা করা সম্ভব হয়। অন্যদিকে এ দেশের ভূপ্রকৃতি খুবই চমৎকার, যার ওপর নির্ভর করে এ দেশের মানুষের সামগ্রিক জীবনধারা, এর সামান্য একটু ভূপ্রকৃতির বিপর্যয় হলে তা সমগ্র মানুষের জীবনে এক বিপর্যস্ত প্রভাব বিস্তার করে থাকে। অর্থাৎ জাতীয় জীবনের সমগ্র স্তরে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয় এবং জীবন ধারণের স্বাভাবিক মাত্রা বিনষ্ট হয়। তাই আমাদের সকলের উচিত জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ভূমির ওপর চাপ কমিয়ে প্রকৃতিকে রক্ষা করার জন্য সচেষ্ট হওয়া।

০৩। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি এবং বাংলাদেশের জলবায়ুতে এর প্রভাব আলোচনা করুন। *[৩০তম বিসিএস]*
অথবা, বিশ্ব উষ্ণায়ন প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে? এই ক্ষতি মোকাবিলায় সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ কি কি? *[৩০তম বিসিএস]*
অথবা, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বাংলাদেশে কি কি বিরূপ প্রভাব পড়েছে এবং পড়তে পারে বর্ণনা করে সরকারের গৃহীত প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থার বর্ণনা দিন। *[৩২তম বিসিএস]*

উত্তর : জলবায়ু পরিবর্তন বর্তমান বিশ্বের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে উপনীত হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় কারণ বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি— যার ফলে আবহাওয়া পরিবর্তিত হয়েছে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়েছে এবং বিশ্ব নিয়মিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হচ্ছে। বৈশ্বিক উষ্ণতা বেড়ে যাওয়ার কারণ বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং এই তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার প্রধান কারণ গ্রিন হাউস ইফেক্ট। সূর্য থেকে আগত তাপশক্তি পৃথিবীপৃষ্ঠকে উত্তপ্ত করে এবং এ বিকিরিত তাপশক্তির অধিকাংশই পুনরায় বায়ুমণ্ডলে ফিরে যায়। কিন্তু মানবসৃষ্ট দূষণ এবং বনভূমি উজাড় করার ফলে বায়ুমণ্ডলে গ্রিন হাউস গ্যাসের পরিমাণ আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে গেছে, যা কার্বন ডাই-অক্সাইড, মিথেন ও নাইট্রাস অক্সাইডের সমন্বয়ে গঠিত। এর ফলে বিকিরিত তাপশক্তি পুনরায় বায়ুমণ্ডলে ফিরে যাওয়ার পথে বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং এভাবেই বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। আধুনিককালে ব্যাপক হারে জীবাশ্ম জ্বালানি দহন, বনাঞ্চল ধ্বংস, শিল্পায়নের ফলে গ্রিন হাউস ইফেক্টের মাত্রা অনেক বেশি বেড়ে গেছে। এর ফলে ১৮৫০-১৯৬০ সালের মধ্যে পৃথিবীর তাপমাত্রা প্রায় পাঁচগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই অতিরিক্ত তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে বর্তমান বিশ্ব প্রতিনিয়ত বিভিন্ন পরিবেশগত বিপর্যয়ের সম্মুখীন হচ্ছে। পরিবেশ বিপর্যয়ের ফলে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম।

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণ : পৃথিবী বেষ্টনকারী আবহাওয়ামণ্ডলের কারণে পৃথিবী প্রাণ ধারণ ও বসবাস উপযোগী হয়েছে। মহাশূন্যের আবহাওয়ামণ্ডলে 'ওজোন স্তর' নামে অদৃশ্য এক বেষ্টনী বিদ্যমান, যা পৃথিবীতে সূর্যের ক্ষতিকর অতিবেগুনি রশ্মি প্রবেশ রোধ করে এবং বিকিরণ প্রক্রিয়ায় পৃথিবী থেকে আসা তাপ মহাশূন্যে পুনরায় ফিরে যেতে সহায়তা করে। কিন্তু মানব সৃষ্ট দূষণ ও বনাঞ্চল ধ্বংসের ফলে প্রকৃতি প্রদত্ত নিরাপত্তা বেষ্টনী, ওজোন স্তর ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। গৃহস্থালি পণ্য যেমন— ফ্রিজ, এয়ারকন্ডিশনার, বিভিন্ন ধরনের স্প্রে ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয় ক্লোরোফ্লোরো কার্বন (সিএফসি) গ্যাস, যা শিল্পকারখানাতেও ব্যবহৃত হয়। এই অবমুক্ত সিএফসি মহাশূন্যের ওজোন স্তর ক্ষয়ের অন্যতম কারণ। এছাড়া গৃহস্থালি ও শিল্পবর্জ্য, কলকারখানা ও যানবাহনের ধোঁয়া প্রভৃতি থেকে ক্রমবর্ধমান হারে নির্গত হচ্ছে কার্বন ডাই-অক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড ও মিথেন গ্যাস। একদিকে পরিবেশ দূষণ ও অপর দিকে বনভূমি উজাড় করার ফলে অতিরিক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষিত হচ্ছে না। এর ফলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি দেখা দিচ্ছে, যা সূর্য থেকে আগত তাপ বায়ুমণ্ডলে ধরে রাখে। এভাবে একদিকে ওজোন স্তরের ক্ষয়জনিত কারণে মাত্রাতিরিক্ত সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি পৃথিবীতে পৌঁছাচ্ছে, অন্যদিকে বায়ুমণ্ডলে প্রতিনিয়ত তাপ সঞ্চিত হচ্ছে। এভাবে পৃথিবী হয়ে উঠছে উত্তপ্ত। সামগ্রিকভাবে পরিবেশ বিপন্ন হওয়ার ফলে পৃথিবী প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হচ্ছে।

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও বাংলাদেশে এর প্রভাব : পরিবেশ বিজ্ঞানীদের মতে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে যেসব বড় ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিচ্ছে তা মূলত জলবায়ু পরিবর্তনের কারণেই দেখা দিচ্ছে। বৈশ্বিক

উষ্ণতা বৃদ্ধিই মূলত এ পরিবর্তিত জলবায়ুর জন্য দায়ী। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে বাংলাদেশের সম্ভাব্য ভয়াবহ পরিণতিসমূহ আলোচনা করা হলো :

১. **সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি :** বিশ্ব উষ্ণায়নের একটি সম্ভাব্য পরিণতি হলো সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি। বায়ুমণ্ডলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে সমুদ্রের পানির উত্তাপ বৃদ্ধি পাবে এবং পানি সম্প্রসারিত হয়ে সমুদ্রের আয়তন ও পরিধিকে বাড়িয়ে তুলবে। উষ্ণায়নের ফলে হিমালয়সহ অন্যান্য পর্বতচূড়ায় জমে থাকা বরফ গলে যাবে এবং সমুদ্রের পানির উচ্চতা বেড়ে যাবে। এর ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সাথে প্লাবিত এলাকার পরিমাণও বেড়ে যাবে। উত্তর ও দক্ষিণমেরুর গ্রীনল্যান্ড, অ্যান্টার্কটিকাসহ অন্যান্য ভূভাগের বরফ গলে যাবে, যা সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা আশঙ্কাজনকভাবে বাড়িয়ে তুলবে। এভাবে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে।

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ ব-দ্বীপ, যেখানে অসংখ্য নদ-নদী বয়ে চলেছে। পৃথিবীর তাপমাত্রা ১° সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেলে বাংলাদেশের ১৯ শতাংশ ভূমি সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে যাবে। এর ফলে ৫৫ মিলিয়ন লোক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বাংলাদেশে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা প্রতিবছর ৭ মিমি হারে বাড়ছে, যেখানে ভূ-পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির হার ৫-৬ মিমি/বছর। এর ফলে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির হার ১-২ মিমি/বছর। Intergovernmental Panel of Climate Change (IPCC)-এর এক সমীক্ষায় বলা হয় বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা প্রতি দশকে ৩.৫ থেকে ১৫ মিমি বৃদ্ধি পেতে পারে। এমনকি ২১০০ সাল নাগাদ তা ৩০ সেমি থেকে ১০০ সেমি এ পৌঁছাতে পারে। তাই সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি বাংলাদেশের জন্য ভয়াবহ বিপর্যয় সৃষ্টি করবে।

২. **মরুভূমির বৈশিষ্ট্য :** বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে একদিকে যেমন পৃথিবীর নিচু এলাকাসমূহ সমুদ্র গর্ভে বিলীন হয়ে যাবে তেমনি পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে মরুভূমির বৈশিষ্ট্য দেখা দেবে। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে ভূ-পৃষ্ঠে পানির পরিমাণ ক্রমাগত হ্রাস পাবে। ফলে সমগ্র ভূমি মরুভূমিতে পরিণত হবে। এর ফলে কৃষিকাজ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং জীববৈচিত্র্য হুমকির সম্মুখীন হবে। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে ইতোমধ্যে মরুভূমির বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়েছে। এর ফলে খাদ্য উৎপাদন ব্যাহতসহ তা দেশের অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

৩. **নিম্নভূমিতে প্লাবন :** বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অন্যান্য নিম্নভূমি সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে যাবে। বায়ুমণ্ডলে তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার ফলে অ্যান্টার্কটিকার বরফ গলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাবে এবং উপকূলীয় এলাকাসমূহ ক্রমেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশের প্রায় ১ লাখ ২০ হাজার বর্গ কিমি এলাকা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হবে। পরিবেশবিজ্ঞানীদের মতে, বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির এ ধারা অব্যাহত থাকলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা এই শতাব্দীর শেষ দিকে ২০-৬০ সেমি পর্যন্ত বাড়তে পারে। জলবায়ু পরিবর্তিত হলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেড়ে যাবে এবং নদ-নদীর পানির পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। আমাদের দেশের অধিকাংশ নদীর উৎস দেশের বাইরে ভারত ও নেপালে। তাই একদিকে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও অপরদিকে ব্যাক ওয়াটার ইফেক্ট যুক্ত হয়ে ভয়াবহ বন্যার সৃষ্টি করবে।

৪. **জীববৈচিত্র্য ধ্বংস :** বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে জীববৈচিত্র্য মারাত্মক হুমকির মুখে পড়েছে। বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার প্রভাবে বনাঞ্চলসমূহ ধ্বংস হওয়ার আশংকা দেখা দিচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ও জলজ প্রাণী বিলুপ্তির পথে। পরিবেশ ও ভূবিজ্ঞানীদের মতে, সমুদ্রের উচ্চতা মাত্র ১ মিটার বৃদ্ধি পেলে সুন্দরবনের ৭০ ভাগ তলিয়ে যাবে। জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হয়ে গেলে তা বিশ্বের জন্য অত্যন্ত ভয়াবহ ফলাফল বয়ে আনবে। পরিবেশ তার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলবে।

৫. **নদ-নদীর প্রবাহ হ্রাস এবং পানির লবণাক্ততা বৃদ্ধি :** বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। জমিতে সেচ ও নৌ-চলাচলের জন্য নদ-নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে নদ-নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ বিঘ্নিত হয়। এর ফলে প্রধান প্রধান নদীর প্রবাহ হ্রাস পাবে এবং নদীর ক্ষীণ প্রবাহের কারণে সামুদ্রিক লোনা পানি সহজে দেশের অভ্যন্তরীণ নদীপ্রবাহে প্রবেশ করে নদ-নদীর পানিতে লবণাক্ততা বাড়িয়ে দেবে। ফলে সামুদ্রিক লোনা পানি উজান অঞ্চলে প্রবেশ করায় কৃষিতে প্রয়োজনীয় মৃদু পানির অভাব দেখা দেবে এবং দেশের সম্পদের বিপুল পরিমাণ ক্ষতি সাধিত হবে। বর্তমানে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ও দূরবর্তী দ্বীপসমূহের প্রায় ১.৪ মিলিয়ন হেক্টর এলাকায় লোনা পানি প্রবেশ করায় উন্মুক্ত জলাশয় ও ভূগর্ভস্থ পানি লবণাক্ত হয়ে পড়েছে। জলবায়ু পরিবর্তিত হওয়ার সাথে সাথে এই লবণাক্ততার মাত্রা আরও বৃদ্ধি পাবে।

৬. **আকস্মিক বন্যা :** পাহাড়ি ঢলের কারণে বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিশেষত মেঘনা অববাহিকায় প্রতিবছর আকস্মিক বন্যা দেখা যায়। দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে প্রায় ৪ হাজার বর্গ কিলোমিটার এবং দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের প্রায় ১ হাজার ৪০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা এ ধরনের আকস্মিক বন্যার শিকার। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বৃষ্টিপাত ও পাহাড়ি ঢলের পরিমাণ আরো বেড়ে যাচ্ছে। ফলে আকস্মিক বন্যার পৌনঃপুনিকতা, ক্ষতির পরিমাণ ও তীব্রতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। বর্তমানে দেশের উত্তরাঞ্চলে বিশেষত সিরাজগঞ্জ ও এর আশপাশের এলাকাসমূহে বন্যা ভয়াবহ রূপ ধারণ করে।

৭. **নদী ভাঙন :** বাংলাদেশে মোট সমুদ্র তটরেখার পরিমাণ ৭১১ কিলোমিটার। এর মধ্যে সুন্দরবন উপকূল ঘিরে রয়েছে ১২৫ কিলোমিটার এবং কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত ১২০ কিলোমিটার দীর্ঘ (সূত্র-বাংলাপিডিয়া)। এছাড়া সমুদ্র উপকূল বরাবর রয়েছে গঙ্গা ও মেঘনা অববাহিকায় অবস্থিত অসংখ্য প্রশস্ত জোয়ার ভাটা সমভূমি এবং নদী মোহনায় রয়েছে বদ্বীপ। নদীসঙ্গমে অবস্থিত এসব বদ্বীপ ও সমুদ্র তটরেখা বরাবর ভূখণ্ড প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। কিন্তু এ পরিবর্তনশীল বৈশিষ্ট্যের মাঝে এক বিশেষ ভারসাম্য বজায় থাকে। কিন্তু বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পেলে এ ভারসাম্য বিঘ্নিত হবে। বর্তমানে দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে নদী ভাঙনের তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের ফলে মেঘনা ও পদ্মার তীরবর্তী এলাকাসমূহে নদী-ভাঙনের ফলে বাংলাদেশের বিপুল পরিমাণ জনগোষ্ঠী সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছে।

৮. **খরা :** মাটিতে আর্দ্রতার অভাব অর্থাৎ বৃষ্টিপাতের তুলনায় বাষ্পীভবনের মাত্রা বেশি হলে খরা দেখা দেয়। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে জলবায়ু পরিবর্তিত হচ্ছে যার প্রভাব বাংলাদেশেও দেখা দিচ্ছে। বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বর্ষাকালে প্রয়োজনীয় বৃষ্টিপাত ও পানির অভাবে কৃষিকাজ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে এবং ফসল উৎপাদনও ক্রমাগতভাবে হ্রাস পাচ্ছে। শীতকালেও এ অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের তুলনায় বাষ্পীভবনের হার বেশি। এর ফলে মাটির আর্দ্রতা হ্রাস পায় এবং কৃষিকাজের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হচ্ছে। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির সাথে সাথে খরার প্রকোপ আরো বৃদ্ধি পাবে এবং বর্তমানের মাঝারি ধরনের খরা উপদ্রুত এলাকা মারাত্মক খরা উপদ্রুত এলাকায় পরিণত হবে।

৯. **সামুদ্রিক ঝড় ও জলোচ্ছ্বাস :** সাধারণত সামুদ্রিক ঝড় সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত বায়ু ও ঘূর্ণিবায়ু থেকে। ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির পেছনে অন্যান্য প্রক্রিয়া সক্রিয় থাকলেও পানির উত্তাপ বৃদ্ধিই মূল কারণ। বাংলাদেশে প্রতিবছর মে-জুন মাসে যে সামুদ্রিক ঝড় হয় তাতে উপকূলীয় জেলাসমূহে ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে সমুদ্রের পানির তাপমাত্রাও ক্রমবর্ধমান হারে বেড়ে যাবে। স্বাভাবিকভাবেই সামুদ্রিক ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের তীব্রতাও বেড়ে যাবে। সাম্প্রতিক সময়ে 'সিডর' বাংলাদেশে যে ধ্বংসযজ্ঞের চিহ্ন রেখে গেছে তা বর্ণনাতীত। পরিবেশ বিজ্ঞানীদের মতে এটা বাংলাদেশের জন্য বড় ধরনের আঘাত। সিডর, সুনামি, সাইক্লোনসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ মূলত জলবায়ুর দ্রুত পরিবর্তনেরই ফলাফল। আর পরিবেশ দূষণের ফলে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধিই জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী। মানব সৃষ্ট দূষণের ফলে জলবায়ু পরিবর্তনের যে ধারা সৃষ্টি হয়েছে, বাংলাদেশের জন্য তা সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ। দূষণের জন্য বিশ্বের শিল্পায়িত দেশগুলোর দায়ভার সবচেয়ে বেশি। কিন্তু এখন পর্যন্ত অনেক ধনী রাষ্ট্রই 'কিয়োটো প্রটোকল, ১৯৯৭' কার্যকর করেনি।

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও বাংলাদেশে সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি : বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাবে সম্ভাব্য ক্ষয়-ক্ষতি নিয়ে ইতোমধ্যে বিশ্বজুড়ে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশ ও তার প্রতিবেশী দেশসমূহে ক্ষয়-ক্ষতির মাত্রা অত্যন্ত ব্যাপক হবে বলে পরিবেশ ও ভূ-বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে বাংলাদেশের উচ্চতা কম থাকার কারণে বাংলাদেশে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আরও ভয়াবহ হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এছাড়া সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ নিয়মিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হচ্ছে যা জলবায়ু পরিবর্তনেরই ফলাফল। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশে যে সকল ক্ষতি হতে পারে তা নিম্নরূপ :

১. **বিপন্ন জনগোষ্ঠী :** বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থার প্রেক্ষিতে কোনো মাঝারি ধরনের প্লাবনে দেশের ৬৫ শতাংশ জনগোষ্ঠী প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়বে এবং প্লাবন এলাকার পরিধি ক্রমেই বাড়তে থাকবে। ফলে বিপুল জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকা বিপন্ন হয়ে পড়বে।

২. **অবকাঠামোগত ক্ষয়ক্ষতি :** ১৯৯০ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশে মোট বস্তুগত সম্পদের পরিমাণ ১৮০০০ বিলিয়ন টাকা। এর মধ্যে ভৌত অবকাঠামো রয়েছে ২৮০ বিলিয়ন টাকা মূল্যের। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে প্লাবনের তীব্রতা বাড়বে এবং অবকাঠামোগত ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হবে। IPCC-এর সমীক্ষা অনুযায়ী ২০১০ সাল নাগাদ বাংলাদেশে প্লাবনজনিত কারণে বস্তুগত সম্পদের ক্ষতির পরিমাণ হবে ২৪২ মিলিয়ন টাকা।

৩. **বিপন্ন কৃষি :** বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পেলে বাংলাদেশের কৃষি খাত মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হবে। কৃষিখাতের ওপর এ বিপর্যয় দেশের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার ওপর ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। IPCC-এর সমীক্ষা অনুযায়ী প্লাবনের কারণে দেশে আমন ধানের উৎপাদন ১৩.৬ মিলিয়ন মেট্রিক টন হ্রাস পাবে। এমনকি জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দেশের কৃষি উৎপাদন বর্তমানের তুলনায় প্রায় ৭০ শতাংশ কমে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। শীত মৌসুমে বাংলাদেশে প্রায় ৩৬০০ বর্গ কিমি এলাকা খরার কবলে পড়ে। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির সাথে সাথে খরার ব্যাপ্তি আরো বেড়ে তা ২২০০ কিমি পর্যন্ত সম্প্রসারিত হবে। গত কয়েক দশক ধরে বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বর্ষা মৌসুমের ফসলের ওপর খরার প্রতিকূল প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন হলে দেশের মধ্য-দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে গমের আবাদ অসম্ভব হয়ে পড়বে এবং আলুর চাষও ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়বে। এছাড়া প্রয়োজনীয় সেচের অভাবে দেশের উত্তর-পশ্চিম ও মধ্য-পশ্চিমাঞ্চলে চাষাবাদ ব্যাপকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হবে।

৪. **লোনা পানির অনুপ্রবেশ :** দেশের মোট জনসংখ্যার ১৫ শতাংশ সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে বসবাস করে। IPCC-এর সমীক্ষা অনুযায়ী সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ১০০ সেমি বৃদ্ধি পেলে ২৫,০০০ বর্গ কিমি এলাকায় লোনা পানির অনুপ্রবেশ ঘটবে। ফলে দেশের প্রায় ৩ কোটি ৫০ লাখ লোকের জীবন ও জীবিকা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এছাড়া লোনা পানি প্রবেশের ফলে দেশের চিংড়ি শিল্প ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হবে। দেশের নদ-নদীতে লোনা পানির অনুপ্রবেশ ঘটলে স্বাদু পানির মৎস্য সম্পদ ধ্বংস হবে এবং জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবন বিপন্ন হবে।

৫. **পরিবেশ বিপর্যয় :** বাংলাদেশের জনসংখ্যার তুলনায় প্রাকৃতিক সম্পদ অত্যন্ত অপ্রতুল। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পেলে জলবায়ুতে যে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে তা বাংলাদেশের জন্য ভয়াবহ পরিণাম ডেকে আনবে। জলবায়ু পরিবর্তিত হলে সম্পদের অপ্রাপ্যতা আরো বেড়ে যাবে এবং প্রাকৃতিক সম্পদ দ্রুত বিনষ্ট হবে। ইতোমধ্যে দেশের বৃহৎ বনভূমি সুন্দরবন ও হাওর অঞ্চলের পরিবেশীয় ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে।

বৈশ্বিক উষ্ণতা রোধে আমাদের করণীয় : বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি শুধুমাত্র বাংলাদেশের জন্য নয় বরং সমগ্র বিশ্ব ও মানবজাতির জন্য হুমকিস্বরূপ। ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূ-প্রাকৃতিক অবকাঠামো বাংলাদেশকে যতটা কুফলভোগী করেছে, এ সংকট সৃষ্টিতে আমাদের দেশের ভূমিকা শিল্পোন্নত দেশের তুলনায় খুবই নগণ্য। এখনই সময় এ সংকট মোকাবিলায় এগিয়ে আসার। বৈশ্বিক উষ্ণতা রোধে আমাদের সবচেয়ে যে বিষয়গুলোর ওপর জোর দিতে হবে তা হলো–

১. ব্যাপকভাবে বনায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। এ ধারাবাহিকতায় দেশের সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় ও নদী তীরবর্তী এলাকাসমূহে বনায়ন কর্মসূচি যত দ্রুত সম্ভব শুরু করতে হবে। ফলে নদী ভাঙন ও সামুদ্রিক ঝড়ের তীব্রতা কমে যাবে।
২. বৃক্ষনিধন রোধ করতে হবে। কারণ বৃক্ষই প্রকৃতি থেকে ক্ষতিকর কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস শোষণ করে এবং অক্সিজেন নির্গমন করে। ফলে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকে।
৩. বায়ুমণ্ডলের উত্তাপ বাড়ায়, এমন ক্ষতিকর গ্যাসের নির্গমন কমাতে হবে।
৪. পরিবেশ সহায়ক জ্বালানির ব্যবহার বাড়াতে হবে।
৫. শিল্পকারখানার জ্বালানি সাশ্রয় করতে হবে এবং উৎপন্ন বর্জ্য বিশুদ্ধকরণের ব্যবস্থা নিতে হবে।
৬. সর্বোপরি দেশের সবাইকে এ ভয়াবহ দুর্যোগ মোকাবিলায় এগিয়ে আসতে হবে।

উপসংহার : একবিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে মানবজাতি যখন সভ্যতার চরম শিখরে, ঠিক তখনই এ মানবজাতি তার পরিবেশকে ঠেলে দিচ্ছে চরম বিপর্যয়ের দিকে। মানুষ তার প্রয়োজনে একদিকে যেমন পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যবহার করছে অপরদিকে পরিবেশকে করে তুলছে বিষাক্ত। পরিবেশ দূষিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত এবং পরিবেশের ভারসাম্য দ্রুত বিনষ্ট হচ্ছে। এ বিশ্ব আমাদেরই, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে তাই এ ভয়াবহ বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচাতে আমাদেরই এগিয়ে আসতে হবে।

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

০৪ । বাংলাদেশের সমাজ-সংগঠনে ভৌগোলিক উপাদানের প্রভাব আলোচনা করুন ।

উত্তর : মানুষের সাথে প্রকৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য ও অকৃত্রিম সম্পর্ক রয়েছে। প্রকৃতির ছায়াতলে মানুষ জন্মগ্রহণ করে বয়ঃপ্রাপ্ত হয় এবং জীবন-জীবিকা নির্বাহ করে। প্রকৃতির এই নানাবিধ ক্ষেত্রের মধ্যে ভৌগোলিক উপাদান মানুষের জীবনে নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করে আছে। সমাজব্যবস্থার রূপরেখা প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে তথা সমাজ-সংগঠনের মাধ্যমে বিবর্তিত ও পরিবর্তিত হয়। ফলে মানবজীবনের প্রতিটি পর্বে ভৌগোলিক উপাদান সংশ্লিষ্ট বলে এর প্রভাব মানবজীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। মানুষ সমাজনির্ভর, তাই সামাজিক সংগঠনের প্রভাবগুলোও মানুষের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত। তবে এ কথা স্বীকার্য যে, এ প্রভাব ইতিবাচক হলেই মানুষের জীবনকে তা সুন্দর ও মনোহর করে তোলে।

সমাজ-সংগঠন ও ভৌগোলিক উপাদান : সমাজজীবন বহুবিধ উপাদান দ্বারা প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। এসব প্রভাব কখনো সমাজজীবনকে সুন্দর ও সাবলীল করে তোলে, কখনো বা এর বিপরীত দিকটিও প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। মানুষের সাথে পরিবেশ তথা প্রাকৃতিক পরিবেশের সমন্বয়সাধনের মাধ্যমেই জীবন হয় সুন্দর ও সুখময়। সমাজবিজ্ঞানীরা চারটি উপাদানকে মৌল উপাদান হিসেবে চিহ্নিত ও পর্যালোচনা করে থাকেন –

১. ভৌগোলিক উপাদান (Geographical factor)
২. জৈবিক বা বংশগত উপাদান (Biological or hereditary factor)
৩. উৎপাদন পদ্ধতি বা সংস্কৃতি (Technique of Production or culture)
৪. গোষ্ঠী বা সামাজিক উপাদান (Group or social factor)

উপর্যুক্ত চারটি উপাদান সমাজজীবনকে এমনভাবে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করে যে, এগুলোর সমন্বয়ে সমাজ ও সভ্যতার বিচার বিশ্লেষণ সম্ভব।

ভৌগোলিক উপাদানের প্রভাব (Influence of Geographical Factor) : সমাজজীবনে ভৌগোলিক উপাদানের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমাজ ও সভ্যতার উত্থান, বিকাশ ও লয়ের সব বিষয় এখানে আলোচনা ও পর্যালোচনা সম্ভব। কেননা, ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যে বাংলাদেশ অনন্য। বাংলাদেশ পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ অঞ্চল এবং এ দ্বীপটি গড়ে উঠেছে পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র বয়ে আনা পলিমাটির মাধ্যমে। অন্যদিকে বাংলাদেশে নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া বিরাজমান। মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। ফলে শস্য-শ্যামলা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক মিলন এখানে মন কেড়ে নেয়।

ভৌগোলিক উপাদান বলতে প্রাকৃতিক জলবায়ু ও তাপমাত্রা, মৃত্তিকা, জলের অবস্থান ও গতি, বনাঞ্চল, পশুপাখি, ঋতু, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, ঝড়-বৃষ্টি, ভূমিকম্প ইত্যাদিকে বোঝায়। গ্রহ, নক্ষত্রপুঞ্জ, নদ-নদী, হাওর, বিল, আবহাওয়া এসবই ভৌগোলিক পরিবেশ সৃষ্টি করে। বস্তুত, জৈব সামাজিক উপাদান এবং মানবসৃষ্ট কৃত্রিম পরিবেশ ব্যতীত প্রায় সব উপাদানই ভৌগোলিক উপাদানযুক্ত। ভৌগোলিক উপাদানের প্রভাবের ধরন প্রকৃতির কয়েকটি সূত্রে দেখানো যেতে পারে —

ক. ভৌগোলিক উপাদানের প্রভাব হতে পারে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ। সমাজজীবনের বিভিন্ন দিক যেমন– ঘরবাড়ি, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদিতে ভৌগোলিক উপাদান সরাসরি প্রভাব বিস্তার করে থাকে। অন্যদিকে, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ইত্যাদিতে ভৌগোলিক উপাদান পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে।

খ. সম্পর্কের নিবিড়তার ভিত্তিতেও এ উপাদানের প্রভাব বিভাজিত হতে পারে। বাসগৃহ, শস্য উৎপাদন ইত্যাদির ওপর ভৌগোলিক প্রভাব নিবিড়। অন্যদিকে, সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন, ধর্মীয় বিশ্বাস ইত্যাদির উপর ভৌগোলিক প্রভাব নিবিড় নয়।

গ. ভৌগোলিক প্রভাবকে নিষ্ক্রিয় করা যেতে পারে ভৌগোলিক কৌশল অবলম্বন করে। বিজ্ঞানের কল্যাণে মানুষ প্রকৃতিকে জয় করতে সচেষ্ট। তাই এককালের মরূদ্যানও কৃত্রিম জলসেচের মাধ্যমে পরিপূর্ণ হয়েছে শস্য-শ্যামলায়।

সমাজজীবনে যেসব ভৌগোলিক উপাদান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সেগুলো নিচে আলোচনা করা হলো :

১. **জনসংখ্যার বণ্টন ও সভ্যতার উৎপত্তি** : বাংলাদেশের জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ। এ উষ্ণতা আমাদের দেশের যুবক-যুবতীদের দ্রুত যৌবনপ্রাপ্তিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ কারণেই জনসংখ্যার ঘনত্ব বৃদ্ধি পায় এবং মানুষ কৃত্রিম সভ্যতা গড়ে তোলে। কেননা, খাদ্যের যোগান এবং বসবাসের উপযোগী স্থানে বসতি গড়ে তোলা মানুষের স্বাভাবিক একটা ধর্ম। অতিরিক্ত শীতল জলবায়ু সভ্যতার বিকাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এস্কিমোদের উদাহরণ এখানে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

২. **অর্থনীতি (Economy)** : ফসল উৎপাদনের জন্য উপযোগী জলবায়ু, আবহাওয়া তথা পরিমিত বৃষ্টিপাত এবং তাপমাত্রা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন ধরনের ফসলের জন্য বিভিন্ন ধরনের ভৌগোলিক পরিবেশ প্রয়োজন। কেননা, মাটি ও জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যের ওপর ফসলের ধরন-প্রকৃতি ও গুণগত মান নির্ভর করে। কোনো কোনো ভৌগোলিক পরিবেশ বা অঞ্চল আম, কাঁঠাল ও কলা, আবার কোনো কোনো অঞ্চল বিখ্যাত কমলালেবু বা ধান-পাটের জন্য। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, নিম্নাঞ্চলে আমন ধানের চাষ সম্ভব, ইক্ষুর জন্য প্রয়োজন অপেক্ষাকৃত উঁচু ভূমি। বিশেষ বিশেষ ফসলের ওপর ভিত্তি করে অর্থনৈতিক তথা সামাজিক জীবন গড়ে ওঠে। অঞ্চলভেদে খাদ্য ও পানীয়ের পার্থক্যের কারণও এর মূল কারণ। কেননা, খাদ্য ও পানীয় নির্ভর করে এলাকার উৎপাদিত ফসলের ওপর। শিল্প-কারখানাও ভৌগোলিক উপাদান দ্বারা প্রভাবিত। শিল্পের জন্য কাঁচামাল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফলে দেখা যায়, যেসব অঞ্চলে কাঁচামাল সহজলভ্য, অথবা সহজেই কাঁচামাল আমদানি করা যায়, সেসব অঞ্চলে শিল্প গড়ে ওঠে। বাংলাদেশের চা, চিনি ও পাটশিল্পের সাথে কাঁচামাল প্রাপ্তির সম্পর্ক রয়েছে, আবার কয়লা, পেট্রোলিয়াম, লৌহ ইত্যাদির অভাব থাকার কারণে বাংলাদেশে ভারী শিল্প-কারখানা গড়ে ওঠেনি। অতএব, ভৌগোলিক উপাদানের সাথে অর্থনীতির এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে।

৩. **পোশাক-পরিচ্ছদ (Dress)** : ভৌগোলিক উপাদানের সাথে পোশাক-পরিচ্ছদের সম্পর্ক রয়েছে। কেননা, পোশাক-পরিচ্ছদ অনেক সময় ভৌগোলিক উপাদান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। শীতপ্রধান অঞ্চলে মোটা কাপড় বা গরম পশমি কাপড়ের প্রচলন এবং গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে হালকা সুতি কাপড়ের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। আবার একই দেশের ঋতুভেদে গরম ও হালকা সুতি কাপড়ের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন– শীতকালে আমরা মোটা সুতি কাপড়, কিন্তু গ্রীষ্মকালে হালকা কাপড়-চোপড় পরিধান করি।

৪. **ঘরবাড়ির ধরন (Housing Pattern)** : ভৌগোলিক উপাদানের ওপর ঘরবাড়ির ধরন নির্ভর করে। কেননা, ঘরবাড়ি তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ যেমন– বাঁশ, কাঠ, ছন, ইট, পাথর ইত্যাদি ভৌগোলিক উপাদান দ্বারা প্রভাবিত। জাপানে প্রায়ই ভূমিকম্প হয় বলে সেখানে অস্থায়ীভাবে ঘর তৈরি করা হয়। আবার বাংলাদেশ ভূমিকম্পপ্রবণ নয় বলে এখানে স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে জনগণ ইদানীং পাকা দালানকোঠার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে।

৫. **যানবাহন (Transport) :** যানবাহনের ধরন ও প্রকৃতি ভৌগোলিক উপাদান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যেসব অঞ্চল নিম্ন, সেখানে লঞ্চ , স্টিমার, নৌকা, ভেলা ইত্যাদি ব্যবহৃত হয় বেশি। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে এসব যানবাহন বেশি ব্যবহৃত হয়। অন্যদিকে উত্তরবঙ্গে এসব যানবাহনের অধিকাংশই ব্যবহৃত হয় না। সেখানে ভৌগোলিক পরিবেশের উপযোগী যানবাহন ব্যবহৃত হয়।

৬. **মানবপ্রকৃতি ও দক্ষতা (Human Nature and Efficiency) :** ভৌগোলিক উপাদান মানবপ্রকৃতি ও দক্ষতার ওপর প্রভাব বিস্তার করে। হান্টিংটনের গবেষণায়, ৪০° ফারেনহাইট তাপমাত্রায় মানসিক দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তা সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করা যায়।

৭. **বিবাহ ও পারিবারিক জীবন (Marriage and Family Life) :** বিবাহ ও পারিবারিক জীবনে ভৌগোলিক উপাদানের প্রভাব অনস্বীকার্য। গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের ছেলেমেয়েরা অতিদ্রুত যৌবনপ্রাপ্ত হয়। ফলে এসব অঞ্চলের ছেলেমেয়েরা শীতপ্রধান অঞ্চলের ছেলেমেয়েদের আগেই বিয়ে করে পরিবার গঠন করে। অল্প বয়সে বিয়ে করার ফলে তারা দ্রুত সন্তানের পিতামাতা হয়। অভাব-অনটনের ফলে তারা মূল পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং যৌথপরিবার ফেলে অণুপরিবার গড়ে তোলে।

৮. **নগরায়নের ওপর প্রভাব :** নগরায়নে ভৌগোলিক অবস্থানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আধুনিক যুগের বাণিজ্য ও শিল্পের বিকাশের কারণে শহুরে সমাজের উদ্ভব হয়েছে। বাংলাদেশের সমাজেও এ প্রভাব লক্ষণীয়। সাধারণত বিভিন্ন নদীর তীরেই এ দেশের শহরগুলো গড়ে উঠেছে। চট্টগ্রাম, খুলনা বা নারায়ণগঞ্জ এ কারণেই বন্দর হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

৯. **অপরাধ প্রবণতা (Crime Tendency) :** অপরাধ প্রবণতা কম-বেশি নির্ভর করে ভৌগোলিক উপাদানের ওপর। গবেষণায় দেখা যায়, সমতল অঞ্চলে তুলনামূলকভাবে অপরাধ প্রবণতা কম। অপরদিকে পাহাড়ি অঞ্চলে অথবা পার্বত্য অঞ্চলে অপরাধ প্রবণতার মাত্রা অনেক গুণ বেশি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে অপরাধ বেশি সংঘটিত হয়।

১০. **বংশগতির প্রভাব (Influence of Heredity) :** সমাজ ও সভ্যতার ওপর বংশগতির প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমাজ ও সভ্যতার উদ্ভব এবং বিকাশের ক্ষেত্রে মানুষের জৈবিক গুণাবলী বা বংশগত গুণাবলী মৌলিক প্রভাব বিস্তার করে। কেননা, সভ্য ও সুস্থ সমাজে জন্মগ্রহণ করলে মানুষ সমাজ ও দেশের কল্যাণে নানা কল্যাণসাধন করতে পারে। সমাজ থেকে সে জীবনের যথার্থতা অনুধাবন করতে পারে বিধায় মানবকল্যাণে সে আত্মনিয়োগ করে। অন্যদিকে, অসভ্য ও বর্বর সমাজে জন্মগ্রহণ করলে একজন মানুষ এর বিপরীতে অবস্থান নেয়।

বংশগতি সূত্রে সন্তানরা পিতামাতা থেকে যেসব বৈশিষ্ট্য উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে থাকে, তা হলো লিঙ্গ (স্ত্রী-পুরুষ), চোখ এবং চুলের রং, গায়ের রং, চুলের ধরন এবং শরীরের বিভিন্ন স্থানে তার বন্টন, আঙ্গুলের ছাপ, হাত-পায়ের গড়ন ও ধরন, জ্ঞান ও পারদর্শিতা, মস্তিষ্কের পারদর্শিতা, রক্তের রাসায়নিক গঠন-প্রকৃতি, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ইত্যাদি। বংশগতির এ প্রভাব প্লেটো ও এরিস্টটলও স্বীকার করেছেন। মানুষে মানুষে যে ভেদাভেদ রয়েছে তা প্লেটো এবং এরিস্টটলের চিন্তাধারায় পরিলক্ষিত হয়। প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রের রূপরেখা বিনির্মাণ মূলত ব্যক্তির জন্মগত গুণাবলীর ওপরই প্রতিষ্ঠিত। বংশগতির এ প্রভাব আমাদের সমাজ জীবনেও বিরল নয়। বংশগতির এ প্রভাবের সাথে ভৌগোলিক উপাদানের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য।

১১. **উৎপাদন কৌশলের ওপর প্রভাব :** ভৌগোলিক উপাদান সমাজনির্ভর মানুষের উৎপাদন তথা উৎপাদন কৌশলের ওপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। পাহাড়ি অঞ্চলের মানুষের উৎপাদিত দ্রব্য হলো পাহাড়ে সহজেই উৎপাদনযোগ্য দ্রব্যাদি উৎপাদন। এসব অঞ্চলে উৎপাদন অনেকটা কষ্টসাধ্য। পাহাড়ের ঢালে গাছপালা কেটে অথবা উঁচু-নিচু পাহাড়-পর্বত কেটে তার মাঝে জমি তৈরি করা হয়। পাহাড়ের ঢালে জুম চাষ উৎপাদনই মূলত পাহাড়িদের প্রধান অবলম্বন। অন্যদিকে, সমতল ভূমির লোকজন সহজেই নানাপ্রকার দ্রব্যাদি উৎপাদন করতে পারে। ধান, পাট, গম নানাপ্রকার সবজি ইত্যাদি দ্রব্যাদি ইচ্ছামতো উৎপাদনে তারা সক্ষম। গবেষণায় দেখা যায়, নদীর অববাহিকায় পলি মাটি সমৃদ্ধ অঞ্চলে নদীমাতৃক সভ্যতার বিকাশ ঘটে। মানুষ যাযাবর জীবন ত্যাগ করে এবং স্থানীয়ভাবে বসতি স্থাপন করে কৃষি সভ্যতার বিকাশ ঘটায়। কৃষি উৎপাদন পদ্ধতি সমাজে একটি স্থায়ীরূপ পরিগ্রহ করে। কেননা, যাযাবর সমাজে স্থায়ী সমাজ বা রাষ্ট্রীয় কাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব নয়। কৃষি উৎপাদন কৌশলনির্ভর সমাজে উদ্বৃত্ত ফসলের সমাগম ঘটে যার ওপর ভিত্তি করে সৃষ্টি হয় একটি অবকাশ জীবনযাপনকারী শ্রেণী। এ শ্রেণী উদ্বৃত্ত ফসলের ওপর নির্ভর হয়ে পড়ে, যাদের প্রত্যক্ষভাবে কৃষি কাজের ওপর নির্ভর করতে হয়নি। এদের দ্বারাই মূলত সভ্যতার বিকাশ ঘটে।

১২. **সামাজিকীকরণের ওপর প্রভাব :** ভৌগোলিক উপাদান একজন ব্যক্তিকে সমাজজীবনে বসবাস উপযোগী নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিক্ষাদান করে থাকে। সমাজবদ্ধ একজন মানুষকে পরিবার থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় পর্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়। ব্যক্তি যে প্রক্রিয়ায় সামাজিক সদস্য হিসেবে গড়ে ওঠে তার নাম সামাজিকীকরণ (Socialization)। এ প্রক্রিয়ায় ব্যক্তি সমাজের মূল্যবোধ, প্রথা, অনুষ্ঠান ইত্যাদির সাথে খাপখাইয়ে নেয়। একজন পূর্ণাঙ্গ সামাজিক সদস্য হিসেবে গড়ে উঠতে হলে ব্যক্তিকে তাই তার নিজস্ব সমাজের বিভিন্ন সংগঠনের নিয়ম পদ্ধতি মেনে চলতে হয়। পরিবার, খেলার মাঠ, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, বিদ্যালয়, সংঘ-সমিতি ইত্যাদি ব্যক্তির সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়। অর্থাৎ সমাজজীবন রূপায়ণে এসবের ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

১৩. **ধর্ম ও সংস্কৃতির ওপর প্রভাব :** প্রথা, বিশ্বাস, ধর্মীয় মূল্যবোধ, আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদির ওপর ভৌগোলিক উপাদানের সুস্পষ্ট প্রভাব রয়েছে। বাংলাদেশ মুসলিম অধ্যুষিত দেশ। এ দেশের প্রায় ৯০.৪% মানুষ মুসলমান। এ ধর্মের পেছনে ঐতিহাসিকভাবে ভৌগোলিক উপাদান মূল্যায়ন করা যায়। ভৌগোলিকভাবে অনুকূল বলে ত্রয়োদশ শতকে বখতিয়ার খলজি বাংলাদেশে আগমন করেন এবং তিনি এ অঞ্চলে ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসার ঘটান। পাহাড়ি ও পার্বত্য অঞ্চলে বৃক্ষপূজা ও তৎসংলগ্ন আচার-অনুষ্ঠান সহজেই সম্পন্ন করা যায় বলে বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী লোকজন পার্বত্য অঞ্চলে বসবাস করে। পবন দেব, মা মনসা প্রভৃতি দেব-দেবীরা উপাসিত হন উপকূলীয়দের দ্বারা। অন্যদিকে পৃথিবীর পরিক্রমণ ও ঋতুবৈচিত্র্যের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে নানা আচার-বিশ্বাস।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিকাশে ভৌগোলিক উপাদানের গুরুত্ব কম নয়। বাংলাদেশেও এ বিকাশ ভৌগোলিক উপাদান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সাহিত্য, সংস্কৃতি বিকাশে ভৌগোলিক উপাদানের সুস্পষ্ট প্রভাব তাই লক্ষণীয়। উত্তরাঞ্চলে ভাওয়াইয়া ও ভাটি অঞ্চলে ভাটিয়ালী সমাজচিত্রের বর্ণনা পাওয়া যায়।

১৪. খাদ্যাভ্যাসের ওপর প্রভাব : খাদ্যাভ্যাসের ওপর ভৌগোলিক উপাদানের প্রভাব রয়েছে। মানুষের খাদ্যাভ্যাস (Foodhabit) নির্ভর করে মূলত ভৌগোলিক অবস্থান, যাতায়াত, আবহাওয়া ইত্যাদির ওপর। কাজেই অঞ্চলভেদে এ খাদ্যের অভ্যাসও পরিবর্তিত হয়। যেমন– এস্কিমোরা প্রচুর পরিমাণে কাঁচা মাছ খায়। কেননা, তাদের বসবাস স্থান হচ্ছে হাওয়াই দ্বীপে। দ্বীপে প্রচুর পরিমাণে মাছ পাওয়া যায় বলে মাছই তাদের প্রধান খাদ্য। অপরদিকে, বাংলাদেশ এরূপ কোনো দ্বীপ নয় বরং কৃষিনির্ভর দেশ বলে অধিকাংশ মানুষের প্রধান খাদ্য ভাত।

উপসংহার : বাংলাদেশের মানুষের সমাজ সংগঠনের ওপর ভৌগোলিক উপাদানের প্রভাব অত্যন্ত তাৎপর্যবাহী। সমাজ ও সভ্যতার বিকাশ ও উত্থানে এসব উপাদান চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে। এসব উপাদান মানুষের ওপর কখনো ইতিবাচক, কখনো বা নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করেছে। কার্ল ইউটফোগেল তার 'Oriental Despotism' গ্রন্থে প্রাচ্যের স্বৈরাচারতন্ত্র তথা ভৌগোলিক পরিবেশ কেন্দ্রীয় শক্তিশালী সরকারের জন্য ভৌগোলিক পরিবেশ তথা জলসেচ অর্থনীতিকে দায়ী করেন। মোটকথা, মানুষের ভাষা, সংস্কৃতি, জীবনযাপন প্রণালী, খাদ্যাভ্যাস ইত্যাদি বিষয়ের ওপর ভৌগোলিক উপাদানের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য।

০৫। গ্রিন হাউস ইফেক্ট কি? ভবিষ্যতে বাংলাদেশে এর কি কি প্রভাব পড়তে পারে এবং তা প্রতিকারের উপায় কী বর্ণনা করুন।

উত্তর : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মানব সভ্যতার অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করেছে। বিজ্ঞানের বৈচিত্র্যপূর্ণ ও বিস্ময়কর অবদানে মানবজাতি একদিকে যেমন সভ্যতার স্বর্ণশিখরে আরোহণ করেছে, অন্যদিকে তার ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া মানবজাতিকে ঠেলে দিচ্ছে এক ভয়াবহ বিপর্যয়ের দিকে। প্রাকৃতিক সম্পদের বিনাশ সাধনের ফলে পৃথিবী চরম দুর্দিনের সম্মুখীন হচ্ছে। পরিবেশ দূষণের ফলে বেড়ে যাচ্ছে গ্রিন হাউস ইফেক্ট। মূলত গ্রিন হাউস ইফেক্ট পরিবেশ দূষণের এমন এক বৈশ্বিক প্রতিক্রিয়া যা বিশ্ববাসীকে এক নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে দাঁড় করিয়েছে। প্রকৃতি হারিয়ে ফেলেছে তার ভারসাম্য ও স্বাভাবিক গতি।

গ্রিন হাউস কি : ইংরেজি 'Green House' শব্দের অর্থ 'সবুজ ঘর'। স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশসমূহ ও মেরু অঞ্চলে সূর্যালোকের স্বল্পতার কারণে নিত্যপ্রয়োজনীয় শাক-সবজির সংকট তীব্র আকার ধারণ করে। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞানীগণ বিশেষ ধরনের কাচের ঘর উদ্ভাবন করেন যার ভেতরে চাষাবাদ সম্ভব। এ ঘরের ছাদ ও দেয়াল তাপ বিকিরণরোধী বিশেষ ধরনের কাচ দিয়ে তৈরি। গ্রীষ্মকালে এ ঘরে সূর্যালোক ও উত্তাপ প্রবেশ করে কিন্তু বিকিরণ না ঘটায় তাপ বের হতে পারে না এবং এর ভেতরের পরিবেশ উত্তপ্ত থাকে। তাই সঞ্চিত সূর্যতাপে বৈরী ও শীতার্ত পরিবেশেও শাক-সবজি উৎপাদন করা সম্ভব হয়। বিজ্ঞানীরা এ বিশেষ ঘরের নাম দিয়েছেন 'গ্রিন হাউস'।

গ্রিন হাউস ইফেক্ট কি : পৃথিবীকে ঘিরে এর চারপাশে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ৩০ কিমি পর্যন্ত রয়েছে ওজোনস্তর। যার ঘনত্ব সব জায়গায় একরকম নয়। ২৩ কি.মি. উর্ধ্বে এর ঘনত্ব অপেক্ষাকৃত কম। এখানে রয়েছে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও অপর কয়েকটি গ্যাসের বেষ্টনী। এ গ্যাসগুলোকে একত্রে গ্রিন হাউস গ্যাস বলা হয়। এ গ্যাসের বেষ্টনী রাসায়নিক পর্দা হিসেবে কাজ করে। গ্রিন হাউসের কাচের দেয়াল যেভাবে তার ভেতরের উষ্ণতাকে বাইরে বিকিরণ হতে বাধা সৃষ্টি করে, ঠিক তেমনিভাবে বায়ুমণ্ডলে সৃষ্ট রাসায়নিক পর্দা বা গ্যাসের দেয়াল ভূপৃষ্ঠের শোষিত তাপের বিকিরণ ঘটাতে বাধা দেয়।

গ্যাসের এ দেয়াল আছে বলেই কিছু পরিমাণ তাপ বাধাপ্রাপ্ত হয়ে পৃথিবীতে থেকে যায় এবং এর প্রভাবে বায়ুমণ্ডল উষ্ণ থাকে। ফলে পৃথিবীতে যে উষ্ণতা থাকে তা জীবের পক্ষে বাসযোগ্য হয়। জীবের বসবাসের অনুকূল এরূপ পরিস্থিতিকে বলা হয় গ্রিন হাউস ইফেক্ট।

গ্রিন হাউস ইফেক্ট-এর কারণ : পৃথিবী বেষ্টনকারী বায়ুমণ্ডলের কারণে পৃথিবী বাসোপযোগী হয়েছে। মহাশূন্যের আবহাওয়ামণ্ডলে 'ওজোনস্তর' নামে অদৃশ্য এক বেষ্টনী বিদ্যমান। এ ওজোন স্তর পৃথিবীতে সূর্যের ক্ষতিকর অতিবেগুনি রশ্মির প্রবেশ রোধ করে এবং বিকিরণ প্রক্রিয়ায় পৃথিবী থেকে আসা তাপ মহাশূন্যে পুনরায় ফিরে যেতে সহায়তা করে। মানবসৃষ্ট বিভিন্ন দূষণের ফলে প্রকৃতির এ প্রাকৃতিক নিরাপত্তা বেষ্টনি ওজোন স্তর প্রতিনিয়ত ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। গৃহস্থালী পণ্য ফ্রিজ, এয়ারকন্ডিশনার, বিভিন্ন ধরনের স্প্রে ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয় ক্লোরোফ্লোরো কার্বন বা সিএফসি গ্যাস। শিল্প কারখানাতেও এ ক্ষতিকর গ্যাস ব্যবহৃত হয়। অবমুক্ত সিএফসি মহাশূন্যের ওজোন স্তর ক্ষয়কারী অন্যতম উপাদান। তাছাড়া গৃহস্থালি ও শিল্পবর্জ্য, কলকারখানা ও যানবাহনের ধোঁয়া থেকে ক্রমবর্ধমান হারে নির্গত হচ্ছে কার্বন ডাই-অক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড, মিথেন প্রভৃতি গ্যাস। বায়ুমণ্ডলে এসব গ্যাসের মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধির ফলে তাপ বিকিরণে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে এবং সূর্য থেকে আগত কিছু তাপ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ধরে রাখে। এভাবে একদিকে ওজোন স্তরের ক্ষয়জনিত কারণে মাত্রাতিরিক্ত সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি পৃথিবীতে পৌঁছাচ্ছে, অন্যদিকে বায়ুমণ্ডলে প্রতিনিয়ত তাপ সঞ্চিত হচ্ছে। ফলে পৃথিবী উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। গ্রিন হাউজ ইফেক্ট-এর আর একটি অন্যতম প্রধান কারণ বনভূমি উজাড়করণ। বনাঞ্চল ধ্বংস হওয়ার ফলে বৃক্ষ কর্তৃক কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণের হারও আশঙ্কাজনকভাবে কমে গেছে। ফলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের মাত্রাও ক্রমাগত বেড়ে যাচ্ছে যা গ্রিন হাউস ইফেক্টের তীব্রতা আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। সামগ্রিকভাবে পরিবেশ বিপন্ন হওয়ার ফলে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটছে।

বাংলাদেশে গ্রিন হাউস ইফেক্ট-এর প্রভাব : গ্রিন হাউস ইফেক্ট শুধুমাত্র বাংলাদেশ নয় বরং সমগ্র বিশ্বের জন্যই এক ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনছে। এটা প্রকৃতির ওপর এমন মারাত্মক প্রভাব ফেলছে যার ফলে বাস্তুসংস্থান হয়ে পড়ছে বিপর্যস্ত। পৃথিবীর স্বাভাবিক তাপমাত্রা ১.৭৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। কিন্তু বর্তমানে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৪.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। পরিবেশ বিজ্ঞানীগণ আশঙ্কা করছেন আগামী ২০৫০ সাল নাগাদ এই তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াবে ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। বৈশ্বিক তাপমাত্রা গ্রিন হাউস ইফেক্টের কারণে বাড়ার প্রভাবে ইতোমধ্যে মেরু অঞ্চলে কোটি কোটি বছর ধরে জমে থাকা বরফ গলতে শুরু করেছে। সেই সাথে পর্বতশৃঙ্গে জমে থাকা বরফও গলতে শুরু করেছে। বরফ গলা এ পানি নদীপথে প্রবাহিত হয়ে নেমে আসছে সমুদ্রে। এভাবে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। যা বাংলাদেশসহ অন্যান্য সমতল ভূমির দেশের জন্য ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনবে। বিজ্ঞানীগণ আশঙ্কা করছেন, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ক্রমাগত হারে বৃদ্ধি পেতে থাকলে ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশ, মালদ্বীপ প্রভৃতি দেশের মতো সমতল দেশগুলোর বিশাল অঞ্চল পানির নিচে চিরতরে তলিয়ে যাবে। এছাড়া সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির কারণে ত্বক-ক্যান্সারসহ অন্ধত্ব ও বিভিন্ন জটিল রোগে আক্রান্ত হবে মানবজাতি। প্রচণ্ড উত্তাপের কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন বনাঞ্চলে দাবানল সৃষ্টি হবে। সমুদ্রের স্রোত পরিবর্তিত হবে। সবুজ-শ্যামল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মরুকরণ প্রক্রিয়া শুরু হবে। বন্যা, খরা, এসিড বৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস পৃথিবীবাসীর জীবন ও জীবিকা বিপন্ন করে তুলবে। এভাবে গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়া বিশ্বকে ধ্বংসের দিকে ধাবিত করবে। বাংলাদেশে গ্রিন হাউস ইফেক্টের ক্ষতিকর প্রভাবগুলো পরবর্তী পৃষ্ঠায় চিহ্নিত করা হলো :

১. **বঙ্গোপসাগরের উচ্চতা বৃদ্ধি :** গ্রিন হাউস ইফেক্টের একটি সম্ভাব্য পরিণতি হলো সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি। গ্রিন হাউস ইফেক্টের ফলে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে যার ফলে ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে এবং পানি সম্প্রসারিত হয়ে পানির আয়তন ও পরিধিকে বাড়িয়ে তুলবে। এছাড়া বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে হিমালয় পর্বতশৃঙ্গে জমে থাকা বরফ গলতে শুরু করবে, যা নদী পথে প্রবাহিত হয়ে সাগরের পানির পরিমাণ আরও বাড়িয়ে তুলবে। এছাড়া উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে মেরু অঞ্চলের বরফ গলতে শুরু করবে, যা ক্রমাগতভাবে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি করবে। বাংলাদেশে প্রতিবছর সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির হার ৭ মিমি কিন্তু এ তুলনায় ভূ-পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির হার ৫-৬ মিমি/বছর। অর্থাৎ প্রতিবছর সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির পরিমাণ ১-২ মিমি/বছর। সমুদ্র থেকে ৯০ কিমি দূরে অবস্থিত বরিশাল জেলা সমুদ্রসীমা থেকে ৩ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। তাই সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা যদি বছরে ৩ মিমি বৃদ্ধি পায় তবে এক হাজার বছর পরে বরিশাল শহর সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে যাবে। এছাড়া সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির এ ধারা অব্যাহত থাকলে কক্সবাজার, চট্টগ্রামসহ অন্যান্য উপকূলবর্তী দ্বীপ ও এলাকাসমূহ পানির নিচে তলিয়ে যাবে। আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ সুন্দরবনের অস্তিত্বও হুমকির সম্মুখীন হবে।

২. **ভূপৃষ্ঠের নিচু এলাকায় প্লাবন :** গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়ার প্রভাবে বায়ুমণ্ডল ও ভূপৃষ্ঠের উষ্ণতা ক্রমাগত বাড়তে থাকবে। যার প্রভাবে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে এবং উপকূলীয় দ্বীপ, শহর ও বনাঞ্চল পানির নিচে তলিয়ে যাবে। পরিবেশ বিজ্ঞানীদের মতে অচিরেই বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে যাবে। এর ফলে বাংলাদেশের প্রায় ১ লাখ ২০ হাজার বর্গ কিলোমিটার এলাকা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্লাবনজনিত ক্ষতির সম্মুখীন হবে। এমনকি সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ১ মিটার বৃদ্ধি পেলে বাংলাদেশের মোট ভূ-ভাগের ১৭ শতাংশ পানির নিচে তলিয়ে যাবে। যার ফলে দেশের মোট জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

৩. **অতিবৃষ্টি :** গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়ার ফলে জলবায়ুতে পরিবর্তন আসবে। জলবায়ু পরিবর্তিত হলে বাংলাদেশে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বাড়বে। এতে বর্ষাকালে নদ-নদীর পানি প্রবাহের মাত্রা বেড়ে যাবে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ইতোমধ্যে আমাদের দেশে বৃষ্টিপাত প্রায় সব ঋতুতেই পরিলক্ষিত হচ্ছে। এভাবে বৃষ্টিপাত বৃদ্ধি পাওয়ার প্রভাবে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বন্যা দেখা দেবে।

৪. **প্রাকৃতিক সম্পদের ধ্বংস সাধন :** গ্রিন হাউস ইফেক্টের ক্ষতিকর প্রভাবে আমাদের অতি মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদের আধার সুন্দরবন মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হবে। পরিবেশ ও ভূবিজ্ঞানীদের মতে সমুদ্রের পানির উচ্চতা মাত্র ১ মিটার বা ৩.৩৩ ফুট বৃদ্ধি পেলে সুন্দরবনের প্রায় ৭০ শতাংশ তলিয়ে যাবে। এর প্রভাব নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত ভয়াবহ। দেশের বনজ সম্পদ বিনষ্ট হবে এবং বিভিন্ন দুর্লভ প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটবে। যার প্রভাব পড়বে বাস্তুসংস্থানে এবং বাস্তুসংস্থান তার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলবে এবং পরিবেশ বিপর্যয়ের মাত্রা আরও ঘনীভূত হবে।

৫. **লবণাক্ততার বিস্তৃতি :** বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ১৫ শতাংশ সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে বসবাস করে। IPCC-র সমীক্ষানুযায়ী, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ১০০ সেমি বৃদ্ধি পেলে ২৫,০০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় লোনা পানি অনুপ্রবেশ ঘটবে। ফলে দেশের প্রায় ৩ কোটি ৫০ লাখ লোকের জীবন ও জীবিকা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সমুদ্রস্ফীতির কারণে খুলনা, বাগেরহাট, পিরোজপুর, নোয়াখালী, পটুয়াখালী, বরগুনা প্রভৃতি জেলার কৃষি জমিতে সহজেই লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ ঘটবে। ফলে

এসব জেলার আবাদি কৃষি জমি কৃষি কাজের অনুপযোগী হয়ে পড়বে। মানুষের ব্যবহার্য স্বাদু পানির উৎস বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এছাড়া স্বাদু পানির মৎস্য সম্পদের বিলুপ্তি ঘটবে। এভাবে গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়া আমাদের দেশের বিপুল পরিমাণ জনগোষ্ঠীর জন্য মারাত্মক হুমকি ডেকে আনবে।

৬. **মরুভূমির বৈশিষ্ট্য :** গ্রিন হাউস ইফেক্টের ফলে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে, সেই সাথে ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রাও বেড়ে যাবে। যার প্রভাবে মাটিতে প্রয়োজনীয় পানির পরিমাণ কমে যাবে এবং সমগ্র ভূমি মরুভূমিতে পরিণত হবে। দেশের উত্তরাঞ্চলে ইতোমধ্যে মরুভূমির বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়েছে। এর ফলে ফসল উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশে শীত মৌসুমে প্রায় ৩৬,০০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা খরার কবলে পড়ে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে খরার ব্যাপ্তি আরও বাড়বে এবং খরাকবলিত এলাকা ভবিষ্যতে ২২,০০০ বর্গ কিলোমিটার পর্যন্ত সম্প্রসারিত হবে। তাছাড়া আমন মৌসুমে খরার প্রকোপ বাড়লে মাঝারি ধরনের খরাকবলিত এলাকা চরম খরাকবলিত এলাকায় পরিণত হবে।

৭. **এসিড বৃষ্টি :** গ্রিন হাউস ইফেক্টের ফলে বায়ুমণ্ডলে বিভিন্ন ক্ষতিকর গ্যাসের মাত্রা ও পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব ক্ষতিকর অক্সাইডসমূহ বৃষ্টির পানির সাথে এসিড বৃষ্টি হিসেবে ভূপৃষ্ঠে পড়বে। যার ফলে ভূপৃষ্ঠের উর্বরতা আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পাবে এবং বনাঞ্চলে এসিড বৃষ্টি হলে বনাঞ্চল ধ্বংস হবে এবং বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীর বিলুপ্তি ঘটবে। বাস্তুসংস্থানের ভারসাম্য বিনষ্ট হবে এবং পরিবেশ বিপর্যয় আরও ত্বরান্বিত হবে।

৮. **ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের প্রকোপ বৃদ্ধি :** গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়ার ফলে সাগর উত্তাল হয়ে উঠছে। নিম্নচাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে অতি বন্যা ও দীর্ঘমেয়াদি বন্যা, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড়ের প্রাদুর্ভাব ঘন ঘন পরিলক্ষিত হচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে 'সিডরের' আঘাতে বাংলাদেশের উপকূলবর্তী জেলাসমূহের বিপুল পরিমাণ জনগোষ্ঠীর সলিল সমাধি ঘটেছে। সেই সাথে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদেরও বিপুল ক্ষতি সাধিত হয়েছে। গত দেড় দশকে বাংলাদেশ ভয়াবহ বন্যার সম্মুখীন হয়েছে। ১৯৮৮ সালের দুমাসব্যাপী বন্যায় দেশের ৫৩টি জেলাই প্লাবিত হয়েছিল। ১৯৯১ সালে উপকূলীয় এলাকায় আঘাত হেনেছিল ভয়াবহ জলোচ্ছ্বাস। ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশে দেখা দিয়েছিল ইতিহাসের সবচেয়ে দীর্ঘমেয়াদি বন্যা যা প্রায় তিন মাস স্থায়ী হয়েছিল।

৯. **আবহাওয়াগত বিপর্যয় :** গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়ার ফলে দেশের উত্তরাঞ্চলে মরুকরণ প্রক্রিয়া লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। ফলে বিশাল এলাকা ভবিষ্যতে অনুর্বর, নিষ্ফলা হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। চিরাচরিত ঋতুচক্র ভেঙে যাচ্ছে। দেখা দিয়েছে অতি শীত ও গ্রীষ্মের দাপট। গ্রীষ্মকালে শীত ও শীতকালে অকাল বন্যার প্রাদুর্ভাবও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ২০০৪ সালে বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে। ক্রমশ নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলের এ দেশটির আবহাওয়া চরমভাবাপন্ন হয়ে উঠছে, যা কৃষিসহ আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

গ্রিন হাউস ইফেক্ট প্রতিকারের উপায় : গ্রিন হাউস ইফেক্ট শুধু বাংলাদেশ নয় বরং সমগ্র বিশ্বের জন্য এক ভয়াবহ সংকট। এ বিপর্যয় রোধে আমাদের যেসব বিষয়গুলোর ওপর গুরুত্ব দিতে হবে তা হলো–

১. বনায়ন কর্মসূচি হাতে নিতে হবে। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বনায়ন বাড়াতে হবে। উপকূলবর্তী জেলাসমূহে অধিক হারে বৃক্ষ রোপণ করতে হবে। কারণ একমাত্র বৃক্ষই প্রকৃতি থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস শোষণ করে।

২. বৃক্ষ নিধন রোধ করতে হবে। বৃক্ষ ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের তীব্রতা কমিয়ে আনে এবং প্রকৃতিকে অক্সিজেন দিয়ে বিশুদ্ধ রাখে।
৩. যেসব গ্যাস বায়ুমণ্ডলের উত্তাপ বাড়ায় তাদের নির্গমন রোধ করতে হবে।
৪. গ্যাসের চুলা ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি অকারণে খোলা রাখা যাবে না। অপচয় রোধ করতে হবে।
৫. পরিবেশ বান্ধব জ্বালানির ব্যবহার বাড়াতে হবে।
৬. শিল্পকারখানায় জ্বালানির সাশ্রয় করতে হবে।
৭. পচা, ডোবা ও মজা পুকুরে মাছ চাষ করতে হবে। কারণ পচা পানিতে মিথেন গ্যাস উৎপন্ন হয়।
৮. চাষাবাদ পদ্ধতির পরিবর্তন আনতে হবে।
৯. শিল্পবর্জ্য পুনরায় বিশুদ্ধকরণের ব্যবস্থা নিতে হবে।
১০. দূষণ রোধে সরকার ও দেশের সকল শ্রেণীর মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে।

উপসংহার : গ্রিন হাউস ইফেক্ট একটি বৈশ্বিক সংকট। বাংলাদেশ এ প্রতিক্রিয়ার অসহায় শিকার। ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূ-প্রাকৃতিক অবকাঠামো বাংলাদেশকে যতখানি এ সংকটের কুফলভোগী করেছে, সংকট সৃষ্টিতে আমাদের দেশের ভূমিকা তার চেয়ে নগণ্যই বটে। বাংলাদেশের মতো ক্ষুদ্র একটি দেশের জন্য এর প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা ও সামর্থ্য খুবই সীমিত। এ সীমাবদ্ধতার কথা মাথায় রেখেই কৌশলগতভাবে অগ্রসর হতে হবে, যাতে দীর্ঘকালীন প্রতিক্রিয়ার হাত থেকে মানবজাতিকে রক্ষা করা যায়।

০৬ ‖ প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার কতটুকু প্রস্তুত বলে আপনি মনে করেন? বর্তমান অবস্থার উন্নয়নে কি কি পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন— সুপারিশসহ আলোচনা করুন।

উত্তর : গোটা পৃথিবী আজ এক কঠিন সংকটে নিপতিত। যে সংকট মানুষ নিজেই সৃষ্টি করেছে, প্রতিদিন সে-ই সংকটকে ঘনীভূত করে চলেছে। বন উজাড় করে মাটির তলা থেকে বেশুমার তেল তুলে ও পুড়িয়ে মানুষ বিশেষ করে উন্নত বিশ্বের মানুষ আরাম-আয়েশী জীবন কাটাচ্ছে। তাতে বেড়ে যাচ্ছে পৃথিবীর তাপমাত্রা। নদ-নদীর গতিপথ যথেচ্ছভাবে পরিবর্তন করিয়ে চলেছি আমরা। দূষণের মাত্রা এতটা বাড়িয়ে দিয়েছি যে পর্বতশীর্ষে ও মেরু এলাকায় জমে থাকা বরফ গলছে অতি দ্রুততায়। ফলে বেড়ে যাচ্ছে সমুদ্রের পানির উচ্চতা। পরিবেশ বিজ্ঞানীগণ সতর্ক করে আসছেন, এভাবে বিশ্বের উষ্ণতা আর দুই ডিগ্রী সেলসিয়াস বেড়ে গেলে পৃথিবীর বহু ভূ-ভাগ পানির নিচে চলে যাবে। এ তালিকায় আছে বাংলাদেশও। বলা হচ্ছে, বর্তমান হারে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে আর মাত্র ১৫-২০ বছরেই বাংলাদেশের পাঁচ ভাগের এক ভাগ এলাকা পানির নিচে চলে যাবে। লবণাক্ততা গ্রাস করবে প্রায় সমগ্র বাংলাদেশকে। আর ভূমিকম্প, প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, খরা, নদীভাঙনসহ নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মানুষের অস্তিত্ব সংকটাপন্ন হবে। এর ফলে বাংলাদেশ হয়তো একদিন বসবাসেরই অযোগ্য হয়ে উঠবে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ : মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ওপর প্রতিকূল প্রভাব রয়েছে এমন যে কোনো প্রাকৃতিক ঘটনাই প্রাকৃতিক দুর্যোগ। প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রাকৃতিকভাবে সংঘটিত ঘটনাবলী যা শুধু মানবসৃষ্ট ভৌত ব্যবস্থাদির উপস্থিতির কারণেই ক্ষতিকর বলে বিবেচিত হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিস্তার এবং প্রভাব পৃথিবীর সব দেশে সমান নয়। উন্নত দেশের তুলনায় উন্নয়নশীল দেশসমূহে সৃষ্ট দুর্যোগে জীবন ও সম্পদহানির পরিমাণ অনেক বেশি।

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান প্রাকৃতিক দুর্যোগ : ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা, নদীভাঙ্গন, ভূমিকম্প, উপকূলীয় ভাঙ্গন, ভূমিধস, প্রাকৃতিক কারণে ভূগর্ভস্থ পানি দূষণ প্রভৃতি বাংলাদেশের প্রধান প্রাকৃতিক দুর্যোগ। ভূগর্ভের প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহের মধ্যে এখানে কেবল ভূমিকম্পের ঝুঁকি রয়েছে; অগ্ন্যুৎপাতের সম্ভাবনা কম। নিচে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :

১. **ঘূর্ণিঝড় :** বাংলাদেশের ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ এটি। তীব্র বাতাস, প্রায়শই ভারি বৃষ্টিপাত আর বজ্র বিদ্যুৎ, সমুদ্রে ফুসে ওঠা উঁচু ঢেউয়ের উত্তাল অবস্থা সবমিলে এই হলো ঘূর্ণিঝড়ের চিত্র। বাংলাদেশের চোঙ আকৃতির উপকূলীয় অঞ্চলটি বঙ্গোপসাগরে প্রায়শই ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির ভূগত কারণ হিসেবে চিহ্নিত। বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড়ের ফলে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বেশি হওয়ার কারণ বিস্তৃত নিম্ন সমতল ভূমি, জনসংখ্যার ঘনত্বের উচ্চমাত্রা এবং ঘরবাড়ির দুর্বল নির্মাণ কাঠামো।

২. **টর্নেডো ও কালবৈশাখী :** টর্নেডো বাংলাদেশে প্রাক্‌বর্ষা উষ্ণ মৌসুমে আকস্মিকভাবে ঘটে, বিশেষত এপ্রিল মাসে যখন তাপমাত্রা সর্বোচ্চ পর্যায়ে থাকে। একটি টর্নেডোর ব্যাস কয়েক মিটার থেকে প্রায় দুই কিলোমিটারের মতো হতে পারে। বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে টর্নেডো তুলনামূলকভাবে অধিক সংঘটিত হয়। সাধারণত এপ্রিল-মে মৌসুমে বাংলাদেশের ওপর দিয়ে বয়ে যায় উত্তর-পশ্চিমাভিমুখী প্রচণ্ড ঝড়, স্থানীয়ভাবে যা 'কালবৈশাখী' নামে পরিচিত। কালবৈশাখীর সাথে সাধারণভাবে শিলাবৃষ্টি দেখা যায়। বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চলে কালবৈশাখী শেষ বিকেলে অধিক হারে ঘটে থাকে। কারণ ঐ সময় ভূ-পৃষ্ঠের বিকিরণকৃত তাপপ্রবাহ বায়ুমণ্ডলে সঞ্চালিত হয়। যে কারণে সন্ধ্যাকালে এ ঝড়ের প্রাদুর্ভাব ঘটে।

৩. **জলোচ্ছ্বাস :** বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড়সমূহের সাথে ঝড়ো জলোচ্ছ্বাস এবং জোয়ার জলোচ্ছ্বাসেরও সৃষ্টি হয়, যা ঘূর্ণিঝড়ের প্রচণ্ড শক্তিশালী বাতাস অপেক্ষা অনেক বেশি ধ্বংসলীলা সম্পাদন করে। বাংলাদেশে এপ্রিল-মে মাসে এবং সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর মাসের মধ্যে মেঘনা মোহনা ও অন্যান্য দক্ষিণাঞ্চলীয় উপকূল এলাকায় জোয়ার জলোচ্ছ্বাস দেখা যায়।

৪. **বন্যা :** প্রচুর বৃষ্টিপাত অথবা নদ-নদীর পানি বৃদ্ধির কারণে ভূভাগের প্লাবিত হয়ে পড়াই হচ্ছে বন্যা। সাধারণত ভারি বৃষ্টিপাত, বরফ অথবা তুষার গলা পানি অথবা এদের মিলিত পানি নদী প্রণালীর ধারণক্ষমতাকে ছাড়িয়ে গেলে বন্যা সংঘটিত হয়। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান, ভূ-কাঠামো, ভূ-প্রকৃতি এবং ভূমিরূপ বন্যা সংঘটনের জন্য দায়ী।

৫. **ভূমিকম্প :** বাংলাদেশের উত্তরে এবং উত্তর-পূর্বে রয়েছে উচ্চ ভূকম্প সক্রিয় এলাকা। প্রধান ভূমিকম্পসমূহের কিছু এ অঞ্চল থেকে উৎপত্তি হয়েছে এবং দেশের সংলগ্ন এলাকাসমূহ এর প্রভাবাধীন। বাংলাদেশকে তিনটি ভূ-কম্পবলয়ে বিভক্ত করা যায়। যথা– (i) দেশের উত্তরাঞ্চলীয় অংশের আওতায় রয়েছে রংপুর, ময়মনসিংহ এবং সিলেটের শহর এলাকা বলয়– ১ ভূকু। (ii) দিনাজপুর, বগুড়া, ঢাকা ও চট্টগ্রামের শহর এলাকা বলয়-২ ভূকু। (iii) দেশের দক্ষিণাঞ্চল সর্বনিম্ন ভূমিকম্প সক্রিয় অঞ্চল এবং অঞ্চল বলয়-৩ ভূকু।

৬. **নদীভাঙন :** প্রতিবছর এদেশের লক্ষ লক্ষ অধিবাসী নদীভাঙনের শিকার হয়। মাঠের শস্য, ক্ষেত ও বসতভিটার জমি বিলীন হয়ে যায় নদীভাঙনের মাধ্যমে। এক পরিসংখ্যান মতে, বাংলাদেশের সর্বমোট প্লাবনভূমির প্রায় ৫% ভূমি প্রত্যক্ষভাবে নদীভাঙনের কবলে পড়ছে। নদীভাঙনে অধিকমাত্রায় সমর্থ নদীগুলো হলো গঙ্গা, যমুনা, পদ্মা এবং মেঘনা। নদীভাঙনের ফলে একটি বিশাল অঞ্চল নদীগর্ভে হারিয়ে যায়।

৭. **ভূমিধস :** বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পার্বত্য এলাকায় একটি সাধারণ ঘটনা হলো ভূমিধস। বিশেষত বান্দরবান এবং রাঙ্গামাটি জেলায় ভূমিধস একটি বড় ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ। বর্ষা মৌসুমে প্রাকৃতিক এবং মানবসৃষ্ট উভয়ভাবে ভূমিধসের ঘটনা ঘটে। খাড়া পাহাড়ি ঢালে জুম চাষ এবং অন্যান্য চাষাবাদ পদ্ধতির প্রভাব ভূমিধস সংঘটনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পাহাড় কাটা ভূমিধসের অপর একটি প্রধান কারণ।

দুর্যোগ পর্যায়সমূহ : দুর্যোগের পর্যায় তিনটি। যথা– ১. দুর্যোগ-পূর্ববর্তী সময়, ২. দুর্যোগের সময়, ৩. দুর্যোগ-পরবর্তী সময়। দুর্যোগ-পূর্ববর্তী সময় দুর্যোগের সম্ভাব্য কারণ, প্রকৃতি, আকার এবং গতিপথ সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করাই সরকারের প্রধান দায়িত্ব। বন্যা সম্পর্কে মূলত আবহাওয়া বিভাগ ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা পূর্ব সতর্কীকরণ দপ্তরই এ কাজটি করে থাকে।

আবহাওয়া অধিদপ্তর উন্নততর প্রযুক্তির মাধ্যমে বর্তমানে ঘূর্ণিঝড়সহ বন্যার বিষয়েও আগাম তথ্য দিয়ে থাকে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের দ্বিতীয় পর্যায়ে সরকার সহ বেসরকারি সাহায্য সংস্থাগুলোর খুব একটা কিছু করার থাকে না। তবে পর্যবেক্ষণসহ প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করতে ব্যস্ত থাকতে হয় মাঠ প্রশাসনকে, বিশেষ করে জেলা প্রশাসনকে। প্রথম পর্যায়ে ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করার বিষয়টিও জেলা প্রশাসনের প্রধান কাজ।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় বাংলাদেশ সরকারের প্রস্তুতি : ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশ সরকার বিআইডিএস (BIDS)-এর অর্থনীতিবিদ ও সমাজবিজ্ঞানী এবং বুয়েটের প্রকৌশলী ও পরিকল্পনাবিদদের নিয়ে তৈরি করে Multipurpose Cyclone Shelter Master Plan। ১৯৮৮ সালের বন্যার পরপরই Flood Action Plan প্রণয়ন করা হয়। ১৯৮৮ সালের শেষদিকে একটি ঘূর্ণিঝড়ে খুলনা অঞ্চল আক্রান্ত হয়েছিল। সেবার বড় ধরনের জলোচ্ছ্বাসও হয়। এ দুটি বিষয় Flood Action Plan-এর সাত নম্বর কম্পোন্যান্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সেখানে উপকূলীয় অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা, বিশেষত বেড়িবাঁধ সংস্কারের বিষয়টিও ছিল। Flood Action Plan-এর ফাইভের বি-তেও সাইক্লোনের বিষয়টি ছিল। পরবর্তীতে 'সমন্বিত উপকূল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা' এবং উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা নীতি প্রণয়ন করা হয়।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য ১৯৯৯ সালের একটি Standing আদেশ আছে যেখানে রাজধানী, জেলা, থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে কে কী করবে তা লেখা আছে।

ক্রমবর্ধমান পরিবেশ বিপর্যয় বর্তমান পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আতঙ্ক। আদর্শিকভাবে একটি দেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় শতকরা ২৫ ভাগ বনাঞ্চল থাকা আবশ্যক। কিন্তু বাংলাদেশ বনাঞ্চলের পরিমাণ মোট আয়তনের শতকরা ১৭.০৮ ভাগ। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় এবং বনসম্পদ উন্নয়নে ২০১৫ সালের মধ্যে দেশের মোট ভূমির শতকরা ২০ ভাগ বনায়নের আওতায় আনার লক্ষ্যে সরকার নানামুখী কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। সামাজিক বনায়ন কর্মসূচির আওতায় প্রতি বছর কয়েক লাখ বাগান সৃজন এবং উপকারভোগীর মধ্যে কয়েক শত কোটি টাকা বিতরণ করছে সরকার। ইন্দোনেশিয়ার বালিতে অনুষ্ঠিত জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বাংলাদেশ ৪টি কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ তথা দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য বাংলাদেশ সরকার ও রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির যৌথ উদ্যোগে গত কয়েক দশকে অর্ধ লক্ষাধিক স্বেচ্ছাসেবকের বিশাল একটি বাহিনী (CPP) তৈরি করা

হয়েছে। ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় লোকজনকে আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়ে যেতে তারা সাহায্য করেন। এ কর্মসূচির ফলে ঘূর্ণিঝড় 'সিডর', 'আইলা' ও 'মহাসেন'-এর মতো সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড়গুলোতে প্রাণহানির সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কমে আসে।

দুর্যোগ প্রতিরোধে বর্তমান অবস্থার উন্নয়নে আবশ্যক পদক্ষেপসমূহ : দুর্যোগ প্রতিরোধে দুর্যোগের পূর্বে ও পরে নানা কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে দুর্যোগের ক্ষতির ভয়াবহতা অনেকাংশে কমিয়ে আনা যেতে পারে। নিচে এরূপ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ সংক্ষেপে তুলো ধরা হলো :

১. **উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী :** সমগ্র উপকূল জুড়ে উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী গড়ে তুললে তা ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, সুনামির মতো ভয়াবহ দুর্যোগে ব্যাপক প্রাণহানি ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করবে। যুক্তরাষ্ট্রের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় জলবায়ু গবেষণা কেন্দ্রের সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী বর্তমান ধারাবাহিকতায় ২০২৫ সালের মধ্যে বিশ্বের উপকূলীয় জনসংখ্যা ৩৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে যারা ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস এবং সুনামির মতো ঝুঁকির মধ্যে বসবাস করবে এবং এ দুর্যোগে প্রাণহানি ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকি আরও বেড়ে যাবে।

২. **আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করা :** উপকূলীয় এলাকায় ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের অপ্রতুলতা ও অব্যবস্থা বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার অন্যতম প্রধান সমস্যা। এলজিইডি'র পরিসংখ্যান মতে– উপকূলীয় ১৪ জেলার ১ হাজার ৮২৭টি আশ্রয়কেন্দ্রে মাত্র ১২ লাখ লোক দুর্যোগের সময় আশ্রয় নিতে পারে, যা ঐ অঞ্চলের মোট জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশেরও কম।

৩. **উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ ও প্রযুক্তি ব্যবহার :** বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড়ে সাধারণত অধিকাংশ লোক নিহত হয় জলোচ্ছ্বাসে ডুবে। উপকূলবর্তী এলাকায় বঙ্গোপসাগরের তলদেশ খুবই অগভীর হওয়ায় ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা সাধারণত অত্যধিক হয়। বিশেষজ্ঞদের গবেষণায় দেখা গেছে জলোচ্ছ্বাসের প্রাথমিক ধাক্কাটা যদি সাগরেই প্রতিহত করা যায় তবে উপকূলে আছড়ে পড়ার সময় এটা আর তেমন ভয়ঙ্কর থাকে না। অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশে জলোচ্ছ্বাসের কবল থেকে উপকূল রক্ষার জন্য কৃত্রিম বাঁধ এবং আরও নানা প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড় প্রবণতা ও জলোচ্ছ্বাসের ভয়াবহতার কথা বিবেচনা করে অচিরেই এসব উদ্যোগ নেয়া জরুরি।

৪. **বহুমুখী ব্যবহার উপযোগী আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ :** নতুন করে আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের ক্ষেত্রে এমন অবকাঠামো তৈরি করতে হবে যা অন্য কাজেও লাগবে। এতে অবকাঠামো ভালো থাকবে। অর্থাৎ এক ধরনের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। স্কুল, ইউনিয়ন পরিষদ ভবন, স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা কমিউনিটি সেন্টারগুলোকে এমনভাবে বানাতে হবে যাতে তা আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এ আশ্রয়কেন্দ্রের কাছে গরু-ছাগলের জন্য মাটির কিল্লা বানানোর বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে। কারণ মানুষ বাঁচানোর পাশাপাশি তাদের পশুসম্পদও রক্ষা করা জরুরি।

৫. **উপকূলীয় রাস্তা নির্মাণ :** সুন্দরবন থেকে টেকনাফ পর্যন্ত সাগরের তীর ঘেঁষে উচ্চ সুবিস্তৃত ও সুদৃঢ় পাকা বাঁধ বা পাকা রাস্তা যথাযথ ডিজাইন অনুযায়ী নির্মাণ করতে হবে। গতানুগতিক বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নয় প্রস্তাবিত পাকা রাস্তা থেকে নিকটস্থ সব জেলার সাথে সংযোগ সড়ক থাকতে হবে। প্রস্তাবিত পাকা রাস্তার ফলে স্থলদেশ প্রান্তে কমপক্ষে ১ কিমি প্রশস্ত স্থানে স্বাভাবিক ভূখণ্ডের চেয়ে কিছু উঁচু করে পরিকল্পিতভাবে পাম, নারিকেল গাছ সহ ঝড়ঝাপ্টা সহ্য করতে পারে এমন গাছ রোপণ করে বনাঞ্চল সৃষ্টি করতে হবে।

৬. **আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা :** পৃথিবীর সবদেশেই যাতে 'গ্রিন হাউস' গ্যাস উদগিরণ নিয়ন্ত্রণসহ পরিবেশ বান্ধব পরিস্থিতি সৃষ্টি করা যায়, তার জন্য বাংলাদেশকে বিশ্ব দরবারে সোচ্চার ও সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে। যেমন বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তন শীর্ষক আন্তর্জাতিক যে সম্মেলনটি ইন্দোনেশিয়ার বালি দ্বীপে অনুষ্ঠিত হয় তাতে বাংলাদেশের বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখা উচিত ছিল কারণ এ সম্মেলনের পূর্বেই বাংলাদেশের উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল সিডরের তাণ্ডবলীলা।

৭. **জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ :** অনিয়ন্ত্রিত জনসংখ্যার বিস্ফোরণ বাংলাদেশের একটি প্রধান সমস্যা। বিশেষ করে ঢাকা শহরের জনসংখ্যা অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধি পরিবেশের জন্য বিরাট হুমকিস্বরূপ। ঢাকা শহরের লোকসংখ্যা ও আয়তন আর বাড়তে দেয়া যাবে না। দেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

৮. **সুপরিকল্পিত নির্মাণ কার্যক্রম :** ঘরবাড়ি, দালানকোঠা এমন সুপরিকল্পিতভাবে বিন্যাস করে প্রস্তুত করতে হবে যেন দুর্যোগের সময় বা পরে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চালাতে কষ্টের মধ্যে পড়তে না হয়। দালানকোঠা, টিনের ঘর এমনকি বাঁশের ঘরও সুদৃঢ়ভাবে স্থাপন করার জন্য দেশবাসীকে কারিগরি পরামর্শ প্রদান করতে হবে। এসব প্রস্তুত করতে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদানেরও ব্যবস্থা নিতে হবে।

৯. **কমিউনিটিভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ :** দুর্যোগপ্রবণ এলাকাগুলোতে জনগণের দুর্যোগ মোকাবিলা করার দক্ষতা বাড়াতে কমিউনিটি ভিত্তিক একটি বড় মাপের কর্মসূচি হাতে নিতে হবে। বিশ্বের বহু দুর্যোগপ্রবণ দেশে বাড়িঘর ও অন্যান্য সম্পদের বীমা ব্যবস্থা আছে। তাই দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে দুর্যোগপ্রবণ এ বাংলাদেশে এ বীমা চালু করতে হবে।

১০. **স্থায়ী পদ্ধতি অবলম্বন :** বাংলাদেশকে প্রতিবছর প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য একটি স্থায়ী পদ্ধতি অবলম্বনের পরামর্শ দিয়েছেন জলবায়ু বিজ্ঞানী ড. আতিকুর রহমান। তিনি জানান– আরও বেশি আশ্রয়কেন্দ্র তৈরি করতে হবে। আর তা শুধু সরকারিভাবে নয়। এজন্য বেসরকারি উদ্যোগকে এগিয়ে আসতে হবে। এ কথা মনে রাখতে হবে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য ব্যক্তিগত প্রতিরোধই অন্যতম প্রধান কাজ।

১১. **চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সমন্বিত প্রয়াস :** ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম বন্যাপ্রবণ এলাকা। কৃষকদের জীবিকা ও সামগ্রিক অর্থনীতির ওপর বন্যার প্রভাব ভয়াবহ। এজন্য সরকার, ব্যাংক, ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান এবং উৎপাদন-উপকরণ সরবরাহকারী সরকারি ও বেসরকারি এজেন্সি থেকে সহযোগিতা পাওয়ার অধিকার তাদের রয়েছে। সংশ্লিষ্ট সবার সমন্বিত প্রয়াসে বন্যাসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করতে হবে।

১২. **দুর্যোগ মোকাবিলায় দরকার সঠিক রাজনৈতিক অঙ্গীকার :** যেসব রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশ নেবে তাদের অবশ্যই দুর্যোগ মোকাবিলায় অঙ্গীকার থাকতে হবে। কিভাবে তারা এ অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করবে, স্পষ্টভাবে তা উল্লেখ করতে হবে। নির্বাচনের পর যখন জাতীয় সংসদ বসবে, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের কমিটি ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলের ঐ অঙ্গীকার পূরণে মূল ভূমিকা রাখবে।

১৩. **স্থানীয় সরকারের ভূমিকা :** দুর্যোগ ঝুঁকি কমাতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরও সক্রিয়, সবল করে তুলতে হবে। স্থানীয় সরকারের প্রকৃত কর্মসূচি ও সম্পদের মাধ্যমে এটি সম্ভব। দুর্যোগ ঝুঁকি কমাতে স্থানীয় সরকারের ভূমিকা নিরাপদ বর্মের মতো হওয়া উচিত। ইরানে ভূমিকম্প হওয়ার পর দুর্গত এলাকায় আন্তর্জাতিক উদ্ধারকারী দলের চেয়ে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলো বেশি মানুষ উদ্ধার করে।

১৪. **বহুমুখী মুক্ত চিন্তা :** বহুমুখী মুক্তচিন্তা এবং বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত ছাড়া দুর্যোগ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। দুর্যোগ মোকাবিলায় সরকারের প্রাথমিক জ্ঞান ও সম্পদ থাকতে হবে। সংবাদমাধ্যমে দুর্যোগ মোকাবিলায় বিষয়সূচি নির্ধারণ ও জবাবদিহিতার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ সম্ভবত একটি অনন্য দৃষ্টান্ত। ইথিওপিয়ায় সংবাদমাধ্যম রুদ্ধ বলে সেখানে খাদ্যসংকট বিরাজমান।

১৫. **অর্থ সরবরাহ :** দুর্যোগের ক্ষতিকর প্রভাব কাটাতে কি করতে হবে, এ ব্যাপারে পর্যাপ্ত জ্ঞান রয়েছে দুর্গত এলাকার মানুষের। কিন্তু এ জ্ঞানকে কাজে লাগাতে অনেক অর্থের প্রয়োজন। দুর্গত এলাকার বেশিরভাগ মানুষের আয় থেকে বাড়তি টাকা থাকে না। কাজেই এক্ষেত্রে সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে। গৃহ নির্মাণ, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ এসব পুনর্গঠন কাজের মাধ্যমে মানসম্পন্ন পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে দুর্গত মানুষের জীবন।

১৬. **Signal System-এ পরিবর্তন দরকার :** বাংলাদেশে প্রচলিত Signal System পরিবর্তন করা দরকার। দেখা গেছে বিভিন্ন মাত্রার ঘূর্ণিঝড়ের একই Signal দেখাতে হয়। Signal-গুলোকে মানুষের আরো কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া দরকার। এ বিষয়ে সাংকেতিক ভাষার চেয়ে বেশি বেশি বিবরণমূলক তথ্য কাজে আসবে। একইভাবে আবহাওয়ার পূর্বাভাস সংক্রান্ত খবরগুলো আরও বেশি সুনির্দিষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

১৭. **সুন্দরবনের সংরক্ষণ ও উন্নয়ন :** ভূপৃষ্ঠে উষ্ণতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বঙ্গোপসাগর ভবিষ্যতে ঘূর্ণিঝড়ের একটা 'ব্রিডিং সেন্টার'-এ পরিণত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে বলে আবহাওয়াবিদরা সতর্ক করে দিয়েছেন, ফলে বাংলাদেশকে ভবিষ্যতে আরও বেশি প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখোমুখি হতে হবে। প্রাকৃতিক ঐসব দুর্যোগ মোকাবিলা করতে সুন্দরবনই সবচেয়ে বেশি কার্যকর বর্ম হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। এ বিবেচনায় সুন্দরবনের সংরক্ষণ ও উন্নয়নই শুধু নয়, উপকূল জুড়ে উল্লম্ব ও আনুভূমিক উভয় দিকে এর পরিকল্পিত বিস্তারের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পরিকল্পনা নেয়া জরুরি।

উপসংহার : পৌনঃপুনিক ভূমিকম্পের দেশ জাপান, লস্ এঞ্জেলস যদি টিকে থাকতে পারে, সমুদ্রবেষ্টিত নেদারল্যান্ডস, সুনামি-সাইক্লোনের জন্য খ্যাত ইন্দোনেশিয়া, ব্রাজিল, কঙ্গো যদি টিকে থাকতে পারে তাহলে বাংলাদেশ পারবে না কেন? ইতিহাস বলে আজ বাংলাদেশে ঝড়, বন্যা, খরার যে পৌনঃপুনিক ছোবল তার জন্য কেবল প্রকৃতিকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। কেননা প্রকৃতির এসব লীলা ও কার্যাবলী মানুষের কৃতকর্মের প্রতিক্রিয়া মাত্র। এ সকল অঘটনের নেপথ্যে রয়েছে মানুষের অবিবেচনা প্রসূত কাজ। আর তাই এখনই এক্ষেত্রে পরিকল্পিত টেকসই ও স্থায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে। এটি সত্যিই যে কোনো দুর্যোগই সম্পূর্ণভাবে প্রতিহত করা সম্ভব নয়, তবে ব্যবস্থাপনা যত ভালো হয় ক্ষয়ক্ষতি তত কমানো সম্ভব। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও নিশ্চয় এর ব্যতিক্রম হবে না।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-০১ বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমারেখা ও অবস্থান বর্ণনা করুন।

উত্তর : প্রায় ষোল কোটি মানুষের এই দেশ, বাংলাদেশ। দেশটির মোট আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার। দক্ষিণ এশিয়ার উত্তর-পূর্বাংশে এ দেশটির অবস্থান। পৃথিবীর মানচিত্রে উত্তর অক্ষাংশের ২০° ৩৪ থেকে ২৬° ৩৮ এবং পূর্ব দ্রাঘিমাংশের ৮৮° ০১ থেকে ৯২° ৪১ মধ্যবর্তী স্থানে বাংলাদেশ অবস্থিত। বাংলাদেশের উত্তরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয় ও আসাম; পূর্বে ভারতের আসাম, ত্রিপুরা, মিজোরাম ও মিয়ানমার; পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। বাংলাদেশের মোট সীমান্ত দৈর্ঘ্য ৫১৩৮ কিমি। এর মধ্যে ভারত সংলগ্ন স্থল ও নৌ সীমান্ত এলাকার দৈর্ঘ্য ৪১৫৬ কিলোমিটার এবং মিয়ানমারের সঙ্গে রয়েছে ২৭১ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত। অন্যদিকে মোট জলসীমার পরিমাণ ৭১১ কিলোমিটার। সেই সাথে বঙ্গোপসাগর তীরবর্তী দেশ হওয়ায় এ দেশের ভূখণ্ডগত সমুদ্রসীমা ১২ নটিক্যাল মাইল এবং অর্থনৈতিক সমুদ্রসীমা উপকূল থেকে ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। দেশটির উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্ত পর্যন্ত অর্থাৎ দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সর্বোচ্চ দূরত্ব ৭৬৫ কিমি। পূর্ব থেকে পশ্চিমে বিস্তৃত সর্বোচ্চ দূরত্ব ৪৬৭ কিমি। আন্তর্জাতিক সময় নির্ধারণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ গ্রিনিচ মান সময় থেকে ৬ ঘণ্টা এগিয়ে রয়েছে। কারণ বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশের অবস্থান পূর্বাঞ্চলীয় সময়াংশে।

প্রশ্ন-০২ বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতিকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে ও কি কি?

উত্তর : বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ ব-দ্বীপ। পদ্মা, যমুনা ও মেঘনা নদী পশ্চিম, উত্তর ও উত্তরপূর্ব দিক থেকে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে একযোগে এ সুবিশাল ব-দ্বীপের সৃষ্টি করেছে। সীমিত উচ্চভূমি ছাড়া সমগ্র দেশ এক বিস্তীর্ণ বৈচিত্র্যহীন সমভূমি। এ দেশের ভূখণ্ড উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ক্রমশ ঢালু। ভূমির বন্ধুরতার পার্থক্য ও গঠনের সময়ানুক্রমিক দিক থেকে বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতিকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। যথা : ১. টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ; ২. প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ বা চত্বরভূমি ও ৩. সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি।

প্রশ্ন-০৩ বাংলাদেশের ওপর দিয়ে কোন ভৌগোলিক রেখা চলে গেছে? বাংলাদেশের জলবায়ুতে এর গুরুত্ব কি?

উত্তর : বাংলাদেশের ওপর দিয়ে যে গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক রেখাটি অতিক্রম করেছে তার নাম কর্কটক্রান্তি রেখা। দেশের মাঝামাঝি দিয়ে এ রেখা অতিক্রম করায় এখানে ক্রান্তীয় জলবায়ু বিরাজ করে। তাছাড়া মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের জলবায়ু ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ু নামে পরিচিত। এর ফলে বাংলাদেশে পরিমিত বৃষ্টিপাত হয়।

প্রশ্ন-০৪ বাংলাদেশ সীমান্তে ভারতের কয়টি রাজ্য আছে? এগুলোর নাম লিখুন।

উত্তর : ভারত বাংলাদেশের অন্যতম প্রতিবেশী রাষ্ট্র। বাংলাদেশ সীমান্তে ভারতের ৫টি রাজ্য রয়েছে। এগুলো হলো পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয়, আসাম, ত্রিপুরা ও মিজোরাম।

প্রশ্ন-০৫ ছিটমহল সমস্যা কি? দহগ্রাম ছিটমহল কোন জেলায় অবস্থিত?

উত্তর : বাংলাদেশের সীমানার মধ্যে ভারতের কিংবা ভারতের সীমানার মধ্যে বাংলাদেশের বিচ্ছিন্নভাবে থেকে যাওয়া ভূখণ্ডই ছিটমহল নামে পরিচিত। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতের ১১১টি এবং ভারতের অভ্যন্তরে বাংলাদেশের ৫১টি ছিটমহল রয়েছে। দহগ্রাম ছিটমহল লালমনিরহাট জেলায় অবস্থিত।

জনমিতিক বৈশিষ্ট্য : নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য
Demographic Features : Ethnic and Cultural Diversity

Syllabus	*Demographic features including ethnic and cultural diversity.*

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১. ১৮৭১ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত জনগণনাসমূহে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী এ দেশের ডেমোগ্রাফিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন। [৩৪তম বিসিএস]

০২. বাংলাদেশের জনাধিক্যের কারণ এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের বিষয়গুলো আলোচনা করুন। [৩২তম বিসিএস]
অথবা, বাংলাদেশের জনাধিক্যের কারণ ও জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের উপায় এবং সরকারি নীতিমালা ও পদ্ধতিসমূহ আলোচনা করুন। [২০তম বিসিএস]

০৩. জনসংখ্যা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নতির পথে অন্যতম অন্তরায়— উক্তিটি কি সম্পূর্ণভাবে সঠিক? জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়? [২৮তম বিসিএস]
অথবা, মানবসম্পদ বলতে কি বোঝায়? বাংলাদেশে মানবসম্পদ উন্নয়নে কি কি পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন? বর্তমানে বাংলাদেশের যে জনসংখ্যা তাকে আপনি সম্পদ নাকি বোঝা (Liability) হিসেবে দেখেন? [২৯তম; ১৫তম বিসিএস]
অথবা, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নতির প্রধান কৌশল হওয়া উচিত জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করা—আলোচনা করুন।

০৪. বাংলাদেশের প্রধান প্রধান উপজাতি কতটি ও কি কি? প্রধান তিনটি উপজাতি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন। [৩৩তম বিসিএস]

০৫. 'বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ'– আপনি এটা কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন? [৩২তম বিসিএস]
অথবা, বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নিয়ে আলোচনা করুন। [১১তম বিসিএস]
অথবা, সংক্ষেপে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্য আলোচনা করুন। [৩৪তম বিসিএস]

০৬. বাংলাদেশের হাওর অঞ্চলের প্রধান সমস্যাসমূহ কি কি এবং কিভাবে ঐ এলাকার অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মানের উন্নতি দ্রুততর করা যায়? [৩১তম বিসিএস]

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

০৭. বাংলাদেশের উপজাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোকপাত করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

০১. সম্প্রদায় ও সাম্প্রদায়িক বলতে কি বুঝায়? [২৭তম বিসিএস]
০২. বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা লিখুন। [২১তম বিসিএস]
০৩. বিগত দুই দশকে বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির প্রভাব আলোচনা করুন।
০৪. মণিপুরী নাচ কি?
০৫. ভাওয়াইয়া কি?
০৬. গম্ভীরা কি?

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১ । ১৮৭১ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত জনগণনাসমূহে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী এ দেশের ডেমোগ্রাফিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন। *[৩৪তম বিসিএস]*

উত্তর : জাতীয় পরিকল্পনার জন্য অন্যতম বিষয় হলো আদমশুমারি বা জনগণনা। দেশের পরিমিত সম্পদের সাথে দেশে বসবাসরত জনসংখ্যার সামঞ্জস্য আছে কি-না সে বিষয়টি সম্পর্কে সঠিকভাবে অবগত হওয়ার জন্য জনগণনা করা হয়ে থাকে। প্রাচ্য অথবা প্রতীচ্যের সরকারসমূহ মধ্যযুগ থেকে কর আদায় অথবা সামরিকবাহিনীতে জনসাধারণের অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনে কখনো কখনো জনগণনার আশ্রয় নিতেন। বর্তমান সময়ে বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে জনসংখ্যা যে হারে বাড়ছে তাতে বিষয়টি অনেকটাই উদ্বেগের। কেননা স্বাধীনতার পরেই ১৯৭৪-এ যে লোকগণনা হয় তাতে দেখানো হয়েছিল প্রায় সাড়ে সাত কোটি জনসংখ্যা। কিন্তু অর্ধ শতাব্দীরও কম সময়ের ব্যবধানে বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ বা প্রায় ১৬ কোটি হয়েছে। স্বাধীনতা উত্তরকাল থেকে এ চল্লিশ বছরে জনসংখ্যা যে হারে বেড়েছে তাতে বিষয়টি অবশ্যই শঙ্কার। কেননা এ জনসংখ্যা সমস্যার কারণে দেশে নানাবিধ সমস্যা দেখা দিচ্ছে।

আদমশুমারি বা জনগণনার বৈশিষ্ট্যসমূহ : জাতিসংঘের সংজ্ঞা অনুযায়ী আদমশুমারিতে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো থাকা প্রয়োজন।

১. প্রতিটি ব্যক্তির তথ্য গণনা,
২. একটি চিহ্নিত এলাকায় সামষ্টিক গণনা,
৩. একই সঙ্গে সারাদেশে কার্যক্রম চালানো এবং
৪. নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে অনুষ্ঠান।

আদমশুমারির জন্য আরো কিছু তথ্য প্রয়োজন, যেগুলো নিম্নরূপ :

১. **ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য :** জনসংখ্যার সমষ্টি, এলাকা-শহর, গ্রাম।
২. **ব্যক্তিগত এবং বাড়িসংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য :** পরিবারের গঠন, বাড়িতে বসবাসকারী সদস্যদের গঠন।
৩. **অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য :** আর্থ-সামাজিক অবস্থা, নির্ভরতা ইত্যাদি।

আদমশুমারির জন্য মূলত দুটি পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়ে থাকে : যথা—

(i) **Dejure বা আইনত :** এ পদ্ধতিতে প্রতিটি মানুষকে তার প্রকৃত আবাসিক এলাকা অনুযায়ী গণনা করা হয়ে থাকে।

(ii) **De fact বা কার্যত :** এ পদ্ধতিতে মানুষের প্রকৃত বাসস্থান যাই থাক না কেন ব্যক্তির শুমারিকালীন উপস্থিতি অনুযায়ী তাকে যে কোনো স্থান থেকে গণনা করা হয়ে থাকে।

১৮৭১ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত জনগণনাসমূহে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী এ দেশের ডেমোগ্রাফিক বৈশিষ্ট্য : জনগণনা বা আদমশুমারিতে ব্যক্তির বয়স, লিঙ্গ, বৈবাহিক অবস্থা, ধর্ম, শিক্ষার হার, জন্ম-মৃত্যু হার, শিশুর জন্ম-মৃত্যু হার ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করা হয়। বাংলায় প্রথম আদমশুমারি বা জনগণনা হয় ১৮৭২ সালে এবং সর্বশেষ স্বাধীন বাংলাদেশে হয় ২০১১ সালে। স্বাধীন বাংলাদেশে হয়েছে ৫ বার (১৯৭৪-২০১১)। নিচে ১৮৭১ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত জনগণনাসমূহে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশের ডেমোগ্রাফিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হলো :

বছর	অবিভক্ত বঙ্গদেশ	বাংলাদেশ এলাকা
১৮৭২	৩,৪৬,৯১,৭৯৯	–
১৮৮১	৩,৭০,২০,৫৬৩	–
১৮৯১	৩,৯৮,১২,১৬৫	–
১৯০১	৪,২৮,৮৮,১৯৪	২,৮৯,২৭,৭৮৬
১৯১১	৪,৬৩,১২,২৬২	৩,১৫,৫৫,০৫৬
১৯২১	৪,৭৫,৯৯,২৩৩	৩,৩২,৫৪,০৯৬
১৯৩১	৫,১০,৮৭,৩৩৮	৩,৫৬,০৪,১৭০
১৯৪১	৬,০৩,০৬,৫২৬	৪,১৯,৯৭,২৯৭
১৯৫১	–	৪,২০,৬২,৬১০
১৯৬১	–	৫,০৮,৪০,২৩৪
১৯৭৪	–	৭,১৪,৭৯,০৭১
১৯৮১	–	৮,৭১,২০,১১৯
১৯৯১	–	১০,৬৩,১৪,৯৯২
২০০১	–	১২,৪৩,৫৫,২৬৩
২০১১	–	১৪,৯৭,৭২,৩৬৪ (অনু)

[উৎস : Census of India (1931, 1941); Bangladesh Population Census, 1991, 2001, 2011]

ক. **১৮৭১-১৯৪১ সাল পর্যন্ত জনগণনা অনুযায়ী ডেমোগ্রাফিক বৈশিষ্ট্য :** ১৮৭২ সালে বাংলায় প্রথম আদমশুমারি পরিচালিত হয়। কিন্তু মানুষের সন্দেহ ও দ্বিধার কারণে প্রথম আদমশুমারি লক্ষ্য অর্জনে সফল হতে পারেনি। লক্ষ্য অর্জনে সফল না হলেও এই আদমশুমারি থেকেই বাংলা একটি মুসলিমপ্রধান রাজ্যরূপে প্রকাশিত হয়। পরবর্তী আদমশুমারিসমূহ ১৮৮৯ এবং ১৮৯১ সালে অনুষ্ঠিত হয়, যা ১৮৭২ সালের আদমশুমারির তুলনায় অনেক বেশি উন্নতমানের ছিল। জনমিতি বিশারদদের মতে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুটি আদমশুমারি গুণগতভাবে যথেষ্ট ভালো ছিল।

১৯৩১-এর আদমশুমারি আংশিকভাবে এবং ১৯৪১-এর আদমশুমারি ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্যতা হারায় তথ্যের ইচ্ছাকৃত বিকৃতির কারণে। হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মের মানুষই তাদের স্ব স্ব ধর্মের পক্ষে মিথ্যা তথ্য প্রদান করে। অন্যদিকে পূর্ববাংলার (পূর্ব পাকিস্তান) প্রথম আদমশুমারি একটি ভিন্ন ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করে। ভারতবর্ষ ও পূর্ববাংলার মধ্যে দ্বি-মুখী ব্যাপক মাইগ্রেশনের কারণে বিভিন্ন জেলার লোকসংখ্যার গণনা দুরূহ সমস্যায় পড়ে।

খ. ১৯৫১-২০০১ সাল পর্যন্ত জনগণনা অনুযায়ী ডেমোগ্রাফিক বৈশিষ্ট্য : ১৯৫১-২০০১ সাল পর্যন্ত জনগণনা অনুযায়ী বাংলাদেশের ডেমোগ্রাফিক বৈশিষ্ট্য নিচে উল্লেখ করা হলো :

১. এক বা পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের বিশেষ করে মেয়ে শিশুদের সংখ্যা প্রতিটি আদমশুমারিতেই কম দেখানো হয়েছে।

২. ১৯৫১-এর আদমশুমারি সুবিন্যস্তভাবে পরিচালিত হয়নি এবং জাতীয়ভাবে শুমারি-পরবর্তী নিরীক্ষা জরিপও পরিচালিত হয়নি। ১৯৫১ সালের আদমশুমারিতে শহর এলাকায় ৫% মানুষ কম গণনা করা হয়েছে ধরা হলেও বাস্তবে তা আরো বেশি বলে ধারণা করা হয়। পরবর্তী সময়ে, জাতীয় পর্যায়ে ৪% মানুষ ১৯৫১-এর আদমশুমারিতে কম ধরা হয়েছে অনুমান করে মোট জনসংখ্যার নতুন হিসাব দেখানো হয়। এই আদমশুমারির মোট জনসংখ্যা যে কারণে প্রভাবিত হয়েছিল তার মধ্যে ছিল প্রথমত, ১৯৪১ পরবর্তী সময়ে বিপুল সংখ্যক নেট মাইগ্রেশন (বহির্গমন বেশি, আগত কম); দ্বিতীয়ত, ১৯৪১ সালের জনসংখ্যা বেশি দেখানো এবং তৃতীয়ত, ১৯৪৩-এর দুর্ভোগ।

৩. সাধারণভাবে ১৯৬১-এর আদমশুমারিকে খুব ভালোভাবে পরিচালিত বলা হলেও বাদপড়া মানুষের সংখ্যা ৮.৬২% ধরে মোট জনসংখ্যা পুনর্বিন্যাস করা হয়।

৪. ১৯৭৪-এর শুমারি-পরবর্তী নিরীক্ষা জরিপের ভিত্তিতে ৪টি প্রধান শহরাঞ্চলে বাদপড়া মানুষের সংখ্যা ১৯.৩% ধরা হয়, অন্যান্য অঞ্চলে তা ৬.৫% ধরা হয়। মোট জনসংখ্যা ৬.৮৮% বাদপড়া মানুষের জন্য পুনর্বিন্যস্ত করা হয়।

৫. ১৯৮১-এর আদমশুমারিতে মোট জনসংখ্যার ৩.১% গণনা করা হয়নি ধরে পুনর্বিন্যস্ত করা হয়।

৬. ১৯৯১-এর আদমশুমারিতে মোট জনসংখ্যার ৪.৬% গণনা করা হয়নি বলে ধরা হয় (গ্রামাঞ্চলে ৪%, ৮.৬% পৌর এলাকায় এবং ৫% অন্যান্য শহর এলাকায়)।

৭. ২০০১-এর আদমশুমারিতে মোট জনসংখ্যার ৪.৯৮% গণনার আয় আনা যায়নি বলে ধরা হয় ৪.৫৪% গ্রামাঞ্চলে, ৫.৮১% পৌর এলাকায়, ৩.৭৩% অন্যান্য শহর এলাকায় ও ৭.৬৭% এসএমএসমূহে অর্থাৎ ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনায়।

গ. ২০১১ সালে জনগণনা অনুযায়ী ডেমোগ্রাফিক বৈশিষ্ট্য : ২০১১ সালের ১৫-১৯ মার্চ বাংলাদেশের পঞ্চম আদমশুমারি ও গৃহগণনা অনুষ্ঠিত হয়। নিচে ২০১১ সালের আদমশুমারি বা জনগণনা অনুযায়ী বাংলাদেশের ডেমোগ্রাফিক বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো :

১. জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৭%।

২. জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১,০১৫ জন বা প্রতি বর্গমাইলে ২,৫২৮ জন।

৩. নারী ও পুরুষের অনুপাত ১০০ ঃ ১০০.৩।

৪. দেশে সাক্ষরতার হার ৫১.৮%। এর মধ্যে পুরুষ ৫৪.১% ও নারী ৪৯.৪৫%।

৫. জনসংখ্যায় বৃহত্তম বিভাগ ঢাকা (জনসংখ্যা ৪,৯৩,২১,৬৮৮ জন), ক্ষুদ্রতম বিভাগ বরিশাল (জনসংখ্যা ৮৬,৫২,৩২৪ জন)।

৬. বাংলাদেশে খানাপ্রতি গড় সদস্য সংখ্যা ৪.৪ জন (অনুমিত)।

৭. গড় আয়ু ৬৯ বছর ইত্যাদি।

ধর্মভিত্তিক জনসংখ্যা : স্বাধীন বাংলাদেশে আদমশুমারি রিপোর্ট অনুযায়ী ধর্মভিত্তিক জনসংখ্যার হার (%) নিচে দেয়া হলো :

ধর্ম	১৯৭৪	১৯৮১	১৯৯১	২০০১	২০১১
মুসলিম	৮৫.৪	৮৬.৭	৮৮.৩	৮৯.৭	৯০.৭
হিন্দু	১৩.৫	১২.১	১০.৫	৯.২	৮.৫
বৌদ্ধ	০.৬	০.৬	০.৬	০.৭	০.৬
খ্রিস্টান	০.৩	০.৩	০.৩	০.৩	০.৩
অন্যান্য	০.২	০.৩	০.৩	০.১	০.২

উপসংহার : আদমশুমারির প্রয়োজনীয়তা সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে মূলত জাতীয় পরিকল্পনার কারণে। বর্তমানে বাংলাদেশের জনসংখ্যা একটি ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতির কারণে (পপুলেশন মোমেন্টাম)। এ বৃদ্ধি আগামী চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছর ধরে ঘটতে থাকবে। এই চলমান প্রক্রিয়ায় শিশু জনসংখ্যার হার দ্রুত হ্রাস পাবে, কর্মক্ষম জনসংখ্যার হার দ্রুত বৃদ্ধি পাবে, জনসংখ্যার নির্ভরতা (Dependency Ratio) অনেক কমে যাওয়ায় নীতি নির্ধারকদের জন্য সুবর্ণ সুযোগ আসবে। উপযুক্ত নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে দ্রুত জাতীয় আয় প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে এগিয়ে যাবে। পপুলেশন মোমেন্টাম চলাকালীন সময়ে দেশের বৃদ্ধ মানুষের আনুপাতিক হারও ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং পরবর্তীকালে জনসংখ্যার নির্ভরতার হারও বৃদ্ধি পাবে। ওই সময়ে আরো একটি প্রক্রিয়া বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় প্রচণ্ড প্রভাব ফেলবে এবং তা হলো ব্যাপক গ্রাম থেকে শহরে মাইগ্রেশন। ঐ মাইগ্রেশনের ফলে খুব দ্রুত বাংলাদেশের শহরাঞ্চলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। তাই ভবিষ্যৎ জনসংখ্যা সম্পর্কে ধারণা পেতে হলেও আদমশুমারির নির্ভুল গণনার বিকল্প নেই। একই সঙ্গে ভবিষ্যতের জনসংখ্যার বৃদ্ধির কারণে জনমিতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরিণতি সম্পর্কে ধারণা পেতে হলেও বয়সভিত্তিক জনসংখ্যার সঠিক গণনা প্রয়োজন।

০২॥ বাংলাদেশের জনাধিক্যের কারণ এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের বিষয়গুলো আলোচনা করুন। *[৩২তম বিসিএস]*

অথবা,* বাংলাদেশের জনাধিক্যের কারণ ও জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের উপায় এবং সরকারি নীতিমালা ও পদ্ধতিসমূহ আলোচনা করুন। *[২০তম বিসিএস]

উত্তর : বর্তমান বিশ্বে বহুল আলোচিত ও আলোড়ন সৃষ্টিকারী সমস্যা হলো জনসংখ্যা বিস্ফোরণ ও পারমাণবিক অস্ত্রের প্রসার। ১৯৭৭ সালে বিশ্বব্যাংকের সাবেক প্রেসিডেন্ট রবার্ট ম্যাকনামারা বলেছেন, 'পারমাণবিক যুদ্ধ ব্যতীত বর্তমানে বিশ্ববাসীর সম্মুখে অন্যতম গুরুতর যে সমস্যা তা হলো জনসংখ্যা স্ফীতিজনিত সমস্যা। একদিক দিয়ে এটি যুদ্ধের চেয়েও ভয়াবহ। কারণ যুদ্ধ নিয়ন্ত্রণ করার উপায় আছে কিন্তু জনসংখ্যা স্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করার কোনো উপায় নেই।' বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৬ সালে এ সমস্যাকে জনসংখ্যা বিস্ফোরণ হিসেবে আখ্যায়িত করে 'এক নম্বর সামাজিক সমস্যা' বলে ঘোষণা দিয়েছে। কাজেই এ সমস্যা সমাধান ও মোকাবিলা করার জন্য দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণ করা আবশ্যক।

বাংলাদেশে জনাধিক্যের কারণ : জনাধিক্য বাংলাদেশের জন্য এক নম্বর সামাজিক সমস্যা, কিন্তু এ সমস্যার পেছনে কোনো একক কারণ দায়ী নয়। বরং বহুবিধ কারণেই জনসংখ্যা সমস্যা আমাদের

দেশে জটিল সামাজিক সমস্যার আকার ধারণ করেছে। যে কোনো দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রক্রিয়া দীর্ঘকালের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, ভৌগোলিক প্রভৃতি কারণে সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান প্রধান কারণগুলো নিচে আলোচনা করা হলো :

১. **ভৌগোলিক কারণ :** ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে বাংলাদেশ নাতিশীতোষ্ণ মৌসুমী অঞ্চলে অবস্থিত। ফলে এ দেশের আবহাওয়ায় অল্প বয়সেই ছেলে মেয়েরা যৌবনপ্রাপ্ত হয় এবং তাদের সন্তান উৎপাদন ক্ষমতা অনেক বেশি থাকে। এছাড়া বাংলাদেশের আবহাওয়া যৌনক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সহায়ক। কাজেই তুলনামূলকভাবে বাংলাদেশের মানুষেরা অল্প বয়সেই সন্তান উৎপাদন ক্ষমতা অর্জন করে। সুতরাং ভৌগোলিক অবস্থিতি বাংলাদেশে জনাধিক্যের একটি অন্যতম কারণ।

২. **বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ :** বাংলাদেশে বিশেষ করে গ্রাম এলাকায় বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের প্রচলন রয়েছে। একটি মহিলা বা মেয়ে ১২ বছর বয়সেই সন্তান ধারণ ক্ষমতা অর্জন করে এবং তা ৪৫ বছর বয়স পর্যন্ত অক্ষুণ্ন থাকে। তাই অল্প বয়সে বিয়ে দিলে সাধারণত সে সন্তান ধারণ করবেই। এভাবে বাল্য ও বহুবিবাহের ফলে পরিবার পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

৩. **খাদ্যাভ্যাস :** বাংলাদেশের বেশির ভাগ জনগণ সাধারণত যেসব খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করে থাকে সেগুলো জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য পরোক্ষভাবে দায়ী। বাংলাদেশের বেশির ভাগ জনগণ অধিক মাত্রায় ভাত, আলু, গম, ডাল ইত্যাদি শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ এবং অল্পমাত্রায় আমিষ জাতীয় খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করায় অধিক সন্তান জন্মদানের ক্ষমতা অর্জন করে। সুতরাং খাদ্যাভ্যাসও বাংলাদেশে জনসংখ্যা সমস্যার জন্য পরোক্ষভাবে দায়ী।

৪. **অজ্ঞতা, অশিক্ষা ও অসচেতনতা :** বাংলাদেশের বেশির ভাগ জনগণই অজ্ঞ, অশিক্ষিত ও অসচেতন। ফলে এসব জনগণের মধ্যে কুপ্রথা ও কুসংস্কার অতিমাত্রায় বিরাজ করে। তাদের অজ্ঞতার কারণে তারা ব্যক্তিগত,পারিবারিক ও সামাজিক তথা জাতীয় জীবনে অধিক জনসংখ্যার বিরূপ প্রভাব সম্পর্কে বলতে গেলে সম্পূর্ণ অসচেতন, যার ফলে তারা পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করে না। এ কারণে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

৫. **শিশু মৃত্যুহারের আধিক্য :** বাংলাদেশে শিশুমৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৩৬ জন। এজন্য শিশু সন্তানের মৃত্যুর আশঙ্কায় পিতা-মাতারা দু-একটি সন্তান নিয়ে ভরসা পায় না এবং অধিক সন্তান জন্ম দিয়ে লালন-পালন করতে আগ্রহী হয়।

৬. **বৃদ্ধকালীন নিরাপত্তার আশা :** বাংলাদেশে বৃদ্ধদের জন্য কোনো সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেই। ফলে পিতা-মাতারা বৃদ্ধকালে সন্তান-সন্ততির ওপর নির্ভর করতে চায়। এভাবে বৃদ্ধকালীন নিরাপত্তার অভাবে বাংলাদেশের অধিকাংশ লোক অধিক সন্তান জন্ম দিয়ে থাকে। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

৭. **পুত্রসন্তান কামনা :** বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ অজ্ঞ ও অশিক্ষিত জনগোষ্ঠী সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণের ক্ষেত্রে পিতা-মাতার ক্রোমোজমজনিত বৈজ্ঞানিক কারণ সম্পর্কে অবহিত নন। সে কারণে সন্তান হওয়া সত্ত্বেও পুত্রসন্তান কামনায় অধিক সন্তানের জন্ম দিয়ে থাকে।

৮. **কৃষিভিত্তিক সমাজ কাঠামো :** বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থা প্রধানত কৃষিভিত্তিক। গ্রাম এলাকার শ্রমজীবী জনগণের শতকরা ৮০ জনই কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। অধিক সন্তান কৃষি কাজের জন্য খুবই সহায়ক। এজন্য কৃষি কাজের সুবিধার্থে অধিক সন্তান জন্মদানের প্রবণতা আমাদের দেশের অনেক পরিবারে লক্ষ্য করা যায়। ফলে গ্রামাঞ্চলে জনসংখ্যা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায়।

৯. **ধর্মীয় কারণ :** বাংলাদেশে জনাধিক্যের অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কার। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ মানুষই অজ্ঞ ও অশিক্ষিত হওয়ায় তারা মাত্রাতিরিক্ত ধর্মভীরু এবং ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ। তাছাড়া স্বল্প জ্ঞানসম্পন্ন মৌলভী সাহেবরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধর্মের অপব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। তারা বলেন, 'মুখ দিয়েছেন যিনি আহার দিবেন তিনি।' ফলে জনগণ বিয়ে ও সন্তান জন্মদান, লালন-পালনকে পবিত্র কাজ বলে মনে করে এবং জন্মনিয়ন্ত্রণকে পাপ বলে মনে করেন। এ ধরনের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির কারণে জনসংখ্যা সমস্যার ব্যাপকতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১০. **অর্থনৈতিক কাজে মহিলাদের কম অংশগ্রহণ :** বাংলাদেশে নারীশিক্ষার স্বল্পতার কারণে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় অর্থনৈতিক কাজে মহিলাদের অংশগ্রহণ খুবই কম। তারা শুধু গৃহস্থালী কাজেই নিজেদের শ্রম নিয়োগ করে থাকে। ফলে তারা সন্তান প্রতিপালনের জন্য অধিক সময় ব্যয় করতে পারে। এ কারণেও তারা অধিক সন্তানের জন্ম দিয়ে থাকে। পক্ষান্তরে কর্মজীবী মহিলারা অধিক সন্তান জন্ম দিতে উৎসাহিত হয় না। সুতরাং অর্থনৈতিক কাজে মহিলাদের কম অংশগ্রহণও বাংলাদেশে জনাধিক্যের জন্য দায়ী।

১১. **অর্থনৈতিক কারণ :** বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য অর্থনৈতিক বিভিন্ন কারণও ব্যাপকভাবে দায়ী। বাংলাদেশে বিশেষ করে পুত্র সন্তান অর্থনৈতিক আয়ের জন্য খুবই সহায়ক। কারণ তারা একটু বড় হলেই অর্থকরী উপার্জন করতে সক্ষম হয়। এছাড়া পুত্রসন্তান যৌতুক লাভের জন্য সহায়ক। তাই পুত্রসন্তান লাভের জন্য অর্থনৈতিক কারণে অনেকে জন্মনিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে না।

১২. **রাজনৈতিক কারণ :** উন্নয়নশীল দেশসমূহে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কারণ দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত লোকদের সহজেই নির্বাচনের প্রচারণা, সভা-সমাবেশ ও আন্দোলনে প্রভাবিত করা সহজ হয়। পাশাপাশি ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করে তাদেরকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা সহজ হয়। সুতরাং পরোক্ষভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়ে রাজনীতির ভূমিকা রয়েছে।

জনাধিক্য সমস্যা সমাধানের উপায় : জনসংখ্যা স্ফীতি বাংলাদেশের জন্য একটি জটিল সামাজিক সমস্যা। এ সমস্যা একক কোনো প্রচেষ্টায় মোকাবিলা করা সম্ভব নয়, বরং বহুমুখী প্রচেষ্টার মাধ্যমে মোকাবিলা করতে হবে। সর্বস্তরের জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে জনসংখ্যা সমস্যা মোকাবিলা করার উপায়গুলো পরবর্তী আলোচনা করা হলো :

১. **জাতীয় পর্যায়ে জনসংখ্যা নীতি প্রণয়ন :** জনাধিক্য সমস্যা কার্যকরভাবে মোকাবিলা করতে হলে জাতীয় পর্যায়ে জনসংখ্যা নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে। জাতীয় পর্যায়ে জনসংখ্যা নীতির মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিকে সুশৃঙ্খল ও যথাযথভাবে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তবেই জনসংখ্যা সমস্যার মতো জটিল সমস্যাকে কার্যকরভাবে মোকাবিলা করা সহজ হবে।

২. **শিক্ষার প্রসার :** শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটিয়েও জনসংখ্যা সমস্যার মোকাবিলা সম্ভব। জনগণ যাতে অধিক জনসংখ্যার কুফল এবং সীমিত জনসংখ্যার সুফল সম্পর্কে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারে সেজন্য জনগণের মাঝে শিক্ষার ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটাতে হবে।

৩. **কৃষির আধুনিকীকরণ :** বাংলাদেশের কৃষিব্যবস্থা এখনো অনুন্নত এবং সনাতন পন্থায় প্রবাহিত হচ্ছে। এ পন্থায় চাষাবাদ করতে অধিক সংখ্যক শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। ফলে গ্রাম্য কৃষকেরা কৃষি কাজের সুবিধার্থে অধিক সন্তান জন্ম দেয়। কাজেই জনসংখ্যাকে কার্যকরভাবে মোকাবিলা করতে হলে কৃষিব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণ করতে হবে, যাতে কৃষক সমাজে সন্তান জন্মদানের প্রবণতা হ্রাস পায়।

৪. **বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ রোধ :** জনাধিক্য সমস্যা প্রতিরোধকল্পে দেশে বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ প্রথা প্রতিরোধ করতে হবে। প্রয়োজনবোধে বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিবাহের বয়স আইনের মাধ্যমে ছেলেদের জন্য সর্বনিম্ন ২৫ এবং মেয়েদের জন্য সর্বনিম্ন ২২ বছর নির্ধারণ করতে হবে।

৫. **ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন :** বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষই প্রচণ্ড ধর্মভীরু। অধিকাংশ মুসলমান বিবাহ ও সন্তান জন্মদানকে পবিত্র কাজ বলে মনে করে এবং পরিবার পরিকল্পনার পদ্ধতি গ্রহণকে নাজায়েজ কাজ বলে মনে করে। তাই সহজ ও বোধগম্য ভাষায় ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্যাদি প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, যাতে এসব ধর্মভীরু জনগণের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আসে।

৬. **গঠনমূলক চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ :** চিত্তবিনোদনের অভাব বাংলাদেশে, বিশেষ করে গ্রামবাংলার জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ। তাই গ্রামীণ পর্যায়ে গঠনমূলক চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা পরিকল্পিত উপায়ে সম্প্রসারণ করতে হবে, যাতে গ্রামবাংলার দরিদ্র জনগণ শুধু স্ত্রীসহবাসকে চিত্তবিনোদনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার না করে।

৭. **চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা :** বাংলাদেশে অধিক শিশু মৃত্যুর কারণে দম্পতিরা অধিক শিশুর জন্ম দিয়ে থাকে। তাই শিশুমৃত্যু রোধকল্পে পর্যাপ্ত পরিমাণে চিকিৎসার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। জনসংখ্যানীতি অনুযায়ী দুটি সন্তানের জন্মদান এবং তাদের বাঁচিয়ে রাখার নিশ্চয়তা যাতে জনগণ লাভ করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

৮. **পুরস্কার প্রদান :** ব্যক্তিগত, দলগত ও সমষ্টিগতভাবে জনসংখ্যা নীতির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অবদান রাখার জন্য পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণকারীদের পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। এতে অন্যরাও পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের ব্যাপারে উৎসাহিত হবে। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অনেকটা হ্রাস পাবে।

৯. **সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সম্প্রসারণ :** ভবিষ্যৎ ও বৃদ্ধ বয়সে নিরাপত্তাহীনতার কারণে যাতে জনগণ অধিক সন্তানের জন্ম না দেয়, তার জন্য দেশে ব্যাপক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি চালু ও সম্প্রসারণ করতে হবে।

১০. **পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির সম্প্রসারণ :** দেশে আরো ব্যাপক হারে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির তৎপরতা বৃদ্ধি করতে হবে। আরো অধিক সংখ্যক ক্লিনিক সৃষ্টি, মাঠকর্মী ও বিশেষজ্ঞ নিয়োগ এবং উন্নত যন্ত্রপাতি ও ওষুধপত্রের সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। তাহলে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি জনগণের কাছে সহজসাধ্য হবে এবং তারা অধিক হারে এ পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারবে। এর মাধ্যমে জনসংখ্যা সমস্যা অনেকাংশেই সমাধান করা সম্ভব হবে।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সরকারি নীতিমালা ও পদ্ধতিসমূহ : বাংলাদেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে জন্মনিয়ন্ত্রণ করা। বাংলাদেশে জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানকল্পে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। নিচে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত নীতিমালা ও পদ্ধতিসমূহ আলোচনা করা হলো :

ক. **নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন :** বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চহার কমিয়ে আনার জন্য সরকারি পর্যায়ে নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারের এ নীতিমালার দুটি দিক রয়েছে। যেমন :

১. গর্ভরোধ পদ্ধতির বর্ধিত চাহিদা পূরণে পর্যাপ্ত ও সহজ গর্ভনিরোধ পদ্ধতির ব্যবস্থা করা এবং
২. স্বাস্থ্য, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আইনগত ব্যবস্থার উন্নতির মাধ্যমে জন্মনিয়ন্ত্রণের নতুন চাহিদা সৃষ্টি করা।

খ. **বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন :** বাংলাদেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য ও নীতিমালার সফল বাস্তবায়নের কৌশল হিসেবে নিচের উপায়গুলো সরকারিভাবে গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়েছে :

১. গর্ভনিরোধ সেবাব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়ন সাধন;
২. মা ও শিশুর স্বাস্থ্যের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া;
৩. বহুমুখী শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে অক্ষরজ্ঞানের পর্যায় বৃদ্ধি করা;
৪. শিক্ষা ও আর্থ-সামাজিক কার্যক্রমের সকল স্তরে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত ও বৃদ্ধি করা;
৫. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে জনগণের সর্বাত্মক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;
৬. ছোট পরিবার গঠনে উৎসাহ ও বড় পরিবার গঠনে নিরুৎসাহ প্রদান করা এবং
৭. সরকারি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণবিষয়ক কর্মসূচির সমর্থনে সহযোগিতা প্রদানে বেসরকারি সংস্থাগুলোর ভূমিকা জোরদার করা।

গ. **পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র স্থাপন করা :** পরিবার পরিকল্পনা ও মাতৃ-শিশু স্বাস্থ্য কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ইউনিয়ন পর্যায়ে পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে ডিসপেনসারি ও উপকেন্দ্রগুলোকে পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে উন্নীত করার কাজ চলছে।

ঘ. **জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম :** বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমগুলোকে নিচের দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা যায় :

১. মাঠ পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;
২. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণকল্পে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করা;
৩. সেবা প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা করা;
৪. পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা।

ঙ. **গবেষণা কার্যক্রম :** বাংলাদেশে জন্মনিয়ন্ত্রণ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নতুন নতুন পন্থা বা পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে। গবেষণা কার্যক্রমের প্রধান ক্ষেত্রগুলো হচ্ছে :

১. প্রজনন ক্ষমতার পর্যায়, গতি নির্ধারক ও ফলাফল সম্পর্কিত সামাজিক ও জনসংখ্যাবিষয়ক গবেষণা;
২. কার্যক্রম পরিচালনা ও নির্দিষ্ট কর্মসূচিবিষয়ক গবেষণা;
৩. প্রজনন ও গর্ভনিরোধ গবেষণা এবং
৪. জনসংখ্যা প্রকল্পগুলোর সফলতা ও ব্যর্থতা মূল্যায়ন গবেষণা।

চ. **বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের গৃহীত কার্যক্রম :** জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় স্ব স্ব কার্যক্রমের মাধ্যমে বিশেষভাবে সহায়তা করে থাকে। যেমন :

১. স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যার সমন্বিত কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রাতিষ্ঠানিক স্বাস্থ্য সুবিধাদি প্রদান করে।
২. পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় জনসংখ্যা পরিকল্পনা, দলিল প্রণয়ন, উন্নয়ন, পরিকল্পনায় জনসংখ্যা বিষয়ক উপাদানগুলোর একীভূতকরণ, জনসংখ্যা কর্মসূচি মূল্যায়ন ও গুরুত্বপূর্ণ উপায় সংক্রান্ত জনসংখ্যা শিক্ষার দায়িত্ব পালন করে থাকে।
৩. পরিবার পরিকল্পনা ও জন্মনিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের জন্য উপজেলা ও গ্রাম পর্যায়ে নিয়োজিত বিভিন্ন জাতি গঠনমূলক ও কল্যাণমূলক কর্মসূচিতে সমন্বয় সাধন করে থাকে।

সরকারের উপরিউক্ত বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ব্যতীত অন্যান্য মন্ত্রণালয়, United Nations Population Fund (UNFPA) এবং বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থাও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহায়তা করে থাকে।

উপসংহার : জনসংখ্যা বিস্ফোরণ বাংলাদেশের জন্য নিঃসন্দেহে অন্যতম সামাজিক সমস্যা। সম্প্রতি বিশ্বব্যাংকের এক দীর্ঘমেয়াদি প্রেক্ষিত সমীক্ষা রিপোর্টে বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শূন্যে নামিয়ে আনার প্রতি গুরুত্বারোপ করে বলা হয়েছে, এক্ষেত্রে এক দশক বিলম্বে ৪ থেকে ৫ কোটি অতিরিক্ত জনসংখ্যা যোগ হবার আশঙ্কা রয়েছে। তাই এ সমস্যা সমাধানকল্পে সরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মসূচির পাশাপাশি দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সমাজকর্মী এবং সর্বস্তরের বিবাহিত দম্পতিদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা উচিত।

০৩। জনসংখ্যা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নতির পথে অন্যতম অন্তরায়—উক্তিটি কি সম্পূর্ণভাবে সঠিক? জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়? *[২৮তম বিসিএস]*
***অথবা,* মানবসম্পদ বলতে কি বোঝায়? বাংলাদেশে মানবসম্পদ উন্নয়নে কি কি পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন? বর্তমানে বাংলাদেশের যে জনসংখ্যা তাকে আপনি সম্পদ নাকি বোঝা (Liability) হিসেবে দেখেন?** *[২৯তম; ১৫তম বিসিএস]*
***অথবা,* বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নতির প্রধান কৌশল হওয়া উচিত জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করা— আলোচনা করুন।**

উত্তর : অতিরিক্ত জনসংখ্যা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। দিনের পর দিন আমাদের দেশে যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে আগামী দিনগুলো আমাদের জন্য আরো ভীতিকর ও আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, জনসংখ্যা কোনো দেশের জন্য অভিশাপ নয় বরং তা আশীর্বাদ। জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করতে পারলে জনসংখ্যার কল্যাণে ও অবদানে দেশ উন্নতির চরম শিখরে অবস্থান করতে সক্ষম হয়। কিন্তু আমাদের দেশে জনসংখ্যা মানবসম্পদে পরিণত হয়নি বলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনগ্রসরতা স্পষ্ট হয়েছে এবং জাতির সামনে ঘন অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ : নানা কারণে কোনো একটি দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পারে। যেসব গুরুত্বপূর্ণ কারণে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়; সেসব বিষয় নিচে উল্লেখ ও আলোচনা করা হলো :

ক. **জলবায়ু ও ভৌগোলিক পরিবেশ :** বাংলাদেশের জলবায়ু উষ্ণ। এ উষ্ণতা আমাদের দেশের যুবক-যুবতীদের দ্রুত যৌবনপ্রাপ্তিতে বিশেষ সাহায্য করে। অকালে বিয়ে ও অপরিকল্পিত সন্তান গ্রহণের ফলে জনসংখ্যা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পায়।

খ. **শিক্ষার অভাব :** আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ অশিক্ষিত। জনসংখ্যার ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে তারা অজ্ঞ। অশিক্ষিত বলেই দূরদর্শিতার বিষয়টি তাদের মধ্যে অনুপস্থিত। ফলে অপরিকল্পিত জীবনযাপনের ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে।

গ. **ধর্মভীরুতা :** জন্মনিয়ন্ত্রণ এদেশের ধর্মভীরু মানুষের কাছে অপরাধের বিষয়। তারা মনে করে, আল্লাহ মুখ দিয়েছেন খাবারের যোগানও তিনি দিবেন। ফলে তারা জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি মানতে চান না।

ঘ. **বাল্যবিবাহ :** গ্রামাঞ্চলে যৌবনে পা দিতে না দিতেই তাদের বিয়ের ব্যবস্থা হয়। বাল্যবিবাহজনিত তাদের সৃষ্ট সমস্যায় গোটা দেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড দুর্বল হয়ে পড়ে।

ঙ. **বহুবিবাহ :** বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের একটু স্বচ্ছল কিংবা ধনাঢ্য জনগোষ্ঠীর অনেকেই একাধিক বিয়ে করেন। স্বাভাবিকভাবেই তখন জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি-প্রকৃতি : বাংলাদেশ বিশ্বের সর্বাধিক ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। আয়তনের দিক থেকে বিশ্বের ৩০০০ ভাগের এক ভাগ মাত্র বাংলাদেশ। কিন্তু জনসংখ্যার দিক থেকে পৃথিবীতে এর স্থান

অষ্টম। ১৯০১ সালে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ছিল প্রায় পৌনে তিন কোটি, ১৯৫১ সালে এ সংখ্যা দাঁড়ায় ৪২.২ মিলিয়ন, ১৯৮১ সালে ৮৯.৯ মিলিয়ন, ১৯৯১ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ১০৯.৮৮ মিলিয়নে উন্নীত হয়। ২০১৪ সালের অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৫ কোটি ৫৮ লাখ। অন্যদিকে UNFPA প্রকাশিত বিশ্ব জনসংখ্যা রিপোর্ট ২০১৪-এ বাংলাদেশের জনসংখ্যা দেখানো হয়েছে ১৫ কোটি ৮৫ লাখ। জনসংখ্যার ক্রমাগত বৃদ্ধি বর্তমানেও অব্যাহত এবং এ ধারা অব্যাহত থাকলে ২০২৫ সাল নাগাদ বাংলাদেশের জনসংখ্যা দ্বিগুণ হবে।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা : বহুবিধ সমস্যার কারণে বাংলাদেশ জর্জরিত। আর এ সমস্যাগুলোর মধ্যে এক নম্বর সমস্যা হলো জনসংখ্যা সমস্যা। ১ লাখ ৪৭ হাজার ৫৭০ বর্গ কিলোমিটারের এ দেশে জনসংখ্যা বাড়ছে জ্যামিতিক হারে। প্রতি মিনিটে জন্ম নিচ্ছে ৩ জনেরও বেশি শিশু। অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৪ অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৭%। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১০১৫ জন।

জনসংখ্যা সমস্যার প্রতিক্রিয়া : জনসংখ্যা সমস্যার দরুন বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়নের অগ্রগতি পদে পদে বিঘ্নিত হচ্ছে। দারিদ্র্য, অশিক্ষা, কুশিক্ষা, অপরাধ প্রবণতা, বেকার সমস্যা ক্রমাগত বাড়ছে। স্বাধীন বাংলাদেশের এসব সমস্যা প্রধান সমস্যা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এসব সমস্যার স্বরূপ পর্যালোচনা করা হলো :

ক. **খাদ্য সমস্যা :** জনসংখ্যার আধিক্যের জন্য আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারছি না। প্রতি বছর বিদেশ থেকে আমাদের খাদ্য আমদানি করতে হয়। জনসংখ্যা যে হারে বাড়ছে, খাদ্য উৎপাদন সে হারে বাড়ছে না বলে অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে।

খ. **কৃষি সমস্যা :** বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ কৃষিনির্ভর। মানুষ বাড়ছে, কিন্তু জমি বাড়ছে না। একই জমি বংশানুক্রমিকভাবে খণ্ড-বিখণ্ড হচ্ছে। খণ্ডিত ক্ষুদ্র কৃষি জোতগুলোতে আনুষ্ঠানিক চাষাবাদ পদ্ধতি ব্যবহার সম্ভব হয়ে উঠছে না।

গ. **শিল্পোন্নয়নে বাধা :** শিল্পোন্নয়নে জনসংখ্যা জনশক্তিতে পরিণত হতে পারে সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিক জনসংখ্যার জন্য খাদ্যাভাব প্রকট হয়েছে। এর অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়ায় কাঁচামালের অভাব দেখা দিয়েছে। কাঁচামালের উৎপাদন আশানুরূপ না হওয়ায় শিল্পোন্নয়নে আঘাত হানছে।

ঘ. **বেকার সমস্যা :** ইচ্ছা এবং কাজের শক্তি থাকা সত্ত্বেও এ দেশের জনগণের বিপুল অংশ কোনো অর্থনৈতিক কাজ পাচ্ছে না। জনসংখ্যার মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি এর অন্যতম কারণ। বেকার সমস্যা থেকে সৃষ্টি হচ্ছে উৎপাদনের অভাব, দারিদ্র্য, সামাজিক অস্থিরতা, জীবনের অনিশ্চয়তা, রাজনৈতিক উত্তেজনা ইত্যাদি।

ঙ. **স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সঙ্কট :** খাদ্যাভাব ও বাসস্থান সঙ্কটে দেশের মানুষের সাধারণ কর্মক্ষমতা কমে যাচ্ছে। যক্ষ্মা, পেটের পীড়া, মা ও শিশুর অপুষ্টি দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। অথচ সুচিকিৎসার উপায় নেই। সাধারণ মানুষের আয়ের সীমাবদ্ধতা, পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা সে সঙ্কটকে তীব্র করেছে।

চ. **মানসিক বিকাশের বাধাগ্রস্ততা :** জনসংখ্যা সমস্যার দরুন মানসিক বিকাশও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপে দেশে মানুষ নানা মানসিক দুশ্চিন্তায় নিমজ্জিত হচ্ছে বলে চিন্তন ও মননে নানা প্রতিবন্ধকতার চিত্র গ্রথিত হচ্ছে। ফলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মানসিক বিকাশের দ্বার ক্রমাগত বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

মানবসম্পদ উন্নয়নে সহায়ক পদক্ষেপ : মানবসম্পদ হলো জনসম্পদের এমন এক গুণগত পরিবর্তন প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে তারা উৎপাদনক্ষম ও দক্ষ জনশক্তি হিসেবে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ক্রমবর্ধিষ্ণুভাবে বলিষ্ঠ অবদান রাখতে পারে এবং মানবীয় শক্তি সামর্থ্যের সর্বোত্তম বিকাশে সক্ষম হয়ে উঠতে পারে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) মানবসম্পদ বলতে ব্যক্তিকে কর্মে নিযুক্ত করার সম্ভাবনা বৃদ্ধির

প্রক্রিয়াকে বুঝিয়ে থাকে। সহজ কথায়, মানবসম্পদ হলো এমন এক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে জনসংখ্যার জ্ঞান, দক্ষতা বৃদ্ধি করে গুণগত পরিবর্তন করা হয়। মানবসম্পদ উন্নয়নে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। যেসব উদ্যোগ জনসম্পদ সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে তা নিম্নরূপ–

ক. **মানবসম্পদ উন্নয়ন ও কারিগরি শিক্ষা :** মানবসম্পদ উন্নয়নের অর্থ হলো শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে উন্নত হওয়ার পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষায় দক্ষ হওয়া। যাতে দক্ষ জনশক্তি সমাজে ও বিশ্বে তাদের অর্জিত জ্ঞানকে কাজে লাগাতে পারে এবং সমাজে তাদের চাহিদা সৃষ্টি হয়। মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য কারিগরি শিক্ষার বিকল্প নেই। সুদান, লিবিয়া, মিশর, কুয়েত, সৌদি আরব প্রভৃতি দেশে প্রাকৃতিক সম্পদ অফুরন্ত। অপরদিকে জাপান বলতে গেলে প্রাকৃতিক সম্পদহীন। তারপরও কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে দেশটি উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেছে।

খ. **মানবসম্পদ ও বিজ্ঞান শিক্ষা :** বর্তমান যুগ হচ্ছে বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞান শিক্ষা ব্যতীত কোনো দেশই কাঙ্ক্ষিত উন্নতি লাভ করতে পারে না। বাংলাদেশের ন্যায় একটি জনবহুল দরিদ্র দেশের সুষম উন্নয়নের চাবিকাঠি নিহিত রয়েছে তার মানবসম্পদ উন্নয়নের মধ্যে। আমাদের রয়েছে বিপুল জনসংখ্যার চাপ, অন্যদিকে বিক্রয়যোগ্য সম্পদের তীব্র সীমাবদ্ধতা। তাই আমাদের মানব উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত বিদ্যার ওপর দখল।

গ. **শিক্ষার প্রসার ও সচেতনতা বৃদ্ধি :** বাংলাদেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠী এখনো অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত। অথচ যে কোনো দেশের অর্থনৈতিক গতিশীলতার জন্য শিক্ষার গুরুত্ব অপরিহার্য। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে জাতীয় অর্থনীতিতে যে ধস নেমে আসছে তাকে রোধ করতে না পারলে জাতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাই সমস্যা হয়ে দেখা দিবে। সেজন্য জনসংখ্যার সমস্যাকে আশু মোকাবিলা করা খুবই জরুরি। এ সমস্যা সমাধানের প্রথম পদক্ষেপ হলো শিক্ষার প্রসার ও এ সম্পর্কে গণসচেতনতা বৃদ্ধি।

ঘ. **মানবসম্পদ উন্নয়ন ও তথ্যপ্রযুক্তি :** বাংলাদেশের মতো ব্যাপক জনসংখ্যা অধ্যুষিত ও সস্তা শ্রমের দেশে মানবসম্পদ উন্নয়নে তথ্যপ্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। পরিকল্পিতভাবে দেশের ব্যাপক শিক্ষিত বেকার জনশক্তিকে তথ্যপ্রযুক্তিতে দক্ষ ও শিক্ষিত করে গড়ে তোলা গেলে দেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নে এক নতুন জগতে প্রবেশ করতে পারে।

ঙ. **শ্রমদক্ষতা বৃদ্ধি :** বাংলাদেশের শ্রম পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিনিয়োগ হয়ে থাকে। মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য ও আমেরিকাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে। তাদেরকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে তোলা সম্ভব হলে দেশের অর্থনীতিতে তাদের ভূমিকা আরো জোরদার হবে।

চ. **ধর্মান্ধতা পরিহার :** ধর্মের নানা কুসংস্কারের কারণে আমাদের দেশের নারীরা ঘরের বাইরে কাজ করতে অনাগ্রহী। আজ দেশের প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে কাজে লাগাতে না পারলে আমাদের অর্থনীতির চাকা সচল রাখা দুঃসাধ্য। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে কাজে আত্মনিয়োগ করলেই দেশ সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। এক্ষেত্রে কুসংস্কার ও ধর্মীয় গোড়ামির পরিহার একান্তভাবেই কাম্য।

এছাড়াও নিম্নলিখিত উদ্যোগ জনসংখ্যা জনসম্পদে রূপান্তরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সহায়ক হবে :

১. জনগণের নৈতিক চেতনার মান বৃদ্ধি করতে হবে।
২. আজকের শিশুরাই আগামী দিনের জাতির চালিকাশক্তি। তাই শিশুদের সঠিক উন্নয়ন জরুরি। জনসংখ্যার এই উল্লেখযোগ্য অংশকে সঠিক দিক নির্দেশনাভিত্তিক পরিচালনা করতে হবে।
৩. সর্বক্ষেত্রে নিয়োজিত শ্রমিকদের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৪. দেশের কারিগরি শিক্ষার সুযোগ খুব সীমিত। সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।
৫. গ্যাস ও তেল সম্পদ উত্তোলনের জন্য আমরা এখনো বিদেশ নির্ভর। তাই সরকারি উদ্যোগে খনিজ বিদ্যা বিভাগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগানো এবং মানবসম্পদ উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করতে হবে।
৬. দেশের জনসংখ্যার বিপরীতে ড. কুদরাত-ই-খুদা কমিশন বর্ণিত পর্যাপ্ত শিক্ষা ও অবকাঠামোগত ব্যবস্থা নিতে হবে।
৭. স্বাস্থ্যখাতের প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।
৮. পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সরকার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও দেশের সব জনগণকে কাজ দিতে সক্ষম নয়। এমতাবস্থায় জনগণ, বিভিন্ন এনজিও এগিয়ে আসলে এবং উদ্যোক্তা তৈরি করলে দেশে মানবসম্পদ তৈরি হবে।
৯. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কৃষিব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল। তাই বেকার জনগোষ্ঠীকে কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদনে উৎসাহী করতে হবে। এ সকল উৎপাদিত দ্রব্যকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন কুটির শিল্প গড়ে ওঠবে এবং সেখানে অধিক সংখ্যক বেকার যুবকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।
১০. আমাদের দেশের শ্রমিক পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত আছে। আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে টিকে থাকার পূর্বশর্ত হলো দক্ষ শ্রমিক তৈরি করা। আমাদের দেশে এ লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মানের অত্যাধুনিক টেকনিক্যাল ও ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা জরুরি। ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড ও ফিলিপাইনে এ ধরনের আন্তর্জাতিক মানের প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে তথ্যপ্রযুক্তি, বিদেশী ভাষা প্রশিক্ষণ, ক্যাটারিং ও কুকিং, হোটেল ম্যানেজমেন্ট, সিভিল, মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, ইলেক্ট্রনিক্স টেকনোলজি ও ড্রাইভিংয়ের মতো পেশায় জনগণকে প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করা হয়ে থাকে। আমাদের দেশে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হলে দেশের লক্ষ লক্ষ অদক্ষ জনগণকে প্রশিক্ষণ দিয়ে আন্তর্জাতিক বাজারে শ্রমের অনুপ্রবেশ ঘটানো সম্ভব হবে।

জনসংখ্যা সমস্যা নয় সম্পদ/জনসংখ্যা বোঝা নয় সম্পদ : বাংলাদেশের মতো একটি দরিদ্র ও জনবহুল দেশে উন্নয়নের মূলমন্ত্র নিহিত আছে মূলত জনসংখ্যার সুষম বণ্টন ও জনশক্তিকে কাজে লাগানোর ওপর। শিক্ষার সকল পর্যায়ে প্রবেশাধিকার (access), সমতা (equity), গুণগত মান (quality), প্রাসঙ্গিকতা (relevance) এবং দক্ষতা (efficiency) ইত্যাদি বিষয়গুলোর সাথে সম্পৃক্ত রেখে জনগণকে দেশের উন্নয়নে সম্পৃক্ত করা গেলে তা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবে। মনে রাখতে হবে জনসংখ্যা উন্নয়নের সহায়ক উপাদান। প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর থাকলেও মানবসম্পদহীন কোনো দেশ উন্নতির চরম শিখরে অবস্থান করতে পারে না। Datton-এর মতামতটি এখানে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণীয়— 'Optimum population is that which gives the maximum income per head.'

বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ একটি দেশ। কাজেই এ দেশের মানুষকে ঠিকমতো কর্মক্ষম করে গড়ে তুলতে পারলে তা জনসম্পদে পরিণত হবে। বর্তমান যুগ বিশ্বায়নের যুগ। বিশ্বায়নের ফলে কর্মশক্তির অবাধ বিচরণ আজ দেশ থেকে দেশান্তরে। বাংলাদেশের বিপুল পরিমাণ জনগোষ্ঠী বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত রয়েছে এবং বৈদেশিক মুদ্রা পাঠাচ্ছে। বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে এ বৈদেশিক মুদ্রার অবদান অসামান্য। কাজেই যদি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এ দেশের লক্ষ লক্ষ জনগণকে প্রশিক্ষিত করা যায়, তাহলে আরো জনবল নিয়োগ করে আমাদের দেশ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সমর্থ হবে। তাছাড়া দেশের অভ্যন্তরীণ কাজে নিয়োজিত শ্রমও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কৃষি, শিল্প, উৎপাদন, বণ্টন, এমনকি ভোগের জন্যও মানুষের প্রয়োজন রয়েছে। বাংলাদেশের জনগণকে যদি দেশের উন্নয়নে নিয়োজিত করা যায়, তাহলে দেশের সার্বিক উন্নতি দ্রুত সম্ভব হবে।

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। আমাদের দেশের শতকরা প্রায় ৪৮.৪% শ্রমিক কৃষি কাজে নিয়োজিত। কাজেই কৃষিব্যবস্থার উন্নয়ন ব্যতীত দেশকে উন্নয়নের দ্বার কোঠায় উন্নীত করা সম্ভব নয়। মৌসুমী বায়ু প্রভাবিত অঞ্চল ও পলি বিধৌত নদীমাতৃক এ দেশে কৃষির সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল। কাজেই কৃষিব্যবস্থায় প্রযুক্তিগত উৎকর্ষসাধন করে উৎপাদনে ভিন্নতা আনয়ন, প্রয়োজনে ভর্তুকি প্রদান, ভূমির মালিকানা ও কাঠামোগত পরিবর্তন করার মাধ্যমে বিপুল জনগোষ্ঠীকে কাজে লাগানো সম্ভব। বিশ্বব্যাংকের এক জরিপে দেখা গেছে বর্তমানে বাংলাদেশে ৫০ হাজার একর জমি বর্গা চাষে রয়েছে, যাতে ২০ লক্ষ শ্রমিকের শ্রম কম প্রয়োজন হচ্ছে। বর্গাপ্রথার উচ্ছেদ ও মালিকানা পরিবর্তনের মাধ্যমে এ সমস্যার আশু সমাধান করা যেতে পারে। ফলে এ শ্রমিকগুলো শ্রম দিতে পারবে এবং দেশের অর্থনীতিকে সচল রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। শ্রীলঙ্কা, ভারত, চীনসহ অনেক দেশ জনশক্তি রপ্তানি করে বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছে। বাংলাদেশও মধ্যপ্রাচ্যসহ ইউরোপ ও অন্যান্য মহাদেশে অনেক জনশক্তি রপ্তানি করেছে। দেশের জনশক্তিকে যথার্থভাবে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করা সম্ভব হলে জনশক্তি রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়ন, নারীর কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এ প্রসঙ্গে Report of the International Conference on Population and Development (New York : United Nations; 1995)-এর ২নং ধারাটি উল্লেখযোগ্য :

'Human beings are at the center of concerns for sustainable development. They are entitled to a healthy and productive life in harmony with nature. People are the most important and valuable resource of any nation.'

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, জনসংখ্যা কোনো দেশের অভিশাপ নয় বরং তা সম্পদ।

মানবসম্পদ উন্নয়নে সরকারি প্রচেষ্টা : বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মানবসম্পদের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। আমাদের দেশের সরকারও এ বিষয়ের সাথে একমত এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির লক্ষ্যে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে দেশের জনগণকে মানবসম্পদে পরিণত করা। এ লক্ষ্যে সরকার পঞ্চম বার্ষিকী পরিকল্পনার আশ্রয় নিয়েছে এবং এতে দেশের মানবসম্পদের উন্নয়নের জন্য নানা পদক্ষেপ নিয়েছে। যেমন—

ক. দেশে পর্যাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন।

খ. দেশে নতুন কারিগরি, প্রকৌশল ও কর্মশিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি।

গ. হাসপাতাল, ক্লিনিক ইত্যাদির অবাধ সম্প্রসারণ ও চার স্তরবিশিষ্ট কাঠামোর স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণ।

ঘ. স্বাস্থ্যসেবার সাথে ডাক্তার ও নার্সদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।

ঙ. সরকারি, বেসরকারি, পিএসসির মাধ্যমে প্রচুর বেকার লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ইত্যাদি।

উপসংহার : জাতীয় উন্নয়নে মানবসম্পদের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সুতরাং বাংলাদেশের মতো জনবহুল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করার কোনো বিকল্প নেই। বাংলাদেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে আধুনিক যন্ত্রনির্ভর প্রশিক্ষণ ও ভাষাগত জ্ঞান দিয়ে যথাযথ মানবসম্পদে পরিণত করতে পারলে স্বদেশে ও বিদেশে ব্যাপক কর্মসংস্থান এবং মানবসম্পদের সদ্ব্যবহার সম্ভব হবে। আজকের উন্নত বিশ্ব প্রমাণ করে দিচ্ছে যে, দক্ষ মানবশক্তি ছাড়া রাষ্ট্রের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। আমাদের দেশেও এ কথা দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা যায়, জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করার মধ্য দিয়েই দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব। সুতরাং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নতির প্রধান কৌশল হওয়া উচিত জনসংখ্যা সমস্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করা।

০৪। বাংলাদেশের প্রধান প্রধান উপজাতি কতটি ও কি কি? প্রধান তিনটি উপজাতি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন। *[৩৩তম বিসিএস]*

উত্তর : বাংলাদেশের অন্যতম প্রাচীন জাতিসত্তা উপজাতি বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী। ৪৫টি উপজাতি জনগোষ্ঠী রয়েছে এই ভূখণ্ডে। পঞ্চম আদমশুমারি রিপোর্ট ২০১১-এর তথ্য মতে, দেশের মোট জনসংখ্যার ১.১০% উপজাতি এবং দেশে মোট উপজাতি বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জনসংখ্যা ১৫ লাখ ৮৬ হাজার। তাদের মূলত বসবাস রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, কক্সবাজার, বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট, দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া, রাজশাহী, পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলায়। বাংলাদেশের প্রতিটি উপজাতি জনগোষ্ঠীর রয়েছে পৃথক ভাষা, সমাজ ব্যবস্থা, খাদ্যাভ্যাস ও পোশাক-পরিচ্ছদ।

উপজাতির সংজ্ঞা ও ধারণা : উপজাতি বলতে এমন একটি জনসমষ্টি বা সামাজিক গোষ্ঠীভুক্ত দলকে বুঝায়, যাদের রয়েছে একটি নিজস্ব বিশেষ ভাষা এবং সংস্কৃতি, আর অন্যান্য জাতি থেকে একটু ভিন্নতর, যারা বাস করে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে, যাদের মধ্যে আছে একটি বিশেষ ঐক্যবোধ, যা দ্বারা তাদেরকে একে অন্যের সাথে সম্পৃক্ত করে রাখে।

নৃবিজ্ঞানী কোহেন ও ইয়ামস বলেন, 'উপজাতি বলতে এমন এক জনগোষ্ঠীকে বুঝায়, যারা তাদের জীবিকার জন্য খাদ্য সংগ্রহ, উদ্যান, কৃষি ও পশুপালনের ওপর নির্ভরশীল' (A group of depending on foragine, hariticulture or pastorolism for subsistence)।

টেলর বলেন, 'উপজাতি বলতে বুঝায় এমন একটি জনগোষ্ঠী, যারা মোটামুটিভাবে একটি অঞ্চলে সংগঠিত এবং তাদের মধ্যে রয়েছে সাংস্কৃতিক ঐক্য এবং যার সদস্যরা মনে করে যে, তারা একই সাংস্কৃতিক এককের অন্তর্ভুক্ত।'
উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে বলা যায়, উপজাতীয় সম্প্রদায় আধুনিক জীবিকা পেশাসহ একধরনের নির্দিষ্ট জীবিকা পদ্ধতি অনুসরণ করে, তাদের নির্দিষ্ট সংস্কৃতি রয়েছে এবং তারা এমন একটি এলাকায় বাস করে যা প্রায়শ নির্দিষ্ট কাঠামোতে আবর্তিত। তাদের জীবনধারা পরিচালিত হয় একইরূপ সামাজিক আচার, প্রথা, বিশ্বাস, বিচারব্যবস্থা, অনুসরণীয় রীতি-নীতি এবং মূল্যবোধ দ্বারা। প্রতিটি উপজাতীয় সদস্য নিজেদের মধ্যে পরস্পর এমনভাবে বিশ্বাস পোষণ করে যে, তাদের মাঝে সংহতিভাব গড়ে ওঠে পারস্পরিক রক্ত সম্পর্কের বিশ্বাসের ভিত্তিতে।

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান উপজাতি : বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের তথ্য মতে, বাংলাদেশে বসবাসকারী উপজাতি বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সংখ্যা ৪৫টি। এগুলো হলো : ০১. খিয়াং ০২. খুমি ০৩. চাক ০৪. চাকমা ০৫. তঞ্চঙ্গ্যা ০৬. ত্রিপুরা/টিপরা ০৭. পাংখোয়া ০৮. বম ০৯. মারমা ১০. ম্রো ১১. রাখাইন ১২. লুসাই ১৩. ওরাওঁ ১৪. নুনিয়া ১৫. পলিয়া ১৬. পাহান ১৭. ভুঁইমালী ১৮. মাহাতো ১৯. মাহালী ২০ মুণ্ডা ২১. মুশহর ২২. রবিদাস ২৩. রাঁজোয়াড় ২৪. রাজবংশী ২৫. রানা কর্মকার ২৬. লহরা ২৭. সাঁওতাল ২৮. কন্দ ২৯. কুর্মি ৩০. কোচ ৩১. খাড়িয়া ৩২. খাসী/খাসিয়া ৩৩. গারো ৩৪. ডালু ৩৫. নায়েক ৩৬. পাঙন ৩৭. পাত্র ৩৮. বর্মণ ৩৯. বীন ৪০. বোনাজ ৪১. ভূমিজ ৪২. মণিপুরী ৪৩. শবর ৪৪. হাজং ৪৫. হালাম। এদের মধ্যে প্রধান প্রধান উপজাতি হলো চাকমা, সাঁওতাল, গারো, মারমা, মণিপুরী, তঞ্চঙ্গ্যা, রাখাইন, বম, ত্রিপুরা, খাসিয়া, পাঙন, হাজং প্রভৃতি।

প্রধান তিনটি উপজাতি : বাংলাদেশে বসবাসকারী ৪৫টি উপজাতির মধ্যে বৃহত্তম উপজাতি চাকমা, দ্বিতীয় বৃহত্তম উপজাতি সাঁওতাল এবং অন্যতম বৃহত্তম উপজাতি গারো। নিচে বাংলাদেশের প্রধান এ তিনটি উপজাতি সম্পর্কে বর্ণনা করা হলো :

ক. **চাকমা :** বাংলাদেশে বসবাসকারী উপজাতিদের মধ্যে চাকমা উপজাতি শিক্ষাদীক্ষা ও রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে খুবই উন্নত উপজাতি। চাকমারা পার্বত্য জেলাসমূহের বৃহত্তম উপজাতি। রাঙ্গামাটি,

খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও কক্সবাজার–এ চার জেলাতেই চাকমাদের বসবাস। বর্তমানে দেশে আড়াই লক্ষের বেশি চাকমা জনগোষ্ঠী রয়েছে। নিচে চাকমা উপজাতি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১. **দেহাকৃতি :** নৃতত্ত্বের বিচারে চাকমারা মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত তিব্বতী বার্মন বলে পরিচিত। তাদের মুখমণ্ডল গোলাকার, গোলাপী ওষ্ঠাধর, চোখের মণি কালো, দেহের রং হলদে, চুল সোজা, দাঁড়ি-গোঁফ কম। মেয়েদের গায়ে লোমের মাত্রা খুবই কম।

২. **পরিবার ও সমাজ :** চাকমাদের পারিবারিক কাঠামো মূলত পিতৃতান্ত্রিক। পরিবারে পিতার মতই চূড়ান্ত। আর চাকমাদের জাতীয় প্রধান হলেন রাজা। কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি মৌজা, আর মৌজার প্রধান হচ্ছেন হেডম্যান। তিনি জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত এবং রাজা কর্তৃক মনোনীত হন। হেডম্যানই চাকমাদের সমস্যা, ঝগড়া-বিবাদ মিটিয়ে দেন।

৩. **ধর্ম ও উৎসব :** চাকমারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তবে তাদের কিছু সংখ্যক এখনো প্রকৃতি পূজায় বিশ্বাসী। তারা থানমানা, কর্মকাম, ভাতদ্যা, গাং পূজা, জম মারা প্রভৃতি অনুষ্ঠান করে থাকে। চাকমাদের সবচেয়ে বড় উৎসব হচ্ছে বিঝু উৎসব। তারা তিনদিন ধরে এই উৎসব পালন করে। প্রথম দিনের উৎসবকে বলে ফুল বিঝু, দ্বিতীয় দিনকে বলে মূল বিঝু আর তৃতীয় ও শেষ দিনের উৎসব গোজ্যাই পোজ্য। রথটানা উৎসবও চাকমা সমাজে প্রচলিত আছে। তারা এই উৎসবকে গাড়ি টানা বলে। এছাড়া বৈশাখী পূর্ণিমা ও মাঘি পূর্ণিমা পালন করে।

৪. **বর্ণমালা :** নৃতাত্ত্বিকভাবে তারা মঙ্গোলীয় লোক হলেও চাকমাদের নিজস্ব বর্ণমালা আছে। এ বর্ণমালার সাথে বর্মী ও অহম বর্ণমালার মিল রয়েছে।

৫. **খাদ্যদ্রব্য :** চাকমাদের প্রধান খাদ্য- ভাত, মাছ, মাংস ও শাকসবজি। এছাড়া অন্যান্য খাদ্যের মধ্যে আছে শূকর, কাঁকরা, ব্যাঙ, শামুক, মুরগি, বাঁশকোড়ল, ফুসি, সাবাং ইত্যাদি।

৬. **পোশাক :** পুরুষ চাকমারা খাটলুঙ্গি, ধুতি, পাঞ্জাবী, সাচ ও গামছা পরে। মাথায় খবং বাঁধে। মেয়েরা লুঙ্গি ও ব্লাউজ পরে। মেয়েদের নিচের অংশের পরনের কাপড়ের নাম পিনন আর উপরের অংশের নাম খাদি। তারা রূপার তৈরি বিভিন্ন ধরনের গহনা পরে। চাকমা মেয়েরা তাঁতে কাপড় বুনে নিজেরা পরে এবং বিক্রিও করে।

৭. **বাড়িঘর :** চাকমারা বাঁশ দিয়ে মাচা করে ঘর তৈরি করে। আর গ্রামকে বলে আদম।

৮. **বিবাহরীতি :** চাকমাদের বিয়ের রীতি-নীতি বেশ চমৎকার। প্রাচীনকালের রীতি-নীতি বর্তমানে আর সেভাবে পালিত না হলেও তারা ঐতিহ্য রক্ষা করতে চেষ্টা করে। চাকমা বিয়ের নিয়মানুসারে পাত্রের বাবাকে পাত্রীর বাবার কাছে বিয়ের পূর্বে অন্তত তিনবার যেতে হয়। প্রতিবারে পাত্রীর বাবাকে সৌজন্যমূলক সুখাদ্য ও বস্ত্রাদি উপহার স্বরূপ নিতে হয়।

খ. **সাঁওতাল :** বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম উপজাতি সাঁওতাল। তাদের বাসস্থান মূলত রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া, নওগাঁ, নাটোর, জয়পুরহাট ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায়। তাদের আদি নিবাস ছিল রাঢ়বঙ্গ, সংলগ্ন বিহার ও উড়িষ্যার অরণ্য অঞ্চল এবং ছোট নাগপুর। পরে সরকার নির্ধারিত সাঁওতাল পরগনায় তারা বসবাস শুরু করে। পাবনা, যশোর, খুলনা এমনকি চট্টগ্রাম জেলায়ও অল্পসংখ্যক সাঁওতালদের বসতি ছিল। নিচে সাঁওতাল উপজাতি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১. **দেহাকৃতি :** সাঁওতালরা অস্ট্রিক ভাষাভাষী আদি-অস্ট্রেলীয় জনগোষ্ঠীর বংশধর। তাদের গায়ের রং কালো, উচ্চতা মাঝারি, চুল কালো ও কোঁকড়ানো, ঠোঁট পুরু, দীর্ঘমুখ ও নাক প্রশস্ত।

২. **ভাষা, বর্ণমালা ও সংস্কৃতি :** সাঁওতালদের নিজস্ব ভাষা আছে, তবে বর্ণমালা নেই। সাঁওতালরা হিন্দ-নাগরী ভাষায় কথা বলে। সাঁওতালের রয়েছে নিজস্ব সংস্কৃতি, যা নানা কাহিনী, রূপকথা, উপকথা, লোকগীতি, নৃত্যগীতি ও সঙ্গীত সমৃদ্ধ।

৩. **বাড়িঘর :** সাঁওতালরা ছন বা খড় দিয়ে বাড়িঘর তৈরি করে। তাদের থাকার ঘরগুলো ছোট ছোট, একটি জানালা ও একটি দরজা থাকে। আবার কোনো কোনো ঘরে শুধু একটি দরজা থাকে। দরজাটি সুন্দর করে আল্পনা দিয়ে আঁকা থাকে। তারা ঘর ও মেঝে লেপেমুছে সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রাখে।

৪. **পরিবার :** সাঁওতাল সমাজে পরিবারের প্রধান পিতা। পরিবারের পুরুষদের প্রভাবই বেশি। পিতার মৃত্যুর পর পুত্ররা সম্পত্তির মালিক হয়।

৫. **পোশাক-পরিচ্ছদ :** সাঁওতাল পুরুষেরা আগে নেংটি পরতো। তবে ধনী পরিবারের পুরুষরা ধুতি, লুঙ্গি ও সার্ট পরে। মেয়েরা পরে মোটা শাড়ি। ধনী ঘরের মেয়েরা শাড়ি, ব্লাউজ ও সায়া পরে। মেয়েরা রূপার অলঙ্কার, যেমন– কানের দুল, নথ, হাঁসুলি, মালা ও তাবিজ পরে। সাঁওতাল যুবতীরা খোঁপায় জবা ও শিমুল ফুল পরতে খুবই ভালোবাসে।

৬. **বিবাহ :** সাঁওতাল সমাজে একই গোত্রে বিয়ে করা যায় না। তাদের বিয়ের চার ধরনের রীতি প্রচলিত। বিয়ের অনুষ্ঠানে তারা নাচ, গান, পানাহার এবং খুবই আনন্দ-ফূর্তি করে থাকে।

৭. **ধর্ম ও উৎসব :** সাঁওতালরা জড়বস্তুর পূজা করে। তাদের প্রধান দেবতা হলো সূর্য। তারা সূর্যকে বলে 'সিংবোঙ্গা'। তাদের গ্রাম দেবতা 'মারাংবুরু'। তাদের সকল কাজকর্মের দেবতা 'বোঙ্গা'। সাঁওতালরা সারা বছর নানা পূজা-পার্বণ করে। 'সোহরাই' পূজা তাদের শ্রেষ্ঠ উৎসব। এই উৎসবের সময় সাঁওতালরা আনন্দ-ফূর্তিতে মেতে উঠে। সোহরাই উৎসব চলে তিনদিন পর্যন্ত।

৮. **জীবনধারণ পদ্ধতি :** সাঁওতালদের জীবিকা কৃষিকাজ। তারা ধানসহ নানা রকমের ফসল ফলায়। তারা চা বাগানে, মাটি কাটা ও কুলি কাজও করে থাকে।

৯. **খাদ্যদ্রব্য :** সাঁওতালদের খাদ্য ভাত, মাছ, গরু, মহিষ, শূকর, ভেড়া, হাঁস-মুরগির মাংস। তারা কাছিম ও পাখির ডিম এবং মণ্ডা, বাতাসা, খাজা, গজাও খেয়ে থাকে। তারা ভাত পচানো মদ অর্থাৎ হাড়িয়া নিজেরা তৈরি করে খায়।

গ. **গারো :** বাংলাদেশের অন্যতম বৃহত্তম উপজাতি গারো। গারোদের আদি সমাজ মান্দাই। গারোরা তিব্বতের বার্মান জাতি। তাদের আদি ভূমি ছিল চীন দেশের উত্তর-পশ্চিমে, যেখান থেকে তারা ব্রহ্মপুত্র নদী হয়ে এসে গারো পাহাড়ে প্রবেশ করে। বর্তমানে ময়মনসিংহ, জামালপুর, শেরপুর, নেত্রকোনা, টাঙ্গাইল, সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলায় গারোদের বসবাস। নিচে গারো উপজাতি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১. **ধর্ম :** গারোদের দেবদেবীর মধ্যে আছে সূর্য, চন্দ্র, তারা, বৃষ্টি ইত্যাদি। এছাড়া তারা পাহাড়-পর্বত, নদ-নদীকেও দেবতা জ্ঞানে পূজা করে থাকে। আবার অনেক গারো হিন্দু আচার-পদ্ধতি ও পূজা-পার্বণ করে থাকে। বেশির ভাগ গারো খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে। তারা পূর্বজন্ম বিশ্বাস করে। তাদের বিশ্বাস, অসৎ জীবন যাপন করলে পরজন্মে পশুপক্ষী বা জীবজন্তুরূপে জন্মগ্রহণ করতে হয়।

২. **জীবনধারণ পদ্ধতি :** পাহাড়ি গারোরা জুম চাষের উপর নির্ভরশীল। আর লামদানী গারোরা বাঙালিদের মতো লাঙ্গল-গরু দিয়ে চাষাবাষ করে। তারা মেয়ে-পুরুষ এক সাথে মাঠে কাজ করে। গারোরা প্রাকৃতিক পরিবেশে পাহাড়ি অঞ্চলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজ গঠন করে জীবন যাপন করে।

৩. **দেহাকৃতি :** গারোদের চেহারা অনেকটাই আসামের নাগা ও মণিপুরীদের মতো। তাদের লোম কম, তাই গোঁফ-দাঁড়িও বিশেষ গজায় না। তাদের নাক চেপ্টা, ঠোঁট কিছুটা পুরু, গায়ের রঙ শ্যামলা ও ফর্সা।

৪. **পোশাক পরিচ্ছদ :** গারো পুরুষেরা ধুতি এবং মেয়েরা সেলাই ছাড়া এক ধরনের লুঙ্গি ও ব্লাউজ পরে। গারোদের পূর্ব পুরুষেরা এমনকি ১০০ বছর আগেও নেংটি পরতো। গারোরা সুতা ও রং তৈরি, কাপড় বুনা, বাঁশ বেত ও কাজ কাঠের কাজ নিজেরাই করে থাকে।

৫. **বিবাহরীতি :** গারো ছেলে-মেয়েরা বয়োপ্রাপ্ত হলেই তাদের বিয়ে দেয়া হয়। এ ব্যাপারে ছেলে-মেয়েদের পিতা-মাতা বা গুরুজনরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। একই গোত্রে বিয়ে দেয়া গারোদের রীতিবিরুদ্ধ। তাদের মধ্যে বংশ পরিচয় মায়ের সূত্রে, সম্পত্তিতে ছেলেদের কোনো অধিকার নেই। বিয়ের পর ছেলে চলে যায় শ্বশুরবাড়ি। মেয়েরাই হচ্ছে সংসারের হর্তাকর্তা।

৬. **সন্তান পালন :** গারো মেয়েরা সন্তানকে খুবই যত্ন করে, সন্তান লালন-পালনে সব সময় ব্যস্ত থাকে। মেয়েরা ক্ষেতে রোপা বোনা, জঙ্গলে কাঠ কাটা ও রান্নাবান্নার করা সময় শিশুদের কাপড় দিয়ে পিঠে বেঁধে নেয়। কারণ, শিশু সন্তানকে গারোরা দেবদেবী মনে করে।

৭. **সংস্কৃতি ও উৎসব :** নৃত্য-গীতি গারো সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। যে কোনো পূজা-পার্বণ, আনন্দ-অনুষ্ঠানে নাচ-গানের আয়োজন অপরিহার্য। গারোদের ধারণা নাচ ও গানের মাধ্যমে দেবদেবীদের তুষ্ট করা যায়। গারোদের শ্রেষ্ঠ উৎসবের নাম ওয়ানগালা। বাংলা তারিখের আশ্বিন মাসে তিন থেকে সাতদিন ধরে ওই উৎসব উদযাপিত হয়। তখন গারোরা মদ পান করে। নাচ, গানে গারো জনপদগুলো আনন্দে উৎসবে উদ্বেলিত ও মুখরিত হয়ে উঠে।

উপসংহার : উপজাতি বা ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী বা ক্ষুদ্র জাতিসত্তা কিংবা আদিবাসী জনগোষ্ঠী যে নামেই ডাকা হোক না কেন বাংলাদেশের একটি বৃহৎ অংশ জুড়ে রয়েছে উপজাতিদের বসবাস। ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটারের বাংলাদেশে সারা দেশ জুড়েই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারে উপজাতিরা যুগ যুগ ধরে বংশ পরম্পরায় বসবাস করে আসছে। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এবং ভৌগোলিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে এরা ভিন্ন ভাষাভাষী। এদের জীবনধারা, সংস্কৃতি, আচার-আচরণ ভিন্ন ভিন্ন হলেও মনোভাবের দিক থেকে এরা সহজ-সরল জীবন যাপন করে। ঐতিহাসিক কাল থেকে বহু ভাষা-ভাষী জনগোষ্ঠী ভিন্ন ভিন্ন সাংস্কৃতিক ধারায় উদ্ভাসিত হয়েও অভিন্ন উৎপাদন ব্যবস্থা (জুম চাষ) এবং আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা উপজাতীয় নৃগোষ্ঠীগুলোকে প্রোথিত করেছে মালার মত অভিন্ন সাংস্কৃতিক বন্ধনে। এখানকার উপজাতীয় নৃগোষ্ঠীর ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, সর্বক্ষেত্রে ব্যাপক বৈসাদৃশ্য লক্ষণীয়। এই বৈচিত্র্য রূপই আবহমান বাংলার জাতীয় জীবনে এক অনুপম সংযোজন বলা যায়।

০৫ ‖ 'বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ'– আপনি এটা কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন? *[৩২তম বিসিএস]*
***অথবা,* বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নিয়ে আলোচনা করুন।** *[১১তম বিসিএস]*
***অথবা,* সংক্ষেপে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্য আলোচনা করুন।** *[৩৪তম বিসিএস]*

উত্তর : সংস্কৃতি সমাজ ও রাষ্ট্রের দর্পণস্বরূপ। প্রতিটি রাষ্ট্রেরই নিজস্ব সংস্কৃতি থাকে। এ সংস্কৃতিই বিশ্বের দরবারে একটি জাতির গৌরব-অগৌরবের জানান দেয়। কোনো দেশের সংস্কৃতির দিকে তাকালেই সে দেশের চেহারা উপলব্ধি করা সম্ভব। সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা সোনার বাংলায় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কোনো কমতি নেই। বাংলার এ সংস্কৃতির ইতিহাস হাজার বছরের পুরনো। কালের পরিক্রমায় ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়ে বর্তমান রূপ পেয়েছে আমাদের সংস্কৃতি। সময়ের পরিক্রমায় অনেক গ্রহণ, বর্জন, পরিবর্তন

ও পরিমার্জনের মধ্য দিয়ে আমাদের সংস্কৃতিতে অনেক নতুন নতুন উপাদান যুক্ত হয়েছে, আবার হারিয়ে গেছে অনেক উপাদান। এক কথায় বলা যায় বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ।

সংস্কৃতি কি? সংস্কৃতি হলো মানুষের আচার-আচরণের সমষ্টি। মানুষের জাগতিক নৈপুণ্য ও কর্মকুশলতা, বিশ্বাস, আশা-আকাঙ্ক্ষা, নৈতিকতা, রাজনীতি, ভাষা, কলা, মূল্যবোধ সবকিছুই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। সংস্কৃতি হচ্ছে সমাজের মানুষের অর্জিত জ্ঞান, বিশ্বাস, কলা, নীতি, নিয়ম, সংস্কার ও অন্যান্য যে কোনো বিষয়ে দক্ষতার সর্বাধিক সমাবেশ। মোতাহের হোসেন চৌধুরী বলেন, 'সংস্কৃতি মানে সুন্দরভাবে, বিচিত্রভাবে বাঁচা।' সংস্কৃতি সম্পর্কে এমারসন বলেন, 'সংস্কৃতিই খুলে দেয় সুন্দরের চেতনার দরজা।' সংস্কৃতি সম্পর্কে ম্যাথু আর্নল্ড-এর অভিমত হলো, 'সংস্কৃতি আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয় বিশ্বের সর্বোত্তম জিনিসগুলোর সঙ্গে এবং সেই সঙ্গে মানুষের গৌরবময় ইতিহাসের সঙ্গে।' আবার কালটাজার গ্রাসিয়ান বলেন, 'মানুষ জন্মায় বর্বর হয়ে, সংস্কৃতিই তাকে করে সুসভ্য'। তবে সংস্কৃতি শনাক্তকরণের কোনো নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য নেই, গণ্ডি নেই। এটি চলমান জীবনের প্রতিচ্ছবি। এলাকাভিত্তিক এর ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। একটা নির্দিষ্ট এলাকার মানুষের জীবন প্রণালী অর্থাৎ মানুষের দৈনন্দিন আচার-আচরণ, কাজকর্ম, পোশাক-পরিচ্ছদ, প্রচলিত লোককাহিনী, ধর্মীয় উৎসব-অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান, চিন্তা-চেতনা সবকিছুই সংস্কৃতির মধ্যে পড়ে।

বাংলাদেশের বৈচিত্র্যপূর্ণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য : সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হলো মানুষের দীর্ঘদিনের আচার-আচরণ, কাজকর্ম, রীতিনীতির মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য কোনো প্রথা বা উপাদান। বাংলাদেশের সংস্কৃতির রয়েছে গৌরবময় ঐতিহ্য। এখানে বাস করে মুসলমান-হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টানসহ আরো অনেক জাতি। এখানে প্রাণ খুলে তারা তাদের প্রাণের ভাষায় ধর্মীয় ও সামাজিক আচার অনুষ্ঠান পালন করে। একের অনুষ্ঠানে অন্যেরা হয় আমন্ত্রিত; একে অপরের সাথে ভাগ করে নেয় এ আনন্দ। আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মধ্যে ধর্মীয় রীতিনীতি, উৎসব, লোকসাহিত্য, সঙ্গীত, ঋতুভিত্তিক উৎসব, বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, খেলাধুলা, সামাজিক প্রথা প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত। আমাদের সংস্কৃতির চর্চা হয় সুপ্রাচীন কাল থেকেই। বিভিন্ন সময়ে আমাদের সংস্কৃতিতে পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং সমৃদ্ধি এসেছে। মধ্যযুগে সুলতানী শাসনামলে আমাদের সংস্কৃতির বিকাশে প্রভূত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। সুলতানী শাসনামলে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক চর্চা, ধর্মীয় চর্চাকে উৎসাহিত করা হয়। হোসেন শাহের আমলে শ্রী চৈতন্যদেব বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন। মোগল শাসকগণ কবিতা, গল্প, উপন্যাস রচনার জন্য সাহিত্যিকদের উৎসাহ দিতেন, কবিতা, গল্প শোনার জন্য লেখকদের দরবারে আহ্বান করতেন। ব্রিটিশ শাসনামলে ইংরেজি সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসে বাংলা সাহিত্য। পাকিস্তান আমলে রাজনৈতিক সংকটের কারণে আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতিতে অস্তিত্বের বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে। বাংলাদেশের বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য নিচে সংক্ষেপে আলোচিত হলো :

১. **লোকসাহিত্য :** আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অন্যতম উপাদান হলো লোকসাহিত্য। লোকসাহিত্যের ইতিহাস ও ঐতিহ্য হাজার বছরের পুরনো। বাংলা ভাষা সৃষ্টির প্রাথমিক যুগেই লোকসাহিত্যের জন্ম। সাধারণ মানুষের মনের কথা, মুখের কথা ভাষা ও ছন্দে বাণীবদ্ধ হয়ে এবং তা লোকমুখে প্রচারিত ও প্রচলিত হয়ে যে সাহিত্য সৃষ্টি হয় তাকে লোকসাহিত্য বলে। যে সাহিত্য লেখা হয়নি তালপাতার মূল্যবান গাত্রে, যে সাহিত্য পায়নি সমাজের উঁচুস্তরের সমাদর, লোকসাহিত্য পল্লীবাংলার সাধারণ মানুষের হৃদস্পন্দন। এ সাহিত্য পল্লীর মানুষের আনন্দকে ফুটিয়ে তুলেছে ফুলের মতো, বেদনাকে বাজিয়েছে একতারার সুরের মতো। এখানে আছে সরল অনুভবের কথা। এ সরলতাই সকলকে মোহিত করে। লোকসাহিত্য তাই পল্লীর মানুষের বুকের বাঁশরী। বাস্তব জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত, আনন্দ-বেদনায় পল্লীর নিরক্ষর অথচ সহজ-সরল মানুষ গানের আসর জমিয়েছে, সাজিয়েছে প্রাণের বীণা। তাদের কর্মক্লান্ত অবসর মুহূর্তগুলো গ্রাম্য সুর মূর্ছনায় মুখরিত হয়ে উঠেছে। বুনো ফুলের স্নিগ্ধ সৌন্দর্যে

মন মাতাল না হলেও তার বিহ্বল সৌন্দর্যে মন পুলকিত না হয়ে পারে না। তেমনি বাংলার লোকসাহিত্যের আছে স্নিগ্ধ মায়াময় সৌন্দর্য ও প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। তাই পল্লীসাহিত্য এত চিরন্তন আবেদন মুখর ও বৈচিত্র্যময়। লোকসাহিত্য বড়ই বৈচিত্র্যময় ও চিত্তাকর্ষক। এর ভাণ্ডারও অনেক বড় ও বিশাল। অনেক রকম সৃষ্টি এখানে দেখা যায়। যেমন—

☐ ছড়া : আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে
ঢাক-ঢোল ঝাঁঝর বাজে
অথবা, ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী এল দেশে
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে।

☐ লোকসঙ্গীত : মনমাঝি তোর বৈঠা নেরে
আমি আর বাইতে পারলাম না।

☐ গীতিকা : ভিনদেশী পুরুষ দেখি চাঁদের মতন
লাজরক্ত হইল কন্যার পরথম যৌবন।

☐ ধাঁধা : সবুজ বুড়ি হাটে যায়
হাটে গিয়ে চিমটি খায়।

উত্তর : লাউ।

☐ রূপকথা, উপকথা, ব্রতকথা : রাজরানীর গল্প, রাজকন্যা রাজকুমারের গল্প, রাক্ষস-খোক্ষসের গল্প, দৈত্য-দানবের গল্প প্রভৃতি।

☐ প্রবাদ-প্রবচন : সবুরে মেওয়া ফলে।
অথবা, অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী।

☐ খনার বচন : কলা রুয়ে না কেটো পাত
তাতেই কাপড় তাতেই ভাত।
অথবা, যদি বরষে মাঘের শেষ,
ধন্য রাজার পুণ্য দেশ।

২. **ধর্মীয় রীতিনীতি :** বাংলাদেশসহ সমগ্র উপমহাদেশের সাংস্কৃতিক বিকাশের মূলে রয়েছে ধর্মের প্রভাব। বিভিন্ন ধর্মের লোকজন একই সমাজে ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রেখে বসবাস করছে। কোনো ধর্মের ধর্মীয় উৎসবে সকল ধর্মের লোক আনন্দ প্রকাশ করে। একের আনন্দে অপর ধর্মের লোক একাত্মতা প্রকাশ করে। এ দেশের মানুষ স্বাভাবিকভাবেই ধর্মভীরু ও আনন্দ প্রকাশে স্বতঃস্ফূর্ত।

৩. **সঙ্গীত :** সমৃদ্ধ সঙ্গীত আমাদের সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্য। জারি, সারি, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, মুর্শিদী, মারফতী, পালাগান প্রভৃতি। এছাড়া বিয়ের গান, ফসল তোলার গানেও প্রচলন রয়েছে। গান, কথা ও অভিনয়ের সমন্বয়ে কবিগান, যাত্রাপালা দর্শক-শ্রোতাদের অফুরন্ত আনন্দ দান করতো। দেওয়ানা মদীনা, রহিম-রূপবান, চম্পাবতী, আলোমতি, বেদের মেয়ে, লাইলী-মজনু, শিরি-ফরহাদ, চণ্ডীদাস-রজকিনী প্রভৃতি যাত্রাপালার কাহিনী প্রাণভরে দেখতো। ঘুম পাড়ানী গান গেয়ে মায়েরা সন্তানদের ঘুম পাড়াতেন। তবে যুগের পরিবর্তনে আজ এসব ঐতিহ্য হারিয়ে যেতে বসেছে। বর্তমানে দেশীয় সঙ্গীত চর্চা যেটুকু হচ্ছে তা প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক।

৪. **প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন :** সমগ্র বাংলার বিস্তীর্ণ জনপদে ছড়িয়ে থাকা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ আমাদের সংস্কৃতির প্রাচীন ঐতিহ্যের স্বাক্ষর বহন করে। আমাদের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহের মধ্যে ঢাকার লালবাগ কেল্লা, বগুড়ার মহাস্থানগড়, কুমিল্লার আনন্দ বিহার, শালবন বিহার, ময়নামতির নিদর্শনসমূহ, সোনারগাঁওয়ের নিদর্শনসমূহ, পাহাড়পুরের সোমপুর বিহার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ঢাকার লালবাগ কেল্লা, আহসান মঞ্জিল, ছোট কাটরা, বড় কাটরা, হোসনী দালান প্রভৃতি মুসলিম শাসনামলের নিদর্শন। নওগাঁ জেলার সোমপুর বিহার, জগদ্দল বিহার বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পাল রাজাদের স্থাপত্য। এ স্থানদ্বয়ে হিন্দু ও বৌদ্ধ সভ্যতার নিদর্শন রয়েছে।

৫. **উৎসব ও বাঙালি আমেজ :** হরেক রকমের উৎসব ও ঋতুভিত্তিক সাংস্কৃতিক জীবনধারা আমাদের জীবনকে আলোড়িত করে, রক্তে তোলে আশ্চর্য-উন্মাদনা। বাংলা নববর্ষ, বসন্তের আগমন প্রভৃতি উৎসবে বাঙালি মেতে ওঠে নিজস্ব সাংস্কৃতিক অনুভূতির শিহরণে। ঋতুভেদে আমাদের সমাজে উৎসব বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। হেমন্তকালে ঘরে ঘরে নতুন পিঠার আয়োজন, শীতকালে খেজুর রস ও পিঠা-পায়েসের আয়োজন বাংলার গ্রাম্য সংস্কৃতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। ফসল তোলার প্রাক্কালে নেচে গেয়ে আনন্দ করা, অনাবৃষ্টির সময় মেঘের গান গাওয়া, ভরা বর্ষায় নৌকা-বাইচ প্রভৃতি ছিল গ্রাম বাংলার নিত্যদিনের চিত্র।

৬. **কুটির শিল্প :** বাংলাদেশের ঘরে ঘরে কুটির শিল্প ছিল মানুষের কর্মের উৎস। কিন্তু বৃহৎ শিল্পের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে কুটির শিল্প আজ বিলুপ্ত প্রায়। তবে বেত, বাঁশ, পোড়ামাটির কাজ আজও টিকে আছে। শিক্ষিত সমাজের সচেতনতাই এই ঐতিহ্যকে বিপুল পৃষ্ঠপোষকতা দান করেছে। ঢাকার শাঁখার কাজ, রূপার তারের কাজ, টাঙ্গাইলের শাড়ি, জামালপুরের বাসন, সিলেটের শীতল পাটি প্রভৃতি ঐতিহ্যবাহী কারুকার্য এখনও দেশে-বিদেশে যথেষ্ট সমাদৃত হচ্ছে। এগুলো বাংলাদেশের গৌরবোজ্জ্বল সংস্কৃতির অনন্য দিক।

৭. **খেলাধুলা :** গ্রামীণ খেলা আমাদের সংস্কৃতির ঐতিহ্য। তবে অনেক খেলা এখন হারিয়ে গেছে বা যাচ্ছে। শুকনো মৌসুমে দাঁড়িয়াবান্ধা, গোল্লাছুট, বর্ষা মৌসুমে হাডুডু খেলার বহুল প্রচলন ছিল। ভরা বর্ষায় নৌকা-বাইচ ছিল এক চমৎকার বিনোদন। কিন্তু এসব সংস্কৃতির বেশির ভাগই আজ কালের গর্ভে নিমজ্জিত।

৮. **পারিবারিক ও সামাজিক দিক :** আগের দিনে এ দেশের মানুষ পারিবারিক বন্ধনে সুখে-শান্তিতে বাস করতো। কবি দ্বিজেন্দ্র লালের ভাষা থেকে জানা যায়–

'ভাইয়ের-মায়ের এমন স্নেহ
কোথায় গেলে পাবে কেহ।'

নগরভিত্তিক পেশিশক্তির দৌরাত্ম্যের বিস্তৃতি, নষ্ট রাজনীতির প্রভাবে গ্রাম্য সমাজে অশান্তির ছায়া নেমে এসেছে। তবুও শান্তি প্রিয় মানুষ নিজেদের সামাজিক ঐক্য টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে, পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট রয়েছে।

উপসংহার : সংস্কৃতি আমাদের সমাজ জীবনের প্রতিচ্ছবি। কোনো সমাজের কোনো সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য যখন দীর্ঘদিন ধরে সে সমাজের মানুষের জীবনযাত্রায় গ্রহণযোগ্যতা ধারণ করে টিকে থাকে তখন তা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। আমাদের দেশের নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা নানা ধর্ম-বর্ণ-গোত্রের মানুষের রয়েছে বৈচিত্র্যপূর্ণ সাংস্কৃতিক ঐহিত্য। কিন্তু বাংলার সংস্কৃতি আজ আর সে পূর্বতন অবিচ্ছিন্ন ধারায় নেই। আধুনিক ও বিদেশী সভ্যতায় মোহান্ধ হয়ে আমরা আমাদের স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত জীবনধারাকে হারিয়ে ফেলতে বসেছি। তাই এখনই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি।

০৬ ॥ বাংলাদেশে হাওর অঞ্চলের প্রধান সমস্যাসমূহ কি কি এবং কিভাবে ঐ এলাকার অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মানের উন্নতি দ্রুততর করা যায়? *[৩১তম বিসিএস]*

ভূমিকা : বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান দক্ষিণ এশিয়ার ক্রান্তীয় অঞ্চলে ৮৮°০১ থেকে ৯২°৪১ পূর্ব দ্রাঘিমা এবং ২০°৩৪ থেকে ২৬°৩৮ উত্তর অক্ষাংশের ভেতরে। হিমালয় পর্বতমালা থেকে উৎপন্ন এবং এর দক্ষিণে অবস্থিত বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম দুটি নদী গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের পানি এই দেশটির উপর দিয়ে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পড়েছে। এছাড়াও লুসাই পাহাড় থেকে উৎপন্ন বরাক নদীর পানিও বাংলাদেশের উপর দিয়ে বঙ্গোপসাগরে বহমান। বরাক নদী বাংলাদেশে প্রবেশের মুহূর্তে সিলেটের অমলশিদের কাছে সুরমা ও কুশিয়ারা নামে দুটি শাখায় ভাগ হয়েছে। এই সুরমা ও কুশিয়ারা নদী দুটির অববাহিকাতেই বাংলাদেশের বিখ্যাত হাওরগুলোর অবস্থান। উত্তর পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত হাওরগুলো দেশের প্রধান নিম্নাঞ্চল এলাকা। ব্রহ্মপুত্র নদ ১৭৮৭ সালের বন্যা ও ভূমিকম্পের পর মধুপুর গড়ের পূর্বদিক থেকে পশ্চিমে তার প্রবাহপথ পরিবর্তন করলে সেই পরিত্যক্ত অঞ্চলে হাওর সৃষ্টি হয়।

হাওর : 'হাওর' শব্দের অর্থ বিস্তীর্ণ জলমগ্ন প্রান্তর। প্রধানত বিল অঞ্চল। মানুষের তৈরি অথবা প্রাকৃতিকভাবে তৈরি বিস্তীর্ণ যে জলাশয় যাতে বছরের বেশির ভাগ সময় পানি থাকে তাকে হাওর বলে। দেশের মোট আয়তনের ৬ ভাগের ১ ভাগ জুড়ে (২৫ হাজার বর্গ কিমি) অবস্থিত হাওরাঞ্চল ৭টি জেলার ৪৮টি উপজেলায় বিস্তৃত। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের তথ্য মতে, বাংলাদেশে ছোট-বড় মিলিয়ে হাওর রয়েছে ৪২৩টি। অন্যদিকে বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ডের তথ্যানুযায়ী, দেশে মোট হাওরের সংখ্যা ৪১৪টি। এ হাওর এলাকায় রয়েছে অসংখ্য খাল-নদী এবং প্রায় ৬,৩০০টি বিল, যার মধ্যে ৩,৫০০ টি স্থায়ী। বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য হাওরগুলো হলো হাকালুকি, হাইল, টাঙ্গুয়ার, বড় হাওর, মুড়িয়া ইত্যাদি।

নিচে অঞ্চলভিত্তিক হাওরের পরিসংখ্যান ছকে দেখানো হলো :

জেলা	হাওরের সংখ্যা	আয়তন (হেক্টর)
সুনামগঞ্জ	১৩২	২,৪৯,৪১০
সিলেট	৪৩	১,১৫,১৮৩
মৌলভীবাজার	০৩	৩৭,৪১৪
হবিগঞ্জ	৩০	৩৯,১৩২
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	০৩	১০,৫৮১
কিশোরগঞ্জ	১২২	১,৮২,১০৩
নেত্রকোনা	৮১	১,৫০,১১৬
মোট	৪১৪	৭,৮৩,৯৩৯

[তথ্যসূত্র : হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড]

বাংলাদেশে হাওর অঞ্চলের প্রধান সমস্যাসমূহ : সরকারিভাবে স্বীকৃত এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ বাংলাদেশের হাওর অঞ্চলগুলো ভীষণভাবে উপেক্ষিত ও বিশৃঙ্খলাপূর্ণ এবং সমস্যা জর্জরিত। নিচে বাংলাদেশে হাওর অঞ্চলের প্রধান সমস্যাসমূহ আলোচনা করা হলো :

১. **অগ্রিম বন্যা :** বাংলাদেশের হাওর এলাকায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধিকাংশ বাঁধ অগ্রিম স্বাভাবিক বন্যা ঠেকানোর জন্য তৈরি, যেগুলো বর্ষাকালে ডুবে যায়। আগে এসব এলাকায় সনাতনী বোরো চাষ হতো,

যার জন্য বীজতলা থেকে ধান পাকা পর্যন্ত সময় লাগতো ১২০ দিন এবং ওই ধান চৈত্র মাসের মাঝামাঝি উঠে যেতো। কিন্তু সুনামগঞ্জ ও সিলেট এলাকার নিম্নাঞ্চলে সম্প্রতি হাইব্রিড উচ্চ ফলনশীল বোরো ধানের চাষ শুরু হয়েছে। এই ধান বীজতলা থেকে পাকা পর্যন্ত সময় লেগে যায় ১৪০ দিন থেকে ১৫০ দিন। তাই হাওর এলাকায় এসব ফসল তোলার সময় বৈশাখ মাস পর্যন্ত গড়িয়ে যায়। আগাম বন্যার কারণে এই সময়টা ঝুঁকিপূর্ণ। ২০০৪ সালের এপ্রিল মাসে যখন বন্যা হয় তখনও ক্ষেতের ধান পেকে ওঠেনি। তাই হাওর এলাকার সমস্যা প্রধানত অগ্রিম বন্যা।

২. **মৎস্যজীবী মানুষের জীবনধারণ বিপন্ন :** নিম্নাঞ্চলগুলো ক্রমশ নিষ্কাশিত হয়ে চাষযোগ্য ভূমিতে পরিণত হওয়ায় স্থানীয় মৎস্যজীবী মানুষের জীবনধারণ বিপন্ন হয়ে পড়েছে। নিম্নাঞ্চলের জলমহাল দুর্নীতিপূর্ণ সরকারি ব্যবস্থার সহায়তায় লিজের নামে আঞ্চলিক প্রভুদের হাতে চলে যাচ্ছে। ফলে তার বাড়ির কাছের মৎস্যসম্পদ থাকে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। এভাবে মৎস্যজীবী সম্প্রদায় তথা হাওর অঞ্চলের সাধারণ মানুষ তাদের ঐতিহ্যগত ও মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর হয়ে পড়েছে।

৩. **নিম্নমানের জনস্বাস্থ্য :** হাওর অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বন্যাজনিত ক্ষয়ক্ষতি, অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে জনস্বাস্থ্য অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের। বর্তমানে তাদের স্বাস্থ্যগত সমস্যার মূল কারণ হচ্ছে বিশুদ্ধ পানির অভাব, নদী ভাঙ্গন এবং স্যানিটেশনের তীব্র সংকট। বাড়ির পাশে, নদীতে, খোলা ও ঝুলন্ত টয়লেটের ফলে পানিবাহিত বিভিন্ন রোগ বালাই লেগেই থাকে হাওর অঞ্চলে। সারা বছর কলেরা, টাইফয়েড, আমাশয়, কৃমি ও জন্ডিস ইত্যাদি রোগের পেছনে প্রায়ই তাদের মোটা অংকের অর্থ ব্যয় করতে হয়। দরিদ্র জনগোষ্ঠী এসব রোগে সময়মত চিকিৎসা অর্থ ব্যয় করতে না পারায় প্রতিবছর হাজার হাজার শিশু মারা যায়।

৪. **পশ্চাৎপদ জীবনযাপন :** হাওর এলাকার মানুষ পশ্চাৎপদ জীবযাপন করে। একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে তার যে ন্যূন্যতম পাওনা সেটিও সে পায় না। প্রধানত কৃষিভিত্তিক এ অঞ্চলের মানুষের জীবনের সব ক্ষেত্রেই সংকট রয়েছে। যোগাযোগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, কৃষি ইত্যাদির কোনোটাই এমনকি দেশের অনুন্নত অঞ্চলের সঙ্গেও তুলনীয় নয়। কৃষি উপকরণ বা সহায়তা এখানকার মানুষের কাছে দুর্লভ। খাল-নদ-নদী-বিলগুলো শুকিয়ে যাওয়ার ফলে এখানকার পরিবেশ-জীববৈচিত্র্য ও জীবন বিপন্ন। দেশের অন্য এলাকার চেয়ে এ এলাকার মানুষ সবচেয়ে বড় যে বিপদটির মুখোমুখি হয় সেটি হচ্ছে প্রচণ্ড ঢেউয়ের আঘাত থেকে নিজের বাড়িটা রক্ষা করা। এখানে চোরের উপদ্রব, সরকারি কর্মকর্তাদের অনুপস্থিতি, সরকারি সেবার অভাব- এসব তো আছেই।

৫. **নাজুক স্যানিটেশন ব্যবস্থা :** হাওরাঞ্চলে স্যানিটেশন ব্যবস্থা খুবই নাজুক। অধিকাংশ ক্ষেত্রে খোলা ল্যাট্রিনসহ ঝুলন্ত ল্যাট্রিন ব্যবহার করতে দেখা যায়। এমনও দেখা যায় পানির মধ্যে ঝুলন্ত ল্যাট্রিনে মলমূত্র ত্যাগ করে এবং একই ল্যাট্রিনের নিচে অজু গোসলসহ থালা-বাসন ও প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী ধৌত করে। মাঝে মাঝে দুই একটি পাকা ল্যাট্রিন থাকলেও তার মলমূত্র বাইরে খোলা অবস্থায় চারপাশের পরিবেশ দূষিত করে। বলা যায়, এটি এমনই এক নাজুক নোংরা পরিবেশ যা রোগব্যাধি সংক্রমণের একটি ভয়ংকর কারখানা বললেও চলে।

৬. **অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপ :** অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপে হাওরগুলো হুমকির সম্মুখীন। মাটিভরাট করে হাওরে গড়ে উঠছে বসতবাড়ি। অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাহিদা মেটাতে হাওরের প্রান্তিকভূমিতে সম্প্রসারিত হচ্ছে বোরো চাষ, কেটে ফেলা হচ্ছে হাওরের বৃক্ষরাজি। তাছাড়া ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা মেটানোর অজুহাত দেখিয়ে হাওরকে অতিনিষ্কাশন করে শুকিয়ে ফেলে ক্রমশ চাষযোগ্য ভূমিতে পরিণত করা হচ্ছে। ফলে আমরা প্রাকৃতিক জলসম্পদ থেকে বঞ্চিত হচ্ছি এবং নষ্ট হচ্ছে পরিবেশের ভারসাম্য। একই সাথে এসব এলাকায় বসবাসকারী পাখি ও উভচর প্রাণিসম্পদ ক্রমশ নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে।

৭. **শিক্ষার বেহাল দশা :** বৈরী আবহওয়া ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে প্রায়ই শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকে। ফলে অনেক শিক্ষার্থী শিক্ষা থেকে পিছিয়ে পরে। শিক্ষার্থীদের দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা না থাকায় অধিকাংশ শিক্ষার্থী বিদ্যালয় থেকে ক্ষুধার তাড়নায় পালিয়ে যায়। অনেক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে খেলার মাঠ না থাকায় শিক্ষার্থীরা পড়াশুনায় নিরুৎসাহিত হয়। এ এলাকার মানুষ দরিদ্র থাকায় শিশুদেরকে বিদ্যালয়ে পাঠাতে চায় না। অনেক পিতা-মাতা সন্তানদেরকে গৃহস্থালি কিংবা সংসারের অন্যান্য কাজে লাগিয়ে দেয়। এমন কি ফসলের মৌসুমে ছাত্র-ছাত্রী সকলেই ফসল তোলার কাজে জড়িয়ে পরে। এই অনিয়মিত অবস্থায় ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষা থেকে পিছিয়ে পরে এবং ঝরে পরে অনেকেই। শিক্ষক ও শ্রেণিকক্ষের স্বল্পতার কারণে উন্নত পরিবেশে শিক্ষাদান সম্ভব হয় না।

৮. **ভাসমান জীবন চিত্র :** নানা সমস্যায় জর্জরিত হাওরবাসী। দৃষ্টিসীমার একেবারে কিনারে বক্ররেখার মতো কালো আঁকাবাঁকা, ছড়ানো-ছিটানো অগোছালো গ্রামগুলো দূর থেকে দেখলে মনে হয় অথৈ সাগরের মাঝে কি যেন ভেলার ওপর ভাসছে। বাস্তবিক অর্থে তাদের জীবনটা ভাসমান ভেলার মতোই নড়বড়ে। প্রকৃতির সঙ্গে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে তাদের টিকে থাকতে হয়। বর্ষাকালে বাড়ির চারপাশে তৈরি করতে হয় আড়া (বাঁশের বেড়া)। এর ভেতর খড়কুটা, কচুরিপানা ভরে স্পঞ্জের মতো করা হয়। যার মাধ্যমে দানব আকৃতির ঢেউ থেকে নিজেদের রক্ষা করে হাওরবাসী। আর বর্ষা মৌসুমে পর্যটকরা এসব এলাকায় ভিড় জমান বিনোদনের জন্য।

৯. **জ্বালানি ও গো-খাদ্যের সংকট :** বর্ষাকালে হাওর এলাকায় সবচেয়ে বড় সংকট হয় জ্বালানি ও গো-খাদ্যের। জ্বালানির অভাবে এ সময়ে অনেক পরিবারে দিনে একবার রান্না করারও উপায় থাকে না। নিরুপায় লোকজন ৫-১০ ফুট হাওরের পানিতে ডুব দিয়ে এক ধরণের দুর্বা ঘাস তুলে। রোদে শুকিয়ে তা রান্নার জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

১০. **মা ও শিশুর নাজুক স্বাস্থ্য পরিস্থিতি :** জনস্বাস্থ্য কার্যক্রমের মধ্যে মা ও শিশু স্বাস্থ্য একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। হাওর অঞ্চলের মানুষের দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও নানা প্রকার কুসংস্কারের জন্য মা ও শিশু স্বাস্থ্য পরিস্থিতি খুবই নাজুক। বন্যার সময় এ পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। বিশাল জলরাশি অতিক্রম করে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ-প্রদান দুটিই কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে মানুষ স্থানীয়ভাবে ঝাঁড়-ফোঁক ও পানি পড়া, তাবিজ-কবজ ব্যবহার করে রোগ মুক্তির প্রচেষ্টা চালায়। বিশেষ করে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী প্রত্যাশিত স্বাস্থ্যসেবা পায় না।

১১. **নারীর স্বাস্থ্য ও পুষ্টির অভাব :** হাওরাঞ্চলের নারীদের খাদ্য সংস্কৃতি আর দশটি গ্রাম অঞ্চলের মতই ঐতিহ্যবাহী অর্থাৎ নারীরা খাওয়া দাওয়া শেষে যা-ই অবশিষ্ট থাকুক না কেন তা খেয়েই সন্তুষ্ট থাকে। বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নারীদের যেন এটা নিয়তি নির্ধারিত। অভাবের সময় হাওরের দরিদ্র নারীদের এ অবস্থা আরো তীব্র আকার ধারণ করে। পুরুষদের যখন কোনো কাজ থাকে না তখন খাদ্যাভাব দেখা দেয়। হাওর অঞ্চলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সন্তানসম্ভবা মায়েরা মারাত্মক পুষ্টিহীনতার শিকার হয়। এ কারণে মাতৃমৃত্যু, শিশু মৃত্যুর হার বেড়ে যায়।

১২. অন্যান্য : উপরিউক্ত কারণগুলো ছাড়াও হাওরাঞ্চলে নানাবিধ সমস্যা বিদ্যমান। যেমন—

ক. যাতায়াত সংকট;
খ. বর্ষাকালে বেকারত্ব ও তীব্র খাদ্যাভাব;
গ. দুর্যোগ, খরা এবং নদী ভাঙ্গন
ঘ. প্রকট দারিদ্র্য;
ঙ. জনগণের কৃষির উপর নির্ভলশীলতা;

চ. স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া;
ছ. বিদ্যুতের অভাব;
জ. স্থায়ী কর্মসংস্থানের অভাব;
ঝ. জলমহালের অবৈধ দখল;
ঞ. আর্থিক দুরাবস্থা ইত্যাদি।

হাওরাঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মানের উন্নতি দ্রুততর করার উপায় : হাওরাঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মানের উন্নতি দ্রুততর করার উপায় হিসেবে নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন—

১. **যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি :** দেশের হাওর এলাকায় অগ্রিম বন্যাই শুধু নয় যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবও একটি সমস্যা। অতএব হাওর এলাকাগুলোতে সুষ্ঠু বন্যা-ব্যবস্থাপনা প্রণয়ন এবং এর সাথে সমন্বিতভাবে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাতে হবে। বন্যা-নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের বাঁধগুলো এমন হওয়া চাই যা স্থানীয় জনগণকে সরাবছর যোগাযোগ সুবিধা দেবে, কিন্তু বন্যার পানি প্রবেশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। হাওর এলাকার জনগণ শুকনো মৌসুম ব্যতীত বছরের অধিকাংশ সময় যাতে নদীপথে যাতায়াত করতে পারে তার ব্যবস্থাপনা অব্যাহত রাখতে হবে। বর্তমানে যেসব থানা সদর সারা বছর সড়ক নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত, ওইসব সড়ক ব্যতীত এমন কোনো নতুন সড়ক নির্মাণ করা যাবে না যার ফলে হাওর এলাকার স্বাভাবিক পরিবেশ বিঘ্নিত হতে পারে।

২. **পরিবেশ, মৎস্যসম্পদ ও জলজ পাখির জীববৈচিত্র্য অক্ষুন্ন :** পরিবেশ, মৎস্যসম্পদ ও জলজ পাখির জীববৈচিত্র্য অক্ষুণ্ন রাখার প্রয়োজনে হাওরগুলোকে অভয়াশ্রম হিসেবে এবং সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জ জেলার হাওর এলাকাকে জাতীয় সংরক্ষিত সম্পদ হিসেবে ঘোষণা করতে হবে। হাওর এলাকার ফসল বিন্যাস পরিবর্তন করে ফসল যাতে চৈত্র মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে উঠে আসে, পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তেমন উৎপাদনের পরিকল্পনা নিতে হবে।

৩. **আইনশৃঙ্খলার উন্নতি ও অভয়াশ্রম ঘোষণা :** দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের হাওরগুলোর পরিবেশ, মৎস্যসম্পদ ও জলজ পাখির জীববৈচিত্র্য অক্ষুণ্ন রাখার জন্য আইনশৃঙ্খলার উন্নতি করে এদেরকে অভয়াশ্রম ঘোষণা করতে হবে। পর্যটন শিল্পের উন্নতির জন্য দেশের হাওর এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং হাওর এলাকাকে জাতীয় সম্পদ ঘোষণা করতে হবে।

৪. **ড্রেজিং বা পলি অপসারণের নামে অতিনিষ্কাশন বন্ধ :** সারাদেশের জলাভূমিগুলোকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য ড্রেজিং বা পলি অপসারণের নামে অতিনিষ্কাশন বন্ধ করা চাই। মৎস্যসম্পদ, জলজ পাখির জীববৈচিত্র সংরক্ষণ করার জন্য দেশের প্রতিটি ইউনিয়নের অন্ততপক্ষে একটি জলাধার চিহ্নিত করে তাতে বছরব্যাপী সকল প্রকার মাছধরা নিষিদ্ধ করা দরকার।

৫. **অবৈধ দখল মুক্ত :** লীজের নামে জলমহালগুলোকে প্রভাবশালী ও সুবিধাভোগী মহলের অবৈধ দখল থেকে মুক্ত করা অত্যাবশক। প্রতিটি ইউনিয়নের নির্দিষ্ট জলাভূমি ব্যতীত সকল জলাভূমিকে সারা বছর উন্মুক্ত মৎসজীবী তথা আপামর জনগণের সম্পত্তি হিসেবে ফিরিয়ে দিতে হবে।

৬. **হাওর এলাকার শিল্পকারখানা নির্মাণ না করা :** পরিবেশ অক্ষুণ্ন রাখার জন্য হাওর, বাঁওড় ও জলাভূমি এলাকায় শিল্প কারখানা নির্মাণ নিষিদ্ধ করা দরকার। কয়েকটি নির্দিষ্ট পথ ব্যতীত সকল পথে ইঞ্জিন চালিত নৌকা বা যান চলাচল নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। তীরবর্তী ভূমিতে বিদেশি ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক গাছপালার পরিবর্তে দেশি এবং পরিবেশবান্ধব গাছ লাগান দরকার।

৭. **প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী এবং আশ্রয় কেন্দ্রের ব্যবস্থা রাখা :** বন্যার সময় জনগণের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা এবং ত্বরিত সহায়তা প্রদানের জন্য হাওর এলাকায় প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী, চিকিৎসার সরঞ্জাম এবং আশ্রয় কেন্দ্রের ব্যবস্থা রাখা জরুরি।

৮. **সচেতনতা বৃদ্ধি :** হাওর এলাকার জনজীবন, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের শিশু-কিশোর তথা জনগণকে অবহিত এবং এই সম্পদের বিষয়ে সচেতন করার জন্য প্রতিটি উপজেলায় একটি করে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলা দরকার। এই পর্যটন কেন্দ্র কেবলমাত্র সরকারি ব্যবস্থাপনায় চলবে এবং ব্যবসামূলক না হয়ে শিক্ষামূলক হবে।

উপসংহার : হাওরাঞ্চলকে ভাত ও মাছের ভাণ্ডার বলা হয়। বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় প্রায় ২৫% এলাকা জুড়ে হাওর বিস্তৃত। ইটনা, মিঠামইন, অষ্টগ্রাম, খালিয়াজুরি এলাকা জুড়ে 'বড় হাওর', অষ্টগ্রামের 'সুমাই হাওর', বাজিতপুরের 'হুমাই', মিঠামইনের 'বাড়ির হাওর', বাজিতপুর, নিকলী, মিঠামইন এলাকা জুড়ে 'তল্লার হাওর', নিকলীর 'মাহমুদপুর হাওর', নিকলীর 'সুরমা বাউলার হাওর', সুনামগঞ্জের 'শনির হাওর', সিলেট ও মৌলভীবাজারের 'হাকালুকি হাওর', নেত্রকোনার 'জারিয়া হাওর', ছিলনীর 'শাপলা ও পাতলা বোড়া হাওর', নূরপুর ও কাতিয়ার কোনা হাওর, জুরির 'চিমনীর হাওর', ইটনার 'বনপুর হাওর'সহ এ দেশে ছোট বড় মিলে প্রায় ৪৫০টি হাওর রয়েছে, যা প্রায় ৮ হাজার বর্গ কিমি এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে আছে। বিদ্যুৎবিহীন জ্যোৎস্না মাখা হাওর এলাকাও অনুপম। হাওর-ভাটি বাংলায় প্রতিবছর এভাবেই আতঙ্ক, কর্মহীনতা, হতাশা এবং বেঁচে থাকার সংগ্রামের বারতা নিয়ে বর্ষা আসছে, যাচ্ছে। প্রকৃতির বিরুদ্ধে জীবনের চলছে নিরন্তর যুদ্ধ। হাওরবাসীর জীবনে সুখ-শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সমন্বিত প্রয়াস চালানো এখন অত্যাবশকীয় বিষয়।

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

০৫ ▌ বাংলাদেশের উপজাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোকপাত করুন।

উত্তর : বাংলাদেশে অনেক উপজাতি রয়েছে এবং তাদের নিজস্ব সংস্কৃতিও আছে। উপজাতি ভেদে, এমনকি একই উপজাতির বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে তাদের সংস্কৃতির পার্থক্য দেখা যায়। তবে কিছু কিছু বিষয় সকল উপজাতির মধ্যেই প্রায় অভিন্ন। যেমন উপজাতীয়রা সাধারণভাবে সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাস করে। আবার কিছু কিছু বিষয় কেবল একেকটি উপজাতির নিজস্ব ব্যাপার। যেমন রাধাকৃষ্ণের প্রেম অবলম্বনে গোপিনীদের যে রাসনৃত্য তা মণিপুরীদের অন্যতম জনপ্রিয় উৎসব। বসন্তে মণিপুরী, সাঁওতাল এবং ওরাওঁ উপজাতি আবির উৎসব করে। ফাগুয়া অর্থাৎ ফাল্গুন মাস থেকে ওরাওঁদের বর্ষগণনা শুরু হয়। ওরাওঁ যুবক-যুবতীরা অগ্নিখেলার মধ্য দিয়ে বছরের প্রথম রাতটি উদ্‌যাপন করে।

চাকমা ও তঞ্চংগাদের মধ্যে পালাগান বিশেষ জনপ্রিয় সঙ্গীত। মণিপুরী ও গারোদের মধ্যে ঋতুভিত্তিক আচার-অনুষ্ঠান সবচেয়ে বেশি। দোল পূর্ণিমার মধ্যরাত থেকে মাসজুরে মণিপুরী যুবক-যুবতীরা মুক্তমাঠে নৃত্য করে। ধান কাটার সময়ও কর্মরত যুবক-যুবতীরা পরস্পর গান ও ছড়া কাটার মাধ্যমে আনন্দমুখর হয়ে ওঠে। মালপাহাড়ি যুবক-যুবতীরাও মাতাল হয়ে রাতভর নাচগান করে। সাঁওতালরা শস্য তোলার উৎসব 'সাহরাই' ৩-৪ দিন ধরে সাড়ম্বরে পালন করে। এ উৎসবে সাঁওতাল যুবক-যুবতীরাও মণিপুরীদের মতো নাচগান করে। মণিপুরী ও সাঁওতালদের মতো গারো যুবক-যুবতীরা 'ওয়াংগালা' অনুষ্ঠানে সম্মিলিত নাচগান করে। শস্য বপন ও আহরণের সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। গোটা উপজাতিটি এ সময় আনন্দে মেতে ওঠে। গারোদের এই ওয়াংগালা অনুষ্ঠানে যে তাণ্ডব নৃত্য করা হয় তার লক্ষ্য অশরীরী অপশক্তিকে ভয় দেখিয়ে বশ করা। তারা ভোগ দিয়েও অপশক্তিকে বশ করার চেষ্টা করে। মগরা গানবাজনা, নৃত্য ও মদ্যপানে মত্ত হয়ে মগি সালের প্রথম তিন দিন অতিবাহিত করে।

ধর্মীয় বিশ্বাস : গারোদের সাংসারেক এবং চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের কতিপয় উপজাতির বৌদ্ধধর্ম ছাড়া অন্য কোনো উপজাতির সুনির্দিষ্ট কোনো ধর্ম নেই। প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত সংস্কার, বিশ্বাস ও প্রথাই তাদের ধর্ম। গারোদের সাংসারেক ধর্মও এখন বিলুপ্তপ্রায়। তাদের অধিকাংশই এখন খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী। তবে সাংসারেক ধর্মের পর্ব-পার্বণও তারা কিছু কিছু পালন করে। সাঁওতালরা অধিকাংশই খ্রিস্টান, কিন্তু তারা স্ব স্ব প্রচলিত প্রথা মেনে চলে। ওরাওঁ, মণিপুরী এবং বৌদ্ধ উপজাতিগুলোর মধ্যে অমাবস্যা-পূর্ণিমা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। পূর্ণিমায় তারা বহুবিধ ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পালন করে। ওরাওঁরা ডাক ও খনার বচনে বিশ্বাসী। যাত্রার শুভাশুভ সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস খনার বচনের অনুরূপ, যেমন যাত্রাকালে হোঁচট খাওয়া, পিছু ডাক, টিকটিকির ডাক, মৃত্যুসংবাদ, লাশ দেখা, মরাডালে কাকের ডাক, শূন্য/পূর্ণ কলস দর্শন ইত্যাদি সংস্কার তারা মেনে চলে। ওরাওঁরা পূর্বদিক থেকে হাল চালনা করে এবং শুভদিন দেখে গৃহ নির্মাণ করে। রাতে কেশবিন্যাস করা, মহিলাদের চুল বাইরে ফেলা, সূর্যাস্তে ঘর ঝাড় দেয়া, সন্ধ্যাবেলা কাউকে কিছু দেয়া, রাতে পেঁচার ডাক ও কুকুরের কান্না ইত্যাদি তাদের নিকট অশুভ। রমণী বশীকরণ, গাভীর প্রথম দোহনের দুধ দান করা, প্রসূতি ও ঋতুবতীর গোশালায় না যাওয়া, ভাসুরের নাম উচ্চারণ না করা, মন্ত্রতন্ত্র ও ডাইনিতে বিশ্বাস করা ইত্যাদিও ওরাওঁ সমাজে প্রচলিত। গারোদের মধ্যে ডাইনি-বিশ্বাস না থাকলেও তাদের বিশ্বাস, কোনো কোনো মানুষ রাতে বাঘ হয়ে গৃহপালিত পশু ধরে নিয়ে খেয়ে ফেলে; হিংস্র জন্তুর আক্রমণে নিহত ব্যক্তি জন্তু-জানোয়ার হয়ে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। ওরাওঁদের বিশ্বাস, মৃতভূমিষ্ঠ শিশুর প্রেতাত্মাও পুনর্জন্ম নেয়। কবিরাজরা এসব অনভিপ্রেত শক্তির আবির্ভাবকে বন্ধ করতে পারে।

ওরাওঁ গর্ভবতীর ইঁদুর ও বাইন মাছ খাওয়া নিষেধ। এতে জাতক কদাকার হবে বলে তাদের বিশ্বাস। প্রসবের পর ওরাওঁ প্রসূতির খেসারির ডাল, আলু, ঠাণ্ডা পানি ও বাসি খাবার খাওয়া নিষেধ। মণিপুরীরা খোলা চুলে গর্ভবতীকে বাইরে যেতে দেয় না; রাতে দূরে কোথায় যাওয়া এবং নদী/সাঁকো পার হওয়াও তাদের জন্য নিষিদ্ধ।

মালপাহাড়িদের বিশ্বাস বিবাহ ও সন্তান প্রসবের সময় মা ও শিশুকে ভূতে ধরতে পারে। সেজন্য তারা সব সময় সতর্ক থাকে। খাসিয়া ও মুণ্ডাদের বিশ্বাস মৃতশিশু ও পূর্বপুরুষদের প্রেতাত্মা ঘরে আসতে পারে। এজন্য তারা প্রেতাত্মার উদ্দেশ্যে পাথরের বেদি নির্মাণ করে। সব উপজাতিই গৃহদেবতায় বিশ্বাসী। তাদের মঙ্গলামঙ্গল এই গৃহদেবতার খুশি-অখুশির ওপর নির্ভর করে।

কৃষিকাজ : কোনো কোনো উপজাতি ভূমিকে মা মনে করে, তাই শস্য বপনের সময় তারা ভূ-মাতার পূজা করে। ওরাওঁরা শস্যক্ষেত্রকে আভূমি প্রণাম করে। তারা এও বিশ্বাস করে যে, ভূ-মাতার ঋতুস্নান হয় বলেই শস্য উৎপাদিত হয়। এজন্য তারা ভূ-মাতার ঋতুকালে বিভিন্ন পর্ব পালন করে। ওরাওঁ এবং সাঁওতালরা কৃষিযন্ত্রপাতিতে শ্রদ্ধাবশত সিঁদুরের ফোঁটা দেয়। গারো ও মণিপুরীদের মতো সাঁওতাল এবং আরো কিছু উপজাতীয় নারী-পুরুষ একসঙ্গে মাঠে কাজ করে। জঙ্গল সাফ ও চাষের কাজ করে পুরুষরা, আর উৎপাদনের প্রতীক মেয়েরা করে বপন-রোপনের কাজ। শস্য বপন ও কর্তনের সময় প্রায় সব উপজাতিই স্বকীয় পদ্ধতিতে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান পালন করে। যুবক-যুবতীরা পরস্পর গান ও ছড়া কাটার মাধ্যমে মাঠ থেকে পাকা ফসল ঘরে তোলে।

বিবাহ : বিবাহের ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপজাতিতে সাদৃশ্য যেমন রয়েছে, বৈসাদৃশ্যও রয়েছে। পূর্বরাগ উপজাতীয় বিবাহের মূলসূত্র, তবে তা অবশ্যই প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী হতে হবে। ওরাওঁদের মধ্যে বাল্যবিবাহ এবং চৈত্র, ভাদ্র ও পৌষ মাসে বিবাহ নিষিদ্ধ। বরপক্ষ কনেপক্ষকে পণ দেয়। পাত্রীদেখা, পানচিনি, গায়ে হলুদ ইত্যাদি তাদের প্রাকবিবাহ অনুষ্ঠান। বিবাহের দিন উভয় পক্ষের মেয়েরা বিয়ের গীত গায়। ওরাওঁ ও মণিপুরীরা বর্ণাঢ্য বিবাহমণ্ডপ তৈরি করে। ওরাওঁরা এতে মঙ্গলঘট বসায়। মণ্ডপে বর-কনে পরস্পরের কপালে সিঁদুর দেয় এবং উভয় পক্ষের মেয়েরা তখন উলুধ্বনি দেয়। ওরাওঁ ও

মণিপুরীদের মধ্যে বিয়ের পূর্বক্ষণে বর-কনে মণ্ডপ প্রদক্ষিণ করে এবং ধান-দূর্বা দিয়ে তাদের বরণ করা হয়। মণিপুরী বিবাহে মণ্ডপে প্রদীপ জ্বালিয়ে বরকে স্বাগত জানানো হয় এবং একজন কিশোর তার পা ধুয়ে দেয়। এ সময় কীর্তন আর বাজনা চলে এবং উভয় পক্ষের দুজন মহিলা দুটি টাকি মাছ পানিতে ছেড়ে দেয়। বর-কনের প্রতীক এই মাছ দুটি পাশাপাশি চললে শুভ, অন্যথায় অশুভ। অনুরূপ একটি অনুষ্ঠান গারোদের মধ্যেও প্রচলিত। তারা একজোড়া মোরগ-মুরগি জবাই করে ছেড়ে দেয় এবং সে দুটি দাপাদাপি করে একত্র হলে শুভ, না হলে অশুভ। অশুভ হলে খামাল (ওঝা) অশুভ দূর করে। বিবাহের শুভ কামনায় অনেক সময় দেবতাকেও ভোগ দেয়া হয়।

মগ যুবক-যুবতীরা নববর্ষ পালন উপলক্ষে ঘনিষ্ঠ মেলামেশার সুযোগ পায় এবং তখন তারা অভিভাবকদের অনুমোদন সাপেক্ষে জীবনসঙ্গী বেছে নেয়। গারো, খাসিয়া, টিপরা ও মগ মেয়েরা বাজারে কেনাবেচা করতে যায়। এই সুযোগে যুবক-যুবতীদের মধ্যে মনের মিল হয় এবং পরে অভিভাবকদের অনুমোদনক্রমে তাদের বিয়ে হয়। গারো ও মণিপুরীদের মতো সাঁওতাল এবং আরো কিছু উপজাতীয় যুবক-যুবতী একসঙ্গে মাঠে কাজ করার সময় জীবনসঙ্গী বেছে নেয়ার সুযোগ পায়।

চাকমাদের মধ্যে অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও গ্রহণের সময় বিবাহ নিষিদ্ধ। ওরাওঁ, সাঁওতাল, খাসিয়া, গারো এবং মণিপুরীদের মধ্যে গোত্রবিবাহ নিষিদ্ধ। মণিপুরীদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তেও বিয়ে হয় না। গারোদের সমগোত্রীয় যুবক-যুবতীদের মধ্যে থাকে ভাই-বোনের সম্পর্ক। মগদের গোত্রবিবাহ বিধিসম্মত, বরং আন্তঃগোত্রীয় বিবাহ তাদের অপছন্দ। তবে চাচাতো-মামাতো বোন ও খালা-ফুফুকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ। সাঁওতাল বধূরা স্বামীর গোত্রভুক্ত হয়। স্ত্রী বন্ধ্যা কিংবা পাগল না হলে মগ পুরুষদের পুনর্বিবাহ নিষিদ্ধ, তবে বিধবাবিবাহ সিদ্ধ। ওরাওঁদেরও তাই। গারো মেয়েরা অনেক সময় পছন্দসই যুবককে ধরে নিয়ে বিয়ে করে ঘরজামাই করে রাখে। এরূপ বিবাহ পার্বত্য চট্টগ্রামে এখন আর না থাকলেও কোনো কোনো উপজাতিতে স্বেচ্ছায় পলাতক বিয়ে হয় এবং পরে অভিভাবকরা তা অনুমোদন করে। ওরাওঁদের মধ্যে এরূপ বিবাহের প্রাচুর্য দেখা যায়। ওরাওঁ ও সাঁওতাল বধূরা সিঁদুর পরে। উপজাতির মধ্যেই সিঁদুরের ব্যবহার ব্যাপক। মগ ছাড়া অন্য সব উপজাতির মধ্যে স্বগোত্রে বিবাহ অপমানজনক এবং এজন্য সংশ্লিষ্টদের গ্রাম থেকে বের করে দেয়া হয়।

খাসিয়াদের বিয়ে না করা পাপ। স্বামীর নপুংসকতা কিংবা লাম্পট্য, অধিক সন্তান, যৌনস্পৃহা ইত্যাদি কারণে খাসিয়া রমণীরা একসঙ্গে একাধিক স্বামী রাখতে পারে, তবে এরূপ ঘটনা বিরল। অন্য কোনো উপজাতিতে স্ত্রীর একাধিক স্বামী কিংবা উপপতি রাখা কঠিন শাস্তিযোগ্য। খাসিয়া যুবতীরা অনুমোদিত গোত্র থেকে পছন্দসই কোনো যুবককে আমন্ত্রণ করে এনে কয়েক দিন সহাবস্থানের পর সন্তোষজনক মনে হলে উভয় পক্ষের আলোচনাক্রমে তাকে বিয়ে করতে পারে। এদের বিবাহে মহিলারা বরযাত্রী হতে পারে না, কিন্তু ওরাওঁ উপজাতিতে পারে। মা ও মুরব্বিদের আশীর্বাদ নিয়ে পাগড়ি ও ধুতি পরিহিত খাসিয়া বর মাতৃগৃহ ত্যাগ করে; সঙ্গে থাকে বরযাত্রীরা। মাতৃতান্ত্রিক খাসিয়া ও গারো উপজাতিতে বর হয় ঘরজামাই। চাকমাদের দুই পক্ষের মধ্যে মদ্য বিনিময়ের পর কনের বাড়িতে বিবাহ অনুষ্ঠান হয়। মণিপুরীদের বিবাহবেশ হচ্ছে বরের ধুতি-পাগড়ি ও কপালে চন্দনতিলক, আর কনের পোশাক রাসনৃত্যে গোপিনীদের মতো। কতিপয় উপজাতিতে তালাক বিধেয় হলেও তা বিরল। সাঁওতাল এবং ওরাওঁদের মধ্যে তালাক সিদ্ধ, তবে অকারণে তালাক ঘৃণ্য। মনোমালিন্য, যৌন-অক্ষমতা, স্ত্রীর পরকীয়া প্রেম ইত্যাদি তালাকের কারণ। ওরাওঁ, খাসিয়া, চাকমা ও মগদের মধ্যে তালাক বিধিসম্মত হলেও তা কদাচিৎ হয়। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বর কনে উভয়ের এবং গোত্রপতিদের সম্মতিতে তালাক হয়।

পোশাক-পরিচ্ছদ ও সাজসজ্জা : ওরাওঁসহ আরো অনেক উপজাতির সাধারণ পোশাক ধুতি-শাড়ি। এক সময় কোনো কোনো উপজাতি দেহের নিম্নাংশে বৃক্ষপত্র এবং গারোরা পাতলা কাপড়ের মতো এক প্রকার বৃক্ষবল্কল পরিধান করত। নিম্নস্তরের গারোরা আজও নেংটি পরে। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বর্তমানেও কোনো কোনো উপজাতির কটিবসন বৃক্ষপত্র। সাঁওতালি পোশাকের নাম পাঁচি, পাঁচাতাত ও মথা। চাকমাদের প্রধান পরিধেয় লুঙ্গি; শার্টের ওপর পরা হয়। গামছা তাদের একটি চিরাচরিত পোশাক। মেয়েদের পোশাক একখণ্ড লাল-কালো কাপড়, চাকমা ভাষায় যাকে বলা হয় পিন্দন; আর গায়ে পরা হয় ব্লাউজের মতো সিলুম। মগরা বুক থেকে হাঁটু পর্যন্ত থামি এবং ফুলহাতা ব্লাউজ পরে।

উপজাতীয়দের অলঙ্কারে বৈচিত্র্য কম। উত্তরবঙ্গীয় উপজাতীয়দের গহনাপত্র প্রায় একই রকম। সাঁওতাল ও ওরাওঁরা হাত, পা, নাক, কান ও গলায় গহনা পরে। ওরাওঁরা চূড়া করে চুল বাঁধে এবং টিকলি পরে। চাকমা মেয়েরা চুড়ি, খাড়ু , গলায় টাকার ছড়া এবং বড়ো ছিদ্র করে কানবালা পরে। গারো মেয়েরা খোপায় ফুল গোঁজে। মগ মেয়েরা 'সানাকা' নামক এক প্রকার বনজ পাউডার মেখে মুখ উজ্জ্বল করে।

খাদ্য-পানীয় : উপজাতীয়রা তাদের টোটেম ছাড়া আর সবই খায়। বিড়াল গারোদের টোটেম, তাই তারা বিড়াল খায় না। মগ, চাকমা ও খাসিয়ারা গোমাংস এবং গারোরা গোদুগ্ধ খায় না। মগ ও চাকমা নর-নারী ধূমপানে অভ্যস্ত। টক ও পচা চিংড়ির প্রস্তুত খাদ্য তাদের প্রিয়। ওরাওঁরা ইঁদুর, বাইন মাছ, আলু, খেসারির ডাল ইত্যাদি খায়। ভাতপচানো মদ সব উপজাতিরই প্রিয় পানীয়।

সামাজিক বিধিবিধান : মাতৃতান্ত্রিক উপজাতিতে পুরুষ সম্পত্তির ওয়ারিশ নয়। ছেলেরা যেমন মাতৃগৃহে, তেমনি স্ত্রীগৃহেও অবহেলিত। মায়ের মৃত্যুর পর গারো কন্যাদের পিতার প্রতি কোনো দায়িত্ব থাকে না, কিন্তু খাসিয়াদের মধ্যে তা অবশ্য পালনীয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি ও সাঁওতালরা গোত্রপ্রধানকে বলে রাজা, আর খাসিয়ারা বলে মন্ত্রী। প্রায় সব উপজাতিতেই ব্যভিচার দোষণীয়। ওরাওঁরা নবজাতকের মুখে প্রথম দেয় ছাগী কিংবা মায়ের দুধ, অন্যরা দেয় মধু; আর প্রসূতিকে খেতে দেয় হলুদ-পানি। প্রায় সব উপজাতিই অশরীরী অপশক্তি থেকে শিশু ও মাকে রক্ষার জন্য ঘরের চতুর্দিকে কাঁটার বেড়া দেয়; ওঝা বৈদ্যরা ঘর বন্ধন করে এবং ঝাড়ফুঁক দেয়। জন্মের ষষ্ঠ দিনে মণিপুরীরা বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় জাতক, প্রসূতি ও প্রসূতিগৃহ পরিশুদ্ধ করে। জন্মের পরই শিশুর কানের লতি ফুঁড়ে দেয়। গারোরা শিশুর সুন্দর নাম রাখে না প্রেতের কুদৃষ্টি এড়াবার জন্য। ওরাওঁরা সাধারণত জন্মের পঞ্চম দিনে পূর্বপুরুষের নাম কিংবা জন্মবারের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিশুর নামকরণ করে। শূকর, কুকুর, মোরগ ইত্যাদি উপজাতীয়দের গৃহপালিত পশু। ওরাওঁরা গরুর খুব যত্ন নেয়। কোনো কোনো উৎসব উপলক্ষে তারা গরুর গা ধুয়ে তেল মেখে দেয়। বিশেষ কোনো অনুষ্ঠানে তারা আঙিনায় আলপনা আঁকে, গোশালায় ধূপ জ্বালায় এবং প্রতি অমাবস্যার পরদিন কৃষিযন্ত্রপাতি ধুয়ে তাতে সিঁদুর লাগায়।

বাসগৃহ : সব পাহাড়ি উপজাতিই মাচার উপর বাঁশ, বেত, কাঠ ও পাতা দিয়ে ঘর তৈরি করে। ঘরে ওঠার জন্য থাকে মই। হিংস্র জন্তু-জানোয়ার যাতে উপরে উঠে আসতে না পারে সেজন্য রাতের বেলা মই সরিয়ে ফেলা হয়। মগরা বাড়ি করে সমতলে। ওরাওঁরা গোবর দিয়ে লেপেপুছে বাড়ি পরিষ্কার রাখে। তাদের ঘরগুলো সাধারণত খড়ের ছাউনিযুক্ত মাটির ঘর, তবে শোলার বেড়ার ঘরও আছে। মাটির দেয়ালে তারা লতাপাতার নকশা আঁকে। বাংলাদেশের এই উপজাতীয় সংস্কৃতি দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বহু দেশের লোকসংস্কৃতিতে লক্ষণীয়।

উপসংহার : বাংলাদেশের উপজাতীয় সংস্কৃতি বৈচিত্র্যপূর্ণ ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এ দেশের নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা আদিবাসীদের নানা লোকাচার ও উৎসব আমাদের গৌরবময় ঐতিহ্য। তবে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে তাদের সংস্কৃতিতেও আসছে নানা বিবর্তন। এছাড়া বিভিন্ন কারণে এই বিপুল ঐতিহ্যের অনেকটাই এখন ধ্বংসোন্মুখ হয়ে পড়েছে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-০১ **সম্প্রদায় ও সাম্প্রদায়িক বলতে কি বুঝায়?** *[২৭তম বিসিএস]*

উত্তর : সম্প্রদায় বলতে এমন একটি জনগোষ্ঠীকে বোঝায় যাদের বাসস্থান, স্বার্থ এবং জীবনপ্রণালী এক ও অভিন্ন। বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে সম্প্রদায়ের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার (MacIver) তার 'Society : Its Structure and Changes' নামক গ্রন্থে সম্প্রদায় বলতে এমন একটি জনগোষ্ঠীকে বুঝিয়েছেন, যার বাসস্থান, স্বার্থ এবং জীবনধারা এক ও অভিন্ন। তিনি সম্প্রদায়ের উদাহরণ হিসেবে গ্রাম, শহর, আদিম জনগোষ্ঠী এবং আধুনিককালের জাতিকে বুঝিয়েছেন। তবে ম্যাকাইভার ও পেজ তাদের 'Society' নামক গ্রন্থে সম্প্রদায়ের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, 'সম্প্রদায় হচ্ছে এমন একটি জনগোষ্ঠী যারা সাধারণত একটি নির্দিষ্ট এলাকায় বসবাস করে এবং যারা সমজাতীয় জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। ম্যাকাইভার সম্প্রদায়ের দুটি মৌল ভিত্তির কথা উল্লেখ করেন। যথা : ক. সম্প্রদায় এলাকা ও খ. সাম্প্রদায়িক মানসিকতা। সাম্প্রদায়িক বলতে সাধারণত সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান, বিশ্বাস ইত্যাদির প্রতি অতিমাত্রায় অনুরক্ত বোঝায়। যেমন— সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বলতে বোঝায় দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে নিজ নিজ ধর্মীয় বিশ্বাস, আচার অনুষ্ঠান, প্রথা, রীতিনীতি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার লড়াই। পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, একই বাসস্থান ও সামাজিক সংহতি যেখানে আছে এরূপ আঞ্চলিক জনগোষ্ঠীকে সম্প্রদায় বলা যায়।

প্রশ্ন-০২ **বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা লিখুন।**

উত্তর : বাংলাদেশের আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিমি। আর জনসংখ্যা হচ্ছে প্রায় সাড়ে ১৫ কোটি। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৪ অনুসারে দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৭% এবং প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১০১৫ জন লোক বাস করে। মাথাপিছু জমির পরিমাণ ০.২৫ একর। প্রাকৃতিক সম্পদের দিক দিয়েও এ দেশ সমৃদ্ধ নয়। সীমিত আয়তন ও সম্পদের ওপর জনসংখ্যার চাপ পৃথিবীর অন্য যে কোনো দেশের তুলনায় অত্যধিক। অতিরিক্ত জনসংখ্যা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। দিনের পর দিন আমাদের দেশে যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে আগামী দিনগুলো আমাদের জন্য আরো ভীতিকর ও আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই, বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন।

প্রশ্ন-০৩ **বিগত দুই দশকে বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির প্রভাব আলোচনা করুন।**

উত্তর : বিগত দুই দশকে বাংলাদেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির নিম্নোক্ত ইতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে :

১. মাত্রাতিরিক্ত জনসংখ্যার কুফল সম্পর্কে জনগণ অধিক মাত্রায় সচেতন হয়েছে।
২. বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে।
৩. দুটো সন্তানে সীমাবদ্ধ দম্পত্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪. পরিবার-পরিকল্পনা কার্যক্রম ও জন্মনিয়ন্ত্রণ সরঞ্জামাদি সহজলভ্য হয়েছে।
৫. জনসাধারণের মধ্যে ধর্মীয় কুসংস্কার হ্রাস পেয়েছে।

উপরিউক্ত ইতিবাচক প্রভাবের ফলশ্রুতিতে বর্তমানে বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৭-এ এসে দাঁড়িয়েছে।

প্রশ্ন-০৪ **মণিপুরী নাচ কি?**

উত্তর : ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্য। মণিপুরী উপজাতি একে একটি পবিত্র ও ধর্মীয় কর্তব্য হিসেবে মনে করে। বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চলে এ নৃত্য দেখা যায়।

প্রশ্ন-০৫ **ভাওয়াইয়া কি?**

উত্তর : বাংলা লোকসঙ্গীতের একটি বিশিষ্ট ধারার নাম ভাওয়াইয়া। বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গের রংপুর অঞ্চলে এ গান বিশেষভাবে প্রচলিত। রংপুর অঞ্চলে মেঠো পথ দিয়ে মহিষের গাড়ি চালনার সময় গাড়িয়ালরা বিশেষ এ ধরনের গান গেয়ে থাকে।

প্রশ্ন-০৬ **গম্ভীরা কি?**

উত্তর : বাংলা লোকসঙ্গীতের অন্যতম একটি ধারা হচ্ছে গম্ভীরা। বাংলাদেশের রাজশাহী ও পশ্চিমবঙ্গের মালদহ অঞ্চলে এটি বিশেষভাবে প্রচলিত।

বাংলাদেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতি : প্রাচীন থেকে বর্তমান
History & Culture of Bangladesh : Ancient to Present

Syllabus | *History and culture of Bangladesh from ancient to recent times.*

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১. আওয়ামী মুসলিম লীগের নাম কেন আওয়ামী লীগ করা হয়? কত সালে আওয়ামী লীগ নামকরণ করা হয়? [৩৩তম বিসিএস]

০২. পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার প্রতিক্রিয়া ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের উদ্ভব সম্বন্ধে আলোচনা করুন। [২০তম বিসিএস]
অথবা, ১৯৪৭ সালের পর হতে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উদ্ভব সম্পর্কে আলোচনা করুন। [৩২তম বিসিএস]
অথবা, বাঙালি জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

০৩. বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে সংস্কৃতির অবদান আলোচনা করুন। [৩৩তম বিসিএস]
অথবা, বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে বাঙালি সংস্কৃতি কিভাবে প্রাণশক্তি হিসেবে কাজ করছে বর্ণনা করুন। [৩৪তম বিসিএস]

০৪. বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পেছনে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কি কারণ ছিল তা বিশ্লেষণ করুন। [২৭তম বিসিএস]

০৫. স্বাধীনতা পূর্ববর্তীকালের তুলনায় স্বাধীন বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নয়নের বিবরণ দিন। [২৭তম বিসিএস]
অথবা, ১৯৪৭ উত্তর সময়ে বাংলাদেশ অঞ্চলে বাংলা সাহিত্যের যে বিকাশ সাধিত হয়েছে এর বর্ণনা দিন। [৩৪তম বিসিএস]

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

০৬. প্রাচীন বাংলার শাসনকাল বর্ণনাপূর্বক বাংলার প্রাচীন জনপদগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।
০৭. মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে সম্রাট বাবরের কৃতিত্ব মূল্যায়ন করুন।
০৮. সম্রাট আকবরের বাংলা বিজয়ের একটি ধারাবাহিক বর্ণনা উপস্থাপন করুন।
০৯. মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণসমূহ বিশ্লেষণ করুন।
অথবা, মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণগুলো কি কি? বর্ণনা করুন।

১০. পলাশী যুদ্ধের পটভূমি আলোচনা করুন। পরবর্তী ইতিহাসে এই যুদ্ধের ফলাফল কি হয়েছিল? তা বর্ণনা করুন।
১১. ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের কারণসমূহ আলোচনা করুন। এটা ব্যর্থ হয়েছিল কেন?
১২. বাংলাদেশের লোকশিল্প সম্পর্কে আলোকপাত করুন। লোকশিল্প সংগ্রহের গুরুত্ব এবং সংগ্রহের সমস্যার ওপর আলোকপাত করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

০১. বাংলার প্রাচীন জনপদগুলোর নাম লিখুন।
০২. বার ভূঁইয়াদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? তার রাজধানী কোথায় ছিল?
০৩. আলীগড় আন্দোলন কি?
০৪. কে, কখন বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন?
০৫. কখন বঙ্গভঙ্গ কার্যকরী হয়? বঙ্গভঙ্গ রদের কারণ কি?
০৬. দ্বি-জাতি তত্ত্ব কি?
০৭. লোকশিল্পের সংজ্ঞা দিন। [২৮তম বিসিএস]
০৮. ময়মনসিংহ গীতিকার ওপর আলোচনা করুন। [১৮তম বিসিএস]
০৯. ম্যাডোনা-৪৩ কি?
১০. লালনগীতি কি এবং এর প্রভাবই বা কি? [১৮তম বিসিএস]
১১. মহাস্থানগড় কি জন্য বিখ্যাত?
১২. চরমপত্র খ্যাত ব্যক্তিত্ব কে?
১৩. শালবন বিহার কোথায় অবস্থিত?
১৪. চর্যাপদ কত সালের মধ্যে রচিত হয়?
১৫. লোকসাহিত্যের সংজ্ঞা দিন।

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১ । আওয়ামী মুসলিম লীগের নাম কেন আওয়ামী লীগ করা হয়? কত সালে আওয়ামী লীগ নামকরণ করা হয়? *[৩৩তম বিসিএস]*

উত্তর : ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হলে জন্ম নেয় ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র। পূর্ববাংলা পাকিস্তানের একটি প্রদেশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এ অংশের নাম হয় পূর্ব পাকিস্তান। মূল পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। তবে শুরু থেকেই পাকিস্তানের শাসনভার পশ্চিম পাকিস্তানের ধনিক গোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রিভূত হওয়ায় পূর্ব বাংলার সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি ও সমাজ ব্যবস্থাকে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী নিজেদের করায়ত্ত করতে শুরু করে। এর বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার জনগণ প্রতিবাদ ও আন্দোলন-সংগ্রাম গড়ে তোলে। মাতৃভাষা বাংলাকে রক্ষা করার জন্য ভাষা আন্দোলন শুরু হয়। এর মাধ্যমে পূর্ব বাংলার বাংলা ভাষাভাষী বাঙালি জনগোষ্ঠী ঐক্যবদ্ধ হয়। মাতৃভাষা রক্ষার চেতনা থেকে পূর্ব বাংলার জনগণ ক্রমান্বয়ে পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রাম ও গণঅভ্যুত্থান গড়ে তোলে। পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৬ শতাংশ বাঙালি হওয়ার পরও রাষ্ট্র পরিচালনা, প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার ভোগসহ সর্বক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী কর্তৃত্ব শুরু করে। বাঙালি তথা পূর্ব বাংলার সাধারণ মানুষ সর্বক্ষেত্রে বঞ্চিত হতে থাকে। ভাষা

আন্দোলনের পটভূমি, পাকিস্তান সরকারের অগণতান্ত্রিক মনোভাব, পক্ষপাতমূলক সরকারি নীতি ও মুসলিম লীগের ভ্রান্ত নীতির প্রতিবাদে ১৯৪৯ সালের জুনে ঢাকায় গঠিত হয় আওয়ামী মুসলিম লীগ।

আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠনের প্রেক্ষাপট : আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতাবৃন্দ প্রায় সকলেই ছিলেন পাকিস্তান মুসলিম লীগের সদস্য। মুসলিম লীগ সুনির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক কর্মসূচিভিত্তিক দল ছিল না। বরং দলটি ছিল পাকিস্তান আন্দোলনের রাজনৈতিক বাহন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর রাষ্ট্র পরিচালনার ভার মুসলিম লীগের ওপর ন্যস্ত হয়। একটি নতুন রাষ্ট্রকে গড়ে তোলার উপযোগী কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের পরিবর্তে অল্পকালের মধ্যেই মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত হন। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্ব মুসলিম লীগকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে সমর্থ হয়। কিন্তু তার মৃত্যুর পর পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশের কিছুসংখ্যক প্রভাবশালী নেতা মুসলিম লীগ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে মুসলিম লীগের দ্বিজাতিতাত্ত্বিক ধ্যান-ধারণা থেকে বের হয়ে অসাম্প্রদায়িক প্রগতিশীল বাঙালি রাজনৈতিক নেতৃত্ব ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন ঢাকার রোজগার্ডেনে প্রায় ৩০০ জন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে এক সম্মেলনের মাধ্যমে 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ' গঠন করে। সম্মেলনে ৪০ সদস্যবিশিষ্ট আওয়ামী মুসলিম লীগের সাংগঠনিক কমিটিও গঠিত হয়। এ কমিটির সভাপতি ছিলেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, সাধারণ সম্পাদক টাঙ্গাইলের শামসুল হক এবং যুগ্ম সম্পাদক হন শেখ মুজিবুর রহমান। পশ্চিম পাকিস্তানেও এ দলের শাখা গঠিত হয় এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের আহ্বায়ক নিযুক্ত হন। তিনি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এ দলের নেতৃত্ব দান করেন। যদিও পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশে আওয়ামী মুসলিম লীগের শাখা ছিল, দলটি সেখানে কোনো দিনই জনপ্রিয় সংগঠনরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আওয়ামী মুসলিম লীগ ছিল মূলত পূর্ব-বাংলাভিত্তিক রাজনৈতিক দল।

আওয়ামী মুসলিম লীগের ঘোষণাপত্র ও ৪২ দফা কর্মসূচি : শুরুতেই দলটি বাঙালিদের স্বার্থে একটি বিস্তৃত কর্মসূচি গ্রহণ করে। এ সব দাবি উত্থাপনের কারণে দলটি দ্রুত পূর্ব বাংলার জনগণের কাছে প্রিয় হয়ে উঠতে শুরু করে। আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রথম ঘোষণাপত্রে যে ৪২ দফা কর্মসূচি প্রকাশ করা হয়, তার মধ্যে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ব-বাংলাকে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দানের দাবি ছিল প্রধান। কেবল প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র বিষয় ও মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে রেখে অন্য সকল বিষয় প্রাদেশিক সরকারের হাতে অর্পণ করার দাবি জানানো হয়। অন্য দাবিগুলোর মধ্যে ছিল বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দান, বিনা খেসারতে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ, উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টন, পাট ও চা শিল্প ও ব্যবসা জাতীয়করণ, যৌথ ও সমবায় পদ্ধতির কৃষি-ব্যবস্থা প্রবর্তন, শ্রমিকদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকারের নিশ্চয়তা দান, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন ইত্যাদি।

মওলানা ভাসানী, শেখ মুজিব ও শামসুল হকের ত্যাগ ও কঠোর পরিশ্রম : মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর অপরিসীম ত্যাগ ও কঠোর পরিশ্রমই আওয়ামী লীগকে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতির ক্ষেত্রে শীর্ষস্থান দখলে সক্ষম করে। মুসলিম লীগ সরকারের আমলে এ. কে. ফজলুল হক এডভোকেট জেনারেলের সরকারি পদ গ্রহণ করেন। আতাউর রহমান খান ওকালতি পেশায় অধিক মনোযোগী হন। ফলে সরকারি নিপীড়ন, নির্যাতন, জেল-জুলুম ও আর্থিক কষ্ট সহ্য করতে হয় মওলানা ভাসানী, তার যোগ্য পার্শ্বচর আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক ও যুগ্ম সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমানকে। শেখ মুজিবকে ১৯৪৯ সালে কারাগারে প্রেরণ করা হয়। তিনি ১৯৫২ সালের

২৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দীর্ঘকাল যাবৎ বন্দি জীবন কাটান। ১৯৫২ সালে ঢাকা কেন্দ্রীয় জেলে আটকাবস্থায় শামসুল হক মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেললে ১৯৫৩ সালে মাওলানা ভাসানীর অনুরোধেই শেখ মুজিবুর রহমানকে আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক করা হয়। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট গঠনের মূল উদ্যোগ ছিল আওয়ামী মুসলিম লীগের।

আওয়ামী মুসলিম লীগের নাম আওয়ামী লীগ করার কারণ : প্রতিষ্ঠা লাভের পর থেকেই দলটি পূর্ব বাংলার জনগণের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিকসহ সকল স্বার্থ রক্ষায় এক দিকে আন্দোলন-সংগ্রাম অব্যাহত রাখে, অন্যদিকে সংসদ ও প্রাদেশিক সরকারের সদস্যগণ সর্বত্র সোচ্চার হতে থাকেন। অবশ্য মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে আওয়ামী মুসলিম লীগের দুই নেতা মওলানা ভাসানী ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মধ্যে মতবিরোধ শুরু হয়। পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি এবং পাকিস্তানের জোট নিরপেক্ষ স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্নে মওলানা ভাসানী ছিলেন আপোশহীন। তিনি ছিলেন সাম্রাজ্যবাদী নীতির ঘোর বিরোধী। অন্যদিকে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নীতি ছিল কিছু নমনীয়, অনেকটা ডানপন্থী। তাই আওয়ামী লীগের মধ্যে মওলানা ভাসানীর বামঘেঁষা নীতি এবং সোহরাওয়ার্দীর ডানপন্থার মধ্যে দেখা দেয় সংঘাত। এ প্রেক্ষাপটে ১৯৫৫ সালের ২১-২৩ অক্টোবর ঢাকার সদরঘাটে অবস্থিত 'রূপমহল' সিনেমা হলে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের তিন দিনব্যাপী দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অধিবেশনের সুদূরপ্রসারী গুরুত্বপূর্ণ অবদান হলো সংগঠনের দ্বার জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্য উন্মুক্ত করা। পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রধান হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী অসাম্প্রদায়িকীকরণের ঘোর বিরোধী ছিলেন। পক্ষান্তরে সংগঠনের সাম্প্রদায়িক চরিত্র পরিবর্তনের প্রবক্তা ছিলেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। ২২ অক্টোবর ১৯৫৫ রাত প্রায় ৪টার দিকে হোসেন সোহরাওয়ার্দী তার আপত্তি প্রত্যাহার করলে সংগঠনকে অসাম্প্রদায়িক ও ধর্ম নিরপেক্ষ করার সিদ্ধান্ত স্থির হয়। পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি রাজনৈতিক নেতৃত্ব সুদূরপ্রসারী যেসব কারণে আওয়ামী মুসলিম লীগের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দিয়ে 'আওয়ামী লীগ' নামকরণ করেন তা নিচে আলোচনা করা হলো :

১. **পূর্ব পাকিস্তানে পালিত ধর্ম :** পূর্ব পাকিস্তান তথা পাক-ভারত উপমহাদেশের ইতিহাস অনেক প্রাচীন। দীর্ঘদিনের ইতিহাসের ধারায় এখানে বিভিন্ন শাসকগোষ্ঠী যেমন শাসন করেছে, তেমনি বিকাশ লাভ করেছে বিভিন্ন ধর্ম, সংস্কৃতি আর বিশ্বাস। এ দেশের ৯০% লোক ছিল মুসলমান। দ্বিতীয় বৃহত্তম জনগোষ্ঠী হিসেবে ছিল হিন্দু। অন্যদিকে ব্রিটিশ শাসনামল এবং পরবর্তীতে এনজিও কার্যক্রমের নামে খ্রিস্টান মিশনারিদের ব্যাপক তৎপরতায় এ দেশে খ্রিস্টানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেট, ময়মনসিংহ ও পটুয়াখালীসহ বিভিন্ন স্থানে যে সকল উপজাতি রয়েছে তাদের অধিকাংশই বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান। তবে তাদের অনেকেরই আবার নিজস্ব ধর্ম ছিল। তাই জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে এক রাজনৈতিক ধারায় পরিচালিত হওয়ার জন্য আওয়ামী মুসলিম লীগের নাম আওয়ামী লীগ করা হয়।

২. **পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে ধর্ম :** ঐতিহাসিক পথপরিক্রমায় পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান প্রভৃতি ধর্মাবলম্বী মানুষ পাশাপাশি অবস্থান করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক গীতিময় ঐতিহ্য ধারণ করে আছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের বাস হলেও স্বীয় অস্তিত্ব আর মান-সম্মান নিয়ে হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধসহ অন্য ধর্মাবলম্বী মানুষও এখানে স্ব স্ব ধর্ম পালন করছে। সামাজিক,

সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে ধর্মীয় বাতাবরণকে পাশ কাটিয়ে জাতীয় চেতনায় এবং শান্তির প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রত্যেকেই সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে জীবনযাপন করছে। এ সৌহার্দ্যে কখনো ফাটল দেখা দিলেই ঐতিহ্যগত সহমর্মিতা আর শান্তির স্বর্গীয় শিক্ষা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠীকে সব সময়ই বাড়াবাড়ির পথে থেকে ফিরিয়ে রেখেছে। ধর্মীয় আচার-আনুষ্ঠানিকতা এবং নিয়মতান্ত্রিক উপাসনার ধর্মীয় রীতি এ দেশের প্রতিটি ধর্মপ্রাণ মানুষের মাঝে থাকলেও ধর্মান্ধতার বিষাক্ত ছোবল কখনও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মাঝে বাধার সৃষ্টি করতে পারেনি। ফলে ধর্ম পরিচয় নির্বিশেষে সকল বাঙালি ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহ জাতীয়তাবাদের ধারায় অংশগ্রহণের সুযোগ লাভের জন্যই বাঙালি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগ নামকরণ করেন।

৩. **আন্দোলন-সংগ্রামে ধর্মনিরপেক্ষতা :** ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলেও দেখা যায়, এ দেশের বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণের মানুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলেছে। ইংরেজবিরোধী আন্দোলন থেকে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আন্দোলনে এ দেশের মানুষ ধর্মীয় বাদ-বিচারের উর্ধ্বে ওঠে জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে লড়েছে। পাকিস্তানি শাসকরা যখন ধর্মের দোহাই দিয়ে বাঙালি জাতিকে শোষণ করছিল, তখন এ দেশের মানুষ সে শুভংকরের ফাঁকি ঠিকই বুঝতে পেরেছে। এ দেশের মানুষ জেনেছে ধর্মের দোহাই দিয়ে শোষণ করা কোনো শাসকের কাজ নয়।

৪. **'৫২ এর ভাষা আন্দোলন :** ইসলামী ঐক্যের নামে পাকিস্তানি শাসকবৃন্দ নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে বাঙালিদের ওপর চাপিয়ে দেবার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এর ফলে পূর্ব-বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায় মনস্তাত্ত্বিকভাবে পাকিস্তান হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নটি সুপ্ত বাঙালি স্বাতন্ত্র্যবোধকে পুনর্জাগরিত করে এবং মুসলিম জাতীয়তাবাদের ভিত্তিকে দুর্বল করে ফেলে। ভাষা আন্দোলন পূর্ব-বাংলায় বিরোধী দল তথা অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির পথ প্রশস্ত করে। এর প্রভাবে ১৯৫১-৫৩ সালের মধ্যে গণতন্ত্রী দল, ছাত্র ইউনিয়ন প্রভৃতি অসাম্প্রদায়িক ছাত্র ও রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে ওঠে এবং পূর্ব-বাংলার 'মুসলিম ছাত্র লীগ' তার নাম থেকে 'মুসলিম' কথাটি বর্জন করে। ১৯৫২ সালের পূর্বে বিরোধী দল 'আওয়ামী মুসলিম লীগ'-এর সমর্থনভিত্তি ছিল খুবই সংকীর্ণ। কিন্তু ভাষা-আন্দোলনের ফলে সে দল দ্রুত শক্তি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করতে থাকে। ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নটি ছিল একটি প্রধান ইস্যু এবং সরকারের ভাষানীতিই ছিল বিরোধী যুক্তফ্রন্টের নিকট শাসক দল মুসলিম লীগের পরাজয়ের অন্যতম কারণ। এ বিষয়টিও আওয়ামী মুসলিম লীগের নাম আওয়ামী লীগ করার একটি অন্যতম কারণ।

৫. **১৯৫৪ সালের নির্বাচনের ফলাফল :** পাকিস্তানের শাসকদল মুসলিম লীগ যুক্তফ্রন্টের স্বায়ত্তশাসন দাবিকে বিচ্ছিন্নতাবাদ বলে আখ্যায়িত করে এবং ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্রকে প্রধান নির্বাচনী ইস্যুতে পরিণত করে। তাদের নির্বাচনী প্রচারের মূল সুর ছিল নিম্নরূপ :

"একমাত্র মুসলিম লীগ মুসলমান ও পাকিস্তানকে রক্ষা করতে পারে। মুসলিম লীগ ধ্বংস হলে পাকিস্তান এবং মুসলমানও ধ্বংস হয়ে যাবে। পাকিস্তান একটি ইসলামী রাষ্ট্র হবে কিনা তা এ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে। কারণ একদিকে রয়েছে মুসলিম লীগ এবং অপরদিকে রয়েছে এমন সব দল যারা ইসলামী রাষ্ট্র চায় না। এ নির্বাচন একটি গণভোট, যার দ্বারা নির্ধারিত হবে পূর্ব-বাংলা পাকিস্তানের অংশ থাকবে, না ভারতের অন্তর্ভুক্ত হবে।"

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য আসন সংরক্ষণসহ পৃথক নির্বাচনের ভিত্তিতে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যায় মোট ২২৮টি মুসলিম আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট ২০৬টি, মুসলিম লীগ ৯টি, খেলাফতে রব্বানী পার্টি ১টি এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ১২টি আসন লাভ করেন। মুসলিম মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ৯টি আসনই পায় যুক্তফ্রন্ট। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে আরও প্রতীয়মান হয় যে, পূর্ব-বাংলার জনগণ তাদের রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন এবং শুধু ধর্মের নামে তাদেরকে প্রতারণা করা যাবে না।

৬. **সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি :** ঐতিহাসিক কাল থেকেই এখানে হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি বসবাস করে আসছে। বাংলার আনাচে-কানাচে পাশাপাশি বাড়ি, পাশাপাশি ঘরে হিন্দু-মুসলিম-খ্রিষ্টান বসবাস করছে, প্রতিনিয়ত পারস্পরিক লেনদেন হচ্ছে। সমমর্যাদা আর অধিকার নিয়ে এখানে সকল ধর্মের মানুষ তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন পরিচালনা করছে। ব্রাহ্মণ্যবাদের মিথ্যা আভিজাত্য একসময় বাঙালি সমাজে জাতিভেদ আর বর্ণভেদের দুষ্ট ক্ষত সৃষ্টি করলেও কালক্রমে তা বিলুপ্ত হয়। বিশেষ মুসলিম ভ্রাতৃত্ব ও মানসিক শিক্ষার প্রচ্ছন্ন ছায়া এবং বাঙালির ঐতিহ্যগত সৌহার্দ্য এ ক্ষতকে বিস্তৃত হতে দেয়নি। এখানে প্রতিটি ধর্মের মানুষ তাদের স্ব স্ব ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করে এবং একে অপরের ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও রীতিনীতির প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল। এমনকি একে অপরকে নিজস্ব ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ জানানোর যে ঐতিহ্যিক রীতি তা সত্যিই প্রশংসনীয়। পরধর্মের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়া এবং উপভোগ করার অনুপম রীতি এখানে বিদ্যমান। তা ছাড়া পহেলা বৈশাখ, পৌষসংক্রান্তি ও পিঠা পুলির উৎসবসহ এমন কিছু উৎসব আছে যেখানে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে প্রতিটি বাঙালি এক অভিন্ন অস্তিত্বের সন্ধান খোঁজে। পরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং প্রত্যেককে তাদের ধর্ম-কর্ম পালনের সুযোগদানের ব্যাপারে এ দেশের প্রতিটি মানুষ সজাগ। প্রতিটি মসজিদে আজানের পবিত্র ধ্বনির আবহ যেমন মানব মনকে আলোড়িত করে, তেমনি মন্দির, চার্চ কিংবা প্যাগোডায় বিনীত প্রার্থনার আকুলতাও তেমনি পবিত্র আবহ ছড়ায়।

আওয়ামী লীগ নামকরণ করা হয় যে সালে : ১৯৫৫ সালের ২৩ অক্টোবর অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক আদর্শ ধারণ করে দলের নাম 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ' নামকরণ করা হয়। ফলে ধর্ম পরিচয় নির্বিশেষে সকল বাঙালি ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহ জাতীয়তাবাদের ধারায় অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। উক্ত সুদূরপ্রসারী ও গভীর সম্ভাবনাময় সিদ্ধান্তের ফলে অনাগত ভবিষ্যতের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে এক শুভ মৌলিক গণতান্ত্রিক সৌভ্রাতৃমূলক পরিবেশ সৃষ্টির গোড়াপত্তন ঘটে। ১৯৭১ সালে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর ঐতিহ্যবাহী এ দলটির নামকরণ করা হয় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ।

উপসংহার : আমাদের রাজনীতিতে ধর্মের উপস্থিতি নিয়ে অনেক কথা চালু থাকলেও এ দেশের মানুষ ধর্মের নামে রাজনৈতিক সহিংসতাকে ঘৃণা করে। বিশেষ করে রাজনৈতিকভাবে ধর্মকে হেয় প্রতিপন্ন করা বা ধর্মবিরোধী কার্যক্রমকে তারা কখনোই সমর্থন করেনি। পুরোপুরি ধর্মীয় শাসন প্রতিষ্ঠার যে আদর্শিক আন্দোলন তার প্রতিও জনসাধারণের সমর্থন তেমন লক্ষ্য করা যায় না। ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে যে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির সূত্রপাত ঘটে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের পর তা আরও জোরদার হয়। তৎকালীন বৃহত্তম বিরোধী দল আওয়ামী মুসলিম লীগ নিজেকে অসাম্প্রদায়িক দল হিসেবে পুনর্গঠিত করে এবং যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে দ্বিজাতি তত্ত্বের মূলে কুঠারাঘাত করে।

০২। পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার প্রতিক্রিয়া ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের উদ্ভব সম্বন্ধে আলোচনা করুন। *[২০তম বিসিএস]*

অথবা, ১৯৪৭ সালের পর হতে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উদ্ভব সম্পর্কে আলোচনা করুন। *[৩২তম বিসিএস]*

***অথবা,* বাঙালি জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করুন।**

উত্তর : ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান নামে যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় তার দুটো অংশ—একটি পূর্ব পাকিস্তান, অপরটি পশ্চিম পাকিস্তান। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশে পরিণত হয়। পাকিস্তানের জাতির পিতা কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ কখনই পূর্ব পাকিস্তানকে সমমর্যাদাপূর্ণ একটি প্রদেশ মনে করেননি। এছাড়া কতিপয় মুসলিম লীগ নেতা সুকৌশলে সমৃদ্ধশালী পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশ তথা করদ রাজ্যে পরিণত করার প্রয়াসে লিপ্ত হন। কিছুদিনের মধ্যেই তাদের প্রকৃত রূপ ধরা পড়ে। বাঙালিরাও তার যথাযথ জবাব দিতে ভুল করেনি। ফলে পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে বাঙালিদের প্রতিক্রিয়ায় ধাপে ধাপে বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকশিত হতে থাকে।

ভাষা সমস্যা ও ভাষা সংগ্রাম : পাকিস্তান সৃষ্টির প্রথমেই দেখা দেয় ভাষা সমস্যা। পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্ব থেকেই পশ্চিমা স্বার্থান্বেষী মহল উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার পাঁয়তারা করতে থাকে। বাংলার জাতীয় ইতিহাসে অবিস্মরণীয় ঘটনার বীজ রোপিত হয় যখন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই নিখিল পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ ভাগ জনগণের মাতৃভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক উপায়ে উর্দুকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেয়ার প্রচেষ্টা চালানো হয়। এরই প্রেক্ষিতে ২ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় শিক্ষক ও ছাত্রের উদ্যোগে 'তমুদ্দুন মজলিস' নামক সাংস্কৃতিক সংগঠনের মাধ্যমে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার যে আন্দোলন শুরু হয়, তা 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ', 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি'সহ বিভিন্ন সংগঠনের অধীনে প্রতিবাদ, হরতালসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সালে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ আরো নাম না জানা অনেকের জীবন বিসর্জনের মাধ্যমে চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করে। এর প্রভাব বাংলার সুদীর্ঘ রাজনৈতিক ইতিহাসের পরতে পরতে দেখতে পাওয়া যায় এবং এরই সার্থক পরিণতি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

বাঙালি জাতীয়তাবাদের উদ্ভবে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব : '৫২-র ভাষা আন্দোলন পূর্ববাংলার গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে এক ধাপ এগিয়ে দেয়। জনগণের মধ্যে এ আন্দোলন এক নতুন জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটায়। এ চেতনাই ক্রমে ক্রমে বাঙালি জাতীয়তাবাদের জন্ম দেয়। জনগণের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে বহু গুণে বাড়িয়ে দেয় এ আন্দোলন। তাই ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন ছিল বাংলাদেশের গণচেতনার প্রথম বহিঃপ্রকাশ এবং স্বাধিকার আন্দোলনের এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। ১৯৮০ সালের 'জিজ্ঞাসা'র একুশে সংকলনে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব সম্পর্কে বলা হয়, 'পূর্ব পাকিস্তানের ইতিহাসে ভাষা আন্দোলন এক নতুন দিকদর্শন, এই আন্দোলন বাঙালিদের মনে যে বৈপ্লবিক চেতনা ও ঐক্যের উন্মেষ ঘটায় তা আমাদের পরবর্তী সকল আন্দোলনের প্রাণশক্তি ও অনুপ্রেরণা যোগায়। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ছাত্র-জনতা যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সূচনা করে তা ক্রমশ শক্তিশালী হতে থাকে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের ঐতিহাসিক বিজয়, ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের স্বাধিকার আন্দোলন ও ছয় দফা, ১৯৬৮-৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের নির্বাচন এবং সর্বোপরি ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে বিশেষভাবে প্রেরণা যুগিয়েছে এ ভাষা আন্দোলন।' অতএব বলা যায়, ভাষা আন্দোলনই ধাপে ধাপে পরবর্তী সকল রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উদ্ভবকে ত্বরান্বিত করেছে।

১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচন : মুসলিম লীগের রাজনৈতিক নিপীড়ন এবং পূর্ববাংলার প্রতি অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রেক্ষাপটে ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচন ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগকে মোকাবিলা করার জন্য বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো যুক্তফ্রন্ট গঠন করে। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, এ কে ফজলুল হক এবং শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি, নেজামে ইসলাম এবং গণতন্ত্রী দলের সমন্বয়ে ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। পূর্ব বাংলার গণমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিফলিত করে যুক্তফ্রন্ট ২১ দফাভিত্তিক নির্বাচনী ইশতেহার প্রণয়ন করে। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দান, কৃষকদের অগ্রগতি সাধন, দেশে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠা, দুর্ভিক্ষের অভিশাপ দূর করা এবং পররাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা ও অর্থ ব্যতীত পূর্ব বাংলাকে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন দান ছিল ২১ দফার মূল বিষয়বস্তু। এ নির্বাচনে স্পিকারসহ ৩১০টি আসনের মধ্যে ২৩৭টি আসন ছিল মুসলিম আসন। এর মধ্যে যুক্তফ্রন্ট ২২৩টি আসনে জয়লাভ করে। অন্যদিকে মুসলিম লীগ পেয়েছিল মাত্র ১০টি আসন। যুক্তফ্রন্ট মোট ভোট পেয়েছিল ৯৭ ভাগেরও বেশি। এ নির্বাচনে পূর্ব বাংলার জনগণ বাংলা ভাষা ও স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে সুস্পষ্ট রায় দেয়।

যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের তাৎপর্য : ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়কে অনেকে বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ অতিক্রম বলে মনে করেন। সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত 'History of Bengal' গ্রন্থে ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচন সম্পর্কে বলা হয়, 'However the election result had on decissive important on the nature and direction of subsequent political changes including the emergence of Bangladesh.'। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, পূর্ব বাংলার জনগণ তাদের রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন এবং শুধু ধর্মের নামে তাদের প্রতারিত করা যায় না। এ নির্বাচনের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, পূর্ব বাংলার জনগণ স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকারের প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ।

১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন : আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে জোটবদ্ধ হতে উৎসাহিত করে। প্রভুত্বব্যঞ্জক সরকারের অবসানের জন্য হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনার সূত্রপাত ঘটালে আইয়ুব খান ভীত হয়ে ১৯৬২ সালের ৩০ জানুয়ারি করাচিতে তাকে গ্রেপ্তার করেন। সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ধর্মঘট ও বিক্ষোভের মুখে সামরিক কর্তৃপক্ষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেন এবং দৈনিক ইত্তেফাক সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, শেখ মুজিবুর রহমান ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আবুল মনসুর আহমদকে গ্রেপ্তার করে। এতে ছাত্র আন্দোলন পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। আইয়ুববিরোধী ছাত্র বিক্ষোভ প্রশমিত করার জন্য অসংখ্য ছাত্র, রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৬২ সালের ১৯ আগস্ট সরকার হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে মুক্তি দেয়ার পরপরই ছাত্র সমাজ হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বাতিলের আন্দোলন শুরু করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এ রিপোর্ট বাতিলের আন্দোলন ১৭ সেপ্টেম্বর এক মর্মান্তিক ঘটনার পরিণতি লাভ করে। ছাত্র বিক্ষোভকালে পুলিশের গুলিতে কয়েকটি তাজা প্রাণ ঝরে পড়ে, যার প্রতিবাদে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর আহ্বানে ৭ অক্টোবর সমগ্র পাকিস্তানে 'প্রতিবাদ দিবস' পালিত হয়। '৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন পরবর্তীকালের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলন : ১৯৬৬ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ বাঙালি জাতিকে এমন একটি ধারণা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে যে, পাকিস্তানিরা নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য শুধু আমাদের ব্যবহার করবে। তাই পশ্চিমা শাসকচক্রের দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ আর হীন বঞ্চনার তিক্ত অভিজ্ঞতা বিচার করে দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি সাবজেক্ট কমিটির মিটিংয়ে প্রথম ছয় দফা কর্মসূচির কথা ঘোষণা করেন এবং ২১ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটিতে ছয় দফা প্রস্তাব ও আন্দোলনের কর্মসূচি পেশ করেন। ১৮ মার্চ ১৯৬৬ শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফাকে 'আমাদের বাঁচার দাবি' বলে অভিহিত করেন। ঐতিহাসিক এই ছয় দফা কর্মসূচি ঐক্যবদ্ধ বাঙালি জাতি জাতীয় মুক্তির প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করে।

ছয় দফার গুরুত্ব : বাঙালি জাতির স্বাধিকার আন্দোলনের ইতিহাসে ছয় দফা আন্দোলন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এক কথায় ছয় দফা দাবি ছিল পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় 'মুক্তির সনদ'। ড. মুহাম্মদ হান্নান 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস' গ্রন্থে বলেন, 'প্রকৃতপক্ষে ছয় দফা হচ্ছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রথম স্মারক, যেখানে বাঙালির মুক্তি সংগ্রাম নতুনভাবে গতি লাভ করেছিল।' রওনক জাহান বলেন, 'ছয় দফা আন্দোলন ক্ষণস্থায়ী হলেও তা বাঙালির রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন ঘটায় এবং তা পরবর্তীকালের রাজনৈতিক আন্দোলনগুলোর গতিপ্রকৃতি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।' তাই নিঃসন্দেহে বলা যায়, বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশের ক্ষেত্রে ছয় দফার ভূমিকা ছিল অনন্য।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা : ছয় দফাভিত্তিক আন্দোলন যখন জাতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করে, তখনই শেখ মুজিবুর রহমানের ওপর নেমে আসে নিপীড়ন। শেখ মুজিবুর রহমান বুঝতে পারলেন, পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী স্বেচ্ছায় বাঙালিদের তাদের ন্যায্য রাজনৈতিক অধিকার দেবে না, অধিকার ছিনিয়ে নিতে হবে। তাই শেখ মুজিব স্বাধীনতার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে যে সকল অন্তরায় ছিল তা দূর করার জন্য ভারতের সহযোগিতার প্রয়োজন ছিল। তাই ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে বাংলাদেশের আলী রেজা এবং ভারতীয় Inter-Intelligence Department-এর ব্রিগেডিয়ার মেনন অংশ নেন। কিন্তু চূড়ান্ত সময় আসার পূর্বেই এ পরিকল্পনার খবর আইয়ুবের প্রশাসনে জানাজানি হয়ে যায়। ফলে শেখ মুজিবসহ ৩৫ জনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে 'আগরতলা ষড়যন্ত্রমূলক মামলা' রুজু করা হয়। বাঙালি জনতা এই মামলার বিরুদ্ধে ইস্পাত কঠিন ঐক্য গড়ে তোলে। এ মামলার অন্যতম আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হক ঢাকা সেনানিবাসে পুলিশের গুলিতে শহীদ হলে আন্দোলন আরো তীব্র রূপ ধারণ করে। এ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন এগার দফার ভিত্তিতে গঠিত সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ। অবশেষে ছাত্র আন্দোলন ও গণআন্দোলনের মুখে সরকার মামলাটি প্রত্যাহার করে নেয়।

'৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান : আওয়ামী লীগের ছয় দফা ও ছাত্র সমাজের ১১ দফা দাবি উপেক্ষিত হলে ১৯৬৯ সালে সারা দেশে তীব্র আন্দোলন শুরু হয়। সরকার এ আন্দোলনকে নস্যাৎ করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। এ উদ্দেশ্যে সরকার সমগ্র দেশে জরুরি অবস্থা ও ১৪৪ ধারা জারি করে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্র-জনতা জরুরি অবস্থা অমান্য করে রাস্তায় নেমে পড়লে শুরু হয় প্রচণ্ড আন্দোলন ও বিক্ষোভ। এ সময় সরকারি নির্দেশে পুলিশ মিছিলের ওপর গুলি চালালে নিহত হয় আসাদসহ বহু সাধারণ মানুষ। ফলে আন্দোলন আরো তীব্র আকার ধারণ করে এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দল এ মৌলিক অধিকার আদায়ের শপথ নিয়ে ৮ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে 'গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করে। পরবর্তী আন্দোলনমুখী ঘটনায় মতিউর, জোহা, জহুরুল হকের শাহাদাত বরণ পাক শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মহাবিস্ফোরণ হিসেবে দেখা

দেয়। ফলে পতন ঘটে স্বৈরাচার আইয়ুবের। প্রকৃতপক্ষে '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানই পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহের পথ সুদৃঢ় করার মাধ্যমে বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশের পথ প্রশস্ত করে।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন : আইয়ুব সরকারের পতনের পর ক্ষমতায় আসেন জেনারেল ইয়াহিয়া খান। তিনি পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের নির্বাচন দেয়ার প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেন। '৭০-এর ৭ ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদের এবং ১৭ ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন সম্পন্ন হয়। অবশ্য বন্যা ও জলোচ্ছ্বাসের কারণে কয়েকটি আসনে '৭১-এর ১৭ জানুয়ারি নির্বাচন হয়। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে। জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮২টি আসন লাভ করে আওয়ামী লীগ। ফলে পুরো পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। নির্বাচনের পূর্ণাঙ্গ ফলাফলের একটি চিত্র প্রদান করা হলো :

দল	সাধারণ আসন	মহিলা আসন	মোট
১. আওয়ামী লীগ	১৬০	৭	১৬৭
২. পিপলস পার্টি	৮৩	৫	৮৮
৩. ন্যাপ (ওয়ালী খান)	৬	১	৭
৪. মুসলিম লীগ	১৮	—	১৮
৫. পিডিপি	১	—	১
৬. জামায়াতে ইসলামী	৪	—	৪
৭. জমিয়তে উলামা-ই-পাকিস্তান	৭	—	৭
৮. জমিয়তে উলামা-ই-ইসলাম	৭	—	৭
৯. স্বতন্ত্র প্রার্থী	১৪	—	১৪
মোট	৩০০	১৩	৩১৩

এ নির্বাচনে জনগণ ছয় দফার প্রতি সমর্থন দান করে এবং বাঙালি জাতি প্রথমবারের মতো স্বশাসন ও আত্মপ্রকাশ করার সুযোগ লাভ করে। ফলে বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশের চূড়ান্ত অধ্যায়ে এ নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১৯৭০ সালের নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতি : নির্বাচনোত্তর সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ১০ ফেব্রুয়ারির মধ্যে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকার জন্য প্রেসিডেন্টকে পরামর্শ দেন। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানি নেতৃবর্গ পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোর কথানুযায়ী ৩ মার্চ অধিবেশন ডাকেন। কিন্তু আকস্মিকভাবে তা ১ মার্চ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়। এমতাবস্থায় সর্বস্তরের জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। উপায়ান্তর না দেখে ইয়াহিয়া খান ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকেন। অন্যদিকে শেখ মুজিব ২৫ মার্চের জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের পূর্বশর্ত হিসেবে ৭ মার্চের ঐতিহাসিক জনসভায় ৪ দফা দাবি পেশ করেন। দাবিগুলো হলো :

১. সামরিক শাসন প্রত্যাহার করতে হবে।
২. অবিলম্বে সামরিক বাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে।
৩. সামরিক বাহিনীর হাতে প্রাণহানির তদন্ত করতে হবে।
৪. অধিবেশনের পূর্বে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা : নির্বাচনের ফলাফলে অসন্তুষ্ট হয়ে ইয়াহিয়া খান গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকেন। এদিকে ক্ষমতা ভাগাভাগির প্রশ্নে ১৬ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ প্রহসনমূলক আলোচনার ব্যবস্থা করেন। তবে গোটা আলোচনা পর্বটাই ছিল ইয়াহিয়া খানের ছলনা। তার মূল উদ্দেশ্য ছিল আলোচনার অন্তরালে সামরিক প্রস্তুতি গ্রহণ করা। সেজন্য সাংবাদিক অ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাস ইয়াহিয়ার উক্ত প্রহসনের আলোচনাকে 'বিশ শতকের সর্বাধিক জঘন্যতম প্রবঞ্চনা' বলে আখ্যায়িত করেন। ২৫ মার্চ ইয়াহিয়া খান পরিকল্পিতভাবে তার সশস্ত্র বাহিনীকে এ দেশের ঘুমন্ত নর-নারী ও শিশুদের পৈশাচিক কায়দায় হত্যাকাণ্ড চালাবার এবং শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করার নির্দেশ দিয়ে মধ্যরাতে ঢাকা ত্যাগ করেন। গ্রেপ্তার হবার পূর্বে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং ২৭ মার্চ শেখ মুজিবের পক্ষে মেজর জিয়া উক্ত স্বাধীনতা ঘোষণা পাঠ করেন। ফলে সম্মিলিতভাবে বাঙালিদের পাকবাহিনীর গণহত্যা প্রতিরোধের সূচনা ঘটে। বিচ্ছিন্ন প্রতিরোধ মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন বাহিনী গঠনের মাধ্যমে সংগঠিত রূপ লাভ করে। দীর্ঘ নয় মাসের এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ১৬ ডিসেম্বর '৭১ বিকশিত হয় বাঙালি জাতীয়তাবাদের চূড়ান্ত অধ্যায় তথা বাংলাদেশের স্বাধীনতা।

০৩ ॥ বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে সংস্কৃতির অবদান আলোচনা করুন। *[৩৩তম বিসিএস]*
অথবা, বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে বাঙালি সংস্কৃতি কিভাবে প্রাণশক্তি হিসেবে কাজ করছে বর্ণনা করুন। *[৩৪তম বিসিএস]*

উত্তর : স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। তাছাড়া সৃষ্টির কোনো জীবই পরাধীন থাকতে চায় না। ব্যক্তি, জাতি সবাই চায় স্বকীয় সত্তার বিকাশ ঘটাতে। তদ্রূপ বাঙালি জাতিও তার নিজস্ব আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভাষা-সাহিত্য, জীবনাচরণ প্রভৃতির বিকাশ ঘটাতে ছিল বদ্ধপরিকর। তাই এ জাতি পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর অন্যায়, অত্যাচার আর শোষণের বিরুদ্ধে গড়ে তোলে তীব্র প্রতিবাদ। শুরু হয় স্বাধীনতা আন্দোলন। বাংলাদেশের এই স্বাধীনতা আন্দোলনে সংস্কৃতির রয়েছে অসামান্য অবদান। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে সংস্কৃতির অবদান আলোচনার পূর্বে সংস্কৃতি সম্পর্কে আমাদের ধারণা নেয়া আবশ্যক।

সংস্কৃতি কি : সংস্কৃতি হলো মানুষের আচার-আচরণের সমষ্টি। মানুষের জাগতিক নৈপুণ্য ও কর্মকুশলতা, বিশ্বাস, আশা-আকাঙ্ক্ষা, নৈতিকতা, রাজনীতি, ভাষা, কলা, মূল্যবোধ সবকিছুই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। সংস্কৃতি হচ্ছে সমাজের মানুষের অর্জিত জ্ঞান, বিশ্বাস, কলা, নীতি, নিয়ম, সংস্কার ও অন্যান্য যে কোনো বিষয়ে দক্ষতার সর্বাধিক সমাবেশ। মোতাহের হোসেন চৌধুরী বলেন, 'সংস্কৃতি মানে সুন্দরভাবে, বিচিত্রভাবে বাঁচা।' সংস্কৃতি সম্পর্কে এমারসন বলেন, 'সংস্কৃতিই খুলে দেয় সুন্দরের চেতনার দরজা।' সংস্কৃতি সম্পর্কে ম্যাথু আর্নল্ড-এর অভিমত হলো, 'সংস্কৃতি আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয় বিশ্বের সর্বোত্তম জিনিসগুলোর সঙ্গে এবং সেই সঙ্গে মানুষের গৌরবময় ইতিহাসের সঙ্গে।' আবার কালটাজার গ্রাসিয়ান বলেন, 'মানুষ জন্মায় বর্বর হয়ে, সংস্কৃতিই তাকে করে সুসভ্য'। তবে সংস্কৃতি শনাক্তকরণের কোনো নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য নেই, গণ্ডি নেই। এটি চলমান জীবনের প্রতিচ্ছবি। এলাকাভিত্তিক এর ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। একটা নির্দিষ্ট এলাকার মানুষের জীবন প্রণালী অর্থাৎ মানুষের দৈনন্দিন আচার-আচরণ, কাজকর্ম, পোশাক-পরিচ্ছদ, প্রচলিত লোককাহিনী, ধর্মীয় উৎসব-অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান, চিন্তা-চেতনা সবকিছুই সংস্কৃতির মধ্যে পড়ে।

স্বাধীনতা-পূর্ব বাঙালি সংস্কৃতি : বাংলাদেশের সংস্কৃতির রয়েছে গৌরবময় ঐতিহ্য। এ দেশের পথে প্রান্তরে সহজ-সরল বিশ্বাসী মানুষের পদচারণা, কাব্য ও শিল্পচর্চা প্রাচীনকাল থেকেই লক্ষ্য করা যায়।

এ দেশের সাহিত্যে গীতি প্রবণতা ও সঙ্গীতের প্রাধান্য দেখা যায় সেই সুদূর প্রাচীনকাল থেকেই। বাংলার ভাটিয়ালি, যাত্রা, বাউল, মুর্শিদী, মারফতী, পালাকীর্তন, কবিগান ইত্যাদির মধ্যে বাংলার অন্তরের সুরটি ধ্বনিত হয়। স্বাধীনতা-পূর্ব কালের বাংলা সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে এসব আচার অনুষ্ঠানের চর্চা উপস্থিত ছিল বেশ ভালোভাবেই। এখানে বাস করে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ আর বাংলা সংস্কৃতি, সকল জাতির সকল স্তরের মানুষের মিলিত মানস-চর্চার বহিঃপ্রকাশ। একে অপরের ভিতর পারস্পরিকতা, হৃদ্যতা, সৌহার্দ্যতা, মমত্ববোধ সেই অনেক জনম থেকেই প্রবল। বাংলাদেশের সংস্কৃতির ভিতর যে ধর্মীয় রীতিনীতি, উৎসব, লোকসাহিত্য, সঙ্গীত, ঋতু উৎসব, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, সামাজিক প্রথা রয়েছে তা বহুকাল পূর্ব থেকে চলে আসছে। তবে বিভিন্ন সময়ে কালের আবর্তে সংস্কৃতির চলমান ধারায় বেশ কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। অনেক ক্ষেত্রে পরিবর্ধন ও সমৃদ্ধির ছোঁয়া লক্ষ্য করা যায়। যেমন— ব্রিটিশ শাসনামলে ইংরেজি সংস্কৃতির সংস্পর্শ ও পাকিস্তানী আমলে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক তথা সামাজিক কারণে এ দেশের মানুষ অনেকখানি কোণঠাসা অবস্থার মধ্যে পড়ে। ফলে সেই ঐতিহ্যগত সংস্কৃতির ধারা বাধাগ্রস্ত হয়। এমনকি এ দেশের নিজস্ব সংস্কৃতির অস্তিত্বও অনেকখানি নাজুক হয়ে পড়ে। এ দেশের ভাষা, সাহিত্য, সমাজ, অর্থনীতি, সংস্কৃতি প্রভৃতি উপাদানের নাজুক অবস্থার জন্য মূলত পশ্চিমা শোষক শ্রেণীই ছিল দায়ী।

স্বাধীনতা আন্দোলনে সংস্কৃতির অবদান : বাঙালি জাতি সংগ্রামী জাতি। এ জাতি পরাধীনতার গ্লানিকে কখনই মেনে নেয়নি। তাই পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী যখন এ দেশের সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল তখন এ দেশের ছেলে-বুড়ো, নারী-পুরুষ, শিক্ষিত অশিক্ষিত সবাই এ ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ গড়ে তোলে, শুরু হয় স্বাধীনতা আন্দোলন। নিচে স্বাধীনতা আন্দোলনে সংস্কৃতির অবদান তুলে ধরা হলো :

১. **ভাষার দাবি আদায় :** বাঙালি জাতির মুক্তির প্রথম ধাপ হলো ভাষা আন্দোলন। এ আন্দোলন পরবর্তী সকল রাজনৈতিক আন্দোলনে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। এ আন্দোলন এ দেশের মানুষকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। এ আন্দোলন পূর্ব পাকিস্তানিদেরকে ঐক্য ও স্বাধীনতার চেতনা দিয়েছে। একুশের চেতনা আমাদেরকে আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে স্বাধীনতা সংগ্রামে অপরিমেয় ইন্ধন যুগিয়েছে। এটি ছিল বাঙালিদের মুক্তির প্রথম আন্দোলন। একুশের চেতনা সকল স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। ভাষা আন্দোলন ১৯৭১ সালে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, কৃষক, শ্রমিক সকল শ্রেণীর মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিল, যার পরিণতিতে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্ম হয়।

২. **কবি ও কবিতায় মুক্তির আহ্বান :** কবি, কবিতা ও সাহিত্য সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায়সমৃদ্ধ হয়ে অনেক কবি তাই জ্বালাময়ী কবিতা রচনা করেছেন। নিচে এরূপ কিছু কবি ও তাদের কবিতা উল্লেখ করা হলো :

ক. জসীমউদ্‌দীন : মুক্তিযুদ্ধের কবিতা আলোচনার ক্ষেত্রে প্রথমেই আসেন পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীন। ১৯৭১ সালের ২ মে ধ্বংসযজ্ঞ শুরুর পরপরই তিনি লিখেছেন 'দগ্ধগ্রাম' ও 'মুক্তিযোদ্ধা' কবিতা। তিনি সহজ সরল ভাষায় লিখেছেন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর অত্যাচারের নগ্ন ইতিহাস—

"মার কোল হতে শিশুরে কাড়িয়া কাটিল যে খান খান
পিতার সামনে মেয়েরে কাটিয়া করিল রক্তস্নান।"

যুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে বাংলাদেশে অবরুদ্ধ বয়োবৃদ্ধ কবি যেন মানসিকভাবে মুক্তিযোদ্ধায় পরিণত হয়েছেন—

"আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা, মৃত্যু পিছনে আগে
ভয়াল বিশাল নখর মেলিয়া দিবস রজনী জাগি।"

খ. **সুফিয়া কামাল :** ১৯৭১ সালের ২ মার্চ সোনার বাংলা খচিত পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে মানুষের যে চেতনার প্রতিফলন ঘটেছিল, বাঙালি জাতীয় চেতনার যে ঐক্য সংগঠিত হয়েছিল তার প্রকাশ যেসব কবির কবিতায় ফুটে উঠেছে তার মধ্যে সুফিয়া কামাল অন্যতম। বেগম সুফিয়া কামাল তার 'প্রথম শহীদ বাংলাদেশের মেয়ে' কবিতায় এ চেতনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। বাংলাদেশকে পাক হানাদার মুক্ত করার দীপ্তশপথ নিয়ে যে নারী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ নির্বিশেষে ত্যাগ স্বীকার করেছিল, সবাই প্রাণ বিসর্জনে প্রস্তুত হয়েছিল, তার প্রকাশ ঘটেছে কবি বেগম সুফিয়া কামালের কবিতায়।

গ. **আবুল হোসেন :** বাংলাদেশের আধুনিক কবিদের মধ্যে অগ্রজ আবুল হোসেন 'পুত্রদের প্রতি' কবিতায় এক বাঁশিওয়ালার কথা বলেছেন, হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালার মতো যিনি সব ছেলেদের ঘরছাড়া করবেন, যারা আর ফিরবে না, যাদের মুখ আর দেখা যাবে না। স্বাধীনতা আর মুক্তির জন্য একটি পুরো প্রজন্ম ঘড়ছাড়া হলো। কেউ তাদের সেদিন ধরে রাখতে পারেনি ঘরে।

ঘ. **শামসুর রাহমান :** একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের শ্বাসরুদ্ধকর, ভয়াবহ বন্দিদশা তথা মুক্তিযুদ্ধে মানুষের একাত্মতা সবচেয়ে প্রবলভাবে প্রকাশ পেয়েছে শামসুর রাহমানের কবিতায়। মুক্তিযুদ্ধের সময় রচিত 'বন্দী শিবির থেকে' কাব্যের কবিতায় অবরুদ্ধ ঢাকার চিত্রকল্প চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে—

"এ বন্দী শিবিরে
মাথা খুঁড়ে মরলেও পারি না করতে উচ্চারণ
মনের মতন শব্দ কোনো।
মনের মতন সব কবিতা লেখার
অধিকার ওরা
করেছে হরণ।"

সুতরাং দেখা যায় যে, এই কবিরাই সময়ের দাবি, মুক্তির বার্তা, অন্যায়ের প্রতিবাদ প্রভৃতি বিষয়কে কেন্দ্র করে কবিতা লিখে, সাহিত্য রচনা করে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে করেছেন আরও বেগবান, সহজ।

৩. **অর্থনৈতিক অধিকার আদায় :** অর্থনৈতিক মুক্তি স্বকীয় সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। যদিও ১৯৪৭ সালে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্তর প্রায় একই রূপ ছিল। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অনুসৃত নীতির ফলে দুই অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশে পরিণত হয়। পাকিস্তানের তৃতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনার (১৯৬৫-৭০) ঘোষিত লক্ষ্য ছিল দুই অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য হ্রাস করা। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ১৯৬৪-৬৫ সালে যেখানে মাথাপিছু আয়ের বৈষম্য ছিল ৪৬%, সেখানে ১৯৬৯-৭০ সালে এ বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৬০%। পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে সম্পদ পাচারই ছিল এ

বৈষম্যের মূল কারণ। এক হিসাব অনুসারে ১৯৪৮-৬৯ সালের মধ্যে মোট ৪১৯ কোটি টাকার সম্পদ পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার করা হয়। তাছাড়া বৈদেশিক সাহায্যের ক্ষেত্রেও পূর্ব পাকিস্তানকে ন্যায্য অংশ দেয়া হয়নি। ১৯৫০-৬৯ সালের মধ্যে পাকিস্তান ৫৬৮৩ মিলিয়ন ডলার বৈদেশিক সাহায্য লাভ করে। তার মাত্র ৩৪% পূর্ব পাকিস্তানকে দেয়া হয়। এভাবে পূর্ব পাকিস্তানের শ্রম ও সম্পদের বিনিময়ে পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয় এবং পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের রক্ষিত বাজারে পরিণত হয়। এমনকি পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত শিল্পসম্পদের ৩৪%-এর মালিক ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানি পুঁজিপতিগণ। সুতরাং বাঙালিদের চোখে পশ্চিম পাকিস্তানিরা শোষক হিসেবেই প্রতিভাত হয়। এই শোষক শ্রেণীর কবল থেকে নিজেদের মুক্ত করার জন্য বাঙালি জাতি সংগ্রামের পথ বেছে নেয়।

৪. **রাজনৈতিক মুক্তি অর্জন :** পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে সংঘাতের অন্যতম কারণ ছিল রাজনীতি ও প্রশাসনে পশ্চিম পাকিস্তানিদের আধিপত্য। ১৯৪৭-৫৮ সালে পাকিস্তানে সংসদীয় পদ্ধতি চালু ছিল। পাকিস্তানের প্রথম আইন পরিষদে বাঙালিদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা কিংবা সংখ্যাসাম্য পশ্চিম পাকিস্তানিদের রাজনৈতিক প্রাধান্য ঠেকাতে পারেনি। তার কারণ, শাসকদলের নেতৃত্ব ছিল পশ্চিম পাকিস্তানিদের হাতে। সংসদীয় ব্যবস্থার অধীনে বাঙালিদের যেটুকু সুযোগ ছিল, আইয়ুব খানের শাসন আমলে সেটুকু হতেও তারা বঞ্চিত হয়। ১৯৫৮ হতে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত প্রকৃত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল আইয়ুব খানের হাতে এবং তার শীর্ষস্থানীয় উপদেষ্টারা প্রায় সকলেই ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানি। সামরিক ও বেসামরিক আমলাবর্গ, যারা আইয়ুব আমলে নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন তাদের মধ্যে বাঙালির সংখ্যা ছিল খুবই অল্প। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ১৯৬৪-৬৫ সালে কেন্দ্রীয় সচিবালয়ে ১৭ জন সচিবের মধ্যে মাত্র ২ জন এবং ১৭ জন সর্বোচ্চ সামরিক অফিসারের মধ্যে মাত্র ১ জন বাঙালি ছিলেন। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিব ঐতিহাসিক ৬-দফা কর্মসূচি উপস্থাপন করেন। তার মূল লক্ষ্য ছিল পূর্ব-বাংলাকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা। কিন্তু আইয়ুব সরকার স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে নস্যাৎ করার জন্য আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাসহ কঠোর দমনমূলক নীতি গ্রহণ করে। তার ফলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষ আওয়ামী লীগ তথা পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে দ্ব্যর্থহীন রায় প্রদান করে। কিন্তু পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী এ গণরায়কে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করে অস্ত্রের জোরে তারা আধিপত্য ও শোষণ বজায় রাখতে চায় এবং ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ বাঙালিদের ওপর সশস্ত্র আক্রমণ শুরু করে। পাকিস্তানি আক্রমণের মুখে আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা ও বিপ্লবী সরকার গঠন করে। সকল শ্রেণীর মানুষ স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং ৯ মাসব্যাপী সংগ্রামের মাধ্যমে পাকিস্তানি বাহিনীকে পরাজিত করে বাঙালিরা তাদের নিজেদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে প্রতিষ্ঠিত করে।

উপসংহার : পরাধীন জাতি তার নিজস্ব সংস্কৃতির বিকাশ সাধন করতে পারে না, একে অন্যের সংস্কৃতির আজ্ঞাবহ হয়ে জীবন ধারণ করতে হয়। তাইতো বাঙালি জাতি তার নিজস্ব সংস্কৃতি রক্ষায়, বিকাশে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে, গড়ে তোলে আন্দোলন, শুরু হয় মুক্তির সংগ্রাম। এই স্বতন্ত্র চিন্তা চেতনাই এক সময় বাঙালিকে এনে দেয় স্বতন্ত্র আবাসভূমি। বিশ্বের বুকে স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায় বাংলাদেশ।

০৪ । বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পেছনে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কি কারণ ছিল তা বিশ্লেষণ করুন। *[২৭তম বিসিএস]*

উত্তর : বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম নবীন রাষ্ট্র। এক রক্ত-সমুদ্রের তীর ঘেষে এখানে উঠেছে স্বাধীনতার সূর্য। অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা, শোষণ-নির্যাতন সহ্য করে কঠোর ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে দেশ মুক্ত হলেও বাংলার জনগণের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হয়নি। অনেক আশা আর উদ্দীপনা নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানিদের সাথে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ একসাথে একটি অবিভক্ত মুসলিম অধ্যুষিত পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের মাধ্যমে বিশ্বের দরবারে একটি প্রভাবশালী ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার দৃঢ় মনবল নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু পাকিস্তানের কূট রাজনীতি এবং রাজনৈতিক স্থবিরতার কারণে সব ধূলিস্যাৎ হয়ে যায়। একের পর এক চরম বৈষম্যমূলক আচরণ করে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী এ দেশের জনগণের ওপর নির্যাতনের স্টিম রোলার চালায়। অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই পূর্ব পাকিস্তানের জনগোষ্ঠীকে বঞ্চিত করা হয়। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ পশ্চিমাদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বঞ্চনার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহের মাধ্যমে বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে ত্বরান্বিত করে। ফলশ্রুতিতে নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পরে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানের পশুশক্তি বাংলার মুক্তিবাহিনী এবং মিত্রবাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করে। লাল সবুজ পতাকার রঙে বিশ্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সামাজিক কারণসমূহ : বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পেছনে সামাজিক কারণগুলো নিম্নরূপ :

১. **ভাষাগত বৈষম্য :** পাকিস্তান রাষ্ট্রের সূচনালগ্ন থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানের আপামর জনসাধারণের ভাষা নিয়ে বৈষম্যের সৃষ্টি করে। এ দেশের কোটি কোটি জনগণের ভাষা বাংলাকে উপেক্ষা করে তারা উর্দুকে এ দেশের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার পায়তারা চালায়। উল্লেখ্য, তদানীন্তন পাকিস্তানে বিভিন্ন ভাষাভাষীর আনুপাতিক হার ছিল নিম্নরূপ :

ভাষার নাম	*ভাষাভাষীর আনুপাতিক হার*
বাংলা	*৫৪.৬%*
পাঞ্জাবি	*২৭.১%*
পশতু	*৬.১%*
উর্দু	*৬%*
সিন্ধি	*৪.৮%*
ইংরেজি	*১.৪%*

[উৎস : বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন, লেখক : ড. মো: আব্দুল ওদুদ ভূঁইয়া, পৃষ্ঠা নং–১৭৩]

১৯৪৭ সালের নভেম্বরে করাচিতে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে একটি শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত হয়। ফলে পূর্ব পাকিস্তানে এ সিদ্ধান্তের প্রচণ্ড প্রতিবাদ শুরু হয়। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করে ঢাকায় সর্বপ্রথম 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয় এবং কতিপয় দাবিতে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের নীতি গৃহীত হয়। এরপর ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে কংগ্রেস

দলীয় সদস্য কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ইংরেজি ও উর্দুর পাশাপাশি বাংলা ভাষা ব্যবহারের দাবি জানান। কিন্তু পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এ দাবির বিরোধিতা করেন। ফলে ঢাকায় ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী মহলে চরম অসন্তোষ দেখা দেয় এবং ২৬ ফেব্রুয়ারি সর্বত্র ধর্মঘট পালিত হয়। এভাবে সংগ্রাম পরিষদ ১৫ মার্চ পর্যন্ত ধর্মঘট ও হরতাল অব্যাহত রাখে। অবশেষে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন বাংলা ভাষার দাবি সমর্থনের আশ্বাস দিলে আন্দোলন প্রশমিত হয়। কিন্তু ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ রেসকোর্স ময়দানের এক জনসভায় এবং কার্জন হলের এক সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা দিলে আন্দোলন পুনরায় চাঙ্গা হয়ে ওঠে এবং দেশব্যাপী তীব্র প্রতিবাদ শুরু হয়। ১৯৫০ সালে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এবং ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি খাজা নাজিমউদ্দিন পুনরায় একই ঘোষণা দেন যা বাংলা ভাষার প্রতি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর তীব্র বৈষম্যমূলক আচরণের পরিচয় বহন করে। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে বাঙালির ভাষা আন্দোলন তীব্র এবং চূড়ান্ত আকার ধারণ করে এবং ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি এক রক্তস্নাত সংগ্রামের মাধ্যমে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা প্রতিষ্ঠিত হয়। মূলত এ ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সূত্রপাত হয় এবং এই আন্দোলন নিম্নলিখিত উপায়ে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে ভূমিকা রাখে—

- ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালিরা দাবি-সচেতন হয়ে ওঠে এবং জাতীয় পর্যায়ে অত্যন্ত সুসংহতভাবে দাবি তুলে ধরে তা আদায়ে উদ্বুদ্ধ হয়।
- এ আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালির মধ্যে এক সংগ্রামী চেতনার সূচনা হয়।
- ভাষা আন্দোলন বাঙালিদের এ ধারণা দান করে যে পাকিস্তানের বৃহত্তম অঞ্চলে তাদের স্বতন্ত্র স্বার্থ, স্বতন্ত্র অস্তিত্ব এবং স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এ আন্দোলন পূর্ব বাংলায় এক ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবোধ গড়ে তোলে।

২. **সাংস্কৃতিক বৈষম্য :** পাকিস্তান সৃষ্টির শুরু থেকেই পাকিস্তানের নেতৃত্ব সাংস্কৃতিক মিশ্রণের এক কেন্দ্রীভূত নীতি গ্রহণ করে। এ নীতির চাপ অধিকমাত্রায় অনুভূত হয় পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে পূর্ব বাংলায় তথা পূর্ব পাকিস্তানে। পশ্চিম পাকিস্তানিরা বাঙালিদের সম্পর্কে কতকগুলো ভুল ধারণা পোষণ করত। প্রথমত, বাঙালিরা পুরোপুরি মুসলমান নয়। দ্বিতীয়ত, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি আদৌ ইসলামিক নয় এবং তৃতীয়ত, কাশ্মীর সম্পর্কে বাঙালিদের কোনো আগ্রহ নেই। এ বিশ্বাসগুলোকে স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে ধরে তারা সমাধান দিতে চেয়েছিল। এরই ফলশ্রুতিতে তারা এ দেশের মানুষের ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্মীয় মনোভাব এবং প্রথাগত আচরণের ওপর অনুচিত প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে। এতে পূর্ব পাকিস্তানের যুব সম্প্রদায়, বুদ্ধিজীবী এবং সর্বোপরি আপামর জনসাধারণের মধ্যে তীব্র হতাশার সৃষ্টি হয়। তাদের মনে চাপা অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হয়। এ হতাশা এবং অসন্তোষের তীব্র বহিঃপ্রকাশ ঘটে বিভিন্ন আন্দোলনের মাধ্যমে।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে অর্থনৈতিক কারণসমূহ : বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের অর্থনৈতিক কারণসমূহ নিম্নরূপ :

১. **অর্থনৈতিক বৈষম্য :** ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার সময় পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে ব্যবধানের মাত্রা ছিল খুব কম। চা এবং বস্ত্র উৎপাদনে পূর্ব পাকিস্তান সামান্য এগিয়ে ছিল। চিনি এবং ধাতব দ্রব্য উৎপাদনে পশ্চিম পাকিস্তান সামান্য এগিয়েছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের সেচ পরিকল্পনা ছিল উন্নততর, যদিও ব্যাংক ব্যবস্থায় পূর্ব পাকিস্তানের সুযোগ ছিল সামান্য বেশি। পশ্চিম পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় ছিল সামান্য বেশি। কিন্তু স্বাধীনতা উত্তরকালে সরকারি নীতির কারণে পাকিস্তানের

উভয় অংশের মধ্যে বৈষম্যের এক পাহাড় গড়ে ওঠে। ১৯৪৯-৫০ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় ছিল ৩৩৮ টাকা। ১৯৫৯-৬০ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৩৬৭ টাকা এবং ১৯৬৯-৭০ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৫৩৩ টাকায়। কিন্তু ১৯৪৯-৫০ সালে পূর্ব পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় ছিল ২৮৭ টাকা, ১৯৫৯-৬০ সালে তা কমে দাঁড়ায় ২৭৭ টাকায়। ১৯৬৯-৭০ সালে তা হয় ৩৩১ টাকা। ১৯৪৯-৫০ সালে উভয় অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্যের মাত্রা ছিল ১৯ ভাগ। ১৯৫৯-৬০ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় শতকরা ৩২ ভাগ। ১৯৬৯-৭০ সালে এর পরিমাণ হয় শতকরা ৬১ ভাগ।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় মূলত প্রদেশে শিল্প প্রতিষ্ঠায় বৈষম্যমূলক নীতির জন্য। ১৯৪৯-৫০ সালে পূর্ব পাকিস্তানের মোট উৎপাদনের শতকরা ৯.৪ ভাগ ছিল শিল্পজাত দ্রব্য। ১৯৬৯-৭০ সালের এ পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে হয় শতকরা ২০ ভাগের মতো। কিন্তু ১৯৪৯-৫০ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের মোট উৎপাদনের শতকরা ১৪.৭ ভাগ ছিল শিল্পজাত দ্রব্য যা ১৯৬৯-৭০ সালে তা হয় সেখানকার মোট উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ।

দেশের উভয় অংশে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে বৈষম্য গড়ে ওঠে তার মূলে ছিল মূলত সরকারের বিনিয়োগ নীতি। প্রথম থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় সম্পদ বিনিয়োগে বৈষম্যমূলক নীতি অনুসরণ করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানে বাস করত পাকিস্তানের ৫৫% জনসংখ্যা, অথচ এ অঞ্চলে ব্যয় হয় উন্নয়ন ও রাজস্ব খাতের শতকরা ৩০% অর্থ। বৈদেশিক সাহায্য এবং ঋণের ক্ষেত্রে উভয় প্রদেশে একই রকম নীতি অনুসরণ করা হয়। ১৯৪৭-৪৮ সাল থেকে ১৯৫৯-৬০ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান সর্বমোট ৬৪২.১৫ কোটি উন্নয়নমূলক বৈদেশিক সাহায্য লাভ করে। এর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান লাভ করে মাত্র ৯৩.৮৯ কোটি টাকা। ১৯৭০ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান সাহায্য ও ঋণবাবদ লাভ করে সর্বমোট ৭০৩ কোটি টাকা। এ সাহায্য ও ঋণের শতকরা ২৫ ভাগ পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয় হয়।

[সূত্র : পৌরবিজ্ঞানের কথা, লেখক : ড. এমাজউদ্দীন আহমেদ, পৃষ্ঠা : ৮৩-৮৪]

২. **কৃষিক্ষেত্রে বৈষম্য :** কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রেও পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অনুরূপ পক্ষপাতিত্বমূলক দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে সরকারি অর্থ বণ্টন বরাবরই পশ্চিম পাকিস্তানকে অনুগ্রহ করেছে পূর্ব পাকিস্তানের বদৌলতে। নিচের সারণি এ বিষয়ের ওপর আলোকপাত করবে :

দ্রব্যাদি	পশ্চিম পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তান
সার বণ্টন ১৯৫৮-৬৮ সালে (হাজার নিউট্রিয়েন্ট টন হিসাবে)	৭৩৯ (৬৬%)	৩৭১ (৩৩%)
উন্নতমানের বীজ বণ্টন ১৯৬৪-৬৯ সালে (হাজার টন হিসাবে)	৩৪২ (৮৯%)	৪০ (১১%)
মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ১৯৬৬-৬৭ সালে (হাজার মেট্রিক টন হিসাবে)	১৫৩ (২৩৭% বৃদ্ধি)	১৭৫-২৫৯(৪৮% বৃদ্ধি)
ট্রাক্টর বণ্টন	২০,০৬৯ (৯১%)	১,৮২৫ (০৯%)

[উৎস : Bangladesh Documents, Ministry of External Affairs, Govt of India, New Delhi, 1971, P. 18]

৩. **শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য :** শিক্ষাক্ষেত্রেও পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে চরম অসম অবস্থা বিরাজমান ছিল। পাকিস্তান সৃষ্টির পরবর্তী কয়েক বছর পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক অনগ্রসর ছিল কিন্তু ক্রমে ক্রমে পশ্চিম পাকিস্তান অনেক এগিয়ে যায়। নিচের সারণি এ বক্তব্যকে বিশ্লেষণ করবে :

ক্ষেত্র	পশ্চিম পাকিস্তান (১৯৬৮-৬৯)	পূর্ব পাকিস্তান (১৯৬৮-৬৯)
প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৯,৪১৮ টি	২৮,৩০৮টি
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৪,৪৭২টি	৩,৯৬৪টি
মহাবিদ্যালয় (বিভিন্ন ধরনের)	২৭১টি	১৬২টি
মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং ও কৃষি মহাবিদ্যালয়	১৭টি	০৯টি
বিশ্ববিদ্যালয়	০৬টি	০৪টি

[উৎস : Bangladesh Documents, Ministry of External Affairs, Govt. of India, New Delhi, 1971, Page - 17]

৪. **আন্তঃপ্রদেশ বাণিজ্য বৈষম্য :** পশ্চিম পাকিস্তানে তৈরি দ্রব্যাদি পূর্ব পাকিস্তানে বিক্রি করা হতো এবং এভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের বাজারে পরিণত হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তান। নিচের টেবিলের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার বাণিজ্যিক সম্পর্ক প্রতিভাত হয়ে ওঠে :

বছর (জুলাই-জুন)	পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে রপ্তানি	পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে রপ্তানি
১৯৪৮-৪৯	১.৮৮ (কোটি টাকা)	১৩.৭৬ (কোটি টাকা)
১৯৫৫-৫৬	২২.০৭ "	৩১.৮৯ "
১৯৬০-৬১	৩৫.৫৯ "	৮০.০৫ "
১৯৬৫-৬৬	৬৪.৯৭ "	১১৮.৯৮ "
১৯৬৭-৬৮	৭৭.৯০ "	১২১.৬০ "
১৯৬৮-৬৯ (জুলাই-ডিসে)	৪৬.৩৩ "	৬৪.০৩ "

[উৎস : Pakistan Economic Survey, 1968-69 Table no-41, Ministry of Finance, Islamabad]

৫. **সামরিক বাহিনীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে বৈষম্য :** পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীতে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের অংশগ্রহণ ছিল নিতান্তই কম। পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ সদস্য ড. আলীম আল রাজীর বক্তব্য এক্ষেত্রে কিছুটা আলোকপাত করে। তিনি তার 'Process of Economic Disparity' নিবন্ধের মাধ্যমে স্পষ্টতই উল্লেখ করেন যে, ১৯৬৩ সালে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী ও অন্যান্য সামরিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে পূর্ব পাকিস্তানের অংশ ছিল শতকরা ৩.৯ জন। পাকিস্তানের সেনাবাহিনীতে পূর্ব পাকিস্তানের অংশগ্রহণ (১৯৬৩ সাল পর্যন্ত) ছিল নিম্নরূপ :

পদবি	অনুমোদিত	বাস্তব
১. অফিসার	কোনো নির্ধারিত অংশ নেই	৫.০%
২. জেসিও	৭.৮%	৭.৮%
৩. ইআর	৭.৮%	৭.৪%

৬. **বেসামরিক চাকরিতে পূর্ব পাকিস্তানের অংশ :** বেসামরিক চাকরির ক্ষেত্রেও পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় অনেক কম সুযোগ-সুবিধা লাভ করত। বেসামরিক চাকরির ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান বঞ্চিত হয়েছিল বিভিন্ন ভাবে। নিচের সারণি থেকে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে :

বছর	চাকরি	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান
১৯৬৭-৬৮	সিভিল সার্ভিস	১৮৬	৩২৬
	পাকিস্তান ট্যাক্সেশন সার্ভিস	৮৬	১৪১
	কাস্টমস অ্যান্ড এক্সাইজ সার্ভিস	৪০	৭৬
	রেলওয়ে একাউন্ট সার্ভিস	২০	৩৬
	অডিট অ্যান্ড একাউন্ট সার্ভিস	৪৪	৯৫
	পুলিশ সার্ভিস	৮২	১২৮
	সেন্ট্রাল ইনফরমেশন সার্ভিস	১৯	৪৯

[উৎস : বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন, মো. আব্দুল ওদুদ ভূঁইয়া, পৃষ্ঠা-২০৮]

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে রাজনৈতিক কারণসমূহ : বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ক্ষেত্রে যেসব রাজনৈতিক কারণ ছিল তা নিম্নরূপ—

১. **অগণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা :** পাকিস্তানের শাসনব্যবস্থায় প্রথম থেকেই স্বৈরাচারী প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। ১৯৫৩ সালের ১৬ এপ্রিল অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নাজিমউদ্দিন মন্ত্রিসভাকে বাতিল করা হয়। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে চক্রান্ত করে বাতিল করা হয়। ১৯৫৪ সালের ৮ নভেম্বর গভর্নর জেনারেল গোলাম মুহাম্মদ সার্বভৌম গণপরিষদকেও বাতিল ঘোষণা করেন এবং নির্দেশনামা হিসেবে সংবিধান ঘোষণা করতে উদ্যত হন। অবশ্য তা সম্ভবপর হয়নি। ১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ সংবিধান প্রবর্তিত হলেও তা ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবরের মধ্যে বাতিল হয়ে যায়। পাকিস্তানের আইন পরিষদ এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিগুলো দুর্বল থাকায় তা জনগণের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ১৯৬২ সালে যে সংবিধান প্রণীত হয়, তাও ছিল অনেকটা স্বৈরাচারী ধাঁচের এবং এখানে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের দাবির প্রতি কোনো দৃষ্টিপাত করা হয়নি। মূলত পূর্ব পাকিস্তানের জনগণই অগণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রধান ভুক্তভোগী ছিল। এ রাজনৈতিক বৈষম্য পরবর্তীতে স্বাধীনতা আন্দোলনের পথ ত্বরান্বিত করে।

২. **সামরিক শাসনের সূত্রপাত :** পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির শুরু থেকেই সামরিক বাহিনী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করতে শুরু করে। ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইস্কান্দার মির্জা সারাদেশে সামরিক শাসন জারি করেন এবং সংবিধান বাতিল ঘোষণা করেন। এই সামরিক শাসন জারির কারণে দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সম্ভাবনা নির্মূল হয়, আঞ্চলিক বৈষম্য বৃদ্ধি পায়, দেশে রাজনৈতিক স্থিতিহীনতা বিরাজ করে এবং নৈরাজ্য বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৮ সালের কুখ্যাত আইয়ুবী দশকে বাঙালি মন গুমরে মরেছে ত্রিবিধ পীড়নের যাঁতাকলে। প্রথমত, সামরিক কর্তৃপক্ষের চরমনীতি; দ্বিতীয়ত, আমলাতন্ত্রের প্রাণহীন শাসনব্যবস্থা এবং তৃতীয়ত, ১৯৫৯ সালের শেষদিকে আইয়ুব খানের দুরভিসন্ধিমূলক সৃষ্টি রাজনৈতিক সুবিধাভোগী মৌলিক গণতন্ত্রীদের দুর্নীতি। এ দশকে একদিকে যেমন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানিদের মধ্যে বৈষম্য আরো বৃদ্ধি পেয়েছে অন্যদিকে রাজনৈতিক দালালের তৎপরতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সময় বাংলার মাটিতে মীরজাফর সৃষ্টি করে তাদের সহায়তায় বাঙালি জনগণকে পদানত রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।

৩. **১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ এবং পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তাহীনতা :** পাকিস্তান একনায়কতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ। এ যুদ্ধের বিরাট শিক্ষা হলো— পাকিস্তানের শাসনব্যবস্থা এবং সামরিক বাহিনী শুধু পশ্চিম পাকিস্তানের। ভারতের সাথে যে কোনো সম্ভাব্য সংঘর্ষের ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান ছিল অরক্ষিত। তাই যুদ্ধের পর বাঙালি নতুন জীবনের রূপরেখা অঙ্কন করল। জন্ম হলো ছয় দফা কর্মসূচির। মূলত এ ছয় দফার পথ ধরেই বাঙালির স্বাধীনতা আন্দোলন সামনের দিকে অগ্রসর হয়।

৪. **পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর রাজনৈতিক প্রতারণা :** বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কারণ হলো পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর রাজনৈতিক প্রতারণা। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা এর একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এছাড়াও ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও, পাকিস্তানি কেন্দ্রীয় শাসকগোষ্ঠী নানা অজুহাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করেনি বরং তারা বাঙালিদের সাথে দেয়া ওয়াদা ভঙ্গ করে প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে ২৫ মার্চ রাতে গণহত্যা চালায়। এবং এরই ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষিত হয় এবং এক পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধে জয়লাভের মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

উপসংহার : উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ক্ষেত্রে মূলত পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বৈষম্যমূলক, অগণতান্ত্রিক এবং নিপীড়নমূলক শাসনব্যবস্থাই দায়ী। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী পাকিস্তান সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকেই পূর্ব পাকিস্তানকে বৈষম্যমূলক দৃষ্টিতে দেখেছে এবং এ অঞ্চলের মানুষের ভাষা, সংস্কৃতি এবং স্বায়ত্তশাসনের ন্যায্য দাবিকে তারা অবহেলা করেছে। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের আন্তরিকতা ও সহযোগিতা থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর নির্যাতন, শোষণ আর অহমিকার জন্য এ দেশের জনগণ বিচ্ছিন্ন হতে বাধ্য হয়। বাঙালিদের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানিদের অর্থনৈতিক বৈষম্য, রাজনৈতিক শোষণ এবং সাংস্কৃতিক নিপীড়নের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগোষ্ঠীর মাঝে বিপ্লব দানা বাধে এবং এরই সূত্র ধরে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে স্বাধীনতায় জাগরণ সৃষ্টি হয় যা পরবর্তীতে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠাকে ত্বরান্বিত করে।

০৫ । স্বাধীনতা পূর্ববর্তীকালের তুলনায় স্বাধীন বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নয়নের বিবরণ দিন। *[২৭তম বিসিএস]*

অথবা, **১৯৪৭ উত্তর সময়ে বাংলাদেশ অঞ্চলে বাংলা সাহিত্যের যে বিকাশ সাধিত হয়েছে এর বর্ণনা দিন।** *[৩৪তম বিসিএস]*

উত্তর : সংস্কৃতি হলো সমাজ ও জীবনাচরণের দর্পণস্বরূপ আর সাহিত্য হলো তার প্রতিচ্ছবি। সাহিত্য ও সংস্কৃতি এক নিবিড় সম্পর্কে আবদ্ধ। প্রতিটা সমাজের নিজস্ব কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠার স্বতন্ত্র সংস্কৃতি বিদ্যমান। আমাদের বাংলাদেশের নিজস্ব সংস্কৃতি, সাহিত্য ও শিল্পকলা রয়েছে যা বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন রূপে আবির্ভূত হয়েছে, কেননা সাহিত্য ও সংস্কৃতি তো সমকালীন সমাজ কাঠামোরই প্রতিবিম্ব। স্বাধীনতা-পূর্বকালীন সাহিত্য ও সংস্কৃতির যে রূপ পরিগ্রহ করেছে, সেটা স্বাধীনতা পরবর্তী সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক জীবনধারায় ধীরে ধীরে নব রূপে বিকশিত হয়েছে। তখনকার সমাজকাঠামোর তুলনায় আজকে উত্তর-আধুনিকতার যুগের সামাজিক আবহ এক নয় বরং অনেক ভিন্নতর। মানুষের বিশ্বাস, রীতিনীতি, জ্ঞান, শিল্প, ভাষা, মূল্যবোধ সকল ক্ষেত্রেই পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। তাইতো শিল্প-সাহিত্য এবং সংস্কৃতির গতিপথ ও ধারাবাহিকতা স্রোতস্বিনী নদীর মতো এঁকে-বেঁকে আজকের পর্যায়ে এসে

দাঁড়িয়েছে। সাহিত্য এবং সংস্কৃতির এ প্রবহমান প্রবণতা স্বতন্ত্র কিছু অবয়ব নিয়ে ক্রমশ সাজিয়েছে নিজের সাংস্কৃতিক ভুবন, যার পরিমণ্ডলেই আবর্তিত হয়েছে সাহিত্য ও শিল্পের চিত্রায়িত রূপ।

স্বাধীনতা-পূর্বকালীন সাহিত্য : স্বাধীনতা-পূর্ববর্তীকালের তুলনায় স্বাধীনতা-পরবর্তীকালের সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নয়নের চিত্র বর্ণনা করতে গেলে প্রথমত বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে স্বাধীনতা পূর্বকালের যে বিভিন্ন পর্ব রয়েছে তার সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা জরুরি। এ সময়ের মধ্যে গড়ে ওঠা বাংলা সাহিত্য নানা দিক থেকে উল্লেখযোগ্য। সামাজিক-রাজনৈতিক কার্যকারণকে বিভাজন রেখা হিসেবে বিবেচনা করে বাংলা সাহিত্যকে তিনটি পর্বে ভাগ করা যায় : প্রথম পর্ব (১৯৪৭-১৯৫৭), দ্বিতীয় পর্ব (১৯৫৮-১৯৭০) এবং তৃতীয় পর্ব (১৯৭১-বর্তমান সময় পর্যন্ত)।

১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের অব্যবহিত পরেই বাঙালি ও পূর্ব বাংলা নানামুখী সমস্যার সম্মুখীন হয়। দেশবিভাগজনিত উদ্বাস্তু সমস্যা, অর্থনৈতিক দুর্দশা, সাম্প্রদায়িক সমস্যা ইত্যাদির সাথে ছিল পূর্ব বাংলা ও বাংলা ভাষার প্রতি পাকিস্তানি শাসকশ্রেণীর বিরূপ মনোভাব। যার ধারাবাহিকতায় আসে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন। এর ফলে বাঙালিরা স্বাধীকার চেতনার যে শক্তি অর্জন করে তার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে বাংলা সাহিত্যের প্রথম পর্ব। এ সময়ের অধিকাংশ সাহিত্যই রচিত হয় গ্রামবাংলার বৃহত্তর পটভূমিতে। গ্রামীণ জীবন ও তার সমস্যা সম্ভাবনাকে উপজীব্য করে রচিত হয় অনেক উপন্যাস, ছোটগল্প, কবিতা, নাটক ইত্যাদি। যেমন– আবু ইসহাকের সূর্যদীঘল বাড়ী, সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহর লালসালু (১৯৪৮), শামসুদ্দীন আবুল কালামের কাশবনের কন্যা (১৯৫৪) ইত্যাদি। এই কালপর্বে গ্রামীণ জীবন ও তার স্বরূপ অনুসন্ধান যেমন উপন্যাসের একটি প্রধান প্রবণতা, তেমনি মধ্যবিত্তের জীবনজিজ্ঞাসা ও জীবন সংকটকেও কেউ কেউ সাহিত্যের বিষয় করেছেন। যেমন– আবুল ফজলের জীবন পথের যাত্রী (১৯৪৮) ও রাঙ্গা প্রভাত (১৯৫৭) উল্লেখযোগ্য। গ্রামীণ নাগরিক জীবনের রূঢ়তা এবং বাস্তবের অনুপুঙ্খ চিত্রায়ন এবং নাগরিক জীবনের অভিঘাত গ্রামীণ জীবনের নিস্তরঙ্গ ব্যবস্থা কিভাবে ভেঙে দিচ্ছিল তার চিত্রও সাহিত্যে স্থান পায়। যেমন– আলাউদ্দিন আল আজাদের জেগে আছি, ধান কন্যা, মৃগনাভি (১৯৫৫) প্রভৃতি এ সময়ের উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ। এ সময়ে ধর্মীয় এবং পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে, সাধারণ মানুষ দেশের মাটি ও প্রকৃতিকে নিয়ে বেশ কিছু কবিতা রচিত হয় যেগুলোকে অসাম্প্রদায়িক ও মানবতাবাদী ধারার কবিতা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

এ পর্বে বাঙালির ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের জন্ম হয়— একুশে ফেব্রুয়ারি। এ ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রচিত হয় অসংখ্য সাহিত্য। যেমন– মুনীর চৌধুরির অসামান্য নাটক কবর (১৯৫৩); হাসান হাফিজুর রহমান 'একুশে ফেব্রুয়ারি' নামে একটি সংকলন প্রকাশ করেন।

দ্বিতীয় পর্ব– ১৯৫৭ সালে দেশে সামরিক শাসন প্রবর্তনের ফলে সাহিত্য ও সংস্কৃতির ধারা বেশ বাধাগ্রস্ত হয়। প্রকাশ্য রাজনীতির ওপর নিষেধাজ্ঞা, গণতন্ত্রের অবয়বে একনায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কারণে বাঙালিদের মধ্যে ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হতে থাকে যা একসময় গণ আন্দোলনে রূপ নেয়। তাইতো এ সময়কালে বাঙালিদের স্বাধীনতা অর্জনের তীব্র প্রয়াস এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের উদ্ভব এসব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ধারাবাহিকভাবে ঘটে। বাংলাদেশের সমাজ জীবনে উল্লিখিত ঘটনাবলীর প্রভাবই ১৯৫৮-১৯৭১ কালপর্বের সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে।

এ পর্বেও প্রধানত গ্রামীণ জীবনের পটভূমিতে সাহিত্য রচনার প্রবণতা লক্ষ করা গেলেও মাত্রাগত পরিবর্তন যুক্ত হয়, ফলে একটু আলাদাভাবেই তখনকার রচনাগুলোকে বিচার করা যায়। যেমন— সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহর 'চাঁদের অমবস্যা' (১৯৬৪) উপন্যাসের কথা স্মরণ করা যাক। এতে গ্রামীণ জীবনকে পটভূমি হিসেবে ব্যবহার করলেও ঔপন্যাসিক মূলত আইয়ুবি দশকের ধর্মভীতি ও সমরাস্ত্র-শাসিত সমাজ জীবনকেই রূপায়িত

করেছেন। এর পাশাপাশি জহির রায়হান গ্রামীণ জীবন বাস্তবতাকে উপজীব্য করে রচনা করেন 'হাজার বছর ধরে' (১৯৬৪)। নাগরিক জীবনের অভিঘাত ও জটিলতা কিভাবে দক্ষিণ বাংলার গ্রামীণ জীবন ব্যবস্থাকে ক্রমশ বিনষ্ট করেছিল তার বাস্তব চিত্র অঙ্কিত হয় শহীদুল্লাহ কায়সারের 'সারেং বৌ' (১৯৬২) উপন্যাসে। ইউরোপীয় সমাজের মধ্যবিত্ত সমাজের অনুসরণে এবং ব্যক্তিবোধের সূত্র ধরে অনেকেই এ পর্যায়ে রচনা করেন আধুনিক জীবন ভাবনা সম্পন্ন উপন্যাস। এসব উপন্যাসে লক্ষ করা যায় মূল্যেবোধে অবিশ্বাস, প্রেমশক্তিতে অনাস্থা, জীবনের প্রতি প্রবল বিতৃষ্ণা, ব্যক্তিমানুষের নিঃসঙ্গতা, বিচ্ছিন্নতা, নাগরিক মধ্যবিত্তের স্থূলতা, নৈতিকতাবর্জিত বিত্তসর্বস্বতা, রুচিবিকার ইত্যাদি। এরকম কিছু উপন্যাস যেমন— শেষ বিকেলের মেয়ে, দিলারা হাশেমের 'ঘর মন জানালা' (১৯৬৫), মধ্যবিত্ত জীবনের সংগ্রাম ও ব্যর্থতা বোধের কাহিনী। এছাড়াও উল্লিখিত প্রবণতার বাইরে গিয়ে সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ রচনা করেন 'কাঁদো নদী কাঁদো' (১৯৬৮), এই উপন্যাসে অঙ্কিত হয়েছে ব্যষ্টি ও সমষ্টি, মানুষের বাইরের ও ভেতরের জীবন, অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের সংঘাত। এ সময়ে সাধারণ প্রবণতার বাইরে সমাজ বাস্তবতাকে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে অবলোকন ও চিত্রনের চেষ্টা করেছেন আলাউদ্দিন আল আজাদ। তার গল্পে শ্রেণী সংগ্রামের নির্মম পরিণতি প্রকাশিত হয়েছে। তখনকার উপন্যাসে সমকালীন রাজনীতির গতি প্রকৃতি এবং জাতীয়তাবাদী মুক্তির সংগ্রাম যেসব উপন্যাসে বস্তুনিষ্ঠভাবে ধরা পড়েছে সেগুলোর মধ্যে শহীদুল্লাহ কায়সারের 'সংশপ্তক', জহির রায়হানের 'আরেক ফাল্গুন' (১৯৬৯) ইত্যাদি।

তখনকার কবিরাও তাদের শিল্পে খুব বস্তুনিষ্ঠভাবে তুলে ধরেন সমকালীন রাজনীতি, স্বদেশ প্রেম, জাতীয় গৌরব, সাম্প্রদায়িক বৈরীভাব, প্রেম, প্রকৃতি ও মানুষকে নিয়ে সরল রোম্যান্টিক ভাবোচ্ছ্বাস সম্পন্ন কবিতাও হয়ে ওঠে প্রধান কাব্যধারা। যেমন– সৈয়দ আলী আহসানের 'উচ্চারণ', শামসুর রাহমানের 'বিধ্বস্ত নীলিমা' (১৯৬৭) ইত্যাদি।

সর্বোপরি ঐ সময়কার সাহিত্যে বিষয়বস্তু হিসেবে যেগুলো প্রধানরূপে স্থান পেয়েছিল সেগুলো হলো পূর্ব বাংলার ইতিহাস, ঐতিহ্য, প্রকৃতি, জনজীবনের দুর্দশা, জাতীয় স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, জাতিগত নির্যাতন ও নিষ্পেষণ এবং প্রতিবাদ। এছাড়াও তখনকার অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার চিত্রায়ণও খুব ভালোভাবে অঙ্কিত হয়েছে সাহিত্যিকদের কালির আঁচড়ে।

স্বাধীনতা-পূর্বকালীন সংস্কৃতির চিত্র : বাংলাদেশের সংস্কৃতির রয়েছে গৌরবময় ঐতিহ্য। এ দেশের পথে প্রান্তরে সহজ-সরল বিশ্বাসী মানুষের পদচারণা, কাব্য ও শিল্পচর্চা প্রাচীনকাল থেকেই লক্ষ করা যায়। এ দেশের সাহিত্যে গীতি প্রবণতা ও সঙ্গীতের প্রাধান্য দেখা যায় সেই সুদূর প্রাচীনকাল থেকেই। বাংলার ভাটিয়ালি, যাত্রা, বাউল, মুর্শিদী, মারফতী, পালাকীর্তন, কবিগান ইত্যাদির মধ্যে বাংলার অন্তরের সুরটি ধ্বনিত হয়। স্বাধীনতা-পূর্বকালের বাংলা সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে এসব আচার অনুষ্ঠানের চর্চা উপস্থিত ছিল বেশ ভালোভাবেই। এখানে বাস করে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ আর বাংলা সংস্কৃতি, সকল জাতির সকল স্তরের মানুষের মিলিত মানস-চর্চার বহিঃপ্রকাশ। একে অপরের ভিতর পারস্পরিকতা, বন্দ্যতা, সৌহার্দ্যতা, মমত্ববোধ সেই অনেক জনম থেকেই প্রবল। বাংলাদেশের সংস্কৃতির ভিতর যে ধর্মীয় রীতিনীতি, উৎসব, লোকসাহিত্য, সঙ্গীত, ঋতু উৎসব, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, সামাজিক প্রথা রয়েছে তা বহুকাল পূর্ব থেকে চলে আসছে, তবে বিভিন্ন সময়ে কালের আবর্তে সংস্কৃতির চলমান ধারায় বেশ কিছু পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। অনেক ক্ষেত্রে পরিবর্ধন ও সমৃদ্ধির ছোঁয়া লক্ষ করা যায়। যেমন— ব্রিটিশ শাসনামলে ইংরেজি সংস্কৃতির সংস্পর্শ ও পাকিস্তানি আমলে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক তথা সামাজিক কারণে এ দেশের মানুষ অনেকখানি কোণঠাসা অবস্থার মধ্যে পড়ে। ফলে সেই ঐতিহ্যগত সংস্কৃতির ধারা বাধাগ্রস্ত হয়, এমনকি এদেশের নিজস্ব সংস্কৃতির অস্তিত্বও অনেকখানি নাজুক হয়ে পড়ে।

তারপরও এ দেশের গ্রামীণ জীবন, সমাজকাঠামো, ধর্মীয় বিশ্বাস, জ্ঞান, প্রকৃতির আবহ সবকিছুকে ঘিরে একটি ভিন্নধর্মী সাংস্কৃতিক রূপ লক্ষ করা যায় যা কিনা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। তৎকালীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, বহির্বিশ্বের সাংস্কৃতিক আবহাওয়া সবকিছুই সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে। তথাপি সেই লোকনৃত্য, গাজী কালুর কিচ্ছা, পালাগান, যাত্রাপালা ইত্যাদি মুখরিত করেছে গ্রামবাংলার প্রান্তর। এছাড়া কৃষিনির্ভর অর্থনীতির ওপর অধিক নির্ভরশীলতার ফলে কৃষিনির্ভর সংস্কৃতির চর্চাও তখন বেশ পরিলক্ষিত হতো।

স্বাধীনতা-পরবর্তী সাহিত্য ও সংস্কৃতির রূপ : স্বাধীনতা-পূর্ব বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির যে বৈশিষ্ট্য বা প্রকৃতি সেগুলো হলো—

– গ্রামীণ জীবন ব্যবস্থার চিত্র অঙ্কন।
– প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক পরিবেশ।
– গ্রামীণ মানুষের আচার-আচরণ।
– গ্রামীণ অর্থনীতি।
– তৎকালীন সংগ্রামী রাজনৈতিক পরিমণ্ডল।
– প্রেমময়তা বা রোমান্টিকতা।
– মধ্যবিত্ত পরিবারের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব, দুর্দশা, ক্লেশ, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ ইত্যাদি।
– শোষণ, নিপীড়ন প্রভৃতি।
– বাংলার রূপ, প্রকৃতি, মাঠ, নদী, পথ-প্রান্তর প্রভৃতি। এগুলোকেই ঘিরে পরিগ্রহ করেছে।

স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের রূপ : স্বাধীনতাপূর্ব বাংলা সাহিত্য এবং স্বাধীন বাংলাদেশের সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধরন, প্রকৃতি এবং বিষয়বস্তুর মধ্যে বেশ ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। এ পর্বের উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধ, যুদ্ধের নারকীয়তা, তার মধ্যে সুন্দর বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখা এবং তারপর স্বাধীনতা অর্জন সবকিছুই স্থান পেয়েছে। সৈয়দ শামসুল হক এ পর্বে যেসব উপন্যাস রচনা করেছেন তাতে ধরা পড়েছে স্বাধীনতা-উত্তর গ্রামীণ জীবনের জটিল ও বহুমাত্রিক দ্বন্দ্ব। তার 'দূরত্ব' (১৯৮১) উপন্যাসে কলেজ শিক্ষক জয়নালের জীবনকথায় পঁচাত্তর-পরবর্তী বাংলাদেশের সামাজিক রাজনৈতিক জীবনের জটিল বাস্তবতার চিত্র ধরা পড়েছে অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে। তার 'মহাশূন্য পরান মাষ্টার' (১৯৮২) ও 'আয়না বিবির পালা' (১৯৮২) উপন্যাস দুটিতে গ্রাম জীবনের পরিবর্তন ও তার ভাঙনের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। স্বাধীনতা অব্যবহিত পরবর্তী কয়েক বছরের অস্থিরতা ও সমাজ রাজনীতির চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে হাসনাত আবদুল হাই রচিত 'তিমি' (১৯৮১) উপন্যাসে। স্বাধীনতা-উত্তর গ্রামীণ জীবনের সংঘাত ও অস্তিত্ব জিজ্ঞাসার এক চমৎকার শব্দরূপ সৃষ্টি হয়েছে বশীর আল হেলালের 'শেষ পানপত্র' (১৯৮৬) উপন্যাসে। স্বাধীনতা-পরবর্তী গ্রামীণ জীবনের বিনষ্টের যে চিত্র উল্লিখিত উপন্যাসগুলোতে পাওয়া যায়, তার বিপরীত গ্রামীণ জীবনের ইতিবাচক পরিবর্তনের চিত্র পাওয়া যায় হরিপদ দত্তের ঈশান 'অগ্নিদাহ' ও অন্ধকূপের 'জন্মোৎসব' উপন্যাস দুটিতে।

দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে যে বিশাল মধ্যবিত্ত শ্রেণী স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল, তাদের একটি বড় অংশ স্বাধীনতার পরে দেশের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অব্যাহত বিশৃঙ্খলা দেখে হতাশ হয়ে পড়ে; ফলে শুরু হয় স্বপ্নভঙ্গের পালা। ১৯৭১-পরবর্তী উপন্যাসে মধ্যবিত্ত জীবনের সেই হতাশা ও স্বপ্নভঙ্গের চিত্রই অঙ্কিত হয়েছে। যেমন— সরদার জয়েনউদ্দীনের শ্রীমতি ক ও খ এবং শ্রীমান তালেব আলী (১৯৭৩) এমন একটি উপন্যাস, যেখানে স্বাধীনতা পরবর্তী বাঙালি জীবনের সামগ্রিক অবয়বের ছবি অঙ্কিত হয়েছে। যুদ্ধ-পরবর্তী-জীবনের হতাশাকে পরিপূর্ণরূপে চিত্রিত না করলেও হুমায়ুন আহমদের 'নন্দিত নরকে' (১৯৭২) ও 'শঙ্খনীল কারাগার' উপন্যাস দুটিতে মধ্যবিত্ত জীবনের

পরিবর্তনহীনতা এবং পারিবারিক বৃত্তের মধ্যে সংঘটিত ব্যর্থতা ও নিঃসঙ্গতাকে রূপ দেয়া হয়েছে। তাছাড়া সমাজবিচ্ছিন্ন ব্যক্তির আত্মসুখ খুঁজে ফেরা ভোগবাদী মানসিকতার চিত্ররূপ দেখতে পাওয়া যায় সৈয়দ শামসুল হকের 'খেলা রাম খেলে যা' (১৯৭৩) উপন্যাসে।

অন্যদিকে, রাজিয়া রহমানের 'রক্তের অক্ষর' (১৯৭৮) উপন্যাসে নগর জীবনের অন্ধকারাচ্ছন্ন বীভৎস ও পাশবিক হিংস্রতায় জর্জরিত পতিতা পল্লীর জীবন চিত্রিত হয়েছে। আবার রাজিয়া খানের 'হে মহাজীবন' উপন্যাসে দেখা যায় মুক্তিকামী এক নারীর জীবনচিত্র।

স্বাধীনতা-উত্তরকালে রাজনীতি সচেতনতা, সেনাতন্ত্র, ধর্মতন্ত্র এবং যুদ্ধাপরাধী পুনর্বাসনের মধ্য দিয়ে যে জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল, তার মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে একাধিক উপন্যাস। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে শওকত ওসমানের 'পতঙ্গ পিঞ্জর' (১৯৮৩) ও সেলিনা খানের 'নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনি' (১৯৮৭) প্রভৃতি।

ঐ সময়কার কবিতাগুলোও রচিত হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধকে ঘিরে। স্বাধীনতা-উত্তর কবিতাকে এক কথায় মুক্তিযুদ্ধের কবিতা বলা চলে। কারণ এ সময়ের কবিতায় বিশেষভাবে মুক্তিযুদ্ধ, যুদ্ধের আবেগ ও অভিজ্ঞতা ধরা পড়েছে। স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের কবিতা অঙ্গনে লেখনীতে যারা সক্রিয় ছিলেন তারা হলেন রফিক আজাদ, মহম্মদ রফিক, আবদুল্লাহ আবু সাঈদ, আসাদ চৌধুরী প্রমুখ। এদের পরে যারা তীব্র আবেগ, দ্রোহ আর প্রেমের কবিতা রচনা করেছেন তাদের মধ্যে নির্মলেন্দু গুণ, মহাদেব সাহা, হুমায়ুন আজাদ, দাউদ হায়দার প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এদের কবিতা অনেক বেশি জীবনঘনিষ্ঠ এবং মাটি-মানুষের কাছাকাছি। এ সময়ের কবিতা ব্যক্তিগত সুখদুঃখ বা বেদনাবোধের পরিবর্তে সমষ্টির চেতনাকে অধিক রূপায়িত করেছে; এবং কবিতায় চিরচেনা ভাব ও ভাষাকে বাদ দিয়ে এরা অনমনীয় ও বিষয়নির্ভর কবিতা রচনার প্রতি মনোযোগী হয়েছেন।

স্বাধীনতা-উত্তর দেশের মুক্ত পরিবেশে সাহিত্য রচনার যে স্বাধীন আবহ তৈরি হয়েছিল তা ক্রমেই বিনষ্ট হয়েছে বিভিন্ন কারণে। কেননা মানুষ এদেশের নিকট যা প্রত্যাশা করেছিল তা বাস্তবায়নের কোনো সম্ভাবনা না দেখে আশাহত ও বঞ্চনার বেদনায় মুষড়ে পড়েন এদেশের সাধারণ মানুষের মতো কবি ও সাহিত্যিকরাও। তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে দাউদ হায়দারের 'জন্মই আমার আজন্ম পাপ', রফিক আজাদের 'ভাত দে হারামজাদা তা-না-হলে মানচিত্র খাবো' ইত্যাদিতে।

এ সময়ের কবিতায় আরেক প্রধান বিষয় ছিল প্রেম। রাজনৈতিক চিন্তা ভাবনার পাশাপাশি কবিদের চেতনায় চিত্তের বৈভবটিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রেম ও বিপ্লবকে তারা সমার্থক বিবেচনা করে তাদের কাঙ্ক্ষিত ভুবনকে পাওয়ার জন্য আকুল হয়েছেন। এ কারণে স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে বিপ্লবী কবিতার পাশাপাশি অজস্র প্রেমের কবিতা রচিত হয়েছে।

কিন্তু এদেশের কবিতাও সাহিত্য এবং এর লেখকরা কখনোই প্রেমসর্বস্ব হয়ে থাকেনি। দেশের শাসনব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে যখন সামরিক স্বৈরাচার ক্ষমতাসীন, তখনও কবিরা নিজেদের হতাশা, ক্ষোভ ও প্রতিবাদ ব্যক্ত করতে দ্বিধাগ্রস্ত হননি। আশির দশকের কবিতা মূলত প্রতিবাদী চেতনায় পূর্ণ। তখন বাংলাদেশে চলছিল সামরিক স্বৈরাচার ও ক্ষমতালোভীদের শাসন-শোষণ; তাই সরাসরি দ্রোহের প্রকাশ ঘটেছে সে সময়ের কবিতায়।

অবশ্য নব্বইয়ের দশকে নতুন একটি চেতনা বাংলাদেশের কবিতাজগৎকে আন্দোলিত করে। এ দশকে কবিরা সচেতনভাবে উত্তর-আধুনিকতার চর্চা শুরু করেন। মূলত লিটল্ ম্যাগাজিনগুলোকে কেন্দ্র করে

দেশীয় ঐতিহ্যের নানা বিষয় নিয়ে তারা ফিরে তাকান আদি ও প্রকৃত বাংলাদেশের দিকে। মূলত আরোপিত আধুনিকতার খোলস থেকে বাংলা কবিতাকে বের করে যথার্থ বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশের কবিতা করে তোলাই উত্তর-আধুনিক কবিদের প্রচেষ্টা।

এ সময়ের ছোটগল্প স্বাধীনতা-পূর্ব যুগের তুলনায় অনেক বেশি গণমুখী ও রাজনীতি সংলগ্ন। মুক্তিযুদ্ধ, যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বিপুলসংখ্যক মধ্যবিত্তের স্বপ্নভঙ্গের বেদনা, গ্রামীণ ও নাগরিক জীবনের ভাঙন, পারিবারিক জীবনে সুস্থিরতার অভাব ইত্যাদি বারবার উঠে এসেছে এ সময়ের গল্পে। আবার, মুক্তিযুদ্ধের পর স্বাধীন বাংলাদেশের সামাজিক অস্থিরতা, আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, যুব সমাজের নৈতিক অবনতি এবং সামগ্রিক মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়কে বিষয়বস্তু করে একাধিক গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। যেমন– শওকত ওসমানের 'জন্ম যদি তব বঙ্গে' (১৯৭৫), আলাউদ্দিন আল আজাদের 'আমার রক্ত', 'স্বপ্ন আমার' (১৯৭৫) ইত্যাদি।

স্বাধীনতা-পরবর্তী ছোটগল্পের একটি বড় পরিবর্তন হচ্ছে জীবন দৃষ্টির পরিবর্তন। সমাজের উঁচু তলার মানুষের পাশাপাশি নিচুতলার মানুষও গল্পের বিষয়বস্তু হিসেবে স্থান পায়। সাধারণ মানুষের কামনা-বাসনার উন্মুখ চিত্র সম্বলিত একটি অনিন্দ্যসুন্দর গল্পগ্রন্থ হলো আল মাহমুদের 'পানকৌড়ির রক্ত'।

এ সময়ে বাংলাদেশের নগর সংস্কৃতি নিয়ে বিভিন্ন গল্প গড়ে উঠেছে এক ভিন্ন ধারায়। এ সংস্কৃতির দুটি প্রান্ত যার একদিকে চিত্ত-বৈভব, অন্যদিকে নিঃসঙ্গতা। বিত্তবানদের চিত্তদৈন্য আর নিঃস্বঙ্গের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ এ দুই বিপরীতমুখী বিষয়কে অবলম্বন করে অনেকেই সৃষ্টি করেছেন তাদের গল্পের ভুবন। যেমন– রাহাত খানের 'অন্তহীন যাত্রা', 'অনিশ্চিত লোকালয়' প্রভৃতি।

স্বাধীনতা-উত্তরকালের ছোটগল্প ও বিভিন্ন সাহিত্যে সামাজিক দায়বদ্ধতা অধিক পরিমাণে প্রকাশিত হয়, কারণ সমাজে তখন নানামুখী পরিবর্তন সূচিত হচ্ছিল; রাজনৈতিক ভাঙাগড়া, শোষণ, বঞ্চনা বৃদ্ধির ফলে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি তেমন ঘটেনি। তবে এর মধ্যেই গজিয়ে ওঠে একটি উচ্চবিত্ত শ্রেণী। তার জীবনাচরণও গল্পে জায়গা করে নিয়েছে। দারিদ্র্যক্লিষ্ট ভূমিহীন কৃষক, জোতদার ও মহাজনের শোষণ পীড়ন, রাজনৈতিক ফড়িয়া, দালাল ও ধর্মব্যবসায়ীদের দ্বারা বিভ্রান্ত বিপর্যস্ত গ্রামবাংলার লোকদের কথা গল্পে স্থান পেয়েছে অনেক পূর্বেই, তবে এ সময়েও কেউ কেউ এ বিষয়কে ঘিরে গল্প রচনা করেছেন।

এ সময়ের নাট্যজগতেও আসে বৈপ্লবিক পরিবর্তন, কেননা তখন এদেশের সংস্কৃতি চর্চার মুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়। তাছাড়া নাট্যকারদের উদ্ভাবনী শক্তি, রাজনীতি সচেতনতা, কৌশলগত আঙ্গিক ও পরিশীলিত ভাষা-স্বাধীনতা পরবর্তী নাটকে এক প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের নাটক হয়ে ওঠে নাট্য আন্দোলনের প্রধান হাতিয়ার, গড়ে ওঠে নানা নাট্যগোষ্ঠী এবং নিয়মিত নাট্য মঞ্চায়নের মাধ্যমে নাটককে ক্রমশ একটি সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যাচ্ছে বর্তমানের নাট্যকর্মীরা।

স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে যেটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক তা হলো– সাহিত্য নিয়ে গবেষণার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লক্ষ করা যায় এবং এর প্রেক্ষিতে বহু গবেষণামূলক গ্রন্থ রচিত হয়।

স্বাধীনতা-উত্তর সংস্কৃতির চিত্র : সাহিত্য ও সংস্কৃতি একই বৃন্তে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে, সংস্কৃতিবোধ ঘিরে জন্ম হয় নব নব সাহিত্য ও শিল্পের। এদেশের সংস্কৃতির ইতিহাস বহু জনমের ঐতিহ্যকে লালন করে এবং ধারণ করে। কিন্তু সংস্কৃতির এ গতিধারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নমুখী হয়ে নতুন নতুন আচার, দৃষ্টিভঙ্গি, বিশ্বাস, শিল্প, জ্ঞান ইত্যাদিকে আলিঙ্গন করেছে। ঠিক তেমনিভাবে

এদেশের স্বাধীনতা-পূর্বকালের সংস্কৃতির গতিপথ এবং স্বাধীনতা-উত্তর সংস্কৃতির পথচলা একই স্রোতমুখো নয় বরং কিছুটা ভিন্ন পথে প্রবহমান। স্বাধীনতা-পরবর্তীকালের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক যে অবস্থা তার ওপর দাঁড়িয়ে সংস্কৃতি তার রূপ বদলিয়েছে। এক সময় এদেশের সংস্কৃতির যে চিত্র পরিলক্ষিত হয়েছে আজ তার রূপ আমরা খুব কমই দেখতে পাই। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের সংস্কৃতির অঙ্গনকে এ দেশের নব নব অর্থনৈতিক ভিত্তি, সামাজিক কাঠামো, রাজনৈতিক পরিমণ্ডল বিভিন্ন উপায়ে প্রভাবান্বিত করে। সেই লোকনৃত্য, জারি, সারি, ভাওয়াইয়া, পালাগানের জায়গা দখল করেছে আধুনিক তথা উত্তরাধুনিককালের পশ্চিমা ও ভারতীয় সংস্কৃতির চর্চা। অতীতের কৃষিনির্ভর সংস্কৃতি বিলুপ্ত হতে থাকে এবং তথাকথিত আধুনিক যন্ত্রনির্ভর সংস্কৃতি চর্চা শুরু হয়।

সমাজ কাঠামোতে পরিবর্তন সূচিত হয়। পরিবারের ভিতর যে একাত্ম মনোভাব, ঐক্যতান ছিল সেটি ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে পরিবার প্রথায় স্বাতন্ত্র্যবোধের জন্ম হয়। ফলে, একক পরিবার গড়ে উঠতে থাকে। স্নেহবোধ, আন্তরিকতা, দায়িত্ববোধ লোপ পেতে থাকে। আজ যেটি আরও বেশি তীব্রতর রূপ নিয়েছে।

একদিন পল্লী জীবনের হৃদয়গ্রাহী যে চিত্র আমাদের মানসপটে ভেসে উঠতো তা ধীরে ধীরে মুছে যেতে শুরু করলো, একতারা, ঢোল, তবলা, সারিন্দার জায়গা দখল করলো পশ্চিমা বাদ্যযন্ত্র।

পোশাক পরিচ্ছদে আমাদের নিজস্ব ঐতিহ্য ছিল। বিদেশী সংস্কৃতির, ব্যাপক প্রসার ও চর্চার প্রভাবে আমাদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরিচ্ছদে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে। বাংলা ভাষা ব্যবহারেও আজ অরুচি, ইংরেজি ভাষা ব্যবহারেই সকলে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে।

আগে যেমন গ্রামীণ সংস্কৃতির রস আস্বাদন করে মানুষ আনন্দ উপভোগ করতো আজ সেখানে জায়গা নিয়েছে চলচ্চিত্র, নাটক, টিভি সিরিয়াল ইত্যাদি। আজ আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও নীতিবোধের জায়গাও বড় বেশি নাজুক হতে চলেছে।

এত কিছুর পরেও আজ মানুষ অনেক বেশি সচেতন। আজ মানুষ বিশ্বমানের চিন্তা, বিশ্বাস, শিল্পকলা, সৃষ্টিশীলতা ইত্যাদিতে মগ্ন। আজ বিশ্বায়নের প্রভাবে সামাজিক সংস্কৃতির অবক্ষয় পরিলক্ষিত হলেও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের অনেক বেশি নিকটবর্তী হচ্ছে অর্থাৎ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে আন্তর্জাতিক উষ্ণ সম্পর্কের জন্ম হয়েছে যেটা বিশ্বের বিভিন্ন সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী মানুষকে পারস্পরিকভাবে কাছাকাছি আসতে সহায়তা করছে।

সত্য বলতে কি, স্বাধীনতা-পরবর্তী সংস্কৃতির ধারা মূলত তথাকথিত আধুনিক বা পশ্চিমা সংস্কৃতির রূপকে পরিগ্রহ করে আবর্তিত হচ্ছে, কেননা মানুষ আধুনিকতার প্রভাবে প্রভাবান্বিত।

উপসংহার : উল্লেখিত দুই কালের সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে অনেক পার্থক্য লক্ষণীয়। স্বাধীনতা-পূর্ব সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চা হতো গ্রামীণ জীবন, প্রকৃতি, কৃষিনির্ভর অর্থনীতি, ঐতিহ্যগত বিশ্বাস ও রীতিনীতি, তখনকার সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলন, শোষণ-নিপীড়ন প্রভৃতিকে ঘিরে। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির গতিপথ কিছুটা ভিন্নখাতে প্রবাহিত হয়। নতুন সামাজিক অর্থনৈতিক তথা রাজনৈতিক কাঠামোই নতুন সংস্কৃতির জন্ম দেয়, যার প্রতিচ্ছবি ভেসে ওঠে সাহিত্যে, কেননা সাহিত্য মানব জীবনাচরণেরই প্রতিবিম্ব। স্বাধীনতা-উত্তর সাহিত্যের ক্ষেত্রে অনেক তরুণ লেখক তাদের শিল্পিত হৃদয় নিয়ে আবির্ভূত হয়, কিন্তু সেই পূর্বের শৈল্পিক রূপটি আজকালকার সাহিত্যে তেমনটি লক্ষ করা যায় না। কেননা এখনকার সাহিত্য চর্চা মানবসর্বস্ব হওয়ার চেয়ে বড় বেশি বাণিজ্যসর্বস্ব হয়ে পড়েছে।

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

০৬ । প্রাচীন বাংলার শাসনকাল বর্ণনাপূর্বক বাংলার প্রাচীন জনপদগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

উত্তর : হাজার বছরের বাঙালির নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস যেমন বাঙময়, তেমনি জটিল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। সে আর্য-আনার্য, বৈদিককাল পেরিয়ে দ্রাবিড়, অদ্রাবিড়, ব্রাহ্ম-অব্রাহ্ম, বাঙাল আর বহিরাগত সকলের এক সম্মিলিত রূপ আজকের বাঙালি। বাঙালির ভূতাত্ত্বিক জনপদে যেমন রয়েছে ভাঙাগড়া, নদীর রূপরেখা বলয়, বাঙালির নৃতাত্ত্বিক ইতিহাসে আছে তেমনি নানা সংযোজন-বিয়োজন, যুগ-যুগান্তরের নানা ঘটন-অঘটন আর পরিবর্তন। বাঙালির সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বলয়ও কখনো একই ধারা বা অভিন্ন গতিতে বহমান ছিল না।

বঙ্গ ও বাংলা নামের উৎপত্তি : 'ঐতরেয় আরণ্যক' গ্রন্থে সর্বপ্রথম বঙ্গ নামের উল্লেখ দেখা যায়। বঙ্গ কলিঙ্গ জনপদের প্রতিবেশী বলে এর অধিবাসীদের সম্পর্কে নানা প্রকার 'অশ্রদ্ধাসূচক' মন্তব্য রয়েছে। বৈদিক যুগের শেষ ভাগে রচিত কতগুলো গ্রন্থ হতে জানা যায়, মগধ, চের ও বঙ্গ এই তিনটি অঞ্চল ছিল। রামায়ণ ও মহাভারতে বঙ্গ নামের উল্লেখ আছে। পুণ্ড্র বা রাঢ় দেশ তখন সূহ্মভূমি ও বজ্রভূমি নামে দুইভাগে বিভক্ত ছিল– এটা জৈনসূত্র আচারঙ্গ গ্রন্থ থেকে জানা যায়। প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যেও বঙ্গ ও সূহ্ম এই দুটি অঞ্চলের কথা রয়েছে। বর্তমানে যে ভূখণ্ড নিয়ে বাংলাদেশ গঠিত; পূর্বে এর অধিকাংশ অংশ 'বঙ্গ' নামে পরিচিত ছিল। এটি অতি প্রাচীনকাল হতে বিদ্যমান ছিল।

বাংলা নামটি মুঘল যুগেই সর্বপ্রথম দেশবাচক নাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এক সময় বাংলার জনপদ বিভিন্ন নামে বিভক্ত ছিল। এগুলো একত্রে 'বাংলা' নামকরণ হয় মাত্র কয়েক'শ বছর আগে।

মুসলিম শাসনামলে সর্বপ্রথম এ অঞ্চলকে 'বাংলা' বা 'বাঙ্গালা' নামে অভিহিত করা হয়। সম্রাট আকবরের শাসনামলে সমগ্র বাংলাদেশ সুবা-ই-বাংলা হিসেবে পরিচিতি পায়। সেখান থেকেই বাংলার নামের উৎপত্তি।

প্রাচীন বাংলার সময়কাল : বাংলার প্রাচীন সময়কাল নিয়ে ইতিহাসবিদদের মধ্যে কিছুটা মতবিবোধ রয়েছে। বাংলার ইতিহাস চার থেকে পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাস। তবে এর মধ্যে কারো মতে বাংলায় সুলতানি শাসনামলের পূর্ব পর্যন্ত ছিল বাংলার প্রাচীন আমল। আবার অনেকের মতে বাংলায় মুঘলদের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত সময়টাই হলো বাংলার প্রাচীনকাল। অধিকাংশের মতে বাংলায় সুলতানি শাসন কায়েমের পূর্ব সময়টাই ছিল বাংলার প্রাচীনকালের শেষ যুগ। কেননা বাংলার মধ্যযুগটি শুরু হয় ১২০০ সালের পর থেকে।

প্রাচীন বাংলার শাসনকাল

১. **গুপ্ত বংশ :** গুপ্ত শাসন প্রাচীন বাংলার ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। খ্রিষ্টীয় তিন শতকের শেষ এবং চার শতকের প্রথমদিকে সম্ভবত প্রথম চন্দ্রগুপ্ত অথবা সমুদ্রগুপ্তের মাধ্যমে বাংলায় গুপ্ত শাসন সম্প্রসারিত হয়। গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীনে বাংলা ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ। ভারতের ইতিহাসে গুপ্ত যুগ সামগ্রিকভাবে 'স্বর্ণযুগ' হিসেবে খ্যাত। এ সময়ে প্রজাহিতৈষী কেন্দ্রীয় শাসনের আওতায় যে শান্তি, সম্পদ ও সমৃদ্ধির প্রকাশ ঘটে সর্বভারতীয় সাম্রাজ্যের অংশ হিসেবে বাংলা তার সুফল ভোগ করে। বাংলা সর্বভারতীয় বাণিজ্যের অংশীদার হয়। গুপ্ত যুগে বাংলায় স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার সর্বব্যাপী প্রচলন হয়। স্বর্ণ মুদ্রার বহুল প্রচলন বাংলার আর্থিক সমৃদ্ধির পরিচায়ক।

সুপারি, রেশম, তুলা, নারিকেল, লবণ, চিনি ইত্যাদি বাংলা থেকে রপ্তানি হতো। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও চীনের সঙ্গে এসময় বাংলার ছিল বাণিজ্যিক সংযোগ। বাংলার বিভিন্ন স্থান থেকে প্রচুর পরিমাণে গুপ্ত অনুকরণ মুদ্রা পাওয়া যায়, যা থেকে বোঝা যায় বাংলা মুদ্রা অর্থনীতির সুফল ভোগ করেছে। খ্রিষ্টীয় চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত গুপ্ত রাজবংশ বাংলা শাসন করেছিল। গুপ্ত রাজবংশের বিখ্যাত রাজাদের মধ্যে সমুদ্রগুপ্ত, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত (বিক্রমাদিত্য নামে খ্যাত)-এর নাম উল্লেখযোগ্য। এর ঠিক পরেই শশাঙ্ক নামের একজন স্থানীয় রাজা স্বল্প সময়ের জন্য এ এলাকার ক্ষমতা দখল করতে সক্ষম হন।

২. **পাল বংশ (৭৫৬-১১৪৩) :** পাল যুগ প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে গৌরবময় অধ্যায়। পাল বংশ প্রায় চারশো বছর বাংলা শাসন করে। একই রাজবংশের এতো দীর্ঘকালের শাসন ইতিহাসে বিরল। এই দীর্ঘ শাসনে বাংলার কৃতিত্ব অবশ্যই পাল যুগের গৌরব। বিস্তৃত সাম্রাজ্য, সাম্রাজ্যে সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা, প্রজাবৎসল শাসন-নীতি, বিভিন্ন শিল্পকলার ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উৎকর্ষ সাধন এবং সাহিত্য ও জ্ঞান চর্চা–এ সবই পাল যুগের কৃতিত্ব ও গৌরব। পালবংশের শাসন প্রতিষ্ঠার পর উদীয়মান প্রতিপত্তির যুগে পাল সাম্রাজ্যের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। সমগ্র উত্তর ভারত তাদের শাসনাধীনে না এলেও কনৌজ পর্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করে পাল শক্তি উত্তর ভারতের রাজনীতিতে দৃঢ় পদক্ষেপের চিহ্ন রাখতে সমর্থ হয়েছিল নয় শতকের প্রথমার্ধে। পালদের অধীনেই উত্তর ভারতের রাজনীতিতে বাংলার প্রথম সাফল্যজনক বিস্তৃতি ঘটে। পালদের সামরিক কৃতিত্বের চাইতে অধিকতর প্রশংসনীয় কৃতিত্ব তাদের সাম্রাজ্যে বিরাজমান সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা। পালদের তাম্রশাসনসমূহে সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রাম পর্যায় থেকে কেন্দ্রীয় সরকার পর্যন্ত স্তরীভূত সুবিন্যস্ত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল পাল সাম্রাজ্যে। প্রশাসন ব্যবস্থা ছিল সর্বব্যাপী, খেয়াঘাটের ব্যবস্থা থেকে শুরু করে নদীপথ, স্থলপথ, ব্যবসা-বাণিজ্য, নগর-বন্দর, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা—কোনো ক্ষেত্রই প্রশাসন যন্ত্রের আওতাবহির্ভূত ছিল না। এমনকি বন এবং বাজার ব্যবস্থাপনার দিকেও নজর ছিল প্রশাসনের।

৩. **সেন রাজবংশ (১০৯৭-১২২৫) :** প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে একাদশ শতাব্দীর অন্তিমলগ্নে পাল রাজবংশের অবসান ঘটিয়ে সেনদের উত্থান একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তারা একশো বছর বাংলা শাসন করে। বাংলার পাল রাজবংশের রাজা দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্বকালে বারেন্দ্র 'সামন্তচক্রের' বিদ্রোহের সুযোগ নিয়ে সেন রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বিজয় সেন পশ্চিমবঙ্গে ক্রমশ স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করেন এবং অবশেষে বাংলার পাল রাজবংশের রাজা মদনপালের রাজত্বকালে স্বাধীন সত্তার বিকাশ ঘটান। বাংলায় সেন শাসনের বিশেষ তাৎপর্য এই যে, সেনগণই সর্বপ্রথম সমগ্র বাংলার ওপর তাদের নিরঙ্কুশ শাসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে বাংলার সেন বংশীয় রাজাদের মধ্যে বিজয় সেন, বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণ সেন বিশিষ্ট স্থান অধিকার করছেন। বাহ্যত চার শতককাল শাসনের মূল ভিত্তিই ছিল তাদের সুষ্ঠু-সুবিন্যস্ত শাসনব্যবস্থা।

বাংলার প্রাচীন জনপদ

৬২৯-৬৪৫ খ্রিষ্টাব্দে ভারতবর্ষেও প্রাচীন ভূপতি হর্ষবর্ধন ও কামরূপের অধিপতি ভাস্কর বর্মণের রাজত্বকালে চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ বাংলা ভ্রমণ করেন। তার বিবরণ থেকে জানা যায়, মগধ, অঙ্গ, পুণ্ড্রবর্ধন, কামরূপ, সমতট, তাম্রলিপ্তি, কর্ণসুবর্ণ প্রভৃতি জনপদের কথা। অঙ্গের রাজধানী ছিল চম্পানগরী, বর্তমানের পশ্চিমবঙ্গের ভাগলপুর। সমগ্র বঙ্গ তখন এসব অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। তারপর মুসলিম শাসনামল পর্যন্ত বাংলা অঞ্চলটি বঙ্গ, রাঢ়, বরেন্দ্র ও গৌড় নামে বেশ প্রচলন ছিল।

আবার ইতিহাস গ্রন্থে থেকে জানা যায় তৎকালীন সময়ে বাংলাকে 'গৌড়দেশ' বলা হতো এবং পরবর্তী সময়ে উত্তর বঙ্গের এলাকাটি 'গৌড়' নামে এবং বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল 'বঙ্গ' নামে পরিচিতি পায়। প্রাচীন বাংলার যে জনপদগুলোর নাম উল্লেখযোগ্য সেসবের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিচে দেয়া হলো :

১. **প্রাচীন পুণ্ড্র :** হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণ থেকে জানা যায়, অঙ্গের পর তিনি পুণ্ড্রে এসেছিলেন। তিনি কলাতু নামে একটি বড় নদীর কথা উল্লেখ করেন। গবেষকরা মনে করেন এটি করতোয়া নদী, তৎকালে ব্রহ্মপুত্র ও যমুনাসহ পুরো নদীপথের কথা বলা হয়েছে। আরো অনেক পুরনো দলিলে করতোয়া এবং করতোয়া ভরাযৌবনে খরস্রোতা ও বিশালত্বের কথা জানা যায়। মূলত করতোয়া নদীকে ঘিরেই পুণ্ড্রবর্ধনের সভ্যতা বিকশিত হয়েছিল। মহাভারতে উল্লিখিত পুণ্যতোয়া নদীই আজকের করতোয়া। তবে তিস্তা খাতের তখন জন্ম হয়নি। মূলত ১৭৮৭ সালের প্রবল বন্যাই তিস্তার জন্ম দিয়েছে। আদিকালের কুশিগঙ্গা বর্তমান পদ্মা এবং করতোয়াকে ঘিরেই প্রাচীন পুণ্ড্রনগরের অবস্থান। নীহাররঞ্জন রায়ের মতে, সে অতীতে পুণ্ড্রনগরের পতনের পূর্ব পর্যন্ত এ জনপদ শাসন, ধর্ম, শিল্প, বাণিজ্য ও সংস্কৃতির সর্বভারতীয় পীঠস্থান হিসেবে গণ্য হতো। আজকের মহাস্থানগড়ের প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দশন সেসব গৌরবময় দিনের স্মৃতি বহন করে।

খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বগুড়ার মহাস্থানগড়ে পুণ্ড্ররাজ্যেও সভ্যতার আলো ছড়িয়েছিল। এখানকার প্রাচীন নগরী, তার সৌন্দর্য ও স্থাপত্যকলা আজ আমাদের সামনে উন্মোচিত হয়েছে। এখানকার প্রাচীর, পরিখা, রাস্তা এবং অন্যান্য নির্দশন এক সমৃদ্ধ নগর সভ্যতার কথাই বলে। এখানকার অসংখ্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আমাদের সম্পদ ও গৌরব।

২. **প্রাচীন বঙ্গ :** পুণ্ড্রের পরই প্রাচীন বাংলার বৃহৎ এবং গুরুত্বপূর্ণ জনপদ বঙ্গ। প্রাচীন মহাভারত, রামায়ণ, কৌটিল্যেও অর্থশাস্ত্র, বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতা, কালিদাসের রঘুবংশ ইত্যাদি গ্রন্থে বঙ্গ সম্পর্কে জানা যায়। পরবর্তীতে বঙ্গের অবস্থানের ধারণা পাওয়া যায় পাল ও সেন আমলের বিভিন্ন লিপিতে। পাল ও সেন আমলে বঙ্গ পুণ্ড্রের সাথে অন্তর্ভুক্ত থাকলেও গুপ্তযুগে স্বর্গ ছিল বলে জানা যায়। গঙ্গার তীরবর্তী ভূখণ্ড বলা হয়েছে কোনো কোনো বর্ণনায়। এতে করে বোঝা যায় পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্রের মধ্যবর্তী অংশই বঙ্গ নামে পরিচিত।

৩. **প্রাচীন সূক্ষ্মদেশ বা তাম্রলিপ্তি বা রাঢ় :** ঐতিহাসিক তথ্যমতে তৎকালে তাম্রলিপ্তির আগের নামই হলো সূক্ষ্মদেশ। এই তাম্রলিপ্তি শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ব্যবসা বাণিজ্যেরও কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। বৌদ্ধ ধর্মাচার্যদের বিবরণ থেকে জানা যায়, সূক্ষ্ম জনপদই পরে তাম্রলিপ্তি নাম ধারণ করে। সূক্ষ্ম সম্পর্কে প্রাচীন পুঁথিপত্রে পুণ্ড্র ও বঙ্গের সাথেই এর উল্লেখ রয়েছে। তাছাড়া মহাভারতের সূত্রে দেখা যায়, অঙ্গের নৃপতি দুর্যোধন এবং পরবর্তীতে ভীমও সূক্ষ্ম জয় করেন। মোটামুটি বিভিন্ন বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান প্রভৃতি জেলা সূক্ষ্ম রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বৃহৎসংহিতার বর্ণনা অনুযায়ী বঙ্গ ও কলিঙ্গের মধ্যবর্তী জনপদই ছিল সূক্ষ্ম বা তাম্রলিপ্তি। পরবর্তীতে বিভিন্ন রাজ্য ভাঙ্গাগড়ার খেলায় এ অঞ্চলটি রাঢ়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। রাঢ় রাজ্যের সীমানা সম্পর্কে যতটা জানা যায় এটা ছিল ভাগীরথীর পশ্চিম তীর মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বাঁকুড়া, হুগলি, হাওড়া ও মেদিনীপুরব্যাপী।

৪. **প্রাচীন সমতট :** হিউয়েন সাঙ সমতটের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে, কামরূপ থেকে ১২০০ থেকে ১৩০০ লি দক্ষিণে (২৫০-২৬০ মাইল) রাজ্যটি সমুদ্র তীরবর্তী। এর পরিধি ৬০০ মাইল, ভূমি উর্বর ও আবাদি। এখানে প্রচুর শস্য জন্মায়, জলবায়ু আরামদায়ক। ৩০টি সঙ্ঘারাম ও শতাধিক মন্দির ছিল বলে তিনি লিখেন। রাজধানীর পরিধি ৪ মাইল। এখানে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের কথা আছে। তাদের বিভিন্ন শিলালিপি অনুযায়ী কুমিল্লা, ত্রিপুরা ও নোয়াখালী এলাকাকে নিয়ে সমতট রাজ্য বিস্তৃত হয়েছিল।

৫. **প্রাচীন হরিকেল :** আদি সাহিত্যে নাম না থাকলেও বিভিন্ন শিলালিপির সূত্রে পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, বর্তমান চট্টগ্রাম অঞ্চলে একসময়ে শ্রীলংকা থেকে আসা এক রাজন্য তার রাজ্য স্থাপন করেন। রাজ্যটি খুব বড় না হলেও এটা বাংলার একটা অংশ ছিল, এর নাম ছিল হরিকেল বা হরিকেলা। চট্টগ্রামে প্রাপ্ত কোনো এক কান্তিদেব নামক রাজার তাম্রশাসনে হরিকেল মণ্ডলের কথা জানা যায়। বর্তমান সিলেট ও চট্টগ্রাম অঞ্চলকে হরিকেলের অন্তর্ভুক্ত মনে করা হয়। ঐতিহাসিকদের ধারণা এর সময়কাল খ্রিষ্টীয় নবম শতক হয়ে থাকবে।

৬. **প্রাচীন গৌড় রাজ্য :** সপ্তম শতাব্দীতে পাণিনির বৈয়াকরণে গেড়ীড়িপুর নামক একটি নগরের উল্লেখ পাওয়া যায়। চতুর্থ শতকে কৌটিল্যেও অর্থশাস্ত্রে রুপার জন্য গৌড়দেশের খ্যাতির কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয় শতকে বাৎসায়নের কামসূত্রে, ষষ্ঠ শতকে বৃহৎসংহিতাতে, গৌড়দেশ ও গৌড়বাসীর কথা বলা হয়। ঐতিহাসিকদের ধারণা গৌড়দেশ বলতে মূলত মালদহ, বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদের কথা বলা হয়েছে এবং এর কিছু অংশ বর্তমান বাংলাদেশের চাপাইনবাবগঞ্জ এলাকা। সপ্তম শতকে শশাংকের আমলে গৌড়, কর্ণসুবর্ণ, তাম্রলিপ্তি একই রাজ্যভুক্ত ছিল। এই রাজ্যের আন্তর্জাতিক পরিচয় ছিল ব্যাপক। খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে মিশরীয় শাসক টলেমি রচিত ভূগোল বৃত্তান্তে এসেছে, তৎকালে বঙ্গদেশে কাটসিনা (কর্ণসূবর্ণ), তমালতিস (তাম্রলিপ্তি), গঙ্গারিডই (গঙ্গারাঢ়ী) প্রভৃতি স্বাধীন রাজ্যের অস্তিত্বের কথা।

উপসংহার : বাংলার ইতিহাস অধুনা বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বিগত চার সহস্রাব্দের ইতিহাস। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদ এক অর্থে বাংলাকে ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতের ইতিহাসে বাংলা এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। সর্বপ্রাচীনকালে বাংলায় বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর লোক বসবাস করত এবং যে অঞ্চলে যে জনগোষ্ঠী বাস করত সে অঞ্চল সেই জনগোষ্ঠীর নামে পরিচিত হতো। এভাবে বঙ্গ, পুণ্ড্র, রাঢ় ও গৌড় নামক প্রাচীন জনপদসমূহ অনার্য জনগোষ্ঠীর দ্বারা এসব নামের অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে স্বীকৃত হয়। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে মেঘনার ওপারে সমতট (কুমিল্লা-নোয়াখালী অঞ্চল) ছিল একটা গুরুত্বপূর্ণ জনপদ। চট্টগ্রাম ও তৎসন্নিহিত অঞ্চল হরিকেল, চাপাইনবাবগঞ্জ অঞ্চল গৌড় এবং বরিশাল, ফরিদপুর অঞ্চল বঙ্গ নামে পরিচিত ছিল, যা আমাদের প্রাচীন বাংলার গৌরবের নিদর্শন বহন করে।

০৭। মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে সম্রাট বাবরের কৃতিত্ব মূল্যায়ন করুন।

ভূমিকা : মধ্যযুগীয় ভারতের ইতিহাসে বাবর ছিলেন সর্বাপেক্ষা প্রথিতযশা নরপতি। যোদ্ধা, শাসক এবং পণ্ডিত ব্যক্তি হিসেবে তিনি ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে পানিপথ যুদ্ধের মাধ্যমে তিনিই ভারতীয় উপমহাদেশের বিশাল মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৫৩০ সাল পর্যন্ত মুঘল সাম্রাজ্যের ভিতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াস চালান। ঐতিহাসিক V.Smith বলেন, "Babur was the most brilliant aslatic prince of his age and of a high place worth among the sovereigns of any age on country."

প্রাথমিক জীবন ও সিংহাসনারোহণ

১৪৮৩ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারি মধ্য এশিয়ার তুর্কীস্থানে এক ক্ষুদ্র রাজ্য ফরগনায় জহিরউদ্দিন মুহাম্মদ বাবর জন্মগ্রহণ করেন। ১৪৯৪ খ্রিষ্টাব্দে পিতা ওমর শেখ মীর্জার মৃত্যু হলে বাবর মাত্র ১১ বছর বয়সে ফরগনার সিংহাসন লাভ করেন। কিন্তু সিংহাসনে আরোহণ করেই তিনি নানা বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হন। তাঁর নিকটাত্মীয়গণ, রাজন্যবর্গ এবং সাইবানি খানের নেতৃত্বে উজবেকগণ তার বিরুদ্ধাচরণ শুরু

করেন। এমনকি উজবেক নেতা সাইবানি খানের হাতে পরাজিত হয়ে তিনি ফরগনা ও সমরখন্দ হতে বিতাড়িত হন। কিন্তু এতে তিনি নিরুৎসাহিত হননি, বরং নতুন উদ্যমে রাজ্য অধিকারের চেষ্টায় তৎপর হন। ১৫০৪ সালে বাবর উজবেক শাসনের বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহের সুযোগ নিয়ে কাবুল জয় করেন এবং ১৫০৭ সালে 'Padsha' উপাধি গ্রহণ করেন।

ভারত জয়ের পরিকল্পনা

এভাবে প্রাথমিক বাধা বিপত্তি কাটিয়ে কাবুল জয়ের পর তিনি পুনরায় সমরখন্দ পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। কিন্তু এখানে ব্যর্থ হয়ে তিনি দক্ষিণ-পূর্ব তথা হিন্দুস্থানে ভাগ্য পরীক্ষা করতে মনস্থির করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি আত্মচরিতে বলেছেন, "As it was always in my heart to posses Hindustan of as these several country." [P - 380] ভারতের অগণিত ধনরত্ন বাবরকে ভারত জয়ে প্রলুব্ধ করে। এছাড়া রাজনৈতিক অন্তর্দ্বন্দ্ব, কেন্দ্রীয় শাসনে শৈথিল্য ইত্যাদি জয়ের আকাঙ্ক্ষাকে বহুলাংশে বৃদ্ধি করেছিল।

ভারতের বিরুদ্ধে প্রাথমিক অভিযানসমূহ

ভারতের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সামরিক অভিযানের পূর্বে বাবর কয়েকটি প্রাথমিক অভিযানে লিপ্ত হন। কাবুল হতে ১৫১৯ সালে তিনি প্রথম ভারত অভিযান করেন এবং রাজৌর দুর্গ, ভীরা, কুশব ও চিনাব নদীর অববাহিকা অঞ্চল জয় করেন। তিনি বাদাখশান ও কান্দাহার যথাক্রমে ১৫২০ ও ১৫২২ সালে দখল করেন। অতঃপর পরীক্ষামূলক অভিযান শেষে বাবর পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খান লোদী ও আলম খানের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে ১৫২৪ সালে প্রথমে লাহোর এবং ১৫২৫ সালে পাঞ্জাব অধিকার করেন। এরপর ১৫২৬ সালের ২১ এপ্রিল পানিপথের প্রান্তরে ইব্রাহীম লোদীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন।

ক. **পানিপথের যুদ্ধ :** মাত্র ১২ হাজার সৈন্য নিয়ে বাবর ইব্রাহীম লোদীর লক্ষাধিক সৈন্যের বিশাল বাহিনীকে পরাজিত করে অতি দ্রুতগতিতে দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করেন এবং প্রথম মুঘল সম্রাট হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

ফলাফল : পানিপথের প্রথম যুদ্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এ যুদ্ধের ফলে লোদী বংশের শাসনের অবসান ঘটে এবং মুঘল শাসনের সূচনা হয়। এ বিজয়ের ফলেই ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হয় এবং ৩০০ বছরের সুলতানী আমলের পরিসমাপ্তি হয়।

খ. **খানুয়ার যুদ্ধ :** পানিপথের যুদ্ধের পর বাবর দিল্লী ও আগ্রার অধিপতি হলেও সমগ্র হিন্দুস্থানের সম্রাটের মর্যাদা লাভ করতে পারেননি। বীর মুক্তিযোদ্ধা রানা সংগ্রাম সিংহ ইব্রাহীম লোদী অপেক্ষা ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। ফলে বাবর আগ্রার অদূরে সিক্রি নামক স্থানে শিবির স্থাপন করে যুদ্ধ প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। সংগ্রাম সিংহও বাবরের বিরুদ্ধে ৮০ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য ও ৫০০ হাতি নিয়ে গঠিত এক বিশাল বাহিনীসহ যুদ্ধে অগ্রসর হলেন। ১৫২৭ সালে খানুয়ার রণাঙ্গনে উভয়ের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং যুদ্ধে সংগ্রাম সিংহের বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে।

ফলাফল : খানুয়ার যুদ্ধের ফলে রাজপুতদের শক্তি নিশ্চিতরূপে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় এবং মুসলমানদের রাজপুত ভীতি দূরীভূত হয়। এর ফলে বাবর নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী হন। অন্যদিকে সংগ্রাম সিংহের পরাজয়ে হিন্দু জাগরণ ব্যাহত হয় এবং মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। এ যুদ্ধের গুরুত্ব পলাশীর পর বক্সারের যুদ্ধের অনুরূপ।

গ. **চান্দেরী দুর্গ জয় :** খানুয়ার যুদ্ধের পর যুদ্ধ ক্ষেত্র হতে প্রত্যাগত রাজপুত বাহিনী আবার চান্দেরী দুর্গে ঐক্যবদ্ধ হলে বাবর দ্রুতবেগে ১৫২৮ খ্রিষ্টাব্দে চান্দেরী দুর্গ আক্রমণ করলে সকলেই নিহত হন। ফলে রাজপুতরা চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়।

ঘ. **গোগরার যুদ্ধ :** অতঃপর আফগান দলপতিদের নিশ্চিহ্ন করতে বাবর বাংলা ও বিহারের আফগানদের সম্মিলিত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। ইব্রাহীম লোদীর ভ্রাতা মাহমুদ লোদী ও বাংলার শাসনকর্তা নুসরৎ শাহের সম্মিলিত বাহিনী ১৫২৯ সালে গোগরার যুদ্ধে মুঘলদের হাতে পরাজিত হয়। ফলে নুসরৎ শাহ বাবরের সাথে সন্ধি করতে বাধ্য হলেন।

এভাবে পর পর তিনটি যুদ্ধে জয়লাভের ফলে বাবর কাবুল হতে বাংলাদেশ পর্যন্ত সমগ্র ভারতের অধিপতি হলেন।

শাসক হিসেবে বাবরের কৃতিত্ব

১. **ব্যক্তিগত গুণাবলি :** সম্রাট বাবর মধ্যযুগীয় ইতিহাসের অনন্য সাধারণ ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। নেতা, যোদ্ধা ও বিদ্বান ব্যক্তি হিসেবে মধ্যযুগের যে কোনো শ্রেষ্ঠ শাসকের সাথে তার তুলনা করা চলে। বাবরের চরিত্রে সামরিক প্রতিভা, সাহসিকতা, রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি, উদারতা, বন্ধু প্রীতি, গভীর মমত্ববোধ প্রভৃতি গুণের অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছিল।

২. **দক্ষ সেনানায়ক ও কূটনীতিক :** তার কৃতিত্বের অন্যতম দিক ছিল তিনি মধ্য এশিয়া ও ভারতবর্ষ, লুণ্ঠনকারী যাযাবর গোষ্ঠী উৎখাত করে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা কায়েম করেন, যার কারণে তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী দুজন শক্তিশালী শাসক তৈমুর ও আকবরের সাথে তাকে তুলনা করা হয়। বাবর দিগ্বিজয়ী আলেকজান্ডারের মতো দেশ জয়ের নেশায় হিন্দুস্থান অভিযানে আগমন করে কখনও বিপর্যস্ত হননি। বিভিন্ন যুদ্ধে গুপ্তচরের মাধ্যমে শত্রুদের প্রস্তুতি সম্পর্কে খবরা-খবর নিতেন, যা তার কূটনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় দেয়।

৩. **শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা :** সমরকুশলী-বীরযোদ্ধা হলেও বাবরের সাহিত্যানুরাগ ছিল প্রগাঢ়। তার রচিত আত্মজীবনী 'তুযুক-ই-বাবর' সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। বাবর যদি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা নাও হতেন তবুও তিনি অমর হয়ে থাকতেন তার সাহিত্য প্রতিভার গুণে।

৪. **প্রশাসন ব্যবস্থা :** স্বল্প সময়ে বাবর সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের সুযোগ ও সময় পাননি বলে তিনি বিজিত অঞ্চলে প্রচলিত শাসন ব্যবস্থাকেই বলবৎ রাখেন। এতদসত্ত্বেও তিনি শাসনকার্য পরিচালনার জন্য ওয়ালী, দিউয়ান, কোতয়াল এবং সমগ্র রাজ্যে ১৫ মাইল অন্তর অন্তর ডাক চৌকীর ব্যবস্থা করেন।

উপসংহার : বাবর ছিলেন মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। একজন প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তিনি সার্থক। রাজ্যহারা হীন অবস্থা থেকে এ বিশাল সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন ও একটি স্বর্ণযুগের সূচনা করে তিনি ইতিহাসে অমর ও অক্ষয় হয়ে আছেন। ড. ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন, "Indeed, there are few princes in Asiatic history who can be ranvied higher then Babar in genius and accomplishment" [P - 234]

০৮। সম্রাট আকবরের বাংলা বিজয়ের একটি ধারাবাহিক বর্ণনা উপস্থাপনা করুন।

ভূমিকা : মোঘল সম্রাট আকবর কর্তৃক বাংলা বিজয় উপমহাদেশের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মোঘল সম্রাট আকবর ছিলেন একজন দক্ষ শাসক। আর তার সাম্রাজ্যবাদী নীতি ছিল ইতিহাসে বিরল। তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মোঘল সৈন্যবাহিনীকে একত্রিত করে একটি শক্তিশালী সামরিক বাহিনী গড়ে তোলেন। আর মোঘলদের সাথে আফগানদের বিরোধ বহুকালের পুরনো। তবে বাংলার আফগান শাসক সোলায়মান কররানী মোঘলদের আনুগত্য স্বীকার করে রাজ্য শাসন করেন। কিন্তু তার পুত্র দাউদ খান ছিলেন স্বাধীনচেতা। তাই তিনি সিংহাসনে আরোহণ করে বাংলার সম্পূর্ণ এলাকা পদানত করেন এবং নিজ নামে খুৎবা পাঠ ও মুদ্রা জারি করেন। এতে সম্রাট আকবর ক্ষুব্ধ হয়ে ১৫৭৪ খ্রিষ্টাব্দে দাউদ খানের বিরুদ্ধে বাংলা আক্রমণ করেন। মূলত সম্রাট আকবরের সময়ই বাংলাদেশ মোঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

আকবরের পরিচিতি : আকবর ছিলেন মোঘল সম্রাট হুমায়ুনের পুত্র। তিনি ১৫৪২ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। অতঃপর ১৫৫৫ খ্রিষ্টাব্দে পিতা হুমায়ুনের মৃত্যুর পর তিনি দিল্লির মসনদে বসেন। তখন তার বয়স ছিল মাত্র ১৩ বছর। তাই আকবরের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে বৈরাম খান নিযুক্ত হন। বৈরাম খান ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা ও শাসক। আর আকবরকেও তিনি মল্লযুদ্ধ, শিকার, তীর চালনা, অশ্ব চালনাসহ যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী করে তোলেন। অতঃপর বৈরাম খানকে পদচ্যুত করে আকবর নিজ হাতে শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করেন।

সম্রাট আকবরের বাংলা বিজয় : সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে মোঘলদের বাংলা বিজয়ের বিভিন্ন পদক্ষেপসমূহ নিচে বর্ণনা করা হলো :

১. **বিহার থেকে দাউদকে বিতাড়ন :** ১৫৭৪ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট আকবর সেনাপতি মুনিম খানকে সঙ্গে নিয়ে বিহার আক্রমণ করেন। কিন্তু দাউদ খান বাংলার দিকে পলায়ন করেন। আর আকবরও পশ্চাদ্ধাবন করেন। ফলে দাউদ ও সেনাপতি গুজর খান ধন-সম্পদ ও হস্তী ফেলে পলায়ন করে। আর হাতিগুলো মোঘলদের অধিকারে আসে। এভাবে দাউদকে বিহার থেকে বিতাড়ন করে মুনিম খানকে রেখে আকবর দিল্লিতে ফিরে যান।

২. **বাংলা থেকে দাউদকে বিতাড়ন :** ১৫৭৪ খ্রিষ্টাব্দ ১৩ আগস্ট মুনিম খান ২০,০০০ সৈন্য নিয়ে বাংলার দিকে অগ্রসর হন এবং বিনা বাধায় সুরুজগড়, মুঙ্গের, ভাগলপুর ও কলহগাঁও অধিকার করে তেলিয়াগড়ি গিরিপথে উপস্থিত হন। দাউদ খান এখানে প্রতিরোধ ব্যূহ গড়ে তোলেন। কিন্তু মোঘল বাহিনীর প্রবল আক্রমণে আফগানরা যুদ্ধ না করেই পালিয়ে যান। ফলে মুনিম খান ১৫৭৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ সেপ্টেম্বর বিনা বাধায় বাংলার রাজধানী তাণ্ডায় প্রবেশ করেন এবং তা দখল করে নেন।

৩. **উড়িষ্যার পথে পলায়ন :** এদিকে দাউদ খান বাংলা থেকে বিতাড়িত হয়ে উড়িষ্যার দিকে পলায়ন করেন। তবে মুনিম খান ও রাজা টোডরমল তার পশ্চাদ্ধাবন করেন। কিন্তু আফগানরা কুচবিহারে আশ্রয় নেয়। এদিকে মোঘল সেনাধ্যক্ষ মুহা কুলী খান সাতগাও উপস্থিত হন। তবে আফগানীরা তখন সাতগাও ছেড়ে পালিয়ে যায়।

৪. **দাউদের বিরুদ্ধে অভিযান :** দাউদকে দমনের জন্য রাজা টোডরমল মুনিম খানের কাছ থেকে সৈন্য সংগ্রহ করেন। এদিকে দাউদ খানও মান্দারনের ২০ মাইল দূরে দেবরাকসারীতে প্রথমে শিবির স্থাপন করেন। মুনিম খান এ খবর পেয়ে নতুন একদল সৈন্যসহ টোডরমলের সাথে যোগ দেন। অতঃপর মিলিত বাহিনী দাউদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। কিন্তু এ সংবাদ পেয়ে, দাউদ খান হরিপুরে পরিখা খনন, প্রতিরোধ প্রাচীর নির্মাণ এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো অবরুদ্ধ করে রাখেন।

৫. **তুকারায়ের যুদ্ধ :** মোঘলদের প্রবল আক্রমণে দাউদ খান উড়িষ্যার পথে পলায়ন করেন। ফলে রাজা টোডরমল ও খান-ই-জাহান কুলী খার নেতৃত্বে মোঘল বাহিনী উড়িষ্যার দিকে অগ্রসর হন। অবশেষে ১৫৭৫ খ্রিষ্টাব্দের ৩ মার্চ তুকারায় নামক স্থানে মোঘল ও আফগান বাহিনীর মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে আফগান বাহিনী সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হলে দাউদ খান কটকে আশ্রয় নেন।

৬. **কটকের সন্ধি :** রাজা টোডরমল ছিলেন দাউদের বিরুদ্ধে ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ। তাই তিনি দাউদের পশ্চাদ্ধাবন করেন। আর দাউদ কোথাও টিকতে না পেরে কটক দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নেন এবং যুদ্ধ চালিয়ে যেতে মনস্থ করেন। কিন্তু মোঘল বাহিনীর সাথে যুদ্ধ জয়ের কোনো সম্ভাবনা না দেখে মুনিম খানের কাছে সন্ধির প্রস্তাব দেয়। ১৫৭৫ খ্রিষ্টাব্দের ১২ এপ্রিল দাউদ খান ও মুনিম খানের মধ্যে সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। আর এ চুক্তি ইতিহাসে কটকের সন্ধি নামে পরিচিত। এ চুক্তি অনুযায়ী দাউদ খান সম্রাট আকবরের বশ্যতা স্বীকার করে নেন।

৭. **আফগানদের বিরোধিতা :** দাউদ খান বশ্যতা স্বীকার করলেও অন্যান্য আফগানরা এ চুক্তি মেনে নেয়নি। তারা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে এবং মোঘলদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। ফলে মুনিম খান আফগানদেরকে দমন করার জন্য রাজধানী তাণ্ডা থেকে গৌড়ে স্থানান্তর করেন। কিন্তু গৌড়ের আবহাওয়া মোঘল সৈন্যদের অনুকূলে নয় দেখে মুনিম খান আবার তাণ্ডায় ফিরে আসেন। কিন্তু তাণ্ডায় ফিরে আসার পর ১৫৭৫ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ অক্টোবর মুনিম খান মারা যান।

৮. **দাউদ খানের পুনরুত্থান :** মুনিম খানের মৃত্যু হওয়ায় সম্রাট আকবর খান-ই-জাহানকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। আর রাজা টোডরমল তার সহকারী নিযুক্ত হন। কিন্তু খান-ই-জাহানের নিয়োগে মোঘল সৈন্যদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এ সুযোগে দাউদ খান আবার বিদ্রোহ করে ভদ্রক, জলেশ্বর প্রভৃতি মোঘল অধিকারভুক্ত অঞ্চল জয় করে সমগ্র বাংলাদেশ পুনরাধিকার করেন।

৯. **রাজমহলের যুদ্ধ :** ১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ১০ জুলাই বিহার থেকে আগত সৈন্যবাহিনী রাজমহলে খান-ই-জাহানের সাথে যোগ দেয়। অতঃপর ১২ জুলাই মোঘলদের সাথে আফগানদের ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধ ইতিহাসে রাজমহলের যুদ্ধ নামে পরিচিত। এ যুদ্ধে আফগানরা সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয় এবং দাউদ খান যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেন। কিন্তু তার অশ্ব জলাভূমিতে আটকে যায়। ফলে তিনি মোঘল বাহিনীর হাতে বন্দি হন। অতঃপর খান-ই-জাহানের আদেশে তাকে হত্যা করা হয়। আর রাজমহলের যুদ্ধের ফলে বাংলায় আফগান রাজত্বের অবসান হয় এবং মোঘল শাসনের সূত্রপাত হয়।

১০. **মির্জা হাকিমের উত্থান :** খান-ই-জাহানের মৃত্যুর পর মোজাফফর খান তুরবাতি বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। কিন্তু তার দুর্বল শাসনে মোঘল কর্মচারীগণ বিদ্রোহ করে এবং মোজাফফর খানকে হত্যা করে সম্রাট আকবরের বৈমাত্রেয় ভাই ও কাবুলের শাসনকর্তা মির্জা হাকিমকে মোঘল সম্রাট বলে ঘোষণা করে এবং তার নামে খুৎবা পাঠ ও মুদ্রা জারি করে। আর মাসুম খান কাবুলী তার প্রধানমন্ত্রী এবং বাবা খান কাকশাল বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন।

১১. **তেলিয়াগড়ি পুনরুদ্ধার :** ১৫৮১ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট আকবর খান-ই-আযমকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। ফলে ১৫৮৬ খ্রিষ্টাব্দ তিনি তেলিয়াগড়ি পুনরুদ্ধার করেন। অন্যদিকে মাসুম খান কাবুলীর সাথে কাকশালের বিরোধের কারণে আফগান বাহিনী পরাজিত হয়। কিন্তু খান-ই-আযম বাংলা পুনরুদ্ধার করলেও তিনি বিহারে চলে যান।

১২. **পুনরায় বিদ্রোহ :** এরপর সম্রাট আকবর শাহবাজ খানকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। কিন্তু তিনি আফগান বিদ্রোহীদের দমন করতে ব্যর্থ হন। ফলে বাংলায় আবার বিদ্রোহ দেখা দেয়। তবে তিনি তোষণ নীতি দ্বারা আফগানদের সপক্ষে আনেন।

১৩. **মানসিংহের কৃতিত্ব :** ১৫৯৪ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট আকবর রাজা মানসিংহকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তিনি দক্ষতার সাথে উড়িষ্যা অভিযান, কুতলু খানের সাথে যুদ্ধ, আফগান বিদ্রোহ দমন ও ঈসা খানের বিদ্রোহ দমন করেন। এছাড়া ১৫৯৯ খ্রিষ্টাব্দে উড়িষ্যার আফগানগণ কুতলু খানের পুত্র ওসমান খানকে সর্দার পদে নিয়োগ করে বাংলা আক্রমণ করে। এ সংবাদ শুনে রাজা মানসিংহ দীর্ঘপথ অতিক্রম করে রোটাস গড়ে এসে উপস্থিত হন। আর শেরপুর নামক স্থানে উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ বাধে। এ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আফগানরা চিরতরে বাংলা থেকে বিতাড়িত হয়।

উপসংহার : সম্রাট আকবর কর্তৃক বাংলা বিজয় এবং বাংলায় মোঘল শাসন প্রতিষ্ঠা সত্যিই একটি তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়। কেননা বাংলার শাসকগণ ছিলেন স্বাধীনচেতা। তাই তারা সুযোগ পেলেই বিদ্রোহ করত। আর মোঘল আমলেও এ বিদ্রোহ থেমে থাকেনি। ফলে দাউদ খান কররানী বিদ্রোহ করে নিজেকে স্বাধীন শাসক হিসেবে ঘোষণা করে। অন্যদিকে সম্রাট আকবরও দক্ষতার সাথে দাউদকে দমন করেন। ফলে বাংলায় আফগান শাসনের পতন ঘটে এবং মোঘল শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

০৯ । মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণসমূহ বিশ্লেষণ করুন।
অথবা, মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণগুলো কি কি? বর্ণনা করুন।

ভূমিকা : ১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট বাবর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মুঘল সাম্রাজ্য ১৮৫৭ সালে ইতিহাসের অমোঘ ধারায় পরিসমাপ্তি ঘটে। উথান এবং পতন ইতিহাসের এক চিরাচরিত নিয়ম। এ নিয়মের অধীনেই বিভিন্ন কারণে মুঘল সাম্রাজ্যের যেমন উথান ঘটেছিল, তেমনি বিভিন্ন কারণে এর পতনও অনিবার্য হয়েছিল।

মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ :
মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের প্রধান কারণগুলোকে প্রধানত দুভাগে বিভক্ত করা যায়; যথা—১. অভ্যন্তরীণ ও ২. বৈদেশিক কারণ। নিচে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো :

অভ্যন্তরীণ কারণ :

১. **সাম্রাজ্যের বিশালতা :** সর্বশ্রেষ্ঠ মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময়ে মুঘল সাম্রাজ্য পশ্চিমে কাবুল হতে পূর্বে চট্টগ্রাম, উত্তরে কাশ্মীর হতে দক্ষিণে কাবেরী নদী পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। কিন্তু পরবর্তী দুর্বল শাসকদের যুগে এই বিশাল সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা বজায় রাখা অত্যন্ত দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছিল। যার ফলে মুঘল সাম্রাজ্য ধীরে ধীরে পতনের দিকে ধাবিত হয়।

২. **ত্রুটিপূর্ণ শাসনব্যবস্থা :** মুঘলদের বংশানুক্রমিক রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ছিল ত্রুটিপূর্ণ। সম্রাটগণই ছিলেন ক্ষমতার উৎস এবং সম্রাট দুর্বল হয়ে পড়াতে সাম্রাজ্যের পতনও তরান্বিত হয়।

৩. **দুর্বল উত্তরাধিকারীদের শাসন :** দুর্বল উত্তরাধিকারীর সিংহাসন লাভ মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল। সম্রাট আওরঙ্গজেবের পরবর্তী মুঘল সম্রাটদের অযোগ্যতা ও দুর্বলতার সুযোগে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও অসন্তোষ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে এবং সে সুযোগে বহিঃশত্রু বারবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পথ প্রশস্ত করে।

৪. **সুষ্ঠু উত্তরাধিকার নীতির অভাব :** মুঘল রাজসিংহাসনে বসার জন্য সুনির্দিষ্ট উত্তরাধিকার নীতি না থাকায় কোনো শাসকের মৃত্যুর পর প্রায়ই সিংহাসনকে কেন্দ্র করে ষড়যন্ত্র ও যুদ্ধ বিগ্রহ লেগে যেত, যা মুঘল সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ও সংহতির মূলে কুঠারাঘাত করে।

৫. **নৈতিক অবনতি :** মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল মুঘল সম্রাটদের নৈতিক অধঃপতন। বাবর, আকবর, শাহজাহান, আওরঙ্গজেব প্রমুখ সম্রাটগণ চারিত্রিক দৃঢ়তা, প্রশাসনিক প্রজ্ঞা ও কূটনৈতিক দূরদর্শিতায় অনন্য থাকলেও পরবর্তীকালে সম্রাটগণের অলসতা, আরামপ্রিয় এবং তাদের নৈতিক অধঃপতন মুঘল সাম্রাজ্যের পতনকে ত্বরান্বিত করে।

৬. **সামরিক শক্তির অবনতি :** মুঘল সাম্রাজ্য সামরিক শক্তির উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু দুর্বল শাসকদের আমলে সামরিক শক্তি অস্বাভাবিকভাবে হ্রাস পায়। সৈন্যদের মধ্যে

শৃঙ্খলাবোধ, রণনৈপুণ্য, তেজস্বিতার পরিবর্তে বিলাসিতা, আত্মকলহ, আনুগত্যহীনতা প্রভৃতি অনেক অনাচার ঢুকে পড়ে। এভাবে সামরিক দুর্বলতা মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ডেকে আনে।

৭. **নৌশক্তির অভাব :** নৌশক্তির অভাব মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ। নৌশক্তির অভাব হেতুই ইউরোপীয় বণিকগণ এ দেশের রাজনীতিতে প্রবেশের সুযোগ পায় এবং কালক্রমে বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে পরিণত হয়। ভি ডি মহাজন বলেন, "Another cause of Mughal down fall was the neglect of the sea power by the Mughals."

৮. **সুবাদারদের বিদ্রোহ :** দুর্বল সম্রাটদের আমলে সুযোগ বুঝে প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং বহু প্রদেশ কেন্দ্রীয় শক্তির নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। এর ফলে বিশাল মুঘল সাম্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়ে।

৯. **হিন্দু রাম রাজ্য প্রতিষ্ঠায় আন্দোলন :** মুঘল শাসনের শেষভাগে মারাঠা, জাঠ, রাজপুত তথা গোটা হিন্দু জাতি রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাগরণ, বিদ্রোহ ও বিরোধিতা শুরু করে, যা মুঘলদের শক্তি ও সংহতি বিনষ্ট করে।

১০. **শিয়া-সুন্নি বিদ্বেষ :** শিয়া-সুন্নি সম্প্রদায়ের বিদ্বেষ মুঘল সাম্রাজ্য পতনের আরেকটি বড় কারণ ছিল। সম্রাট আওরঙ্গজেব ও সম্রাট ফররুখ শিয়ারের রাজত্বকালে শিয়া-সুন্নি বিদ্বেষজনিত কারণে যে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও সংকটের সৃষ্টি হয়েছিল তা মুঘল সাম্রাজ্যকে বিপজ্জনক করে তুলেছিল। গ্যারেট বলেন, "Action of this kind caused much resentment and helped to pave the way for political disintegration."

১১. **অর্থনৈতিক দুরবস্থা :** পতনের যুগে শাসকদের অদূরদর্শিতা ও অমিতব্যয়িতার কারণে মুঘল সাম্রাজ্য চরম আর্থিক সংকটে নিপতিত হয় যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাম্রাজ্যকে অবনতির দিকে ঠেলে দিয়েছিল।

১২. **স্বাভাবিক স্থিতিকাল অতিক্রান্ত :** প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ইবনে খালদুনের মতবাদ অনুযায়ী মুঘল সাম্রাজ্য বহু পূর্বেই তার স্বাভাবিক আয়ুষ্কাল (১০০ বছর) অতিক্রম করেছে এবং সে জন্যই তাঁর পতন ঘটেছে।

১৩. **অভিজাত এলিটদের অধঃপতন :** যে অভিজাত এলিট গোষ্ঠী মুঘল শাসনের ভিত্তি ছিল সে এলিট গোষ্ঠীই আওরঙ্গজেবের পরবর্তী শাসকদের আমলে স্বার্থপর, বিশ্বাসঘাতক ও ক্ষমতালোভী হয়ে ওঠে। তাদের নৈতিক অধঃপতনই মুঘল সাম্রাজ্যের পতনকে তরান্বিত করে। J. N. Sarker তাই বলেন, "To the thoughtful students of Mughal history nothing is more striking than the decline of the perage."

১৪. **জাতি গঠন সমস্যা :** প্রাথমিক যুগের মহাপরাক্রমশীল মুঘল সম্রাটগণ জাতি গঠনের চেয়ে রাষ্ট্রগঠনে বেশি আগ্রহী ছিলেন। তাই মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি ছিল সামরিক শক্তির উপর। ফলে জাতি গঠন প্রক্রিয়া ছিল অবহেলিত যা মুঘল সাম্রাজ্যের পতনকে ত্বরান্বিত করে।

বৈদেশিক কারণ :

১. **নাদির শাহের আক্রমণ :** মুঘল সাম্রাজ্য অভ্যন্তরীণ শক্তি, প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং নিজ অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সকল শক্তি যখন হারিয়ে ফেলেছিল তখন পারস্য সম্রাট নাদির শাহের আক্রমণ, লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ড মুঘল সাম্রাজ্যের উপর চরম আঘাত হানে, যা প্রতিহত করা তৎকালীন মুঘল সম্রাটের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না।

২. **আহমদ শাহ আবদালীর আক্রমণ :** নাদির শাহের সাফল্যজনক বিজয় পরবর্তীকালে আফগান নেতা আহমদ শাহ আবদালীকে প্রলুব্ধ করে। তিনি কমপক্ষে নয়বার ভারত আক্রমণ করে অধঃপতিত মুঘল সাম্রাজ্যের ধ্বংস সুনিশ্চিত করেন।

৩. **ব্রিটিশ-বেনিয়া উত্থান :** ছলে বলে কৌশলে ব্রিটিশ-বেনিয়ারা ভারতবর্ষে পর্যায়ক্রমে আধিপত্য বিস্তার করে দিল্লির সিংহাসন দখল করলে মুঘল সাম্রাজ্যের পরিসমাপ্তি ঘটে।

উপসংহার : ইবনে খালদুনের মতে, প্রাকৃতিক নিয়মেই মুঘল সাম্রাজ্য ধীরে ধীরে পতনের দিকে ধাবিত হয়। যার সর্বশেষ পরিণতি ঘটে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবের মাধ্যমে মুঘল সাম্রাজ্য পতনের সাথে সাথে। তাই ভাঙ্গা গড়ার এ ইতিহাস চিরন্তন, এতে বিস্ময়ের কোনো অবকাশ নেই।

১০। পলাশী যুদ্ধের পটভূমি আলোচনা করুন। পরবর্তী ইতিহাসে এই যুদ্ধের ফলাফল কি হয়েছিল? তা বর্ণনা করুন।

ভূমিকা : পলাশীর যুদ্ধ কোনো আকস্মিক কিংবা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। ১৮শতকের প্রথমার্ধের বাংলা, সর্ব ভারতীয় ও ইউরোপীয় ঘটনা প্রবাহের এক অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে ঐ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের পলাশীর যুদ্ধ। বিশেষত চল্লিশের দশকে ইংরেজ ও ফরাসি বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা এবং কলকাতা নগরীর নিয়ন্ত্রণকে কেন্দ্র করে ইংরেজ কোম্পানি ও নবাব সরকারের মধ্যকার সম্পর্ক যে নতুন মোড় নেয় তা-ই অব্যাহত পলাশী যুদ্ধের পটভূমি রচনা করে। কাজেই পলাশীর যুদ্ধ ছিল ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে একটা পরিবর্তনের অধ্যায় যা বাঙালির স্কন্ধে চাপিয়ে দিয়েছিল ব্রিটিশ শোষণ ও পরাধীনতার শৃঙ্খল।

পলাশী যুদ্ধের পটভূমি/কারণ

১. **বাংলায় ইংরেজ আগমন এবং বাণিজ্য স্থাপন :** ষোড়শ শতাব্দীতে ভারতীয় উপমহাদেশ যখন আত্মরক্ষার সংগ্রামে লিপ্ত ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহ তখন বিশ্বের সর্বত্র বাণিজ্যিক সাম্রাজ্য গঠনে অবতীর্ণ। এ বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা ১৬০০ সালে ব্রিটেনে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠনে সহায়তা করে। ১৬৫১ সালে এ ইংরেজ কোম্পানি কলকাতা হয়ে বাংলায় আগমন করে সুবাদার শাহ সুজাকে মাত্র ৩ হাজার টাকা কর প্রদানের বিনিময়ে বাংলায় অবাধ বাণিজ্য করার অধিকার পায়। যদিও সুবাদার শায়েস্তা খান ইংরেজদের এই বিশেষ সুবিধা রহিত করে তাদেরকে বাংলা হতে বিতাড়িত করেন। কিন্তু ১৬৯৮ সালে কোম্পানি পুনরায় আজিমুশ্‌শানের কাছ থেকে কলকাতা, সুতানটি ও গোবিন্দপুর গ্রাম ক্রয় করে বিনা শুল্কে বাংলায় বাণিজ্য করার অধিকার পায়। পরবর্তীতে মুর্শিদকুলী খানের সময়ে তারা সম্রাট ফররুখ শিয়ারের কাছ থেকে অবাধ বাণিজ্যের ফরমান লাভ করে এবং বাংলায় ইংরেজ বাণিজ্যের দ্রুত বিকাশ ঘটায়। এর ফলে ধীরে ধীরে তারা বাংলায় আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটি শক্তিরূপে আবির্ভূত হয়।

২. **বাংলার অভ্যন্তরীণ ঘটনা প্রবাহ :** বাংলার আর্থ-সামাজিক ঘটনা প্রবাহ তথা মুর্শিদাবাদ দরবারের রাজনীতি পলাশী যুদ্ধের অন্যতম কারণ ছিল। সুবাদারি যুগে বাংলা প্রশাসনের প্রধান প্রধান পদগুলোর কর্মকর্তা সরাসরি সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত হতো, কিন্তু নবাবী আমলে এ ধারার বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে। বিশেষ করে মুর্শিদকুলী খানের নেতৃত্বে বাংলার নবাব সরকার প্রতিষ্ঠা করলে নবাবকেন্দ্রিক বঙ্গীয় প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে এবং প্রশাসনযন্ত্রে ও জমিদার শ্রেণীতে অভিজাত হিন্দুশ্রেণীর প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলশ্রুতিতে বঙ্গীয় ভৌমিক বর্গ, আমলা ও

বণিক, মহাজন, অভিজাতদের নিয়ে দ্রুত বিকাশমান একটি নতুন সামাজিক শ্রেণীর উদ্ভব হয় এবং তাঁরা বাংলার রাজনীতি ও অর্থনীতিতে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। এদেরই ভূমিকায় এ সময় বাংলার মসনদকেন্দ্রিক দলীয় রাজনীতি ও প্রাসাদ চক্রান্তের উদ্ভব হয়। ফলে মুর্শিদকুলী খানের পর এ চক্রের সমর্থন ও সহযোগিতা ব্যতীত কোনো নবাবই ক্ষমতায় বসতে পারেনি। তাই দেখা যায় ইউরোপীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মতো এরাও ক্ষমতা লাভের জন্য আঁতাতের মাধ্যমে প্রথমে সরফরাজ খানকে উৎখাত করে সুজাউদ্দিনকে মসনদে বসায় ও পরে আলীবর্দী খানকেও অনুরূপভাবে ক্ষমতা অর্পণ করে রাজনির্মাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। আর এই নতুন সামাজিক শ্রেণীর পূর্ণসমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করেছিল ইংরেজ কোম্পানি। তাই গোলাম হোসেন সলীম বলেন, "বাংলার মসনদ দখলের জন্য এ দেশীয় ষড়যন্ত্রকারীরাই ইংরেজদের সাহায্য চেয়ে তাদের সাথে যোগাযোগ করেছিল।"

৩. **কোম্পানির রাজনৈতিক কর্তৃত্ব লাভ :** এভাবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে সাথে ইংরেজরা এ দেশে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব স্থাপনেও উদ্যোগী হয়। এ সময় বাংলার মসনদ নিয়ে মীরজাফর, ঘসেটি বেগম, রায়দুর্লভ, ইয়ার লতিফ, জগৎশেঠ প্রভৃতি কুচক্রী মহল প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়।

যদুনাথ সরকারের মতে, তারা সরকারের মধ্যে একটা বিপ্লব ঘটানোর প্রচেষ্টা চালায়। ফলে ইংরেজরা দেশের এই রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনুধাবন করে কূটনৈতিক কৌশলের আশ্রয় নেয়। ফলশ্রুতিতে তারা সরকারের বিরুদ্ধে উক্ত সামাজিক শ্রেণী ও অনেক পদস্থ কর্মচারীদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি লাভ করে। এভাবেই ধীরে ধীরে পলাশী যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত হতে থাকে।

৪. **নবাব সিরাজউদ্দৌলা ও ইংরেজ কোম্পানির সংঘাত :** যুবরাজ অবস্থায়ই ইংরেজদের সাথে সিরাজের সম্পর্ক ভালো ছিল না। তদুপরি সিংহাসনে আরোহণের পর নবাবকে কোম্পানি কর্তৃক অভিনন্দন ও উপহার না পাঠানো, নবাব আলীবর্দী খানের সময় সিরাজকে কাসিম বাজারে প্রবেশ করতে না দেয়া, নবাবের অপরাধী প্রজাদের কলকাতায় আশ্রয় দান, নবাবের অনুমতি ছাড়া ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গকে অস্ত্র সজ্জিতকরণ, ১৭৫৬ সালে কলকাতা আক্রমণ ইত্যাদি কারণে তাঁর সাথে ইংরেজদের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। এই অবস্থায় সিরাজ কোম্পানি কর্মচারীদের বিনাশুল্কে বাণিজ্য করার অধিকার বাতিল করলে কোম্পানি সিরাজকে উৎখাত করার সুযোগ খুঁজতে থাকে। সিরাজের উত্তরাধিকার নিয়ে নবাব পরিবারের দ্বন্দ্ব চরম আকার ধারণ করলে ইংরেজরা সে সুযোগ পেয়ে যায়। ফলে কোম্পানি সিরাজকে হটিয়ে মীর জাফরকে নবাব বানানোর আশ্বাসে তার সাথে এক ষড়যন্ত্রমূলক চুক্তি করে।

চুক্তি অনুসারে মীর জাফর ১৭৫৭ সালের ৫ জুন তারিখে শপথ নেন এবং ১৩ জুন ক্লাইভ নবাবকে চরমপত্র প্রদান করে ইংরেজ বাহিনীকে মুর্শিদাবাদ মার্চ করার নির্দেশ দেন। এর মাত্র দশ দিন পর ২৩ জুন পলাশীর প্রান্তরে প্রহসনমূলক যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং যুদ্ধে নবাব পরাজিত হলে মীর জাফর বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন।

পলাশী যুদ্ধের ফলাফল

বাংলা ভারতীয় ইতিহাসে পলাশীর যুদ্ধের গুরুত্ব ছিল সুদূরপ্রসারী। এ প্রসঙ্গে আর সি মজুমদার বলেন, 'The Battle of Plassy paved the way for British conquest for Bengal and eventually the whole of India.' এর ফলাফল নিম্নরূপ :

প্রথমত, শাসনতান্ত্রিক ফলাফল : এই যুদ্ধের ফলশ্রুতিতেই পলাশীর প্রান্তরে বাংলার স্বাধীনতা সূর্য দীর্ঘদিনের জন্য অস্তমিত হয়ে যায় এবং বাংলা পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। এই যুদ্ধে ইংরেজরা পুরোপুরি সার্বভৌমত্ব লাভ করতে না পারলেও এ দেশে যে ব্রিটিশ প্রভুত্বের সূত্রপাত ঘটেছিল তা সমগ্র উপমহাদেশে ইংরেজ আধিপত্যের পথ সুগম করেছিল।

দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক ফলাফল : (১) এর ফলেই ইংরেজরা King maker তথা নবাব সৃষ্টির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় এবং নিজেদের স্বার্থ অনুযায়ী তারা একের পর এক নবাব বদলাতে থাকে ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব কুক্ষিগত করে। (২) স্থানীয় জনগণের মধ্যেও কোম্পানির মর্যাদা ও শক্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পায় এবং দেশীয় শক্তির বিলুপ্তি ঘটে। এর ফলে সমগ্র ভারতে ইংরেজ আধিপত্যের পথ সুগম হয়।

তৃতীয়ত, অর্থনৈতিক ফলাফল : অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও এ যুদ্ধের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। (১) ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পে ইংরেজদের একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। (২) ইংরেজ কোম্পানি বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অধিকার পায় এবং (৩) ধীরে ধীরে ব্যবসায়ী থেকে ভূ-স্বামীতে পরিণত হয়। এর ফলে (ক) জগৎশেঠসহ বাংলার সকল বণিক ও ব্যাংকিং পরিবার নিঃস্ব হয়ে পড়ে এবং (খ) মহাজন ও জমিদার শ্রেণীতে ধ্বংস নেমে আসে।

চতুর্থত, সাংস্কৃতিক ফলাফল : এ যুদ্ধের ফলে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সাথে সাথে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনও সূচিত হয়েছিল। পলাশী যুদ্ধের পর এ দেশে ইউরোপীয় সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটে এবং কালক্রমে ভারতীয় মুসলিম শিক্ষা-সংস্কৃতি বিপন্ন হয়ে পড়ে।

পঞ্চমত, সর্বোপরি ইংরেজদের আধুনিক আইন-কানুন, সংস্কৃতি, সামরিক সংগঠন, উন্নত কূটনীতি ইত্যাদি এ দেশে এক নতুন প্রগতিমূলক যুগের সূচনা করে।

উপসংহার : সামরিক দিক দিয়ে পলাশীর যুদ্ধ খুব গুরুত্বপূর্ণ না হলেও রাজনৈতিক দিক দিয়ে এটা ছিল নিঃসন্দেহে বাংলার ইতিহাসে একটি সর্বাধিক বেদনাবহ ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই যুদ্ধ মুসলমানদের ঐতিহ্য ও গৌরবময় ইতিহাসকে যেমন বিপন্ন করেছিল তেমনি ইংরেজদের শক্তি এতই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, পরবর্তীতে বক্সারের যুদ্ধে জয়লাভ করে সমগ্র ভারত বিজয়ের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। ম্যালসনের ভাষায়, 'The Battle at Plassey may be truly said to have decided the fate of India.'

১১ ॥ ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের কারণসমূহ আলোচনা করুন। এটা ব্যর্থ হয়েছিল কেন?

ভূমিকা : ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। মূলত, ইংরেজদের শাসনের বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতার জন্য এটি ছিল প্রথম সংগ্রাম। ভারতে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির একশত বছরের শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে এ সংগ্রাম ছিল একটি মহাবিদ্রোহ। প্রথমে এটি ছিল সিপাহীদের বিদ্রোহ, কিন্তু পরবর্তীতে জনগণের সমর্থনে সিপাহীদের এ বিদ্রোহ মহাবিদ্রোহ বা স্বাধীনতা সংগ্রামে পরিণত হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটানো ছিল এই মহাবিদ্রোহের মূল উদ্দেশ্য। আর এ সংগ্রাম ছিল বৈদেশিক শাসনের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী অসন্তোষের এক জ্বলন্ত প্রকাশ। এ প্রসঙ্গে প্রফেসর পি. ই. রবার্টস বলেন, 'The Mutiny was mainly military in origin but it occurred at a time when for various reasons there was social and political discontentment in the country and the mutineers took advantage of the same."

মহাবিদ্রোহের কারণ : রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সামরিক কারণে ১৮৫৭ সালে ভারতীয় জনগণ ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে এ মহাবিদ্রোহের সূচনা করে। নিচে কারণগুলো আলোচনা করা হলো :

১. **রাজনৈতিক কারণ :** কোম্পানির সাম্রাজ্যবাদ নীতি এ সংগ্রামের প্রধান রাজনৈতিক কারণ। এ নীতি উপমহাদেশের সকল শ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা ও ব্যাপক আশঙ্কার সৃষ্টি করে। লর্ড ডালহৌসির স্বত্ব বিলোপ নীতির ফলে সাতারা, নাগপুর, ঝাঁসি, সম্বলপুর প্রভৃতি রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। এসব রাজ্যের রাজপরিবার, তাঁদের কর্মচারী ও সেনাবাহিনীর মধ্যে ইংরেজবিরোধী মনোভাব প্রবল হয়ে ওঠে। অযোধ্যার নবাব ওয়াজিদ আলী শাহ ক্ষমতাচ্যুত হলে তাঁর প্রজাদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়। কানপুরের নানা সাহেবের বৃত্তি বন্ধ করে দেয়া হয়। একে একে মুসলিম ও হিন্দু রাজ্যের বিলোপ, উপাধিলোপ, বৃত্তিলোপ, ভারতীয়দের উচ্চ রাজপদ থেকে বিতাড়ণ, সম্রাট বাহাদুর শাহকে পৈতৃক রাজপ্রাসাদ থেকে অপসারণ ইত্যাদি কার্যকলাপ এ দেশবাসীর মনে সন্দেহ সৃষ্টি করে। দেশীয় রাজা, সিপাহী ও জনসাধারণ সকলেই ইংরেজদের হাত থেকে মুক্তির সুযোগ খোঁজে। ঝাঁসির রানী ও নানা সাহেব এ সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন।

২. **অর্থনৈতিক কারণ :** ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লবের ফলে উপমহাদেশের কুটির শিল্প ধ্বংস হয় এবং অনেক শ্রমিক বেকার হয়। লর্ড কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বহু জমিদার জমির মালিকানা লাভ করলেও সূর্যাস্ত আইন তাদের সর্বনাশ করে। বহু লাখেরাজ সম্পত্তি সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত করা হয়। অনেক কৃষক ও বণিক ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কোম্পানির কর্মচারীদের সীমাহীন দুর্নীতির ফলে সাধারণ মানুষও অসন্তুষ্ট হয়। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণ এ অবস্থার প্রতিকারের প্রত্যাশায় মহাবিদ্রোহে যোগ দেয়। দেশীয় সিপাহী ও ইংরেজ সিপাহীদের মধ্যে বেতনের বৈষম্যের জন্যও দেশীয় সিপাহীরা ক্ষিপ্র হয়ে ওঠে এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

৩. **সামাজিক কারণ :** সমাজ সংস্কার ও ব্রিটিশ সরকারের সক্রিয় সহযোগিতার ফলে হিন্দু সমাজে প্রচলিত কুসংস্কারাদি বিলুপ্ত হয়। সতীদাহ প্রথার উচ্ছেদ, বিধবা বিবাহ আইন পাস, বাল্য বিবাহ নিষিদ্ধকরণ, শিশু হত্যা নিবারণ ইত্যাদি সংস্কার সনাতন হিন্দুদের মনে তীব্র আঘাত দিয়েছিল এবং কোম্পানির শাসনের প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণা জন্মেছিল। ইংরেজি শিক্ষার প্রসার, রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফ প্রবর্তন প্রভৃতি সামাজিক সংস্কারকমূলক কার্যাবলী ভারতীয়দের সন্দেহের উদ্রেক করে। দেশীয় সৈন্যের নিম্ন বেতন তাদের সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ন করেছিল। ফারসি ভাষার পরিবর্তে ইংরেজি ভাষা রাজভাষা হিসেবে প্রবর্তনের ফলে মুসলমানদেরকে সামাজিকভাবে হেয় করা হয়। এসব পরিস্থিতি ভারতীয়দের মনে অসন্তোষ সৃষ্টি করে এবং মহাবিদ্রোহের মূলে ইন্ধন যোগায়।

৪. **ধর্মীয় কারণ :** ইংরেজ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় খ্রিস্টান মিশনারিরা প্রকাশ্যে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করে। ফলে হিন্দু মুসলমানদের মনে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি হয়। তাদের আশঙ্কা ছিল যে, ইংরেজ সরকার উপমহাদেশের সকল ধর্মের লোককে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করবে। মসজিদ-মন্দিরের খাস জমির ওপর অতিরিক্ত কর আরোপ করে হিন্দু মুসলমানদের মনে ইংরেজ সরকার ভীষণ আঘাত হানে। ড. অতুলচন্দ্র রায় বলেন, 'মন্দির ও মসজিদের খাস জমির ওপর খাজনা ধার্য করে এবং ধর্মীয় ও দাতব্য সংস্থাগুলোর ওপর কর ধার্য করে ইংরেজ সরকার ভারতীয়দের ধ্যান-ধারণার ওপর চরম আঘাত হেনেছিলেন। ১৮৫০ সালে আইন পাস করে ধর্মান্তরকারীদের পৈতৃক সম্পত্তি লাভ করার অধিকার প্রদান করা হয়। এ সমস্ত কারণে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ তীব্রতর হতে থাকে।

৫. **সামরিক কারণ :** দেশীয় সিপাহীরা বিভিন্ন কারণে কোম্পানি সরকারের ওপর অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। বেতন-ভাতা, পদোন্নতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সৈন্য ও দেশীয় সৈন্যদের মধ্যে বৈষম্য ছিল পর্বতপ্রমাণ। ১৮৫৬ সালে লর্ড ক্যানিং নতুন আইন পাস করেন যে, দেশীয় সিপাহীদের প্রয়োজনে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে দূর দেশে যেতে হবে। সিপাহীরা এ আইনকে তাদের ধর্মের ওপর আঘাত বলে গণ্য করে। সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ইংরেজ সৈন্য সংখ্যা ছিল অপ্রতুল। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ইংরেজদের পরাজয় দেশীয় সিপাহীদের অনুপ্রাণিত করেছিল এবং ইংরেজদের অতি সহজেই এ দেশ থেকে বিতাড়িত করতে সক্ষম হবে– এ আত্মবিশ্বাস দেশীয় সিপাহীদের মনে বদ্ধমূল হয়।

৬. **আশু বা প্রত্যক্ষ কারণ :** ১৮৫৬ সালে 'এনফিল্ড' নামে এক প্রকার বন্দুকের ব্যবহার চালু করা হয়। এ বন্দুকের কার্তুজ দাঁত দিয়ে কেটে বন্দুকে ব্যবহার করতে হতো। গুজব রটে যে, এ কার্তুজ শূকর ও গরুর চর্বি দিয়ে তৈরি। হিন্দু মুসলমান সিপাহীদের মনে বদ্ধমূল হয়েছিল যে, তাদের ধর্ম বিনষ্ট করে দেয়ার জন্য ইংরেজ সরকার এ কার্তুজ প্রচলন করে। এ কারণে সিপাহীদের মধ্যে বিদ্রোহ আরম্ভ হয় এবং দেশব্যাপী স্বাধীনতার সংগ্রাম ছড়িয়ে পড়ে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের বিস্তার : ১৮৫৭ সালের ২৯ মার্চ ব্যারাকপুরে সংগ্রাম শুরু হয়। ঢাকা, চট্টগ্রাম, বহরমপুরসহ বাংলার বিভিন্ন জায়গায় অভ্যুত্থান ঘটে। বিপ্লব ক্রমে মীরাট, লক্ষ্মৌ, কানপুর, ঝাঁসি, বেরেলী, অযোধ্যা, রোহিলাখণ্ড প্রভৃতি স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। গোয়ালিয়র, হায়দারাবাদ, পাঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্য এ সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেনি, বরং তারা ইংরেজদের সহযোগিতা করেছিল।

এ সংগ্রাম সিপাহীদের বিদ্রোহ দিয়ে শুরু হলেও এর পেছনে জনসাধারণের সমর্থন ছিল। এ সংগ্রাম রাজনৈতিক স্বাধীনতারও সংগ্রাম ছিল। সৈন্য বাহিনীর বাইরে জনসাধারণের মধ্যেও আন্দোলন ও সংগ্রাম ছড়িয়ে পড়ে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, অযোধ্যা ও বিহারের জনসাধারণ সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে এবং অনেক দিন ধরে এ সংগ্রাম চলে। বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন জন সংগ্রামে সক্রিয় হলেও ইংরেজ বিতাড়নে সকলেই একমত ছিল। এ অবস্থায় একে জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম বলা যায়। প্রথমদিকে এ সংগ্রাম আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এতে ইংরেজ শাসনের ভিত নড়ে ওঠে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভারতীয়দের স্বাধীনতা সংগ্রাম ব্যর্থ হয়। এ সংগ্রাম সুপরিকল্পিতভাবে সুযোগ্য নেতৃত্ব দ্বারা পরিচালিত হয়নি। উন্নত অস্ত্রশস্ত্রের অভাব, শক্তিশালী সংগঠনের অভাব, বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর মধ্যে একতার অভাব, সংহতি ও সর্বভারতীয় আদর্শের অভাব ছিল। বিদ্রোহীরা বহু স্থানে জনসাধারণের সহানুভূতি ও সমর্থন হতে বঞ্চিত ছিল। বিদ্রোহীদের তুলনায় ইংরেজ সেনাপতিরা ছিলেন দক্ষ, রণকুশলী ও নিষ্ঠাবান।

স্বাধীনতা সংগ্রাম ব্যর্থতার কারণ : ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম ব্রিটিশ সরকারের প্রতি প্রচণ্ড হুমকি ও চ্যালেঞ্জস্বরূপ হলেও নিম্নলিখিত কারণে তা ব্যর্থ হয়।

১. **একতার অভাব :** বিপ্লবীদের মধ্যে ঐক্য ও সমন্বয়ের অভাবে ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম ব্যর্থ হয়। স্বার্থ সিদ্ধির অভিপ্রায়ে এবং নেতৃবৃন্দের মধ্যে পারস্পরিক সংহতি ও সমঝোতার অভাব পরিলক্ষিত হয়, যদিও জনগণ নিঃস্বার্থ ও সদুদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়ে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল।

২. **সুপরিকল্পিত কর্মপন্থার অভাব :** কেন্দ্রীয়ভাবে এ সংগ্রাম পরিচালিত হয়নি, বরং বিপ্লবীগণ স্বীয় উদ্যমে উক্ত সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ইংরেজ শক্তিকে এ দেশ থেকে বিতাড়িত করার সুপরিকল্পিত কর্মপন্থা অবলম্বন করা হয়নি বলে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

৩. **আদর্শ ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব :** সম্রাট বাহাদুর শাহ, ঝাঁসির রানী, মারাঠা নেতা নানা সাহেব প্রত্যেকে স্বীয় স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে স্ব স্ব এলাকায় ক্ষমতা পুনরুদ্ধারে লিপ্ত ছিলেন। নেতৃবৃন্দের আদর্শগত পার্থক্য ও সঠিক পথ নির্দেশনার অভাবে এ দেশীয় সিপাহীগণ দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। ফলে স্বাধীনতা সংগ্রাম সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। এ প্রসঙ্গে ড. সেন এবং ড. মজুমদার বলেন, 'এ বিদ্রোহ পূর্ব পরিকল্পিত ছিল না এবং সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে এটি সংঘটিত হয়নি।'

৪. **আঞ্চলিক রূপ :** এ বিপ্লব সর্বভারতীয় রূপ গ্রহণ না করে আঞ্চলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল। পাঞ্জাব, সিন্ধু, রাজপুতনা কিংবা সিন্ধিরা, সাফার জং, ভূপালের বেগম, নেপালের বাহাদুর জং, যোধপুরের রাজা প্রমুখ দেশীয় রাজন্যবর্গ এ বিপ্লবে যোগদান থেকে বিরত থেকে ব্রিটিশ সরকারকে সাহায্য করায় এটি ব্যর্থ হয়।

৫. **যোগ্য নেতৃত্বের অভাব :** ভারতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে সাধারণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের অভাবের ফলে এবং হিন্দু-মুসলিম বিভেদের ফলে এটি ঈপ্সিত লক্ষ্যে উপনীত হতে সক্ষম হয়নি। ঐতিহাসিক হোমস বলেন, While the mutineers lacked ahead, many were half-hearted and fought reluctantly against the leaders whom they had been accustomed to obey.'

৬. **সুদক্ষ সেনানায়কের অভাব :** ভারতীয় সেনানায়কদের তুলনায় ইংরেজ সেনানায়কগণ ছিলেন অধিকতর সমরকুশলী ও সুদক্ষ। লরেন্স, নিকলসন, আউট্রাম এডওয়ার্ড প্রমুখ সুদক্ষ সেনানায়কের মতো বিপ্লবীদের মধ্যে একজনও ছিলেন না বললে অত্যুক্তি হবে না।

৭. **অনুন্নত সমরাস্ত্র :** অনুন্নত ও পুরাতন অস্ত্রশস্ত্র ছিল এ দেশীয় সিপাহীদের সম্বল। ফলে আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রে সুসজ্জিত ইংরেজ বাহিনীর সাথে মোকাবিলা করতে সিপাহীগণ সক্ষম হননি।

৮. **জনসমর্থনের অভাব :** বিপ্লবের উদ্দেশ্যে কিংবা গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে এ দেশের জনগণের সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। তদুপরি বিভিন্ন রাজ্যের দেশীয় রাজন্যবর্গ কর্তৃক জনগণ অত্যাচারিত হচ্ছিল। ফলে বিদ্রোহ, অনাচার ও বিশৃঙ্খলার হাত থেকে পরিত্রাণ লাভের উদ্দেশ্যে জনগণ এ বিপ্লবকে সাদরে গ্রহণ করতে পারেনি।

৯. **ক্যানিং-এর শান্তি নীতি :** লর্ড ক্যানিং ভারতীয়দের প্রতি হিংসাত্মক নীতি পরিহার করে শান্তিপূর্ণ ও বন্ধুত্বপূর্ণ নীতি গ্রহণ করলে স্বভাবতই জনগণ বিপ্লবীদের বিদ্রোহ উপেক্ষা করে ইংরেজ শক্তিকে আন্তরিক সমর্থন দান করে। ফলে এ বিপ্লব সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়।

উপসংহার : ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম ব্যর্থ হলেও এটি ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা করে। সুদীর্ঘ একশত বছরের ইংরেজ শাসনের শোষণ, অত্যাচার, উৎপীড়ন এবং কঠোরতার বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণ যে দুর্জয় সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিল তাই পরবর্তী বংশধরকে ভবিষ্যৎ মুক্তি সংগ্রামের চেতনায় উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করে। তাই এ সংগ্রামকে যথার্থভাবে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন হিসেবে অখ্যায়িত করা যায়।

১২ ॥ বাংলাদেশের লোকশিল্প সম্পর্কে আলোকপাত করুন। লোকশিল্প সংগ্রহের গুরুত্ব এবং সংগ্রহের সমস্যার ওপর আলোকপাত করুন।

উত্তর : প্রাচীন কাল থেকেই বাঙালিরা মৌসুমী কাজের অবসরের ফাঁকে ফাঁকে হরেক রকমের কারুশিল্প সৃষ্টি করতো। এগুলোর মধ্যে সূচি শিল্প, তাঁত শিল্প, নকশি কাঁথা ও মসলিন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গৃহিণীরা কাজের বিশ্রামে নকশিকাঁথা কিংবা নানারূপ কারুময় শিল্পকলা অনায়াসে সৃষ্টি করে ফেলতো। এসবের সুনাম বহুকাল আগে বিদেশেও ছড়িয়েছে। আমাদের লোকশিল্প আমাদের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের পরিচায়ক।

লোকশিল্পের পরিচয় : লোকশিল্প সাধারণ লোকের জন্য সাধারণ লোকের সৃষ্টি। এর পরিধি এত ব্যাপক ও বিস্তৃত এবং প্রকৃতি এত বিচিত্র যে, এককথায় এর সংজ্ঞা নিরূপণ করা যায় না। অগাস্ট প্যানিয়েলা (August Panyella) বলেন, লোকশিল্পের কেবল 'শিল্প' শব্দ বোঝা কঠিন নয়, 'লোক' শব্দও সমান সমস্যাপূর্ণ। তাঁর ভাষায়, 'In the expression 'Folk art' it is not only the word 'art' that is difficult to understand, the word 'Folk' is equally problematic.'

Webster's New Collegiate Dictionary 'লোক'-এর ব্যাখ্যা এভাবে দিয়েছে : The great proportion of the members of a people that determines the group character and the tends to preserve its characteristics form of civilization and its customs, arts and crafts, legends, traditions and superstitions from generation to generation.

অর্থাৎ 'লোক' হলো সাধারণ মানুষের একটি বড় অংশ যারা গোষ্ঠীচরিত্র নির্ধারণ করে এবং সভ্যতা, আচার, বিশ্বাস, ঐতিহ্য, পুরাণ, চারু ও কারুশিল্পের বিশিষ্ট রূপকে বংশপরম্পরায় ধরে রাখে।

আর 'শিল্প' হলো মানব মনের আনন্দিত উপলব্ধির বহিঃপ্রকাশ। শিল্প মানুষের সত্তার গভীরতম প্রকাশ। এবার দেখা যাক একত্রে লোকশিল্পকে কিভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

সবচেয়ে সহজলভ্য উপাদান মাটি থেকে আরম্ভ করে কাঠ, বাঁশ, বেত, পাতা, সুতা, লোহা, তামা-সোনা-রূপা, ধাতব দ্রব্য, সোলা, পাট, পুঁতি, ঝিনুক, চামড়া পর্যন্ত নানা উপাদান লোকশিল্প নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। কামার, কুমার, ছুতার, তাঁতি, কাঁসারু, সোনারু, শাঁখারি, পটুয়া প্রভৃতি পেশাদার এবং অন্য অনেক অপেশাদার নর-নারী লোকশিল্পের নির্মাতা। এরূপ বিভিন্ন ও শ্রেণী প্রকৃতির লোকশিল্পের সংজ্ঞায়ন সত্যিই দুঃসাধ্য ব্যাপার। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় এরই প্রতিফলন ঘটেছে। বিশেষজ্ঞরা বলেন, 'Although the definition of the folk art is not get firm, it may be considered as the art created among groups that exist within the framework of a developed society but for geographically or cultural reason, are largely separated from the sophisticated artistic developments of their time and that produced distinctive styles and objects for local needs and tastes.'

অর্থাৎ যদিও লোকশিল্পের সংজ্ঞা এখনো নির্ণয় করা হয়নি, তবু গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ যারা উন্নত সমাজের কাঠামোর মধ্যেই বিরাজ করে কিন্তু ভৌগোলিক অথবা সাংস্কৃতিক কারণে শিল্পের উন্নত ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তাদের নির্মিত এই শিল্পকে লোকশিল্পরূপে বিবেচনা করা যায়, অবশ্য স্থানীয় চাহিদা ও রুচির কারণে এই শিল্প স্থানীয় বৈশিষ্ট্যসূচক রীতি ও বস্তুগুণ ধারণ করে।

লোকশিল্পের অপর একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন হ্যারল্ড ওসবোর্ন (Harold Osborne)। তিনি লিখেছেন, 'Objects and decorations made in a traditional fashion by craftsmen without formal training, either for daily use and ornament or for special occasion such as wedding and funerals are called folk art.'

অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ পায়নি এমন কারুশিল্পী প্রথাগত যেসব বস্তু ও সরঞ্জাম প্রাত্যহিক জীবনের ব্যবহার, অলংকরণ, বিবাহ বা মৃতের সৎকারের কাজে তৈরি করে, সেসব শিল্পবস্তুকে লোকশিল্প বলে।

লোকশিল্পের ব্যবহারিক উপযোগিতা আছে সত্য, তবে এর নান্দনিক ও রসগত মূল্য উপেক্ষা করলে চলে না। সব কাঁথা লোকশিল্পের নমুনা নয়, নকশি কাঁথাই লোকশিল্পের নিদর্শনরূপে গণ্য হয়। কেননা

এতে চিত্র আছে, রঙের ব্যবহার আছে, মটিফের বিন্যাস আছে, সর্বোপরি শিল্পীমনের স্পর্শ আছে। কুমার দেবমূর্তি গড়ে, তার হাতের স্পর্শে কোনোটি মনসা, কোনোটি সরস্বতী দেবীর রূপ লাভ করে, সৃজনশীলতার গুণেই এটি সম্ভব হয়। ব্রতের আল্পনায় ধর্মীয় আবেগ, বিয়ের আল্পনায় নান্দনিক আবেগ এবং একুশের আল্পনায় জাতীয়তার আবেগ আছে। চিত্রবস্তুর নির্বাচনে ও বিন্যাসে এরূপ বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। এখানে শিল্পীর ভূমিকা অস্বীকার করার উপায় নেই। আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ না পেলেও পূর্বপুরুষের কাছ থেকে এক ধরনের হাতে-কলমে শিক্ষা পায় তারা, বাকিটা স্বভাব-প্রতিভার গুণে সৃষ্টির কাজ চালিয়ে নেয়। সুতরাং লোকশিল্পী পূর্বপুরুষের কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করে সমাজের মানুষের চাহিদা ও উপযোগিতার কথা বিবেচনায় রেখে মনের মাধুরী মিশিয়ে প্রথাগতভাবে যে শিল্প গড়ে, তাকেই লোকশিল্প হিসেবে আখ্যা দেয়া যায়।

লোকশিল্পের শ্রেণীবিভাগ : ফোকলোরের তিনটি প্রধান ধারা রয়েছে। যথা : মৌখিক (oral), বস্তুগত (material) ও অঙ্গক্রিয়াগত (performing)। লোকজ চারু ও কারুশিল্প একত্রে 'লোকশিল্প' নামে অভিহিত। শিষ্ট শিল্পের মতো লোকশিল্পেরও তিনটি প্রধান শাখা রয়েছে। যথা : চিত্র, ভাস্কর্য ও স্থাপত্য। প্রতি শাখার আবার নানা উপবিভাগ রয়েছে। উপকরণ, ক্যানভাস ও রীতি অনুযায়ী উন্নত শিল্পের মতো লোকশিল্পেরও নিম্নরূপ শ্রেণীকরণ করা যায় :

১. অঙ্কন (painting) ও নকশা (sketch), ২. সূচিকর্ম (embroidery), ৩. বয়নশিল্প (weaving), ৪. আদর্শায়ন (modelling), ৫. ভাস্করণ (engraving), ৬. স্থাপত্যশিল্প (architecture)

নিচে উল্লিখিত শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী কয়েকটি লোকশিল্পজাত বস্তুর নাম, আধার, উপকরণ ও শিল্পীর নাম আলোচনা করা হলো :

অঙ্কন (Painting)

আল্পনা : বর্তমানে ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আল্পনা আঁকা সাধারণ রীতিতে পরিণত হয়েছে। লোকশিল্পের এ ধারাটি শিক্ষিত সমাজেও উঠে এসেছে। লোকশিল্পের এটি একটি জনপ্রিয় শাখা, এতে রঙ-তুলির ব্যবহার আছে। চালের পিটালি দিয়ে সাদা, গোবর-জল দিয়ে মেটে, কাঠ-কয়লা দিয়ে কালো, পোড়া ইটের গুঁড়া দিয়ে লাল বা খয়েরি ইত্যাদি দেশজ রং ও বাজারের কেমিক্যালজাত বিভিন্ন রঙ এ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত মেঝে, দেওয়াল, কুলা, পিঁড়ি, ঘরের খুঁটি, দুয়ার, পূজার বেদী, সরা, কলস, ঝাঁপি ইত্যাদি আধার বা পাত্রে আল্পনা আঁকা হয়।

পটচিত্র : পটচিত্র আর একটি মাধ্যম, যা এ দেশের লোকঐতিহ্যের সাথে জড়িত। আল্পনার রূপকার নারীসমাজ, পটচিত্রের রূপকার মূলত পুরুষ, তবে এর জটিল প্রক্রিয়ায় নারীও অংশগ্রহণ করে থাকে। এদিক থেকে পটচিত্র একটি যৌথশিল্প। পটুয়া নামের একশ্রেণীর পেশাজীবী মানুষ পটচিত্রের নির্মাতা। পটুয়াদের আদি পুরুষ 'মস্করী' বৌদ্ধ ছিল। তারা বুদ্ধকাহিনী পট বা কাপড়ে এঁকে তার সাহায্যে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করত। মধ্যযুগে পটুয়ারা কৃষ্ণলীলা, রামলীলা, চৈতন্যলীলা কাপড়ে অথবা কাগজে চিত্রিত করে প্রচার করত। এটি তাদের জীবিকারও উপায় ছিল। এ যুগে গাজীর পট, মহররমের পট-এর সন্ধান পাওয়া যায়, যার পৃষ্ঠপোষক ছিল মুসলিম সমাজ। এভাবে পট হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলমান সব সম্প্রদায়ের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

উল্কি : উল্কি লোকশিল্পের একটি স্থায়ী ধারা। বিশ্বের নানা জাতির মধ্যে শরীরের নানা অংশে উল্কি আঁকার ও ধারণ করার রীতি প্রচলিত আছে। আফ্রিকার কোনো কোনো উপজাতি প্রায় সারা অঙ্গেই বিচিত্র রূপের

ও রঙের উল্কি পরে। উল্কি অঙ্কনে ধর্ম, চিকিৎসা, সংবাদ আদান-প্রদান, সৌন্দর্যচর্চা ইত্যাদি মনোভাব কাজ করে। আমাদের দেশে বৈরাগী-বোষ্টামীরা বাহুতে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তির উল্কি ধারণ করে। উপজাতিদের মধ্যে সাঁওতাল, ওঁরাও, মুরিয়ারা উল্কি পরে। তারা গোত্রধর্ম, পবিত্রতা ও সৌন্দর্যজ্ঞানে উল্কি ধারণ করে থাকে। উল্কি আঁকার জন্য পেশাদার নারী-পুরুষ আছে। উল্কি দেহে আজীবন থেকে যায়। বর্তমানে শহরের অনেক শৌখিন ছেলেমেয়ে ফ্যাশন হিসেবে অঙ্গে উল্কি ধারণ করে।

মুখোশচিত্র : গ্রামবাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে মুখোশ তৈরি হয়। হাল্কা কাঠ, শোলা, মাটি, রঙ ইত্যাদি মুখোশ তৈরির উপকরণ। গাজন-নৃত্যে শিবের, কালী-নৃত্যে কালীদেবীর মুখোশ পরার রীতি হিন্দু সমাজে প্রচলিত আছে। দেবতার মুখোশে দেবভাব, মানুষের মুখোশে মানবভাব, জীবজন্তুর মুখোশে পশুভাব, ভূত-প্রেতের মুখোশে বীভৎসভাব ফুটিয়ে তোলা হয়। এ ধরনের মুখোশে নৃত্যাভিনয়ের চেতনামিশ্রিত থাকায় লোকশিল্পী কিছুটা সৌন্দর্যসৃষ্টির প্রয়াস পান।

শখের হাঁড়ি : লোকশিল্পীদের কাজ বিশদ এবং বহুল। তারা হাঁড়ি গড়েন, সরা তৈরি করেন, সেই হাঁড়ি ক্ষেত্র বিশেষে শখের হাঁড়ি, সেই সরা ক্ষেত্র বিশেষে লক্ষ্মীর সরা। কোনো কোনো গ্রামাঞ্চলে মাটির সরাতে লক্ষ্মী-রাধাকৃষ্ণ-গাজীর মূর্তি ও মহরমের ঘটনা চিত্রিত করা হয়। এতে পটের অনুরূপ রঙ-তুলির ব্যবহার আছে। শখের হাঁড়িতে ফল, ফুল, ফসল, বসতি, জনপদ ইত্যাদির চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়।

পুতুলচিত্র : ছুতার, কুমার, মালাকার এবং গৃহস্থ বালিকারা রঙ এবং রঙিন সুতার সাহায্যে পুতুলচিত্র তৈরি করে। পুতুলচিত্র তৈরির উপকরণ হলো কাঠ, কাপড়, মাটি, শোলা ইত্যাদি।

খেলনাচিত্র : গ্রামবাংলার গৃহস্থ নরনারীরা কাঠ বা মাটিনির্মিত খেলনার ওপর রঙের সাহায্যে বিভিন্ন চিত্র এঁকে খেলনাচিত্র তৈরি করেন।

বয়নশিল্প

নকশি পাটি : নকশি পাটি বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্প। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকশিল্পীরা রঙিন বেত দিয়ে অত্যন্ত সুন্দর ও চমৎকার নকশি পাটি তৈরি করে থাকেন।

নকশি শিকা : বাংলাদেশের গ্রামীণ অঞ্চলের নারীদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় আরেকটি বয়নশিল্প হলো নকশি শিকা। গৃহস্থ রমণীরা পাট বা সুতার জো-এর ওপর পাট, সুতা, পুতি, কড়ি ইত্যাদির সাহায্যে নকশি শিকা তৈরি করেন। এই নকশি শিকায় গ্রামবাংলার নারীরা বিভিন্ন জিনিসপত্র সাজিয়ে রাখেন।

নকশি পাখা : গ্রামবাংলার আরেকটি ঐতিহ্যবাহী বয়নশিল্প নকশি পাখা। গৃহস্থ নারীরা অত্যন্ত শখ করে পাতা বা সুতার টানার ওপর রঙে রঙিন সুতা এবং পাটের মাধ্যমে নকশি পাখা তৈরি করেন।

ঝুড়ি, কুলা-ডালা, ফুলচাঙ্গা : এ দেশের ঐতিহ্যবাহী বয়নশিল্পের অন্যতম হলো বেত ও বাঁশের জো-এর তৈরি ঝুড়ি, কুলা-ডালা ও ফুলচাঙ্গা। ঝুড়ি এবং কুলা-ডালা তৈরি করে যে সকল লোকশিল্পী তাদেরকে ডোম জাতি বলা হয়। আর সাধারণত গৃহস্থ রমণীরা ফুলচাঙ্গা তৈরি করে।

সূচিকর্ম

নকশি কাঁথা : নকশি কাঁথা নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের লোকশিল্পের সবচেয়ে মনোরম নিদর্শন। নকশি কাঁথা সূচিকর্মের অন্তর্ভুক্ত। কয়েক ফালি কাপড় স্তর পরম্পরায় সাজিয়ে কাঁথার জমিন তৈরি করা হয়। সাধারণ ব্যবহার্য সূচে রঙ-বেরঙের সুতা পরিয়ে 'ফোঁড়' দ্বারা এই জমিনে ছবি আঁকা হয়।

নকশি কাঁথার ছবি ও নকশা : নকশি কাঁথাতে সাধারণত মাছ, পাতা, ছড়া বা ধানের শীষ, চাঁদ, তারা, বৃক্ষ, ঘোড়া, হাতি, দেব-দেবীর ছবি অথবা কোনো গ্রামীণ ঘটনার ছবি বুনন করা হয়। পাহাড়-পর্বত, পশু-পাখি, প্রসাধনী দ্রব্য, রান্নাঘরের জিনিসপত্র, পালকি, মটর, ঘোড়-সওয়ার, মসজিদ-মন্দির, গ্রাম্যমেলা, রাধা-কৃষ্ণ, লক্ষ্মী, জ্যামিতিক নকশা, ফুল ও নানা ধরনের আল্পনা এবং শ্লোক, নানা ফিগার মোটিফ এতে দেখতে পাওয়া যায়।

নকশি কাঁথার প্রকার : লোকশিল্প হিসেবে নকশি কাঁথা ব্যক্তিগত, সামাজিক ও ধর্মীয় কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। প্রয়োজনের দিক থেকে নকশি কাঁথাকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন— লেপ, ঢাকনা, ওশার ও থলে। এসবের মধ্যে লেপ এবং ঢাকনাই উল্লেখযোগ্য। লেপ-কাঁথা আবার দুই প্রকার। যেমন— দোরখা এবং আঁচল বুননী।

আদর্শায়ন

লোকশিল্পের অন্যতম প্রধান শাখা এই আদর্শায়ন। পুতুল, খেলনা, হাঁড়ি-পাতিল, দেবমূর্তি, মুখোশ, মুকুট, সন্দেশ-পিঠা-আমসত্ত্বের ছাঁচ, নকশি পিঠা, মিষ্টি, অলঙ্কার, নৌকা, তাজিয়া, রথ, শৌখিন দ্রব্য, খাট-পালঙ্ক, সিন্দুক-বাক্স, পালকি, গাড়ি ইত্যাদি সবই আদর্শায়নের অন্তর্ভুক্ত লোকশিল্পজাত বস্তু।

পুতুল : কুমার, ছুতার, গৃহস্থ রমণী ও বালিকারা মাটি, কাঠ, কাপড়, সুতা, পাট, ধাতু ইত্যাদির সাহায্যে মাটির পুতুল, কাঠের পুতুল, কাপড়ের পুতুল, ধাতুর পুতুল ইত্যাদি তৈরি করেন।

খেলনা : মাটি, কাঠ, শোলা ও ধাতুর সাহায্যে কুমার, ছুতার, গৃহস্থ ব্যক্তি ও মহিলারা শিশু-কিশোরদের জন্য নানা রকমের খেলনা তৈরি করেন। এই ধরনের খেলনার মাঝে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের পশু-পাখি, মানুষ, হাঁড়ি-পাতিল ইত্যাদির প্রতিকৃতি।

দেবমূর্তি : হিন্দুদের দেবমূর্তি একটি উল্লেখযোগ্য লোকশিল্প। পেশাদার কুমার মাটি, বাঁশ, কাঠ, সুতা, শোলা, ধাতু, কাপড়, রঙ ইত্যাদি উপকরণের সাহায্যে হিন্দুদের নানা দেব-দেবীর মূর্তি তৈরি করেন।

নকশি পিঠা : বাংলার নারীমনের শিল্প সৌন্দর্যের প্রকাশ নকশি পিঠা। এতে আছে যুগ-যুগান্তরের বাংলার অন্তঃপুরিকাদের চিন্তা, চেতনা ও রসবোধ। পিঠা সুন্দর, স্বাদে ভরপুর ও বেশিদিন রাখার জন্য বিভিন্ন ডিজাইনে, মোটিফে, সাইজে বা নকশা দিয়ে যে পিঠা তৈরি করা হয় তাকে নকশি পিঠা বলে। অতিথি আপ্যায়ন, বিয়ে-শাদী, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, বিশেষ অনুষ্ঠান, ঈদ, খতনা, নবান্ন, শবে বরাত, শবে কদর ও জামাই আদরে নকশি পিঠা দিয়ে অতিথিদের আপ্যায়ন করা হয়।

স্থাপত্যশিল্প : বাংলাদেশের স্থাপত্যশিল্পে লোকশিল্পের ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ঘর-বাড়ি, দালান-কোঠা, মসজিদ, মন্দিরসহ বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে ঘরামি, ছুতার ও রাজমিস্ত্রিরা বিশেষ ধরনের নকশা ও ডিজাইনে এগুলো গড়ে তোলেন। এ সকল অবকাঠামো নির্মাণে মাটি, মাঠ, বাঁশ, খড়, দড়ি ইত্যাদি উপকরণ ব্যবহার করা হয়।

ভাস্করণ : কাঠখোদাই শিল্প (প্রধানত মূর্তি ও নকশা খোদাই), ধাতুর নকশা, পোড়ামাটির ফলকচিত্র ইত্যাদি হলো লোকশিল্পের অন্তর্ভুক্ত ভাস্করণের নিদর্শন। বাড়ি, দরজা, জানালা, বেড়া, খাট, পালঙ্ক, বাক্স, সিন্দুক, বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি তৈরির ক্ষেত্রে ছুতার কাঠ খোদাই করে বিভিন্ন রকমের দৃষ্টিনন্দন নকশা ও ডিজাইন তৈরি করেন। বাসন-কোসন এবং শৌখিন দ্রব্যের যাবতীয় কাজে কাঁসারু ও স্বর্ণকার তামা, পিতল, লোহা, সোনা, রূপা ইত্যাদির সাহায্যে ধাতুর নকশা তৈরি করেন। এ ছাড়া ঘরবাড়ি, মসজিদ, মন্দির ইত্যাদি অলঙ্করণের সময় কুমার পোড়ামাটির ফলকচিত্র তৈরি করেন।

লোকশিল্প সংগ্রহের গুরুত্ব : লোকশিল্প যে কোনো জাতির ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সাথে সম্পর্কিত একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প। তাই একটি জাতির আত্মপরিচয় সম্পূর্ণভাবে জানার জন্য লোকশিল্প সংগ্রহের গুরুত্ব অপরিসীম। এ সম্পর্কে বিখ্যাত লোকবিজ্ঞানী আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন, 'লোক-সংস্কৃতির রূপ-রসগত বহুমুখী আলোচনাই এর সব নয়, এর জন্য তাত্ত্বিক আলোচনা প্রয়োজন। কিন্তু এ কথা সত্য, তাত্ত্বিক আলোচনার পূর্বে এর উপকরণের যথাসম্ভব সামগ্রিক সংগ্রহ আবশ্যক। কেবল মাত্র আংশিক সংগ্রহের ওপর তাত্ত্বিক আলোচনা সম্ভব নয়। কেবলমাত্র সংগ্রহের আয়তন নয় তার গুণগত দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে কিংবা সংগ্রহ বিষয়ে কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানে আধুনিক পদ্ধতিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত গবেষক বা সংগ্রহকারী দ্বারা সংগ্রহ করা দরকার।'

লোকশিল্প সংগ্রহের সমস্যা : লোকশিল্পজাত বস্তু সংগ্রহের সমস্যা ও অসুবিধা অনেক। অনেক ক্ষেত্রে লোকশিল্পী তার নিজস্ব সৃষ্টি হস্তান্তর করতে অনীহা প্রকাশ করেন। কারণ, শিল্পী সৃষ্টির আনন্দে তাঁর শিল্পকর্মে ব্রতী হন তাই নিজের সৃষ্টির প্রতি মমত্ববোধের জন্য তিনি হাতের তৈরি জিনিস সহজে হাতছাড়া করতে চান না। পূর্বপুরুষের স্মৃতিবিজড়িত অতি পুরাতন লোকশিল্পজাত বস্তু পরিবারের ঐতিহ্য হিসেবে ধরে রাখতে চান শিল্পীর উত্তরাধিকারী।

সরল গ্রামবাসী অনেক সময় তাদের শিল্পকর্মের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে না। যে সামান্য জিনিস তারা তৈরি করে ক্ষেত্রবিশেষে তা যে অমূল্য সম্পদরূপে বিবেচিত হতে পারে তা তারা বোঝে না। ফলে তার সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তাও তারা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। সেজন্য অনেক সময় লোকশিল্পজাত সামগ্রী সংগ্রহের ক্ষেত্রে তাদের কাছ থেকে আশানুরূপ সাড়া ও সহযোগিতা পাওয়া যায় না।

শিল্পকর্মের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা আর একটি সমস্যার সৃষ্টি করে। সেটা হলো নকল সামগ্রী চালিয়ে দেয়ার প্রবণতা। শিল্প সামগ্রীর পেশাদারী বিক্রেতা বা মিডলম্যানদের মধ্যে সাধারণত এ ধরনের প্রবণতা দেখা যায়। যেমন— পিতল বা ব্রোঞ্জের প্রাচীন ভাস্কর্যের চাহিদা বৃদ্ধির দরুন আজকাল পুরাতন আদলে পিতল বা ব্রোঞ্জের মডেল তৈরি করে তার ওপর এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করা হয়। ফলে পুরাতন মূর্তি এবং এসব নকল ভাস্কর্যের মধ্যে তারতম্য করা মুশকিল হয়ে পড়ে।

লোকশিল্প সংরক্ষণের সমস্যা : সংগৃহীত সামগ্রীর সংরক্ষণেও সমস্যা আছে। সাধারণত ভঙ্গুর ও ক্ষণস্থায়ী উপাদানে লোকশিল্প সৃষ্টি করা হয়। ফলে এগুলোর স্থায়িত্ব কম। বাঁশ, বেত, সুতা, পাতা প্রভৃতির ক্ষেত্রে এ সমস্যা দেখা দেয়। লোকশিল্পীরা যে রঙ ব্যবহার করেন তারও স্থায়িত্ব নেই। তাছাড়া প্রতিকূল আবহাওয়ায় সংগৃহীত সামগ্রী ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায়।

লোকশিল্প সংরক্ষণের উদ্যোগ : লোকশিল্পের সংগ্রহ দু রকমের হতে পারে : বাস্তব সংগ্রহ (Physical collection) অথবা তার দলিলায়ন (documentation)। বাস্তব সংগ্রহের জন্য প্রয়োজন সংগ্রহশালা বা জাদুঘর। ১৯৩৭ সালে স্থাপিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গ সংস্থা 'আশুতোষ মিউজিয়াম অফ ইন্ডিয়ান আর্ট' নামক জাদুঘর সম্ভবত বিভাগ-পূর্ব বাংলায় লোকশিল্প সংগ্রহের প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়াস। ১৯৬৯ সালে এ জাদুঘরের সংগ্রহ সংখ্যা ছিল ২৫,০০০। এর বিরাট অংশ হলো লোকশিল্প। এ জাদুঘরে বাংলাদেশের লোকশিল্পের বেশ কিছু নিদর্শন আছে। এর মধ্যে নকশি কাঁথা ও মাটির খেলনা পুতুল উল্লেখযোগ্য।

১৯১৩ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা জাদুঘর ১৯৮৩ সালে জাতীয় জাদুঘরে উন্নীত হয়। ২,১৫,০০০ বর্গফুটের এ বিশাল জাদুঘরে লোকশিল্পের নিদর্শনের মধ্যে আছে অনেকগুলো নকশি কাঁথা, কাঠ খোদাই, টেরাকোটা বা পোড়া মাটির ফলক, পুতুল, পুঁথি, পটচিত্র, মৃৎপাত্র প্রভৃতি।

বাংলা একাডেমীর লোক-ঐতিহ্য বিভাগের লোকশিল্প সংগ্রহশালার জন্য সংগ্রহ শুরু হয় ১৯৬৪ সাল থেকে। ১৯৬৯ সালে গৃহসংস্থানের পর সংগ্রহশালা বাস্তব রূপ গ্রহণ করে। সংগ্রহের মধ্যে আছে নকশি কাঁথা, মুখোশ, লোকবাদ্যযন্ত্র, শীতল পাটি, নকশি পাখা, লোক-অলঙ্কার, নকশি পিঠা, শিকা, মৃৎফলক, পুতুল প্রভৃতি।

লোকশিল্পের পঠন-পাঠন ও সংগ্রহের জন্য ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন গঠন করা হয়। বাংলার এককালের রাজধানী সোনারগাঁয়ে লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের সদর দপ্তর এবং লোকশিল্প জাদুঘরের স্থান নির্বাচন করা হয়। ১৯৭৬ সালের অক্টোবর মাসে সর্দার বাড়ি নামক এক পুরনো জমিদার বাড়ি মেরামত করে তাতে লোকশিল্প জাদুঘর স্থাপিত হয়। লোকশিল্পের নানা নিদর্শন এ সংগ্রহশালায় স্থান পেয়েছে।

এ ছাড়া চট্টগ্রামের জাতিতত্ত্ব জাদুঘর, রাঙামাটির ট্রাইবাল কালচারাল একাডেমি ও বিরিশিরি ট্রাইবাল একাডেমিতে উপজাতীয় শিল্পের সংগ্রহ আছে। মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর ও ময়নামতির প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘরের লোকশিল্পের নিদর্শনের মধ্যে মাটির ফলকচিত্র উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া দিনাজপুর, কিশোরগঞ্জ, ত্রিশাল প্রভৃতি আঞ্চলিক জাদুঘরে কিছু কিছু লোকশিল্পের নিদর্শন রক্ষিত আছে।

উপসংহার : বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থায় লোকশিল্পের প্রয়োজন বা উপযোগিতা জাতিতাত্ত্বিক দিক দিয়ে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু লোকশিল্পের অনেক উপাদানই আজ বিলুপ্তির পথে। পুঁথিচিত্র, পুঁথির পাটাচিত্র, পটচিত্র আজ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত। বাঁশের অলংকৃত বেড়া, লক্ষ্মীর সরা, লোক-অলংকার বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। কিছু কিছু শিল্প নিদর্শন বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে। অনেক মূল্যবান লোক নিদর্শন পুড়ে গেছে স্বাধীনতা যুদ্ধে, অথবা হারিয়ে গেছে। আগামীতে যদি এভাবে লোকশিল্পের উৎপাদন ও ব্যবহার আরো কমতে থাকে, তবে ইতিহাস খ্যাত ঢাকাই মসলিন শাড়ির মতো একদিন লোকশিল্পের অনেক উপাদানও হারিয়ে যাবে। এ ছাড়া বর্তমানে শহরের সঙ্গে গ্রামের ব্যবধান দ্রুত অপসারিত হচ্ছে, শিক্ষার বিস্তার ঘটছে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভাব জীবনের সর্বস্তরে পড়েছে। এমতাবস্থায় লোকশিল্পের নমুনা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, সেগুলোর উৎস-ইতিহাস ও শিল্প-বিচার এখন জরুরি হয়ে পড়েছে। আবহমান বাংলার ঐতিহ্য ও গৌরবকে ধরে রাখার স্বার্থে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে লোকশিল্পের জন্য আর্থিক বিনিয়োগ ও বাজারজাত ব্যবস্থা উন্নত করতে হবে। দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য লোকশিল্পীদের উৎসাহ বাড়াতে হবে। এতে লোকশিল্পসহ আমাদের হারানো দিনের অনেক ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি কিছুটা হলেও রক্ষা পাবে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-০১ বাংলার প্রাচীন জনপদগুলোর নাম লিখুন।

উত্তর : বাংলা নামের একটি অখণ্ড দেশের জন্ম একবারে হয়নি। এর যাত্রা শুরু হয় কতগুলো জনপদের মধ্য দিয়ে। এ জনপদগুলো ভিন্ন ভিন্ন রাজা কর্তৃক শাসিত হতো। বাংলার প্রধান ৬টি জনপদ হচ্ছে গৌড়, বঙ্গ, পুণ্ড্র, বরেন্দ্র, সমতট ও হরিকেল।

প্রশ্ন-০২ বার ভূঁইয়াদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? তার রাজধানী কোথায় ছিল?

উত্তর : বাংলার বড় জমিদাররা মুঘলদের অধীনতা মেনে নেননি। জমিদারগণ তাদের নিজ নিজ জমিদারিতে স্বাধীন ছিলেন। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তারা মুঘল সেনাপতির বিরুদ্ধে এক জোট হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। বাংলার ইতিহাসে এ জমিদারগণ বার ভূঁইয়া নামে পরিচিত। বার বলতে বারো জনের সংখ্যা বোঝায় না, বরং অনির্দিষ্ট সংখ্যক জমিদারদের বোঝাতেই বার শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। বার ভূঁইয়াদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন ঈসা খান। তার রাজধানী ছিল সোনারগাঁও।

প্রশ্ন-০৩ আলীগড় আন্দোলন কি?

উত্তর : ব্রিটিশ শাসনামলে মুসলমানগণ ইংরেজি বিদ্বেষী হওয়ায় তারা হিন্দুদের চেয়ে পিছিয়ে পড়ে। ফলে স্যার সৈয়দ আহমদ আলীগড় আন্দোলনের নামে বিশেষ আন্দোলন গড়ে তোলে। মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করে আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বাস্তবায়নই ছিল এ আন্দোলনের মূল লক্ষ্য।

প্রশ্ন-০৪ কে, কখন বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন?

উত্তর : তুর্কি বীর সেনানায়ক ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী ১২০৪ সালে শেষ হিন্দু রাজা লক্ষ্মণ সেনকে পরাজিত করে বাংলার রাজধানী লক্ষ্মাবতী দখল করেন। আর এভাবেই মধ্যযুগে বাংলায় মুসলিম শাসনের সূত্রপাত ঘটে।

প্রশ্ন-০৫ কখন বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হয়? বঙ্গভঙ্গ রদের কারণ কি?

উত্তর : শাসনকার্যের সুবিধার জন্য ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর বড়লাট লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করেন। বঙ্গভঙ্গ অনুযায়ী ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিভাগ এবং আসাম নিয়ে গঠিত হয় পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ। নবগঠিত এ প্রদেশের রাজধানী হয় ঢাকা। বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায় বঙ্গভঙ্গকে বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদ হিসেবে আখ্যায়িত করে ব্যাপক আন্দোলন শুরু করে। এক পর্যায়ে সহিংস আন্দোলনে ভীত হয়ে ব্রিটিশ সরকার ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করেন।

প্রশ্ন-০৬ দ্বি-জাতি তত্ত্ব কি?

উত্তর : পাকিস্তানের জনক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ দ্বি-জাতি তত্ত্বের প্রবক্তা। 'একজাতি একরাষ্ট্র' এটিই হচ্ছে দ্বি-জাতি তত্ত্বের মূলমন্ত্র। তার মতে, হিন্দু ও মুসলমানেরা দুটি পৃথক জাতি। তাদের কৃষ্টি-কালচার স্বতন্ত্র। তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ইতিহাস ও অনুপ্রেরণার ক্ষেত্র স্বতন্ত্র। এমনকি তাদের নাম পরিচয়ও আলাদা। তাছাড়া হিন্দু-মুসলমান একত্রে আহার করে না। সুতরাং যে কোনো আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে মুসলমানেরা একটি পৃথক জাতি। তাই ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক রাষ্ট্র থাকা প্রয়োজন।

প্রশ্ন-০৭ লোকশিল্পের সংজ্ঞা দিন। *[২৮তম বিসিএস]*

উত্তর : লোকশিল্প সাধারণ লোকের জন্য সাধারণ লোকের সৃষ্টি। এর পরিধি এত ব্যাপক ও প্রকৃতি এত বিচিত্র যে, এককথায় এর সংজ্ঞা নিরূপণ করা যায় না। অগাস্ট প্যানিয়েলা (August Panyella) বলেন, লোকশিল্পের কেবল 'শিল্প' শব্দ বোঝা কঠিন নয়, 'লোক' শব্দও সমান সমস্যাপূর্ণ। তার ভাষায়, 'In the expression 'Folk art' it is not only the word 'art' that is difficult to understand, the word 'Folk' is equally problematic.'

নৃতাত্ত্বিক অভিধানে 'লোক'-এর সংজ্ঞা দিয়েছে এভাবে : Folk in ethnology is the common people who share a basic store of old tradition. অর্থাৎ পুরাতন ঐতিহ্যের অংশীদার যেসব সাধারণ মানুষ, নৃতত্ত্বের পরিভাষায় তারাই Folk বা লোক নামে অভিহিত।

আর 'শিল্প' হলো মানব মনের আনন্দিত উপলব্ধির বহিঃপ্রকাশ। শিল্প মানুষের সত্তার গভীরতম প্রকাশ। এবার দেখা যাক একত্রে লোকশিল্পকে কিভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

বিশেষজ্ঞরা লোকশিল্পের সংজ্ঞা এড়িয়ে যান এ বলে যে, দেখলেই তাকে চেনা যাবে। 'Know it when you see it. Material will define itself if one would allow it to so.'

লোকশিল্পের অপর একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন হ্যারল্ড ওসবোর্ন (Harold Osborne)। তিনি লিখেছেন, 'Objects and decorations made in a traditional fashion by craftsmen without formal training, either for daily use and ornament or for special occasion such as wedding and funerals are called folk art.'

অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ পায়নি এমন কারুশিল্পী প্রথাগত যেসব বস্তু ও সরঞ্জাম প্রাত্যহিক জীবনের ব্যবহার, অলংকরণ, বিবাহ বা মৃতের সৎকারের কাজে তৈরি করে, সেসব শিল্পবস্তুকে লোকশিল্প বলে। সুতরাং লোকশিল্পী পূর্বপুরুষের কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করে সমাজের মানুষের চাহিদা ও উপযোগিতার কথা বিবেচনায় রেখে মনের মাধুরী মিশিয়ে প্রথাগতভাবে যে শিল্প গড়ে, তাকেই লোকশিল্প হিসেবে আখ্যা দেয়া যায়।

প্রশ্ন-০৮ ময়মনসিংহ গীতিকার ওপর আলোচনা করুন। *[১৮তম বিসিএস]*

উত্তর : ময়মনসিংহ গীতিকা সংগ্রহ করেন ড. দীনেশচন্দ্র সেন। এটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'মৈমনসিংহ গীতিকা' ও 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' নামে চারখণ্ডে প্রকাশিত হয়। ব্রহ্মপুত্র নদ দ্বারা দ্বিধাবিভক্ত সাবেক ময়মনসিংহ জেলার পূর্বাংশে নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জের বিল, হাওর ও বিভিন্ন নদ-নদী প্লাবিত বিস্তৃত ভাটি অঞ্চলে বাংলার শ্রেষ্ঠ গীতিকার যে শতদলগুলো বিকশিত হয়েছিল তাই 'মৈমনসিংহ গীতিকা' নামে দেশে-বিদেশে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মৈমনসিংহ গীতিকায় এসব অঞ্চলের মাতৃতান্ত্রিক সমাজের বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠেছে। এ সমাজে নারীর স্বাধীন প্রেমের যে স্বীকৃতি রয়েছে তার অনুসরণে গীতিকাগুলোতে নারী চরিত্রের রূপায়ণ লক্ষ্য করা যায়। মৈমনসিংহ গীতিকার কাহিনীগুলো প্রেমমূলক এবং তাতে নারী চরিত্রই প্রাধান্য পেয়েছে। নারীর ব্যক্তিত্ব, আত্মবোধ, স্বাতন্ত্র্য, সতীত্ব প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য এসব গীতিকায় বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে।

প্রশ্ন-০৯ ম্যাডোনা-৪৩ কি?

উত্তর : শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের আঁকা একটি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিত্রকর্ম হচ্ছে 'ম্যাডোনা-৪৩'। এটি ১৯৪৩ সালে (বাংলা ১৩৫০ সাল) বাংলার দুর্ভিক্ষের ওপর আঁকা বিখ্যাত সিরিজ চিত্রকর্মগুলোর একটি।

প্রশ্ন-১০ লালনগীতি কি এবং এর প্রভাবই বা কি? *[১৮তম বিসিএস]*

উত্তর : বাংলার বাউল সম্রাট ফকির লালন শাহের রচিত আধ্যাত্মিক গানগুলো 'লালনগীতি' নামে পরিচিত। বর্তমানে সর্বমহলে এ গান সমাদৃত। লালনগীতিতে রয়েছে বেশ ভাবগাম্ভীর্যতা, মাধুর্যতা ও

সুরের মোহ। এসব গীতি কামনা-বাসনা, আশা, আনন্দ-বেদনা প্রাণে এক আন্দোলন ও আবেগের সৃষ্টি করে। এ গানের অনুভূতি মন কেড়ে নেয়। সব গান থেকে এ গানের গতি, সুর, স্বচ্ছতা একেবারে স্বকীয়। বাংলায় অন্য সব গানের তুলনায় এ গানের প্রভাব সবচেয়ে বেশি।

প্রশ্ন-১১ মহাস্থানগড় কি জন্য বিখ্যাত?

উত্তর : মহাস্থানগড় বগুড়া শহর থেকে ১৩ কিমি উত্তরে ঢাকা-দিনাজপুর মহাসড়কের পাশে অবস্থিত। এটি বাংলাদেশের সর্বপ্রাচীন ও সর্ববৃহৎ নগরকেন্দ্র। এর প্রাচীন নাম পুণ্ড্রনগর। এখানে মৌর্য সভ্যতার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে।

প্রশ্ন-১২ চরমপত্র খ্যাত ব্যক্তিত্ব কে?

উত্তর : এম আর আখতার মুকুল মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শাণিত অস্ত্র 'চরমপত্র'-এর পাঠক। তিনি চরমপত্র পাঠ করে বাংলার সংগ্রামী জনগণকে আত্মপ্রত্যয়ে বলীয়ান করেছেন। এজন্য বিশিষ্ট ভাষা সৈনিক, মুক্তিযোদ্ধা ও সাংবাদিক এম আর আখতার মুকুল চরমপত্র নামে পরিচিত। তার বিখ্যাত গ্রন্থ হচ্ছে 'আমি বিজয় দেখেছি', 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র (১ খণ্ডে সমাপ্ত)', 'বঙ্গবন্ধু, কে ভারতের দালাল'। তিনি ২০০৪ সালের ২৬ জুন মৃত্যুবরণ করেন।

প্রশ্ন-১৩ শালবন বিহার কোথায় অবস্থিত?

উত্তর : শালবন বিহার কুমিল্লার কোটবাড়ির পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর লাগোয়া লালমাই পাহাড়ের মধ্যবর্তী এলাকায় অবস্থিত। এটি ময়নামতিতে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলোর মধ্যে অন্যতম। এখানে একটি বিরাট বৌদ্ধবিহারের সন্ধান পাওয়া গেছে।

প্রশ্ন-১৪ চর্যাপদ কত সালের মধ্যে রচিত হয়?

উত্তর : ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতে ৬৫০-১২০০ ও ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে ৯৫০-১২০০ সালের মধ্যে চর্যাপদ রচিত হয়।

প্রশ্ন-১৫ লোকসাহিত্যের সংজ্ঞা দিন।

উত্তর : এক কথায় সাধারণ মানুষের মনের কথা, মুখের কথা ভাষা ও ছন্দে বাণীবদ্ধ হয়ে এবং লোকমুখে তা প্রচারিত ও প্রচলিত হয়ে যে সাহিত্য সৃষ্টি হয় তাকে লোকসাহিত্য বলে। জনৈক সমালোচক বলেন, যে সাহিত্য লেখা হয়নি তালপাতার মূল্যবান গাত্রে, যে সাহিত্য পায়নি সমাজের উচুঁতলার লোকদের সমাদর, যে সাহিত্য পল্লীর সাধারণ মানুষের কথা বলেছে গানে গানে, যে সাহিত্যের রচয়িতার নামও অনেক সময় হারিয়ে গেছে, তাকে বলা হয় লোকসাহিত্য। এ সাহিত্য সাধারণ মানুষ ও পল্লীর আলোছায়া, ভালোবাসা ও স্মৃতিকে সম্বল করে বেঁচে আছে। আমরা অনেক ছড়া, গান, গীতিকা, গাথা পড়ি ও শুনি। কিন্তু জানি না সেগুলোর রচয়িতা কারা? এগুলো অনেক দিন ধরে বেঁচে আছে পল্লীর মানুষের কণ্ঠে। কোন কবি-সাহিত্যিক লিখেছিলেন এ বেদনাময় কাহিনী তাও আমরা জানি না। কিন্তু এগুলো বেঁচে আছে চিরকাল। সুতরাং বলা যায়, যে সাহিত্য কোনো বিশেষ ব্যক্তিচিন্তা বা সাধনা থেকে উদ্ভূত না হয়ে মানুষের মনে আপনা থেকেই জন্মায়, যার মধ্যে কোনো নিগূঢ় তত্ত্বকথা বা কোনো রকমের নীতি উপদেশ নিহিত থাকে না, কিন্তু নিতান্ত সরল প্রাণের সুখ-দুঃখ, কান্না-হাসি প্রভৃতির অনাড়ম্বর প্রকাশ ঘটে এবং যা নিত্য পরিবর্তনশীল নদীস্রোতের মতো মানুষের মনে বিরাজ করে, তাকেই লোকসাহিত্য বলে। সাধারণ মানুষের মনের সহজ ও স্বচ্ছন্দ রূপায়ণ হলো লোকসাহিত্য। বাংলার লোকসাহিত্য বাঙালির স্বতঃস্ফূর্ত হৃদয়ধারার প্রতিচ্ছবি। এ কারণেই লোকসাহিত্য শাশ্বত বাঙালি জাতির সম্পদ—জাতির যুগ-যুগান্তরের হৃদয় ছবি।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাহিত্যবিষয়ক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন

Economy, Social, Literature & Culture Development of Bangladesh

Syllabus *Economy, society, literature and culture of Bangladesh with particular emphasis on developments including Poverty Alleviation, Vision-2021, GNP, NNP, GDP etc. after the emergence of the country.*

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১. *সামাজিক অস্থিরতা বলতে কি বোঝায়? বাংলাদেশে সামাজিক অস্থিরতা বৃদ্ধির কারণ ও এর প্রতিকার আলোচনা করুন। [৩৩তম বিসিএস]*
অথবা, বাংলাদেশের সামাজিক অস্থিরতার কারণ উদঘাটন করুন। কিভাবে সামাজিক অস্থিরতা দূর করা সম্ভব বলে আপনি মনে করেন? [সিনিয়র স্কেল ২০০৫]

০২. *বাংলাদেশে সামাজিক মূল্যবোধের পূর্ণ অবক্ষয় ঘটেছে বলে কি আপনি মনে করেন? এর কারণ ও প্রতিকার সম্পর্কে আপনার মতামত দিন। [১৭তম বিসিএস]*

০৩. *দুর্নীতি আমাদের জাতীয় উন্নয়নের অন্যতম প্রধান অন্তরায়। এক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন প্রকৃত কার্যকরি ভূমিকা গ্রহণ করতে পারছে না কেন? [৩৩তম বিসিএস]*
অথবা, 'দুর্নীতি জাতীয় উন্নয়নের অন্যতম প্রধান অন্তরায়।'—আপনি কি এই বক্তব্যের সাথে একমত? আলোচনা করুন। [২৭তম বিসিএস]
অথবা, 'দুর্নীতি প্রতিরোধে বহুমুখী ও দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া গ্রহণ জরুরি।'—উক্তিটির ব্যাখ্যা করুন।

০৪. *বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের গুরুত্ব আলোচনা করুন। এক্ষেত্রে বোয়েসেল (Bangladesh Overseas Employment and Service Ltd) ও বায়রা (Bangladesh Association of International Recruiting Agencies)-এর ভূমিকা আলোচনা করুন। [৩৩তম বিসিএস]*
অথবা, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে জনশক্তি রপ্তানির ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করুন। এ ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাবলী চিহ্নিত করে তা সমাধানের পথ নির্দেশ করুন।

০৫. *বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষিখাতের ভূমিকা আলোচনা করুন। ভবিষ্যতে বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থার ধরন কি হতে পারে বলে আপনি মনে করেন? [২১তম বিসিএস]*

অথবা, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষিখাতের অবদান তুলে ধরুন। কৃষিতে বিদ্যমান সমস্যাগুলো কি? বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে কি কি পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

০৬. বাংলাদেশের বৈদেশিক বিনিয়োগের সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোকপাত করুন। [১৭তম; ১৮তম; ২৫তম বিসিএস]

০৭. টেকসই উন্নয়ন বলতে কি বোঝায়? বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়নের অন্তরায়গুলো কি কি? [৩৩তম বিসিএস]

০৮. খাদ্য নিরাপত্তা বলতে কি বোঝায়? কিভাবে বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়? [২৮তম বিসিএস]
অথবা, খাদ্য নিরাপত্তা বলতে কি বোঝেন? খাদ্য নিরাপত্তার ধারণাটি বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করুন।

০৯. সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসমূহ (MDG) কি কি এবং তা অর্জনে বাংলাদেশের অনুসৃত কৌশল ও অর্জিত সাফল্যসমূহ আলোচনা করুন। [৩৩তম (আন্তর্জাতিক); ৩১তম বিসিএস]

১০. বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের সমস্যাসমূহ উপস্থাপন করুন। তৈরি পোশাক শিল্পের সমস্যা থেকে উত্তরণের ক্ষেত্রে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় বলে আপনি মনে করেন? [৩০তম বিসিএস]

১১. বাংলাদেশে শিল্পায়নের প্রধান প্রধান প্রতিবন্ধকতাসমূহ নিরূপণ করুন। এসব প্রতিবন্ধকতা কিভাবে দূর করা যায় বলে আপনি মনে করেন? [১১তম; ২২তম; ২৩তম বিসিএস]

১২. রপ্তানি বাণিজ্যে বাংলাদেশের সাফল্য ও ব্যর্থতা আলোচনা করুন। [১১তম বিসিএস]

১৩. ইপিজেড কি? ইপিজেড কিভাবে শিল্প উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে? [৩২তম বিসিএস]

১৪. অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বলতে কি বোঝায়? বাংলাদেশে গৃহীত বিভিন্ন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা উল্লেখ করুন। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সমস্যা ও সমাধানের পথ চিহ্নিত করুন।
অথবা, বাজার অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রাসঙ্গিকতা, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করুন। [২৯তম বিসিএস]

১৫. বাংলাদেশে শেয়ার বাজারের সম্ভাবনা কতটুকু? শেয়ার বাজারে বিদ্যমান সমস্যা কিভাবে দূর করা যায় বলে আপনি মনে করেন? [৩২তম বিসিএস]

১৬. জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মৌলিক সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করুন এবং এর সম্ভাব্য প্রতিকারের পরামর্শ দিন। [৩০তম; ১৭তম বিসিএস]
অথবা, বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মৌলিক সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করুন এবং এর সম্ভাব্য প্রতিকারের পরামর্শ দিন। [১৫তম বিসিএস]

১৭. বাংলাদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে সমস্যাসমূহ ও সুপারিশ আলোচনা করুন। [২৭তম; ১৫তম বিসিএস; সিনিয়র স্কেল ২০০২]
অথবা, বাংলাদেশের নিরক্ষরতা ২০২১ সালের মধ্যে দূরকরণে কি কি কৌশল ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে মনে করেন? [৩২তম বিসিএস]

১৮. মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় কি পরিবর্তন আনয়ন করা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন।
অথবা, বাংলাদেশে মানবসম্পদ বিকাশে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন। [৩৪তম বিসিএস]

১৯. 'শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড'—উক্তিটির ব্যাখ্যা দিন। আপনি কি মনে করেন দেশের প্রয়োজনীয় দক্ষ জনশক্তি উন্নয়নে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা যথেষ্ট? [২৭তম বিসিএস]

২০. জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করুন। এই শিক্ষানীতি বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় কি ধরনের সংস্কার নিশ্চিত করতে পারে? [৩১তম বিসিএস]
অথবা, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ নিয়ে আলোচনা করুন।

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

২১. বাংলাদেশের বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করুন এবং এর প্রতিকারে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে বিস্তারিত লিখুন।

২২. 'স্বাধীনতার চার দশক অতিক্রান্ত হলেও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান রয়েছে'— এ উক্তির পক্ষে-বিপক্ষে আপনার সুচিন্তিত মতামত তুলে ধরুন।

২৩. 'একটি দুর্ঘটনাই সারা জীবনের কান্না।'—এ প্রসঙ্গে সড়ক দুর্ঘটনার কারণসমূহ উল্লেখপূর্বক তা সমাধানের উপায় তুলে ধরুন।
অথবা, 'নিরাপদ সড়ক চাই।'– এ দাবি বাস্তবায়নে কি কি পদক্ষেপ নেয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন। এ প্রসঙ্গে আপনার মতামত প্রদান করুন।

২৪. রাজনৈতিক সংস্কৃতি কি? বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক সংস্কৃতি গণতন্ত্র বিকাশে কতটা সহায়ক বলে আপনি মনে করেন?
অথবা, বাংলাদেশে সাম্প্রতিক বিদ্যমান রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণসমূহ উদঘাটন পূর্বক এ থেকে উত্তরণের উপায় আলোচনা করুন।

২৫. পরিবার পরিকল্পনা বলতে কি বুঝায়? জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে পরিবার পরিকল্পনার গুরুত্ব আলোচনা করুন।

২৬. রাজধানীর যানজট সমস্যার কারণ এবং এর উত্তরণে কি কি পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

২৭. বাংলাদেশে নগরায়ন সম্পর্কে আলোচনা করুন। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নগরায়নের গুরুত্ব ও নগরায়ণের বিভিন্ন সমস্যার উপর আলোকপাত করুন।

২৮. 'ঢাকা শহরকে প্রকৃতির সাথে সঙ্গতি রেখে পরিচ্ছন্ন, বাসযোগ্য ও আধুনিক ঢাকায় রূপান্তরের রূপরেখা ডিটেইলড এরিয়া প্ল্যান (ড্যাপ)'—এ প্রসঙ্গে ড্যাপের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আলোচনা করুন।

২৯. পল্লী উন্নয়ন ধারণার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ আলোচনা পূর্বক বাংলাদেশের পল্লী উন্নয়ন কৌশলসমূহ আলোচনা করুন।

৩০. ভূমি সংস্কার বলতে কি বোঝায়? বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভূমি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করুন।

৩১. অর্পিত সম্পত্তি আইন কি? অর্পিত সম্পত্তি আইনের পটভূমি এবং বাংলাদেশে এই আইনের কথিত বৈধ প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৩২. 'বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে প্রয়োজন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়ন'—এ উক্তির আলোকে আপনার মতামত প্রদান করুন।

৩৩. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে দুর্নীতি কিভাবে বাধাগ্রস্ত করছে? দুর্নীতি দূরীকরণে কি ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণযোগ্য বলে আপনি মনে করেন?

৩৪. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে বেসরকারি বিনিয়োগকে কেন এত গুরুত্ব দেয়া হয়? এরূপ বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ আলোচনা করুন।

৩৫. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় কি কি? কিভাবে অন্তরায়সমূহ থেকে উত্তরণ সম্ভব?

৩৬. পোশাক শিল্প কারখানায় অগ্নিকাণ্ড ও ধসের কারণ এবং বিশ্ববাজারে এর প্রভাব আলোচনা করুন। এ থেকে উত্তরণের উপায় নির্দেশ করুন।

৩৭. বাংলাদেশের জাতীয় আয় পরিমাপের পদ্ধতিগুলো কি কি? জাতীয় আয় বৃদ্ধির উপায় আলোচনা করুন।
অথবা, বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের পরিমাপকগুলো কি কি? জাতীয় আয় কিভাবে বৃদ্ধি করা যায় তা আলোচনা করুন।

৩৮. 'GDP-তে শিল্প খাতের অবদান যথেষ্ট নয়।'—এই উক্তির আলোকে বাংলাদেশের শিল্প খাতে বিদ্যমান সমস্যা ও তা সমাধানে আপনার সুপারিশ তুলে ধরুন।

৩৯. GDP-তে কৃষি খাতের অবদান তুলে ধরুন। কৃষির বিদ্যমান সমস্যাগুলো কি? বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে কি কি পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

৪০. বাংলাদেশের শ্রমিক অসন্তোষের কারণসমূহ কি কি? শ্রমিক অসন্তোষের প্রেক্ষিতে পোশাক শিল্পের ভবিষ্যৎ নিয়ে আপনার মতামত প্রদান করুন।
৪১. বাংলাদেশের চামড়া শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা করুন।
৪২. ভিশন-২০২১ কি? ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিকল্পনাগুলো উল্লেখ করুন।
৪৩. পদ্মা সেতু নির্মাণের অর্থনৈতিক গুরুত্ব আলোচনাপূর্বক পদ্মা সেতু বাস্তবায়নের অগ্রগতি বিষয়ে আলোকপাত করুন। পদ্মা সেতু নির্মাণের সাম্প্রতিক পরিস্থিতির বিবরণ দিন।
৪৪. বর্তমান বিশ্বে টেকসই উন্নয়ন প্রক্রিয়া চালু হওয়ায় বাংলাদেশের পদক্ষেপ কি হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?
৪৫. জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ কি? জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ নির্বাহী কমিটি (একনেক)-এর গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা করুন।
৪৬. বাংলাদেশের উন্নয়নে বেসরকারি ব্যাংকের ভূমিকা আলোচনা করুন।
৪৭. বাংলা সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধের প্রভাব আলোচনা করুন।
অথবা, বাংলা সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধের কিরূপ প্রতিফলন ঘটেছে– বিশ্লেষণ করুন।
৪৮. কর্মমুখী শিক্ষা কি? দক্ষ জনশক্তি গঠনে কর্মমুখী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করুন।
৪৯. দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা কতখানি? এক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা আলোচনা করুন।
৫০. সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন কি? মানবসম্পদ উন্নয়নে এর গুরুত্ব আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

০১. বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যাগুলো কি কি?
০২. বেকারত্ব কি?
০৩. সামাজিক অবক্ষয়ের কারণ এবং প্রতিকারের উপায় লিখুন।
০৪. ঢাকা মহানগরের যানজট সমস্যার প্রতিকার কি হতে পারে?
০৫. ঢাকা মহানগরের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সমন্বয় সমস্যা কতটা এবং কেন?
০৬. শহরমুখী গ্রামীণ জনস্রোতের কারণ ও প্রতিকার সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
০৭. জিএসপি ও কোটামুক্ত বিশ্ব বলতে কি বোঝেন?
০৮. ভ্যাট (VAT) কি?
০৯. হরতালের কারণে আমাদের অর্থনীতি কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়? আলোচনা করুন।
১০. বাংলাদেশে কৃষিক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ কি কি?
১১. কি কারণে বাংলাদেশে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন সম্ভব হয়েছে?
১২. বাংলাদেশের কোথায় সর্বাধিক বোরো ধান উৎপন্ন হয়?
১৩. বাংলাদেশের কোন স্থানে (নির্দিষ্ট স্থানের নাম দিতে হবে) প্রথম চা চাষ করা হয় এবং কোন সনে?
১৪. পিআরএসপি (PRSP) কি?
১৫. বাংলাদেশের উন্নয়ন সমস্যা চিহ্নিত করুন।
১৬. ব্যাপক দারিদ্র্যের প্রেক্ষিতে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণে করণীয় কি?
১৭. GDP ও GNP কি?
১৮. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সেক্টরে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে এ পর্যন্ত কি কি পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে?
১৯. রাজস্ব বাজেট ও উন্নয়ন বাজেট বলতে কি বোঝেন? সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
২০. মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) ও মোট দেশজ উৎপাদন (GDP)-এর মধ্যে পার্থক্য কি?
২১. বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের বিভিন্ন খাতগুলো কি কি?
২২. প্রয়োজনীয় কাঁচামালের অভাবই বাংলাদেশের শিল্পায়নের পথে প্রধান অন্তরায়—আপনার মতামত লিখুন।
২৩. প্রাইভেটাইজেশন কমিশন সম্পর্কে কি জানেন?

২৪. বাংলাদেশের কোন সরকারি প্রতিষ্ঠান পরিকল্পনা প্রণয়ন করে?
২৫. অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কাকে বলে?
২৬. প্রকল্প কি? পূর্বাচল প্রকল্প কোথায় অবস্থিত?
২৭. মানবসম্পদ বলতে কি বোঝায়?
২৮. মানবসম্পদ উন্নয়নের উপায় কি?
২৯. অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন ও জনগণের অংশীদারিত্ব নিশ্চিতকরণে শিক্ষার ভূমিকা কি?
৩০. বাংলাদেশের পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানকোষের নাম কি? এর সম্পাদক কে?
৩১. বাংলা সাহিত্যের গবেষণাকারী সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠানের নাম কি?
৩২. 'বাংলাদেশে স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র' ও 'একুশে ফেব্রুয়ারি' প্রথম সংকলনের সম্পাদক কে?
৩৩. জাতীয় স্মৃতিসৌধ কোথায় এবং এর স্থপতি কে?
৩৪. উত্তরা গণভবন কোথায় অবস্থিত?
৩৫. বাংলা সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতিফলন সম্পর্কে লিখুন। [২০তম; ২৩তম বিসিএস]
৩৬. উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষার সুবিধা-অসুবিধা বিষয়ে আপনার মতামত কি?
৩৭. বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলা ও ভাস্কর্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতিফলন কতটা?
৩৮. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কখন গঠিত হয়?
৩৯. বাংলাদেশে এ পর্যন্ত কয়টি শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি গঠিত হয়েছে?
৪০. নিরক্ষরতা কি?
৪১. গ্রেডিং পদ্ধতি কি?
৪২. NAPE কি এবং কোথায় অবস্থিত?

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১। সামাজিক অস্থিরতা বলতে কি বোঝায়? বাংলাদেশে সামাজিক অস্থিরতা বৃদ্ধির কারণ ও এর প্রতিকার আলোচনা করুন। *[৩৩তম বিসিএস]*

অথবা, বাংলাদেশের সামাজিক অস্থিরতার কারণ উদ্‌ঘাটন করুন। কিভাবে সামাজিক অস্থিরতা দূর করা সম্ভব বলে আপনি মনে করেন? *[সিনিয়র স্কেল ২০০৫]*

উত্তর : ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তি পাওয়ার পর পাকিস্তান রাষ্ট্র মাত্র ২৪ বছরের মাথায় আবার ভেঙে যায়। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অন্যায় আচরণ ও দুঃশাসন থেকে মুক্তি পেতে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতা যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীনতা লাভ করে। মূলত অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে মুক্তিযুদ্ধ চালিত হলেও সে স্বপ্ন আজও পূরণ হয়নি। বরং মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা আরো খারাপ হচ্ছে। ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান আরো বেড়েছে। বেকারত্ব, সুশাসনের অভাব, সুষ্ঠু শিক্ষানীতির অভাব, শিক্ষাব্যবস্থায় নানা সমস্যা, ব্যবসায়ী পুঁজির বিকাশ কিন্তু উৎপাদন পুঁজির অভাব, বুদ্ধিজীবীদের রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি, রাজনৈতিক দলগুলোতে গণতান্ত্রিক পরিবেশের অভাব, ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাস ইত্যাদি সবকিছু মিলে স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের সামাজিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পাচ্ছে।

সামাজিক অস্থিরতা : সামাজিক পরিবেশের ভারসাম্যহীনতার কারণে অযাচিত যুদ্ধ, হত্যা, ধর্ষণ, মারামারি, লুটতরাজ, ছিনতাই, চাঁদাবাজি, দুর্নীতি, খুন, স্বজনপ্রীতি ইত্যাদি ব্যাধির দরুন সমাজে সৃষ্ট

সমস্যাই সামাজিক অস্থিরতা। অন্যভাবে বলা যায়, ন্যায়নীতি বিসর্জন, ধনসম্পদের পাহাড় গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা, ক্ষমতার মসনদ আঁকড়ে ধরে রাখার প্রচেষ্টা, ধনী-দরিদ্র বৈষম্য ইত্যাদি সামাজিক সমস্যার দরুন সৃষ্ট অস্থিরতাই সামাজিক অস্থিরতা।

বাংলাদেশে সামাজিক অস্থিরতার বৃদ্ধির কারণ : বাংলাদেশে সামাজিক অস্থিরতার পেছনে রয়েছে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ঘটনা, যা বর্তমানে এ দেশের মানুষকে চরম হতাশাগ্রস্ত করে তুলেছে। নিচে বাংলাদেশের সামাজিক অস্থিরতার কারণসমূহ আলোচনা করা হলো :

১. **পুঁজিবাদীদের অত্যধিক মুনাফা লাভের আকাঙ্ক্ষা :** বদরুদ্দীন উমরের মতে, বাংলাদেশে ব্যবসায়ী পুঁজির প্রাধান্য কায়েম হওয়ায় সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যারা কর্তৃত্ব করছে তারা এ ব্যবসায়ী পুঁজিরই প্রতিনিধি, খেদমতগার ও মালিক। এ ব্যবসায়ী পুঁজি শিল্পসহ সব ধরনের উৎপাদনশীল পুঁজিকে নিজের অধীনস্ত করে ১৯৭২ সাল থেকে এখন পর্যন্ত ক্রমবর্ধমানহারে যে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা অর্থনৈতিক জীবনে সৃষ্টি করেছে তার পরিচয় জনগণ প্রতিদিনের জীবনে লাভ করছে। ব্যবসায়ী পুঁজি যে শুধু অনিয়মিতভাবে মুনাফা লুট করছে তাই নয়, স্থিতিশীল পুঁজিবাদী সমাজের যেসব নিয়মকানুন প্রচলিত থাকে সেগুলোকেও অহরহ লঙ্ঘন করে চলেছে। ফলে এ ব্যবসায়ী পুঁজি কেবল তার উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করার মধ্যেই সীমিত নেই বরং তাদের কাজের সাথে চুরি ডাকাতির কোনো তফাৎ নেই। ব্যবসায়ী পুঁজির এ বিকাশের ফলে উৎপাদন ব্যাহত হয়ে যে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে, যেভাবে বেকারত্ব বৃদ্ধি করে, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি করে তাতে সাধারণ মানুষের আয়ব্যয়ের মধ্যে দিন দিন ফারাক বাড়তে থাকে। এ ফাঁক কোনোভাবে পূরণ করার পথ দেখতে না পেয়ে মানুষ নানারকম চুরি-দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে এবং যাদের কোনো নির্দিষ্ট কাজ নেই তারা ঝুঁকে পড়ে ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানি ইত্যাদির দিকে। এসব কাজকর্মের সাথে সঙ্গতি রেখে খুনজখম, অপরাধপ্রবণতাও তাদের মধ্যে বিস্তার লাভ করে। এ কারণেই বাংলাদেশে সামাজিক অস্থিরতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২. **চরম বেকারত্ব :** বর্তমান বাংলাদেশে মোট শ্রমশক্তির ৪০ ভাগ বেকার। যুবশক্তির বিশাল অংশ তাই চরম হতাশায় দিন কাটাচ্ছে। তাদের জন্য যে ভবিষ্যতে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে তেমন সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তৈরি হচ্ছে অস্থিরতা। এখন যে কোনো চাকরিতে সুযোগ পাওয়ার জন্য প্রচুর পরিমাণ ঘুষ দেয়া লাগে। বিশেষত সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে এ অবস্থা বেশি লক্ষণীয়। ফলশ্রুতিতে অর্থের বিনিময়ে যারা চাকরি লাভ করে, তারা চাকরির বেতন শুধু নয়, একই সাথে লগ্নীকৃত অর্থ আদায় করে নেয়ার জন্য অসৎ পথ অবলম্বন শুরু করে।

৩. **কৃষিখাতের ভারসাম্য বিনষ্ট :** বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান এলাকা। এর অর্থনীতিও কৃষিভিত্তিক। কিন্তু এ দেশের কৃষিপ্রধান অর্থনীতি এখন সেবা প্রধান অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। গত চার দশকে জিডিপির গড়নে দেখা যায় এ রূপান্তর। যেখানে ১৯৭২-৭৩ সালে জিডিপিতে কৃষি ও শিল্পের অবদান ছিল যথাক্রমে ৬০ ভাগ ও ৮ ভাগ, সেখানে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে তা দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১৬.৩৩ ভাগ ও ২৯.৬১ ভাগ। জিডিপিতে কৃষির এ ব্যাপক পশ্চাৎগতি ও শিল্পক্ষেত্রের সামান্যতম অগ্রগতির বিপরীতে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি দেখা যায়, সেবা, নির্মাণ ও ব্যবসা খাতে। অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৪-এর হিসাব অনুযায়ী বর্তমানে GDP-এর শতকরা ৫৪.০৫ ভাগ হলো বিভিন্ন ধরনের সেবা। প্রকৃতপক্ষে আমাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা, যুগযুগ ধরে লালিত ঐতিহ্য আর

গবেষণাকে কাজে না লাগিয়ে আমাদের কৃষিকে করে তোলা হয়েছে আমদানিকৃত বিপজ্জনক প্রযুক্তির মুখাপেক্ষী। আন্তর্জাতিক দাতাগোষ্ঠীর চাপে তাদের কাছ থেকে সাহায্যের নামে ঋণ নেয়ার কারণে তাদের দেয়া প্রযুক্তি ও কৃষিব্যবস্থাপনা অনুযায়ী আমাদেরকে কৃষিকাজ করতে হয়েছে। ফলশ্রুতিতে আমাদের অনেক পুষ্টিকর প্রজাতির ধানের অবলুপ্তি ঘটেছে। রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহারের কারণে একদিকে যেমন কৃষিকাজের খরচ বেড়েছে, অন্যদিকে মাটি ও পানিতে দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতিকর প্রভাব পড়েছে। নষ্ট হয়েছে প্রাণিবৈচিত্র্য, এমনকি আর্সেনিকের সমস্যায় জর্জরিত বাংলাদেশ। এসব কিছুই বাংলাদেশের সামাজিক অস্থিরতা তৈরি করছে।

৪. **বৈদেশিক বিনিয়োগের প্রভাব :** বাংলাদেশে বিদেশী বিনিয়োগের সিংহভাগই (৯১.১%) বিনিয়োগ হয় ব্যবসায়। স্বাধীনতার পরপরই বাংলাদেশ 'বিদেশী সাহায্যে'র নামে সাম্রাজ্যবাদী জালে ধরা পড়ে, যা আমদানি বাণিজ্যকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি সমাজে একটি শক্তিশালী অনুৎপাদক শাসকশ্রেণী সংস্কৃতি বিস্তারে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। বিভিন্ন পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, বিদেশী সাহায্যের মধ্যে বিভিন্ন প্রকল্প সাহায্যের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ৮০ ভাগ বিদেশী দ্রব্যাদি আমদানি ও বিদেশী কনসালট্যান্টদের পেছনেই ব্যয় হয়। বিদেশী সাহায্য ও প্রকল্প গ্রহণ করার ফলে আমাদের নিজেদের উন্নতি হচ্ছে না, রপ্তানি বৃদ্ধি পাচ্ছে না, নিজেদের শক্তি ও সামর্থ্য আমরা ব্যবহার করতে ব্যর্থ হচ্ছি। ফলে সামাজিক অস্থিরতা তৈরি হচ্ছে ব্যাপক হারে। বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র এবং তাদের এ দেশী দালালদের জন্য এ দেশের সবচেয়ে বড় অংশটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। স্বাধীনতা যুদ্ধ এদের দরিদ্র অবস্থা কাটাতে পারেনি। এদের জন্য নতুন রাষ্ট্র কোনো সুযোগ সুবিধা তৈরি করতে পারেনি।

৫. **চরম দারিদ্র্য :** বাংলাদেশের সামাজিক অস্থিরতার একটি বড় কারণ আমরা খুঁজে পাই চরম দারিদ্র্যাবস্থার মধ্যে। বেঁচে থাকার জন্য যে সংগ্রাম করে এ দরিদ্র জনগোষ্ঠী, তা সব সময় সমাজের জন্য সুফল বয়ে আনে না। অনেক সময়ই তৈরি করে অস্থিরতা। বিভিন্ন অবৈধ উপায়ে উপার্জন এ অস্থিরতা তৈরিতে মূল নিয়ামকের ভূমিকা নেয়।

৬. **রাজনৈতিক দ্বিমেরুকরণ :** বাংলাদেশের সামাজিক অস্থিরতার আরো একটি বড় কারণ আমাদের বর্তমান রাজনীতির দ্বিমেরুকরণ অথবা বাইপোলারাইজেশন। স্বাধীনতাত্তোর প্রথম যুগ অতিবাহিত হওয়ার পর থেকেই এ সমস্যা ধীরে ধীরে চরম আকারে দানা বাঁধতে শুরু করে। বর্তমানেও যা অব্যাহত। এর ফলে আমরা আমাদের মূল সমস্যা চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হচ্ছি। একই সাথে দেখা দিচ্ছে নানা ধরনের অস্থিরতা।

৭. **সামরিক শাসন :** স্বাধীনতা পরবর্তী সামরিক শাসন দীর্ঘদিন আমাদের গলাটিপে রেখেছিল। অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাকের মতে, 'সামরিক শাসন তার সমর্থক ভিত্তির ক্ষুদ্রতার কারণে অনিবার্যভাবেই বৈদেশিক স্বার্থের ক্রীড়নকে পরিণত হয়।' ফলে বৃদ্ধি পেয়েছে সামাজিক অস্থিরতা।

৮. **রাজনৈতিক সংস্কৃতির নিম্নমান :** বাংলাদেশে রাজনৈতিক সংস্কৃতির নিম্নমানের দরুন ভূলুণ্ঠিত হয়েছে রাজনৈতিক শৃঙ্খলা, বৃদ্ধি পেয়েছে সন্ত্রাসী কার্যকলাপসহ নানাবিধ অন্যায়। রাজনৈতিক শৃঙ্খলা না থাকাতে রাজনৈতিক নেতৃত্বের জন্য কোন্দল সৃষ্টি হয়। ফলে বিভিন্ন ছাত্রসংগঠনের কর্মীদের মধ্যে সশস্ত্র দলের জন্ম শুরু হয় অবৈধ। কালোবাজারি এবং বাইরের বিভিন্ন দেশ থেকেও অবৈধ অস্ত্র আসে। এ অবস্থা সামাজিক অস্থিরতা তৈরিতে বড় ভূমিকা পালন করে।

আবুল কালাম মনজুর মোরশেদের মতে, 'সমাজে বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিজের মালিকরা সন্ত্রাসের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে গোপনে ও প্রকাশ্যে একশ্রেণীর মাসলম্যান নিয়োগ করার ফলে সমাজের আর একটি স্তরে সন্ত্রাসী দল অন্যভাবে প্রবেশ করতে থাকে।'

৯. **নারী নির্যাতন :** বাংলাদেশের সামাজিক অস্থিরতার আরো একটি কারণ নারী নির্যাতন। এসিড নিক্ষেপ, ধর্ষণ, শিক্ষাঙ্গন ও কর্মস্থলে যৌন নির্যাতন, টিজিং, পারিবারিক নির্যাতন ইত্যাদি সামাজিক অস্থিরতা তৈরি করছে।

সামাজিক অস্থিরতা দূর করার উপায় : বাংলাদেশের সামাজিক অস্থিরতার কারণগুলো সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলেই এর সমাধানগুলো বের হয়ে আসবে। নিম্নোক্ত উপায় অবলম্বন করে সামাজিক অস্থিরতা দূর করা যেতে পারে :

১. **দেশপ্রেমিকদের নিকট রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তর :** রাজনৈতিক ক্ষেত্রকে ব্যবসায়ীদের হাত থেকে মুক্ত করে প্রকৃত দেশপ্রেমিক রাজনীতিবিদদের হাতে স্থানান্তর করতে হবে।

২. **কর্মসংস্থান তৈরি :** কর্মসংস্থান তৈরি করতে হবে। এজন্য উৎপাদন পুঁজির প্রয়োজন। অ্যাপার্টমেন্ট এবং অন্যান্য অনুৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ কমিয়ে শিল্প কারখানাসহ বিভিন্ন উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ বাড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

৩. **শিক্ষাখাতে ভর্তুকি ও বাজেট বৃদ্ধি :** শিক্ষাক্ষেত্রে ভর্তুকি এবং বাজেট বৃদ্ধি করতে হবে। এখন উচ্চশিক্ষা মূলত ধনী লোকের জন্য প্রযোজ্য হয়ে যাচ্ছে। তা যেন না হয়, এটি যেন জনগণের মৌলিক অধিকারেই থাকে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে।

৪. **বুদ্ধিজীবীদের নির্লোভ দায়িত্ব পালন :** বুদ্ধিজীবীদের নির্লোভ দায়িত্ব পালন করতে হবে। রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি, অর্থলোভ ত্যাগ করে দেশের কাজে মনোনিবেশ করতে হবে।

৫. **সাংস্কৃতিক আগ্রাসন রোধ :** সাংস্কৃতিক আগ্রাসন রোধ করতে হবে। এজন্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ যেমন প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন সমাজের প্রতিটি স্তরের সচেতন মানুষের। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের ভূমিকা অত্যাধিক।

৬. **দারিদ্র্য দূরীকরণ :** সামাজিক অস্থিরতা নিরসনে দারিদ্র্য দূরীকরণ আবশ্যক। এ লক্ষ্যে দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ তথা দাতাগোষ্ঠী প্রণীত PRSP জাতীয় পরিকল্পনা দারিদ্র্য দূর করতে পারবে। এজন্য প্রয়োজনে সমাজের এবং গ্রাম, গঞ্জ ও শহরের আপামর জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে মতামতের প্রেক্ষিতে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

৭. **গণতান্ত্রিক সংবিধান :** সংবিধানকে একটি গণতান্ত্রিক সংবিধানে রূপান্তর করতে হবে। বাংলাদেশের বৃহত্তর অংশের কাছে যেন মনে হয় এ সংবিধান তাদের।

৮. **প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগানো :** নিজেদের প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগিয়ে নিজের বুদ্ধি, শ্রম ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে।

উপসংহার : বাংলাদেশের সামাজিক অস্থিরতা তৈরির পিছনে ব্যবসায়ী, শাসক শ্রেণীর হাত যেমন রয়েছে তেমনি নব্য সাম্রাজ্যবাদীদের ভূমিকাও রয়েছে। সমাজের এ অস্থিরতা দূর করতে হলে এখন নিজেদেরকেই ঐক্যবদ্ধ হয়ে একসাথে কাজ করতে হবে। সমাজের বৃহত্তর গোষ্ঠীকে নিজেদের রক্ষার খাতিরেই নতুন নেতৃত্ব, নতুন রাজনীতি ও নতুন পথ তৈরি করতে হবে। নতুবা এ অস্থিরতা আরো বৃদ্ধি পাবে।

০২ ॥ বাংলাদেশে সামাজিক মূল্যবোধের পূর্ণ অবক্ষয় ঘটেছে বলে কি আপনি মনে করেন? এর কারণ ও প্রতিকার সম্পর্কে আপনার মতামত দিন। *[১৭তম বিসিএস]*

উত্তর : বাংলাদেশে সামাজিক মূল্যবোধের যে চরম অবক্ষয় ও অবনতি ঘটেছে, সে কথা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। বাংলাদেশের সামাজিক মূল্যবোধের এই অবক্ষয়ে জনজীবন আজ অতিষ্ঠ। অফিস-আদালত, রাস্তা-ঘাট, হাট-বাজার, যানবাহন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সর্বত্রই এর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশে যতগুলো সমস্যা রয়েছে তার মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়কে শীর্ষ পর্যায়ে রাখা যায়। শুধু বাংলাদেশের জনগণই নয়, বিদেশী দাতা গোষ্ঠীসহ বিভিন্ন সামাজিক ও মানবিক সংগঠনগুলোও এই সমস্যার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন এবং এর হ্রাসকল্পে তারা সরকারকে উপদেশ ও চাপ দুটোই প্রয়োগ করেছে। কিন্তু এর উন্নতি তো দূরের কথা, দিন দিন এ সমস্যা আরো প্রকট আকার ধারণ করছে। স্বাধীনতাপূর্ব সময়ে এর পরিমাণ তুলনামূলক যথেষ্ট কম ছিল। কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তর এই সামাজিক অবক্ষয় চরমভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং আজও এ ধারা ধীরে ধীরে বেগবান হচ্ছে।

সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ও এর কারণসমূহ : দীর্ঘকাল ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে স্বাধীনতা-উত্তরকালে একাধিক কারণে বাংলাদেশে সামাজিক মূল্যবোধের পূর্ণ অবক্ষয় ঘটেছে—এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। সাম্প্রতিককালে এর ক্রমবর্ধমান ব্যাপকতা জাতীয় উন্নয়নের মূল স্রোতধারাকে ব্যাহত করছে। বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবী মহল সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের প্রকৃত কারণ উদঘাটনের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মতবাদ ব্যক্ত করেছেন। নিচে তাদের মতবাদের আলোকে মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণসমূহ আলোচনা করা হলো :

১. **দারিদ্র্য :** দারিদ্র্যের দিক থেকে শীর্ষস্থানে অবস্থানকারী দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। জাতিসংঘের মানব উন্নয়ন রিপোর্ট ২০১৪-এ বাংলাদেশের অবস্থান ১৪২তম। বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষই দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত। অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৪-এর তথ্য মতে দেশের প্রায় ৪০% মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। ফলে জীবনের মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে এবং পরিবারের ভরণ-পোষণ যোগাতে গিয়ে বাংলাদেশের মানুষ সমাজবিরোধী কাজকর্ম করতেও দ্বিধাবোধ করে না।

২. **জনসংখ্যার আধিক্য :** ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার বিস্তৃত বাংলাদেশের ভূখণ্ডের মধ্যে জনসংখ্যা ১৫ কোটি ৫৮ লাখ (অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৪) এবং প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১০১৫ জন লোক বাস করে। জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্বের অষ্টম এবং এশিয়ার পঞ্চম জনাধিক্য দেশ। মাথাপিছু জমির পরিমাণ মাত্র ০.১৫ একর। প্রাকৃতিক সম্পদের দিক দিয়েও এ দেশ ততটা সমৃদ্ধ নয়। তাই সীমিত আয়তন ও সম্পদের ওপর মাত্রাতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপ মানুষের মৌল চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। ফলে কর্মসংস্থান ও সুযোগের অভাবে মানুষ বিকল্প রাস্তা হিসেবে অন্ধকার জগতে পা বাড়ায় তথা অপরাধমূলক কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়ে।

৩. **বেকারত্ব :** দেশে প্রায় দেড় কোটি লোক বেকারত্বের বোঝা বহন করে চলেছে। বেকারত্ব গোটা জাতিকে এক মহা সংকটে ফেলেছে। কর্মক্ষম মানুষ কর্মের অভাবে নিশ্চুপ বসে থাকতে থাকতে জীবিকার তাগিদে যে কোনো কাজের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকে। বিশেষ করে পরিবারের প্রতি অর্থনৈতিক দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে চোরাচালান, রাহাজানি, ছিনতাই, মাদকদ্রব্যের ব্যবসা ইত্যাদি গর্হিত কাজ করে থাকে। এ অন্ধকার জগতে এসে অল্প পরিশ্রমে বেশি মুনাফা দেখে ধীরে ধীরে আসক্তির পরিমাণ বাড়তে থাকে এবং পরবর্তীতে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কেউ ঐ রাস্তা থেকে বের হয়ে আসতে পারে না। এভাবেই বাড়তে থাকে মূল্যবোধের অবক্ষয়।

৪. **মাদকাসক্তি :** বাংলাদেশে মাদকাসক্তি সমস্যা প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। বর্তমানে মাদকাসক্তি ও সন্ত্রাস শব্দ দুটো সমার্থকরূপে বিবেচিত হয়। দেখা যায়, যে মাদকদ্রব্য গ্রহণ করে সে কমবেশি সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি করে। মাদক সেবনের টাকা জোগাড় করতে গিয়ে তাকে ছিনতাই, রাহাজানি, ডাকাতি, চাঁদাবাজি ইত্যাদির আশ্রয় নিতে হয়, আর এভাবেই কলুষিত হচ্ছে আজকের সমাজ।

৫. **অশিক্ষা :** বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষই অশিক্ষিত তথা মূর্খ। মূর্খরা উন্নত জীবন ও জগতের প্রতি সাধারণত উদাসীন, এদের মধ্যে পশুবৃত্তির প্রবণতাটাই বেশি পরিমাণে প্রকট। তাই সমাজবিরোধী কার্যকলাপ করতে এদের বিবেকে বাঁধে না। এ কারণে সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের জন্য অশিক্ষাকেই প্রধানত দায়ী বলে মনে করা হয়।

৬. **দুর্নীতি :** বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রতিটি দেশে দুর্নীতি একটি জটিল সামাজিক সমস্যা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। দুর্নীতি আজ আমাদের সংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের 'কান্ট্রি প্রকিউরমেন্ট অ্যাসেসমেন্ট' সম্পর্কিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'সরকারি অফিসে ঘুষ ছাড়া ফাইল নড়ে না। ঘুষ এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যেন এটা বেতনের অংশ হয়ে গেছে।' পরিস্থিতি এমন হয়ে গেছে, দুর্নীতিই যেন বাংলাদেশের প্রশাসনযন্ত্রের মূল চালিকাশক্তি। আর এ সম্প্রসারিত দুর্নীতি সংঘটনের বহুবিধ কারণও রয়েছে। কখনও দারিদ্র্যের কারণে, কখনো লোভের বশবর্তী হয়ে, আবার কখনো দুর্নীতি করার সুযোগ আছে, কিন্তু শাস্তির সম্ভাবনা নেই এরূপ পরিস্থিতির কারণে দুর্নীতি সংঘটিত হয়ে থাকে। সুশাসনের অভাব দুর্নীতিকে উৎসাহিত করে। শাসনব্যবস্থা উন্নত না হলে রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক দুর্নীতি বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া আইনের অনুশাসনের অনুপস্থিতি এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের অসততা ও দুর্বলতা দুর্নীতির মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার অন্যতম কারণ।

৭. **রাজনৈতিক কারণ :** স্বাধীনতার পর থেকে বিশেষত '৭৫-এর পর থেকেই বাংলাদেশের রাজনীতিতে চরম অস্থিরতা বিরাজ করছে। রাজনীতি ক্রমান্বয়ে পেশীশক্তি নির্ভর হয়ে পড়েছে। প্রতিপক্ষকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলার পরিবর্তে পেশীশক্তি দ্বারা ঘায়েল করার এক আত্মঘাতী প্রতিযোগিতায় নেমেছে আজকের রাজনৈতিক সংগঠনগুলো। আর এ কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে কিছু বিপথগামী তরুণ-যুবক। এরা জাতীয় নেতৃবৃন্দের প্রশ্রয় ও আনুকূল্য পেয়ে আরো বেপরোয়া হয়ে ওঠে। ফলে সমাজ জীবন এদের অতিরিক্ত বাড়াবাড়িতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। তাই সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের জন্যে দুর্বল রাজনৈতিক অঙ্গীকার দায়ী বলে সমাজবিজ্ঞানীরা অভিমত ব্যক্ত করেন।

৮. **অসম বন্টন ব্যবস্থা :** বাংলাদেশে সম্পদ বন্টন ব্যবস্থা যথেষ্ট ত্রুটিপূর্ণ। এ দেশের মুষ্টিমেয় লোকের কাছে বিশাল সম্পত্তি ও টাকা-পয়সা জমা রয়েছে এবং এর ফলে সমাজের অধিকাংশ লোক সহায়-সম্পদহীন। এক হিসাবে দেখা গেছে, এ দেশের শতকরা ৯০ ভাগ সম্পদ ১০ ভাগ লোক ভোগ করছে এবং মাত্র ১০ ভাগ সম্পদ ভোগ করছে ৯০ ভাগ লোক। যেহেতু আমাদের সম্পদ সীমিত, কাজেই একজন বেশি ভোগ করলে স্বভাবতই আরেকজনের ভাগে কম পড়বে। একদিকে সীমিত সংখ্যক শিশু প্রচুর সম্পদ আর প্রাচুর্যের মধ্যে বড় হচ্ছে, অপরদিকে অধিকাংশ শিশু বেড়ে উঠছে চরম দারিদ্র্য আর অবহেলার মধ্যে। এতে উভয়ের মধ্যেই অপরাধবোধ জাগ্রত হয়। প্রাচুর্যের আধিক্যে লালিত সন্তান সম্পদের অহংকার ও টাকার গরমে যেমন অসামাজিক কার্যকলাপ তথা মদ, গাঁজা, হেরোইন ও কোকেন সেবন করে, তেমনি অভাব আর তাচ্ছিল্যের মধ্যে বেড়ে ওঠা সন্তান সন্ত্রাস, মাস্তানি, চাঁদাবাজি আর রাহাজানিতে সুদক্ষ হয়ে ওঠে।

৯. **সামাজিক কারণ :** কিছু কিছু সামাজিক কারণেও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় বাড়তে থাকে, সেগুলো হচ্ছে :

ক. **পারিবারিক :** যেসব পিতা-মাতা অর্থনৈতিক বা অন্যান্য কাজকর্মে ব্যস্ত থাকে এবং সন্তানের পেছনে সময় দিতে পারে না তাদের সন্তান পিতা-মাতার অবাধ্য হয়ে গড়ে ওঠে। তাদের অনুপস্থিতিতে সন্তান অনেক সময় অবাঞ্ছিত অভ্যাস ও আচরণ রপ্ত করে। তাছাড়া বহুদিন যাবৎ যদি পিতা-মাতার মধ্যে মনোমালিন্য বা ব্যক্তিত্বের সংঘাত চলে আসে তাহলে সন্তান-সন্ততির মধ্যে হতাশা ও উদ্দেশ্যহীনতা সৃষ্টি হয়। এর ফলে সন্তান মাদকাসক্তিসহ সমাজবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হতে থাকে।

খ. **প্রেমে ব্যর্থতা :** প্রেমে ব্যর্থতার কারণে কিংবা প্রেমিক-প্রেমিকা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে অনেকে মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়ে এবং অভিমানে মাদকদ্রব্য সেবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। কেউ কেউ প্রতিশোধ হিসেবে খুন, এসিড নিক্ষেপ ও ধর্ষণ করতেও দ্বিধা করে না।

গ. **সঙ্গদোষ :** মানুষ সামাজিক জীব। সবাই মিলেমিশে পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে চায়। ফলে পরিবারের বাইরে মিশতে গিয়ে খারাপ সঙ্গে মিশে অনেকেই খারাপ হয়ে যায়।

ঘ. **অনুকরণ :** মানুষ অনুকরণপ্রিয়। কেউ কোনো কিছু করলে অন্যদের সেটা করার ইচ্ছা প্রবণতা জাগে। বিশেষ করে বাংলাদেশের ছেলেমেয়েদের অনেকেই অশ্লীল পত্রিকা, সিনেমা দেখে বা গল্প শুনে অধঃপতনের দিকে যাচ্ছে। অনেকে মাদকদ্রব্য সেবন একটি বাহাদুরিমূলক ফ্যাশন হিসেবে গ্রহণ করে অবাধে তার ব্যবহার করছে।

১০. **চলচ্চিত্র ও স্যাটেলাইট চ্যানেল :** চলচ্চিত্রের অশ্লীল নাচ, গান, সংলাপ আর অতি নিম্নমানের কাহিনীতে এ দেশের যুবসমাজ ক্রমান্বয়ে বিপথগামী হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া ডিশ এন্টেনার প্রভাবে বিদেশী সংস্কৃতির নামে যে অপসংস্কৃতি আমাদের সমাজে ভূতের মতো চেপে বসেছে তার কুফল ইতোমধ্যেই অনুমান করা যাচ্ছে।

১১. **সেশনজট :** সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের পেছনে পরোক্ষভাবে যে কারণটি চিহ্নিত করা যায় তা হলো সেশনজট। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশনজটের শিকার আজ হাজার হাজার ছাত্র। নির্দিষ্ট সময়ের কোর্স শেষ করতে দ্বিগুণ সময় লাগায় অনেকেই দুশ্চিন্তা আর বিষণ্ণতায় ভোগে এবং অনেক দরিদ্র বা মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান এই দীর্ঘ সময়ের শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করতে অপারগ হয়ে পড়ে। একদিকে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ অন্যদিকে আর্থিক দুশ্চিন্তা দুয়ে মিলে তারা বিষণ্ণতার চরম সীমায় পৌঁছে যায় এবং এর ফলে এক পর্যায়ে তারা বিভিন্ন সমাজবিরোধী কার্যকলাপে অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও জড়িয়ে পড়ে।

১২. **ভৌগোলিক কারণ :** প্রাকৃতিক দুর্যোগ, স্থানগত ও আবহাওয়াগত বিষয়, খাদ্যাভাস ইত্যাদি কারণও মানুষের মধ্যে বিরাট প্রভাব ফেলে এবং এর ফলে মানুষ সামাজিক মূল্যবোধগর্হিত কাজ করে থাকে।

প্রতিকার : আমাদের জাতীয় জীবনে সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় জাতীয় সামাজিক সমস্যা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। দেশ ও জাতির স্বার্থে এ সমস্যার প্রতিকার খুবই জরুরি। নিচে মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কিছু প্রতিকার সম্পর্কে আলোচিত হলো :

১. **দারিদ্র্য বিমোচন :** সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধকল্পে দারিদ্র্য বিমোচনের ওপর যথেষ্ট নজর দিতে হবে। সহায়-সম্বলহীন লোকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে। বেকারদের বিভিন্ন ধরনের কারিগরি প্রশিক্ষণ ও ঋণ দিয়ে উৎপাদনমুখী কাজে নিয়োগ করতে হবে।

২. **গ্রাম উন্নয়ন :** গ্রামপ্রধান বাংলাদেশে গ্রামই প্রাণ। গ্রামই বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বড় ভূমিকা পালন করছে। তাই সরকারকে গ্রাম উন্নয়ন তথা কৃষি সেক্টরের দিকে অধিক নজর দিতে হবে। কৃষি কাজে জড়িত ব্যক্তিদের যারা ইতিমধ্যে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে বিভিন্ন বিবেকবর্জিত কাজে জড়িত হয়ে পড়েছে তাদেরকে স্বাবলম্বী করতে সরকারকে দৃষ্টি দিতে হবে।

৩. **জনসংখ্যা হ্রাস :** বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধকল্পে সরকারকে আরো সজাগ ও কঠোর নীতি গ্রহণ করতে হবে। জনসংখ্যা যদি বর্তমান হারে বাড়তেই থাকে, তবে সামাজিক অবক্ষয়ও বাড়তে থাকবে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হলে দেশের জন্য প্রণীত পরিকল্পনাও ব্যর্থ হবে। তাই মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধকল্পে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থা গ্রহণ অতি জরুরি।

৪. **বেকারত্ব হ্রাস :** যেহেতু অধিকাংশ অপরাধ বেকাররাই ঘটিয়ে থাকে, তাই এদের কর্মের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করলে সামাজিক অবক্ষয়ও বহুলাংশে হ্রাস পাবে। বেকারদের আত্মকর্মসংস্থানে প্রেরণা যোগাতে হবে। তাদের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী ব্যাংক ঋণের পরিমাণ বাড়াতে হবে এবং কর্মসংস্থান ব্যাংকের শাখা ও মূলধন বৃদ্ধি করতে হবে। পাশাপাশি ঋণ গ্রহণের শর্ত আরো শিথিল করতে হবে।

৫. **রাজনৈতিক অঙ্গীকার :** যে কোনো রাজনৈতিক সংগঠন বা স্থানীয় নেতৃবৃন্দ রাজনৈতিক কর্মসূচিতে যুবশক্তিকে পেশীশক্তির কাজে ব্যবহার করবে না এই মর্মে আন্তরিক সিদ্ধান্তে আসতে হবে। প্রয়োজনে নেতৃবৃন্দের আলোচনায় বসে বিষয়টি সুরাহা করতে হবে।

৬. **শিক্ষার প্রসার :** শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষিত জাতি একটা দেশের শক্তি। আধুনিক জীবন যাপনের অন্যতম শর্ত হলো শিক্ষা। অশিক্ষা অন্ধকারের শামিল। তাই মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধকল্পে ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। কেননা সামাজিক, রাজনৈতিক, নাগরিক ও ধর্মীয় কর্তব্যবোধ সম্পর্কে যতই উপদেশ বা বাণী শোনানো হোক না কেন তাতে কাজের কাজ কিছুই হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করে তোলা হবে।

৭. **সম্পদের সুষম বণ্টন :** বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থায় সম্পদ বণ্টনে যে বিশাল বৈষম্য রয়েছে তা দূর করতে হবে। প্রয়োজনে সরকারকে নতুন নীতি প্রণয়ন করতে হবে। সবার সম্পদের হিসাব নিতে হবে এবং আয়ের উৎসের সাথে সম্পদ বৃদ্ধির সামঞ্জস্য কতটুকু তার একটা জরিপ চালিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

৮. **সংস্কৃতির অবাধ প্রসার রোধ :** বাংলাদেশের সামাজিক অবক্ষয়ে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা পালন করে বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ। সংস্কৃতি তথা বিনোদনের নামে স্যাটেলাইটের কিছু চ্যানেল আমাদের যুবসমাজ থেকে প্রৌঢ় পর্যন্ত সবার মধ্যে যৌন উদ্দীপনা তথা বিকৃতির সৃষ্টি করছে, যার ফলে বেড়ে যাচ্ছে ধর্ষণসহ মারাত্মক সামাজিক অপরাধসমূহ। এক হিসাবে জানা গেছে, ডিশ এন্টেনা আমদানির পর ধর্ষণের পরিমাণ আগের চেয়ে বহুগুণে বেড়ে গেছে। তাই নির্দিষ্ট কিছু শিক্ষামূলক এবং সপরিবারে দেখার মতো চ্যানেল রেখে বাকি চ্যানেল বন্ধের ব্যাপারে সরকারকে আশু পদক্ষেপ নিতে হবে।

৯. **পারিবারিক কর্তব্যবোধ :** পিতা-মাতাকে সন্তান-সন্ততির ব্যাপারে আরো বেশি খেয়াল রাখতে হবে। সন্তান-সন্ততি যেন পাড়া বা মহল্লার বখাটে ছেলেমেয়েদের সাথে না মেশে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। অর্থাৎ সন্তানদের গতিবিধির ওপর পিতা-মাতার কড়া নজর রাখতে হবে।

১০. **সেশনজট নিরসন :** শিক্ষা ক্ষেত্রে সেশনজট নিরসন করতে হবে। একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী সকল পরীক্ষা এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রেজাল্ট দেওয়ার জন্য শিক্ষকদের বাধ্য করতে হবে।

১১. **ধর্মীয় বোধ জাগ্রত :** মানুষের মধ্যে ধর্মীয় বোধ জাগ্রত করতে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে বিশেষ ভূমিকা রাখতে হবে। কেননা ধর্মীয় অনুভূতি মানুষের বিবেকের রক্ষাকবচ।

উপসংহার : সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় এমন একটি অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি, যা সমাজে প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধকে অস্বীকার করে। এর ফলে সমাজের সর্বত্রই হতাশা ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশে সাম্প্রতিককালে এর প্রভাব লক্ষণীয়। সামাজিক অবক্ষয়ের মাধ্যমে একটা দেশ ক্রমান্বয়ে হারিয়ে যেতে পারে, ধ্বংসের অতল গহ্বরে বিলীন হয়ে যেতে পারে পৃথিবীর সভ্য দেশের মানচিত্র থেকে। আবার এই অবস্থার উন্নতির মাধ্যমে হয়ে উঠতে পারে একটা আধুনিক সভ্য ও উন্নত জাতি এবং রাষ্ট্রে। তাই বাংলাদেশের সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধকল্পে উপরিউক্ত প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

০৩। দুর্নীতি আমাদের জাতীয় উন্নয়নের অন্যতম প্রধান অন্তরায়। এক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন প্রকৃত কার্যকরি ভূমিকা গ্রহণ করতে পারছে না কেন? *[৩৩তম বিসিএস]*
অথবা, **'দুর্নীতি জাতীয় উন্নয়নের অন্যতম প্রধান অন্তরায়।'—আপনি কি এই বক্তব্যের সাথে একমত? আলোচনা করুন।** *[২৭তম বিসিএস]*
অথবা, **'দুর্নীতি প্রতিরোধে বহুমুখী ও দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া গ্রহণ জরুরি।' —উক্তিটির ব্যাখ্যা করুন।**

উত্তর : বাংলাদেশ কিংবা উন্নয়নশীল দেশসমূহ কেবল নয়, বরং বিশ্বজুড়ে দুর্নীতি আজ উন্নয়নের পথে একটি প্রধান বাধা। দুর্নীতির কারণে অর্থনৈতিক অনুন্নয়নের সাথে সাথে বাড়ছে রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা। স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি গড়ে উঠতে পারছে না, দেখা দিচ্ছে সুশাসনের অভাব। সাম্প্রতিককালে দাতা দেশ ও সংস্থাসমূহ বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণদানের জন্য যেসব শর্ত আরোপ করেছে তার মধ্যে সুশাসন অন্যতম। বলার অপেক্ষা রাখে না, দুর্নীতি রোধ ছাড়া সুশাসনের পথ প্রশস্ত করার কোনো উপায় নেই।

দুর্নীতি : সাম্প্রতিক কালে দুর্নীতি একটি বহুল আলোচিত শব্দ। ব্যাপক আলোচনা ও বাস্তবতায় এর মূল অর্থ দাঁড়িয়েছে ব্যক্তিগত স্বার্থলাভের জন্য ক্ষমতার অপব্যবহার (Abuse of power for personal gain)। Social Work Dictionary-তে দুর্নীতির সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে এভাবে, 'রাজনৈতিক ও সরকারি প্রশাসনে সাধারণত ঘুষ, বলপ্রয়োগ, ভয় প্রদর্শন, প্রভাব বিস্তার এবং ব্যক্তিবিশেষকে সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে ক্ষমতার অপব্যবহার দ্বারা ব্যক্তিগত সুবিধা অর্জনই দুর্নীতি।'

ওপরের সংজ্ঞানুযায়ী নিম্নোক্ত কার্যাবলীকে দুর্নীতি বলা যায় : ১. ক্ষমতার অপব্যবহার, ২. ঘুষ, ৩. আত্মসাৎ, ৪. ভীতি প্রদর্শন করে আদায়, ৫. প্রতারণা, ৬. প্রভাব বিস্তার, ৭. স্বজনপ্রীতি, ৮. সম্পদের অপব্যবহার, ৯. সরকারি ক্রয়, ১০. দায়িত্ব পালনে অবহেলা।

জাতীয় উন্নয়ন : সাধারণভাবে জাতীয় উন্নয়ন বলতে জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে বুঝায়। নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক অমর্ত্য সেন দীর্ঘ দেড় দশক 'উন্নয়ন তত্ত্ব' চর্চা করার পর উপলব্ধি করছেন যে, শুধু মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি কোনো দেশের উন্নয়নের মাপকাঠি হতে পারে না। কেননা মাথাপিছু আয় বাড়লেও সেই বাড়তি আয়ে জনসাধারণের একটি বড় অংশের কোনো অধিকার না-ও

থাকতে পারে। তার মতে, কেবল উৎপাদন ও প্রবৃদ্ধিনির্ভর অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্থহীন উন্নয়নে পর্যবসিত হতে বাধ্য, যদি সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র ও বঞ্চিত মানুষ তার সুফল না পায়। সুতরাং, জাতীয় উন্নয়ন হলো একটি দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানের উন্নয়নসহ আর্থ-সামাজিক ও অবকাঠামোর ইতিবাচক উন্নয়ন।

দুর্নীতি আমাদের জাতীয় উন্নয়নের অন্যতম প্রধান অন্তরায় : বাংলাদেশে যে দুর্নীতি ব্যাপকভাবে বিদ্যমান সে কথা আজ সর্বজনস্বীকৃত, যা আমাদের জাতীয় উন্নয়নকে চরমভাবে ব্যাহত করছে। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১. **আইন প্রয়োগকারী সংস্থায় দুর্নীতি :** বাংলাদেশে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রধান বাহিনী পুলিশ। কিন্তু পুলিশ সম্পর্কে জনগণের ধারণা অত্যন্ত নেতিবাচক। ডেমোক্রেসিওয়াচ-এর এক জরিপ থেকে জানা যায়, দেশের ৯৫% মানুষ মনে করে পুলিশ দুর্নীতিপরায়ণ। লন্ডনভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের বিভিন্ন রিপোর্টেও পুলিশের দ্বারা ক্ষমতার অপব্যবহারসহ নানা রকম দুর্নীতির চিত্র বিবৃত হয়েছে। সংবাদপত্রসমূহে পুলিশের দুর্নীতির ব্যাপক চিত্র প্রায়শ প্রকাশিত হয়। দুর্নীতিপরায়ণ পুলিশ কর্মকর্তা-কর্মচারীরা জাতীয় স্বার্থের চেয়ে নিজস্ব ব্যক্তিস্বার্থকেই বড় করে দেখে। ফলে আইনের শাসন ব্যাহত এবং জাতীয় উন্নয়ন ভূলুণ্ঠিত হয়।

২. **শিক্ষা খাতে দুর্নীতি :** শিক্ষা খাত বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম বৃহৎ খাত। মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং জাতীয় উন্নয়নে শিক্ষার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। কিন্তু স্বাধীনতা-পরবর্তী প্রায় চার দশকেও বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা সর্বজনীন, গণমুখী এবং জাতির মেরুদণ্ড গঠনে সহায়ক হতে পারেনি। শিক্ষার মান উন্নয়ন ও প্রসার নিয়ে কাগজে-কলমে বিস্তর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, ব্যয় করা হয়েছে হাজার হাজার কোটি টাকা। কিন্তু শিক্ষাব্যবস্থা যে তিমিরে ছিল, সে তিমিরেই রয়ে গেছে। অরাজকতা, অনিয়ম এবং সর্বব্যাপী দুর্নীতি শিক্ষা নামক জাতির মেরুদণ্ডকে সুদৃঢ় করতে পারেনি। এই খাতে দুর্নীতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সার্টিফিকেট জালিয়াতি, মার্কশিট জালিয়াতি, 'ডোনেশন'-এর নামে ঘুষ আদায় এবং ছাত্রদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ফি আদায় ইত্যাদি। স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা না থাকায় শিক্ষক, কর্মকর্তা এবং কর্মচারীরা ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে বহুবিধ দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে থাকেন। এমতাবস্থায় জাতীয় উন্নয়নের বিষয়টি প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়াটাই স্বাভাবিক।

৩. **স্থানীয় সরকার খাতে দুর্নীতি :** স্থানীয় সরকার খাতও সরকারের অন্যতম বৃহৎ খাত। স্বাধীনতার পর প্রতিটি সরকার স্থানীয় সরকার খাতকে শক্তিশালী করার জন্য নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বর্তমানে স্থানীয় সরকার খাতকে তিন স্তরে বিভক্ত করে তৃণমূল পর্যায়ে উন্নয়নের কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে। কিন্তু ব্যাপক দুর্নীতির কারণে এই খাত কাঙ্ক্ষিত সফলতা অর্জন করতে পারছে না। এই খাতের উপ-খাতের আওতাধীন অফিসগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের অভাব, জবাবদিহিতা ও তদারকির অভাব এবং ক্যাডার সার্ভিস দ্বন্দ্বের কারণে হাজার হাজার কোটি টাকা অপচয় এবং দুর্নীতি হচ্ছে, জনগণ কোনো কার্যকর সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে না। জবাবদিহিতা এবং তদারকি না থাকায় ক্ষমতার অপব্যবহার ও প্রতারণার ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটছে। এ ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ, জেলা প্রশাসন, সিটি কর্পোরেশন, উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং ওয়াসার অবস্থান সর্বশীর্ষে। অন্যদিকে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যরা সরকারি সহায়তার ভিজিডি, ভিজিএফ, টিআর ইত্যাদি গ্রামীণ কর্মসূচির আওতায় দেয়া বরাদ্দের অধিকাংশই আত্মসাৎ করে থাকেন। এমতাবস্থায় জাতীয় উন্নয়ন বিষয়টি সুদূর পরাহত।

৪. **স্বাস্থ্য খাতে দুর্নীতি :** বাংলাদেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থার চিত্র অত্যন্ত নাজুক। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে উন্নয়ন বাজেটের হিসাবে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা খাতে যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ ব্যয় করা হলেও দায়িত্ববোধ ও জবাবদিহিতার অভাবে দুর্নীতি সমগ্র স্বাস্থ্যব্যবস্থায় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে স্বাস্থ্য সেবাকে বিঘ্নিত করছে। বর্তমানে জেলা ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, সিভিল সার্জন অফিস এবং পরিবার কল্যাণসহ সার্বিক স্বাস্থ্য খাত দৃশ্যত দুর্নীতিতে নিমজ্জিত। দেশের স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, যেগুলো তৃণমূল পর্যায়ে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করার দায়িত্বে নিয়োজিত, সেগুলো দুর্নীতির কারণে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করতে ব্যর্থ হচ্ছে। নির্ধারিত সময়ে রোগীদের সেবা না করে নিজস্ব ক্লিনিক পরিচালনা করা, কমপ্লেক্সে অনুপস্থিত থাকা, হাসপাতালে বসে ফি নিয়ে চিকিৎসা করা সাধারণ ঘটনায় পরিণত হয়েছে। মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালসমূহে রোগী ভর্তি, রোগীদের জিম্মি করে কমিশন আদায়, প্যাথলোজিক্যাল টেস্টের জন্য অর্থ আদায় থেকে শুরু করে প্রতিটি পদেই দুর্নীতি হচ্ছে। দুর্নীতির কারণে এই খাতে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ক্ষমতার অপব্যবহার, অর্থ আত্মসাৎ, প্রতারণা এবং দায়িত্বে অবহেলার ঘটনাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এমতাবস্থায় জাতি কাঙ্ক্ষিত স্বাস্থ্য সেবা পাচ্ছে না ও জাতীয় উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে।

৫. **বন ও পরিবেশ খাতে দুর্নীতি :** বাংলাদেশে বন ও পরিবেশ খাতে দুর্নীতি চরম মাত্রায় পৌঁছেছে। বন বিভাগের এক শ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারীর সহায়তায় সংঘবদ্ধ প্রভাবশালী চক্র সমগ্র দেশের বনভূমির গাছ কেটে উজাড় করে দিচ্ছে। সুন্দরবন এবং পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সমগ্র দেশের বনাঞ্চলে গাছ কাটার এবং কাঠ পাচারের 'মহোৎসব' চলছে। অনেকটা খোলামেলাভাবেই এই অবৈধ কাজটি করা হচ্ছে। কখনও কখনও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বন বিভাগের হাজার হাজার একর জমি অবৈধভাবে ইজারা দিচ্ছে। বন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দুর্নীতির কারণে প্রতি বছর ৩৭ হাজার একর বনভূমি বৃক্ষশূন্য হয়ে পড়ছে। বন বিভাগের দুর্নীতি বলতে বন অধিদপ্তরের দুর্নীতিকেই বোঝানো হয়ে থাকে। তাছাড়া এ অধিদপ্তরে ঘুষ, ক্ষমতার অপব্যবহার এবং সম্পদের অপব্যবহারের ঘটনাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এভাবে বাংলাদেশের প্রতিটি খাতেই কম-বেশি দুর্নীতি হচ্ছে। ফলে জাতীয় উন্নয়ন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

দুর্নীতি দমন কমিশন প্রকৃত কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করতে না পাবার কারণ : বাংলাদেশে দুর্নীতি প্রতিরোধে সরকারের যেসব প্রতিষ্ঠান কাজ করছে, তার মধ্যে দুর্নীতি দমন কমিশন অন্যতম। ২০০৪ সালের নভেম্বরে এ কমিশন গঠিত হলেও কোনো সরকারের আমলেই প্রতিষ্ঠানটি তেমন কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেনি। নিচে দুর্নীতি দমন কমিশন প্রকৃত কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করতে না পারার কারণ আলোচনা করা হলো :

১. **রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ :** দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রকৃত কার্যকরী ভূমিকা না রাখতে পারার প্রধান কারণ হলো রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ। কাগজে কলমে দুর্নীতি দমন কমিশন স্বাধীন, স্বশাসিত ও নিরপেক্ষ বাস্তবে এর বিপরীত চিত্র লক্ষ্য করা যায়। দুর্নীতিবাজ কোনো সংসদ সদস্য বা রাজনীতিবিদের দুর্নীতি তদন্ত করার পূর্বে সংসদ সদস্যদের অনুমোদন লাগবে মর্মে আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল। যদিও বর্তমানে আইনটি বাতিল করা হয়েছে তথাপিও প্রচ্ছন্নভাবে এরূপ অনেক আইন বা রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বিদ্যমান, যা দুদককে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে দিচ্ছে না।

২. **সিদ্ধান্ত গ্রহণে মতপার্থক্য :** দুর্নীতি দমন কমিশনের সদস্যগণ কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে গিয়ে তীব্র মতপার্থক্যে জড়িয়ে পড়েন। এতে করে জাতীয় ও জনগুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা তো সম্ভব হয়ই না, বরং আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় কাজটি ফাইলবন্দি থাকে। সুতরাং মতপার্থক্যও দুর্নীতি দমন কমিশনের অকার্যকর ভূমিকা রাখার একটি উল্লেখযোগ্য কারণ।

৩. **সহায়তা প্রদানে অনীহা :** বাংলাদেশে যে সরকারই ক্ষমতায় থাকুক না কেন সে সরকারই দুর্নীতি দমন কমিশনকে আইনগত, প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রদানে চরম অনীহা দেখায়। সরকারের এহেন অসহায়তায় দুর্নীতি দমন কমিশন আজ নখদন্তহীন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

৪. **পদের লোভ :** পদের লোভও দুর্নীতি দমন কমিশনের কার্যকর ভূমিকা না রাখার একটি বড় কারণ। দুর্নীতি দমন কমিশনের কর্তাব্যক্তিরা পদ ও মর্যাদা টিকিয়ে রাখার স্বার্থে সরকারি দলের অনুগত হয়ে প্রায়ই কাজ করে। ফলে দুদক তার কার্যক্রম নিয়ে হরহামেশাই মুখ থুবড়ে পড়ে।

৫. **অর্থবিত্তের পাহাড় গড়ার নেশা :** দুদকের কিছু দুর্নীতিপরায়ণ কর্তাব্যক্তি যেমন অর্থবিত্তের পাহাড় গড়ার নেশায় ব্যস্ত, তেমনি ব্যস্ত রাজনীতিবিদ ও আমলারা। আর এ উদ্দেশ্যকে সফল রূপ দিতে গিয়ে তারা দুদকের গতিকে স্থিমিত করে নিজেদের অবৈধ পথের পাহাড় গড়ার নেশায় সতত ব্যস্ত।

দুর্নীতি দমনে পরামর্শ : বাংলাদেশের দুর্নীতি নতুন কোনো বিষয় নয়। তবে দুর্নীতি প্রতিরোধে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সরকার কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা একেবারেই অপ্রতুল। বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকসহ বিভিন্ন দাতা সংস্থা গত কয়েক বছর ধরে সরকারকে দুর্নীতি হ্রাস করার উপায় হিসেবে অনেক পরামর্শ দিয়েছে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশও তাদের প্রকাশিত বিভিন্ন রিপোর্ট এবং সেমিনারে দুর্নীতি প্রতিরোধে বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা বলে সরকারকে পরামর্শ দিয়েছে। সরকারের নীতি-নির্ধারকরাও বিভিন্ন সময়ে এ বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ দিয়েছেন। নিচে বাংলাদেশে দুর্নীতি দমনে সম্ভাব্য করণীয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো :

১. **দুর্নীতি দমন কমিশনকে কার্যকর করা :** ২০০৪ সালে কার্যকরভাবে দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য পুরোপুরি স্বাধীন এবং পর্যাপ্ত ক্ষমতাসম্পন্ন একটি স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন করা হয়েছে। কিন্তু ২০০৪-২০০৬ সময়কালে এটি তেমন কার্যকর ছিল না। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শাসনামলে দুর্নীতি দমন কমিশনকে দেখা গেছে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করতে। বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হয়ে কমিশনকে আরও বেশি কার্যকর করতে নানা উদ্যোগ নিয়েছে, যাতে কমিশন যে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার পূর্বানুমতি ছাড়াই দুর্নীতির অভিযোগ তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারে। কিন্তু এখনও আশানুরূপ সাফল্য পরিলক্ষিত হচ্ছে না।

২. **প্রশাসনিক সংস্কার :** জনপ্রশাসনে সংস্কার দুর্নীতি কমাতে জোরালো ভূমিকা রাখতে পারে। সমাজের সতত পরিবর্তনশীল চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে দুর্নীতিমুক্ত সমাজের জন্য প্রশাসনিক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

৩. **স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা সৃষ্টি :** স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা দুর্নীতি হ্রাস এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম পূর্বশর্ত। সরকারের প্রতিটি কাজে যদি স্বচ্ছতা থাকে এবং জনগণ যদি সরকারের সিদ্ধান্ত এবং কর্মকাণ্ড সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য পায় তাহলে দুর্নীতির সুযোগ অনেক কমে আসবে। একই সাথে সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী যদি নিজেদের কাজের জন্য জবাবদিহিতায় বাধ্য থাকেন তাহলেও দুর্নীতি থেকে উত্তরণ অনেকাংশে সম্ভব। এজন্য ১৯২৩ সালের 'Official Secrate Act' বাতিল করতে হবে।

৪. **ন্যায়পাল নিয়োগ :** সংবিধানের ৭৭নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী পর্যাপ্ত ক্ষমতা দিয়ে ন্যায়পাল পদ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ক্ষমতাধর ব্যক্তি ও কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ নিরপেক্ষভাবে তদন্তের জন্য ন্যায়পালের পদ প্রতিষ্ঠা করা জরুরি।

৫. **আলাদা বিচারালয় :** তদন্ত থেকে শুরু করে রায় ঘোষণা পর্যন্ত দুর্নীতি মামলায় বছরের পর বছর সময় লেগে যায়। মামলার এ দীর্ঘসূত্রিতার অন্যতম প্রধান কারণ আদালতের স্বল্পতা বা পর্যাপ্ত বিচারকের অভাব। তাই দুর্নীতি মামলার বিচার কার্যক্রম দ্রুত পরিচালনার জন্য আলাদা বিচারালয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ দুর্নীতির মামলা দ্রুত সুরাহা না হওয়া দুর্নীতি বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ।

৬. **শাস্তি :** দুর্নীতি প্রতিরোধে আমাদের দেশে শাস্তির ব্যবস্থা অপ্রতুল। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে দুর্নীতির জন্য বিভাগীয় শাস্তি হিসেবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাময়িক বরখাস্ত বা বদলির আদেশ দেয়া হয়। সাময়িক বরখাস্তপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীরা দেন-দরবার করে পুনরায় চাকরিতে বহাল হন। আর শাস্তি হিসেবে 'বদলি' কতটুকু কার্যকর—তাও বিবেচনা করে দেখার দাবি রাখে।

৭. **সুশীল সমাজের ভূমিকা :** দুর্নীতির বিরুদ্ধে সাধারণ জনগণকে সচেতন করার দায়িত্ব রাজনৈতিক দল ও সুশীল সমাজের। সুশীল সমাজ এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালনের মাধ্যমে সাধারণ জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

৮. **গণমাধ্যমের ভূমিকা :** বিশ্বব্যাংকের Working Paper 'The Media's Role in Curbing Corruption'-এ বলা হয়, The role of the media is critical in promoting good governance and controlling corruption. It is not only raises public awareness about corruption, its causes, consequences and possible remedies but also investigates and reports incidences of corruption। দুর্নীতি দমনে গণমাধ্যমের ভূমিকা সম্পর্কে বিশ্বব্যাংক কিছুটা উদ্বেগ প্রকাশ করলেও সত্যিকার অর্থে দুর্নীতি দমন এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গণমাধ্যমসমূহ কার্যকর অস্ত্র হিসেবে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

উপসংহার : দুর্নীতি যে কোনো দেশের জাতীয় উন্নয়নের অন্যতম প্রধান অন্তরায়। তাই দুর্নীতি থেকে দেশ ও জাতিকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক সদিচ্ছা, সর্বত্র সততার একটি আবহ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার একটি পরিমণ্ডল। প্রতিটি ব্যক্তি যদি তার কর্তৃপক্ষের কাছে স্বচ্ছ থেকে সততার সঙ্গে স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করেন এবং প্রতিটি ব্যক্তিকে যদি জনগণ ও তার কর্তৃপক্ষের কাছে জবাবদিহি করানো যায়, তাহলে দুর্নীতি থেকে দেশবাসী রক্ষা পেতে পারে। এর ফলে দেশে যেমন সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হতে পারে, তেমনি জাতীয় উন্নয়নও হতে পারে ত্বরান্বিত।

০৪। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের গুরুত্ব আলোচনা করুন। এক্ষেত্রে বোয়েসেল (Bangladesh Overseas Employment and Service Ltd) ও বায়রা (Bangladesh Association of International Recruiting Agencies)-এর ভূমিকা আলোচনা করুন। *[৩৩তম বিসিএস]*

অথবা, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে জনশক্তি রপ্তানির ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করুন। এ ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাবলী চিহ্নিত করে তা সমাধানের পথ নির্দেশ করুন।

উত্তর : বর্তমান বিশ্বে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের বিষয়টি একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় জনসংখ্যার অসম বণ্টনের কারণে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, আফ্রিকার দারিদ্র্যপীড়িত কিছু দেশ ও দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশে সে দেশের অর্থনৈতিক সামর্থ্যের তুলনায় জনসংখ্যা অনেক বেশি। তাই বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল

দেশের জন্য জনশক্তি রপ্তানির বিষয়টি আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কেননা বাংলাদেশ একটি উদ্বৃত্ত জনশক্তির দেশ এবং এই উদ্বৃত্ত বৃহৎ জনগোষ্ঠীর বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেয়া হলে, তারা এ দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। আমাদের দেশে জনশক্তি রপ্তানি ও তাদের বিদেশে কর্মসংস্থানের ব্যাপারে বোয়েসেল (BOESL) এবং বায়রা (BAIRA) গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

বাংলাদেশের বর্তমান শ্রমশক্তি এবং জনশক্তি রপ্তানির চালচিত্র : বিশ্বের প্রায় দেশেই বাংলাদেশের শ্রমশক্তি রয়েছে। প্রতিবছর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাংলাদেশী কাজের জন্য মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গমন করে থাকে। তবে বাংলাদেশের প্রবাসী জনশক্তির অধিকাংশই সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া, কুয়েত, ওমান ও সিঙ্গাপুরে কর্মরত। এছাড়া বাহরাইন, লিবিয়া, কাতার, জর্ডান, লেবানন, ব্রুনাই, দক্ষিণ কোরিয়া, মরিসাস, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, আয়ারল্যান্ড ও ইতালিসহ অন্যান্য দেশেও বাংলাদেশী শ্রমশক্তি কর্মরত রয়েছে। এর মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যেই রয়েছে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শ্রমবাজার। সারাবিশ্বে অন্তত ৭০ লাখ বাংলাদেশী বৈধভাবে চাকরি নিয়ে বসবাস করছেন, যার প্রায় ৬০ শতাংশই আছেন মধ্যপ্রাচ্যে। এর মধ্যে সৌদি আরবে ১৯৭৬ সাল থেকে ২০১৫ সালের এপ্রিল পর্যন্ত গমনকারী বাংলাদেশী শ্রমিকের সংখ্যা ২৬.৫ লাখ জন, যা মোট জনশক্তির ৩৬ শতাংশ। তন্মধ্যে শুধু ২০১৩ সালে প্রায় ৪.০৯ লক্ষ বাংলাদেশী নাগরিক কাজের সন্ধানে বিদেশে গমন করছে। সংখ্যার বিচারে সৌদি আরবের পরে সংযুক্ত আরব আমিরাত বাংলাদেশের অন্যতম শ্রমবাজার। অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৪ মতে, ২০১২-২০১৩ (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) অর্থবছরে দেশটিতে গমনকারী শ্রমিকের সংখ্যা ১৪২৪১ জন। তবে ২০১৩ সালে সর্বাধিক ১,৩৪,০২৮ জন বাংলাদেশী ওমানে গমন করেছে। এছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশ, যেমন কুয়েতে ৭ শতাংশ, কাতারে ২ শতাংশ ও লিবিয়ায় ১ শতাংশ বাংলাদেশী শ্রমশক্তি নিয়োজিত রয়েছে। মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে বিস্তৃত এ ৮০ শতাংশ শ্রমবাজারের অবশিষ্ট ২০ শতাংশ মালয়েশিয়া (১০ শতাংশ), সিঙ্গাপুর (৪ শতাংশ) ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বিস্তৃত।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের গুরুত্ব : বাংলাদেশের অর্থনীতিতে জনসংখ্যা একটি অন্যতম বিচার্য বিষয়। অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপে ন্যুব্জ জাতীয় অর্থনীতিতে জনসংখ্যার ইতিবাচক ভূমিকার নজীরও বিরল নয়। মানব পুঁজি (Human Capital) গড়ার মাধ্যমে চীন, তাইওয়ান, কোরিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশ বিশ্ব অর্থনীতিতে তাদের অবস্থানকে যেভাবে উন্নত করেছে তা আমাদের দেশেও সম্ভব। কিন্তু আমাদের অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক কাঠামো শক্তিশালী না হওয়ায় এ বিপুল সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থান সম্ভব হচ্ছে না। এমতাবস্থায় অতিরিক্ত দক্ষ জনশক্তি বিদেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে তা নিচে আলোচিত হলো :

১. **জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন :** বাংলাদেশের রপ্তানিকৃত জনশক্তির অধিকাংশই গ্রামীণ জনগণ। এ বিপুল পরিমাণ জনশক্তির প্রেরিত অর্থ গ্রামীণ নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এতে এসব পরিবারের অন্যান্য কর্মক্ষম সদস্যদের কর্মসংস্থানের প্রয়োজনীয় পুঁজি, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া, কৃষিতে বিনিয়োগ প্রভৃতি বৃদ্ধি পায় এবং সার্বিকভাবে এসব জনগণের জীবনযাত্রার মানেরও উন্নতি ঘটে। তাছাড়া এসব শ্রমিক দেশে ফেরার পথে যে সব দ্রব্যসামগ্রী যেমন—মোবাইল ফোন, টিভি, ভিসিডি, ডিভিডি, পোশাক, প্রসাধনী সামগ্রীসহ ব্যবহার্য জিনিসপত্র নিয়ে আসে তাতে তাদের পরিবারসহ আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের জীবনেও ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

২. **কৃষি উন্নয়ন :** দেশের কৃষি খাতে বর্তমানে অতিরিক্ত জনশক্তি নিয়োজিত রয়েছে। অন্যদিকে কৃষিতে নিয়োজিত এসব অতিরিক্ত শ্রমিককে শিল্পখাতে স্থানান্তরের কারণে প্রয়োজনীয় শিল্পায়ন হচ্ছে না। এমতাবস্থায় অতিরিক্তি এ শ্রমশক্তি কৃষিতে কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা না রেখে বরং শ্রমিকের মজুরি হ্রাসসহ মাথাপিছু উৎপাদনশীলতার হারকে হ্রাস করছে এবং শ্রমের অপচয় হচ্ছে। তাছাড়া কৃষক পরিবারগুলো কৃষিতে বিনিয়োগের প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। সরকারি-বেসরকারি ব্যাংকগুলোর সরবরাহকৃত ঋণও পর্যাপ্ত নয়। এমতাবস্থায় বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের প্রেরিত অর্থ কৃষক পরিবারগুলোর কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। গ্রামীণ কৃষি অর্থনীতিতে অতিরিক্ত অর্থের এ যোগান সার্বিক কৃষি খাতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তাছাড়া পূর্বের ভূমিহীন কৃষক পরিবারগুলোও বিভিন্নভাবে বিদেশে চাকরি পাওয়ার সুবাদে ন্যূনতম কৃষিজমির মালিক হচ্ছে।

৩. **বিনিয়োগ :** বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের প্রেরিত অর্থ দেশের বিনিয়োগ ও অভ্যন্তরীণ অর্থ যোগানের ক্ষেত্রেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেশের সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংকগুলোতে আমানত ও বিনিয়োগের বিভিন্ন স্কিমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তারা নিজেদের জন্য লাভজনক করমুক্ত সুদ/মুনাফা অর্জনের পাশাপাশি স্বদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে ইতিবাচক অবদান রাখতে পারে। বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকের অধীন এ জাতীয় স্কিমের উল্লেখযোগ্য দিক হলো :

ক. অনিবাসী বৈদেশিক মুদ্রা মেয়াদি আমানত (Non-resident Foreign Currency Deposit—NFCD),

খ. ওয়েজ আর্নার্স ডেভেলপমেন্ট বন্ড,

গ. পোর্ট ফোলিও বিনিয়োগের জন্য অনিবাসী বিনিয়োগ টাকা হিসাবে (Non-resident Investors Taka Account—NITA)।

এসব সুবিধা গ্রহণ করে বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশীরা দেশীয় ব্যবসা বাণিজ্য ও উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে, যা একই সাথে তাদের নিজের এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ সহায়ক হয়ে থাকে।

৪. **দারিদ্র্য বিমোচন :** বিদেশে জনশক্তি রপ্তানি আমাদের দারিদ্র্য বিমোচনেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। কেননা এ সকল জনশক্তির অধিকাংশই গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত যাদের প্রেরিত অর্থ তাদের নিম্নবিত্ত দরিদ্র পরিবারের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বীতা অর্জনের জন্য অন্যতম অনুঘটক (Catalyst) হিসেবে কাজ করে। তাছাড়া এ পরিবর্তন প্রথমত গুটি কয়েক পরিবারের মধ্যে আসলেও তা সার্বিক দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তখন তাদের পরিবারগুলো গ্রামীণ মহাজন কিংবা এনজিও নামক আধুনিক পরিবর্তিত মহাজনদের অশুভ শিকারে পরিণত হওয়া থেকে রেহাই পায়। তাছাড়া তাদের এ অর্থ গ্রামীণ অর্থনীতিতে আগমনের ফলে গ্রামীণ কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সংস্কৃতি তথা তাদের পরিবারের সদস্যদের উন্নয়নে এবং দীর্ঘমেয়াদি দারিদ্র্য দূরীকরণে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে।

৫. **বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরশীলতা হ্রাস :** বাংলাদেশে যে বিপুল পরিমাণ জনশক্তি রয়েছে এ জনশক্তিকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করে তা বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরশীলতার হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো। বর্তমানে আমাদের অর্থনীতি বহুলাংশে বৈদেশিক সাহায্যনির্ভর যার কোনো

ইতিবাচক ফলাফল বৃহত্তর অর্থনৈতিক পরিসরে লক্ষ্য করা যাচ্ছে না বরং এ ঋণের বোঝা বহন করে জাতীয় অর্থনীতি আজ ভীষণভাবে ন্যুব্জ। এমতাবস্থায় বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের পাঠানো অর্থ এ নির্ভরতা হ্রাস করে স্বনির্ভর অর্থনীতির ভিত নির্মাণে সহায়তা করতে পারে। তাছাড়া বর্তমানে বৈদেশিক ঋণ শোধের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার অন্যতম উৎস জনশক্তি রপ্তানি।

৬. **আমদানি-রপ্তানি ভারসাম্য রক্ষা :** বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের অর্থ দেশের সামষ্টিক অর্থনীতিতে সবচেয়ে বড় যে ভূমিকা রাখে তা হলো এ অর্থ দেশের আমদানি-রপ্তানি ভারসাম্য রক্ষায় অতীব গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। কেননা দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের এটি একটি বিরাট খাত। বর্তমানে বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্প, যা শীর্ষস্থানীয় বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী খাত হিসেবে চিহ্নিত তাও হুমকির মুখে এবং সম্ভাব্য বিপর্যয় বাস্তব হলে দেশের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ও নিশ্চিত। এমতাবস্থায় দেশের গার্মেন্টস শিল্পকে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য প্রস্তুত করার পাশাপাশি বিপর্যস্ত জনশক্তি রপ্তানি খাতের ব্যাপারে মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। তাছাড়া পূর্বতন বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের শীর্ষ খাত পাট ও পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানিও আজ বিপর্যস্ত। সুতরাং দেশের বিদ্যমান জনশক্তিকে বিশ্ব শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী প্রস্তুত করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের অন্যতম খাতে পরিণত করার সম্ভবনা খুবই উজ্জ্বল।

তাছাড়া দেশ বর্তমানে খাদ্যে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ায় শিল্পায়ন ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের জন্য মেশিনারি ও প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানি বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। সুতরাং শিল্পায়নেও জনশক্তি রপ্তানি থেকে আসা রেমিটেন্স ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে।

৭. **কর্মসংস্থান বৃদ্ধি :** দেশীয় অর্থনীতিতে বিদেশে জনশক্তি রপ্তানির প্রত্যক্ষ ফল লক্ষ্য করা যায় কর্মসংস্থান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে। এর প্রতিফলন দুভাবে ঘটে : ক. বেকার জনগোষ্ঠী বিদেশে স্থানান্তর, খ. তাদের প্রেরিত অর্থে দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি।

ক. বাংলাদেশে বর্তমান জনগোষ্ঠীর একটা বিরাট অংশ বেকার। দেশের বর্তমানে প্রায় তিন কোটি লোক বেকার রয়েছে। অন্যদিকে প্রতি বছর গড়ে প্রায় আড়াই লাখ লোক কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে বিদেশে যাচ্ছে, যা দেশের ক্রমবর্ধমান বেকারত্বের হার হ্রাস করতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বিশেষ করে দেশে যেসব শিক্ষিত বেকার নিম্নমানের কাজ করতে রাজি হতো না তারাও বিদেশে গিয়ে অনুরূপ কাজ করে বিপুল পরিমাণ অর্থ যোগাচ্ছে। এতে বেকারত্ব হ্রাস পাওয়ার পাশাপাশি সামাজিক শৃঙ্খলা ও শান্তির ক্ষেত্রেও ইতিবাচক প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তাছাড়া নিজেদের পারস্পরিক সহযোগিতায় পরিবারের অন্যান্য সদস্য, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদেরও বিদেশে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছে। যেমন— এ পর্যন্ত বিদেশে যাওয়া শ্রমিকদের প্রায় ৫৪.৬%ই তাদের বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ও পরিচিত জনের সহযোগিতায় ব্যক্তিগত পর্যায়ে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়। এ প্রক্রিয়ায় কিছু সমস্যা থাকলেও পারস্পরিক সহযোগিতায় অনেক ভূমিহীন লোক পর্যন্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ পায়।

খ. বিদেশে কর্মরত শ্রমিকরা নিজেদের বেকারত্ব ঘোচানোর পাশাপাশি পরিবারের অন্যদের বেকারত্ব ঘোচানোর ক্ষেত্রেও সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। কেননা তাদের প্রেরিত অর্থ তাদের পরিবারের অন্যান্য পূর্ণ ও মৌসুমী বেকারদের কর্মসংস্থানের প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থান করছে এবং অনেকক্ষেত্রে তাদের প্রেরিত অর্থে গড়া প্রতিষ্ঠানে বাইরের অনেক শ্রমিকেরও কর্মসংস্থান হচ্ছে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

বোয়েসেলের ভূমিকা : বোয়েসেল বা Bangladesh Overseas Employment and Services Limited হলো দেশের একমাত্র রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন জনশক্তি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান। বিদেশে জনশক্তি রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের লক্ষ্য নিয়ে ১৯৮৪ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বৈদেশিক কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বোয়েসেল-এর গুরুত্ব ও ভূমিকা অপরিসীম। বোয়েসেল এর ভূমিকা সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো :

১. জনশক্তি আমদানিকারক দেশের নিয়ম-নীতি মেনে স্বল্প খরচে ও নিরাপদে লোক পাঠানোর ব্যবস্থা করা;
২. বৈদেশিক নিয়োগকর্তাকে 'সঠিক কাজের জন্য সঠিক লোক' নির্বাচনে সহায়তা করা;
৩. অভিজ্ঞ ও দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির মাধ্যমে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করা এবং বিদেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূর করা;
৪. মহিলা শ্রমিকদের জন্য বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা;
৫. বিভিন্ন দেশের সাথে কূটনৈতিক যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির ব্যবস্থা করা।

বায়রার ভূমিকা : বায়রা বা Bangladesh Association of International Recruiting Agencies হলো জনশক্তি রপ্তানিকারক বেসরকারি এজেন্টদের একটি সংগঠন। এটি ১৯৮৪ সালে গঠিত হয়। মুনাফা অর্জনের নিমিত্তে জনশক্তি আমদানি কারক দেশের সরকারি সংস্থা এবং মাঠ পর্যায়ের জনশক্তির মধ্যে সংযোগ স্থাপন করাই সংগঠনটির প্রধান কাজ। বৈদেশিক কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এই সংগঠনের ভূমিকা সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো :

১. আমদানিকারকের চাহিদামত প্রয়োজনীয় জনশক্তি যোগানের ব্যবস্থা করা।
২. আমদানিকারক, রাষ্ট্রীয় সংস্থা ও বিদেশগমনেচ্ছুদের জন্য পাইপলাইন হিসেবে কাজ করা।
৩. বিভিন্ন দেশের আমদানিকারক সংগঠনগুলোর সাথে যোগাযোগ করে নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।

পরিশেষে বলা যায়, বৈদেশিক কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বোয়েসেল এর পাশাপাশি বায়রা ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে বর্তমানে বায়রার বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সীমা নির্ধারণের জন্য আইন তৈরির প্রস্তুতি চলছে। বোয়েসেল, বায়রাসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর সমন্বিত উদ্যোগের ফলেই আজ আমাদের দেশ জনশক্তি রপ্তানিতে বিশ্বে দ্বিতীয়।

জনশক্তি রপ্তানির ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা : বাংলাদেশে রপ্তানিখাতের অন্যান্য উপখাতের মতো জনশক্তি রপ্তানির ক্ষেত্রেও সমস্যা বিদ্যমান। যেমন—

১. **শ্রমবাজারে প্রতিযোগিতা ও শ্রমিকের দক্ষতার অভাব :** আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে বর্তমানে প্রতিযোগিতা ব্যাপক। এ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দক্ষ শ্রমশক্তির চাহিদাই বেশি। অথচ আমাদের শ্রমিকদের প্রায় ৪৭.৪০ শতাংশ অদক্ষ। এমতাবস্থায় নিয়োজিত অদক্ষ শ্রমিকরা কম মজুরিতে কাজ করছে এবং নতুন শ্রমিক রপ্তানির ক্ষেত্রেও দক্ষ শ্রমিকের অভাব কাঙ্ক্ষিত বাজারে টিকে থাকা যাচ্ছে না এবং আমদানিকারক দেশগুলো আমাদের ব্যাপারে ক্রমশ আগ্রহ হারাচ্ছে।

২. **অবৈধ উপায়ে লোক প্রেরণ :** বিদেশে শ্রমিক প্রেরণ ও গ্রহণের ক্ষেত্রে অবৈধ পন্থা অবলম্বনের ফলে অনেক শ্রমিকই বিদেশে গিয়ে অবৈধ শ্রমিকে পরিণত হয় এবং নিয়োগকর্তা, পুলিশ ইমিগ্রেশান কর্তৃপক্ষের নির্যাতনের শিকার হয়েও কোনো আইনগত সহায়তা নিতে পারে না। ফলে সেসব শ্রমিক নিজে যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয় তেমনি শ্রম বাজারে দেশের ভাবমূর্তিও ক্ষুণ্ন হয়।

৩. **শ্রম বাজার সম্পর্কে ধারণার অভাব :** জনশক্তি রপ্তানি সংক্রান্ত সরকারের সুষ্ঠু নীতিমালা না থাকার ফলে অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয়। আন্তর্জাতিক শ্রম বাজার সম্পর্কে যথাযথ ধারণা না থাকায় বাংলাদেশী শ্রমিকদের জন্য কাজের সুযোগ অনেকাংশে হ্রাস পাচ্ছে। ফলে বাংলাদেশ অধিকাংশই নিম্ন মজুরিতে অদক্ষ শ্রমিক রপ্তানি করে থাকে। যার প্রমাণ হলো গত ১০-১৫ বছরে যেখানে অদক্ষ শ্রমিকদের মজুরি হ্রাস পেয়েছে সেখানে আধা দক্ষ ও দক্ষ শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ সরকার এ বাস্তবতাটা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে যে বাংলাদেশ একটি আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারে প্রতিযোগিতা করছে। অথচ বাজারে চাহিদা মোতাবেক শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য শ্রীলঙ্কা, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, ভারত প্রভৃতি দেশ প্রচুর বিনিয়োগ করেছে। অন্যদিকে এরূপ পদক্ষেপের অভাবেই আজ বাংলাদেশ ক্রমে বাজার হারাচ্ছে।

৪. **বিদেশে বাংলাদেশী মিশনগুলোর অসহযোগিতা :** শ্রমিকদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে বিদেশে বাংলাদেশী মিশনগুলোর অসহযোগিতার অভিযোগ দীর্ঘদিনের। এ ক্ষেত্রে অবশ্য মিশনগুলোর উদাসীনতা, কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের অভাব প্রভৃতির পাশাপাশি শ্রমিকদের অজ্ঞতা ও যোগাযোগের অভাবও দায়ী।

৫. **প্রেরিত অর্থের অদক্ষ ব্যবহার :** অভিবাসী শ্রমিকদের বিপুল পরিমাণ অর্থ যথাযথভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে না। অনেক ক্ষেত্রে অর্থ প্রেরণে তাদের অনাগ্রহ থেকে যেমন প্রেরিত অর্থের পরিমাণ হ্রাস পায় তেমনি প্রেরিত অর্থ অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় করা, অতিরিক্ত ব্যবহার্য জিনিসপত্র কিনে আনা, পারিবারিক ও আচার অনুষ্ঠানে বেহিসেবি খরচ প্রভৃতি কারণে এ টাকার বিপুল অংশই অপচয় হয়। ফলে চুক্তি শেষে দেশে ফিরে শ্রমিকদের পুনরায় সংকটে পড়তে হয়।

৬. **দক্ষতার প্রমাণপত্রের অভাব :** আমাদের দেশে অনেক লোক আছে যারা বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষ কিন্তু তাদের কোনো সার্টিফিকেট নেই। এমতাবস্থায় দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট শ্রমিক তার কাঙ্ক্ষিত চাকরিটা পায় না। এ ক্ষেত্রে সরকারি এমন কোনো ব্যবস্থাও নেই যাতে সহজেই সে তার প্রয়োজনীয় দক্ষতার প্রত্যয়নপত্র পেতে পারে।

৭. **বৈদেশিক নিয়োগকারীদের প্রদেয় বৈদেশিক মুদ্রা :** বিদেশে আমাদের দেশের শ্রমিকরা যে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে তার একটা বিরাট অংশ পুনরায় বৈদেশিক নিয়োগকারী এজেন্টদের কাছে চলে যায়। কেননা প্রতিটি শ্রমিক পিছু এদেরকে বৈদেশিক মুদ্রার বেশ অঙ্কের ফি দিতে হয়। ফলে কষ্টার্জিত বৈদিশিক মুদ্রার পরিপূর্ণ ফল আমরা ভোগ করতে পারি না।

৮. **বিদেশে নিয়োগকারীদের হয়রানি :** বিদেশে নিয়োগকারীরা শ্রমিকদেরকে নানাভাবে হয়রানি করে। শ্রমিকদের কাগজপত্র জব্দ করে নেয়া, মূল চুক্তি বাতিল করা, অস্বাস্থ্যকর কাজের পরিবেশ ও ভয়ভীতি প্রদর্শন প্রভৃতি এর অন্যতম। ফলে অনেক শ্রমিকই সর্বস্ব হারিয়ে দেশে ফেরে কিংবা অবৈধ শ্রমিক হিসেবে নানা নির্যাতনের শিকার হয়।

সুপারিশসমূহ : দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে দেশের অবস্থান সুদৃঢ় করতে জনশক্তি রপ্তানির মতো বিপুল সম্ভাবনাময় এ খাতটিকে টিকিয়ে রাখার জন্য সরকারি, বেসরকারি ও নাগরিক পর্যায়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি। সেজন্য যেসব বিষয়গুলোতে নজর দেয়া আবশ্যক তা হলো :

১. **উপযুক্ত সরকারি নীতি :** ১৯৮২ সালের অভিবাসী আইন (Immigration Ordinance)টির সংস্কার করে এতে শ্রমিকদের জন্য সহায়ক প্রয়োজনীয় নীতির সংযোজন ও সংস্করণ আবশ্যক। এছাড়া বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের ভূমিকার স্বীকৃতি ও অর্জিত অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে একটা জাতীয় নীতি প্রণয়ন আবশ্যক।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

২. **মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা :** দেশে এবং বিদেশে রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর কার্যক্রম মনিটরিং করার ব্যবস্থাকে আরো দক্ষ ও জোরদার করা আবশ্যক। এ ক্ষেত্রে BMET-এর মনিটরিং ইউনিটকে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা প্রদানও জরুরি।

৩. **যোগ্য ব্যক্তিদের সার্টিফিকেট প্রদান :** যেসব শ্রমিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষ সরকারের উচিত তাদেরকে যথাযথ সার্টিফিকেট প্রদান করা।

৪. **উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও দক্ষতাবর্ধক কর্মসূচি :** জনশক্তি রপ্তানির বিষয়টি কেবল শ্রমিকদের নিজেদের চেষ্টা ও রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর ব্যবস্থার কাছে ছেড়ে না দিয়ে সরকারের উচিত এ খাতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা। সে জন্য সরকারের যা করা উচিত তা হলো :

প্রথমত, দেশত্যাগপূর্ব সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ (Pre-departure awareness building training) গ্রহণকে সকল শ্রমিকের জন্য বাধ্যতামূলক করা। এতে তাদেরকে বিদেশে তাদের অধিকার ও কর্তব্য, নিয়োগকারী দেশের আইন-কানুন, দূতাবাসের ঠিকানা ও জরুরি যোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মকর্তার তথ্য প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান দান করা হবে।

দ্বিতীয়ত, প্রতিযোগিতামূলক আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারে টিকে থাকার জন্য শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা জরুরি। সেজন্য কম খরচে বাজার গবেষণা কর্মসূচি গ্রহণের সমন্বিত উদ্যোগ নিয়ে আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা ও চাহিদার ধরন নির্ণয় আবশ্যক। অতঃপর চাহিদা মাফিক শ্রমিক সরবরাহের নিমিত্তে ব্যাপক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ আবশ্যক।

তৃতীয়ত, যেসব দক্ষ শ্রমিক তাদের সংশ্লিষ্ট Informal sector-এ রয়েছে সরকারের উচিত তাদেরকে প্রয়োজনীয় ভাষা জ্ঞান ও হিসাব-নিকাশের সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সার্টিফিকেট দেয়া।

৫. **পুনর্বাসন :** দেশে ফেরৎ শ্রমিকদের পুনর্বাসনের জন্য বাপক কর্মসূচি গ্রহণ আবশ্যক। সে ক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে তাদের ক্ষুদ্র ব্যবসা উন্নয়ন ও অন্যান্য অর্থনৈতিক কার্য, ব্যাংকিং সুবিধা, ঋণ সুবিধা ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করা আবশ্যক, যাতে তারা তাদের অর্জিত সম্পদ ও অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতার যথাযথ ব্যবহার করতে পারে।

৬. **বিদেশ ফেরত শ্রমিকদের নেটওয়ার্ক সৃষ্টি :** বিদেশ ফেরৎ শ্রমিক ও বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের দাবি দাওয়া ও সমস্যাবলী গ্রন্থিকরণ ও যথাযথ কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত করার জন্য একটি সাংগঠনিক নেটওয়ার্ক আবশ্যক।

৭. **আমানত ও বিনিয়োগ স্কিম :** সহজ ও দক্ষ বিনিয়োগ স্কিমের মাধ্যমে প্রবাসী শ্রমিকদের অর্থ খাটানো এবং সঞ্চয়ের ব্যবস্থাকে আরো জোরদার ও উৎসাহব্যাঞ্জক করা আবশ্যক, যেন দেশে ফিরে তাদের পুনর্বাসন সহজ হয়।

৮. **দূতাবাসের সক্রিয় ভূমিকা :** বিদেশে বাংলাদেশের দূতাবাস ও মিশনগুলোকে শ্রমিকদের প্রয়োজনে সাড়া দানের উপযোগী করতে হবে। সেজন্য—

প্রথমত, সংশ্লিষ্ট দূতাবাসের Labour Attache-কে শ্রমিকদের সমস্যা সম্পর্কে সচেতন ও তাদের অধিকার সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হতে হবে।

দ্বিতীয়ত, দূতাবাসকে শ্রমিকদের আইনগত অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে যথাযথ তথ্য সরবরাহ এবং দূতাবাসে তাদের নাম অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে উৎসাহী করতে হবে।

তৃতীয়ত, শ্রমিকদের আইনগত বৈধতা-অবৈধতা নির্বিশেষে সকল শ্রমিকদের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা দানের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

চতুর্থত, শ্রমিকদের যাবতীয় অভিযোগ দূতাবাসকে অবহিত করার ব্যাপারে তাদেরকে উৎসাহী করতে হবে।

৯. **কার্যকর দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক চুক্তি ও সংস্থা :** জনশক্তি রপ্তানিকারক দেশগুলোর একটা আঞ্চলিক ফোরাম থাকা আবশ্যক এবং এক্ষেত্রে SAARC-কে ভিত্তি করেই তা গড়ে তোলা যেতে পারে। তাছাড়া সম্ভাব্য শ্রমিক আমদানিকারক দেশগুলোর সাথে কূটনৈতিক যোগাযোগ বৃদ্ধি এবং প্রয়োজনীয় চুক্তি সম্পাদনও গুরুত্বপূর্ণ।

১০. **ডাক ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা সংস্কার :** ডাক ও ব্যাংক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় সংস্কারের মাধ্যমে এতে স্বচ্ছতা আনা আবশ্যক, যাতে প্রবাসী শ্রমিকরা এ সকল বৈধ মাধ্যমে তাদের অর্থ প্রেরণ করতে পারে এবং সরকারও মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা থেকে বঞ্চিত না হয়।

১১. **শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার :** বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার করে তাকে কর্মমুখি করা আবশ্যক। সেক্ষেত্রে মাধ্যমিক পর্যায়ে ট্রেড কোর্স চালু এবং উচ্চতর পর্যায়ে কারিগরি ও তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষায় জোর দেয়া জরুরি।

১২. **প্রেরিত অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ :** শ্রমিকদের প্রেরিত অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য তাদের এবং তাদের পরিবারের সদস্যদেরকে এ ব্যাপারে নাগরিক পর্যায়ে উৎসাহী করতে হবে। গ্রামীণ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের অর্থকে উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করার ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

উপসংহার : গণতান্ত্রিক রাজনীতি অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির পথে ধাবমান বাংলাদেশকে এ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রস্তুত করতে হলে এর ১৬ কোটি মানব সন্তানকে মানব সম্পদে পরিণত করতে হবে এবং এর মানব সম্পদই মানব পুঁজিতে রূপান্তরিত হয়ে বিশ্ব অর্থনীতিতে সুদৃঢ় অবস্থান গড়ে নেবে। এ জন্য সর্বাগ্রে যা প্রয়োজন তা হলো জনগণকে শিক্ষার মাধ্যমে কর্মক্ষম করে গড়ে তোলা, আন্তর্জাতিক শ্রম বাজার সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ, শ্রমিক প্রেরণে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার উপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান।

০৫ ৷ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষিখাতের ভূমিকা আলোচনা করুন। ভবিষ্যতে বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থার ধরন কি হতে পারে বলে আপনি মনে করেন? *[২১তম বিসিএস]*

***অথবা,* বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষিখাতের অবদান তুলে ধরুন। কৃষিতে বিদ্যমান সমস্যাগুলো কি? বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে কি কি পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে বলে আপনি মনে করেন?**

উত্তর : বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির সাথে জড়িত। দেশের জাতীয় আয়ের বিরাট একটি অংশ আসে কৃষিখাত থেকে। গুরুত্বের দিক দিয়ে নীটওয়্যার ও তৈরি পোশাক রপ্তানির পরেই কৃষির অবদান। গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা তথা খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বনির্ভরতা অর্জন, দারিদ্র্য বিমোচন ইত্যাদির মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক ও টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু বাংলাদেশের কৃষিখাত তথা কৃষি উন্নয়নে রয়েছে হাজারো সমস্যা। কৃষির সামগ্রিক উন্নয়নে এই সমস্যাসমূহ অন্তরায় হিসেবে দণ্ডায়মান। তাই জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে কৃষি ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ অনতিবিলম্বে প্রতিকার করা জরুরি।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষির অবদান : বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষি খাতের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে জিডিপি'তে সার্বিক কৃষির অবদান শতকরা ১৬.৩৩ ভাগ। বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষির উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেছে। বাংলাদেশের কৃষি খাতকে ৪টি অধঃখাতে ভাগ করা হয়। যেমন ক. কৃষিপণ্য, খ. বন, গ. পশুপালন ও ঘ. মৎস্য। সমন্বিত কৃষিখাত অর্থাৎ কৃষিখাতের এই চারটি অধঃখাতের অবদান নিচে তুলে ধরা হলো :

ক. **কৃষিপণ্য :** কৃষির চারটি অধঃখাতের মধ্যে কৃষিপণ্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ। ২০১৩-১৪ (সাময়িক) অর্থবছরে স্থুল দেশজ উৎপাদন বা জিডিপি-তে কৃষির বিভিন্ন উপখাতের (ফসল, প্রাণিসম্পদ, বন ও মৎস্য) সমন্বিত অবদান শতকরা প্রায় ১৬.৩৩ ভাগ। আর এই মোট অবদানের মধ্যে কৃষিপণ্যের এককভাবে অবদান হলো শতকরা প্রায় ১৩.০৯ ভাগ। যা কৃষির অন্যান্য খাত থেকে এককভাবে সর্বাধিক। বাংলাদেশের মানুষ কৃষির অন্যান্য খাত থেকে কৃষিপণ্যের প্রতি বেশি নির্ভরশীল। অর্থাৎ আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলের মানুষ কৃষি ফসল উৎপাদনের উপরই নির্ভরশীল।

খ. **বনজ সম্পদ :** দেশের বনজ সম্পদ জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন ছাড়াও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বিশেষ অবদান রাখছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে প্রাক্কলিত সাময়িক হিসেবে মোট দেশজ উৎপাদনে বনজ সম্পদের অবদান শতকরা প্রায় ১.৭৬ ভাগ। মোট বনাঞ্চলের মধ্যে মাত্র ৪৫% এলাকায় গাছপালা রয়েছে। দেশের মোট জনশক্তির শতকরা ২ ভাগ এ খাতে নিয়োজিত রয়েছে।

গ. **প্রাণিসম্পদ :** কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে প্রাণিসম্পদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান এবং দারিদ্র্য বিমোচনে প্রাণিসম্পদ খাত বর্তমানে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে বিবেচিত। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে প্রাণিজাত দ্রব্য, যেমন– চামড়া, পশম, হাড় ইত্যাদির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) এ খাতের অবদান শতকরা ১.৭৮ ভাগ যা কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। দেশে প্রায় শতকরা ২৫ ভাগ মানুষ সরাসরি ও শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ মানুষ আংশিকভাবে প্রাণিসম্পদের উপর নির্ভরশীল। বেসরকারি খাত ও এনজিওসমূহকে সম্পৃক্ত করার ফলে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে এ খাত পরিচালনার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

ঘ. **মৎস্যসম্পদ :** কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৎস্য সেক্টরের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সম্ভাবনাময়। দেশে আমিষের চাহিদা পূরণ, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিপূর্বক দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে মৎস্য খাত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে মোট দেশজ উৎপাদনে মৎস্য খাতের অবদান শতকরা প্রায় ৩.৬৯ ভাগ। এই উৎপাদিত মৎস্যের নির্দিষ্ট অংশ রপ্তানি করে বাংলাদেশ প্রতিবছর প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে।

কৃষির বিদ্যমান সমস্যাসমূহ : বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড কৃষি হওয়া সত্ত্বেও নানাবিধ সমস্যার কারণে কৃষির আশানুরূপ উন্নয়ন হয়নি। কৃষিতে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ নিম্নরূপ :

১. **সনাতন চাষ পদ্ধতি :** সনাতন চাষ পদ্ধতিই বাংলাদেশের কৃষিব্যবস্থা পিছিয়ে থাকার অন্যতম প্রধান কারণ। আমাদের দেশের বেশির ভাগ গ্রামাঞ্চলে এখনো পর্যন্ত কাঠের লাঙল এবং একজোড়া বলদই কৃষকের একমাত্র অবলম্বন। কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ছোঁয়া গ্রামাঞ্চলে পর্যাপ্ত পরিমাণে এখনো পৌঁছায়নি। ফলে মান্ধাতার আমলের চাষপদ্ধতি এবং শুধু

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

শারীরিক শ্রমের উপর নির্ভরশীল কৃষি প্রত্যাশিত ফসল উৎপাদন করতে পারেনি। অর্থাৎ সনাতন চাষপদ্ধতির কারণেই কৃষির উৎপাদন অনেকাংশ পিছিয়ে রয়েছে।

২. **প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীলতা :** বাংলাদেশের কৃষি প্রকৃতি নির্ভর। আমাদের সেচ ব্যবস্থা এখনো আশানুরূপ উন্নত নয়। মৌসুমী বৃষ্টিপাতের উপর কৃষি অনেকাংশে নির্ভরশীল। কৃষকদের প্রয়োজন অনুযায়ী পর্যাপ্ত পরিমাণ বৃষ্টিপাত না হলে এখানে কৃষি কাজের ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়। আবার মাত্রাতিরিক্ত বৃষ্টিপাত হলেও পানি নিষ্কাশনের অভাবে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। তবে ধীর ধীরে কৃষির আধুনিকায়নের ফলে একর প্রতি উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকৃতির উপর নির্ভরশীলতাই কৃষির উৎপাদনকে ব্যাহত করেছে।

৩. **প্রাকৃতিক দুর্যোগ :** বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগের দেশ। ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে প্রতি বছরই বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাস লেগে আছে। ১৯৯৮ সালের প্রলয়ংকরী বন্যায় দেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ৫২টিই প্লাবিত হয়। বিআইডিএস-এর সমীক্ষায় বলা হয়েছিল, '৯৮-এর বন্যায় বিভিন্ন খাতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ১০ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে শুধু কৃষিখাতে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ৫ হাজার কোটি টাকারও বেশি। ২০০০ সালের বন্যায়ও দেশের দক্ষিণাঞ্চলের কৃষিখাতের বিপুল পরিমাণ ক্ষতি সাধিত হয়েছে। ২০০৭ সালের ১৫ নভেম্বর ঘূর্ণিঝড় 'সিডর'-এর আঘাতে বিশেষ করে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের ফসলের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়।

৪. **আধুনিক প্রযুক্তির কম ব্যবহার :** বাংলাদেশের অধিকাংশ কৃষক অজ্ঞ ও অশিক্ষিত। আধুনিক প্রযুক্তি যেমন– ভালো মানের বীজ, সার, সেচ ও কীটনাশক ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষির ফলন বাড়ানো সম্ভব হলেও কৃষকদের অজ্ঞতা ও উদাসীনতার কারণে তাদের উৎপাদিত ফসলও কম হয়। ভালো বীজ ব্যবহার না করার ফলে উৎপাদন ব্যাহত হয়। সর্বশেষ পাওয়া তথ্য অনুযায়ী আমাদের চাষযোগ্য কৃষি জমির শতকরা ৬০ ভাগ আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতির আওতায় এসেছে।

৫. **ক্ষুদ্র কৃষিজাত ও খণ্ড-বিখণ্ডতা :** বাংলাদেশের কৃষিব্যবস্থার অন্যতম প্রধান সমস্যা হলো কৃষি জমির ক্ষুদ্রায়তন এবং খণ্ড-বিখণ্ডতা। ক্ষুদ্র কৃষিজাত এবং খণ্ড-বিখণ্ডতার ফলে এরূপ জমিতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ বা বৃহদায়তন উৎপাদন কাজ পরিচালনা করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ এখানকার জমিতে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার ও প্রয়োগ করা যায় না বলে ফলনও ব্যাহত হচ্ছে।

৬. **সারের অভাব :** বাংলাদেশের অধিকাংশ কৃষকই দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করে। অর্থাভাবে সময়মত সার, সেচ ও কীটনাশক ব্যবহার করতে পারে না। সার প্রয়োগ ছাড়াই একই জমি বারবার চাষাবাদের ফলে জমির উর্বরা শক্তি হ্রাস পায় আর জমির উর্বরা শক্তি কমে গেলে স্বাভাবিকভাবেই ফলন বা উৎপাদন কম হয়। এছাড়া অনেক সময় বাজারে সারের সংকট দেখা দেয়, ফলে কৃষক সময়মতো কৃষি জমিতে সার প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয়। তাছাড়া কীটনাশকের অভাব এবং জ্বালানির অভাবে সেচের অসুবিধার কারণে কৃষিকাজ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে।

৭. **ঋণের স্বল্পতা :** এ দেশে অধিকাংশ কৃষকই দরিদ্র বলে তাদের নগদ অর্থের অভাব থাকে। এক হিসেবে দেখা যায়, শতকরা ৮০ ভাগ কৃষক যাদের ০.৫০ একরের কম জমি আছে তারা কৃষিঋণ পায় না। সংগঠিত উৎস থেকে বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্প বলে তারা চড়া সুদে ঋণ গ্রহণ করে মহাজনদের শোষণের শিকারে পরিণত হয়। অর্থাভাবে কৃষকরা প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণ ক্রয় করতে ব্যর্থ হয়, ফলে কৃষি উন্নয়ন কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে পৌঁছাতে পারছে না।

৮. **কৃষি জমির পরিমাণ হ্রাস পাওয়া :** বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে আবাসিক সমস্যা সমাধানের জন্য নতুন নতুন বাসস্থান সৃষ্টি হচ্ছে। নতুন নতুন বাসস্থান নির্মাণ করতে গিয়ে আবাদযোগ্য কৃষি জমির পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। বাসস্থান সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে শুধু ১৯৬৫ সাল থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত চাষাবাদযোগ্য এক লক্ষ আশি হাজার একর জমি হ্রাস পেয়েছে।

৯. **মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য :** বাংলাদেশের কৃষি বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। ফলে প্রকৃত ক্রেতা এবং বিক্রেতার মাঝে থাকে অসংখ্য মধ্যস্বত্বভোগী। এই মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্যের কারণে কৃষকরা তাদের ফসলের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হয় এবং ভোগান্তির শিকার হয়। ফলে ধীরে ধীরে কৃষি উৎপাদনে উৎসাহ হারিয়ে ফেলে।

১০. **জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততা :** বাংলাদেশের কৃষি উন্নতির মূলে জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততা অন্যতম অন্তরায় হিসেবে কাজ করে। এ দেশে প্রায় আড়াই হাজারের মতো হাওর ও বিলে ৭ লক্ষ ২৪ হাজার একর জমি জলাবদ্ধতার কারণে অনাবাদি অবস্থায় আছে যা সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে পানি নিষ্কাশন করে চাষযোগ্য করা সম্ভব। এছাড়া সমুদ্র উপকূলীয় বিস্তীর্ণ এলাকায় কৃষিযোগ্য জমি প্রতি বছরই সমুদ্রের লোনা পানি ঢুকে নষ্ট করে ফেলে। ফলে কৃষি উন্নয়ন ব্যাহত হয়।

১১. **ভূমিক্ষয় :** ভূমিক্ষয় বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে অন্যতম সমস্যা। ভূস্তরের হালকা মৃত্তিকা কণা, যা খুবই উর্বরা শক্তিসম্পন্ন এবং ফসল উৎপাদনে অপরিহার্য তা বন্যা, প্রবল বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহ প্রভৃতি কারণে অপসারিত হয়ে ভূমিক্ষয় হচ্ছে। এর ফলে এ দেশের জমিগুলো ক্রমশ ফসল উৎপাদনের অযোগ্য হয়ে পড়ছে।

১২. **উপযুক্ত কৃষি নীতির অভাব :** উপযুক্ত কৃষি নীতিই কৃষি উন্নয়নে সহায়তা করতে পারে। কিন্তু সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রায়ই নীতির পরিবর্তন ঘটে। যা কৃষি উন্নয়নকে ব্যাহত করে। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে কোনো নির্দিষ্ট কৃষি নীতির কিছু কিছু বিষয় উন্নতির অন্তরায় হিসেবে কাজ করে।

অতএব, বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রে উপরিউক্ত সমস্যার কারণেই বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ হওয়া সত্ত্বেও এখানকার কৃষি ব্যবস্থার এখনও আশানুরূপ উন্নতি ঘটেনি ফলে তুলনামূলকভাবে একর প্রতি উৎপাদনও কম হয়।

বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে যেসব পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন : বাংলাদেশে কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ সমাধানকল্পে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করা যায় :

১. **পর্যাপ্ত ঋণের ব্যবস্থা :** বাংলাদেশের অধিকাংশ কৃষক দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। ফলে প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাবে প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণ ক্রয় করতে পারে না। আর কৃষিক্ষেত্রে প্রদেয় ঋণের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত নয় বিধায় কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হয়। ১৯৭৯–৮০ সালে বাংলাদেশের কৃষিঋণের পরিমাণ ছিল জাতীয় উৎপাদনের মাত্র ৪.৫৮ ভাগ। এমতাবস্থায় কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হওয়াই স্বাভাবিক। তাই কৃষি উন্নয়নে দরিদ্র কৃষককে সহজ শর্তে ও সরল পদ্ধতিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে ঋণ দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে করে কৃষি উপকরণসমূহ সময়মতো ক্রয় করতে সক্ষম হয়। এক্ষেত্রে কৃষিঋণের পরিমাণ মোট উৎপাদনের ন্যূনতম ২৫% হওয়া উচিত।

২. **সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ :** কৃষকদের বহু কষ্টে উৎপাদিত শস্যের একটি বিরাট অংশ প্রতিবছর নানা প্রকার কীটপতঙ্গের আক্রমণে নষ্ট হয়। কৃষকরা সাধারণত এ কীটপতঙ্গের আক্রমণ প্রতিহত করতে অপারগ। তাই কীটপতঙ্গের আক্রমণ থেকে ফসল রক্ষা করার জন্য সম্প্রতি উদ্ভাবিত সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম আরো জোরদার করা প্রয়োজন।

৩. **বাজার ব্যবস্থার ত্রুটি দূরীকরণ :** ত্রুটিপূর্ণ বাজার ব্যবস্থার দরুণ কৃষকরা তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে না। মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্যে কৃষকরা তাদের পণ্য বিক্রয় করার ক্ষেত্রে ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হয় এবং ক্রেতারাও ভোগান্তির স্বীকার হয়। তাই এ সমস্যা সমাধানে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে সরকারি ক্রয়কেন্দ্র খোলা যেতে পারে। ফলে কৃষকরা মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য থেকে মুক্তি পেয়ে কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য পাবে এবং কৃষি উৎপাদনে উৎসাহী হবে, যা সামগ্রিকভাবে কৃষি উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

৪. **সংরক্ষণাগার স্থাপন :** বাংলাদেশে সংরক্ষণের সুব্যবস্থার অভাবে প্রতিবছর ২৫% থেকে ৩০% কৃষিজাত পণ্য নষ্ট হয়ে যায়। ফসল কাটার মৌসুমে সংরক্ষণাগারের অভাবে কৃষকরা কম মূল্যে শস্য বিক্রয় করতে বাধ্য হয় এবং ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হয়। কৃষিজাত পণ্য যাতে নষ্ট না হয় সেজন্য দেশের বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে কৃষিপণ্য সংরক্ষণাগার স্থাপন করতে হবে। এতে কৃষকরা আর্থিক ক্ষতি থেকে রক্ষা পেয়ে অধিক পরিমাণ কৃষি পণ্য উৎপাদনে উৎসাহী হবে। ফলে সামগ্রিকভাবে কৃষির উন্নয়ন বৃদ্ধি পাবে।

৫. **শ্রম দক্ষতা বৃদ্ধি :** বাংলাদেশের কৃষিকাজে নিয়োজিত অধিকাংশ কৃষি শ্রমিকই অদক্ষ এবং অশিক্ষিত। কৃষি শ্রমিকদের দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে আধুনিক প্রযুক্তি ও চাষপদ্ধতি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে। এতে করে কৃষকরা তাদের কাজে দক্ষ হবে এবং ভালো ফসল উৎপাদনের জন্য সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম হবে। যার ফলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং কৃষি উন্নয়নের পথ সুগম হবে।

৬. **আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি :** কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার একান্ত প্রয়োজন। উন্নত মানের বীজ, সার, সেচ, কীটনাশকের যথাযথ প্রয়োগের ফলে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ কার্যক্রম শুরু করলেও প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার করতে সক্ষম কৃষির উৎপাদন নাটকীয়ভাবে বেড়ে যেতে পারে, যা কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে সূচনা করতে পারে নতুন মাত্রা।

৭. **পর্যাপ্ত উপকরণ সরবরাহ :** বর্তমানে দেশে সারের অভাবের কারণে কৃষকরা নগদ মূল্যেও সময়মতো সার পাচ্ছে না যা উৎপাদনকে ব্যাহত করে। প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণ যেমন– সার, সেচযন্ত্র, জ্বালানি, কীটনাশক ওষুধ, বীজ প্রভৃতি ব্যক্তিগত খাতের মাধ্যমে সরবরাহ করা হলেও এসব উপকরণ যেন কৃষকরা সময়মতো পায় এবং উপকরণের গুণগত মান ও দাম যেন কৃষকের স্বার্থের অনুকূলে হয়, সেদিকে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন।

৮. **কৃষিজোত একত্রীকরণ :** কৃষির উন্নয়নের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষিজোতগুলো একত্র করতে হবে এবং জমির খণ্ড-বিখণ্ডতা রোধ করতে হবে। সমবায় ও বিনিময় প্রথার মাধ্যমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিগুলো একত্রিত করতে হবে। এতে করে জমিতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আধুনিক চাষাবাদ সম্ভব হবে এবং তুলনামূলক উৎপাদনও বাড়বে।

৯. **ভূমি সংস্কার :** আমাদের দেশে অধিকাংশ জমির মালিক হলো জমিদাররা। ফলে তারা জমি চাষের ব্যাপারে দৃষ্টি নিক্ষেপ না করে বর্গাপ্রথার মাধ্যমে সুবিধা ভোগ করে। এতে করে চাষীরা উৎপাদন বৃদ্ধিতে উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। প্রকৃত ভূমিহীন চাষীরা যেন কৃষি জমির মালিক হয় সেরূপ উদ্যোগ নেয়া উচিত। বর্গাপ্রথা বাস্তবমুখী করে এবং সরকারি খাসজমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করে উৎপাদন বাড়ানো যেতে পারে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

১০. **জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততা দূরীকরণ :** পানি নিষ্কাশনের মাধ্যমে জলাবদ্ধ জমি চাষের আওতায় আনতে হবে। এতে করে আবাদযোগ্য কৃষি জমির আয়তন বৃদ্ধি পাবে এবং সামগ্রিক উৎপাদন-ত্বরান্বিত হবে। এছাড়া সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকার জমি যাতে লবণাক্ত হতে না পারে সে লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

১১. **কৃষিনীতি প্রণয়ন :** কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে বাস্তবমুখী সম্প্রসারণশীল ও টেকসই কৃষিনীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। সরকার কৃষির সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনাসহ ১৯৯৯ সালে 'জাতীয় কৃষিনীতি' প্রণয়ন করেছে। কৃষি গবেষণার মাধ্যমে বন্যা-খরায় সহনশীল কাজ উদ্ভাবন করা প্রয়োজন এবং কৃষি প্রদর্শনীর মাধ্যমে কৃষকদের মধ্যে উৎপাদন বৃদ্ধিতে উৎসাহ প্রদান করা যেতে পারে।

উপসংহার : বাংলাদেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধকরণে কৃষি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও আমাদের দেশের কৃষিব্যবস্থা নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। ফলে কৃষি উন্নয়ন কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে পৌঁছাতে পারছে না। বহুবিধ সমস্যার কারণে মোট দেশজ উৎপাদনে কৃষিখাতের অপার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তা সম্ভব হচ্ছে না। তবে আশার কথা, বহুবিধ সমস্যা থাকা সত্ত্বেও সম্প্রতি বাংলাদেশ খাদ্যোৎপাদনে ব্যাপক সফলতা অর্জন করছে এবং বিশ্বের অষ্টম খাদ্যোৎপাদনকারী দেশের মর্যাদা লাভ করেছে। এ সফলতা অর্জন করায় বাংলাদেশের সরকার প্রধান FAO-এর 'সেরেস পুরস্কার' লাভ করেছে। ভবিষ্যতে খাদ্যে স্বনির্ভরতা অর্জন এবং দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধকরণ ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পুরস্কার বা খ্যাতি অর্জনের লক্ষ্যে বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে উপরিউক্ত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করতে পারলে বাংলাদেশ সফল হবে এবং কৃষি ও খাদ্যোৎপাদনের ক্ষেত্রে নতুন জগতে প্রবেশ করতে পারবে বলে আশা করা যায়।

০৬ । বাংলাদেশের বৈদেশিক বিনিয়োগের সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোকপাত করুন।

[১৭তম; ১৮তম; ২৫তম বিসিএস]

উত্তর : একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে বৈদেশিক বিনিয়োগের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বিনিয়োগের সাথে উন্নয়নের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। বিনিয়োগের মাধ্যমে উদ্ভাবন হয় নতুন নতুন প্রযুক্তি, সৃষ্টি হয় কর্মসংস্থান এবং বিভিন্ন জাতি, ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রের মধ্যে সেবা ও পণ্যাদি আদান-প্রদান সম্ভব হয়। বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়, বাংলাদেশ বিদেশী বিনিয়োগের জন্য দক্ষিণ এশিয়ার 'পরবর্তী উদীয়মান তারকা'। তথাপিও বাংলাদেশে বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা এবং বিদেশী বিনিয়োগের যথাযথ ব্যবহারের ক্ষেত্রে রয়েছে শত-সহস্র প্রতিবন্ধকতা।

অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৈদেশিক বিনিয়োগ : মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিকে পরিমাপক হিসেবে ধরে নিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে সংজ্ঞাটি প্রচলিত তা হলো : 'Economic development is the process whereby the real per capita income of a country increases over a long period of time.'

মূলধন গঠন ছাড়াও বৈদেশিক বিনিয়োগ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিভিন্ন খাতে আর্থিক সুবিধা সৃষ্টি করেছে। এগুলো হলো : ১. রপ্তানি বৃদ্ধি; ২. সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি; ৩. কর্মসংস্থান বৃদ্ধি; ৪. উৎপাদনের দক্ষতা বৃদ্ধি; ৫. উৎপাদন কারখানা এবং ব্যবস্থাপনার মান উন্নয়ন; ৬. প্রযুক্তি হস্তান্তর ও কারিগরি জ্ঞান প্রসারের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি।

বিনিয়োগের জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন হচ্ছে মূলধন। প্রধানত তিনটি মূল উৎস থেকে মূলধন সংস্থাপন হয়। যেমন : ১. অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় ২. বৈদেশিক বিনিয়োগ এবং ৩. বৈদেশিক সাহায্য।

বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের চিত্র : বাংলাদেশ বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য সব ধরনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এশিয়ার অধিকাংশ দেশের চেয়ে বাংলাদেশ উদারভাবে দেশকে বিদেশী বিনিয়োগের জন্য মুক্ত করে দিয়েছে। বাংলাদেশের হাতে নেয়া বিভিন্ন পদক্ষেপ এবং এর প্রভাব সম্পর্কে অনেকে বাংলাদেশকে এশিয়ার 'Emerging Tiger' বা 'উদীয়মান ব্যাঘ্র' হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে বাংলাদেশে বিদেশী বিনিয়োগ তেমন আশাব্যঞ্জক নয়। বিশ্বব্যাংক ও IFC প্রকাশিত Doing Business 2015 শীর্ষক প্রতিবেদন অনুযায়ী Ease of Doing Business : Global Rank-এ বাংলাদেশের অবস্থান ১৮৯টি দেশের মধ্যে ১৭৩তম। তবে বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষার (protecting investors) ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ৪৩তম। তাছাড়া ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩১তম এবং ব্যবসা শুরুর ক্ষেত্রে ১১৫তম।

বাংলাদেশের জিডিপি'তে বিনিয়োগের শতকরা হার

বছর	*জিডিপি'র হার*	*সরকারি*	*বেসরকারি*
২০০১-০২	২৩.১৫	৬.৩৭	১৬.৭৮
২০০২-০৩	২৩.৪১	৬.২০	১৭.২১
২০০৩-০৪	২৪.০২	৬.১৯	১৭.৮৩
২০০৪-০৫	২৪.৫৩	৬.২১	১৮.৩২
২০০৫-০৬	২৪.৬৫	৬.০০	১৮.৬৫
২০০৬-০৭	২৪.৪৬	৫.৪৫	১৯.০২
২০০৭-০৮	২৬.১৯	৪.৫০	২১.৬৯
২০০৮-০৯	২৬.১৯	৪.৩১	২১.৮৭
২০০৯-১০	২৬.২৩	৪.৬৭	২১.৫৬
২০১০-১১	২৭.৩৯	৫.২৫	২২.১৪
২০১১-১২	২৮.২৬	৫.৭৬	২২.৫০
২০১২-১৩	২৮.৩৯	৬.৬৪	২১.৭৫
২০১৩-১৪ (সাময়িক)	২৮.৬৯	৭.৩০	২১.৩৯

[সূত্র : *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৪*]

বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের সমস্যা : বিনিয়োগ সংক্রান্ত সরকারি টাস্কফোর্সের খসড়া প্রতিবেদনে বাংলাদেশে বিদেশী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ১৪টি সমস্যা চিহ্নিত করা হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে :

১. বিদেশে বাংলাদেশের নেতিবাচক ভাবমূর্তি;
২. অবকাঠামোগত সুবিধার অভাব;

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৩. বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি জায়গাতেই সেবা প্রদানের ব্যবস্থা অর্থাৎ ওয়ান স্টপ সার্ভিসের অভাব;
৪. ঘোষিত সরকারি নীতি বাস্তবায়নের ও সরকারি বিভাগগুলোর সমন্বয়ের অভাব;
৫. শ্রমিক বিশৃঙ্খলা ও শ্রমিক ইউনিয়নগুলোর জঙ্গিপনা;
৬. হরতালসহ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড;
৭. প্রতিযোগী দেশগুলোর তুলনায় ইনসেনটিভ বা উৎসাহদানের অভাব ও অবকাঠামোগতভাবে পিছিয়ে থাকা;
৮. কাস্টমস ছাড় করানোর জটিলতা;
৯. দক্ষ ও প্রশিক্ষিত কর্মশক্তির অভাব;
১০. নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সরকারি বিনিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য ও উপাত্তের অভাব;
১১. দুর্নীতি;
১২. আমদানি ও বাণিজ্যনীতির অতি দ্রুত উদারীকরণ করার ফলে স্থানীয় পণ্য উৎপাদন শিল্পের ওপর নেতিবাচক প্রভাব;
১৩. দক্ষ ও কার্যকর বিনিয়োগ ব্যাংকিংয়ের অভাব;
১৪. ঋণের ওপর সুদের উচ্চহার।

নিচে বাংলাদেশে বিদেশী বিনিয়োগের উপরোক্ত সমস্যাসমূহ এবং অন্যান্য কতিপয় সমস্যাদি আলোচনা করা হলো :

১. **বিদেশে বাংলাদেশের নেতিবাচক ভাবমূর্তি :** সম্প্রতি বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ সংক্রান্ত একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে আন্তর্জাতিক চেম্বার অব কমার্স-এর মহাসচিব বলেছেন, বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের প্রধান অন্তরায় দুর্বল অবকাঠামো ও বিদেশে বাংলাদেশের মলিন ভাবমূর্তি। বিদেশীদের কাছে বাংলাদেশের একটা নেতিবাচক ইমেজ রয়েছে যে, বাংলাদেশ হলো ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ, খরা, বন্যা, মহামারী, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি সমস্যায় আক্রান্ত দেশ। বাংলাদেশ ভাবলেই বিদেশীদের অনেকেই দেখে পানিতে ডোবা একটি দেশের ছবি। সেই দেশে শুধু খাদ্যাভাব আর দুর্ভিক্ষ। বাংলাদেশের আর একটা ইমেজ হলো, সাহায্য চাওয়া। বাংলাদেশ মানে যেন ইন্টারন্যাশনাল বাস্কেট বল, সেখানে শুধু দান করা, শুধু দেয়া। বিদেশে এমন একটা ধারণাও গড়ে উঠছে যে, বাংলাদেশকে কিছু দিলে সেটা আর ফেরত পাওয়া যায় না, বাংলাদেশকে শুধু দিয়ে যেতে হয়। বাংলাদেশ যেন শুধু খেলাপি ঋণের দেশ এবং সরকারি কর্পোরেশনসমূহের প্রতি বছর শত শত কোটি টাকা লোকসান দেয়ার দেশ। বাংলাদেশ মানে রাজনীতি ও অর্থনীতিতে শুধু গিঁটের পর গিঁট পড়া, সে সবের কোনো সমাধান না হওয়া। বস্তুত বাইরে বাংলাদেশের এ ধরনের নেতিবাচক ভাবমূর্তির কারণে লগ্নিকারক দেশ ও সংস্থাসমূহ বাংলাদেশে বড় যে কোনো বিনিয়োগে দ্বিধাগ্রস্ত থাকে।

২. **অবকাঠামোগত সুবিধার অভাব :** বিদেশী বিনিয়োগের অন্যতম প্রধান শর্ত হচ্ছে অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা। বাংলাদেশে তার পর্যাপ্ত অভাব ও ঘাটতি রয়েছে। বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা, রেল ও সড়ক ব্যবস্থা যথেষ্ট উন্নত নয়। সবচেয়ে করুণ বিদ্যুৎ সরবরাহজনিত অবস্থা। কল-কারখানায় গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ ইত্যাদি সময়মতো এবং চাহিদামতো পাওয়ার কোনো গ্যারান্টি নেই, নেই ঠিকমতো টেলিফোন ব্যবহারের নিশ্চয়তা। বাংলাদেশের কোনো সরকারই এ যাবৎ অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা উন্নয়নের সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতি ও ব্যবস্থা নিতে পারেনি। এ অবস্থায় দেশী বিনিয়োগকারীরাই বিনিয়োগে ভরসা পায় না।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৩. **হরতালসহ নেতিবাচক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড :** হরতালসহ নেতিবাচক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের প্রধান অন্তরায়। সম্প্রতি বিশ্বব্যাংক থেকে প্রকাশিত একটি রিপোর্টে বলা হয়, বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশের উন্নয়নের জন্য হরতাল একটি প্রধান প্রতিবন্ধকতা, দেশটিতে একদিনের হরতালে ৩০০ কোটি টাকা ক্ষতি হয়। জাতীয় অর্থনৈতিক স্বার্থ সম্পর্কে রাজনৈতিক দলসমূহের উদাসীনতার কারণে পুনঃ পুনঃ ডাকা হরতালে বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রবাহ ব্যাহত হচ্ছে এবং দেশ অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

৪. **দুর্নীতি :** বলা হয়ে থাকে, বাংলাদেশ দুর্নীতির ওপর ভাসছে। দুর্নীতি হচ্ছে এমন একটা দুষ্ট ক্ষত যা জনগণের মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের প্রধান প্রতিবন্ধক। বর্তমানে বৈদেশিক বিনিয়োগ, দারিদ্র্য বিমোচন, মানব সম্পদ উন্নয়নসহ কল্যাণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থায় গৃহীত সকল রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের প্রধান অন্তরায় হচ্ছে দুর্নীতি। সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্র থেকে শুরু করে বাংলাদেশের মতো উন্নয়শীল দেশেও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বকে প্রশ্নের সম্মুখীন করে তুলছে এ দুর্নীতি। এমতাবস্থায় বৈদেশিক বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগে দ্বিধাগ্রস্ত থাকাটাই স্বাভাবিক।

৫. **আমলাতান্ত্রিক জটিলতা :** আমলাতান্ত্রিক জটিলতা আমাদের দেশে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিরাট অন্তরায়। শিল্প ও বাণিজ্য প্রক্রিয়ায় অহেতুক বিধিনিষেধ ও নিয়ন্ত্রণ থাকায় বিনিয়োগ উৎসাহিত হতে পারছে না। শিল্প-বাণিজ্য প্রক্রিয়ায় বিরাজমান এসব অহেতুক বিধি-নিষেধ, নিয়ন্ত্রণ এবং লাল ফিতার দৌরাত্ম্য উচ্ছেদ না করলে যতই বাণিজ্য টিম পাঠানো হোক, বা নতুন আইন-বিধি তৈরি করা হোক কিংবা বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো হোক, কোনোদিনই বিদেশী বিনিয়োগ কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে উৎসাহিত হবে না।

৬. **বিনিয়োগ বোর্ডের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতা :** বিনিয়োগ বোর্ড একটি স্পেশালাইজড প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো। এখানে থাকা উচিত পরিসংখ্যান, অর্থনীতি, এমবিএ ডিগ্রিধারী দক্ষ লোকজন, যারা এ সংক্রান্ত বিষয়গুলো বোঝেন। এ ধরনের দক্ষ লোক যথেষ্ট সংখ্যক না থাকা বিনিয়োগ বোর্ডের ব্যর্থতার একটি কারণ। তাছাড়া বিনিয়োগ বোর্ডের আরেকটি সমস্যা হলো ঘন ঘন নির্বাহী পদে রদবদল।

৭. **দক্ষ ও কার্যকর বিনিয়োগ ব্যাংকিংয়ের অভাব :** বিনিয়োগ ও সকল শিল্পায়নের অন্যতম মৌলিক শর্ত হচ্ছে যথাযথ ব্যাংকিং সহায়তা। বাংলাদেশে তা সম্পূর্ণরূপেই অনুপস্থিত। কোনো ব্যাংকেরই যথাযথ দায়িত্ব ও অধিকারের ভিত্তির ওপর প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেয়ার সুযোগ নেই। ব্যাংকগুলো খেলাপি ঋণগ্রহীতা ও দলীয় দৌরাত্ম্যের কাছেই অনেক সময় জিম্মি থাকে। তাই ব্যাংক ব্যবস্থাকে পরিপূর্ণ স্বায়ত্তশাসন না দিলে বাংলাদেশে কখনো বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষিত হবে না।

৮. **প্রতিকূল আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি :** বাংলাদেশে বাইরের পুঁজি না আসার এবং অভ্যন্তরীণ পুঁজির স্বাভাবিক নিয়মে বিকশিত না হয়ে ওঠার আর একটি গুরুতর কারণ দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি। এ কথা সর্বজনস্বীকৃত যে, অর্থনীতির সুষ্ঠু পরিচালনা বহুলাংশে নির্ভর করে দেশের 'ল অ্যান্ড অর্ডার' সঠিক থাকার ওপর। কিন্তু বাংলাদেশে দোকানে, মহল্লায়, কল-কারখানায়, দালান-কোঠা নির্মাণে চাঁদা দাবি করা একটা স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। থানা পুলিশ বহুক্ষেত্রে স্থানীয় প্রভাবশালী মহলের ইঙ্গিতে চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসকে আনুকূল্য দেয়। রক্ষক ভক্ষকে পরিণত হলে ফল কি হয় তা সহজেই অনুমেয়।

৯. **কর প্রশাসনের অব্যবস্থা :** বাংলাদেশে বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট না হওয়ার আরো একটি কারণ হলো বিরাজমান কর কাঠামো ও কর প্রশাসনের অব্যবস্থাপনা এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে এদের

নির্যাতন ও দুর্নীতি। বহু উন্নয়নশীল দেশে বিদেশী পুঁজি আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে কর কাঠামো ঢেলে সাজানো হয়েছে, ক্যাপিট্যাল গেইন ট্যাক্স হ্রাস করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে এসব ক্ষেত্রে তেমন কোনো পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে না।

১০. **নির্ভেজাল জমি সংকট :** বাংলাদেশে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের জন্য বর্তমানে সবচেয়ে বড় সমস্যা নির্ভেজাল জমি। যে কোনো বড় শিল্প-কারখানা গড়ে তুলতে হলে ২০ থেকে ২৫ একর জমির প্রয়োজন হয়। কিন্তু নির্ভেজাল জমি পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়েছে।

১১. **ব্যাংক ঋণ সমস্যা :** দেশীয় বিনিয়োগকারীদের জন্য বর্তমানে সবচাইতে বড় সমস্যা ব্যাংক ঋণ। বড় কোনো প্রকল্প গ্রহণ করতে গেলে বিভিন্ন ব্যাংক কনসোর্টিয়াম গঠন করে অর্থের যোগান দেয়ার বিধান চালু আছে। বেশ কিছু দেশীয় শিল্পোদ্যোক্তা এ ধরনের শিল্প স্থাপনের জন্য আবেদন করে ঘুরপাক খাচ্ছে। এছাড়া ১০ কোটি, ১৫ কোটি টাকার শিল্প ইউনিট স্থাপনের লক্ষ্যে প্রকল্প ব্যাংকে দাখিল করে ঘাটে ঘাটে ঘুরে হয়রানি হচ্ছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ অধিকাংশ ক্ষেত্রে নানা অজুহাতে শুধু ঘুরপাকের নীতিই অবলম্বন করছে। আর যখন শিল্প স্থাপনের জন্য কেউ ব্যাংক ঋণ পায় তখন বৈদেশিক মুদ্রার উঠানামা, যন্ত্রপাতির মূল্য বৃদ্ধিতে প্রকল্প বাস্তবায়নের আগেই সংকট শুরু হয়ে যায়।

বৈদেশিক বিনিয়োগের সম্ভাবনা

'2020 Bangladesh : A Long Run Perspective Study' শীর্ষক সাম্প্রতিক বিশ্বব্যাংকের এক দীর্ঘমেয়াদি প্রেক্ষিত সমীক্ষা রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২০ সাল নাগাদ কমপক্ষে ৮০০ কোটি মার্কিন ডলারের প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ বাংলাদেশে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। চলতি বিনিময় হার অনুযায়ী স্থানীয় মুদ্রায় এর পরিমাণ প্রায় ৪৫ হাজার কোটি টাকা।

উক্ত রিপোর্টে বিশ্বব্যাংক বলেছে, এ পর্যায়ে FDI আহরণের জন্য বাংলাদেশকে অবশ্যই সুষ্ঠু অর্থনৈতিক রেগুলেটরি পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। মানব ও প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই উন্নয়নের দীর্ঘমেয়াদি কৌশল গ্রহণ করতে হবে। যদি তা করা হয়, তবে বাংলাদেশের সামনে রয়েছে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। বিশ্বব্যাংকের এ রিপোর্টে বিদ্যমান সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে ২০২০ সালে কেমন বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব তার চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে। এতে দেখা যায়, এ সময়ের মধ্যে দারিদ্র্য উল্লেখযোগ্য হারে কমবে। গড় বার্ষিক জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৭% থেকে ৮%-এ উন্নীত হবে। সর্বজনীন বয়স্ক শিক্ষা ও মৌলিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত হবে। কার্যকরভাবে পরিবেশ সংরক্ষিত হবে। সাফল্যের সাথে নগরায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা যাবে। ২৫ বছরে ৫ কোটি কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। অবকাঠামো উন্নয়নে বিনিয়োগ এবং দ্রুততর প্রবৃদ্ধির জন্য সম্পদের যোগান বৃদ্ধি পাবে। বিশ্ববাজারে চাহিদার ভিত্তিতে প্রতিযোগিতামূলকভাবে অর্থনীতির বহুমুখীকরণ ঘটবে। এতে বলা হয়, এ উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অর্থায়নের সবচেয়ে বড় উৎস হয়ে উঠতে পারে FDI।

বিশ্বব্যাংক রিপোর্টটিতে ২০২০ সালের উজ্জ্বল বাংলাদেশ গড়ার সম্ভাবনাকে তুলে ধরে বলেছে, তা অর্জনের জন্য বর্তমানে প্রচলিত অনেক রীতিনীতির পরিবর্তন আনতে হবে। প্রশাসনিক অব্যবস্থাপনা ও দুর্বল শাসনব্যবস্থাসহ বিভিন্ন সমস্যার মোকাবিলা করতে না পারলে এ সমৃদ্ধির স্বপ্ন শুধু কল্পনাই রয়ে যাবে।

রিপোর্টটিতে প্রকাশিত প্রাকৃতিক গ্যাস খাতে বাংলাদেশে ভবিষ্যতে প্রত্যাশিত বৈদেশিক বিনিয়োগ বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ অর্থনীতি সম্পর্কে আশাবাদী হতে সমর্থন যোগায়। এছাড়া বিদ্যমান যেসব সম্ভাবনা রয়েছে তা নিম্নরূপ :

১. **তেল ও গ্যাসক্ষেত্রে বিনিয়োগের সম্ভাবনা :** যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রসহ কয়েকটি দেশ বাংলাদেশে তেল ও গ্যাস খাতে বিনিয়োগের জন্য প্রস্তুত। তাদের মতে, বাংলাদেশে এ খাত বিপুল সম্ভাবনাময়। এদিকে গত কয়েক বছরে বাংলাদেশের Energy Sector-এ মার্কিন কোম্পানিগুলোর সরাসরি বিনিয়োগ প্রায় শূন্য থেকে ৫০০ মিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে এবং অতিরিক্ত হিসেবে আরো কয়েকশো মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের অপেক্ষায় আছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসের একটি ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বছর ধরে অনুসন্ধান চালাবার পর এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, বাংলাদেশে বিশ্বের বৃহত্তম তেলখনিসহ অন্তত ১৭টি তেলখনি রয়েছে। আর তেলের মান অত্যন্ত উৎকৃষ্ট। রিপোর্টটিতে উল্লেখ করা হয়, তেল কূপ খনন ও উত্তোলনের খরচ বাদ দিলেও প্রাপ্ত তেল থেকে প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাবে বর্তমান মাথাপিছু আয়ের অন্তত ১৪ শত গুণ বেশি। অবশ্য এ রিপোর্ট বিতর্কিত ও সন্দেহজনক হলেও এ কথা নিশ্চিত যে, বাংলাদেশের তেল সম্পদের ভবিষ্যৎ বিপুল সম্ভাবনাময়।

পেট্রোবাংলায় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মার্কিন ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ বিভাগ (ইউএসজিএস) ও পেট্রোবাংলার যৌথ সমীক্ষা রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, বাংলাদেশে অনাবিষ্কৃত প্রাকৃতিক গ্যাস মজুদের পরিমাণ প্রায় ৩২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট (টিএসএফ), যা গ্যাস সম্পদ উত্তোলনে ভবিষ্যতে বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগকারীদের আগমন সম্পর্কে আশাবাদী হতে সমর্থন যোগায়।

২. **ইপিজেডে বিনিয়োগের সম্ভাবনা :** বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের অন্যতম সম্ভাবনা হলো ইপিজেড এলাকায় বিনিয়োগ। বাংলাদেশে নতুন কোনো বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ইপিজেড-এর অভ্যন্তরস্থ প্রতিষ্ঠানের জন্য ১০ বছর পর্যন্ত Tax Holiday বা শুল্ক রেয়াত অনুমোদিত। ইউরোপ, আমেরিকা, জাপানসহ এশিয়ার বেশ কয়েকটি দেশের বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশের ইপিজেড এলাকায় শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছে। বিনিয়োগকারীদের ক্রমাগত চাহিদা মেটাতে ঢাকা ও চট্টগ্রামের ইপিজেড সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এছাড়া গাজীপুর, কুমিল্লাসহ দেশে আরো ৬টি ইপিজেড নির্মাণ করা হয়েছে। কোরিয়ার একটি বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রামে কর্ণফুলী নদীর তীরে কেইপিজেড নির্মাণ করেছে। তাছাড়া উত্তর চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় বেসরকারি ইপিজেড নির্মাণাধীন রয়েছে। এ থেকে অনুমান করা যায়, বাংলাদেশ এখন শিল্পযুগে পদার্পণ করেছে এবং দেশে দ্রুত শিল্পায়নের ক্ষেত্রে বিনিয়োগের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

৩. **বস্ত্রশিল্পে বিনিয়োগের সম্ভাবনা :** বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের সিংহভাগ অর্জনকারী শিল্পের মধ্যে বস্ত্রশিল্প বা তৈরি পোশাক শিল্প অন্যতম। আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশী তৈরি পোশাকের বিপুল চাহিদা থাকায় দেশী-বিদেশী প্রচুর বিনিয়োগকারী বাংলাদেশের বস্ত্রশিল্পে পুঁজি বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তবে বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব বাজারে টিকে থাকতে হলে বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পকে অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে। প্রথমেই দ্রব্যের গুণগত মান বৃদ্ধি করতে হবে এবং অধিক মূল্যের বাজারে প্রবেশ করতে হবে। বাংলাদেশের উদ্যোক্তা এবং শ্রমিক শ্রেণীর কাজের গুণগত মান ঠিক থাকলে ও ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তুলতে পারলে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতায় সহজেই টিকে থাকতে পারবে। বাংলাদেশের ক্রমসম্প্রসারমাণ গার্মেন্টস শিল্পে বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রবাহ অব্যাহত গতিতে বৃদ্ধি পেলে বাংলাদেশ অচিরেই Garment Valley-তে পরিণত হবে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৪. **কৃষিভিত্তিক শিল্পে বিনিয়োগের সম্ভাবনা :** বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষির গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশ সফরকালে ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট ফিদেল রামোস বলেছিলেন, 'কৃষি ও কৃষিভিত্তিক শিল্পে বিনিয়োগের অপার সম্ভাবনা রয়েছে বাংলাদেশে।' উচ্চফলনশীল ধানবীজের ব্যবহার এবং আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে ধান উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। এছাড়া সাম্প্রতিককালে তেলবীজ, আখ, তুলা, আলু ও গম উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে নাটকীয়ভাবে। তাই বিশ্বায়নের নতুন শতকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষিক্ষেত্রে বিনিয়োগের অপার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

৫. **সম্ভাবনাময় পর্যটন শিল্প :** বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পর্যটন শিল্পের ভূমিকা ও গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশ পর্যটন শিল্পে বিপুল সম্ভাবনাময় এক অসাধারণ সৌন্দর্যমণ্ডিত দেশ, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পর্যটন শিল্পে পুঁজি বিনিয়োগের বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে। পর্যটন শিল্প বিকাশের জন্য উন্নত প্রযুক্তি বা উচ্চ মূলধনের প্রয়োজন নেই। বরং দেশে বিদ্যমান প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানব সৃষ্ট সুবিধাদি দ্বারাই এ শিল্পকে উন্নততর করে তোলা যায়, যা দেশের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন ও জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যাপক অবদান রাখতে পারে।

সাম্প্রতিক বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে বিনিয়োগ বোর্ডের ভূমিকা

দেশে ও বিদেশে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের শিল্প স্থাপনে সর্বোত্তম সহায়তা ও উন্নততর সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ বোর্ডের কার্যক্রম পুনর্বিন্যস্ত করা হয়েছে। বিগত সরকারসমূহ কর্তৃক গৃহীত শিল্প ও বিনিয়োগ-বান্ধব অর্থনৈতিক নীতি ও কৌশল প্রণয়ন এবং বর্তমান সরকার কর্তৃক এই সকল নীতিমালা অব্যাহত রাখায় এই অর্জন সম্ভব হয়েছে। বাংলাদেশের সামগ্রিক মূলধন কাঠামোতে (Gross Capital Formation) বেসরকারি খাতের অবদান সিংহভাগ। প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগের (Foreign Direct Investment) গন্তব্য হিসেবে বাংলাদেশ ক্রমশঃ আকর্ষণীয়, প্রতিযোগিতামূলক ও ব্যয় সাশ্রয়ী দেশ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বেসরকারি খাত উন্নয়নে সরকারের বিনিয়োগমুখী নীতি ও কৌশল অবলম্বনের ফলে বাংলাদেশ ক্রমেই দেশী ও বিদেশী বেসরকারি উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগ-মানচিত্রে (investment map) একটি প্রতিযোগী অর্থায়ন ও গবেষণা প্রতিষ্ঠা Goldman Sachs বাংলাদেশকে 'সম্ভাবনাময় এগারো' (Next-11) দেশের অন্তর্ভুক্ত করার পর বিনিয়োগকারীরা আরো আগ্রহী হয়েছেন। JP Morgan বাংলাদেশকে "Frontier Five" দেশগুলোর অন্যতম হিসেবে অমিত সম্ভাবনার ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে উল্লেখ করেছে। সরকারের বিনিয়োগ-বান্ধব নীতিমালা, বিনিয়োগ পরিবেশ (investment climate) উন্নয়নের প্রত্যয় এবং সর্বোপরি দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগকারীদের অব্যাহত অংশগ্রহণের ধারা এ সম্ভাবনাকে আরো উজ্জীবিত করছে।

উপসংহার : বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের কোনো বিকল্প নেই। বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যেমন রয়েছে অসংখ্য সমস্যা, তেমনি রয়েছে বিপুল সম্ভাবনা। বর্তমান সরকারের শিল্পনীতিতে কৌশলগত কারণে কয়েকটি শিল্পখাত ছাড়া সকল খাত বেসরকারি বিনিয়োগের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। বর্তমানে বিশ্ব অর্থনীতির বিশ্বায়নের ফলে বৈদেশিক বিনিয়োগ আহরণ করে রপ্তানিনির্ভর নতুন নতুন শিল্প প্রসারের সম্ভবনা দেখা দিয়েছে। সম্প্রতি নতুন নতুন আঞ্চলিক অর্থনৈতিক জোটের আত্মপ্রকাশ এবং বাংলাদেশের এসব জোটসমূহের সদস্যপদ প্রাপ্তির ফলে বাংলাদেশে বিদেশী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে।

০৭ ৷ টেকসই উন্নয়ন বলতে কি বোঝায়? বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়নের অন্তরায়গুলো কি কি? *[৩৩তম বিসিএস]*

উত্তর : সৃষ্টির শুরু থেকে মানুষ পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। পরিবেশ ব্যতীত মানুষের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায়ও মানুষ পরিবেশের উপর নির্ভরশীলতা কমাতে পারেনি যেমনটি ছিল আদিম সমাজ ব্যবস্থাতে। বিগত শতকের শুরুর দিকে মানুষের বদ্ধমূল ধারণা ছিল পরিবেশ যতই দূষিত হোক না কেন প্রকৃতির নিয়মেই তা আবার পরিশোধিত হবে। বিশ্বে বিশ শতকের ৬০-৭০ দশকে পরিবেশের দূষণ নিয়ে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা চলে। পরবর্তীতে পরিবেশ বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, পরিবেশ তার নিজস্ব নিয়মে পরিশোধন হতে অক্ষম, মানুষকেই পরিবেশ সংরক্ষণের দায়িত্ব নিতে হবে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে।

টেকসই উন্নয়ন (Sustainable Development) : United Nations Environment Programme (UNEP)-এর এক প্রতিবেদনে বলা হয় 'পরিবেশকে ভিত্তি করে সংঘটিত আর্থ-সামাজিক উন্নয়নই হলো টেকসই উন্নয়ন।' অর্থাৎ পরিবেশকে গুরুত্ব দিয়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন হলো টেকসই উন্নয়ন।

মোটকথা, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ব্যতীত বিশ্বের উন্নয়ন সম্ভব নয়। আবার পরিবেশকে অবিবেচ্য রেখেও পৃথিবীর অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। এ দুইয়ের যথাযথ সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সাথে পরিবেশের প্রতি গুরুত্ব আরোপ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নিরাপদ বিশ্ব সংরক্ষণ করে, যে উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা যায় সেটাই 'টেকসই উন্নয়ন'।

পরিবেশ সংরক্ষণ ও টেকসই উন্নয়ন : ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোতে অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্ব ধরিত্রী সম্মেলনে (Earth Summit) পরিবেশ সংরক্ষণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের কথা বলা হয়। রিও সম্মেলনের ঘোষিত পদক্ষেপ :

- পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি;
- পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ;
- জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ;
- নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার ইত্যাদি।

২০০২ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় বিশ্ব ধরিত্রী সম্মেলন বা টেকসই উন্নয়ন শীর্ষ সম্মেলন। সম্মেলনে মোট ৩৭টি ঘোষণার কথা বলা হয়। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ঘোষণা হলো :

- সম্মিলিত শক্তি ও টেকসই উন্নয়নের অভিন্ন লক্ষ্য অর্জনে ঐক্য প্রতিষ্ঠা
- উন্নয়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে উন্নত দেশগুলোর প্রতি আবেদন জানানো
- বিশুদ্ধ পানি, পয়ঃনিষ্কাশন, পর্যাপ্ত আশ্রয়, স্বাস্থ্য সেবা, খাদ্যের নিশ্চয়তা
- নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণ
- দারিদ্র্য, অপুষ্টি, প্রাকৃতিক বিপর্যয় রোধ
- অপরাধ ও দুর্নীতি রোধ
- ILO'র নীতিমালা অনুযায়ী চাকরির ব্যবস্থা ইত্যাদি।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

কিয়োটো প্রটোকল : জাপানের প্রাচীনতম শহর কিয়োটো শহরে ১৯৯৭ সালে অনুষ্ঠিত হয় The International Conference on Global Warming। বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে এ সম্মেলন ছিল খুবই তাৎপর্য ও গুরুত্বপূর্ণ। জাতিসংঘ এ সম্মেলনের আয়োজক ছিল। ১৯৯৫ সালে Berlin Summit ও ১৯৯৬ সালে Geneva সম্মেলনে পরিবেশ ও টেকসই উন্নয়ন সংক্রান্ত আলোচনা হলেও কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয়নি।

কিয়োটো ঘোষণাপত্র (১৯৯৭) : বিশ্বের উন্নত দেশগুলো এবং সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রগুলো ২০০৮ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে ১৯৯০ সালের স্তররেখা (Stage line)-এর ভিত্তিতে ৫.২% গ্রিন হাউজ গ্যাস হ্রাস করবে। অন্যদিকে, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ৮%, যুক্তরাষ্ট্র ৭%, জাপান ৬% হারে গ্রিন হাউস গ্যাস হ্রাস করতে সম্মত হয়। বর্তমানে কিয়োটো প্রটোকলের মেয়াদ ২০২০ সাল পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।

বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়নের অন্তরায়সমূহ : একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়নের নানাবিধ অন্তরায় বিদ্যমান। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১. **সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব :** বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়নের প্রধান অন্তরায় হলো সুষ্ঠু পরিকল্পনার প্রভাব। উন্নয়নে দক্ষ ও অভিজ্ঞ পরিকল্পনাবিদের সংখ্যা খুবই কম। যেমন– ফসলি জমি, বাড়িঘর, উন্মুক্ত মৎস্যচারণ ক্ষেত্রের কথা চিন্তা না করেই সরকার প্রথমে ময়মনসিংহের ত্রিশালে এবং পরবর্তীতে মুন্সিগঞ্জের আড়িয়ল বিলে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। স্থানীয় জনগণের চাপের মুখে সরকারের এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হতে পারেনি।

২. **পরিবেশ নীতি বাস্তবায়নে ব্যর্থতা :** উপযুক্ত পরিবেশ নীতি টেকসই উন্নয়নের সহায়ক। অথচ স্বাধীনতা পরবর্তী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিবেশ নীতি গৃহীত হলেও আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, সরকারি নীতি নির্ধারকদের উদাসীনতা, দুর্নীতি ইত্যাদি কারণে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। সর্বশেষ ১৯৯২ সালে গৃহীত পরিবেশ নীতিতে কিছুটা আলোর মুখ দেখা গেলেও তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ফলে বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন অধরাই রয়ে গেছে।

৩. **বনাঞ্চল উজাড় :** পর্যাপ্ত বৃক্ষ ও পরিমিত বনাঞ্চল পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা তথা টেকসই উন্নয়নের সহায়ক। বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে মাত্র ১৭.০৮% বনাঞ্চল আছে। এছাড়া অবাধে বৃক্ষনিধন ও বনাঞ্চল উজাড় করা হচ্ছে। ফলে বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

৪. **যত্রতত্র শিল্পকারখানা স্থাপন :** বাংলাদেশে যত্রতত্র স্থানে ব্যাঙের ছাতার মতো কলকারখানা গড়ে উঠছে। অপরিকল্পিত, অনুমোদনবিহীন বা দুর্নীতির আশ্রয়ে ডোবা, নর্দমা, পুকুর ভরাট করে কিংবা জনসতিপূর্ণ এলাকায় গড়ে উঠছে এসব শিল্পকারখানা। এসব শিল্পকারখানায় একদিকে পরিবেশের বিপর্যয়, অন্যদিকে প্রাণহানির ঘটনা ঘটছে। এর ফলে দেখা দিচ্ছে তাজরীন ফ্যাশনে আগুন বা সাভারের রানা প্লাজা ধসের মতো ঘটনা। এ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়নের আশা করা দুরাশার শামিল।

৫. **রাজনৈতিক মেরুকরণ :** বাংলাদেশে রাজনৈতিক মেরুকরণের খেলা খুবই ধ্বংসাত্মক ও ভয়ঙ্কর। রাজনৈতিক মেরুকরণের এ খেলায় সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মতো টেকসই উন্নয়ন প্রক্রিয়াও প্রতিনিয়ত ঘুরপাক খায়। অর্থাৎ একদল যদি টেকসই উন্নয়নে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করে, আরেক দল এসে এ প্রক্রিয়াকে থামিয়ে দিবে– এটা বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির অংশ হয়ে

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

দাঁড়িয়েছে। সুতরাং রাজনৈতিক মেরুকরণ যে বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নে একটি বড় বাধা এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

৬. **দুর্বল ভৌত অবকাঠামো :** টেলিযোগাযোগ, সাবমেরিন ক্যাবল, রাস্তাঘাট, পানি সরবরাহ, সুয়ারেজ ব্যবস্থা, বৈদ্যুতিক গ্রিড ব্যবস্থা প্রভৃতি ভৌত অবকাঠামোগত দিকগুলো বাংলাদেশে খুবই দুর্বল। এগুলোর উন্নয়নে যুগোপযোগী কোনো পদক্ষেপ না থাকায় বাংলাদেশ টেকসই উন্নয়নের পথে খুবই ধীরগতিতে অগ্রসর হচ্ছে।

৭. **বন্যপ্রাণী নিধন :** জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ টেকসই উন্নয়নের সহায়ক। অথচ বাংলাদেশে অবাধে বন্যপ্রাণী নিধন করে শিকারিরা অর্থলোভে বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল ধ্বংস করছে। বন্যপ্রাণী শিকারিরা আন্তর্জাতিক পাচারকারী চক্রের সাথে হাত মিলিয়ে আইনকানুনের তোয়াক্কা না করে তাদের কর্মসাধনে তৎপর। ফলে একদিকে হুমকির মুখে পড়েছে জীববৈচিত্র্য, অন্যদিকে ব্যাহত হচ্ছে টেকসই উন্নয়ন।

৮. **প্রাকৃতিক দুর্যোগ :** জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে পৃথিবীর তাপমাত্রা দিন দিন ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে দেখা দিচ্ছে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এ দুর্যোগের শিকারের তালিকায় বাংলাদেশ এগিয়ে। এতে করে মহাসেন, আইলা, সিডর, নার্গিস প্রভৃতি ঘূর্ণিঝড় বাংলাদেশে অহরহ দেখা দিচ্ছে। এ ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের ধাক্কা সামলিয়ে বাংলাদেশ টেকসই উন্নয়নে পুনঃপুন ব্যর্থতার পাল্লায় দোল খাচ্ছে।

৯. **বিদেশী ঋণের চাপ :** বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে প্রায় সকল উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে বাংলাদেশকে বিদেশী ঋণ বা সাহায্যের উপর নির্ভর করতে হয়। বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এডিবি, জাইকার মতো দাতা সংস্থাগুলো কঠিন শর্তে ঋণ দিয়ে বাংলাদেশের উন্নয়ন অংশীদারে শরিক হয়। বাংলাদেশ বিদেশী ঋণের দায় মেটাতে যেখানে হিমশিম খায়, সেখানে টেকসই উন্নয়নের চিন্তা করা আরেকটা স্বপ্নের মতো।

১০. **অপরিকল্পিত নগরায়ন :** পরিকল্পিত নগরায়ন টেকসই উন্নয়নের একটি অন্যতম শর্ত হলেও বাংলাদেশে এর বিপরীত চিত্র লক্ষ্য করা যায়। ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, সিলেট, বরিশাল, রাজশাহী ও সিলেটে এ চিত্র ব্যাপকভাবে লক্ষণীয়। এসব নগরে অপরিকল্পিত, অনুমোদনহীন ও অন্যায়ভাবে বিভিন্ন স্থাপনা তথা অফিস-আদালত, কলকারখানা গড়ে উঠছে। বৃদ্ধি পাচ্ছে জনসংখ্যার চাপ, সন্ত্রাসীদের তৎপরতা— ব্যাহত হচ্ছে পরিবেশ ও স্বাভাবিক জীবনযাত্রা। আর অপরিকল্পিত নগরায়নের এ সামগ্রিক প্রক্রিয়ার দরুন বার বার মুখ থুবড়ে পড়ছে টেকসই উন্নয়ন প্রক্রিয়া।

১১. **মাত্রাতিরিক্ত কীটনাশকের ব্যবহার :** বিজ্ঞান-প্রযুক্তির উন্নতির দরুন কৃষিজমিতে কীটনাশকের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। কীটনাশক ব্যবহারের ফলে জমির ফলন বৃদ্ধি পেলেও পরিবেশের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হচ্ছে। যেমন– বাতাসের সাথে বিষের দূষণের ফলে মানুষের নানাবিধ রোগ দেখা দিচ্ছে। সুতরাং কীটনাশকের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারও টেকসই উন্নয়নের অন্তরায়।

১২. **জনসচেতনতার অভাব :** টেকসই উন্নয়ন কি বা টেকসই উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তাই বা কি এ ধারণা অশিক্ষিত মানুষ তো বটেই, অনেক শিক্ষিত মানুষের মাঝেও এ ধারণা পরিষ্কার নয়। সুতরাং বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে কোনো বিষয়ে অসচেতন রেখে তার উন্নয়ন কখনোই সম্ভব নয়। তাই টেকসই উন্নয়ন প্রক্রিয়া বাংলাদেশে আলোর মুখ দেখতে পাচ্ছে না।

টেকসই উন্নয়নে বাংলাদেশের পদক্ষেপসমূহ : যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে হবে। বিশ্বব্যাপী Sustainable development চালু হওয়ায় বাংলাদেশের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত নিজস্ব কাঠামোর মাঝে থেকেই উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ। টেকসই উন্নয়নে বাংলাদেশের পদক্ষেপসমূহ নিচে আলোচনা করা হলো :

১. **পরিবেশ নীতির বাস্তবায়ন :** জাতীয়ভাবে বাংলাদেশের একটি সুনির্দিষ্ট পরিবেশ নীতিমালা প্রণয়ন প্রয়োজন। আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কাঠামো সঠিকভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে পরিবেশ নীতিমালাকে শিথিল করা হয়েছে স্বাধীনতা পরবর্তী বিভিন্ন সময়ে। আবার কিছু নীতিমালা ছিল পুরনো আমলের। আধুনিক বিশ্বের প্রেক্ষাপটে সময়োপযোগী পরিবেশ নীতিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ Sustainable development ঘটাতে পারে।

২. **অবকাঠামো বিনির্মাণের পূর্বে পরিবেশ সম্পর্কে চিন্তা করা :** Sustainable development-এর পূর্বশর্ত হিসেবে বাংলাদেশের অবকাঠামোগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে পরিবেশের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন। বর্তমান সময়ের অবকাঠামোগত কার্যাবলী ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য কতটুকু ইতিবাচক ও নেতিবাচক হবে তা বিবেচনায় আনা। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ক্ষতিগ্রস্ত হবে এমন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালিত না হওয়াই উচিত। বাংলাদেশের জনবসতির সংখ্যা পরিমাপ এবং পরবর্তী সময়ের জন্য ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে এমন অবকাঠামো বিনির্মাণের প্রতি গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন।

৩. **সমন্বিত ও সুপরিকল্পিত ভূমি ব্যবস্থাপনা :** বাংলাদেশে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১০১৫ জন লোক বাস করে। আয়তনের তুলনায় জনবসতির ঘনত্ব বেশি বিধায় মাথা পিছু ভূমি ব্যবহারের পরিমাণও কম এবং ভূমির মালিকানা মুষ্টিমেয় শ্রেণীর হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়ায় ভূমির যথাযথ ব্যবহার সম্ভব হয় না। সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমেই সুপরিকল্পিত ভূমি ব্যবস্থাপনার প্রতি আলোকপাত করা প্রয়োজন। মোটকথা, যথাযথ ভূমি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বৈষম্য দূর করার মধ্য দিয়ে টেকসই উন্নয়ন প্রক্রিয়া ঘটানো যেতে পারে।

৪. **জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রণ :** টেকসই উন্নয়নকল্পে যে সকল পদক্ষেপ গৃহীত হওয়া প্রয়োজন তার মধ্যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ অন্যতম। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৪ অনুসারে, বাংলাদেশে বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৭%, প্রতি বর্গকিলোমিটারে বাস করে ১০১৫ জন। জনসংখ্যার বৃদ্ধি বাংলাদেশে ম্যালথাসীয় তত্ত্ব অনুসারে চলছে সেই অনুপাতে বাড়ছে না খাদ্যের উৎপাদন, বাড়ছে না ভূমির পরিমাণ। সুতরাং পরিকল্পিত জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত 'টেকসই উন্নয়ন' সম্ভব নয়।

৫. **শিক্ষার হার বৃদ্ধি ও জনসচেতনতা :** শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমেই জনসচেতনার সৃষ্টি হয়। শহরে এলাকায় শিক্ষার প্রসার বেশি হলেও গ্রামীণ ও পৌর এলাকায় তা অনুপস্থিত। বিগত শাসনামলে এবং বর্তমান সরকার শিক্ষার প্রসারে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। টেকসই উন্নয়ন-এর যে ধারণা তা জনসাধারণের বিশেষ করে গ্রামীণ ও পৌর এলাকার মানুষের কাছে পৌছাতে হবে এবং তাদের মাঝে টেকসই উন্নয়ন ধারণা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে, যা শিক্ষার প্রসার ব্যতীত সম্ভব নয়।

৬. **পরিকল্পিত নগরায়ন :** নগরায়নের মাত্রা বাংলাদেশে খুব বেশি যা মোটেও পরিকল্পিত নয়। অপরিকল্পিত নগরায়ন নগর জীবনে সৃষ্ট সমস্যাগুলোর প্রধান অন্তরায়। 'টেকসই উন্নয়ন' শর্ত হিসেবে নগরায়িত সমাজের প্রয়োজনীয়তা আছে তবে তা সুপরিকল্পিত ও সুবিন্যস্ত হতে হবে।

৭. **শিল্প-কারখানার জন্য নির্দিষ্ট এলাকা :** কল-কারখানার বিষাক্ত ধোঁয়ায় পরিবেশ দূষিত হয়। এই দূষণ রোধকল্পে শিল্প-কারখানাগুলোর জন্য শিল্প এলাকা তৈরি করতে হবে যা জনবসতি থেকে অনেক দূরে হবে। সুপরিকল্পিত উপায়ে শিল্প এলাকা তৈরির মধ্য দিয়ে পরিবেশের সংরক্ষণ সম্ভব। আর পরিবেশ সংরক্ষিত না করে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়।

৮. **কাঠের বিকল্প জ্বালানি ব্যবহার :** কাঠের ব্যবহার জ্বালানি হিসেবে খুব বেশি হয়ে থাকে। বাংলাদেশে কাঠের অবৈধ ব্যবহার পরিবেশের জন্য হুমকিস্বরূপ। একটি দেশে উপযুক্ত পরিবেশ ভারসাম্যের জন্য মোট আয়তনের ২৫% বনভূমি থাকা আবশ্যক। কিন্তু বাংলাদেশে এর পরিমাণ ১৭.০৮%। অবাধে বৃক্ষ নিধনতো চলছেই, যা বাংলাদেশের ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য হুমকিস্বরূপ।

৯. **বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ :** ব্যাপক হারে বৃক্ষরোপণ করতে হবে। বাংলাদেশে সম্প্রতি বৃক্ষরোপণে বিভিন্ন পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে, বৃক্ষরোপণ অভিযানের মাধ্যমে বৃক্ষরোপণে জনসচেতনতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। বৃক্ষ শুধু রোপণ করলেই চলবে না, উপযুক্ত সংরক্ষণের মাধ্যমে এ পদক্ষেপের বাস্তবায়ন করতে হবে।

১০. **রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার কমানো :** সাময়িক সময়ের জন্য রাসায়নিক সারের সুফল পাওয়া গেলেও এতে জমির উর্বরা শক্তি বিনষ্ট হয়, যা পরবর্তীতে উচ্চ ফলনে বাধা সৃষ্টি করে। মাটির যে প্রকৃতিগত শক্তি রাসায়নিক সার ব্যবহারে তার মাত্রা কমে যায়। কীটনাশকে যে রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয় তা জমির জন্য খুবই ক্ষতিকারক। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা বিবেচনায় আনলে এসব পরিহারের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের পথ সুগম করা যায়।

১১. **বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ :** জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের মাধ্যমে বন্যপ্রাণীর অভয়ারণ্য সৃষ্টি করতে হবে। সুন্দরবনসহ অন্য বনাঞ্চলগুলোতে প্রাণীর আবাসস্থলগুলোকে প্রাণী বিচরণের নিরাপদ ক্ষেত্র হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। ২০০২ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে অনুষ্ঠিত বিশ্ব টেকসই সম্মেলনে বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ইস্যুতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১২. **ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন :** টেকসই উন্নয়ন প্রক্রিয়ার বাস্তবায়নকল্পে বাংলাদেশের উচিত রাষ্ট্রীয় ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন ঘটানো। তথ্য প্রযুক্তিতে সহায়তা করে এমন অবকাঠামোর আধুনিকীকরণ করতে হবে। টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা, সাবমেরিন কেবল প্রযুক্তির উপযুক্ত বিকাশ ঘটানো প্রয়োজন।

১৩. **সামাজিক খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি :** সামাজিক খাতে দক্ষ বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন প্রক্রিয়া পরিচালনা সম্ভব। বাড়াতে হবে অবহেলিত মানুষের কর্মক্ষমতা। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে। এ বিনিয়োগ যথাযথভাবে যাতে পরিচালিত হয় যে বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে। দারিদ্র্য নিরসনে যত্নবান হতে হবে।

১৪. **তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নে উৎসাহ প্রদান :** তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নে উৎসাহ ও বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। শিল্পায়নের স্তিমিত ভাব দূর করে কৃষি ও প্রযুক্তি নির্ভর শিল্পায়নে মনোযোগ দিতে হবে। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও শিক্ষিত বেকারদের প্রতি যত্নবান হতে হবে।

১৫. **মানব সম্পদ উন্নয়ন :** সীমিত আয়তনের বাংলাদেশের মানব সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন ঘটাতে হবে। বাংলাদেশে মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। উন্নত ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোতেও মানব সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের প্রতি সুদৃষ্টি দেয়া হয়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

১৬. **আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা :** বাংলাদেশে আইনের যথাযথ প্রয়োগ হয় না বলে দাতাগোষ্ঠী ও বিদেশী সংস্থাগুলো মনে করে, অপ্রয়োগের মাধ্যমে আইনের সুষ্ঠু শাসনের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে হবে। টেকসই উন্নয়ন প্রক্রিয়া আইনের সুশাসন ব্যতীত সম্ভব নয়।

১৭. **দুর্নীতি রোধ ও জবাবদিহিতা :** বার্লিনভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের জরিপে বিশ্বের সর্বোচ্চ দুর্নীতিপরায়ণ রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের স্বীকৃতি বিশ্বব্যাপী। দুর্নীতি রোধে প্রথম পদক্ষেপ জবাবদিহিতার মাধ্যমে নিতে হবে বলে বিশেষজ্ঞ মহল মনে করেন। টেকসই উন্নয়নের পথে দুর্নীতি একটি প্রধান অন্তরায়। জবাবদিহিতার মাধ্যমে এর পরিত্রাণ অবশ্যই সম্ভব।

উপসংহার : একুশ শতকের পৃথিবীর সাথে সঙ্গতি রেখেই বাংলাদেশকে চলতে হবে। উন্নত ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোর মৌলিক পার্থক্য হিসেবে নির্ভরশীলতা ও আধুনিকীকরণকে চিহ্নিত করা হয়। উন্নয়নশীল রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ এখনো উন্নত রাষ্ট্রগুলোর প্রতি নির্ভরশীলতার জালে জড়ানো। Sustainable Development প্রক্রিয়ার যে ধারণা বিশ্বব্যাপী প্রচলিত বাংলাদেশকে এর সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে চলতে হবে। Sustainable Development উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোর জন্য স্বাবলম্বী হবার যে কৌশল ও পদ্ধতির উন্নয়নের কথা বলে বাংলাদেশের জন্য তা নতুন দিগন্তের সূচনা করতে পারে।

০৮ । খাদ্য নিরাপত্তা বলতে কি বোঝায়? কিভাবে বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়? *[২৮তম বিসিএস]*
অথবা, **খাদ্য নিরাপত্তা বলতে কি বোঝেন? খাদ্য নিরাপত্তার ধারণাটি বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করুন।**

উত্তর : বর্তমানে বিশ্বব্যাপী একটি বিরাট সংকট দেখা দিয়েছে আর তা হলো খাদ্য সংকট। যার প্রভাব পৃথিবীব্যাপী পড়েছে, তা হোক উন্নত বিশ্ব কিংবা তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল কোনো দেশ। সবাই এর কমবেশি ভুক্তভোগী। FAO বলেছে যে, 'বিশ্বব্যাপী খাদ্য সংকট কিছু দেশের জন্য গৃহযুদ্ধের জন্ম দিবে এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার জন্ম দিবে।' অন্যদিকে, জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুন বলেছেন যে, 'বিশ্বব্যাপী খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির কারণে নীরব সুনামি চলছে।' খাদ্য সংকট নিয়ে সারা বিশ্বে একটি তোলপাড় অবস্থা। খাদ্য নিরাপত্তার ফলে দিন দিন সারা বিশ্বে দরিদ্র লোকের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। যেমন— FAO-এর হিসাবে ৮৯ মিলিয়ন গরিব মানুষ আছে সারা বিশ্বে, যাদের খাওয়াতে এখন তহবিল ঘাটতি ৫০০ মিলিয়ন ডলার। বর্তমান পরিস্থিতিতে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য অনেকগুলো সমস্যা রয়েছে। কিন্তু তার পাশাপাশি সমাধানও রয়েছে।

খাদ্য নিরাপত্তা কি : খাদ্য নিরাপত্তা বা Food security বলতে আমরা বুঝি যে, যখন খাদ্যের যথেষ্ট মজুদ থাকবে, মানুষ যখন খাদ্য চাইবে তখন তার হাতের কাছে পাবে। প্রত্যেকটি নাগরিকের খাদ্য পাওয়া তার মৌলিক অধিকার। সুতরাং কেউ যখন তার প্রয়োজনীয় খাদ্য না পাবে তখন তাকে তার মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হলো।

খাদ্য নিরাপত্তার বর্তমান পরিস্থিতি : বিশ্বব্যাপী খাদ্য সংকট চরম আকার ধারণ করেছে। খাদ্য সংকটের ফলে খাদ্য নিরাপত্তা চরমভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। সারা বিশ্বে খাদ্য নিরাপত্তার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়।

FAO বলেছে যে, বিশ্বব্যাপী খাদ্য সংকট কিছু দেশের জন্য গৃহযুদ্ধের জন্ম দিবে এবং অভ্যন্তরীণ গোলযোগ সৃষ্টি করতে পারে। FAO-এর বক্তব্যের সূত্র ধরে বলতে হয় যে, তাদের বক্তব্য অনেকটা সঠিক। কারণ ইতোমধ্যে খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির কারণে হাইতিতে দাঙ্গা বেঁধে যাওয়ার পর এ সংকটের বিষয়টি আন্তর্জাতিক মহলের নজরে পড়ে।

এছাড়াও ল্যাটিন আমেরিকা থেকে শুরু করে আফ্রিকা ও এশিয়া পর্যন্ত বিশ্বের প্রায় সব দেশেই হাজার হাজার ক্ষুধার্ত মানুষ জাতিসংঘ খাদ্য বিতরণ কেন্দ্রের সামনে ভিড় জমায়। এশিয়ার অনেক দেশে খাদ্যের মূল্য বৃদ্ধির সংকট এমন পর্যায় গেছে যে, চাল পাহারা দেয়ার জন্য সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

বিশ্বব্যাপী খাদ্য কর্মসূচির হিসাব মতে, অন্তত ৮৫ কোটি মানুষ ভয়াবহ রকম ক্ষুধার্ত এবং দিন দিন বিশ্বব্যাপী ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুন বিশ্বব্যাপী খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধিকে 'নীরব সুনামি' হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, মূল্যবৃদ্ধির সংকট সার্বিকভাবে মোকাবিলা করতে না পারলে তা বিশ্বের সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তা ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। তিনি আরো বলেন– খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির সংকট মানেই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে সাত বছর পিছিয়ে পড়া।

খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থার সমস্যা : খাদ্য সংকট বর্তমান বিশ্বের অন্যতম আলোচিত একটি বিষয়। খাদ্য সংকটের ফলে খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। এর পিছনে অনেকগুলো কারণ রয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতির আলোকে এর সমস্যাগুলো বিস্তারিত আলোকপাত করা হলো :

১. **খাদ্য রপ্তানির ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ :** সারা বিশ্বে যখন খাদ্য সংকট চরম আকারে পৌঁছতে শুরু করেছে ঠিক সেই মুহূর্তে বিশ্বের শীর্ষ চাল রপ্তানিকারক দেশগুলো চাল রপ্তানির ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে। তার মধ্যে ভারত, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ডসহ বিশ্বের প্রধান প্রধান চাল উৎপাদনকারী দেশগুলো খাদ্য রপ্তানির ওপর নিয়ন্ত্রণ করেছে। ফলে কম উৎপাদনকারী দেশগুলো আমদানি করতে পারছে না। যার কারণে খাদ্য সংকট চরম আকার ধারণ করেছে। এছাড়া খাদ্যদ্রব্যের দাম অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে।

২. **জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধি :** বিশ্বের প্রায় ৩৩টি দেশের জ্বালানির দাম কয়েক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। জ্বালানি ছাড়া কোনো কিছুর উৎপাদন সম্ভব নয়। বিশ্বে জ্বালানি রপ্তানিকারক দেশগুলো আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানির মূল্য দ্বিগুণেরও বেশি করে দিয়েছে। ২০০৭-এর তুলনায় ব্যারেল প্রতি ১২০ ডলার বৃদ্ধি পেয়েছে। অতএব জ্বালানির অভাবে খাদ্যোৎপাদন চরমভাবে বিঘ্নিত হয়। সুতরাং খাদ্য সংকট দেখা দেয়, ফলে খাদ্য নিরাপত্তাও বিঘ্নিত হয়।

৩. **জনসংখ্যা বৃদ্ধি :** সারা বিশ্বে জনসংখ্যা বৃদ্ধি অন্যতম একটি সমস্যা বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। আর জনসংখ্যাবহুল দেশগুলোই মূলত এর দ্বারা আক্রান্ত। উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশের কথা চিন্তা করলে দেখা যায় যে, বর্তমান বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যা প্রায় ১৫.৫৮ কোটি (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৪)। উল্লেখ্য, প্রতিবছর এখানে ২০ লাখ করে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে কৃষি জমি কমছে। এই বাড়তি চাহিদা মেটানোর জন্য বছরে বাংলাদেশের উৎপাদন বাড়াতে হবে প্রায় সাড়ে তিন লাখ টন অর্থাৎ চাল উৎপাদনের হার বছরে অন্তত সাড়ে তিন শতাংশ হতে হবে। ফলে এ দেশে খাদ্য নিরাপত্তা চরমভাবে বিঘ্নিত হয়। খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এটি একটি বড় সমস্যা হিসেবে ধরা যায়।

৪. **পরিবেশগত সমস্যা :** বর্তমান বিশ্বে আবহাওয়া পরিবর্তনে বিরাট একটি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রতি বছর খরা, বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৫ নভেম্বর ২০০৭-এ সংঘটিত ঘূর্ণিঝড় সিডরে বাংলাদেশে প্রায় ২৫ লাখ টন খাদ্যশস্যের ক্ষতি

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

হয়। এমনকি ২০০৭ সালে ভয়াবহ খরার কারণে অস্ট্রেলিয়ায় অর্ধেক শস্য নষ্ট হয়। একই ঘটনা ঘটে নাইজেরিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকায়। আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলে শস্য উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটা প্রত্যক্ষ কারণ। অতএব খাদ্য সংকটের অন্যতম কারণ হলো পরিবেশগত সমস্যা।

৫. **মুদ্রাবাজারে ডলারের মূল্য হ্রাস :** যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রাবাজারে ডলারের দাম কমে যাওয়া এবং পুঁজিবাজারে সংকটের কারণে বিনিয়োগ বরাদ্দ পণ্যবাজারে সরে যায়। ২০০৭ সালে পণ্যবাজারে এ ধরনের পুঁজির আক্রমণ ঘটতে দেখা যায়। এ থেকে জার্মানরা প্রচুর পরিমাণ লাভবান হয়েছে। তারা এর নাম দিয়েছে 'লোকাস্ট'। এই পুঁজির সিংহভাগ আসে ধনী দেশগুলোর আত্মরক্ষামূলক পুঁজি থেকে। এর প্রভাব পড়ে দরিদ্র দেশগুলোর ওপরে। এর ফলে খাদ্য সংকট চরম আকার ধারণ করে।

৬. **বিশ্বায়নের প্রভাব :** বিশ্বায়ন বর্তমান বিশ্বের আলোচিত একটি বিষয়। এর যেমন সুফল আছে তেমনি রয়েছে কুফলও। এটি ধনীদের আরো ধনী করে এবং গরিবদের আরো গরিব করছে। খাদ্য সংকট তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এক পরিসংখ্যান রিপোর্টে দেখা গেছে, বিশ্বের এক বিলিয়ন মানুষ কোনো না কোনোভাবে দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করে। অতএব আমরা বলতে পারি এই বিশ্বায়নের ফলে দরিদ্র দেশগুলো চরম খাদ্য সংকটে নিমজ্জিত হয়।

৭. **বায়ো ফুয়েল উৎপাদনের দিকে ঝোঁক :** ওয়াশিংটনভিত্তিক বেসরকারি চিন্তাশালা ওয়ার্ল্ডওয়াচের সভাপতি লেস্টার ব্রাউনের দেয়া তথ্য মতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাষীরা খাদ্যশস্য উৎপাদন কমিয়ে বায়ো ফুয়েল উৎপাদনের দিকে ঝুঁকেছে। এর অন্যতম কারণ হলো মার্কিন প্রেসিডেন্ট চাষীদেরকে ভুট্টার পরিবর্তে ইথানল উৎপাদনের প্রতি বেশি করে উৎসাহ প্রদান করছেন। বিশ্বের অনেক দেশের প্রধান খাদ্য ভুট্টা। মেক্সিকো, মিশর, জাপানসহ অনেক দেশ যুক্তরাষ্ট্র থেকে ভুট্টা আমদানি করে। বিশ্বের প্রায় ৭০% ভুট্টা রপ্তানি করে যুক্তরাষ্ট্র। অন্যদিকে, ব্রাজিল ১২ কোটি হেক্টর কৃষি জমিতে, আফ্রিকার কয়েকটি দেশ মিলে ৪০ কোটি হেক্টর জমিতে জৈব জ্বালানি উৎপাদন করেছে। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, ডিজেল-পেট্রোলের ওপর ১০% নির্ভরতা কমিয়ে জৈব জ্বালানি উৎপাদন করবে। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন— ফসলের জমিতে জৈব জ্বালানি উৎপাদনের এ উন্মাদনা যদি চলতে থাকে তাহলে বিশ্বজুড়ে খাদ্য নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়বে।

৮. **খাদ্যের মূল্য বৃদ্ধি :** FAO-এর হিসাব মতে, সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বে খাদ্যের দাম বেড়েছে ২৩%। অন্যদিকে গমের ৪২%, তেলের ৫০% এবং দুধের ৮০% দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। যা উন্নয়নশীল দেশ কিংবা দরিদ্র দেশের পক্ষে এত চড়া দামে ক্রয় করা অসম্ভব। যার ফলে বিশ্বে ৮৯ মিলিয়ন গরিব মানুষ খাবার পায় না। FAO-এর হিসাব মতে, ৮৯ মিলিয়ন গরিব মানুষকে খাওয়াতে এখন তহবিল ঘাটতি ৫০০ মিলিয়ন ডলার। বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট বলেছেন, এ সংকটের ফলে পৃথিবীর ১০ কোটি মানুষ দরিদ্র অবস্থায় পড়ে যেতে পারে।

৯. **খাদ্যপণ্যে বিনিয়োগের অভাব :** দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে এ দেশের জনগণ মোটামুটি কম এবং স্থিতিশীল দামে খাবার কিনতে পেরেছে। এটা ভোক্তাদের জন্য ভালো হলেও খাদ্যপণ্যে বিনিয়োগ এবং উৎপাদনের জন্য ভালো ছিল না। ফলে কৃষিতে, বিশেষ করে খাদ্যশস্য উৎপাদনে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ হয়নি বাংলাদেশে। বস্তুত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ষাট থেকে আশির দশক পর্যন্ত খাদ্যশস্যের ফলন যে হারে বেড়েছিল নব্বইয়ের দশকে তা অর্ধেকের নিচে নেমে এসেছে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

১০. **আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে উদারীকরণ :** আন্তর্জাতিক বাণিজ্য উদারীকরণ হওয়ার ফলে এ রকম ধারণার সৃষ্টি হয় যে, খাদ্যপণ্যের বিরাট মজুদ আর রাখার দরকার নেই। প্রয়োজনে যে কোনো সময় কেনা যাবে। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় পর্যায়ে এ ধরনের কাজ করে। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশে ২০০৭ সালে বন্যার পরও মজুদ গড়ে তোলার বিশেষ কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। আর আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খাদ্যশস্যের মজুদ কয়েক দশক ধরেই কম ছিল। যা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আশঙ্কাজনকভাবে আরো কমে যায়। ২০০৭ সালের মজুদ ২০০৩ সালের তুলনায় ১০% কমে যায়। মজুদ যথেষ্ট না থাকলে বাজারের ওপর কোনো প্রভাব সৃষ্টি করা যায় না।

সমাধান : বিশ্বজুড়ে খাদ্য সংকট চরম আকার ধারণ করার পিছনে অনেকগুলো সমস্যা রয়েছে। বিশেষ করে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য অনেক সমস্যা রয়েছে। সুতরাং সমস্যার পাশাপাশি সমাধানও রয়েছে। নিচে কিভাবে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায় তার ওপর বিস্তারিত আলোকপাত করা হলো :

১. **সার্ক তহবিল গঠন করা :** সার্কভুক্ত দেশগুলোর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সার্ক তহবিল গঠন করা উচিত। এ বিষয়ে ২০০৭ সালে নয়াদিল্লিতে সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে 'সার্ক ফুড ব্যাংক' গঠন করার ব্যাপারে একমত হয়। এতে প্রায় আড়াই লাখ টন খাদ্যশস্য মজুদ রাখার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। ২০০৮ সালে এসে নেপাল সরকার তার দেশে খাদ্যভাণ্ডার স্থাপনে সম্মতি জানায় এবং তারা চার হাজার টন খাদ্যশস্য যোগান দেয়ার ঘোষণা দেয় কিন্তু আজও তা আলোর মুখ দেখেনি। সুতরাং এ প্রস্তাব অনুযায়ী যদি সার্ক তহবিল গঠন করা হয় তাহলে অন্তত সার্কভুক্ত দেশগুলোর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হতো।

২. **কৃষিখাতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন :** বিশ্বে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার অন্যতম উপায় হচ্ছে কৃষিখাতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন। এটা অসম্ভব নয়। কারণ ২০০৮ সালে বাংলাদেশে বোরো ধানের উৎপাদন ছিল ১ কোটি ৭০ লাখ মেট্রিক টন, যা ২০০৭ সালের তুলনায় ১৪% বেশি। ২০০৮ সালে আলুর ফলন হয়েছে ১ কোটি মেট্রিক টন। যা গত বছরের তুলনায় ৪০% বেশি। সুতরাং কৃষিখাতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারলে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব।

৩. **নিবিড় চাষ :** এর অর্থ হলো সার-বীজ-পানি-সেচ সমন্বিত ও বিজ্ঞানসম্মত চাষাবাদ চালু করা। যেমন- কোন জমিতে কোন ফসলের জন্য কোন সময় কী সার কী অনুপাতে দিতে হবে, সেচ কখন কতটা প্রয়োজন, কোন বীজ দরকার এগুলো বিবেচনায় নিয়ে আবাদ করলে উৎপাদন অনেকগুণে বৃদ্ধি করা সম্ভব।

৪. **খাদ্য রপ্তানির ওপর বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করা :** খাদ্য সংকটের অন্যতম কারণ হলো খাদ্য রপ্তানিতে বিভিন্ন দেশের নিষেধাজ্ঞা আরোপ। যা সত্যিই অনাকাঙ্ক্ষিত। এ ধরনের বিধিনিষেধ থাকলে খাদ্য ঘাটতি হওয়াটা স্বাভাবিক। ইতোমধ্যে বিভিন্ন দেশ রপ্তানির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। যেমন- সম্প্রতি কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ভারত, ভিয়েতনাম, কাজাকিস্তান, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, ইউক্রেন প্রভৃতি দেশ খাদ্যসামগ্রী রপ্তানির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। সুতরাং, খাদ্য উৎপাদনে বিশ্বের শীর্ষ দেশগুলোর রপ্তানির নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারই হতে পারে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের অন্যতম উপায়।

৫. **খাদ্য মজুদ গড়ে তোলা :** খাদ্য নিরাপত্তার জন্য খাদ্য মজুদ গড়ে তোলা একান্ত আবশ্যক। সুতরাং খাদ্য মজুদ গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গড়ে তোলা প্রয়োজন। সিডিপির সুপারিশ মতে, বাংলাদেশে ৫০ লাখ টন খাদ্য মজুদ গড়ে তোলা দরকার। কিন্তু সেখানে দেশের সর্বোচ্চ মজুদ ক্ষমতা হচ্ছে ১২-১৪ লাখ টন।

৬. **নিজস্ব উৎপাদন বৃদ্ধি করা :** খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশের নিজস্ব খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং এর পাশাপাশি প্রত্যেকটি অর্থবছরে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা দরকার। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য অনাবাদি ও পতিত জমি চাষের আওতায় আনার উদ্যোগ নিতে হবে। এ পদক্ষেপ বাস্তবায়িত হলে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব।

৭. **খাদ্য উৎপাদনের জন্য বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা :** খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষিতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়— সৌদি আরব ও চীনের মতো উদ্বৃত্ত খাদ্যের দেশগুলো যদি তাদের সার্বভৌম সম্পদের ১% আফ্রিকার দরিদ্র দেশগুলোতে বিনিয়োগ করে, তবে তা ৩০ বিলিয়ন ডলারের উন্নয়নমূলক ব্যয় তৈরি করতে পারে। এ খাতে যত বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে তত বেশি উৎপাদন বাড়বে।

৮. **সরকারের আন্তরিক সহযোগিতা :** কোনো দেশের খাদ্য সংকট নিরসন কিংবা খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সে দেশের সরকারই যথেষ্ট। কিন্তু সে সরকারের থাকতে হবে আন্তরিক প্রচেষ্টা। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি সরকারের যেসব পদক্ষেপ নেয়া উচিত তা হলো কৃষিতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা, কৃষি ভর্তুকি দেয়া, উৎপাদিত পণ্যে কৃষকদের জন্য ন্যায্যমূল্যের নিশ্চয়তা দেয়া। এসব পদক্ষেপ গ্রহণ করলে দেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অতি সহজ।

৯. **আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সহযোগিতা :** আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সহযোগিতার মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় FAO, World Bank-এর কথা। ২ এপ্রিল ২০০৮ বিশ্বব্যাংকের সাবেক সভাপতি রবার্ট জোয়েলিক ওয়াশিংটনে তার এক ভাষণে খাদ্য সংকট মোকাবিলায় 'নিউডিল'-এর রূপরেখা দিয়েছেন। সুতরাং এই পদ্ধতি বাস্তবায়ন করা হলে খাদ্য নিরাপত্তা অনেকাংশে নিশ্চিত করা সম্ভব। তিনি আরো বলেন, ২০০৫ সাল থেকে খাদ্যের দাম ৮০% বৃদ্ধি পেয়েছে।

১০. **টাস্কফোর্স গঠন করা :** খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজন উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন টাস্কফোর্স গঠন করা, যা খাদ্য সংকট কমিয়ে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রচেষ্টা চালাবে। এই টাস্কফোর্স তদারকিও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুন আন্তর্জাতিক টাস্কফোর্স গঠন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন— যা বাস্তবায়িত হলে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। এছাড়াও কোনো দেশ যাতে তার প্রয়োজনের তুলনায় খাদ্য মজুদ করে না রাখে তা টাস্কফোর্স তদারকি করবে।

১১. **উন্নত ও আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করার ব্যবস্থা করা :** কৃষিনির্ভর দেশে কৃষিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া উচিত। আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করানোর জন্য কৃষকদের যথাযথ প্রশিক্ষণ দেয়া, কৃষকদের সার, বীজ ও আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করা দরকার। যদি এগুলো করা যায়, তবে ফলন বা উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। ফলে খাদ্য সংকট দূর হয়ে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।

১২. **গবেষণা পদ্ধতি চালু :** খাদ্য পরিস্থিতি মূল্যায়নের জন্য নির্ভরযোগ্য স্বাধীন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গবেষণা চালিয়ে যেতে হবে।

উপসংহার : পরিশেষে আমরা একথা দৃঢ়ভাবে বলতে পারি যে, খাদ্য সংকটের ফলে খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গিয়ে অনেক সমস্যা রয়েছে। পাশাপাশি এর সমাধানেরও ব্যবস্থা রয়েছে। সুতরাং উপরিউক্ত সমস্যাগুলো কাটিয়ে উঠে সার্বিকভাবে সমাধান করার ব্যবস্থা করা হলে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব।

০৯ ॥ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ (MDG) কি কি এবং তা অর্জনে বাংলাদেশের অনুসৃত কৌশল ও অর্জিত সাফল্যসমূহ আলোচনা করুন। *[৩৩তম (আন্তর্জাতিক); ৩১তম বিসিএস]*

উত্তর : বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল এবং অনুন্নত রাষ্ট্রগুলোর উন্নতির লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF)-এর গৃহীত সংস্কার কর্মসূচি ব্যর্থ হওয়ার প্রেক্ষিতে এসব দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ২০০০ সালের সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘ আয়োজিত 'সহস্রাব্দ শীর্ষ বৈঠক' অনুষ্ঠিত হয়। এতে ২০১৫ সালের মধ্যে ৮টি লক্ষ্য পূরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। যা 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য' (Millennium Development Goal) নামে পরিচিত। মিলেনিয়াম লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে ২০০২ সালে মেক্সিকোর মন্টেরে শহরে 'উন্নয়নের জন্য অর্থায়ন' শীর্ষক বৈঠকে ধনী ও দরিদ্র দেশগুলোর আলোচনার প্রেক্ষিতে একটি সর্বসম্মত রাজনৈতিক রূপরেখা প্রণীত হয়। ধনী দেশগুলো অর্থায়নের ব্যাপারে একমত পোষণ করে থাকে।

জাতিসংঘের গৃহীত 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য'-এর ৮টি লক্ষ্য আছে। সে লক্ষ্যসমূহ এবং বাংলাদেশের বাস্তবতা—

লক্ষ্য-১ : চরম দারিদ্র্য এবং ক্ষুধা দূর করা।

লক্ষ্যমাত্রা : ১৯৯০ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে মোট জনগোষ্ঠীতে ক্ষুধার্ত মানুষের আনুপাতিক অংশ অর্ধেকে হ্রাস।

বাংলাদেশের বাস্তবতা : সরকার আশা করে যে ২০১৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশ এ লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে। তবে বেসরকারি সংস্থাগুলোর তথ্য অনুসারে গত ৮ বছরে দেশের দারিদ্র্য দূর হয়েছে ৪.৭ শতাংশ। সেই হিসাবে বছরে দারিদ্র্য কমেছে মাত্র ০.৫৪ শতাংশ হারে। কিন্তু MDG পূরণে প্রতি বছর ১.১৫ শতাংশ হারে দারিদ্র্য দূর করতে হবে। বাংলাদেশ ইকনোমিক রিভিউ-এর তথ্য অনুসারে খাদ্য গ্রহণের ভিত্তিতে দারিদ্র্যের হার ২০০০ সালের ৪৪.৭ শতাংশ থেকে কমে ২০১২ সালে দাঁড়িয়েছে ৪০.১২ শতাংশে।

তাছাড়া প্রতিবছর মঙ্গা, খরা, বন্যার কারণে এ লক্ষ্য অর্জন করা খুব কঠিন হয়ে উঠবে। তাছাড়া ধনী গরিব বৈষম্য চরম পর্যায়ে। ১৯৯১-৯২ সালে যেখানে সর্বাধিক ৫ শতাংশ ধনী পরিবারের জাতীয় আয়ের অংশ ছিল ১৮.৮৫ শতাংশ, ২০১০ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৫২ শতাংশ।

লক্ষ্য-২ : সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন।

লক্ষ্যমাত্রা : ২০১৫ সালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার হার শতকরা ১০০ ভাগে উন্নীত করা।

বাংলাদেশের বাস্তবতা : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যানুসারে প্রাথমিক শিক্ষায় অংশগ্রহণের হার ৮৩ শতাংশ। আর প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করার হার ৮০ শতাংশ। আমাদের দেশে শিক্ষা বলতে শুধু সাক্ষরতা ধরে নেয়া হচ্ছে। কিন্তু ২০১৫ সালের মধ্যে মানসম্মত শিক্ষার কথা বলা হয়েছে, যা অর্জন করা বেশ কঠিন।

লক্ষ্য-৩ : নারী-পুরুষের বৈষম্য দূর করা।

লক্ষ্যমাত্রা : ২০০৫ সালের মধ্যে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে এবং ২০১৫ সালের মধ্যে সকল শিক্ষাস্তরে নারী-পুরুষের বৈষম্য দূর করা।

বাংলাদেশের বাস্তবতা : বাংলাদেশ সরকার প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ে লিঙ্গ-বৈষম্য দূর হয়েছে বলে দাবি করেছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকার নারীদের প্রাধান্য দিয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক ক্ষেত্রে কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। ফলে বৈষম্য কিছু কমেছে। কিন্তু বৈষম্য দূর করতে নারীর ক্ষমতায়ন একান্ত জরুরি।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

লক্ষ্য-৪ : শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস।

লক্ষ্যমাত্রা : ১৯৯০ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে ৫ বছরের কম বয়সী শিশুমৃত্যুর হার দুই-তৃতীয়াংশ হ্রাস।

বাংলাদেশের বাস্তবতা : ৫ বছরের নিচে শিশুমৃত্যুর হার হ্রাসে সরকার বেশ সাফল্য পেয়েছে। এক্ষেত্রে টিকা দান কর্মসূচি, পুষ্টিমান বাড়ানো, গ্রামাঞ্চলে চিকিৎসা সেবা পৌঁছানো প্রভৃতি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

লক্ষ্য-৫ : মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নতি।

লক্ষ্যমাত্রা : ২০১৫ সালের মধ্যে প্রসবকালীন মৃত্যুর হার তিন-চতুর্থাংশ হ্রাস।

বাংলাদেশের বাস্তবতা : মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য বাল্যবিবাহ রোধ, প্রশিক্ষিত ধাত্রী দ্বারা প্রসব, প্রসবকালীন জটিলতা সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয়ে সরকারি পদক্ষেপের ফলে এ বিষয়ে বেশ অগ্রগতি হয়েছে।

লক্ষ্য-৬ : এইডস, ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগের বিস্তার রোধ করা।

লক্ষ্যমাত্রা :

১. ২০১৫ সালের মধ্যে এইডস এর বিস্তার রোধ এবং রোগীর সংখ্যা হ্রাস।

২. ২০১৫ সালের মধ্যে ম্যালেরিয়া রোগের বিস্তার রোধ এবং রোগীর সংখ্যা হ্রাস।

বাংলাদেশের বাস্তবতা : সরকারি তথ্য মতে ২০১২ সালের জুন পর্যন্ত বাংলাদেশে শনাক্তকৃত এইডস আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা কয়েক হাজার। কিন্তু এ সংখ্যা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। বেসরকারি হিসেবে এটা কয়েক লাখ হবে। মাদকসেবী এবং পতিতাদের মাধ্যমে এ রোগ বেশি ছড়াতে পারে। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে তেমন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে না।

লক্ষ্য-৭ : টেকসই উন্নয়ন নীতিমালা এবং পরিবেশ নিশ্চিত করা।

লক্ষ্যমাত্রা :

১. জাতীয় পর্যায়ে নীতিমালা এবং কার্যক্রমে টেকসই উন্নয়ন নীতিমালা অঙ্গীভূত করা এবং পরিবেশীয় সম্পদের ক্ষয়রোধ।

২. ২০১৫ সালের মধ্যে সুপেয় পানি প্রাপ্তির সুযোগহীন জনসংখ্যার আনুপাতিক হার অর্ধেকে হ্রাস।

৩. ২০২০ সালের মধ্যে ন্যূনতম ১০ কোটি বস্তিবাসীর জীবনমান লক্ষণীয়ভাবে উন্নত করা।

বাংলাদেশের বাস্তবতা : বাংলাদেশে বনভূমি আছে মাত্র ১৭.০৮ ভাগ। কিন্তু ২৫ ভাগ বনভূমি থাকা জরুরি। তাছাড়া টিউবওয়েলের পানিও আর্সেনিকের কারণে খেতে পারছে না। আর্সেনিক সমস্যা ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। আর গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নতি কম হওয়া এবং জনসংখ্যার আধিক্যের কারণে মানুষ যেভাবে শহরমুখী হচ্ছে তাতে বস্তিবাসীর জীবনমানের উন্নতি সম্ভব নয়।

লক্ষ্য-৮ : উন্নয়নে বিশ্বব্যাপী অংশীদারিত্ব তৈরি করা।

বাস্তবতা : স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ঋণ নিয়ে থাকে। কিন্তু ঋণগুলো এমন শর্ত নির্ভর হয় যেখানে উন্নতির চেয়ে অবনতির সম্ভাবনাই বেশি। তাছাড়া মুক্ত বাণিজ্যের কারণে আমাদের শিক্ষা খাত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সুশাসনের অভাবে এবং দুর্নীতির কারণে ৫ বার দুর্নীতিতে প্রথম হয়েছে বাংলাদেশ।

গৃহীত উন্নয়ন কৌশল/ নীতিসমূহের পর্যালোচনা :

১. **দারিদ্র্য বিমোচন :** দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র (PRSP–I) সরকারিভাবে ১৬ অক্টোবর ২০০৫ গৃহীত হয়েছে। পরবর্তীতে PRSP–I (২০০৫-০৮) ও PRSP–II এর মেয়াদ শেষ হলে ষষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এ পরিকল্পনার মাধ্যমে সরকারি সংস্থা এবং এনজিওগুলো দারিদ্র্য

বিমোচনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে কয়েকশ' এনজিও কাজ করছে। এছাড়া বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের ভাতা দেয়া হচ্ছে। কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে দারিদ্র্য বিমোচন ধীর গতিতে চলছে। উত্তরাঞ্চলের জনগণ মঙ্গাকবলিত, দক্ষিণাঞ্চল এবং মধ্যাঞ্চলে বন্যা জনগণের ব্যাপক ক্ষতি করে। এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগও দারিদ্র্য বিমোচনের অন্তরায় হিসেবে কাজ করছে। তাছাড়া জনগণকে সুশিক্ষিত করতে না পারলে কখনোই দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব নয়। বিশ্বের দিকে তাকালে দেখা যায় যেসব দেশের শিক্ষার হার বেশি তারা তত বেশি উন্নত। তাই সরকারকে আরো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং তার বাস্তবায়ন করতে হবে।

২. **প্রাথমিক শিক্ষা :** বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা এবং গরিব শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান জোরদার করতে হবে। শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য শিক্ষকের প্রশিক্ষণ এবং আর্থিক সহায়তা দান করা প্রয়োজন। ২০১৫ সালের মধ্যে মানসম্মত শিক্ষার জন্য স্কুল এবং শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

৩. **নারী-পুরুষ বৈষম্য দূর করা এবং নারীর ক্ষমতায়ন :** ২০১৫ সালের মধ্যে সকল শিক্ষাস্তরে নারী-পুরুষের বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে সরকার মেয়েদের বিনাবেতনে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশুনার ব্যবস্থা করেছে। এটা আরো বাড়াতে হবে এবং সামাজিকভাবে নারী-পুরুষের বৈষম্য কমানো না গেলে শিক্ষাক্ষেত্রে তা সম্ভব হবে না। তাছাড়া নারীর ক্ষমতায়ন একান্ত জরুরি। সংসদে নারী আসন, ইউপি নির্বাচন প্রভৃতির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নে সরকার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এটি পর্যাপ্ত নয়। দেশে যেখানে সরকারি এবং বিরোধী দলীয় প্রধান দুজনেই মহিলা সেখানে অন্যান্য ক্ষেত্রে মেয়েদের অবস্থান অনেক নিচে। ধর্মীয় কুসংস্কার, ফতোয়া, পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা এজন্য দায়ী। তাই শিক্ষিত করা এবং সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে সরকারকে এ সমস্যা মোকাবিলা করতে হবে।

৪. **শিশু মৃত্যুহ্রাস :** বেসরকারি ক্ষেত্রে যে পুষ্টি কার্যক্রম রয়েছে তা সরকারিভাবে এবং ব্যাপক হারে চালিয়ে যেতে হবে। এছাড়া টিকাদান কর্মসূচি দক্ষতার সাথে চালিয়ে যেতে হবে। চিকিৎসা সেবা গ্রামাঞ্চলে পৌছে দিতে হবে। ইউনিয়ন পর্যায়ে যে চিকিৎসাকেন্দ্র রয়েছে সেখানে চিকিৎসকের সংখ্যা বৃদ্ধি, ওষুধপত্রের সহজলভ্যতা এবং দুর্নীতি রোধ করা একান্ত প্রয়োজন।

৫. **মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নতি :** ইউনিয়ন এবং গ্রাম পর্যায়ে প্রসূতিসেবা, মাতৃমঙ্গলকেন্দ্র চালু এবং প্রশিক্ষিত ধাত্রী ও ডাক্তার রাখা দরকার। তাছাড়া বাল্যবিবাহ রোধ, শিক্ষার বিস্তার এবং সচেতনা বৃদ্ধির মাধ্যমে এগিয়ে যেতে হবে। এসব ক্ষেত্রে সরকারের গৃহীত ব্যবস্থা জোরদার করা না গেলে মাতৃমৃত্যুর হার কমানো সম্ভব নয়।

৬. **এইডস রোধ :** সরকার এইডস নিয়ে খুব সচেতন নয়। কারণ তাদের পরিসংখ্যান এবং বাস্তবতাতে আকাশ-পাতাল তফাৎ লক্ষ্য করা যায়। মাদকসেবীদের একই সুচে মাদক গ্রহণ ব্যবহৃত ডিসপজেবল সিরিঞ্জ অবৈধভাবে হাসপাতালে ব্যবহার, অনিরাপদ রক্ত সঞ্চালন বন্ধ করা এবং পতিতাদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও নিরাপদ স্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে হবে। পতিতালয়গুলোতে কনডম ব্যবহারের ওপর জোর দিতে হবে। সরকারিভাবে এসব নিয়ে তেমন কোনো কাজ হচ্ছে না। বেসরকারিভাবে এইডস নিয়ে যেসব কাজ চলছে তাতে এ ভয়ঙ্কর ব্যাধি রোধ করা সম্ভব হবে না। তাছাড়া ব্যাপকভাবে গণসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এইডস এবং অন্যান্য রোগ থেকে জনগণকে রক্ষা করা সম্ভব।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৭. **টেকসই উন্নয়ন এবং পরিবেশ :** পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় পলিথিন নিষিদ্ধকরণ, ইটের ভাটায় গাছ পোড়ানো বন্ধ, চিমনি ১২০ ফুট লম্বা করা ইত্যাদি ভালো পদক্ষেপ সরকার গ্রহণ করেছে। তাছাড়া বনায়ন কর্মসূচির ফলে জনগণ সচেতন হচ্ছে এবং সরকারি, বেসরকারি এবং ব্যক্তিগতভাবে বৃক্ষরোপণ চলছে। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমাতে না পারলে ভূমি এবং বনভূমির ওপর চাপ বাড়বেই। তাছাড়া জনসংখ্যার আধিক্যের ফলে যে হারে শহরাঞ্চলের জনসংখ্যা বাড়ছে তাতে বস্তিবাসীদের জীবনমান উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমানো এবং গ্রামীণ উন্নয়ন একান্ত জরুরি।

৮. **উন্নয়নে বিশ্বব্যাপী অংশীদারিত্ব তৈরি :** বাংলাদেশ যেহেতু স্বল্পোন্নত দেশ তাই দেশের এসব সমস্যাগুলোকে সাহায্যদাতাদের কাছে তুলে ধরতে হবে এবং বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সুবিধা আদায় করতে হবে। এজন্য কূটনৈতিক যোগাযোগ বৃদ্ধি করতে হবে। এছাড়া বিদেশী সহায়তাগুলোর যথাযথ ব্যবহার এবং দুর্নীতিরোধ করতে হবে।

উপসংহার : 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য' অর্জনের জন্য মূলত যে জিনিস দরকার তা হচ্ছে সদিচ্ছা, দুর্নীতি রোধ, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং গৃহীত নীতিমালার সঠিক প্রয়োগ। বর্তমানে দেশে যে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা তৈরি হয়েছে তা বন্ধ করতে না পারলে এ লক্ষ্য পূরণ কেন কোনো লক্ষ্যই অর্জন করা সম্ভব নয়। তাই দেশে এবং জনগণের উন্নতির স্বার্থে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে যেতে অন্যের সাহায্যের আশায় থাকতে হবে না। নিজের পায়ে দাঁড়াবে বাংলাদেশ।

১০ ॥ বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের সমস্যাসমূহ উপস্থাপন করুন। তৈরি পোশাক শিল্পের সমস্যা থেকে উত্তরণের ক্ষেত্রে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় বলে আপনি মনে করেন? *[৩০তম বিসিএস]*

উত্তর : এক সময় বাংলার মসলিন ও জামদানি ছিল পৃথিবী বিখ্যাত। কিন্তু ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন নামক শোষণ সৃষ্টির ফলে এ শিল্পের অগ্রযাত্রা ব্যাহত হয়। ফলে বাংলাদেশ তার শিল্প গৌরব হারায়। পরবর্তীতে দীর্ঘপথ অতিক্রমের পর বাংলাদেশ তৈরি পোশাক শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে বস্ত্রক্ষেত্রে হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার করেছে। বেসরকারি উদ্যোগে ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে যাত্রা করা তৈরি পোশাক শিল্প ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দে রপ্তানি করতে শুরু করে। আশির দশক থেকে পোশাক শিল্প বিস্ময়কর উন্নতি করতে থাকে। বর্তমানে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার সিংহভাগ আসে তৈরি পোশাক থেকে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ রপ্তানি আয়ের ৮১.৪% পোশাক শিল্প (তৈরি পোশাক ৪১.৫% এবং নীটওয়্যার ৩৯.৯%) থেকে আয় করে *[বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৪]*। প্রায় ৪০ লাখ লোক পোশাক শিল্পের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত। তাই বলা যায়, পোশাক শিল্প বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান খাত, বৈদেশিক বাণিজ্যের বৃহৎ খাত এবং মহিলা শ্রমিকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী বৃহৎ খাত। বর্তমানে বাংলাদেশ ২০টিরও অধিক দেশে পোশাক রপ্তানি করছে। বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের প্রধান ক্রেতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, কানাডা, জার্মানি, বেলজিয়াম ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ। এককভাবে দেশ হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের পোশাকের সবচেয়ে বড় ক্রেতা। বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয়ের ২০.০৬ ভাগ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে অর্জিত হয়। বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের দ্বিতীয় বৃহত্তম বাজার হচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশ যথাক্রমে জার্মানি (১৪.৭৫%), যুক্তরাজ্য (১০.৪২%) ও ফ্রান্স (৫.৩৭%)।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের সমস্যাসমূহ : বর্তমান বিশ্বায়নের এ যুগ হচ্ছে প্রতিযোগিতার যুগ। প্রতিযোগিতার মাধ্যমেই পৃথিবীতে টিকে থাকতে হয়। আর এ প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য প্রয়োজন নানাবিধ প্রস্তুতি। বাংলাদেশের পোশাক শিল্প বিশ্ব বাজারে ভারত, চীন, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড ইত্যাদি দেশের পোশাক শিল্পের সাথে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন। এসব দেশ প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পোশাক শিল্পের উন্নয়নে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। অথচ সে তুলনায় বাংলাদেশ অনেক পিছিয়ে আছে। বাংলাদেশের পিছিয়ে থাকার মূলে রয়েছে তৈরি পোশাক শিল্পের বহুবিধ সমস্যা। পরবর্তী পৃষ্ঠায় ধারাবাহিকভাবে এ সমস্যাগুলো উপস্থাপন করা হলো :

১. **নির্দিষ্ট সময়ে রপ্তানি করতে না পারা :** আমদানিকারকগণ পোশাক ডেলিভারির নির্দিষ্ট সময় সীমা বেঁধে দেন। এ নির্দিষ্ট সময়ে মাল ডেলিভারি করতে না পারলে আমদানিকারকগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, শিল্পের সুনাম ব্যাহত হয়। বিদেশীরা বিকল্প প্রতিষ্ঠান খুঁজতে থাকে। অথচ বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের মালামাল তথা সুতা, বোতাম প্রভৃতি বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। যা আসতে প্রায়ই বিলম্ব ঘটে। ফলে উৎপাদন ব্যাহত হয়, নির্দিষ্ট সময়ে রপ্তানি করতে পারে না।

২. **দক্ষ শ্রমিকের অভাব :** বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের সাথে জড়িত শ্রমিকরা অধিকাংশই অশিক্ষিত, স্বল্পশিক্ষিত ও অদক্ষ। আমদানিকারকরা দেশের মানুষের রুচি ও নির্দেশ মোতাবেক পোশাক তৈরি করতে বলে। কিন্তু বাংলাদেশের অশিক্ষিত, স্বল্পশিক্ষিত, অদক্ষ শ্রমিকরা অনেক সময় নির্দেশ অনুযায়ী চাহিদামতো পোশাক তৈরিতে ব্যর্থ হয়। তাই অনেক সময় বিদেশীরা তা গ্রহণ না করে ফেরত পাঠায় বা ভবিষ্যতে এদেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতি বিমুখ মনোভাব পোষণ করে। ফলে বাংলাদেশের পোশাক শিল্প ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

৩. **উচ্চসুদের হার ও স্বার্থান্বেষী চক্র :** বাংলাদেশের সাথে তৈরি পোশাক শিল্পে প্রতিযোগিতাকারী অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে ব্যাংক ঋণের সুদের হার দুই থেকে তিনগুণ বেশি। তাও বছরের পর বছর ঘুরেও পাওয়া যায় না। প্রকৃত শিল্প মালিকরা ব্যাংক ঋণ পায় না। আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, ব্যাংকের নানামুখী শোষণ, বঞ্চনা, সর্বক্ষেত্রে চরম অসহযোগিতা-অনিয়মের ফলে স্বার্থান্বেষী মহল ব্যাংক ঋণ তুলে অন্য খাতে বিনিয়োগ করে কোটি কোটি টাকার মালিক হচ্ছে। অথচ প্রকৃত শিল্প মালিকরা উচ্চ হারে সুদের কারণে ঋণের দায়ে জর্জরিত হয়ে চোখেমুখে অন্ধকার দেখছে। বাধ্য হচ্ছে পোশাক শিল্পের কারখানা বন্ধ করে দিতে।

৪. **শ্রমিকদের নিম্ন মজুরি :** বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের দ্রুত বিকাশের মূলে রয়েছে শ্রমিক সহজলভ্যতা। শ্রমিক সহজলভ্যতার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে পোশাক শিল্প মালিকরা শ্রমিকদেরকে তাদের ইচ্ছেমতো ব্যবহার করছে। আট ঘণ্টার কাজ বার বা ষোল ঘণ্টা করিয়েও ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত করছে। সরকার শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরির দিক নির্দেশনা দিলেও শিল্প মালিকরা তা মানছে না বা মানতে টালবাহানার আশ্রয় নিচ্ছেন। ফলে পোশাক শিল্পে প্রায়ই অসন্তোষ দেখা দিচ্ছে। শ্রমিকরা আন্দোলন করছে; জ্বালাও, পোড়াও নীতির আশ্রয় নিচ্ছে। যা বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের জন্য সবচেয়ে বড় সমস্যা বলে সম্প্রতি বিবেচিত হচ্ছে।

৫. **বিশ্ববাজারে মূল্যহ্রাস :** গত কয়েক বছরে বিশ্ববাজারে তৈরি পোশাকের মূল্য উল্লেখযোগ্য হারে কমে গেছে। বিশেষ করে ওভেন পোশাকের কাটিং অ্যান্ড মেকিং (সিএম) চার্জ কমেছে ১৫ ভাগের বেশি। উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, আগে প্রতি ডজন পোশাকে সিএম পাওয়া যেত ১০ ডলার। বর্তমানে তা ৬ থেকে ৭ ডলারে নেমে এসেছে। নীট পোশাকের মূল্যও কমেছে উল্লেখযোগ্য হারে। চীন, ভিয়েতনাম এবং অন্যান্য প্রতিযোগী দেশ কম মূল্যে পোশাক সরবরাহ করার কারণে এক্ষেত্রে বাংলাদেশের উদ্যোক্তারা বেশ চাপে রয়েছেন।

৬. **গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংকট :** বিদ্যুৎ ও গ্যাসের তীব্র সংকটের কারণে পোশাক রপ্তানিকারকরা সমস্যায় পড়ছেন। পোশাক উৎপাদনকালীন এসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে অধিকাংশ সময়ই বিদ্যুৎ থাকে না। গ্যাসের চাপ কম থাকায় উদ্যোক্তারা গ্যাস জেনারেটরও ব্যবহার করতে পারেন না। ডিজেলচালিত জেনারেটর দিয়ে উৎপাদন করার কারণে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে। টেক্সটাইল উপখাতেও চলছে গ্যাসের নিম্নচাপ সমস্যা। গ্যাসের চাপ কম থাকায় অনেক মিলের উৎপাদন অর্ধেকে নেমে এসেছে। উদ্যোক্তাদের মতে, গ্যাস এবং বিদ্যুৎ সমস্যার কারণে এ খাতে নতুন উদ্যোক্তা আসছেন না। এক হিসাব মতে, পোশাক ও টেক্সটাইল খাতে বিনিয়োগ ২৬ শতাংশ কমেছে। কাজেই গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংকট বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পকে দিন দিন হুমকির সম্মুখীন করে তুলেছে।

৭. **রপ্তানির সীমাবদ্ধতা :** বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রায় ১১৫ প্রকারের পোশাকের চাহিদা রয়েছে। এর মধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশসমূহের চাহিদা রয়েছে ৮৫ রকমের পোশাকের। অথচ বাংলাদেশ মাত্র ৩৬ রকমের পোশাক উৎপাদন করতে সক্ষম। উৎপাদনের এ সীমাবদ্ধতা বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের অপর একটি বড় সমস্যা। অথচ হংকং ৬৫ রকমের, চীন ৯০ রকমের, ভারত ৬০ রকমের পোশাক রপ্তানি করে থাকে। বাংলাদেশের পোশাক শিল্প সবচেয়ে বেশি প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে ভারত ও চীনের সাথে। উৎপাদনের এ সীমাবদ্ধতা বাংলাদেশের পোশাক শিল্পকে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন করে তুলেছে।

৮. **মূলধনের স্বল্পতা :** বিশ্বের উন্নয়নশীল প্রতিটি দেশেরই শিল্পায়নের প্রধান অন্তরায় মূলধন। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশও এ সমস্যার সম্মুখীন। বাংলাদেশের প্রভূত সম্ভাবনাময় পোশাক শিল্পে যে পরিমাণ মূলধন বিনিয়োগ করা উচিত যথাসময়ে যথাযথভাবে সে পরিমাণে ব্যাংকসমূহ বা ব্যক্তিগত উদ্যোক্তারা বিনিয়োগ করতে পারছে না। ফলে বাংলাদেশের পোশাক শিল্প ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। বাংলাদেশের পোশাক শিল্প অতিমাত্রায় বিদেশী পুঁজির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। নির্ভরশীলতার কারণে অনেকটা বিদেশীদের খেয়াল-খুশিমতো এ শিল্প পরিচালিত হয়। এর ফলে শিল্পের উন্নয়নে অনিশ্চয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

৯. **অনুন্নত অবকাঠামো ও অব্যবস্থাপনা :** বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের অপর একটি সমস্যা হলো অনুন্নত অবকাঠামো। বাংলাদেশের রাস্তাঘাট, কালভার্ট, হাসপাতাল প্রভৃতির অবস্থা যথেষ্ট নাজুক। তাছাড়া রয়েছে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজনীয় বন্দরজনিত অব্যবস্থাপনা ও বন্দরের অভাব। পণ্য খালাস করতে বিদেশী জাহাজগুলোকে দিনের পর দিন অপেক্ষা করতে হয়। কাঁচামাল বিদেশ থেকে আমদানি করার পর বন্দর থেকে তা খালাস করতে এক শ্রেণীর কাস্টমস্ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের হয়রানির শিকার হতে হয়। এক হিসেবে দেখা যায়, বাংলাদেশের কাস্টমস্ কর্মকর্তা-কর্মচারীর ৮০ ভাগই অনৈতিক কাজে জড়িত। এরূপ অব্যবস্থাপনা ও অবকাঠামোগত দুর্বলতা বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করছে।

১০. **আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি :** বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের বিকাশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি সবচেয়ে বড় বাধা হিসেবে কাজ করছে। চাঁদাবাজি, মাস্তানি, ছিনতাই, হরতাল, অবরোধ, বিক্ষোভ, ধর্মঘট, অপহরণ প্রভৃতি অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড দিনের পর দিন একের পর এক ঘটেই চলেছে। এরূপ আইন শৃঙ্খলার অবনতি বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের উন্নয়নে প্রধান অন্তরায় হিসেবে বিবেচনা করা যায়। ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতির উন্নয়ন হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে।

বাংলাদেশে তৈরি পোশাক শিল্পে বিদ্যমান সমস্যা থেকে উত্তরণে আশু সুপারিশসমূহ : বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে সবচেয়ে সম্ভাবনাময় শিল্প হচ্ছে তৈরি পোশাক শিল্প। তাই এ শিল্পকে উত্তরোত্তর উন্নতি ও বিকশিত করতে হলে এর কতিপয় সমস্যার সমাধান অতি জরুরি। এ সম্পর্কে কতিপয় সুপারিশ নিচে ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা হলো :

১. **অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধন করা :** বাংলাদেশের অবকাঠামোগত দুর্বলতা দূর করতে হলে প্রথমে অবকাঠামোগত উন্নয়ন তথা শিল্পাঞ্চলগুলোর সাথে বিশেষ করে ঢাকা-চট্টগ্রাম রেল, সড়ক, আকাশ পথে পরিবহন ব্যবস্থার আরো উন্নয়ন প্রয়োজন। অপরদিকে দ্রুততার সাথে গ্যাস, বিদ্যুৎ সংকট দূরীকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

২. **পশ্চাৎ সংযোগ শিল্পের প্রসার ঘটানো :** বাংলাদেশে তৈরি পোশাক শিল্পের সুতা, বোতাম, কাপড় বিদেশ থেকে ৮৫ ভাগ আমদানি করতে হয়। কেননা দেশে প্রস্তুতকৃত কাপড়ের পরিমাণ খুবই অপ্রতুল। কাজেই পোশাক শিল্পের সমস্যা সমাধানে পশ্চাৎ সংযোগ শিল্পের প্রসার ঘটাতে হবে।

৩. **পোশাক শিল্পকে আয়কর মুক্ত করা :** পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পকে আয়কর মুক্ত করতে হবে। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকার জন্য রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্পের আয় সম্পূর্ণভাবে করমুক্ত করে রপ্তানি বাণিজ্যকে উৎসাহিত করা প্রয়োজন।

৪. **পোশাকের শ্রেণী বৃদ্ধি করা :** বিশ্ববাজারে ১১৫ রকমের পোশাকের চাহিদা থাকলেও বাংলাদেশ মাত্র ৩৬ রকমের পোশাক তৈরি করতে পারঙ্গম। কাজেই বিশ্বের চাহিদা অনুযায়ী বাংলাদেশের পোশাকের শ্রেণী বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন।

৫. **শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা :** বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পখাতে নিয়োজিত শ্রমিক, কর্মকর্তা, কর্মচারীদের দক্ষতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। প্রয়োজনে বিদেশে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রেরণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৬. **অ্যাপারেল বোর্ড গঠন করা :** রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর বর্তমান বস্ত্র সেল পোশাক শিল্পখাতের বর্ধিত কর্মকাণ্ড তত্ত্বাবধান করার জন্য যথেষ্ট নয়। পোশাক সম্প্রসারণের সাথে সাথে তৈরি পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক একটি অ্যাপারেল বোর্ড প্রতিষ্ঠার জন্য দাবি জানিয়ে আসছে। প্রস্তাবিত অ্যাপারেল বোর্ডের নিজস্ব আয় থেকেই এর সকল ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব। উল্লেখ্য যে, প্রতিবেশী দেশ ভারতেও তৈরি পোশাক শিল্প খাতের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড তত্ত্বাবধান করার জন্য অ্যাপারেল বোর্ড রয়েছে।

৭. **বিদেশে লবিস্ট নিয়োগ করা :** বাংলাদেশে তৈরি পোশাক শিল্পের সমূহ সম্ভাবনাকে অবহিত করতে বিদেশে প্রয়োজনে লবিস্ট নিয়োগ করা যেতে পারে। লবিস্ট নিয়োগ করলে তারা বিশ্বের বাজারে বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের ইতিবাচক দিকগুলো তুলে ধরতে পারবে ফলে এদেশে বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধির পাশাপাশি পোশাক রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে।

৮. **আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাতে হবে :** দেশের সুস্থ ও স্বাভাবিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি শিল্পোন্নয়নের পূর্বশর্ত। বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক দলসমূহ কর্তৃক ঘোষিত হরতাল, অবরোধ, ধর্মঘট প্রভৃতির কারণে রপ্তানিমুখী শিল্পখাত, বিশেষ করে রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্পখাত বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়। এ সমস্যার সমাধানকল্পে পোশাক শিল্পখাতকে সকল প্রকার রাজনৈতিক কর্মসূচির আওতামুক্ত রাখার জন্য ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৯. **আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপন তথা প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সাধন করা :** পোশাক শিল্পকে বিশ্ববাজারে তুলে ধরতে হলে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে মানসম্মত পোশাক তৈরি করা। আর এজন্য উন্নত প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি আমদানি করতে হবে। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে। কম খরচে অধিক উৎপাদন করতে পারলে তা পোশাক শিল্পকে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে সহায়তা করবে।

১০. **টেক্সটাইল পল্লী প্রতিষ্ঠা করা :** সুতা, বস্ত্র, পোশাক ইত্যাদি উৎপাদনের ক্ষেত্রে কাঁচামাল যত কম নাড়াচাড়া করা যাবে, উৎপাদন ব্যয় তথা অপচয় তত কমবে। তাই টেক্সটাইল পল্লী প্রতিষ্ঠা করা একান্ত দরকার।

উপসংহার : দেশের রপ্তানি বাণিজ্যে তৈরি পোশাক শিল্পের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এ শিল্প খাত থেকে রপ্তানি আয়ের সিংহভাগই অর্জিত হয়। জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন, অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্বের চাপ রোধ এবং অধিক বৈষয়িক সমৃদ্ধি লাভের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ঘটাতে তৈরি পোশাক শিল্পের অবদান অনস্বীকার্য। এদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মতৎপরতার মেরুদণ্ড এ পোশাক শিল্প আজ নানামুখী সমস্যায় জর্জরিত। বর্তমান প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ বিশ্ববাজারে টিকে থাকতে হলে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পকে অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে। আর এর জন্য অবশ্যই সুষ্ঠু পরিকল্পনা, নীতিমালা এবং সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা অতি জরুরি।

১১ ॥ বাংলাদেশে শিল্পায়নের প্রধান প্রধান প্রতিবন্ধকতাসমূহ নিরূপণ করুন। এসব প্রতিবন্ধকতা কিভাবে দূর করা যায় বলে আপনি মনে করেন? *[১১তম; ২২তম; ২৩তম বিসিএস]*

উত্তর : বিশ্ব আজ মানুষের হাতের মুঠোয়। কারণ শিল্প বিপ্লব মানব জীবনকে স্বপ্নের মতো রঙিন করে দিয়েছে। জীবন হয়েছে সুখের, ভোগের ও আরামের। আবার, অন্যদিকে কতিপয় মানুষ, সমাজ তথা দেশ বিভিন্ন কারণে এর আশীর্বাদ থেকে পিছিয়ে রয়েছে। বাংলাদেশ তেমনি একটি দেশ, যেটা এখনো শিল্পায়নের ক্ষেত্রে তেমন অগ্রগতি অর্জন করতে পারেনি।

বাংলাদেশে শিল্পায়নের প্রধান প্রধান প্রতিবন্ধকতাসমূহ : বাংলাদেশে ঔপনিবেশিক শোষণ, নির্যাতন, রক্তক্ষয়ী আন্দোলন ও বিপ্লবের ফলে শিল্পায়নের তেমন বিকাশ ঘটতে পারেনি। ব্রিটিশ ও পাকিস্তানি শোষণ ও বৈষম্য, অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিরতা, আন্তর্জাতিক রাজনীতির হস্তক্ষেপ প্রভৃতি কারণেও এ দেশে শিল্পায়ন বিকাশ লাভ করতে পারেনি। বাংলাদেশে শিল্পায়নের প্রধান প্রতিবন্ধকতাসমূহ নিচে আলোচনা করা হলো :

১. **ঐতিহাসিক পটভূমি :** বর্তমান বাংলাদেশ যে ভূখণ্ড নিয়ে গঠিত তা ঐতিহাসিক বিভিন্ন পর্বে বিদেশীদের দ্বারা শাসিত, শোষিত, বঞ্চিত, লুণ্ঠিত ও অবহেলিত হয়ে আসছিল। ফলে দেশের আর্থ-সামাজিক ভিত বরাবরই থেকেছে দুর্বল। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে যখন পাশ্চাত্যে ব্যাপক শিল্পায়ন প্রক্রিয়া চলছিল, তারই একটা বিশেষ পর্বে (১৭৫৭-১৯৪৭) বাংলাদেশ ছিল ব্রিটিশ উপনিবেশ। ব্রিটিশ যুগে শাসকগোষ্ঠী ভারতের কয়েকটি স্থানে যেমন— কলকাতা, মুম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি এলাকায় শিল্প-কারখানা গড়ে তুললেও এ অঞ্চলে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার শিল্পায়নে কোনো প্রয়াস নেয়নি। অধিকন্তু তখন বাংলাদেশ ব্রিটিশ শিল্পজাত পণ্য বিক্রির অন্যতম বাজারে পরিণত হয়। ফলে শিল্পায়ন তো দূরের কথা, ব্রিটিশ শিল্পজাতদ্রব্য এখানে আমদানির ফলে আমাদের ঐতিহ্যবাহী তাঁত শিল্পও ভেঙ্গে পড়ে।

২. **উদ্যোক্তার অভাব :** মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে ব্যবসায়িক ঝুঁকি নিতে সক্ষম এমন উৎসাহী ব্যক্তি তথা উদ্যোক্তার অভাব থাকায় বাংলাদেশ শিল্পায়নে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। পাশ্চাত্যের শিল্পায়িত সমাজে অনেক সম্পদশালী ব্যক্তি মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে ব্যবসায়িক ঝুঁকি নিয়ে শিল্প-কারখানা গড়ে তোলে। কিন্তু বাংলাদেশে বরাবরই শিল্পায়নে আগ্রহী ও উদ্যোগী ব্যক্তির বেশ অভাব লক্ষ্য করা গেছে। উদ্যোক্তার অভাবেই বাংলাদেশে শিল্পায়ন প্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে।

৩. **আধুনিক প্রযুক্তি ও কারিগরি জ্ঞানের অভাব :** শিল্প-কারখানা গড়ে তুলতে হলে দরকার আধুনিক প্রযুক্তির পর্যাপ্ততা তথা প্রযুক্তি সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান। কারণ প্রতিটি শিল্প-কারখানায়ই আধুনিক প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হচ্ছে। সেজন্য কেবল পুঁজি ও সদিচ্ছা থাকলেই শিল্প-কারখানা গড়ে তোলা যায় না। শিল্প-কারখানায় ব্যবহৃত হবে এমন যন্ত্রের কলকজা, চালন ক্ষমতা ও কৌশল সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকতে হবে। কিন্তু আমাদের দেশের জনগণের সে জ্ঞানের অভাবে শিল্প-কারখানা গড়ে উঠেনি।

৪. **দক্ষ শ্রমিকের অভাব :** বাংলাদেশ শিল্পায়নের অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে দক্ষ শ্রমিকের অভাব। আমাদের দেশে শিক্ষার হার খুবই কম। তার ওপর শিক্ষা ব্যবস্থা এমন যে, তা দক্ষ শ্রমিকের অভাব পূরণে ব্যর্থ। কারণ আমাদের দেশে আধুনিক প্রযুক্তিগত শিক্ষার অভাব সর্বত্র বিরাজমান। ফলে আমাদের বেকার জনগোষ্ঠীর এক বিরাট অংশই প্রযুক্তি জ্ঞানহীন। সুতরাং দক্ষ শ্রমিকের অভাব আমাদের দেশে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে মারাত্মক বাধা।

৫. **রাজনৈতিক কারণ :** শিল্পায়নের দুটি রাজনৈতিক কারণেও প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। যেমন :

ক. রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বাংলাদেশে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে মারাত্মক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। বিভিন্ন কারণে ঘন ঘন সরকার পরিবর্তন এবং বারবার শিল্পনীতি পরিবর্তিত হওয়ায় বাংলাদেশে শিল্পোন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে না।

খ. কোনো শিল্পপতিই চায় না যে, তার কারখানায় উৎপাদন ব্যাহত হোক। কারণ উৎপাদন ব্যাহত হলে তার লোকসানের আশঙ্কা থাকে। বিভিন্ন কারণে হরতাল, ধর্মঘট, মিছিল, ভাংচুর হলে শিল্পপতিরা শিল্প-কারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি করতে উৎসাহ বোধ করে না।

৬. **প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাব :** বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ দরিদ্র। যারা দরিদ্র নয় তাদের অনেকেরই আবার সঞ্চয় করার মতো আর্থিক সঙ্গতি নেই। আর সঞ্চয় না থাকলে শিল্প-কারখানায় বিনিয়োগের জন্য মূলধন সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। শিল্প-কারখানা স্থাপনের জন্য চাই প্রচুর মূলধন। তাই প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাবেও এখানে শিল্পায়ন ব্যাহত হচ্ছে। জনসাধারণের যে ক্ষুদ্র অংশটি মূলধন গঠনে সক্ষম তাদের অনেকেই আবার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মতো ঝুঁকিপূর্ণ সেক্টরে অর্থ বিনিয়োগ করতে চায় না। তারা তাদের অর্থ জাঁকজমকপূর্ণ ঘরবাড়ি, জমিজমা, স্বর্ণালংকার, গাড়ি ও অন্যান্য বিলাসদ্রব্য সামগ্রীর পেছনে ব্যয় করে। সুতরাং মূলধনের অভাব বাংলাদেশে শিল্পায়নের অন্যতম অন্তরায়।

৭. **মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব :** ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতি শিল্প-কারখানা গঠনের ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করে। একটি বৃহৎ শিল্প-কারখানা গড়ে তুলতে বেশ কয়েক বছর সময় লাগতে পারে। ঐ কারখানা স্থাপনের শুরুতে যে অনুমানিক খরচ ধরা হয় তা থেকে বছরের ব্যবধানে মুদ্রাস্ফীতির কারণে সে খরচ অপর্যাপ্ত মনে হয়। কারণ বিভিন্ন উপকরণের দাম অপ্রতিহত গতিতে বেড়ে চলে। এমন অবস্থায় গৃহীত প্রকল্প

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

শেষ করতে আরো অর্থ খরচ করার প্রয়োজন দেখা দেয়। মুদ্রাস্ফীতির কারণে আমাদের দেশে কোনো শিল্প উদ্যোক্তার পক্ষে তাই স্থির করা সম্ভব নয় যে, তাকে প্রকল্পের জন্য মোট কত অর্থ ব্যয় করতে হবে। আর এসব কারণেই অনেক শিল্প উদ্যোগী ব্যক্তি শিল্প স্থাপনে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

৮. **শর্তহীন বৈদেশিক সাহায্যের অভাব :** এ কথা ঠিক যে, শিল্পায়িত অনেক দেশ এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা বাংলাদেশের উন্নয়নকল্পে তাদের সাহায্যের হাত অধিকতর সম্প্রসারিত করেছে। তবে অভিযোগ রয়েছে, ঐ সব সাহায্য শর্তহীন নয়। সাহায্যদাতা দেশগুলো তাদের দেশের যন্ত্রপাতি এবং কাঁচামাল আমাদেরকে অধিক দামে কিনতে এবং সে দেশের টেকনিশিয়ান বা এক্সপার্টদের অনেক বেতনে এ দেশের বিভিন্ন প্রযুক্তি পরিচালনায় চাকরি দিতে শর্ত আরোপ করে। ফলে বৈদেশিক সাহায্যের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ সাহায্যদাতা দেশেই নানাভাবে ফিরে যায়।

৯. **উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব :** উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব বাংলাদেশের শিল্পায়নের পথে একটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অন্তরায়। বিশেষ করে স্থল ও জলপথ ব্যবস্থা অদ্যাবধি এতই অনুন্নত যে, শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল এবং উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী স্বল্প সময়ে ও স্বল্প ব্যয়ে আনা-নেয়া সম্ভব হয় না। যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুন্নত বলেই আজও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জনসংখ্যার ঘনত্ব ও চাহিদা অনুসারে শিল্প-কারখানা স্থাপন করা যাচ্ছে না। কয়েকটি নির্দিষ্ট এলাকায়ই শিল্প-কারখানা স্থাপনের কাজ সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। সাম্প্রতিক কালের যানজট ও প্রতিনিয়ত পরিবহন ধর্মঘট যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরো বিপর্যয়ের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে।

১০. **কাঁচামাল ও খনিজ সম্পদের অভাব :** শিল্পের জন্য চাই পর্যাপ্ত পরিমাণে ও নিয়মিতভাবে কাঁচামালের সরবরাহ। দেশে বিভিন্ন ধরনের ভারী শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় সব কাঁচামাল আমাদের দেশে পাওয়া যায় না। এগুলো আমদানি করতেও প্রচুর খরচ লাগে। আবার শিল্পের জন্য দরকার পর্যাপ্ত শক্তি সম্পদ বা খনিজ সম্পদ। যেমন—তেল, লৌহ, কয়লা, ইস্পাত ইত্যাদি। এগুলোরও চাহিদা অনুপাতিক অভাবে বাংলাদেশের শিল্পায়ন প্রক্রিয়া দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

১১. **দেশাত্মবোধের অভাব :** আমাদের দেশের জনগণের স্বদেশে তৈরি শিল্পজাতদ্রব্য কেনার পরিবর্তে বিদেশী তৈরি জিনিসপত্র কেনার প্রবণতা বেশি। ফলে দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রি হয় কম এবং এতে করে দেশীয় শিল্পগুলোকে চরম লোকসানের সম্মুখীন হতে হয়। দেশাত্মবোধের অভাবে জনগণ দেশীয় শিল্পের বিকাশে সহযোগিতা করেছে না।

১২. **জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে উচ্চাভিলাষী ও হিতৈষী দৃষ্টিভঙ্গির অভাব :** আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ বরাবরই অল্পে তুষ্ট থেকেছে বা তুষ্ট থাকতে বাধ্য হয়েছে। মোটা ভাত মোটা কাপড় এবং মাথা গুঁজবার ঠাঁই হলেই তারা পরিতুষ্ট। এর চেয়ে বেশি কিছু পাবার তেমন প্রয়োজন বোধই জাগেনি। ইদানীং বিশেষ করে স্বাধীনতা-উত্তরকালে যদিও অনেকেই জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে উচ্চাভিলাষী মনের পরিচয় দিচ্ছে, তথাপি তাদের অনেকেই কেবল ভোগ বিলাসী জীবনের মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখতে চাইছে। আরো অধিক মুনাফার আশায় তথা দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রে অবদান রাখতে হিতৈষী মনে তারা শিল্প-কারখানা গড়ে তুলতে নারাজ। তারা নানা কারণে এটাকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ মনে করে। বিনা ঝুঁকিতে সহজে রাতারাতি অধিক সম্পদশালী হবার বাসনা ও মনমানসিকতার কারণে দেশে একটি স্থায়ী শিল্পপতি শ্রেণী গড়ে উঠতে পারছে না।

প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূরীকরণের উপায় : বাংলাদেশে শিল্পায়নের পথে যেসব অন্তরায় রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে ইতিমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে। বস্তুত ঐ সব প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর করতে পারলেই বাংলাদেশে শিল্পায়ন প্রক্রিয়া দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাবে এবং দেশ শিল্পায়িত হবে বলে আশা করা যায়। নিচে এসব প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের উপায়সমূহ উল্লেখ করা হলো :

১. **অবকাঠামো উন্নয়ন :** বাংলাদেশ সফর শেষে একজন বিশ্বব্যাংক কর্মকর্তা বলেছেন, বাংলাদেশের শিল্পায়ন বিকাশের পথে প্রধান বাধা হচ্ছে দুর্বল অবকাঠামো। যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন বাংলাদেশে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করতে পারে। তাই বাংলাদেশের শিল্পায়নের জন্য অবকাঠামো উন্নয়ন একান্ত অপরিহার্য।

২. **ঋণখেলাপি সংস্কৃতি রোধ :** ঋণখেলাপিরা বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান শত্রু। খেলাপি ঋণ গ্রহীতারা নানা প্রভাব-প্রতিপত্তির মাধ্যমে বিনিয়োগের নামে শত শত কোটি টাকা ব্যাংক থেকে তুলে নির্ধারিত খাতে বিনিয়োগ না করে অন্য অনুৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করে। এই খেলাপি ঋণের হাজার হাজার কোটি টাকা নিয়মিত পরিশোধ করা হলে উক্ত টাকা পুনঃবিনিয়োগের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতি লাভবান হতো। কিন্তু ঋণখেলাপি হওয়ার কারণে দেশ সমৃদ্ধির সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাই জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শিল্পায়নের স্বার্থে এই ঋণখেলাপি সংস্কৃতি বন্ধ করা অতীব জরুরি।

৩. **প্রযুক্তির উন্নয়ন :** বাংলাদেশের শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তির লাগসই ব্যবহার অনুঘটকের ভূমিকা পালন করতে পারে। নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক রবার্ট শোলো প্রমাণ করেছেন যে, দেশের শিল্প ও অর্থনৈতিক উন্নতিতে পুঁজি ও শ্রমের অবদানের তুলনায় প্রযুক্তি উন্নয়ন এবং এর যথোপযুক্ত ব্যবহারের অবদান অনেক বেশি। পুঁজি ও শ্রমের বর্ধিত দক্ষতার সাথে প্রযুক্তির সার্বিক প্রয়োগ না থাকলে উন্নয়নের গতি মন্থর হতে বাধ্য। তাই বাংলাদেশকে শিল্পায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে প্রযুক্তির উন্নয়নে বিশেষ নজর দিতে হবে।

৪. **স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক ও দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন :** সম্প্রতি বিশ্বব্যাংক বলেছে, বাংলাদেশের ৯৮ শতাংশ মানুষের মতে, বাংলাদেশের শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান অন্তরায় হচ্ছে দুর্নীতি। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসন ব্যবস্থার অভাবে প্রশাসনের প্রতিটি পর্যায়ে অপ্রতিরোধ্য গতিতে বেড়ে চলছে দুর্নীতি। তাই শিল্পায়নের স্বার্থে স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক ও দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন।

৫. **রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা :** শিল্পায়নের জন্য দেশে একটি গণতান্ত্রিক তথা স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন। আরো প্রয়োজন উন্নয়নের জন্য একটি যৌক্তিক রাজনৈতিক দর্শনের।

৬. **নীতি নির্ধারণ ও নীতি প্রণয়ন :** সরকারি নীতি নির্ধারণ ও নীতি প্রণয়নে এমন রাজনৈতিক দর্শনের প্রয়োজন যাতে শিল্প-কারখানা গড়ে তুলতে উদ্যোক্তাগণ আগ্রহী হন।

৭. **বিনিয়োগ পরিবেশ সৃষ্টি :** মূলধন গঠনে উদ্বুদ্ধ করা এবং যাদের প্রয়োজনীয় মূলধন রয়েছে তারা যাতে নির্বিঘ্নে নিরাপত্তার সাথে শিল্প-কারখানায় অর্থ বিনিয়োগ করতে উৎসাহিত হতে পারে, তেমন একটি অনুকূল সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৮. **আমলাতান্ত্রিক জটিলতা দূর করা :** আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে অনেক সময় প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে অতিরিক্ত অনেক সময় লেগে যায়। ফলে প্রকল্প ব্যয় বেড়ে যায় বহুগুণ। তাই শিল্প স্থাপনের উপাদান সহজলভ্য করার জন্য আমলাতান্ত্রিক জটিলতা দূর করাসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক।

৯. **দেশাত্মবোধ সৃষ্টি :** দেশাত্মবোধ সৃষ্টির জন্য দেশীয় পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধি ও বিদেশী পণ্য বর্জন করার মন-মানসিকতা সৃষ্টি করতে জনমত গড়ে তুলতে হবে। বস্তুত স্বদেশী শিল্পের বিকাশের জন্য চাই ত্যাগ স্বীকার এবং প্রকৃত দেশপ্রেম। আমরা যদি বাইরের জিনিস ব্যবহার একেবারে বাদ দিতে পারি, তাহলে দেশী শিল্পজাত দ্রব্যের মান ক্রমেই প্রতিযোগিতায় স্বাভাবিক নিয়মে উন্নত হবে এবং বিদেশী দ্রব্যের প্রতি মোহ পরিত্যাগ করাও সহজ হবে।

১০. **উন্নত জীবনযাত্রা সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি :** সমাজের সকল শ্রেণীর মধ্যে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করার মতো একটা সদিচ্ছা তথা অভিলাষ সৃষ্টি করতে হবে এবং ঐ সদিচ্ছা পূরণের জন্য দেশকে যে শিল্পায়িত করতে হবে এটার গুরুত্ব অনুধাবন করার ব্যবস্থাও করতে হবে।

১১. **কাঁচামাল সহজলভ্যকরণ :** শিল্পায়নের স্বার্থে কাঁচামালের সহজলভ্যতা সৃষ্টিতে প্রয়োজনবোধে সরকারকে ভর্তুকি প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

উপসংহার : বাংলাদেশের শিল্পায়নের ক্ষেত্রে রয়েছে অজস্র সমস্যা। এদিকে নতুন বিশ্ব ব্যবস্থায় অর্থনীতি মূল নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা গ্রহণ করায় বাংলাদেশকেও শিল্প ও অর্থনৈতিক উন্নতির দিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হচ্ছে। তাই বাংলাদেশের শিল্পায়নের জন্য উপরোক্ত সম্ভাব্য করণীয়সমূহ যথাযথভাবে গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং আঞ্চলিক অর্থনীতির সংহতিকরণের মাধ্যমে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে প্রাণসঞ্চার করতে পারবে বলে আশা করা যায়।

১২ ॥ রপ্তানি বাণিজ্যে বাংলাদেশের সাফল্য ও ব্যর্থতা আলোচনা করুন। *[১১তম বিসিএস]*

উত্তর : বর্তমান বিশ্বের মুক্তবাজার অর্থনীতির অবাধ প্রতিযোগিতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের গুরুত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাথে বাণিজ্যিক কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। প্রতি বছর জনশক্তি, তৈরি পোশাক, পাটজাত দ্রব্য, মৎস্যজাত দ্রব্য রপ্তানি করে বাংলাদেশ তার অর্থনীতিকে সচল রাখতে বদ্ধপরিকর। তারপরও বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন আমাদের দেশের বাণিজ্যব্যবস্থা। বাংলাদেশের বাণিজ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো লেনদেনের ঘাটতি। তাই লেনদেন ঘাটতি দূরীকরণের লক্ষ্যে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনের জন্য বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য বহুমুখী করার পদক্ষেপ নিতে হবে। বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের ব্যর্থতাগুলো দূর করতে পারলেই বাংলাদেশের বাণিজ্য হবে স্বয়ংসম্পূর্ণ-আত্মনির্ভরশীল।

বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য : উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নিচে বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হলো :

১. **কাঁচামাল রপ্তানি :** বাংলাদেশ মূলত একটি কৃষিপ্রধান দেশ। তাই এদেশের রপ্তানি দ্রব্যের শতকরা ২০ ভাগই কাঁচামাল। কাঁচামালগুলোর মধ্যে কাঁচা পাট, চা, চামড়া, হিমায়িত খাদ্যসামগ্রী ইত্যাদি প্রধান।

২. **জনশক্তি রপ্তানি :** জনশক্তি রপ্তানি বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। মাত্র ৬ হাজার লোক রপ্তানির মাধ্যমে এ বাণিজ্যের সূত্রপাত হলেও আজ রপ্তানি বাণিজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এই জনশক্তি রপ্তানি। যার মাধ্যমে প্রতি অর্থবছরে গড়ে ২০০০ মিলিয়ন ডলার আয় করে বাংলাদেশ।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৩. **তৈরি পোশাক রপ্তানি :** বর্তমানে বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ আসছে তৈরি পোশাক রপ্তানির মাধ্যমে।

৪. **সীমিত বাণিজ্যক্ষেত্র :** আমাদের রপ্তানির পরিমাণ কম হওয়ায় বাণিজ্যক্ষেত্রও সীমিত। শুধুমাত্র ২৫-৩০টি রাষ্ট্রের সাথে রপ্তানি বাণিজ্য প্রচলিত।

৫. **অপ্রচলিত পণ্য রপ্তানি :** বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে অপ্রচলিত পণ্যের রপ্তানি লক্ষ করা যায়। যার ফলে রপ্তানি আয় অনেকাংশে ব্যাহত হয়।

৬. **প্রতিবেশী দেশের সাথে বাণিজ্য :** বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য মূলত প্রতিবেশী দেশসমূহের মধ্যে বিদ্যমান। ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, চীন প্রভৃতি দেশের সাথে ভালো বাণিজ্য সম্পর্ক রয়েছে।

৭. **ওয়েজ-আর্নার স্কিম :** রপ্তানি বাণিজ্যে উৎসাহ প্রদানের জন্য সরকার ওয়েজ আর্নার স্কিম প্রবর্তন করেছে। ফলে সাধারণ জনগণ দ্রব্যসামগ্রী রপ্তানি করে বৈদেশিক বাণিজ্যে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছে।

৮. **সরকারি নিয়ন্ত্রণ :** বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য পরিচালিত হয় পুরোপুরি সরকারি নিয়ন্ত্রণে। 'রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো' এর মাধ্যমে বাংলাদেশের রপ্তানি কার্য পরিচালিত হয়।

৯. **এলাকাভিত্তিক বাণিজ্য :** বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য এলাকাভিত্তিক। বাংলাদেশ ডলার ও স্টার্লিং এলাকার বাইরে প্রচুর রপ্তানি করে। কিন্তু ডলার ও স্টার্লিং এলাকার দেশসমূহ হতে আমদানি করে।

১০. **বৈদেশিক প্রভাব :** বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে বৈদেশিক প্রভাব রয়েছে। কারণ রপ্তানি সম্পর্কিত সকল কাজ বিদেশী সংস্থার মাধ্যমে করতে হয়।

১১. **প্রতিকূল বাণিজ্য শর্ত :** বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য প্রতিকূল বাণিজ্য শর্তের সম্মুখীন। ফলে, আমাদের রপ্তানি চাহিদা বিশ্ববাজারে অস্থিতিস্থাপক।

বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ বিদ্যমান। রপ্তানি বাণিজ্যে উন্নতি করতে হলে প্রতিকূল বৈশিষ্ট্যগুলোকে অনুকূলে নিয়ে আসতে হবে।

বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি দ্রব্যসমূহ : বাংলাদেশ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পণ্য রপ্তানি করে থাকে। বাংলাদেশ প্রধানত পাট, পাটজাত দ্রব্য, চা, চামড়া, চামড়াজাত দ্রব্য, হিমায়িত খাদ্য, তৈরি পোশাক, রাসায়নিক দ্রব্য, হোসিয়ারি দ্রব্য, তাজা ও কৃত্রিম ফুল ইত্যাদি রপ্তানি করে থাকে।

বাংলাদেশের রপ্তানি দ্রব্যের ক্রেতা দেশ : বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন দেশ পণ্য আমদানি করে থাকে। বাংলাদেশের নির্দিষ্ট পণ্যদ্রব্যের জন্য নির্দিষ্ট বাজার রয়েছে। বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানি ও রপ্তানিকারী দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে :

১. **তৈরি পোশাক :** বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের সবচেয়ে বড় বাজার যুক্তরাষ্ট্র। দেশভিত্তিক রপ্তানি বাণিজ্যে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় উৎস এই যুক্তরাষ্ট্র। এছাড়াও তৈরি পোশাকের দ্বিতীয় বৃহত্তম ক্রেতা ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহ।

২. **হিমায়িত খাদ্য :** বাংলাদেশ থেকে হিমায়িত খাদ্য আমদানি করে ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, থাইল্যান্ড, মধ্যপ্রাচ্য, ইইউ প্রভৃতি দেশ।

৩. **চামড়া :** যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, জাপান, কোরিয়া, ভারত, বেলজিয়াম, পোল্যান্ডে বাংলাদেশ চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য রপ্তানি করে থাকে।

৪. **চা :** বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, জার্মানি, ভারত, রাশিয়া, ফ্রান্স, ইতালি এসব দেশে চা রপ্তানি করা হয়।

৫. **পাট :** পাট ও পাটজাত দ্রব্য যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ইতালি, রাশিয়া, জার্মানি, জাপান, ভারত, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি প্রভৃতি দেশে রপ্তানি করা হয়।

৬. **কাগজ ও নিউজপ্রিন্ট :** ভারত, পাকিস্তান, ইরাক, হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড প্রভৃতি দেশে কাগজ ও নিউজপ্রিন্ট রপ্তানি করা হয়।

৭. **হস্তশিল্পজাত দ্রব্য :** যুক্তরাষ্ট্র, ইতালি, যুক্তরাজ্য, মধ্যপ্রাচ্য প্রভৃতি দেশে হস্ত ও কুটির শিল্পের বিভিন্ন দ্রব্য রপ্তানি করা হয়।

এছাড়া আরও বেশকিছু দ্রব্য প্রতিবেশী দেশসহ অন্যান্য দেশে রপ্তানি করা হয়, যার ফলে বাংলাদেশ রপ্তানি বাণিজ্যের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে পেরেছে।

বাংলাদেশের অপ্রচলিত রপ্তানি দ্রব্যের সম্ভাবনা : বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ একটি দেশ। এ দেশে প্রচলিত দ্রব্যের পাশাপাশি এমন সব অপ্রচলিত দ্রব্য আছে যা রপ্তানি করে একটি বিশাল পরিমাণ মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। এসব দ্রব্যের মধ্যে শাকসবজি, ফলমূল, পান, গোলআলু, মৃৎশিল্প, বাঁশ ও বেত, দড়ি, বিভিন্ন প্রকার ধাতব পদার্থ, কাঠ দ্বারা তৈরি আসবাবপত্র, চিটাগুড়, ছবি, মশলা, হোসিয়ারি দ্রব্য, ভেষজ উপকরণ প্রভৃতি। সম্প্রতি বিশ্ববাজারের প্রেক্ষাপটে বলা যায় যে, প্রচলিত দ্রব্যের পাশাপাশি অপ্রচলিত দ্রব্যের চাহিদাও সমান তালে বেড়ে চলেছে। এমতাবস্থায় উৎপাদন বৃদ্ধি, মান উন্নয়ন, বাজার অনুসন্ধান, আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর মাধ্যমে এসব অপ্রচলিত পণ্যের রপ্তানি বাড়ানো যায়। যা বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে একটি বিরাট সম্ভাবনা। তাই এ উৎসকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যিকে চলমান করা উচিত।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে রপ্তানি বাণিজ্যের গুরুত্ব : একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে রপ্তানি বাণিজ্যের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। নিচে রপ্তানি বাণিজ্যের গুরুত্ব আলোচনা করা হলো :

১. **বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন :** বাংলাদেশের উদ্বৃত্ত কৃষি ও শিল্পজাত পণ্যসামগ্রী বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। এটি দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

২. **দেশীয় পণ্যের বাজার সৃষ্টি :** রপ্তানির মাধ্যমে বিদেশে দেশীয় পণ্যের নতুন ভোক্তার সৃষ্টি হয় এবং চাহিদার যোগান দিতে দেশীয় পণ্যের নতুন বাজার সৃষ্টি হয়।

৩. **মূলধনের গতিশীলতা বৃদ্ধি :** রপ্তানির মাধ্যমে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় বৃদ্ধি পায়। ফলে আন্তর্জাতিক লেনদেনের ভারসাম্য বজায় থাকে ও মূলধনের গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়।

৪. **বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস :** রপ্তানি বাণিজ্যকে গতিময় করতে পারলে বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভর না করেই বাংলাদেশের অর্থনীতি স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে।

৫. **অপ্রচলিত পণ্য রপ্তানি :** বাংলাদেশ যেসব পণ্যের চাহিদা কম সেসব পণ্য রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারে।

৬. **আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বৃদ্ধি :** রপ্তানি বাণিজ্যের মাধ্যমে বাংলাদেশের সাথে অন্যান্য দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে যা বাংলাদেশের বাণিজ্যকে আরও ত্বরান্বিত করে।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে রপ্তানি বাণিজ্যের গুরুত্ব অত্যধিক। কারণ বাংলাদেশের পণ্যের বিদেশের বাজারে একটি অন্যতম বাজার দখলের সম্ভাবনা রয়েছে।

বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে সমস্যাসমূহ : বাংলাদেশ রপ্তানি বাণিজ্যে আজও পশ্চাৎপদ রয়েছে। এদেশের রপ্তানি বাণিজ্য বিভিন্ন সমস্যায় নিমজ্জিত বলে রপ্তানি বাণিজ্যের সাফল্য এখনো অর্জিত হয়নি। বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে যেসব সমস্যা বিদ্যমান তা নিম্নরূপ :

১. **সুষ্ঠু রপ্তানি নীতির অভাব :** বাংলাদেশের বাণিজ্য নীতি সরকার ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তনশীল বিধায় রপ্তানি নীতিও পরিবর্তিত হয়। ফলে স্থায়ী পরিকল্পনা প্রণয়নে রপ্তানিকারকগণ বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন হন।

২. **স্বল্পসংখ্যক পণ্য রপ্তানি :** বাংলাদেশ স্বল্পসংখ্যক ও নির্দিষ্ট পণ্য রপ্তানি করে। বিশ্ববাজারের চাহিদা অনুসারে পণ্য সরবরাহ করতে না পারা বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের অন্যতম প্রধান সমস্যা।

৩. **বাণিজ্য চুক্তির অভাব :** সার্কভুক্ত দেশসমূহ এবং এশিয়া ও ইউরোপ-আমেরিকার কয়েকটি দেশ ছাড়া অনেক দেশের সাথেই বাংলাদেশের বাণিজ্য চুক্তি নেই। ফলে অনেক দেশে পণ্য রপ্তানি করা সম্ভব হচ্ছে না।

৪. **নিম্নমানের পণ্য :** বাংলাদেশে উৎপাদিত পণ্যের বেশির ভাগই নিম্নমানের বিধায় বৈদেশিক বাজারে এর চাহিদা কম।

৫. **মূলধনের অভাব :** বাংলাদেশের অধিকাংশ রপ্তানি কারকেরই নিজস্ব মূলধন নেই। তারা পর্যাপ্ত সরকারি সহযোগিতা পায় না। অন্যদিকে সরকারি ঋণব্যবস্থা কঠিন শর্তযুক্ত থাকে বলে অনেকেই রপ্তানি বাণিজ্যে আগ্রহী হয় না।

৬. **দুর্নীতি ও রাজনৈতিক অস্থিরতা :** বাংলাদেশে প্রবাহমান দুর্নীতি ও রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্য এ দেশের পণ্য আমদানিতে অনেক দেশ আগ্রহ দেখায় না।

এছাড়াও চোরাচালান, পরিবহনে সমস্যা, খাদ্য ঘাটতি, মূল্য স্থিতিশীলতার অভাব প্রভৃতি কারণে দেশের রপ্তানি বাণিজ্য সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। রপ্তানি বাণিজ্যে প্রভূত উন্নয়ন করতে এসব সমস্যা দূর করতে হবে।

বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে সাফল্য-ব্যর্থতা : বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রধান সমস্যা হলো লেনদেনের ভারসাম্যের অব্যাহত প্রতিকূলতা। একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে প্রচুর পরিমাণ ভোগ্যপণ্য আমদানি করতে হয়। বিশ্ব বাণিজ্যে এসব পণ্যদ্রব্যের দাম ক্রমবর্ধমান। অপরদিকে বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য ক্ষুদ্র ও অবিকেন্দ্রীকৃত হওয়ায় রপ্তানি আয় আমদানি ব্যয়ের তুলনায় অনেক কম। বর্তমানে আমাদের আমদানি ব্যয়ের মাত্র ৬০ ভাগ রপ্তানি আয় দ্বারা মেটানো সম্ভব। বাকি ৪০ ভাগ আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যর্থতা। তাই স্বাধীনতার পর থেকে অদ্যাবধি বাংলাদেশ বৈদেশিক বাণিজ্যের ভারসাম্য অব্যাহত প্রতিকূলতার সম্মুখীন।

প্রদত্ত সারণী থেকে বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের বাস্তব চিত্র প্রকাশ পাবে—

বাংলাদেশের আমদানি-রপ্তানির তুলনামূলক চিত্র (মিলিয়ন ডলারে)

অর্থবছর	*আমদানি ব্যয়*	*রপ্তানি আয়*	*ঘাটতি (–)*
২০০৯-১০	*২৩৭৩৮*	*১৬৫৭৯*	*(–) ৭১৫৯*
২০১১-১২	*৩৩৬৫৮*	*২২৯২৮*	*(–) ১০৭৩০*
২০১১-১২	*৩৫৫১৬*	*২৪২৮৮*	*(–) ১১২২৮*
২০১২-১৩	*৩৪০৮৪*	*২৭০১৮.২৬*	*(–) ৭০৬৫.৭৪*
২০১৩-১৪ (জুলাই-মার্চ)	*১৮৭৪৭*	*১৪৬৮৫.৮১*	*(–) ৪০৬১.১৯*

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

উপরিউক্ত সারণিটি বিশ্লেষণ করলেই বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের বাস্তব অবস্থা অনুভব করা যায়। লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, প্রতিটি অর্থবছরেই আমদানি ব্যয় রপ্তানি আয়ের তুলনায় অনেক বেশি। তাই সৃষ্টি হচ্ছে বাণিজ্য ঘাটতি। বাণিজ্য ঘাটতি ছাড়াও অদৃশ্যমান কিছু ঘাটতি বৃদ্ধি পাচ্ছে। অবশ্য আমাদের বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাসে ওয়েজ আর্নার্স স্কিম সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। ওয়েজ আর্নার্স স্কিমের অধীনে বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণের পরিমাণ ক্রমে বাড়ছে। তা সত্ত্বেও দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান খাতে আমদানি ও বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের পরিমাণ বৃদ্ধির কারণে লেনদেন প্রতিকূলতা থেকেই যাচ্ছে। এ ভারসাম্যহীনতা জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করে। বলা যায় যে, রপ্তানি বাণিজ্য দেশের চাহিদা পূরণে ব্যর্থ। তাই, লেনদেনের ভারসাম্যের এরূপ প্রতিকূলতা দূরীকরণের জন্য আশু পদক্ষেপ নেয়া অত্যাবশ্যক।

বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে ব্যর্থতা দূরীকরণের উপায় : বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের বহুবিধ সমস্যা রয়েছে। এ সমস্যাগুলো থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার লক্ষ্যে কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক। এজন্য সরকার ও রপ্তানিকারকের সমন্বিত প্রচেষ্টা সবচেয়ে জরুরি। নিচে বাংলাদেশের রপ্তানি বৃদ্ধির পদক্ষেপসমূহ আলোচনা করা হলো :

১. **রপ্তানি-নীতি প্রণয়ন :** বাংলাদেশের রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য যুগোপযোগী রপ্তানি-নীতি প্রণয়ন করা প্রয়োজন। তা না হলে বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য বারবার বাধাপ্রাপ্ত হবে।

২. **পণ্যের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি :** বিশ্ববাজারে পণ্যের চাহিদা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে স্বাভাবিকভাবে পণ্যের মান উন্নত করা প্রয়োজন।

৩. **পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি :** বাংলাদেশে কৃষি ও শিল্পজাত পণ্যের উৎপাদন কম। তাই অধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে।

৪. **পণ্যের মূল্য হ্রাস :** পণ্যের উৎপাদনব্যয় হ্রাস করে, কম মূল্য নির্ধারণ করলে বিদেশী বাজারে পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে।

৫. **রপ্তানি শুল্ক হ্রাস :** রপ্তানির ওপর শুল্ক হ্রাস করে অথবা শুল্ক প্রত্যাহার করে রপ্তানি প্রক্রিয়া সহজ করলে রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে। পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রাও বেশি অর্জিত হবে।

৬. **বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন :** রপ্তানি ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আনয়নের জন্য অনেকগুলো দেশের সাথে দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি সম্পাদন করে রপ্তানি বাণিজ্যে বেশি সুযোগসুবিধা লাভ করা যায়।

৭. **পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন :** পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সাশ্রয়ী করে রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধি করা সম্ভব।

৮. **চোরাচালান প্রতিরোধ :** বাংলাদেশের বিপুল পরিমাণ রপ্তানিজাত দ্রব্য চোরাপথে পার্শ্ববর্তী দেশে চলে যায়। ফলে বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য অনেকাংশে ব্যাহত হয়। তাই রপ্তানি বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে চোরাচালান প্রতিরোধ করতে হবে।

৯. **প্রচারের ব্যবস্থা :** বিদেশে বাংলাদেশের পণ্যের চাহিদা সৃষ্টির জন্য যথাযথ প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। আর এজন্য বিজ্ঞাপন, প্রদর্শনী, মেলার আয়োজন করতে পারলে রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে।

১০. **বাণিজ্য প্রতিনিধি দল :** বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাণিজ্য প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে বাংলাদেশী পণ্যের বাজার সৃষ্টি করতে হবে।

উপরিউক্ত বিষয়গুলোর কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে স্বাভাবিকভাবেই রপ্তানি অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের যেসব বৈশিষ্ট্য রয়েছে তাতে সীমিত সংখ্যক সুবিধাদি থাকলেও প্রতিকূল বাণিজ্য শর্ত, লেনদেন ঘাটতি ইত্যাদির মতো জটিল সমস্যাগুলো দেশের অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব ফেলছে। রপ্তানি বাণিজ্যকে বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে সরকার বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে যদিও তার বাস্তবায়ন প্রয়োজনের তুলনায় সীমিত। তাই, রপ্তানি বাণিজ্যের সমস্যা দূরীকরণের লক্ষ্যে সরকার, উৎপাদক, রপ্তানিকারক সবাইকে সমন্বিত উদ্যোগ নিতে হবে। আর এ উদ্যোগের বাস্তবায়ন হলেই রপ্তানি বাণিজ্য ব্যর্থতা কাটিয়ে সফলতার মুখ দেখবে। আর আমাদের প্রিয় বাংলাদেশের অর্থনীতি হবে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও লেনদেনের ঘাটতি মুক্ত।

১৩ । ইপিজেড কি? ইপিজেড কিভাবে শিল্প উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে? *[৩২তম বিসিএস]*

উত্তর : একটি দেশের অর্থনৈতিক ও শিল্পোন্নয়নের মোক্ষম হাতিয়ার হলো ইপিজেড। কারণ ইপিজেডকে কেন্দ্র করেই দেশের অর্থনৈতিক ও শিল্পোন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত ও প্রসারিত হয়। এর ফলে দেশের জনগণ স্বচ্ছলতার মুখ দেখে, দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন হয় এবং বিদেশে দেশের সুনাম বৃদ্ধি পায়। তাই প্রতিটি দেশের সরকারই ইপিজেড-এর উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। বাংলাদেশেও ইপিজেড-এর উন্নয়নে সরকারের তৎপরতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

ইপিজেড বা রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা : রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানাদি স্থাপনের জন্য নির্ধারিত বিশেষ এলাকাকে বলা হয় ইপিজেড বা রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা (Export Processing Zone)। যোগাযোগের সুবিধা আছে, সহজে কাঁচামাল আনা-নেয়ার বন্দোবস্ত আছে এবং শিল্পশ্রমিক পেতে অসুবিধা হয় না সাধারণত এমন জায়গা নির্বাচন করে সেখানে ইপিজেড স্থাপন করা হয়। ইপিজেড-এর লক্ষ্যসমূহের মধ্যে থাকে বিদেশী পুঁজি আকর্ষণ, দ্রুত শিল্পায়ন, স্থানীয় জনশক্তির জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, প্রযুক্তি হস্তান্তর ত্বরান্বিতকরণ এবং বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন বৃদ্ধির জন্য রপ্তানি সম্প্রসারণ। বাংলাদেশে ১৯৮০ সালে জাতীয় সংসদে প্রণীত একটি আইনের ভিত্তিতে ১৯৮৩ সালে প্রথম ইপিজেড প্রতিষ্ঠিত হয় চট্টগ্রামের পতেঙ্গায়। দ্বিতীয়টি প্রতিষ্ঠিত হয় এর দশ বছর পর, ১৯৯৩ সালে ঢাকার সাভারে। এছাড়া ১৯৯৮ সালে মংলা (খুলনা) ও ঈশ্বরদী (পাবনা)-তে দুটি, ১৯৯৯ সালে উত্তরা (নীলফামারী)-তে একটি, ২০০০ সালে কুমিল্লায় একটি, ২০০৬ সালে আদমজী (নারায়ণগঞ্জ) ও কর্ণফুলী (চট্টগ্রাম)-তে দুটি ইপিজেড স্থাপন করা হয়। এ নিয়ে দেশের সরকারি ইপিজেড-এর সংখ্যা দাঁড়ায় ৮টিতে।

ইপিজেড যেভাবে শিল্পোন্নয়নে ভূমিকা রাখছে : ইপিজেড নানাভাবে শিল্পোন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। ইপিজেড যেভাবে শিল্পোন্নয়নে ভূমিকা রাখছে তা নিচে আলোচনা করা হলো :

১. **জায়গা বরাদ্দ :** ইপিজেডসমূহের ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ ইপিজেড কর্তৃপক্ষের ওপর ন্যস্ত। ইপিজেড-এ সরকারের কার্যাবলীর মধ্যে আছে অবকাঠামো (ভবন, গ্যাস-বিদ্যুৎ-পানি সংযোগ, গুদামঘর, রাস্তা ইত্যাদি) নির্মাণ, শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠার আবেদনপত্রসমূহ যাচাই-বাছাই ও বিবেচনা, জমি বা বিল্ডিং স্পেস বরাদ্দকরণ এবং দেশী বা বিদেশী ব্যাংক ও বীমা কোম্পানি, ক্লিয়ারিং ও ফরোয়ার্ডিং এজেন্ট, কুরিয়ার কোম্পানি, ডাকঘর ইত্যাদির জন্য জায়গা বরাদ্দকরণ। এ জায়গা বরাদ্দকরণ শিল্পোন্নয়নে সহায়তা করে।

২. **নিশ্চিত বিনিয়োগ সহায়তা :** ইপিজেড-এ যারা বিনিয়োগ করে তাদের বিনিয়োগ ও ব্যবসায় যাতে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হতে পারে ও যাতে মালিক-শ্রমিক বিরোধ দেখা না দেয় তা

নিশ্চিত করতে সরকার সচেষ্ট থাকে। এতে করে বিনিয়োগকারীদের মাঝে প্রণোদনার সৃষ্টি হয়। ফলে তারা নির্ভয়ে বিনিয়োগ করে, যা প্রকারান্তরে শিল্পোন্নয়নে অবদান রাখে।

৩. **সরকারের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ :** ইপিজেড-এ বিনিয়োগকারীরা সরকারের নিকট থেকে ঋণ পেতে পারে এবং শিল্প-সহায়ক সকল প্রকার সমর্থন আশা করতে পারে বিধায় বিনিয়োগে আকৃষ্ট হয়। ফলে সহজেই বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে।

৪. **মুনাফাসহ ব্যয় উশুলের চেষ্টা :** সরকার ইপিজেড প্রতিষ্ঠা করে এবং তাতে শিল্পস্থাপনার উপযোগী নানা অবকাঠামো তৈরি করে নিজেই ইপিজেডকে নিজের একটি বিনিয়োগ ক্ষেত্র হিসেবে দেখে এবং স্থাপনা ও ভবন ভাড়া, ইজারা বা স্থায়ী বরাদ্দের মাধ্যমে মুনাফাসহ ব্যয় উশুলের চেষ্টা করে।

৫. **লগ্নীকৃত পুঁজির উৎস :** দীর্ঘ মেয়াদের জন্য লগ্নীকৃত পুঁজির একটি অংশের উৎস হচ্ছে ইপিজেড-এ সংস্থাপনকৃত স্থির পরিসম্পদের অবচিতি। ইপিজেড-এ সরকারের বিনিয়োগের প্রায় ৪০%-ই এমন সব খাতে ব্যয় হয় যেগুলো থেকে কোনো আয় আসে না। এখানে নির্মিত অবকাঠামোগত সুবিধাদির (জমি, ভবন, পানি-বিদ্যুৎ-গ্যাস সংযোগ ইত্যাদির) জন্য সরকার যে হারে চার্জ আদায় করে তা ঠিক ব্যয়মূল্য উশুলের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয় না। এগুলো প্রতিবেশী অন্যান্য দেশের ইপিজেড-এ ধরা রেটসমূহের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ধার্য করতে হয়।

৬. **বিনিয়োগের নিরাপদ এলাকা :** বিদেশি বেসরকারি বিনিয়োগের জন্য ইপিজেডকে অধিকতর নিরাপদ এলাকা বলে বিবেচনা করা হয়। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জানুয়ারি, ২০১৪ পর্যন্ত ৮টি ইপিজেডে (চট্টগ্রাম, ঢাকা, মংলা, কুমিল্লা, ঈশ্বরদী, উত্তরা– নীলফামারী, আদমজী ও কর্ণফুলী) পুঞ্জীভূত বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ৩০০১.৭৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জানুয়ারি, ২০১৪ পর্যন্ত ইপিজেডসমূহে প্রকৃত বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ২১৬.২৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১১-১২ অর্থবছরের একই সময়ে এ বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ২২২.৬৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

৭. **বিনিয়োগ আকর্ষণ :** দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণ এবং বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধিতে ইপিজেড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কোনো দেশে ইপিজেড-এ বিনিয়োগ নিরাপদ থাকলে, যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ হলে, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা থাকলে সেখানে বিদেশীরা বিনিয়োগে আকৃষ্ট হয়। ফলে শিল্পায়ন ত্বরান্বিত হয়।

৮. **লেনদেন ভারসাম্যের ঘাটতি হ্রাস :** ইপিজেড-এর রপ্তানির মাধ্যমে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা দেশের লেনদেন ভারসাম্যের ঘাটতি কমাতে সাহায্যে করে। এ বৈদেশিক মুদ্রার একটি অংশ দেশীয় মুদ্রায় রূপান্তর করে তা দিয়ে স্থানীয় বাজার থেকে ইপিজেড-এর জন্য বিভিন্ন পণ্য ও সেবা ক্রয় করা হয়। যেমন– বাংলাদেশে ১৯৯০-৯১ সালে ইপিজেড থেকে রপ্তানি করা হয় দেশের মোট রপ্তানির ২.৭% আর ১৯৯৭-৯৮ সালে এ অনুপাত দাঁড়ায় ১২.৩%। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জানুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত দেশের ইপিজেডগুলো থেকে সর্বমোট ৩০৮৭.৫৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের রপ্তানি সম্পন্ন হয়েছে। সুতরাং এ পরিস্থিতি শিল্পায়নে সহায়তা করবে তা সহজেই বুঝা যায়।

৯. **উন্নততর বিদেশী প্রযুক্তি :** প্রায়ক্ষেত্রেই ইপিজেড-এ বিদেশি বিনিয়োগের সঙ্গে থাকে উন্নততর বিদেশী প্রযুক্তি। ফলে স্থানীয় শ্রমিক, কারিগর, প্রকৌশলী ও ব্যবস্থাপকরা প্রযুক্তি হস্তান্তরের সুবিধা পায়, অর্জন করে উন্নততর কর্মকৌশল, যা কাজে লাগিয়ে শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার উন্নয়ন ঘটায়।

১০. **প্রবৃদ্ধি কেন্দ্র :** দেশের যেসব এলাকায় ইপিজেড স্থাপিত হয়েছে সেগুলো একেকটি প্রবৃদ্ধি কেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়েছে, সেগুলোতে গড়ে উঠেছে নতুন নতুন রাস্তা, পানি-বিদ্যুৎ-গ্যাস লাইন, টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা, ফায়ার ব্রিগেড, ডাকঘর, ব্যাংক ইত্যাদি ভৌত ও পরিসেবা সুবিধা। ইপিজেড সংলগ্ন এলাকায় নানা ধরনের শপিং সেন্টার ও বাজার, পরিবহন, আবাসিক ব্যবস্থা, বিনোদন ইত্যাদির ব্যবসায় বিকাশ লাভ করেছে এবং এসবের মাধ্যমে বৃদ্ধি পেয়েছে সার্বিক অর্থনৈতিক তৎপরতা। নতুন সৃষ্ট অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডসমূহের গুরুত্বপূর্ণ একটি হচ্ছে ইপিজেড-এর শিল্প প্রতিষ্ঠানাদির সম্মুখ বা পশ্চাৎ-অন্বয়ী শিল্পস্থাপনা। ইপিজেড-এর অনেক প্রতিষ্ঠানই এদেরকে উৎপাদন কাজের অংশ সাব-কন্ট্রাক্ট দেয়। সাব-কন্ট্রাক্টসহ ইপিজেড-এর প্রতিষ্ঠানসমূহের বার্ষিক উৎপাদনের মোট মূল্য প্রায় ১ কোটি ডলার।

১১. **পরিসেবা :** ইপিজেড সংলগ্ন এলাকায় যেসব পরিসেবা প্রতিষ্ঠান চালু হয়েছে সেগুলোর মধ্যে আছে ব্যাংক, বীমা কোম্পানি, সি অ্যান্ড এফ এজেন্ট, কন্টেইনার সার্ভিস, কুরিয়ার সার্ভিস, পরামর্শক প্রতিষ্ঠান, ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান, নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি। ইপিজেড-এর সকল প্রতিষ্ঠান মোট যে পরিমাণ মূল্যের পণ্য রপ্তানি করে এ সকল পরিসেবা প্রতিষ্ঠানের আয় তার প্রায় ২ শতাংশ। সুতরাং পরিসেবার মাধ্যমেও শিল্পায়ন বেগবান হয় এ কথা নিশ্চিন্তেই বলা যায়।

১২. **মূল্য সংযোজন :** ইপিজেড-এর প্রতিষ্ঠানসমূহ তার শ্রমিকদের মজুরি ও ভাতা, বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি, টেলিযোগাযোগ ইত্যাদির বিল এবং স্টেশনারিজ ও অন্যান্য মালামাল কেনার মূল্য হিসেবে যত অর্থ ব্যয় করে তা স্থানীয় মূল্য সংযোজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ইপিজেড-এর প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থানীয় শ্রমিকদের বছরে প্রায় ২১৫ কোটি টাকা মজুরি হিসেবে দেয় এবং তাদের কল্যাণ খাতে যেমন, খাদ্য/টিফিন ভাতা, যাতায়াত ভাতা, চিকিৎসা ভাতা ইত্যাদিতে ব্যয় করে আরও প্রায় ৫৩ কোটি টাকা। ইপিজেড-এ কর্মরত বিদেশী কর্মকর্তা ও শ্রমিকদের একেকজন প্রতি মাসে গড়ে প্রায় ১,০০০ ডলার আয় করে এবং তারা এই আয়ের প্রায় ৪০%-এর সমপরিমাণ টাকা স্থানীয়ভাবে ব্যয় করে। এ অর্থও স্থানীয় মূল্য সংযোজন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। আর মূল্য সংযোজন শিল্প উন্নয়নে অবদান রাখে।

১৩. **অর্থনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধি :** ইপিজেড গ্যাস-পানি-বিদ্যুৎ সেবার সবচেয়ে বড় একক গ্রাহক। দেখা যায়, বাংলাদেশে এসব খাতে ইপিজেড-এর বার্ষিক পরিশোধকৃত বিলের পরিমাণ প্রায় ৪২ কোটি টাকা। ইপিজেড-এর প্রতিষ্ঠানসমূহ টেলিফোন বিল হিসেবে বছরে প্রায় ৩ কোটি টাকা পরিশোধ করে। এসব প্রতিষ্ঠান মোট যে পরিমাণ মূল্য সংযোজন ঘটায় তার একটি অংশের উৎস হচ্ছে দেশীয় কাঁচামাল ও নানারকম মাধ্যমিক পণ্যসামগ্রী। এছাড়া ইপিজেড-এ প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থানীয় বাজার থেকে স্টেশনারিজ, আসবাবপত্র, খাদ্যপণ্য, পেট্রোলিয়াম ও ল্যুব্রিকান্ট এবং যন্ত্রসরঞ্জাম কেনার অর্থ ব্যয় করে। এসবই ইপিজেড সংলগ্ন এলাকায় অর্থনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে থাকে।

১৪. **পশ্চাৎসংযোগ শিল্পস্থাপন ও অনগ্রসর শিল্পে সহায়তা :** ইপিজেডসমূহ পশ্চাৎসংযোগ (Backward Linkage) শিল্প স্থাপন ও অনগ্রসর শিল্পে সহায়তা প্রদান করছে। এক্ষেত্রে ইপিজেডের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ইপিজেডের বাইরে অবস্থিত শিল্প হতে কাঁচামাল সংগ্রহ করা হচ্ছে অপরদিকে তেমনি বাইরে অবস্থিত ১০০ শতাংশ রপ্তানিমুখী শিল্পসমূহে ইপিজেডের অভ্যন্তরে উৎপাদিত বিভিন্ন কাঁচামাল সরবরাহ করছে। এ যাবত ইপিজেডসমূহে জাপান, কোরিয়া,

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

হংকং, থাইল্যান্ড, চীন, তাইওয়ান, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সিংগাপুর, যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, সুইডেন, নেদারল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ভারত, পানামা, নেপাল, অস্ট্রেলিয়া, পাকিস্তান, মরিশাস, আয়ারল্যান্ড, তুরস্ক, ইউক্রেন, মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ, শ্রীলংকা, বেলজিয়াম, কানাডা ও বাংলাদেশসহ প্রায় ৩৭টি দেশ বিনিয়োগ করেছে।

উপসংহার : দেশের শিল্পায়নে তথা শিল্পখাতের সামগ্রিক উন্নয়নে ইপিজেড-এর ভূমিকা অপরিসীম। তাই ইপিজেড-এ যাতে নিশ্চিন্তে বিনিয়োগ করা যায়, সহজে বিদেশীরা বিনিয়োগে আকৃষ্ট হয় সে ব্যাপারে দৃষ্টি রাখতে হবে। পাশাপাশি অন্যান্য সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে তা সমাধানের যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারলে ইপিজেড দেশের শিল্পায়নে গতিশীল ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়।

১৪ ॥ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বলতে কি বোঝায়? বাংলাদেশে গৃহীত বিভিন্ন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা উল্লেখ করুন। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সমস্যা ও সমাধানের পথ চিহ্নিত করুন।

অথবা, **বাজার অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রাসঙ্গিকতা, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করুন।** *[৩৪তম বিসিএস]*

উত্তর : পৃথিবীতে এমন কোনো দেশ নেই যেখানে কোনো অর্থনৈতিক পরিকল্পনা নেই। যে কোনো দেশের জাতীয় উন্নয়নে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিকল্পনার গুরুত্ব অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা অপরিহার্য। সুষ্ঠু পরিকল্পনা ছাড়া অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। ব্যক্তিগত জীবনের দৈনন্দিন কাজ থেকে শুরু করে একটি রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সুচিন্তিত কর্মসূচির প্রয়োজন হয়। এ কর্মসূচিকে পরিকল্পনার মাধ্যমে সংগঠিত করতে হয়। কাজেই এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা হলো অর্থনৈতিক সফলতা লাভে পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনে সুচিন্তিত কর্মসূচি।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনা : অর্থনৈতিক পরিকল্পনা হলো নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য দেশের যাবতীয় সম্ভাব্য উপকরণগুলোর হিসাব-নিকাশ ও তাদের দক্ষ ব্যবহারের জন্য রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে পরিচালিত একটি সুচিন্তিত কর্মধারা। অথবা বলা যায়, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা হচ্ছে পূর্ব নির্ধারিত ও স্বচ্ছভাবে বর্ণিত অর্থনৈতিক লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য একটি বহুল পরিচিত কৌশল।

বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। যেমন—

অধ্যাপক এল. রবিন্স (Prof. L. Robins)-এর মতে, "উৎপাদন ও বিনিয়োগের বেসরকারি কর্মযজ্ঞ যৌথভাবে সম্পাদন বা নিয়ন্ত্রণের নামই হচ্ছে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা।"

অধ্যাপক ডিকিন্সন (Dieckinson)-এর ভাষায়, "সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক পদ্ধতির সকল জরিপের ভিত্তিতে কোন সম্পদ কতটুকু পরিমাণ, কীভাবে, কখন ও কোথায় উৎপাদিত হবে এবং কোন খাত বা প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির উদ্দেশ্যে ঐ সম্পদ কী পরিমাণে বণ্টন করা হবে; এসব ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় নির্ধারণী কর্তৃপক্ষের প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তই হচ্ছে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা।"

অর্থনীতিবিদদের মধ্যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা নিয়ে মতপার্থক্য বিদ্যমান। তবে অধিকাংশ অর্থনীতিবিদ মনে করেন যে, একটি নির্দিষ্ট সময়ে স্বচ্ছভাবে সংজ্ঞায়িত ও নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্থনীতির স্বেচ্ছাকৃত নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশ প্রদানই হচ্ছে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা।

বাংলাদেশে গৃহীত অর্থনৈতিক পরিকল্পনাসমূহ : স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশে এ পর্যন্ত মোট ৯টি পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এর মধ্যে ৬টি পঞ্চবার্ষিক ও ১টি দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা ছাড়াও ২টি দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র (PRSP) রয়েছে। নিচে বিভিন্ন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা উপস্থাপন করে আলোচনা করা হলো–

পরিকল্পনা	মেয়াদ	পরিকল্পনার আকার (মিলিয়ন টাকা)			প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত প্রবৃদ্ধি
		মোট	গণখাত	ব্যক্তিখাত	%	%
প্রথম পঞ্চবার্ষিক	১৯৭৩-৭৮	৪৪,৫৫০	৩৯,৫২০	৫,০৩০	৫.৫০	৪.০০
দ্বি-বার্ষিক	১৯৭৮-৮০	৩৮,৬৮০	৩২,৬১০	৬,০০০	৫.৬০	৩.৫০
দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক	১৯৮০-৮৫	১৭২,০০০	১১১,০০০	৬১,০০০	৫.৪০	৩.৮০
তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক	১৯৮৫-৯০	৩৮৬,০০০	২৫০,০০০	১৩৬,০০০	৫.৪০	৩.৮০
চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক	১৯৯০-৯৫	৬২০,০০০	৩৪৭,০০০	২৭৩,০০০	৫.০০	৪.১৫
পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক	১৯৯৭-০২	১৯৫৯,৫২১	৮৫৮,৯৩৯	৮৫৮,৯৩৯	৭.০০	৫.২১
ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক	২০১০-১৫	১৩৪৭,০০০	৩১০,০০০	১০,৩৯,৩৬০	৮.০০	—

[উৎস : ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন।]

১. **প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা :** স্বাধীনতা অর্জনের পর ১৯৭৩ সালের ১ জুলাই থেকে বাংলাদেশে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শুরু হয়। যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতির পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের জন্য এ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৭৩ সালের ১ জুলাই শুরু হয়ে ১৯৭৮ সালের ৩০ জুন শেষ হয়। এ পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য ছিল জনগণের দারিদ্র্য লাঘব করা, মোট জাতীয় উৎপাদন বার্ষিক ৫.৫% হারে বৃদ্ধি করা, ২.৫% হারে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি করা, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বার্ষিক ৩% থেকে ২.৮% ভাগে নামিয়ে আনা, অভ্যন্তরীণ সম্পদের সদ্ব্যবহার ও আত্মনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি করা, দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা। যদিও এ লক্ষ্যের অধিকাংশই অর্জিত হয়নি।

২. **দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা :** ১৯৭৮-৮০ সালের জন্য একটি দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এটি ছিল একটি অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা। আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন প্রতিকূলতার কারণে দেশের জন্য কোনো দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়নের অবস্থা তখন ছিল না। প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক অবস্থা এবং প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ব্যর্থতা সরকারকে দীর্ঘকালীন পরিকল্পনা হতে বিরত রাখে। দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য ছিল দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক কাঠামোকে একটা সুষ্ঠু ভিত্তির ওপর দাঁড় করানো, যার ভিত্তিতে একটা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা যায়। এ পরিকল্পনায় প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অসমাপ্ত প্রকল্পগুলো সমাপ্ত করার লক্ষ্য নির্ধারিত হয়। এ পরিকল্পনাটি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কিছুটা গতির সঞ্চার করে।

৩. **দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা :** ১৯৮০ সালের ১ জুলাই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। জনগণের মৌলিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলোর যোগান বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, বার্ষিক জাতীয় উৎপাদন ৫.৪% হারে বৃদ্ধি, মাথাপিছু বার্ষিক আয় ৩.৫% হারে বৃদ্ধি,

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

কৃষি ও শিল্প খাতে প্রবৃদ্ধির হার যথাক্রমে ৫% ও ৮.৪% অর্জন, খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.৭% থেকে ১.৫%-এ নামিয়ে আনা, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, পল্লী এলাকার উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস ইত্যাদি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা করা হয়।

৪. **তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা :** ১৯৮৫ সালের ১ জুলাই হতে ১৯৯০ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত এ পরিকল্পনার মেয়াদ ছিল। এ পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠনের কাজ সম্পন্ন করা, কৃষি ও শিল্প উভয় খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য লাঘব করা। পরিবারকে জনগোষ্ঠীর প্রাথমিক ইউনিট হিসেবে ধরে তাদের ভেতরকার সম্ভাবনাময় সম্পদের সর্বোত্তম বিকাশের প্রচেষ্টা চালানো, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস করা, দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর জন্য উৎপাদনশীল কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে তাদের আত্মনির্ভরশীল করে তোলা, সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ও মানবসম্পদের উন্নয়ন, দীর্ঘমেয়াদী কাঠামোগত পরিবর্তন সাধনের জন্য প্রযুক্তিগত ভিত্তির উন্নয়ন সাধন করা, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা, স্বনির্ভরতা ত্বরান্বিত করা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি চাঙ্গা করা, জনগণের সর্বনিম্ন মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করা, সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে যৌথ কার্যক্রম চালু করা, এতিম ও অসহায় শিশুদের যথোপযুক্ত বিকাশ এবং তাদের স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহে পারিবারিক পরিবেশ সৃষ্টি করা। এ পরিকল্পনায় প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ৫.৪০% কিন্তু অর্জিত হয় ৪.১৫%।

৫. **চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা :** এ পরিকল্পনার অধীনে যমুনা বঙ্গবন্ধু বহুমুখী সেতু, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, বিদ্যুৎ উৎপাদন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন খাতসমূহকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য ছিল দারিদ্র্য দূরীকরণ। এ পরিকল্পনায় সমন্বিত ও কার্যকর কর্মসূচি প্রণয়নের লক্ষ্যে পরিবারকে সমাজসেবা কার্যক্রমের মৌলিক একক হিসেবে ধরা হয়। এ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল দুস্থ মহিলা ও পুরুষদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং উৎপাদন ও উন্নয়নমুখী কর্মকাণ্ডে দরিদ্র ও অসহায় শ্রেণীর অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা। পরিবারকেন্দ্রিক কর্মসূচি ও সমষ্টিকেন্দ্রিক প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ কেন্দ্রের মাধ্যমে পঙ্গুদের পুনর্বাসন ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন, কিশোর অপরাধী ও মাদকাসক্তদের যথাযথ যত্ন, চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ সৃষ্টি করা, অনুদান কর্মসূচির মাধ্যমে রেজিস্ট্রিকৃত বেসরকারি সংস্থাসমূহকে সীমিত আর্থিক সাহায্য, উপদেশ, নির্দেশনা, সেবা প্রদান এবং সমন্বয় সাধন করা। বিদেশী সাহায্যনির্ভর এ পরিকল্পনা প্রশাসনিক ত্রুটি, দক্ষ কর্মীর অভাবে সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয়নি।

৬ **পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা :** পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি ছিল শহর-গ্রাম সমষ্টি উন্নয়ন, দৈহিক, মানসিক পঙ্গু ও প্রতিবন্ধীদের কল্যাণ কার্যক্রম, এতিম-অনাথ শিশুদের কল্যাণমূলক কার্যক্রম, কিশোর অপরাধ ও যুবকল্যাণ কার্যক্রম, বৃদ্ধ ও অক্ষমদের কল্যাণ কার্যক্রম, মাদকাসক্তদের পুনর্বাসন কার্যক্রম, ভিক্ষুক, ভবঘুরে ও দুস্থ কল্যাণ কার্যক্রম, সামাজিক নিরাপত্তা প্রভৃতি। এ পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য ছিল দারিদ্র্য দূরীকরণ, মানবসম্পদের উন্নয়ন। এ পরিকল্পনায় সমাজকল্যাণ খাতে মোট ৫,২৫৩.৭০ মিলিয়ন টাকা অর্থ বরাদ্দ করা হয়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৭. **দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র (PRSP)-১ :** বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোর দারিদ্র্য বিমোচনে বিশ্বব্যাংকের উদ্যোগে দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রের (PRSP–I) পরিকল্পনার সূচনা ঘটে ২০০২ সালে, যা চূড়ান্ত হয় ২০০৫ সালের নভেম্বর মাসে। জুলাই ০৫-৩০ জুন '০৮ মেয়াদি এ দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রের প্রধান লক্ষ্য হলো দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী দেশের সাধারণ নাগরিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন। আর এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য ৪টি কৌশলগত উপাদানকে চিহ্নিত করা হয়। যার মধ্যে রয়েছে কৃষি, পল্লী উন্নয়ন, মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প, পল্লী অবকাঠামো, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, নিরাপদ পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন প্রভৃতি খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে মানব উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা।

৮. **দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র (PRSP)-২ :** ২০১৪-১৫ সালে জিডিপি ৮ শতাংশে উন্নীত করা এবং দারিদ্র্যের হার ৩০ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্য নিয়ে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (এনইসি) সভায় ২৯ ডিসেম্বর ২০০৯ সংশোধিত দ্বিতীয় দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্র (পিআরএসপি-২) অনুমোদিত হয়। পিআরএসপি-২ (২০০৯-১১) বাস্তবায়নে ২১টি খাতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অর্থ ব্যয় হয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা, কারিগরিসহ সার্বিক শিক্ষায়। বিশেষ করে বিদ্যুৎ খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা হয়। সর্বশেষে পিআরএসপি-২ বাস্তবায়নের মেয়াদকাল জুলাই ২০১০-জুন ২০১২ নির্ধারণ করা হয়।

৯. **ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা :** সাতটি অগ্রাধিকার খাত ও অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দলিল চূড়ান্ত হবার পর ২২ জুন ২০১১ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (ECNEC) বৈঠকে তা অনুমোদিত হয়। পরিকল্পনার মেয়াদকাল ধরা হয়েছে ২০১০ সালের জুলাই থেকে ২০১৫ সালের জুন পর্যন্ত। তবে এটি কার্যকর হয় জুলাই ২০১১ সাল থেকে। উক্ত পরিকল্পনার আওতায় মোট বিনিয়োগ প্রাক্কলন করা হয়েছে ১৩ লাখ ৪৭ হাজার কোটি টাকা। গণখাতে বিনিয়োগ প্রাক্কলন করা হয়েছে ৩ লাখ ১০ হাজার কোটি টাকা যা মোট বিনিয়োগের ২২.৮ শতাংশ। ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ প্রাক্কলন করা হয়েছে ১০ লাখ ৩৯ হাজার ৩৬০ কোটি টাকা যা মোট বিনিয়োগের ৭৭ শতাংশ।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ :

– দারিদ্র্যের হার বর্তমানের ৩১.৫ শতাংশ থেকে ২২ শতাংশে হ্রাস করা।
– শিল্পখাতে কর্মসংস্থানের প্রবৃদ্ধির হার ১৭ শতাংশ থেকে ২৫ শতাংশে উন্নীত করা।
– পরিকল্পনা মেয়াদে ৯২ লাখ নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।
– শিশুমৃত্যু হার হাজারে ৩১ জনে নামিয়ে আনা।
– মাতৃমৃত্যু হার লাখে ১৪৪ জনে নামিয়ে আনা।
– ৯৬% জনগোষ্ঠীর জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা।
– ৯০% জনগণের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগারের ব্যবস্থা করা।
– বিদ্যুতায়নের হার ৬৫ শতাংশে উন্নীত করা।
– ২০১৫ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের হার ১৫,৩৫৭ মেগাওয়াটে উন্নীত করা।
– প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তকারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা বর্তমান ৬৭ শতাংশ থেকে ১০০ শতাংশে নিয়ে যাওয়া।

– দ্বাদশ শ্রেণীতে ভর্তির হার ৬০ শতাংশে উন্নীত করা।
– উচ্চ শিক্ষায় ছাত্রী ও ছাত্র অনুপাত ৪০ : ৬০-এ উন্নীত করা।
– দ্বাদশ শ্রেণীতে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা এবং ২০১৫ সালের মধ্যে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগের হার ৩০ শতাংশ ও টেলি ঘনত্বের হার ৭০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সমস্যাবলী

১. **মূলধনের স্বল্পতা :** বাংলাদেশের জনগণের মাথাপিছু আয় কম বিধায় সঞ্চয়ের হারও কম। তাছাড়া রয়েছে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের দুর্বলতা। ফলে সরকার পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহে ব্যর্থ হয়। এতে পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়।

২. **প্রশাসনিক দুর্বলতা :** সৎ, দক্ষ, নীতিবান প্রশাসন যে কোনো দেশের উন্নয়নে একান্ত অপরিহার্য। কিন্তু উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বাংলাদেশের প্রশাসনব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্বল। পরিকল্পনায় সুফল অর্জন করতে পারে না।

৩. **রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা :** বাংলাদেশ রাজনৈতিকভাবে অস্থিতিশীল একটি দেশ। এখানের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সৌহার্দ্য, শ্রদ্ধা, পারস্পরিক বিশ্বাসের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। তাই এক সরকার এসে কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করলে অন্য সরকার তা বাতিল করে বা অকার্যকর করে রাখে। এরূপ নীতির কারণে বাংলাদেশে অধিকাংশ উন্নয়ন পরিকল্পনাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

৪. **কৃষি সংক্রান্ত সমস্যা :** বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রাণ হলো কৃষি। এদেশের কৃষির সাথে প্রায় ৮০ ভাগ লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত। অথচ এদেশের কৃষি ব্যবস্থায় জমির খণ্ডীকরণ, জলসেচের অভাব, রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের অভাবসহ নানাবিধ সমস্যায় আক্রান্ত।

৫. **আধুনিক প্রযুক্তি ও দক্ষ শ্রমিকের অভাব :** শিল্পায়নের এ যুগে যে কোনো পরিকল্পনাকে বাস্তবে সফল করতে হলে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন আধুনিক প্রযুক্তি ও দক্ষ শ্রমশক্তি। অথচ বাংলাদেশে আধুনিক প্রযুক্তির অভাবের পাশাপাশি শ্রমশক্তি থাকলেও তারা অদক্ষ। ফলে সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা অসম্ভব।

৬. **অন্যান্য :** এছাড়াও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি, দক্ষ বিশেষজ্ঞের অভাব, অধিক জনসংখ্যা, সঠিক তথ্য-তত্ত্বের অভাবসহ নানাবিধ সমস্যা পরিলক্ষিত হয়।

উন্নয়ন পরিকল্পনার সমস্যার সমাধান

১. **দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন :** বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশ দুর্নীতিতে বার বার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। যা দেশ ও জাতির জন্য অত্যন্ত লজ্জাজনক। কাজেই এ রকম দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসন দিয়ে আর যাই হোক উন্নয়ন পরিকল্পনা সফল হবে না। কোনো পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপদান করতে হলে সবার আগে প্রয়োজন দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসনের।

২. **সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন :** উন্নয়ন পরিকল্পনাকে সার্থক করে তুলতে হলে প্রয়োজন সঠিক বাস্তবোচিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা, আকাশ কুসুম বা তথ্যনির্ভরহীন পরিকল্পনা কখনোই আলোর মুখ দেখে না। বাংলাদেশে পরিকল্পনা প্রণয়নে বাস্তবতার অভাব পরিলক্ষিত হয়।

৩. **পরিকল্পনা হবে নমনীয় :** পরিকল্পনা হবে এমন যা প্রয়োজনমাফিক পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করার সুযোগ থাকে। কেননা, সময়ের পরিবর্তনে মানুষের চিন্তাচেতনা ও চাহিদার পরিবর্তন ঘটে। তাই পরিকল্পনা হতে হবে সুদূরপ্রসারী।

৪. **প্রশাসক ও পরিকল্পক সম্পর্ক :** প্রশাসক ও পরিকল্পকদের মধ্যে সুসম্পর্ক থাকতে হবে। যা পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নে জরুরি।

৫. **সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ :** বাংলাদেশের মতো জনবহুল দেশে সম্পদের যথেষ্ট অপ্রতুলতা রয়েছে। এ অপ্রতুল বা স্বল্প সম্পদকে কীভাবে অধিক পরিমাণে কাজে লাগানো যায় তা নিশ্চিত করতে হবে।

৬. **অন্যান্য :** এছাড়াও পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সঠিক লক্ষ্য, উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে হবে, সঠিক তথ্য, তত্ত্বের সমাহার ঘটাতে হবে। মূল্যস্তরের উর্ধ্বগতির লাগাম টেনে ধরতে হবে, সঠিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

উপসংহার : যে কোনো দেশের জাতীয় নীতির প্রতিফলন ঘটে সে দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা অপরিহার্য। সুষ্ঠু পরিকল্পনা ব্যতীত জাতীয় উন্নয়ন অসম্ভব। সার্বিক উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে পরিকল্পনা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হিসেবে বিবেচিত। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করতে এ পর্যন্ত অনেক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলেও তা থেকে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়নি। পরিকল্পনার সঠিক বাস্তবায়নে প্রয়োজন সকলের একান্ত সহযোগিতা। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার দ্বারাই যে কোনো পরিকল্পনা সঠিকভাবে গৃহীত ও বাস্তবায়িত হতে পারে।

১৫ ॥ বাংলাদেশে শেয়ার বাজারের সম্ভাবনা কতটুকু? শেয়ার বাজারে বিদ্যমান সমস্যা কিভাবে দূর করা যায় বলে আপনি মনে করেন? *[৩২তম বিসিএস]*

উত্তর : শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করে অনেকেই অল্প সময়ে বেশি মুনাফার প্রত্যাশা করেন। অনেকের ভাবনা শেয়ারে বিনিয়োগ মানে কাঁড়ি কাঁড়ি লাভ। তাই না জেনে, না বুঝে নিজের কষ্টার্জিত জমানো টাকা, পেনশনের টাকা কিংবা সহায়-সম্পত্তি বিক্রি করে শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করেন। এদের মধ্যে কারো কারো স্বপ্ন হয়ত পূরণ হয়, আবার অনেকেই বিনিয়োগ হারিয়ে এক পর্যায়ে নিঃস্ব হয়ে ঘরে ফেরেন। তাই শেয়ার ব্যবসা করতে হবে বুঝে শুনে। শেয়ার বাজারে বিনিয়োগের আগে যে কোনো বিনিয়োগকারীরই উচিত পুরো বিষয়টি বুঝে নেয়া। শেয়ার বাজারের উত্থান-পতনকে এজন্য অনেকেই বলে থাকেন ষাঁড়ের লড়াই আর ভল্লুকের জ্বর।

শেয়ার কি : শেয়ার ইংরেজি শব্দ, যার অর্থ হলো অংশ। তবে ব্যবসার ক্ষেত্রে শেয়ার হলো কোনো প্রতিষ্ঠানের মালিকানার একটা অংশ। অর্থাৎ কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তার ব্যবসাকে চালিয়ে রাখার জন্য অন্য কাউকে যুক্ত করে মালিকানার একটা অংশ প্রদান করে। অথবা সরকার বা বিশেষ কোনো সংস্থা জনসাধারণকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত করে শেয়ারের মাধ্যমে।

শেয়ারবাজার : সাধারণ অর্থে যেখানে শেয়ার কেনাবেচা হয় তাকে শেয়ার বাজার বলে। এখান থেকে বেনিফিশিয়ারী অউনার বা বিও অ্যাকাউন্টধারী যে কেউ শেয়ার কেনাবেচা করতে পারেন। যদিও শেয়ারকে আমরা একটি পণ্য হিসেবে মনে করি, প্রকৃতরূপে এটি দৃশ্যমান কোনো বস্তু নয়। শুধু টাকার বিনিময়ে মালিকানা পরিবর্তনের দৃশ্যই চোখে পড়ে। শেয়ার কেনাবেচার জন্য বাংলাদেশে দুটি বাজার

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

আছে। একটি ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ, অপরটি চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ। আবার এ দুটি বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য রয়েছে একটি সংস্থা, বাংলাদেশ সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন বা বিএসইসি। বিএসইসির কাজ হলো শেয়ার বাজার পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ; প্রয়োজনে আইন প্রণয়ন, সংশোধন, পরিমার্জন; বিনিয়োগকারীদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তাসহ অনিয়ম প্রতিরোধ ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

শেয়ারের ধরন : শেয়ারবাজারে দুই ধরনের শেয়ার দেখা যায়। প্রাইমারি শেয়ার আর সেকেন্ডারি শেয়ার। প্রাইমারি শেয়ার ইনিশিয়াল পাবলিক অফার বা আইপিও নামে পরিচিত। প্রাইমারি শেয়ার কিনতে আগ্রহীদের পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে দরখাস্ত আহ্বান করে সংশ্লিষ্ট কোম্পানি। বর্তমানে দেখা যায়, কোম্পানির প্রয়োজনীয় শেয়ার লটের চেয়ে প্রায় ৫০-৬০ গুণ এমন কি ১০০ গুণ পর্যন্ত বেশি দরখাস্ত জমা পড়ে। সেজন্য সংশ্লিষ্ট কোম্পানি লটারির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় শেয়ার লট বিতরণ করে থাকে। যারা লটারির মাধ্যমে প্রাইমারি শেয়ার জয়ী হন, তাদের শেয়ারগুলোই সেকেন্ডারি শেয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। প্রাইমারি শেয়ার বাজারে এলে বিও অ্যাকাউন্টধারী যে কেউ এ শেয়ার কেনাবেচা করতে পারে।

শেয়ার বাজারের সাম্প্রতিক অবস্থা : কালো টাকার শর্তহীন বিনিয়োগের সুযোগ, গ্যাস-বিদ্যুৎ সংকটের কারণে উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগের সুযোগ কমে যাওয়া এবং ব্যাংক আমানত ও সঞ্চয়পত্রে সুদের হার কমে যাওয়ায় শেয়ারবাজারে অর্থপ্রবাহ ব্যাপক মাত্রায় বেড়ে যায়। কালো টাকা সাদা করার শর্তহীন সুযোগ গ্রহণ করে অনেকেই বিপুল পরিমাণ টাকা শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ করেছেন। কারণ অন্যান্য খাতের চেয়ে শেয়ারবাজারে কালো টাকা বিনিয়োগে ঝামেলা কম, মুনাফার সুযোগ বেশি। পাশাপাশি বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংকটের কারণে শিল্প খাতে বিনিয়োগ প্রত্যাশা অনুযায়ী না বাড়ায় শিল্প উদ্যোক্তাদের অনেকেই শেয়ারবাজারে বড় অংকের বিনিয়োগ করেছেন। একই কারণে ব্যাংকিং খাতের উদ্বৃত্ত তারল্য শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ হয়েছে। শিল্প খাতে বিনিয়োগের সুযোগ কমে যাওয়ায় মুনাফার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য মার্চেন্ট ব্যাংকিং ও ব্রোকারেজ হাউসের ঋণ কার্যক্রম প্রসারিত করেছে ব্যাংকগুলো।

শেয়ার বাজারে সম্প্রতি সৃষ্ট বিপর্যয়ের কারণসমূহ : ইক্যুইটি মার্কেটে ও প্রাইমারি মার্কেটের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে কতকগুলো সমস্যা বিদ্যমান। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১. **আইপিও ইস্যু প্রক্রিয়ায় জটিলতা :** ইনিশিয়াল পাবলিক অফারিং (আইপিও) ইস্যু করার প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত জটিল– সেখানে অস্বচ্ছতা আছে, অনেক সময় লাগে। এতে ভালো ভালো কোম্পানির শেয়ার সময়মতো আসে না। আবার কিছু কিছু কোম্পানি শেয়ার ম্যানিপুলেশন করে আইপিওতে ছাড়ে। অন্যদিকে আইপিওতে ইনিশিয়াল শেয়ার প্রাইসিংয়ের ক্ষেত্রেও যোগসাজশ করে অভিহিত মূল্যের চেয়ে অনেক বেশি মূল্য নির্ধারণ করা হয়। এসব জায়গায় কিছু গলদ আছে। যেসব কোম্পানি আইপিও ইস্যু করে এবং ইস্যু ব্যবস্থাপনা করে, তাদের বিশেষ ভূমিকা আছে। তারা ইচ্ছা করেই ইস্যুমূল্যটা অনেক বাড়িয়ে দেয়। ১০ টাকার একটা শেয়ারের ইস্যুমূল্য ৩০০ টাকা হয়েছে। এটা একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার। পৃথিবীর কোনো বাজারে ইস্যুমূল্যের এত ভিন্নতা দেখা যায় না। আইপিওর এই জায়গায়ও একটা গলদ আছে।

২. **তথ্যের অসামঞ্জস্য :** তথ্যের অসামঞ্জস্য বাংলাদেশের শেয়ার বাজার বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ। যে কোম্পানি বা ব্রোকার বা যে মার্চেন্ট ব্যাংক আইপিও বিক্রির মাধ্যমে শেয়ার প্রাইসের লেনদেন করে আর যারা কেনে, তাদের মধ্যে তথ্যের বিস্তর ফারাক আছে। এই অসামঞ্জস্যতার জন্য যারা

তথ্য কম পায়, বিশেষত, ক্রেতা ও বিক্রেতা একটা বেকায়দা অবস্থায় পড়ে। কোম্পানি সম্পর্কে, কোম্পানির অর্থনৈতিক অবস্থা, অডিট রিপোর্টে উপস্থাপিত তথ্য ঠিকমতো আসে না। এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সাধারণ বিনিয়োগকারীরা। তারা এসব তথ্য পায় না, কিন্তু পায় স্টক এক্সচেঞ্জ, এসইসি, ডিএসই, মার্চেন্ট ব্যাংকের লোক। ফলে তারা ইনসাইডার ট্রেডিং করতে পারে। তারা জানে, কার শেয়ার বাড়বে, কারটা কমবে। ইনসাইডার ট্রেডিং আমাদের দেশে হয়েছে এবং এখনো হয়। এটা রোধ করার জন্য তেমন কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

৩. **পরিচালনাগত সমস্যা :** বাংলাদেশের শেয়ার বাজারে পরিচালনাগত সমস্যা বিদ্যমান। দেখা যায়, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের যে ট্রেডিং হাউসগুলো আছে, এগুলো চালায় নির্বাচিত ও অনির্বাচিত সদস্যরা। তাদের বেশির ভাগই হলো মার্চেন্ট ব্যাংকার্স, ব্রোকারস। তারাই যদি গভর্নেন্সে থাকে, আবার ব্যবসায়ও থাকে, তার মানে হলো জবাবদিহির ঘাটতি গভর্নেন্সে থাকবে, তারা ব্যবস্থাপনায় থাকবে না, স্টেকহোল্ডার হবে না। দুটোকে আলাদা করতে হবে। অন্যান্য দেশে এটা করা হয়েছে। এ কাজটি করতে যত দেরি হবে, ততই ট্রেডিং হাউসগুলো স্টেকহোল্ডারদের দ্বারা ম্যানিপুলেশনের শিকার হবে।

৪. **শেয়ারের জোগান বাড়াতে ব্যর্থতা :** নানা উৎস থেকে স্রোতের মতো টাকা ঢুকলেও এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নতুন শেয়ারের জোগান বাড়াতে না পারার কারণেই পুঁজিবাজারে অস্বাভাবিক ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা তৈরি হয়েছে। অধিকাংশ তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ারের দর কয়েক বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। তারপরও নানা ধরনের গুজব ও প্রলোভনের কারণে শেয়ার ধরে রেখেছেন অধিকাংশ বিনিয়োগকারী। ওই অবস্থায় শেয়ারবাজারে জমে ওঠা পুঁজি উৎপাদনমুখী খাতে স্থানান্তর করে শেয়ারের জোগান বাড়ানো ছিল সবচেয়ে জরুরি কাজ। শক্তিশালী পুঁজিবাজারকে দেশের উৎপাদনমুখী খাতসহ সামগ্রিক অর্থনীতির বিকাশে কিভাবে কাজে লাগানো যায়, সরকারের দিক থেকে সে ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত ছিল। সময় মতো সে ধরনের পদক্ষেপ নিতে না পারায় বাজার অস্থিরতার দিকে ধাবিত হয়েছে।

৫. **প্লেসমেন্টে আটকে যাওয়া টাকা :** প্রাইভেট প্লেসমেন্টের নামে দীর্ঘদিন ধরে শেয়ারবাজারে বড় ধরনের অনৈতিক বাণিজ্য চলেছে। কোম্পানির মূলধন বৃদ্ধির জন্য শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত হওয়ার আগেই প্লেসমেন্টের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ শেয়ার বিতরণ করা হয়ে থাকে। কিছু কিছু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান বিপুল পরিমাণ শেয়ার বরাদ্দ নিয়ে শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্তির আগেই আগাম বিক্রির জমজমাট ব্যবসা চালিয়েছে।

৬. **প্রেফারেন্স শেয়ারের নীতিমালা :** কোম্পানির মূলধন সংগ্রহের জন্য অগ্রাধিকার শেয়ার একটি স্বীকৃত মাধ্যম হলেও বাংলাদেশে এর খুব বেশি প্রচলন ছিল না। গত দেড় বছরে হঠাৎ করেই শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর মধ্যে অগ্রাধিকার শেয়ার ছেড়ে মূলধন বৃদ্ধির হিড়িক পড়ে যায়। স্বল্প সময়ে অনুমোদন নিয়ে অতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহের সুযোগ থাকায় অধিকাংশ কোম্পানিই এখন এই পথ বেছে নিতে শুরু করে। সুনির্দিষ্ট কোনো নীতিমালা না থাকায় এর মধ্য দিয়ে কোম্পানির সাধারণ শেয়ারহোল্ডাররা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।

৭. **গুজব :** কঠোর আইন থাকলেও পুঁজিবাজারে ইনসাইডার ট্রেডিং বন্ধ হয়নি। মূল্য সংবেদনশীল তথ্য ঘোষণার আগেই শেয়ার লেনদেনের মাধ্যমে লাভবান হয়েছে কোম্পানির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

ব্যক্তিরা। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদে সিদ্ধান্ত অনুমোদনের লভ্যাংশ, বোনাস শেয়ার, রাইট শেয়ার বা অভিহিত মূল্য পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্য শেয়ারবাজারে ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন কোম্পানির পরিচালক বা কর্মকর্তারা শেয়ার ব্যবসায় জড়িত থাকায় তাদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মার্চেন্ট ব্যাংক বা ব্রোকারেজ হাউসে এসব খবর চলে আসে। আর এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে গুজব। পাশাপাশি শেয়ারবাজারে সক্রিয় বিভিন্ন চক্র কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাধ্যমে আগাম তথ্য সংগ্রহ করে শেয়ারবাজারে ছড়িয়ে দেয়।

৮. **কালো টাকা :** পুঁজিবাজারে বিপুল পরিমাণ কালো টাকা বা অপ্রদর্শিত অর্থ বিনিয়োগ হলেও এর সঠিক হিসাব জানে না কেউ। শেয়ার কেনার সময় অর্থের উৎস সম্পর্কিত তথ্য নেয়ার বিধান না থাকায় কারও পক্ষেই কালো টাকা চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। অর্থবছর শেষে আয়কর রিটার্নে ঘোষণা দেয়ার কথা বলা হলেও পুঁজিবাজারে কালো টাকা বিনিয়োগের সুনির্দিষ্ট হিসাব পাওয়া যায়নি। ফলে শেয়ারবাজারে বিনিয়োগকৃত অর্থের তথ্য গোপন করে নতুন করে কালো টাকা সৃষ্টির সুযোগ রয়ে গেছে। কালো টাকা বিনিয়োগকারীরা মুনাফাসহ বিনিয়োগকৃত অর্থ সরিয়ে নেয়ায় বাজারে অস্থিরতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে। সঠিক মনিটরিং ব্যবস্থা না থাকলে কালো টাকা বিনিয়োগের মাধ্যমে শেয়ারবাজার থেকে বিপুল পমিাণ অর্থ বাইরে চলে যেতে পারে। বিনিয়োগের শুরুতে তথ্য রাখার ব্যবস্থা না থাকায় যে কেউ সরকারের দেয়া সুযোগকে ভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারে এবং তা বিগত সময়ে করা হয়েছে বলে ধারণা করা হয় ও তদন্ত রিপোর্টেও উল্লেখ আছে।

শেয়ারবাজারের বিপর্যয় দূরীকরণে করণীয় : বাংলাদেশের শেয়ার বাজারের বিপর্যয় রোধে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে :

১. **শেয়ারের যোগান বৃদ্ধি :** বর্তমান পরিস্থিতিতে পুঁজিবাজারকে দীর্ঘমেয়াদে স্থিতিশীল রাখতে হলে চাহিদা অনুযায়ী শেয়ারের যোগান বাড়ানো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। পুঁজিবাজারে বড় ধরনের বিপর্যয়ের পর পরিস্থিতি সামাল দিতে বুকবিল্ডিং পদ্ধতির কার্যকারিতা স্থগিত রাখার পাশাপাশি প্রক্রিয়াধীন প্রাথমিক গণপ্রস্তাব (আইপিও) অনুমোদনে ধীরে চলার নীতি অবলম্বন করছে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি)। এর ফলে পুঁজিবাজারে আসার অপেক্ষায় থাকা উল্লেখযোগ্য বেশ কিছু কোম্পানির ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। আর সামগ্রিকভাবে বাজারে শেয়ারের যোগান বাড়ানোর প্রচেষ্টায় বড় ধরনের ধাক্কা লেগেছে। বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফেরাতে নানামুখী প্রচেষ্টার সঙ্গে ভালো শেয়ারের জোগান বৃদ্ধির প্রক্রিয়াও অব্যাহত রাখতে হবে।

২. **তারল্য সংকট নিরসনে যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ :** সেকেন্ডারি মার্কেট থেকে টাকা তুলে নিয়ে প্লেসমেন্ট শেয়ার কেনায় একদিকে বিনিয়োগকারীদের টাকা আটকে গেছে, অন্যদিকে শেয়ারবাজারে তীব্র হয়েছে তারল্য সংকট। এ কারণে কোম্পানিগুলোর আইপিও নিয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা জরুরি। যেসব কোম্পানি প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করে পুঁজিবাজারে আসতে পারবে, সেগুলোর বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়া প্রয়োজন। তালিকাভুক্তির অনুমোদন দেয়া না হলেও বিনিয়োগকারীদের টাকা ফেরতের ব্যবস্থা করা উচিত। এতে বিনিয়োগকারীরা যেমন হয়রানি থেকে মুক্তি পাবেন, তেমনি আটকে থাকা অর্থ শেয়ারবাজারে ফিরলে বর্তমান মন্দা কাটাতে সহায়ক হবে।

৩. **স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় রাইট শেয়ার ছাড়া :** স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় রাইট শেয়ার ছাড়ার যোগ্যতা না থাকলেও কোনো কোনো কোম্পানি বিকল্প হিসেবে অগ্রাধিকার শেয়ার ছেড়ে অর্থ সংগ্রহ করেছে

একাধিক কোম্পানি। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পুঁজিবাজারে হরিলুট বন্ধে প্রেফারেন্স শেয়ারের নীতিমালা প্রণয়ন জরুরি।

৪. **মূল্য সংবেদনশীল তথ্য প্রকাশে সুনির্দিষ্ট বিধি প্রণয়ন :** ১৯৯৫ সালের সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী-ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা অনুযায়ী, 'স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানির কোনো স্পন্সর, পরিচালক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী, নিরীক্ষক বা নিরীক্ষাকার্যে সম্পৃক্ত ব্যক্তি, পরামর্শক বা আইন উপদেষ্টা কিংবা উপকারভোগী মালিক, উক্ত কোম্পানির বার্ষিক হিসাব সমাপ্তির তারিখ হইতে উক্ত হিসাব কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক চূড়ান্তভাবে বিবেচিত, গৃহীত বা অনুমোদিত হওয়ার তারিখ পর্যন্ত সময়কালে আলোচ্য কোম্পানির শেয়ার ক্রয়, বিক্রয় কিংবা অন্য কোনো প্রকারে হস্তান্তর বা গ্রহণ করিতে পারিবে না'। এই বিধিমালা প্রয়োগের মাধ্যমে ইনসাইডার ট্রেডিং বন্ধের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হলেও অনেক কোম্পানির পরিচালক, উদ্যোক্তা বা কর্মকর্তারা বেনামে কিংবা আত্মীয়স্বজনের নামে শেয়ার ব্যবসায় জড়িত। আবার এ বিধিমালায় শুধু কোম্পানির বার্ষিক হিসাব সংক্রান্ত তথ্য ব্যবহার করে ইনসাইডার ট্রেডিং বন্ধের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ফলে রাইট ইস্যু, অভিহিত মূল্য পরিবর্তন, সম্পদ পুনর্মূল্যায়নসহ বর্তমানে শেয়ারবাজারের মূল্য প্রভাবিত করার মতো অন্যান্য তথ্যের ক্ষেত্রে কোনো বিধি আরোপ করা হয়নি। ফলে তালিকাভুক্ত কোম্পানির যে কোনো ধরনের মূল্য সংবেদনশীল তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট বিধি প্রণয়ন জরুরি।

৫. **উপযুক্ত মনিটরিং ব্যবস্থা :** সঠিক মনিটরিং ব্যবস্থা না থাকলে কালো টাকা বিনিয়োগের মাধ্যমে শেয়ারবাজার থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ বাইরে চলে যেতে পারে। বিনিয়োগের শুরুতে তথ্য রাখার ব্যবস্থা না থাকায় যে কেউ সরকারের দেয়া সুযোগ গ্রহণ করে কেউ যাতে শেয়ারবাজার থেকে নতুন করে অপ্রদর্শিত অর্থ বানাতে না পারে সেজন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে।

৬. **বুক বিল্ডিং প্রক্রিয়ার যথাযথ প্রয়োগ :** বুক বিল্ডিং প্রক্রিয়াটি খারাপ নয়, কিন্তু এর অপপ্রয়োগ করা হয়েছে। এটা বন্ধ করতে হবে। প্রাইভেট প্লেসমেন্ট, ডাইরেক্ট লিস্টিংয়ের ক্ষেত্রেও একই রকম অবস্থা। এসবের ম্যানিপুলেট করার মাধ্যমে যারা শেয়ার ইস্যু করে, তাদের পকেটেই টাকা চলে যায়। পুঁজিবাজারে অর্থ উত্তোলনের উদ্দেশ্য থাকে কোম্পানির মূলধন বাড়িয়ে নিজের বিস্তৃতি ঘটানো, কাজের সুযোগ তৈরি হবে, তারপর যারা শেয়ারের মালিক তাদের রিটার্ন দেয়া হবে। কিন্তু এই অর্থ ব্যক্তির পকেটে চলে যাওয়ার অর্থ তা আর বিনিয়োগ হলো না। এসব প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সেই অর্থ ব্যক্তিগত লাভে চলে যায়– ব্যবসা না করেও পুঁজিবাজারে গিয়ে ব্যবসার লাভটা পাওয়া হয়ে যায়। এটা হলো অর্থ লাভের চোরা পথ।

৭. **এসইসিকে শক্তিশালীকরণ :** এসইসিকে শক্তিশালী করতে হবে। তবে শুধু নতুন নিয়োগ দিলেই হবে না, এসইসিকে একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করতে দিতে হবে– সঙ্গে সঙ্গে জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। এসইসিতে যত সৎ ও দক্ষ লোকই আসুন না কেন, তাঁর কাজে হস্তক্ষেপ করা হলে তিনি নিজের মতো কাজ করতে পারবেন না। সাম্প্রতিক তদন্ত প্রতিবেদনে প্রধান বিষয়গুলো সঠিকভাবেই চিহ্নিত করা হয়েছে। তদন্ত দল সুনির্দিষ্টভাবে বলেছে, কারা কারা জড়িত, আর এসইসির কি কি দুর্বলতা। তাদের সুপারিশগুলোর কিছু কিছু এখনই বাস্তবায়নযোগ্য।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৮. **সুপারিশ বাস্তবায়ন :** সুপারিশ বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটা বার্তা দিতে হবে। তদন্তে যাদের নাম এসেছে, সেগুলো প্রকাশ করা হবে না বলে সরকার যে বার্তাটি দিতে চেয়েছে, তা সঠিক নয়। পরবর্তীকালে যারা এ ধরনের কাজ করবে তারা একটা ইনটেনসিভ পাবে– ভাববে, আমি করলেও তো আমার নাম আসবে না, পর্দার আড়ালে লাভ করে নিয়ে সবকিছু ঠিকঠাক করে ফেলতে পারব। মনে রাখা দরকার, শেয়ারবাজার সংকট তো নিছক গবেষণার বিষয়বস্তু নয়। পুঁজিবাজার চলে মানুষের আস্থার ওপর দাঁড়িয়ে। মানুষের আস্থা তৈরি করতে হলে সুস্পষ্ট ব্যবস্থা নিতে হবে।

উপসংহার : পুঁজিবাজারে আবারও বিপর্যয়ের পুনরাবৃত্তি ঘটবে কিনা তা নিয়ে এখনই বিভিন্ন মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে যেসব বিনিয়োগকারী বিপুল পরিমাণ লোকসানের শিকার হয়েছেন তাদের ক্ষতি পোষাতে গিয়ে নতুন করে যেন শেয়ারের অতি মূল্যায়ন ও ধসের ঘটনা না ঘটে সে বিষয়ে এখনই যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে। বাজার স্থিতিশীল ও গতিশীল করতে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের পাশাপাশি যেসব কারণে বাজারে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে সেগুলো রোধ করতে অবশ্যই সরকার ও বাজার সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

১৬। জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মৌলিক সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করুন এবং এর সম্ভাব্য প্রতিকারের পরামর্শ দিন। *[৩০তম; ১৭তম বিসিএস]*

অথবা, বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মৌলিক সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করুন এবং এর সম্ভাব্য প্রতিকারের পরামর্শ দিন। *[১৫তম বিসিএস]*

উত্তর : শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষার এই গুরুত্ব অনুধাবন করে অধ্যাপক মার্শাল শিক্ষাকে পুঁজি বিনিয়োগের সর্বোৎকৃষ্ট ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। একটি সমাজের সামগ্রিক বিকাশের ক্ষেত্রে শিক্ষার ভূমিকা অনস্বীকার্য। C.P. Snow (1990) তাঁর The Two Cultures and the Scientific Revolution গ্রন্থে বলেন, 'আমাদের শিক্ষিত হতে হবে, অন্যথায় ধ্বংস অনিবার্য। বাস্তব অবস্থার তুলনায় কথাটি অতিরঞ্জিত মনে হতে পারে, বরং কথাটি এমন যে নিজেদের শিক্ষিত করে তুলতে না পারলে জীবদ্দশায় আমাদের অতল খাদে নিক্ষিপ্ত হওয়ার ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে হবে, তাহলে সেটিই হবে সঠিক।' আর বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশসমূহে শিক্ষাই সকল উন্নয়নের মূল ভিত্তি। তাই জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত সর্বজনীন শিক্ষানীতি এক্ষেত্রে আলোকবর্তিকারূপে একটি শিক্ষিত জাতি বিনির্মাণে ভূমিকা রাখতে পারে।

স্বাধীনতাত্তোর বিভিন্ন শিক্ষানীতি : স্বাধীনতার পর থেকে বর্তমান পর্যন্ত বাংলাদেশে ৫টি শিক্ষা কমিশন ও ৩টি শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি গঠিত হয়েছে। যথা :

দেশের ৫টি শিক্ষা কমিশন

কমিশন	*প্রধান*	*গঠন*
১. কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন	*ড. কুদারত-এ-খুদা*	*২৬ জুলাই ১৯৭২*
২. মফিজ উদ্দিন শিক্ষা কমিশন	*ড. মফিজ উদ্দিন আহমদ*	*১৯৮৮*
৩. শামসুল হক শিক্ষা কমিশন	*ড. এম শামসুল হক*	*১৯৯৭*
৪. ড. এম এ বারী কমিশন	*ড. এম এ বারী*	*২০০২*
৫. মনিরুজ্জামান মিঞা শিক্ষা কমিশন	*ড. মনিরুজ্জামান মিঞা*	*১৫ জানুয়ারি ২০০৩*

দেশের ৩টি শিক্ষানীতি কমিটি

নাম	প্রধান	গঠনকাল
১. জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা কমিটি	কাজী জাফর আহমেদ ও আবদুল বাতেন	০৫ আগস্ট ১৯৭৮
২. মজিদ খান শিক্ষা সংস্কার কমিটি	ড. মজিদ খান	১৯৮৩
৩. জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি	অধ্যাপক কবীর চৌধুরী	০৮ এপ্রিল ২০০৯

শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতি : উপরিউক্ত শিক্ষানীতিসমূহে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সুপারিশ করা হয়েছে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলোতেও অনেক পরিকল্পনা ও নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। সেসব নীতি ও পরিকল্পনার আলোকে ইতিমধ্যেই শিক্ষাক্ষেত্রে বেশ কিছু অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। সেগুলো হলো :

১. বাংলাদেশ উন্মুক্ত ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ বেশ কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ প্রতিষ্ঠা।
২. সহশিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন।
৩. ইসলামী শিক্ষা প্রসারে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।
৪. প্রাইমারি স্কুলে ৫০% মহিলা শিক্ষক নিয়োগ।
৫. মাদ্রাসা শিক্ষার সিলেবাস ও মানের আধুনিকীকরণ।
৬. শিক্ষা প্রশাসনের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন।
৭. শিক্ষাক্ষেত্রে ইলেক্ট্রনিক্স ও কম্পিউটার চালু।
৮. নারীশিক্ষা প্রসারে উপবৃত্তি প্রদান।

অবশ্য অগ্রগতির সাথে সাথে এমন কিছু সমস্যাও বিদ্যমান রয়েছে, যা শিক্ষার অগ্রগতিকে থামিয়ে দিচ্ছে এবং জাতিকে শিক্ষার সুফল পাওয়া থেকে বঞ্চিত করছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে মৌলিক সমস্যাসমূহ

১. **শিক্ষাঙ্গনে কলুষিত রাজনীতি :** বাংলাদেশের ছাত্র রাজনীতির অতীত ইতিহাস অত্যন্ত গৌরবোজ্জ্বল। '৫২-র ভাষা আন্দোলন, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান এবং '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে ছাত্র নেতৃবৃন্দ ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। কিন্তু '৭৫ পরবর্তী আদর্শ বিবর্জিত সামরিক-বেসামরিক রাজনীতিকগণ নিজেদের রাজনৈতিক ক্ষমতার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে ছাত্র রাজনীতিকে কলুষিত করেছে। ফলে শিক্ষাঙ্গন পরিণত হয়েছে রণাঙ্গনে। এ পর্যন্ত প্রতিহিংসাপরায়ণ ছাত্ররাজনীতির কারণে অজস্র ছাত্র প্রাণ হারিয়েছে। কলুষিত ছাত্র রাজনীতি শিক্ষাঙ্গনের সামগ্রিক পরিবেশ বিনষ্ট করেছে।

২. **সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি :** বর্তমানে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। ছাত্র নামধারী কতিপয় বখাটে যুবক শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজিতে লিপ্ত। তারা কতিপয় রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় থেকে শিক্ষাঙ্গনে টেন্ডারবাজি, দরপত্র জমাদানে বাধা প্রদান, সন্ত্রাস ও চাঁদা আদায়ে লিপ্ত থেকে সাধারণ ছাত্রছাত্রীর শিক্ষা অর্জন প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করছে।

৩. **কোচিং সেন্টারের দৌরাত্ম্য :** সমগ্র বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় বর্তমানে মানসম্মত নয় এমন অনেক কিন্ডার গার্টেন, কোচিং সেন্টার, নোট বই ও প্রাইভেট টিউশনি শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাণিজ্যে পরিণত করেছে। শহর এলাকায় সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ নামেমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও পরীক্ষা

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ৮০% শিক্ষক প্রাইভেট টিউশনি ও কোচিং সেন্টারের সাথে জড়িত। সে কারণে সংখ্যাগরিষ্ঠ মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত ছাত্রছাত্রী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

৪. **সেশন জট :** কলুষিত ছাত্ররাজনীতির নেতিবাচক প্রভাবে শিক্ষাঙ্গনগুলোতে সেশন জট প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে। অতি সামান্য কারণে প্রতিহিংসাপরায়ণ ছাত্র সংগঠনগুলো বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা সৃষ্টি করতে দ্বিধা করছে না। ফলে হরতাল, ধর্মঘট, অবরোধ নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। তাছাড়া তথাকথিত ছাত্র নামধারীদের পরীক্ষা পেছানোর আন্দোলনের ফলে ৪ বছরের কোর্স সমাপ্ত করতে ন্যূনতম ৭ বছর সময় লাগছে। সেশন জটের কারণে অতিরিক্ত ৩/4 বছর সময় ব্যয় করার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক এবং সরকার।

৫. **পরীক্ষায় নকল ও অসদুপায় অবলম্বন :** সারা বছর বই-পুস্তকের সাথে সম্পর্কহীন অবস্থায় থেকে পরীক্ষার পূর্বে বাজারে প্রচলিত কিছুসংখ্যক ছোট আকারের নোটের ওপর নির্ভর করে পরীক্ষায় নকল ও অসদুপায় অবলম্বনের মাধ্যমে পাস করা অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীর বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। ফলে শিক্ষা অর্জনের মৌল উদ্দেশ্যটাই রয়ে যাচ্ছে আবৃত অবস্থায়। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বেশকিছু সংখ্যক শিক্ষকও এ ধরনের নৈতিকতা বিবর্জিত কাজে জড়িত থেকে ছাত্রছাত্রীদের সহযোগিতা করছে। ফলে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা অনেকের কাছেই প্রহসনে পরিণত হয়েছে।

প্রস্তাবিত নতুন শিক্ষানীতি : ড. কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের আলোকে দেশে ২০১০ সালে নতুন শিক্ষানীতি প্রণীত হয়। এজন্য ২৭টি অধ্যায় সংবলিত একটি খসড়া নীতিমালা প্রণয়ন করে জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি। ৩১ মে ২০১০ এ নীতিটি মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হয়। এতে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা, নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষা এবং এর পরের স্তরকে উচ্চশিক্ষার স্তর হিসেবে চালু করার সুপারিশ করা হয়েছে। বর্তমানে চালু বিভিন্ন ধরনের প্রাথমিক শিক্ষার সবগুলোর মধ্যে একটি মৌলিক ঐক্য আনারও সুপারিশ করা হয়েছে। প্রথমবারের মতো প্রাথমিক স্তরে বাংলাদেশ পরিচিতি বা বাংলাদেশ স্টাডিজ নামে নতুন বিষয় চালু করা হচ্ছে। নতুন শিক্ষানীতিতে দুটি বিষয়ের ওপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বিষয় দুটি হলো নৈতিক শিক্ষা ও আইসিটি (তথ্যপ্রযুক্তি) শিক্ষা। তবে নতুন শিক্ষানীতিতে পুরো শিক্ষানীতিকেই নৈতিক ও কারিগরি শিক্ষার সংমিশ্রণে ঢেলে সাজানোর সুপারিশ রয়েছে।

১. **শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত সুপারিশ :** শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির প্রতিবেদনে শিক্ষক নিয়োগের বিষয়ে বলা হয়েছে, মাধ্যমিক স্তরে সরকারি কর্মকমিশনের অনুরূপ প্রস্তাবিত শিক্ষক নির্বাচনী কমিশন গঠন করে তার আওতায় লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে বিষয়ভিত্তিক প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক প্রতিবছর নিয়োগ করা হবে। নতুন নিয়োগ পাওয়া শিক্ষকদের কাজে যোগদানের আগে মৌলিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সুপারিশ রয়েছে। এতে আরও বলা হয় স্কুল পর্যায়ে আগামী ৬/৭ বছরের মধ্যে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অনুপাত হবে ১ ঃ ৩০। শিক্ষার মাধ্যম হবে বাংলা। বিদেশীদের জন্য যথাযথ অনুমোদন সাপেক্ষে ইংরেজি মাধ্যম চালু থাকবে। তবে সেক্ষেত্রে সহজ বাংলা শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থাও রাখতে হবে। বিশেষ পদক্ষেপ হিসেবে যেসব বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আয়ের উৎস আছে এবং মিশনারি, ট্রাস্ট ও দেশী-বিদেশী এনজিও, সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে সরকারের শিক্ষা খাত থেকে বরাদ্দ না দেয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। অধিক হারে বেতন আদায়কারী প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য বেতন আদায়ের নীতিমালা তৈরির সুপারিশ করেছে।

২. **প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সুপারিশ :** দেশে বর্তমানে ১১ ধরনের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে। সব কটি ধারার মধ্যে একটি মৌলিক ঐক্য নিয়ে এসে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে কিছু বিষয়কে বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করেছে। এসব বিষয় হলো– বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বাংলাদেশ স্ট্যাডিজ, তথ্যপ্রযুক্তি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা। অবশ্য প্রত্যেক ধারায় সংশ্লিষ্ট আবশ্যিক ও ঐচ্ছিক বিভিন্ন বিষয় পড়ানো যাবে। তৃতীয় শ্রেণী থেকে বাধ্যতামূলকভাবে ইংরেজি পড়াতে হবে। তবে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চাইলে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী থেকেও তা পড়াতে পারবে। বাংলাদেশে বিদ্যমান ক্ষুদ্র জাতিসত্তা এবং আদিবাসীদের ভাষা ও সংস্কৃতি সংরক্ষিত রাখতে শিক্ষানীতিতে সুপারিশ রয়েছে। আদিবাসী ছেলেমেয়েরা যেন নিজ মাতৃভাষাতেই শিক্ষা লাভ করতে পারে সেজন্য সরকারকে পদক্ষেপ নিতে বলা হয়েছে। শিক্ষাব্যবস্থায় বিদ্যমান সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষক-কর্মচারীদের বৈষম্য দূর করতে সুপারিশ রয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ের দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য স্কুল ফিডিং কর্মসূচি আরো জোরদার করতে সরকারকে পরামর্শ দেয়া হচ্ছে। বর্তমানে দেশে ৫ বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষা দেয়া হয়; এর পরিবর্তে প্রাথমিক শিক্ষাকে ৮ বছর মেয়াদি করা হবে। প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত হবে প্রাথমিক শিক্ষা স্তর। এতে ইংরেজি এবং ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষাকে তৃতীয় শ্রেণী থেকে বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব করা হয়েছে। অষ্টম শ্রেণী শেষে আন্তঃজেলা পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে (যা বর্তমানে কার্যকর)।

৩. **মাধ্যমিক ক্ষেত্রে সুপারিশ :** বর্তমান পদ্ধতির মতো দশম শ্রেণীতে মাধ্যমিক স্তর শেষ না হয়ে তা শেষ হবে দ্বাদশ শ্রেণীতে গিয়ে। মাধ্যমিক পরীক্ষা বা এসএসসি পরীক্ষা নেয়া হবে দ্বাদশ শ্রেণী শেষ হলে। দশম শ্রেণীর পর এসএসসি পরীক্ষা নয়, হবে বৃত্তি পরীক্ষা। বর্তমানে ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মাধ্যমিক স্তর হলেও এর মাঝে তিনটি ভাগ রয়েছে। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত নিম্ন মাধ্যমিক, নবম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত মাধ্যমিক এবং একাদশ ও দ্বাদশ স্তরকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর বলা হয়। নতুন নীতি প্রবর্তিত হলে নিম্ন মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক বলে কোনো স্তর থাকবে না।

৪. **উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সুপারিশ :** উচ্চশিক্ষা নিয়ে খসড়া প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, উচ্চশিক্ষার নীতি হবে বিজ্ঞানমনস্ক, অসাম্প্রদায়িক, উদারনৈতিক, মানবমুখী, প্রগতিশীল ও দূরদর্শী। ক্ষুদ্র জাতিসত্তা এবং অন্যান্য গোষ্ঠীর সন্তানদের পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য বিশেষ সহায়তা দেয়া হবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ৪ বছরের সমন্বিত অনার্স এবং এক বছরের মাস্টার্স কোর্স পড়ানো হবে। যেসব কলেজ যথাযথ ব্যবস্থা করতে পারবে সেগুলোতে ৪ বছরের অনার্স পড়ানো যেতে পারে। অন্যান্য কলেজে আপাতত ৩ বছরের ডিগ্রি কোর্স চালু থাকবে। সব বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে বিভিন্ন বিষয়ের পাঠ্যসূচি হবে এক এবং অভিন্ন। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে সব ডিগ্রি কোর্স পর্যায়ে ১০০ নম্বরের ইংরেজি বিষয় বাধ্যতামূলক হতে হবে। মেধা ও অভিভাবকের আর্থিক সচ্ছলতার নিরিখে শিক্ষার্থীদের পর্যাপ্ত পরিমাণ বৃত্তি দেয়া হবে। তাছাড়া মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা যাতে মেধার ভিত্তিতে সহজ শর্তে ঋণ সুবিধা পায় তার সুপারিশ রয়েছে। এছাড়া প্রতিবেদনে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনকে কঠোর জবাবদিহিতার মধ্যে আনা, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে বিভাগীয় আঞ্চলিক কেন্দ্রে স্থাপন করে এর কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ এবং উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমমানের করার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।

৫. **মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কারে প্রস্তাবনা :** খসড়া জাতীয় শিক্ষানীতিতে মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজিয়ে যুগোপযোগী করে তুলতে আটটি কৌশল উপস্থাপন করা হয়েছে। এতে এবতেদায়ি পর্যায় থেকেই বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাকে সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। এছাড়া ইংরেজি, গণিত, বাংলা ও বাংলাদেশ পরিচিতিমূলক বিষয়ও অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ রয়েছে। এসব বিষয়ে শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন পদ্ধতি সাধারণ শিক্ষাধারার মতোই থাকবে। অর্থাৎ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, কারিগরি শিক্ষা বোর্ড বা প্রস্তাবিত তথ্যপ্রযুক্তি, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা কাউন্সিল বিষয়গুলোতে শিক্ষার্থীর দক্ষতা মূল্যায়ন করবে। আর ধর্মীয় শিক্ষা মূল্যায়ন করবে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড।

৬. **টিউশনি ও কোচিং ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ :** খসড়া প্রতিবেদনে বলা হয়েছে শিক্ষক সমাজের একাংশের নৈতিকতার অভাবে দেশে ব্যাপকভাবে প্রাইভেট টিউশনির ব্যবস্থা ও কোচিং সেন্টার চালু হয়েছে। তা নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ দ্রুত গ্রহণ করা হবে। কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত নন এমন ব্যক্তি যদি কোচিং সেন্টার চালাতে চান তা পারবেন। তবে তা যথাযথ মানসম্পন্ন হতে হবে এবং চালু করার/রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিতে হবে। কমিশনের সুপারিশে আরও বলা হয়েছে যে কোনো স্থানে ৫ বা ততোধিক শিক্ষার্থীর পারিশ্রমিকের বিনিময়ে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার যে কোনো ধারার যে কোনো বিষয়ে পাঠদান করা হলে তার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ও নিবন্ধন গ্রহণ করতে হবে।

উপসংহার : বাস্তবভিত্তিক শিক্ষা জাতীয়তাবোধ ও মানসিক বিকাশে যেমন সহায়ক তেমনি অপরিহার্য। পরিবর্তিত বিশ্বব্যবস্থার সাথে তাল মিলিয়ে শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন এবং বাস্তবায়ন করতে পারলে তবেই এ জাতির মুক্তি সম্ভব। বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। এর গুরুত্ব অনুধাবন করে সরকার প্রতিটি বাজেটেই শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দিয়ে আসছে। দেশে সাক্ষরতার হার বাড়াবার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য ইউনেস্কো ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশ সরকারকে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা পুরস্কারেও ভূষিত করেছে। শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যমান মৌলিক সমস্যাসমূহের প্রতিকার সম্ভব হলে সার্বিক শিক্ষার হার বৃদ্ধির পাশাপাশি নৈতিক গুণাবলী অর্জন ও মানব সম্পদের উন্নয়ন সম্ভব হবে। একই সাথে দেশ উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাবে।

১৭ ॥ বাংলাদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে সমস্যাসমূহ ও সুপারিশ আলোচনা করুন।
[২৭তম; ১৫তম বিসিএস; সিনিয়র স্কেল ২০০২]

অথবা, **বাংলাদেশের নিরক্ষরতা ২০২১ সালের মধ্যে দূরকরণে কি কি কৌশল ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে মনে করেন?** *[৩২তম বিসিএস]*

উত্তর : 'শিক্ষা শেকড়ের রস তেতো হলেও এর ফলটা কিন্তু মিষ্টি'– রবীন্দ্রনাথের এ শিক্ষা সম্পর্কিত বাণী প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক সব শিক্ষার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। শিক্ষাকে যারা উৎপাদনশীলতার নিরিখে বিবেচনা করতে চান তাদের কাছে শিক্ষা যেমন উপার্জনের মাধ্যম আবার যারা বলেন শিক্ষার কাজ হলো সৃজনশীলতা তারা সব শিক্ষাকেই এর অভ্যন্তরে স্থান দেন। একুশ শতকে এসে শিক্ষা, শিক্ষা কাঠামো, শিক্ষা ভাবনায় যেমন পরিবর্তন এসেছে তেমনি বৈশ্বিক শিক্ষার প্রেক্ষাপটটিও নতুন করে ভাবতে হচ্ছে একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ এবং বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে। শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য যেখানে শিশুর সামাজীকিকরণের প্রক্রিয়ার ওপর নিহিত তাই এ প্রক্রিয়ার শুরুটা হয় কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার ভেতর দিয়েই। শিক্ষা স্বতঃস্ফূর্ততার মধ্য দিয়ে অর্জিত হবে নাকি বাধ্যতামূলক ঘোরটোপের মধ্যে থাকবে তা নির্ভর করে একটি দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা, পরিকল্পনা ও ভবিষ্যৎ লক্ষ্যমাত্রার ওপর।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান অবস্থা : বাংলাদেশে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছুটা অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৪-এর তথ্যমতে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নীট ভর্তির হার ১০০%-এ দাঁড়িয়েছে। ছেলে ও মেয়ে শিশুর বিদ্যালয়ে উপস্থিতির ক্ষেত্রে সমতা অর্জিত হয়েছে (ছাত্র ঃ ছাত্রী = ৪৯.৯৪ ঃ ৫০.০৬)। সাক্ষরতার হার পৌঁছেছে ৫৭.৯% (৭ বছর+)-এর কোঠায়। প্রাথমিক শিক্ষাপরবর্তী ঝড়ে পড়া শিশুর সংখ্যা ১৯৭০ সালের তুলনায় ৮০ শতাংশ থেকে নেমে এসে বর্তমানে ৩০ এ উন্নীত হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষার মূল সমস্যাসমূহ : বাংলাদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। দক্ষ শিক্ষকের অভাব, গ্রাম ও শহরের মধ্যে গুণগত মানে পার্থক্য। শ্রেণীকক্ষের সঙ্কট, শিক্ষা উপকরণের অপ্রতুলতা, শিক্ষকদের পাঠদানে অনীহা, প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রাতিষ্ঠানিক ইত্যাদি সমস্যা প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজমান। নিচে প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে সমস্যাসমূহ আলোচনা করা হলো :

১. **সরকারি অপ্রতুল সহায়তা :** বাংলাদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যয়ের গুরুত্বপূর্ণ অংশ আসে সরকারের কাছ থেকে। অপ্রাতিষ্ঠানিক ও উপ-আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে যেসব স্কুল রয়েছে সেগুলো বেসরকারি সাহায্য সংস্থা দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। উপ-আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে প্রায় ২ মিলিয়ন শিশুকে শিক্ষা কার্যক্রমের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশে প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য ধার্যকৃত প্রাথমিক শিক্ষা ব্যয় ২৩ ডলার, যা কিনা ভারত (৪৮ ডলার), পাকিস্তান (৪২ ডলার), শ্রীলঙ্কা (৪২ ডলার) এবং চীন (৪৩ ডলার) অপেক্ষা অনেক কম। যেখানে বাংলাদেশের জাতীয় বাজেটের শতকরা ৪০ ভাগ রাজস্ব খাতে এবং শতকরা ৫০ ভাগ উন্নয়ন খাতে ব্যয় ধরা হয় সেখানে শিক্ষা ব্যয় নিতান্তই কম।

২. **গুণগত পরিবর্তন ছাড়াই পরিমাণগত পরিবর্তন :** দেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে যে বিষয়টি উল্লেখযোগ্য তা হলো এর পরিমাণগত পরিবর্তন। দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৯৭ ভাগ স্কুল পড়ুয়া শিশুকে এর আওতায় আনা গেলেও গুণগত লক্ষ্যমাত্রা খুব কমই অর্জিত হয়েছে। গ্রাম এবং শহরের শিক্ষা বৈষম্য অনেক প্রকট আকার ধারণ করেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জুনিয়র স্কলারশিপের ফলাফলের ভিত্তিতে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB) কর্তৃক পরিচালিত একটি জরিপে দেখা গেছে যে, এক-তৃতীয়াংশ স্কুল পড়ুয়া শিক্ষার্থী গণনা, পড়তে এবং লিখতে পারার মতো যোগ্যতা অর্জন করেছে আর দুই-তৃতীয়াংশ শিক্ষার্থী এসব যোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। অন্য এক জরিপে দেখা গেছে যে, শহরের স্কুলগুলো গ্রামের স্কুলগুলো থেকে দক্ষতা অর্জনে অনেক বেশি এগিয়ে এবং মেয়েরা ছেলেদের থেকে প্রতিযোগিতায় অনেক ভালো করে।

৩. **কাঠামোগত দুর্বলতা :** আমাদের দেশে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় অনেক কম। অধিকাংশ শিক্ষক উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাবে শিক্ষার্থীদের যথার্থ উজ্জীবিত করতে ব্যর্থ হয়। শিক্ষকদের মধ্যে পাঠদানে অনীহা এবং শিক্ষা বহির্ভূত অন্যান্য কর্মে সংশ্লিষ্ট থাকতে দেখা যায়। উপস্থিতির নিম্নহার, শিক্ষা উপকরণের অপ্রতুলতা, শ্রেণীকক্ষের সঙ্কট প্রভৃতি প্রাথমিক শিক্ষার নিম্নমানই প্রমাণ করে। প্রাতিষ্ঠানিক তদারকির অভাব, ক্লাসরুমের দক্ষতা মনিটরিংয়ের অভাব প্রভৃতি শিক্ষার নিম্নমানের জন্য দায়ী।

৪. **দুর্বল আঞ্চলিক অংশগ্রহণ :** দুর্বল আঞ্চলিক সহযোগিতা প্রাথমিক শিক্ষার নিম্নমানের অন্যতম কারণ। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক স্কুল শিক্ষা কার্যক্রমে গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের খুব কম অংশগ্রহণ করে থাকে। স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং অভিভাবক শিক্ষক-সমিতি প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ। কমিটির সদস্যদের অসহযোগিতা, শিক্ষক-কমিটি এবং প্রশাসনের মধ্যে অসহযোগিতা স্কুল ব্যবস্থাপনায় বাধা সৃষ্টি করে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৫. **আনুষ্ঠানিক এবং উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমে বিভাজন :** দেশে প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমে সুস্পষ্ট বিভাজন লক্ষ্য করা যায়, যা কিনা লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো শিক্ষাক্ষেত্রেও বেসরকারি সাহায্য সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় তারা শ্রমজীবী শিশুদেরকে এবং অনাথ শিশুদেরকে শিক্ষা উপকরণ দিচ্ছে। কিন্তু মানের দিক থেকে এখানেও খুব বেশি অগ্রগতি সাধিত হয়নি।

৬. **সম্পদের অপ্রতুলতা :** শিক্ষা তহবিলের অভাব এবং সম্পদের যথার্থ ব্যবহারের অভাব প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া দেশের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো শিক্ষাক্ষেত্রেও দুর্নীতি বিরাজ করছে, যা সার্বিক শিক্ষা কার্যক্রমে সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

৭. **আর্থ-সামাজিক অবস্থা :** দেশের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমেও প্রভাব রাখছে। দেশের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদনির্ভর লুটেরা ধনবাদী ধারায়। হতদরিদ্র দেশে সামরিক ব্যয় বরাবরই শিক্ষা ব্যয়ের চেয়ে বেশি। ছাত্রদের চরিত্র হননের জন্য সুকৌশলে ভোগবাদ, অপসংস্কৃতি, মূল্যবোধের অবক্ষয়, স্বার্থপরতা ইত্যাদি নেতিবাচক সামাজিক মনস্তত্ত্বের জন্ম দিচ্ছে। শিক্ষা কার্যক্রমের বাইরে শিশুর মনস্তত্ত্ব ও চারিত্রিক গঠন নির্ভর করে বাইরের জগৎ থেকে সে যা দেখে তা থেকে সে শিক্ষা গ্রহণ করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি কেবল নেতিবাচক মানসিকতারই জন্ম দেয়। উপরন্তু শিক্ষা কার্যক্রমে বিভাজন শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যকে যেমন ব্যাহত করছে তেমনি শিশুর মনস্তত্ত্বেও এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

৮. **শিক্ষা কাঠামোর সঙ্কট :** একটি দেশের শিক্ষা কাঠামোর ওপর নির্ভর করে সে দেশের শিক্ষা কার্যক্রমের সফলতা। শিক্ষা কাঠামোর বাস্তব বিশ্লেষণে আমরা দেখি যে, শিক্ষার বৈষম্য দিন দিন প্রকট হচ্ছে। একদিকে চলছে মাদ্রাসা শিক্ষা, অপরদিকে কিন্ডারগার্টেন শিক্ষা। একই ধারায় শিক্ষাব্যবস্থা এখনো গড়ে ওঠেনি। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় ধনী ও গরিবের মধ্যে, গ্রাম ও শহরের মধ্যে, নারী ও পুরুষের মধ্যে সীমাহীন বৈষম্য বিদ্যমান। উচ্চবিত্ত ও সাধারণের জন্য দু'ধরনের শিক্ষাপদ্ধতি ছাড়াও বাস্তব উপযোগিতাহীন ধর্মীয় শিক্ষা পদ্ধতি এখনো বিদ্যমান। প্রতিবছর হাজার হাজার ছাত্র শিক্ষাজীবন অসমাপ্ত রেখেই বিদায় নিতে বাধ্য হয়। সরকারি তথ্য অনুযায়ী প্রতি বছর প্রাথমিক পর্যায়ে ৩৫% ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া থেকে ঝড়ে পড়ে। 'শিক্ষা সুযোগ নয়, অধিকার'— এ শ্লোগানটি বহুল ব্যবহৃত হলেও বাস্তবে দেখা যাচ্ছে ভিন্ন চিত্র। শিক্ষা ব্যয় বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে শিক্ষা সঙ্কোচনের নীতি সমাজে পরিলক্ষিত হয়। তাছাড়া প্রাথমিক স্কুলগুলোতে অভিজ্ঞ শিক্ষকের স্বল্পতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। অধিকাংশ স্কুলে পর্যাপ্ত অবকাঠামো নেই, লাইব্রেরি নেই, শিক্ষা উপকরণের অপ্রতুলতা লক্ষণীয়। ছাত্রদের খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক সুযোগ-সুবিধা, শিক্ষা সফরের সুযোগ নেই। ফলে শিক্ষার মান কমে যাচ্ছে। একজন ছাত্রের শিক্ষার সাথে সাথে শারীরিক ও মানসিক বিকাশ লাভ কঠিন হয়ে পড়ছে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

০৯. **শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমস্যা :** নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণের কোনো সরকারি উদ্যোগ নেই। অনেক বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অর্থাভাবে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, অধিকাংশগুলো কোনো প্রকারে টিকে আছে। অসংখ্য প্রাইমারি স্কুলের অস্তিত্ব বিলিন হয়ে গেছে। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১,০৪,০১৭ যা প্রয়োজনের তুলনায় কম। ধনীর সন্তানদের জন্য ব্যয়বহুল কিন্ডারগার্টেন গড়ে ওঠছে। শিক্ষা বাজেটের একটা অংশ যাচ্ছে মাদ্রাসাগুলোতে। অথচ গরিব ও মধ্যবিত্ত জনগণের জন্য কিছুই করা হচ্ছে না। ফলে তাদের পক্ষে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। গ্রামের ও শহরের ছাত্রের মধ্যে ব্যবধান ক্রমেই বাড়ছে। স্কুল কর্তৃপক্ষের দুর্নীতির কারণেও অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নতুন সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। উল্লেখ্য, ১৯৯৩ সালে 'খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা' কর্মসূচি চালু হলেও দুর্নীতির কারণে তা সম্ভাব্য লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে।

১০. **শিক্ষকদের সমস্যা :** একজন শিক্ষক যখন নিজের ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার খরচ চালাতে পারেন না, তার চেয়ে দুঃখের আর কি আছে। শিক্ষকদের বেতন এতই কম যে, নিশ্চিত মনে তারা ছাত্রদের শিক্ষা দিতে পারেন না। প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের অবস্থা আরো করুণ। গত কয়েক বছরে শিক্ষকদের সামাজিক মর্যদাও ক্ষুণ্ন হয়েছে। উপযুক্ত মর্যাদা না থাকায় এবং সরকারি অপরিণামদর্শী নীতির কারণে অনেক শিক্ষক শিক্ষকতা ছেড়ে অন্য পেশায় চলে যাচ্ছেন। বেসরকারি স্কুলের শিক্ষকদের পক্ষে টিকে থাকা বা মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন অসম্ভব হয়ে পড়েছে। শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা নেই।

সুপারিশসমূহ : প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান এসব সমস্যা সমাধানের জন্য ইতিপূর্বে যেসব পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তার অনেকগুলোই যথেষ্ট অর্থ-সম্পদ বিনিয়োগের অভাবে ব্যর্থ হয়েছে। কাজেই সর্বাগ্রে শিক্ষা খাতে এবং প্রাথমিক শিক্ষা খাতে বরাদ্দের পরিমাণ অন্তত দ্বিগুণ করতে হবে। এছাড়া সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়নের জন্য যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার সেগুলো হলো :

- একটি দেশের সার্বিক শিক্ষাব্যবস্থা নির্ভর করে শিক্ষা কাঠামোর ওপর। শিক্ষা কাঠামোতে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম একমুখী হতে হবে।
- শিক্ষা উপকরণের দাম কমাতে হবে, যাতে করে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পক্ষে তা নির্বাহ করা সহজসাধ্য হয়।
- শিক্ষা সুযোগ নয়, অধিকার— এ কথাটির বাস্তব প্রয়োগ ঘটাতে হবে।
- প্রাথমিক স্কুলসমূহের ভৌত অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে হবে, শ্রেণীকক্ষের পরিবেশ এমন হতে হবে, যাতে করে শিশু স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিক্ষাগ্রহণে উৎসাহী হয়।
- বেসরকারি প্রাথমিক স্কুলসমূহকে পর্যায়ক্রমে জাতীয়করণ করতে হবে।
- পাঠ্যসূচিতে মূল্যবোধ, নৈতিকতা, মহান ব্যক্তিদের জীবনী প্রভৃতি সংযোজিত করতে হবে। পাঠ্যসূচি এমন হবে যাতে করে শিশুর মনস্তত্ত্ব গঠনে দেশীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রভাব থাকে।
- খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, বইপড়া, বনভোজন প্রভৃতি আয়োজনের মধ্য দিয়ে উৎসবমুখর পরিবেশে শিশুকে শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় নিয়ে আসতে হবে।
- শিক্ষকদের বেতন কাঠামো জাতীয় ভিত্তিতে নির্ধারণ করতে হবে এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। সমাজে শিক্ষকদের অবস্থানকে সম্মানজনক পর্যায়ে পৌঁছে দিতে হবে।
- সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি অঙ্কন, শারীরিক শিক্ষা, সংগীত প্রভৃতি বিষয়কে পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

- শ্রেণীকক্ষে মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- অপেক্ষাকৃত কম মেধাবী শিক্ষার্থীদের বিশেষ কোচিংয়ের মাধ্যমে তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার স্পৃহা বাড়িয়ে তুলতে হবে।
- প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমে শিক্ষক সমিতি, অভিভাবকবৃন্দ, স্কুল কমিটি, প্রশাসনের আন্তরিক সহযোগিতার মাধ্যমে কার্যক্রমকে সাফল্যমণ্ডিত করতে হবে।
- শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাতকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে।
- শিক্ষাক্ষেত্রে অনিয়ম-দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে।
- প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক সকল শিক্ষাকে এ কার্যক্রমের আওতায় নিয়ে আসতে হবে।
- প্রতি তিন মাসে অভিভাবকবৃন্দের সভা আহ্বান করে কার্যক্রমের মধ্যে তাদেরকে সংশ্লিষ্ট করে নিতে হবে।
- সরকারি সহায়তা ছাড়াও ব্যক্তিগত ও বেসরকারি সাহায্য গ্রহণের ব্যাপারে নীতিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে নতুন নতুন প্রজেক্ট হাতে নিতে হবে।
- বিত্তশালীদের কাছ থেকে বাধ্যতামূলক শিক্ষা কর আদায় করতে হবে।
- ইউনেস্কো ঘোষিত জাতীয় আয়ের শতকরা ৮ ভাগ শিক্ষাক্ষেত্রে বরাদ্দ দিতে হবে।
- বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যসূচিতে প্রতিটি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার স্ব-স্ব মাতৃভাষায় পাঠদানের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, শিক্ষা একটি দেশের অর্থনীতি, সমাজব্যবস্থা, মূল্যবোধ, জাতীয় ঐতিহ্য প্রভৃতি অভিব্যক্তির আকার হিসেবে উপস্থাপিত হয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য যেখানে সৃজনশীলতা সেখানে মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন অগ্রসর মানুষ তৈরির প্রক্রিয়ার মধ্যেই তা নিহিত। সুতরাং নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিক্ষা কাঠামোর আমূল পরিবর্তনের মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নে সকলকে সচেতন হতে হবে।

১৮ ॥ মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় কি পরিবর্তন আনয়ন করা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

অথবা, বাংলাদেশে মানবসম্পদ বিকাশে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন। [৩৪তম বিসিএস]

উত্তর : কোনো দেশের জনসংখ্যার প্রশিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তিকে বলা হয় মানবসম্পদ। অন্যান্য সম্পদের মতো মানবসম্পদও একটি দেশের, জাতির এবং সমগ্র বিশ্বের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য প্রয়োজন। আমাদের এ ছোট এবং ঘনবসতিপূর্ণ দেশে প্রাকৃতিক সম্পদ তেমন নেই। আমাদের আছে প্রায় ষোল কোটির বিশাল জনসংখ্যা। এ জনসংখ্যার ভারে ন্যুজ না হয়ে বিশ্বের বুকে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে একমাত্র মানবসম্পদের উন্নয়ন এবং ব্যবহারের মাধ্যমে তা করতে হবে। কিন্তু আমাদের দেশের জনসংখ্যা প্রশিক্ষিত এবং দক্ষ নয়। তাই শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এ জনসংখ্যাকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করা একান্ত জরুরি। সে লক্ষ্যে আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার ব্যাপক সুপরিকল্পিত পরিবর্তন একান্ত প্রয়োজন। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায় তাদের রয়েছে শিক্ষিত এবং প্রশিক্ষিত দক্ষ জনশক্তি এবং এ দক্ষ জনশক্তি আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে নিজেদের উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে দিয়েছে।

আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা : আমাদের দেশে বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা রয়েছে। মূলধারার শিক্ষা, ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষা এবং কারিগরি শিক্ষা। এছাড়াও রয়েছে কাওমি মাদ্রাসা। এ হরেক রকম শিক্ষা মাধ্যমে পড়ুয়া ছেলেমেয়েরা নিজেদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং জ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্য রাখতে পারছে না। কারণ তাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং শিক্ষার মাধ্যম এক নয়। মূলধারার শিক্ষায় প্রাথমিক বিদ্যালয় বাংলা মাধ্যম ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করছে। ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলো দেশীয় সংস্কৃতিকে উপেক্ষা করে বিদেশী ধারা অনুসরণ করছে। মাদ্রাসা শিক্ষায় ধর্মীয় শিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়ে মূলধারার শিক্ষাকে অনুসরণ করছে। এছাড়াও রয়েছে কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা যেখানে শুধু ধর্মীয় শিক্ষা দেয়া হয়ে থাকে। কারিগরি শিক্ষায় মূলধারা এবং ইবতেদায়ি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা পরবর্তীতে শিক্ষা করতে পারে।

আমাদের এ বিশৃঙ্খল শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার মাধ্যমও এক নয়। বাংলা ভাষা শুধু মূলধারার শিক্ষা মাধ্যমেরই মূল বাহন। ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষায় ইংরেজি আর মাদ্রাসা শিক্ষায় আরবি, উর্দু, ফারসি জোর দেয়া হয়। ফলে পরবর্তীতে এসব শিক্ষার্থীরা জনশক্তিতে পরিণত হতে পারে না।

এসব সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছে, যেখানে একমুখী শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এ একমুখী শিক্ষাব্যবস্থায় ইংরেজি মাধ্যম এবং ধর্মীয় মাদ্রাসা শিক্ষাকে আনা হয়নি। ফলে মূলধারার শিক্ষা এবং ইবতেদায়ী মাদ্রাসা শিক্ষাই শুধু একমুখী শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে পড়ছে। তাই এ একমুখী শিক্ষাব্যবস্থাও সমালোচনার মুখে।

মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষাব্যবস্থার সুপারিশ : একটা জাতি তখনই সমৃদ্ধ জাতি বলে পরিগণিত হয় যখন তারা সুশিক্ষিত হতে পারে। আর সুশিক্ষিত জাতিই পারে বর্তমানের সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যেতে। তাই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা আধুনিক এবং যুগোপযোগী হওয়ার দরকার। নিচে সুপারিশসমূহ আলোচিত হলো :

১. **শিক্ষাব্যবস্থার একমুখীকরণ :** আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাকে মূলধারার শিক্ষার সাথে একমুখী করতে হবে। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শিক্ষার্থীকে বিজ্ঞান শিক্ষায় আকৃষ্ট করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত উন্নীত করা একটা ভালো পদক্ষেপ। কারণ পঞ্চম শ্রেণী পাস করেও আমাদের শিক্ষার্থীরা ভালো করে নিজের নামও অনেক সময় লিখতে পারে না। তাছাড়া ধর্ম শিক্ষাভিত্তিক মাদ্রাসাকে মূলধারার সাথে এক করতে হবে। ইংরেজি শিক্ষা মাধ্যমগুলোকে দেশীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং ভাষার প্রতি জোর দিতে হবে।

২. **বিজ্ঞান শিক্ষায় গুরুত্বারোপ :** বর্তমান বিশ্ব প্রযুক্তির উন্নত শিখরে পৌছেছে। তাই গণিত এবং বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করতে হবে। একমুখী শিক্ষাব্যবস্থায় কোনো বিভাগ থাকবে না দশম শ্রেণী পর্যন্ত। পরবর্তীতে বিজ্ঞান, মানবিক, বাণিজ্যিক বিভাগ তারা নিজেরা পছন্দ করবে। কিন্তু অনেক বিশেষজ্ঞের মতে এতে বিজ্ঞানের উপর কম জোর দেয়া হবে। তাই শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান এবং গণিতের উপর জোর দেয়া একান্ত জরুরি। এতে পরবর্তীতে শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে।

৩. **কারিগরি শিক্ষায় গুরুত্বারোপ :** আমাদের দেশে কারিগরি শিক্ষাকে তেমন মূল্যায়ন করা হয় না। কিন্তু কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা সম্ভব। যেসব শিক্ষার্থী উচ্চ শিক্ষায় যেতে পারবে না তাদের কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে প্রশিক্ষিত করতে পারলে দেশে এবং বিদেশে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে কাজ করানো যাবে। এতে তারা নিজেরাও আর্থিকভাবে লাভবান হবে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

কোরিয়ায় যে প্রযুক্তির বিপ্লব সম্ভব হয়েছিল তার ভিত্তি ছিল সরকারের সহায়তায় বিদেশে প্রশিক্ষিত বিজ্ঞানীদের শিক্ষাব্যবস্থার সাথে যুক্ত করে গবেষণা ও শিক্ষার সমন্বয় সাধন। সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়া একইভাবে নিজেদের উন্নতি করেছে।

৪. **উচ্চশিক্ষার গবেষণার উপর গুরুত্বারোপ :** আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষা তার প্রাচীন পদ্ধতিতেই রয়ে গেছে। শুধু মুখস্থবিদ্যার ওপর ভর করে চলছে। কিন্তু উচ্চ শিক্ষাকে আধুনিক করতে হবে। গবেষণার ওপর গুরুত্বারোপ করতে হবে। এর জন্য সরকারি সাহায্য বাড়াতে হবে।

৫. **নারী শিক্ষায় গুরুত্বারোপ :** দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক প্রায় নারী। তাই তাদের সুশিক্ষিত করতে সরকার দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক ব্যবস্থা চালু করেছে। এটাকে আরো বাড়াতে হবে এবং দীর্ঘদিন পৃষ্ঠপোষকতা করতে হবে। তাছাড়া তাদের সুশিক্ষিত করে বসিয়ে রাখলে চলবে না, কাজ করার সুযোগ এবং পরিবেশ দিতে হবে। আমাদের দেশে নারীদের প্রতি বৈষম্য করা হয়। এতে তারা সব কিছুতে পিছিয়ে পড়ে। তাই নারী শিক্ষার অগ্রগতির জন্য সচেতনতা এবং সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা দরকার।

৬. **সুশিক্ষিত এবং সুপ্রশিক্ষিত শিক্ষক :** শিক্ষার মূল হচ্ছে শিক্ষক। শিক্ষার মান উন্নতির জন্য শিক্ষকদের মান উন্নত করা প্রয়োজন। আমাদের দেশে শিক্ষকের অবস্থা খুব করুন। মেধাবী লোকজন এখন আর শিক্ষকতায় যেতে চায় না। তাই শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি এবং সময়মতো বেতনপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা দিতে হবে। তাছাড়া তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা দরকার। কারণ তিনি বন্ধু, পথপ্রদর্শক, সন্ধানী, সৃজন সহযোগী, আলোচনায় বিতর্কের সঙ্গী হয়ে নতুনের উদ্ভাবন করেন, নতুন মনের সৃষ্টি করেন। তাই সুশিক্ষিত জাতি পেতে হলে সুশিক্ষিত এবং সুপ্রশিক্ষিত শিক্ষক দরকার।

৭. **শিক্ষালয়ের পরিবেশ এবং ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক :** আমাদের দেশের শিক্ষালয়ের অবস্থা খুব খারাপ। গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে যেতে শিক্ষার্থীদের অনেক কষ্ট পোহাতে হয়। তাছাড়া সরকারি ছাড়া অন্যান্য বিদ্যালয়ের অবস্থাও খুব জীর্ণ। অধিকাংশ বিদ্যালয়েই খেলার মাঠ নেই। বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা নেই, নেই পায়খানা। এসব অবকাঠামোগত উন্নয়ন না করে ভালো শিক্ষা পাওয়ার আশা করা যায় না। তাই অবকাঠামোগত উন্নয়ন দরকার। তাছাড়া ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক যদি বন্ধুত্বপূর্ণ না হয় তাহলে পাঠদান তেমন কার্যকর হয় না। আর উচ্চশিক্ষায় ছাত্র-শিক্ষক এমনভাবে রাজনীতির সাথে জড়িয়ে গেছে যে, তারা শিক্ষাকে গৌণ মনে করছে।

৮. **শিক্ষাব্যবস্থায় আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার :** আমরা বিজ্ঞানের যুগে বাস করছি। বিজ্ঞানমনস্কতা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। তাই আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার শিক্ষাক্ষেত্রে অপরিহার্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে। প্রথম থেকেই শিক্ষার্থীকে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের সাথে পরিচিত করতে হবে এবং হাতে-নাতে শিক্ষা দিতে হবে। জ্ঞানের যে বৈশ্বিক পরিবর্তন তাতে অংশীদারী হতে হলে শিক্ষায় যে নেটওয়ার্কিং প্রয়োজন তা আমাদের দেশে নেই। তাই অবকাঠামোগত উন্নতি সাধনের মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে আমাদের শিক্ষাকে এগিয়ে নিতে হবে।

উপসংহার : মানবসম্পদ উন্নয়নে শুধু সিলেবাস পরিবর্তন করলেই চলবে না। এর জন্য সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ নিতে হবে। তাছাড়া শুধু শিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত জনশক্তি তৈরি করলেই চলবে না তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ দিতে হবে। আমাদের দেশ থেকে অনেক শ্রমিক বিদেশে গিয়ে কাজ করে। তাদের যদি স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণও দেয়া যায় তাহলেও তারা দক্ষ হয়ে উঠে। আর প্রশিক্ষিত হলে

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

বিদেশে গিয়ে কাজ করার সুযোগ আরো বাড়বে। তাছাড়া আমাদের বর্তমান শিক্ষাকে পাল্টিয়ে আধুনিকায়ন করতে হলে সব কিছুতেই পরিবর্তন অপরিহার্য। সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তনও কাঙ্ক্ষিত নয়। আর জনগণকে শিক্ষিত, দক্ষ করতে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন জরুরি। যদিও কয়েক বছর যাবৎ সরকার শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দিয়ে আসছে। কিন্তু এটাও যথেষ্ট নয়। সরকারি উদ্যোগ, পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন এবং সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জনসংখ্যাকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নতি তথা মুক্তি লাভ করতে হবে।

১৯ । 'শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড'– উক্তিটির ব্যাখ্যা দিন। আপনি কি মনে করেন দেশের প্রয়োজনীয় দক্ষ জনশক্তি উন্নয়নে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা যথেষ্ট? *[২৭তম বিসিএস]*

উত্তর : 'Education is the backbone of a nation'. মানুষের পরিচয় তার যোগ্যতায় তার মনুষ্যত্ববোধে। মানব সন্তান হিসেবে জন্মগ্রহণ করলেই মানুষের যোগ্যতা বা মনুষ্যত্ব বা তার সর্ববিধ গুণ তার মধ্যে বিকশিত হয়ে ওঠে না। এসব গুণ তাকে নিজের সাধনায় অর্জন করতে হয়। আর যথার্থভাবে তা অর্জন করা সম্ভব হলে তার মধ্যে যোগ্যতার বিকাশ ঘটে, মনুষ্যত্ব অর্জিত হয়, যথার্থ মানুষ হিসেবে তখন তার বৈশিষ্ট্য রূপলাভ করে; এ যোগ্যতা বা গুণাবলী অর্জনের জন্য মানুষকে যা অর্জন করতে হয় তা হলো শিক্ষা। শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে মানুষ তার জীবনের প্রয়োজনীয় বিকাশ ঘটায়। সে যোগ্যতার অধিকারী হয়ে জীবনটা প্রতিষ্ঠিত করে এবং মনুষ্যত্বের গুণাবলী অর্জন করে সে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে নিজের গৌরব ঘোষণা করে। ব্যক্তিজীবনে শিক্ষার এ সাফল্য জাতীয় জীবনে প্রতিফলিত হয়ে জাতিকে সমৃদ্ধ করে, জাতিকে বড় করে। বিশ্বের দরবারে অর্জন করে মর্যাদাপূর্ণ আসন। এসব কারণেই শিক্ষাকে জাতির মেরুদণ্ড বলা হয়।

শিক্ষার বৈশিষ্ট্য : শিক্ষার সংজ্ঞা হলো– 'Education is the harmonious development of body, mind and soul'. শিক্ষা মানুষের মানবিক, দৈহিক ও নৈতিক প্রশিক্ষণের ধারাবাহিক পদ্ধতি বলে বিবেচিত। জ্ঞানার্জনের লক্ষ্য সামনে রেখে শিক্ষার বিভিন্ন পদ্ধতির প্রয়োগে জীবনকে উৎকর্ষমণ্ডিত করা হয়; শিক্ষার্থীর মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শিতা বিকাশ লাভ করে। অজানাকে জানার নাম শিক্ষা। সেই জানাকে প্রয়োগ করার কৌশল শিক্ষা। মানুষের সুপ্ত প্রতিভাকে কাজে লাগানোর জন্য শিক্ষা পদ্ধতির বিকাশ ঘটেছে। শিক্ষার সহায়তায় মানুষ যোগ্যতা অর্জন করে। তার লব্ধ জ্ঞান তাকে শক্তিশালী করে তোলে। বিশ্বের বিচিত্র জ্ঞানভাণ্ডারের সাথে শিক্ষার মাধ্যমেই পরিচিত হওয়া যায়। জীবনের পথে শত সহস্র বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে জীবনের সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেওয়ার জন্য দরকার শিক্ষার। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে পরিচিত হয়ে তা থেকে জীবনকে উপকৃত করার প্রধান মাধ্যম হলো শিক্ষা। মানুষের মধ্যে যে অফুরন্ত সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে তা বিকশিত করে মানবজাতির জন্য কাজে লাগানোর কৌশল আছে শিক্ষা পদ্ধতিতে।

জাতীয় জীবনে শিক্ষা : জাতীয় জীবনে শিক্ষার গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে শিক্ষাকে জাতির মেরুদণ্ড বলে অভিহিত করা হয়েছে। শিক্ষা কোনো জাতির উন্নতির পূর্বশর্ত। শিক্ষার মাধ্যমে জাতি এগিয়ে যায়, উন্নতির শীর্ষে আরোহণ করে। শিক্ষায়, জ্ঞান-বিজ্ঞানে যে জাতি যত বেশি অগ্রসর সে জাতি তত বেশি উন্নত। শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে জাতির প্রতিটি লোক যদি জ্ঞান-বিজ্ঞানে দক্ষতা অর্জন করে যোগ্যতার অধিকারী হয় তাহলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা প্রচুর অবদান রাখতে পারবে; কাজে কর্মে তখন

জাতি উন্নতি লাভ করবে, অর্থনৈতিক দিক থেকে সমৃদ্ধি আনয়ন করে সমৃদ্ধ জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাবে। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি জাতিকে মর্যাদাসম্পন্ন করে তোলে এবং জাতীয় জীবনে সুখের প্রাচুর্য আনয়ন করে। শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষা সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে এবং সভ্যতার উৎকর্ষ সাধিত হয়। শিক্ষিত মানুষের মধ্যেই মহামনীষীর আবির্ভাব ঘটে। তারা নিজের জাতি ও সারা বিশ্বকে জ্ঞানের ও কর্মের অবদানে সমৃদ্ধ করে তোলেন। জাতীয় উন্নতির জন্য যেসব পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তার জন্য দরকার হয় দক্ষ জনশক্তির। আর শিক্ষার মাধ্যমেই দক্ষ জনশক্তি গড়ে ওঠে।

শিক্ষার প্রভাব : ব্যক্তিজীবনে যেমন, তেমনি জাতীয় জীবনেও শিক্ষার প্রভাবে গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা হয়। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ নানা দিক থেকে যোগ্যতা অর্জন করে। তার নিজের গুণের যেমন বিকাশ ঘটায়, তেমনি বিভিন্ন বিদ্যা অধ্যয়ন করে নানা বিষয়ে পারদর্শী হয়ে ওঠে। তার এ যোগ্যতা কাজে লাগিয়ে সে জীবনে প্রভূত উন্নতির সুযোগ পায়। সেজন্য মানুষ সারাজীবন শিক্ষা লাভ করে। শিক্ষার ব্যাপারে মানুষের আগ্রহের শেষ নেই। শিক্ষার মাধ্যমে বুদ্ধি ও মেধার বিকাশ ঘটে। যার শিক্ষা নেই তার বুদ্ধি বিকশিত হয় না। তার কাজের যোগ্যতা থাকে না। জাতিকে সমৃদ্ধ করতে হলে বিভিন্ন পেশার লোকদের কাজের মাধ্যমে সুফল অর্জন করতে হয়। কিন্তু যার মধ্যে কোনো শিক্ষা নেই তার পক্ষে জাতীয় জীবনে কোনো অবদান রাখা সম্ভব নয়। জাতীয় জীবনে নিরক্ষর বা অশিক্ষিত লোকেরা বোঝা হয়ে থাকে। তখন জাতির সকল উন্নয়ন প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়।

জাতির উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন শিক্ষার। বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন করে মানুষ জাতির উন্নতির পথ প্রসারিত করে। অন্যদিকে, শিক্ষার অভাবে জাতি নির্জীব হয়ে যায়। শিক্ষাহীন জাতি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জড়িত হতে পারে না। ফলে দরিদ্রতা তার বৈশিষ্ট্য হয়ে পড়ে। বিশ্বের অনুন্নত ও অনগ্রসর জাতির দুঃখ-দুর্দশা কেবল অশিক্ষার জন্যই। অশিক্ষা সকল সমস্যার উৎস। অশিক্ষা জাতিকে মর্যাদাহীন করে ফেলে।

শিক্ষা জাতীয় উন্নতির চাবিকাঠি— এ কথা মনে রেখে জাতিকে শিক্ষিত করে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে রূপ দিতে হবে। জাতীয় জীবন থেকে অনগ্রসরতা, দারিদ্র্য, কুসংস্কার ইত্যাদি দূর করার জন্য দরকার ব্যাপক শিক্ষার। তাই প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থাকে ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণ করতে হবে। সেই সাথে শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন করে এবং বিভিন্ন জীবনমুখী শিক্ষাধারা প্রবর্তন করে শিক্ষার মাধ্যমে মানবসম্পদ সৃষ্টির যথার্থ উদ্যোগ নিতে হবে। বিশ্বের বুকে উন্নত, সমৃদ্ধ ও মর্যাদাশীল জাতি হিসেবে দাঁড়ানোর জন্য যে দৃঢ় মেরুদণ্ড আবশ্যক তা তৈরি করবে শিক্ষা। তাই কালবিলম্ব না করে দ্রুত গুণগত-মানসম্পন্ন শিক্ষাব্যবস্থার সম্প্রসারণ প্রয়োজন।

দেশের প্রয়োজনীয় দক্ষ জনশক্তি উন্নয়নে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা কী যথেষ্ট?

আমাদের দেশে প্রয়োজনীয় দক্ষ জনশক্তি উন্নয়নে শিক্ষাব্যবস্থা যথেষ্ট নয়। বর্তমান যুগ বিশ্বায়নের যুগ। এ যুগে পৃথিবী তথ্য ও প্রযুক্তিনির্ভর। বিশ্বায়নের যুগে এসে তথ্য, প্রযুক্তি কিংবা কারিগরি শিক্ষাব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা প্রযুক্তিনির্ভর বা কারিগরি মাধ্যমের নয়। এবার দেখা যাক আসলে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা কেমন—

আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থা বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত। যথা–

(i) বাংলা মাধ্যমের শিক্ষাব্যবস্থা

(ii) ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষাব্যবস্থা

(iii) মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা — (ক) আলীয়া মাদ্রাসা ও (খ) কওমী মাদ্রাসা।

পক্ষান্তরে, আমরা যদি উন্নত বিশ্বের দেশগুলোর দিকে তাকাই তাহলে আমরা দেখব সেখানে একমুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত। আর আমাদের দেশে হরেক রকম শিক্ষাব্যবস্থা। এখন আমরা আলোচনা করব দেশের প্রয়োজনীয় দক্ষ জনশক্তি উন্নয়নে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা যথেষ্ট কি না? আমার ব্যক্তিগত মতামত হচ্ছে– আমাদের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে আমাদের দেশে দক্ষ জনশক্তি উন্নয়ন সম্ভব নয় বা যথেষ্ট নয়। কেন যথেষ্ট নয় তার বিস্তারিত বিবরণ আমরা একে একে আলোকপাত করার প্রয়াস পাচ্ছি–

প্রথমত, আমার মতে দেশের প্রয়োজনীয় দক্ষ জনশক্তি উন্নয়নে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা যথেষ্ট নয়। কারণ–

১. **যুগোপযোগী শিক্ষার অভাব :** বর্তমান যুগ বিশ্বায়নের যুগ। এ যুগ তথ্য-প্রযুক্তির যুগ। বর্তমান বিশ্ব অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক। এ প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে টিকে থাকার জন্য দরকার দক্ষ ও জ্ঞানী লোকের। কিন্তু আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থা পুরোপুরি প্রযুক্তিনির্ভর না হওয়ার কারণে এবং যুগোপযোগী শিক্ষার অভাবে দক্ষ ও প্রয়োজনীয় জনশক্তি তৈরি হচ্ছে না। এর জন্য দায়ী যুগোপযোগী শিক্ষার অভাব।

২. **অবকাঠামোগত দুর্বলতা :** অবকাঠামোগত উন্নয়নকেও শিক্ষাব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলা চলে। সুন্দর শিক্ষাব্যবস্থার পাশাপাশি অবকাঠামোগত উন্নয়ন একান্ত প্রয়োজন। অবকাঠামোগত দুর্বলতার জন্য মূলত শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়– আমাদের দেশে প্রাথমিক স্কুলগুলো, যেখানে অধিকাংশ স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের তুলনায় অবকাঠামো অতি সামান্য।

৩. **মান্ধাতার আমলের শিক্ষাব্যবস্থা :** এদেশ ব্রিটিশদের অধীনে থাকাকালে ব্রিটিশরা এমন এক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিল যে শিক্ষাব্যবস্থায় ভারতবর্ষের লোকজন বর্ণে হবে ভারতীয় কিন্তু চিন্তা-চেতনায় হবে ব্রিটিশ। তারা কখনও ভারতবর্ষের মানুষের উন্নতি কামনা করেনি। এমনকি ভারতীয়রা শিক্ষিত হয়ে দক্ষ নাগরিক হিসেবে বিভিন্ন পদে প্রতিষ্ঠিত হোক এটাও তারা কামনা করেনি, বরং তাদের ধ্যানধারণা ছিল ইংরেজরা অফিসের বড় বড় পদে থাকবে আর ভারতীয়রা হবে অফিসের কেরানি। যার ফলে তারা সুনির্দিষ্ট শিক্ষা নীতি তথা শিক্ষাব্যবস্থা তৈরি করেনি যাতে ভারতীয়রা দক্ষ জনশক্তিরূপে পরিগণিত হয়। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, আজও আমরা মান্ধাতার আমলের শিক্ষাব্যবস্থা অনুসরণ করে আসছি।

৪. **নির্দিষ্ট শিক্ষানীতির অভাব :** দেশের প্রয়োজনীয় দক্ষ জনশক্তি তৈরির জন্য প্রথমত যে বিষয়টি থাকা উচিৎ তা হলো সুনির্দিষ্ট একটি শিক্ষানীতি। আমাদের শিক্ষানীতি নিয়ে খেল-তামাশা হচ্ছে। নতুন নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হচ্ছে। আমরা যদি একটু পিছনের দিকে তাকাই তাহলে দেখব, স্বাধীনতা-পরবর্তী এ পর্যন্ত ৫টি শিক্ষা কমিশন ও ৩টি শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন করলেও এসব নীতি দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়। প্রয়োজনীয় দক্ষ জনশক্তি উন্নয়নের লক্ষ্যে দরকার সুনির্দিষ্ট শিক্ষানীতি, যা আমরা আজও প্রণয়ন করতে ব্যর্থ হয়েছি।

৫. **মুখস্থনির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা :** আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা মূলত মুখস্থনির্ভর। ছাত্ররা পরীক্ষায় পাশের জন্য শুধু গৎবাঁধা মুখস্থ করে থাকে। আর করবেইবা না কেন, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাই এরকম। প্রাকটিক্যাল শিক্ষা কম, যার ফলে ছাত্রছাত্রীরা কিছু নির্দিষ্টসংখ্যক প্রশ্ন মুখস্থ করে পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করছে, ফলে তারা মুখস্থনির্ভর হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং এ মুখস্থনির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা প্রয়োজনীয় দক্ষ জনশক্তি উন্নয়নে যথেষ্ট নয়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৬. **পাঠ্যপুস্তক বহির্ভূত শিক্ষা কার্যক্রমের অভাব :** আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় ছাত্রছাত্রীরা পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। শিক্ষকরা মানুষ গড়ার হাতিয়ার এ কথা আমরা সবাই জানি। কিন্তু মানুষ হওয়া নির্ভর করে মন বড় হওয়ার ওপর আর মন বড় হওয়াটা নির্ভর করে প্রচুর বই পড়ার ওপর। পাঠ্যপুস্তক বহির্ভূত শিক্ষা ছাড়া পরিপূর্ণ শিক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব নয়। আমাদের দেশের ছাত্রছাত্রীরা পাঠ্যপুস্তকে নির্দিষ্ট একটি খাঁচার মধ্যে আবদ্ধ। তারা যেন এ খাঁচার মধ্যে বন্দী দশায় কাটাচ্ছে। সুতরাং আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় পাঠ্যপুস্তক বহির্ভূত শিক্ষা কার্যক্রম না থাকলে প্রয়োজনীয় দক্ষ জনশক্তি উন্নয়ন করা সম্ভব নয়।

৭. **ইংরেজির ওপর জোর না দেয়া :** বিশ্বায়নের যুগে ইংরেজি এখন আর একটি ভাষার নাম নয়, বরং এখন এটি একটি টেকনোলজির নাম। ইংরেজি ছাড়া বিশ্বায়নের এ যুগে প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে টিকে থাকাটা সম্পূর্ণ অসম্ভব। সুতরাং প্রয়োজনীয় দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ার জন্য ইংরেজি ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু আমাদের দেশে বিভিন্নমুখী শিক্ষাব্যবস্থায় আজও ইংরেজিকে ঐভাবে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে না। সুতরাং আমাদের দেশে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় ইংরেজির প্রতি গুরুত্বারোপ করা জরুরি।

৮. **নৈতিক শিক্ষার অপ্রতুলতা :** Education is the harmonious development body, mind and soul. আমাদের দেশে বিভিন্ন শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে মাদ্রাসা শিক্ষা ছাড়া অন্য কোনো শিক্ষায় নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা নেই বললেই চলে, আর যতটুকু আছে তা নৈতিক মানে উন্নীত হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। শিক্ষাব্যবস্থায় নৈতিকতার অভাবে আজ বড় বড় শিক্ষিত লোকেরাও দুর্নীতি, ঘুষ, চাঁদাবাজি ইত্যাদির আশ্রয় নিতে কুণ্ঠাবোধ করে না। শিক্ষিত হওয়ার অর্থই হচ্ছে ব্যক্তি জ্ঞানে যেমন সমৃদ্ধ হবে তেমনি নৈতিক দিক থেকে হবে উন্নত চরিত্রের অধিকারী। কিন্তু আমাদের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিকতার শিক্ষা না থাকার কারণে প্রয়োজনীয় দক্ষ জনশক্তি উন্নয়ন যথেষ্ট নয়।

১০. **বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ তৈরির ব্যবস্থা না থাকা :** আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় একটা ছাত্রকে সমস্ত বিষয়ে জ্ঞান রাখতে হয়। সমস্ত বিষয় তাকে পড়তে হয়, তার ফলে সে কোনো বিষয়েই পরিপূর্ণ পাণ্ডিত্য বা পারদর্শিতা অর্জন করতে সক্ষম নয়। যেমন আমাদের দেশের উচ্চশিক্ষায় বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক অনার্স কোর্স চালু আছে। কিন্তু সেখানে এক বিষয়ের মধ্যে নানা বিষয় পড়ানো হচ্ছে। তাহলে ঐ ছাত্রটি কিভাবে বিষয়ভিত্তিক-এর উপরে পাণ্ডিত্য অর্জন করবে? সুতরাং আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় বিষয়ভিত্তিক পড়াশুনা থাকলেও তা দক্ষ জনশক্তি তৈরির জন্য যথেষ্ট নয়।

১১. **প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের অভাব :** আমাদের দেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। আমরা জানি, শিক্ষকরা হচ্ছেন মানুষ গড়ার হাতিয়ার বা কারিগর। যারা দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে নিমজ্জিত তারা যদি দক্ষ না হন তাহলে কিভাবে সম্ভব? শিক্ষকরা বা কারিগররা যদি না জানেন তাহলে তিনি শিক্ষা দিবেন কি? এজন্য আমি বলব আমাদের দেশের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এই অভাব পূরণ করতে না পারলে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা সম্ভব নয়। তাই শিক্ষকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা উচিত।

১২. **শিক্ষকদের অপ্রতুলতা :** আমাদের দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্রছাত্রীর তুলনায় শিক্ষকদের সংখ্যা অতি সামান্য। আমরা যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর দিকে লক্ষ করি তাহলে দেখব ছাত্রছাত্রীর বিপরীতে শিক্ষক সংখ্যায় কম। সুতরাং আমরা যদি প্রয়োজনীয় দক্ষ জনশক্তি উন্নয়ন করতে চাই তাহলে শিক্ষকদের সংখ্যা অবশ্যই বৃদ্ধি করতে হবে। তাহলেই একমাত্র দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা সম্ভব।

১৩. **স্থায়ী ও সুদূরপ্রসারী শিক্ষানীতির অভাব :** আমাদের দেশ একটি গণতান্ত্রিক দেশ হওয়া সত্ত্বেও এদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা থাকে সারা বছর। এমন আজব দেশ যে, সরকার পরিবর্তন হওয়ার সাথে সাথে শিক্ষানীতিও পরিবর্তিত হয়। আবার পরবর্তী সরকার এসে তা বাতিল করে নতুন শিক্ষানীতি চালু করে। ফলে শিক্ষক-শিক্ষার্থী পড়ে মহাবিপাকে। তারা নিত্যনতুন শিক্ষানীতির সম্মুখীন হয়। আমাদের দেশে স্থায়ী ও সুদূরপ্রসারী শিক্ষানীতির যথেষ্ট অভাব রয়েছে। যার ফলে প্রয়োজনীয় দক্ষ জনশক্তি উন্নয়নে এ অস্থায়ী ও ক্ষণস্থায়ী শিক্ষাব্যবস্থা যথেষ্ট নয়।

১৪. **শিক্ষাব্যবস্থা যুগোপযোগীকরণে পর্যাপ্ত গবেষণার অভাব :** বর্তমান যুগ জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগ ও তথ্য-প্রযুক্তির যুগ। কিন্তু আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা পুরোপুরি বিজ্ঞানভিত্তিক ও প্রযুক্তিনির্ভর নয়। এই যুগোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করার জন্য প্রয়োজন যথেষ্ট গবেষণা ও গবেষণাগার কিন্তু তা আমাদের দেশে নগণ্য। আমাদের দেশে কারিগরি ও ভোকেশনাল শিক্ষার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। যার ফলে দক্ষ জনশক্তি তৈরি সম্ভব হচ্ছে না।

১৫. **পরীক্ষায় নকল প্রবণতা :** নকল জাতির জন্য অন্যতম শত্রু। উন্নত ও দক্ষ জাতি গঠনের অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধকতা হলো পরীক্ষায় নকল প্রবণতা। নকল শিক্ষার্থীর প্রতিভাকে বিকশিত হতে দেয় না। শিক্ষার্থীরা যখন নকলের আশ্রয় নেয় তখন তার নৈতিক অবক্ষয় ঘটে। কিন্তু সুখের সংবাদ হচ্ছে আমাদের দেশে ২০০১ সালের পূর্বে নকলের যে ভয়াবহ অবস্থা ছিল তা বলাই বাহুল্য। ২০০১-পরবর্তী সময় সরকারের দৃঢ় পদক্ষেপে নকল প্রবণতা অনেকাংশে কমে এসেছে। শিক্ষার্থীরা পড়াশুনার প্রতি মনোযোগী হয়েছে। এ নকল প্রবণতা দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে বিরাট প্রতিবন্ধক।

উপসংহার : পরিশেষে আমরা এ কথা অত্যন্ত দীপ্তকণ্ঠে বলতে পারি যে, শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। উপরিউক্ত আলোচনার পরে আমরা এও স্বীকার করতে পারি যে, আমাদের দেশে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা প্রয়োজনীয় দক্ষ জনশক্তি উন্নয়নে যথেষ্ট নয়। তবে উপযুক্ত শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিক্ষাকে জাতির মেরুদণ্ড বানানো ও সেই শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি সম্ভব, যা দেশের উন্নয়নে সহায়ক হবে।

২০। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করুন। এই শিক্ষানীতি বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় কি ধরনের সংস্কার নিশ্চিত করতে পারে? *[৩১তম বিসিএস]*
অথবা, **জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ আলোচনা করুন।**

উত্তর : একটি উন্নত আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের জন্য, একটি সুষম সুস্থ-পরিচ্ছন্ন মানবিক সমাজ গড়ে তোলার জন্য সর্বজনীন শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। পৃথিবীর উন্নয়ন-অগ্রগতির ইতিহাসে কোনো জাতি, দেশ, রাষ্ট্র এগুতে পারে না তার গণমানুষকে নিরক্ষর রেখে, অজ্ঞানতা-অশিক্ষা-কুশিক্ষার অন্ধকারে রেখে। এ ধ্রুব সত্যকে বিবেচনায় রেখে জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীকে প্রধান করে ৮ এপ্রিল ২০০৯ জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০৯ কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটি ২ সেপ্টেম্বর ২০০৯ শিক্ষামন্ত্রী ড. নুরুল ইসলাম নাহিদের কাছে তাদের প্রণীত জাতীয় শিক্ষানীতির চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দেন। তারপর তা ৭ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়। প্রধানমন্ত্রী গৃহীত এ শিক্ষানীতিই 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০' হিসেবে পরিচিত।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ও খসড়া প্রতিবেদন : ১৯৭৪ সালের ড. কুদরত-এ-খুদা কমিশনের আলোকে ১৯৯৭ সালে প্রণীত ড. শামসুল হক শিক্ষানীতিকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ৮ এপ্রিল ২০০৯ জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীকে প্রধান করে ১৬ সদস্যবিশিষ্ট একটি জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি গঠন করে। পরবর্তীতে এ কমিটিতে অধ্যাপক ড. খলিকুজ্জামানকে কো-চেয়ারম্যান করা হয় এবং ২ জন সদস্যকে কো-অপ্ট করা হয়। এ কমিটি প্রথম সভা করে ৩ মে ২০০৯। মোট ২৩টি সভার মাধ্যমে এ কমিটি চূড়ান্ত খসড়া রিপোর্ট সম্পন্ন করে। এ চূড়ান্ত খসড়া করতে গিয়ে কমিটি ৫৬টি সংস্থা ও সংগঠনের প্রতিনিধিদের সাথে আলাদা আলাদা বিস্তারিত মত বিনিময় করেন। পরবর্তীতে ২ সেপ্টেম্বর ২০০৯ চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন সরকারের কাছে জমা দেয়।

শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর মূল উদ্দেশ্য মানবতার বিকাশ এবং জনমুখী উন্নয়নে ও প্রগতিতে নেতৃত্বদানের উপযোগী মননশীল, যুক্তিবাদী, নীতিবান, সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কুসংস্কারমুক্ত, পরমতসহিষ্ণু, অসাম্প্রদায়িক, দেশপ্রেমিক ও কর্মকুশল নাগরিক গড়ে তোলা। পাশাপাশি, শিক্ষার মাধ্যমে জাতিকে দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলার বৈশিষ্ট্য ও দক্ষতা অর্জনে সক্ষম করে তোলা। এ উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও নীতিকে সামনে রেখে নিচে ধারাবাহিকভাবে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর উল্লেখযোগ্য লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উপস্থাপন করা হলো :

১. শিক্ষার সর্বস্তরে সাংবিধানিক নিশ্চয়তার প্রতিফলন ঘটানো এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীদের সচেতন করা।
২. ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে নৈতিক, মানবিক, সাংস্কৃতিক, বিজ্ঞানভিত্তিক ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠাকল্পে শিক্ষার্থীদের মননে, কর্মে ও ব্যবহারিক জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা।
৩. মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করে তোলা এবং তাদের চিন্তা চেতনায় দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবোধ এবং চরিত্রে সুনাগরিকের গুণাবলীর (যেমন– ন্যায়বোধ, ধর্মনিরপেক্ষতাবোধ, কর্তব্যবোধ, মানবাধিকার সচেতনতা, শৃঙ্খলা, সহ-জীবনযাপনের মানসিকতা, সৌহার্দ্য, অধ্যবসায় ইত্যাদি) বিকাশ ঘটানো।
৪. জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারা বিকশিত করে প্রজন্ম পরম্পরায় সঞ্চালনের ব্যবস্থা করা।
৫. দেশজ আবহ ও উপাদান সম্পৃক্ততার মাধ্যমে শিক্ষাকে শিক্ষার্থীর চিন্তাচেতনা ও সৃজনশীলতার উজ্জীবন এবং তার জীবনঘনিষ্ঠ বিকাশে সহায়তা করা।
৬. দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি সাধনের জন্য শিক্ষাকে সৃজনশীল, প্রয়োগমুখী ও উৎপাদন-সহায়ক করে তোলা; শিক্ষার্থীদেরকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে তোলা এবং তাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলীর বিকাশে সহায়তা প্রদান করা।
৭. জাতি, ধর্ম, গোত্র নির্বিশেষে আর্থ-সামাজিক শ্রেণীবৈষম্য দূর করা, বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব, অসাম্প্রদায়িকতা, সৌহার্দ্য ও মানুষে মানুষে সহমর্মিতাবোধ গড়ে তোলা এবং মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলা।
৮. বৈষম্যহীন সমাজ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী স্থানিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান নির্বিশেষে সকলের জন্য শিক্ষালাভের সমান সুযোগ-সুবিধা অবারিত করা।
৯. গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ বিকাশের জন্য পারস্পরিক মতাদর্শের প্রতি সহনশীল হওয়া এবং জীবনমুখী, বস্তুনিষ্ঠ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশে সহায়তা করা।

১৩. **স্থায়ী ও সুদূরপ্রসারী শিক্ষানীতির অভাব :** আমাদের দেশ একটি গণতান্ত্রিক দেশ হওয়া সত্ত্বেও এদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা থাকে সারা বছর। এমন আজব দেশ যে, সরকার পরিবর্তন হওয়ার সাথে সাথে শিক্ষানীতিও পরিবর্তিত হয়। আবার পরবর্তী সরকার এসে তা বাতিল করে নতুন শিক্ষানীতি চালু করে। ফলে শিক্ষক-শিক্ষার্থী পড়ে মহাবিপাকে। তারা নিত্যনতুন শিক্ষানীতির সম্মুখীন হয়। আমাদের দেশে স্থায়ী ও সুদূরপ্রসারী শিক্ষানীতির যথেষ্ট অভাব রয়েছে। যার ফলে প্রয়োজনীয় দক্ষ জনশক্তি উন্নয়নে এ অস্থায়ী ও ক্ষণস্থায়ী শিক্ষাব্যবস্থা যথেষ্ট নয়।

১৪. **শিক্ষাব্যবস্থা যুগোপযোগীকরণে পর্যাপ্ত গবেষণার অভাব :** বর্তমান যুগ জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগ ও তথ্য-প্রযুক্তির যুগ। কিন্তু আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা পুরোপুরি বিজ্ঞানভিত্তিক ও প্রযুক্তিনির্ভর নয়। এই যুগোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করার জন্য প্রয়োজন যথেষ্ট গবেষণা ও গবেষণাগার কিন্তু তা আমাদের দেশে নগণ্য। আমাদের দেশে কারিগরি ও ভোকেশনাল শিক্ষার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। যার ফলে দক্ষ জনশক্তি তৈরি সম্ভব হচ্ছে না।

১৫. **পরীক্ষায় নকল প্রবণতা :** নকল জাতির জন্য অন্যতম শত্রু। উন্নত ও দক্ষ জাতি গঠনের অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধকতা হলো পরীক্ষায় নকল প্রবণতা। নকল শিক্ষার্থীর প্রতিভাকে বিকশিত হতে দেয় না। শিক্ষার্থীরা যখন নকলের আশ্রয় নেয় তখন তার নৈতিক অবক্ষয় ঘটে। কিন্তু সুখের সংবাদ হচ্ছে আমাদের দেশে ২০০১ সালের পূর্বে নকলের যে ভয়াবহ অবস্থা ছিল তা বলাই বাহুল্য। ২০০১-পরবর্তী সময় সরকারের দৃঢ় পদক্ষেপে নকল প্রবণতা অনেকাংশে কমে এসেছে। শিক্ষার্থীরা পড়াশুনার প্রতি মনোযোগী হয়েছে। এ নকল প্রবণতা দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে বিরাট প্রতিবন্ধক।

উপসংহার : পরিশেষে আমরা এ কথা অত্যন্ত দীপ্তকণ্ঠে বলতে পারি যে, শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। উপরিউক্ত আলোচনার পরে আমরা এও স্বীকার করতে পারি যে, আমাদের দেশে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা প্রয়োজনীয় দক্ষ জনশক্তি উন্নয়নে যথেষ্ট নয়। তবে উপযুক্ত শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিক্ষাকে জাতির মেরুদণ্ড বানানো ও সেই শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি সম্ভব, যা দেশের উন্নয়নে সহায়ক হবে।

২০। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করুন। এই শিক্ষানীতি বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় কি ধরনের সংস্কার নিশ্চিত করতে পারে? *[৩১তম বিসিএস]*

***অথবা,* জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ আলোচনা করুন।**

উত্তর : একটি উন্নত আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের জন্য, একটি সুষম সুস্থ-পরিচ্ছন্ন মানবিক সমাজ গড়ে তোলার জন্য সর্বজনীন শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। পৃথিবীর উন্নয়ন-অগ্রগতির ইতিহাসে কোনো জাতি, দেশ, রাষ্ট্র এগুতে পারে না তার গণমানুষকে নিরক্ষর রেখে, অজ্ঞানতা-অশিক্ষা-কুশিক্ষার অন্ধকারে রেখে। এ ধ্রুব সত্যকে বিবেচনায় রেখে জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীকে প্রধান করে ৮ এপ্রিল ২০০৯ জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০৯ কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটি ২ সেপ্টেম্বর ২০০৯ শিক্ষামন্ত্রী ড. নুরুল ইসলাম নাহিদের কাছে তাদের প্রণীত জাতীয় শিক্ষানীতির চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দেন। তারপর তা ৭ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়। প্রধানমন্ত্রী গৃহীত এ শিক্ষানীতিই 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০' হিসেবে পরিচিত।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ও খসড়া প্রতিবেদন : ১৯৭৪ সালের ড. কুদরত-এ-খুদা কমিশনের আলোকে ১৯৯৭ সালে প্রণীত ড. শামসুল হক শিক্ষানীতিকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ৮ এপ্রিল ২০০৯ জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীকে প্রধান করে ১৬ সদস্যবিশিষ্ট একটি জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি গঠন করে। পরবর্তীতে এ কমিটিতে অধ্যাপক ড. খলিকুজ্জামানকে কো-চেয়ারম্যান করা হয় এবং ২ জন সদস্যকে কো-অপ্ট করা হয়। এ কমিটি প্রথম সভা করে ৩ মে ২০০৯। মোট ২৩টি সভার মাধ্যমে এ কমিটি চূড়ান্ত খসড়া রিপোর্ট সম্পন্ন করে। এ চূড়ান্ত খসড়া করতে গিয়ে কমিটি ৫৬টি সংস্থা ও সংগঠনের প্রতিনিধিদের সাথে আলাদা আলাদা বিস্তারিত মত বিনিময় করেন। পরবর্তীতে ২ সেপ্টেম্বর ২০০৯ চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন সরকারের কাছে জমা দেয়।

শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর মূল উদ্দেশ্য মানবতার বিকাশ এবং জনমুখী উন্নয়নে ও প্রগতিতে নেতৃত্বদানের উপযোগী মননশীল, যুক্তিবাদী, নীতিবান, সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কুসংস্কারমুক্ত, পরমতসহিষ্ণু, অসাম্প্রদায়িক, দেশপ্রেমিক ও কর্মকুশল নাগরিক গড়ে তোলা। পাশাপাশি, শিক্ষার মাধ্যমে জাতিকে দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলার বৈশিষ্ট্য ও দক্ষতা অর্জনে সক্ষম করে তোলা। এ উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও নীতিকে সামনে রেখে নিচে ধারাবাহিকভাবে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর উল্লেখযোগ্য লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উপস্থাপন করা হলো :

১. শিক্ষার সর্বস্তরে সাংবিধানিক নিশ্চয়তার প্রতিফলন ঘটানো এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীদের সচেতন করা।
২. ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে নৈতিক, মানবিক, সাংস্কৃতিক, বিজ্ঞানভিত্তিক ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠাকল্পে শিক্ষার্থীদের মননে, কর্মে ও ব্যবহারিক জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা।
৩. মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করে তোলা এবং তাদের চিন্তা চেতনায় দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবোধ এবং চরিত্রে সুনাগরিকের গুণাবলীর (যেমন– ন্যায়বোধ, ধর্মনিরপেক্ষতাবোধ, কর্তব্যবোধ, মানবাধিকার সচেতনতা, শৃঙ্খলা, সহ-জীবনযাপনের মানসিকতা, সৌহার্দ্য, অধ্যবসায় ইত্যাদি) বিকাশ ঘটানো।
৪. জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারা বিকশিত করে প্রজন্ম পরম্পরায় সঞ্চালনের ব্যবস্থা করা।
৫. দেশজ আবহ ও উপাদান সম্পৃক্ততার মাধ্যমে শিক্ষাকে শিক্ষার্থীর চিন্তাচেতনা ও সৃজনশীলতার উজ্জীবন এবং তার জীবনঘনিষ্ঠ বিকাশে সহায়তা করা।
৬. দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি সাধনের জন্য শিক্ষাকে সৃজনশীল, প্রয়োগমুখী ও উৎপাদন-সহায়ক করে তোলা; শিক্ষার্থীদেরকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে তোলা এবং তাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলীর বিকাশে সহায়তা প্রদান করা।
৭. জাতি, ধর্ম, গোত্র নির্বিশেষে আর্থ-সামাজিক শ্রেণীবৈষম্য দূর করা, বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব, অসাম্প্রদায়িকতা, সৌহার্দ্য ও মানুষে মানুষে সহমর্মিতাবোধ গড়ে তোলা এবং মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলা।
৮. বৈষম্যহীন সমাজ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী স্থানিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান নির্বিশেষে সকলের জন্য শিক্ষালাভের সমান সুযোগ-সুবিধা অবারিত করা।
৯. গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ বিকাশের জন্য পারস্পরিক মতাদর্শের প্রতি সহনশীল হওয়া এবং জীবনমুখী, বস্তুনিষ্ঠ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশে সহায়তা করা।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

১০. মুখস্থ করা বিদ্যার পরিবর্তে বিকশিত চিন্তাশক্তি, কল্পনাশক্তি এবং অনুসন্ধিৎসু মননের অধিকারী হয়ে শিক্ষার্থীদের প্রতিস্তরের প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জন নিশ্চিত করা।

১১. জ্ঞানভিত্তিক তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর (ডিজিটাল) বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্যপ্রযুক্তি (ICT) এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য (গণিত, বিজ্ঞান ও ইংরেজি) শিক্ষাকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা।

১২. শিক্ষাকে ব্যাপকভিত্তিক করার লক্ষ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ওপর জোর দেয়া, শ্রমের প্রতি শিক্ষার্থীদেরকে শ্রদ্ধাশীল ও আগ্রহী করে তোলা এবং শিক্ষার স্তর নির্বিশেষে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হওয়ার জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষায় দক্ষতা অর্জনে সমর্থ করা।

১৩. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিশুর/শিক্ষার্থীর সুরক্ষা ও যথাযথ বিকাশের অনুকূল আনন্দময় ও সৃজনশীল পরিবেশ গড়ে তোলা এবং সেটি অব্যাহত রাখা।

১৪. শিক্ষার্থীদের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনসহ প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ-সচেতনতা এবং এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়ে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করা।

১৫. উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষা চর্চা এবং শিক্ষাসংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম যাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে পারে সেই লক্ষ্যে যথাযথ আবহ ও পারিপার্শ্বিকতা নিশ্চিত করা।

১৬. দেশের পশ্চাৎপদ অঞ্চলগুলোতে শিক্ষার উন্নয়নে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১৭. পথশিশুসহ আর্থ-সামাজিকভাবে বঞ্চিত সকল ছেলেমেয়েকে শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসা।

১৮. দেশের আদিবাসীসহ সকল ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সংস্কৃতি ও ভাষার বিকাশ ঘটানো।

১৯. প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা।

২০. দেশের জনগোষ্ঠীকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করা এবং সেই অর্জন ধরে রাখা।

১. **প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা :** জাতীয় শিক্ষানীতি কমিটির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ৫ বছরের বেশি বয়সী শিশুদের জন্য এক বছর মেয়াদি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হবে। এর জন্য প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাড়তি শিক্ষকের পদ সৃষ্টি এবং শ্রেণীকক্ষ বাড়াতে হবে। আদিবাসী শিশুরা যাতে নিজেদের ভাষা শিখতে পারে, সেজন্য আদিবাসী শিক্ষক ও পাঠ্যপুস্তকের ব্যবস্থা করা হবে। পিছিয়ে পড়া এলাকাগুলোতে অবস্থিত বিদ্যালয়সহ গ্রামীণ বিদ্যালয়গুলোকে বিশেষ সহায়তা দেয়া হবে। প্রাথমিক শিক্ষা হবে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত এবং অবৈতনিক, সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক। প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার ধারা নির্বিশেষে সব শিক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট শ্রেণীর পাঠ্যসূচি অনুযায়ী বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বাংলাদেশ স্টাডিজ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ধারণাসহ প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিচিতি এবং তথ্যপ্রযুক্তি ও বিজ্ঞান বাধ্যতামূলকভাবে পড়তে হবে। এর পাশাপাশি সব শিক্ষার্থীর জন্য নিজ নিজ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। পঞ্চম শ্রেণীর পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের উপজেলা, পৌরসভা, থানা পর্যায়ে স্থানীয় সমাজ কমিটি বা স্থানীয় সরকারের যৌথ ব্যবস্থাপনায় অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বৃত্তি দেয়া হবে। ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাক-বৃত্তিমূলক শিক্ষা সবার জন্য বাধ্যতামূলক হবে। ২০১৮ সালের মধ্যে তিন ধাপে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা করা হবে। এর মধ্যে প্রথম ধাপে ২০১২ সালে ষষ্ঠ শ্রেণীতে উন্নীত হবে প্রাথমিক শিক্ষা। ২০১৫ সালে সপ্তম এবং সর্বশেষ ২০১৮ সালে অষ্টম শ্রেণীতে উন্নীত হবে এ স্তর। অধ্যাপক কাজী খলীকুজ্জামান জানান, মূলত আর্থিক দিকটি বিবেচনায় রেখে সময় নেয়া হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত হবে ১ ঃ ৩০। এ লক্ষ্য ২০১৮ সালের মধ্যে পর্যায়ক্রমে অর্জন করা হবে।

২. **মাধ্যমিক শিক্ষা :** মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর হবে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত। দ্বাদশ শ্রেণী শেষে মাধ্যমিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে সাধারণ, মাদরাসা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ধারায় বাংলা, ইংরেজি, গণিত, তথ্যপ্রযুক্তি ও বাংলাদেশ স্টাডিজ শিক্ষায় অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুসরণ করা হবে। ১০ম শ্রেণী শেষে সমাপনী পরীক্ষা উপজেলা/পৌরসভা/থানা পর্যায়ে অভিন্ন প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। এই পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে বৃত্তি প্রদান করা হবে।

৩. **উচ্চশিক্ষা :** এ স্তরে বর্তমানে কলেজগুলোতে প্রদত্ত তিন বছর মেয়াদি বিদ্যমান ডিগ্রি পাস কোর্স তুলে দেয়া হবে। এর পরিবর্তে চার বছর মেয়াদি অনার্স পাঠদান করা হবে। আর এই চার বছর মেয়াদি ডিগ্রি হবে প্রফেশনাল ডিগ্রি বা প্রান্তিক ডিগ্রি। শিক্ষকতা ছাড়া সব ধরনের চাকরির জন্য এ ডিগ্রিই যথেষ্ট। শিক্ষকতার জন্য মাস্টার্স ডিগ্রি বাধ্যতামূলক। ডিগ্রি ও অনার্স কলেজগুলো মনিটরিংয়ের জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় সদরে আঞ্চলিক কেন্দ্র হবে। এসব কেন্দ্র পরে এক একটি পূর্ণাঙ্গ এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে কাজ করবে, যারা নিজ নিজ এলাকার কলেজ অনুমোদন করবে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিয়ন্ত্রণ করবে ইউজিসি। তবে প্রয়োজন আর বাস্তবতার কারণে ইউজিসি'র নাম পরিবর্তন করে (তাদেরই প্রস্তাব অনুযায়ী) নাম হয় 'হায়ার এডুকেশন কমিশন অব বাংলাদেশ'। এ লক্ষ্যে আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হবে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অভিন্ন আইন দরকার। ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশের সংশোধন দরকার। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নির্বাচন এবং তাদের প্রশিক্ষণ দানের জন্য বেসরকারি শিক্ষক কমিশন গঠন করা হবে।

৪. **বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা :** অষ্টম শ্রেণী শেষে প্রাথমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা ইচ্ছা করলে বৃত্তিমূলক শিক্ষায় প্রবেশ করতে পারবে। বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রতিটি উপজেলায় একটি করে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হবে। এছাড়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট ও লেদার ইনস্টিটিউটের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে। বৃত্তিমূলক ও ডিপ্লোমা পর্যায়ে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুবিধাদি ব্যবহার করে সান্ধ্যকালীন ও খণ্ডকালীন শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে স্কুল পরিত্যাগকারী বয়স্কদের বিভিন্ন বৃত্তিমূলক শিক্ষাদান করে তাদেরকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করা হবে। ডিপ্লোমাধারীদের জন্য যথাযথ নির্বাচনের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। বেসরকারি খাতে মানসম্পন্ন বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনকে উৎসাহিত করা হবে, এমপিওভুক্তিতে অগ্রাধিকার প্রদান এবং যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জামাদিসহ আর্থিক সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে।

৫. **মাদরাসা শিক্ষা :** প্রতিবেদনে মাদরাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলা হয়, মাদরাসা শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালা ও তাঁর রাসূল (স)-এর প্রতি সরল বিশ্বাস গড়ে তোলা এবং তাদের আচারসর্বস্ব নয় বরং শান্তির ধর্ম ইসলামের প্রকৃত মর্মার্থ অনুধাবনে সক্ষম করে তোলা। শিক্ষার অন্যান্য ধারার সাথে সমন্বয় রেখে ইবতেদায়ী পর্যায়ে নির্দিষ্ট শ্রেণীর পাঠ্যসূচি অনুযায়ী নির্ধারিত বিষয়সমূহ (বাংলা, ইংরেজি, নৈতিক শিক্ষা, বাংলাদেশ স্টাডিজ, গণিত, সামাজিক পরিবেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ধারণাসহ প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিচিতি, তথ্যপ্রযুক্তি ও বিজ্ঞান) বাধ্যতামূলকভাবে পড়তে হবে। একইভাবে মাধ্যমিক পর্যায়ে নির্ধারিত বিষয়সমূহ বাধ্যতামূলক থাকবে।

৬. **শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত সুপারিশ :** শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির প্রতিবেদনে শিক্ষক নিয়োগের বিষয়ে বলা হয়েছে, মাধ্যমিক স্তরে সরকারি কর্মকমিশনের অনুরূপ প্রস্তাবিত শিক্ষক নির্বাচনী কমিশন গঠন করে তার আওতায় লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে বিষয়ভিত্তিক প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক প্রতিবছর নিয়োগ করা হবে। নতুন নিয়োগ পাওয়া শিক্ষকদের কাজে যোগদানের আগে মৌলিক

প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সুপারিশ রয়েছে। এতে আরো বলা হয় স্কুল পর্যায়ে আগামী ৬/৭ বছরের মধ্যে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অনুপাত হবে ১ ঃ ৩০। শিক্ষার মাধ্যম হবে বাংলা। বিদেশীদের জন্য যথাযথ অনুমোদন সাপেক্ষে ইংরেজি মাধ্যম চালু থাকবে। তবে সেক্ষেত্রে সহজ বাংলা শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থাও রাখতে হবে। বিশেষ পদক্ষেপ হিসেবে যেসব বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আয়ের উৎস আছে সেসব এবং মিশনারি, ট্রাস্ট ও দেশী-বিদেশী এনজিও, সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে সরকারের শিক্ষা খাত থেকে বরাদ্দ না দেয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। অধিক হারে বেতন আদায়কারী প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য বেতন আদায়ের নীতিমালা তৈরির সুপারিশ করা হয়েছে।

৭. **টিউশনি ও কোচিং ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ :** খসড়া প্রতিবেদনে বলা হয়েছে শিক্ষক সমাজের একাংশের নৈতিকতার অভাবে দেশে ব্যাপকভাবে প্রাইভেট টিউশনির ব্যবস্থা ও কোচিং সেন্টার চালু হয়েছে। তা নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ দ্রুত গ্রহণ করা হবে। কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত নন এমন ব্যক্তি যদি কোচিং সেন্টার চালাতে চান তা পারবেন। তবে তা যথাযথ মানসম্পন্ন হতে হবে এবং চালু করার/রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিতে হবে। কমিশনের সুপারিশে আরো বলা হয়েছে যে কোনো স্থানে ৫ বা ততোধিক শিক্ষার্থীর পারিশ্রমিকের বিনিময়ে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার যে কোনো ধারার যে কোনো বিষয়ে পাঠদান করা হলে তার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ও নিবন্ধন গ্রহণ করতে হবে।

প্রণীত শিক্ষানীতি : প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত শিক্ষার সকল স্তরে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান নিশ্চিত করার ঘোষণা দিয়ে শিক্ষার ২৪টি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে প্রণীত ১৯টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত এবং ৬৮ হাজার কোটি টাকায় বাস্তবায়নযোগ্য এ শিক্ষানীতির উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ হলো :

- ☐ তিন স্তরবিশিষ্ট শিক্ষাব্যবস্থা
- ☐ প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা চালু
- ☐ প্রাথমিক শিক্ষার ১১টি লক্ষ্য নির্ধারণ
- ☐ পঞ্চম শ্রেণীতে সমাপনী এবং অষ্টম শ্রেণীতে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে পাবলিক পরীক্ষা
- ☐ এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি চালু
- ☐ নৈতিক শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ
- ☐ অন্তর্ভুক্তিমূলক (ধর্ম, ছেলেমেয়ে, আর্থ-সামাজিক ও ভৌগোলিক অবস্থান, আদিবাসীসহ সব জাতিসত্তা, প্রতিবন্ধী) শিক্ষাব্যবস্থা
- ☐ দেশে বিরাজমান আবহ ও উপাদান সম্পৃক্ত শিক্ষাব্যবস্থা
- ☐ মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা
- ☐ উচ্চশিক্ষা মন্ত্রণালয় গঠন
- ☐ একটি স্থায়ী শিক্ষা কমিশন গঠন
- ☐ একটি সমন্বিত শিক্ষা আইন প্রবর্তন।

উপসংহার : শিক্ষা মানবসম্পদ উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার। মানসম্মত শিক্ষা যে কোনো জাতির জন্য আশীর্বাদস্বরূপ। ইউনেস্কো গুণগত শিক্ষাকে টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্ত হিসেবে ঘোষণা করেছে। শিক্ষার মান উন্নয়ন ছাড়া ব্যক্তিগত ও জাতীয় উন্নতি অসম্ভব। উচ্চশিক্ষায় গবেষণার অপ্রতুলতাসহ আমাদের দেশে বিভিন্ন স্তরে শিক্ষার মান এখনো আশাব্যঞ্জক স্তরে পৌছেনি। তাই বাস্তবভিত্তিক শিক্ষা জাতীয়তাবোধ ও মানসিক বিকাশে যেমন সহায়ক তেমনি অপরিহার্য। পরিবর্তিত বিশ্বব্যবস্থার সাথে তাল মিলিয়ে শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন এবং বাস্তবায়ন করতে পারলে তবেই এ জাতির মুক্তি সম্ভব।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

২১। বাংলাদেশের বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করুন এবং এর প্রতিকারে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে বিস্তারিত লিখুন।

উত্তর : বর্তমান বিশ্বে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোতে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা অভিশাপ হিসেবে দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। এটি একটি জটিল এবং বহুমাত্রিক সমস্যা। যে কোনো সমাজের ক্ষেত্রে এ সামাজিক সমস্যা বিদ্যমান থাকলে সে দেশের উন্নয়ন সম্পূর্ণ রূপে ব্যাহত হয়। উন্নত দেশগুলো তাদের সামাজিক সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে যথাযথ প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ নেয়ার কারণেই তাদের আজকের এ অবস্থান। পক্ষান্তরে, উন্নয়নশীল দেশগুলো, বিশেষ করে বাংলাদেশের মত দেশ তাদের লক্ষ্যমাত্রায় পৌছতে পারছে না, সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণে অসমর্থ এবং যেটুকু পদক্ষেপ নিয়েছে তার যথাযথ প্রয়োগের অভাবে। সামাজিক সমস্যার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী ই. র‍্যাব ও জি. জে. সেলজনিক বলেছেন, "সামাজিক সমস্যা হলো সমাজের মানুষের সম্পর্ক থেকে উদ্ভূত একটি অবস্থা, যা সমাজকে মারাত্মকভাবে আঘাত করে এবং বহু মানুষের গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যাশাকে বাধাগ্রস্ত করে।" তাই সামাজিক সমস্যা হচ্ছে সমাজের এমন একটি অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থা যা সমাজজীবনে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে।

সামাজিক সমস্যা ও প্রতিকার : বাংলাদেশ বর্তমানে প্রতিটি স্তরেই নানা সামাজিক সমস্যার দ্বারা জর্জরিত। যেহেতু বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষি নির্ভর, সে কারণেই এর অর্থনৈতিক কাঠামো দুর্বল। আর এই দুর্বল কাঠামোর সুযোগ নিয়ে, সমাজের প্রতিটি স্তরেই দেখা দিয়েছে নানা সামাজিক সমস্যা। অভাব এবং দারিদ্র্যকে পুঁজি করে, সমাজে মানুষের নৈতিক অবক্ষয় ঘটছে। ফলে জনসংখ্যা সমস্যা, দারিদ্র্য, বেকারত্ব, অপরাধ, কিশোর অপরাধ, দুর্নীতি, পুষ্টিহীনতা, পতিতাবৃত্তি, ভিক্ষাবৃত্তি, যৌতুক প্রথা, শিশু শ্রম, নারী নির্যাতন, বিবাহ বিচ্ছেদ, মানসিক অসুস্থতা, নিরাপত্তাহীনতা, মাদকাসক্তি, শিক্ষার অভাব, স্বাস্থ্যহীনতা, সন্ত্রাসসহ নানাবিধ সামাজিক সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে। নিচে এসব সামাজিক সমস্যা এবং তার প্রতিকারে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

জনসংখ্যা সমস্যা : বর্তমানে বাংলাদেশের অন্যতম মারাত্মক এবং ভয়াবহ সমস্যা হলো জনসংখ্যা সমস্যা। বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৬ সালে এ সমস্যাকে জনসংখ্যা বিস্ফোরণ হিসেবে আখ্যায়িত করে 'এক নম্বর সামাজিক সমস্যা' বলে ঘোষণা দিয়েছে। পঞ্চম আদমশুমারি রিপোর্ট ২০১১ অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৪ কোটি ৯৭ লাখ এবং প্রতি বর্গ কিলোমিটারে প্রায় ৯৬৪ জন লোক বাস করে। জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ১.৩৭% ভাগ। বাংলাদেশের পক্ষে যেখানে শুধু তার জনসংখ্যার ন্যূনতম চাহিদা মেটানোর ব্যবস্থা করাই দুঃসাধ্য, সেখানে বর্ধিত জনসংখ্যার চাহিদা পূরণ এক অস্বাভাবিক ব্যাপার। যার কারণে দেশে বেড়ে যাচ্ছে দারিদ্র্য, বেকারত্ব, নির্ভরশীলতা, বাসস্থান সংকট, খাদ্য, শিক্ষা সমস্যাসহ আরো নানাবিধ সামাজিক সমস্যা। বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির পেছনে কোনো একক কারণ দায়ী নয়। বরং বহুবিধ কারণেই জনসংখ্যা সমস্যা আমাদের দেশে জটিল সামাজিক সমস্যার আকার ধারণ করেছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে অনগ্রসরতা, নারী শিক্ষার অভাব, ধর্মীয় গোঁড়ামি, দারিদ্র্য, বাল্যবিবাহ, চিত্তবিনোদনের অভাব, সামাজিক নিরাপত্তার অভাব, শিশুর মৃত্যুর হার আধিক্য, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর কম অংশগ্রহণ ইত্যাদি বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির পেছনে অন্যতম প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে। নিচে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সরকারি পদক্ষেপসমূহ আলোচনা করা হলো :

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সরকারি নীতিমালা ও পদ্ধতি : বাংলাদেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে জন্ম নিয়ন্ত্রণ করা। বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানে সরকার কর্তৃক গৃহীত নীতিমালা নিম্নরূপ :

ক. পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে সাধারণ নীতি নির্ধারণের জন্য একটি জাতীয় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ পরিষদ গঠন করা হয়েছে এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের সাথে জড়িত সব বিভাগ ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলোর সমন্বয়ে দেশের সর্বত্র একটি করে সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়েছে।

খ. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিকে দেশের সব উন্নয়ন প্রচেষ্টা ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে এবং সব রকম উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনার উপাদানকে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

গ. শহর এলাকায় সব হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, দাতব্য চিকিৎসালয়, মাতৃসদন ও শিশুমঙ্গল কেন্দ্রে পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক খোলা হয়েছে। এছাড়া দেশের প্রতিটি থানা ও পল্লী স্বাস্থ্যকেন্দ্রেও পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক খোলা হয়েছে। এসব কেন্দ্র হতে স্বল্পমূল্যে, গর্ভনিরোধক ট্যাবলেট, কনডম, প্লাস্টিক কয়েল প্রভৃতি সরবরাহ করা হয়। এছাড়া সরকারি হাসপাতালসমূহে জন্মনিরোধের জন্য অস্ত্রোপচারেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ঘ. পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সরকার এ পর্যন্ত দেশে মোট ৫৫ হাজার বিভিন্ন শ্রেণীর পরিবার পরিকল্পনা কর্মী নিয়োগ করেছেন। এসব ট্রেনিংপ্রাপ্ত পুরুষ ও মহিলা কর্মীরা গ্রামাঞ্চলের অশিক্ষিত জনসাধারণকে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

ঙ. পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও সম্প্রসারণের জন্য প্রতি বছরই উন্নয়ন বাজেটে অধিক পরিমাণে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। ১৯৭২-৭৩ সালে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৩.০০ কোটি টাকা। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের বাজেটে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ খাতে বরাদ্দ ছিল ১১,১৪৬ কোটি টাকা।

দারিদ্র্য : দারিদ্র্যের দিক থেকে শীর্ষ স্থানে অবস্থানকারী দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। এডিবি তাদের এশীয় উন্নয়ন আউটলুকে বলেছে, "বাংলাদেশের প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহের মধ্যে যে দুটি বিষয়ে নজর দেয়া অব্যাহত রাখতে হবে তা হচ্ছে দ্রুত দারিদ্র্য কমিয়ে আনা এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত করা। বাংলাদেশের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সরকার দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ১৯৯৫-৯৬ সাল থেকে শুরু ১৫ বছর মেয়াদি পরিকল্পনায় প্রথমেই স্থান দেয়া হয়েছে দারিদ্র্য বিমোচনকে এবং পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৯৭-২০০২) দারিদ্র্যের হার ৪৮ শতাংশ থেকে ৪০ শতাংশে হ্রাস করা হয়। দারিদ্র্যের কারণে সমাজে সন্ত্রাস, চুরি-ডাকাতি, পারিবারিক ভাঙন, অপুষ্টি ইত্যাদি সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। বাংলাদেশের দারিদ্র্যের কারণ হচ্ছে, অনগ্রসর কৃষি ব্যবস্থা, শিল্পায়নের অভাব, ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা, অধিক জনসংখ্যা, কম উৎপাদন, বেকারত্ব, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা ইত্যাদি। নিচে দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারি পদক্ষেপসমূহকে তুলে ধরা হলো–

দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারি পদক্ষেপসমূহ : বাংলাদেশ সরকার ২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দারিদ্র্য নিরসন কার্যক্রমসমূহের জন্য উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেটের প্রায় ৬০ শতাংশ বরাদ্দ

করেছে। দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান, আয় বৃদ্ধি এবং তাদের উন্নয়নের জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচি রয়েছে। নিচে ধারাবাহিকভাবে দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারি পদক্ষেপসমূহ উপস্থাপন করা হলো :

১. **সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি :** নারী, শিশু, প্রতিবন্ধীসহ সকল সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করা হচ্ছে সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়নের একটি মৌলিক চ্যালেঞ্জ। সামাজিক সুরক্ষা ও সামাজিক ক্ষমতায়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতায় বর্তমানে নানা কর্মসূচি/কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ সকল কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে নগদ প্রদান কার্যক্রম, খাদ্য নিরাপত্তা কার্যক্রম, ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি ও বিভিন্ন তহবিল।

২. **খাদ্য সাহায্য কর্মসূচির আওতায় চলমান বিভিন্ন কর্মসূচি :** এ কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত রয়েছে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি, ভিজিডি, ভিজিএফ, টেস্ট রিলিফ, জিআর প্রভৃতি।

৩. **মৎস্য কর্মসূচি :** মৎস্য খাতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্যে সরকার মাছের রেণু ও পোনা উৎপাদন, মানব সম্পদের উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান ও মৎস্য ব্যবস্থাপনা, মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন, মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন, জাটকা সংরক্ষণ এবং মৎস্য গবেষণায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

৪. **কর্মসংস্থান ব্যাংক :** বেকার বিশেষ করে শিক্ষিত বেকার যুবক ও যুব মহিলাদেরকে উৎপাদনমুখী এবং আয় বর্ধক কর্মকাণ্ডে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে দারিদ্র্য বিমোচন করার লক্ষ্যে কর্মসংস্থান ব্যাংক কাজ করছে।

৬. **আবাসন প্রকল্প :** বাংলাদেশের গৃহহীন, ছিন্নমূল হতদরিদ্র প্রায় ৬৫ হাজার পরিবারকে আবাসন ও কর্মসংস্থান সৃজনের মাধ্যমে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে গ্রহণ করা আশ্রায়ন প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় ৭১৬ কোটি টাকা ব্যয় বিশিষ্ট আবাসন প্রকল্পটি গৃহীত হয়।

৭. **যুব উন্নয়ন :** জাতীয় উন্নয়নে যুব সমাজের সম্পৃক্ততার গুরুত্ব উপলব্ধি করে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর যুবক ও যুবমহিলাকে দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়নে ও প্রসারে দেশের ৬৪টি জেলায় শতাধিক কেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষিত বেকার যুবকদের ইন্টারনেট ও নেটওয়ার্কিংসহ কম্পিউটারের বেসিক কোর্স ও গ্রাফিক্স ডিজাইন কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। এছাড়া, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের যুবকদের কর্মসংস্থানের জন্য প্রায় ২০টি জলাশয় বিভিন্ন যুব সমবায় সমিতিকে ইজারা দিয়েছে।

৮. **পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচি :** স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়াধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়নমূলক প্রকল্প, বিশেষ করে পল্লী অঞ্চলে গ্রামীণ সড়ক, সেতু/কালভার্ট, প্রবৃদ্ধি কেন্দ্র (Growth Center), গ্রামীণ হাট-বাজার উন্নয়ন ও বাঁধ নির্মাণ প্রকল্পের মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক মহিলা ও পুরুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে, যা গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

অপরাধ : অপরাধ হলো এক ধরনের অস্বাভাবিক আচরণ যা সমাজ ও প্রচলিত আইন কর্তৃক স্বীকৃত নয়। সমাজ বিজ্ঞানী কোনিগ (Koenig) বলেন, 'সমাজ বা গোষ্ঠী দ্বারা দৃঢ়ভাবে অসমর্থিত বা নিষিদ্ধ মানব আচরণই হলো অপরাধ।' যেমন– চুরি করা, ভেজাল দেয়া, খুন করা, ঘুষ খাওয়া ইত্যাদি হলো

অপরাধমূলক কাজ। বাংলাদেশে অপরাধ বৃদ্ধির কারণ অনেক। এসব কারণ উদ্ঘাটন করতে হলে ব্যক্তির দৈহিক, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক অবস্থা বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে। বাংলাদেশের অপরাধ বৃদ্ধির কারণগুলো হলো— ভৌগোলিক কারণ, দৈহিক কারণ দারিদ্র্য, বেকারত্ব, পারিবারিক বিশৃঙ্খলা, সামাজিক মূল্যবোধের অভাব, রাজনৈতিক কারণ, জেলখানা ও বিচারালয়ের প্রভাব।

অপরাধ কমানোতে সরকারি পদক্ষেপ : বাংলাদেশে অপরাধ যাতে সংঘটিত না হয় তার জন্য সরকার ত্রিমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে :

ক. **প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা :** ১. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ; ২. বাস্তবমুখী শিক্ষানীতির প্রচলন; ৩. নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষার প্রসার।

খ. **প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা :** অপরাধের মাত্রানুযায়ী উপযুক্ত শাস্তি দানের মাধ্যমে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে সরকার। এজন্য দেশে যেসব প্রবেশন ও প্যারোল কার্যক্রম ব্যবস্থা প্রচলিত আছে তা জোরদার করা হয়েছে।

গ. **পুনর্বাসনমূলক ব্যবস্থা :** অপরাধ ও শাস্তি ভোগের পর মানুষ অপরাধীকে সহজভাবে গ্রহণ করতে চায় না। এজন্য সরকার অপরাধীকে অপরাধ ভোগের পাশাপাশি বিভিন্ন বাস্তবমুখী ও কর্মমুখী শিক্ষা প্রদান করে। ফলে অপরাধী সাজাভোগের পর, আত্মনির্ভরশীল হতে সাহায্য পায়।

যৌতুক প্রথা : যৌতুক প্রথা বাংলাদেশের সমস্যাগুলোর মধ্যে সর্বাধিক অমানবিক ও বেদনাদায়ক সমস্যা। যৌতুকের দাবিকে কেন্দ্র করে বিয়ের পর দাম্পত্য কলহ, স্ত্রী নির্যাতন, স্ত্রীহত্যা, বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে। কন্যাদায়গ্রস্ত দরিদ্র পিতামাতা যৌতুকের দাবি মেটাতে গিয়ে, সর্বস্ব বিক্রি করে একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। যৌতুকের লোভে বাংলাদেশে প্রায় অসামঞ্জস্য বিয়ে সংঘটিত হয়ে থাকে এবং আত্মহত্যার পেছনে যৌতুক প্রথা অনেকাংশে দায়ী। যৌতুক প্রথা বাংলাদেশের একটি ভয়াবহ সামাজিক সমস্যা।

যৌতুক নির্মূলে সরকারি পদক্ষেপ : বাংলাদেশের সমাজ থেকে যৌতুক প্রথা বিলুপ্ত করণে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যদিও এসব পদক্ষেপ যৌতুক নির্মূলে যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারছে না। তারপরও এগুলো নারী সমাজের নিরাপত্তা কিছুটা হলেও নিশ্চিত করে। নিচে এগুলো তুলে ধরা হলো :

ক. **সাংবিধানিক অধিকার :** বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রয়োজনে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০, ১৮, ২৭ অনুচ্ছেদ ২৮(২), ২৮(৪) ধারা সংযোজন করে নারী অধিকার রক্ষায় সচেষ্ট হয়েছে। নারীর এ সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় গ্রহণ করেছে জাতীয় উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণের পরিকল্পনা, জাতীয় নারী উন্নয়ন পরিকল্পনা।

খ. **আইন প্রণয়ন :** নারীর উপর সকল প্রকার নির্যাতন রোধের উদ্দেশ্যে সরকার বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করেছে। যেমন– বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন-১৯২৯, মুসলিম বিবাহ ভঙ্গ আইন-১৯৩৯, মুসলিম পারিবারিক আইন-১৯৬১, মুসলিম বিবাহ ও তালাক (রেজি.) আইন-১৯৭৪, যৌতুক নিরোধ আইন-১৯৮০, নারী নির্যাতন আইন-১৯৮৩, পারিবারিক আদালত-১৯৮৫ এবং নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন-২০০০।

গ. **কঠিন শাস্তি প্রদান :** সরকার কর্তৃক ২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে শাস্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, যদি কোনো নারী স্বামী অথবা স্বামীর পিতামাতা, অভিভাবক, আত্মীয় বা স্বামীর

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি যৌতুকের জন্য নারীর মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টা করেন, উক্ত নারীকে মৃত্যু ঘটানোর জন্য মৃত্যুদণ্ডে বা মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টার জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন এবং উভয়ক্ষেত্রে দণ্ডের অতিরিক্ত দণ্ডেও দণ্ডিত হবেন। আহত করার জন্য যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড অনধিক ১৪ বছর কিন্তু অন্যূন ৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন এবং উভয়ক্ষেত্রে দণ্ডের অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত হবেন।

নিরক্ষরতা : নিরক্ষরতা বাংলাদেশের অন্যতম সামাজিক সমস্যা। বাংলাদেশের প্রায় ৪২% লোকই নিরক্ষর। এর প্রভাবে সমাজে অজ্ঞতা, কুসংস্কার, অদৃষ্টবাদিতা, স্বাস্থ্যহীনতা, দারিদ্র্য ইত্যাদি সমস্যা ক্রমশ জটিল হচ্ছে। সাধারণত নিরক্ষর বলতে অক্ষরজ্ঞানহীনতাকেই বোঝায়। নিরক্ষর হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে ব্যক্তি লিখতে পড়তে জানে না।

নিরক্ষরতা দূরীকরণে সরকারি পদক্ষেপ : নিরক্ষরতা দূরীকরণে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। নিচে সেগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :

ক. **জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ :** জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে প্রতি বছর ২৪ লক্ষ নতুন শিশু স্কুলে পড়ার উপযোগী হচ্ছে। এ বিপুল সংখ্যক শিশুর শিক্ষার ব্যবস্থা করা বাংলাদেশের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই সরকার বিভিন্ন বাজেটে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য পরিবার পরিকল্পনায় মোটা অংকের অর্থ বরাদ্দ করে থাকে।

খ. **দারিদ্র্য দূরীকরণ :** জনগণের শিক্ষা বিস্তার দারিদ্র্য দূরীকরণ ছাড়া সম্ভব নয়। আর সে কারণে সরকার, আশ্রায়ন প্রকল্প, গৃহায়ন পরিকল্পনা, বিধবা ভাতা, দুস্থ ভাতা, বয়স্ক ভাতা প্রদানসহ বিভিন্ন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে, দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য, যা নিরক্ষরতা দূরীকরণে সহায়তা করে।

গ. **বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা প্রবর্তন :** দারিদ্র্য ও সচেতনতার অভাবে বাংলাদেশে নিরক্ষরতার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ অবস্থা মোকাবিলার জন্য সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক করেছে, যা নিরক্ষরতা দূরীকরণে ব্যাপক সহায়তা প্রদান করে।

ঘ. **নারী শিক্ষার সম্প্রসারণ :** পুরুষদের তুলনায় নারীদের মধ্যে নিরক্ষরতার হার বেশি। সরকার নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটানোর জন্য নারীদের দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত উপবৃত্তি প্রদান এবং বিনাবেতনে অধ্যয়নের সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

বেকারত্ব : বেকারত্ব বলতে সাধারণভাবে মানুষের কর্মহীনতাকে বুঝায়। সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বেকারত্ব বলতে এমন একটি পরিস্থিতিকে বুঝায়, যাতে কর্মক্ষম ব্যক্তি বর্তমান মজুরিতে কর্মে ইচ্ছুক থাকা সত্ত্বেও কর্মে নিয়োগ লাভে সক্ষম হয় না। অর্থাৎ কর্মক্ষম ব্যক্তির অনিচ্ছাকৃত বেকারত্বকে সমাজবিজ্ঞানে বেকারত্ব বলে। বর্তমান বাংলাদেশে মোট শ্রমশক্তির ৪০ ভাগ বেকার। এদেশে প্রায় ৩ কোটি লোক বেকার। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশে মূলধনের অভাব এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে বেকারত্বের প্রধান কারণ বলে অভিহিত করা হয়। তবে উপরের দুটি কারণ ছাড়াও আরো বহুবিধ কারণ রয়েছে।

সরকারি পদক্ষেপ : বাংলাদেশের মত দরিদ্র দেশের পক্ষে সীমিত সম্পদ নিয়ে বেকারত্ব মোকাবিলা করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। দীর্ঘ ও বাস্তবমুখী পরিকল্পনা ছাড়া এ সমস্যার সমাধান দুঃসাধ্য। তারপরও বাংলাদেশ সরকার বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। বেকারত্ব দূরীকরণে সেসব পদক্ষেপ তুলে ধরা হলো :

ক. **কারিগরি শিক্ষার প্রচলন :** স্কুল-কলেজে কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থা চালুকরণের মাধ্যমে সরকার, তরুণ শিক্ষিতদের বাস্তব ও কর্মমুখী শিক্ষা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

খ. **শিল্পে প্রসার :** বাংলাদেশে দেশী বিদেশী বিনিয়োগের অবাধ সুযোগ দেয়ায় অসংখ্য কলকারখানা স্থাপিত হচ্ছে। ফলে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগও তৈরি হচ্ছে।

গ. **কৃষিক্ষেত্রে নিয়োগ বৃদ্ধি :** কৃষিতে ভর্তুকি প্রদান, ভূমির মালিকানা কাঠামো পরিবর্তন, খাস জমির সুষ্ঠু বণ্টন, কৃষিতে প্রযুক্তি প্রয়োগ করার মাধ্যমে সরকার বেকারত্ব নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে।

ঘ. **জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ :** সরকার জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণের ফলে বেকারদের বৃদ্ধির হার ক্রমাগত কমতির দিকে।

ঙ. **নারীর শিক্ষা প্রসার ও কর্মসংস্থান :** নারী শিক্ষা প্রসারে সরকার উপযুক্ত ভূমিকা পালন করছে। ফলে নারী শিক্ষার হার যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে তেমনি তাদের কর্মসংস্থানেরও সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।

দুর্নীতি : দুর্নীতি বর্তমানে বাংলাদেশের অন্যতম সামাজিক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুর্নীতি সমাজের প্রচলিত নীতি, আদর্শ ও মূল্যবোধের পরিপন্থী বিশেষ ধরনের অপরাধমূলক আচরণ। দুর্নীতির সাথে পেশী ক্ষমতা, সুযোগ-সুবিধা, পদবি প্রভৃতির অপব্যবহার সংশ্লিষ্ট। আভিধানিক অর্থে দুর্নীতি হলো ঘুষ বা অনুগ্রহ দ্বারা জনকর্তব্য সম্পাদনে একাগ্রতার বিকৃতি বা ধ্বংস। নৈতিক প্রেক্ষাপটে বলা যায়, নীতি বিচ্যুত হওয়া বা কোনো গুণ ও পবিত্রতার অবমাননা হলো দুর্নীতি। আবার প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ, কিংবা আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব বা অন্য কাউকে অবৈধ সুযোগ-সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে যদি কোনো সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী নিজের খেয়াল খুশিমতো সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার করে বা টাকা পয়সা বা অন্যান্য উৎকোচের মাধ্যমে অন্যায় কাজ করে বা ন্যায়সঙ্গত কাজ থেকে দূরে থাকে, তাহলে এরূপ কার্যকলাপ হলো দুর্নীতি।

দুর্নীতি দমনে সরকারের ভূমিকা : বর্তমানে দুর্নীতি সমস্যা আমাদের জাতীয় জীবনে ক্যান্সার স্বরূপ বিস্তার লাভ করেছে। তাই দেশের জাতীয় উন্নয়নের স্বার্থেই সরকার দুর্নীতি প্রতিরোধ ও মোকাবিলার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে :

ক. দুর্নীতিবিরোধী টাস্কফোর্স গঠন;
খ. ন্যায়পালের পদ সৃষ্টি ও বাস্তবায়ন;
গ. স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা;
ঘ. স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন;
ঙ. সরকারি নিরীক্ষা কমিটি গঠন;
চ. সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী ও রাজনৈতিক নেতাদের আয় ও ব্যয়ের হিসাব প্রদান;
ছ. দুর্নীতির বিরুদ্ধে, নৈতিক ও সামাজিক চেতনা সৃষ্টি;
জ. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা।

উপসংহার : উপরোল্লিখিত সামাজিক সমস্যা ছাড়াও আরো নানাবিধ সামাজিক সমস্যা রয়েছে। তবে প্রধান প্রধান সমস্যা নির্মূলে সরকার যে পদক্ষেপ নিয়েছে, তা যথাযথ বাস্তবায়ন করা হলে, ছোট ছোট সমস্যাগুলো আপনা-আপনি দূরীভূত হবে। কিন্তু এজন্য দরকার সঠিক পরিকল্পনা এবং এর যথাযথ বাস্তবায়ন। সেই সঙ্গে জনগণের মধ্যে দেশপ্রেম থাকাও জরুরি। আর তাছাড়া ব্যাপক সামাজিক সমস্যায় আক্রান্ত বাংলাদেশের এসব সামাজিক সমস্যা রাতারাতি সমাধান করার মত নয়। যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে ধীরে ধীরে সব সমস্যারই প্রতিকার সম্ভব।

২২। 'স্বাধীনতার চার দশক অতিক্রান্ত হলেও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান রয়েছে'— এ উক্তির পক্ষে-বিপক্ষে আপনার সুচিন্তিত মতামত তুলে ধরুন।

উত্তর : স্বাধীনতা অর্জনকে একটি জাতির জীবনের সবচেয়ে বড় পাওয়া বলে বিবেচনা করা হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর প্রায় চার দশকে আমরা প্রবেশ করেছি। এখন সময় এসেছে, যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে, তা কতটা পূরণে আমরা সক্ষম হয়েছি তার হিসাব মেলানোর; প্রয়োজন নানা ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন সম্ভব না হলে কেন হয়নি তা বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের; এমনকি আকাঙ্ক্ষিত ফললাভের অন্তরায়গুলো অপসারণের।

স্বাধীন বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের কারণ : পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিভক্তি এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের পশ্চাতে যে কারণগুলো বিদ্যমান ছিল তা হলো :

১. সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাষা বাংলাকে যথার্থ সম্মান প্রদর্শনে পাকিস্তানি শাসকদের ব্যর্থতা।
২. পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সৃষ্ট অর্থনৈতিক বৈষম্য।
৩. গণতন্ত্রের পথ থেকে সরে গিয়ে সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা দখল ও জনমানুষের ওপর শোষণ।
৪. প্রশাসনিক বৈষম্যের কারণে পূর্ব পাকিস্তানের দক্ষ, যোগ্য ও মেধাবীরা চাকরি থেকে বঞ্চিত।
৫. ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তাহীনতা।
৬. পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর রাজনৈতিক প্রতারণা।
৭. ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে ও ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের অস্বাভাবিক বিজয় একটি পৃথক বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনাকে তীব্রতর করে তোলে।
৮. পাকিস্তান রাষ্ট্রের উদ্ভবের এক দশক পরেও গ্রহণযোগ্য কোনো সংবিধান প্রণয়ন করতে না পারা।
৯. সঠিক শিক্ষানীতি প্রণয়নে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর ব্যর্থতা।
১০. ভৌগোলিক বৈপরীত্য এক পাকিস্তানকে পূর্ব-পশ্চিম ভাগ করে জটিল সমস্যা সৃষ্টি করেছে।
১১. আমলাতান্ত্রিক প্রভুত্বের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের আকাঙ্ক্ষা।
১২. প্রতিবেশী বৃহৎ রাষ্ট্র ভারতের সাথে পাকিস্তানের বৈরী সম্পর্ক এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতায় ভারতের সাহায্য ও সহযোগিতা।
১৩. পশ্চিম পাকিস্তানে তৈরি দ্রব্যাদি পূর্ব পাকিস্তানে বিক্রি করা হতো এবং এভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের বাজারে পরিণত হয় পূর্ব পাকিস্তান।

স্বাধীনতার চার দশকে বাংলাদেশের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি : স্বাধীনতার চার দশকে বাংলাদেশের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি নিচে ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা হলো :

১. **মাতৃভাষা হিসেবে বাংলার মর্যাদা :** বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দান এবং রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে বাংলার ব্যবহার পাকিস্তান রাষ্ট্রের কাছে আমাদের অন্যতম প্রধান দাবি ছিল। পাকিস্তান আমলেই লড়াই করে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা হলেও সরকারি কাজকর্মে বাংলার প্রচলন ছিল একেবারেই অপর্যাপ্ত। বাংলা ভাষার আন্দোলনকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হলেও এখনও আমাদের দেশে অফিস, আদালতে ইংরেজি ভাষার প্রাধান্য ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাংলা পাঠ্যসূচিতে থাকলেও তা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পড়ানো হয় না।

২. **পরনির্ভরশীলতা :** বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূলে ছিল ঔপনিবেশিক শাসন নামের শোষণের অবসান ঘটানো এবং স্বনির্ভরশীলতা অর্জন করা। কিন্তু স্বাধীনতার চার দশক অতিক্রান্ত হলেও আজও বাংলাদেশ পরনির্ভরশীল হয়ে আছে। বিদেশী ঋণ, সাহায্য ও অনুদানের প্রতি অতিমাত্রায় বাংলাদেশ নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। তারা চায় বাংলাদেশ যেন বিদেশী দাতাদের ওপর নির্ভরশীলতা ক্রমান্বয়ে কমিয়ে নিজেদের শক্তি ও সম্ভাবনা নিয়ে দাঁড়াতে পারে। বাংলাদেশের পরনির্ভর অর্থনীতি এখন নিয়ন্ত্রণ করে দাতাগোষ্ঠী। ফলে তারা তাদের সুবিধামতো শর্ত চাপিয়ে দিচ্ছে। দেশের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয় দাতাদের নির্দেশ ও পরামর্শে; যা একটি স্বাধীন দেশের জন্য কাম্য নয়।

৩. **সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব :** জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও দাবি-দাওয়ার প্রতিফলন ঘটে যোগ্য নেতৃত্বের মাধ্যমে। কিন্তু বাংলাদেশে নেতৃত্বের যথেষ্ট দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়। এদেশের রাজনীতিতে নেতৃত্ব দেন ব্যবসায়ীরা। স্বাধীনতার পূর্বে রাজনীতিতে যে সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব ছিল, আজ স্বাধীনতার চার দশক পর তা খুঁজে পাওয়া মুশকিল। অথচ বাংলাদেশের প্রত্যাশা ছিল সৎ ও যোগ্য নেতৃত্বের যে নেতৃত্বের দ্বারা দেশ ও জনগণ পরিচালিত হবে এবং তারা উপকৃত হবে। দেশকে বিশ্বের দরবারে মর্যাদার আসনে বসাবে।

৪. **জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা :** পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিরাজমান বৈষম্য দূর করে পাকিস্তানকে একটি স্বনির্ভর কল্যাণমূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যর্থতা বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকে ত্বরান্বিত করেছিল। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল এ রাষ্ট্রের গণমানুষের মৌলিক চাহিদা তথা অন্ন, বস্ত্র, চিকিৎসা, শিক্ষা, বাসস্থানের চাহিদা পূরণ করে বাংলাদেশকে একটি জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু স্বাধীনতা অর্জনের চার দশক অতিক্রম করলেও তা আজও সম্ভব হয়নি। সে লালিত স্বপ্ন এখনও ধরাছোঁয়ার বাইরে। প্রতিবছর অপুষ্টি, অর্ধাহার, অনাহার, প্রসূতিকালীন মৃত্যুর মুখে শত শত লোক পতিত হচ্ছে। দারিদ্র্য এদেশের মানুষের নিত্যসঙ্গী। বাসস্থানের অভাবে, ক্ষুধার জ্বালায়, চাকরি বা সামান্য আয়ের আশায় মানুষ পাড়ি দিচ্ছে শহরে। অবস্থান নিচ্ছে রেলস্টেশন, বাসস্ট্যান্ড কিংবা রাস্তার পাশে।

৫. **জাতীয় ঐকমত্য :** পাকিস্তান শাসনামলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যে জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় বাংলাদেশ নামক এক নতুন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। স্বাধীনতা অর্জনের চার দশক পরও সেই জাতীয় ঐকমত্য সমস্যা এখনো এদেশে বিরাজমান। যেসব বিষয়ে এদেশে ঐকমত্যের প্রবল অভাব পরিলক্ষিত হয় তা হলো— জাতির জনক, স্বাধীনতার ঘোষক, স্বাধীনতা যুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধ, বাঙালি জাতীয়তাবাদ, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম, ভারত-চীনবিরোধী মনোভাব প্রভৃতি। বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো আজ পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণে ঐকমত্যে পৌছাতে পারেনি। বাংলাদেশের স্বার্থে রাজনৈতিক দলগুলোর উচিত জাতীয় উন্নয়নে ও দেশীয় ভাবমূর্তি রক্ষায় কতিপয় বিষয়ে জাতীয় ঐকমত্যে পৌছানো। তা না হলে অদূরভবিষ্যতে নতুন প্রজন্মকে দ্বিধাবিভক্ত করবে। যার দায়ভার বর্তমান রাজনৈতিক নেতৃত্বকেই বহন করতে হবে।

৬. **সংসদীয় গণতন্ত্রের চিত্র :** বহু ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে বাংলাদেশে সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রাণ হলো সচল সংসদ। অথচ ব্যয়বহুল এ সংসদীয় কার্যক্রমের অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিরোধী দল থাকে অনুপস্থিত। বিরোধী দল আর ক্ষমতায় যেতে পারবে না বলে সদম্ভ ঘোষণাও দেয় সরকারি দল। আবার বিরোধী দলও সরকারের কোনো সাফল্যকেই স্বীকৃতি দেয় না, বরং সব সময় সরকারের ব্যর্থতাই দেখে, সরকারকে সব সময় ব্যর্থ বলে অভিহিত করে। এ পরিস্থিতিতে জনগণ গণতন্ত্র উপলব্ধি করে না বরং সরকারি দলের স্বৈরপ্রবণতা আর বিরোধী দলের বৈরী আচরণ তাতে প্রত্যক্ষ করে। গণতন্ত্রের নামে এখানে চলছে এক ধরনের চালিয়াতি ও জালিয়াতি।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৭. **রাজনৈতিক দল ব্যবস্থা :** বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার চার দশক পেরিয়ে গেলেও এখনো কোনো সঠিক রাজনৈতিক দল এ দেশে গড়ে ওঠেনি। কারণ বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোয় গণতন্ত্রের কোনো বালাই নেই। এসব দল মুখে গণতন্ত্র গণতন্ত্র বলে ফেনা তুললেও তাদের নিজেদের ভেতর গণতন্ত্রের চর্চা শতভাগ অনুপস্থিত। নেতা নেত্রী নির্বাচন করা হয় মনোনয়নের মাধ্যমে। বাংলাদেশের প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের নেত্রী উত্তরাধিকার সূত্রে ক্ষমতাপ্রাপ্ত। যোগ্য ব্যক্তির মর্যাদা এসব রাজনৈতিক দলে প্রায় নেই। এখানে চেনামুখ, সন্ত্রাসী, অভিযুক্ত গডফাদার, বিতর্কিত নেতা, জঙ্গিবাদের পৃষ্ঠপোষক, দেশদ্রোহী, কালোবাজারি, ঋণখেলাপি ও দুর্নীতিবাজদের মনোনয়ন দেয়া হয়; নেতা নির্বাচন করা হয়। জনগণের স্বার্থে রাষ্ট্রকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করার জন্য রাজনীতিবিদদের কাছে তাদের যে প্রত্যাশা ছিল তা গড়ে ওঠেনি স্বাধীনতার চার দশকেও। বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উন্নয়নের আকাঙ্ক্ষা ক্রমাগত উপেক্ষিত হয়েই চলেছে অসুস্থ ধারার রাজনীতিতে বিদেশী সংস্থা বাংলাদেশকে ব্যর্থ বা অকার্যকর রাষ্ট্র বলে অভিহিত করছে। এতে রাজনৈতিক দলগুলোর কোনো মাথাব্যথা নেই। নির্বাচনপরবর্তী পরাজিতদের নির্যাতন, হত্যা এখন বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে, যা অনভিপ্রেত ও অনাকাঙ্ক্ষিত।

৮. **প্রশাসনিক দুর্বলতা :** ব্রিটিশ ও পাকিস্তানি আমলাদের ন্যায় বর্তমান বাংলাদেশের আমলারাও অত্যন্ত শক্তিশালী। এসব আমলা দেশের নীতিনির্ধারণী, হর্তাকর্তা, ভাগ্যবিধাতায় রূপান্তরিত হয়েছে। প্রশাসনিক দুর্বলতার কারণে বাংলাদেশ ৫ বার দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। তারপরও এ দেশের শাসকগোষ্ঠী দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন গড়ে তুলতে পারেনি। বরং প্রশাসনের সকল ক্ষেত্রে দুর্নীতি পূর্বাপেক্ষা অধিক শেকড় গেড়ে বসেছে। দুর্নীতিবাজরা দাপটের সঙ্গেই বহাল রয়েছে। দুর্নীতি দমনে নানা কথা কেবল মুখেই চলছে বাস্তবে কার্যকর কোনো উদ্যোগ নেই। এ কারণে দেশের ভাবমূর্তি বিদেশে বিনষ্ট হচ্ছে। দুর্নীতির কারণে অবাধে নিয়োগবাণিজ্য চলছে। ফলে মেধাবীরা যোগ্য অবস্থানে যেতে পারছে না। এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে অদূর ভবিষ্যতে দেশ মহাসংকটের সম্মুখীন হবে।

৯. **অর্থনৈতিক সুষম বন্টন :** বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল অর্থনৈতিক সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা। কারণ পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী শিল্পকারখানা স্থাপন, জাতীয় বাজেটে উন্নয়ন ব্যয়, জনগণের শিক্ষার সুযোগ, চাকরির হার প্রভৃতি ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের সাথে বৈষম্যমূলক ও বিমাতাসুলভ আচরণ করে। এ থেকে মুক্তির প্রত্যাশায় এদেশের জনগণ স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু অর্থনৈতিক সেই বৈষম্য আজও দূর হয়নি। তার প্রমাণ দেখা যায়, স্বাধীনতার পূর্বে এ দেশে ৩০ পরিবার ধনী ছিল এখন সে জায়গায় দখল করেছে তিন হাজার বা ততোধিক বাংলাদেশী ধনী পরিবার। ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান এদেশে দিন দিন বেড়েই চলেছে। পুঁজিপতি ধনিকশ্রেণী শোষণ, নির্যাতন করছে এ দেশের নিরীহ, সাধারণ দরিদ্র শ্রেণীকে। এ যেন এক চক্রে পরিণত হয়েছে। এ থেকে মুক্তির সকল দুয়ার যেন বন্ধ হয়ে গেছে। আমাদের সরকার জাতীয় উন্নয়নে সর্বজনীন কোনো নীতি-কৌশল গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

১০. **জনজীবনের নিরাপত্তা :** নিরাপত্তা লাভের জন্য এবং শান্তিপূর্ণভাবে বসবাসের জন্য মানুষ জীবন বাজি রেখে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। কিন্তু জনজীবনের নিরাপত্তা আজ হুমকির সম্মুখীন। স্বাভাবিক ও শান্তিপূর্ণ জীবনে হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছে সশস্ত্র সন্ত্রাসী, সড়ক দুর্ঘটনা, নারী নির্যাতন, সামাজিক অবক্ষয়, জঙ্গি তৎপরতা, রাজনৈতিক দল, দুর্নীতি, চাঁদাবাজি, অপহরণ, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, ভেজাল, ভূমি দখল, দস্যুতা প্রভৃতি। স্বাধীনতার চার দশক অতিক্রান্ত হলেও এখনও এদেশের রাজনৈতিক দলগুলো, সরকার বা প্রশাসন নিশ্চিত করতে পারেনি মানুষের নিরাপত্তাব্যবস্থাকে। কেউ বলতে পারে না এদেশে ঘর থেকে বের হওয়ার পর বাসায় ফিরবে কিনা? জীবন এখানে অনিশ্চিত। সামান্য কারণে একজন আরেকজনকে হত্যা করে চলেছে। রাজনৈতিক দলগুলো কারণে অকারণে হরতাল ডাকছে, জনজীবন বিপর্যস্ত করে তুলছে।

প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির ব্যবধান দূরীকরণে সুপারিশ : স্বাধীনতার চার দশক অতিক্রম হলেও বাংলাদেশের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান রয়েছে। আর এ ব্যবধান দূর করতে নিম্নলিখিত সুপারিশগুলো করা যেতে পারে :

১. সংবিধানে দেয় জনগণের সকল অধিকার নিশ্চিত করার জন্য দীর্ঘমেয়াদি আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক নীতি-কৌশল স্থানীয় মেধা ও গণসম্পৃক্ত মাধ্যমে প্রণয়ন ও রূপায়ণ করতে হবে।
২. শান্তিপূর্ণভাবে নির্দিষ্ট সময়ের পর সরকার বদলের স্থায়ী ব্যবস্থা করতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে পারস্পরিক আস্থা বৃদ্ধি করতে হবে।
৩. সৎ, যোগ্য ও দক্ষ নেতৃত্বের বিকাশে রাজনৈতিক নেতাদের কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।
৪. প্রশাসনিক দুর্নীতির মূলোৎপাটনসহ সকল প্রকার দুর্নীতিরোধে কঠোর ও কঠিন হতে হবে। এক্ষেত্রে মন্ত্রী-আমলা যেন কেউ রেহাই না পায়। সকল স্তরে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে।
৫. রেডিও-টিভিসহ সকল গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও উন্নয়ন সহায়ক ভূমিকা পালনের স্থায়ী অধিকার দিতে হবে।
৬. গণতন্ত্রকে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দেশের সকল কল্যাণমুখী জনপ্রতিষ্ঠান, সমিতি, এনজিও, সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী ইত্যাদি তৃণমূলের সংগঠনকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতে হবে। সংসদকে অর্থবহ ও কার্যকর করতে হবে।
৭. সরকারের সকল আর্থ-সামাজিক নীতির মূল্যায়ন ও সমালোচনার জন্যে তথ্যপ্রবাহ স্বচ্ছ করতে হবে এবং সংসদীয় কমিটিগুলোতে বিরোধী দলীয় সদস্যদের সভাপতিত্বের পাশাপাশি এ কমিটির ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।
৮. শক্তিশালী স্থানীয় সরকারের যে অঙ্গীকার সংবিধানে দেয়া হয়েছে তার দ্রুত রূপায়ণ করতে হবে।
৯. আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে আরো সবল, দায়বদ্ধ, স্বচ্ছ, জবাবদিহিতার আওতায় নিয়ে আসতে হবে।
১০. অর্থনৈতিক সুষম বন্টন নিশ্চিত করার জন্য সঠিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও নীতি-কৌশল উদ্ভাবন করতে হবে। বেকার সমস্যা লাঘব করতে হবে। দারিদ্র্য, অশিক্ষা, পুষ্টিহীনতা দূর করতে হবে।

উপসংহার : বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যাশা ছিল পরাধীনতার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে একটি শোষণমুক্ত, স্বনির্ভর, জনকল্যাণমূলক স্বাধীন বাংলাদেশ গঠন করা। মাতৃভাষাকে সর্বস্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর আর্থ-রাজনৈতিক শোষণ-বঞ্চনা ও গ্লানি থেকে বাঙালিকে মুক্ত করে স্বাধিকার, স্বায়ত্তশাসন ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করাই ছিল মুক্তিযুদ্ধের মূল প্রত্যাশা। সামাজিক বৈষম্য, বঞ্চনা, দুর্নীতি, শোষণ, পরাধীনতা আজ শেকড় গেড়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনীতির দুষ্টচক্র ক্ষমতার অপব্যবহার করে জনজীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। তারা স্বাধীনতার মূল প্রত্যাশা বিপন্ন করে তুলেছে। এ থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে গণজাগরণ ঘটিয়ে অভীষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়া; সুশাসন নিশ্চিত করা।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

২৩। "একটি দুর্ঘটনাই মানুষের সারা জীবনের কান্না।" —এ প্রসঙ্গে সড়ক দুর্ঘটনার কারণসমূহ উল্লেখপূর্বক তা সমাধানের উপায় তুলে ধরুন।
অথবা, "নিরাপদ সড়ক চাই।"– এ দাবি বাস্তবায়নে কি কি পদক্ষেপ নেয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন। এ প্রসঙ্গে আপনার মতামত প্রদান করুন।

উত্তর : সড়ক দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ দেশ বলা হয়। এখানে প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও একাধিক দুর্ঘটনা ঘটছে। দেশজুড়ে দুর্ঘটনায় মৃত্যুর হার ক্রমশ বেড়েই চলেছে। সেই সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে দুর্ঘটনাজনিত আহত ও পঙ্গুত্ব বরণকারীদের সংখ্যা। দুর্ঘটনায় পঙ্গুত্ব বরণ এবং প্রাণহানি ছাড়াও দেশের বিপুল পরিমাণ সহায়সম্পদের ক্ষতি হচ্ছে। অসহায় শঙ্কিত যাত্রী, পণ্যের মালিক কিংবা পথচারী কেউই নিশ্চিত নয়, তাদের জীবন ও পণ্য নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছবে কিনা। প্রতিদিন এ আতঙ্ক আর অনিশ্চয়তা নিয়েই তাদের পণ্য পরিবহন করতে হয়। একজন সুস্থ মানুষ বাড়ি থেকে বের হয়ে ফিরে আসেন লাশ হয়ে। তাই একটি দুর্ঘটনা কারো না কারো জন্য সারাজীবনের কান্না হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কত পরিবারে বেঁচে থাকার আলো নিভে যাচ্ছে। স্বপ্ন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে।

সড়ক দুর্ঘটনার কারণসমূহ : সড়ক দুর্ঘটনার মূলে নানাবিধ কারণ বিদ্যমান। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্ঘটনা গবেষণা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ড. শামসুল হকের মতে, সড়ক দুর্ঘটনার জন্য কেবল চালকই দায়ী নয়। অপরিকল্পিত রাস্তাঘাট তৈরি, ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন, বাণিজ্যিকীকরণ, আইন প্রয়োগে শিথিলতাসহ আরো অনেক কারণ রয়েছে। নিচে ধারাবাহিকভাবে সড়ক দুর্ঘটনার কতিপয় কারণ উপস্থাপন করা হলো–

১. **বেপরোয়া গাড়ি চালনা :** সড়ক দুর্ঘটনার একটি অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে গতিসীমাকে লঙ্ঘন করে অতিরিক্ত গতিতে বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালনা। দূরের পথে চালক তাড়াতাড়ি গন্তব্যে পৌঁছার তাড়নায়, অথবা আগে যাওয়ার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হলে সাধারণত চালকরা বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালায়। ফলে গাড়ি হয়ে যায় নিয়ন্ত্রণহীন। আর এর ফলে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে।
২. **অপরিকল্পিত সড়ক :** আমাদের দেশের অধিকাংশ সড়কই ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করে করা হয়নি। সড়কের প্রশস্ততা যেমন কম, তেমনি সড়কগুলো লোকালয়কে স্পর্শ করে চলে গেছে। দ্রুতগতির যানবাহনের সড়কে চলছে মন্থর গতির যানবাহন। তাছাড়া বর্ষা মৌসুমে সড়কের অবস্থা আরো করুণ রূপ ধারণ করে। এরূপ নানাবিধ সড়কজনিত দুর্বলতার কারণে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে থাকে।
৩. **আইন অমান্য করা :** প্রশাসনিক দুর্বলতার কারণে সড়ক-মহাসড়কের গাড়ি চালকরা দিন দিন বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। সুযোগ পেয়ে তারা ট্রাফিক আইন, সাধারণ নিয়ম-নীতি কিছুই মানছে না। অন্যদিকে পথচারীরাও একই কাজ করে চলেছে। দ্রুত গন্তব্যে পৌঁছতে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে রাস্তা পাড়ি দিচ্ছে, রাস্তায় চলছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই দুর্ঘটনা ঘটছে।
৪. **চালকের অদক্ষতা :** আমাদের দেশের সড়ক দুর্ঘটনার মূলে অন্যতম একটি কারণ হলো চালকের দক্ষতার অভাব। এমনও অনেক চালক আছে যারা জানে না ডানে বা বাঁয়ে যেতে হলে কি সংকেত দিতে হয়। কোথায়, কিভাবে মোড় নিতে হবে। এছাড়া দেখা যায়, মালিকরা অদক্ষ ও হেলপারদের কম বেতনে ড্রাইভার হিসেবে নিয়োগ দিচ্ছে। অভিযোগ রয়েছে, বিআরটিএর' কিছু কর্মচারী অদক্ষ চালকদের ভুয়া ড্রাইভিং লাইসেন্স দিচ্ছে। এগুলোকে ড্রাইভিং লাইসেন্স না বলে মানুষ হত্যার লাইসেন্স বলাটাই সঙ্গত। এসব চালকের কারণেও দুর্ঘটনার সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে।

৫. **ওভারলোডিং ও ওভারটেকিং :** প্রত্যেকটি যানের একটি ধারণক্ষমতা আছে। এ ধারণ ক্ষমতার অধিক বহন করলে জেল, জরিমানা করার বিধান আমাদের দেশে থাকলেও তা কার্যকর নেই। ফলে দেখা যায় ৪০ জনের গাড়িতে ৬০/৮০ জন বহন করছে। ৫ টন ওজনের ট্রাকে ১০ টন পণ্য বহন করছে। তাছাড়া ওভারটেকিং তো রয়েছেই। সবাই চায় আগে যেতে। কেউ পেছনে থাকতে চায় না। আর এর ফলে নিয়মবহির্ভূতভাবে ওভারটেক করতে গিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হয়।

৬. **যান্ত্রিক ত্রুটি ও গাড়ির ফিটনেসহীনতা :** আমাদের দেশের অনেক গাড়ি আছে যা চলতে চলতে হঠাৎ রাস্তার মাঝে থেমে যায়। পরে আবার পেছনে ঠেলা দিয়ে চালু করতে হয়। এরূপ যান্ত্রিক ত্রুটিসহ অনেক গাড়ির পেছনে সাংকেতিক লাইট নেই, ব্রেক নেই, থাকলেও ঠিকমতো কাজ করে না। তাছাড়া ফিটনেসহীন গাড়ি তো রাস্তায় অহরহ। এ ব্যাপারে প্রশাসন নীরব। দু/একটি উদ্যোগ নিলেও তা অকার্যকর হয়ে পড়ে সর্ষের ভেতর ভূত থাকার কারণে। ফলে দুর্ঘটনা দিন দিন বেড়ে চলেছে।

৭. **ট্রাফিক আইন প্রয়োগে দুর্বলতা :** অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন, আমাদের দেশে প্রচলিত ট্রাফিক আইন যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হলে সড়ক দুর্ঘটনা অর্ধেকে নেমে আসবে। কেননা ট্রাফিক আইন যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হলে চালকদের মধ্যে ভীতি সৃষ্টি হবে এবং চালকরা গাড়ি চালানোর সময় সাবধানতা অবলম্বন করবে। ট্রাফিক আইনের তোয়াক্কা না করে অস্বাভাবিক গতিতে গাড়ি চালানো হয়, যত্রতত্র গাড়ি পার্কিং করা, চলন্ত গাড়িতে ওঠা-নামা করানো হয়। মেয়াদোত্তীর্ণ গাড়ি রাস্তায় নামানো হয়, অতিরিক্ত যাত্রী বা পণ্য পরিবহন করা হয় প্রভৃতি অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনার কারণে দুর্ঘটনা ঘটে।

৮. **চালকের নেশাজাতীয় দ্রব্যগ্রহণ :** অনেক চালক আছেন যারা গাড়ি চালানোর পূর্বে নেশাজাতীয় দ্রব্য গ্রহণ করেন। এরূপ নেশাখোর চালকরা অনেক সময় অধিকমাত্রায় নেশা গ্রহণের ফলে নিজের গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। ফলে দুর্ঘটনা ঘটে।

৯. **সড়ক-মহাসড়কের পাশে হাট-বাজার, অবৈধ স্থাপনা :** আমাদের দেশের সড়কের পাশের ফুটপাত থাকে দোকানদার বা ব্যবসায়ীদের দখলে। অনেক সময় দেখা যায় ব্যস্ত সড়কের পাশে গাড়ি পার্কিং করে রাখা হয়েছে। এছাড়া রয়েছে নানাবিধ অবৈধ স্থাপনা। এরূপ সড়ক-মহাসড়কের পাশের হাট-বাজার, অবৈধ স্থাপনা দুর্ঘটনার জন্য দায়ী।

১০. **পথচারীর অসাবধানতা :** পথচারীরা সময় বাঁচানোর জন্য বা অলসতার কারণে অনেক সময় ফুট ওভারব্রিজ ব্যবহার করে না। আবার অনেক সময় দেখা যায় ব্যস্ত সড়কে পথচারীরা দৌড়ে রাস্তা পার হচ্ছে। রাস্তা পারাপারে পথচারীরা জেব্রা ক্রসিং ব্যবহার করছে না। অনেক সময় পথচারী মোবাইলে কথা বলতে বলতে রাস্তা পার হচ্ছে। পথচারীর এরূপ অসাবধানতার কারণেও দুর্ঘটনা ঘটে থাকে।

সড়ক দুর্ঘটনা রোধে করণীয় : সময়ের চেয়ে জীবনের মূল্য অনেক বেশি। তাই সড়ক দুর্ঘটনা রোধে উল্লেখিত পদক্ষেপগুলো অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে—

১. **চালকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে :** বিআরটিএ'র কতিপয় অসাধু কর্মকর্তার কারণে অনেক অদক্ষ, অপ্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তি ভুয়া ড্রাইভিং লাইসেন্স পেয়েছে। এরূপ অদক্ষ, অপ্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

২. **সড়ক প্রশস্ত করতে হবে :** অপরিকল্পিত নগরায়নের ফলে আমাদের দেশের অধিকাংশ সড়কই প্রশস্ত নয়। অথচ জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে যানবাহনও বাড়ছে দ্রুতগতিতে। কাজেই সড়ক দুর্ঘটনা রোধ করতে হলে সড়কের প্রশস্ততা অতি জরুরি।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৩. **ফুটপাত অবৈধ দখলদার থেকে মুক্ত করতে হবে :** ফুটপাত বিভিন্ন ব্যবসায়ী অবৈধভাবে দখল করে রেখেছে। ফলে পথচারী চলাচলের ক্ষেত্রে ফুটপাতের বিকল্প হিসেবে রাস্তাকে বেছে নিচ্ছে। রাস্তা কেবল গাড়ি চলাচলের জন্য, পথচারীর জন্য নয়। কাজেই পথচারীর অধিকার ফুটপাতকে জরুরি ভিত্তিতে অবৈধ দখলদারদের হাত থেকে মুক্ত করে পথচারীর চলাচলের যুগোপযোগী করে তুলতে হবে।

৪. **আইনি দুর্বলতা রোধ করতে হবে :** ১৯৩৯ সালের মোটরযান আইনের দণ্ডবিধি ৩০৪ (খ) ধারা সংশোধন করে ১৯৮৪ সালে চালকের অপরাধের জন্য শাস্তি ১৪ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও অজামিনযোগ্য অপরাধের স্থলে ৭ বছর করা হয় এবং জামিনযোগ্য করা হয়। এরপর ১৯৮৫ সালে ৭ বছরের স্থলে ৩ বছর করা হয়। তাও সুষ্ঠুভাবে কার্যকর হচ্ছে না পুলিশী তদন্তে গাফিলতি, আদালতে মামলা না হওয়া, আইনের ফাঁকফোকর প্রভৃতি কারণে। কাজেই দণ্ডবিধি ৩০৪ (খ) ধারার অবশ্যই সংশোধন প্রয়োজন। দোষী চালকদের কঠোর শাস্তির বিধান করা গেলে চালকরা বাধ্য হবে সতর্কতার সাথে গাড়ি চালাতে, যা দুর্ঘটনা রোধে সহায়ক হবে।

৫. **ট্রাফিক আইন যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে হবে :** আমাদের দেশে যে ট্রাফিক আইন আছে তা যদি যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হয় এবং আইন লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তাহলে সড়ক দুর্ঘটনা অনেকটা কমে যাবে। কেননা ট্রাফিক আইন যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হলে চালকদের মধ্যে ভীতির সৃষ্টি হবে এবং চালকরা গাড়ি সাবধানতার সাথে চালাবে।

৬. **বেপরোয়া গতি, ওভারলোডিং, ওভারটেকিং বন্ধ করতে হবে :** আমাদের দেশে অধিকাংশ গাড়িই বেপরোয়া গতিতে চালনা করা হয়। এছাড়া ওভারলোডিং, ওভারটেকিং প্রবণতা তো আছেই; কারো যেন ধৈর্য নেই। সবাই আগে যেতে চায়, সবাই খরচ কম করতে চায়। তারা ভুলে যায় 'সময়ের চেয়ে জীবনের মূল্য বেশি'। কাজেই বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালনা, ওভারলোডিং ও ওভারটেকিং বন্ধ করতে পারলে সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাস পাবে।

৭. **ত্রুটিপূর্ণ মেয়াদোত্তীর্ণ যান চালনা বন্ধ করতে হবে :** বিআরটিএ'র অব্যবস্থাপনা ও দুর্বলতার কারণে ও ট্রাফিক পুলিশের অনিয়মের ফলে রাস্তায় ত্রুটিপূর্ণ ও মেয়াদোত্তীর্ণ যান চলাচল করতে দেখা যায়। এরূপ যান চলাচল বন্ধ করলে সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাস পাবে।

৮. **চালকদের নেশাজাতীয় দ্রব্য গ্রহণে বিরত রাখতে হবে :** অনেক সময় দেখা যায় দূরপথের চালকরা গাড়ি চালনার পূর্বে বিভিন্ন নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবন করে। এরূপ নেশাজাতীয় দ্রব্য গ্রহণ থেকে চালকদের বিরত রাখতে হবে। এর জন্য রাস্তায় মোবাইল কোর্ট বসিয়ে ড্রাইভারদের ড্রোপ টেস্ট করা যেতে পারে।

৯. **রাস্তা পারাপারে ফুট ওভারব্রিজ ও জেব্রা ক্রসিং ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে :** সড়ক দুর্ঘটনা রোধ করতে হলে পথচারীদের পথ চলাচলের নিয়ম সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। রাস্তা পারাপারে ফুট ওভারব্রিজ ও জেব্রা ক্রসিং ব্যবহারে উৎসাহিত করতে হবে। পথচারীরা সতর্ক হলে অনেক দুর্ঘটনা আপনা আপনি বন্ধ হয়ে যাবে।

১০. **ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করে জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে :** বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তকে, সভা-সম্মেলনে, সেমিনারে, সংবাদপত্রে, ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা করতে হবে। যাতে সকলের ভেতর সচেতনতা সৃষ্টি হয়। এর ফলে পথচারী যেমন পথ চলতে সচেতন হবে, তেমনি চালকও গাড়ি চালনায় সচেতন হবে। ফলে সড়ক দুর্ঘটনা রোধ হবে।

উপসংহার : নিরাপদ সড়ক আজ সময়ের দাবি। নিরাপদ সড়কের জন্য প্রতিনিয়তই আন্দোলন হচ্ছে; হচ্ছে প্রতিবাদ সভা। কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না এসব দুর্ঘটনা। একটু সতর্কতা, পরিকল্পিত রাস্তাঘাট, যানবাহনের ফিটনেস, আইনের কঠোর প্রয়োজনই এমন পরিস্থিতি থেকে সবাইকে রক্ষা করতে পারে। বেঁচে যেতে পারে অপ্রত্যাশিতভাবে অকালে ঝরা অজস্র তাজা প্রাণ। সড়ক দুর্ঘটনারোধে দুর্বল মোটরযান আইন থাকলেও তা নানা অনিয়মের কারণে কার্যকর হচ্ছে না। প্রয়োজন বিদ্যমান মোটরযান আইনের সংশোধন, যথাযথ প্রয়োগ, পুলিশ বিভাগের সক্রিয়তা, জনসচেতনতা বৃদ্ধি প্রভৃতি। তবেই মানুষের অপ্রত্যাশিত করুণ মৃত্যু প্রতিরোধ করা সম্ভব।

২৪। রাজনৈতিক সংস্কৃতি কি? বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক সংস্কৃতি গণতন্ত্র বিকাশে কতটা সহায়ক বলে আপনি মনে করেন?
***অথবা,* বাংলাদেশে সাম্প্রতিক বিদ্যমান রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণসমূহ উদঘাটন পূর্বক এ থেকে উত্তরণের উপায় আলোচনা করুন।**

উত্তর : রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধারণাটি খুব বেশি প্রাচীন নয়। 'রাজনৈতিক সংস্কৃতি' (Political culture) প্রত্যয়টি প্রথম ব্যবহার করেন সিডনি ভার্বা। তারপর থেকে রাজনৈতিক বিশ্লেষণে রাজনৈতিক সংস্কৃতির সম্পৃক্ততা ও প্রভাবের বিষয়টি আলোচনায় আসে। আধুনিক কালে প্রতিটি রাজনৈতিক ব্যবস্থাই তার নিজস্ব রাজনৈতিক সংস্কৃতির আবহে গড়ে উঠতে দেখা যায়। কোনো দেশের রাজনৈতিক আবহ তথা রাজনৈতিক বিশ্বাস, চেতনা, মূল্যবোধ ও ঐতিহ্য তার রাজনৈতিক ব্যবস্থায় মূর্ত হয়ে প্রকাশ পায়। কেননা রাজনৈতিক সংস্কৃতি হলো কতকগুলো অন্তর্গত প্রবণতা ও মাত্রাবোধ। এ প্রবণতা ও বিশ্বাসগুলো বিভিন্নভাবে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, নীতি এবং আচরণকে প্রভাবিত করে। তাই দেখা যায়, কোনো সমাজের বিদ্যমান রাজনৈতিক সংস্কৃতির উপাদানগুলো যদি সেখানকার রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় তাহলে সে ব্যবস্থা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিকশিত হতে পারে না। আরোপিত বিধি-বিধান, নীতিপদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠানগুলো তখন বিদ্যমান বিশ্বাস ও বোধের সাথে খাপ খাওয়াতে না পেরে রাজনীতিতে হ-য-ব-র-ল অবস্থার সৃষ্টি করে। তাই কোনো একটি গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনের জন্য কেবল গণতান্ত্রিক বিধিবিধানই যথেষ্ট নয়। সেজন্য চাই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রসার।

বাংলাদেশের চলমান রাজনীতির দিকে দৃষ্টি দিলে অতি সহজেই বলা যায়, বর্তমান পরিস্থিতি গণতান্ত্রিক বিকাশের সহায়ক নয়। বিরোধী দলের ক্রমাগত সংসদ বর্জন, জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে অনৈক্য ও রাজনৈতিক দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এদের বিবেচনা; হরতাল, রাজনৈতিক হয়রানি, পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ওপর জনগণের অনাস্থা, আইনের অসম প্রয়োগ, রাজনৈতিক অস্থিরতা ও হানাহানি গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রাকে কেবল রুখেই দিচ্ছে না, বরং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মৌলিক নীতি ও বিশ্বাসগুলোকে গলা টিপে হত্যা করছে। নব্বই-পরবর্তী সময়ে পরপর পাঁচটি অবাধ, সুষ্ঠু ও ব্যাপকভিত্তিক জাতীয় নির্বাচনে জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ দেখে অনেকেই হয়তো মনে করেন বাংলাদেশের গণতন্ত্রের ভিত্তি মজবুত হচ্ছে, গণতন্ত্রের পথে আমাদের অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছে, তবে আমাদের অগ্রগতির হার কচ্ছপের চেয়েও ধীর।

এখন প্রশ্ন হলো, গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রায় দীর্ঘ আড়াই যুগ পেরিয়ে এসেও আমাদের অগ্রগতি দ্রুততর হচ্ছে না কেন? গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারের অধীনে থেকেও কেন জনগণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুফল

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

ভোগ করতে পারছে না? এ প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে গেলে দেখা যায়, গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতির যে মৌলিক উপাদান এগুলোর অধিকাংশই আমাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিদ্যমান নেই। যেমন—

প্রথমত, একটি উন্নত গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য হলো সরকার ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা তথা রাজনৈতিক নীতি, প্রতিষ্ঠান ও রাজনীতিবিদদের প্রতি জনগণের আস্থা। এক্ষেত্রে সংসদ, সরকারি ও বিরোধী দলের ভূমিকা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং আইন ও বিচার বিভাগের ভূমিকা জনগণের বিবেচনায় আসে। বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতির দিকে তাকালে দেখা যাবে, সরকার ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি জনগণের আস্থা শূন্যের কোঠায়। কেননা বিরোধী দলহীন সংসদ, সরকার ও বিরোধী দলের নেতিবাচক ও গণস্বার্থহীন রাজনৈতিক বিরোধ, দুর্নীতিগ্রস্ত ও একচোখা পুলিশি ব্যবস্থা, দুর্নীতি ও রাজনৈতিক দুষ্টচক্রে আক্রান্ত আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতি জনগণ আস্থা হারিয়ে ফেলছেন।

দ্বিতীয়ত, গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হলো পারস্পরিক বিশ্বাসের উপস্থিতি। পারস্পরিক বিশ্বাসের আবার দুটি দিক রয়েছে। এক. সরকারের প্রতি জনগণের বিশ্বাস, দুই. নাগরিকদের মধ্যকার পারস্পরিক বিশ্বাস। জনগণ যদি সরকারের হাতে তাদের স্বার্থকে নিরাপদ মনে না করে, রাজনৈতিক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি যদি জনগণের বিশ্বাস না থাকে, তখন তারা সরকারকে সহযোগিতা করে না। অন্যদিকে নাগরিক তথা রাজনীতিবিদদের মাঝে পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাসের অভাব দেখা দিলে তখন তারা নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক পদ্ধতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকে না এবং নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতাও হস্তান্তর করতে চায় না। এর ফলে বিরোধী রাজনৈতিক দল ও শক্তিকে নিজেদের জন্য নিরাপদ মনে করতে পারে না। বাংলাদেশেও এরূপ পরিস্থিতি দেখা যায়। রাজনৈতিক দলগুলো সব সময়ই রাজনৈতিক ক্ষমতা হারানোর ভয়ে থাকে। বিরোধী দলে থেকেও যে সরকারের অংশ হয়ে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করা যায়, সে মানসিকতা যেমন বিরোধী দলের মাঝে নেই, তেমনি সরকারি দলও বিরোধীদের রাজনৈতিক উপস্থিতিকে ভালো চোখে দেখে না। তাই দেখা যায়, রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য যা করা দরকার তাই করতে প্রস্তুত থাকে। এ প্রবণতার অংশ হিসেবে নগ্ন দলীয়করণ সব দলের মাঝেই দেখা যায়। রাজনৈতিক দলগুলো মনে করে প্রশাসন, বিচার ও সামরিক বাহিনীসহ সকল ক্ষেত্রে নিজেদের দলীয় লোক বসিয়ে গেলে শত অপকর্ম করলেও ক্ষমতা হারানোর পর তাদের কিছুই হবে না এবং এ থেকে দেখা দিচ্ছে প্রশাসনিক অব্যবস্থাপনা ও স্থবিরতা।

তৃতীয়ত, বাংলাদেশের মানুষের আরেকটি দুর্ভাগ্য হলো, আমাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আজ পর্যন্ত এমন কোনো গৌরবময় অবস্থানে পৌছতে পারেনি যা নিয়ে বাংলাদেশের মানুষ গর্ব করতে পারে। শেখ মুজিবুর রহমান, জিয়াউর রহমান প্রমুখ নেতা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ও বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছেন। কিন্তু বর্তমানে রাজনৈতিক কাঁদা ছোড়াছুড়ির মাধ্যমে তাদেরকে এমন অবস্থানে নেয়া হয়েছে যে, আইন করে তাদের প্রতি জনগণের শ্রদ্ধা আদায়ের চেষ্টা করতে দেখা যায়। ব্রিটিশরা যেভাবে তাদের সংসদ, আমেরিকানরা তাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থা আর ভারতীয়রা তাদের নেতা মহাত্মা গান্ধীকে নিয়ে গর্ব করে এবং এগুলোকে তাদের রাজনৈতিক ঐক্যের আশ্রয় হিসেবে ব্যবহার করে, এমন কোনো আশ্রয় আমাদের নেই। এ দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা যুদ্ধ করে যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল, মুক্তিযুদ্ধের সে ঐক্যবদ্ধ চেতনাও আমরা টিকিয়ে রাখতে পারিনি। আর জাতীয় গৌরববোধ নেই বলে বৃহত্তর জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার ন্যূনতম অবলম্বনও আমাদের নেই। এমনকি যা আছে তাকেও আমরা দলীয় স্বার্থে কলুষিত করে ফেলেছি।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

চতুর্থত, গণতান্ত্রিক রাজনীতির বিকাশের জন্য দরকার মুক্ত ও শঙ্কাহীন রাজনৈতিক যোগাযোগের সুযোগ ও পরিবেশ। গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে রাজনৈতিক পরিবেশটা এমন হওয়া চাই যেন জনগণ কেবল চুপি চুপি ভোটদানই নয় বরং মুক্ত, স্বাধীন ও শঙ্কাহীনভাবে নিজের রাজনৈতিক মতামত প্রকাশ করতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশে অনেক ক্ষেত্রেই নাগরিকরা তাদের রাজনৈতিক ইচ্ছা, মত ও বিশ্বাসকে নিঃসংকোচে প্রকাশ করতে পারে না। নাগরিকরা আজ নিজের ও পরিবারের নিরাপত্তার কথা ভেবে রাজনীতি থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে বাধ্য হচ্ছে। রাজনৈতিক হত্যা, বিরোধী দলের প্রতি সরকারের বৈরী আচরণ আর সুযোগসন্ধানী রাজনীতিকদের হাত থেকে বাঁচার জন্য মত প্রকাশে সকলেই ভয় পাচ্ছে। এটা যে কেবল বিরোধীদের বেলায় সত্য এমন নয়, বরং সরকারি দলের কর্মী-সমর্থকরাও অনেক ক্ষেত্রে দলীয় সহকর্মীর কোপানলে পড়ার ভয়ে স্বাধীন মতামত প্রকাশ করতে পারেন না। এমনকি নিরন্তর হুমকি, সরকার ও বিরোধী দলের পর্যায়ক্রমিক কোপানলে পড়ার ভয় সংবাদপত্রগুলোকেও রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তির দিকে ঠেলে দিয়েছে। এমতাবস্থায় গণতান্ত্রিক রাজনীতির বিকাশ আশা করা দুরাশারই শামিল। কেননা গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় পরমতসহিষ্ণুতা ও স্বাধীন মত প্রকাশের সুযোগ না থাকলে গণতন্ত্রের বিকাশ হতে পারে না।

পঞ্চমত, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকারি দল ও বিরোধী দলের উপস্থিতি এবং জনগণের দলীয় মানসিকতার উপস্থিতি অত্যাবশ্যক। এখানে জনগণ কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিকাশে তা তখনই বিপত্তির জন্ম দেয়, যখন দলীয় সমর্থন উগ্রতায় রূপ নেয় কিংবা রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার সৃষ্টি করে। আর এটা তখনই হয় যখন রাজনৈতিক দল ও নেতৃত্ব দলীয় রাজনীতি বলতে একদলীয় রাজনীতিকে বোঝে। আমাদের দেশেও পরমত সহিষ্ণুতা ও গণতান্ত্রিক দলব্যবস্থা অনুপস্থিত। আমাদের রাজনীতিবিদরা নিজেদের আঞ্চলিক কর্তৃত্বের বলয় সৃষ্টি করে প্রতিপক্ষ রাজনীতিবিদদের বিতাড়িত করে একচ্ছত্র রাজনীতি ও লুটপাটের অপচেষ্টায় লিপ্ত। এভাবে দেখা যায়, প্রতিটা সরকারই ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় তাদের নেতা-কর্মীদের সকল অপকর্মকে অনৈতিকভাবে সমর্থন করে। কিন্তু ক্ষমতা পরিবর্তনের পর যখন তাদের শাস্তির প্রক্রিয়া শুরু হয় তখন তারাই আবার রাজনৈতিক হয়রানির অভিযোগ তুলে আন্দোলন-সংগ্রামে নামে। প্রত্যেকেরই রাজনৈতিক পরিচয় থাকবে। তাই বলে এ পরিচয়টা সকল অপকর্মের সার্টিফিকেট হলে গণতন্ত্র চলতে পারে না।

ষষ্ঠত, গণতন্ত্রের বিকাশের জন্য গণতান্ত্রিক সামাজিক আবহ ও জনগণের অংশগ্রহণমূলক দৃষ্টিভঙ্গি থাকা জরুরি। সেক্ষেত্রে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয় যোগ্যতাও জনগণের থাকতে হবে। কিন্তু আমাদের দেশে এর কোনোটাই যথাযথভাবে বিদ্যমান নেই। বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকার জনগণের অধিকাংশই রাজনীতি সম্পর্কে অজ্ঞ এবং এটা তাদের নিজেদের ব্যাপার বলে মনে করে না। ভোটদানের উচ্চহার দেখে অনেকেই হয়তো জনগণ রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বেশি বলতে চাইবেন। আসলে শুধু ভোটদান দিয়ে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বোঝা যায় না। কেননা ভোটদানের গুরুত্ব যে ভোটাররা বোঝেন না তা নির্বাচনে কালো টাকার ছড়াছড়ি থেকেই বোঝা যায়। তবে ইদানীং বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সপ্তমত, গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় যে গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ও আবহ দরকার তাও আমাদের দেশে অনুপস্থিত। কর্তৃত্বপরায়ণ পারিবারিক ব্যবস্থা, সামাজিক কুসংস্কার, অশিক্ষা ও অসাম্য গণতান্ত্রিক বিকাশকে অনেক ক্ষেত্রেই বাধাগ্রস্ত করে থাকে। ফলে গণতান্ত্রিক বিচার-বিবেচনার বাইরে সামাজিক প্রপঞ্চগুলো রাজনীতিকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে।

তাছাড়া গণতান্ত্রিক শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ ও পরিস্থিতি আমাদের দেশে নেই। পাঠ্যপুস্তকে ইতিহাসের বিকৃতি এবং প্রচার মাধ্যমগুলোর নোংরা দলীয় ব্যবহার আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে যথার্থ গণতান্ত্রিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করছে। সুশীল, সুবোধ যুবকরা কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে পা রেখেই শুনছে অস্ত্রের ঝনঝনানি আর লাশের মিছিল। ফলে সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক ও গঠনমূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অভ্যস্ত হওয়ার সুযোগ তারা পাচ্ছে না।

উপসংহার : বর্তমানে আমাদের রাজনীতিতে যে হানাহানি, সরকারি ও বিরোধী দলের ক্রমাগত বিরোধ, ছবি এবং লাশের রাজনীতি, বৈদেশিক সাহায্য ও সমর্থন বন্ধের জন্য বিরোধী দলের তৎপরতা, নতুন নতুন আইন প্রণয়ন ও বাতিল, সন্ত্রাস, নৈরাজ্য, রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ, প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতির প্রতি অনাস্থা, হরতাল প্রভৃতি মূলত গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতির অপরিহার্য উপাদানগুলোর অনুপস্থিতিরই ফল।

২৫ ৷ পরিবার পরিকল্পনা বলতে কি বুঝায়? জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে পরিবার পরিকল্পনার গুরুত্ব আলোচনা করুন।

উত্তর : বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম জনবহুল দেশ। অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৪-এর তথ্য মতে, বাংলাদেশে বর্তমানে জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১০১৫ জন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৭%। 'জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল'-এর প্রতিবেদন মতে, জনসংখ্যার দিক দিয়ে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান ৮ম। পৃথিবীর সকল দেশের জন্যই জনসংখ্যা সম্পদস্বরূপ। কিন্তু তা কোনো দেশের প্রয়োজনের অতিরিক্ত হলে সমস্যার সৃষ্টি করে, যার ফলে সে দেশের জনগণের সার্বিক কল্যাণ ব্যাহত হয় এবং জাতীয় অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হয়। তাই বর্তমান বিশ্বের প্রতিটি দেশেই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ওপর জোর দেয়া হয়েছে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের অন্যতম হাতিয়ার হলো পরিবার-পরিকল্পনা কর্মসূচি গ্রহণ। বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি গ্রহণ করে। বর্তমানে বাংলাদেশে জন্ম নিরোধ ব্যবহার করে ৫৬.৮%।

পরিবার-পরিকল্পনা : সাধারণত পরিকল্পিত উপায়ে পরিবারের আয়তন ছোট রাখাকে পরিবার পরিকল্পনা বলে। প্রকৃত অর্থে পরিবার পরিকল্পনা হলো প্রয়োজনমতো পরিবারের আয়তন ছোট বা বড় রাখা। পরিবার পরিকল্পনা জন্ম নিয়ন্ত্রণ নয়। একটি সুখী ও সমৃদ্ধ পরিবার গঠনের লক্ষ্যে পরিবারের সকল সদস্যের শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করণার্থে সন্তান সংখ্যা সীমিত পর্যায়ে রাখা এবং মা ও শিশুর সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার ব্যবস্থা বা পদ্ধতি গ্রহণ করাকে পরিবার পরিকল্পনা বলা হয়।

বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা সমিতি প্রদত্ত সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, 'পরিবারের সামর্থ্য এবং মা ও শিশুর স্বাস্থ্য বিবেচনা করে নির্দিষ্ট বিরতিতে সীমিত সংখ্যক সন্তান জন্মদানকে পরিবার পরিকল্পনা বলে।' সুতরাং বলা যায় যে, সুনির্দিষ্ট কর্মসূচির মাধ্যমে পরিবারের সদস্যসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে তাদের জীবনমান ও স্বাস্থ্যের উন্নতি এবং পরিবারের সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে জাতীয় অগ্রগতিতে সহায়তা করাই পরিবার পরিকল্পনার লক্ষ্য। পরিবার-পরিকল্পনার মাধ্যমে মা ও শিশুর স্বাস্থ্য, পরিবারের আয় ও অন্যান্য সদস্যের সর্বাধিক কল্যাণ সাধনের প্রতি লক্ষ রেখে সীমিত আকৃতির পরিবার গঠনের প্রচেষ্টা চালানো হয়।

পরিবার-পরিকল্পনার উদ্ভব ও বিকাশ : আজকের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার-পরিকল্পনা কর্মসূচির প্রসারতা ও জনপ্রিয়তার পেছনে যে মহীয়সীর আজীবন শ্রম ও সাধনা রয়েছে তাঁর নাম মার্গারেট স্যাঙ্গার। তিনি ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরের কর্নিং-এ জন্মগ্রহণ করে। এগারো

সন্তানের পরিবারে মার্গারেট ছিলেন ষষ্ঠ। তাঁদের সংসারে অধিক সন্তান জন্মদানের কারণে স্যাঙ্গারের মায়ের স্বাস্থ্য ভেঙে যায় এবং ৪৮ বছর বয়সে তিনি যক্ষ্মা রোগে মারা যান। মায়ের অকালমৃত্যুতে স্যাঙ্গার গভীর দুঃখ পান। অধিক সন্তানের কারণে তাদের পারিবারিক জীবনে আর্থিক অসচ্ছলতা ছিল, আর এ অসচ্ছলতার কারণে তাঁর মায়ের সুষ্ঠু চিকিৎসাও সম্ভব হয়নি। আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে মার্গারেটের পড়ালেখাও বিঘ্নিত হওয়ার উপক্রম হয়। সাংসারিক এ টানাপোড়েন দেখে স্যাঙ্গার নিজে কলেজ শিক্ষার ব্যয় বহনের জন্য ছোটখাটো চাকরি গ্রহণ করেন। পরে ম্যানহাটন হাসপাতাল থেকে নার্সিং-এ স্নাতক ডিগ্রিপ্রাপ্ত হয়ে স্যাঙ্গার জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলন শুরু করেন। জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলন শুরুর সূচনালগ্নে স্যাঙ্গার জন্ম নিরোধক সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্যাদির অভাব উপলব্ধি করেন। এ অভাব পূরণকল্পে তিনি 'The Women Rebel' নামে একটি ম্যাগাজিন প্রকাশ করেন। সরকার ম্যাগাজিনটি বন্ধ করে দিলে স্যাঙ্গার 'Family Limitation' নামে একখানা তথ্যবহুল গ্রন্থ রচনা করেন। জন্মনিরোধক সম্পর্কিত বিভিন্ন বক্তব্যের জন্য ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়। কিন্তু দেশের চিকিৎসক, সমাজকর্মী ও প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন সংশ্লিষ্টদের প্রতিবাদে মামলা বাতিল হয়ে যায়। মামলায় জন্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষে সমর্থন পাওয়ার পর স্যাঙ্গার ইউরোপের বিভিন্ন দেশ সফর করেন এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ বিষয়ে ব্যাপক অভিজ্ঞতা লাভ করেন। এ সময়ে তিনি ইংল্যান্ডে মালথ্যাসের মতবাদের সাথে পরিচিত হন এবং নেদারল্যান্ডে জন্মনিয়ন্ত্রণ ক্লিনিক পরিদর্শন করেন। ইউরোপ সফর শেষে আমেরিকায় এসে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে স্যাঙ্গার নিউইয়র্কের ব্রুকলিনে জন্মনিয়ন্ত্রণ ক্লিনিক স্থাপন করেন। কিন্তু এ ক্লিনিক স্থাপনের পর অশ্লীলতার অভিযোগে তাঁকে গ্রেফতার করা হয় এবং ক্লিনিকটি বন্ধ করে দেয়া হয়। অচিরেই তিনি মুক্তি পান এবং জন্মনিয়ন্ত্রণে আরো জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণে নেমে পড়েন।

আমাদের দেশে সর্বপ্রথম ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে পরিবার পরিকল্পনা ব্যবস্থার প্রচলন হয়। এ ব্যবস্থাটি শুরুতেই নানা বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হয়। একটি বিশেষ গোষ্ঠী একে আল্লাহর বিরুদ্ধ কাজ বলে অভিহিত করেন। তারা প্রচার করেন, 'মুখ দিয়েছেন যিনি আহার দিবেন তিনি।' কিন্তু পরবর্তীতে তাদের এ অপপ্রচার কালের ধোপে টেকেনি। জনগণ যত দ্রুত শিক্ষিত হতে থাকে, ততই তারা পরিবার পরিকল্পনার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে শেখে। তাই জনগণ ধীরে ধীরে পরিবারের সদস্যসংখ্যা সীমিত রাখতে, সুখী ও সমৃদ্ধ পরিবার গড়তে পরিবার পরিকল্পনার দিকে ধাবিত হয়। বাংলাদেশ সরকার পরিবার পরিকল্পনাকে আন্দোলনে রূপ দিয়ে ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে জনসংখ্যাকে বাংলাদেশের এক নম্বর সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি গ্রহণ করে। অশিক্ষা, কুসংস্কার, ধর্মীয় গোঁড়ামি, অসচেতনতা, অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতা, নারী শিক্ষার অভাব, বাল্যবিবাহ ও বহু বিবাহ, ভ্রান্ত ধারণা, সরঞ্জামাদির দুষ্প্রাপ্যতার জটিলতা ও পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া প্রভৃতি কারণে বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি আন্দোলনে রূপ নিলেও তা আজও পরিপূর্ণতা পায়নি। বাংলাদেশ সরকার পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিকে আরো বেগবান করতে নানাবিধ উদ্যোগ ইতোমধ্যেই গ্রহণ করেছে এবং এর সফলতাও ধীরে ধীরে পেতে শুরু করেছে।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে পরিবার-পরিকল্পনার গুরুত্ব : উন্নয়নশীল দেশগুলোতে রয়েছে নানা সমস্যা। এসব দেশে সম্পদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এ সীমিত সম্পদ দিয়ে কিভাবে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সমস্যাসমূহের সমাধান করা যায় মূলত সেজন্যই পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। পরিকল্পনা হলো বহুসংখ্যক অভীষ্ট লক্ষ্যের মধ্য থেকে সর্বাধিক লক্ষ্যগুলো বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সনাক্ত করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অর্জনের জন্য একদিকে সম্পদ আহরণ ও অন্যদিকে সম্পদের যুক্তিগ্রাহ্য বিভাজন।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

জনসংখ্যা অর্থনৈতিক উন্নয়নে কিরূপ ভূমিকা রাখে বা প্রভাব বিস্তার করে তা নির্ভর করে অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর। বাংলাদেশের মতো অনুন্নত বা স্বল্পোন্নত দেশে যেখানে সম্পদ ও মূলধনের পরিমাণ কম সেখানে অতিরিক্ত জনসংখ্যা অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মঙ্গলজনক হতে পারে না। কারণ জনসংখ্যা বেশি হলে স্বাস্থ্য ও শিক্ষাগত সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। খাদ্যদ্রব্য, কাঁচামাল ও কারিগরি মূলধনের অতিরিক্ত চাহিদা সৃষ্টি হয়। মাথাপিছু আয় কম হলে জীবনযাত্রার মান এবং মূলধন গঠনের পরিমাণ কমতে থাকে অর্থাৎ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা হিসেবে পরিগণিত হয়। কাজেই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে পরিবার-পরিকল্পনার গুরুত্ব অপরিসীম। নিচে ধারাবাহিকভাবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে পরিবার-পরিকল্পনার গুরুত্ব উপস্থাপন করা হলো :

১. **পারিবারিক সুখ সমৃদ্ধি ও সচ্ছলতা আনয়ন :** পরিবার পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য সুনির্দিষ্ট কর্মসূচির মাধ্যমে পরিবারের সদস্যসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে তাদের জীবনমান ও স্বাস্থ্যের উন্নতি এবং পরিবারের সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে জাতীয় অগ্রগতিতে সহায়তা করা। একমাত্র ছোট পরিবার গঠনের মাধ্যমেই সংসারে প্রকৃত সুখ, সমৃদ্ধি ও সচ্ছলতা আসতে পারে। আর তাই বলা হয় ছোট পরিবার সুখী পরিবার। কারণ ছোট পরিবার হলো সর্ব সুখের আধার; শান্তি আর শৃঙ্খলার আলয়।

২. **ভরণপোষণের সুবিধা বাড়ে :** একটি পরিবারে একাধিক সদস্য থাকলে তাদের ভরণপোষণ ও সেবাযত্নে নানাবিধ সমস্যা দেখা দেয়। চাহিদা অনুযায়ী প্রত্যেকের প্রাপ্য পূরণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। কাজেই ছোট পরিবারে সন্তানের ভরণপোষণ অনেক সহজ। পিতামাতা সন্তানকে অনেক সময় দিতে পারেন। সন্তানকে উপযুক্ত স্থানে শিক্ষা দিয়ে মানুষ করতে পারেন। কাজেই ভরণপোষণের ক্ষেত্রে পরিবার পরিকল্পনার গুরুত্ব অপরিসীম।

৩. **জীবনযাত্রার মান উন্নত হয় :** যে কোনো দেশের মাথাপিছু আয় দ্বারা জীবনযাত্রার মান নির্ধারণ করা যায়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমানুপাতে যদি মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পায় তবে জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে। অধিক হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে খাদ্য, বাসস্থান, বস্ত্র, চিকিৎসা চাহিদা বৃদ্ধি পায়। কাজেই দেশের সীমিত সম্পদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে জনসংখ্যাকে পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করতে এবং মৌলিক চাহিদা পূরণে ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে পরিবার পরিকল্পনার গুরুত্ব অপরিহার্য।

৪. **আবাদি ভূমির ওপর চাপ হ্রাস পায় :** জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে আবাদি জমির ওপর ক্রমান্বয়ে চাপ বৃদ্ধি পায়। ফলে নতুন নতুন গঠিত পরিবারসমূহ বাসস্থান নির্মাণে কৃষি জমিকে ব্যবহার করে, যা কৃষি উন্নয়নকে ব্যাহত করে। কাজেই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ছোট পরিবার গঠন করে আবাদি জমির ওপর চাপ হ্রাস করা সম্ভব।

৫. **সামাজিক শৃঙ্খলা ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় :** অতিরিক্ত জনসংখ্যা পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে অশান্তি, হতাশা, ব্যর্থতা, খুন, ধর্ষণ, পতিতাবৃত্তি, আত্মহত্যা, পারিবারিক ভাঙন, নারী নির্যাতন, নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি করে। ফলে সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি দেখা দেয়। পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা গেলে এরূপ সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি অনেকাংশে হ্রাস পাবে।

৬. **খাদ্য ঘাটতি হ্রাস পায় :** জনসংখ্যা দ্রুত হারে বৃদ্ধির ফলে খাদ্য ঘাটতিজনিত সমস্যা সৃষ্টি হয়। একদিকে জনসংখ্যা বাড়ছে, বাড়তি জনসংখ্যার জন্য নতুন নতুন ঘরবাড়ি তৈরি করতে হচ্ছে। কৃষি জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে। ফলে প্রতিবছর নতুন মুখের জন্য বাড়তি খাদ্য উৎপাদন তো সম্ভবই হচ্ছে না, বরং খাদ্য ঘাটতি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কাজেই পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে জনসংখ্যাকে নিয়ন্ত্রণ করা গেলে খাদ্য ঘাটতি অনেকাংশে দূর করা সম্ভব হবে।

৭. **মৌলিক চাহিদা পূরণ সম্ভব হয় :** সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে সমাজে বসবাস করার জন্য খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও চিত্তবিনোদনের চাহিদা পূরণ করা খুবই জরুরি। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে এসব মৌলিক চাহিদা দ্রুত পূরণ করা সম্ভব হয় না। কাজেই পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে জনসংখ্যা সীমিত পর্যায়ে রাখা গেলে মৌলিক চাহিদা পূরণ করা সম্ভব।

৮. **পরিবেশ দূষণ হ্রাস ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করা যায় :** মানুষ সৃষ্টির পর থেকে নানাভাবে পরিবেশকে জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে পরিবেশ দূষণ করে চলেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ব্যাপকতার ফলে প্রকৃতি আজ বিরূপ আচরণ করছে। পরিবেশ দূষণের মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধির ফলে প্রাকৃতিক ভারসাম্যহীনতা দেখা দিয়েছে। বন্যা, দুর্যোগ, খরা, দাবানল, ঘূর্ণিঝড় নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাজেই পরিবেশ দূষণ হ্রাস করতে হলে প্রয়োজন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ। জনসংখ্যা যত বৃদ্ধি পাবে, পরিবেশ তত অধিক হারে দূষিত হবে। সুতরাং পরিবেশ দূষণরোধে পরিবার পরিকল্পনার অবদান তাৎপর্যবহ।

৯. **পারিবারিক বন্ধন দৃঢ়করণ সম্ভব হয় :** জনসংখ্যা বৃদ্ধি পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধনকে লোপ করে দেয়। দাম্পত্য কলহ, বহু বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, আত্মহত্যা, ধর্ষণ, খুন, নিরুদ্দেশ যাত্রা, সন্তান ও বৃদ্ধদের নিরাপত্তাহীনতা বৃদ্ধি পায়। পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে সংসারে জনসংখ্যা সীমিত করা গেলে পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন দৃঢ়করণ সম্ভব। কেননা তখন সবার দিকে নজর দেয়া যায়। সকলের সুখ-সুবিধা, ভালোমন্দ উপলব্ধি করা যায়। প্রত্যেকের চাহিদা পূরণ করা যায়।

১০. **আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধি পায় :** জনসংখ্যার বৃদ্ধি সমাজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মূলধন গঠন ও শিল্পায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। ফলে ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায়ে সঞ্চয় হ্রাস পায়। জাতীয় আয়, মূলধন, শিল্পায়নে অন্তরায় সৃষ্টি হয়। জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ব্যাহত হয়। পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি গ্রহণ করে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা গেলে দেশের সীমিত সম্পদের সঠিক ব্যবহার করা সম্ভব হয় এবং আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধি করা যায়।

উপসংহার : বিশ্বব্যাংকের সাবেক প্রেসিডেন্ট রবার্ট ম্যাকনামারা বলেছেন, 'পারমাণবিক যুদ্ধ ব্যতীত বিশ্ববাসীর সম্মুখে অন্যতম যে সমস্যা তা হলো জনসংখ্যা স্ফীতি। অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে এটি যুদ্ধের চেয়েও ভয়াবহ। কারণ একে সংঘবদ্ধভাবে নিয়ন্ত্রণের কোনো উপায় নেই।' জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ তথা জন্ম শাসনের জন্য সর্বোত্তম পন্থা বা একমাত্র সাহায্যকারী হাতিয়ার হলো পরিবার পরিকল্পনা আর তা সম্ভব হলে জনসংখ্যা সমস্যা বা বোঝা না হয়ে সম্পদে পরিণত হবে।

২৬ ॥ রাজধানীর যানজট সমস্যার কারণ এবং এর উত্তরণে কি কি পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর : ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী ও প্রধান শহর। এ শহরটিতে প্রায় দেড় কোটি লোকের বসবাস। ইউনিসেফের ২০১৩ সালের তথ্যানুসারে বিশ্বে মোট মেগাসিটি আছে একুশটি। এর মধ্যে ঢাকার অবস্থান নবম। সামগ্রিকভাবে ঢাকা মহানগরীর গুরুত্ব অত্যধিকভাবে বৃদ্ধি পেলেও ক্রমবর্ধমান যানবাহনের চাপ ও জনসংখ্যার চাপের প্রতি লক্ষ্য রেখে মহানগরীর প্রধান সড়কগুলো সম্প্রসারণ, বর্ধিতকরণ ও ব্যাপক সংস্কারমূলক কার্যগুলো মূলত কোনো সরকারই গুরুত্ব সহকারে তাদের আমলে নেননি। ফলে রাজধানীতে ক্রমবর্ধমান যানবাহন ও লোকসংখ্যার চাপে ঢাকার জনজীবন চরমভাবে বিপর্যস্ত। সত্যিকার অর্থে, মহানগরীর যানজটের কারণে এ পর্যন্ত জাতীয় অর্থনীতির কি পরিমাণ ক্ষতিসাধন হচ্ছে বা পরিবেশ বিপর্যয় ঘটছে বা যানজটের মূল কারণগুলো কি তা তলিয়ে দেখা হচ্ছে কিনা এ বিষয়ে জনমনে প্রশ্ন জাগরিত হওয়া স্বাভাবিক।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

যানজটের ফলে সৃষ্ট সমস্যাসমূহ : ইউএনডিপি (UNDP) পরিচালিত এক সমীক্ষায় জানা গেছে, শুধু ঢাকা শহরেই যানজটের কারণে যে সময়ের অপচয় হয় তাতে প্রতি বছর প্রায় ১৫০ কোটি টাকা অপচয় হয়। ঢাকা মহানগরীর এ যানজটের কারণে জাতীয় অর্থনীতির ক্ষতিসাধনসহ সুষ্ঠ নাগরিক ব্যবস্থা বিঘ্নিত হচ্ছে। নষ্ট হচ্ছে পরিবেশ এবং বঞ্চিত হচ্ছে ন্যূনতম নাগরিক সুযোগ-সুবিধা। এর ফলে নিম্নলিখিত সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে :

১. মহানগরীসহ আশেপাশের শহরের মানুষ জরুরি চিকিৎসা সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ক্ষেত্রবিশেষে মারাত্মক অসুস্থ রোগী যানজটের কবলে পড়ে রাস্তায় প্রাণ হারাচ্ছেন।

২. নগরীর অপ্রীতিকর ঘটনা ও জরুরি সংকটে পুলিশ, ফায়ার ব্রিগেড, এম্বুলেন্সসহ নাগরিক সুবিধা প্রদানকারী সংশ্লিষ্ট মহল প্রয়োজনীয় ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারছে না। ফলে নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত হচ্ছে না। ভেঙ্গে পড়ছে জননিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা।

৩. স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরা তাদের নির্ধারিত সময়ের শিক্ষাক্রম থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ফলে শিক্ষাব্যবস্থা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

৪. যানজটের ফলে নির্ধারিত সময়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ অফিস-আদালতসহ কল-কারখানায় তাদের কর্মকাণ্ড শুরু করতে পারছে না। ফলশ্রুতিতে সার্বিক ব্যবস্থাপনা বাধাগ্রস্তসহ উৎপাদনশীলতায় প্রতিদিন হাজার হাজার শ্রমঘণ্টা বিনষ্ট হচ্ছে, চাপ পড়ছে জাতীয় অর্থনীতিতে।

৫. যানজটের কারণে যানবাহনে প্রয়োজনের অতিরিক্ত লক্ষ লক্ষ টাকা মূল্যমানের অতিরিক্ত জ্বালানি পোড়ানো হচ্ছে। ফলে প্রতি বছর অতিরিক্ত জ্বালানি ক্রয়ের জন্য কয়েক কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা জাতীয় কোষাগার থেকে বের হয়ে যাচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে জাতীয় রিজার্ভ।

৬. যানবাহনের জীবনীশক্তি হ্রাস পেয়ে গ্যারান্টি বা লাইফ পিরিয়ডের পূর্বেই সম্পদ বিনষ্ট হচ্ছে। এক্ষেত্রেও বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় হচ্ছে।

৭. যানজটের কারণে যানবাহন থেকে নির্গত ধোঁয়া ও গ্যাস সামগ্রিকভাবে পরিবেশকে মারাত্মকভাবে দূষিত করে তুলেছে। সুস্থ স্বাস্থ্য রক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে। পাশাপাশি নগরীর মানুষ সকলের অজান্তে মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হচ্ছে।

এক্ষেত্রে প্রতীয়মান হয় যে, যুগ যুগ ধরে রাজধানী ঢাকার সড়কগুলোর তেমন কোনো উন্নয়ন, পরিবর্তন বা পরিবর্ধন না করা এবং মহানগরীতে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও যানবাহনের চাপে ধীরে ধীরে নগরীকে ক্যান্সারের মতো গ্রাস করেছে। আগামী দিনগুলোতে পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ আকার ধারণ করবে তা বলার অবকাশ রাখে না।

রাজধানীর যানজট সমস্যা সমাধানের উপায় : ঢাকা মহানগরীর সকল সড়ক ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন। পক্ষান্তরে, নগরীতে চলাচলকারী সকল যান্ত্রিক যানবাহন যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন। এক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশন ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীর সড়ক পথগুলোর ব্যাপক উন্নয়নের মাধ্যমে যানজট ত্বরিতভাবে সমাধান এবং এর জন্য বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ একান্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। এর জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে :

১. **ঢাকা মহানগরীর প্রবেশ ও প্রস্থান মুখ থেকে আন্তঃজেলা বাস টার্মিনাল স্থানান্তরকরণ ও নতুন টার্মিনাল নির্মাণকরণ :** ঢাকা মহানগরীর প্রবেশ ও প্রস্থান মুখে তিনটি আন্তঃজেলা বাস ও দুটি ট্রাক টার্মিনাল বিদ্যমান, যার কারণে নিয়মিত সড়কে প্রতিবন্ধকতা ও যানজট হচ্ছে। নগরীর মুখ থেকে এই টার্মিনালগুলো নগরীর বাইরে যে কোনো স্থানে স্থানান্তর করতে হবে। নতুন টার্মিনালগুলোকে যুগোপযোগী করে নির্মাণ এবং বর্তমান পরিধির চেয়ে ৩/৪ গুণ বর্ধিত আকারে নির্মাণ করতে হবে। ভবিষ্যৎ বর্ধিত যানবাহনের চাপের প্রতি লক্ষ্য রেখে আন্তঃজেলা টার্মিনালের পাশে শহর ও শহরতলীর স্ট্যান্ড নির্মাণ করতে হবে।

২. **নগরীর প্রধান প্রধান সড়ক থেকে যানবাহন পরিচালন ব্যবস্থা প্রত্যাহারকরণ :** নির্ধারিত স্থানে লোকাল বাস, মিনিবাসের জন্য টার্মিনাল না থাকার কারণে নগরীর প্রায় প্রধান প্রধান সড়কের উপর থেকে যানবাহন পরিচালনা করতে হচ্ছে। তাই প্রধান প্রধান সড়ক থেকে যানবাহন পরিচালনা বন্ধ করা জরুরি প্রয়োজন। তবে তার পূর্বেই প্রয়োজনীয় টার্মিনালের ব্যবস্থা করা দরকার।

৩. **নগরীর সকল বাণিজ্যিক এলাকার প্রধান সড়কের উপর পার্কিং নিষিদ্ধকরণ :** নগরীর সকল বাণিজ্যিক এলাকার প্রতিটি বিল্ডিংই বহুতলবিশিষ্ট এবং প্রায় প্রতিটি বিল্ডিংয়ের আওতায় কমপক্ষে ২০-৩০টি করে প্রাইভেট কার রয়েছে। অথচ এই গাড়িগুলোর নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় কোনো পার্কিংয়ের ব্যবস্থা নেই। ফলে বাণিজ্যিক এলাকার প্রধান রাস্তাগুলোতে ২-৩ সারিতে সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত গাড়ি পার্কিং করে রাখা হয়। ফলে এই সকল এলাকা নিয়মিতভাবে যানজটের কবলে থাকছে। এ অবস্থার নিরসনকল্পে প্রত্যেক ভবনের নিচের তলায় বা বেইজমেন্টে গাড়ি পার্কিং ব্যবস্থার জন্য সরকার আইন জারি করে বাণিজ্যিক এলাকার পার্শ্ববর্তী অপেক্ষাকৃত কম চাপের রাস্তায় গাড়ি পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করতে পারে।

৪. **নগরীর সড়কের মোড়গুলোতে যাত্রীবাহী বাস-মিনিবাসের দৌরাত্ম্য বন্ধকরণ :** ঢাকা মহানগরীর যানজটের অন্যতম আরো একটি কারণ হচ্ছে নগরীর সকল মোড়েই যাত্রী উঠানামার জন্য এক সাথে ৩-৪টি বা তারও বেশি পরিমাণ বাস/মিনিবাস ইচ্ছামাফিক ও এলোপাতাড়িভাবে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব নিয়ে সম্পূর্ণ সড়কে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে। সড়কের যেখানে সেখানে দাঁড় করিয়ে যাত্রী উঠানামার ব্যবস্থা রোধ করতে হবে এবং আইন অমান্যকারীর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান করতে হবে এবং ঢাকা মহানগরীর প্রায় প্রতিটি মোড়ে স্থাপিত ট্যাম্পো স্ট্যান্ডও অন্যত্র স্থানান্তর প্রয়োজন।

৫. **মহানগরীতে ট্রাক চলাচলের সময়সীমা নির্ধারণ :** যানজট নিরসনকল্পে ট্রাক মালিক-শ্রমিক সংগঠনগুলোর সাথে আলোচনা সাপেক্ষে মহানগরীতে ট্রাক চলাচলের নির্ধারিত সময়ের (রাত ৮.০০টা থেকে সকাল ৮.০০টা) ব্যাপারে কড়াকড়ি আরোপ করতে হবে।

৬. **নগরীর সড়কের বাঁক ও মোড় সংস্কারকরণ :** নগরীর প্রায় সকল সড়কেই ১০০ থেকে ৩০০ গজের মধ্যে বাঁক ও মোড় রয়েছে। এই বাঁক ও মোড়গুলো গাড়ির গতি স্তিমিত করে দিচ্ছে। ফলে রাস্তায় যানবাহনের অতিরিক্ত চাপ হচ্ছে। ঢাকার রাস্তার এই বাঁকগুলো সরলকরণ ও মোড়ের বামদিকের টার্নগুলো প্রয়োজনীয় পরিমাণ প্রশস্তকরণ জরুরি।

৭. **উচ্চ চাপের সড়কের উপর ট্রাফিক পুলিশ কর্তৃক যানবাহনের কাগজপত্র চেকিং ব্যবস্থা বন্ধকরণ :** প্রায় ক্ষেত্রে দেখা যায়, নগরীর প্রধান সড়কের উপর বা মোড়গুলোতে যানবাহন দাঁড় করিয়ে ট্রাফিক

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

সার্জেন্ট গাড়ির প্রয়োজনীয় কাগজপত্র চেক করে থাকে। ফলে অতি অল্প সময়ে যানজটের সৃষ্টি হয়। এটি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করার ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। এর বদলে খোলামেলা যানবাহনের চাপবিহীন রাস্তায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে বা অন্যভাবে চেকিং করার ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

৮. **ট্রাফিক আইন অমান্য করার প্রবণতা কঠোর হস্তে রোধের ব্যবস্থা :** ট্রাফিক আইন অমান্য করার প্রবণতা সকল শ্রেণীর যানবাহন চালকদের একটি সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ট্রাফিক আইন না মানার কারণে নগরীর যানজট ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ ব্যাপারে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগকে কঠোর মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। প্রয়োজনে ট্রান্সপোর্ট সেক্টরের মালিক, শ্রমিক, নেতৃবৃন্দ ও জনগণের সমন্বয়ে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

৯. **নগরীর সড়কের উপর যত্রতত্র গ্যারেজ ও ভাসমান মেরামত কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ :** নগরীর প্রায় প্রতিটি বাস ও ট্রাক স্ট্যান্ডের পাশে রয়েছে অসংখ্য মোটর গ্যারেজ এবং ভাসমান/ভ্রাম্যমাণ মেরামতকারী। এরা সাধারণত প্রধান সড়কের গুরুত্ব অনুধাবন করতে চায় না। সড়কের পাশে বা ক্ষেত্রবিশেষ সড়কের বিরাট অংশ দখল করে গাড়ি দাঁড় করিয়ে মেরামত করে থাকে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী গাড়িকে জরিমানা ও মেরামতকারীকে আর্থিক জরিমানাসহ সকল যন্ত্রপাতি বাজেয়াপ্তকরণের ব্যবস্থা নিতে হবে।

১০. **বিপণী বিতানের সামনে যানজট :** ঢাকা নগরীর প্রায় সকল বিপণী বিতান নির্মাণকালে গাড়ি, রিকশা, স্কুটার প্রভৃতি পার্কিংয়ের জন্য স্থান না রেখে নির্মাণ করা হয়েছে। ফলে ঐসব স্থানে দিনরাত্রি যানজট লেগেই আছে। ঐ সকল স্থানে পার্কিং সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধকরণসহ ট্রাফিক পুলিশ ব্যবস্থা জোরদার করার পাশাপাশি ট্রাফিক পুলিশকে সহায়তা করার জন্য বাধ্যতামূলকভাবে প্রতিটি বিপণী বিতান কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে নির্ধারিত জনবল সরবরাহের মাধ্যমে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে সহযোগিতা করার ব্যবস্থা গ্রহণ।

১১. **নগরীর সড়কের উপর বাজার ও এতদক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা :** নগরীর অত্যন্ত ব্যস্ততম সড়কের পাশে বা সড়কের কিয়দংশ জুড়ে নানা পণ্যের বাজার বসছে। মূলত সড়কের উপর এসব অবৈধ ব্যবসায়ীদের বাজার বসানোর কারণে যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে। এগুলো স্থায়ীভাবে বন্ধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ সড়ক, ফুটপাত ও ওভারব্রিজ হকারমুক্ত করতে হবে।

১২. **সড়কের পাশে দোকানপাটের মালামাল রাখা ও দোকানের সামনে ভ্যান ও ঠেলাগাড়ি পার্কিং ব্যবস্থা বন্ধকরণ :** নগরীর প্রধান প্রধান এলাকায় বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিক্রেতারা প্রায় প্রত্যেকেই অভ্যাসজনিত কারণে তাদের দোকানের পাশের ফুটপাত ও সড়কের কিয়দংশ জুড়ে মালামাল রেখে যুগ যুগ ধরে সড়ক দখলের প্রবণতার মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনা করে আসছে। ফলে নগরীর বহু উচ্চচাপের সড়কের যানজট স্থায়ীরূপ ধারণ করেছে এবং সর্বসাধারণের পায়ে হেঁটে চলাচল মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। এ বিষয়টি স্থায়ী সমাধানের জন্য প্রত্যেক দোকান বা প্রতিষ্ঠানের অভ্যাসের পরিবর্তন ঘটাতে হবে এবং সড়কের উপর থেকে ভ্যান ও ঠেলাগাড়ির স্ট্যান্ড উচ্ছেদের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৩. **নির্মাণসামগ্রী নগরীর সড়ক ও ফুটপাত থেকে অপসারণ :** নগরীর ছোট ছোট সড়কপথ ছাড়াও প্রধান প্রধান সড়কের পাশে বড় বড় বহুতল ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে এবং সকল ভবনেরই বিভিন্ন নির্মাণসামগ্রী অবহেলিতভাবে মাস থেকে বছর পর্যন্ত ফেলে রেখে ইচ্ছামতো সড়কে

প্রতিবন্ধকতার মাধ্যমে তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এ সকল ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মালিকের বিরুদ্ধে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ আর্থিক জরিমানার বিধানসহ মালামাল বাজেয়াপ্ত করার ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

১৪. **বর্ষাকালে নগরীর সড়কে বৃষ্টির জমাট পানির জরুরি নিষ্কাশন ও আধুনিক পদ্ধতিতে সড়ক উন্নয়ন প্রথা চালুকরণ :** বর্ষাকালে ঢাকা মহানগরীর বেশ কয়েকটি প্রধান সড়কে বৃষ্টির পানি জমে থাকে। বিগত সরকারগুলো এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছে, তারপরও সংকটের তেমন উন্নতি হয়নি। সম্ভবত পানি দ্রুত সরে না যাওয়ার কারণ হিসেবে ঐ সকল সড়কের পানি নিষ্কাশন মুখগুলো অপর্যাপ্ত এবং বিভিন্ন স্থানে স্লুইস গেটে পাম্প মেশিনের অপর্যাপ্ততা। এ সকল ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি। বর্তমানে উন্নত বিশ্বসহ বৃষ্টিবহুল দেশে অর্থনৈতিক সাশ্রয় ও দীর্ঘস্থায়িত্বের জন্য উন্নত রাবার জাতীয় সিনথেটিক কার্পেটিং ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। প্রয়োজনে আমাদের দেশে এ ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে।

১৫. **সড়কের উপর ডাস্টবিন নিয়ন্ত্রণ :** মহানগরীর অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্থানের প্রধান সড়কের প্রায় এক-চতুর্থাংশ স্থান জুড়ে আধুনিক স্থানান্তরযোগ্য ডাস্টবিনগুলো বহনকারী গাড়ি থেকে নামিয়ে রেখে যায়। ফলে প্রচুর ময়লা-আবর্জনা ডাস্টবিনের চতুর্দিকে অর্ধেক সড়ক পর্যন্ত পুঁতিগন্ধময় অবস্থা সৃষ্টি করে এবং যানজটের সৃষ্টি হয়। এটা সিটি কর্পোরেশনের কনজারভেন্সি বিভাগ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সমাধান সম্ভব।

১৬. **বর্ষায় সমন্বিতভাবে নগরীর সড়ক খোঁড়াখুঁড়ি বন্ধকরণ :** বর্ষা মৌসুম এলেই মহানগরীর বিভিন্ন সড়কে মহাসমারোহে চলে খোঁড়াখুঁড়ির উৎসব। এ সময়টাতে একের পর এক ওয়াসা, সিটি কর্পোরেশন, টিএন্ডটি, তিতাস গ্যাস, বিদ্যুৎ বিভাগসহ মোটামুটি সকল বিভাগই সমন্বয়বিহীনভাবে ঢাকা শহরের সড়কগুলোকে নাস্তানাবুদ করে তোলে। ফলে সর্বসাধারণের চলাচলের ভোগান্তিসহ যানবাহন চলাকালে মারাত্মক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। তাছাড়া মহানগরীর প্রধান প্রধান সড়কগুলোর যে কোনো মেরামত কাজ দিনের পরিবর্তে গভীর রাতে সম্পন্ন করার স্থায়ী ব্যবস্থা নেয়া জরুরি প্রয়োজন।

১৭. **সিটি কর্পোরেশনের অযান্ত্রিক যানবাহন নিয়ন্ত্রণ :** সিটি কর্পোরেশনের অনুমোদিত নম্বরের বাইরে হাজার হাজার নম্বরবিহীন ও বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদের রিকশাগুলো মহানগরীতে চলাচল করছে। পাশাপাশি চলছে অটোরিকশা, ভ্যান ও ঠেলাগাড়ি। অথচ মহানগরীর সমগ্র রিকশার ২০ ভাগের বেশি নম্বর ও ড্রাইভারের লাইসেন্স আছে কিনা সন্দেহ। এক্ষেত্রে অনুমোদিত রিকশার বাইরে সকল রিকশা চলাচল বন্ধ করা ও লাইসেন্সবিহীন ড্রাইভারকে রিকশা চালানো বন্ধ করা, পুলিশ প্রশাসনের সহায়তায় অবৈধ চলাচলকারী সকল রিকশা, ভ্যান, ঠেলাগাড়ি আটক ও সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণসহ মালিক ও ড্রাইভারের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।

১৮. **স্কুল-কলেজের সামনে যানজট নিরসনের ব্যবস্থাকরণ :** ঢাকা মহানগরীর সিংহভাগ স্কুল-কলেজ নগরীর গুরুত্বপূর্ণ সড়কের পার্শ্বে অবস্থিত। এ সকল স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস আরম্ভ হওয়া এবং ছুটির সময়ের প্রায় ২/১ ঘণ্টা পূর্ব থেকে রিকশা, স্কুলভ্যান, প্রাইভেট কার প্রভৃতি এলোপাতাড়িভাবে দণ্ডায়মান থেকে মারাত্মক যানজট সৃষ্টি করে। এ ব্যাপারে স্কুল ও কলেজ সময়ে ট্রাফিক পুলিশ নিয়োগের মাধ্যমে এর যথাযথ সমাধান সম্ভব।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

১৯. **পাড়া-মহল্লার প্রবেশ মুখ থেকে রিকশা ও স্কুটার স্ট্যান্ড উচ্ছেদ :** ঢাকা মহানগরীর এমন কোনো পাড়া-মহল্লা নেই, যেখানে প্রবেশ ও প্রস্থান মুখসহ অলিগলিতে স্কুটার ও রিকশা স্ট্যান্ড নেই। ফলে সর্বত্রই এ কারণে যানজট সৃষ্টি হচ্ছে। এ সকল স্ট্যান্ড করার প্রবণতা রোধকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

২০. **সভা-মিছিল :** দেশের সকল রাজনীতি, দাবি-দাওয়া, মিটিং-মিছিলের কেন্দ্রস্থল ঢাকা মহানগরী। ভোর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত ঢাকা মহানগরী কর্মচঞ্চল থাকে রাজনৈতিক, সামাজিকসহ বিভিন্ন কারণে। প্রায় প্রতিদিন মিটিং-মিছিল চলে। সড়কের উপর মিছিলের কারণে প্রতিদিনই সড়কপথে যানজট হচ্ছে। এক্ষেত্রে সকল রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনগুলোর সাথে আলোচনা করে সড়কের একপাশ দিয়ে মিছিল করার প্রচলন চালু করা প্রয়োজন।

উপসংহার : যুগ যুগের সৃষ্ট অনিয়ম ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের অভাবে ঢাকা মহানগরী ও নগরীর আশেপাশের শহরগুলো যানজটের চরম সংকটে নিপতিত। জাতীয় স্বার্থ তথা নগরবাসীর ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ও নগরীর জীবনযাত্রা সচল রাখার স্বার্থে যত কষ্টই হোক না কেন সীমিত সম্পদের মাঝেও নগরীর সড়কপথগুলোর সংস্কার জরুরি প্রয়োজন। বিষয়টি ধীরে ধীরে গুরুতর জটিল অবস্থার সৃষ্টি করছে, যা আগামী বছরগুলোতে ঢাকা মহানগর ও আশেপাশের শহরগুলোকে স্থবির করে দিতে পারে। এ নিয়ে এখনই ভাববার সময়। এক্ষেত্রে প্রয়োজন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি হস্তক্ষেপসহ সংশ্লিষ্ট সরকারি মহল ছাড়াও জনসাধারণের পক্ষ থেকে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সংশ্লিষ্ট কাজে সহায়তা।

২৭। বাংলাদেশে নগরায়ন সম্পর্কে আলোচনা করুন। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নগরায়নের গুরুত্ব ও নগরায়নের বিভিন্ন সমস্যার উপর আলোকপাত করুন।

উত্তর : নগরায়ন প্রক্রিয়া বর্তমান বিশ্বের প্রগতি ও উন্নয়নের অন্যতম মানদণ্ড হিসেবে চিহ্নিত। বড় বড় শহরগুলো সাধারণত আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থা, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, শিক্ষা ও প্রশাসনের গতিশীল প্রাণকেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। শুধু তাই নয়, নগর আধুনিক মননশীলতা, সংস্কৃতিচর্চা, উদ্ভাবন ও সচেতন জীবনমুখী দৃষ্টিভঙ্গি অনুশীলনের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু। এ কারণে বিশ্বব্যাপী নগরায়ন ঘটে চলেছে দ্রুত, গ্রামীণ জীবনযাত্রা ও অবকাঠামোর রূপান্তর ঘটছে প্রতিনিয়ত। অনেকে মনে করেন, মানব-সভ্যতার ইতিহাসে নানা আবিষ্কারের মধ্যে কৃষির পরেই নগরের স্থান। নগরের উৎপত্তি এবং প্রসারের ফলে মানুষ আদিম অবস্থা থেকে মুক্তি লাভ করেছে। জীবনকে সহজ এবং উপযোগী করে তোলার ব্যাপারে নগরের দান অপরিসীম।

নগরায়ন : নগরায়নের ইংরেজি প্রতিশব্দ Urbanization। এই Urban শব্দটির সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, 'The concentration of people in cities and towns.'

Beaujeau Garnier এবং Chabot নগরায়নের সংজ্ঞায় বলেন, 'Its a continuous and dense agglomeration of people and dwellings.'

নেলস এন্ডারসন নগরায়ন সম্পর্কে বলেন, 'নগরায়ন মানুষের চিন্তা, ব্যবহার ও মূল্যবোধের পরিবর্তন সাধন করে। এটি শুধু কোনো ব্যক্তি বা দলের পরিবর্তন নয়, বরং কাজের প্রতি মানুষের মনোবৃত্তির এবং শ্রমবিভাগের ক্রমাগত পরিবর্তন।' এ প্রসঙ্গে The Social Work Dictionary-র সংজ্ঞাটি প্রণিধানযোগ্য :

'A social trend in which people adopt the life styles, residential patterns and cultural values of those who live in or near cities.'

সার্বিকভাবে বলা যায়, ধারাবাহিক, দীর্ঘমেয়াদি এবং অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়ায় কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলে অধিক সংখ্যক জনগোষ্ঠীর স্থানান্তরের ফলে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের অর্থনীতি, সমাজব্যবস্থা এবং ভৌত কাঠামোর বিকাশ ঘটলে, তাকে নগরায়ন বলা হয়।

নগরায়নের নির্ধারকসমূহ : নগরায়ন প্রক্রিয়ার নির্ধারক হিসেবে যেসব উপাদান ভূমিকা পালন করে সেগুলোকে নগরায়নের নির্ধারক বলা হয়। নগরায়নের নির্ধারকসমূহ নগরায়নের সম্প্রসারণ, নগরের শ্রীবর্ধন, নগরের ভিত্তি, নগরের আকার, নগরীয় কৃষ্টি ও সভ্যতা গড়ে তুলতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে থাকে। নগরায়নের নির্ধারকসমূহকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে :

ক. জনমিতিক নির্ধারক,

খ. অর্থনৈতিক নির্ধারক,

গ. ভূমি, গৃহায়ন ও সেবামূলক নির্ধারক,

ঘ. স্বাস্থ্য নির্ধারক ইত্যাদি।

নগরায়নের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট : নগরায়নের ইতিহাস সুপ্রাচীন। শিল্পায়ন নগরায়নের গতিকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করলেও শিল্প বিপ্লবের আগেও অনেক প্রাচীন ও সমৃদ্ধ নগর সভ্যতার সন্ধান পাওয়া যায়। নগরায়নের দ্রুত গতি ও বিস্তৃতি সাম্প্রতিক হলেও এর উন্মেষ ঘটেছে বহু আগে। প্রাক-শিল্প নগর সভ্যতার অন্যতম উদাহরণ হলো মহেনজোদারো, সিন্ধু, মেসোপটেমিয়া, ট্রয়, এথেন্স, গ্রিস, মিশর ও জাপানের অগণিত শহর। এসব শহরের স্থাপত্য, গঠন, অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা, পরিবেশ ব্যবস্থাপনা আধুনিক শহরের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল। তবে মধ্যযুগে নগর সভ্যতা ছিল অবহেলিত, পরিত্যক্ত এবং মৃতপ্রায়। শিল্পবিপ্লব নগরায়নে প্রাণসঞ্চার করে এবং বিংশ শতাব্দীতে এসে তা পূর্ণতা লাভ করে। শিল্পায়ন নগরায়নের প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে। শিল্পবিপ্লব ও নগরায়নের প্রত্যক্ষ ফলাফল হচ্ছে উৎপাদন ব্যবস্থায় যান্ত্রিক প্রযুক্তির প্রয়োগ, ভারী বৃহৎ শিল্পের বিকাশ, যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, বহুমুখী বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন ইত্যাদি। উৎপাদন ব্যবস্থা ও অর্থনীতির এই পরিবর্তন প্রচলিত সমাজ কাঠামোকে আমূল পাল্টে দেয় এবং সম্পূর্ণ নতুন এক নাগরিক সভ্যতার জন্ম হয়।

বাংলাদেশে নগরায়ন : চীনের পরিব্রাজক হিউয়েন সাংয়ের বিবরণ মতে, প্রাচীন বঙ্গদেশে ৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দে চারটি রাজ্য ছিল। সেগুলো হলো পুণ্ড্রবর্ধন, সমতট, তাম্রলিপ্ত এবং কর্ণসুবর্ণ। তখন বঙ্গদেশের রাজা ছিলেন শশাঙ্ক। দেশটি গৌড় নামে পরিচিত ছিল। বল্লাল সেনের সময় বর্তমান বঙ্গদেশ রাঢ়, বরেন্দ্র, বাগড়ী ও বঙ্গ নামে পরিচিত ছিল। তবে হিন্দু যুগে সমগ্র বঙ্গদেশের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। নগরায়নের ক্রমধারা বিশ্লেষণের জন্য বিভিন্ন শাসন আমল হিসেবে বিশ্লেষণ তাই যুক্তিযুক্ত। সে হিসেবে নগরায়নের ধারাগুলো হলো :

১. প্রাচীনকালের নগরায়ন;

২. মধ্যযুগের নগরায়ন;

৩. ইংরেজ আমলের নগরায়ন;

৪. পাকিস্তান আমলের নগরায়ন;

৫. সাম্প্রতিককালের নগরায়ন প্রভৃতি।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

১৯৪১ সালে মাত্র ১.৫৪ মিলিয়ন লোক ছিল নগরবাসী। পঞ্চাশ বছরের ব্যবধানে ১৯৯১ সালে এ সংখ্যা প্রায় ২০ গুণ (২২.৪৫ মিলিয়ন) বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৫ সাল নাগাদ নগরায়নের বিকাশের হার কিছুটা মন্থর হলেও ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কারণে নগরবাসীর সংখ্যা ব্যাপক বৃদ্ধি পাবে। বাংলাদেশে নগরায়নের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে নগরগুলোতে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা কেন্দ্রমুখী ও ভারসাম্যহীন। বাংলাদেশে বর্তমানে নগরায়নের হার ২৩.৩০% (পঞ্চম আদমশুমারি রিপোর্ট ২০১১)। এর মধ্যে ঢাকাতেই বর্তমান লোকসংখ্যা প্রায় ১৫ মিলিয়ন, যা ২০২৫ সাল নাগাদ ২৫ মিলিয়নে রূপ নিতে পারে। এছাড়া নগরায়নের স্তর বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, দেশের সব অঞ্চলে নগরায়নের বৃদ্ধি বা বিকাশ সুষম বা একই মাত্রার নয়। ঢাকায় নগরায়নের হার সবচেয়ে বেশি। সবচেয়ে কম নগরায়নের হার লক্ষ্য করা গেছে টাঙ্গাইলে। বর্তমানে বাংলাদেশে শহুরে জনসংখ্যা ২৮.৯% (UNDP রিপোর্ট ২০১৪)। সার্বিকভাবে বলা যায়, বাংলাদেশে নগরায়নের বিকাশ ও সম্প্রসারণ প্রক্রিয়া অনেকাংশেই ভারসাম্যহীন এবং অসম।

নগরায়নের কারণ : বাংলাদেশে দ্রুত নগরায়নের কারণগুলো নিম্নরূপ :

১. জনসংখ্যার তুলনায় মৃত্যুহার কম হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই নগরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২. আর্থ-সামাজিক সংকটের কারণে বিশেষ করে জনসংখ্যার চাপ, আর্থিক সংকট তথা ক্রমবর্ধমান বেকারত্বের কারণে অনেকেই গ্রাম ছেড়ে নগরমুখী হচ্ছে। ফলে দিন দিন নগরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৩. গ্রাম এলাকায় নদীভাঙন।

৪. আধুনিক প্রযুক্তির উদ্ভাবন।

৫. ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি ইত্যাদি।

নগরায়নের নীতিমালা : বাংলাদেশে প্রচলিত নগরায়নের নীতিমালাগুলোকে কয়েকটি স্তরে ভাগ করা যায় : ক. জাতীয় গৃহায়ন নীতি, খ. ভূমি ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি।

ক. **জাতীয় গৃহায়ন নীতি :** দেশে আবাসন সমস্যা সমাধান করার লক্ষ্যে জাতীয় গৃহায়ন নীতির বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য প্রস্তাব ও কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে—

১. নগর এলাকায় বসবাসকারী সকল স্তরের মানুষের জন্য গৃহায়ন নীতি যাতে সহজলভ্য হয় সে লক্ষ্যে নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত, সামাজিকভাবে অবহেলিত, সহায়-সম্বলহীন মহিলা ও ব্যক্তি যাতে সহজে একটি গৃহের মালিক হতে পারে তার অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।

২. নিম্নবিত্ত ও বিত্তহীনরা গৃহনির্মাণের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক সুবিধা যাতে ভোগ করতে পারে সেজন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

৩. সহজভাবে জমি রেজিস্ট্রি করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৪. দেশব্যাপী সুষম নগরায়নের লক্ষ্যে বিকেন্দ্রীকরণ নীতির প্রস্তাব রাখা হয়েছে ইত্যাদি।

খ. **ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতি :** নগরীয় চাহিদা অনুযায়ী সড়কের জন্য ভূমি অধিকার, ভূমির মালিকানা স্বত্ব ও জমি হস্তান্তর সংক্রান্ত জটিলতা পরিহার করা, নগরীয় জমির অনিয়ন্ত্রিত তথ্যের অভাব পরিহার করা, নগরীয় খাসজমির সার্বিক হিসাব ও তার রাষ্ট্রীয় মালিকানা নিশ্চিত করা প্রভৃতি বিষয় ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতির আওতায় আনা হয়েছে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

জাতীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে নগরায়নের গুরুত্ব : বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নগরায়নের ভূমিকা অনস্বীকার্য। নগরায়নের ফলে দেশে নতুন নতুন শিল্প-কারখানা, স্থাপনা, ব্যবসা কেন্দ্র ইত্যাদি গড়ে ওঠায় নতুন নতুন কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা দেশের জাতীয় আয় বৃদ্ধি করতে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। নগরায়নের ফলে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পরিলক্ষিত হয় :

১. **যোগাযোগের ক্ষেত্রে নগরায়ন :** বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়নে নগরায়নের গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের রাস্তাঘাট, সেতু, রেললাইন প্রভৃতি উন্নয়নের সাথে নগর কেন্দ্রের উন্নয়নের সম্পর্ক বিদ্যমান।

২. **কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে :** বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান সমস্যা বেকারত্ব। এ সমস্যা সমাধানে নগরায়ন গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

৩. **অর্থনৈতিক কার্যক্রমে :** দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কার্যক্রমে নগরায়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৪. **অনানুষ্ঠানিক ক্ষেত্রে :** অনানুষ্ঠানিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশে নগরায়ন বেকারত্ব মোচন ও জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে ভূমিকা পালন করছে।

৫. **সামাজিক ক্ষেত্রে নগরায়ন :** নগরায়নের ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা, বিশুদ্ধ পানি, উন্নত পয়ঃব্যবস্থা ইত্যাদি সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হয়।

নগরায়নের নেতিবাচক দিক : নগরসমৃদ্ধ দেশসমূহের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ ও সামাজিক কাঠামো সাধারণত দৃঢ় ও স্থিতিশীল হয়। নগরায়ন উন্নয়নশীল দেশসমূহের অর্থনৈতিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। Hardoy এবং Satterhwaite বিগত দশকগুলোতে এশিয়া, লাতিন আমেরিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা ও উত্তর আমেরিকার দেশসমূহে নগরায়নের ফলাফল সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণে উল্লেখ করেন, এসব দেশের নগরায়নের হারের সাথে জিএনপি বা মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির একটি শক্তিশালী ইতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে। তবে নগরায়নের এই সুফলের পাশাপাশি নগরায়নজনিত আর্থ-সামাজিক এবং পরিবেশগত সমস্যার জটিলতা ও তীব্রতা বিশ্বজনীন রূপ লাভ করেছে। মূলত দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, দুর্বল প্রশাসনিক পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা, আর্থিক সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি কারণে অপরিকল্পিতভাবে নগরায়ন ঘটেছে, যা নানা রকম সমস্যার উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে। নগরায়নজনিত সমস্যার ধরন ও বৈশিষ্ট্য নিচে আলোচিত হলো :

আর্থ-সামাজিক সমস্যা

ক. **গৃহ ও বস্তি সমস্যা :** আয়তনের তুলনায় অতিরিক্ত জনসংখ্যা, ক্রমবর্ধমান স্থানান্তর প্রভৃতি কারণে শহরগুলোতে বাসস্থান সমস্যা প্রকট। দক্ষিণ আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নগরায়নের অন্যতম কুফল হচ্ছে শহরের নিম্নবিত্ত শ্রেণীর বস্তি নির্মাণ ও জবরদখল। এসব দেশে নগর বাসস্থানের ৪০-৫০ ভাগ হচ্ছে জবরদখলকৃত। বাংলাদেশের শহরাঞ্চলে বাসস্থান ব্যবস্থা করুণ। ঢাকায় প্রায় ৫০-৬০% লোক বস্তিতে বাস করে। ১৯৯৫ সালের তথ্যে দেখা যায়, সরকারি রাস্তা, রেলওয়ে সম্পত্তি, পরিত্যক্ত জমি বা অন্য প্রাতিষ্ঠানিক স্থানে জবরদখলকারী জনসংখ্যা ঢাকায় ১৮.৫% এবং সারা বাংলাদেশে প্রায় ৯.৩% ভাগ।

খ. **সামাজিক সেবা কর্মসূচির অপর্যাপ্ততা :** শহরের অবকাঠামোগত সেবা ও সুযোগ-সুবিধার অন্যতম উপাদান হচ্ছে পানীয় জল, স্যানিটেশন ব্যবস্থা, বর্জ্য নিষ্কাশন, পয়ঃপ্রণালী, বিদ্যুৎ, পরিবহন ব্যবস্থা ইত্যাদি। WHO-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী উন্নয়নশীল বিশ্বে কমপক্ষে ২২০ মিলিয়ন নগরবাসী পানীয় জলের সমস্যায় ভুগছে। দ্রুত নগরায়ন যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থাতেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। বর্ধিত জনসংখ্যা অনুযায়ী যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি না পাওয়ায় শহরগুলোতে যানজট, পরিবহন ব্যয় ও সড়ক দুর্ঘটনার ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। অনুন্নত দেশে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর হার উন্নত বিশ্বের তুলনায় ১৮ গুণ বেশি। এর অন্যতম কারণ যানবাহন স্বল্পতা।

গ. **সামাজিক সমস্যা :** নগরায়নের ফলে সুবিধাভোগী বিত্তশালী শ্রেণী এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যস্থ অর্থনৈতিক ব্যবধান ও সামাজিক বৈষম্য আরো বৃদ্ধি পায়। মাথাপিছু আয়, জন্মহার, শিশুমৃত্যু হার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি মানদণ্ডে গ্রামের সাথে শহরের দূরত্ব বৃদ্ধি পায়। উন্নয়নের একমুখীকরণের ফলে কেবল গ্রামীণ অর্থনীতিই উপেক্ষিত হয় না, খোদ নগরেই দারিদ্র্য, সামাজিক বঞ্চনা, শ্রেণীবৈষম্য, সম্পদের অসম বণ্টন প্রভৃতি আর্থ-সামাজিক সমস্যার জন্ম হয়। এ প্রসঙ্গে সমাজবিদ Hoselitz (১৯৫৭) বলেন, 'Hyper urbanization has created a large marginalized class with minimal economic, social and political links to the favoured social minority.'

নগরীয় সন্ত্রাস ও অপরাধ : বাংলাদেশে নগরীয় অপরাধ ক্রমে বেড়ে চলেছে। আমাদের দেশের নগরগুলোতে সংঘটিত অপরাধের মধ্যে রাজনৈতিক অপরাধ, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, হত্যা, ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপ, অপহরণ, চাঁদাবাজি, চোরাচালান, যৌনব্যবসা, গাড়ি ভাঙচুর ইত্যাদি আশঙ্কাজনক মাত্রায় ঘটতে দেখা যায়। এ সন্ত্রাস ও অপরাধের নানা কারণ বিদ্যমান। মূলত নগর দারিদ্র্য, বস্তি ও জবরদখলকৃত এলাকার শিশুর সুষ্ঠু মনোদৈহিক বিকাশে ব্যাঘাত, আইনশৃঙ্খলার অবনতি, সামাজিক বৈষম্য প্রভৃতি অপরাধের উৎস হিসেবে কাজ করে।

পরিবেশ দূষণজনিত সমস্যা : সারা বিশ্বে নগর বৃদ্ধির সাথে সাথে পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা ও অবক্ষয় ঘটছে। অত্যধিক জনসংখ্যা, ভূমির অপরিকল্পিত ও যথেচ্ছ ব্যবহার, শিল্পোৎপাদন, বন উজাড় করে কৃষি উৎপাদন ও বাসস্থান নির্মাণ প্রভৃতি কারণে মাটি, পানি, বায়ু, শব্দদূষণসহ নানা পরিবেশগত সমস্যা জটিল আকার নিয়েছে। গ্রিন হাউস প্রভাব ও ওজোন স্তরের ক্ষয়কে নগরায়নজনিত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও জীবনযাত্রার পরোক্ষ ফলাফল হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। নগর জীবনযাত্রার আরেকটি ক্ষতিকর দিক শব্দদূষণ। যুক্তরাষ্ট্রের Environmental Protection Agency (EPA) সাধারণভাবে ৭০ ডেসিবল শব্দমাত্রা ২৪ ঘণ্টার ভিত্তিতে কোনো ব্যক্তির জন্য নিরাপদ বলে ঘোষণা করেছে। এ মাত্রার অতিরিক্ত শব্দকে শব্দসন্ত্রাস বলে তারা আখ্যায়িত করেছেন।

নগরায়নের সংকট মোকাবিলা : বাংলাদেশে নগরায়নের দ্রুত বৃদ্ধি সাম্প্রতিক হলেও ইতিমধ্যেই এ সমস্যা তীব্রতা লাভ করেছে, যা সামগ্রিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য প্রতিকার ও প্রতিরোধমূলক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে :

ক. **গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তর হ্রাসকরণ :** গ্রামোন্নয়নের কর্মসূচির মাধ্যমে জনগোষ্ঠীর ব্যাপকহারে শহরে স্থানান্তর প্রক্রিয়াকে নিরুৎসাহিত করতে হবে। এজন্য কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান ও আকর্ষণীয় মজুরি, সুযোগ, শিক্ষা বিস্তার, পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন ইত্যাদি প্রয়োজন।

খ. **ছোট বা মাঝারি শহরের উন্নয়ন :** কেন্দ্রীয় শহরগুলোর ওপর ক্রমবর্ধমান চাপ কমাতে এর কোনো বিকল্প নেই। বড় শহরের তুলনায় ছোট বা মাঝারি শহরগুলোতে দূষণ কম। অবকাঠামোগত ব্যয় কম বলে বিশ্বব্যাপী বিকেন্দ্রীকরণ কৌশলের মাধ্যমে এসব শহরের বিস্তারকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য, অর্থনৈতিক উৎপাদন বিশিষ্টতা এবং সামাজিক প্রবণতার ওপর ভিত্তি করে ছোট ও মাঝারি শহরগুলোর উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ ঘটলে তা ভারসাম্যহীন নগরায়নজনিত সমস্যার প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করবে।

গ. **নগর উন্নয়ন :** নগরায়নজনিত সমস্যার মূলে রয়েছে সীমিত সুযোগ-সুবিধা ও প্রাতিষ্ঠানিক অব্যবস্থাপনা, বর্ধিত জনসংখ্যার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ ভৌত অবকাঠামো, সামাজিক সেবা ও নিরাপত্তা কর্মসূচি। ফলে পরিকল্পিত, গঠনমূলক এবং উন্নত শিল্প ও অবকাঠামোভিত্তিক নগরায়ন ব্যাহত হচ্ছে, যা পরবর্তীকালে নানারকম সমস্যার জন্ম দিয়েছে।

উপসংহার : কৃষিনির্ভর বাংলাদেশে নগরায়ন সবার কাম্য। কেননা নগরায়ন ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা ও প্রশাসনের গতিশীল প্রাণকেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত। কিন্তু নগরায়নজনিত সমস্যার যথাযথ ও সুষ্ঠু প্রতিকার অত্যাবশ্যক। বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক দশ বছর মেয়াদি (১৯৯৫-২০০৫) National Environment Management Action Plan (NEMAP) প্রণীত হয়েছে, যার আওতায় নগরায়ন ও গৃহায়নসহ সকল উন্নয়ন ক্ষেত্রে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধির তাগিদ রয়েছে। বর্তমান বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় পরিকল্পিত ও আধুনিক নগরায়নের কোনো বিকল্প নেই এবং সে লক্ষ্যে বাংলাদেশে নগরকেন্দ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনাকে আরো গতিশীল ও জোরদার করে তুলতে হবে।

২৮। 'ঢাকা শহরকে প্রকৃতির সাথে সঙ্গতি রেখে পরিচ্ছন্ন, বাসযোগ্য ও আধুনিক ঢাকায় রূপান্তরের রূপরেখা ডিটেইলড এরিয়া প্ল্যান (ড্যাপ)'—এ প্রসঙ্গে ড্যাপের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আলোচনা করুন।

উত্তর : ইউনিসেফের ২০১৪ সালের তথ্যানুসারে বিশ্বে মোট মেগাসিটি আছে ২৮টি। এর মধ্যে ঢাকার অবস্থান নবম। অপরিকল্পিত নগরায়নের ফলে সৃষ্ট জলাবদ্ধতা, যানজট, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ এবং ভয়াবহ পরিবেশ দূষণের কারণে আজ প্রায় বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়েছে রাজধানী ঢাকা। অপরিকল্পিত এ মহানগরী যেন এক মৃত্যুকূপ। সাম্প্রতিক সময়ে পুরনো ঢাকার নিমতলীর স্মরণকালের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে এবং সাভারে বহুতল ভবন ভূপাতিত হওয়ায় ব্যাপক প্রাণহানিসহ নানাবিধ দুর্ঘটনা ঢাকাকে আবারো নিয়ে এসেছে অপরিকল্পিত মহানগরীর এক মৃত্যুকূপের পাদপ্রদীপে।

ডিটেইলড এরিয়া প্ল্যান (ড্যাপ) : ড্যাপ হচ্ছে ঢাকার সার্বিক উন্নয়নের জন্য টাউন ইমপ্রুভমেন্ট অ্যাক্ট ১৯৫৩ (ইবি অ্যাক্ট ১৩-১৯৯৩)-এর সেকশন ৭৩-এর আওতায় রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) এখতিয়ারভুক্ত ৫৯০ বর্গমাইল বা ১৫২৮ বর্গকিলোমিটার ব্যাপী ঢাকার বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা। ড্যাপের আওতাভুক্ত সীমানা হচ্ছে : উত্তরে গাজীপুর পৌরসভার উত্তর প্রান্ত ও দক্ষিণে ধলেশ্বরী নদী; পশ্চিমে বংশী নদী ও ধলেশ্বরী নদী এবং পূর্বে শীতলক্ষ্যা নদী, মেঘনা নদী ও সোনারগাঁ থানার অংশবিশেষ। ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এলাকাসহ নারায়ণগঞ্জ, কদমরসুল, সিদ্ধিরগঞ্জ, তারাবো, সাভার, টঙ্গী ও গাজীপুর পৌরসভা, সাভার ইপিজেড, কেরানীগঞ্জ, জিঞ্জিরা এবং রূপগঞ্জ ও কালীগঞ্জ থানার অংশবিশেষ। ঢাকা মহানগরীর পরিকল্পিত নগরায়নের নিমিত্তে ড্যাপ প্ল্যানে সমগ্র রাজউক এলাকাকে ১৭টি ভূমি ব্যবহার জোনে ভাগ করা হয়েছে।

ড্যাপের উদ্দেশ্যসমূহ : ক. ঢাকা স্ট্রাকচার প্ল্যান (১৯৯৫-২০১৫) এবং আরবান এরিয়া প্ল্যান (১৯৯৫-২০০৯)-এর দিক নির্দেশনা মোতাবেক ঢাকা মহানগরীর পরিকল্পিত উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ; খ. মৌজা ম্যাপে ভূমি ব্যবহার সুনির্দিষ্টকরণ; গ. প্রাকৃতিক জলাশয়, পার্ক ও উন্মুক্ত স্থানসমূহ সংরক্ষণ; ঘ. যোগাযোগ ব্যবস্থা, পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থাসহ Multi-Sectoral Investment Programme (MSIP)-এর বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান; ঙ. প্রণীত ড্যাপ বাস্তবায়নে আইন, বিধি ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা নির্ধারণে সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদান।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

ড্যাপের আওতায় আসনসমূহ : রাজধানী ঢাকার বিশদ উন্নয়ন পরিকল্পনার আওতাধীন নির্বাচনী আসনগুলো হচ্ছে— ঢাকা-১ আসন ছাড়া ১৯টি, গাজীপুর-১, গাজীপুর-২, গাজীপুর-৩, গাজীপুর-৫, নারায়ণগঞ্জ-১, নারায়ণগঞ্জ-২, নারায়ণগঞ্জ-৪, নারায়ণগঞ্জ-৫, মুন্সীগঞ্জ-১ ও মুন্সীগঞ্জ-২।

ড্যাপের পটভূমি : রাজউকের আওতাভুক্ত ৫৯০ বর্গমাইল (১৫২৮ বর্গ কিলোমিটার) এলাকার জন্য ঢাকা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানের (ডিএমডিপি) আওতায় ঢাকা স্ট্রাকচার প্ল্যান (১৯৯৫-২০১৫) এবং আরবান এরিয়া প্ল্যান (১৯৯৫-২০০৯) প্রণয়নের কাজ ১৯৯৫ সালে সম্পন্ন করা হয়। ঐ প্ল্যান ১৯৯৭ সালে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ঐ পরিকল্পনার আওতায় ২০০৪ সালের আগস্টে সমগ্র ডিএমডিপি এলাকাবাসীর জন্য ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান (DAP) প্রণয়নের কাজ শুরু হয়। ২০০৭ সালে চারটি প্রতিষ্ঠান ২০ খণ্ডে ড্যাপ দাখিল করে। এরপর ২০০৮ সালে একটি খসড়া ড্যাপ তৈরি করা হয়। অবশেষে ২২ জুন ২০১০ ড্যাপের গেজেট প্রকাশ করা হয়।

ঢাকার সংকট ও সমাধান সরণি— ড্যাপ : জলাবদ্ধতা, আবাসন সংকট, যানজট, ভঙ্গুর অবকাঠামো, অপরিকল্পিত ও যথেচ্ছ শিল্প স্থাপনা থেকে সৃষ্ট ভয়াবহ পরিবেশ দূষণসহ নানাবিধ সংকটের সম্মুখীন মহানগরী ঢাকা। এমনই এ ঢাকাকে প্রকৃতির সাথে সঙ্গতি রেখে পরিচ্ছন্ন, বাসযোগ্য ও আধুনিক ঢাকায় রূপান্তরে সমাধান সরণি হয়ে এসেছে বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা বা ড্যাপ। ড্যাপের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনায় ঢাকা বাঁচানোর রূপরেখাটি স্পষ্টতই প্রতিভাত হয়। কেননা ড্যাপে রাজধানীর আবাসিক এলাকা, শিল্প এলাকা, বাণিজ্যিক এলাকা, রাস্তা-ঘাট, কৃষি এলাকা, বন্যা প্রবাহ এলাকা, উন্মুক্ত স্থান, খেলার মাঠ, পার্ক, প্রাকৃতিক জলাধার, ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলো ঢাকাবাসীর উন্নত জীবনমানের নিশ্চয়তা বিধানসহ পরিকল্পিত ঢাকা নিশ্চিত করবে।

আবাসন জনগণের মৌলিক চাহিদার অন্যতম। ড্যাপ বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত ৫৯০ বর্গমাইল (১৫২৮ বর্গকিলোমিটার) এলাকার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভূমি ব্যবহারের মধ্যে শহুরে আবাসিক, মিশ্র ও গ্রামীণ বসতি জোন, ড্যাপ এলাকার ৩৩.৩৫ ভাগ এলাকা চিহ্নিত করা হয়েছে, যা এলাকায় মোট ১ কোটি ৮৪ লাখ ৩০ হাজার লোকের আবাসনের সঙ্কুলান করবে। কৃষিনির্ভর অর্থনীতির আমাদের এ দেশে প্রায় ৮০ শতাংশের জীবিকা নির্বাহের প্রধান মাধ্যম কৃষি। তাই কৃষিভূমি রক্ষা করা গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। আর কোনো শহরের সব এলাকা নগরায়িত হয়ে যাওয়া মানেই কৃষিভূমি নির্মূল হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। এ কারণে ড্যাপে ঢাকা শহরের পার্শ্ববর্তী যে সকল এলাকা কৃষিজমি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে সেগুলো যথাযথ সংরক্ষণের বিষয়টি লক্ষ্য রেখে ২৭.২৭ ভাগ এলাকা কৃষিভূমি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ঢাকা মহানগরীর অপরিকল্পিত নগরায়নের জ্বলন্ত উদাহরণ মহানগরের যত্রতত্র বিভিন্ন মাত্রায় দূষণ উৎপাদনকারী শিল্প-কারখানাগুলো। এসবের বিষাক্ত বর্জ্য, কেমিক্যাল অযাচিতভাবে নদীনালা খাল-বিল এমনকি কৃষিজমিতেও পড়ছে। ফলে সামগ্রিক পরিবেশ যেমন মারাত্মক দূষণের শিকার তেমনি হুমকির সম্মুখীন দেশের জীববৈচিত্র্যও। পরিবেশ দূষণের ক্ষতিকর এ প্রভাব থেকে রেহাই পাচ্ছে না দেশের কৃষিক্ষেত্র। ফলে খাদ্য উৎপাদন কমে গিয়ে তৈরি হচ্ছে খাদ্য ঝুঁকির। দূষণের ফলে সৃষ্ট সামগ্রিক এ কুপ্রভাব থেকে পরিত্রাণের লক্ষ্যে ড্যাপে সাধারণ ও ভারি শিল্প কারখানাসমূহের জন্য আলাদা আলাদা অঞ্চলের কথা বলা হয়েছে, যা ঢাকার দূষণমুক্ত পরিবেশকে সুনিশ্চিত করবে। ভূমি ব্যবহার এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা একে অন্যের পরিপূরক। তথাপি উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা পরিকল্পিত নগরায়নের অপরিহার্য উপাদান। তাই ড্যাপে ভবিষ্যতের কথা লক্ষ্য রেখে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থায় নতুন নতুন রাস্তার প্রস্তাব করা হয়েছে। সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা কার্যকর করার জন্য রাস্তার

গতি বজায় রেখে সড়কসমূহ জাতীয় সড়ক, আঞ্চলিক সড়ক, সংযোগ সড়ক হিসেবে চিহ্নিত করে নির্মাণ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়া সরকার প্রণীত স্ট্র্যাটেজিক ট্রান্সপোর্ট প্ল্যানের প্রস্তাবনাসমূহ ড্যাপে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ প্ল্যানে নদীপথ ব্যবহারের বাধা দূর করে ঢাকার চতুষ্পার্শ্বে কার্যকর ব্যয়সাশ্রয়ী ও দ্রুতগতির নৌযান চলাচলের প্রস্তাব করা হয়েছে। ঢাকাকে বাসযোগ্য ও পরিকল্পিত নগরী প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এমনই সব রূপরেখায় সাজানো সরকারের বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা বা ড্যাপ।

ঐতিহ্যের ঢাকায় উন্মত্ত নগরায়ন ও সময়োপযোগী ড্যাপ : প্রায় চারশ' বছরের ইতিহাস আর ঐতিহ্যের সাক্ষী মহানগরী ঢাকা। ১৬১০ সালে রাজধানীরূপে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পর থেকে ঢাকায় বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ শুরু হয়। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত ঢাকার অবকাঠামোর প্রভূত উন্নতি শুরু হয়। কিন্তু উন্নয়নের এ পথধারায় ক্রমেই উন্মত্ত নগরায়নের করালগ্রাসে আচ্ছাদিত হয়েছে প্রাণের মহানগরী ঢাকা। অপরিকল্পিত নগরায়নে ঢাকার অস্বাভাবিক পরিবর্তন উন্মুক্ত করেছে হাজারো সমস্যার দুয়ার। ফলশ্রুতিতে ভূমিকম্পের অশনি সংকেত, দালানধস আর অগ্নিকাণ্ডের ভয়াবহতার মধ্যে রাজ্যের আতংক নিয়েই বাস করছে ঢাকার মানুষ। সবুজের সমারোহ হটিয়ে একের পর এক বহুতল ভবন নির্মাণ, ঢাকার চারপাশে বেষ্টিত নদী দখল, দূষণ আর জলাশয় ভরাট করে শিল্পের নামে, আবাসনের নামে অসংখ্য অবকাঠামো নির্মাণ করার ফলে প্রকৃতির সাথে রূঢ় সম্পর্কের সৃষ্টি হয়েছে ঢাকার। প্রকৃতির ওপর যান্ত্রিকতার এ আস্ফালনের ফলও সাম্প্রতিক সময়ে আছড়ে পড়েছে ঢাকার ওপর। প্রকৃতির সাথে সম্পর্ক হারিয়ে মহানগরবাসীরা অনিশ্চিত জীবনের মুখোমুখি। এমনই এক ক্রান্তিলগ্নে ঢাকাকে বাসযোগ্য করার ও বাঁচানোর লক্ষ্যে প্রণীত হয়েছে সময়োপযোগী ডিটেইলড এরিয়া প্ল্যান (ড্যাপ)। ঢাকার সার্বিক উন্নয়নপ্রয়াসী এ বিশদ পরিকল্পনাটি একুশ শতকের সোনার বাংলা গড়ার একটি মাইলফলক। যুগান্তকারী সব পরিকল্পনার সমন্বয়ে প্রণীত এ ড্যাপ প্রকৃতির ওপর যান্ত্রিকতাকে নির্মূল করে মহানগরবাসীর জীবন ও চারশ' বছরের ঐতিহ্যের ঢাকাকে বাঁচিয়ে রাখবে– এমনই প্রত্যাশা সবার।

উপসংহার : মহানগরী ঢাকাকে বাঁচাতে ও বাসযোগ্য করতে সরকারের ড্যাপ বাস্তবায়নের কার্যকর উদ্যোগ সফল করার দায়িত্ব প্রতিটি নাগরিকের। জাতীয় এ ইস্যুটির সাথে রাজধানীর বিশাল অংশের মানুষের জীবন ও জীবিকা জড়িত বিধায় এটি জনবান্ধব হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা ড্যাপের জনকল্যাণী হওয়ার ওপরই এর সফল বাস্তবায়ন তথা দৃশ্যায়ন নির্ভরশীল। ফলশ্রুতিতে আমরা পাব দূষণমুক্ত, পরিচ্ছন্ন ও পরিকল্পিত এক মহানগর, যেখানে প্রকৃতির ওপরে যান্ত্রিকতা থাকবে না। নদী আর জলাশয়ের মৃত্যু থাকবে না। কেননা তা তো সভ্যতারই মৃত্যু। থাকবে না নদী দখল, দূষণ আর জলাশয় ভরাট করে শিল্পের নামে, আবাসনের নামে লাখো মানুষের জীবন আর চারশ' বছরের ঐতিহ্য বিপন্ন করার লোলুপ বাণিজ্য। পরিশেষে ঐতিহ্য আর সবুজের সমন্বয়ে ঢাকা ফিরে পাক তার হারানো গর্ব—এ প্রত্যাশা আমাদের সবার।

২৯ । পল্লী উন্নয়ন ধারণার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ আলোচনা পূর্বক বাংলাদেশের পল্লী উন্নয়ন কৌশলসমূহ আলোচনা করুন।

উত্তর : বাংলাদেশ একটি গ্রামীণ প্রকৃতির অর্থনীতিনির্ভর দেশ। এদেশের প্রায় ৭৬.৬১% মানুষ গ্রামে বাস করে, জাতীয় উৎপাদনের প্রায় ১৬.৩৩% (অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৪ অনুসারে) আসে কৃষি খাত থেকে এবং মোট কর্মসংস্থানের শতকরা প্রায় ৮০% বহন করে গ্রামীণ খাত। সুতরাং বাংলাদেশের উন্নয়ন কৌশল বলতে যদি আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের উন্নতির কথা বুঝে থাকি তাহলে নিঃসন্দেহে সেটা হবে পল্লী উন্নয়ন কৌশল। বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়ন প্রচেষ্টার মূল কেন্দ্রবিন্দুই থাকে গ্রামে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

দেশের উন্নয়ন চিন্তাবিদগণ ও নীতিনির্ধারকগণ মনে করেন যে, কৃষি খাতসহ অকৃষি খাতে ক্ষুদ্র গ্রামীণ শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমেই দেশের গ্রামীণ দরিদ্রের দরিদ্রতার হাত থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব।

পল্লী উন্নয়ন ধারণার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ : পল্লী উন্নয়নের প্রসঙ্গটি আজ নতুন নয়। পল্লী উন্নয়নের ধারণাটি প্রথমে আলোচনায় আসে পঞ্চাশের দশকে। এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার উন্নয়নশীল দেশসমূহে পল্লী উন্নয়ন ধারণাটি প্রাথমিকভাবে পরিচিতি লাভ করে। বর্তমানে উন্নয়নশীল দেশসমূহে এ ধারণাটি এমন একটি দর্শনের সৃষ্টি করেছে যে— এসব দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে পল্লী উন্নয়ন অপরিহার্য। জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নীতি হিসেবে পল্লী উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে বিবেচনা করা হচ্ছে পৃথিবীর প্রায় সব উন্নয়নশীল দেশেই।

বাংলাদেশের পল্লী উন্নয়ন দীর্ঘ ইতিহাস বহন করে বর্তমান অবস্থায় এসে পৌছেছে। বাংলাদেশের পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে— নানা নামে, আকারে ও প্রকৃতিতে। এ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন–

ক. **ব্রিটিশ আমল :** লর্ড কর্নওয়ালিশের ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে গৃহীত 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' আইনের দ্বারা ভূমির ব্যবস্থাপনা ও মালিকানার দায়িত্ব জমিদারদের নিকট হস্তান্তর করে জমিদারদের শোষণ ও রায়তদের অধিকার সংরক্ষণ করে। এ ব্যবস্থার ব্যর্থতার পর রায়তদের ন্যায়ভিত্তিক কর প্রদান নিশ্চিতকরণে ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে 'Rent Act-1859' পাস হয়। এছাড়াও রয়েছে ১৮৮০ সালের কৃষি ডিপার্টমেন্ট, ১৯১৯ সালের ইউনিয়ন বোর্ড ও জেলাবোর্ড, ১৯২৮ সালে ৩৫ রায়তকে ভূমির ওপর অধিকার প্রদান, ১৯৩৬ সালে পল্লী পুনর্গঠন ডিপার্টমেন্ট গঠন প্রভৃতি।

খ. **পাকিস্তান আমল :** এ সময়ে পল্লী উন্নয়নে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। যেমন— ১৯৫০ সালে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ, ১৯৫৩ সালে V-AIDP কর্মসূচি (Village Agricultural and Industrial Development Programme), ১৯৬১ সালে RWP (Rural Works Programme), ১৯৬৩ সালে IRDP (Integrated Rural Development Programme), ১৯৬৯ সালে BARD (Bangladesh Academy for Rural Development)-এর IRDP প্রকল্প, ১৯৭০ সালে ECNEC (Executive Committee of the National Economic Council) প্রভৃতি।

গ. **বাংলাদেশ আমল :** ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ IRDP-কে জাতীয় কর্মসূচি হিসেবে গ্রহণ করে, ১৯৮২ সালে IRDP-কে BRDB (Bangladesh Rural Development Board)-এ রূপান্তর করে। এছাড়া স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের পল্লী উন্নয়নে বেসরকারি সংস্থার অনুপ্রবেশ পল্লী উন্নয়নে এক নতুন মাত্রা যোগ করে। যেসব বেসরকারি সংস্থা পল্লী উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– গ্রামীণ ব্যাংক, ব্র্যাক, আশা, প্রশিকা প্রভৃতি।

পল্লী উন্নয়ন কি?

উপর্যুক্ত প্রক্রিয়ায় পল্লীবাসীর উন্নয়নের নামই পল্লী উন্নয়ন। অর্থাৎ পল্লী উন্নয়ন হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া, যা সুপরিকল্পিতভাবে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে পল্লী এলাকার সকল শ্রেণীর মানুষের চাহিদা মিটিয়ে দেশের উন্নয়নকে নিশ্চিত করা।

মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান বলেন, 'পল্লী উন্নয়ন বলতে পল্লী এলাকায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি তথা এক কথায় পল্লী এলাকার সার্বিক উন্নয়নকে বোঝায়।'

[সামাজিক ইতিহাস ও উন্নয়ন ভাবনা]

মুহম্মদ আবদুল হামিদ-এর ভাষায়, 'পল্লী উন্নয়ন হলো মানুষ চালিত প্রক্রিয়া, যা পল্লীর সর্বস্তরের জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণের নিশ্চয়তা প্রদান করে দেশের সার্বিক উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে।'

মো. আবদুল কুদ্দুস-এর মতে, 'পল্লী উন্নয়ন বলতে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে সমগ্র দেশের পল্লী জনগণের প্রাতিষ্ঠানিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং প্রযুক্তিগত পরিবর্তনকে বোঝায়।'

অর্থনীতিবিদ Gotsch এবং Falcon পল্লী উন্নয়নের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, 'পল্লী উন্নয়ন বলতে বোঝায় আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়ায় পল্লী জনগোষ্ঠীর ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করাকে।'

কাজেই পল্লী উন্নয়ন হলো পল্লীর জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকল্পে পল্লীর সম্পদের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন করা, যা দেশের সার্বিক উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করবে।

বাংলাদেশের পল্লী উন্নয়নের কৌশলসমূহ : পল্লী উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশে এ পর্যন্ত নানাবিধ কৌশলের অবতারণা করা হয়েছে। এসব কৌশলকে দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা : ক. সরকারি কৌশল ও খ. বেসরকারি কৌশল।

সরকারি কৌশলের মধ্যে রয়েছে BRDB, ড. আখতার হামিদ খানের কুমিল্লা মডেল যা BARD নামে পরিচিত। ড. মুহম্মদ ইউনূসের গ্রামীণ ব্যাংক, মাহাবুবুল আলম চাষীর স্বনির্ভর আন্দোলন, সরকারি অর্থায়নে PKSF প্রকল্প প্রভৃতি। তাছাড়া ব্র্যাক, প্রশিকা, আশাসহ প্রায় সাড়ে চার হাজার বেসরকারি প্রতিষ্ঠান জাতীয় ও আঞ্চলিক ভিত্তিতে পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। নিচে ধারাবাহিকভাবে বাংলাদেশের পল্লী উন্নয়নের কৌশলসমূহ উপস্থাপন করা হলো :

১. **দারিদ্র্য বিমোচন :** দারিদ্র্য বাংলাদেশের পল্লীর প্রধান সমস্যা। বাংলাদেশের ৩১.৫% লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। এর মধ্যে গ্রামের লোক/জনগোষ্ঠীই বেশি দারিদ্র্যের শিকার। সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহ বিভিন্নভাবে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে সাময়িক প্রশিক্ষণ দিয়ে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ সুবিধা প্রদান করে চলেছে। এ প্রকল্পের আওতায় স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের গ্রামীণ দরিদ্রের সংখ্যা কিছুটা হ্রাস পেয়েছে।

২. **কৃষি উন্নয়ন :** বাংলাদেশ একটি কৃষিভিত্তিক উন্নয়নশীল দেশ। এ দেশের অর্থনীতি মূলত কৃষিনির্ভর। দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮০ ভাগ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষিপ্রধান হলেও অন্যান্য উন্নত দেশের তুলনায় এ দেশের চাষাবাদে এখন প্রাচীন লাঙল, জোয়াল, মই, বলদ ব্যবহৃত হচ্ছে। অজ্ঞতার কারণে জমির গুণাগুণ বিচার না করে সার ব্যবহার করে জমির উর্বরতা শক্তি বিনষ্ট করছে। এসব সমস্যা উত্তরণে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা স্বল্পসুদে কৃষকদের ঋণ প্রদান করে জমিতে উন্নত বীজ, সার, চাষাবাদে ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার প্রভৃতি সরবরাহে সাহায্য করছে।

৩. **স্বাস্থ্য সেবা :** স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। এ ধারণাকে উপলব্ধি করে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা সুস্বাস্থ্যের জন্য টিকাদান কর্মসূচি, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাসে পরিবার-পরিকল্পনা কার্যক্রমকে উৎসাহিতকরণ, বিশুদ্ধ পানীয়জল সরবরাহে টিউবওয়েল স্থাপন, ট্যাবলেট, পানি ফুটিয়ে খাওয়ার জন্য সচেতনতা সৃষ্টি, গ্রামে স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র স্থাপন, সবুজ ছাতা প্রকল্প, মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা ক্লিনিক স্থাপন, গ্রামীণ জনগণের গৃহায়ন সমস্যা সমাধানে স্থানীয় সম্পদের ব্যবহারের মাধ্যমে প্রদর্শনীমূলক বাসগৃহ নির্মাণের ব্যবস্থা, পশুপালনের জন্য উন্নতমানের পশু সংগ্রহ করা,

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

পারিবারিক চাহিদাপূরণে হাঁস-মুরগি পালনের ব্যবস্থাসহ প্রভৃতি কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছে। পুষ্টি চাহিদাপূরণে এবং আমিষের যোগানেও বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। মৎস্য চাষে উদ্বুদ্ধকরণে সাময়িক প্রশিক্ষণ দান করে স্বল্পমেয়াদি ঋণ সুবিধা অব্যাহত রেখেছে।

৪. **নারী শিক্ষা ও গার্হস্থ্য উন্নয়ন :** বাংলাদেশের অধিকাংশ নারী অশিক্ষিত ও অজ্ঞ হওয়ার কারণে এবং সমাজে বিদ্যমান পর্দা প্রথাসহ নানাবিধ জটিলতার ফলে নারীরা চার দেয়ালের মাঝে বন্দি হয়ে রয়েছে। উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণ খুবই কম। পারিবারিক সিদ্ধান্তগ্রহণে তাদের অংশীদারিত্ব নেই বললেই চলে। অর্থনৈতিকভাবে পরমুখাপেক্ষী। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য শিক্ষার ওপর জোর দিয়েছে। বাংলাদেশের অধিকাংশ বেসরকারি সংস্থার সদস্যের প্রায় ৯৫ ভাগই নারী। বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ নারী সমাজকে ঋণ প্রদানসহ শিক্ষায় উৎসাহিতকরণে, পরিবারে অবদান রাখতে, অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য অব্যাহত রেখেছে।

৫. **যুব কল্যাণ কর্মসূচি :** গ্রামীণ জনগোষ্ঠী অধিকাংশই দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে এসব জনগোষ্ঠী শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। এরূপ যুবক জনগোষ্ঠীকে সহায়তাদানে বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানে 'কর্মসংস্থান ব্যাংক' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি প্রকল্প চালু করা হয়েছে। গ্রামীণ সুদখোর মহাজনদের শোষণের বিলোপসাধনে গ্রামীণ কর্মহীন মানুষের স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে নানাবিধ কাজে উৎসাহিত করা হয়েছে, প্রশিক্ষণ ও সহযোগিতার মাধ্যমে গ্রামীণ জনশক্তিকে কর্মে লিপ্ত করতে গ্রামে নার্সারি স্থাপন, মৎস্য চাষ, গবাদি পশুপালন, সমবায় সমিতি গঠন ও মূলধন গঠনে সাহায্য ও সহযোগিতা অব্যাহত রয়েছে।

৬. **জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ :** বাংলাদেশ সরকার জনসংখ্যা সমস্যাকে এক নম্বর সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করেছে। এ লক্ষ্যে সরকার প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, মা ও শিশুর স্বাস্থ্য পরিচর্যা, শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস, মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস, প্রজনন হ্রাসে শিক্ষা ও সাক্ষরতার প্রসার ঘটানো, অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি, উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে ছোট পরিবারকে আদর্শ পরিবার হিসেবে প্রতিষ্ঠায় সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মতৎপরতার সমন্বয় সাধন করেছে। বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা সরকারের পাশাপাশি বাল্যবিবাহ রোধ, জন্ম নিরোধক ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান ও জন্মনিরোধক সরবরাহ, পুত্র ও কন্যা সন্তানজনিত বিভ্রাট দূরে সহায়তা প্রদান, বহু বিবাহ রোধে সচেতনতা সৃষ্টিতে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছে।

৭. **শিক্ষার প্রসার :** বাংলাদেশের অধিকাংশ লোকই অশিক্ষিত ও অজ্ঞ। বর্তমানে বাংলাদেশে শিক্ষার হার ৫৭.৯% (অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৪)। বাংলাদেশ সরকার শিক্ষার প্রসারে 'প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি', 'সবার জন্য শিক্ষা', স্কুল ফিডিং কর্মসূচি, বিনা বেতনে শিক্ষাসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেছে। বাংলাদেশ সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাসমূহ শিক্ষা কর্মসূচির ব্যাপক প্রসার ঘটিয়েছে। এক হিসাবে দেখা যায়, বেসরকারি সংস্থাসমূহ প্রায় ১ লাখ স্কুল পরিচালনা করছে। এ ১ লাখ স্কুলে কম করে হলেও ৪০ লাখ ছেলেমেয়েকে শিক্ষা দান করা হচ্ছে। তাছাড়া বেসরকারি সংস্থাসমূহের রয়েছে বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচি, যার মাধ্যমে বয়স্কদেরকে দেয়া হচ্ছে শিক্ষার আলো। এভাবে পল্লী অঞ্চলে শিক্ষার প্রসার ঘটাতে জনগণকে শিক্ষিত ও সচেতন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

৮. **পরিবেশগত সচেতনতা সৃষ্টি :** বর্তমানে বিশ্ব মানুষের বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। এর মূলে দায়ী মানুষের কার্যক্রম। বাংলাদেশ সরকার পরিবেশ দূষণ রোধে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, বৃক্ষমেলা, বৃক্ষরোপণে পুরস্কার প্রদান, উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী প্রভৃতি চালু করেছে। পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাসমূহ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির মাধ্যমে পথে প্রান্তরে বিপুল পরিমাণ বৃক্ষরোপণ করছে। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে তারা এক্ষেত্রে সরকারের জাতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালনসহ দেশে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বিরাট ভূমিকা রাখছে। গ্রামীণ জনগণকে নার্সারি প্রকল্পে ঋণ সুবিধা প্রদানের পাশাপাশি পরিবেশ দূষণ রোধে সচেতন করে তুলছে।

মূল্যায়ন : বাংলাদেশের পল্লী উন্নয়নে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা নিয়োজিত থাকলেও পল্লীর জনগোষ্ঠীর কতিপয় ক্ষেত্র ছাড়া উল্লেখযোগ্য তেমন কোনো উন্নয়ন ঘটেনি। এর মূলে দায়ী বিভিন্ন সরকারের আমলে বিভিন্ন পরিকল্পনায় নতুন নতুন কৌশল গ্রহণ, ঘনঘন সরকার পরিবর্তন ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দর্শনের সুস্পষ্ট কাঠামোর অভাব, পল্লী উন্নয়নের জন্য পূর্বে গৃহীত পদক্ষেপসমূহের যথাযথ মূল্যায়ন ছাড়াই নতুন নতুন কৌশল গ্রহণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের দীর্ঘসূত্রিতা ও সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব, সর্বস্তরে ব্যাপক দুর্নীতি ও নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, বেসরকারি সংস্থাসমূহের মানবসেবার নামে শোষণ পদ্ধতি, রাজনৈতিক দর্শন প্রচার, সরকারের সম্পূরক হিসেবে না হয়ে বিকল্প হিসেবে কাজ করা, প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতির বাইরে গিয়ে কাজ করা, ধর্মের অপব্যাখ্যা দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্তির দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

উপসংহার : বাংলাদেশের পল্লী উন্নয়নের কৌশলের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ মোকাবিলা করে পল্লী উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা জাতীয় উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যদিও গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত রয়েছে, কিন্তু দীর্ঘ সময় ধরে এ কার্যক্রম পরিচালনা করার পরও সার্বিক মান উন্নয়নে অতি সামান্যই সফলতা অর্জিত হয়েছে। তাই সরকারের উচিত কর্মসূচি প্রণয়নের আগে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে বিজ্ঞানভিত্তিক উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করা। পল্লী উন্নয়নে পল্লীর জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়মূলক কর্মকাণ্ডের জন্য সুষ্ঠু যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধনের মাধ্যমেই পল্লী উন্নয়ন কৌশল সফল হওয়ার আশা করা যায়।

৩০ ৷ ভূমি সংস্কার বলতে কি বোঝায়? বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভূমি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করুন।

উত্তর : ভূমি মানুষের জীবিকা অর্জনের জন্য একটি অপরিহার্য মাধ্যম। কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ভূমির গুরুত্ব অপরিহার্য। কারণ এ দেশের ৮০ ভাগ লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভূমির ওপর নির্ভরশীল। ঘনবসতিপূর্ণ বাংলাদেশের চাষাবাদযোগ্য ভূমি জনসংখ্যার তুলনায় অপ্রতুল। এ সমস্যা আরো জটিলতর হয়েছে ভূমির মালিকানার ক্ষেত্রে অসম বণ্টনের কারণে। দেশের শতকরা ২৫ ভাগ আবাদী জমি মাত্র ২% লোকের মালিকানায়, পক্ষান্তরে ৪.৮% আবাদী ভূমি ৫০% চাষীর মালিকানায়। এ কারণে ভূমিহীন লোকের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের ভূমি সংস্কার অতীব গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘকাল থেকেই এই বিরাজমান সমস্যা সমাধানের জন্য ভূমি সংস্কারের তীব্রতা অনুভূত হয়েছে এবং এ লক্ষ্যে নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে বেশ কিছু পদক্ষেপ লক্ষ্য করা যায়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

ভূমি সংস্কার : সাধারণভাবে ভূমি সংস্কার বলতে বোঝায় এমন এক কর্মসূচি যা ভূমি মালিকানায় ও ভূমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে গভীর পরিবর্তন সূচিত করে। অন্যথায় বলা যায়, প্রচলিত ভূমি মালিকানা ব্যবস্থার ত্রুটিসমূহ সংশোধন করে ব্যাপক পরিবর্তন আনয়নই ভূমি সংস্কার।

ভূমি সংস্কারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে D. Warriner বলেন, 'ভূমি সংস্কার হচ্ছে ক্ষুদ্র ফার্ম ও কৃষি শ্রমিকদের কল্যাণার্থে ভূমি মালিকানার পুনর্বণ্টন।' জাতিসংঘ প্রদত্ত ভূমি সংস্কারের সংজ্ঞানুযায়ী, 'কোনো অর্থনীতির গ্রামীণ খাতে প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন সাধন করে যদি তার অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন আনা যায় তবে তাকে ভূমি সংস্কার বলা যেতে পারে।'

ভূমি সংস্কারের প্রক্রিয়া : ভূমি সংস্কার এমন এক কর্মসূচি যা প্রচলিত ভূমি স্বত্ব ব্যবস্থার ত্রুটিসমূহ দূর করে জমির মালিকানা ও ব্যবহার সম্পর্কিত আইন-কানুনের ক্ষেত্রে পরিবর্তন সূচিত করে। ভূমি সংস্কার প্রক্রিয়ায় দুটি পর্যায় থাকে। যথা : ১. ভূমি মালিকানার প্রকৃতির পরিবর্তন ও ২. ভূমি থেকে অর্জিত আয় বা ক্ষমতা বা উৎপাদনের সুষম বিন্যাস।

ভূমি মালিকানার প্রকৃতির পরিবর্তন বলতে ভূমি ব্যবস্থায় ভূমি মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ এবং তার ফলে সৃষ্ট উদ্বৃত্ত জমি দেশের ক্ষুদ্র কৃষক ও ভূমিহীন চাষীদের মধ্যে বণ্টন করাকে বোঝায়। একটি দেশে বা সমাজে কি ধরনের ভূমি সংস্কার হওয়া উচিত তা নির্ভর করে সে দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অবস্থা এবং সরকারের দৃঢ় ইচ্ছা ও নিয়ন্ত্রণের ওপর। ভূমি সংস্কারের প্রকৃতি তাই সরকারের ওপর নির্ভরশীল। অধ্যাপক বার্লো (Barlowe) সরকার কর্তৃক প্রযোজ্য প্রয়োজনীয় কঠোরতা ও নিয়ন্ত্রণের ক্রমানুসারে ভূমি সংস্কারের চারটি রূপের বর্ণনা দিয়েছেন। যথা : ১. অত্যন্ত মৃদু ও ধীর গতিসম্পন্ন সংস্কার, ২. দৃঢ় ও সুস্পষ্ট সংস্কার, ৩. সমাজ বিপ্লব প্রতিরোধক সংস্কার এবং ৪. যৌথ খামার প্রতিষ্ঠা।

১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ সরকারের ভূমি সংস্কারের পদক্ষেপ বিশ্লেষণ করলে পাঁচটি মডেল পরিলক্ষিত হয়। যথা : ১. সীমিত নমুনা, ২. সংস্কারমূলক নমুনা, ৩. বণ্টনমূলক নমুনা, ৪. সমবায়ভিত্তিক নমুনা ও ৫. বৈপ্লবিক নমুনা।

১. **সীমিত নমুনা :** সীমিত সংস্কারের ক্ষেত্রে সরকারের কাজ সহজ। ভূমি মালিক ও চাষীদের মধ্যে উৎপাদনের ন্যায়সঙ্গত বণ্টন প্রক্রিয়া নির্ধারণ, ভূমি মালিক ও কৃষকদের উৎসাহ দান, কৃষির আধুনিকায়নে কৃষককে অবহিতকরণ, কৃষি ঋণ সহজলভ্য করে উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা দান প্রভৃতি পদক্ষেপগুলো একত্রে গৃহীত হয়।

২. **সংস্কারমূলক নমুনা :** এ নমুনা অনুযায়ী উৎপাদন ক্ষেত্রে কৃষকের অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলকভাবে বৃদ্ধি করে কৃষককে ঝুঁকি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে, আধুনিক উপকরণ প্রয়োগে ভূমি মালিককে বাধ্য করতে, সমগ্র জমি চাষের আওতায় এনে নিবিড় চাষের ব্যবস্থা বাধ্যতামূলকভাবে প্রবর্তন করা ছাড়াও খণ্ড খণ্ড জমিগুলোকে একত্রীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ প্রভৃতি পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

৩. **বণ্টনমূলক নমুনা :** এ মডেল অনুযায়ী সরকার সাহসিকতার সাথে নানা বৈপ্লবিক পরিবর্তন গ্রহণে আগ্রহী হয়ে ওঠে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ভূমি মালিকানার একটা সীমারেখা নির্ধারণ করা এবং ঐ সীমারেখার ঊর্ধ্বে সকল জমি দখল করে তা ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষীদের মধ্যে বণ্টন করা। একই সাথে বর্গা প্রথা, মহাজনী প্রথা, লগ্নী ব্যবস্থা প্রভৃতির বিলোপ সাধন ও অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ।

৪. **সমবায়ভিত্তিক নমুনা :** এই মডেল অনুযায়ী ভূমি মালিকানায় কোনো পরিবর্তন ঘটে না। কিন্তু চাষাবাদ বাধ্যতামূলকভাবে সমাজের ওপর ন্যস্ত হয়। এতে গ্রামে গ্রামে সমবায় সমিতি গঠন করা হয় এবং সমিতিগুলোই চাষাবাদের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকে। এতে উৎপাদনক্ষেত্রে ভূমি ও শ্রমের অংশ স্পষ্টভাবে নির্ধারিত হয়।

৫. **বৈপ্লবিক নমুনা :** এ নমুনা অনুযায়ী অন্যান্য খাতসহ কৃষিকেও জাতীয়করণ করা হয়। প্রতিটি সমাজের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ভূমি ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করা হয়। ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে এই মডেল চরম একটি ব্যবস্থা।

ভূমি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা : কৃষি নির্ভর বাংলাদেশে ভূমি সংস্কার অতি গুরুত্বপূর্ণ। দেশের জনসংখ্যার প্রায় ৮০ ভাগ কৃষির ওপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৪ মতে, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে (জিডিপি) কৃষিখাতের অবদান ১৬.৩৩%। কৃষির উন্নতি দেশের ভূমিস্বত্ব ব্যবহারের ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। ব্রিটিশ আমলে তৎকালীন বাংলায় সামন্ততান্ত্রিক ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার প্রচলন ছিল। ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ভূমির মালিকানার ক্ষেত্রে জমিদার ও জোতদার শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। এসব শ্রেণী দেশের সকল জমির মালিক ছিল। এ সামন্ততান্ত্রিক প্রথার পরিবর্তন হয় ১৯৫০ সালে জমিদারী প্রথা বিলোপের মাধ্যমে। এই প্রথা বিলুপ্তির মাধ্যমে সামন্ত শ্রেণীর প্রভাব কিছুটা খর্ব হলেও প্রকৃতপক্ষে জমির মালিকানার ক্ষেত্রে এদের প্রভাব এখনো দৃশ্যমান।

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে বেশ কিছু পদক্ষেপ গৃহীত হলেও সার্বিক ভূমি মালিকানায় মৌলিক কোনো পরিবর্তন হয়নি। এখনো আমাদের দেশে বেশিরভাগ জমির মালিকানা কিছুসংখ্যক জোতদারের হাতে কেন্দ্রীভূত। ফলশ্রুতিতে দেশের ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের ব্যাপক সংখ্যক গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নকল্পে ভূমি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

কৃষিপ্রধান দেশের বৃহত্তর উন্নয়ন পরিকল্পনা ভূমি সংস্কার ব্যতীত বাস্তবায়ন অসম্ভব। ভূমি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা নিম্নোক্ত তিনটি যুক্তির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়। যথা : ১. সামাজিক সাম্যের নৈতিক যুক্তি, ২. অর্থনৈতিক যুক্তি এবং ৩. সুষম রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার যুক্তি। নিচে বাংলাদেশের ভূমি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা এই তিন ধরনের যুক্তির মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো :

১. **সামাজিক সাম্যের নৈতিক যুক্তি :** নীতিগতভাবে অসাম্য গ্রহণযোগ্য নয়। কৃষিভিত্তিক সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠায় ভূমি সংস্কার হলো সহজ ও সরল পথ। বাংলাদেশে ভূমি মালিকানায় অসাম্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে দারিদ্র্য ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হচ্ছে। ১৯৬১ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ভূমিহীনের সংখ্যা ছিল প্রায় ১৮ শতাংশ। ১৯৮৭ সালে এই সংখ্যা ৫০ শতাংশের ওপরে দাঁড়ায় আর বর্তমানে এ সংখ্যা ৩১.৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। গ্রাম্য জনপদের প্রকট দারিদ্র্য দূরীকরণের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নের জন্য ভূমি সংস্কারের বিকল্প নেই।

২. **ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক যুক্তি**

ক. **খামারের আয়তন ও উৎপাদন ক্ষমতা :** বাংলাদেশের বড় খামারগুলোর তুলনায় ক্ষুদ্রায়তনের খামারগুলোর উৎপাদন ক্ষমতা এবং একর প্রতি উৎপাদন অপেক্ষাকৃত বেশি। ক্ষুদ্রায়তনের খামার মালিক বেশি শ্রম ও আন্তরিকতার সাথে চাষাবাদ করে। অপরপক্ষে বৃহৎ খামার মালিকেরা ভাড়া করা শ্রমিক ব্যবহার করে। ফলে বড় খামারের উৎপাদনের হার অপেক্ষাকৃত কম হয়। নারায়ণগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও, ময়মনসিংহ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে BIDS-এর পক্ষ থেকে এক জরিপ চালিয়ে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, বড় খামারগুলোর চেয়ে ক্ষুদ্রায়তন খামারগুলোতে উৎপাদন ক্ষমতা ও একর প্রতি উৎপাদন অপেক্ষাকৃত বেশি।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

খ. **শস্যের নিবিড়তা :** শস্যের নিবিড়তাকে বিবেচনায় আনলে ভূমি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত হয়। BIDS-এর গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফল থেকে দেখা যায়, খামারের আয়তন বাড়লে শস্যের নিবিড়তা কমে। তাই শস্যের নিবিড়তা বাড়াতে হলে কাম্য আয়তনের খামার গড়ে তুলতে হবে, যা ভূমি সংস্কারের মাধ্যমেই করা সম্ভব।

গ. **কর্মসংস্থান সৃষ্টি :** তালিকা থেকে দেখা যায়, বৃহৎ খামারের চেয়ে ক্ষুদ্রায়তনের খামারে অধিকসংখ্যক শ্রমিক প্রয়োজন। বাংলাদেশ যেহেতু ঘনবসতিপূর্ণ দেশ এবং কর্মসংস্থানের অভাবহেতু অনেকে বেকার। সেহেতু ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রায়তনের খামার সৃষ্টি করলে বহু সংখ্যক গ্রাম্য শ্রমিকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে, যা কর্মসংস্থানের সন্ধানে গ্রাম্য লোকের শহরে ভিড় জমানোর প্রবণতা রোধ করবে।

ঘ. **ভাগচাষ প্রথার অবসান :** বাংলাদেশের আবাদযোগ্য জমির প্রায় ২৫ ভাগ বর্গা ও ভাগচাষের মাধ্যমে চাষ করা হয়। বর্গাদারেরা অস্থায়ী ভিত্তিতে কৃষিকাজে নিয়োজিত থাকে বলে জমির উন্নয়নে আগ্রহী হয় না। ফলে কৃষি উৎপাদনের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয় না। ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে এ সকল ভূমিহীন কৃষকদের স্থায়ী স্বত্ব প্রদান করলে তারা জমির উন্নয়নে আগ্রহী হবে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। তাই কৃষি উন্নয়নের স্বার্থে ভূমি সংস্কার করা প্রয়োজন।

ঙ. **খাস জমি বিতরণ :** দেশে সরকারি হিসাব মতে, খাস জমির পরিমাণ কম নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই খাস জমি নানাবিধ কৌশলে তা বিত্তবানদের বা প্রভাবশালীদের দখলে যাচ্ছে বা দখলে আছে। দেশের অসংখ্য দরিদ্র, ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষকদের মধ্যে এ খাস জমি সুষ্ঠুভাবে বণ্টনের জন্য ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। ফলে ভূমিহীন শ্রেণীর অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটবে।

চ. **কৃষি ঋণ প্রদান :** বাংলাদেশের ত্রুটিপূর্ণ ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার ফলে কৃষি ঋণ ও অন্যান্য কৃষি উপকরণের সুযোগ-সুবিধা কেবল বিত্তশালী কৃষকেরাই ভোগ করে থাকে। ফলে প্রয়োজনীয় মূলধন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার অভাবে ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকেরা কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারে না। ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষক যাতে ঋণ ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদি পেতে পারে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করলে কৃষির উৎপাদনশীলতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাবে।

৩. **সুষম রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার যুক্তি :** তৃতীয় বিশ্বের বেশির ভাগ দেশের মতো বাংলাদেশের রাজনৈতিক কার্যাবলী শহরভিত্তিক এলিট শ্রেণীর দ্বারা পরিচালিত। এদের সহযোগী হিসেবে আছে গ্রামের ভূ-স্বামী শ্রেণী। ব্যাপক সংখ্যক সাধারণ জনগণ অর্থনৈতিক দুর্দশার কবলে পতিত থাকার কারণে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর্যায়ে তথা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকাই রাখতে পারছে না। তাদের ভেতরে আশ্রিত মনোভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে দেশের সার্বিক উন্নয়ন কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে উপনীত হচ্ছে না। এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্য ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর কাছে ভূমির মালিকানা সুষমভাবে বণ্টন করতে হবে, যাতে তাদের অর্থনৈতিক সামর্থ্য বৃদ্ধি পায়। এর মাধ্যমে জনগণকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত করা যাবে, যা সুষম রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত।

উপসংহার : ভূমি সংস্কার জাতীয় স্বার্থের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভূমি হলো সম্পদ ও আয়ের প্রধান উৎস। সেজন্য এর মালিকানা গুটিকতক ব্যক্তির হাতে সীমাবদ্ধ বা কুক্ষিগত না করাই বাঞ্ছনীয়। আর বণ্টন ব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত যার ফলে ভূমির সাথে সংশ্লিষ্ট সবাই যেন নিম্নতর জীবনমান লাভ করতে পারে। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ভাগ্যোন্নয়নের জন্য মৌলিক, প্রগতিশীল ও প্রয়োগযোগ্য ভূমিসংস্কার নীতি গ্রহণ করা উচিত। সামগ্রিকভাবে দেশের ভূমিহীন কৃষকদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন তথা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে ভূমি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

৩১। অর্পিত সম্পত্তি আইন কি? অর্পিত সম্পত্তি আইনের পটভূমি এবং বাংলাদেশে এই আইনের কথিত বৈধ প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

উত্তর : ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে সীমান্ত বিরোধের সৃষ্টি হয়। এ বিরোধের জের ধরে দেশ দুটি ১৯৬৫ সালে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীতে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যস্থতায় ঐতিহাসিক তাসখন্দ চুক্তির মধ্য দিয়ে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। যুদ্ধে যারা পাকিস্তান ত্যাগ করে ভারতে গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি তৎকালীন পাকিস্তান সরকার শত্রু সম্পত্তি হিসেবে ঘোষণা করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৭৪ সালের ২৩ মার্চ তৎকালীন সরকার মহামান্য রাষ্ট্রপতির ৪নং অধ্যাদেশ দ্বারা শত্রু সম্পত্তিকে অর্পিত সম্পত্তি হিসেবে চিহ্নিত করে।

সারাদেশে অর্পিত সম্পত্তি

- সারা দেশে ৭ লাখ ২২ হাজার ৩৩৫ একর জমি এবং ২২ হাজার ৮৩৫টি বাড়ি অর্পিত সম্পত্তি হিসেবে তালিকাভুক্ত রয়েছে।
- অর্পিত সম্পত্তি হিসেবে তালিকাভুক্ত ৩ লাখ ৮৯ হাজার ১৯৭ একর জমি ও ১৩ হাজার ৪৩২টি বাড়ি সরকারের বেদখলে রয়েছে।
- বেদখলী সম্পত্তি নিয়ে ১৮৭৯টি মামলা সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগের বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন রয়েছে।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক আবুল বরকত ও শফিকউজ্জামানের গবেষণা জরিপে অর্পিত সম্পত্তির জমির পরিমাণ প্রায় ১৬ লাখ ৪০ হাজার একর যার আর্থিক মূল্য দাঁড়ায় ৬০ হাজার কোটি টাকা।
- ভূমি মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ হিসাবে, অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যার্পণ আইন প্রণয়নের আগে দেশে এ সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ৬ লাখ ৪৩ হাজার ১৩৬ একর। আইনটি প্রণয়নের পর এ তালিকায় বর্তমানে জমির পরিমাণ ১ লাখ ৯৭ হাজার ২৫৭ একর।

অর্পিত সম্পত্তি আইন : ১৯৬৫ সালের ৬ সেপ্টেম্বর তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার এক প্রতিরক্ষা অধ্যাদেশ জারি করে যা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে সমানভাবে প্রযোজ্য। এ অধ্যাদেশের ৩ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে একই তারিখে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়। এ বিধিমালার ১৮২ বিধির (১) উপবিধির (খ) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ১৯৬৫ সালের ৩ ডিসেম্বর একটি আদেশ জারি করেন। এ আদেশে উক্ত বিধিমালার ১৬৯(৪) বিধির সংজ্ঞা অনুযায়ী শত্রু সম্পত্তি হিসেবে চিহ্নিত সকল জমি ও সেগুলোর উপর অবস্থিত ভবনসমূহ ও অস্থাবর সম্পত্তি উপ-তত্ত্বাবধায়ক, শত্রু সম্পত্তি বরাবর ন্যস্ত হবে বলে উল্লেখ করা হয়। ৩ ডিসেম্বর ১৯৬৫ থেকে উপ-তত্ত্বাবধায়ক বরাবর ন্যস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়, বিনিময় দান, উইল, বন্ধক, ইজারা, উপ-ইজারা বা অন্য কোনো প্রকারে হস্তান্তর নিষিদ্ধ করা হয় এবং এই আদেশের পরিপন্থী কোনো প্রকার হস্তান্তর অবৈধ ও অকার্যকর ঘোষণা করা হয়।

শত্রু (অর্পিত) সম্পত্তি আইনের ইতিহাস : শত্রু সম্পত্তি বা অর্পিত সম্পত্তি আইনের ইতিহাসকে দুই ভাগে করা যায়। যথা– ক. শত্রু সম্পত্তি আইনের অতীত ইতিহাস ও খ. শত্রু সম্পত্তি আইনের বাংলাদেশে বিবর্তন।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

ক. **শত্রু সম্পত্তি আইনের অতীত ইতিহাস :** বিশ শতকের শুরুতেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। ১৯১৪ সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ১৯১৮ সালে শেষ হয়। যুদ্ধে পরাজিত শক্তিগুলোর সম্পদ বন্টনকল্পে ১৯২১ সালে The Enemy Mission Act প্রবর্তিত হয়। শত্রু সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দেয়া হয় কিছু কাস্টোডিয়ানকে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের তাণ্ডব শেষ হতে না হতেই ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত হয়। ১৯৩৯ সালেই প্রবর্তিত হয় Defence of India Act (XXXV) of 1939; যা Act in of 1921-এর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়।

খ. **শত্রু সম্পত্তি আইনের বাংলাদেশে বিবর্তন :** ব্রিটিশ শাসনামলেও উপমহাদেশে শত্রু সম্পত্তি আইন অন্যান্য আইনের মতো প্রচলিত ছিল। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর এটা পূর্ণ বৈধতা পায়। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ-পরবর্তী তৎকালীন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান সংবিধানের ৩০ অনুচ্ছেদের ১ নং ধারার ক্ষমতাবলে ১৯৬৫ সালের ৬ সেপ্টেম্বর এক জরুরি ঘোষণা জারি করেন, যা Defence of Pakistan (No-XXIII of 1965) নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। যে কারণে Defence of Pakistan Actটি Defence of India Act XXXV of 1939 আইনের পরবর্তী সংস্করণ হিসেবে বিবেচিত।

পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ১৯৬৬ সালের ৮ জানুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান শত্রু সম্পত্তি (জমি ও ইমারত) প্রশাসন ও নিষ্পত্তিকরণ আদেশ ১৯৬৬ জারি করেন। এ আদেশে তত্ত্বাবধায়ক, উপ-তত্ত্বাবধায়ক ও সহকারী তত্ত্বাবধায়কদের অনধিক এক বছর ভিত্তিতে ইজারা প্রদান করে যাবতীয় সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়।

১৪ মার্চ ১৯৬৬ সালে উপ-তত্ত্বাবধায়ক (পরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ, পূর্ব পকিস্তান) শত্রু সম্পত্তির (জমি ইমারত) দখল গ্রহণ ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিস্তারিত নির্দেশাবলী লিপিবদ্ধ করে একটি স্মারক জারি করেন। শত্রু সম্পত্তি (জমি ও ইমারত) চিহ্নিতকরণ, দখলগ্রহণ এবং অনধিক এক বছরের জন্য ইজারা প্রদান করার জন্য এ স্মারকে নির্দেশ দেয়া হয়। পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোনো শত্রু সম্পত্তি বিক্রয় বা হস্তান্তর করা যাবে না বলে স্মারকে সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করা হয়। শত্রু সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার জন্য আয় ও ব্যয়ের আলাদা-আলাদা হিসাব সংরক্ষণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেয়া হয়। শত্রু সম্পত্তির যথাযথ ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করার জন্য ১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত উপ-তত্ত্বাবধায়ক বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নির্দেশ জারি করেন।

১৯৬৯ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানে জরুরি অবস্থা তুলে নেওয়ার পর পাকিস্তান প্রতিরক্ষা অধ্যাদেশ এবং পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধিমালার কার্যকারিতা ও বৈধতা রহিত হয়ে যায়। পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধিমালার ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ শত্রু সম্পত্তি (জরুরি বিধানসমূহের ধারাবাহিকতা) অধ্যাদেশ জারি করা হয়। এই অধ্যাদেশটি শত্রু সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে এবং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের অভ্যুদয় পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে।

স্বাধীন বাংলাদেশে শত্রু সম্পত্তি আইন : স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশে আইনের ধারাবাহিকতা প্রয়োগাদেশ ১৯৭১ (The Laws of Continuance Enforcement Order 1971) অনুসারে শত্রু সম্পত্তি আইন বলবৎ থাকে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রপতির ১৯৭২ সালের ২৯ নং আদেশ অনুসারে ২৬ মার্চ ১৯৭২ পূর্ব পাকিস্তান সরকারের শত্রু সম্পত্তি বাংলাদেশ সরকারের অর্পিত সম্পত্তি বলে পরিগণিত হয়। ১৯৭৪ সালে শত্রু সম্পত্তি [জরুরি বিধানসমূহের ধারাবাহিকতা রক্ষাকরণ (রহিতকরণ) আইন (১৯৭৪ সালে ৪৫ নং আইন)] পাস করা হয়।

১৯৭৬ সালে এই আইনটি সংশোধন করে একটি অধ্যাদেশ জারি করা হয়। অধ্যাদেশে সরকার বরাবর অর্পিত সকল শত্রু সম্পত্তির প্রশাসন, নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা, হস্তান্তর ইত্যাদি সরকার অথবা সরকার নির্দেশিত কর্মকর্তা বা কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত করা হয়।

ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৯৭৭ সালের ২৩ মে একটি প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে অর্পিত সম্পত্তির (জমি ও ইমারত) ব্যবস্থাপনা, প্রশাসন ও বিলিবন্টন সংক্রান্ত বিস্তারিত নির্দেশাবলী জারি করা হয়। চার খণ্ডে বিভক্ত ৩৮টি অনুচ্ছেদের এ প্রজ্ঞাপনে ভূমি ও বাড়িঘর-সংক্রান্ত যাবতীয় সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণ, প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ, দখল গ্রহণ, ইজারা প্রদান ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বিস্তারিত আদেশ দেয়া হয়।

প্রথম খণ্ডের আদেশসমূহ : জেলা প্রশাসক ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)-এর সার্বিক তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে মহকুমা প্রশাসক তাদের নিজ নিজ এলাকায় অবস্থিত অর্পিত সম্পত্তির অনুসন্ধান, দখল গ্রহণ, প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা ও ইজারা প্রদানের ক্ষমতা প্রদান করা হয়। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসককে (রাজস্ব) সরকারের পূর্বানুমোদন ক্রমে নিজে অথবা সংশ্লিষ্ট এলাকার মহকুমা প্রশাসকের মাধ্যমে অর্পিত সম্পত্তি হস্তান্তর বা অন্যভাবে বিলি-বন্দোবস্ত প্রদান করার ক্ষমতা অর্পণ করা হয়।

দ্বিতীয় খণ্ডের আদেশসমূহ : ভূমি এবং বাড়িঘর সম্পর্কিত অর্পিত সম্পত্তি যে সকল শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় সেগুলো হচ্ছে কৃষি জমি, পতিত অকৃষি জমি, গ্রামাঞ্চলের কাঁচাপাকা বাড়িঘর, শহর অঞ্চলের কাঁচাপাকা বাড়িঘর, দোকান, ফল ও ফুলের বাগান, পুকুর, বিল ইত্যাদি অর্পিত সম্পত্তির উপর বিদ্যমান অস্থাবর সম্পত্তি এবং অর্পিত সম্পত্তির সাথে সংযুক্ত অন্যান্য সম্পত্তি সংযুক্ত করার ক্ষমতা প্রদান করা হয় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)-কে।

তৃতীয় খণ্ডের আদেশসমূহ : প্রজ্ঞাপনের তৃতীয় খণ্ডে অর্পিত সম্পত্তির আয় ও ব্যয় সংক্রান্ত নির্দেশ প্রদান করা হয়। ইতিপূর্বে অর্পিত সম্পত্তির (ভূমি ও বাড়িঘর) ডেপুটি কাস্টোডিয়ানের নামে খোলা পারসোনাল একাউন্ট পরিচালনার দায়িত্ব সরকারি গেজেটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার বিভাগের একজন উপ-সচিবের উপর অর্পণ করা হয়। অর্পিত সম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত সকল আয় পারসোনাল ডিপোজিট একাউন্টে জমা দিতে এবং অর্পিত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয় এ পারসোনাল ডিপোজিট একাউন্ট থেকে মেটানোর জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকদের (রাজস্ব) অর্পিত সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত যাবতীয় ব্যয়ের ত্রৈমাসিক হিসাব ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার বিভাগে প্রেরণ করার এবং সময় সময় সরকারের নিকট থেকে তহবিল সংগ্রহ করার নির্দেশ প্রদান করা হয়।

চতুর্থ খণ্ডের আদেশসমূহ : প্রজ্ঞাপনের চতুর্থ খণ্ডে অর্পিত সম্পত্তির সুষ্ঠু ও কার্যকরী ব্যবস্থাপনার স্বার্থে ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার বিভাগে জেলা পর্যায়ে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)-এর অধীনে, মহকুমা পর্যায়ে মহকুমা প্রশাসকের অধীনে এবং থানা পর্যায়ে সার্কেল অফিসার (রাজস্ব)-এর অধীনে বিশেষ সেল গঠন করার নির্দেশ প্রদান করা হয়।

অর্পিত সম্পত্তি আইনের প্রয়োগে প্রবর্তিত নীতিমালা : ১৯৪৭ সালে 'Vested and Non resident Property (Administration) Act 46'-এর মাধ্যমে শত্রু সম্পত্তি আইন বহাল রাখা হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তীতে এ আইনের প্রয়োগে কতিপয় নীতিমালার প্রবর্তন করা হয়। নিচে নীতিমালাগুলো উল্লেখ করা হলো :

১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ : বাংলাদেশ (ভেস্টিড অব প্রপার্টি এন্ড এসেটস) রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ২৯।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

১৯৭৪ সালের নীতিমালা : Enemy Property Continuance of Emergency Provision Repeal Act 45. Vested and non-resident property Administration Act-46.

১৯৭৬ সালের নীতিমালা : Enemy Property Repeal (Amend) Ordinance (Ordinance No-93).

১৯৭৭ সালের নীতিমালা : তৎকালীন সরকার এক সার্কুলার জারি করে নতুন অর্পিত সম্পত্তি খুঁজে বের করার দায়িত্ব দেয় স্থানীয় ভূমিকর ব্যবস্থাপনা পর্ষদকে।

১৯৯৩ সালের নীতিমালা : এক সার্কুলার জারির মাধ্যমে অর্পিত সম্পত্তির তালিকা যাচাইয়ের নামে লুকিয়ে থাকা সম্পত্তি বের করার নির্দেশ দেয়া হয়।

নীতিমালার প্রয়োগের প্রস্তাবনা : আইন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়ের ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার বিভাগ ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৮২ এ বিভাগের কার্যকরী নিয়ন্ত্রণাধীন অর্পিত ও পরিত্যক্ত সম্পত্তির হস্তান্তর বা বিলি বন্দোবস্ত সংক্রান্ত নীতিমালা জারি করেন। নীতিমালা অনুযায়ী সরকারি অফিস বা সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আবাসিক স্থান সংকুলানের জন্য যে সকল অর্পিত ও পরিত্যক্ত বাড়ি বরাদ্দ করা হয়েছে এবং যেগুলো ভালো অবস্থায় আছে সেগুলো যেভাবে ব্যবহারের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে সেভাবে ব্যবহার অব্যাহত থাকবে।

- ১৯৮৩ সালের ১৭ জুলাই মন্ত্রিপরিষদ সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ভূমি প্রশাসন বোর্ড ২৪ অক্টোবর ১৯৯৩ বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের অর্পিত সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়াদি জরুরি ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করার জন্য বিস্তারিত নির্দেশনামা জারি করা হয়।
- ১৯৮৪ সালের ৯ এপ্রিল ভূমি প্রশাসন বোর্ড পুনরায় একটি নির্দেশনামা জারি করে ১৯৮৪ সালের ৩০ জুনের মধ্যে অর্পিত সম্পত্তি হস্তান্তর ও বিলিবন্দোবস্তের কাজ সমাপ্ত করার নির্দেশ দেয়া হয়। উক্ত তারিখের মধ্যে যেসব সম্পত্তি হস্তান্তর করা যাবে না তার তালিকা ব্যাখ্যাসহ দাখিল করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়।
- ১৯৮৮ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত জারিকৃত (অর্পিত সম্পত্তি আইন বিষয়) কয়েকটি স্মারকের বিষয়বস্তু নিচে উল্লেখ করা হলো :
  - স্মারক নং ৫-১৯৩/৮৫/৩৫১/(৬.৮.১৯৮৮) : অর্পিত সম্পত্তি থেকে উচ্ছেদ, অর্পিত সম্পত্তির তালিকা ও অবমুক্তি প্রসঙ্গে জারিকৃত এ স্মারকে ৫ বিঘা পর্যন্ত কৃষি জমির অবমুক্তির আদেশ বিভাগীয় কমিশনার, ১০ বিঘা পর্যন্ত ভূমি প্রশাসন বোর্ড এবং তারও বেশি কৃষি জমি ও শহর এলাকার অর্পিত সম্পত্তি অবমুক্তির ক্ষমতা ভূমি মন্ত্রণালয়ের হাতে ন্যস্ত করা হয়।
  - ভূম/শা-৫/৭০৪ (১২৮) (১৪.১২.১৯৮৯) : জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে অর্পিত সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ।
  - ভূম/শা-৫/১৬৪ (২৬.০২.৯০) :

    ক. অর্পিত সম্পত্তির বাজেট, আয়, অর্থ ছাড় এবং ব্যয় নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সকল ব্যবস্থাদি ভূমি মন্ত্রণালয় গ্রহণ করবে।

    খ. বিভাগীয় কমিশনার ১০ একর পর্যন্ত কৃষিজমি অবমুক্ত করতে পারবেন।

    গ. ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে বিভাগীয় কমিশনার অর্পিত সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলা পরিচালনার জন্য উকিল নিয়োগ করবেন।

    ঘ. ঢাকা মহানগর ব্যতীত অন্যান্য সকল জেলার জেলা প্রশাসক অর্পিত সম্পত্তির একসনা লিজ প্রদানে চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

অর্পিত সম্পত্তি আইন শুধু মৌলিক মানবাধিকার বিরোধী নয় এই আইন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বঞ্চনার আইন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ২৮, ২৮(১) ধারায় সকল নাগরিকের সমান অধিকারের যে কথা বলা হয়, অর্পিত সম্পত্তি আইনের মাধ্যমে সংবিধানকে অবমাননা করা হয়েছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় নাগরিকদের মাঝে শ্রেণীবিন্যাস কখনোই একটি কল্যাণকর রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না। জাতীয় সংহতির অন্তরায় হিসেবে আইনবিদগণ অর্পিত সম্পত্তি আইনকে চিহ্নিত করেছেন। সাম্প্রদায়িকতার বীজ নিহিত এ আইন কখনোই রাষ্ট্রীয়ভাবে সকলের আনুগত্য দাবি করতে পারে না।

দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে এ বৈষম্যমূলক আইন থেকে অব্যাহতি দেয়ার লক্ষ্যে গত ২০০১ সালের ৮ এপ্রিল অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন পাস হয়। এ আইনের উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো ছিল :

— ১৮০ দিনের মধ্যে প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকা প্রকাশ।
— তালিকা প্রকাশের ৯০ দিনের মধ্যে ট্রাইব্যুনালে আবেদন।
— আবেদন প্রাপ্তির ১৮০ দিনের মধ্যে রায়।
— প্রতি জেলায় কমপক্ষে ১টি ট্রাইব্যুনাল।
— মিথ্যা বললে কিংবা নির্দেশ লঙ্ঘন করলে সর্বোচ্চ ৭ বছরের কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ১ লাখ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিতের বিধান।
— সম্পত্তি ফেরত পাবে অব্যাহতভাবে বাংলাদেশের নাগরিক। স্থায়ী বাসিন্দা কিংবা তাদের উত্তরাধিকারীরা।
— কেবল সরকারের দখলে থাকা দেড় লাখ একর জমি ফেরতযোগ্য।

উপসংহার : সরকারি বলিষ্ঠ ভূমিকার অভাবে এ আইনটির অবস্থাও 'কাজীর গরু গোয়ালে থাকা'র মতোই। 'বিচারের বাণী নিভৃতে কাঁদে'—অর্পিত সম্পত্তি আইনও পরবর্তীতে গৃহীত প্রত্যর্পণ আইন আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে তা-ই দেখিয়ে দেয়।

৩২। 'বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে প্রয়োজন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়ন'–এ উক্তির আলোকে আপনার মতামত প্রদান করুন।

উত্তর : বাংলাদেশ মূলত কৃষিপ্রধান দেশ। শিল্পের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অনগ্রসর। শিল্পের উন্নয়ন ছাড়া শুধু কৃষির ওপর নির্ভর করে কোনো দেশের উন্নয়ন সাধন করা সম্ভব নয়। কিন্তু বাংলাদেশের শিল্প কাঠামো অনুন্নত ও দুর্বল। ব্রিটিশ আমলে এদেশে কোনো শিল্পকারখানা গড়ে ওঠেনি, বরং তারা ঐতিহ্যময় কিছু শিল্প ধ্বংস করে দিয়েছিল। তারপর পাকিস্তানিদের বৈরীমূলক আচরণের কারণে এদেশে বাঙালি উদ্যোক্তারা শিল্প স্থাপনে কোনো বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে পারেনি। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে শিল্পোন্নয়নের চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু তার সুফল পাওয়া যায়নি। বর্তমানে শিল্পোন্নয়নের প্রতি অনেক বেশি উদ্যোগ লক্ষণীয় এবং শিল্পখাত থেকে অতীতের তুলনায় বর্তমানে অনেক বেশি অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন হচ্ছে। নিচে প্রশ্নালোকে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :—

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প : কাঠামোগত দিক বিবেচনা করলে বাংলাদেশের শিল্পসমূহকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়, তার মধ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প অন্যতম। তাই নিচে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :

ক. **ক্ষুদ্র শিল্প :** বাংলাদেশের শিল্প আইন অনুসারে, যে শিল্প কারখানায় শ্রমিকের সংখ্যা ২০ জন বা তার চেয়ে কম তাকে ক্ষুদ্র শিল্প বলা হয়। স্বল্প পুঁজি ও অল্পসংখ্যক শ্রমিক-কর্মচারী নিয়ে এক মালিকানা, অংশীদারি অথবা সমবায়ভিত্তিক শিল্প গড়ে উঠলে তাকে ক্ষুদ্র শিল্প বলে।

ক্ষুদ্র শিল্পের বৈশিষ্ট্য

- ক্ষুদ্র শিল্পের আয়তন কুটির শিল্প অপেক্ষা বড়। অপেক্ষাকৃত ছোট কারখানায় ক্ষুদ্র শিল্প অবস্থিত হয়।
- যে কেউ এককভাবে অথবা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকজন যৌথভাবে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে তুলতে পারে।
- ক্ষুদ্র শিল্পের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার দায়িত্ব পরিবারের মধ্যে বা সদস্যদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না বিধায় তা অপেক্ষাকৃত জটিল প্রকৃতির হয়।
- ক্ষুদ্র শিল্পে মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ ও দামি যন্ত্রপাতির ব্যবহার বেশি হয়।
- ক্ষুদ্র শিল্পে কারিগরি জ্ঞানের প্রয়োগ বেশি।
- ক্ষুদ্র শিল্পে শ্রমিক নিয়োগ হয় চুক্তিভিত্তিক।
- ক্ষুদ্র শিল্পের অধিকাংশই বিদ্যুৎ দ্বারা পরিচালিত হয়।
- ক্ষুদ্র শিল্প কমসংখ্যক শ্রমিক ব্যবহার করে সীমিত পরিমাণ উৎপাদন করে।

বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য ক্ষুদ্র শিল্প

১. **রেশম শিল্প :** রেশম শিল্পের উৎপাদিত রাজশাহী সিল্ক বাংলাদেশে অত্যন্ত সুপরিচিতি লাভ করেছে। এ শিল্প থেকে শাড়ি, চাদর, থানকাপড় প্রভৃতি উৎপাদিত হয়ে থাকে। বর্তমানে পাবনা, বগুড়া ও দিনাজপুরে রেশম চাষ হচ্ছে। বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ সেরিকালচার বোর্ড এ শিল্প উন্নয়নে নিয়োজিত।

২. **চামড়া শিল্প :** বাংলাদেশের সর্বত্র গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়ার চামড়া পাওয়া যায়। এসব চামড়ার সাহায্যে জুতা, ব্যাগ, সুটকেস, বেল্ট ইত্যাদি তৈরি হয়। ঢাকার হাজারীবাগ চামড়ার জন্য বিখ্যাত।

৩. **বিড়ি শিল্প :** বিড়ি বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে অত্যন্ত জনপ্রিয়। কৃষক, শ্রমিক প্রভৃতি মেহনতি মানুষ বিড়ি থেকে ধূমপানের তৃপ্তি লাভ করে। বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র বিড়ি শিল্প গড়ে উঠেছে।

৪. **সাবান শিল্প :** বাংলাদেশের বৃহদায়তন শিল্পের পাশাপাশি ক্ষুদ্র শিল্পের মাধ্যমে সাবান প্রস্তুত হয়ে থাকে।

৫. **লবণ শিল্প :** কুটির শিল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশ বছরে প্রায় ৩ লক্ষ টন লবণ উৎপাদন করে।

৬. **পাট শিল্প :** বৃহদায়তন পাট শিল্প বর্তমানে না গড়ে উঠলেও বাংলাদেশের নানা স্থানে ক্ষুদ্র পাট শিল্প গড়ে উঠেছে।

খ. **মাঝারি শিল্প :** বাংলাদেশের কারখানা আইন অনুযায়ী, যেসব শিল্পে ২০ জনের বেশি কিন্তু ২৩০ জনের কম শ্রমিক নিয়োগ করা হয় তাকে মাঝারি শিল্প বলে। মাঝারি শিল্পগুলো ক্ষুদ্রায়তন ও বৃহদায়তন শিল্পের মাঝামাঝি পর্যায়ে অবস্থান করে। তবে এ ধরনের শিল্প উৎপাদনক্ষেত্রে বৃহদায়তন শিল্পের মতো আধুনিক কারিগরি ও প্রযুক্তিগত কৌশল অবলম্বন করে। বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য মাঝারি শিল্পগুলো হলো :

১. **নাইলন শিল্প :** বাংলাদেশে বৃহৎ শিল্প কারখানার পাশাপাশি মাঝারি শিল্প গড়ে উঠেছে। নাইলন শিল্প দেশের চাহিদা পূরণ করে অতিরিক্ত নাইলন দ্রব্যাদি বিদেশে রপ্তানি করে।

২. **চামড়া শিল্প :** মাঝারি শিল্পের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে চামড়া শিল্প। বাংলাদেশের সর্বত্র গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়ার চামড়া পাওয়া যায় এবং এর দ্বারা জুতা, ব্যাগ ইত্যাদি তৈরি করা হয়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৩. **সিগারেট শিল্প :** বর্তমানে বাংলাদেশে বিড়ির তুলনায় সিগারেটের চাহিদা অনেক বেশি। যার ফলে মাঝারি শিল্পের মধ্যে সিগারেট অন্যতম।

৪. **প্লাস্টিক শিল্প :** জনবহুল বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, সাথে সাথে তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই মাঝারি আকারে দেশের বিভিন্ন জায়গায় প্লাস্টিক শিল্প গড়ে উঠেছে।

৫. **সাবান শিল্প :** মাঝারি শিল্পের মধ্যে সাবান শিল্প অনন্য ভূমিকা পালন করেছে। দেশের বিভিন্ন জায়গায় মাঝারি আকারে সাবান শিল্প গড়ে উঠেছে।

৬. **দিয়াশলাই শিল্প :** মাঝারি শিল্পের মাধ্যমে দিয়াশলাই শিল্প আধুনিক যুগের এক নবতর সৃষ্টি।

বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ভূমিকা : বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষিনির্ভর। দেশের প্রায় ৮০%-৮৫% লোক প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশের কৃষি মৌসুমী বায়ুর প্রভাবাধীন। কৃষকদের এজন্য বছরের অধিকাংশ সময় বেকার থাকতে হয়। মৌসুমী বেকারত্ব ছাড়াও বাংলাদেশের কৃষিতে ছদ্মবেকারত্ব প্রকট রূপ ধারণ করেছে। কৃষিখাতের এসব বাড়তি লোকদের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে নিয়োগ করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজ ত্বরান্বিত করা যায়। বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ভূমিকা নিচে আলোকপাত করা হলো :

১. **কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি :** তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ একটি জনসংখ্যা সমস্যা জর্জরিত দেশ। বর্তমানে দেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৫ কোটি ৫৮ লাখ *[সূত্র : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৪]*। এ বৃহৎ জনসংখ্যার সাথে তাল মিলিয়ে কর্মসংস্থান করা মোটেও সম্ভব হচ্ছে না। দেশে বর্তমানে বেকারের সংখ্যা ৩ কোটিরও ওপরে। এ বিপুল বেকার জনশক্তিকে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের মাধ্যমে উৎপাদনশীল কাজে নিয়োগ করা যায়। ফলে তারা বিপুল পরিমাণ টাকা রোজগার করে জাতীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে।

২. **মহিলাদের কর্মসংস্থান :** বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক মহিলা। মহিলা কর্মশক্তির অধিকাংশই বেকার ও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে তাদের ভূমিকা খুব বেশি নয়। অশিক্ষা ও সামাজিক প্রথা এজন্য দায়ী। কিন্তু বর্তমানে এ সমস্যা অনেকাংশে দূর হয়েছে। ফলে মেয়েরা শিক্ষিত হচ্ছে ও জাতীয় অর্থনীতিতে তারা বিরাট ভূমিকা রাখছে। তাই ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের মাধ্যমে এসব মহিলা দক্ষ কর্মশক্তিকে উৎপাদন কাজে নিয়োগ করে দেশের জাতীয় অর্থনৈতিক শক্তিশালী করা যেতে পারে।

৩. **কৃষকদের অতিরিক্ত আয় সৃষ্টি :** কৃষিনির্ভর এদেশে প্রায় ৮০%-৮৫% লোক প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। কৃষকদেরকে অবসর সময় তাদেরকে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে নিয়োগ করা যেতে পারে। ফলে কৃষকরাও ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের মাধ্যমে তাদের অবসর সময়ে অর্থোপার্জন করার সুযোগ পায়। তাই কৃষির ওপর তাদের নির্ভরশীলতা অনেকাংশে কমে আসে। ফলে জাতীয় অর্থনীতি শক্তিশালী হয়।

৪. **দেশীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার :** বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উপযোগী প্রচুর কাঁচামাল পাওয়া যায়। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার সম্ভব। ফলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাত থেকে প্রচুর পরিমাণ দেশীয় ও বিদেশী মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হয়, যা জাতীয় অর্থনীতিকে আরো শক্তিশালী করে।

৫. **বৈদেশিক মুদ্রা আয় :** ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের মাধ্যমে অধিক বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা যায়। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রচুর চাহিদা রয়েছে বিদেশের মাটিতে। তাই এগুলো বিদেশের বাজারে বিক্রি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা যায়। যা বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিকে আরো শক্তিশালী করে।

৬. **বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় :** ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানি করে যেমন প্রচুর পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যায়, তেমনি এ শিল্প প্রসারে বিদেশ থেকে আমদানির পরিমাণ হ্রাস পায়। ফলে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় ঘটে যা দেশের জাতীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে সহায়তা করে।

৭. **মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস :** বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। এখানে চাহিদার তুলনায় যোগান কম। তাই ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের মাধ্যমে ভোগ্যপণ্যের যোগান বাড়ানো সম্ভব। এতে মুদ্রাস্ফীতি অনেকাংশে হ্রাস পায়। যার ফল গিয়ে পড়ে দেশের জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের ওপর।

৮. **সুষম উন্নয়ন :** বৃহৎ শিল্প ও কলকারখানাগুলো অধিকাংশই শহরে প্রতিষ্ঠিত হয়। যার কারণে গ্রাম্য উন্নয়ন সেই তুলনায় হয় না বললেই চলে। কিন্তু যদি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলো গ্রামে প্রতিষ্ঠা করা হয় তবে গ্রামেরও উন্নয়ন হবে। অবকাঠামোগত উন্নয়ন হলে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী সহজে সরবরাহ করা যায়। ফলে দেশের অর্থনীতি শক্তিশালী হয়।

৯. **জাতীয় আয় বৃদ্ধি :** বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে হলে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। বাংলাদেশের জাতীয় আয়ে শিল্পের অবদান কম নয়। তার মধ্যে বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প অন্যতম। তাই ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিপ্লব ঘটাতে হবে। যার ফলে দেশের জাতীয় আয়ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে এবং দেশের অর্থনীতির চাকা আরো দৃঢ় হবে।

১০. **দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন :** দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় আয় ও অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় বৃদ্ধি করে শিল্প দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করে থাকে। ফলে দ্রুত ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়ন ঘটিয়ে অতি দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব।

১১. **স্থিতিশীল অর্থনীতি :** শিল্পনির্ভর অর্থনীতি অনেক স্থিতিশীল হয়ে থাকে। শিল্প কৃষির মতো প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল নয়। সুতরাং অর্থনীতিকে অনিশ্চয়তা ও অস্থিতিশীলতার হাত থেকে রক্ষা করতে হলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নে গুরুত্ব দেয়া উচিত।

১৩. **বৈদেশিক নির্ভরশীলতা হ্রাস :** কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের প্রয়োজনীয় শিল্পসামগ্রী বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। দেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি পেলে বিদেশের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস পাবে এবং স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ে উঠবে; দেশের প্রয়োজনীয় মৌলিক দ্রব্যাদি এবং মূলধন সামগ্রী দেশেই উৎপাদিত হবে। ফলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা শক্তিশালী হবে।

১৪. **বৈদেশিক বাণিজ্যের লেনদেনে ভারসাম্য রক্ষা :** বাংলাদেশ প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ শিল্পদ্রব্য আমদানি করে থাকে। ফলে লেনদেন ভারসাম্য সব সময়েই বাংলাদেশের প্রতিকূলে থাকে। বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোন্নয়ন হলে রপ্তানির পরিমাণ ও রপ্তানি আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যের লেনদেন ভারসাম্য অনুকূলে আসবে। যার কারণে দেশের অর্থনীতি শক্তিশালী হবে।

১৫. **কৃষির ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস :** বাংলাদেশের অর্থনীতি প্রধানত কৃষিনির্ভর। কিন্তু শিল্পোন্নয়ন ঘটলে কৃষির উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস পাবে এবং এর ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। এমনকি বাংলাদেশের অর্থনীতি শক্তিশালী হবে।

বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়ন : উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। এ দেশটি মূলত কৃষিনির্ভর। কৃষিনির্ভর হওয়া সত্ত্বেও শিল্পখাতও একটি সম্ভাবনাময় খাত। শিল্পখাত দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে বিরাট ভূমিকা পালন করে থাকে। বাংলাদেশের অতীতের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, এদেশে একসময় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে বিপ্লব ঘটেছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে এসে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের পরিবর্তে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নতি সাধিত হয়েছিল। বর্তমানেও ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী ও মজবুত করতে এর ভূমিকা অনন্য। এ খাতটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি খাত। সাধারণ মানুষ কিংবা মধ্যবিত্ত পরিবারগুলো এখাতে শ্রম ও যোগান দিতে খুবই আগ্রহী। কারণ কম বিনিয়োগ, কম শ্রমিক ও শ্রম দিয়ে বেশি ফল পাওয়া সম্ভব। যার কারণে সাধারণ মানুষ এই ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের দিকে আস্তে আস্তে ঝুঁকে পড়ছে। কারণ এটি একটি সম্ভাবনাময় খাত। এ খাত থেকে বিপুল পরিমাণ উৎপাদন ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনয়ন করা সম্ভব। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নে অনেক সমস্যা রয়েছে। তারপরও কিছু সম্ভাবনা রয়েছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে কিছু বাস্তবিক পদক্ষেপ ও সুপারিশমালা গ্রহণ করা যেতে পারে। নিচে তা আলোকপাত করা হলো :

১. উৎপাদন পদ্ধতির আধুনিকায়ন করা;
২. পর্যাপ্ত মূলধন সরবরাহ;
৩. সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা;
৪. কাঁচামালের পর্যাপ্ত যোগান নিশ্চিতকরণ;
৫. বৃহদায়তন শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতার অবসান;
৬. কারিগরদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা;
৭. উৎপন্ন দ্রব্যের মান নির্ধারণ;
৮. বাজার ব্যবস্থার উন্নয়ন;
৯. দালালি প্রথার অবসান;
১০. যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন;
১১. রপ্তানি উন্নয়ন;
১২. গবেষণা;
১৩. সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ;
১৪. পরিপূরক শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠা;
১৫. শিল্প সংরক্ষণ;
১৬. শক্তিসম্পদ ব্যবহার;
১৭. প্রচার ও বিজ্ঞাপন;
১৮. দেশীয় পণ্য ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ;
১৯. স্বল্প সুদে ঋণ দান।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করতে বিরাট ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমানে প্রতিযোগিতার বাজারে বৃহদায়তন শিল্পের পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এক অন্যতম সম্ভাবনাময় খাত। দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নে রয়েছে অসংখ্য সমস্যা ও প্রতিকূলতা। তা সত্ত্বেও এ খাতকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে পেশকৃত সুপারিশমালা অবলম্বন করলে হয়ত দেশের এ শিল্প খাতটি একটি অনন্য ভূমিকা রাখবে। আমরা একথা বলতে পারি যে, দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ভূমিকা ও উন্নয়ন অবশ্যম্ভাবী।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৩৩। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে দুর্নীতি কিভাবে বাধাগ্রস্ত করছে? দুর্নীতি দূরীকরণে কি ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণযোগ্য বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর : সমস্যা আর সম্ভাবনা—এ দুটি প্রত্যয় আমাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই সমভাবে বিদ্যমান। আমাদের চারপাশে তাকালে যেমন অগণিত সমস্যার পাহাড় চোখে পড়ে, তেমনি দেশী-বিদেশী চিন্তাবিদ আর বিশেষজ্ঞদের কাছে আমাদের উন্নয়নের সম্ভাবনার কথাও অহরহই শোনা যায়। উন্নয়ন, সুশাসন, গণতন্ত্র আর মানবাধিকারের মতো সুবচন যেমন আমাদের চোখে আশার আলো জ্বালায়, তেমনি দুর্নীতি, দারিদ্র্য, সন্ত্রাস, অশিক্ষা আর অসাম্যের মতো জটিল জাতীয় সমস্যা আমাদেরকে অন্ধকারে নিক্ষেপ করে। কিন্তু সমস্যা আর সম্ভাবনার প্রতিটি ক্ষেত্রেই আজ যে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উচ্চারিত হয় তা হলো দুর্নীতি। দুর্নীতি আজ আমাদের জাতীয় জীবনের এক অনিবার্য অনুষঙ্গ। বিশেষ করে জাতীয় উন্নয়নের পথে দুর্নীতির নেতিবাচক প্রভাবের বিষয়ে বিতর্ক নেই বললেই চলে।

দুর্নীতি ও উন্নয়নের আন্তঃসম্পর্ক : দুর্নীতি ও উন্নয়নের সম্পর্ক আপাতবিরোধী। একদিকে ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড দুর্নীতির ক্ষেত্র প্রস্তুত করে, অন্যদিকে ব্যাপক দুর্নীতির ফলে উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়।

প্রথমত, উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য যে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রবাহ জাতীয় অর্থনীতিতে যুক্ত হয় তাতে সংশ্লিষ্ট আমলা, রাজনীতিবিদসহ অনেক স্বার্থবাদী গোষ্ঠী দুর্নীতির নতুন নতুন ক্ষেত্র খুঁজে পায়। বিশেষ করে উন্নয়নের পথে অগ্রসরমান তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতেই এ প্রবণতা বেশি দেখা যায়। এক্ষেত্রে বৈদেশিক সাহায্য এবং ঋণই উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অর্থ যোগানের অন্যতম উৎস।

দ্বিতীয়ত, উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতির ফলে সরকারি অর্থের ব্যাপক অপচয়ের কারণে উন্নয়নের মূল কার্যই বাকি থেকে যায়। যে পরিমাণ অর্থ উন্নয়নের জন্য দেশী-বিদেশী উৎস থেকে বরাদ্দ থাকে তার সিকি ভাগও সফলভাবে ব্যবহৃত হয় না। এক্ষেত্রে সাম্প্রতিককালে সরকারের বিকল্প হিসেবে দাতারা এনজিওগুলোকে ব্যাপক বরাদ্দ দিলেও তাদের কার্যক্রমেও ব্যাপক দুর্নীতি আজ সুস্পষ্ট।

এখন প্রশ্ন হলো, তাহলে কি দুর্নীতির হাত থেকে জাতিকে বাঁচানোর জন্য উন্নয়ন কর্মকাণ্ডই বন্ধ রাখা হবে নাকি দুর্নীতিসহ উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে? কেননা উন্নয়নে দুর্নীতির প্রভাব নিয়েও বিতর্ক রয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে অনেক মার্কিন বিশেষজ্ঞ মনে করতেন যে, দুর্নীতি উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করে, প্রশাসনকে উন্নয়ন বিষয়ে চাঙ্গা করতে সহায়তা করে। অপরদিকে একদল মনে করেন যে, দুর্নীতি অর্থনৈতিক উন্নয়নকে নানাভাবে বাধাগ্রস্ত করে। বিশেষ করে দুর্নীতির ফলে সরকারি উন্নয়ন বরাদ্দের অপব্যবহার, অর্থপাচার, বিনিয়োগে ও শিল্পায়নে জটিলতা ও খরচ বৃদ্ধির ফলে বিনিয়োগে নিরুৎসাহ, দুর্নীতির ফলে দাতাদের শ্যেনদৃষ্টি প্রভৃতি উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে কেবল স্থবিরই করে না, বরং জাতীয় অর্থনীতির নিম্নগতিকে ত্বরান্বিত করে।

তবে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় এ বিষয়ে আজ ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, দুর্নীতি কমানোর জন্য যেমন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বন্ধ রাখা যাবে না, তেমনি ব্যাপক দুর্নীতির ব্যাপারে নিশ্চুপ থেকে জাতীয় উন্নতি ঘটানো যাবে না। বরং উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার পাশাপাশি দুর্নীতি দমন ও মুক্তকরণের জন্য সরকারি, বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাংলাদেশে দুর্নীতির বিস্তার ও উন্নয়নের গতিধারা : বাংলাদেশের উন্নয়ন চিন্তা ও পরিকল্পনায় এবং বিশেষজ্ঞ আলোচনায় দুর্নীতির বিষয়টি বর্তমানে খুব জোরেশোরে আলোচিত হচ্ছে। প্রতিদিন পত্রিকার পাতা খুললেই দুর্নীতির নানা খতিয়ান আর ঘটনা চোখে পড়ে। বাংলাদেশের রাষ্ট্র ও সমাজের এমন কোনো ক্ষেত্র নেই যেটি দুর্নীতিমুক্ত। দুর্নীতির এ ভয়াবহতা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে স্থবিরতা ও বিশৃঙ্খলার বিষয়ে আলোচনায় বিশেষজ্ঞরা দুর্নীতিকে উন্নয়নের অন্যতম প্রতিবন্ধক হিসেবেই চিহ্নিত করেন। দুর্নীতির অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমাণ ও ভয়াবহতাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার আর কোনো সুযোগ আমাদের হাতে নেই। বাংলাদেশের দুর্নীতি এতই বিস্তৃত যে, কোথায় কোথায় দুর্নীতি হয় তার খতিয়ান দেয়ার চেয়ে কোথায় কোথায় দুর্নীতি হয় না তার উত্তর দেয়াই শ্রেয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, দুর্নীতি থেকে রাষ্ট্র ও সমাজকে মুক্ত করার জন্য কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ তেমন চোখে পড়ে না। বরং সভা-সমিতি আর সেমিনারে বক্তৃতা দানের মধ্যে দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রম সীমিত। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য হরহামেশা নানা পরিকল্পনা, কর্মসূচি আর বিবৃতি চোখে পড়লেও দুর্নীতি যে উন্নয়নকে কিভাবে গ্রাস করছে সে বিষয়ে উৎকণ্ঠার বহিঃপ্রকাশ কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় না। অথচ দুর্নীতি আমাদের জাতীয় উন্নয়ন ও অর্থনীতির প্রতিটি ক্ষেত্রকেই গ্রাস করে ফেলেছে। যেমন—

ক. **দুর্নীতি ও প্রবৃদ্ধি :** দুর্নীতি বাংলাদেশের উচ্চতর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পথে অন্যতম অন্তরায়। দেশীয় অর্থনীতির বিভিন্ন খাত যেমন—কৃষি, শিল্প, ব্যাংকসহ অন্যান্য আর্থিক খাতের দুর্নীতি দেশজ উৎপাদনকে নানাভাবে বাধাগ্রস্ত করে থাকে। বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশে দুর্নীতি বিষয়ে এক গবেষণা প্রতিবেদনে (Corruption in Bangladesh : Costs and Cures) বলেছে, বাংলাদেশের দুর্নীতির ব্যাপকতা রোধ করা গেলে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি ২-৩ শতাংশ বেড়ে যেত এবং মাথাপিছু আয় দ্বিগুণ হতো। এমনকি বিশেষজ্ঞরা দাবি করেন যে, দুর্নীতির ফলে যে অর্থ অপচয় হয় তা উন্নয়নে ব্যয় করা গেলে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি হতো ৪ শতাংশ বেশি। সুতরাং অনায়াসেই বলা যায় যে, দুর্নীতি রোধ করা গেলে বাংলাদেশ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উদীয়মান অর্থনৈতিক শক্তিগুলোর সাথে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে পারতো।

খ. **দুর্নীতি ও বিনিয়োগ :** দুর্নীতি দেশী-বিদেশী বিনিয়োগের পথেও একটি অন্যতম বাধা। ইতিপূর্বে এডিবি (Asian Development Bank) এবং ইইউ (European Union) বাংলাদেশকে এই বলে সতর্ক করে দিয়েছে যে, দুর্নীতি, অস্বচ্ছতা আর আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে বাংলাদেশ পর্যাপ্ত পরিমাণ বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে পারছে না। এক হিসাবে দেখা গেছে, একটি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি স্থাপনের জন্য প্রাথমিকভাবে যে দাপ্তরিক খরচ হয়, দুর্নীতির ফলে এক্ষেত্রে শতকরা ৩৫০ ভাগ খরচ বেশি হয় এবং এক্ষেত্রে দুর্নীতির শতকরা ৬০ ভাগই ঘুষ। ফলে প্রচুর সুযোগ-সুবিধা আর কাগুজে ঘোষণা সত্ত্বেও প্রশাসনিক হয়রানি এবং অতিরিক্ত খরচের ভয়ে বিনিয়োগকারীরা উৎসাহিত হয় না।

দুর্নীতি ও দারিদ্র্য বিমোচন : দুর্নীতি এবং দারিদ্র্য আমাদের জাতীয় জীবনের দুটি সমবর্তী সমস্যা। দারিদ্র্য অনেক ক্ষেত্রে দুর্নীতিকে সহায়তা করছে আবার দুর্নীতির ফলে আমরা দারিদ্র্যের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আসতে পারছি না। দুর্নীতি পদে পদে দারিদ্র্য বিমোচনের সরকারি-বেসরকারি নানাবিধ প্রয়াসকে বাধাগ্রস্ত করছে। এমনকি আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি যেটুকু হচ্ছে তাও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছুচ্ছে না। দুর্নীতিবাজ আমলা, রাজনীতিবিদ, এনজিও কর্মকর্তা ও ধনকুবেরদের যোগসাজশে তা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নাগালের বাইরেই থেকে যায়। অথচ দুর্নীতির ফলে যে অর্থ অপচয় হয় তা যদি দারিদ্র্য বিমোচনে সঠিকভাবে কাজে লাগানো যেত তাহলে কয়েক বছরেই দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব হত। এক সূত্র মতে, দুর্নীতির কারণে প্রতি বছর গড়ে ১২০০০ কোটি টাকা ক্ষতি হয়। প্যারিসে বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরামের বৈঠকে বিশ্বব্যাংক

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

'Progress in Poverty Reduction' নামে যে নিবন্ধ উপস্থাপন করে তাতে বলা হয়, বাংলাদেশকে ২০১৫ সালের মধ্যে Millennium Development Goals অনুযায়ী দারিদ্র্যকে অর্ধেকে নামিয়ে আনার লক্ষ্য অর্জনের জন্য সুশাসন ও দুর্নীতিবিরোধী অভিযানে অবশ্যই সফলতা অর্জন করতে হবে।

দুর্নীতি ও মানব উন্নয়ন : মানব উন্নয়নে বাংলাদেশের অবস্থান এখনো দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সর্বনিম্ন। অর্থনীতির কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সফলতা অর্জন করলেও উন্নয়নের সামাজিক নির্ধারক যেমন—শিশুশ্রম, প্রসূতি মৃত্যুর হার, অপুষ্টি, বয়স্ক শিক্ষা এবং শিক্ষার গুণগত মানের দিকে থেকে অন্যান্য নিম্ন আয়ের দেশগুলোর তুলনায় দুর্বল অবস্থানেই রয়েছে। বাংলাদেশের এ অবস্থানের পেছনে দুর্নীতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কেননা স্বাস্থ্য, শিক্ষাসহ মানব উন্নয়নের বিভিন্ন খাতে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে যে অর্থ এসেছে তা যদি সঠিকভাবে ব্যবহৃত হতো তাহলে বাংলাদেশের অবস্থান এমন থাকার কথা নয়। বাংলাদেশে যে পরিমাণ বৈদেশিক সাহায্য এসেছে এর ২৫ ভাগের মতো সুষ্ঠুভাবে ব্যবহৃত হতে পেরেছে। বাকি ৭৫ ভাগই দুর্নীতিবাজরা আত্মসাৎ করেছে। টিআইবি প্রণীত করাপশন ডাটাবেজ রিপোর্টে দেখা যায়, সংখ্যাগত বিচারে সর্বাধিক দুর্নীতিগ্রস্ত খাত পুলিশ। এরপর যথাক্রমে স্থানীয় সরকার, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ খাত। আর আর্থিক বিচারে সর্বাধিক দুর্নীতিগ্রস্ত খাত যোগাযোগ, এরপর রয়েছে যথাক্রমে খাদ্য এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর খাত। সুতরাং এমতাবস্থায় দেশে মানব উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার চিন্তা করাই বোকামি।

দুর্নীতি দূরীকরণে করণীয় : দুর্নীতির এ মহামারির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অনেক বিশেষজ্ঞ ও চিন্তাবিদ ইতিমধ্যে অনেক সুপারিশ ও পরামর্শ দিয়েছেন। এগুলোর মধ্যে যেগুলো অত্যাবশ্যক তা হলো :

প্রথমত, দুর্নীতি দমনের ব্যাপারে আমাদের রাজনীতিবিদদের কঠোর ও প্রতিশ্রুতিশীল হতে হবে। দুর্নীতি যে দল-মত নির্বিশেষে একটি জাতীয় সমস্যা এটা যতদিন পর্যন্ত তারা অনুভব করতে না পারবেন, ততদিন দুর্নীতি দমন অসম্ভব।

দ্বিতীয়ত, পুলিশ বাহিনী ও দুর্নীতি দমন কমিশনকে আরও কার্যকর ও শক্তিশালী করতে হবে। ২০০৪ সালে একটি স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠিত হলেও একে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করার বিষয়টি অবশ্যই সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করতে হবে।

তৃতীয়ত, দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের বিচারের ব্যাপারে ত্বরিৎ সিদ্ধান্ত নিতে এবং তাদেরকে অপসারণ করতে হবে। এক্ষেত্রে বিচার প্রক্রিয়া দ্রুততর করা অত্যাবশ্যক।

চতুর্থত, সরকারি আইনজীবী ও পুলিশ বাহিনীর সদস্যদেরকে দুর্নীতির বিষয়ে যথাযথ প্রশিক্ষণ দিতে হবে। পাশাপাশি তাদের চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে বেতন-ভাতা বৃদ্ধির বিষয়টি সক্রিয়ভাবে বিবেচনায় আনতে হবে।

পঞ্চমত, দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনগণকে সজাগ করে গড়ে তোলার জন্য সামগ্রিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রচার মাধ্যম, সুশীল সমাজ ও শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দুর্নীতিবাজদের সামাজিকভাবে বয়কট করার মতো কঠোর সিদ্ধান্ত নেয়ার মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে হবে। এজন্য মূল্যবোধ বিনির্মাণের বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ।

উপসংহার : দুর্নীতির মূলোৎপাটনের জন্য রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ও দলীয় দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আবশ্যক। বিরোধী দলের ওপর দুর্নীতির দায়ভার চাপিয়ে সরকারি দলের দুর্নীতি চলতে থাকলে দুর্নীতি দমন আশা করা যায় না। এছাড়া সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দলীয় সম্পৃক্ততা বিচ্ছিন্ন করতে না পারলে দলীয় সরকারের পক্ষে তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের আশা করা যায় না। সুতরাং দুর্নীতিবাজদের রাজনৈতিক পরিচয় বাদ দিয়ে যদি আমরা তাদেরকে কেবল দুর্নীতিবাজ বলেই চিহ্নিত করতে পারি, কেবল তখনই তাদের ভিত নাড়ানো সম্ভব।

৩৪ । বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে বেসরকারি বিনিয়োগকে কেন এত গুরুত্ব দেয়া হয়? এরূপ বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ আলোচনা করুন।

উত্তর : একটি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য বেসরকারি বিনিয়োগ একান্ত অপরিহার্য। বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ অর্থাৎ মাথাপিছু আয় কম, তাই এদেশের জন্য বেসরকারি বিনিয়োগ আবশ্যক। কেননা এই বিনিয়োগই পারে দেশের অর্থনৈতিক চাকাকে সচল করতে। তাই এর গুরুত্বও অপরিসীম। বিনিয়োগের সাথে উন্নয়নের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। কেননা এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত হয় নতুন নতুন প্রযুক্তি, সৃষ্টি হয় কর্মসংস্থান এবং ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়। স্বাধীনতা পরবর্তী প্রতিটি সরকারই বিনিয়োগের প্রতি বেশ গুরুত্বারোপ করেছে। বেসরকারি বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকার কর্মসূচি গ্রহণ করা যায়। যার ফলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়। পরনির্ভরশীল অর্থনীতি থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলার জন্য বিনিয়োগের বিকল্প নেই। এছাড়াও বর্তমান মুক্তবাজার অর্থনীতির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য বিনিয়োগের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রশ্নালোকে নিচে এর বিস্তারিত আলোকপাত করা হলো :

বেসরকারি বিনিয়োগ : মুক্তবাজার অর্থনীতিতে বেসরকারি খাত চলমান অর্থনৈতিক গতিকে সমুন্নত রাখতে সহায়ক চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে আসছে। অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণের নিমিত্তে সরকার বেসরকারি বিনিয়োগের প্রতি অত্যধিক গুরুত্বারোপ করছে, বর্তমান জাতীয় অর্থনীতিতে মোট বিনিয়োগের প্রায় ৭৭ শতাংশ বেসরকারি খাত থেকে আসছে, যা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখছে।

বেসরকারি বিনিয়োগের গুরুত্ব : অর্থনৈতিক চাকাকে সচল রাখার জন্য বিনিয়োগের কোনো বিকল্প নেই। তার মধ্যে বেসরকারি বিনিয়োগ অত্যধিক গুরুত্বের দাবিদার। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে বেসরকারি বিনিয়োগের গুরুত্ব নিম্নরূপ :

১. **প্রবৃদ্ধি বাড়ানোর জন্য :** অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বলতে আমরা বুঝি কোনো দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়ানোর জন্য বেসরকারি বিনিয়োগের কোনো বিকল্প নেই। কারণ বেসরকারি বিনিয়োগ যত বেশি হবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিও তত বৃদ্ধি পাবে।

২. **কর্মসংস্থানের সৃষ্টি :** বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ, তাই এখানে সরকারিভাবে কর্মসংস্থানের অনেক অভাব রয়েছে। এই জনসংখ্যা বহুল দেশের মানুষের তুলনায় কর্মসংস্থানের পরিমাণ অত্যন্ত সামান্য। যার ফলে এদেশে বেকারত্বের হার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেক্ষেত্রে বেসরকারি বিনিয়োগ যত বেশি বৃদ্ধি পাবে ততই এদেশে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে। ইতোমধ্যে আমাদের দেশে বিভিন্ন মোবাইল কোম্পানি কিংবা বেসরকারি ব্যাংক বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে আমাদের দেশের অনেক জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, যা একমাত্র বেসরকারি বিনিয়োগের ফলেই সম্ভব হয়েছে। বেসরকারি বিনিয়োগ না হলে হয়ত এত মানুষের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হতো না। তাই কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যেও বেসরকারি বিনিয়োগের গুরুত্ব অপরিসীম।

৩. **মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি :** বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৪ অনুসারে বর্তমানে বাংলাদেশে মানুষের মাথাপিছু আয় ১,১৯০ মার্কিন ডলার। কিন্তু আমরা যদি একটু পিছনের দিকে ফিরে তাকাই তাহলে দেখব তখনকার GDP বর্তমানের তুলনায় অনেকাংশেই কম ছিল কারণ তখন বেসরকারি বিনিয়োগের পরিমাণও ছিল অনেক কম, যার ফলে মাথাপিছু আয়ও কম ছিল। বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ করতে অনেকেই আগ্রহী। কারণ এখানে জটিলতা কম থাকে। যার ফলে বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ বিনিয়োগ বৃদ্ধির সাথে সাথে এর প্রভাব পড়ে দেশের GDP-এর ওপরে। দেশের GDP যত বেশি হবে বিদেশী বিনিয়োগও তত বেশি আকৃষ্ট হবে। তাই আমরা বলতে পারি যে, বাংলাদেশের GDP কিংবা মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির জন্য বেসরকারি বিনিয়োগের গুরুত্ব অনেক বেশি।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৪. **বিদেশী বিনিয়োগকারীদের জন্য সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি :** অর্থনৈতিক চাকা সচল রাখার জন্য বিদেশী বিনিয়োগের গুরুত্ব কোনো অংশে কম নয়। কোনো দেশে বিদেশী বিনিয়োগ তখনই বৃদ্ধি পায় যখন দেশীয় বা বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়। বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি না পেলে বৈদেশিক বিনিয়োগও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। বেসরকারি বিনিয়োগের প্রতি আকৃষ্ট হয়েই মূলত বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়। বেসরকারি বিনিয়োগের মাধ্যমে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের জন্য সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করতে হবে। তাই আমরা বলতে পারি, বিদেশী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বেসরকারি বিনিয়োগের গুরুত্ব অপরিসীম।

৫. **মুদ্রাস্ফীতি কমানোর তাগিদ :** বেসরকারি বিনিয়োগ যত বেশি হবে মুদ্রাস্ফীতি ততই কমে আসবে। মানুষের হাতে যদি টাকা থাকে কিন্তু নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস না পায় অথবা টাকার তুলনায় জিনিসপত্র পর্যাপ্ত না হয় তাহলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা যায়। বাংলাদেশে বিভিন্ন বেসরকারি খাতে বিনিয়োগের ফলে আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র থেকে শুরু করে সমস্ত জিনিস পেতে পারি। কিন্তু যদি বেসরকারি বিনিয়োগ না থাকে তবে আমাদের দেশে মুদ্রাস্ফীতি প্রকটভাবে বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। অতএব মুদ্রাস্ফীতি কমানোর লক্ষ্যে বেসরকারি বিনিয়োগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৬. **শিল্পায়ন সৃষ্টি করার নিমিত্তে :** বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বর্তমানে যে বিষয়টিতে গুরুত্বারোপ করার দরকার তা হচ্ছে শিল্পায়ন। শিল্পায়ন ছাড়া কোনো দেশ সমৃদ্ধশালী হতে পারে না। আর বেসরকারি বিনিয়োগের অধিকাংশই শিল্প খাতে বিনিয়োগ করতে দেখা যায়। যার ফলে শিল্পায়ন বৃদ্ধি পায়, কর্মসংস্থানও বৃদ্ধি পায়। অতএব শিল্পায়নের ক্ষেত্রে বেসরকারি বিনিয়োগের গুরুত্ব অপরিসীম।

৭. **বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি :** কোনো দেশে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ যত বেশি পরিমাণ থাকে ততই বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়। বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের ফলে বাংলাদেশ ইচ্ছা করলে বিদেশে কোনো বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ করার সুযোগ পায়। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ যত বেশি হবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তত বৃদ্ধি পাবে। তাই বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের জন্য বেসরকারি বিনিয়োগ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে এবং এর গুরুত্ব অপরিসীম।

৮. **মুক্তবাজার অর্থনীতিতে টিকে থাকা :** বিশ্বায়নের যুগে মুক্তবাজার অর্থনীতি অন্যতম চ্যালেঞ্জ। তাই মুক্তবাজার অর্থনীতিতে টিকে থাকার জন্য বিনিয়োগের কোনো বিকল্প নেই। বিনিয়োগ যদি কমে যায় তাহলে মুক্তবাজারে টিকে থাকা সম্ভব নয়। তাই মুক্তবাজার অর্থনীতিতে টিকে থাকার জন্য বেসরকারি বিনিয়োগের গুরুত্ব অত্যধিক।

৯. **অর্থনৈতিক চাকা সচল করার জন্য :** দেশের অর্থনৈতিক চাকা সচল রাখার জন্য বেসরকারি বিনিয়োগের ভূমিকা অন্যতম। বিনিয়োগ না হলে অর্থনীতি স্থবির হয়ে পড়ে। ব্যক্তি কিংবা কোনো কোম্পানি বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ করে যার মাধ্যমে দেশের অর্থনীতি সচল থাকে। তাই অর্থনৈতিক চাকা সচল করার জন্য বেসরকারি বিনিয়োগের গুরুত্ব কোনো অংশে কম নয়।

১০. **সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন :** বাংলাদেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের যেসব কারণ আছে বিনিয়োগ তার মধ্যে অন্যতম প্রধান ভূমিকা পালন করে। বেসরকারি বিনিয়োগের ফলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ইত্যাদি সব কিছুই অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করে। আর এই উন্নয়ন একমাত্র বেসরকারি বিনিয়োগের ফলেই সম্ভব, তাই এর গুরুত্ব অপরিসীম।

১১. **দারিদ্র্য হ্রাস করা :** বাংলাদেশের প্রায় ৪০% লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। বেসরকারি বিনিয়োগের ফলে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী পায় বিভিন্ন প্রকার সাহায্য সহযোগিতা এবং কিছু মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও হয়ে থাকে। ফলে দেশের দারিদ্র্য আস্তে আস্তে হ্রাস পেতে থাকে। অতএব আমরা বলতে পারি, বাংলাদেশের দারিদ্র্য মোচনের লক্ষ্যে বেসরকারি বিনিয়োগের গুরুত্ব অপরিসীম।

বিগত কয়েক বছরে বেসরকারি বিনিয়োগের চিত্র

অর্থবছর	বেসরকারি বিনিয়োগ (কোটি টাকায়)
২০০৬-০৭	৮৯,৮৬২
২০০৭-০৮	১,০৫,০৯০
২০০৮-০৯	১,২০,৯৪২
২০০৯-১০	১,৩৪,৬৯১
২০১০-১১	১,৫৫,৪৪৪
২০১১-১২	১,৮৪,০৩৬
২০১২-১৩	১,৯৭,১২৭
২০১৩-১৪	২,৮৮,৯১১

[সূত্র : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো]

বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহ : দেশে যাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায় এবং বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগে ব্যাপক আকৃষ্ট হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় নানা ধরনের পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। পদক্ষেপগুলো নিচে আলোকপাত করা হলো :

১. **সুদের হার কমানো :** বেসরকারি খাতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ঋণের চাহিদা অনেক বেশি। চাহিদা অনুপাতে সুদের হার বেশি। সুতরাং দেশের বৃহত্তর স্বার্থে বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগের প্রতি আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে সুদের হার কমানো উচিত। সুদের হার যত কম হবে বেসরকারি খাতে বিনিয়োগের পরিমাণ তত বৃদ্ধি পাবে। তাই সুদের হার কমিয়ে বিনিয়োগের প্রতি উৎসাহিত করতে হবে।

২. **ব্যাংক ঋণ :** বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের সবচেয়ে বড় সাফল্য ব্যাংক ঋণ। বেসরকারি বিনিয়োগকারীরা যাতে অতি সহজে ব্যাংক ঋণ পেতে পারে তার সুব্যবস্থা করতে হবে। সরকারি ব্যাংকে অনেক সময় দীর্ঘসূত্রিতা লক্ষ্য করা যায়, তাই বেসরকারি কিংবা বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো থেকে যাতে অতি দ্রুত উদ্যোক্তারা ব্যাংক ঋণ পেতে পারে তার নিশ্চয়তা দিতে হবে।

৩. **অবকাঠামোগত সুবিধা প্রদান :** বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার অন্যতম পদক্ষেপ হচ্ছে দেশের অবকাঠামোগত সুবিধা প্রদান করা। বিনিয়োগ আকর্ষণের লক্ষ্যে অবকাঠামোগত সকল সুযোগ-সুবিধার নিশ্চয়তা দিতে হবে। দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন যত বেশি উন্নত এবং ভালো হবে ততই বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগের প্রতি আকৃষ্ট হবে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৪. **বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা :** বেসরকারি বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য বিদ্যুৎ ঘাটতি কমাতে হবে। বিদ্যুৎ ঘাটতি থাকলে বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগের প্রতি উৎসাহ পাবে না। অতএব বেসরকারি বিনিয়োগকারীরা যাতে বিনিয়োগে আগ্রহী হয় তার জন্য বিদ্যুৎ সরবাহ নিশ্চিত করতে হবে।

৫. **রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা :** দেশে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বিরাজ করার কারণে বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগে উৎসাহিত হয় না। বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ কম হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হলো রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাব। স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা কমই বিরাজ করেছে, যার ফলে বেসরকারি বিনিয়োগও কম হয়েছে। অতএব বেসরকারি বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে হবে।

৬. **শুল্কমুক্ত বাজার সুবিধা :** বেসরকারি বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের মধ্যে অন্যতম হলো শুল্কমুক্ত বাজার সুবিধা প্রদান করা। বেসরকারি বিনিয়োগ করার ফলে অনেক সময় বিদেশ থেকে দ্রব্যসামগ্রী আনতে হয়, ফলে তাদেরকে কর দিতে হয়। সুতরাং বেসরকারি বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য শুল্কমুক্ত বাজার সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।

৭. **বিনিয়োগ বোর্ডের ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু :** বেসরকারি বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য বিনিয়োগ বোর্ডের ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ এবং একে শক্তিশালীও করা উচিত। এই ওয়ান স্টপ সার্ভিস বিনিয়োগের সকল নিয়ম নীতি প্রণয়ন করে তা সমানভাবে প্রয়োগ করবে এবং সময় ও বাস্তবতার সাথে মিল রেখে তা পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করবে। বেসরকারি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বোর্ড কর্তৃক যে কমিটি থাকবে তা সব নিয়মনীতি প্রণয়ন করবে।

৮. **উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা :** বিনিয়োগ আকর্ষণের অন্যতম দিক হচ্ছে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা। কারণ কোনো দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা যত বেশি উন্নত সে দেশে বিনিয়োগও তত বেশি। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করা যায়। তাই যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করে বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে।

৯. **শর্তহীন বিনিয়োগ :** বিনিয়োগ ছাড়া অর্থনীতি স্থবির হয়ে পড়বে। তাই বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য অনেক বেশি উদার হতে হবে। খুব বেশি শর্তারোপ করলে বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগে উৎসাহী হবে না। সুতরাং বেসরকারি বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য শর্তারোপ করা যাবে না।

১০. **সরকারি সহযোগিতা ও আন্তরিকতা :** বেসরকারি বিনিয়োগ আকর্ষণের ক্ষেত্রে সরকারকে অনেক বেশি আন্তরিক হতে হবে। সরকারি সহযোগিতা না পেলে বেসরকারি বিনিয়োগ আকৃষ্ট হবে না। তাই বেসরকারি বিনিয়োগ আকর্ষণের লক্ষ্যে সরকারকে অনেক বেশি সহযোগী ও আন্তরিক হতে হবে।

১১. **প্রযুক্তির উন্নয়ন নিশ্চিত রাখা :** বর্তমান প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে প্রযুক্তির উন্নয়ন ছাড়া কোনো প্রকার উন্নয়ন সম্ভব নয়। বেসরকারি বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য প্রযুক্তির উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে।

১২. **দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন :** বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য দুর্নীতিকে মূলোৎপাটন করতে হবে। বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান সমস্যা হচ্ছে দুর্নীতি যা অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিরাট প্রতিবন্ধক। কোনো দেশের প্রশাসন দুর্নীতিগ্রস্ত হলে সার্বিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়। এই দুর্নীতি নামক ব্যাধির কারণে বিনিয়োগকারীরাও বিনিয়োগ করতে অপারগতা প্রকাশ করে। অতএব বিনিয়োগ আকর্ষণের নিমিত্তে দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন গড়ে তোলা একান্ত জরুরি।

১৩. **আমলাতান্ত্রিক জটিলতা দূর করা :** আমলাতান্ত্রিক জটিলতা আমাদের দেশে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এক বিরাট বাধা। শিল্প ও বাণিজ্য প্রক্রিয়ায় বিধিনিষেধ থাকায় ও নিয়ন্ত্রণের কারণে বিনিয়োগ উৎসাহিত হয় না। অতএব বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য সকল প্রকার আমলাতান্ত্রিক জটিলতা দূর করতে হবে।

১৪. **বিনিয়োগ বোর্ডকে শক্তিশালী করা :** বিনিয়োগ আকর্ষণের অন্যতম পদক্ষেপ হচ্ছে বিনিয়োগ বোর্ডকে শক্তিশালী করা। বিনিয়োগ বোর্ড যতই শক্তিশালী হবে ততই বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগের প্রতি আকৃষ্ট হবে।

১৫. **নিরাপত্তা নিশ্চিত করা :** বিনিয়োগ আকর্ষণের অন্যতম দিক হলো নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। বিনিয়োগকারীরা নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে থাকলে বিনিয়োগে আকৃষ্ট হবে না। অতএব বেসরকারি বিনিয়োগ আকর্ষণের লক্ষ্যে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

১৬. **নেতিবাচক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ রাখা :** দেশে যদি নেতিবাচক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চলতে থাকে তবে বিনিয়োগে আকৃষ্ট হবে না। আর ইতিবাচক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিশ্চিত করা গেলে বিনিয়োগ আকৃষ্ট হবে।

উপসংহার : পরিশেষে আমরা এ কথা দৃঢ়কণ্ঠে বলতে পারি যে, দেশের অর্থনৈতিক চাকা সচল রাখার অন্যতম হাতিয়ার হচ্ছে বিনিয়োগ খাত। বিনিয়োগ খাত ছাড়া অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আশা করা বোকামির লক্ষণ। আর এই বিনিয়োগ যাতে আকৃষ্ট হয় তার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা একান্ত অপরিহার্য।

৩৫ ॥ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় কি কি? কিভাবে অন্তরায়সমূহ থেকে উত্তরণ সম্ভব?

উত্তর : নতুন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ তার নির্জীব অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে হাজারো সমস্যায় জর্জরিত বাংলাদেশের একার পক্ষে সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন আঞ্চলিক বা আন্তর্জাতিক সহযোগিতার। কেননা ১৯৯১ সালে স্নায়ুযুদ্ধের পতন বিশ্ব অর্থনীতিকে একটি প্রায় অভিন্ন অর্থনীতিতে পরিণত করেছে। ইতোমধ্যেই বাংলাদেশসহ বিশ্বের অধিকাংশ দেশ মুক্তবাজার অর্থনীতি গ্রহণ করেছে। মুক্তবাজার হলো একটি সর্বজনীন ব্যবস্থাপনা। বাংলাদেশে প্রযুক্তিগত উন্নয়নের মাধ্যমে শিল্প প্রতিষ্ঠান বিকশিত না হওয়ায় এবং কৃষি ব্যবস্থাপনা উন্নত না হওয়ায় অর্থনীতি মূলত আমদানি নির্ভরই রয়ে গেছে। প্রতিযোগিতাপূর্ণ বাজার ব্যবস্থায় বাংলাদেশের অস্তিত্ব রক্ষা এবং আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে উত্তরণের জন্য অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং সম্ভাব্য করণীয় নির্ধারণ ও তা বাস্তবায়নের কৌশল উদ্ভাবন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্তরায়সমূহ : বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়সমূহ নিম্নরূপ :

১. **অবকাঠামোগত দুর্বলতা :** বাংলাদেশ সফর শেষে একজন বিশ্বব্যাংক কর্মকর্তা বলেছেন, বাংলাদেশের অর্থনীতি বিকাশের পথে প্রধান বাধা হচ্ছে অবকাঠামোগত দুর্বলতা। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য দৃঢ় ভিতের অবকাঠামো দরকার। ট্যাক্স বা শুল্ক রেয়াত, মুদ্রা বিনিময়ের সুবিধা এবং অন্যান্য সুবিধা দেয়া হলেও অবকাঠামো ঠিক না থাকলে উদ্যোক্তাদের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থেকে যাওয়াই স্বাভাবিক। এর ফলে অর্থনীতির গতিশীলতা ব্যাহত হয়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

২. **ঋণখেলাপিদের দৌরাত্ম্য :** ঋণখেলাপিরা বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান শত্রু। খেলাপি ঋণ অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রার পথে প্রধান বাধা। ঋণগ্রহীতারা নানা প্রভাব-প্রতিপত্তির মাধ্যমে বিনিয়োগের নামে শত শত কোটি টাকা ব্যাংক থেকে তুলে নির্ধারিত খাতে বিনিয়োগ না করে অন্য কোনো অনুৎপাদন খাতে বিনিয়োগ করে। এ খেলাপি ঋণের হাজার হাজার কোটি টাকা নিয়মিত পরিশোধ হলে উক্ত টাকা পুনঃবিনিয়োগের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতি লাভবান হতো। কিন্তু ঋণ খেলাপি হওয়ার ফলে দেশ সমৃদ্ধির সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

৩. **বৈদেশিক সাহায্য ও উন্নয়ন :** বৈদেশিক সাহায্য আদৌ জাতীয় উন্নয়নে কোনো অবদান রাখতে পারে কিনা এ নিয়ে খোদ দাতা দেশগুলোতেও বিতর্ক চলছে। দাতা দেশগুলোতেও এ কথা শোনা যাচ্ছে যে, বৈদেশিক সাহায্যে তৃতীয় বিশ্বের কোনো কাজে আসছে না। প্রসঙ্গক্রমে জার্মান পার্লামেন্টের একজন সদস্যা ব্রিগেতে এরলারের নাম এখানে উল্লেখ করা যায়। জার্মান সাহায্য বাংলাদেশে কিভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং তাতে বাংলাদেশের জনগণ আদৌ উপকৃত হচ্ছে কিনা, তা দেখার জন্য তিনি বাংলাদেশ সফরে আসেন। বাংলাদেশ থেকে ফিরে গিয়ে তিনি তার সংসদ সদস্যের পদ থেকে ইস্তফা দেন। তার যুক্তি ছিল, যে সাহায্য দেয়া হয়, তাতে বাংলাদেশের মানুষের কোনো উপকার হচ্ছে না। বরং সাহায্যের একটা বড় অংশই বিভিন্ন খাতে আবার জার্মানিতে ফিরে যাচ্ছে। পরে তিনি বাংলাদেশে জার্মান সাহায্য সম্পর্কিত বিষয়ে একটি বই লিখেন, যার নাম ছিল 'Toedliehe Hilfe' অর্থাৎ 'সাহায্য যা মৃত্যুর সমতুল্য।' মিসেস এরলার উক্ত বইয়ে দেখিয়েছিলেন, কিভাবে সাহায্য অপচয় হচ্ছে, কিভাবে তথাকথিত কনসালটেন্সির নাম করে ঋণের একটা বড় অংশ চলে যাচ্ছে জার্মান ফার্মের পকেটে। ব্রিগেতে এরলারের বইটি হচ্ছে আমাদের কাছে একটি জ্বলন্ত উদাহরণ যে, বৈদেশিক সাহায্য আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করছে।

৪. **বিদেশী পণ্যের আধিপত্য :** বর্তমানে বাংলাদেশের বাজার বিদেশী পণ্যে সয়লাব, এ ঘটনা দেশী-বিদেশী উদ্যোক্তাদের হতাশ করেছে। বিদেশী বিনিয়োগকারীরা যখন কোনো দেশে বিনিয়োগ করতে আসে, তখন স্থানীয় বাজারের সম্ভাব্যতা যাচাই করে। সুতরাং বাংলাদেশের বাজারে বিদেশী পণ্যের আধিপত্য আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে মারাত্মক অন্তরায়।

৫. **কম সঞ্চয় :** একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ১৬% থেকে ২০% জাতীয় সঞ্চয়ের প্রয়োজন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বাংলাদেশে বর্তমান জাতীয় সঞ্চয়ের পরিমাণ মাত্র ৮%। সুতরাং জাতীয় সঞ্চয়ের এই নিম্নমান বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের এক বিরাট সমস্যা।

৬. **আমদানি নির্ভরতা :** বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কার্যক্রমে রপ্তানির তুলনায় আমদানির আধিক্যের কারণে বাণিজ্যিক লেনদেনের ভারসাম্যে ঘাটতি সৃষ্টি হয়। অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৪ অনুসারে, ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জুলাই '১৩-এপ্রিল '১৪ সময়কালে আমদানি ব্যয় ২৯,৭৭৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ও রপ্তানি আয় ২৪,৬৫৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ আমদানি নির্ভরতা তথা বাণিজ্যিক ঘাটতি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মারাত্মক সমস্যা সৃষ্টি করছে।

৭. **প্রশাসনিক জটিলতা :** বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রের মূল চালিকাশক্তি রাজনৈতিক প্রকৃতির হলেও মূল কাজকর্ম পরিচালনা করে আমলারা। সংসদে মন্ত্রীদের যেসব প্রশ্ন করা হয় তার উত্তরও লিখে দেন আমলারা। সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি, যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাবিকাঠি, তাও

প্রণয়ন করেন সম্পূর্ণ আমলারা। UNDP এর এক রিপোর্টে বলা হয়, 'বাংলাদেশে আমলাতন্ত্র রাজনৈতিক কর্তৃত্বের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে রাজি নয়।' গতিশীল রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও নেতৃত্বের অভাব বাংলাদেশে শাসনতান্ত্রিক জটিলতা সৃষ্টি করেছে। ফলে বিদেশী বিনিয়োগকারীরা উৎসাহী হচ্ছে না এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে।

৮. **প্রতিকূল আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি :** বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি মোটেও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পক্ষে অনুকূল নয়, যা পুঁজি বিনিয়োগের প্রধান অন্তরায়। বিদেশী বিনিয়োগকারী দল বিনিয়োগের পরিবেশ দেখার জন্য বাংলাদেশ সফরে আসার পর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের কিছু অসাধু কর্মকর্তার অশালীন আচরণে ঐ বিনিয়োগকারী দল বিমানবন্দর থেকেই দেশে ফিরে যাওয়ার নজীরও আমাদের আছে। এটা আমাদের জন্য শুধু দুঃখজনক নয়, লজ্জাজনকও বটে। তাই বলা যায়, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি বাংলাদেশের অর্থনীতির পথে হুমকিস্বরূপ।

৯. **রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা :** বলা হয়ে থাকে, রাজনৈতিক উন্নয়ন অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত। কিন্তু বাংলাদেশে সরকারি ও বিরোধী দলসমূহের নিম্ন রাজনৈতিক সংস্কৃতি চর্চার ফলে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার দরুন অর্থনৈতিক উন্নয়ন অনেকটাই মুখ থুবড়ে পড়ে। লাগাতার হরতাল, ধর্মঘট, অবরোধ অর্থনৈতিক উন্নতির চাকাকে অচল করে দেয়। সুতরাং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে অর্থনৈতিক উন্নয়ন চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

১০. **দুর্নীতি :** অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক কূটনীতি সফল করতে স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক এবং দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন অপরিহার্য। কিন্তু বাংলাদেশে এর উপস্থিতি নগণ্য। 'দক্ষিণ এশিয়ায় সংস্কারের অভিজ্ঞতা এবং ভবিষ্যৎ করণীয়' শীর্ষক এক আন্তর্জাতিক সেমিনারে বিশ্বব্যাংকের দক্ষিণ এশীয় বিভাগের এক অর্থনীতিবিদ বলেন, 'বাংলাদেশের দুর্নীতির স্তর এক ধাপ কমাতে পারলে বিনিয়োগ বাড়বে GDP-র ৪ শতাংশ এবং GDP-র প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পাবে ০.৫ শতাংশ।' এতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান যে, এ দেশে দুর্নীতির শিকড় কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। Transperancy International-এর রিপোর্ট ২০১৪-এও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নতির অন্যতম সমস্যা হিসেবে দুর্নীতিকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

১১. **নীতি বাস্তবায়নে সরকারের ধীরগতি :** নীতি বাস্তবায়নে সরকারের ধীরগতির কারণেও অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যাহত হয়। বিশ্বব্যাংকের সাতজন নির্বাহী পরিচালক বাংলাদেশ সফর শেষে এক রিপোর্ট তৈরি করেন। রিপোর্টে সরকারের নীতি বাস্তবায়নে ধীরগতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় এবং এ ধীরগতিকে অর্থনৈতিক উন্নতির পথে অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

অন্তরায়সমূহ থেকে উত্তরণের উপায় : বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্তরায়সমূহ উত্তরণে নিচের পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে :

১. **গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান :** বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় অর্থনীতির যে রূপরেখা তা হলো গণতান্ত্রিক রাজনীতির অর্থনৈতিক কর্মসূচি। মুক্তবাজার অর্থনীতি এবং এর আলোকে গৃহীত কর্মসূচি সফল করতে যেটি সর্বাগ্রে গুরুত্বপূর্ণ তা হলো গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান। রাজনৈতিক উন্নয়ন অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত। তাই পরিবর্তিত বিশ্বে অর্থনীতির ক্ষেত্রে যে চ্যালেঞ্জ আবির্ভূত হয়েছে তা মোকাবিলা করতে হলে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের মাধ্যমে জাতীয় ঐকমত্য

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

অপরিহার্য। অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত বিদ্যমান রাজনৈতিক দলসমূহ জাতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক ইস্যুতে ঐকমত্য তথা জাতীয় সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। অথচ এটি নিশ্চিত যে, গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপলাভে ব্যর্থ অর্থনীতির ক্ষেত্রে সংস্কার কর্মসূচিও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। তাই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান।

২. **স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক ও দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন :** সম্প্রতি বিশ্বব্যাংক বলেছে, বাংলাদেশের ৯৮ শতাংশ মানুষের মতে, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান অন্তরায় হচ্ছে দুর্নীতি। স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক সুশাসন ব্যবস্থার অভাবে প্রশাসনের প্রতিটি পর্যায়ে অপ্রতিরোধ্য গতিতে বেড়ে চলেছে এই দুর্নীতি। সরকারের দুর্বল ও দুর্নীতিগ্রস্ত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো জনগণের উন্নয়ন প্রত্যাশা পূরণে বরাবরই পিছিয়ে থাকছে। সুতরাং স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক এবং দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন ব্যবস্থা ব্যতীত দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রত্যাশা হবে অরণ্যে রোদন মাত্র।

৩. **রপ্তানি বৃদ্ধি :** মুক্তবাজার অর্থনীতি সফল করার জন্য প্রয়োজন রপ্তানি উন্নয়ন বৃদ্ধি করা। কারণ আমদানিনির্ভর অর্থনীতি বাণিজ্য ঘাটতি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়নে সচেষ্ট হলেও প্রযুক্তিগতভাবে উৎকর্ষ লাভ করতে না পারায় রপ্তানি উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারছে না। সম্প্রতি UNCTAD-এর সহযোগিতায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত রপ্তানি উন্নয়ন বিষয়ক 'Integrated Country Program'-এ দশটি ধাপ চিহ্নিত করা হয়েছে। ধাপগুলো হলো : ১. বস্ত্র ও তৈরি পোশাক, ২. হিমায়িত চিংড়ি, ৩. চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য, ৪. স্বর্ণালংকার, ৫. কম্পিউটার সফটওয়্যার, ৬. সিল্ক, ৭. ইলেক্ট্রনিক্স, ৮. ফুল, ৯. জনশক্তি ও ১০. বহুমুখী পাটজাত দ্রব্য। উল্লিখিত দশটি ক্ষেত্রে রপ্তানি বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রত্যাশিত অবদান রাখতে পারবে বলে আশা করা যায়।

৪. **অবকাঠামো উন্নয়ন :** বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য দৃঢ় ভিতের অবকাঠামো দরকার। তাই রাস্তাঘাট, সেতু, বিদ্যুৎ, গ্যাস, টেলিফোন ইত্যাদি অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা আরো বৃদ্ধি করতে হবে। সামগ্রিক অবকাঠামোগত উন্নয়ন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যোগাতে পারে নতুন মাত্রা।

৫. **ঋণখেলাপি সংস্কৃতি রোধ :** ঋণখেলাপিরা বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান শত্রু। বাংলাদেশের অর্থনীতির ক্ষেত্রে এক ধরনের ঋণখেলাপি সংস্কৃতি সৃষ্টি হয়েছে। জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে এই খেলাপি সংস্কৃতি বন্ধ করা অত্যন্ত জরুরি।

৬. **শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার প্রতি গুরুত্ব আরোপ :** শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন ব্যতীত প্রকৃত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। অধ্যাপক মার্শাল যেমন শিক্ষাকে পুঁজি বিনিয়োগের সর্বোৎকৃষ্ট মাপকাঠি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, তেমনি বাংলাদেশকেও একবিংশ শতাব্দীর অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় যোগ্যতা অর্জনের জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। জাতিসংঘের মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে বিভিন্ন দেশের উদাহরণ দিয়ে উন্নয়নবিষয়ক বিনিয়োগকে অগ্রাধিকার দিয়ে বলা হয়েছে যে, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বিনিয়োগ ব্যতীত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। জাতিসংঘের মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে ধনী ও দরিদ্র নির্বিশেষে সকল দেশের প্রতি এ মর্মে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছে যে, মৌলিক শিক্ষার প্রসার ছাড়া কোনো দেশের পক্ষেই অর্থনৈতিক কাঠামোর ইতিবাচক রূপান্তর সম্ভব নয়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৭. **বিনিয়োগ বৃদ্ধি :** একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে বৈদেশিক বিনিয়োগের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বিনিয়োগের সাথে উন্নয়নের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। বিনিয়োগের মাধ্যমে উদ্ভাবন হয় নতুন নতুন প্রযুক্তির। সৃষ্টি হয় কর্মসংস্থান এবং বিভিন্ন জাতি, ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মধ্যে সেবা ও পণ্যাদি আদান-প্রদান সম্ভব হয়। বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়, বাংলাদেশ বিদেশী বিনিয়োগের জন্য দক্ষিণ এশিয়ার পরবর্তী উদীয়মান তারকা।

৮. **প্রযুক্তির উন্নয়ন :** 'তৃতীয় বিশ্বকে নিজেদেরই নিজেদের ভাগ্য ফেরাতে হবে, নিঃসন্দেহে বৈদেশিক সাহায্য দ্বারা নয়। বরং নিজস্ব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দ্বারা। আমি বিশ্বাস করি, প্রতিভাকে কখনো থামিয়ে রাখা যায় না, হয়তো বিলম্বিত করা যেতে পারে।' উপরিউক্ত কথাগুলো বলেছিলেন নোবেল বিজয়ী মুসলিম পদার্থবিদ ড. আব্দুস সালাম। আর বাংলাদেশের মতো কৃষিনির্ভর এবং শিল্পকাঙ্ক্ষিত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সব সময় উন্নত প্রযুক্তির লাগসই ব্যবহার উন্নয়নের ক্ষেত্রে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করতে পারে। নোবেলবিজয়ী অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক রবার্ট শোলো প্রমাণ করেছেন যে, দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে পুঁজি ও শ্রমের অবদানের তুলনায় উন্নত প্রযুক্তি এবং এর যথোপযুক্ত ব্যবহারের অবদান অনেক বেশি। পুঁজি ও শ্রমের বর্ধিত দক্ষতার সাথে প্রযুক্তির সার্বিক প্রয়োগ না থাকলে উন্নয়নের গতি মন্থর হতে বাধ্য। তাই বাংলাদেশকে একবিংশ শতাব্দীর অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে প্রযুক্তির উন্নয়নে বিশেষ নজর দিতে হবে।

৯. **তৈরি পোশাক ও নিটওয়্যার রপ্তানি বৃদ্ধি :** বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিল্প হচ্ছে তৈরি পোশাক। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৪ অনুসারে ২০১৩-১৪ (জুলাই-মার্চ) সময়ে জাতীয় রপ্তানি আয়ের শতকরা প্রায় ৮১.৪০ ভাগ আসে তৈরি পোশাক ও নিটওয়্যার শিল্প খাত থেকে। দেশের রপ্তানি বাণিজ্যেও পোশাক শিল্পের একচ্ছত্র আধিপত্য। পোশাক শিল্পের প্রভাবে বাংলাদেশে রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধি, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, উদ্যোক্তা সৃষ্টি, বস্ত্রশিল্প, প্রসাধন শিল্প, পরিবহন শিল্প ও প্যাকেজিং শিল্পের প্রসার ঘটেছে, নতুন নতুন প্রযুক্তির আগমন ঘটেছে, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের পরিচিতি এবং অবস্থান পাকা হচ্ছে। তাই পোশাক শিল্পের উত্তরোত্তর উন্নতি ও বিকাশের জন্য এর কতিপয় সমস্যার আশু সমাধান অত্যাবশ্যক।

১০. **গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতির চর্চা :** একটি সমাজে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি নির্ভর করে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির ওপর। আধুনিক মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী Dianee Ravitch-এর ভাষায়, রাজনৈতিক সংস্কৃতি হচ্ছে 'The behaviours, practices and norms that define the ability of a people to govern themselves.' আলোচ্য সংজ্ঞাটি থেকে আমরা তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পেয়ে থাকি। প্রথমত, রাজনৈতিক আচরণ; দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক অনুশীলন; তৃতীয়ত, রাজনৈতিক প্রথা পদ্ধতি বা রীতি রেওয়াজ, যা যে কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য অপরিহার্য। কিন্তু বাংলাদেশে এ ধরনের রাজনৈতিক সংস্কৃতির চর্চা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। জাতীয় ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সরকারি ও বিরোধী দলের ঐকমত্য অনস্বীকার্য। কিন্তু বাংলাদেশে যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সরকারি ও বিরোধী দলের ধারণা পরস্পরবিরোধী। এ কারণে জাতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্টহীন ও অগুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে অবরোধ, ধর্মঘট, হরতাল প্রভৃতি কর্মসূচির মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতির সর্বনাশ করা হচ্ছে। তাই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কাঙ্ক্ষিত রাজনৈতিক সংস্কৃতির জন্য ক্ষমতাসীন দল এবং ক্ষমতার বাইরের দলগুলোকে রাজনৈতিক সহিষ্ণুতা, আলোচনা, সমঝোতা, দলের ভেতরে ও বাইরে গণতন্ত্র চর্চা অনুশীলন করতে হবে এবং জাতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক ইস্যুগুলোতে ঐকমত্য অর্জন করতে হবে।

১১. **আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনায় কৌশলগত অবস্থান :** একবিংশ শতাব্দীর সূচনায় বিশ্ব কোনো আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক কাঠামোর মাধ্যমে পরিচালিত হবে, সে বিষয়ে বাংলাদেশসহ স্বল্পোন্নত উন্নয়নশীল বিশ্ব শঙ্কিত। তাই বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনায়, বিশেষ করে অর্থনৈতিক কাঠামোতে এমন কৌশল অবলম্বন করতে হবে যাতে করে সহায়তা বৃদ্ধি করা যায়।

উপসংহার : স্নায়ুযুদ্ধ অবসানের পর বিশ্ব ব্যবস্থার মূল নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় অর্থনীতি বিশেষ স্থান অধিকার করার ফলে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে। এ কারণে বাংলাদেশ বিশ্ব ব্যবস্থার আলোকে মুক্তবাজার অর্থনীতি গ্রহণ করেছে এবং এ নীতির সাফল্যের জন্য আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কূটনীতিকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। তাই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমস্যাসমূহ সমাধানকল্পে উপরিউক্ত সম্ভাব্য করণীয়সমূহ যথাযথভাবে গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং আঞ্চলিক অর্থনীতির সংহতিকরণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রাণসঞ্চার করবে বলে আশা করা যায়।

৩৬। পোশাক শিল্প কারখানায় অগ্নিকাণ্ড ও ধসের কারণ এবং বিশ্ববাজারে এর প্রভাব আলোচনা করুন। এ থেকে উত্তরণের উপায় নির্দেশ করুন।

উত্তর : বাংলাদেশের অর্থনীতিতে শিল্পক্ষেত্রে তৈরি পোশাক খাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার সিংহভাগ আসে এই তৈরি পোশাক খাত থেকে। মোট দেশজ আয়ের ১৬.৫ শতাংশ আসে এই খাত থেকে। সেখানে কাজ করা শ্রমিক শ্রেণীর ৮০ শতাংশই হলেন নারী। সেখানকার চ্যালেঞ্জগুলো ক্রমেই ঘনীভূত হচ্ছে। নব্বইয়ের দশকের দিকে পোশাক কারখানার জন্য শ্রমিকদের শ্রমঘণ্টা, কাজের পরিবেশ, কারখানার পরিবেশ, শিশুশ্রম ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের নির্দেশনা আমাদের ওপর এসেছে পশ্চিমা বিশ্ব থেকে। অগ্নিকাণ্ড, ভবনধস আবার আমাদেরকে মনে করিয়ে দিচ্ছে আমাদের কারখানাগুলোর দুর্বল দিকগুলো। এ থেকে উত্তরণের কোনো বিকল্প নেই।

বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের বর্তমান অবস্থা : সস্তা শ্রমের ফলে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাত খুব অল্প সময়েই বিকাশ লাভ করেছে। ১৯৭৭-৭৮ সালে রিয়াজ গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠার পর এ দেশে পোশাক শিল্পে যে অগ্রগতির ধারা চালু হয়েছিল তা এখনও বিকাশলাভ করছে। এ খাতের সম্প্রসারণের চিত্র এ খাতে কর্মরত শ্রমিকদের সংখ্যার দিকে তাকালে বোঝা যায়।

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পে শ্রমিকদের সংখ্যা

বছর	শ্রমিকের সংখ্যা (মিলিয়ন)
২০০৬	২.২
২০০৭	২.৪
২০০৮	২.৮
২০০৯	৩.৫
২০১০	৩.৬
২০১১	৩.৬
২০১২	৪.০

বাংলাদেশে তৈরি পোশাক শিল্প কারখানা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এটি বাংলাদেশে দ্রুত শিল্পায়নে সহায়তা করছে ব্যাপকভাবে।

এ শিল্প বিকাশের সাথে সাথে আমাদের রপ্তানি আয়ও ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। বাণিজ্য ঘাটতি দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে বাংলাদেশের পোশাক শিল্প।

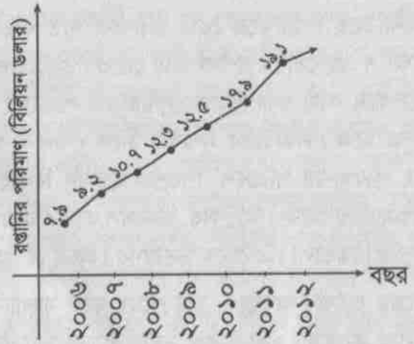

এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে বাংলাদেশের পোশাক শিল্প কতটা বিকাশমান। এ রকম সম্প্রসারণকে ধরে রাখতে পারলে অবশ্যই এ শিল্প বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিরাট ভূমিকা রাখবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

পোশাক শিল্পে সৃষ্ট সংকট : বাংলাদেশ গার্মেন্টিস ম্যানুফাকচারার অ্যান্ড এক্সপোর্টার এসোসিয়েশন (বিজিএমইএ) এর হিসাব মতে গত ২৩ বছরে পোশাক কারখানায় আগুন লেগে পদপিষ্ট হয়ে ও ভবনধসে ১৫১৪ শ্রমিক মারা গেছেন। তবে বেসরকারি হিসাবে এই সংখ্যা আরও বেশি। আমরা এর উপর একটি তালিকা দেখতে পারি।

সাল	দুর্ঘটনার বিবরণ	নিহত
১৯৯০	সারাকা গার্মেন্টিসে আগুন	৩০
২০০৫	স্পেকট্রাম গার্মেন্টিস ভবনধস	৬৪
২০০৬	কেটিএস গার্মেন্টিসে আগুন	৫৫
২০১২	তাজরীন ফ্যাশনসে আগুন	১১২
২০১৩	রানা প্লাজা ধস	১১২৭

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

তবে সবচেয়ে বেশি আলোচিত ও মর্মান্তিক হচ্ছে ২০১২ সালের ২৪ নভেম্বর রাতে তাজরীন ফ্যাশনসে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ১১২ জন শ্রমিক নিহত হওয়া এবং ২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল রানা প্লাজায় ভবনধসে ১১৩৬ জনের নিহত হওয়ার ঘটনা। রানা প্লাজায় ২৩ এপ্রিল ফাটল ধরলেও কর্তৃপক্ষের চাপে শ্রমিকরা পরের দিনও কাজ করতে আসে। এ ভবনধসের পর সেখান হতে ২৪৩৮ জনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে, তবে এদের অনেকেই পঙ্গুত্ববরণ করেছেন এবং কাজ করার ক্ষমতা হারিয়েছেন চিরতরে।

পোশাক শিল্প কারখানায় অগ্নিকাণ্ড ও ধসের কারণসমূহ : বাংলাদেশের পোশাক শিল্প কারখানায় অগ্নিকাণ্ড ও ধসের কারণসমূহ চোখের সামনে জাজ্বল্যমান। নিচে কারণসমূহ উল্লেখ করা হলো :

১. **আন্তর্জাতিক নজরদারির অভাব :** বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে কমপ্লায়েন্স মানার ক্ষেত্রে ব্যাপক ঘাটতি লক্ষ্য করা যায়। ২০০০ সালের পর থেকে আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের কাছ থেকে এক্ষেত্রে জোরালো দাবি উঠছে। কিন্তু সেই আন্তর্জাতিক ক্রেতারাই আবার শ্রমিকদের স্বার্থে পোশাকের মজুরি একটু বাড়ানো হলে অর্ডার বন্ধের হুমকি দেন। বিকল্প বাজার সন্ধান করেন তারা। এই দুর্ঘটনার দায় তারাও এড়াতে পারেন না।

২. **সরকারি নীতিমালা বাস্তবায়নের অভাব :** সরকার যে নীতিমালা তৈরি করে সেগুলো সরকারের বিভিন্ন সংস্থা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করছে কিনা, তা সঠিকভাবে তদারক করার ক্ষেত্রে গাফিলতি রয়েছে। কারখানার কমপ্লায়েন্সের জন্য যেসব দায়িত্বশীল বিভাগ রয়েছে যেমন– শ্রম অধিদপ্তর, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, কারখানা পরিদর্শন কর্তৃপক্ষ, অগ্নিনির্বাপণ কর্তৃপক্ষ, ভবন নির্মাণ কর্তৃপক্ষ— তারা তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অবহেলা করছে।

৩. **বিজিএমইএ এর উদাসীনতা :** পোশাক শিল্পের মালিকদের সংস্থা বিজিএমইএ যেভাবে কারখানার কমপ্লায়েন্স তদারক করছে তাতেও ক্রটি রয়েছে। দুর্ঘটনাকবলিত কারখানাগুলো বেশির ভাগই বিজিএমইএর সদস্য। কিন্তু প্রায়ই দুর্ঘটনার পর তারা দোষীদের চিহ্নিত করে না, তাদের সদস্যপদ বাতিল করে না।

৪. **রাজনৈতিক প্রভাব :** দেখা যাচ্ছে, যারা রাজনীতি করেন, তাদের অনেকে এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত। সুতরাং অবহেলাজনিত দুর্ঘটনা ঘটার পরও পার পেয়ে যাওয়া তাদের জন্য বেশ সহজ।

৫. **শ্রমিকদের অসংগঠিত আন্দোলন :** দুর্ঘটনার পর মালিকদের পক্ষ থেকে সভা, সংবাদ সম্মেলন করা হয়, প্রধানমন্ত্রীর কাছে যাওয়া হয়। কিন্তু শ্রমিকেরা অসংগঠিত। তাই আমরা দেখি একদিকে তারা স্বজন হারানোর বেদনায় বিষণ্ণ, অন্যদিকে অসংগঠিতভাবে প্রতিবাদ করতে গিয়ে নিজেরা কয়েকজন রাস্তায় নেমে গাড়ি, ভবন ইত্যাদি ভাঙচুর করছেন, যা এ শিল্পটির ও প্রকারান্তরে নিজেদেরই ক্ষতি করছেন।

৬. **ট্রেড ইউনিয়নগুলোর ব্যর্থতা :** ট্রেড ইউনিয়নের যে প্রভাব বাংলাদেশে ষাট-সত্তরের দশকে ছিল নানা কারণে আজ সে ঐতিহ্যটি হারিয়ে গেছে। বিভিন্ন সময়ে শ্রমিকনেতাদের রাজনৈতিক বা মালিকপক্ষের লেজুড়বৃত্তি করতে দেখা গেছে। ফলে শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া আদায়ের ক্ষেত্রে তাদের নৈতিক ভিত্তি দুর্বল হয়ে গেছে। বর্তমানে তৈরি পোশাক খাতে শ্রমিক ইউনিয়ন করার জন্য দেশের ভেতরে ও বাইরে থেকে চাপ রয়েছে।

পোশাক শিল্প কারখানায় অগ্নিকাণ্ড ও ধসের ফলে বিশ্ববাজারে প্রভাব : ২০১১-১২ অর্থবছরে যুক্তরাষ্ট্রের মোট রপ্তানির মাত্র ৩.২ শতাংশ জিএসপি বা অবাধ বাজার সুবিধার আওতায় রপ্তানি হয়েছে। এ দেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে যত পণ্য রপ্তানি হয় তার ৯৫ শতাংশই তৈরি পোশাক। তৈরি পোশাক রপ্তানিতে ১৫.৩ শতাংশ শুল্ক দিতে হয়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

কিন্তু সাম্প্রতিক পোশাক খাতে কর্মপরিবেশের মানোন্নয়নে বাংলাদেশের ধীরগতির পদক্ষেপে যুক্তরাষ্ট্র অস্বস্তি বোধ করছে। আবার টিকফা চুক্তি সইয়ে সরকারের অনাগ্রহ শ্রমিকের অধিকার রক্ষায় বাংলাদেশের অবস্থানকে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে প্রশ্নের মুখে রেখেছে। এ অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের পণ্যের জিএসপি সুবিধা অব্যাহত থাকাটা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবার অ্যান্ড কংগ্রেস অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল অর্গানাইজেশন বাংলাদেশের জিএসপি সুবিধা বাতিলের আবেদন করেছে। শর্ত সাপেক্ষে জিএসপি সুবিধা অব্যাহত থাকতে পারে এমন আভাস পাওয়া যাচ্ছিল। কিন্তু সাভারে ভবনধসে হাজারের বেশি শ্রমিকের মৃত্যুর পর এই আবহ পুরো বদলে যায়।

অন্যদিকে ইউরোপীয় ইউনিয়নও সেখানকার বাজারে বাংলাদেশের পণ্যের শুল্ক ও কোটামুক্ত সুবিধা প্রত্যাহার হতে পারে বলে হুমকি দিয়েছে। তারা তাজরীন ফ্যাশনসের অগ্নিকাণ্ডে এবং সাভারে ভবনধসে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের দুর্ঘটনা এড়াতে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বলেছে। পোশাক কারখানার অগ্নিনির্বাপণ ও ভবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সম্প্রতি ট্রেড ইউনিয়ন, বেসরকারি সংস্থা ও ৪০টি বিদেশি টেক্সটাইল ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছে ইইউ।

বাংলাদেশি পোশাকের সবচেয়ে বড় সুইডেন ভিত্তিক ক্রেতা প্রতিষ্ঠান এইচ অ্যান্ড এম লাতিন আমেরিকাও আফ্রিকার দেশগুলোর দিকে ঝুঁকছে। এটি বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম খুচরা পোশাক বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান।

আমেরিকার প্রতিষ্ঠান ডিজনি জানিয়ে দিয়েছে, বাংলাদেশ থেকে তারা আর কোনো পোশাক কিনবে না। কয়েকদিন আগে ওয়াল-মার্ট বাংলাদেশের অনুমোদনহীন ২৫০ পোশাক কারখানার তালিকা প্রকাশ করেছে। মানোন্নয়ন না করা পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটি এসব কারখানা থেকে পণ্য কিনবে না বলে জানিয়েছে।

জিএসপি সুবিধা বাতিল হলে ভাবমূর্তির জন্য সংকট তৈরি হবে। যুক্তরাষ্ট্র জিএসপি বাতিল করলে এবং তা দেখে ইইউ একই পথে হাঁটলে বাংলাদেশের রপ্তানি বাজারে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

পোশাক শিল্প কারখানার সংকট থেকে উত্তরণের উপায় : শ্রমশক্তি জরিপ-২০১০ অনুযায়ী আমাদের বেকারত্বের হার ৪.৫ শতাংশ, আর অর্ধবেকারত্বের হার প্রায় ২০ শতাংশ। প্রতিবছর শ্রমবাজারে ঢুকছে প্রায় ১৮ লাখ শ্রমশক্তি। আমাদের ছোট অর্থনীতিতে ২০১২ সালে জিডিপির পরিমাণ ছিল মাত্র ১১২ বিলিয়ন ডলার। আর বেসরকারি খাতই কর্মসংস্থানের মূল ক্ষেত্র। তাই এ পোশাক শিল্প রক্ষায় আমাদের সবাইকে সচেতন হতে হবে। নিতে হবে কিছু বাস্তব পদক্ষেপ।

প্রথমত, শ্রম আইন আধুনিকীকরণ করতে হবে, যাতে ইতোমধ্যেই হাত দেওয়া হয়েছে। তবে এ আইন এখন শুধু আমাদের দেশীয় প্রয়োজনের দৃষ্টিতে দেখলে চলবে না। এটিকে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের আলোকেও দেখতে হবে। এতে শ্রমিকের নিরাপত্তা, কর্মপরিবেশ ও তাদের সংগঠনকেও কথা বলার অধিকার সুনিশ্চিত করতে হবে এবং তা করতে হবে আন্তর্জাতিক চাহিদার কথা মনে রেখে। আর আইন এখানে বাধ্যবাধকতাটা আসবে আইএলও এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার কাছ থেকে। আর আইন বাস্তবায়নের বিষয়টিতে অবশ্যই দেখতে হবে। এ নিয়ে আমাদের অতীত রেকর্ড তেমন ভালো নয়।

দ্বিতীয়ত, চীন আমাদের দৃষ্টান্ত হতে পারে। তারা তাদের পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির সাথে সাথে তাদের শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে বেশি মূল্যমানের দিকে উঠে এসেছে। আমাদেরকেও তাই করতে হবে। অর্থাৎ কম মূল্যের থেকে উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে বেশি মূল্যের পোশাক স্তরে উঠে আসতে হবে। এজন্য দরকার শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি। এজন্য দরকার শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ।

তৃতীয়ত, আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সাথে আমাদের সমন্বয়ের প্রয়োজন রয়েছে। তাদের সহায়তা নিয়ে মাঠে নেমে পড়া দরকার। প্রয়োজন হলে সুশীল সমাজভিত্তিক বা বেসরকারি খাতে যারা কাজ করছেন তাঁদের সাহায্যও নেয়া যেতে পারে। সরকার ও বিজিএমইএ এ কাজে নেতৃত্ব দিবে।

চতুর্থত, খুব শিগগিরই পোশাক শিল্পের জন্য নিরাপত্তা ও শ্রমমানের বিষয়ে নতুন কাঠামো ও কর্মপরিকল্পনা তৈরি হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে ক্রেতা সংস্থাগুলোর সাথে আমাদের মালিক-শ্রমিক প্রতিনিধিদের সংশ্লিষ্টতা প্রয়োজন। আমাদের কূটনৈতিক দক্ষতা ও কাঠামোকে ব্যবহার করে আমাদের সত্তর দরকষাকষিতে লেগে যাওয়া দরকার। তা না হলে আমাদের জাতীয় মান পুরোপুরি সংরক্ষিত নাও হতে পারে।

উপসংহার : রানা প্লাজা ট্র্যাজেডি অত্যন্ত শক্তিশালী এক জেগে ওঠার ডাক। এই দুর্ঘটনায় বিপুলসংখ্যক মানুষের প্রাণহানির মধ্য দিয়ে যে মানবিক বিপর্যয় ঘটেছে, তা সহ্য করার মতো নয়। মানুষের প্রাণের এত চড়া মাশুল সহ্যাতীত রকমের ভারী। এখন দায়িত্ব এড়ানোর পালায়নপরতার সময় নয়। আমাদের রাষ্ট্র ও পোশাকশিল্পের সঙ্গে আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলোকে নিশ্চিত করতে হবে যে শ্রমিকদের জীবন মূল্যহীন নয়। শ্রমিকদের শ্রমও এত সস্তা নয়।

৩৭। বাংলাদেশের জাতীয় আয় পরিমাপের পদ্ধতিগুলো কি কি? জাতীয় আয় বৃদ্ধির উপায়সমূহ আলোচনা করুন।
***অথবা,* বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের পরিমাপকগুলো কি কি? জাতীয় আয় কিভাবে বৃদ্ধি করা যায় তা আলোচনা করুন।**

উত্তর : একটি নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক বছরে) কোনো দেশের জনগণ যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম উৎপাদন করে তার সমষ্টিকে মোট জাতীয় উৎপাদন (Gross National Product বা GNP) বলে। মোট জাতীয় উৎপাদনকে আর্থিক মূল্যে বা বাজার দামে প্রকাশ করলে তাকে মোট জাতীয় আয় (Gross National Income) বলা হয়। অতএব, বাজার দামে প্রকাশিত মোট জাতীয় উৎপাদন হলো মোট জাতীয় আয়। মোট জাতীয় আয় নির্ধারণকালে একই দ্রব্যের মূল্য যাতে দু'বার গণনা করা না হয় সেজন্য মধ্যবর্তী দ্রব্যের মূল্য (Price of Intermediary Product) বাদ দিয়ে চূড়ান্ত দ্রব্যের (Final Product) দাম হিসাব করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, মোট জাতীয় উৎপাদনকে বাজার দামে প্রকাশ করলে এর মধ্যে পরোক্ষ কর নিহিত থাকে। সুতরাং, মোট জাতীয় আয় হতে পরোক্ষ কর বাদ দিলে উপাদান মূল্যে মোট জাতীয় আয় (Gross National Income at Factor Price) পাওয়া যায়। উপাদান মূল্যে মোট জাতীয় আয় হবে, উপাদানগুলোকে যেসব পারিশ্রমিক (খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফা) দেয়া হয় তাদের সমষ্টির সমান। অতএব, মোট জাতীয় আয় = খাজনা + মজুরি + সুদ + মুনাফা। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো বাংলাদেশের জাতীয় আয় হিসাব করে থাকে। এ ব্যুরো বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে প্রতিবছর বাংলাদেশের মোট জাতীয় উৎপাদন, মোট দেশজ উৎপাদন, নিট জাতীয় ও দেশজ উৎপাদন পরিমাপ করে। চলতি বাজার দাম, স্থির দাম এবং উপাদান দামে বাংলাদেশের জাতীয় আয় হিসাব করা হয়।

জাতীয় আয় পরিমাপের পদ্ধতি : বাংলাদেশের তথ্য ও উপাত্তের অভাবে জাতীয় আয় পরিমাপের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে কোনো একক পদ্ধতি ব্যবহার করা যায় না। সেজন্য জাতীয় আয় পরিমাপে উৎপাদন, আয় ও ব্যয় এ তিনটি পদ্ধতির যৌথ ব্যবহার লক্ষ করা যায়। জাতীয় উৎপাদন পরিমাপের জন্য দেশে সমগ্র অর্থনীতিকে ১১টি প্রধান খাতে ভাগ করা হয়। এ খাতগুলো হলো— ১. কৃষি ও বনজ, ২. শিল্প, ৩. খনিজ, ৪. নির্মাণ, ৫. বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি ও স্বাস্থ্য, ৬. পরিবহন, যোগাযোগ ও

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

স্টোরেজ, ৭. ব্যবসায়-বাণিজ্য, ৮. গৃহ, ৯. বেসামরিক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা, ১০. ব্যাংক ও বীমা এবং ১১. পেশাগত ও বিবিধ সেবা। এসব খাতের জাতীয় উৎপাদন পৃথকভাবে পরিমাপ করা হয়।

১. **কৃষি :** কৃষি খাতকে ৪টি অধঃখাতে ভাগ করা হয়। এগুলো হলো— ক. কৃষিপণ্য, খ. বন, গ. পশুপালন ও ঘ. মৎস্য। কৃষিপণ্যের জাতীয় উৎপাদন পরিমাপের ক্ষেত্রে উৎপাদন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। এক্ষেত্রে উৎপাদনের মোট আর্থিক দাম থেকে বীজ, সার, কীটনাশক ওষুধ, অন্যান্য উপকরণ, অপচয় ইত্যাদির দাম বাদ দিয়ে মূল্য সংযুক্তি হিসাব করা হয়। বন অধঃখাতের উৎপাদনের ব্যবহৃত উপকরণের সঠিক উপাত্ত পাওয়া যায় না। কাজেই সেক্ষেত্রে মোট উৎপাদন থেকে শতকরা তিনভাগ মূল্য বাদ দিয়ে অবশিষ্ট অংশকে মোট মূল্য সংযুক্তি হিসেবে গণ্য করা হয়। পশু পালন ও মৎস্য অধঃখাতের ক্ষেত্রেও উৎপাদন পদ্ধতির মূল্য সংযুক্তি কৌশল অবলম্বন করা হয়। কিন্তু সঠিক পরিসংখ্যানের অভাবে এসব ক্ষেত্রে মূল্য সংযুক্তি পদ্ধতির নির্ভুল প্রয়োগ নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না।

২. **শিল্প :** বাংলাদেশে শিল্প খাতকে বৃহৎ ও ক্ষুদ্রশিল্প এ দু ভাগে ভাগ করা হয়। এ উভয় ক্ষেত্রে জাতীয় উৎপাদন পরিমাপের জন্য উৎপাদন পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। তবে চূড়ান্ত দ্রব্য হিসাবের পরিবর্তে মূল্য সংযুক্তি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। এজন্য বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্পের জরিপ এবং শিল্প উৎপাদনের পাইকারী দাম সূচক ব্যবহার করা হয়।

বাংলাদেশে খনিজ দ্রব্যের উৎপাদন যথেষ্ট কম। এ খাতের জাতীয় উৎপাদন নির্ধারণের জন্য মূল্য সংযুক্তি পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। অর্থাৎ বিভিন্ন খনিজ দ্রব্যের বাজার দাম ও উপকরণ ব্যয় সম্পর্কে যে উপাত্ত পাওয়া যায় তার ভিত্তিতে এ খাতের মূল্য উদ্বৃত্ত হিসাব করা হয়।

৩. **অন্যান্য খাত :** অন্যান্য প্রধান খাতের অধিকাংশ ক্ষেত্রে মূল্য সংযুক্তি নির্ধারণের জন্য দ্রব্য প্রবাহ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। ব্যবসায়-বাণিজ্য, চাকরি, ব্যাংক ও বীমা প্রভৃতি ক্ষেত্রে আংশিকভাবে আয় পদ্ধতিও প্রয়োগ করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের দ্বারা গঠিত দেশের লেনদেনের ভারসাম্য তালিকা অবলম্বনে বৈদেশিক নিট আয় হিসাব করা হয়।

নির্ভরযোগ্য উপাত্ত ও তথ্যের অভাবে বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের হিসাব-নিকাশ নির্ভুল হয় না। বিশেষ করে কয়েকটি খাতে মূল্য সংযুক্তি পদ্ধতি ব্যবহারে অসুবিধা দেখা যায়। তবে বিগত সময়ের চেয়ে বর্তমানে আমাদের জাতীয় আয় পরিমাপের ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত উন্নতি সাধিত হয়েছে।

জাতীয় আয় বৃদ্ধির উপায় : বাংলাদেশে জাতীয় আয়ের পরিমাণ ও আয় বৃদ্ধির হার কম। দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন এবং জনগণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির জন্য উচ্চহারে জাতীয় আয় বাড়ানো দরকার। জাতীয় আয় বৃদ্ধির জন্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এজন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার :

১. **কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি :** কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির সবচেয়ে বড় ও প্রধান খাত। তাই এ দেশে জাতীয় আয় বৃদ্ধির জন্য কৃষি উৎপাদন বাড়াতে হবে। উন্নত চাষাবাদ পদ্ধতি, সেচ সুবিধার প্রসার, কৃষি উপকরণের যোগান বৃদ্ধি প্রভৃতি পদক্ষেপের মাধ্যমে এদেশে কৃষিখাতের উন্নয়ন এবং একর প্রতি ফলন বৃদ্ধি করা সম্ভব। শস্য ছাড়াও কৃষির অন্যান্য অধঃখাত; যেমন– মৎস্য, পশুপালন ও বনায়নের ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। অর্থাৎ সমগ্র কৃষিখাতের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেলে আমাদের জাতীয় আয় দ্রুতগতিতে বাড়বে।

২. **শিল্পের উন্নয়ন :** অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও জাতীয় আয় বাড়াতে হলে শিল্প খাতের ব্যাপক উন্নয়ন অপরিহার্য। বৃহৎ শিল্প-কারখানার পাশাপাশি এ দেশে বেশি সংখ্যক মাঝারি ও ক্ষুদ্রশিল্প স্থাপন করা দরকার। সুষ্ঠু শিল্পনীতির মাধ্যমে শিল্পের উন্নতি ঘটলে আমাদের জাতীয় আয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়বে।

৩. **সেবাকর্মের উৎপাদন বৃদ্ধি :** জাতীয় উৎপাদনের মধ্যে দ্রব্যসামগ্রী ছাড়াও সেবাকর্ম অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশে ব্যবসায়-বাণিজ্য, চাকরি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রভৃতি ক্ষেত্রে সেবা উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। সমগ্র সেবা খাতের উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে জাতীয় আয়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পাবে।

৪. **প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার :** বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদ ও শ্রমশক্তি অব্যবহৃত রয়েছে। কৃষি, শিল্প ও অন্যান্য ক্ষেত্রে এসব প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি করা যায়।

৫. **বিনিয়োগ বৃদ্ধি :** উৎপাদন বৃদ্ধির প্রথম শর্তই হচ্ছে বিনিয়োগ বৃদ্ধি। বাংলাদেশে জাতীয় বা দেশের আয় বৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়াতে হবে। এজন্য অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সঞ্চয় বৃদ্ধি ও দেশীয় সম্পদ সংগ্রহের হার বাড়াতে হবে। এছাড়া এদেশে বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৬. **উন্নত অবকাঠামো সৃষ্টি :** ক্ষেত-খামারে ও কলকারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবকাঠামো উন্নত করা দরকার। অর্থাৎ যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ বাঁধ ও বন্দর, ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা প্রভৃতি উপাদানের উন্নয়ন সাধন করা হলে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

৭. **কারিগরি জ্ঞানের উন্নতি :** বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎপাদনের পরিমাণ ও মান বৃদ্ধির জন্য উন্নত কারিগরি জ্ঞান ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা দরকার। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশে কারিগরি জ্ঞানের উন্নয়ন সাধন করতে হয়। এর ফলে উৎপাদনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে।

৮. **সুষ্ঠু পরিকল্পনা :** অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান এবং অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে দ্রুত উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। তাই বাংলাদেশে অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সুষ্ঠু উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তার সফল বাস্তবায়ন একান্ত প্রয়োজন।

৯. **অব্যাহত উন্নয়ন প্রচেষ্টা :** উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে যেমন অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করা যায়, তেমনি অব্যাহত উন্নয়ন প্রচেষ্টার দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশে জাতীয় ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পিত উন্নয়ন কর্মকাণ্ড চালানো প্রয়োজন। এরূপ উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের উৎপাদনক্ষেত্রে সমস্যার সমাধান হয় এবং এর ফলে অবিরাম ধারায় উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়।

সুতরাং বাংলাদেশের জাতীয় আয় বৃদ্ধির জন্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধির সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা প্রয়োজন।

৩৮। 'GDP-তে শিল্প খাতের অবদান যথেষ্ট নয়।' এই উক্তির আলোকে বাংলাদেশের শিল্প খাতে বিদ্যমান সমস্যা ও তা সমাধানে আপনার সুপারিশ তুলে ধরুন।

উত্তর : শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একটি দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন অনেকাংশেই শিল্পের অগ্রসরতার ওপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল ও জনবহুল দেশ, যেখানে অর্থনীতির মূল ভিত্তি হলো কৃষি। কিন্তু, এ দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে শুধু কৃষি খাত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে না। তাছাড়া দেশের সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক গতি সঞ্চার করতে হলে, বিশ্বায়নের এ যুগে বিশ্ব অর্থনীতির যে স্রোত তার সাথে দেশীয় অর্থনীতির গতিকে মিলিয়ে দিতে গেলে শিল্প খাতকে অপরিহার্যভাবে অর্থনৈতিক ভিত্তির মূলস্তম্ভ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা অতীব জরুরি। কিন্তু অভ্যন্তরীণ এবং দেশের সীমানা পেরিয়ে প্রবহমান বিশ্ব অর্থনীতির নেতিবাচক প্রভাবে এ দেশের শিল্পখাত তেমন বেশি সম্ভাবনাময় বা ফলপ্রসূ খাতে পরিণত হতে পারেনি বা পারছে না। এ দেশের জাতীয় আয়, দেশজ উৎপাদনে শিল্পের হার খুবই নগণ্য। ২০১৩-১৪ (সাময়িক) অর্থবছরে মোট দেশজ উৎপাদনে শিল্পের অবদান ছিল ২৯.৬১%। এ দেশের মৌলিক অর্থনৈতিক ভিত্তির দুর্বলতা, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা,আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক তথা অর্থনৈতিক প্রভাব এবং সামগ্রিক অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তিগুলোর নাজুক অবস্থা আজকের শিল্পখাতের দুর্দশার জন্য প্রধানতম দায়ী।

বাংলাদেশের শিল্পখাতের সমস্যা : বিগত কয়েক দশকে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলো শিল্পে উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়ে গেলেও বাংলাদেশ শিল্পক্ষেত্রে তেমন একটা অগ্রগতি লাভ করতে পারেনি। সম্ভাবনাময় শিল্পখাতগুলোতে কাঙ্খিত সাফল্য পায়নি। যেমন– জিডিপিতে এর অবদান প্রত্যাশার তুলনায় অনেক কম। অনেক ক্ষেত্রে আজকের শিল্পখাতের এ দুরবস্থার জন্য ব্রিটিশ আমলে ঔপনিবেশিক শাসন এবং পাকিস্তান আমলে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক শোষণ, নিপীড়ন, বৈষম্য প্রভৃতিকে দায়ী করা হয়। কিন্তু ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে অদ্যাবধি প্রায় চার দশক সময় অতিবাহিত হয়েছে। এ সময়ে আমরা নিজেরাই পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছি। কিন্তু তথাপি এ দেশের শিল্পের যে অন্ধকারাচ্ছন্ন রূপটি ছিল সেটি তিমিরের নগ্ন জনপদ থেকে অগ্রগতি আর সাফল্যের আলোর দিশারী হতে পারেনি। শিল্পে বাংলাদেশের এ অনগ্রসরতার পিছনে অনেক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। নিচে এগুলো সংক্ষিপ্তরূপে আলোকপাত করা হলো :

১. **ঐতিহাসিক পটভূমিগত কারণে প্রতিবন্ধকতা :** বাংলাদেশ শিল্পে অনগ্রসর থাকার পিছনে অন্যতম কারণ হলো ঔপনিবেশিক শাসন। প্রায় দুশত বছর ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী উপমহাদেশে শাসনের নামে শোষণ চালিয়েছে। শিল্প স্থাপন করা তো দূরের কথা বিদ্যমান শিল্পকে তারা বিভিন্ন উপায়ে বন্ধ করার ব্যবস্থা করেছে। আর বিভিন্ন উপায়ে শোষণ, শাসন, নিপীড়ন, লুণ্ঠন, অবহেলা, বঞ্চনা প্রভৃতির কারণে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তি বরাবরই থেকেছে দুর্বল। তদুপরি এ উপমহাদেশে যা কিছু শিল্প কারখানা গড়ে তোলা হয়েছিল, সেগুলোর বেশিরভাগ স্থাপন করা হয়েছিল কোলকাতা, বোম্বে, মাদ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চলে, কিন্তু এ অঞ্চলে ব্রিটিশ সরকার কোনো শিল্প কারখানা স্থাপনে প্রয়াসী হয়ে ওঠেনি। অধিকন্তু, বাংলাদেশ ব্রিটিশ শিল্পজাত পণ্য বাজারজাতকরণের অন্যতম পাদভূমিতে পরিণত হয়েছিল। পরবর্তী পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীও অধিকাংশ শিল্পকারখানা পশ্চিম পাকিস্তানে স্থাপন করে। ফলে সামান্য দু-একটি শিল্পকারখানা গড়ে উঠলেও পূর্ব বাংলার অর্থনীতি মূলত কৃষিনির্ভর থেকে যায়। আর শিল্পখাত উপেক্ষিত থেকে যায়, যার নেতিবাচক ফল এসে পড়ে আজকের শিল্পখাতে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

২. **পুঁজি বা মূলধনের অভাব :** বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক দরিদ্র। তাছাড়া, তাদের মাথাপিছু জাতীয় আয়ও অত্যন্ত সীমিত, মাত্র ১,১৯০ (অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৪) মার্কিন ডলার। কাজেই পুঁজি গঠনের জন্য যে পরিমাণ আর্থিক সঞ্চয় প্রয়োজন তা খুবই কম। অধিকন্তু বর্তমান বাজার অর্থনীতির যুগে প্রতিটি পণ্যের অবাধ প্রবেশের দরুন এবং অন্যান্য দেশের সাথে বাণিজ্য সম্পর্কের উষ্ণতার কারণে এক দেশের অর্থনৈতিক মন্দাভাবের নেতিবাচক প্রভাব এ দেশের বা তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশে এসে পড়ে। যে কারণে, আন্তর্জাতিক বাজারে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির ফল আমাদেরকেই ভোগ করতে হয়। কাজেই দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন উর্ধ্বগতি জনমানুষের সঞ্চয়ের বিরাট অংশ নিয়ে নিচ্ছে এবং এভাবেই মূলধনের অভাবে শিল্প খাতে বিনিয়োগ অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।

৩. **দক্ষ উদ্যোক্তার অভাব :** উৎপাদন ক্ষেত্রে নতুন নতুন সামগ্রী প্রবর্তন, উৎপাদনের নতুন পদ্ধতি, নতুন বাজার সৃষ্টি, উৎপাদনের জন্য কাঁচামালের উৎস আবিষ্কার এবং শিল্পে নতুন সংগঠন ব্যবস্থার প্রবর্তন সবই নির্ভর করে একজন উদ্ভাবনী শক্তিসম্পন্ন ও দক্ষ উদ্যোক্তা তথা বিনিয়োগকারীর উপর। বাংলাদেশে বরাবরই শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগে আগ্রহী, দক্ষ এবং সাহসী উদ্যোক্তার অভাব পরিলক্ষিত হয়। যার, দরুন শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগ ব্যাহত হয় এবং শিল্পখাত অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা পালন করতে পারে না।

৪. **কাঁচামালের অভাব :** শিল্পের জন্য কাঁচামালের নিয়মিত ও পর্যাপ্ত সরবরাহ অত্যন্ত জরুরি। এ দেশের ভারী শিল্পের অধিকাংশই কাঁচামালের জন্য বিদেশ থেকে আমদানির ওপর নির্ভরশীল। ফলে, প্রয়োজনীয় আমদানি করতে একদিকে যেমন প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করতে হয়, অন্যদিকে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়। এজন্য স্থানীয় শিল্প, আন্তর্জাতিক পণ্যের সাথে স্থানীয় বাজারে টিকে থাকতে ব্যর্থ হয়। অনেক প্রতিষ্ঠান এই প্রতিনিয়ত ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান একেবারে গুটিয়ে নিয়েছে, এভাবেই শিল্পখাত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে।

৫. **আধুনিক প্রযুক্তি ও কারিগরি জ্ঞানের অভাব :** শিল্পকারখানা গড়ে তুলতে হলে দরকার আধুনিক প্রযুক্তির পর্যাপ্ততা তথা প্রযুক্তি সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান। কেবল পুঁজি বা সদিচ্ছা থাকলেই শিল্পকারখানা গড়ে তোলা যায় না। শিল্পকারখানায় ব্যবহৃত হয় এমন যন্ত্রের পর্যাপ্ততা থাকতে হবে যাতে করে পর্যাপ্ত উৎপাদন সম্ভব হয় এবং এই প্রযুক্তির যথাযথ প্রয়োগের জন্য সক্ষম এবং দক্ষতাসম্পন্ন জ্ঞান অতীব জরুরি।

৬. **দক্ষ শ্রমিকের অভাব :** আমাদের দেশের শিক্ষার হার অত্যন্ত কম এবং শিক্ষা ব্যবস্থার মানও এতটা উন্নত নয় যে দক্ষ শ্রমিকের অভাব পূরণ করতে পারে। কেননা, আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় আধুনিক প্রযুক্তিগত শিক্ষার অভাব সর্বত্র বিরাজমান। ফলে, প্রযুক্তি ও কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ, কর্মঠ শ্রমিকের অপ্রতুলতা শিল্পের বিকাশে একটি বড় বাধা।

৭. **বৈদেশিক মুদ্রার অভাব :** যদিও বর্তমান বাংলাদেশে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আসছে, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা খুব বেশি নয়। যেহেতু, উৎপাদনের বড় অংশ কাঁচামাল সরবরাহে ব্যয় হয় এবং কাঁচামাল ক্রয়ে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করতে হয়, সেহেতু বৈদেশিক মুদ্রা যে প্রয়োজনের তুলনায় কম একথা বলা অত্যুক্তি হবে না। তাছাড়া শিল্পের উন্নত ও আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয়, আমদানি ঘাটতি পূরণ, বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ ইত্যাদিতে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা প্রয়োজন। আর প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল বৈদেশিক মুদ্রা দেশীয় উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগে নিরুৎসাহিত করছে। যা শিল্পের বিকাশে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে।

৮. **রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা :** রাজনৈতিক অস্থিরতা দেশে শিল্পের বিকাশের পথে অন্যতম প্রতিবন্ধক। এ দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে হরতাল, অবরোধ, ঘেরাও একটি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে, যা শিল্প কারখানায় উৎপাদন ব্যাহত করে এবং উদ্যোক্তাকে প্রচুর লোকসানের সম্মুখীন করে। তাছাড়া, বিদেশী সহায়ক প্রতিষ্ঠানগুলো উপযুক্ত সময়ে প্রয়োজনীয় নিয়ামক যোগান দিতে পারে না আবার অনেক ক্ষেত্রে বিদেশী বিনিয়োগও এ কারণে নিরুৎসাহিত হয়। অন্যদিকে ঘনঘন সরকার পরিবর্তনের ফলে, সহসাই শিল্প নীতিতে পরিবর্তন আনা হয়, যা কোনো না কোনোভাবে উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়ী মনোভাবকে নিরুৎসাহিত করে। সুতরাং দেশের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, অস্থিরতা, সংঘাতময় রাজনৈতিক পরিমণ্ডল সুষ্ঠু বিনিয়োগের পথে অন্যতম অন্তরায়।

৯. **মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব :** ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতি শিল্পকারখানা গঠনের ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করে। একটি বৃহৎ শিল্পকারখানা গড়ে তুলতে বেশ কয়েক বছর সময় লাগতে পারে। তাই, মূল্যস্ফীতির হার ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকলে, প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার শুরুতে যে বাজেট বা অর্থের বরাদ্দ হয়, শেষদিকে দেখা যায় খরচ অনেক বেড়ে যাচ্ছে। কেননা ইতোমধ্যে মুদ্রাস্ফীতির ফলে প্রয়োজনীয় উপকরণের মূল্যবৃদ্ধি পেয়েছে। এরকম অবস্থায় অনেক শিল্পোদ্যক্তা শিল্পকারখানা গড়ে তুলতে অনাগ্রহ বোধ করে।

১০. **অবকাঠামোগত দুর্বলতা :** উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব বাংলাদেশে শিল্পখাতের বিকাশের পথে অন্তরায় হয়ে রয়েছে। বিশেষ করে সড়ক ও জলপথের যোগাযোগ ব্যবস্থা অদ্যাবধি এতই অনুন্নত যে, শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল এবং উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী স্বল্প সময়ে ও স্বল্প ব্যয়ে একস্থান থেকে অন্যস্থানে আনা নেয়া সম্ভব হয় না। যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুন্নত বলেই আজও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জনসংখ্যার ঘনত্ব, চাহিদা, কাঁচামালের সহজলভ্যতা প্রভৃতি অনুসারে শিল্প কারখানা স্থাপন করা যাচ্ছে না।

১১. **শর্তহীন বৈদেশিক সাহায্যের অভাব :** আমাদের দেশের উন্নয়ন বাজেটের একটা বিরাট অংশ বিদেশী সাহায্যকারী সংস্থা বা বিভিন্ন দাতা দেশ থেকে আসে। কিন্তু তাদের এই ঋণ প্রদান শর্তহীন নয়, বরং এমন কিছু শর্তসাপেক্ষে যে, শিল্পক্ষেত্রে, কৃষিতে, সামগ্রিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের নির্দেশনা অনুযায়ী নীতিমালা প্রণয়ন করতে হয়; যা দেশীয় শিল্পের বিকাশে দেশীয় সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রগুলোকে অনেক ক্ষেত্রে উপেক্ষা করে, আন্তর্জাতিক পণ্যের বাজার সৃষ্টিতে উদ্যোগী হতে হয়।

১২. **খেলাপি ঋণের বোঝা :** খেলাপি ঋণের বোঝা বাংলাদেশের শিল্পের উন্নয়নের পথে আর একটি বড় বাধা। হাজার হাজার টাকা ঋণ খেলাপি হয়ে থাকায় মূলধনের আবর্তন হচ্ছে না। ফলে চলতি মূলধনের ঘাটতি প্রতিনিয়ত থেকেই যাচ্ছে। এর ফলে শিল্পোদ্যোক্তারা ব্যাংক থেকে তাদের প্রয়োজনীয় মূলধন পাচ্ছে না যা শিল্প বিকাশকে ব্যাহত করছে।

১৩. **আইন-শৃঙ্খলাজনিত সমস্যা :** দেশে আইন-শৃঙ্খলার অবনতির কারণে অনেকে শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগকে ঝুঁকিপূর্ণ মনে করছে। ফলে, শিল্পায়নের জন্য প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ হচ্ছে না এবং দেশ শিল্পক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ছে। সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, খুন, রাহাজানি ইত্যাদি বন্ধ করে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাতে না পারলে দেশে শিল্পের বিকাশ বাধাগ্রস্ত হতে বাধ্য।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

শিল্পখাতে বিদ্যমান সমস্যাগুলো সমাধানের উপায় : বাংলাদেশে শিল্পখাত বিকাশের পথে বিরাজমান এ সমস্যাগুলো যত জটিল বা যত দীর্ঘ দিনেরই হোক না কেন, সরকার ও জনগণের সদিচ্ছা থাকলে এর সমাধান তেমন কঠিন কোনো বিষয় নয়। যা হোক, বাংলাদেশে শিল্পায়ন তথা শিল্পক্ষেত্রে দ্রুত উন্নয়নের জন্য উপরিল্লিখিত সমস্যাগুলোর সমাধানের উপায় নিচে সুপারিশ করা হলো :

১. **রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা :** বাংলাদেশের বিভিন্ন মতাদর্শের রাজনৈতিক দলগুলো জাতীয় স্বার্থে বা সামগ্রিক উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় ঐক্য মতে পৌছাতে অক্ষম। তাই, পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে বিদ্যমান মতপার্থক্যগুলো দূর করে, দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীল পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হবে। আর এটি সম্ভব হলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হবে, বিনিয়োগ পরিবেশ ফিরে আসবে এবং নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে।

২. **অবকাঠামোগত উন্নয়ন :** অনুন্নত রাস্তাঘাট, রেল, সড়ক ও জলপথ, যোগাযোগ মাধ্যম, দেশের শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান অন্তরায়। তাই দেশে শিল্পবিকাশের জন্য অবকাঠামো উন্নয়ন অত্যন্ত জরুরি।

৩. **খেলাপি ঋণের বোঝা হ্রাস :** দেশে যে বিশাল অঙ্কের খেলাপি ঋণ হয়েছে তা আদায়ের জন্য প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ভবিষ্যতে ঋণ প্রদানের পূর্বে প্রকল্প পর্যালোচনা করে সন্তুষ্টি সাপেক্ষে ঋণ দিতে হবে এবং খেলাপি ঋণের এ সংস্কৃতি বন্ধের জন্য কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। কেননা, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শিল্পের বিকাশের পথে খেলাপি ঋণ অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধক।

৪. **প্রযুক্তির উন্নয়ন :** বাংলাদেশের শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে প্রযুক্তির লাগসই ব্যবহার অনুঘটকের ভূমিকা পালন করতে পারে। অর্থনীতিবিদ রবার্ট শোলো প্রমাণ করেছেন যে, দেশের শিল্প ও অর্থনৈতিক উন্নতিতে পুঁজি ও শ্রমের অবদানের তুলনায় প্রযুক্তি উন্নয়ন এবং এর যথোপযুক্ত ব্যবহারের অবদান অনেক বেশি। পুঁজি ও শ্রমের বর্ধিত দক্ষতার সাথে প্রযুক্তির সার্বিক প্রয়োগ না থাকলে উন্নয়নের গতি মন্থর হতে বাধ্য। তাই বাংলাদেশকে শিল্পায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে প্রযুক্তির উন্নয়নে বিশেষ নজর দিতে হবে।

৫. **সরকারি সহায়তা/পৃষ্ঠপোষকতা :** নতুন নতুন শিল্পকারখানা স্থাপনে সরকারকে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন না করে সহায়কের ভূমিকা পালন করতে হবে। এতে শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীরা আগ্রহী হয়ে উঠবে। সম্প্রতি, শিল্পকারখানার বেসরকারিকরণ এবং বেসরকারিখাতে নতুন শিল্প স্থাপন এবং বিদেশী শিল্প বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার জন্য সরকার যে নীতি গ্রহণ করেছে তা দেশের শিল্প-বিকাশে সুস্পষ্ট প্রভাব ফেলবে বলে আশা করা যায়।

৬. **প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার :** আমাদের আবিষ্কৃত প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে রয়েছে প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, চুনাপাথর, কাচবালি ইত্যাদি। এসব সম্পদ আহরণ ও এদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

৭. **কাঁচামালের যোগান :** শিল্পের অত্যাবশ্যকীয় উপাদান হলো কাঁচামাল। তাই শিল্পের কাঁচামাল যাতে সহজলভ্য হয় সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। এজন্য প্রয়োজনে ভর্তুকি প্রদান করা যেতে পারে।

৮. **সহায়ক নীতি প্রণয়ন :** শিল্পের বিকাশের পথে অন্তরায় না হয়ে সহায়ক হবে, এমন নীতি প্রণয়নে মনোযোগী হতে হবে। বিদেশী সংস্থা বা দাতাগোষ্ঠীর প্রভাবমুক্ত হয়ে দেশীয় আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে সামনে রেখে নীতি প্রণয়ন করার উদ্যোগ নিলে দেশীয় শিল্পের বিকাশের পথ সুপ্রসন্ন হবে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৯. **জবাবদিহিমূলক ও দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন :** প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা না থাকায় প্রশাসনের সর্বত্র দুর্নীতি শিকড় গেড়ে বসেছে। বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশের শিল্পায়নের পথে প্রধান বাধা হিসেবে দুর্নীতিকে চিহ্নিত করেছে। এমতাবস্থায়, শিল্পের বিকাশের স্বার্থে স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক ও দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন ব্যবস্থা একান্ত অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

১০. **দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিক :** কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিল্পের জন্য দক্ষ শ্রমিক ও কারিগর সৃষ্টি করতে হবে।

১১. **আমলাতান্ত্রিক জটিলতা দূরীকরণ :** বিদ্যমান আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রিতার কারণে প্রকল্প চূড়ান্তকরণ ও বাস্তবায়নে দীর্ঘ সময় লেগে যায়। অনেক উদ্যোক্তা এ কারণে শিল্প স্থাপনে নিরুৎসাহিত হয়ে পড়েন। তাই দেশের শিল্পের বিকাশের লক্ষ্যে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা হ্রাস করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

১২. **দেশাত্মবোধ সৃষ্টি :** দেশাত্মবোধ সৃষ্টির জন্য দেশীয় পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধি এবং বিদেশী পণ্য বর্জন করার মানসিকতা সৃষ্টি করতে জনমত গড়ে তুলতে হবে। বস্তুত স্বদেশী শিল্পের বিকাশের জন্য চাই ত্যাগ স্বীকার এবং প্রকৃত দেশপ্রেম।

উপসংহার : বিশ্বায়নের এই যুগে বিশ্ব অর্থনীতির তুমুল প্রতিযোগিতাপূর্ণ আবহে বাংলাদেশকে টিকে থাকতে হলে শিল্পের বিকাশ অতীব জরুরি। বিশ্ব পরিস্থিতির আলোকে বাস্তবসম্মত ও কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। দেশের শিল্পখাতে যেসব বিদ্যমান সমস্যাগুলো রয়েছে তা যথাযথ ভাবে সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শিল্পায়ন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, দেশের সামগ্রিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে হলে এবং একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হলে শিল্প খাতে সাফল্য যত দ্রুত লাভ করা যায় ততই মঙ্গল।

৩৯ । GDP-তে কৃষি খাতের অবদান তুলে ধরুন। কৃষির বিদ্যমান সমস্যাগুলো কি? বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে কি কি পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর : বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির সাথে জড়িত। দেশের জাতীয় আয়ের বিরাট একটি অংশ আসে কৃষিখাত থেকে। গুরুত্বের দিক দিয়ে নীটওয়্যার ও তৈরি পোশাক রপ্তানির পরেই কৃষির অবদান। গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা তথা খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বনির্ভরতা অর্জন, দারিদ্র্য বিমোচন ইত্যাদির মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক ও টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু বাংলাদেশের কৃষিখাত তথা কৃষি উন্নয়নে রয়েছে হাজারো সমস্যা। কৃষির সামগ্রিক উন্নয়নে এই সমস্যাসমূহ অন্তরায় হিসেবে দণ্ডায়মান। তাই জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে কৃষিক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ অনতিবিলম্বে প্রতিকার করা জরুরি।

GDP-তে কৃষির অবদান : বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষি খাতের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। ২০১৩-১৪ (সাময়িক) অর্থবছরে জিডিপি'তে সার্বিক কৃষির অবদান ১৬.৩৩% (সাময়িক)। বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষির উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেছে। বাংলাদেশের কৃষি খাতকে ৪টি অধঃখাতে ভাগ করা হয়। যেমন– ক. কৃষিপণ্য, খ. বন, গ. পশুপালন ও ঘ. মৎস্য। সমন্বিত কৃষিখাত অর্থাৎ কৃষিখাতের এই চারটি অধঃখাতের অবদান নিচে তুলে ধরা হলো :

ক. **কৃষিপণ্য :** কৃষির চারটি অধঃখাতের মধ্যে কৃষিপণ্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ। ২০১৩-১৪ (সাময়িক) অর্থবছরে স্থূল দেশজ উৎপাদন বা জিডিপি-তে কৃষির বিভিন্ন উপখাতের (শস্য ও শাকসবজি, প্রাণিসম্পদ, বন ও মৎস্য) সমন্বিত অবদান শতকরা প্রায় ১৬.৩৩ ভাগ, পূর্ববর্তী অর্থবছরে যা ছিল ১৬.৭৮ শতাংশ। বাংলাদেশের মানুষ কৃষির অন্যান্য খাত থেকে কৃষিপণ্যের প্রতি বেশি নির্ভরশীল। অর্থাৎ আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলের মানুষ কৃষি ফসল উৎপাদনের উপরই নির্ভরশীল।

খ. **বনজ সম্পদ :** দেশের বনজ সম্পদ জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন ছাড়াও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বিশেষ অবদান রাখছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে সাময়িক হিসেবে মোট দেশজ উৎপাদনে বনজ সম্পদের অবদান শতকরা প্রায় ১.৭৪ ভাগ। মোট বনাঞ্চলের মধ্যে মাত্র ৪৫% এলাকায় গাছপালা রয়েছে। দেশের মোট জনশক্তির শতকরা ২ ভাগ এ খাতে নিয়োজিত রয়েছে।

গ. **প্রাণিসম্পদ :** কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে প্রাণিসম্পদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান এবং দারিদ্র্য বিমোচনে প্রাণিসম্পদ খাত বর্তমানে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে বিবেচিত। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে প্রাণিজাত দ্রব্য, যেমন– চামড়া, পশম, হাড় ইত্যাদির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) এ খাতের অবদান শতকরা ১.৭৮ ভাগ যা কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। দেশে প্রায় শতকরা ২৫ ভাগ মানুষ সরাসরি ও শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ মানুষ আংশিকভাবে প্রাণিসম্পদের উপর নির্ভরশীল। বেসরকারি খাত ও এনজিওসমূহকে সম্পৃক্ত করার ফলে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে এ খাত পরিচালনার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

ঘ. **মৎস্যসম্পদ :** কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৎস্য সেক্টরের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সম্ভাবনাময়। দেশে আমিষের চাহিদা পূরণ, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিপূর্বক দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে মৎস্য খাত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। ২০১৩-১৪ (সাময়িক) অর্থবছরে মোট দেশজ উৎপাদনে মৎস্য খাতের অবদান শতকরা প্রায় ৩.৬৯ ভাগ। এই উৎপাদিত মৎস্যের নির্দিষ্ট অংশ রপ্তানি করে বাংলাদেশ প্রতিবছর প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে।

কৃষির বিদ্যমান সমস্যাসমূহ : বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড কৃষি হওয়া সত্ত্বেও নানাবিধ সমস্যার কারণে কৃষির আশানুরূপ উন্নয়ন হয়নি। কৃষিতে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ নিম্নরূপ :

১. **সনাতন চাষ পদ্ধতি :** সনাতন চাষপদ্ধতিই বাংলাদেশের কৃষিব্যবস্থা পিছিয়ে থাকার অন্যতম প্রধান কারণ। আমাদের দেশের বেশির ভাগ গ্রামাঞ্চলে এখনো পর্যন্ত কাঠের লাঙল এবং একজোড়া বলদই কৃষকের একমাত্র অবলম্বন। কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ছোঁয়া গ্রামাঞ্চলে পর্যাপ্ত পরিমাণে এখনো পৌছায়নি। ফলে মান্ধাতার আমলের চাষপদ্ধতি এবং শুধু শারীরিক শ্রমের উপর নির্ভরশীল কৃষি প্রত্যাশিত ফসল উৎপাদন করতে পারেনি। অর্থাৎ সনাতন চাষপদ্ধতির কারণেই কৃষির উৎপাদন অনেকাংশে পিছিয়ে রয়েছে।

২. **প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীলতা :** বাংলাদেশের কৃষি প্রকৃতি নির্ভর। আমাদের সেচ ব্যবস্থা এখনো আশানুরূপ উন্নত নয়। মৌসুমী বৃষ্টিপাতের উপর কৃষি অনেকাংশে নির্ভরশীল। কৃষকদের প্রয়োজন অনুযায়ী পর্যাপ্ত পরিমাণ বৃষ্টিপাত না হলে এখানে কৃষি কাজের ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়। আবার মাত্রাতিরিক্ত বৃষ্টিপাত হলেও পানি নিষ্কাশনের অভাবে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। তবে ধীর ধীরে কৃষির আধুনিকায়নের ফলে একর প্রতি উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকৃতির উপর নির্ভরশীলতাই কৃষির উৎপাদনকে ব্যাহত করেছে।

৩. **প্রাকৃতিক দুর্যোগ :** বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগের দেশ। ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে প্রতি বছরই বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাস লেগে আছে। ১৯৯৮ সালের প্রলয়ঙ্করী বন্যায় দেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ৫২টিই প্লাবিত হয়। বিআইডিএস-এর সমীক্ষায় বলা হয়েছিল, '৯৮-এর বন্যায় বিভিন্ন খাতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ১০ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে শুধু কৃষিখাতে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ৫ হাজার কোটি টাকারও বেশি। ২০০০ সালের বন্যায়ও দেশের দক্ষিণাঞ্চলের কৃষিখাতের বিপুল পরিমাণ ক্ষতি সাধিত হয়েছে। ২০০৭ সালের ১৫ নভেম্বর ঘূর্ণিঝড় 'সিডর' ও সাম্প্রতিককালে (২০১৩, ১৬ মে) ঘূর্ণিঝড় 'মহাসেন'-এর আঘাতে বিশেষ করে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের ফসলের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়।

৪. **আধুনিক প্রযুক্তির কম ব্যবহার :** বাংলাদেশের অধিকাংশ কৃষক অজ্ঞ ও অশিক্ষিত। আধুনিক প্রযুক্তি যেমন– ভালো মানের বীজ, সার, সেচ ও কীটনাশক ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষির ফলন বাড়ানো সম্ভব হলেও কৃষকদের অজ্ঞতা ও উদাসীনতার কারণে তাদের উৎপাদিত ফসলও কম হয়। ভালো বীজ ব্যবহার না করার ফলে উৎপাদন ব্যাহত হয়। সর্বশেষ পাওয়া তথ্য অনুযায়ী আমাদের চাষযোগ্য কৃষি জমির শতকরা ৬০ ভাগ আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতির আওতায় এসেছে।

৫. **ক্ষুদ্র কৃষিজোত ও খণ্ড-বিখণ্ডতা :** বাংলাদেশের কৃষিব্যবস্থার অন্যতম প্রধান সমস্যা হলো কৃষি জমির ক্ষুদ্রায়তন এবং খণ্ড-বিখণ্ডতা। ক্ষুদ্র কৃষিজোত এবং খণ্ড-বিখণ্ডতার ফলে এরূপ জমিতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ বা বৃহদায়তন উৎপাদন কাজ পরিচালনা করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ এখানকার জমিতে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার ও প্রয়োগ করা যায় না বলে ফলনও ব্যাহত হচ্ছে।

৬. **সারের অভাব :** বাংলাদেশের অধিকাংশ কৃষকই দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। অর্থাভাবে সময়মত সার, সেচ ও কীটনাশক ব্যবহার করতে পারে না। সার প্রয়োগ ছাড়াই একই জমি বারবার চাষাবাদের ফলে জমির উর্বরা শক্তি হ্রাস পায় আর জমির উর্বরা শক্তি কমে গেলে স্বাভাবিকভাবেই ফলন বা উৎপাদন কম হয়। এছাড়া অনেক সময় বাজারে সারের সঙ্কট দেখা দেয়, ফলে কৃষক সময়মতো কৃষি জমিতে সার প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয়। তাছাড়া কীটনাশকের অভাব এবং জ্বালানির অভাবে সেচের অসুবিধার কারণে কৃষিকাজ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে।

৭. **ঋণের স্বল্পতা :** এ দেশে অধিকাংশ কৃষকই দরিদ্র বলে তাদের নগদ অর্থের অভাব থাকে। এক হিসেবে দেখা যায়, শতকরা ৮০ ভাগ কৃষক যাদের ০.৫০ একরের কম জমি আছে তারা কৃষিঋণ পায় না। সংগঠিত উৎস থেকে বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্প বলে তারা চড়া সুদে ঋণ গ্রহণ করে মহাজনদের শোষণের শিকারে পরিণত হয়। অর্থাভাবে কৃষকরা প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণ ক্রয় করতে ব্যর্থ হয়, ফলে কৃষি উন্নয়ন কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে পৌঁছাতে পারছে না।

৮. **কৃষিজমির পরিমাণ হ্রাস পাওয়া :** বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে আবাসিক সমস্যা সমাধানের জন্য নতুন নতুন বাসস্থান সৃষ্টি হচ্ছে। নতুন নতুন বাসস্থান নির্মাণ করতে গিয়ে আবাদযোগ্য কৃষিজমির পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। বাসস্থান সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে শুধু ১৯৬৫ সাল থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত চাষাবাদযোগ্য এক লক্ষ আশি হাজার একর জমি হ্রাস পেয়েছে।

৯. **মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য :** বাংলাদেশের কৃষি বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। ফলে প্রকৃত ক্রেতা এবং বিক্রেতার মাঝে থাকে অসংখ্য মধ্যস্বত্বভোগী। এই মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্যের কারণে কৃষকরা তাদের ফসলের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হয় এবং ভোগান্তির শিকার হয়। ফলে ধীরে ধীরে তারা কৃষি উৎপাদনে উৎসাহ হারিয়ে ফেলে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

১০. **জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততা :** বাংলাদেশের কৃষি উন্নতির মূলে জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততা অন্যতম অন্তরায় হিসেবে কাজ করে। এ দেশে প্রায় আড়াই হাজারের মতো হাওর ও বিলে ৭ লক্ষ ২৪ হাজার একর জমি জলাবদ্ধতার কারণে অনাবাদি অবস্থায় আছে যা সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে পানি নিষ্কাশন করে চাষযোগ্য করা সম্ভব। এছাড়া সমুদ্র উপকূলীয় বিস্তীর্ণ এলাকায় কৃষিযোগ্য জমি প্রতি বছরই সমুদ্রের লোনা পানি ঢুকে নষ্ট করে ফেলে। ফলে কৃষি উন্নয়ন ব্যাহত হয়।

১১. **ভূমিক্ষয় :** ভূমিক্ষয় বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে অন্যতম সমস্যা। ভূস্তরের হালকা মৃত্তিকা কণা, যা খুবই উর্বরা শক্তিসম্পন্ন এবং ফসল উৎপাদনে অপরিহার্য তা বন্যা, প্রবল বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহ প্রভৃতি কারণে অপসারিত হয়ে ভূমিক্ষয় হচ্ছে। এর ফলে এ দেশের জমিগুলো ক্রমশ ফসল উৎপাদনের অযোগ্য হয়ে পড়ছে।

১২. **উপযুক্ত কৃষিনীতির অভাব :** উপযুক্ত কৃষিনীতিই কৃষি উন্নয়নে সহায়তা করতে পারে। কিন্তু সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রায়ই নীতির পরিবর্তন ঘটে। যা কৃষি উন্নয়নকে ব্যাহত কর। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে কোনো নির্দিষ্ট কৃষিনীতির কিছু কিছু বিষয় উন্নতির অন্তরায় হিসেবে কাজ করে।

অতএব, বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রে উপরিউক্ত সমস্যার কারণেই বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ হওয়া সত্ত্বেও এখানকার কৃষিব্যবস্থার এখনও আশানুরূপ উন্নতি ঘটেনি ফলে তুলনামূলকভাবে একর প্রতি উৎপাদনও কম হয়।

বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে যেসব পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন : বাংলাদেশে কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ সমাধানকল্পে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করা যায় :

১. **পর্যাপ্ত ঋণের ব্যবস্থা :** বাংলাদেশের অধিকাংশ কৃষক দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। ফলে প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাবে প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণ ক্রয় করতে পারে না। আর কৃষিক্ষেত্রে প্রদেয় ঋণের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত নয় বিধায় কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হয়। ১৯৭৯-৮০ সালে বাংলাদেশের কৃষিঋণের পরিমাণ ছিল জাতীয় উৎপাদনের মাত্র ৪.৫৮ ভাগ। কিন্তু, সাম্প্রতিক সময়ে কৃষিক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণ আগের তুলনায় বৃদ্ধি পেলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। এমতাবস্থায় কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হওয়াই স্বাভাবিক। তাই কৃষি উন্নয়নে দরিদ্র কৃষককে সহজ শর্তে ও সরল পদ্ধতিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে ঋণ দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে করে কৃষি উপকরণসমূহ সময়মতো ক্রয় করতে সক্ষম হয়। এক্ষেত্রে কৃষিঋণের পরিমাণ মোট উৎপাদনের ন্যূনতম ২৫% হওয়া উচিত।

২. **সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ :** কৃষকদের বহু কষ্টে উৎপাদিত শস্যের একটি বিরাট অংশ প্রতিবছর নানা প্রকার কীটপতঙ্গের আক্রমণে নষ্ট হয়। কৃষকরা সাধারণত এ কীটপতঙ্গের আক্রমণ প্রতিহত করতে অপারগ। তাই কীটপতঙ্গের আক্রমণ থেকে ফসল রক্ষা করার জন্য সম্প্রতি উদ্ভাবিত সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম আরো জোরদার করা প্রয়োজন।

৩. **বাজার ব্যবস্থার ত্রুটি দূরীকরণ :** ত্রুটিপূর্ণ বাজার ব্যবস্থার দরুণ কৃষকরা তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে না। মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্যে কৃষকরা তাদের পণ্য বিক্রয় করার ক্ষেত্রে ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হয় এবং ক্রেতারাও ভোগান্তির স্বীকার হয়। তাই এ সমস্যা সমাধানে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে সরকারি ক্রয়কেন্দ্র খোলা যেতে পারে। ফলে কৃষকরা মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য থেকে মুক্তি পেয়ে কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য পাবে এবং কৃষি উৎপাদনে উৎসাহী হবে, যা সামগ্রিকভাবে কৃষি উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

৪. **সংরক্ষণাগার স্থাপন :** বাংলাদেশে সংরক্ষণের সুব্যবস্থার অভাবে প্রতিবছর ২৫% থেকে ৩০% কৃষিজাত পণ্য নষ্ট হয়ে যায়। ফসল কাটার মৌসুমে সংরক্ষণাগারের অভাবে কৃষকরা কম মূল্যে শস্য বিক্রয় করতে বাধ্য হয় এবং ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হয়। কৃষিজাত পণ্য যাতে নষ্ট না হয় সেজন্য দেশের বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে কৃষিপণ্য সংরক্ষণাগার স্থাপন করতে হবে। এতে কৃষকরা আর্থিক ক্ষতি থেকে রক্ষা পেয়ে অধিক পরিমাণ কৃষিপণ্য উৎপাদনে উৎসাহী হবে। ফলে সামগ্রিকভাবে কৃষির উন্নয়ন বৃদ্ধি পাবে।

৫. **শ্রম দক্ষতা বৃদ্ধি :** বাংলাদেশের কৃষিকাজে নিয়োজিত অধিকাংশ কৃষি শ্রমিকই অদক্ষ এবং অশিক্ষিত। কৃষি শ্রমিকদের দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে আধুনিক প্রযুক্তি ও চাষপদ্ধতি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে। এতে করে কৃষকরা তাদের কাজে দক্ষ হবে এবং ভালো ফসল উৎপাদনের জন্য সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম হবে। যার ফলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং কৃষি উন্নয়নের পথ সুগম হবে।

৬. **আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি :** কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার একান্ত প্রয়োজন। উন্নত মানের বীজ, সার, সেচ, কীটনাশকের যথাযথ প্রয়োগের ফলে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ কার্যক্রম শুরু করেও প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার করতে সক্ষম হলে কৃষির উৎপাদন নাটকীয়ভাবে বেড়ে যেতে পারে, যা কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে সূচনা করতে পারে নতুন মাত্রা।

৭. **পর্যাপ্ত উপকরণ সরবরাহ :** বর্তমানে দেশে সারের অভাবের কারণে কৃষকরা নগদ মূল্যেও সময়মতো সার পাচ্ছে না যা উৎপাদনকে ব্যাহত করে। প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণ যেমন– সার, সেচযন্ত্র, জ্বালানি, কীটনাশক ওষুধ, বীজ প্রভৃতি ব্যক্তিগত খাতের মাধ্যমে সরবরাহ করা হলেও এসব উপকরণ যেন কৃষকরা সময়মতো পায় এবং উপকরণের গুণগত মান ও দাম যেন কৃষকের স্বার্থের অনুকূলে হয়, সেদিকে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন।

৮. **কৃষিজোত একত্রীকরণ :** কৃষির উন্নয়নের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষিজোতগুলো একত্র করতে হবে এবং জমির খণ্ড-বিখণ্ডতা রোধ করতে হবে। সমবায় ও বিনিময় প্রথার মাধ্যমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিগুলো একত্রিত করতে হবে। এতে করে জমিতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আধুনিক চাষাবাদ সম্ভব হবে এবং তুলনামূলক উৎপাদনও বাড়বে।

৯. **ভূমি সংস্কার :** আমাদের দেশে অধিকাংশ জমির মালিক হলো জমিদাররা। ফলে তারা জমি চাষের ব্যাপারে দৃষ্টি নিক্ষেপ না করে বর্গাপ্রথার মাধ্যমে সুবিধা ভোগ করে। এতে করে চাষীরা উৎপাদন বৃদ্ধিতে উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। প্রকৃত ভূমিহীন চাষীরা যেন কৃষি জমির মালিক হয় সেরূপ উদ্যোগ নেয়া উচিত। বর্গাপ্রথা বাস্তবমুখী করে এবং সরকারি খাসজমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করে উৎপাদন বাড়ানো যেতে পারে।

১০. **জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততা দূরীকরণ :** পানি নিষ্কাশনের মাধ্যমে জলাবদ্ধ জমি চাষের আওতায় আনতে হবে। এতে করে আবাদযোগ্য কৃষি জমির আয়তন বৃদ্ধি পাবে এবং সামগ্রিক উৎপাদন-ত্বরান্বিত হবে। এছাড়া সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকার জমি যাতে লবণাক্ত হতে না পারে সে লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

১১. **কৃষিনীতি প্রণয়ন :** কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে বাস্তবমুখী সম্প্রসারণশীল ও টেকসই কৃষিনীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। সরকার কৃষির সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনাসহ ১৯৯৯ সালে 'জাতীয় কৃষিনীতি' প্রণয়ন করেছে। কৃষি গবেষণার মাধ্যমে বন্যা-খরায় সহনশীল কাজ উদ্ভাবন করা প্রয়োজন এবং কৃষি প্রদর্শনীর মাধ্যমে কৃষকদের মধ্যে উৎপাদন বৃদ্ধিতে উৎসাহ প্রদান করা যেতে পারে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

উপসংহার : বাংলাদেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধকরণে কৃষি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও আমাদের দেশের কৃষিব্যবস্থা নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। ফলে কৃষি উন্নয়ন কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে পৌঁছাতে পারছে না। বহুবিধ সমস্যার কারণে মোট দেশজ উৎপাদনে কৃষিখাতের অপার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তা সম্ভব হচ্ছে না। তবে আশার কথা, বহুবিধ সমস্যা থাকা সত্ত্বেও সম্প্রতি বাংলাদেশ খাদ্যোৎপাদনে ব্যাপক সফলতা অর্জন করছে এবং বিশ্বের অষ্টম খাদ্যোৎপাদনকারী দেশের মর্যাদা লাভ করেছে। এ সফলতা অর্জন করায় বাংলাদেশের সরকার প্রধান FAO-এর 'সেরেস পুরস্কার' লাভ করেছে। ভবিষ্যতে খাদ্যে স্বনির্ভরতা অর্জন এবং দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধকরণ ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পুরস্কার বা খ্যাতি অর্জনের লক্ষ্যে বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে উপরিউক্ত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করতে পারলে বাংলাদেশ সফল হবে এবং কৃষি ও খাদ্যোৎপাদনের ক্ষেত্রে নতুন জগতে প্রবেশ করতে পারবে বলে আশা করা যায়।

৪০। বাংলাদেশের শ্রমিক অসন্তোষের কারণসমূহ কি কি? শ্রমিক অসন্তোষের প্রেক্ষিতে পোশাক শিল্পের ভবিষ্যৎ নিয়ে আপনার মতামত প্রদান করুন।

উত্তর : বর্তমানে বিভিন্ন শিল্প-কারখানার 'ক্রমবর্ধমান শ্রমিক অসন্তোষ' একটি আলোচিত বিষয়। এর মূল কারণ হিসেবে বলা যায় শ্রমিকের কল্যাণে প্রণীত শ্রম আইনে শ্রমিকের স্বার্থ উপেক্ষিত এবং বিভিন্ন শিল্প-কারখানার শ্রম আইনের প্রয়োগ খুবই সীমিত। এ ক্রমবর্ধমান শ্রমিক অসন্তোষ বিভিন্ন শিল্প, বিশেষ করে পোশাক শিল্পের ওপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। 'শ্রম আইন ২০০৬' শ্রমিকদের দীর্ঘদিনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে প্রণয়ন করা হলেও তা শ্রমিকদের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়েছে। ILO কনভেনশন অনুযায়ী শ্রমিকদের নেতা নির্বাচনের স্বাধীনতা ও শ্রমিকরা অবসরের পরে তার প্রতিষ্ঠান বা কারখানার ট্রেড ইউনিয়নের সাথে সম্পৃক্ত থাকার বিধান যা প্রচলিত ছিল, ২০০১ সালে প্রণীত শ্রম আইনে তা রহিত করা হয়েছে। এছাড়া আমাদের দেশে জুট, টেক্সটাইল, চিনি, স্টিল, সিরামিকসহ সবক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়ন বৈধতা পেলেও পোশাক শিল্পের ক্ষেত্রে ILO কনভেনশন অনুযায়ী ট্রেড ইউনিয়ন বাস্তবায়িত হয়নি। বর্তমানে সরকার শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে, যার অন্যতম হলো ট্রেড ইউনিয়নসমূহকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করা।

শ্রমিক অসন্তোষের কারণসমূহ : পোশাক শিল্পসহ অন্যান্য শিল্পকারখানায় উদ্ভূত শ্রমিক অসন্তোষের কারণসমূহ পরবর্তী পৃষ্ঠায় আলোচনা করা হলো :

১. **স্বল্প মজুরি :** শ্রম আইন ২০০৬ শ্রমিকদের দীর্ঘদিনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে প্রণয়ন করা হলেও তা শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে। বর্তমান বাজারদর অনুযায়ী শ্রমিকদের জন্য ধার্যকৃত ন্যূনতম মজুরির পরিমাণ খুবই অসন্তোষজনক। এই স্বল্প মজুরি দ্বারা একজন শ্রমিকের জীবিকা নির্বাহ প্রায় অসম্ভব। পোশাক শিল্পের শ্রমিকরা বর্তমান বাজারদর অনুযায়ী শ্রম আইন ২০০৬ এ ধার্যকৃত ন্যূনতম ১৬৬২ টাকা মজুরি যখন সরকারকে পুনর্মূল্যায়নের আহ্বান জানাচ্ছে, তখন ২০১০-এর আগস্টে সরকার নতুন করে ৩০০০ টাকা ন্যূনতম মজুরি বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা বর্তমান জীবনযাত্রার ব্যয় মেটানোর জন্য খুবই অপর্যাপ্ত। কয়েকটি বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠান ছাড়া ছোট অনেক প্রতিষ্ঠানে এই ন্যূনতম মজুরি বাস্তবায়ন করা হয়নি। এই স্বল্প মজুরি শ্রমিক অসন্তোষের অন্যতম প্রধান কারণ।

২. **দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি :** শ্রমিক অসন্তোষের মূলে অন্যতম একটি প্রধান কারণ দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি। বর্তমানে চাল, ডালসহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর দাম লাগামহীনভাবে ছুটে চলেছে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

শ্রমিকরা তাদের স্বল্প মজুরি দ্বারা দ্রব্যমূল্যের এ অস্বাভাবিক উর্ধ্বগতির সাথে তাল মেলাতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে। এর ফলে দেশের অধিকাংশ শ্রমিক ও তাদের পরিবারবর্গ মানবেতর জীবনযাপন করছে। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি শ্রমিক অসন্তোষ ত্বরান্বিত করছে।

৩. **শ্রম আইন সকল শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষা করে না :** বর্তমান শ্রম আইন ২০০৬ দেশের সব শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষা করে না। কেননা এর আওতার বাইরে আছে দেশের ৭৫ থেকে ৮০ ভাগ শ্রমিক। এ আইন শুধু ২০ থেকে ২৫ ভাগ শ্রমিকের স্বার্থ নিশ্চিত করার চেষ্টা করে। কৃষি, শিক্ষা ও গবেষণা, গৃহস্থালী, সরকারি কর্মচারী, প্রিন্টিং প্রেস, নিরাপত্তা কর্মী প্রভৃতি শ্রমিক জনগোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষায় বর্তমান শ্রম আইন প্রয়োগ করা সম্ভবপর নয়। শ্রমিক স্বার্থ উপেক্ষিত হওয়ার ফলে শ্রমিক অসন্তোষের মাত্রাও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া বর্তমান বাজারদর অনুযায়ী মজুরি পুনর্নির্ধারণ না করার ফলে ২০ থেকে ২৫ ভাগ শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষাও সম্ভবপর হচ্ছে না। শ্রম আইনের ত্রুটিসমূহের কারণে শ্রমিক অসন্তোষ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৪. **রাজনৈতিক প্রভাবদুষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন :** ১৯৪৮ সালের মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার ২৩ (৪) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজ স্বার্থ রক্ষায় ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও তাতে যোগদানের অধিকার সংরক্ষণ করে। ILO'র গঠনতন্ত্রের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, সংগঠন করার স্বাধীনতার স্বীকৃতিই হচ্ছে শ্রমিকদের অবস্থার উন্নয়ন এবং সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার অন্যতম উপায়। ILO'র গঠনতন্ত্র ছাড়াও এর ৮৭ নং কনভেনশনে মালিক-শ্রমিকদের সংগঠন করার অধিকার তথা ট্রেড ইউনয়ন গঠনের অধিকারের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু হতাশার কথা হলো, ট্রেড ইউনিয়ন শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষায় যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারছে না। এর মূল কারণ হলো ট্রেড ইউনিয়নে রাজনৈতিক প্রভাব। রাজনৈতিক প্রভাব থাকার কারণে ট্রেড ইউনিয়ন পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে পড়ছে। যার ফলে শ্রমিক অসন্তোষ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমান শ্রম আইন অনুযায়ী, কোনো ইউনিয়ন গঠনের জন্য শতকরা ৩০ ভাগ শ্রমিক থাকতে হবে। বর্তমানে শ্রম আইন ২০০৬ সংশোধনের যে প্রস্তাব করা হয়েছে তাতে বলা হয়েছে, কোনো ইউনিয়ন গঠনের জন্য শ্রমিকের সংখ্যা হবে শতকরা ৫১ ভাগ। কিন্তু শ্রমিক নেতারা বলছেন– আইন করে এটা করা হলে তা ILO কনভেনশনের ৮৭ ও ৯৮ ধারার পরিপন্থি হবে। তাদের মতে, ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করতে হবে শ্রমিক-কর্মচারীদের সচেতন ও সম্মিলিত সম্মতির ভিত্তিতে।

৫. **শ্রম আইন সংশোধনীর বিরোধিতা :** সরকার বর্তমানে শ্রম আইন ২০০৬, সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছে। এ সংশোধনীর খসড়ায় বলা হয়েছে– 'কোনো শ্রমিক নেতা দুই মেয়াদের বেশি কোনো ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না। শ্রমিক ইউনিয়নের কার্যকরী কমিটির কোনো পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হলে তার প্রশিক্ষণ থাকতে হবে। কোনো ট্রেড ইউনিয়ন প্রকাশ্যে বা গোপনে কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারবে না।' বাংলাদেশের মোট শ্রমিকের অধিকাংশ অশিক্ষিত এবং অধিকাংশ শ্রমিক কোনোরকম প্রশিক্ষণ ছাড়াই কর্মক্ষেত্রে যোগদান করে। বর্তমান সংশোধনী কার্যকর করা হলে শ্রমিকরা ট্রেড ইউনিয়নে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে না। যার ফলে শ্রমিকদের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দিচ্ছে।

৬. **কৃষি শ্রমিকের স্বার্থ উপেক্ষিত :** বর্তমান শ্রম আইনে কৃষি শ্রমিকের স্বার্থ নিশ্চিত করা হয়নি এবং তারা এ আইনের প্রায় বহির্ভূত। এজন্য যে— ১০ জন কৃষি শ্রমিক নিয়ে যদি কোনো কৃষি খামার গড়ে ওঠে, তবেই ওই কৃষি খামার বর্তমান শ্রম আইনের অন্তর্ভুক্ত হবে। ১৯৮৪ সালে কৃষি শ্রমিকের জন্য মজুরি নির্ধারিত হলেও তা কখনও বাস্তবায়িত হয়নি। কৃষি শ্রমিকরা সার, কীটনাশক ইত্যাদি ব্যবহারের ফলে স্বাস্থ্যগত সমস্যার সম্মুখীন হয়। কিন্তু সরকার তাদের আর্থিক ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য কোনো কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

৭. **শ্রম আদালতের অপ্রতুলতা :** বাংলাদেশে সাতটি শ্রম আদালত রয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে এ আদালতসমূহ তাদের কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারছে না। বাংলাদেশে মোট শ্রম আদালতের মধ্যে ঢাকায় তিনটি, চট্টগ্রামে দুটি, খুলনা ও রাজশাহীতে একটি করে শ্রম আদালত রয়েছে। আইনগত জটিলতা, সময় এবং দীর্ঘসূত্রতার কারণে শ্রমিকরা সাধারণত আদালতে আসতে অনীহা প্রকাশ করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শ্রমিকরা প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পর্যন্ত প্রদর্শন করতে পারে না। এছাড়া কৃষি শ্রমিকসহ যেকোনো তৃণমূল পর্যায়ের শ্রমিকের জন্য শ্রম আদালতে আসা বেশ কঠিন এবং দুরূহ। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকরা কোনো প্রকার ক্ষতিপূরণ পায় না, যা শ্রমিক অসন্তোষ বৃদ্ধির একটি অন্যতম কারণ।

৮. **সার্ভিস বেনিফিট থেকে বঞ্চিত :** পূর্বের আইনে প্রতিবছরের অতিরিক্ত ছয় মাস চাকরিকাল অতিক্রান্ত হলে তাকে পূর্ণ বছর হিসেবে গণনা করে সার্ভিস বেনিফিট দেয়ার বিধান ছিল। কিন্তু বর্তমান আইনে অতিরিক্ত ছয় মাস হিসাব থেকে বাদ দিয়ে শুধু পূর্ণ বছর গণনা করার বিধান করা হয়েছে। ফলে শ্রমিকরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

৯. **দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণের অপ্রাপ্যতা :** 'শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন ১৯২৩'-এ দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শ্রমিকেরা তাদের প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এছাড়া শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইনে মৃত্যুর ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ৮০০০ টাকা এবং সর্বাধিক ক্ষতিপূরণ ২১০০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইনে ক্ষতিপূরণের এ পরিমাণ বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে একেবারেই নগণ্য। এছাড়া শ্রমিকদের পক্ষ থেকে কর্তব্যরত অবস্থায় কারো মৃত্যু ঘটলে পাঁচ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ হিসেবে দাবি করা হলেও সরকার ঐ স্থলে এক লাখ টাকা নির্ধারণ করে দিয়েছে। যা শ্রমিকদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

১০. **চাকরিক্ষেত্রে নিরাপত্তাহীনতা :** বাংলাদেশের শিল্প শ্রমিকেরা কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। কারণ মালিকশ্রেণী তাদের ইচ্ছানুযায়ী শ্রমিক ছাঁটাই করে থাকে এবং চাকরি স্থায়ী না হওয়ার কারণে শ্রমিকদের নিরাপত্তাহীনতাবোধ আরও বৃদ্ধি পায়।

১১. **কল্যাণমূলক ব্যবস্থার অভাব :** দেশের অধিকাংশ শিল্প-কারখানাতে শ্রমিকদের কল্যাণমূলক ব্যবস্থার অভাব রয়েছে। কল্যাণমূলক ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে– প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জামাদি, ক্যান্টিন, শিশুদের জন্য কক্ষ, কল্যাণ কর্মকর্তা ইত্যাদি।

১২. **কাজের সময় :** 'কারখানা আইন ১৯৬৫'-তে বলা হয়েছে– 'কোনো কারখানায় একজন প্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিককে দৈনিক ৯ ঘণ্টার বেশি কাজ করানো যাবে না। তবে ওভারটাইমসহ একজন প্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিক দৈনিক ৯ ঘণ্টার বেশি কাজ করতে পারেন কিন্তু ১০ ঘণ্টার অতিরিক্ত পারবেন না। ওভারটাইমের জন্য একজন শ্রমিক তার সাধারণ মজুরির দ্বিগুণহারে ভাতা পাবেন।' কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশ শিল্প-কারখানায় এ আইনের যথাযথ প্রয়োগ ঘটে না। যার ফলে শ্রমিকরা তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় এবং এরই ফলস্বরূপ বর্তমানে শ্রমিক অসন্তোষ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

শ্রমিক অসন্তোষ ও পোশাক শিল্পের ভবিষ্যৎ : বাংলাদেশে বেসরকারি উদ্যোগে গার্মেন্টস শিল্প দ্রুত বিকাশ লাভ করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশে গার্মেন্টসের সংখ্যা তিন হাজারের অধিক। যেখানে প্রায় ২২ লাখ শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয়েছে, যা বাংলাদেশের মোট শ্রমিকের ১৫%-এরও অধিক। পোশাক শিল্প বর্তমানে বৈদেশিক বাণিজ্যের সর্ববৃহৎ খাত। বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের ৭৫% পোশাক শিল্প থেকে অর্জিত হয়। বাংলাদেশের সস্তা শ্রম ও অনুকূল পরিবেশ এ খাতের উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। বর্তমানে বাংলাদেশে বিভিন্ন গার্মেন্টস ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানে সৃষ্ট শ্রমিক অসন্তোষ গার্মেন্টস শিল্পের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। শ্রমিক অসন্তোষের প্রেক্ষিতে পোশাক শিল্পের ওপর এর নেতবিাচক প্রভাবসমূহ আলোচনা করা হলো :

১. **আন্তর্জাতিক বাজারে চ্যালেঞ্জ :** শ্রমিক অসন্তোষের ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের পোশাক শিল্প বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হবে। কারণ আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশকে ভারত, চীনসহ এশিয়ার অনেক দেশের সাথে তীব্র প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকতে হয়। শ্রমিক অসন্তোষ বৃদ্ধির ফলে শ্রমিকদের অসহযোগিতা বাংলাদেশের পোশাক শিল্পকে ঝুঁকির মুখে ফেলবে।

২. **উৎপাদন ব্যাহত :** বর্তমানে বাংলাদেশ ২০টিরও অধিক দেশে পোশাক রপ্তানি করছে। বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের সবচেয়ে বড় ক্রেতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় দেশসমূহ।

পোশাক শিল্পে শ্রমিক অসন্তোষ বৃদ্ধি পেলে বাংলাদেশে পোশাক শিল্পের উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হবে, যা এ শিল্পের ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত নেতিবাচক।

৩. **বৈদেশিক বিনিয়োগ ব্যাহত :** যেহেতু বাংলাদেশে মূলধনের যথেষ্ট অভাব রয়েছে, তাই এ অভাব পূরণের জন্য বৈদেশিক বিনিয়োগ অপরিহার্য। শ্রমিক অসন্তোষ বৃদ্ধি পেলে সঠিক সময়ে কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন মাত্রা অর্জিত হবে না। ফলে উৎপাদনকারীরা সময়মতো পণ্য সরবরাহ করতে ব্যর্থ হবে। যার ফলে বৈদেশিক বিনিয়োগকারীরা তাদের বিনিয়োগ প্রত্যাহার করে নিতে পারেন।

৪. **উৎপাদনকারীর আর্থিক ক্ষতি :** শ্রমিক অসন্তোষ বৃদ্ধি পেলে পণ্য পরিবহন ও শিপমেন্ট প্রদানে বিলম্ব কিংবা অপারগ হলে ক্রেতারা পণ্য সময়মতো পান না বিধায় ক্রেতারা তাদের অর্ডার বাতিল করে দিতে পারেন। এর ফলে উৎপাদনকারীরা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হবেন।

৫. **বিদেশে বাংলাদেশের নেতিবাচক ভাবমূর্তি :** বাংলাদেশের বৈদেশিক বিনিয়োগের প্রধান অন্তরায় দুর্বল অবকাঠামো ও বিদেশে বাংলাদেশের মলিন ভাবমূর্তি। অধিকাংশ বিদেশীদের নিকট বাংলাদেশ একটি ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ, খরা, বন্যা ইত্যাদি সমস্যায় আক্রান্ত একটি দেশ। এ ধরনের নেতিবাচক ভাবমূর্তির কারণে লগ্নিকারক দেশ ও সংস্থাসমূহ বাংলাদেশে বড় যে কোনো বিনিয়োগে দ্বিধাগ্রস্ত থাকে। এসব সমস্যার সাথে শ্রমিক অসন্তোষ যুক্ত হলে পোশাক শিল্পে বৈদেশিক বিনিয়োগের হার কমে যাবে।

৬. **রপ্তানি বাণিজ্যে ধস :** শ্রমিক অসন্তোষ বৃদ্ধি পেলে তার প্রভাব রপ্তানি বাণিজ্যের ওপর পড়বে। ফলে উৎপাদনের ধারা ব্যাহত হবে, বৈদেশিক বিনিয়োগ কমে আসবে। ফলে দেশের রপ্তানি বাণিজ্যের প্রধান খাত পোশাক শিল্পের ভবিষ্যৎ হুমকির মুখে পড়বে।

উপসংহার : বাংলাদেশে পোশাক শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা অত্যন্ত উজ্জ্বল। বর্তমানে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকতে হলে বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পপণ্যের গুণগত মান বৃদ্ধি করতে হবে। বাংলাদেশে উদ্যোক্তা ও শ্রমিক শ্রেণীর পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ববাজারে টিকে থাকতে পারবে। তবে এর জন্য অবশ্যই সুষ্ঠু পরিকল্পনা, নীতিমালা ও সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা থাকতে হবে। শ্রম আইনে শ্রমিক স্বার্থ নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বাংলাদেশে পোশাক শিল্পে অগ্রগতির ধারা অব্যাহত থাকলে অচিরেই বাংলাদেশ 'Garment Valley'-তে পরিণত হবে বলে আশা করা যায়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৪১। বাংলাদেশের চামড়া শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

উত্তর : চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য ঐতিহ্যগতভাবে আমাদের দেশের রপ্তানি বাণিজ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ। দেশের রপ্তানি আয়ে যে কয়টি খাতের অবদান রয়েছে তার মধ্যে চামড়া এবং চামড়াজাত দ্রব্য অন্যতম। আমদানি নির্ভর বাংলাদেশে দেশীয় কাঁচামাল নির্ভর এ খাতের মূল্য সংযোজন ৮৫ শতাংশ। একমাত্র কিছু কেমিক্যাল ছাড়া এ শিল্পের সব কাঁচামাল দেশেই পাওয়া যায়। গবাদিপশুর চামড়ার ওপর নির্ভর করেই বিকাশ লাভ করেছে এসব শিল্প। সরকার চামড়া শিল্পকে থ্রাস্ট সেক্টর হিসেবে চিহ্নিত করেছে। বহুবিধ সমস্যা সত্ত্বেও বর্তমানে চামড়া খাত থেকে বছরে প্রায় ১২০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। সংশ্লিষ্টরা বলেছেন, আমদানি নির্ভর জাতীয় অর্থনীতিতে চামড়া শিল্পের সমস্যাগুলো সমাধান করা গেলে এ খাত থেকে বছরে পাঁচ হাজার কোটি টাকার রপ্তানি আয় অর্জন করা সম্ভব হবে, যা বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে বিশেষ অবদান রাখবে।

বাংলাদেশে চামড়া শিল্পের ইতিহাস : ব্রিটিশ শাসনামলে এ দেশে কোনো চামড়া শিল্প গড়ে উঠেনি। তখন এ দেশের চামড়া কাঁচামাল হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ, কানপুর এবং মাদ্রাজে প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য পাঠানো হতো। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর পাকিস্তান সরকার এ দেশে চামড়া শিল্প প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল এবং দুটি শিল্প প্রতিষ্ঠা করেছিল—একটি ঢাকার হাজারীবাগে অপরটি চট্টগ্রামের কালুরঘাটে। ১৯৪৯ সালে সরকারি পর্যায়ে এ দেশে চামড়া শিল্পের ওপর একটি ইনস্টিটিউট স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়, কিন্তু সে পরিকল্পনা কার্যকরী হয়নি। পরবর্তীতে উন্নতমানের শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৫০ সালে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেদার টেকনোলজি-এর গোড়া পত্তন ঘটে। ১৯৫১ সালে আর পি সাহা নারায়ণগঞ্জে একটি ট্যানারি স্থাপন করেন। পরে ১৯৬০ সালে কতিপয় পাকিস্তানি চামড়া ব্যবসায়ীর উদ্যোগে ঢাকার হাজারীবাগ এলাকায় আধুনিক ট্যানারি স্থাপিত হয়। তখন দেশে স্থাপিত মোট ৫৫টি মাঝারি ও বড় আকারের ট্যানারির মধ্যে ৩০টির মালিক ছিলেন তারা। আধুনিক ট্যানারি বলতে তখন ঐগুলোকেই বুঝাত। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ধরনের ট্যানারির মালিক ছিলেন কিছু সংখ্যক বাঙালি। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের পর ৩০টি বড় ট্যানারি সরকার অধিগ্রহণ করে কিন্তু দুর্বল ব্যবস্থাপনার জন্য লোকসান হওয়ায় সেগুলোকে আবার ব্যক্তিগত পর্যায়ে ছেড়ে দিতে হয়। বর্তমানে সারা দেশে ট্যানারির সংখ্যা ৩০০টির ওপরে, এর মধ্যে ২৭০টি হাজারীবাগ এলাকায় অবস্থিত।

সরকারের নীতি : রপ্তানি ক্ষেত্রে এ খাতের ব্যাপক সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করে সরকার ১৯৭৭ সালে চামড়া শিল্পের উন্নয়নে মালিকদের উৎসাহ দেয়ার জন্য কিছু ক্যাশ সাবসিডি সুবিধা প্রদানের নীতি প্রবর্তন করেন। এ ব্যবস্থা উদ্যোক্তাদের দারুণভাবে উৎসাহিত করে। ফলে এ সময় দ্রুত এ সেক্টরের বিস্তৃতি ঘটে। সরকার রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ খাতে ঋণ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এ সুযোগে প্রকৃত ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি ট্রেড লাইসেন্স ও রপ্তানি লাইসেন্স সর্বস্ব সংরক্ষক কিছু ব্যবসায়ী ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে এ ব্যবসায় জড়িত হয়। ভ্যালু এডিশন বৃদ্ধির জন্য ১৯৯০ সালের ১ জুলাই থেকে ওয়েট-ব্লু চামড়া রপ্তানি সরকার নিষিদ্ধ করে। এর উদ্দেশ্য হলো ক্রাস্ট ও ফিনিশড চামড়া রপ্তানি করে অধিক পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা। ওয়েট-ব্লু চামড়া রপ্তানি করলে ভ্যালু এডিশন কম হয়।

অপরদিকে সরকার রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য মূলত দু'ভাবে ইনসেনটিভ (incentive) দেয়ার ব্যবস্থা হাতে নিয়েছেন। এগুলো হচ্ছে ১. প্রত্যাহারকৃত শুল্ক (duty drawback) এবং ২. রপ্তানি কৃতিত্ব লাইসেন্স (export performence)।

পণ্য বৈচিত্র্য : দেশের অর্থনীতিতে চামড়া শিল্পের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ খাত থেকে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। বিশ্ববাজারে চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ জন্য বিভিন্ন ধরনের চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্যসামগ্রী তৈরি হচ্ছে যেমন—জুতা, ব্যাগ, বেল্ট, পার্স, ওয়ালেট, ট্রাভেল কিটস, ফুটওয়্যার, জ্যাকেট, থ্রি কোয়ার্টাস, স্কাই লংকোট, ওয়েস্ট কোট, হাফপ্যান্ট, ফুলপ্যান্ট, স্যুটকেস, ফার্নিচার্স কভার, লেডিস ব্যাগ, মানিব্যাগ, ওয়েট ব্লু, ক্রাস্ট চামড়া, ফিনিশ চামড়া ইত্যাদি।

রপ্তানি প্রবণতা অগ্রগতি : চামড়া শিল্পের কাঁচামাল মূলত অন্যান্য শিল্পের বাই প্রোডাক্ট। ফলে এ শিল্পে ভ্যালু এডিশন অন্যান্য শিল্পের তুলনায় অনেক বেশি। ক্রাস্ট ও ফিনিশড লেদার রপ্তানি করে যে পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব তার থেকে চারগুণ পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা চামড়াজাত পণ্য ও জুতা শিল্প স্থাপন এবং তা সফলভাবে রপ্তানি করলে অর্জন করা সম্ভব।

রপ্তানি বাণিজ্যে চামড়া শিল্পের অবদান *[মিলিয়ন মার্কিন ডলার]*

সাল	*রপ্তানি মূল্য (চামড়া ও চামড়ার তৈরি দ্রব্যাদি)*	*দেশের মোট রপ্তানিতে শতকরা হার*
২০০০-০১	২০৭.৩৩	৩.৪৬
২০০২-০৩	১৯১.২৩	২.৯২
২০০৬-০৭	২৬৬.০৮	২.১৮
২০০৭-০৮	২৮৪.৪১	২.০২
২০০৮-০৯	১৭৭.৩২	১.১৪
২০০৯-১০	২২৬.১০	১.৪০
২০১০-১১	২৯৭.৮৩	১.৩০
২০১১-১২	৩৩০.০০	১.৪০
২০১২-১৩	৪০০.০০	১.৫০
২০১৩-১৪ (জুলাই-জুন)	৩৩৩.০০	১.৭০

সূত্র : রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

চামড়াজাত দ্রব্যের রপ্তানির অগ্রগতি সন্তোষজনক। চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের প্রধান প্রধান আমদানিকারক দেশসমূহ হচ্ছে হংকং, ইতালি, স্পেন, জাপান, তাইওয়ান, ফ্রান্স, ব্রাজিল, চীন, রাশিয়া, জার্মানি এবং যুক্তরাজ্য। উল্লিখিত দেশসমূহের অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে আমাদের চামড়া শিল্প অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

রপ্তানি সমস্যা ও বাধাসমূহ : ব্যাপক সম্ভাবনাময় এ শিল্প এখন বহু সমস্যায় জর্জরিত। চামড়া শিল্পে শুরু থেকে এ পর্যন্ত উদ্ভূত সমস্যাবলীর ধারাবাহিক বর্ণনা করা হলো :

- সঠিক ও সময়োপযোগী নীতিমালার অভাব।
- কোটি কোটি বর্গফুট চামড়া পার্শ্ববর্তী দেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে।
- আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে আমাদের রপ্তানি ক্ষেত্রে কোনো কিছু পাস করাতে সময় লাগছে বলে আমরা ঠিকমতো শিপমেন্ট দিতে পারি না। তাই বিশ্ববাজারের সাথে প্রতিযোগিতায় আমরা টিকে থাকতে পারছি না।
- ব্যাংকগুলোর স্বচ্ছতার অভাব ও অসহযোগিতা এবং ঋণ মিস ব্যবহার হওয়াতে প্রকৃত চামড়া শিল্পের ব্যবসায়ী বা মালিকরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

- কাস্টমস সমস্যা।
- দক্ষ শ্রমিকের অভাব।
- ভালো টেকনিশিয়ানের অভাব।
- অনেক অসাধু ব্যবসায়ীদের সাথে অসম প্রতিযোগিতায় প্রকৃত ব্যবসায়ীদেরকে অনেক খেসারত দিতে হচ্ছে। তারা ঘুষ দিয়ে ঋণ নিয়ে ব্যক্তিগত খাতে টাকা খরচ করে।
- বকেয়া ব্যাংক ঋণ।

ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা : দেশে প্রাপ্ত মোট চামড়ার প্রায় ৯৫ শতাংশ ফিনিশড ও ক্রাস্ট চামড়া এবং চামড়াজাত পণ্য, ফুটওয়্যার, গার্মেন্টস ইত্যাদি রূপে বিদেশে রপ্তানি হয়ে থাকে। এতে প্রায় ৮৫ ভাগ ভ্যালু এডিশন হয়। চামড়া শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিক-কর্মচারীর সংখ্যা প্রায় ৬৫,০০০। সারা দেশে চামড়া আড়তদারের সংখ্যা প্রায় ১৫ হাজার। সারা দেশে চামড়া সংগ্রহকারী ফড়িয়ার সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ। বাংলাদেশের ভয়াবহ বেকার সমস্যা লাঘব করার ক্ষেত্রে এ শিল্প যথেষ্ট ভূমিকা রাখছে এবং ভবিষ্যতে আরো বৃদ্ধি পাবে আশা করা যাচ্ছে।

কতিপয় সুপারিশ : বাংলাদেশের ব্যাপক সম্ভাবনাময় চামড়া শিল্প নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত এবং বর্তমানে অত্যন্ত সংকটপূর্ণ অবস্থা বিরাজ করছে। এ সমস্যাবলীর সমাধানের জন্য বর্তমান অবস্থার নিরিখে কতিপয় সুপারিশ রাখা হলো :

- চামড়া শিল্পের জন্য সম্পূর্ণ আলাদাভাবে চামড়া নীতি প্রণয়ন করে আসল ব্যবসায়ীদের ঋণ প্রদান করতে হবে।
- তৈরি পোশাক শিল্পের মতো চামড়া শিল্পে নিয়োজিত রপ্তানিকারক শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর অনুকূলে নির্দিষ্ট হারে 'বিকল্প সুবিধা' প্রদান করা যেতে পারে।
- হাজারীবাগ চামড়া শিল্প এলাকায় সরকারি উদ্যোগে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন করা প্রয়োজন।
- আমদানি ও রপ্তানি ক্ষেত্রে অগ্রিম ট্যাক্স আদায়ের নিয়ম বাতিল করে তাদেরকে কিছু বাড়তি সুবিধা দেয়া যেতে পারে।
- পিক আওয়ারে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিল আদায় না করার বা ক্রম হ্রাসমান হারে আদায়ের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
- সরাসরি চামড়া রপ্তানি বন্ধ করতে হবে। এতে মূল্য সংযোজন বহু গুণে বৃদ্ধি পাবে।
- নতুন ট্যানারি স্থাপন না করে সরকারকে বরং বন্ধ ট্যানারিগুলোকে চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
- ক্রাস্ট ও ফিনিশড চামড়ার বাজারে টিকে থাকার লক্ষ্যে অধিক সংখ্যক চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্যের কারখানা গড়ে তোলা প্রয়োজন।
- সরকার ও বিরোধী দলকে সহনশীল হতে হবে। কারণ আইন-শৃঙ্খলা ঠিক না থাকলে বৈদেশিক ক্রেতারা আকৃষ্ট হবে না।
- গার্মেন্টস শিল্পের মতো চামড়া শিল্পকে উন্নয়ন করতে হলে বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসে চামড়া বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি রাখা এবং যে কোনো আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করতে হবে।
- নতুন নতুন বাজার সৃষ্টির তথা পণ্য বহুমুখীকরণের মাধ্যমে রপ্তানি আয় বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
- চামড়া ক্যাপিটাল ইনটেনসিভ বা মূলধন নির্ভর শিল্প। তাই ব্যাংকগুলো যেন সময়মতো চলতি মূলধন বা ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের যোগান দেয় সেদিকে নজর দিতে হবে।

– ট্যানারিগুলোকে হাজারীবাগ থেকে স্থানান্তরিত করে পরিকল্পিতভাবে ও সুবিধাজনক স্থানে চামড়া শিল্প স্থাপন করতে হবে।
– আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে তুলনা করে নীতি গ্রহণ করতে হবে।
– ব্যাংকগুলোকে চামড়া শিল্পের জন্য আলাদা নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।
– চামড়া শিল্পের স্থায়ী ও টেকসই উন্নয়নের জন্য ব্যাকওয়ার্ড ও ফরওয়ার্ড লিংকেজ ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তুলতে হবে।
– হাজারীবাগ এলাকা পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখার লক্ষ্যে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্রজেক্ট হাতে নিতে হবে।

উপসংহার : আমদানি নির্ভর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য রপ্তানি আয় বৃদ্ধির বিকল্প কোনো পথ নেই। চামড়া শিল্পকে একটি সম্ভাব্য রপ্তানিমুখী ও বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী খাত হিসেবে গড়ে তোলার জন্য চামড়া উৎপাদন ও বাজারজাত করার কাজে নিয়োজিত বিভিন্ন সংস্থা এবং সরকারের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা একান্ত প্রয়োজন। যেহেতু চামড়া শিল্প একটি রপ্তানি নির্ভর শিল্প সুতরাং এর আন্তর্জাতিক বিপণন বৃদ্ধির দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাণিজ্য মেলায় উপস্থিত হয়ে আমাদের চামড়ার গুণগতমান প্রদর্শন করতে হবে। প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব বাজারে টিকে থাকতে হলে আমাদেরকে এ ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন হতে হবে।

৪২ । ভিশন-২০২১ কি? ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পূর্তি উপলক্ষে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিকল্পনাগুলো উল্লেখ করুন।

উত্তর : বাংলাদেশ ২০২১ সালে তার স্বাধীনতার ৫০ বছর অতিক্রম করবে। ১৯৭১ সালে ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয় আমাদের স্বাধীনতা। পাকিস্তানি শোষণ থেকে মুক্তি ও এদেশের জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করাই ছিল মুক্তিযুদ্ধের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে স্বাধীনতার ৪৩ বছর পার হওয়ার পরেও স্বাধীনতার স্বপ্ন ও উদ্দেশ্য আজও পূরণ হয়নি। ৯০ দশকের পর থেকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও গণতান্ত্রিক চর্চার কিছুটা উন্নতি হয়ে আসছিল। কিন্তু কোনো ক্ষমতাসীন দলই সুনির্দিষ্ট কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ না করায় অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা কোন পর্যায়ে পৌছাবে তা বুঝা যাচ্ছিল না। ২০০৮ সালে বাংলাদেশের নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ একটি দীর্ঘমেয়াদি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা সম্বলিত নির্বাচনী ইশতেহার রচনা করেছিল। যেখানে ২০২১ সালে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন মেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণের কথা বলা হয়েছিল। মূলত ২০২১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে গৃহীত পরিকল্পনাগুলোই ভিশন-২০২১ নামে পরিচিত।

ভিশন-২০২১ কি : বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২০০৮ সালে সর্বপ্রথম 'ভিশন-২০২১' বা 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' নামটি প্রচার করে। ২০২১ সাল নাগাদ বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দারিদ্র্যমুক্ত ও প্রযুক্তি নির্ভর দেশ গঠন করাই 'ভিশন-২০২১' 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' এর প্রধান লক্ষ্য। এগারো বছর মেয়াদি (২০১০-২০২১) একটি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (Perspective plan) এবং ষষ্ঠ ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে এর বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ রূপকল্প অর্জিত হবে। উল্লিখিত সময়ে বাংলাদেশ একটি অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল ও উদার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হবে। রূপকল্পের অন্যান্য বিষয়গুলো হলো প্রকৃত অংশীদারিত্বমূলক সহিষ্ণু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, সামাজিক ন্যায়বিচারের

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

নিশ্চয়তা, নারীর অধিকার ও সুযোগের সমতা, আইনের শাসন, মানবাধিকার, সুশাসন, দূষণমুক্ত পরিবেশ, সবার জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিতকরণ, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট বিপর্যয়ের মোকাবিলার সক্ষমতা অর্জন প্রভৃতি। তথ্য প্রযুক্তিতে বিকশিত হয়ে রূপকল্প বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে সেই সময়ে বাংলাদেশ পরিচিতি পাবে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' নামে।

ভিশন-২০২১ স্বপ্নপূরণে সরকারের গৃহীত সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিকল্পনাসমূহ :

১. **শক্তিশালী গণতন্ত্র ও কার্যকর সংসদ :** যথাসময়ে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন, কার্যকর সংসদ ও সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গণতন্ত্রকে জোড়দার ও শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া হবে।

২. **রাজনৈতিক কাঠামো, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও ক্ষমতায় জনগণের অংশগ্রহণ :** রাজনৈতিক কাঠামোগত বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়নের মাধ্যমে স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করা। যাতে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে স্থানীয় সরকারের প্রতিষ্ঠানসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তৃণমূল পর্যায়ে সরকারি কর্মকাণ্ডকে জবাবদিহিতামূলক ও প্রতিনিধিত্বমূলক করতে জেলা-উপজেলা পর্যায়ে আত্মনির্ভরশীল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হবে।

৩. **সুশাসন প্রতিষ্ঠা :** আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা হবে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও প্রশাসনকে সরকারের প্রভাবমুক্ত করে স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা হবে। মেধা, দক্ষতা, জ্যেষ্ঠতা, সততা অনুযায়ী প্রশাসক ও বিচারকের নিয়োগ ও পদোন্নতি নিশ্চিত হবে।

৪. **রাজনৈতিক সংস্কৃতির আদান প্রদান :** সন্ত্রাস, দুর্নীতি এবং রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার রোধ করা হবে। রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে গণতান্ত্রিক চর্চা, রাজনৈতিক দলের তহবিল গঠনে স্বচ্ছতা, শিষ্টাচার ও সহনশীলতা তৈরিতে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

৫. **দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠন :** দুর্নীতিকে সমাজ থেকে মুছে ফেলার লক্ষ্যে দুর্নীতি দমন কমিশনকে আরো শক্তিশালী করা হবে। যথাযথ আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ, নাগরিক অধিকার সনদ প্রণয়ন, তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণ, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণসহ সকল সম্ভাব্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৬. **নারীর ক্ষমতায়ন ও সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা :** সামাজিক ও রাজনৈতিক পর্যায়ে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত এবং নারীদের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠায় নারী নীতি-১৯৯৭ কে সংশোধন করা হবে।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনাসমূহ :

১. **মৌলিক চাহিদা পূরণ :** সংবিধানের ১৫ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নাগরিকদের মৌলিক চাহিদা পূরণ তথা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের অধিকার নিশ্চিত করা হবে। জিডিপির প্রবৃদ্ধি হার ২০১৩ সালে ৮% এবং ২০২১ সালে ১০% এ উন্নীত করা।

২. **জনসংখ্যা ও জনশক্তি :** ২০২১ সালে প্রাক্কলিত জনসংখ্যা হবে ১৬৫ মিলিয়ন এবং শ্রমশক্তি হবে ১০৫ মিলিয়ন। শ্রমশক্তির অন্তত ৮৫% কে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

৩. **দারিদ্র্যের হ্রাস :** দারিদ্র্য নিরসনে জাতিসংঘের মিলিনিয়াম লক্ষ্যমাত্রা ২০১৫ ও টেকসই লক্ষ্যমাত্রা-২০১৭ অর্জন করা হবে। ২০২১ সালে দারিদ্র্যের হার ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনা হবে। দারিদ্র্য নির্মূলে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি কার্যক্রমকে শক্তিশালী করা হবে।

৪. খাদ্য ও পুষ্টি : ২০১২ সালের মধ্যেই খাদ্য ঘাটতি দূর করে বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশ গঠন করা হবে এবং একই সময়ে জনসংখ্যার ৮৫% কে পুষ্টির আওতায় আনা হবে।

৫. শিক্ষা ও স্বাস্থ্য : ২০১০ সালেই প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ ১০০ শতাংশে উন্নীত করা হবে। ২০১৪ সালে নিরক্ষরতা দূর করা হবে। গুণগত শিক্ষা প্রদান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থা এবং শিক্ষকদের জন্য যথাযথ বেতনস্কেল গঠনের মাধ্যমে শিক্ষার আধুনিকায়ন হবে। অন্যদিকে ২০২১ সালের মধ্যে প্রতিটি নাগরিকের জন্য সর্বনিম্ন ২১২২ কিলোক্যালরি খাদ্য গ্রহণ, সংক্রামক রোগের নির্মূল, প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা এবং সবার জন্য স্যানিটারি ব্যবস্থা সুবিধার নিশ্চয়তা প্রদান। জীবন আয়ু গড়ে ৭০ বছর এ উন্নীত এবং শিশু ও মাতৃ মৃত্যুহার উল্লেখজনকহারে হ্রাস করা।

৬. শিল্প : দেশের শিল্পায়নের জন্য ২০২১ সালের মধ্যে একটি শক্তিশালী ভিত্তি রচনা। জিডিপিতে শিল্পের অবদান দ্বিগুণ করা। কৃষি এবং শ্রমনিবিড় শিল্পকে গুরুত্ব দেওয়া এবং তথ্যপ্রযুক্তি খাতকে অগ্রাধিকার দেওয়া। দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগকে উৎসাহিত করতে যথাযথ বিনিয়োগ নীতি গ্রহণ।

৭. জ্বালানি নিরাপত্তা : দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শিল্পায়নের গতির তরান্বিতকে নিশ্চিত করতে একটি জ্বালানি নীতি গ্রহণ করা হবে। ২০১৫ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন ৮,০০০ মেগাওয়াট এবং ২০২১ সালের মধ্যে ২০,০০০ মেগাওয়াটে উন্নীত হবে। গ্যাস্ উৎপাদন ও নতুন গ্যাস ক্ষেত্রের অনুসন্ধান এবং জ্বালানি চাহিদা মেটাতে সম্ভাব্য সকল পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

৮. অবকাঠামো উন্নয়ন : সড়ক, রেল, নৌ ও আকাশপথ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরো সম্প্রসারিত করা হবে। নতুন নতুন ব্রিজ নির্মাণ, পদ্মা ও কর্ণফুলী নদীতে টানেল নির্মাণ,এশিয়ান হাইওয়ে এবং রেলওয়েতে বাংলাদেশকে সম্পৃক্ত করা, বন্দর সুবিধার উন্নয়নসহ গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ করা হবে। ঢাকা শহরের যানজট নিরসনে এখানে মেট্রোরেল ও উড়ালসড়ক নির্মাণ করা হবে।

৯. আবাসন সুবিধা : ২০১৫ সালের মধ্যেই সবার জন্য আবাসন সুবিধা নিশ্চিত করা হবে। প্রতিটি ইউনিয়ন এবং উপজেলায় গ্রাম এববং শহর কেন্দ্রিক প্রবৃদ্ধি কেন্দ্র (Growth center) স্থাপন করা হবে।

১০. পরিবেশ : বাংলাদেশকে রক্ষা করতে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ নেয়া হবে, প্রয়োজনে জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈশ্বিক উষ্ণতারোধে বিদেশে পরিকল্পিত উপায়ে জমি অধিগ্রহণ হবে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা, পরিকল্পিত উপায়ে বায়ু দূষণ হ্রাস, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং শিল্প ও পরিবহন খাতকে পরিবেশ বান্ধব হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সকল পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

উপসংহার : ভিশন ২০২১ বা রূপকল্প ২০২১ হলো বাংলাদেশের উন্নয়নের স্বপ্ন। ভিশন ২০২১ এর লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছাতে আর মাত্র ৪-৫ বছর বাকি। রূপকল্পের সফলতা ও ব্যর্থতা নিয়ে শুরু হয়েছে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ। ভিশন ২০২১ এর অধিকাংশ পরিকল্পনা যথাসময়ে বাস্তবায়িত হওয়ার ব্যাপারে সংশয় থাকলেও কয়েকটি দিক থেকে বাংলাদেশ আশাতীত সাফল্য অর্জন করেছে। দারিদ্র্য হ্রাস, শিশু ও মাতৃমৃত্যু হার হ্রাস, প্রাথমিক শিক্ষায় ছাত্র/ছাত্রীদের ঝরে পড়ার হার হ্রাস, নারীর ক্ষমতায়ন ও বিদ্যুৎ উৎপাদনে বাংলাদেশ ব্যাপক সাফল্য দেখিয়েছে। ভিশন ২০২১ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে পরিকল্পনার বাকি বিষয়গুলোরও বাস্তবায়ন জরুরি। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালনের মাধ্যমে যেন এ দেশের প্রতিটি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা পায়, দারিদ্র্যমুক্ত ও মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয় সে লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার যেন উন্নয়ন কার্যক্রমকে আরো জোরদার করে সেই প্রত্যাশাই ব্যক্ত করি।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৪৩। পদ্মা সেতু নির্মাণের অর্থনৈতিক গুরুত্ব আলোচনাপূর্বক পদ্মা সেতু বাস্তবায়নের অগ্রগতি বিষয়ে আলোকপাত করুন। পদ্মা সেতু নির্মাণের সাম্প্রতিক পরিস্থিতির বিবরণ দিন।

উত্তর : বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের বহুমুখী উন্নয়নের জন্য বিকল্পহীন উপায় পদ্মা সেতু। পদ্মা সেতুর নির্মাণ ব্যয়ের জন্য বিশ্বব্যাংকসহ এডিবি, জাইকা প্রভৃতি দাতা সংস্থার সাথে বাংলাদেশের চুক্তি হয়। এ প্রকল্পে বিশ্বব্যাংক ১.২ বিলিয়ন ডলারের ঋণ সহায়তা চুক্তি দিবে বলে সম্মত হয়। কিন্তু ২৯ জুন ২০১২ দুর্নীতির অভিযোগে বিশ্বব্যাংক এ চুক্তি বাতিল করে। ফলে বাংলাদেশের স্বপ্নের পদ্মা সেতু বাস্তবায়ন মুখ থুবড়ে পড়ে। কিন্তু বাংলাদেশ সরকারের সাহসী উদ্যোগে ও নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণের উদ্যোগে আজ বাস্তবায়নের পথে পদ্মা সেতু প্রকল্প। সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে ২০১৪ সালের নভেম্বর মাসে পদ্মা সেতুর মূল কাজ শুরু হয়।

পদ্মা সেতুর কাঠামো : প্রস্তাবিত পদ্মা সেতুর দৈর্ঘ্য হবে ৬.১৫ কিমি। সেতুটি নির্মিত হলে এটিই হবে বাংলাদেশের সবচেয়ে দীর্ঘতম সড়ক সেতু। মুন্সিগঞ্জের মাওয়া ও শরীয়তপুরের জাজিরা পয়েন্টে পদ্মা সেতু নির্মিত হচ্ছে। এ সেতু মাদারীপুর জেলার সাথে মুন্সিগঞ্জ ও শরীয়তপুর জেলাকে সংযুক্ত করার পাশাপাশি পূর্বাঞ্চলের সাথে সমগ্র দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের সংযোগ সাধন করবে। এর ২৬৮টি পাইল ও ৪টি লেন থাকবে। আয়ুষ্কাল হবে ১০০ বছর।

পদ্মা সেতু বাস্তবায়নের অগ্রগতি : পদ্মা সেতু একটি স্বপ্নের নাম। ১৯টি জেলাকে সরাসরি ঢাকার সাথে যোগাযোগের মাধ্যম হবে এই পদ্মা সেতু। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বেড়ে যাবে ১ শতাংশের বেশি। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে কোটি মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল পদ্মার উপরে একটি সেতু নির্মাণের। বাংলাদেশ সরকারের গুরুত্ব ও বৈদেশিক সহায়তায় পদ্মা সেতুর কাজ শুরু হওয়ার বিষয় যখন চূড়ান্ত তখনই স্বপ্নের পদ্মা সেতু নির্মাণে বাধ সাধে আন্তর্জাতিক চক্র। বিশ্বব্যাংক দুর্নীতির অভিযোগ আনলে বিশ্বব্যাংকের সাথে অন্যান্য দাতা সংস্থাগুলো ২০১২ সালের ২৯ জুন পদ্মা সেতু প্রকল্পে অর্থায়ন বন্ধ করে দেয়। ফলে বাংলাদেশে শুরু হয় আলোচনা-সমালোচনার ঝড়। অনেকেই ভাবতে লাগল পদ্মা সেতু নির্মাণের স্বপ্ন বুঝি মুখ থুবড়ে পড়ল। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার পদ্মা সেতু নির্মাণে অনঢ় থাকায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয় নিজস্ব অর্থায়নেই পদ্মা সেতু নির্মাণের। বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে এই সাহসী সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে ২০১৪ সালের প্রথম দিকেই পদ্ম সেতু নির্মাণের কাজ শুরু হয়ে যায়। নভেম্বর থেকে শুরু হয় পদ্মার সেতুর অংশের কাজ। নিম্নোক্ত উপায়ে পদ্মা সেতুর নির্মাণ কাজ এগিয়ে চলেছে।

১. পদ্মা সেতু প্রকল্পের কাজকে প্যাকেজে বিভক্ত : দ্রুত নির্মাণ ও শৃঙ্খলাজনিত কারণে পদ্মা সেতু প্রকল্পের কাজকে ছয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এর মধ্যে পাঁচটি হলো ভৌতজনিত এবং একটি তদারকি পরামর্শ সংক্রান্ত। ভৌতজনিত অংশগুলো হলো :

ক. মূল সেতু : পদ্মা সেতুর মূল অংশ নির্মাণের জন্য চীনের 'চায়না মেজর ইঞ্জিনিয়ারিং করপোরেশন লিমিটেড'-এর সাথে ২০১৪ সালের জুনে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। একই বছরের নভেম্বর মাসে কাজ শুরুর আদেশ পায়। মূল সেতুটি নির্মাণে বরাদ্দের পরিমাণ ১২১৩৩.৩৩ কোটি টাকা। অনুমতি লাভের পরপরই কোম্পানিটি কাজ শুরু করে দেয়। এপ্রিল ২০১৫ পর্যন্ত মূল সেতুর ৫ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়। কাজ শুরুর ৪ বছরের মধ্যেই সম্পন্ন করার তাগিদে রয়েছে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

খ. **নদীশাসন :** নদীশাসনের জন্য চীনেরই আরেকটি প্রতিষ্ঠান 'চীনোহাইড্রো করপোরেশন লিমিটেড'-এর সাথে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। নদীশাসনের জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে ৮৭০৭.৮১ কোটি টাকা। ২০১৪ সালের ডিসেম্বরে কাজ শুরু করে বর্তমানে নদী শাসনের কাজ এগিয়ে চলেছে যা ২০১৮ সালে শেষ হবে।

গ. **জাজিরা সংযোগ সড়ক :** ১০ কিমি দীর্ঘ পদ্মা সেতুর সাথে জাজিরা সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রায় ৪০ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে। এই প্রকল্পের কাজ শুরু হয় ২০১৩ সালের অক্টোবর মাসে।

ঘ. **মাওয়া সংযোগ সড়ক :** ১.৫ কিমি দীর্ঘবিশিষ্ট মাওয়া সংযোগ সড়কের নির্মাণ কাজ ইতিমধ্যে ৩০ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে। ১৯৩ কোটি টাকা বরাদ্দের এই প্রকল্পটির কাজ শুরু হয় ২০১৪ সালের জানুয়ারি মাসে এবং শেষ হবে কাজ শুরুর ২.৫ বছরের মাথায়।

ঙ. **অন্যান্য অবকাঠামো :** অন্যান্য অবকাঠামোর মধ্যে রয়েছে সার্ভিস এরিয়া-২, পুনর্বাসন, পরিবেশ, ভূমি অধিগ্রহণ, ইঞ্জিনিয়ারিং সাপোর্ট প্রভৃতি। যার প্রত্যেকটির অগ্রগতির হার সন্তোষজনক। মুন্সিগঞ্জ, মাদারীপুর, শরীয়তপুর এ তিন জেলা থেকে ১ হাজার ৪২২ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। পুনর্বাসনের জন্য ২ হাজার ৫৯২টি প্লটের মধ্যে ইতিমধ্যেই ১ হাজার ২৭০টি প্লট ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে হস্তান্তর হয়েছে। পরিবেশ কার্যক্রমের আওতায় সেতুর উপভয়পাশে রোপন করা হয়েছে ৫৫ হাজার ১৫০টি চারা গাছ।

চ. **তদারকি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান :** তদারকির দায়িত্ব দেয়া হয়েছে দুটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান দুটি হলো দক্ষিণ কোরিয়ার কোরিয়ান এক্সপ্রেসওয়ে ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনী।

পদ্মা সেতু প্রকল্পের অগ্রগতি বিষয়ে প্রকল্প বিশেষজ্ঞ কমিটির প্রধান ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী বলেন, নির্মাণ পর্যায়ে করিগরির জটিল বিষয় আসতে পারে। তবে সবকিছুই ঠিকমতো এগোচ্ছে। কাজ নির্ধারিত সময়েই শেষ হবে বলে আশা করা যায়।

২. **পদ্মা সেতুর অর্থায়ন ও কারিগরি বিষয় :** পদ্মা সেতুর কারিগরি বিষয়ে কয়েকটি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিদেশী কোম্পানিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সেতু নির্মাণের সবচেয়ে কঠিন কাজ হলো নদীতে পাইল বসানো। ইতোমধ্যেই চীনে পাইল তৈরি করা হয়েছে এবং জার্মানিতে তৈরি করা হয়েছে ৩ হাজার টন ওজনের হাইড্রোলিক হ্যামার, যা দিয়ে ১২০ ফুট মাটির গভীর পাইলগুলোকে বসানো হবে। ২০১৫ সালের মে মাসে এগুলো বাংলাদেশে পৌছানোর কথা রয়েছে।

অন্যদিকে পদ্মা সেতু নির্মাণের প্রধান বিষয়টি হলো অর্থায়ন। এ সেতু নির্মাণে আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে ২৫ হাজার কোটি টাকা। যার ৭০ শতাংশ বৈদেশিক মুদ্রায় সংঘটিত হবে। বাংলাদেশের এত বৈদেশিক মুদ্রা খরচের সামর্থ্য নেই এই ভাবনায় বিশ্বব্যাংকসহ অন্যান্য দাতা সংস্থাগুলোর সাথে অর্থায়ন নিয়ে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। কিন্তু বাংলাদেশে অর্থায়নে বিশ্বব্যাংকের নেতৃত্বে সংস্থাগুলো চুক্তি বাতিল করলে পদ্মা সেতু নির্মাণ নিয়ে টানাপোড়েন শুরু হয়। কিন্তু বাংলাদেশ সরকারের সাহসী উদ্যোগ 'নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ' পদ্মা সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নের স্বপ্নকে জিইয়ে রাখে।

পদ্মা সেতু নির্মাণে ২.১ বিলিয়ন ডলার বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন পড়বে। বাংলাদেশ ব্যাংকে রিজার্ভের পরিমাণ ২৩ বিলিয়ন ছাড়িয়ে গেছে। তাছাড়া প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স প্রতিবছর ১৪ বিলিয়নের বেশি।

চার বছরে ২.১ বিলিয়ন ডলার বাংলাদেশ ব্যাংক অনায়াসেই অর্থনীতির কোনোরূপ ক্ষতিছাড়া ব্যবস্থা করতে পারবে গভর্নর ড. আতিউর রহমানের এমন আশ্বাসে শুরু হয় বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় অবকাঠামো নির্মাণের পথচলা। অগ্রণী ব্যাংককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যখন যত ডলার লাগবে বাংলাদেশ ব্যাংককে যেন সময়মত অবহিত করা হয়। এভাবেই পদ্মা সেতু নির্মাণে অর্থায়নের সমস্যাটির সমাধান হয় এবং বাংলাদেশ শুরু করে বিদেশীদের সাহায্যে ছাড়া নিজস্ব উদ্যোগে এবং নিজেদের সামর্থ্যবলে বাংলাদেশের অহংকার 'পদ্মা সেতু প্রকল্পের' নির্মাণ কাজ।

পদ্মা সেতুর অর্থনৈতিক গুরুত্ব : পদ্মা সেতু নির্মিত হলে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ১৯টি জেলা রাজধানী ঢাকাসহ পূর্বাঞ্চলের সাথে যুক্ত হবে। এছাড়া রয়েছে নানাবিধ সম্ভাবনা। পরবর্তী পৃষ্ঠায় এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১. **সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন :** দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্ভর করে যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়নের উপর। পদ্মা সেতু নির্মিত হলে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সাথে সারাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধিত হবে। এতে করে সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে। বিশেষজ্ঞদের মূল্যায়নে দেখা গেছে বাংলাদেশে পদ্মা সেতু নির্মিত হলে ২০১৫ সাল থেকে ৩১ বছরের মধ্যে জিডিপি ৬০০০ মিলিয়ন ডলার বৃদ্ধি পাবে এবং ২০৩২ সালের পর বাৎসরিক রিটার্ন ৩০০ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়াবে।

২. **আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধি :** পদ্মা সেতু নির্মিত হলে দেশের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক যোগাযোগ সহজ হবে। ফলে প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে আঞ্চলিক সহযোগিতা জোরদার করা সহজ হবে। যা বর্তমান প্রেক্ষাপটে খুবই প্রয়োজন।

৩. **শিল্পায়ন :** উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থাকে শিল্পায়নের প্রাণ বলা হয়। কেননা কাঁচামালের সহজলভ্যতা এবং উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণের জন্য প্রয়োজন উন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা। তাই পদ্মা সেতু নির্মিত হলে দেশের শিল্প উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই।

৪. **কৃষি ও কৃষকের উন্নয়ন :** কৃষি ও কৃষকের উন্নয়ন মানে দেশের উন্নয়ন। নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মিত হলে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সহজলভ্যতা কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। ফলে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের কৃষি ও কৃষকের উন্নয়ন হবে।

৫. **অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন :** পদ্মা সেতু নির্মিত হলে দেশের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হবে। যা প্রকারান্তরে অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন ঘটিয়ে পুঁজির সরবরাহ বৃদ্ধি করবে। এটা দেশের অর্থনীতির জন্য কল্যাণকর।

৬. **কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি :** শিল্পায়ন, ব্যবসা-বাণিজ্য ও পরিবহন খাতের বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করবে পদ্মা সেতু। এতে করে ব্যাপক নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশে বিদ্যমান প্রায় দুই কোটি বেকারের কিছু সংখ্যক লোক কর্মসংস্থানের মুখ দেখবে।

৭. **দারিদ্র্য হ্রাস :** পদ্মা সেতু নির্মিত হলে বাংলাদেশে প্রতি বছর ১.৯% হারে দারিদ্র্য হ্রাস পাবে বলে দাতা সংস্থাগুলো আশা প্রকাশ করেছে। এর ফলে বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটবে।

৮. **নদী ভাঙ্গনরোধ :** নদী তীরবর্তী এলাকায় নদী ভাঙ্গন একটি স্বাভাবিক ঘটনা। পদ্মা সেতু বাস্তবায়িত হলে নদী তীরবর্তী ৯ হাজার হেক্টর জমি নদী ভাঙ্গন থেকে রেহাই পাবে এবং বন্যার হাত থেকে রক্ষা পাবে। এই জমির মূল্যমান প্রায় ১৫৬ মিলিয়ন ডলার।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৯. **সরকারি ব্যয় হ্রাস :** ৫০ শতাংশ ভর্তুকি দিয়ে বর্তমান সরকার ফেরী সার্ভিস চালু রেখেছে। নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মিত হলে ফেরী সার্ভিস বন্ধ হবে, আদায়কৃত পরিবহন টোলের অর্থ নিজ দেশেই থেকে যাবে। ফলে সরকারের বাৎসরিক আয় বৃদ্ধি পাবে। এর মূল্যমান প্রায় ৪০০০ মিলিয়ন ডলার।

১০. **দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের উন্নয়ন :** দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল এখনো অবহেলিত। শুধুমাত্র যোগাযোগ ব্যবস্থার সমস্যাই এ অবহেলাকে জিইয়ে রেখেছে। তাই বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা মতে, নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মিত হলে অবহেলিত দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়নের মুখ দেখবে।

পদ্মা সেতু নির্মাণের সর্বশেষ পরিস্থিতি : পদ্মা সেতু প্রকল্পের কাজ এগিয়ে চলছে কাঙ্ক্ষিত গতিতে। এমনকি দেশে চলমান রাজনৈতিক অচলাবস্থাও কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি এ প্রকল্পের অগ্রযাত্রায়। ২০১৮ সালে পদ্মা সেতুতে যানবাহন চলাচলের লক্ষ্য নিয়ে দ্রুতগতিতে চলছে প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ। মূল সেতু, নদীশাসন, সংযোগ সড়কসহ প্রকল্পের সার্বিক কাজের ৩৪ শতাংশ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। ২০১৪ সালের নভেম্বর থেকে শুরু হয়েছে মূল সেতুর কাজ এবং তা এ পর্যন্ত পাঁচ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে। ঠিকাদারের নিজস্ব স্থাপনা, অফিস ল্যাবরেটরি, ওয়ার্কশেড, শ্রমিকদের থাকার স্থান এবং জেটি নির্মাণের কাজও চলছে সমান গতিতে। টেস্ট পাইলিংয়ের স্টিল ফেব্রিকেশনের কাজ চলছে ওয়ার্কশপে। পদ্মা সেতু প্রকল্পের জাজিরা অংশে সংযোগ সড়ক নির্মাণ কাজ চলছে দ্রুততার সাথে। ২০১৬ সালের মধ্যেই সংযোগ সড়কের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে এমনটিই আশা করছেন প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা। জাজিরা অংশে সংযোগ সড়কের কাজ শেষ হয়েছে ৪০ শতাংশ। একইভাবে মাওয়া অংশের সংযোগ সড়ক নির্মাণের কাজ চলছে, যা শেষ করার কথা ২০১৭ সালের জুলাই মাসের মধ্যে। মাওয়া অংশের কাজ এ পর্যন্ত প্রায় ৩০ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে। এগিয়ে চলছে নদীশাসনের কাজ যা ২০১৮ সালের নভেম্বরের মধ্যে শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। পদ্মা সেতুর ভূমি অধিগ্রহণ প্রায় শেষ হওয়ার পথে। প্রকল্পের জন্য ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের কাজও চলছে সমানতালে। এ পর্যন্ত পুনর্বাসনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে ৬৫ ভাগ। পদ্মা সেতু প্রকল্প থেকে বিশ্বব্যাংক নিজেকে প্রত্যাহার করে নেয় কল্পিত দুর্নীতির অভিযোগ তুলে। যেখানে প্রকল্পের জন্য কোনো টাকাই তারা বরাদ্দ দেয়নি, সেখানে দুর্নীতির পরিকল্পনা করা হচ্ছে এমন যুক্তি তুলে তাদের সরে যাওয়া ছিল জাতির জন্য এক বিড়ম্বনার ঘটনা। সরকার নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়ার পর তা যথাসময়ে বাস্তবায়নকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছে।

উপসংহার : নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ বাংলাদেশ সরকারের সাহসী উদ্যোগ। এটি যেমন আমাদের সাহসিকতা ও সামর্থ্যের পরিচয় বহন করে, তেমনি পরনির্ভরশীলতার মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসার এবং স্বাধীনভাবে প্রকল্প গ্রহণ করার সামর্থ্য ও ক্ষমতা প্রকাশ করে, যা পরবর্তীতে আরো বড় বড় প্রকল্প গ্রহণে ও স্বনির্ভর হতে বাংলাদেশকে সাহায্য করবে।

৪৪ । বর্তমান বিশ্বে টেকসই উন্নয়ন প্রক্রিয়া চালু হওয়ায় বাংলাদেশের পদক্ষেপ কি হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর : সৃষ্টির শুরু থেকে মানুষ পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। পরিবেশ ব্যতীত মানুষের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায়ও মানুষ পরিবেশের উপর নির্ভরশীলতা কমাতে পারেনি যেমনটি ছিল আদিম সমাজ ব্যবস্থাতে। বিগত শতকের শুরুর দিকে মানুষের বদ্ধমূল ধারণা ছিল পরিবেশ যতই দূষিত হোক না কেন প্রকৃতির নিয়মেই তা আবার পরিশোধিত হবে। বিশ্বে বিগত শতকের ৬০-৭০ দশকে পরিবেশের দূষণ নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে। পরবর্তীতে পরিবেশ বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, পরিবেশ তার নিজস্ব নিয়মে পরিশোধন হতে অক্ষম, মানুষকেই পরিবেশ সংরক্ষণের দায়িত্ব নিতে হবে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে।

টেকসই উন্নয়ন বা Sustainable Development : United Nations Environment Programme (UNEP)-এর এক প্রতিবেদনে বলা হয় 'পরিবেশকে ভিত্তি করে সংঘটিত আর্থ-সামাজিক উন্নয়নই হলো টেকসই উন্নয়ন।' অর্থাৎ পরিবেশকে গুরুত্ব দিয়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন হলো টেকসই উন্নয়ন।

মোটকথা, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ব্যতীত বিশ্বের উন্নয়ন সম্ভব নয়। আবার পরিবেশকে অবিবেচ্য রেখেও পৃথিবীর অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। এ দুইয়ের যথাযথ সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সাথে পরিবেশের প্রতি গুরুত্ব আরোপ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নিরাপদ বিশ্ব সংরক্ষণ করে, যে উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা যায় সেটাই 'টেকসই উন্নয়ন'।

পরিবেশ সংরক্ষণ ও টেকসই উন্নয়ন : ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোতে অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্ব ধরিত্রী সম্মেলনে (Earth Summit) পরিবেশ সংরক্ষণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের কথা বলা হয়। রিও সম্মেলনের ঘোষিত পদক্ষেপ :

- পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি;
- পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ;
- জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ;
- নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার ইত্যাদি।

২০০২ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় বিশ্ব ধরিত্রী সম্মেলন বা টেকসই উন্নয়ন শীর্ষ সম্মেলন। সম্মেলনে মোট ৩৭টি ঘোষণার কথা বলা হয়। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ঘোষণা হলো :

- সম্মিলিত শক্তি ও টেকসই উন্নয়নের অভিন্ন লক্ষ্য অর্জনে ঐক্য প্রতিষ্ঠা
- উন্নয়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে উন্নত দেশগুলোর প্রতি আবেদন জানানো
- বিশুদ্ধ পানি, পয়ঃনিষ্কাশন, পর্যাপ্ত আশ্রয়, স্বাস্থ্য সেবা, খাদ্যের নিশ্চয়তা
- নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণ
- দারিদ্র্য, অপুষ্টি, প্রাকৃতিক বিপর্যয় রোধ
- অপরাধ ও দুর্নীতি রোধ
- ILO'র নীতিমালা অনুযায়ী চাকরির ব্যবস্থা ইত্যাদি।

কিয়োটো প্রটোকল : জাপানের প্রাচীনতম শহর কিয়োটো শহরে ১৯৯৭ সালে অনুষ্ঠিত হয় The International Conference on Global Warming। বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে এ সম্মেলন ছিল খুবই তাৎপর্য ও গুরুত্বপূর্ণ। জাতিসংঘ এ সম্মেলনের আয়োজক ছিল। ১৯৯৫ সালে Berlin Summit ও ১৯৯৬ সালে Geneva সম্মেলনে পরিবেশ ও টেকসই উন্নয়ন সংক্রান্ত আলোচনা হলেও কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয়নি।

কিয়োটো ঘোষণাপত্র (১৯৯৭) : বিশ্বের উন্নত দেশগুলো এবং সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রগুলো ২০০৮ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে ১৯৯০ সালের স্তর রেখা (Stage line)-এর ভিত্তিতে ৫.২% গ্রিন হাউজ গ্যাস হ্রাস করবে। অন্যদিকে, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ৮%, যুক্তরাষ্ট্র ৭%, জাপান ৬% হারে গ্রিন হাউস গ্যাস হ্রাস করতে সম্মত হয়।

টেকসই উন্নয়নে বাংলাদেশের পদক্ষেপসমূহ : যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে হবে। বিশ্বব্যাপী Sustainable development চালু হওয়ায় বাংলাদেশের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত নিজস্ব কাঠামোর মাঝে থেকেই উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ। উন্নয়নশীল রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ এখনো নির্ভরশীলতার জালে জড়ানো বিধায় উপযুক্ত পরিবেশ সংরক্ষণকে প্রাধান্য দিলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ব্যাহত হবে। আবার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে গুরুত্ব দিলে পরিবেশ সংরক্ষণ সঠিকভাবে সম্ভব নয়। তাই উভয় পন্থার যথাযথ সমন্বয়ের মাধ্যমেই বাংলাদেশকে তার কর্মসূচি প্রণয়ন করতে হবে এবং সেই কর্মসূচি অনুযায়ী পদক্ষেপ নিতে হবে। ২০০২ সালের জোহানেসবার্গ সম্মেলনে বাংলাদেশ আবহাওয়া পরিবর্তন, পানি সরবরাহ, দারিদ্র্য, কৃষি ও জীববৈচিত্র্য জ্বালানি ও স্বাস্থ্য বিষয়ক ইস্যুতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। টেকসই উন্নয়নে বাংলাদেশের পদক্ষেপসমূহ নিচে আলোচনা করা হলো :

১. **পরিবেশ নীতির বাস্তবায়ন :** জাতীয়ভাবে বাংলাদেশের একটি সুনির্দিষ্ট পরিবেশ নীতিমালা প্রণয়ন প্রয়োজন। স্বাধীনতার পরবর্তীতে বিভিন্ন পরিবেশ নীতি গৃহীত হলেও বিভিন্ন কারণে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, সরকারি নীতি নির্ধারকদের উদাসীনতা এবং নীতিমালা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত সংশ্লিষ্টদের ভূমিকাকে এ ক্ষেত্রে দায়ী করা হয়। আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কাঠামো সঠিকভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে পরিবেশ নীতিমালাকে শিথিল করা হয়েছে স্বাধীনতা পরবর্তী বিভিন্ন সময়ে। আবার কিছু নীতিমালা ছিল পুরনো আমলের। আধুনিক বিশ্বের প্রেক্ষাপটে সময়োপযোগী পরিবেশ নীতিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ Sustainable development ঘটাতে পারে।

২. **অবকাঠামো বিনির্মাণের পূর্বে পরিবেশ সম্পর্কে চিন্তা করা :** Sustainable development-এর পূর্বশর্ত হিসেবে বাংলাদেশের অবকাঠামোগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে পরিবেশের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন। বর্তমান সময়ের অবকাঠামোগত কার্যাবলী ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য কতটুকু ইতিবাচক ও নেতিবাচক হবে তা বিবেচনায় আনা। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ক্ষতিগ্রস্ত হবে এমন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালিত না হওয়াই উচিত। বাংলাদেশের জনবসতির সংখ্যা পরিমাপ এবং পরবর্তী সময়ের জন্য ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে এমন অবকাঠামো বিনির্মাণের প্রতি গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন।

৩. **সমন্বিত ও সুপরিকল্পিত ভূমি ব্যবস্থাপনা :** বাংলাদেশে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৯৯৩ জন লোক বাস করে। আয়তনের তুলনায় জনবসতির ঘনত্ব বেশি বিধায় মাথা পিছু ভূমি ব্যবহারের পরিমাণও কম এবং ভূমির মালিকানা মুষ্টিমেয় শ্রেণীর হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়ায় ভূমির যথাযথ ব্যবহার সম্ভব হয় না। সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমেই সুপরিকল্পিত ভূমি ব্যবস্থাপনার প্রতি আলোকপাত করা প্রয়োজন। খাসজমি বণ্টনের নীতিমালা, প্রান্তিক চাষীদের মাঝে ভূমির উপযুক্ত বণ্টন এবং সর্বোপরি ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন বাস্তবায়ন সম্ভব বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। জোতদারের নির্যাতনে অনেকে ভূমিহীন হয়ে পড়ে যাতে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ব্যাহত হয়। তাই যথাযথ ভূমি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বৈষম্য দূর করার মধ্য দিয়ে টেকসই উন্নয়ন প্রক্রিয়া ঘটানো যেতে পারে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৪. **জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রণ :** টেকসই উন্নয়নকল্পে যে সকল পদক্ষেপ গৃহীত হওয়া প্রয়োজন তার মধ্যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ অন্যতম। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১২ অনুসারে, বাংলাদেশে বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৪%, প্রতি বর্গকিলোমিটারে বাস করে ৯৬৪ জন। জনসংখ্যার বৃদ্ধি বাংলাদেশে ম্যালথাসীয় তত্ত্ব অনুসারে চলছে সেই অনুপাতে বাড়ছে না খাদ্যের উৎপাদন, বাড়ছে না ভূমির পরিমাণ। সুতরাং পরিকল্পিত জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত 'টেকসই উন্নয়ন' সম্ভব নয়।

৫. **শিক্ষার হার বৃদ্ধি ও জনসচেতনতা :** শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমেই জনসচেতনার সৃষ্টি হয়। শহরে এলাকায় শিক্ষার প্রসার বেশি হলেও গ্রামীণ ও পৌর এলাকায় তা অনুপস্থিত। বিগত শাসনামলে এবং বর্তমান সরকার শিক্ষার প্রসারে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। টেকসই উন্নয়নের যে ধারণা তা জনসাধারণের বিশেষ করে গ্রামীণ ও পৌর এলাকার মানুষের কাছে পৌঁছাতে হবে এবং তাদের মাঝে টেকসই উন্নয়ন ধারণা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে যা শিক্ষার প্রসার ব্যতীত সম্ভব নয়।

৬. **পরিকল্পিত নগরায়ন :** নগরায়নের মাত্রা বাংলাদেশে খুব বেশি, যা মোটেও পরিকল্পিত নয়। অপরিকল্পিত নগরায়ন নগর জীবনে সৃষ্ট সমস্যাগুলোর প্রধান অন্তরায়। 'টেকসই উন্নয়ন' শর্ত হিসেবে নগরায়িত সমাজের প্রয়োজনীয়তা আছে তবে তা সুপরিকল্পিত ও সুবিন্যস্ত হতে হবে।

৭. **শিল্প-কারখানার জন্য নির্দিষ্ট এলাকা :** কল-কারখানার বিষাক্ত ধোঁয়ায় পরিবেশ দূষিত হয়। এই দূষণ রোধকল্পে শিল্প-কারখানাগুলোর জন্য শিল্প এলাকা তৈরি করতে হবে যা জনবসতি থেকে অনেক দূরে হবে। সুপরিকল্পিত উপায়ে শিল্প এলাকা তৈরির মধ্য দিয়ে পরিবেশের সংরক্ষণ সম্ভব। আর পরিবেশ সংরক্ষিত না করে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়।

৮. **কাঠের বিকল্প জ্বালানি ব্যবহার :** কাঠের ব্যবহার জ্বালানি হিসেবে খুব বেশি হয়ে থাকে। বাংলাদেশে কাঠের অবৈধ ব্যবহার পরিবেশের জন্য হুমকিস্বরূপ। একটি দেশে উপযুক্ত পরিবেশ ভারসাম্যের জন্য মোট আয়তনের ২৫% বনভূমি থাকা আবশ্যক। কিন্তু বাংলাদেশে এর পরিমাণ ১৭.০৮%। অবাধে বৃক্ষ নিধনতো চলছেই, যা বাংলাদেশের ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য হুমকিস্বরূপ।

৯. **বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ :** ব্যাপক হারে বৃক্ষরোপণ করতে হবে। বাংলাদেশে সম্প্রতি বৃক্ষরোপণে বিভিন্ন পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে, বৃক্ষরোপণ অভিযানের মাধ্যমে বৃক্ষরোপণে জনসচেতনতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। বৃক্ষ শুধু রোপণ করলেই চলবে না, উপযুক্ত সংরক্ষণের মাধ্যমে এ পদক্ষেপের বাস্তবায়ন করতে হবে।

১০. **রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার কমানো :** সাময়িক সময়ের জন্য রাসায়নিক সারের সুফল পাওয়া গেলেও এতে জমির উর্বরা শক্তি বিনষ্ট হয়, যা পরবর্তীতে উচ্চ ফলনে বাধা সৃষ্টি করে। মাটির যে প্রকৃতিগত শক্তি রাসায়নিক সার ব্যবহারে তার মাত্রা কমে যায়। কীটনাশকে যে রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয় তা জমির জন্য খুবই ক্ষতিকারক। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা বিবেচনায় আনলে এসব পরিহারের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের পথ সুগম করা যায়।

১১. **বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ :** জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের মাধ্যমে বন্যপ্রাণীর অভয়ারণ্য সৃষ্টি করতে হবে। সুন্দরবনসহ অন্য বনাঞ্চলে প্রাণীর আবাসস্থলগুলোকে প্রাণী বিচরণের নিরাপদ ক্ষেত্র হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। ২০০২ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে অনুষ্ঠিত বিশ্ব টেকসই সম্মেলনে বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ইস্যুতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

১২. **ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন :** টেকসই উন্নয়ন প্রক্রিয়ার বাস্তবায়নকল্পে বাংলাদেশের উচিত রাষ্ট্রীয় ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন ঘটানো। তথ্য প্রযুক্তিতে সহায়তা করে এমন অবকাঠামোর আধুনিকীকরণ করতে হবে। টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা, সাবমেরিন কেবল প্রযুক্তির উপযুক্ত বিকাশ ঘটানো প্রয়োজন।

১৩. **সামাজিক খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি :** সামাজিক খাতে দক্ষ বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন প্রক্রিয়া পরিচালনা সম্ভব। বাড়াতে হবে অবহেলিত মানুষের কর্মক্ষমতা। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে। এ বিনিয়োগ যথাযথভাবে যাতে পরিচালিত হয় সে বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে। দারিদ্র্য নিরসনে যত্নবান হতে হবে।

১৪. **তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নে উৎসাহ প্রদান :** তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নে উৎসাহ ও বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। শিল্পায়নের স্তিমিত ভাব দূর করে কৃষি ও প্রযুক্তি নির্ভর শিল্পায়নে মনোযোগ দিতে হবে। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও শিক্ষিত বেকারদের প্রতি যত্নবান হতে হবে।

১৫. **মানব সম্পদ উন্নয়ন :** সীমিত আয়তনের বাংলাদেশের মানব সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন ঘটাতে হবে। বাংলাদেশে মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। উন্নত ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোতেও মানব সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের প্রতি সুদৃষ্টি দেয়া হয়।

১৬. **আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা :** বাংলাদেশে আইনের যথাযথ প্রয়োগ হয় না বলে দাতাগোষ্ঠী ও বিদেশী সংস্থাগুলো মনে করে। আইন প্রয়োগের মাধ্যমে আইনের সুষ্ঠু শাসনের পথে প্রতিবন্ধকতা দূর করতে হবে। টেকসই উন্নয়ন প্রক্রিয়া আইনের সুশাসন ব্যতীত সম্ভব নয়।

১৭. **দুর্নীতি রোধ ও জবাবদিহিতা :** বার্লিনভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের জরিপে বিশ্বের সর্বোচ্চ দুর্নীতিপরায়ণ রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের স্বীকৃতি বিশ্বব্যাপী। দুর্নীতি রোধে প্রথম পদক্ষেপ জবাবদিহিতার মাধ্যমে নিতে হবে বলে বিশেষজ্ঞ মহল মনে করেন। টেকসই উন্নয়নের পথে দুর্নীতি একটি প্রধান অন্তরায়। জবাবদিহিতার মাধ্যমে এর পরিত্রাণ অবশ্যই সম্ভব।

উপসংহার : একুশ শতকের পৃথিবীর সাথে সঙ্গতি রেখেই বাংলাদেশকে চলতে হবে। উন্নত ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোর মৌলিক পার্থক্য হিসেবে নির্ভরশীলতা ও আধুনিকীকরণকে চিহ্নিত করা হয়। উন্নয়নশীল রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ এখনো উন্নত রাষ্ট্রগুলোর প্রতি নির্ভরশীলতার জালে জড়ানো। Sustainable Development প্রক্রিয়ার যে ধারণা বিশ্বব্যাপী প্রচলিত বাংলাদেশকে এর সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে চলতে হবে। Sustainable Development উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোর জন্য স্বাবলম্বী হবার যে কৌশল ও পদ্ধতির উন্নয়নের কথা বলে বাংলাদেশের জন্য তা নতুন দিগন্তের সূচনা করতে পারে।

৪৫ । জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ কি? জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ নির্বাহী কমিটি (একনেক)-এর গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা করুন।

উত্তর : জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (এনইসি) দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় জাতীয় নীতি ও উদ্দেশ্য সম্বলিত উন্নয়ন কর্মসূচি অনুমোদনের জন্য দেশের সর্বোচ্চ রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ। এ পরিষদ কর্তৃক প্রণীত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী সাধারণত বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ তাদের নিজ নিজ পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন করে। মন্ত্রিপরিষদের সকল সদস্য এ পরিষদের সদস্য থাকেন। প্রধানমন্ত্রী তথা সরকারপ্রধান পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করেন। প্রয়োজন মাফিক পরিষদের সভা আহ্বান করা হয়। কোনো নির্দিষ্ট সভার আলোচ্য

বিষয়ের গুরুত্ব বা প্রকৃতি অনুসারে সভায় কারা উপস্থিত থাকবেন তা নির্ধারিত হয়। প্রথম পর্যায়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এনইসির সচিবালয় হিসেবে কাজ করত। পরবর্তীকালে এ সচিবালয় পরিকল্পনা কমিশনে স্থানান্তরিত হয়। জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের কার্যাবলীর মধ্যে রয়েছে : ১. পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও সকল অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়নে সামগ্রিক দিক নির্দেশনা দান; ২. নীতি, কর্মসূচি ও পরিকল্পনা চূড়ান্তকরণ ও অনুমোদন; ৩. উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা; ৪. আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য বিবেচ্য সকল ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ; ৫. জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের দায়িত্ব সম্পাদনের ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় কমিটি নিয়োগ করা।

জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ নির্বাহী কমিটি (একনেক) : ১৯৮২ সালে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিদ্ধান্তে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির গঠন কাঠামো ও কার্যাবলী নিরূপণ করা হয়। ঐ প্রস্তাবের ফলে এ সম্পর্কিত পূর্ববর্তী সকল আদেশ বাতিল হয়ে যায়। ১৯৮২ সালে অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রীকে আহ্বায়ক করে এ কমিটি গঠিত হয়। কমিটিতে আরো ছিলেন শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী, পূর্তমন্ত্রী এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রিগণ। কমিটির বিবেচ্য বিষয়াবলী ছিল : ১. পাঁচ কোটি টাকার উর্ধ্বে ব্যয়সাপেক্ষ উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ যাচাই ও অনুমোদন; ২. বেসরকারি খাতে ১৫ কোটি টাকার উর্ধ্বে ব্যয়সাপেক্ষ বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহ যাচাই ও অনুমোদন; ৩. উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা; ৪. বেসরকারি, যৌথ উদ্যোগ ও বিদেশী অংশগ্রহণে গঠিত কোম্পানিসমূহের বিনিয়োগ প্রস্তাব যাচাই; ৫. অর্থনৈতিক ও সংশ্লিষ্ট নীতিগত ক্ষেত্রে অগ্রগতি পর্যালোচনা ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির অগ্রগতি সাধন; ৬. সংবিধিবদ্ধ কর্পোরেশনের অর্থনৈতিক কর্মসম্পাদন এবং বিশেষত এদের কর্মকাণ্ডের ফলাফল পর্যালোচনা এবং ৭. সরকারি প্রতিষ্ঠানের উৎপন্ন পণ্যাদির মূল্য এবং সরকারি সেবা খাতের রেট, ফি ইত্যাদি নির্ধারণ।

মন্ত্রিপরিষদ সচিব, পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যবর্গ, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর এবং অর্থ, বৈদেশিক সম্পদ, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন ও মনিটরিং বিভাগের সচিব এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের সচিবগণকে কমিটির বৈঠকে উপস্থিত থাকতে হতো। ঐ সময় দেশে সামরিক শাসন চালু থাকায় প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার ও জেনারেল স্টাফ অফিসার এবং চিফ অফ জেনারেল স্টাফকেও একনেকের বৈঠকে উপস্থিত থাকতে হতো। ১৯৮২ সালের পর থেকে একনেকের কাঠামো ও কার্যাবলীতে অনেক পরিবর্তন ঘটে। তৎকালীন প্রশাসন ব্যবস্থার প্রকৃতির উপর নির্ভর করে কাঠামো সংক্রান্ত পরিবর্তন করা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৯৮৬ সালের জুলাই মাসে একনেকের আহ্বায়কের পদে উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের স্থলাভিষিক্ত হন উপ-প্রধানমন্ত্রী। অনুরূপভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলেও একনেকের কাঠামোতে যথাযথ পরিবর্তন আনা হয়। ১৯৯১ সালের সেপ্টেম্বরে একনেকের সভাপতি হন অর্থমন্ত্রী। সে বছর অক্টোবরে এর সভাপতি হন সরকারপ্রধান। ২০০০ সালের জানুয়ারিতে জারিকৃত প্রজ্ঞাপনে একনেকের সদস্য তালিকা থেকে পরিকল্পনামন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীকে বাদ দেয়া হয়। এ ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী একনেকের সভাপতি এবং অর্থমন্ত্রী বিকল্প সভাপতি। সদস্যদের মধ্যে রয়েছে স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, খাদ্যমন্ত্রী, পানিসম্পদ মন্ত্রী, শিল্পমন্ত্রী, বাণিজ্যমন্ত্রী, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী, কৃষিমন্ত্রী এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রী। যেসব মন্ত্রণালয়ের বিষয় কমিটিতে আলোচিত হয় সেসব দপ্তরের মন্ত্রীরাও একনেকের সদস্য থাকেন। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব, বৈদেশিক সম্পদ বিভাগের সচিব, পরিকল্পনা সচিব, বাস্তবায়ন মনিটরিং ও মূল্যায়ন বিভাগের সচিব, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সদস্যবর্গ ও সচিবগণকে একনেকের কাজে সহায়তা করতে হয়।

একনেকের কার্যাবলী : ১. সকল প্রকল্প পরিকল্পনাপত্র যাচাই ও অনুমোদন; ২. প্রকল্প মূল্যায়ন সংক্রান্ত বিশেষ কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত ২৫ কোটি টাকার ঊর্ধ্ব ব্যয়সাপেক্ষ সকল প্রকল্প যাচাই ও অনুমোদন; ৩. উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা; ৪. বেসরকারি ও যৌথ উদ্যোগের বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহ যাচাই; ৫. দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড তত্ত্বাবধান ও নীতিমালা পর্যালোচনা; ৬. সরকারি বিধিবদ্ধ কর্পোরেশনের আর্থিক কর্মসূচি পর্যালোচনা; ৭. সরকারি প্রতিষ্ঠানের উৎপন্ন পণ্যাদির মূল্য এবং সরকারি সেবা খাতের রেট, ফি ইত্যাদি নির্ধারণ এবং ৮. বৈদেশিক সাহায্য ও ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্প্রসারণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপ বিবেচনা এবং জনশক্তি রপ্তানির ব্যাপারে বিদেশে বাংলাদেশ মিশনসমূহের লক্ষ্য নির্ধারণ ও এসব ক্ষেত্রে অগ্রগতি পর্যালোচনা।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, জাতীয় সকল প্রকল্প অনুমোদনে একনেক হচ্ছে দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। সেক্ষেত্রে এ কমিটি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য বিবেচ্য সকল ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে ও বাস্তবায়নে সহায়তা করে।

৪৬ ‖ বাংলাদেশের উন্নয়নে বেসরকারি ব্যাংকের ভূমিকা আলোচনা করুন।

উত্তর : এ কথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, কোনো দেশের সার্বিক উন্নয়নের যতগুলো মাধ্যম থাকে তার মধ্যে ব্যাংক অন্যতম। তেমনি বাংলাদেশও তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু বাংলাদেশে বেসরকারি ব্যাংকের অবদান অপরিসীম। এদেশের আর্থ-সামাজিক, অর্থনৈতিক চাকা সচল, দারিদ্র্য নিরসন, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, এমনকি ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে বেসরকারি ব্যাংকের ভূমিকা সত্যিই প্রশংসার দাবিদার। বাংলাদেশের সরকারি ব্যাংকের তুলনায় বেসরকারি ব্যাংকের চাহিদা অনেক বেশি। বেসরকারি ব্যাংকসমূহ গ্রাহকদের সেবা নিশ্চিতকরণ ও বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে যে অবদান রাখছে তা সত্যিই অনন্য। তাই নিচে বাংলাদেশের উন্নয়নে বেসরকারি ব্যাংকের ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করা হলো :

অর্থনৈতিক উন্নয়নে বেসরকারি ব্যাংকের ভূমিকা (Role of Bank in the Economic Development of Bangladesh) : বাংলাদেশ শিল্পে অনুন্নত কৃষিনির্ভর একটি দেশ। এ দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য এখনও অনগ্রসর বলা চলে। মানুষের মাথাপিছু আয়ও যথেষ্ট নয়। তাই এসব দুরাবস্থা কাটিয়ে উঠতে ও দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে হলে ব্যাংক ব্যবস্থার উন্নয়ন ও কার্যকরী ভূমিকা একান্ত আবশ্যক। এদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বেসরকারি ব্যাংকের ভূমিকা অপরিসীম; নিচে তা তুলে ধরা হলো—

১. **বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি (Creation of Medium of Exchange) :** বিনিময়ের কার্যকর মাধ্যম ছাড়া আর্থিক লেনদেন সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা সম্ভব নয়। বেসরকারি ব্যাংকগুলো চেক, ড্রাফট, পে-অর্ডার, ক্রেডিট কার্ড ইত্যাদি সহজ বিনিময় মাধ্যম সৃষ্টি করে। এর ফলে দেশের আর্থিক লেনদেন সহজ ও নিরাপদ হয়, যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়ে থাকে।

২. **সঞ্চয় সংগ্রহ ও মূলধন গঠন (Collection of Savings and Formation of Capital) :** সঞ্চয় সৃষ্টি ও মূলধন গঠন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মূলধনের অভাবে আমরা আমাদের দেশের সম্পদকে কাজে লাগাতে পারছি না। বেসরকারি ব্যাংক সেক্ষেত্রে দেশের প্রায় সর্বত্র শাখা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জনগণকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করে ও আমানত সংগ্রহের চেষ্টা চালায়, এতে দেশে সঞ্চয় বাড়ে এবং তা ব্যাংকে এসে মূলধনে রূপান্তরিত হয়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৩. **মূলধন সরবরাহ (Supply of Capital) :** দেশের বেসরকারি ব্যাংকসমূহ তাদের সৃষ্ট মূলধন দেশের প্রয়োজনে বিভিন্ন খাতে ঋণ দেয় ও বিভিন্ন লাভজনক খাতে তা বিনিয়োগ করে। এতে মূলধনের গতিশীলতা বৃদ্ধি পায় এবং উৎপাদনশীল খাতে তা ব্যবহৃত হওয়ায় জাতীয় উৎপাদন বাড়ে।

৪. **শিল্প উন্নয়ন (Industrial Development) :** শিল্পে অনুন্নত এ দেশে শিল্পের উন্নয়নের জন্য বেসরকারি ব্যাংকগুলো সর্বদা চেষ্টা করে। বেসরকারি ব্যাংকগুলো শিল্পোন্নয়নের জন্য বিভিন্ন মেয়াদি শিল্প ঋণ বিতরণ করে থাকে। যার মধ্যে স্বল্পমেয়াদি ও ক্ষেত্র বিশেষে মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দিয়ে থাকে। এ সকল ঋণ সুবিধার কারণে দেশে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে।

৫. **কৃষি উন্নয়ন (Agricultural Development) :** কৃষিনির্ভর বাংলাদেশে কৃষির উন্নয়নে বেসরকারি ব্যাংকগুলোর অবদান কোনো অংশে কম নয়। কৃষকদের সার, বীজ, গবাদিপশু ইত্যাদি সংগ্রহে বেসরকারি ব্যাংক ঋণ প্রদান করে। এমনকি কৃষির আধুনিকায়নেও ঋণ দিয়ে থাকে।

৬. **সরকারি রাজস্ব বৃদ্ধি (Increase of Govt. Revenue) :** বাংলাদেশে সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধিতেও ব্যাংকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বেসরকারি ব্যাংকগুলো তাদের অর্জিত মুনাফার অংশ যেমন কর হিসেবে সরকারকে প্রদান করে তেমনই ব্যাংকের সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান হতেও সরকার রাজস্ব পেয়ে থাকে। বেসরকারি ব্যাংকগুলো আমানতের ওপর মক্কেলদের অর্জিত সুদ বা লাভ হতেও সরকারি পাওনা প্রদান করে। এতে সরকার ও দেশ উপকৃত হয়।

৭. **সরকারকে ঋণ দান (Credit to Govt.) :** দুর্বল অর্থনীতির এদেশে ব্যাংকগুলো শুধুমাত্র ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলোকেই ঋণ দেয় না সরকারকেও ঋণ প্রদান করে। সরকার অনেক সময় বেকায়দায় পড়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ছাড়াও অনেক বেসরকারি ব্যাংক থেকেও ঋণ নেয়। এছাড়া সরকারি বন্ড, সিকিউরিটিজ বিক্রয় করেও ব্যাংকগুলো সরকারকে ঋণ সংগ্রহে সহায়তা করে। ফলে সরকারের আর্থিক সামর্থ্য বৃদ্ধি পায়।

৮. **সরকারের আর্থিক নীতি বাস্তবায়ন** (Implementation of Govt. Monetary Policy) : সরকার আর্থিক নীতি প্রণয়ন করলেও তা বাস্তবায়নের দায়িত্ব মূলত পালন করে দেশের বেসরকারি ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানসমূহ। কোনো বিশেষ খাতে সরকার বাড়তি ঋণদানের নীতি গ্রহণ করলে এ কাজে ব্যাংকগুলো সহায়তা করতে পারে। কাজেই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বেসরকারি ব্যাংকগুলো ভূমিকা রাখে।

৯. **কর্মসংস্থান (Employment) :** বেসরকারি ব্যাংকগুলো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তায় দেশে ব্যাপক সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়। একক খাত হিসেবে আমাদের দেশে বেসরকারি ব্যাংকিং খাতে যে পরিমাণ লোক কর্মরত রয়েছে তা ব্যাপক বেকারত্বের এ দেশে কোনো অংশেই কম নয়।

১০. **অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন (Achievement of Economic Growths) :** বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে বেসরকারি ব্যাংকিং খাতের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা অনস্বীকার্য। বেসরকারি ব্যাংকের সহায়তায় দেশে শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়, উৎপাদনের চাকা সচল থাকে ও জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। বেসরকারি ব্যাংকগুলোর কারণে ব্যাংকিং সুবিধা সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে। সঞ্চয় বাড়ে ও মূলধন বৃদ্ধি পায়। সব মিলিয়ে জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়।

দারিদ্র্য বিমোচনে বেসরকারি ব্যাংকের ভূমিকা : বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৩ অনুযায়ী দারিদ্র্যের হার ৩১.৫%। এ বিশাল অংশের দারিদ্র্যপীড়িত মানুষকে দারিদ্র্যের ছোবল থেকে বাঁচানোর জন্য দেশের বেসরকারি ব্যাংক অনন্য ভূমিকা পালন করে থাকে, যা নিচে আলোকপাত করা হলো :

১. **আয় বৃদ্ধি (Increase income) :** বেসরকারি ব্যাংকগুলো সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ঋণ প্রদানের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধিতে বিরাট ভূমিকা পালন করে।

২. **কর্মসংস্থান (Employment) :** বেসরকারি ব্যাংকগুলো সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক গতিশীলতা আনতে সহায়তা করে এবং অতিরিক্ত বিনিয়োগ ও নতুন নতুন কর্মসংস্থান, কর্মপন্থা উদ্ভাবনের মাধ্যমে নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে।

৩. **সঞ্চয় ও বিনিয়োগ :** বেসরকারি ব্যাংকসমূহ জনগণের বিক্ষিপ্ত ও ক্ষুদ্র সঞ্চয় আমানতস্বরূপ গ্রহণ করে। উক্ত আমানত আবার বিনিয়োগের জন্য ঋণ হিসেবে বিতরণ করে। এতে একদিকে যেমন জনগণের সঞ্চয় বৃদ্ধি পায়। পাশাপাশি বিনিয়োগও বৃদ্ধি পায়। ফলে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথ সুগম হয়।

৪. **সঞ্চয়ের গতিশীলতা :** বেসরকারি ব্যাংক জনগণের গচ্ছিত অর্থের ওপর যে সুদ প্রদান করে তাতে জনগণ সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ হয় এবং সঞ্চয়ের গতিশীলতা রক্ষা পায়।

৫. **উৎপাদন বৃদ্ধি :** বেসরকারি ব্যাংক কৃষি, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পসহ অন্যান্য উৎপাদনশীল খাতে অর্থসংস্থানের মাধ্যমে সার্বিক উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারে।

অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে বেসরকারি ব্যাংকের ভূমিকা (Importance of bank in home-trade) : বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বেসরকারি ব্যাংক যেসব ভূমিকা পালন করে তা নিচে আলোচনা করা হলো :

১. **কোম্পানির শেয়ার ও ঋণপত্র বিক্রয় (Sale of Company's Share and Debenture) :** যৌথমূলধনী কোম্পানি এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন প্রকার শেয়ার স্টক ও ঋণপত্র ব্যাংকের মাধ্যমে বিক্রয় হয়। অনেক সময় বেসরকারি ব্যাংক কোম্পানির শেয়ার ও ঋণপত্র বিক্রয়ের দায় গ্রহণ করে ও প্রয়োজনে নিজেই ক্রয় করে। এভাবে বেসরকারি ব্যাংকসমূহ কোম্পানির অবলেখক হিসেবে মূলধন সংগ্রহে গুরুত্বপূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করে।

২. **অর্থের নিরাপদ সংরক্ষণ (Preserving Money) :** ব্যবসায়ীদের নিকট ব্যয় নির্বাহ ক্ষেত্রে প্রত্যহ যে অর্থ জমা থাকে বেসরকারি ব্যাংক তার নিরাপদ সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করে। বেসরকারি ব্যাংক সর্বত্র থাকার কারণে ব্যবসায়ীরা তাদের অর্থ সহজেই ব্যাংকে জমা রাখতে পারে। চেকের মাধ্যমে লেনদেনে নগদ অর্থের ঝামেলা এড়ানো যায়, যা নিরাপত্তা বৃদ্ধির সহায়ক হয়।

৩. **অর্থ স্থানান্তর (Transfer of Money) :** ব্যবসায়িক প্রয়োজনে অর্থ স্থানান্তর একটি স্বাভাবিক বিষয়। এ বিষয়টি মোটেই ঝুঁকিপূর্ণ নয়। সেক্ষেত্রে বেসরকারি ব্যাংকসমূহ অতি অল্প খরচে দেশে-বিদেশের যে কোনো স্থানে নিরাপদ ও দ্রুত অর্থ স্থানান্তরের ব্যবস্থা করে থাকে। এর ফলে ব্যবসায়ীরা সহজেই প্রয়োজনীয় স্থানে অর্থ স্থানান্তর করে প্রয়োজনীয় লেনদেন করতে পারে।

৪. **দেনা-পাওনা নিষ্পত্তি (Provision of Clearing House) :** বর্তমানে বেসরকারি ব্যাংকগুলো শুধুমাত্র আমানত জমা বা ঋণদানই করে না, বরং ব্যবসায়ীদের পক্ষে দেনা পরিশোধ, পাওনা অর্থ

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

আদায়, বিলের অর্থ সংগ্রহ ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে পারস্পরিক দেনা-পাওনা নিষ্পত্তিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এতে ব্যবসায়ীগণ অনেক ঝামেলামুক্ত থেকে ব্যবসায় কাজে মনোনিবেশ করতে পারেন।

৫. **ঋণ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা (Aid to Credit Control) :** দেশের ঋণের পরিমাণ বেশি হলে মুদ্রাস্ফীতি ও ঋণের পরিমাণ হ্রাস পেলে মুদ্রা সংকোচন ঘটে। এ ধরনের মুদ্রাস্ফীতি বা সংকোচন উভয়ই দেশের জন্য ক্ষতিকর; তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পাশাপাশি বেসরকারি ব্যাংকগুলো এ অসুবিধা দূর করার নিমিত্তে দেশের ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে।

বৈদেশিক বাণিজ্যে বেসরকারি ব্যাংকের ভূমিকা (Importance of Bank in Foreign Trade) : বেসরকারি ব্যাংক শুধুমাত্র অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যেই সহায়তা করে না বৈদেশিক বাণিজ্যেও এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। নিচে বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বেসরকারি ব্যাংকের ভূমিকা আলোচনা করা হলো :

১. **অর্থসংস্থান (Financing) :** বেসরকারি ব্যাংকসমূহ বৈদেশিক বাণিজ্যে আমদানি ও রপ্তানিকারকদেরকে শুধুমাত্র নগদ ঋণই প্রদান করে না। প্রত্যয়পত্র ইস্যু, বিল ও হুন্ডির মূল্য পরিশোধ, বিল বাট্টাকরণ বিলে স্বীকৃতিদান ইত্যাদির মাধ্যমেও অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা করে। এরূপ অর্থায়ন বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নয়নে প্রভূত সাহায্য করে।

২. **প্রত্যয়পত্র ইস্যু (Issuing Letter of Credit) :** বর্তমান আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রত্যয়পত্রের ওপর নির্ভরশীল। এ পত্রের মাধ্যমে বেসরকারি ব্যাংক রপ্তানিকারককে তার পাওনা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা প্রদান করে। এর মাধ্যমে বেসরকারি ব্যাংক আমদানিকারক ও রপ্তানিকারকের মাধ্যমে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে। ফলে আমদানি ও রপ্তানি সহজ হয়।

৩. **বিলে স্বীকৃতিদান ও মূল্য পরিশোধ (Acceptance and Payment of Foreign Bill) :** আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বেসরকারি ব্যাংকসমূহ রপ্তানিকারক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বিলে আমদানিকারকের পক্ষে স্বীকৃতি প্রদান করে এবং পরবর্তী সময়ে এ স্বীকৃত বিলের অর্থ পরিশোধের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এতে আমদানিকারকদের ঝামেলা যেমন হ্রাস পায় তেমনই রপ্তানিকারকও ব্যাংক প্রদত্ত স্বীকৃতি আস্থার সাথে গ্রহণ করতে পারে।

৪. **বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ (Collection of Foreign Currency) :** কোনো কোনো পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে নগদ অর্থে মূল্য পরিশোধ করতে হয়। বেসরকারি ব্যাংক এসব ক্ষেত্রে আমদানিকারকদের পক্ষে বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ করে। এছাড়া ব্যবসায়ীদের বিদেশ ভ্রমণকালেও বেসরকারি ব্যাংক প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার সংস্থান করে থাকে।

৫. **দলিলপত্র হস্তান্তর (Transfer of Document) :** বেসরকারি ব্যাংক আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার দলিল; যেমন– বিনিময় বিল, নৌভাটকপত্র, চালান রসিদ, বীমাপত্র ইত্যাদি হস্তান্তরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। রপ্তানিকারক জাহাজি দলিলপত্রাদি আমদানিকারকের বেসরকারি ব্যাংকের মাধ্যমে পাঠায়। আমদানিকারক তা সংগ্রহ করে পণ্য খালাসের ব্যবস্থা করে।

৬. **বাজার সম্প্রসারণ (Expansion of Market) :** বেসরকারি ব্যাংক আমদানিকারকের প্রতিনিধি হিসেবে অনেক সময়ই তার বিদেশস্থ শাখার মাধ্যমে অন্য দেশ থেকে পণ্য আমদানিতে আমদানিকারককে সহায়তা করে। অন্যদিকে অনেক ক্ষেত্রেই রপ্তানিকারকের প্রতিনিধি হিসেবে বিদেশস্থ শাখার সাহায্য নিয়ে অন্য দেশে পণ্য রপ্তানি করে। ফলে আমদানি রপ্তানির বাজার সম্প্রসারিত হয়।

প্রযুক্তিগত উন্নয়নে বেসরকারি ব্যাংকের ভূমিকা : বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি বেসরকারি ব্যাংক এদেশের প্রযুক্তিগত উন্নয়নে বিশাল ভূমিকা রেখে আসছে, তা নিচে আলোকপাত করা হলো :

১. **সার্বক্ষণিক সেবা (Round the Clock Service) :** বেসরকারি ব্যাংকসমূহ সার্বক্ষণিক সেবা প্রদান করে থাকে, যা দেশের সরকারি ব্যাংক দিতে ব্যর্থ। যার ফলে ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এটা সম্ভব একমাত্র প্রযুক্তিগত কারণে।

২. **On-line Banking System :** বেসরকারি ব্যাংকসমূহ On-line Banking সেবা চালু করেছে। যার মাধ্যমে গ্রাহকরা অতি সহজে লেনদেন করতে পারে। নেটের মাধ্যমে গ্রাহকরা অতি দ্রুত লেনদেন সরবরাহ করে থাকে। বেসরকারি ব্যাংকসমূহ একমাত্র এ সেবা দিতে সক্ষম হয়েছে।

৩. **ATM-Booth চালু :** বেসরকারি ব্যাংক প্রযুক্তিগত উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ATM-Booth চালু। বেসরকারি ব্যাংকসমূহ গ্রাহকদের সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন জায়গায় অসংখ্য Booth চালু করেছে, যার ফলে গ্রাহক তার জরুরি মুহূর্তেও কার্ডের মাধ্যমে যে কোনো সময় টাকা তুলতে পারে।

৪. **SMS Banking :** বেসরকারি ব্যাংকগুলা প্রযুক্তিগত দিক থেকে এতই অগ্রগামী যে, গ্রাহকরা SMS কিংবা Mobile এর মাধ্যমে Bank লেনদেন করতে পারে।

৫. **Card System :** বেসরকারি ব্যাংকসমূহ বিভিন্ন প্রকার কার্ড চালু করে থাকে যেমন Debit এবং Credit Card যার মাধ্যমে গ্রাহক অতি সহজে ও নিশ্চিন্তে তার লেনদেন করতে সক্ষম।

শিক্ষাক্ষেত্রে বেসরকারি ব্যাংকের ভূমিকা : বাংলাদেশে শিক্ষার উন্নয়নে বেসরকারি ব্যাংকের রয়েছে অপরিসীম ভূমিকা। শিক্ষার গুণগত মান পরিবর্তন ও শিক্ষায় মানুষের আগ্রহ সৃষ্টিতে বেসরকারি ব্যাংক বৃত্তি প্রদান ও শিক্ষালোন দিয়ে থাকে।

উপসংহার : পরিশেষে আমরা এ কথা অকপটে স্বীকার করতে পারি যে, বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে বেসরকারি ব্যাংকের রয়েছে অগ্রণী ভূমিকা। যার ফলে বাংলাদেশের উন্নয়ন আস্তে আস্তে ত্বরান্বিত হচ্ছে।

৪৭ । বাংলা সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধের প্রভাব আলোচনা করুন।

***অথবা,* বাংলা সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধের কিরূপ প্রতিফলন ঘটে– বিশ্লেষণ করুন।**

উত্তর : ভূমিকা : আধুনিক বাংলা সাহিত্য ভাষা আন্দোলনে যতটা আলোড়িত হয়েছিল, মুক্তিযুদ্ধে তার চেয়ে বেশি আন্দোলিত হয়েছে। কেননা মুক্তিযুদ্ধের সময় মানুষের মধ্যে যে জাতীয়তাবাদী চেতনা, স্বদেশপ্রেম ও মানবতাবাদী আবেগের স্ফুরণ ঘটেছিল তা প্রকাশ পায় বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন অঙ্গনে। মোটকথা, মুক্তিযুদ্ধ অনুষঙ্গটি বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে বিভিন্নভাবে। এর মাধ্যমে সাহিত্যের ভাব, ভাষা, প্রকাশভঙ্গি আমূল পরিবর্তিত হয়েছে; বাংলা সাহিত্যে যোগ হয়েছে নতুন মাত্রা।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনাসমৃদ্ধ কবি/সাহিত্যিক : মুক্তিযুদ্ধের চেতনাসমৃদ্ধ বাংলাদেশের কবি ও সাহিত্যিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন হাসান হাফিজুর রহমান। তার সম্পাদিত 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও দলিলপত্র' গ্রন্থটি ১৬ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। তার এ গ্রন্থটি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোর অনুপুঙ্খ বিবরণ উপস্থাপন করে। বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে যাদের বিভিন্ন লেখায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রতিফলিত হয়েছে তাদের মধ্যে শামসুর রাহমান, এম আর আখতার মুকুল, আব্দুল গাফফার চৌধুরী, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, জাহানারা ইমাম, সেলিনা হোসেন, শওকত ওসমান, সৈয়দ শামসুল হক, বদরুদ্দিন উমর প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলা সাহিত্য : ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে এ দেশের বিভিন্ন কবি, সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার কবিতা, উপন্যাস ও নাটক লিখে মুক্তিযুদ্ধে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। শুধু মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ই নয়, মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়েও মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে নানা কবিতা, উপন্যাস, নাটক, গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি। মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যের যে সকল দিক মুখরিত হয়েছে তা নিচে আলোচনা করা হলো :

১. **কবিতা :** মুক্তিযুদ্ধের অব্যবহিত পরে 'হে স্বদেশ' এবং 'উত্তরণে অমরত্ব' (১৯৮২) নামক দুটি কবিতা সংকলন প্রকাশিত হয়। দুটি সংকলনেই মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক কবিতা প্রাধান্য পেয়েছে। এরপর প্রকাশিত হয় 'মুক্তিযুদ্ধের কবিতা' (১৯৮৪) এবং 'মুক্তিযুদ্ধের নির্বাচিত কবিতা' (১৯৮৭)। এসব সংকলনের কবিতাগুলো বিশ্লেষণ করলে যে বিষয়গুলো চোখে পড়ে তা হলো :

ক. অবরুদ্ধ বাংলাদেশের ভীতি, শঙ্কা ও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জীবন ও যুদ্ধকে অবলোকন।

খ. যুদ্ধক্ষেত্রে শঙ্কা ও ভীতির মধ্য দিয়ে সহযোদ্ধার মৃত্যু ও শত্রুহননের উল্লাস এবং বিজয়ের স্বপ্ন নিয়ে লেখা কবিতা।

গ. সাধারণভাবে মুক্তিযুদ্ধ জনতার সংগ্রামের উদ্দীপনা, শোষণ ও নীপিড়নের বিরুদ্ধে সহিংস প্রতিবাদের উচ্চারণ।

ঘ. যুদ্ধ-পরবর্তীকালে রচিত যুদ্ধের স্মৃতিচারণ, ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ঘরে ফেরার আনন্দ ও স্বজন হারানোর বেদনা ইত্যাদি।

কবি ও কবিতায় মুক্তির আহ্বান : মুক্তিযুদ্ধের চেতনায়সমৃদ্ধ হয়ে অনেক কবি জ্বালাময়ী কবিতা রচনা করেছেন। নিচে এরূপ কিছু কবি ও তাদের কবিতা উল্লেখ করা হলো :

ক. **জসীমউদ্‌দীন :** মুক্তিযুদ্ধের কবিতা আলোচনার ক্ষেত্রে প্রথমেই আসেন পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীন। ১৯৭১ সালের ২ মে ধ্বংসযজ্ঞ শুরুর পরপরই তিনি লিখেছেন 'দগ্ধগ্রাম' ও 'মুক্তিযোদ্ধা' কবিতা। তিনি সহজ সরল ভাষায় লিখেছেন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর অত্যাচারের নগ্ন ইতিহাস—

"মার কোল হতে শিশুরে কাড়িয়া কাটিল যে খান খান
পিতার সামনে মেয়েরে কাটিয়া করিল রক্তস্নান।"

যুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে বাংলাদেশে অবরুদ্ধ বয়ঃবৃদ্ধ কবি যেন মানসিকভাবে মুক্তিযোদ্ধায় পরিণত হয়েছেন—

"আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা, মৃত্যু পিছনে আগে
ভয়াল বিশাল নখর মেলিয়া দিবস রজনী জাগি।"

খ. **সুফিয়া কামাল :** ১৯৭১ সালের ২ মার্চ সোনার বাংলা খচিত পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে মানুষের যে চেতনার প্রতিফলন ঘটেছিল, বাঙালি জাতীয় চেতনার যে ঐক্য সংগঠিত হয়েছিল তার প্রকাশ যেসব কবির কবিতায় ফুটে উঠেছে তার মধ্যে সুফিয়া কামাল অন্যতম। বেগম সুফিয়া কামাল তার 'প্রথম শহীদ বাংলাদেশের মেয়ে' কবিতায় এ চেতনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। বাংলাদেশকে পাক হানাদার মুক্ত করার দীপ্ত শপথ নিয়ে যে নারী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ নির্বিশেষে ত্যাগ স্বীকার করেছিল, সবাই প্রাণ বিসর্জনে প্রস্তুত হয়েছিল, তার প্রকাশ ঘটেছে কবি বেগম সুফিয়া কামালের কবিতায়।

গ. **আবুল হোসেন :** বাংলাদেশের আধুনিক কবিদের মধ্যে অগ্রজ আবুল হোসেন 'পুত্রদের প্রতি'

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৭)

কবিতায় এক বাঁশিওয়ালার কথা বলেছেন, হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালার মতো যিনি সব ছেলেদের ঘরছাড়া করবেন, যারা আর ফিরবে না, যাদের মুখ আর দেখা যাবে না। স্বাধীনতা আর মুক্তির জন্য একটি পুরো প্রজন্ম ঘড়ছাড়া হলো। কেউ তাদের সেদিন ধরে রাখতে পারেনি ঘরে।

ঘ. **শামসুর রাহমান :** একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের শ্বাসরুদ্ধকর, ভয়াবহ বন্দীদশা তথা মুক্তিযুদ্ধে মানুষের একাত্মতা সবচেয়ে প্রবলভাবে প্রকাশ পেয়েছে শামসুর রাহমানের কবিতায়। মুক্তিযুদ্ধের সময় রচিত 'বন্দী শিবির থেকে' কাব্যের কবিতায় অবরুদ্ধ ঢাকার চিত্রকল্প চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে—

"এ বন্দী শিবিরে
মাথা খুঁড়ে মরলেও পারি না করতে উচ্চারণ
মনের মতন শব্দ কোনো।
মনের মতন সব কবিতা লেখার
অধিকার ওরা
করেছে হরণ।"

২. **মুক্তিযুদ্ধের চেতনাসমৃদ্ধ ঔপন্যাসিক ও উপন্যাস :** মুক্তিযুদ্ধের চেতনার উপর নির্ভর করে বাংলা সাহিত্যে অনেক উপন্যাস রচিত হয়েছে। নিম্নে উল্লেখযোগ্য ঔপন্যাসিকের কিছু মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

ক. **রাইফেল রোটি আওরাত :** শহীদ অধ্যাপক আনোয়ার পাশার 'রাইফেল রোটি আওরাত' মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাসসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এ দেশের ইতিহাসের এক দুঃসহ ও নৃশংসতম অধ্যায়ের বিশ্বস্ত দলিল এই উপন্যাসটি। এ শুধু একাত্তরের বাংলাদেশের হাহাকারের চিত্র নয়, তার দীপ্ত যৌবনেরও এক প্রতিচ্ছবি। এ গ্রন্থের নায়ক সুদীপ্ত শাহীন বাংলাদেশ আর বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষা, সংকল্প প্রত্যয় আর স্বপ্ন কল্পনারই যেন প্রতীক। একাত্তরের মার্চের সে ভয়াবহ কটা দিন আর এপ্রিলের প্রথমার্ধের কালো দিনগুলোর মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার সংকীর্ণ পরিধি টুকুতেই এ বইয়ের ঘটনাপ্রবাহ সীমিত, কিন্তু এর আবেদন আর দিগন্ত দুঃখ এ সময়সীমার আগেও বহুদূর বিস্তৃত। বাঙালির বেদনা আর আশা-নিরাশার এ এমন এক শিল্পরূপ যা সব সময় সীমাকে ডিঙিয়ে এক দীর্ঘস্থায়ী অপরূপ সাহিত্য কর্ম হয়ে উঠেছে।

এটি তার শেষ বই। জীবনের শেষ বই প্রত্যক্ষ আর সাক্ষাৎ ঘটনাবলীকে তিনি উপন্যাসে রূপ দিয়েছেন এ গ্রন্থে। ঢাকায় বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অঞ্চলে, যে বিশ্ববিদ্যালয় এ দেশের সব প্রগতি আন্দোলনের উৎস তার উপর পাক হানাদারের বর্বর আক্রমণ আর তাদের অমানুষিক তাণ্ডবলীলার এমন নিখুঁত ছবি, এমন শিল্পোত্তীর্ণ রচনা আর কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। ইতিহাসের দিক দিয়েও এ বইয়ের মূল্য অপরসীম।

"ফ্ল্যাশব্যাক রীতিনির্ভর রাইফেল রোটি আওরাত-এর ভাষা শ্লেষাত্মক, প্রশ্ননির্ভর বিশ্লেষণধর্মী। নির্লিপ্ত, নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিচেতনা দিয়ে লেখক প্রতিটি চরিত্র, পরিবেশ চিত্রিত করেছেন। সর্বত্র অনুসন্ধিৎসা আছে। ভাবাবেগের প্রাবল্য নেই, চরিত্র-পরিবেশ-ভাষা সর্বত্র এক সংহত, সংযত নির্লিপ্ত শিল্পীমনেরই যেন উৎসারণ।" চোখের সামনে ঘটা টাটকা ঘটনাবলীর উত্তাপ তার শিল্প সত্তাকে কেন্দ্রচ্যুত করেনি কোথাও। লেখকের জন্য এর চেয়ে প্রশংসার কথা আর হতে পারে না।

খ. **দুই সৈনিক :** আমাদের জাতীয় চরিত্রের কলঙ্কময় দিক শওকত ওসমান তার দুই সৈনিক উপন্যাসে অঙ্কিত করেছেন। সেই স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় কিভাবে আমাদেরই আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে কেউ কেউ কত অযাচিতভাবে পাক মিলিটারির সহায়তা করতে এগিয়ে গিয়েছিল এবং অবশেষে নিজেদের এবং প্রিয়জনদের জীবনে দুর্ভোগ ও করুণ পরিণতি নেমে এসেছিল তার একটি চিত্র তিনি অঙ্কন করেছেন দুই সৈনিক উপন্যাসে।

গ. **নেকড়ে অরণ্য :** শওকত ওসমানের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক আরেকটি উপন্যাস 'নেকড়ে অরণ্য' নির্বাসিত রমণীদের বোবা কান্নায় মুখর। একটা গুদাম ঘর শৃঙ্খলিত বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করছে। গুদাম ঘরের মধ্যে যেসব নারী আছে তারা অপমানিতা, নির্যাতিতা, ধর্ষিতা এবং সেই সূত্রে হিন্দু-মুসলমান শিক্ষিত-অশিক্ষিত গ্রামীণ ও নাগরিক রমণীদের মধ্যে একটা ঐক্য ও সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রুচি, সংস্কৃতি ও ভাষার ব্যবধান দূর হয়ে একটি গভীর মমত্ববোধ পরা সবাই পরস্পরের কাছাকাছি এসেছিল। সকলের কাছে একটা দুঃখই পাহাড়। তারই ভার সকলে বহনরতা। তাই একে অপরের কাছাকাছি হওয়ার ব্যগ্রতা অপরিসীম।

ঘ. **অবেলায় অসময় :** আমজাদ হোসেনের 'অবেলায় অসময়' উপন্যাসের স্থান আকর্ষণীয়, একটি চলমান নৌকা বাংলাদেশের মিলন তীর্থ। মিলিটারির আক্রমণের ভয় নৌকাটির ভেতরে। বড়ুয়া, ব্যানার্জী, জনসন, জসিমুদ্দি, কিশিত, টুপী, নামাবলী সবই আছে। কিন্তু এরা সব জাত ধর্ম এ নদীর জলে ধুয়ে ফেলেছে। সব এখন মানুষ।

আলী মাঝির দার্শনিক উপলব্ধি– 'সুখের সময় যত জাত ধর্মের বাহাদুরী, মারামারি, খুনোখুনি! আজকে আমার এ নৌকার ভিতরে যেমন এক জাতের মানুষ, সারাজীবন এইভাবে বসবাস করলেই তো আর গাল গালাজ হয় না।'

স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে খণ্ড খণ্ড কাহিনী ফ্ল্যাশব্যাক রীতিতে এগিয়ে চলছে। আলী মাঝি ও ফাতেমা, আদম ও হাওয়া, কাসেম ও সকিনা সমান মর্যাদা অর্জন করেছে। জুটির নাম নির্বাচনে আমজাদ হোসেনের ইতিহাস চেতনা কাজ করছে। বর্ণনার ভাষায় ঋজুতা, স্বাচ্ছন্দ্য ফুটে উঠেছে।

ঙ. **হাঙ্গর নদী গ্রেনেড :** সেলিনা হোসেনের 'হাঙ্গর নদী গ্রেনেড' উপন্যাসের নামকরণ এবং বিষয়বস্তুতে প্রতীকী ব্যঞ্জনার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। হাঙ্গর আক্রমণকারী মিলিটারি, নদী-বুড়ী-তথা বাংলাদেশের নিস্তরঙ্গ জীবন এবং গ্রেনেড মুক্তিযোদ্ধা।

সর্বমোট বিরানব্বই পৃষ্ঠার উপন্যাসটির চুয়াল্লিশ পৃষ্ঠা পর্যন্ত প্রধান চরিত্র বুড়ীর জীবন, তার কৈশোর, যৌবন, বিবাহ, সন্তানহীনতা, সন্তানপ্রাপ্তি, স্বামীর মৃত্যু, সতীনের বড় ছেলের বিয়ে, দাদী হওয়া ইত্যাদি যেন হাজার বছরের বাংলাদেশের নিস্তরঙ্গ একঘেয়ে বৈচিত্র্যহীন শান্ত নদীর মতো প্রবাহিত জীবনের বর্ণনা রয়েছে। হাজার বছরের বাংলাদেশের নয় মাস সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যতিক্রমী। নয় মাসের প্রথম পর্যায় পাকবাহিনী আক্রমণকারী হাঙ্গর এবং দ্বিতীয় পর্যায় প্রতি আক্রমণকারী মুক্তিযোদ্ধা গ্রেনেড। তাই হাঙ্গর ও গ্রেনেড উপন্যাসটির অর্ধেক জায়গা মাত্র জুড়েছে। হাজার বছরের নদীমাতৃক বাংলাদেশের হাঙ্গর ও গ্রেনেডের অবস্থান সংক্ষিপ্ত এবং ব্যতিক্রমী। তাই ইচ্ছে করেই হয়ত সেলিনা হোসেন তিন শব্দের নামকরণের যে সমন্বয় সাধন করেছেন তাকে সমান গুরুত্ব দিয়ে সমান জায়গা করে দেননি। সেলিনা হোসেনের বর্ণনা আন্তরিক, জীবন্ত এবং তীক্ষ্ণ ভাষা সরল বাক্য তির্যক। সর্বত্র ঔচিত্যবোধের ছাপ বর্তমান।

চ. **যাত্রা :** শওকত আলীর 'যাত্রা' ২৭ মার্চ থেকে ৩ এপ্রিলের জিঞ্জিরা সৈয়দপুরের ঘটনা ধারণ করেছে। 'যাত্রা'র প্রথমেই বুড়িগঙ্গায় 'হুড়োহুড়ি পাড়াপাড়ি করে নৌকায় ওঠা' পলায়নপর

জনস্রোতের ঢাকা থেকে জিঞ্জিরা হয়ে উদ্দেশ্যবিহীন ছুটে চলার মর্মান্তিক দৃশ্য বিবৃত হয়েছে। হাজার হাজার ভয়তাড়িত রাতজাগা, ক্লান্ত মানুষগুলোর একই চিন্তা এখন দূরে চলে যাওয়া। শহর থেকে শুধু চলে যাওয়া যেখানে হোক, ঠিকানাবিহীন হোক শুধু হেটে চলা। এক নদী পার হয়ে আরেক নদী। যেন বা বাংলাদেশের বুকের ভিতরে চলে যাচ্ছে মানুষ শত্রুর হাত যেন পৌছতে না পারে, মৃত্যুর হিংস্র থাবার বাইরে যেন চলে যাওয়া যায়।

সেদিন পলায়নপর মানুষের কোনো সতন্ত্র পরিচিতি ছিল না, সেদিন 'সবাই একসঙ্গে হাটে, তারপর লীলা-মঞ্জু-সাকিনা, হাসান, বাচ্চারা বিনু, রায়হান যেন একটি পরিবার।' এখানে পঙ্গু, অসুস্থ হাসানের জন্য সেবা করতো বিনু প্রফেসর পত্নী, এখানে লীলা অপেক্ষা করে হাসানের জন্য যোশেফ ফার্নান্দেজ ধরে রাখে হাসানকে, রায়হানের টাকার জন্য ঢাকার দিকে রওয়ানা দেয় রাতের আধারে। পলায়নটা সেদিন সত্য ছিল, অপরিহার্য ছিল। তবু তারও মধ্যে আনিসের মতো লোকেরা দেখেছে প্রতিরোধের লক্ষণ। 'এই অবস্থাতেই প্রতিরোধ গড়ে উঠবে কেউ চাক বা না চাক তবু প্রতিরোধ হবে।'

ছ. **সৌরভ ও আগুনের পরশমনি :** উপন্যাস দুটোতে কাহিনীগত ঐক্য আছে। সৌরভে কাদের, রফিক মুক্তিযুদ্ধে ট্রেনিংয়ে যায় আগরতলায় আর আগুনের পরশমণিতে আলম, সাদেক, গৌরাঙ্গ ট্রেনিং শেষে ঢাকায় যুদ্ধ করতে আসে। যুদ্ধের সময়ে বাঙালিদের স্বাধীনতাকামী মনোভাব প্রেম ও দ্রোহের নিরিখে এখানে দেখানো হয়েছে।

জ. **নির্বাসন :** হুমায়ূন আহমেদের নির্বাসন পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাকে নিয়ে লিখিত। কথা ছিল জরীর সাথে আনিসের বিয়ে হবে। কিন্তু স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকবাহিনীর হাতে আনিস গুলিবিদ্ধ হলে তার নিম্নাঙ্গ অবশ হয়ে যায়। চিকিৎসা চলে দীর্ঘদিন। কিন্তু রোগ মুক্তির কোনো লক্ষণ নেই। একটি ধূসর বিবর্ণ রিক্ত অন্ধকার সময় আনিসকে ঘিরে ফেলে। জরীর বিয়ে হয়ে যায় অন্য ছেলের সাথে। বরযাত্রীরা তৈরি হয়েছে বিদায় নিতে। সবাই জরীকে ধরাধরী করে উঠানে নিয়ে এলো। আনিস জানালা দিয়ে নিচে তাকিয়ে আছে। গভীর বিষাদে আনিসের চোখে জল এল। যে জীবন কোয়েলের, দোয়েলের, ফড়িংয়ের মানুষের সাথে তার কোনো কালেই দেখা হয় না। একটি বেদনাময় অনুসরণের মধ্যে কাহিনী শেষ হয়েছে।

৩. **মুক্তিযুদ্ধের চেতনাসমৃদ্ধ নাটক ও নাট্যকার :** মুক্তিযুদ্ধের চেতনাসমৃদ্ধ নাটকসমূহের মধ্যে সৈয়দ শামসুল হকের 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' নাটকটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এটি মুক্তিযুদ্ধকে অবলম্বন করে লেখা তার সবচেয়ে সার্থক ও মঞ্চসফল নাটক। লেখক এটি কাব্যনাট্যের আঙ্গিকে লিখেছেন। উত্তর বাংলার আঞ্চলিক শব্দের নিপুণ ব্যবহার রয়েছে এ নাটকে। গতিশীল ভাষার ব্যবহারের মধ্য দিয়ে যুদ্ধকালীন বাস্তবতার কুশলী প্রয়োগ ঘটেছে এ নাটকে। যুদ্ধ শেষে মুক্তিবাহিনীর গ্রামে প্রবেশের সময়কার ঘটনা এখানে সংলাপ ব্যবহারের বাঙালির দেশপ্রেম, দেশের শত্রুর প্রতি প্রবল ঘৃণা এবং আক্রোশের সাথে বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবনের চিত্র রূপায়িত হয়েছে।

পরিশেষ : পরিশেষে বলা যায়, সমসাময়িক বিশাল ঘটনা মুক্তিযুদ্ধ বাংলা সাহিত্যকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে। এর মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে এসেছে নানান নতুন শব্দ, নির্মাণ শৈলী এবং প্রকাশভঙ্গি। যদিও এসব সাহিত্যকর্ম সম্পূর্ণতা অর্জন করেনি তথাপি মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপকতা প্রকাশে যেসব খণ্ডচিত্র প্রকাশ পেয়েছে তা আগামী প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানতে সাহায্য করবে। সুতরাং বাংলা সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধের প্রভাব অপরিসীম।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৪৮ ॥ কর্মমুখী শিক্ষা কি? দক্ষ জনশক্তি গঠনে কর্মমুখী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করুন।

উত্তর : কোনো দেশের অর্থনীতিতে নিয়োজিত শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে কর্মমুখী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অপরিসীম। বর্তমানে বাজার বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উন্মুক্ত হয়ে পড়ছে। সে কারণে মানুষ পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে বৈচিত্র্যপূর্ণ দ্রব্য সম্ভার উপভোগ করার, যদিও সে সুযোগটি অসম, স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে রয়েছে বিশাল জনসংখ্যা। সুযোগের সুষম বণ্টন হলে অভাবমুক্ত পৃথিবীও পাওয়া সম্ভব। সে কারণে জনসংখ্যাকে বোঝা হিসেবে বিবেচনা করে সংকট না বাড়িয়ে বরং সময় এসেছে একে জনশক্তিতে রূপান্তর করার। জনশক্তির উৎপাদনশীলতা বাড়ে, যদি জনসংখ্যা অর্জন করতে পারে ক্রমবর্ধমান দক্ষতা। সে দক্ষতা অর্জন অবশ্যই শিক্ষা বিস্তারের মধ্য দিয়ে সম্ভব; শিক্ষাকে যদি উৎপাদনের গতিশীলতা বৃদ্ধির উপায় হিসেবে বিবেচনা করা হয় তাহলে অবশ্যই কর্মমুখী শিক্ষা গুরুত্ববহ। পৃথিবীর একটি বিশাল জনগোষ্ঠী মানবেতর জীবনযাপনে বাধ্য হয় (যাদের আয় দৈনিক ১ ডলারের নিচে), যাদের অধিকাংশের বাস মূলত দক্ষিণ এশিয়া, সাব সাহারা আফ্রিকায় এবং লাতিন আমেরিকার কিছু কিছু জায়গায়। এসব এলাকায় জনসংখ্যার চাপ অনেক বেশি। কিন্তু সম্পদ ব্যবহার করে অভাব পূরণের উপযোগী দ্রব্য উৎপাদনের পরিমাণ কম। কারণ সম্পদ ব্যবহার করার যে প্রক্রিয়া, পদ্ধতি তার সাথে তাদের পরিচয় তথা সে সম্পর্কে তাদের জ্ঞান কম। কর্মমুখী শিক্ষার মাধ্যমে জনসংখ্যার বিরাট অংশ শ্রমের অধিক উৎপাদনশীলতা তৈরির মাধ্যমে তাদের সেই দারিদ্র্যাবস্থা কাটাতে পারে।

কর্মমুখী শিক্ষা বিষয়ক ধারণা : যে শিক্ষা ব্যবহারিক জ্ঞানের বিকাশ ঘটায় এবং কর্মে প্রয়োগ করার প্রণালী ও পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করে তাকে কর্মমুখী শিক্ষা বলে। কর্মমুখী শিক্ষার কাঠামোর প্রকৃতি নির্ধারিত হয় সমাজের যেসব দ্রব্য উৎপাদিত হয় তার উপকরণের ওপর। আলাদা আলাদা সংস্কৃতির ভিতর জীবনযাপনকারী মানুষের অভাব পূরণের উপকরণগুলো আলাদা আলাদা হয়, ফলে সেগুলোর আকাঙ্ক্ষিত রূপান্তর পদ্ধতিও আলাদা আলাদা হতে পারে। এ পদ্ধতিগুলোই রপ্ত হয় কর্মমুখী শিক্ষার মাধ্যমে। তবে বর্তমান প্রযুক্তির বিকাশ অতি উৎপাদন ঘটিয়েছে, পৃথিবীর প্রায় সব জায়গায়ই আন্তর্জাতিকতার ছোঁয়া পেয়েছে। তাই প্রযুক্তি ও উৎপাদিত দ্রব্যের এক ধরনের সমরূপতাও পরিলক্ষিত হচ্ছে। সুতরাং কর্মমুখী শিক্ষাতেও সমরূপতা আসছে।

দক্ষ জনশক্তি : শ্রমের বিশেষায়ণ ঘটছে মানুষের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনের প্রেক্ষিতেই। তাই সমাজের চাহিদা অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ প্রকারের শ্রমে নিয়োজিত হওয়ার জন্য প্রয়োজন ন্যূনতম কিছু যোগ্যতা, যাকে দক্ষতার মাপকাঠি বলা যায়। উৎপাদন কাঠামোর ভেতর প্রথাগত নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণই শুধু দক্ষতার মাপকাঠি নয়, বরং এটা তাই যা লব্ধ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে শ্রমশক্তিকে উৎপাদনের গতিশীলতা বৃদ্ধি ও বিনির্মাণে উৎসাহী ও যোগ্য করে তোলে। আধুনিক সমাজের যে কাঠামো সেখানে দক্ষতার নির্ধারক হচ্ছে স্ব স্ব ক্ষেত্রে শিক্ষা ও মেধাগত উৎকর্ষতা। পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকার অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশগুলো শিক্ষার উচ্চহার ও মেধাগত উৎকর্ষতার ভিত্তিভূমি বলে সর্বজনবিদিত। ফলে উৎপাদনশীলতা ও বৈচিত্র্যও অন্যান্য অনগ্রসর স্থানের তুলনায় অত্যধিক।

দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে কর্মমুখী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা : দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে কর্মমুখী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের আলোচনা শুরু করার আগে অবশ্যই কোনো ভূখণ্ডের আর্থ-সামাজিক অবস্থান ও আচরিত জীবনের রূপ বা সংস্কৃতিকে বিবেচনাধীন করতে হবে। যেমন— যেসব জায়গায় জনসংখ্যার বেশির ভাগ লোক প্রাথমিক পেশা যেমন– কৃষি, মৎস্য চাষ ইত্যাদির সাথে জড়িত

সেখানকার কর্মমুখী শিক্ষার ধরনের সাথে একটি বৃহদায়তন শিল্পাঞ্চলের কর্মমুখী শিক্ষার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ইরানির গালিচা তৈরির ক্ষেত্র; আর তাই সেখানকার শ্রমশক্তি কর্মমুখী শিক্ষায় শিক্ষিত করার অর্থই হচ্ছে এ সংক্রান্ত প্রযুক্তি ও পদ্ধতির সাথে শ্রমদানকারীকে পরিচিত করানো। একইভাবে পশ্চিম ইউরোপ, ভারতবর্ষ ও আফ্রিকার কর্মমুখী শিক্ষার ধরন আলাদা হবে।

কর্মমুখী শিক্ষার মাধ্যমে শ্রমশক্তির বেকার অংশকে নবতর দ্রব্য উৎপাদনের কাজে লাগানো যায়, যার কারণে তার দক্ষতা বাড়ে, মানবিক পুঁজির অবচয় রোধ করা সম্ভব হয়। সুতরাং অবচয় হতে থাকা দক্ষতাকে সংরক্ষণ ও বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করে জনশক্তির দক্ষতা বাড়ানো সম্ভব হয়।

কর্মমুখী শিক্ষার মাধ্যমে শ্রমশক্তির যে অংশ কর্মে নিয়োজিত হয়, ব্যক্তির অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের সুযোগের মাধ্যমে সামষ্টিক অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়। ফলে অবকাঠামো নির্মাণ ও দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ পাওয়া যায়।

কর্মমুখী শিক্ষার মাধ্যমে শ্রমের বিশেষায়ন ও দ্রব্যের মধ্যে বৈচিত্র্য আনয়ন সম্ভব হয়। ফলে অনুৎপাদিত দ্রব্য, মাধ্যমিক দ্রব্য বিনিয়োজিত হয়। সম্পদের অবচয় রোধ করা সম্ভব হয়।

কর্মমুখী শিক্ষা উৎপাদনের সময় ও শ্রমের ব্যয় হ্রাস করে। ফলে যেমন উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব হয়, শ্রমশক্তির সৃজনশীলতা বৃদ্ধির সুযোগ পাওয়া যায়।

অর্থনীতিবিদ রেহমান সোবহান দেখিয়েছেন, কয়েকটি দেশ অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় কর্মমুখী শিক্ষাকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়ে তা বাস্তবায়ন করে অর্থনীতিকে শক্তিশালী করেছে। জাপান, জার্মানি, তাইওয়ান সিঙ্গাপুরকে নিবিড় পর্যবেক্ষণের পর তিনি দেখিয়েছেন যে মধ্যপর্যায়ের কর্মমুখী শিক্ষার বিস্তারই তাদের অগ্রসর শিল্প অর্থনীতির মূলভিত্তি। এসব দেশে এই শিক্ষায় শিক্ষিতরাই প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটিয়েছে টেকসই উন্নয়নের ধারাকে বেগবান করেছে। কোনো দেশে এ ধরনের প্রশিক্ষিত শ্রমিকের অপচয় থাকলে বড় শিল্প গড়ে ওঠার সম্ভাবনা তো থাকেই না বরং থাকলেও তা মুখ থুবড়ে পড়ে। যদি ব্যয়বহুল প্রযুক্তি কোনো কারণে অচল হয়ে পড়ে, সেক্ষেত্রে যদি এ ধরনের প্রশিক্ষিত একটি শ্রমশক্তি থাকে, তাহলে তাদের সম্মিলিত প্রয়াসেই শিল্প কাঠামো টিকে থাকতে পারে। এছাড়া বিনিয়োগ কখনোই সফল হয় না, সুফল বয়ে আনে না যদি যথেষ্ট প্রযুক্তি ও কর্মমুখী শিক্ষাসম্পন্ন শ্রমিক অপ্রতুল থাকে।

প্রাচ্যের যেসব দেশের অর্থনীতি ক্রমাগ্রসরমান, তাদের কর্মমুখী শিক্ষাসম্পন্ন শ্রমশক্তির চাহিদাই তাদের অগ্রসরতার কারণটি উন্মোচন করে।

বিশ্বব্যাংক দক্ষ জনশক্তি বৃদ্ধির উপায় হিসেবে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কর্মমুখী শিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপের জন্য পরামর্শ দিয়ে আসছে।

প্রেক্ষিত বাংলাদেশ : অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির উচ্চহার ধরে রাখতে এবং এর সুফল ভোগ করার ক্ষেত্রে মানব সম্পদের উন্নয়ন ও সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করার বিকল্প নেই। বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো জনবহুল দেশে তা আরো বেশি জরুরি। বাংলাদেশের সরকারগুলো তাই স্বাধীনতা অর্জনের অব্যবহিত পর থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের অগ্রাধিকার বিবেচনায় গুরুত্ব দিয়ে আসার চেষ্টা করেছে। বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় মূলত তিন ধরনের ধারা প্রচলিত আছে। ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সাধারণ শিক্ষা, ধর্মীয় শিক্ষা এবং ব্রিটিশ পদ্ধতির ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষা। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়ার আগের শিক্ষাটি এককভাবে পারিবারিক গণ্ডির মধ্যে আয়ত্ত করার পর মূলত এখানকার শিশুদের একটি অংশ অর্থনৈতিক, সামাজিক অবস্থানের তারতম্য ও মূল্যবোধের বিভিন্নতার কারণে এ তিনটি ধারার যে কোনো একটি ধারায় অনুপ্রবেশ করে। রাষ্ট্র সব শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণ বাধ্যতামূলক করার পর থেকে তা বাস্তবায়ন করার সাংবিধানিক দায়িত্ব বর্তেছে সরকারগুলোর ওপর। নীতি

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নানা ধরনের সীমাবদ্ধতা থাকার জন্য সব ছাত্রের জন্য যেমন প্রাথমিক শিক্ষাই নিশ্চিত করা যায়নি তেমনি প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের সময় ঝড়ে পড়াও বন্ধ হয়নি; যার ফলে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ জনগোষ্ঠীর মধ্যে অদক্ষ, শিক্ষাবঞ্চিত যে সংখ্যাটি থাকবে তারা বোঝা হিসেবে পরিগণিত হতে শুরু করেছে।

এ বোঝাকে উৎপাদনে নিয়োজিত করার জন্য যে প্রস্তুতি শ্রম বাজারের চাহিদা অনুযায়ী নেয়া উচিত ছিল তা অনেকগুলো কারণেই নেয়া সম্ভব হয়নি। তবে কর্মমুখী শিক্ষায় শিক্ষিত করে বাংলাদেশে অধিকাংশ প্রাথমিক পেশানির্ভর মানুষকে শিল্পক্ষেত্রে নিয়োজিত করে উপযোগী করা গেলে জাতীয় উন্নতির ক্ষেত্রে দারুণ ভূমিকা পালন করতে পারতো।

কিন্তু বাংলাদেশে নব্বই দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত ৫১টি Vocational Training Institute এর মধ্যেই কর্মমুখী শিক্ষা সীমাবদ্ধ ছিল। এগুলো শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত হতো। এছাড়াও ছিল ১১টি Technical Training Institute যা পরিচালিত হতো শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় দ্বারা। বিভিন্ন জরিপ কিংবা সমীক্ষায় দেখা গেছে, এ স্বল্প সংখ্যক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কর্মমুখী শিক্ষার যে ব্যাপ্তি ছিল, তা আমাদের প্রয়োজন মোতাবেক দক্ষ শ্রমশক্তি যোগাতে তেমন কোনো কার্যকর ভূমিকাই রাখতে পারেনি। অবশ্য এগুলোর বাইরে কিছু বেসরকারি সংস্থা (NGO) ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও কাজ করতো কর্মমুখী শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি উৎপাদনের লক্ষ্য নিয়ে; কিন্তু সেগুলোও ছিল অপ্রতুল। কর্মমুখী শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে যে সমস্যাটি বারবার এখানে দেখা দিয়েছে তা হলো— একদিকে কর্মমুখী শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রমশক্তির চাহিদা যেমন ছিল না অর্থনীতিতে, তেমনি এখানে শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষতা সৃষ্টিতে এখানকার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যর্থ হয়েছে। আরো একটি বড় সমস্যা হলো কর্মমুখী শিক্ষাব্যবস্থা ছিল কেন্দ্রীভূত এবং সমানুগতিক। ফলে এখানে যারা দেশের সব অংশে কর্মমুখী শিক্ষাকে উৎপাদনশীল পুঁজির বিকাশে সহায়তা করেনি, উদ্যোগের ক্ষেত্রেও তারা প্রেরণা যোগায়নি।

তারপরও নব্বই এর মাঝামাঝি সময় হতে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কর্মমুখী শিক্ষার বিস্তৃতির লক্ষ্য নিয়ে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে মাধ্যমিক পর্যায় থেকে সিলেবাসে কর্মমুখী শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য সরকার কোনো দাতাগোষ্ঠীর ওপর নির্ভর করেনি, স্থানীয় পর্যায়ে এ উদ্যোগ ভালোভাবেই গৃহীত হয়। কারণ সাধারণত মানুষ এতে করে তর দক্ষতার স্তরকে উন্নীত করার সুযোগ পাবে। কিন্তু সেক্ষেত্রেও যেটি সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় তা হলো বেশির ভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই কর্মমুখী শিক্ষাকে ফলপ্রসূ করার জন্য। বোধগম্য করার জন্য যে পরিমাণ শিক্ষক প্রয়োজন ছিল, তা ছিল না। একই সাথে ছিল অবকাঠামোগত অপর্যাপ্ততা। তত্ত্বীয় জ্ঞানের পাশাপাশি প্রায়োগিক জ্ঞান অর্জনের অনুজ্ঞাগুলোর অপ্রতুলতা মাধ্যমিক পর্যায়ে কর্মমুখী শিক্ষা প্রচলনের ইতিবাচকতাকে ব্যাহত করেছে।

বাংলাদেশে কর্মমুখী শিক্ষার পরিসরের বৃদ্ধি অবকাশ ও প্রয়োজন দুটোই আছে। বর্তমান বিশ্বায়িত পৃথিবীতে কর্মমুখী শিক্ষার প্রস্তুতি নিতে হবে বিজ্ঞান, গণিত, ভাষার সাথে সুষম ও সমন্বিতভাবে। যারা মাধ্যমিক পর্যায়ের আগে পরে ঝরে পড়ে, তাদের বাজারের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কর্মমুখী শিক্ষা প্রদানের মধ্য দিয়ে কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসন করা সম্ভব। সেক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগও প্রয়োজনীয়।

দারিদ্র্যবিমোচন কৌশলপত্রে শিক্ষাক্ষেত্রে যে অগ্রাধিকার বিবেচনা করা হচ্ছে তার মধ্যে কর্মমুখী ও প্রযুক্তি শিক্ষা অন্যতম। সেখানে মাধ্যমিক পর্যায়ে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের উন্নয়ন সহায়ক ও বাজারমুখী দক্ষতা অর্জনের জন্য কর্মমুখী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করার সুপারিশ রয়েছে। সুযোগ সৃষ্টির দায়িত্ব

সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি খাতেও ন্যস্ত হয়েছে। ইউসেপ (UCEP) যেরকম সাধারণ শিক্ষার সাথে সমন্বয় করে সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের কর্মমুখী শিক্ষায় শিক্ষিত করার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছে। ইউসেপ (UCEP- Under Privileged Children Educational Program) -এর আদলে যেসব প্রতিষ্ঠান উদ্যোগী হয়ে এগিয়ে আসবে, সেসব প্রতিষ্ঠানকে সব ধরনের প্রয়োজনীয় সহযোগিতার নীতি গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে।

বাংলাদেশে নারীদের কর্মমুখী শিক্ষায় শিক্ষিত করা সম্ভব হলে বৈদেশিক শ্রমবাজারে বাংলাদেশ খুব ভালোভাবেই অংশগ্রহণ করতে পারতো, যেটা আমাদের অর্থনীতির সচলতার জন্য অত্যন্ত জরুরিও ছিল।

বাংলাদেশে দক্ষ জনশক্তি তৈরির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ

১. বর্তমান পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটগুলোর সুবিধা বৃদ্ধি করা;
২. নতুন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা;
৩. গ্রামীণ প্রযুক্তির আধুনিকায়ন ও উন্নয়ন;
৪. পলিটেকনিক ইনস্টিটিউশনগুলোতে কোর্সের বৈচিত্র্য আনা;
৫. পাঠ্যক্রমের পুনর্মূল্যায়ন ও উন্নয়ন;
৬. শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ জোরদার করা;
৭. প্রযুক্তি শিক্ষার আশু প্রয়োজনগুলো নিয়ে গবেষণা।

উপসংহার : একুশ শতকের ভাষা মূলত প্রযুক্তির ভাষা। যদি আমরা পর্যাপ্তভাবে প্রশিক্ষিত না হতে পারি তাহলে আমাদের ভাষাহীন হয়ে পড়া ছাড়া গত্যন্তর কি? কর্মমুখী শিক্ষার মাধ্যমেই শ্রমবাজারের চাহিদা পূরণ, অর্থনৈতিক গতিশীলতা, উৎপাদনশীলতা, বেকার সমস্যার সমাধান, বিকল্প কর্মসংস্থান তথা দক্ষ জনশক্তি তৈরি সম্ভব। তবে তা হতে হবে অবশ্যই উৎপাদনের উপকরণ ও পদ্ধতির সাথে অর্থনৈতিকভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৪৯ ▌ দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভূমিকা কতখানি? এক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা আলোচনা করুন।

উত্তর : মানবসম্পদ দেশের শক্তিশালী পুঁজি, যা কোনো দেশের উন্নয়নের চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে। একটি দেশের মানবিক উন্নয়ন বিশেষ করে আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিকসহ সকল ক্ষেত্রে দক্ষ ও যোগ্য মানবসম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। মানবসম্পদ উন্নয়নে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর যে ভূমিকা রাখার কথা, তা তারা সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারছে না; মানসম্মত শিক্ষা প্রদানে অনেকাংশেই ব্যর্থ হচ্ছে। প্রয়োজনীয় অর্থ-সংস্থানের অভাবে দেশের সরকারি স্বল্পসংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারছে না। এমতাবস্থায়, ১৯৯২ সালে সরকারি অ্যাক্ট-এর মাধ্যমে দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রচলন শুরু হয়। তখন থেকে অদ্যাবধি ৭১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আজকের পৃথিবীতে যে তুমুল প্রতিযোগিতা, তাতে যোগ্য ও দক্ষ প্রতিযোগী তৈরি করা বাঞ্ছনীয়, যাতে করে বিশ্বমানের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে দেশ ও জাতির সামগ্রিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হতে পারে। আর সেই সম্ভাবনাময় মানবসম্পদকে আরো বেশি প্রাণের সঞ্চার করছে বর্তমানের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

মানবসম্পদ উন্নয়নে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভূমিকা : স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক পরিমণ্ডলের সার্বিক উন্নয়নে দক্ষ, যোগ্য, অভিজ্ঞ এবং কর্মঠ জনশক্তির বেশ অভাব পরিলক্ষিত হয় এবং সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক গতিকে আরও ধাবমান করার প্রক্রিয়াতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারবে এমন ব্যবস্থাপক, কৌশলী ও দক্ষ আমলার বেশ অভাব ছিল। কিন্তু বর্তমান বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার পটপরিবর্তনের ফলে চিত্র বেশ পরিবর্তিত হয়েছে। আজকের শিক্ষাব্যবস্থায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পাশাপাশি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো জ্ঞান দান, প্রশিক্ষণ, দক্ষতা বৃদ্ধি, উদ্যোক্তা তৈরি, বিশ্বমানের শিক্ষা প্রদান, টেকসই শিক্ষা প্রদানে অনেক তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

এদেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মানবসম্পদ উন্নয়নে কতখানি ভূমিকা রাখছে সেটি আলোচনার জন্য মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষার উন্নত গুণাগুণ ও মান সম্পর্কে সম্যক ধারণা অত্যন্ত জরুরি। যেহেতু এখানে আঞ্চলিক, জাতীয়, বৈশ্বয়িক চাহিদাকে বিবেচনায় রাখতে হয়। কেননা উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধু জ্ঞান সৃষ্টি এবং জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেয়া নয় বরং মানবসম্পদের উন্নয়ন বা দেশের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন। এ আলোকে আপাতভাবে শিক্ষার মান বলতে আমরা বুঝি :

ক. দেশের জনগণ, সরকার, বহির্বিশ্বের নিকট শিক্ষার মানের মূল্য।
খ. অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রদানে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট ইতোমধ্যে শেষ করা ডিগ্রির গ্রহণযোগ্যতা এবং উচ্চশিক্ষার সুযোগ বা শিক্ষক হিসেবে সেখানে যোগদানে ন্যূনতম যোগ্যতা।
গ. যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট একজনের সদ্য ডিগ্রির গ্রহণযোগ্যতা তথা স্থানান্তরের যোগ্যতা।
ঘ. আন্তর্জাতিক পর্যায়ের পণ্ডিতদের স্বীকৃতি এবং স্বীকৃতিস্বরূপ বিভিন্ন গবেষণায় প্রকাশ।
ঙ. ডিগ্রি হতে হবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চাহিদার আলোকে, চাকরির বাজারের বিবেচনায়।

এছাড়া আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে যেগুলো মানসম্পন্ন শিক্ষাব্যবস্থার পরিমাপক হিসেবে কাজ করে। যেমন– ভর্তি প্রক্রিয়া, কোর্স ও কর্মসূচি, ভৌত অবকাঠামো যার মধ্যে থাকছে গ্রন্থাগার, ল্যাবরেটরিজ, ইন্টারনেট সুবিধা, অনুষদগুলোর মান, জ্ঞানদান ও জ্ঞান আহরণের পদ্ধতিতে উদ্ভাবনী শক্তি, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে সখ্যতা, ছাত্রদের জন্য কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড, ব্যবস্থাপনা, শিক্ষার মান নিয়ে ছাত্রদের দৃষ্টিভঙ্গি, শিক্ষার সহায়ক পরিবেশ প্রভৃতি।

আজকে শিক্ষা পদ্ধতি অনেক বেশি বিশ্বমানের হওয়া জরুরি। বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশের উঁচুমানের দক্ষ মানবসম্পদের খুব প্রয়োজন যেখানে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে। মানবসম্পদ উন্নয়নে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভূমিকা নিচে আলোকপাত করা হলো :

ক. **যুগোপযোগী শিক্ষা :** বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যুগের চাহিদা মেটাতে বদ্ধপরিকর। তাইতো প্রয়োজন অনুযায়ী যুগের চাহিদার বিবেচনায় যে কোনো মুহূর্তে পাঠ্যবিষয় সংযোজন করতে পারে। আবার আপেক্ষিকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ পাঠ্যবিষয় ত্যাগ করতে পারে। এতে করে যুগোপযোগী চাহিদা মেটানো সহজতর হয়। সময়ের দাবিকে প্রধানরূপে দেখে দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়। এর মাধ্যমে দেশের জনগণ সময়ের চাহিদা অনুযায়ী নিজেকে দক্ষ সম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে পারে।

খ. **সময়মতো দক্ষ মানবসম্পদ সরবরাহ :** বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো রাজনৈতিক আবহ থেকে পুরোপুরি মুক্ত। তাই এখানে সেশনজট, সংঘাত ইত্যাদির দরুন দীর্ঘসূত্রিতার মতো অভিশাপ

নেই। বরং, দ্রুত শিক্ষাজীবন সম্পন্ন করতে পারে এমন সহায়ক নীতি বা ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। ফলে সময়োপযোগী শিক্ষায় শিক্ষিত মানবসম্পদ সময়মতো শিক্ষাজীবনের ইতি টেনে চাকরি জীবনে প্রবেশ করতে পারে।

গ. **উচ্চশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি :** এ দেশের উচ্চশিক্ষা কাঠামোতে সুযোগের তুলনায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক বেশি। দেশে একাডেমিক কার্যক্রম চালুকৃত ৩৪টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে যেখানে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীর উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা একেবারেই অসম্ভব। এমতাবস্থায় দেশের ৭১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় তাদেরকে (শিক্ষার্থী) উচ্চশিক্ষা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করে দিচ্ছে। আর মানবসম্পদ উন্নয়নকল্পে বিরাট অবদান রাখছে; যেটিকে অস্বীকার করার অবকাশ নেই।

ঘ. **উচ্চতর ডিগ্রিধারী শিক্ষক কর্তৃক পাঠদান :** শিক্ষকদের যোগ্যতা বিচার করতে গেলে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় বেশ এগিয়ে। তথাপি বাংলাদেশের বেশ কিছু বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে; চাকরির বাজারেও যাদের খ্যাতি প্রণিধানযোগ্য। যেমন– নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি, ইস্ট-ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উত্তর আমেরিকান ডিগ্রিধারী, অভিজ্ঞ প্রশিক্ষিত এবং মানসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়, যারা এদেশের শিক্ষিত যুবসমাজকে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তরিত করছে তাদের বিশ্বমানের শিক্ষা আর বাস্তব অভিজ্ঞতার ছোঁয়ায়।

ঙ. **ক্যারিয়ার সার্ভিস বিভাগ :** বাংলাদেশের উঁচুমানের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে Career Service Department বলে একটি প্রাতিষ্ঠানিক বিভাগ থাকে যারা শিক্ষার্থীদেরকে পেশা, পছন্দ ও চাকরির বাজার সম্পর্কে অবগত করে চাকরি, প্রশিক্ষণ, সাংগঠনিক গুণাগুণ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরির সুযোগ প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে ছাত্রদের নির্দেশনাও জানান দিয়ে থাকে। যেগুলো শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাসী, প্রাণশক্তিসম্পন্ন ও প্রয়াসী হয়ে উঠতে সহায়তা করে।

চ. **বিদেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি :** বাংলাদেশের অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাথে বিদেশী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি থাকে যার মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী বিদেশে উচ্চতর শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ অর্জন করে। অনেক বিদেশী খ্যাতিসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সুসম্পর্ক বিদ্যমান, যার ভিত্তিতে অনেক শিক্ষার্থী বৃত্তির মাধ্যমে বিদেশে শিক্ষাগ্রহণের মধ্য দিয়ে নিজেকে বিশ্বমানের মানুষ হিসেবে গড়ে তুলছে এবং দেশের আর্থ-সামাজিক কল্যাণে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে।

ছ. **কর্মসংস্থানের যোগ্যতা সৃষ্টি :** বিশ্বায়নের এ যুগে, বেসরকারি ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের দ্বারাই দেশের অর্থনীতির চাকায় গতির সঞ্চার হচ্ছে। সরকারি প্রতিষ্ঠানের তুলনায় বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরির সুযোগ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ। আর বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুঁথিগত বিদ্যা বা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরে ব্যক্তির কর্ম-দক্ষতা, উপস্থাপনা, পরিবেশনা, ব্যবস্থাপনা যোগ্যতা, বাজারজাতকরণের দক্ষতা, প্রযুক্তি ব্যবহারের সক্ষমতা প্রভৃতিকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। আর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের শিক্ষা পদ্ধতির আয়োজন এমনভাবে পরিবেশন করে যাতে করে শিক্ষার্থী উপরোল্লিখিত যোগ্যতা বা দক্ষতা অর্জনে সক্ষম হয়।

জ. **আন্তর্জাতিক ভাষা শিক্ষা ও প্রযুক্তি জ্ঞান :** বাংলাদেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অধিকাংশগুলোতেই ইংরেজি মাধ্যমে পাঠদান করানো হয়। যার ফলে শিক্ষার্থীরা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গ্রহণযোগ্যতা অর্জনে সক্ষম হয়। অনেক ক্ষেত্রে বিদেশী প্রতিষ্ঠানে চাকরি অর্জনের সুযোগ

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

লাভ করে। অধিকন্তু, ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষার ফলে শিক্ষার্থীদের আন্তর্জাতিক ভাষায় দক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং বিশ্বের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মানুষের সাথে সুসম্পর্ক তৈরিতে সহায়ক/অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। আর এভাবেই বিশ্বমানের অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে এদেশের শিক্ষার্থীরা বিশ্বমানের নাগরিক হয়ে উঠতে পারে।

ঝ. **বাস্তব জ্ঞানদান :** বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাথে দেশীয় ও বহুজাতিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সখ্যতা বিদ্যমান। যার ফলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে থাকাকালীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ইন্টার্নশিপ করার সুযোগ পায় এবং বাস্তবজ্ঞান আহরণ করতে পারে।

ঞ. **বৃত্তি ও অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদান :** অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র কল্যাণ ফান্ড থাকে; যা থেকে মেধাবি শিক্ষার্থীদের বৃত্তি ও অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদান করা হয়। এর ফলে অনেক নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের মেধাবিমুখ উচ্চশিক্ষার সুযোগ পায়। অনেক ক্ষেত্রে পূর্বের রেজাল্টের ভিত্তিতে ভালো ফলাফলধারী শিক্ষার্থীদের পূর্ণ টিউশন ব্যতীত পড়াশুনার ব্যবস্থা করে থাকে। আর এই কার্যক্রমগুলোর মাধ্যমে মেধাবী শিক্ষার্থীদের মানবসম্পদে পরিণত করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

বিদ্যমান সমস্যা : বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যে দেশের জনগণকে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তরে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে আসছে সে ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই। তথাপি, সকল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোই যে সমানভাবে শিক্ষার সেবা নিশ্চিত করতে পারছে এমনটি নয়। বেসরকারি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর বেশ কিছু সমস্যাও রয়েছে। যেমন–

১. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার মান নিয়ে বোদ্ধা সমাজের অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন। তারা বলছে, এ প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেয়ার চেয়ে নিজেদের ব্যবসায়িক লাভের বিষয়টিকে বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে অনেকেরই মন্তব্য কিছু অনভিজ্ঞ ব্যবসায়ী উদ্যোক্তা নিজেদের মূলধন বিনিয়োগের ক্ষেত্র হিসেবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ব্যবসায়ী লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে ফেলছে। স্বল্প সংখ্যক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত অধিকাংশের শিক্ষার মানই প্রশ্নবিদ্ধ।
২. শিক্ষার গুণগত মান বৈচিত্র্যপূর্ণ। অর্থাৎ শিক্ষার পরিবেশ, কোর্স, পাঠ্যবিষয়, একই ইউনিভার্সিটিতেই ভিন্নতর হয়। সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় বা আয়োজনে যে মান রক্ষার দরকার সেটি তারা রক্ষা করতে অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থ।
৩. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শুধু চাকরি লাভের জন্য শিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। এখানে গবেষণায় এতটা উৎসাহিত করা হয় না। এমন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা খুব কমই আছে যাদের গবেষণার নির্দিষ্ট কক্ষ নিয়ামক ও যন্ত্রপাতি রয়েছে।
৪. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় শ্রেণী কক্ষের অভাব, অনুষদগুলোর মান নিম্ন, ক্যাম্পাসের আয়তন স্বল্প, অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের বাইরে বিচরণের সুযোগও নেই।
৫. শিক্ষার গুণগত মানের চেয়ে আকর্ষণীয় নামের দিকেই অনেকের দৃষ্টি আর এটাকে ঘিরে বেসরকারি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষার মানের চেয়ে চাকচিক্যপূর্ণ পরিবেশে বেশি মনোযোগী হয়ে থাকে।
৬. শিক্ষার ব্যয় প্রচুর। এদেশের অধিকাংশ মানুষ নিম্ন আয়ের, তাই যেহেতু বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার ব্যয় প্রচুর। সেহেতু নিম্ন বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা খুব কমই এখানে ভর্তির সুযোগ পায়। সুতরাং এ প্রতিষ্ঠানগুলো সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টি করছে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৭. শিক্ষার সামগ্রিক কর্মসূচি বাজারের চাহিদা মেটাতে উৎসাহী, সামাজিক চাহিদা বা কল্যাণ সাধনে অত্যন্ত সীমিত। অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ব্যবসায় প্রশাসন, কম্পিউটার বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিয়ে থাকে কিন্তু সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের বিষয় তেমন পড়ানো হয় না বললেই চলে। এভাবে মানব সম্পদকে সামাজিক কল্যাণে তৈরির চেয়ে যান্ত্রিক করে তুলছে বেশি।

৮. শিক্ষকদের মান এতটা ভালো নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে খণ্ডকালীন শিক্ষক দিয়ে ক্লাস নেয়া হয়, যার দরুণ কোর্সগুলো সম্পন্ন করতে গিয়ে অনেক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে একই শিক্ষক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ক্লাস নিয়ে থাকেন যার ফলশ্রুতিতে অর্থনৈতিকভাবে কেবল শিক্ষকগণই লাভবান হতে পারেন কিন্তু শিক্ষার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৯. প্রয়োজনীয় গ্রন্থের অভাব, শিক্ষার্থীদের বই পড়ার অনভ্যাস, যন্ত্র নির্ভর শিক্ষা পদ্ধতি, শিক্ষার মূল লক্ষ্য হতে বিচ্যুত, সামাজিক কল্যাণের চেয়ে অর্থনৈতিক লাভের প্রাধান্য, গবেষণালব্ধ শিক্ষা পদ্ধতির অভাব, দক্ষ ও মানসম্পন্ন শিক্ষকের অভাব প্রভৃতি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য।

উপসংহার : জ্ঞান, দক্ষতা ও যোগ্যতা হলো একটি দেশের টেকসই উন্নয়নের অন্যতম প্রধান নিয়ামক। দেশের বেসরকারি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো নিজ নিজ অবস্থান থেকে এই গুণগুলো অর্জনে সহায়তা পূর্বক জনগণের বিরাট অংশকে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করছে। যার ফলশ্রুতিতে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এ দক্ষ জনশক্তি উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারছে। তবে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সবগুলোই যে সমান মান রক্ষা করে চলছে তা নয়। অনেক ক্ষেত্রে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানগুলোর মান নিয়ে হাজারো প্রশ্ন রয়েছে। তবে এটা সত্য যে বাজারের চাহিদা পূরণ আর সমাজের নৈতিক মূল্যবোধের ধারক ও বাহক রূপে তৈরি তথা, সমাজের কল্যাণে সামাজিক মানবসম্পদে রূপায়ণ এক কথা নয়।

৫০ ‖ সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন কি? মানবসম্পদ উন্নয়নে এর গুরুত্ব আলোচনা করুন।

উত্তর : নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্তি আজকের পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ স্বপ্ন। সামগ্রিক উন্নয়নের চেতনার উৎস হচ্ছে শিক্ষা। পরাধীনতা, শোষণ, বঞ্চনা ও অজ্ঞতার অতীত অতিক্রম করে জাতীয় মেধার অবাধ বিকাশ ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ অনুধাবন, ধারণ ও উন্নয়ন এবং নতুন বিশ্বে মানবিক সম্পর্কের চেতনা উন্মেষের পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক ঐক্যভূমি নির্মাণই আজ সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলনের মূল লক্ষ্য। মানবসম্পদ উন্নয়নে এ ফলপ্রসূ আন্দোলনের ভূমিকা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলনের পটভূমি : শিক্ষা মানুষের মৌলিক চাহিদাসমূহের অন্যতম একটি। শিক্ষা ব্যতীত কোনো জাতিই উন্নতি লাভে সমর্থ নয়। এ কারণে বিশ্বব্যাপী নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে স্লোগান ধ্বনিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯৬০ সাল থেকে এশিয়ার দেশসমূহে বিরাজমান নিরক্ষরতা দূর করার জন্য ইউনেস্কোর নানা কর্মসূচি গ্রহণের কথা। এ কর্মসূচির আওতায় ১৯৮০ সালের মধ্যে এশিয়ার দেশসমূহ শিশুর জন্য সাত বছর মেয়াদি অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের এক পরিকল্পনা গ্রহণ করে। আমাদের দেশেও নানাধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন আরও জোরদার হয়। এ সময়ে শিক্ষার মান উন্নয়ন, সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি, নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা, নারী শিক্ষার উন্নয়ন এবং উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। উল্লেখ্য, স্বাধীনতাকালে সাক্ষরতার হার

ছিল মাত্র ২৭%। বর্তমানে তা ৫৭.৯% (অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৩)-এ উন্নীত হয়েছে। তাছাড়া উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে একটি অভূতপূর্ব উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। দেশের নিরক্ষরতা দূর করার জন্য অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু, শিক্ষা উপবৃত্তি প্রবর্তন, শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি, ডিগ্রি স্তর পর্যন্ত নারী শিক্ষা অবৈতনিক প্রভৃতি উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে। সার্বিক শিক্ষার আন্দোলনকে বেগবান করার জন্য ১৯৯৫ সাল থেকে শুরু হয় সার্বিক শিক্ষা আন্দোলন বা 'সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন'। এ আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় এ পর্যন্ত লালমনিরহাট, চুয়াডাঙা, রাজশাহী, মাগুরা, জয়পুরহাট, গাজীপুর ও সিরাজগঞ্জসহ বেশ কয়েকটি জেলা নিরক্ষরমুক্ত জেলা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ও মানবসম্পদ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

মানবসম্পদ : বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ পল জে মায়ার বলেছেন 'The greatest natural resource of our country is its people.' আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ মনে করেন, অন্যান্য সম্পদের মতো মানুষও জাতীয় সম্পদ। বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমীক্ষা ও বিশ্লেষণে দেখা যায়, কোনো দেশের জাতীয় আয় যেমন তার প্রাকৃতিক সম্পদের সাথে সম্পর্কযুক্ত, ঠিক তেমনি দেশের মানুষের গুণগত মানের সাথেও সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ সমাজে বসবাসকারী ব্যক্তিদের ছাড়া সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নতি কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। সমাজের উন্নয়নে প্রকৃতপক্ষে অর্থ ও বস্তু সম্পদের মতো ব্যবহৃত হচ্ছে মানবসম্পদ। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ কার্ল মার্কস মানুষকে তাই মানবীয় মূলধন (Human Capital) বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ মানবীয় মূলধনকে আধুনিক পরিভাষায় মানবসম্পদ (Human resource) হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। তবে এ কথা স্বীকার্য যে, জনশক্তি তখনই মানবসম্পদে পরিণত হয় যখন তা সুপরিকল্পিতভাবে পরিচালিত হয়। অপরদিকে, মানবকে সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করার একটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য উপাদান হচ্ছে সাক্ষরতা (Literacy)। কোনো ব্যক্তিকে সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হবে তখনই যখন সে সামাজিক নির্দিষ্ট মান অনুযায়ী সাক্ষরতা অর্জন করবে।

মানবসম্পদ উন্নয়ন : আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) মানবসম্পদ উন্নয়ন বলতে ব্যক্তিকে কর্মে নিযুক্ত করার সম্ভাবনা বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে বিবেচনা করেছেন। হার্বিসন ও মায়ার্স-এর মতে, উন্নয়ন এমন একটি পদ্ধতি, যার মাধ্যমে একটি সমাজের সকল ব্যক্তির জ্ঞান, দক্ষতা এবং কাজ সম্পাদনের ক্ষমতা বৃদ্ধিকে বোঝায়। মানবসম্পদ উন্নয়নে ব্যক্তির প্রাধান্য যেহেতু সর্বাধিক তাই এ বিষয়টি অধিক গ্রহণযোগ্য। মানবসম্পদ উন্নয়নের উপায় হিসেবে তারা ৫টি বিষয়কে চিহ্নিত করেছেন। যথা :

১. **আনুষ্ঠানিক শিক্ষা :** প্রাথমিক শিক্ষাস্তর থেকে শুরু করে বিভিন্ন কাঠামোয় মাধ্যমিক শিক্ষা এবং কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চ পর্যায়ের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত শিক্ষাকে বোঝানো হয়েছে।

২. **কর্মকালীন প্রশিক্ষণ :** ধারাবাহিক বা উপানুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠানভিত্তিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম এবং বিভিন্ন সংগঠন; যেমন– রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত হয়।

৩. **আত্মউন্নয়ন :** যেমন জ্ঞান, দক্ষতা এবং সামর্থ্যের উন্নয়ন, যা ব্যক্তি তার নিজের চেষ্টায় আনুষ্ঠানিক উপায়ে অথবা দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে অনানুষ্ঠানিক উপায়ে পড়ে বা অন্যের কাছ থেকে শিখে নিজের আগ্রহ ও কৌতূহল অনুযায়ী ব্যাপক গুণমান, দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে নিজেকে তৈরি করে।

৪. **স্বাস্থ্য উন্নয়ন :** উন্নততর চিকিৎসাব্যবস্থা এবং গণস্বাস্থ্য কার্যক্রমের মাধ্যমে কর্মরত জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য উন্নয়ন।

৫. **পুষ্টি উন্নয়ন :** পুষ্টি মানুষের কর্মদক্ষতা বাড়িয়ে দেয়। মানুষ অধিক সময় ধরে কাজ করতে পারে এবং কর্মজীবন দীর্ঘ হয়। এটা সুস্পষ্ট যে, পুষ্টি এবং উন্নত স্বাস্থ্যসেবা মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে জড়িত আনুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং তা অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফল।

শিক্ষার সাথে মানবসম্পদের সম্পর্ক ও জাতীয় উন্নয়ন : শিক্ষা হচ্ছে জাতির মেরুদণ্ড। জাতীয় জীবনে উন্নতির মূলে শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ অজানাকে জানে, নিজেকে চিনে। বর্তমানকে গড়ার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করে এবং ভবিষ্যতের কর্মপন্থা নির্ধারণ করে। শিক্ষা ও জ্ঞান মানুষের রুচি, আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কাম্য পরিবর্তন সাধন করে। প্রকৃতি প্রদত্ত বস্তু নিয়ে উপযোগিতা সৃষ্টি করে মানবকল্যাণ বৃদ্ধিতে তৎপর হয়। কেননা শিক্ষার শেষ লক্ষ্য হচ্ছে মানবকল্যাণ সাধন ও জাতীয় উন্নয়ন আনয়ন। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সার্বভৌম রাষ্ট্রের জনগণকেই জাতি হিসেবে গণ্য করা হয়। জাতি বড় হয় উন্নত হয়, শিক্ষা-দীক্ষায়, জ্ঞান-গরিমায়, ত্যাগ-তিতিক্ষায় ও জাতীয় অবদানে। কোনো জাতির শ্রেষ্ঠত্ব ও উন্নতি বিপুল জনসংখ্যা দিয়ে নয়; বরং দক্ষ জনসম্পদ দিয়ে তা বিচার করা হয়। কেননা মানুষের আত্মপ্রতিষ্ঠা, উৎপাদন ক্ষমতা ইত্যাদি শিক্ষার মাধ্যমেই অর্জিত হয়। শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো জনগণকে সৎকাজে উদ্বুদ্ধ করে দায়িত্বশীল ও সুনাগরিকরূপে গড়ে তোলা এবং ব্যক্তির বিকাশ সাধন করা। জনগণের কর্মকাণ্ডের ওপরই জাতীয় উন্নতি নির্ভরশীল। যে জাতির জনগণ সুশিক্ষিত, দায়িত্বশীল, বিবেকবান এবং পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল সে জাতির মাধ্যমে সমাজ তথা রাষ্ট্রের কল্যাণসাধন সম্ভব। পরিবর্তনশীল সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় শিক্ষার বিষয়বস্তু ও পদ্ধতির ক্ষেত্রে পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। সবক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য দক্ষতা ও কৌশল আয়ত্তের জন্য আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি বর্তমানে বহুবিদ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। কবির ভাষায়—

'বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর সবার আমি ছাত্র,
নানানভাবে নূতন জিনিস শিখছি দিবারাত্র।'

এ সত্য বাণীটি অনুধাবন করেই আজ জনগণের উন্নয়নে শিক্ষাকে ব্যবহার করা হচ্ছে। কেননা কোনো জাতির আশা আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের প্রধান হাতিয়ার হলো তার শিক্ষা। শিক্ষাব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত যাতে শিক্ষা গ্রহণের পর শিক্ষার্থীদের মধ্যে শ্রমের মর্যাদা ও শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত হয়। শিক্ষা মানবজাতির উন্নতির অবলম্বন। শিক্ষা মানুষের আত্মোন্নতি, আত্মবর্ধন ও আত্মবিকাশের মূল চাবিকাঠি। শিক্ষা জাতীয় উন্নতির সবচেয়ে উত্তম ব্যবস্থা। তাই বলা হয়ে থাকে— 'Education is the best weapon in a Nation's Armoury.' বর্তমান বিশ্বের সামগ্রিক উন্নতি ও উন্নয়নের মূলে রয়েছে শিক্ষা। বাস্তব কাজের মাধ্যমে দেশের গণশক্তি ও প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের ফলে জাতীয় অগ্রগতি সাধন করা সম্ভব।

বাংলাদেশের সার্বিক শিক্ষা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন : সার্বিক শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে মানবকে মানবসম্পদে উন্নয়ন করা সম্ভব। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই ১৯৯৫ সাল থেকে বাংলাদেশে সার্বিক সাক্ষরতা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। কেননা শিক্ষা একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষ শিক্ষা লাভ করে। শিক্ষাই মানুষকে সার্বিক গুণাবলী বিকাশে ও নানারকম কৌশল আয়ত্তে সহায়তা

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

করে থাকে। এ কারণে বাংলাদেশের সার্বিক সাক্ষরতা উদ্যোগ জনগণকে জনসম্পদে পরিণত করতে গুরুত্বপূর্ণ একটি পদক্ষেপ। এ লক্ষ্যে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তা নিচে আলোচিত হলো :

অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা (Informal Education) : মানুষের জীবনে শিক্ষার সূত্রপাত ঘটে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে। দৈনন্দিন জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে মানুষ দেখেশুনে, অনুকরণ করে যা শিখছে তাই অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা। শিক্ষার এ পদ্ধতিটি একেবারেই সুশৃঙ্খল ও ধারাবাহিক নয়। অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে অনুকরণ পদ্ধতিটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এতে করে আমাদের চিন্তা-চেতনা অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার বেলায় নিরক্ষরদের প্রতি বেশি কেন্দ্রীভূত। মূলত এ পদ্ধতিটিই সাক্ষর, নিরক্ষর; উচ্চশিক্ষিত সবার বেলায় প্রযোজ্য। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা মোটামুটি একটা সীমিত সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু অনানুষ্ঠানিক উপায়ে শিক্ষা গ্রহণ সবার জন্য সারা জীবন চলতে থাকে এবং শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার বৃহৎ অংশ শিক্ষাধারার এ পদ্ধতিতেই অর্জিত হয়ে থাকে। ফলে মানবসম্পদ উন্নয়নে এ শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা (Non-formal Educatin) : শিক্ষা মানবসম্পদ উন্নয়নের অন্যন্য উপায়। কিন্তু শিক্ষার উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি বাস্তবধর্মী না হলে এবং শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা সর্বজনীন ও সহজলভ্য না হলে উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছানো সম্ভব নয়। উন্নয়নশীল দেশের ছেলেমেয়েদের এক বিরাট অংশ স্কুলে যায় না। যারা স্কুলে ভর্তি হয় তাদের এক বিরাট অংশ প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার আগেই স্কুল ত্যাগ করে। আবার প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তকারীদের একটি বড় অংশ মাধ্যমিক শিক্ষায় অংশগ্রহণ করে না। তাই উপরিউক্ত সকলের জন্য এমনকি যারা উচ্চশিক্ষা লাভ করেছে তারাও উপানুষ্ঠানিক উপায়ে তাদের শিক্ষা ও দক্ষতা বাড়াতে পারে। এদেরকে তিনটি শ্রেণীতে বিভাজন করা হয়েছে। যথা :

ক. যারা কখনো আনুষ্ঠানিক উপায়ে শিক্ষা লাভের সুযোগ পায়নি তাদের জন্য সাক্ষরতা এবং বয়স উপযোগী কর্মভিত্তিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা।

খ. বিভিন্ন স্তরের স্কুল ত্যাগকারী, যাদেরকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মদক্ষ করে তোলা।

গ. বিভিন্ন পেশা ও কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ, যাদের কর্মদক্ষতা বাড়িয়ে এবং সমকালীন প্রশিক্ষণ বাড়িয়ে অধিকতর দক্ষ ও উৎপাদনশীল হতে সাহায্য করা।

উল্লেখ্য, প্রথম দলটির জন্য সাক্ষরতা কার্যক্রমে এর ফলে সমাজসচেতনতা সৃষ্টিকারী বিষয়বস্তু থাকবে। তাছাড়া তার পরিবার, পরিবেশ অনুযায়ী দৈনন্দিন জীবনের ফলে সম্পৃক্ত কার্যক্রমের প্রশিক্ষণ থাকবে। দ্বিতীয় পর্যায়ের জন্য থাকবে সমাজসচেতনতা সৃষ্টিকারী বিষয়। তাছাড়া কর্মদক্ষতা অর্জনে বিভিন্ন পেশাভিত্তিক কাজ, কারিগরি শিক্ষা ও কুটিরশিল্প প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে বিষয়বস্তুর সংযোজন থাকবে। তৃতীয় বিষয়ে থাকবে পাঠ্যক্রম, বিভিন্ন পেশা ও কর্মভিত্তিক জ্ঞান ও দক্ষতার উন্নয়ন ও নবায়ন এবং আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে বিষয়বস্তুর সংযোজন।

আনুষ্ঠানিক শিক্ষা (Formal Education) : মানবসভ্যতার অগ্রগতির পাশাপাশি মানুষের চাহিদারও পরিবর্তন ঘটে এবং আর্থ-সামাজিক প্রসার ঘটতে থাকে। ফলে ক্রমবর্ধমান সাংস্কৃতিক সংরক্ষণ ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যে এর বিতরণ এবং সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের এবং বিভিন্ন পেশায় দক্ষ জনশক্তি, দক্ষ কারিগর ও বিশেষজ্ঞ সমাজের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর জন্য প্রয়োজন হয় উন্নত মানসম্পন্ন প্রচুর পণ্যসামগ্রীর। সেবা মান উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন হয় বিপুল পরিমাণ দক্ষ জনশক্তির। এ জনশক্তির উন্নয়ন ও পণ্য উৎপাদনে পরস্পরের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। তাই মানুষ এটি অর্জনের জন্য

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

প্রাণান্তর চেষ্টায় রত হয়। এর ফলশ্রুতিতেই আনুষ্ঠানিক শিক্ষার উৎপত্তি ও বিকাশ। এর ফলে উদ্ভাবিত হয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের এক নতুন কৌশল, যার মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি গঠনের সুযোগ তৈরি হয়।

মানসম্পদ উন্নয়নে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ভূমিকা : মানবসম্পদ উন্নয়নে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সবিশেষ ভূমিকা পালন করছে। শিক্ষিত জনশক্তি দেশের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত। কৃষিক্ষেত্রে, শিল্পকারখানায়, জনস্বাস্থ্য ও জনসেবায় তারা প্রভূত সাফল্যের সাথে কাজ করছে। এ কথা স্বীকার্য যে, দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য দরকার বিভিন্ন পেশার জনশক্তি। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষিত জনগোষ্ঠী ও দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্তরে যে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তা মানবসম্পদ উন্নয়নে যথাযথ ভূমিকা রাখছে।

মানবসম্পদ উন্নয়নে কর্মমুখী শিক্ষার গুরুত্ব : হাতে-কলমে বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে কর্মের যে সম্পর্ক স্থাপনব্যবস্থা শিক্ষার কাজে অনুষ্ঠিত হয় তাই কর্মমুখী শিক্ষা। বাস্তবিক কর্মমুখী শিক্ষা প্রবণতা আধুনিক শিক্ষা ধারার প্রধান বৈশিষ্ট্য। পুরনো ধারার শিক্ষার সাথে শিক্ষার এ বিষয়টি যুক্ত হলে মানবসম্পদ উন্নয়নে ও দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বিংশ শতাব্দীতে জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয়ের পেরিবোবেট সর্বপ্রথম কর্মকেন্দ্রিক Activities Education স্থাপন করে শিক্ষা ব্যবস্থায় নবযুগের সূচনা করেন। এ আন্দোলনের মূলকথা হলো শিশুর শিক্ষা নিষ্ক্রীয়ভাবে বই পড়া কিংবা শিক্ষকের বক্তৃতার মধ্যে সীমিত না থেকে সক্রিয়তা বা বাস্তবভিত্তিক কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে সম্পন্ন হবে। কর্মমুখী শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীরা নিজেরাই নিজেদের কাজ করে, সমস্যা খুঁজে বের করে, বাস্তব বস্তুসামগ্রী প্রস্তুত করে নিজেদের উৎপাদিত ও সৃষ্ট কাজের মূল্যায়ন করে। শিক্ষক অবশ্য নেপথ্যে তাদেরকে দিক নির্দেশনা দেয়; যেমন– ধাতুর কাজ, মাটি, কাঠ, বাঁশ ও বেতের কাজ। বর্তমান যুগ বাস্তবতা ও কারিগরি শিক্ষার যুগ। তাই শিক্ষার্থীরা নিজেদের যন্ত্রপাতি নিজেরাই ব্যবহার করতে পারে। এ শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীরা কর্মপ্রসূত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তাদের জীবন গঠন করে এবং বাইরের সাথে যোগসূত্র স্থাপন করে। এ প্রক্রিয়ায় শিশুরা হাতে-কলমে বাস্তব কাজের মাধ্যমে বস্তুত তার গঠনপ্রক্রিয়া সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করে।

নারীশিক্ষা উন্নয়নে ভূমিকা : আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং দেশের অগ্রগতির জন্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক। মানব উন্নয়নে এটি প্রধান নিয়ামক। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৩ অনুযায়ী বাংলাদেশে সাত বছর এবং তার উর্ধ্বে শিক্ষার হার শতকরা ৫৭.৯ ভাগ। এর মধ্যে নারী শিক্ষার হার পুরুষের তুলনায় অনেক কম। অথচ দেশের প্রায় অর্ধেক নারী। তাই দেখা যায়, নিরক্ষরদের মধ্যে পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ। জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এবং দেশের অগ্রগতির জন্য এ বিপুল সংখ্যক নারীকে শিক্ষিত করে তোলা একান্তই কাম্য। সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাস হওয়ায় একদিকে যেমন ছেলেদের মতো মেয়েদেরও স্কুলে আসতে হচ্ছে; অন্যদিকে মেয়েদেরকে আসার জন্য বাড়তি সুযোগ সুবিধা দেয়া হচ্ছে। এমনকি সারা দেশে নারী শিক্ষাকে এগিয়ে নেয়ার জন্য ১৯৯৪ সালে মাধ্যমিক পর্যায়ে মেয়েদের জন্য ব্যাপক আর্থিক সহায়তা দেয়ার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। মাধ্যমিক পর্যায়ে মেয়েদের জন্য শিক্ষা অবৈতনিক এবং নারী স্টাইপেন্ড প্রকল্পের মাধ্যমে মেয়েদের আর্থিক সহায়তা দানের ফলে নারী শিক্ষায় অগ্রগতি সাধিত হয়েছে এবং এ ফল আশাব্যঞ্জক। নারী শিক্ষার অগ্রগতি ধরে রাখার জন্য এবং নারী গ্রাজুয়েটের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য এ কর্মসূচি আরো সম্প্রসারিত করা হচ্ছে। বাংলাদেশের

উন্নয়নমূলক কর্মসূচি নারী-পুরুষকে সমানভাবে উপকৃত করতে সক্ষম নয়। এ ধরনের কর্মসূচি অনেক সময় নারী উন্নয়নে প্রতিবন্ধক রূপে কাজ করে। এসব প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে উঠতে নারী সর্বত্রই সচেষ্ট রয়েছে। শিক্ষার সর্বস্তরে এখন নারীদের বিচরণ। গবেষণায় দেখা যায়, পূর্বে নারী শিক্ষার হার ছিল খুবই কম। বর্তমানে নারী শিক্ষার হার প্রতিটি স্তরে ও শাখায় বেড়ে চলেছে। অতএব নারী সমাজ শিক্ষিত হয়ে সমাজকে উন্নতি করছে।

উন্নয়নে গণশিক্ষা ও সাক্ষরতার প্রয়োজনীয়তা : একটি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদগুলোর মধ্যে মানবসম্পদ অন্যতম। মানবসম্পদ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য অত্যাবশ্যকীয় মৌলিক উপাদান। মানুষের জন্যই উন্নয়ন এবং মানুষই উন্নয়নের অপরিহার্য নিয়ামক। অর্থসম্পদ ও ভৌত সম্পদের আধিক্য সত্ত্বেও মানবসম্পদহীন কোনো দেশ উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করতে পারে না। কোনো দেশের জনগণ শিক্ষিত, সচেতন ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হলে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা রাখতে পারে। কেননা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য মানুষের গুণগত পরিবর্তন সাধন করে তাকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করে। শিক্ষা বলতে জনগণের সাক্ষরতা থেকে শুরু করে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চশিক্ষাসহ বিভিন্ন বৃত্তিমূলক কারিগরি ও পেশাগত শিক্ষাকে বোঝায়। তবে উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার জন্য গণশিক্ষা ও সাক্ষরতার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

জনশক্তি উন্নয়নে সাক্ষরতা :

১. **পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করে :** সাক্ষরতা আত্মসচেতনতা বাড়িয়ে দেয় এবং মানুষের মধ্যে পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করে। গণশিক্ষা ও সাক্ষরতা মানুষকে তাদের অভ্যাস, রীতিনীতি এবং সামাজিক অবস্থা ও ব্যবস্থাপনা জানতে এবং এর পরিবর্তনে আগ্রহ সৃষ্টি করে।

২. **জ্ঞানার্জনের পথ সুগম করে :** নিরক্ষর লোক জ্ঞানাহরণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। তার পরিধি অত্যন্ত সীমিত বলে প্রয়োজনীয় তথ্য তার কাছে অনুপস্থিত। পাঠে অক্ষম থাকার কারণে শুধু অন্যের কথা, আলাপ-আলোচনা শুনে এবং রেডিও শুনে কিংবা টিভি দেখে বিভিন্ন বিষয়ে সে জানার চেষ্টা করে। তারা অন্যের ওপর নির্ভরশীল বলে ব্যক্তি ও মহল নিরক্ষরদের সহজেই বিভ্রান্ত ও প্রতারিত করতে পারে। নিরক্ষর ব্যক্তি সাক্ষর হলে নিজের আগ্রহ ও প্রয়োজন মতো বইপত্র, পুস্তক ও সংবাদপত্র পড়ে জ্ঞানার্জন করতে পারে এবং নিজের উন্নতি সাধন করে সে দেশ ও জাতিকে উন্নয়নে সহায়তা করতে পারে।

৩. **চিন্তা ও বিচারশক্তির বিকাশ :** সাক্ষরতা মানুষকে আবেগ ও সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে স্বচ্ছ চিন্তা করতে শেখায়। এর ফলে তারা ব্যক্তিগত ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিশ্লেষণ করে সঠিক কর্মপন্থা উদ্ভাবন এবং সুচিন্তিত পরিকল্পনা প্রণয়নে সক্ষম হয়। ফলে তারা ব্যক্তিগত ও সামাজিক উন্নয়নে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারে।

৪. **সমাজ সচেতনতা ও ঐক্যবোধ জাগ্রত করে :** শিক্ষা মানুষের চেতনার উন্মেষ ঘটায়। পত্রপত্রিকা পাঠ, আলাপ আলোচনা এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদের সাথে মত বিনিময়ের ফলে ব্যক্তিজীবনের ওপর সমাজের প্রভাব এবং সমাজের প্রতি ব্যক্তির দায়িত্ব সম্পর্কে অধিক সচেতন হয়। শিক্ষিত জনগণ আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে সমাজের ও দেশের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করে। সে উপলব্ধি করে আর্থ-সামাজিক জীবনের সাফল্য অর্জনের ক্ষেত্রে একক প্রচেষ্টার সাথে যৌথ উদ্যোগ যুক্ত হলে তা উন্নয়নে অধিক ফলপ্রসূ হয়। এ উপলব্ধি থেকেই তারা ব্যক্তি স্বার্থের চেয়ে দেশ ও জনগণের

স্বার্থকে বড় করে দেখে এবং মানুষ হিসেবে তার সামাজিক, রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনের জন্য সমাজসেবী সংগঠন, সমিতি ও অন্যান্য সমবায় সংগঠন গড়তে উদ্যোগী হয়।

৫. **নাগরিক অধিকার ও দায়িত্ববোধের উন্মেষ ঘটায় :** সাক্ষরতার মাধ্যমে ব্যক্তি নিজের সম্পর্কে জানে বলে সে নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয়। অন্যদিকে, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে নিজেদের অধিকার প্রয়োগ ও প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়। সাক্ষর ব্যক্তিরা অন্ধ বিশ্বাস ও অন্ধ অনুকরণে গা না ভাসিয়ে দেশ ও জাতির কল্যাণে নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে পারে।

৬. **কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে :** একজন নিরক্ষর ব্যক্তির চেয়ে একজন সাক্ষরকর্মী অধিকতর কর্মদক্ষ। কেননা সাক্ষর ব্যক্তি নিজের আত্মবিশ্লেষণের মাধ্যমে তার দোষ-ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে একজন দক্ষ জনসম্পদরূপে নিজেকে গড়ে তুলতে আপ্রাণ চেষ্টা করে। কিন্তু একজন নিরক্ষর ব্যক্তির সে বোধ ও সুযোগ থাকে না বলে জীবনের নানা সমস্যা তাকে আঁকড়িয়ে ধরে। ফলে সে সমাজের একজন বোঝা হয়ে বিরাজ করে।

৭. **স্বাস্থ্যবিধি ও পরিবার পরিকল্পনার গুরুত্ব সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে :** শিক্ষিত ব্যক্তি জীবন সম্পর্কে জ্ঞাত বলে স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে সে সচেতন হয়। সে স্বাস্থ্যহানির কুফল সম্পর্কে জানে বলে রোগ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা মেনে চলার চেষ্টা করে। অন্যদিকে, নিরক্ষর ব্যক্তিরা স্বাস্থ্য রক্ষার উপায় সম্পর্কে উদাসীন থেকে প্রতিরোধযোগ্য রোগের কবলে পড়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে অনেক অর্থ বিসর্জন দেয়। শিক্ষিত ব্যক্তিরা পরিকল্পিত পরিবারের সুফল সম্পর্কে জ্ঞাত বলে তারা তাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা সীমিত রাখে।

৮. **জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের স্পৃহা জাগায় :** শিক্ষা মানুষকে সুন্দর ও সাবলীল করে তোলে। জীবনের বিভিন্ন দিকের উন্নয়ন ঘটিয়ে তা মানুষকে সুন্দর ও সাফল্যের পথ দেখায়। নিজেকে অন্যের সাথে তুলনার মাধ্যমে একজন সাক্ষর লোক নিজের জ্ঞানবুদ্ধি, বিবেক-বিবেচনার মানোন্নয়নের মাধ্যমে যে নিজেকে সুন্দর করার সুযোগ পায়। নিজেকে উন্নত রাখার পাশাপাশি সে তার পরিবারকে সুন্দর করে তোলে। পরিবারের অন্যান্য সদস্যের প্রতি তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালিত হয় বলে তার অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনও সুন্দর হয়। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুযোগদানের জন্য তারা পর্যাপ্ত খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা ইত্যাদির সংস্থান করতে সচেষ্ট হয়। অন্যদিকে নিরক্ষর মানুষ রোগ, শোক, দারিদ্র্য ইত্যাদিকে ভাগ্যের ফল হিসেবে গ্রহণ করে এবং সমাজে মানবেতর জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়। ফলে নিজেকে তো নয়ই বরং তার পুরো পরিবারকেও উন্নত করতে পারে না। এরূপ পরিবার সমাজ, দেশ ও রাষ্ট্রের জন্য ভারবাহী রূপে পরিগণিত হয়।

উপসংহার : মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। শিক্ষা ব্যতীত কোনো জাতিই উন্নতি লাভে সমর্থ নয়। প্রাচীনকাল থেকেই তাই শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। অন্যান্য শিল্পের মতো মানবজাতির দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নয়ন না হলে অন্যান্য শিল্পের উন্নয়ন সভ্য সমাজে অর্থহীন। কাজেই সুষ্ঠু ও সুন্দর জীবনের জন্য বিশ্বজুড়ে মানবশিল্প উন্নয়নের লক্ষ্যে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তার মধ্যে সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন অন্যতম। এ আন্দোলনের সুফল আমাদের সমাজে ইতোমধ্যেই পাওয়া যাচ্ছে। কেননা উচ্চতর প্রযুক্তি প্রণয়ন, উত্তম সম্পদ সরবরাহ, বাস্তবমুখী কল্যাণকর শিক্ষার প্রচলনের মাধ্যমে একটি দেশের জনগণ মানবসম্পদে পরিণত হতে পারে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৭)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-০১ বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যাগুলো কি কি?

উত্তর : সামাজিক সমস্যা হচ্ছে সমাজের এমন একটি অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থা, যা সমাজজীবনে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে। বাংলাদেশ বর্তমানে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা দ্বারা আক্রান্ত। এসব সমস্যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ১. জনসংখ্যা সমস্যা, ২. দারিদ্র্য, ৩. যৌতুক প্রথা, ৪. নিরক্ষরতা, ৫. বেকারত্ব, ৬. অপরাধ, ৭. বাল্যবিবাহ ইত্যাদি। এসব সামাজিক সমস্যার জন্য বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে।

প্রশ্ন-০২ বেকারত্ব কি?

উত্তর : কর্মক্ষম মানুষ প্রচলিত মজুরিতে কাজ করতে ইচ্ছুক থাকা সত্ত্বেও যখন তার যোগ্যতানুযায়ী কোনো কাজ পায় না সমাজের এ অবস্থাকে তখন বেকারত্ব বলে। অধ্যাপক পিগু বলেন, 'তাকে বেকারত্ব বলে যখন কর্মক্ষম ব্যক্তিরা কাজে ইচ্ছুক থাকা সত্ত্বেও যোগ্যতা অনুসারে কাজ পায় না।' বেকারত্ব একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা। বাংলাদেশে এ সমস্যা আরো বেশি প্রকট।

প্রশ্ন-০৩ সামাজিক অবক্ষয়ের কারণ এবং প্রতিকারের উপায় লিখুন।

বর্তমানে বাংলাদেশের সামাজিক অবক্ষয়ের অবস্থার কথা নতুন করে বলার কিছু নেই। চরম অবনতি ঘটেছে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের। আমাদের দেশে সামাজিক অবক্ষয়ের অনেক কারণ রয়েছে। এগুলোর মধ্যে দারিদ্র্য, জনসংখ্যার আধিক্য, বেকারত্ব, মাদকাসক্তি, রাজনৈতিক অস্থিরতা, অশিক্ষা ও কুশিক্ষা, অসম বণ্টনব্যবস্থা, বিদেশী-বিজাতীয় সংস্কৃতি গ্রহণ, কুরুচিপূর্ণ চলচ্চিত্র ও স্যাটেলাইট চ্যানেলের দৌরাত্ম্য, সন্ত্রাস উল্লেখযোগ্য। সামাজিক অবক্ষয়ের বর্তমান অবস্থান থেকে উত্তরণের জন্য যেসব প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে বলে আমি মনে করি সেগুলো হচ্ছে দারিদ্র্য বিমোচন, গ্রামোন্নয়ন, জনসংখ্যা হ্রাস, বেকারত্ব হ্রাস, রাজনৈতিক সদিচ্ছা, শিক্ষা, সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন, নিজস্ব সংস্কৃতির অবাধ প্রসার, পারিবারিক কর্তব্যবোধ, ধর্মীয়বোধ জাগ্রতকরণ।

প্রশ্ন-০৪ ঢাকা মহানগরের যানজট সমস্যার প্রতিকার কি হতে পারে?

উত্তর : যানজট ঢাকা মহানগরের অন্যতম বহুল আলোচিত সমস্যা। এ সমস্যার সমাধানকল্পে নিচের ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে :

১. রাস্তার উভয় পার্শ্বে অবৈধ দোকানপাট, গাড়ি পার্কিং, আসবাবপত্র ও বস্তি উচ্ছেদ করা।
২. রাস্তার সংস্কার ও প্রশস্তকরণ করা।
৩. ট্রাফিক সিগন্যাল ব্যবস্থা আরো কার্যকর করা।
৪. পর্যায়ক্রমে রিকশার উচ্ছেদ করা।
৫. অত্যধিক যানজট পূর্ণ রাস্তায় ফ্লাইওভার নির্মাণ করা ও
৬. জনসচেতনা বৃদ্ধি করা।

প্রশ্ন-০৫ ঢাকা মহানগরের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সমন্বয় সমস্যা কতটা এবং কেন?

উত্তর : ঢাকা মহানগরের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সমন্বয় সমস্যা সবচেয়ে বেশি, কেননা নির্ধারিত আয়তনের ঢাকা মহানগরীতে প্রতিনিয়ত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে চলছে। এক হিসাবে দেখা গেছে, বর্তমানে ঢাকা মহানগরীতে মাত্রাতিরিক্ত পঞ্চাশ লক্ষ লোক বসবাস করছে। এ মাত্রাতিরিক্ত জনসংখ্যা ঢাকা মহানগরীর অবকাঠামো, পরিবেশ ও জীবনযাত্রার ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে। জনজীবন ক্রমশ হয়ে উঠছে দুর্বিষহ এবং মহানগরের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সমন্বয় সমস্যা হচ্ছে ক্রমশ ব্যাহত।

প্রশ্ন-০৬ শহরমুখী গ্রামীণ জনস্রোতের কারণ ও প্রতিকার সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

উত্তর : বর্তমানে বাংলাদেশের ৭৭% লোক গ্রামে বাস করে। বিশাল জনসংখ্যার একটি ক্ষুদ্রতম অংশ শহরে বসবাস করে। কিন্তু প্রতিদিন শহরের জনসংখ্যা আশাতীত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে শহর এখন হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। শহর অঞ্চল নানাভাবে দূষিত হচ্ছে। শহরমুখি গ্রামীণ জনস্রোতের কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে—

১. গ্রামের জনসাধারণের খাদ্যাভাব;
২. মহাজনদের শোষণ;
৩. নদী ভাঙ্গন;
৪. অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ও বন্যার ফলে খাদ্যাভাব;
৫. গ্রাম্য দালালদের অত্যাচার;
৬. বেকারত্বের চরম বৃদ্ধি;

এ থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে—

১. প্রশাসনকে বিকেন্দ্রীকরণের মধ্য দিয়ে গ্রামে চাকরির পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টি।
২. গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নতকরণ।
৩. প্রাকৃতিক দুর্যোগ রোধে সরকারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া।
৪. গ্রামের মানুষের মধ্যে সুষ্ঠু যোগাযোগের ব্যবস্থা করা।
৫. গ্রামে স্কুল, কলেজ প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি।

প্রশ্ন-০৭ জিএসপি ও কোটামুক্ত বিশ্ব বলতে কি বোঝেন?

উত্তর : জিএসপি ও কোটামুক্ত বিশ্ব কথাটি এক সময় বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের সাথে সম্পর্কিত ছিল। সাধারণত ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহে শুল্কমুক্ত পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে কোনো দেশ যে সুবিধা ভোগ করে তাই জিএসপি। আর কোনো দেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্র, আফ্রিকা ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের নির্দিষ্ট দেশ যে নির্দিষ্ট হারে পোশাক আমদানি করে সেটাই হচ্ছে কোটা সুবিধা। বাংলাদেশে পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে ২০০৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত জিএসপি ও কোটা সুবিধা বহাল ছিল। অর্থাৎ ২০০৫ সালের ১ জানুয়ারি থেকে পোশাক শিল্প জিএসপি ও কোটামুক্ত বিশ্বে প্রবেশ করে এবং বর্তমানে বিশ্ব বাজারে প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকতে হচ্ছে।

প্রশ্ন-০৮ ভ্যাট (VAT) কি?

উত্তর : মূল্য সংযোজনের মূল কথা হলো, কোনো চূড়ান্ত দ্রব্যের প্রতি এককের উৎপাদন ব্যয় এবং উক্ত দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামালের ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য। অর্থাৎ মূল্য সংযোজন করা (VAT) হলো মোট উৎপাদিত পণ্যমূল্যের উপর আরোপিত কর থেকে মোট উপকরণ মূল্যের উপর আরোপিত করের

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

বিয়োগ ফল। মুক্তবাজার অর্থনীতিতে VAT প্রথা খুবই কার্যকরী এবং সময়োপযোগী বলে অর্থনীতিবিদদের ধারণা। সুষ্ঠুভাবে রাজস্ব সংগ্রহে VAT প্রথা ইতোমধ্যেই বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। ১৯৯১ সালের ১ জুলাই বাংলাদেশে Value Added Tax (VAT) বা মূল্য সংযোজন কর চালু হয়। সাবেক অর্থমন্ত্রী এম. সাইফুর রহমান অর্থনীতিতে এ ধারণা সর্বপ্রথম চালু করেছেন।

ভ্যাটের সুবিধা :

- ভ্যাট আরোপিত হয় শুধু চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা সরবরাহের সময়ে।
- এ প্রথা দ্বৈত করের অবসান ঘটায়।
- করদাতারা পরস্পরের প্রতি পরীক্ষায় লিপ্ত থাকায় কারো পক্ষেই কর এড়ানো সম্ভব নয়।
- এ কর পদ্ধতি বেশ সহজ।
- সাথে স্থিতিস্থাপক করা যায়।
- রপ্তানি বৃদ্ধি ও আমদানি হ্রাস পায়।
- বিনিয়োগে উৎসাহ জাগে।

অর্থাৎ আধুনিক বিশ্ব অর্থনীতির প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে এবং সুষ্ঠুভাবে রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ভ্যাট (VAT)-এর বিকল্প নেই।

প্রশ্ন-০৯ হরতালের কারণে আমাদের অর্থনীতি কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়? আলোচনা করুন।

উত্তর : আমাদের দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব একটা ভালো নয়। সাম্প্রতিক সময়ে এ অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার প্রধান হাতিয়ার হিসেবে দেখা দিয়েছে হরতাল। রাজনৈতিক দলগুলোর ঘন ঘন হরতালে দেশের অর্থনীতি এখন ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে। একদিনের হরতালে দেশের কোটি কোটি টাকার লোকসান হয়। কলকারখানা সব বন্ধ থাকে। জনগণ দুর্ভোগ পোহাতে হয়। হরতালের ফলে বিদেশীরা এ দেশে বিনিয়োগ করতে আগ্রহ প্রকাশ করে না। এতে আমাদের অর্থনীতি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

প্রশ্ন-১০ বাংলাদেশে কৃষিক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ কি কি?

উত্তর : বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির সাথে সম্পৃক্ত। জাতীয় আয়ের একটি বিরাট অংশ আসে কৃষি খাত থেকে। কিন্তু বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে রয়েছে হাজারো সমস্যা। বাংলাদেশে কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যাসমূহ নিম্নরূপ :

১. **সনাতন চাষ পদ্ধতি :** বাংলাদেশের কৃষিব্যবস্থা পিছিয়ে থাকার অন্যতম প্রধান কারণ হলো মান্ধাতার আমলের চাষ পদ্ধতি। অধিকাংশ গ্রামাঞ্চলেই এখনো কাঠের লাঙল এবং এক জোড়া বলদই কৃষকের একমাত্র সম্বল। কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ছোঁয়া গ্রামাঞ্চলে পর্যাপ্ত পরিমাণে এখনো পৌঁছায়নি।

২. **প্রাকৃতিক দুর্যোগ :** বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগের দেশ। ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে প্রতি বছর বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাস লেগেই আছে। এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রে প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয়।

৩. **প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীলতা :** বাংলাদেশের কৃষিব্যবস্থা এখনো অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল। সর্বত্র সেচব্যবস্থা না থাকার ফলে কৃষকদের প্রয়োজন অনুযায়ী পর্যাপ্ত পরিমাণ বৃষ্টিপাত না হলে এখানে কৃষি কাজের ধারাবাহিকতা ব্যাহত হয়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৪. ভালো বীজের অভাব : অজ্ঞতার কারণে বাংলাদেশের কৃষকরা ভালো বীজের সুফল সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয়। সে কারণে তারা ভলো বীজ সংরক্ষণের ব্যাপারে উদাসীন থাকে।

৫. কৃষি জমির ক্ষুদ্রায়তন ও খণ্ড-বিখণ্ডতা : বাংলাদেশের কৃষিব্যবস্থার অন্যতম প্রধান সমস্যা হলো কৃষি জমিগুলোর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আয়তন ও খণ্ড-বিখণ্ডতা। কৃষি জমিগুলো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ও খণ্ড-বিখণ্ড হওয়ার ফলে কলের লাঙল বা ট্রাক্টর ব্যবহার করা সম্ভব হয় না।

৬. সারের অভাব : বাংলাদেশের অধিকাংশ কৃষকই জমিতে সারসহ প্রয়োজনীয় উপকরণ পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয়। সার প্রদান ছাড়াই একই জমি বারবার চাষাবাদের কারণে জমির উর্বরতা শক্তি ও উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে।

৭. ঋণের স্বল্পতা : বাংলাদেশের কৃষকগণ দরিদ্র হওয়ায় তাদের কোনো উদ্বৃত্ত অর্থ থাকে না। তাছাড়া কৃষকদের প্রদেয় কৃষি ঋণের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত অল্প, ফলে কৃষি উন্নয়ন কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে উপনীত হতে পারছে না।

৮. কৃষি জমির পরিমাণ হ্রাস পাওয়া : বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে আবাসিক সমস্যা সমাধানের জন্য নতুন নতুন বাসস্থান সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে আবাদযোগ্য কৃষি জমির পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে।

৯. চাষাবাদে অনীহা : সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশী শ্রমিকদের মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন দেশে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় তারা কৃষি কাজের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়েছে। যারা পূর্বে সম্পূর্ণভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল ছিল, বর্তমানে তারা বৈদেশিক মুদ্রার ওপর নির্ভরশীল।

১০. মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য : বাংলাদেশের কৃষি বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। এখানে ক্রেতা-বিক্রেতার মাঝে থাকে অসংখ্য মধ্যস্বত্বভোগী। এ কারণে কৃষকরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে কৃষি উৎপাদনে উৎসাহ হারিয়ে ফেলে।

১১. অন্যান্য সমস্যা : ক. কীটপতঙ্গের আক্রমণ, খ. সেচের অভাব, গ. ত্রুটিপূর্ণ ভাগচাষ ব্যবস্থা, ঘ. সংরক্ষণের অভাব, ঙ. দক্ষ শ্রমিকের অভাব ইত্যাদি।

তাই জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে কৃষিক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাসমূহের সমাধানের কোনো বিকল্প নেই।

প্রশ্ন-১১ কি কারণে বাংলাদেশে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন সম্ভব হয়েছে?

উত্তর : বাংলাদেশে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের প্রধান প্রধান কারণসমূহ নিম্নরূপ :

১. চাষাবাদের আধুনিকীকরণ।
২. কৃষি ঋণ মওকুফ ও ঋণ সরবরাহ।
৩. স্বল্পমূল্যে রাসায়নিক সার ও কৃষি উপকরণাদির সরবরাহ।
৪. উন্নতজাতের বীজের ব্যবহার।
৫. কৃষকদের কৃষিপণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিতকরণ।
৬. কৃষকদের পর্যাপ্ত পরিমাণে ভর্তুকি প্রদান।
৭. কৃষি খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধিকরণ।
৮. সেচব্যবস্থার সম্প্রসারণ।
৯. সরকারি পর্যায়ে খাদ্য সংগ্রহ ও মজুদ।

উপরিউক্ত কারণে বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পাশাপাশি খাদ্য উদ্বৃত্তের দেশে পরিণত হয়েছে।

প্রশ্ন-১২ বাংলাদেশের কোথায় সর্বাধিক বোরো ধান উৎপন্ন হয়?

উত্তর : বাংলাদেশের কিশোরগঞ্জ জেলায় সর্বাধিক বোরো ধান উৎপন্ন হয়। এ জেলায় বার্ষিক উৎপাদন প্রায় ৬ লাখ মেট্রিক টন।

প্রশ্ন-১৩ বাংলাদেশের কোন স্থানে (নির্দিষ্ট স্থানের নাম দিতে হবে) প্রথম চা চাষ করা হয় এবং কোন সনে?

উত্তর : বাংলাদেশে প্রথম চা চাষ শুরু হয় সিলেট থেকে ৬.৪৩ কিলোমিটার দূরে 'মালনীছড়া' নামক স্থানে ১৮৫৪ সালে।

প্রশ্ন-১৪ পিআরএসপি (PRSP) কি?

উত্তর : পিআরএসপি-এর পূর্ণ অভিব্যক্তি হলো Poverty Reduction Strategy Paper অর্থাৎ দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র। ১৯৯৯ সালে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ তৃতীয় বিশ্বের দারিদ্র্য হ্রাসকরণে PRSP কার্যক্রম গ্রহণ করে।

প্রশ্ন-১৫ বাংলাদেশের উন্নয়ন সমস্যা চিহ্নিত করুন।

উত্তর : বাংলাদেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে বহুবিধ সমস্যা বিরাজমান। এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য সমস্যাসমূহ হলো : ১. রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, ২. প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অনুপস্থিতি, ৩. দুর্নীতি, ৪. প্রতিকূল আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, ৫. বিদেশী পণ্যের আধিপত্য, ৬. অবকাঠামোগত দুর্বলতা, ৭. মাত্রাতিরিক্ত খেলাপি ঋণ, ৮. শর্তপূর্ণ বৈদেশিক সাহায্য, ৯. আমদানি নির্ভরতা এবং ১০. গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের অনুপস্থিতি।

প্রশ্ন-১৬ ব্যাপক দারিদ্র্যের প্রেক্ষিতে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণে করণীয় কি?

উত্তর : শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। একটি সমাজের সামগ্রিক বিকাশের ক্ষেত্রে শিক্ষার ভূমিকা অনস্বীকার্য। বর্তমান বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সবার জন্য শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন। আর সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণে নিচে উল্লিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে–

১. বাংলাদেশের অধিক জনসংখ্যা ও ব্যাপক দারিদ্র্যকে সামনে রেখে প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে সর্বাধিক গুরুত্বের পাশাপাশি বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণের ব্যবস্থা করা।

২. দেশের শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে শিক্ষাসূচির আমূল পরিবর্তন করা, যাতে শিক্ষা দ্বারা জ্ঞান, দক্ষতা ও মৌলিক উৎকর্ষ সাধন ত্বরান্বিত হয়। এছাড়াও মাধ্যমিক ও অন্যান্য স্তরে শিক্ষার মান উন্নয়নে বরাদ্দকৃত বাজেটে ছাত্রবৃত্তি এবং স্কুল উন্নয়ন পরিকল্পনার বিষয়সমূহের সংযুক্তি আবশ্যক।

৩. দেশের অনেক দরিদ্র পিতামাতা তাদের সন্তানকে স্কুলে পাঠানোর পরিবর্তে অর্থ আয়ের উদ্দেশ্যে তাদেরকে কাজে যেতে বাধ্য করে। এসব ছাত্রকে স্কুলের প্রতি আকৃষ্ট করে তাদেরকে স্কুলে ভর্তির জন্য বিভিন্ন ধরনের আর্থিক সহযোগিতার ব্যবস্থা করা।

৪. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মানসম্মত শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, তাদের বেতনাদি বৃদ্ধি এবং সে সাথে কোচিং সেন্টারের দৌরাত্ম্য বন্ধের ব্যবস্থা করা।

৫. দেশের তৃণমূল পর্যায়ে শিক্ষা পৌছানোর লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যুগোপযোগী ও প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা কার্যক্রমের ব্যবস্থা করা।

৬. শিক্ষাঙ্গনে অস্থিরতা রোধে ও মানসম্মত শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে লেজুড়বৃত্তিক ছাত্র ও শিক্ষক রাজনীতি বন্ধ করা। এজন্য রাজনৈতিক দলসমূহের ঐক্য ও সদিচ্ছার বাস্তবায়ন একান্তই জরুরি।

প্রশ্ন-১৭ **GDP ও GNP কি?**

উত্তর : GDP হচ্ছে Gross Domestic Producet বা মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন। কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে একটি দেশের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে যেসব দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম উৎপন্ন হয় এর আর্থিক মূল্যকে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা GDP বলে।

GNP হচ্ছে Gross National Product বা মোট জাতীয় উৎপাদন। কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে দেশের জনগণ কর্তৃক উৎপাদিত চূড়ান্ত পর্যায়ের মোট দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের সমষ্টিকে মোট জাতীয় উৎপাদন বলা হয়। অর্থাৎ মোট জাতীয় উৎপাদন = মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন + (বিদেশে দেশী বিনিয়োগ থেকে আয় ও দেশে বিদেশীদের সৃষ্ট আয়)।

প্রশ্ন-১৮ **বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সেক্টরে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে এ পর্যন্ত কি কি পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে?**

উত্তর : বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সেক্টরে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে এ পর্যন্ত যেসব পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো :

১. রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের লোকসানী প্রতিষ্ঠানসমূহকে বেসরকারি খাতে হস্তান্তর।
২. ব্যাংকিং ক্ষেত্রে ব্যাপক সংস্কার সাধন।
৩. খেলাপি ঋণ আদায়ের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ।
৪. বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাসমূহের অবসান ও বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদান।
৫. নীতিমালা সংক্রান্ত পদক্ষেপ।

প্রশ্ন-১৯ **রাজস্ব বাজেট ও উন্নয়ন বাজেট বলতে কি বোঝেন? সংক্ষেপে আলোচনা করুন।**

উত্তর : দেশের অভ্যন্তরীণ ও বহিঃউৎস থেকে কি পরিমাণ সম্পদ পাওয়া যেতে পারে তার প্রাক্কলন চূড়ান্ত করা এবং এক বছরের হিসাব-নিকাশ করা রাজস্ব সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। এ সম্পদকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা– ক. রাজস্ব খাত ও খ. উন্নয়ন খাত।

রাজস্ব খাতের ব্যয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট অর্থ উন্নয়নের খাতে বরাদ্দ দেয়া হয়। বিভিন্ন রাজস্ব ব্যয় প্রাক্কলনের আলোকে এবং অর্থসংস্থান বিবেচনা করে অর্থ মন্ত্রণালয় রাজস্ব ব্যয় বিবরণী তৈরি করে।

উন্নয়ন খাতে বরাদ্দের ভিত্তিতে পরিকল্পনা কমিশন বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন করে থাকে।

প্রশ্ন-২০ **মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) ও মোট দেশজ উৎপাদন (GDP)-এর মধ্যে পার্থক্য কি?**

উত্তর : মোট জাতীয় উৎপাদন ও মোট দেশজ উৎপাদন কোনো দেশের মোট উৎপাদনের দুটি ধারণা। দেশের অভ্যন্তরে দেশী এবং বিদেশীদের দ্বারা মোট উৎপাদনই মোট দেশজ উৎপাদন। আর দেশের অভ্যন্তরে এবং বিদেশে দেশী লোকদের মোট উৎপাদনকে মোট জাতীয় উৎপাদন বলে। মোট জাতীয় উৎপাদন ও মোট দেশজ উৎপাদন ধারণা দুটি পরস্পরের খুব কাছাকাছি হলেও এদের মধ্যে মৌলিক এবং সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান।

মোট জাতীয় উৎপাদন ও মোট দেশজ উৎপাদনের মধ্যে পার্থক্য : নিচে মোট জাতীয় উৎপাদন ও মোট দেশজ উৎপাদনের মধ্যে পার্থক্য দেখান হলো :

উপরিউক্ত ধারণা দুটির মধ্যে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও উভয়ই জাতীয় আয়ের অতি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। তবে মোট জাতীয় উৎপাদন অপেক্ষা মোট দেশজ উৎপাদন আংশিক ধারণামাত্র।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

প্রশ্ন-২১ **বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের বিভিন্ন খাতগুলো কি কি?**

উত্তর : কোনো দেশের একটি নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে উৎপাদিত সব বস্তুগত ও সেবাজাত দ্রব্যের আর্থিক মূল্যের সমষ্টিকে সে দেশের জাতীয় আয় বলে। জাতীয় আয় একটি উৎস হতে সংগৃহীত হয় না। বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের বিভিন্ন খাত রয়েছে। খাতগুলো হলো : কৃষি, শিল্প, পরিবহন, যোগাযোগ, নির্মাণ, গৃহায়ণ, বাণিজ্য প্রভৃতি।

বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের বিভিন্ন খাত : নিচে বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের বিভিন্ন খাতের বর্ণনা করা হলো :

১. **কৃষি খাত :** বাংলাদেশ মূলত কৃষিভিত্তিক। তাই বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষি খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ২০১৩-১৪ (সাময়িক) অর্থবছরের হিসাব অনুযায়ী এ দেশে জাতীয় আয়ে কৃষি খাতের অবদান শতকরা প্রায় ১৬.৩৩ ভাগ।

২. **শিল্প খাত :** বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাত হলো শিল্প খাত। বর্তমানে শিল্প খাতের অবদান কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৩-১৪ (সাময়িক) অর্থবছরে স্থিরমূল্যে সার্বিক শিল্প খাতের অবদান হলো প্রায় ২৯.৬১ শতাংশ ভাগ।

৩. **পরিবহন ও যোগাযোগ খাত :** বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাত হলো পরিবহন ও যোগাযোগ। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এ খাতে জাতীয় আয়ের অবদান হলো শতকরা প্রায় ১০.৮৮ শতাংশ *[বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৪]*।

৪. **নির্মাণ খাত :** বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের একটি উল্লেখযোগ্য খাত হলো নির্মাণ খাত। ২০১৩-২০১৪ (সাময়িক) দেশে নির্মাণ খাতে জাতীয় আয়ের অবদান হলো শতকরা প্রায় ৭.০৬ ভাগ।

৫. **গৃহায়ণ খাত :** বাংলাদেশের জাতীয় আয়ে গৃহায়ণ একটি উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। বর্তমানে বাংলাদেশে জাতীয় আয়ের এ খাতের অবদান হলো শতকরা প্রায় ৬.৭৩ ভাগ।

৬. **বিপণন খাত :** বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের একটি উল্লেখযোগ্য খাত হলো বিপণন খাত। বিপণন খাতে জাতীয় অবদান হলো শতকরা প্রায় ১৪.০৫ ভাগ।

৭. **অন্যান্য খাত :** বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের উল্লেখযোগ্য অন্যান্য খাতগুলো হলো লোকপ্রশাসন ও প্রতিরক্ষা, বিদ্যুৎ ও গ্যাস, ব্যাংক ও বীমা, খনিজ ও খনন, পেশা ও বিবিধ সেবা প্রভৃতি।

কৃষি, শিল্প, পরিবহন, গৃহায়ন, নির্মাণ, বিপণন প্রভৃতি বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের প্রধান প্রধান খাত। এসব খাতের মধ্যে কৃষি খাত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন-২২ **প্রয়োজনীয় কাঁচামালের অভাবই বাংলাদেশের শিল্পায়নের পথে প্রধান অন্তরায়— আপনার মতামত লিখুন।**

উত্তর : বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলত কৃষিনির্ভর। শিল্পক্ষেত্রে বাংলাদেশে বহুবিধ প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান। বর্তমান বিশ্বে কোনো দেশই শুধু কৃষিনির্ভর অর্থনীতির ওপর টিকে থাকতে পারে না। কাজেই আমাদের দেশে শিল্পায়নের প্রধান প্রধান প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করে সেগুলো দূর করার মাধ্যমে কৃষির পাশাপাশি শিল্পকেও এগিয়ে নিতে হবে।

আলোচ্য বক্তব্যে কাঁচামালকেই শিল্পায়নের প্রধান শর্ত হিসেবে ধরে কাঁচামালের অভাবকে শিল্পায়নের প্রধান অন্তরায় হিসেবে ধরা হয়েছে। আসলে কি ব্যাপারটা তাই? না, তাই যদি হতো তাহলে কাঁচামালের অস্তিত্ববিহীন জাপান কি করে শিল্পায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে? তাই জাপানের

উদাহরণকে সামনে রেখে কাঁচামালের অভাবকেই শিল্পায়নের প্রধান অন্তরায় হিসেবে বিবেচনা করা যায় না। তাছাড়া বিশ্বের শিল্পায়নের ইতিহাসও খুব বেশি দীর্ঘ দিনের নয়। বিশ্বে এমন কোনো শিল্পোন্নত দেশ খুঁজে পাওয়া যাবে না, যে দেশ কেবল কাঁচামালকে কেন্দ্র করেই অগ্রগতি লাভ করেছে। তবে শিল্পায়নের অন্যান্য শর্ত সম্বন্ধে ধারণা না থাকলে কাঁচামাল যে শিল্পায়নের প্রধান অন্তরায় হতে পারে না সে সম্বন্ধে উপলব্ধি করা যাবে না। শিল্পায়নের প্রয়োজনীয় শর্তাবলীর মধ্যে প্রযুক্তিগত শিক্ষা, কর্মদক্ষতা, দেশাত্মবোধ, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, পর্যাপ্ত মূলধন, উদ্যোক্তা, বাজার প্রাপ্তি অন্যতম। এ শর্তগুলোর সমন্বয় ঘটলে শিল্পায়ন সহজসাধ্য হয়। কিন্তু শর্তসমূহের অনুপস্থিতিতে শুধু কাঁচামালের যোগানই শিল্পায়ন ঘটাবে এ কথা কিছুতেই বলা যাবে না। তাই বলা যায়, প্রয়োজনীয় কাঁচামালের অভাব বাংলাদেশের শিল্পায়নের সহায়ক অন্তরায় হতে পারে, কিছুতেই প্রধান অন্তরায় নয়।

প্রশ্ন-২৩ **প্রাইভেটাইজেশন কমিশন সম্পর্কে কি জানেন?**

উত্তর : আর্থিক লোকসান থেকে জাতিকে মুক্তি দেয়ার লক্ষ্যে শিল্প-কল-কারখানাগুলোকে বেসরকারিকরণের জন্য সরকার ১৯৯৩ সালে প্রাইভেটাইজেশন বোর্ড গঠন করে যার বর্তমান নাম প্রাইভেটাইজেশন কমিশন। স্বাধীনতা-উত্তর সমস্ত শিল্প-কল-কারখানাগুলোকে ঢালাওভাবে সরকারিকরণের পর থেকে শিল্পে চরম দুর্দশা নেমে আসে। প্রতি বছর প্রায় আড়াই হাজার কোটি টাকা লোকসান গুনতে হয়। গত ৪০ বছরে প্রায় ৯০ হাজার কোটি টাকা লোকসান হয়েছে। তাই সরকার শিল্প সেক্টরকে যুগোপযোগী করে ব্যক্তি মালিকানায় ছেড়ে দেওয়ার লক্ষ্যে প্রতিমন্ত্রীর সমমর্যাদাসম্পন্ন একজনকে প্রাইভেটাইজেশন কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ করেছেন।

প্রশ্ন-২৪ **বাংলাদেশের কোন সরকারি প্রতিষ্ঠান পরিকল্পনা প্রণয়ন করে?**

উত্তর : বাংলাদেশের অবকাঠামো উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে বাস্তব ও জনকল্যাণমুখী পরিকল্পনা প্রণয়নে সরকার ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন গঠন করে। বাংলাদেশের সকল প্রকার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ দানই পরিকল্পনা কমিশনের প্রধান কাজ।

প্রশ্ন-২৫ **অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কাকে বলে?**

উত্তর : একটি নির্দিষ্ট সময়ে সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পূর্ব নির্ধারিত এবং স্বচ্ছভাবে বর্ণিত অর্থনৈতিক লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য দেশের প্রাপ্ত সম্পদের সুষ্ঠু ও সচেতন ব্যবহারকে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বলে।

প্রশ্ন-২৬ **প্রকল্প কি? পূর্বাচল প্রকল্প কোথায় অবস্থিত?**

উত্তর : সাধারণত প্রকল্প বলতে নির্দিষ্ট কার্যকলাপ বোঝায়, যেখানে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য অর্থ ব্যয় করা হয়। পূর্বাচল প্রকল্প নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ এবং গাজীপুর জেলার কালিগঞ্জে অবস্থিত।

প্রশ্ন-২৭ **মানবসম্পদ বলতে কি বোঝায়?**

উত্তর : কোনো দেশের জনসংখ্যা যদি গুণগত দিক থেকে উন্নতমানের হয় তা হলে দেশের জনসংখ্যা সে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হবে। কোনো দেশের জনসংখ্যার গুণগত দিক বলতে জনসংখ্যা শিক্ষিত, দক্ষ, কর্মঠ এবং উদার দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন গুণকে বোঝায়। এরূপ জনসংখ্যা সম্পদরূপে পরিগণিত হয়। আর এ মানবসম্পদের গুণগত মানোন্নয়নই হলো মানবসম্পদ উন্নয়ন।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

মানবসম্পদ উন্নয়ন : মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন এর উপাদানগুলোর উন্নয়ন। যেসব সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে মানবসম্পদের উন্নয়ন ঘটানো যায় সেগুলোই হলো মানবসম্পদ উন্নয়নের উপাদান। অর্থনীতিবিদ গুনার মিরডালি মানবসম্পদ উন্নয়নের ৮টি উপাদানের কথা উল্লেখ করেছেন। যথা : ১. খাদ্য ও পুষ্টি, ২. বস্ত্র, ৩. বাসস্থান ও তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা, ৪. স্বাস্থ্য সুবিধা, ৫. শিক্ষা, ৬. গণসংযোগ মাধ্যম, ৭. শক্তিভোগ এবং ৮. পরিবহন সুবিধা।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার গুণগত মান বৃদ্ধি করতে পারলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে জনসংখ্যা মানবসম্পদ হিসেবে যথেষ্ট অবদান রাখতে সক্ষম হবে। সুতরাং জনসংখ্যা শিক্ষিত, দক্ষ, কর্মঠ এবং উদার দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন হলেই মানবসম্পদ উন্নয়ন হয়েছে বলা চলে।

প্রশ্ন-২৮ **মানবসম্পদ উন্নয়নের উপায় কি?**

উত্তর : জনশক্তি অর্থনৈতিক উন্নয়নের অপরিহার্য উপাদান। জনসাধারণের কর্মনৈপুণ্য ও ধ্যান-ধারণা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। সুতরাং দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ত্বরান্বিত করতে হলে মানবসম্পদের গুণগত মান বৃদ্ধি করতে হবে।

মানবসম্পদ উন্নয়নের উপায় : মানবসম্পদ উন্নয়নের উপায়গুলো হচ্ছে–

১. শিক্ষার ব্যাপক সম্প্রসারণ করতে হবে।
২. চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যরক্ষার আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে।
৩. জনগণের মাথাপিছু খাদ্য ও পুষ্টির যোগান বৃদ্ধি করতে হবে।
৪. উপযুক্ত বাসস্থান, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, বর্জ্য নিষ্কাশনসহ পরিবেশের উন্নয়ন ঘটাতে হবে।
৫. গ্রামাঞ্চলের আর্থ-সামাজিক অবস্থায় উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর গুণগত মান বৃদ্ধি করতে হবে।
৬. শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করতে হবে।
৭. জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার রোধ করতে হবে।

উপরিউক্ত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ এবং এগুলোর সমন্বিত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে পারলে বাংলাদেশসহ সব দেশে জনসংখ্যার গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে জনসংখ্যা মানবসম্পদ হিসেবে যথেষ্ট অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

প্রশ্ন-২৯ **অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন ও জনগণের অংশীদারিত্ব নিশ্চিতকরণে শিক্ষার ভূমিকা কি?**

উত্তর : শিক্ষা উন্নয়নের অন্যতম চালিকাশক্তি। তাই শিক্ষা যে কোনো দেশের সবচেয়ে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত হিসেবে বিবেচিত হয়। মানবসম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্যবিমোচন, লিঙ্গবৈষম্য হ্রাস এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শিক্ষা অন্যতম হাতিয়ার। উন্নয়ন পরিমাপের ক্ষেত্রে এখন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনই একমাত্র নির্দেশক নয়, মানব উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের তথা অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন ও জনগণের অংশীদারিত্বের পর্যায় নির্ণয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিমাপক। এ কারণে বর্তমান সময়ে এ উন্নয়ন বৈশ্বিক উন্নয়ন কর্মসূচির কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। উন্নয়নের স্তর নির্বিশেষে যে কোনো দেশের জনসাধারণের জীবনযাপনে দীর্ঘ জীবন, জ্ঞান অর্জন এবং সম্পদে প্রবেশাধিকার এ তিনটি অপরিহার্য ক্ষেত্রে সুযোগপ্রাপ্তির অধিকার রয়েছে। এসব ক্ষেত্রে অধিকার অর্জন নিশ্চিত হলে জনগণ দীর্ঘ সুস্বাস্থ্যময় ও শিক্ষিত জীবনযাপনের সুযোগ লাভ করতে পারে। আর একমাত্র শিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত জনগোষ্ঠী দেশের জীবনমান উন্নয়নে, দারিদ্র্যবিমোচনে এবং টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সুতরাং অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন ও জনগণের অংশীদারিত্ব নিশ্চিতকরণে শিক্ষার ভূমিকা অনস্বীকার্য।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

প্রশ্ন-৩০ **বাংলাদেশের পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানকোষের নাম কি? এর সম্পাদক কে?**

উত্তর : বাংলাদেশের জাতীয় জ্ঞানকোষের নাম 'বাংলাপিডিয়া'। এটি গবেষক, শিক্ষক, ছাত্র, পেশাজীবী ও সাধারণ জ্ঞানান্বেষীদের জন্য রচিত দশ খণ্ডের একটি রেফারেন্স বা আকরগ্রন্থ। এর লক্ষ্য হচ্ছে সুপ্রাচীনকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাংলাদেশের মানুষের অভিজ্ঞতা ও অর্জনসমূহের অনুসন্ধান, ব্যাখ্যা ও সমন্বয়ের সুযোগ সৃষ্টি করা। বাংলাপিডিয়ার সম্পাদক হলেন সিরাজুল ইসলাম।

প্রশ্ন-৩১ **বাংলা সাহিত্যের গবেষণাকারী সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠানের নাম কি?**

উত্তর : 'বাংলা একাডেমি' বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সংক্রান্ত সর্ববৃহৎ গবেষণা প্রতিষ্ঠান। ১৯৫৫ সালের ৩ ডিসেম্বর (১৭ অগ্রহায়ণ, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ) ঢাকার বর্ধমান হাউসে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন এবং এ দেশের মুসলিম মধ্যবিত্তের জাগরণ ও আত্মপরিচয় বিকাশের প্রেরণায় এ প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়।

প্রশ্ন-৩২ **'বাংলাদেশে স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র' ও 'একুশে ফেব্রুয়ারি' প্রথম সংকলনের সম্পাদক কে?**

উত্তর : বিশিষ্ট কবি ও সাংবাদিক হাসান হাফিজুর রহমানের সম্পাদনায় ভাষা আন্দোলনের ওপর প্রথম সংকলন 'একুশে ফেব্রুয়ারি' (১৯৫৩) এবং ১৫ খণ্ডে 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র' প্রকাশিত হয়। হাসান হাফিজুর রহমান ১৯৩২ সালের ১৪ জুন জামালপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ভাষা আন্দোলন ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তিনি ১৯৭১ সালে বাংলা একাডেমী পুরস্কার এবং ১৯৮৪ সালে একুশে পদক (মরণোত্তর) লাভ করেন।

প্রশ্ন-৩৩ **জাতীয় স্মৃতিসৌধ কোথায় এবং এর স্থপতি কে?**

উত্তর : জাতীয় স্মৃতিসৌধ ঢাকা থেকে ৩৫ কিমি উত্তর-পশ্চিমে সাভারে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের পাশে অবস্থিত। ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর প্রথম বিজয় দিবসে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ স্মৃতিসৌধের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের মহান শহীদদের অসামান্য ত্যাগ ও শৌর্যের স্মৃতি হিসেবে সৌধটি দাঁড়িয়ে আছে। জাতীয় স্মৃতিসৌধের স্থপতি সৈয়দ মাইনুল হোসেন। গণপূর্ত বিভাগের তত্ত্বাবধানে এটি নির্মিত হয় এবং ১৯৮২ সালের ১৬ ডিসেম্বর তৎকালীন রাষ্ট্রপতি লে. জে. হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ এটি উদ্বোধন করেন। অসমান উচ্চতা ও স্বতন্ত্র ভিত্তির ওপর সাতটি ত্রিভুজাকৃতির ফলক নিয়ে মূল সৌধটি গঠিত। ফলকগুলো বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধ পর্যন্ত ৭টি আন্দোলন-সংগ্রামের মূর্ত প্রতীক। জাতীয় স্মৃতিসৌধের উচ্চতা ১৫০ ফুট।

প্রশ্ন-৩৪ **উত্তরা গণভবন কোথায় অবস্থিত?**

উত্তর : নাটোর জেলা শহর থেকে ২.৪০ কিমি দূরে উত্তরা গণভবন অবস্থিত। আদিতে এটি ছিল দিঘাপাতিয়া মহারাজাদের বাসস্থান। বর্তমানে এটি ব্যবহৃত হয় উত্তরাঞ্চলের গভর্নমেন্ট হাউস হিসেবে।

প্রশ্ন-৩৫ **বাংলা সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতিফলন সম্পর্কে লিখুন।** *[২০তম; ২৩তম বিসিএস]*

উত্তর : বাংলা সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতিফলন অনন্য সাধারণ। মুক্তিযুদ্ধ অনুষঙ্গটি বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। এর মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের ভাব, ভাষা, প্রকাশভঙ্গি আমূল পরিবর্তিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে যোগ হয়েছে নতুন মাত্রা। মুক্তিযুদ্ধের মহান চেতনা যেসব লেখকের গ্রন্থে সুনিপুণভাবে উপস্থাপিত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'চিলেকোঠার সেপাই', সৈয়দ শামসুল হকের 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়', 'নীল দংশন', 'নিষিদ্ধ লোবান', আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর 'বাংলাদেশ কথা কয়,' শওকত ওসমানের 'নেকড়ে অরণ্য', 'জাহান্নাম হতে বিদায়', জাহানারা ইমামের 'একাত্তরের দিনগুলি' এবং সেলিনা হোসেনের 'হাঙর নদী গ্রেনেড'। এসব গ্রন্থে মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসের ভয়াবহতা, হিংস্রতা, ঐক্যবদ্ধতা ও বাঙালি জাতির প্রত্যাশার অনুপম প্রকাশ ঘটেছে। সুতরাং বাংলা সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতিফলন অপরিসীম।

প্রশ্ন-৩৬ **উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষার সুবিধা-অসুবিধা বিষয়ে আপনার মতামত কি?**

উত্তর : আমাদের মাতৃভাষা বাংলা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন করলেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালত সর্বত্র বাংলা ব্যবহার হলেও উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষার একাধিক সুবিধার পাশাপাশি বহুবিধ অসুবিধাও রয়েছে। উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষা ব্যবহার হলে ছাত্রছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষা সহজসাধ্য ও সুলভ হবে, তাই এর সুবিধা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু এর অসুবিধাও বিস্তর। কারণ উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন বিষয়ে প্রয়োজনীয় বই, জার্নাল, গবেষণা কর্ম ইত্যাদি বাংলা ভাষায় পাওয়া দুষ্কর। এক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের বাধ্যতামূলক ইংরেজির ওপর নির্ভরশীল হতে হচ্ছে। তাছাড়া দীর্ঘদিন এ অঞ্চলে ইংরেজ শাসন অব্যাহত থাকায় অদ্যাবধি অধিকাংশ জায়গায় ইংরেজিই প্রাধান্য বিস্তার করে চলছে। অফিসিয়াল বিভিন্ন কাজ বাংলার চেয়ে ইংরেজিতে সহজবোধ্য হয়। এমতাবস্থায় নতুন বিশ্বব্যবস্থার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলার পাশাপাশি ইংরেজির প্রতি সমান গুরুত্ব প্রদান করা উচিত।

প্রশ্ন-৩৭ **বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলা ও ভাস্কর্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতিফলন কতটা?**

উত্তর : বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম তথা মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছিল ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ। এ যুদ্ধের ইতিহাস একদিকে যেমন করুণ, শোকাবহ, লোমহর্ষক, তেমনি ত্যাগের দিক দিয়ে মহিমান্বিত ও বীরত্বপূর্ণ। দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম এবং লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে বিজয়সূর্য উদিত হয় ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর। এ দিন পৃথিবীর মানচিত্রে অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের।

বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলা ও ভাস্কর্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় প্রতিফলন অপরিসীম। জাতীয় স্মৃতিসৌধ, মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ, জাগ্রত চৌরঙ্গী, অপরাজেয় বাংলা, স্বোপার্জিত স্বাধীনতা, বিজয়োল্লাস, মুক্তবাংলা, সংশপ্তক, বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ, সাবাশ বাংলাদেশ, স্মারক ভাস্কর্য, চেতনা '৭১ ইত্যাদি ভাস্কর্য মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম নিদর্শন। এসব চিত্রকলা ও ভাস্কর্য যতদিন থাকবে ততোদিন মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রতিফলিত হতে থাকবে।

প্রশ্ন-৩৮ **প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কবে গঠিত হয়?**

উত্তর : তৃণমূল পর্যন্ত শিক্ষার বিস্তার এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা ক্ষেত্রে আরো গুরুত্বারোপ করার লক্ষ্যে সরকার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগকে ২০০৩ সালের ২ জানুয়ারি পূর্ণ মন্ত্রণালয়ে রূপান্তরিত করে। প্রেসিডেন্ট ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ সংবিধানের ৫৫(৬) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগকে 'প্রাথমিক ও গণশিক্ষা' মন্ত্রণালয়ে পরিবর্তিত করেন।

প্রশ্ন-৩৯ **বাংলাদেশে এ পর্যন্ত কয়টি শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি গঠিত হয়েছে?**

উত্তর : দেশে এ পর্যন্ত ৫টি শিক্ষা কমিশন ও ৩টি শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি গঠিত হয়েছে। এগুলো হলো :

দেশের ৫টি শিক্ষা কমিশন

কমিশন	প্রধান	গঠন
১. কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন	ড. কুদারত-এ-খুদা	২৬ জুলাই ১৯৭২
২. মফিজ উদ্দিন শিক্ষা কমিশন	ড. মফিজ উদ্দিন আহমদ	১৯৮৮
৩. শামসুল হক শিক্ষা কমিশন	ড. এম শামসুল হক	১৯৯৭
৪. ড. এম এ বারী কমিশন	ড. এম এ বারী	২০০২
৫. মনিরুজ্জামান মিঞা শিক্ষা কমিশন	ড. মনিরুজ্জামান মিঞা	১৫ জানুয়ারি ২০০৩

দেশের ৩টি শিক্ষানীতি কমিটি

নাম	প্রধান	গঠনকাল
১. জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা কমিটি	কাজী জাফর আহমেদ ও আবদুল বাতেন	০৫ আগস্ট ১৯৭৮
২. মজিদ খান শিক্ষা সংস্কার কমিটি	ড. মজিদ খান	১৯৮৩
৩. জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি	অধ্যাপক কবীর চৌধুরী	০৮ এপ্রিল ২০০৯

প্রশ্ন-৪০ নিরক্ষরতা কি?

উত্তর : নিরক্ষরতা একটি বড় ধরনের সামাজিক সমস্যা। বাংলাদেশের জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ নিরক্ষর, প্রায় ৪২.১%। সাধারণত অক্ষরজ্ঞানহীন মানুষকে নিরক্ষর বলে। নিরক্ষর মানুষ অন্ধসমতুল্য। নিরক্ষরতার কারণে আমাদের জনসংখ্যা জনসম্পদ না হয়ে জনসমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং দেশের অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে।

প্রশ্ন-৪১ গ্রেডিং পদ্ধতি কি?

উত্তর : বাংলাদেশে শিক্ষাক্ষেত্রে 'গ্রেডিং পদ্ধতি'র ধারণা বেশি দিনের নয়। ২০০১ সালে এসএসসি ও দাখিল পর্যায়ে পরীক্ষায় প্রথম গ্রেডিং পদ্ধতি চালু করা হয়। ইতোপূর্বে এসব পরীক্ষার ফলাফলে প্রথম বিভাগ, দ্বিতীয় বিভাগ ও তৃতীয় বিভাগ প্রযোজ্য ছিল, যা মেধার অধিকতর যাচাই-বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সঠিক মূল্যায়নে সমস্যা দেখা দেয়। এ কারণেই ব্যাপক ও বিন্যাসিত গ্রেডিং পদ্ধতি চালু শিক্ষার্থীদের মেধা মূল্যায়নে আধুনিকতর পদ্ধতি, সন্দেহ নেই। প্রথমে গ্রেডিং পদ্ধতি ছিল ছয় ধাপের। পরে ২০০৩ সালের ৪ জানুয়ারি গ্রেডিং পদ্ধতির পুনর্বিন্যাস করে সাত ধাপের গ্রেডিং পদ্ধতি চালু করা হয়। সাত ধাপের গ্রেডিং পদ্ধতির শীর্ষ ধাপটি হলো 'এ প্লাস'। এ প্লাসের প্রাপ্ত নম্বর ৮০-১০০ এবং এর গ্রেড পয়েন্ট হচ্ছে ৫.০০। আর সর্বনিম্ন গ্রেডের নাম 'গ্রেড এফ'। এর প্রাপ্ত নম্বর ০-৩২। পুনর্বিন্যাসিত পদ্ধতিতে নতুন গ্রেডটির নাম 'এ মাইনাস' (A^-)। ২০০৩ সাল থেকে এফ গ্রেডপ্রাপ্তদের কলেজে ভর্তির সুযোগ রহিত করা হয়েছে এবং ২০০৩ সাল থেকে এইচএসসি ও আলিম পরীক্ষায় গ্রেডিং পদ্ধতি চালু হয়েছে।

প্রশ্ন-৪২ NAPE কি এবং কোথায় অবস্থিত?

উত্তর : NAPE-এর পূর্ণনাম হলো National Academy for Primary Education। এটি ময়মনসিংহ শহরে অবস্থিত।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

বাংলাদেশের পরিবেশ ও প্রকৃতি এবং চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা : রক্ষণাবেক্ষণ, সংরক্ষণ ও টেকসইকরণ

Bangadesh's Environment & Nature and Challenges & Prospects : Conservation, Preservation & Sustainablity

Syllabus	*Bangladesh's environment and nature and challenges and prospects with particular emphasis on conservation, preservation and sustainability.*

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১. *প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিশেষত বন্যা সমস্যা ও এর সম্ভাব্য সমাধান সম্পর্কে আলোচনা করুন। [২২তম বিসিএস]*
অথবা, বাংলাদেশের বন্যা সমস্যা ও এর সম্ভাব্য সমাধান সম্পর্কে আলোচনা করুন। [১১তম বিসিএস]

০২. *দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও প্রশমনে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে? [২৮তম বিসিএস]*

০৩. *বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে বাংলাদেশের সাফল্য ও ব্যর্থতা কি? [৩৪তম বিসিএস]*

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

০৪. *'কৃষির আধুনিকায়ন জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত, কিন্তু জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার পূর্বশর্ত'–ব্যাখ্যা করুন।*

০৫. *বাংলাদেশের অর্থনীতি ও পরিবেশের ওপর বনায়নের গুরুত্ব সম্পর্কে একটি নিবন্ধ রচনা করুন।*

০৬. *বাংলাদেশের পরিবেশ ও অর্থনীতিতে সুন্দরবন ও উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনীর প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করুন।*

০৭. *ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প, বাংলাদেশে এর প্রভাব এবং বাংলাদেশের করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করুন।*
অথবা, ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পে বাংলাদেশ কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে তা আলোচনা করুন।

০৮. *'টিপাইমুখ বাঁধ বাংলাদেশের জন্য ভবিষ্যৎ ফারাক্কা'– আলোচনা করুন।*
অথবা, টিপাইমুখ বাঁধ ও এর সম্ভাব্য পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

০৯. *বাংলাদেশের পর্যটনশিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা আলোচনা করুন।*

১০. *বাংলাদেশে পরিবেশ সংরক্ষণ নীতি কি? পরিবেশ সংরক্ষণে আর কি কি উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে বলে আপনি মনে করেন?*

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

১১. *বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষায় বাংলাদেশের গৃহীত কার্যক্রম আলোচনা করুন।*
১২. *বাংলাদেশের পরিবেশ ও প্রকৃতি কিরূপ? বাংলাদেশের পরিবেশের চ্যালেঞ্জসমূহ সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।*

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

০১. *বিশ্ব পরিবেশ আন্দোলনে বাংলাদেশের ভূমিকা বর্ণনা করুন। [৩০তম বিসিএস]*
০২. *কি কি কারণে বাংলাদেশের পরিবেশ দূষিত হচ্ছে— আলোচনা করুন।*
০৩. *ম্যানগ্রোভ বন কি?*
০৪. *বাংলাদেশের জাতীয় বন কোন অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত? এর মোট আয়তন কত?*
০৫. *দেশের প্রধান নদীসমূহের গতিপথ নিয়ন্ত্রণে রাখতে করণীয় পদক্ষেপ লিখুন। [২২তম বিসিএস]*
০৬. *ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প এবং বাংলাদেশে এর প্রভাব কি?*
০৭. *আগুনমুখা কি?*
০৮. *বাংলাদেশে নদীর তলদেশ পলিতে ভরাট হওয়ায় উদ্ভূত সমস্যা ও সমাধানের ব্যাপারে বক্তব্য রাখুন।*
০৯. *বাংলাদেশ-ভারত নদী কমিশন সম্পর্কে কি জানেন?*

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১ ▌ প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিশেষত বন্যা সমস্যা ও এর সম্ভাব্য সমাধান সম্পর্কে আলোচনা করুন। *[২২তম বিসিএস]*
অথবা, **বাংলাদেশের বন্যা সমস্যা ও এর সম্ভাব্য সমাধান সম্পর্কে আলোচনা করুন।** *[১১তম বিসিএস]*

উত্তর : ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে প্রতি বছর বাংলাদেশকে নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করতে হয়। বন্যা বাংলাদেশে নতুন কিছু নয়। দু-এক বছর পরপরই আমরা বন্যার তাণ্ডবলীলা প্রত্যক্ষ করি। অবস্থানগত কারণেই আমাদের পক্ষে কখনোই সম্পূর্ণরূপে বন্যামুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। তবে আমরা যদি পূর্বসতর্কতা অবলম্বন করি তাহলে ভবিষ্যতে বন্যার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কিছুটা হলেও সীমিত রাখা যাবে। তাই বন্যার কারণ এবং অর্থনীতিতে এর প্রভাব সম্পর্কে আলোচনার অবকাশ রয়েছে।

প্রেক্ষাপট : বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশে প্রায় ৩০টির মতো বড় ধরনের বন্যা সংঘটিত হয়েছে। এর মধ্যে ১৯৫৪, ১৯৫৫, ১৯৭৪, ১৯৮৫, ১৯৮৮, ১৯৯১, ১৯৯৮, ২০০০ সালের বন্যা এবং সর্বশেষ ২০০৪ সালের ভয়াবহ রেকর্ড সৃষ্টিকারী বন্যা এবং ১৫ নভেম্বর ২০০৭ এর ঘূর্ণিঝড় সিডর, ২ মে ২০০৮ 'নার্গিস', ২৬ অক্টোবর ২০০৮ 'রেশমি', ২৫ মে ২০০৯ 'আইলা', ১৬ মে ২০১৩ 'মহাসেন'-এর কথা উল্লেখ করা যায়।

বাংলাদেশে বন্যার অন্যতম কারণ হিসেবে দায়ী করা হয় অতিবৃষ্টিকে। বন্যার জন্য নদীর অনাব্যতা এবং উজানের পানিও অনেকাংশে দায়ী। বাংলাদেশে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২৩০ সেন্টিমিটার। এ বৃষ্টির শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশি হয় জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে। বাংলাদেশের ভূমি সমতল, যার ফলে বৃষ্টির এই পানি সহসা সরে যেতে পারে না। বাংলাদেশ নদী জরিপ গবেষণা কেন্দ্রের তথ্য মতে, বাংলাদেশে ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় ৩১০টি নদী রয়েছে। বেশ কয়েক বছর ধরে নদীগুলো ড্রেজিং না করার ফলে এর পানি ধরে রাখার ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। ফলে অতিবৃষ্টি হলে নদীসমূহের দুকূল ছাপিয়ে বন্যার সৃষ্টি হয়। তবে এ দেশে বন্যার অন্যতম কারণ উজান থেকে আসা পাহাড়ি ঢল। হিমালয় থেকে নেমে আসা বিপুল জলরাশি ভারত ও নেপালের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের পদ্মা, মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর মাধ্যমে দক্ষিণের বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়। প্রতি বছর প্রায় ৫০ লক্ষ কিউসেক পানি এ প্রধান তিনটি নদীর মাধ্যমে প্রবল বেগে প্রবাহিত হওয়ার সময় প্রবল চাপের মাধ্যমে বন্যার সৃষ্টি করে।

বন্যার কারণ : বিশেষজ্ঞগণ বন্যার জন্য বেশ কয়েকটি কারণ চিহ্নিত করেছেন :

ক. প্রাকৃতিক কারণ

১. পদ্মা-মেঘনা-ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার সকল পানি সমুদ্রে যাওয়ার যে একমাত্র পথ, তারই ভাটি এলাকায় বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান।

২. একদিকে পৃথিবীর উত্তাপ বৃদ্ধি এবং অন্যদিকে বনাঞ্চলসমূহ দ্রুত ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে থাকায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ যেমন ক্রমশ বাড়ছে, তেমনি হিমালয়ে আগে যে বিপুল পরিমাণ পানি বরফ হয়ে জমা থাকতো, তাও ক্রমে গলে নিচে নেমে আসছে।

৩. গত আড়াই দশকে পলি জমে বাংলাদেশের নদ-নদীসমূহের স্বাভাবিক পানি পরিবহন ক্ষমতা বিপুলভাবে হ্রাস পেয়েছে। ভারত কর্তৃক বিভিন্ন নদীতে বাঁধ নির্মাণ ও একতরফা পানি অপসারণের ফলে খরা মৌসুমে বাংলাদেশের নদ-নদীর স্রোত এতোই কমে যায় যে, তার পক্ষে পলিমাটি ঠেলে নিয়ে যাওয়া সম্ভব না। ফলে, দেশের নদীসমূহ ক্রমশই ভরাট হয়ে যাচ্ছে। যেমন—হার্ডিঞ্জ ব্রিজ পয়েন্টে ৩০ বছর আগে পদ্মা নদীর যে গভীরতা ছিল এখন তা অন্তত ৮০% হ্রাস পেয়েছে। ব্রহ্মপুত্রসহ অন্যান্য নদ-নদীরও প্রায় একই অবস্থা। ফলে এখন নদীসমূহ আর বন্যার পানি টেনে নিতে পারছে না।

৪. বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে গ্রীন হাউস প্রতিক্রিয়াজনিত কারণে সমুদ্রের পানির স্তর বৃদ্ধিও বন্যার বিশেষ কারণ।

৫. পদ্মা-মেঘনার নির্গম বা সাগর-সঙ্গমস্থলে যে বিশাল স্থলভূমি জেগে উঠেছে সেটাও পানির প্রবাহকে অনেকাংশে বাধাগ্রস্ত করছে।

৬. ভূ-গর্ভের অগভীর স্তরে পানির প্রবাহ (Sub-Surface water circulation) বৃদ্ধিও বন্যার কারণ।

৭. বর্ষাকালে বঙ্গোপসাগরের ওপর দিয়ে প্রবাহিত দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু সমুদ্রের পানি দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে উত্তর-পূর্বদিকে ঠেলে বঙ্গোপসাগরের পূর্বাঞ্চলে স্তূপীকৃত করতে চেষ্টা করে। বর্ষাকালে মৌসুমী বায়ুর কারণে পানির উজান চাপ একটি সার্বক্ষণিক ব্যাপার।

৮. বর্ষাকালে বাংলাদেশের সমুদ্রে প্রচুর নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। এ সকল নিম্নচাপ সাময়িকভাবে বন্যা পরিস্থিতিকে আরো গুরুতর করে তোলে। তাছাড়া নিম্নচাপ থেকে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, যা বন্যার পানি বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়।

খ. কৃত্রিম কারণ

১. **অবকাঠামো নির্মাণ :** মানুষ জীবনযাত্রার সুবিধার জন্য নদী অববাহিকায় ব্রিজ, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করার নিমিত্তে বাঁধ এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য ভেড়িবাঁধ নির্মাণ করেছে। বাঁধ নির্মাণের ফলে নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয়। তাছাড়া নদীর তীর বরাবর ভেড়িবাঁধ নির্মাণের ফলে নদীর পানি অববাহিকায় প্লাবিত হতে পারে না। ফলে দীর্ঘদিন ধরে নদীর তলদেশ পলি-বালি সঞ্চিত হতে হতে নদীর তলদেশ ভরাট হয়ে বন্যার প্রকোপ বৃদ্ধি পায়।

২. **অরণ্য নিধন :** গঙ্গা, যমুনা নদীর উৎসস্থলে ব্যাপকভাবে বন উজারকরণ বাংলাদেশে বন্যার আরেকটি কারণ। স্বাভাবিক অবস্থায় বৃষ্টির পানি নদী-নালায় আসার আগে বনাঞ্চলের গাছ-পালা, ঝোপ-ঝাড়, ঝরা পাতা ও শিকড়ে বাধা পেয়ে মোট বৃষ্টিপাতের ৫০-৫৫ ভাগ পানি

ভূগর্ভে প্রবেশ করার সুযোগ পায়। কিন্তু বাংলাদেশে ব্যাপক হারে বনাঞ্চল কাটার ফলে বর্ষাকালে বৃষ্টিপাতের সিংহভাগ পানি বাধা না পেয়ে নদীতে চলে আসায় পানিপ্রবাহ বেড়ে যায় এবং বন্যার সৃষ্টি হয়। এছাড়া নদীর উৎসে বনাঞ্চল কেটে ফেলার কারণে বিরান এলাকায় প্রভূত পরিমাণ পলিমাটি বয়ে এনে প্রবাহ পথ বন্ধ করে দেয়।

৩. **গঙ্গা নদীর ফারাক্কা বাঁধ :** বাংলাদেশে বন্যার আরেকটি প্রধান কারণ হলো পশ্চিমবঙ্গের ফারাক্কা বাঁধ। এ বাঁধ নির্মাণের আগে ভাগীরথী নদীতে বর্ষাকালে যেখানে প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ১,৩০,০০০ ঘনফুট পানি প্রবাহিত হতো, তা বাঁধ নির্মাণের পরে দাঁড়ায় ৮০,০০০ ঘনফুটে। এই হ্রাসপ্রাপ্ত ৫০,০০০ ঘনফুট পানিপ্রবাহ অতিরিক্ত হিসেবে বন্যার প্রকোপ বাড়িয়ে তুলেছে। তাছাড়া ভারত প্রতি বছর শুকনো মৌসুমে ফারাক্কায় পানি আটকে রেখে বর্ষা মৌসুমে সকল গেট একসঙ্গে খুলে দিয়ে বাংলাদেশকে পানিতে ডুবিয়ে দেয়ার প্রয়াস চালায়, যার ফলে বাংলাদেশে বন্যার সম্ভাবনা আরো বৃদ্ধি পায়।

৪. **সামুদ্রিক জোয়ার ও জলোচ্ছ্বাস :** বাংলাদেশের প্রধান তিনটি নদী বর্ষাকালে কোটি কোটি কিউসেক পানি দেশের ওপর দিয়ে বয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু এ বিপুল পরিমাণ পানি খুব সহজেই বঙ্গোপসাগরে মিশতে পারে না। কারণ নদীর মোহনায় বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট জোয়ারের পানির চাপ নদীর পানির চাপের চেয়ে ৫ গুণ বেশি। অর্থাৎ জোয়ার ও জলোচ্ছ্বাসের জন্য নদীর পানিপ্রবাহ বাধা পেয়ে সাগরে পতিত না হয়ে ওভার-ফ্লো হয়ে বন্যার সৃষ্টি করে।

৫. **গ্রীন হাউস প্রতিক্রিয়া :** বিজ্ঞানীরা বন্যা ও জলোচ্ছ্বাসের আরেকটি কারণ দাঁড় করিয়েছেন, তা হলো 'গ্রীন হাউস প্রতিক্রিয়া'। গ্রীন হাউস প্রতিক্রিয়া তথা তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য পর্বত শিখরে ও মেরু অঞ্চলের বরফ গলে নদীর পানির উচ্চতা ও প্রবাহ বৃদ্ধি করে, এই বরফ গলা পানি বৃষ্টির পানির সঙ্গে একত্রে প্রবাহিত হওয়ায় বন্যার তীব্রতা বৃদ্ধি পায়।

৬. **ভূমিক্ষয় :** অপরিকল্পিতভাবে রাস্তা-ঘাট, ব্রিজ ও কালভার্ট নির্মাণ, দালান-কোঠা তৈরি প্রভৃতি কাজে নিম্নভূমির অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে ভূমিক্ষয় হয়ে যায়। তাছাড়া সাম্প্রতিককালের ভূমিকম্পনের ফলেও অতিরিক্ত মাটিক্ষয় হয়ে নদীমুখ বন্ধ ও দিক পরিবর্তন করে ফেলেছে। এতে নদীতে পানি ধারণক্ষমতা কমে যাওয়ায় বন্যার প্রকোপ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বন্যা সমস্যার প্রতিকার : বন্যার ক্ষয়ক্ষতি ও দুর্ভোগ থেকে রক্ষার জন্য বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কার্যত তেমন কিছু করা হয়নি। বাঁধের মাধ্যমে এ যাবৎ বন্যা নিয়ন্ত্রণের কিছুটা চেষ্টা করা হলেও তেমন কোনো সাফল্য অর্জিত হয়নি। সাম্প্রতিক কালের বন্যার তীব্রতা ও ব্যাপকতা সে কথাই প্রমাণ করে। ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে বন্যাকে স্থায়ীভাবে প্রতিরোধ করা না গেলেও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে অবকাঠামোগত ও অ-অবকাঠামোগত নানা ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে বন্যার ভয়াবহতা ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমানো যেতে পারে। বন্যা প্রতিরোধের ক্ষেত্রে দু ধরনের পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে— ক. তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা এবং খ. দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থা।

ক. তাৎক্ষণিক ব্যবস্থাসমূহ

১. **প্রাক-সতর্কীকরণ ব্যবস্থা :** বন্যা সম্পর্কে তাৎক্ষণিকভাবে প্রাক-সতর্কীকরণ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রযুক্তিগতভাবে এই ব্যবস্থা গ্রহণে বাংলাদেশ সক্ষম। এক্ষেত্রে ভূ-তাত্ত্বিক ও আঞ্চলিক পরিবাহের মাধ্যমে সর্তকীকরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটানো যেতে পারে। ফলে জান-মাল যথেষ্ট পরিমাণে রক্ষা পাবে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

২. **ত্রাণব্যবস্থা সক্রিয়করণ :** বন্যা-উত্তর ত্রাণব্যবস্থা সক্রিয় রাখার উদ্দেশ্যে ও ত্বরিত সাহায্য সরবরাহের জন্য আঞ্চলিক পর্যায়ে যথেষ্ট ত্রাণসামগ্রী মজুদ রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

৩. **অশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ :** পানিবন্দি এলাকায় প্রতিটি ইউনিয়ন পর্যায়ে একটি জরুরি আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করতে হবে। এ লক্ষ্যে একটি স্কুলগৃহকে বহুতলে রূপান্তরিত করা যেতে পারে, যা অন্তত ৩,০০০ লোক ধারণ করতে পারে।

৪. **স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান স্থাপন :** সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহকে বন্যা প্রতিরোধের জন্য আরো কার্যকর ও সক্রিয় হতে হবে। এক্ষেত্রে একটি দুর্যোগ সংক্রান্ত স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা যেতে পারে। প্রতিষ্ঠানটি বন্যাসহ সকল দুর্যোগ সম্পর্কে তথ্য আহরণ, সংরক্ষণ, প্রচার এবং দুর্যোগ প্রতিরোধক কর্মসূচি ও গবেষণা পরিচালনা করবে।

৫. **অন্যান্য ব্যবস্থা :** এছাড়া সরকার ও জনগণের বন্যার আগাম প্রস্তুতি গ্রহণ করা, ঘরবাড়ির ভিটে উঁচু করা ও গুচ্ছগ্রাম গড়ে তোলা, বন্যার উপযোগী ধানের উদ্ভাবন ও চাষ করা ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে।

খ. দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা : বন্যা প্রতিরোধে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাসমূহ হলো মুখ্য। দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থাসমূহ নিম্নরূপ :

১. **রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত :** প্রকৃতপক্ষে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থেই আমাদেরকে জরুরি ভিত্তিতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি নিতে হবে। এক্ষেত্রে আঞ্চলিক সহযোগিতার ভিত্তিতে নেপাল, ভারত, ভুটান ও বাংলাদেশকে বন্যা নিয়ন্ত্রণের দীর্ঘমেয়াদি ও কার্যকর ব্যবস্থার জন্য সর্বোচ্চ পর্যায়ে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

২. **বাঁধ নির্মাণ :** বন্যার পানি প্রবেশের উৎসমুখ বন্ধ করে দেয়ার উদ্দেশ্যে ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা ও তিস্তা— এ তিনটি নদীতেই শুধু বাঁধ নির্মাণ নয়, উক্ত তিনটি ছাড়াও দেশের বিভিন্ন Tributory বা খাঁড়ির মুখে বাঁধ দিতে হবে। এতে বাংলাদেশের পক্ষে নদীর প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে।

৩. **পোল্ডার নির্মাণ :** দেশের উপকূল ভাগে স্থাপিত ৭০০ স্বয়ংক্রিয় জোয়ারবিরোধী গেটের মতো কাঠামো দ্বারা সাগরের জোয়ার অনুপ্রবেশ রোধ এবং জলাবদ্ধ এলাকায় পোল্ডার নির্মাণ করে পানি পাম্প করে বের করার ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

গ. সমন্বিত ব্যবস্থা : ভারত, নেপাল, ভুটান ও চীনকে নিয়ে বন্যা নিয়ন্ত্রণের আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা নিতে হবে। দেশে জাতীয় ভিত্তিতে দীর্ঘমেয়াদি ও স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। জরুরি ভিত্তিতে বন্যা নিয়ন্ত্রণের কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে, যাতে বড় পরিকল্পনা বাস্তবায়নকালে পুনরায় বন্যা না দেখা দেয়। এ লক্ষ্যে ব্যাপকভাবে বনায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে।

এছাড়া বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য আরো কতিপয় সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেয়া যেতে পারে :

১. প্রধান নদী ও শাখা নদীগুলোর মুখ খনন করা, যাতে বর্ষাকালে অতিবৃষ্টির পানি দ্রুত নিষ্কাশিত হতে পারে।

২. নদীর তীর বরাবর উঁচু করে বাঁধ নির্মাণ করা, যাতে পানি নদী খাতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে।

৩. নদীর তলদেশ খনন করা; যাতে পানি বেশি পরিমাণে দ্রুত সাগরে চলে যেতে পারে।

৪. নদী ছোট বা বড় যা-ই হোক না কেন, নদীর মুখ বন্ধ না করে রাস্তাঘাট ও সেতু নির্মাণ।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৫. নদীর উৎসস্থলে ও অববাহিকায় ব্যাপক ঘন অরণ্য সৃষ্টি করে বৃষ্টির বা বরফ গলা পানি ধীরে ধীরে প্রবাহিত হওয়ার ব্যবস্থা করা।

৬. নদীর উৎসস্থলে ও অববাহিকায় জলাধার নির্মাণ করে পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। এই পানি পরে সেচের কাজে ব্যবহৃত হতে পারে।

৭. Flood Action plan-এর প্রস্তাবিত সমীক্ষাসমূহ পুনরায় যাচাই করা, যাতে তা জাতীয় স্বার্থে এবং চাহিদার উপযোগী করে তোলা যায়।

বন্যার সাথে যেহেতু আমাদের সহাবস্থান করতে হবে, সেহেতু বন্যাকে মেনে নিয়ে মানুষ তাদের ক্ষুদ্র সম্পদ নিয়ে যাতে বন্যায় সময় নিরাপদ থাকতে পারে সে বিষয়টি সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে। যে বিষয়টি শুকনা মৌসুমে করা যায় তা হলো, বন্যাপ্রবণ এলাকায় সর্বোচ্চ বন্যা লেভেলের চেয়ে উঁচু মাঠ তৈরি করে (দক্ষিণাঞ্চলের কিল্লার মতো) বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র ও স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এখানে বিশুদ্ধ পানি ও সুষ্ঠু পয়ঃব্যবস্থা থাকবে। খাদ্য ও ওষুধের মজুদ থাকবে। প্রতি ইউনিয়নে ও প্রতি গ্রামে বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ করতে হবে। এছাড়া—

- সুন্দরবন ও পাহাড়ি এলাকার মতো উঁচু খুঁটির ওপর ঘর-বাড়ি নির্মাণ করার পদ্ধতি চালু করতে হবে।
- শহর ও গ্রামকে উঁচু বাঁধ দ্বারা ঘেরাও করতে হবে।
- সস্তা শ্রমশক্তি ব্যবহার করে পুকুর, নালা, খাল, বিল খনন করে সেচের পানি সংরক্ষণ করতে হবে।
- নদী খনন অত্যন্ত ব্যয়বহুল হলেও পদ্মা, মেঘনা, যমুনা তিনটি প্রধান নদীকে নিয়মিত ড্রেজিং করে পানি সংরক্ষণের ক্ষমতা বাড়াতে হবে। খননকৃত মাটি দ্বারা উঁচু বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র বানাতে হবে।
- নদীতীরকে স্থায়ী মজবুত কাঠামো দ্বারা সংরক্ষিত করলে নদী স্রোত বৃদ্ধি হয়ে পলি জমা বন্ধ হবে। যেরূপ স্থায়ী কাঠামো বঙ্গবন্ধু সেতু এলাকায় করা হয়েছে।
- বেড়ি বাঁধ, পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নির্মাণ করতে হবে।
- প্রতিবছর অল্প করে হলেও নদীর তীর রক্ষায় স্পার, গ্রোয়েন, পারকোপাইন, গ্যারিয়ন ইত্যাদি নিক্ষেপের পাশাপাশি শহর এলাকায় ব্রিজ এবাটমেন্ট বা পিয়ারের মতো স্কাউর ডেপথের নিচ পর্যন্ত কংক্রিটের দেয়াল নির্মাণ করা উচিত।
- পূর্বাভাস ব্যবস্থা উন্নত করতে হবে, যাতে মানুষ নিরাপদ স্থানে সরে যেতে পারে। আগারগাঁওয়ে স্থাপিত রাডারটির কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ২৪ তলা আইডিবি ভবনে স্থানান্তর করা উচিত। এছাড়া দিনাজপুর অঞ্চলে একটি রাডার কেন্দ্র স্থাপন করা প্রয়োজন।
- কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাকে বন্যা উপযোগী করা প্রয়োজন। কাঠ বা প্লাস্টিকের ভাসমান বীজতলা তৈরি করা প্রয়োজন।
- ব্যাপক বনায়ন প্রয়োজন।

উপসংহার : বন্যা নামক সর্বগ্রাসী দৈত্যের ভয়ে দেশবাসী সর্বদা শঙ্কিত। বন্যার ভয়াবহ তাণ্ডবলীলায় প্রতি বছর মৃত্যুবরণ করে হাজার হাজার মানুষ। পানিতে ভেসে যায় অসংখ্য ঘর-বাড়ি ও গবাদিপশু। পানিবন্দি হয়ে এক অবর্ণনীয় দুর্ভোগের শিকার হয় লাখ লাখ মানুষ। বিনষ্ট হয় হাজার হাজার একর জমির ফসল। সর্বোপরি ভেঙে যায় কৃষকের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড এবং নেতিবাচক প্রভাব পড়ে লেনদেনের ভারসাম্যে। সুতরাং এমন অস্বস্তিকর পরিস্থিতি থেকে দেশবাসীর মুক্তির জন্য সরকারের বাস্তব ও বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত।

০২। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও প্রশমনে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে? *[২৮তম বিসিএস]*

উত্তর : বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ দেশ। ভৌগোলিক অবস্থান ও আবহাওয়াগত কারণে এ দেশে নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটিত হয়ে থাকে। এর মধ্যে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, নদীভাঙন, খরা, মহামারী, টর্নেডো, ভূমিকম্প ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এ সকল দুর্যোগের ফলে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতি থেকে উত্তরণ, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস এবং দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য বিভিন্ন রকম ব্যবস্থাপনা ও কৌশল গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

দুর্যোগ কি : দুর্যোগ হচ্ছে এমন প্রতিকূল অবস্থা যা সমাজের স্বাভাবিক কাজকর্মে প্রচণ্ডভাবে বিঘ্ন ঘটায় এবং জীবন, সম্পদ ও পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। ক্ষতিগ্রস্ত সমাজের পক্ষে নিজস্ব সম্পদের দ্বারা এই ক্ষতি মোকাবিলা করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। এ আকস্মিক ও চরম বিপর্যয় জীবন ও সম্পদের ওপর প্রতিকূলভাবে আঘাত করে জনজীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। এই আকস্মিক বিপর্যয়ই দুর্যোগের সৃষ্টি করে থাকে।

দুর্যোগের প্রকারভেদ : UNITAR (United Nations Institute for Training and Research) দুর্যোগসমূহকে চারভাগে ভাগ করেছে। যথা :

১. প্রাকৃতিক দুর্যোগ : বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, টর্নেডো, নদীভাঙন, ভূমিকম্প ইত্যাদি।
২. দীর্ঘস্থায়ী দুর্যোগ : মহামারী, খরা ইত্যাদি।
৩. মানবসৃষ্ট দুর্যোগ : যুদ্ধ, অপরিকল্পিত নগরায়ন, বনাঞ্চল ধ্বংস, পরিবেশ দূষণ ইত্যাদি।
৪. দুর্ঘটনাজনিত দুর্যোগ।

অপরিকল্পিত নগরায়ন ও রাস্তা নির্মাণ, নদীতে বাঁধ নির্মাণ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বনাঞ্চল ধ্বংস, পরিবেশ দূষণ প্রভৃতি দুর্যোগের ব্যাপকতা ও ক্ষতির পরিমাণ বৃদ্ধি করে থাকে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা হচ্ছে দুর্যোগ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্তসমূহের সমষ্টি এবং এগুলোর প্রায়োগিক কাজ, যা প্রশাসনিক সকল স্তরের দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগপরবর্তী পর্যায়সমূহের কার্যক্রমকে বোঝায়। অন্যভাবে বলা যায়, Disaster management is an applied science which seeks by the systematic observation and analysis of disasters, to improve measurers relating to prevention, mitigation, preparedness, emergency response and recovery. অর্থাৎ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা হচ্ছে এরূপ একটি ব্যবহারিক বিজ্ঞান, যার আওতায় পড়ে যথাযথ পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে দুর্যোগ প্রতিরোধ, দুর্যোগ প্রস্তুতি এবং দুর্যোগে জরুরি সাড়া দান ও পুনরুদ্ধার ইত্যাদি কার্যক্রম।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রধান উদ্দেশ্য তিনটি। সেগুলো হলো :

১. দুর্যোগের সময় জীবন, সম্পদ ও পরিবেশের যে ক্ষতি হয়ে থাকে তা এড়ানোর বা ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস করা।
২. প্রয়োজন অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের মধ্যে অল্প সময়ে সকল প্রকার ত্রাণ ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করা। এবং
৩. দুর্যোগ পরবর্তী পুনরুদ্ধার কাজ ভালোভাবে সম্পন্ন করা।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার পর্যায় : অতীতে দুর্যোগ সংঘটনের পরপরই ব্যাপক ত্রাণকার্য পরিচালনকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বলে মনে করা হতো। বস্তুত ত্রাণকার্য সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার একটি উপাদান মাত্র। দুর্যোগপূর্ব কার্যকলাপ যেমন—দুর্যোগ প্রতিরোধ, দুর্যোগ প্রশমন ও পূর্বপ্রস্তুতি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মুখ্য

উপাদান। এর যে কোনো একটি অসম্পন্ন থাকলে গোটা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বিপর্যয় দেখা দেয়। তাই দুর্যোগপূর্ণ সময়েই এর ব্যবস্থাপনার বেশি কাজ সম্পন্ন করতে হয়। সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে তিনটি পর্যায় লক্ষ্য করা যায়। যথা— ক. দুর্যোগপূর্ব পর্যায়, খ. দুর্যোগকালীন পর্যায় ও গ. দুর্যোগপরবর্তী পর্যায়।

ক. দুর্যোগপূর্ব পর্যায় : যে কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয় শুরুর আগে সম্ভাব্য সতর্ক ব্যবস্থা অবলম্বন করাই হলো দুর্যোগ পূর্বকালীন ব্যবস্থা। দুর্যোগের প্রকারভেদ অনুসারে প্রস্তুতি কর্মসূচি গ্রহণ করতে হয়। যেমন—

১. দুর্যোগপ্রবণ এলাকার জনগণ ও প্রশাসনকে সজাগকরণ এবং বিভিন্ন বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারী ও জনগণের করণীয় সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
২. দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য স্থানীয়, বিভাগীয় ও জাতীয়ভাবে পরিকল্পনা প্রণয়ন।
৩. সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি ও স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণদান।
৪. দুর্যোগকালে উদ্ধার, অপসারণ ও ত্রাণ কাজ পরিচালনার জন্য ত্রাণসামগ্রী মজুদকরণ এবং তা তড়িৎ গতিতে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের মাঝে পৌঁছে দেয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ।
৫. আশ্রয়কেন্দ্র সংরক্ষণ।
৬. বেতার ও টেলিভিশনের মাধ্যমে দুর্যোগ সম্পর্কিত করণীয় বিষয়ে অবহিত করা এবং পূর্বাভাস প্রদান করা।

এছাড়া ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের ক্ষেত্রে পূর্বেই বেতার ও টেলিভিশনের মাধ্যমে দূরবর্তী হুঁশিয়ারি সংকেত, বিপদ সংকেত ও মহাবিপদ সংকেত এবং আবহাওয়া সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি পরিবেশন করা হয়।

খ. দুর্যোগকালীন পর্যায় : দুর্যোগের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার জনগণের জীবন ও সম্পদ রক্ষা করার জন্য অপসারণ, তল্লাশি ও উদ্ধার, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। প্রাথমিক চিকিৎসাসহ স্বাস্থ্য কর্মসূচি পরিচালনার প্রস্তুতি গ্রহণ ও আশ্রয়স্থল চিহ্নিত করা হয়।

গ. দুর্যোগ-পরবর্তী ব্যবস্থা : দুর্যোগে পরিবেশ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো ইত্যাদির যে ক্ষতি হয়ে থাকে তা পুনর্নির্মাণের মাধ্যমে দুর্যোগপূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হয় এ পর্যায়ে। এ লক্ষ্যে বেশ কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়ে থাকে। যেমন—কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচি প্রণয়ন, কৃষি ঋণের চাহিদা নিরূপণ ও প্রদান, বাসস্থান, শিল্পায়ন, রাস্তাঘাট, বাঁধ নির্মাণ, শিল্প কারখানা পুনর্নির্মাণ প্রভৃতি।

এ সকল কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে তথা জাতীয়, বিভাগ, জেলা ও স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন কমিটি রয়েছে। এছাড়া ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচিতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সেনাবাহিনী, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও আন্তর্জাতিক সংস্থা অংশগ্রহণ করে থাকে। জাতীয় পর্যায়ে দুর্যোগ সংশ্লিষ্ট ৮টি কমিটি এবং ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে একটি করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনের ব্যবস্থা আছে। এসব কমিটি হলো :

১. জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল (NDMC)।
২. আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি।
৩. জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা কমিটি।
৪. ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি বাস্তবায়ন বোর্ড।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৫. দুর্যোগ সংশ্লিষ্ট 'ফোকাল পয়েন্ট'দের কার্যক্রম সমন্বয়কারী দল।
৬. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও গণসচেতনতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত টাস্কফোর্স।
৭. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি সংস্থাসমূহের সমন্বয় কমিটি।
৮. দুর্যোগ সংক্রান্ত সংকেতসমূহ দ্রুত প্রচার সম্পর্কিত কমিটি।

জাতীয় পর্যায়ে ৮টি কমিটি ছাড়াও দেশের সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে অর্থাৎ জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিসমূহ রয়েছে। যথা :

১. জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি,
২. উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি,
৩. ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি।

দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা : বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে দুর্যোগের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় পার্থক্য রয়েছে। দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল বা অন্যান্য দ্বীপসমূহ ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসপ্রবণ এবং উত্তরাঞ্চল বন্যা কবলিত ও খরাপ্রবণ অঞ্চল। দুর্যোগের প্রকারভেদে ভিন্ন ভিন্ন মেয়াদে পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন—

১. **বন্যা প্রতিরোধ :** ১৯৮৮, ১৯৯৮ ও ২০০৪ সালে সর্বনাশা বন্যা সংঘটিত হয়েছিল। ১৯৮৮ ও ১৯৯৮ সালের বন্যা ছিল সর্বনাশা ও ভয়াবহ। ৬০টি জেলা জুড়ে ১২৯৭৩ বর্গ কিমি এলাকার ৪ কোটি ৬৭ লক্ষ মানুষ বন্যার কবলে পড়েছিল। বন্যার ক্ষয়ক্ষতি ও ভয়াবহতা মানুষ আবার উপলব্ধি করে ২০০৪ সালের ভয়াবহ বন্যায়। বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন দাতা সংস্থার সাহায্যে বিভিন্ন দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। যেমন—নদী-খাল পুনঃখনন, নদীর (বিপজ্জনক) দুধারে বাঁধ নির্মাণ, নগর রক্ষা বাঁধ, সংকেত প্রদান ব্যবস্থার উন্নয়ন। এ প্রসঙ্গে সরকার FAP (Flood Action Plan) দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল।

২. **নদীভাঙন প্রতিরোধ ও খরা মোকাবিলা :** নদীভাঙন রোধে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা হলো নদীর তীর জুড়ে বেড়ী বাঁধ নির্মাণ করা, নদীর তীরে ব্যাপক বৃক্ষরোপণ করা ও নদীশাসন বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়া। খরা মোকাবিলায় দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা হলো ব্যাপক বনায়ন, বন উজাড় বন্ধকরণ এবং পুকুর খনন ও পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ।

ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলা : ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস এ দুটি ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ মানুষের জীবন ও সম্পদের প্রচুর ক্ষতি করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৭০, ১৯৮৫ ও ১৯৯১ সালের ২৯ এপ্রিলের ঘটনা উল্লেখযোগ্য। এ ঘূর্ণিঝড়ে সরকার যেসব কর্মসূচি প্রণয়ন করেছে তা হচ্ছে উপকূলীয় এলাকায় দুই হাজার আশ্রয় কেন্দ্র স্থাপন, হেলিপ্যাড নির্মাণ, রাস্তা নির্মাণ, বনায়ন কর্মসূচি ইত্যাদি।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও দুর্যোগ মোকাবিলার কৌশল বিষয়টি এত ব্যাপক ও কঠিন কাজ, যা কারো একার পক্ষে, কোনো একক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না। এজন্য রয়েছে বিভিন্ন কমিটি, কাউন্সিল, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো (DMB), CPP, SPARRSO ইত্যাদি।

সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সহায়কের ভূমিকায় ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (CPP) বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির একটি অঙ্গসংগঠন হিসেবে কাজ করছে। সংগঠনটি ঘূর্ণিঝড়ে সাড়াদান, যোগাযোগ রক্ষা, প্রস্তুতি এবং গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে থাকে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন—ঘূর্ণিঝড়, টর্নেডো, খরা, অতিবৃষ্টি ইত্যাদিকে মোকাবিলার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সময়মতো আবহাওয়ার তথ্যভিত্তিক পূর্বাভাস প্রদান ও সতর্কীকরণ। এ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের জন্য সরকারি পেশাভিত্তিক দপ্তর হিসেবে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর কাজ করে থাকে।

মহাকাশ গবেষণাকারী সরকারি সংস্থা 'SPARRSO' ভূ-উপগ্রহের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে মেঘচিত্র সরবরাহ করে আবহাওয়া অধিদপ্তরকে পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণে সহায়তা করছে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন বন্যা পূর্বাভাস কেন্দ্র বন্যা সংক্রান্ত পূর্বাভাস দান ও প্রচারের ব্যবস্থা করে থাকে।

ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দেয়ার কোনো কলাকৌশল অদ্যাবধি আবিষ্কার হয়নি বটে, তবে রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ও প্রকৃতি সম্পর্কে জানা যায়। জরুরি পরিস্থিতিতে আর্তদের চিকিৎসা, উদ্ধার, ত্রাণ বিতরণ ও পুনর্বাসন কাজে সামরিক বাহিনীর সদস্যবৃন্দ বেসামরিক প্রশাসনকে সবরকম সাহায্য ও সহযোগিতা দান করে থাকে। বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশন দুর্যোগ সংক্রান্ত সংকেতসমূহ প্রচারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আমাদের দেশে কর্মরত বেসরকারি সংস্থাসমূহ যেমন—অক্সফাম, ডিজাস্টার ফোরাম, কেয়ার বাংলাদেশ, কারিতাস, প্রশিকা, সিসিডিবি, বিডিপিসি (Bangladesh Disaster Preparation Centre) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

সমস্যাসমূহ : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও দুর্যোগ মোকাবিলার কৌশলগুলো সর্বদা সঠিকভাবে বা দ্রুত কার্যকর করা অসম্ভব হয়ে পড়ে বহুবিধ সমস্যার কারণে। যথা :

১. ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি,
২. অপ্রতুল চিকিৎসা সাহায্য,
৩. পুনরুদ্ধার ও পুনর্নির্মাণ ব্যয়সাপেক্ষ,
৪. অবকাঠামোর ক্ষয়-ক্ষতি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সেবার দুষ্প্রাপ্যতা,
৫. জনসচেতনার অভাব,
৬. সময়মতো সতর্কীকরণ সংকেত না দেয়া,
৭. প্রযুক্তির দুর্বলতা ও আধুনিক প্রযুক্তির অপ্রতুলতা,
৮. ত্রাণসামগ্রীর অভাব,
৯. আন্তর্জাতিক সাহায্য নির্ভরতা প্রভৃতি।

উপসংহার : ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণেই বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে পুরোপুরি মুক্তি পাবে না। তাই এই আকস্মিক দুর্যোগের মোকাবিলা যাতে ভালোভাবে করা যায় তার ব্যবস্থা করাই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রধান উদ্দেশ্য। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সকল স্তরের সকল পর্যায়ের কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালিত করতে পারলে দুর্যোগের হাত থেকে জীবন, সম্পদ ও পরিবেশকে বহুলাংশে রক্ষা করা সম্ভব হবে। দুর্যোগের মানবসৃষ্ট কারণগুলো যথাসম্ভব নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের স্বল্পোন্নত দেশ হওয়া সত্ত্বেও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও দুর্যোগ মোকাবিলার ক্ষেত্রে বেশ সফলতা লাভ করেছে। এসব সম্ভব হয়েছে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ বা দপ্তর, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক সহায়তা এবং ক্রমবর্ধমান সচেতন জনগোষ্ঠীর সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে।

০৩। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে বাংলাদেশের সাফল্য ও ব্যর্থতা কি? *[৩৪তম বিসিএস]*

উত্তর : প্রয়োজনের তুলনায় বনাঞ্চলের পরিমাণ কম থাকার পরেও বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ একটি দেশ। বাংলাদেশে রয়েছে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবনের বৃহদাংশ। অভয়ারণ্য লাউয়াছড়াও জীববৈচিত্র্যে ভরপুর। পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চল,মধুপুর বনাঞ্চলসহ ছোট বড় অন্যান্য বনাঞ্চলে নানা প্রাণীর বিচরণ, দুর্লভ উদ্ভিদের সমারোহ। বিভিন্ন নদ-নদী, হাওর-বিলসহ সকল জলাশয় বিচিত্র জীবের বিচরণক্ষেত্র। সুন্দরবনে রয়েছে বিশ্বখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগার, লাউয়াছড়ায় রয়েছে বিলুপ্ত প্রায় উল্লুক। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য অন্যায়ভাবে বন্যপ্রাণী হত্যা, বণ্যপ্রাণীর আবাসনের ধ্বংস, নির্বিচারে পাখি নিধন, জলবায়ুর পরিবর্তনসহ মানবসৃষ্ট নানা অপকর্মের কারণে বন্যপ্রাণীর অনেকটাই আজ বিলুপ্তির ও হুমকির মুখে। বিগত সময়ে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে নানা উদ্যোগ নেয়া হলেও জনসচেতনতার অভাবে, আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন না হওয়াতে অপরাধীরা ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকায় কিংবা ধরা পড়লেও সহজেই ছাড় পেয়ে যাওয়ায় বন্যপ্রাণী রক্ষার এসব আইন ও উদ্যোগের সাফল্য কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে অর্জিত হয়নি।

বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী : বাংলাদেশে বর্তমানে মোট বনভূমির পরিমাণ হলো ১.৬০ মিলিয়ন হেক্টর বা ১৬ হাজার বর্গ কিলোমিটার (প্রায়)। কিন্তু বন্যপ্রাণী কেবল বনভূমিতেই বাস করে না। আমাদের বাড়িঘরে বসবাসরত টিকটিকি, বাড়ির আশেপাশের চুড়ই, কবুতর, শালিক, কাক সবই বন্যপ্রাণী। অর্থাৎ বন্যপ্রাণীর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে মানুষ, গৃহপালিত পশুপাখি এবং মাছ ব্যতীত প্রাকৃতিক পরিবেশে বসবাসকারী মেরুদণ্ডী প্রাণী, উভচর, সরীসৃপ, পাখি এবং স্তন্যপায়ীর সদস্য, তাদের ডিম ও শাবক বন্যপ্রাণীদের অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশে বন্যপ্রাণীদের মধ্যে রয়েছে প্রায় ২২ প্রজাতির উভচর, ১০৯ প্রজাতির অভ্যন্তরীণ ও ১৭ প্রজাতির সামুদ্রিক সরীসৃপ, ৩৮৮ প্রজাতির আবাসিক ও ২৪০ প্রজাতির পরিযায়ী পাখি এবং ১১০ প্রজাতির অন্তর্দেশীয় ও ৩ প্রজাতির সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী প্রাণী।

বন্যপ্রাণী রক্ষায় বাংলাদেশের সাফল্য : বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় ইতোমধ্যেই দেশের অনেক এলাকায় সংরক্ষিত বনাঞ্চল, অভয়ারণ্য ও অভয়াশ্রম গড়ে তোলা হয়েছে। প্রণয়ন করা হয়েছে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন। এছাড়াও নানা পরিকল্পনা ও উদ্যোগ গ্রহণে এবং বিভিন্ন পরিবেশবাদী সংস্থার জোর ভূমিকায় বন ও বন্যপ্রাণী রক্ষার আন্দোলন ও কর্মসূচি বন্যপ্রাণীর হুমকি মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

ক. **বন্যপ্রাণীর অভয়ারণ্য :** বন্যপ্রাণী রক্ষায় বাংলাদেশের অন্যতম সাফল্য হলো বন্য প্রাণীদের অবাধ বিচরণের জন্য অভয়ারণ্য ও অভরাশ্রম গড়ে তোলা। এসব অভয়ারণ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্যগুলো হলো :

১. রেমা-কালেঙ্গা অভয়ারণ্য, হবিগঞ্জ;
২. চর কুকরি-মুকরি অভয়ারণ্য, ভোলা;
৩. সুন্দরবন (পূর্ব) অভয়ারণ্য, বাগের হাট;
৪. সুন্দরবন (পশ্চিম) অভয়ারণ্য, সাতক্ষীরা;
৫. সুন্দরবন (দক্ষিণ) অভয়ারণ্য, খুলনা;

৬. পাবলাখালী অভয়ারণ্য, খাগড়াছড়ি;
৭. চুনতি অভয়ারণ্য, চট্টগ্রাম;
৮. ফাসিয়াখালী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, চকোরিয়া;
৯. দুধু পুকুরিয়া ধোপছড়ি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, চট্টগ্রাম;
১০. হাজরাখিল বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, সীতাকুণ্ড;
১১. সাঙ্গু অভয়ারণ্য, বান্দরবান;
১২. টেকনাফ গেম রিজার্ভ, কক্সবাজার;
১৩. টেংরাগিরি অভয়ারণ্য;
১৪. দুধমুখী অভয়ারণ্য, বাগেরহাট;
১৫. চাঁদপাই অভয়ারণ্য, বাগেরহাট;
১৬. ঢাংমারী অভয়ারণ্য, বাগেরহাট;
১৭. সোনারচর অভয়ারণ্য, পটুয়াখালী;

উল্লিখিত অভয়ারণ্য ও অভয়াশ্রমে বন্যপ্রাণী শিকার, বন্য প্রাণীদের বিরক্ত করা আইনত নিষিদ্ধ। অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র হিসেবে বন্যপ্রাণী রক্ষায় ও সম্প্রসারণে এসব অভয়ারণ্যের গুরুত্ব অপরিসীম। অন্যদিকে ন্যাশনাল পার্ক, সংরক্ষিত বন ও ইকোপার্ক নির্মাণও বন্যপ্রাণী রক্ষায় অনবদ্য ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশে বর্তমানে ১৫টির বেশি ন্যাশনাল পার্ক এবং ১০টিরও বেশি ইকোপার্ক রয়েছে, যা বাংলাদেশের পরিবেশ সুরক্ষার পাশাপাশি বন্য প্রাণীর আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

খ. বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত আইন : বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন পাস হয় ১৯৭৩ সালে। আইনটি সংশোধন হয় ১৯৭৪ সালে। সর্বশেষ আইনটি সংশোধিত হয়ে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিল-২০১২ নামে জাতীয় সংসদে ২০১২ সালে পাস হয়। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের এই আইনটি সংশ্লিষ্ট মহলের প্রশংসা কুড়িয়েছে। কেননা এই আইন প্রণয়নের মাধ্যমে লাইসেন্স বা পারমিট গ্রহণ ছাড়া কোনো ব্যক্তির পক্ষে কোনো বন্যপ্রাণী শিকার বা ইচ্ছাকৃত ধ্বংস বা সংগ্রহ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বিপন্ন, বিপদাপন্ন প্রজাতি নির্ধারণ, বন্যপ্রাণী অপসারণ, বন্যপ্রাণী অবমুক্তকরণ, পারমিট প্রদান, অভয়ারণ্য ঘোষণা ও ব্যবস্থাপা, অভয়ারণ্যে প্রবেশ, জাতীয় উদ্যান ঘোষণা, সাফারি পার্ক, ইকো পার্ক, উদ্ভিদ উদ্যান, বন্যপ্রাণী প্রজনন কেন্দ্র, করিডোর, বাফারজোন ও কোরজোন ইত্যাদি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট বিধান করা হয়েছে। এছাড়া জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা নির্ধারণ, আবদ্ধ প্রাণী, বন্যপ্রাণী আমদানি ও রপ্তানি, বন্যপ্রাণী উদ্ধারকেন্দ্র, বন্যপ্রাণী অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ইউনিট, অনুসন্ধান ও জব্দকরণসহ প্রভৃতি বিষয়ে বিধান করা হয়েছে। বাঘ ও হাতিহত্যা জনিত অপরাধে সর্বোচ্চ ১২ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং সর্বোচ্চ ১৫ লাখ টাকা পর্যন্ত জরিমানার বিধান রয়েছে। এছাড়া অভয়ারণ্যের বিধিনিষেধ লঙ্ঘনজনিত অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ ২ বছরের কারাদণ্ড এবং ১ লক্ষ টাকা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করার বিধান এবং এই অপরাধের পুনরাবৃত্তিতে ৫ বছর কারাদণ্ড এবং সর্বোচ্চ ৪ লক্ষ টাকা জরিমানা বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করার বিধান রয়েছে। চিতাবাঘ, লামচিতা, উল্লুক, সাম্বার হরিণ, কুমির, ঘড়িয়াল, তিমি বা ডলফিন, পাখি বা পরিযায়ী পাখি হত্যাজনিত অপরাধের ক্ষেত্রেও সুনির্দিষ্ট দণ্ড প্রদানের বিধান রয়েছে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

গ. বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে বিশেষ সংস্থা : বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে বাংলাদেশে বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হলো বনবিভাগ এবং বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে বাংলাদেশ সরকার এই প্রতিষ্ঠানদ্বয়কে বিশেষ কর্তৃত্ব প্রদান করেছে। এদের অনুরোধে বাংলাদেশ পুলিশ, বিজিবি, আবগারী ও শুল্ক বিভাগ যথাযথ পদক্ষেপ নিতে এগিয়ে আসে। এছাড়া বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও পরিবেশের সুরক্ষায় বিশ্বের নানা সংস্থার সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়ায় বন্য প্রাণীর ক্ষতিসাধন দিনদিন হ্রাস পাচ্ছে।

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে বাংলাদেশের ব্যর্থতা : দেশে মোট বন্যপ্রাণী প্রজাতির সংখ্যা ১ হাজারের বেশি। এদের মধ্যে বন ও বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল ধ্বংস, বন্যপ্রাণীর অবৈধ ব্যবসা এবং পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে হুমকির মুখে রয়েছে ২১৯ প্রজাতির প্রাণী। অপরদিকে মহাবিপন্ন ৬৫টি প্রজাতি, বিপন্ন ৯৫, সংকটাপন্ন ৫৯ এবং বিলুপ্ত প্রাণীর সংখ্যা ১৩টি। বিলুপ্ত প্রাণীদের মধ্যে গোলাপি শির হাঁস, বাদি হাঁস, একশিঙ্গা গন্ডার, বারশিঙ্গা, প্যারা হরিণ, রাজশকুন, মিঠা পানির কুমির এবং হকস বিল্ড টারটল অন্যতম। দেশের হাট-বাজারে এমনটি শহরের রাস্তাঘাটেও বিভিন্ন বন্য পশু-পাখি ও এদের মাংস বিক্রি বন্যপ্রাণীর অস্তিত্বের হুমকিস্বরূপ। সময়মতো প্রয়োজনীয় উদ্যোগ না নেওয়া, আইনের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন না হওয়া, চোরাকারবারী ও শিকারিদের দমন না করতে পারা এবং জনসচেতনতার অভাবই বন্যপ্রাণীর বিলুপ্তি ও হুমকির কারণ। অন্যদিকে বিশ্বখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগারের বাস বাংলাদেশের সুন্দরবনে। এই বাঘের কারণেই পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবন এখন পর্যন্ত টিকে রয়েছে। না হয় আরো আগেই সুন্দরবন কাঠ চোরদের দ্বারা ধ্বংস হয়ে যেত। অথচ বিগত কয়েক দশক ধরে শিকারি ও কাঠ চোরদের কারণে সুন্দরবনের বাঘের সংখ্যা বাড়ছে না। বরং প্রায় সময়ই শিকারিদের হাতে বাঘ মারা যাওয়ার সংবাদ পাওয়া যায়। সুন্দরবনের অবস্থান বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে হলেও বাঘ রক্ষায় এখন পর্যন্ত কোনো যৌথ উদ্যোগ কিংবা বিশেষ উদ্যোগ নেয়া হয়নি, যা বাঘ রক্ষায় উভয় দেশেরই ব্যর্থতার প্রমাণ করে।

এছাড়া বন্য প্রাণী রক্ষায় বাংলাদেশের আরো যে ব্যর্থতা রয়েছে তা নিচে উল্লেখ করা হলো।

১. বন্যপ্রাণী রক্ষা ও সংরক্ষণ আইনটির বাস্তবায়নে অনগ্রসরতা।
২. পরিবেশ, বন ও বন্যপ্রাণী রক্ষার আন্দোলন জোরদার না হওয়া।
৩. অবৈধভাবে পাহাড় কাটা ও নদীর বালু উত্তোলন বন্ধ করতে না পারা।
৪. অতিথি পাখি রক্ষায় উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ না নেওয়া।
৫. বন্য পশুপাখির মাংস এমনকি জীবিত পাখি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বিক্রি বন্ধ না করতে পারা।
৬. সর্বস্তরের মানুষ বিশেষ করে গ্রাম এলাকার জনসাধারণের জন্য বন্যপ্রাণী রক্ষায় সচেতনতামূলক বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করতে না পারা।
৭. অবৈধভাবে বন্যপ্রাণী পাচার রোধ করতে না পারা।
৮. বন্যপ্রাণীর আবাস্থল রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা না রাখা।

উপসংহার : বাংলাদেশে বণ্যপ্রাণী রক্ষায় নানা উদ্যোগ নেয়া হলেও এখনো মানুষের হাতে নির্বিচারে বন্যপ্রাণী মারা যাচ্ছে। অবিলম্বে বন্যপ্রাণী রক্ষণ ও নিরাপত্তা আইন বাস্তবায়ন না হলে অচিরেই হয়তো আমরা বন্যপ্রাণীর অনেক প্রজাতিকেই দেখতে পারব না। যে কোনো মূল্যে বাংলাদেশের ফুসফুস সুন্দরবনের জীববৈচিত্রকে রক্ষা করতে হবে। বিদেশ থেকে বিশেষ করে সাইবেরিয়া থেকে আগত অতিথি পাখিকে কোনোভাবেই বিরক্ত করা যাবে না। আমাদের দেশের সকল স্তরের মানুষকে নিজ নিজ জায়গা থেকে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে, যাতে এসব বন্যপ্রাণীর জন্য অভয়াশ্রম হয় সমগ্র বাংলাদেশ।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৭)

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

০৪ । 'কৃষির আধুনিকায়ন জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত, কিন্তু জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার পূর্বশর্ত'–ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলত কৃষিনির্ভর। আর তাই কৃষির আধুনিকায়নের মাধ্যমে অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা এবং খাদ্য সঙ্কট মেটানো সম্ভব। সীমিত জমি এবং অধিক জনসংখ্যার এ দেশে একমাত্র কৃষির আধুনিকায়ন-ই পারে সমৃদ্ধি এনে দিতে। কিন্তু কৃষির আধুনিকায়ন এবং মানুষের নিজের প্রয়োজনে প্রকৃতির পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট প্রাকৃতিক ক্ষতিতে জীববৈচিত্র্য নষ্ট হচ্ছে। জীববৈচিত্র্য নষ্ট হওয়াতে খাদ্যচক্র এবং জীবনচক্রের যে ভারসাম্যহীনতা দেখা দিচ্ছে তাতে গাছপালা কাটার ফলে যে ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি হচ্ছে এতে মানুষের নিজের অস্তিত্বই হুমকির মুখে পড়ছে। তাই জীববৈচিত্র্য এবং পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা রক্ষা একটি জাতীয় দায়িত্ব এবং আমাদের নিজেদের প্রয়োজনেই এটা করতে হবে।

কৃষির আধুনিকায়ন জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত : কৃষিই বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি। আর তাই কৃষির আধুনিকায়নের মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব। কৃষিপ্রধান এ দেশের রয়েছে কৃষির উপযোগী সবকিছু। এগুলো হলো—

উর্বর পলিজ মাটির প্রাচুর্য : মৃত্তিকা গবেষণা প্রতিষ্ঠান (SRDI) প্রায় ৫০০ শ্রেণীর মাটি শনাক্ত করেছে। এ ৫০০ শ্রেণীর মধ্যে বন্যা দ্বারা সঞ্চিত পলিজ মাটি বেশি, যা নদীর মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়। বাংলাদেশের গর্ব হচ্ছে নদী। প্রায় ৩১০টি নদীর জাল ছড়িয়ে আছে এ দেশে। প্রতিবছর প্রচুর পরিমাণে পলি জমিকে উর্বর করে।

শস্যাবর্তনের জন্য অনুকূল আবহাওয়া : বাংলাদেশের জলবায়ু কৃষি কাজের জন্য অত্যন্ত অনুকূল। ফলে এখানে বছরে চারটি কৃষি মৌসুমে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়। আর এখানকার জীববৈচিত্র্যও ব্যাপক।

সুবিধাজনক সেচ ব্যবস্থা : বৃষ্টি, নদ-নদী এবং ভূ-গর্ভে পানির প্রাচুর্য বিদ্যমান। মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে উত্তর-পশ্চিম এলাকায় গড়ে প্রায় ১২৫ সেমি এবং পূর্বাঞ্চলে প্রায় ৪০০ সেমি বৃষ্টিপাত হয়। ৫৫ হাজার বর্গকিমি অঞ্চল, যা দেশের এক-তৃতীয়াংশ শুষ্ক মৌসুমেও পানি সুবিধার আওতায় থাকে।

কৃষিক্ষেত্রে সস্তা শ্রমিকের প্রাপ্তি : বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োজনাতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োজিত। তাই শ্রম অনেক সস্তা। যদিও শিক্ষা বিস্তার এবং নগরায়নের ফলে শ্রমিক অন্য ক্ষেত্রে চলে যাচ্ছে; তবুও দেশের মোট শ্রমশক্তির ৪৭.৩০% কৃষিতে নিয়োজিত।

কৃষির আধুনিকায়ন : এত সব সুযোগ-সুবিধা থাকার পরও আমাদের দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা এ দেশে শুধু কৃষিক্ষেত্রে আধুনিকায়নের অভাবে অন্যান্য দেশের তুলনায় হেক্টর প্রতি কম উৎপাদন হয়। বাংলাদেশে কৃষিক্ষেত্রে এ অনগ্রসরতার কারণগুলো হলো —

১. **সনাতন চাষ পদ্ধতি :** অধিকাংশ গ্রামেই এখনো কাঠের লাঙল এবং গরু কৃষকের চাষের একমাত্র সম্বল। এটি কৃষিক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকার একটি বড় কারণ।

২. **ভালো বীজের অভাব :** ভালো এবং উন্নত বীজের অভাবে আমাদের উৎপাদন কম। তাছাড়া ভালো বীজ সংরক্ষণের ব্যাপারেও কৃষকরা উদাসীন।

৩. **সারের অভাব :** অধিকাংশ কৃষকই পরিকল্পিত এবং নিয়মমাফিক সারের ব্যবহার জানেন না। তাছাড়া সারের অভাবও রয়েছে আমাদের দেশে।

৪. **প্রাকৃতিক দুর্যোগ :** যদিও এ ক্ষেত্রে মানুষের হাত কম। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে ফসলহানি এবং ফসল উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটে।

৫. **সেচের অভাব :** ফসলের ক্ষেতে সেচের অভাব আমাদের নদীমাতৃক দেশে অভাবনীয় হলেও বিদ্যুৎ, তেল, পাম্পের অপ্রতুলতা, পরিকল্পিত সেচ প্রকল্পের অভাবের কারণে ফসলের উৎপাদন ব্যাহত হয়।

৬. **অন্যান্য :** এ মূল কারণগুলো ছাড়াও কিছু কারণ রয়েছে। যেমন— কৃষকদের শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের অভাব, ঋণের স্বল্পতা, কৃষি জমির ক্ষুদ্রায়তন ও খণ্ড-বিখণ্ডতা; কীটপতঙ্গের আক্রমণ, দক্ষ শ্রমিকের অভাব প্রভৃতি সমস্যার কারণে পর্যাপ্ত সুযোগ এবং সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও আমরা কৃষিক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছি।

এত সব সমস্যার পরও আমাদের কৃষিক্ষেত্রে যে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগেনি তা নয়। বিশ্বব্যাপী সবুজ বিপ্লবের ধারাবাহিকতায় আমাদের দেশের কৃষিক্ষেত্রে আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে। যেমন—

১. **উন্নত বীজ :** সোনার বাংলা-১, উফশী, আলোক-৬২০১, ব্রি-২৮, ব্রি-২৯ ইত্যাদি উচ্চ ফলনশীল বীজের ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২. **সারের ব্যবহার :** আগের চেয়ে সারের ব্যবহার বর্তমানে বহু গুণ বেড়েছে। ইউরিয়া, পটাশ, ফসফেট, জিঙ্ক ইত্যাদি সার ব্যবহার হচ্ছে। উচ্চ ফলনশীল জাত চাষের জন্য অবশ্যই সার ব্যবহার করতে হয়। তাই দিন দিন সারের ব্যবহার বাড়ছে।

৩. **কীটনাশকের ব্যবহার :** আমাদের দেশে কীটপতঙ্গের আক্রমণে ১৬% ধান, ১১% গম, ২৫% শাকসবজি এবং ১৫% পাট নষ্ট হয়। কীটনাশকের ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে এ ক্ষতি মেটানো সম্ভব। যদিও কীটনাশকের ব্যবহার বিতর্কের মুখে পড়েছে।

৪. **সেচ :** স্যালো এবং ডিপ মেশিন ব্যবহারের মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার বাড়ছে। তাছাড়া বিভিন্ন সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বাড়ানোর চেষ্টা চলছে।

৫. **ভর্তুকি :** যদিও কৃষিক্ষেত্রে সরকারি সাহায্য একদম অপ্রতুল। কিন্তু অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তির পেছনে ভর্তুকি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

উন্নত বীজ, সার, সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে একই জমিতে বেশিবার ফসল ফলানোর মাধ্যমে আমাদের উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে আশা করা যায়, আগামীতে আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে সক্ষম হব। এতে অপুষ্টি এবং দারিদ্র্য হ্রাস পাবে। এজন্য কৃষিক্ষেত্রে আধুনিকায়নকে আরো জোরদার করতে হবে এবং পরিকল্পিত উপায়ে চাষাবাদ করতে হবে।

আধুনিকায়নের কুফল : কৃষিক্ষেত্রে আধুনিকায়নের ফলে বর্তমানে আমরা বেশ কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছি। এ সমস্যাগুলো হচ্ছে—

১. **জমির উর্বরতা হ্রাস :** হাইব্রিড এবং উচ্চ ফলনশীল জাত চাষাবাদের ফলে বর্তমানে একই জমিতে বছরে কয়েক বার চাষ করা হচ্ছে। আর ফসল চাষে বৈচিত্র্য না থাকায় মাটির একটি মাত্র স্তর বার বার ব্যবহারে মাটির উর্বরতা ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে।

২. **কীটনাশকের ব্যবহার বৃদ্ধি :** ফসলের ক্ষতি রোধ করতে এবং আগাছা দমনের জন্য কীটনাশকের ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় অনেক ধরনের জটিলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কীটনাশক ব্যবহারের সঠিক পদ্ধতি জানা না থাকায় কৃষকেরা এর বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছে। যদিও এগুলোর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া বোঝা যায় না। তবে অনেকদিন পর মারাত্মক রোগের সৃষ্টি হয়। তাছাড়া রাসায়নিক সার এবং

কীটনাশকের ব্যবহারের ফলে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। শুধু মাছই নয়, বিভিন্ন ধরনের জলজ প্রাণী, পাখি এবং ফসলের উপকারী কীটপতঙ্গও কীটনাশক ব্যবহারের ফলে হারিয়ে যাচ্ছে।

৩. **রাসায়নিক সার :** আমাদের কৃষি জমিতে বিরামহীন আবাদ এবং আগের মতো শস্যচক্রের পন্থা অবলম্বন না করায় কৃষি জমির গুণগতমান খুব খারাপ হয়ে গেছে। এর ফলে মাটির ভৌত, রাসায়নিক ও গঠনগত মানের ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটে মাটি অনুর্বর হয়ে পড়ছে। দীর্ঘদিন ধরে রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে মাটির জৈব উপাদান কমে যাচ্ছে। সাথে সাথে মাটিতে থাকা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণুজীব কেঁচোর সংখ্যা কমে যাচ্ছে। এতে করে মাটির প্রাকৃতিক উর্বরতা বৃদ্ধির প্রক্রিয়া নষ্ট হয়ে পড়ছে, মাটি শক্ত হচ্ছে এবং অম্লীয় বা ক্ষারকীয় গুণসম্পন্ন হচ্ছে।

৪. **সেচ :** সেচ পাম্পের সাহায্যে সেচের ফলে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর দিন দিন নিচে নেমে যাচ্ছে। প্রায় দেশব্যাপী আর্সেনিক সমস্যা এ সেচ ব্যবস্থার একটি বড় কুফল। তাছাড়া সেচ পাম্পের মাধ্যমে বিভিন্ন বদ্ধ জলাশয়, পুকুর থেকে জমিতে পানি সেচের ফলে দেশীয় মাছ তাদের বংশবিস্তার করতে পারছে না। এতে করে অনেক প্রজাতির মাছ বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। শুধু মাছই নয়, এতে করে বিভিন্ন জলজ উদ্ভিদ, প্রাণী এবং এসব নির্ভর অনেক পাখিও বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

৫. **বেকার সমস্যা :** আমাদের দেশে কৃষিখাতে মোট জনশক্তির ৪৮.১% লোক নিয়োজিত। এ অদক্ষ এবং দক্ষ শ্রমিকের কাজ কমে যাচ্ছে বিভিন্ন যান্ত্রিক পদ্ধতির বহুল ব্যবহারের ফলে। অথচ অন্যান্য ক্ষেত্রে দেশের বেকার সমস্যা দিন দিন মারাত্মক আকার ধারণ করছে।

জীববৈচিত্র্য এবং পরিবেশ : আমাদের বেঁচে থাকার জন্য অর্থাৎ মানুষের এবং পৃথিবীর অস্তিত্বের জন্য জীববৈচিত্র্য এবং পরিবেশের প্রভাব অপরিসীম। এ পৃথিবী চলছে একটি চক্রের আবর্তনের মধ্য দিয়ে। আর এ চক্রের আবর্তন সঠিকভাবে চলতে গেলে জীববৈচিত্র্য এবং পরিবেশের সংরক্ষণ একান্ত জরুরি। কিন্তু মানুষ তার বিবিধ প্রয়োজনে নির্বিচারে গাছ কাটছে এবং প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণের জন্য পরিবেশ দূষিত করছে। ফলে ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী এবং উদ্ভিদ। আর আবাদি জমি বৃদ্ধি এবং আবাসনের জন্য নির্বিচারে গাছ কাটার ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে, বাড়ছে গ্রিন হাউজের প্রভাব।

আমাদের দেশের লোকসংখ্যা অনেক বেশি। এর ফলে আবাদি জমি বৃদ্ধি এবং আবাসনের জন্য গাছ কাটা হচ্ছে। কিন্তু একটি দেশের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় যে পরিমাণ বনভূমি থাকার প্রয়োজন তার থেকে অনেক কম বনভূমি আমাদের রয়েছে। একটি দেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য মোট জমির ২৫ ভাগ বনভূমি থাকা প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশের বনভূমির পরিমাণ ২৫ লক্ষ হেক্টর, যা দেশের মোট আয়তনের শতকরা ১৭.০৮ ভাগ মাত্র। আর দিন দিন এর পরিমাণও কমে যাচ্ছে। এতে করে বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এসব দুর্যোগে প্রাণহানি এবং ফসলহানি ঘটছে, যার প্রভাবে অর্থনীতির মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে। আজ আর আমাদের গর্বের ঋতু বৈচিত্র্যের দেখা পাওয়া যায় না। এখন মাত্র তিনটি ঋতু বোঝা যায়। তাতেও শীত, গ্রীষ্ম এবং বর্ষার বাড়াবাড়িতে আগের আমেজ পাওয়া যায় না। ষড়ঋতুর এ দেশের আজকের এ পরিণতির কারণ শুধু আমরা নই, সারা বিশ্বের মানুষ। মূলত উন্নত বিশ্বের মানুষ।

বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে করে আমাদের দেশের অনেক অংশ পানির নিচে তলিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে সমুদ্রের লোনা পানি উপরে চলে আসছে। এতে করে জমির লবণাক্ততা বাড়ছে এবং বন্যার আশঙ্কা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

মানুষের এ আগ্রাসনের ফলে জীববৈচিত্র্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। মাছে-ভাতে বাঙালির কাছে মাছ আজ দুর্লভ বস্তু। আবার এ মাছের এবং বিভিন্ন জলজ প্রাণী এবং উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল পাখি আজ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বিভিন্ন প্রজাতির সাপ, ব্যাঙ, মাছ বিলুপ্ত হওয়াতে প্রাণিচক্রের যে ভারসাম্যহীনতা দেখা দিচ্ছে তাতে সমগ্র প্রাণিজগৎ হুমকির সম্মুখীন হতে পারে। আজ আর বিভিন্ন ধরনের পাখির কলতানে পরিবেশ মুখরিত হয় না। তাছাড়া গ্রামাঞ্চলের ছোট ছোট ঝোপঝাড়ে যেসব প্রাণী বসবাস করতো তাদের সংখ্যাও হ্রাস পাচ্ছে।

গোটা বাংলাদেশ জুড়েই ধান হয় প্রায় ৩০টি ভিন্ন ভিন্ন কৃষি পরিবেশে। ১৯১০ সাল থেকে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত এখানে ২০০০ প্রজাতির আউশ ধান পাওয়া যেত। পানির মধ্যে চাষ করার মতো ৮০০ প্রজাতির আমন ধান পাওয়া যেত। এমনকি ১৯৬০ সাল পর্যন্ত এখানকার ধানের প্রায় ৩০০০ প্রজাতির সন্ধান পাওয়া যায়।

১৯৭৯-৮০ সালে বাংলা অঞ্চলে আবাদ হওয়া ধানের প্রজাতিসমূহের ওপর যে শুমারি চালানো হয় তাতে করে সেখানে আশ্চর্যজনক হলেও সত্য, নিবন্ধিত ধানের প্রজাতির সংখ্যা দাঁড়ায় ১২,৪৭৯। অথচ বর্তমানে এ বৈচিত্র্য অনেকটাই হারিয়ে গেছে। বিভিন্ন পরিবেশে খাপ খাইয়ে নেয়া এসব প্রজাতির ধান আজ আর জন্মে না।

জীববৈচিত্র্য রক্ষায় বাংলাদেশ : বাংলাদেশ এ পর্যন্ত জীববৈচিত্র্য রক্ষার অঙ্গীকার করে যেসব জায়গায় স্বাক্ষর করেছে তা হলো—CITES, World Heritage Convention, Ramsar Convention, CBD, Climate Change Convention and Convention to Combat Desertification. জীববৈচিত্র্য বিষয়ক কনভেনশনে দেয়া জাতীয় অঙ্গীকার বিবেচনা করে বাংলাদেশ সরকার জীববৈচিত্র্য রক্ষার্থে পরিকল্পনা ও কৌশল প্রণয়ন এবং কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ National Conservation Strategy (NCS) এবং National Environment Management Action Plan (NEMAP) গঠন করেছে এবং বাংলাদেশের প্রাণী তালিকা প্রণীত হয়েছে। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণার্থে তিন ধরনের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে; যেগুলোর মধ্যে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কেন্দ্র, ন্যাশনাল পার্ক, মৎস্য সংরক্ষণ কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে। পরিবেশগতভাবে জীববৈচিত্র্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ মুমূর্ষু এলাকা চিহ্নিত করা হয়েছে Ecologically Critical Area (ECA) হিসেবে। বাংলাদেশে ১৪টি বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কেন্দ্র, ১৭টি ন্যাশনাল পার্ক নির্মিত হয়েছে। ঋতুভেদে মাছ ও তার আবাস সংরক্ষণের জন্য মৎস্য সংরক্ষণ কেন্দ্র তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা প্রতিষ্ঠানে (BRRI) ধানের প্রজাতি সংরক্ষণের লক্ষ্যে জিন ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

উপসংহার : জীববৈচিত্র্য নষ্ট হলে প্রাণিজগতের অংশ হিসেবে মানুষের নিজের অস্তিত্বও হুমকির মুখে পড়বে। এ প্রাকৃতিক জগৎ যে জীবনচক্র মেনে চলে তাতে ব্যত্যয় ঘটলে সমগ্র প্রাকৃতিক জগতই ধ্বংস হতে পারে। ইতোমধ্যে আমাদের দেশে এ ভারসাম্যহীনতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। উত্তরাঞ্চলে মরু প্রক্রিয়া, সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দক্ষিণাঞ্চল প্লাবিত হওয়া, অতিবৃষ্টি-অনাবৃষ্টি, বেশি গরম, বেশি শীত অনুভূত হওয়া, ঋতুবৈচিত্র্য নষ্ট হওয়া, নদ-নদী শুকিয়ে যাওয়া প্রভৃতি হাজারো সমস্যার দেখা যাচ্ছে। আর এগুলো আমাদের জাতীয় জীবনের প্রতি হুমকিস্বরূপ। কৃষির আধুনিকায়নসহ শিল্পে আধুনিকায়ন যেমন অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য একান্ত প্রয়োজন তেমনি জীববৈচিত্র্য এবং পরিবেশের সংরক্ষণ না করা গেলে তা হবে জাতীয় অস্তিত্ব বিনষ্টের কারণ। তাই আমাদের দরকার সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রকৃতিকে নষ্ট না করে বরং প্রকৃতিকে সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে নিজেদের উন্নয়ন সাধন করা। তাহলেই পৃথিবী রক্ষা পাবে ধ্বংসের হাত থেকে এবং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদেরকে অপরাধের কাঠগড়াতে দাঁড় করাবে না।

০৫। বাংলাদেশের অর্থনীতি ও পরিবেশের ওপর বনায়নের গুরুত্ব সম্পর্কে একটি নিবন্ধ রচনা করুন।

উত্তর : সুদূর অতীতকাল থেকেই বাংলাদেশ একটি ঘন অরণ্যের দেশ হিসেবে পরিচিত হলেও মূলত ব্রিটিশ শাসন থেকেই এ দেশে শুরু হয় অরণ্য নিধনযজ্ঞ। বিপুল জনগোষ্ঠীর মানবিক প্রয়োজনে নির্বিচারে উজাড় হতে থাকে এ দেশের বনজ সম্পদ। ফলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্টসহ পরিবেশ ও তাপমাত্রার ব্যাপক বিপর্যয় সৃষ্টি হচ্ছে। অন্যদিকে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, পরিবেশ সুরক্ষা ও মানবিক চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে বনজ সম্পদের অনন্য ভূমিকা রয়েছে। তাই বাংলাদেশ তথা বিশ্বব্যাপী বনজ সম্পদ সুরক্ষা ও তার উন্নয়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান বিষয় হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

বাংলাদেশের বনভূমির অবস্থান : কোনো দেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য মোট ভূ-ভাগের ২৫% বনভূমির প্রয়োজন থাকলেও বাংলাদেশে ১৭.০৮% বনভূমি রয়েছে। এর মোট পরিমাণ ২৫ লক্ষ হেক্টর বা প্রায় ২৫ হাজার বর্গকিলোমিটার। অবস্থান বা প্রকৃতি অনুসারে বাংলাদেশের বনভূমি মোট ৩টি শ্রেণীতে বিভক্ত।

বনভূমির শ্রেণীবিভাগ : উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য অনুসারে বনভূমি আবার ৩টি শ্রেণীতে বিভক্ত। এগুলোকে বিভিন্ন জাতের বৃক্ষ ও তার প্রকৃতি অনুযায়ী বিভাজন করা হয়েছে। যথা :

ক. **ক্রান্তীয় পতনশীল ও পত্রযুক্ত বৃক্ষের অরণ্য :** বৃহত্তর ময়মনসিংহ, ঢাকা, দিনাজপুর ও রংপুর অঞ্চল তথা শালভূমিতে এরূপ বনাঞ্চল দেখতে পাওয়া যায়।

খ. **ক্রান্তীয় চিরহরিৎ পতনশীল পত্রযুক্ত বৃক্ষের অরণ্য :** বৃহত্তর চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেট জেলার পাহাড়ি অঞ্চলে এরূপ বনভূমি অবস্থিত।

গ. **টাইডাল বা স্রোতজ অরণ্য :** খুলনা ও সাতক্ষীরা, বাগেরহাট ও বরগুনা জেলার সুন্দরবন এবং চট্টগ্রাম জেলার উপকূলবর্তী এলাকার বনভূমি।

এছাড়া বরেন্দ্র অঞ্চলের বনভূমি, টাইডাল বনভূমি, গ্রামীণ বন প্রভৃতিও রয়েছে। অবশ্য এগুলো ওপরের বনাঞ্চলেরই অংশবিশেষ।

বরেন্দ্র অঞ্চলের বনভূমি : দিনাজপুর ও রংপুরের বরেন্দ্র অঞ্চলের বনভূমিকে বরেন্দ্র বনভূমি বলা হয়। এর আয়তন প্রায় ১৪৫০ হেক্টর বা ৩৯ বর্গকিলোমিটার। এ অঞ্চলের প্রধান বৃক্ষ শাল ও কড়ই।

টাইডাল বনভূমি : বাংলাদেশের বনভূমির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো টাইডাল বা স্রোতজ বনভূমি। যে বনভূমি জোয়ারের পানিতে প্লাবিত হয় এবং ভাটার সময় শুকিয়ে যায় তাকে টাইডাল বনভূমি বলে। সুন্দরবন হলো পৃথিবীর সর্ববৃহৎ টাইডাল বনভূমি। এছাড়া চকোরিয়ার সংরক্ষিত অঞ্চলেও টাইডাল বন দেখতে পাওয়া যায়।

গ্রামীণ বন : সমগ্র বাংলাদেশব্যাপী এ বনভূমির পরিমাণ ০.২৭ মিলিয়ন হেক্টর। ব্যক্তি মালিকানায় নিয়ন্ত্রিত এ ধরনের বনভূমিতে বিভিন্ন ধরনের গাছপালা, ফলের গাছ, বাঁশ প্রভৃতি রয়েছে।

বাংলাদেশ সরকার বনব্যবস্থাপনা অনুসারে বনভূমিকে নিচের কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করেছে। যেমন—

নাম	*ব্যবস্থাপনা*	*পরিমাণ*
ক. খাস অরণ্য	*বন বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন*	*প্রায় ৭০০০ ব.কি.মি.*
খ. সংরক্ষিত অরণ্য	*বন বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন*	*প্রায় ২২৫ ব.কি.মি.*
গ. রাষ্ট্রীয় বনভূমি	*সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণাধীন*	*প্রায় ২৩০০ ব.কি.মি.*
ঘ. বেসরকারি বনভূমি	*বেসরকারি উদ্যোগে নিয়ন্ত্রণাধীন*	*প্রায় ৪৫ ব.কি.মি*
ঙ. সামাজিক বনভূমি	*গ্রামীণ এলাকায় ও রাস্তাঘাটে রোপিত বনভূমি*	*৭৫০ ব.কি.মি.*

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

বিভাগওয়ারী বনভূমি : দেশের জেলাভিত্তিতে মাত্র ৭টি জেলায় পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার মতো প্রয়োজনীয় বনভূমি রয়েছে। জেলাগুলো হচ্ছে—খুলনা, বাগেরহাট, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, রাঙামাটি, বান্দরবান ও সাতক্ষীরা। তবে বিভাগওয়ারী প্রয়োজনীয় বনভূমির পরিমাণ খুবই সামান্য। যেমন :

ঢাকা	*৭%*	*চট্টগ্রাম*	*৪৩%*
রাজশাহী	*২%*	*বরিশাল*	*৩%*
খুলনা	*৩৯%*	*সিলেট*	*৬%*

এ থেকে দেখা যায়, খুলনা ও চট্টগ্রাম ছাড়া অন্যান্য বিভাগে বনভূমির পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় খুবই হতাশাজনক। উল্লেখ্য, রংপুর বিভাগকে এখনো হিসাবে আনা হয়নি।

বনবিভাগ কর্তৃক বনায়নের বেহাল অবস্থা : সরকার যখন নতুন নতুন বনভূমি সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের বনাঞ্চল বৃদ্ধির কর্মসূচি গ্রহণ করেছে, তখন সংবাদ আসছে পুরাতন বনভূমি বেদখলের। অবশ্য এ ঘটনা ঘটছে দেশের সর্বত্র, তবে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে যা ঘটছে তা খুবই ভয়াবহ। এই জেলাদ্বয়ের সংরক্ষিত বনভূমির প্রায় এক লক্ষ একর বেদখল হয়েছে। এ বেদখল প্রক্রিয়া খুবই বিচিত্র। বনভূমির পার্শ্ববর্তী এলাকার লোকেরা দীর্ঘদিন যাবৎ বনের গাছ কেটে নিজেদের জমির চৌহদ্দি বৃদ্ধি করছে। অন্যদিকে সরকারের তরফ থেকে বনাঞ্চলে এক শ্রেণীর লোকের বসবাসের জন্য এক একর পরিমাণের জমি বরাদ্দ করা হয়েছে। এই শ্রেণীর লোকেরা তাদের বরাদ্দের এক একরের স্থলে ৮/১০ একর জমি দখল করছে। তাছাড়া স্থানীয় প্রভাবশালী লোকেরা বন দখল করছে। এই শ্রেণীর লোকেরা জেলার সীমানার হেরফের দেখিয়ে বনের জমি দখল করা ছাড়াও বনভূমিতে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন করছে। পুনর্বাসিতদের দ্বারা বন পরিষ্কার করার মাধ্যমেও ঐ জমি নিজেদের বলে চালিয়ে দিচ্ছে। আর এভাবেই বনভূমির জমি সরকারের বেহাত হচ্ছে। দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও এ সমস্যাটি অত্যন্ত তীব্র আকারে দেখা যাচ্ছে।

সরকারি পদক্ষেপ ও তার কার্যকারিতা : বনভূমির স্বল্পতার জন্য আমাদের দেশের প্রকৃতি ও পরিবেশে ইতিমধ্যেই ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হয়েছে। দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল রূপান্তরিত হচ্ছে মরু অঞ্চলে। এ পরিস্থিতি রোধকল্পে সরকার একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এই কর্মসূচির লক্ষ্য হচ্ছে পুরাতন বনভূমি সংরক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে নতুন বনভূমি সৃষ্টি করা। ইতিমধ্যে এ খাতে বিপুল অর্থও ব্যয় হয়েছে। নতুন যে পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে তাতে ২৬ লক্ষ একর নতুন জমিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, পুরাতন বনভূমি রক্ষায় বনবিভাগ যেখানে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে, সেখানে তাদের পক্ষে নতুন বনভূমি সৃষ্টি করা কি সম্ভব? এ উদ্দেশ্যে তাদের হাতে যে বিপুল অর্থ দেয়া হবে তা সদ্ব্যবহার হবে, নাকি বনভূমির মতো বেহাল হয়ে যাবে?

বাংলাদেশের অর্থনীতি ও পরিবেশের ওপর বনজ সম্পদের গুরুত্ব : বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বনজ সম্পদের অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মোট জিডিপি প্রবৃদ্ধির প্রায় ৪.৪২ ভাগ আসে বনজ সম্পদ থেকে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিবেশ রক্ষার্থে বনজ সম্পদ যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে তা হলো :

১. **শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে :** বাংলাদেশে বনজ সম্পদের মোট পরিমাণ প্রায় ৩৬৩৮.৫০ মিলিয়ন ঘনফুট। শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে এর প্রধান চাহিদা কাগজ কলগুলোতে। কাগজ কলগুলোতে যেসব কাঁচামাল ব্যবহৃত হয়, তা ছকাকারে নিচে দেয়া হলো :

কাগজ কল	কাঁচামাল
১. খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল	সুন্দরী ও গেওয়া কাঠ
২. কর্ণফুলী কাগজ কল	বাঁশ
৩. পাকশী কাগজ কল	আঁখের ছোবড়া
৪. সিলেট মণ্ড ও কাগজকল	নলখাগড়া ও সাফাইঘাস
৫. খুলনা হার্ডবোর্ড মিল	সুন্দরী কাঠ

২. **ঘরবাড়ি ও আসবাবপত্র নির্মাণে :** ঘরবাড়ি ও আসবাবপত্র নির্মাণে বনজ সম্পদের অবদান অসামান্য। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের কাঠ দ্বারা নানা জাতীয় শিল্পদ্রব্যও নির্মিত হয়, যা এদেশের শিল্পোন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। যেমন :

সুন্দরী কাঠ : গৃহনির্মাণ, টেলিগ্রাফ ও বিদ্যুৎ লাইনের খুঁটি, নৌকা তৈরি, কাগজ প্রস্তুত ও জ্বালানি সরবরাহ
গেওয়া কাঠ : বাক্স ও দেয়াশলাই তৈরি এবং কাগজ প্রস্তুত
ধুন্দল কাঠ : পেন্সিল তৈরি
গরান গাছের ছাল : রঙ তৈরি ইত্যাদি

৩. **জ্বালানি সরবরাহের ক্ষেত্রে :** গ্রামপ্রধান বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলত কৃষিভিত্তিক। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ গ্রামাঞ্চলে বসবাস করে। আর তাদের গৃহস্থালীর কাজে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার হয়ে থাকে বন থেকে আহরিত কাঠ।

৪. **প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী সরবরাহের ক্ষেত্রে :** প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী সরবরাহের ক্ষেত্রেও বনজ সম্পদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বন থেকে আহরিত পণ্যসামগ্রীর অর্থনৈতিক মূল্যও অসাধারণ।

৫. **পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে :** সমসাময়িক বিশ্বে বহুমাত্রিক সমস্যার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সমস্যা হচ্ছে পরিবেশ দূষণ। পরিবেশ দূষণ রোধ তথা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে বনায়নের গুরুত্ব অপরিসীম। জাতীয় ও ব্যক্তিগত জীবনে পরিবেশের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে গিয়ে Franklin Roosevelt (1937) বলেছিলেন, 'The nation that destroy it land and forest destory itself.' জনৈক প্রকৃতিবিজ্ঞানী বলেছিলেন, 'যে ব্যক্তি দেশ ও দেশের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে সচেতন নন, তিনি যেমন একজন প্রকৃত ভোটার হতে পারেন না, তেমনি যে ব্যক্তি প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতন নন, তিনি একজন সুযোগ্য নাগরিক হতে পারেন না।' আর এক্ষেত্রে ব্যাপক বনায়নের কোনো বিকল্প নেই।

৬. **জীববৈচিত্র্যে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া রোধ :** পরিবেশ দূষণ জীববৈচিত্র্যে (Bio-diversity) নেতিবাচক পরিবর্তন আনছে। 'International Union for the Protection of Nature'-এর হিসাব অনুযায়ী, গত ৬০ বছরে পৃথিবী থেকে ৭৬ হাজার প্রজাতির প্রাণী ও কয়েক হাজার রকমের গাছপালা বিলুপ্ত হয়েছে। আরো ১৩২ রকমের স্তন্যপায়ী ও ২৬ প্রজাতির পাখি বিলুপ্তির পথে। একমাত্র বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি জোরদার করার মাধ্যমে জীববৈচিত্র্যের এ নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া রোধ করা সম্ভব।

৭. **প্রতিবেশ ও বাস্তুতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানে :** ব্যাপক বন উজাড়ের কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে মরুকরণ প্রক্রিয়া সূচিত হয়েছে। জমির উর্বরতা কমে যাচ্ছে। প্রতিবেশ ও বাস্তুতন্ত্রে সৃষ্টি হচ্ছে

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

ভারসাম্যহীনতা। তাই মানব সভ্যতার সুস্থ ও স্বাভাবিক বিকাশের স্বার্থে দূষণমুক্ত পরিবেশের জন্য বনায়নের গুরুত্ব অপরিসীম।

৮. **গ্রিন হাউস ইফেক্ট :** পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবর্তনশীল আবহাওয়ার প্রতিক্রিয়াকে গ্রিন হাউস ইফেক্ট বলে। শিল্প বিপ্লবের পর থেকে বিভিন্ন গ্রিন হাউস গ্যাসের কার্যকারিতায় পৃথিবীর তাপমাত্রা ক্রমশ বাড়ছে। বিজ্ঞানীদের মতে, এই শতাব্দীর মাঝামাঝি নাগাদ পৃথিবীর তাপমাত্রা ১.৫ থেকে ৪.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে। এতে মেরু অঞ্চলের জমাট বাধা বরফ গলবে। ফলে বাংলাদেশ, মালদ্বীপসহ অন্যান্য উপকূলীয় দেশের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হবে, যা পরিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। এমতাবস্থায় ব্যাপক বনায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৯. **অন্যান্য :** বাংলাদেশের অর্থনীতি ও পরিবেশের ওপর বনায়নের অন্যান্য গুরুত্বসমূহ নিম্নরূপ :

ক. কৃষি উন্নয়নে;
খ. পর্যটন শিল্প উন্নয়নে;
গ. পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে;
ঘ. কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে;
ঙ. বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে;
চ. প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায়;
ছ. ওষুধ তৈরির উপকরণে;
জ. ভূমিক্ষয় রোধে;
ঝ. পশুচারণ শিল্পে;
ঞ. প্রাকৃতিক দুর্যোগ হ্রাসে।

উপসংহার : বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে বনায়নের গুরুত্ব অপরিসীম। বনায়নের মাধ্যমে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির দ্বারা দারিদ্র্য বিমোচন করা সম্ভব। জাতিসংঘ বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশসহ উপমহাদেশের দেশগুলো পরিবেশ সমস্যার আবর্তে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার অন্তর্ভুক্ত। এমতাবস্থায় পরিবেশ সুরক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নকল্পে ব্যাপক বনায়ন অপরিহার্য।

০৬। বাংলাদেশের পরিবেশ ও অর্থনীতিতে সুন্দরবন ও উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনীর প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করুন।

উত্তর : পৃথিবীর আবহাওয়া ও পরিবেশ সুস্থ রাখতে এবং প্রাণী ও উদ্ভিদের বৈচিত্র্য সংরক্ষণ করতে অর্থাৎ জীবসমষ্টির বাসযোগ্য একটি পৃথিবীর জন্য এর স্থলভাগের চারভাগের একভাগ জমিতে বনাঞ্চল থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু বর্তমান পৃথিবীর গুটিকয়েক দেশ ছাড়া অন্য সব দেশে বনভূমির সংকোচন ঘটছে। এর প্রধান কারণ হলো অভূতপূর্ব জনবিস্ফোরণ ও পরিবেশ অসহনশীল মানুষের নানামুখী আত্মঘাতী কর্মকাণ্ড। বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ হওয়ার ফলে এদেশের বনভূমির পরিমাণ খুবই কম; জনপ্রতি মাত্র ০.০২ হেক্টর যা দেশের মোট ভূভাগের শতকরা মাত্র ১৩ ভাগ। বাংলাদেশের মোট বনভূমির এক বিরাট অংশ দখল করে আছে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম এর সুন্দরবন এবং উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী যা দেশের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ অবদান রেখে আসছে।

সুন্দরবন ও উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী : দেশের দক্ষিণের জেলাসমূহের মধ্যে খুলনা, বাগেরহাট, বরগুনা, পটুয়াখালী, সাতক্ষীরা জেলার উপকূলীয় এলাকাসমূহে সমুদ্রের লোনা পানির প্রভাবে যে ম্যানগ্রোভ জাতীয় বন গড়ে উঠেছে তাকে সুন্দরবন বলে। এছাড়াও দেশের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের পাহাড়ী জেলাসমূহ যেমন– চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, বান্দরবান, খাগড়াছড়িসহ বরিশাল, নোয়াখালী ও ভোলা জেলায় গড়ে উঠেছে উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী, যা আমাদের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাসহ অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে অতি প্রাচীনকাল থেকে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

পরিবেশে সুন্দরবন ও উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনীর গুরুত্ব : সুন্দরবনসহ উপকূলীয় এলাকার সবুজ বেষ্টনী আমাদের দেশের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ও অর্থনীতির উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে অতি প্রাচীন কাল থেকে। নিচে দেশের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সুন্দরবন ও উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনীর ভূমিকা আলোচনা করা হলো :

১. **গ্রিন হাউস ইফেক্ট থেকে রক্ষা :** বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বাড়ার ফলে তাপমাত্রা বাড়তে থাকে। এতে হাল্কা হয়ে যায় ওজোন স্তরে থাকা অক্সিজেনের অণু এবং পৃথিবীতে প্রবেশ করে সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মি এবং দেখা দেয় নানা প্রকার চর্মরোগ। তাই আমাদের দেশের বায়ুমণ্ডলীয় স্তরের কার্বন ডাই-অক্সাইড-এর পরিমাণ সহনীয় মাত্রায় রাখার জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সুন্দরবন এবং উপকূলীয় বনভূমি।

২. **বন্যা ও প্লাবন রোধ :** ঘন বনজঙ্গল পর্বতে, পাহাড়ে বা সমতল ভূমিতে বৃষ্টির জলের স্রোত, প্রবাহকে স্থানে স্থানে ঠেকায়; বিনা বাধায় যেতে দেয় না। এতে স্রোতের দোর্দণ্ড প্রতাপ বা গতিবেগ কমে আসে। ঠিক তেমনি আমাদের দেশের উপকূলীয় এলাকায় অবস্থিত সুন্দরবনসহ নানা প্রকার বনভূমি আমাদের দেশের দক্ষিণে অবস্থিত বঙ্গোপসাগর থেকে ধেয়ে আসা প্লাবন জলোচ্ছ্বাস থেকে দেশকে রক্ষা করে এবং পাহাড়ি এলাকার বনভূমি পাহাড়ি ঢল থেকে পাহাড়ি জনপদকে রক্ষা করে থাকে, যা পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৩. **বায়ুমণ্ডলের আর্দ্রতা বৃদ্ধি ও তাপমাত্রার সমতা রক্ষা :** বনের গাছপালার পাতা ও শাখা সূর্যরশ্মিকে সরাসরি মাটিতে পড়ায় বাধা প্রদান করে। ফলে বনের মাটি গরম হয় না। আর তাই বনের ভিতরে থাকা বাতাস মাটির সংস্পর্শে ঠাণ্ডা হয়ে যায়। এছাড়া গাছ প্রস্বেদনের মাধ্যমে বাতাসে জলীয়বাষ্প ছড়িয়ে দেয়। ফলে বাতাসে আর্দ্রতা বেড়ে যায় এবং বাতাসের তাপমাত্রা কমে আসে। ঠিক একইভাবে সুন্দরবন এবং উপকূলীয় অঞ্চলের বনভূমি আমাদের দেশের বায়ুমণ্ডলীয় তাপমাত্রার সমতা রক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখে, যা বীজের অঙ্কুরোদগমে এবং বৃষ্টিপাত হতে সহায়তা করে।

৪. **ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস রোধ :** ঘন বনাঞ্চল বা সারিবদ্ধ গাছের বেষ্টনী বাতাসের প্রবল বেগকে প্রশমিত করে। অবশ্য গতিরোধের হার নির্ভর করে গাছের ঘনত্ব ও উচ্চতার ওপর যা দুটোই উপকূলীয় বনাঞ্চলের রয়েছে, তাই প্রতিবছর বঙ্গোপসাগর থেকে আঘাত হানা বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও ঘূর্ণিঝড়-এর হাত থেকে দেশকে রক্ষা করে এ বনভূমি, যার উদাহরণ ২০০৭ সালের উপকূলীয় এলাকায় আঘাত হানা সিডর যার গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ২৬০-২৭০ কিমি। এই গতিতে বাধা প্রদান করে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে দেয় উপকূলীয় এই সবুজ বেষ্টনী ও সুন্দরবন।

৫. **ভূমির ক্ষয়রোধ :** গাছপালার শিকড় মাটিকে দৃঢ়ভাবে আটকে রাখে। গাছপালা বা ঘাসহীন মাটি বৃষ্টির তোড়ে বা বন্যার স্রোতে ধুয়ে যায়; এর সাথে ফসল উৎপাদনের জন্য অতি প্রয়োজনীয় উপাদান পটাশিয়াম, নাইট্রোজেন, ফসফরাস পানিতে ধুয়ে সাগরে মিশে যায়। এক হিসাবে দেখা গেছে পৃথিবী থেকে প্রতিবছর ৪ বিলিয়ন টন অজৈব, ৪০০ মিলিয়ন টন জৈব পদার্থ মাটির গা ধুয়ে সাগরে চলে যায়। সুন্দরবনসহ আমাদের উপকূলীয় এলাকায় অবস্থিত সবুজ বেষ্টনী আমাদের দেশের ভূমিকে ক্ষয় হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে এবং উপকূলীয় এলাকার নদীভাঙন রক্ষায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

৬. **ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি :** উপকূলীয় এলাকায় গাছের পাতা, ডালপালা, বাকল, শিকড় ও বৃক্ষরাজী, পশুপাখি ও কীটপতঙ্গের মলমূত্র ও দেহাবশেষ মাটির সাথে মিশে খনিজ ও জৈব সারে পরিণত হয়। এই হিউমাস জাতীয় জৈব সার মাটিতে নাইট্রোজেন, পটাশিয়াম, ফসফরাস সরবরাহ করে। উপকূলীয় এলাকার মাটিতে হিউমাসযুক্ত মাটির পানি ধারণক্ষমতা বেশি থাকায় লবণাক্ততা থাকার পরও ফসল উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে।

৭. **বায়ু বিশুদ্ধকরণ :** এ দেশের শিল্প, কলকারখানা, গাড়ি ইত্যাদিতে নানা প্রকার জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার করা হচ্ছে, যার ফলে বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের মতো নানা প্রকার ক্ষতিকারক গ্যাসের পরিমাণ ও ধূলিকণা বেড়ে যাচ্ছে। আর সুন্দরবনসহ আমাদের উপকূলীয় এ সবুজ বেষ্টনী বায়ু থেকে এসব ক্ষতিকারক গ্যাস যেমন— কার্বন ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনো-অক্সাইড ও ধুলাবালি অপসারণ করে নেয় এবং বাতাসে পর্যাপ্ত পরিমাণ অক্সিজেন সরবরাহ করে থাকে।

৮. **মরু বিস্তার রোধ :** মাটি গাছপালার আচ্ছাদনের নিচে না থাকলে সূর্যের কিরণ সরাসরি মাটিতে পড়ে। এতে মাটির পানি বাষ্প হয়ে উড়ে যায় আর মাটি শুষ্ক হয়ে যায়, ফলে উর্বর মাটির স্তর পানিতে ধুয়ে যায়। ফলে এই এলাকা উষ্ণতা হারিয়ে মরু অঞ্চলে পরিণত হয়। তাই আমাদের দেশের ভূভাগকে মরু অঞ্চলে পরিণত হওয়ার হাত থেকে রক্ষার পেছনে সুন্দরবনসহ উপকূলীয় এলাকার সবুজ বেষ্টনীর অবদান অনেক বেশি।

৯. **পশুপাখির আশ্রয়স্থল :** প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষার জন্য নানা জাতের পশুপাখি, কীটপতঙ্গ প্রয়োজন। পশুপাখি, জন্তু-জানোয়ার ও কীটপতঙ্গের প্রধান আশ্রয় হলো বনাঞ্চল ও গাছপালা। বনাঞ্চল ও গাছপালা ধ্বংস হয়ে গেলে এদের ধ্বংস অনিবার্য। ফলে প্রকৃতিতে দেখা দেয় নানা বিপর্যয়। ঘন বনাঞ্চল ও যেখানে সেখানে গড়ে তোলা বন-বনানী এ বিপর্যয় থেকে মানুষ ও পৃথিবীকে রক্ষা করতে পারে। UNDP ও FAO-এর এক জরিপে দেখা যায়, শুধু সুন্দরবনে বাস করে ৪২০টি বাঘ, ১ লাখ ২০ হাজার হরিণ, ৪০ হাজার বানর ও ৪৩ হাজার বন্য শূকর। এছাড়া বনে ভাল্লুক, সাপ, পাখি, কাঠবিড়াল, গোসাপ ও কীটপতঙ্গ তো রয়েছেই। একইভাবে আমাদের উপকূলীয় সবুজ বনানীতে নানা প্রকার পশুপাখি নির্ভয়ে আশ্রয় স্থাপন করে আছে, যা আমাদের দেশের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ : লক্ষ লক্ষ উদ্ভিদ ও প্রাণী অণুজীব ও এদের দেহের জিনসমষ্টি এবং জটিল পরিবেশ জীববৈচিত্র্য গড়ে তোলে। আর যে কোনো এলাকার জীববৈচিত্র্য রক্ষার ক্ষেত্রে বনভূমির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আমরা দেখতে পাই বনে বসবাসরত নানা প্রকার প্রাণী বন ধ্বংস হওয়ার ফলে মিলিত হতে না পেরে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এছাড়া বন ধ্বংস হলে সেই সাথে সাথে অনেক ধরনের উদ্ভিদ পৃথিবী থেকে বিলীন হয়ে যায়। আর এর ফলে নানা ধরনের প্রাণীর অস্তিত্ব চিরতরে বিলীন হয়ে যায় এবং বাস্তুতান্ত্রিক খাদ্যশৃঙ্খল বিনষ্ট হয়ে যায়। এর ফলে জীবের বা প্রাণীর বিলুপ্তির আশঙ্কা দেখা দেয়। তাই আমাদের দেশের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং নানা প্রকার বন্যপ্রাণীকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করার পেছনে সুন্দরবন এবং উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনীর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সুন্দরবন ও উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনীর গুরুত্ব : বন দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ। একটি দেশের তেল সম্পদ বা খনিজ সম্পদ কোনো না কোনো সময় ফুরিয়ে যেতে পারে। কিন্তু বনসম্পদ কোনো কালেই ফুরায় না, যদি এর সুরক্ষা ও পরিচর্যার বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা থাকে।

বাংলাদেশের সুন্দরবন ও উপকূলীয় এলাকার সবুজ বেষ্টনী এদেশের অর্থনীতিতে যে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে সেগুলো নিচে আলোচনা করা হলো :

১. **জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ :** দেশের অধিকাংশ জ্বালানি চাহিদা নানা ধরনের বনাঞ্চলে সৃষ্ট কাঠের সাহায্যে মেটানো হলেও তার সিংহভাগই আসে সুন্দরবন ও উপকূলীয় এলাকার বনাঞ্চল থেকে। এদেশের এখনো শতকরা ৮০ ভাগ লোক জ্বালানির জন্য কাঠের ওপর নির্ভরশীল। আর তাই উপকূলীয় এ সবুজ বেষ্টনী আমাদেরকে অতি প্রয়োজনীয় জ্বালানি কাঠ সরবরাহ করে অর্থনৈতিকভাবে সহায়তা করে থাকে।

২. **আদিবাসীদের আবাসস্থল :** উপকূলীয় যে সবুজ বেষ্টনীর কথা বলা হয়েছে তার সিংহভাগ জুড়ে রয়েছে চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও কক্সবাজার এলাকার পাহাড়ি বনাঞ্চল যার পুরো জায়গা জুড়ে বাস করে আদিবাসী জনগোষ্ঠী। এসব আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা সম্পূর্ণরূপে বনভূমিনির্ভর। তাই উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী আদিবাসীদের আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার ফলে সেখানে বিকাশ ঘটে নানা প্রকার হস্ত ও কুটির শিল্পের, যা আমাদের দেশীয় অর্থনীতির বিকাশে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৩. **গৃহনির্মাণ ও আসবাবপত্রের জন্য উপকরণ সংগ্রহ :** সুন্দরবনসহ দেশের উপকূলীয় এলাকার সবুজ বেষ্টনী থেকে প্রতিবছর প্রচুর পরিমাণ কাঠ, বাঁশ, বেত ও লতা জাতীয় উদ্ভিদ সংগ্রহ করা হয়, যা দিয়ে মূলত ঘরবাড়ি, চৌকি, খাট, টেবিল, চেয়ার, আলমারি, শোকেসসহ যাবতীয় আসবাবপত্র তৈরি করা হয়। এছাড়া নৌকা, বাস-ট্রাকের বডি, গরুগাড়ি, রেলের স্লিপার, ইলেকট্রিক লাইনের খুঁটি, লঞ্চ, লাঙ্গল, মইসহ অন্যান্য কৃষি যন্ত্রপাতি, খেলার সরঞ্জাম যেমন– ক্রিকেট ব্যাট, খেলার টেবিল, কেরাম বোর্ড ইত্যাদি তৈরির জন্য আমরা প্রতিবছর সুন্দরবন এবং উপকূলীয় এলাকার বনভূমি থেকে মেহগনি, শাল, গজারি, গামারি, কাঁঠাল, সুন্দরী, গেওয়া, শিশু, বহেরা, হরিতকি, জাম, গর্জন ইত্যাদি কাঠ সংগ্রহ করে থাকি।

৪. **মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর খাদ্য :** বনাঞ্চলে অধিকাংশ প্রাণী পাতা, ফুল ও ফল খেয়ে জীবনধারণ করে। মানুষও বহু প্রকার শাক, লতা-পাতা ও ফলমূল খায়। বনাঞ্চলের মধু সবচেয়ে উৎকৃষ্ট। বাংলাদেশের বনাঞ্চল থেকে উৎপাদিত মধুর বেশিরভাগই আসে সুন্দরবন ও উপকূলীয় বনাঞ্চল থেকে। সুন্দরবন (ম্যানগ্রোভ)-এর নদীর মোহনায় বহুরকম মাছ, কাঁকড়া, চিংড়ি, শামুক, ঝিনুক পাওয়া যায় যা মানুষ খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে এবং এগুলো দেশের বাইরে রপ্তানির মাধ্যমে আমরা প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারি। সুন্দরবনসহ উপকূলীয় বনাঞ্চল থেকে সংগৃহীত সুস্বাদু ও পুষ্টিকর ফলের মধ্যে জলপাই, আমলকি, বহেরা, বেল, লটকা, চালতা, আমড়া, বাদাম, কাঠবাদাম, জাম, করমচা, কমলা, কলা, কামরাঙ্গা, লিচু, আম, কাঁঠাল, আনারস অন্যতম।

৫. **মাছের আহার্য :** উপকূলীয় বনভূমির মধ্যে ম্যানগ্রোভ অন্যতম যার অধিকাংশ গাছপালা বেশিরভাগ সময় পানির সংস্পর্শে কাটায়। এখানে অসংখ্য নদী ও খাল ভূ-ভাগ থেকে মিঠা পানি বয়ে আনে যা বর্ষার সময় প্রায়ই নদী-খালের দুকূল ছাপিয়ে বনকে প্লাবিত করে। ফলে গাছপালা থেকে ঝরে পড়া পাতা, ফুল, ফল, কাণ্ড পচে জৈব সারে পরিণত হয় যা মাছ ও শামুকের খাবার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তাই এ অঞ্চলের বনাঞ্চল মৎস্য সম্পদের বিকাশে বিশেষভাবে সহায়ক।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৬. **শিল্পের কাঁচামাল :** বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অর্থোপার্জনকারী অধিকাংশ শিল্প-কারখানা উৎপাদনের জন্য দেশের বনজ সম্পদের বিভিন্ন উপাদানকে ব্যবহার করে থাকে যার সিংহভাগই আসে উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী থেকে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বাজার ও বিশ্ববাজারের চাহিদা মেটাতে যেসব শিল্প-কারখানা গড়ে উঠেছে বর্তমানে তার কাঁচামালের অন্যতম যোগানদাতা বাংলাদেশের উপকূলীয় বনাঞ্চল। নিচে উপকূলীয় বনভূমিনির্ভর শিল্পের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদান করা হলো :

ক. **দিয়াশলাই :** দেশের দিয়াশলাই কারখানায় প্রায় ১ কোটি বাক্স দিয়াশলাই প্রতিবছর উৎপাদিত হয়, যার অন্যতম কাঁচামাল ছাতিম, শিমুল, কদম, জিনিয়া ও দেবদারু। এর অধিকাংশই আসে উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী থেকে।

খ. **প্লাইউড :** আমাদের দেশের প্লাইউড শিল্পের কাঁচামালের অন্যতম যোগান আসে এসব বনাঞ্চল থেকে।

গ. **কাগজের মণ্ড ও কাগজ :** দেশী কাগজ কলগুলোর যোগানের সিংহভাগই আমরা পেয়ে থাকি সুন্দরবন এবং উপকূলীয় এলাকার বনাঞ্চল থেকে।

ঘ. **ইট :** ইট ভাটার জ্বালানি হিসেবে বনের কাঠ ব্যবহার করা হয় যার অন্যতম যোগান আসে এসব বনাঞ্চল থেকে।

ঙ. **নৌকা ও জলযান :** নদীপ্রধান আমাদের দেশে নৌকা ও জলযান যাতায়াত ব্যবস্থার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর এই জলযানসমূহ তৈরির অধিকাংশ উপাদান আমরা এসব বনভূমি থেকে পেয়ে থাকি।

চ. **শীতল পাটি/ মাদুর শিল্প :** উপকূলীয় বনাঞ্চল থেকে সংগৃহীত হোগলাপাতা, পাটি পাতা ইত্যাদি দিয়ে তৈরি করা হয় নানা প্রকার পাটি, যা আমাদের দেশে খুবই সমাদৃত।

ছ. **বাঁশজাত সামগ্রী :** বর্তমান সময়ে বাঁশ দিয়ে নানা প্রকার আসবাবপত্র তৈরি করা হচ্ছে যার অন্যতম যোগানদাতা উপকূলীয় বনাঞ্চল।

জ. **বেতজাত সামগ্রী :** সুন্দরবন ও উপকূলীয় এলাকার বন থেকে সংগৃহীত বেত থেকে নানা প্রকার লাঠি, হাতিয়ারসহ বিভিন্ন ধরনের আকর্ষণীয় আসবাবপত্র তৈরি করা হয় যা দেখতে অতি সুন্দর এবং আমাদের দেশের চাহিদা মেটানোর পর এসব জিনিস বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে থাকে আমাদের দেশ।

ঝ. **রেশম ও তামাক শিল্প :** প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সহজপ্রাপ্যতার কারণে উপকূলীয় এলাকাসহ পাহাড়ী এলাকায় গড়ে উঠেছে রেশম ও তামাকজাত দ্রব্যের শিল্প।

ঞ. **কাঠ কয়লা শিল্প :** বন থেকে সংগৃহীত কাঠ হালকা পুড়িয়ে তৈরি করা হয় কাঠ কয়লা যার অন্যতম যোগান আসে এসব বনাঞ্চল থেকে।

ভেষজ উপকরণ : আয়ুর্বেদী, ইউনানী, হোমিওপ্যাথি ও এলোপ্যাথি চিকিৎসা শাস্ত্রে ঔষধ উৎপাদনের মুখ্য উপকরণ হলো ভেষজ উদ্ভিদের মূল, পাতা, ফুল, বীজ। এ কাজে বর্তমানে প্রায় ৭০০ উদ্ভিদ ব্যবহৃত হচ্ছে যার অন্যতম যোগান আসে সুন্দরবন ও উপকূলীয় এলাকার সবুজ বেষ্টনী থেকে, যা আমাদের দেশীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

উপসংহার : পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও অর্থনীতিকে গতিশীল করার পিছনে সুন্দরবন ও উপকূলীয় এলাকার সবুজ বনাঞ্চলের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই আমাদের নিজেদের প্রয়োজনে সুস্থ-সুন্দর থাকার তাগিদে এই উপকূলীয় বনাঞ্চল ও সুন্দরবনকে নির্বিচারে নিধনের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

০৭। ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প, বাংলাদেশে এর প্রভাব এবং বাংলাদেশের করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করুন।

***অথবা,* ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পে বাংলাদেশ কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে তা আলোচনা করুন।**

উত্তর : ভারত বাংলাদেশের প্রতিবেশী রাষ্ট্র। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূল কথা 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে শত্রুতা নয়'—এর ভিত্তিতে আমরা সকল দেশের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন ও সহাবস্থানে বিশ্বাসী। কিন্তু ভারত কখনই সুপ্রতিবেশী সুলভ মনোভাব দেখায়নি। বরং বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকে অদ্যাবধি আমাদের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, নিরাপত্তা, রাজনীতি, সংস্কৃতি, বাণিজ্য ও অর্থনীতির বিরুদ্ধে তার নগ্ন আগ্রাসন চালিয়ে আসছে। যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে পরাজিত পাকিস্তানি হানাদারদের যুদ্ধাস্ত্র লুণ্ঠন থেকে শুরু করে বেরুবাড়ী, তিন বিঘা, দক্ষিণ তালপট্টি, ফারাক্কা বাঁধ, সীমান্ত সন্ত্রাস, চোরাচালান, পুশইন ইত্যাদি সমস্যা সৃষ্টি করে জর্জরিত করেছে বাংলাদেশকে। ভারতের ধারাবাহিক আগ্রাসনের নতুন সংযোজন আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প।

পানি নিয়ে ভারতীয় ষড়যন্ত্র : ছোট-বড় মিলে বাংলাদেশে রয়েছে ৩১০টি নদ-নদী। এগুলোর মধ্যে ৫৭টি হলো আন্তঃসীমান্ত—এর মধ্যে ৫৪টি এসেছে ভারত থেকে এবং বাকি তিনটি মিয়ানমার থেকে। বাংলাদেশের অবস্থান ভাটিতে হওয়ায় উজানে যে কোনো ধরনের পানি নিয়ন্ত্রণের প্রত্যক্ষ প্রভাব বাংলাদেশের ওপর পড়ে। কিন্তু ভারত বাংলাদেশের স্বার্থের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে দু দেশের অভিন্ন সম্পদ পানি নিয়ে ষড়যন্ত্র শুরু করে ১৯৫৬ সাল থেকে। কোলকাতা বন্দরের নাব্যতা বৃদ্ধির অজুহাতে ভারত পশ্চিমবাংলার মুর্শিদাবাদ জেলার রাজমহল ও ভগবান গোলার মাঝে ফারাক্কায় এক মরণবাঁধ নির্মাণ শুরু করে ১৯৫৬ সালে। রাজশাহী সীমান্ত থেকে ১৬ কিমি উজানে গঙ্গা নদীর ওপর নির্মিত এই বাঁধের কাজ শেষ হয় ১৯৬৯ সালে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় এই বাঁধ চালু হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে মরুকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়। পানি সম্পর্কিত দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য ১৯৭২ সালে গঠিত বাংলাদেশ-ভারত যৌথ নদী কমিশনের (Joint Rivers Commission) মাধ্যমে ভারতীয় নীতির প্রতিবাদ করেও বাংলাদেশের কোনো লাভ হয়নি। অতঃপর বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর ৩০ বছর মেয়াদি গঙ্গার পানিবণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু এই চুক্তিতে কোনো গ্যারান্টি ক্লোজ না থাকায় বাংলাদেশ পানির ন্যায্য হিস্যা পাচ্ছে না। অধিকন্তু ভারত তার সাম্প্রতিক নদী সংযোগ প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশের অস্তিত্ব ধ্বংসের ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে। শুধু তাই নয়, ভারত সিলেট সীমান্তবর্তী বরাক নদীর ওপর পানি-বিদ্যুৎ উৎপাদন বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর পানি নিয়ন্ত্রণ করে দেশের পূর্বাঞ্চলকেও শুকিয়ে মারার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে।

আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প কি : আগামী ৫০ বছরের ক্রমবর্ধমান পানির চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং এর অববাহিকার সকল নদ-নদীর পানি বাঁধ, জলাধার ও সংযোগ খালের মাধ্যমে প্রত্যাহার করে ভারতের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে, এমনকি দক্ষিণের কাবেরি নদী পর্যন্ত টেনে নিয়ে খরাপীড়িত অঞ্চলে পানি সরবরাহের জন্য ভারত যে মহাপরিকল্পনা হাতে নিয়েছে তা-ই River Inter-linking Project বা আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প নামে পরিচিত।

এই প্রকল্পের আওতায় ৩৭টি ছোট-বড় নদীকে ৩০টি খালের মাধ্যমে সংযোগ ঘটিয়ে ৭৪টি জলাধারে পানি সংরক্ষণ করে পানির প্রবাহ ঘুরিয়ে ভারতের উত্তর, উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলের খরাপ্রবণ রাজ্যগুলোতে

বণ্টন করে কৃষিকাজে ব্যবহার করা হবে। ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার পানি পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা হয়ে দক্ষিণ ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশ ও কর্ণাটক দিয়ে তালিমনাডুতে নিয়ে যাওয়া হবে। আর গঙ্গার পানি পৌঁছবে উত্তর প্রদেশ, হরিয়ানা, রাজস্থান এবং গুজরাটে। ১২০০ কিমি দীর্ঘ কৃত্রিম নদী সম্বলিত এই প্রকল্পের মাধ্যমে ভারত গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের এক-তৃতীয়াংশ পানি তথা ১৭৩ বিলিয়ন ঘনমিটার পানি সরিয়ে নিতে সক্ষম হবে। ১২-১৫ বছর মেয়াদি এই প্রকল্পের প্রাক সম্ভাব্যতা যাচাই ও রিপোর্ট প্রদান সম্পন্ন হয় যথাক্রমে ২০০৫ ও ২০০৬ সালে, আর প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পন্ন হবে ২০১৬ সালের মধ্যে। ভারতের ইতিহাসে দ্বিতীয় বৃহত্তম এই উচ্চাভিলাসী প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৫ লাখ ৬০ হাজার কোটি রুপি বা ১২৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের মতে এই প্রকল্পের ব্যয় হবে ১৪৪ থেকে ২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

প্রকল্পের প্রেক্ষাপট : ভারত বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এ রাষ্ট্রীয় মূলনীতিতে যেমন রয়েছে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, রাজনৈতিক জীবনে তেমনি রয়েছে সাম্প্রদায়িক উগ্রবাদ। মোট জনসমষ্টির ৮৫% হিন্দু হলেও তাদের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন সম্প্রদায়, জাতি-উপজাতি, রয়েছে পশ্চাৎপদ ও তফসিলি সম্প্রদায়। কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে আছে বরাবরের মতোই সংখ্যালঘু উচ্চবর্ণের হিন্দু নেতৃবৃন্দ। আর এই সংখ্যালঘু নেতৃবৃন্দ বাস করে ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও মধ্যাঞ্চলে, যা নদী সংযোগ প্রকল্পের টার্গেট এরিয়া। সুতরাং এই প্রকল্পের সাথে যে কেন্দ্রীয় রাজনীতি ও আঞ্চলিকতাবাদ জড়িত তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বস্তুত ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের গোড়াপত্তন হয় পঞ্চাশের দশকে। ১৯৫০ সালের দিকে ড. কে এল রাও এই প্রকল্পের ধারণা দেন। তারপর আরেক প্রকৌশলী কর্নেল দস্তর হিমালয়ের নিম্নাঞ্চলের জলাধারে পানি সংরক্ষণ করে উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান, অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও গুজরাটসহ অন্যান্য স্থানে সরবরাহের প্রস্তাব করেন। তৎকালীন নেহেরু মন্ত্রিসভার পানিমন্ত্রী কে এল রাও, কর্নেল দস্তরের প্রস্তাব অত্যন্ত ব্যয়বহুল হবে বলে আরেকটি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করেন যা, Indian Water Wealth নামে প্রকাশিত হয়। এই পরিকল্পনায় ব্রহ্মপুত্রের পানির একাংশ পূর্ববাংলা দিয়ে খাল কেটে গঙ্গায় ফেলার পর গঙ্গার পানি সংরক্ষণ করে গঙ্গা-কাবেরি সংযোগ চ্যানেলের মাধ্যমে সমগ্র ভারতে বিতরণের প্রস্তাব করা হয়। ১৯৭২ সালে কে এল রাও যখন আবার ইন্দিরা গান্ধীর মন্ত্রিসভায় সেচমন্ত্রী নিযুক্ত হন তখন উল্লিখিত প্রস্তাব আরো জোরালোভাবে উত্থাপন করেন। ১৯৭৫ সালে ভারতের National Water Master Plan-এ পানি প্রত্যাহারের বিষয়টি সর্বাধিক প্রধান্য পায়। ফলে ১৯৮০ সালে গ্রহণ করা হয় জাতীয় মহাপরিকল্পনা। এর ভিত্তিতে নদী আন্তঃসংযোগের বিভিন্ন সম্ভাব্যতা যাচাই, বিভিন্ন কারিগরী, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং পরিবেশগত বিষয়গুলো সম্পর্কে জরিপ চালানোর জন্য ১৯৮২ সালে গঠিত হয় National Water Development Agency (NWDA)। গত আড়াই দশকে বছরে ভারত সরকার এই এজেন্সির পেছনে এক হাজার কোটি রুপির বেশি অর্থ ব্যয় করেছে। বিভিন্ন সমীক্ষা ও জরিপ চালানোর পর ভারত সরকার ১৯৯৭ সাল থেকে নদী সংযোগের ব্যাপারে স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং ইতোমধ্যে কাজ অনেক দূর এগিয়েছে।

প্রকল্পের অগ্রগতি : ভারত সরকার গঠিত উক্ত টাস্কফোর্স ইতোমধ্যে এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত ১৩৭টি উপপ্রকল্প সম্পর্কে পানি সমীক্ষা, ৭১টি পানি প্রবাহ প্রত্যাহার পয়েন্টের সুনির্দিষ্টকরণ সমীক্ষা, ৩৭টি সংযোগ খাল এলাইনমেন্টের ভূ-প্রকৃতিগত সমীক্ষা, ৩১টি প্রাকসম্ভাব্যতা সমীক্ষা এবং ৬টি প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা শেষ করেছে। এই প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য ভারত সরকার ইতোমধ্যে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে লবিং চালিয়ে যাচ্ছে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

নদী ব্যবহারের আন্তর্জাতিক নীতিমালা : পৃথিবীতে মোট ২১৪টি বড় বড় নদ-নদী আছে, যার অধিকাংশই একাধিক রাষ্ট্রের ওপর দিয়ে প্রবাহিত। এসব নদী সবার অভিন্ন সম্পদ এবং এ নিয়ে বিরোধ দেখা দিলে আন্তর্জাতিক নীতিমালা ও সালিশীর মাধ্যমে তা সমাধান করা হয়। যেমন—কলোরোডা যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকোর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত একটি নদী, যা থেকে উদ্ভূত সমস্যা আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা হয়েছে। যেমনটি হয়েছে ইউফ্রেটিস নদী নিয়ে সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যে। মেকং নদীটি ৬টি দেশ লাওস, থাইল্যান্ড, চীন, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, মিয়ানমারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কিন্তু কোথাও কোনো বিরোধ নেই। বিরোধ শুধুমাত্র বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে। কারণ, ভারত কোনো আন্তর্জাতিক আইন বা ন্যায়নীতির তোয়াক্কা করে না। ভারত রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে নদীগুলো ব্যবহার করে থাকে।

ভারতের গৃহীত এই প্রকল্প নদী ব্যবহারের আন্তর্জাতিক নীতিমালার সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। ১৮১৫ সালের ভিয়েনা সম্মেলনের গৃহীত প্রস্তাবে, ১৯৯২ সালের হেলসিংকি চুক্তিতে এবং ১৯৯৭ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্তে আন্তর্জাতিক পানিসম্পদ ব্যবহারের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা বর্ণনা করা হয়েছে। এমনকি ১৯৯৬ সালের সম্পাদিত ভারত-বাংলাদেশ পানি চুক্তির প্রস্তাবনায় দুদেশের জনকল্যাণে পানিসম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। হেলসিংকি চুক্তির 2 (c) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'The parties shall, in particular, take all appropriate measures to ensure that transboundary waters are used in a reasonable and equitable way, taking into particular account their transboundary, character, in the case of activities which cause or likely to cause transboundary impact.'—(Helsinki Agreement 1992) অর্থাৎ 'সকল পক্ষকে নিশ্চিত করতে হবে যে আন্তঃসীমানার পানিসম্পদের এমন যুক্তিসঙ্গত ও ন্যায়ানুগভাবে ব্যবহারে কোনো আন্তঃসীমা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না হয়।'

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ১৯৯৭ সালের মে মাসে গৃহীত সিদ্ধান্তের দিকে তাকালেই বোঝা যায়, ভারত কত অবহেলাভরে জাতিসংঘের সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করছে। ঐ সিদ্ধান্তের ৭নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'Water course states shall, in utilizing an international water course in their territories, take all appropriate measures to prevent the causing of significant harm to other water course states.' অর্থাৎ 'পানিসম্পদের তীরবর্তী রাষ্ট্রগুলো নিজেদের এলাকায় কোনো আন্তর্জাতিক নদীর পানিসম্পদের ব্যবহারে এমন যথাযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করবে যেন অন্য রাষ্ট্রের ওপর কোনো উল্লেখযোগ্য অশুভ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না হয়।'

বাংলাদেশের ওপর প্রভাব : উজানে গঙ্গার ওপর ফারাক্কা বাঁধ দেয়ায় বাংলাদেশের ওপর যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে তা সবারই জানা। এখন আবার ভারত যদি তার নদী সংযোগ প্রকল্প চালিয়ে যায় তাহলে বাংলাদেশের অস্তিত্বই বিপন্ন হতে বাধ্য। এই প্রকল্পের ফলে বাংলাদেশে যেসব মারাত্মক প্রতিক্রিয়া হবে তার উল্লেখযোগ্য কিছু দিক এখানে তুলে ধরা হলো :

১. **বিস্তৃত মরুকরণ :** গঙ্গায় বাঁধ দেয়ার ফলে ইতোমধ্যেই বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল মরুভূমি হয়ে গেছে। উত্তর, উত্তর-পূর্ব ও মধ্যাঞ্চলের সব নদীতে শীতকালে যে পানি আসে তার প্রায় ৭০ ভাগই আসে ব্রহ্মপুত্র থেকে। এর এক-তৃতীয়াংশ পানি যদি ভারত একতরফাভাবে প্রত্যাহার করে নেয় তাহলে দেশের অধিকাংশ অঞ্চল পরিণত হবে মরুভূমিতে।

২. **লবণাক্ততা বৃদ্ধি :** বাংলাদেশের নদীগুলো দিয়ে মিঠা পানি প্রবাহিত হয়। নদীর পানিপ্রবাহ কমে গেলে সমুদ্রের লবণাক্ত পানি উজানে উঠে আসবে। ফলে এই পানি মাটির লবণাক্ততা বৃদ্ধি করে মারাত্মক সমস্যা সৃষ্টি করবে।

৩. **কৃষিক্ষেত্র ধ্বংস :** কৃষিপ্রধান দেশ বাংলাদেশ চাষাবাদের জন্য নদীনালার পানির ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু শুষ্ক মৌসুমে ভারত পানি প্রত্যাহার করলে বাংলার মানুষ সেচের জন্য পানি পাবে না। ফলে অনেক জায়গার ফসল পুড়ে যাবে এবং বন্ধ হয়ে যাবে চাষাবাদ। অধিকন্তু লবণাক্ততার ফলে জমির উর্বরতা ও উৎপাদন হ্রাস পাবে।

৪. **মৎস্যসম্পদ নির্মূল :** কোনো এক সময় আমরা 'মাছে-ভাতে বাঙালি' থাকলেও এখন খাল-বিলে মাছ পাওয়া যায় না বললেই চলে। এখন মাছের জন্য আমরা নদীর ওপরই বেশি নির্ভরশীল। কিন্তু শুষ্ক মৌসুমে পানি না আসলে নদীনালা শুকিয়ে যাবার ফলে মাছের বংশবিস্তার হবে না। এভাবে একদিন এ দেশ থেকে মৎস্যসম্পদ বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

৫. **সুন্দরবনের বিনাশ :** সুন্দরবন ছিল মিঠা পানির বন। কিন্তু ফারাক্কার প্রভাবে এর নদীনালার পানি প্রবাহ কমে যাওয়ায় সমুদ্রের লবণাক্ত পানি ঢুকেছে সুন্দরবনে। সুন্দরী গাছ তাই আক্রান্ত আগামরা রোগে। উজাড় হচ্ছে সুন্দরবনের সৌন্দর্য, ধ্বংস হচ্ছে পশুপাখি। যদি আরো পানি কমে আসে তাহলে ধ্বংস হয়ে যাবে বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন, নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের রয়েল বেঙ্গল টাইগার।

৬. **মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক দূষণ :** ফারাক্কার প্রভাব ও গভীর নলকূপের মাধ্যমে পানি সেচের ফলে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নেমে যাওয়ায় বাংলাদেশের ৬০টিরও বেশি জেলা আর্সেনিক দূষণে আক্রান্ত। এমতাবস্থায় উজানে পানি প্রত্যাহার করা হলে পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ হতে পারে যে এক সময় বিশুদ্ধ খাবার পানি পাওয়া দুঃসাধ্য হয়ে পড়বে।

৭. **যাতায়াত ব্যবস্থায় বিপর্যয় :** বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ হওয়ায় বাংলার অনেক মানুষ নৌপথের ওপর নির্ভরশীল। তাছাড়া নদীপথে পারাপার ও পণ্য পরিবহন অত্যন্ত সস্তা। কিন্তু নদীতে পর্যাপ্ত পানি না থাকলে নৌ যোগাযোগ বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। সড়ক পরিবহনের ওপর চাপ পড়বে, পণ্য পরিবহন হবে ব্যয়বহুল। ফলে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাবে। অন্যদিকে যেসব এলাকার মানুষ যাতায়াতের জন্য শুধুমাত্র নৌপথের ওপর নির্ভরশীল তাদের চলাচল হবে অত্যন্ত দুর্গম।

৮. **নদ-নদীর বিলুপ্তি :** বাংলাদেশের প্রধান পাঁচটি নদী তথা পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, মেঘনা ও কর্ণফুলীর মধ্যে পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর উৎপত্তি হিমালয়ে এবং এগুলো ভারতের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। ব্রহ্মপুত্রের প্রধান নদী যমুনা যা মেঘনার সাথে মিলিত হয়েছে। এখন ভারত যদি সংযোগ খালের মাধ্যমে ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গার পানি সরিয়ে নেয় তাহলে কুষ্টিয়া থেকে চাঁদপুর পর্যন্ত পদ্মার পানিপ্রবাহ বন্ধ হয়ে যাবে। ফলে শুকিয়ে যাবে পদ্মার ৬টি উপনদী ও শাখা নদী। আবার ব্রহ্মপুত্রের পানি জলাধারে সংরক্ষণ করলে তিস্তা ব্যারেজের কার্যকারিতা বন্ধ হয়ে সেচসুবিধা বঞ্চিত হবে উত্তরবঙ্গের হাজার হাজার কৃষক। ব্রহ্মপুত্র দিয়ে পানি বাংলাদেশে আসার আগেই সরিয়ে নিলে শুকিয়ে যাবে ব্রহ্মপুত্র নদ এবং মরে যাবে ধরলা, তিস্তা, বংশী ও শীতলক্ষ্যা নদী। অন্যদিকে ভারতের নদী মহাপরিকল্পনার আওতায় সিলেটের বরাক নদীর ওপর টিপাইমুখে পানি বিদ্যুৎ উৎপাদন বাঁধ নির্মাণ করলে শুকিয়ে যাবে সুরমা, কুশিয়ারা, মেঘনা ইত্যাদি প্রধান

নদী। ফলে মরে যাবে মনু, বাউলাই, তিতাস, গোমতী প্রভৃতি উপনদী। তেমনি কর্ণফুলী নদীর পানি প্রবাহ হ্রাস পেয়ে শুকিয়ে যাবে কাসালং, হালদা, বোয়ালখালীসহ পূর্বাঞ্চলের নদীসমূহ।

৯. **প্রাকৃতিক দুর্যোগ :** বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ এলাকা। দেশের প্রধান নদ-নদীর পানি শুকিয়ে গেলে তীব্র খরায় আক্রান্ত হবে বাংলাদেশ। সম্প্রতি চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন এলাকায় বেশ কিছু ভূকম্পন অনুভূত হয়েছে। এমতাবস্থায় ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর কমে গেলে বাংলাদেশ আরো অধিক ভূমিকম্পপ্রবণ হয়ে উঠবে। তবে সবচেয়ে বেশি প্রলয়ঙ্করী হয়ে উঠবে বন্যা। বর্ষাকালে যখন উজানে নদীগুলোতে পানির প্রবাহ বেড়ে যাবে তখন ভারত ফারাক্কা বাঁধ, মানস জলাধার ও টিপাইমুখ বাঁধ খুলে দিলে সমগ্র বাংলাদেশ ভেসে যাবে বন্যার পানিতে। সেই সাথে কালবৈশাখীর দাপট যে হবে কত মারাত্মক তা সহজেই অনুমেয়।

১০. **বন্দরের অচলাবস্থা :** ভারতের নদী সংযোগ প্রকল্পের ফলে প্রধান নদীগুলোর পানি প্রবাহ কমে গেলে বাংলাদেশের নদীবন্দরগুলো বছরের অধিকাংশ সময় অচল হয়ে পড়ে থাকবে। বন্দরের নাব্যতা না থাকলে নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর ও চট্টগ্রাম বন্দরে জাহাজ ভিড়তে পারবে না। ফলে মালামাল লোডিং ও আনলোডিংয়ে প্রচণ্ড সমস্যার সৃষ্টি হবে।

১১. **বেকারত্ব ও উদ্বাস্তু সমস্যা :** বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন-জীবিকা নদীনালার ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং নদ-নদীর অস্তিত্ব বিপন্ন হলে এর সাথে মাঝি, জেলেসহ লক্ষ লক্ষ মানুষ বেকার হয়ে যাবে। সেই সাথে নদীর তীরবর্তী ও চর এলাকার মানুষ যাদের জীবিকা মূলত নদীনির্ভর তারা উদ্বাস্তু হয়ে পড়বে।

১২. **জীববৈচিত্র্য (Bio-diversity) ধ্বংস :** বাংলার নদ-নদীর স্বার্থের সাথে শুধু মানুষই নয়, এর সাথে জড়িয়ে আছে হাজার হাজার পশুপাখি, কীটপতঙ্গ, পোকামাকড়ের জীবন। নদ-নদী মরে গেলে এসব এলাকার অনেক দুর্লভ প্রাণী ও কীটপতঙ্গ চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। ধ্বংস হবে এ দেশের জীববৈচিত্র্য।

১৩. **প্রতিবেশগত ভারসাম্যহীনতা :** নদীনালা কোনো দেশের বিচ্ছিন্ন কোনো অংশ নয় বরং সে দেশের পরিবেশের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। নদীনালার সাথে দেশের আবহাওয়া ও জলবায়ুর সম্পর্কও গভীর। সুতরাং নদ-নদী হুমকির সম্মুখীন হলে দেশের আবহাওয়া ও জলবায়ুর পরিবর্তন হতে বাধ্য। ফলে ভারতের নদী প্রকল্পের প্রতিক্রিয়া হিসেবে বাংলাদেশ চরমভাবাপন্ন হয়ে উঠবে। বাড়বে গড় তাপমাত্রা, মানুষের জীবনযাপন হবে কষ্টসাধ্য, বিপন্ন হবে Ecological balance বা প্রতিবেশ ভারসাম্য।

বাংলাদেশের করণীয় : ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের প্রভাব তাৎক্ষণিকভাবে অনুভূত না হলেও এর প্রতিক্রিয়া শুধুমাত্র ২০-২৫ বছর নয়, চলতে থাকবে যুগ যুগ ধরে। সুতরাং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষার জন্য এক্ষুণি ভারতকে এই প্রকল্প থেকে বিরত রাখার জন্য প্রবল চাপ সৃষ্টি করতে হবে। সেজন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থাগুলো জরুরি ভিত্তিতে গ্রহণ করতে হবে :

১. **জনমত গঠন :** ভারতের মহাপরিকল্পনার বিরুদ্ধে আমাদেরকে প্রথম যে কাজটি করতে হবে তা হলো জনমত গঠন। পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, বিভেদ, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা, ক্ষুদ্র দলীয় স্বার্থ ভুলে জাতীয় স্বার্থে আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। সরকার ও বিরোধী দল এক হয়ে বাংলাদেশ বিরোধী ভারতের এই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। সভা, সমাবেশ, মিছিল, সেমিনার ইত্যাদির মাধ্যমে সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে সচেতন করে তুলতে হবে। সচেতন ও ঐক্যবদ্ধ জাতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কখনও

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

সফল হয় না। ফারাক্কা বাঁধের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক লং মার্চের মাধ্যমে মওলানা ভাসানী যেভাবে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলে ভারতসহ সারা বিশ্বকে হতচকিত করেছিলেন, তেমনি আজকের এই গভীর সংকটকালে জাতীয় নেতৃত্বের মাধ্যমে জনমত গড়ে তুলে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

২. **আন্তর্জাতিক ফোরামে উত্থাপন :** বাংলাদেশের জীবন-মরণ এই সমস্যাটি আন্তর্জাতিক ফোরামে উত্থাপন করে বিশ্ব জনমত গড়ে তুলতে হবে। আন্তর্জাতিক নদ-নদীর পানি বণ্টন ও প্রত্যাহার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক বিধি-বিধান সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরে জাতিসংঘের বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ সংস্থাকে জানাতে হবে। ভারতীয় পরিকল্পনার ফলে যেসব সম্ভাব্য ক্ষতি হবে তার প্রামাণ্য দলিল তথ্য-উপাত্তসহ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের আগামী অধিবেশনে সারা বিশ্বের কাছে তুলে ধরতে হবে। জাতিসংঘ যেহেতু সুন্দরবনকে World Heritage হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে, সেহেতু বিশ্ববাসীকে জানাতে হবে পানি প্রত্যাহারের ফলে সুন্দরবনের কি কি ক্ষতি হবে, রয়েল বেঙ্গল টাইগারের অস্তিত্ব থাকবে কি না তাও জানাতে হবে। সেই সাথে আগামী সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে এই সমস্যাটি জোরালোভাবে উত্থাপন করতে হবে।

৩. **কূটনৈতিক তৎপরতা :** ভারতের এই পানি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কূটনৈতিক তৎপরতা জোরদার করতে হবে। এই সমস্যার বিস্তারিত তথ্য-উপাত্তসহ বিভিন্ন দেশে বিশেষ দূত প্রেরণ করতে হবে। সেই সাথে পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক ও সফর আয়োজন করা যেতে পারে। বিশ্বের বড় বড় শক্তিশালী রাষ্ট্র যেমন—যুক্তরাষ্ট্র, চীন, রাশিয়া, ফ্রান্স, ব্রিটেনসহ সমগ্র পশ্চিমা বিশ্বকে সংশ্লিষ্ট সমস্যার কথা জানিয়ে ভারতের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে।

৪. **অর্থনৈতিক কূটনীতি :** বিশ্বের বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান যেমন—বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এডিবি ইত্যাদির আর্থিক সহায়তা ছাড়া ভারতের এই মিলিয়ন ডলার প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। ভারত ইতোমধ্যে বিশ্বব্যাংক ও অন্যান্য সংস্থার কাছে আর্থিক সহায়তার আবেদন জানিয়েছে। সরকারি পর্যায়ে এসব প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার কাছে আমাদের যুক্তিসঙ্গত আপত্তি ও পরিবেশ বিপর্যয়ের কথা তুলে ধরতে হবে যেন তারা এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অর্থায়ন না করে।

৫. **গণমাধ্যম ও ই-মিডিয়ার ভূমিকা :** এই সমস্যাকে ব্যাপকভাবে প্রচার, জনমত গঠন ও জাতীয় আন্দোলন হিসেবে গড়ে তুলতে গণমাধ্যমকে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে। ভারতীয় এই পরিকল্পনার ক্ষতিকর প্রভাবের ওপর সচিত্র প্রতিবেদন সংবাদপত্র, বিটিভি ও অন্যান্য মাধ্যমে নিয়মিত প্রচার করতে হবে। বর্তমান যুগ ইন্টারনেটের যুগ। ভারত যেমন তাদের প্রকল্পভিত্তিক ওয়েব সাইট তৈরি করেছে তেমনি আমাদেরকেও এই প্রকল্পের ক্ষতিকর দিক তুলে ধরে ওয়েব সাইট তৈরি করতে হবে। এ ব্যাপারে ই-মেইলের মাধ্যমে মত বিনিময়, বিশ্ব জনমত গঠন এবং বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠনের কাছে ই-বার্তা পাঠাতে হবে।

৬. **পরিবেশবাদী আন্দোলন :** পরিবেশবিরোধী এই প্রকল্পকে প্রতিহত করতে হলে বিশ্ব পরিবেশবাদী আন্দোলনে আমাদেরকে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক International Rivers Network, হল্যান্ডভিত্তিক International Water Tribunal, Third World Water Forum ইত্যাদি সংগঠন নদীর স্বাভাবিক গতি প্রবাহ রোধের বিরুদ্ধে সোচ্চার আর তাই তাদের কাছে এই বিষয়টি জোরালোভাবে উত্থাপন করতে হবে। প্রয়োজনে মানবাধিকার কর্মী, পরিবেশবাদী নেতৃবৃন্দ ও বুদ্ধিজীবীদের কাছে ই-মেইল করে উক্ত বিপদ সম্বন্ধে অবহিত করতে হবে।

৭. **জোট গঠন ও লবিং :** ভারতের নদী সংযোগ প্রকল্পের সাথে শুধু বাংলাদেশী স্বার্থই জড়িত নয়— এর সাথে জড়িত নেপাল, ভুটান ও চীনের স্বার্থ। তাই এ প্রকল্প প্রতিহত করতে এই তিন রাষ্ট্রকে নিয়ে জোট গঠন করতে হবে। শুধু তাই নয়—এই প্রকল্প নিয়ে খোদ ভারতেই বিতর্ক চলছে। সুতরাং এই প্রকল্প বিরোধী ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা করতে হবে। অর্ধ শতাব্দী পূর্বে সূচিত এই প্রকল্প ভারত একদিনেই ছেড়ে দেবে না, বরং তৈরি করবে জোরালো লবি। তাই শক্তিশালী ভারতীয় লবির বিরুদ্ধে আমাদেরকেও লবিস্ট নিয়োগ করতে হবে।

৮. **প্রবাসীদের ভূমিকা :** এ ব্যাপারে প্রবাসীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। কারণ তারা যেভাবে বিভিন্ন সংস্থার সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন, আমরা দেশে থেকে সেভাবে পারি না। প্রবাসীদের প্রচেষ্টায় একুশে ফেব্রুয়ারি যেমন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে, তদ্রূপ তাদের দ্বারাই এই ষড়যন্ত্রও প্রতিহত করা সম্ভব। এজন্য এই সমস্যা সম্বন্ধে জানাতে হবে এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার কাছে তাদেরকে স্মরণাপন্ন হতে হবে।

৯. **সরকারের ভূমিকা :** ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের বিরুদ্ধে সরকারকে সবচেয়ে জোরালো ও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। কারণ কেবলমাত্র সরকারের জোরালো উপস্থাপনাই বিশ্ব সংস্থার কাছে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত। উপরোল্লিখিত কাজগুলো সরকার যদি নিজেই করে তাহলেই কেবল বাংলাদেশ বিরোধী এই প্রকল্প দ্রুত প্রতিহত করা সম্ভব হতে পারে। সরকার ইতোমধ্যে ভারতীয় রাষ্ট্রদূতকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তলব করে বাংলাদেশের উদ্বেগের কথা জানিয়েছে। দিল্লিতে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ-ভারত যৌথ নদী কমিশনের বৈঠকে বাংলাদেশ এই সমস্যাটি জোরালোভাবে উপস্থাপন করে। তীব্র আপত্তি সত্ত্বেও ভারত অবশেষে নদী সংযোগের বিষয়টি আলোচ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করতে বাধ্য হয়। ভারতের এই প্রকল্পের কারণে উদ্ভূত সমস্যার তথ্য সংগ্রহের জন্য পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় Institute of Water Monitoring নামে মন্ত্রণালয়ের একটি প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব দিয়েছে। তাছাড়া বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় থেকেও পরিবেশগত বিপর্যয়ের দিকগুলো তুলে ধরার কাজ চলছে।

উপসংহার : ফারাক্কা চালু হয়েছে, কিন্তু আমাদের মধ্যকার অনৈক্যের কারণে আমরা তা প্রতিহত করতে পারিনি। এখন যদি ভারতীয় আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়িত হয় তাহলে জাতি হিসেবে আমাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাই ধর্ম-বর্ণ, দল-মত নির্বিশেষে সকলকে ভারতীয় এই অশুভ চক্রান্তের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে।

০৮। 'টিপাইমুখ বাঁধ বাংলাদেশের জন্য ভবিষ্যৎ ফারাক্কা'— আলোচনা করুন।
***অথবা,* টিপাইমুখ বাঁধ ও এর সম্ভাব্য পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করুন।**

উত্তর : প্রাণিকুল ও উদ্ভিদকুল জীবনধারণের জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পানির ওপর নির্ভরশীল। এজন্য স্থান-কাল নির্বিশেষে বর্তমান বিশ্বে পানি শুধু একটি পদার্থই নয় একটি মূল্যবান সম্পদও বটে। পৃথিবীর তিন-চতুর্থাংশ জুড়ে রয়েছে পানি। এ পানির ৯৭.৩০ ভাগই লবণাক্ত। বাকি ২.৭০ ভাগ মিঠা পানি। বিশ্বের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে পানির চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। প্রতিটি দেশের সরকার তার বর্ধিত জনসংখ্যার চাহিদা মেটাতে নানা পরিকল্পনা হাতে নিচ্ছে। পানির পরিমাণ চাহিদার তুলনায় বেশি হলেও যেখানে যে পরিমাণ পানি সরবরাহ দরকার সেখানে সে পরিমাণ পানি পাওয়া যায় না

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

বলেই যুগে যুগে মানুষে-মানুষে, জাতিতে-জাতিতে এ সমস্যা নিয়ে হয়েছে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ ও বিগ্রহ। পানির সমস্যা দিন দিন ভয়াবহ হওয়ার কারণে এখন আর একটি বা দুটি দেশ নয়, সারা বিশ্বে এই সংকট আরো প্রকট হয়ে উঠছে। পানীয় জলের অভাব এবং বর্তমান বিশ্বের প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে বিশ্বব্যাংকের সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট ইসমাইল সেরাগেলদিন ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে ভবিষ্যৎ যুদ্ধ সম্পর্কে সতর্ক করতে গিয়ে বলেছেন, 'এ শতাব্দীর যুদ্ধ যদি হয়েছে তেলের জন্য, আগামী শতাব্দীর যুদ্ধ হবে পানির জন্য।' অনেক বিশেষজ্ঞের মতে, ইরাক যুদ্ধ শুধু তেলের জন্য নয় বরং এর সাথে ফোরাত নদীর পানির বিষয়টিও জড়িত। বাংলাদেশ ভারতের একটি বন্ধুপ্রতিম প্রতিবেশী রাষ্ট্র। কিন্তু ভারত কখনোই সুপ্রতিবেশীসুলভ মনোভাব দেখায়নি। বরং বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকে ভারত বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, নিরাপত্তা, রাজনীতি, বাণিজ্য ও অর্থনীতিতে নগ্ন আগ্রাসন চালিয়ে সমস্যা সৃষ্টি করেছে ভারত। ভারতের সাম্প্রতিক আগ্রাসন আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের আওতায় টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণ।

ভারতের পানি ষড়যন্ত্র ও ফারাক্কা বাঁধ পরিচিতি : বাংলাদেশে ছোট-বড় ৩১০টি নদ-নদী রয়েছে। এর মধ্যে ৫৭টি আন্তঃসীমান্তবর্তী– যার ৫৪টি এসেছে ভারত থেকে এবং বাকি ৩টি মিয়ানমার থেকে। বাংলাদেশের অবস্থান ভাটিতে হওয়ায় উজানে যে কোনো ধরনের পানি নিয়ন্ত্রণের প্রত্যক্ষ প্রভাব বাংলাদেশের ওপর পড়ে। কিন্তু ভারত বাংলাদেশের স্বার্থের দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে দু'দেশের অভিন্ন সম্পদ পানি নিয়ে ষড়যন্ত্র শুরু করে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে। কোলকাতা বন্দরের নাব্যতা বৃদ্ধির জন্য ভারত পশ্চিম বাংলার মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত রাজমহল ও ভগবান গোলার প্রায় মাঝামাঝি স্থান ফারাক্কায় ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে মরণবাঁধ নির্মাণ শুরু করে। রাজশাহী সীমান্ত থেকে ১৬.৫ কিমি উজানে গঙ্গা নদীর ওপর নির্মিত এ বাঁধের কাজ শেষ হয় ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে। কোলকাতা বন্দর থেকে এ বাঁধের দূরত্ব ১৬০ মাইল। ফারাক্কায় আছে রেল ও সড়ক সেতু, ডান তীরে সংযোগ খালের জন্য রয়েছে একটি হেড রেগুলেটর। এখান থেকে শুরু হয়েছে সংযোগ খাল। মূল বাঁধের দৈর্ঘ্য ২২৪৫ মিটার বা ৭ হাজার ৩৬৩ ফুট ৪ ইঞ্চি। উচ্চতা ২৩ মিটার। গেটের সংখ্যা ১০৯টি, গেটের প্রস্থ ১৮ মিটার। খাদের গভীরতা ২২ মিটার। ডিসচার্জ ২৭,০০০,০০ কিউসেক। এটি নির্মাণে ব্যয় হয় ১৫৬ কোটি ভারতীয় রুপি। একটানা ১৩ বছর ধরে ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণের কাজ চালিয়ে পুরো প্রকল্প সম্পূর্ণ করতে ভারতের ২০০ কোটি রুপি ব্যয় হয়।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে মুক্তিযুদ্ধের সময় এ বাঁধ চালু হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে মরুকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়। পানি সম্পর্কিত দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে গঠিত বাংলাদেশ-ভারত যৌথ নদী কমিশনের (Joint Rivers Commission) মাধ্যমে ভারতীয় নীতির প্রতিবাদ করে। পরবর্তীকালে দু'দেশের পানি সম্পদ মন্ত্রী কর্তৃক স্বাক্ষরিত এক চুক্তি অনুযায়ী ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের ২১ এপ্রিল থেকে ৩১ মে পর্যন্ত ৪০ দিনের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে বাঁধের ফিডার ক্যানেলটি চালু রাখার ব্যবস্থা করা হয়। নির্ধারিত এ সময়ে ১১ হাজার থেকে ১৬ হাজার কিউসেক পানি ফিডার ক্যানেল দিয়ে প্রত্যাহার করে হুগলি নদীতে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ভারত ৪১ দিনের সময়সীমা পার হয়ে যাওয়ার পরে বাংলাদেশের সাথে কোনো চুক্তি বা সমঝোতা ছাড়াই ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পট পরিবর্তনের পর ১৯৭৬ সালের শুষ্ক মৌসুমে ফিডার ক্যানেলের পূর্ণ ক্ষমতা অনুযায়ী গঙ্গার পানি ধরে রাখে এবং বর্ষা মৌসুমে প্রত্যাহার করে। এর ফলে শুষ্ক মৌসুমে বাংলাদেশে দেখা দেয় খরা আর বর্ষা মৌসুমে দেখা দেয় বন্যা, জলোচ্ছ্বাস। পরবর্তীতে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে এ বিষয়টি উত্থাপনের পর ১৯৭৭ থেকে ১৯৮২ পর্যন্ত ৫ বছরের মেয়াদে পানি বণ্টন নিয়ে ফারাক্কা চুক্তি হয় এবং চুক্তির মেয়াদ শেষে ১৯৮২ সালের অক্টোবরে দু'বছরের জন্য উভয় দেশের মধ্যে এক সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৮৫ সালের

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

২২ নভেম্বর পুনরায় ৩ বছরের জন্য আরেকটি সমঝোতা দলিলে শুষ্ক মৌসুমে গঙ্গার প্রবাহ বৃদ্ধির ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার উল্লেখ থাকলেও উভয় দেশ এ ব্যাপারে তাদের পূর্ব অবস্থানে রয়ে যায়। পরবর্তীতে ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দের ১২ ডিসেম্বর ৩০ বছর মেয়াদী পানি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প ও টিপাইমুখ বাঁধ : আগামী ৫০ বছরের ক্রমবর্ধমান পানির চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং এর অববাহিকায় সকল নদ-নদীর পানি বাঁধ, জলাধার এবং সংযোগ খালের মাধ্যমে প্রত্যাহার করে ভারতের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে, এমনকি দক্ষিণের কাবেরি নদী পর্যন্ত টেনে নিয়ে খরাপীড়িত অঞ্চলে পানি সরবরাহের জন্য ভারত যে মহাপরিকল্পনা হাতে নিয়েছে তা আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প (Inter-river Linking Project) নামে পরিচিত।

এ প্রকল্পের আওতায় ৩৭টি ছোট-বড় নদীকে ৩০টি খালের মাধ্যমে সংযোগ ঘটিয়ে ৭৪টি জলাধারে পানি সংরক্ষণ করে পানির প্রবাহ ঘুরিয়ে ভারতের উত্তর, উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলের খরাপ্রবণ রাজ্যগুলোতে বণ্টন করে কৃষিকাজে ব্যবহার করা হবে। ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার পানি পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা হয়ে দক্ষিণ ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশ ও কর্ণাটক দিয়ে তামিলনাড়ুতে নিয়ে যাওয়া হবে। আর গঙ্গার পানি পৌঁছাবে উত্তর প্রদেশ, হরিয়ানা, রাজস্থান এবং গুজরাটে। ১২০০ কিমি দীর্ঘ কৃত্রিম নদী সম্বলিত এ প্রকল্পের মাধ্যমে ভারত গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের এক-তৃতীয়াংশ পানি তথা ১৭৩ বিলিয়ন ঘনমিটার পানি সরিয়ে নিতে সক্ষম হবে। ১২-১৫ বছর মেয়াদী এ প্রকল্পের প্রাক সম্ভাব্যতা যাচাই ও রিপোর্ট প্রদান সম্পন্ন হয় যথাক্রমে ২০০৫ ও ২০০৬ খ্রিষ্টাব্দে। আর প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পন্ন হবে ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে। ভারতের ইতিহাসে দ্বিতীয় বৃহত্তম এ উচ্চাভিলাষী প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৫ লাখ ৬০ হাজার কোটি রুপি বা ১২৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের মতে, এ প্রকল্পের ব্যয় হবে ১৪৪ থেকে ২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

টিপাইমুখ নামক স্থানটি ভারতের মণিপুর রাজ্যের চুরাচাঁদপুর জেলায়। এটি বাংলাদেশের সিলেটের জকিগঞ্জ সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে ১০০ কিমি দূরে অবস্থিত। এ টিপাইমুখ নামক স্থানে বরাক নদীতে ভারত ১৫০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন করার লক্ষ্যে বাঁধ নির্মাণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে। প্রায় ৩৯০ মিটার দীর্ঘ এবং ১৬০ মিটার উচ্চতাবিশিষ্ট এ বাঁধ নির্মাণে ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ৯,০০০ কোটি টাকা এবং এর কাজ ২০১১ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ সম্পন্ন হবে বলে ধারণা করা হয়েছিল। বরাক নদীটি বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে সিলেট অঞ্চল দিয়ে সুরমা ও কুশিয়ারা নামক দুটি পৃথক নদী হিসেবে। সুরমা ও কুশিয়ারা পরবর্তীতে মিলিত হয়েছে আজমিরিগঞ্জে এবং মেঘনা নাম ধারণ করে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে।

টিপাইমুখ বাঁধ বাংলাদেশের জন্য ভবিষ্যৎ ফারাক্কা : পানি এবং নদী সংযোগ প্রজেক্ট নিয়ে ভারত ও বাংলাদেশ– এ দু'দেশের সম্পর্কের সংকট অনেক দিনের। ভারতের সাথে বাংলাদেশের মোট ৫৪টি অভিন্ন নদী রয়েছে। যার মধ্যে ৫৩টি ভারত থেকে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে এবং এ কারণে ভারত নানাভাবে আমাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করছে। অন্যদিকে, ভারত তাদের বিশাল জনসংখ্যা এবং আয়তনের দোহাই দিয়ে তাদের বেশি পরিমাণ পানির প্রয়োজন বলে দাবি করে আসছে এবং আমাদের অভিযোগ অস্বীকার করছে। আর ভারত কর্তৃক উজানের পানি প্রত্যাহারে বাংলাদেশ মরুভূমিতে পরিণত হচ্ছে। শুকিয়ে যাচ্ছে দেশের নদ-নদী, খাল-বিল, হাওর-জলাশয়। হারিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশের নদ-নদীর নাব্যতা। কৃষি, জীববৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক ভারসাম্যতা আজ হুমকির সম্মুখীন। দ্রুত পরিবর্তিত আবহাওয়া আমাদের

মরুময়তার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। ফারাক্কা বাঁধ প্রমত্তা পদ্মাকে বিরান মরুভূমিতে পরিণত করছে। এছাড়া মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা, মহানন্দার মতো নদীগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে পানির প্রবাহ নিম্নস্তরে নেমে আসায়। ফারাক্কা বাঁধ ও এর বাস্তবায়নের ফলে নিয়ন্ত্রিত পানি প্রবাহ তিস্তা ব্যারেজকে অকার্যকর করে তুলেছে এবং প্রায় ৪০ হাজার হেক্টর জমির সেচ সুবিধা বিঘ্নিত হচ্ছে। রাজশাহী বরেন্দ্র সেচ প্রকল্পও হুমকির সম্মুখীন।

এছাড়া রাজশাহী অঞ্চলের ছোট ছোট সেচ প্রকল্পগুলোতেও অচলাবস্থা বিরাজ করছে। ফলে প্রায় লক্ষাধিক হেক্টর জমির সেচ সুবিধা বিঘ্নিত হচ্ছে। ফারাক্কা আগ্রাসন কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের অর্থনীতিকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে চলেছে। এদিকে মণিপুর রাজ্যের টিপাইমুখ নামকস্থানে বরাক নদীর ওপর আরো একটি বাঁধ নির্মাণ শুরু করেছে ভারত। বরাক নদীতে বাঁধ স্থাপনের মাধ্যমে এ নদীর পানিকে পরিকল্পিতভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হবে এবং ফারাক্কার পানি প্রবাহের মতো ভারত সরকারের প্রয়োজন ও ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর বরাক নদীর পানি প্রবাহও নির্ভরশীল হয়ে পড়বে এবং ফলে সুরমা ও কুশিয়ারা তার স্বাভাবিক পানি প্রবাহ থেকে বঞ্চিত হবে। টিপাইমুখ বাঁধ কিভাবে বাংলাদেশের জন্য ভবিষ্যৎ ফারাক্কায় পরিণত হবে তা উপস্থাপন করা হলো :

১. **নদ-নদীর বিলুপ্তি ঘটবে :** বরাক নদী বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে সিলেট অঞ্চল দিয়ে সুরমা ও কুশিয়ারা নামক দুটি পৃথক নদী হিসেবে। সিলেট ও এর আশপাশের এলাকাগুলোর কৃষি ব্যবস্থা ও শিল্প-কারখানা বিশেষভাবে এ নদী দুটির ওপর নির্ভরশীল। একদিকে মনুষ্য সৃষ্ট কার্যকলাপ, পরিবেশ বিপর্যয়, পাহাড়ি ঢল থেকে নেমে আসা পলির স্তর নদীগুলোর গভীরতা হ্রাস করছে প্রতিনিয়ত। তার ওপর টিপাইমুখ বাঁধ সুরমা-কুশিয়ারার মতো নাব্যতা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করবে। ভারতের ইচ্ছামাফিক পানি প্রবাহে সুরমা ও কুশিয়ারা পদ্মার মতো ধু ধু বালুচরে রূপান্তরিত হবে। শুকিয়ে যাবে পদ্মার ৬টি উপনদী ও শাখা নদী। সেচ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে উত্তর পূর্বাঞ্চলের হাজার হাজার মানুষ। শুকিয়ে যাবে ব্রহ্মপুত্র, মরে যাবে তিস্তা, ধরলা, বংশী ও শীতলক্ষ্যা নদী। মরে যাবে মনুই, বাউলাই, তিতাস, গোমতি নদীসমূহ।

২. **চা শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হবে :** টিপাইমুখ বাঁধের প্রভাবে যদি সুরমা ও কুশিয়ারা পদ্মার মতো স্বাভাবিক পানি বঞ্চিত হয় তাহলে বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে শুরু হবে মরুকরণ প্রক্রিয়া। সিলেট অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ দিন দিন নষ্ট হয়ে যাবে এবং পর্যাপ্ত পানির অভাবে কৃষিকাজ ব্যাহত হবে। বৃষ্টিপাত কমে যাবে। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে আমাদের চা শিল্প।

৩. **প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিবে :** বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ এলাকা। বিশেষজ্ঞদের মতে, টিপাইমুখে বাঁধ বাস্তবায়ন হলে সিলেট অঞ্চলে শুকনো মৌসুমে পানির অভাবে খরা এবং বর্ষা মৌসুমে উজানের ছেড়ে দেয়া পানি ও বর্ষার পানিতে বন্যা সংঘটিত হবে। সাধারণত সিলেট অঞ্চলে বন্যা দেখা দেয় মূলত পাহাড়ি ঢলে। উত্তর দিকে হিমালয় হতে ৫০ লাখ কিউসেক বরফ গলা পানি প্রতিবছর ভারত-নেপালের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশের পদ্মা, মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র দিয়ে প্রবাহিত হয়। এ সময় দেশে বৃষ্টিপাতের গড় থাকে প্রায় ২০৩ সেন্টিমিটার, তার ওপর ভারত এ সময়ে টিপাইমুখ বাঁধ খুলে দিলে দেশ ভেসে যাবে বন্যার পানিতে। সে সাথে কালবৈশাখীর দাপট যে কত মারাত্মক হবে তা সহজেই অনুমেয়।

৪. **বিস্তৃত মরুকরণ শুরু হবে :** গঙ্গা অববাহিকায় উত্তর ভারত ও নেপালের বনাঞ্চল নষ্ট হয়ে বর্ষা মৌসুমে পাহাড় ক্ষয়ে বিপুল পরিমাণ পলিমাটি নদীতে গিয়ে পড়ছে। আবার প্রতিবছর পাহাড়ি ঢল থেকে আসা প্রচুর পরিমাণ পলি নদীতে পড়ে নদীর নাব্যতা নষ্ট করছে। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

নদীতে প্রতি বছর ২শ কোটি ৫০ লাখ টন পলি পড়ে। এ কারণে গত ১০ বছরে মোট নৌপথের ১৫শ কিলোমিটার নদীপথ নাব্যতা হারিয়েছে এবং পলি পড়ে কুড়িগ্রাম থেকে রাজবাড়ি পর্যন্ত ৫ হাজারটি চর ও ডুবো চর সৃষ্টি হয়েছে। নাব্যতা হারানো নদীগুলোতে নৌচলাচলে বিঘ্ন ঘটছে এবং ফেরিঘাট বারবার বদলের কারণে ব্যাপক আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে। এভাবে নাব্যতা হারাতে থাকলে বাংলাদেশ এক সময় পানির অভাবে বিস্তৃত মরুভূমিতে পরিণত হবে।

৫. **লবণাক্ততা বৃদ্ধি ও আর্সেনিক দূষণ :** বাংলাদেশের নদীগুলো দিয়ে মিঠা পানি প্রবাহিত হয়। নদীর পানি প্রবাহ কমে গেলে সমুদ্রের লবণাক্ত পানি উজানে উঠে আসবে। ফলে এ পানি মাটির লবণাক্ততা বৃদ্ধি করে মারাত্মক সমস্যা সৃষ্টি করবে। পানি প্রবাহ কমে যাওয়ায় ভূ-গর্ভস্থ পানি অনেক নিচে নেমে গিয়ে আর্সেনিক দূষণ সৃষ্টি করছে। টিপাইমুখ বাঁধ এ পরিস্থিতিকে আরো ভয়াবহ করে তুলবে।

৬. **কৃষি ও মৎস্যসম্পদ ধ্বংস হবে :** বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান খাত কৃষি। বাংলাদেশের প্রায় ৮০ ভাগ লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষি কাজে নিয়োজিত। এ দেশের চাষাবাদ নদীনালার পানি ও প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল। টিপাইমুখ বাঁধ দিয়ে শুষ্ক মৌসুমে ভারত গঙ্গার ফারাক্কা বাঁধের মতো পানি প্রত্যাহার করলে বাংলাদেশের রাজশাহী অঞ্চলের মতো সিলেট অঞ্চলের কৃষিও পানির অভাবে বিনষ্ট হবে। ফসল পুড়ে যাবে। বন্ধ হয়ে যাবে চাষাবাদ। বৃদ্ধি পাবে লবণাক্ততা। জমির উর্বরতা ও উৎপাদন কমে যাবে। পানির অভাবে খালবিল-নদীনালা শুকিয়ে যাবে। ফলে বিলুপ্ত হয়ে যাবে মৎস্যসম্পদ।

৭. **টিপাইমুখ বাঁধ সুন্দরবনের জন্য নয়া হুমকি :** বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন— যা বাংলাদেশের ৫টি জেলাকে স্পর্শ করে আছে। সুন্দরবন ছিল মিঠাপানির বন। কিন্তু ফারাক্কার প্রভাবে এর নদীনালার পানি প্রবাহ কমে যাওয়ায় সমুদ্রের লবণাক্ত পানি ঢুকেছে সুন্দরবনে। ফলে সুন্দরী গাছ আক্রান্ত হচ্ছে আগামরা রোগে। উজাড় হচ্ছে সুন্দরবনের সৌন্দর্য, ধ্বংস হচ্ছে পশুপাখি। যদি এভাবে পানি দিনের পর দিন কমতে থাকে তাহলে সুন্দরবন ধ্বংসের সম্মুখীন হবে। হারিয়ে যাবে ইউনেস্কো ঘোষিত বিশ্বের ৭৯৮তম (প্রচলিত তথ্য মতে, ৫২২তম) ঐতিহ্য হিসেবে ঘোষিত সুন্দরবন।

৮. **যাতায়াত ব্যবস্থায় বিপর্যয় ঘটবে :** বাংলাদেশে ৩১০টি নদ-নদী জালের মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। কিন্তু গঙ্গায় ভারতের ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ ও ভারতের ইচ্ছামাফিক পানি প্রত্যাহারের ফলে ইতোমধ্যেই বাংলাদেশের অনেক নদী মরে গেছে, অনেক নদী মৃতের সম্মুখীন হয়েছে। পদ্মা, মেঘনা, ব্রহ্মপুত্রের মতো নদীগুলোতে চর পড়ে মানুষের নদী পারাপার, পণ্য পরিবহন ও জাহাজ চলাচলে বিপর্যয় সৃষ্টি করছে। টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণ সম্পন্ন হলে বাংলাদেশে এ সমস্যা আরো প্রকট হয়ে দেখা দিবে। ফলে এক সময় নদীপথ চলাচলের জন্য অযোগ্য হয়ে পড়বে।

৯. **বেকারত্ব ও উদ্বাস্তু সমস্যার সৃষ্টি :** বাংলাদেশের লাখ লাখ মানুষের জীবন-জীবিকা নদীনালার ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং নদ-নদীর অস্তিত্ব বিপন্ন হলে এর সাথে মাঝি, জেলেসহ লাখ লাখ মানুষ বেকার হয়ে পড়বে। সেই সাথে নদীর তীরবর্তী ও চর এলাকার মানুষ যাদের জীবিকা মূলত নদীনির্ভর তারা উদ্বাস্তু হয়ে পড়বে।

১০. **জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হবে :** বাংলাদেশের নদ-নদীর সাথে শুধু মানুষই নয়, এর সাথে জড়িয়ে আছে হাজার হাজার পশুপাখি, কীটপতঙ্গ, পোকামাকড়ের জীবন। নদ-নদী মরে গেলে এসব এলাকার অনেক দুর্লভ প্রাণী ও কীটপতঙ্গ চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। ধ্বংস হবে এদেশের জীববৈচিত্র্য।

উপসংহার : তাই ভারত যতই বলুক, 'বাংলাদেশের জন্য ক্ষতিকর কিছু ভারত করবে না।' দক্ষিণ তালপট্টি জবরদখল করা, পুশইন, গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তির অবমাননা, সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ, আন্তঃবাণিজ্য বৈষম্য, ভূমি ও ছিটমহল বিরোধ, সীমান্ত হত্যাকাণ্ড ও উত্তেজনা সৃষ্টির মতো বিভিন্ন কুপ্রতিবেশীসুলভ আচরণ ও আধিপত্যবাদী মানসিকতা আমাদের জন্য যে শুভ কিছু নয় এটি স্পষ্ট। প্রকৃতপক্ষে ভারত চায় বাংলাদেশকে তাদের ওপর নির্ভরশীল করতে। হতে পারে সেটা ফারাক্কা বাঁধ অথবা টিপাইমুখ বাঁধ দিয়ে। তাই বাংলাদেশের অচিরেই উচিত ভারতের এ আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বজনমত গড়ে তোলা, আন্তর্জাতিক ফোরামে উত্থাপন করা, কূটনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধি করা, জোট গঠন করে সোচ্চার প্রতিবাদ করা। নতুবা বাংলাদেশ নামের একটি দেশের অস্তিত্ব অচিরেই বিলীন হয়ে যাবে।

০৯ ॥ বাংলাদেশের পর্যটনশিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা আলোচনা করুন।

উত্তর : সুপ্রাচীন কাল থেকে মানুষ দেশে দেশে ভ্রমণ করে আসছে। পৃথিবী দেখার দুর্নিবার নেশায় মানুষ সাত সমুদ্র তের নদী পাড়ি দিয়েছে—বিক্ষুব্ধ মহাসমুদ্র পাড়ি দিয়ে পৌঁছেছে অজানা অচিন দেশে। মানুষের এই দুর্নিবার ভ্রমণাকাঙ্ক্ষা থেকেই পর্যটনশিল্পের উৎপত্তি। সভ্যতা বিকাশের সাথে সাথে পর্যটনের রূপ ও প্রকৃতিতে এসেছে অভাবিত পরিবর্তন। পর্যটন এখন শুধু কোনো ব্যক্তি বা ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর দেশভ্রমণ নয়, বরং সমগ্র মানবগোষ্ঠীর জন্য একটি বিশ্বজনীন শখ ও নেশা। আর তাই পর্যটন এখন একটি শিল্প, যা অনেক দেশের অর্থনীতির একটি মুখ্য উপাদান। ইতিমধ্যেই এ শিল্প বিশ্বব্যাপী একটি দ্রুত বিকাশমান খাত হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ছাড়াও বহুমাত্রিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে পর্যটন বর্তমানে অনেক দেশেই শীর্ষ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী শিল্পে পরিণত হয়েছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে তাই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি বাংলাদেশে পর্যটনশিল্পের বর্তমান অবস্থা এবং এর সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশের পর্যটনশিল্পের আকর্ষণ : প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি বাংলাদেশ। অপরিমেয় সৌন্দর্য ছড়িয়ে রয়েছে এই দেশে। ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক, ঐতিহ্যিক ও আত্মিক সকল সম্পদেই বাংলাদেশ সমৃদ্ধ। তাই যুগ যুগ ধরে বিদেশী পর্যটকদের কাছে বাংলাদেশ চিরসবুজে ঘেরা এক স্বপ্নের দেশ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আসছে। নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু এবং প্রাচীন সভ্যতার একটি কেন্দ্র হিসেবে পর্যটকদের আকর্ষণ করার মতো অনেক সম্পদ রয়েছে এ দেশে। বাংলাদেশের সুন্দরবন, সোনারগাঁও, কক্সবাজার, কাপ্তাই, কুয়াকাটা, রাঙামাটি, ময়নামতি, পাহাড়পুরসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক স্থানসমূহ দেশী-বিদেশী পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য যথেষ্ট সমৃদ্ধ। তাই প্রাচীনকাল থেকে বহু জ্ঞানী-গুণী বিদেশী পর্যটক বাংলার বুকে পা রেখে মুগ্ধ হয়েছেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে রয়েছে বিভিন্ন উপজাতি। যেমন—চাকমা, মারমা, মগ, সাঁওতাল, গারো, কুকি, টিপরা, মণিপুরী, খাসিয়া ইত্যাদি। তাদের বিচিত্র পোশাক, জীবনযাত্রার পদ্ধতি এবং বর্ণাঢ্য সংস্কৃতির সম্ভার হৃদয়ে দোলা দেয়। এত সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য দেশের মতো পর্যটন বাংলাদেশে এখনো শিল্প হিসেবে পূর্ণ বিকশিত হতে পারেনি। অথচ দারিদ্র্য বিমোচনে এবং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পর্যটনশিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

বাংলাদেশে পর্যটনশিল্প বিকাশের প্রেক্ষাপট : প্রাচীনকাল থেকেই অতিথিপরায়ণতা ও সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে এসেছে আমাদের দেশ। কিন্তু পর্যটকদের আকৃষ্ট করে এখানে এমন অনেক

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

উপকরণ থাকলেও স্বাধীনতা-পূর্বকালে এ ব্যাপারে কার্যত কোনো ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়নি। স্বাধীনতার পর পর্যটনের ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং এর সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালের ১ জানুয়ারি 'বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন' নামে একটি জাতীয় পর্যটন সংস্থা গঠিত হয়। দেশের পর্যটনের উন্নয়নের স্বার্থে প্রয়োজনীয় সকল প্রকার কার্য পরিচালনার একক দায়িত্ব এই সংস্থার ওপর ন্যস্ত হয় এবং সংস্থাটি নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণ ও সেগুলো বাস্তবায়নের কাজ শুরু করে। বিদেশী পর্যটকদের আকর্ষণের জন্য বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, ইতিহাস ও সংস্কৃতি তুলে ধরে বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বৃদ্ধির কাজও পর্যটন কর্পোরেশন গ্রহণ করে।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পর্যটনশিল্পের গুরুত্ব : জাতিসংঘের এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, বিশেষত তৃতীয় বিশ্বের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে পর্যটনের ভূমিকা অনন্য। কারণ এটি অপ্রচলিত পণ্যের রপ্তানি বাড়ায়, বাণিজ্যিক লেনদেন অনুকূলে রাখতে সাহায্য করে। ফলে জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে পর্যটনশিল্প থেকে সবচেয়ে বেশি উপার্জন করে ভারত। ভারতের পর পর্যটন খাতে সর্বোচ্চ আয় শ্রীলংকার। তাই আমাদের দেশে পর্যটনশিল্পকে অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাজে লাগাতে হলে আরো অনেক বিদেশী পর্যটককে আকর্ষণ করাতে হবে।

বাংলাদেশের পর্যটনশিল্পের সংকট : বহুমুখী সমস্যার আবর্তে বাংলাদেশে পর্যটনশিল্প সংকটাপন্ন। অপার প্রাকৃতিক শোভামণ্ডিত এ দেশে পর্যটনশিল্পের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার আয় বাড়াবার এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির কোনো সুনির্দিষ্ট ও সমন্বিত পদক্ষেপ এখন পর্যন্ত না হওয়ায় পর্যটনশিল্পের আশানুরূপ বিকাশ ঘটছে না। ১৯৯২ সালে ঘোষিত পর্যটন সম্পর্কিত জাতীয় নীতিমালারও সুচারু বাস্তবায়ন হচ্ছে না। বাংলাদেশের পর্যটনশিল্পের প্রধান সমস্যাগুলো নিম্নরূপ :

১. **যোগাযোগ ও অবকাঠামোগত সমস্যা :** আমাদের দেশের আকর্ষণীয় ও দর্শনীয় স্থানগুলো বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে অবস্থান করছে। এ সকল স্থানে যাতায়াতের জন্য নৌ ও সড়ক যোগাযোগের ব্যবস্থা পর্যাপ্ত নয়। এ ছাড়া ভ্রমণের জন্য দ্রুত ও নিরাপদ যানবাহনের ব্যবস্থা, আরামদায়ক ও নিরাপদ হোটেল, মোটেল ও বাসস্থানের ব্যবস্থা এবং কাঙ্ক্ষিত বিনোদনের অভাব রয়েছে।

২. **বেসরকারি উদ্যোগের অভাব :** পর্যটন বেসরকারি উদ্যোগেই সব দেশে সমৃদ্ধ হয়। কিন্তু আমাদের দেশে এখনো পর্যন্ত এমন কোনো পরিবেশ সৃষ্টি হয়নি যাতে পর্যটন খাতে বেসরকারি উদ্যোক্তারা ব্যাপক পুঁজি বিনিয়োগ করতে পারেন। তাছাড়া বেসরকারি খাতে পর্যটন এখনো শিল্প হিসেবে স্বীকৃতি পায়নি। পর্যটন খাতে বেসরকারি উদ্যোগকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মতৎপরতারও অভাব রয়েছে।

৩. **সরকারি উদ্যোগের অভাব :** যে কোনো দেশের সরকারি পর্যটন দপ্তরেই স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রমোশন বিভাগ থাকে। তারা দেশে ও বিদেশে যথাক্রমে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পর্যটকদের উৎসাহিত করার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে। দেশের বাইরে দূতাবাসগুলোর মাধ্যমে এ কাজ পরিচালিত হয়। অথচ আমাদের অনেক বিদেশী দূতাবাসে পর্যটন বিষয়ক কোনো ডেস্ক পর্যন্ত নেই বলে অভিযোগ রয়েছে।

৪. **অনুন্নত অভ্যন্তরীণ পর্যটন ব্যবস্থা :** অভ্যন্তরীণ পর্যটন উন্নত না হলে কোনো দেশে আন্তর্জাতিক পর্যটন বিকাশ লাভ করতে পারে না। আর অভ্যন্তরীণ পর্যটন উন্নত হয় কেবল দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে পর্যটনে উৎসাহিত করার মাধ্যমে। কিন্তু আমাদের দেশে এ ক্ষেত্রে গৃহীত উদ্যোগ পর্যাপ্ত নয়।

৫. **নিরুপদ্রব পরিবেশ এবং নিরাপত্তার অভাব :** আমাদের দেশে পর্যটনের ক্ষেত্রে নিরুপদ্রব পরিবেশ এবং নিরাপত্তার অভাব পরিলক্ষিত হয়। পত্রিকায় প্রায়ই দেখা যায়, বিমানবন্দরে বিদেশীরা নানাভাবে প্রতারিত কিংবা ভোগান্তির শিকার হচ্ছে। বিমানবন্দর পেরিয়ে ট্যাক্সি বা মোটর ভাড়া করতে গিয়েও তারা প্রতারকের খপ্পরে পড়ে। এ সকল কারণে পর্যটকদের মনে বাংলাদেশের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব গড়ে ওঠে।

৬. **আকর্ষণীয় প্রচার ও সাবলীল উপস্থাপনার অভাব :** বাংলাদেশের নয়নাভিরাম অফুরন্ত প্রাকৃতিক শোভা এবং ঐতিহাসিক স্থাপত্যকীর্তি থাকলেও দেশী-বিদেশী পর্যটকদের কাছে সেগুলো আকর্ষণীয় করে প্রচার এবং উপস্থাপন করার পর্যাপ্ত উদ্যোগ নেই। এর ফলে পর্যটনশিল্প দ্রুতগতিতে বিকশিত হচ্ছে না।

৭. **দক্ষ গাইডের অভাব :** ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে আসা বিদেশীদের অনেক সমস্যার মধ্যে একটি হলো ভালো গাইডের দুষ্প্রাপ্যতা। ভিন দেশে এসে একজন পর্যটক প্রথমেই পেতে চায় একজন ভালো গাইড, যিনি তার ভ্রমণকে সহজ ও আকর্ষণীয় করে তুলবেন। কিন্তু আমাদের দেশের পর্যটন কেন্দ্রগুলোতে ভালো ও উপযুক্ত গাইডের অপ্রতুলতা রয়েছে।

৮. **পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব :** দেশে পর্যটনশিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য দক্ষ ও মানসম্মত জনশক্তি অপরিহার্য। আর আধুনিক পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই কেবল এ ধরনের জনশক্তি গড়ে তোলা যায়। কিন্তু বাংলাদেশে পর্যটন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের আধুনিক ব্যবস্থা একেবারেই অপর্যাপ্ত।

৯. **রাজনৈতিক অস্থিরতা :** হরতাল, ধর্মঘট তথা রাজনৈতিক অস্থিরতা এ দেশের অন্যান্য খাতের মতো পর্যটনশিল্পের বিকাশের ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। বাংলাদেশে যখন-তখন হরতাল-ধর্মঘট শুরু হওয়ায় বাড়তি ঝুঁকির সম্মুখীন হয় পর্যটকরা। ফলে ভাটা পড়ে পর্যটকদের উৎসাহে, অবদমিত হয় বিদেশীদের বাংলাদেশ ভ্রমণের ইচ্ছা। আর এভাবেই রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে বাংলাদেশ পর্যটনশিল্প থেকে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।

১০. **পর্যটন নীতির দৈন্যদশা :** বাংলাদেশে পর্যটনশিল্পের ক্ষেত্রে সরকারি নীতির দৈন্যদশা পরিলক্ষিত হয়। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসমূহে এ খাতে বরাদ্দ অপ্রতুল। পর্যটন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজে নিয়োজিত বিভিন্ন সরকারি বিভাগ যেমন— রাস্তাঘাট, যানবাহন, প্রত্নতত্ত্ব, সংস্কৃতি, ক্রীড়া প্রভৃতির মধ্যে সমন্বিত কর্মকাণ্ডের নীতি অনুসৃত হয় না। পর্যটনশিল্পের বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নীতিগত দুর্বলতা রয়েছে। পর্যটনশিল্পের বিকাশের জন্য যে বিশেষজ্ঞ জ্ঞান, দক্ষতা, উদ্ভাবন ও অর্থ বিনিয়োগ অপরিহার্য তা জাতীয় উন্নয়ন নীতিমালায় খুব একটা প্রাধান্য পায়নি।

বাংলাদেশে পর্যটনশিল্পের সম্ভাবনা : বাংলাদেশে রয়েছে অফুরন্ত প্রাকৃতিক শোভা। বিস্তীর্ণ পাহাড়-পর্বত, বর্ণাঢ্য উপজাতি, বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ সুন্দরবন, দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার, হ্রদ, নদ-নদী, চা-বাগান, প্রাচীন ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন প্রভৃতি এ দেশের পর্যটনের অন্যতম আকর্ষণ। তাই প্রাচীন কাল থেকে বহু জ্ঞানী-গুণী বিদেশী পর্যটক বাংলার বুকে পা রেখে রূপসী এ দেশ দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। কিন্তু এ দেশে পর্যটনশিল্প এখনো তেমনভাবে বিকশিত হয়নি। অথচ এ দেশের প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক পর্যটন আকর্ষণকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারলে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের একটি সম্ভাবনার দ্বার খুলে যেতে পারে। পর্যটনশিল্প হতে পারে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী অন্যতম প্রধান খাত।

বিশ্বব্যাপী পর্যটনকে বলা হয় 'Invisible Export Goods' বা অদৃশ্য রপ্তানি পণ্য। অন্যান্য রপ্তানি পণ্যের চেয়ে পর্যটনের সুবিধা হলো, অন্যান্য পণ্য রপ্তানির একটা সীমা আছে, সুতরাং রপ্তানি আয়ও সীমিত। কিন্তু পর্যটন এমন একটি শিল্প যেখানে বিনিয়োগ, চাকরি ও আয়ের কোনো সীমা নেই। বিশেষত বাংলাদেশে

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

যেখানে অসংখ্য সমস্যা, বেকারত্ব, প্রতিকূল বৈদেশিক বাণিজ্য, প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক খাতগুলোর শ্লথগতি এবং পুঁজি, প্রযুক্তি ও সম্পদের অপ্রতুলতা রয়েছে, সেখানে নৈসর্গিক প্রকৃতি ও ঐতিহ্যকে কাজে লাগিয়ে স্বল্প পুঁজিতে পর্যটনশিল্পের উন্নয়ন করতে পারলে তা ব্যাপক কর্মসংস্থান ও বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের বিরাট উৎস হতে পারে। কারণ এ খাতে উচ্চ প্রযুক্তি ও বিরাট মূলধন বিনিয়োগের কোনো প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন শুধু জাতির মানসিক গঠন এবং সেবাদানের উপযুক্ত দক্ষ জনগোষ্ঠী।

পর্যটনশিল্পের উন্নয়নের জন্য করণীয় : বাংলাদেশের পর্যটনশিল্পের সংকটের উত্তরণ এবং বিদ্যমান সমস্যার সমাধান হঠাৎ করে সম্ভব না হলেও এজন্য এখনই পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার। নিচে বাংলাদেশের পর্যটনশিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য কতিপয় সুপারিশ পেশ করা হলো :

- অবিলম্বে পর্যটন সম্পর্কিত জাতীয় নীতিমালা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।
- দেশের আকর্ষণীয় পর্যটন স্থানগুলোকে সুপরিকল্পিতভাবে আধুনিকায়ন করে দেশী-বিদেশী পর্যটকদের কাছে তা তুলে ধরার ব্যবস্থা করতে হবে।
- ঐতিহাসিক নিদর্শন ও দর্শনীয় স্থানসমূহে যাতায়াতের জন্য উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, আরামদায়ক বাসস্থান ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- অভ্যন্তরীণ পর্যটন ব্যবস্থাকে উন্নত করার জন্য দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে পর্যটন সম্পর্কে সচেতন ও আগ্রহী করে তোলা অত্যন্ত প্রয়োজন। এজন্য পর্যটন বিষয়ে ব্যাপক গণশিক্ষা এবং স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পর্যটন বিষয়ে শিক্ষা দিতে হবে।
- দেশের শিক্ষিত বেকার জনগোষ্ঠীকে পর্যটন বিষয়ে আধুনিক ও মানসম্মত প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে পর্যটন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন করতে হবে।
- পর্যটকদের নিরাপত্তার জন্য দেশে সুষ্ঠু আইনশৃঙ্খলার প্রয়োজন। বিমানবন্দরে নানা উটকো ঝামেলা, ভিক্ষুকদের উৎপাত, ছিনতাই ইত্যাদি যাতে বিদেশী পর্যটকদের বিব্রত না করে সেদিকে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন।
- প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ পর্যটক গাইড গড়ে তুলতে হবে এবং দক্ষ গাইডের দুষ্প্রাপ্যতা দূর করতে হবে।
- বাংলাদেশের পর্যটন কেন্দ্র ও আকর্ষণীয় স্থানগুলোর ওপর ফিল্ম ও ডকুমেন্টারি তৈরি করে বিদেশে বাংলাদেশের মিশনসমূহের মাধ্যমে তা বহির্বিশ্বে ব্যাপকভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।
- পর্যটন স্পটগুলোতে নিয়মিতভাবে আকর্ষণীয় খেলাধুলা, হস্তশিল্প প্রদর্শনী, মাছধরা, নৌকা ভ্রমণ, লোকসঙ্গীত ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে।
- সর্বোপরি দেশের আইনশৃঙ্খলার উন্নয়ন করে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়ন করতে হবে।

উপসংহার : বাংলাদেশে পর্যটনের আকর্ষণের অভাব নেই। একজন পর্যটক যা চায় তার সবই আছে এ দেশে। কিন্তু অভাব আছে কার্যকর উদ্যোগের, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার এবং আন্তরিক প্রচেষ্টার। বর্তমানে আমাদের দেশে দেশী-বিদেশী পর্যটকদের জন্য সীমিত পর্যটন সুবিধা আছে। কেননা সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রে এ শিল্পে বিনিয়োগ চাহিদার তুলনায় সামান্য। ফলে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে পর্যটনশিল্পে বাংলাদেশের সাফল্য খুবই কম। কিন্তু পর্যটনশিল্পে বাংলাদেশের সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল। পর্যটনশিল্পে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ সমাধান করতে পারলে এবং উপযুক্ত পর্যটন পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারলে বাংলাদেশের পর্যটনশিল্প কর্মসংস্থান, বিনিয়োগ ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের অন্যতম প্রধান উৎস হতে পারে।

১০ ॥ বাংলাদেশের পরিবেশ সংরক্ষণ নীতি কি? পরিবেশ সংরক্ষণে আর কি কি উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর : আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে তাই নিয়ে আমাদের পরিবেশ। মানুষ, প্রাণী, পশুপাখি, পাহাড়পর্বত, সাগর-নদী, বন জঙ্গল, খাল-বিল, পানি-বাতাস সব কিছুই পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত। মানববসতির জন্য পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা অপরিহার্য বিষয়। প্রয়োজনমাফিক বনাঞ্চল থাকা, বিশুদ্ধ পানির সরবরাহ, দূষণমুক্ত বাতাস, কোলাহলমুক্ত পরিবেশ পৃথিবীকে গড়ে তোলে বসবাসের অধিক উপযোগী। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, মানব সৃষ্ট অনেক কর্মের জন্য পৃথিবী তার বসবাসের উপযোগিতা ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে অনেক দেশ অচিরেই সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে যাবে।

বনভূমি উজাড়, পাহাড়কাটা, নির্বিচারে পশু পাখি হত্যা, বন ও বন্যপ্রাণীর নিধন প্রভৃতি পরিবেশের ভারসাম্যকে নষ্ট করছে। পৃথিবীর অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশে পরিবেশের ভারসাম্য বেশি হারে নষ্ট হচ্ছে। একদিকে বাংলাদেশ একটি জনবহুল রাষ্ট্র। মাত্র ৫৫ হাজার বর্গমাইলের এ দেশে ১৫.৮৫কোটির অধিক মানুষ বসবাস করছে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় যেখানে বনভূমি মোট আয়তনের ২৫ শতাংশ থাকা উচিত, সেখানে বাংলাদেশে কেবল ৯ শতাংশের সামান্য বেশি রয়েছে।

তাই পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টি বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে বারবার গুরুত্ব পেয়েছে। বিভিন্ন সময়ে পরিবেশ সংরক্ষণে নানা উদ্যোগ নেয়া হলেও এখনো নানাভাবে পরিবেশ বিনষ্ট হয়ে জীববৈচিত্র্যের ক্ষতিসাধন ও মানুষের বসবাসের উপযোগিতা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। এক্ষেত্রে পরিবেশ সংরক্ষণ নীতি বাস্তবায়ন ও নতুন পরিবেশ আইন প্রণয়ন এবং পরিবেশবান্ধব অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারে।

পরিবেশ সংরক্ষণে বাংলাদেশের নীতি : পরিবেশ সংরক্ষণে বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে যুগোপযোগী পরিবেশবান্ধব বিভিন্ন নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশে পরিবেশের সামগ্রিক ধারণাটি প্রথম জাতীয়ভাবে স্বীকৃত ও ঘোষিত হয় ১৯৯২ সালের জাতীয় পরিবেশ নীতিমালায় এবং এর বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ প্রণীত হয়। পরবর্তীতে সংশোধিত পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ২০১০ জাতীয় সংসদে পাস হয়। পরিবেশ আদালত, ২০০০ প্রণয়নের মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষার আন্দোলনকে আরো শক্তিশালী করেছে। এছাড়া পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মানোন্নয়ন এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও রোধ করার উদ্দেশ্যে পরিবেশ আইন বাস্তবায়নের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে পরিবেশ অধিদপ্তরের ওপর। বাংলাদেশের পরিবেশ সংরক্ষণে যেসব নীতি ও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিচে দেয়া হলো :

জাতীয় পরিবেশ নীতি, ১৯৯২ : বাংলাদেশের পরিবেশ অবক্ষয় এবং মারাত্মক দূষণের প্রেক্ষাপটে পরিবেশ নীতি ১৯৯২ একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। পরিবেশ নীতির উদ্দেশ্যগুলো হলো :

- পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে প্রাকৃতিক ভারসাম্য সংরক্ষণ ও সার্বিক উন্নয়ন।
- দেশকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা।
- সব ধরনের দূষণ ও অবক্ষয়মূলক কর্মকাণ্ড শনাক্তকরণ ও নিয়ন্ত্রণ।
- সবক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ।
- সব জাতীয় সম্পদের টেকসই, দীর্ঘমেয়াদি ও পরিবেশসম্মত ব্যবহারের নিশ্চয়তার বিধান এবং
- পরিবেশ সংক্রান্ত সব আন্তর্জাতিক উদ্যোগের সঙ্গে যথাসম্ভব সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকা।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ : বাংলাদেশের পরিবেশ সংরক্ষণে ১৯৯৫ সালের পরিবেশ সংরক্ষণ আইন একটি যুগান্তকারী ঘটনা। যে আইনে ২১টি ধারা বর্ণিত আছে। যা পরিবেশ সংরক্ষণে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক। পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর উল্লেখযোগ্য দিক হলো এই আইন অনুযায়ী পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মান উন্নয়ন এবং পরিবেশের দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও অবসানের প্রয়োজনে বায়ু, পানি, মাটি, গবাদিপশু, বন্যপ্রাণী, মৎস্য ও গাছপালা সংরক্ষণের প্রচেষ্টা অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে পরিবেশগত মান উন্নয়ন পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সব কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।

আইনের ৬ ধারায় আছে, স্বাস্থ্যহানিকর বা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ধোয়া বা গ্যাস নিঃসরণ করে এমন কোনো যানবাহন চালানো যাবে না। এছাড়া সরকার পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর সামগ্রী উৎপাদন, আমদানি, বাজারজাতকরণ, বিক্রি, মজুদ, বিতরণ, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিবহন বা ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করার নির্দেশ দিতে পারবে।

৭ ধারায় বলা আছে, কোনো ব্যক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পরিবেশের জন্য ক্ষতিসাধন করছে বলে মনে হলে, মহাপরিচালক ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করে পরিবেশ বা সংশোধনমূলক ব্যবস্থাগ্রহণের নির্দেশ দিতে পারবে না। ১২ ধারায় রয়েছে, পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের কাছ থেকে পরিবেশগত ছাড়পত্র ছাড়া কোনো এলাকায় শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন বা প্রকল্প গ্রহণ করা যাবে না। এই আইনের ১৫ ধারায় আরো বলা হয়েছে, পরিবেশ আইনের কোনো বিধান লঙ্ঘনের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এ শাস্তির বিধান সর্বনিম্ন ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ড, পাঁচ হাজার টাকা অর্থদণ্ড এবং সর্বোচ্চ ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ডপূর্বক পলিথিন-সামগ্রী উৎপাদন, আমদানি ও বাজারজাতকরণ প্রতিবেশ সংকটাপন্ন এলাকায় নিষিদ্ধকর্ম বা প্রক্রিয়া চালু রাখা, মহাপরিচালকের নির্দেশ অমান্য করা এবং অতিরিক্ত পরিবেশ দূষক নির্গমন ইত্যাদি অপরাধের জন্য অনধিক ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ লাখ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডের ব্যবস্থা রয়েছে।

পরিবেশ আদালত আইন, ২০০০ : পরিবেশ আদালত আইন, ২০০০ এর ৪(১) ধারা মতে, সরকারি প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রতিটি বিভাগে এক বা একাধিক পরিবেশ আদালত প্রতিষ্ঠা করা হবে। সেই সূত্রে ২০০২ সালে ঢাকা ও চট্টগ্রামে দুটি পরিবেশ আদালত ও ২০০৪ সালে সিলেটে একটি পরিবেশ আদালত গঠিত হয়েছে। পরিবেশ আদালত আইনের ৫(১) ধারায় বলা হয়েছে অন্য কোনো আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, পরিবেশ আইনের অধীনে অপরাধের বিচার ও ক্ষতিপূরণ লাভের জন্য বা উভয়ের জন্য এই আইনের বিধান অনুসারে পরিবেশ আদালতে সরাসরি মামলা করতে হবে এবং ১৮০ দিনের মধ্যে ঐ আদালতেই মামলার বিচার ও নিষ্পত্তি হবে।

সংশোধিত পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ২০১০ : সংশোধিত পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ২০১০ অনুসারে পরিবেশ সংরক্ষণে আরো কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সংশোধিত এ আইনে জলাধার ভরাট, পাহাড় কাটা, ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য, জাহাজ ভাঙ্গা বা কাটার ফলে সৃষ্ট দূষণ এবং পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার নিয়ম ভঙ্গ করাকে সরাসরি অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সংশোধনী আইনের ৬ ধারায় বলা আছে, আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, জলাদার হিসেবে চিহ্নিত জায়গা ভরাট বা কোনোরূপ পরিবর্তন করা যাবে না। তবে অপরিহার্য জাতীয় স্বার্থে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণক্রমে জলাধার সম্পর্কিত বিধিনিষেধ শিথিল করা যেতে পারে।

নতুন আইনে প্রতিটি জেলায় একটি করে পরিবেশ আদালত গঠনের কথা বলা হয়েছে। এসব আদালতে ক্ষতিগ্রস্ত যে কেউ দূষণকারীর বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবে। পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর দুর্বলতা ও ফাঁকপূরণে সংশোধিত পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ২০১০ অধিক শক্তিশালী ও কার্যকর হওয়ার আশা করা যায়।

পরিবেশ সংরক্ষণে আরো যেসব উদ্যোগ নেয়া বাঞ্ছনীয় : পরিবেশ সংরক্ষণ ও প্রতিবেশ সুরক্ষাকে প্রাধান্য দিয়ে সরকারকে আরো কিছু কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। দ্রুতহারে বন্যপ্রাণী হ্রাস, পরিবেশের ধ্বংসসাধন ও জলবায়ুর পরিবর্তনে নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলায় প্রয়োজন জনসচেতনতা, আইনের প্রয়োগ ও পরিবেশবান্ধব নীতি গ্রহণ। পরিবেশ সংরক্ষণে আরো যে সকল নীতি গ্রহণ করা যেতে পারে, সেগুলো হলো :

ক. পরিবেশ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় সাধন/যোগাযোগ।

খ. পরিবেশ উন্নয়নের জন্য নিয়োজিত বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাজের সমন্বয় সাধন।

গ. জাতীয় অর্থনীতি পরিকল্পনার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে পরিবেশ সুরক্ষার স্বার্থে জাতীয় পরিবেশ অগ্রাধিকার কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

ঘ. পরিবেশ মন্ত্রণালয়কে আদর্শ হিসেবে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। এর জন্য বিদ্যুৎসহ অন্যান্য সম্পদ ও সামগ্রী ব্যবহারে সশ্রয়ী হতে হবে। যেমন– এসিড ও ব্যক্তিগত গাড়ি পরিহার করতে হবে।

ঙ. সকল প্রকল্প বা কর্মসূচিতে সোস্যাল অডিট অর্থাৎ বৃহত্তর পরিসরে সামগ্রিক অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন করতে হবে।

চ. সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের পরিবেশ ব্যবস্থাপনাকে যুগোপযোগী করার জন্য আলোচনাকে উৎসাহিত করার দায়িত্ব পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়কে গ্রহণ করতে হবে।

ছ. বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রণীত 'রুলস অব বিজনেস' এর মধ্যে অবশ্যই পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের সাথে পরামর্শের ব্যাপারেও সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

জ. বন্যপ্রাণী ও অতিথি পাখি নিধন কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করতে হবে।

ঝ. পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, পরিবেশ আদালতের ভূমিকা দ্রুত বাস্তবায়ন চাই।

ঞ. টেকসই পরিবেশবান্ধব অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করতে হবে।

ট. জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণ আবশ্যকীয়।

উপসংহার : জীব ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের মাধ্যমে যেমন টেকসই পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা হয়, তেমনি পরিবেশবান্ধব নীতি গ্রহণ পরিবেশের ভারসাম্য অর্জনে সহায়ক। মহাবিশ্বে একমাত্র পৃথিবীই প্রাণী বসবাসের উপযোগী স্থান। পৃথিবীর পরিবেশ, আবহাওয়া, জলবায়ু ও ভৌগোলিক অবস্থান মানব ও প্রাণী বসবাসের সহায়ক। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় প্রতিটি দেশের মোট ভূমির ন্যূনতম ২৫% বনভূমি থাকতে হয়। অনেক দেশেই প্রয়োজনের তুলনায় কম বনভূমি রয়েছে। তাছাড়া মানবসৃষ্ট কারণে জলবায়ুর পরিবর্তন পৃথিবীকে হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে। তাই এ হুমকি মোকাবিলায় সকলকে সম্মিলিতভাবে উদ্যোগ নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। এ জন্য দরকার প্রতি দেশে পরিবেশ নীতি গ্রহণ। কেননা পরিবেশ ও জলবায়ু খুবই পরিপূরক বিষয়। সুতরাং বনায়ন কর্মসূচি ও পরিবেশবান্ধব নীতি গ্রহণ বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও অপরিহার্য বিষয়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

১১ । বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষায় বাংলাদেশের গৃহীত কার্যক্রম আলোচনা করুন।

উত্তর : বর্তমানে জীববৈচিত্র্য খুবই আলোচিত একটি বিষয়। বিশ্বজুড়ে মানুষ নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার যে চেষ্টা এতকাল করে এসেছে প্রকৃতির ওপর, তা-ই কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে তার জন্য। বাস্তুসংস্থান, খাদ্যচক্র ভেঙে পড়েছে। অস্তিত্ব অবলুপ্ত হতে চলেছে অনেক প্রজাতির। এমনকি অনেক প্রজাতি হারিয়ে গেছে চিরতরে। নিসর্গের বুক থেকে বৈচিত্র্যময় প্রাণী ও উদ্ভিদের হারিয়ে যাওয়া অশনি সংকেত বয়ে আনছে পরিবেশের জন্য, ক্রমাগতভাবে পরিবেশ হয়ে উঠছে ভারসাম্যহীন। বাংলাদেশ, যার অবস্থান দক্ষিণ এশিয়ায়, বঙ্গোপসাগর যার দক্ষিণে, হিমালয় যার উত্তরে, অসংখ্য নদী যার শিরা উপশিরার মতো শরীর জুড়ে বয়ে চলেছে, তারই জীববৈচিত্র্য নিয়ে আজ গুরুত্ব দিয়ে ভাবার সময় এসেছে। কারণ ক্রান্তীয় অঞ্চলের এ ভূখণ্ড অত্যন্ত উর্বর। দক্ষিণ-পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের কিছু পাহাড় ছাড়া এর বাকি পুরো অংশই পাললিক সমতল। আবহাওয়া প্রাণী ও উদ্ভিদের যথার্থ বিকাশের জন্য অত্যন্ত অনুকূল। অত্যন্ত বৈচিত্র্য ধারণ করার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও এখানকার জীববৈচিত্র্য হ্রাস পেয়েছে। সময় এসেছে সেই জীববৈচিত্র্যের স্বরূপ উদ্ধার, জীববৈচিত্র্য রক্ষার অঙ্গীকার ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করার। জনবহুল এ দেশের বাসযোগ্যতা বজায় রাখার জন্য যেসব কারণে জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের মুখোমুখি তা খুঁজে বের করা অপরিহার্য।

বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্যের অতীত বর্তমান : বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। এখানে ১১৩ প্রজাতির স্তন্যপায়ী, ৬৩০-এর বেশি প্রজাতির পাখি, ১২৫ প্রজাতির সরীসৃপ, ২২ প্রজাতির উভচর বাস করে। স্বাদু পানিতে বসবাস করে ২৬০টি প্রজাতি, আর ৪৭৫টি সামুদ্রিক প্রজাতি আছে। উদ্ভিদ প্রজাতির সংখ্যা ৩২৭ এবং ৬৬ প্রজাতির সামুদ্রিক উদ্ভিদ।

বাংলাদেশ আগে ৫০০০ প্রজাতি এবং উপপ্রজাতির জীবনকে ধারণ করতো। তার মধ্যে ১৬টি প্রজাতিকে ব্যবহার করা হতো খাদ্যশস্য হিসেবে।

সমগ্র বাংলাদেশ জুড়েই ধান হয় প্রায় ৩০টি ভিন্ন ভিন্ন কৃষি পরিবেশে। ১৯১০ সাল থেকে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত এখানে ২০০০ প্রজাতির আউশ ধান পাওয়া যেত। ৮০০ প্রজাতির পানির মধ্যে চাষ করার মতো আমন ধান পাওয়া যেত। এমনকি ১৯৬০ সাল পর্যন্ত এখানকার ধানের প্রায় ৩০০০ প্রজাতির সন্ধান পাওয়া যায়। ১৯৭৯-৮০ সালে বাংলা অঞ্চলে আবাদ হওয়া ধানের প্রজাতিসমূহের ওপর যে শুমারি চালানো হয় তাতে করে সেখানে আশ্চর্যজনক হলেও সত্যি নিবন্ধিত ধানের প্রজাতির সংখ্যা দাঁড়ায় ১২,৪৭৯।

জীববৈচিত্র্য রক্ষায় বাংলাদেশ : বাংলাদেশ এ পর্যন্ত জীববৈচিত্র্য রক্ষার অঙ্গীকার করে যেসব জায়গায় স্বাক্ষর করেছে তা হলো CITES, World Heritage Convention, Ramsar Convention, CBD, Climate Change Convention and Convention to Combat Desertification. বিশেষ করে বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য রক্ষায় যেক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকার করেছিল তা হলো CBD (Convention on Biological Diversity)। ১৯৯২ সালে রিওতে অনুষ্ঠিত জীববৈচিত্র্য বিষয়ক কনভেনশনে বাংলাদেশ স্বাক্ষর করেছিল, ১৯৯৪ সালের ৩ মে বাংলাদেশ সেটি গ্রহণ করে। সেখানে বন ও পরিবেশ সংক্রান্ত নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে জীববৈচিত্র্য রক্ষার ওপর জোর দেয়া হয়, যদিও জীববৈচিত্র্য রক্ষার্থে কোনো স্বতন্ত্র নীতিমালা এখনো এখানে প্রস্তুত হয়নি। বাংলাদেশ সরকারের অনেকগুলো বিভাগই জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত। জীববৈচিত্র্য বিষয়ক কনভেনশনে দেয়া জাতীয় অঙ্গীকার বিবেচনা করে বাংলাদেশ সরকার জীববৈচিত্র্য রক্ষার্থে পরিকল্পনা ও কৌশল প্রণয়ন এবং কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ National Conservation strategy (NCS) এবং National Environment Management Action Plan (NEMAP) গঠন করেছে এবং বাংলাদেশের প্রাণী তালিকা প্রণীত হয়েছে। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণার্থে তিন ধরনের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে, যেগুলোর মধ্যে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কেন্দ্র, ন্যাশনাল পার্ক, মৎস্য সংরক্ষণ কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে। পরিবেশগতভাবে জীববৈচিত্র্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ মুমূর্ষু এলাকা চিহ্নিত করা হয়েছে Ecologically Critical Area (ECA) হিসেবে। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, ১৯৭৩-এর আওতায় ৮টি বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কেন্দ্র, ৫টি ন্যাশনাল পার্ক নির্মিত হয়েছে। বাংলাদেশ পরিবেশ আইন, ১৯৯৫-এর আওতায় সাতটি এলাকাকে Ecologically Critical Area (ECA) ঘোষিত হয়েছে। বাংলাদেশ মৎস্য আইন, ১৯৫০ অনুযায়ী ঋতুভেদে মাছ ও তার আবাস সংরক্ষণের জন্য মৎস্য সংরক্ষণ কেন্দ্র তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা প্রতিষ্ঠানে (BRRI) ধানের প্রজাতি সংরক্ষণের লক্ষ্যে জিন ব্যাংকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের লক্ষ্য অর্জনের জন্য অনেকগুলো প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে ১৩টি প্রকল্প এলাকায় জীববৈচিত্র্য শুমারি, বনজসম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প Forest resource management project, Management of Aquatic Ecosystem through Community Husbandry (MACH), হাওড় ও প্লাবিত অঞ্চল ও ঔষধি বৃক্ষ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা, Integrated Coastal Zone Management (ICZM) এবং কক্সবাজার ও হাকালুকি হাওড়ের উপকূলীয় এলাকা ও জলাভূমির জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি।

বাংলাদেশে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও বিজ্ঞানী, বেসরকারি সংস্থার পাশাপাশি জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য কিছু প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। অন্যদিকে স্বাধীনতার পর থেকেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় জীববৈচিত্র্য বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করে আসছে। এছাড়াও প্রত্যেকটি খাত এবং উপখাতেও প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান রয়েছে জীববৈচিত্র্যের উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার জন্য। উদাহরণস্বরূপ, কৃষিক্ষেত্রে বৈচিত্র্য রক্ষার জন্য বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান আছে। যথা– বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান (Bangladesh Agricultural Research Institute); বাংলাদেশ ধান গবেষণা প্রতিষ্ঠান (Bangladesh Rice Research Institute-BRRI); বাংলাদেশ পাট গবেষণা প্রতিষ্ঠান (Bangladesh Jute Research Institute) ইত্যাদি।

বন উপখাতে আছে বন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (Forest Research Institute), মৎস্য উপখাতে আছে Bangladesh Fisheries Research Institute. গবাদিপশু উপখাতে আছে Bangladesh Livestock Research Institute. বাংলাদেশ চা উন্নয়ন কেন্দ্রও রয়েছে একটি।

জীববৈচিত্র্য নিয়ে গবেষণা ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মূল ঘাটতি হলো জীববৈচিত্র্য নিয়ে স্বতন্ত্র কোনো গবেষণা প্রতিষ্ঠান নেই। এ কারণে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক লক্ষ্য পূরণের চাহিদা অনুযায়ী জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য যে ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রয়োজন জীববৈচিত্র্য নিয়ে যারা গবেষণা করছেন তারা পাচ্ছেন না।

২৪ মে ২০০০ সালে বাংলাদেশ স্বাক্ষর করেছে The Cartegana protocol on biosafety to the convention on biological diversity. সে অনুযায়ী বাংলাদেশ 'Development of National

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

Biosafety Frame work' নামে একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। যার লক্ষ্য হচ্ছে– অত্যাধুনিক জীবপ্রযুক্তির ক্ষতিকর প্রভাব থেকে বৈচিত্র্যময় প্রাণসম্ভারকে রক্ষা করার জন্য পর্যাপ্ত প্রয়োজনীয় বিষয়াদি নিশ্চিত করা।

১ জুন ২০০০ বাংলাদেশ গেজেট জীবনিরাপত্তা সংক্রান্ত বিস্তারিত দিক নির্দেশনা প্রণয়ন করেছে– যার কাঠামোটি নির্মিত হয়েছে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের আদলেই, সেখানে শুধু সংজ্ঞায়ন, সংগঠন বা কর্মপ্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতা নিয়েই আলোচনা হয়নি বরং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে কার্যক্রমের বিস্তারিত রূপরেখা, ঝুঁকি, সীমাবদ্ধতা, সম্ভাবনা সহকারে উল্লিখিত হয়েছে।

বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্যের আধারগুলোর বর্তমান পরিস্থিতি : যে কোনো দেশের পরিবেশগত ভারসাম্য ধরে রাখার জন্য তার মোট আয়তনের ২৫ শতাংশ বনভূমি থাকা আবশ্যক। কারণ তার পরিবেশগত ভারসাম্য টিকিয়ে রাখতে বনভূমিগুলো বৈচিত্র্যময় প্রাণী ও উদ্ভিদের বেঁচে থাকার অনুকূল শর্তগুলো পূরণ করে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, বাংলাদেশের মোট আয়তনের তুলনায় বনভূমির পরিমাণ ১৭.০৮ শতাংশেরও কম, যার আয়তন আরো কমছে, বেঁচে থাকার পরিবেশ থেকে উৎখাত হচ্ছে অনেকগুলো জীব।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে তিন ধরনের বনাঞ্চল– পার্বত্য বনাঞ্চল যা চিরহরিৎ পর্নমোচী বৃক্ষের সমাবেশ, মধুপুর ও ভাওয়ালের গড়ে শাল ও গজারি বৃক্ষের বন, যা মূলত দেশের মধ্যভাগ ও উত্তরে অবস্থিত, আর দক্ষিণের স্রোতজ বনভূমি যা আমাদের কাছে 'সুন্দরবন' নামেই সমাধিক পরিচিতি, সবক'টিই এখন হুমকির সম্মুখীন। বছরে সমগ্র বনাঞ্চলের ৩.৩ শতাংশ উজাড় হচ্ছে।

১৪,০০০ হাজার বর্গ কিমি আয়তনবিশিষ্ট পার্বত্য চট্টগ্রাম আমাদের দেশের মোট আয়তনের ১০ ভাগ জুড়ে আছে। দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে দৈত্যাকার বেশ কিছু প্রজাতির বৃক্ষ এ বনাঞ্চলে জন্মে। এ বনাঞ্চলে লম্বা বৃক্ষগুলোর অধিকাংশই পাতাঝরা, আর খাটো বৃক্ষগুলো চিরহরিৎ। বাঁশ জন্মে অনেক। কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণীর বাস এখানে– হাতি, বাইসন, ভল্লুক, চিতাবাঘ এবং অনেক ধরনের পাখিও প্রচুর পরিমাণে থাকে। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বৃক্ষরোপণ, অবৈধভাবে গাছ কাটা, বাঁধ প্রকল্প, জোর করে অধিবাসীদের স্থানান্তর এখানকার মূল্যবান বাস্তুসংস্থানে ক্রমাগতভাবে ভয়ানক ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়েছে তথা জীববৈচিত্র্যকে ধ্বংস করেছে। রপ্তানির জন্য রবার এবং ইউক্যালিপটাস বৃক্ষ এখানকার যেসব বন ধ্বংস করে লাগানো হয়েছে সেখানকার পরিবেশগত ভারসাম্য নেতিবাচক পরিবর্তনের মুখোমুখি হয়েছে। আবার এখানকার আদিবাসী, বাঙালি, বনবিভাগের আন্তসম্পর্কের নানারূপ বনাঞ্চলের প্রকৃতিকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করছে। ১৯৬২ সালে বৈদেশিক সাহায্য দিয়ে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের ফলে পাহাড়িদের ২৫০ কিমি কৃষিযোগ্য জমি ও বনভূমি তলিয়ে যায়। ১ লক্ষ লোককে বিশেষ করে চাকমাদের জোরপূর্বক সেখান থেকে সরিয়ে দেয়া হয়, স্থানান্তরিত এ লোকেরা পুরাতন বনভূমি কেটে নতুন বাসস্থান তৈরি করতে দু জায়গায়ই পরিবেশগত ভারসাম্য পরিবর্তিত হয়, জীববৈচিত্র্যও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় নানা মাত্রায়।

শাল বৃক্ষ আছে দেশের মধ্যাঞ্চলে ও পূর্বাঞ্চলের বনাঞ্চলগুলোতে। শালবন এ বনাঞ্চলের ৭০% থেকে ৭৫% এলাকা জুড়ে থাকলেও এখানে আছে আরো অনেক বৈচিত্র্যপূর্ণ মূল্যবান গাছ এবং লতাগুল্মের প্রজাতি। এখানকার প্রাণবৈচিত্র্য অনন্য ও স্বতন্ত্র। এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংকের (ADB) অর্থায়নে শালবন ধ্বংস করা হয়েছে। কারণ তারা পরামর্শ দিয়েছিল কম উৎপাদনশীল বৃক্ষ কর্তন করে ইউক্যালিপটাস

বা রবারের মতো গাছ লাগাতে। মধুপুর গড়ের জীববৈচিত্র্যও ক্রমাবনতিশীল। কারণ এখানেও বনাঞ্চলের গাছ কাটা হচ্ছে অবাধে, অনেক প্রতিষ্ঠানই বনের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে, সরিয়ে দিচ্ছে আদি বাসিন্দাদের।

বাংলাদেশ ও ভারত সীমান্তে, বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাংশে সুন্দরবনই পৃথিবীর সবেচেয়ে বড় স্রোতজ বনভূমি। এর প্রাণশক্তি সঞ্চার করতো গঙ্গা বা পদ্মার স্বাদু পানি এবং দক্ষিণের বঙ্গোপসাগরের লোনা পানি। যে ১০,০০০ বর্গ কিমি জুড়ে সুন্দরবন বিস্তৃত সেখানে রয়েছে অসংখ্য বৃক্ষ, লতাগুল্মরাজি ও প্রাণীর সমাবেশ। অনেক রকম স্তন্যপায়ী, কয়েকশ প্রজাতির পাখি যার মধ্যে কতিপয় পরিযায়ী, অনেক জলজ প্রজাতি; যেমন– কুমির, সরীসৃপ, amphibians and invertebates.

এটাই বোধ হয় রয়েল বেঙ্গল টাইগারের শেষ আবাসস্থল। ইউনেস্কো (UNESCO) সুন্দরবনকে World heritage site ঘোষণা করেছে। স্থানীয় অধিবাসীদের জীবিকা নির্বাহেরও উৎস এ সুন্দরবন। সুন্দরবনের মধু সংগ্রহ, জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ, মাছ শিকার, আর গোলপাতা সংগ্রহ সুন্দরবন ও বনসংলগ্ন এলাকার মানুষের উপজীবিকা।

সাম্প্রতিককালের একটি শুমারি অনুযায়ী ৫ থেকে ৬ লাখ লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সুন্দরবন থেকে প্রাপ্ত সম্পদের ওপর নির্ভরশীল। আরো যে কারণে বনজ জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হচ্ছে, তা হলো তেল উত্তোলনের জন্য বহুজাতিক কোম্পানি বন ধ্বংস করছে। এছাড়া যে কোম্পানিকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্যকে রক্ষার সে কোম্পানির কর্মকাণ্ড এ ব্যাপক সমালোচিত হচ্ছে এজন্য যে, স্থানীয় অধিবাসীদের সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে তারা তাদের কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে।

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে সুন্দরবনের আদি নিসর্গ ও বাস্তুসংস্থান ফিরিয়ে আনার জন্য যে তথাকথিত সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য প্রকল্প তার সমালোচনায় এখন পরিবেশবাদী সংগঠন সোচ্চার হয়ে উঠেছে। উন্নয়ন সংস্থাগুলো বরাবর বন ধ্বংসের কারণ হিসেবে জনসংখ্যা বৃদ্ধিকেই প্রধানত দায়ী বলার চেষ্টা করে থাকেন, কিন্তু উন্নয়নের নামে এখানে বন উজাড় করা হচ্ছে অনেক বেশি।

তাই যেসব ঘটনাকে বন উজাড়ের মাধ্যমে জীববৈচিত্র্যের ধ্বংসের কারণ বলা যায় সেগুলো হলো–

১. চাষাবাদের জন্য জমি তৈরি (যেমন– কলা ও পেপে চাষের জন্য মধুপুর ও ভাওয়ালের বন ধ্বংস করা হয়েছে)।
২. বাঁধ নির্মাণ (কাপ্তাই বাঁধ)।
৩. দাবানল (মাগুরছড়া ও টেংরাটিলায় জীববৈচিত্র্য ধ্বংস)।
৪. অবাধে গাছকাটা (চোরাকারবারিরা স্থানীয় প্রয়োজন মেটানোর জন্য গাছ কেটে ফেলছে)।
৫. স্রোতজ বনভূমি উজাড় করে চিংড়ি চাষ (সুন্দরবন এলাকায় লোনাজল আটকে চিংড়ি চাষ)।
৬. গ্যাস ও খনিজ উত্তোলনের জন্য খনন কাজ (টেংরাটিলা, মাগুরছড়া, হরিপুর গ্যাসক্ষেত্রের জীববৈচিত্র্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব)।
৭. বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গাছ রোপণ (ইউক্যালিপটাস বৃক্ষ বনজ বৃক্ষের বদলে রোপণ করায় জীববৈচিত্র্যের মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে)।

তবে বনজ জীববৈচিত্র্য বিষয়টির স্থিতিশীলতা সবক্ষেত্রে নির্ভর করে উৎপাদন ব্যবস্থা, ভূমি নীতি, বন সংরক্ষণ নীতির উপর।

বনভূমিগুলোর পাশাপাশি এখানকার পানির আধারগুলোও প্রাণ-বৈচিত্র্যের ধারক। এখানে নদী, হাওর-বাওড়, বিল, জলাভূমিতে অসংখ্য জলজ জীব ও উদ্ভিদের সমাহার পরিলক্ষিত হতো। অপরিকল্পিত ও অদূরদর্শী উন্নয়ন, কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্যাদি, বাঁধ ও স্লুইস গেট নির্মাণ করে পানির স্বাভাবিক পলি প্রবাহে বাঁধাদান জনিত কারণে ব্যাপক মরুকরণ, নদী শাসন ও সেতু নির্মাণের মধ্য দিয়ে জলাশয় ও নদীগুলোতে জীববৈচিত্র্যের জন্য প্রতিকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়েছে। বিশেষ করে রাসায়নিক বর্জ্য নিক্ষেপের মাধ্যমে বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা নদী, ফারাক্কা বাঁধের কারণে গঙ্গা কপোতাক্ষ নদী ধ্বংস হয়েছে, বিপন্ন হয়েছে জলজ জীবের বাসস্থান। আশঙ্কাজনক হারে তাদের জাতি বিলীন হয়েছে।

যদিও টাঙ্গুয়ার হাওর, চলন বিলকে ইতোমধ্যে Ecologically Critical Zone ঘোষণা করা হয়েছে, কিন্তু নদী ধ্বংসের যে প্রক্রিয়া তা বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে না।

কৃষিক্ষেত্রে বহুজাতিক কোম্পানি জিন প্রযুক্তি ব্যবহার করে যে উচ্চফলনশীল বীজ উদ্ভাবন করেছে তাব্যবহার করে এখানকার উৎপাদন বেড়েছে। কিন্তু কৃষকরা এসব বহুজাতিক কোম্পানির কাছে নানাভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ায় এখানকার ফসলের বৈচিত্র্য ধ্বংস হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে।

জীববৈচিত্র্য রক্ষায় বাংলাদেশ ও অন্যান্য দেশ : বাংলাদেশের পশ্চিম-উত্তর ও উত্তর-পূর্বে রয়েছে ভারত সীমান্ত, আর দক্ষিণ-পূর্বে মিয়ানমার সীমান্ত। এ দু দেশের জীব পরিবেশের সাথে বাংলাদেশের পরিবেশের সমরূপতা ও সংযোগ আছে। গঙ্গা নদীর প্রবাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে যে মরুকরণ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে হয়েছে তা ঐসব অঞ্চলের জীববৈচিত্র্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। বাংলাদেশের সাথে ভারতের যে পানি বণ্টন চুক্তি হয়েছে তার আরো কার্যকর প্রয়োগ উভয় দেশের জীববৈচিত্র্য রক্ষার জন্যই অতি জরুরি। যে সুন্দরবন বিশ্বঐতিহ্য হিসেবে ঘোষিত হয়েছে তাও বাংলাদেশ ও ভারত উভয় দেশেই অবস্থিত। সুতরাং তা সংরক্ষণেও উভয় দেশের ভূমিকাই কাম্য।

বাঘ, হাতি, গণ্ডার, শুশুক, সাদা পাখাবিশিষ্ট হাঁস, শিকারি ঈগল, অজগরের সারা বিশ্বব্যাপীই অস্তিত্ব বিলীন হওয়ার পথে। সুতরাং সেগুলোকে রক্ষা করার জন্যও প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে অন্যান্য দেশসমূহকেও উৎসাহিত করতে হবে।

বাংলাদেশ যেহেতু জীববৈচিত্র্য রক্ষায় অঙ্গীকারবদ্ধ বিশ্বের অন্যান্য অনেক দেশের সাথেই, কিছু দেশ তার স্বার্থ সংশ্লিষ্টতার জায়গা থেকে অসহযোগিতা করতে চাইলেও বাংলাদেশকে অনেক বেশি তৎপর হতে হবে অন্যান্য শক্তির সাথে আলোচনা সাপেক্ষেই। কারণ বাংলাদেশ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ জীববৈচিত্র্য প্রশ্নে।

উপসংহার : ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে প্রতি বছর বাংলাদেশকে নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করতে হয়। এরপর জীববৈচিত্র্যের পরিবেশ রক্ষায় ব্যর্থ প্রচেষ্টাও অনেক বেশি ঝুঁকিপূর্ণ ও ভয়াবহ। তাই প্রকৃতির ওপর লাগামহীন আধিপত্য নয়; বরং প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখার মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের জীবনকে রক্ষা করতে পারি। জীববৈচিত্র্য রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব, এর জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি, পরিবেশ বান্ধব নীতি প্রণয়ন, পরিবেশবিষয়ক নিবিড় অনুসন্ধানের মাধ্যমে জীববৈচিত্র্যের আন্তঃসম্পর্ক বা আন্তঃনির্ভরশীলতা আবিষ্কার জরুরি। বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য রক্ষায় যা করছে তা খুবই অপ্রতুল, জীববৈচিত্র্য রক্ষার জন্য সব অধিবাসীকেই সজাগ, সচেতন থাকতে হবে তার নিজের স্বার্থেই।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

১২ । বাংলাদেশের পরিবেশ-প্রকৃতি কিরূপ? বাংলাদেশের পরিবেশের চ্যালেঞ্জসমূহ সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

উত্তর : কোনো দেশের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও রূপ ফুটে ওঠে তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে। প্রকৃতির বৈচিত্র্যময়তা ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিভিন্নভাবে প্রতীয়মান হয়ে মানুষকে আকৃষ্ট করে। আমাদের দেশ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর এক অপূর্ব লীলাভূমি। সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা অপরূপ সৌন্দর্য ভরা আমাদের এ দেশ। শাশ্বতকাল ধরে অপরূপ সৌন্দর্য আমাদের মনকে দোলা দিয়ে আসছে। ব্যতিক্রম ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ দেশ। অসংখ্য নদী, তাদের শাখা-প্রশাখা দ্বারা জালের মতো বিস্তৃত বাংলাদেশ পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ, অত্যন্ত পুরু পলিস্তর দ্বারা গঠিত দেশটির সাধারণ ভূপৃষ্ঠ, এদেশে রয়েছে বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন ও দীর্ঘতম বালুময় সৈকত, বিশ্বের সর্বাধিক ঘনবসতি ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর অত্যধিক চাপ, আর্দ্র ও শুষ্ক মৌসুমে ভূপৃষ্ঠস্থ পানির প্রাপ্যতার পরিমাণের মধ্যে ব্যাপক তারতম্য এবং দেশের মধ্য দিয়ে পানির প্রবাহের ব্যাপকতা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য দেশটিকে একদিকে যেমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দান করেছে অন্যদিকে পরিবেশগত সমস্যাপ্রবণ করে তুলেছে।

বাংলাদেশের বৈচিত্র্যময় প্রকৃতি ও পরিবেশ : টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া পর্যন্ত ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার আয়তনের ছোট দেশটি বিশ্বের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি হিসেবে পরিচিত। এ সৌন্দর্য যেমন দেশের ভূ-প্রাকৃতিক গঠনের দিক থেকে তেমনি ঋতু বৈচিত্র্যের দিক থেকে। দেশের দক্ষিণে বিশাল বঙ্গোপসাগরের উত্তাল প্রতিধ্বনি প্রতিনিয়তই এক অলৌকিক সুরের মায়াজাল সৃষ্টি করে চলেছে। হাজার হাজার মানুষ সেই সুরের মোহে ছুটে যায় সমুদ্র সৈকতে। উত্তরের ধূসর প্রকৃতির উদাসীনতার বাণী সন্ন্যাসী বাউলের মতো মানুষকে ঘর ছাড়া করে। অসংখ্য নদ-নদী জালের মত সারা দেশে ছেয়ে রয়েছে। বাংলাদেশ উষ্ণমণ্ডলীয় মৌসুমী জলবায়ুর দেশ। বর্ষা মৌসুমে প্রচুর বৃষ্টিপাতের পর আসে শীতকাল, তারপর আসে গ্রীষ্মকাল। তিনটি বিশাল নদী পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা উত্তর দেশগুলোর থেকে প্রচুর পরিমাণে পলিযুক্ত পানি বহন করে নিয়ে আসে, যা দেশে কৃষি পণ্য উৎপাদনে ব্যাপক ভূমিকা রাখে।

বাংলাদেশের পরিবেশের চ্যালেঞ্জসমূহ : মানুষের কর্মকাণ্ডের ফলশ্রুতিতে পরিবেশের উপাদানে দেখা যায়, অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন। পরিবেশের স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখার জন্য চ্যালেঞ্জ বলতে সেসবকে বুঝায়, যেগুলো নানা প্রকার দূষণের মাধ্যমে পরিবেশের প্রকৃত অবস্থার ব্যাঘাত ঘটায়। পরিবেশের স্বাভাবিক অবস্থার জন্য চ্যালেঞ্জগুলো নিচে আলোচনা করা হলো :

১. **শিল্পদূষণ :** কারখানা ও অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে নির্গত দ্রব্য বা বিষাক্ত বর্জ্য থেকে পরিবেশের অবক্ষয় হচ্ছে। বর্তমান বাংলাদেশে শিল্পখাত থেকে অর্জিত জিডিপির ২৯.৬৯% মধ্যে কারখানা শিল্পের অংশ ৮.৩৯%। শক্তিশালী শিল্পখাতের বিকাশ কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির নিরিখে লাভজনক হলেও এগুলো পরিবেশের অবক্ষয় ঘটায়। প্রধানত তৈরি পোশাক, চামড়া ও অন্যান্য রপ্তানিমুখী শিল্পপণ্য উৎপাদক খাতসমূহে এ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। বিশ্বব্যাংকের জরিপ অনুযায়ী পরিবেশগতভাবে বাংলাদেশের সর্বাধিক কলুষিত ছয়টি শহর হলো– ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, খুলনা ও বগুড়া। উপর্যুক্ত জেলাগুলোর শিল্প-কারখানা থেকে যে বর্জ্য নিক্ষিপ্ত হয় তাকে ছয়টি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। যথা (i) ভূমিতে নিক্ষিপ্ত বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ; (ii) বায়ুতে উৎক্ষিপ্ত বিষাক্ত রাসায়নিক

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

পদার্থ; (iii) বায়ুতে মিশ্রিত মোট কণাপুঞ্জ; (iv) সালফার-ডাই অক্সাইডের নির্গমন; (v) পানিতে বিদ্যমান জীবসঞ্চিত বিষাক্ত ধাতুসমূহ ও (vi) জৈব অক্সিজেন চাহিদা।

২. **বায়ুদূষণ :** বাংলাদেশে জীবাশ্ম জ্বালানি দহন ছাড়াও বায়ুদূষণের অন্যান্য উৎসের মধ্যে রয়েছে ইটের ভাটা, সার কারখানা, চিনি, কাগজ, পাট ও বস্ত্র কারখানা, সুতাকল, পোশাক কারখানা, সিমেন্ট কারখানা, করাত কলের কাঠের গুঁড়া, চাষকৃত জমির ধূলাবালি, উপকূলবর্তী দ্বীপ ও উপকূলে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের লবণকণা ইত্যাদি। এসব উৎস থেকে প্রচুর পরিমাণে ধোঁয়া, গ্যাস, ধূলিকণা ইত্যাদি বাতাসে মিশে ধোঁয়া সৃষ্টির মাধ্যমে ব্যাপকভাবে বায়ুদূষণ করে। বাংলাদেশের কোনো কোনো শিল্প কারখানা হাইড্রোজেন সালফাইড, অ্যামোনিয়া, ক্লোরিন এবং আরো কিছু দুর্গন্ধযুক্ত, বিষাক্ত বা বিরক্তিকর রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদন করে যেগুলো সর্বসাধারণের স্বাস্থ্যের জন্য ব্যাপক ক্ষতিকর। ঢাকা পৃথিবীর ঘনবসতি পূর্ণ শহরগুলোর একটি। এ শহরের বাসিন্দাদের প্রাত্যহিক পরিবহণ ছিল মোটরগাড়ি, বেবিট্যাক্সি ও টেম্পো যার সিংহভাগই টু-স্ট্রোক ইঞ্জিনচালিত নিম্নমানের জ্বালানি ব্যবহার। দক্ষতাসম্পন্ন এসব ইঞ্জিন ফোর-স্ট্রোক ডিজেল ইঞ্জিনের তুলনায় ৪০ গুণ বেশি হাইড্রোকার্বন ও অধিক কার্বন মনোঅক্সাইড বায়ুতে ত্যাগ করে। ২০০২ সালের মধ্যেই ঢাকা শহর থেকে সব টু-স্ট্রোক ইঞ্জিনচালিত পরিবহন অপসারণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করার কারণে পরিবহনজনিত বায়ুদূষণ অনেকটা কমেছে।

৩. **শব্দদূষণ :** শব্দদূষণের প্রকোপ বাংলাদেশের জন্য এক সুদূরপ্রসারী পরিণতিবহ সমস্যা হয়ে উঠছে। গাড়ির হর্ন ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে কোনো ট্রাফিক আইন না থাকায় শহরের অনেক অংশে শব্দসমস্যা অত্যন্ত তীব্র আকার ধারণ করেছে। শব্দদূষণের উৎস হচ্ছে মোটরগাড়ি, ট্রাক, বাস, উড়োজাহাজ, মোটর সাইকেল, রেলগাড়ি, নির্মাণকাজ ও শিল্পকারখানা।

৪. **তেজস্ক্রিয়তাজনিত দূষণ :** এ দূষণ মানুষের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর এক ধরনের অদৃশ্য দূষণ। তেজস্ক্রিয়তার উৎস সূর্য ও মহাশূন্য যেখান থেকে তা পৃথিবীতে পৌঁছায়। ক্ষতিকর তেজস্ক্রিয়তার অধিকাংশ বিকিরিত হয় বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় পদার্থ, বিশেষত পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্ফোরণ, পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রনিক সামগ্রী থেকে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য লেজার রশ্মি, এক্সরে মেশিন, রঙিন টেলিভিশন সেট, মাইক্রো-ওয়েভ ওভেন ইত্যাদি। বিশ্বজুড়ে তেজস্ক্রিয় বর্জ্য অপসারণের সমস্যা জনসমাজে গুরুতর উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। তেজস্ক্রিয় বর্জ্য গভীর সমুদ্রে নিক্ষেপের ঘটনা ঘটছে যা সমুদ্রের চারপাশে বসবাসকারীদের জন্য একটি বড় আতঙ্কের বিষয়। বিশেষ করে বঙ্গোপসাগরে তেজস্ক্রিয় বর্জ্য নিক্ষেপের ঘটনায় বাংলাদেশসহ ভারত উপমহাদেশের জনগণের উদ্বেগ বেড়েছে।

৫. **মৃত্তিকাদূষণ :** প্রতিবছর বন্যার ফলে মাটিতে নতুন নতুন স্তর সঞ্চিত হতে থাকে, আবার পুরনো স্তরগুলোর বিন্যাসের বৈশিষ্ট্যেও পরিবর্তন বা রূপান্তর আসে। ব্যবস্থাপনার অভাবে ইদানীং বাংলাদেশে মৃত্তিকাদূষণ একটি গুরুতর বিপদ হিসেবে দেখা দিয়েছে। মাটির উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস ছাড়াও মৃত্তিকা দূষণের আরেকটি প্রধান কারণ হচ্ছে ভূমিক্ষয়, যা মাটির গুণগত পরিবর্তন ঘটায় এবং বন্ধনকে দুর্বল করে। বন্যার ফলে মাটি স্থানান্তরিত হয়। এতে মাটির গঠনের গুণগত পরিবর্তন দেখা দেয়। অপরিকল্পিত ও অসমন্বিত ভূমি ব্যবহার এবং চাষাবাদ পদ্ধতি পরিবেশগত অবক্ষয়ের কারণ। একইভাবে অপরিকল্পিতভাবে রাস্তাঘাট ও ঘরবাড়ি নির্মাণের জন্য জমি পরিষ্কার, গাছকাটা, বন উজাড়ের জন্যও মৃত্তিকাক্ষয় ঘটে।

৬. **পানিদূষণ :** শিল্প ও পৌর বর্জ্য বাংলাদেশের নদী ও জলাশয়গুলোকে ব্যাপক মাত্রায় দূষিত করছে। পরিবেশ অধিদপ্তর উল্লেখ করেছে যে চট্টগ্রামের টিএসপি সার কারখানা থেকে সালফিউরিক ও ফসফরিক এসিড এবং চন্দ্রঘোনার কর্ণফুলি কাগজ মিল, সিলেট কাগজ মিল, দর্শনার কেরু অ্যান্ড কোম্পানি, খুলনার শিপইয়ার্ড ও মাছ-প্রক্রিয়াকরণ কারখানা, ঢাকার অলিম্পিক ও কাদেরিয়া টেক্সটাইল মিলস লক্ষ লক্ষ গ্যালন তরল বর্জ্য পার্শ্ববর্তী নদী ও জলাশয়ে নিক্ষেপ করে পানি দূষণ করছে। ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদীর পানি পোস্তগোলা ও ফতুল্লার ৫৩টি কারখানা ও হাজারীবাগের ১৫১টি চামড়াশিল্প দ্বারা দূষিত হচ্ছে। ঢাকার আর তিন পাশের বালু, তুরাগ ও শীতলক্ষ্যা নদীগুলোও শিল্প কারখানার বর্জ্য দ্বারা ব্যাপকভাবে দূষিত হচ্ছে যা ঢাকা শহরের স্বাভাবিক পরিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকি হিসেবে দেখা দিয়েছে।

৭. **উপকূলীয় দূষণ :** উপকূলীয় দূষণের বিবিধ উৎসের মধ্যে রয়েছে নদীর উজানে অবস্থিত কাগজের কল ও অন্যান্য কারখানা থেকে নির্গত তরল বর্জ্য। অধিকাংশ কারখানায় বর্জ্য শোধনের কোনো ব্যবস্থা না থাকায় অশোধিত বর্জ্য সরাসরি কর্ণফুলি নদী বা বঙ্গোপসাগরে ফেলা হয়, এতে জলজ প্রাণী ও মোহনার বাস্তুতন্ত্র মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পানিসম্পদ উন্নয়নের কর্মকাণ্ডের দরুন উপকূল অঞ্চলে মাছচাষের পরিবেশ, জলজ প্রাণীর অস্তিত্ব, জীববৈচিত্র্য ও জীবনধারণ ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে বিপর্যস্ত।

৮. **সামুদ্রিক দূষণ :** পরিবেশীয় দূষণ সংক্রান্ত অন্যতম প্রধান উদ্বেগের বিষয় হলো বঙ্গোপসাগরের দূষণ যা বাংলাদেশের পরিবেশের জন্য এক মারাত্মক চ্যালেঞ্জ। কেননা শহরের শিল্প বর্জ্য, নদীবাহিত আবর্জনা এবং চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরের জাহাজ থেকে নির্গত তেলের সঠিক ব্যবস্থাপনা যদি না করা যায় তাহলে অদূর ভবিষ্যতে সামুদ্রিক পরিবেশে যে বিপর্যয় অবস্থার সৃষ্টি হবে এর ফলে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের পরিমাণ ব্যাপকভাবে হ্রাস পাবে।

উপসংহার : অপরূপ রূপ-বৈচিত্র্যের আমাদের এ দেশের প্রকৃতি ও পরিবেশ বিশ্বের অনন্য। কিন্তু মানুষের অবিবেচনাপ্রসূত কর্মকাণ্ডের জন্য পরিবেশ আমাদের সাথে বৈরি আচরণ করতে শুরু করেছে। বিশ্বব্যাপী জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাব, দ্রুত শিল্পায়নের ফলে শিল্পবর্জ্যের অব্যবস্থাপনার প্রভাব, অজানা আকস্মিক প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাবে আমাদের দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশের স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখা একটি চ্যালেঞ্জিং ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরিবেশের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় গিয়ে লাভ হবে না। চিন্তা থেকেই আমাদেরকে পরিকল্পিত শিল্পায়ন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পরিবহন সেক্টরের সঠিক ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পিত পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনায় বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি গ্রহণ করার মাধ্যমে নানামুখী দূষণ কমানো বা প্রতিরোধ করার মাধ্যমে পরিবেশের ছুড়ে দেওয়া চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হবে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-০১ বিশ্ব পরিবেশ আন্দোলনে বাংলাদেশের ভূমিকা বর্ণনা করুন। *[৩০তম বিসিএস]*

উত্তর : সুস্থ জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজন স্বাস্থ্যকর নির্মল পরিবেশ। পরিবেশের ভালোমন্দ দুটি দিকই মানুষসহ সমগ্র জীব-জগতের অস্তিত্বের জন্য গুরুত্ববহন করে। পরিবেশের ভারসাম্য নষ্টের দ্বারা চলমান উন্নয়ন প্রক্রিয়া বিঘ্নিত হয়। শিল্পায়ন, জনসংখ্যা ও যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি, নির্বিচারে বৃক্ষ রোধন ও বিভিন্ন প্রকারের দূষণ প্রভৃতি কারণে পৃথিবীর পরিবেশ আজ বিপন্ন প্রায়। বিশেষ করে মানবসৃষ্ট অপকর্মের ও পরিবেশের সাথে বৈরি আচরণে কারণে জলবায়ুর পরিবর্তন দ্বারা পৃথিবীর ভবিষ্যত সংকটাপন্ন। এ প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক সম্মেলন, আন্তর্জাতিক আন্দোলন জোড়দারকরণ, দূষণের মাত্রা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের গঠনমূলক আলোচনা ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ দিন দিন বেড়েই চলেছে। বিশ্ব পরিবেশ আন্দোলনে ছোট থেকে বড় সকল রাষ্ট্রই সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে, কেননা পৃথিবীটা সকলের আবাসভূমি।

বিশ্বের পরিবেশ ও আন্দোলন : পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য একটি দেশের মোট ভূমির ২৫ শতাংশ বনভূমি থাকতে হয়। সে হিসেবে পৃথিবীকে একটি দেশ হিসেবে ভাবা হলে পৃথিবীর মোট ভূমির ২৫ শতাংশ বনভূমি থাকা চাই। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় অনেক দেশেরই বনভূমির পরিমাণ কম রয়েছে। এছাড়া প্রতিকূল আচরণের কারণে জীববৈচিত্রের হ্রাসের হুমকী, বিভিন্ন বর্জ্য উৎপাদনের মাধ্যমে পানি ও বায়ু দূষণ, বায়ুমন্ডলে কার্বণ ডাই-অক্সাইডের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় পৃথিবীর উপর গ্রিন হাউস গ্যাসের প্রতিক্রিয়া বিশ্ব নাগরিকদের ভাবিয়ে তুলছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ২১ শতাব্দির সমাপ্তিকালের মধ্যে মালদ্বীপ, পাপুয়া নিউগিনি, বার্বাডোজ, কিরিবাতিসহ প্রশান্ত মহাসাগরের অনেক দ্বীপপুঞ্জ পৃথিবীর মানচিত্র থেকে হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের দ্বারা সকল দেশ-ই ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার আশঙ্কা থাকায় যুক্তরাষ্ট্র থেকে শুরু করে চীন জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় পরিবেশ আন্দোলন মূলত পরিবেশনীতি, সবুজ আন্দোলন, পরিবেশগত ইস্যুতে সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনকে অন্তর্ভুক্ত করে। সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ বিষয়ে গণনীতি ও ব্যক্তি পর্যায়ের আচরণ, বাস্তুসংস্থান, স্বাস্থ্য এবং মানবীয় অধিকার নিয়ে পরিবেশ আন্দোলন অগ্রণী ভূমিকা রাখে। পরিবেশ আন্দোলনের সংস্থা যেমন– গ্রিনপিস, আইপিসিসি, আইসিইউএন, ডব্লিউইএফ প্রভৃতি দূষণের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ, বনায়ন, টেকসই ভোগের জন্য প্রাকৃতিক অঞ্চল ও সম্পদের রক্ষা, সুপেয় পানি, দক্ষ সুয়েজ ব্যবস্থা, সামাজিক স্বাস্থ্য ও পুষ্টি নিশ্চিতকরণ, ইলেকট্রনিক বর্জ্য অপসারণ, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ধরণ, সবুজায়ন প্রভৃতির উপর গুরুত্বারোপ করে। বিশ্বের সবচেয়ে বড় সংস্থা জাতিসংঘ ও পরিবেশ আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রাখছে।

বিশ্ব পরিবেশ আন্দোলনে বাংলাদেশের ভূমিকা : বিশ্বায়নের এই যুগে যেমন একটি রাষ্ট্রকে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা বাদ দেওয়া যায়না, তেমনি একটি দেশের পরিবেশকে বিশ্ব পরিবেশ থেকে আলাদা করা যায় না। এক দেশের পরিবেশের বিরূপ প্রতিক্রিয়া পার্শ্ববর্তী দেশেও দেখা দেয়। কেননা পরিবেশের জন্য কোন

সীমানা প্রাচীর নেই। বাতাসে গ্রিন হাউস গ্যাসের নিঃসরণে বিশ্বের কয়েকটি দেশ যেমন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, জাপান, ভারত ও রাশিয়া প্রধানত দায়ী হলেও জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক ফলাফলে অনুন্নত দেশগুলো এগিয়ে। ক্ষতিগ্রস্থ দেশগুলোর তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান প্রথম দিকে। বাংলাদেশ ছোট ও অনুন্নত একটি দেশ। জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশের যেমন ভূমিকা কম, তেমনি জলবায়ু মোকাবিলায় বাংলাদেশের সামর্থ্যও কম। আবার বাংলাদেশের পরিবেশনীতি বা পরিবেশ রক্ষার আন্দোলনের ভূমিকাও বিশ্ব পরিবেশ আন্দোলনের তুলনায় নগন্য। তবু বাংলাদেশ ক্ষতিগ্রস্থ দেশ হিসেবে বিশ্বনেতাদের সচেতন করা ও সতর্কবাণীর মাধ্যমে বিশ্ব পরিবেশ আন্দোলনে বাংলাদেশের জোড়ালো ভূমিকা রাখার সুযোগ রয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ আন্দোলন ও বিশ্ব পরিবেশ আন্দোলনের অংশ। আশির দশকে বাংলাদেশে পরিবেশ আন্দোলনের সূচনা হয়। নব্বইয়ের দশকে তা আরো অগ্রসর হয়। 'পরিবেশ রক্ষা শপথ (পরশ)' নামক সংগঠনের আওতায় দেশের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি সমবেত হন। বিদেশে প্রবাসী বাংলাদেশীরাও পরিবেশ রক্ষার উদ্দেশ্যে সংগঠিত হতে থাকে। ১৯৯৮ সালে তারা 'বাংলাদেশ পরিবেশ নেটওয়ার্ক (বেন)' প্রতিষ্ঠা করে। পরশ, বেন এবং অন্যান্য বহু পরিবেশ সপক্ষ সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগের ২০০০ সালে জানুয়ারিতে প্রথম 'বাংলাদেশ পরিবেশ বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন' (ICBEN) অনুষ্ঠিত হয়। তারই ফসল হিসেবে ২০০০ সালের জুলাই মাসে 'বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) গঠিত হয়। বাপা ও অন্যান্য পরিবেশ সংগঠনের প্রচেষ্টার ফলে দেশে কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। সীসামুক্ত গ্যাসোলিনের প্রচলন, টু স্ট্রোক ইঞ্জিনবিশিষ্ট যানের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ, প্লাস্টিক ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা, জলাশয় রক্ষা আইন পাশ, নদীবিষয়ক টাস্কফোর্স গঠন, ইমারত নির্মাণ বিধিমালার অনুমোদন, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, পরিবেশ সংরক্ষণনীতি তারই কতিপয় উদাহরণ।

বাংলাদেশে পরিবেশের আন্দোলনের সংস্থাগুলো গ্রিন পিস ইন্টারন্যাশনালের মত না হলেও বাংলাদেশের পরিবেশ সুরক্ষায় এসব সংস্থা যথেষ্ট ভূমিকা রাখছে। আর বিশ্ব পরিবেশ আন্দোলনের অংশ হিসেবে বাংলাদেশের পরিবেশ আন্দোলনের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

পরিবেশ দুর্যোগ একবারে ঘাড়ের ওপর এসে পড়ায় এখন চারদিকে এ বিষয়ে বেশ সচেতনতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পরিবেশ রক্ষার আন্দোলন দিনদিন গুরুত্ব পাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের দ্বারা বাংলাদেশেসহ অনেক উন্নয়নশীল দেশ ক্ষতিগ্রস্থ হলেও এর জন্য তারা কমই দায়ী। তাই বাংলাদেশ ও অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্থ দেশগুলোর জোড়ালো প্রতিবাদ ও ভূমিকা বিশ্ব পরিবেশ আন্দোলনকে বেগবান করতে পারে। উন্নত ও দায়ী দেশগুলোর নিকট বাংলাদেশ উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারে।

প্রশ্ন-০২ কি কি কারণে বাংলাদেশের পরিবেশ দূষিত হচ্ছে— আলোচনা করুন।

উত্তর : নিম্নলিখিত কারণে বাংলাদেশের পরিবেশ দূষিত হচ্ছে—

১. শিল্প কলকারখানার বিষাক্ত বর্জ্য।
২. যানবাহনের কালো ধোঁয়া।
৩. ব্যাপক হারে বৃক্ষ নিধন।
৪. মাটির ক্ষয় ও অব্যবহার।
৫. পলিথিনের ব্যাপক ব্যবহার।
৬. পানি দূষণ।
৭. বর্জ্য ও আবর্জনা যত্রতত্র ফেলা।
৮. কীটনাশক ও রাসায়নিক পদার্থের অপরিকল্পিত ব্যবহার।

প্রশ্ন-০৩ ম্যানগ্রোভ বন কি?

উত্তর : লোনা পানি বা কাদার মধ্যে জেগে থাকা খুঁটির মতো এক ধরনের শ্বাস গ্রহণকারী শিকড়বিশিষ্ট উদ্ভিদকে ম্যানগ্রোভ বলে। আর যে বনে প্রচুর পরিমাণে এ ধরনের গাছ জন্মে সে বনকে ম্যানগ্রোভ বন বলে। ম্যানগ্রোভ বন বিশ্বের গ্রীষ্মমণ্ডলীয় উপকূলে জন্মায়। শান্ত সাগর, খাড়ি ও নদীর মোহনা এ বনের উপযুক্ত স্থান। ম্যানগ্রোভ বনে গাছপালা-লতাগুল্ম লবণাক্ত সাগরের তীরে আপনা আপনিই গড়ে ওঠে। এবং গাছপালা-লতাগুল্মের রয়েছে বিশেষ বৈশিষ্ট্য। গাছের বীজ থেকে প্রায় ৩০ সেন্টিমিন্টার লম্বা মূল গজায়। জলে বা ডাঙায় বীজ পড়েই মূলকে ওপর দিকে রাখে। কাদা বা মাটি পেলে মূল বীজের সহায়তায় জীবন্ত প্রাণীর মতো তা আঁকড়ে ধরে। মূল কাজ করে শ্বাসমূল হিসেবে। স্রোতে বালুকণা ভেসে যাবার সময় শ্বাসমূল বালু ও পলি জমা করে। ম্যানগ্রোভ এভাবে ভূখণ্ড তৈরি করে। গাছের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কিছু শিকড় মাটির তলায়, কিছু ওপর দিকে থাকে। একে বলে 'শূল'। এটি খুব ধারালো। বিশ্বের সেরা প্রজাতির গাছপালাসমৃদ্ধ ম্যানগ্রোভ জঙ্গলকে বলা হয় লাল ম্যানগ্রোভ (Rhitophoramangle)। এ বন রয়েছে ফ্লোরিডা থেকে শুরু করে দক্ষিণ আমেরিকা ও পশ্চিম আফ্রিকা উপকূলে। এ বনে গুল্ম ও ফার্ন জাতীয় ছোট গাছ জন্মে। কিছু প্রজাতির গাছ ২৫ মিটার লম্বা হয়। গাছের বাকলে ট্যানিক এসিড থাকে। এটি চামড়া ট্যান করতে ব্যবহৃত হয়। সুন্দরবন পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন।

প্রশ্ন-০৪ বাংলাদেশের জাতীয় বন কোন অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত? এর মোট আয়তন কত?

উত্তর : বাংলাদেশের জাতীয় বন সুন্দরবন খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, পটুয়াখালী উপকূল জুড়ে বিস্তৃত। সুন্দরবনের মোট আয়তন ৬,০১৭ বর্গ কিলোমিটার। *[সূত্র : মাধ্যমিক ভূগোল]*

প্রশ্ন-০৫ দেশের প্রধান নদীসমূহের গতিপথ নিয়ন্ত্রণে রাখতে করণীয় পদক্ষেপ লিখুন। *[২২তম বিসিএস]*

উত্তর : আমাদের প্রধান নদ-নদীসমূহের গতিপথ নিয়ন্ত্রণে রাখতে নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা উচিত :

১. প্রধান নদী ও শাখা নদীগুলোর মুখ খনন করা, যাতে বর্ষাকালে অতিবৃষ্টির পানি দ্রুত নিষ্কাশিত হতে পারে।
২. নদীর তীর বরাবর উঁচু করে বাঁধ নির্মাণ করা, যাতে পানি নদী খাতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে।
৩. নদীর তলদেশ খনন করা, যাতে পানি বেশি পরিমাণে ও দ্রুত সাগরে চলে যেতে পারে।
৪. নদী ছোট বড় যাই হোক না কেন, নদীর মুখ বন্ধ না করেই রাস্তাঘাট ও সেতুর নির্মাণ করা।
৫. নদীর উৎস স্থলে ও অববাহিকায় ব্যাপক ঘন অরণ্য সৃষ্টি করে বৃষ্টির বা বরফ গলা পানি ধীরে ধীরে প্রবাহিত হওয়ার ব্যবস্থা করা।

প্রশ্ন-০৬ ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প এবং বাংলাদেশে এর প্রভাব কি?

উত্তর : ভারতের মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া বড় বড় নদীগুলোর মধ্যে আন্তঃসংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের খরাপীড়িত অঞ্চলে পানি সরবরাহের এক মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে ভারত। পঞ্চাশের দশক থেকে পরিকল্পিত ভারতের এ প্রকল্পটির উদ্দেশ্য হলো হিমালয় থেকে বয়ে আসা নদ-নদীর পানি পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের খরাপীড়িত অঞ্চলে স্থানান্তর করা। এ জন্য বিভিন্ন নদীর মধ্যে মোট ৩০টি পয়েন্টে সংযোগ স্থাপনের কথা রয়েছে। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ভারত সরকার সাবেক আমলা সুরেশ প্রভুকে প্রধান করে একটি টাস্কফোর্স গঠন করে। এছাড়া গঠন করা হয়েছে 'ন্যাশনাল ওয়াটার ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি'। এ এজেন্সি আন্তঃনদী অববাহিকা স্থানান্তরের জন্য একটি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে, যার ব্যয় ধরা হয়েছে ৫ লাখ ৬০ হাজার কোটি রুপি। ভারতীয়

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

সরকার এ প্রকল্পের পক্ষে যুক্তি হিসেবে শুকনো মৌসুমে খরাপীড়িত রাজ্যগুলোর জনগণের পানি অধিকার রক্ষা সংক্রান্ত একটি মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়কে যুক্তি হিসেবে দেখাচ্ছে যেখানে ২০১২ সালের মধ্যে দেশের নদীগুলোর আন্তঃসংযোগ স্থাপনের সময়সীমা বেঁধে দেয়া হয়। গঙ্গা অববাহিকার পানি রাজস্থানে স্থানান্তরের জন্য খালকাটার কাজ শুরু হয়ে গেছে। এ প্রবাহ গুজরাট এবং মহারাষ্ট্রে নিয়ে যাওয়ারও পরিকল্পনা রয়েছে। নেপাল থেকে আসা ঘাঘড়া, কাশি, সেচিসহ অন্যান্য নদীর পানি মধ্য ও পশ্চিম ভারতে নেয়া হবে। আর ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা থেকে গঙ্গা ও দামোদরের মাধ্যমে উড়িষ্যা হয়ে দক্ষিণ ভারতে মহানন্দা ও গোদাবরী নদীতে পানি নেয়া হবে। ব্রহ্মপুত্র নদের অন্যতম প্রধান উৎস মানস ও সাংকোসের প্রবাহ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গঙ্গায় স্থানান্তরের পদক্ষেপ নেয়া হবে। এজন্য ইতোমধ্যে তিস্তা ও মহানন্দার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা থেকে মোট ১৭ হাজার ৩০০ কোটি ঘনমিটার পানি দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে নেয়ার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। আর এ ধরনের প্রকল্পের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ (প্রায় ৩৪ হাজার মেগাওয়াট) পানি বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা থাকায় ভারতীয় কর্তৃপক্ষ আন্তর্জাতিক সহায়তারও আশা করছে।

সর্বগ্রাসী এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে ভারত থেকে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ৫৪টি নদীর প্রবাহ কেবল বিঘ্নিতই হবে না বরং শুকনো মৌসুমে বাংলাদেশ গঙ্গার প্রায় পুরোটা এবং ব্রহ্মপুত্রের অধিকাংশ পানিপ্রবাহ থেকে চিরকালের জন্য বঞ্চিত হবে। এর প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশের অন্তত অর্ধেক অঞ্চল সামুদ্রিক লবণাক্ততার শিকার হবে। যার ফলে ফসল উৎপাদন অর্ধেক কমে যাবে, বনাঞ্চল ধ্বংস হবে, কৃষি জমিতে সেচের পানি থাকবে না এবং আমাদের স্বপ্নের যমুনা সেতুর তলদেশ শুকিয়ে যাবে। মোটকথা, পুরো বাংলাদেশের চেহারাই পাল্টে যাবে। এ প্রসঙ্গে ভারতীয় পরিবেশবাদীসহ কিছু শুভবুদ্ধির মানুষও এর বিরোধিতায় নেমেছে। এজন্য বাংলাদেশকেও এর বিরুদ্ধে বহুমুখী প্রতিরোধ ব্যবস্থার পরিকল্পনা করতে হবে।

প্রশ্ন-০৭ আগুনমুখা কি?

উত্তর : পটুয়াখালী জেলার গলাচিপা উপজেলার বাইশদিয়ার উত্তরে পাঁচটি নদীর মোহনায় যে উত্তাল তরঙ্গের সৃষ্টি হয় তা দেখতে আগুনের মতো মনে হয়। এজন্য একে আগুনমুখা বলা হয়।

প্রশ্ন-০৮ বাংলাদেশে নদীর তলদেশ পলিতে ভরাট হওয়ায় উদ্ভূত সমস্যা ও সমাধানের ব্যাপারে বক্তব্য রাখুন।

উত্তর : বর্তমানে বাংলাদেশে ছোট-বড় সব মিলে ৩১০টি নদ-নদী রয়েছে। এর মধ্যে পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, কর্ণফুলী, ব্রহ্মপুত্র উল্লেখযোগ্য। এক সময় এসব নদী নাব্য ছিল। কিন্তু কালের বিবর্তনে নদীগুলোর তলদেশ পলিতে ভরে গেছে। এর ফলে নদীগুলোর পানি ধারণক্ষমতা অনেক কমে গেছে। যার কারণে অধিক বৃষ্টিপাত ও বন্যা হলেই নদীর দুকূল প্লাবিত হয়ে পড়ে। এতে করে ফসল ও সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষতি হয়। বাংলাদেশে বন্যা এখন একটি নৈমিত্তিক ব্যাপার। প্রতি বছরই দেশের কোনো না কোনো অঞ্চলে বন্যা হয়ে থাকে।

নদীর তলদেশ ভরাট হয়ে যাওয়ায় শীত মৌসুমে পর্যাপ্ত পানি সেচের ব্যাঘাত ঘটে। নদীতে যাত্রী ও পণ্যবাহী পরিবহনে সমস্যা দেখা দেয়। এ পরিস্থিতিতে ড্রেজারের মাধ্যমে নদীর গভীরতা বৃদ্ধি করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। ইতোমধ্যে সরকার এ ব্যাপারে কিছু ব্যবস্থা নিলেও তা পর্যাপ্ত নয়। এ সমস্যার আশু সমাধান করতে না পারলে দেশের কৃষিব্যবস্থা অচিরেই ভেঙে পড়বে। নৌপথে মালামাল পরিবহনও অসম্ভব হয়ে পড়বে।

প্রশ্ন-০৯ **বাংলাদেশ-ভারত নদী কমিশন সম্পর্কে কি জানেন?**

উত্তর : বাংলাদেশে প্রবাহিত অধিকাংশ নদীরই উৎপত্তিস্থল ভারতে। ফলে এ দেশে প্রবাহিত নদীগুলোর গতিপথ, পানি প্রাপ্তি ইত্যাদি বিষয়ে ভারতের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। বিশেষ করে বন্যা, প্লাবন ইত্যাদি সমস্যার হাত থেকে স্থায়ী সমাধান পাওয়ার লক্ষ্যে ১৯ মার্চ ১৯৭২ ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশন গঠন করা হয়। এ কমিশন গঠনের প্রধান উদ্দেশ্য হলো উভয় দেশের নদ-নদী থেকে সর্বাধিক সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এছাড়া আরো যেসব লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এ কমিশন গঠন করা হয়েছে তা হলো উভয় দেশের পানিসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্পসমূহের পর্যালোচনা করা। এ উদ্দেশ্যে কমিশন এ পর্যন্ত যেসব পদক্ষেপ নিয়েছে সেগুলো হলো : ১. গঙ্গা নদীর যৌথ জরিপ; ২. তিস্তা বাঁধ জরিপ; ৩. নদীর ধারপথের উন্নতি সাধন; ৪. বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানিসম্পদ উন্নয়নের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন; ৫. শীতকালে নদীর পানিপ্রবাহ বৃদ্ধির সম্ভাবনা পরীক্ষা; ৬. সীমান্ত নদী সম্পর্কে আলোচনা ও সমস্যা সমাধানের উপায় উদ্ভাবন।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ : টেকসই ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা
Natural Resources of Bangladesh : Sustainable Harnessing & Management

Syllabus *Natural resources of Bangladesh with focus on their sustainable harnessing and management.*

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১. *বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে জ্বালানি সমস্যা, বিশেষত বিদ্যুৎ সমস্যা কতটুকু অন্তরায় সৃষ্টি করছে? বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানে আশু কি কি পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন? [২৯তম বিসিএস]*

০২. *বর্তমানে গ্যাস সংকট মোকাবিলায় সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে? সম্প্রতি বাংলাদেশ কর্তৃক সমুদ্র বিজয় এতে কি প্রভাব ফেলবে বলে মনে করেন? [৩২তম বিসিএস]*

০৩. *পাটের জিনোম ডিকোড উদ্ভাবন বাংলাদেশের পাট চাষ এবং পাটজাত পণ্য উৎপাদনে কি সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছে বলে আপনি মনে করেন। [৩১তম বিসিএস]*

০৪. *বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ এবং এর উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে আলোকপাত করুন। [৩০তম বিসিএস]*

০৫. *বাংলাদেশে কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যাসমূহ এবং এগুলোর সম্ভাব্য সমাধান সম্পর্কে আলোচনা করুন। [২০তম; ১৩তম বিসিএস]*

০৬. *বাংলাদেশের অর্থনীতিতে জ্বালানি সেক্টরের ভূমিকা আলোচনা করুন। বাংলাদেশের কি গ্যাস রপ্তানি করা উচিত? [২৩তম বিসিএস]*
অথবা, বর্তমানে গ্যাস সংকট মোকাবিলায় সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে? সম্প্রতি বাংলাদেশ কর্তৃক সমুদ্র বিজয় এতে কি প্রভাব ফেলবে বলে মনে করেন? [৩২তম বিসিএস]

০৭. *ভূমিহীনদের মাঝে 'খাসজমি' বণ্টনের সরকারি নীতিমালা পর্যালোচনা করুন। নিরপেক্ষ বণ্টনের জন্য কি কি পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে বলে আপনি মনে করেন? [২২তম বিসিএস]*

০৮. *বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নদীর ভূমিকা বর্ণনা করুন। [৩০তম বিসিএস]*

০৯. *পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের সাফল্য-ব্যর্থতা আলোচনা করুন। এ প্রসঙ্গে আর্সেনিকমুক্ত পানি সরবরাহে বাংলাদেশ সরকারের ভূমিকা আলোচনা করুন। [২৭তম বিসিএস]*

১০. *বাংলাদেশে জলসেচন কর্মে জলসম্পদের অপচয় সম্পর্কে বিশদভাবে লিখুন। [৩৪তম বিসিএস]*

১১. *বাংলাদেশের কৃষি জমি অকৃষি কাজে স্থানান্তরিত হবার স্বরূপ ও সংকট বিশ্লেষণ করুন। এই সংকট মোচনের উপায়গুলি কি কি? [৩১তম বিসিএস]*

১২. *সংক্ষেপে বাংলাদেশের খনিজসম্পদের বিবরন দিন। [৩০তম বিসিএস]*

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

১৩. *বাংলাদেশে কয়লা শক্তির মজুদের বিস্তারিত বিবরণ দিন। এ প্রসঙ্গে কয়লার ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করুন।*

১৪. *বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে সরকারের ভর্তুকি কি অব্যাহত রাখা উচিত? নাকি আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে মূল্যের সমন্বয় করা উচিত? আপনার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দিন।*

১৫. *বিকল্প জ্বালানি হিসেবে বাংলাদেশে জৈবগ্যাস প্রযুক্তির সম্ভাবনা ও সুবিধা পর্যালোচনা করুন।*

১৬. *'জ্বালানি নিরাপত্তা : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ' শিরোনামে একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন লিখুন।*

১৭. *'পরমাণু জ্বালানি ও বাংলাদেশ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখুন।*

১৮. *নবায়নযোগ্য শক্তি কি? বাংলাদেশের নবায়নযোগ্য শক্তিসম্পদের সম্ভাবনা কতটুকু?*

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

০১. *কালো সোনা কি?*

০২. *রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস (CNG) কি?*

০৩. *বাংলাদেশের খনিজসম্পদের ওপর আলোকপাত করুন।*

০৪. *বাংলাদেশের কোথায় সাদা মাটি পাওয়া যায়?*

০৫. *বাংলাদেশে কয়টি গ্যাসক্ষেত্র রয়েছে? সবচেয়ে বৃহৎ গ্যাসক্ষেত্র এবং বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত গ্যাসক্ষেত্রের নাম লিখুন।*

০৬. *বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি কোথায়?*

০৭. *বাংলাদেশের বৃহৎ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের নাম কি? এটি কোথায় অবস্থিত?*

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে জ্বালানি সমস্যা, বিশেষত বিদ্যুৎ সমস্যা কতটুকু অন্তরায় সৃষ্টি করছে? বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানে আশু কি কি পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন? *[২৯তম বিসিএস]*

উত্তর : বাংলাদেশ অফুরন্ত সম্ভাবনার দেশ। প্রায় ১৬ কোটি মানুষের শ্রম, স্বপ্ন আর সাধনায় সিক্ত এ জন্মভূমি রকমারি সমস্যায় জর্জরিত। এ রকমারি সমস্যার মধ্যে অন্যতম একটি সমস্যা হলো জ্বালানি সমস্যা। জ্বালানি সমস্যার দুষ্টচক্রে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ধীর হচ্ছে। বিশেষ করে বিদ্যুৎ সমস্যা এ ক্ষেত্রে ব্যাপক অন্তরায় সৃষ্টি করছে। বিদ্যুতের চাহিদা অনুযায়ী সরকার সরবরাহ নিশ্চিত করতে পারছে না বিধায় শিল্প ও কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। জনজীবন বিপর্যস্ত হচ্ছে। ফলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাকা ধীর হয়ে পড়ছে।

জ্বালানি সমস্যা : জ্বালানি বলতে বোঝায় যা দিয়ে জ্বাল দেয়া হয় অথবা যা জ্বালানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। এ অর্থে জ্বালানি বলতে বিদ্যুৎ, গ্যাস, কয়লা, কাঠ প্রভৃতিকে বোঝায়। একটি দেশে যে পরিমাণ জ্বালানির চাহিদা রয়েছে, সে পরিমাণে যদি জ্বালানি সরবরাহ করা না যায় তখনই সমস্যা দেখা দেয়। আর একেই বলে জ্বালানি সমস্যা। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশই জ্বালানি সমস্যায় আক্রান্ত। তবে এ সমস্যার মধ্যে তারতম্য রয়েছে। উন্নত দেশগুলো তাদের জ্বালানি চাহিদা পূরণে বিভিন্ন ব্যয়বহুল পদ্ধতি গ্রহণ করলেও অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে তা সম্ভব নয়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

বিদ্যুৎ সমস্যা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাধাসমূহ : বিদ্যুৎ আজ উন্নয়ন এবং আধুনিক জীবনযাত্রার সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। শিল্পায়ন, কৃষি, নগর উন্নয়ন, শিক্ষা, বিনোদন ইত্যাদি যে কোনো বিষয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ অপরিহার্য। নিচে ধারাবাহিকভাবে বিদ্যুৎ সমস্যার কারণে অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্তরায়সমূহ উপস্থাপন করা হলো :

১. **তৈরি পোশাক শিল্পের ক্ষেত্রে :** তৈরি পোশাক রপ্তানিকারকদের সংগঠন বিজিএমইএ-এর ভাষ্য মতে, বিদ্যুৎ সংকটের কারণে তাদের বছরে ৭০০ কোটি টাকা ক্ষতি হচ্ছে। এ খাতে প্রতিষ্ঠানগুলো বছরে ২৪ কোটি লিটার ডিজেল কিনছেন জেনারেটর দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য। যদি সরাসরি বিদ্যুৎ পাওয়া যেত– তাহলে বিল বাবদ খরচ হতো ৪০০ কোটির মতো। এখানেই শেষ নয়– ৫০ থেকে ৬০ ভাগ কারখানার ডিজেল জেনারেটর দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সামর্থ্য আছে। বাকি অন্তত ত্রিশ ভাগের বিদ্যুতের জন্য তাকিয়ে থাকতে হয় জাতীয় গ্রিডের দিকে। অথচ বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার সিংহভাগ আসে এই তৈরি পোশাক খাত থেকে। এ ভাগে যদি বিদ্যুৎ সমস্যা অব্যাহত থাকে তাহলে অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প বিপর্যয় ও ধ্বংসের সম্মুখীন হবে।

২. **ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ক্ষেত্রে :** তৈরি পোশাক শিল্পের চেয়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের অবস্থা আরো করুণ। বংশাল, ধোলাইখালসহ পুরোনো ঢাকা জুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ছোট ছোট কারখানাগুলো এরই মধ্যে তাদের উৎপাদন অর্ধেকেরও নিচে নামিয়ে আনতে বাধ্য হয়েছেন, অনেকেই কর্মী ছাটাই করেছেন, কেউ কেউ কারখানা বন্ধ রাখার কথাও ভাবছেন।

৩. **মেশিনারিজের ক্ষয়ক্ষতি :** ঘনঘন বিদ্যুৎ যাওয়া-আসার কারণে মেশিনারিজও ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। এক হিসেবে দেখা যায় যে, এভাবে বিদ্যুৎ আসা-যাওয়ার ফলে বছরে মেশিনারিজের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ১২ কোটি টাকা। এতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীসহ সকল ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। পাশাপাশি উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে।

৪. **শিক্ষা সমস্যা :** যখন তখন বিদ্যুৎ চলে যাওয়ায় শিক্ষার্থীরা ঠিক সময়ে পড়তে পারছে না। পড়তে বসার পর বিদ্যুৎ চলে যাওয়ায় পরবর্তীতে বিদ্যুৎ আসলে পূর্বের ন্যায় শিক্ষার্থী পড়ায় মনোযোগ দিতে পারছে না। অথবা নগরে বেড়ে ওঠা শিক্ষার্থী মোম বা হারিকেনের আলোয় অভ্যস্ত না হওয়ার কারণে এসবের আলোতে পড়তে বসছে না। যা দেশের শিক্ষাব্যবস্থার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৫. **কৃষি উৎপাদনে সমস্যা :** বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রাণ হলো কৃষি। কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের জমি সেচের জন্য ব্যাপকভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহার করা হয়। অথচ বিদ্যুৎ সংকটের কারণে কৃষকরা যথাসময়ে জমিতে সেচ দিতে পারে না। ফলে উৎপাদন ব্যাহত হয়। যা বাংলাদেশের খাদ্য ঘাটতি ও অপুষ্টিকে বাড়িয়ে তোলে।

৬. **বৈদেশিক বিনিয়োগ সমস্যা :** বাংলাদেশে যে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় তা অধিকাংশ গ্যাস নির্ভর। বর্তমানে গ্যাস সংকট দেখা দেয়ায় বিদ্যুৎ উৎপাদনেও বিভ্রাট দেখা দিয়েছে। আর এরূপ বিদ্যুৎ সমস্যার কারণে বিদেশীরা বিনিয়োগে নিরুৎসাহিত হচ্ছেন। যেমন– ভারতের বিখ্যাত টাটা কোম্পানির গ্যাসনির্ভর যে বিনিয়োগ প্রস্তাব ছিল তা দামজনিত পার্থক্যের কারণে বাতিল করতে হয়েছে।

বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানে আশু যেসব পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন :

১. অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রণীত প্রকল্পসমূহ বিদেশী ঋণ বা বিনিয়োগের জন্য অপেক্ষা না করে নিজস্ব অর্থেই বাস্তবায়ন করতে হবে। এগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে টেন্ডার আহবান, মূল্যায়ন বা কার্যাদেশ প্রদানে কোনোরূপ বিলম্ব বা অনিয়ম করা যাবে না।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

২. বর্তমান বিদ্যুৎ সরবরাহের যে কার্যক্রম আছে– তার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ লাইনের মেরামত ও নবায়ন জরুরি।

৩. বিদ্যুৎ অপচয়রোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে।

৪. ভারত থেকে যে বিদ্যুৎ ক্রয়ের সমঝোতা হয়েছে তা যথাশীঘ্র জাতীয় গ্রিডে আনয়নের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫. বর্তমানে যে সংকট চলছে তা সমাধানে বন্ধ গ্যাসকূপগুলো দ্রুত চালু করতে হবে, সমৃদ্ধ গ্যাসক্ষেত্রগুলোর উত্তোলন বৃদ্ধি করতে হবে, উত্তোলন ও অনুসন্ধান জোরদার করতে হবে।

৬. রাষ্ট্রীয় বিদ্যুৎ প্লান্টের মেরামত ও নবায়নে গুরুত্ব দিতে হবে।

৭. জরুরি ভিত্তিতে ক্ষুদ্র বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের জন্য বেসরকারি দেশীয় উদ্যোক্তাদের সুযোগ দিতে হবে।

৮. সরকারি-বেসরকারি সকল অফিস-আদালতের এয়ারকন্ডিশনার ব্যবহার সার্বক্ষণিকভাবে বন্ধ রাখার জন্য সরকারি নিষেধাজ্ঞা জারি করতে হবে।

৯. একমাত্র হাসপাতাল-ক্লিনিক ছাড়া সর্বত্র লোডশেডিং ব্যবস্থা সমানভাবে চালু রাখতে হবে।

১০. তথাকথিত সিস্টেম লসের নামে যেসব অবৈধ বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন চালু আছে, তা অবিলম্বে বন্ধ করে সংশ্লিষ্ট দোষীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১১. বিশেষ উৎসব উদ্‌যাপনে সকল প্রকার আলোকসজ্জা নিষিদ্ধ করতে হবে।

উপসংহার : জ্বালানি সমস্যা বিশেষ করে বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধান সময়সাপেক্ষ ও বিপুল ব্যয়সাপেক্ষ। রাতারাতি এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। যা সম্ভব তা হলো এ সমস্যার সমাধানে স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করার পাশাপাশি কর্তৃপক্ষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা।

০২। বর্তমানে গ্যাস সংকট মোকাবিলায় সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে? সম্প্রতি বাংলাদেশ কর্তৃক সমুদ্র বিজয় এতে কি প্রভাব ফেলবে বলে মনে করেন? *[৩২তম বিসিএস]*

উত্তর : বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলে বাণিজ্যিক জ্বালানি হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাস সম্পদটিকে গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যবহ করে তুলছে। এটা নবায়নযোগ্য সম্পদ নয়। কাজেই উত্তোলন ও ব্যবহারজনিত কারণে প্রাকৃতিক গ্যাস এক সময় অবশ্যই নিঃশেষিত হয়ে যাবে। বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান জ্বালানি সম্পদ প্রাকৃতিক গ্যাসের পরিকল্পিত ও সুষ্ঠু উত্তোলন ও ব্যবহারের মাধ্যমেই এদেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে আরো গতিশীল করা যেতে পারে। জ্বালানি শক্তি ব্যবহার যে কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমানুপাতিক। এদিক দিয়ে বিবেচনা করলে পঞ্চাশের দশকের শেষ দিকে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাস আবিষ্কার এবং জ্বালানি শক্তি হিসেবে এর ক্রমবর্ধমান ব্যবহার এদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে এবং সম্প্রতি বাংলাদেশ কর্তৃক সমুদ্র বিজয়ে এ ভূমিকাকে আরো উজ্জ্বল করে তোলে।

বর্তমানে গ্যাস সংকট মোকাবিলায় সরকার যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে : গ্যাস বাংলাদেশের অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ। বাংলাদেশে এ সম্পদের প্রাচুর্য থাকলেও নানাবিধ সমস্যার কারণে এর তীব্র সংকট চলছে। ফলে দেশের কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। স্বল্প পরিমাণে যেগুলো চালু

রয়েছে সেগুলোর উৎপাদন ঘাটতি দেখা দিচ্ছে। এতে করে সামগ্রিকভাবে দেখা দিচ্ছে অর্থনৈতিক বিপর্যয়। এহেন অবস্থা উপলব্ধি করে বাংলাদেশ সরকার গ্যাস সংকট মোকাবিলায় নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। বর্তমানে গ্যাস সংকট মোকাবিলায় সরকার যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তা নিচে আলোচনা করা হলো :

১. **নতুন নতুন কূপ অনুসন্ধান :** বাংলাদেশে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানকারী প্রতিষ্ঠান বাপেক্স (Bangladesh Petroleum Exploration & Production Company Limited — BAPEX) দেশের গ্যাস সংকট মোকাবিলায় নতুন নতুন কূপ অনুসন্ধান অব্যাহত রেখেছে। এ পর্যন্ত (জুন ২০১৪) আবিষ্কৃত বাংলাদেশে ২৬টি গ্যাস ক্ষেত্রের মধ্যে ৫টি গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার করেছে বাপেক্স। এগুলো হলো ভোলার শাহবাজপুর গ্যাসক্ষেত্র (১৯৯৫); ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সালদা গ্যাসক্ষেত্র (১৯৯৬); নোয়াখালীর সুন্দলপুর গ্যাসক্ষেত্র (২৮ আগস্ট ২০১১); কুমিল্লার শ্রীকাইল গ্যাসক্ষেত্র (১৩ জুলাই ২০১২) এবং নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ (২০১৪)। এছাড়া নতুন গ্যাসের খোঁজে বাপেক্স পাবনার নগরবাড়ির মোবারকপুর, গাজীপুরের কাপাসিয়া, সুনামগঞ্জ-নেত্রকোণার সুনেত্র, নারায়ণগঞ্জের মদনপুর এবং কিশোরগঞ্জের বাজিতপুরে পর্যায়ক্রমে অনুসন্ধান কূপ খনন করবে। ২০১৫ সাল নাগাদ বাপেক্স ১০টি উন্নয়ন এবং ৮টি অনুসন্ধান কূপ খননের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

২. **কূপ খনন :** গ্যাস সংকট নিরসনে বাপেক্স আবিষ্কৃত গ্যাসক্ষেত্রগুলো থেকে গ্যাস উত্তোলনের লক্ষ্যে কূপ খনন করা হয়েছে। খননকৃত এসব কূপ থেকে সম্ভাব্য গ্যাস মজুদের পরিমাণ সম্পর্কে জানা যায়। যেমন : সর্বশেষ আবিষ্কৃত শ্রীকাইল গ্যাসক্ষেত্রের দুটি স্তরে ৩১৮ বিলিয়ন ঘনফুট (BCF) গ্যাস মজুদের সম্ভাবনা রয়েছে। আশা করা হচ্ছে গ্যাস উত্তোলন শুরু হলে নিচের স্তরসহ প্রতিদিন এ গ্যাসক্ষেত্র থেকে তিন কোটি ঘনফুট গ্যাস উত্তোলন করা যাবে। এতে করে দেশে গ্যাসের সংকট অনেকাংশে নিরসন করা সম্ভব হবে।

৩. **গ্যাস উত্তোলন :** বাংলাদেশে আবিষ্কৃত এ পর্যন্ত ২৬টি গ্যাসক্ষেত্র থেকে সরকার গ্যাস উত্তোলনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। উত্তোলিত গ্যাসের সুবিস্তৃত বণ্টনের মাধ্যমে সরকার গ্যাস সংকট নিরসনের চেষ্টা করছে। বর্তমানে দেশের ২৬টি গ্যাসক্ষেত্রের মধ্যে ২০টি গ্যাসক্ষেত্রের ৯০টি কূপ হতে গ্যাস উৎপাদিত হচ্ছে। দেশে উত্তোলনযোগ্য প্রমাণিত ও সম্ভাব্য মোট গ্যাস মজুদের পরিমাণ ২৭.০৩৮ ট্রিলিয়ন ঘনফুট (ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত)।

৪. **স্থল এলাকায় ব্লক সৃষ্টি :** গ্যাস সম্পদের অনুসন্ধান, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সরকার ১৯৮৮ সালে দেশের স্থল এলাকাকে মোট ২৩টি ব্লকে ভাগ করে। এসব ব্লকে বর্তমান সরকার প্রোডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্ট (পিএসসি)-এর আওতায় আকর্ষণীয় শর্তে বিদেশী বিনিয়োগের অনুমতি প্রদান করেছে। ফলে একাধিক আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানি এতে আকৃষ্ট হয়ে সাড়া দিয়েছে। যা দেশের গ্যাস সংকট নিরসনের একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

৫. **আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান :** সরকার দেশীয় কারিগরি প্রযুক্তির সহায়তার পাশাপাশি বিদেশী কারিগরি প্রযুক্তির সহায়তায় দেশে মজুদকৃত গ্যাস উত্তোলনের লক্ষ্যে অন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করেছে। এ দরপত্র আহ্বানে অনেক বিদেশী তেল কোম্পানি ইতোমধ্যে সাড়া দিয়েছে। আন্তর্জাতিক দরপত্রের কার্যাদি যথাযথভাবে সম্পাদিত হলে দেশের গ্যাস সংকট লাঘব করা সহজ হবে বলে সরকার আশা প্রকাশ করছে।

৬. **গ্যাস জাতীয় গ্রিড লাইনে সংযোজন :** বাংলাদেশ সরকার গ্যাস সংকট নিরসনে নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে নোয়াখালীর সুন্দলপুর এবং সুনামগঞ্জ-নেত্রকোনার সুনেত্র গ্যাসক্ষেত্র থেকে উৎপাদিত গ্যাস জাতীয় গ্রিড লাইনে সংযোজনের উদ্যোগ অন্যতম। এ উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে গ্যাস সংকট তুলনামূলকভাবে অনেকাংশে নিরসন সম্ভব হবে।

৭. **বাপেক্সকে গতিশীল করার উদ্যোগ :** দেশে নতুন নতুন কূপ খনন ও গ্যাস উত্তোলনের জন্য বাপেক্সের কার্যক্রমকে গতিশীল করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। যার ফলে পেট্রোবাংলার অধীন কোম্পানিগুলোর মধ্যে বাপেক্সের সফল প্রকল্প বাস্তবায়ন লক্ষ্য করা যায়। ২০১১, ২০১২ ও ২০১৩ সালে যথাক্রমে সুন্দলপুর, শ্রীকাইল ও রূপগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার বাপেক্সের সফলতা।

৮. **প্রকল্প বাস্তবায়ন :** সরকার গ্যাস সংকট নিরসনের লক্ষ্যে যেসব প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে তা পেট্রোবাংলা ও তার কোম্পানিসমূহের অধীনে পরিচালিত। বর্তমানে এরূপ বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের সংখ্যা ২৬টি। বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো– ত্রিমাত্রিক জরিপ, পাইপ লাইন উন্নয়ন, গ্যাসফিল্ড উন্নয়ন, কূপ, কম্প্রেসর স্টেশন স্থাপন, গ্যাস সঞ্চালন, টিজিটিডিসিএর এর সিস্টেম লস হ্রাসকরণ, এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব বাপেক্স, আপগ্রেডেশন অব ডাটা সেন্টার অব বাপেক্স ইত্যাদি।

৯. **অপব্যবহার রোধে প্রচারণা :** গ্যাসের অপব্যবহার রোধ করেও দেশে বিদ্যমান গ্যাস সংকট নিরসন করা যায়। তাই সরকার গ্যাসের অপব্যবহার রোধে রেডিও, টেলিভিশন ও পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা অব্যাহত রেখেছে। যেমন : ব্যবহারের পর গ্যাসের চুলা বন্ধ রাখা, তুচ্ছ কারণে গ্যাসের ব্যবহার না করা ইত্যাদি জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম সরকার চালিয়ে যাচ্ছে।

১০. **কারিগরি ও উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার :** বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল ও দারিদ্র্য পীড়িত দেশ। এদেশের জনশক্তিকে এখনো পুরোপুরি জনসম্পদে রূপান্তরিত করা সম্ভব হয়নি। এরপরও বাংলাদেশ স্বল্পপ্রক্রিয়ায় কারিগরি ও উন্নত প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনের মাধ্যমে গ্যাস সংকট নিরসনের চেষ্টা করছে।

১১. **বিদেশী বিশেষজ্ঞদের সহায়তা :** গভীর সমুদ্র থেকে গ্যাস উত্তোলনের জন্য বাংলাদেশের একক প্রচেষ্টা পর্যাপ্ত নয়। তাই সরকার এ অঞ্চল থেকে গ্যাস উত্তোলনের জন্য বিদেশী বিশেষজ্ঞদের সহায়তা নিয়ে থাকে। সরকারের এ প্রচেষ্টা গ্যাস সংকট নিরসনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

সম্প্রতি বাংলাদেশ কর্তৃক সমুদ্র বিজয় গ্যাস সংকট মোকাবিলায় যে ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে : সম্প্রতি (১৪ মার্চ ২০১২ এবং ৭ জুলাই ২০১৪) জার্মানির হামবুর্গস্থ আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইন বিষয়ক ট্রাইব্যুনাল তথা ইটলস কর্তৃক বঙ্গোপসাগরের বাংলাদেশ, মিয়ানমার ও ভারতের মধ্যকার দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত সমুদ্রসীমা চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হয়েছে। এতে করে বাংলাদেশ সমুদ্রসীমানায় ১,১৮,৮১৩ বর্গকিমি এলাকার মালিকানা লাভ করে। অর্জিত নতুন সমুদ্রসীমায় বিপুল পরিমাণ তেল-গ্যাস পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে বাংলাদেশ কর্তৃক এ সমুদ্র বিজয় গ্যাস সংকট মোকাবিলায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১. **নব গ্যাসক্ষেত্র অনুসন্ধান :** বাংলাদেশের সমুদ্রসীমাকে বিভক্তকারী ২৮টি ব্লকের মধ্যে ২৭টিই মিয়ানমার ও ভারত নিজেদের বলে দাবি করত। কিন্তু ইটলস কর্তৃক মামলার রায়ে বাংলাদেশ ১৮টি ব্লকের একক মালিকানা লাভ করে। বাংলাদেশ এতদিন এ ১৮টি ব্লকে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান থেকে বিরত ছিল। তাই সম্প্রতি অর্জিত ১৮টি ব্লকেই বাংলাদেশ এককভাবে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান করবে, যা বাংলাদেশে বিদ্যমান গ্যাস সংকট মোকাবিলায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

২. **নতুন ব্লক সৃষ্টি :** ইটলস কর্তৃক মামলার রায়ে বাংলাদেশের বিশেষায়িত অর্থনৈতিক অঞ্চলের আয়তন বৃদ্ধি পায়। ফলে গভীর সমুদ্রে সম্প্রসারিত মহীসোপানে অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বেশকিছু নতুন ব্লক সৃষ্টি করা যাবে। সৃষ্টিকৃত এ নতুন ব্লক থেকে গ্যাস অনুসন্ধান করা সহজ হবে।

৩. **নতুন নতুন চুক্তি স্বাক্ষর :** বাংলাদেশ দীর্ঘদিন থেকেই দেশে মজুদকৃত গ্যাস উত্তোলনের লক্ষ্যে নাইকো, কেয়ার্ন এনার্জি, শেভরন, কনোকো ফিলিপস, স্যান্তোস ইন্টারন্যাশনাল, হেলিবার্টস ব্রাউন অ্যান্ড রুট, রেক্সউড, টোটাল ইত্যাদি আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানির সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করে গ্যাস উত্তোলন করছে। আশা করা হচ্ছে, অর্জিত নতুন সমুদ্রসীমা থেকে গ্যাস অনুসন্ধান ও তা উত্তোলনের স্বার্থে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানির সাথে নতুন নতুন চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে। যা দেশের গ্যাস সংকট মোকাবিলায় অবদান রাখবে।

৪. **চাহিদা ও প্রাপ্তির সমন্বয় :** বাংলাদেশের নতুন সমুদ্রসীমায় নতুন নতুন গ্যাস কূপ অনুসন্ধান ও তা থেকে যদি গ্যাস উত্তোলন করা সম্ভব হয় তবে বাংলাদেশের গ্যাসের চাহিদা অনেকাংশে লাঘব করা সহজ হবে বলে বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা। অর্থাৎ নতুন সমুদ্রসীমা থেকে চাহিদা ও প্রাপ্তির সমন্বয়ের মাধ্যমে গ্যাসের সংকট মোকাবিলা করার পথ প্রশস্ত হয়েছে।

৫. **অন্যান্য :** বাংলাদেশের সমুদ্র জয় তথা নতুন সমুদ্র সীমায় যে প্রচুর গ্যাস পাবার সম্ভাবনা রয়েছে এতে কোনো সন্দেহ নেই। বাংলাদেশ এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে দেশের গ্যাস সংকট সহজেই মোকাবিলা করতে পারে। এক্ষেত্রে বাপেক্সকে আরো শক্তিশালী ও গতিশীল করতে হবে।

উপসংহার : প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান প্রাথমিক জ্বালানি শক্তি সম্পদ। এটা নবায়নযোগ্য নয় বলে একসময় নিঃশেষিত হয়ে যাবে। ক্ষুদ্রায়তন বিশিষ্ট সম্পদশোভিত আমাদের প্রিয় বাংলাদেশে প্রাকৃতিক সম্পদ প্রাপ্তির সমূহ সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকলেও প্রাকৃতিক গ্যাসনির্ভর হয়ে গড়ে ওঠা এদেশের অর্থনীতি ও ১৫ কোটি ৫৮ লাখ (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৪) মানুষের ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে তা নিতান্তই অপ্রতুল। কাজেই বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় নতুন সমুদ্রসীমাকে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে দেশের গ্যাস সংকট মোকাবিলার যথাযথ উদ্যোগ এখন সময়ের দাবি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

০৩ । পাটের জিনোম ডিকোড উদ্ভাবন বাংলাদেশের পাট চাষ এবং পাটজাত পণ্য উৎপাদনে কি সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছে বলে আপনি মনে করেন। *[৩১তম বিসিএস]*

উত্তর : বাংলাদেশ কৃষি নির্ভর অর্থনীতির দেশ যার মোট দেশজ উৎপাদনের ১৬.৩৩ (২০১৩-২০১৪) শতাংশ কৃষি থেকে আসে এবং শ্রম শক্তির ৪৭ (২০১৩-২০১৪) শতাংশ কৃষিতে নিয়োজিত। পাট খাত কৃষি এবং শিল্পের এক বিশাল অংশ। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এ খাতে ৩ কোটি লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে যার মধ্যে আছে কৃষক, ব্যবসায়ী, শ্রমিক এবং আত্মকর্মসংস্থানকারী অনেকে। এক সময়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী খাত ছিল পাট যা বর্তমানে চতুর্থ বৃহৎ অবস্থানে রয়েছে। পাট উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে দ্বিতীয়। জাতীয় উন্নয়নে এর গুরুত্ব ব্যাপক।

পাটের DNA উদ্ভাবনে বাংলাদেশ : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যথাযথ, স্থায়ী এবং যথাসময়ে প্রয়োগের মাধ্যমে একটি দেশ তার উন্নয়ন ধারায় প্রবৃদ্ধি অর্জন করে। বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ এবং স্থায়ী উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে যার জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন শাখায় গবেষণার উপর ব্যাপকভাবে গুরুত্ব দিচ্ছে। একবিংশ শতাব্দীতে জীববিজ্ঞানে জিন প্রযুক্তির ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেয়েছে। উন্নত বিশ্বের মতো উন্নয়শীল দেশসমূহ তথা বাংলাদেশও জিন প্রযুক্তির গবেষণার উপর গুরুত্ব দিয়েছে।

বাংলাদেশের বিজ্ঞানী আমেরিকার হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মাকসুদুল আলমের নেতৃত্বে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরীর আন্তরিক সহযোগিতা এবং কৃষিমন্ত্রণালয়ের অর্থায়নের মাধ্যমে পাটের জিনোম ডিকোড উদ্ভাবন সম্ভব হয়। এ গবেষণায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞান অনুষদের ৩৪ জন তরুণ স্নাতকোত্তর গবেষক এবং সফটওয়্যার কোম্পানি ডাটা সফটের সমন্বয়ে স্বপ্নযাত্রা নামক প্রকল্পের মাধ্যমে অতি স্বল্প সময়ে পাটের জিনোম কোড উদ্ভাবন করা হয়। প্রকল্পের সমস্ত কার্যাবলি বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের সার্বিক তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়।

জিনোম সিকোয়েন্স/ডিকোড : জিনোম সিকোয়েন্স বলতে কোনো জীবের DNA তে লুকানো তার জীবন রহস্যের তথ্য উন্মোচন করাকে বোঝায়। এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে যে কোনো প্রজাতির DNA-এ বিভিন্ন ক্রমোসোমের রাসায়নিক গঠন A, T, C এবং G এর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়। জিনোম সিকোয়েন্স/ডিকোড আবিষ্কার (উদ্ভাবন) হলে গবেষকরা বিভিন্ন জিনগত পরিবর্তনের মাধ্যম নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনতে পারে :

১. স্বাদ ও মানের উন্নয়ন।
২. ফসল তোলার সময় স্বল্পকরণ।
৩. সংরক্ষণ প্রক্রিয়ার উন্নয়ন।
৪. পুষ্টি গুণাগুণ, ফলন এবং অন্যান্য সহনশীলতা বৃদ্ধিকরণ।
৫. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, পোকা-মাকড়ের আক্রমণ প্রতিরোধ ক্ষমতা, কম আগাছা জন্মানো, Abiotic শক্তির উন্নয়ন ঘটানো।
৬. নতুন পণ্য উৎপাদনে ও বৃদ্ধির নানা কৌশল উদ্ভাবনে।

পাট উৎপাদনের বহুমুখী সম্ভাবনায় জিনোম ডিকোডের ব্যবহার : পাট পরিবেশ বান্ধব ফাইবার হওয়ার কারণে পরিবেশ বিপর্যয়ের বিরূপ প্রভাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পাটের চাষ বৃদ্ধি এবং এর ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে। পাট চাষে জিনোম ডিকোড উদ্ভাবন বেশ কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে। পাট জাত পণ্য উৎপাদনের জিনোম ডিকোড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এটি পাটজাত পণ্য তৈরির পরিধি বিস্তৃত করবে। জিনোম ডিকোড এর জন্য রপ্তানি পণ্য মানের পাটজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির করা সম্ভব যার গুণগত মান অনেক উন্নত হবে। পাটজাত পণ্য উৎপাদনে জিনোম ডিকোড উদ্ভাবনের সম্ভাবনা :

১. বিভিন্ন রং-এর পাট উৎপাদিত হলে বিভিন্ন রং-সংমিশ্রিত পাটজাত পণ্য উৎপাদন সম্ভব হবে।
২. পাটের সৌন্দর্য, শক্তি ও নমনীয়তা এবং পচনশীলতা প্রতিরোধ ক্ষমতা জিনগত পরিবর্তনের মাধ্যমে বৃদ্ধি করা সম্ভব। এর ফলে পাটজাত পণ্যের স্থায়িত্ব ও সৌন্দর্য বাড়বে।
৩. তৈরি পোশাক শিল্পে পাটজাত সুতার ব্যবহার বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। এর ফলে Back-word linkage শিল্পের প্রসার ঘটবে। তৈরি পোশাক এর নীট রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পাবে এবং আমদানি ব্যয় কমে যাবে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৪. পাটজাত পণ্য উৎপাদনে পরিবর্তন সাধিত হলে-এর রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে ফলে রপ্তানি আয়ও বৃদ্ধি পাবে।
৫. জিনগত পরিবর্তনের মাধ্যমে পাটকাঠির কাঠজাত গুণগত মান বৃদ্ধি করা সম্ভব হলে কাঠের পরিবর্তে-এর ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে। ফলে গাছপালা কাটার পরিমাণ অনেকাংশে কমে যাবে এবং বনায়ন আরো বাড়বে। এর ফলে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।
৬. উন্নতমানের Geo-textile পণ্য উৎপাদন করা সম্ভব হবে যা বিভিন্ন কাজে (নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধ, পাহাড়ে মাটির ক্ষয়রোধ, প্যাকেজিং ব্যাগ তৈরি ইত্যাদি) অধিক হারে ব্যবহার করা সম্ভব হবে।
৭. উৎপাদিত পণ্যে বৈচিত্র্যতা আনা সম্ভব। যেমন–
   ক. গাড়ির বিভিন্ন অংশ।
   খ. জুটন-এর উন্নয়নের মাধ্যমে-এর ব্যবহার বৃদ্ধি এবং সীসামুক্ত পরিবেশ তৈরি।
   গ. কাগজ তৈরি (মণ্ড তৈরির উপাদান হিসেবে)।
   ঘ. বিভিন্ন ধরনের আসবাব তৈরি।
   ঙ. খেলনা, টেবিল ল্যাম্পসহ অন্যান্য জিনিস তৈরি।
   চ. পরিবেশ বান্ধব নৌকা তৈরি।

জিনোম ডিকোড এবং বাংলাদেশ পাট উৎপাদনে নতুন সম্ভাবনা : জিনোম ডিকোড উদ্ভাবনের ফলে ব্যাপকতর গবেষণার মাধ্যমে বিভিন্ন উদ্ভিদের উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। বাংলাদেশের সোনালী আঁশ পাটের জিনোম ডিকোড উদ্ভাবন পাট চাষ এবং পাটজাত পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে নতুন নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছে।

পাট বছরে একবার চাষ করা হয়। এটি আর্দ্র মাটি এবং জলবায়ুতে ভালো জন্মে। শুষ্ক অবস্থায় বীজ মাটিতে বপন করা হয় এবং ৪ থেকে ৬ মাসের মধ্যে পরিপক্ব হয়ে উঠে যা সাধারণত ১০-১২ ফুট (৩ থেকে ৩.৬ মিটার) লম্বা হয়। জিনোম ডিকোডে উদ্ভাবন এবং এর ব্যাপকতর গবেষণা বাংলাদেশের পাট চাষে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সম্ভব :

১. **উন্নত মানের বীজ :** জিন ডিকোড করার ফলে উন্নত মানের বীজ তৈরি এখন বাংলাদেশেই সম্ভব। এর ফলে বীজের অঙ্কুরোদগমের হার বাড়ানো যাবে এবং অধিক পরিমাণ জমিতে অল্প বীজ দিয়ে কম খরচে পাট উৎপাদন সম্ভব হবে। বর্তমানে হেক্টর প্রতি ২ টন পাট উৎপাদিত হয় যা ২.৫-৩.০ টনে উন্নীত করা সম্ভব হবে। অধিকন্তু দেশের বীজের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি করা যাবে।
২. **পাট গাছের আকার আকৃতি :** সাধারণত আমাদের দেশের পাট গাছ ১০-১২ ফুট লম্বা হয় এবং বেশি মোটা হয় না। ফলে জমিতে পাটের পরিমাণ আশানুরূপ হয় না। জিনগত পরিবর্তনের মাধ্যমে পাট গাছের উচ্চতা বাড়ানোর পাশাপাশি যথেষ্ট মোটা করা সম্ভব এবং শাখা প্রশাখা কম হবে।
৩. **চাষের মেয়াদ ও সময় :** পাট চাষের জন্য কমপক্ষে চার মাস সময় লাগে। এপ্রিল-আগস্ট পাট চাষের সময়। জিনোম ডিকোড উদ্ভাবন হওয়ার ফলে এ সময়কে কমিয়ে আনা সম্ভব। যার ফলে বন্যা বা খরা জনিত কারণে পাট উৎপাদন ব্যাহত হবে না। এ উদ্ভাবনের ফলে আশা করা যায় যে, ৯০ দিনের মধ্যে এবং বছরের যে কোনো সময় পাট চাষ সম্ভব হবে।
৪. **অঞ্চলভিত্তিক চাষাবাদ ও লবণাক্ততা :** পাট বাংলাদেশের বৃহত্তর ফরিদপুর, টাঙ্গাইল, যশোর, ঢাকা, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, জামালপুর, রংপুর, ময়মনসিংহ এবং কিশোরগঞ্জে ব্যাপকভাবে

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

উৎপাদিত হয়। প্রাকৃতিক কারণে এসব অঞ্চলের মাটি পাট চাষের জন্য উপযোগী। এসব অঞ্চল ছাড়া অন্যান্য অঞ্চলে তেমন পাট চাষ হয় না। জিনগত পরিবর্তনের মাধ্যমে অন্যান্য অঞ্চলে চাষ যোগ্য পাটের জাত আবিষ্কার সম্ভব হবে। বিশেষ করে পাহাড়ি অঞ্চলের জন্য। উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্তের কারণে পাট চাষ করা যায় না। এ উদ্ভাবন আমাদেরকে লবণ সহিষ্ণু পাটের জাত উদ্ভাবনে সাহায্যে করবে।

৫. **সহনশীলতা :** উন্নত জাতের বীজ উদ্ভাবন করার মাধ্যমে পাটের গুণাগুণ উন্নয়ন করা সম্ভব। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের রোগবালাই প্রতিরোধ ব্যবস্থা; পোকামাকড়ের আক্রমণ রোধকারী, বন্যার পানি সহনশীলতা, খরা সহনশীলতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য জিনগত বিভিন্ন পরিবর্তনের মাধ্যমে অর্জন করা যাবে।

৬. **রং-এর বিভিন্নতা :** বাংলাদেশে সাদা এবং সোনালী এ দুই ধরনের পাট জন্মায়। জিনোম ডিকোড উদ্ভাবন হওয়ার ফলে অন্যান্য রং যেমন : লাল, সবুজ, হলুদ, নীল ইত্যাদি রং এর পাট উদ্ভাবন করা সম্ভব হবে। এতে পাট চাষে বিভিন্নতা আসবে।

৭. **পাট সংরক্ষণ :** পাট গাছ কাটার পর তা বেশ কিছু দিন পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হয়। এরপর পাটকাঠি থেকে পাট আলাদা করার মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়। পরে শুকানোর মাধ্যমে পাট সংরক্ষণ করা হয়। জিনগত পরিবর্তন মাধ্যমে সংরক্ষণের প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন আনা সম্ভব যা সময় এবং শ্রম উভয়েরই সাশ্রয় ঘটবে।

৮. **অন্যান্য :** পাট চাষ শ্রম নির্ভর এবং এর উৎপাদন খরচ অনেক। জিনগত পরিবর্তন আনার মাধ্যমে অল্প খরচে অধিক পাট উৎপাদন সম্ভব হবে। এছাড়াও শ্রমশক্তির উপর নির্ভরতা অনেকাংশে কমে যাবে।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, পাটের জিনোম ডিকোড বাংলাদেশের পাট উৎপাদন এবং পাটজাত পণ্য উৎপাদনে ব্যাপকভাবে বহুমুখী সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছে। তাই এ জিনগত উদ্ভাবনের উপর উচ্চতর গবেষণা চালিয়ে সম্ভাবনার বহুমুখিতাকে যথাযথভাবে কাজে লাগানোই আমাদের লক্ষ্য।

০৪ । বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ এবং এর উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে আলোকপাত করুন। *[৩০তম বিসিএস]*

উত্তর : প্রকৃতি প্রদত্ত সকল সম্পদকে প্রাকৃতিক সম্পদ বলে। যে কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রাকৃতিক সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। যে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ যত বেশি সে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনাও তত বেশি। একটি দেশের শ্রম, মূলধন ও প্রযুক্তিবিদ্যাকে কাজে লাগিয়ে প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা যেতে পারে। প্রাকৃতিক সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার দেশের দ্রুত শিল্পায়নে সহায়তা করে, জাতীয় আয় বৃদ্ধি করে এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করে। বাংলাদেশে যথেষ্ট প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে। কিন্তু প্রয়োজনীয় উদ্যোগ, মূলধন এবং প্রযুক্তিবিদ্যার অভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। ফলে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ আজ পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম।

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ : 'প্রাকৃতিক সম্পদ' বলতে প্রকৃতি প্রদত্ত সকল সম্পদকে বুঝায়। প্রাকৃতিক সম্পদ প্রকৃতির অবাধ দান যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সহায়তা করে। দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু, বৃষ্টিপাত, মৃত্তিকা, নদ-নদী, কৃষিজ সম্পদ, খনিজ সম্পদ, বনজ

সম্পদ, মৎস্য সম্পদ, শক্তি সম্পদ প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। পৃথিবীর বুকে জীবনের অস্তিত্ব প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভরশীল। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদ পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। নিচে বাংলাদেশের প্রধান কয়েকটি প্রাকৃতিক সম্পদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং এ সকল সম্পদের উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ : প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে খনিজ সম্পদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু বাংলাদেশ খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ নয়। প্রয়োজনের তুলনায় এ দেশে খনিজ সম্পদের পরিমাণ খুবই কম। ফলে প্রয়োজনীয় বেশিরভাগ খনিজ সম্পদই বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। বাংলাদেশে যে সকল খনিজ সম্পদ রয়েছে তার বর্ণনা নিচে দেয়া হলো :

১. **প্রাকৃতিক গ্যাস :** প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের প্রধান খনিজ সম্পদ। ১৯১০ সাল থেকে এ দেশে অনুসন্ধানমূলক কূপ খনন করা হয়েছে। ১৯৫৫ সালে সিলেটের হরিপুরে সর্বপ্রথম গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়। পরবর্তীতে ১৯৫৭ সালে এই গ্যাসক্ষেত্র থেকে সর্বপ্রথম গ্যাস উত্তোলন করা হয়। গ্যাস দেশের মোট জ্বালানি চাহিদার শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ পূরণ করে। দেশে আবিষ্কৃত মোট গ্যাস ক্ষেত্রের সংখ্যা (বর্তমান) ২৬টি। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৪-এর তথ্য মতে এই ২৬টি গ্যাস ক্ষেত্রে উত্তোলনযোগ্য ও সম্ভাব্য প্রমাণিত মজুদের পরিমাণ ২৭.০৩৮ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। বর্তমানে ২০টি গ্যাস ক্ষেত্রের ৯০টি কূপ থেকে গ্যাস উৎপাদিত হচ্ছে। প্রাকৃতিক গ্যাস অফুরন্ত নয়। তাই নতুন নতুন গ্যাস ক্ষেত্রের অনুসন্ধান এবং আবিষ্কৃত গ্যাস ক্ষেত্রের উন্নয়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গ্যাস সম্পদের দ্রুত অনুসন্ধান ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১৯৮৮ সালে সারা দেশকে ২৩টি ব্লকে বিভক্ত করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে সুবিধাজনক শর্তে উৎপাদন বণ্টন চুক্তির আওতায় বিদেশী বিনিয়োগের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানির পক্ষ থেকে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া গেছে।

২. **কয়লা :** বাংলাদেশ কয়লা সম্পদে তত উন্নত নয়। বাংলাদেশে যে কয়লা পাওয়া যায় তার অধিকাংশই নিকৃষ্টমানের। এ দেশের ফরিদপুরে বাঘিয়া ও চান্দা বিল, খুলনার কোলা বিল এবং সিলেটের কিছু অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে পীট জাতীয় কয়লার সন্ধান পাওয়া গেছে। এছাড়া রাজশাহী, বগুড়া, নওগাঁ এবং সিলেট জেলায় উৎকৃষ্টমানের বিটুমিনাস ও লিগনাইট কয়লার সন্ধান পাওয়া গেছে। ১৯৮৫ সালে দিনাজপুর জেলার বড়পুকুরিয়া এলাকায় বিরাট কয়লা খনি আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন প্রকার অসুবিধার কারণে সকল খনি থেকে কয়লা উত্তোলন সম্ভব হচ্ছে না। এ পর্যন্ত দেশে মোট আবিষ্কৃত ৫টি কয়লা ক্ষেত্রসমূহে কয়লার মজুদ প্রায় ৩৩০০ মিলিয়ন টন, যা প্রায় ৪৬ ট্রিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসের সমতুল্য। বর্তমানে বাংলাদেশে যে পরিমাণ কয়লা মজুদ আছে তা উত্তোলন করতে পারলে প্রায় ২ শত বছর পর্যন্ত ব্যবহার করা সম্ভব হবে বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন।

৩. **খনিজ তেল :** বিশেষজ্ঞদের ধারণা বাংলাদেশে প্রচুর খনিজ তেল পাওয়া যাবে। এ লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে দেশী ও বিদেশী বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় দীর্ঘদিন ধরে অনুসন্ধান কার্য চালানো হচ্ছে। কিন্তু খনিজ তেল সম্পদের আবিষ্কার ও উত্তোলনে মোটেই অগ্রগতি হয়নি। তবে ১৯৮৬ সালে সিলেটের হরিপুরে প্রাকৃতিক গ্যাসের সপ্তম কূপে কিছুটা অপ্রত্যাশিতভাবেই খনিজ তেল পাওয়া যায়। কূপটিতে ২০২০ থেকে ২০৩০ মিটার গভীরতায় প্রায় ১০ মিলিয়ন ব্যারেল তেল মজুদ আছে। তবে উত্তোলনযোগ্য মজুদের পরিমাণ নির্ণয় করা হয় প্রায় ৬ মিলিয়ন ব্যারেল বা ৮.৯৪ লাখ মেট্রিক টন। সিলেটের হরিপুর ছাড়াও ফেঞ্চুগঞ্জ-৩ ও কৈলাসটিলা-২ কূপে খনিজ তেলের

সন্ধান পাওয়া গেছে। কিন্তু কারিগরি জটিলতার কারণে তেল আধারের ব্যাপ্তি ও তেলের পরিমাণ সঠিকভাবে নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি।

৪. **চুনাপাথর :** বাংলাদেশ চুনাপাথর সম্পদে সমৃদ্ধ নয়। সিলেট জেলার জাফলং, জকিগঞ্জ; সুনামগঞ্জ জেলার ভাঙারঘাট, বাগালিবাজার, লালঘাট ও টাকেরঘাট এবং চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড ও কক্সবাজার জেলার সেন্টমার্টিন দ্বীপে চুনাপাথর পাওয়া যায়। এছাড়া রাজশাহী বিভাগে জয়পুরহাট জেলার জামালগঞ্জ ও জয়পুরহাটে চুনাপাথর পাওয়া যায়। জয়পুরহাট চুনাপাথর প্রকল্প থেকে বছরে প্রায় ১৬ লাখ টন চুনাপাথর উত্তোলন করা হয়।

৫. **চীনামাটি :** বাংলাদেশের নেত্রকোনার বিজয়পুর এবং নওগাঁ জেলার পত্নীতলায় চীনামাটি পাওয়া গেছে। তন্মধ্যে নেত্রকোনা জেলার বিজয়পুর গ্রামে প্রায় ২৬ কিমি. দীর্ঘ এবং কয়েক মিটার প্রস্থ এলাকাজুড়ে প্রধান খনি অবস্থিত। এ খনিতে সঞ্চিত চীনামাটির পরিমাণ আনুমানিক ২৫ লক্ষ ৭ হাজার টন। বাংলাদেশের মোট চাহিদার প্রায় ৫০ ভাগ চীনামাটি এ খনি হতে উত্তোলন করা হয়। পত্নীতলার চীনামাটি খনিটি ৪১১ মিটার মাটির নিচে এবং স্তরটি প্রায় ৯ মিটার পুরু।

৬. **তামা :** বাংলাদেশের রংপুর জেলার রানীপুকুর ও পীরগঞ্জ এবং দিনাজপুর জেলার মধ্যপাড়ায় কঠিন শিলার সঙ্গে তামার সন্ধান পাওয়া গেছে। এসব খনি হতে তামা উত্তোলনের জন্য সরকার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, বাসনপত্র, মুদ্রা প্রভৃতি প্রস্তুত করতে তামার প্রয়োজন হয়।

৭. **সিলিকা বালু :** সিলেটের নয়াপাড়া, ছাতিয়ানি, শাহজীবাজার ও কুলাউড়া; চট্টগ্রামের দোহাজারী, জামালপুরের গারো পাহাড়ের বালিঝুরি এবং কুমিল্লা জেলার কালিকাপুর মৌজায় সিলিকা বালু পাওয়া গেছে। বাংলাদেশে বছরে প্রায় ১ লক্ষ ৮০ হাজার বর্গফুট সিলিকা বালু উৎপাদিত হয়।

৮. **পারমাণবিক খনিজ পদার্থ :** পারমাণবিক খনিজ পদার্থ (Atomic minerals) সাধারণত ভারী ধাতব শিল্পে ব্যবহৃত হয়। চট্টগ্রাম জেলার কুতুবদিয়া থেকে টেকনাফ পর্যন্ত উপকূলীয় এলাকায় প্রচুর খনিজ বালির সন্ধান পাওয়া গেছে। পারমাণবিক খনিজ পদার্থগুলো হলো জিরকন, মোনাজাইট, ইলমেনাইট, ম্যাগনেটাইট, লিউকক্সেন প্রভৃতি।

৯. **গন্ধক :** বারুদ, কীটপতঙ্গ নাশক ওষুধ তৈরি, এসিড, পেট্রোলিয়াম পরিশোধন, দিয়াশলাই, আতশবাজি প্রভৃতি তৈরিতে গন্ধক ব্যবহৃত হয়। চট্টগ্রাম জেলার কুতুবদিয়া দ্বীপে গন্ধক পাওয়া যায়।

১০. **নুড়ি পাথর :** সিলেট জেলার লুবা, ভোলাগঞ্জ ও জিয়নগঞ্জ; দিনাজপুর জেলার পঞ্চগড় এবং লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম প্রভৃতি স্থানে প্রচুর নুড়ি পাথর পাওয়া যায়। প্রধানত রাস্তাঘাট, গৃহ, পুল, কালভার্ট, রেল লাইন প্রভৃতি নির্মাণে নুড়ি পাথর ব্যবহার করা হয়। বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি নুড়ি পাথর পাওয়া যায় সিলেটে।

১১. **খনিজ বালি :** চট্টগ্রাম জেলার কুতুবদিয়া থেকে টেকনাফ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ উপকূলীয় এলাকায় প্রচুর Radio Active Sand পাওয়া গেছে। এর মোট পরিমাণ ৫ লক্ষ টন বলে অনুমান করা হয়। এতে প্রচুর ভারী খনিজ পদার্থ বিদ্যমান থাকায় এটি ভারী ধাতব শিল্পে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

১২. **লবণ :** খনিজ সম্পদ হিসেবে লবণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে কোনো লবণের খনি না থাকলেও সমুদ্রের লোনা পানি আটকিয়ে কুটির শিল্পের ভিত্তিতে উপকূলীয় জেলাগুলোতে প্রচুর লবণ উৎপাদন করা হয়। সরকারের অর্থানুকূল্যে এবং ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় বছরে প্রায় ২ কোটি মণ লবণ উৎপাদন করা হয়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

১৩. **কঠিন শিলা :** রংপুর জেলার রানীপুকুর ও শ্যামপুরে এবং দিনাজপুর জেলার মধ্যপাড়ায় কঠিন শিলার সন্ধান পাওয়া গেছে। রংপুরের রানীপুকুর থেকে বৈদেশিক সহযোগিতায় শিলা উত্তোলনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। দেশে বার্ষিক কঠিন শিলার চাহিদা প্রায় ৬০-৭০ লাখ মেট্রিক টন। এর বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন শুরু হয় ২৫ মে ২০০৭ সালে। জানুয়ারি ২০১২ পর্যন্ত মোট উৎপাদিত কঠিন শিলা ১৮.১১ লক্ষ মেট্রিক টন। বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন, এখান থেকে বছরে প্রায় ১৭ লক্ষ টন শিলা উত্তোলন করা যাবে। অন্যদিকে মধ্যপাড়া কঠিন শিলা প্রকল্প ২০০৪-২০০৫ সালে সমাপ্ত হয়, যা থেকে প্রতি বছর প্রায় ১৬.৫ মিলিয়ন টন কঠিন শিলা উত্তোলনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়।

বাংলাদেশের মৎস্যসম্পদ : মৎস্য বাংলাদেশের একটি উল্লেখযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ। বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ। এদেশে অসংখ্য নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর-দীঘি, বিল ও হাওর রয়েছে। এ সকল জলাশয়ে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। এছাড়া বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলভাগের লোনা পানিতেও প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। বাংলাদেশের জলসীমার দ্বীপসমূহের মধ্যে সেন্টমার্টিন দ্বীপ, কুতুবদিয়া, মহেশখালী, হাতিয়া, সন্দ্বীপ, দুবলার চর, বড় বাইশদিয়া প্রভৃতি স্থান মৎস্য শিকার কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত। এখানে মৃত শুকমৎস্যের মধ্যে ভেটকি, রূপচাঁদা, লাক্ষা, ছুরি, কোরাল, গলদা চিংড়ি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশের প্রায় ২৪,১৪০ কিমি দীর্ঘ নদ-নদী, অসংখ্য খাল-বিল, পুকুর, হাওর-বাঁওড় এবং বর্ষাকালীন বিস্তৃত প্লাবিত এলাকা মিঠা পানির মৎস্যের বিচরণ ক্ষেত্র হিসেবে পরিগণিত। এসব স্থানে প্রাপ্ত মৎস্যের মধ্যে রুই, কাতলা, মৃগেল, ইলিশ, শোল, বোয়াল, গজার, পাঙ্গাস, আড়, কালবাউস, কৈ, শিং, মাগুর, চিংড়ি, টেংরা, সরপুটি, টাকি, তেলাপিয়া, পাবদা, তপসী প্রভৃতি মাছ উল্লেখযোগ্য। মৎস্য অধিদপ্তরের হিসাব অনুযায়ী ২০১৩-১৪ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ ও সামুদ্রিক উৎস হতে মোট মৎস্য আহরণের লক্ষ্যমাত্রা ৩৫.৫৫ লক্ষমাত্রা মেট্রিক টন, যা ২০১২-১৩ অর্থবছরের মোট মৎস্য আহরণের (৩৪.০০ লক্ষ মেট্রিক টন) তুলনায় ১.৫৫ মেট্রিক টন বেশি।

বর্তমানে কৃত্রিম উপায়ে পোনা উৎপাদন ও মাছ চাষের উন্নত প্রযুক্তি বেসরকারি পর্যায়ে হস্তান্তরের ফলে দীঘি-পুকুর তথা বদ্ধ জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। মূলত দেশে এখন ব্যক্তি মালিকানাধীন খামার ও হ্যাচারি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে মাছের উৎপাদন যেমন বাড়ছে, তেমনি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হচ্ছে। পাশাপাশি বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগও বাড়ছে। বিশ্বখাদ্য কর্মসূচির সহায়তায় কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির আওতায় প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকারি জলাশয় সংস্কার ও উন্নয়ন হচ্ছে। বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ এলাকায় সমন্বিত মৎস্য চাষ উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে অবকাঠামো নির্মাণ, হ্যাচারি স্থাপন ও প্রশিক্ষণ প্রদানের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের প্রাণিসম্পদ : প্রাণিসম্পদ বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ। বাংলাদেশের প্রাণিসম্পদকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- (১) বন্য প্রাণী, (২) গৃহপালিত প্রাণী। বন্য প্রাণীর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো : হাতি, বাঘ, হরিণ, চিতাবাঘ, শূকর, বনবিড়াল, শিয়াল, বানর, সরীসৃপ এবং নানা ধরনের পাখি। গৃহপালিত প্রাণিসম্পদের মধ্যে গরু, মহিষ, ছাগল, মেষ, ঘোড়া, হাঁস, মুরগি প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ সকল প্রাণী পালন করে যে সকল প্রাণিজাত দ্রব্য বা প্রাণিজ সম্পদ পাওয়া যায় তার মধ্যে মাংস, ডিম, দুধ, দুগ্ধজাত দ্রব্য, চামড়া, প্রাণিজ চর্বি প্রভৃতি

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ২০১১-১২ অর্থবছরে মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ১.৭৮% যার বাজার মূল্য ২৪,০৪৬ কোটি টাকা।

প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ হচ্ছে– গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির টিকা উৎপাদন ও সম্প্রসারণ, স্বল্পমূল্যে হাঁস-মুরগির বাচ্চা সরবরাহ, জাত উন্নয়নের জন্য তরল ও হিমায়িত সিমেন উৎপাদন এবং উৎপাদিত সিমেন দ্বারা কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম এবং এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম গ্রহণ। প্রাণিসম্পদ খাতে সিমেন উৎপাদন বৃদ্ধি এবং মাংস ও দুধের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১২,০০০ খামারিকে প্রণোদনা প্রদান, ভেড়ার খামার ও মহিষের খামার স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। দেশে প্রাণী চিকিৎসকের অভাব নিরসনকল্পে সরকার ইতোমধ্যে চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি অ্যান্ড অ্যানিমেল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছে। সিলেট, বরিশাল ও দিনাজপুরে ৩টি ভেটেরিনারি কলেজ চালু করেছে। প্রাণিসম্পদের উন্নয়নে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে দেশে ব্যাপক গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির খামার স্থাপন করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের বনজসম্পদ : যে সকল ভূমিতে ছোট, মাঝারি বা বড় ইত্যাদি অসংখ্য প্রকারের বৃক্ষের সমাবেশ ঘটে তাকে বনভূমি বলে। আর বনভূমিতে উৎপাদিত বা প্রাপ্ত সম্পদকে বনজসম্পদ বলা হয়। প্রাকৃতিক সম্পদ হিসেবে বনজসম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম।

একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বিশুদ্ধ পরিবেশ রক্ষার জন্য সে দেশের মোট আয়তনের ২৫% বনভূমি থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশের মোট বনভূমির পরিমাণ ২৫ লক্ষ হেক্টর যা বাংলাদশের মোট ভূ-খণ্ডের প্রায় ১৭.০৮%। জলবায়ু, মৃত্তিকা ও উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে এদেশের বনভূমিকে তিনটি প্রধান অঞ্চলে বিভক্ত করা যায়। যথা- ১. ক্রান্তীয় চিরহরিৎ ও পত্র-পতনশীল বৃক্ষের বনভূমি, ২. ক্রান্তীয় পত্র-পতনশীল বৃক্ষের বনভূমি বা শালবন, ৩. স্রোতজ বনভূমি বা সুন্দরবন।

১. **ক্রান্তীয় চিরহরিৎ ও পত্র-পতনশীল বৃক্ষের বনভূমি :** বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভাগের জেলাগুলোর পাহাড়িয়া এলাকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এ বনভূমি গড়ে উঠেছে। এ বনভূমির আয়তন প্রায় ১৪,১০২ বর্গ কিমি। উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু এবং অত্যধিক বৃষ্টিপাতের দরুন এ অঞ্চলে বনভূমি গড়ে উঠেছে। চিরহরিৎ বৃক্ষের মধ্যে ময়না, তেলসুর, চাপালিস প্রভৃতি প্রধান। পর্ণমোচী বৃক্ষের মধ্যে গর্জন, গামারি, জারুল, সেগুন, কড়াই প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও এ বনাঞ্চলে নারিকেল, জলপাই, চাম্পা, হরিনা প্রভৃতি গাছ প্রচুর জন্মে।

২. **ক্রান্তীয় পত্র-পতনশীল বৃক্ষের বনভূমি বা শালবন :** বাংলাদেশের এ বনভূমি দু'টি অংশে বিভক্ত। যথা- (ক) মধুপুর ও ভাওয়ালের বনভূমি, (খ) ঠাকুরগাঁও, রংপুর ও দিনাজপুর জেলার বনভূমি। এ দুটি অংশের মোট আয়তন ১,৩৩৮ বর্গ কিমি। এ বনাঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে গজারি, শাল, কড়ই, হিজল, বহেরা প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মে।

৩. **স্রোতজ বনভূমি বা সুন্দরবন :** বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় এ বনাঞ্চল অবস্থিত। এটি বাংলাদেশের বৃহত্তম এবং বিশ্বের অন্যতম প্রধান গরান বৃক্ষের বনভূমি। এর আয়তন প্রায় ৬,৪৭৪ বর্গ কিমি। এ বনাঞ্চলে সুন্দরী, গেওয়া, রাইন, কেওড়া, বালপাশা, গড়ান, নোনাঝাউ, সিউরা, ওড়া, কাকড়া, বায়েন, ধুন্দল, আমুর, পশুর খলসী, কিরপা, ভোলা, হেতাল, দারুল, গরাইয়া, তাল ইত্যাদি বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে জন্মে।

বাংলাদেশের বনজসম্পদ জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন ছাড়াও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বিশেষ অবদান রাখছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে মোট দেশজ উৎপাদনে বনজসম্পদের অবদান ১.৭৪%। এ খাতে বর্তমানে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৪.৪৭%। দেশের মোট জনশক্তির শতকরা ২ ভাগ এ খাতে নিয়োজিত রয়েছে। দেশে ব্যাপক বনায়ন ও বন সংরক্ষণ, বন সম্পদের ঘাটতি পূরণ, কাষ্ঠভিত্তিক শিল্প কারখানার কাঁচামাল সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, জীববৈচিত্র্য, পরিবেশ ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও উন্নয়ন তথা সার্বিক বন উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার এক ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এ লক্ষ্যে ২০ বছরব্যাপী (১৯৯৫-২০১৫) বন মহাপরিকল্পনা অনুমোদিত হয়েছে।

উপসংহার : যে কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ও সমৃদ্ধি বহুলাংশে সে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও দেশের শ্রম, মূলধন ও প্রযুক্তি বিদ্যাকে কাজে লাগিয়ে তার সুষ্ঠু ও সুপরিকল্পিত ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। ফলে যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ আজও পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। তাই দেশের সার্বিক উন্নতি ও সমৃদ্ধির স্বার্থে এদেশের সকল প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ সংরক্ষণ ও ব্যবহার নিশ্চিত করার ওপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা প্রয়োজন।

০৫। বাংলাদেশে কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যাসমূহ এবং এগুলোর সম্ভাব্য সমাধান সম্পর্কে আলোচনা করুন। *[২০তম; ১৩তম বিসিএস]*

উত্তর : বাংলাদেশ কৃষিভিত্তিক দেশ। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রায় ৮০% জনগোষ্ঠী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির সাথে সম্পর্কযুক্ত। তবে দুঃখজনক সত্য যে, বর্তমানে বাংলাদেশে মাথাপিছু আবাদি জমির পরিমাণ ০.১৫ একর। দেশের জাতীয় আয়ের বিরাট একটি অংশ আসে কৃষি খাত থেকে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান (মৎস্য সম্পদসহ) শতকরা ১৬.৩৩ ভাগ। কিন্তু বাংলাদেশের কৃষি খাত তথা কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে রয়েছে হাজারো সমস্যা। তাই জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে কৃষিক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাসমূহের প্রতিকার অনতিবিলম্বে জরুরি।

বাংলাদেশে কৃষি উন্নয়নের সমস্যাসমূহ : বাংলাদেশে কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যাসমূহ নিম্নরূপ :

১. **সনাতন চাষ পদ্ধতি :** বাংলাদেশের কৃষিব্যবস্থা পিছিয়ে থাকার অন্যতম প্রধান কারণ হলো মান্ধাতার আমলের চাষ পদ্ধতি। অধিকাংশ গ্রামাঞ্চলে এখনো কাঠের লাঙল এবং এক জোড়া বলদ দিয়েই কৃষিকাজ করে থাকে। কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ছোঁয়া গ্রামাঞ্চলে পর্যাপ্ত পরিমাণে এখনো পৌঁছায়নি। ফলে শুধু শারীরিক শ্রমের ওপর নির্ভরশীল কৃষি প্রত্যাশিত ফসল উৎপাদন করতে পারেনি।

২. **প্রাকৃতিক দুর্যোগ :** বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগের দেশ। ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে প্রতি বছর বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাস লেগেই আছে। ১৯৯৮ সালের ভয়াবহ বন্যায় দেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ৫২টিই প্লাবিত হয়। বিআইডিএস-এর এক সমীক্ষায় বলা হয়েছিল, ১৯৯৮-এর বন্যায় বিভিন্ন খাতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ১০ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে শুধু কৃষি খাতে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ৫ হাজার কোটি টাকারও বেশি। এছাড়াও ২০০৪, ২০০৭, ২০০৮, ২০০৯ সালের ভয়াবহ বন্যায়ও দেশের কৃষি খাতের বিপুল পরিমাণ ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

৩. **প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীলতা :** বাংলাদেশের কৃষিব্যবস্থা এখনো পর্যন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল। সর্বত্র সেচব্যবস্থা না থাকার ফলে কৃষকদের প্রয়োজন অনুযায়ী পর্যাপ্ত পরিমাণ বৃষ্টিপাত না হলে এখানে কৃষি কাজের ধারাবাহিকতা ব্যাহত হয়। আবার মাত্রাতিরিক্ত বৃষ্টিপাত হলেও পানি নিষ্কাশনের অভাবে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়।

৪. **ভালো বীজের অভাব :** বাংলাদেশের অধিকাংশ কৃষক অজ্ঞ ও অশিক্ষিত। অজ্ঞতার কারণে তারা ভালো বীজের সুফল সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয়। সে কারণে তারা ভলো বীজ সংরক্ষণের ব্যাপারে উদাসীন থাকে। আর ভালো বীজ ব্যবহার না করার ফলে তাদের উৎপাদিত ফসলও কম হয়।

৫. **কৃষি জমির ক্ষুদ্রায়তন ও খণ্ড-বিখণ্ডতা :** বাংলাদেশের কৃষিব্যবস্থার অন্যতম প্রধান সমস্যা হলো এখানকার কৃষি জমিগুলোর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আয়তন ও খণ্ড-বিখণ্ডতা। কৃষি জমিগুলো আয়তনে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ও খণ্ড-বিখণ্ড হবার ফলে কলের লাঙল বা ট্রাক্টর ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। অর্থাৎ এখানকার কৃষি জমিতে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার ও প্রয়োগ করা যায় না বলে এখানকার জমির ফলনও কম হয়।

৬. **সারের অভাব :** বাংলাদেশের অধিকাংশ কৃষকই দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। অর্থাভাবে কৃষিতে সারসহ প্রয়োজনীয় উপকরণ পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রয়োগ করতে তারা ব্যর্থ হয়। সার প্রদান ছাড়াই একই জমি বারবার চাষাবাদের কারণে জমির উর্বরতা শক্তি ও উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে। ফলে স্বাভাবিক কারণে ফলনও কম হচ্ছে।

৭. **ঋণের স্বল্পতা :** বাংলাদেশের কৃষকগণ নিদারুণভাবে গরিব। ফলে তাদের কোনো উদ্বৃত্ত অর্থ থাকে না। বর্তমানে প্রচলিত কৃষকদের কৃষি উপকরণ ক্রয় করার জন্য প্রদেয় ঋণের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত অল্প, ফলে কৃষি উন্নয়ন কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে উপনীত হতে পারছে না।

৮. **কৃষি জমির পরিমাণ হ্রাস পাওয়া :** বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে আবাসিক সমস্যা সমাধানের জন্য নতুন নতুন বাসস্থান সৃষ্টি হচ্ছে। নতুন নতুন বাসস্থান তৈরি করতে গিয়ে আবাদযোগ্য কৃষি জমির পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। বাসস্থান সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে শুধু ১৯৬৫ সাল থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত চাষাবাদযোগ্য এক লক্ষ আশি হাজার একর জমি হ্রাস পেয়েছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার দরুন ক্রমহ্রাসমান কৃষি জমি কৃষি উৎপাদন হ্রাস পাবার অন্যতম কারণ।

৯. **চাষাবাদে অনীহা :** সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশী শ্রমিকদের মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন দেশে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় তারা কৃষি কাজের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়েছে। অধিকাংশ কৃষক পরিবারে লক্ষ্য করা যায়, যারা পূর্বে সম্পূর্ণভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল ছিল, বর্তমানে তারা বৈদেশিক মুদ্রার ওপর নির্ভরশীল। বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধির কারণে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের চাষাবাদের প্রতি অনীহা সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে সামগ্রিকভাবে কৃষি উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে।

১০. **মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য :** বাংলাদেশের কৃষি বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। ফলে প্রকৃত ক্রেতা এবং প্রকৃত বিক্রেতার মাঝে থাকে অসংখ্য মধ্যস্বত্বভোগী। এ মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্যের কারণে কৃষকরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে কৃষি উৎপাদনে উৎসাহ হারিয়ে ফেলে।

১১. **অন্যান্য সমস্যা :** ক. কীটপতঙ্গের আক্রমণ, খ. সেচের অভাব, গ. ত্রুটিপূর্ণ ভাগচাষ ব্যবস্থা, ঘ. সংরক্ষণের অভাব, ঙ. দক্ষ শ্রমিকের অভাব ইত্যাদি।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

কৃষি সমস্যা সমাধান : বাংলাদেশে কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে উপরোক্ত সমস্যাসমূহ সমাধানকল্পে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করা যায় :

১. **পর্যাপ্ত ঋণের ব্যবস্থা :** বাংলাদেশের অধিকাংশ কৃষক চরম দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাবে তারা ঠিকমতো কৃষিকাজ করতে পারে না বলে উৎপাদনও ঠিকমতো হয় না। আর কৃষিক্ষেত্রে প্রদেয় ঋণের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত নয় বিধায় কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হয়। ১৯৭৯-৮০ সালে বাংলাদেশের কৃষিঋণের পরিমাণ ছিল জাতীয় উৎপাদনের মাত্র ৪.৫৮ ভাগ। এমতাবস্থায় কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হওয়াই স্বাভাবিক। তাই কৃষিঋণের ব্যবস্থা এমনভাবে করতে হবে, যাতে কৃষকরা প্রয়োজনের সময় পর্যাপ্ত পরিমাণ কৃষিঋণ নিতে পারে। এক্ষেত্রে কৃষিঋণের পরিমাণ মোট উৎপাদনের ন্যূনতম ২৫% হওয়া উচিত।

২. **সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ :** কৃষকদের বহু কষ্টে উৎপাদিত শস্যের একটি বিরাট অংশ প্রতি বছর নানা প্রকার কীটপতঙ্গের আক্রমণে নষ্ট হয়। কৃষকরা সাধারণত এ কীটপতঙ্গের আক্রমণ প্রতিহত করতে অপারগ। তাই কীটপতঙ্গের আক্রমণ থেকে ফসল রক্ষা করার জন্য সম্প্রতি উদ্ভাবিত সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম আরো জোরদার করা উচিত।

৩. **বাজার ব্যবস্থার ত্রুটি দূরীকরণ :** বর্তমানে ত্রুটিপূর্ণ বাজার ব্যবস্থার দরুন কৃষকেরা তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য পাচ্ছে না। তাই এ সমস্যা সমাধানে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে সরকারি ক্রয়কেন্দ্র খোলা যেতে পারে। ফলে কৃষকরা মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য থেকে মুক্তি পেয়ে কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য পাবে এবং কৃষি উৎপাদনে উৎসাহী হবে, যা সামগ্রিকভাবে কৃষি উন্নয়নে প্রভাব ফেলবে।

৪. **সংরক্ষণাগার স্থাপন :** বাংলাদেশে সংরক্ষণের অভাবে প্রতি বছর ২৫% থেকে ৩০% কৃষিজাত পণ্য নষ্ট হয়ে যায়। এই কৃষিজাত পণ্য যাতে নষ্ট না হয় সেজন্য দেশের বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে কৃষিপণ্য সংরক্ষণাগার স্থাপন করতে হবে। এতে কৃষকরা আর্থিক ক্ষতি থেকে রক্ষা পেয়ে অধিক পরিমাণ কৃষি উৎপাদনে উৎসাহী হবে।

৫. **শ্রম দক্ষতা বৃদ্ধি :** বাংলাদেশের কৃষি কাজে নিয়োজিত অধিকাংশ কৃষি শ্রমিকই অদক্ষ। কৃষি শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন স্থানে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে। এতে করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং কৃষি উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

৬. **উন্নত মানের বীজের ব্যবহার :** বাংলাদেশের কৃষকগণ অজ্ঞতার কারণে ভালো বীজের প্রতি নজর দেয় না। ফলে তারা ফলনও কম পায়। অথচ উন্নতমানের কৃষি বীজ ব্যবহার করে কৃষি উৎপাদন কয়েকগুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব। তাই এ ব্যাপারে কৃষকদের সচেতন হতে হবে।

৭. **আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগ :** বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগ নগণ্য। ফলে উন্নত দেশসমূহের মতো আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যথাযথ প্রয়োগ সম্ভব হলে কৃষি উৎপাদন নাটকীয়ভাবে বেড়ে যেতে পারে, যা কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে সূচনা করতে পারে নতুন মাত্রা।

৮. **সার সরবরাহ নিশ্চিত করা :** কৃষিভিত্তিক বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সার, কীটনাশক, ওষুধ, কৃষির উপকরণসহ কৃষিতে ভর্তুকির বিষয়গুলো জনগণ অতি সহজেই আশা করে। কৃষি জমিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে সার প্রয়োগ করলে জমির উর্বরতা শক্তি ও উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। তাই কৃষি উৎপাদন ও কৃষি উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সারসহ কৃষি উপকরণের মূল্য স্থিতিশীলকরণ ও সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।

উপসংহার : বাংলাদেশের কৃষিব্যবস্থা একাধিক সমস্যায় জর্জরিত। ফলে কৃষি উন্নয়ন কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে পৌঁছতে পারছে না। তবে আশার কথা, বহুবিধ সমস্যা থাকা সত্ত্বেও সম্প্রতি বাংলাদেশ খাদ্যোৎপাদনে ব্যাপক সফলতা অর্জন করছে এবং বিশ্বের অষ্টম খাদ্যোৎপাদনকারী দেশের মর্যাদা লাভ করেছে। এ সফলতা অর্জন করায় বাংলাদেশের সরকারপ্রধান FAO-এর 'সেরেস পুরস্কার' লাভ করেছে। তাই বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে উল্লিখিত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করতে পারলে কৃষি ও খাদ্যোৎপাদনের ক্ষেত্রে সম্ভাবনাময় নতুন জগতে প্রবেশ করতে পারবে বলে আশা করা যায়।

০৬। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে জ্বালানি সেক্টরের ভূমিকা আলোচনা করুন। বাংলাদেশের কি গ্যাস রপ্তানি করা উচিত? *[২৩তম বিসিএস]*

অথবা, **বর্তমানে গ্যাস সংকট মোকাবিলায় সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে? সম্প্রতি বাংলাদেশ কর্তৃক সমুদ্র বিজয় এতে কি প্রভাব ফেলবে বলে মনে করেন?** *[৩২তম বিসিএস]*

উত্তর : বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলে বাণিজ্যিক জ্বালানি হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাস সম্পদটিকে গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যবহ করে তুলছে। এটা নবায়নযোগ্য সম্পদ নয়। কাজেই উত্তোলন ও ব্যবহারজনিত কারণে প্রাকৃতিক গ্যাস এক সময় অবশ্যই নিঃশেষিত হয়ে যাবে। বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান জ্বালানি সম্পদ প্রাকৃতিক গ্যাসের পরিকল্পিত ও সুষ্ঠু উত্তোলন এবং ব্যবহারের মাধ্যমেই এদেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে আরো গতিশীল করা যেতে পারে। জ্বালানি শক্তি ব্যবহার যে কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমানুপাতিক। এদিক দিয়ে বিবেচনা করলে পঞ্চাশের দশকের শেষ দিকে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাস আবিষ্কার এবং জ্বালানি শক্তি হিসেবে এর ক্রমবর্ধমান ব্যবহার এদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে এবং ভবিষ্যতেও এর ভূমিকা অতি উজ্জ্বল।

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গাসক্ষেত্রসমূহের বৈশিষ্ট্য : বাংলাদেশের গ্যাসক্ষেত্রসমূহ দেশের পূর্বাংশে প্রধানত ফোল্ডবেল্ট অঞ্চলে অবস্থিত, অদ্যাবধি দেশের পশ্চিম অঞ্চলে কোনো গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়নি। এ গ্যাসক্ষেত্রসমূহে গ্যাসস্তরগুলো ভূ-পৃষ্ঠের নিচে প্রায় ৯৮০ মিটার থেকে প্রায় ৩৪৫০ মিটার গভীরতার মধ্যে বিরাজ করে। অধিকাংশ গ্যাসক্ষেত্রেই একাধিক গ্যাসস্তর বিদ্যমান এবং কোনো কোনো গ্যাসক্ষেত্রে; যেমন— তিতাস গ্যাসক্ষেত্রে এরকম ১০টি গ্যাসস্তর রয়েছে।

প্রাকৃতিক গ্যাস আবিষ্কার ও মজুদের পরিমাণ : প্রাকৃতিক গ্যাস একটি অনবায়নযোগ্য মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ। পৃথিবীর অনেক দেশ পরিকল্পিত উপায়ে প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যবহার করে অর্থনীতিক উন্নয়নের ধারা ত্বরান্বিত করতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশেও প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রাচুর্যতা পরিলক্ষিত হয় এবং ইতোমধ্যে এ সম্পদ ব্যবহার করে এদেশে একটি গ্যাস নির্ভর অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা সৃষ্টি হয়েছে।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৪ অনুসারে এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত প্রাকৃতিক গ্যাসক্ষেত্রের সংখ্যা ২৬টি। এ গ্যাসক্ষেত্রের মোট প্রমাণিত ও সম্ভাব্য মজুদ এবং উত্তোলনযোগ্য প্রমাণিত ও সম্ভাব্য মজুদের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, এসব গ্যাসক্ষেত্রে উত্তোলনযোগ্য প্রমাণিত ও সম্ভাব্য মোট গ্যাস মজুদের পরিমাণ প্রায় ২৭.০৩৮ ট্রিলিয়ন ঘনফুট (১ কিউবিক ফুট = দৈর্ঘ্য ১ ফুট × প্রস্থ ১ ফুট × উচ্চতা ১ ফুট)। এ মজুদকৃত গ্যাসের মধ্যে ২০১৩ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ১১.৭২ ট্রিলিয়ন কিউবিক ঘনফুট গ্যাস ইতোমধ্যেই উত্তোলন ও ব্যবহার করা হয়েছে এবং মোট গ্যাস মজুদের পরিমাণ

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

(জানুয়ারি ২০১৪ সময়ে) দাঁড়িয়েছে ১৫.৩২ ট্রিলিয়ন কিউবিক ঘনফুট। বর্তমান হারে প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলন এবং গ্যাস সম্পদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করলে এ গ্যাস ২০২০ সালের মধ্যে নিঃশেষ হয়ে যাবে।

[উৎস : পেট্রোবাংলা, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ বিভাগ।]

প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদা ও সরবরাহ : ২০০০ সালে প্রাকৃতিক গ্যাসের দৈনিক চাহিদা ছিল ১২৩৫ মি. ঘনফুট এবং প্রতিদিন গ্যাস উত্তোলন করা হতো ১০০০ মি. ঘনফুট। এক্ষেত্রে প্রতিদিন গ্যাস চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে ২৩৫ মি. ঘনফুট গ্যাস ঘাটতি পরিলক্ষিত হয় এবং ক্রমবর্ধমান গ্যাস চাহিদার ভিত্তিতে প্রতিদিনের গ্যাস ঘাটতির পরিমাণ ২০০৫ সালে ৮০০ মি. ঘনফুট, ২০১০ সালে ১৬০০ মি. ঘনফুট, ২০১৫ সালে ২৮০০ মি. ঘনফুট এবং ২০২০ সালে এ ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াবে ৪৪০০ মি. ঘনফুট। ফলে চাহিদা অনুযায়ী প্রাকৃতিক গ্যাস ঘাটতির পরিমাণ মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়বে।

সাম্প্রতিক পেট্রোবাংলার সমীক্ষানুযায়ী, ২০০১-২০৫০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের মোট গ্যাস চাহিদার পরিমাণ দাঁড়াবে ৬২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট এবং এ সময়ের মধ্যে শুধুমাত্র বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রেই প্রয়োজন হবে ৪০ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। আন্তর্জাতিক কনসালটেন্ট মার্ক রোডেকার মতে, 'বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পেলেও পরবর্তী ৫০ বছর এদেশের অর্থনৈতিক ধারাকে প্রবহমান রাখতে প্রায় ৬১ ট্রিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস প্রয়োজন হবে।'

তবে আশার কথা হচ্ছে, সমুদ্রবক্ষে বড় কয়েকটি গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কারের সম্ভাবনা রয়েছে। বঙ্গোপসাগরে মোট ২৮টি ব্লকে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান করবে বিভিন্ন কোম্পানি। তবে এক্ষেত্রে আবিষ্কৃত হলেও তা থেকে গ্যাস উত্তোলন করতে বেশ কয়েক বছর লাগবে। তাই গ্যাসের বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করে বার্মা থেকে গ্যাস আমদানির চিন্তা সক্রিয় রয়েছে।

বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়নে প্রাকৃতিক গ্যাস : বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়নে প্রাথমিক জ্বালানি শক্তি হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাসের ভূমিকা অপরিসীম। স্বাধীনতার পর থেকে প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি এদেশের অর্থনীতি ও জাতীয় উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ১৯৬৮-৬৯ সালে বাংলাদেশের প্রাথমিক জ্বালানি হিসেবে খনিজ তেলের ব্যবহার ছিল ৬৮% এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার ছিল ১৭% কিন্তু দেশে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক গ্যাস আবিষ্কার এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর ব্যবহার বৃদ্ধির কারণে প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার ১৭% থেকে ৭০%-এ উন্নীত হয়েছে। এভাবেই তেলের বিকল্প হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যাপক ব্যবহার তেল আমদানি হ্রাস ঘটিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় এবং এদেশকে একটি গ্যাসনির্ভর সম্ভাবনাময় উন্নয়নশীল দেশে পরিণত করেছে।

বাংলাদেশে বর্তমানে যেসব ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হচ্ছে তার প্রতিটিতেই আরো অধিক হারে গ্যাসের ব্যবহার এবং নতুন নতুন ক্ষেত্রে গ্যাস ব্যবহার করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার সুযোগ রয়েছে। যেমন—

বিদ্যুৎ উৎপাদন : ২০১৩-১৪ অর্থবছরে (মার্চ ২০১৪ পর্যন্ত) সর্বোচ্চ পরিমাণে গ্যাস ব্যবহৃত হয় বিদ্যুৎ উৎপাদন খাতে, ১৬৯.২ বিলিয়ন ঘনফুট। ২০১৩-১৪ অর্থবছরেও গ্যাসের সর্বোচ্চ চাহিদা হবে বিদ্যুৎ উৎপাদন খাতে, যা ৩৭৯ বিলিয়ন ঘনফুট মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। কিন্তু তারপরও দেশের বিদ্যুৎ ঘাটতি থেকেই যাচ্ছে। তাই দেশের বিদ্যুৎ সুবিধা বঞ্চিত জনগণকে বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদানের জন্য আরও বেশি গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করা যেতে পারে। এতে একদিকে যেমন নিজস্ব সম্পদ

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

ব্যবহার করে বিদ্যুৎ আমদানির বিরাট অংকের ব্যয় থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে, তেমনি বিদ্যুৎ সুবিধা সম্প্রসারণের মাধ্যমে শিল্প-বাণিজ্যের বিকাশ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নকে আরো ত্বরান্বিত করা যাবে। বিশেষ করে দেশের উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের যে বিশাল জনগোষ্ঠী বিদ্যুৎ ও গ্যাসের কোনো সুবিধা পাচ্ছে না, তাদের জন্য গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিষয়টি জরুরি ভিত্তিতে বিবেচনার দাবি রাখে।

সার কারখানায় ব্যবহার বৃদ্ধি : বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষির উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির ওপর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন অনেকাংশে নির্ভরশীল। কিন্তু কৃষকরা যথাসময়ে সার-বীজ-কীটনাশক পাচ্ছে না বলে কৃষি উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে সার কারখানায় ৩০.০৮ এবং ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৬০.০ বিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস ব্যবহৃত হয়, যা চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। তাই সার কারখানাগুলোতে গ্যাস সরবরাহ বাড়াতে হবে এবং গ্যাস ব্যবহারের মাধ্যমে আরও সার কারখানা তৈরি করলে সারের সংকট কমে যাবে, সার আমদানি বন্ধ হবে এবং দেশের কৃষি উন্নয়ন নতুন গতি পাবে।

সিএনজি হিসেবে ব্যবহার : সিএনজি হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত উন্নয়নে এক নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে। কেননা যানবাহনে সিএনজি ব্যবহারের ফলে জ্বালানি তেলের ব্যবহার কমে যাবে যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিরাট ভূমিকা রাখে। এ খাতে বর্তমানে গড়ে মাসিক প্রায় ৯৭.০০ এমএমসিএম গ্যাস ব্যবহৃত হচ্ছে। তাই যত দ্রুত সম্ভব দেশের যানবাহনকে সিএনজি চালিত বাহনে রূপান্তর করা উচিত।

এছাড়াও শিল্প কারখানা, চা শিল্প, গৃহস্থালির কাজে গ্যাসের ব্যবহার বৃদ্ধি করা হলে জাতীয় উন্নয়নে এর বিরাট প্রভাব পড়বে।

গ্যাস রপ্তানি ও সৃষ্ট সম্ভাব্য বিপর্যয় : বাংলাদেশ যদি কোনোদিন গ্যাস রপ্তানির পর্যায়ে উন্নীত হয়, ভৌগোলিক কারণে সেক্ষেত্রে ভারতই হবে উপযুক্ত বাজার এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে প্রশ্ন হলো, এদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জীবনীশক্তি এই গ্যাস আদৌ কোনোদিন রপ্তানি করা উচিত কিনা, কিংবা বাংলাদেশে রপ্তানির মতো পর্যাপ্ত উদ্বৃত্ত গ্যাস এদেশে আছে কিনা সে ব্যাপারে সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন করা একান্ত আবশ্যক।

কোনো স্থান থেকে প্রাকৃতিক গ্যাস তিনটি উপায়ে স্থানান্তর করা হয়। প্রথমত, পাইপলাইনের মাধ্যমে স্থলভাগে গ্যাস একস্থান থেকে অন্যস্থানে সহজে স্থানান্তর করা যায়। দ্বিতীয়ত, গ্যাসকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় তরল করে জাহাজে সমুদ্রপথে অন্যত্র নেয়া যেতে পারে। তবে এ প্রক্রিয়া বেশ ব্যয়বহুল। তৃতীয়ত, গ্যাসকে রূপান্তরিত করে সিলিন্ডারে ভরে স্থানান্তর করা যেতে পারে। কাজেই স্থলবেষ্টিত হওয়ায় ভারতের জন্য বাংলাদেশ হতে পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্যাস আমদানি অপেক্ষাকৃত সহজ ও অন্যান্য যে কোনো দেশ থেকে গ্যাস আমদানি করার চেয়ে অত্যন্ত লাভজনক হবে। তাছাড়া স্বার্থান্বেষী আন্তর্জাতিক তেল ও গ্যাস কোম্পানিগুলোও খুব সহজে পেয়ে যাবে ভারতের বিশাল বাজার। তাই বাংলাদেশের প্রয়োজন ও চাহিদাকে উপেক্ষা করে ভারত, তেল কোম্পানিগুলোর কর্মকর্তারা, মার্কিন রাষ্ট্রদূত, ইউরোপীয় সংস্থা, এডিবি, যুক্তরাষ্ট্রের জ্বালানি বিভাগ এবং এদেশের একটি স্বার্থান্বেষী মহল বাংলাদেশে মজুদ সামান্য পরিমাণ গ্যাস ভারতের কাছে রপ্তানির জন্য সরকারের ওপর নানামুখী চাপ সৃষ্টি করে চলেছে। একই কারণে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন এসেছিলেন বাংলাদেশ সফরে। এমনকি অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার দেশের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে গ্যাস রপ্তানির ব্যাপারে আশ্বস্ত হয়ে দেশে ফিরে গেছেন। তাই চার দলীয় জোট ২০০১ সালে

ক্ষমতায় আসার পরপরই মার্কিন রাষ্ট্রদূত ম্যারি অ্যান পিটার্স এবং ভারতীয় বিশেষ দূত তৎকালীন সরকার প্রধানের সাথে দেখা করে গ্যাস রপ্তানির একটি চূড়ান্ত প্রস্তাব পেশ করেন এবং এ প্রস্তাব গ্রহণপূর্বক বাংলাদেশ সরকার ভারতে গ্যাস রপ্তানির ব্যাপারে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়ার কথা ঘোষণা করেন। তেল কোম্পানি ইউনোকলের প্রস্তাবনায় দেখা যায়, সিলেটের বিবিয়ানা গ্যাসক্ষেত্র থেকে ভারতের দিল্লি পর্যন্ত গ্যাস পাইপ স্থাপনের মাধ্যমে আগামী ২০ বছরে প্রথম পর্যায়ে মোট ৩.৬ ট্রিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস ভারতে রপ্তানি করতে পারবে। কিন্তু এ সরবরাহ নিশ্চিত করা বাংলাদেশের জন্য আদৌ সম্ভব কিনা তা আগে ভেবে দেখতে হবে।

তাছাড়া গ্যাস রপ্তানি করা হলে বাংলাদেশে যেসব প্রভাব পড়বে তা নিচে তুলে ধরা হলো :

- আগামী ১০ থেকে ১২ বছরের মধ্যে দেশের সমস্ত গ্যাস নিঃশেষ হয়ে যাবে।
- বিদ্যুৎ শিল্প, কৃত্রিম সার শিল্প ও অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সচল রাখতে বিদেশ থেকে অধিক মূল্যে তেল ও গ্যাস আমদানি করতে হবে।
- তরল গ্যাস আমদানি ও সমুদ্রবন্দর হতে গ্যাস উত্তোলনের সময় বিশেষ প্রক্রিয়ায় তা গ্যাসীয় অবস্থায় রূপান্তরের জন্য হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করে টার্মিনাল তৈরি করতে হবে।
- বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যাবে।
- শিল্প পণ্যের উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যাবে এবং তা মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যাবে।
- গ্যাস নিঃশেষ হয়ে গেলে জ্বালানি হিসেবে কাঠের ওপর মানুষের নির্ভরতা বেড়ে যাবে। ফলে বনজ সম্পদ উজাড় হয়ে যাবে।
- গ্যাস নিঃশেষ হলে যানবাহন ও কলকারখানার তেল ও কয়লা ব্যবহৃত হবে যা পরিবেশের জন্য হুমকিস্বরূপ।
- গ্যাস রপ্তানি করা হলে মানুষের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হবে যা ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্কের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে।

তাই সার্বিক চিন্তা করে ভারতের কাছে গ্যাস রপ্তানি থেকে বাংলাদেশ সরকার বিরত থাকতে হবে। আর সেটাই দেশের জন্য মঙ্গলজনক।

গ্যাসবিষয়ক পরিকল্পনা গ্রহণে প্রস্তাবনা : বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলন ও ব্যবহার প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হলে এদেশকে একটি সমৃদ্ধশালী ও উন্নত দেশে পরিণত করা সম্ভব হবে।

ক. দেশের উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলসহ প্রত্যন্ত অঞ্চলে গ্যাস সরবরাহের মাধ্যমে মানুষের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি ও অভ্যন্তরীণ বাজার সৃষ্টি করে দেশকে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নেয়া যেতে পারে।

খ. প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করে দেশে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা যেতে পারে।

গ. প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করে এদেশে সার শিল্প ও পেট্রো কেমিক্যাল শিল্প গড়ে তোলা সম্ভব।

ঘ. প্রাকৃতিক গ্যাসকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় তরল (CNG) করে ব্যাপকভাবে যানবাহনে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে এদেশের পরিবেশকে দূষণমুক্ত ও গ্যাসনির্ভর অর্থনীতিকে উন্নয়ন করা সম্ভব।

ঙ. স্বার্থান্বেষী বিদেশী বেনিয়াদের উৎপাদন ও বণ্টন চুক্তি বাতিল করে দেশীয় কোম্পানির মাধ্যমে প্রতিবছর অন্তত একটি অনুসন্ধান কূপ খনন করে দেশীয় প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলন ও ব্যবহারে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা যেতে পারে।

উপসংহার : প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান প্রাথমিক জ্বালানি শক্তি সম্পদ। এটা নবায়নযোগ্য নয় বলে একসময় নিঃশেষিত হয়ে যাবে। ক্ষুদ্রায়তন বিশিষ্ট সম্পদশোভিত আমাদের প্রিয় বাংলাদেশে প্রাকৃতিক সম্পদ প্রাপ্তির সমূহ সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকলেও প্রাকৃতিক গ্যাসনির্ভর হয়ে গড়ে ওঠা এদেশের অর্থনীতি ও ১৫ কোটি ৫৮ লাখ (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৪) মানুষের ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে তা নিতান্তই অপ্রতুল। কাজেই বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় নির্ভরশীল অর্থনীতিকে সাবলীল ও গতিশীল করার ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক গ্যাস সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তের পূর্বে সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও নীতিমালা গ্রহণ একান্ত আবশ্যক। সুতরাং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি প্রাকৃতিক গ্যাসের পরিকল্পিত ও সুষ্ঠু উত্তোলন ও ব্যবহারের মাধ্যমেই এদেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে আরো গতিশীল করে একটি উন্নত ও স্বনির্ভর দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা তুলে দাঁড়াতে সক্ষম হবে।

০৭ ॥ ভূমিহীনদের মাঝে 'খাসজমি' বন্টনের সরকারি নীতিমালা পর্যালোচনা করুন। নিরপেক্ষ বন্টনের জন্য কি কি পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে বলে আপনি মনে করেন? *[২২তম বিসিএস]*

উত্তর : উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থান বিগত বছরগুলোতে খুব একটা পরিবর্তিত হয়নি। উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়নের ভিত্তি হিসেবে কৃষি ব্যবস্থাকে পুঁজি করে শিল্পায়নের কথা বলা হয়। কিন্তু উৎপাদনের প্রধান নিয়ামক হিসেবে ভূমি ব্যবস্থার যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ এবং এর উপযুক্ত বাস্তবায়ন কখনোই হয়নি। বাংলাদেশের মত কৃষিনির্ভর দেশে ভূমির যথাযথ ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হওয়া উচিত। ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটারের এ দেশে মাথাপিছু জমির পরিমাণ মাত্র ০.১৫ একর।

সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা যায়, বাংলাদেশের অধিকাংশ ভূমি স্বল্পসংখ্যক জোতদারের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। আবাদযোগ্য জমির মাত্র ২% রয়েছে সাধারণ কৃষকদের মাঝে এবং ৫০% চাষীর মালিকানায় রয়েছে ৪.৮% ভূমি। কৃষিশুমারি ২০০৮ অনুসারে বাংলাদেশে ৪.৪৮ মিলিয়ন বা ১৫.৬২% লোক ভূমিহীন। এর মধ্যে গ্রামীণ ভূমিহীন ১২.৪৮%।

ব্রিটিশ শাসনামলে বাংলাদেশে জমিদারি প্রথা চালু ছিল। এ ব্যবস্থায় জমিদারগণ ছিলেন জমির মালিক। ১৯৫০ সালে জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হলে জমির মালিকানা প্রজাদের হাতে চলে আসলেও এর যথাযথ বন্টন হয়নি বিধায় বাংলাদেশে কৃষিক্ষেত্রে তেমন কোনো বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসেনি। এসব অতীত ব্যর্থতার আলোকে ভবিষ্যৎ উন্নয়নকল্পে ১৯৮৭ সালে বাংলাদেশ সরকার ভূমিহীনদের মাঝে খাস জমি বন্টনের নীতি গ্রহণ করে।

খাস জমি বন্টনে সরকারি নীতিমালা : খাস জমি বন্টনে সরকারি নীতিমালার আওতায় জেলা, থানা এবং জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন কমিটি গঠন করা হয়। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে যেসব পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তা মূল্যায়নের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় ও খাস জমি বন্টনের সাথে যুক্ত এনজিওগুলোকে নিয়ে একটি যৌথ কমিশন গঠন করা হয়।

সংশ্লিষ্ট কমিশনে নিযুক্ত সমীক্ষক দল তাদের মূল্যায়ন প্রতিবেদনে মাঠপর্যায়ে খাস জমি বন্টন নীতি বাস্তবায়নের বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কথা উল্লেখ করেন। তবে উক্ত কমিশন বর্তমান ধারায় প্রচলিত আমলাতান্ত্রিক কাঠামো অক্ষুণ্ন রেখে সরকারি বন্টন নীতি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য তাদের সুপারিশ পেশ করেন।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

বাংলাদেশে ভূমিহীনতা : কৃষি ব্যবস্থার অগ্রসরহীনতার প্রধান কারণ হিসেবে ভূমিহীনতাকে চিহ্নিত করা হয়। বাংলাদেশে কৃষি ব্যবস্থার সাথে গ্রামীণ এলাকার প্রায় প্রতিটি পরিবারই জড়িত। আমাদের পল্লী জীবনের চিত্র খুবই ভয়াবহ। যেখানে দেখা যায়, কম জমি সম্পন্ন পরিবারগুলোর প্রতি জোতদার-মহাজনদের অত্যাচারের জন্য গ্রামীণ রাজনৈতিক প্রক্রিয়াই দায়ী। কম জমির মালিক জোতদারের অত্যাচারে নিপীড়িত হতে হতে এক পর্যায়ে 'ভূমিহীন' হয়ে পড়ে। এর একটি চিত্র নিচে দেখানো হলো :

প্রতি ব. কি. (২০০৮)	ভূমিহীন	ভূমিহীনতা (চাষযোগ্য জমি নেই)	ভিটাসহ চাষযোগ্য জমি ½ একর	ভিটাসহ চাষযোগ্য থেকে ১ একর জমি আছে
৯৭৭	১৫.৬২%	২৫.২%	২৮.৫%	১৭.৩%

[সূত্র : কৃষিশুমারি ২০০৮]

পল্লী উন্নয়নে প্রতিবন্ধক ভূমিহীন : ভূমিহীনদের মাঝে খাস জমি যথাযথ বন্টন ব্যবস্থা না করে পল্লী উন্নয়ন সম্ভব নয়। পল্লীবাসীদের জীবনযাপন একান্তভাবেই ভূমির সাথে সম্পর্কযুক্ত। ভূমি ব্যবস্থার যথাযথ সংস্কার প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই পল্লী উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলি করতে হবে।

কৃষি মজুরের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ : একজন কৃষি মজুর শ্রমের তুলনায় অতি সামান্য পরিমাণ মজুরি পেয়ে থাকেন। ২০১০-১১ সালের হিসাব অনুযায়ী একজন ভূমি মজুর ২০০/২৫০ টাকা পেয়ে থাকে যা তার প্রয়োজনের তুলনায় অতি নগণ্য। তাই ভূমি মজুররা তাদের চাহিদা পূরণ করতে পারছে না।

লভ্য জমি ও জলাশয় ভূমিহীন ক্ষেত মজুরদের মাঝে বন্টন : জলাশয়, সরকারি খাস জমি ভূমিহীন ক্ষেত মজুরদের মাঝে বন্টন করতে হবে। যার ফলে ভূমিহীন মানুষ আশ্রয় খুঁজে পাবে, কমে যাবে অপরাধ। কারণ তৃণমূল পর্যায়ের অপরাধীদের অধিকাংশই ভূমিহীন।

অকৃষিখাতের সম্প্রসারণ : ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ সরকার প্রণীত আইনে ভূমিহীনদের মাঝে জলাশয়গুলো প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এ আইনের অধীনে গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ :

- এ অঞ্চলের কাছাকাছি অবস্থিত স্থলবেষ্টিত জলমহাল মাছ উৎপাদনের সুনির্দিষ্ট প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে।
- যে সকল জলমহাল আনা সম্ভব হয়নি সেগুলোকে প্রকৃত ভূমিহীনদের মাঝে সমবায় সমিতির মাঝে ৫ বছরের জন্য ইজারা দেয়ার ব্যবস্থা করা।
- উন্মুক্ত জলমহালগুলো (মুক্ত নদী, খাল) ভূমি প্রশাসনের মাধ্যমে জেলেদের কাছে মাছ ধরার জন্য উন্মুক্ত করা যেতে পারে।
- সমকালীন আর্থ-সামাজিকতার প্রেক্ষাপটে ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে ০.৮০ হেক্টরের চেয়ে কম এলাকার সকল দীঘি, পুকুর শুধু ভূমিহীন ও প্রকৃত জেলেদের কল্যাণে প্রদান করা উচিত।

নিরপেক্ষ বন্টনের জন্য পদক্ষেপসমূহ

১. **জরিপের মাধ্যমে বন্টন ব্যবস্থা :** ভূমিহীন, মূলধনহীন প্রান্তিক শ্রেণীর মানুষের মাঝে খাস জমি যথার্থ বন্টনের জন্য প্রথমে জরিপ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকৃত ভূমিহীন চিহ্নিত করতে হবে। এ জরিপ প্রক্রিয়া অবশ্যই যেন সৎ ও সুষ্ঠু উপায়ে পরিচালিত হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং জরিপের তথ্যের উপর ভিত্তি করে খাস জমি বন্টন করা যেতে পারে।

২. **উপযুক্ত ভূমি কাঠামো তৈরি :** আমাদের দেশে প্রচলিত ভূমি কাঠামো প্রাচীন আমলের। বিভিন্ন সময়ে নীতিমালা পরিবর্তিত হলেও যথাযথ সংস্কার হয়নি বিধায় ভূমিহীন কৃষকদের জন্য এসব

নীতিমালা কখনো সুফল বয়ে আনতে পারেনি। তাই পরিকল্পিত ভূমি কাঠামো প্রণয়নের মাধ্যমে খাস জমি বন্টনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৩. **অবৈধ দখলদারিত্ব উচ্ছেদ :** অবৈধভাবে ভূমির দখল নিরপেক্ষ বন্টনের অন্যতম অন্তরায় হিসেবে বিবেচিত। অবৈধ দখলকৃত ভূমির তালিকা তৈরির মাধ্যমে দখলদার উচ্ছেদ করে খাস জমি ভূমিহীনদের মাঝে নিরপেক্ষভাবে বিতরণ করা যেতে পারে।

৪. **গুচ্ছগ্রাম ব্যবস্থার মাধ্যমে :** গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প ভূমিহীন প্রান্তিক চাষিদের মাঝে নতুন আশার সঞ্চার করেছিল। এ প্রকল্পের মাধ্যমে কিছু জমি ভূমিহীনদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে যথাযথ সরকারি ব্যবস্থাপনার অভাবে তা বন্ধ হয়ে যায়।

৫. **পাহাড়ি এলাকায় প্রান্তিক মানুষের পুনর্বাসন :** বাংলাদেশের অন্যান্য জেলাগুলোর তুলনায় পাহাড়ি জেলাগুলোতে জনসংখ্যার ঘনত্ব অনেক কম। পুরো বাংলাদেশে যেখানে জনসংখ্যার ঘনত্ব ১,০১৫ জন; সেখানে তিন পার্বত্য জেলা বান্দরবান, রাঙামাটি ও খাগড়াছড়িতে জনসংখ্যার ঘনত্ব যথাক্রমে ৮৬, ৯৭ ও ২২৩। তাই ভূমিহীনদের পুনর্বাসনে তিনটি পার্বত্য জেলা রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানের খাস জমি তাদের মাঝে বন্টন করা যেতে পারে।

৬. **চরাঞ্চলে পুনর্বাসন :** দেশের প্রত্যন্ত চরাঞ্চলের মালিকানা থাকে সরকারের হাতে। কিন্তু দখলকারীদের প্রভাবে জোতদার, মহাজন এবং স্থানীয় কতিপয় রাজনৈতিক নেতার হাতেই থাকে তথাকথিত মালিকানা। এসব অব্যবস্থা পরিহারের মাধ্যমে প্রান্তিক চাষী ও ভূমিহীন শ্রেণীকে চরাঞ্চলে পুনর্বাসন করা যেতে পারে।

৭. **সরকারি সুষ্ঠু নীতিমালা :** একমাত্র সুষ্ঠু সরকারি নীতিমালার মাধ্যমেই খাস জমি বন্টন ব্যবস্থা যথাযথভাবে পরিচালিত হতে পারে। কারণ সরকারি ভূমির মালিকানা সরকার কিভাবে বন্টন করবে তার উপরই নির্ভর করবে ভূমিহীনরা খাস জমি সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারবে কিনা। তাই সরকার সময়োপযোগী ও সুষ্ঠু নীতিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে প্রকৃত ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষীদের মধ্যে এসব জমি বন্টন করতে পারে।

উপসংহার : বাংলাদেশের আয়তন খুব বেশি নয়। সীমিত আয়তনের এ দেশটিতে প্রায় ১৫.৫৮ কোটি লোকের বাস। বর্তমানে এখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৭% এবং প্রতি বর্গকিলোমিটারে বাস করে ১০১৫ জন। সুতরাং সীমিত আয়তনের এই দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে মোকাবিলা করে সুষ্ঠু ও সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমেই কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের খাস জমি নিরপেক্ষভাবে বণ্টিত হবার মাধ্যমে 'ভূমিহীন' এবং ভূমিহীনতা সমস্যার সমাধান সম্ভব।

০৮ ▌ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নদীর ভূমিকা বর্ণনা করুন। *[৩০তম বিসিএস]*

উত্তর : বাংলাদেশের সৃষ্টি নদী থেকে। বাংলাদেশের ভূচিত্র তৈরি করেছে তার নদীগুলো। এ নদীগুলোর উপরই নির্ভর করেছে উদ্ভিদ ও প্রাণিকুল এবং মানুষের জীবন ও জীবিকা। প্রমত্তা নদীগুলো দিয়ে হাজার বছর ধরে বয়ে আসা উর্বর পলিগঠিত সবুজ-শ্যামল বদ্বীপ বাংলাদেশ মানুষকে সুদূর মধ্য এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্য থেকে আকর্ষণ করেছে। যার ফলে এখানে সৃষ্টি হয়েছে পাঁচ-মিশালী জাতির সংমিশ্রণে এক জনগোষ্ঠী। নদীমাতৃক এ দেশের আর্থ-সামাজিক ও জীবন-জীবিকায় নদীর প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নদী এদেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল বাহক। যুগে যুগে এ নদীগুলো গড়ে তুলেছে জনপদ এবং

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

ব্যবসায়িক ও শিল্প কর্মের কেন্দ্রবিন্দু, এনেছে সমৃদ্ধি ও স্বাচ্ছন্দ্য। আমাদের দেশের নদী আমাদের গৌরব। এ নদী আমাদের আবাসভূমি গড়ে তুলেছে, জনপদ সৃষ্টি করেছে, খাদ্য যুগিয়েছে, স্বাস্থ্য সম্পদে আমাদেরকে পূর্ণ করেছে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়—হাজার বছরের নদীতে বয়ে যাওয়া পলি দ্বারা এ ব-দ্বীপের সৃষ্টি হয়েছে। বনাঞ্চল সৃষ্টি হয়েছে। পরিবেশের পরিবর্তন ঘটিয়ে ভূমিকে মানুষের আবাসস্থলরূপে পরিণত করেছে। দেশে শিরা-উপশিরার মতো ছড়িয়ে থাকা নদী দেশকে করেছে শস্য-শ্যামল। এসব নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে জীবিকা, পরিবহন, কৃষি, শিল্প, সভ্যতা, আচার, ব্যবহারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন।

বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থা : বাংলাদেশের নদীগুলো সমভাবে প্রবাহিত নয়। দেশের উত্তর-পশ্চিম অংশের চেয়ে দক্ষিণাঞ্চলের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে নদীর সংখ্যা অনেক বেশি। এগুলো আকার ও আয়তনে বড়। এ দেশের নদীগুলো অধিকাংশই উত্তর-দক্ষিণে দক্ষিণমুখী হয়ে প্রবাহিত। মোট প্রায় ২৪,১৪০ কি. মি. দৈর্ঘ্যের বাংলাদেশের নদীগুলো ৪টি নদীপ্রণালী বা নদীব্যবস্থায় বিভক্ত। যথা : ১. ব্রহ্মপুত্র-যমুনা, ২. গঙ্গা-পদ্মা, ৩. সুরমা-মেঘনা ও ৪. চট্টগ্রাম অঞ্চলের নদীসমূহ।

গঠন ও প্রবাহ বৈশিষ্ট্যে বাংলাদেশের নদীগুলো কয়েকটি ভাগে বিভক্ত। যথা : প্রধান নদী, উপনদী, শাখা নদী, স্বাধীন নদী ও নদী মোহনা। এর মধ্যে গঙ্গা-পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র-যমুনা এবং সুরমা-মেঘনা দেশের প্রধান নদীব্যবস্থা। তবে বড় কোনো নদীর উৎপত্তিস্থল বাংলাদেশ নয়। বাংলাদেশের নদীর সংখ্যার কোনো সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। মাধ্যমিক ভূগোল ও বাংলাপিডিয়ার তথ্যানুযায়ী নদীর সংখ্যা প্রায় ৭০০টি। তবে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান পকেট বুক এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বাংলাদেশের নদ-নদী শীর্ষক বইয়ের তথ্য অনুযায়ী দেশে মোট নদ-নদীর সংখ্যা ৩১০টি।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নদীর ভূমিকা : নদীকে ঘিরেই বাংলাদেশের শহর, বন্দর, গঞ্জ, বাজার প্রভৃতি গড়ে উঠেছে। নদী ও বাংলাদেশ একই সূতোয় গাঁথা দুটি নাম। এ দেশের মাটি ও মানুষের সাথে নদী ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। এ দেশের সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি, অর্থনীত, রাজনীতি সবকিছুই নদীর সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এ দেশে মালামাল পরিবহন ও যোগাযোগের সহজ উপায় হলো নদী। বাংলাদেশকে বলা হয় পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ব-দ্বীপ, যার সৃষ্টি নদীবাহিত পলি জমাট বেঁধে। এসব নদী মাতৃভূমিকে করেছে সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা। তাই ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে নদীর গুরুত্ব অপরিসীম। নদীবহুল বাংলাদেশের উর্বরতা মধ্যযুগ ও তৎপরবর্তী সময়ে আকৃষ্ট করেছে পর্তুগীজ, ব্রিটিশ, ফরাসি পর্যটক, বণিক ও রাজনৈতিক শক্তিকে; ফলে বাঙালির জীবনে সূচিত হয়েছে নতুন নতুন ইতিহাসের। নদীর সঙ্গে এ দেশের ইতিহাসের যেরূপ সম্পর্ক তেমনি এ দেশের নানা ধরনের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গেও রয়েছে এর নিবিড় সম্পর্ক। নদী তার সবকিছুই দেশ ও মানব কল্যাণে বিলিয়ে দেয়। নদী যখন ঝর্ণাধারা হয়ে নিচের দিকে নেমে আসে তখন এর স্ফটিক সদৃশ জলধারা মানুষের কাছে সুপেয়। নদী পলি বয়ে নিয়ে এসে মাটিকে করে উর্বর। নদীতে বাঁধ দিয়ে মানুষ বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। নিচে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নদীর ভূমিকা উপস্থাপন করা হলো :

১. **নদী ও কৃষি :** কৃষিখাত বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চালিকা শক্তি। বাংলাদেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, দারিদ্র্য বিমোচন, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ইত্যাদি কৃষির অগ্রগতির সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। কৃষি প্রধান বাংলাদেশের চাষাবাদ নদীনালার পানির ওপর নির্ভরশীল। কেননা আমন ধান কাটার পর নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে বীজতলা তৈরি করে ডিসেম্বর মাসের প্রথমার্ধে বোরো ধান

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

রোপণ করা হয়। এ সময় বোরো মৌসুমে বৃষ্টিপাত তেমন হয় না বিধায় জমি চাষ করা থেকে শুরু করে ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথমার্ধ পর্যন্ত জোয়ারের সময় নদীর পানি দিয়ে সেচ প্রদান করা হয়। সারাদেশে জালের মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য নদী বাংলাদেশের সেচ ব্যবস্থায় তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যা দেশের কৃষি উন্নয়নে ভূমিকা রাখে।

২. **নদী ও শিল্প :** দ্রুত ও টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক অগ্রগতির একটি অপরিহার্য পূর্বশর্ত হচ্ছে শিল্পায়ন। শিল্প অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত। দেশজ উৎপাদনে এ খাতের অবদান দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশের শিল্প কারখানাগুলো বিভিন্নভাবে নদীর পানি ব্যবহার করে। যেমন—পানীয় তৈরিতে, স্টিল মিল ঠাণ্ডা রাখতে, সিমেন্ট, কাপড়, কাগজ প্রভৃতি তৈরিতে নদীর পানি ব্যবহৃত হয়। এছাড়া নদীপথে কাঁচামাল ও উৎপাদিত পণ্য পরিবহনে খরচ কম হওয়ায় বাংলাদেশের অধিকাংশ বড় বড় শিল্পকারখানা তাই নদী-তীরবর্তী অঞ্চলে গড়ে উঠেছে।

৩. **মৎস্য সম্পদ :** বাংলাদেশ বিশ্বের বৃহত্তম নদীবাহিত ব-দ্বীপ অঞ্চল হিসেবে পরিচিত। নদীমাতৃক এ দেশটি স্মরণাতীতকাল থেকে মৎস্য সম্পদে সমৃদ্ধশালী। দেশের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি, আত্মকর্মসংস্থান, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং দারিদ্র্য বিমোচনে মৎস্য সম্পদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রাণিজ আমিষের অন্যতম উৎস মৎস্য সম্পদ। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে মৎস্যখাত ব্যাপক সফলতা অর্জন করেছে। বাংলাদেশ থেকে হিমায়িত চিংড়ি ও মৎস্যজাত পণ্য বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হয়। ২০১৩-১৪ (সাময়িক) অর্থবছরে জিডিপিতে মৎস্য সম্পদ খাতের অবদান ৩.৬৯ শতাংশ। মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিবছর নভেম্বর থেকে মে মাস পর্যন্ত মোট সাত মাস জাটকা রক্ষা কর্মসূচি পালন করা হয়ে থাকে। জাতীয় অর্থনীতিতে ইলিশের অবদান বিবেচনা করে জাটকা সংরক্ষণ, জেলেদের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ২০১০ সালে ৪.৬২ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। এর মাধ্যমে ৬,৬০৯ জন জেলে সুবিধাভোগী হবে। মৎস্য সম্পদ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর অগ্রগতি, দারিদ্র্য বিমোচন, পুষ্টি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। জীবনধারণ ও বাণিজ্যিক উদ্যোগের দিক থেকে মৎস্য সম্পদের জন্য নদীর গুরুত্ব অত্যন্ত তাৎপর্যবহ।

৪. **নৌচলাচল ও পরিবহন :** সভ্যতার ইতিহাসে স্থলযানের চেয়েও বোধ হয় আগে আবিষ্কৃত হয়েছে জলযান। নদী-নালা বেয়ে মানুষ ভ্রমণ করছে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায়। প্রথমে খাদ্যের প্রয়োজনে, পরে ব্যবসা-বাণিজ্য ও সামাজিক প্রয়োজনে। নদী পরিবহন সবচেয়ে সস্তা ও সহজ। বাংলাদেশে নদী পরিবহন দীর্ঘ দিন ধরে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। নির্মানাধীন পায়রা সমুদ্রবন্দর ছাড়াও বাংলাদেশে চট্টগ্রাম ও মংলায় দুটি সমুদ্র বন্দর। যে বন্দর দুটি দিয়ে শতভা আমদানি-রপ্তানি হয়ে থাকে। এছাড়া BIWTC-এর ১৮২টি জলযানের মাধ্যমে নাগরিক সেবাপ্রদান করে থাকে। BIWTC দেশের ৬০০০ কি. মি. নৌপথে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করে থাকে। নদীপথে পরিবহন ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে নৌকা, লঞ্চ, স্টিমার, পরিবহন মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

৫. **পানি বিদ্যুৎ উৎপাদন :** মানুষ পানির গতি শক্তিকে বহুদিন ধরেই কাজে লাগিয়ে আসছে। পানি শক্তির প্রথম ব্যবহার শুরু হয় গাছের গুঁড়ি ভাসিয়ে নেয়ার মাধ্যমে। এর পর তৈরি হয় জল চাকি যা সেচের জন্য নদী থেকে পানি তোলার কাজে ব্যবহার করা হতো। পানি শক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবহার পানি বিদ্যুৎ উৎপাদনে। পাহাড়ি জায়গায় উঁচু থেকে নিচুতে প্রবাহিত পানির এ গতি শক্তিকে কাজে

লাগিয়েই উৎপন্ন হয় পানি বিদ্যুৎ। পাহাড়ি উঁচু জায়গায় নির্মিত জলাধার থেকে নিম্নমুখী জলের সাহায্যে টারবাইন ঘোরানো হয়। টারবাইনের সাহায্যে জেনারেটর ঘুরলে বিদ্যুৎ শক্তি তৈরি হয়। পার্বত্য এলাকায় স্বাভাবিক জলাশয়কেও কাজে লাগানো হয়। বাংলাদেশে একমাত্র পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র কর্ণফুলি নদীতে অবস্থিত যা কাপ্তাই পানি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নামে পরিচিত। এ কেন্দ্রটি স্থাপিত হয় ১৯৬২ সালে। এ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মোট ৫টি ইউনিট। বাংলাদেশের পানি বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা খুব সীমিত। কারণ এর ভূমি সমতল এবং পানি সঞ্চয়ের তেমন উপযোগী জলাধার নেই। তবে ছোট ছোট ড্যাম ও ব্যারাজ এলাকায় ক্ষুদ্র পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করে দেশের বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণে সামান্য হলেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

৬. **সুন্দরবনকে রক্ষায় :** বিশ্বের সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য রক্ষায় নদীর গুরুত্ব অপরিসীম। সুন্দরবন বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকায় ৭৯৮তম। ইউনেস্কো ৬ ডিসেম্বর ১৯৯৭ সুন্দরবনকে বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে ঘোষণা করে। সুন্দরবনের চারদিক ঘিরে রয়েছে নদী, খাল। এ বনে রয়েছে বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ, মাছ, পাখি, প্রাণী, সরীসৃপ প্রভৃতি। নদীর পানির প্রবাহের উপর সুন্দরবনের ভবিষ্যত নির্ভরশীল। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সুন্দরবনের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। কেননা এ বন থেকে টুকরা কাঠ, জ্বালানি কাঠ, বাঁশ, বেত, মধু সংগ্রহ করা হয়। এ বন একটি বড় জনগোষ্ঠীর জন্য স্থানীয় কর্মসংস্থান যোগায়। এ বনের মধ্যে ও পাশে অবস্থিত নদীপথগুলো মাছের প্রাপ্তির দিক দিয়েও সমৃদ্ধ। এখানকার জেলেরা মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে।

৭. **পরিবেশ ও জলবায়ু রক্ষায় :** নদী দেশের বিচ্ছিন্ন কোনো অংশ নয় বরং দেশের পরিবেশের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। নদীর সাথে আবহাওয়া ও জলবায়ুর সম্পর্ক গভীর। বিশ্ব উষ্ণায়নের একটি সম্ভাব্য পরিণতি হলো সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি। বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে এবং পানি সম্প্রসারিত হয়ে সমুদ্রের আয়তন ও পরিধিকে আরো বাড়িয়ে তুলবে। উষ্ণায়নের ফলে হিমালয়সহ অন্যান্য পর্বতচূড়ায় জমে থাকা বরফ গলে যাবে। এর ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সাথে প্লাবিত এলাকার পরিমাণও বেড়ে যাবে, নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ বিঘ্নিত হবে, প্রধান প্রধান নদীর প্রবাহ হ্রাস পাবে এবং নদীর ক্ষীণ প্রবাহের কারণে সামুদ্রিক লোনা পানি সহজেই দেশের অভ্যন্তরীণ নদীপ্রবাহে প্রবেশ করে নদীর পানির লবণাক্ততা বাড়িয়ে দেবে। কাজেই বাংলাদেশের ভরাট হওয়া, মৃতপ্রায় নদীগুলোকে খনন করে জলবায়ু পরিবর্তনের এ মারাত্মক প্রভাব থেকে কিছুটা হলেও রক্ষা পাওয়া সম্ভব হবে। তাছাড়া বাংলাদেশের নদীগুলো দিয়ে মিঠা পানি প্রবাহিত হয়। পৃথিবীতে মিঠা পানির পরিমাণ খুবই কম। যাও আছে তার বেশির ভাগই এশিয়ায় অবস্থিত। এদিক দিয়েও বাংলাদেশের নদীগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। সুতরাং প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্ষয়রোধ, সংরক্ষণ এবং টেকসই উন্নয়নে নদীর অর্থনৈতিক গুরুত্ব তাৎপর্যবহ।

৮. **জীববৈচিত্র্য রক্ষা :** নদী কেবল মানুষের স্বার্থেই কাজ করে না এর সাথে জড়িয়ে আছে হাজার হাজার পশুপাখি, কীটপতঙ্গ, পোকামাকড় প্রভৃতির জীবন। কেননা নদী মরে গেলে বা শুকিয়ে গেলে নদীর পাশে অবস্থিত বন, জঙ্গলের বিলুপ্তি ঘটবে। ফলে দুর্লভ প্রাণী ও কীটপতঙ্গ চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। ধ্বংস হবে এ দেশের জীববৈচিত্র্য। কাজেই জীববৈচিত্র্য রক্ষায় নদীর ভূমিকা অপরিসীম। দেশের মূল্যবান জীবসম্পদ সংরক্ষণে জাতীয় কর্ম-পরিকল্পনা ২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৯. **আর্সেনিকমুক্ত পানি :** নদীই বাংলাদেশের জীবন, বাংলাদেশের সবুজ শ্যামল সৌন্দর্যের একমাত্র বাহক ও নিয়ন্ত্রক। নদী বাংলাদেশের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বাংলাদেশের কোনো অংশই যেন নদী ছাড়া কল্পনা করা যায় না। ঐতিহাসিক কাল থেকে মানুষ নদীর পানি ফুটিয়ে পান করে আসছে। কিন্তু পরবর্তীতে নলকূপ আসায় মানুষ নলকূপের মাধ্যমে পানি ব্যবহার ও পান করতে থাকে। কিন্তু গত দেড় দশকেরও অধিক সময় বাংলাদেশের ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ আর্সেনিক আক্রান্ত অঞ্চল হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। এ দেশের ৬৪টি জেলার ৬০টি জেলাই কম-বেশি আর্সেনিক আক্রান্ত। কিন্তু এ দিক দিয়ে বাংলাদশের নদীর পানি আর্সেনিকমুক্ত, স্বচ্ছ, নিরাপদ। নদীপাড়ের অনেক মানুষ এখনও নদীর পানি দৈনন্দিন প্রয়োজনে ব্যবহার করে জীবন পরিচালনা করছে। বাংলাদেশে বর্তমানে ৯৭.৮% মানুষ সুপেয় পানি ব্যবহার করে থাকে।

উপসংহার : বাংলাদেশের প্রতিটি এলাকায় কোনো না কোনো নদী বা শাখা নদী রয়েছে। এসব নদীর সাথে বাংলাদেশের মানুষের সমাজ, সভ্যতা-সংস্কৃতি, রাজনীতি-অর্থনীতি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। নদী এ দেশে বসবাসকারী সকল মানুষের জননী স্বরূপ। ঐতিহাসিক কাল থেকেই এ দেশের মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা নদী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসছে। এ দেশে নদী সেচকাজে অপরিহার্য, উর্বরতা বৃদ্ধির সহায়ক, মাছের যোগান দাত্রী, আমদানি-রপ্তানি, পরিবহন ও যাতায়াতের অন্যতম রুট হিসেবে অর্থনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এ দেশের নদীগুলো কমপক্ষে ত্রিশ হাজার মাঝিমাল্লার খাদ্য সংস্থান করছে। এ দেশের গ্রামীণ মানুষের জীবন জীবিকা অতীতে ছিল নদীনির্ভর, এখনো তা অব্যাহত রয়েছে। নদী ছাড়া জীবন কল্পনা করা যায় না। কারণ নদীকে ঘিরেই মানুষ মাছ ধরে, মালামাল স্থানান্তরিত করে সড়কপথের সাথে সংযুক্ত করা হয়। কাজেই নদী বাংলাদেশের অর্থনীতির উন্নয়নে বহুমাত্রিক ভূমিকা পালন করে। সুতরাং নদীরক্ষায় সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করে বিপন্ন, হারিয়ে যাওয়া, মৃত প্রায়, ভরাট নদীগুলোকে উদ্ধার করতে হবে। কেননা নদী বাঁচলে দেশ বাঁচবে, বাঁচবে দেশের মানুষ।

০৭ ৷ পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের সাফল্য-ব্যর্থতা আলোচনা করুন। এ প্রসঙ্গে আর্সেনিকমুক্ত পানি সরবরাহে বাংলাদেশ সরকারের ভূমিকা আলোচনা করুন। *[২৭তম বিসিএস]*

উত্তর : পানির অপর নাম জীবন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে জীবন, জীবিকা ও উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে পানি অপরিহার্য। পানি তৃতীয় বিশ্বের কৃষি খাতের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে এবং এসব দেশের উন্নয়ন কার্যক্রমে পানি ব্যবস্থাপনা একটি উচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত। পৃথিবীর চারভাগের তিনভাগ জল, একভাগ স্থল। পানির এক বিশাল ভাণ্ডার এ পৃথিবী— কথাটা সত্য হলেও ব্যবহারযোগ্য সুপেয় পানি অফুরন্ত নয় বরং সীমিত। বিশ্বে মোট প্রাক্কলিত পানির পরিমাণ ১৩৮৬.০০ মিলিয়ন কিউবিক কিলোমিটার (Mkm^3)। এর মধ্যে ১৩৪০.০০ মিলিয়ন কিউবিক কিলোমিটার পানির (মোট পানির ৯৬.৫%) উৎস সমুদ্র, যা লবণাক্ত। বিশ্বে সুপেয় পানির পরিমাণ ৩৫.০০ মিলিয়ন কিউবিক কিলোমিটার। তন্মধ্যে ২৪.৪ মিলিয়ন কিউবিক কিলোমিটার পানি বরফ ও তুষার, যা দুষ্প্রাপ্য। অবশিষ্ট ১০.৬ মিলিয়ন কিউবিক কিলোমিটার পানি সুপেয় এবং সহজপ্রাপ্য, যা বিশ্বের মোট পানির ০.৭৬% মাত্র (সুব্রামনিয়া, ২০০৩)।

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের মূলত কৃষিনির্ভর উন্নয়নশীল দেশ। এ দেশের জীবনধারা পানিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। পানি এ দেশের জনগণের কল্যাণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। এ দেশে বন্যা, খরা, নদীভাঙন, জলাবদ্ধতা, নদী ভরাট সর্বোপরি পানির প্রাপ্যতা পানিসম্পদ সেক্টরের অন্যতম সমস্যা, যা দেশের কৃষি উন্নয়নের অন্তরায়। পানিসম্পদের উন্নয়নের মাধ্যমে উল্লিখিত সমস্যা লাঘব করে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, দারিদ্র্য বিমোচন, জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি, নিরাপত্তা ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সুরক্ষা সর্বোপরি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সরকারি বিভিন্ন সংস্থা নানাবিধ প্রকল্প বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড পানিসম্পদ সেক্টরে ছোট বড় ৬৮৪টি সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন, শহর ও গুরুত্বপূর্ণ স্থান রক্ষা, নদীভাঙন ও পরিবেশ সংরক্ষণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের সাফল্যের ওপর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সাফল্য অনেকাংশে নির্ভরশীল।

পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা (Water Resources Management) :

ব্যবহারযোগ্য পানি আহরণ ও পানি থেকে সমাজের জন্য আবশ্যকীয় পণ্য ও সেবা সামগ্রী উৎপাদনের জন্য পানিসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন। পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার আওতাভুক্ত বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে আছে ভৌত কাঠামো নির্মাণ, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ, এতদ্‌সংক্রান্ত আর্থিক ব্যবস্থাপনা, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা এবং আইন ও নানারকম বিধিবিধান।

বাংলাদেশে পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা : প্রাকৃতিক কাঠামো এবং ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান বা সরকার কর্তৃক নির্মিত অবকাঠামোর বিভিন্ন অংশ বা উৎপাদন এবং ব্যবহারকারীদের জন্য এসবের লভ্যতা ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নিয়ে এটি গঠিত। কৃষি বাংলাদেশের প্রধান অর্থনৈতিক খাত এবং পানিসম্পদের প্রধান ব্যবহারকারী। কৃষিখাত ছাড়াও আবাসিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে পানিসম্পদের ব্যবহার ব্যাপক। নদীনালা এবং পুকুর, বিল, হাওর, মৎস্য, বন ও নৌ পরিবহন ইত্যাদি খাত ছাড়াও পানিসম্পদ পরিবেশ দূষণ রোধ, লবণাক্ততা নিয়ন্ত্রণ, প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা ও বিনোদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। দেশের পানিসম্পদের প্রাকৃতিক উৎসসমূহ হচ্ছে– (ক) নদী-নালা এবং পুকুর-বিল-হাওর ইত্যাদি, (খ) প্লাবনভূমি, (গ) জলাভূমি, (ঘ) হাওর-বাওড় ও হ্রদ, (ঙ) পুকুর, (চ) জোয়ারপ্লাবিত জমি, (ছ) ভূগর্ভস্থ জলস্তর।

পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনায় জটিল ক্ষেত্রসমূহ : বাংলাদেশে পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনায় কতকগুলো জটিল ও দুরূহ ক্ষেত্র রয়েছে। এসবের মধ্যে প্রধান হচ্ছে বর্ষা মৌসুমে বন্যা ও শুষ্ক মৌসুমে খরার সমস্যা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ক্রমবর্ধমান পানি চাহিদার মোকাবিলা, নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন, আর্সেনিক কর্তৃক নদীর তলদেশ ভরাট হয়ে যাওয়া এবং নদীভাঙন। এছাড়া পানিসম্পদকেন্দ্রিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, বিশেষ করে মৎস্য সম্পদের এলাকাসমূহ এবং জলাভূমি এলাকার পরিবেশ রক্ষার বিষয়টি ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে সরকার বা ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণের বাইরের বিভিন্ন বিষয় যেমন জলবায়ু পরিবর্তন ও সমুদ্রস্তরের উচ্চতা বৃদ্ধি, বহির্দেশীয় নদী বা নদী অববাহিকার পরিবর্তন ইত্যাদি বাংলাদেশের পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার কাজকে খুবই জটিল করে তুলেছে।

পানিসম্পদ উন্নয়ন সংক্রান্ত সমীক্ষা : বাংলাদেশ সরকারের পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা নীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সমীক্ষা প্রতিবেদন হচ্ছে– ১. তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে পানি ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন, জাতিসংঘের কারিগরি সহায়তা মিশন ১৯৫৭ (ক্রুগ মিশন প্রতিবেদন), ২. পূর্ব পাকিস্তান পানি ও বিদ্যুৎ

উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের মাস্টারপ্ল্যান ১৯৬৪, ৩. মাস্টারপ্ল্যান ১৯৬৪ পর্যালোচনার পর বিশ্বব্যাংক প্রণীত ১৯৬৬ সালের প্রতিবেদন, ৪. বিশ্বব্যাংক প্রণীত ভূমি ও পানিসম্পদ খাত সমীক্ষা প্রতিবেদন ১৯৭২, ৫. পানিসম্পদ পরিকল্পনা (১ম পর্যায়) ১৯৮৬, ৬. জাতীয় পানিসম্পদ পরিকল্পনা (২য় পর্যায়) ১৯৯১, ৭. ফ্লাড অ্যাকশন প্ল্যান ১৯৮৯–৯৫ এবং ৮. বাংলাদেশ পানিসম্পদ ও বন্যা ব্যবস্থাপনা কৌশল প্রতিবেদন ১৯৯৫।

☐ ১৯৫৭ সালে প্রণীত ক্রুগ মিশন প্রতিবেদনটি ১৯৫৪, ১৯৫৫ এবং ১৯৫৬ সালের উপর্যুপরি ভয়াবহ বন্যার পর পূর্ব পাকিস্তানে বন্যানিয়ন্ত্রণ ও পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার ওপর পরিচালিত ব্যাপক সমীক্ষার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছিল। প্রতিবেদনটি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট প্রায় সকল প্রতিষ্ঠানের মনোযোগ আকর্ষণ করে। এই প্রতিবেদনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ ছিল একটি সরকারি কর্পোরেশন গঠন করা, যার কাজ হিসেবে চিহ্নিত করা হয় পানি ও বিদ্যুৎ উন্নয়নের সমস্যাসমূহকে সমন্বিতভাবে একত্রিত করে দায়িত্ব ও ক্ষমতা সহকারে সেগুলোর সমাধান করা। এই সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯৫৯ সালে 'পূর্ব পাকিস্তান পানি ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ' (East Pakistan Water and Power Development Authority– EPWAPDA) গঠিত হয়।

☐ ইপিওয়াপদার ১৯৬৪ সালের মাস্টারপ্ল্যানটি মূলত কৃষির জন্য পানির চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে প্রণীত হয়। এ লক্ষ্যে মাস্টারপ্ল্যান সরকারি উদ্যোগে শুকনো ও বর্ষা উভয় মৌসুমেই বেশ কিছু বড় আকারের পানি ব্যবস্থাপনার কর্মসূচি চিহ্নিত করে। এসব কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে ভৌগোলিক অঞ্চল অনুযায়ী গ্রুপবদ্ধ মোট ৩৬টি পানিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প। মাস্টারপ্ল্যানের একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য ছিল জাতীয় পর্যায়ে পানিসম্পদ খাতের পরিকল্পনা সূচনা করা এবং এর সূত্র ধরে, জলোচ্ছ্বাসজনিত বন্যা থেকে অধিকাংশ উপকূলীয় অঞ্চলকে প্রতিরক্ষাসহ বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি নিষ্কাশন (Flood Control and Drainage– FCD) এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন ও সেচ (Flood Control, Drainage and Irrigation– FCDI) কর্মসূচির অনেক বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন।

☐ বিশ্বব্যাংক মিশন ১৯৬৬ সালে ইপিওয়াপদা মাস্টারপ্ল্যান ১৯৬৪ পর্যালোচনা করে। বিশ্বব্যাংকের এই প্রতিবেদনে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন ও সেচ বিষয়ে মাস্টারপ্ল্যানের মৌলিক নীতিসমূহকে যথার্থ বলে মত প্রকাশ করা হয়। তবে প্রতিবেদনটির মাস্টারপ্ল্যানে বর্ণিত কৌশল ও বেশ কিছু কর্মপরিকল্পনার বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করা হয়। প্রতিবেদনটি অনেক দাতা সংস্থাকে বাংলাদেশে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ সংক্রান্ত বিষয় বৃহৎ, তুলনামূলকভাবে জটিল ও বিনিয়োগ উসুলে দীর্ঘ সময় নিতে পারে– এ ধরনের বিবৃতি দিয়ে এ জাতীয় প্রকল্পে অর্থায়ন না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাবিত করে।

☐ ১৯৮৩ সালে গঠিত মাস্টারপ্ল্যানের সংস্থা ১৯৮৬ সালে জাতীয় সম্পদ পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। এই পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ে পানিসম্পদ উন্নয়নের ১৫টি সুনির্দিষ্ট ধরন চিহ্নিত করা হয় এবং ক. বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি নিষ্কাশন, খ. সেচ, গ. বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন ও সেচ এবং ঘ. বিবিধ বিষয়– এই চার ধরনের কর্মসূচি বিশ্লেষণ করা হয়।

☐ মাস্টারপ্ল্যান সংস্থা পানিসম্পদ পরিকল্পনার ২য় পর্যায় প্রণয়ন করে ১৯৯১ সালে। এতে প্রথম পর্যায়ের কার্যক্রম হালনাগাদ করে বিস্তারিত বিনিয়োগ কর্মসূচিসহ নতুন প্রকল্পসমূহের একটি তালিকা তৈরি করা হয়। একই সঙ্গে ১৯৯১-২০১০ সালের জন্য ২০ বছর মেয়াদি সরকারি বিনিয়োগ পরিকল্পনাও তৈরি করা হয় এবং তাতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি নিষ্কাশনের ওপর জোর দেয়া হয়। ১৯৮৭ এবং ১৯৮৮ সালের ভয়াবহ বন্যার পর বাংলাদেশ সরকার ও উন্নয়ন সহযোগী বিদেশী সংস্থা ও সরকারসমূহ পুনর্বার

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

বাংলাদেশের বিশেষ করে এখানকার শহরাঞ্চলের বন্যা নিয়ে বিশেষভাবে মনযোগী হয়। ১৯৮৯ সালে বন্যা পরিকল্পনা সমন্বয় সংস্থা গঠিত হয় এবং এ ফ্লাড অ্যাকশন প্ল্যানের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল– ক. অবকাঠামো ছাড়া অন্যবিধ উপায়ে বন্যা মোকাবিলার উপায় নির্ধারণ করা, খ. আঞ্চলিক পরিকল্পনায় কৃষিখাতকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া এবং গ. সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাবকে বিশেষ বিবেচনায় নেয়া, বিশেষত মৎস্য চাষ এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনায় জনগণের অংশগ্রহণকে গুরুত্ব দেয়া।

☐ ফ্লাড অ্যাকশন প্ল্যানের ফলাবর্তন হিসেবে ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশের পানিসম্পদ ও বন্যা ব্যবস্থাপনা শীর্ষক একটি প্রতিবেদন প্রণীত হয়। প্রতিবেদনটি বাংলাদেশের পানিসম্পদ খাতের জন্য নীতি নির্ধারণ ও পানি খাতের উন্নয়ন এবং এই খাতে গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে একই কাঠামো উপস্থাপন করে। এই প্রতিবেদনে একটি পাঁচ বছর মেয়াদি কার্যক্রম সুপারিশ করা হয়, যাতে ছিলো– ক. একটি জাতীয় পানিসম্পদ নীতি প্রণয়ন, খ. জাতীয় পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন, গ. পরিকল্পনা, নির্মাণ ও কার্যচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে নিয়োজিত পানিখাতসংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ শক্তিশালীকরণ এবং উচ্চ অগ্রাধিকার সম্বলিত প্রকল্পমালা বাস্তবায়ন।

পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার কৌশলগত কাঠামোবিষয়ক নীতি : বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৯ সালে জাতীয় পানিসম্পদ নীতি ঘোষণা করে। এই নীতির যে ৬টি প্রধান লক্ষ্য চিহ্নিত করা হয় তা হলো : অর্থনৈতিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য দূরীকরণ, খাদ্য নিরাপত্তা, জনস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং সামগ্রিক পরিবেশ প্রতিরক্ষা। পানিসম্পদ খাতের ওপর প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব ফেলে এমন অন্যান্য সরকারি নীতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে জাতীয় পরিবেশ নীতি ১৯৯২, জাতীয় বন নীতি ১৯৯৪, জাতীয় জ্বালানি নীতি ১৯৯৬, নিরাপদ পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন সংক্রান্ত জাতীয় নীতি ১৯৯৮, জাতীয় মৎস্যচাষ নীতি, জাতীয় কৃষি নীতি, জাতীয় শিল্প নীতি ১৯৯৯।

আন্তর্জাতিক চুক্তি ও প্রটোকল : ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে গঙ্গার পানি বণ্টন বিষয়ক ৩০ বছর মেয়াদি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। দুই দেশে প্রবাহিত ৫৪টি অভিন্ন নদীর পানি বণ্টন সংক্রান্ত এটিই একমাত্র চুক্তি। বাংলাদেশ পানিসম্পদ ও পরিবেশ বিষয়ক বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক প্রটোকলে স্বাক্ষর করেছে। এগুলোর মধ্যে আছে জীববৈচিত্র্য বিষয়ক ১৯৯২-এর রিও কনভেনশনের ২১ ধারা, সুন্দরবন ও হাওরাঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য জলাভূমি বিষয়ক ১৯৭১-এর রামসার কনভেনশন; বিপন্ন বন্যপ্রাণী ও গাছপালার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিষয়ক ১৯৭৩-এর কনভেনশন, বিশ্বের সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ বিষয়ক ১৯৭২-এর কনভেনশন, জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ১৯৯২ সালের জাতিসংঘ কনভেনশন, তেলদূষণ থেকে সমুদ্র প্রতিরক্ষা বিষয়ক ১৯৫৪ এর আন্তর্জাতিক কনভেনশন, সামুদ্রিক দূষণ বিষয়ক বিভিন্ন কনভেনশন এবং ক্ষতিকর বর্জ্যবিষয়ক বাসেল কনভেনশন।

পানি খাতের প্রকল্প ও কার্যক্রমসমূহ : বাংলাদেশের পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার প্রথাগত ধরন ছিল মূলত বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন ও সেচের জন্য নানাবিধ কাঠামো নির্মাণ বিষয়ক। সম্প্রতি বন্যা সতর্কীকরণ ও ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার উপায় সম্বলিত বিকল্প ব্যবস্থার ওপর জোর দেয়া হচ্ছে। পানি ব্যবস্থাপনায় যেসব কার্যক্রম হাতে নেয়া হয় সেগুলোর মধ্যে আছে–

ক. গ্রামীণ বন্যা নির্মাণ ও পানি নিষ্কাশন : দেশের অভ্যন্তরে এবং উপকূলীয় এলাকাসমূহে বাঁধ নির্মাণ ও পোল্ডার নির্মাণ, পানি প্রবাহ নিয়ন্ত্রক পয়েন্ট স্থাপন, নদী শাসন, নদীতীর প্রতিরক্ষা ও নদী খনন।

খ. শহর এলাকায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি নিষ্কাশন : শহর রক্ষাবাঁধ, শহর এলাকায় প্রতিরক্ষা স্থাপনা, রেগুলেটর পাম্প ইত্যাদি।

গ. ক্ষুদ্র সেচ : গভীর-অগভীর নলকূপ, রবার বাঁধ, খাল পুনঃখনন।

ঘ. বৃহৎ সেচ পাম্প : সেচ খাল নেটওয়ার্ক, পানি নিষ্কাশন খাল নেটওয়ার্ক, ব্যারেজ ইত্যাদি।

ঙ. বন্যা থেকে প্রতিরক্ষা : বাস্তুভিটা উঁচুকরণ এবং আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ।

চ. বন্যা সতর্কীকরণ : বন্যা/দুর্যোগ সম্পর্কে পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ।

ছ. পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন।

জ. ড্রেজিং : নদীর পানি প্রবাহ বৃদ্ধি ও নৌ-চলাচল সুগমকরণ।

ঝ. ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় প্রস্তুতি : বেড়িবাঁধ, আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ।

ঞ. পানি বিদ্যুৎ উৎপাদন : বাঁধ নির্মাণ, আড়বাঁধ নির্মাণ, নদী শাসন, বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন ইত্যাদি।

বাংলাদেশে পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার ব্যর্থতার কারণসমূহ : পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার নানামুখী কার্যক্রম ও বহুমুখী সাফল্যের পাশাপাশি এর ব্যর্থতাও কম নয়। এসব ব্যর্থতার মূলে রয়েছে সচেতনতা, শিক্ষা ও নৈতিকতার অভাব। কারণ এক্ষেত্রে সামান্য ব্যক্তিস্বার্থের জন্য বৃহৎ জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় স্বার্থ জলাঞ্জলি দেয়া হয়। নিচে পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার ব্যর্থতার কারণসমূহ আলোচনা করা হলো :

১. **প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রকল্প প্রণয়ন ও প্রক্রিয়াগত জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা :** পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনায় ব্যর্থতার অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে শিক্ষা তথা প্রকল্পে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের শিক্ষার অভাব। কারণ একটি প্রকল্প প্রণয়ন ও প্রক্রিয়াকরণের অনেক কৌশলগত দিক আছে। তাই উক্ত ক্ষেত্রে যথেষ্ট জ্ঞানের ও অভিজ্ঞতার ঘাটতি রয়ে গেছে। সেজন্য পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার প্রকল্পসমূহ প্রায়শই আশানুরূপ ফল পায় না কিংবা কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

২. **চেতনার অনুপস্থিতি :** সব ক্ষেত্রে সচেতনতার ঘাটতি পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনায় ব্যর্থতার আরেকটি কারণ। একটি প্রকল্প যাদের উদ্দেশ্যে প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয় তারাই জানে না যে, শুধু সরকারি বা এনজিও কর্মী নয় এই প্রকল্প রক্ষণাবেক্ষণ তাদেরই অধিকার এবং প্রকল্পের সুফল ভোগ করা তাদের কর্তব্য।

৩. **সনাতনী দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ :** আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ এখনও পশ্চাৎপদ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন অর্থাৎ আমরা এখন সব ক্ষেত্রে প্রকৃতির ওপর সর্বাংশে নির্ভরশীল থাকতে চাই। কিন্তু তথ্যপ্রযুক্তি ব্যতিরেকে প্রকৃতিপ্রদত্ত পানিসম্পদের অর্থপূর্ণ ব্যবহার সম্ভব নয় কিন্তু এ ক্ষেত্রে সনাতনী ধ্যান-ধারণা বিভিন্ন প্রকল্পে অংশগ্রহণে ব্যত্যয় ঘটায়।

৪. **সংগঠনের গুণগত মানের ঘাটতি :** পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট সংগঠনের গুণগত মান যথেষ্ট ভালো থাকে না। তাই এসব ক্ষেত্রে সম্পদ ব্যবস্থাপনায় জনগণের অংশগ্রহণে এরা ভালো ভূমিকা রাখতে পারে না।

৫. **আন্তঃব্যবহারকারী বিরোধ :** একটি নির্দিষ্ট এলাকায় অথবা নির্দিষ্ট প্রকল্পের অধীনে পানিসম্পদ ব্যবহারকারীদের মধ্যে বিরোধ পরিলক্ষিত হয়। ফলে পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা সফল হওয়ার ক্ষেত্রে এই ঘটনা বাধার সৃষ্টি করে।

৬. **অর্থপূর্ণ ও কার্যকরী অংশগ্রহণের অনুপস্থিতি :** ব্যবস্থাপনায় শুধু অংশগ্রহণ করলেই পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা সফল হয় না, অংশগ্রহণ হতে হবে অর্থপূর্ণ ও কার্যকরী; কিন্তু অংশগ্রহণে এসবের অভাবের কারণে ব্যবস্থাপনায় সমস্যার সৃষ্টি করে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৭. **চাহিদার তুলনায় পানির মৌসুমভিত্তিক ঘাটতি :** প্রাকৃতিক কারণে পানির ঘাটতি শুরু হয়। নির্দিষ্ট মৌসুমে যে পরিমাণ পানি থাকা প্রয়োজন তা থাকে না আবার যে মৌসুমে পানি ক্ষতিকর কিংবা বেশি প্রয়োজন নেই সে মৌসুমে পানির আধিক্য থাকে যা পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনায় সমস্যার সৃষ্টি করে।

আর্সেনিকমুক্ত পানি সরবরাহে বাংলাদেশ সরকারের ভূমিকা : আর্সেনিক একটি রাসায়নিক পদার্থ, যার প্রতীক As. এর পারমাণবিক ভর 33। আর্সেনিক সাধারণত কৃষি, বনায়ন ও শিল্প কারখানায় ব্যবহৃত হয়। কিন্তু খাবার পানিতে আর্সেনিকের মাত্রা সহ্যসীমা পার করলেই তা হয়ে দাঁড়ায় আর্সেনিক দূষিত বিষাক্ত পানি। তাই বর্তমানে বাংলাদেশে আর্সেনিক দূষণকে অন্যতম প্রাকৃতিক দুর্যোগ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

বাংলাদেশে আর্সেনিক উপস্থিত এলাকাসমূহে আর্সেনিকমুক্ত পানি সরবরাহে বাংলাদেশ সরকার নানামুখী তৎপরতা চালাচ্ছে। এর পাশাপাশি আর্সেনিকমুক্ত পানি সরবরাহ তথা আর্সেনিকোসিস আক্রান্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে নিয়োজিত বিভিন্ন NGO পৃষ্ঠপোষকতা দিচ্ছে।

সরকারের কার্যক্রম :

ক. আক্রান্ত জনসাধারণের দ্রুত শনাক্তকরণ ও চিকিৎসা।

খ. পানি সরবরাহের উপযুক্ত বিকল্প উৎসের উন্নয়ন।

গ. আক্রান্ত এলাকা চিহ্নিতকরণ এবং আর্সেনিক দূষণের উৎসমূহ শনাক্তকরণ।

ঘ. খাবার পানিতে আর্সেনিক দূষণ সংক্রান্ত সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি।

স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আর্সেনিক প্রশমন প্রকল্প : UNDP-এর অর্থায়নে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় টিউবওয়েলের পানিতে আর্সেনিক দূষণের উপর ২১টি জেলা, ১৩টি থানা ও ২০০০ গ্রামে জরিপ চালায়। এই গ্রামগুলোতে ১৮০২ জনের আর্সেনিক ধরা পড়ে যার মধ্যে ৯৯১ জন পুরুষ, ৬৪৮ জন মহিলা ও ১৬৩ জন শিশু রয়েছে। ঐসব গ্রামের ৩২,৬৫১টি টিউবওয়েলের মধ্যে আর্সেনিকদূষিত টিউবওয়েল পাওয়া গেছে ১৯,৭৮৭টি।

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের আর্সেনিকমুক্ত পানি সরবরাহ প্রকল্প : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে শহর ও গ্রামীণ জনগণের নিকট আর্সেনিকমুক্ত পানি সরবরাহ করা। এরা সরকারি ও বেসরকারি Organisation-এর মাধ্যমে এ কাজ করছে। খুলনা, রাজশাহী, কুমিল্লা ও ময়মনসিংহে অবস্থিত DPHE-এর চারটি ল্যাবরেটরিতে আর্সেনিক পরীক্ষা করে নিম্নোক্ত ফল পাওয়া গেছে :

পরীক্ষাকৃত টিউবওয়েলের সংখ্যা– ২৪৯৬৪টি। আর্সেনিক দূষিত টিউবওয়েলের সংখ্যা– ৫৩৩৩টি (২১%)।

DPHE-এর আরেকটি জরিপে ৩৬৮টি থানার মধ্যে ১৭৯টি থানায় আর্সেনিকের উপস্থিতি ধরা পড়েছে।

এছাড়াও সরকারের সহায়তায় ও পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন এনজিও যেমন অক্সফাম, ব্র্যাক, প্রশিকা, মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র, গ্রামীণ ব্যাংক, কারিতাস ইত্যাদি আর্সেনিকমুক্ত পানি সরবরাহ তথা আর্সেনিক দূষণরোধে কাজ করছে।

উপসংহার : কৃষি বাংলাদেশের প্রধান অর্থনৈতিক খাত এবং পানিসম্পদের প্রধান ব্যবহারকারী। কৃষিখাত ছাড়াও আবাসিক ও বাণিজ্যিক খাতে পানির ব্যবহার ব্যাপক। তাই পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার সফলতার ওপর বাংলাদেশের অর্থনীতি অনেকাংশে নির্ভরশীল। বাংলাদেশে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সফলতার পাশাপাশি ব্যর্থতাও কম নয়। তাই পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার ত্রুটিসমূহ চিহ্নিত করে এর সমাধানের জন্য আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

১০ ॥ বাংলাদেশে জলসেচন কর্মে জলসম্পদের অপচয় সম্পর্কে বিশদভাবে লিখুন। *[৩৪ তম বিসিএস]*

ভূমিকা : দারিদ্র্য বিমোচন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার অন্যতম নিয়ামক হলো জলসম্পদের পরিকল্পিত ব্যবহার। আমরা প্রচলিত জলসেচন কর্মে পানির প্রকৃত চাহিদার তুলনায় ২ থেকে ৩ গুণের বেশি ব্যবহার করছি, যা মূল্যবান জলসম্পদের অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়। মোটকথা, বাংলাদেশে জলসেচন কর্মের শতকরা ২৫ থেকে ৪০ ভাগ শস্য উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয়, বাকি ৭৫ থেকে ৬০ ভাগ জলের অপচয় হয়। জলসেচন কর্মে জলসম্পদের অপচয়ের চিত্র উঠে এসেছে International Water Management Institute (IWMI)-এর তথ্যে। তাতে বলা হয়েছে, বিশ্বে জলসেচন কর্মে জলের অপচয় হয় গড়ে ৫০ শতাংশ। কিন্তু বাংলাদেশে এর হার ৬৬ শতাংশ। অর্থাৎ দক্ষ ব্যবহার হচ্ছে এ জলের মাত্র ৩৪ শতাংশ। জলসেচন কর্মের সর্বোত্তম ব্যবহারে ধান উৎপাদনকারী, এমনকি দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যেও বাংলাদেশের অবস্থান নিচের সারিতে।

বাংলাদেশে জলসেচন কর্মে জলসম্পদের অপচয় : দেশে বিদ্যমান সেচযন্ত্র দিয়ে যে জলসেচন কর্ম সম্পাদন করা হয় তাতে জলসম্পদের অতিমাত্রায় অপচয় হয়। নিচে বাংলাদেশে জলসেচন কর্মে জলসম্পদের অপচয় সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১. **অনিয়ন্ত্রিত গভীর ও অগভীর নলকূপ স্থাপন :** বাংলাদেশে বর্তমানে ৫০ লাখেরও অধিক সেচযন্ত্র রয়েছে। এর মধ্যে আছে ভূগর্ভ থেকে পানি উত্তোলনের জন্য গভীর ও অগভীরসহ ৬ ধরনের নলকূপ। ভূ-উপরিস্থ পানি সেচের জন্য রয়েছে লো-লিফটসহ যান্ত্রিক পাম্প ও সনাতন পদ্ধতির নানাবিধ সেচব্যবস্থা। এসব সেচ যন্ত্র প্রায় ১ কোটি ৫০ লাখ হেক্টর জমিতে সেচের কাজ করে। জানা যায়, একযুগের ব্যবধানে প্রায় ৬ লাখ ৫০ হাজার সেচযন্ত্র বেড়েছে। তার ফলে সেচের জমি বেড়েছে ২০ লাখ হেক্টরেরও বেশি। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, এসব গভীর ও অগভীর নলকূল অনিয়ন্ত্রিত উপায়ে স্থাপন হওয়ার দরুন জলসম্পদের অপচয় হচ্ছে।

২. **ড্রেনেজ ব্যবস্থায় দুর্বলতা :** জলসেচন কর্মে পানি সরবরাহের মাধ্যম হলো ড্রেনেজ ব্যবস্থা। এসব ড্রেনেজ ব্যবস্থার মাধ্যমে দূর-দূরান্তে পানি সরবরাহ করা হয় কৃষি ফসল ফলানোর উদ্দেশ্যে। কিন্তু এসব ড্রেনেজ ব্যবস্থা আঁধা কাঁচা আঁধা পাকা হওয়ায় চুঁইয়ে চুঁইয়ে অনেক পানির অপচয় হয়। ফলে সরবরাহকৃত পানির একটা বৃহৎ অংশ ড্রেনেজ দুর্বলতার কারণে পথিমধ্যেই অপচয় হয়।

৩. **পানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তির অভাব :** বাংলাদেশে পানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তির প্রকট অভাব। কৃষকরা যেমন পানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তি ব্যবহারে খুব একটা আগ্রহী নন তেমনি কৃষি বিভাগ ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডও এ ব্যাপারে খুব একটা আগ্রহী বা সচেতন নন। ফলে জলসেচন কর্মে জলসম্পদের অপচয় হচ্ছে অতিমাত্রায়।

৪. **পানি সাশ্রয়ী পদ্ধতি উদ্ভাবনের অভাব :** বাংলাদেশে পানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তির অভাব থাকা সত্ত্বেও পানি সাশ্রয়ী নতুন নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবনে খুব একটা সাড়া লক্ষ্য করা যায় না। পানির সঠিক ব্যবহারের বিষয়টি মাথায় রেখে উন্নয়নশীল বিশ্বের ধান আবাদি এলাকার জন্য আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবন করেছে পানি সাশ্রয়ী এক নতুন পদ্ধতি, যা 'এডব্লিউডি' নামে পরিচিত। বাংলাদেশে প্রচলিত সেচ পদ্ধতিতে ১ কেজি ধান উৎপাদন করতে ৩ থেকে সাড়ে ৩ হাজার লিটার পানির প্রয়োজন হয়। আর নতুন পদ্ধতিতে ১ কেজি ধান উৎপাদনের জন্য পানির

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

প্রয়োজন হয় মাত্র ১৩০০ থেকে ১৭০০ লিটার। বাংলাদেশে এ ধরনের নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন না করার দরুন জলসেচন কর্মে জলসম্পদের অপচয় হচ্ছে।

৫. **টেকসই সেচ না দেয়া :** বাংলাদেশে যে প্রক্রিয়ায় ভূ-গর্ভস্থ পানি তুলে সেচ দেয়া হচ্ছে তা মোটেই টেকসই নয়। মাটির নিচের পানি দিয়ে কৃষিতে জলসেচন কর্ম বেশিদিন চালানো সম্ভব নয়। কারণ এ পানি অফুরন্ত নয়। নানা ওয়াটার মডিউলিং করে বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষ দেখানোর চেষ্টা করে যে, বরেন্দ্র অঞ্চল থেকে যে পানি তোলা হয়, বর্ষায় তা পুনর্ভরণ হয়। কিন্তু এটা অবিশ্বাস্য। কারণ অগভীর নলকূপ থেকে এখন আর পানি আসে না। তাই ভূগর্ভস্থ পানি কৃষিতে ব্যবহার আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত ছাড়া আর কিছু নয়। অর্থাৎ টেকসই সেচ না দেয়ার কারণেও পানির অপচয় হচ্ছে।

৬. **বিতরণ ও প্রয়োগ পদ্ধতিতে দুর্বলতা :** বাংলাদেশে কৃষিক্ষেত্রে জলসেচনের ক্ষেত্রে বিতরণ ও প্রয়োগ পদ্ধতিতে যথেষ্ট দুর্বলতা বিদ্যমান। ফলে পানির অদক্ষ ব্যবহার হচ্ছে হরহামেশা। সুতরাং জলসেচনের ক্ষেত্রে বিতরণ ও প্রয়োগ পদ্ধতির দুর্বলতা রোধ এখন সময়ের দাবি।

৭. **অপরিকল্পিত পানি উত্তোলন :** বাংলাদেশে জলসেচন কর্মের জন্য অপরিকল্পিত উপায়ে পানি উত্তোলন করা হয় এবং চাহিদার তুলনায় অসচেতনভাবে বেশি পানি ব্যবহার করা হয়। এতে করে একদিকে জলসম্পদের অপচয় হচ্ছে অন্যদিকে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তরও নিচে নেমে যাচ্ছে। যা ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের জন্য খুবই আশঙ্কাজনক।

৮. **বিদ্যুতের অপর্যাপ্ততা :** বাংলাদেশে সেচের জন্য ব্যবহারযোগ্য প্রায় ১৪ লাখ গভীর ও অগভীর নলকূপ রয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ১১ লাখ ডিজেল চালিত। বাকি ৩ লাখ চলে বিদ্যুতে। গভীর নলকূপের ব্যবহার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তি চাপ পড়ছে বিদ্যুতের ওপর। সেচের জন্য প্রতিদিন বিদ্যুৎ প্রয়োজন হয় দেড় হাজার থেকে ১ হাজার ৭০০ মেগাওয়াট। কিন্তু বাংলাদেশে বিদ্যুতের অপর্যাপ্ততা থাকায় চাহিদামতো সেচ ব্যবস্থায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হয় না। অর্থাৎ সেচ ব্যবস্থায় বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা যাতায়াতের মধ্যে থাকে। এতে করে জলসম্পদের অপচয় হয়।

৯. **সচেতনতার অভাব :** বাংলাদেশের কৃষিকাজে নিয়োজিত অধিকাংশ কৃষকই অল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিত। তাই তাদের মাঝে আধুনিক প্রযুক্তি ও কলাকৌশলের যেমন অভাব বিদ্যমান তেমনি জলসেচে পানির অপচয়রোধে সচেতনতার অভাবও বিদ্যমান। এতে করে তারা চাহিদার তুলনায় বেশি পরিমাণে পানি সেচ ব্যবস্থায় ব্যবহার করে ও পানির অপচয় করে।

১০. **প্রশিক্ষণের অভাব :** বাংলাদেশ কৃষিমন্ত্রণালয়ের তথ্য মতে, দেশে ধানের আবাদ হয় প্রতিবছর সাড়ে এক কোটি হেক্টর জমিতে। এর মধ্যে বোরো ধানের আবাদ হয় ৪৭-৪৮ লাখ হেক্টর জমিতে। বোরোর এ আবাদে সেচের প্রয়োজন হয় সবচেয়ে বেশি। এর বাইরে গম ও ভুট্টার আবাদেও সেচের প্রয়োজন হয়। এ লাখ লাখ হেক্টর জমিতে কতটুকু সেচ দিলে সর্বোচ্চ ফলন হবে সে বিষয়ে আমাদের কৃষকদের কোনো প্রশিক্ষণ নেই। ফলে সেচ ব্যবস্থায় পানির অপচয় বাড়ছে।

১১. **পানি ধরে রাখতে না পারা :** একে তো দুর্বল ড্রেনেজ সিস্টেমের মাধ্যমে ফসলি জমিতে সেচ দেওয়া হয়, তারপর আবার সেই জমিতে ঠিকমত আইল না থাকায় ক্ষেতে পর্যাপ্ত পানি ধরে রাখা সম্ভব হয় না। এতে করে পুনঃপুন ফসলি জমিতে সেচ দিতে হয়। যা পানির অপচয়কে বাড়িয়ে দেয় বহুগুণে।

১২. **সময়মত সেচ না দেওয়া :** পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, আমাদের দেশে ফসলি জমিতে যে সেচ দেওয়া হয় তার বেশির ভাগই হয় সেচের আগে, আর না হয় সেচের পরে। এতে করে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ফসল ও ফসলের উৎপাদন এবং অপচয় হয় জলসম্পদের।

জলসম্পদের অপচয় রোধে করণীয় : বাংলাদেশে জলসেচন কর্মে যে প্রচুর পরিমাণ জলসম্পদের অপচয় ঘটে তা রোধ করা না গেলে দেশে জলসেচন তো বটেই পাশাপাশি সুপেয় পানির চাহিদা পূরণ করাও অসম্ভব হয়ে পড়বে। নিচে জলসম্পদের অপচয়রোধে করণীয় দিকসমূহ উল্লেখ করা হলো :

১. ভূগর্ভস্থ পানির উপর চাপ কমাতে হবে,
২. সরকার কর্তৃক বিভিন্ন প্রকল্প ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণের উদ্যোগ নিতে হবে,
৩. সেচের পানির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে কৃষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
৪. প্রথাগত সেচনালা সম্প্রসারণ না করে টেকসই বারিড পাইপ সম্প্রসারণ করতে হবে।
৫. খাল খনন বা পুকুর খননসহ ভেড়িবাঁধ, রাবার ড্যাম নির্মাণ ও সোলার প্যানেলের মাধ্যমে সেচ কার্যক্রম জনপ্রিয় করতে হবে।
৬. পানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তি জনপ্রিয় করতে কৃষকদেরকে উৎসাহ ও আর্থিক প্রণোদনা দিতে হবে।
৭. এডব্লিউডি পাইপ (এলাকাভেদে হাতিম ও যাদু পাইপ নামে পরিচিত) এর সম্প্রসারণ করতে হবে।
৮. পানির অপচয় রোধে প্রচার বাড়াতে হবে ইত্যাদি।

উপসংহার : বাংলাদেশে জলসেচন কর্মে জলসম্পদের অপচয় আজ বিরাট সমস্যা হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। যদি এই বিপুল পরিমাণ জলসম্পদের অপচয়রোধ করা সম্ভব হয় তবে প্রতিবছর কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত ডিজেল ও বিদ্যুৎ থেকে অতিরিক্ত ৩৫০ কোটি টাকা জ্বালানি সাশ্রয় করা সম্ভব হবে। এতে ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার হ্রাস পাবে, সুপেয় পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পাবে এবং কৃষি উৎপাদন, মৎস্য চাষ, শিল্প উৎপাদন ও মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব হবে। এছাড়া যুগের প্রয়োজনে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ এবং গৃহস্থালী কাজে ব্যবহৃত পানির পুন:ব্যবহারের বিষয়টিও আমাদের গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে।

১১ ॥ বাংলাদেশের কৃষি জমি অকৃষি কাজে স্থানান্তরিত হবার স্বরূপ ও সংকট বিশ্লেষণ করুন। এই সংকট মোচনের উপায়গুলো কি কি? *[৩১তম বিসিএস]*

উত্তর : বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। মোট জাতীয় উৎপাদন (জিডিপি)-এ কৃষি ও এর অধঃখাতের সমন্বিত অবদান ২০১২-১৩ অর্থবছরে শতকরা ১৬.৭৮% ভাগ এবং ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে (সাময়িক) জিডিপিতে সার্বিক কৃষিখাতের (মৎস্য সম্পদসহ) অবদান শতকরা ১৬.৩৩ ভাগ। গুরুত্বের দিক দিয়ে তৈরি পোশাক ও নীটওয়্যার রপ্তানির পরেই কৃষির অবস্থান। কিন্তু বাংলাদেশের মতো কৃষিনির্ভর দেশে ভূমির যথাযথ ব্যবহার আরো গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হওয়া উচিত। ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটারের এ দেশে মাথাপিছু জমির পরিমাণ মাত্র ০.১৫ একর। অত্যধিক জনসংখ্যার চাপে মাথাপিছু জমির পরিমাণ দিন দিন কমে আসছে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

বাংলাদেশের কৃষি জমি অকৃষিখাতে স্থানান্তরিত হওয়ার স্বরূপ ও সৃষ্ট সংকট : নিচে বাংলাদেশের কৃষিজমি অকৃষি খাতে স্থানান্তরিত হওয়ার স্বরূপ ও সৃষ্ট সংকট আলোচনা করা হলো :

১. **অতিরিক্ত জনসংখ্যার আবাসন :** আদমশুমারি রিপোর্ট ২০১১ অনুসারে বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৭%। এই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার আবাসনের জন্য ক্রমেই চাষাবাদযোগ্য জমি বসতবাড়িতে রূপান্তরিত হচ্ছে। বিভিন্ন অঞ্চলে এখন অত্যন্ত উর্বর জমিও বসতবাড়ি নির্মাণের স্থান হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। অপরিকল্পিতভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এবং সুষ্ঠু জনসংখ্যা নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের অভাবের ফল এ দেশের জনসংখ্যানীতিতে মারাত্মকভাবে বিরূপ প্রভাব ফেলছে। এর ফলে একদিকে যেমন বন উজাড় করে গৃহনির্মাণ সামগ্রী সংগ্রহের ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশ ধ্বংস হচ্ছে অন্যদিকে আবাদী জমিও দিন দিন কমে যাচ্ছে।

২. **অপরিকল্পিতভাবে কল-কারখানা নির্মাণ :** দেশে কৃষি জমি দখল করে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক সামগ্রীর কিংবা খাদ্য সামগ্রীসহ বিভিন্ন সামগ্রী তৈরির কারখানা গড়ে উঠেছে। এগুলোর ফলে একদিকে যেমন আবাদী জমি অকৃষি খাতে স্থানান্তরিত হচ্ছে তেমনি এসব কল-কারখানা থেকে নির্গত বিষাক্ত রাসায়নিক বর্জ্য আবাদী জমিকে উর্বরতা শূন্য করে তুলছে। ইটের ভাটার প্রভাবেও ক্রমান্বয়ে আবাদী জমি কমে যাচ্ছে।

৩. **রাস্তাঘাট নির্মাণ :** আদমশুমারি রিপোর্ট ২০১১ অনুসারে বর্তমানে জনসংখ্যা ১৪ কোটি ৯৭ লাখ ৭২ হাজার ৩৬৪ জন। যদিও জনসংখ্যার তুলনায় দেশে বিদ্যমান রাস্তাঘাট অপ্রতুল তথাপি নতুন নতুন রাস্তা টার্মিনাল নির্মাণের ফলে আবাদী জমি বিনষ্ট হচ্ছে। জমির মালিক কৃষকদেরকে সামান্য ক্ষতিপূরণ দেয়া হলেও তা সামগ্রিক ক্ষতির তুলনায় নগণ্য।

৪. **ভূমির দুর্বৃত্তায়ন :** ভূমিদস্যুরা বিশাল এলাকা দখল করে অনেক সময় পতিত ফেলে রাখে। তারা তাদের ইচ্ছামতো ঐ জমি পরে অকৃষি কাজে ব্যবহার করে। এর ফলে প্রকৃত চাষীরা বঞ্চিত হয় আবার জমির সদ্ব্যবহারও সম্ভব হয় না।

৫. **অপরিকল্পিত নগরায়ণ ও আবাসন ব্যবসা :** কর্মসংস্থানের সুযোগসহ নানা কারণে বর্তমানে মানুষ ক্রমেই ঢাকামুখী হচ্ছে। ঢাকার পরিধিও দিন দিন বাড়ছে। এর ফলে ঢাকার চারপাশের আবাদী জমি কমছে, বুড়িগঙ্গা, তুরাগ নদীর পানি বিষাক্ত হচ্ছে। আবার হাউজিং কোম্পানিগুলো তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থে আবাসিক জমি অধিগ্রহণ করে তা ভরাট করছে। এর ফলে আবাদী জমি কমে আসছে।

৬. **লবণাক্ততা ও জলাবদ্ধতা :** দেশের দক্ষিণাঞ্চলে সমুদ্রের লবণাক্ত পানি অনুপ্রবেশের ফলে চাষযোগ্য জমি অনাবাদী হয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় প্রায় ২ হাজার ৪৬৪টি হাওড় ও বিলে ২৪ লক্ষ একর জমি জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততার কারণে অনাবাদী রয়েছে।

৭. **জমির খণ্ড-বিখণ্ডতা ও বিচ্ছিন্নতা :** উত্তরাধিকার আইন, জনসংখ্যার চাপ, দারিদ্র্যতা প্রভৃতি কারণে এদেশের জমি খণ্ডবিখণ্ড ও বিচ্ছিন্ন হয় পড়ছে। এতে করে দেশের মোট ২.২০ কোটি একর কৃষি জমির মধ্যে প্রায় ৬৫ লাখ কৃষি জমি রয়েছে যার দুই-তৃতীয়াংশ ক্ষুদ্রাকৃতির। ফলে এ দেশের খামারের আকৃতি গড়ে ২ একরের নিচে, যেখানে ইংল্যান্ডের খামারের গড় আয়তন ৬২ একর এবং আমেরিকার ১৪৮ একর। জমির খণ্ড-বিখণ্ডতার ফলে সৃষ্ট 'আইল' কৃষি জমির একটা নির্দিষ্ট অংশ দখল করছে।

সংকট মোচনে করণীয় : বাংলাদেশের কৃষিজমি অকৃষি খাতে স্থানান্তরিত হওয়ায় যেসব সংকট সৃষ্টি হয় তা মোচনে করণীয় দিক নিচে আলোকপাত করা হলো :

১. **যথাযথ ভূমি সংস্কার :** বাংলাদেশে বিদ্যমান ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা যথেষ্ট ক্রটিপূর্ণ। ভূমি সংস্কারের উভয় পর্যায় যেমন– ভূমি মালিকানার প্রকৃতির পরিবর্তন ও ভূমি থেকে অর্জিত আয় বা ক্ষমতা বা উৎপাদনের সুষম বিন্যাসের মাধ্যমে ভূমির কৃষিখাতে সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব।

২. **সুষ্ঠু জনসংখ্যানীতি প্রণয়ন :** বাংলাদেশে যে জনসংখ্যানীতি এ পর্যন্ত প্রণীত হয়েছে তা আসলে ত্রুটিপূর্ণ এবং সুষ্ঠু বাস্তবায়নও সম্ভব হয়নি। এ নীতিকে আসলে জনসংখ্যানীতি না বলে জনসংখ্যা সমস্যা নীতি বলাটাই ভালো। কারণ, এখানে জনসংখ্যাকে কেবল সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অথচ বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যার মূলে রয়েছে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব উপযুক্ত প্রশিক্ষণ পেলে এসব জনগণ দেশের জন্য সম্পদ বলে বিবেচিত হতো। সঠিক জনসংখ্যানীতি প্রণয়নের মাধ্যমে দেশের নাগরিকদের প্রশিক্ষণ দিতে পারলে এসব জনগণ দেশের জন্য সম্পদ বলে বিবেচিত হতো। সঠিক জনসংখ্যানীতি প্রণয়নের মাধ্যমে দেশের নাগরিকদের প্রশিক্ষিত ও সচেতন করে জমির কার্যকরী ও উপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব।

৩. **পরিকল্পিত আবাসন ব্যবস্থা :** মানুষের বসবাসের জন্য যে ঘরবাড়ি নির্মাণ করতে হবে তা অপেক্ষাকৃত কম উর্বর জমিতে নির্মাণ করতে হবে। বহুতল ভবন নির্মাণের মাধ্যমে অল্প জায়গায় অধিক পরিবারের বাসস্থান নিশ্চিত করা সম্ভব। এভাবে সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে উন্নত আবাসনও সম্ভব আবার কৃষিজমি রক্ষাও সম্ভব।

৪. **শিল্পের স্থানীয়করণ :** শিল্পের সঠিক স্থানীয়করণের মাধ্যমে সুষ্ঠু শিল্প বর্জ্য নিষ্কাশন সম্ভব। কৃষি জমির উপর চাপ হ্রাস করতে হলে সঠিক শিল্পনীতি প্রণয়নও গুরুত্বপূর্ণ।

৫. **কৃষি গবেষণা সম্প্রসারণ :** উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে উচ্চফলনশীল বীজ ও কৃষি সামগ্রী উদ্ভাবনের মাধ্যমে কৃষি পেশাকে লাভজনক করে কৃষি জমি রক্ষা করা সম্ভব। বাংলাদেশে এ ধরনের পদক্ষেপের অভাব রয়েছে।

৬. **জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততা দূরীকরণ :** পানি নিষ্কাশনের আধুনিক ব্যবস্থা অবলম্বন করে জলাবদ্ধ জমি চাষের আওতায় আনতে হবে এবং সমুদ্র উপকূলবর্তী জমি যাতে লবণাক্ত না হতে পারে সে লক্ষ্যে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এভাবে কৃষি জমির সম্প্রসারণ ঘটাতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতি যথাসম্ভব কমাতে হবে।

৭. **সমবায় ব্যবস্থার প্রবর্তন :** কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে সমবায় কৃষি খামার স্থাপন করে যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে চাষাবাদ, বিপণন, শস্য সংগ্রহ, জমির খণ্ড-বিখণ্ডতা রোধ প্রভৃতি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৮. **কৃষিনীতি প্রণয়ন :** কৃষি উন্নয়ন ও কৃষিজমি রক্ষার লক্ষ্যে বাস্তবমুখী সম্প্রসারণশীল কৃষিনীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

উপসংহার : নানাবিধ কারণে বাংলাদেশের কৃষি জমি অকৃষি খাতে হস্তান্তরিত হচ্ছে। যার ফলে ব্যাহত হচ্ছে কৃষি উৎপাদন। যদিও বাংলাদেশের সরকার প্রধান FAO-এর 'সেরেস পুরস্কার' পেয়েছেন তথাপি বাংলাদেশের কৃষিখাত এখনও অনুন্নত। সঠিক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে কৃষি জমির সমস্যা সমাধান করে কৃষিখাতের অবদান বৃদ্ধি করা সম্ভব।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৭)

১২ ∎ সংক্ষেপে বাংলাদেশের খনিজসম্পদের বিবরণ দিন। *[৩০তম বিসিএস]*

উত্তর : সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের নতুন নতুন চাহিদার উন্মেষ ঘটেছে। মানুষ তার প্রয়োজন মেটাতে ছুটে চলেছে পাহাড়ে-পর্বতে-সমুদ্রে-আকাশে-মাটির গভীরে। এভাবে শুরু হয় মানুষের প্রয়োজনের তাগিদে প্রাকৃতিক জ্বালানির আবিষ্কার ও ব্যবহার। বাংলাদেশ বিশ্ব মানচিত্রে আয়তনে ৯০তম একটি দেশ। সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময় পরিবেশ এ দেশে থাকলেও খনিজ সম্পদ এদেশে অপ্রতুল নয়, যা ষোল কোটি মানুষের চাহিদা পূরণে অক্ষম। বস্তুত, ১৯৫১ সালে খনিজ সম্পদ আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে খনিজ যুগে পদার্পণ বাংলাদেশের।

খনিজ সম্পদ : সাধারণ অর্থে যা খনি থেকে তোলা হয় তাকে খনিজ বলে। ব্যাপক অর্থে নভোমণ্ডল, ভূতল ও অতল ভূগহ্বরে বিভিন্ন প্রকার শিলার গঠন উপাদানই খনিজ। খনিজ হচ্ছে একটি যৌগিক পদার্থ, যার সৃষ্টি হয়েছে ভূত্বকের প্রাপ্ত দুই বা ততোধিক স্বাভাবিক মৌলিক উপাদানের রাসায়নিক সংযোগে। উল্লেখ্য, একটি মাত্র মৌলিক পদার্থ নিয়ে তৈরি খনিজ হীরা, সোনা, গন্ধক, তামা ইত্যাদি।

বাংলাদেশের খনিজ সম্পদের বর্তমান অবস্থান

১. **প্রাকৃতিক গ্যাস (Natural Gas) :** প্রাকৃতিক গ্যাস মূলত মিথেন (CH_4) গ্যাস দিয়ে গঠিত। প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান খনিজ সম্পদ। ১৯১০ সালে এ দেশে অনুসন্ধানমূলক কূপ খনন করা হয়েছে। ১৯৫৫ সালে সিলেটে সর্বপ্রথম গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়। এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত গ্যাসক্ষেত্রের সংখ্যা ২৬টি (২০১৪)। এর অধিকাংশই সিলেট বিভাগে। স্বাধীনতার পর যে ১৮টি গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে তার ৮টি গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার করেছে পেট্রোবাংলা এবং ৫টি গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার করেছে দেশীয় অনুসন্ধানী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন কোম্পানি বা বাপেক্স (BAPEX)। কিন্তু প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের অভাবে দেশীয় ভূ-বিজ্ঞানী ও কারিগরি প্রকৌশলীদের দক্ষতাকে সঠিক ও পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগানো যায়নি। বিভিন্ন গ্যাসক্ষেত্রে প্রায় ৩৭.৬৮০ ট্রিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস সংরক্ষিত আছে বলে অনুমান করা হয়। তার মধ্যে উত্তোলনযোগ্য মজুদের পরিমাণ প্রায় ২৭.০৩৮ ট্রিলিয়ন ঘনফুট।

গ্যাসক্ষেত্রসমূহের বৈশিষ্ট্য : বাংলাদেশের গ্যাসক্ষেত্রসমূহ দেশের পূর্বাংশে প্রধানত ফোল্ড বেল্ট (Fold Belt) অঞ্চলে অবস্থিত। আজ পর্যন্ত দেশের পশ্চিম অঞ্চলে কোনো গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়নি। এ গ্যাসক্ষেত্রসমূহের গ্যাস স্তরগুলো ভূ-পৃষ্ঠের নিচে প্রায় ৯৮০ মিটার থেকে প্রায় ৩,৪৫০ মিটার গভীরতার মধ্যে বিরাজ করে। অধিকাংশ গ্যাসক্ষেত্রেই একাধিক গ্যাসস্তর বিদ্যমান এবং কোনো কোনো গ্যাসক্ষেত্রে যেমন তিতাস গ্যাসক্ষেত্রে ১১টি গ্যাসস্তর রয়েছে। গ্যাসক্ষেত্রসমূহ ঊর্ধ্বভাজ (anticline) দিয়ে সৃষ্ট ফাঁদ কর্তৃক গঠিত— যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মৃদু প্রকৃতির এবং ভূগর্ভে সুপ্ত অবস্থায় বিদ্যমান, অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠে যার বাহ্যিক প্রতিফলন তেমন ঘটেনি। বাংলাদেশের গ্যাসক্ষেত্রসমূহের গ্যাস বেল্টে শিলাপাথরের মজুদ বিদ্যমান— যা বদ্বীপ পরিবেশে সৃষ্ট এবং তা মূলত একের পর এক স্তরীভূত বেলেপাথর এবং কাদাশিলা (Shale) দিয়ে গঠিত।

বাংলাদেশের গ্যাসক্ষেত্রসমূহে গ্যাসের উপাদান : বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাস বিশুদ্ধতার জন্য সুবিদিত। গ্যাসক্ষেত্রসমূহে গ্যাসের মূল উপাদান মিথেনের পরিমাণ ৯৩.৫০% থেকে সর্বোচ্চ ৯৯.০৫% পর্যন্ত এবং ভেতরে ক্ষতিকারক সালফার উপাদান প্রায় সকল ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত। এ

গ্যাসে নাইট্রোজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণও নগণ্য। এদের ক্যালরিফিক মান ১০০৬ বিটিইউ ((btu) থেকে ১০৬২ বিটিইউ পর্যন্ত। গ্যাসক্ষেত্রসমূহে গ্যাসের মূল উপাদান মিথেন ছাড়াও কিছু পরিমাণ অপেক্ষাকৃত উচ্চমানের হাইড্রোকার্বন রয়েছে— যা গ্যাস উৎপাদনের সময় মিথেন থেকে আলাদা হয়ে তরল আকারের কনডেনসেট হিসেবে উৎপাদিত হয়।

বাংলাদেশে বার্ষিক গ্যাস উৎপাদন : বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ১৯৫৭ সালে সিলেটের হরিপুর গ্যাসক্ষেত্র থেকে গ্যাস উৎপাদন শুরু হয় এবং ১৯৫৯ সালে ছাতক গ্যাসক্ষেত্র চালু হয়। শুরুর দিকে প্রথম ২০ বছরে গ্যাস উৎপাদন অল্প বৃদ্ধি পেলেও ১৯৬৮ সালে তিতাস, ব্রাহ্মণবাড়িয়া; ১৯৮৩-৮৪ সালে বাখরাবাদ, কৈলাশটিলা, কামতা গ্যাসক্ষেত্রের উৎপাদন শুরুর মাধ্যমে উৎপাদন মাত্রার বৃদ্ধি ঘটে এবং ২০১৩ সালে তা ৮০০.৬ বিলিয়ন ঘনফুটে পৌঁছে। বিগত বছরগুলোর তুলনায় ২০১১-১২ অর্থবছরে গ্যাসের চাহিদা ৩৪.৬৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ হারে গ্যাসের চাহিদা বৃদ্ধি পেলে চলতি বছরেই অর্থাৎ ২০১৫ সালেই ১৫০০ বিলিয়ন ঘনফুটে পৌঁছাবে।

বাংলাদেশে গ্যাসের ব্যবহার : বর্তমানে প্রাকৃতিক গ্যাসই বাংলাদেশের প্রাথমিক বাণিজ্যিক জ্বালানির প্রধান উৎস। দেশে উৎপাদিত গ্যাস বিদ্যুৎ, সার, শিল্প ও কলকারখানায়, বাণিজ্যিক ও গৃহস্থালী কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। বাংলাদেশের উৎপাদিত বিদ্যুতের ৮৮.৯০% উৎপাদিত হয় গ্যাসের ব্যবহারের মাধ্যমে। দেশের বার্ষিক মাথাপিছু বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ হচ্ছে মাত্র ১০০ কিলোওয়াট ঘণ্টা যা উন্নত দেশের তুলনায় একশভাগের একভাগ মাত্র। চীনের মতো জনবহুল দেশেও এর পরিমাণ বর্তমানে ১,০০০ কিলোওয়াট ঘণ্টা।

২. **খনিজ তেল (Natural Oil) :** খনিজ তেল হলো পেট্রোলিয়ামের তরল রূপ, যা ভারী হাইড্রোকার্বন যৌগসমূহের সমষ্টি। বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই একটি প্রাকৃতিক গ্যাসসমৃদ্ধ এলাকা হিসেবে প্রমাণিত হলেও এ দেশে খনিজ তেলের আবিষ্কার তুলনামূলকভাবে কম ঘটেছে। বাংলাদেশে সর্বপ্রথম তেলক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয় ১৯৮৬ সালে সিলেটের হরিপুর গ্যাসক্ষেত্রের সপ্তম কূপে কিছুটা অপ্রত্যাশিতভাবে। ১৯৮৭ সালের জানুয়ারি মাসে তেল উৎপাদন শুরুর মাধ্যমে বাংলাদেশ তেলযুগে পদার্পণ করে। ২০২০ থেকে ২০৩০ মিটার গভীরতায় প্রায় ১০ মিলিয়ন ব্যারেল তেল এখানে মজুদ আছে। তবে উত্তোলনযোগ্য মজুদের পরিমাণ নির্ণয় করা হয় প্রায় ৬ মিলিয়ন ব্যারেল। সিলেটের হরিপুর ছাড়াও ফেঞ্চুগঞ্জ-৩ ও কৈলাশটিলা-২ কূপে খনিজ তেলের সন্ধান পাওয়া গেছে।

বাংলাদেশে তেলের চাহিদা ও ব্যবহার : বাংলাদেশে বর্তমানে তেলের চাহিদা ও ব্যবহারের হার প্রতিদিন প্রায় ৪৫,০০০ ব্যারেল। এর পুরোটাই বিদেশ (মধ্যপ্রাচ্য) থেকে আমদানি করা হয়ে থাকে। প্রতিদিন প্রায় ৩০,০০০ ব্যারেল তেল পরিশোধন করার ক্ষমতাসম্পন্ন দেশের একমাত্র তেল পরিশোধনাগার চট্টগ্রামের ইস্টার্ন রিফাইনারিতে এ খনিজ পরিশোধন করে সরবরাহ করা হয়। বাকি চাহিদা মেটানোর জন্য বিদেশ থেকে পরিশোধিত তেলজাত পদার্থ আমদানি করা হয়। বাংলাদেশের মোট তেল চাহিদার প্রায় ৫০% ডিজেল, ২৫% কেরোসিন, ১০% ফুয়েল অয়েল এবং ৮% পেট্রোলের চাহিদা রয়েছে। দেশে ডিজেল ও কেরোসিনের ঘাটতি রয়েছে। বাংলাদেশে বর্তমানে তেল ও তেলজাতীয় পদার্থের চাহিদা ২.৫% থেকে ৩% হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে প্রতি বছর প্রায় ১৫ মিলিয়ন ব্যারেল খনিজ তেল ও তেলজাত দ্রব্য আমদানি করে থাকে এবং এ খাতে প্রতি বছর ব্যয় করতে হয় প্রায় ১৫০০ কোটি টাকা।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৩. **কয়লা (Coal) :** কয়লা শক্তির অন্যতম উৎস। স্কপৃফ্ (১৯৬৫) এর সংজ্ঞা অনুযায়ী কয়লা হলো ৭০ ভাগেরও বেশি অঙ্গারময় (Carbonaceous) পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত সহজে দাহ্য এক শ্রেণীর শিলা বিশেষ, যা উদ্ভিদজাত পদার্থ থেকে ভূগর্ভের চাপ ও তাপের সাহায্যে দৃঢ়ীকরণ ও পরিবর্তনের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশ কয়লা সম্পদে তত উন্নত নয়। এদেশের উত্তরবঙ্গে কয়লা সম্পদ রয়েছে। ১৯৬১ সালে জাতিসংঘের আর্থিক সহায়তায় ইউএন পাক মিনারেল সার্ভে (UN-PAK Mineral Survey) নামে এক অনুসন্ধান প্রকল্প জয়পুরহাট-বগুড়া জেলায় ১০টি অনুসন্ধান কূপ খনন করলে ১৯৬২ সালে জামালগঞ্জ পাহাড়পুর এলাকায় ভূ-পৃষ্ঠের ৬৪০ মিটার থেকে ১১৫৮ মিটার নিচে বিরাট কয়লার মজুদ আবিষ্কৃত হয়। দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের আবিষ্কৃত মোট ৫টি কয়লা ক্ষেত্রের (রংপুরের খালাশপীর, দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া, ফুলবাড়ি ও দীঘিপাড়া এবং বগুড়ার জামালগঞ্জ) মজুদ প্রায় ২,৭০০ মিলিয়ন টন। উল্লেখ্য, উত্তোলন শুরুর পর থেকে ২০১০-১১ অর্থবছরে (ফেব্রুয়ারি ২০১১ পর্যন্ত) প্রায় ৩.৯৯ মিলিয়ন মেট্রিক টন কয়লা উত্তোলিত হয়েছে।

৪. **পীট সম্পদ (Peat Wealth) :** ভূপৃষ্ঠের উদ্ভিদজাত পদার্থ সুবিধাজনক স্থানে জমা হয়ে ভূগর্ভে অল্প গভীরতায় আংশিক পচন ও দৃঢ়ীকরণের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে ছিদ্রযুক্ত (Porous) জৈবিক সমষ্টি পীট (Peat)-এ পরিণত হয়। এ পীট ভূগর্ভে আরো অধিক গভীরতায় উচ্চতর চাপ ও তাপের সাহায্যে কয়লাকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কয়লায় পরিণত হয়। এ কয়লার বর্ণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পীট পর্যায়ক্রমে উচ্চতর কয়লা শ্রেণীতে পরিণত হয়। ১৯৫৩ সালে বাংলাদেশের বর্তমান মাদারিপুর, গোপালগঞ্জ জেলার বাঘিয়া-চান্দা বিল এলাকায় এবং খুলনার কোলা ও ডাকাতিয়া বিল এলাকায় বিরাট পীটের মজুদ আবিষ্কৃত হয়। প্রাপ্ত পীট মজুদসমূহ সাধারণত দেশের বদ্বীপ ও পলিজ বন্যাতল এলাকার নিম্নাঞ্চলসমূহে পাওয়া যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ নিম্নাঞ্চলসমূহ জলাভূমির সৃষ্টি করে যা বছরের অধিক সময়ই পানির নিচে নিমজ্জিত থাকে। বাংলাদেশের পীট সম্পদসমূহের বাণিজ্যিক ব্যবহার এখন শুরু হয়নি। যদিও বিশেষজ্ঞ পরামর্শক দল এ পীটসম্পদের বাণিজ্যিক ব্যবহারের সম্ভাব্যতা যাচাই করে এমত প্রকাশ করেন যে, এ পীট শুষ্ক অবস্থায় এবং এ দিয়ে তৈরি ব্রিকেট ব্যবহার করে গৃহস্থালী কাজের শিল্পক্ষেত্রে যেমন ইটের ভাটায় ইট পোড়ানোর কাজে এবং পল্লী অঞ্চলে ছোট আকারের (১০ মেগাওয়াট) বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র চালানোর কাজে জ্বালানি হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

৫. **চুনাপাথর (Lime stone) :** চুনাপাথর এক জাতীয় পাললিক শিলা। এর প্রধান উপাদান হলো ক্যালসাইট। চুনাপাথর সাধারণত সাদা, হালকা বাদামি বা ধূসর রঙের শক্ত শিলা হিসেবে ভূপৃষ্ঠে উন্মোচিত অবস্থায় উচ্চভূমির সৃষ্টি করে থাকে। চুন তৈরির ক্ষেত্রে চুনাপাথর বহু প্রাচীনকাল থেকেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সিমেন্ট তৈরির মূল উপাদান চুনাপাথর। এ ছাড়া লোহা ও কাগজ শিল্পে চুনাপাথরের ব্যবহার অত্যাবশ্যক। ১৯৫৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যান্ডার্ড ভ্যাকুয়াম অয়েল কোম্পানি বগুড়ায় তেল অনুসন্ধানে কুচমা-৩ কূপ খনন করলে সর্বপ্রথম চুনাপাথর স্তরের সন্ধান পায়।

৬. **কঠিন শিলা (Hard Rock) :** কঠিন শিলা বলতে সাধারণত শক্ত ঘন, আগ্নেয়শিলাকে বোঝায় যা সড়ক, রেলপথ, ব্রিজ, প্রতিরোধ বাঁধ বা গৃহ নির্মাণ এবং নদী শাসন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কাজে ব্যবহারের উপযোগী হয়ে থাকে। বাংলাদেশ মূলত নরম পলিমাটির

দেশ হিসেবে পরিচিত। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা নদীধারা বাহিত পলিজ ও বদ্বীপ সমতল ভূমি এদেশের দুই-তৃতীয়াংশ গঠন করে। পূর্বাংশে উত্তর-দক্ষিণে বিন্যস্ত পাহাড় শ্রেণীও মূলত নরম বা অল্প কঠিন পাললিক শিলা তথা বেলে পাথর ও কাদাশিলা স্তর দিয়ে গঠিত। এদেশে উন্মোচিত কঠিন শিলা দেখতে পাওয়া না গেলেও প্রাক-ক্যামব্রিয়ান কঠিন শিলার বিশাল ভান্ডার রয়েছে বলে গবেষকগণ মতামত প্রকাশ করেন।

৭. **সৈকত বালি ভারি মণিক (Beach Saned Heavy Mineral) :** বালির ভারি মণিক হলো সাধারণ মণিকের তুলনায় বেশি ঘনত্বপূর্ণ মণিক যা বেশি ঘনত্বের কারণে ভারি তরল ব্রোমোফর্ম মাধ্যমে বালি থেকে তলানিরূপে আলাদা হয়ে যায়। ভারি মণিকসমূহের এক বড় অংশ কালো রঙের হওয়ায় এ প্লেসারসমূহ সাধারণত কালো আকারে বিরাজ করে এবং তাদেরকে কালো বালু (Black Sand) নামেও অভিহিত করা হয়। কয়েকটি মূল্যবান ভারি মণিক হলো— ইমেমেনাইট, ম্যাগনেটাইট, রুটাইল, লিউকক্সিন, গারনেট, জিরকন, মোনাজাইট, কায়ানাইট। ১৯৬১ সালে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে তেজস্ক্রিয় মণিকের সন্ধানকালে সেখানে সৈকত বালিতে একাধিক মূল্যবান ভারি মণিকের সন্ধান পাওয়া যায়। এছাড়াও বাংলাদেশের ১৫টি এলাকায় ভারি মণিক প্লেসার মজুদ আবিষ্কার করা হয়। যেগুলো চট্টগ্রাম কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত বরাবর ৭টি, (কক্সবাজার, ইনানী, শিলাখালী, টেকনাফ, সাবরাং, বদর মোকাম) মহেশখালীতে ৭টি, মাতারবারী দ্বীপে ১টি, কুতুবদিয়া দ্বীপে ১টি এবং দক্ষিণ উপকূলে নিঝুপ দ্বীপে ১টি ও কুয়াকাটায় ১টি মজুদ। বাংলাদেশে মোট ভারি মণিকের পরিমাণ প্রায় ৪.৩৫ মিলিয়ন টন।

৮. **চীনামাটি (China Clay) :** চীনামাটি এক ধরনের উন্নত মানের সাদা রঙের কাদা, যার প্রধান উপাদান হলো কেয়োলিনাইট। সিরামিক শিল্পে চীনামাটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বাংলাদেশে ১৯৫৭ সালে নেত্রকোনা জেলার বিজয়পুরে ভূ-পৃষ্ঠে উন্মোচিত চীনামাটি স্তরের আবিষ্কার ঘটে।

৯. **কাচবালি (Glass Sand) :** কাচবালি হলো উন্নতমানের কোয়ার্টজ (quartz) বালি – যা দিয়ে কাচ ও কাচজাতীয় দ্রব্যাদি তৈরি করা হয়। কাচ বালির রাসায়নিক উপাদানে ন্যূনতম ৯৫% সিলিকা (Sioz) থাকা প্রয়োজন। সাধারণত কাচবালিতে ৯৫-৯৮% সিলিকা থাকে।

১০. **ধাতব খনিজ (Metalic Mineral) :** ভূবিজ্ঞানীগণ এমত দেন যে, বাংলাদেশের রানীগঞ্জ, পীরগঞ্জ, কানসাট, গাইবান্ধা, স্থানসমূহে ও কূপ খননের মাধ্যমে স্বল্প গভীরতায় কেলাসিত ভিত শিলার কোন এক পর্যায়ে ধাতবখনিজ তামা, সোনা, সীসা, দস্তা, রুপা, লোহা ও মূল্যবান ধাতব খনিজ পদার্থ পাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশের সিলেট জেলার কুলাউড়া পাহাড়ে ইউরেনিয়াম খনি আবিষ্কৃত হয়েছে।

১১. **ভূগর্ভস্থ পানি (Ground Water) :** বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার ১৫% সমুদ্র উপকূলে বসবাস করে, যেখানে সাধারণভাবে পানি লবণাক্ত। তাই এ অঞ্চলের মানুষ নলকূপ বসিয়ে মাটির গভীর থেকে পানি সংগ্রহ করে। অন্যদিকে শুষ্ক মৌসুমে বাংলাদেশের পানির স্তর স্থানভেদে ৩-১৫ মিটার নিচে নেমে যায়। বর্ষায় পানি থাকলেও শুষ্ক মওসুমে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে পানির অভাব দেখা দেয়। যা সেচ কাজে যথেষ্ট বাধার সম্মুখীন করে। এমতাবস্থায় পাম্পের সাহায্যে মাটির গভীর থেকে পানি উত্তোলন করে সেচ ব্যবস্থা সম্পন্ন করা হয়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

বাংলাদেশের গ্যাসসম্পদের ভবিষ্যৎ : বাংলাদেশের ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিমি ভূখণ্ড এবং ১,১১,৩৩১ বর্গ কিমি সমুদ্রবক্ষ এলাকায় ১৯১৪ সাল থেকে আরম্ভ করে ২০১৪ সাল পর্যন্ত অনুসন্ধান কূপের সংখ্যা ৯০টি অর্থাৎ এ সময়ে প্রতি ২,৬৬৫ বর্গকিলোমিটার এলাকায় মাত্র ১টি করে অনুসন্ধান কূপ খনন করা হয়েছে। বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় অনুসন্ধানের এ হার বা মাত্রা খুবই অপ্রতুল। তথাপি উপরিউক্ত অনুসন্ধান কাজের ফলাফল অনুযায়ী সাফল্যের অনুপাত ৩ : ১ অর্থাৎ প্রতি তিনটি কূপ খননে একটি আবিষ্কার– যা কিনা বিশ্বের গড় সাফল্যের অনুপাতের অধিক। বিশ্বের অন্যতম স্বল্প অনুসন্ধানকৃত অঞ্চল হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশে এ বিপুল পরিমাণ গ্যাসের আবিষ্কার এ অঞ্চলকে অন্যতম প্রাকৃতিক গ্যাস-সমৃদ্ধ অঞ্চল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ভূতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে, এ দেশের ভূগর্ভে আরো প্রচুর গ্যাসের মজুদ থাকার উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে।

বাংলাদেশের তেল সম্পদের ভবিষ্যৎ : বাংলাদেশ ভৌগোলিক দিক থেকে সিলেটের ভাঁজের পাশে আসাম অবস্থিত। আসামের ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য তথা শিলার গঠন, শিলার প্রকৃতি ও ইতিহাস বিশেষ করে এদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মতো। আসাম ইতোমধ্যেই ভারতের তেল সম্পদ সমৃদ্ধ এলাকা হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। বাংলাদেশের সিলেটের হরিপুরে যে তেল পাওয়া যায় তার সাথে আসাম তেলের যথেষ্ট মিল রয়েছে। কাজেই আসামের মতোই সিলেটেও একাধিক স্তরে তেলের সন্ধান পাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

তাছাড়া ফেঞ্চুগঞ্জ-৩, কৈলাশটিলা-২ কূপে খনিজ তেলের সন্ধান পাওয়া গেলেও কারিগরি জটিলতার কারণে তার পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। কাজেই অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাদপদ বাংলাদেশকে কারিগরিভাবে উন্নত হতে হলে প্রয়োজন দেশীয় ও বিদেশি কোম্পানির সাথে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে যৌথ দরকষাকষি করে জাতীয় স্বার্থ-অক্ষুণ্ন রেখে কারিগরি উন্নয়ন ঘটানো। যাতে ভবিষ্যৎ তেলের মজুদ সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়।

অন্যদিকে সিলেটের হারারগঞ্জ, পাথরিয়া, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড ও উথানছত্র নামক স্থানে তেলের বিন্দু আকারের ঝরনার সন্ধান লাভ বাংলাদেশের ভূগর্ভে তেল থাকার সমূহ সম্ভাবনা উজ্জ্বল করে দিয়েছে।

এদেশে খননকৃত একাধিক কূপ জলদিত, রশিদপুর-২, হাজিরপুর-১, তেলের চিহ্ন লক্ষ্য করা গেছে। ভূতাত্ত্বিকগণের ধারণা বাংলাদেশের ভূগর্ভে একাধিক স্থানে তেলের অপার সম্ভাবনা রয়েছে— যা আদৌ অমূলক নয়। কাজেই ভবিষ্যৎ জ্বালানি চাহিদা পূরণে, আমদানি ব্যয় হ্রাসে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো পর্যাপ্ত মাত্রায় তেল অনুসন্ধানের আশু উদ্যোগ নেয়া জরুরি।

বাংলাদেশের কয়লা সম্পদের ভবিষ্যৎ : এক সময় কয়লাই ছিল জ্বালানির প্রধান উৎস। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যে তেল আবিষ্কারের সাথে সাথে কয়লার ব্যবহার কমতে থাকে। তাই বলে এর মূল্য কোন অংশেই কম নয়। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে জ্বালানির উত্তরোত্তর ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় অদূর ভবিষ্যতে গ্যাস ও তেল ঘাটতি দেখা দেবে। যেহেতু এখন পর্যন্ত গ্যাস ও প্রাকৃতিক তেলের বিকল্প জ্বালানি আবিষ্কৃত হয়নি এবং এর বিকল্প হিসেবে যে সৌরশক্তি, বায়ু শক্তি ও জৈব শক্তির কথা বলা হয় তাও অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং এর ক্ষমতা অনেক ক্ষীণ। তাই হয়তো মানুষের প্রয়োজনে পূর্বের কয়লার কাছেই ফিরে আসতে হবে।

বাংলাদেশে এ পর্যন্ত যে ৬টি কয়লাখনি আবিষ্কৃত হয়েছে তা আশাপ্রদ নয়। ১৮২৯ সালে বিশেষজ্ঞগণ এদেশে কয়লা থাকার উজ্জ্বল সম্ভাবনার কথা বললেও সরকার এদিকে তেমন মনোযোগী নয়। যে

কোম্পানিকে অনুসন্ধানের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে তার গতিও কচ্ছপ প্রকৃতির। প্রাকৃতিক জ্বালানি হিসেবে কয়লাকে ব্যবহার করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে দেশের অপ্রতুল প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার করা যেতে পারে।

বাংলাদেশের পীট সম্পদের ভবিষ্যৎ : কয়লার প্রাথমিক অবস্থা পীট সম্পদ সাধারণত বিল এলাকায় ভূগর্ভে থাকার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। হাওড়, বাওড় নিয়ে গঠিত বাংলাদেশ। বাংলাদেশের মাটির অধিকাংশ পলল সমভূমি। তাই এ পলল মাটিতে বিশেষ করে বরিশাল, বরগুনা, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, মাদারিপুর, শরীয়তপুর, ফরিদপুর অঞ্চলে পীট সম্পদ থাকার অপার সম্ভাবনা রয়েছে। পীট সম্পদ যেহেতু ভূপৃষ্ঠের স্বল্প গভীরে থাকে। তাই তা অনুসন্ধান যথেষ্ট ব্যয়বহুল নয়। পীটকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে রপ্তানি করে আয় করা যায় বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা —যা দেশের অর্থনীতির ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ বা সহায়ক ভূমিকা পালনে সক্ষম।

বাংলাদেশের কঠিন শিলার ভবিষ্যৎ : ভূতাত্ত্বিকগণ বাংলাদেশের মাটির গঠন বিন্যাস বিশ্লেষণ করে বলেন যে, এদেশে মূলত নরম পলি মাটির দেশ। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা নদীর ধারা বাহিত পলিজ ও বদ্বীপ সমতল ভূমি এদেশের দুই-তৃতীয়াংশ গঠন করেছে। পূর্বাংশে উত্তর-দক্ষিণে বিন্যস্ত পাহাড় শ্রেণীও মূলত নরম ও অল্প কঠিন পাললিক শিলা তথা বেলে পাথর ও কাদামাটি স্তর দিয়ে গঠিত। এদেশে উন্মোচিত কঠিন শিলা পাওয়া না গেলেও প্রাক-ক্যামব্রিয়ান কঠিন শিলার বিশাল ভাণ্ডার থাকার উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে।

বাংলাদেশের সৈকত বালি ভারি মণিক ও ভবিষ্যৎ : বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত বাংলাদেশে অবস্থিত। একই সাথে সূর্য উদয় ও অস্ত দেখা যায় কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত থেকে। বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী বাংলাদেশে জালের মতো ছড়িয়ে আছে অসংখ্য নদ-নদী। সমুদ্র তীরের বালুর মধ্যে রয়েছে অসংখ্য ইলমেনাইট, গারনেট, জিরকন, লিউকক্সিন, কায়ানাইট, রিউটাল, ম্যাগনেটাইট, মোনাজাইট জাতীয় প্রাকৃতিক মহা মূল্যবান সম্পদ। বাংলাদেশে মোট সৈকত বালি ভারি মণিকের পরিমাণ প্রায় ৪.৩৫ মিলিয়ন টন। যা বাংলাদেশের উজ্জ্বল সম্ভাবনার বহির্প্রকাশ। বাংলাদেশ সরকার এ প্রাকৃতিক সম্পদকে অনায়াসে দেশের উন্নয়নের জন্য লাগাতে পারে এবং প্রয়োজনে দেশীয় প্রয়োজন মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি করতে পারে।

উপসংহার : উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, প্রকৃতির লীলা বৈচিত্র্যের এ বাংলাদেশ বিশ্বমানচিত্রে ৯০তম স্থান দখল করে একটি ক্ষুদ্র অংশ নিয়ে অবস্থান করছে। এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত খনিজ সম্পদসমূহ বাংলাদেশের ১৫ কোটি ৫৮ লাখ মানুষের জন্য যথেষ্ট নয়। তবে এ দেশে যথেষ্ট খনিজ সম্পদ প্রাপ্তির অপার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই বাংলাদেশ সরকারের উচিত দেশের প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটদের মধ্য থেকে মেধাবী, তরুণ, যোগ্যতাসম্পন্নদেরকে বেছে নিয়ে আন্তর্জাতিকভাবে উচ্চতর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে পেট্রোবাংলা ও বাপেক্স খনিজ সম্পদ অনুসন্ধানও আহরণে নেতৃত্ব দানের সুযোগ করে দেয়া এবং খনিজ সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করা।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

১৩ ॥ বাংলাদেশে কয়লা শক্তির মজুদের বিস্তারিত বিবরণ দিন। এ প্রসঙ্গে কয়লার ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করুন।

উত্তর : কয়লা শক্তির অন্যতম উৎস। কয়লা সম্পদে বাংলাদেশ তত উন্নত নয়। এদেশের উত্তরবঙ্গ কয়লা সম্পদে সমৃদ্ধ। ১৮২৯ সালে ব্রিটিশ ভূতত্ত্ববিদ রুপার্ট জোনস ও ১৮৫৬ সালে ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক এফ. ম্যালেট এদেশের ভূগর্ভে কয়লা সম্পদ মজুদের সমূহ সম্ভাবনার কথা বললেও ১৯৫৯ সালে সর্বপ্রথম আমেরিকার স্ট্যান্ডার্ড ভ্যাকুয়াম অয়েল কোম্পানি বগুড়ায় তেল অনুসন্ধান কাজে একটি গভীর কূপ কুচমা-১ খননকালে ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ২৩৮০ মিটার নিচে পুরু কয়লা স্তরের সন্ধান পায়। ১৯৬১ সালে জাতিসংঘের আর্থিক সহায়তায় ইউএন-পাক মিনারেল সার্ভে নামে এক অনুসন্ধান প্রকল্প জয়পুরহাটে (বগুড়া) ১০টি অনুসন্ধান কূপ খনন করলে ১৯৬২ সালে জামালগঞ্জের পাহাড়পুর এলাকায় ভূপৃষ্ঠের ৬৪০ মিটার থেকে ১১৫৮ মিটার নিচে বিরাট কয়লার মজুদ আবিষ্কৃত হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৫ সালে দিনাজপুরে ১১৮ থেকে ৫০ মিটার গভীরে, ১৯৮৯ সালে রংপুর জেলার খালাশপীরের ২৫৭-৪৫০ মিটার গভীরে, ১৯৯৫ সালে দিনাজপুরের দীঘিপাড়ায় ২৫০ মিটার গভীরতায় কয়লার খনি আবিষ্কৃত হয়।

কয়লা বিভিন্ন প্রকৃতির রয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে উন্নত মানের হচ্ছে বিটুমিন জাতীয় কয়লা। বাংলাদেশের দিনাজপুরের দীঘিপাড়া ও ফুলবাড়িতে সর্বোৎকৃষ্ট এ বিটুমিন জাতীয় কয়লার সন্ধান পাওয়া গেছে। যদিও বাংলাদেশ কয়লা সম্পদে সমৃদ্ধ নয়। তাছাড়া তেল ও গ্যাস আবিষ্কারের পূর্বে কয়লাই ছিল একমাত্র জ্বালানি। কিন্তু তেল, গ্যাস আবিষ্কৃত হওয়ায় এর গুরুত্ব কিছুটা হলেও হ্রাস পেয়েছে।

১৯৯৪ সালের আগস্ট মাসে সম্পাদিত এক চুক্তি অনুযায়ী অস্ট্রেলিয়াভিত্তিক ব্রোকেনহিল প্রপাইলট ইন্টারন্যাশনাল (BHP)-কে বাংলাদেশের রংপুর-দিনাজপুর এলাকায় কয়েকটি ব্লক ইজারা দেয় এবং কয়লা অনুসন্ধানে নিয়োজিত করে।

কয়লার ব্যবহার : সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বে দিন দিন তেল ও গ্যাসের চাহিদা উন্নত, উন্নয়নশীল সব দেশেই ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। ফলে বিশ্ব বাজারে তেলের সরবরাহের চেয়ে চাহিদা বেশি হওয়ায় তেলের মূল্য দিন দিন বেড়েই চলেছে পাগলা ঘোড়ার মতো। কিন্তু এ তেল সম্পদ চিরস্থায়ী নয়। এর আবিষ্কার যেমন আছে এর নিঃশেষও আছে। এভাবে তেল, গ্যাস ব্যবহার করতে করতে একদিন তা ফুরাবেই। তাই মানুষকে ফিরে আসতে হবে অতীতের কয়লার কাছে। এদিক থেকে কয়লার গুরুত্ব তাৎপর্যবহ।

১. **জ্বালানি হিসেবে :** পরিসংখ্যান অনুযায়ী, প্রতিবছর বিশ্বে ৫৮শ মিলিয়ন টন কয়লা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এর মধ্যে ৭৫% ব্যবহৃত হয় বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে। চীন, ভারতসহ এ অঞ্চলের দেশগুলোতে বছরে ১৭শ মিলিয়ন টন কয়লা ব্যবহৃত হচ্ছে। ধারণা করা হয়, ২০২৫ সাল নাগাদ এর পরিমাণ ৩ হাজার মিলিয়ন টনে গিয়ে দাঁড়াবে। বাংলাদেশে ২০০/৩০০ কোটি মেট্রিক টন কয়লা মজুদ রয়েছে। যা দিয়ে বাংলাদেশ বর্তমানে তার অন্যতম সমস্যা বিদ্যুৎ ঘাটতি পূরণ করতে পারে। বাংলাদেশে মাত্র ৬২ ভাগ লোক বিদ্যুৎ সুবিধা ভোগ করে। আমাদের দেশে বর্তমানে ৭৪.৭০ শতাংশ গ্যাস খরচ হয় বিদ্যুৎ উৎপাদনে। বড়পুকুরিয়া কয়লা খনিটি বাংলাদেশের প্রথম এবং বর্তমানে চালু থাকা একমাত্র কয়লা খনি। বড়পুকুরিয়ায় কয়লা খনির পাশে কয়লানির্ভর ২৫০-৩৭৬ মেগাওয়াট তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। পরিকল্পনা

অনুযায়ী বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি হতে আহরিত শতকরা ৬৫ ভাগ কয়লা ২৫০ মেগাওয়াটের তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ব্যবহার করা হবে। এভাবে দেশের অন্য ৬টি কয়লা খনি থেকে কয়লা উৎপাদন শুরু করে বিদ্যুৎ তৈরিতে ব্যবহার করে গ্যাসের ওপর বিদ্যুৎ উৎপাদনের চাপ হ্রাস করা যেতে পারে।

২. **শিল্পায়নে :** বর্তমান বিশ্ব রেনেসাঁ-পরবর্তী খুব দ্রুত শিল্পের দিকে ধাবিত হয়ে বর্তমান স্তরে এসে পৌঁছেছে। আর এ অবস্থায় পৌঁছানোর পেছনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত অষ্টাদশ শতাব্দীর শিল্প বিপ্লব। শিল্পক্ষেত্রে গ্যাসের চাহিদা হ্রাস করে বিকল্প হিসেবে কয়লা ব্যবহার করা যেতে পারে। এর ফলে পরিবেশ দূষণও অনেকটা হ্রাস পাবে বলে আশা করা যায়।

৩. **পারিবারিক কাজে :** অনেক আগে যখন গ্যাস আবিষ্কৃত হয়নি তখন মানুষ গৃহস্থালির কাজে কয়লাকেই ব্যবহার করেছে। এখনো শীতপ্রধান দেশে বৈদ্যুতিক হিটারের পাশাপাশি ঘর উষ্ণ রাখতে কয়লার আগুন জ্বালানো হয়। বর্তমানে পাইপ লাইনের মাধ্যমে যেসব শহরে গ্যাস সরবরাহ করা যায় না, সেখানে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে ও রান্না ঘরে জ্বালানি কাজে এলপিজি-এর ব্যবহার পরিবর্তন করে কয়লার ব্যবহার জনপ্রিয় করে তোলা যেতে পারে।

৪. **যানবাহনে :** একসময়ে যানবাহন চলতো কয়লার সাহায্যে। কিন্তু প্রাকৃতিক গ্যাস আবিষ্কৃত হওয়ায় এর চাহিদা ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে। কিন্তু দিন দিন গ্যাসের অত্যধিক ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রাকৃতিক গ্যাসও নিঃশেষ হয়ে যাবে। ধারণা হয় ২০৫০-৭০ সালের মধ্যে পৃথিবী গ্যাসশূন্য হবে। গ্যাসের বিকল্প হিসেবে বিজ্ঞানীরা যথেষ্ট গবেষণা করে যাচ্ছেন আবিষ্কার করার জন্য। কিন্তু এখন পর্যন্ত তেমন কোনো বিকল্প পাওয়া যায়নি। যা পাওয়া গেছে তাও অত্যন্ত ব্যয়বহুল। তাই ভবিষ্যতে পুনরায় যানবাহন চলাচলে হয়তো পৃথিবীকে কয়লার কাছেই পুনরায় প্রত্যাবর্তন করতে হতে পারে। কাজেই এ ধারণাকে অমূলক বলে উড়িয়ে দেয়া যায় না।

৫. **বনাঞ্চল উজাড় রক্ষায় :** জ্বালানি হিসেবে কাঠ ব্যবহৃত হলে এতদিনে বাংলাদেশের স্বল্প বনাঞ্চল উজাড় হয়ে যেত যদি না গ্যাস ব্যবহৃত হতো। এমনিতেই সরকারি হিসেবে দেশে মোট আয়তনের মাত্র ১৭% বনভূমি রয়েছে, যা পরিবেশ রক্ষার জন্য অনুকূল নয়। তাই গ্যাসের পাশাপাশি কয়লা ব্যবহার করে জ্বালানির চাহিদা মেটানো যেতে পারে।

৬. **কয়লা থেকে গ্যাস উৎপাদনে :** কয়লাকে 'শিল্পবিপ্লবের জ্বালানি' বলা হয়। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলো প্রথমদিকে কয়লাকে অধিক হারে ব্যবহার করেছে। রান্না করা ও ঘর গরম করার জন্য পর্যায়ক্রমে কয়লার পরিবর্তে কয়লা থেকে তৈরি করা গ্যাস-এর ব্যবহার শুরু করে। কয়লা থেকে গ্যাস উৎপাদন করতে গিয়ে নানা ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদন শুরু করে। কয়লা উত্তোলন, প্রসেসিং, পরিবহন ও ব্যবহার মিলে আলাদা শিল্প হিসেবে কয়লা শিল্প গড়ে ওঠে এবং লক্ষ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হয়। এভাবে কয়লাকে গ্যাসে রূপান্তরিত করার প্রযুক্তির প্রচলন করা হয়।

৭. **পরিবেশ রক্ষায় :** যদিও কয়লা কার্বন ডাই-অক্সাইড তৈরি করে যা পরিবেশের জন্য হুমকিস্বরূপ। তবুও এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, কয়লা ব্যবহারকালীন বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের পরিমাণ ছিল ০.০২৮% যা বেড়ে ১৯৯৪ সালে হয়েছে ০.০৩৫৮%। এর ফলে গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিসহ পরিবেশ বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে। যা কয়লা ব্যবহারকালীন ছিল না। কাজেই প্রযুক্তির উৎকর্ষতার দ্বারা গ্যাস অপেক্ষা কয়লাকে আরো শোধন করে পরিবেশ দূষণ রোধে কয়লার ব্যবহার বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৮. **ইটের ভাটা পোড়াতে :** দালানকোঠা, রাস্তাঘাট তৈরিতে যে ইট তৈরি করা হয় তাতে গাছ কেটে পোড়ানো হয়, গ্যাস ব্যবহার করা হয়। গাছ কাটা রোধ করে, গ্যাস ব্যবহার হ্রাস করে কয়লা পুড়িয়ে ইট তৈরি করা যেতে পারে।

৯. **সার উৎপাদনে :** বাংলাদেশে সার উৎপাদনে প্রচুর গ্যাস ব্যবহার করা হয়। দেশের সার কারখানাগুলোতে বার্ষিক গ্যাসের চাহিদা ৯০,৯৭০ মিলিয়ন ঘনফুট। এক্ষেত্রে গ্যাসের পরিবর্তে কয়লা ব্যবহার করে সার উৎপাদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা যেতে পারে। এতে করে গ্যাসের ওপর যে চাপ তা বহুলাংশে হ্রাস পাবে।

১০. **রপ্তানি বাণিজ্যে :** বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ৬টি কয়লা খনি আবিষ্কৃত হয়েছে। ভূতাত্ত্বিকরা ধারণা করছেন বাংলাদেশে আরো কয়লার খনি রয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশে এ পর্যন্ত প্রাপ্ত কয়লা খনির মধ্যে মাত্র একটি কয়লা খনি থেকে কয়লা উত্তোলন শুরু হলে বাংলাদেশ তার অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ করে বিদেশে রপ্তানি করতে পারবে। এভাবে বাংলাদেশ কয়লা রপ্তানি করে প্রতিবছর প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারে। বাংলাদেশের কয়লা আমদানিতে ইতোমধ্যে ভারত এগিয়ে এসেছে। আমদানি শুরু করলে আরো অনেক দেশ এগিয়ে আসবে। যা বাংলাদেশের কয়লা সম্পদকে আরো মূল্যবান করে তুলবে।

১১. **কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে :** বাংলাদেশে বর্তমানে শিক্ষিত-অশিক্ষিত ৩ কোটি লোক বেকার রয়েছে। প্রতিবছর যে পরিমাণ লোক কর্মক্ষম হচ্ছে সে পরিমাণ কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাচ্ছে না। তাই কয়লা খনি থেকে কয়লা উত্তোলন শুরু হলে অনেক লোকের কর্মসংস্থান হবে। যা দেশের বিপুল বেকার জনগোষ্ঠীর অন্তত কিছু অংশের বেকারত্ব লাঘব করবে।

উপসংহার : কোনো দেশের অর্থনীতিতে নির্ধারক শক্তি হিসেবে খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য ও তার সার্থক ব্যবহার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। খনিজ সম্পদের পর্যাপ্ততা বাংলাদেশে না থাকলেও বিশেষ ক্ষেত্রে যে খনিজ সম্পদ রয়েছে তা আহরণ করে সার্থকভাবে ব্যবহার করতে পারলে অর্থনৈতিক উন্নয়নে বহুলাংশে সহায়ক হবে তা সুনিশ্চিত। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত প্রাপ্ত খনিজ সম্পদের মধ্যে প্রাকৃতিক গ্যাসের পর তিনটি প্রধান ফসিল ফুয়েলের মধ্যে কয়লার স্থান দ্বিতীয়। দেশে এ পর্যন্ত ৫টি কয়লা খনি আবিষ্কৃত হয়েছে, যার মাত্র একটিতে উত্তোলন কার্য অব্যাহত রয়েছে। বাকি ৪টিতে উত্তোলন কার্যক্রম শুরু করলে বাংলাদেশ তার অভ্যন্তরীণ সংকট মোচনের পাশাপাশি সরকারি আয় বৃদ্ধি করতে পারবে। যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করবে।

১৪ ॥ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে সরকারের ভর্তুকি কি অব্যাহত রাখা উচিত? নাকি আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে মূল্যের সমন্বয় করা উচিত? আপনার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দিন।

উত্তর : জ্বালানি তেল বা গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি অত্যন্ত স্পর্শকাতর একটি বিষয়। গণতান্ত্রিক সরকারগুলো বেশির ভাগ সময়ই এ ব্যাপারে দ্বিধাদ্বন্দ্বে থাকে। অন্যদিকে, জনগণও মনে করে, সস্তায় এসব পাওয়াটা অনেকটা তাদের অধিকার। অর্থাৎ সরকারকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছে, কাজেই সরকারকে কমদামে জ্বালানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস ইত্যাদি দিয়ে যেতে হবে। অনেক সময় দেখা যায়, বাসাবাড়িতে দিয়াশলাইয়ের একটি কাঠির খরচ বাঁচাতে সারা দিন গ্যাসের চুলা জ্বালিয়ে রেখে গ্যাসের অপচয় করা হয়। তারপরও তারা মনে করে এটা কম দামেই তাদের দিতে হবে।

জ্বালানি খাতে ভর্তুকির বাস্তবতা : শুধু বাংলাদেশে নয়, ভারত কিংবা পাকিস্তানেও কম বেশি একই প্রবণতা দেখা যায়। জ্বালানি তেল বা গ্যাসের দাম বাড়ালেই বিক্ষুব্ধ জনতা রাস্তায় নেমে আসে।

অর্থাৎ সেবা বা সেবা-পণ্যের দাম বৃদ্ধিকে তারা সহজে মেনে নিতে পারে না। কেউ কেউ আবার যুক্তিও দিয়ে থাকেন, সরকার অন্যান্য জায়গায় ভর্তুকি দিতে গিয়ে জ্বালানির দাম বাড়াচ্ছে, এটা উচিত নয়। সরকার কেন অন্যদিকে ভর্তুকি কমিয়ে জ্বালানি তেলের ভর্তুকি বাড়াচ্ছে না-তা নিয়েও অনেকে প্রশ্ন তোলেন। অনেক অর্থনীতিবিদ বলে থাকেন ভর্তুকি না কমিয়ে অর্থনীতি ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বাড়িয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া উচিত। বেশির ভাগের যুক্তি হলো, জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির ফলে পণ্য পরিবহনের খরচ বাড়বে এবং বাজার আরও অস্থিতিশীল হবে। এসব যুক্তির যে ভিত্তি নেই, তা বলা যাবে না। কিন্তু ভর্তুকি কোনটা রাখা হবে, কতটুকু রাখা হবে অথবা কোন ক্ষেত্রে ভর্তুকি রাখা বেশি জরুরি সেগুলো নিয়ে অনেক বিতর্ক করা যায়। তবে, যারা সরকার চালান, তাদের অবশ্য সরকারের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনাকে গতিশীল রাখার ওপর অনেক বেশি গুরুত্ব আরোপ করতে হয়। সরকারের আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হয়। সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয় সাধারণ জনগণের সামগ্রিক স্বার্থ রক্ষার প্রতি।

বাংলাদেশের জ্বালানি চাহিদা এবং ভর্তুকি : আমাদের দেশে জনসংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। জনসংখ্যার অনুপাতে প্রতিটি দ্রব্যের চাহিদাও বাড়ছে। মানুষের মাথাপিছু আয় বাড়ছে এবং সেই সঙ্গে শুধু নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য নয়, বিলাসদ্রব্যের চাহিদাও বাড়ছে। রাস্তায় এখন প্রতিদিনই নতুন নতুন মডেলের গাড়ি নামছে। আবার মানুষের সঞ্চয় বাড়ছে, উদ্যোক্তা বাড়ছে, বিনিয়োগ বাড়ছে, নতুন নতুন কল-কারখানা হচ্ছে। আর এসবের সঙ্গে সঙ্গে জ্বালানির চাহিদাও অনেক বেড়ে যাচ্ছে। যেমন ২০১১ সালে আমরা বাইরে থেকে জ্বালানি এনেছিলাম ৩৮ লাখ মেট্রিক টন। আমরা সাধারণত জ্বালনি তেল আনি কুয়েত, সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে। আবার কিছু পরিমাণ তেল আনি মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুর থেকে। অতীতে আমাদের আমদানি করা জ্বালানি তেলের একটি বড় অংশই ছিল ক্রুড বা অপরিশোধিত জ্বালানি তেল, যেগুলো আমাদের রিফাইনারিতে পরিশোধনের পর বাজারে ছাড়া হতো। কিন্তু আমাদের রিফাইনারির পরিশোধন ক্ষমতা সীমিত হওয়ায় এবং জ্বালানি তেলের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় আমাদের এখন পরিশোধিত তেল বেশি করে আমদানি করতে হচ্ছে। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি) দেশের চাহিদা অনুযায়ী প্রতি বছরই পরিশোধিত ও অপরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানি করে থাকে। ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে বিপিসির সাময়িক লোকসান ছিল ৫৩৬৮ কোটি টাকা। এবং একই বছরে সরকার বিপিসিকে ভর্তুকি দিয়েছিল ১৩,৫৫৮ কোটি টাকা। কিন্তু বর্তমানে অর্থাৎ ২০১৪-১৫ অর্থবছরে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের দাম হ্রাস পাওয়ায় বিপিসির লাভ হবে অন্তত ২০০০ কোটি টাকা। ফলে ভর্তুকিও এ খাতে কমবে।

ভর্তুকির বিপরীতে আন্তর্জাতিক মূল্যের সাথে সমন্বয় সাধনের যৌক্তিকতা : ১৯৯১ সাল থেকেই উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে বাংলাদেশ একটি অর্থনৈতিক নীতিমালা গ্রহণ করে। সেটি হচ্ছে, বাজেট ঘাটতি পাঁচ শতাংশের মধ্যে সীমিত রাখা। সেটি আমরা মোটামুটিভাবে রক্ষা করে এসেছি। আর সে কারণেই বলা যায়, গত বিশ্বমন্দার সময়ও বাংলাদেশ তার প্রবৃদ্ধির হার ধরে রাখতে পেরেছিল। এখন যেহেতু আমাদের জ্বালানি তেলের চাহিদা অনেক বেড়ে গিয়েছে, তাই মোট ভর্তুকির পরিমাণও অনেক বেড়ে গিয়েছে। বলা যায়, এক্ষেত্রে এই ভর্তুকি রীতিমতো এক মহীরুহে পরিণত হয়েছে। কিন্তু আমরা একই সাথে আমাদের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকেও এগিয়ে নিতে চাই। আমরা আমাদের দারিদ্র্য বিমোচনকে ত্বরান্বিত করতে চাই। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবাকে শক্তিশালী করতে চাই, পদ্মা সেতু, ঢাকা-চট্টগ্রাম দ্বৈত লেন, মেট্রো রেলের মতো অবকাঠামো উন্নয়নে হাত দিতে চাই।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

এখন আমরা স্বাভাবিকভাবেই উন্নয়ন সহযোগীদের দ্বারস্থ হই। তারা তখন আমাদের ভর্তুকির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলে, এত ভর্তুকি রেখে তোমরা এগুবে কী করে? তাদের কথা না হয় বাদই দিলাম। কিন্তু আমাদের তো বিদ্যুতের যে ভয়াবহ সংকট তা থেকে উত্তরণ ঘটাতেই হবে। এখন পিডিবির কী অবস্থা? বেসরকারি খাতের ছোট ছোট স্টেশন থেকে তারা অনেক বেশি দামে বিদ্যুৎ কিনে কম দামে গ্রাহকদের সরবরাহ করার মাধ্যমে আপাতত সংকট মিটাচ্ছে। এর ফলে পিডিবিকে বিরাট লোকসান দিতে হচ্ছে, অর্থাৎ এখানেও ভর্তুকি দিতে হচ্ছে। পিডিবি এখন একটি বিরাট দেনাগ্রস্থ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। কিন্তু দেশে শিল্পায়নসহ উন্নয়নের স্বার্থে আমাদের বড় বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা প্রয়োজন। কিন্তু দেনাগ্রস্ত পিডিবির সঙ্গে বিদেশী সংস্থাগুলো বড় বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের চুক্তি করতে আগ্রহী হবে কি? বিপিসির ভর্তুকি, পিডিবির ভর্তুকি, বিএডিসির ভর্তুকি ইত্যাদি মিলে বাজেটে ২.৩ শতাংশ প্রাক্কলিত ভর্তুকি দাঁড়িয়েছে বাজেটের প্রায় ৫ শতাংশের কাছাকাছি। এ বিরাট ঘাটতি মোকাবেলা করার জন্য একমাত্র খোলা পথ হচ্ছে কাগজের নোট ছাপিয়ে মুদ্রা সরবরাহ বাড়ানো। যা সাথে সাথে মূল্যস্ফীতিতে আগুনের মতো প্রভাব সৃষ্টি করবে। অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা হবে ভেঙে পড়ার মতো।

সরকারের একটি মূল লক্ষ্য হচ্ছে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এজন্য কৃষিখাতেও প্রচুর ভর্তুকি দিতে হচ্ছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে আমাদের বাজেটের একটি বড় অংশই বিভিন্ন খাতে ভর্তুকি হিসেবে চলে যায়। যেমন কৃষি খাতে সারের জন্য, কীটনাশকের জন্য, বীজের জন্য একটি বড় ভর্তুকি যায়, খাদ্যঘাটতি মোকাবেলা করতে কিংবা ন্যূনতম বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে প্রচুর টাকা চলে যায়, আবার প্রাকৃতিক দুর্যোগের দেশ হিসেবে দুর্যোগ মোকাবেলায়ও প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। এমনি আরও অনেক খাতেই আমাদের ভর্তুকি দিয়ে যেতে হয়। এজন্য একটি উপায় হতে পারে যে আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে আমরা আমাদের জ্বালানি তেলের দাম নির্ধারণ করব। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বেড়ে গেলে আমরা দেশের বাজারে দাম বাড়িয়ে দেব, আবার আন্তর্জাতিক বাজারে দাম কমে গেলে দাম কমিয়ে দেব। জ্বালানি তেলের দাম নির্ধারণের এই পদ্ধতিটিই যুক্তিযুক্ত। পাশাপাশি আমাদের আরও একটি কথা মনে রাখতে হবে, ইতোমধ্যে ডলারের বিপরীতে আমাদের টাকারও অবমূল্যায়ন হয়েছে। কাজেই আগের দাম বহাল থাকলে প্রকৃত ঘাটতির পরিমাণ আরও বেড়ে যাবে। অনেকে এর ফলে ব্যাপক মূল্যস্ফীতির আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। সেই আশঙ্কা মোটেও অযৌক্তিক নয়। সামগ্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা রক্ষা করা। এটি না করা গেলে আমরা আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ধরে রাখতে ব্যর্থ হব।

লাভজনক খাতে ভর্তুকি প্রদান : আবার ভর্তুকি প্রদানের ক্ষেত্রেও আমাদের অগ্রাধিকার নির্ণয় করতে হবে। অর্থাৎ কোন খাতে ভর্তুকি দিলে তা বিনিময়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নে বেশি সহযোগিতা করবে সেই খাতগুলো নির্ধারণ করতে হবে। অর্থাৎ রাষ্ট্রকে দেখতে হবে, কেউ দামি গাড়ি চালাবে, তাকে অকটেনে ভর্তুকি দিলে রাষ্ট্রের বেশি লাভ হবে, নাকি দরিদ্র কৃষককে সারে ভর্তুকি দিলে বেশি লাভ হবে। সেভাবেই আমাদের ভর্তুকির খাতগুলো বিবেচনা করতে হবে। কাজেই জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধিকে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিবেচনা না করে সামষ্টিক অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকেই বিবেচনা করতে হবে। সামগ্রিক ভর্তুকিকে একটি নির্দিষ্ট সীমায় রাখা অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনারই একটি অংশ। বর্তমান ৫ শতাংশে ভর্তুকি প্রায় আমাদের উন্নয়ন বাজেটের সমান যা যে কোনো ভবিষ্যতমুখী উন্নয়নশীল দেশের জন্য মোটেও সুখকর নয়। আমাদের উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন বাদ রেখে বিপিসি, পিডিবি এমনকি কৃষিখাতেও প্রাক্কলিত ভর্তুকির বেশি টাকা ব্যয় করাটা সমীচীন নয়। অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার দক্ষতা

বৃদ্ধি যেমন প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার জন্য ব্যাপক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও যথাসময়ে সেগুলোর বাস্তবায়ন। সমগ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন ব্যতিরেকে দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। কিছু সংখ্যক শহুরে মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্তকে ভর্তুকির টাকা পাইয়ে দিয়ে উন্নয়নকে গতিশীল বা দীর্ঘস্থায়ী করা সম্ভব নয় কিংবা সামাজিক ন্যায়বিচার বিবেচনায় উচিতও নয়। বরং আমরা চাই সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি হোক এবং মাঠ পর্যায়ে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনাকে আরও দক্ষ এবং দুর্নীতিমুক্ত করে সেই নিরাপত্তা বেষ্টনী সত্যিকার অর্থেই অবহেলিত জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে কাজে লাগানো হোক। আর প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে জবাবদিহিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে তা আরও বেশি জনকল্যাণমুখী এবং সকল বিতর্কের উর্ধ্বে স্থান দেওয়া হোক। ভারত ২০১১ সালে ১১ বার জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি করেছে, সেই সাথে অবকাঠামো খাতে সকল বাধা দূর করে একটি ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির জন্যও দেশটির সরকার বদ্ধপরিকর। বাংলাদেশ তার ব্যতিক্রম হতে পারে না।

উপসংহার : বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি দরিদ্র দেশ। ঘাটতি বাজেট এ দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এদেশকে প্রতিবছরই বিভিন্ন দেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য, জ্বালানিসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী আমদানি করতে হয়। বিশেষ করে, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার বিদ্যুৎ ও জ্বালানি চাহিদা মেটাতে দেশটিকে উল্লিখিত খাতে প্রচুর পরিমাণে ভর্তুকি দিতে হয়। গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে জনগণের ন্যূনতম চাহিদা পূরণ না করে সরকারের উপায় নেই। কিন্তু অত্যধিক পরিমাণে ভর্তুকি দেশের অর্থনীতিকে ধ্বংস করে দিতে পারে। তাই সরকারের উচিত প্রকৃত জনস্বার্থে লাভজনক খাতে ভর্তুকি প্রদান এবং সেই সাথে আন্তর্জাতিক বাজারের জ্বালানি ও বিদ্যুতের দামের সাথে অভ্যন্তরীণ দামের কিছুটা হলেও সমন্বয় সাধন।

১৫ ▮ বিকল্প জ্বালানি হিসেবে বাংলাদেশে জৈবগ্যাস প্রযুক্তির সম্ভাবনা ও সুবিধা পর্যালোচনা করুন।

উত্তর : বাংলাদেশ জনবহুল দেশ। মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলো এখানে প্রতিনিয়ত হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। তাই প্রয়োজন অনুযায়ী মানুষ তাদের চাহিদা পূরণ করতে পারে না। প্রায় সবসময় জনগণের চাহিদা অনুযায়ী যোগান ঘাটতির এ প্রভাব বর্তমানে পরিলক্ষিত হচ্ছে জ্বালানি ক্ষেত্রেও। এ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে বর্তমানে বাংলাদেশে বিকল্প জ্বালানি হিসেবে জৈবগ্যাস প্রযুক্তির প্রসার ঘটানো প্রয়োজন।

জ্বালানি উৎস : আধুনিক যুগের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশের শহর এলাকাগুলোতে রান্নার জ্বালানি হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশের শতকরা ১৪ ভাগ মানুষ শুধু এ গ্যাস সুবিধা পাচ্ছে। গ্রামের বৃহৎ জনগোষ্ঠী এ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এছাড়া দেশে বর্তমানে যে পরিমাণ উত্তোলনযোগ্য প্রাকৃতিক গ্যাস আছে তাতে গ্যাস ঘাটতি দেখা দেবে আগামী ৩০ বছরের মধ্যেই। তাই এখন থেকেই জ্বালানি হিসেবে বিকল্প পথ তৈরি করে নিতে হবে দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে। বাংলাদেশে সনাতন জ্বালানিশক্তির উৎসগুলো অর্থাৎ শস্য অবশেষ (৪০.৯%), গোবর (১৪.৩%) এবং জ্বালানি কাঠ (৮.৭%) মোট শক্তি খরচের সিংহভাগই (৬৩.৯%) দখল করে আছে। তাই পরিবেশ উপযোগী ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে সনাতনী জ্বালানি শক্তিকে কাজে লাগাতে হবে। আর এর জন্য সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য পথ হলো বায়োগ্যাস বা জৈবগ্যাস প্রযুক্তি।

জৈবগ্যাস পরিচিতি ও প্রযুক্তি : জৈবগ্যাস হলো বাতাসের অনুপস্থিতিতে জৈববস্তুর অণুজীবীয় ভাঙনের ফলে সৃষ্ট গ্যাস। এ গ্যাস মূলত মিথেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের সমন্বয়ে গঠিত। মিথেন

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

উৎপাদন প্রক্রিয়াটিকে দুই ধাপ বিশিষ্ট একটি প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যার প্রথম ধাপে উৎপন্ন হয় এসিড গঠনকারী ব্যাকটেরিয়া, যারা জৈব উপাদানসমূহকে আর্দ্র বিশ্লেষণ ও গাঁজনের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের গাঁজন দ্রব্য যেমন– জৈব এসিড, হাইড্রোজেন এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি উৎপন্ন করে। দ্বিতীয় ধাপে উৎপন্ন হয় মিথেন গঠনকারী ব্যাকটেরিয়া, যারা এসব গাঁজন দ্রব্যকে মিথেন এবং কার্বন ডাই-অক্সাইডে রূপান্তরে যেসব সাধারণ উপাদান প্রভাব বিস্তার করে সেগুলো হচ্ছে মূল জৈববস্তুসমূহের ধরন, তাপমাত্রা, ঘনদ্রবণ ও দ্রাবকের পিএইচ (P^{H}) মাত্রা। ২০ : ১ মাত্রার C : N অনুপাতযুক্ত গোবর জৈবগ্যাস উৎপাদনের জন্য উপযোগী বলে বিবেচিত হয়। জৈবগ্যাস উৎপাদনে অবায়বীয় পরিপাক প্রক্রিয়া ১০° থেকে ৩৫° সেলসিয়াস তাপমাত্রা পরিসরের মধ্যে সংঘটিত হয়ে থাকে এবং কাঙ্ক্ষিত তাপমাত্রা পরিসর হচ্ছে ৩৩° থেকে ৩৫° সেলসিয়াস। কাঙ্ক্ষিত পিএইচ (P^{H}) মাত্রার পরিসর হচ্ছে ৬.৫ থেকে ৭.৫ এবং ঘনবস্তুর পরিমাণ ৮ থেকে ১২ শতাংশে। জৈবসার প্রস্তুতের জন্য উপাদানমূহের নির্দেশিত মান হচ্ছে গোবর ও পানির ১ : ১ অনুপাতের মিশ্রণের সাথে ১৮% পরিমাণ ঘনবস্তু, যা পরিশেষে ঘনবস্তুর পরিমাণকে ৯ থেকে ১০ শতাংশে দাঁড় করায়। তরল বর্জ্যের ধীর মিশ্রণ বা আন্দোলন জৈবগ্যাসের উৎপাদনকে ত্বরান্বিত করে থাকে।

বাংলাদেশে জৈবগ্যাসের ইতিহাস : বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ বা সায়েন্স ল্যাবরেটরির যৌথ উদ্যোগে সত্তর দশকের প্রথম দিকে জৈবগ্যাস প্রযুক্তি উন্নয়ন এবং গৃহস্থলিতে ব্যবহার উপযোগী আকৃতির জৈবগ্যাস উৎপাদক যন্ত্র নির্মাণের কর্মসূচি গ্রহণ করে। ১৯৭৬ সালে সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে প্রথম ৩ ঘনমিটার উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন গৃহস্থালিতে ব্যবহার উপযোগী জৈবগ্যাস উৎপাদক যন্ত্র স্থাপন করা হয়, এটি ছিল একটি ভাসমান গম্বুজাকৃতির জৈবগ্যাস উৎপাদক যন্ত্র। এ যন্ত্রটি মূলত মাটির নিচে তৈরি ইটের গাঁথুনির সিলিন্ডার আকৃতির একটি পাত্র, যার ওপরে ও নিচে ছিল দুটি প্রকোষ্ঠ এবং সিলিন্ডারের তলা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া একটি প্রবেশ নল ও একটি নির্গম নল। ওপরের প্রকোষ্ঠটি বর্জ্যের ওপর ভাসমান একটি গ্যাস প্রকোষ্ঠ নিয়ে গঠিত, যেটি লোহার পাত দিয়ে তৈরি। গ্যাস প্রকোষ্ঠ থেকে নমনীয় রবারের পাইপ ও লোহার পাইপের সাহায্যে সরাসরি রান্নাঘরের চুলায় জৈবগ্যাস নিয়ে যাওয়া হয়। এ ধরনের একটি জৈবগ্যাস উৎপাদিক যন্ত্র স্থাপনে মোট ব্যয় হতো ১২,০০০ টাকা। এরপর ১৯৮১ সালে সায়েন্স ল্যাবরেটরি মাত্র ৩,০০০ টাকায় ৩ ঘনমিটার উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন গম্বুজাকৃতির জৈবগ্যাস উৎপাদক যন্ত্র তৈরি করতে সমর্থ হয়। তবে রান্নার জ্বালানি সংকট মোকাবিলা করার লক্ষ্যে নির্মিত এ যন্ত্রগুলো মাত্র ৩-৫ বছর কার্যক্ষম ছিল তাদের গ্যাস হোল্ডারে ছিদ্র থাকার কারণে। তাই সায়েন্স ল্যাবরেটরি ১৯৯১ সালে একই ক্ষমতাসম্পন্ন গৃহস্থালিতে ব্যবহার উপযোগী স্থির গম্বুজাকৃতির জৈবগ্যাস উৎপাদক যন্ত্র তৈরি করে। এ যন্ত্রগুলো আকৃতিতে কিছুটা ভিন্ন এবং পুরো যন্ত্রটাই মাটির নিচে থাকে। মাটি খুঁড়ে ইটের গাঁথুনি দিয়ে গ্যাস উৎপাদক তৈরি করা হয়। এছাড়া সামগ্রিক যন্ত্রটিকে পানি ও গ্যাস নিরোধক করে তৈরি করার ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়। ওপরের ঢাকনাটিও সুগঠিত ও গ্যাস নিরোধক হিসেবে গড়ে তোলা হয়। এক পাশের পাইপের মাধ্যমে কাঁচামাল প্রবেশ করানো হয় এবং অন্য পাশের পাইপ থেকে বালতির মাধ্যমে ব্যবহৃত অবশেষ বের করা হয়।

জৈবগ্যাস প্রযুক্তির সম্ভাবনা : বাংলাদেশে জৈবগ্যাস প্রযুক্তির উন্নয়নে দারুণ সম্ভাবনা রয়েছে। ১৯৯৬ সালের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে গবাদিপশুর মোট সংখ্যা ছিল ২,৪১,৯০,০০০, যা থেকে প্রতিদিন প্রায় ২৪,২০,০০০০০ কিলোগ্রাম বর্জ্য উৎপন্ন হয়। এ পরিমাণ পশুবর্জ্য থেকে প্রতিদিন প্রায় ৩.১৯ × ১০৯ ঘনমিটার জৈবগ্যাস উৎপাদন করা সম্ভব। যদি মোট পশু বর্জ্যের ৫০ শতাংশও জৈবগ্যাস উৎপাদনে ব্যবহৃত

হতো, তাহলে দেশে ৩ ঘনমিটার উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন প্রায় ১৩,৬০,০০০ জৈবগ্যাস উৎপাদক যন্ত্র স্থাপন করা সম্ভব হতো। সম্প্রতি ২০১৩-১৪ সালের হিসাব মতে বর্তমানে দেশে মোট গবাদিপশু প্রায় সাড়ে ৫ কোটি। অর্থাৎ ১৯৯৬ সালের চেয়ে দ্বিগুণেরও বেশি, তাই বর্তমানে সে তুলনায় আরো ব্যাপক পরিমাণ পশুবর্জ্য থেকে আরো বেশি জৈবগ্যাস উৎপাদন সম্ভব। সুতরাং এক্ষেত্রে সরকারকে পৃষ্ঠপোষকতা করতে হবে। কৃষি, জ্বালানি মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে মোটকথা, সরকারি উদ্যোগে এ সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণ ও উৎসাহ সৃষ্টি করা জরুরি। বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা উৎপাদক যন্ত্র স্থাপনে আর্থিক ও সামাজিক সহায়তার মাধ্যমে বিপ্লব গড়ে তোলা উচিত। ৩ ঘনমিটার উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন একটি জৈবগ্যাস উৎপাদক যন্ত্র ৭-৮ সদস্যের একটি পরিবারের রান্না ও আলোর জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি সরবরাহ করতে সক্ষম এবং এজন্য প্রয়োজন হবে ৬০-৭০ কিলোগ্রাম গোবর, যা ৫-৬টি গরু অথবা ৩-৪টি মহিষ থেকে পাওয়া যেতে পারে। সুতরাং এ ব্যাপারে এখন থেকেই ব্যাপক উৎসাহ সৃষ্টির প্রয়োজন।

জৈবগ্যাস প্রযুক্তির সুবিধাসমূহ : জৈবগ্যাস প্রযুক্তির রয়েছে কিছু উল্লেখযোগ্য সুবিধা। সেগুলো নিম্নরূপ :

১. **পরিবেশ উপযোগী :** জৈবগ্যাস প্রযুক্তি পরিবেশ উপযোগী একটি ব্যবস্থা। গবাদিপশুর বর্জ্য যত্রতত্র না ফেলে বরং একটি নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে পশুবর্জ্য থেকে এ বায়োগ্যাস উৎপন্ন করা হয়। এতে পরিবেশ দূষণ রোধ হয়।

২. **সাশ্রয়ী :** জৈবগ্যাস উৎপাদক যন্ত্র এবং জৈবগ্যাস প্রস্তুতের প্রযুক্তি বেশ সাশ্রয়ী। মূলত পশুর বর্জ্যই এর কাঁচামাল হওয়াতে এটি কম খরচেই উৎপাদন সম্ভব।

৩. **কৃষি সহায়ক :** জ্বালানি হিসেবে সরাসরি গোবর পোড়ালে একদিকে যেমন গোবর সারের ঘাটতি সৃষ্টি করে, তেমনি অন্যদিকে পরিবেশেরও দূষণ ঘটায়। অবায়বীয় পরিপাকের মাধ্যমে জৈবগ্যাস উৎপাদনের ফলে দূষণমুক্ত শক্তি সরবরাহ ছাড়াও ব্যবহৃত পশুবর্জ্যকে সার হিসেবেও ব্যবহার করা যায়।

৪. **পরিবারের প্রয়োজন মেটাতে পারে :** একটি সাধারণ আকৃতির জৈবগ্যাস উৎপাদক যন্ত্র ৩ ঘনমিটার উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন হয়ে থাকে। পাঁচ-ছয়টি গবাদিপশু যে পরিবারে রয়েছে সে পরিবারের দৈনন্দিন জ্বালানির প্রয়োজন মেটাতে সাধারণ আকৃতির জৈবগ্যাস উৎপাদক যন্ত্রই যথেষ্ট।

৫. **প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়োজনও মেটাতে সক্ষম :** জৈবগ্যাস উৎপাদন প্রযুক্তি যে শুধু পরিবারের জ্বালানি চাহিদা মেটাতে সক্ষম তা নয়, অপেক্ষাকৃত বড় গো-খামারের ক্ষেত্রে বড় আকৃতির জৈবগ্যাস উৎপাদন যন্ত্রও নির্মাণ করা যায় এবং উৎপন্ন গ্যাস প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়োজনও পূরণ করতে পারে। তাই গ্রামের বড় গো-খামারগুলোতে এ প্রযুক্তি অবলম্বন করা উচিত।

৬. **অন্য জ্বালানি দ্রব্য ও অর্থ ব্যয় রোধ করে :** সনাতনী ধারায় গ্রামের প্রায় বেশিরভাগ ঘরেই গাছের ডালপালা, কাঠ, গোবর এসব দ্রব্য জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। জৈবগ্যাস প্রযুক্তির ফলে গাছকাটা ও কাঠ ব্যবহার বন্ধ হয়, ফলে তা আসবাবপত্র তৈরিতে অধিকতর কাজে লাগে এবং গোবরকে জৈবগ্যাস ও সারের প্রয়োজনে মূলত ব্যবহার করা সম্ভব হয়।

৭. **জ্বালানি গ্যাসের ও কেরোসিনের ওপর চাপ কমানো :** বর্তমানে শুধু শহর এলাকাতেই মূলত জ্বালানি হিসেবে গ্যাস ব্যবহৃত হচ্ছে। ব্যাপক চাহিদার ভিত্তিতে এবং সিলেটের মাগুরছড়া ও সুনামগঞ্জের টেংরাটিলায় প্রচুর পরিমাণে গ্যাস ধ্বংস হওয়ায় অদূর ভবিষ্যতে এ প্রাকৃতিক গ্যাস দুর্লভ হয়ে যাবে। তাই গ্রামে এ গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব নয়। এছাড়া মফস্বল ও গ্রামে রান্নার কাজে কেরোসিনের ব্যবহার এখনো লক্ষণীয়। কিন্তু জ্বালানি তেল হিসেবে এ কেরোসিনের দামও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই এ পরিস্থিতিতে জৈবগ্যাসই পারে জ্বালানি গ্যাস ও কেরোসিনের ওপর চাপ কমাতে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

উপসংহার : বাংলাদেশের প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ লোকই গ্রামে বাস করে। আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যার আধিক্য প্রাকৃতিক গ্যাস থাকা সত্ত্বেও ব্যাপক চাহিদার ফলে গ্রামাঞ্চলের সিংহভাগ মানুষের কাছেই এ গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে গ্রামের প্রায় সব পরিবার এখনো রান্নার কাজে গাছের ডালপালা, কাঠ, খড়, শুকনো গোবর এসব ব্যবহার করছে। এর ফলে মূলত দেশের সবুজ সুন্দর পরিবেশ দূষিত হচ্ছে এবং গাছপালাও নির্দ্বিধায় কেটে ফেলা হচ্ছে। তাই এ অবস্থায় একটি বিকল্প জ্বালানি অবশ্যই প্রয়োজন। আর এ প্রয়োজনকে যুক্তিসঙ্গতভাবে মেটাতে সক্ষম জৈবগ্যাস প্রযুক্তি। দেশের অসংখ্য গবাদিপশু যেহেতু গ্রামেই পালিত হয় এবং জৈবগ্যাস প্রযুক্তিতে যেহেতু পশুবর্জ্যই জরুরি, তাই এ প্রযুক্তি প্রতিটি গ্রামে ব্যাপক হারেই তৈরি করা সম্ভব। এ প্রযুক্তি গ্রহণের নিমিত্তে ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্পের মাধ্যমে সরকার ও বেসরকারি সংস্থাগুলো গ্রামের মানুষের আরো উৎসাহিত করবে তা-ই আমাদের কামনা। সারা দেশের সবগুলো গ্রামে এ সম্ভাবনাময় বিকল্প জ্বালানি দ্রুত বিস্তার লাভ করবে যদি সবার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা থাকে।

১৬। 'জ্বালানি নিরাপত্তা : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ' শিরোনামে একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন লিখুন।

উত্তর : বিশ্বের যে কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে কাঙ্ক্ষিত স্তরে নিয়ে যেতে হলে অন্যতম পূর্বশর্ত হলো পর্যাপ্ত জ্বালানি সম্পদের নিশ্চয়তা। কেননা যে কোনো দেশের কৃষি, শিল্প, সেবা খাতসহ দৈনন্দিন জীবনে জ্বালানি সম্পদের চাহিদা অত্যন্ত ব্যাপক। বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এ দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, শিল্পায়নের অগ্রগতির ফলে দিন দিন জ্বালানি চাহিদা বেড়েই চলেছে। এমতাবস্থায় সরকার দেশের চাহিদা পূরণে পর্যাপ্ত জ্বালানি সরবরাহ করতে পারছে না। ফলে উৎপাদন কমে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে উপনীত হতে ব্যর্থ হচ্ছে। যেন থমকে যাচ্ছে দেশের উন্নয়নের গতি, জনজীবন করে তুলেছে দুর্বিষহ। এ এক নির্মম দুষ্টচক্র। এ দুষ্টচক্র থেকে বের হওয়ার জন্য নানা পথ খুঁজছে সরকার। বর্তমানে দেশের মোট জনসংখ্যার মাত্র ৬২ শতাংশ বিদ্যুৎ সুবিধা ভোগ করে। দেশে মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ৩২১ কিলোওয়াট/ঘণ্টা, যা বিশ্বের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় অনেক কম।

বাংলাদেশে জ্বালানির উৎস : বাংলাদেশ জ্বালানির উৎসগত দিক দিয়ে যথেষ্ট সমৃদ্ধ নয়। এ দেশে জ্বালানির অবাণিজ্যিক উৎসসমূহ হলো : জৈব জ্বালানি (Biomass fuels), কৃষির অবশিষ্টাংশ, বৃক্ষের অবশিষ্টাংশ এবং প্রাণীর মলমূত্র। জ্বালানির বাণিজ্যিক উৎসসমূহ হলো : জীবাশ্ম জ্বালানি তথা কয়লা, তৈল, প্রাকৃতিক গ্যাস এবং পানিশক্তি। নিচে ধারাবাহিকভাবে জ্বালানির বাণিজ্যিক উৎসসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১. **প্রাকৃতিক গ্যাস :** বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান জ্বালানি সম্পদ হলো প্রাকৃতিক গ্যাস, যা দেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানি ব্যবহারের শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ পূরণ করে। এ যাবত আবিষ্কৃত মোট গ্যাসক্ষেত্রের সংখ্যা ২৬টি। ক্ষেত্রসমূহে মোট প্রাকৃতিক গ্যাস মজুদের পরিমাণ ৩৭.৬৮০ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। বর্তমানে দেশে ২০টি গ্যাসক্ষেত্রের ৯০টি কূপ হতে গ্যাস উৎপাদিত হচ্ছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন, সার কারখানা, বাণিজ্যিক শিল্প ও গৃহস্থালি খাতে জ্বালানির প্রধান উৎস হচ্ছে প্রাকৃতিক গ্যাস। ২০১৩-১৪ বছরে (২০১৪ সালের মার্চ পর্যন্ত) বাংলাদেশে ৪০৫-৫ বিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উত্তোলন করা হয়েছে। উৎপাদিত এ গ্যাসের ১৬৯.২ বিলিয়ন ঘনফুট বিদ্যুৎ উৎপাদনে, ৪৮.২ বিলিয়ন ঘনফুট গৃহস্থালি খাতে, ৩০.৮ বিলিয়ন ঘনফুট সার উৎপাদনে, ৬৮.৯ বিলিয়ন ঘনফুট শিল্প উৎপাদনে, ০.৬০ বিলিয়ন ঘনফুট চা বাগানে, ৪.৪ বিলিয়ন ঘনফুট বাণিজ্যিক খাতে, ১৮.৯ বিলিয়ন

ঘনফুট সিএনজি-তে ব্যবহার করা হয়েছে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে গ্যাস অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে ভূমিকা পালন করে আসলেও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশে গ্যাসের অভাব প্রকট আকার ধারণ করেছে।

বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক যে সকল কোম্পানির সাথে গ্যাসক্ষেত্র অনুসন্ধান ও উত্তোলনের জন্য চুক্তি করেছে তাদের আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা নেই বললেই চলে। কানাডার নাইকো নামের অখ্যাত এক কোম্পানিকে টেংরাটিলাসহ সিলেটের বিরাট সম্ভাবনাময় এলাকার ইজারা দেয়া হয়। অথচ তাদের এ পর্যন্ত গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার ও উত্তোলন ফলাফল যথেষ্ট সুবিধাজনক নয়। বরং কোম্পানিটি দেশের গ্যাস খাতের মারাত্মক ক্ষতি করেছে। বিশেষজ্ঞদের সাথে চুক্তি করার আগে উন্মুক্ত টেন্ডারের মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে কোম্পানি নির্ধারণ করতে হয়। যেহেতু এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সম্পদ, তাই জাতীয় সংসদে জনপ্রতিনিধিদের বিস্তারিত আলোচনার ভিত্তিতে কোম্পানি নির্বাচন করতে হবে। বাংলাদেশে নাইকো ও অন্যান্য কোম্পানি নির্বাচনে আন্তর্জাতিক টেন্ডার না করে এককভাবে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

আমেরিকান কোম্পানি অক্সিডেন্টাল ১৯৯৭ সালে মৌলভীবাজারের মাগুরছড়ায় প্রথম কূপ খনন শুরু করে। ১৯৯৭ সালের জুন মাসের ৩ তারিখে খনন কাজ শুরু করার ১২ দিনের মাথায় গ্যাসফিল্ডে মহাবিপর্যয় ঘটে। বিকট শব্দে চারদিক প্রকম্পিত করে আগুনের লেলিহান শিখা ৩০০ ফুট পর্যন্ত ওপরে ওঠে। আগুন দীর্ঘ ৬ মাস ধরে জ্বলতে থাকে এবং ২০৫ বিসিএফ গ্যাস পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যায়। দেশের ক্ষতি হয় সাড়ে ২৮ কোটি মার্কিন ডলার। আর পরিবেশ ও অবকাঠামোর ক্ষতি হয় সাড়ে ১১ কোটি মার্কিন ডলার। দুঃখের বিষয়, এ ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করতে আমলা ও মন্ত্রণালয়ের দীর্ঘ ৬ বছর সময় লাগে। এরই মধ্যে অক্সিডেন্টাল যন্ত্রপাতি নিয়ে দেশ ছেড়ে চলে যায়। ৮০ কোটি ডলারের একটি ক্ষতির তালিকা দিলেও তা আদায়ে ব্যর্থ হয় চুক্তির শর্তাবলীর দুর্বলতার কারণে। দ্বিতীয়বার জ্বলল টেংরাটিলা গ্যাসফিল্ড। এবার ক্ষতির পরিমাণ ১৫০ কোটি মার্কিন ডলার। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক আদালতে মার্কিন তেল-গ্যাস কোম্পানি শেভরনের মামলায় বাংলাদেশ জিতেছে। ১৭ মে ২০১০ লন্ডনে International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) আদালতে তিন বিচারক এ মামলার রায় ঘোষণা করে। শেভরনের সাথে বাংলাদেশ সরকারের অংশীদারিত্ব চুক্তি অনুযায়ী স্থানীয় বাজারে বাংলাদেশ সরকারের পাইপলাইন ব্যবহার করে গ্যাস বিক্রি করলে তার জন্য হুইলিং চার্জ বাবদ মোট গ্যাসের ৪ শতাংশ সরকারকে দিতে হবে। হুইলিং চার্জ নিয়ে উভয়পক্ষের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। এতে শেভরন নাখোশ হয়ে ১৭ মার্চ ২০০৬ ICSID-এ মামলা করে। দু'পক্ষের এ বক্তব্যের ভিত্তিতে ১৭ ও ১৮ মে ২০০৯ চূড়ান্ত শুনানি হয়। শুনানি শেষে বাংলাদেশের পক্ষে আদালত রায় দেয়, যাতে আগামী ২০ বছরে গ্যাস পাইপলাইন ভাড়া বাবদ শেভরনের কাছ থেকে বাংলাদেশ ২ হাজার ১৫০ কোটি টাকা আয় করতে পারবে।

২. **কয়লা :** দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের রংপুরের খালাশপীর, দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া, ফুলবাড়ি ও দীঘিপাড়ায় এবং বগুড়ার জামালগঞ্জে অর্থাৎ মোট ৬টি কয়লার ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়। যার মোট মজুদ প্রায় ২,৭০০ মিলিয়ন টন। এর তাপজনন ক্ষমতা প্রায় ৩৭ ট্রিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসের সমতুল্য। দেশের ভবিষ্যৎ জ্বালানি চাহিদা মেটানো এবং নিরাপত্তার জন্য ইতোমধ্যে আবিষ্কৃত কয়লাক্ষেত্রের উন্নয়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে আবিষ্কৃত কয়লা অদূর ভবিষ্যতে দেশের জ্বালানি চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

চীন সরকারের সহায়তায় সরবরাহ ঋণের আওতায় বার্ষিক ১০ লাখ মেট্রিক টন কয়লা উত্তোলনের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ১০ সেপ্টেম্বর ২০০৫ হতে বড়পুকুরিয়া ভূ-গর্ভস্থ কয়লা খনি থেকে বাণিজ্যিকভাবে কয়লা উত্তোলিত হয়। সুপরিকল্পিতভাবে কয়লা ক্ষেত্রসমূহ উন্নয়নের মাধ্যমে কয়লা উত্তোলিত করা গেলে তা বিদ্যুৎ উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে, যা পরবর্তীতে প্রাকৃতিক গ্যাসের ওপর নির্ভরতা অনেকটাই কমিয়ে আনবে। সে বিবেচনাতেই বাংলাদেশের একমাত্র ভূগর্ভস্থ বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি উন্নয়নের কাজ হাতে নেয়া হয়েছিল। উত্তোলিত কয়লার অধিকাংশই বর্তমানে বড়পুকুরিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে সরবরাহ করা হচ্ছে।

আমাদের বিপুল পরিমাণ উন্নতমানের কয়লা আছে। এ কয়লার গুণগত মান অনেক উন্নত। দিনাজপুরের ফুলবাড়িতে বড়পুকুরিয়ার চেয়েও বেশি কয়লা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। একমাত্র দিনাজপুর এলাকা থেকেই যদি কয়লাভিত্তিক ২০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়, তাহলে দেশের বর্তমান বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণ হবে। তবে আমাদের প্রকৌশলী ও টেকনিশিয়ানরা কয়লা উত্তোলনের ব্যাপারে তেমন অভিজ্ঞ নয়। চুক্তি হওয়ার সময় চুক্তিবদ্ধ কোম্পানির সঙ্গে শর্ত থাকতে হবে যে, আমাদের প্রকৌশলীদের কয়লা উত্তোলনের বাস্তব জ্ঞান দিতে হবে এবং প্রযুক্তি হস্তান্তর করতে হবে, যাতে পরে তারাই কয়লাখনির ব্যবস্থাপনা ও কয়লা উত্তোলনে পারদর্শী হয়ে নিজেরাই পুরো কয়লাখনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। কয়লা দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রতিবেশী দেশ ভারত তার বিদ্যুতের বড় অংশ এখনো কয়লা থেকে উৎপাদন করছে। চীনে কয়লার খনিতে দুর্ঘটনায় প্রতিনিয়ত অজস্র শ্রমিক নিহত হচ্ছে। তারপরও তারা কয়লা উৎপাদন অব্যাহত রেখেছে এবং উক্ত কয়লা দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে ক্রমবর্ধমান শিল্পখাতে বিদ্যুৎ চাহিদার যোগান দিচ্ছে।

৩. **খনিজ তেল :** খনিজ তেল হলো ভারী হাইড্রোকার্বন যৌগসমূহের সমষ্টি। বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই একটি প্রাকৃতিক গ্যাসসমৃদ্ধ এলাকা হিসেবে প্রমাণিত হলেও এ দেশে খনিজ তেলের আবিষ্কার তুলনামূলকভাবে কম ঘটেছে। বাংলাদেশে সর্বপ্রথম তেলক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয় ১৯৮৬ সালে সিলেটের হরিপুর গ্যাসক্ষেত্রের সপ্তম কূপে কিছুটা অপ্রত্যাশিতভাবে। ১৯৮৭ সালের জানুয়ারি মাসে তেল উৎপাদন শুরুর মাধ্যমে বাংলাদেশ তেল যুগে পদার্পণ করে। ২০২০ থেকে ২০৩০ মিটার গভীরতায় প্রায় ১০ বিলিয়ন ব্যারেল তেল এখানে মজুদ আছে। তবে উত্তোলনযোগ্য মজুদের পরিমাণ নির্ণয় করা হয় প্রায় ৬ বিলিয়ন ব্যারেল। ১৯৮৭ সাল থেকে বেশ কয়েক বছর প্রতিদিন প্রায় ৩০০ থেকে ৪০০ ব্যারেল তেল উৎপাদন করা হলেও পরবর্তীতে তা কমে আসে। একটি বিতর্কিত তেল কোম্পানির হাতে কূপটি অর্পণ করাতে যথার্থ উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে জটিলতা দেখা দেয়ার ফলে ১৯৯৪ সালের জুলাই মাস থেকে উৎপাদন স্থগিত করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে তেলের চাহিদা প্রতিদিন প্রায় ৪৫,০০০ ব্যারেল। যার পুরোটাই বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়ে থাকে। প্রতিদিন প্রায় ৩০,০০০ ব্যারেল তেল পরিশোধন করার ক্ষমতাসম্পন্ন দেশের একমাত্র তেল পরিশোধনাগার চট্টগ্রামের ইস্টার্ন রিফাইনারিতে এ খনিজ তেল পরিশোধন করে সরবরাহ করা হয়। বাকি চাহিদা মেটানোর জন্য বিদেশ থেকে পরিশোধিত তেলজাত পদার্থ আমদানি করা হয়। বাংলাদেশে মোট তেল চাহিদার প্রায় ৫০% ডিজেল, ২৫% কেরোসিন, ১০% ফুয়েল অয়েল এবং ৮% পেট্রোল। দেশে ডিজেল ও কেরোসিনের ঘাটতি রয়েছে। বাংলাদেশে প্রতিবছর তেল ও তেল জাতীয় পদার্থের চাহিদা ২.৫% থেকে ৩% হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে প্রতিবছর বিদেশ থেকে মিলিয়ন মিলিয়ন ব্যারেল খনিজ তেল ও তেলজাত দ্রব্য আমদানি করার কারণে এখানে প্রচুর অর্থ ব্যয় হচ্ছে।

৪. পানিসম্পদ : পৃথিবীর চার ভাগের তিন ভাগ জল, এক ভাগ স্থল। পানির এক বিশাল ভাণ্ডার এ পৃথিবী। বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের মূলত কৃষিনির্ভর উন্নয়নশীল একটি দেশ। এ দেশের জীবনধারা পানিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। পানি এ দেশের জনগণের কল্যাণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের সাফল্যের ওপর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সাফল্য অনেকাংশে নির্ভরশীল। কিন্তু বাংলাদেশে পানিসম্পদের প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ তার পানিসম্পদকে যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারছে না। ১৯৬২ সাল থেকে রাঙামাটির কাপ্তাই-এর কর্ণফুলী নদীর তীরে বাঁধ দিয়ে বাংলাদেশ পানিবিদ্যুৎ উৎপাদন করে আসছে। এটাই বাংলাদেশের একমাত্র পানিবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র। এ কেন্দ্রের উৎপাদন ক্ষমতা ২৩০ মেগাওয়াট। উৎপাদিত বিদ্যুতের হার হিসেবে মাত্র ৩ ভাগ বিদ্যুৎ পানি দিয়ে উৎপাদিত হয়। আর বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিভিন্ন ধরনের জ্বালানি ব্যবহারের হার হিসেবে পানিবিদ্যুৎ ব্যবহার করে মাত্র ৩.৩৯ ভাগ মানুষ। কাজেই উৎপাদন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে পানির ব্যবহার খুবই নগণ্য।

জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পরিকল্পনাসমূহ : বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে বিরাজমান সমস্যা সমাধানে সরকার যেসব পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে তা হলো নতুন নতুন বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ, বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশে কয়লা ক্ষেত্রসমূহের উন্নয়ন, এলএনজি আমদানির জন্য ব্যবস্থাগ্রহণ এবং নতুন গ্যাসক্ষেত্র অনুসন্ধান ও উন্নয়নের পাশাপাশি বিদ্যমান গ্যাস ক্ষেত্রসমূহ পুনর্মূল্যায়ন ও পুনর্বাসনের বিষয়েও সরকার বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তাছাড়া, জ্বালানি বহুমুখীকরণ কর্মসূচির আওতায় নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ বিকল্প জ্বালানি উৎস অনুসন্ধানে ইতোমধ্যে নতুন নতুন নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

বর্তমানে বিরাজমান বিদ্যুৎ ঘাটতি সমাধানে সরকার বিদ্যুৎ খাতে যে সকল সমস্যা রয়েছে তা চিহ্নিত করেছে। যেমন– বিদ্যুতের চাহিদার তুলনায় সরবরাহের অপ্রতুলতা। বিদ্যুৎ উৎপাদনে একক জ্বালানির (গ্যাস) ওপর নির্ভরশীলতা, বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যক্তি খাতের অংশগ্রহণ তথা বিনিয়োগ খুবই কম। বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণে বিশাল বিনিয়োগের সিংহভাগই ব্যক্তি খাত অথবা সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি) হতে আসা প্রয়োজন। উৎপাদন ঘাটতি ছাড়াও বিদ্যুতের সঞ্চালন এবং বিতরণেও ঘাটতি বিদ্যমান। বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণে বাংলাদেশ সরকার একটি রূপকল্প ঘোষণা করে, যাতে ২০১৫ সাল নাগাদ ১১,৫০০; ২০২১ সাল নাগাদ ২০,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করে সকলের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করবে। আর এ রূপকল্পের বাস্তবায়নে কতিপয় লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। যেমন– জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, বিদ্যুৎ খাতকে আর্থিকভাবে লাভজনক করার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের চালিকাশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা, বিদ্যুৎ খাতের দক্ষতা বৃদ্ধি, বিদ্যুৎ খাতের প্রতিষ্ঠানসমূহে নতুন কর্পোরেট কালচার প্রবর্তন, নিরবচ্ছিন্ন ও মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা, বিদ্যুৎ খাতের অর্থায়নে বেসরকারি খাতের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি প্রভৃতি। আর এ লক্ষ্যসমূহ অর্জনে যে সকল ইস্যুকে চিহ্নিত করা হয়েছে তা হলো : চাহিদামাফিক যোগান, সকলের জন্য জ্বালানি নিশ্চিত করা, কয়লা নীতি চূড়ান্তকরণ, কয়লাভিত্তিক নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন ও গ্যাসের ব্যবহার হ্রাসকরণ, বিদ্যুৎ/জ্বালানি সাশ্রয়, নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান ও এর উন্নয়ন, সিস্টেম লস হ্রাসকরণ প্রভৃতি। এ ছাড়াও সরকার বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানে বিদ্যুৎসাশ্রয়ী কার্যক্রমের আওতায় রাত ৮টার পর শপিংমল ও বিপণি বিতান বন্ধ রাখার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সোলার প্যানেল স্থাপনে উদ্বুদ্ধ করছে, এসির তাপমাত্রা ২৫° সেলসিয়াস বা তার ওপর রাখা এবং পিক আওয়ারে এসির ব্যবহার না করতে সম্মানিত গ্রাহকদের উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে, বিদ্যুৎসাশ্রয়ী বাল্ব ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে।

সরকার নতুন গ্যাসক্ষেত্রের অনুসন্ধান, আবিষ্কার ও উন্নয়নে এবং গ্যাস উত্তোলন ও সরবরাহের লক্ষ্যে সময়নিষ্ঠ পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে। এ ক্ষেত্রে সরকার যে সকল নীতি-কৌশল

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

অবলম্বন করেছে তা হলো : তেল-গ্যাস অনুসন্ধানে বাপেক্সকে অধিকতর কার্যকর করা, সমুদ্র এলাকার অন্তর্ভুক্ত অফসোর ব্লকসমূহের দরপত্র দ্রুত প্রক্রিয়াকরণ ও চুক্তি সম্পাদন করা, গ্যাসের বিকল্প জ্বালানি আমদানিতে অনুমোদন ও অবকাঠামো নির্মাণে সহায়তা করা, গ্যাসের বিকল্প জ্বালানি ব্যবহারে উৎসাহিত করা, বহুমুখী উৎসের জ্বালানি ব্যবহারের সুযোগ উন্মোচন করা প্রভৃতি।

আমাদের দেশের কয়লার অফুরন্ত সম্ভাবনা বিদ্যমান। কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানে জ্বালানি হিসেবে কয়লা ব্যবহার করার মাধ্যমে দেশে প্রাপ্ত কয়লাসম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সরকার যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করবে তা হলো : কয়লানীতি দ্রুত চূড়ান্তকরণ, দেশের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে কয়লার উত্তোলন পরিকল্পনা প্রণয়ন, উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলনে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা, কয়লা আমদানির বিষয়ে সরকারের অবস্থান সুস্পষ্ট করা।

বর্তমান সরকার রাশিয়ার কারিগরি সহযোগিতায় পাবনার রূপপুরে ১,০০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে রাশিয়ার সাথে একটি কাঠামো চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এছাড়াও প্রাকৃতিক গ্যাস ও আমদানিনির্ভর জ্বালানি তেলের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস ও জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে পরিবেশবান্ধব নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসার ও উন্নয়ন এবং জ্বালানিসাশ্রয়ী কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে সরকার ইতোমধ্যে বেশকিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। যেমন– নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসার ও উন্নয়ন, জ্বালানি সাশ্রয়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন, জ্বালানির দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

উপসংহার : বাংলাদেশের ভূগর্ভে যথেষ্ট খনিজসম্পদের সম্ভাবনা থাকার কথা বলা হলেও তা এখনো নানা জটিলতার কারণে আবিষ্কার করা যায়নি। বাংলাদেশ সরকার তার জ্বালানি উদ্দেশ্য ও নীতি প্রণয়ন করেছে, যাতে ২০২১ সালের মধ্যে সবার জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। বর্তমানে দেশের মোট জনসংখ্যার ৬২ শতাংশ বিদ্যুৎ সুবিধা ভোগ করে। দেশে বর্তমানে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় তা চাহিদার তুলনায় এক-তৃতীয়াংশ কম। কাজেই বিদ্যুৎ ঘাটতি বাংলাদেশের একটি দৈনন্দিন মারাত্মক সমস্যা। তাছাড়া দ্রুত উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের জ্বালানি চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমতাবস্থায় সরকার ২০১২ থেকে ২০১৬ সাল নাগাদ সরকারি ও বেসরকারি খাতে মোট প্রায় ১৩,০০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার নতুন বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে যুক্ত করার পরিকল্পনা নিয়েছে। পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে আগামী ২০২১ সালের মধ্যে দেশের সকল জনসাধারণকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনার লক্ষ্যে সরকার বিদ্যুৎ খাত সংস্কার ও পুনর্গঠনের ব্যাপক কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। সরকার বর্তমানে নির্মাণাধীন ও গৃহীত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র দ্রুত বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে। এছাড়া নতুন উদ্যোগের অংশ হিসেবে গ্যাস সংকট বিবেচনায় ২০১০-১৫ অর্থবছরের মধ্যে বাস্তবায়নের জন্য জরুরি ভিত্তিতে তেল ও কয়লাভিত্তিক প্রকল্প হাতে নিয়েছে। আশা করা যায়, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে সরকারের এরূপ বহুমুখী উদ্যোগ দেশের বর্তমান জ্বালানি খাতের বেহাল অবস্থা দূর করতে সক্ষম হবে।

১৭ ॥ 'পরমাণু জ্বালানি ও বাংলাদেশ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখুন।

উত্তর : নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ব্যবস্থা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান নিয়ামক। তবে বাংলাদেশে বর্তমানে যে সমস্যাগুলো রয়েছে তার মধ্যে বিদ্যুৎ সমস্যা প্রকট হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ সমস্যার কারণে ব্যাহত হচ্ছে শিল্প-কলকারখানা চালু রাখা। স্থাপন করা যাচ্ছে না নতুন শিল্প-কারখানা। বিদেশি বিনিয়োগও বাড়ছে না। এরূপ জটিল ও অস্বস্তিকর পরিস্থিতি মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকার দেশের ক্রমবর্ধমান বৈদ্যুতিক চাহিদা পূরণে, দেশজ জ্বালানির অপ্রতুলতা মোকাবেলায়, জ্বালানি সরবরাহের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে,

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায়, দেশের জন্য দীর্ঘমেয়াদে সুষম, আর্থিকভাবে লাভজনক ও কারিগরি দিক থেকে গ্রহণযোগ্য পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের উদ্দেশ্যে রাশিয়ার সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। যে চুক্তি মোতাবেক রাশিয়া বাংলাদেশে পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনে সার্বিক সাহায্য ও সহযোগিতা করবে, পরমাণু প্রযুক্তি হস্তান্তর করবে এবং পরমাণু প্রযুক্তি ব্যবহারে প্রশিক্ষণ প্রদান করবে।

পরমাণু বিদ্যুৎ কি? : পরমাণু বিদ্যুৎ প্লান্ট স্থাপনের মাধ্যমে পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় প্রক্রিয়াজাত ইউরেনিয়াম অথবা থোরিয়াম এর নিউক্লিয়াস ভেঙ্গে দুটি ক্ষুদ্রতম অংশে বিভক্ত হয়ে শক্তি সৃষ্টি করে (২০০ এমইভি) এবং দুটি অথবা তিনটি নিউট্রন নির্গত করে। এ ফিউশান পদ্ধতির মাধ্যমে চেইন রিঅ্যাকশন সৃষ্টি করা যায়। ফলে এই শক্তি এক বিরাট তাপের সৃষ্টি করে যাকে পরবর্তী সময়ে বিদ্যুতে পরিণত করা যায়। এ বিদ্যুৎকেই পরমাণু বিদ্যুৎ বলা হয়। এর শক্তি এত বেশি যে এক কিলোগ্রাম ইউরেনিয়ামে যে শক্তি তা দুই হাজার ৫০০ টন কয়লা পোড়ালে যে শক্তি হবে তার সমান। এ পদ্ধতি অত্যন্ত কঠিন, জটিল ও বিপজ্জনক। এর জন্য দরকার দক্ষ পরমাণু বিজ্ঞানী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অবশ্য এর ব্যতিক্রম ঘটিয়ে নিউক্লিয়ার বোমা তৈরি করা হয়েছিল; তার পরপরই ১৯৫০-এর দিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইসেন হাওয়ার 'Atom for Peace' অর্থাৎ 'শান্তির জন্য অ্যাটম' কর্মসূচি হাতে নেন। ফলে গড়ে ওঠে 'আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থা'। এর তত্ত্বাবধানে পরবর্তী সময়ে আণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার হয় পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদনে।

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট : বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৭২ সালেই বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থার সদস্য হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। এরপর থেকে আণবিক শক্তি সংস্থা বহুভাবে বহুমাত্রিক সাহায্য করে যাচ্ছে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনকে। পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারে আমেরিকা, ফ্রান্স, জাপান, কোরিয়া, চীন, তুরস্ক এবং অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাংলাদেশ দ্বিপক্ষীয় চুক্তি করেছে। বাংলাদেশ আরসিএরও সদস্য। পরমাণু বিদ্যুতের প্রয়োজনীয়তা শুধু যে আজকের প্রতিপাদ্য, তা নয়—স্বাধীনতা-পূর্ব বাংলাদেশে এর প্রয়োজনীয়তার কথা আমাদের দেশের পরমাণু বিজ্ঞানীরা বলেছেন। এমনকি পাকিস্তান আণবিক শক্তি কমিশন যখন ১৯৬১ সালে পারমাণবিক বিদ্যুতের বিষয় মাথায় আনে, তখন থেকেই বিষয়টি প্রাধান্য পায়।

পাকিস্তানে পারমাণবিক বিদ্যুতের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য ইন্টারনিউক্লিয়ার কোম্পানি এবং গিরস অ্যান্ড হিল ইন করপোরেটেড অব আমেরিকা কাজে লাগানো হয়েছিল। তারা তাদের সমীক্ষা রিপোর্ট তদানীন্তন পাকিস্তান আণবিক শক্তি কমিশনের কাছে দাখিল করে। তাতে বলা হয়, পূর্ব পাকিস্তানে পদ্মা নদীর তীরে হার্ডিঞ্জ ব্রিজের পাশে পাবনার রূপপুরে কারিগরি ও অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রকল্প গ্রহণ বাস্তবসম্মত। পাকিস্তানে পরমাণু বিদ্যুতের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য প্রথমে রূপপুরকে সঠিক জায়গা বলে অভিমত দেয় সম্ভাব্যতা যাচাই দল। কিন্তু পাকিস্তান সরকার ঔপনিবেশিক মনোভাবের কারণে চেয়েছিল এটা করাচিতে স্থাপিত হোক। এর ক্ষমতা নির্ধারিত হয় ১৪০ মেগাওয়াট। আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থার কারিগরি দল রূপপুরে ২৬২ একর জমির ওপর এ প্রকল্প নির্মাণের উপযুক্ত জায়গা বলে অনুমোদন করে। এর অদূরবর্তী ৩২ একর জায়গায় অফিস এবং কলোনি নির্মাণের সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু এত বছর পরও কিছুই হয়নি; শুধু রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা এবং আন্তর্জাতিক কারণে। উল্লেখ্য, সে সময়ে কানাডা সরকারও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে ছিল। তারা কারিগরি এবং আর্থিক দুই বিষয়েই সাহায্য করতে চেয়েছিল। ১৯৬৫ সালে সর্বপ্রথম রূপপুরে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের ওয়াদা করে তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার তা রাখেনি। এরপর স্ক্যানডিনেভিয়ান দেশগুলো থেকে সহায়তা নেয়ার চেষ্টা করা হয়। সে সময়ে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকেও প্রস্তাব আসে তার নাম হলো 'ওয়েসটিং হাউস (ইউএসএ); কিন্তু এটাও পাকিস্তান সরকারের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি। এরপর ১৯৬৮ সালে সোভিয়েত

ইউনিয়নের প্রধানমন্ত্রী কোসেগিন পাকিস্তান সফরকালে পশ্চিম পাকিস্তানকে একটি স্টিলমিল এবং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে একটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনে সাহায্যের কথা ঘোষণা করেন। এর সম্ভাব্যতা যাচাই করেছিল 'মেসার্স টেকনোপ্রমেকসপোর্ট (ইউএস এসআর)। এদের রিপোর্ট ১৯৬৯ সালে সরকারের কাছে পেশ করেছিল। রিপোর্টে সুপারিশ করা হয়েছিল— ৪২০ মেগাওয়াট পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্লান্ট রূপপুরে করা যাবে। তার সঙ্গে দুটি 'টারবো জেনারেটর' ২১০ মেগাওয়াট করে থাকবে। উল্লেখ্য, সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্যক জ্ঞান আছে এ ব্যাপারে। তাদের দ্বারাই পরিচালিত হচ্ছে ঘোড়াশাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ২১০ মেগাওয়াটের 'টারবো জেনারেটর'। এর মূল্য ধরা হয়েছিল ৭৮ কোটি টাকা।

স্বাধীন বাংলাদেশে পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প নিয়ে প্রথমে সরকার একটি কার্যপত্র তৈরি করে ১৯৭৩ সালে। এ 'ওয়ার্কিং গ্রুপ' তাদের রিপোর্টে রূপপুরে ২০০ মেগাওয়াট পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্লান্ট স্থাপনের সুপারিশ করে। ১৯৭৫ সালে ইতিহাসের জঘন্যতম রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর এর কাজ ধীরগতিতে চলে। এরপর ১৯৮৪-৮৫ সালে 'ফ্রেন্স পাওয়ার রিঅ্যাক্টর' এবং জাপানি 'টারবো জেনারেটর' স্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। সে সময়ও আন্তর্জাতিক আণবিক সংস্থার মতামত গ্রহণ করা হয়। তাদের রিপোর্টে বলা হয় :

"Bangladesh has a nucleus of trained manpower to work in implementation of its First Nuclear Power Programme. In this respect, Bangladesh is unique as a developing country and is qualified to assume more responsibility for its nuclear power project than is expected for its type of Member States."

আশির দশকের প্রথমার্ধে পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প জাতীয় চাহিদা হিসেবে দেখা দেয়। এরপর আবার রাশিয়ার সাহায্যে প্রস্তাব বিবেচনায় আনা হয়। কিন্তু চেরনোবিল পারমাণবিক দুর্ঘটনার পর সব ভেস্তে যায়। এদেশে সোচ্চার হন পারমাণবিক বিদ্যুৎ বিরোধী কিছু বুদ্ধিজীবী এবং বিজ্ঞানী। সে সময় অবশ্য ইউরোপ-আমেরিকায়ও ঝড় ওঠে, শুধু ফ্রান্স ব্যতীত। আনন্দের বিষয় হলো, ঠিক সেই মুহূর্তে অর্থাৎ একই বছরে বাংলাদেশের সাভারে তিন মেগাওয়াট রিসার্চ রিঅ্যাক্টর কার্যক্রম শুরু করে, যদিও আন্তর্জাতিক আণবিক সংস্থার কিছু সদস্য রাষ্ট্রের বিরোধিতা ছিল; কিন্তু আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থা বাংলাদেশকে অভিনন্দন জানিয়েছিল। সে সময় আইএইএ প্রধান ড. হ্যান্স ব্লিক্স (Hans Blix) ব্যক্তিগত সফরে বাংলাদেশে আসেন এবং রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের পক্ষে অভিমত জানিয়েছিলেন সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে।

বাংলাদেশ ও রাশিয়া পরমাণু চুক্তি স্বাক্ষর : বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে কাঙ্ক্ষিত স্তরে নিয়ে যাওয়ার জন্য সরকার পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন ও এর যথোপযুক্ত ব্যবহারে বিশেষ নজর দিচ্ছে। বর্তমানে দেশের মোট জনসংখ্যার মাত্র ৬২ শতাংশ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় রয়েছে। দেশে বর্তমানে মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ৩২১ কিলোওয়াট/ঘণ্টা, যা বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর অনেকগুলো বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র বাণিজ্যিকভাবে চালু করেছে। এছাড়া বর্তমান ৩৮৯৭ মেগাওয়াট ক্ষমতার উল্লেখযোগ্য ৯টি প্রকল্প নির্মাণাধীন রয়েছে। সার্বিক পরিকল্পনার আওতায় ২০১৩ থেকে ২০১৭ সাল নাগাদ প্রায় ১২,৯০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হবে বলে আশা করা যায়। সার্বিক এ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে বাংলাদেশ সরকার রাশিয়ার সাথে ২০০৯ সালের ১৩ মে একটি প্রাথমিক চুক্তি স্বাক্ষর করে। যাতে বলা হয় ১ হাজার মেগাওয়াটের পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করতে হবে। এতে আনুমানিক ব্যয় ধরা হয় ১৫০ কোটি মার্কিন ডলার। ২০০৯ সালের ২১ মে মস্কোয় বাংলাদেশ ও রাশিয়া পরমাণু জ্বালানির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সহযোগিতার 'কাঠামো চুক্তি' স্বাক্ষর করা হয়।

পরমাণু জ্বালানির সুবিধা-অসুবিধাসমূহ : পরমাণু জ্বালানি সম্পর্কে বলা হয় এ জ্বালানির মাধ্যমে কার্বন নির্গমন হয় কম। ভারতে কয়লা পোড়ানোর ফলে সেখানে কার্বন নির্গমন এক বছরে ২৭৯ দশমিক ৯ মিলিয়ন মেট্রিক টন। পাকিস্তানে এর পরিমাণ ২৯ দশমিক ৬১ ও বাংলাদেশে ৮ দশমিক ৮ মিলিয়ন মেট্রিক টন। পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে সুবিধা যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে অসুবিধাও। সুবিধা হলো অনেক কম খরচে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। বিদ্যুৎ উৎপাদনে গলিত জ্বালানি যেমন গ্যাস, কয়লা, তেল এসব থেকে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রে উৎপাদন খরচ অনেক কম হবে। আমদানি নির্ভর জ্বালানির ক্ষেত্রে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রে জ্বালানি খরচ সব থেকে কম। অন্যদিকে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সব থেকে বড় সমস্যা বিনিয়োগ—স্থাপন করতে অনেক অর্থের প্রয়োজন। কম আয়ের দেশগুলোর ক্ষেত্রে এ অর্থ সংগ্রহ অসম্ভব হয়ে পড়ে। দীর্ঘমেয়াদে লাভজনক হলেও স্থাপনে খরচ প্রায় দ্বিগুণ। এর জ্বালানি যে কোনো দেশ থেকে আনা সম্ভব নয়। বাংলাদেশ নিজেও উৎপাদন করতে পারবে না কারণ আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা আছে। নির্দিষ্ট দেশ থেকেই সব সময় জ্বালানি আনতে হবে। তাদের সঙ্গে সব সময় ভালো সম্পর্ক থাকতে হবে। বাংলাদেশের মতো কম আয়ের দেশে তাই এ ধরনের বিশাল বিনিয়োগ একটি বড় সমস্যা।

সাধারণত ৬০০ থেকে ১০০০ মেগাওয়াটের পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা হলে উৎপাদন খরচ কম হয়। কিন্তু কেন্দ্র স্থাপনে গ্যাসভিত্তিক কেন্দ্রের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ খরচ হয়। প্রচলিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে প্রতি মেগাওয়াটের জন্য গড়ে খরচ হয় ১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। কিন্তু আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলোতে পরমাণু কেন্দ্র স্থাপন করতে খরচ হয়েছে দেড় থেকে ২ মিলিয়ন ডলার। সে হিসেবে ১ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করতে খরচ হবে দেড় মিলিয়ন ডলার বা ১৫০ কোটি ডলার। বর্তমানে ২৫০ থেকে ৩০০ মেগাওয়াটের বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা যায়। তবে এ খরচ দেশ ও স্থানভেদে ভিন্ন হয়। জাপানে পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদনে খরচ হয় প্রতি ইউনিটে ৪ ডলার ৮০ সেন্ট, কয়লায় ৪ ডলার ৯৫ সেন্ট ও গ্যাসে ৫৫ ডলার ২১ সেন্ট। কোরিয়ায় পরমাণুতে ২ ডলার ৩৪ সেন্ট, কয়লায় ২ ডলার ১৬ সেন্ট ও গ্যাসে ৪ ডলার ৬৫ সেন্ট। বর্তমানে বিশ্বে যে বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় তার ২৪ ভাগই পরমাণু শক্তি থেকে। এগুলোর সবই প্রায় উন্নত দেশে। বিশ্বে ২০টি পরমাণুভিত্তিক ৪২০টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র আছে। যাই হোক, পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র নিয়ে একটা বড় ভয় হচ্ছে এর রক্ষণাবেক্ষণে যদি ত্রুটি থাকে তাহলে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। আশির দশকে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের চেরনোবিলে যে দুর্ঘটনা ঘটেছিল তার ফল এখনো রয়ে গেছে। চেরনোবিলের ঐ এলাকা এখনো বসবাসের অযোগ্য। দুর্ঘটনাকবলিত কেন্দ্রটি আর চালু করা সম্ভব হয়নি। বরং বিশাল এক এলাকা মাটি চাপা দেয়া হয়েছে। সেখান থেকে এখনো তেজস্ক্রিয় রশ্মি বের হচ্ছে এমন খবরও পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউক্লিয়ার প্লান্টে অতীতে দুর্ঘটনা ঘটেছে। বাংলাদেশের জন্য ভয়টা এখানেই। পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দক্ষ জনশক্তি আমাদের নেই। কাজেই দীর্ঘদিন আমাদের রাশিয়ার বিশেষজ্ঞদের উপর নির্ভর করে থাকতে হবে। দ্বিতীয় আরেকটি সমস্যা হচ্ছে জনশক্তির ঘনত্ব। রূপপুরে যেখানে জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল, সেখানকার আশপাশে জনবসতি রয়েছে। এই জনবসতি উৎখাত করা হবে একটি বড় সমস্যা। এছাড়া বাংলাদেশের এমন কোনো বিরল এলাকা নেই যেখানে কেন্দ্রটি স্থাপন করা যায়। কয়লা উত্তোলন নিয়ে বাংলাদেশে যে বড় ধরনের বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে এবং যেভাবে জনমতকে সংগঠিত করা হয়েছে, তাতে করে একটা আশংকা থেকেই গেল যে অদূর ভবিষ্যতে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র নিয়েও এমনটি ঘটতে পারে। তবে বাস্তবতা হচ্ছে এটা ছাড়া আমাদের কোনো বিকল্পও নেই।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

উপসংহার : জ্বালানি আজ বিশ্বের অন্যতম একটি সমস্যা। আর এ সমস্যা সমাধানে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রসমূহ অনেক আগেই পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদনের আশ্রয় নিয়েছে। বিশ্বে বর্তমানে উৎপাদিত বিদ্যুতের ১৭ থেকে ২৪ শতাংশ পাওয়া যাচ্ছে পরমাণু শক্তি থেকে। বিশ্বে বর্তমানে ৪২০টি পরমাণুভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র আছে, এর মধ্যে ৫৯টি ফ্রান্সে। তারা এ খাত থেকে ৭৯ শতাংশ বিদ্যুৎ পাচ্ছে। বেলজিয়ামের ৫৮টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ পাচ্ছে তার পরিমাণ ৫৮ শতাংশ। চীন এ খাত থেকে উৎপাদন করছে ৯ হাজার মেগাওয়াট, ভারত চার হাজার ১২০ মেগাওয়াট এবং পাকিস্তান ৪২৫ মেগাওয়াট। ২০২০ সালের মধ্যে পাকিস্তান সাত হাজার, ভারত ২০ হাজার এবং চীন ৪০ হাজার মেগাওয়াটের পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করবে। জাতিসংঘ ২০০৭ সালের জুনে বাংলাদেশকে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের অনুমতি দিয়েছে। এ লক্ষ্যে ২০০৯ সালের ১৩ মে রাশিয়ার সাথে বাংলাদেশ একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। এরপর ২০০৯ এর ২১ মে মস্কোয় বাংলাদেশ ও রাশিয়া পরমাণু জ্বালানির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সহযোগিতায় 'কাঠামো চুক্তি' বা 'ছাতা চুক্তি' স্বাক্ষর করেছে। বাংলাদেশে বিদ্যুৎ সংকট দিনদিন প্রকট হয়ে উঠছে। এমতাবস্থায় এ সংকট মোকাবেলায় বাংলাদেশকে পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদনের দিকে দ্রুত যেতে হবে। আর এর জন্য যা প্রয়োজন তা হলো পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে চুক্তি স্বাক্ষরের পর সফল বাস্তবায়নে সকলের ঐকান্তিক সদিচ্ছা ও সহযোগিতা।

১৮ । নবায়নযোগ্য শক্তি কি? বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য শক্তি সম্পদের সম্ভাবনা কতটুকু?

উত্তর : শক্তি ছাড়া পৃথিবী অচল। বিভিন্ন শক্তির রূপান্তর ঘটিয়ে টিকে আছে পৃথিবী ও মানবসভ্যতা। কিন্তু পৃথিবীতে জ্বালানি অসীম নয়। প্রতিনিয়তই নিঃশেষ হওয়ার পথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছে তেল, গ্যাস, কয়লাসহ প্রাকৃতিক জ্বালানি। অদূর-ভবিষ্যতে শক্তি প্রাপ্যতার সংকট চরমে উঠবে বলেই মেনে নিয়েছেন গবেষক ও বিশ্লেষকরা । তাই বিকল্প শক্তির সন্ধানে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন সংশ্লিষ্টরা। বর্তমান বিশ্বে একটি উল্লেখযোগ্য শক্তি হলো নবায়নযোগ্য শক্তি। বিশ্বে প্রতিদিনই নবায়নযোগ্য শক্তির উৎপাদন বাড়ছে। বর্তমান বিশ্বে মোট জ্বালানি চাহিদার অনেকটাই আসছে নবায়নযোগ্য শক্তি থেকে। বাংলাদেশে সহজলভ্য নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে। তাছাড়া বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় অন্যতম কৌশল হিসেবেও নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহারকে বেছে নেয়া যায়। তাই আমাদের সম্পদ ও সামর্থ্য অনুযায়ী নবায়নযোগ্য শক্তির উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন নতুন প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে।

নবায়নযোগ্য শক্তি : নবায়নযোগ্য শক্তি হচ্ছে এমন এক ধরনের শক্তি, যার ক্রয়মূল্য শূন্য এবং যার উৎসসমূহ সাধারণত নিঃশেষিত হয় না। এর রূপান্তরিত শক্তি সকল প্রকার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ও পরিবেশ দূষণ থেকে মুক্ত। তাছাড়া এটি গতানুগতিক জীবাশ্ম জ্বালানি ও পারমাণবিক বিভাজন উপকরণাদি থেকে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। বিদ্যুৎ উৎপাদনসহ হিটিং, যানবাহনের জ্বালানি এবং দুর্গম অঞ্চলে শক্তি সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যেও নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহৃত হয়।

উল্লেখ্য, গতানুগতিক শক্তি পদ্ধতির সাথে তুলনায় নবায়নযোগ্য শক্তি পদ্ধতির নির্দিষ্ট কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যেমন–

১. অত্যন্ত নিম্ন রূপান্তর ক্ষমতা।
২. অত্যন্ত উচ্চ পুঁজি ব্যয়।
৩. একটিমাত্র বৃহদাকার বাস্তবায়ন যোগ্যতা না থাকা।
৪. উৎসের সহজলভ্যতার ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

বাংলাদেশে সম্ভাব্য নবায়নযোগ্য শক্তি : বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশ। বাংলাদেশ প্রতিনিয়ত স্বপ্ন দেখাচ্ছে নতুন নতুন সম্ভাবনাময় পথের। প্রযুক্তি ক্ষেত্রে উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে প্রতিনিয়ত বাড়ছে শক্তির ব্যবহার ও চাহিদা। আর এই চাহিদা মেটাতে প্রতিনিয়ত বিদ্যুৎ ও গ্যাসের উপর চাপ বাড়ছে। কিন্তু সে তুলনায় এই দু শক্তির নতুন নতুন উৎপাদন হচ্ছে না। ফলে আমাদের বিকল্প শক্তির সন্ধান করতে হচ্ছে। এই বিকল্প শক্তি হিসেবে নবায়নযোগ্য শক্তির কোনো বিকল্প নেই। বাংলাদেশে উৎপাদন বা ব্যবহার করা সম্ভব এমন কিছু নবায়নযোগ্য শক্তি সম্পদ হলো :

১. **সৌরশক্তি :** সৌরশক্তি হলো সূর্য রশ্মি থেকে আহরিত শক্তি। সাধারণভাবে বললে সূর্যের বিকিরণ থেকে আসা তাপকে সংরক্ষণ করে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরের ধারণাই সৌরশক্তির প্রাথমিক সাফল্যের জানান দেয়। শক্তি ব্যবহারের যতগুলো রূপ আছে তার প্রায় সবই তাপ উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কিত। আর পৃথিবীতে তাপের একমাত্র উৎস হলো সূর্য। সৌরশক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হওয়ার পর পরই নতুন করে গতি পেয়েছে শক্তির সংকট মোকাবিলা ও ভবিষ্যতে ব্যবহার্য শক্তি উৎপাদন সম্ভাবনার।

ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশের অবস্থান ২০°২৪′-২৬°৩৮′ উত্তর অক্ষাংশে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ সৌরশক্তি ব্যবহারের অনুকূলে রয়েছে। বাংলাদেশে জুন থেকে আগস্ট পর্যন্ত প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। বৃষ্টিপাতের এ সময়টুকু ব্যতীত বছরের অধিকাংশ সময় জুড়ে বিদ্যমান প্রচুর সূর্যালোককে কাজে লাগিয়ে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব। বাংলাদেশ এখন সৌরশক্তির সাহায্যে ঘরের বাতি, ফ্যান, টেলিভিশন, ফ্রিজ থেকে শুরু করে মোটর চালিয়ে পানি তোলার কাজেও সাফল্য পেয়েছে। বর্তমানে উড়োজাহাজ, ভূ-উপগ্রহ, সামুদ্রিক প্রমোদতরী, রেসিংকার থেকে শুরু করে একটি পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ, তাপ অথবা যান্ত্রিক শক্তি সৌরশক্তির সাহায্যে উৎপাদন করা যাচ্ছে।

সৌরশক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরের যান্ত্রিক দক্ষতা বৃদ্ধি পেলে বাণিজ্যিকভাবে তো বটেই শিল্প-কারখানায় বিপুল পরিমাণ উৎপাদন সৌরশক্তি নির্ভর হয়ে পড়াটা সময়ের ব্যাপার মাত্র। অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৪ অনুযায়ী সারাদেশে অদ্যাবধি ২৮ লক্ষের অধিক সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। সেখান থেকে ১১৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়েছে, যা আমাদের বিদ্যুৎ ঘাটতি পূরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। বর্তমানে বাংলাদেশের সোলার হোম সিস্টেম (SHS) প্রমোশন কর্মসূচি বিশ্বের অন্যতম সফল সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন কর্মসূচি। এ সৌরশক্তিকে সঠিকভাবে কাজে লাগালে, তা থেকে আরও অধিক পরিমাণে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব।

২. **জলবিদ্যুৎ শক্তি :** বিদ্যুৎ উৎপাদনের একটি সস্তা এবং সুগঠিত পদ্ধতি হলো জলবিদ্যুৎ। নদী, সাগর বা জোয়ার ভাটার স্রোত কাজে লাগিয়ে এবং খালের মতো কৃত্রিম জলপথে প্রবাহ তৈরি করে টারবাইন ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রক্রিয়াকে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন প্রক্রিয়া বলে। এরই মধ্যে স্রোত ও প্রবাহমান পানি থেকে শক্তি উৎপাদনের দিকে ঝুঁকতে শুরু করেছে বিশ্বের বেশ কিছু উন্নত দেশ। পিছিয়ে নেই উন্নয়নশীল দেশগুলোও। পানির স্থিতিশক্তি এবং গতিশক্তি শক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কয়েকটি পদ্ধতিতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : ক. প্রথাগত জলবিদ্যুৎ পদ্ধতি; খ. জোয়ার-ভাটা কেন্দ্রিক বিদ্যুৎ স্থাপনা পদ্ধতি ও গ. তরঙ্গ বিদ্যুৎ পদ্ধতি।

ক. **প্রথাগত জলবিদ্যুৎ :** বাংলাদেশের মতো দেশে প্রথাগত জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সুযোগ অত্যন্ত সীমিত। কারণ দেশটি উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বের কিছু পাহাড়ি এলাকা এবং উত্তর ও উত্তর-

পশ্চিমাঞ্চলের কিছু উচ্চভূমি ছাড়া মূলত নিম্ন ও সমতলভূমির। দেশের একমাত্র প্রথাগত জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটি হলো কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প। কর্ণফুলী নদীর উপর অবস্থিত কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানির উৎপাদন শুরু হয় ১৯৬২ সালে। শুরুর দিকে ৮০ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতা থাকলেও ধাপে ধাপে এর উৎপাদন ক্ষমতা ২৩০ মেগাওয়াটে উন্নীত করা হয়েছে। জলাধারের ধারণ ক্ষমতা ও পানির শীর্ষের ওপর নির্ভর করে প্রথাগত জলবিদ্যুৎ স্থাপনাগুলোকে তিনটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা যায়।

i. বৃহৎ (পানির শীর্ষ ৩০ মিটারের ওপরে ও উৎপাদিত শক্তি ৫ মেগাওয়াটের ওপরে হলে)

ii. ক্ষুদ্র (পানির শীর্ষ ২৫ থেকে ৩০ মিটার ও উৎপাদিত বিদ্যুৎশক্তি ৫০০ কিলোওয়াট থেকে ৫ মেগাওয়াট পর্যন্ত হলে)

iii. অতি ক্ষুদ্রায়তন (পানির শীর্ষ ৩ থেকে ১৫ মিটার ও উৎপাদিত বিদ্যুৎশক্তির পরিমাণ ১০ থেকে ৫০০ কিলোওয়াট পর্যন্ত হলে)।

খ. **জোয়ার-ভাটাকেন্দ্রিক বিদ্যুৎ স্থাপনা পদ্ধতি :** জোয়ার-ভাটাকে কাজে লাগিয়েও বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়, যা ইতোমধ্যে বিশ্বের অনেক উন্নত দেশগুলো এ সংক্রান্ত জরিপ সম্পন্ন করেছে এবং এক্ষেত্রে প্রস্তাবনাসমূহ স্ব স্ব সরকার কর্তৃক মূল্যায়িত হয়েছে। ফ্রান্সের রেনস নদীর মোহনায় ২৪০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন জোয়ার-ভাটা বিদ্যুৎ স্থাপনা রয়েছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও দেশটির দক্ষিণের উপকূলীয় অঞ্চলে এর চমৎকার সম্ভাবনা রয়েছে।

গ. **তরঙ্গ বিদ্যুৎ পদ্ধতি :** সমুদ্রের তরঙ্গকে কাজে লাগিয়ে তরঙ্গবিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। সমুদ্র তরঙ্গের শক্তি নির্ভর করে তরঙ্গের উচ্চতা এবং তরঙ্গের স্থায়িত্বের ওপর। তরঙ্গশক্তিকে কাজে লাগিয়ে যুক্তরাজ্য, আয়ারল্যান্ড, নরওয়ে, ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও বঙ্গোপসাগর থেকে তরঙ্গশক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব।

৩. **পারমাণবিক শক্তি :** অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য শক্তির উৎস হবে পারমাণবিক শক্তি। পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে সে পথেই হাঁটছে বিশ্ব। পারমাণবিক শক্তি হলো মূলত শক্তির এক প্রকার রূপ। নিউক্লিয় ফিউশন বা ফিশন বিক্রিয়ার ফলে এ শক্তির উদ্ভব ঘটে। কোনো একটি ভারি মৌলের পরমাণুকে নিউট্রন দ্বারা আঘাত করলে ভারি মৌলটি ভেঙে দুটি হালকা মৌলের পরমাণুতে পরিণত হয় এবং বিপুল পরিমাণ তাপশক্তির বিকিরণ ঘটে। এ শক্তিকেই বলা হয় পারমাণবিক শক্তি। পরমাণুর কেন্দ্র যত ছোট হোক না কেন ক্ষুদ্র এ বস্তু পিণ্ডটাকে একসঙ্গে ধরে রাখতে এর ভেতর প্রচুর পরিমাণে শক্তি সঞ্চিত থাকে। নিরাপদ বিদ্যুতের অন্যতম একটি সমাধান হলো পারমাণবিক শক্তি। বাংলাদেশে পারমাণবিক শক্তির উন্নয়নে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের প্রথম পরিকল্পনা গৃহীত হয় ১৯৬১ সালে। সে থেকে এই প্রকল্প স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের পর ১৯৬৩ সালে পাবনার রূপপুরকে প্রকল্পের স্থান হিসেবে নির্বাচন করা হয়। ২০০১ সালে বাংলাদেশ সরকার পারমাণবিক শক্তি পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং ২০০৭ সালে বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সরকারিভাবে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের নীতিগত সিদ্ধান্তগ্রহণ করা হয়।

বাংলাদেশ সরকার পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে কানাডা, সুইডেন, নরওয়ে সরকারের সাথে আলোচনা করে কোনো ফলাফল না পেলেও ২০০৯ সালে রাশিয়ার সাথে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে একটি সমঝোতা স্মারক বা MOU (Memorendum of Understanding) স্বাক্ষর করে। অবশেষে ২০১৩ সালের ২ অক্টোবর পাবনার রূপপুরে দেশের প্রথম পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। রাশিয়ার সহযোগিতায় ২ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি নির্মিত হবে। ৫ স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থাযুক্ত রাশিয়ার সর্বাধুনিক তৃতীয় প্রজন্মের প্রযুক্তি দিয়ে ১ হাজার মেগাওয়াটের দুটি ভিভিআর রিঅ্যাক্টর সম্বলিত পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র হবে এটি। ২০২১ সালের মধ্যে এ পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে দুই হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যোগ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

৪. **বায়ুশক্তি :** বায়ুশক্তি হলো বায়ুর গতিশক্তিকে কাজে লাগিয়ে পাওয়া রূপান্তরিত শক্তি। শক্তি ব্যবহারের প্রথম দিকে কয়েক শতাব্দীব্যাপী বায়ু প্রবাহকে ব্যবহার করা হতো জাহাজ চালনায়, বাতাস কল চালনায়, পানি উত্তোলনে, জমিতে সেচকার্যে এবং অন্যান্য অসংখ্য উদ্দেশ্যে। কিন্তু 'উইন্ড মিল' স্থাপনের পর থেকে বায়ু প্রবাহে শক্তি সম্ভাবনার দুয়ার খুলে যায়। বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে বায়ুকল বা উইন্ড মিল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন। বিশ্বের সবচেয়ে বড় বায়ুচালিত জেনারেটর দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। বিগত কয়েক বছরে প্রায় ১৮ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করার মাধ্যমে সাফল্যের প্রমাণ মিলেছে সেখানে। যুক্তরাষ্ট্র ২০৩০ সালের মধ্যে তাদের মোট বিদ্যুৎ চাহিদার পাঁচ ভাগের এক ভাগ বায়ুশক্তির সাহায্যে উৎপাদিত বিদ্যুৎ দিয়ে পূরণ করার লক্ষ্যমাত্রা হাতে নিয়েছে। ডেনমার্কেও তাদের চাহিদার বিশভাগ শক্তির জোগান দিচ্ছে উইন্ড মিলগুলো।

বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি অনুযায়ী বছরে ছয় মাসেরও বেশি সময় মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হয়। এ মৌসুমী বায়ুকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশেও উন্নত প্রযুক্তির বায়ু বিদ্যুৎ প্রকল্প বসিয়ে দেশের বিস্তীর্ণ উপকূলীয় এলাকায় হাজার হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব। বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে বিনিয়োগের বাইরে চারটি জরুরি উপকরণ হলো প্রচুর বাতাস, বিস্তীর্ণ সমভূমি, উৎপাদিত বিদ্যুৎ সঞ্চালনের ব্যবস্থা এবং প্রয়োজনীয় সড়ক অবকাঠামো। এ চারটি উপকরণের উপস্থিতিতে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ইতোমধ্যে পাইলটভিত্তিক উপায়ে উপকূলবর্তী কুতুবদিয়া দ্বীপে ১.০ মেগাওয়াট ও ফেনী এলাকায় ০.৯ মেগাওয়াট ক্ষমতার বায়ু চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও উপকূলীয় এলাকায় বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক কিছু সংখ্যক ক্ষুদ্র বায়ুশক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে স্থাপনা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

নবায়নযোগ্য শক্তি গবেষণা কেন্দ্র : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিজ্ঞান অনুষদের আওতায় ১৯৮৬ সালে নবায়নযোগ্য শক্তি গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ গবেষণা কেন্দ্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে সৌরশক্তি এবং সেই সঙ্গে শক্তির অন্যান্য বিকল্প উৎসসমূহ সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা, সৌরশক্তি সংক্রান্ত বহুশাস্ত্রীয় গবেষণা কার্যক্রম প্রতিষ্ঠা, সহযোগিতা ও অনুসন্ধান করা এবং দেশে বিদেশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীদের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা। গবেষণা কেন্দ্রটির একটি নিজস্ব বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার রয়েছে। প্রতিবছর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গবেষক এ গবেষণাকেন্দ্রে গবেষণাকর্ম পরিচালনা করে থাকেন।

উপসংহার : বর্তমান বিশ্বে মোট জ্বালানি চাহিদার অনেকটাই আসছে নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস থেকে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নবায়নযোগ্য শক্তির বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি, জলবিদ্যুৎ শক্তি, পারমাণবিক শক্তি, সমুদ্রতাপ শক্তি, বর্জ্যকে শক্তি সম্পদে রূপান্তরসহ অন্যান্য নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস বাংলাদেশে রয়েছে। এসব নবায়নযোগ্য শক্তিকে সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে তা থেকে বিপুল পরিমাণ বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন সম্ভব।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-০১ কালো সোনা কি?

উত্তর : কালো সোনা মূলত কোনো সোনা নয়। রূপকার্থে মূল্যবান কালো রঙের খনিজ পদার্থকে কালো সোনা বা 'ব্লাক গোল্ড' আখ্যা দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে এ কালো সোনা প্রথম আবিষ্কার করেন বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের কর্মকর্তা ও. এইচ. কবির। কালো সোনা নামে যে মূল্যবান খনিজ পদার্থ পাওয়া গেছে তার মধ্যে রয়েছে জিরকন, রিওটাইল, মোনাজাইট ইত্যাদি। এসব খনিজ কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের বালুতে যথেষ্ট পরিমাণে মিশ্রিত অবস্থায় আছে। জিরকন নিউক্লিয়ার ফুয়েল, কাগজশিল্প, কালার টেলিভিশন, গ্যাস প্লাই প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয়। কক্সবাজারের কালো সোনা আহরণ করলে দেশের চাহিদা মিটিয়েও বিদেশে রপ্তানি করা সম্ভব হবে। এখন বাংলাদেশ অস্ট্রেলিয়া থেকে এ উপাদান সংগ্রহ করে। অস্ট্রেলিয়ার বালুতে জিরকনের পরিমাণ ৫%। অথচ কক্সবাজারের বালুতে এর পরিমাণ ১০%-এরও বেশি বলে প্রতীয়মান হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার একদল বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশের এ কালো সোনা সংগ্রহ না করার পরামর্শ দেয়ায় সরকার এ বিষয়ে পুনরায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখার চিন্তাভাবনা করছে।

প্রশ্ন-০২ রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস (CNG) কি?

উত্তর : গ্যাস একটি মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ। আধুনিক সভ্যতায় এর রয়েছে বহুমুখী ব্যবহার। বিদ্যুৎ উৎপাদন, সার উৎপাদন, শিল্পে ব্যবহার, জ্বালানি ও গৃহস্থালি কাজে ব্যবহারের মাধ্যমে গ্যাস একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে। বাংলাদেশে বিদ্যমান প্রাকৃতিক গ্যাসের বহুমুখী ব্যবহার করা গেলে এ দেশেও তা ব্যাপক ভূমিকা রাখবে। বর্তমানে বাংলাদেশে যে সব খাতে গ্যাস ব্যবহৃত হচ্ছে তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ খাতকে এখনো আমরা কাজে লাগাতে পারি। সেটি হলো পরিবহনের জ্বালানি হিসেবে গ্যাসের ব্যবহার। এ দেশে যানবাহনে প্রাকৃতিক গ্যাস বা সিএনজির ব্যবহার ব্যাপক লাভজনক হতে পারে। কেননা পেট্রোল বা ডিজেলচালিত যানবাহনের তুলনায় গ্যাসচালিত যান থেকে দূষণ নির্গমনের মাত্রা অনেক কম। তাই সিএনজির মাধ্যমে গ্যাসের ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারলে পরিবেশ রক্ষায় তা হবে একটি অন্যতম মাইলফলক। অন্যদিকে প্রাকৃতিক গ্যাসের মোট অকটেন নম্বর ১৩৪ আর মিথেন নম্বর ৯১.১। অকটেন নম্বর বৃদ্ধিকারক কোনো পদার্থ গ্যাসের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে না বলে অনেক অর্থ সাশ্রয় হবে। এছাড়া প্রতি কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করতে গ্যাসচালিত যানের জ্বালানি খরচ পেট্রোল/ডিজেলচালিত যানের তুলনায় অনেক কম পড়বে।

প্রশ্ন-০৩ বাংলাদেশের খনিজসম্পদের ওপর আলোকপাত করুন।

উত্তর : বাংলাদেশ খনিজসম্পদে ততটা সমৃদ্ধ নয়। গ্যাস, তেল, কয়লা, কঠিন শিলা, চুনাপাথর, কাচবালি, চীনামাটি প্রভৃতি খনিজসম্পদ এ দেশে পাওয়া যায়। এদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দেয়া হলো :

১. **প্রাকৃতিক গ্যাস :** বাংলাদেশে এ পর্যন্ত প্রাপ্ত প্রাকৃতিক গ্যাসের খনি অনুসন্ধানে জানা যায়, এসব খনিতে উত্তোলনযোগ্য সম্ভাব্য মজুদ ২৭.০৩৮ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। ২০১৪ পর্যন্ত ২৬টি গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হলেও ২০টি গ্যাসক্ষেত্র থেকে গ্যাস উত্তোলন করা হচ্ছে।

২. কঠিন শিলা : দিনাজপুর জেলার মধ্যপাড়ায় কঠিন শিলা আবিষ্কৃত হয়েছে। এখান থেকে পাথর উত্তোলিত হচ্ছে।

৩. চীনামাটি : নেত্রকোনা জেলার বিজয়পুরে ৮ লাখ মেট্রিক টন চীনামাটি সঞ্চিত আছে। এছাড়া নওগাঁর পত্নীতলা ও চট্টগ্রামের পটিয়াতেও চীনামাটি মজুদ আছে।

৪. চুনাপাথর : সিলেটের টেকেরহাট, লালঘাট ও বাগালী বাজার এবং জয়পুরহাটে চুনাপাথর পাওয়া গেছে।

৫. খনিজ তেল : ১৯৮৬ সালে সিলেটের হরিপুরে তেলের সন্ধান পাওয়া যায়। বর্তমানে এ তেলক্ষেত্র থেকে দৈনিক ১২০০ ব্যারেল তেল উত্তোলন করা হচ্ছে।

৬. অন্যান্য : এছাড়া আরো অনেক খনিজসম্পদ আমাদের দেশে রয়েছে। তার মধ্যে কয়লা ও কাচবালি অন্যতম।

প্রশ্ন-০৪ বাংলাদেশের কোথায় সাদা মাটি পাওয়া যায়?

উত্তর : বাংলাদেশের নেত্রকোনা জেলার বিজয়পুরে সাদামাটি (White Clay) পাওয়া যায়।

প্রশ্ন-০৫ বাংলাদেশে কয়টি গ্যাসক্ষেত্র রয়েছে? সবচেয়ে বৃহৎ গ্যাসক্ষেত্র এবং বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত গ্যাসক্ষেত্রের নাম লিখুন।

উত্তর : প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলনের জন্য সমগ্র বাংলাদেশকে ২৩টি ব্লকে ভাগ করা হয়েছে। আর দেশে গ্যাসক্ষেত্রও রয়েছে মোট ২৬টি। তিতাস বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ গ্যাসক্ষেত্র এবং বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত গ্যাসক্ষেত্র হচ্ছে সাঙ্গু।

প্রশ্ন-০৬ বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি কোথায়?

উত্তর : বড়পুকুরিয়া হচ্ছে দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর থানার চৌহাটি গ্রামের একটি স্থান। বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) ১৯৮৫ সালে এখানে কয়লা মজুদ আবিষ্কার করে। পৃথিবীর মোট তাপ ও শক্তি সরবরাহের শতকরা ৫২ ভাগই আসে সর্বশ্রেষ্ঠ জড়শক্তি কয়লা থেকে। আমাদের দেশে কয়লার ব্যবহার কম হলেও প্রতি বছর প্রায় ১৫৭ কোটি টাকা মূল্যের ৭ লাখ টন কয়লা আমদানি করা হয়। কিন্তু বড়পুকুরিয়ায় কয়লাখনি আবিষ্কৃত হওয়ায় এ অবস্থার পরিবর্তন হতে চলেছে। এখানে উন্নত মানের বিটুমিনাস শ্রেণীর কয়লা পাওয়া গেছে, যাতে কার্বনের পরিমাণ ৪৮.৪%। মোট মজুদ প্রায় ৩৯০ মিলিয়ন মেট্রিক টন। এ থেকে উত্তোলনযোগ্য কয়লার পরিমাণ প্রায় ৬৪ মিলিয়ন মেট্রিক টন। ৫.২৫ বর্গকিলোমিটার বিস্তৃত এলাকায় ১১৮ মিটার থেকে ৫০৯ মিটার গভীরতায় এ কয়লা ৬টি স্তরে মজুদ রয়েছে। তাপজনন ক্ষমতার দিক দিয়ে এ মজুদ কয়লা ১০.৪৪ ট্রিলিয়ন সিএফটি প্রাকৃতিক গ্যাসের সমপরিমাণ।

প্রশ্ন-০৭ বাংলাদেশের বৃহৎ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের নাম কি? এটি কোথায় অবস্থিত?

উত্তর : বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র কর্ণফুলী পানিবিদ্যুৎ কেন্দ্র। ১৯৬২ সালে এটি নির্মাণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পে রাঙামাটির কাপ্তাই নামক স্থানে কর্ণফুলী নদীর ওপর বাঁধ দিয়ে পানির প্রবাহকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়। কাপ্তাই পানিবিদ্যুৎ কেন্দ্রে দুটি জেনারেটরের সাহায্যে বর্তমানে ৮০ হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

বাংলাদেশের সংবিধান : প্রস্তাবনা, বৈশিষ্ট্য, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ও সাংবিধানিক সংশোধনী

Constitution of Bangadesh : Preamble, Features, Directive Principles of State Policy & Constitutional Amendments

Syllabus | *The Constitution of the People's Republic of Bangladesh; Preamble, Features, Directive Principles of State Policy, Constitutional Amendments.*

বিগত বিসিএস পরীক্ষায় প্রশ্ন ও উত্তর

০১. ১৯৭২ সালের সংবিধানে বিধৃত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ বর্ণনা করুন। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনের প্রেক্ষিতে কি কি পরিবর্তন সাধিত হয়েছে? [৩২তম বিসিএস]

০২. বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন সম্বন্ধে কি জানেন? ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সংবিধানকে কেন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংবিধান হিসেবে বিবেচনা করা হয়? [২৩তম বিসিএস]

০৩. ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সংবিধানে উল্লিখিত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ বা নির্দেশাত্মক নীতিগুলো আলোচনা করুন। [৩০তম বিসিএস]

০৪. মৌলিক অধিকার বলতে কি বোঝেন? ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ সংবিধানে উল্লিখিত মৌলিক অধিকারসমূহ আলোচনা করুন। মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকারের মধ্যে পার্থক্য কি? [৩০তম বিসিএস]
অথবা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান কোন সালের কোন তারিখ হতে কার্যকর হয়? এতে বিধৃত মৌলিক অধিকারসমূহ বর্ণনা করুন। [২৯তম বিসিএস; ৩৪তম বিসিএস]

০৫. বিভিন্ন শাসনামলে সাধিত বাংলাদেশের সংবিধানের সংশোধনীসমূহ আলোচনা করুন। [১৮তম; ২১তম; ২৪তম বিসিএস]
অথবা, বাংলাদেশের সংবিধানের সংশোধনীসমূহ আলোচনা করুন। [১৩তম বিসিএস]
অথবা, বাংলাদেশ সংবিধানের প্রধান সংশোধনীগুলো আলোচনা করুন। [২৭তম বিসিএস]

০৬. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত 'সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী'। — ব্যাখ্যা করুন। [২৭তম বিসিএস]

০৭. *সংবিধান বলতে কি বুঝায়? বাংলাদেশ সংবিধানের ৪র্থ সংশোধনীর মাধ্যমে কি কি পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল, তা আলোচনা করুন। [২৭তম বিসিএস]*

০৮. *'রাষ্ট্রের পছন্দকৃত জীবন পদ্ধতিই সংবিধান।' বাংলাদেশ সংবিধানের সংশোধনীর আলোকে উক্তিটি ব্যাখ্যা করুন। [২৭তম বিসিএস]*

০৯. *সংবিধান অনুযায়ী অর্থ বিলে কোন বিষয়াবলী সম্বলিত থাকে? কোন মন্ত্রী/মন্ত্রণালয় এটা প্রণয়ন ও অনুমোদন প্রক্রিয়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং এর সার্বিক অনুমোদন প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন। [২৯তম বিসিএস]*

১০. *ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে কি বোঝেন? বিভিন্ন শাসনামলে এক্ষেত্রে আনীত পরিবর্তনগুলো পর্যালোচনা করুন। [২২তম বিসিএস]*

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

১১. *সংবিধান কাকে বলে? সংবিধান প্রণয়নের পদ্ধতি আলোচনা করুন। বাংলাদেশের সংবিধান কোন পদ্ধতিতে প্রণয়ন করা হয়েছে?*

১২. *বাংলাদেশ সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী সম্পর্কে বিস্তারিত লিখুন।*

১৩. *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে কি কি সংশোধনী আনা যুক্তিযুক্ত বলে আপনি মনে করেন?*

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

০১. *সংবিধানের সংজ্ঞা দিন? [৩৩তম বিসিএস]*

০২. *বঙ্গবন্ধু (শেখ মুজিবুর রহমান)-এর প্রতিকৃতি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে? [৩৩তম বিসিএস]*

০৩. *বাংলাদেশ সংবিধান কখন প্রণীত হয়?*

০৪. *বাংলাদেশের সংবিধানের চার মূলনীতি কি কি? [৩৩তম বিসিএস]*

০৫. *চতুর্দশ সংশোধনীতে সংবিধানের কোন কোন বিষয় সংশোধন করা হয়?*

০৬. *পঞ্চদশ সংশোধনীতে সংবিধানের কোন কোন বিষয় সংশোধন করা হয়?*

০৭. *বাংলাদেশ সংবিধানে কয়টি অনুচ্ছেদ আছে?*

০৮. *বাংলাদেশ সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি কিরূপ?*

০৯. *সাংবিধানিকভাবে গঠিত প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার নাম লিখুন।*

১০. *সংবিধানের প্রথম ও চতুর্থ সংশোধনী সম্পর্কে কি জানেন?*

১১. *সংবিধানে উল্লিখিত নারী অধিকারগুলো লিখুন।*

১২. *বাংলাদেশ সংবিধানে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও এখতিয়ার আলোচনা করুন।*

১৩. *"প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ।" –সংবিধানের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ অনুসরণে ব্যাখ্যা করুন। [২৮তম বিসিএস]*

১৪. *কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তি বলতে কি বোঝায়? সংবিধানের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ অনুসরণে লিখুন। [২৮তম বিসিএস]*

১৫. *গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লব বলতে কি বোঝায়? সংবিধানের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদে বর্ণিত মতে ব্যাখ্যা করুন। [২৮তম বিসিএস]*

১৬. *"কোর্ট অব রেকর্ড" বলতে কি বোঝায়? এ প্রেক্ষিতে সংবিধানের ১১২ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত মতে আলোচনা করুন। [২৮তম বিসিএস]*

১৭. *সুপ্রিমকোর্ট এবং হাইকোর্ট বিভাগের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কি? থাকলে বর্ণনা করুন (সংবিধান অনুসরণে)। প্রধান বিচারপতির নিয়োগ দেন কে? [২৮তম বিসিএস]*

১৮. *বাংলাদেশের অস্থায়ী সংবিধান আদেশ আলোচনা করুন।*

১৯. *বাংলাদেশের গণপরিষদ আদেশ সম্পর্কে আলোচনা করুন।*

২০. *সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনীতে কোন কোন বিষয় সংশোধন করা হয়?*

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

বিগত বিসিএস পরীক্ষায় প্রশ্ন ও উত্তর

০১। ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সংবিধানে বিধৃত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ বর্ণনা করুন। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনের প্রেক্ষিতে কি কি পরিবর্তন সাধিত হয়েছে? *[৩২তম বিসিএস]*

উত্তর : আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে লিখিত সংবিধানের অন্যতম অলংকার হলো রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বা নির্দেশাত্মক নীতির সংযোজন। যে কোনো গণতান্ত্রিক সরকারের অন্যতম লক্ষ্য হলো জনসাধারণকে সর্বাধিক নাগরিক সুবিধা প্রদান করা। যেহেতু রাষ্ট্রের পুলিশি ভূমিকা এখন আর নেই, সে কারণে রাষ্ট্রনৈতিক গণতন্ত্রের সাথে সামাজিক ও অর্থনৈতিক গণতন্ত্রকে সম্মিলিতভাবে বাস্তবায়ন করে গণতন্ত্রকে সফল করাই আধুনিক রাষ্ট্রগুলোর প্রধান লক্ষ্য। এ কারণে আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো তাদের সংবিধানে মৌলিক অধিকার সংযোজন করে আসছে। তবে রাষ্ট্রগুলো প্রয়োজনে এসব মৌলিক অধিকার ও সংবিধানে সন্নিবেশিত অন্যান্য বিষয় প্রয়োজনে সংশোধন করতে পারেন। যেমনটা সংশোধিত হয়েছে বাংলাদেশ সংবিধানে।

পটভূমি : ইউরোপের দেশ আয়ারল্যান্ডের গণতান্ত্রিক সরকার ১৯৩৭ সালে তার নতুন সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি সংযোজন করে। ব্রিটিশ শাসন থেকে বের হয়ে মিয়ানমার ১৯৪৮ সালে যে সংবিধান রচনা করে তাতেও রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি অন্তর্ভুক্ত করে। পাকিস্তানের গণপরিষদ সদস্যরাও তাদের সংবিধানে (১৯৫৬, ১৯৬২) রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি সংযোজন করে। ভারতে জওহর লাল নেহেরুর সংবিধানেও রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির উল্লেখ দেখা যায়। ১৯৭২ সালের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের বাংলাদেশ সংবিধানের ৮ম অনুচ্ছেদ থেকে ২৫ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেখতে পাওয়া যায়।

রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি : রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলতে আমরা সেসব নীতিকে বুঝি, যা একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক এবং বৈদেশিক নীতি নির্ধারণে সহায়তা করে। রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিকে আবার কর্মসূচিগত অধিকারও বলা হয়। কারণ এগুলো সরকারের বিবিধ কর্মকাণ্ড পরিচালনায় মন্ত্রণা যোগায়।

রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির সাংবিধানিক নিশ্চয়তা নেই। অর্থাৎ মৌলিক অধিকারের মতো এগুলোকে সাংবিধানিক নিশ্চয়তা দেয়া হয়নি। মূলনীতিগুলোর বাস্তবায়ন নির্ভর করে একটি রাষ্ট্রের জাতীয় সম্পদ, জনগণের মেধা এবং অর্থনৈতিক সচ্ছলতার ওপর। সরকার এসব নীতি বাস্তবায়ন করে রাষ্ট্রের জনগণের কল্যাণ সাধন করার জন্য। সরকার এসব ক্ষেত্রে পারদর্শিতা দেখাতে না পারলে সরকারের বিরুদ্ধে এগুলো বাস্তবায়নের জন্য মামলা করা যাবে না, যেমনটি করা যায় মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে সাধারণত সম্পদের অপর্যাপ্ততা এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা দেখা দেয়। সে কারণে সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বাস্তবায়নে চেষ্টা করে কিন্তু বাস্তবায়নের গ্যারান্টি দেয় না।

১৯৭২ সালে রচিত বাংলাদেশ সংবিধানে বিধৃত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের ৮ম অনুচ্ছেদ থেকে ২৫তম অনুচ্ছেদ পর্যন্ত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা রয়েছে। জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা—এ চারটি বিষয়কে রাষ্ট্রের মৌলস্তম্ভ বা মৌলিক আদর্শ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। এতে আরো বলা হয় যে, অন্যান্য মৌলিক নীতিগুলো উপরোক্ত ৪টি আদর্শ থেকে উৎসারিত হবে। নিচে চারটি মৌলিক আদর্শ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো :

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

১. **জাতীয়তাবাদ :** ভাষাগত এবং সংস্কৃতিগত একক সত্তাবিশিষ্ট যে বাঙালি জনগোষ্ঠী ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করেছে, সেই জনগোষ্ঠীর ঐক্যবদ্ধতা বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি। (*অনুচ্ছেদ ৯*)

২. **সমাজতন্ত্র :** মানুষের ওপর মানুষের শোষণ থেকে মুক্ত ন্যায়ানুগ সমাজ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হলো রাষ্ট্রের লক্ষ্য। (*অনুচ্ছেদ ১০*)

৩. **গণতন্ত্র :** বাংলাদেশ হবে একটি প্রজাতন্ত্র। এর রাজনৈতিক ব্যবস্থা হবে গণতান্ত্রিক। প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে। (*অনুচ্ছেদ ১১*)

৪. **ধর্মনিরপেক্ষতা :** ধর্মনিরপেক্ষতা অর্থ হলো সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতার অবসান, রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা না দেয়া, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মকে ব্যবহার না করা এবং ধর্মের ভিত্তিতে কোনো ব্যক্তির প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ বা নিপীড়নের অবসান। (*অনুচ্ছেদ ১২*)

রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির শ্রেণীকরণ : বাংলাদেশের সংবিধানে উল্লিখিত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিগুলোকে আমরা চার ভাগে ভাগ করে আলোচনার প্রয়াস পাব। নিচে এগুলো আলোচনা করা হলো :

ক. **অর্থনৈতিক আদর্শ সম্পর্কিত নীতিসমূহ :** সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের ১৩, ১৫, ১৬, ১৯ (২), এবং ২০ অনুচ্ছেদে অর্থনৈতিক আদর্শ সম্পর্কিত নীতিসমূহ সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে। এগুলো হলো :

১. রাষ্ট্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীকরণের জন্য সচেষ্ট হবে;
২. নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা হবে;
৩. গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিকরণের ব্যবস্থা করা হবে;
৪. কুটির শিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ ঘটানো হবে;
৫. যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হবে;
৬. শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন করা হবে;
৭. অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসাসহ জীবন ধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা করবে;
৮. অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে রাষ্ট্র এ ধরনের মালিকানা নিশ্চিত করবে : ক. রাষ্ট্রীয় মালিকানা, খ. সমবায়ী মালিকানা এবং গ. ব্যক্তিগত মালিকানা;
৯. যোগ্যতা অনুযায়ী ও কর্মানুযায়ী প্রত্যেকে স্বীয় কর্মের জন্য পারিশ্রমিক লাভ করবে।

খ. **সামাজিক আদর্শ সম্পর্কিত নীতিসমূহ :** দ্বিতীয় ভাগের ১৪ ও ১৭ অনুচ্ছেদে সামাজিক আদর্শ সম্পর্কিত বিষয়ে নিম্নরূপ ব্যাখ্যা রয়েছে :

১. একমাত্র ঔষধ হিসেবে ব্যবহার ছাড়া অন্য সব ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যহানিকর উত্তেজক পানীয়, মাদকদ্রব্য ও ভেষজের ব্যবহার নিষিদ্ধ;
২. গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য বালক-বালিকাদের অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;
৩. নিরক্ষরতা দূরীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;
৪. মেহনতি মানুষকে অর্থাৎ কৃষক-শ্রমিক এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ থেকে মুক্তিদান এবং
৫. সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করা হবে।

গ. **আইন ও শাসনব্যবস্থার সংস্কারমূলক নীতি :** দ্বিতীয় ভাগের ১০, ২২, ২৩ ও ২৪ অনুচ্ছেদে আইন ও শাসনব্যবস্থার সংস্কারমূলক নীতির ব্যাখ্যা রয়েছে। এগুলো হলো :

১. নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ নিশ্চিত করা হবে;
২. জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার রক্ষণের ব্যবস্থা;
৩. জাতীয় ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পকলাসমূহের পরিপোষণ ও উন্নয়ন করবে;
৪. জাতীয় জীবনের সর্বত্র মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে।

ঘ. **পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কিত নীতিসমূহ :** ২৫ অনুচ্ছেদে পররাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত নীতির উল্লেখ লক্ষণীয়। এতে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের পঞ্চশীলা নীতি এবং জাতিসংঘ সনদের কথাও রয়েছে। এগুলো হলো :

১. অন্যান্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা;
২. আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান;
৩. আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগ পরিহার এবং সাধারণ সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের জন্য চেষ্টা করবে;
৪. প্রত্যেক জাতির স্বাধীন অভিপ্রায় অনুযায়ী পন্থার মাধ্যমে নিজস্ব সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা নির্ধারণ ও গঠনের অধিকার সমর্থন করবে;
৫. আন্তর্জাতিক আইনের ও জাতিসংঘ সনদের নীতিসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে;
৬. সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ ও বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে সমর্থন করবে এবং
৭. ইসলামী সংহতির ভিত্তিতে মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক সংহত, সংরক্ষণ এবং জোরদার করতে সচেষ্ট হবে।

সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনের প্রেক্ষিতে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে যেসব পরিবর্তন আনা হয় : ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে ১৯৭৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির চারটি মৌলিক আদর্শে কোনো পরিবর্তন আনা হয়নি। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় আসার পর নিজের ক্ষমতা দখল বৈধকরণের পাশাপাশি চারটি মৌলিক আদর্শের তিনটিতে পরিবর্তন আনেন। এ বিষয়ে তিনি চতুর্থ ফরমান জারি করেন, যা পঞ্চম সংশোধনীতে পাস করিয়ে নেয়া হয়। সংশোধন বা পরিবর্তনগুলো নিম্নরূপ :

১. **জাতীয়তাবাদ :** 'বাঙালি' জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে 'বাংলাদেশী' জাতীয়তাবাদ করা হয়। তবে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ধরন বা ভিত্তি কি হবে সংশোধনীতে তার কোনো উল্লেখ করা হয়নি। ফলে নতুন জাতীয়তাবাদ প্রশ্নে বিতর্ক রয়ে যায়।

২. **সমাজতন্ত্রে :** সমাজতন্ত্রেও পরিবর্তন আনা হয়। এতে বলা হয় সমাজতন্ত্রের স্থানে হবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার–এই অর্থে সমাজতন্ত্র।

৩. **ধর্মনিরপেক্ষতা :** 'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দটি পরিবর্তিত হয়ে 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' প্রতিস্থাপিত হয়।

পরবর্তীতে ২০১১ সালের ৩০ জুন পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের ৮ অনুচ্ছেদের (১) দফায় উল্লিখিত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি পরিবর্তন করে '৭২-এর সংবিধানের মূলনীতি পুনর্বহাল করা হয়। একই সাথে ৮(১ক) দফায় উল্লিখিত 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই হইবে যাবতীয় কার্যাবলীর ভিত্তি' বিলোপ করা হয়। পাশাপাশি ৯ ও ১০ নং অনুচ্ছেদে *স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত*

প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন এবং *জাতীয় জীবনে মহিলাদের অংশগ্রহণ* স্থলে যথাক্রমে *জাতীয়তাবাদ* এবং *সমাজতন্ত্র ও শোষণমুক্তি* বিষয়গুলো প্রতিস্থাপন করা হয়। বিলুপ্ত ১২ নং অনুচ্ছেদের মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতার বিষয়টিকে পুনর্বহাল করা হয়।

উপসংহার : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানে উল্লিখিত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে রাষ্ট্রের দায়িত্বের পাশাপাশি নাগরিকদের কর্তব্যের কথাও বলা হয়েছে। যদিও রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিগুলো রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক এবং বৈদেশিক সম্পর্ক নির্ধারণের সাথে সম্পৃক্ত, তবুও এগুলোকে সাংবিধানিক নিশ্চয়তা দেয়া হয়নি। কিন্তু একেবারে অবহেলাও করা হয়নি। জাতীয় সংসদকে এ মূলনীতিগুলো কার্যকর করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে ৪৭ অনুচ্ছেদে চমৎকার ব্যাখ্যা রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, কোনো সম্পত্তির রাষ্ট্রায়ত্তকরণ, বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ বা দখল, খনি সম্পর্কিত অধিকার বিলোপ বা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিষয়ে সংসদ আইন প্রণয়ন করতে পারবে। তবে এই আইন প্রণয়ন বিষয়ে যদি উল্লেখ থাকে যে, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহের কোনো একটিকে কার্যকর করার জন্য আইন প্রণয়ন করা হয়েছে, তবে উক্ত আইন মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী হলেও বাতিল হবে না। সুতরাং ৪৭ অনুচ্ছেদে অনুযায়ী আইনসভাকে মূলনীতি কার্যকর করার স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে এবং সকল ক্ষেত্রে মূলনীতির ওপর মৌলিক অধিকারের প্রাধান্য নেই।

০২। বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন সম্বন্ধে কি জানেন? ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সংবিধানকে কেন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংবিধান হিসেবে বিবেচনা করা হয়? *[২৩তম বিসিএস]*

***অথবা,* বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়া এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করুন।**

উত্তর : স্বাধীন বাংলাদেশে প্রণীত ১৯৭২ সালের সংবিধান সমগ্র জাতির জন্য আশীর্বাদস্বরূপ। পাকিস্তান যেখানে তার পৃথক সংবিধান রচনা করতে প্রায় নয় বছর (১৯৪৭–১৯৫৬) এবং ভারত প্রায় তিন বছর (১৯৪৭–১৯৪৯) সময় নেয়, সেখানে বাংলাদেশ মাত্র নয় মাসে (এপ্রিল '৭২–ডিসেম্বর '৭২) জাতিকে একটি সংবিধান উপহার দিতে সক্ষম হয়। দেশের প্রখ্যাত আইন বিশেষজ্ঞ তৎকালীন সরকারের আইন ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রী ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে গঠিত ৩৪ সদস্যবিশিষ্ট 'খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি' বিভিন্ন মহলের ৯৮টি সুপারিশের ভিত্তিতে ৭৪টি বৈঠকে ৩০০ ঘণ্টা সময়ে সংবিধান প্রণয়ন করেন। তারপর সংসদে মুক্ত বিতর্কের মাধ্যমে ৪ নভেম্বর ১৯৭২ বিপুল ভোটাধিক্যে এটি গৃহীত হয় এবং ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ থেকে তা কার্যকর হয়।

বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়া : স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাস থেকেই সংবিধান রচনার কাজ শুরু হয়। ১১ জানুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান অস্থায়ী শাসনতান্ত্রিক আদেশ জারি করেন। সে আদেশ অনুযায়ী ১৯৭০-এর নির্বাচনে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্যগণ গণপরিষদের সদস্য হন। আর ১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশ জারি করেন। তারপর ১৯ এপ্রিল গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন আহ্বান করা হয় এবং তৎকালীন আইনমন্ত্রী কামাল হোসেনের নেতৃত্বে ৩৪ সদস্যবিশিষ্ট সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি ৭১টি অধিবেশনে শাসনতন্ত্রের খসড়াটি তৈরি করেন এবং ১০ জুন এর শেষ সভায় তা চূড়ান্ত করেন। তারপর ১৯৭২ সালের ১২ অক্টোবর গণপরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশন বসে এবং ঐ দিনই ড. কামাল হোসেন খসড়া শাসনতন্ত্রটি অধিবেশনে উপস্থাপন করেন। তারপর এর ওপর

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

আলোচনা শুরু হয়। অবশেষে ৪ নভেম্বর খসড়াটি পরিষদে গৃহীত হয়। ১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত অধিবেশন মুলতবি ঘোষণা করা হয় এবং ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রটি কার্যকর হয়। ১৯৭২ সালের পর থেকে বাংলাদেশের সংবিধানে এ পর্যন্ত ১৬টি সংশোধনী হয়।

বাংলাদেশের সংবিধানকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সংবিধান বলার কারণ/বাংলাদেশ সংবিধানের বৈশিষ্ট্য : যে কোনো সংবিধান নির্দিষ্ট কতকগুলো বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। বাংলাদেশের সংবিধানও এর ব্যতিক্রম নয়। বাংলাদেশের সংবিধানের জন্মলগ্নে যেসব বৈশিষ্ট্য গৃহীত হয়েছিল সেগুলো একাধিক সংশোধনীর মাধ্যমে রদবদল হয়ে বর্তমানে প্রচলিত আছে। বাংলাদেশ সংবিধানের সর্বশেষ সংশোধনী হলো ২০১৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর গৃহীত ষোড়শ সংশোধনী। উক্ত সংশোধনী অনুযায়ী বর্তমানে বাংলাদেশের সংবিধানের যেসব বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত তাতে নিঃসন্দেহে একে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংবিধান হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১. **প্রজাতন্ত্রের প্রস্তাবনা :** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ১নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশ একটি একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র, যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ নামে পরিচিত। প্রজাতন্ত্রের প্রস্তাবনায় আরো বলা হয়েছে, স্বাধীনতা ঘোষণার পূর্বে যেসব এলাকা নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান গঠিত ছিল, স্বাধীনতার পর সেসব এলাকা নিয়েই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ গঠিত হবে।

২. **অসাংবিধানিক পন্থায় ক্ষমতা দখলকারীদের শাস্তি :** সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭(ক) অনুযায়ী অসাংবিধানিক পন্থায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলকারীদের অপরাধ রাষ্ট্রদ্রোহিতা হিসেবে বিবেচিত হবে এবং সর্বোচ্চ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

৩. **সংবিধানের মৌলিক কাঠামো সংক্রান্ত বিধানাবলী :** সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭(ক) অনুযায়ী সংবিধানের মৌলিক কাঠামো সংক্রান্ত বিধানাবলী সংশোধন অযোগ্য।

৪. **রাষ্ট্রীয় মূলনীতি :** ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সংবিধানের ৮নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ছিল চারটি। যেমন : ক. জাতীয়তাবাদ, খ. গণতন্ত্র, গ. সমাজতন্ত্র ও ঘ. ধর্মনিরপেক্ষতা।

পরবর্তীকালে ১৯৭৯ সালে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে এ মূলনীতিগুলোতে নিম্নলিখিতভাবে পরিবর্তন আনেন :

ক. সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস, খ. বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, গ. গণতন্ত্র এবং ঘ. সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার—এ অর্থে সমাজতন্ত্র।

৩০ জুন ২০১১ জাতীয় সংসদে পাস হওয়া সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে পুনরায় ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানে প্রণীত রাষ্ট্রীয় মূলনীতিতে ফিরে যাওয়া হয়।

৫. **মৌলিক অধিকার :** সংবিধানের তৃতীয় ধারায় নাগরিকদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ উন্মুক্ত করার তাগিদে কতগুলো মৌলিক অধিকার সংবিধানে লিপিবদ্ধ করা হয়। যেমন– সাম্যের অধিকার; চলাফেরা, সভা-সমিতি, চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা; বাক-স্বাধীনতা; সম্পত্তির অধিকার; ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রভৃতি অত্যাবশ্যক ও স্বাভাবিক মানবিক অধিকারগুলো এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু সংসদ প্রায় সকল অধিকারের ওপর আইনের দ্বারা যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ আরোপ করতে পারে।

৬. **জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব :** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ৬নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রত্যেক নাগরিক 'বাংলাদেশী' বলে পরিচিত হবেন এবং তাদের এ নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত হবে। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী অনুযায়ী বাংলাদেশের জনগণ বাঙালি হিসেবে পরিচিত হবেন।

৭. **পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকার ও পার্লামেন্টের প্রাধান্য :** সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার প্রবর্তন করা হয়। রাষ্ট্রপ্রধান হবেন নিয়মতান্ত্রিক প্রধান এবং মন্ত্রিপরিষদসহ প্রধানমন্ত্রী হবেন প্রকৃত শাসক। মন্ত্রিপরিষদ সদস্যগণ একক ও যৌথভাবে সংসদের নিকট দায়ী থাকবেন।

৮. **শাসনতন্ত্র বা সংবিধানের সার্বভৌমত্ব :** বাংলাদেশ সংবিধানে শাসনতন্ত্রের সার্বভৌমত্বের বিধান রয়েছে। এখানে সংবিধান বা শাসনতন্ত্রই হলো দেশের সর্বোচ্চ আইন। তাই সংবিধানের সাথে সঙ্গতিহীন যে কোনো আইন বাতিল বলে গণ্য হবে।

৯. **জনগণের সার্বভৌমত্ব :** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মালিক জনগণ এবং জনগণের পক্ষে সংবিধান অনুযায়ী নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এ ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয়।

১০. **শাসনতন্ত্র বা সংবিধানের প্রাধান্য :** শাসনতন্ত্রের যে কোনো ধারা সংশোধন বা রদবদল করার জন্য পার্লামেন্টের দুই-তৃতীয়াংশের সম্মতিসূচক প্রস্তাব বা ভোট গ্রহণের বিধান সংবিধানে রয়েছে। তাছাড়া যুদ্ধ ঘোষণা বা যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য সংসদ সদস্যদের সম্মতি প্রয়োজন।

১১. **বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা :** বাংলাদেশ সংবিধানের বিধান মোতাবেক বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্ট নামে অভিহিত হবে। আপিল বিভাগ এবং হাইকোর্ট বিভাগ নিয়ে গঠিত এই সুপ্রিম কোর্ট শাসন বিভাগ থেকে পৃথক থাকবে। সংবিধানের ২২নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের নির্বাহী অর্থাৎ প্রশাসনিক অঙ্গসমূহ থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ রাষ্ট্র কর্তৃক নিশ্চিত করা হবে।

১২. **সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল :** সংবিধানে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী অনুযায়ী এটি শুধু 'কাউন্সিল' নামে অভিহিত হবে। প্রধান বিচারপতি এবং সর্বাপেক্ষা প্রবীণতম দুজন বিচারপতি নিয়ে এ কাউন্সিল গঠিত, যাদের প্রধান কর্তব্য হলো বিচারকদের জন্য অবশ্য পালনীয় আচরণবিধি নির্ধারণ করা।

১৩. **এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র :** বাংলাদেশে যেহেতু কোনো প্রদেশ নেই, সেহেতু এখানে সরকারের সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকবে এবং দেশে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা প্রচলিত থাকবে।

১৪. **দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান :** বাংলাদেশ সংবিধান সংশোধনগত দিক থেকে দুষ্পরিবর্তনীয়। একে পরিবর্তন করতে হলে দরকার শিরোনাম, সংসদের দুই-তৃতীয়াংশের সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং রাষ্ট্রপতির অনুমোদন।

১৫. **এক কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা :** বাংলাদেশের আইনসভা এক কক্ষবিশিষ্ট। এর নাম জাতীয় সংসদ।

১৬. **মহিলা নাগরিকদের অবস্থান :** বাংলাদেশ সংবিধানে জাতীয় জীবনের সর্বত্র মহিলা নাগরিকদের অংশগ্রহণের নিশ্চয়তা বিধানের ব্যবস্থা রয়েছে। সংবিধানের ১৯(৩) ধারা অনুযায়ী, জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা নিশ্চিত করা হবে। এছাড়া ২৮ (১) ধারায় বলা হয়েছে, 'কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবে না।' ২৮ (২) ধারায় বলা হয়েছে, 'রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করবেন।' ৬৫ (৩) ধারায় নারীর জন্য জাতীয় সংসদের আসন সংরক্ষিত রাখা হয়েছে এবং এ ধারার অধীনে স্থানীয় শাসনসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হয়েছে।'

১৭. **মালিকানা নীতি :** বাংলাদেশ সংবিধানের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো এখানে তিন শ্রেণীর মালিকানার নীতিকে স্বীকার করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে– ১. রাষ্ট্রীয় মালিকানা, ২ সমবায় মালিকানা, ৩. ব্যক্তিগত মালিকানা।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

১৮. **বাংলা পাঠের প্রাধান্য :** বাংলাদেশ সংবিধানের ১৫৩(৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাবে।

১৯. **সংসদ সদস্য নিয়ন্ত্রণ :** বাংলাদেশ সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, দলীয় শৃঙ্খলা রক্ষা ও সরকারের স্থিতিশীলতার স্বার্থে সংসদে সদস্যপদ নিয়ন্ত্রণ করা আবশ্যক। এ উদ্দেশ্যে বিধান করা হয় যে, কোনো সদস্য তার দল ত্যাগ করলে অথবা বহিষ্কৃত হলে সংসদে তার পদ শূন্য বলে গণ্য হবে।

২০. **ন্যায়পাল :** বাংলাদেশ সংবিধানের ৭৭ অনুচ্ছেদে ন্যায়পালের বিধান রয়েছে। ন্যায়পাল যে কোনো মন্ত্রণালয় ও সরকারি কর্মচারীর যে কোনো কার্য সম্পর্কে তদন্ত করতে পারবেন।

২১. **সর্বজনীন ভোটাধিকার :** বাংলাদেশ সংবিধান অনুযায়ী ন্যূনতম আঠার বছরের ঊর্ধ্বে যে কোনো ব্যক্তি বাংলাদেশে ভোটাধিকার প্রয়োগ করার যোগ্য। এক ব্যক্তি এক ভোট—এ নীতিই বাংলাদেশ সংবিধানের সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তি।

২২. **প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল :** সাধারণ বিচার বিভাগ ছাড়াও বাংলাদেশ সংবিধানে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সরকারি কর্মচারীদের নিয়োগ, বদলি, বরখাস্ত, পদোন্নতি, দণ্ড ও কর্মের মেয়াদ, রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগ ও সম্পত্তি পরিচালনা এবং ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিষয়সমূহের ওপর প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ার থাকবে। এ সমস্ত বিষয়ে সাধারণ আদালতগুলোর কোনো এখতিয়ার থাকবে না।

উপসংহার : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান হলো বাংলাদেশের রাষ্ট্র পরিচালনার মূল লিখিত দলিল। এতে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি, শাসক-শাসিতের সম্পর্ক, অধিকারের প্রশ্ন ইত্যাদি বিষয়ে সাংবিধানিক ব্যাখ্যা রয়েছে। রাষ্ট্রের প্রধান লক্ষ্য যেহেতু জনগণ, সেহেতু রাষ্ট্র জনগণের প্রয়োজনে সংবিধান সংশোধন করে যুগোপযোগী করে তোলে। বাংলাদেশ সংবিধানও একই কারণে এ পর্যন্ত ১৬ বার সংশোধিত হয়েছে। বাংলাদেশ সংবিধানে ১টি প্রস্তাবনা, ১১টি ভাগ, ১৫৩টি অনুচ্ছেদ এবং ৭টি তফসিল রয়েছে। এগুলো জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তব প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তুলেছে। তাই বাংলাদেশের সংবিধান বাংলাদেশের নাগরিকদের কাছে পবিত্র ও অমূল্য সম্পদ।

০৩। ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সংবিধানে উল্লিখিত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ বা নির্দেশাত্মক নীতিগুলো আলোচনা করুন। *[৩০তম বিসিএস]*

উত্তর : আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে লিখিত সংবিধানের অন্যতম অলংকার হলো রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বা নির্দেশাত্মক নীতির সংযোজন। যে কোনো গণতান্ত্রিক সরকারের অন্যতম লক্ষ্য হলো জনসাধারণকে সর্বাধিক নাগরিক সুবিধা প্রদান করা। যেহেতু রাষ্ট্রের পুলিশি ভূমিকা এখন আর নেই, সে কারণে রাষ্ট্রনৈতিক গণতন্ত্রের সাথে সামাজিক ও অর্থনৈতিক গণতন্ত্রকে সম্মিলিতভাবে বাস্তবায়ন করে গণতন্ত্রকে সফল করাই আধুনিক রাষ্ট্রগুলোর প্রধান লক্ষ্য। এ কারণে আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো তাদের সংবিধানে মৌলিক অধিকার সংযোজন করে আসছে। মূলনীতিগুলোর সামাজিক, নৈতিক, শিক্ষাগত এবং আইনগত গুরুত্ব রয়েছে। এ কারণে মূলনীতিগুলোকে National Manifesto, Highest standard of excellence এবং Decoration of constitution বলা হয়।

পটভূমি : ইউরোপের দেশ আয়ারল্যান্ডের গণতান্ত্রিক সরকার ১৯৩৭ সালে তার নতুন সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি সংযোজন করে। ব্রিটিশ শাসন থেকে বের হয়ে মিয়ানমার ১৯৪৮ সালে যে সংবিধান রচনা করে তাতেও রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি অন্তর্ভুক্ত করে। পাকিস্তানের গণপরিষদ

সদস্যরাও তাদের সংবিধানে (১৯৫৬, ১৯৬২) রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি সংযোজন করে। ভারতে জওহর লাল নেহেরুর সংবিধানেও রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির উল্লেখ দেখা যায়। ১৯৭২ সালের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের বাংলাদেশ সংবিধানের ৮ম অনুচ্ছেদ থেকে ২৫ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেখতে পাওয়া যায়।

রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি : রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলতে আমরা সেসব নীতিকে বুঝি, যা একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক এবং বৈদেশিক নীতি নির্ধারণে সহায়তা করে। রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিকে আবার কর্মসূচিগত অধিকারও বলা হয়। কারণ এগুলো সরকারের বিবিধ কর্মকাণ্ড পরিচালনায় মন্ত্রণা যোগায়।

রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির সাংবিধানিক নিশ্চয়তা নেই। অর্থাৎ মৌলিক অধিকারের মতো এগুলোকে সাংবিধানিক নিশ্চয়তা দেয়া হয়নি। মূলনীতিগুলোর বাস্তবায়ন নির্ভর করে একটি রাষ্ট্রের জাতীয় সম্পদ, জনগণের মেধা এবং অর্থনৈতিক সচ্ছলতার ওপর। সরকার এসব নীতি বাস্তবায়ন করে রাষ্ট্রের জনগণের কল্যাণ সাধন করার জন্য। সরকার এসব ক্ষেত্রে পারদর্শিতা দেখাতে না পারলে সরকারের বিরুদ্ধে এগুলো বাস্তবায়নের জন্য মামলা করা যাবে না, যেমনটি করা যায় মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে সাধারণত সম্পদের অপর্যাপ্ততা এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা দেখা দেয়। সে কারণে সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বাস্তবায়নে চেষ্টা করে কিন্তু বাস্তবায়নের গ্যারান্টি দেয় না।

রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির প্রয়োগ ক্ষেত্র : বাংলাদেশ সংবিধানে উল্লিখিত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিগুলো আলোচনার আগে এসব নীতি কোন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হবে তা একটু জানা দরকার।

সংবিধানের ৮(২) অনুচ্ছেদে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিগুলো কোন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হবে তা বলা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে :

ক. দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে মৌলিক সূত্র বলে গণ্য হবে।

খ. আইন প্রণয়নকালে প্রয়োগ হবে।

গ. সংবিধান ও অন্যান্য আইনের ক্ষেত্রে এই নীতিগুলো দিশারী, নির্দেশক তথা মানদণ্ড হিসেবে ব্যবহৃত হবে এবং

ঘ. রাষ্ট্র ও নাগরিকদের কার্যের ভিত্তি হবে এসব নীতি।

১৯৭২ সালে রচিত বাংলাদেশ সংবিধানে উল্লিখিত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের ৮ম অনুচ্ছেদ থেকে ২৫তম অনুচ্ছেদ পর্যন্ত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা রয়েছে। জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা—এ চারটি বিষয়কে রাষ্ট্রের মৌলস্তম্ভ বা মৌলিক আদর্শ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। এতে আরো বলা হয় যে, অন্যান্য মৌলিক নীতিগুলো উপরোক্ত ৪টি আদর্শ থেকে উৎসারিত হবে।

নিচে চারটি মৌলিক আদর্শ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো :

১. **জাতীয়তাবাদ :** ভাষাগত এবং সংস্কৃতিগত একক সত্তাবিশিষ্ট যে বাঙালি জনগোষ্ঠী ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করেছে, সেই জনগোষ্ঠীর ঐক্যবদ্ধতা বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি। (*অনুচ্ছেদ ৯*)

২. **সমাজতন্ত্র :** মানুষের ওপর মানুষের শোষণ থেকে মুক্ত ন্যায়ানুগ সমাজ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হলো রাষ্ট্রের লক্ষ্য। (*অনুচ্ছেদ ১০*)

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৩. **গণতন্ত্র :** বাংলাদেশ হবে একটি প্রজাতন্ত্র। এর রাজনৈতিক ব্যবস্থা হবে গণতান্ত্রিক। প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে। (*অনুচ্ছেদ ১১*)

৪. **ধর্মনিরপেক্ষতা :** ধর্মনিরপেক্ষতা অর্থ হলো সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতার অবসান, রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা না দেয়া, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মকে ব্যবহার না করা এবং ধর্মের ভিত্তিতে কোনো ব্যক্তির প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ বা নিপীড়নের অবসান। (*অনুচ্ছেদ ১২*)

রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির শ্রেণীকরণ : বাংলাদেশের সংবিধানে উল্লিখিত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিগুলোকে আমরা চার ভাগে ভাগ করে আলোচনার প্রয়াস পাব। নিচে এগুলো আলোচনা করা হলো :

ক. **অর্থনৈতিক আদর্শ সম্পর্কিত নীতিসমূহ :** সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের ১৩, ১৫, ১৬, ১৯ (২), এবং ২০ অনুচ্ছেদে অর্থনৈতিক আদর্শ সম্পর্কিত নীতিসমূহ সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে। এগুলো হলো :

১. রাষ্ট্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীকরণের জন্য সচেষ্ট হবে;

২. নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করা হবে;

৩. গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিকরণের ব্যবস্থা করা হবে;

৪. কুটির শিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ ঘটানো হবে;

৫. যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হবে;

৬. শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন করা হবে;

৭. অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসাসহ জীবন ধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা করবে;

৮. অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে রাষ্ট্র এ ধরনের মালিকানা নিশ্চিত করবে : ক. রাষ্ট্রীয় মালিকানা, খ. সমবায়ী মালিকানা এবং গ. ব্যক্তিগত মালিকানা;

৯. যোগ্যতা অনুযায়ী ও কর্মানুযায়ী প্রত্যেকে স্বীয় কর্মের জন্য পারিশ্রমিক লাভ করবে।

খ. **সামাজিক আদর্শ সম্পর্কিত নীতিসমূহ :** দ্বিতীয় ভাগের ১৪ ও ১৭ অনুচ্ছেদে সামাজিক আদর্শ সম্পর্কিত বিষয়ে নিম্নরূপ ব্যাখ্যা রয়েছে :

১. একমাত্র ঔষধ হিসেবে ব্যবহার ছাড়া অন্য সবক্ষেত্রে স্বাস্থ্যহানিকর উত্তেজক পানীয়, মাদকদ্রব্য ও ভেষজের ব্যবহার নিষিদ্ধ;

২. গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য বালক-বালিকাদের অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

৩. নিরক্ষরতা দূরীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

৪. মেহনতি মানুষকে অর্থাৎ কৃষক-শ্রমিক এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ থেকে মুক্তিদান এবং

৫. সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করা হবে।

গ. **আইন ও শাসনব্যবস্থার সংস্কারমূলক নীতি :** দ্বিতীয় ভাগের ১০, ২২, ২৩ ও ২৪ অনুচ্ছেদে আইন ও শাসনব্যবস্থার সংস্কারমূলক নীতির ব্যাখ্যা রয়েছে। এগুলো হলো :

১. নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ নিশ্চিত করা হবে;

২. জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার রক্ষণের ব্যবস্থা;

৩. জাতীয় ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পকলাসমূহের পরিপোষণ ও উন্নয়ন করবে;

৪. জাতীয় জীবনের সর্বত্র মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে।

ঘ. **পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কিত নীতিসমূহ :** ২৫ অনুচ্ছেদে পররাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত নীতির উল্লেখ লক্ষণীয়। এতে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের পঞ্চশীলা নীতি এবং জাতিসংঘ সনদের কথাও রয়েছে। এগুলো হলো :

১. অন্যান্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা;
২. আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান;
৩. আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগ পরিহার এবং সাধারণ সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের জন্য চেষ্টা করবে;
৪. প্রত্যেক জাতির স্বাধীন অভিপ্রায় অনুযায়ী পন্থার মাধ্যমে নিজস্ব সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা নির্ধারণ ও গঠনের অধিকার সমর্থন করবে;
৫. আন্তর্জাতিক আইনের ও জাতিসংঘ সনদের নীতিসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে;
৬. সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ ও বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে সমর্থন করবে এবং
৭. ইসলামী সংহতির ভিত্তিতে মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক সংহত, সংরক্ষণ এবং জোরদার করতে সচেষ্ট হবে।

রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে যেসব পরিবর্তন আনা হয় : ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে ১৯৭৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির চারটি মৌলিক আদর্শে কোনো পরিবর্তন আনা হয়নি। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় আসার পর নিজের ক্ষমতা দখল বৈধকরণের পাশাপাশি চারটি মৌলিক আদর্শের তিনটিতে পরিবর্তন আনেন। এ বিষয়ে তিনি চতুর্থ ফরমান জারি করেন, যা পঞ্চম সংশোধনীতে পাস করিয়ে নেয়া হয়। সংশোধন বা পরিবর্তনগুলো নিম্নরূপ :

১. **জাতীয়তাবাদ :** 'বাঙালি' জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে 'বাংলাদেশী' জাতীয়তাবাদ করা হয়। তবে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ধরন বা ভিত্তি কি হবে সংশোধনীতে তার কোনো উল্লেখ করা হয়নি। ফলে নতুন জাতীয়তাবাদ প্রশ্নে বিতর্ক রয়ে যায়।
২. **সমাজতন্ত্রে :** সমাজতন্ত্রও পরিবর্তন আনা হয়। এতে বলা হয় সমাজতন্ত্রের স্থানে হবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার—এই অর্থে সমাজতন্ত্র।
৩. **ধর্মনিরপেক্ষতা :** 'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দটি পরিবর্তিত হয়ে 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' প্রতিস্থাপিত হয়।

মূল্যায়ন : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানে উল্লিখিত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে রাষ্ট্রের দায়িত্বের পাশাপাশি নাগরিকদের কর্তব্যের কথাও বলা হয়েছে। যদিও রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিগুলো রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক এবং বৈদেশিক সম্পর্ক নির্ধারণের সাথে সম্পৃক্ত, তবুও এগুলোকে সাংবিধানিক নিশ্চয়তা দেয়া হয়নি। কিন্তু একেবারে অবহেলাও করা হয়নি। জাতীয় সংসদকে এ মূলনীতিগুলো কার্যকর করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে ৪৭ অনুচ্ছেদে চমৎকার ব্যাখ্যা রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, কোনো সম্পত্তির রাষ্ট্রায়ত্তকরণ, বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ বা দখল, খনি সম্পর্কিত অধিকার বিলোপ বা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিষয়ে সংসদ আইন প্রণয়ন করতে পারবে। তবে এই আইন প্রণয়ন বিষয়ে যদি উল্লেখ থাকে যে, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহের কোনো একটিকে কার্যকর করার জন্য আইন প্রণয়ন করা হয়েছে, তবে উক্ত আইন মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী হলেও বাতিল হবে না। সুতরাং ৪৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আইনসভাকে মূলনীতি কার্যকর করার স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে এবং সকল ক্ষেত্রে মূলনীতির ওপর মৌলিক অধিকারের প্রাধান্য নেই।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

০৪। মৌলিক অধিকার বলতে কি বোঝেন? ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ সংবিধানে উল্লিখিত মৌলিক অধিকারসমূহ আলোচনা করুন। মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকারের মধ্যে পার্থক্য কি? *[৩০তম বিসিএস]*

***অথবা,* গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান কোন সালের কোন তারিখ হতে কার্যকর হয়? এতে বিধৃত মৌলিক অধিকারসমূহ বর্ণনা করুন।** *[২৯তম বিসিএস]*

উত্তর : পৃথিবীর যে কোনো দেশের সংবিধানে মৌলিক অধিকারকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। মৌলিক অধিকারগুলো একদিকে যেমন জনগণের বিবিধ গুরুত্বপূর্ণ অধিকারকে সাংবিধানিক নিশ্চয়তা দেয়, অন্যদিকে এগুলো শাসক শ্রেণীকে স্বৈরাচারী হওয়া থেকেও বিরত রাখে। ফরাসি বিপ্লব (১৭৮৯) এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ঘোষণার (১৭৭৬) পর থেকেই মূলত বিভিন্ন দেশের সংবিধানে মৌলিক অধিকার বা অধিকারের সনদ সন্নিবেশ করা একটা রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য মৌলিক অধিকারগুলো পরিবর্তনযোগ্য। তবে আইন পরিষদের সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় এগুলো পরিবর্তন করা যায় না। সংবিধানে মৌলিক অধিকার রক্ষার ব্যাপারে স্পষ্ট বক্তব্য থাকে। মৌলিক অধিকারগুলো আদালতের মাধ্যমে বলবৎযোগ্য বলে সরকার যেমন সচেতন থাকে, তেমনি জনগণ এসব অধিকার বাস্তবায়ন করার জন্য আদালতের আশ্রয় নিতে পারে।

মৌলিক অধিকার : মৌলিক অধিকার বলতে আমরা সেসব অধিকারকে বুঝি যা কোনো দেশের সংবিধানে লিপিবদ্ধ করা হয় এবং যা বাস্তবায়নের ব্যাপারে সাংবিধানিক নিশ্চয়তা দেয়া হয়। মৌলিক অধিকারগুলো সবই মানবাধিকার, তবে পার্থক্য এই যে, মানবাধিকারগুলোকে সাংবিধানিক নিশ্চয়তা দেয়া হয় না। সুতরাং বলা যায় যে, যখন কতিপয় মানবাধিকারকে সংবিধানে লিপিবদ্ধ করে তাদেরকে সাংবিধানিক নিশ্চয়তা দেয়া হয় তখন এগুলোকে মৌলিক অধিকার বলে। সাংবিধানিক নিশ্চয়তা বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে, এসব অধিকার থেকে কেউ বঞ্চিত হলে সে ব্যক্তি আদালতের মাধ্যমে ঐ সব অধিকার ফিরে পাবে। আদালত তার রায়ের মাধ্যমে সরকারকে ঐ সব অধিকার ফিরিয়ে দেয়ার হুকুম দিতে পারে।

পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি মুনির State vs Dosso মামলার রায়ে অন্যান্য বিষয়ের সাথে মৌলিক অধিকারের বিষয়ে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বিচারপতি মুনিরের মতে, 'মৌলিক অধিকারের প্রকৃত উপাদান হলো, এগুলো কমবেশি স্থায়ী এবং সাধারণ আইনের মতো পরিবর্তনযোগ্য নয়।'

সুতরাং মৌলিক অধিকারগুলো এমন অধিকার যা কোনো দেশের সংবিধানে সন্নিবেশিত করে তা বাস্তবায়নের ব্যাপারে সাংবিধানিক নিশ্চয়তা দেয়া হয়। গণতান্ত্রিক সরকার তার শাসনতান্ত্রিক উৎকর্ষের জন্য মৌলিক অধিকারকে অত্যন্ত যত্নসহকারে লালন করে এবং এগুলো বাস্তবায়নের ব্যাপারে সাধ্যমতো চেষ্টা করে। বস্তুত বর্তমান বিশ্বে শাসক শ্রেণীর সফলতা নির্ণয়ের অন্যতম মাপকাঠি হলো তারা কতটুকু মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা জনগণকে দিতে পেরেছে।

বাংলাদেশ সংবিধানে সন্নিবেশিত মৌলিক অধিকারসমূহ : বাংলাদেশের সংবিধান প্রণেতাগণ সংবিধানে মৌলিক অধিকার সন্নিবেশের ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। ১৭৮৯ সালের মার্কিন সংবিধান এবং ১৯৪৯ সালের ভারত সংবিধানে উল্লিখিত মৌলিক অধিকারের ব্যাপারে বাংলাদেশের সংবিধান প্রণেতাগণ ওয়াকিবহাল ছিলেন। ফলে এসব দেশের সংবিধানে উল্লিখিত মৌলিক অধিকারের আলোকে মুজিব সরকারের গণপরিষদ বাংলাদেশ সংবিধানে মৌলিক অধিকার সংযুক্ত করে।

বাংলাদেশ সংবিধানের তৃতীয় ভাগে ২৭ অনুচ্ছেদ থেকে ৪৪ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত মৌলিক অধিকার সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা রয়েছে। সংবিধান প্রণেতাগণ শুধু বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্যই মৌলিক অধিকার প্রণয়ন করেননি, বরং বাংলাদেশে বিদেশী নাগরিকদের ব্যাপারেও গুরুত্বপূর্ণ ধারা সংযোজন করেছেন। মৌলিক অধিকার মোট ১৮টি।

ক. শুধু বাংলাদেশের নাগরিকরা ভোগ করতে পারে এমন মৌলিক অধিকার ১২টি। যথা :

১. **আইনের দৃষ্টিতে সমতা :** সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের আশ্রয় লাভের অধিকারী। এই অনুচ্ছেদকে ব্যাখ্যা করলে দাঁড়ায়, সকল ব্যক্তিই আইন দ্বারা সমভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে, কেউ আইনের উর্ধ্বে নয়। সমপর্যায়ভুক্ত সকল ব্যক্তির প্রতি আইন সমান আচরণ করবে এবং সকলকে সমভাবে রক্ষা করবে। তবে ব্যক্তির কার্য ও দায়িত্বের ভিন্নতা থাকতে পারে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর কর্তব্য এবং অধিকার ভিন্ন হতে পারে। (*অনুচ্ছেদ ২৭*)

২. **ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ বৈষম্য করা যাবে না :** ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী, নারী-পুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবে না এবং উক্ত কারণে নাগরিককে সাধারণ বিনোদন ও বিশ্রাম কেন্দ্রে কিংবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ বা ভর্তি হতে বঞ্চিত করা যাবে না। রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বস্তরে নারী ও পুরুষ সমান অধিকার লাভ করবে। তবে নারী, শিশু ও অনগ্রসর নাগরিকদের অগ্রগতির জন্য রাষ্ট্র বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। (*অনুচ্ছেদ ২৮*)

৩. **সরকারি চাকরির সমান সুযোগ :** প্রজাতন্ত্রের চাকরিতে নিয়োগ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সমান সুযোগ থাকবে। আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট যোগ্যতাসম্পন্ন নাগরিকদের মধ্যে রাষ্ট্রের চাকরিতে নিয়োগ লাভের ক্ষেত্রে কোনো বৈষম্য করা যাবে না। (*অনুচ্ছেদ ২৯*)

৪. **বিদেশী রাষ্ট্রের উপাধি গ্রহণ :** ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানে বিধান ছিল যে, রাষ্ট্র কোনো উপাধি, সম্মান বা ভূষণ প্রদান করবে না এবং রাষ্ট্রের বিনা অনুমতিতে কোনো নাগরিক কোনো বিদেশী পুরস্কার গ্রহণ করবে না। তবে রাষ্ট্র সাহসিকতার জন্য পুরস্কার বা Academic distinction দান করতে পারে। (*অনুচ্ছেদ ৩০*)

৫. **আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার :** বাংলাদেশে অবস্থানরত সকল ব্যক্তি কেবল আইন অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হবে এবং আইনের বিধি ছাড়া কারো জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি করা যাবে না। (*অনুচ্ছেদ ৩১*)

৬. **সমাবেশের স্বাধীনতা :** জনশৃঙ্খলা বা জনস্বার্থের জন্য আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ সাপেক্ষে শান্তিপূর্ণভাবে বা নিরস্ত্র অবস্থায় সমবেত হবার এবং জনসভা ও শোভাযাত্রায় যোগদান করার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকবে। (*অনুচ্ছেদ ৩৭*)

৭. **চলাফেরার স্বাধীনতা :** সকল নাগরিক বাংলাদেশের সর্বত্র অবাধে চলাফেরা করতে পারবে। নাগরিকরা যে কোনো স্থানে বসবাস করতে পারবে এবং বাংলাদেশ ত্যাগ ও এ দেশে পুনঃপ্রবেশ করতে পারবে। এতে অবশ্য কিছুটা ব্যতিক্রমও আছে। সেটা হলো সরকার জনস্বার্থে চলাফেরার স্বাধীনতার ওপর যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ আরোপ করতে পারবে। (*অনুচ্ছেদ ৩৬*)

৮. **সংগঠনের স্বাধীনতা :** জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ সাপেক্ষে সমিতি বা সংগঠন করার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকবে। তবে শর্ত থাকে যে, ধর্মীয় সামাজিক এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে, নাগরিকদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে এবং সন্ত্রাসী বা জঙ্গি কার্য পরিচালনার উদ্দেশ্যে কোনো সংগঠন করা যাবে না। (*অনুচ্ছেদ ৩৮*)

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৯. **বাক-স্বাধীনতা :** সকলের চিন্তা ও বিবেকের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে। এ অনুচ্ছেদে বাক-স্বাধীনতা ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা স্বীকার করা হয়েছে। তবে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা বা নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে রাষ্ট্র আইনের দ্বারা যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ আরোপ করতে পারবে। (*অনুচ্ছেদ ৩৯*)

১০. **পেশা ও বৃত্তির অধিকার :** যোগ্যতাসম্পন্ন প্রত্যেক নাগরিক আইনের দ্বারা আরোপিত বাধানিষেধ সাপেক্ষে যে কোনো আইনসঙ্গত পেশা বা বৃত্তি গ্রহণ করতে পারবে এবং যে কোনো আইনসঙ্গত কারবার বা ব্যবসায় পরিচালনা করতে পারবে। (*অনুচ্ছেদ ৪০*)

১১. **সম্পত্তির অধিকার :** প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর বা অন্যভাবে বিলি-ব্যবস্থা করার অধিকার থাকবে এবং আইনের কর্তৃত্ব ব্যতীত কোনো সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্ত বা দখল করা যাবে না। (*অনুচ্ছেদ ৪২*)

১২. **গৃহ ও যোগাযোগ রক্ষণ :** প্রত্যেক নাগরিকের স্বীয় গৃহে নিরাপত্তা লাভের অধিকার থাকবে। এ অনুচ্ছেদের অর্থ দাঁড়ায় কারো গৃহে প্রবেশ করা, তল্লাশি করা এবং কাউকে আটক করা চলবে না। এছাড়া চিঠিপত্রের এবং যোগাযোগের অন্যান্য মাধ্যমে গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকবে। তবে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা, নৈতিকতা বা জনস্বার্থের জন্য আইনের দ্বারা যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ আরোপ করা যাবে। (*অনুচ্ছেদ ৪৩*)

খ. বাংলাদেশে বসবাসকারী নাগরিক ও বিদেশীরা ভোগ করতে পারে এমন মৌলিক অধিকার ৬টি। যথা :

১. **জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার :** বাংলাদেশে বসবাসরত সকল নাগরিক ও বিদেশী কেবলমাত্র আইন অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হবে। আইনের ধারা ব্যতীত কারো জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। (*অনুচ্ছেদ ৩২*)

২. **গ্রেপ্তার ও আটক সম্পর্কে রক্ষাকবচ :** কোনো ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের কারণ না জানিয়ে আটক রাখা যাবে না, কোনো ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আদালতে হাজির করতে হবে এবং আদালতের আদেশ ছাড়া তাকে আটক রাখা যাবে না। অবশ্য সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনীতে বলা হয়, সরকার বিনা বিচারে রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে আটক রাখতে পারবে। অবশ্য বিদেশী শত্রুর এই অধিকার প্রযোজ্য নয়। (*অনুচ্ছেদ ৩৩*)

৩. **জবরদস্তি শ্রম নিষিদ্ধকরণ :** সকল প্রকার জবরদস্তিমূলক শ্রম নিষিদ্ধ। তবে ফৌজদারি অপরাধে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য এ বিধি কার্যকর নয়। রাষ্ট্র জনগণের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে আইনের দ্বারা বাধ্যতামূলক শ্রমের বিধান করতে পারবে। (*অনুচ্ছেদ ৩৪*)

৪. **বিচার ও দণ্ড সম্পর্কে বিধান :** এ ধারায় বলা হয়েছে, যে সময়ে কোনো কার্য সংঘটিত হয়েছে সে সময়ে প্রচলিত আইনের বিধান লঙ্ঘন করা না হলে ঐ কার্যের জন্য কাউকেও দোষী করা যাবে না। এক অপরাধের জন্য এক ব্যক্তিকে একাধিকবার অভিযুক্ত করা যাবে না। ফৌজদারি অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালত বা ট্রাইব্যুনালে দ্রুত ও প্রকাশ্য বিচার লাভের অধিকারী। কোনো অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত কোনো ব্যক্তিকে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে বাধ্য করা যাবে না। কোনো ব্যক্তিকে যন্ত্রণা দেয়া যাবে না বা নিষ্ঠুর ও অমানুষিক দণ্ড দেয়া যাবে না। [*অনুচ্ছেদ ৩৫ (১) (২) (৩) (৪) (৫)*]

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৫. **ধর্মীয় স্বাধীনতা :** ধর্মীয় স্বাধীনতার ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, আইনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের যে কোনো ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার থাকবে। প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন, রক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার অধিকার থাকবে। (*অনুচ্ছেদ ৪১*)

৬. **সাংবিধানিক প্রতিকার পাওয়ার অধিকার :** রাষ্ট্র মৌলিক অধিকারসমূহ লঙ্ঘন করে এমন কোনো আইন প্রণয়ন করবে না (*অনুচ্ছেদ ২৬*)। মৌলিক অধিকারসমূহ বলবৎ করার জন্য যে কোনো ব্যক্তি সুপ্রিম কোর্টে মামলা রুজু করতে পারে (*অনুচ্ছেদ ৪৪*)।

মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকারের মধ্যে পার্থক্য : মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকারের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে। পার্থক্যগুলো নিম্নরূপ :

১. **সংবিধানে লিপিবদ্ধ ও নিশ্চয়তা অর্থে :** সকল মৌলিক অধিকারই মানবাধিকার। কিন্তু সকল মানবাধিকার মৌলিক অধিকার নয়। মৌলিক অধিকারগুলো সংবিধানে লিপিবদ্ধ থাকে এবং কোনো কোনো মৌলিক অধিকারকে সাংবিধানিক নিশ্চয়তা দেয়া হয়। কিন্তু মানবাধিকার সংবিধানে ভিন্নভাবে লেখা থাকে না। মানবাধিকারের ক্ষেত্র ব্যাপক, কিন্তু মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্র সংকীর্ণ।

২. **উৎসগত :** মৌলিক অধিকারের উৎস মূলত কোনো দেশের সংবিধান। অর্থাৎ কোনো মানবাধিকার যখন সংবিধানে স্থান পায় তখন তাকে মৌলিক অধিকার বলে। অন্যদিকে মানবাধিকারের উৎস হলো আন্তর্জাতিক আইনের বিভিন্ন বিষয়।

৩. **অবস্থানগত :** মৌলিক অধিকারগুলো দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এক দেশের মৌলিক অধিকারের সাথে অন্য দেশের মৌলিক অধিকারের পার্থক্য থাকতে পারে। মানবাধিকারগুলো কোনো দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ না হয়ে আন্তর্জাতিকতা লাভ করে অর্থাৎ মানবাধিকারকে ভৌগোলিক সীমারেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ রাখা যায় না।

৪. **সাংবিধানিক নিশ্চয়তা অর্থে :** মৌলিক অধিকারকে সাংবিধানিক নিশ্চয়তা দেয়া হয়। অর্থাৎ কোনো সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হলে আদালত তার মৌলিক অধিকার বলবৎ করতে পারে। পক্ষান্তরে, মানবাধিকারগুলোর কোনো সাংবিধানিক নিশ্চয়তা নেই অর্থাৎ এগুলো আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য নয়।

৫. **প্রযোজ্যতা ক্ষেত্রে :** মৌলিক অধিকারগুলো একটি নির্দিষ্ট দেশের নাগরিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে মানবাধিকারগুলো সামগ্রিকভাবে পৃথিবীর প্রতিটি দেশের নাগরিকদের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য।

উপসংহার : বাংলাদেশের সংবিধানে উল্লিখিত মৌলিক অধিকারগুলো মূলত সামাজিক ও রাজনৈতিক। আমাদের সংবিধানের ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯(২) (ক) (খ), ৪১ ও ৪৩ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত মৌলিক অধিকারের ওপর যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ আরোপ করা যাবে। ভারত, জাপান, রাশিয়া প্রভৃতি দেশেও কতিপয় মৌলিক অধিকারের ওপর বাধানিষেধ আরোপ করার বিধান রয়েছে। তবে সিভিল সমাজে সরকারের গতিশীলতা ও কার্যকারিতা নির্ভর করে সরকার কর্তৃক সর্বাধিক মৌলিক অধিকার বাস্তবায়নের ওপর।

০৫। বিভিন্ন শাসনামলে সাধিত বাংলাদেশের সংবিধানের সংশোধনীসমূহ আলোচনা করুন।
[১৮তম; ২১তম; ২৪তম বিসিএস]
অথবা, **বাংলাদেশের সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনীসমূহ আলোচনা করুন।** *[১৩তম বিসিএস]*
অথবা, **বাংলাদেশ সংবিধানের প্রধান সংশোধনীগুলো আলোচনা করুন।** *[২৭তম বিসিএস]*

উত্তর : ১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি অস্থায়ী সংবিধান আদেশ জারি করেন। এ আদেশানুযায়ী একটি গণপরিষদ গঠিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ (১৬৯ জন) ও প্রাদেশিক

পরিষদ সদস্যরা এর সদস্য হন। শেষ পর্যন্ত গণপরিষদের সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ৪০৪ জন। ১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশের সভাপতিত্বে এক খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠিত হয়। ৩৪ সদস্যের এ কমিটির চেয়ারম্যান হন আইনমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন। খসড়া সংবিধান নিয়ে তিন দফায় আলোচনার পর ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর সংবিধানটি গণপরিষদে গৃহীত হয়। ১৪ ডিসেম্বর গণপরিষদের অধিবেশনে সদস্যরা এতে স্বাক্ষর দেন। ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে সংবিধান কার্যকর হয়।

বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি : বাংলাদেশের সংবিধান একটি লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় দলিল। তবে তিনটি পদ্ধতি বা ধাপ অনুসরণ করে সংবিধান সংশোধন করা যায়। ধাপ তিনটি হলো :

১. বিলে স্পষ্ট শিরোনাম ও তারিখ থাকতে হবে।
২. জাতীয় সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের দ্বারা বিলটি পাস হতে হবে।
৩. সংসদ কর্তৃক পাসকৃত বিলে রাষ্ট্রপতি ৭ দিনের মধ্যে সম্মতি দেবেন এবং সম্মতি না দিলেও তিনি বিলটিতে সম্মতি দিয়েছেন বলে ধরে নেয়া হবে।

বাংলাদেশ সংবিধানের সংশোধনীসমূহ : বাংলাদেশের সংবিধান ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে কার্যকরী হওয়ার পর রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন বিভিন্ন সময়ে এ পর্যন্ত ১৫ বার সংশোধন করা হয়েছে। নিচে বিভিন্ন শাসনামল অনুযায়ী বাংলাদেশ সংবিধানের সংশোধনগুলো আলোচনা করা হলো।

মুজিব আমল (১৯৭২-১৯৭৫)

প্রথম সংশোধনী, ১৫ জুলাই ১৯৭৩ : ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে গণহত্যা ও যুদ্ধাপরাধে লিপ্ত বন্দি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের সহযোগীদের বিচারের জন্য প্রথম সংশোধনী আনা হয়। এ সংশোধনীর ফলে অভিযুক্তদের বিচারের পথ সুগম হয়। এ সংশোধনীবলে সংবিধানের ৪৭-ক নামে একটি নতুন অনুচ্ছেদ করে দুটি নতুন ধারা যোগ করা হয়।

দ্বিতীয় সংশোধনী, ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ : দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণার বিধান এবং বিনা বিচারে আটকসংক্রান্ত আইন প্রণয়নের ক্ষমতা পার্লামেন্টকে দেয়ার ব্যবস্থা রেখে দ্বিতীয় সংশোধনী আনা হয়। জরুরি আইন বলবৎ থাকাকালীন সময়ে জনগণের মৌলিক অধিকারসমূহ স্থগিত রাখার বিধানও এ আইনের অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় সংশোধনীবলে সংবিধানের ২৬ নম্বর অনুচ্ছেদের শেষে একটি নতুন দফা সংযোজিত হয়; ৬৩ নম্বর অনুচ্ছেদের কিছু অংশ বাদ দেয়া হয় এবং ৭২ নম্বর অনুচ্ছেদের পরিবর্তন সাধন করা হয়।

তৃতীয় সংশোধনী, ২৮ নভেম্বর ১৯৭৪ : সংবিধানের ২ (ক) উপ-অনুচ্ছেদকে সংশোধন করে বাংলাদেশ-ভারত সীমানা চুক্তি কার্যকর করার জন্য এ সংশোধনী আনা হয়। দু দেশের প্রধানমন্ত্রী ১৬ মে ১৯৭৪ সীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এ চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশের সীমানা অন্তত ১৫টি স্থানে রদবদল হয়।

চতুর্থ সংশোধনী, ২৫ জানুয়ারি ১৯৭৫ : এ সংশোধনীতে সংসদীয় পদ্ধতির পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির বিধান করা হয়। রাষ্ট্রপতি হবেন নির্বাচিত এবং তার মেয়াদ হবে ৫ বছর। রাষ্ট্রপতি একজন উপরাষ্ট্রপতি, একজন প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবর্গ নিয়োগ করবেন। এ সংশোধনীর ফলে সকল দলের সমন্বয়ে বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক-আওয়ামী লীগ (বাকশাল) নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দলের বিধান করা হয়। মৌলিক অধিকার ও বিচার বিভাগের ওপর যুক্তিসঙ্গত হস্তক্ষেপ করার বিধানও এ সংশোধনীতে স্থান পায়। তাছাড়া এতে ১৯টি জেলাকে ৬১টি জেলায় রূপান্তরিত করে জেলা গভর্নরের বিধান করা হয়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৭)

জিয়া আমল (১৯৭৬-মে ১৯৮১)

পঞ্চম সংশোধনী, ৬ এপ্রিল ১৯৭৯ : এ সংশোধনীর মাধ্যমে প্রথমবারের মতো দেশে সামরিক শাসনের বৈধতা দেয়া হয়। এ সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনার চার মূলনীতির তিনটিতে পরিবর্তন আনা হয়। ধর্মনিরপেক্ষতার স্থলে 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস', বাঙালি জাতীয়তাবাদের স্থলে 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ' এবং সমাজতন্ত্রের স্থলে 'অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার—এ অর্থে সমাজতন্ত্র' করা হয়। সংবিধানের প্রস্তাবনায় 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' সংযোজন করা হয়। এবং 'মুক্তি সংগ্রাম' শব্দগুলোর পরিবর্তে 'স্বাধীনতা যুদ্ধ' শব্দগুচ্ছ সন্নিবেশ করা হয়। ১৯৭৫ সালের 'ইনডেমনিটি অধ্যাদেশকে' বৈধতা দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জাতীয় চার নেতা এবং ১৫ আগস্টে নিহতদের বিচার রহিত করা হয়।

সাত্তার আমল-১৯৮১

ষষ্ঠ সংশোধনী, ১০ জুলাই ১৯৮১ : ১৯৮১ সালের ৩০ মে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান নিহত হলে উপরাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তার অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে কার্যভার গ্রহণ করে ২১ সেপ্টেম্বর নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন। ক্ষমতাসীন জাতীয়তাবাদী দল রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তারকে মনোনয়ন দিলে এক সাংবিধানিক সংকট দেখা দেয়। সংবিধানের ৫০ ও ৬৬ (২) অনুচ্ছেদের বিধান মতে, রাষ্ট্রের লাভজনক পদে আসীন থেকে কোনো ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারতেন না। বিচারপতি আব্দুস সাত্তারের মনোনয়নকে বৈধতা দানের জন্য সংবিধানের ষষ্ঠ সংশোধনী আনা হয়। এতে সংবিধানের ৬৬ (২-ক) উপ-অনুচ্ছেদে সংশোধনী এনে বলা হয়, উপরাষ্ট্রপতির পদ রাষ্ট্রের অলাভজনক পদ।

এরশাদ আমল (১৯৮২-১৯৯০)

সপ্তম সংশোধনী, ১০ নভেম্বর ১৯৮৬ : ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের অবৈধভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল এবং ২৪ মার্চ '৮২ থেকে ১০ নভেম্বর '৮৬ পর্যন্ত সকল কর্মকাণ্ডের বৈধতা দেয়ার জন্য সংবিধানের সপ্তম সংশোধনী আনা হয়। এছাড়াও সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদের ১নং দফার পরিবর্তন এনে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৬২ থেকে ৬৫ বছরে বৃদ্ধি করা হয়।

অষ্টম সংশোধনী, ৯ জুন ১৯৮৮ : অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের ২ ধারার পর (২-ক) ধারার সংযোজন হয়, যার মাধ্যমে বলা হয় প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম হবে ইসলাম, তবে অন্যান্য ধর্মও শান্তিতে পালন করা যাবে। এছাড়া সংবিধানের ১০০ ধারা সংশোধন করে বরিশাল, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, যশোর, রংপুর ও সিলেটে হাইকোর্ট বিভাগের ছয়টি স্থায়ী আসন বা বেঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয়। একই সাথে সংবিধানের ৩ ও ৫ (১) নং ধারা পরিবর্তিত হয়ে যথাক্রমে 'Bengal' শব্দের পরিবর্তে 'Bangla' এবং 'Dacca'-র পরিবর্তে 'Dhaka' করা হয়।

নবম সংশোধনী, ১১ জুলাই ১৯৮৯ : নবম সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের ৪৯, ৫০, ৫৩, ৫৪, ৭২, ১১৯, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১৪৮ এবং ১৫২ অনুচ্ছেদ এবং সংবিধানের চতুর্থ তফশিল সংশোধন করা হয়। এতে বলা হয়, রাষ্ট্রপতি এবং উপরাষ্ট্রপতি ৫ বছর মেয়াদের জন্য প্রত্যক্ষভাবে একই দিনে নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক নির্বাচিত হবেন এবং উভয় পদের সময় ২ মেয়াদের বেশি হবে না।

দশম সংশোধনী, ২৩ জুন ১৯৯০ : দশম সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত ৩০টি মহিলা আসন আরো ১০ বছরকাল সংরক্ষণ করা হয় এবং রাষ্ট্রপতি নির্বাচন প্রসঙ্গে ১২৩ (২) অনুচ্ছেদের ইংরেজি ও বাংলা পাঠের মধ্যকার অসঙ্গতি দূর করা হয়।

খালেদা জিয়া আমল (জুন ১৯৯১-৯৬)

একাদশ সংশোধনী, ১০ আগস্ট ১৯৯১ : একাদশ সংশোধনী দ্বারা সংবিধানের চতুর্থ তফসিলে ২১ (১) অনুচ্ছেদ সংযোজন করে বলা হয় যে, ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর তারিখে তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক উপ-রাষ্ট্রপতি হিসেবে বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদকে নিয়োগ ও শপথ প্রদান এবং উক্ত উপরাষ্ট্রপতি কর্তৃক অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে প্রয়োগকৃত সকল ক্ষমতা, প্রণীত সকল আইন ও গৃহীত সকল ব্যবস্থা এতদ্বারা অনুমোদিত ও সমর্থিত হলো। এতে আরো বলা হয় যে, সংবিধান অনুযায়ী নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়ে কার্যভার ও দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারবেন এবং উপরাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালনের সময়কাল বিচারপতি হিসেবে তাঁর প্রকৃত কর্মকাল বলে গণ্য হবে।

দ্বাদশ সংশোধনী, ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৯১ : দ্বাদশ সংশোধনীর বিলটিতে সংবিধানের অনুচ্ছেদ নং ৪৮, ৫৬ ও ১৪২ সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়। যেহেতু এসব অনুচ্ছেদ সংবিধানের মৌল কাঠামো, সে কারণে রাষ্ট্রপতি ১৪২ (৬) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বিলটিতে গণভোট দেন। বিলটির পক্ষে গণভোটে প্রদত্ত ভোটের ৮৩.৩৮% পড়ে সংবিধানে ১৪২ (১ গ) ধারা মতে তা রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে বলে ধরে নেয়া হয় এবং তা আইনে পরিণত হয়।

দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে দেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রজাতন্ত্রের সকল নির্বাহী ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রিসভার ওপর ন্যস্ত করা হয়। এতে বলা হয়, সংসদ সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবেন। তার মেয়াদ হবে পাঁচ বছর। এ সংশোধনীতে ফ্লোর ক্রসিংয়ের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ধারা সংযোজন করা হয় এবং বলা হয়, সংসদের এক অধিবেশন থেকে অন্য অধিবেশনের বিরতি ৬০ দিনের বেশি হবে না।

ত্রয়োদশ সংশোধনী, ২৮ মার্চ ১৯৯৬ : নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান সংযোজন করে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী আনা হয়। সংবিধানের ৫৮ অনুচ্ছেদের সাথে নতুন ৫৮ (ক) অনুচ্ছেদ সন্নিবেশ করে ত্রয়োদশ সংশোধনীতে বলা হয়—

ক. সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার পর বা মেয়াদ অবসানের কারণে ভঙ্গ হওয়ার পর যে তারিখে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা কার্যভার গ্রহণ করবেন, সে তারিখ থেকে সংসদ গঠিত হওয়ার পর নতুন প্রধানমন্ত্রী তার কার্যভার গ্রহণ করার তারিখ পর্যন্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকার থাকবে।

খ. নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার যৌথভাবে রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ী থাকবেন।

সংবিধানের ৫৮ অনুচ্ছেদের সাথে ৫৮ (ক) ও (খ) সংযোজন করে এবং ৬১ (১) ১২৩ (৩) ১৪৭ (৪) অনুচ্ছেদে কতিপয় পরিবর্তন এনে ত্রয়োদশ সংশোধনী আনা হয়।

উল্লেখ্য, ত্রয়োদশ সংশোধনী অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদকালে প্রতিরক্ষা কর্ম বিভাগসমূহের সর্বাধিনায়কত্ব রাষ্ট্রপতির ওপর ন্যস্ত হবে।

চারদলীয় জোট সরকারের আমল (অক্টোবর ২০০১-২০০৬)

চতুর্দশ সংশোধনী ১৬ মে ২০০৪ : এ সংশোধনীর মাধ্যমে জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য ৪৫টি আসন সংরক্ষণ, সরকারিভাবে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ছবি সংরক্ষণ, সংসদ সদস্যদের শপথ গ্রহণ সংক্রান্ত নতুন বিধান, অর্থবিলের সংজ্ঞা সহজীকরণ, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি, মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এবং সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের অবসর গ্রহণের বয়সসীমা বৃদ্ধি করা হয়। এ সংশোধনীতে সংশোধিত অনুচ্ছেদগুলো হলো যথাক্রমে ৮২, ১৪৮, ৯৬, ১৩৯ ও ১২৯ নং অনুচ্ছেদ। সংযোজিত অনুচ্ছেদগুলো হলো (২৩) ও ৪ (ক)।

মহাজোট সরকারের আমল (২০০৯-)

পঞ্চদশ সংশোধনী, ৩০ জুন ২০১১ : সংবিধানের প্রস্তাবনা, মূলনীতি, নির্বাচন ব্যবস্থা ও তফসিলসহ অনেকগুলো ধারায় ব্যাপক ও মৌলিক পরিবর্তনের বিধান সংবলিত সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন ২০১১ জাতীয় সংসদে পাস হয় ৩০ জুন ২০১১।

উল্লেখযোগ্য সংশোধনী : ১. বিস্মিল্লাহির-রহমানির রহিম ও রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম বহাল এবং অন্যান্য ধর্মের সমমর্যাদার নিশ্চয়তা। ২. ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানের মূলনীতি পুনর্বহাল। ৩. তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলুপ্ত এবং দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন। ৪. অবৈধ ক্ষমতা দখলকারীদের রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্তকরণ ও সর্বোচ্চ দণ্ডে দণ্ডিত করা। ৫. ৭ মার্চের ভাষণ, ২৬ মার্চের স্বাধীনতা ঘোষণা ও স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের সংযোজন। ৬. সংরক্ষিত নারী আসন ৫০। ৭. জাতির পিতার স্বীকৃতি।

ষোড়শ সংশোধনী, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪ : সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৬ এর প্রতিষ্ঠান। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৬ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ অনুচ্ছেদ ৯৬ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা– "৯৬। বিচারকদের পদের মেয়াদ। – (১) এই অনুচ্ছেদের বিধানাবলী-সাপেক্ষে কোন বিচারক সাতষট্টি বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন।

(২) প্রমাণিত অসদাচরণ বা অসামর্থ্যের কারণে সংসদের মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ গরিষ্ঠতার দ্বারা সমর্থিত সংসদের প্রস্তাবক্রমে প্রদত্ত রাষ্ট্রপতির আদেশ ব্যতীত কোন বিচারককে অপসারিত করা যাইবে না।

(৩) এই অনুচ্ছেদের (২) দফার অধীন প্রস্তাব সম্পর্কিত পদ্ধতি এবং কোন বিচারকের অসদাচরণ বা অসামর্থ্য সম্পর্কে তদন্ত ও প্রমাণের পদ্ধতি সংসদ আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করিবেন।

(৪) কোন বিচারক রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করিয়া স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।"

উপসংহার : আধুনিক যুগে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকারি ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সমঝোতা, সহযোগিতা ও ঐকমত্য প্রত্যয়গুলো প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করতে শুরু করেছে। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও জাপানের রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ করলে অন্তত তা-ই মনে হয়। সুতরাং রাষ্ট্রের মৌলিক প্রয়োজনেই সংবিধানে সংশোধনী আনা উচিত। কোনো বিশেষ মহলের অবৈধ ক্ষমতাকে বৈধ করার জন্য সংবিধান সংশোধন করাটা দুর্ভাগ্যজনক। দুঃখজনক হলেও সত্য, বাংলাদেশে এ ধরনের বেশ কয়েকটি সংশোধনী আনা হয়েছে।

০৬। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত 'সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী'। — ব্যাখ্যা করুন। *[২৭তম বিসিএস]*

উত্তর : সংবিধান হলো বিশ্বের সকল স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশেষভাবে অপরিহার্য একটি দলিল। ১৯৭১ সালে দীর্ঘ নয় মাস এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে ঐ বছরের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতা লাভের পর দ্বিতীয় অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধান দ্বারা সদ্য স্বাধীন দেশ পরিচালনাকারী রাষ্ট্রপতি গণপ্রজাতন্ত্রী স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ স্থায়ী সংবিধান রচনার উদ্দেশ্যে ১৯৭২ সালের ২২ মার্চ 'বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশ' জারি করে ড. কামাল হোসেনকে প্রধান করে ৩৪ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করে দেয়। এ কমিটি ৭৪টি অধিবেশনে মিলিত হয়ে প্রায় ৩০০ ঘণ্টা আলোচনার পর সংবিধানের খসড়া গণপরিষদে ১২ অক্টোবর ১৯৭২ উত্থাপন করে, ৪ নভেম্বর ১৯৭২ খসড়া সংবিধান গৃহীত হয় এবং ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ সংবিধান

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৭)

কার্যকর হয়। এ সংবিধানের মোট ১১ ভাগের তৃতীয় ভাগে ২২টি অনুচ্ছেদ সংযোজিত হয় (২৬-৪৭)। এ অনুচ্ছেদগুলোতে ১৮টি মৌলিক অধিকার সন্নিবেশ করা হয়। যার একটি হচ্ছে 'সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী' (অনুচ্ছেদ ২৭)।

আইনের দৃষ্টিতে সমান (Equality before Law)

আইন হলো এমন কতকগুলো নিয়মকানুন বা বিধিবিধানের সমষ্টি যা জনসাধারণের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য রাষ্ট্রের সকলের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং সকলের জন্যই সমানভাবে প্রয়োগ করা যায়। আইনের দৃষ্টিতে সমতা বলতে বোঝায়, কোনো ব্যক্তিই আইনের ঊর্ধ্বে নয়। আইনের চোখে সকলেই সমান। ক্ষমতা, পদমর্যাদা ও অবস্থা নির্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তি দেশের সাধারণ আইনের অধীন এবং সাধারণ আদালতের নিকট সকলকেই দায়িত্বশীল থাকতে হয়। আইনের চোখে সাধারণ নাগরিক এবং সরকারি কর্মচারীদের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। আইন সকলের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য হবে। আইনে কেউ কোনো বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত হবে না। শাসক ও শাসিত একই আইনের অধীনে থাকবে। শাসকের জন্য কোনো আলাদা আইন থাকবে না। আর সংবিধান হবে দেশের সাধারণ আইনের মূল উৎস। সংবিধানে থাকবে নাগরিক অধিকারসমূহের পূর্ণ নিশ্চয়তা। সংবিধানের আইনের ভিত্তি হবে জনগণের পূর্ণ সম্মতি। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নয়, বরং রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে ব্যক্তিই সমান বলে বিবেচিত হবে। রাষ্ট্রের কোনো নাগরিক আপন প্রভাবে আইনের ঊর্ধ্বে উঠতে পারবে না, কোনো নাগরিকই আইনের চোখে নিম্নতর বলে বিবেচিত হবে না।

আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী : এটা বলতে বোঝায় জাতি, ধর্ম, বর্ণ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি কোনোরূপ বৈষম্য করা যাবে না, এমনকি অধিকার আদায় বা ন্যায়বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রেও। কোনো নাগরিক যদি মনে করে রাষ্ট্র বা ব্যক্তি তার অধিকারের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা বা জটিলতা সৃষ্টি করছে, তার ন্যায্য প্রাপ্তি থেকে তাকে বঞ্চিত করছে, সেক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি তার অধিকার আদায়ে আইনের শরণাপন্ন হতে পারে এবং আইনের মাধ্যমে তার অধিকার ফিরে পেতে পারে– যদি তা ন্যায়সঙ্গত হয়। এক্ষেত্রে আদালত তথা বিচার বিভাগ ধনী-গরিব বিবেচনায় কাউকে প্রাধান্য দিবে না বা কারো প্রতি অবমাননাকর কোনো আচরণ করবে না। এক্ষেত্রে আদালতের কাজ আইনী প্রক্রিয়ায় সত্য উদ্‌ঘাটন করে মিথ্যাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে শাস্তি বিধান করা এবং সত্যের অধিকার ফিরিয়ে দেয়া। বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে অবস্থানরত প্রত্যেক ব্যক্তির আইনের আশ্রয় লাভ ও আইন অনুযায়ী ব্যবহার লাভের অধিকার রয়েছে। কোনো ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি ঘটে এমন বিষয়ে আইনের বিধান ব্যতীত কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না। আইনের বিধান ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতা থেকে কোনো ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাবে না।

সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী সম্পর্কিত ব্যাখ্যা : ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ বা জন্মগত কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি বৈষম্য করা যাবে না। এসব কারণে জনসাধারণের কোনো বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে বা কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোনো নাগরিককে কোনো রূপ বাধা বা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হবে না। বাংলাদেশ সংবিধানে স্পষ্টভাবে রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষের সমান অধিকার লাভের কথা বলা হয়েছে। পাশাপাশি এ কথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে— নারী, শিশু বা অনগ্রসর নাগরিকদের অগ্রগতির জন্য রাষ্ট্র বিশেষ বিধান প্রণয়ন/সুবিধা প্রদান করতে পারবে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

রাষ্ট্রে কর্মসংস্থান প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সমান সুযোগ থাকবে। ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ বা জন্মস্থান নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিক এক্ষেত্রে সুযোগের সমতা উপভোগ করবে। তবে অনগ্রসর অংশের উপযুক্ত প্রতিনিধিত্বের জন্য বা কোনো ধর্মীয় বা উপ-সম্প্রদায়গত প্রতিষ্ঠান তাদের যথার্থ নিয়োগ সংরক্ষণের জন্য বা বিশেষ কোনো কর্মের প্রকৃতির জন্য নারী বা পুরুষের পক্ষে তা অনুপযোগী এবং এজন্য রাষ্ট্র ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

রাষ্ট্র কোনো উপাধি, সম্মান বা ভূষণ প্রদান করবে না এবং রাষ্ট্রপ্রধানের পূর্ব অনুমতি ব্যতীত কোনো নাগরিক বিদেশী রাষ্ট্রের নিকট থেকে কোনো উপাধি বা সম্মান লাভ করতে পারবে না। অবশ্য সাহসিকতার ক্ষেত্রে প্রাপ্য পুরস্কার বা উপাধির ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হবে না।

কোনো গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে গ্রেফতারের কারণ জ্ঞাপন না করে প্রহরায় আটক রাখা যাবে না এবং তাকে তার মনোনীত আইনজীবীর সাথে পরামর্শের ও আত্মপক্ষের সমর্থনের অধিকারী দেয়া হবে। গ্রেফতারকৃত ও প্রহরায় আটক ব্যক্তিকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আদালতে হাজির করতে হবে এবং আদালতের আদেশ ব্যতীত তাকে এর বেশি সময় আটক রাখা যাবে না। তবে এ বিধান কোনো বিদেশী ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

সকল প্রকার জবরদস্তিমূলক শ্রম নিষিদ্ধ ও আইনগত দণ্ডনীয়। অবশ্য কোনো ব্যক্তি ফৌজদারি অপরাধের জন্য আইনত দণ্ড ভোগকালে বাধ্যতামূলক শ্রম করলে বা জনগণের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে আইনের দ্বারা তা প্রয়োজনীয় হলে তা দূষণীয় হবে না।

প্রচলিত আইন ভঙ্গ করার অপরাধ ব্যতীত কোনো ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না এবং অপরাধ সংঘটনকালে বলবৎ আইনে যে শাস্তি দেয়া যেতে পারত, তার অধিক শাস্তি তাকে দেয়া যাবে না। এক অপরাধের জন্য কোনো ব্যক্তিকে একাধিকবার ফৌজদারিতে সোপর্দ ও দণ্ডিত করা যাবে না। ফৌজদারি অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালতে দ্রুত ও প্রকাশ্য বিচারের সুযোগ লাভ করবে। তাছাড়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা যাবে না। কোনো ব্যক্তিকে যন্ত্রণা দেয়া যাবে না বা নিষ্ঠুর, অমানবিক বা লাঞ্ছনাকর কোনো শাস্তি দেয়া যাবে না। তবে আইনের দ্বারা সেসব শাস্তি প্রবর্তিত হলে তা অন্য কথা।

জনস্বার্থ আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ সাপেক্ষে বাংলাদেশের সর্বত্র অবাধ চলাফেরা এবং যে কোনো স্থানে বসতি স্থাপন করার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকবে। জনশৃঙ্খলা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনগত বাধানিষেধ সাপেক্ষে যে কোনো নাগরিক শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্রভাবে সমবেত হতে পারবে এবং যে কোনো জনসভা বা শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনগত বাধানিষেধ সাপেক্ষে সমিতি বা সংঘ গঠন করার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের রয়েছে। তবে কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সাম্প্রদায়িক সমিতি বা ধর্মভিত্তিক কোনো সমিতি গঠন করতে পারবে না বা সদস্য হয়ে তৎপরতা গ্রহণ করতে পারবে না, যা রাষ্ট্রীয় মূলনীতিবিরোধী।

প্রত্যেক নাগরিক চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা লাভ করবে এবং প্রত্যেক নাগরিকের বাক ও ভাব প্রকাশের অধিকার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অধিকারের নিশ্চয়তা দান করা হয়েছে। তবে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা বা নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা মানহানি বা আদালতগত অবমাননার ক্ষেত্রে আইন আরোপিত বাধা নিষেধ সাপেক্ষে সেসব অধিকার যুক্তিসঙ্গতভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে।

রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিক যে কোনো আইনানুগ পেশা অবলম্বন ও আইনসঙ্গতভাবে কারবার বা ব্যবসায় পরিচালনা করতে পারবে। আইন-শৃঙ্খলা, নৈতিকতা সাপেক্ষে রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিক স্বীয় ধর্মমত পোষণ করতে পারবে। স্বীয় ধর্মচর্চা, উপাসনা, অনুষ্ঠানাদি পালন করতে পারবে এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের রক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা করতে পারবে। কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত কাউকে ও তার ধর্ম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্মের শিক্ষা গ্রহণ করতে বা অন্য ধর্মের আচার অনুষ্ঠানে যোগদান করতে বাধ্য করা যাবে না।

আইনগতভাবে প্রত্যেক নাগরিক তার সম্পত্তি অর্জন, ধারণ এবং হস্তান্তর করতে পারবে এবং আইনের নির্দেশ ব্যতীত কোনো নাগরিককে তার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা, জনসাধারণের নৈতিকতা ও জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত শর্তসাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিক প্রবেশ, তল্লাশি ও আইন হতে স্বীয় গৃহে নিরাপত্তা লাভের অধিকার ভোগ করবে এবং চিঠিপত্র ও যোগাযোগের অন্যান্য উপায়ে গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার লাভ করবে।

কোনো নাগরিকের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ন হলে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করা যাবে বা আইনগতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য আদালতেও আবেদন করা যাবে। ১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দে সংবিধান সংশোধন আদেশ অনুযায়ী মৌলিক অধিকার অধ্যায়ের ৪২তম অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় ধারা সংশোধন করে ঘোষণা করা হয় যে, সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্তকরণ ও সম্পত্তি দখলের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ দানের ব্যবস্থা করা হবে।

উপসংহার : বাংলাদেশ সংবিধানে প্রত্যেক নাগরিককে আইনের চোখে সমতা এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকার প্রদান করে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের অন্যতম মূল লক্ষ্য হবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার ও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, সুবিচারের নিশ্চয়তা থাকবে। জনগণকে সকল ক্ষমতার মালিক বলে উল্লেখ করে মানবসত্তার মর্যাদা এবং মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে।

০৭। সংবিধান বলতে কি বোঝায়? বাংলাদেশ সংবিধানের ৪র্থ সংশোধনীর মাধ্যমে কি কি পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল, তা আলোচনা করুন। *[২৭তম বিসিএস]*

অথবা, **বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।**

উত্তর : রাষ্ট্রের কাঠামো এবং ক্ষমতার মৌল নমুনা হলো সংবিধান। রাজনীতির গন্তব্যস্থানে পৌঁছা এবং চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমাদের এমন কিছু আইন-কানুনের প্রয়োজন যা সকলের জ্ঞাত এবং সমর্থিত। মূলত সংবিধানই হলো সেসব আইন-কানুনের সর্বোচ্চ নির্দেশক। সংবিধানের মাধ্যমেই রাষ্ট্রের রূপ ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। তাই সংবিধানকে বলা হয় ' রাষ্ট্রের দর্পণ'। লিখিত বা অলিখিত যা-ই হোক সংবিধান একটি রাষ্ট্রের শাসন নীতি ও শাসনব্যবস্থা পরিচালনার দিক নির্দেশ করে।

সংবিধানের সংজ্ঞা : সাধারণত সংবিধান বলতে আমরা এমন কিছু নিয়ম-নীতি, বিধি-বিধান বা অনুশাসনকে বুঝি যা রাষ্ট্র পরিচালনার মূলসূত্র হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ রাজনৈতিক ব্যবস্থা এসব নিয়ম-কানুনকে অনুসরণ করেই তার কার্য পরিচালনা করে থাকে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

০৮। 'রাষ্ট্রের পছন্দকৃত জীবন পদ্ধতিই সংবিধান।'—বাংলাদেশ সংবিধানের সংশোধনীর আলোকে উক্তিটি ব্যাখ্যা করুন। *[২৭তম বিসিএস]*

উত্তর : রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রাষ্ট্র গঠিত হয়। আর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বলতে বোঝায় সুশৃঙ্খল সমাজ জীবনের প্রতিষ্ঠা। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তথা রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য একটি শাসকগোষ্ঠী থাকে। এ শাসকগোষ্ঠী হলো সরকার। প্রচলিত অর্থে একটি দেশে সরকার বলতে শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগকে বোঝায়। সরকারের এ বিভাগগুলোর মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন কিভাবে হবে, কিভাবে সরকারি কাজ পরিচালিত হবে এবং রাষ্ট্রাধীন ব্যক্তিসমূহের সাথে সরকারের কি সম্পর্ক হবে ইত্যাদি বিষয়ে কতকগুলো নিয়মকানুন থাকে। এ নিয়মকানুনগুলোই হলো সংবিধান। সংবিধান বা শাসনতন্ত্র অনুযায়ী সরকার রাষ্ট্র পরিচালনা করে। সংবিধানের বিধানকে টপকিয়ে কোনো কাজ করার ক্ষমতা সরকারের থাকে না। এজন্য সংবিধানকে রাষ্ট্র পরিচালনার চাবিকাঠি বলা যায়।

সংবিধান সংশোধনী : পৃথিবীর কোনো নিয়মই স্বতঃসিদ্ধ বা চিরন্তন নয়। আজ যার প্রয়োজন আছে, কাল তার প্রয়োজন নাও থাকতে পারে। মানুষের প্রয়োজনেই বিভিন্ন নিয়মকানুনের আবির্ভাব। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে কতিপয় নিয়ম অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে এবং প্রয়োজন হয়ে পড়ে নতুন নিয়ম প্রবর্তনের। আর যে প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রের মৌলিক দলিল তথা রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সৃষ্ট সংবিধান ও সংশোধনীর প্রয়োজন হয়। যুগে যুগে দেশে দেশে রাষ্ট্রসমূহ জনগণের কল্যাণে নানা সময়ে সংবিধানের সংশোধনী এনেছে। কাজেই সংক্ষেপে সংবিধান সংশোধনী বলতে বোঝায়, জনগণের কল্যাণে সময়ের প্রয়োজনে প্রচলিত অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে অপ্রয়োজনীয় নিয়মকানুনকে পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন, বিয়োজন করে নতুন আইনের বা নিয়মকানুনের প্রবর্তন করাকে। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর রক্তক্ষয়ী এক যুদ্ধের মাধ্যমে সৃষ্ট বাংলাদেশের সংবিধানে এ পর্যন্ত মোট ১৬ বার সংশোধনী আনা হয়েছে। যার কিছু রাজনৈতিক ও কিছু প্রশাসনিক প্রয়োজনে সংশোধন করা হয়েছে।

রাষ্ট্রের পছন্দকৃত জীবন পদ্ধতিই সংবিধান : সংবিধান হলো বিশ্বের সকল স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশেষভাবে অপরিহার্য একটি দলিল। সংবিধানবিহীন রাষ্ট্র কর্ণধারবিহীন জাহাজের সাথে তুলনীয়। কারণ সংবিধানের ভিত্তিতেই একটি রাষ্ট্র পরিচালিত হয়, সরকার গঠিত হয়, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টিত হয়, সরকারি কাজকর্ম পরিচালিত হয় এবং ব্যক্তি ও সরকারের মধ্যে সম্পর্ক নিরূপিত হয়। গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল তাই যথার্থই বলেছেন, 'Constitution is the way of life the state has chosen for itself.'

সংবিধান হলো লিখিত বা অলিখিত মৌলিক নিয়মাবলীর সমষ্টি যা কোনো রাষ্ট্রের ক্ষমতা ব্যবহারের ও বণ্টনের নীতি নির্ধারণ করে এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয় করে। কোনো রাষ্ট্রের শাসন পদ্ধতি কিরূপ তা সংবিধান থেকেই অবহিত হওয়া যায়। তাই সংবিধানকে রাষ্ট্রের প্রতিচ্ছবি বলেও অভিহিত করা যায়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জেলিনেকের মতে, 'সংবিধান রাষ্ট্রের বিভাগসমূহ নির্ধারণ করে, তাদের গঠন-প্রণালী এবং পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয় করে, কাজের সীমারেখা চিহ্নিত করে এবং সর্বশেষ রাষ্ট্রের সাথে উক্ত বিভাগ বা শাখাসমূহের কি সম্বন্ধ হবে তাও স্থির করে।'

অধ্যাপক কে. সি. হুইয়ার (K. C. Wheare) বলেন, যে কোনো সংবিধানে সার্বভৌম ক্ষমতার নিরূপণ এবং বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক এর প্রয়োগ ইত্যাদিও থাকে। কাজেই সংবিধান হলো সেসব নিয়ম, যার দ্বারা কি উদ্দেশ্যে এবং কোন বিভাগের দ্বারা সরকারি ক্ষমতা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হবে তা লিপিবদ্ধ থাকে।

আধুনিককালে প্রত্যেক সংবিধানে নাগরিকগণের মৌলিক অধিকারগুলো কি হবে এবং তা রক্ষা করার উপায় কি তাও বর্ণনা করা থাকে। সুতরাং এদিক দিয়ে বিচার করলে বলা যায় যে, সংবিধান সরকারের ক্ষমতা নির্ধারণ করে, শাসিতের অধিকার এবং এ দুয়ের সম্বন্ধ নির্ণয় করে।

সংবিধানের বিধান ও নীতি অবশ্যই দ্বার্থহীন, পরিষ্কার ও সহজ ভাষায় থাকে। এসব বিধান ও নীতির অর্থ সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট হয়। সংবিধানে থাকে সমগ্র শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিধি বিধানের উল্লেখ। সংবিধান জনগণের পরিবর্তনশীল চাহিদা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

সংবিধানের বিধান অধিকাংশই স্থায়ী ও স্থিতিশীল হয়ে থাকে। সংবিধানের মূলনীতি রাষ্ট্রীয় আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে তৈরি করা হয়। সে কারণে এটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্থায়ী হয়ে থাকে। জনগণের মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতির নিশ্চয়তা থাকে সংবিধানে। ফলে সরকার ব্যক্তির কোনো অধিকার লঙ্ঘন করলে সে আদালতে তার প্রতিকার চাইতে পারে। ব্যক্তি আদালতে ন্যায়বিচারের জন্য সরকারের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করতে পারে।

সংবিধানে সার্বভৌম ক্ষমতা সঙ্গতিপূর্ণ উপায়ে বণ্টন করা হয়। সরকার আইনগত সার্বভৌমত্বের অধিকারী। আর জনগণ রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের অধিকারী। সরকার এবং জনগণের ক্ষমতার ভারসাম্যের বিধান করাই সংবিধানের উদ্দেশ্য। প্রতিটি জাতির কিছু আশা-আকাঙ্ক্ষা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আছে। আর সংবিধানে জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, আদর্শের সন্নিবেশ থাকে। ফলে সরকার নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে জাতির স্বপ্নপূরণে কাজ করতে পারে। ফলে জনগণও লক্ষ্য, উদ্দেশ্য অর্জনের দিকে অগ্রগামী হয়। কারণ জনগণ একে তাদের ধ্যানধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে করে।

সংবিধান জনমতের ধারক ও বাহক। কারণ সংবিধানে জনমতের প্রতিফলন ঘটে। জনমতের প্রতি লক্ষ্য রেখেই সংবিধান পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত, সংযোজিত, বিয়োজিত হয়ে যুগোপযোগী হয়। সংবিধান সার্বভৌম ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা করে। রাষ্ট্রের আইনগত সার্বভৌমত্ব অর্থাৎ সরকার এবং রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব অর্থাৎ জনগণের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে সংবিধান।

সংবিধানের প্রাধান্য সুনিশ্চিত করার জন্য বিচার বিভাগের প্রাধান্য নিশ্চিত করা হয়। এজন্য বিচার বিভাগের হাতে সংবিধানকে ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়। বিচার বিভাগ হয় সংবিধান রক্ষার অভিভাবক। যেমন— বাংলাদেশ সংবিধানে সুপ্রিম কোর্টকে এ ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। সংসদ কোনো আইন পাস করলে তা যদি সংবিধানের বিধানাবলীর সাথে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ হয় তবে তাকে বাতিল ঘোষণা করতে পারে। যেমন— ৫ম সংবিধান সংশোধনী আদালত অবৈধ বলে রায় দেয়।

বাংলাদেশ ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে দীর্ঘ নয় মাস এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতা লাভের পরই ৩৪ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটির দ্বারা সংবিধান প্রণয়ন ও তা কার্যকর করে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২। কিন্তু প্রথম সংবিধানে এদেশের যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কোনো ব্যবস্থা করার বিধান না থাকায় ১৫ জুলাই ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে সংবিধানের প্রথম সংশোধনীতে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে গণহত্যা ও যুদ্ধাপরাধে লিপ্ত বন্দি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের সহযোগীদের বিচারের ক্ষমতার বিধান করা হয়।

দীর্ঘ ২৩ বছরের পাকিস্তানি শাসনামলে জরুরি অবস্থার অহরহ অপব্যবহার করা হয়েছে যার তিক্ত অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের সংবিধান প্রণেতাগণকে সিদ্ধান্ত নিতে প্রভাবিত করে যে, বাংলাদেশের সংবিধানে জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত কোনো বিধান রাখা হবে না। কিন্তু সংবিধান প্রণয়নের পর বছর যেতে না যেতেই দ্বিতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে জরুরি অবস্থার বিধান

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

সংযোজিত হয় নবম-ক ভাগে ১৪১ক, ১৪১খ, ১৪১গ অনুচ্ছেদে। ১৪১ ক অনুচ্ছেদে বলা হয়, 'রাষ্ট্রপতির নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, যুদ্ধ বা বহিরাক্রমণ বা অভ্যন্তরীণ গোলযোগের দ্বারা বাংলাদেশ বা তার কোনো অংশের নিরাপত্তা বা অর্থনৈতিক জীবন বিপদের সম্মুখীন, তাহলে তিনি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারবেন।'

বাংলাদেশ সংবিধানের তৃতীয় সংশোধনী আনা হয় একটি বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে। ১৯৭৪, ১৬ মে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সাথে সীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তিতে ১৫টি স্থানে বাংলাদেশের সীমানা রদবদল করা হয়। যার জন্য সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন ছিল চুক্তিকে কার্যকর করতে। এ চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানা নির্ধারণ করা হয়।

বাংলাদেশ সংবিধানে এ পর্যন্ত যতগুলো সংশোধনী আনা হয়েছে তার মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, বিতর্কিত এবং সুদূরপ্রসারী ছিল চতুর্থ সংশোধনী। যে সরকার স্বাধীনতার পর দেশ ও জাতিকে একটি উন্নত সংবিধান উপহার দিয়েছিল সে সরকারই মাত্র দু বছর পর ১৯৭৫ সালের ২৪ জানুয়ারি তথাকথিত রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা চালু করে, অভিশংসনের জটিলতা সৃষ্টি করে, সংসদকে অথর্ব ও ক্ষমতাহীন বিভাগে পরিণত করে, হাইকোর্টের মৌলিক অধিকার বলবৎকরণের ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা খর্ব করে, একদলীয় শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করে সংবিধানকে কাঁচিকাটা করে ধূলিসাৎ করে।

পঞ্চম-একাদশ সংশোধনীতে সংবিধানকে সামরিক আইনের সাপেক্ষ ও অধীনে রাখা হয় এবং বিভিন্ন আদেশের মাধ্যমে সংবিধানকে সামরিক সরকারের ইচ্ছামতো পরিবর্তন করা হয়েছে। সাংবিধানিকভাবে এবং আইনগত দিক দিয়ে এসব পরিবর্তন ও সংশোধন সম্পূর্ণ অবৈধ। কারণ সংবিধান সংশোধন করতে পারে কেবল সংসদ। সামরিক প্রশাসক বা সামরিক আইন চলাকালে কার্যরত রাষ্ট্রপতির সংবিধান সংশোধন করার কোনো ক্ষমতা থাকে না; যদি না সংবিধানে বিপরীত মর্মে কিছু বলা থাকে। কিন্তু এসব পরিবর্তনের বৈধতা সম্পর্কে পরবর্তীতে কেউ যেন কোনো প্রশ্ন না তুলতে পারে তার জন্য ব্যবস্থা করে অধ্যাদেশ দ্বারা মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়।

দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয় এবং রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা নির্ধারণ করা হয়। ত্রয়োদশ সংশোধনীতে অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয় এবং এজন্য সংবিধানে অতিরিক্ত অনুচ্ছেদ ৫৮ক, খ, গ, ঘ, ঙ সংযোজিত হয়। চতুর্দশ সংশোধনীতে কতিপয় সাংবিধানিক পদের অবসরের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়, প্রতিকৃতি সংরক্ষণের বিধান প্রবর্তন করা হয়, নারী সংরক্ষিত আসন ৩০ থেকে ৪৫-এ উন্নীত করা হয়, অর্থ বিলে সংশোধনী আনা হয়।

পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের প্রস্তাবনা, মূলনীতি ও নির্বাচন ব্যবস্থা ও তফসিলসহ ৫৫টি ধারায় ব্যাপক ও মৌলিক পরিবর্তনের বিধান সংযোজন করা হয়।

ষোড়শ সংশোধনীর মাধ্যমে বিচারপতিদের অভিশংসন বা অপসারণের ক্ষমতা জাতীয় সংসদের উপর অর্পণ করা হয়।

কাজেই উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষাপটে দেখা যায় যে, সংবিধানকে রাষ্ট্রের পছন্দকৃত জীবন পদ্ধতি বলা হলেও বাংলাদেশের সংবিধানে সংশোধনীগুলোর অধিকাংশই ছিল ক্ষমতাসীনদের ক্ষমতাকে সুসংহত করতে তথা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। দু তিনটি সংশোধনী ছাড়া অধিকাংশ সংশোধনীতে যেসব বিধান সংযোজিত হয়েছে তাতে জনগণের লাভবান হওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

ক্ষেত্র বিশেষে জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে জনমত যাচাইয়ের গণভোটের কথা থাকলেও রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ ক্ষমতার হীনস্বার্থে তার অবমাননা করে চলেছে। রাজনৈতিক দলের এরূপ কাজ সংবিধানকে অমর্যাদা করে, যা জনগণকে অমর্যাদা করার শামিল।

উপসংহার : কোনো সংবিধানই চূড়ান্ত ও চিরন্তন নয়। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে সংবিধানেরও পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটতে বাধ্য। লর্ড ব্রুহামের ভাষায় বলা যায়, উপযোগী হতে হলে সংবিধানের পক্ষে সম্প্রসারণশীল হতে হবে। অথবা সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসনের ভাষায় বলা যায় যে, সকল জীবন্ত রাষ্ট্রনৈতিক সংবিধানই বিবর্তনশীল। সংবিধানের মাধ্যমেই একটি দেশ, রাষ্ট্র ও জাতির পরিচয় লাভ করা যায়। এর মাধ্যমেই জাতির স্বকীয়তা ও মৌলিকত্ব ফুটে ওঠে। বাংলাদেশের সংবিধানে যেসব সংশোধনী আনা হয়েছে তার অধিকাংশই শাসকবর্গের প্রয়োজনে— জনকল্যাণে নয়। কাজেই ভবিষ্যতে সংবিধান সংশোধনী আনলে জনগণের কল্যাণকেই অগ্রাধিকার দেয়া উচিত।

০৯। সংবিধান অনুযায়ী অর্থ বিলে কোন বিষয়াবলী সম্বলিত থাকে? কোন মন্ত্রী/মন্ত্রণালয় এটা প্রণয়ন ও অনুমোদন প্রক্রিয়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং এর সার্বিক অনুমোদন প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন। *[২৯তম বিসিএস]*

উত্তর : ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতার পর দ্বিতীয় অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধান দ্বারা সদ্য স্বাধীন দেশ পরিচালনা করা হয়। পরবর্তী দীর্ঘ এক বছরের মাথায় একটি সংবিধান তৈরি করা হয়, যা ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ সালে কার্যকর হয়। এই সংবিধান হয় বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সংবিধানগুলোর মধ্যে অন্যতম। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের এ সংবিধান ১১ বিভাগে বিভক্ত এবং ১৫৩ অনুচ্ছেদ সম্বলিত। সংবিধানের পঞ্চম ভাগের ২য় পরিচ্ছেদে 'আইন প্রণয়ন ও অর্থসংক্রান্ত পদ্ধতি' শিরোনামে ৮১ নং অনুচ্ছেদে অর্থবিল সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে।

সংবিধানের ৮১ নং অনুচ্ছেদের দফা (১)-এ বলা হয়েছে, 'অর্থবিল' বলতে কেবল নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের সকল বা যে কোন একটি সম্পর্কিত বিধানাবলী সংবলিত বিল বুঝাইবে :

(ক) কোন কর আরোপ, নিয়ন্ত্রণ, রদবদল, মওকুফ বা রহিতকরণ;

(খ) সরকার কর্তৃক ঋণ গ্রহণ বা কোন গ্যারান্টি দান, কিংবা সরকারের আর্থিক দায়-দায়িত্ব সম্পর্কিত আইন সংশোধন;

(গ) সংযুক্ত তহবিলের রক্ষণাবেক্ষণ, অনুরূপ তহবিলে অর্থ প্রদান বা অনুরূপ তহবিল হতে অর্থদান বা নির্দিষ্টকরণ;

(ঘ) সংযুক্ত তহবিলের উপর দায় আরোপ কিংবা অনুরূপ কোন দায় রদবদল বা বিলোপ;

(ঙ) সংযুক্ত তহবিল বা প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব বাবদ অর্থপ্রাপ্তি, কিংবা অনুরূপ অর্থ রক্ষণাবেক্ষণ বা দান, কিংবা সরকারের হিসাব-নিরীক্ষা;

(চ) উপরিউক্ত উপ-দফাসমূহে নির্ধারিত যে কোন বিষয়ের অধীন কোন আনুষঙ্গিক বিষয়।

দফা (২)-এ বলা হয়েছে, 'কোন জরিমানা বা অন্য অর্থদণ্ড আরোপ বা রদবদল কিংবা লাইসেন্স-ফি বা কোন কার্যের জন্য ফি বা উসুল আরোপ বা প্রদান কিংবা স্থানীয় উদ্দেশ্য-সাধনকল্পে কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কোন কর আরোপ, নিয়ন্ত্রণ, রদবদল, মওকুফ বা রহিতকরণের বিধান করা হয়েছে, কেবল এই কারণে কোন বিল অর্থবিল বলে গণ্য হইবে না।'

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

কোন মন্ত্রী/মন্ত্রণালয় এটা প্রণয়ন ও অনুমোদন প্রক্রিয়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং এর সার্বিক অনুমোদন প্রক্রিয়া : অর্থমন্ত্রী বা অর্থ মন্ত্রণালয় এটা প্রণয়ন করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৮১ অনুচ্ছেদের (৩) দফায় বলা হয়েছে, 'রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য তাঁহার নিকট পেশ করার সময় প্রত্যেক অর্থবিলে স্পিকারের স্বাক্ষরে এই মর্মে একটি সার্টিফিকেট থাকিবে যে, তাহা একটি অর্থবিল এবং অনুরূপ সার্টিফিকেট সকল বিষয়ে চূড়ান্ত হইবে এবং সেই সম্পর্কে কোন আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।'

মূল্যায়ন : বাংলাদেশ সংবিধানের ৮১(৩) দফায় অর্থবিল নিরূপণের ক্ষেত্রে স্পিকারের সার্টিফিকেটই চূড়ান্ত বলে গণ্য। সেক্ষেত্রে স্পিকারের সার্টিফিকেট নিয়ে আদালতে কোনো প্রশ্ন করা যাবে না। ৭৮ নং অনুচ্ছেদের (১) দফা বলে যে, 'সংসদের কার্যধারার বৈধতা নিয়ে আদালতে কোন প্রশ্ন তোলা যাইবে না।' এ কারণে অর্থবিল নয়—এমন বিলের ওপর অর্থবিলের রং চড়ালেও আদালত প্রতিকার দিতে পারবে না। অর্থবিলের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি ১৫ দিনের মধ্যে তাতে সম্মতি দেবেন এবং না দিলেও এ মেয়াদ শেষে তিনি সম্মতি দিয়েছেন বলে গণ্য হবে।

১০ । ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে কি বোঝেন? বিভিন্ন শাসনামলে এক্ষেত্রে আনীত পরিবর্তনগুলো পর্যালোচনা করুন। *[২২তম বিসিএস]*

উত্তর : বাংলাদেশের ইতিহাস মানেই সংগ্রাম আর রুখে দাঁড়ানোর ইতিহাস। ব্রিটিশ আমলে সিপাহী বিদ্রোহ, ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, ফরায়েজী আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন ইত্যাদি শেষে ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হলেও এ বাংলাদেশের মানুষ পরাধীনতার শিকল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে পারেনি। বরং ব্রিটিশদের হাত থেকে তারা পাকিস্তানিদের হাতে হস্তান্তরিত হয়েছিল মাত্র। ব্রিটিশদের 'ভাগ করো এবং শাসন করো' (Divide and Rule)—নীতির শিকার হয়ে বাঙালি জাতি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসেবে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকরা ধর্মের অনুশাসনকে অসম্মান করে বাঙালি মুসলমানদের ওপর যে অন্যায় ও অবিচার করে তা ধর্মের পবিত্র বন্ধনকে ক্রমেই শিথিল করতে থাকে। তারপর একপর্যায়ে তাদের শোষণ এতই ব্যাপক হয় যে, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বাঙালি জনতা পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় এবং ১৯৭১ সালে দীর্ঘ নয় মাসের যুদ্ধে জয়ী হয়ে বাংলাদেশ নামে একটি নতুন রাষ্ট্রের জন্ম দেয়। তারপর ১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের নতুন সংবিধান প্রণীত হয় এবং এখানে রাষ্ট্রীয় মূলনীতির একটি অন্যতম মূলনীতি ছিল 'ধর্মনিরপেক্ষতা' (Secularism)। কিন্তু সংবিধানের এ ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিটি আর পরবর্তীতে টিকে থাকেনি। পঁচাত্তর-পরবর্তী সময়ে দেশের নতুন সরকার সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে এতে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' সংযোজন করে এবং ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি পরিবর্তন করে 'পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালার ওপর আস্থা ও বিশ্বাস' স্থাপনকে মূলনীতি হিসেবে প্রতিস্থাপন করে। তারপর এরশাদ সরকার অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে সাংবিধানিকভাবে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দেন। এরপরই বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতার চরিত্র বিষয়ে বিতর্ক শুরু হয়। সর্বশেষ পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ও রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম বহাল রেখে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতাকে পুনর্বহাল করা হয়।

ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ : ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ মূলত ইউরোপীয় রেনেসাঁর ফলে সৃষ্ট একটি মতবাদ। এ মতবাদে ধর্মকে সকল বৈশ্বিক বিষয় থেকে আলাদা রাখার কথা বলা হয়। ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে এমন বিষয়কে বোঝায় যা কোনো ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। আর ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বলতে ঐ মতবাদকে বুঝায় যেখানে বিশ্বাস করা হয় যে, মানুষের আইন, শিক্ষা, রাষ্ট্রীয় রীতিনীতি তথা রাজনীতি হবে প্রকৃত তথা বাস্তব ঘটনা ও বৈজ্ঞানিক বাস্তবতার ভিত্তিতে, ধর্মের ভিত্তিতে নয়। এ মতবাদ অনুযায়ী ধর্ম এবং রাষ্ট্রের মধ্যে সুস্পষ্ট বিভাজন থাকবে। ধর্ম ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনেই

সীমাবদ্ধ থাকবে, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ধর্মের কোনো সম্পৃক্ততা থাকবে না। তাছাড়া ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে বস্তুবাদী দর্শনেরই ভিন্ন রূপ বলে মনে করা হয়। এতে বলা হয়, ব্যক্তির বস্তুগত স্বার্থ ও বিষয়াদিতে ধর্ম বা আদর্শগত বিষয়াদি সম্পৃক্ত থাকা অযৌক্তিক। তবে এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ক্ষমতাও সীমিত করা হয়। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদে ব্যক্তির ধর্মীয় বিষয়াদির ব্যাপারে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ করার কোনো অধিকার থাকবে না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলতে আমরা বোঝাতে পারি এমন রাষ্ট্রকে যেখানে কোনো ধর্মীয় বিষয়, অবস্থান বা নিয়মনীতির সাথে রাষ্ট্রের কোনো দাপ্তরিক সম্পর্ক থাকবে না।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের উদ্দেশ্য হলো বস্তুগত উপাদান এবং বস্তুবাদী নীতি ও পদ্ধতির সাহায্যে মানব জীবনকে উন্নত করা। এ মতবাদের কেন্দ্রবিন্দু সম্পূর্ণ বৈষয়িক এবং এখানে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু দৃশ্যমান এবং মানবীয় অনুভূতির আওতাধীন তা-ই বিবেচনাযোগ্য। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদে কেবল ঐ জাতীয় জ্ঞানের প্রতি বিশ্বাস রাখা হয় যা ঐশ্বরিক নয়, যা অভিজ্ঞতা ও যুক্তিগ্রাহ্য এবং যাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাই করা যায়। এখানে ঐশ্বরিক কোনো কিছুরই স্থান নেই।

তবে আধুনিককালে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে অনেক ক্ষেত্রে ভিন্নতর রূপে দেখা যায়। আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের প্রবক্তারা বলেন, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ধর্মীয় মতবাদ থেকে ভিন্ন হলেও তাদের মধ্যে কোনো অত্যাবশ্যকীয় বিরোধ নেই। কেননা শান্তিপূর্ণভাবে ধর্ম পালনের সাথে সেকুলারিজমের কোনো বিরোধ নেই। তাদের দৃষ্টিতে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ হলো রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো ধর্মকে বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান না করা এবং রাষ্ট্রে সকল ধর্মের সমমর্যাদার অবস্থান নিশ্চিত করা।

বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার বিবর্তন : ইউরোপে রেনেসাঁর মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষতার যে ধারণাটি জন্মলাভ করেছিল, প্রকৃত অর্থে বিশ্বব্যাপী ইউরোপীয় দখলদারদের শাসনক্ষেত্রে এর প্রভাব নিরঙ্কুশ ছিল না। বিশেষ করে ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসকরা এ অঞ্চলের জনগণের ধর্মীয় চেতনাকে নানাভাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছে। এ অঞ্চলের দুটি ধর্মীয় সম্প্রদায় মুসলিম ও হিন্দু জনগোষ্ঠীর মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করে তাদের শক্তিকে নস্যাৎ করার মাধ্যমে শাসন করার অপকৌশল ব্রিটিশরা সার্বক্ষণিকভাবে কাজে লাগিয়েছে। কিন্তু তারপরও বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে এ অঞ্চলের মানুষের ধর্মনিরপেক্ষ চেতনার স্ফুরণ লক্ষ্য করা গেছে। এক্ষেত্রে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ একটি অন্যতম মাইলফলক। কেননা এ আন্দোলনে হিন্দু-মুসলিম-খ্রিস্টান নির্বিশেষে সকল সিপাহী ইংরেজদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে একটি অভিন্ন অস্তিত্বের জানান দিয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে বাংলার তৎকালীন হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী এটিকে একটি মুসলিম ষড়যন্ত্র বলে আখ্যা দিয়ে মিথ্যাচার করছিল। এমনিভাবে তাদের প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক সংগঠন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসও হিন্দুদের স্বার্থরক্ষায় ইংরেজদের ক্ষমতার ভাগ নিতে ব্যতিব্যস্ত ছিল। অন্যদিকে মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজনৈতিক সংগঠন মুসলিম লীগও একই কৌশল অবলম্বন করেছিল। এরই প্রেক্ষিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের জনপদ এ পূর্ববাংলাকে আলাদা করার প্রস্তাব আসে এবং ১৯০৫ সালে তা কার্যকরও হয়। কিন্তু হিন্দুদের প্রবল আপত্তির মুখে ১৯১১ সালে তা রদ হয়। তবে ১৯৪৭ সালে বাংলার স্থায়ী বিভাজন নিশ্চিত হয় এবং মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসেবে পূর্ববাংলা পূর্ব পাকিস্তান নামে পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়।

তারপর পাকিস্তানি শাসকরাও ধর্মের কৌশলটিকে নানাভাবে ব্যবহার করতে থাকে। রাষ্ট্রকে ইসলামীকরণের রাজনৈতিক অপকৌশল হিসেবে শাসকগোষ্ঠী পাকিস্তানকে ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা দেয়। কিন্তু পূর্ববাংলার মানুষ এ হীন চক্রান্ত মেনে নিতে পারেনি। ফলে ১৯৫২ সালে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে ভাষার দাবিতে আন্দোলন করে তারা তাদের অবস্থান জানান দেয় এবং এর চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটায় ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান ও ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

বাংলাদেশের সংবিধান ও ধর্মনিরপেক্ষতা : পাকিস্তানি শাসকদের ধর্মের ছদ্মাবরণে ধারাবাহিক অত্যাচার, অবিচার এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের ব্যবহারে অতিষ্ঠ এ দেশের বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংগঠন একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠনের দাবিতে প্রথম থেকেই সোচ্চার ছিল। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে বিভিন্ন সময়ে এ দেশের জনগণ তাদের এ দাবির বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে। শেষ পর্যন্ত এ দেশের জনগণ বুঝতে পেরেছিল, পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী তাদের এ দাবি কখনোই মেনে নেবে না। এজন্য তাদের চাই একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র, যেখানে তারা রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ধর্মের ব্যবহার সীমিত করে একটি সর্বজনীন সরকার ও রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। জনগণের এ প্রাণের দাবিকে পুঁজি করেই ১৯৭১ সালে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল। তখন স্বাধীনতা যুদ্ধের নেতারাও জনগণের জন্য সমতা, মানুষের মর্যাদা এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদসহ অন্যান্য নেতা এ কথা বার বার বলেছেন যে, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং গণতন্ত্র হবে নবগঠিত বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মূলনীতি। সে অনুযায়ী যুদ্ধ শেষে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর শেখ মুজিবুর রহমানও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা হবে নবগঠিত স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের মূল ভিত্তি। সে অনুযায়ী ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের যে নতুন সংবিধান রচিত হয় তার প্রস্তাবনায় বলা হয়, জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের উচ্চতর আদর্শ, যা স্বাধীনতা যুদ্ধে আমাদের বীরজনতাকে আত্মোৎসর্গ করতে এবং আমাদের বীর শহীদদেরকে জীবন বিসর্জন দিতে প্রণোদিত করেছিল, তা-ই সংবিধানের মৌলনীতি। আবার সংবিধানের ৮ (১) ধারায় বলা হয় যে, জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি হবে রাষ্ট্রীয় নীতিমালার মৌলনীতি। ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিকে কার্যকর করার পন্থা বাতলাতে গিয়ে বলা হয় যে, ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিটি কার্যকর হবে—

– সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতা দূরীকরণের মাধ্যমে;
– বিশেষ কোনো ধর্মকে রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো প্রকার বিশেষ মর্যাদা না দিয়ে;
– রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যবহার রোধ করে এবং
– কোনো নির্দিষ্ট ধর্মের অনুসারীর প্রতি যে কোনো ধরনের বৈষম্যরোধের মাধ্যমে।

এ উদ্দেশ্যে মূল সংবিধানে সকল প্রকার সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল যাতে ধর্মকে কোনো প্রকার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার না করা যায়। সংবিধানের ৩৮ ধারায় বলা হয়েছিল যে, কোনো সাম্প্রদায়িক বা অন্য কোনো সংগঠন বা সংঘ যা কোনো ধর্মের নামে বা কোনো ধর্মের ভিত্তিতে গঠিত হয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলে লিপ্ত—এ ধরনের কোনো সংগঠন বা সংঘ গঠন বা এর সদস্য হওয়া বা এতে অংশগ্রহণের অধিকার কারো থাকবে না। এ ধারার বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে সকল প্রকার সাম্প্রদায়িক সংগঠন—মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী, নিজামে ইসলামকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

পঞ্চম সংশোধনী ও ধর্মনিরপেক্ষতা : ১৯৭৫ সালের আগ পর্যন্ত বাংলাদেশে সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতার যে বৈশিষ্ট্য সেটা আক্ষরিক অর্থে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু ১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর দেশে সামরিক আইন চালু হওয়ায় পর এ ক্ষেত্রে অনেকাংশে পরিবর্তন সাধিত হয়। বিশেষ করে ক্ষমতা গ্রহণের পর তৎকালীন সামরিক শাসক জিয়াউর রহমানের প্রথম থেকেই গুটিকয়েক বামপন্থী সমর্থক থাকলেও দেশের ডানপন্থীদের বৃহদাংশ তার সমর্থনে এগিয়ে এসেছিল।

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান তার চার বছরের শাসনামলে সংবিধানেও কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন নিয়ে আসেন। বিশেষ করে Martial Law Proclamation-এর মাধ্যমে যে সমস্ত পরিবর্তন আনা হয়, সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে এসবের বৈধতা দেয়া হয়। সর্বোপরি পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের নিম্নোক্ত মৌলিক পরিবর্তনগুলো আনা হয় :

১. বাংলাদেশ সংবিধানের প্রস্তাবনার ওপরে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম' সংযোজন করা হয়।
২. সংবিধানের চারটি মূলনীতির মধ্যে অন্যতম ছিল 'ধর্মনিরপেক্ষতা' (Secularism)। এ মূলনীতিটিকে বিলুপ্ত করে তার স্থলে 'পরম করুণাময় আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' সংযুক্ত করা হয়। *(অনুচ্ছেদ ৮)*

সংবিধানের এ পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতা ও অসাম্প্রদায়িক চরিত্র নষ্ট হয়েছে বলে অভিযোগ করে অনেকেই এর বিরোধিতা করেন। তবে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এ পরিবর্তনের পক্ষে যুক্তি দাঁড় করিয়ে বলতেন যে, দেশের ৮৫% মুসলমানের বিশ্বাসে যে বিষয়টি নিহিত রয়েছে সেটি সংবিধানে সংযোজন অন্যায় কিছু নয়।

অষ্টম সংশোধনী ও ধর্মনিরপেক্ষতা : অষ্টম সংশোধনী বিল বাংলাদেশের চতুর্থ সংসদের পাস করা আইনগুলোর অন্যতম। ১৯৮২ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পর সামরিক শাসক এরশাদ রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে নির্ধারণের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এ লক্ষ্যে ১৯৮৮ সালের ৯ জুন জাতীয় সংসদে সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী পাস হয়। এ সংশোধনী অনুযায়ী :

প্রথমত, সংবিধানে ২ (ক) ধারা সংযোজনের মাধ্যমে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

দ্বিতীয়ত, রাজধানীতে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের অতিরিক্ত দেশের বিভিন্ন স্থানে হাইকোর্টের আরো ছয়টি বেঞ্চ প্রতিষ্ঠার আইনও এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অবশ্য পরবর্তীতে অষ্টম সংশোধনী মামলার রায়ে বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী এ জাতীয় পদক্ষেপকে অবৈধ ঘোষণা করলে শেষ পর্যন্ত তা বাতিল হয়ে যায়।

পঞ্চদশ সংশোধনী ও ধর্মনিরপেক্ষতা : ৩০ জুন ২০১১ নবম জাতীয় সংসদে পাস হয় পঞ্চদশ সংশোধনী। এ সংশোধনীতে পঞ্চম সংশোধনীর বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ও অষ্টম সংশোধনীর রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম বহাল রেখে ১৯৭২ সালের সংবিধানের মূলনীতি ধর্মনিরপেক্ষতা পুনর্বহাল করা হয়। পুনর্বহাল হওয়া বাংলাদেশ সংবিধানের ১২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ধর্মনিরপেক্ষতা নীতি বাস্তবায়নের জন্য— (ক) সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা, (খ) রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান, (গ) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মীয় অপব্যবহার, (ঘ) কোনো বিশেষ ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তার উপর নিপীড়ন বিলোপ করা হবে। একই সাথে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৮-এর ১(ক) ধারা 'সর্ব শক্তিমান আল্লাহের উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই হইবে যাবতীয় কার্যাবলীর ভিত্তি' বিলোপ করা হয়।

উপসংহার : স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ১৯৭২ সালে প্রণীত মূল সংবিধানকে অনেকেই একটি ধর্মনিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িক সংবিধান হিসেবে মূল্যায়ন করেন। তারা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও হুসেইন মুহম্মদ এরশাদকে সংবিধানের এ বিশেষ বৈশিষ্ট্য ধ্বংস করার দায়ে অভিযুক্ত করেন। অভিযোগকারীরা বলেন যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় বোধকে কাজে লাগিয়ে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্যই তারা এরূপ করেছেন। আর তাদের সমর্থকদের বক্তব্য হলো, সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের এ দেশে ধর্মনিরপেক্ষতার স্লোগানও এক ধরনের ভাঁওতাবাজি। বরং সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর চাওয়া-পাওয়ার সাথে সঙ্গতি রেখেই এ ধরনের পরিবর্তন আনা হয়েছে। সর্বোপরি দেশের সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ধর্মবিশ্বাসেও এর দ্বারা কোনোরূপ আঘাত করা হয়নি বরং তাদের ধর্ম-কর্ম পালনের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকৃত রয়েছে।

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

১১ । সংবিধান কাকে বলে? সংবিধান প্রণয়নের বিভিন্ন পদ্ধতি আলোচনা করুন। বাংলাদেশের সংবিধান কোন পদ্ধতিতে প্রণীত হয়েছে?

অথবা, **সংবিধানের সংজ্ঞা দিন। যেসব পদ্ধতিতে সংবিধান প্রণয়ন করা হয় সেগুলো আলোচনা করুন। বাংলাদেশের সংবিধান কোন পদ্ধতিতে প্রণীত হয়েছে?**

উত্তর : রাষ্ট্রের কাঠামো এবং ক্ষমতার মৌল নমুনা হলো সংবিধান। রাজনীতির গন্তব্যস্থানে পৌছা এবং চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমাদের এমন কিছু আইন-কানুনের প্রয়োজন যা সকলের জ্ঞাত এবং সমর্থিত। মূলত সংবিধানই হলো সেসব আইন-কানুনের সর্বোচ্চ নির্দেশক। সংবিধানের মাধ্যমেই রাষ্ট্রের রূপ ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। তাই সংবিধানকে বলা হয় ' রাষ্ট্রের দর্পণ'। লিখিত বা অলিখিত যা-ই হোক সংবিধান একটি রাষ্ট্রের শাসন নীতি ও শাসনব্যবস্থা পরিচালনার দিক নির্দেশ করে।

সংজ্ঞা : সাধারণত সংবিধান বলতে আমরা এমন কিছু নিয়ম-নীতি, বিধি-বিধান বা অনুশাসনকে বুঝি যা রাষ্ট্র পরিচালনার মূলসূত্র হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ রাজনৈতিক ব্যবস্থা এসব নিয়ম-কানুনকে অনুসরণ করেই তার কার্য পরিচালনা করে থাকে।

লেখক ও গবেষকদের মতে সংবিধান

এরিস্টটল, কে সি হুইয়ার, হারমান এইচ ফাইনার, লেসলি লিপসন, লর্ড ব্রাইস, সি এফ স্ট্রং, স্টিফেন লিকক, বিলিংব্রোক, উলসি, ডাইসি প্রমুখ সংবিধান বিশেষজ্ঞ এবং গবেষকগণ সংবিধানের সংজ্ঞা দেয়ার প্রয়াস পেয়েছেন। এদের মধ্যে এরিস্টটল, ডাইসি, কে সি হুইয়ার এবং লেসলি লিপসনের সংজ্ঞা সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটল সংবিধানের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে, 'A Constitution is the way of life; The state has chosen for itself.'

আধুনিক মার্কিন সংবিধান বিশারদ ডাইসির মতে, 'সকল প্রকার নিয়ম-কানুন যা রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার অনুশীলন বা ক্ষমতার বন্টনকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে তাকে সংবিধান বলে।'

কে সি হুইয়ার তার The English Constitution গ্রন্থে সংবিধানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, সংবিধান হলো সেসব নিয়মের সমষ্টি যা কি উদ্দেশ্য এবং কোন বিভাগের সরকার কর্তৃক পরিচালিত হবে তা নির্দেশ করে।'

তবে সংবিধানের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা দিয়েছেন লেসলি লিপসন। মার্কিন এই সংবিধান বিশেষজ্ঞ তাঁর Democratic Civilization গ্রন্থে সংবিধানের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে, "সংবিধান হচ্ছে রাষ্ট্রের প্রশাসনগত নিয়ম-প্রণালী ও তার সঙ্গে নাগরিকদের সম্পর্ক সংবলিত একটি রাজনৈতিক প্রকল্প। বলা বাহুল্য, এই প্রকল্পের মূল কাঠামো হলো লিখিত সংবিধান।'

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌছতে পারি যে, সংবিধান হলো কতিপয় নিয়ম-কানুন যা সরকার গঠন, দেশ পরিচালনা, সরকার ও জনগণের অবস্থান নির্ণয় এবং সর্বোপরি পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে মূলসূত্র হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

সংবিধান প্রণয়নের বিভিন্ন পদ্ধতি : সংবিধান প্রণয়নের পদ্ধতি অবস্থা ও ঘটনার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। বর্তমান বিশ্বে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সংবিধান বিশেষজ্ঞগণ তাদের সংবিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

প্রায় অভিন্ন নিয়ম পালন করে থাকেন। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ এবং আমেরিকা প্রভৃতি দেশের পূর্ব ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সেসব দেশে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংবিধান গড়ে উঠেছে।

প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক র‍্যামন্ড জি-গেটেল তার Political Science গ্রন্থে সংবিধান প্রণয়নের চারটি পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছেন। পদ্ধতি চারটি নিম্নরূপ :

১. **মঞ্জুরি বা অনুমোদন :** রাজার আদেশ বা শাসকের অনুমোদনের মাধ্যমে গড়ে উঠে সংবিধান। তবে এ পদ্ধতি অত্যন্ত পুরনো। ফরাসি বিপ্লব (১৭৮৯), আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা (১৭৭৬) ইত্যাদির পূর্বে ও পরে পৃথিবীর দেশে দেশে স্বৈরশাসন পরিলক্ষিত হয়। এসব শাসক তাদের ইচ্ছামাফিক দেশ পরিচালনা করতেন। ফলে ব্যক্তিস্বাধীনতা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকার ইত্যাদি মানব জীবনের মৌলিক বিষয়গুলো ছিল একেবারে উপেক্ষিত। ফলে সময়ের পরিবর্তন, জনগণের জীবনের প্রয়োজন ইত্যাদি কারণে প্রতিবাদী ও সংগ্রামী জনগণ স্বৈরশাসকের রক্তচক্ষু ও দমননীতি উপেক্ষা করে সংগঠিত হয়ে রাজা বা শাসকের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়। এসব চুক্তিতে রাজার বা শাসকের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা, জনগণের প্রতি তাদের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে জনগণের অধিকার ইত্যাদি সুনির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। এসব চুক্তিতে রাজা বাধ্য হয়ে অনুমোদন দিয়ে থাকেন। সুতরাং রাজা বা শাসকের আদেশ বা অনুমোদনের মাধ্যমে গড়ে উঠে সংবিধান। এভাবে ১২১৫ সালে টেমস নদীর রানিমিড দ্বীপে রাজা জন কর্তৃক স্বাক্ষরিত ম্যাগনা কার্টা, ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়নের ঘোষণা (১৭৯৯), জাপানের মেইজি সম্রাটের ঘোষণা (১৮৮৯), রুশ সম্রাট দ্বিতীয় জার নিকোলাসের অনুমোদন (১৯০৫) ইত্যাদির মাধ্যমে সেসব দেশে সংবিধান প্রতিষ্ঠিত হয়।

২. **সুপরিকল্পিত রচনা :** যখন কোনো দেশের সংবিধান সুপরিকল্পিতভাবে কোনো প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গড়ে উঠে তখন তাকে সুপরিকল্পিত রচনা বলে। এ ধরনের প্রতিষ্ঠান হলো গণপরিষদ। গণপরিষদের সদস্যরা সাধারণত জনগণের ভোটে প্রথমে আইন পরিষদের সদস্য হন। এই আইন পরিষদ সংবিধান প্রণয়ন করলে তখন তার নাম হয় গণপরিষদ। অবশ্য জনগণের ভোট ছাড়াও কোনো কোনো ক্ষেত্রে মনোনয়নের মাধ্যমে গণপরিষদের সদস্য নির্বাচন করা হয়। এসব গণপরিষদে প্রথমে খসড়া সংবিধান প্রণয়ন করা হয়। এরপরে উক্ত খসড়া সংবিধানের ওপর উন্মুক্ত বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। এই অবস্থায় এর বিভিন্ন ধারা এবং উপধারা পরিবর্তন বা সংযোজন করা হয়। প্রয়োজনে একে গণভোটেও দেয়া হয়। সব শেষে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে একে পাস করিয়ে সরকারপ্রধানের অনুমোদন নেয়া হয়। এভাবে ১৭৮৯ সালের মার্কিন সংবিধান, ১৯৪৯ সালের ভারতের সংবিধান এবং ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সংবিধান রচিত হয়।

৩. **ক্রমবিবর্তন :** ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমেও সংবিধান গড়ে উঠে। এ অবস্থায় কোনো নির্দিষ্ট শাসক বা প্রতিষ্ঠান সংবিধান প্রণয়ন করে না। মূলত অত্যাচারী শাসকদের থেকে জনগণ এ ধরনের সংবিধান আদায় করে নেয়। শাসকগণের অত্যাচার যখন চরমে পৌছে তখন জনগণের মধ্যে প্রতিবাদ বা প্রতিরোধের স্পৃহা জাগরিত হয়। জনগণ তখন ঐক্যবদ্ধভাবে শাসকের কাছ থেকে কতিপয় দাবি আদায় করে থাকে যা বিধিবদ্ধভাবে লিখিত থাকে। এছাড়া শাসকরাও অনেক সময় তাদের উৎকর্ষ প্রতীয়মান করতে গিয়ে জনগণকে কতিপয় বিধিবদ্ধ নিয়ম-কানুনের আওতায় নিয়ে আসেন। এভাবে জনগণ ও শাসকের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বা শাসনকার্যের নীতিমালা প্রণয়ন করতে গিয়ে ধীরে ধীরে কতিপয় বিধান রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। আর এভাবেই ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে গড়ে উঠে সংবিধান। এসব সংবিধান মূলত অলিখিত হয়। ব্রিটিশ সংবিধান ক্রমবিবর্তন সংবিধানের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

৪. **বিপ্লব :** লেনিন এবং মাও-সে-তুং-এর মতে, বিপ্লব হলো প্রচলিত শাসনব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করে নতুন ধ্যান-ধারণা চালু করা। বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সরকার পূর্ববর্তী সরকারের সকল কিছুতেই পরিবর্তন আনেন। ফলে তাকে সংবিধানকেও নতুনভাবে রচনা করতে হয়। বিপ্লবী সরকার অবশ্য তার নতুন সংবিধান প্রণয়নে জনগণের মতামত গ্রহণ বা তাদের অংশগ্রহণকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। এভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিপ্লবোত্তর সরকারের নতুন সংবিধান প্রণয়ন করার নজির রয়েছে। ১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লব, ১৯১৭ সালের বলশেভিক বিপ্লব এবং ১৯৪৯ সালের চীন বিপ্লবের মাধ্যমে সেসব দেশে নতুন সংবিধান প্রণীত হয়েছে।

বাংলাদেশে সংবিধান প্রণয়নের পদ্ধতি : বিভিন্ন রাষ্ট্র বিভিন্ন পদ্ধতিতে সংবিধান লাভ করেছে। সংবিধান লাভের চারটি প্রধান পদ্ধতি আছে; যথা : মঞ্জুরি, সুপরিকল্পিত রচনা, ক্রমবিবর্তন ও বিপ্লব। উল্লিখিত চারটি পদ্ধতির কোনোটিই বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে প্রযোজ্য নয়। বাংলাদেশে সংবিধান প্রতিষ্ঠা পদ্ধতির একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। রক্তাক্ত বিপ্লবের মাধ্যমে পাকিস্তান হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাংলাদেশ একটি নতুন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু যে মূল রাষ্ট্র হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাংলাদেশের উৎপত্তি হয় সেই রাষ্ট্র পাকিস্তানের কোনো সংবিধান ছিল না। মুখ্যত পাকিস্তানের সংবিধান রচনা করার উদ্দেশ্যে একটি গণপরিষদ নির্বাচিত হয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তান সরকার এ গণপরিষদকে সংবিধান রচনা করার সুযোগ দিতে অস্বীকার করে। বাঙালি জনগণের স্বার্থ ও নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যই বাংলাদেশে বিপ্লব সংঘটিত হয়। এই জনপ্রতিনিধিগণ বিপ্লবে নেতৃত্ব প্রদান করেন। সুতরাং বিপ্লবের সফল পরিসমাপ্তির পর সংবিধান প্রণয়নের ব্যাপারে বাংলাদেশকে কোন বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি। স্বাধীনতা লাভের পর নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ একটি গণপরিষদ গঠন করে বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন করেন। অতএব এ পদ্ধতিকে বিপ্লব ও সুপরিকল্পিত রচনার সংমিশ্রণ বলা যেতে পারে।

উপসংহার : বিশ্বব্যাপী গণতান্ত্রিক ধারণার সুপ্রচারণার ফলে সংবিধানের প্রণয়ন পদ্ধতিতে পরিবর্তন অনস্বীকার্য হয়ে উঠেছে। বর্তমান বিশ্বে রাজনীতিই তার জঠর থেকে সংবিধানকে জন্ম দেয়, একে লালিত-পালিত করে এবং আইনগত ক্ষমতা দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করে। সংবিধান থেকেই উৎসারিত হয় অন্য সকল আইন।

১২। বাংলাদেশ সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী সম্পর্কে বিস্তারিত লিখুন।

উত্তর : ২০১০ সালের ২১ জুলাই প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতা শেখ হাসিনার প্রস্তাবে সংবিধান সংশোধনে জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি ২৬৬ বিধি মোতাবেক ১৫ সদস্যবিশিষ্ট বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটি ২৭টি বৈঠক করে ৫১ দফা সুপারিশ সম্বলিত সংবিধান সংশোধন প্রতিবেদন চূড়ান্ত করে ৫ জুন ২০১১। এর আগে ৫ জন সাবেক প্রধান বিচারপতি, মূল সংবিধানের সাথে সংশ্লিষ্ট গণপরিষদ সদস্যসহ ১৮ জন আইন ও সংবিধান বিশেষজ্ঞ, ২৬ জন বুদ্ধিজীবী, গণমাধ্যমের সম্পাদক, সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দল (বিএনপি ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ব্যতীত) এবং সেক্টর কমান্ডারদের মতামত নেয় কমিটি। এরপর কমিটির ১৫ সদস্যের স্বাক্ষরসহ ৪০ পৃষ্ঠার প্রতিবেদন সংসদে উপস্থাপন করা হয় ৮ জুন ২০১১। বিশেষ কমিটির ৫১টি সুপারিশের মধ্যে ৩টি বিষয় (বিসমিল্লাহ... রাখা, রাষ্ট্রধর্ম ও ধর্মভিত্তিক রাজনীতি— ১, ৩ ও ১৭ নম্বর সুপারিশ) নিয়ে ২ সদস্যের (রাশেদ খান মেনন ও হাসানুল হক ইনু) আপত্তিসহ এ প্রতিবেদন উপস্থাপিত হয়। এরপর ২০ জুন ২০১১ বিলের খসড়া সংসদে তোলার অনুমোদন দেয় মন্ত্রিসভা। এ বিল মন্ত্রিসভা অনুমোদন

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

দেয়ার পর সংবিধানের ৮২নং অনুচ্ছেদ অনুসারে তা সংসদে উত্থাপনের অনুমতি দেন রাষ্ট্রপতি মোঃ জিল্লুর রহমান। ২৫ জুন ২০১১ সংসদে বিল আকারে উত্থাপিত হয় সংবিধান সংশোধন কমিটির সুপারিশ। স্পিকার বিলটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করেন। সংসদীয় কমিটি দু'দফা বৈঠক শেষে ২৯ জুন ২০১১ চার দফা সংশোধনীসহ সংসদে বিলটির প্রতিবেদন দেয়। এরপর ৩০ জুন ২০১১ জাতীয় সংসদে প্রথমে কণ্ঠভোটে এবং পরে বিভক্তি ভোটে পাস হয় সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১। বিভক্তি ভোটে সংবিধান সংশোধন বিলটি পাসের পক্ষে ২৯১ এবং বিপক্ষে মাত্র ১টি ভোট (স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য ফজলুল আজিম) পড়ে। ৩ জুলাই ২০১১ রাষ্ট্রপতি মোঃ জিল্লুর রহমান সম্মতি দান করলে আইনে পরিণত হয় সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) বিল, ২০১১।

পঞ্চদশ সংশোধনীর উদ্দেশ্য ও কারণ : ১৯৭২ সালের সংবিধানের মৌলিক বৈশিষ্ট্য, রাষ্ট্র পরিচালনা নীতি ইত্যাদি সংক্রান্ত বিধান পুনর্বহালসহ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করার মাধ্যমে জনগণের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত এবং গণতন্ত্রকে সুসংহত করার লক্ষ্যে অসাংবিধানিক পন্থায় ক্ষমতা গ্রহণ এবং এর অপব্যবহারের মাধ্যমে দেশে আইনের শাসন ও জনগণের অধিকার পরাহত করার প্রচেষ্টা বন্ধের লক্ষ্যে এ ধরনের পদক্ষেপকে অপরাধ গণ্য করে তার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, উস্কানিদাতা এবং সহযোগীদেরকে শাস্তির বিধান রেখে সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধনী) বিল, ২০১১ উত্থাপন করা হয়। এটি জনগণের রাজনৈতিক ও মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সংরক্ষণে মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে। ফলশ্রুতিতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জনগণ তাদের কাঙ্ক্ষিত কল্যাণকামী রাষ্ট্রের নাগরিক সুবিধা ভোগ করবে।

পঞ্চদশ সংশোধনীর বিষয়সমূহ : সংবিধানের প্রস্তাবনা, মূলনীতি, নির্বাচন ব্যবস্থা ও তফসিলসহ অনেকগুলো ধারায় ব্যাপক ও মৌলিক পরিবর্তনের বিধান সংবলিত সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন ২০১১-এর উল্লেখযোগ্য সংশোধন, সংযোজন, প্রতিস্থাপন, বিলুপ্ত ও নতুন বিষয়সমূহ হচ্ছে :

১. **প্রস্তাবনা সংশোধন :** সংবিধানের প্রারম্ভে 'বিসমিল্লাহির-রহমানির রহিম' ও এর বাংলা অনুবাদ 'দয়াময়, পরম দয়ালু, আল্লাহর নামে'-এর পাশাপাশি বিকল্প হিসেবে *'পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তার নামে'* সংযোজনের পাশাপাশি প্রস্তাবনার প্রথম ও দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে কয়েকটি শব্দের সংশোধন করে মূল সংবিধানের শব্দসমূহ প্রতিস্থাপন করা হয়।

২. **রাষ্ট্রধর্ম ও অন্যান্য ধর্ম এবং ধর্মের অপব্যবহার রোধ :** সংবিধানের ২ক অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম বহাল রাখার পাশাপাশি অন্যান্য ধর্মের মর্যাদা ও সমঅধিকার নিশ্চিত করা হয়। অনুচ্ছেদ ১২-এ ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা বিষয়টি পুনর্বহাল করার পাশাপাশি অনুচ্ছেদ ৩৮ সংশোধন করে ধর্মের অপব্যবহার রোধ করা হয়।

৩. **জাতির পিতার স্বীকৃতি ও প্রতিকৃতি :** সরাসরি বিশেষ কোনো অনুচ্ছেদ বা দফার মাধ্যমে জাতির পিতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে উল্লেখ করা না হলেও সংবিধানের প্রতিস্থাপিত অনুচ্ছেদ ৪ক-এ জাতির পিতা হিসেবে তাকে স্বীকৃতি দেয়া হয় এবং তার প্রতিকৃতি সংরক্ষণও বাধ্যতামূলক করা হয়। এছাড়া সংবিধানের পঞ্চম ও ষষ্ঠ তফসিলেও জাতির পিতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম উল্লেখ করা হয়।

৪. **জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব :** সংশোধিত সংবিধানের ৬ অনুচ্ছেদের ২ দফা অনুযায়ী বাংলাদেশের জনগণ হিসেবে 'বাঙালি' এবং নাগরিকগণ 'বাংলাদেশী' বলে পরিচিত হবেন।

৫. **অবৈধ ক্ষমতা দখলকারীদের বিরুদ্ধাচরণ :** সংবিধানের নতুন সংযোজিত ধারা ৭ক অনুযায়ী অসংবিধানিক পন্থায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলকারীরা অপরাধ বিবেচনায় রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে বিবেচিত হবে এবং সর্বোচ্চ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

৬. **সংবিধানের মৌলিক কাঠামো সংক্রান্ত বিধানাবলী :** সংবিধানের মৌলিক কাঠামো সংক্রান্ত বিধানাবলী সংশোধন অযোগ্য করে নতুন অনুচ্ছেদ ৭-খ সংযোজন করা হয়। এখানে বলা হয়– *সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদে যা কিছুই থাকুক না কেন, সংবিধানের প্রস্তাবনা, প্রথম ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, দ্বিতীয় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, নবম-ক ভাগে বর্ণিত অনুচ্ছেদসমূহের বিধানাবলী সাপেক্ষে তৃতীয় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ এবং একাদশ ভাগের ১৫০ অনুচ্ছেদসহ সংবিধানের অন্যান্য মৌলিক কাঠামো সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমূহের বিধানাবলী সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন, রহিতকরণ কিংবা অন্য কোনো পন্থায় সংশোধনের অযোগ্য হবে।*

৭. **'৭২-এর সংবিধানের মূলনীতি বহাল :** সংবিধানের ৮ অনুচ্ছেদের (১) দফায় উল্লিখিত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি পরিবর্তন করে '৭২-এর সংবিধানের মূলনীতি পুনর্বহাল করা হয়। একই সাথে ৮(১ক) দফায় উল্লিখিত 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই হইবে যাবতীয় কার্যাবলীর ভিত্তি' বিলোপ করা হয়। পাশাপাশি ৯ ও ১০ নং অনুচ্ছেদে *স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন* এবং *জাতীয় জীবনে মহিলাদের অংশগ্রহণ* স্থলে যথাক্রমে *জাতীয়তাবাদ* এবং *সমাজতন্ত্র ও শোষণমুক্তি* বিষয়গুলো প্রতিস্থাপন করা হয়। বিলুপ্ত ১২ নং অনুচ্ছেদের মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতার বিষয়টিকে পুনর্বহাল করা হয়।

৮. **পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন :** প্রথমবারের মতো কোনো সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে পরিবেশ বিষয়কে গুরুত্ব দেয়া হয়। অনুচ্ছেদ ১৮ক সংযোজনের মাধ্যমে রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করা এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণীর নিরাপত্তা বিধান করার নিশ্চয়তা দেয়া হয়।

৯. **জাতীয় জীবনে মহিলাদের অংশগ্রহণ :** সংবিধানের ১৯ অনুচ্ছেদের (২) দফার পর নতুন করে (৩) দফা সংযোজন করে বলা হয়, জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে।

১০. **উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি :** সংবিধানের ২৩ অনুচ্ছেদের পর নতুন ২৩ক অনুচ্ছেদ সন্নিবেশিত হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে— রাষ্ট্র বিভিন্ন উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১১. **তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিলুপ্ত :** পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বিলুপ্ত ঘটে ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে প্রচলিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা। এজন্য বিলুপ্ত করা হয় ৫৮ক অনুচ্ছেদ, চতুর্থ ভাগের ২-ক পরিচ্ছেদের ৫৮-খ-৫৮ঙ এবং সংশোধন করা হয় অনুচ্ছেদ ৬১, অনুচ্ছেদ ১৪৭ ও অনুচ্ছেদ ১৫২। এছাড়া সংবিধানের তৃতীয় তফসিলও সংশোধন করা হয়।

১২. **সংরক্ষিত নারী আসন বৃদ্ধি :** সংবিধানের ৬৫ নং অনুচ্ছেদ সংশোধন করে জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন ৪৫ থেকে বাড়িয়ে ৫০ করা হয়।

১৩. **দালাল আইনের পুনরুজ্জীবন :** সংবিধানের ১২২ অনুচ্ছেদের (২) দফা সংশোধন করে ১৯৭২ সালের দালাল আইন পুনরুজ্জীবিত করা হয় এবং এ আইনে দোষী সাব্যস্তদের ভোটাধিকার হরণ করা হয়।

১৪. **নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা বৃদ্ধি :** সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদের (১) দফা সংশোধন করে নির্বাচন কমিশনের সদস্য সংখ্যা বাড়িয়ে ৫ জনে নির্ধারণ করা হয়। একই সাথে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পর নির্বাচন কমিশনকে যুক্তিসঙ্গত নোটিশ না দিয়ে কোনো আদেশ না দেয়ার বিধান দিয়ে ১২৫ অনুচ্ছেদের (৩) দফায় (গ) উপদফা যুক্ত করা হয়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

১৫. **পররাষ্ট্রনীতিতে পরিবর্তন :** পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে যুক্ত সংবিধানের ২৫ অনুচ্ছেদের (২) দফা বিলুপ্ত করা হয় পঞ্চদশ সংশোধনীতে। এ দফায় ছিল *রাষ্ট্র ইসলামী সংহতির ভিত্তিতে মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক সংহত, সংরক্ষণ এবং জোরদার করতে সচেষ্ট হবে।*

১৬. **অন্তর্বর্তী সরকার ও দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন :** সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর ফলে পরবর্তী জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে রাজনৈতিক সরকারের অধীনে। আগে মেয়াদ শেষ হওয়ার পরবর্তী ৯০ দিনে নির্বাচন করার বিধান ছিল। এখন পূর্ববর্তী ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন হবে। এ ৯০ দিনে সংসদ থাকলেও অধিবেশন বসবে না। এজন্য সংবিধানের ১২৩নং অনুচ্ছেদ সংশোধন করা হয়।

১৭. **ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ :** গুরুত্ব অনুধাবন করে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ তারিখে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেয়া ঐতিহাসিক ভাষণ সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের পর পঞ্চম তফসিলে [১৫০(২) অনুচ্ছেদ] যুক্ত করা হয়।

১৮. **স্বাধীনতার ঘোষণা :** ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্য রাত শেষে অর্থাৎ ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত স্বাধীনতার ঘোষণা সংযোজন করা হয় ষষ্ঠ তফসিলে [১৫০(২) অনুচ্ছেদ]।

১৯. **স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র :** ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল তারিখে মুজিবনগর সরকারের জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র সংযোজন করা হয় সপ্তম তফসিলে [১৫০(২) অনুচ্ছেদ]।

২০. **সংবিধান সংশোধনে গণভোট বাতিল :** সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদ সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধান সংশোধনে গণভোট প্রথা বাতিল করা হয়।

২১. **চার সংশোধনী বাতিল :** পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বিলুপ্ত হয়ে গেছে সংবিধানের সপ্তম, একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ সংশোধনী। চারটি সংশোধনীর মধ্যে তিনটি চতুর্থ তফসিলে অন্তর্ভুক্ত ছিল। চতুর্থ তফসিলের সংশোধনী সম্পর্কে বলা হয়েছে, অনুচ্ছেদ ৩ক, ১৮, ১৯ (সপ্তম সংশোধনী) এবং ২৩ বিলুপ্ত।

২২. **বাকশাল গঠন সংক্রান্ত বিধান বিলুপ্ত :** সংবিধানে চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে আনা বাকশাল গঠন সংক্রান্ত বিধান আদালতের রায়ে পুনরুজ্জীবিত হলেও পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তা বিলুপ্ত হয়। বাকশাল গঠনের বিধান সংবলিত 'ষষ্ঠ ক-ভাগ' বিলোপের প্রস্তাব করে দেয়া সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সুপারিশসহ সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধনী) বিল, ২০১১ জাতীয় সংসদে পাস হয়।

উপসংহার : সংবিধান সংশোধন একটি চলমান প্রক্রিয়া। বাংলাদেশের সংবিধান হলো আমাদের রাষ্ট্র পরিচালনার মূল লিখিত দলিল। রাষ্ট্রের প্রধান লক্ষ্য যেহেতু জনগণ সেহেতু রাষ্ট্র জনগণের প্রয়োজনে সংবিধান সংশোধন করে যুগোপযোগী করে তোলে। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের প্রস্তাবনা, মূলনীতি, নির্বাচন ব্যবস্থাসহ মৌলিক অনেকগুলো বিষয়ে পরিবর্তন আনা হয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলুপ্ত করা হয়েছে, '৭২-এর সংবিধানের চার মূলনীতি ফিরিয়ে আনা হয়েছে, রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম রাখা হয়েছে। ৭ মার্চের ভাষণ, ২৬ মার্চের স্বাধীনতা ঘোষণা ও ১০ এপ্রিল '৭১ জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অবৈধ ক্ষমতা দখলের জন্য সর্বোচ্চ শাস্তি ও সংরক্ষিত নারী আসন ৫টি বাড়িয়ে ৫০টি করা হয়েছে। সংবিধানে জাতির পিতার স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। দোষীদের ভোটার না করার ব্যবস্থা রেখে দালাল আইন পুনর্বহাল করা হয়েছে। এক কথায় পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়।

১৩ । গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধানে কি কি সংশোধনী আনা যুক্তিযুক্ত বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর : সংবিধান সংশোধন সময়ের দাবি। তবে তা যেন জনগণের সম্মতিতে তাদের কল্যাণের জন্য করা হয় তা অবশ্যই বিবেচনা করা উচিত। সংবিধান সংশোধন করতে হলে প্রথমে একটি সংবিধান সংশোধনী কমিটি গঠন করতে হয়। এ কমিটি সংবিধানের নির্দিষ্ট ধারা বা ধারাসমূহ সংশোধনের জন্য নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রপতির নিকট সুপারিশ পেশ করে। অতঃপর সংসদের সম্মতির ভিত্তিতে জাতীয় সংসদে সংবিধান সংশোধনী পাস হয়।

বাংলাদেশের সংবিধানে যেসব সংশোধনী দরকার : একটি উন্নয়নশীল দেশ এবং বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সংবিধানে যেসব সংশোধনী আনা দরকার বলে আমি মনে করি তা নিচে উল্লেখ করা হলো :

১. **বিকল্প সরকারের কার্যকাল ও কার্যাবলী :** পঞ্চদশ সংশোধনীতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিল হওয়ায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিকল্প সরকারের কার্যকাল ও কার্যাবলী সুনির্দিষ্ট করতে হবে। এ ধরনের সরকার ক্ষমতায় থাকাকালে রাষ্ট্রপতি অতিমাত্রায় ক্ষমতায় ক্ষমতাশালী হয়ে পড়েন বলে এই একজন ব্যক্তিকে বাধ্য করে বহু অঘটন করানো সম্ভব। তাই বিকল্প সরকার ক্ষমতায় থাকাকালে রাষ্ট্রপতির ওপর অবশ্যই উপদেষ্টামণ্ডলীর পরামর্শ অনুসারে কাজ করার বাধ্যবাধকতা আরোপ করতে হবে।

২. **রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রিসভার ক্ষমতা বৃদ্ধি :** নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় থাকাকালে প্রধানমন্ত্রী অতিমাত্রায় ক্ষমতা ভোগ করেন বলে কার্যত এক ব্যক্তির সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় তখন দেশে। ভারতের সংবিধানে এই ক্ষমতা রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার মধ্যে বণ্টিত। ভারতের রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভার পরামর্শ নিয়ে কাজ করেন, আমাদের দেশের মতো শুধু প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ নেয়ার বাধ্যবাধকতা সেখানে নেই। ভারতে রাষ্ট্রপতি প্রয়োজন মনে করলে এই পরামর্শ পুনর্বিবেচনার জন্য মন্ত্রিসভার কাছে ফেরতও পাঠাতে পারেন। রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রিসভার ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এসব ভালো বিধানকে বিবেচনায় নেয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

৩. **আইনসভাকে অধিকতর কার্যকর :** আইনসভাকে আরও কার্যকর করার জন্য সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ শুধু আস্থা-অনাস্থা ভোট ও বাজেট পাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, এটি সংবিধানে লিখে দেয়া প্রয়োজন। আফ্রিকা ও পূর্ব ইউরোপের কিছু দেশে অনুরূপ ও প্রতিবেশী পাকিস্তানে অবিকল এ ধরনের বিধান রয়েছে।

৪. **নিম্ন আদালতের স্বাধীনতা :** নিম্ন আদালতের স্বাধীনতার জন্য ১৯৭২ সালের সংবিধানের ১১৫ ও ১১৬ অনুচ্ছেদ অবিকলভাবে ফিরিয়ে আনতে হবে। পঞ্চম সংশোধনী মামলায় স্বয়ং আপিল বিভাগের কাছে এটি করার সুযোগ ছিল। কিন্তু তারা এটি করতে আশ্চর্যজনকভাবে অনীহ ছিলেন। এখন সংসদও এটি করতে ব্যর্থ হলে বিচার বিভাগের কাজে নানাভাবে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ অব্যাহত থাকবে।

৫. **উচ্চ আদালতের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা :** উচ্চ আদালতের জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা করতে হলে ১৯৭২ সালের ৯৬ অনুচ্ছেদ ফিরিয়ে আনতে হবে। ওই অনুচ্ছেদে বিচারপতিদের অপসারণের ক্ষমতা সংসদকে দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশে সংসদ নির্বাহী বিভাগের আজ্ঞাবহ বলে এই ক্ষমতা সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের কাছেই রাখতে চান কেউ কেউ। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হলো, এই কাউন্সিলকে আমরা কদাচিৎ কাজ করতে দেখি। কাজেই সংসদের কাছে এ ক্ষমতা ফিরিয়ে দেয়ার বিধানে আপত্তির কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। এ ছাড়া সংবিধানের ৯৫ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে উচ্চ আদালতের বিচারক পদে প্রার্থীদের যোগ্যতা অবশ্যই সুনির্দিষ্ট ও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করতে হবে। এতে সর্বোচ্চ আদালতে অযোগ্য ও রাজনৈতিক ব্যক্তিদের নিয়োগের সম্ভাবনা হ্রাস পাবে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৬. **অন্যান্য :** সংবিধানের আরও বহু সংশোধনীর প্রয়োজন রয়েছে। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারগুলো আমাদের সংবিধানে যথেষ্টভাবে বর্ণিত হয়নি, সুরক্ষিতও হয়নি। সংবিধানে লিগ্যাল এইড, শ্রমিকদের জীবনধারণক্ষম ন্যূনতম মজুরি, মা ও শিশুদের জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা, পরিবেশ রক্ষা এবং ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীগুলোর সাংস্কৃতিক অধিকারের কোনো সুনির্দিষ্ট উল্লেখ নেই। আমাদের সংবিধানে নিবর্তনমূলক আটকের বিধান ভারত বা পাকিস্তানের চেয়ে অনেক বেশি কঠোর ও স্বৈরতান্ত্রিক। সংবিধানে সংসদের ন্যূনতম অধিবেশন বা কার্যদিবসের কথা বলা হয়নি, অনুমতি না নিয়ে সংসদে একাদিক্রমে উননব্বই বৈঠক দিবসে অনুপস্থিত থাকার সুযোগ রয়েছে, ধর্মপালনের অধিকারের ক্ষেত্রে বৈষম্য আছে আমাদের সংবিধানে। গত কয়েক বছরে নাগরিক সমাজ, পেশাজীবী, গণমাধ্যম এমনকি বড় দুই দলের অনেক নেতা এসব বিষয়ে সংবিধান সংশোধনীর প্রয়োজনের কথা বলেছেন। এখন তা ভুলে যাওয়া ঠিক হবে না।

সংবিধান সংশোধনের পাশাপাশি আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার প্রয়োজন রয়েছে। আমরা চার দশক বছর ধরে এটি করতে ব্যর্থ হয়েছি সংবিধানের সুস্পষ্ট নির্দেশনা সত্ত্বেও। যেমন– সংবিধানের ৭৬ অনুচ্ছেদে রয়েছে সংসদীয় কমিটি তার কাছে কোনো ব্যক্তিকে হাজির হতে (বা দলিল উপস্থাপনের জন্য) নির্দেশ দেবেন, এই ক্ষমতা সংসদ আইন দ্বারা কমিটিগুলোকে প্রদান করবে। বর্তমানে সংসদীয় কমিটিগুলো বিভিন্ন ব্যক্তিকে হাজির হওয়ার জন্য নির্দেশ দিচ্ছেন এ ধরনের কোনো আইন ছাড়াই। এই আইনটি করতে অসুবিধা কী? সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদে আছে, প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনারকে রাষ্ট্রপতি 'উক্ত বিষয়ে প্রণীত কোনো আইনের বিধানাবলী-সাপেক্ষে' নিয়োগদান করবেন। সুশাসনের স্বার্থে সংবিধানে এ রকম আরও কয়েকটি জায়গায় আইন প্রণয়নের নির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু সংসদ এসব আইন প্রণয়ন করেনি। সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদ পুনঃস্থাপিত হলে তার অধীনে বিচারপতিদের অপসারণের পদ্ধতিসংক্রান্ত একটি আইনও করতে হবে। এসব আইন প্রণীত না হওয়ায় শুধু বাহাত্তরের সংবিধানের চেতনা ও প্রত্যাশা খর্বিত হচ্ছে না, গণতন্ত্রের ভিতও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

১৯৭২ সালের সংবিধানের একটি মূল প্রত্যাশা ছিল সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় প্রশাসন ও বিচারব্যবস্থাকে নিয়ে যাওয়া। এর ১০০ অনুচ্ছেদে প্রধান বিচারপতিকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে হাইকোর্টের অস্থায়ী অধিবেশন বসানোর নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এটি করা হলে সারা দেশের মানুষকে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ঢাকায় ছুটে আসার দুর্ভোগে পড়তে হতো না। গত প্রায় ৪০ বছরে আমাদের প্রধান বিচারপতিরা এই জনস্বার্থমূলক কাজটি করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন কমিটির কাছে আরেকটি অনুরোধ সংবিধান সংশোধনী বিষয়ে তাড়াহুড়ো না করার জন্য। তথ্যপ্রযুক্তি, তথ্য অধিকার, ডিজিটাল বাংলাদেশ– এসব কথা এই সরকারের কাছে আমরা সবচেয়ে বেশি শুনি। এ লক্ষ্যে সরকার কিছু গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগও নিয়েছে। সংবিধান সংশোধন কমিটি কি পারে না একটি ওয়েব পাতা খুলে এবং একই সঙ্গে নির্দিষ্ট নম্বরে ফোন ও এসএমএস করে সব নাগরিককে মতামত পেশের সুযোগ দিতে? আমি বিশ্বাস করি, কমিটি চাইলেই তা করতে পারে। চাইলে আরও বহু ভালো নজির স্থাপন করা যায়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-০১ সংবিধানের সংজ্ঞা দিন। *[৩৩তম বিসিএস]*

উত্তর : যে আইন নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে নির্দেশ এবং বিধি জারি করে, সেই আইনকে সংবিধান বলা হয়।

১. **রাষ্ট্রের চরিত্র :** রাষ্ট্র কোন প্রকৃতির, তা এই আইন দ্বারা নির্ণীত হয়। রাষ্ট্র বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। যেমন– রাজতান্ত্রিক, প্রজাতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক, একতান্ত্রিক প্রভৃতি। মিশ্র পদ্ধতির রাষ্ট্রও হয়ে থাকে। এই আইন বা সংবিধানের প্রধান কর্তব্য রাষ্ট্রের চরিত্র নিরূপণ ও বর্ণনা করা।

২. **রাষ্ট্র পরিচালনার শক্তিকেন্দ্রসমূহের ক্ষমতার পরিমাণ ও এলাকা নির্ধারণ :** আইন বিভাগ, নির্বাহী বিভাগ, বিচার বিভাগ প্রভৃতি রাষ্ট্র পরিচালনার কার্যে সতত নিয়োজিত। তারাই রাষ্ট্রের শক্তি বা কর্মকেন্দ্র। এই আইনে বা সংবিধানে তাদের ক্ষমতা, অধিকার ও দায়িত্বের বর্ণনা থাকে।

৩. রাষ্ট্রের শক্তিকেন্দ্রসমূহের গঠন, আকৃতি, প্রকৃতি এবং তাদের পক্ষে অবশ্য পালনীয় নীতি ও বিধি এই সংবিধানে নির্দিষ্ট হয়।

৪. ব্যক্তির প্রতি রাষ্ট্রের কর্তব্য ও রাষ্ট্রের প্রতি ব্যক্তির কর্তব্য এবং এ দুয়ের মধ্যে অধিকার ও দায়িত্বের সীমানা নির্ধারণও সংবিধানের কাজ।

স্মরণ রাখতে হবে যে, সংবিধান দেশের সর্বোচ্চ আইন। সর্বোচ্চ আইন বলতে মৌলিক আইন বোঝা যায়। সংবিধানের আইন অন্য কোনো আইনের অধীন নয়। কিন্তু অন্যসব আইন সংবিধানের আইনের অধীন।

প্রশ্ন-০২ বঙ্গবন্ধু (শেখ মুজিবুর রহমান)-এর প্রতিকৃতি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে? *[৩৩তম বিসিএস]*

উত্তর : সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধীর মাধ্যমে ৪(ক) অনুচ্ছেদে জাতির পিতার প্রতিকৃতি সংরক্ষণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ঐ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের প্রতিকৃতি রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পীকার ও প্রধান বিচারপতির কার্যালয় এবং সকল সরকারি ও আধা-সরকারি অফিস, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের প্রধান ও শাখা কার্যালয়, সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাস ও মিশনসমূহে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করতে হবে।

প্রশ্ন-০৩ বাংলাদেশ সংবিধান কখন প্রণীত হয়?

উত্তর : বাংলাদেশের সংবিধান রচনার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ১৯৭২ সালের ২৩ মার্চ রাষ্ট্রপতি 'বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশ' নামে একটি আদেশ জারি করেন। এ আদেশ অনুসারে ১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল ৪৩০ জন সদস্যবিশিষ্ট গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে। এদের মধ্যে ৩৪ জন সদস্য নিয়ে খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠিত হয়। কমিটি সংবিধানের খসড়া প্রণয়ন করে ১৯৭২ সালের ১২ অক্টোবর তা গণপরিষদে পেশ করে। ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর বাংলাদেশ সংবিধান গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয়। আর সংবিধান কার্যকরী হয় ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে।

প্রশ্ন-০৪ বাংলাদেশ সংবিধানের মূল চার নীতি কি কি? *[৩৩তম বিসিএস]*

উত্তর : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের ৮ম অনুচ্ছেদ থেকে ২৫তম অনুচ্ছেদ পর্যন্ত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা রয়েছে। জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা— এ চারটি বিষয়কে রাষ্ট্রের মৌলস্তম্ভ বা মৌলিক আদর্শ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। এতে আরো বলা হয় যে, অন্যান্য মৌলিক নীতিগুলো উপরোক্ত ৪টি আদর্শ থেকে উৎসারিত হবে। নিচে চারটি মৌলিক আদর্শ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো :

১. **জাতীয়তাবাদ :** ভাষাগত এবং সংস্কৃতিগত একক সত্তাবিশিষ্ট যে বাঙালি জনগোষ্ঠী ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করেছে, সেই জনগোষ্ঠীর ঐক্যবদ্ধতা বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি। (অনুচ্ছেদ ৯)

২. **সমাজতন্ত্র :** মানুষের ওপর মানুষের শোষণ থেকে মুক্ত ন্যায়ানুগ সমাজ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হলো রাষ্ট্রের লক্ষ্য। (অনুচ্ছেদ ১০)

৩. **গণতন্ত্র :** বাংলাদেশ হবে একটি প্রজাতন্ত্র। এর রাজনৈতিক ব্যবস্থা হবে গণতান্ত্রিক। প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে। (অনুচ্ছেদ ১১)

৪. **ধর্মনিরপেক্ষতা :** ধর্মনিরপেক্ষতা অর্থ হলো সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতার অবসান, রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা না দেয়া, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মকে ব্যবহার না করা এবং ধর্মের ভিত্তিতে কোনো ব্যক্তির প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ বা নিপীড়নের অবসান। (অনুচ্ছেদ ১২)

প্রশ্ন-০৫ চতুর্দশ সংশোধনীতে সংবিধানের কোন কোন বিষয় সংশোধন করা হয়?

উত্তর : সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী বিল ১৬ মে ২০০৪ জাতীয় সংসদে পাস হয় এবং ১৭ মে ২০০৪ রাষ্ট্রপতি এতে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। চতুর্দশ সংশোধনীর উল্লেখযোগ্য সংশোধনীসমূহ হলো :

- সংরক্ষিত নারী আসন ৩০ থেকে বাড়িয়ে ৪৫ করা হয়।
- স্পিকার অথবা ডেপুটি স্পিকার সংসদ সদস্যদের শপথ পাঠ করাতে অসমর্থ হলে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের শপথ পাঠ করানোর বিধান পাস করা হয়।
- সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের অবসর বয়সসীমা ৬৫ বছর থেকে বৃদ্ধি করে ৬৭ বছর করা হয়।
- সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও আধা সরকারি অফিস এবং বিদেশে বাংলাদেশ মিশনে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ছবি প্রদর্শন করতে হবে।
- সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের অবসর বয়সসীমা ৬২ বছর থেকে বাড়িয়ে ৬৫ বছর করা হয়।
- মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের অবসর বয়সসীমা ৬০ বছর থেকে বৃদ্ধি করে ৬৫ বছর করা হয়
- অর্থবিলের সংজ্ঞা সহজীকরণ করা হয়।

প্রশ্ন-০৬ পঞ্চদশ সংশোধনীতে সংবিধানের কোন কোন বিষয় সংশোধন করা হয়?

উত্তর : সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধনী) আইন, ২০১১ জাতীয় সংসদে পাস হয় ৩০ জুন ২০১১ এবং এতে রাষ্ট্রপতি সম্মতি জ্ঞাপন করে ৩ জুলাই ২০১১। পঞ্চদশ সংশোধনীর উল্লেখযোগ্য সংশোধনীসমূহ হলো :

১. প্রস্তাবনা সংশোধন।
২. রাষ্ট্রধর্ম ও অন্যান্য ধর্ম এবং ধর্মের অপব্যবহার রোধ।
৩. জাতির পিতার স্বীকৃতি ও প্রতিকৃতি।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৪. জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব।
৫. অবৈধ ক্ষমতা দখলকারীদের বিরুদ্ধাচরণ।
৬. সংবিধানের মৌলিক কাঠামো সংক্রান্ত বিধানাবলী।
৭. '৭২-এর সংবিধানের মূলনীতি বহাল।
৮. পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।
৯. জাতীয় জীবনে মহিলাদের অংশগ্রহণ।
১০. উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি।
১১. তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলুপ্ত।
১২. সংরক্ষিত নারী আসন বৃদ্ধি।
১৩. দালাল আইনের পুনরুজ্জীবন।
১৪. নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা বৃদ্ধি।
১৫. পররাষ্ট্রনীতিতে পরিবর্তন।
১৬. অন্তর্বর্তী সরকার ও দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন ।
১৭. ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ সংযোজন।
১৮. স্বাধীনতার ঘোষণা সংযোজন।
১৯. স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র সংযোজন।
২০. সংবিধান সংশোধনে গণভোট বাতিল।
২১. সপ্তম, একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ এ চার সংশোধনী বাতিল।
২২. বাকশাল গঠন সংক্রান্ত বিধান বিলুপ্ত।

প্রশ্ন-০৭ বাংলাদেশ সংবিধানে কয়টি অনুচ্ছেদ আছে?

উত্তর : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয় এবং একই বছরের ১৬ ডিসেম্বর থেকে তা কার্যকরী হয়। বাংলাদেশের সংবিধান একটি লিখিত দলিল। এতে ১টি প্রস্তাবনা, ৭টি তফসিল, ১১টি ভাগ এবং ১৫৩টি অনুচ্ছেদ রয়েছে।

প্রশ্ন-০৮ বাংলাদেশ সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি কিরূপ?

উত্তর : বাংলাদেশের সংবিধান একটি লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান। এটি সংশোধনের জন্য নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। প্রথমে সংবিধানের কোন বিধান সংশোধন করা প্রয়োজন তা নির্দিষ্ট শিরোনাম উল্লেখ করে সংসদে উপস্থাপন করতে হয়। সংসদে আলোচনার পর বিলটি দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত হলে তা রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য পাঠানো হবে। রাষ্ট্রপতি সাত দিনের মধ্যে বিলটিতে সম্মতি প্রদান করবেন। তিনি তা করতে অসমর্থ হলে সাত দিন পর তিনি বিলটিতে সম্মতি দিয়েছেন বলে গণ্য হবে। তবে সংবিধানের মৌলিক বিধানাবলী সংশোধন অযোগ্য।

প্রশ্ন-০৯ সাংবিধানিকভাবে গঠিত প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার নাম লিখুন।

উত্তর : বাংলাদেশে সর্বপ্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয় ১৯৯০ সালের গণঅভ্যুত্থানে এরশাদের পতনের পর। আর তত্ত্বাবধায়ক সরকার সাংবিধানিক স্বীকৃতি পায় ১৯৯৬ সালের ২৭ মার্চ সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে। সাধারণত একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান কাজ। বাংলাদেশে সাংবিধানিকভাবে গঠিত প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার নাম হচ্ছে বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান।

প্রশ্ন-১০ সংবিধানের প্রথম ও চতুর্থ সংশোধনী সম্পর্কে কি জানেন?

উত্তর : সংবিধানের প্রথম সংশোধনী : সংবিধানের প্রথম সংশোধনী গৃহীত হয় ১৫ জুলাই ১৯৭৩ সালে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে গণহত্যা ও যুদ্ধাপরাধে লিপ্ত বন্দি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের সহযোগীদের বিচারের জন্য প্রথম সংশোধনী আনা হয়। এ সংশোধনীর ফলে অভিযুক্তদের বিচারের পথ সুগম হয়। এ সংশোধনীবলে সংবিধানের ৪৭ নং অনুচ্ছেদকে পরিবর্তন করে ৪৭ (ক) নামে একটি নতুন অনুচ্ছেদ যোগ করা হয়। এতে আরো উল্লেখ করা হয় যে, সংশোধনীর বিরুদ্ধে প্রতিকার লাভের আশায় কেউ সুপ্রিম কোর্টের আশ্রয় নিতে পারবে না।

চতুর্থ সংশোধনী : চতুর্থ সংশোধনী গৃহীত হয় ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি। এ সংশোধনীতে সংসদীয় পদ্ধতির পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির বিধান করা হয়। রাষ্ট্রপতি হবেন নির্বাচিত এবং তার মেয়াদ হবে ৫ বছর। রাষ্ট্রপতি একজন উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবর্গ নিয়োগ করবেন। এ সংশোধনীর ফলে সব দলের সমন্বয়ে বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক-আওয়ামী লীগ (বাকশাল) নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দলের বিধান করা হয়। মৌলিক অধিকার ও বিচার বিভাগের ওপর যুক্তিসঙ্গত হস্তক্ষেপ করার বিধানও এ সংশোধনীতে স্থান পায়। তাছাড়া এতে ১৯টি জেলাকে ৬১টি জেলায় রূপান্তরিত করে জেলা গভর্নরের বিধান করা হয়।

প্রশ্ন-১১ সংবিধানে উল্লিখিত নারী অধিকারগুলো লিখুন।

উত্তর : বাংলাদেশের সংবিধানে নারীর অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করার বিধান সন্নিবেশিত হয়েছে। যেমন– সংবিধানের ১৯ অনুচ্ছেদের (৩) দফায় উল্লেখ রয়েছে : 'জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন।'

১. সংবিধানের ২৭ ধারায় উল্লেখ রয়েছে, 'সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান ও আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।'
২. ২৮(১) ধারায় রয়েছে, 'কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।'
৩. ২৮(২) ধারায় আছে, 'রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন।'
৪. ২৮(৩) ধারায় আছে, 'কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না।'
৫. ২৮(৪) ধারায় উল্লেখ আছে, 'নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হইতে এ অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।'
৬. ২৯(১) ধারায় রয়েছে, 'প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে।'
৭. ২৯(২) এ আছে, 'কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের অযোগ্য হইবেন না কিংবা সেইক্ষেত্রে তাহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না।'
৮. ৬৫(৩) ধারায় নারীর জন্য সংসদে আসন সংরক্ষিত রাখা হয়েছে এবং এ ধারার অধীনে স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হয়েছে।

প্রশ্ন-১২ বাংলাদেশ সংবিধানে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও এখতিয়ার আলোচনা করুন।

উত্তর : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সাংবিধানিক প্রধান হলেন রাষ্ট্রপতি। সংবিধানের ৪৮-৫৪ অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রপ্রতি সম্পর্কিত বিধানাবলী বিধৃত হয়েছে। রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত এবং তিনি সংবিধান ও আইন বলে তার উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করেন। অধিকন্তু রাষ্ট্রের যাবতীয় কার্যাদি রাষ্ট্রপতির নামে সম্পাদিত হয়। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও এখতিয়ার নিম্নরূপ :

১. রাষ্ট্রপ্রধান রূপে রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের অন্য সকল ব্যক্তির উর্ধ্বে স্থান লাভ করিবেন এবং এই সংবিধান ও অন্য কোন আইনের দ্বারা তাঁহাকে প্রদত্ত ও তাঁহার উপর অর্পিত সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কর্তব্য পালন করিবেন [বাংলাদেশ সংবিধান, ৪৮ (২) অনুচ্ছেদ]।
২. কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন দণ্ডের মার্জনা, বিলম্বন ও বিরাম মঞ্জুর করিবার এবং যে কোন দণ্ড মওকুফ, স্থগিত বা হ্রাস করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকিবে (বাংলাদেশ সংবিধান, ৪৯ অনুচ্ছেদ)।
৩. প্রধানমন্ত্রীর লিখিত পরামর্শ অনুসারে রাষ্ট্রপতি সংসদ অধিবেশন আহ্বান, স্থগিতকরণ ও ভেঙে দিতে পারেন।
৪. রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে আদালতে কোনো ফৌজদারি কার্যধারা দায়ের করা যাবে না।
৫. রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে আদালত হতে পরোয়ানা জারি করা যাবে না।
৬. রাষ্ট্রপতি তার দায়িত্ব পালন বা তার কোনো কার্যের জন্য কোনো আদালতে জবাবদিহি করতে বাধ্য নন।
৭. রাষ্ট্রপতি সরকারের কার্যক্রম বণ্টন ও কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য বিধি প্রণয়ন করেন।
৮. রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা সার্ভিস বা সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক।
৯. সংসদ অধিবেশন চালু না থাকলে রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ জারি করতে পারেন এবং এসব অধ্যাদেশ সংসদে গৃহীত আইনের মতোই কার্যকর হয়।
১০. অর্থবিল বা সরকারি ব্যয়ের সাথে জড়িত যে কোনো বিল রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতীত সংসদে পেশ করা যাবে না।
১১. প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও রাষ্ট্রপতি অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রীদের নিয়োগ করেন।
১২. প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি এটর্নি জেনারেল, প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার, মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যদের নিয়োগ করেন।
১৩. প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ব্যতীত রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ করতে পারেন।
১৪. প্রধানমন্ত্রী, প্রধান বিচারপতি, অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী, স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারকে সংবিধানের তৃতীয় তফসিল অনুসারে রাষ্ট্রপতি শপথ বাক্য পাঠ করান।
১৫. রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রদূত ও অন্যান্য কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের প্রেরণ ও গ্রহণ করেন।

প্রশ্ন-১৩ **"প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ।"–সংবিধানের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ অনুসরণে ব্যাখ্যা করুন।** *[২৮তম বিসিএস]*

উত্তর : সংবিধান হলো বিশ্বের সকল স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশেষভাবে অপরিহার্য একটি দলিল। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সংবিধানে রাষ্ট্রের সকল নিয়ম-নীতি সংক্ষেপে উল্লেখ থাকে। ঠিক তেমনি ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর কার্যকরকৃত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানে বাংলাদেশকে একটি একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করে সংবিধানের প্রথম ভাগের ৭(১) অনুচ্ছেদে 'সংবিধানের প্রাধান্য' শিরোনামে বলা হয়েছে "প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

মালিক জনগণ; এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে।" প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাষ্ট্রের সরকারপ্রধান বা রাষ্ট্রপ্রধান জনগণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভোটে নির্বাচিত হন। আইন পরিষদের সদস্যরা জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। তারা তাদের সকল কাজের জন্য জনগণের নিকট দায়ী থাকেন। তাদের সকল কাজের জন্য জনগণের নিকট জবাবদিহি করতে হয়। আর এ জবাবদিহিতা হয় ভোটের মাধ্যমে। জনগণ যাকে ভোট দিয়ে তার প্রতিনিধি বানায়, সে প্রতিনিধি যদি জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা বা চাহিদা পূরণ করতে না পারে বা ব্যর্থ হয় তাহলে পরবর্তী নির্বাচনে জনগণ তাকে আর ভোট দিবে না। আর এভাবেই জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। জনগণ হয়ে ওঠে রাষ্ট্রের চরম বা চূড়ান্ত ক্ষমতার মালিক। তাছাড়া সত্যিকার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় জনগণকে সরকারি অধিকাংশ কাজের ব্যাপারে অবহিত করা হয়, জনগণের মতামত গ্রহণ করা হয় রাষ্ট্রীয় কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে, প্রয়োজনে গণভোটের আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশের সংবিধানে এরূপ গণভোট গ্রহণের ব্যবস্থা রয়েছে। সরকার তার কাজের জন্য জবাবদিহি করে থাকে, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা আছে। সরকার চরম স্বৈরাচার বা একনায়ক হলে সরকারকে জনগণ আন্দোলনের মাধ্যমে পতন ঘটায় অথবা একটি নির্দিষ্ট সময় (৫ বছর) অতিক্রান্ত হবার পর সরকার পদত্যাগ করে।

প্রশ্ন-১৪ **কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তি বলতে কি বোঝায়? সংবিধানের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ অনুসরণে লিখুন।** *[২৮তম বিসিএস]*

উত্তর : সংবিধান হলো একটি রাষ্ট্রের দর্পণস্বরূপ। সংবিধানে থাকে রাষ্ট্র পরিচালনার নিয়ম-কানুন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে ১৪ অনুচ্ছেদে 'কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তি' শিরোনামে বলা হয়েছে, "রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতী মানুষকে ও কৃষক শ্রমিকের— এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা।" কৃষিপ্রধান বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল ৮০ ভাগ লোক। কৃষি খাত বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাত। ২০০৭-০৮ অর্থবছরের জিডিপিতে এ খাতের অবদান ছিল ২০.৮৩ শতাংশ। দেশের মোট শ্রমশক্তির মোট ৪৮.১ শতাংশ কৃষি খাতের নিয়োজিত। (শ্রমশক্তি জরিপ, ২০০৫-০৬, বিবিএস)। গত অর্থবছরে (২০০৭-০৮) বিস্তৃত কৃষিজাত পণ্য রপ্তানি আয় ছিল মোট রপ্তানি আয়ের ৬.৯৯ শতাংশ। কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বহুলাংশে কৃষিখাতে উন্নয়নের ওপর নির্ভরশীল। কৃষির অগ্রগতির সাথে বাংলাদেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ইত্যাদি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত বিধায় কৃষিখাতের উন্নয়নে কৃষকের দারিদ্র্য ও অসহায়ত্ব থেকে মুক্তির জন্য সরকারের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। কৃষিখাতের সর্বাধিক উন্নতি সাধনের জন্য জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি, জাতীয় বীজ নীতি এবং সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা নীতি কার্যকর রয়েছে। এছাড়া জাতীয় কৃষি নীতি '৯৯ সংশোধন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষির আধুনিকায়ন, প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং কৃষি গবেষণার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। উপরন্তু, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি উপকরণে ভর্তুকি বৃদ্ধি, কৃষি উপকরণ সহজলভ্য করা, সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ ও সুলভ করা, ফসল সংরক্ষণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেয়া, ফসল ও সকল কৃষিজাত পণ্যের ন্যায্য মূল্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করা হচ্ছে। কৃষকদের মুক্তি তথা দরিদ্র বা অসহায় অবস্থা থেকে পরিত্রাণের উপায় হিসেবে কৃষিঋণের আওতা বৃদ্ধি ও প্রাপ্তি সহজীকরণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে কৃষিঋণ খাতে পুনঃঅর্থায়নের জন্য এ বছরে সর্বমোট ১১৮৩ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। তাছাড়া কৃষি প্রবাহ সচল ও

শক্তিশালী করার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক কাঠামো শক্তিশালী করার জন্য ১৫০০ কোটি টাকা পুনঃ মূলধনীকরণ-এর জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। কৃষি উন্নয়নে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলেও কৃষকদের রয়েছে বহুবিধ সমস্যা। যেমন— সেচ সমস্যা, ঋণ সমস্যা, জলাবদ্ধতা সমস্যা, কৃষিপণ্যের মূল্য নির্ধারণ সমস্যা, উন্নত বীজ সরবরাহ সমস্যা, মূলধনী সমস্যা প্রভৃতি বিদ্যমান। কাজেই কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তি বলতে যে ব্যবস্থাকে বলা হয়েছে প্রকৃত অর্থে এখনো বাংলাদেশে তা সম্ভব হয়নি।

প্রশ্ন-১৫ গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লব বলতে কি বোঝায়? সংবিধানের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদে বর্ণিত মতে ব্যাখ্যা করুন। *[২৮তম বিসিএস]*

উত্তর : ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় অর্জন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংবিধান উপহার দেয়া। ১৯৭২ সালে প্রবর্তিত সংবিধানের ১৫৩ অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ ৮ থেকে ২৫ অনুচ্ছেদে সংযোজন করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৬ অনুচ্ছেদে 'গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লব' শিরোনামে বলা হয়েছে, "নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করিবার উদ্দেশ্যে কৃষি বিপ্লবের বিকাশ, গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিকরণের ব্যবস্থা, কুটির শিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের আমূল রূপান্তর সাধনের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।" শিরোনামে বলা 'গ্রামীণ উন্নয়ন' বলতে গ্রামীণ অবকাঠামোগত উন্নয়ন তথা রাস্তা-ঘাট, সেতু, হাসপাতাল, দালানকোঠা, ঘরবাড়ি, পানি ও শক্তি সম্পদ, প্রশাসনিক ব্যবস্থা, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশ ত্বরান্বিত করাকে বোঝায়। অপরদিকে, 'কৃষি বিপ্লব' বলতে কৃষিক্ষেত্রে উন্নত বীজ ও সার সরবরাহ, ভূমি চাষে উন্নত ও আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার, নদী ভাঙন রোধ, জমির উর্বরতা বৃদ্ধি উন্নয়ন, কৃষির যথাযথ মূল্য নির্ধারণ, সঠিক কৃষিনীতি ঘোষণা ও ভূমির সঠিক মালিকানা নির্ধারণ প্রভৃতি ব্যবস্থাকে বোঝায়।

প্রশ্ন-১৬ "কোর্ট অব রেকর্ড" বলতে কি বোঝায়? এ প্রেক্ষিতে সংবিধানের ১১২ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত মতে আলোচনা করুন। *[২৮তম বিসিএস]*

উত্তর : বাংলায় 'কোর্ট অব রেকর্ড'-এর অর্থ হলো লেখ্য আদালত। বাংলাদেশ সংবিধানের ১০৮ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, "সুপ্রীম কোর্ট একটি 'কোর্ট অব্ রেকর্ড' হইবেন এবং ইহার অবমাননার জন্য তদন্তের আদেশদান বা দণ্ডাদেশদানের ক্ষমতাসহ আইন-সাপেক্ষে অনুরূপ আদালতের সকল ক্ষমতার অধিকারী থাকিবেন।" সাধারণ বিচার ব্যবস্থায় 'কোর্ট অব রেকর্ড' বলতে বোঝায় জুডিসিয়াল ট্রাইব্যুনাল আরোপ করা, স্বাধীনভাবে ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যক্রম পরিচালনা করা, সাধারণ আইন অনুযায়ী কাজ চালিয়ে যাওয়া এবং তার চিরস্থায়ী প্রমাণস্বরূপ নথিভুক্ত বা তালিকাভুক্ত করা। সব বিচার ব্যবস্থাতেই বিচারকার্যক্রম রেকর্ড করা হয়। আর এ কাজটি করে থাকেন কেরানি (Clerk)। যার প্রাথমিক কর্তব্যই হচ্ছে চিরস্থায়ী নথিভুক্ত করে সীলমোহর করা এবং রেকর্ড কপি সংগ্রহে রাখা।

নিম্নতর আদালত যেমন— বিচারিক আদালতে (Justice court) রেকর্ড রাখা হয় না। ডাটা সংগ্রহ করে রাখা আধুনিক যুগে খুবই সহজ। কম্পিউটারে সহজেই ডাটা সংগ্রহ করে রাখা যায়। যদিও কোনো কোনো কোর্টে রেকর্ড রাখার নিয়ম নেই তা সত্ত্বেও সুবিধার জন্য স্থায়ী রেকর্ড রাখা হয়। যাই হোক, বিচার পার্থক্যের দিক দিয়ে দুই ধরনের কোর্টকে চিহ্নিত করা হয়। নিম্নতর আদালত কোনো মামলা রেকর্ড করে আপিল বিভাগের প্রয়োজনে পুনঃবিবেচনার জন্য। এটা অডিও বা ভিডিও যে কোনো প্রকৃতির হতে পারে। বিচারকরা সাধারণত তথ্য, প্রমাণ, যুক্তি, আইন প্রভৃতির ভিত্তিতে বিচারকার্য সমাধা করে থাকেন।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

প্রশ্ন-১৭ সুপ্রীমকোর্ট এবং হাইকোর্ট বিভাগের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কি? থাকলে বর্ণনা করুন (সংবিধান অনুসরণে)। প্রধান বিচারপতির নিয়োগ দেন কে? *[২৮তম বিসিএস]*

উত্তর : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ষষ্ঠভাগের 'বিচার বিভাগ' অধ্যায়ের ১ম পরিচ্ছেদের (সুপ্রীমকোর্ট) ৯৪ (১) নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট' নামে বাংলাদেশের একটি সর্বোচ্চ আদালত থাকিবে এবং আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ লইয়া তাহা গঠিত হইবে।"

সুপ্রীমকোর্ট ও হাইকোর্টের মধ্যে পার্থক্য :

সুপ্রীমকোর্ট বিভাগ : সুপ্রীমকোর্ট বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত এবং আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ নিয়ে এটি গঠিত। প্রধান বিচারপতি এবং প্রত্যেক বিভাগে আসন গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রপতি যত সংখ্যক বিচারক নিয়োগের প্রয়োজন বোধ করিবেন তত সংখ্যক অন্যান্য বিচারক নিয়ে সুপ্রীমকোর্ট গঠিত হবে। প্রধান বিচারপতি ও আপিল বিভাগে নিযুক্ত বিচারকগণ কেবল উক্ত বিভাগের এবং অন্যান্য বিচারক কেবল হাইকোর্ট বিভাগে আসন গ্রহণ করবেন। রাজধানীতে সুপ্রীমকোর্টের স্থায়ী আসন থাকবে, তবে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন নিয়ে প্রধান বিচারপতি সময়ে সময়ে অন্য যে স্থান বা স্থানসমূহ নির্ধারণ করবেন, সে স্থান বা স্থানসমূহে হাইকোর্ট বিভাগের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হতে পারে। যদি কোনো সময় রাষ্ট্রপতির মনে কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যা এমন যে সুপ্রীমকোর্টের মতামত গ্রহণ করা প্রয়োজন, তাহলে তিনি প্রশ্নটি আপিল বিভাগের বিবেচনার জন্য প্রেরণ করতে পারবেন এবং উক্ত বিভাগ স্বীয় বিবেচনায় উপযুক্ত শুনানির পর প্রশ্নটি সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে স্বীয় মতামত জ্ঞাপন করতে পারবেন। সংসদ কর্তৃক প্রণীত যে কোনো আইন সাপেক্ষে সুপ্রীমকোর্ট রাষ্ট্রপতির অনুমোদন নিয়ে প্রত্যেক বিভাগের এবং অধস্তন যে কোনো আদালতের রীতি ও পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণের জন্য বিধিসমূহ প্রণয়ন করতে পারবেন। প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানার অন্তর্ভুক্ত সকল নির্বাহী ও বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ সুপ্রীমকোর্টের সহায়তা করবেন।

হাইকোর্ট বিভাগ : রাষ্ট্রপতির অনুমোদন নিয়ে প্রধান বিচারপতি সময়ে সময়ে অন্য যে স্থান বা স্থানসমূহ নির্ধারণ করবেন, সেই স্থান বা স্থানসমূহে হাইকোর্ট বিভাগের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হতে পারবে। সংবিধানের বা অন্য কোনো আইনের দ্বারা হাইকোর্ট বিভাগের ওপর যেরূপ আদি, আপিল ও অন্য প্রকার এখতিয়ার, ক্ষমতা ও দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে বা হতে পারে উক্ত বিভাগের সেরূপ এখতিয়ার, ক্ষমতা ও দায়িত্ব থাকবে। হাইকোর্ট বিভাগের রিট অব প্রোহিবিশন, সারলিওরারি (cerliorari), হেবিয়াস কর্পাস জাতীয় ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। হাইকোর্ট বিভাগের অধস্তন সকল আদালতের ওপর উক্ত বিভাগের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকবে। হাইকোর্ট বিভাগের নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত বিভাগের কোনো অধস্তন আদালতের বিচারাধীন কোনো মামলায় এ সংবিধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত আইনের এমন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বা এমন জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয় জড়িত রয়েছে, সংশ্লিষ্ট মামলার মীমাংসার জন্য যার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা আবশ্যক, তাহলে হাইকোর্ট বিভাগ উক্ত আদালত হতে মামলাটি প্রত্যাহার করে নিবেন এবং স্বয়ং মামলাটি মীমাংসা করবেন অথবা উক্ত আইনের প্রশ্নটি নিষ্পত্তি করবেন এবং উক্ত প্রশ্ন সম্পর্কে হাইকোর্ট বিভাগের রায়ের নকলসহ যে আদালত হতে মামলাটি প্রত্যাহার করা হয়েছিল, সে আদালতে মামলাটি ফেরত পাঠাবেন এবং তাহা প্রাপ্ত হওয়ার পর সে আদালত উক্ত রায়ের সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে মামলাটি মীমাংসা করবার উদ্যোগী হবেন।

প্রধান বিচারপতির নিয়োগ : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৬ষ্ঠ ভাগে ৯৫(১) অনুচ্ছেদে 'বিচারক নিয়োগ' শিরোনামে বলা হয়েছে, প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারকগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন।

প্রশ্ন-১৮ বাংলাদেশের অস্থায়ী সংবিধান আদেশ আলোচনা করুন।

উত্তর : বাংলাদেশের সাংবিধানিক বিবর্তনে এই ঘোষণা বা আদেশ দ্বিতীয় পদক্ষেপ। ১৯৭২-এর ১১ জানুয়ারি এই আদেশ জারি করা হয়। এই আদেশের সারমর্ম হচ্ছে : বাংলাদেশের সরকার মোটামুটি ব্রিটিশ পদ্ধতির পার্লামেন্টারি বা সংসদীয় ধরনের হবে। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি কেবিনেট গঠিত হবে, প্রধানমন্ত্রী ও কেবিনেটের সদস্যগণ গণপরিষদের সদস্যদের মধ্য থেকে নিযুক্ত হবেন ও কেবিনেটকে গণপরিষদের কাছে দায়ী ও আস্থাশীল থাকতে হবে; কেবিনেট একজন বাংলাদেশী নাগরিককে প্রেসিডেন্ট মনোনীত ও নিযুক্ত করবেন; প্রেসিডেন্টের কাজ হবে গণপরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করা, অতঃপর প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে কাজ করা। এই ব্যবস্থা চালু থাকে ১৯৭২-এর নতুন সংবিধান কার্যকরী না হওয়া পর্যন্ত।

প্রশ্ন-১৯ বাংলাদেশের গণপরিষদ আদেশ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

উত্তর : ১৯৭২-এর ২৩ মার্চ তারিখে বাংলাদেশের একটি সংবিধান রচনার জন্য গণপরিষদ আদেশ জারি করা হয়। এই আদেশ বলে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ ও পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে যেসব সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন তাদের নিয়ে গণপরিষদ গঠিত হয়। এর সদস্য ছিলেন ৪৩০ জন। গণপরিষদকে বাংলাদেশের জন্য পূর্ণাঙ্গ সংবিধান রচনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। এই আদেশ অনুসারে প্রেসিডেন্টকে ক্ষমতা দেয়া হয় যে, প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে তিনি গণপরিষদ আহ্বান করতে, স্থগিত রাখতে, এমনকি ভেঙে দিতে পারেন। এই ব্যবস্থা সংসদীয় পদ্ধতির অনুকূল, কিন্তু আইনসভা হিসেবে কাজ করার ও আইন পাস করার ক্ষমতা এই আদেশে গণপরিষদকে দেয়া হয়নি। সেই কারণে, সংবিধান তৈরি না হওয়া পর্যন্ত সরকার সব আইন প্রণয়ন করে প্রেসিডেন্টের আদেশের মাধ্যমে। একই দিনে আরেকটি আদেশ জারি করা হয়। আদেশটির সারমর্ম এই : কোনো দলের টিকেট নিয়ে নির্বাচিত সদস্য যদি ঐ দল ত্যাগ করেন বা দল থেকে বহিষ্কৃত হন, তাহলে গণপরিষদে তার সদস্যপদ বাতিল হয়ে যাবে। আদেশটির মর্ম পরে নতুন সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

প্রশ্ন-২০ সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনীতে কোন কোন বিষয় সংশোধন করা হয়?

উত্তর : ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪ দশম জাতীয় সংসদের তৃতীয় অধিবেশনে সংবিধান (ষোড়শ সংশোধন) আইন, ২০১৪ পাস হয়। শুধু বিচারপতিদের অভিশংসন বা অপসারণের পদ্ধতি পরিবর্তন করতেই সংবিধানের এ সংশোধনী।

সংবিধান (ষোড়শ সংশোধন) আইন, ২০১৪

১। এই আইন সংবিধান (ষোড়শ সংশোধন) আইন, ২০১৪ নামে অভিহিত হয়।

২। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে নিম্নরূপ ৯৬ অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপিত হয়। যথা :

৯৬। বিচারকদের পদের মেয়াদ।– (১) এই অনুচ্ছেদের বিধানাবলী-সাপেক্ষে কোনো বিচারক ৬৭ (সাতষট্টি) বছর বয়স পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকবেন।

(২) প্রমাণিত অসদাচরণ বা অসামর্থ্যের কারণে সংসদের মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ গরিষ্ঠতার দ্বারা সমর্থিত সংসদের প্রস্তাবক্রমে প্রদত্ত রাষ্ট্রপতির আদেশ ব্যতীত কোনো বিচারককে অপসারণ করা যাবে না।

(৩) এই অনুচ্ছেদের (২) দফার অধীন প্রস্তাব সম্পর্কিত পদ্ধতি এবং কোনো বিচারকের অসদাচরণ বা অসামর্থ্য সম্পর্কে তদন্ত ও প্রমাণের পদ্ধতি সংসদ আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।

(৪) কোনো বিচারক রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে পদত্যাগ করতে পারবেন।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

সরকারের অঙ্গ-সংগঠন : আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ
Organs of the Goverment : Legistature, Executive & Judiciary

Syllabus

Organs of the Government :

a) *Legislature : Representation, Law-making, Financial and Oversight functions; Rules of Procedure, Gender Issues, Caucuses, Parliament Secretariat.*

b) *Executive : Chief and Real executive e.g., President and Prime Minister, Powers and Functions; Cabinet, Council of Ministers, Rules of Business, Bureaucracy, Secretariat, Law enforcing agencies; Administrative setup-National and Local Government structures, Decentralization Programmes and Local Level Planning.*

c) *Judiciary : Structure : Supreme, High and other Subordinate Courts, Organization, Powers and functions of the Supreme Court, Appointment, Tenure and Removal of Judges, Organization of Sub-ordinate Courts, Separation of Judiciary from the Executive, Judicial Review, Adjudication, Gram Adalat, Alternative Dispute Resolution (ADR).*

ক. আইন বিভাগ (Legislature)

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১. *বাংলাদেশে জাতীয় সংসদের সদস্য হবার যোগ্যতা এবং অযোগ্যতা সম্পর্কে বর্ণনা করুন। সংসদ সদস্যদের আসন কেন এবং কখন শূন্য ঘোষণা করা হয়? [৩১তম বিসিএস]*

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

০২. *সরকারের বিভাগসমূহ কি কি? আধুনিক রাষ্ট্রে আইনসভার ক্ষমতা ও কার্যাবলী আলোচনা করুন।*

০৩. *বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলী আলোচনা করুন।*

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

০৪. *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের সমস্যা ও সম্ভাবনা আলোচনা করুন।*

০৫. *সংবিধানের কোন সংশোধনীর দ্বারা নারীদের জন্য জাতীয় সংসদে আসন সংরক্ষণ করা হয়েছিল? এর মূল বক্তব্য কি ছিল? বর্তমান সংসদে নারীদের আসন সংখ্যা কত? এর মেয়াদ কবে শেষ হবে? এ আসন সংরক্ষণ অব্যাহত রাখা কি যুক্তিযুক্ত? আলোচনা করুন।*

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

০১. *বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির অভিশংসন পদ্ধতি কি রূপ?*

০২. *অর্থবিল কি?*

০৩. *সংসদের কার্যপদ্ধতির বিবরণ দিন।*

০৪. *আইন বিভাগ কিভাবে নির্বাহী বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে?*

০৫. *বাংলাদেশে মোট কতবার গণভোট অনুষ্ঠিত হয়?*

০৬. *মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকারের পার্থক্য লিখুন।*

০৭. *বাংলাদেশের আইনসভার নাম কি?*

০৮. *ককাস কি?*

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১ । বাংলাদেশে জাতীয় সংসদের সদস্য হবার যোগ্যতা এবং অযোগ্যতা সম্পর্কে বর্ণনা করুন। সংসদ সদস্যদের আসন কেন এবং কখন শূন্য ঘোষণা করা হয়? *[৩১তম বিসিএস]*

উত্তর : সংবিধান একটি রাষ্ট্রের মৌলিক দলিল, যাতে রাষ্ট্র পরিচালনার যাবতীয় বিষয়াদি লিপিবদ্ধ থাকে। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার মাত্র এক বছরের মাথায় অর্থাৎ ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সংবিধান প্রণীত হয়। এ সংবিধানকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সংবিধান বলা হয়। কেননা লিখিত এ সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি, মৌলিক অধিকার, আইন, বিচার ও শাসন বিভাগ ক্ষমতা ও কার্যপরিধি ইত্যাদি বিষয় সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ আছে।

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ : বাংলাদেশের আইনসভা 'জাতীয় সংসদ' নামে পরিচিত। এটি একটি এক কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা। দেশের জন্য আইন প্রণয়নের ক্ষমতা জাতীয় সংসদের ওপর ন্যস্ত। সংসদ যে কোনো নতুন আইন প্রণয়ন এবং প্রচলিত আইনের পরিবর্তন বা সংশোধন করতে পারে। জাতীয় সংসদ মোট ৩৫০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। এদের মধ্যে ৩০০ জন নাগরিকদের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হন। ৫০টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। সংরক্ষিত আসনে মহিলা সদস্যগণ সংসদের নির্বাচিত সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হন।

বাংলাদেশে জাতীয় সংসদের সদস্য হওয়ার যোগ্যতা এবং অযোগ্যতা : বাংলাদেশে জাতীয় সংসদের সদস্য হওয়ার যোগ্যতা এবং অযোগ্যতা সম্পর্কে সংবিধানের পঞ্চম ভাগে ৬৬ অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

৬৬। (১) কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক হইলে এবং তাঁহার বয়স পঁচিশ বছর পূর্ণ হইলে এই অনুচ্ছেদের (২) দফায় বর্ণিত বিধান-সাপেক্ষে তিনি সংসদের সদস্য নির্বাচিত হইবার এবং সংসদ-সদস্য থাকিবার যোগ্য হইবেন।

(২) কোন ব্যক্তি সংসদের সদস্য নির্বাচিত হইবার এবং সংসদ-সদস্য থাকিবার যোগ্য হইবেন না, যদি

(ক) কোন উপযুক্ত আদালত তাঁহাকে অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষণা করেন;

(খ) তিনি দেউলিয়া ঘোষিত হইবার পর দায় হইতে অব্যাহতি লাভ না করিয়া থাকেন;

(গ) তিনি কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করেন কিংবা কোন বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা বা স্বীকার করেন;

(ঘ) তিনি নৈতিক স্খলনজনিত কোন ফৌজদারী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া অন্যূন দুই বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং তাঁহার মুক্তিলাভের পর পাঁচ বৎসরকাল অতিবাহিত না হইয়া থাকে;

(ঙ) তিনি ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ যোগসাজশকারী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশের অধীন যে কোন অপরাধের জন্য দণ্ডিত হইয়া থাকেন;

(চ) আইনের দ্বারা পদাধিকারীকে অযোগ্য ঘোষণা করিতেছে না, এমন পদ ব্যতীত তিনি প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন; অথবা;

(ছ) তিনি কোন আইনের দ্বারা বা অধীন অনুরূপ নির্বাচনের জন্য অযোগ্য হন।

২(ক) এই অনুচ্ছেদের (২) দফার (গ) উপ-দফাতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তি জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক হইয়া কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করিলে এবং পরবর্তীতে উক্ত ব্যক্তি–

(ক) দ্বৈত নাগরিকত্ব গ্রহণের ক্ষেত্রে, বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ত্যাগ করিলে; কিংবা

(খ) অন্য ক্ষেত্রে, পুনরায় বাংলাদেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করিলে– এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে তিনি বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে না।

(৩) এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে কোন ব্যক্তি কেবল রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপ-মন্ত্রী হইবার কারণে প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত বলিয়া গণ্য হইবেন না।

(৪) কোন সংসদ-সদস্য তাঁহার নির্বাচনের পর এই অনুচ্ছেদের (২) দফায় বর্ণিত অযোগ্যতার অধীন হইয়াছেন কিনা কিংবা এই সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ অনুসারে কোন সংসদ-সদস্যের আসন শূন্য হইবে কিনা, সে সম্পর্কে কোন বিতর্ক দেখা দিলে শুনানী ও নিষ্পত্তির জন্য প্রশ্নটি নির্বাচন কমিশনের নিকট প্রেরিত হইবে এবং অনুরূপ ক্ষেত্রে কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

(৫) এই অনুচ্ছেদের (৪) দফার বিধানাবলী যাহাতে পূর্ণ কার্যকরতা লাভ করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশনকে ক্ষমতাদানের জন্য সংসদ যেরূপ প্রয়োজনবোধ করিবেন, আইনের দ্বারা সেইরূপ বিধান করিতে পারিবেন।

যে কারণে ও যখন সংসদ সদস্যদের আসন শূন্য হয় :

সংবিধানের ৬৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংসদ সদস্যের আসন শূন্য হবে যদি–

১. তার নির্বাচনের পর সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ হতে নব্বই দিনের মধ্যে তিনি তৃতীয় তফসিলে নির্ধারিত শপথ গ্রহণ (বা ঘোষণা) করতে ও শপথপত্রে (বা ঘোষণাপত্রে) স্বাক্ষর দান করতে অসমর্থ হন;
২. সংসদের অনুমতি না নিয়ে তিনি একাদিক্রমে নব্বই বৈঠক দিবস-অনুপস্থিত থাকেন;
৩. সংসদ ভেঙে যায়;
৪. তিনি নির্বাচিত হবার পর অযোগ্য ঘোষিত হন।

৭০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংসদ সদস্যের আসন শূন্য হবে যদি

৫. কোনো নির্বাচনে কোনো রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরূপে মনোনীত হয়ে কোনো ব্যক্তি সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হলে তিনি যদি উক্ত দল হতে পদত্যাগ করেন বা বহিষ্কৃত হন অথবা সংসদে উক্ত দলের বিপরীতে ভোট প্রদান করেন তাহলে সংসদে তার আসন শূন্য হবে।

৭১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংসদ সদস্যের আসন শূন্য হবে যদি—

৬. কোনো ব্যক্তি একই সাথে দুই বা ততোধিক আসনে নির্বাচিত হবার পর তিনি যে আসনে প্রতিনিধিত্ব করতে ইচ্ছুক তা জানিয়ে নির্বাচন কমিশনকে সর্বশেষ নির্বাচনের ত্রিশ দিনের মধ্যে জানাতে হবে এবং এক্ষেত্রে অন্য আসনগুলো শূন্য হবে। যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জানাতে অসমর্থ হন তবে তার নির্বাচিত সকল আসন শূন্য ঘোষণা করা হবে।

৭. কোনো সংসদ সদস্য মৃত্যুবরণ করলে সে আসন শূন্য হবে।

৮. ৬৭ (২) অনুযায়ী সংসদ সদস্য স্বীয় স্বাক্ষর যুক্ত পদত্যাগ পত্র স্পীকারের কাছে প্রেরণ করলে।

৯. ৬৬ (২) ধারা অনুযায়ী যে সমস্ত যোগ্যতার উল্লেখ আছে তার যদি বিলুপ্ত হয় তবে সংসদ সদস্য থাকবেন না এবং আসন শূন্য হবে।

উপসংহার : সংসদ সদস্যরা জাতীয় সংসদের প্রাণ। সংসদ সদস্যরা সংসদকে যেমন প্রাণবন্ত করে তোলে, তেমনি তাদের দ্বারা জনকল্যাণমুখী নানা আইন ও বিধিও প্রণীত হয়। এ কারণেই বাংলাদেশ সংবিধান জাতীয় সংসদের সদস্যদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা এবং কি কারণে, কখন সংসদের আসন শূন্য হবে তা স্পষ্ট করেছে। আর এ বিধির দরুন সংসদ সদস্যরাও শৃঙ্খলিত থাকে।

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

০২ ॥ সরকারের বিভাগসমূহ কি কি? আধুনিক রাষ্ট্রে আইনসভার ক্ষমতা ও কার্যাবলী আলোচনা করুন।
***অথবা,* আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইন প্রণয়ন ছাড়া আইনসভা অন্যান্য কি কাজ করে থাকে— আলোচনা করুন।**
***অথবা,* সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হিসেবে আইন বিভাগের কার্যাবলী আলোচনা করুন।**

উত্তর : একটি দেশকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য সরকারের তিনটি বিভাগ তথা আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সরকারের এ তিনটি বিভাগের মধ্যে আইন বিভাগ অন্যতম। কেননা, যে দেশের আইন বিভাগ যত বেশি শক্তিশালী সে দেশ তত বেশি গণতান্ত্রিক। তাই আইন বিভাগকে গণতন্ত্রের সোপান বলা হয়। আইন বিভাগ একটি দেশের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ।

সরকারের বিভাগসমূহ : রাষ্ট্রের ইচ্ছা ও অনিচ্ছাকে প্রকাশ করতে গিয়ে সরকারকে যেসব কাজ সম্পাদন করতে হয় সেগুলোকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন— ক. আইন সংক্রান্ত কাজ, খ. শাসন সংক্রান্ত কাজ ও গ. বিচার সংক্রান্ত কাজ। এ তিন প্রকার কাজ সম্পাদন করার জন্য রাষ্ট্রে সরকারের তিনটি বিভাগ বা অঙ্গ রয়েছে। যথা : ১.আইন বিভাগ, ২. শাসন বিভাগ এবং ৩. বিচার বিভাগ।

১. **আইন বিভাগ :** সরকারের যে বিভাগ রাষ্ট্রের শাসন কাজ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের চাহিদা অনুযায়ী আইনের সংশোধন ও পরিবর্তন করে তাকে আইন বিভাগ বা আইনসভা বলে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

২. **শাসন বিভাগ :** সরকারের যে বিভাগ আইন বলবৎ করে তাকে শাসন বিভাগ বলে। শাসন বিভাগ শব্দটি ব্যাপক ও সংকীর্ণ উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। ব্যাপক অর্থে আইন বলবৎকরণে নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়ে শাসন বিভাগ গঠিত।

৩. **বিচার বিভাগ :** সরকারের যে বিভাগ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আইনকে বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে অপরাধীর দণ্ড বিধান এবং নিরপরাধীর নিরাপত্তা বিধান করে তাকে বিচার বিভাগ বলে।

আধুনিক রাষ্ট্রে আইনসভার ক্ষমতা ও কার্যাবলী : আধুনিক রাষ্ট্রে আইনসভা নিম্নলিখিত ক্ষমতা ও কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে :

১. **আইন প্রণয়ন :** রাষ্ট্রের জন্য আইন প্রণয়ন আইন বিভাগের প্রধান কাজ। বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী দুটি পদ্ধতিতে আইন প্রণয়ন হতে পারে— বিল উত্থাপনের মাধ্যমে এবং অধ্যাদেশ প্রণয়ন করে। সরকারপ্রধান আইনসভার অধিবেশন যখন স্থগিত থাকে তখন অধ্যাদেশ প্রণয়ন করেন। পরবর্তীতে এতে আইনসভার অনুমোদন নিতে হয়। আইনসভা নতুন আইন প্রণয়ন ছাড়াও পুরাতন আইনের সংস্করণ ও সংশোধন করে থাকে।

২. **শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ :** আইনসভার অন্যতম কাজ শাসন বিভাগের অগণতান্ত্রিক কাজে বাধা প্রদান করা। সংসদে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, শাসন বিভাগের কাজের যৌক্তিকতা যাচাই করা, চুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে আইন বিভাগ শাসন বিভাগকে সর্বদা জাগ্রত রাখে। ফলে শাসন বিভাগ নিজের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করতে পারে না।

৩. **প্রশাসনিক কাজ :** আইন বিভাগ কোনো কোনো দেশে প্রশাসনিক কাজও করে থাকে। বিশেষ করে সংসদীয় পদ্ধতিতে আইন বিভাগের সদস্যরাই মন্ত্রী হয়ে থাকেন। মার্কিন সিনেট সন্ধি, চুক্তি, যুদ্ধ ঘোষণা, শান্তি স্থাপন এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে অনুমোদন দিয়ে থাকে। এগুলো সিনেটের প্রশাসনিক কাজ।

৪. **অর্থসংক্রান্ত কাজ :** দেশের সকল অর্থব্যবস্থা আইনসভার অনুমোদন দ্বারা কার্যকর হয়। আইনসভা আর্থিক বাজেট অনুমোদন করে থাকে। শাসন বিভাগের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ, মন্ত্রণালয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে যেসব মঞ্জুরি দেয়া হয় তা আইনসভা অনুমোদন করে। আইনসভা পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার মাধ্যমে সরকারের অর্থব্যবস্থা অনুমোদন করে থাকে।

৫. **নির্বাচন সংক্রান্ত :** আইনসভার নির্বাচন সংক্রান্ত কাজও রয়েছে। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভা নিজ নিজ দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করে থাকে। বাংলাদেশ সংসদের ৫০টি সংরক্ষিত মহিলা আসন এখানকার আইনসভা নির্বাচন করে থাকে।

৬. **অনুসন্ধানমূলক কমিটি গঠন :** আইনসভা বিভিন্ন কমিটির মাধ্যমে সরকারের অর্থ, শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি, ভূমি, উপজাতি ইত্যাদি বিষয়ের অনুসন্ধান করে রিপোর্ট তৈরি করে থাকে। বাংলাদেশ সংবিধানে (৭৬ অনুঃ) এই ধরনের কমিটির উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রেও এ ধরনের কমিটির ব্যবস্থা রয়েছে।

৭. **সরকারি নীতি নির্ধারণ :** সরকারের গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্ধারণে আইনসভা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বাংলাদেশসহ বেশ কিছু দেশে কেবিনেট সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক। তবুও এখানে আইন বিভাগের ভূমিকাকে খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। আইনসভা সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বৈদেশিক নীতি ইত্যাদি ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৮. **বিচারসংক্রান্ত কাজ :** আইনসভা কিছু কিছু বিচারসংক্রান্ত কাজও করে থাকে। রাজদ্রোহ, উৎকোচ গ্রহণ বা অন্য কোনো গুরুতর অপরাধ ও বিধিবহির্ভূত কাজের জন্য সরকারপ্রধান বা সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে আইনসভা অভিসংশন উত্থাপন করে। বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রে এ ধরনের বিধান রয়েছে। ব্রিটেনের লর্ড সভা সে দেশের সর্বোচ্চ আপিল আদালত হিসেবে কাজ করে।

৯. **সংবিধান রচনা ও সংশোধন সংক্রান্ত কাজ :** আইনসভা সংবিধান রচনা করে এবং প্রয়োজনে এর সংশোধন করে থাকে। কোনো দেশের আইনসভা যখন সংবিধান রচনা করে তখন তাকে গণপরিষদ বলে। বাংলাদেশের আইনসভা দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে সংবিধান সংশোধন বিল পাস করে থাকে।

১০. **জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা :** আইনসভা দেশের জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে উন্মুক্ত আলোচনার আয়োজন করে থাকে। এসব আলোচনায় উত্থাপিত বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা, সমস্যা নির্ধারণ, সমাধান প্রস্তাবকরণ এবং কার্যকর করা হয়।

১১. **জনগণ ও প্রশাসনের মধ্যে চ্যানেল হিসেবে আইনসভা :** আধুনিক আমলাতন্ত্রের আয়তন অত্যন্ত বিশাল। আর আমলাতন্ত্র সবসময়ই সাধারণ জনগণের স্বার্থের প্রতি অমনোযোগী। ফলে আমলাতন্ত্রের লাল ফিতার দৌরাত্ম্যে জনগণ বঞ্চিত হয় তাদের নাগরিক অধিকার থেকে। এক্ষেত্রে আইন পরিষদের সদস্য বা সংসদ সদস্যগণ তাদের নির্বাচনী এলাকার জনগণের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করে থাকে। সংসদ সদস্যগণ এলাকার সমস্যা, জনগণের স্বার্থ ও উন্নয়নমূলক কাজের ব্যাপারে সরকারকে অবহিত করেন এবং প্রয়োজনে আইন পরিষদে বিতর্কের ব্যবস্থা করে থাকেন। নিজ নিজ নির্বাচনী এলাকার জনগণের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করে বলে আধুনিক লেখকরা আইন পরিষদের সদস্যদেরকে সংবাদ বাহক (Expand Boys) বলার প্রয়াস পান।

১২. **অভিযোগ সম্পর্কিত আলোচনা :** সকল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইনসভা জনমতের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় শাখা হিসেবে কাজ করে। আইন পরিষদের সদস্যরা জনগণের প্রতিনিধি। তারা আইন পরিষদে জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে এবং জনগণের অভিযোগ বা সমস্যা সম্পর্কিত বিষয়ের পূর্ণ আলোচনা (Ventilate the grievances) করে। আইন পরিষদে তাদের আলোচনা ও বিতর্ক ইলেকট্রনিক ও প্রেস মিডিয়ার মাধ্যমে সমগ্র দেশের আনাচে-কানাচে পৌঁছে যায়। এভাবে আইন পরিষদ জনমত গঠন করে এবং দেশকে রাজনৈতিকভাবে স্থিতিশীল রাখে।

উপসংহার : বর্তমান বিশ্ব রাজনীতি বহু মেরুকরণের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ফলে এর পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছে বিভিন্ন দেশের শাসন বিভাগে। তাই শাসন বিভাগ উপেক্ষা করার প্রয়াস পাচ্ছে আইন বিভাগকে। সে কারণে সমালোচকরা আইন বিভাগের ক্ষমতা হ্রাস করার পক্ষে অভিযোগ তুলছে। এরপরেও বলা যায়, আইন বিভাগই সরকারের গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ, যেখানে জনপ্রতিনিধিত্ব করা যায়। আইন বিভাগের উল্লিখিত কার্যাবলী একটি দেশের জন্য অত্যাবশ্যক। তাই আমরা আইন বিভাগকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং মর্যাদাপূর্ণ বিভাগ বলতে পারি।

০৩ । বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলী আলোচনা করুন।

উত্তর : বাংলাদেশের আইনসভার নাম জাতীয় সংসদ। প্রজাতন্ত্রের সব আইন প্রণয়নের ক্ষমতা জাতীয় সংসদের ওপর ন্যস্ত। ১৯৭২ সালের সংবিধানে জাতীয় সংসদ ছিল রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের উৎস। পরবর্তীতে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী আইনে সংসদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়। দ্বাদশ সংশোধনী আইনে জাতীয় সংসদ আবারো ফিরে পেয়েছে তার পূর্ব গৌরব।

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের গঠন : ১৯৭২ সালের মূল সংবিধান অনুযায়ী জাতীয় সংসদ ৩১৫ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হতো। এর মধ্যে ৩০০ জন প্রাপ্তবয়স্ক জনগণের ভোটে, বাকি ১৫ জন সংসদ সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হতেন। সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীতে সংরক্ষিত নারী আসন ৩০ করা হয়। এ ৩০ জন নারী সদস্য সংসদ সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হন। সংসদের কার্য পরিচালনার জন্য সংসদ সদস্যদের ভোটে একজন স্পিকার ও একজন ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হন। নারীদের জন্য সংরক্ষিত ৩০টি আসনের বিধান সম্বলিত আইনের মেয়াদ শেষ হওয়ায় অষ্টম জাতীয় সংসদের আসন সংখ্যা ছিল ৩০০। তবে চতুর্দশ সংশোধনীতে নারীদের জন্য ৪৫টি আসন সংরক্ষণ করা হয়েছে। নবম জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য ৫০টি আসন সংরকক্ষণ করা হয়েছে। সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সংখ্যানুপাতে এ আসন বণ্টিত হবে। এ আসন সংরক্ষণের মেয়াদ হবে ১০ বছর। ফলে জাতীয় সংসদের আসন সংখ্যা বর্তমানে ৩৫০। প্রধানমন্ত্রী সংসদের নেতা বা নেত্রী হিসেবে গণ্য হন। জাতীয় সংসদের কার্যকাল ৫ বছর। অবশ্য এ কার্যকালের পূর্বেও রাষ্ট্রপতি জাতীয় সংসদ ভেঙে দিতে পারেন। প্রজাতন্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত থাকলে সংসদের আইন দ্বারা সংসদের মেয়াদ ১ বছর বাড়ানো যায়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী

১. **আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত :** আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত যাবতীয় ক্ষমতা জাতীয় সংসদের ওপর ন্যস্ত। এটা শাসনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের সকল প্রকার আইন প্রণয়ন এবং প্রচলিত আইনের পরিবর্তন ও সংশোধন করতে পারে। সংসদ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে কোনো সংস্থা বা কর্তৃপক্ষকে আদেশ প্রদান, বিধি, উপবিধি ও বিধান প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ করতে পারে।

২. **অর্থ সংক্রান্ত :** জাতীয় সংসদ বাংলাদেশের সরকারি অর্থ তহবিলের নিয়ন্ত্রক ও রক্ষক হিসেবে কাজ করে। সংসদের অনুমোদন প্রদান বা তা হতে অর্থ প্রত্যাহার এবং উপরিউক্ত বিষয়সমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় জাতীয় সংসদের আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সংসদ প্রত্যেক অর্থ বছরের শুরুতে সরকারের সম্ভাব্য আয়-ব্যয়ের খতিয়ান সম্বলিত বাজেট পেশ করে। কিন্তু অর্থ ব্যয়সংক্রান্ত কোনো বিল বা মঞ্জুরির দাবি সংসদে উপস্থাপনের পূর্বে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের প্রয়োজন হয়।

৩. **নির্বাহী বিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ :** দ্বাদশ সংশোধনী অনুসারে বাংলাদেশে সংসদীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। সংসদীয় ব্যবস্থায় আইনসভার প্রাধান্য সর্বত্র স্বীকৃত। প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির নামে পরিচালিত হলেও প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রিসভার হাতে প্রকৃত ক্ষমতা ন্যস্ত। তবে প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রিসভা ব্যক্তিগত ও যৌথভাবে জাতীয় সংসদের নিকট দায়ী থাকেন। সংসদের অনাস্থা পেলে প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হয়। সংসদ মুলতবি প্রস্তাব, নিন্দা প্রস্তাব, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, বাজেটের ওপর বিস্তৃত আলোচনা, বিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ এবং সরকারি কর্মকর্তাদের কার্য সম্পর্কে তদন্ত অনুষ্ঠান ও অনাস্থা প্রস্তাবের দ্বারা শাসন বিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে।

৪. **বিচার সংক্রান্ত :** জাতীয় সংসদের কিছু কিছু বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা রয়েছে। সংবিধানের কোনো ধারা লঙ্ঘন বা গুরুতর অপরাধ বা অসদাচরণের জন্য অথবা দৈহিক ও মানসিক অসামর্থ্যের অভিযোগে জাতীয় সংসদ রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসনের মাধ্যমে অপসারিত করতে পারেন। তবে এর জন্য সংসদ সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন প্রয়োজন হয়।

৫. **নির্বাচন সংক্রান্ত ক্ষমতা ও কার্যাবলী :** জাতীয় সংসদ বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার ও সংসদের বিভিন্ন কমিটির সদস্য নির্বাচন করে থাকেন। তাছাড়া সংসদের ৫০টি সংরক্ষিত নারী আসনের নারী সদস্যরা সংসদ কর্তৃক নির্বাচিত হয়ে থাকেন।

৬. **সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত :** সংবিধানের বিধান সাপেক্ষে জাতীয় সংসদ সংবিধানের সংশোধন করতে পারে। সংশোধনের জন্য সংসদের মোট সদস্য সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের প্রয়োজন হয়।

৭. বিতর্কসভা : বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ একটি বিতর্কসভা হিসেবে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। এটা মহাহিসাব নিরীক্ষক ও সরকারি কর্মকমিশনের বার্ষিক রিপোর্ট এবং বাজেট নিয়ে বিতর্ক করে থাকে। রাষ্ট্রপতির বাণী ও ভাষণ নিয়েও সংসদ ব্যাপক আলোচনায় রত থাকে।

৮. চাকরি সংক্রান্ত : প্রজাতন্ত্রের কার্যবিভাগ ও প্রশাসনিক কাঠামোর পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত ক্ষমতাও সংসদের হাতে ন্যস্ত। প্রতিরক্ষা ও শৃঙ্খলা বিভাগের লোক নিয়োগ সংসদের হাতে ন্যস্ত।

৯. অধ্যাদেশ সংক্রান্ত : সংসদ অধিবেশন বন্ধ থাকা অবস্থায় রাষ্ট্রপতি যেসব অধ্যাদেশ জারি করেন সেগুলো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সংসদে পেশ করতে হয়। পেশকৃত অধ্যাদেশ সংসদের অনুমোদন না পেলে কার্যকারিতা হারায়।

১০. বিবিধ : জাতীয় সংসদ সুপ্রিম কোর্ট ব্যতীত অন্যান্য অধঃস্তন আদালত প্রতিষ্ঠার জন্য আইন প্রণয়ন করতে পারে। যুদ্ধ ঘোষণা ও আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুমোদন করার ক্ষমতা সংসদের হাতে ন্যস্ত। স্থানীয় শাসনসংক্রান্ত বিধি ও প্রবিধি প্রণয়ন করা সংসদের এখতিয়ারভুক্ত।

উপসংহার : বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ বহুবিধ ক্ষমতা ও বিভিন্ন কার্যাবলী সম্পাদন করে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বর্তমানে সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় আইন প্রণয়ন, জবাবদিহিতা অর্জন, অনাস্থা প্রস্তাব গ্রহণ ও শাসন বিভাগের ওপর প্রাধান্য বিস্তারের চরম ক্ষমতার আলোকে জাতীয় সংসদকে সার্বভৌম ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু বলা যায়।

০৪ ❚ বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের সমস্যা ও সম্ভাবনা আলোচনা করুন।

উত্তর : বাংলাদেশে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান। মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারব্যবস্থা যে কোনো দেশের গণতন্ত্রের অন্যতম হাতিয়ার। বাংলাদেশে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারব্যবস্থায় কিছু সমস্যা রয়েছে। এসব সমস্যা সঠিকভাবে সমাধান করতে পারলে বাংলাদেশ একটি শক্তিশালী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হবে। যে শাসনব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিপরিষদ থাকে এবং প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীগণ তাদের সকল ভালো-মন্দের (Omission and Commission)-এর জন্য ব্যক্তিগতভাবে এবং সম্মিলিতভাবে আইন পরিষদের নিকট দায়ী থাকে তাকে সংসদীয় সরকার বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার বা দায়িত্বশীল সরকার বলে।

সংসদীয় সরকার

অধ্যাপক গার্নার-এর মতে, 'সংসদীয় সরকার এমন একটি শাসনব্যবস্থা যেখানে প্রকৃত শাসক বা মন্ত্রিপরিষদ তার রাজনৈতিক কার্যাবলীর জন্য প্রথমত আইনসভার নিকট দায়ী থাকে এবং অবশেষে নির্বাচকমণ্ডলীর নিকট দায়ী থাকে। এখানে রাষ্ট্রপ্রধানের পদটি তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়।'

মার্কিন গবেষক অধ্যাপক ডাইসির বক্তব্যে সংসদীয় সরকারের ধারণা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠে। ডাইসির মতে, সংসদীয় সরকারব্যবস্থা আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের ক্ষমতা একত্রীকরণের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে এবং উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে।'

সুতরাং সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার বলতে আমরা এমন এক ধরনের সরকার ব্যবস্থাকে বুঝি যেখানে—

– আইন পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকার গঠন করে;

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

– প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিপরিষদ দেশ পরিচালনা করে;

– মন্ত্রীরা তাদের কাজের জন্য সংসদের নিকট দায়ী থাকেন এবং

– প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করলে, মারা গেলে বা শারীরিকভাবে অসমর্থ হলে সরকার ব্যবস্থা ভেঙ্গে যায়।

ইংল্যান্ড, ভারত প্রভৃতি দেশে সংসদীয় সরকারব্যবস্থা কার্যকর রয়েছে। বাংলাদেশের ১৯৭২ সালের সংবিধান অনুসারে প্রথমে এই ধরনের শাসনব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৭৫ সালে সংবিধান সংশোধন করে সে স্থলে রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার প্রবর্তন করা হয়। পরবর্তীকালে ১৯৯০ সালে গণঅভ্যুত্থানের পর অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে এ দেশে আবার সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

সংসদীয় সরকারের বৈশিষ্ট্য : সংসদীয় সরকারের কতগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

১. **আইনসভা ও নির্বাহী বিভাগের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক :** মন্ত্রিপরিষদের সদস্যরা একই সময়ে আইনসভারও সদস্য থাকেন। দেশের আইন বা দেশাচার অনুযায়ী মন্ত্রীগণের আইনসভার সদস্য হওয়া সাধারণত বাধ্যতামূলক। এভাবে আইনসভা ও নির্বাহী বিভাগের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়।

২. **মন্ত্রীগণ একই রাজনৈতিক দলের সদস্য :** মন্ত্রিপরিষদ আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতৃস্থানীয় সদস্যদের নিয়ে গঠিত হয়। অর্থাৎ তারা একই দলের সদস্য হয়ে থাকে। অবশ্য, বিভিন্ন দলের সমন্বয়ে গঠিত কোনো কোয়ালিশনও মন্ত্রিসভা বা সরকার গঠন করতে পারে।

৩. **দায়িত্বশীলতা :** মন্ত্রিপরিষদের সদস্যরা তাদের সব কাজের ব্যাপারে আইনসভার কাছে ব্যক্তিগতভাবে বা যৌথভাবে দায়ী থাকেন। তারা যতদিন আইনসভার আস্থা ভোগ করেন ততদিনই তারা নিজেদের পদে বহাল থেকে দেশ শাসন করতে পারেন। আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থা হারালে মন্ত্রিসভা বা সরকারের পতন ঘটে।

৪. **রাষ্ট্রপ্রধান এবং সরকারপ্রধানের মধ্যে পার্থক্য :** সংসদীয় সরকারের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপ্রধান এবং সরকারপ্রধান এক ব্যক্তি থাকেন না। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপ্রধান নামমাত্র নির্বাহী কর্তা এবং সরকারপ্রধান হলেন প্রকৃত নির্বাহী কর্তা। সকল ক্ষমতা আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রপ্রধানের হাতে ন্যস্ত থাকলেও তিনি কার্যত এসব ক্ষমতা প্রয়োগ করেন না। বরং প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভাই প্রকৃত নির্বাহী কর্তা হিসেবে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করেন।

৫. **প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব :** প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বেই মন্ত্রিপরিষদের সদস্যরা টিম হিসেবে দেশ শাসনের দায়িত্ব পালন করেন। প্রধানমন্ত্রীই মন্ত্রিপরিষদের প্রধান। তার পরামর্শেই অন্য মন্ত্রীকে নিয়োগ বা বরখাস্ত করা হয়। বস্তুত বর্তমান যুগে প্রধানমন্ত্রীই দেশের প্রকৃত নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠেছেন।

৬. **আইন প্রণয়নে মন্ত্রিপরিষদের নেতৃত্ব :** মন্ত্রিপরিষদের সদস্যরাই আইনসভার অধিকাংশ আইনের বিল ও বাজেট প্রস্তাব করেন। তারা আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সদস্য হওয়ায় তাদের উত্থাপিত বিল ও প্রস্তাব সাধারণত নিশ্চিতভাবে পাস হয়।

৭. **বিরোধীদলের অস্তিত্ব :** স্যার আইভর জেনিংস মনে করেন, সংসদীয় সরকারের ক্ষেত্রে বিরোধী দলের অস্তিত্ব অপরিহার্য। তার মতে, সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় আইন প্রণয়ন ও শাসন পরিচালনার ক্ষমতা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে। তাই এই দলের স্বেচ্ছাচার রোধ করতে বিরোধী দল থাকা অবশ্য প্রয়োজনীয়।

সংসদীয় সরকারের সফলতার শর্তাবলী : সংসদীয় সরকারের সফলতার জন্য কতগুলো শর্তাবলী আবশ্যক। নিচে তা বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :

১. **উপাধিসর্বস্ব রাষ্ট্রপ্রধান :** মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের ক্ষেত্রে একজন উপাধিসর্বস্ব রাষ্ট্রপ্রধান থাকা অপরিহার্য। শাসনক্ষমতা আনুষ্ঠানিকভাবে তার হাতে ন্যস্ত থাকবে, তবে তার নামে মন্ত্রিপরিষদই সেই ক্ষমতা বাস্তবে প্রয়োগ করবে।

২. **কোনো দলের বা কোয়ালিশনের সংখ্যাগরিষ্ঠতা :** এরূপ সরকারের কার্যকারিতার জন্য কোনো কোনো দল বা কোয়ালিশনকে আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পেতে হবে। কারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বা কোয়ালিশনই মন্ত্রিপরিষদ গঠন করে।

৩. **মন্ত্রিসভার দায়িত্বশীলতা :** সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রীদের নিজ নিজ কাজকর্মের ব্যাপারে আইনসভার কাছে অবশ্যই দায়ী থাকতে হবে। আইনসভার সমর্থন হারালে মন্ত্রীরা পদত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকবেন। মন্ত্রীরা ব্যক্তিগতভাবে ও যৌথভাবে আইনসভার কাছে দায়ী থাকে।

৪. **সহনশীলতা :** সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতার শান্তিপূর্ণ হস্তান্তর নিশ্চিত করতে বিভিন্ন দলের মধ্যে সহযোগিতা ও সমঝোতা থাকা আবশ্যক। সরকারি ও বিরোধী দল একে অপরের সাথে সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে কাজ করবে। প্রকৃতপক্ষে এই সহনশীলতার অভাবেই উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সংসদীয় সরকারব্যবস্থাকে ব্যর্থ করে তুলেছে।

৫. **সুবিবেচনার সাথে আইনসভা ভেঙ্গে দেয়া :** আইনসভা ও মন্ত্রিপরিষদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে আইনসভা ভেঙ্গে দিয়ে পুনর্নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে হবে। এরূপ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপ্রধান আইনসভা ভেঙ্গে দিতে সুবিবেচনা প্রয়োগ করবেন।

৬. **বিরোধী দল :** স্যার আইভর জেনিংস বিরোধী দলকে সংসদীয় সরকারের পক্ষে অপরিহার্য বলে গণ্য করেন। তাঁর মতে, সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের স্বেচ্ছাচার রোধ করতে বিরোধী দল থাকা আবশ্যক। বিরোধী দলের ন্যায়সঙ্গত সমালোচনার অধিকার অবশ্যই থাকতে হবে। 'Agreement to Differ'-ই হলো সংসদীয় ব্যবস্থার সফলতার অন্যতম শর্ত।

৭. **জনগণের প্রস্তুতি :** সংসদীয় শাসনব্যবস্থা গ্রহণ ও তা সফল করতে জনগণকে স্বাভাবিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে। সংসদীয় ব্যবস্থা গড়ে উঠতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হতে পারে।

বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের সমস্যা : ১৯৫৬-৫৮ এবং ১৯৭২-৭৫ সালে প্রবর্তিত সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থার অভিজ্ঞতা এ অঞ্চলের জনগণের স্মৃতিতে আছে। পাকিস্তান আমলে গভর্নর জেনারেলের আইন ও শাসন বিষয়ে অহেতুক হস্তক্ষেপ সংসদীয় পদ্ধতির কার্যক্রমকে নস্যাৎ করেছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। নিচে বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের সমস্যা আলোচিত হলো :

১. **একদলীয় শাসব্যবস্থা কায়েম :** বাঙালি জাতির দীর্ঘ প্রতীক্ষিত ও বহু প্রত্যাশিত সংসদীয় পদ্ধতির শাসনব্যবস্থা ১৯৭২ সালের সংবিধানের মাধ্যমে প্রবর্তন করা হয়। তখন সংসদ সদস্যদের দলীয় শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য সাংবিধানিক পদক্ষেপ সংসদ সদস্যদের মর্যাদা ও স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করে এবং তাদের ভূমিকাকে ম্লান করে দেয়। কোনো সংসদ সদস্য নিজ দল ত্যাগ করলে কিংবা সংসদে নিজ দলের বিরুদ্ধে ভোট দিলে তাকে সদস্যপদ হারাতে হতো। ফলে ক্ষমতাসীন দল অতি সহজেই কোনো বিল পাস করিয়ে নিত। এভাবে সংসদ একটি রাবার স্ট্যাম্পে পরিণত হয়। ১৯৭২ সালের পর দেখা যায়, যারা সংসদীয় গণতন্ত্র চালু করেছিল সাড়ে তিন বছর পর তারা নিজেরাই সংসদীয় ব্যবস্থায় আস্থা হারিয়ে সংবিধানের আমূল পরিবর্তন করে রাষ্ট্রপতি শাসিত ও একদলীয় ব্যবস্থা কায়েম করে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

২. **সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপ :** বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে সামরিক বাহিনীর নির্লজ্জ হস্তক্ষেপ এ দেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎকে আরো অনিশ্চিত করে তুলেছে। ক্ষমতা দখলের পর প্রাথমিক পর্যায়ে সরকারের নিরপেক্ষতা প্রচার করে সামরিক বাহিনী বৈধতার সংকট নিরসনে সচেষ্ট হয়। এ দেশে বিভিন্ন সময়ে সামরিক শাসন জারি করে যেমন সংসদীয় পদ্ধতি ও গণতন্ত্রকে বিধ্বস্ত করা হয়েছে, তেমনি রাজনীতিবিদদের অগণতান্ত্রিক আচরণ এবং স্বার্থ ও ক্ষমতার মোহও তাকে বিপর্যস্ত করেছে।

৩. **সংসদীয় মূল্যবোধ ও পরমতসহিষ্ণুতার অভাব :** সংসদীয় গণতন্ত্রকে সাফল্যে নিয়ে যাওয়ার অন্যতম দায়িত্ব রাজনৈতিক দলের। বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক দলগুলোর সংসদীয় মূল্যবোধ ও পরমতসহিষ্ণুতার বিষয়ে আমরা মোটামুটি ওয়াকিবহাল। নিয়মিত কাউন্সিল অধিবেশন বা কোনো সুষ্ঠু নিয়মনীতি কিংবা নির্বাচনের ভিত্তিতে দলের নেতৃবৃন্দের নির্বাচিত হওয়ার ঐতিহ্য বিরল। যতদিন পর্যন্ত রাজনৈতিক দলগুলো গণতান্ত্রিক আচরণ করতে না পারবে ততদিন পর্যন্ত সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করা কষ্টকর হয়ে দাঁড়াবে।

৪. **পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সহনশীলতার অভাব :** বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সহনশীলতার মনোভাবের অভাব রয়েছে। বিরোধী দলগুলো শুধু বিরোধিতার খাতিরে বিরোধিতা করছে। পক্ষান্তরে সরকারি দল প্রায় ক্ষেত্রে বিরোধী দলের কথাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছে না। ফলে পরস্পরের মধ্যে দেখা দিচ্ছে অবিশ্বাস, সৃষ্টি হচ্ছে বিরাট ব্যবধান, যা সংসদীয় গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে কখনো কাম্য হতে পারে না।

শেষত, দেখা যায় সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের চেয়ে দলের নেতা নিজেই সাধারণত প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা লাভ করে থাকেন। দলের নেতার বিরোধিতা করে কোনো সদস্য ভবিষ্যতে তার রাজনৈতিক জীবন নষ্ট করতে চাননা। এটাও সংসদীয় গণতন্ত্রের এক বিরাট সমস্যা।

এ পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলাদেশে প্রবর্তিত সংসদীয় ব্যবস্থার কার্যক্রম সন্তোষজনক নয়।

বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের সম্ভাবনা

সুদীর্ঘ দেড় দশকের স্বৈরশাসন বাংলাদেশকে এমন এক গভীর আর্থ-সামাজিক সংকটের ভেতর ঠেলে দিয়েছিল যে, একটি গণঅভ্যুত্থান ছাড়া সে সংকট থেকে পরিত্রাণের কোনো বিকল্প পথ জনগণের ছিল না। ঐকমত্য ও প্রত্যাশার ভিত্তিতে সম্মিলিতভাবে গণঅভ্যুত্থানকে সার্থক করা হয়েছে। ১৯৯০ সালের গণ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে গঠিত পঞ্চম জাতীয় সংসদে বিএনপি, আওয়ামী লীগ, জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় পার্টি নজিরবিহীন ঐকমত্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ১৯৯১ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত গণভোটে দ্বাদশ সংশোধনী গৃহীত হওয়ায় বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়। দ্বাদশ সংশোধনী বিলটি সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হওয়ায় সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি তা অনুমোদন করবেন কিনা সে প্রশ্নে গণভোট অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। জনগণ কর্তৃক গণভোটে দ্বাদশ সংশোধনী অনুমোদিত হওয়ার পর রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভের মাধ্যমে তা আইনে পরিণত হয়েছে। নির্বাচিত বিএনপি সংসদীয় সরকার তাদের পাঁচ বছরের শাসনামল অতিবাহিত করার পর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ১৯৯৬ সালের ১২ জুন সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। দেশি-বিদেশি পর্যবেক্ষক ও গবেষকদের মতে সম্পূর্ণ-অবাধ ও নিরপেক্ষ এই নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সুদীর্ঘ একুশ বছর পর জনগণের সুচিন্তিত রায় নিয়ে ক্ষমতায় আসে।

১৯৯১ সালে নির্বাচিত বিএনপি সংসদীয় সরকার, ১৯৯৬ সালে নির্বাচিত আওয়ামী সংসদীয় সরকার, ২০০১ সালে বিএনপি নেতৃত্বাধীন চার দলীয় সংসদীয় সরকার এবং সর্বশেষ ২৯ ডিসেম্বর ২০০৮ আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকারের কাছে জনগণ সকল সমস্যার সমাধান চেয়ে ব্যর্থ হয়েছে ব্যাপারটা কিন্তু এমন নয়। জনগণের আশাভঙ্গের কারণ হচ্ছে সরকার তাদের প্রত্যাশা পূরণে অনাগ্রহী। এটাই তাদের অভিযোগ। সন্ত্রাস ও নিরাপত্তাহীনতা আজ সামাজিক বাস্তবতা, দারিদ্র্য ও বেকারত্ব পরিস্থিতি ভয়াবহ, উৎপাদন ব্যবস্থা বিপর্যস্ত, অর্থনৈতিক অবস্থা চাঙ্গা হবার সম্ভাবনা ক্ষীণ। সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ফলে বাংলাদেশে সকল মহলে স্বস্তি ফিরে এলেও দেশে বিরাজমান অর্থনৈতিক অবস্থা রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে অনিশ্চিত করে তুলেছে।

এ সকল সমস্যা থাকা সত্ত্বেও মানুষ এখনো হাল ছাড়েনি। সকল দল মিলে ৬ আগস্ট ১৯৯১ মধ্যরাতে যে দ্বাদশ সংশোধনী বিল পাস করে রাজনীতিতে নবদিগন্তের সূচনা করেছে সে দৃশ্য এখনো ম্লান হয়নি। জাতির প্রত্যাশা সকল দল ও নেতৃবৃন্দ সংসদীয় গণতন্ত্রকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। জনগণ যাতে নিজেদের অধিকার ও মর্যাদা লাভ করতে পারে এবং দেশের পর্বতপ্রমাণ সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করে পৃথিবীর বুকে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন জাতি হিসেবে টিকে থাকতে পারে— এটা সকলেরই কাম্য।

সার্বিক ঐক্য মত্যের ভিত্তিতে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, বিশ্বাস ও সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনা করা উচিত। তাই প্রয়োজন অধিক দেশপ্রেম ও দায়িত্ববোধের। দেশকে বাঁচাতে হলে, সংসদীয় সরকারকে সফল করে তুলতে হলে, রাজনৈতিক অস্থিরতা দূর করতে হলে আপামর জনগণকে আজ দায়িত্বশীল ও মানবিক আচরণ করতে হবে। সংসদীয় পদ্ধতির বিকাশ ও স্থিতিশীলতার জন্য জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতা ও শিক্ষার উচ্চহার অন্যতম প্রধান শর্ত। কিন্তু শিক্ষার হার স্বল্প হলেও রাজনৈতিক সচেতনতার দিক দিয়ে বাংলাদেশের মানুষ অনগ্রসর এমন মন্তব্য সত্যের পরিপন্থি।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এ কথা বলতে পারি যে, বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যেমন পাহাড়সমান সমস্যা রয়েছে, তেমনি সংসদীয় গণতন্ত্রকে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রেও রয়েছে উজ্জ্বল সম্ভাবনা। এজন্য প্রয়োজন জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতা, শিক্ষার উচ্চহার, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সহনশীলতা, সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে দূরত্ব কমিয়ে আনা, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে গণতন্ত্রের চর্চা, সামরিক বাহিনী যাতে দেশের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করতে না পারে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা। তাহলে বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল।

০৫ ॥ সংবিধানের কোন সংশোধনীর দ্বারা নারীদের জন্য জাতীয় সংসদে আসন সংরক্ষণ করা হয়েছিল? এর মূল বক্তব্য কি ছিল? বর্তমান সংসদে নারীদের আসন সংখ্যা কত? এর মেয়াদ কবে শেষ হবে? এ আসন সংরক্ষণ অব্যাহত রাখা কি যুক্তিযুক্ত? আলোচনা করুন।

উত্তর : মানবজাতির অর্ধেক অংশই নারী। আর নারীকে বাদ দিয়ে যে সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়, তা বিশ্ববাসীর কাছে আজ স্পষ্ট। জাতীয় জীবনে নারীর অংশগ্রহণের জন্য নারীর ক্ষমতায়ন একান্ত প্রয়োজন। আর নারীর ক্ষমতায়ন হলো নারী-পুরুষের মধ্যকার অসমতা ও বৈষম্য দূর করে নারীকে সমদক্ষতায় প্রতিষ্ঠিত করা। আর এজন্য দেশের সংবিধান সংশোধন বা নতুন আইন প্রণয়ন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৬১০৩)

সংবিধানের যে সংশোধনীর দ্বারা নারীদের জন্য জাতীয় সংসদে আসন সংরক্ষণ করা হয়েছিল : বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশ। এ দেশে নানা প্রকার সামাজিক সমস্যা বিদ্যমান। এসব সমস্যার মধ্যে অন্যতম হলো নারী-পুরুষের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসমতা, সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর অনগ্রসরতা তথা জাতীয় জীবনে নারীর সমান অংশগ্রহণের অভাব। ১৯৯০ সালে সংবিধানের (দশম সংশোধন) আইনের মাধ্যমে নারীদের জন্য ৩০টি আসন সংরক্ষণ করা হয় এবং সংরক্ষণের মেয়াদ উল্লেখ করা হয়। বর্তমানে সংরক্ষিত নারী আসন ৫০টি। নিচে সংবিধানের দশম সংশোধনীর মূল বক্তব্য, সংরক্ষিত আসনের মেয়াদ এবং সংরক্ষণ অব্যাহত রাখার যৌক্তিকতা তুলে ধরা হলো।

সংবিধানের দশম সংশোধনীর মূল বক্তব্য : ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানে বিধান ছিল যে, সংবিধান প্রবর্তনের তারিখ থেকে পরবর্তী দশ বছরের জন্য জাতীয় সংসদে অতিরিক্ত ১৫টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। সুতরাং সংরক্ষিত আসনের মেয়াদ ১৯৮২ সালে শেষ হওয়ার কথা। কিন্তু ১৯৭৯ সালে গৃহীত পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে সংরক্ষিত নারী আসন সংখ্যা ১৫ থেকে ৩০ এ বৃদ্ধি করা হয় এবং সংরক্ষণের মেয়াদ ১০ বছর থেকে ১৫ বছরে বর্ধিত করা হয়। সংরক্ষণের মেয়াদকাল (১৯৭২ সাল থেকে ১৫ বছর) উত্তীর্ণ হয় ১৯৮৮ সালে। ফলে ১৯৮৮ সালে নির্বাচিত চতুর্থ সংসদে কোনো নারী আসন ছিল না। অন্যদিকে এরশাদের জাতীয় পার্টির নারী শাখা সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনের বিধান রাখার জন্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে। তাই এরশাদ সরকার সংসদে নারীদের জন্য আসন সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ১৯৯০ সালের ১০ জুন তারিখে সংবিধানের দশম সংশোধনী বিল উত্থাপন করে এবং ১২ জুন তারিখে তা সংসদে পাস হয়।

দশম সংশোধনীর মূল বিষয়বস্তু হলো যে চতুর্থ সংসদের অব্যবহিত পরের সংসদের ১ম বৈঠকের তারিখ থেকে ১০ বছর অতিবাহিত হওয়ার পর সংসদ ভেঙে না যাওয়া পর্যন্ত ৩০টি আসন কেবল নারীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। এই নারী সদস্যগণ নির্বাচিত ৩০০ সদস্যের দ্বারা মনোনীত হবেন।

সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনের বর্তমান চিত্র : সপ্তম সংসদ শেষ হওয়ার সাথে সাথেই দশম সংশোধনীর মাধ্যমে সংরক্ষিত ৩০টি নারী আসনের মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। ফলে অষ্টম সংসদের প্রথম দিকে (২০০১-০৪ সাল পর্যন্ত) সংরক্ষিত নারী আসন শূন্য ছিল। ২০০৪ সালের ১৬ মে জাতীয় সংসদে সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী পাস হওয়ার মাধ্যমে সংরক্ষিত নারী আসনের সংখ্যা ৩০ থেকে ৪৫ এ উন্নীত করা হয়। এর মেয়াদ করা হয় পরবর্তী ১০ বছর। পঞ্চদশ সংশোধনীর পর এ আসন সংখ্যা করা হয় ৫০।

সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত সাংসদদের পদমর্যাদা : সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত সাংসদগণ কোনো নির্বাচনী এলাকা থেকে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন না। কিন্তু তারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত সাধারণ সদস্যদের মতো সমমর্যাদা ভোগ করেন; একই ধরনের সুযোগ-সুবিধা, বেতন ও বিশেষ অধিকার ভোগ করে থাকেন এবং সংসদে আলোচনা ও ভোটাভুটিতে তারা প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন। অন্যভাবে বলা যায়, নারী সাংসদগণ সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত হলেও তারা সাধারণভাবে নির্বাচিত সদস্যদের মতো যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা, অধিকার এবং বেতন-ভাতা ভোগ করেন। তারা সাধারণ সদস্য হিসেবেই বিবেচিত হন।

সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনের যৌক্তিকতা : যুক্তি দেখানো হয়ে থাকে যে, নারীসমাজ পশ্চাৎপদ। তাই তাদের উন্নয়নের লক্ষ্যে এবং সম অধিকার প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব রাখা

একান্ত প্রয়োজন। মূলত সংসদে নারী আসন সংরক্ষণের পেছনে নিম্নলিখিত যুক্তিসমূহ উপস্থাপন করা হয় :

১. নারীকে রাজনৈতিক মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণ।
২. সংসদ অলংকরণ।
৩. সরকারি দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে এবং সরকার গঠনে সহায়তা।
৪. নির্বাচনী ব্যয় সংকোচন।
৫. রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব সংঘাত নিরসন।
৬. সমাজে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং নারী উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিতকরণ।
৭. নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়ন এবং দেশের নারীদের দক্ষতার বহিঃপ্রকাশের মাধ্যম।
৮. দেশের সার্বিক উন্নয়নে নারী-পুরুষের সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ।

কিন্তু দুঃখের বিষয় হলেও সত্যি যে উপরিউক্ত যুক্তির বাস্তবতার নিরিখে বাংলাদেশ সংবিধানে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন রাখা হয়নি। বরং এই ৪৫ জন নারী সাংসদ বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে শাসকদের বা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তাই বলা হয়, "Women members are being used as tools of the majority party in Bangladesh." কারণ সংবিধানের সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে ৩০০ জন সাধারণ সদস্য যখন সংবিধানের ৬৫(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্বাচিত হন, তখন যদি কোনো দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে (যদি ১৫১টি আসনে বিজয়ী হয়) তাহলে উক্ত দল তাদের ভোট দিয়ে ৫০টি নারী (সংরক্ষিত) আসনের সবকটিতে জয়ী হতে পারে। সুতরাং দলীয়করণ ব্যতীত কোনো নারীর সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ থাকে না।

আবার, যদি কোনো দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নাও পায় (৩০০টি আসনের মধ্যে যদি ১৫১টি না পায়) তাহলেও বিভিন্নভাবে ঐ সংরক্ষিত নারী আসনের অধিকাংশ আসনে জয়ী হয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার পথ সৃষ্টি করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৯১ সালের পঞ্চম জাতীয় সংসদের ৩০০ জন সাধারণ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর দেখা গেল কোনো দলই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। বিএনপি ১৪০টি আসন পেয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। পরবর্তীতে বিএনপি জামায়াতে ইসলামী দলের সমর্থন আদায় করে তারা যৌথভাবে ৩০টি সংরক্ষিত নারী আসনে প্রার্থী মনোনীত করে এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী ২৮টি নারী আসন বিএনপির পক্ষে যায় এবং ২টি যায় জামায়াতে ইসলামীর পক্ষে। উল্লেখ্য, অন্য কোনো দল নারী আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেনি এবং এরূপ প্রেক্ষিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার প্রশ্নই আসে না। সুতরাং এই নারীদের ৪৫টি সংরক্ষিত আসনের মাধ্যমে কোনো দল ক্ষমতায় যাওয়ার পথ সুগম করতে পারে; ক্ষমতায় টিকে থাকার (যেমন অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপিত হলে সরকারি দল নারী সাংসদদের ব্যবহার করতে পারে) পথ দৃঢ় করতে পারে এবং বিভিন্ন আইন পাস করিয়ে নিতে পারে অনায়াসে। সুতরাং এদিক থেকে বিচার করলে নারী সাংসদদের জন্য এরূপ সংরক্ষিত আসন রাখা কোনো দিক দিয়েই যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না।

দ্বিতীয়ত, নারীরা পুরুষের সাথে সমানভাবে পাল্লা দিয়ে সংবিধানের ৬৫(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশের যে কোনো এলাকা থেকে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে সাংসদ নির্বাচিত হতে পারে। সুতরাং নারীর জন্য সংরক্ষিত আসনের প্রয়োজন পড়ে না। তবে অনেক সময় যুক্তি দেখানো হয় যে নারীদের পুরুষের মতো সার্বিকভাবে রাজনীতিতে প্রবেশ করতে পারে না এবং সে কারণে তাদের জন্য সংরক্ষিত আসন রাখা প্রয়োজন।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

অন্যান্য দেশের সংবিধানের বিধান : উন্নত গণতান্ত্রিক বিশ্বে আইন প্রণয়নকারী সংস্থায় নারীদের জন্য আলাদা সংরক্ষিত আসনের ঘটনা সাধারণত নজীরবিহীন। যুক্তরাজ্য এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাংবিধানিক পদ্ধতিতে এ ধরনের কোনো বিধান নেই। এমনকি বর্তমান ভারত, সিঙ্গাপুর ইত্যাদি দেশের সংবিধানেও এরূপ কোনো বিধান নেই। কতিপয় দেশের সংবিধানে অনগ্রসর সংখ্যালঘু বা তফসিলী সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত আসন রাখার বিধান থাকে। এরূপ তফসিলী সম্প্রদায়ের জন্য আসন রাখার পেছনে যে বাস্তব কারণ তা হলো :

১. এরা শুধু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ই নয়, উপরন্তু এরা শিক্ষায় অনগ্রসর, অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল এবং এদের ভাষা, সংস্কৃতি, সামাজিক আচার ব্যবহার অন্যান্য সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।
২. এদের ভাষা অনেক ক্ষেত্রে এক হলেও বিশেষ সংস্কৃতি এদেরকে সাধারণ জাতি থেকে পৃথক করেছে এবং এরা সুদীর্ঘকাল ধরে সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে অত্যাচারিত এবং অবহেলিত হয়ে আসছে।
৩. এরা এমন পশ্চাৎপদ সম্প্রদায় বা উপজাতি যারা বহুদিন থেকে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে আসছে এবং হঠাৎ এসব সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হলে তারা বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হবে।
৪. যেখানে ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র ও সংবিধান প্রণীত হয় এবং সামান্য কিছু ভিন্নধর্মাবলম্বী ছাড়া অধিকাংশ লোক উক্ত রাষ্ট্রধর্মাবলম্বী সেখানে সংখ্যালঘু ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের জন্যও সংরক্ষিত আসন রাখা যায়।

সংরক্ষিত নারী আসন এবং সুশীল সমাজের প্রতিক্রিয়া : বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের সর্বশেষ সংশোধনীর মাধ্যমে নারী আসন ৫০টিতে উন্নীত করা হলেও বিভিন্ন মহল তাদের মতামত প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ তাদের মতামত প্রকাশ করে বলে, সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা ৬৪টি করা এবং সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে নারী-পুরুষ সব ভোটার কর্তৃক নির্বাচিত করতে হবে। জাতীয় নির্বাচনের সময় সাধারণ আসন এবং নারী আসনের জন্য আলাদাভাবে প্রার্থী নির্বাচন পদ্ধতি প্রচলনেরও দাবি জানিয়েছে মহিলা পরিষদ। এছাড়া নারীপক্ষ তাদের মতামতে ৬৪ জেলাকে ৬৪টি আসনে বিভক্ত করা, বাধ্যতামূলক নারী প্রার্থী মনোনয়ন, বিভিন্ন দলের নারী প্রার্থীদের মাঝে প্রত্যক্ষ ভোট পদ্ধতির মাধ্যমে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং জাতীয় নির্বাচনকালে দুটি ব্যালট বাক্স এবং ভোটারগণের একই সাথে দুটি ভোট প্রদানের দাবি তুলে ধরেন। তবে সকলের মতামতের মধ্যেই একটি বিষয় ফুটে ওঠে, সেটি হলো, নারীদের সংরক্ষিত আসনসমূহকে যেন শুধুমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠতা বৃদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা না হয়। বরং তাদেরকে যেন দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত করা হয়।

সংরক্ষিত নারী আসনের বিভিন্ন সমস্যাবলী :

১. জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত না হওয়ায় জনসমর্থন থাকে না।
২. সংরক্ষিত আসনের সংসদ সদস্য এবং সরাসরি আসনে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি হয়।
৩. নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়নে অন্তরায় সৃষ্টি করে।
৪. রাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্ট হওয়ায় যোগ্য লোক নির্বাচিত হয় না।
৫. সামাজিক দায়বদ্ধতা তুলনামূলকভাবে কম।
৬. দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারী সদস্যগণ প্রকৃত ভূমিকা রাখতে পারে না।
৭. সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত হওয়ার ফলে সংশ্লিষ্ট আসনে একাধিক জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ার এবং নারীদের জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি না থাকায় উভয়ের মাঝে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়।

সংরক্ষিত নারী আসনের সমস্যাসমূহ দূরীকরণে সুপারিশসমূহ : দেশের পশ্চাৎপদ নারী সমাজের সঠিক প্রতিনিধিত্ব এবং সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনের সূত্রপাত হলেও বর্তমানে এ ব্যবস্থাটি নানা অসুবিধায় জর্জরিত। এ সমস্যাসমূহ দূরীকরণে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে।

১. নারীদের জন্য কিছু সাধারণ নির্বাচনী এলাকা সংরক্ষিত রাখার বিধান করা যেতে পারে যাতে করে নারী প্রার্থীরা প্রত্যক্ষভাবে জনগণের ভোটে উক্ত এলাকা থেকে নির্বাচিত হতে পারে। এতে নারীদের নির্বাচন প্রক্রিয়াটি আরও স্বচ্ছ এবং প্রতিনিধিত্বমূলক হবে।
২. দেশের প্রতিটি জেলায় নারীদের জন্য একটি করে আসন সংরক্ষণ করা যেতে পারে।
৩. বর্তমান ইউনিয়ন পরিষদ বা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের অনুরূপ প্রতি জেলায় অথবা প্রতি তিনটি আসনে একজন করে সংরক্ষিত নারী প্রার্থী নির্বাচিত হতে পারে।
৪. নারী প্রার্থীদের জন্য আলাদা ব্যালট বাক্স ও ব্যালট পেপার এবং নির্বাচনের বিশেষ নীতিমালা প্রণীত হতে পারে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন এবং সরকারের সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
৫. সংরক্ষিত নারী আসনের নির্বাচনকে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
৬. সংরক্ষিত নারী আসনের প্রার্থীগণ শুধু সংসদে সরকারি দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতার হাতিয়ার না হয়ে, তারা যাতে সত্যিকারের নারী সমাজের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে এ ব্যাপারে সকলকে দৃষ্টি রাখতে হবে।
৭. সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত নারী প্রার্থীদেরকে তাদের স্ব স্ব এলাকার উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে।
৮. নারী সাংসদ (সংরক্ষিত) এবং সাধারণভাবে নির্বাচিত সাংসদদের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য সৃষ্টি করতে হবে এবং বিদ্যমান যাবতীয় বৈষম্য দূর করতে হবে।
৯. নারীদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে এবং তাদেরকে বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে।
১০. সংরক্ষিত নারী আসনের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা এবং আইন প্রণয়ন একান্ত জরুরি। তাই এ বিষয়ে দেশের সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে।
১১. সংরক্ষিত নারী আসন এবং জাতীয় উন্নয়নে নারীর ভূমিকা সম্পর্কে দেশের সর্বস্তরের জনগণকে সচেতন হতে হবে।
১২. নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়নের ব্যাপারে সরকার এবং সর্বস্তরের মানুষকে যার যার অবস্থান থেকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

উপসংহার : একটি দেশের রাজনৈতিক তথা সামাজিক সংস্কৃতির উপর সে দেশের নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতা নির্ভর করে। তাই সাম্প্রতিক সময়ে জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনে পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি, সংরক্ষিত আসনে নারীদের ক্ষমতাহীনতা, কম গুরুত্ব, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর ভঙ্গুর অবস্থান ইত্যাদি বিষয়গুলো অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হচ্ছে। নারীর জন্য সাধারণ আসনে কোটা নির্ধারণ বা সংরক্ষণে কোনো প্রক্রিয়া চালু না রেখে অতিরিক্ত ৫০টি আসন বরাদ্দ এবং এ ধরনের পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নারী আসন সংরক্ষণের নজির বিশ্বের আর কোথাও নেই। এ ধরনের নারী কোটা সংরক্ষণ প্রকৃতপক্ষে অবমাননাকর বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন। তাই সংরক্ষিত নারী আসনের পুনর্বিন্যাস আজ সময়ের দাবি। এ ব্যাপারে সরকারসহ সর্বস্তরের জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে এবং পাশাপাশি নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়নের বিষয়টিও বিবেচনা করতে হবে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-০১ বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির অভিশংসন পদ্ধতি কিরূপ?

উত্তর : সংবিধান লঙ্ঘন, গুরুতর অসদাচরণ, শারীরিক ও মানসিক অক্ষমতার কারণে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসিত করা যায়। এরূপ ক্ষেত্রে সংসদের মোট সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের স্বাক্ষর সংবলিত অভিযোগ লিপিবদ্ধ করে প্রস্তাবটি স্পিকারের নিকট প্রদান করতে হবে। নোটিশ প্রদানের দিন থেকে চৌদ্দ দিনের পূর্বে বা ত্রিশ দিনের পর এ প্রস্তাব আলোচিত হতে পারবে না। স্পিকার অভিযোগটি সংসদে উপস্থাপন করবেন। এ সময় রাষ্ট্রপতি বা তার প্রতিনিধি উপস্থিত থাকতে পারবে। অভিযোগটি সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য কর্তৃক গৃহীত হলে রাষ্ট্রপতি তার পদ থেকে অপসারিত হবেন।

প্রশ্ন-০২ অর্থ বিল কি?

উত্তর : অর্থ বিল বলতে আমরা সে বিলকে বুঝি যাতে কর ধার্য, তার পরিবর্তন, ঋণ গ্রহণ বা ঋণ পরিশোধ, ব্যয়ের মঞ্জুরি প্রভৃতি আলোচিত হয়। কোনো বিল অর্থ বিল কিনা এ ব্যাপারে স্পিকারের মতামতই চূড়ান্ত। অর্থ বিল রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতীত জাতীয় সংসদে পেশ করা যায় না।

প্রশ্ন-০৩ সংসদের কার্যপদ্ধতির বিবরণ দিন।

উত্তর : বাংলাদেশের আইনসভার নাম জাতীয় সংসদ। সংসদের কার্যকাল ৫ বছর। এর পূর্বেও রাষ্ট্রপতি সংসদ ভেঙে দিতে পারেন। তবে প্রজাতন্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত থাকলে সংসদের কার্যকাল এক বছর বাড়ানো যায়। রাষ্ট্রপতি সংসদের অধিবেশন আহ্বান, স্থগিত ও ভঙ্গ করেন। সাধারণ নির্বাচনের পর ৩০ দিনের মধ্যে সংসদের অধিবেশন আহ্বান করতে হয়। সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৬০ জন সদস্য উপস্থিত থাকলে সংসদের কোরাম গঠিত হয়। সংসদের প্রথম বৈঠকে সদস্যদের মধ্য থেকে একজন স্পিকার ও একজন ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হবেন।

প্রশ্ন-০৪ আইন বিভাগ কিভাবে নির্বাহী বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে?

উত্তর : বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রিসভা একক ও যৌথভাবে আইনসভার নিকট দায়ী থাকে। সংসদ অনাস্থা জ্ঞাপন করলে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হয়। তাছাড়া সংসদ মুলতবি প্রস্তাব, নিন্দা প্রস্তাব, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা এবং অনাস্থা প্রস্তাবের দ্বারা শাসন বিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে থাকে।

প্রশ্ন-০৫ বাংলাদেশে মোট কতবার গণভোট অনুষ্ঠিত হয়?

উত্তর : বাংলাদেশে মোট তিনবার গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে দু বার প্রশাসনিক গণভোট এবং একবার সাংবিধানিক গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশে সর্বপ্রথম গণভোট অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৭ সালের ৩০ মে। এটি প্রেসিডেন্ট হিসেবে জিয়াউর রহমানের ক্ষমতাকে বৈধতা দানের জন্য অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশে দ্বিতীয়বার গণভোট অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৫ সালের ২১ মার্চ। এ গণভোট জেনারেল এরশাদের ক্ষমতাকে বৈধতা দানের জন্য অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশে সর্বপ্রথম সাংবিধানিক গণভোট অনুষ্ঠিত হয়

১৯৯১ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর। দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশে সংসদীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে এর পক্ষে গণসমর্থন আদায়ের জন্য এ গণভোট অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশ্ন-০৬ মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকারের পার্থক্য লিখুন।

উত্তর : মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকারের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

১. সব মৌলিক অধিকারই মানবাধিকার কিন্তু সকল মানবাধিকার মৌলিক অধিকার নয়। কেবল ঐসব মানবাধিকার মৌলিক অধিকার যেগুলো কোনো দেশের সংবিধানে লিপিবদ্ধ করা হয়। সুতরাং মানবাধিকারের ক্ষেত্র ব্যাপক কিন্তু মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্র সংকীর্ণ।

২. মৌলিক অধিকারের উৎস হলো কোনো দেশের সংবিধান কিন্তু মানবাধিকার হলো আন্তর্জাতিক আইনের বিষয়।

৩. মৌলিক অধিকার নির্দিষ্ট দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ কিন্তু মানবাধিকার কোনো ভৌগোলিক সীমারেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়।

৪. মৌলিক অধিকারগুলো দেশের সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত এবং সাংবিধানিক নিশ্চয়তা দ্বারা সংরক্ষিত। ফলে এগুলো বলবৎ করা যায় কিন্তু মানবাধিকারকে তদ্রূপ বলবৎ করা যায় না।

৫. মানবাধিকারগুলো পৃথিবীর প্রত্যেকের কাছে সমভাবে প্রযোজ্য কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকারগুলো নাগরিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করা হয়।

প্রশ্ন-০৭ বাংলাদেশের আইনসভার নাম কি?

উত্তর : আইনসভা সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আইনসভা বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশের আইনসভা 'জাতীয় সংসদ' নামে পরিচিত। এটি একটি এক কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা। দেশের জন্য আইন প্রণয়নের ক্ষমতা জাতীয় সংসদের ওপর ন্যস্ত। সংসদ যে কোনো নতুন আইন প্রণয়ন এবং প্রচলিত আইনের পরিবর্তন বা সংশোধন করতে পারে। জাতীয় সংসদ মোট ৩৫০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। এদের মধ্যে ৩০০ জন নাগরিকদের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হন। ৫০টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। সংরক্ষিত আসনে মহিলা সদস্যগণ সংসদের নির্বাচিত সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হন।

প্রশ্ন-০৮ ককাস কি?

উত্তর : ককাস একটি অনানুষ্ঠানিক গ্রুপ, যারা কোনো বিষয় আনুষ্ঠানিকভাবে উপস্থাপনের পূর্বে নিজেদের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য মিলিত হয়। বহুপাক্ষিক কূটনীতিতে এ ধরনের তৎপরতা বেশি পরিলক্ষিত হয়। বহুপাক্ষিক কূটনীতিতে ককাসকেন্দ্রিক সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়া অত্যন্ত সাধারণ দৃশ্য। জাতিসংঘ, যুক্তরাষ্ট্রসহ বহু সংস্থায় ও দেশে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের নীতি নির্ধারণীতে ককাসের গঠন লক্ষণীয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কংগ্রেসের কয়েকটি ককাস হলো- ইসরাইল বিষয়ক ককাস, ভারত বিষয়ক ককাস, বাংলাদেশ বিষয়ক ককাস (বাংলাদেশ ককাস)।

বাংলাদেশ ককাস হলো মার্কিন কংগ্রেসের একটি সুনির্দিষ্ট প্রতিনিধিদল (সদস্য সংখ্যা ৩৪), যার কাজ হলো যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের স্বার্থ দেখভাল করা ও বাংলাদেশের সমসাময়িক বিষয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে কংগ্রেসকে অবহিত করা। একসময় যুক্তরাষ্ট্রে কেবল নির্বাচনের ক্ষেত্রে দলীয় প্রার্থী মনোনয়নের জন্য ককাস গঠন করা হতো। কিন্তু বর্তমানে এটি রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের বহুল ব্যবহৃত একটি শব্দ যা যুক্তরাষ্ট্রের সীমানা পেরিয়ে বর্তমানে বাংলাদেশেও কয়েকটি সংসদীয় ককাস গঠিত হয়েছে। যার উদ্দেশ্য হলো সুনির্দিষ্ট বিষয়ে নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

খ. নির্বাহী বিভাগ (Executive)

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১. *'বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী অতিমাত্রায় ক্ষমতার অধিকারী'– এ উক্তির পক্ষে ও বিপক্ষে আপনার বক্তব্য উপস্থাপন করুন। [৩২তম বিসিএস]*

অথবা, বর্তমানে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলী আলোচনা করুন।

অথবা, বাংলাদেশের বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলী আলোচনা করুন।

০২. *সুশাসন বলতে কি বুঝায়? সুশাসনের সাথে দুর্নীতি দমনের কোনো সম্পর্ক আছে কি? সুশাসন প্রতিষ্ঠায় মৌলিক বিষয়গুলো কি কি– আলোচনা করুন। [২৮তম বিসিএস]*

অথবা, 'সুশাসন জনপ্রশাসনের জন্য একটি নব্য সংস্কৃতি'— প্রত্যয়টি ব্যাখ্যাপূর্বক সুশাসন-এর উপরে বিস্তারিত আলোচনা করুন। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের সাফল্য-ব্যর্থতা আপনার সুপারিশসহ আলোচনা করুন। [২৯তম বিসিএস]

অথবা, সুশাসন জনপ্রশাসনের একটি সর্বগৃহীত বৈশিষ্ট্য হিসেবে স্বীকৃত। বিষয়টি ব্যাখ্যাপূর্বক সুশাসন-এর উপরে বিস্তারিত আলোচনা করুন। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের সাফল্য ব্যর্থতা এবং আপনার মতামত বর্ণনা করুন। [৩৪তম বিসিএস]

০৩. *বাংলাদেশে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে এ ব্যবস্থা বাতিলের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করুন। [২৯তম বিসিএস]*

০৪. *স্থানীয় সরকার পর্যায়ে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ব্যতীত সত্যিকার অর্থে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ সম্ভব নয়— বিশ্লেষণ সহকারে ব্যাখ্যা করুন। [৩২তম বিসিএস]*

অথবা, বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।

০৫. *কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে স্থানীয় সরকারের সম্পর্ক সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কি হওয়া উচিত? [৩১তম বিসিএস]*

০৬. *স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের দুর্বল দিকগুলো উল্লেখ করুন। [৩১তম বিসিএস]*

০৭. *উপজেলা পদ্ধতির ভালো-মন্দ দিকগুলো উল্লেখ করুন। উপজেলা পদ্ধতির স্থানীয় সরকার পুনরায় চালু করা উচিত কিনা যুক্তি সহকারে আলোচনা করুন। [২৪তম বিসিএস]*

অথবা, প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ কি? উপজেলা পদ্ধতির ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলো তুলে ধরে এর বাস্তবায়নে আপনার মতামত তুলে ধরুন।

০৮. *স্থানীয় সরকার বলতে কি বোঝেন? দেশে কয়টি স্থানীয় সরকার গঠন এবং কোন স্তরে কি কি ক্ষমতা ও দায়িত্ব থাকা সমীচীন বলে আপনি মনে করেন? [১৮তম বিসিএস]*

অথবা, স্থানীয় সরকারকে আরও কার্যকর করার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট পরামর্শ দিন। [২৭তম বিসিএস]

অথবা, গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার গুরুত্ব কতটুকু? সংক্ষেপে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বর্ণনা দিন। [২৯তম বিসিএস]

০৯. *বাংলাদেশে প্রশাসনিক সংস্কারের আবশ্যকতা কত দূর? এক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়সমূহ দূরীকরণে আপনার সুপারিশ আলোচনা করুন। [২০তম বিসিএস]*

অথবা, বাংলাদেশের প্রশাসন ব্যবস্থাকে একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার উপযোগী করে তুলতে হলে কি করা উচিত বলে আপনি মনে করেন?

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

১০. *নির্বাহী বিভাগ বা শাসন বিভাগের ক্ষমতা ও কার্যাবলী আলোচনা করুন।*

অথবা, আধুনিক রাষ্ট্রে নির্বাহী বিভাগের ক্ষমতা ও কার্যাবলী আলোচনা করুন।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

১১. *বাংলাদেশের আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাসমূহ কি কি? দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় বাংলাদেশ পুলিশের ভূমিকা বর্ণনা করুন।*
১২. *বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা, ক্ষমতা ও কার্যাবলী আলোচনা করুন।*
১৩. *বাংলাদেশের উন্নয়নে আমলাতন্ত্রের ভূমিকা বর্ণনা করুন।*
১৪. *বর্তমানে কয়টি স্তরে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে? গ্রামীণ উন্নয়নে স্থানীয় সরকারের ভূমিকা আলোচনা করুন।*
১৫. *স্থানীয় সরকার বলতে কি বোঝায়? বাংলাদেশের সংবিধানে স্থানীয় সরকার সম্পর্কে কি বলা হয়েছে? গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও সুশাসনের জন্য স্থানীয় সরকারের ভূমিকা আলোচনা করুন।*
১৬. *বাংলাদেশের প্রশাসনিক সংস্কার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন।*

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

০১. *রাষ্ট্রপতি কখন অধ্যাদেশ (Ordinance) জারি করেন?*
০২. *বাংলাদেশে প্রথম কখন জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়?*
০৩. *প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল সম্পর্কে কি জানেন?*
০৪. *বিশেষ ক্ষমতা আইন চালু রাখার যৌক্তিকতা কি?*
০৫. *রুলস অব বিজনেস কি?*
০৬. *মহামান্য রাষ্ট্রপতি পদাধিকার বলে কোন কোন সংস্থার প্রধান? [৩৩তম বিসিএস]*
০৭. *প্রশাসনিক স্বচ্ছতা কি?*
০৮. *বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোর বর্ণনা দিন।*
০৯. *বাংলাদেশ সচিবালয়ের পদবিন্যাস কিরূপ?*
১০. *বাংলাদেশে বর্তমানে কয় স্তরবিশিষ্ট স্থানীয় সরকার রয়েছে?*
১১. *গ্রাম আদালত কি?*
১২. *উপজেলা পদ্ধতি সম্পর্কে কি জানেন?*
১৩. *স্থানীয় সরকারে নারীর অংশগ্রহণ নারীর ক্ষমতায়নে কতটুকু সহায়ক?*
১৪. *প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ বলতে কি বোঝেন? [২৭তম বিসিএস]*
১৫. *বাংলাদেশের জনপ্রশাসন সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।*
১৬. *স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার কি?*
১৭. *পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ সম্পর্কে কি জানেন?*

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১ । 'বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী অতিমাত্রায় ক্ষমতার অধিকারী'– এ উক্তির পক্ষে ও বিপক্ষে আপনার বক্তব্য উপস্থাপন করুন। *[৩২তম বিসিএস]*

অথবা, বর্তমানে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলী আলোচনা করুন।

অথবা, বাংলাদেশের বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলী আলোচনা করুন।

উত্তর : ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছিল। পরবর্তীতে ১৯৭৫ সালে চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে দেশে একদলীয় রাষ্ট্রপতিশাসিত শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। ১৯৯০-এর গণঅভ্যুত্থান এবং ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি সাধারণ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রবল জনমত সৃষ্টি হয়। সংসদীয় গণতন্ত্রে প্রধানমন্ত্রীই কার্যত প্রধান শাসক এবং শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলী : ১৯৯১ সালের দ্বাদশ সংশোধনী আইন অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী 'কেবিনেট স্থাপত্যের প্রধান প্রস্তর' হিসেবে গণ্য হন। কেননা, কেবিনেট তথা মন্ত্রিপরিষদের সাফল্য এবং ব্যর্থতা প্রধানমন্ত্রীর ওপর নির্ভরশীল। নিচে বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলী আলোচনা করা হলো :

১. **সার্বিক ক্ষমতার অধিকারী :** সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী অনুযায়ী যাবতীয় নির্বাহী সংক্রান্ত ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর দ্বারাই পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। রাষ্ট্রপতি শুধু নামসর্বস্ব প্রধান হিসেবে থাকবেন। তিনি সকল ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করবেন। উচ্চ পদে নিয়োগ, পররাষ্ট্র বিষয়ক ও যাবতীয় অর্থ সংক্রান্ত কার্যাদি প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই পরিচালিত হয়।

২. **সংসদে নেতৃত্ব দান :** প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংসদের নেতা। তিনি একজন সদস্যও। তার পরামর্শে প্রেসিডেন্ট সংসদের অধিবেশন আহ্বান ও স্থগিত করেন। তার পরামর্শে সংসদ ভেঙে দেয়া হয়। তার সাথে পরামর্শ করে স্পিকার সংসদ অধিবেশনের কর্মসূচি নির্ধারণ করেন। সংসদে তিনি সরকারের মুখপাত্র হিসেবে সকল গুরুত্বপূর্ণ বিল ও সরকারি নীতির ব্যাখ্যা দেন। তার নির্দেশমতো দলীয় হুইপ সংসদে দলীয় সদস্যগণকে নিয়ন্ত্রণ করেন। সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সমর্থন হারালে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ অথবা রাষ্ট্রপতিকে সংসদ ভেঙে দেয়ার পরামর্শ প্রদানের মধ্যে যে কোনো একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। মূলত তিনিই সংসদের প্রধান নিয়ন্ত্রক।

৩. **মন্ত্রিসভার সর্বেসর্বা :** প্রধানমন্ত্রীই মন্ত্রিপরিষদের প্রধান এবং সর্বেসর্বা। তাকে কেন্দ্র করেই মন্ত্রিপরিষদ গঠিত। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শেই মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী নিয়োগ করা হয়। তার স্থায়িত্বের ওপর মন্ত্রিসভার স্থায়িত্ব নির্ভরশীল। তিনি পদত্যাগ করলে মন্ত্রিসভার পতন ঘটে।

৪. **নির্বাহী কর্তা :** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সকল নির্বাহী ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির নামে পরিচালিত হয়। কিন্তু এর বাস্তব প্রয়োগের কর্তৃত্ব প্রধানমন্ত্রীর হাতে ন্যস্ত। রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ ও প্রধান বিচারপতি নিয়োগ ব্যতীত সকল কাজ প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শমতো সম্পাদন করবেন। প্রধানমন্ত্রী নিজে মন্ত্রিসভার সদস্যগণের মাধ্যমে কিংবা প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের মাধ্যমে বাংলাদেশের নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগ, আইনে সম্মতিদান, অধ্যাদেশ জারি, দণ্ড মওকুফ বা হ্রাস ইত্যাদি সকল কাজে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ করেন।

৫. **আইনসভার প্রধান :** সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংসদের নেতা। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতিকে সংসদ অধিবেশন আহ্বান, স্থগিত ও মুলতবি রাখতে হয়। সংসদের কর্মসূচি প্রণয়নে সংসদ নেতা হিসেবে তার ভূমিকাই প্রধান।

৬. **আইন প্রণয়নে ভূমিকা :** সংসদ নেতা হিসেবে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংসদে উত্থাপিত কোনো বিল সংসদে পাস না হলে সংসদের নেতা হিসেবে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে সংসদ বা মন্ত্রিপরিষদ ভেঙে দেয়ার পরামর্শ দিতে পারেন।

৭. **জাতীয় নিরাপত্তা এবং সংহতির প্রতীক :** প্রধানমন্ত্রী জাতীয় নিরাপত্তা এবং সংহতির প্রতীক। জাতীয় প্রতিরক্ষা তার অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। সংকটকালে সম্পূর্ণ প্রতিরক্ষা দপ্তর প্রধানমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণে আসে। এ সময় জাতীয় নিরাপত্তা এবং রাষ্ট্রের সংহতির জন্য তিনি সম্ভাব্য সবকিছু করতে পারেন।

৮. **জরুরি অবস্থায় :** দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষিত হলে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা অপ্রতিহত হয়ে ওঠে। জরুরি অবস্থায় কোনো সিদ্ধান্তগ্রহণের জন্য প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিপরিষদকে পর্যন্ত এড়িয়ে যেতে পারেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারি করতে পারেন।

৯. **অর্থনৈতিক কার্যাবলী :** জাতীয় সংসদ জাতীয় তহবিলের অভিভাবক। প্রধানমন্ত্রী অর্থমন্ত্রীকে বাজেট প্রণয়নের ব্যবস্থা ও তা সংসদে পেশ করার নির্দেশ দেন। তাছাড়া প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহের ব্যাপারে সংসদ অর্থ মঞ্জুরি দিতে অসমর্থ হলে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি ষাট দিনের জন্য অর্থ মঞ্জুরি দিতে পারেন।

১০. **রাজনৈতিক দলের নেতা :** ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের নেতা হচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। এ দল সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করার ফলেই তিনি প্রধানমন্ত্রিত্ব লাভ করেন। দলীয় নীতি ও কর্মসূচি সংসদীয় সমর্থনের ভিত্তিতে বাস্তবায়নে তিনি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। আবার সরকারি নীতি ও কর্মসূচি নিজ দলকে অবহিত করে সে ব্যাপারে স্থানীয় পর্যায়ে প্রচার ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য দলকে নির্দেশ দেন। সংসদে তার দলীয় সদস্যগণ তার নির্দেশমতো ভূমিকা পালন করেন। সংবিধানের ৭০ নং অনুচ্ছেদ সংসদে নিজ দলীয় সদস্যদের নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীকে প্রভূত ক্ষমতা দান করেছে। তার ভাবমূর্তিই দলের ইমেজ বৃদ্ধি ও ক্ষুণ্ন করার প্রধান মাপকাঠি।

১১. **জাতীয় নেতা :** জাতীয় নেতার ভূমিকায় প্রধানমন্ত্রীর স্থান সবার ঊর্ধ্বে। জাতীয় সংসদের প্রধান নেতা হিসেবে তিনি বহির্বিশ্বেও প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি বিবৃতি ও বক্তৃতা দানের মাধ্যমে জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন।

১২. **পররাষ্ট্রনীতির প্রধান নির্ধারক :** প্রধানমন্ত্রী পররাষ্ট্র বিভাগের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। তার সম্মতি ব্যতীত কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদিত হতে পারে না। আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তিনিই রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন।

১৩. **পদস্থ কর্মচারীদের নিয়োগদান :** তত্ত্বগতভাবে রাষ্ট্রপতি বিভিন্ন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী, বিচারক, রাষ্ট্রদূত প্রভৃতি নিয়োগ করতে পারলেও কার্যত তিনি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমেই নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদন করেন।

১৪. **সেতুবন্ধনস্বরূপ :** প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি এবং মন্ত্রিপরিষদের মধ্যে সেতুবন্ধনস্বরূপ। সংবিধানের ৪৮ (৫) ধারা অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রীদের সিদ্ধান্তসমূহ রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করেন এবং রাষ্ট্রপতির উত্থাপিত কোনো বিষয় বিবেচনার জন্য তিনি তা মন্ত্রিসভায় আলোচনা করেন।

১৫. **সংসদীয় কমিটি গঠন :** সংসদীয় সরকারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্থায়ী কমিটির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এসব কমিটির ভূমিকা যথাযথভাবে পালিত হওয়া, না হওয়ার ওপরে সরকারের সাফল্য/ব্যর্থতা নির্ভর করে। প্রধানমন্ত্রী এসব কমিটির সদস্যপদে তার দলীয় সংসদ সদস্যদের মনোনীত করেন।

১৬. **জনমতের নিয়ামক :** প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত ও কার্যাবলি দেশের জনমতের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। বিশেষত সংসদে তার বিবৃতি ও বক্তব্য বিরোধী দল ও সরকারি দলের সদস্যদের মাধ্যমে জনগণের নিকট পৌঁছায়। জনগণ এসবের ওপর যে প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে তা সরকারি সিদ্ধান্ত ও কার্যক্রমকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে। অতএব প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিত্ব, ভাবমূর্তি, জনসংযোগ ইত্যাদি সরকারকে কার্যকর ভূমিকা পালনে সহায়তা করে থাকে।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, দ্বাদশ সংশোধনী আইনে বাংলাদেশের সংবিধানে প্রধানমন্ত্রীকে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত শাসন ব্যবস্থার মূল চালিকাশক্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। তাকে কেন্দ্র করেই মন্ত্রিসভার গঠন, স্থায়িত্ব, উত্থান, পতন আবর্তিত। তাই বাংলাদেশ সংবিধান অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীকে রাষ্ট্রের কর্ণধার বলা হয়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

০২। সুশাসন বলতে কি বুঝায়? সুশাসনের সাথে দুর্নীতি দমনের কোনো সম্পর্ক আছে কি? সুশাসন প্রতিষ্ঠায় মৌলিক বিষয়গুলো কি কি– আলোচনা করুন। *[২৮তম বিসিএস]*

অথবা, 'সুশাসন জনপ্রশাসনের জন্য একটি নব্য সংস্কৃতি'— প্রত্যয়টি ব্যাখ্যাপূর্বক সুশাসন-এর উপরে বিস্তারিত আলোচনা করুন। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের সাফল্য-ব্যর্থতা আপনার সুপারিশসহ আলোচনা করুন। *[২৯তম বিসিএস]*

অথবা, সুশাসন জনপ্রশাসনের একটি সর্বগৃহীত বৈশিষ্ট্য হিসেবে স্বীকৃত। বিষয়টি ব্যাখ্যাপূর্বক সুশাসন-এর উপরে বিস্তারিত আলোচনা করুন। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের সাফল্য ব্যর্থতা এবং আপনার মতামত বর্ণনা করুন। *[৩৪তম বিসিএস]*

উত্তর : সুশাসন বা Good governance হচ্ছে বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে একটি ব্যাপক প্রচলিত ধারণা, যার মাধ্যমে দেশের জনগণ কিভাবে শাসিত হবে, কিভাবে রাষ্ট্র পরিচালিত হবে, রাষ্ট্র ও সরকারের সম্পর্ক কেমন হবে ইত্যাদি জানা যায়। আধুনিক সরকারের মূল লক্ষ্য হচ্ছে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বিরাজমান সকল সমস্যার সমাধান ঘটিয়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। মূলত রাষ্ট্রকে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও সঠিক পরিচালনার মাধ্যমে উৎকর্ষের শীর্ষে পৌঁছে দেয়াই হচ্ছে সরকারের প্রধান কর্তব্য। সরকার যদি প্রকৃত অর্থেই জনগণের কাছে দায়িত্বশীল, দায়বদ্ধ, স্বচ্ছ ও কর্তব্যপরায়ণ থাকে তবেই সুশাসন বা Good governance কথাটি কার্যকর ও সফলতা লাভ করে।

সুশাসনের গুরুত্ব : বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের (3rd world) একটি উন্নয়নশীল দেশ। তাই বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশের জন্য সুশাসন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এসব দেশে অনুন্নয়নের কারণ শুধু জনশক্তির অভাব কিংবা সম্পদের অপ্রতুলতা নয়, বরং সুশাসনের অভাব এখানে অন্যতম প্রধান ভূমিকা পালন করে। এখানে সুশাসনের পথে অন্তরায় হয়ে আছে বিভিন্ন বিষয়। এখানে রয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা, আছে প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব, সাংবিধানিক শাসন ও আইনের শাসনের অনুপস্থিতি, নিরপেক্ষ ও শক্তিশালী গণমাধ্যমের অভাব, বৈদেশিক শক্তি ও দাতাগোষ্ঠীর ওপর নির্ভরশীলতা, ব্যবসায়ী-রাজনৈতিক সিন্ডিকেট, সামাজিক ঐকমত্যের অভাব, NGO-এর নগণ্য ভূমিকা, Charismatic leader-এর অভাব এবং রাজনৈতিক দল ও নির্বাচনী ব্যবস্থায় ত্রুটি ও দুর্বল স্থানীয় সরকার কাঠামো।

সুশাসনের সংজ্ঞা : এখন পর্যন্ত বিশ্বের কোনো একাডেমিক মহল থেকে বিভিন্ন দেশের উন্নয়ন অভিজ্ঞতার আলোকে সুশাসনের কোনো গ্রহণযোগ্য ও সর্বজনীন তত্ত্ব বা সংজ্ঞা দেয়া সম্ভব হয়নি। তবে সাধারণভাবে বলা যায়, সুশাসন হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যাতে দেশের সীমিত সম্পদকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করে জনগণকে অধিক সুযোগ-সুবিধা দান করা যায় বা তাদের অধিক কল্যাণ নিশ্চিত করা যায়।

Professor Dr. Ataur Rahman বলেছেন— 'Good governance implies the ability of political system, its effectiveness, performance and quality.' *[BISS Journal, Vol-14, No-4, P-461, October 1993]*

সুতরাং সুশাসন হচ্ছে এমন একটি কাঙ্ক্ষিত রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রতিফলন যেখানে শাসক ও শাসিতের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে, সর্বোচ্চ স্বাধীন বিচার বিভাগ থাকবে, আইনের শাসন থাকবে, নীতির গণতন্ত্রায়ন থাকবে, মানবাধিকারের নিশ্চয়তা থাকবে, সিদ্ধান্তগ্রহণে সকলের অংশগ্রহণ-মতামত ও পছন্দের স্বাধীনতা থাকবে এবং থাকবে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা।

সুশাসন সম্পর্কে বৈশ্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রচলিত প্রধান ২টি ধারণা আছে। ধারণা ২টি হচ্ছে—

(i) বিশ্বব্যাংকের ধারণা (World Bank View)

(ii) পশ্চিমা বিশ্বের ধারণা (Western View)।

কিন্তু সুশাসনের ধারণাটি সর্বজনীন নয় কেননা ভৌগোলিক অবস্থান, শিক্ষার হার, জীবনযাত্রার মান ও সামাজিক-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্কৃতির ভিন্নতার জন্য বাংলাদেশের সুশাসন এবং পশ্চিমা বিশ্বের সুশাসনের ধরন কিছুটা ভিন্ন।

বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সম্ভাব্য করণীয় : বাংলাদেশের সুশাসন প্রতিষ্ঠাকল্পে নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে :

১. **প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন :** ঔপনিবেশিক শাসনামলে ব্রিটিশরা তাদের স্বার্থ ব্যতীত কোনো আধুনিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেনি। ১৯৪৭-পরবর্তীতেও কোনো প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হয়নি। সামরিক শাসনে রাজনৈতিক দল, প্রতিষ্ঠান, চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী এতই দুর্বল ছিল যে, আইয়ুব খান এসব প্রতিষ্ঠানকে নিজ উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহার করেছে। বাংলাদেশ এই দুর্বল প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিয়ে স্বাধীনতা লাভ করে এবং ব্যাপক অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হয়। তাই বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন।

২. **জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা (রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক) :** সুশাসনের পূর্বশর্ত হচ্ছে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা। জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা ২ প্রকার। যথা : রাজনৈতিক জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা এবং প্রশাসনিক জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা। বাংলাদেশে রাজনীতি ও প্রশাসনে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। কারণ বাংলাদেশের রাজনীতি ও প্রশাসনে রয়েছে ক্ষমতার ঔদ্ধত্য ও অপব্যবহার, কর্মের দীর্ঘসূত্রিতা, লাল ফিতার দৌরাত্ম্য, পার্লামেন্টারি কমিটিগুলোর ব্যর্থতা, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে গণতান্ত্রিক চর্চার অভাব। তাই সহজেই অনুমেয় যে, বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে।

৩. **ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা ও স্বজনপ্রীতি পরিহার ও গণতান্ত্রিক চর্চা বৃদ্ধি :** বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থায় আজ পর্যন্ত যারা নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন তাদের মধ্যে কর্তৃত্বপরায়ণতা, পিতৃতান্ত্রিকতা, ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা ও স্বজনপ্রীতি পরিলক্ষিত হয় এবং নেতা ও দলের মধ্যে রয়েছে গণতান্ত্রিক চর্চা ও মূল্যবোধের অভাব। তাই এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা পরিহার করে অর্থাৎ নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করে গণতান্ত্রিক চর্চা তথা জাতির বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষা করতে হবে।

৪. **চারিত্রিক দৃঢ়তা বৃদ্ধি ও দুর্নীতি প্রতিরোধ :** বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতাদের চারিত্রিক দুর্বলতা অত্যন্ত প্রকট। নীতির প্রশ্নে অটল থাকা, নিজের বা অন্যের প্রতি প্রদর্শিত অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হওয়া, অন্যায় নির্দেশকে অগ্রাহ্য করা, অঙ্গীকার/প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা, ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো প্রভৃতি চারিত্রিক সবলতা নেতাদের মাঝে দেখা যায় না। কার্যত এর বিপরীত অবস্থাটিই বিদ্যমান।

দুর্নীতি সুশাসনের অন্যতম প্রধান অন্তরায়। বাংলাদেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতি পরিলক্ষিত হয়। যেমন- প্রকল্পে দুর্নীতি, সরকারি রাজস্ব আদায়ে দুর্নীতি, সরকারি-বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি, সরকারি সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি, কাবিখা প্রকল্পে দুর্নীতি, ভূমি জরিপে দুর্নীতি, পুলিশ প্রশাসনে দুর্নীতি প্রভৃতি। অতএব বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠাকল্পে অবশ্যই ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা ও স্বজনপ্রীতি পরিহার করে গণতান্ত্রিক চর্চা বৃদ্ধি করতে হবে এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে সকল ক্ষেত্রে দুর্নীতি নির্মূল করতে হবে। কেননা দুর্নীতি হচ্ছে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রধানতম অন্তরায়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৫. **বহিঃশক্তির ওপর নির্ভরশীলতা :** বিদেশী শক্তি ও সাহায্যদাতা দেশগুলোর ওপর নির্ভর করে ক্ষমতা চর্চার চেষ্টা করে থাকে আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। দেশীয় রাজনৈতিক বিষয়াদিতে বিদেশী প্রভুশক্তির অনধিকার হস্তক্ষেপ তারা মেনে নেন নির্দ্বিধায়, যা আমাদের দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অন্তরায়। তাই বহিঃশক্তির প্রভাবমুক্ত সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে।

৬. **ব্যবসায়ী-রাজনীতিবিদ সিন্ডিকেট কঠোর হস্তে দমন :** সুশাসন প্রতিষ্ঠার একটি বড় অন্তরায় হচ্ছে ব্যবসায়ী ও রাজনীতিবিদ আঁতাত। ঋণখেলাপি শ্রেণী এখন বাংলাদেশের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করছে, প্রতিনিধি নির্বাচনে অর্থের যোগান দিচ্ছে। এসব প্রতিনিধিরা অবশ্যই ব্যবসায়ীদের স্বার্থে আইন ও নীতিমালা তৈরি করে, যা সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে, অন্যদিকে এরা মাস্তান পোষে এবং আইন এদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তাই এদেরকে কঠোর হস্তে দমন করতে হবে।

৭. **দাতাগোষ্ঠীর ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস :** রেহমান সোবহান বলেন যে, বাংলাদেশের পক্ষে এখন autonomous agent হিসেবে কাজ করা সম্ভব নয়। কারণ অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠী বহিঃচাপ বিশেষ করে দাতাগোষ্ঠীর চাপে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে কোনো কাজ করতে পারে না। দেশের অর্থনীতি নির্ভর করে বিভিন্ন দেশ ও দাতাগোষ্ঠীর সাহায্যের ওপর। কাজেই কোনো নীতি নির্ধারণে তাদের মতামতকে প্রাধান্য দিতে হয়। এ অবস্থা সুশাসনের জন্য বাধাস্বরূপ। তাই বাংলাদেশকে দাতাগোষ্ঠী কিংবা দেশের ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে হবে। আর দাতাদের ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে হলে আমাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে, আর অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার জন্য রাজস্ব আয়ের টার্গেট অনুযায়ী সম্পূর্ণ আদায় করতে হবে, উন্নয়ন খাতে ব্যয় কিছুটা কমিয়ে দাতাগোষ্ঠীর কাছে হাত পাতা বন্ধ করতে হবে। তাহলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ত্বরান্বিত হবে।

৮. **রাজনৈতিক ঐকমত্য সৃষ্টি :** বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে ঐকমত্য প্রশ্নে বাধার সম্মুখীন হচ্ছে, যার ফলে আজও সমাধান হয়নি বাঙালি ও বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ দ্বন্দ্ব, স্থানীয় সরকার কাঠামো, পররাষ্ট্র নীতি ইত্যাদি। ফলে একেক রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় থাকাকালীন একেক ব্যবস্থা চালু হয় যা সুশাসনের জন্য মোটেও ইতিবাচক নয় বরং হরতাল ও অবরোধের ফলে দেশের আইন-শৃঙ্খলা ও অর্থনীতি ভেঙে পড়ে, যা সুশাসনের ব্যাপারে সমস্যার সৃষ্টি করে। অতএব বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে রাজনৈতিক ঐকমত্যে পৌঁছাতে হবে। সবার সম্মিলিত প্রয়াসে স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলতে হবে।

৯. **এনজিওদের সরকারের সহযোগী হিসেবে ভূমিকা পালনের সুযোগ সৃষ্টি :** World Bank-এর মতে, 'প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতা ও ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হলে NGO-গুলোকে স্থান দিতে হবে।' কিন্তু বাংলাদেশে শাসনের মূল দায়িত্ব সরকারের নির্বাহী বিভাগের ওপর। এখানে NGO-গুলোকে কাজ করতে হয় সরকারের নানান রকম বাধা-নিষেধের আওতায়। অর্থাৎ বাংলাদেশে NGO সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত হতে পারছে না। অথচ সুশাসনে NGO সরকারের সহযোগী এবং NGO-গুলো দেশের স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। তাই বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে NGO-গুলোকে তাদের ভূমিকা পালনের জন্য যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে।

১০. **ক্ষমতার বৈধতা :** ১৯৪৭-পরবর্তী যারা ক্ষমতায় বা নেতৃত্বে এসেছে তাদের ক্ষমতার বৈধতা নিয়ে সংকট রয়েছে। যাদের ক্ষমতা গ্রহণই প্রশ্নের সম্মুখীন তাদের দ্বারা সুশাসন কতটা সম্ভব সেটা সহজেই অনুমেয়। তাই সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য বৈধ ও স্বচ্ছ সরকার চাই।

১১. **ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ :** ক্ষমতা ও সম্পদের সুষম বন্টনের অভাবে দেশে এক শ্রেণীর লোক সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলছে আর জনগণের অপর অংশ দিনে দিনে আরও গরিব হচ্ছে। তাই বন্টন সমস্যা সুশাসন প্রতিষ্ঠার প্রধানতম বাধা হয়ে কাজ করছে। তাই বলাই বাহুল্য, বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণে আশু পদক্ষেপ নিতে হবে।

১২. **বিদ্যমান আইনের সংস্কার :** সুশাসনের অন্যতম শর্ত আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু বাংলাদেশে আইন প্রণীত হচ্ছে রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য, একদল অন্যদলকে ঘায়েল করার জন্য। আইন প্রণয়নে রয়েছে নানাবিধ সমস্যা, ফলে দেশে বিদ্যমান আইনের শাসন বিঘ্নিত হচ্ছে। অতএব সুশাসন নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় আইনগুলো সংস্কার করতে হবে।

১৩. **জাতীয় সংসদকে শক্তিশালী করা :** বাংলাদেশের পার্লামেন্ট কমবেশি রাবার স্ট্যাম্পে পরিণত হয়েছে। কারণ পার্লামেন্টের কাজ আইন প্রণয়ন, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করা হলেও Prime Minister-এর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো আইন সংসদে গৃহীত হয় না। অতএব সুশাসনের জন্য সংসদকে শক্তিশালী করতে হবে।

১৪. **রাজনৈতিক দলগুলোকে স্বচ্ছ ও শক্তিশালী করা :** সুশাসন চায় গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতামূলক দল ব্যবস্থা। কিন্তু বাংলাদেশে যেসব রাজনৈতিক দল রয়েছে এসব দলের প্রতিনিধিরা জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে জনগণকে উপেক্ষা করে। যারা দলের নেতৃত্বে আছে তারা সর্বদা নেতৃত্বেই থাকতে চায়। সিদ্ধান্তগ্রহণে দলের প্রধানের প্রাধান্য দেখা যায়। জনগণের পৃষ্ঠপোষক না হয়ে রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নে গুরুত্ব দেয় যা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অন্তরায়।

তাছাড়া রাজনৈতিক দলগুলোতে দলীয় কোন্দল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। ক্ষমতাসীনরা বিরোধীদের কোণঠাসা করে রাখতে ষড়যন্ত্র করে। আর বিরোধীরা সরকারকে বিপর্যস্ত করে অরাজকতা সৃষ্টিতে তৎপর। অতএব সুশাসনের জন্য রাজনৈতিক দলগুলোতে স্বচ্ছতা আনয়নের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৫. **স্থানীয় সরকার কাঠামো শক্তিশালীকরণ :** একটি শক্তিশালী, কার্যকর, দক্ষ, স্বায়ত্তশাসিত, জনপ্রতিনিধিত্বশীল স্থানীয় সরকার সুশাসনের অন্যতম শর্ত। যে দেশে স্থানীয় সরকার কাঠামো যত শক্তিশালী ও জনপ্রতিনিধিত্বশীল, সে দেশে গণতন্ত্র ততটাই বিকশিত। অথচ বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার সময়ের বিবর্তনের সাথে সাথে নানা রূপ পরিগ্রহ করলেও কোনো পদ্ধতি কাঙ্ক্ষিত প্রত্যাশা পূরণে সক্ষম হয়নি। তাই স্থানীয় সরকারের হাতে কেন্দ্রীয় ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে, জবাবদিহিতার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে, তবেই সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে।

১৬. **আমলাতান্ত্রিক জটিলতা রোধ :** বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতাদের দুর্বলতার সুযোগে আমলারা কর্তৃত্বপরায়ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। প্রশাসনকে গণমুখী করতে হলে আমলাতন্ত্রের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। আর আমলাতন্ত্র তথা প্রশাসনের জবাবদিহিতা সুশাসন নিশ্চিত করে।

১৭. **গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ :** মানুষের বাক্‌স্বাধীনতা ও জনগণের সচেতনতার জন্য গণমাধ্যমের স্বাধীনতা অপরিহার্য। কিন্তু ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে সরকার গণমাধ্যমের কণ্ঠরোধ করে যা সুশাসনের অন্তরায়। তাই সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকারের ত্রুটি কিংবা দুর্নীতি জনগণের সামনে উপস্থাপনের লক্ষ্যে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াকে স্বাধীনতা দিতে হবে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

১৮. **ধর্মীয় সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি :** বাংলাদেশ সংবিধানের ৪১ নং অনুচ্ছেদে ধর্মীয় স্বাধীনতার কথা বলা থাকলেও বিভিন্ন ধর্ম ও জাতির লোকেরা নানাভাবে অত্যাচারিত হচ্ছে এবং রাজনৈতিক কিছু দল কর্তৃক তাদের রাজনৈতিক ফায়দা লুটার জন্য ধর্মকে ইস্যু হিসেবে ব্যবহার করার ফলে ক্রমেই ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা বৃদ্ধি পাচ্ছে যা সুশাসনে কাম্য নয়। তাই সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ধর্মীয় সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি করতে হবে।

১৯. **বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের সর্বোচ্চ সুবিধা গ্রহণ :** ১ নভেম্বর ২০০৭ সাল থেকে সংবিধানের ২২নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ আলাদা হয়েছে। এর সুফল শতভাগ আদায় করে নিতে হবে। নির্বাহী বিভাগ কোনোভাবেই যাতে এখনো বিচার বিভাগের ওপর কোনো প্রভাব ফেলতে না পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য যত দ্রুত সম্ভব আইন মন্ত্রণালয় থেকে আলাদা সচিবালয় সৃষ্টি করতে হবে। যা সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অনেক দূর এগিয়ে যাবে।

উপসংহার : বস্তুত স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ইত্যাদির মূলে রয়েছে মানুষের নৈতিকতা, সততা ও ধর্মবোধ। তাই সুশাসন প্রতিষ্ঠাকল্পে আমাদের অন্যান্য পদক্ষেপ নেয়ার পাশাপাশি সবার নৈতিক চরিত্রের উন্নতি ও দেশপ্রেম দৃঢ় করতে হবে।

০৩। বাংলাদেশে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তা বাতিলের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করুন। *[২৯তম বিসিএস]*

উত্তর : গণতন্ত্রচর্চাকারী বিভিন্ন দেশসমূহে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বা নির্বাচনকালীন সরকার হিসেবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণাটি বেশ পুরনো। তবে ঐসব দেশে এ ধরনের সরকার সাধারণত কোনো বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে এ দায়িত্ব পালন করতো। যেমন– ব্রিটেনে ১৯৪৫ সালে, ভারতে ১৯৭৯ সালের আগস্ট মাসে বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়। কিন্তু সরকার পরিবর্তন তথা নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন সরকারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য কেবল বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণা সাংবিধানিকভাবে স্থায়ী রূপ লাভ করে। অবশ্য এর পেছনে সুস্পষ্ট কারণও রয়েছে। উন্নত গণতান্ত্রিক দেশসমূহের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে দলসমূহের মধ্যে সুস্পষ্ট ঐকমত্য পরিলক্ষিত হয় এবং পারস্পরিক আস্থা ও সহিষ্ণুতার মাত্রাও উন্নত মানের। কেননা ঐসব দেশের গণতন্ত্রের চর্চা সংসদীয় গণতন্ত্রের বিভিন্ন প্রপঞ্চ, মূল্যবোধ, প্রথা এবং পারস্পরিক বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ফলে সরকার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক উপায় অনুসরণ করা হয়।

বাংলাদেশে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রেক্ষাপট : বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর রাজনীতিতে এসব উন্নত সংস্কৃতি অনুপস্থিত। ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা, জটিলতা, কারচুপি ও ক্ষমতার অপব্যবহার হয়ে থাকে। তাই রাজনৈতিক দলগুলো পরস্পরের প্রতি এক ধরনের আস্থাহীনতায় ভোগে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেও এ ধরনের আস্থাহীনতার মাত্রা ক্রমশ প্রবল হয়ে দেখা দেয়। এর কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো ক্ষমতা হস্তান্তরের বিদ্যমান প্রক্রিয়ার নানা-ধরনের ত্রুটি। নির্বাচন পরিচালনার মূল দায়িত্ব হলো নির্বাচন কমিশনের। নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে সরকারি হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত রেখে স্বাধীনভাবে পরিচালনার জন্য নির্বাচন কমিশনের বিধান পৃথিবীর বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দেশে রয়েছে। বাংলাদেশ সংবিধানের সপ্তমভাগে নির্বাচন সংক্রান্ত একটি আলাদা বিভাগ রয়েছে এবং এতে বলা হয়েছে যে, নির্বাচন কমিশন দায়িত্ব

পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকবে এবং কেবল এ সংবিধান ও আইনের অধীন হবে। কিন্তু সংবিধানের এ বিধানটি অনেকটা শুভঙ্করের ফাঁকিতে পরিণত হয়েছে−

প্রথমত, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়টি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের সাথে সংযুক্ত ছিল। ফলে নির্বাহী বিভাগ কমিশনের কর্মকাণ্ডে বিভিন্নভাবে হস্তক্ষেপ করে এবং কমিশনের পক্ষে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয়ত, যদিও নির্বাচন কমিশনারদের চাকরির মর্যাদা সুপ্রিম কোর্টের বিচারকের সমমর্যাদায় রাখা হয়। কিন্তু সংশ্লিষ্ট আইন ও প্রবিধানের মাধ্যমে এমন শর্তাবলি জুড়ে দেয়া হয়েছে যে, কমিশনারের কর্মকর্তা-কর্মচারীর পক্ষে নিরপেক্ষভাবে নির্বাচনী কার্যাবলী সম্পাদন করা সম্ভব হয় না।

তৃতীয়ত, নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণার ক্ষেত্রে মূল দায়িত্ব পালন করে থাকেন প্রত্যেক জেলার জেলা প্রশাসকগণ, যারা রিটার্নিং অফিসার নামে পরিচিতি। তাদেরকে যে কোনো দলীয় সরকার খুব সহজেই প্রভাবিত করতে পারে এবং তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়ার অভিন্ন ও স্বাধীন ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনারের নেই। রিটার্নিং অফিসার একবার কাউকে বিজয়ী ঘোষণা করলে নির্বাচন কমিশনারের কার্যত তেমন কিছুই করার থাকে না। নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় কারচুপির অভিযোগ কেবল নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালে নিষ্পত্তি করা হয়। কিন্তু নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালের দীর্ঘসূত্রিতা নির্বাচনকে কলুষিত ও পক্ষপাতিত্ব দোষে দুষ্ট করার আরেক মাধ্যম। নির্বাচন কমিশনের এসব সীমাবদ্ধতা কমিশনকে তার নির্বাচনী কার্যক্রম স্বাধীনভাবে সম্পন্ন করার প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে। বাংলাদেশে বিদ্যমান এ অবস্থার প্রেক্ষিতে পঞ্চম জাতীয় সংসদের শেষের দিনগুলোকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা একটি জনদাবিতে ক্রমশ রূপ নেয়। কেননা তত্ত্বাবধায়ক সরকার কোনো দলীয় সরকার না হওয়ায় অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য তারা নির্বাচন কমিশনকে সর্বতোভাবে সহায়তা করবে বলে দাবি করা হয়।

বাংলাদেশের নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পটভূমি : বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সূচনা ঘটে ১৯৯০ সালে তৎকালীন শাসক জেনারেল এরশাদ-এর নিকট থেকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ফিরিয়ে নেয়ার একটি অহিংস ও সম্মানজনক বিকল্প হিসেবে। ওই সময় আন্দোলনরত বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সুশীল সমাজ থেকে ক্রমশ এ দাবি উত্থাপিত হয়। তবে বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণাটি প্রথম উচ্চারিত হয় একটি অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অ্যাডভোকেট শামসুল হক চৌধুরীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ আইনজীবী সমন্বয় পরিষদের পক্ষ থেকে। দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ১৯৮৩ সালের ২০ নভেম্বর ঢাকায় এক সমাবেশে জেনারেল এরশাদের ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য কেয়ারটেকার সরকারের প্রস্তাব ও দাবি উত্থাপন করে এবং এজন্য একটি ফর্মুলা উপস্থাপন করে বলে দলের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়।

প্রবল গণঅভ্যুত্থানের মুখে ক্ষমতাসীন জেনারেল এরশাদ ১৯৯০ সালের ৪ ডিসেম্বর তৎকালীন বিরোধী দল ও জোটসমূহের প্রস্তাবিত নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্য ঘোষিত রূপরেখা গ্রহণ করার ঘোষণা দেন। ৬ ডিসেম্বর বিরোধী দলের নির্দেশনা মতো জেনারেল এরশাদ পদত্যাগ করে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার পথ উন্মুক্ত করেন। বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহম্মদ-এর নেতৃত্বে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য বাংলাদেশের পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ওই নির্বাচন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিজয়ী দল এবং ১৯৯১ সালের ৬ আগস্ট বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী বিল পাসের মাধ্যমে দেশে ১৬ বছর পর সংসদীয়

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তিত হয়। ওই সময় জামায়াতে ইসলামী তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকেও দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সাংবিধানিকভাবে গ্রহণ করার দাবি তোলে। দেশের সুশীল সমাজের কেউ কেউ ভিন্ন আঙ্গিকে একই ধরনের দাবি করেছিলেন। এ দাবি তখন প্রধান রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও ক্ষমতাসীন বিএনপি ভেবে দেখতে সম্মত হয়নি। যদিও পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি এবং জামায়াতে ইসলামী এ তিন বিরোধী দল পৃথক পৃথকভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখাসহ তিনটি বিল সংসদ সচিবালয়ে জমা দেয়। ১৯৯৩ সালের ২৮ অক্টোবর আওয়ামী লীগ প্রস্তাবিত বিলটিতে সংবিধানের ৫৬(৪) অনুচ্ছেদে সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়, যাতে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে একটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের কথা বলা হয়। প্রধান বিচারপতি তার মূল দায়িত্বের বাইরে এ অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করবেন এবং নির্বাচন শেষে আবার তার স্বপদে ফিরে যাবেন।

১৯৯৩ সালের নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময় জাতীয় পার্টি 'সংবিধান সংশোধনী বিল-১৯৯৩' নামে একটি বিল উত্থাপন করে। এ বিলে জাতীয় পার্টি সংবিধানের ১২৩(৪) অনুচ্ছেদে সংশোধনের প্রস্তাব করে এবং আরো দুটো উপ-অনুচ্ছেদ ৫ ও ৬ অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব করে যাতে উল্লেখ করা হয় নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার দিনই প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির নিকট পদত্যাগপত্র জমা দিবেন এবং রাষ্ট্রপতি একজন নির্দলীয় ব্যক্তিকে প্রধান হিসেবে নিয়োগ দিবেন, যার নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার পরিচালনার জন্য একটি কেবিনেট গঠিত হবে। এ অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কেবল প্রতিদিনের রুটিন কার্যক্রম পরিচালনা করবে এবং নির্বাচনে অংশ নিবে না। নির্বাচনের পর নতুন সরকার ক্ষমতাগ্রহণের পরপরই এ সরকারের মেয়াদ শেষ হবে।

১৯৯১ সালের জামায়াতে ইসলামী সংসদীয় দলের নেতা মতিউর রহমান নিজামী তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে সংসদ সচিবালয়ে একটি বিল জমা দেন। ঐ বিলে সংবিধান সংশোধনের কথা বলা হয় এবং উল্লেখ করা হয় যে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার দিনই প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির নিকট পদত্যাগ করবেন এবং রাষ্ট্রপতি নির্দলীয় ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করবেন, যারা তত্ত্বাবধায়ক সরকার হিসেবে রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা করবেন এবং নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে বিরত থাকবেন। সংবিধানের ৫৬(৩) এবং ৫৫(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্বাচিত নতুন প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতা নেয়ার দিন থেকে উপদেষ্টা পরিষদ ভেঙে যাবে বা বিলীন হবে।

বিরোধী দলগুলোর উত্থাপিত এ প্রস্তাবগুলোর প্রকৃতি মোটামুটি একই ধরনের ছিল। মূল পার্থক্য ছিল আওয়ামী লীগ উত্থাপিত প্রস্তাবে এবং জাতীয় পার্টির প্রস্তাবে নির্দলীয় ব্যক্তিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার-এর প্রধান করার কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। জামায়াতে ইসলামী একজন নিরপেক্ষ ও নির্দলীয় ব্যক্তির নেতৃত্বে উপদেষ্টা পরিষদ গঠনের প্রস্তাব করে। কিন্তু সরকারি দলের সদিচ্ছার অভাবে ওই বিল তিনটি সংসদের আলোচ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। ১৯৯৪ সালের ২০ মার্চ মিরপুর এবং মাগুরা-২ উপনির্বাচনে সরকারি দলের ব্যাপক প্রভাব বিস্তার এবং কারচুপি বিরোধী দলের নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিকে জোরালো করে তোলে। বিরোধী দল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিল সংসদে উত্থাপন ও পাসের দাবিতে আন্দোলন কর্মসূচি প্রদান করে। সরকার বিরোধী দলের দাবির প্রতি চরম অনমনীয় মনোভাব প্রদর্শন করে এবং ওই দাবিকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করতে থাকে। এক পর্যায়ে ১৯৯৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর বিরোধীদলীয় সকল সদস্য একযোগে পদত্যাগ করেন এবং সকল বিরোধী দল সম্মিলিতভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবির প্রতি একমত হন। তারা সম্মিলিতভাবে সংসদ ভেঙে দিয়ে নতুন নির্বাচন দাবি করেন এবং যে কোনো নির্দলীয় ব্যক্তি বা সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের সর্বশেষ বিচারপতির নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানান। এর প্রায় দীর্ঘ দু'বছর পর সরকারের মেয়াদের প্রায়

শেষ পর্যায়ে পঞ্চম জাতীয় সংসদ ভেঙে দেয়া হয় এবং ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬ ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়। ওই নির্বাচনে প্রধান বিরোধী দলগুলো অংশ নেয়া থেকে বিরত থাকে। বিএনপি বিতর্কিত নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করে এবং ২১ মার্চ ১৯৯৬ ত্রয়োদশ সংশোধনী বিলটি সংসদে উত্থাপন করে। ২৫ মার্চ ১৯৯৬ মধ্যরাতে বিলটি ২৬৮-০ ভোটে সংসদে পাস হয়। ২৮ মার্চ ১৯৯৬ রাষ্ট্রপতি বিলটিতে সম্মতি প্রদান করেন। এভাবেই ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাংলাদেশে সাংবিধানিক রূপ লাভ করে।

৩০ জুন ২০১১ জাতীয় সংসদে পাস হওয়া সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী বিল ২০১১ অনুযায়ী বিলুপ্ত হয়ে যায় দীর্ঘ ১৫ বছর ৩ মাস ৪ দিন বয়সী তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা।

উপসংহার : বাস্তব এবং সত্য হলো বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার উদ্ভব হয় রাজনৈতিক দলগুলোর পারস্পরিক অবিশ্বাস, দ্বন্দ্ব, বিদ্বেষ থেকে, যা বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির দৈন্যদশাই প্রমাণ করে। তারপরও যে মহান উদ্দেশ্য নিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে সে মহান উদ্দেশ্য যদি সফল হতো, তাহলে এ ব্যবস্থা নিয়ে কোনো প্রশ্ন উঠতো না। প্রথম তিনটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে প্রশ্ন না উঠলেও চতুর্থ ও পঞ্চম তত্ত্বাবধায়ক সরকার যথেষ্ট প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে, নানা বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। একটি বিতর্কের অবসান ঘটাতে সৃষ্ট সংগঠন যদি নতুন বিতর্কের সৃষ্টি করে তবে এরূপ সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা নেই।

০৪. স্থানীয় সরকার পর্যায়ে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ব্যতীত সত্যিকার অর্থে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ সম্ভব নয়— বিশ্লেষণ সহকারে ব্যাখ্যা করুন। *[৩২তম বিসিএস]*
***অথবা,* বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।**

উত্তর : আধুনিককালে বৃহৎ রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের প্রভাব সর্বত্র পরিলক্ষিত হলেও দূরবর্তী নগর, শহর, গ্রাম ও জনপদের বিচিত্র সমস্যা সমাধানকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ওপর কিছু কিছু ক্ষমতা ন্যস্ত করে থাকে। ফলে এক ধরনের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রশাসন গড়ে ওঠে, এদেরকে মূলত স্থানীয় সরকার বলে অভিহিত করা হয়। নিচে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক ও এর বিকেন্দ্রীকরণ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হলো :

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস : ভারতীয় উপমহাদেশে স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, অতি প্রাচীনকাল থেকে এখানে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে এক ধরনের স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। এ উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের পূর্বেও গ্রাম্য শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য গ্রাম্য পঞ্চায়েত প্রথা বিদ্যমান ছিল। কিন্তু ব্রিটিশগণ এ দেশের শাসন ক্ষমতা দখল করার পর থেকে উপমহাদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার পরিবর্তন সূচিত হয়। ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারি প্রথার সৃষ্টি করে। তারা মোটামুটি শাসক ও শাসিতের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। এ জমিদারশ্রেণী শুধু রাজস্ব আদায়ের জন্যই ব্রিটিশ সরকারের নিকট দায়বদ্ধ ছিল না বরং নিজ এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষাও ছিল এদের অন্যতম দায়িত্ব। কিন্তু এক্ষেত্রে এদের চরম ব্যর্থতার কারণে ব্রিটিশ সরকার নতুন ধরনের স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা চালু করতে বাধ্য হয়। তাই ব্রিটিশ সরকার ১৮৭০ সালে 'চৌকিদারি পঞ্চায়েত' আইন পাস করে। মোটামুটিভাবে এটাকেই স্থানীয় সরকার প্রবর্তনের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে অভিহিত করা যায়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

এ আইন অনুযায়ী ৬০-এর অধিক বাড়িবিশিষ্ট গ্রাম থেকে ৫ সদস্যবিশিষ্ট পঞ্চায়েতমণ্ডলী নিয়োগ করা হতো। সাধারণত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা তার অধস্তন সরকারি কর্মচারী এ নিয়োগ দিতে পারত। এ ব্যবস্থা অনেক ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার কারণে এটি পরবর্তীতে অকার্যকর হয়। এ ব্যর্থতা নিরসনকল্পে লর্ড রিপন কতকগুলো সংস্কার আইন পাস করেন। তিনি ভারতীয়দের জন্য স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ছিলেন। তাই তিনি ১৮৮২ সালে কতকগুলো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এগুলো হলো :

১. মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের ন্যায় স্থানীয় বোর্ড চালু করা হবে। যেমন– মহকুমা বোর্ড, তহসিল ও তালুকা বোর্ড।
২. দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য অবশ্যই বেসরকারি হবেন। ঐতিহাসিক কারণে এটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। ১৯০৭ সালে ভারত সরকার কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক সম্পর্ক নিরূপণের জন্য শাসনব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ নীতি কার্যকর করার মানসে Hobhouse-এর নেতৃত্বে রাজকীয় কমিশন গঠন করেন কিন্তু তাও কার্যকর করা হয়নি। এক্ষেত্রে ১৯১৯ সালের Bengal Village Self Government আইন ছিল বেশ কার্যকর। এ আইন অনুযায়ী ইউনিয়ন বোর্ড কমপক্ষে ছয়জন এবং উর্ধ্বে নয়জন নিয়ে গঠিত হয়। এ বোর্ড সাধারণত ৯-১০ হাজার লোক নিয়ে এবং বেশ কয়েকটি গ্রাম এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৫৯ সালের Basic Democratic Order প্রবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত এ আইনটি বলবৎ ছিল। ১৯৫৯ সালের Basic Democratic Order-এর মাধ্যমে স্থানীয় সরকারের বিকেন্দ্রীকরণ মোটামুটি নিশ্চিত হয়। তখন থেকেই আজকের আধুনিক স্থানীয় সরকারের রূপটি পরিলক্ষিত হয়।

স্থানীয় সরকার : স্থানীয় সরকার বলতে সাধারণত কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা কাউন্সিল, থানা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ, পঞ্চায়েত ও অন্যান্য সংস্কার কার্যাবলীকে বোঝায়। এ কার্যাবলী সাধারণত কোনো নির্দিষ্ট এলাকা বা স্থানের জনগণের কল্যাণার্থে সম্পাদিত হয়ে থাকে। তারা কখনো সমগ্র দেশের কল্যাণে নিয়োজিত থাকে আবার কখনো দেশের কোনো একটি বিশেষ এলাকার উন্নতি বিধানে শাসনকাজ পরিচালনা করে থাকে। স্থানীয় সরকারের কার্যাবলীর প্রকৃতি এমন যে, তারা বিশেষভাবে স্থানীয় এবং স্থানীয়ভাবেই তাদের কাজ সম্পন্ন করে থাকে।

অধ্যাপক R.M. Jackson বলেছেন, 'Local government is essentially a method of getting various services run for the benefit of the community. It is a practical business, and if we think of it in this way, we are more likely to see its real nature than if we think in terms of training for citizenship.'

কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকারের সাংবিধানিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট থেকে ক্ষমতা লাভ করে থাকে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্বের অধীনে থেকে তাদের কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে। পক্ষান্তরে, যুক্তরাষ্ট্রীয় ও অর্ধ-যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় স্থানীয় সরকার একটি প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক বিষয়। বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের বিকেন্দ্রীকরণ বোঝার ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকা আবশ্যক সেগুলো নিম্নরূপ :

প্রথমত, ব্যাপক স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা, যাতে স্থানীয় সংস্থাগুলোর উদ্দেশ্য বহুমুখী হয়ে থাকে। এ ব্যবস্থায় স্থানীয় সরকার একাধারে স্থানীয় এবং জাতীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে।

দ্বিতীয়ত, অংশীদার পদ্ধতি, যাতে কিছুসংখ্যক কাজ জাতীয় সরকারের আঞ্চলিক সংস্থার মাধ্যমে সম্পাদিত হয় এবং অন্যান্য কার্যাবলী স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়।

তৃতীয়ত, দ্বৈত পদ্ধতি, যাতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদগুলো প্রত্যক্ষভাবে টেকনিক্যাল বা কারিগরি বিষয়াদি শাসন করে থাকে এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ উক্ত বিষয়াদি পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা, অর্থ ও কর্মচারী নিয়োগ করতে পারে।

চতুর্থত, যৌথ প্রশাসনিক পদ্ধতি, যাতে কেন্দ্রীয় সরকার প্রত্যক্ষভাবে যাবতীয় কারিগরি বিষয়াদি শাসন করে এবং যাতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কোনো ক্ষমতা নেই বললেই চলে।

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ : সুষ্ঠু প্রশাসনিক সংস্থার প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণ ক্ষমতার অবস্থান এবং হস্তান্তর দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত হয়। প্রশাসনিক ক্ষমতা এককেন্দ্রিক বা বিকেন্দ্রিক উভয়ই হতে পারে। যেখানে প্রশাসনিক সংস্থার সব কাজ এবং দায়িত্ব কেন্দ্রে বা কেন্দ্রীয় অফিসে নিয়োজিত থাকে সেখানে কেন্দ্রীকরণ হয়েছে বলা চলে। পক্ষান্তরে, যেখানে প্রশাসনিক সংস্থার কাজ ও দায়িত্ব কোনো কেন্দ্র বা কেন্দ্রীয় সংস্থায় নিয়োজিত না থেকে বিভিন্ন অধস্তন সংস্থাসমূহে বা কেন্দ্র থেকে প্রদেশে বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয় তখন তাকে বিকেন্দ্রীকরণ বলা চলে। এভাবে কিছু কিছু ক্ষমতা স্থানীয় সরকারের হাতে ন্যস্তকরণকেই স্থানীয় সরকারের বিকেন্দ্রীকরণ বলা হয়।

Professor Allen বলেছেন, 'কেন্দ্র থেকে প্রয়োগ করা সম্ভব এমন কর্তৃত্ব ব্যতীত অপর সব কর্তৃত্ব সর্বনিম্নস্তরে ভারার্পণের নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে বিকেন্দ্রীকরণ বলা হয়।' সামগ্রিকভাবে এখান থেকেও স্থানীয় সরকারের বিকেন্দ্রীকরণের রূপ, অবস্থা এবং ক্ষমতা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

Dwight Waldo-এর মতে, 'Decentralisation denotes a tendency where administration and responsibility are delegated from the central authority to regional and local units to suit the particular local condition.' এর ফলে প্রশাসনিক সংস্থার যাবতীয় দায়-দায়িত্ব ও কাজ সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ে নিয়োজিত কর্মচারীদের হাতে অর্পণ করা হয়। তবে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ক্ষমতা ও দায়িত্ব কেন্দ্রের হাতে ন্যস্ত থাকে। এর ফলে স্থানীয় সরকারের কার্যাবলী ও ক্ষমতা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রবিজ্ঞানী David Lilianthal বিকেন্দ্রিক প্রশাসনের তিনটি মূল বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেন :

- ☐ বেশিরভাগ সিদ্ধান্তই আঞ্চলিক ও স্থানীয় এলাকায় গ্রহণ করা উচিত এবং এর জন্যে আঞ্চলিক ও স্থানীয় কর্মচারীদের যথাযথভাবে নির্বাচন ও অতিসত্বর সিদ্ধান্তগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করতে হবে।
- ☐ বিকেন্দ্রিক প্রশাসনে অবশ্যই যতদূর সম্ভব জনগণের অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করতে হবে। একে সফল করতে হলে জনগণের সহযোগিতা আবশ্যক।
- ☐ আঞ্চলিক সংস্থাসমূহের বিভিন্ন কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয় সাধন আঞ্চলিকভাবেই করতে হবে। কেননা কেন্দ্রীয় সমন্বয় বাগাড়ম্বর, হিংসা-বিদ্বেষ এবং বিরোধের সৃষ্টি করবে।

সুতরাং উপরের বৈশিষ্ট্যগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার বিকেন্দ্রীকরণের মধ্যে এর প্রতিচ্ছবি রয়েছে। যদিও কেন্দ্রীয় সরকারই সকল প্রকার নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে, তবুও কেন্দ্রীয় সরকারের সফলতার অনেকাংশ স্থানীয় সরকারের কার্যাবলীর ওপর নির্ভরশীল। কারণ জনগণ স্থানীয় সরকারের মাধ্যমেই কেন্দ্রীয় সরকারের কার্যাবলীর সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়। তাই স্থানীয় সরকার যতটা সফলভাবে, দক্ষভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের স্থানীয় প্রতিনিধিরূপে কাজ করতে পারবে, কেন্দ্রীয় সরকারের সফলতাও এর মাধ্যমে নিরূপিত হবে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় বিকেন্দ্রীকরণের উপাদানসমূহ : সমস্ত বিশ্বের প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের একাধিক উপাদান রয়েছে, সেই আলোকেই বাংলাদেশের প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের উপাদানগুলো আলোচনা করা হলো।

১. **দায়িত্বশীলতার উপাদান :** দায়িত্বশীলতার উপাদানটি বাংলাদেশের প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের পথকে অনেকটা দুর্গম করে দেয়। স্থানীয় পর্যায়ে যেসব কার্যাবলী সম্পাদন করতে হয় তার জন্য স্থানীয় সরকারকে জবাবদিহিতার সম্মুখীন হতে হয়। তাছাড়া যেহেতু স্থানীয় পর্যায়ে জনগণের সাথে যোগাযোগ ও সকল দায়িত্ব স্থানীয় সরকারই সম্পন্ন করে, সেহেতু কেন্দ্রীয় সরকার তাদের ওপর কর্তৃত্ব রেখে দেয়, কেননা তারা স্বেচ্ছাচারী হয়ে যেতে পারে।

২. **প্রশাসনিক উপাদান :** যেসব প্রশাসনিক উপাদান বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের বিকেন্দ্রীকরণকে প্রভাবিত করে সেগুলো হলো Age of the agency, stability of the policies and method of the agency, competence of the agency's field personnel, speed and economy of the agency, administrative sophistication বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

৩. **কাজ সম্বন্ধীয় উপাদান :** বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের বিকেন্দ্রীকরণের তৃতীয় উপাদান এটি। এক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো আলোচিত হয় তা হলো— পরিচালনার জন্য বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন কতটুকু, এ কাজ বিভিন্ন এলাকা বা অঞ্চলে জাতীয় ঐক্য নাকি অনৈক্য আনবে ইত্যাদি।

৪. **বাহ্যিক উপাদানসমূহ :** বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের বিকেন্দ্রীকরণের বাহ্যিক উপাদান যেমন নাগরিকদের প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার অধীন করা, অন্যান্য সংস্থার সাথে যোগসূত্র স্থাপন ও আঞ্চলিক কার্যাবলীকে রাজনৈতিক চাপের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলার বিষয়গুলোও বিরাজমান।

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় বিকেন্দ্রীকরণের সমস্যাবলী : বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের বিকেন্দ্রীকরণেও কিছু সমস্যা বিরাজমান। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১. **ঐতিহ্যগত প্রভাব :** স্থানীয় সরকারের বিকেন্দ্রীকরণের সর্বপ্রথম বাধা হলো ঐতিহ্যগত প্রভাব। কেননা বিশ্বের চলমান গতির কারণে সবকিছুই পরিবর্তনশীল। তাই স্থানীয় প্রশাসনের সফলতার জন্য পুরোনো ধ্যানধারণা বা রীতিনীতি পরিহার করে আধুনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

২. **কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান :** স্থানীয় সরকারের বিকেন্দ্রীকরণ নিশ্চিত করতে হলে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান সঠিকভাবে করতে হবে। শুধু নামমাত্র প্রশাসন ব্যবস্থা তৈরি করে রাখা হয় কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক যথেষ্ট তত্ত্বাবধান করা হয় না।

৩. **স্থানীয় চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীসমূহের প্রভাব :** বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের বিকেন্দ্রীকরণের পথে এটি একটি বড় বাধা হিসেবে পরিলক্ষিত হয়। স্থানীয় বিভিন্ন রাজনৈতিক মদদপুষ্ট গোষ্ঠীসমূহ কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে থাকে। তাই স্থানীয় সরকার বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে প্রাপ্ত ক্ষমতা ও কার্যাবলীর প্রয়োগ করতে পারে না বিধায় স্থানীয় সরকারের বিকেন্দ্রীকরণে পথে এটি অনেক বড় একটি অন্তরায় হিসেবে কাজ করে।

৪. **বিভিন্ন বিকেন্দ্রিক সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয় :** স্থানীয় সরকারের বিকেন্দ্রীকরণের সমস্যাবলীর মধ্যে এটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সমস্যা। কেননা একটি রাষ্ট্রের কার্যাবলীর সুষ্ঠু সম্পাদন কোনো একক সংস্থার মাধ্যমে সম্ভব হয় না। তাই অনেকগুলো বিকেন্দ্রিক সংস্থাকে একযোগে কাজ করতে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশে এ সমন্বয় সুষ্ঠু হয় না বিধায় স্থানীয় সরকারের বিকেন্দ্রীকরণও সত্যিকারার্থে সম্ভব হয়নি।

উপসংহার : সবশেষে বলা যায়, রাষ্ট্র পরিচালনায় কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন প্রকার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সম্পন্ন করে এবং স্থানীয় সরকার রাষ্ট্র পরিচালনায় ব্যাপক ভূমিকা রাখে। কিন্তু বাংলাদেশের ইতিহাসের আলোকে দেখা যায়, ১৯৭০-১৯৮০ দশক-পরবর্তীতে স্থানীয় সরকার প্রশাসনে পৃথিবীব্যাপী যে ব্যাপক পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছে এবং অত্যন্ত কার্যকর হয়েছে সেই তুলনায় বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার প্রশাসনের খুব বেশি আধুনিকায়ন হয়নি বা কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়নি। তাই রাষ্ট্র প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে দায়িত্ব, কার্যাবলী এবং ক্ষমতার স্বচ্ছ বণ্টন প্রদানপূর্বক কেন্দ্রীয় সরকারের সাংবিধানিক নিয়ন্ত্রণ যুগোপযোগী করে। বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ নিশ্চিত করলে বাংলাদেশের সামগ্রিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা যেমন শক্তিশালী হবে তেমনি জনগণের অংশগ্রহণও নিশ্চিত হবে।

০৫ । কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে স্থানীয় সরকারের সম্পর্ক সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কি হওয়া উচিত? *[৩১তম বিসিএস]*

উত্তর : পরিবর্তনশীল সমাজব্যবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে সরকারি কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য, সরকারের গৃহীত নীতিমালা ও কর্মপরিকল্পনার সুফল জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের একটি উত্তম ব্যবস্থা হলো স্থানীয় সরকার পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা। আর এজন্যই বলা হয়, রাজনীতির প্রাণ যদি হয় নির্বাচন, গণতন্ত্রের প্রথম কর্তব্য যদি হয় ভোট প্রদান, তাহলে এরূপ যে কোনো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় স্থানীয় সরকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্থানীয় সরকার হয়ে ওঠে কেন্দ্রীয় সরকারের মুখপাত্র।

স্থানীয় সরকার কী : স্থানীয় সরকার বলতে স্থানীয় জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত এমন স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে বোঝায়, যাদের দায়িত্বাবলী নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। দায়িত্বাবলী পালনের নিমিত্তে নিজস্ব আয়ের উৎস হিসেবে স্থানীয় সরকার কর ধার্য করতে পারে। যদিও জাতীয় সরকার জনস্বার্থে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিষ্ঠা করে, তবুও তারা জাতীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন থেকে কাজ করে বা জাতীয় সরকারের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকে।

সুশাসন সম্পর্কিত ধারণা : সাধারণভাবে বলা যায়, সুশাসন হলো এমন একধরনের শাসনব্যবস্থা, যা শাসক ও শাসিতের মধ্যকার সুসম্পর্ক বোঝায় এবং সেখানে সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক স্বাধীন বিচারব্যবস্থা, মতামতের স্বাধীনতা ও পছন্দের স্বাধীনতা থাকবে।

বিশ্বব্যাংকের মতে, সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করা বোঝায়। দাতা সংস্থা এবং পশ্চিমা দেশসমূহের মতে, সুশাসন হলো অধিকতর রাজনৈতিক প্রক্রিয়া এবং জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে শাসনব্যবস্থা পরিচালনা।

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কেন্দ্রীয় সরকার ও স্থানীয় সরকার সম্পর্ক : Mr. Valdersin-এর মতে, 'Local Government is the yard stick of Good Governance.' যে দেশে স্থানীয় সরকার যতটা শক্তিশালী ও জনপ্রতিনিধিত্বশীল সে দেশে গণতন্ত্র ততটাই বিকশিত। এ কারণেই সুশাসনের অন্যতম চাহিদা একটি শক্তিশালী, কার্যকরী, দক্ষ, স্বায়ত্তশাসিত স্থানীয় পর্যায়ের সরকার। স্থানীয় সরকার সুশাসনের অন্যতম উপাদান, কেননা এটি–

i. জবাবদিহিমূলক প্রশাসনের নিশ্চয়তা দেয়;
ii. জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে;
iii. গণমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করে;
iv. প্রশাসনে স্বচ্ছতা আনে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

কেন্দ্রীয় শাসন হচ্ছে কেন্দ্র থেকে পরিচালিত শাসনব্যবস্থা। সুশাসনের দুটি পূর্বশর্ত হচ্ছে হলো জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা। জবাবদিহিতারও আবার ধরন রয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম রাজনৈতিক জবাবদিহিতা। বাংলাদেশে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থার ফলে রাজনৈতিক জবাবদিহিতা কিছুটা নিশ্চিত হলেও যখন স্থানীয় সরকার তাদের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে জনগণের নিকট জবাবদিহি হবে তখন কেন্দ্রীয় সরকারও জনগণের সামনে জবাবদিহি করতে বাধ্য হবে। এভাবে স্থানীয় সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের মাঝে কাজের সমন্বয় ঘটিয়ে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে।

দুর্নীতির ক্ষেত্র হলো দুটি– রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক। জনপ্রতিনিধিগণ ও আমলারা উভয়ই দুর্নীতিগ্রস্ত। এরা একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাংলাদেশে এ উভয় প্রকার দুর্নীতি ব্যাপকভাবে বিস্তৃত। অবৈধ কাজ করার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দুর্নীতি বন্ধ করতে না পারলে উত্তম শাসনব্যবস্থা পাওয়া যাবে না। সমাজ ও প্রশাসনের প্রতিটি স্তরে বিরাজমান দুর্নীতির মূলোৎপাটন করেই কেবল সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব। এখানে প্রশাসনের প্রতিটি স্তর বলতে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় উভয় পর্যায়ে দুর্নীতি রোধ করাকে বোঝানো হয়েছে। তাই দুর্নীতি প্রতিরোধে স্থানীয় সরকারকে কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগী হিসেবে কাজ করতে হবে।

আমাদের প্রশাসনিক স্তরগুলোতে উর্ধ্বতনের কাছে অধস্তন একেবারেই জবাবদিহি নয়। জনগণ চায় ও মনে করে প্রশাসন তাদের মতো করেই তাদেরকে সুশাসন উপহার দিবে। বর্তমানে বাংলাদেশে NGOগুলো ব্যাপক হারে বিস্তার লাভ করেছে। কিন্তু বাস্তবে আমাদের দেশে তাদের কোনো আইনগত ভিত্তি নেই। কাজকর্মে জবাবদিহিতা নেই। দাতা সংস্থাগুলো এবং দাতা দেশ থেকে সাহায্য পেয়ে দানগ্রহণকারী দেশের সাথে কোনোরূপ পরামর্শ ছাড়াই তারা প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন করে থাকে। ফলে দেশে উন্নয়ন ব্যাহত হয়। তাই এনজিওগুলোকে জবাবদিহি না করলে সুশাসন সম্ভব হবে না। এক্ষেত্রে নতুন এনজিওগুলোকে অনুমোদন প্রদানে কিংবা বিদ্যমান এনজিওগুলোকে নতুন কর্মসূচি প্রণয়নে অনুমতি প্রদানে কেন্দ্রীয় সরকারকে সতর্ক হতে হবে। আবার স্থানীয় সরকারকে এনজিওগুলোর কার্যক্রমের প্রভাব সম্পর্কে সরকারকে অবহিত করতে হবে। এভাবে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকার একে অপরের সহায়তাকারী হিসেবে পাশাপাশি অবস্থান করবে।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর : দেশের সর্বময় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকে প্রধান নির্বাহীর হাতে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৪৪ বছরের মধ্যে ২৬ বছর প্রধান নির্বাহী ছিলেন একাধিক সামরিক শাসক। তাদের সমর্থন দিয়েছে কতিপয় রাজনীতিবিদ এবং আমলারা। ফলে নির্বাহী কর্তৃত্বের প্রভাব সুদৃঢ় হয়েছে। কিন্তু ১৯৯১ সালের পর থেকে এ পর্যন্ত দেশের প্রধান নির্বাহী হলেন প্রধানমন্ত্রী। সংবিধানের ৭০ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, প্রধানমন্ত্রীর মতামতকে উপেক্ষা করে স্বদলীয় কোনো সাংসদের বিরুদ্ধে মত পোষণ করলে উক্ত সাংসদের সদস্যপদ বাতিল হয়ে যাবে। ফলে সংসদীয় পদ্ধতিতেও নির্বাহী কর্তৃত্বের প্রভাব প্রকট। আর এজন্য দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না। কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকারের মাঝে ক্ষমতা ভাগাভাগির মাধ্যমে নির্বাহী কর্তৃত্বের প্রভাব একটা নির্দিষ্ট সীমারেখায় রেখে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

আইন প্রণয়নে স্থানীয় সাংসদের মতামত গ্রহণ : বাংলাদেশে শাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হলো আইন প্রণয়ন। প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো আইন 'আইন পরিষদে' গৃহীত হওয়া সম্ভব নয়। সাংসদকে পাশ কাটিয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও নীতি প্রণীত হচ্ছে। তাই বলা যায়, আইন প্রণয়নের সমস্যা সমাধান করে সুশাসনের পথ সুগম করা এখনো সম্ভব হয়নি। আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে কেন্দ্রীয় সরকারকে স্থানীয় সরকারের প্রয়োজন ও সুবিধা-অসুবিধা দেখে পরস্পর দায়িত্ববোধের পরিচয় দিতে হবে।

যে দেশের স্থানীয় সরকার কাঠামো যত শক্তিশালী ও জনপ্রতিনিধিত্বশীল সে দেশে গণতন্ত্র ততটাই বিকশিত এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আমাদের দেশে স্থানীয় সরকার কাঠামো এতটা শক্তিশালী নয়। ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারকে উদারতার পরিচয় দিয়ে স্থানীয় সরকারকে সহায়তা করতে হবে, শক্তিশালী করতে হবে। স্থানীয় সরকার যেমন বিভিন্ন বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তাকারী হবে তেমনি কেন্দ্রীয় সরকারকেও বিভিন্ন ব্যাপারে স্থানীয় সরকারকে সর্বোচ্চ সহযোগিতা প্রদান করতে হবে।

গণমাধ্যমে স্থানীয় জনমতকে প্রাধান্য দান : বাংলাদেশের মতো একটি বহুদলীয় গণতান্ত্রিক দেশে সুশাসন নিশ্চিত করতে স্বচ্ছতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু এটি বহুলাংশে অনুপস্থিত। জনপ্রতিনিধিগণ জনগণের পণ্য কি করছে তা স্বচ্ছভাবে জানা যায় না এবং প্রচার মাধ্যমে সরকারি নিয়ন্ত্রণের ফলে অবাধ তথ্যপ্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয়। যেমন– বাংলাদেশে রেডিও এবং টেলিভিশনের ওপর আজ পর্যন্ত সরকারি নিয়ন্ত্রণ বিদ্যমান, যা স্বাধীন মত প্রকাশের পরিপন্থি। জাতীয় মিডিয়ায় স্থানীয় সংবাদ পরিবেশনের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। স্থানীয় জনগণকে সরাসরি এসব অনুষ্ঠানে সংযুক্ত করতে হবে। কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় প্রশাসনকে এক্ষেত্রে বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব পোষণ করে তৃণমূল পর্যায়ে জনগণের অবস্থানকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

উপসংহার : কেন্দ্রীয় সরকার এবং স্থানীয় সরকারের মধ্যে যথোপযুক্ত সম্পর্কোন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব। স্থানীয় সরকারব্যবস্থা রাজনীতি ও প্রশাসনের উপব্যবস্থা। প্রশাসনকে সচল, গতিশীল, উন্নয়নমুখী করতে হলে স্থানীয় সরকারব্যবস্থাকে আরো শক্তিশালী, স্বচ্ছ, জবাবদিহি ও দায়িত্বশীল করতে হবে। কেননা শক্তিশালী স্থানীয় সরকারই পারে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে, উন্নত জাতি তৈরি করতে, স্থানীয় উন্নয়নে বাস্তবসম্মত ও কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে।

০৬। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের দুর্বল দিকগুলো উল্লেখ করুন। *[৩১তম বিসিএস]*

উত্তর : বাংলাদেশে স্থানীয় সরকারের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হলো যোগ্য ও জনপ্রিয় ব্যক্তির নির্বাচনে না আসা। অধিকাংশ অযোগ্য লোক নির্বাচনে আসে এবং তারা অর্থের জোরে, পেশী শক্তির জোরে, পারিবারিক ঐতিহ্যের জোরে নির্বাচনে জয়ী হয়। তাছাড়া অর্থনৈতিকভাবেও স্থানীয় সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর নির্ভরশীল। স্থানীয় সরকার কোনো জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণেও অপারগ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্থানীয় সরকারকে কেন্দ্রীয় সরকারের মুখাপেক্ষী থাকতে হয়। তাছাড়া দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, জবাবদিহিতা ও দায়িত্বহীনতা বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারব্যবস্থার সবচেয়ে ক্ষতিকর দিক বলে বিবেচিত। নিচে বাংলাদেশে বিদ্যমান স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের দুর্বল দিকগুলো বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :

১. **দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি :** সরকারি সম্পদ ও সেবার সুষ্ঠু বন্টন নিশ্চিত করাই বিকেন্দ্রীকরণের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। অথচ সরকারি বন্টনব্যবস্থাকে রাজনীতিকীকরণের ফলে স্থানীয় সরকার পরিণত হয় দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, লুটপাট আর অব্যবস্থাপনার প্রাণকেন্দ্রে। এক্ষেত্রে স্থানীয় নেতৃবর্গ তাদের আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব এবং রাজনৈতিক সহযোগীদের বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা দেন। যথা : বিভিন্ন টেন্ডার, ওয়ার্ক অর্ডার প্রদান; হাট-বাজার, জলমহাল, বালুমহাল, ঘাট প্রভৃতি নিজেদের লোকদের ইজারা প্রদান; বিভিন্ন লাইসেন্স ও পারমিট প্রদান প্রভৃতি।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

২. **উপদলীয় কোন্দল ও দ্বন্দ্ব :** বিকেন্দ্রীকৃত স্থানীয় সরকারব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে সেখানে বিভিন্ন দল-উপদল ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সৃষ্টি হয়। কেননা প্রভাবশালী মহলের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিরোধ এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা ও প্রভাব বিস্তারের দ্বন্দ্ব চরম আকার ধারণ করে। এ সকল দ্বন্দ্ব হলো সাধারণত উপজেলা চেয়ারম্যান ও সাংসদদের মধ্যে; নির্বাচিত প্রতিনিধি ও কর্মকর্তাদের মধ্যে; নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিজেদের মধ্যে।

৩. **জনগণের অংশগ্রহণের অসারতা :** স্থানীয় সরকারব্যবস্থা প্রবর্তনের আরেকটি উদ্দেশ্য হলো প্রশাসনে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা। কিন্তু বাস্তবতা উল্টো সেখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার কোনো ব্যবস্থাই নেই।

৪. **স্থানীয় সম্পদের স্থানান্তর :** বিকেন্দ্রীকরণের আরেকটি উদ্দেশ্য হলো স্থানীয় সম্পদের স্থানান্তর ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ। কিন্তু স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় এ উদ্দেশ্য অর্জিত হয়নি। উপজেলা পরিষদকে স্থানীয় কর আদায়ের ক্ষমতা প্রদান করা হলেও তারা এতে ব্যর্থ হয়। তারা উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য প্রয়োজনীয় কর আদায় করতে পারেনি।

৫. **নির্বাচনী গণতন্ত্রের অপমৃত্যু :** ১৯৮৫, ১৯৯০ ও ২০০৯ সালে দেশে তিনটি উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনগুলোর অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, এসব নির্বাচনে জনগণের ভোটাধিকার প্রয়োগের চেয়ে সন্ত্রাস, কারচুপি, ব্যালট বাক্স চুরি প্রভৃতিরই প্রাধান্য ছিল এবং নির্বাচন উপহাসে পরিণত হয়েছিল। সর্বশেষ চতুর্থ উপজেলা নির্বাচন ২০1৪ সালে অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনেও সরকারি দলের প্রাধান্যই বেশি পরিলক্ষিত হয়।

৬. **গ্রামীণ টাউটদের উৎপত্তি :** বিকেন্দ্রীকরণের নামে স্থানীয় সরকারব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে সরকারি অফিস-আদালতে জনগণের প্রবেশের পথ মোটেও সুগম হয়নি। বরং একে কেন্দ্র করে গ্রামীণ এলাকায় এক শ্রেণীর টাউটের উৎপত্তি হয়, যারা জনগণের হয়ে এসব অফিস-আদালতে ধন্না দেয় এবং উপজেলা কর্মকর্তাদের সাথে যোগসাজশে সাধারণ জনগণকে হয়রানি করে।

৭. **মামলা-মোকদ্দমার অশুভ পরিণতি :** বিকেন্দ্রীকরণের একটা উদ্দেশ্য হলো বিচার ব্যবস্থাকে জনগণের দোরগোড়ায় নিয়ে যাওয়া। কিন্তু এক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারব্যবস্থা তেমন সুফল বয়ে আনতে পারেনি। কেননা তখন জনগণের অতি সাধারণ বিষয়েও মামলা-মোকদ্দমা করার প্রবণতা দেখা দেয়। তাছাড়া স্থানীয় প্রভাবশালীরা অহেতুক তাদের বিরোধীদের হয়রানির জন্য এ সুযোগ কাজে লাগায়।

৮. **সমন্বয়ের অভাব :** স্থানীয় সরকারের কার্যক্রমে সমন্বয়ের যথেষ্ট অভাব থাকে। বিশেষ করে সরকারি কর্মকর্তা এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-বিবাদ, পারস্পরিক অবিশ্বাস চরম আকার ধারণ করে।

৯. **অমনোযোগী নেতৃত্ব :** স্থানীয় সরকারের নেতারা তাদের সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রতিও তেমন মনোযোগী হন না। তাদের অধিকাংশই রাজধানী কিংবা জেলা শহরগুলোতে অবস্থান করেন। ফলে স্থানীয় সমস্যা সম্পর্কে তারা খোঁজখবর কমই রাখতে পারেন।

১০. **ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের আঞ্চলিকতা :** উপজেলা উন্নয়ন কমিটির মিটিংয়ের সময় চেয়ারম্যানরা উপজেলার সার্বিক উন্নয়নের পরিবর্তে নিজ নিজ এলাকার উন্নয়নের ব্যাপারে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। এতে সমন্বিত উন্নয়নের পরিবর্তে অঞ্চলভিত্তিক উন্নয়ন বৈষম্য দেখা দেয়।

উপসংহার : রাষ্ট্র পরিচালনায় কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন প্রকার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সম্পন্ন করে এবং স্থানীয় সরকার রাষ্ট্র পরিচালনায় ব্যাপক ভূমিকা রাখে। কিন্তু বাংলাদেশের ইতিহাসের আলোকে দেখা যায়, ১৯৭০-১৯৮০ দশক-পরবর্তীতে স্থানীয় সরকার প্রশাসনে পৃথিবীব্যাপী যে ব্যাপক পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছে এবং অত্যন্ত কার্যকর হয়েছে সেই তুলনায় বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার প্রশাসনের খুব বেশি আধুনিকায়ন হয়নি বা কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়নি। তাই রাষ্ট্র প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে দায়িত্ব, কার্যাবলী এবং ক্ষমতার স্বচ্ছ বণ্টন প্রদানপূর্বক কেন্দ্রীয় সরকারের সাংবিধানিক নিয়ন্ত্রণ যুগোপযোগী করে। বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের বিকেন্দ্রীকরণ নিশ্চিত করলে বাংলাদেশের সামগ্রিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা যেমন শক্তিশালী হবে তেমনি জনগণের অংশগ্রহণও নিশ্চিত হবে।

০৭ । উপজেলা পদ্ধতির ভালো-মন্দ দিকগুলো উল্লেখ করুন। উপজেলা পদ্ধতির স্থানীয় সরকার পুনরায় চালু করা উচিত কিনা যুক্তি সহকারে আলোচনা করুন। *[২৪তম বিসিএস]*
অথবা, **প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ কি? উপজেলা পদ্ধতির ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলো তুলে ধরে এর বাস্তবায়নে আপনার মতামত তুলে ধরুন।**

উত্তর : কোনো দেশের সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণ তার ক্ষমতার অবস্থান ও হস্তান্তর প্রক্রিয়ার দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত হয়। এক্ষেত্রে দুটি বিকল্প হতে পারে। যথা : ১. প্রশাসনিক ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ ও ২. বিকেন্দ্রীকরণ। বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র ও সমাজে এ উভয় অবস্থাই কমবেশি পরিলক্ষিত হয়। তবে সাধারণত আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ও উন্নয়নমুখী কর্মপরিকল্পনার প্রাধান্যের ফলে বিকেন্দ্রীকরণই তুলনামূলকভাবে জনপ্রিয়। বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এর প্রয়োজনীয়তা তুলনামূলকভাবে বেশি।

বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার হিসেবে উপজেলা পরিষদের যাত্রা : ১৯৮৫ সালে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ বাংলাদেশে উপজেলা ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। এ ব্যবস্থায় বিকেন্দ্রীকরণের সুফলগুলো জনগণের দোড়গোড়ায় পৌছে দেয়ার জন্য অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় এবং ব্যাপক সফলতাও আসে। কিন্তু এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কোনো কোনো ক্ষেত্রে এতই মারাত্মক ছিল যে, শেষ পর্যন্ত পুরো ব্যবস্থাটার ওপরই জনগণ আস্থা হারিয়ে ফেলে এবং পরবর্তীতে বিএনপি সরকার এসে ১৯৯১ সালে এ ব্যবস্থাকে বাতিল ঘোষণা করে। ১৯৯৮ সালের ৩ ডিসেম্বর তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার উপজেলা ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করে। অতঃপর ২০০৮ সালের ৩০ জুন রাষ্ট্রপতি স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ) অধ্যাদেশ জারি করেন। এ অধ্যাদেশের আলোকেই ২২ জানুয়ারি ২০০৯ অনুষ্ঠিত হয় তৃতীয় উপজেলা পরিষদ নির্বাচন।

বিকেন্দ্রীকরণের ধারণা : সাধারণভাবে বলা যায়, কোনো প্রশাসনিক সংস্থার দায়িত্ব ও কাজ যখন কোনো কেন্দ্র বা কেন্দ্রীয় সংস্থায় নিয়োজিত না রেখে অধস্তন সংস্থাসমূহের বা কেন্দ্র থেকে প্রদেশ অথবা স্থানীয় ও আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয় তখন সেখানে বিকেন্দ্রীকরণের নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে ধরা হয়। তবে বিভিন্ন লেখক এর সংজ্ঞা দিয়েছেন বিভিন্নভাবে। ডুয়াইট ওয়ালডো (Dwight Waldo) বলেন, 'Decentralization denotes a tendency where administration and responsibility are delegated from the central authority to regional and local units to suit the particular local conditions.' (বিকেন্দ্রীকরণ বলতে স্থানীয় কোনো বিশেষ অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে কেন্দ্রীয় প্রশাসন ও দায়িত্বকে আঞ্চলিক ও স্থানীয় সংস্থার নিকট হস্তান্তরকে বোঝায়।)

এল ডি হোয়াইটের ভাষায়, 'The process of transfer of administrative authority from a lower to a higher level of government is called centralization, the converse decentralization.'

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

Prof. Allen-এর মতে, 'কেন্দ্র থেকে প্রয়োগ করা সম্ভব এমন ক্ষমতা ব্যতীত অপর ক্ষমতা সর্বনিম্নস্তরে ভারার্পণের নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে বিকেন্দ্রীকরণ বলা হয়।'

সুতরাং বিকেন্দ্রীকরণ এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে ওপর থেকে ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তব্যকে একটি সুনির্দিষ্ট চ্যানেলের মাধ্যমে নিচে পর্যায়ক্রমে হস্তান্তর করা হয়। এ প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত প্রতিটি স্তর একে অপরের সাথে কোনো না কোনোভাবে জড়িত থাকে এবং সার্বিক প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় এদের সকলের কাজের সমন্বয় জরুরি বলে বিবেচিত হয়।

বিকেন্দ্রীকরণের অংশ হিসেবে উপজেলা কার্যক্রম : বিকেন্দ্রীকরণের অংশ হিসেবে প্রাথমিক পর্যায়ে দেশের ৪৫টি মান উন্নীত থানাকে উপজেলায় রূপান্তর করা হয়। তারপর পর্যায়ক্রমে দেশের সব কটি থানাকেই উপজেলায় রূপান্তর করা হয়। এ সময় ফৌজদারি কোর্টকে জেলা থেকে উপজেলায় স্থানান্তর এবং সকল বিভাগে উপজেলা অফিস স্থাপন করা হয়। ফলে দেশের সকল প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয় উপজেলা। প্রতি উপজেলায় একজন চেয়ারম্যান জনগণের ভোটে নির্বাচনের বিধান রাখা হয় এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলার অধীন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণ পদাধিকারবলে উপজেলা পরিষদের সদস্য হন। তবে বিকেন্দ্রীকরণের একটি পদক্ষেপ হিসেবে এ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হলে এক পর্যায়ে দেশের সর্বত্র এ ব্যবস্থার ইতিবাচক প্রভাবের পাশাপাশি নেতিবাচক প্রভাবও ক্রমশ সুস্পষ্ট হতে থাকে।

ইতিবাচক দিকসমূহ : ১৯৯১ সালে যখন উপজেলা ব্যবস্থা রহিত করা হয় তখন অনেকেই এ ব্যবস্থার পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করেন। তখন তারা যে সকল বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন সেগুলো হলো :

১. **গ্রামীণ এলাকার প্রতি বিশেষ নজর দান :** উপজেলা ব্যবস্থা যখন প্রবর্তন করা হয় তখন তার মূল উদ্দেশ্য ছিল গ্রামীণ জনগণের ভাগ্য উন্নয়নে বিশেষ নজর দান। সেজন্য বেশ কিছু ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়েছিল। যেমন—কৃষি উন্নয়নে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স স্থাপন, WFP, FFWP প্রভৃতি উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড।

২. **দ্রুত ও সহজ বিচারব্যবস্থা :** বিচারব্যবস্থাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌছে দিয়ে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাই ছিল উপজেলা ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য। সেজন্য উপজেলা পর্যায়ে ফৌজদারি কোর্ট স্থাপন করা হয়, যাতে সহজেই গ্রামীণ জনগণ আইনের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে।

৩. **পল্লী উন্নয়নের গণতান্ত্রিক রূপায়ণ :** উপজেলা ব্যবস্থায় পল্লী উন্নয়নের বহুমুখী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, যাতে স্থানীয় প্রতিনিধিদের উন্নয়ননীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে। এ ব্যবস্থা অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন নীতিকে বাস্তবায়নের নানা ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল।

৪. **পল্লী যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন :** উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে পল্লী এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়েছিল। কেননা তখন উপজেলা ছিল সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। ফলে জেলার সাথে উপজেলার যোগাযোগ, আন্তঃউপজেলা কেন্দ্রবিন্দু এবং উপজেলার সাথে প্রতিটি ইউনিয়ন ও গুরুত্বপূর্ণ এলাকার যোগাযোগ স্থাপন করা হয়েছিল।

৫. **গ্রামীণ অবকাঠামোর উন্নয়ন :** উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে অনেকগুলো নতুন বিভাগ উপজেলা পর্যায়ে স্থাপন করা হয়। যেমন—উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, মৎস্য অফিস, কৃষি সম্প্রসারণ অফিস, সমবায় অফিস প্রভৃতি। সেজন্য সৃষ্টি করতে হয় নানা সুযোগ-সুবিধা। অফিস ভবন নির্মাণ, কর্মকর্তাদের আবাসিক ভবন নির্মাণ, রাস্তাঘাটের সংস্কারসহ নানা অবকাঠামো গড়ে তোলা হয়। এভাবে একসময়ের অবহেলিত থানা প্রশাসনের অবকাঠামোগত ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছিল।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৬. **রাজনৈতিক উন্নয়ন :** উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে প্রভাবটি গ্রামীণ এলাকায় পড়েছিল, সেটি হলো জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি। উপজেলা পরিষদ নির্বাচন গ্রামীণ নেতৃত্বের পাঠশালা হিসেবে কার্যকর ছিল। ফলে এটি গ্রামীণ নেতৃত্বের বিকাশে বিশেষ অবদান রেখেছিল।

৭. **আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন :** উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে পল্লী এলাকায় কর্মচাঞ্চল্য এসেছিল এবং জনগণের একটি অংশের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। এতে দেশের ৪৮৩টি উপজেলায় প্রায় একই সঙ্গে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছিল।

নেতিবাচক দিকসমূহ : উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তনের যে উদ্দেশ্য ছিল বাস্তবতা ছিল তার থেকে অনেক দূর। যেমন—

১. **দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি :** সরকারি সম্পদ ও সেবার সুষ্ঠু বণ্টন নিশ্চিত করাই বিকেন্দ্রীকরণের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। অথচ সরকারি বণ্টন ব্যবস্থাকে রাজনীতিকীকরণের ফলে উপজেলা পরিণত হয়েছিল দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, লুটপাট আর অব্যবস্থাপনার প্রাণকেন্দ্রে। এক্ষেত্রে উপজেলা চেয়ারম্যানগণ তাদের আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব এবং রাজনৈতিক সহযোগীদের বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা দিতেন। যথা : বিভিন্ন টেন্ডার, ওয়ার্ক অর্ডার প্রদান; হাট-বাজার, জলমহাল, বালুমহাল, ঘাট প্রভৃতি নিজেদের লোকদের ইজারা প্রদান; বিভিন্ন লাইসেন্স ও পারমিট প্রদান প্রভৃতি।

২. **উপদলীয় কোন্দল ও দ্বন্দ্ব :** বিকেন্দ্রীকৃত উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে সেখানে বিভিন্ন দল-উপদল ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সৃষ্টি হয়। কেননা প্রভাবশালী মহলের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিরোধ এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা ও প্রভাব বিস্তারের দ্বন্দ্ব চরম আকার ধারণ করে। এ সকল দ্বন্দ্ব হলো সাধারণত উপজেলা চেয়ারম্যান ও সাংসদদের মধ্যে; নির্বাচিত প্রতিনিধি ও কর্মকর্তাদের মধ্যে; নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিজেদের মধ্যে।

৩. **জনগণের অংশগ্রহণের অসারতা :** উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তনের আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল প্রশাসনে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা। কিন্তু বাস্তবতা ছিল উল্টো। সেখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার কোনো ব্যবস্থাই ছিল না।

৪. **স্থানীয় সম্পদের স্থানান্তর :** বিকেন্দ্রীকরণের আরেকটি উদ্দেশ্য হলো স্থানীয় সম্পদের স্থানান্তর ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ। কিন্তু উপজেলা ব্যবস্থায় এ উদ্দেশ্য অর্জিত হয়নি। উপজেলা পরিষদকে স্থানীয় কর আদায়ের ক্ষমতা প্রদান করা হলেও তারা এতে ব্যর্থ হয়। তারা উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য প্রয়োজনীয় কর আদায় করতে পারেনি।

৫. **নির্বাচনী গণতন্ত্রের অপমৃত্যু :** ১৯৮৫-১৯৯০ সালের মধ্যে দেশে দুটি উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ দুটি নির্বাচনের অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, এসব নির্বাচনে জনগণের ভোটাধিকার প্রয়োগের চেয়ে সন্ত্রাস, কারচুপি, ব্যালট বাক্স চুরি প্রভৃতিরই প্রাধান্য ছিল এবং নির্বাচন উপহাসে পরিণত হয়েছিল। সর্বশেষ উপজেলা নির্বাচন ২২ জানুয়ারি ২০০৯ অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনেও সরকারি দলের প্রাধান্যই বেশি পরিলক্ষিত হয়।

৬. **গ্রামীণ টাউটদের উৎপত্তি :** বিকেন্দ্রীকরণের নামে উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে সরকারি অফিস-আদালতে জনগণের প্রবেশের পথ মোটেও সুগম হয়নি। বরং একে কেন্দ্র করে গ্রামীণ এলাকায় একশ্রেণীর টাউটের উৎপত্তি হয়, যারা জনগণের হয়ে এসব অফিস-আদালতে ধর্না দিত এবং উপজেলা কর্মকর্তাদের সাথে যোগসাজশে সাধারণ জনগণকে হয়রানি করতো।

৭. **মামলা-মোকদ্দমার অশুভ পরিণতি :** বিকেন্দ্রীকরণের একটা উদ্দেশ্য হলো বিচার ব্যবস্থাকে জনগণের দোরগোড়ায় নিয়ে যাওয়া। কিন্তু এক্ষেত্রে উপজেলা ব্যবস্থা তেমন সুফল বয়ে আনতে পারেনি। কেননা তখন জনগণের অতি সাধারণ বিষয়েও মামলা-মোকদ্দমা করার প্রবণতা দেখা দেয়। তাছাড়া স্থানীয় প্রভাবশালীরা অহেতুক তাদের বিরোধীদের হয়রানির জন্য এ সুযোগ কাজে লাগায়।

৮. **সমন্বয়ের অভাব :** উপজেলা পরিষদের কার্যক্রমে সমন্বয়ের যথেষ্ট অভাব ছিল। বিশেষ করে সরকারি কর্মকর্তা এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-বিবাদ, পারস্পরিক অবিশ্বাস চরম আকার ধারণ করে।

৯. **অমনোযোগী নেতৃত্ব :** উপজেলা পরিষদের নেতারা তাদের সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রতিও তেমন মনোযোগী ছিলেন না। তাদের অধিকাংশই রাজধানী কিংবা জেলা শহরগুলোতে অবস্থান করতেন। ফলে স্থানীয় সমস্যা সম্পর্কে তারা খোঁজখবর কমই রাখতে পারতেন।

১০. **ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের আঞ্চলিকতা :** উপজেলা উন্নয়ন কমিটির মিটিংয়ের সময় চেয়ারম্যানরা উপজেলার সার্বিক উন্নয়নের পরিবর্তে নিজ নিজ এলাকার উন্নয়নের ব্যাপারে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতো। এতে সমন্বিত উন্নয়নের পরিবর্তে অঞ্চলভিত্তিক উন্নয়ন বৈষম্য দেখা দিয়েছিল।

উপসংহার : দেশের প্রশাসন ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের বিকেন্দ্রীকরণ এবং জনগণের সাথে সরকারের নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই উপজেলা ব্যবস্থার যাত্রা শুরু হয়েছিল। এরশাদ সরকারের আমলে প্রবর্তিত উপজেলা ব্যবস্থা ১৯৯১ সালে ক্ষমতায় এসে বিএনপি সরকার বাতিল করে এবং ১৯৯২ সালের ২৯ জানুয়ারি আইন পাসের মাধ্যমে উপজেলা ব্যবস্থা রহিতকরণ করা হয়। ১৯৯৮ সালের ৩ ডিসেম্বর আওয়ামী লীগ সরকার সংসদে আইন পাস করে উপজেলা ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করে। ১৯৯৯ সালের ১ ফেব্রুয়ারি গেজেটের মাধ্যমে উপজেলা আইন কার্যকর হয়। ২০০০ সালের ২০ এপ্রিল সরকার সকল প্রশাসনিক থানাকে উপজেলা হিসেবে অভিহিত করার নির্দেশ জারি করে। ২০০৮ সালের ৩০ জুন রাষ্ট্রপতি উপজেলা পরিষদে ২ জন ভাইস চেয়ারম্যান (১ জন মহিলা) সৃষ্টি করে স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ) অধ্যাদেশ ২০০৮ জারি করেন। এই অধ্যাদেশের আলোকেই অনুষ্ঠিত হয় ২০০৯ সালে তৃতীয় উপজেলা পরিষদ নির্বাচন এবং ২০১৪ সালে চতুর্থ উপজেলা পরিষদ নির্বাচন।

০৮। স্থানীয় সরকার বলতে কি বোঝেন? দেশে কয়টি স্থানীয় সরকার গঠন এবং কোন স্তরে কি কি ক্ষমতা ও দায়িত্ব থাকা সমীচীন বলে আপনি মনে করেন? *[১৮তম বিসিএস]*

***অথবা,* স্থানীয় সরকারকে আরও কার্যকর করার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট পরামর্শ দিন।** *[২৭তম বিসিএস]*

***অথবা,* গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার গুরুত্ব কতটুকু? সংক্ষেপে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বর্ণনা দিন।** *[২৯তম বিসিএস]*

উত্তর : আধুনিককালের প্রশাসনিক ব্যবস্থা পর্যালোচনা করলে একটি বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, দিন দিন স্থানীয় সরকারব্যবস্থার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়ে চলছে। পূর্বে কোনো রাজা বা মহারানী সমগ্র দেশকে একটি কেন্দ্রীয় প্রশাসনযন্ত্রের সাহায্যে যথেষ্ট প্রতাপের সাথে শাসন করতেন। তখন দেশের কেন্দ্রীয় সরকারই ছিল সকল ক্ষমতার উৎস। এমনকি গণতন্ত্রের যুগেও সেসব দেশে আঞ্চলিক তথা স্থানীয় সরকারের তেমন গুরুত্ব ছিল না। কিন্তু অধুনা অধিকাংশ গণতান্ত্রিক দেশেই বিকেন্দ্রীকরণ নীতি গৃহীত হয়েছে। তাই আঞ্চলিক তথা স্থানীয় সমস্যা স্থানীয়ভাবে সমাধানকল্পে স্থানীয় সরকারসমূহকে যথেষ্ট স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশসহ অনেক দেশের সংবিধানেই এ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার

স্বীকৃত হয়েছে। দেশের ভৌগোলিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে স্থানীয় সরকারের গুরুত্ব ও তাৎপর্য দিন দিন বেড়ে চলছে।

স্থানীয় সরকার : স্থানীয় সরকার বলতে স্থানীয় পর্যায়ে সরকার ব্যবস্থা অর্থাৎ কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন, গ্রাম ও অপরাপর সংস্থার কর্মতৎপরতাকে বোঝায়। এ সমস্ত কর্মতৎপরতা সাধারণত কোনো নির্দিষ্ট এলাকা বা স্থানের জনগণের কল্যাণার্থে সম্পাদিত হয়। Prof. R M Jackson তার The Machinery of Local Government গ্রন্থে বলেন, 'স্থানীয় সরকার মূলত সম্প্রদায়ের কল্যাণে বিভিন্ন সেবামূলক কাজ পরিচালনা করার এক পদ্ধতি বিশেষ।'

জাতিসংঘ স্থানীয় সরকারের সংজ্ঞা দিয়েছে এভাবে, 'স্থানীয় সরকার কোনো দেশ বা রাষ্ট্রের আইনসভার অতি ক্ষুদ্র রাজনৈতিক বিভক্তিকরণকে নির্দেশ করে, কর আরোপ এবং শ্রমিক নিয়োগসহ স্থানীয় বিষয়সমূহের ওপর যাদের যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ বিদ্যমান। এই সংস্থার পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ নির্বাচিত বা স্থানীয়ভাবে মনোনীত হয়ে থাকে।'

বাংলাদেশের সংবিধানে স্থানীয় সরকার : বাংলাদেশ সংবিধানের বিধানাবলীর মধ্যে স্থানীয় শাসন সম্পর্কিত বিধানসমূহ অন্যতম। সংবিধানের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ভাগের ৯ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'রাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রতিনিধিগণ সমন্বয়ে গঠিত স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহদান করবেন এবং এ সকল প্রতিষ্ঠানসমূহে কৃষক, শ্রমিক এবং মহিলাদেরকে যথাসম্ভব বিশেষ প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হবে।'

১১ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'প্রজাতন্ত্র হবে গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে।'

স্থানীয় শাসন ভাগের ৫৯ ও ৬০ ধারায় স্থানীয় শাসন সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিধান দেওয়া হয়েছে। ৫৯ (১) বিধিতে বলা আছে, 'আইন অনুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হবে।'

৬০ নং অনুচ্ছেদে ৫৯ অনুচ্ছেদের বিধানাবলীকে পূর্ণ কার্যকারিতা দানের উদ্দেশ্যে সংসদ আইনের দ্বারা উক্ত অনুচ্ছেদে উল্লিখিত স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় প্রয়োজনে কর আরোপ করবার ক্ষমতাসহ বাজেট প্রস্তুতকরণ ও নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা প্রদান করবে।

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা : ২০০৮ সালের মে মাসে জারিকৃত অধ্যাদেশ অনুসারে বর্তমানে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে তিন স্তরবিশিষ্ট এবং শহরাঞ্চলে দুই স্তরবিশিষ্ট স্থানীয় সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান। স্তরগুলো হলো :

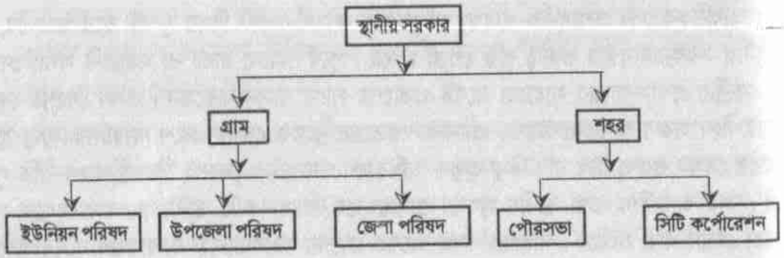

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

উল্লেখ্য, পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলা এ প্রক্রিয়ার বাইরে থাকবে, সেখানে পার্বত্য শান্তিচুক্তির আওতায় বর্তমানের তিনটি জেলা পরিষদ কিছু সংস্কার সাধনের পর কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে।

স্থানীয় সরকারের গঠন এবং বিভিন্ন স্তরের ক্ষমতা ও কার্যাবলী : স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ স্থানীয় কাউন্সিল ও মিউনিসিপ্যাল (বাতিল ও পরিচালনা) আদেশ অনুযায়ী বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন পরিচালনার জন্য যেসব স্থানীয় প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করা হয়, তন্মধ্যে– ক. ইউনিয়ন পঞ্চায়েত; খ. নগর পঞ্চায়েত; গ. শহর কমিটি; ঘ. থানা উন্নয়ন কমিটি; ঙ. জেলা বোর্ড ও চ. পৌরসভা উল্লেখযোগ্য।

১৯৭২ সালে এ ব্যবস্থা কার্যকর করা হলেও ১৯৭২ সালে স্থানীয় প্রশাসনে রদবদল করা হয়। ফলে ইউনিয়ন পঞ্চায়েতগুলো ইউনিয়ন পরিষদে এবং শহর পঞ্চায়েতগুলো পৌরসভায় রূপ লাভ করে। এর পরে বহুবার বহু আইনের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের গঠনে পরিবর্তন এসেছে, তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনটি সাধিত হয় ১৯৯৭ সালের Local Government Act-1997 অনুসারে। পরবর্তীতে খালেদা জিয়া সরকার এসে এর সাথে যোগ করে গ্রাম পরিষদ ও উপজেলা পরিষদ। সর্বশেষ ২০০৮ সালের মে মাসে জারিকৃত অধ্যাদেশ অনুসারে বর্তমানে বাংলাদেশে স্থানীয় সরকারের নিম্নলিখিত স্তরগুলো বিদ্যমান :

গ্রামাঞ্চল : ক. ইউনিয়ন পরিষদ; খ. উপজেলা পরিষদ ও গ. জেলা পরিষদ।

শহরাঞ্চল : ক. পৌরসভা ও খ. সিটি কর্পোরেশন।

ইউনিয়ন পরিষদ

গঠন : প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটের মাধ্যমে প্রতিটি ইউনিয়নে একজন চেয়ারম্যান, ৯টি ওয়ার্ডে ৯ জন মেম্বার এবং প্রতি তিনটি ওয়ার্ডে ১ জন করে মহিলা মেম্বার নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয়। ইউনিয়ন পরিষদের প্রধান হচ্ছেন চেয়ারম্যান। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের মেয়াদকাল ৫ বছর।

কার্যাবলী : ইউনিয়ন পরিষদ বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ড সম্পাদন করে থাকে। এসব কার্যাবলীকে প্রধানত দু ভাগে ভাগ করা হয়। যথা : ক. মৌলিক কার্যাবলী এবং খ. উন্নয়নমূলক কার্যাবলী।

ক. মৌলিক কার্যাবলী : প্রধান প্রধান মৌলিক কার্যাবলীগুলো হলো :

১. শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করা;
২. গ্রাম প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
৩. রাজস্ব আদায় করা;
৪. ছোট ছোট দেওয়ানী ও ফৌজদারি মামলার বিচার করা;
৫. দুর্যোগকালীন সময়ে ত্রাণ ও পুনর্বাসনমূলক কাজে অংশগ্রহণ করা;
৬. সরকারের কাজে সহযোগিতা করা ইত্যাদি।

খ. উন্নয়নমূলক কাজ : উন্নয়নমূলক কাজগুলো নিম্নরূপ :

১. রাস্তাঘাট নির্মাণ, মেরামত ও তত্ত্বাবধান করা এবং আলোর ব্যবস্থা করা;
২. রাস্তাঘাটের পাশে বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ করা;
৩. খেলাধুলার জন্য মাঠ নির্মাণ, পার্ক নির্মাণ, মেরামত ও সংরক্ষণ করা;
৪. কবরস্থান, শ্মশান, মসজিদ, মন্দির প্রভৃতি সাধারণ স্থান সংরক্ষণ করা;
৫. এতিমখানা স্থাপন;
৬. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিধান করা;

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৭. বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা
৮. নলকূপ স্থাপন করা ও ড্রেনের ব্যবস্থা করা;
৯. জন্ম, মৃত্যু ও বিয়ে রেজিস্ট্রি করা;
১০. পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণে উৎসাহিত করা;
১১. স্থানীয় শিক্ষার উন্নয়নে কাজ করা এবং
১২. সংস্কার ও উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ করা।

উপজেলা পরিষদ

১৯৮২ সালের ২৩ অক্টোবর তৎকালীন সামরিক সরকার এক আদেশ বলে উপজেলা পরিষদ গঠন করে। পরবর্তীতে ১৯৯১ সালে তা বাতিল করা হলেও ১৯৯৮ সালের ২৫ নভেম্বর জাতীয় সংসদ উপজেলা পরিষদ আইন প্রণয়ন করে পুনরায় উপজেলা ব্যবস্থা চালু করে।

গঠন : উপজেলা পরিষদের প্রধান হচ্ছেন চেয়ারম্যান। তিনি জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। এছাড়া ২ জন ভাইস-চেয়ারম্যান রয়েছেন, যার মধ্যে ১ জন নারী থাকবেন। উপজেলা পরিষদের সাচিবিক সহায়তা করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা। উপজেলা পরিষদের ১৪টি স্থায়ী কমিটি রয়েছে। উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যানের মেয়াদকাল ৫ বছর।

কার্যাবলী : উপজেলা পরিষদের প্রধান প্রধান কার্যাবলীগুলো হলো :
১. উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা;
২. ইউনিয়ন পরিষদগুলোকে উন্নয়নমূলক কাজে সহযোগিতা করা;
৩. স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা;
৪. উপজেলা পর্যায়ে সরকারি নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
৫. সমবায় আন্দোলন জোরদার করা;
৬. কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষকদের মধ্যে উন্নতমানের সার, বীজ, কীটনাশক সরবরাহ করা;
৭. শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণ করা;
৮. পশুপালন, মৎস্য চাষ, বৃক্ষরোপণ করা;
৯. নারী ও শিশু নির্যাতন বা পাচার রোধ করা;
১০. পুলিশ বাহিনীর সহায়তায় আইনশৃঙ্খলা নিশ্চয়তা বিধান করা ইত্যাদি।

জেলা পরিষদ

জেলা পরিষদ হলো বাংলাদেশে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের সর্বোচ্চ স্তর।

গঠন : জেলা পরিষদ আইন ২০০০ (২০০০ সালের ১৯ নং আইন) অনুসারে জেলা পরিষদ নিম্নলিখিত সদস্যদের নিয়ে গঠিত হবে। যেমন–
ক. একজন চেয়ারম্যান;
খ. পনের জন সদস্য; এবং
গ. সংরক্ষিত আসনের পাঁচজন মহিলা সদস্য।

সকল জেলা পরিষদের সদস্য সংখ্যা সমান নয়। মনোনীত মহিলা সদস্যদের সংখ্যা নির্বাচিত সদস্য ও সরকারি সদস্যের এক দশমাংশের বেশি হবে না। অন্যদিকে নির্বাচিত সদস্যের সংখ্যা মনোনীত মহিলা

সদস্য ও সরকারি সদস্যের মোট সংখ্যার চেয়ে কম হবে না। সরকারি সদস্যরা পদাধিকার বলে সদস্য হবেন। মহিলা সদস্যদের মনোনয়ন দান করবেন বিভাগীয় কমিশনার।

কার্যাবলী : জেলা পরিষদের প্রধান প্রধান কার্যাবলীগুলো হলো :
১. উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা বা সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত নয় এরূপ রাস্তাঘাট, সেতু, পুল, জলপথ নির্মাণ ও মেরামত করা;
২. প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ ও উন্নয়ন করা;
৩. লাইব্রেরি, হাসপাতাল ও পশু চিকিৎসালয় স্থাপন করা;
৪. বৃক্ষরোপণ, পার্ক, মসজিদ, মন্দির, ডাক বাংলো ও রেস্ট হাউস নির্মাণ করা;
৫. মেলা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা;
৬. আদর্শ কৃষিখামার প্রতিষ্ঠা করা, উন্নত চাষাবাদের ব্যবস্থা করা;
৭. এতিমখানা, আশ্রম স্থাপন করা এবং ভিক্ষাবৃত্তি ও পতিতাবৃত্তিতে নিরুৎসাহিত করা;
৮. গণপূর্ত ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক কার্যাবলী সম্পাদন করা;
৯. সরকারি দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা।

পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন

গ্রামাঞ্চলে স্থানীয় সরকার ইউনিট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ইউনিয়ন পরিষদ। আর শহরের জন্য স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারি প্রতিষ্ঠান হলো পৌরসভা। দুই বন্দর নগরীর জন্য রয়েছে দুটি পোর্ট ট্রাস্ট এবং ৬টি সেনানিবাসের জন্য রয়েছে ৬টি ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড। রাজধানী ঢাকায় উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নামে দুটি, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা, রংপুর ও গাজীপুরে রয়েছে ১১টি সিটি কর্পোরেশন। স্বাধীনতার পরে ১৯৭৩ সালে পৌরসভার সংখ্যা ছিল ৭৩টি। বর্তমানে (মে ২০১৫) পৌরসভার সংখ্যা ৩১৯টি।

গঠন : পৌরসভা গঠিত হয় একজন মেয়র, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক নির্বাচিত কাউন্সিলর ও মহিলা কাউন্সিলরের সমন্বয়ে। মেয়র, কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত নারী আসনের নারী কাউন্সিলরগণও ৫ বছরের জন্য জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। সিটি কর্পোরেশনেও একজন মেয়র প্রতিটি ওয়ার্ডে একজন কমিশনার এবং ৩টি ওয়ার্ড মিলে একজন নারী কমিশনার নিয়ে গঠিত।

কার্যাবলী : পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের কার্যাবলী নিম্নরূপ :
১. শহরের জনস্বাস্থ্যমূলক কার্যাবলী সম্পাদন করা;
২. বিশুদ্ধ পানির সরবরাহের ব্যবস্থা করা, পানি নিষ্কাশন ও পয়ঃপ্রণালী তৈরি করা ও মেরামত করা;
৩. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা;
৪. পৌর পরিকল্পনা অনুযায়ী নগর পরিচালনা করা;
৫. রাজপথ ও সড়ক নির্মাণ করা;
৬. জননিরাপত্তা বিধান করা;
৭. পার্ক, উদ্যান তৈরি ও সংরক্ষণ করা;
৮. সুশিক্ষা নিশ্চিত করা এবং শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করা ইত্যাদি।

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালী করার উপায় : স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কে এমন কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত, যা গণতন্ত্র ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। এ ব্যাপারে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে :

প্রথমত, স্থানীয় সরকারের অর্থ সংগ্রহ ও ব্যবহারের সাংবিধানিক নিশ্চয়তা থাকতে হবে। আমাদের দেশে বাজেট প্রণীত হয় উপরিমহল থেকে এবং তা নিম্নপর্যায়ে চাপিয়ে দেয়া হয়। এক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারের কিছু করণীয় থাকে না। তাই সাংবিধানিকভাবে স্থানীয় সরকারের অর্থের উৎস চিহ্নিতকরণ এবং আদায়ের ব্যবস্থাসহ নিজস্ব বাজেট প্রণয়নের একটি অংশ স্থানীয় সরকারকে দেয়া যেতে পারে। এ লক্ষ্যে সাংবিধানিকভাবে একটি স্থানীয় অর্থ কমিশন গঠন করা যেতে পারে। উল্লেখ্য যে, ভারতে এ রকম কমিশন রয়েছে।

দ্বিতীয়ত, প্রতিটি ক্ষেত্রেই সর্বজনীন ভোটাধিকারের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে।

তৃতীয়ত, স্থানীয় সরকারের অধীনস্ত কর্মকর্তাদের পরিচালনার অধিকার স্থানীয় সরকারকেই দিতে হবে।

চতুর্থত, স্থানীয় সরকারের নেয়া পরিকল্পনা প্রতিটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় স্থান দিতে হবে।

পঞ্চমত, স্থানীয় সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

ষষ্ঠত, স্থানীয় সরকার আমলাতন্ত্রের লাঠি হিসেবে যাতে ব্যবহার না হয়, সেজন্য এর সাংবিধানিক কার্যকরী স্বীকৃতি থাকতে হবে।

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করার লক্ষ্যে যদি উল্লিখিত ব্যবস্থাপনা সাংবিধানিক রূপদান করা যায় তাহলে এর প্রভাব সামগ্রিক প্রশাসনে পড়বে বলে আশা করা যায়।

উপসংহার : গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, অর্থনৈতিক উন্নয়নসহ মানব উন্নয়ন সম্ভব হয় শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাপনার সাথে কেন্দ্রীয় সরকারের সমন্বয়ের মাধ্যমে। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারকে যথেষ্ট গণতান্ত্রিক হতে হবে। সংবিধানে বর্ণিত স্থানীয় সরকার সংক্রান্ত নীতিমালাসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হলে দেশে একটি শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাপনা গড়ে উঠবে, যে ব্যবস্থাপনার সাথে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে। প্রকৃত অর্থে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় স্থানীয় শাসনের বিকল্প নেই। নরওয়ের Los-Sentert University, Bergon-এর অধ্যাপক Mr. Valdersin-এর মতে, 'Local Government is the yardstick of Good Governance.'

০৯। বাংলাদেশে প্রশাসনিক সংস্কারের আবশ্যকতা কত দূর? এক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়সমূহ দূরীকরণে আপনার সুপারিশ আলোচনা করুন। *[২০তম বিসিএস]*

***অথবা,* বাংলাদেশের প্রশাসন ব্যবস্থাকে একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার উপযোগী করে তুলতে হলে কি করা উচিত বলে আপনি মনে করেন?**

উত্তর : বাংলাদেশ রাষ্ট্র হিসেবে নতুন হলেও জাতিগত বিবেচনায় এর ইতিহাস সুপ্রাচীন। এ দেশটি ১৯০ বছর যাবৎ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন এবং ২৫ বছর যাবৎ পাকিস্তানের শাসনাধীন ছিল। ব্রিটিশ আমল ও পাকিস্তান আমলে প্রবর্তিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা বর্তমান সময়কার স্বাধীন দেশের নাগরিকদের জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। প্রশাসন রাষ্ট্রযন্ত্রের অন্যতম উপাদান। সরকারের নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে প্রশাসনই মুখ্য ভূমিকা পালন করে। দক্ষ, গতিশীল এবং যুগোপযোগী প্রশাসনের অভাবে দেশের

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

সার্বিক অগ্রগতি ও উন্নতি বাধাগ্রস্ত হয়। উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রশাসনের ভূমিকার তাৎপর্যের কারণেই বিজ্ঞজনেরা প্রশাসনকে নিয়ে নানাভাবে চিন্তাভাবনা করে থাকেন। একটি গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় প্রশাসন কিভাবে অগ্রগতিতে সহায়ক শক্তি হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারে এটা অনুসন্ধান করতে গিয়েই প্রশাসনিক সংস্কারের দিকে আমাদের দৃষ্টিপাত করতে হয়।

প্রশাসনিক সংস্কার : বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্রেরই একটি নিজস্ব প্রশাসনিক কাঠামো রয়েছে। আধুনিক রাষ্ট্র কল্যাণকামী রাষ্ট্র বিধায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সরকারি কাজের পরিধি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবার সাথে সাথে প্রশাসনিক কাজের পরিধিও বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই বর্তমানে গতিশীল ও পরিবর্তনশীল সমাজে প্রশাসনিক কাজের পরিধির ব্যাপকতার ফলে প্রশাসনিক কাঠামোর ক্ষেত্রে সাধিত হয়েছে পরিবর্তন। সামাজিক প্রয়োজন তথা রাষ্ট্রীয় চাহিদা এবং বিশ্ব প্রেক্ষাপটের সাথে সঙ্গতি রেখেই প্রশাসনিক কাঠামোর পুনর্বিন্যাস, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধিত হয়। এর এটাই হচ্ছে প্রশাসনিক সংস্কার বা Administrative reformation।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীনতা অর্জনের পরপরই সুষ্ঠু ও সুন্দর প্রশাসনিক অবকাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশে সচিবালয় পুনর্গঠন ও মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। ফলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে ১৯৭২ সালের প্রণীত বিভিন্ন আইন অনুযায়ী প্রশাসনিক ব্যবস্থার কাঠামোগত রূপ প্রণয়ন করা হয়, যা প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ হিসেবে বিবেচিত। আর এ বিকেন্দ্রীকরণ ছিল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রথম প্রশাসনিক সংস্কার। পরবর্তীতে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের ওপর ভিত্তি করে, বিশেষত সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে কিছু কিছু প্রশাসনিক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধিত হয়েছে, যা প্রশাসনিক সংস্কারের আওতাভুক্ত।

বাংলাদেশের প্রশাসনিক সংস্কারের আবশ্যকতা : সমাজের সতত পরিবর্তনশীল চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রাখার জন্য প্রশাসনিক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। উন্নত-অনুন্নত নির্বিশেষে সকল রাষ্ট্রই এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। তবে বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশসমূহের ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক শাসন পরবর্তী চ্যালেঞ্জ এবং চাহিদাসমূহ মোকাবিলার জন্য এ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা আরো বেশি। আমাদের দেশের প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের কার্যাবলী সাধারণত আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; কিন্তু প্রচলিত আইনে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের অনেক বেশি ব্যক্তিগত বিচার-বুদ্ধি অনুযায়ী কাজ করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে আইনের মাধ্যমে অনেক ক্ষেত্রে বা প্রায় সকল ক্ষেত্রে নাগরিকদের প্রতি এবং সমাজের প্রতি প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের আইনি কর্তব্য সৃষ্টি হয় না, সৃষ্টি হয় সমাজ ও নাগরিকদের প্রতি আইনি কর্তৃত্ব।

বর্তমানে বাংলাদেশের প্রশাসনিক দুর্নীতি ব্রিটিশ আমলকেও ছাড়িয়ে গেছে এবং প্রায় সকল স্তরের কর্মকর্তার মধ্যে তা সংক্রামক ব্যাধির মতো বিরাজ করছে। আজ দেশের জনগণকে প্রশাসনিক দুর্নীতির শিকার হতে হচ্ছে প্রতি পদে, নানাভাবে—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে। এ অন্যায়, অবিচার আর দুর্নীতি থেকে জনগণকে মুক্ত করতে প্রশাসনিক সংস্কারের আবশ্যকতা অনস্বীকার্য।

বাংলাদেশের সরকার অনেকাংশেই আমলানির্ভর আর আমলানির্ভর সরকার হলো আমলাতন্ত্রের নামান্তর। গণতন্ত্র আর গণতান্ত্রিক সরকারের সাফল্য আমলাতন্ত্র নস্যাৎ করে দেয়। এজন্য গণতন্ত্র হয় বাধাগ্রস্ত। দেশের রাজনৈতিক নেতা-নেত্রী কর্তৃক আমলাদের কাছে অন্যায় ও বেআইনি আবদারই আমলাদের দুর্নীতিবাজ করার জন্য অনেকাংশে দায়ী। এমতাবস্থায় দেশ ও দশের স্বার্থে প্রশাসনিক সংস্কার একান্ত আবশ্যক।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

সংস্কারের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়সমূহ : বাংলাদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় বিদ্যমান বৈশিষ্ট্যসমূহই প্রশাসনিক সংস্কারের ক্ষেত্রে প্রধান বাধা। বাংলাদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় বর্তমান বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ :

- ক্ষমতা কেন্দ্রীভূতকরণ (Centralization of Power)
- সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বহুবিধ স্তর (Multiple Layers of decision making)
- নিয়ন্ত্রিত কার্যপ্রণালী বিধি (Regulatory modus operandi)
- নিয়মানুগ অবিশ্বাস (Systematic Lack of trust)
- জবাবদিহিতার অভাব (Lack of Accountability)
- প্রতিশ্রুতির অভাব (Lack of Commitment)
- উৎসাহ প্রদানের ব্যবস্থার অভাব (Lack of incentive)
- শ্রেণীবিভাগের ওপর অধিক নির্ভরতা (Excessive reliance on hierarchy)
- অধীনদের ওপর বিশ্বাসের অভাব (Lack of trust in the subordinates)
- পুনঃপুন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জবাবদিহিতার বিভাজন (Diffusion of accountability through overlapping checks and balances)
- স্বচ্ছতার অভাব (Lack of transperancy)

নিম্নবর্ণিত কারণসমূহকেও প্রশাসনিক সংস্কারের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয় :

- কায়েমী স্বার্থ (Vested Interests)
- ভয় ও নিরাপত্তাহীনতা (Fear and insecurity)
- সীমিত সম্পদ
- সংস্কার কর্মীদের প্রতি বিশ্বাস ও সম্মানের অভাব ইত্যাদি।

প্রশাসনিক সংস্কারের ক্ষেত্রে কতিপয় সুপারিশ : বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত কমপক্ষে ২১টি কমিশন প্রশাসনিক সংস্কারের জন্য গঠিত হয়েছে। এসব কমিটি সংস্কারের উদ্দেশ্য নানাবিধ সুপারিশমালা পেশ করেছে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, কোনো সুপারিশই পূর্ণমাত্রায় বাস্তবায়িত হয়নি। মূলত আমলাতন্ত্র (Bureaucracy) এবং রাজনৈতিক পদ্ধতি (Political system) থেকেই অধিকাংশ সংস্কার প্রচেষ্টা বাধাগ্রস্ত হয়েছে। সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে দৃঢ় সিদ্ধান্তের অভাব, পরিবর্তনের ব্যাপারে অনীহা এবং বর্তমান অবস্থা অপরিবর্তিত (Maintaining Status-quo) রাখার প্রবণতার কারণেই মূলত সংস্কার কর্মসূচি বাধাগ্রস্ত হয়।

বাংলাদেশের প্রশাসনিক সংস্কারের জন্য নিম্নবর্ণিত সুপারিশমালা বিবেচনায় আনা যেতে পারে :

১. **সরকারি ক্ষেত্রসমূহের সীমা নির্ধারণ :** স্বাধীনতার পর থেকে আমাদের দেশের সরকারের আকার প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। বাংলাদেশে বর্তমানে মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা ৪১, যেখানে মালয়েশিয়ায় ২০টি এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় ১৭টি। আমাদের সরকারে প্রায় ১০ লাখের মতো সরকারি কর্মচারী আছে। সরকারের আয়তন বাড়লেও গুণগত মান আদৌ বাড়েনি। এজন্যই সরকারের ভূমিকা পুনর্নির্ধারণ প্রয়োজন। এজন্য নিম্নবর্ণিত চারটি পদক্ষেপ নিতে হবে :

ক. সরকারের আয়তন ছোট এবং যথাযথ করা।
খ. বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা বৃদ্ধি করা।
গ. স্থানীয় সরকারসমূহের প্রতিপালন।
ঘ. ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ বৃদ্ধিকরণ।

২. **জবাবদিহিতা এবং প্রতিবেদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ (Enhancing Accountability and Responsiveness of the Govt.) :** বাংলাদেশের সরকারব্যবস্থায় পার্লামেন্ট থেকে শুরু করে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী পর্যন্ত কোথাও জবাবদিহিতার লেশমাত্র নেই। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা যেতে পারে :

ক. স্বীয় দায়বদ্ধতা থাকতে হবে।
খ. সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে কর্মসম্পাদনের কর্তৃত্ব দিতে হবে।
গ. তদারকির ব্যবস্থা থাকতে হবে।
ঘ. গণমাধ্যমের Accessibility থাকতে হবে।
ঙ. নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।
চ. ন্যায়পালের ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।
ছ. সংসদীয় স্থায়ী কমিটি ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।
জ. Standards Customer Service প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
ঝ. উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন টাস্কফোর্স গঠন করতে হবে।
ঞ. দুর্নীতি দূর করতে হবে।

৩. **স্বচ্ছতা বৃদ্ধি (Transperancy) :** প্রশাসনে স্বচ্ছতা আনয়নে যেসব পদক্ষেপ নেয়া জরুরি তা হলো :

ক. কাজের পরিধি নির্দিষ্ট থাকতে হবে।
খ. কাজের গতিপ্রকৃতি প্রকাশ করতে হবে।
গ. বর্তমান প্রচলিত 'Secret Act' বাতিল করতে হবে।
ঘ. Discretionary power হ্রাস করতে হবে।
ঙ. অর্থনৈতিক সব বিষয় জনসম্মুখে প্রকাশ করতে হবে।

৪. **দক্ষতা বৃদ্ধি (Enhancing efficiency) :** প্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করা আবশ্যক :

ক. পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। ক্ষেত্র বিশেষে বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
খ. প্রশাসনে উপযুক্ত ও দক্ষ জনশক্তি নিয়োগ করতে হবে।
গ. নিয়োগ পদ্ধতি আধুনিক করতে হবে। এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা ও স্বচ্ছতার ব্যবস্থা থাকতে হবে।
ঘ. শিক্ষানবিশকালকে গুরুত্বের সাথে বিচার করতে হবে।
ঙ. ভালো কাজে উৎসাহিতকরণে পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।
চ. Automation এবং Information Network System (INS) প্রবর্তন করতে হবে।
ছ. বিভিন্ন সার্ভিসের মাঝে বিরাজমান বৈষম্য দূর করতে হবে।

৫. **গতিশীলতা ও কার্যকারিতা (Dynamism & effectiveness) :** স্থবির হয়ে পড়া বাংলাদেশের প্রশাসনে গতিসঞ্চার এবং কার্যকর করতে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে :

ক. প্রতিটি কর্মসম্পাদনে একক দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব প্রদান করতে হবে।
খ. দ্রুত এবং যথাযথ কারিগরি সহায়তা প্রদান করতে হবে।
গ. সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ তিনটি পর্যায় ধার্য করতে হবে।
ঘ. Performance Auditing ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।

ঙ. পুরাতন ও জটিল আইনসমূহ সংস্কার করতে হবে।
চ. চুক্তিভিত্তিক নিয়োগব্যবস্থা বাতিল করে চাকরিতে পদোন্নতি ও উৎসাহভাতার ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।

৬. **প্রশাসনে জনগণের অংশগ্রহণ :** প্রশাসনে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে নিম্নোক্ত দুটি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে :
ক. উন্নয়ন কর্মকাণ্ড চিহ্নিতকরণ এবং কর্মকাণ্ড হাতে নেয়ার পর জনপ্রতিনিধি ও জনসাধারণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
খ. আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায়ও জনসাধারণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

৭. **নিয়ন্ত্রণমূলক ও আইনগত সংস্কার (Regulatory & Legal reforms) :** প্রশাসনকে নিয়ন্ত্রণমুক্ত রাখা ও আইনগত সংস্কারে নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে :
ক. সরকারি অফিসসমূহে অনর্থক কালক্ষেপণ যেন না হয় সেজন্য নিয়ন্ত্রণ হ্রাস করতে হবে।
খ. আইন মন্ত্রণালয়ে Clearing house প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যা সব ধরনের আইন-কানুনের হিসাব রাখে।
গ. আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রেও স্বচ্ছতা থাকতে হবে।
ঘ. Law Reform Commission-কে কার্যকরী করতে হবে।
ঙ. কোর্টসমূহের গতি এবং ক্ষমতা বাড়াতে হবে।
চ. আদালতের উন্নয়ন সাধন করতে হবে।
ছ. নিম্ন আদালতসমূহের ওপর তদারকি জোরদার করতে হবে।
জ. শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ সম্পূর্ণরূপে আলাদা করতে হবে।

৮. **বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সংস্কারসমূহ :** প্রশাসন ক্ষেত্রে সংস্কারকল্পে যেসব কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে সেজন্য নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা যেতে পারে :
ক. সংস্কার কর্মসূচি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারকে দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে হবে।
খ. উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন এবং পেশাগত দিক দিয়ে দক্ষ কর্মকর্তাদের নিয়ে Reforms Commission গঠন করতে হবে।
গ. বেসামরিক কর্মকর্তা-কর্মচারী (Civil Servants) হচ্ছে পরিবর্তনের প্রতিনিধি। অতএব তাদেরকে পূর্ণমাত্রায় স্বীকৃতি দিতে হবে।
ঘ. সংবাদপত্র এবং গণমাধ্যমসমূহ যেন বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করে তা নিশ্চিত করতে হবে।
ঙ. সংস্কার কর্মসূচি পর্যায়ক্রমে হাতে নিতে হবে। হঠাৎ কোনো ব্যাপক সংস্কার কর্মসূচি হাতে নিলে তা ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল।

উপসংহার : অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক সংস্কারের প্রচণ্ড গুরুত্ব রয়েছে। তাই একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কার্যকরী সংস্কার সাধনের জন্য অত্যন্ত দক্ষ এবং নিরপেক্ষ কমিটি গঠন করতে হবে। কমিটির সদস্যরা হবেন সত্যিকার অর্থে নিবেদিত প্রাণ। আমূল পরিবর্তন না এনে বরং ধীরে ধীরে পরিবর্তন আনতে হবে। আমলাদেরকে পাশ কাটিয়ে কোনো সংস্কার কর্মসূচিই সার্থক করা সম্ভব হবে না। এজন্য সংস্কারটা এমনভাবে হতে হবে যেন বেসামরিক কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তা সহজে মেনে নেন। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। সরকারের আন্তরিকতা এবং সরকারি কর্মচারীদের সহযোগিতাই কেবল পারে একটি কার্যকরী পরিবর্তন আনয়ন করতে। কমিটি গঠন এবং প্রস্তাবনা পেশ করাই আসল কথা নয়, বরং বাস্তবায়নই আসল কথা।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

১০। নির্বাহী বিভাগ বা শাসন বিভাগের ক্ষমতা ও কার্যাবলী আলোচনা করুন।
***অথবা,* আধুনিক রাষ্ট্রে নির্বাহী বিভাগের ক্ষমতা ও কার্যাবলী আলোচনা করুন।**

উত্তর : নির্বাহী বিভাগ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। সরকারের অপরাপর বিভাগের মধ্যে সঙ্গত কারণে নির্বাহী বিভাগ রাষ্ট্রপরিচালনায় সরাসরি অংশ নিয়ে থাকে। নির্বাহী বিভাগের উৎকর্ষের ওপর একটি সরকারের স্থায়িত্ব, সুনাম এবং সমৃদ্ধি নির্ভর করে। যদিও সংবিধান নির্বাহী বিভাগের এখতিয়ার নির্ধারণ করে থাকে, তথাপি বর্তমান সমস্যাসংকুল পৃথিবীতে নির্বাহী বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

নির্বাহী বিভাগ কাকে বলে

নির্বাহী বিভাগ হলো সরকারের সেই শাখা যা আইন বিভাগ কর্তৃক প্রণীত আইন প্রয়োগ করে শাসনকার্য নির্বাহ করে থাকে। মন্ত্রিপরিষদ নির্বাহী বিভাগের অন্যতম সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ। সংসদীয় পদ্ধতিতে আইন বিভাগ থেকে প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীগণ নিয়োগ পেয়ে থাকেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগের সদস্যরা কেউ আইনসভার সদস্য নন। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে মন্ত্রিপরিষদ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের আমলাবর্গ এবং গ্রামের চৌকিদার পর্যন্ত নির্বাহী বিভাগের সদস্য। আমাদের দেশে নির্বাহী বিভাগের সদস্যরা আইনপরিষদের নিকট দায়বদ্ধ।

নির্বাহী বিভাগের ক্ষমতা ও কার্যাবলী

সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে নির্বাহী বিভাগ নিম্নোক্ত কার্যাবলী সম্পাদন করে :

১. **আইনসংক্রান্ত কার্য :** বর্তমানকালের রাষ্ট্রব্যবস্থায় আইন প্রণয়নের ব্যাপারে নির্বাহী বিভাগকে কতকগুলো আইনসংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করতে হয়। বর্তমানে অধিকাংশ দেশে রাষ্ট্রপ্রধান আইনসভার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে গণ্য হন। তিনিই আইনসভার অধিবেশন আহ্বান করেন, আবার প্রয়োজনবোধে আইনসভার অধিবেশন স্থগিত রাখার নির্দেশ দেন। তিনি ইচ্ছা করলে আইনসভা ভেঙ্গে দিতেও পারেন। তার সম্মতি ছাড়া কোনো বিল আইনে পরিণত হয় না।

২. **বিচারসংক্রান্ত কার্য :** নির্বাহী বিভাগের কয়েকটি বিচারসংক্রান্ত ক্ষমতাও রয়েছে। অনেক রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপ্রধান উচ্চ আদালতের বিচারপতিদের নিযুক্ত করেন। তিনি দণ্ডিত অপরাধীর দণ্ড হ্রাস করতে, স্থগিত রাখতে, মওকুফ করতে পারেন। আবার কর নির্ধারণ, নিয়োগ, পদোন্নতি, পদচ্যুতি প্রভৃতি বিষয়ে আপত্তির নিষ্পত্তি নির্বাহী বিভাগই করে থাকে।

৩. **অভ্যন্তরীণ শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা :** নির্বাহী বিভাগের প্রধান কাজ হলো রাষ্ট্রের মধ্যে আইন প্রয়োগ করা, নিয়মশৃঙ্খলা বজায় রাখা, স্থায়ী কর্মচারীদের নিযুক্ত করা প্রভৃতি। ব্যাপক অর্থে নির্বাহী বিভাগকে অভ্যন্তরীণ শাসনকার্য পরিচালনা করতে হয়। এই কার্য সম্পাদনের দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে নির্বাহী বিভাগের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ওপর।

৪. **প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত কার্য :** রাষ্ট্রের অখণ্ডতা রক্ষা করা, বহিরাক্রমণ প্রতিহত করা এবং প্রয়োজন দেখা দিলে যুদ্ধ ঘোষণা করা নির্বাহী বিভাগের গুরুদায়িত্ব হিসেবে বিবেচিত হয়। নির্বাহী বিভাগ এই উদ্দেশ্যে স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমান বাহিনী গঠন, অন্যান্য সামরিক কর্মচারী নিয়োগ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণের মাধ্যমে সামরিক প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

৫. **পররাষ্ট্র সংক্রান্ত কার্য :** পররাষ্ট্র সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য নির্বাহী বিভাগের গুরুদায়িত্ব হিসেবে গণ্য হয়। পররাষ্ট্রবিষয়ক কার্য বলতে অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন, রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদন, বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ, অন্য দেশে রাষ্ট্রদূত প্রেরণ এবং তাদের রাষ্ট্রদূতকে নিজ রাষ্ট্রে গ্রহণ ইত্যাদি বোঝায়। রাষ্ট্রের প্রতিভূ হিসেবে রাষ্ট্রপ্রধানই এই দায়িত্ব পালন করেন। নির্বাহী বিভাগের পররাষ্ট্র দপ্তর এ সমস্ত কার্য সম্পাদন করে থাকে।

৬. **অর্থসংক্রান্ত কার্য :** জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থায় সরকারের বিবিধ কার্যসম্পাদনের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। সাধারণত কর ধার্য ও সেবামূলক কার্যাদি সম্পাদন প্রভৃতি উপায়ে এই বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত হয়। নির্বাহী বিভাগই সরকারি অর্থ সংগ্রহ এবং ব্যয় নির্বাহ করে। তবে কর ধার্য ও ব্যয় বরাদ্দের ব্যাপারে আইনসভার অনুমোদন আবশ্যক। সরকারের অর্থসংক্রান্ত কার্য নির্বাহী বিভাগের অর্থ দপ্তরে মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ে থাকে।

৭. **নীতি নির্ধারণ সংক্রান্ত কার্য :** স্বরাষ্ট্র এবং পররাষ্ট্র সংক্রান্ত কাজকর্ম পরিচালনার জন্য সরকারের সুনির্দিষ্ট নীতি থাকতে হয়। সরকারের নির্বাহী বিভাগ এই নীতি নির্ধারণ করে।

৮. **জনকল্যাণমূলক কার্য :** সাম্প্রতিক প্রতিটি রাষ্ট্র জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধনে আত্মনিয়োগ করেছে। এর ফলে স্বাভাবিকভাবে নির্বাহী বিভাগের কার্যক্ষেত্রের পরিধি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন নির্বাহী বিভাগকে জনশিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, পরিবহন, শিল্প-বাণিজ্য, ডাক ও তার এবং অন্যান্য সেবামূলক বহুবিধ কার্যাদি সম্পাদন করতে হয়।

৯. **জনমত সৃষ্টি :** নির্বাহী বিভাগ তাদের কর্মকাণ্ডের ওপর জনসমর্থন আদায় করার চেষ্টা করেন। জনমত তাদের অনুকূলে থাকলে পরবর্তী নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়া সম্ভব হয়। ফলে নির্বাহী বিভাগের অন্যতম কাজ হলো তাদের কাজের স্বপক্ষে জনমত সৃষ্টি করা।

১০. **সম্মেলনে নেতৃত্ব দেয়া :** রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকারপ্রধান নির্বাহী বিভাগের সদস্য। এরাই সম্মেলনে দেশের নেতৃত্ব দেন। এসব সম্মেলনে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

১১. **সামরিক কার্য :** বাংলাদেশ ও আমেরিকার সংবিধান অনুযায়ী এসব দেশের প্রেসিডেন্ট সশস্ত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়ক। ফলে সশস্ত্রবাহিনীর যাবতীয় কাজে যেমন— নিয়োগ, প্রমোশন, সামরিক হার্ডওয়্যার সরবরাহ, সামরিক নীতি প্রণয়ন, যুদ্ধ ঘোষণা ইত্যাদি কাজগুলো প্রেসিডেন্টরা করে থাকেন।

১২. **আইন বিভাগের নেতৃত্ব দান :** সংসদীয় পদ্ধতিতে আইন বিভাগের সদস্য থেকে প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রী নিয়োগ করা হয়। এছাড়া বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভা পরোক্ষভাবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করে থাকে। প্রেসিডেন্ট সংসদে ভাষণ প্রদান, বাণী প্রেরণ এবং পাসকৃত আইনের অনুমোদন দিয়ে থাকেন। আর সংসদীয় পদ্ধতিতে প্রধানমন্ত্রী তার দলের পক্ষে সংসদে নেতৃত্ব দান করেন। বলা বাহুল্য, এরা সবাই নির্বাহী বিভাগের সদস্য।

১৩. **আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দেশের নেতৃত্ব প্রদান :** নির্বাহী বিভাগের সদস্যরা পরদেশে অনুষ্ঠিত সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, কৌশলগত ও সামরিক সম্মেলনে দেশের পক্ষে নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন। UN, OIC, NAM, NATO, APEC, G-8, GCC ইত্যাদি সম্মেলনে নির্বাহী বিভাগের সদস্যরাই সাধারণত যোগদান করে থাকেন।

উপসংহার : নির্বাহী বিভাগের আকার-আয়তন অন্য দুই বিভাগের চেয়ে অনেক বড়। ফলে আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগের মতো এই বিভাগের কার্যাবলী নির্দিষ্ট করে দেয়া যায় না। গণতান্ত্রিক পরিবেশে নির্বাহী বিভাগের ক্ষমতা অপ্রতিহতভাবে বেড়ে চলছে। এর অবশ্য যৌক্তিকতাও আছে। তবে লাগামহীন ক্ষমতা বৃদ্ধি একে স্বৈরাচারে পরিণত করবে এতে সন্দেহ নেই।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

১১ । বাংলাদেশে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহ কি কি? দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় বাংলাদেশ পুলিশের ভূমিকা বর্ণনা করুন।

উত্তর : রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত কতকগুলো সুনির্দিষ্ট নিয়মের সমষ্টি যেগুলো মান্য না করলে শাস্তি ভোগ করতে হয় তাই আইন। এ আইনের যথাযথ প্রয়োগের জন্য প্রতিটি দেশেই কতকগুলো সুনির্দিষ্ট সংস্থা রয়েছে। যারা প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান করে আইন প্রয়োগ করে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় নিরলসভাবে কাজ করে। বাংলাদেশেও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো আইনের যথাযথ প্রয়োগ করে দেশে শান্তির সুবাতাস প্রবাহিত করার লক্ষ্যে কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহ : বাংলাদেশে আইন প্রয়োগকারী একাধিক সংস্থা বিদ্যমান। নিচে এ সকল সংস্থাসমূহের নাম উল্লেখ করা হলো :

১. বাংলাদেশ পুলিশ
   - i. র‌্যাব (RAB-Rapid Action Battalion)
   - ii. ডিবি (DB-Detective Branch)
   - iii. এসবি (SB-Special Branch)
   - iv. সিআইডি (CID-Criminal Investigation Department)
   - v. সোয়াত (SWAT-Special Weapons And Tacties)
   - vi. হাইওয়ে পুলিশ
   - vii. শিল্পাঞ্চল পুলিশ
   - viii. আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন
   - ix. স্পেশাল আর্মড ফোর্স (এসএএফ)
   - x. রেলওয়ে পুলিশ
   - xi. ট্যুরিস্ট পুলিশ
   - xii. জেলা পুলিশ
   - xiii. মেট্রোপলিটন পুলিশ
   - xiv. অশ্বারোহী পুলিশ
   - xv. ট্রাফিক পুলিশ
   - xvi. রিভার পুলিশ
   - xvii. রেঞ্জ রিজার্ভ ফোর্স
   - xviii. পুলিশ ইন্টারনাল ওভারসাইট
   - xix. বাংলাদেশ পুলিশ উইমেন নেটওয়ার্ক
   - xx. ইমিগ্রেশন পুলিশ
   - xxi. ক্রিমিনাল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (সিআইইউ)
   - xxii. নৌ-পুলিশ

২. বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)

৩. আনসার ও ভিডিপি ইত্যাদি।

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় বাংলাদেশ পুলিশের ভূমিকা : বাংলাদেশে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় সংস্থা হলো বাংলাদেশ পুলিশ। দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় বাংলাদেশ পুলিশ অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। নিচে দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় বাংলাদেশ পুলিশের ভূমিকা আলোচনা করা হলো :

১. **অপরাধী চিহ্নিত ও গ্রেফতার :** অপরাধীরা দেশ ও সমাজের শত্রু। এরা দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে। তাই বাংলাদেশ পুলিশ সমাজের আনাচে-কানাচে লুকিয়ে থাকা দাগী অপরাধীদের চিহ্নিত ও গ্রেফতার করে। এতে দেশের শান্তিকামী ও নিরীহ জনগণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ও নির্ভয়ে চলাফেরা করার সাহস পায়।

২. **অপরাধীদের আইনের আওতায় আনে :** দেশের আইন-শঙ্খলা রক্ষাকল্পে বাংলাদেশ পুলিশ শুধুমাত্র অপরাধীদের চিহ্নিত ও গ্রেফতার করেই ক্ষান্ত হন না, পাশাপাশি অপরাধীদেরকে আইনের আওতায়ও আনেন। ফলে দেশে অপরাধীদের জন্য করা মামলার সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ৩১ জানুয়ারি ২০১৫ দৈনিক যুগান্তরে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনের তথ্য মতে বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। নিচে তা উল্লেখ করা হলো :

সাল	মামলার সংখ্যা
২০১০	১,৬২,৮৯৮টি
২০১১	১,৬৯,৬৬৭টি
২০১২	১,৮৩,৪০৭টি
২০১৩	১,৭৯,১৯৯টি
২০১৪	১,৮৩,৭২৯টি

[বি. দ্র. উল্লিখিত মামলার সংখ্যা সারা দেশের পরিসংখ্যান মতে।]

৩. **অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার :** এক হিসাব মতে, দেশে বর্তমানে অবৈধ অস্ত্র আছে প্রায় ২ লাখ। এর মধ্যে নিয়মিত ব্যবহৃত হয় প্রায় ৮০ হাজার (সচেতন মহলের দাবি এ সংখ্যা আরো বেশি)। এসব অবৈধ অস্ত্রের শিকার দেশের সাধারণ মানুষ। সন্ত্রাসীরা রকেট লাঞ্চার, উজি গান, একে-৪৭ এর মতো অত্যাধুনিক অস্ত্র দিয়ে পাখির মতো গুলি করে মারছে মানুষ। এহেন অবস্থায় বাংলাদেশ পুলিশ অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার করে জনমনে শৃঙ্খলা ও শান্তি স্থাপনে বেশ তৎপর হয়ে মাঠে নেমেছে। পুলিশ সদর দপ্তরের তথ্য মতে, দেশে ২০ বছরে ৪৫ হাজারের মতো অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। তবে এ যাবৎকালে পুলিশের উদ্ধার করা অবৈধ অস্ত্রের চালানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ২০০৪ সালে চট্টগ্রামে দশ ট্রাক অস্ত্র উদ্ধার। নিচে এর পরিসংখ্যান ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো :

অস্ত্রের নাম	সংখ্যা
আগ্নেয়াস্ত্র	৪,৯৩০টি
হ্যান্ড গ্রেনেড	২৭,০২০টি
রকেট	৮৪০ টি
রকেট লাঞ্চার	৩৩ বাক্স
রকেট লাঞ্চারের যন্ত্রাংশ	৩০০টি
গ্রেনেড লাঞ্চিং টিউব	২,০০০টি
ম্যাগাজিন	৬,৩৯২ টি
গুলি	১,১৪,০০০ রাউন্ড
নাইন এমএম সেমি অটো চাইনিজ রাইফেল	দুই ট্রাক
চাইনিজ একে - ৫৬	দুই ট্রাক
টমিগান	১০০টি

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

[ছক : ২০০৪ সালে চট্টগ্রামে উদ্ধারকৃত ১০ ট্রাক অস্ত্রের পরিসংখ্যান।]

৪. **মানব পাচার রোধ :** মানব পাচার বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে এক দুষ্ট ক্ষত। সংঘবদ্ধ অপরাধী চক্রের ফাঁদে পড়ে প্রতি বছর বাংলাদেশের অসংখ্য নারী, পুরুষ ও শিশু মানব পাচারের শিকার হচ্ছে। পাচারকৃত পুরুষ ও শিশুদের দিয়ে চলে অবমাননাকর শ্রম বাণিজ্য আর নারীর বৃহদংশ ব্যবহৃত হয় সেক্স ট্যুরিজমের চিত্তাকর্ষক জগতে। এ অভিশপ্ত জগতে প্রবেশ ও প্রবেশকারীদের ফিরিয়ে আনতে বাংলাদেশ পুলিশ সদা তৎপর। বাংলাদেশ পুলিশ মনিটরিং সেলের তথ্য অনুযায়ী মানব পাচার রোধে পুলিশের কিছু ভূমিকা নিচের ছকে উল্লেখ করা হলো :

সাল	মানব পাচার মামলার সংখ্যা	মানব পাচারের সংখ্যা	পাচারকৃতদের উদ্ধারের সংখ্যা	পাচারকারী আটক
২০১৩	৩৭৭টি	১,৩৪৩ জন	১,২২৫ জন	-
২০১৪ (জানু-জুলাই)	২৮৭টি	১,২৬২ জন	১,১৪১ জন	৩৮৮ জন

৫. **মানি লন্ডারিং রোধ :** অপরাধ কর্মকাণ্ডের দ্বারা অর্জিত কালো টাকা সাদা করা বাংলাদেশের অপরাধীদের একটি বিশাল কর্মযজ্ঞ। মাদকদ্রব্য চোরাচালান কিংবা অস্ত্র ব্যবসা বা মানব পাচারের মতো অপরাধের দ্বারা অর্জিত অর্থ বৈধ পথে প্রবাহিত করার জন্য এরা সাধারণত বড় বড় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আন্ডার ইনভয়েসিং, ওভার ইনভয়েসিং, ডাবল ও ফলস্ ইনভয়েসিং করে থাকে। তাছাড়া ব্ল্যাক মার্কেট পেসো এক্সচেঞ্জ, হাওয়ালা, বিল্ক ক্যাশ স্মাগলিং, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, সিনেমা ইত্যাদিতে বিনিয়োগ করে থাকে। ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কিংবা ডেভেলপিং ব্যবসায় কালো টাকা বিনিয়োগ হয় এবং ক্রমান্বয়ে সাদা হতে থাকে। এর নেতিবাচক প্রভাবে রাষ্ট্রীয় জীবনে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। তাই বাংলাদেশ পুলিশ মানি লন্ডারিংকারীদের চিহ্নিত করে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

৬. **চুরি-ডাকাতি রোধ :** চুরি-ডাকাতি, দস্যুতা বাংলাদেশের অন্যতম সামাজিক অপরাধ। চুরি-ডাকাতি ও দস্যুতার ফলে সমাজে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় ও জনমনে আতঙ্ক বিরাজ করে। ৩১ জানুয়ারি ২০১৫ দৈনিক যুগান্তরের এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০১০ সালে সিঁধেল চুরি মামলা হয়েছে ৩,১১৪টি, দুর্ধর্ষ চুরি মামলা ৮,৫১৩টি, ডাকাতি মামলা ২৯১টি এবং দস্যুতা মামলা ১,৩৬৬টি। তবে আশার কথা এই যে, পুলিশ বাহিনীর তৎপরতার কল্যাণে বিগত ৫ বছর অর্থাৎ ২০১৫ সাল নাগাদ চুরি-ডাকাতি কিংবা দস্যুতার মতো অপরাধ অনেকটা কমে এসেছে। ফলে কমছে মামলার সংখ্যাও।

৭. **অপহরণ রোধ :** বাংলাদেশে সাম্প্রতিক সময়ে চুরি-ডাকাতির মতো ঘটনা ক্রমশ কমলেও বৃদ্ধি পাচ্ছে অপহরণ ও অপহরণ-পরবর্তী জিম্মি করে মুক্তিপণ আদায় কিংবা গুম বা খুনের মত ঘটনা। ফলে সামাজিক অস্থিরতা যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তেমনি বিঘ্নিত হচ্ছে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি। এহেন পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পুলিশ আইনের যথাযথ প্রয়োগ করছে। বাংলাদেশ পুলিশ সদর দপ্তরের তথ্য মতে, ২০০৯ সালে অপহরণের মামলা ছিল ৯২০টি। ২০১১ সালে ৭৯২টি, ২০১২ সালে ৮৫০টি এবং ২০১৩ সালে ৮৭৯টি।

৮. **হত্যা রোধ :** মানব হত্যা একটি জঘন্য অপরাধ। বাংলাদেশে এ হত্যা ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে। ফলে জনসমাজ ক্রমশ অস্থির হয়ে উঠছে। পুলিশ সদর দপ্তরের তথ্য মতে, ২০১০ সালে ঢাকাসহ সারাদেশে হত্যা মামলা ছিল ৩,৯৮৮টি, ২০১১ সালে ৩,৯৬৬টি, ২০১২ সালে ৪,১১৪টি, ২০১৩ সালে ৪,৩৯৩টি ও ২০১৪ সালে ৪,৫১৪টি। ২০১৫ সালে অন্যান্য হত্যার সাথে যুক্ত হয়েছে পেট্রোলবোমা হামলা করে হত্যা। ২২ মার্চ ২০১৫ পর্যন্ত (তথ্যসূত্র : দৈনিক প্রথম আলো ২৩ মার্চ ২০১৫) পেট্রোলবোমায় নিহত হয়েছে ৯৫ জন। পুলিশবাহিনী এ সকল হত্যা রোধ করে সমাজে আইনের শাসন ও শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য নিরলসভাবে কাজ করছে।

৯. **নারী ও শিশু নির্যাতন রোধ :** বাংলাদেশে কাম্য শিক্ষা এখনো অর্জিত হয় নি। ফলে নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা আমাদের সমাজে এখনো বিদ্যমান। এর মধ্যে যৌন হয়রানি, ক্যামেরায় গোপন দৃশ্য ধারণ করে তা ইন্টারনেটে প্রচার, গৃহপরিচারিকার উপর অমানবিক নির্যাতন, পর্ণো ছবি করতে বাধ্য করা, পতিতালয়ে বিক্রি, শিশুদের অত্যধিক শ্রমের ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজে লাগানো ইত্যাদি। ফলে সমাজের পরিবেশ কলুষিত হয়ে পড়ছে। নারী ও শিশু নির্যাতন রোধকল্পে বাংলাদেশ পুলিশ অব্যাহতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পুলিশ সদর দপ্তরের তথ্য মতে, নারী ও শিশু নির্যাতন মামলা ২০১০ সালে ছিল ১৭,৭৫২টি আর ২০১৪ সালে এসে দাঁড়ায় ২১,২৯১টি।

১০. **মাদকের নীল ছোবল থেকে রক্ষা :** মাদকের ভয়াবহ নীল ছোবলে আজ গোটা বাংলাদেশ আক্রান্ত। দেশের সীমান্ত জেলাগুলোতে এর প্রকোপ বেশি। মাদকে আক্রান্ত ব্যক্তিরা নেশার টাকা জোগাড় করতে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই এমনকি মানুষ পর্যন্ত খুন করতে দ্বিধাবোধ করে না। মাদকের নীল ছোবল থেকে দেশকে রক্ষা করে শৃঙ্খলা স্থাপনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পুলিশ মাদক আক্রান্ত অপরাধীদের আইনের আওতায় এনে শাস্তির ব্যবস্থা করছে। পুলিশের অপরাধের পরিসংখ্যান মতে, মাদকদ্রব্যের মামলা ২০১০ সালে ২৯,৩৪৪টি, ২০১১ সালে ৩১,৬৯৬টি, ২০১২ সালে ৩৭,২৬৪টি, ২০১৩ সালে ৩৫,৮৩২টি এবং ২০১৪ সালে ৪২,৫০১টি রেকর্ড করা হয়।

১১. **পাবলিক পরীক্ষায় শৃঙ্খলা স্থাপন :** দেশের সামগ্রিক আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করাই বাংলাদেশ পুলিশের অন্যতম প্রধান কাজ। তাই দেশের প্রতিটি পাবলিক পরীক্ষায় (বিশেষ করে পিএসসি, জেএসসি, এসএসসি, এইচএসসি, ডিগ্রি, বিসিএস, হোমিওপ্যাথিক বোর্ডের পরীক্ষা ইত্যাদি) পুলিশ আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত থেকে পরীক্ষার্থীদের নির্বিঘ্নে পরীক্ষাদানের সুযোগ দান করে দেয়।

১২. **অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ :** অবৈধ স্থাপনা স্থাপন করে সেখানে বসবাস করা, দোকান-পাট, মার্কেট নির্মাণ করে ফুটপাত বন্ধ করা ইত্যাদি বাংলাদেশের আইনের পরিপন্থি। অথচ কেউ ক্ষমতার জোরে, কেউ অভাবের তাড়নায়, কেউ বুঝে, কেউ না বুঝে অবৈধ স্থাপনা স্থাপন করে একদিকে আইনের লঙ্ঘন করে অন্যদিকে সাধারণ জনগণের অসুবিধার সৃষ্টি করে। বাংলাদেশ পুলিশ জনগণের অসুবিধা দূরীকরণের লক্ষ্যে এসব অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করে থাকে।

উপসংহার : দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় বাংলাদেশ পুলিশের ভূমিকা অপরিসীম। কিছু কিছু ক্ষেত্রে পুলিশবাহিনী বিতর্কিত হলেও সামগ্রিক বিচারে দেশের শৃঙ্খলা রক্ষা ও শান্তি স্থাপনের ক্ষেত্রে পুলিশের বিকল্প কোনো সংস্থা নেই। অপরাধ দমনের এমন কোনো সেক্টর নেই যেখানে পুলিশের পদচারণা অনুপস্থিত। জঙ্গিদমন, গোলাবারুদ ও বিস্ফোরক উদ্ধার, নির্যাতিত মানুষের সহায়তা থেকে শুরু করে জনগণের সার্বিক জানমালের নিরাপত্তায় বাংলাদেশ পুলিশ কাঙ্ক্ষিত এক বাহিনীর নাম।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

১২ । বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা, ক্ষমতা ও কার্যাবলী আলোচনা করুন।
অথবা, **বর্তমান সংসদীয় ব্যবস্থায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা, ক্ষমতা ও কার্যাবলী আলোচনা করুন।**
অথবা, **বাংলাদেশের প্রেসিডেন্টের পদমর্যাদাসহ ক্ষমতা ও কার্যাবলী উল্লেখ করুন।**

উত্তর : ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের মাত্র এক বছরের মধ্যেই অর্থাৎ ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন করা হয়। এ সংবিধানে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। ফলে রাষ্ট্রপতি হন উপাধিসর্বস্ব। পরবর্তীতে ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। কিন্তু এ ব্যবস্থা বাংলাদেশের রাজনীতিতে অনুকূল প্রভাব ফেলতে পারেনি। যার দরুন ১৯৯০ সালে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে পুনরায় সংসদীয় সরকারব্যবস্থা প্রবর্তন করে রাষ্ট্রপতিকে উপাধিসর্বস্ব করে রাষ্ট্রপ্রধানের ক্ষমতা প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা : বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি পদমর্যাদার দিক হতে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। বিশ্বের অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের ন্যায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধানও প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে সকল কার্য সম্পন্ন করে থাকেন। শাসনতান্ত্রিক নিয়মানুসারে রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে আদালতে কেউ মামলা দায়ের করতে পারবে না। আবার কোনো আদালত তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করতে পারবে না। তবে তার কার্যাবলীর মাধ্যমে যদি কোনো ব্যক্তির স্বার্থ নষ্ট হয় তবে সরকারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাবে। শাসনতান্ত্রিক বিধান অনুসারেই তিনি ক্ষমতার অধিকারী এবং তদনুসারেই তিনি ক্ষমতা পরিচালনা করেন। বস্তুত বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি একজন নিয়মতান্ত্রিক শাসক প্রধান। তবে তার নামেই সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পরিচালিত হয়।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যাবলী : বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি উপাধিসর্বস্ব হলেও তিনি নানাবিধ ক্ষমতা ও কার্যাবলী সম্পাদন করেন। নিচে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যাবলী আলোচনা করা হলো :

১. **শাসনসংক্রান্ত :** সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশের শাসন বিভাগীয় সকল কার্যাবলী রাষ্ট্রপতির নামে পরিচালিত হয়। নিচে রাষ্ট্রপতির শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতা ও কার্যাবলী আলোচনা করা হলো :

ক. **নিয়োগ :** রাষ্ট্রপতি সংসদে নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রধানকে প্রধানমন্ত্রীরূপে নিয়োগ করেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং উপমন্ত্রীদের নিয়োগ করে থাকেন। রাষ্ট্রপতি প্রতিরক্ষাবাহিনীর প্রধান হিসেবে সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর প্রধান, নির্বাচন কমিশনের কমিশনারগণ, সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ, মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, প্রধান বিচারপতি প্রমুখ ব্যক্তিদের নিয়োগ দেন। বিদেশে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত, হাইকমিশনার ও কনসালটেন্টও নিয়োগ করেন রাষ্ট্রপতি।

খ. **বিধি নিয়ন্ত্রণ :** সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কেবল প্রধান বিচারপতি, আপিল ও হাইকোর্টের বিচারপতি, প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও কমিশনারগণ, সরকারি কর্মকমিশনের চেয়ারম্যান ও কমিশনারগণ প্রমুখ ব্যক্তিদের নিয়োগই করেন না পাশাপাশি এদের কার্যাবলীর

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

বিধি-বিধানও নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। ফলে প্রতিটি বিভাগের কর্মকর্তাগণ চাইলেও স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠতে পারেন না।

গ. **হাইকমিশনার ও রাষ্ট্রদূতদের গ্রহণ :** রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের সংবিধানের বিধান অনুযায়ী বিদেশে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত, হাইকমিশনার ও কনসালটেন্ট নিয়োগের পাশাপাশি বাংলাদেশে নিযুক্ত বিদেশি রাষ্ট্রদূত ও হাইকমিশনারদের গ্রহণ করে থাকেন। ফলে শাসনবিভাগীয় শৃঙ্খলা বজায় থাকে।

২. **আইনসংক্রান্ত :** ১৯৭২ সালে প্রণীত বাংলাদেশের সংবিধান রাষ্ট্রপতিকে আইনসংক্রান্ত কতিপয় ক্ষমতা ও কার্যাবলী সম্পাদনের অধিকার দিয়েছে। নিচে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির আইনসংক্রান্ত ক্ষমতা ও কার্যাবলী আলোচনা করা হলো :

ক. **অধিবেশন আহ্বান, স্থগিত ও ভঙ্গ :** বাংলাদেশ সংবিধানের ৭২ অনুচ্ছেদে জাতীয় সংসদের অধিবেশন সম্পর্কে বলা হয়েছে। ৭২(১) অনুচ্ছেদে বলা হয় যে, সরকারি বিজ্ঞপ্তি দ্বারা রাষ্ট্রপতি সংসদ আহ্বান, স্থগিত ও ভঙ্গ করবেন এবং সংসদ আহ্বানকালে রাষ্ট্রপতি প্রথম বৈঠকের সময় ও স্থান নির্ধারণ করবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সংসদের এক অধিবেশনের সমাপ্তি ও পরবর্তী অধিবেশনের প্রথম বৈঠকের মধ্যে ষাট দিনের অতিরিক্ত বিরতি থাকবে না। উক্ত অনুচ্ছেদে আরো বলা হয় যে, উল্লিখিত দফার অধীন তাঁর দায়িত্ব পালনে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক লিখিতভাবে প্রদত্ত পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করবেন।

খ. **ভাষণদান ও বাণী প্রেরণ :** বাংলাদেশ সংবিধানের ৭৩(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি জাতীয় সংসদে ভাষণদান ও বাণী প্রেরণ করে থাকেন। ৭৩(২) অনুচ্ছেদ মোতাবেক, সংসদ-সদস্যদের প্রত্যেক সাধারণ নির্বাচনের পর প্রথম অধিবেশনের সূচনায় এবং প্রত্যেক বৎসর প্রথম অধিবেশনের সূচনায় রাষ্ট্রপতি সংসদে ভাষণদান করে থাকেন। ৭৩(৩) অনুচ্ছেদ মোতাবেক, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণ শ্রবণ বা প্রেরিত বাণী প্রাপ্তির পর সংসদ উক্ত ভাষণ বা বাণী সম্পর্কে আলোচনা করে থাকেন।

ঘ. **অধ্যাদেশ জারি :** সংবিধানের ৯৩নং অনুচ্ছেদে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিকে অধ্যাদেশ জারির ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। সংবিধান মোতাবেক জাতীয় সংসদের অধিবেশন মুলতবি থাকাকালে রাষ্ট্রপতি যেকোনো জরুরি অবস্থা মোকাবেলার জন্য অধ্যাদেশ জারি করতে পারেন। তবে পুনরায় এ অধ্যাদেশ কার্যকর হবে না।

ঙ. **বিলের সম্মতি :** জাতীয় সংসদে কোনো বিল গৃহীত হলে তা রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য প্রেরিত হয়। রাষ্ট্রপতি ১৫ দিনের মধ্যে উক্ত বিলে সম্মতি দিয়ে থাকেন। অথবা অর্থবিল ব্যতীত অন্যবিল হলে তা পুনর্বিবেচনার জন্য জাতীয় সংসদে ফেরত পাঠাতে পারেন। সংবিধান মোতাবেক এ দুটির কোনোটি না করলে তাতে রাষ্ট্রপতির সম্মতি আছে বলে ধরে নেয়া হয়।

৩. **বিচারসংক্রান্ত :** বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির বিচারসংক্রান্ত কার্যাবলীর মধ্যে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে তার ক্ষমতা প্রদর্শন করাই প্রধান। রাষ্ট্রপতি দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে তার শাস্তি হতে রেহাই দিতে পারেন বা উক্ত দণ্ড লঘু করে দিতে পারেন। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকেও তিনি ক্ষমা করে দিতে পারেন।

৪. **অর্থসংক্রান্ত :** বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি কতিপয় অর্থসংক্রান্ত কার্যাবলীও সম্পন্ন করেন। রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতীত কোনো অর্থবিল জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা যাবে না এবং কোনো মঞ্জুরি দাবিও উত্থাপন করা যাবে না। প্রত্যেক আর্থিক বছরের প্রারম্ভে সরকারের আয়-ব্যয় সম্পর্কিত বাজেট রাষ্ট্রপতির অনুমোদনপ্রাপ্ত হয়ে অর্থমন্ত্রী কর্তৃক সংসদে উত্থাপিত হয়।

৫. **জরুরি অবস্থা জারি :** বাংলাদেশ সংবিধানের নবম ক-ভাগের ১৪১নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতিকে জরুরি অবস্থা ঘোষণার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। যুদ্ধ বা অন্য দেশ কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে বা অভ্যন্তরীণ গোলযোগের কারণে দেশের নিরাপত্তা বা শান্তি বিনষ্ট হওয়ার উপক্রম হলে রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে ঘোষণার পূর্বে প্রধানমন্ত্রীর সম্মতির প্রয়োজন হয়।

৬. **প্রতিরক্ষাসংক্রান্ত :** বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি প্রতিরক্ষাসংক্রান্ত বেশ কিছু কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকেন। যেমন– কোনো রাষ্ট্রের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করা, কোনো দেশের সাথে চুক্তি ঘোষণা করা, কোনো দেশের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে তা প্রকাশ করা ইত্যাদি। মোটকথা, রাষ্ট্রপতি দেশের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা মোকাবিলার জন্য যেকোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

৭. **শপথ বাক্য পাঠ :** দেশের জনগুরুত্বপূর্ণ সরকারি পদগুলোতে ক্ষমতা গ্রহণের পর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সংবিধানের বিধি মোতাবেক শপথ বাক্য পাঠ করানো হয়। বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্রপতিকে কতিপয় পদের ব্যক্তিবর্গের শপথ বাক্য পাঠ করানোর ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। সে মোতাবেক রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি, স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবৃন্দকে শপথ বাক্য পাঠ করান।

৮. **সভাপতিত্ব ও শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ :** জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন দিবসে, ঐতিহাসিক ঘটনার স্মরণে আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি সভাপতিত্ব করেন ও শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। যেমন– বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, মহান স্বাধীনতা দিবস, বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস, জাতীয় শোক দিবস, বিজয় দিবস ইত্যাদি। এছাড়া রাষ্ট্রপতি বিভিন্ন দিবসে বাণী প্রদান করে থাকেন।

৯. **খেতাব ও সম্মাননা প্রদান :** বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি সকল সম্মানের উৎস। তিনি দেশপ্রেম, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও পেশাগত দিক হতে বরেণ্য ব্যক্তিদের কৃতিত্বের জন্য খেতাব ও উচ্চতর সম্মাননা প্রদান করেন। সংবিধানের ৩০নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, রাষ্ট্রপতির পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোনো নাগরিক কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের নিকট হতে কোনো উপাধি, সম্মাননা, পুরস্কার বা ভূষণ গ্রহণ করবেন না।

১০. **বিদেশ সফর :** রাষ্ট্রপতি দেশের কল্যাণের প্রতীক। তাই তিনি দেশের স্বার্থে বিদেশি রাষ্ট্রদূতদের সাথে বন্ধুত্ব ও যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে বিদেশ সফর করেন। ফলে বিদেশের সাথে বাংলাদেশের সুসম্পর্ক গড়ে উঠে।

উপসংহার : বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারব্যবস্থা অনুপযোগী। তাই এদেশে নামসর্বস্ব রাষ্ট্রপতি বিদ্যমান। তবে যদিও রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর তুলনায় সীমিত তবুও রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর সাথে পরামর্শক্রমে দেশের জনগুরুত্বপূর্ণ কাজে অংশগ্রহণ করে থাকেন। তাই রাষ্ট্রপতির সীমিত ক্ষমতা ও কার্যাবলীকে কোনোভাবেই খাটো করে দেখার অবকাশ নেই।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

১৩ । বাংলাদেশের উন্নয়নে আমলাতন্ত্রের ভূমিকা বর্ণনা করুন।
অথবা, **বাংলাদেশের উন্নয়নে আমলাদের অবদান আলোচনা করুন।**
অথবা, **'বাংলাদেশের উন্নয়ন ও আমলাতন্ত্র'- এ বিষয়ে একটি নাতিদীর্ঘ রচনা লিখুন।**
অথবা, **'আমলারা উন্নয়নের ধারক ও বাহক।' বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে উক্তিটি ব্যাখ্যা করুন।**

উত্তর : আমলাতন্ত্র হলো একদল অভিজ্ঞ, নিরপেক্ষ, স্থায়ী ও পেশাজীবী কর্মচারীবৃন্দের দ্বারা পরিচালিত বেসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে সরকারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়িত হয়। আধুনিক জটিল বিশ্বে প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে এ আমলাতন্ত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা। বর্তমানকালের প্রশাসন ব্যবস্থার সাথে আমলাতন্ত্র এমনভাবে জড়িয়ে আছে যে, শত সমালোচনা সত্ত্বেও আমলাতন্ত্র ছাড়া প্রশাসন পরিচালনা করা সম্ভব নয়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও আমলাতন্ত্র সম্পর্কে এহেন ধারণা সমভাবে প্রযোজ্য।

বাংলাদেশের উন্নয়নে আমলাতন্ত্রের ভূমিকা : বাংলাদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন এমনকি সামগ্রিক পরিবর্তন সাধনে আমলাতন্ত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। নিচে বাংলাদেশের উন্নয়নে আমলাতন্ত্রের ভূমিকা আলোচনা করা হলো :

ক. রাজনৈতিক উন্নয়ন : আইন প্রণয়ন, রাজনৈতিক আধুনিকীকরণ, রাজনীতিতে জনগণের অংশগ্রহণ, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়ন, শিল্পায়িত সমাজ প্রতিষ্ঠা, জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রপরিচালনা, অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি, প্রশাসনিক ও আইনগত উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয়গুলো রাজনৈতিক উন্নয়নের মানদণ্ড হিসেবে বিবেচিত। বাংলাদেশের আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা রাজনৈতিক উন্নয়নের এসব মানদণ্ড নিশ্চিতকরণে সহায়তা করে থাকে। নিচে বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়নে আমলাতন্ত্রের ভূমিকা আলোচনা করা হলো :

১. **আইন প্রণয়ন ও নীতিনির্ধারণ :** বাংলাদেশের জনগুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে আইন প্রণয়ন এবং প্রশাসনিক কার্য পরিচালনার জন্য নীতি নির্ধারণ করতে হয়। আর আইন প্রণয়ন ও নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে কলাকৌশলগত জ্ঞান, বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতার প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের আমলারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আইনসভার সদস্যদের সহযোগিতা করে থাকে। ফলে আইন প্রণয়ন ও নীতি নির্ধারণ সহজ হয়। প্রকারান্তরে রাজনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।

২. **রাজনৈতিক আধুনিকীকরণ :** সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, প্রশাসন পরিচালনা, জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি গঠন প্রভৃতি দিকগুলো রাজনৈতিক আধুনিকীকরণের পরিচায়ক। বাংলাদেশের আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা এক্ষেত্রে সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করে। অর্থাৎ আমলারা রাজনৈতিক আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে কখনো সরকারের সাথে আবার কখনো জনগণের সাথে মিশে কাজ করে। ফলে রাজনৈতিক উন্নয়ন হয়।

৩. **রাজনৈতিক অংশগ্রহণ :** রাজনীতিতে জনগণের অংশগ্রহন রাজনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম মানদণ্ড হিসেবে বিবেচিত। বাংলাদেশের আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে জনগণকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে উৎসাহিত করে। যেমন— ভোটদান, নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া, গণতান্ত্রিক আচরণ চর্চা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। মোটকথা, বাংলাদেশে আমলাতন্ত্র রাজনীতিতে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিয়ে রাজনৈতিক উন্নয়ন ঘটায়।

৪. **রাজনৈতিক যোগাযোগ :** বাংলাদেশের আমলাতন্ত্র রাজনৈতিক যোগাযোগ স্থাপন করে রাজনৈতিক সামগ্রিক ব্যবস্থাকে সচল করে রাখে। কূটনীতি, বৈঠক, বিনিয়োগ, আন্তঃবিভাগীয় ডকুমেন্টস লেনদেন ইত্যাদির মাধ্যমে আমলারা রাজনৈতিক যোগাযোগ সম্পন্ন করে থাকেন। আর রাজনৈতিক যোগাযোগ রাজনৈতিক উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

৫. **রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা :** রাজনৈতিক উন্নয়নের কাম্য দিক হলো রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়ন করা। বাংলাদেশের রাজনীতিতে হরতাল, অবরোধ, ভাঙচুর, খুন, গুম, চাঁদাবাজি, দুর্নীতি, সরকারি সম্পত্তি লুটপাট ইত্যাদি অস্থিতিশীল পরিস্থিতি হরহামেশাই লক্ষ্য করা যায়। আমলারা এক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে সরকারি ও বিরোধী দলের সাথে কখনো কখনো সমঝোতা, সংলাপ কিংবা বিদেশি বন্ধু রাষ্ট্রের সহায়তা নিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করে।

খ. অর্থনৈতিক উন্নয়ন : সামগ্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করে কোনো দেশের কাম্য পরিবর্তন আনয়নই অর্থনৈতিক উন্নয়ন। আমলাদেরকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের বাহক বলা হয়। নিচে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আমলাতন্ত্রের ভূমিকা আলোচনা করা হলো :

১. **অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন :** বাংলাদেশের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করে থাকে। আর পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় উর্ধ্বতন আমলাদের দ্বারা গঠিত। ফলে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্ব স্বাভাবিকভাবেই আমলাদের উপর ন্যস্ত হয়। বাংলাদেশের আমলারা তাদের বিচক্ষণতা, দক্ষতা, মেধা ও অভিজ্ঞতার আলোকে দেশের আর্থিক অবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করে দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখে।

২. **বৈদেশিক বিনিয়োগে উৎসাহিত :** বৈদেশিক বিনিয়োগ দেশের অর্থনীতির চাকাকে ধাবমান ঘোড়ার মত সামনের দিকে অগ্রসরমান করে। বাংলাদেশের আমলারা তাদের সুনিপুণ দক্ষতা দিয়ে দেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। দেশের প্রতিকূলতাকে ছাপিয়ে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করে বিদেশিদের আকৃষ্ট করে। ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।

৩. **শুল্ক ও রাজস্ব আদায় :** বাংলাদেশ সরকারের আয়ের অন্যতম উৎস হলো শুল্ক ও রাজস্ব আদায়। আদায়কৃত শুল্ক ও রাজস্ব দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনায় ব্যয় করে থাকে। আর জনগণের কাছ থেকে বিভিন্ন প্রকার শুল্ক ও রাজস্ব আদায় করে সরকারের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে আমলারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

৪. **বৈদেশিক ঋণ নিয়ন্ত্রণ :** বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। ফলে এদেশে প্রচুর বৈদেশিক ঋণের প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে আমলাদের ভূমিকা অগ্রগণ্য। কেননা আমলারা বিভিন্ন দাতা সংস্থা ও দেশের সাথে যোগাযোগ করে বৈদেশিক ঋণ আদায় করে থাকে। ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে দেশের জাতীয় স্বার্থের দিকেও আমলারা তীক্ষ্ন নজর রাখে। তাছাড়া ঋণ প্রাপ্তি পরবর্তী সময়ে তার যথোপযুক্ত বিলিবন্টনের ব্যাপারেও সরকারকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করে।

৫. **আর্থিক খাত নিয়ন্ত্রণ :** আর্থিক খাত তথা ব্যাংক, বীমা প্রভৃতি খাতগুলোর সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণের উপর কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন অনেকাংশে নির্ভরশীল। বাংলাদেশের পরিক্ষীত ও অভিজ্ঞ আমলারা দেশের আর্থিক খাতগুলোর জন্য উপর্যুক্ত নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে থাকে। ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।

গ. **সামাজিক উন্নয়ন :** দেশের সামাজিক অবস্থাকে ধাপে ধাপে উন্নতির দিকে অগ্রসর করাই সামাজিক উন্নয়ন। নিচে সামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশের আমলাতন্ত্রের ভূমিকা আলোচনা করা হলো :

১. **সামাজিক সংস্কার :** বাংলাদেশে শিক্ষার হার কাঙ্ক্ষিত নয়। ফলে চিকিৎসা, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতিক্ষেত্রে নানাবিধ কুসংস্কার বিদ্যমান। এ সকল কুসংস্কার দেশের সামাজিক উন্নয়নে নানাবিধ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে বিধায় আমলারা কুসংস্কার দূর করে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলে। যেমন— চিকিৎসাক্ষেত্রে ঝাড়ফুঁক রোধ, শিক্ষায় ঝরে পড়া রোধ, সংস্কৃতির নামে নগ্ন ও বেহায়াপনা রোধে জনসচেতনতা সৃষ্টি প্রভৃতি।

২. **উন্নত জাতি গঠন :** উন্নত জাতি দেশের সামাজিক উন্নয়নে ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখে। উন্নত জাতি গঠনের জন্য প্রয়োজন শিল্প, সংস্কৃতি, যাতায়াত, যোগাযোগ, শিক্ষা প্রভৃতির উন্নয়ন। আমলারা বাংলাদেশের উন্নয়নের বাহক হিসেবে তাদের অভিজ্ঞতা দিয়ে উল্লিখিত দিকগুলোর উন্নয়ন ঘটায়। এক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা, কর্মোদ্দীপনা ও দক্ষতা আমলারা কাজে লাগায়।

৩. **জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন :** উন্নত জীবনযাত্রার সূচক সামাজিক উন্নয়নের নির্দেশ করে। বাংলাদেশের আমলারা পরিকল্পনামাফিক শিল্পায়ন ও নগরায়নের লক্ষ্যে যুগোপযোগী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে থাকে। ফলে সমাজের মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটে এবং কর্মের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়।

৪. **তথ্য ও প্রযুক্তি উন্নয়ন :** তথ্য ও প্রযুক্তির দিক দিয়ে যে সমাজ যত বেশি এগিয়ে সে সমাজ তত বেশি উন্নত। বাংলাদেশের আমলারা অন্যান্য দিকের মতো তথ্য প্রযুক্তির দিক দিয়েও বেশ দক্ষ। শিক্ষা, প্রশাসন, চিকিৎসা, আইন-আদালত প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রযুক্তির প্রয়োগ করে আমলারা দেশের উন্নয়নে অবদান রাখছে।

৫. **সংস্কৃতির বিকাশ :** বাংলাদেশের আমলারা উন্নত সংস্কৃতির বাহক। তারা দেশের স্বার্থে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দেশ সফর করে থাকে। সফরকালে তারা বিভিন্ন দেশের সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। পরে তারা দেশে ফিরে তাদের সঞ্চিত সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা দেশের সংস্কৃতিতে প্রয়োগ করে। ফলে বাংলাদেশের সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে, যা প্রকারান্তরে সামাজিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে।

উপসংহার : বাংলাদেশের আমলাতন্ত্র উন্নয়নের প্রকৃত ধারক ও বাহক। কেননা আমলারা দীর্ঘদিনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা দিয়ে দেশের উন্নয়নে নিজেদের আত্মনিয়োগ করে। তবে আমলাদের ভূমিকার যথার্থতা নির্ভর করে তাদের নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির উপর। কারণ আমলারা পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করলে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ব্যাহত হতে বাধ্য। তাই আমলাদেরকে চতুরতার সাথে উন্নয়ন কাজে নিমগ্ন হতে হয়।

১৪ । বর্তমানে কয়টি স্তরে স্থানীয় সরকারব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে? গ্রামীণ উন্নয়নে স্থানীয় সরকারের ভূমিকা আলোচনা করুন।

উত্তর : প্রতিটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় প্রশাসনিক কার্যাবলী সঠিক ও সুবিন্যস্ত করার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়। প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের আয়তন অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে মাঠ পর্যায়ের মানুষের জন্য সুশাসন নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে থেকে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বিকাশ সাধনে এবং ক্ষমতায়নে নিয়মিত পরিকল্পনা গ্রহণ করে যাচ্ছে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

স্থানীয় সরকার কি? : সাধারণভাবে বলা যায়, স্থানীয়ভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি সংস্থা যা স্থানীয় কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য গঠন করা হয় তাকে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা বলে। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সার্বভৌম কোনো ক্ষমতা না থাকায় স্থানীয় সরকারের গঠন ও কার্যপরিধি এবং অর্থব্যবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা বিভিন্ন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

International Encyclopedia of Social Science অনুযায়ী 'স্থানীয় সরকার বলতে একটি ভূখণ্ডগত অসার্বভৌম সম্প্রদায়কে বোঝায় যাদের নিজস্ব বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ করার মতো আইনগত অধিকার রয়েছে।' (Vol-10)

প্রখ্যাত মার্কিন স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ David. G. Saffel বলেন 'কেন্দ্রীয় সরকারের কাঠামোর মধ্যে থেকে স্থানীয় পর্যায়ে প্রশাসনিক কার্যক্রম ঘটায় এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে উদ্যোগী সংস্থা হলো স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা এবং যার আইনগত ভিত্তি রয়েছে।' **[Source : State and Local Government]**

সুতরাং স্থানীয় সরকার হলো রাষ্ট্রীয় উপবিভাগ যা আইন দ্বারা গঠিত এবং স্থানীয় পর্যায়ে কার্যাবলীর উপর নিয়ন্ত্রণ রাখে।

স্থানীয় সরকারের বৈশিষ্ট্য

- স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা বৈধ কর্তৃত্বের অধীন।
- স্থানীয় জনগণ দ্বারা নির্বাচিত একটি সংস্থা যা নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার জন্য গঠিত।
- স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা স্থানীয় প্রশাসন পরিচালনার জন্য ক্ষমতা প্রাপ্ত একটি সংগঠন, যার নিজস্ব কার্যাবলীর ব্যবস্থাপনার অধিকার থাকে।
- স্থানীয় সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দায়বদ্ধ ও অধীনস্থ।
- স্থানীয় সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য স্থানীয় সরকার গঠিত।
- স্থানীয় জনকল্যাণ স্থানীয় সরকারের মুখ্য উদ্দেশ্য।

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার : সুবিন্যস্ত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বিকাশ ঘটানোর প্রচেষ্টার প্রতিফলন বাংলাদেশ সংবিধানে রয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'রাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে উৎসাহ দান করিবেন এবং সেই সকল প্রতিষ্ঠানসমূহে মহিলা, কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করিতে হইবে।' এ ব্যবস্থার অংশ হিসেবে গ্রাম পর্যায়ে একাধিকবার স্থানীয় সরকার গঠনের চেষ্টা করা হয় এবং থানা পর্যায়ে উপজেলা পরিষদ গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। জিয়াউর রহমানের আমলে গ্রাম পর্যায়ে 'গ্রাম সরকার' এবং হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের আমলে 'পল্লী পরিষদ' গঠনের চেষ্টা করা হয় কিন্তু দুটি পরিকল্পনাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। বিগত চারদলীয় সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে আবার গ্রাম সরকার ব্যবস্থার প্রচলন করে। সর্বশেষ ৩০ জুন ২০০৮ বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে গ্রাম সরকার (রহিতকরণ) অধ্যাদেশ ২০০৮ জারির মাধ্যমে এ ব্যবস্থাটি বাতিল করা হয়।

বাংলাদেশে স্থানীয় সরকারব্যবস্থার স্তর বিন্যাস : একটি রাষ্ট্রকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করে প্রত্যেক অংশ সুষ্ঠুভাবে শাসন করার জন্য পৃথক শাসনব্যবস্থার একক হিসেবে স্থানীয় সরকার গঠন করা হয়। বাংলাদেশে প্রশাসনিক কার্যাবলীর সঠিক বিন্যাস এবং স্থানীয় জনগণের উন্নয়নকল্পে চারটি স্তরে স্থানীয় সরকারব্যবস্থা প্রচলনের প্রক্রিয়া চালু হয়েছে। ২০০৩ সালের ২ আগস্ট পুনরায় গ্রাম সরকার ব্যবস্থা চালু হওয়ায় এ প্রক্রিয়া শুরু হয়। পরবর্তীতে ২০০৮ সালের ৩০ জুন রাষ্ট্র কর্তৃক জারিকৃত অধ্যাদেশের

মাধ্যমে গ্রাম সরকার ব্যবস্থা বাদ দিয়ে বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে তিন স্তর এবং শহরাঞ্চলে দুই স্তরবিশিষ্ট স্থানীয় সরকারব্যবস্থা চালু হয়। নিচে স্তরগুলো উল্লেখ করা হলো :

গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল
জেলা পরিষদ : চেয়ারম্যান/ ডিসি	সিটি কর্পোরেশন : মেয়র
↓	↓
উপজেলা পরিষদ : চেয়ারম্যান/ ইউএনও	পৌরসভা : মেয়র
↓	
ইউনিয়ন পরিষদ : চেয়ারম্যান	

গ্রামীণ উন্নয়নে স্থানীয় সরকারের ভূমিকা : গ্রামীণ উন্নয়নকে সফল করার জন্য স্থানীয় সরকারের ভূমিকা অনস্বীকার্য। মূলত গ্রামের সরকার হলো স্থানীয় সরকার আর গ্রামীণ জনগণ সে সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাই গ্রামের উন্নয়ন করতে হলে স্থানীয় সরকারকে মূল ভূমিকা পালন করতে হবে। গ্রামীণ উন্নয়নে স্থানীয় সরকার কিভাবে কাজ করতে পারে এবং কি ভূমিকা পালন করতে পারে সে বিষয়টি নিচে বিশদভাবে আলোচনা করা হলো :

১. **স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিকরণ :** কার্যকর গ্রামীণ উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো স্থানীয় সরকারে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ। স্থানীয় সরকারে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ যখন নিশ্চিত হবে তখনি গ্রামীণ উন্নয়নও সফল হবে। অথচ কতিপয় সমস্যার কারণে স্থানীয় সরকারে জনগণের শক্তিশালী অংশগ্রহণ নিশ্চিত হচ্ছে না। 'ফার ইস্টার্ন ইকোনমিক রিভিউ' এ সমস্যাগুলোকে 'FAMINE' একরনিমে (acronym) ব্যাখ্যা করেছে। যেখানে—
   - 'F' দিয়ে বুঝায় failure তথা কার্যকর এবং যথাযথ গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়নে ব্যর্থতা;
   - 'A' দিয়ে বুঝায় 'arrogance' তথা শহুরে এলিটদের ঔদ্ধত্য এই বিষয়ে যে, যথাযথ গ্রামীণ উন্নয়ন তাদের স্বার্থকে ক্ষুণ্ন করবে;
   - 'M' দিয়ে বুঝায় 'mismanagement' তথা অর্থনৈতিক ও মানবিক সম্পদের অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতি;
   - 'I' দিয়ে বুঝায় 'illiteracy' তথা অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও সামাজিক শৃঙ্খলার ব্যাপারে জনগণের অজ্ঞতা;
   - 'N' দিয়ে বুঝায় non-availability তথা সকল শ্রেণীর মানুষকে সংশ্লিষ্ট করতে পর্যাপ্ত অর্থ ও প্রত্যয়ের অভাব; এবং
   - 'E' দিয়ে বুঝায় 'empty election pledge' তথা স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির অকার্যকারিতা।

   এসব প্রতিবন্ধকতা বাংলাদেশে ও স্থানীয় সরকারে জনগণের অংশগ্রহণকে হ্রাস করছে। তাই গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য এসব প্রতিবন্ধকতা দূর করে স্থানীয় সরকারে জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করতে হবে।

২. **নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও শিক্ষা বিস্তার :** উন্নয়নশীল বিশ্বে এখনো গ্রামের দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ অশিক্ষিত। এই অশিক্ষিত মানুষকে শিক্ষিত করে তোলা ও গ্রাম থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। এক্ষেত্রে সরকার নিরক্ষরতা দূরীকরণ কার্যক্রম ও শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রমের অর্থ ও পরিচালনার দায়িত্ব স্থানীয় সরকারকে প্রদান করতে পারে। স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিগণ স্থানীয় সমস্যা সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি অবগত থাকেন বিধায় এসব কর্মসূচি সফলভাবে তারা বাস্তবায়ন করতে পারবেন।

৩. **অবকাঠামো নির্মাণ :** গ্রামীণ উন্নয়ন করতে হলে গ্রামের যোগাযোগব্যবস্থা তথা অবকাঠামোর উন্নয়ন করা প্রয়োজন। স্থানীয় সরকার গ্রামের অবকাঠামোগত উন্নয়নেও বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

স্থানীয় সরকার প্রথমেই গ্রামের অবকাঠামোগত সমস্যা চিহ্নিত করবে এবং সে অনুসারে কর্মসূচি প্রণয়ন করে রিপোর্ট তৈরি করবে এবং তা সরকারকে জানাবে। এভাবে রিপোর্ট তৈরির মাধ্যমে সরকার থেকে অর্থ সংগ্রহ করে স্থানীয় যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করতে পারে।

৪. **অর্থনৈতিক উন্নয়ন :** গ্রামীণ উন্নয়নের প্রথম শর্ত হলো গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন। এই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একটি সঠিক কর্মপদ্ধতি থাকা জরুরি। স্থানীয় সরকার এই কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করতে পারে। স্থানীয় সরকার তার সাংগঠনিক কাঠামোর বিভিন্ন প্রতিনিধিকে বিভিন্ন কাজ ও দায়িত্ব প্রদান করে কর্মপদ্ধতি তৈরি করলে এবং তার যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করলে গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন সফল হবে।

৫. **সচেতনতা বৃদ্ধি :** গ্রামীণ উন্নয়নের একটি বড় সমস্যা হলো গ্রামের মানুষের সচেতনতার অভাব। নির্বাচনী প্রচারণা, প্রশিক্ষণ, নেতৃত্ব দান, সভা-সমাবেশ, সালিশ ইত্যাদির মাধ্যমে স্থানীয় সরকার ও তার প্রতিনিধিরা এই সচেতনতা বৃদ্ধি করতে পারে।

৬. **কৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি :** গ্রামীণ উন্নয়নের একটি প্রধানতম লক্ষ্য হলো কৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা। এক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার অবদান রাখতে পারে। স্থানীয় জনগণকে কৃষি বীজ সরবরাহ করা, কৃষি প্রশিক্ষণ প্রদান, ঋণ দান ইত্যাদি নতুন নতুন কর্মসূচি গ্রহণ করে গ্রামের কৃষকদের সাহায্য করতে পারে এবং এভাবে কৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

৭. **আধুনিকীকরণ ও প্রযুক্তির ব্যবহার :** অনেক তাত্ত্বিকই উন্নয়ন বলতে আধুনিকীকরণকে বুঝিয়ে থাকেন। গ্রামের আধুনিকীকরণ এখনও স্বপ্ন হিসেবেই রয়ে গেছে। সকল এলাকাতেই চাষাবাদ প্রক্রিয়ায় প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়নি। সনাতনী প্রক্রিয়া ব্যবহার করার ফলে অন্যান্য দেশের তুলনায় উন্নয়নশীল বিশ্বের উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে না। এই অবস্থায় স্থানীয় সরকার বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে এই আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া সফল করতে পারে।

৮. **স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টি :** গ্রামের উন্নয়নের একটি বড় সমস্যা হলো গ্রামের মানুষের ভগ্ন স্বাস্থ্য। এক্ষেত্রে গ্রামের মানুষের অসচেতনতাই প্রধানত দায়ী। স্থানীয় সরকার বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামের মানুষদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি করতে পারে। এক্ষেত্রে স্থানীয় প্রতিনিধিরা স্থানীয় হাসপাতাল ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির স্বাস্থ্য ক্লিনিকগুলোকে কার্যকরভাবে পরিচালনা করতে পারে।

৯. **চাকরির সুযোগ :** গ্রামীণ উন্নয়নের একটি প্রধান লক্ষ্য হলো গ্রামের যুবকদের জন্য চাকরির সুযোগ সৃষ্টি করা। স্থানীয় সরকারেরও কিছু আর্থিক ক্ষমতা রয়েছে। স্থানীয় সরকার সে আর্থিক ক্ষমতা ব্যবহার করে গ্রামের যুবকদের জন্য চাকরির সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে।

১০. **জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা :** বাংলাদেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হলো জনসংখ্যাধিক্য। বাংলাদেশের উন্নয়ন করতে হলে এই জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করতে হবে। স্থানীয় সরকারব্যবস্থা এই জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করার জন্য বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। একদিকে স্থানীয় সরকার বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারে। অন্যদিকে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির সাথে সহযোগিতা করে বা নিজস্ব কর্মসূচির মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

১১. **ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠা :** বর্তমান যুগে শিল্পোন্নয়ন ছাড়া কোনো দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। আর শিল্পোন্নয়নের জন্য গ্রামীণ শিল্পোন্নয়নকেও গুরুত্ব দিতে হবে। স্থানীয় সরকার গ্রামীণ শিল্পোন্নয়নের জন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিতে পারে। এক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারের অর্থনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং স্থানীয় সরকারের বাজেট বৃদ্ধি করতে হবে।

১২. **অবকাঠামোগত উন্নয়ন :** গ্রামীণ উন্নয়ন গ্রামের অবকাঠামোগত উন্নয়নকেও অন্তর্ভুক্ত করে। একটি দেশের উন্নয়নের জন্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন পূর্বশর্ত। আর এই অবকাঠামোগত উন্নয়ন গ্রামীণ যোগাযোগব্যবস্থা থেকেই শুরু করতে হবে। স্থানীয় সরকার নিজস্ব বাজেটের উদ্যোগে এবং কেন্দ্রীয় সরকার থেকে অর্থ নিয়ে গ্রামের অবকাঠামোগত উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে পারে।

১৩. **গ্রামীণ সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ :** বর্তমান বাজেটে গ্রামভিত্তিক উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। গ্রামীণ উন্নয়ন করতে হলে গ্রামীণ সম্পদকে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে এবং এর কার্যকর ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। স্থানীয় সরকার গ্রামীণ সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করার কাজে এবং এর যথাযথ ব্যবহারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

গ্রামীণ উন্নয়ন একটি জটিল ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা। এই জটিল ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাকে সফল করার জন্য স্থানীয় সরকার গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করতে পারে। তবে এক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারে সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। স্থানীয় সরকারের বর্তমান অর্থনৈতিক ক্ষমতাও অতি সামান্য। যথেষ্ট অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও কার্যকর বাজেট ছাড়া স্থানীয় সরকারকে গ্রামীণ উন্নয়নে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারকে আরো উদার হতে হবে এবং গ্রামীণ জনগণকে স্থানীয় সরকারকে সহযোগিতা করার জন্য আরো এগিয়ে আসতে হবে।

১৫ ॥ স্থানীয় সরকার বলতে কি বোঝায়? বাংলাদেশের সংবিধানে স্থানীয় সরকার সম্পর্কে কি বলা হয়েছে? গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও সুশাসনের জন্য স্থানীয় সরকারের ভূমিকা আলোচনা করুন।

উত্তর : বাংলাদেশ সৃষ্টির প্রেক্ষাপট ছিল একটি অতিকেন্দ্রিভূত শাসনব্যবস্থা এবং সে ব্যবস্থায় পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসরত বাঙালিদের প্রতি ছিল চরম বৈষম্য ও বঞ্চনা। মূলত ক্ষমতা ও সম্পদের কেন্দ্রীকরণই ছিল এ অবস্থার জন্য দায়ী। তাই আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানি আধিপত্যবাদের অবসান এবং বাঙালিদের জন্য সত্যিকার স্বশাসন অর্জন। এই উদ্দেশ্যই বহুলাংশে প্রতিফলিত হয়েছে স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে রচিত আমাদের সংবিধানে। সুস্পষ্টভাবে আমাদের সংবিধানে প্রশাসনের প্রত্যেক একাংশ বা স্তরে স্থানীয়ভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানের ওপর স্থানীয় শাসনের ভার প্রদানের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। এ অঙ্গীকারের অংশ হিসেবে প্রশাসন ও সরকারি কর্মচারীদের কার্যক্রম পরিচালনা, জনশৃঙ্খলা রক্ষা, সকল সরকারি সেবা বিতরণ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর অর্পণ করা হয়েছে। স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে গণতন্ত্রের ভিত গভীরে প্রোথিত এবং তৃণমূলেও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার চর্চা এবং সকল কার্যক্রমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়।

স্থানীয় সরকার : স্থানীয় সরকারকে বলা হয় নিম্নস্তরের (Grossroot level) জাতীয় সরকার। কোনো দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নির্ভর করে মূলত শক্তিশালী স্থানীয় সরকারের ওপর। স্থানীয় সরকার হচ্ছে এমন একটি শাসনব্যবস্থা যার মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট এলাকার জনগণ তাদের প্রাপ্য অধিকার, ক্ষমতা ও সম্পদ একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সহজেই পেতে এবং একই সাথে স্থানীয় বিষয়সমূহের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব কর্তব্য ও দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠা করতে পারে। শক্তিশালী স্থানীয় শাসনের অর্থ হলো প্রয়োজনীয় সম্পদ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত সত্যিকারের স্থানীয় গণতান্ত্রিক শাসন। যার

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

মূল লক্ষ্য হলো জনগণের ক্ষমতায়ন। সংজ্ঞাগতভাবেই স্থানীয় সরকার একটি স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান। Prof. R.M Jackson তার 'The Machinery of Local Government' গ্রন্থে বলেন, 'স্থানীয় সরকার মূলত সম্প্রদায়ের কল্যাণে বিভিন্ন সেবামূলক কাজ পরিচালনা করার এক পদ্ধতি বিশেষ।'

বাংলাদেশের সংবিধানে স্থানীয় সরকার : আমাদের সংবিধানে স্থানীয় সরকার সম্পর্কে ৪টি অনুচ্ছেদ রয়েছে। অনুচ্ছেদগুলো হলো ৯, ১১, ৫৯ ও ৬০। যা নিচে উপস্থাপন করা হলো–

৯। রাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রতিনিধিগণ সমন্বয়ে গঠিত স্থানীয় শাসন-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহ দান করিবেন এবং এই সকল প্রতিষ্ঠানসমূহে কৃষক, শ্রমিক এবং মহিলাদিগকে যথাসম্ভব বিশেষ প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হইবে।

১১। প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে।

৫৯। (১) আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হইবে।

(২) এই সংবিধান ও অন্য কোন আইনসাপেক্ষে সংসদ আইনের দ্বারা যেরূপ নির্দিষ্ট করিবেন, এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় উল্লিখিত অনুরূপ প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান যথোপযুক্ত প্রশাসনিক একাংশের মধ্যে সেইরূপ দায়িত্ব পালন করিবেন এবং অনুরূপ আইনে নিম্নলিখিত বিষয় সংক্রান্ত দায়িত্ব অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিবে :
(ক) প্রশাসন ও সরকারী কর্মচারীদের কার্য;
(খ).জনশৃঙ্খলা রক্ষা;
(গ) জনসাধারণের কার্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

৬০। এই সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদের বিধানাবলীতে পূর্ণ কার্যকরতাদানের উদ্দেশ্যে সংসদ আইনের দ্বারা উক্ত অনুচ্ছেদে উল্লিখিত স্থানীয় শাসনসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় প্রয়োজনে কর আরোপ করিবার ক্ষমতাসহ বাজেট প্রস্তুতকরণ ও নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা প্রদান করিবেন।

গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও সুশাসনে স্থানীয় সরকারের ভূমিকা : নিচে গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও সুশাসনে স্থানীয় সরকারের ভূমিকা আলোচনা করা হলো :

১. **প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র বিকাশ :** স্থানীয় সরকারব্যবস্থার মাধ্যমে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটে, যা অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রের উত্তরণ ঘটায়। অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র কার্যকর হয় জনগণের সরাসরি, সক্রিয় ও কার্যকর সম্পৃক্ততার মাধ্যমে। অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রে জনগণ সিদ্ধান্তগ্রহণের অধিকার ও দায়িত্ব লাভ করে। সিদ্ধান্তে তাদের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে নিজস্ব উদ্যোগ ও সক্রিয়তার সৃষ্টি হয়। ফলে গণতন্ত্র হয় সত্যিকার অর্থে কার্যকর ও অর্থবহ।

২. **উপযুক্ত প্রতিনিধি বাছাই :** প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের চর্চা হয় নির্বাচনের দিনেই। নির্বাচনসর্বস্ব গণতন্ত্রে জনগণ প্রতিনিধি নির্বাচন করার পর নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় এবং জনগণের সে নিষ্ক্রিয়তার সুযোগে প্রতিনিধিরাও দায়িত্বহীন ও স্বেচ্ছাচারী হওয়ার সুযোগ পায়। যাই হোক, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় জনগণ তাদের পরিচিত, কাছের প্রতিনিধি নির্বাচিত করে। এসব নির্বাচিত প্রতিনিধির কাছে তাদের চাহিদা তুলে ধরে। যার ভিত্তিতে স্থানীয় নির্বাচিত প্রতিনিধি বিভিন্ন রকম উদ্যোগ গ্রহণ করে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৩. **শিক্ষা ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন :** বাংলাদেশে শিক্ষার হার খুবই কম। অশিক্ষিত মানুষকে শিক্ষিত করে তুলতে, গ্রামীণ নিরক্ষরতা দূরীকরণে, প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক— সরকারের এ নীতি বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। গ্রামীণ অবকাঠামোর উন্নয়নে স্থানীয় সরকার বিশেষ ভূমিকা পালন করে; স্থানীয় সরকার প্রথমে গ্রামের অবকাঠামোগত সমস্যা চিহ্নিত করে এবং সে অনুসারে কর্মসূচি প্রণয়ন করে রিপোর্ট তৈরি করে সরকারকে জানায়। এ রিপোর্টের ভিত্তিতে সরকার অর্থ সংগ্রহ করে স্থানীয় অবকাঠামোর উন্নয়ন সাধন করে।

৪. **সচেতন নাগরিক গঠন :** গ্রামনির্ভর বাংলাদেশের গ্রামীণ মানুষের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো সচেতনতার অভাব। নির্বাচনী প্রচারণা, প্রশিক্ষণ, নেতৃত্বদান, সভা-সমাবেশ ইত্যাদির মাধ্যমে স্থানীয় সরকার ও তার প্রতিনিধিরা সচেতনতা বৃদ্ধি করে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপদ পানি, সুষ্ঠু পরিবেশ ইত্যাদি মৌলিক মানবিক সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণে স্থানীয় সরকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নারী নির্যাতন, বাল্যবিবাহ, যৌতুক, জন্ম ও বিবাহ নিবন্ধীকরণ (Registration), মাদকাসক্তি প্রভৃতি দুরূহ সামাজিক সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিগণ জনগণকে সচেতন ও সংঘবদ্ধ করে। যা করার জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনো অর্থের প্রয়োজন হয় না।

৫. **অর্থনৈতিক উন্নয়ন :** একটি গতিশীল শক্তিশালী অর্থনীতির জন্য প্রয়োজন বাজার ব্যবস্থা, ব্যাংকিং সুবিধা ও কর্মসংস্থান, বিশেষত আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ। এজন্য আরো প্রয়োজন প্রশিক্ষিত ও দক্ষ জনগোষ্ঠী। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা, ঋণের সহজলভ্যতা ইত্যাদি নিশ্চিত করতে পারে। একই সাথে বিরাজমান সরকারি-বেসরকারি সুযোগ-সুবিধা কাজে লাগিয়ে কারিগরি দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ আয়োজনে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করতে পারে। যার ফলে আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম শুরু হয় এবং স্থানীয়ভাবে ক্ষুদ্রশিল্প স্থাপিত হতে পারে।

৬. **কৃষি উন্নয়ন :** বাংলাদেশ একটি কৃষিনির্ভর দেশ। এ দেশের অধিকাংশ লোকই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। গ্রামপ্রধান ও কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের উন্নয়নে স্থানীয় সরকার অবদান রাখতে পারে। স্থানীয় জনগণকে কৃষি বীজ সরবরাহ করা, কৃষি প্রশিক্ষণ প্রদান, ঋণ দান ইত্যাদি কর্মসূচি গ্রহণ করে গ্রামের কৃষকদের সাহায্য করতে পারে এবং এভাবে কৃষিপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পেতে পারে।

৭. **আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা :** উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন নিরাপদ পরিবেশ ও আইনের শাসন। স্থানীয়ভাবে মানুষকে সংগঠিত করার মাধ্যমে তা বহুলাংশে নিশ্চিত করা সম্ভব। বেকারত্ব কমানো ও শিক্ষার হার বাড়ানোর সাথে সাথে সামগ্রিকভাবে স্থানীয় জনগণের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক মান বাড়ানো এবং অসামাজিক কাজ ও অপরাধ রোধে জনগণকে সংগঠিত করা সম্ভব। এটি করতে পারে একমাত্র আইন-শৃঙ্খলার প্রতি শ্রদ্ধাশীল নিরপেক্ষ স্থানীয় সরকার। এছাড়াও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা স্থানীয় পর্যায়ে জনগণের মধ্যকার পারস্পরিক বিরোধ কার্যকরভাবে নিষ্পত্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

৮. **গণতান্ত্রিক পরিবেশ গঠন :** বাংলাদেশের সংবিধানে মৌলিক মানবাধিকার, স্বাধীনতা এবং মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের শ্রদ্ধাবোধ প্রদর্শন করা হয়েছে। একটি নির্দিষ্ট এলাকার মানুষের মৌলিক অধিকারসমূহ কিভাবে নিশ্চিত করা যায় তা সুনির্দিষ্টভাবে নির্ণয় করা, তদনুযায়ী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রয়োজনীয় উদ্যোগ সবচেয়ে কার্যকরভাবে গ্রহণ করা স্থানীয় সরকারের পক্ষেই সম্ভব। এছাড়াও বাকস্বাধীনতাসহ অন্যান্য গণতান্ত্রিক অধিকার সংরক্ষণে স্থানীয় সরকারের গণতান্ত্রিক ভূমিকা দেশব্যাপী গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

৯. **স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক রাজনৈতিক পরিবেশ গঠন :** আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব একটি পর্বতপ্রমাণ সমস্যা ও জবাবদিহিতার চর্চা সবচেয়ে কার্যকরভাবে করা সম্ভব স্থানীয় পর্যায়ে। কারণ নির্বাচিত স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিগণের অধিকাংশই গ্রামে থাকেন। গ্রামের মানুষ তাদের জীবনাচরণ ও কার্যক্রম অত্যন্ত কাছ থেকে পর্যবেক্ষণের সুযোগ পায়। তাই ব্যক্তিগতভাবে সততা ও স্বচ্ছতার চর্চা তাদের নিজেদেরই শুরু করতে হবে। জনগণের সামনে বাজেট পেশ ও অনুরূপ প্রকাশ্য অধিবেশনের মাধ্যমে তারা জবাবদিহিতামূলক রাজনীতি চর্চার বড় ধরনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেন। এছাড়াও গণমানুষকে সংগঠিত করার মাধ্যমে দায়বদ্ধতার চাহিদা সৃষ্টির ভিত্তিতে এ সমস্যা সমাধানে আন্দোলন শুরু হওয়া দরকার তৃণমূল পর্যায় থেকে। স্থানীয় নির্বাচিত প্রতিনিধি এক্ষেত্রে উদ্যোগী ভূমিকা নিতে পারেন।

১০. **সমঅধিকার নিশ্চিতকরণ :** নারী-পুরুষের মধ্যকার সমতা নিশ্চিত করা, সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের প্রতি ন্যায়পরায়ণতা প্রদর্শন ছাড়া জাতি হিসেবে আমাদের এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব। গ্রামীণ নারীদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে সমাজে বিদ্যমান নারী-পুরুষের বৈষম্য নিরসনের প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে। গ্রামের কন্যাশিশুদের শিক্ষা ও সুস্বাস্থ্যের নিশ্চয়তা প্রদানে স্থানীয় সরকারের সচেতন তদারকি খুবই ফলপ্রসূ হতে পারে। স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিরা শুধু দৃষ্টান্তই স্থাপন করতে পারেন না, এ ব্যাপারে তারা জনগণকে সচেতন এবং ঐক্যবদ্ধও করতে পারেন।

১১. **পুঁজি গঠন :** ক্ষুধা-দারিদ্র্যজনিত ও সুশাসন সম্পর্কিত অধিকাংশ সমস্যা স্থানীয় জনগণের সংগঠিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব। অর্থের অপ্রতুলতা সত্ত্বেও জনগণ তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সৃষ্ট সামাজিক পুঁজি কাজে লাগিয়ে স্বাস্থ্যকেন্দ্র, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য মৌলিক অবকাঠামো সৃষ্টি করতে পারে। তেমনিভাবে জনগণ ঐক্যবদ্ধ হলে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, দুর্নীতি, নারী নির্যাতনের মতো সর্বগ্রাসী সামাজিক এবং শাসনসংক্রান্ত সমস্যার বিরুদ্ধেও তারা রুখে দাঁড়াতে এবং এগুলো রোধ করার ব্যাপারে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে পারে। যদি তৃণমূল পর্যায় থেকে অংশগ্রহণমূলক গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এমনি সামাজিক পুঁজি গড়ে ওঠে তবে অনেক সমস্যারই সমাধান সহজেই হতে পারে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান জনগণের মধ্যে উন্নত ভবিষ্যতের প্রত্যাশা জাগাতে এবং এ প্রত্যাশা অর্জনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে জনগণকে সংগঠিত করতে পারে। এসব সংগঠনের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে সঞ্চয় সংগৃহীত হতে পারে। এছাড়াও মানুষ সংগঠিত হলে এক ধরনের সামাজিক পুঁজির সৃষ্টি হয়। যা আর্থিক পুঁজির অপ্রতুলতা নিরসনে সহায়তা করতে পারে।

১২. **সরকার ও জনগণের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন :** আমাদের দেশে জনকল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয় অধিকাংশ অর্থসম্পদ সাধারণত সরকার নিয়ন্ত্রণ করে। এছাড়াও সরকারের হাতে রয়েছে মেধাবী ও দক্ষ জনবল। স্থানীয় সরকার জনগণ ও সরকারের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে জবাবদিহিতার সাথে এসব সম্পদ জনগণের কাছে পৌছে দিতে পারে। বাংলাদেশের জনগণের আয়ের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে বাড়ছে। ধনী এবং দরিদ্র জনগণের মধ্যে অধিকাংশই গ্রামে বাস করে— আয়, প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা ও সেবাপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে বর্তমান ব্যবধান প্রকট। তৃণমূল পর্যায়ের জনগণের সর্বাধিক নিকটের প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্থানীয় সরকারকে অধিক অর্থসম্পদ বরাদ্দ দান ও বরাদ্দকৃত অর্থের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা কাজে লাগিয়ে এ ব্যবধান দূরীকরণ সম্ভব।

১৩. **নারীর ক্ষমতায়ন :** স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পুরুষের পাশাপাশি নারীদের নেতৃত্ব বিকাশেরও সুযোগ রয়েছে। যা হওয়াও প্রয়োজন। অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায়, নারীরা নির্বাচিত হলে তারা পরিবর্তনের বলিষ্ঠ রূপকারে পরিণত হয়। তারা স্বাস্থ্য, পয়ঃনিষ্কাশন, শিক্ষা, আয় বৃদ্ধি প্রভৃতি মানব উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে অধিক মনোযোগী হয়। এসব কার্যক্রম বাংলাদেশের অগ্রগতির জন্য অপরিহার্য। এছাড়াও নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিরা অন্য নারীদের জন্য আদর্শ হিসেবে কাজ করতে পারে। যার ফলে নারী-পুরুষের সমতা অর্জন ও নারীদের অধিক হারে অংশগ্রহণের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হতে পারে।

উপসংহার : বহু রক্ত ও অনেক আত্মত্যাগের বিনিময়ে একটি ঐতিহাসিক মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ অর্জন করেছি। আমাদের প্রত্যাশা ছিল এমন একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা, যা জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হবে। যেখানে সকলের জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচারের নিশ্চয়তা থাকবে, নারী এবং সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী যথাযথ প্রতিনিধিত্ব ও সমসুযোগ লাভ করবে। এসব বিষয়ের প্রতি জাতি হিসেবে আমরা সাংবিধানিকভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অথচ স্বাধীনতার চার দশক অতিক্রান্ত হলেও আমরা আজো পারিনি স্ব-শাসন প্রতিষ্ঠা করতে, সিদ্ধান্তগ্রহণে জনগণের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে। এমনকি পারিনি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা গড়তে। আর এর মূলে রয়েছে সংবিধান প্রদর্শিত পথে শক্তিশালী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থতা। যার ফলে আমাদের দেশে গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হচ্ছে না।

১৬ । **বাংলাদেশের প্রশাসনিক সংস্কার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন।**

উত্তর : আধুনিক সমাজে প্রশাসনকে সরকারের প্রাণকেন্দ্র বলে অভিহিত করা হয়। প্রশাসন হচ্ছে কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য একটি সমবেত প্রচেষ্টা। এ প্রচেষ্টার মাধ্যমে সরকারের উদ্দেশ্য ও ইচ্ছা বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। পৃথিবীর প্রতিটি দেশেই একটি নিজস্ব প্রশাসনিক কাঠামো রয়েছে। আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যাবলী পরিবর্তনের ফলে সরকারের কার্যাবলীও বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই পরিবর্তিত সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য এবং ক্রমবর্ধমান রাষ্ট্রীয় কার্যাবলী পরিচালনার জন্য প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়োজন আছে। দুর্নীতিমুক্ত, স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক, কার্যকর, পেশাদারি, মেধাবী, দক্ষ, দায়িত্বশীল এবং আমলানির্ভরতা থেকে মুক্ত প্রশাসন যন্ত্রের বাস্তবায়নে বাংলাদেশে প্রশাসনিক সংস্কার অত্যন্ত জরুরি।

বাংলাদেশে প্রশাসনিক সংস্কারসমূহ

বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো ও প্রশাসনব্যবস্থা মূলত ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা এবং পরবর্তীতে পাকিস্তানি প্রশাসনব্যবস্থা থেকে ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় প্রাপ্ত। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি লাভ করে। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর থেকে দুর্বল প্রশাসনিক কাঠামো ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতা দূর করার জন্য প্রশাসনিক সংস্কারের বিষয়টি একের পর এক ক্ষমতায় আসা সব সরকারের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিণত হয়। তাই সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে বিভিন্ন সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে, যা নিচে শাসনক্রম অনুসারে উপস্থাপন করা হলো :

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

১. **শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনামল (১৯৭২-৭৫) :** বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা পরবর্তী রাষ্ট্রের বহুমুখী সমস্যার মধ্যে সুষ্ঠু প্রশাসনব্যবস্থা চালু করার উদ্দেশ্যে তিনটি কমিটি গঠন করেন। যথা :

ক. বেসামরিক প্রশাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা কমিটি (Civil Administrative Restoration Committee)

খ. প্রশাসনিক ও চাকরি পুনর্গঠন কমিটি (Administrative and Services Reorganization Committee)

গ. জাতীয় বেতন কমিশন (National Pay Commission)

বেসামরিক প্রশাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা কমিটি (CARC) চেয়ারম্যানসহ ৬ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়। এ কমিটির সকল সদস্যই ছিলেন সিভিল সার্ভেন্ট। এ কমিটি যে সুপারিশ করে সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– ২০টি মন্ত্রণালয়, ৩টি অন্যান্য সচিবালয় সংগঠন এবং সাতটি সাংবিধানিক কাঠামো সৃষ্টি করা; মহকুমা, জেলা এবং বিভাগীয় পর্যায়ে আমলাদের কার্যাবলী নির্ধারণ করা, সরকারের একটি অঙ্গ হিসেবে প্রশাসনিক কর্মচারীদের পদমর্যাদা রক্ষা করা। এ কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে প্রাদেশিক সচিবালয়কে জাতীয় সচিবালয়ে রূপান্তর করা হয়। এ ছাড়া ২০টি মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর, বিভাগ ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা রাখা হয়।

প্রশাসনিক ও চাকরি পুনর্গঠন কমিটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ প্রদান করলেও এ রিপোর্ট সরকারিভাবে প্রকাশিত হয়নি। এ কমিটি তাদের রিপোর্ট দু'ভাবে জমা দিয়েছিল। এ কমিটির অধিকাংশ সুপারিশই ছিল আমলাদের স্বার্থবিরোধী।

জাতীয় বেতন কমিশন ৫ বছরের জন্য ৯ স্তরবিশিষ্ট প্রশাসনিক কাঠামোর অনুরূপ বেতনস্কেলের সুপারিশ করে। কমিশনের এ মত গৃহীত না হলে কমিশন ১০ গ্রেড সম্বলিত একটি জাতীয় বেতনস্কেল সুপারিশ করে। এ সুপারিশমালাও আংশিকভাবে বাস্তবায়ন করা হয়, যা মাত্র তিন বছর অব্যাহত ছিল।

২. **জিয়াউর রহমানের শাসনামল (১৯৭৬-৮১) :** জেনারেল জিয়াউর রহমানের সামরিক সরকারের শাসনামলে বেতন ও চাকরি কমিশন (Pay & Services Commission) গঠন করা হয়। এ কমিশনের কাজ ছিল মেধার ওপর ভিত্তি করে সকল প্রকার নিয়োগ ও পদোন্নতি দেয়া এবং সকল ক্যাডার সদস্যের সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদান। এ কমিশনের প্রস্তাবিত ১০টি বেতনস্কেলের পরিবর্তে ২২টি বেতনস্কেল করা হয়। এতে সর্বোচ্চ তিন হাজার ও সর্বনিম্ন দু'শ পঁচিশ টাকা বেতনস্কেল নির্ধারণ করা হয়। এ কমিশনের সুপারিশের প্রেক্ষিতে সরকার ৫টি কমিটি গঠন করে। ২৮টি ক্যাডার তৈরি করে ২১টি গ্রেডে বেতনস্কেল প্রবর্তন করে, স্বনির্ভর গ্রাম সরকারব্যবস্থা প্রবর্তন করে। যা পরবর্তীতে গ্রাম সরকারে রূপ নেয়।

৩. **এরশাদ সরকারের শাসনামল (১৯৮২-৯০) :** ১৯৮১ সালে ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে হত্যা করা হয়। ১৯৮২ সালে জেনারেল এরশাদ সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেন। তার দীর্ঘ ৯ বছরের শাসনামলে বেশ কয়েকটি কমিটি ও কমিশন গঠন করা হয়। নিচে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কমিটি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিভিন্ন বিভাগ ও দপ্তরগুলোর গঠনকাঠামো পরীক্ষা করে দেখা এবং বেসামরিক চাকরির ক্ষেত্রে দক্ষতা বাড়ানোর উপায় সম্পর্কে গঠিত মার্শাল 'ল কমিটি সুপারিশ করে। এ কমিটির সুপারিশগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল— মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা এবং বেসামরিক কর্মচারী বিশেষ করে নিম্নপর্যায়ের কর্মচারীদের সংখ্যা হ্রাস করা, সচিবালয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ধাপগুলো কমানো, সচিবালয় এবং অন্যান্য নির্বাহী সংস্থার কাজ ঢেলে সাজানো, নিয়োগ প্রক্রিয়া এবং

আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা হস্তান্তর বিধিবিধানুযায়ী নিয়মিতকরণ। উক্ত কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে সচিবালয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ধাপগুলো কমানো ব্যতীত কমিটি প্রদত্ত অপর সুপারিশগুলো সামরিক সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়।

১৯৮২ সালে ৭ সদস্যবিশিষ্ট প্রশাসনিক সংস্কার ও পুনর্গঠন কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটি যেসব সুপারিশ করে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– থানা পরিষদকে উন্নীত করে উপজেলা পরিষদ করা এবং জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদে প্রত্যক্ষ ভোটে চেয়ারম্যান নির্বাচন দেয়া, কর্মকর্তাগণ এসব পরিষদের সদস্য থাকবেন, স্থানীয় পর্যায়ে কর্মরত আমলাদের ওপর নির্বাচিত পরিষদগুলোর পূর্ণ কার্যকরী নিয়ন্ত্রণ থাকবে, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণ উপজেলা পরিষদের সদস্য হবেন, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানগণ জেলা পরিষদের সদস্য হবেন প্রভৃতি। এ কমিটির সুপারিশমালা বাস্তবায়নে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটি একবছরের মধ্যে সুপারিশমালা বাস্তবায়ন করে। এছাড়াও এরশাদ সরকারের শাসনামলে জাতীয় বেতন কমিশন ১৯৮৪, সিনিয়র সার্ভিসেস পুলের কাঠামো নিরূপণের জন্য বিশেষ কমিটি ১৯৮৫, ক্যাবিনেট সাব-কমিটি ১৯৮৩, জাতীয় বেতন কমিশন ১৯৮৯, Committee Constituted for Re-examining Organizational Set up of Departments /Directorates ১৯৮৯ গঠন করা হয়। এ কমিটির প্রধান লক্ষ্য ছিল সরকারি আধাস্বায়ত্তশাসিত ও স্বায়ত্তশাসিত অফিসসমূহের প্রয়োজনীয়তা যাচাই করা এবং ১৯৮২ সালে গঠিত সাংগঠনিক কাঠামো পরীক্ষা কমিটির রিপোর্টটি পর্যালোচনা করা। ১৯৮৯ সালের জুলাই মাসে কমিটি রিপোর্ট পেশ করে। এ কমিটি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অন্তর্গত বিভাগ ও সংযুক্ত অফিসসমূহকে প্রেসিডেন্ট সচিবালয়ের একটি সেলে বিলুপ্তির সুপারিশ করে। কিন্তু কমিটির অল্পসংখ্যক সুপারিশ বাস্তবায়ন করা হয় এবং লোকসংখ্যাও কিছু কমানো হয়, তবে বেশির ভাগ সুপারিশই বাস্তবায়ন করা হয়নি।

৪. **খালেদা জিয়ার শাসনামল (১৯৯১-৯৬) :** ১৯৯০ সালে গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের পতন ঘটানো হয় এবং ১৯৯১ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল জয়ী হয়। জাতীয়তাবাদী দলের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া সরকার গঠন করে। তার শাসনামলের শুরুতেই প্রশাসনকে ঢেলে সাজানোর অঙ্গীকার করা হয় এবং প্রশাসনব্যবস্থাকে আরো গণতান্ত্রিক, জবাবদিহিমূলক ও দুর্নীতিমুক্ত করার ইচ্ছা পোষণ করা হয়। ১৯৯১ সালে এ সরকার উপজেলা পরিষদ বাতিল ঘোষণা করে এবং ১৯৯১ সালের নভেম্বর মাসে 'স্থানীয় সরকার কাঠামো পর্যবেক্ষণ কমিশন' গঠন করা হয়। এ কমিশন গ্রাম ও থানা পর্যায়ে দুটি কমিটি গঠনের সুপারিশ করে। তাতে বলা হয় গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণী থেকে জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধি ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে নিয়ে গ্রাম সভা গঠিত হবে। এর মাধ্যমে ইউনিয়নে বাজেট ও সামগ্রিক উন্নয়নমূলক কার্য পরিচালিত হবে। থানা উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটি থানা পর্যায়ে গঠন করা হবে। এর প্রধান দায়িত্ব হলো জেলা, থানা ও ইউনিয়নের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন, থানার সকল উন্নয়নমূলক প্রজেক্টসমূহ পর্যালোচনা করা এবং প্রশাসনের সকল স্তরের সমন্বয় সাধন করা। স্থানীয় সরকারের সকল আইন-কানুন, নীতিমালা, কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ পদ্ধতি, অর্থব্যবস্থা প্রভৃতি নির্ধারণ করার দায়িত্ব এ কমিটির ওপর বর্তায়। ১৯৯৩ সালে স্থানীয় সরকার সংশোধন অ্যাক্ট পাস করা হয়। ১৯৯৩ সালের আগস্ট মাসে এম নূরন্নবী চৌধুরীর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়, যে কমিটি প্রায় তিন বছর পর রিপোর্ট জমা দেয়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৫. **শেখ হাসিনার শাসনামল (১৯৯৬-২০০১) :** ১৯৯৬ সালের জুন মাসে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মাধ্যমে শেখ হাসিনা ক্ষমতা গ্রহণ করেন। প্রশাসনিক সংস্কারের লক্ষ্যে শেখ হাসিনা স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করার জন্য স্থানীয় সরকার কমিশন গঠন করে। এ কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে চার স্তরবিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে প্রতিটি ইউনিয়নে তিনজন মহিলা সদস্যকে সরাসরি ভোটে নির্বাচনের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। তাছাড়া ইউনিয়ন পরিষদের কাঠামো ও কার্যাবলি পূর্বের মতোই বলবৎ থাকে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শাসনামলে পঞ্চম জাতীয় বেতন কমিশন গঠন করা হয়, যাতে বেতনস্কেল ২০ স্তরবিশিষ্ট করা হয়। এছাড়া জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন প্রশাসনিক সংস্কারের লক্ষ্যে দক্ষতা, কার্যকারিতা, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার স্তর উন্নত করার জন্য নীতি, কার্যক্রম ও কার্যকলাপের সুপারিশ করে, যাতে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও জনগণের জন্য তার সুফল নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সরকারের অঙ্গীকার পূরণে এসব সংস্থা সক্ষম হয়। এ কমিশন কর্তৃক বাস্তব ও বিধিসম্মত অধিকাংশ সুপারিশই বাস্তবায়িত হয়নি।

৬. **খালেদা জিয়ার শাসনামল (২০০১-২০০৬) :** বেগম খালেদা জিয়া ২০০১ সালের অক্টোবরে দ্বিতীয় মেয়াদের শাসন কার্যক্রম শুরু করেন। এ মেয়াদে তারা প্রশাসনিক সংস্কারের জন্য কোনো কমিশন গঠন না করেই কিছু কার্যক্রম গ্রহণ করেন। যেমন– প্রশাসনকে সেবাধর্মী করা ও তৃণমূল পর্যায়ে সেবাদান নিরবচ্ছিন্ন এবং নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মাঠপর্যায়ে কর্মরত সরকারি কর্মকর্তাদের সার্বক্ষণিকভাবে কর্মস্থলে অবস্থান নিশ্চিত করতে সরকারের প্রয়োজনীয় নির্দেশনামূলক পরিপত্র জারি করা, প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন সভার প্রেক্ষিতে কয়েকটি নতুন উপজেলা সৃষ্টি করা; প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (NICAR)-এর সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে নতুন উপজেলা, থানা ও তদন্ত কেন্দ্র স্থাপনের নীতিমালা জারি করা, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে ক্যারিয়ার প্লানিং এবং প্রশিক্ষক অণুবিভাগ স্থাপনের সুপারিশ করা, ক্লাস্টার অব মিনিস্ট্রিজের আওতায় চারটি ক্লাস্টারের সমন্বয়ে সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট পুল গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া। যদিও প্রশাসনিক সংস্কার কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা চেষ্টা করেছে। যেমন– বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা ইত্যাদি।

৭. **নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার (২০০৭-০৮) :** ফখরুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রশাসনিক সংস্কারের ক্ষেত্রে জনপ্রশাসন সংস্কারে জনপ্রশাসনকে জবাবদিহিমূলক, গতিশীল, স্বচ্ছ এবং জাতীয় অগ্রগতির সহায়ক হিসেবে গড়ে তুলতে মন্ত্রণালয়ের পত্র গ্রহণ ও প্রেরণ ব্যবস্থা পরিবর্তন, সরকারি দলিলাদি জনগণের জন্য ক্ষেত্রবিশেষে উন্মুক্তকরণ ও ভ্রমণ কর পরিশোধ সহজীকরণ বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়ার কথা বলে। এছাড়া বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস, টেলিফোনসহ সব ইউটিলিটি বিল এক স্থানে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। পেনশন সহজীকরণ, পাসপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্স সহজীকরণ ও ভূমি ব্যবস্থাপনা আধুনিকীকরণ করা হয়। এছাড়া মন্ত্রণালয়ে মুখ্য সচিবের পদ সৃষ্টি করা হয়, বিভাগীয় কমিশনারকে বলা হবে চিফ কমিশনার, পদোন্নতির জন্য নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করা হয়, সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট পুল গঠন, বাজারভিত্তিক বেতন কাঠামো চালু করা হয়।

৮. **শেখ হাসিনার শাসনামল (২০০৯-বর্তমান) :** ভোক্তা অধিকার আদায়ে একটি জাতীয় ভোক্তা অধিকার পরিষদ এবং ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার জন্য সরকার সংসদে একটি বিল পাস

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

করে ১ এপ্রিল ২০০৯। সরকার উপজেলা পরিষদে চেয়ারম্যানদের ক্ষমতা সংক্রান্ত উপজেলা পরিষদ (রহিত আইন পুনঃপ্রচলন ও সংশোধনী) বিল পাস করে ৬ এপ্রিল ২০০৯। সরকার তথ্য কমিশন গঠন করেছে। দেশের গোয়েন্দা কার্যক্রমের অসঙ্গতি দূর করা এবং একাধিক গোয়েন্দা সংস্থার মধ্যে সমন্বয় রক্ষার লক্ষ্যে জাতীয় গোয়েন্দা সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। দেশের পর্যটন শিল্পকে গতিশীল এবং এ খাত থেকে রাজস্ব আদায় বাড়াতে সরকার পর্যটন শিল্পের জন্য গঠন করেছে জাতীয় পর্যটন পরিষদ। বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন ২০০৯ পাস করে দেশের বীমা কোম্পানিগুলোকে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে নেয়া হয়। ৯ জানুয়ারি ২০১২ সরকার বর্তমান সচিব পদের একধাপ ওপরে সিনিয়র সচিব (জ্যেষ্ঠ সচিব) নামে জনপ্রশাসনে আটটি নতুন পদ সৃষ্টি করে। মন্ত্রিপরিষদ ও প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব এবং সচিবদের মাঝামাঝি একটি পদমর্যাদা হলো এ পদ। অর্থাৎ তাদের পদ হলো সেনাবাহিনীর লে. জেনারেল পদমর্যাদায় সিনিয়র সচিব। একই সাথে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের পদ 'জেনারেল'-এর পদমর্যাদায় উন্নীত করা হয়।

স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত প্রশাসনিক সংস্কারের জন্য কয়েকবার সংস্কার কমিশন ও কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিশন বা কমিটির সুপারিশগুলোর মধ্যে কিছু কিছু বাস্তবায়িত হয়েছে। আবার কখনো ক্ষমতার পালাবদল বা পরিবর্তিত অবস্থার প্রেক্ষিতে কিংবা আমলাদের পরিবর্তনের প্রতি অনীহার কারণে সুপারিশগুলো উপেক্ষিত থেকেছে বা বাস্তবায়িত হয়নি। তাছাড়া এসব প্রশাসনিক সংস্কার নিয়েও অনেক সমালোচনা রয়েছে।

উপসংহার : স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের প্রশাসনিক সংস্কারে অনেক কমিটি ও কমিশন গঠন করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ থেকে কোনো উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জিত হয়নি। এর মূলে রয়েছে রাজনৈতিক দলগুলোর পারস্পরিক বিদ্বেষপরায়ণতা ও বিরোধীমূলক মনোভাব। কেননা সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রশাসনে ব্যাপক রদবদল হয়। এতে প্রশাসনিক শূন্যতা দেখা দেয়। ফলে গৃহীত নীতি সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয় না। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য সফল প্রশাসনিক সংস্কার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর এজন্য প্রয়োজন অত্যন্ত দক্ষ এবং নিরপেক্ষ কমিটি গঠন করা, যে কমিটির সদস্যরা হবেন ন্যায়পরায়ণ এবং সৎ। আমলা ব্যতীত কোনো কর্মসূচি সফল করা সম্ভব নয়। এজন্য সংস্কারটি হতে হবে এমন— যেন সরকারি কর্মকর্তাগণ সহজে তা মেনে নেয়। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং সরকারের আন্তরিকতা প্রয়োজন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-০১ রাষ্ট্রপতি কখন অধ্যাদেশ (Ordinance) জারি করেন?

উত্তর : বাংলাদেশ সংবিধানের ৯৩ (১) অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি দু অবস্থায় অধ্যাদেশ জারি করতে পারেন।

প্রথমত, সংসদের অধিবেশন না থাকলে কোনো জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য তিনি অধ্যাদেশ জারি করতে পারেন।

দ্বিতীয়ত, সংসদ ভেঙে যাওয়া অবস্থায় রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ জারির ক্ষমতা রয়েছে।

প্রশ্ন-০২ বাংলাদেশে প্রথম কখন জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়?

উত্তর : সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। আর জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৮ সালের ৩ জুন। এ নির্বাচনে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান।

প্রশ্ন-০৩ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল সম্পর্কে কি জানেন?

উত্তর : বাংলাদেশ সংবিধানে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা এক অভিনব পদক্ষেপ। সংবিধানের ১১৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'সংসদ আইনের দ্বারা এক বা একাধিক প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে।' কোনো ক্ষেত্রে কোনো প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠিত হলে তার এখতিয়ারের অন্তর্গত কোনো বিষয়ে অন্য কোনো আদালত কোনোরূপ কার্যধারা গ্রহণ করবে না বা কোনো আদেশ প্রদান করবে না। অবশ্য সংসদ আইনের দ্বারা কোনো ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার বা অনুরূপ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিলের বিধান করতে পারবে।

সংবিধান মোতাবেক নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে বা সেই সম্পর্কিত বিষয়াদির ওপর এখতিয়ার প্রয়োগের জন্য জাতীয় সংসদ এক বা একাধিক প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। তা হলো :

১. প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের কর্মের শর্তাবলী, অর্থদণ্ড ও অন্যান্য শাস্তিদান সম্পর্কে।
২. কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগ বা সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা সরকারের ওপর ন্যস্ত বা সরকারের দ্বারা পরিচালিত কোনো সম্পত্তি অর্জন, প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা ও বিলিব্যবস্থা।
৩. সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদে বর্ণিত যেসব বিষয়ে হাইকোর্ট বিভাগের কার্যকারিতা থাকে না।

প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল ব্যবস্থা অনেকটা ফ্রান্স ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে প্রচলিত বিভাগীয় আদালতের অনুরূপ। ব্রিটেনেও অনুরূপ আন্তঃবিভাগীয় বোর্ড রয়েছে। এ ধরনের প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও ন্যায়নীতির পক্ষে সহায়ক। বাংলাদেশে মাত্র দুটি প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল রয়েছে। একটি ঢাকায় এবং অপরটি বগুড়ায় অবস্থিত। এছাড়া ঢাকায় একটি প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনাল (Administrative Appellate Tribunal) আছে।

প্রশ্ন-০৪ বিশেষ ক্ষমতা আইন চালু রাখার যৌক্তিকতা কি?

উত্তর : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে বিশেষ ক্ষমতা আইন বা জরুরি বিধানাবলীর সারমর্ম ছিল যুদ্ধ বা বহিরাক্রমণ অথবা অভ্যন্তরীণ গোলযোগের দ্বারা বাংলাদেশ বা তার যে কোনো অংশের নিরাপত্তা বা অর্থনৈতিক জীবন বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারবেন। জরুরি আইন বলবৎ থাকাকালীন সময়ে জনগণের মৌলিক অধিকারসমূহ স্থগিত রাখার বিধানও এ আইনের আওতাভুক্ত। পরবর্তীতে সামরিক ও বেসামরিক স্বৈরশাসকগণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে নিজেদের দলীয় স্বার্থে এ আইনের অপপ্রয়োগ করছে। জাতীয় সঙ্কটময় মুহূর্তে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ব্যতিরেকে আটকের ব্যবস্থা সম্বলিত বিশেষ ক্ষমতা আইন এবং ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৫৪ ধারার প্রয়োগ যেমন অপরিহার্য, তেমনি রাজনৈতিক হীন স্বার্থে রাজনৈতিক বিরোধী ও অন্যান্য নাগরিককে হয়রানির উদ্দেশ্যে এ আইনে নিবর্তনমূলক আটক অবাঞ্ছিত।

প্রশ্ন-০৫ রুলস অব বিজনেস কি?

উত্তর : রুলস অব বিজনেস স্বাভাবিকভাবে মনে হতে পারে ব্যবসায়িক নীতি বিষয়ক কিছু, কিন্তু না। রুলস অব বিজনেস হলো সরকারি কার্যবিধিমালা। অর্থাৎ যে দলিল অনুযায়ী (কার্য বিধিমালা) বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বা ডিভিশনের মধ্যে বিভিন্ন কার্যাবলি বণ্টন করা হয় এবং কে, কোন দায়িত্ব পালন করবে, কিভাবে পালন করবে, কোন বিভাগ/মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলি কিরূপ হবে তা নির্ধারণ হয় তাকেই বলা হয় রুলস অব বিজনেস (Rules of Business)। রুল্স অব বিজনেস মূলত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় এবং সেই সাথে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে পূর্ণ অভিহিত রাখে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৫(৬) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি 'রুলস অব বিজনেস' সংশোধন করতে পারেন।

প্রশ্ন-০৬ মহামান্য রাষ্ট্রপতি পদাধিকারবলে কোন কোন সংস্থার প্রধান? *[৩৩তম বিসিএস]*

উত্তর : মহামান্য রাষ্ট্রপতি পদাধিকারবলে যেসব সংস্থার প্রধান :

১. বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক;
২. পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর;
৩. বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি;
৪. বাংলাদেশ স্কাউট;
৫. এশিয়াটিক সোসাইটি।

প্রশ্ন-০৭ প্রশাসনিক স্বচ্ছতা কি?

উত্তর : সরকারি প্রশাসন ব্যবস্থাকে অধিকতর গণমুখী ও দুর্নীতিমুক্ত করার প্রচেষ্টা থেকেই প্রশাসনিক স্বচ্ছতার ধারণার উদ্ভব ঘটেছে। প্রশাসনিক স্বচ্ছতা এমন একটি ধারণা, যা নাগরিক এবং প্রশাসনের মধ্যকার সম্পর্ক প্রকাশ করে। স্বচ্ছতা জনসাধারণের দৈনন্দিন চাহিদার ব্যাপারে প্রশাসনের যথাযথ সাড়া দান নিশ্চিত করে। যার ফলে সরকার নাগরিকদের জন্য যা করছে নাগরিকগণ তা জানতে পারে, অন্যদিকে সরকারও অনুমান করতে পারে যে, জনসাধারণ তাদের কাছ থেকে কি প্রত্যাশা করছে। প্রশাসনিক স্বচ্ছতার মৌলনীতি হচ্ছে তথ্য সামগ্রীতে ভোক্তা সাধারণের প্রবেশাধিকার যাতে করে তাদের ন্যায্য স্বার্থ সংরক্ষণ করতে পারেন।

প্রশ্ন-০৮ বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোর বর্ণনা দিন।

উত্তর : বাংলাদেশ একটি এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র। সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত। কেন্দ্রীয় সরকারের সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে সচিবালয়। সচিবালয়ের পরেই রয়েছে বিভাগীয় প্রশাসন ও এর পর জেলা প্রশাসন। আর একেবারে তৃণমূল পর্যায়ে থানা বা উপজেলা প্রশাসন বিদ্যমান।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

প্রশ্ন-০৯ বাংলাদেশ সচিবালয়ের পদবিন্যাস কিরূপ?

উত্তর : বাংলাদেশ সচিবালয় প্রশাসনের স্নায়ুকেন্দ্র। দেশের সকল প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত সচিবালয়ে গৃহীত হয়। বাংলাদেশ সচিবালয় কয়েকটি মন্ত্রণালয় নিয়ে গঠিত। প্রতিটি মন্ত্রণালয় এক একজন মন্ত্রীর অধীনে ন্যস্ত। মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক প্রধান হলেন সচিব। সচিবের কাজে সাহায্য করার জন্য অতিরিক্ত সচিব থাকেন। মন্ত্রণালয়ের এক একটি অনুবিভাগের জন্য একজন যুগ্ম সচিব, একাধিক শাখার দায়িত্বে একজন উপ-সচিব এবং প্রতি শাখার দায়িত্বে একজন করে সহকারী সচিব থাকেন। সচিবালয়ের প্রশাসনিক কাঠামো হচ্ছে– মন্ত্রী → সচিব → অতিরিক্ত সচিব → যুগ্মসচিব → উপসচিব → সহকারী সচিব → সেকশন অফিসার।

প্রশ্ন-১০ বাংলাদেশে বর্তমানে কয় স্তরবিশিষ্ট স্থানীয় সরকার রয়েছে?

উত্তর : সাধারণত স্থানীয়ভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি সংস্থা, যা স্থানীয় কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য গঠন করা হয়, তাকে স্থানীয় সরকার বলে। ২০০৮ সালে সরকার গ্রামাঞ্চলে তিন স্তরবিশিষ্ট এবং শহরাঞ্চলে দুই স্তরবিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। গ্রামাঞ্চলে স্তরগুলো হলো : ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদ। অন্যদিকে শহরাঞ্চলে স্তরগুলো হলো : পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশন। স্থানীয় সরকার গণতন্ত্রের সূতিকাগার। আইনের শাসন ও ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের জন্য স্থানীয় সরকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন-১১ উপজেলা পদ্ধতি সম্পর্কে কি জানেন?

উত্তর : ৭ নভেম্বর ১৯৮২ থেকে কার্যকর স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা পুনর্গঠন) অধ্যাদেশ ১৯৮২ বলে প্রথমে উন্নীত থানা পরিষদ গঠন করা হয় এবং থানা পর্যায়ে বিকেন্দ্রীভূত প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। পরবর্তীতে উন্নীত থানা পরিষদকে উপজেলা পরিষদে রূপান্তরিত করা হয়। থানা পর্যায়ে সমস্ত কার্যাবলীকে মূলত (ক) সংরক্ষিত ও (খ) হস্তান্তরিত দুই বিষয়ে ভাগ করা হয়। দশটি বিষয়কে হস্তান্তরিত বিষয় হিসেবে এবং তেরটি দায়িত্ব সংরক্ষিত রাখা হয়। একটি থানায় বসবাসকারী প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান নির্বাচিত করার বিধান করা হয়। উপজেলার আওতাধীন ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার চেয়ারম্যানগণ উপজেলা পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে থাকতেন। উপজেলা পর্যায়ে প্রতিটি বিভাগের কার্যক্রমকে সম্প্রসারিত করে প্রায় ২০ জন প্রথম শ্রেণীর সরকারি কর্মকর্তাকে উপজেলায় পোস্টিং দেয়া হয়। তিনজন মহিলা সদস্য উপজেলার অধিবাসীদের মধ্য থেকে সদস্য হতেন। একজন ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তাকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়, যিনি উপজেলা পরিষদের সকল কার্যক্রম সম্পাদন করতেন। কর ইত্যাদি আরোপ করাসহ ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্পাদনের সার্বিক দায়িত্বে উপজেলা পরিষদে অর্পণ করা হয়। ১৯৯১ সালে বিএনপি সরকার ক্ষমতায় এলে ১৯৯২ সালের ২৯ জানুয়ারি আইন পাসের মাধ্যমে উপজেলা ব্যবস্থা রহিতকরণ করা হয়। ১৯৯৮ সালের ৩ ডিসেম্বর আওয়ামী লীগ সরকার সংসদে আইন পাস করে উপজেলা ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করে। ১৯৯৯ সালের ১ ফেব্রুয়ারি গেজেটের মাধ্যমে উপজেলা আইন কার্যকর হয়। ২০০০ সালের ২০ এপ্রিল সরকার সকল প্রশাসনিক থানাকে উপজেলা হিসেবে অভিহিত করার নির্দেশ জারি করে। ২০০৮ সালের ৩০ জুন রাষ্ট্রপতি উপজেলা পরিষদে ২ জন ভাইস চেয়ারম্যান (১ জন মহিলা) সৃষ্টি করে স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ) অধ্যাদেশ ২০০৮ জারি করেন। এই অধ্যাদেশের আলোকেই অনুষ্ঠিত হয় ২০০৯ ও ২০১৪ সালের চতুর্থ উপজেলা পরিষদ নির্বাচন।

প্রশ্ন-০৪ বিশেষ ক্ষমতা আইন চালু রাখার যৌক্তিকতা কি?

উত্তর : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে বিশেষ ক্ষমতা আইন বা জরুরি বিধানাবলীর সারমর্ম ছিল যুদ্ধ বা বহিরাক্রমণ অথবা অভ্যন্তরীণ গোলযোগের দ্বারা বাংলাদেশ বা তার যে কোনো অংশের নিরাপত্তা বা অর্থনৈতিক জীবন বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারবেন। জরুরি আইন বলবৎ থাকাকালীন সময়ে জনগণের মৌলিক অধিকারসমূহ স্থগিত রাখার বিধানও এ আইনের আওতাভুক্ত। পরবর্তীতে সামরিক ও বেসামরিক স্বৈরশাসকগণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে নিজেদের দলীয় স্বার্থে এ আইনের অপপ্রয়োগ করছে। জাতীয় সঙ্কটময় মুহূর্তে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ব্যতিরেকে আটকের ব্যবস্থা সম্বলিত বিশেষ ক্ষমতা আইন এবং ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৫৪ ধারার প্রয়োগ যেমন অপরিহার্য, তেমনি রাজনৈতিক হীন স্বার্থে রাজনৈতিক বিরোধী ও অন্যান্য নাগরিককে হয়রানির উদ্দেশ্যে এ আইনে নিবর্তনমূলক আটক অবাঞ্ছিত।

প্রশ্ন-০৫ রুলস অব বিজনেস কি?

উত্তর : রুলস অব বিজনেস স্বাভাবিকভাবে মনে হতে পারে ব্যবসায়িক নীতি বিষয়ক কিছু, কিন্তু না। রুলস অব বিজনেস হলো সরকারি কার্যবিধিমালা। অর্থাৎ যে দলিল অনুযায়ী (কার্য বিধিমালা) বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বা ডিভিশনের মধ্যে বিভিন্ন কার্যাবলি বণ্টন করা হয় এবং কে, কোন দায়িত্ব পালন করবে, কিভাবে পালন করবে, কোন বিভাগ/মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলি কিরূপ হবে তা নির্ধারণ হয় তাকেই বলা হয় রুলস অব বিজনেস (Rules of Business)। রুলস অব বিজনেস মূলত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় এবং সেই সাথে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে পূর্ণ অভিহিত রাখে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৫(৬) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি 'রুলস অব বিজনেস' সংশোধন করতে পারেন।

প্রশ্ন-০৬ মহামান্য রাষ্ট্রপতি পদাধিকারবলে কোন কোন সংস্থার প্রধান? *[৩৩তম বিসিএস]*

উত্তর : মহামান্য রাষ্ট্রপতি পদাধিকারবলে যেসব সংস্থার প্রধান :

১. বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক;
২. পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর;
৩. বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি;
৪. বাংলাদেশ স্কাউট;
৫. এশিয়াটিক সোসাইটি।

প্রশ্ন-০৭ প্রশাসনিক স্বচ্ছতা কি?

উত্তর : সরকারি প্রশাসন ব্যবস্থাকে অধিকতর গণমুখী ও দুর্নীতিমুক্ত করার প্রচেষ্টা থেকেই প্রশাসনিক স্বচ্ছতার ধারণার উদ্ভব ঘটেছে। প্রশাসনিক স্বচ্ছতা এমন একটি ধারণা, যা নাগরিক এবং প্রশাসনের মধ্যকার সম্পর্ক প্রকাশ করে। স্বচ্ছতা জনসাধারণের দৈনন্দিন চাহিদার ব্যাপারে প্রশাসনের যথাযথ সাড়া দান নিশ্চিত করে। যার ফলে সরকার নাগরিকদের জন্য যা করছে নাগরিকগণ তা জানতে পারে, অন্যদিকে সরকারও অনুমান করতে পারে যে, জনসাধারণ তাদের কাছ থেকে কি প্রত্যাশা করছে। প্রশাসনিক স্বচ্ছতার মৌলনীতি হচ্ছে তথ্য সামগ্রীতে ভোক্তা সাধারণের প্রবেশাধিকার যাতে করে তাদের ন্যায্য স্বার্থ সংরক্ষণ করতে পারেন।

প্রশ্ন-০৮ বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোর বর্ণনা দিন।

উত্তর : বাংলাদেশ একটি এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র। সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত। কেন্দ্রীয় সরকারের সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে সচিবালয়। সচিবালয়ের পরেই রয়েছে বিভাগীয় প্রশাসন ও এর পর জেলা প্রশাসন। আর একেবারে তৃণমূল পর্যায়ে থানা বা উপজেলা প্রশাসন বিদ্যমান।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

প্রশ্ন-০৯ বাংলাদেশ সচিবালয়ের পদবিন্যাস কিরূপ?

উত্তর : বাংলাদেশ সচিবালয় প্রশাসনের স্নায়ুকেন্দ্র। দেশের সকল প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত সচিবালয়ে গৃহীত হয়। বাংলাদেশ সচিবালয় কয়েকটি মন্ত্রণালয় নিয়ে গঠিত। প্রতিটি মন্ত্রণালয় এক একজন মন্ত্রীর অধীনে ন্যস্ত। মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক প্রধান হলেন সচিব। সচিবের কাজে সাহায্য করার জন্য অতিরিক্ত সচিব থাকেন। মন্ত্রণালয়ের এক একটি অনুবিভাগের জন্য একজন যুগ্ম সচিব, একাধিক শাখার দায়িত্বে একজন উপ-সচিব এবং প্রতি শাখার দায়িত্বে একজন করে সহকারী সচিব থাকেন। সচিবালয়ের প্রশাসনিক কাঠামো হচ্ছে– মন্ত্রী → সচিব → অতিরিক্ত সচিব → যুগ্মসচিব → উপসচিব → সহকারী সচিব → সেকশন অফিসার।

প্রশ্ন-১০ বাংলাদেশে বর্তমানে কয় স্তরবিশিষ্ট স্থানীয় সরকার রয়েছে?

উত্তর : সাধারণত স্থানীয়ভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি সংস্থা, যা স্থানীয় কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য গঠন করা হয়, তাকে স্থানীয় সরকার বলে। ২০০৮ সালে সরকার গ্রামাঞ্চলে তিন স্তরবিশিষ্ট এবং শহরাঞ্চলে দুই স্তরবিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। গ্রামাঞ্চলে স্তরগুলো হলো : ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদ। অন্যদিকে শহরাঞ্চলে স্তরগুলো হলো : পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশন। স্থানীয় সরকার গণতন্ত্রের সূতিকাগার। আইনের শাসন ও ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের জন্য স্থানীয় সরকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন-১১ উপজেলা পদ্ধতি সম্পর্কে কি জানেন?

উত্তর : ৭ নভেম্বর ১৯৮২ থেকে কার্যকর স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা পুনর্গঠন) অধ্যাদেশ ১৯৮২ বলে প্রথমে উন্নীত থানা পরিষদ গঠন করা হয় এবং থানা পর্যায়ে বিকেন্দ্রীভূত প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। পরবর্তীতে উন্নীত থানা পরিষদকে উপজেলা পরিষদে রূপান্তরিত করা হয়। থানা পর্যায়ে সমস্ত কার্যাবলীকে মূলত (ক) সংরক্ষিত ও (খ) হস্তান্তরিত দুই বিষয়ে ভাগ করা হয়। দশটি বিষয়কে হস্তান্তরিত বিষয় হিসেবে এবং তেরটি দায়িত্ব সংরক্ষিত রাখা হয়। একটি থানায় বসবাসকারী প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান নির্বাচিত করার বিধান করা হয়। উপজেলার আওতাধীন ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার চেয়ারম্যানগণ উপজেলা পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে থাকতেন। উপজেলা পর্যায়ে প্রতিটি বিভাগের কার্যক্রমকে সম্প্রসারিত করে প্রায় ২০ জন প্রথম শ্রেণীর সরকারি কর্মকর্তাকে উপজেলায় পোস্টিং দেয়া হয়। তিনজন মহিলা সদস্য উপজেলার অধিবাসীদের মধ্য থেকে সদস্য হতেন। একজন ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তাকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়, যিনি উপজেলা পরিষদের সকল কার্যক্রম সম্পাদন করতেন। কর ইত্যাদি আরোপ করাসহ ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্পাদনের সার্বিক দায়িত্বে উপজেলা পরিষদে অর্পণ করা হয়। ১৯৯১ সালে বিএনপি সরকার ক্ষমতায় এলে ১৯৯২ সালের ২৯ জানুয়ারি আইন পাসের মাধ্যমে উপজেলা ব্যবস্থা রহিতকরণ করা হয়। ১৯৯৮ সালের ৩ ডিসেম্বর আওয়ামী লীগ সরকার সংসদে আইন পাস করে উপজেলা ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করে। ১৯৯৯ সালের ১ ফেব্রুয়ারি গেজেটের মাধ্যমে উপজেলা আইন কার্যকর হয়। ২০০০ সালের ২০ এপ্রিল সরকার সকল প্রশাসনিক থানাকে উপজেলা হিসেবে অভিহিত করার নির্দেশ জারি করে। ২০০৮ সালের ৩০ জুন রাষ্ট্রপতি উপজেলা পরিষদে ২ জন ভাইস চেয়ারম্যান (১ জন মহিলা) সৃষ্টি করে স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ) অধ্যাদেশ ২০০৮ জারি করেন। এই অধ্যাদেশের আলোকেই অনুষ্ঠিত হয় ২০০৯ ও ২০১৪ সালের চতুর্থ উপজেলা পরিষদ নির্বাচন।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

প্রশ্ন-১২ **স্থানীয় সরকারে নারীর অংশগ্রহণ নারীর ক্ষমতায়নে কতটুকু সহায়ক?**

উত্তর : বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। নারীরা এখন আর শুধু অন্তঃপুরবাসী নয়, বরং পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও সমাজের উন্নতি সাধনে কাজ করছে। অথচ বাংলাদেশের নারীসমাজ যুগ যুগ ধরে শোষিত ও অবহেলিত হয়ে আসছে। পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থায় ধর্মীয় গোঁড়ামি, সামাজিক কুসংস্কার, নিপীড়ন ও বৈষম্যের বেড়াজালে নারীদের সর্বদা রাখা হয়েছে অবদমিত। তাদের মেধা ও শ্রমশক্তিকে সমাজ ও দেশ গঠনে সম্পৃক্ত করা হয়নি। নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে গ্রহণ করা হয়নি কোনো বাস্তব পদক্ষেপ। অথচ মানুষের মৌলিক প্রয়োজনগুলো পূরণ করতেও পুরুষের পাশাপাশি সহায়তা করে নারী। এটি কোনো একমুখী প্রক্রিয়া নয় বরং দ্বিপাক্ষিক প্রক্রিয়া। নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন বলতে বোঝায় ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যক্তির অধিকার এবং রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সর্বজনীনতা সংরক্ষণ করে আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে নারীর স্বাধীন ও সার্বভৌম সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা নিশ্চিত করা। দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নারীর সার্বিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা প্রয়োজন। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় বাংলাদেশ সরকার নারীদের জন্য বিশেষ আসনের ব্যবস্থা করেছে। যেমন– ইউনিয়ন পরিষদ ও সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ডে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ। পৌরসভা নির্বাচনেও সে রকম ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এতে একদিকে যেমন নারীদের দাবি ও সমর্থনের সুযোগ প্রদান করা হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি তাদের ক্ষমতায়নেও বিশেষ ভূমিকা রাখা হয়েছে। এতে নারীরা প্রশাসনে তাদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে বিশেষ সুযোগ পাচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে নারীর সচেতনতা এবং ক্ষমতায়নে এটি ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে, এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

প্রশ্ন-১৩ **প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ বলতে কি বোঝেন?** *[২৭তম বিসিএস]*

উত্তর : সাধারণভাবে বলা যায়, কোনো প্রশাসনিক সংস্থার দায়িত্ব ও কাজ যখন কোনো কেন্দ্র বা কেন্দ্রীয় সংস্থায় নিয়োজিত না রেখে অধস্তন সংস্থাসমূহের বা কেন্দ্র থেকে প্রদেশ অথবা স্থানীয় ও আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয় তখন সেখানে বিকেন্দ্রীকরণের নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে ধরা হয়। তবে বিভিন্ন লেখক এর সংজ্ঞা দিয়েছেন বিভিন্নভাবে। ডুয়াইট ওয়ালডো (Dwight Waldo) বলেন, Decentralization denotes a tendency where administration and responsibility are delegated from the central authority to regional and local units to suit the particular local conditions. (বিকেন্দ্রীকরণ বলতে স্থানীয় কোনো বিশেষ অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে কেন্দ্রীয় প্রশাসন ও দায়িত্বকে আঞ্চলিক ও স্থানীয় সংস্থার নিকট হস্তান্তরকে বোঝায়।) এল ডি হোয়াইটের ভাষায়, The process of transfer of administrative authority from a lower to a higher level of government is called centralization, the converse decentralization.

Prof. Allen-এর মতে 'কেন্দ্র থেকে প্রয়োগ করা সম্ভব এমন ক্ষমতা ব্যতীত অপর ক্ষমতা সর্বনিম্ন স্তরে ভারার্পণের নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে বিকেন্দ্রীকরণ বলা হয়।' সুতরাং বিকেন্দ্রীকরণ এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে ওপর থেকে ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তব্যকে একটি সুনির্দিষ্ট চ্যানেলের মাধ্যমে নিম্নস্তর পর্যায়ে ক্রমে হস্তান্তর করা হয়। এ প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত প্রতিটি স্তর একে অপরের সাথে কোনো না কোনোভাবে জড়িত থাকে এবং সার্বিক প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় এদের সকলের কাজের সমন্বয় জরুরি বলে বিবেচিত হয়।

প্রশ্ন-১৪ **বাংলাদেশের জনপ্রশাসন সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।**

উত্তর : বাংলাদেশে বর্তমানে Unitary form of government' প্রচলিত। যেখানে রাষ্ট্রপতি হচ্ছেন রাষ্ট্রপ্রধান এবং প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন সরকারপ্রধান। মন্ত্রিপরিষদ প্রধানমন্ত্রীকে তার কাজে সহযোগিতা করে। সচিবগণ মন্ত্রণালয় বা একটি বিভাগের প্রশাসনিক প্রধান (Administrative head) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে রাষ্ট্রপতির সচিবালয় ও প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়সহ ৩৯টি মন্ত্রণালয় রয়েছে। প্রশাসনিক সুবিধার্থে গোটা দেশকে ৭টি বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। একজন বিভাগীয় কমিশনার বিভাগের প্রশাসনিক প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন। এ সাতটি বিভাগের অধীন মোট ৬৪টি জেলা আছে। একজন সহকারী কমিশনার (Deputy Commissioner) জেলার প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে বাংলাদেশে ৬৪টি জেলার অধীন ৪৮৯টি উপজেলা রয়েছে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপজেলা প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

প্রশ্ন-১৫ **স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার কি?**

উত্তর : ঔপনিবেশিক শাসনামলে Local self govt. বা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের ধারণার জন্ম। ঔপনিবেশিক আমলে উপমহাদেশের কেন্দ্রে বা আঞ্চলিক পর্যায়ে কোনো স্বায়ত্তশাসিত সরকার ছিল না। পরবর্তী পর্যায়ে ব্রিটিশ সরকার স্থানীয় বিষয়সমূহে স্থানীয় পর্যায়ের লোকদের সংশ্লিষ্ট করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বর্তমানে ঔপনিবেশিক শাসন নেই বিধায় Local self govt.-এর গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে। তবে ব্যবহারিক দিক দিয়ে এ দুয়ের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। স্থানীয় সরকার (Local govt.) হচ্ছে রাষ্ট্রের ক্ষুদ্রতম পরিসরে প্রতিষ্ঠিত সরকার, যেখানে স্বায়ত্তশাসন নেই। যেমন– বর্তমানে জেলা পরিষদ এবং থানা/উপজেলা পরিষদ। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার (Local self govt.) বলতে বোঝায় এমন ধরনের সরকার ব্যবস্থা, যা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এলাকায় প্রতিষ্ঠিত এবং আইনের দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত। আমাদের দেশে ইউনিয়ন পরিষদ এবং পৌরসভাসমূহ এর অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্ন-১৬ **পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ সম্পর্কে কি জানেন?**

উত্তর : বাংলাদেশের তিনটি পার্বত্য জেলা নিয়ে পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত। জেলা তিনটি হলো রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি। এ জেলা তিনটির সামগ্রিক উন্নয়নকল্পে 'পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ' বিল জাতীয় সংসদের মাধ্যমে পাস করে আইনে পরিণত করা হয়। ১৯৮৯ সালে ৬ মার্চ এ বিলটি রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের মাধ্যমে আইনে পরিণত হয়। এ আইনের লক্ষ্য হলো : ১. উপজাতি এবং পার্বত্য অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা। ২. প্রশাসন ও সংস্কৃতির মধ্যে উপজাতীয়দের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখা। ৩. উন্নয়নমূলক কাজে উপজাতীয়দের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

আঞ্চলিক পরিষদের প্রধান কার্যাবলী : ১. আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন। ২. বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সমন্বয় ও বাস্তবায়ন। ৩. স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতির অগ্রগতি ও উন্নয়ন সাধন। ৪. কৃষি, বন, মৎস্য ও সমাজকল্যাণ। ৫. ধর্ম ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড সংগঠন ও সংরক্ষণ করা।

পরিষদের ক্ষমতা :

১. **পুলিশ :** সহকারী সাব-ইনসপেক্টর অব পুলিশ এবং তার অধস্তন সকল পুলিশ কর্মকর্তা পরিষদ নিয়োগ করবে এবং দায়িত্বের ব্যাপারে পরিষদের কাছে দায়ী থাকবে।

২. **ভূমি হস্তান্তর :** পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোনো জায়গাজমি উক্ত জেলার বাসিন্দা নন এরকম কোনো ব্যক্তির কাছে হস্তান্তর করা যাবে না।

৩. **বিরোধের অবসান :** সামাজিক-সাংস্কৃতিক কোনো সমস্যা দেখা দিলে স্থানীয় হেডম্যান তাদের রীতিনীতি অনুযায়ী বিরোধের নিষ্পত্তি করবেন।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

গ. বিচার বিভাগ (Judiciary)

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১. *সংবিধানের অনুচ্ছেদ উল্লেখপূর্বক সুপ্রিম কোর্টের প্রতিষ্ঠা, এর গঠন, কার্যপ্রণালী ও এখতিয়ার আলোচনা করুন। [২৯তম বিসিএস]*

০২. *বিচার বিভাগ ও নির্বাহী বিভাগ কি? এ বিভাগসমূহের দায়িত্ব আলোচনা করুন। বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা রক্ষার শর্তসমূহ কি কি? [২৮তম বিসিএস]*

অথবা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে কি বুঝায়? বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা রক্ষার শর্ত কি? [২৭তম বিসিএস]

অথবা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে কি বোঝায়? বিচার বিভাগের স্বাধীনতা কিভাবে রক্ষা করা যায়?

০৩. *সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকারের বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ করা দরকার বলে কি আপনি মনে করেন? বিশ্লেষণ করুন। [২৫তম বিসিএস]*

অথবা, নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথককরণ সম্পর্কে আপনার মতামত লিখুন। আপনি কি মনে করেন নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথককরণ প্রয়োজন? [১৮তম বিসিএস]

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

০৪. *গ্রাম আদালত কি? গ্রাম এলাকায় বিরোধ ও বিবাদ নিষ্পত্তিতে গ্রাম্য আদালতের ভূমিকা বর্ণনা করুন।*

অথবা, গ্রাম আদালতের সংজ্ঞা দিন। গ্রাম এলাকায় বিরোধ ও বিবাদ নিষ্পত্তিতে গ্রাম আদালতের বিচার প্রক্রিয়া আলোচনা করুন।

০৫. *বাংলাদেশে বিচারপতিদের নিয়োগ প্রক্রিয়া, যোগ্যতা, মেয়াদকাল ও অপসারণ পদ্ধতি বর্ণনা করুন।*

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

০১. *সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিল কি?*
০২. *বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের গঠন কিরূপ?*
০৩. *হেবিয়াস কার্পাস কি?*
০৪. *বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের সর্বোচ্চ শাস্তি কি?*
০৫. *অ্যামিকাস কিউরি বলতে কি বোঝেন?*
০৬. *রাষ্ট্রপতির রেফারেন্স কাকে বলে?*
০৭. *মহামান্য রাষ্ট্রপতি কাদেরকে শপথবাক্য পাঠ করান? [৩৩তম বিসিএস]*
০৮. *বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (ADR) কি?*
০৯. *গ্রাম আদালত কি?*

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১। সংবিধানের অনুচ্ছেদ উল্লেখপূর্বক সুপ্রিম কোর্টের প্রতিষ্ঠা, এর গঠন, কার্যপ্রণালী ও এখতিয়ার আলোচনা করুন। *[২৯তম বিসিএস]*

অথবা, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলী আলোচনা করুন।

উত্তর : বাংলাদেশে বিচার বিভাগের শীর্ষে রয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, নেপাল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশের সর্বোচ্চ বিচার প্রতিষ্ঠান হলো সেসব দেশের সুপ্রিম কোর্ট। সুপ্রিম কোর্ট মূলত বিচার বিভাগের অধীন সর্বোচ্চ আদালত। একটি সুপ্রিম কোর্ট, অধস্তন আদালতসমূহ এবং

প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল নিয়ে বাংলাদেশের বিচার বিভাগ গঠিত। সুপ্রিম কোর্টই মূলত সর্বোচ্চ আদালত হিসেবে সংবিধানের রক্ষক ও অভিভাবক হিসেবে কাজ করে আসছে।

গঠন : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ষষ্ঠ ভাগের প্রথম পরিচ্ছেদের ৯৪ ধারায় সুপ্রিম কোর্টের গঠন সম্পর্কে স্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে। এতে বলা হয়েছে, 'বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট' নামে বাংলাদেশের একটি সর্বোচ্চ আদালত থাকবে এবং আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ নিয়ে তা গঠিত হবে।

প্রধান বিচারপতি (যিনি 'বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি' নামে অভিহিত হবেন) এবং প্রত্যেক বিভাগে আসনগ্রহণের জন্য রাষ্ট্রপতি যেরূপ সংখ্যক বিচারক নিয়োগের প্রয়োজনবোধ করবেন, সেইরূপ সংখ্যক অন্যান্য বিচারক নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট গঠিত হবে [অনুঃ ৯৪(২)]।

বিচারক পদে যোগ্যতা : সংবিধানের ৯৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্টের বিচারক পদে নিয়োগ পেতে হলে নিম্নলিখিত যোগ্যতা থাকতে হবে :

ক. সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট হিসেবে অন্যূন দশ বছর কাজ করার অভিজ্ঞতা।

খ. বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে অন্যূন দশ বছর কোনো বিচার বিভাগীয় পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন কিংবা অন্যূন দশ বছর অ্যাডভোকেট ছিলেন এবং অন্যূন তিন বছর জেলা বিচারকের ক্ষমতা নির্বাহ করেছেন।

কর্মের মেয়াদ ও শর্তাবলী : সুপ্রিম কোর্টের বিচারকগণ সাতষট্টি বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকবেন (চতুর্দশ সংশোধনী)। একজন বিচারপতি যে কোনো সময় স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করতে পারেন। শারীরিক বা মানসিক অসমর্থ, গুরুতর অসদাচরণ ইত্যাদি বিষয়ে তিনসদস্য বিশিষ্ট সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের সুপারিশক্রমে কোনো বিচারককে অপসারণ করা যাবে। বিচারক পদে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো লাভজনক পদে বহাল হতে পারবেন না। অবসরগ্রহণ শেষে কোনো আদালতে ওকালতি করতে পারবে না বা প্রজাতন্ত্রের কোনো কর্মে নিয়োগযোগ্য হবেন না (অনুঃ ৯৯)।

হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতা ও কার্যাবলী : ধারা-১০১ অনুযায়ী হাইকোর্ট বিভাগের কার্যাবলীর উৎস দুটি। যথা : (ক) সাধারণ এখতিয়ার ও (খ) সাংবিধানিক এখতিয়ার।

ক. **সাধারণ এখতিয়ার :** দেশের সাধারণ আইনসমূহ হাইকোর্ট বিভাগকে যে এখতিয়ার দিয়ে থাকে তাকে সাধারণ এখতিয়ার বলে। সাধারণ এখতিয়ার বিভিন্ন রকমের হতে পারে। এগুলো হলো :

১. **আদি এখতিয়ার :** যা প্রাথমিকভাবে গ্রহণ করা যায়। যেমন কোম্পানি আইন ১৯১৩, এডমিরালটি আইন ১৮৬১, ব্যাংকিং কোম্পানিজ আইন ১৯৬২।

২. **আপিল এখতিয়ার :** ফৌজদারি কার্যবিধি ও দেওয়ানি কার্যবিধি হাইকোর্ট বিভাগকে আপিল এখতিয়ার দিয়েছে।

৩. **রিভিশনাল এখতিয়ার :** এর বলে সুপ্রিম কোর্ট অধস্তন আদালতের রায় পরীক্ষা করতে পারে।

৪. **রেফারেন্স এখতিয়ার :** অধস্তন আদালত কর্তৃক পাঠানো কোনো মামলার আইনগত প্রশ্নে হাইকোর্ট বিভাগ যে পরীক্ষা করতে পারে তা রেফারেন্স এখতিয়ার।

খ. **সাংবিধানিক এখতিয়ার :** সংবিধানে তিন ধরনের সাংবিধানিক এখতিয়ার রয়েছে। এগুলো হলো : ১. রিট জারির এখতিয়ার; ২. তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণমূলক এখতিয়ার; ৩. মামলা হস্তান্তরের ক্ষমতা।

১. **রিট জারির এখতিয়ার :** ধারা ১০২ যে এখতিয়ারবলে হাইকোর্ট বিভাগ মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হলে তা বলবৎ করতে পারে এবং বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনাকে কার্যকর করতে পারে, তাকে হাইকোর্ট বিভাগের রিট এখতিয়ার বলা হয়।

২. **তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণমূলক এখতিয়ার (ধারা ১০৯) :** হাইকোর্ট বিভাগ তার অধস্তন সকল আদালত ও ট্রাইব্যুনালের ওপর তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর এটি করা যাবে :

ক. অধস্তন আদালত বা ট্রাইব্যুনালকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল করার নির্দেশ দিতে পারে।

খ. অধস্তন আদালত ও ট্রাইব্যুনালের কর্মচারীবৃন্দ কিভাবে খাতাপত্র এবং হিসাবপত্র রক্ষা করবে সে বিষয়ে নির্দেশ দান করতে পারে।

গ. এরা আইন অনুযায়ী কাজ করছে কিনা, তাদের দ্বারা আইন সীমালঙ্ঘিত হচ্ছে কিনা, সীমা অনুযায়ী তারা কাজ করছে কিনা তা তদারকি করতে পারবে।

ঘ. অধস্তন আদালত বা ট্রাইব্যুনালের প্রশাসনিক বা বিচার বিভাগীয় যে কোনো আদেশ হাইকোর্ট বিভাগ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে পারবে।

৩. **মামলা হস্তান্তরের ক্ষমতা :** হাইকোর্ট বিভাগ কতিপয় শর্তসাপেক্ষে কোনো অধস্তন আদালত থেকে মামলা হস্তান্তর করে নিজের কাছে আনতে পারে (অনুঃ ১১০)।

হাইকোর্ট বিভাগের রিট এখতিয়ার : হাইকোর্ট বিভাগের একটি ক্ষেত্রে আদি এখতিয়ার রয়েছে। সেটি হলো রিট জারির এখতিয়ার। রিট শব্দের অর্থ হলো আদালত বা যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঘোষিত বিধান বা আদেশ। বাংলাদেশ সাংবিধানে সরাসরি কোনো রিটের কথা উল্লেখ নেই। তবে ১০২ অনুচ্ছেদ বিশ্লেষণ করলে নিম্নলিখিত রিটগুলো অনুমান করা যায় :

১. বন্দি প্রদর্শন (Write of Habeas Corpus);
২. পরমাদেশ বা হুকুমজারি রিট (Write of Mandamus);
৩. প্রতিষেধক বা নিষেধাজ্ঞামূলক রিট (Write of Prohibition);
৪. উৎপেষণ রিট (Write of Certiorari);
৫. কারণ দর্শাও রিট (Write of Quo Warrento)।

সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের এখতিয়ার : আপিল বিভাগের কোনো আদি (original) এখতিয়ার নেই। অর্থাৎ এখানে প্রথমে কোনো মামলা দায়ের করা যাবে না। হাইকোর্ট বিভাগের মতো আপিল বিভাগের এখতিয়ারের উৎস দুটি। যথা : ১. সংবিধানিক এখতিয়ার ও ২. উপদেষ্টামূলক এখতিয়ার।

সাংবিধানিক এখতিয়ার : (ক) আপিল এখতিয়ার, (খ) পরোয়ানা জারি ও নির্বাহের এখতিয়ার, (গ) পুনর্বিবেচনার অধিকার/এখতিয়ার ও (ঘ) উপদেষ্টামূলক এখতিয়ার।

ক. **আপিল এখতিয়ার :** আপিল এখতিয়ার শুধু হাইকোর্ট বিভাগের রায়, ডিক্রি, আদেশ ও দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে প্রযোজ্য। এটা হলো সাংবিধানিক আপিল এখতিয়ার। সাংবিধানিক আপিল এখতিয়ার দুই ভাগে বিভক্ত :

১. যে ক্ষেত্রে অধিকারবলে আপিল করা যাবে।

২. যে ক্ষেত্রে আপিল বিভাগের অনুমতি সাপেক্ষে আপিল করা যাবে।

হাইকোর্ট বিভাগের রায়, ডিক্রি, আদেশ ও দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগে তিনটি ক্ষেত্রে আপিল করা যাবে। যেমন—

(i) যে ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগ কোনো মামলায় সার্টিফিকেট প্রদান করে যে, সংবিধান ব্যাখ্যার ব্যাপারে আইনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত আছে;

(ii) যে ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগ কোনো ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছে এবং

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

(iii) যে ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি হাইকোর্ট বিভাগের অবমাননা করেছে এবং তার জন্য হাইকোর্ট বিভাগ উক্ত ব্যক্তিকে কোনো দণ্ডদান করেছে।

১০৩ (২) ধারায় বলা হয়েছে, সংসদ আইন দ্বারা এদের ক্ষেত্র আরো বাড়াতে পারে।

উপরিউক্ত তিনটি ক্ষেত্র ব্যতীত হাইকোর্ট বিভাগের অন্যান্য সকল রায়, ডিক্রি, আদেশ বা দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে কেবল তখনই আপিল করা যাবে যখন আপিল বিভাগ আপিলের অনুমতি দেবে।

খ. **পরোয়ানা জারি ও নির্বাহ-এর এখতিয়ার (অনুঃ ১০৪) :** আপিল বিভাগের বিচারাধীন যে কোনো বিষয়ের সম্পূর্ণ ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য উক্ত বিভাগ যে কোনো আদেশ-নির্দেশ জারি করতে পারে। এটি আপিল বিভাগের একটি স্বেচ্ছাধীন ও অসাধারণ ক্ষমতা। এ ক্ষমতা আপিল বিভাগ Suo moto করতে পারে। অথবা কারো আবেদনের প্রেক্ষিতে করতে পারে।

গ. **পুনর্বিবেচনার অধিকার (অনুঃ ১০৫) :** নিজের ঘোষিত রায়, আদেশ পুনর্বিবেচনা করতে পারে। তবে শর্ত ২টি— ১. সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোনো আইনের বিধানসাপেক্ষে ও ২. আপিল বিভাগ কর্তৃক প্রণীত কোনো বিধান সাপেক্ষে।

ঘ. **উপদেষ্টামূলক এখতিয়ার (অনু : ১০৬) :** রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপিল বিভাগের পরামর্শ চাইলে। তবে আপিল বিভাগ মতামত দিতে বাধ্য নন, মতামত দিতে অস্বীকার করতে পারেন আবার মতামত দিতেও পারেন এবং প্রদত্ত উপদেশ প্রেসিডেন্ট গ্রহণ করতে বাধ্য নন। এটি বিচার বিভাগীয় রায় নয়।

উপসংহার : বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট বাংলাদেশে বিচারব্যবস্থার সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান। অধস্তন আদালতগুলো বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে শাসন বিভাগের হস্তক্ষেপমুক্ত নয়। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট অত্যন্ত সুনামের সাথে স্বাধীনভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সংবিধানের ৮ম সংশোধনীর বিরুদ্ধে রায়সহ বিভিন্ন রায়ে সুপ্রিম কোর্টের উৎকর্ষ প্রমাণিত হয়। বস্তুত অভিজ্ঞ ও বিজ্ঞ বিচারক এবং অত্যন্ত সচেতন আইনবিদ থাকার কারণে সুপ্রিম কোর্ট স্বাধীনভাবে কাজ করতে সক্ষম হয়েছে।

০২। বিচার বিভাগ ও নির্বাহী বিভাগ কি? এ বিভাগসমূহের দায়িত্ব আলোচনা করুন। বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা রক্ষার শর্তসমূহ কি কি? *[২৮তম বিসিএস]*

***অথবা,* বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে কি বুঝায়? বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা রক্ষার শর্ত কি?** *[২৭তম বিসিএস]*

***অথবা,* বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে কি বোঝায়? বিচার বিভাগের স্বাধীনতা কিভাবে রক্ষা করা যায়?**

উত্তর : বিচার বিভাগ সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে অন্যতম। আইনসভা কর্তৃক প্রণীত এবং শাসন বিভাগ কর্তৃক কার্যকরী আইনের ব্যাখ্যা দেয়া ও দেশের প্রচলিত আইনের আলোকে বিচারকার্য সম্পাদন করে নাগরিক স্বাধীনতা রক্ষা করাই এর দায়িত্ব। এ বিভাগ একাধারে সংবিধানের ব্যাখ্যাদাতা ও অভিভাবক। রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তি ও ন্যায়নীতিকে সংরক্ষণ করার জন্য বিচার বিভাগের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাহী বিভাগ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। সরকারের অপরাপর বিভাগের মধ্যে সঙ্গত কারণে নির্বাহী বিভাগ রাষ্ট্রপরিচালনায় সরাসরি অংশ নিয়ে থাকে। নির্বাহী বিভাগের উৎকর্ষের ওপর একটি সরকারের স্থায়িত্ব, সুনাম এবং সমৃদ্ধি নির্ভর করে। যদিও সংবিধান নির্বাহী বিভাগের এখতিয়ার নির্ধারণ করে থাকে, তথাপি বর্তমান সমস্যাসংকুল পৃথিবীতে নির্বাহী বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে চলেছে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

নির্বাহী বিভাগ কাকে বলে : নির্বাহী বিভাগ হলো সরকারের সেই শাখা যা আইন বিভাগ কর্তৃক প্রণীত আইন প্রয়োগ করে শাসনকার্য নির্বাহ করে থাকে। মন্ত্রিপরিষদ নির্বাহী বিভাগের অন্যতম সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ। সংসদীয় পদ্ধতিতে আইন বিভাগ থেকে প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীগণ নিয়োগ পেয়ে থাকেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগের সদস্যরা কেউ আইনসভার সদস্য নন। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে মন্ত্রিপরিষদ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের আমলাবর্গ এবং গ্রামের চৌকিদার পর্যন্ত নির্বাহী বিভাগের সদস্য। আমাদের দেশে নির্বাহী বিভাগের সদস্যরা আইনপরিষদের নিকট দায়বদ্ধ।

নির্বাহী বিভাগের ক্ষমতা ও কার্যাবলী : সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে নির্বাহী বিভাগ নিম্নোক্ত কার্যাবলী সম্পাদন করে :

১. **আইনসংক্রান্ত কার্য :** বর্তমানকালের রাষ্ট্রব্যবস্থায় আইন প্রণয়নের ব্যাপারে নির্বাহী বিভাগকে কতগুলো আইনসংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করতে হয়। বর্তমানে অধিকাংশ দেশে রাষ্ট্রপ্রধান আইনসভার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে গণ্য হন। তিনিই আইনসভার অধিবেশন আহ্বান করেন, আবার প্রয়োজনবোধে আইনসভার অধিবেশন স্থগিত রাখার নির্দেশ দেন। তিনি ইচ্ছা করলে আইনসভা ভেঙ্গে দিতেও পারেন। তার সম্মতি ছাড়া কোনো বিল আইনে পরিণত হয় না।

২. **বিচারসংক্রান্ত কার্য :** নির্বাহী বিভাগের কয়েকটি বিচারসংক্রান্ত ক্ষমতাও রয়েছে। অনেক রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপ্রধান উচ্চ আদালতের বিচারপতিদের নিযুক্ত করেন। তিনি দণ্ডিত অপরাধীর দণ্ড হ্রাস করতে, স্থগিত রাখতে, মওকুফ করতে পারেন। আবার কর নির্ধারণ, নিয়োগ, পদোন্নতি, পদচ্যুতি প্রভৃতি বিষয়ে আপত্তির নিষ্পত্তি নির্বাহী বিভাগই করে থাকে।

৩. **অভ্যন্তরীণ শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা :** নির্বাহী বিভাগের প্রধান কাজ হলো রাষ্ট্রের মধ্যে আইন প্রয়োগ করা, নিয়মশৃঙ্খলা বজায় রাখা, স্থায়ী কর্মচারীদের নিযুক্ত করা প্রভৃতি। ব্যাপক অর্থে নির্বাহী বিভাগকে অভ্যন্তরীণ শাসনকার্য পরিচালনা করতে হয়। এই কার্য সম্পাদনের দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে নির্বাহী বিভাগের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ওপর।

৪. **প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত কার্য :** রাষ্ট্রের অখণ্ডতা রক্ষা করা, বহিরাক্রমণ প্রতিহত করা এবং প্রয়োজন দেখা দিলে যুদ্ধ ঘোষণা করা নির্বাহী বিভাগের গুরুদায়িত্ব হিসেবে বিবেচিত হয়। নির্বাহী বিভাগ এই উদ্দেশ্যে স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমান বাহিনী গঠন, অন্যান্য সামরিক কর্মচারী নিয়োগ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সামরিক প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

৫. **পররাষ্ট্র সংক্রান্ত কার্য :** পররাষ্ট্র সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য নির্বাহী বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হিসেবে গণ্য হয়। পররাষ্ট্রবিষয়ক কার্য বলতে অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন, রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদন, বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ, অন্য দেশে রাষ্ট্রদূত প্রেরণ এবং তাদের রাষ্ট্রদূতকে নিজ রাষ্ট্রে গ্রহণ ইত্যাদি বোঝায়। রাষ্ট্রের প্রতিভূ হিসেবে রাষ্ট্রপ্রধানই এই দায়িত্ব পালন করেন। নির্বাহী বিভাগের পররাষ্ট্র দপ্তর এ সমস্ত কার্য সম্পাদন করে থাকে।

৬. **অর্থসংক্রান্ত কার্য :** জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থায় সরকারের বিবিধ কার্যসম্পাদনের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। সাধারণত কর ধার্য ও সেবামূলক কার্যাদি সম্পাদন প্রভৃতি উপায়ে এই বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত হয়। নির্বাহী বিভাগই সরকারি অর্থ সংগ্রহ এবং ব্যয় নির্বাহ করে। তবে কর ধার্য ও ব্যয় বরাদ্দের ব্যাপারে আইনসভার অনুমোদন আবশ্যক। সরকারের অর্থসংক্রান্ত কার্য নির্বাহী বিভাগের অর্থ দপ্তরে মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ে থাকে।

৭. **নীতি নির্ধারণ সংক্রান্ত কার্য :** স্বরাষ্ট্র এবং পররাষ্ট্র সংক্রান্ত কাজকর্ম পরিচালনার জন্য সরকারের সুনির্দিষ্ট নীতি থাকতে হয়। সরকারের নির্বাহী বিভাগ এই নীতি নির্ধারণ করে।

৮. **জনকল্যাণমূলক কার্য :** সাম্প্রতিক প্রতিটি রাষ্ট্র জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধনে আত্মনিয়োগ করেছে। এর ফলে স্বাভাবিকভাবে নির্বাহী বিভাগের কার্যক্ষেত্রের পরিধি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন নির্বাহী বিভাগকে জনশিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, পরিবহন, শিল্প-বাণিজ্য, ডাক ও তার এবং অন্যান্য সেবামূলক বহুবিধ কার্যাদি সম্পাদন করতে হয়।

৯. **জনমত সৃষ্টি :** নির্বাহী বিভাগ তাদের কর্মকাণ্ডের ওপর জনসমর্থন আদায় করার চেষ্টা করেন। জনমত তাদের অনুকূলে থাকলে পরবর্তী নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়া সম্ভব হয়। ফলে নির্বাহী বিভাগের অন্যতম কাজ হলো তাদের কাজের স্বপক্ষে জনমত সৃষ্টি করা।

১০. **সম্মেলনে নেতৃত্ব দেয়া :** রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকারপ্রধান নির্বাহী বিভাগের সদস্য। এরাই সম্মেলনে দেশের নেতৃত্ব দেন। এসব সম্মেলনে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

১১. **সামরিক কার্য :** বাংলাদেশ ও আমেরিকার সংবিধান অনুযায়ী এসব দেশের প্রেসিডেন্ট সশস্ত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়ক। ফলে সশস্ত্রবাহিনীর যাবতীয় কাজে যেমন– নিয়োগ, প্রমোশন, সামরিক হার্ডওয়্যার সরবরাহ, সামরিক নীতি প্রণয়ন, যুদ্ধ ঘোষণা ইত্যাদি কাজগুলো প্রেসিডেন্ট করে থাকেন।

১২. **আইন বিভাগের নেতৃত্ব দান :** সংসদীয় পদ্ধতিতে আইন বিভাগের সদস্য থেকে প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রী নিয়োগ করা হয়। এছাড়া বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভা পরোক্ষভাবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করে থাকে। প্রেসিডেন্ট সংসদে ভাষণ প্রদান, বাণী প্রেরণ এবং পাসকৃত আইনের অনুমোদন দিয়ে থাকেন। আর সংসদীয় পদ্ধতিতে প্রধানমন্ত্রী তার দলের পক্ষে সংসদে নেতৃত্ব দান করেন। বলা বাহুল্য, এরা সবাই নির্বাহী বিভাগের সদস্য।

১৩. **আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দেশের নেতৃত্ব প্রদান :** নির্বাহী বিভাগের সদস্যরা অন্য দেশে অনুষ্ঠিত সামাজিক, রাজনৈতিক ধর্মীয়, কৌশলগত ও সামরিক সম্মেলনে দেশের পক্ষে নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন। UN, OIC, NAM, NATO, APEC, G-8, GCC ইত্যাদি সম্মেলনে নির্বাহী বিভাগের সদস্যরাই সাধারণত যোগদান করে থাকেন।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা : বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ ও অন্যান্য শক্তির প্রভাব, হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে বিচার বিভাগ কর্তৃক নির্ভয়ে, নির্বিঘ্নে, স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে বিচারকার্য সম্পাদন করার স্বাধীনতাকেই বোঝায়। বিচারকগণ যখন তাদের কর্তব্য পালন করবেন তখন তারা সব ধরনের সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক শক্তির প্রভাব ও চাপ থেকে মুক্ত থাকবেন। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে এ কথাও বোঝায় যে, আদালতের সিদ্ধান্ত সঠিকভাবে কার্যকরী করতে বা মান্য করতে শাসন বিভাগ সর্বদাই বাধ্য থাকবেন। বস্তুত একটি স্বাধীন বিচার বিভাগ গণতান্ত্রিক সরকারের জন্য অপরিহার্য। বিচার বিভাগের স্বাধীনতাই নাগরিক স্বাধীনতার সর্বোত্তম গ্যারান্টি। লর্ড ব্রাইসের ভাষায়, কোনো দেশের সরকারের কৃতিত্ব পরিমাপ করার সর্বোত্তম মাপকাঠি হচ্ছে বিচার বিভাগের দক্ষতা ও যোগ্যতা। লাস্কি বলেন, 'কিভাবে রাষ্ট্র তার বিচারকার্য নিষ্পন্ন করছে তা জানতে পারলেই রাষ্ট্রের নৈতিক চরিত্রের স্বরূপ অনেকটা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যায়।' ব্যক্তি স্বাধীনতার সংরক্ষণ, আইন ভঙ্গকারীর শাস্তি প্রদান ও সংবিধানের শ্রেষ্ঠত্ব এবং পবিত্রতা রক্ষার জন্য বিচার বিভাগের কর্মদক্ষতা অপেক্ষা সরকারের উৎকৃষ্টতা পরিমাপের আর কোনো শ্রেষ্ঠ মানদণ্ড নেই।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার উপায় : বিচার বিভাগের সুনাম বা পারদর্শিতার ওপর একটি সরকারের অবস্থান ও স্থায়িত্ব অনেকটা নির্ভর করে। ফলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার প্রশ্নটি জরুরি হয়ে ওঠে। নিচে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার কতিপয় সুপারিশ উপস্থাপন করা হলো :

১. **বিচারকদের নিয়োগ :** বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও কর্মদক্ষতা বিচারকদের যোগ্যতার ওপর বহুলাংশে নির্ভর করে। তাই তারা কিভাবে নিয়োগ লাভ করেন, সেদিকে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। বিচারকদের নিয়োগের ক্ষেত্রে সাধারণত তিনটি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। যথা—আইনসভা কর্তৃক নির্বাচন, জনগণ কর্তৃক নির্বাচন এবং প্রধান নির্বাহী কর্তৃক নির্বাচন।

আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত বিচারকগণ আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন। তাছাড়া এ পদ্ধতিতে দলীয় লোকজন নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ থাকে। ফলে মেধা ও যোগ্যতাসম্পন্ন লোক নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ থাকে না। জনগণ কর্তৃক নির্বাচনের ক্ষেত্রেও জনভাবাবেগ দ্বারা তাড়িত হয়ে কিংবা প্রচারণায় বিভ্রান্ত হয়ে অযোগ্য লোক নির্বাচিত হতে পারে। এ অসুবিধা দূর করার জন্য বর্তমানে অধিকাংশ রাষ্ট্রেই প্রধান নির্বাহী কর্তৃক বিচারক নিয়োগের পদ্ধতি গৃহীত হয়েছে। তবে এতেও রাজনৈতিক প্রভাব থাকায় প্রধান নির্বাহী বিচারকমণ্ডলী এবং বিচারকদের সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটির সুপারিশক্রমে বিচারকদের নিয়োগ দান করেন। বর্তমানে এটিই সর্বপেক্ষা গ্রহণযোগ্য নিয়োগ পদ্ধতি।

২. **বিচারকদের কার্যকাল :** বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করার জন্য বিচারপতিদের কার্যকালের স্থায়িত্ব বিধান প্রয়োজন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী Alan Ball-এর মতে, 'বিচারপতিদের কার্যকালের নিরাপত্তা তাদের স্বাধীনতা সংরক্ষণের হাতিয়ার। কার্যকালের স্থায়িত্ব থাকলে বিচারকগণ নির্ভীক ও নিঃসংশয় চিত্তে সততার সাথে বিচারকার্য সম্পাদন করতে উৎসাহী ও তৎপর থাকবেন।

৩. **বিচারকদের পদোন্নতি :** বিচারকদের কার্যক্ষমতা নির্ভর করে তাদের কার্য সম্পাদনের ওপর। এ কর্ম সম্পাদনের ইচ্ছা আবার অনেকাংশে নির্ভর করে পদোন্নতির আশার ওপর। সাধারণত জ্যেষ্ঠত্ব নীতি অনুসারেই পদোন্নতি হওয়া বাঞ্ছনীয়। তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কর্মদক্ষতা ও মেধা পদোন্নতির ভিত্তি হতে পারে। সাম্প্রতিক বাংলাদেশে জনৈক বিচারপতি দীর্ঘদিন যাবৎ পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত হওয়ায় বিচারপতির আসন থেকে পদত্যাগ করেছেন, যা পদোন্নতি নিয়ে বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে সচেতন মহলকে হতাশ করেছে। কাজেই বিচারকদের পদোন্নতির বিষয়টি অতি যত্নের সাথে বিবেচনা করা উচিত।

৪. **অপসারণ পদ্ধতি :** বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিতকরণের স্বার্থে সংবিধান বর্ণিত অভিযোগ ব্যতীত শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ কিংবা জনগণের হাতে এককভাবে খেয়ালখুশি মতো বিচারকদের অপসারণ করার ক্ষমতা ছেড়ে দেয়া উচিত নয়।

৫. **উপযুক্ত বেতন-ভাতা :** বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বিচারকদের উচ্চ বেতন-ভাতার সুব্যবস্থা এবং অবসরজনিত ভাতার সুব্যবস্থা থাকা অপরিহার্য। এর ফলে বিচারকগণ সৎ ও নির্লোভ থাকবেন এবং ভবিষ্যতে সৎ ও মেধাবী আইনজ্ঞগণ বিচারক পদে প্রবেশ করতে আগ্রহী হবেন।

৬. **সামাজিক মর্যাদা :** বিচার বিভাগের স্বাধীনতার সাথে সামাজিক পদমর্যাদার বিষয়টি নির্ভর করে। তাই সামাজিকভাবে বিচারকদের অবস্থান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৭. **বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র্য ও প্রাধান্য :** বিচার বিভাগকে আইন ও শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখতে হবে। লাস্কির মতে, 'স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র্য অত্যাবশ্যক। তাছাড়া সাংবিধানিক উপায়ে বিচার বিভাগের প্রধান্যও প্রতিষ্ঠা করা উচিত।'

৮. **প্রশিক্ষণ ও গবেষণার সুযোগ :** বিচারকদের উচ্চতর প্রশিক্ষণ ও গবেষণার সুযোগ দিতে হবে। এতে একদিকে তারা যোগ্যতা ও দক্ষতার উৎকর্ষ সাধন করতে পারবেন, অন্যদিকে আর্থিকভাবেও লাভবান হবেন।

৯. **বিচারকদের শ্রেণীস্বার্থের উর্ধ্বে থাকতে হবে :** বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বিচারকদের শ্রেণীস্বার্থের উর্ধ্বে থাকতে হবে। এ প্রসঙ্গে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী লাস্কির অভিমত প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, 'বিচারকেরা সমাজের উচ্চ শ্রেণী থেকে আবির্ভূত হন। সেজন্য যখন শ্রমিকদের সঙ্গে ধনীদের সংঘর্ষ বাঁধে, তখন বিচারকদের সহানুভূতি নিজেদের শ্রেণীর ওপর থাকা বিচিত্র নয়।' কিন্তু এটি পরিহার করা উচিত।

১০. **বিচারকদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা :** বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য বিচারকদের পূর্ণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ নিরাপত্তার অভাবে অনেক সময় বিচারকগণ ন্যায্য রায় প্রদান করতে ব্যর্থ হন।

১১. **জনগণ ও রাজনীতিবিদদের আগ্রহ :** বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য জনগণ ও রাজনীতিবিদদের আগ্রহ থাকতে হবে। প্রয়োজনবোধে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণকে শাসনতান্ত্রিক উপায়ে চাপ প্রয়োগ ও আন্দোলন করতে হবে।

১২. **লিখিত সংবিধান :** সংবিধান হলো দেশের মৌলিক আইন, যা রাষ্ট্রের শাসনপ্রণালী নির্ধারণ করে। বিচারকেরা লিখিত সংবিধানের ধারা অনুযায়ী রায় দিলে জনগণের মধ্যে রায় সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি থাকবে না। তাই লিখিত সংবিধানও বিচার বিভাগের স্বাধীনতার সাথে সম্পৃক্ত।

১৩. **সুরক্ষিত আদালত ভবন :** সুরক্ষিত আদালত ভবন এবং নিরাপত্তার সাথে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার প্রসঙ্গটি জড়িত। তাই আদালত ভবন থাকবে সুপ্রশস্ত ও সুরক্ষিত, যেখানে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা বিরাজ করবে। ফলে বিচারকগণও তাদের কাজে স্বস্তি ভোগ করতে পারবেন।

১৪. **আইন ও সাংবিধানিক বিষয় :** বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য আইন ও সাংবিধানিক ব্যাপারে বিচারকদের কর্তৃত্ব থাকতে হবে।

১৫. **সুশিক্ষিত ও দক্ষ আইনজীবী :** আইনজীবীগণ বাদী-বিবাদীর পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন। তাই এসব আইনজীবী যদি আইন বিষয়ে সুশিক্ষিত ও দক্ষ হন, তবে বিচারকদের সাথে ভুল বোঝাবুঝির সুযোগ থাকে না। ফলে বিচারকগণ আদালত ভবনে নিজেদের মর্যাদাবান ও স্বাধীন মনে করবেন।

১৬. **ডব্লিও এফ উইলোবির অভিমত :** বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও কর্মদক্ষতা অর্জনের জন্য প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ডব্লিও এফ উইলোবি তিনটি প্রধান শর্তের কথা উল্লেখ করেছেন। যথা :

ক. বিচারের জন্য অপরাধীদের তাদের সম্মুখে আনয়ন করার অধিকার বিচারপতিদের থাকতে হবে।

খ. আদালতের যাবতীয় বিষয়াদির গুরুত্ব যাতে বিচারকগণ জনসাধারণকে উপলব্ধি করাতে সক্ষম হন, তার সুযোগ থাকতে হবে এবং

গ. বিচারপতিদের আদেশ ও রায়কে কার্যকর করার পর্যাপ্ত ক্ষমতা প্রদান করা আবশ্যক।

উপসংহার : উপর্যুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষা করা যেতে পারে, কিন্তু সাংবিধানিক কতগুলো যান্ত্রিক ব্যবস্থা অবলম্বন করলেই বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষা করা যাবে না। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নির্ভর করে বিচারপতিদের চারিত্রিক মনোবল, নিরপেক্ষতা ও দৃঢ় মনোভাবের ওপর। বস্তুত গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা সংরক্ষণ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতার প্রয়োজন অপরিসীম।

০৩। সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকারের বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে সম্পূর্ণ পৃথিকীকরণ করা দরকার বলে কি আপনি মনে করেন? বিশ্লেষণ করুন। *[২৫তম বিসিএস]*
অথবা, **নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথককরণ সম্পর্কে আপনার মতামত লিখুন। আপনি কি মনে করেন নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথককরণ প্রয়োজন?** *[১৮তম বিসিএস]*
অথবা, **স্বাধীন বিচার বিভাগের গুরুত্ব ও তাৎপর্য আলোচনা করুন।**

উত্তর : সরকারের তিনটি অঙ্গের মধ্যে বিচার বিভাগ জনগণের অধিকার সংরক্ষণ, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় অতীব গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত। তাই কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের সফলতার পূর্বশর্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয় বিচার বিভাগের স্বাধীনতা। কোনো দেশ গণতন্ত্র আর আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার যত আয়োজনই করুক না কেন একটি স্বাধীন বিচার বিভাগ ছাড়া এ সকল আয়োজন সবই নিরর্থক। আর বিচার বিভাগের স্বাধীনতার অন্যতম পূর্বশর্ত হলো শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথককরণ। শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক করতে হলে প্রথমেই নজর দিতে হবে বিচারপতিদের নিয়োগ ও বদলি সংক্রান্ত বিষয়ের উপর। নিশ্চিত করতে হবে যেন কোনো বিষয়ে বিচারপতিগণ মন্ত্রী, আমলা বা রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের অধীনস্থ হয়ে না পড়ে। এক্ষেত্রে বিচারপতিদের আইনগত দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতার বিষয়টিকে ছোট করে দেখাও সমীচীন হবে না।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতার অর্থ : বিচার বিভাগ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। সরকার মূলত আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের সমন্বয়েই গঠিত হয়। তাই এদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও সম্পর্কের ধরন শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এক্ষেত্রে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে সাধারণত আইন ও শাসন বিভাগের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ থেকে বিচার বিভাগের হস্তক্ষেপমুক্তকে বুঝায়। অন্য কথায় বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে আইনের ব্যাখ্যাদান ও বিচারকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে বিচারকদের স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালনের ক্ষমতাকে বুঝায়। তবে এ স্বাধীনতার অর্থ অবশ্যই বিচারকদের অবাধ ও যা খুশি তাই করার ক্ষমতাকে বুঝায় না। তাই স্বাধীন বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠার জন্য উপযুক্ত ও যোগ্য বিচারকও আবশ্যক। বেকন যথার্থই বলেছেন, 'বিচারকদের হতে হবে সিংহের মতো। সিংহাসনের ছত্রছায়া তাদের ওপর থাকবে।' অর্থাৎ বিচারকদের হতে হবে সাহসের অধিকারী। তবে সে সাহসী কার্যক্রমে ন্যায়বিচারের নীতি অবশ্যই প্রতিফলিত হতে হবে।

অন্যদিকে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বিচারপতিদের নিয়োগ, কার্যকাল, অপসারণ, বেতন-ভাতাদি ইত্যাদির ক্ষেত্রে শাসন বিভাগের কর্তৃত্ব হ্রাস করার ব্যাপারে সতর্ক ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক।

স্বাধীন বিচার বিভাগের গুরুত্ব : দেশে আইনের শাসন, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথকীকরণের গুরুত্ব অনেক। যেমন—

১. **স্বাধীনভাবে বিচার কার্য পরিচালনা :** সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে শাসন বিভাগ সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী এবং অন্যান্য বিভাগ তথা আইন ও বিচার বিভাগের কর্তৃত্ব সুবিদিত। বিশেষ করে যারা দেশের রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করেন অর্থাৎ রাষ্ট্র ও সরকারের প্রধান হিসেবে শাসনকার্য পরিচালনা করেন তারা সরকারের শাসন বিভাগেরই অন্তর্ভুক্ত। দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ ও প্রশাসন চালায় শাসন বিভাগ। তাই শাসন বিভাগ যদি বিচার বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে তাহলে স্বাধীনভাবে বিচার কার্য পরিচালনা করা বিচার বিভাগের জন্য রীতিমত অসম্ভব।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

২. **বিচারপতিগণ প্রভাবমুক্ত :** বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথক করতে না পারলে বিচারপতিগণ প্রভাবমুক্ত হয়ে বিচারকার্য পরিচালনা করতে পারবে না। কেননা দেশের সাধারণ জনগণের সাথে ব্যাপক সম্পৃক্ততার কারণে শাসন বিভাগ তথা রাজনীতিবিদরা প্রতিটি অপরাধ ও অপরাধীর সাথে কোনো না কোনোভাবে জড়িত থাকেন। ফলে যখন তাদের কোনো বিষয় কোর্টে উত্থাপিত হয় তখন তারা প্রভাব খাটিয়ে প্রকৃত সত্য উদঘাটন ও ন্যায়বিচার পরিচালনার পথে পাহাড়সমান বাধার সৃষ্টি করে। তারা বিচারকার্যকে আপনভাগে নিতে বিচারপতিদের প্রভাবিত করে। ফলে প্রভাবমুক্ত থেকে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার পথ রুদ্ধ হয়ে পড়ে। এতে একদিকে যেমন জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয় তেমনি বিচার ব্যবস্থার প্রতি জনগণের আস্থা হ্রাস পায়।

৩. **বিচারকার্যে নিরপেক্ষতা :** শাসন বিভাগের প্রভাব ও হস্তক্ষেপের ফলে বিচারকার্যে নিরপেক্ষতা নষ্ট হয়। শাসন বিভাগের অযাচিত ও অনুচিত হস্তক্ষেপের ফলে বিচারপতিগণ তাদের পবিত্র দায়িত্ব নিরপেক্ষভাবে পালন করতে পারেন না। ফলে পুরো বিচারকার্যই একটা প্রহসনে রূপ নেয়। এতে বিচার বিভাগে দুর্নীতির বিস্তার ঘটে, যা দেশের সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথকে করে রুদ্ধ। কেননা যেখানে বিচারপতিগণ নিরপেক্ষভাবে বিচার কার্য পরিচালনায় ব্যর্থ হয় সেখানে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। অর্থাৎ সুশাসনকে উন্নয়ন ও গণতান্ত্রিক শাসনের জন্য অপরিহার্য বলে বিবেচনা করা হয়।

৪. **বিচারকার্যকে দ্রুততর করা :** বিচার বিভাগ স্বাধীনভাবে তাদের দায়িত্বপালন করতে না পারলে বিচারকার্যে নানা জটিলতার সৃষ্টি হয় এবং বিচারকার্য হয় বিলম্বিত। অথচ বলা হয় 'Justice delayed is justice denied'. সুতরাং বিচারকার্যকে দ্রুততর করার জন্যও বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথকীকরণ জরুরি।

৫. **আস্থা ও দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা :** সরকারের প্রতি জনগণের আস্থা ও দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ খুবই জরুরি। কেননা শাসন বিভাগের আশ্রয়ে-প্রশ্রয়ে সন্ত্রাসী ও অপরাধী চক্র যদি বিচার বিভাগের হাত থেকে রেহাই পেয়ে যায় তাহলে তাদের নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে না। ফলে দেশে অস্থিতিশীলতা ও অরাজকতার সৃষ্টি হয়, যা দেশের গণতান্ত্রিক বিকাশকে চরমভাবে বাধাগ্রস্ত করে এবং মৌলিক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার পথে চরম প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।

সর্বোপরি দেশে আইনের শাসন, গণতন্ত্র ও মৌলিক মানবাধিকারের মতো সুশীল ধারণাগুলোর কার্যকারিতার জন্য বিচার বিভাগের স্বাধীনতা আবশ্যক।

বিচার বিভাগ পৃথকীকরণে ব্যর্থতা : বাংলাদেশে নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ এবং সংবিধানে স্বীকৃত জনগণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের লক্ষ্যে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের বিষয়টি একটি সর্বজনীন দাবি। কিন্তু স্বাধীনতার প্রায় চার দশক অতিক্রান্ত হলেও আজ পর্যন্ত এ প্রশ্নে কোনো বাস্তব ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি। উল্লেখ্য, ১৮৯৮ সালে প্রণীত অভিন্ন ফৌজদারি কার্যবিধি আইনে ভারত উপমহাদেশে ফৌজদারি মামলা নিষ্পত্তি করা হতো। এই আইনে নিম্ন আদালতকে নির্বাহী বিভাগের অন্তর্ভুক্ত রাখা হয়েছিল। এ আদালতগুলোর বিচারকদের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতিসহ সবকিছু নির্বাহী বিভাগের ওপর ন্যস্ত ছিল। ফলে বিচার বিভাগ নিয়োগকর্তা কর্তৃপক্ষের মর্জিমতো পরিচালিত হতো। ব্রিটিশ আমল এভাবেই শেষ হয়। পাকিস্তান আমলে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণে দাবি উঠলেও তা কোনো গুরুত্ব পায়নি। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের জোরালো দাবি ওঠে। উল্লেখ্য, পাকিস্তান সরকার ১৯৭৩ সালে নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক করে ফেলে এবং আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

১৯৭৪ সালে এই পৃথকীকরণের কাজ সম্পন্ন করে। তারা ১৮৯৮-এর আইন বাতিল (Repeal) করে সম্পূর্ণ নতুন আইন প্রণয়ন করেছে। বাংলাদেশের সংবিধানে স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা গড়ে তোলার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হলেও তার বাস্তবায়ন হয়নি। উল্লেখ্য, সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ সংবিধানের রক্ষক হিসেবে ১৯৯৯ সালের ২ ডিসেম্বর বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের বিষয়ে ১২ দফা নির্দেশনা দেন। জানা গেছে, বিগত আওয়ামী লীগ আমলে ৭ বার, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে ২ বার এবং বিগত চার দলীয় জোট সরকারের আমলে ১২ বার নির্দেশনা কার্যকরের জন্য সময় চাওয়া হয়।

বিচার বিভাগ পৃথককরণ ও বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভূমিকা : পৃথকীকরণ নিশ্চিত করে বিচার বিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠাই ছিল এ রায়ের উদ্দেশ্য। কেননা, সংবিধানের ১১৬ (ক) অনুচ্ছেদে বলা আছে, 'এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে বিচার-কর্ম বিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ এবং ম্যাজিস্ট্রেটগণ বিচারকার্য পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকিবেন।'

এত সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা এবং সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও ১৯৯৯ সাল থেকে অদ্যাবধি কোনো সরকারই বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের নির্দেশনা মানেনি। বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ বিষয়ে সরকার এ পর্যন্ত কোর্টের কাছ থেকে ২১ বার সময় নিয়েছে। এর মধ্যে বিগত আওয়ামী লীগ সরকার ৭ বার, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ২ বার এবং বিগত চারদলীয় জোট সরকার ১২ বার সময় নিয়েছে। সবশেষে ১ নভেম্বর ২০০৭ ঐতিহাসিক মাজদার হোসেন মামলার রায়ের প্রেক্ষিতে প্রশাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথক হয়।

উপসংহার : স্বাধীন বিচার বিভাগের আকাঙ্ক্ষা প্রতিটি গণতান্ত্রিক দেশের জনগণেরই থাকে। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের জনগণও দীর্ঘ ৯ মাসের সশস্ত্র সংগ্রাম শেষে একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এই আশায় যে ন্যায়ভিত্তিক ও বিকশিত সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে। বাংলাদেশের নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে ১ নভেম্বর ২০০৭ পৃথক করলেও স্বাধীন বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠায় আরো যেসব উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন তা এখনো গ্রহণ করা হয়নি। তাই এখনো দেখা যায় বিচার বিভাগের কথা বলে রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতায় বসে বিচার বিভাগকে নিজেদের কাজে অহরহ ব্যবহার করছে, যা কখনো কাম্য নয়। তাই আমরা আশা করি অদূর ভবিষ্যতে স্বাধীন বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠায় যেসব উদ্যোগ বা সীমাবদ্ধতা রয়েছে তা দূর করার জন্য সরকার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

০৪ ❚ গ্রাম আদালত কি? গ্রাম এলাকায় বিরোধ ও বিবাদ নিষ্পত্তিতে গ্রাম আদালতের ভূমিকা বর্ণনা করুন।
***অথবা,* গ্রাম আদালতের সংজ্ঞা দিন। গ্রাম এলাকায় বিরোধ ও বিবাদ নিষ্পত্তিতে গ্রাম আদালতের বিচার প্রক্রিয়া আলোচনা করুন।**

ভূমিকা : বিচারব্যবস্থায় দরিদ্র মানুষের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত ও সহজ করতে ১৯৭৬ সালে এক অধ্যাদেশের মাধ্যমে গ্রাম আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই আদালতের মাধ্যমে গ্রামের দরিদ্র মানুষ সহজে ও নামমাত্র খরচে তাদের অধিকার রক্ষা বা প্রতিষ্ঠা করতে পারে। এ আদালতে গ্রামের ছোটোখাটো বিরোধ বড় আকার ধারণ করার আগেই সহজে তা নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়। গ্রামীণ আদালতে ন্যায়বিচারের ভিত শক্তিশালী করতে ১৯৭৬ সালের গ্রাম আদালত অধ্যাদেশ সংশোধন করে ২০০৬ সালে গ্রাম আদালত পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়। গ্রাম আদালতে অধিকতর সক্রিয় করতে পরবর্তীতে জাতীয় সংসদে গ্রাম আদালত (সংশোধন) আইন ২০১৩ পাশ করা হয়। আইনগত দিক দিয়ে গ্রাম আদালত একটি পূর্ণাঙ্গ আদালত।

গ্রাম আদালত : গ্রামাঞ্চলের ছোটো ছোটো দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা নিষ্পত্তির জন্য ইউনিয়ন পরিষদের আওতায় যে আদালত গঠিত হয় সে আদালত হলো গ্রাম আদালত। সহজ কথায়, গ্রাম আদালত (সংশোধন) আইন-২০১৩ অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদে ৭৫ হাজার টাকা মূল্যমানের দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা নিষ্পত্তির জন্য ইউনিয়ন পরিষদে যে আদালত বসে সে আদালতই হলো গ্রাম আদালত। গ্রাম আদালত গ্রামাঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সুবিধা পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়।

গ্রাম এলাকায় বিরোধ ও বিবাদ নিষ্পত্তিতে গ্রাম আদালতের ভূমিকা : চুরি, বাচ্চাদের মারামারি, মহিলা-মহিলায় ঝগড়া, গরু-ছাগলে ক্ষেতের ফসল খাওয়া, প্রেম, ইভটিজিং, ক্রিকেট-ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে ঝগড়া, চা-স্টলে রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনাকে কেন্দ্র করে মারামারি, ব্যক্তিগত বিরোধ, জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধ ইত্যাদি ঘটনাকে কেন্দ্র করে গ্রাম এলাকায় বিরোধ ও বিবাদ নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। গ্রাম এলাকার এসব বিরোধ ও বিবাদ নিষ্পত্তিতে গ্রাম আদালত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১. **এজলাস স্থাপন :** গ্রাম এলাকায় বিচিত্র ধরনের বিষয়কে কেন্দ্র করে বিরোধ ও বিবাদ দেখা দেয়। এসব বিষয় নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদের একটি কক্ষে বা পছন্দমতো স্থানে গ্রাম আদালতের এজলাস স্থাপন করা হয়। এই এজলাসেই সাধারণত বিচারের সমস্ত কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

২. **বিচারক নিয়োগ :** বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য বিচারক হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে মনোনীত করা হয়। যদি গ্রাম আদালতে আবেদনকারী নির্ধারিত চেয়ারম্যান মনোনীত না করেন তাহলে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে আবেদন করলে তিনি মামলা পরিচালনা করার জন্য ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যগণের মধ্যে বিচারক মনোনীত করার জন্য বিচারক নির্ধারণ করতে পারেন।

৩. **অভিযোগ দায়েরে বাধ্যবাধকতা :** গ্রাম এলাকার সুনির্দিষ্ট বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে গ্রাম আদালত বিবদমান পক্ষের যেকোনো পক্ষকে অভিযোগ দায়েরের ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা আরোপ করেন। এক্ষেত্রে বিচারপ্রার্থী পক্ষ বিচার চেয়ে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের নিকট ৪ টাকা (দেওয়ানি মামলা হলে) অথবা ২ টাকা (ফৌজদারি মামলা হলে) ফি দিয়ে অভিযোগ দায়ের করে থাকেন। অভিযোগপত্রে নিম্নোক্ত বিবরণ থাকতে হয় —
   (i) যে ইউনিয়ন পরিষদে আবেদন করা হয়েছে তার নাম;
   (ii) আবেদনকারীর নাম, ঠিকানা ও পরিচয়;
   (iii) যে ইউনিয়নে অপরাধ ঘটেছে অথবা মামলার কারণের সৃষ্টি হয়েছে তার নাম :
   (iv) সংক্ষিপ্ত বিবরণাদিসহ অভিযোগ বা দাবির প্রকৃতি ও পরিমাণ;
   (v) প্রার্থিত প্রতিকার;
   (vi) অভিযোগ দায়েরকারীর স্বাক্ষর ইত্যাদি (উল্লেখ্য, কোনো অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো আবেদন করা যাবে না)।

৪. **সদস্য মনোনয়ন :** গ্রাম আদালতে অভিযোগ দায়ের করার পর সদস্য মনোনয়ন করা হয়। এক্ষেত্রে আবেদনকারীর পক্ষে ২ জন এবং প্রতিবাদীর পক্ষে ২ জন করে ব্যক্তি মনোনীত করে মোট ৪ জন সদস্য মনোনয়ন করা হয়। উল্লেখ্য যে, গ্রাম আদালতে আবেদনকারীকে বাদী এবং প্রতিবাদী বা আসামিকে বিবাদী বলা হয়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৫. **অভিযোগ বা আবেদন নাকচ :** ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বাদী বা বিবাদী কর্তৃক দায়েরকৃত অভিযোগ বা আবেদনপত্র অমূলক মনে করলে তা নাকচ করতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে নাকচের কারণ লিখে আবেদনপত্র আবেদনকারীকে ফেরত দিতে হবে। সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের আবেদনকারী ব্যক্তিবর্গ সকলের ক্ষেত্রেই এ নিয়ম প্রযোজ্য।

৬. **মামলা নিষ্পত্তির তারিখ নির্ধারণ :** দেওয়ানি বা ফৌজদারি ফি পর্যবেক্ষণ করে গ্রাম আদালত উত্থাপিত অভিযোগ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে একটি সুনির্দিষ্ট তারিখ নির্ধারণ করে দেয়। সেই তারিখ অনুযায়ীই মামলাটি নিষ্পত্তি হয়। গ্রাম আদালত (সংশোধন) ২০০৬ অনুসারে এ সময়সীমা ছিল ৯০ দিন। তবে গ্রাম আদালত (সংশোধন)-২০১৩ অনুসারে গ্রাম আদালতের আদেশের বিরুদ্ধে দায়ের করা রিভিশন আবেদন প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট সহকারী জজ কর্তৃক তা ৩০ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করার বিধান রাখা হয়েছে।

৭. **নির্ধারিত এখতিয়ারে মামলা পরিচালনা :** গ্রাম আদালতের বিচারকরা নির্ধারিত এখতিয়ারে মামলা পরিচালনা করে গ্রামের বিরোধ ও বিবাদ নিষ্পত্তি করে থাকেন। গ্রাম আদালত (সংশোধন) আদেশ ২০০৬-এ গ্রাম আদালতের এখতিয়ার ২৫ হাজার টাকা থাকলেও ২০১৩ সালের সংশোধনীতে তা বৃদ্ধি করে ৭৫ হাজার টাকা করা হয়। গ্রাম আদালত এ নির্ধারিত এখতিয়ারে মামলা পরিচালনা করে বলে মামলায় অহেতুক জটিলতা বৃদ্ধি পায় না।

৮. **জরিমানা :** গ্রাম আদালতে মিথ্যা মামলা দায়েরের প্রবণতা হ্রাসের জন্য জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে। গ্রাম আদালত (সংশোধন) আইন ২০০৬ অনুযায়ী গ্রাম আদালতে মিথ্যা মামলা দায়েরের অভিযোগ প্রমাণিত হলে অনধিক ৫০০ টাকা জরিমানার বিধান করা হয়। কিন্তু ২০১৩ সালের সংশোধনীতে ৫০০ টাকার পরিবর্তে ১০০০ টাকা করা হয়। ফলে মিথ্যা মামলা দায়েরের প্রবণতা হ্রাস পেয়ে মামলা জটও কমেছে। এতে করে গ্রাম আদালত অসংখ্য মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করে বিবাদের মীমাংসা করছে।

৯. **মামলা স্থগিত ও পুনর্বিচার রোধ :** গ্রাম আদালত (সংশোধন) আইন-২০১৩ অনুযায়ী, একই বাদী বিবাদীর মধ্যে একাধিক মামলা থাকলে পরে দায়ের করা মামলা স্থগিত এবং পূর্বে নিষ্পত্তি করা মামলার পুনর্বিচার রোধ করার বিধান রাখা হয়েছে। এছাড়া গ্রাম আদালতে বিচার্য ফৌজদারি মামলা থানায় দায়েরের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা আরোপ এবং আদালতের পক্ষ থেকে গ্রাম আদালতে বিচার্য ফৌজদারি মামলা পুনরায় গ্রাম আদালতে পাঠানোর বিধান সুস্পষ্ট করা হয়েছে। এতে করে গ্রাম আদালত সহজেই গ্রাম বিরোধ ও বিবাদ নিষ্পত্তি করতে সক্ষম হচ্ছে।

১০. **দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা দায়েরে সীমাবদ্ধতা :** দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা দায়েরের সীমাবদ্ধতা থাকায় গ্রাম আদালতে অহেতুক মামলা জটের সৃষ্টি হয় না এবং বিবাদ দ্রুত নিষ্পত্তি হয়। দেওয়ানি মামলার ক্ষেত্রে-যখন কোনো অপ্রাপ্ত বয়স্কের স্বার্থ জড়িত থাকে, বিবাদের পক্ষগণের মধ্যে বিদ্যমান কলহের ব্যাপারে কোনো সালিশের ব্যবস্থা (সালিশি চুক্তি) করা হয়ে থাকলে, মামলায় সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা কার্যরত কোনো সরকারি কর্মচারী হয়ে থাকলে তার বিরুদ্ধে গ্রাম আদালতে মামলা করা যায় না। ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি পূর্বে অন্য কোনো আদালত কর্তৃক কোনো আদালত গ্রাহ্য অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে ও গ্রাম আদালতে মামলা দায়ের করা যাবে না।

১১. **উচ্চ আদালতে আপিল :** গ্রাম আদালতের বিচারকার্যের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপিলের সুযোগ থাকায় গ্রাম এলাকার বিরোধ ও বিবাদ নিষ্পত্তিতে গ্রাম আদালতের গুরুত্ব বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রাম আদালতের ৫ জন বিচারকের মধ্যে ৩ জনের রায়ের প্রতি যদি আপত্তি থাকে তাহলে এ রায়ের প্রতি আবেদনকারী অথবা প্রতিবাদী যেকোনো উচ্চ আদালতের আপিল করতে পারবেন। কিন্তু মামলা নিষ্পত্তি করতে চেয়ারম্যানসহ ৪ জন একমত হয়ে রায় প্রদান করেন সেক্ষেত্রে আবেদনকারী অথবা প্রতিবাদী কোনো আদালতে আপিল করতে পারবেন না।

উপসংহার : সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা তথা গ্রাম এলাকার ছোটোখাটো বিরোধ ও বিবাদ মীমাংসার ক্ষেত্রে গ্রাম আদালতের ভূমিকা অপরিসীম। উকিল নিয়োগের বিধান না থাকা, মিথ্যা মামলা দায়েরে জরিমানার বিধান ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকায় গ্রাম আদালতে মামলা জট ও জনদুর্ভোগ হ্রাস পাচ্ছে। এর বাস্তব সুফলও পেতে শুরু করেছে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের লোকজন যেমন— ২০১৩ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময়ে সিলেটের দক্ষিণ সুরমা উপজেলার ৫টি ইউনিয়নে ১৪টি মামলা নিষ্পত্তি করতে সক্ষম হয় গ্রাম আদালত। মোটকথা, কম সময়ে ও নামমাত্র খরচে ন্যায্য বিচার পাওয়া, বন্ধুসুলভ মীমাংসা, রায় বাস্তবায়ন সহজ হওয়ায় গ্রাম আদালতের জনপ্রিয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

০৫ । বাংলাদেশে বিচারপতিদের নিয়োগ প্রক্রিয়া, মেয়াদকাল, যোগ্যতা ও অপসারণ পদ্ধতি বর্ণনা করুন।

উত্তর : বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগের সমন্বয়ে গঠিত। প্রধান বিচারপতির আসন এবং প্রত্যেক বিভাগের আসন গ্রহণ করার জন্য রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক বিচারক নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট গঠিত হয়। প্রধান বিচারপতি ও আপিল বিভাগে নিযুক্ত বিচারকগণ আপিল বিভাগ এবং অন্যান্য বিচারকগণ হাইকোর্ট বিভাগে আসন গ্রহণ করেন। সংবিধানের বিধানাবলি সাপেক্ষে বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারকগণ বিচারকার্য পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকেন। বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট ব্যতীত আইনের বিধান সাপেক্ষে অন্যান্য অধস্তন আদালতের বিচারকরাও বিচারকার্য সম্পাদন করে থাকেন।

বাংলাদেশে বিচারপতিদের নিয়োগ প্রক্রিয়া : বাংলাদেশে বিদ্যমান বর্তমান সংবিধানের ৯৫নং অনুচ্ছেদে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতিদের এবং ১১৫ নং অনুচ্ছেদে অধস্তন আদালতে বিচারপতিদের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পর্কে উল্লেখ আছে। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১. **সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতি :** বাংলাদেশ সংবিধানের ৯৫(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন এবং প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শ করে রাষ্ট্রপতি অন্যান্য বিচারককে নিয়োগদান করবেন।

২. **অধস্তন আদালতের বিচারপতি :** বাংলাদেশ সংবিধানের ১১৫ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, বিচার বিভাগীয় পদে বা বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব পালনকারী ম্যাজিস্ট্রেট পদে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক উক্ত উদ্দেশ্য প্রণীত বিধিসমূহ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দান করবেন। ২০০৭ সালের ১ নভেম্বর বিচার বিভাগকে স্বাধীন করার পর থেকে নিম্ন আদালতের বিচারকদের নিয়োগের জন্য বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন গঠন করা হয়েছে।

বাংলাদেশের বিচারপতিদের মেয়াদকাল ও নিয়োগ লাভের যোগ্যতা : বাংলাদেশের সংবিধানে বিচারপতিদের মেয়াদকাল ও নিয়োগ লাভের যোগ্যতা সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১. **বিচারপতিদের মেয়াদকাল :** সংবিধানের ৯৬(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোনো বিচারক ৬৭ বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। উল্লেখ্য যে, সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনীর মাধ্যমে বিচারপতিদের মেয়াদকাল ৬৭ বৎসর পর্যন্ত করা হয়। এর পূর্বে ছিল ৬৫ বৎসর।

২. **বিচারপতিদের নিয়োগলাভের যোগ্যতা :**

i. **সুপ্রিম কোর্ট :** বাংলাদেশ সংবিধানের ৯৫(২) নং অনুচ্ছেদে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের নিয়োগ লাভের যোগ্যতা সম্পর্কে বলা হয়েছে। উক্ত অনুচ্ছেদ মোতাবেক, কোনো ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক না হলে, এবং—

ক. সুপ্রিম কোর্টে অন্যূন দশ বৎসরকাল অ্যাডভোকেট না থেকে থাকলে;
অথবা,

খ. বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে অন্যূন দশ বৎসরকাল কোনো বিচার বিভাগীয় পদে অধিষ্ঠান না করে থাকলে; অথবা

গ. সুপ্রিম কোর্টের বিচারক পদে নিয়োগ লাভের জন্য আইনের দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য যোগ্যতা না থেকে থাকলে:

তিনি বিচারক পদে নিয়োগ লাভের যোগ্য হবেন না।

ii. **অধস্তন আদালত :** বাংলাদেশের অধস্তন আদালতে কোনো ব্যক্তিকে জেলা বিচারকের পদে নিয়োগ লাভ করতে হলে তার নিম্নলিখিত যোগ্যতা থাকতে হয় :

ক. নিয়োগ লাভের সময় প্রজাতন্ত্রে কর্মরত থাকতে হবে।

খ. অন্যূন সাত বৎসরকাল বিচার বিভাগীয় পদে বহাল থাকবেন; অথবা,

গ. অন্যূন দশ বৎসরকাল অ্যাডভোকেট থাকতে হবে। এছাড়া ২০০৭ সালে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের ফলে নিম্ন আদালতে সহকারী জজ বা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে নিয়োগ পেতে কোনো ব্যক্তিকে নিম্নোক্ত যোগ্যতা থাকতে হয় :

ক. জন্মসূত্রে বাংলাদেশী নাগরিক;

খ. সাধারণ কোটায় প্রার্থীদের বেলায় বয়স ৩২ বছর এবং মুক্তিযোদ্ধা কোটার প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৩৪ বছর।

গ. অনুমোদিত কোনো বিশ্ববিদ্যালয় হতে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণির এলএলবি ডিগ্রি।

উপরে বর্ণিত যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন কর্তৃক অনুষ্ঠিত প্রিলিমিনারি, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও পুলিশ ভেরিফিকেশন সম্পন্ন করার মাধ্যমে কোনো প্রার্থী নিম্ন আদালতে সহকারী জজ হিসেবে নিয়োগ পেয়ে থাকেন। সাংবিধানিক বিধান অনুসারে বিচার বিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিদের এবং বিভাগীয় দায়িত্ব পালনরত ম্যাজিস্ট্রেটদের সুপ্রিম কোর্ট নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

বিচারপতিদের অপসারণ পদ্ধতি : ১৯৭২ সালের সংবিধানের ৯৬ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অদক্ষতা, অযোগ্যতা, দুর্নীতিসহ অসদাচরণের কারণে বিচারপতিদের অভিশংসনের ক্ষমতা জাতীয় সংসদের হাতে ছিল। সংবিধান (চতুর্থ সংশোধন) আইন, ১৯৭৫-এর মাধ্যমে সংসদীয় অভিশংসন প্রথা বিলোপ করে কারণ দর্শানোর মাধ্যমে বিচারকদের অভিশংসন ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির ওপর ন্যস্ত করা হয়। ১ ডিসেম্বর

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

১৯৭৭ এক সামরিক ফরমানে মাধ্যমে বিচারপতিদের অভিশংসনের সংসদের ক্ষমতাকে বাতিল করে। পরে সংবিধান (পঞ্চম সংশোধন) আইন, ১৯৭৯-এর মাধ্যমে বিচারপতিদের অভিশংসন ক্ষমতা দেয়া হয় সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের কাছে। বিচারকদের অভিশংসন ক্ষমতা পুনরায় জাতীয় সংসদের হাতে ফিরিয়ে দিতে সংবিধান (ষোড়শ সংশোধন) আইন, ২০১৪ পাস হয় ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪।

১৯৭২ সালের মূল সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদের আলোকে সংবিধান (ষোড়শ সংশোধন) আইন ২০১৪ বিচারপতিদের অভিশংসনের ক্ষমতা নিয়ে তৃতীয়বারের মতো সংবিধানের এ অনুচ্ছেদের সংশোধনী আনা হয়। ষোড়শ সংশোধনী পাস হওয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশ সংবিধানের ৯৬(২) অনুচ্ছেদ হতে ৯৬(৪) অনুচ্ছেদ পর্যন্ত বিচারপতিদের অপসারণের পদ্ধতি বলা আছে। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১. **অনুচ্ছেদ ৯৬(২) :** প্রমাণিত অসদাচরণ বা অসামর্থ্যের কারণে সংসদের মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ গরিষ্ঠতার দ্বারা সমর্থিত সংসদের প্রস্তাবক্রমে প্রদত্ত রাষ্ট্রপতির আদেশ ব্যতীত কোনো বিচারককে অপসারণ করা যাবে না।

২. **অনুচ্ছেদ ৯৬(৩) :** এই অনুচ্ছেদের (২) দফার অধীন প্রস্তাব সম্পর্কিত পদ্ধতি এবং কোনো বিচারকের অসদাচরণ বা অসামর্থ্য সম্পর্কে তদন্ত ও প্রমাণের পদ্ধতি সংসদ আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।

৩. **অনুচ্ছেদ ৯৬(৪) :** কোনো বিচারক রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে পদত্যাগ করতে পারবেন।

উপসংহার : সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দক্ষ, যোগ্য ও মেধাবী বিচারকদের বিকল্প নেই। বিচারকদের নিরপেক্ষতার উপর ন্যায়বিচার অনেকাংশে নির্ভরশীল। তাই বিচারকরা যাতে চাপমুক্ত থেকে নিরপেক্ষভাবে বিচারকার্য সম্পাদন করতে পারে তার জন্য সতর্ক দৃষ্টি রাখা জরুরি।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-০১ সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিল কি?

উত্তর : বাংলাদেশ সংবিধানের ৯৬(৩) অনুচ্ছেদে একটি সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিল গঠনের ব্যবস্থা রয়েছে। বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং অন্য দুজন প্রবীণতম বিচারকের সমন্বয়ে তা গঠিত হয়। সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিলের দায়িত্বসমূহ হচ্ছে :

১. বিচারকগণের জন্য পালনীয় আচরণ বিধি নির্ধারণ করা;
২. কোনো বিচারকের বা কোনো বিচারক যে পদ্ধতিতে অপসারিত হতে পারেন সে পদ্ধতি ব্যতীত তার পদ থেকে অপসারণযোগ্য নন এরূপ কোনো কর্মকর্তার সামর্থ্য বা আচরণ সম্পর্কে তদন্ত করা।

প্রশ্ন-০২ বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের গঠন কিরূপ?

উত্তর : সুপ্রিম কোর্ট বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত। সুপ্রিম কোর্ট আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগের সমন্বয়ে গঠিত। প্রধান বিচারপতি এবং উভয় বিভাগে আসন গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক বিচারক সমন্বয়ে সুপ্রিম কোর্ট গঠিত। প্রধান বিচারপতি ও আপিল বিভাগে নিযুক্ত বিচারকগণ আপিল বিভাগে আসন গ্রহণ করেন। অন্যান্য বিচারকগণ হাইকোর্ট বিভাগে আসন গ্রহণ করেন। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারকগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। বাংলাদেশে আইনের শাসন সমুন্নত রাখতে সুপ্রিম কোর্টের ভূমিকা অদ্বিতীয়।

প্রশ্ন-০৩ হেবিয়াস কর্পাস কি?

উত্তর : হেবিয়াস কর্পাস হচ্ছে বাদীকে সশরীরে আদালতে হাজির করা এবং আদালতে বন্দিত্বের কারণ প্রদর্শনের নির্দেশপত্র। এ কারণ বিবেচনাপূর্বক আদালত তদন্ত করবে যে, বন্দিকে কারাগার থেকে মুক্তি দেয়া হবে কিনা। হেবিয়াস কর্পাসের জন্য সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ রিট (writ) করতে পারে। হাইকোর্টকে হেবিয়াস কর্পাসের রিটের ব্যাপারে নিরাপত্তা, মৌলিক অধিকার প্রভৃতি নিশ্চিত করতে হবে।

প্রশ্ন-০৪ বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের সর্বোচ্চ শাস্তি কি?

উত্তর : দেশে ক্রমবর্ধমান নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা বৃদ্ধি, অপরাধের ধরন পরিবর্তন ও কঠোরভাবে অপরাধ দমন করার জন্য পূর্বের আইনের দুর্বলতা, অস্পষ্টতা, ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অসম্পূর্ণতা সম্পূর্ণভাবে রোধ করে বর্তমান সমাজের চাহিদা উপযোগী নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ প্রণীত হয়। এ আইনে নারী নির্যাতনের সর্বোচ্চ শাস্তি হচ্ছে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা ক্ষেত্র বিশেষে মৃত্যুদণ্ড।

প্রশ্ন-০৫ অ্যামিকাস কিউরি বলতে কি বোঝেন?

উত্তর : Amicus curiae পরিভাষাটি ল্যাটিন ভাষার। একবচনে Amicus, বহুবচনে Amici, উচ্চারণ— 'আমিকি' বা 'আমিচি'। সোজা বাংলায় বলা যায়— 'আদালতের বন্ধু'। বাংলায় উচ্চারণ দাঁড়ায় 'অ্যামিকাস কিউরি'। ১৯ আগস্ট ২০০৯ সুপ্রিম কোর্ট আদালতকে আইনি সহায়তা দিতে সুপ্রিম

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

কোর্টের ১০ জন সিনিয়র আইনজীবীকে অ্যামিকাস কিউরি নিয়োগ দেয়। তখন থেকেই প্রত্যয়টি আলোচিত হয়ে আসছে। অ্যামিকাস কিউরি বলতে একজন ব্যক্তি অথবা একটি সংগঠনকে বোঝায়, যিনি অথবা যারা মামলার কোনো পক্ষ নন, কিন্তু আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে তথ্য অথবা পরামর্শ দানের মাধ্যমে আদালতের কাজে সহায়তা করেন। অ্যামিকাস কিউরি কোনো আইনের প্রশ্ন অথবা ঘটনার প্রশ্নে তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য আদালতে পেশ করেন, যা আদালতকে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে সহায়তা করে। অ্যামিকাস কিউরির বক্তব্য সম্পূর্ণরূপে আদালতের বিবেচনাধীন বিষয়। এ বক্তব্য আদালতের ওপর বাধ্যতামূলক নয়। রোমান আইনে সর্বপ্রথম অ্যামিকাস কিউরি সম্পর্কিত ধারণা ও বিধান বিকশিত হয়েছিল। নবম শতকে শুরু হয়ে এ বিধান ধীরে ধীরে ব্রিটিশ আইনে অন্তর্ভুক্ত হয় এবং পরে আরো বিস্তৃত হয়ে অধিকাংশ কমন ল' ব্যবস্থার অনুসারী অধিকাংশ দেশে স্থান করে নেয়। বাংলাদেশে অ্যামিকাস কিউরি নিয়োগ সংক্রান্ত কোনো বিধিবদ্ধ আইন নেই। কিন্তু ব্রিটিশ কমন ল' ব্যবস্থার অংশ হিসেবে প্রচলিত রেওয়াজ অনুসরণ করে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট অ্যামিকাস কিউরি নিয়োগ করে থাকে। অ্যামিকাস কিউরি নিয়োগ করার এখতিয়ার নিম্ন আদালতের নেই।

প্রশ্ন-০৬ রাষ্ট্রপতির রেফারেন্স কাকে বলে?

উত্তর : সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, 'যদি কোনো সময়ে রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতীয়মান হয় যে, আইনের এরূপ কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে বা উত্থাপনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, যা এমন ধরনের ও এমন জনগুরুত্বসম্পন্ন যে, সেই সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্টের মতামত গ্রহণ করা প্রয়োজন, তাহলে তিনি প্রশ্নটি আপিল বিভাগের বিবেচনার জন্য প্রেরণ করতে পারবেন এবং উক্ত বিভাগ স্বীয় বিবেচনায় উপযুক্ত শুনানির পর প্রশ্নটি সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে স্বীয় মতামত জ্ঞাপন করতে পারবেন।' সংবিধানের এ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি ১৭ আগস্ট ২০০৯ পিলখানা হত্যাকাণ্ডের বিচার আর্মি অ্যাক্ট ১৯৫২-এর আওতায় কিংবা অ্যাক্টটির ৫(১) ধারা অনুযায়ী প্রজ্ঞাপন জারি করে বিডিআরকে অ্যাক্টটির আওতায় এনে বিচার করা সম্ভব কি-না সে প্রশ্নে আপিল বিভাগে রেফারেন্স পাঠান। সংবিধান অনুযায়ী মতামত না দেয়ার সুযোগ আপিল বিভাগের রয়েছে এবং মতামত দিলেও সেক্ষেত্রে তা সাধারণ মামলার সিদ্ধান্তের মতো প্রকাশ্য এজলাসে দেয়া হয় না। রাষ্ট্রপতির কাছে এ বিষয়ে লিখিত মতামত পাঠানো হবে। ১০ সেপ্টেম্বর ২০০৯ সুপ্রিম কোর্ট বিডিআরের বিচার সম্পর্কিত রাষ্ট্রপতির পাঠানো রেফারেন্স বিষয়ে মতামত রাষ্ট্রপতির কাছে পৌঁছে দেন। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে এ নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো রাষ্ট্রপতি রেফারেন্স পাঠান সুপ্রিম কোর্টের কাছে। এর আগে ১৯৯৫ সালে বিরোধীদল কর্তৃক সংসদ বর্জনের অংশ হিসেবে ৯০ দিন সংসদে হাজির না হলে তা সংবিধান অনুযায়ী 'অনুপস্থিতি' হিসেবে গণ্য করা হবে কি-না সেই প্রশ্নে আইনগত ব্যাখ্যা চেয়ে রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাস আপিল বিভাগের কাছে অনুরূপ রেফারেন্স চেয়ে পাঠিয়েছিলেন।

প্রশ্ন-০৭ বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (ADR) কি?

উত্তর : ADR এর পূর্ণরূপ হলো Alternative Desptue Resolution। যা বাংলায় বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি। আদালতে প্রথাগত পদ্ধতিতে মামলা নিষ্পত্তির ধারণার বিপরীতে আদালতের বাইরে কিংবা ক্ষেত্রবিশেষে আদালতের ভেতরে সমঝোতার ভিত্তিতে দ্রুততম সময়ের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তি করার প্রক্রিয়াকেই বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি বা ADR বলে। সাধারণত বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি করা যায় তিনটি পদ্ধতিতে। সেগুলো হলো :

১. Negotiation বা আপোস পদ্ধতি
২. Mediation বা মধ্যস্থতা পদ্ধতি
৩. Arbitration বা সালিস পদ্ধতি

১. **Negotiation বা আপোস পদ্ধতি :** এ পদ্ধতিতে পক্ষ ও বিপক্ষ অন্য কারো মধ্যস্থতা ছাড়া নিজেরাই আপোসে বিরোধ মিটাতে পারে। এখানে তৃতীয় পক্ষের তেমন ভূমিকা থাকে না।

২. **Mediation বা মধ্যস্থতা পদ্ধতি :** মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি অর্থাৎ তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতি। এখানে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এ পদ্ধতিকে আমাদের দেশে গ্রাম্য সালিস বলে।

৩. **Arbitration বা সালিস পদ্ধতি :** এ পদ্ধতিতে আদালতের মাধ্যমে সালিসকার বা ফ্যাসিলিটেটর (মধ্যস্থতাকারী) নিয়োগ করা হয়। তিনি নির্দিষ্ট আইনের মাধ্যমে উভয়পক্ষের সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে বিবদমান পক্ষের মধ্যে সমঝোতার একটি ভারসাম্য তৈরি করে বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে রায় দিবেন। উভয়পক্ষ এ রায় মানলে বিরোধটি নিষ্পত্তির পর্যায়ে চলে যায়। তবে কোনো এক পক্ষের আপত্তি থাকলে তিনি চাইলে বিষয়টি নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হতে পারেন।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশে ২০০৩ সালে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (ADR) আইনি রূপ লাভ করে। যা ২০১২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর বাধ্যতামূলক আইন হিসেবে পাস হয়।

প্রশ্ন-০৮ গ্রাম আদালত কি?

উত্তর : পল্লী এলাকার ছোটখাট বিবাদের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য গঠিত হয় গ্রাম আদালত। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও অন্য চারজন সদস্য নিয়ে গ্রাম আদালত গঠিত হয়। গ্রাম আদালতে সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) হাজার টাকার দাবি সম্বলিত দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার বিচার হয়ে থাকে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি ও বহিঃসম্পর্ক
Foreign POlicy & External Relation of Bangladesh

Syllabus

Foreign Policy and External Relations of Bangladesh :
Goals, Determinants and policy formulation process: Factors of National Power; Security Strategies; Geo-Politics and Environment Issues; Economic Diplomacy; Man-power exploitation, Participation in International Organizations: UNO and UN Peace Keeping Missions, NAM, SAARC, OIC, BIMSTEC, D-8 etc. and International Economic Institutions, Foreign Aid, International Trade.

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১. বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও রেমিটেন্স আয়বর্ধনে বাংলাদেশের বর্তমান সাফল্য এবং তা ধরে রাখার জন্য ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জের চিত্র তুলে ধরুন। [৩১তম বিসিএস]

০২. বৈদেশিক নীতি কি? বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন সাধিত হয় তা আলোচনা করুন। [২১তম বিসিএস]
অথবা, পররাষ্ট্রনীতি বলতে কি বোঝায়? আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশ কি কি ভূমিকা নিতে পারে বলে মনে করেন? বর্ণনা করুন। [২৮তম বিসিএস]
অথবা, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করুন। [৩৩তম; ১৩তম বিসিএস]
অথবা, পররাষ্ট্রনীতি বলতে কি বুঝায়? বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূলনীতিগুলোর বর্ণনা দিন। [২৭তম বিসিএস]
অথবা, বৈদেশিক নীতি কি? বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি বা পররাষ্ট্রনীতির উদ্দেশ্য ও বিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করুন।

০৩. 'সার্ক ও বাংলাদেশ' শিরোনামে একটি নিবন্ধ রচনা করুন। [৩০তম; ১৫তম বিসিএস]
অথবা, সার্কের প্রতিষ্ঠা, উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম এবং বাংলাদেশের ভূমিকা আলোচনা করুন।
অথবা, আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তুতে 'সার্ক (SAARC)-এর গুরুত্ব ও অর্জন কতটুকু? আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সার্ক (SAARC)-এর আওতায় কি কি করা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন? [২৯তম বিসিএস]
অথবা, 'আঞ্চলিক দেশসমূহের উন্নয়নে সার্কের ভূমিকা অপরিহার্য।' আলোচনা করুন। [২৫তম বিসিএস]

০৪. রাষ্ট্রীয় সমুদ্রসীমা কিভাবে নির্ধারিত হয়? সমুদ্র সংলগ্ন উপকূলীয় রাষ্ট্রের সমুদ্র অধিকারগুলো কি কি? এ প্রেক্ষাপটে গভীর সমুদ্রে বাংলাদেশের তেল-গ্যাস সম্পদ প্রতিবেশী দেশ ভারত-মিয়ানমার থেকে কতটুকু নিরাপদ? আলোচনা করুন। [৩০তম বিসিএস]

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

০৫. বাংলাদেশ-মিয়ানমার সমুদ্রসীমা নির্ধারণী মামলার রায়ের প্রেক্ষাপটের বিবরণ দিন এবং এ মামলার রায় বিশ্লেষণ করুন।
০৬. রোহিঙ্গা সমস্যা উদ্ভবের কারণ উল্লেখপূর্বক সমাধানের উপায় নির্দেশ করুন। মিয়ানমার থেকে বিতাড়িত রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে আশ্রয় দেয়া উচিত বলে মনে করেন কি?
০৭. জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ সম্পর্ক আলোচনা করুন।
০৮. জাতিসংঘ ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করুন।
০৯. বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের বিভিন্ন দিক আলোচনা করে এক্ষেত্রে বিদ্যমান বিবদমান ইস্যুগুলো চিহ্নিত করুন।
অথবা, সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের বিস্তারিত আলোচনা করুন।
অথবা, বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের সাম্প্রতিক গতিবিধি ব্যাখ্যা করুন এবং বিদ্যমান বিবদমান ইস্যুগুলো চিহ্নিত করুন।
১০. বৈদেশিক সাহায্য কি? বাংলাদেশ কি কি উপায়ে বৈদেশিক সাহায্য আসে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।
১১. বাংলাদেশ বর্তমানে যেসব আন্তর্জাতিক সংস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে তার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করুন।
১২. এ পর্যন্ত জাতিসংঘের কতটি শান্তিরক্ষী মিশন গঠিত হয়েছে? বর্তমানে বাংলাদেশ কোন কোন মিশনে শান্তিরক্ষায় কাজ করছে?
১৩. জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশনে বাংলাদেশের সফলতা আলোচনা করুন।
১৪. স্বাধীনতা-উত্তরকাল থেকে সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অর্জনগুলো সম্পর্কে আলোচনা করুন।
১৫. অভ্যন্তরীণ নানামুখী প্রতিবন্ধকতার পাশাপাশি বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের জন্য চ্যালেঞ্জসমূহের বর্ণনা দিন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

০১. বাংলাদেশ কখন জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে?
০২. কত সালে সার্ক গঠিত হয়? এর উদ্যোক্তা কে?
০৩. বাংলাদেশ কখন সিডও সনদ স্বাক্ষর করে?
০৪. অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের মহাসচিবের নাম কি?
০৫. বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার ও মার্কিন রাষ্ট্রদূতের নাম লিখুন।
০৬. বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূলনীতিগুলো কি?
০৭. জাতিসংঘে বাংলাদেশের ভূমিকা লিখুন।
০৮. বাংলাদেশের আসিয়ান (ASEAN) জোটে অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয়তা লিখুন।
০৯. জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের ভূমিকা লিখুন।

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১ ॥ বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও রেমিটেন্স আয়বর্ধনে বাংলাদেশের বর্তমান সাফল্য এবং তা ধরে রাখার জন্য ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জের চিত্র তুলে ধরুন। *[৩১তম বিসিএস]*

উত্তর : প্রবাসী শ্রমিক, রেমিট্যান্স ও বাংলাদেশের অর্থনীতি একই যোগসূত্রে গাঁথা। কারণ বৈদেশিক কর্মসংস্থান এবং প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ বেকার সমস্যা, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধিসহ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখছে। বিশ্বের বহু দেশে ছড়িয়ে আছে বাংলাদেশি শ্রমিক। বিশেষ

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

করে আরব রাষ্ট্রসমূহে ও মধ্যপ্রাচ্যে। সাম্প্রতিক সময়ে আরব বিশ্বের অস্থিতিশীল রাজনীতি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। সংকুচিত হয়ে আসছে দেশের অর্থনীতির প্রাণ ভোমরা রেমিট্যান্স প্রবাহ। আরব দেশগুলোর বর্তমান পরিস্থিতির কারণে প্রায় লক্ষাধিক জনশক্তি দেশে ফিরে আসার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। ফলে কমে যাচ্ছে তাদের রেমিট্যান্স। ২০০৮ সালে শুরু হওয়া অর্থনৈতিক মন্দার রেশ কাটতে না কাটতে বিশ্ব অর্থনীতির নতুন এ সংকটে বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোর রেমিট্যান্স-নির্ভর অর্থনীতি এখন হুমকির মুখে পড়েছে।

বাংলাদেশের শ্রমবাজার : বিশ্বের প্রায় দেশেই বাংলাদেশের শ্রমশক্তি রয়েছে। প্রতিবছর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাংলাদেশি কাজের জন্য মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গমন করে থাকে। তবে বাংলাদেশের প্রবাসী জনশক্তির অধিকাংশই সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া, কুয়েত, ওমান ও সিঙ্গাপুরে কর্মরত। এছাড়া বাহরাইন, লিবিয়া, কাতার, জর্ডান, লেবানন, ব্রুনাই, দক্ষিণ কোরিয়া, মরিসাস, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, আয়ারল্যান্ড ও ইতালিসহ অন্যান্য দেশেও বাংলাদেশি শ্রমশক্তি কর্মরত রয়েছে। এর মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যেই রয়েছে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শ্রমবাজার। সারাবিশ্বে অন্তত ৯০ লাখ বাংলাদেশী বৈধভাবে চাকরি নিয়ে বসবাস করছেন, যার প্রায় ৬০ শতাংশই আছেন মধ্যপ্রাচ্যে। এর মধ্যে সৌদি আরবে ১৯৭৬ সাল থেকে ২০১১ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত গমনকারী বাংলাদেশি শ্রমিকের সংখ্যা ২৫ লাখ ৮০ হাজার ১৯৮ জন, যা মোট জনশক্তির ৩৬ শতাংশ। তন্মধ্যে শুধু ২০১২ সালে প্রায় ৬,০০,৭৯৮ জন বাংলাদেশী নাগরিক কাজের সন্ধানে বিদেশে গমন করছে। সংখ্যার বিচারে সৌদি আরবের পরে সংযুক্ত আরব আমিরাত বাংলাদেশের অন্যতম শ্রমবাজার। অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৪ মতে, ২০১২ সালে দেশটিতে গমনকারী শ্রমিকের সংখ্যা ২,১৫,৪৫২ জন। এছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশ, যেমন কুয়েতে ৭ শতাংশ, কাতারে ২ শতাংশ ও লিবিয়ায় ১ শতাংশ বাংলাদেশী শ্রমশক্তি নিয়োজিত রয়েছে। মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে বিস্তৃত এ ৮০ শতাংশ শ্রমবাজারের অবশিষ্ট ২০ শতাংশ মালয়েশিয়া (১০ শতাংশ), সিঙ্গাপুর (৪ শতাংশ) ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বিস্তৃত।

বাংলাদেশের রেমিট্যান্স চিত্র : ১৯৭৬ সালে সর্বপ্রথম জনশক্তি রফতানির মাধ্যমে দেশে রেমিট্যান্স প্রবাহ শুরু হয়। ঐ বছর মোট রেমিট্যান্স প্রাপ্তির পরিমাণ ছিল ৩৫.৮৫ কোটি টাকা। এরপর প্রতিবছরই উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে দেশের রেমিট্যান্স প্রবাহ ক্রমান্বয়ে এগিয়েছে। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৪ অনুযায়ী ২০১৩-২০১৪ (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) অর্থবছরের দেশের রেমিট্যান্স প্রাপ্তির পরিমাণ ৯২০৬.১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। রেমিট্যান্সের সিংহভাগ আসে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ থেকে। এক্ষেত্রে কয়েক বছর যাবত এককভাবে সৌদি আরবের পরই সংযুক্ত আরব আমিরাতের অবস্থান। বিশ্বব্যাংকের মাইগ্রেশন অ্যান্ড রেমিট্যান্সেস ফ্যাক্ট বুক-২০১১ অনুযায়ী, ২০১০ সালে রেমিট্যান্স অর্জনে নিম্ন আয়ের দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান শীর্ষে, যার পরিমাণ প্রায় ১১০০ কোটি ডলার এবং দক্ষিণ এশিয়ায় রেমিট্যান্স অর্জনে ভারতের পরই বাংলাদেশের অবস্থান।

আরব, মধ্যপ্রাচ্য সংকট ও বাংলাদেশের রেমিট্যান্স প্রবাহ : আরব বিশ্বজুড়ে এখন রাজনৈতিক সুনামি চলছে। সেই সুনামি আঘাত হানছে উত্তর আফ্রিকার মুসলিম দেশগুলোতে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে এরই মধ্যে দেখা দিয়েছে ভয়াবহ রাজনৈতিক সংকট। আন্দোলনের ভয়ে তটস্থ সিরিয়া, জর্ডান, ইয়েমেন, মরক্কো, বাহরাইন, এমনকি সৌদি আরবও। তিউনিসিয়ার বেন আলীর বিরুদ্ধে ব্যাপক গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক সুনামি শুরু হয়। এতে ঝরে পড়েন বেন ...

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

পরিণতি বরণ করেন মিসরের প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারক। পরবর্তীতে ভয়াবহ গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে লিবিয়ার নেতা কর্নেল গাদ্দাফি ক্ষমতাচ্যুত হন ও নিহত হন। সাম্প্রতিক ইয়েমেন সংকট মধ্যপ্রাচ্যকে অস্থিতিশীল করে তুলেছে। জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) হিসাবে, ২০০৯-১০ অর্থ বছরে বৈধ চ্যানেলে লিবিয়া থেকে রেমিট্যান্স প্রাপ্তির পরিমাণ ১০ কোটি ২২ লাখ টাকা বা ১৪ লাখ ৬০ হাজার ডলার। এছাড়া ২০১০-১১ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে (জুলাই থেকে ডিসেম্বর) লিবিয়া থেকে বৈধ পথে রেমিট্যান্স এসেছে ২ কোটি ৯৪ লাখ টাকা (৪ লাখ ২০ হাজার ডলার)। লিবিয়ার রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের দরুন বাংলাদেশের শ্রমবাজার আজ মুখ থুবড়ে পড়েছে। ফিরে এসেছে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক। প্রবাসী আয়ের শতকরা ৯০ ভাগই আসে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ থেকে। মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে চলমান রাজনৈতিক সংকটের মধ্যেও দেশের রেমিট্যান্স প্রবাহ কমেছে। ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে প্রেরিত অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় সৌদি আরব ৩৮২৯.৫, আরব আমিরাত ২৮২৯.৪, বাহরাইন ৩৬১.৭, ওমান ৬১০.১ এবং কুয়েতে ১১৮৬.৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শ্রমবাজার সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত। কিন্তু এসব দেশের বাংলাদেশী জনশক্তি আমদানির প্রতি বিমুখতা এবং সাম্প্রতিক মধ্যপ্রাচ্য সংকট দুইয়ে মিলে দেশের জনশক্তি রফতানি এবং রেমিট্যান্স প্রবাহে নেতিবাচক প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

শ্রমবাজার সংকট, সম্ভাবনা ও করণীয় : দেশের সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের সেরা মাধ্যম জনশক্তি রফতানি বা প্রবাসী আয়। কিন্তু ক্রমবর্ধমান শ্রমবাজার সংকটহেতু জনশক্তি রফতানিতে বিপর্যয় দেশের রেমিট্যান্স প্রবাহকে প্রতিনিয়তই স্থবির করে তুলছে। প্রায় তিন বছর ধরে জনশক্তি রফতানির নিম্নমুখী প্রবণতা রয়েছে। বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা, বিদেশে মানুষরূপী অমানুষদের পদচারণ ও অপতৎপরতায় বাংলাদেশীদের ভাবমূর্তি সংকট, দক্ষ শ্রমিকের অভাব এবং বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের জনশক্তি রফতানি বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং কূটনৈতিক তৎপরতার অভাবসহ নানাবিধ কারণ এর পেছনে জড়িত। সাম্প্রতিক সময়ে লিবিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্য ও আরব বিশ্বে রাজনৈতিক সংকটে রিক্ত নিঃস্ব হয়ে প্রবাসী শ্রমিকদের দেশে ফিরে আসার প্রবণতায় দেশের রেমিট্যান্স প্রবাহে যোগ করেছে সংকটের নতুন মাত্রা। ফলে দক্ষিণ এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রবাসী আয় বা রেমিট্যান্স অর্জনকারী দেশ হয়েও হুমকির মুখে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ। সম্প্রতি দীর্ঘ ৬ বছর পর (১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৫) সৌদি আরবে জনশক্তি পাঠানোর বিষয়ে আনুষ্ঠানিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। তবে জাতীয় অর্থনীতিতে অসামান্য অবদান রাখা এ বৃহৎ খাতটির স্থবিরতা দূর করা প্রয়োজন সবার আগে। এক্ষেত্রে যথেষ্ট সুযোগও রয়েছে বাংলাদেশের। মধ্যপ্রাচ্যের শ্রমবাজারে চাহিদার ভাটা পড়লেও পূর্ব এশিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের অর্থনৈতিকভাবে অনেক এগিয়ে যাওয়া দেশগুলোতে দক্ষ ও অদক্ষ জনবলের ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে। এসব অঞ্চলে বাংলাদেশের জনশক্তি রফতানিকে সহায়তা দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে শ্রমবাজারের যে ধাক্কা লেগেছে তা পূরণ করা সম্ভব। এছাড়া আফ্রিকা মহাদেশ ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোতে জনশক্তি রফতানির সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। এক্ষেত্রে নতুন করে শ্রমবাজার পাওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে বাংলাদেশের সামনে। এখন প্রয়োজন দ্রুত কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ। ২০২২ সালে বিশ্বকাপ ফুটবলের আয়োজক দেশ কাতারে নির্মাণ শিল্পে বাংলাদেশীদের কাজ পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। সামগ্রিকভাবে সংকটময় পরিস্থিতিতেও দেশের জনশক্তি রফতানি বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রবাসী আয়ের উর্ধ্বমুখী গ্রাফ ধরে রাখার যথেষ্ট সম্ভাবনা বিদ্যমান বাংলাদেশের সামনে। এক্ষেত্রে এ সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর পাশাপাশি বিদেশে বাংলাদেশের বন্ধ হয়ে যাওয়া শ্রমবাজার উন্মুক্ত করার জন্য জোর কূটনৈতিক প্রচেষ্টা ও কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ জরুরি।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বাংলাদেশের শ্রম বাজার এক বিশাল সম্ভাবনাময় খাত। এ খাত থেকে বাংলাদেশ প্রতিবছর প্রচুর রেমিট্যান্স পেয়ে থাকে, যা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ব্যাপক অবদান রাখে। তাই বাংলাদেশের শ্রমবাজারের সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে তা সমাধানের আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি।

০২. **বৈদেশিক নীতি কি? বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন সাধিত হয় তা আলোচনা করুন।** *[২১তম বিসিএস]*

অথবা, **পররাষ্ট্রনীতি বলতে কি বোঝায়? আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশ কি কি ভূমিকা নিতে পারে বলে মনে করেন? বর্ণনা করুন।** *[২৮তম বিসিএস]*

অথবা, **বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করুন।** *[৩৩তম; ১৩তম বিসিএস]*

অথবা, **পররাষ্ট্রনীতি বলতে কি বুঝায়? বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূলনীতিগুলোর বর্ণনা দিন।** *[২৭তম বিসিএস]*

অথবা, **বৈদেশিক নীতি কি? বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি বা পররাষ্ট্রনীতির উদ্দেশ্য ও বিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করুন।**

উত্তর : স্নায়ুযুদ্ধোত্তর নতুন বিশ্বব্যবস্থায় প্রতিটি দেশের পররাষ্ট্রনীতিতে লেগেছে পরিবর্তনের হাওয়া। ইতঃপূর্বে স্নায়ুযুদ্ধের কারণে বিভিন্ন দেশের পররাষ্ট্রনীতিতে সামরিক বিষয়াদি গুরুত্ব পেত। এখন তার অবসান হয়েছে। বিশ্ব রাজনীতির পরিবর্তন এবং শক্তিবলয়ে রূপান্তরের প্রেক্ষিতে পররাষ্ট্রনীতির বিবর্তন অনিবার্য হয়ে ওঠে। স্বাধীন, সার্বভৌম ও গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে বাংলাদেশেরও একটি বৈদেশিক নীতি রয়েছে, যা সার্বিক পরিচয় ও অবস্থানের আলোকে নির্মাণ, বিবর্তন ও পরিবর্তন ঘটেছে বিভিন্ন সময়ে।

বৈদেশিক নীতি : বৈদেশিক নীতি হলো কোনো দেশের জাতীয় নীতির সেই অংশ, যা বহির্বিশ্বের সাথে সম্পর্কযুক্ত। রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রাখা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন, সর্বোপরি বিশ্বে সম্মানজনক অবস্থান সৃষ্টির জন্য পররাষ্ট্রনীতি রাষ্ট্রীয় নীতিরই অনিবার্য অনুষঙ্গ।

জার্মান রাষ্ট্রনায়ক অটোভন বিসমার্ক বলেন, 'কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ নীতির সম্প্রসারণই হলো বৈদেশিক নীতি।'

Prof. Padelford ও Lincoln তাঁদের 'Dynamics of International Politics' গ্রন্থে বলেন, 'বৈদেশিক নীতি হলো একটি দেশের জাতীয় নীতির একটি অংশ, যার দ্বারা অন্য দেশের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং এ সম্পর্ক জাতীয় স্বার্থের ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত।'

Joseph Frankle তাঁর 'Making of Foreign Policy' গ্রন্থে বলেছেন, 'বৈদেশিক নীতি হলো সিদ্ধান্ত ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফল, যা এক রাষ্ট্রের সাথে অন্য রাষ্ট্রের সম্পর্ক সৃষ্টি করে।' সুতরাং বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে উপরিউক্ত ধারণাগুলোর আলোকে বলা যায়, কোনো রাষ্ট্র তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার জন্য যে প্রচেষ্টা চালায় সেটাই তার বৈদেশিক নীতি।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির উদ্দেশ্য : বিশ্বের সকল দেশের পররাষ্ট্রনীতির উদ্দেশ্য সাধারণভাবে এক ও অভিন্ন। এ উদ্দেশ্যগুলো প্রধানত দেশসমূহের আয়তন, জনসংখ্যা, ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষিত, প্রাকৃতিক সম্পদ, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ইত্যাদির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ প্রেক্ষিতে প্রতিটি রাষ্ট্রই আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা

সম্বন্ধে তার নিজস্ব অভিমত ও অভিপ্রায় প্রকাশ করে। বাংলাদেশও এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়। আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সংহতির উন্নয়ন—এ মূলনীতির ভিত্তিতে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি পরিচালিত হয়। নিচে ধারাবাহিকভাবে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির উদ্দেশ্যসমূহ উপস্থাপন করা হলো :

১. **স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা :** বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষা এবং সমতা বজায় রাখা। সুদীর্ঘকাল ধরে ভারতের সাথে দহগ্রাম-আঙরপোতা ও তিনবিঘা করিডোর নিয়ে কূটনীতি এবং অবশেষে তার উল্লেখযোগ্য সমাধান এ উদ্দেশ্যকে আরো উজ্জ্বল করেছে। তাছাড়া বাংলাদেশ শান্তিকামী দেশ হিসেবে সব দেশের সাথেই বন্ধুত্ব কামনা করে, কারো প্রভুত্ব স্বীকার করে না। যেসব দেশ অন্যের স্বাধীনতাকে খর্ব করে সেসব দেশকে বাংলাদেশ সমর্থন করে না কিংবা তার সাথে বন্ধুত্বও করে না।

২. **অর্থনৈতিক উন্নয়ন :** অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা মুক্তি ব্যতীত কোনো দেশের ভূ-খণ্ডগত স্বাধীনতা অর্থহীন। একটি আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে টিকে থাকার জন্য চাই অর্থনৈতিক উন্নয়ন। তাই অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও এক্ষেত্রে স্বাবলম্বিতা অর্জন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা, রুগ্ন শিল্প ও অনুন্নত অবকাঠামোর জন্য বাংলাদেশ প্রতিনিয়ত বিদেশী সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল। এছাড়া মুক্ত অর্থনীতির যুগে প্রতিযোগিতামূলক বিদেশী বাজার ধরা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার প্রয়োজন। তাই বাংলাদেশ সব সময়ই নতুন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার (NIEO—New International Economic Order) সমর্থক। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্লকে যোগদান ও Islamic Common Market গড়তে যেমন আন্তরিক, তেমনি ডি-৮, দক্ষিণ এশিয়ায় SAPTA ও SAFTA বাস্তবায়ন, উন্নয়ন চতুর্ভুজ ও উপ-আঞ্চলিক জোট গঠনেও বদ্ধপরিকর।

৩. **আন্তর্জাতিক সহযোগিতা :** পারস্পরিক সহযোগিতা ছাড়া কোনো রাষ্ট্রই উন্নতি লাভ করতে পারে না। তাছাড়া শান্তি, সমৃদ্ধি, স্থিতাবস্থা ও নিরাপত্তার জন্যও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রয়োজন। এজন্য বাংলাদেশ পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক উভয় ব্লকের সাথেই সুসম্পর্ক বজায় রাখে। দেশের প্রথম ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সাথে ঘনিষ্ঠতা রাখলেও পরবর্তী সরকারগুলো পশ্চিমা গণতান্ত্রিক পুঁজিবাদী ও মধ্যপ্রাচ্যের তেলসমৃদ্ধ মুসলিম দেশগুলোর সাথে ঘনিষ্ঠতা অর্জন করে। এমনকি ধর্মীয় আদর্শকে সমুন্নত রাখতে আরব দেশগুলোর সাথেও বাংলাদেশের সম্পর্ক সুনিবিড়। এক্ষেত্রে মতাদর্শগত পার্থক্য বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণে কোনো বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি।

৪. **আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা :** শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও তার পরিবেশ সৃষ্টি বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম উদ্দেশ্য। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রে বাংলাদেশ শান্তিপূর্ণ পরিবেশ প্রত্যাশা করে বলে সব সময়ই অস্ত্র প্রতিযোগিতা, জাতীয়তাবাদী সংঘর্ষ ও জাতিগত দাঙ্গার বিরুদ্ধে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ ও নিরস্ত্রীকরণের কথা বলে। এ কারণে বাংলাদেশ ফিলিস্তিন ও মিয়ানমারে মুসলিমদের ওপর নির্যাতনের নিন্দা জানায়। আবার এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ জাতিসংঘ সনদ, পঞ্চশীলা ও বান্দুং ঘোষণার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে। অন্যদিকে নিজস্ব নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশীয় দেশগুলো, বিশেষত প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সাথে সদ্ভাব বজায় রাখতে সক্ষম হয়। এ কারণে উপমহাদেশে পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ অত্যন্ত সোচ্চার ভূমিকা রেখেছে। কারণ এ অঞ্চলে পারমাণবিক অস্ত্র ছড়িয়ে পড়ে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হোক, বাংলাদেশ তা কোনোভাবেই চায় না।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৫. **জাতীয় পরিচয় অক্ষুণ্ন রাখা :** বাংলাদেশের প্রধান পরিচয় হলো একটি স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র। যে কোনো মূল্যে এ পরিচয় অক্ষুণ্ন রাখা বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মৌলিক উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই বাংলাদেশ একদিকে অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্বপূণ সম্পর্ক বজায় রাখতে আগ্রহী, অন্যদিকে নিজস্ব স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষা এবং জাতীয় অর্থনীতি গড়ে তুলে বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ করতে বদ্ধপরিকর। এছাড়া সর্বপ্রকার বর্ণবাদ, ইহুদিবাদ, উপনিবেশবাদ ও সম্প্রসারণবাদ দূরীকরণ এবং এদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির অপর একটি উদ্দেশ্য।

বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন সাধিত হয় : বিশ্ব রাজনীতির গতিপ্রকৃতি, অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার পরিবর্তন, স্নায়ুযুদ্ধের অবসান প্রভৃতি প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি বিভিন্ন সময়ে বিবর্তন, পরিবর্তন ও রূপান্তর হয়েছে। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের শাসনামল : ১৯৭১ সালে মুক্তি সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ছিল প্রকৃতপক্ষে সোভিয়েত-ভারত শক্তির বিজয় আর পাকিস্তান-চীন-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরাজয়। ফলে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির সূচনা ঘটেছিল মিত্রশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে। তাছাড়া সাংবিধানিকভাবে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ গ্রহণ করায় স্বভাবতই এর পররাষ্ট্রনীতি ছিল সোভিয়েত ও ভারতমুখী। কিন্তু অচিরেই দেখা গেল তারা বাংলাদেশের উন্নয়নে ততটা আন্তরিক নয়। তাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব দিল্লির রক্তচক্ষু উপেক্ষা করেও পাকিস্তানের লাহোরে ওআইসি সম্মেলনে যোগ দেন এবং মুসলিম বিশ্ব ও চীনের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালান। এর ফলস্বরূপই তিনি বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় বাহিনীকে ফেরত পাঠানো, গঙ্গার পানিচুক্তি এবং পাকিস্তানে আটকে পড়া বাংলাদেশীদের নিজ দেশে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন।

জিয়াউর রহমানের শাসনামল : প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন আনয়ন করেন। তিনি সংবিধানের ২৫ অনুচ্ছেদের সাথে ২৫ (২) অনুচ্ছেদ সন্নিবেশ করেন—'রাষ্ট্র ইসলামী সংহতির ভিত্তিতে মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে সম্পর্ক সংহত, সংরক্ষণ এবং জোরদার করতে সচেষ্ট হবে।' তার গতিশীল পররাষ্ট্রনীতির ফলে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের পরিবর্তে গণতান্ত্রিক বিশ্ব ও মুসলিম বিশ্বের দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক জোরদার হয়েছিল। এর ফলে ইসলামী দুনিয়ায়ও বাংলাদেশ স্থায়ী মিত্রশক্তি অর্জনে সক্ষম হয়েছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এবং বাংলাদেশের উন্নয়নে ও দুর্যোগ মোকাবিলায় মুসলিম বিশ্ব সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে সব সময় পাশে দাঁড়াচ্ছে। এছাড়াও জাপান-চীন প্রভৃতি বন্ধুরাষ্ট্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য সহযোগিতা পাওয়া গেছে। ১০ নভেম্বর ১৯৭৮ বাংলাদেশ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছে, ইরান-ইরাক যুদ্ধে মধ্যস্থতা করেছে এবং ফারাক্কা সমস্যা আন্তর্জাতিক ফোরামে উত্থাপন করেছে। জিয়াউর রহমানের পররাষ্ট্রনীতির সবচেয়ে বড় সাফল্য সার্ক-এর চেতনা। অনেক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সার্ক এ অঞ্চলে একশ কোটি মানুষের সামনে অনাগত ভবিষ্যতের সম্ভাবনার স্বপ্ন রচনা করেছে।

এরশাদের শাসনামল : জেনারেল এইচ এম এরশাদ ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ একটি নির্বাচিত সরকারকে বন্দুকের নল ঠেকিয়ে অবৈধভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করেন। তিনি জিয়াউর রহমানের পররাষ্ট্রনীতিকে অনুসরণ করে মুসলিম বিশ্বের সাথে সম্পর্ক গভীর করতে সক্ষম হন। তবে তিনি একই

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

সাথে ভারত-সোভিয়েত, চীন-মার্কিন, পাকিস্তান ও মধ্যপ্রাচ্যের সাথেও বন্ধুত্ব বজায় রেখেছেন। তার সময়েই ১৯৮৫ সালে সার্কের প্রতিষ্ঠা পূর্ণতা লাভ করে। তার সময়ে বাংলাদেশ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতির আসন লাভ করে। ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি প্রদান এবং ইরাকের কুয়েত দখলকে কেন্দ্র করে সৌদি আরব ও যুক্তরাষ্ট্রকে সমর্থন করা এবং তাদের পক্ষে সৈন্য প্রেরণ ছিল বাংলাদেশের স্বার্থ বিবেচনায় এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

খালেদা জিয়ার শাসনামল : বেগম খালেদা জিয়ার শাসনামলে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে একটা অস্বচ্ছ ধোঁয়াটে ভাব পরিলক্ষিত হয়। তার সময়ে বিদেশে শান্তি মিশনে সৈন্য প্রেরণসহ ভারতের সাথে তিন বিঘা সমস্যার সমাধান, পানি চুক্তি আলোচনা এবং পশ্চিমা বিশ্বের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের প্রচেষ্টা প্রভৃতি উদ্যোগ প্রশংসিত হলেও সবই ছিল সীমিত পরিসরে। সুতরাং বলা যায়, খালেদা জিয়ার আমলে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেনি।

শেখ হাসিনার শাসনামল : ১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। ভূ-রাজনৈতিক কারণে ভারতের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কের টানাপোড়েন থাকা সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ সরকার প্রধানত ভারতমুখী পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করে। বাংলাদেশ-ভারত দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ ভারতমুখী পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণের প্রমাণ বহন করে। এক্ষেত্রে প্রথম যাত্রা শুরু হয় জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যপদে জাপানের পরিবর্তে ভারতকে ভোট দেয়ার মাধ্যমে। পরবর্তীতে গঙ্গার পানি চুক্তি ও পার্বত্য শান্তি চুক্তি বর্তমান পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে কাজ করেছে। ১২ ডিসেম্বর ১৯৯৬ ভারতের সাথে ফারাক্কার ন্যায্য হিস্যা প্রাপ্তির লক্ষ্যে ৩০ বছর মেয়াদি পানি চুক্তি সম্পাদিত হয়। এছাড়া ২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ পার্বত্য চট্টগ্রামের বিদ্রোহী উপজাতিদের সাথে সম্পাদিত হয় ঐতিহাসিক পার্বত্য শান্তি চুক্তি। এ চুক্তি স্থাপনের মাধ্যমে একদিকে যেমন দীর্ঘদিনের রক্তক্ষয়ী আঞ্চলিক সমস্যার সুরাহা হয়েছে, তেমনি বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে কুড়িয়েছে বহুল প্রশংসা।

ক্ষমতায় আসার পর শেখ হাসিনার সরকারকে আঞ্চলিক জোট গঠনেও বেশ সক্রিয় দেখা গেছে। ইতোমধ্যে BIMSTEC, উন্নয়ন ত্রিভুজ ও উন্নয়ন চতুর্ভুজ গঠিত হয়েছে। লক্ষ্য করার বিষয় হলো, সবগুলো জোটে ভারত Common factor থাকছে। ১৭ নভেম্বর ১৯৯৯ শেখ হাসিনার সরকারের আমলেই বাঙালি জাতির গর্ব একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে এবং বাংলাদেশ জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যপদ লাভ করে। জাতিসংঘের মিলেনিয়াম সম্মেলন (সাধারণ পরিষদের ৫৫তম অধিবেশনে) ও নিরাপত্তা পরিষদের বিশেষ সম্মেলনে ঐতিহাসিক ভাষণ বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের আসনকে করেছে শক্তিশালী ও সুসংহত। ১২-১৩ নভেম্বর ২০০০ কাতারের রাজধানী দোহায় অনুষ্ঠিত নবম ওআইসি শীর্ষ সম্মেলনে স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বীকৃতির প্রতি বলিষ্ঠ অবস্থান মুসলিম বিশ্বের ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে করেছে মজবুত।

সরকারের পররাষ্ট্র নীতিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য হলো 'অর্থনৈতিক কূটনীতি' বা 'Economic Diplomacy'। সরকার অর্থনৈতিক কূটনীতির ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করেছে। এর ফলে বিভিন্ন দেশ বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে অর্থ বিনিয়োগ করেছে। এতে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে যেমন গতিসঞ্চার হয়েছে, তেমনি সাপটা ও সাফটা বাস্তবায়নে পদক্ষেপ নেয়ায় এতদঞ্চলে বাণিজ্যের প্রসার ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় কৌশলগত অবস্থানের কারণে ১৯৯৯ সালে ডি-৮ সম্মেলন বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয় এবং বাংলাদেশ ডি-৮-এর চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়।

খালেদা জিয়ার শাসনামল : ২০০১ সালের নির্বাচনে বিজয়ী চারদলীয় জোট সরকার আওয়ামী লীগ সরকারের বিগত পাঁচ বছরের পররাষ্ট্রনীতিকে নতুনভাবে বিন্যস্ত করার প্রচেষ্টা চালিয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক জোরদার করার প্রচেষ্টা চালায় এবং এক্ষেত্রে সুস্পষ্টভাবে যা প্রতিভাত হয় তা হচ্ছে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির প্রাচ্যমুখী প্রবণতা। বাংলাদেশের বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে চীন একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। এ সময়ে এ সম্পর্ক আরো জোরদার হয় দু দেশের প্রধানমন্ত্রীর পারস্পরিক সফর বিনিময়ের মাধ্যমে। ২০০২ সালের ১১ জানুয়ারি চীনা প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সফর করেন। এ সময় তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদানের কথা ঘোষণা করেন এবং এ জন্য সাতটি সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। দু দেশের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি ও বন্ধুত্বকে আরো গাঢ় করতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী গত ৫ ডিসেম্বর ২০০২ পাঁচ দিনব্যাপী চীন সফর করেন। এ সফরের মাধ্যমে উভয় দেশ স্ব স্ব জনগণের কল্যাণে পারস্পরিক বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক সম্প্রসারণে একমত হয়।

ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ভারত একটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর। সে কারণে তৎকালীন বাংলাদেশ সরকার মূলত ভারতের সাথে সুসম্পর্কের ওপরই বেশি জোর দিয়েছে।

মিয়ানমার বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রতিবেশী যার সাথে ভৌগোলিক সীমান্ত রয়েছে। দেশটির সাথে দীর্ঘ দিন ধরেই রোহিঙ্গা সমস্যা, সীমান্ত বিরোধ, নাফ নদীতে বাঁধ নির্মাণসহ নানা জটিলতার কারণে সম্পর্ক তেমন ভালো যাচ্ছিল না। কিন্তু ২০০২ সালের ডিসেম্বরে মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীর প্রধান ও প্রধানমন্ত্রী থান শোয়ে বাংলাদেশ সফর করেন এবং দু দেশের মধ্যে একাউন্ট ট্রেড চালু, কোস্টাল শিপিং এবং জয়েন্ট ট্রেড কমিশন গঠনের ব্যাপারে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তাছাড়া রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানের জন্য আলোচনার ব্যাপারেও দু দেশ সম্মত হয়। ফলে দু দেশের মধ্যে সুসম্পর্ক নতুন মাত্রা লাভ করে।

আবার থাইল্যান্ডের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কোন্নয়ন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির একটি বিশেষ দিক। ৮ জুলাই, ২০০২ থাই প্রধানমন্ত্রী থাকসিন সিনাওয়াত্রা বাংলাদেশ সফর করেন। ১২ ডিসেম্বর ২০০২ তিনি আবার সদলবলে বাংলাদেশে আসেন এবং একই বিমানে করে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে নিজ দেশে যান। বাংলাদেশের কূটনীতির ইতিহাসে এটি বিরল ঘটনা। এ সফরের মাধ্যমে থাইল্যান্ড ছয়টি ক্যাটাগরির ১২৮টি বাংলাদেশী পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশের ব্যাপারে সম্মত হয়। তাছাড়া এশিয়ান হাইওয়ের ব্যাপারে সব ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণসহ বাংলাদেশকে আসিয়ানের সদস্যপদ লাভের ব্যাপারেও সমর্থন ও সহায়তা করার ব্যাপারে থাইল্যান্ড সম্মত হয়। ১৭ জানুয়ারি ২০০৪ থাই প্রধানমন্ত্রী থাকসিন সিনাওয়াত্রা ৪ ঘণ্টার এক সংক্ষিপ্ত সফরে ঢাকা আসেন। এ সফরে তিনি পূর্বের ১২৮টি পণ্যের ক্ষেত্রে দেয়া সুবিধার অতিরিক্ত আরো ১০১টি পণ্যের জন্য অনুরূপ সুবিধা দেয়ার আশ্বাস দেন।

২০০৪ সালের ৪ এপ্রিল মিয়ানমারের প্রধানমন্ত্রী জেনারেল খিন নিয়ন্ত তিন দিনের সফরে বাংলাদেশে আসেন। মিয়ানমারের প্রধানমন্ত্রী জেনারেল খিন নিয়ন্ত এবং বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া তিনটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করেন। চুক্তি তিনটি হলো : ১. বাংলাদেশ-মিয়ানমারের মধ্যে সরাসরি সড়ক যোগাযোগ বাস্তবায়ন সমঝোতা চুক্তি। ২. বাংলাদেশ-মিয়ানমারের মধ্যে কৃষি বিষয়ক সহযোগিতা সমঝোতা চুক্তি। এবং ৩. উভয় দেশের মধ্যে ভিসা ফি অব্যাহতি বিষয়ক সমঝোতা চুক্তি। এই চুক্তি তিনটি স্বাক্ষরের মাধ্যমে বাংলাদেশ-মিয়ানমার মৈত্রী সম্পর্ক একটি বাস্তবভিত্তিক শক্ত ভিতের ওপর দিয়ে যাত্রা শুরু করে এবং পারস্পরিক সহযোগিতার নতুন দুয়ার উন্মোচিত হয়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

এ দিকে সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী গো চক তং তিন দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে ২৩ জুন, ২০০৪ ঢাকায় আসেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর সিঙ্গাপুরের কোনো প্রধানমন্ত্রীর এটাই প্রথম বাংলাদেশ সফর। সিঙ্গাপুর বাংলাদেশের পঞ্চম বৃহত্তম অংশীদার।

তাছাড়া ২০০৪ সালে ফিলিপাইনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী, মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডোনাল্ড রামসফেল্ড, জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীসহ বিশ্ব নেতৃবৃন্দের আগমন বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক বৈদেশিক নীতির সাফল্য বহন করে।

এছাড়া তৎকালীন সরকারের আমলে পাকিস্তানের সাথেও বাংলাদেশের সম্পর্কের অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়। পাকিস্তানের সরকারপ্রধান ও সামরিক বাহিনীর প্রধান জেনারেল পারভেজ মোশাররফ বাংলাদেশ সফর করেছেন। তিনি ঢাকায় অবস্থানকালে ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন সংঘটিত ঘটনার জন্য গভীরভাবে দুঃখ প্রকাশ করেন। তার এ সফরের সময় দু দেশের কিছু অমীমাংসিত সমস্যা নিয়েও আলোচনা হয়।

২০০৫ সালে (৭ এপ্রিল) চীনা প্রধানমন্ত্রী ওয়েন জিয়াবাও দু দিনের সফরে বাংলাদেশে আসেন। বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট পল উলফোভিৎজ ২১ আগস্ট ২০০৫ বাংলাদেশে আসেন। অন্যদিকে বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া চীন, জাপান, সিঙ্গাপুর, ভিয়েতনাম, যুক্তরাষ্ট্র, সৌদি আরব প্রভৃতি দেশ সফর করেন এবং বাংলাদেশের বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও বিভিন্ন দেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কোন্নয়নে ভূমিকা রাখেন। তদুপরি ঢাকায় ত্রয়োদশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলন সফলভাবে সম্পন্ন এবং সার্ককে কার্যকর আঞ্চলিক সংস্থায় রূপান্তরে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন।

শেখ হাসিনার শাসনামল (২০০৮-বর্তমান) : ২০০৬ সালের অক্টোবরে খালেদা জিয়া সরকারের মেয়াদ শেষ হলে দীর্ঘ সোয়া দুই বছর দেশ তত্ত্বাধায়ক সরকার দ্বারা পরিচালিত হয়। অতঃপর ২৯ ডিসেম্বর ২০০৮ অনুষ্ঠিত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়ী হয়ে শেখ হাসিনা সরকার পুনরায় দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তার এ শাসনামলে ২০১২ সালে মিয়ানমারের সাথে সমুদ্র বিরোধ নিষ্পত্তি ছাড়াও ২০১৪ সালে ভারতের সাথে বিরোধপূর্ণ ২৫,৬০২ বর্গকিলোমিটারের মধ্যে বাংলাদেশ ১৯,৪৬৭ বর্গকিলোমিটার লাভ করে। ফলে ১,১৮,৮১৩ বর্গ কিলোমিটারের বেশি টেরিটোরিয়াল সমুদ্র ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত অর্থনৈতিক অঞ্চল ও চট্টগ্রাম উপকূল থেকে ৩৫৪ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত মহীসোপানের তলদেশে সব ধরনের প্রাণিজ ও অপ্রাণিজ সম্পদের ওপর বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। প্রতিবেশী দেশ ভারত ও মিয়ানমার এবং রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেনসহ সকল দেশের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে বর্তমানের এ সরকার কাজ করে চলেছে।

উপসংহার : বিগত প্রায় চার দশকে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে অনেক রূপান্তর ঘটেছে। ক্ষমতার বদল, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন এ রূপান্তরের কারণ। এ সময়কালে পররাষ্ট্রনীতির সাফল্য ও ব্যর্থতা দুটোই ছিল। কিন্তু অভ্যন্তরীণ প্রেক্ষাপট পররাষ্ট্রনীতির সফলতার জন্য একটি মৌলিক ফ্যাক্টর। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে না পারলে শক্তিশালী পররাষ্ট্রনীতি নির্মাণ সম্ভব হবে না। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পররাষ্ট্রনীতিকে যেমন সবচেয়ে বেশি কাজে লাগাতে হবে, আবার অর্থনৈতিক অবস্থাটাই পররাষ্ট্রনীতিকে শক্তিশালী করবে। এদিকে নতুন শতাব্দী এসেছে কঠিন চ্যালেঞ্জ নিয়ে। তাই নতুন সময়ের কার্যক্রমের মূল্যায়ন এবং দেশীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বাস্তবতার আলোকে বর্তমান শতকের জন্য উপযোগী পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

০৩। 'সার্ক ও বাংলাদেশ' শিরোনামে একটি নিবন্ধ রচনা করুন। *[৩০তম; ১৫তম বিসিএস]*
***অথবা,* সার্কের প্রতিষ্ঠা, উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম এবং বাংলাদেশের ভূমিকা আলোচনা করুন।**
অথবা,* আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তুতে 'সার্ক' (SAARC)-এর গুরুত্ব ও অর্জন কতটুকু? আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সার্ক (SAARC)-এর আওতায় কি কি করা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন? *[২৯তম বিসিএস]

উত্তর : বর্তমান বিশ্ব সমৃদ্ধি ও আঞ্চলিক সহযোগিতার বিশ্ব। প্রত্যেক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে এক সৌহার্দ্যপূর্ণ অবস্থান তৈরিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। পাশাপাশি বিভিন্ন রাষ্ট্র জোটবদ্ধ হয়ে উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। আর পারস্পরিক কল্যাণ ও আঞ্চলিক সহযোগিতামূলক উদ্দেশ্য নিয়েই সার্ক-এর যাত্রা। অন্যান্য আঞ্চলিক সংস্থা যেমন– আসিয়ান, সিরডাপ, ইইসি, ডি-৮, জি-৮ প্রভৃতি সংগঠনের মতো সার্ক দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সংগঠিত একটি আঞ্চলিক সংস্থা। দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিষ্ঠাকালীন সাত সদস্য দেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমিতে সার্ক প্রতিষ্ঠিত হলেও আফগানিস্তানসহ সার্কের বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৮। প্রস্তাবক এবং প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে সার্কের জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশ এ আঞ্চলিক জোটে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

সার্কের নামকরণ ও সদস্য রাষ্ট্রসমূহ : দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশী সাতটি রাষ্ট্র নিয়ে যে সংস্থাটি গঠিত হয়, তার নামকরণ করা হয় SAARC—South Asian Association for Regional Co-operation. অর্থাৎ দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা। উল্লেখ্য, সার্ক গঠনের পূর্বে এর নামকরণ প্রসঙ্গে ৭টি দেশের পররাষ্ট্র সচিবগণ ৪টি প্রস্তাব করেছিলেন। প্রস্তাবিত নামগুলো হলো : ১. South Asian Association for Co-operation (SAAC), ২. Association for South Asia (ASA), ৩. Association of South Asia for Co-operation (ASAC), ৪. Organization of South Asian States (OSAS)। ১৯৮৫ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম শীর্ষ সম্মেলনে প্রস্তাবিত নামগুলোর কোনোটিই গৃহীত হয়নি। ১৯৮৫ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম শীর্ষ সম্মেলনে সংস্থাটি দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহায়তা (SARC) নামে পরিচিতি লাভ করে। ১৯৮৫ সালের ৭ ও ৮ ডিসেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত শীর্ষ সম্মেলনে নেপালের তৎকালীন রাজা বীরেন্দ্র বিক্রম শাহ দেব SARC-এর বদলে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা বা SAARC নামকরণের প্রস্তাব দেন। পরে ১৯৮৬ সালে ভারতের ব্যাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত শীর্ষ সম্মেলন থেকে এ সংস্থাটি South Asian Association for Regional Co-operation (SAARC) নামে পরিচিত হয়। সার্কের সদস্য আটটি রাষ্ট্র হচ্ছে বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ভুটান, মালদ্বীপ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান। ত্রয়োদশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে আফগানিস্তানকে সার্কের অষ্টম সদস্য পদ দেয়া হয় এবং চীন ও জাপানকে পর্যবেক্ষকের মর্যাদা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সার্কের জন্ম : ১৯৮০ সালে বাংলাদেশের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মরহুম জিয়াউর রহমান দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে একটি আঞ্চলিক সহযোগিতামূলক সংস্থা গঠনের উদ্যোগ নেন। ১৯৮০ সালের মে মাসে তিনি দক্ষিণ এশিয়ার ৭টি দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে একটি আঞ্চলিক সংস্থা গঠনের প্রস্তাব করেন। ১৯৮১ সালের ২১-২৩ এপ্রিল শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বোতে আনুষ্ঠানিকভাবে এ অঞ্চলের ৭টি দেশের পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ১৯৮৩ সালের আগস্ট মাসে এ অঞ্চলের ৭টি দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীগণ দিল্লিতে তাদের প্রথম আনুষ্ঠানিক বৈঠকে মিলিত হন। এ বৈঠকে মন্ত্রিবর্গ একীভূত বা যৌথ কর্মসূচি (Integrated Program of Action) নামে একটি কর্মসূচি

গ্রহণ করেন। এই কর্মসূচির আওতায় সার্কভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সহযোগিতার মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সম্পাদনের জন্য নয়টি ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়। ১৯৮৫ সালের ৭ ও ৮ ডিসেম্বর ঢাকা শীর্ষ সম্মেলনের মাধ্যমে সার্কের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। এর আগেই অবশ্য সার্কের উদ্দেশ্য ও আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কাজকর্ম শুরু হয়ে যায়।

সার্কের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো : সার্ক সনদে এ সংস্থার পাঁচ স্তরবিশিষ্ট একটা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো রয়েছে। সেগুলো হলো :

১. রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানদের শীর্ষ সম্মেলন।
২. পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলন।
৩. স্ট্যান্ডিং কমিটি।
৪. টেকনিক্যাল কমিটি ও
৫. সার্ক সচিবালয়।

সার্কের মূলনীতি

ক. এ সংস্থার যে কোনো সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত হবে।
খ. দ্বিপক্ষীয় বিরোধপূর্ণ বিষয়গুলো এ সংস্থায় তোলা হবে না।
গ. আঞ্চলিক অখণ্ডতা, সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ না করার নীতি এবং পারস্পরিক লাভালাভের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার নীতিকে সহযোগিতার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হবে।
ঘ. এ অঞ্চলের দেশগুলোর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি লক্ষ্য রেখে সার্ক ভূমিকা গ্রহণ করবে।

সার্কের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১. দক্ষিণ এশিয়ার মানুষের জীবন মান উন্নয়ন।
২. এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক উন্নতির ধারা ত্বরান্বিত করা।
৩. দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের জাতীয় আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
৪. এ অঞ্চলের রাষ্ট্রসমূহের সাধারণ স্বার্থে সহানুভূতি ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।
৫. অন্যান্য আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন।

সার্ক সচিবালয়

সার্ক সচিবালয় নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডুতে অবস্থিত। ১৯৮৭ সালের ১৬ জানুয়ারি এটি উদ্বোধন করা হয়। সার্কের বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও মনিটর করা, সংস্থার বিভিন্ন সভায় কার্যকর ভূমিকা পালন করা এবং সার্ক ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করাই সার্ক সচিবালয়ের দায়িত্ব।

একজন সেক্রেটারি জেনারেল, ৭ জন পরিচালক এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়ে সার্ক সচিবালয় গঠিত। সার্কের মহাসচিব ইংরেজি বর্ণমালার ক্রমানুযায়ী দুই বছরের জন্য নিযুক্ত হয়ে থাকেন। তার মনোনয়ন কোনো ক্রমেই এক মেয়াদের বেশি হবে না। সচিবালয়ের পরিচালকগণ সদস্যরাষ্ট্র কর্তৃক মনোনয়নের প্রেক্ষিতে সেক্রেটারি জেনারেল কর্তৃক তিন বছরের জন্য নিযুক্ত হন, যা বিশেষ ক্ষেত্রে সেক্রেটারি জেনারেল আরো একটি পূর্ণ মেয়াদের জন্য বর্ধিত করতে পারেন।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

সার্ক সনদ : ১৯৮৫ সালের ৭-৮ ডিসেম্বরে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় প্রথম সার্ক শীর্ষ সম্মেলন। এ সম্মেলনেই অনুমোদিত হয় সার্ক সনদ। এ সনদের আওতায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে :

ক. দক্ষিণ এশিয়ার জনগণের কল্যাণ সাধন এবং তাদের জীবনের উৎকর্ষ বৃদ্ধি।
খ. এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক বিশ্বাস, সামাজিক প্রগতি এবং সাংস্কৃতিক অগ্রগতি দ্রুততর করা।
গ. দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের যৌথভাবে আত্মনির্ভরশীলতার প্রসার ও শক্তিবর্ধনে সাহায্য করা।
ঘ. পরস্পরের সমস্যা অনুধাবন, পারস্পরিক বিশ্বাস ও বোঝাপড়ায় সাহায্য দান।
ঙ. অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, কারিগরি, বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে সক্রিয় সহযোগিতা এবং পারস্পরিক সাহায্যের পরিস্থিতি সৃষ্টি।
চ. অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের সঙ্গে সহযোগিতা বৃদ্ধি।
ছ. সমজাতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে আন্তর্জাতিক সংগঠনের ক্ষেত্রে নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা প্রসার।
জ. ঐসব লক্ষ্য পূরণের জন্য অন্যান্য আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থাসমূহের সাথে সহযোগিতা সম্পন্ন করা।

সার্কের সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহ : ১৯৮৫ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত সদস্য রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানগণ ১৮ বার শীর্ষ বৈঠকে মিলিত হয়েছেন। সর্বশেষ শীর্ষ বৈঠক হয় ২০১৪ সালের ২৬-২৭ নভেম্বর নেপালের কাঠমাণ্ডুতে।

সার্কের সম্মেলনসমূহ

সম্মেলন	সাল	স্থান	চেয়ারম্যান
প্রথম	৭-৮ ডিসেম্বর ১৯৮৫	ঢাকা, বাংলাদেশ	এইচ এম এরশাদ
দ্বিতীয়	১৬-১৭ নভেম্বর ১৯৮৬	ব্যাঙ্গালোর, ভারত	রাজীব গান্ধী
তৃতীয়	২-৪ নভেম্বর ১৯৮৭	কাঠমাণ্ডু, নেপাল	রাজা বীরেন্দ্র বীরবিক্রম শাহ দেব
চতুর্থ	২৯-৩১ ডিসেম্বর ১৯৮৮	ইসলামাবাদ, পাকিস্তান	বেনজির ভুট্টো
পঞ্চম	২১-২৩ নভেম্বর ১৯৯০	মালে, মালদ্বীপ	মামুন আবদুল গাইয়ুম
ষষ্ঠ	২১-২২ ডিসেম্বর ১৯৯১	কলম্বো, শ্রীলংকা	রানাসিংহে প্রেমাদাসা
সপ্তম	১০-১১ নভেম্বর ১৯৯৩	ঢাকা, বাংলাদেশ	বেগম খালেদা জিয়া
অষ্টম	২-৪ মে ১৯৯৫	নয়াদিল্লি, ভারত	নরসীমা রাও
নবম	১২-১৪ মে ১৯৯৭	মালে, মালদ্বীপ	মামুন আবদুল গাইয়ুম
দশম	২৯-৩১ জুলাই ১৯৯৮	কলম্বো, শ্রীলংকা	চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গা
একাদশ	৪-৬ জানুয়ারি ২০০২	কাঠমাণ্ডু, নেপাল	শের বাহাদুর দেউবা
দ্বাদশ	৪-৬ জানুয়ারি ২০০৪	ইসলামাবাদ, পাকিস্তান	মীর জাফরুল্লাহ খান জামালি
ত্রয়োদশ	১২-১৩ নভেম্বর ২০০৫	ঢাকা, বাংলাদেশ	বেগম খালেদা জিয়া
চতুর্দশ	৩-৪ এপ্রিল ২০০৭	নয়াদিল্লি, ভারত	ড. মনমোহন সিং
পঞ্চদশ	২-৩ আগস্ট ২০০৮	কলম্বো, শ্রীলংকা	মাহিন্দ রাজাপাকসে
ষোড়শ	২৮-২৯ এপ্রিল ২০১০	থিম্পু, ভুটান	জিগমে ওয়াই থিনলে
সপ্তদশ	১০-১১ নভেম্বর ২০১১	আদ্দু সিটি, মালদ্বীপ	মোহাম্মদ ওয়াহিদ হাসান
অষ্টাদশ	২৬-২৭ নভে-২০১৪	কাঠমাণ্ডু, নেপাল	সুশীল কৈরালা

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

১৭তম সার্ক শীর্ষ সম্মেলন ২০১১ : সেতুবন্ধ রচনা

২০১১ সালের ১০-১১ নভেম্বর ১৭তম সার্ক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় মালদ্বীপের আদ্দু শহরে। এ সম্মেলনে ৪টি চুক্তিসহ ২০ দফা আদ্দু ঘোষণা করা হয়।

এক সার্ক এক ভিসা : ১৭তম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে আঞ্চলিক সহযোগিতা ও সম্প্রীতি দৃঢ়করণের লক্ষ্যে সার্কের দেশগুলোর জনগণের মধ্যে ভিসা পদ্ধতি তুলে নিয়ে 'এক সার্ক এক ভিসা' নামের একটি পরিকল্পনা পেশ করে পাকিস্তান।

৪ চুক্তি স্বাক্ষর : ১১ নভেম্বর ২০১১ আটটি দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা ৪টি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এগুলো হলো—সার্ক এগ্রিমেন্ট অন র‍্যাপিড রেসপন্স টু ন্যাচারাল ডিজাস্টারস ⊙ সার্ক এগ্রিমেন্ট অন মাল্টিল্যাটেরাল অ্যারেঞ্জমেন্ট অন রিকগনিশন অব কনফর্মিটি অ্যাসেসমেন্ট ⊙ সার্ক এগ্রিমেন্ট অন ইমপ্লিমেনটেশন অব রিজিওনাল স্ট্যান্ডার্ডস ⊙ সার্ক সিড ব্যাংক এগ্রিমেন্ট।

১৮তম শীর্ষ সম্মেলন : ২০১৪ সালের ২৬-২৭ নভেম্বর সার্কের ১৮তম শীর্ষ সম্মেলন নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনের শেষ দিনে ২৭ নভেম্বর ২০১৪ 'সার্ক ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট ফর এনার্জি কো-অপরারেশন (ইলেকট্রিসিটি)' শীর্ষক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পরে ৩৬ দফা কাঠমান্ডু ঘোষণার মধ্য দিয়ে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘটে। পরবর্তী ১৯তম সার্ক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে ২০১৬ সালে পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে।

চেয়ারপার্সন : সার্কের বর্তমান চেয়ারপার্সন নেপালের প্রধানমন্ত্রী সুশীল কৈরালা। ২৬ নভেম্বর ২০১৪ মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতি আবদুল্লাহ ইয়ামিনের কাছ থেকে তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরবর্তী ১৯তম শীর্ষ সম্মেলনের পূর্ব পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্ব পালন করবেন।

আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচি :

সার্ক বিশ্ববিদ্যালয় : ২০১০ সালের ২৬ আগস্ট ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে শুরু হয় সাউথ এশিয়ান ইউনিভার্সিটি বা সার্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম। সার্কভুক্ত আটটি দেশের ছাত্রছাত্রীরা এ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পাচ্ছেন। প্রথমে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারবেন চার হাজার ছাত্রছাত্রী। পরে অবশ্য শিক্ষার্থীর সংখ্যা সাত হাজারে উন্নীত করা হবে। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অর্ধেক হবেন ভারতীয়। বাকিরা আসবেন সার্কের অন্য সাতটি সদস্য রাষ্ট্র থেকে।

সার্ক মান নিয়ন্ত্রণ সংস্থা (এসএআরএসও) প্রতিষ্ঠা : সার্ক দেশসমূহের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে তোলা তথা পণ্যের আমদানি-রফতানির ক্ষেত্রে পণ্যের মান সকল দেশের কাছে গ্রহণযোগ্য করার লক্ষ্যে অভিন্ন মান নিয়ন্ত্রণ সংস্থা গড়ে তোলার প্রস্তাব দেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং। ১৫তম শীর্ষ সম্মেলনে এ বিষয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান দফতর হবে ঢাকায়। এটি ১২টি পণ্যের মান নির্ণয় করবে। পণ্যগুলো হচ্ছে– সিমেন্ট, ইলেকট্রিকস ক্যাবল, ভেজিটেবল ঘি, ইন্সট্যান্ট নুডলস, চিনি, পাট, টেক্সটাইলস ফ্যাব্রিক্স, স্ট্রাকচারাল স্টিল, স্টিল টিউবস, গ্যালভানাইজড স্টিল, স্কিমড মিল্ক পাউডার ও টয়লেট সোপ।

সন্ত্রাস দমনে তথ্য বিনিময় : সন্ত্রাসবাদ সার্ক অঞ্চলের প্রধান সমস্যা। ইতোমধ্যে প্রায় সব দেশ সন্ত্রাসবাদের শিকার হয়েছে। আঞ্চলিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সন্ত্রাস ও অপরাধ দমনে যৌথ প্রচেষ্টার প্রয়োজন বোধ করে সার্ক দেশগুলো। এজন্য ১৫তম শীর্ষ সম্মেলনে 'এগ্রিমেন্ট অন এ মিউচুয়াল লিগ্যাল এসিস্ট্যান্স ইন ক্রিমিনাল মেটারস' নামক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

বাংলাদেশ ও সার্ক : ১৯৮৫ সালের ৭ ও ৮ ডিসেম্বর ঢাকায় সার্ক-এর প্রথম শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানগণ উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে সাড়া জাগানো এ শীর্ষ বৈঠকে যোগদান করেন। তারা সহযোগিতা ও সমঝোতায় গভীর আগ্রহ প্রকাশ করে তাদের বক্তব্য পেশ করেন। এ শীর্ষ বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন ভুটানের রাজা জিগমে সিংগে ওয়াংচুক, ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজিব গান্ধী, মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মামুন আব্দুল গাইয়ুম, নেপালের প্রেসিডেন্ট বীর বিক্রম শাহদেব, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক এবং শ্রীলংকার প্রেসিডেন্ট জুলিয়াস রিচার্ড জয়বর্ধনে।

ঢাকা ঘোষণা : সার্কের জন্মভূমি ঢাকায় এ যাবত তিনটি শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৮৫ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম শীর্ষ সম্মেলন, ১৯৯৩ সালে সপ্তম শীর্ষ সম্মেলন এবং ২০০৫ সালে ত্রয়োদশ শীর্ষ সম্মেলন ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৮৫ সালে প্রথম সার্ক শীর্ষ সম্মেলন ১৪ দফা ঢাকা ঘোষণার মধ্য দিয়ে সার্কের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। এ ঘোষণায় সাত নেতা আশা ব্যক্ত করেন যে, ঢাকা সম্মেলন ও নবগঠিত সার্ক দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তি, প্রগতি, আস্থা ও বন্ধুত্বের ভিত্তিতে একত্র হয়ে অভিন্ন সমস্যাগুলোর সমাধান এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সমতা ও সুযোগ-সুবিধার অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে একটি ব্যবস্থা গড়ে তোলার অঙ্গীকার। এ লক্ষ্যসমূহ সফল করার উদ্দেশ্যে সাত দেশের শীর্ষ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ মাঝে মাঝে সম্মেলনে মিলিত হবার সম্মতি ব্যক্ত করেন। ঢাকা ঘোষণায় সাত দেশের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানরা রাষ্ট্রগুলোর সার্বভৌম ক্ষমতা, বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা, অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা, অন্য দেশের আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ বা বলপ্রয়োগের হুমকি প্রদর্শন না করা এবং জাতিসংঘ সনদ ও নীতিমালার প্রতি নিষ্ঠাবান থাকার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সব সমস্যার সমাধানে জাতিসংঘই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ফোরাম বলে তারা উল্লেখ করেন। এ ঘোষণায় জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রতি গভীর আস্থা প্রকাশিত হয়। এতে সার্কভুক্ত দেশগুলো আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন ও বিভিন্ন সিদ্ধান্তকে প্রভাবান্বিত করতে সক্ষম হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়। অস্ত্র প্রতিযোগিতার উত্তেজনাকর প্রভাবের কথা উল্লেখ করে আণবিক অস্ত্র তৈরি, পরীক্ষা ও মজুদ করা ইত্যাদি পুরোপুরি বন্ধ করার আহ্বান জানানো হয়। ঢাকা ঘোষণায় বিশ্বের অর্থনৈতিক সংকটে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে দরিদ্র ও অনগ্রসর দেশগুলোর চাহিদা পূরণে আন্তর্জাতিক অর্থ ও কারিগরি প্রতিষ্ঠানগুলোর সহযোগিতা হ্রাসের নীতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় এবং এসবের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সহায়তা প্রদান ও উত্তর-দক্ষিণ আলোচনা পুনরায় শুরু করার আহ্বান জানানো হয়।

ঢাকায় অনুষ্ঠিত সপ্তম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের ঢাকা ঘোষণায় (১৯৯৩) সার্ক তৎপরতার ক্ষেত্রে সমন্বিত কর্মসূচিকে আরো সংহত ও জোরদার করা, পরিবেশ সংরক্ষণ ও অবক্ষয়রোধে জাতীয়, দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। মোট ৬৩ দফা সম্বলিত এই ঘোষণাপত্রে উপরোক্ত বিষয়গুলো ছাড়াও জনসংখ্যা, বাসস্থান, শিশু, যুব, প্রতিবন্ধী, নারীকল্যাণ, বিজ্ঞান ও কারিগরি ক্ষেত্রে সহযোগিতা, ছোট দেশগুলোর নিরাপত্তা, সকল পর্যায়ে যোগাযোগ, আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, সংস্থায় পর্যবেক্ষক পর্যায়ে সদস্যপদ দান বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শিশুদের রক্ষা, তাদের নিরাপত্তা ও উন্নয়নের ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দানের অঙ্গীকার করে সদস্য দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতা সম্প্রসারণের ব্যাপারেও সার্ক নেতৃবৃন্দ একমত হন। দক্ষিণ এশিয়ার যুবসমাজকে জাতীয় উন্নয়নের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে অভিহিত করে ১৯৯৪ সালকে 'সার্ক যুব বর্ষ' ঘোষণার ব্যাপারেও তারা একমত হন।

১৯৯৩ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সপ্তম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে কয়েকটি মূল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও সহযোগিতার পদক্ষেপ নেয়া হয়। এই উদ্দেশ্যে SAPTA (SAARC Preferential Trading Arrangement) চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিতে সদস্যরাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ১০ ভাগ শুল্ক কমানোর কথা বলা হয়েছে। অষ্টম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, ১৯৯৫ সালের ডিসেম্বর থেকে এটি কার্যকর করা হবে। অষ্টম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে আরো কতিপয় জরুরি সহযোগিতার ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে ২০০২ সালের মধ্যে দারিদ্র্য দূরীকরণ। নবম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে ২০০১ সালের মধ্যে SAFTA (South Asian Free Trade Area) গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। দশম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে ৮৪ দফা সম্বলিত ঐতিহাসিক কলম্বো ঘোষণায় ক. আঞ্চলিক সহযোগিতার উন্নয়ন, খ. অর্থনৈতিক সহযোগিতা ত্বরান্বিতকরণ, গ. জনগণের মধ্যে সংযোগ বৃদ্ধি, ঘ. ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহের নিরাপত্তা বিধান, ঙ. সন্ত্রাস ও মাদক চোরাচালান বন্ধ, চ. ৭টি দেশের সার্কভুক্ত অঞ্চলের দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বারোপসহ বিশ্বব্যাপী পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণের আহ্বান জানানো হয়।

২০০৫ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের মধ্য দিয়ে সার্কে নতুন গতি সঞ্চারিত হয়েছে। এ সম্মেলনে আফগানিস্তানকে সার্কের অষ্টম সদস্য এবং চীন ও জাপানকে পর্যবেক্ষকের মর্যাদা দান, ২০০৬-১৫ সালকে 'দারিদ্র্যমুক্ত সার্ক দশক' ঘোষণাসহ ৫৩ দফা ঢাকা ঘোষণা গৃহীত হয়। ঢাকা ঘোষণার প্রধান দফাগুলো—

- আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির অঙ্গীকার।
- সার্ক ডেভেলপমেন্ট গোলস অনুমোদন।
- সার্ক দারিদ্র্য বিমোচন ফান্ড (এসপিএএফ) গঠনের সিদ্ধান্ত।
- সার্ক অর্থমন্ত্রীদের পরবর্তী বৈঠক হবে পাকিস্তানে।
- অর্থমন্ত্রীরা এখন থেকে প্রতি শীর্ষ সম্মেলনের প্রথম ৪ মাসের মধ্যেই বৈঠক করবেন।
- অর্থনীতির গতিশীলতা বৃদ্ধিতে পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ।
- ১ জানুয়ারি থেকে সাফটা কার্যকরের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ।
- সার্ক অঞ্চলে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তার কথা পুনর্ব্যক্ত।
- পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে সার্ক দেশগুলোর মধ্যে ট্রানজিটসহ অন্যান্য বাণিজ্য সুবিধা সৃষ্টির পদক্ষেপ গ্রহণে ঐকমত্য।
- সদস্য দেশগুলোর মধ্যে প্রতিদিন বিমান চলাচল ব্যবস্থা চালুর প্রস্তাব পরীক্ষা করে দেখার সিদ্ধান্ত।
- নন-ট্যারিফ এবং প্যারা-ট্যারিফ বাধা দূরীকরণের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ।
- নারী ও শিশুপাচার রোধে কাজ করে যাওয়ার দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা।
- স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে আঞ্চলিক উদ্যোগ গ্রহণে ঐকমত্য।
- রিজিওনাল এনভায়রনমেন্টাল ট্রিটি করার বিষয়টি বিবেচনায় রাখা হয়েছে।
- সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অঙ্গীকার।
- সদস্য দেশগুলোর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীদের বার্ষিক বৈঠকের সিদ্ধান্ত।
- দেশগুলোর মানুষের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ।
- রাজনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধিতে ঐকমত্য।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

উপসংহার : দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নকামী দেশগুলোর জনগণের সার্বিক উন্নতি সাধন, তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি প্রভৃতি লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় সার্ক। সার্কের মূলমন্ত্র হলো 'সংহতি, সৌহার্দ্য, সহযোগিতা, উন্নয়ন, প্রগতি, সমৃদ্ধি ও শান্তি।' ইতিমধ্যে সার্ক অনেক বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে এ অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি ও সহযোগিতা সৃষ্টিতে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে এসেছে। দক্ষিণ এশিয়ার এসব অঞ্চলের সমস্যা প্রকট কিন্তু আন্তরিক ও সহযোগিতার মনোভাব থাকলে কোনো সমস্যাই অনতিক্রম্য হয়ে উঠতে পারে না। ১৯৮৫ সালে সহযোগিতার আহ্বান জানিয়ে 'ঢাকা ঘোষণা' দিয়ে ঢাকা থেকে সার্কের যে যাত্রা শুরু হয়েছিল মাঝে সার্ক নিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার গণমানুষের মনে নেতিবাচক ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল— সবাই ভাবতে শুরু করেছিল সার্ক অকার্যকর ও স্থবির একটি সংস্থা। কিন্তু না, ত্রয়োদশ শীর্ষ সম্মেলনের মধ্য দিয়ে সার্ক পেয়েছে নতুন গতি। আজ আবার এখান থেকেই এক শক্তিশালী ও কল্যাণকামী সার্কের অগ্রযাত্রা শুরু হোক— এটাই বাংলাদেশসহ সার্ক অঞ্চলের শান্তিপ্রিয় জনগণের প্রত্যাশা।

০৪ ॥ রাষ্ট্রীয় সমুদ্রসীমা কিভাবে নির্ধারিত হয়? সমুদ্র সংলগ্ন উপকূলীয় রাষ্ট্রের সমুদ্র অধিকারগুলো কি কি? এ প্রেক্ষাপটে গভীর সমুদ্রে বাংলাদেশের তেল-গ্যাস সম্পদ প্রতিবেশী দেশ ভারত-মিয়ানমার থেকে কতটুকু নিরাপদ? আলোচনা করুন। *[৩০তম বিসিএস]*

উত্তর : সমুদ্র যেমন পরিবহনের মাধ্যম, তেমনি মানব প্রয়োজনীয় অসংখ্য সম্পদের উৎসও বটে। সমুদ্র প্রকৃতির দান। সমগ্র মানবজাতির রয়েছে এতে অধিকার। সমুদ্র ব্যবহারে অতীতে দুটি বিষয় বিবেচনা হতো। প্রথমত, আঞ্চলিক সমুদ্র ব্যবহার এবং দ্বিতীয়ত, গভীর সমুদ্র ব্যবহার। অতীতে গভীর সমুদ্র সকলের জন্য ছিল অবারিত। কিন্তু পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর দিকে কয়েকটি শক্তিশালী রাষ্ট্র সমুদ্রের বিশাল এলাকার সার্বভৌম কর্তৃত্ব দাবি করত; তা প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হতো। এসব রাষ্ট্রের নৌশক্তি ছিল বৃহৎ (যুক্তরাজ্য, স্পেন, পর্তুগাল)। প্রচলিত কামানের পাল্লানীতিতে তিন মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত সমুদ্রসীমা ব্যবস্থা, উনবিংশ শতাব্দীতে এসে পরিবর্তিত হয়। সমুদ্র সংক্রান্ত সঠিক ব্যবহার নীতি প্রণয়ন হয় ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের হেগ সম্মেলনে। এ সম্মেলনে সমুদ্রের আঞ্চলিক সীমা ৩ নটিক্যাল মাইল নির্ধারণ করা হয়। অতঃপর ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে সমুদ্র সংক্রান্ত কতিপয় আইন প্রণীত হয়। যাতে সমুদ্র এলাকাকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়। এরপর সমুদ্র সংক্রান্ত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও বৈঠকে আঞ্চলিক সমুদ্রের প্রশস্ততা নিয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রের দাবির তালিকা নিয়ে জাতিসংঘ ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে কারাকাসে এবং ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে জেনেভাতে দুটি সম্মেলন করে। ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দের ৬ ডিসেম্বর জ্যামাইকার মনেটাগোবেতে জাতিসংঘের তৃতীয় সম্মেলনে ৩২০ অনুচ্ছেদ সম্বলিত একটি ব্যাপক সমুদ্র বিষয়ক আইনের কাঠামো দাঁড় করানো হয়। পূর্বের সকল আইনের সমন্বয়ের ভিত্তিতে এ আইনে রাষ্ট্রীয় সমুদ্রসীমা নির্ধারণের উপায়, সমুদ্র সংলগ্ন উপকূলীয় রাষ্ট্রের ব্যবহার ও অধিকারের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

রাষ্ট্রীয় সমুদ্রসীমা যেভাবে নির্ধারিত হয় : রাষ্ট্রীয় সমুদ্রসীমা নির্ধারণের প্রক্রিয়া জানার পূর্বে আমাদের জানতে হবে রাষ্ট্রীয় সমুদ্রসীমা কী? রাষ্ট্রীয় সমুদ্রসীমা বলতে আঞ্চলিক কিংবা অভ্যন্তরীণ (নদ-নদী, খাল-বিল, হ্রদ, নদ-নদীর মোহনা ইত্যাদি) জলরাশিকে বোঝায়। এরূপ সমুদ্রসীমা কোনো বিশেষ রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের অধীন। এরূপ রাষ্ট্রীয় সমুদ্র এলাকায় বিদেশী সবরকম জাহাজ বা বিমানের অবারিত অতিক্রমণের অধিকার নেই। রাষ্ট্রীয় সমুদ্রসীমা রাষ্ট্রের উপকূল থেকে মুক্ত সমুদ্রের দিকে নির্দিষ্ট অংশ ও উপকূলবর্তী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রাধীন জলরাশি।

রাষ্ট্রীয় সমুদ্রসীমা নির্ধারণের স্বাভাবিক ভিত্তি রেখা হলো উপকূল বরাবর নিম্ন জলরেখা, যা উপকূলীয় রাষ্ট্র কর্তৃক সরকারিভাবে স্বীকৃত মানচিত্রে চিহ্নিত থাকবে। এ ভিত্তি রেখার অভ্যন্তরস্থ জলসীমা রাষ্ট্রাধীন স্থলভাগের সাথে খুবই ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত থাকবে, যাতে এ জলসীমা সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ জলরাশি সংক্রান্ত শাসনবিধি প্রয়োগের উপযোগী হয়। জাতিসংঘ সনদের ১নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, সকল রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব তার স্থলভাগ এবং অভ্যন্তরীণ জলরাশির বাইরে রাষ্ট্রীয় সমুদ্র বলে অভিহিত এক সমুদ্র বেষ্টনী পর্যন্ত বিস্তৃত। সমুদ্র উপকূলবর্তী রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব আঞ্চলিক সমুদ্রের উপরস্থ বায়ুমণ্ডল এবং আঞ্চলিক সমুদ্রের তলদেশও অন্তঃভূমির ওপর প্রসারিত।

১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে জেনেভাতে সমুদ্র সংক্রান্ত কতিপয় আইন প্রণীত হয়। এ আইনে ৪টি সনদ গৃহীত ও অনুস্বাক্ষরিত হয়। এ সনদ মোতাবেক রাষ্ট্রীয় জলসীমাকে মোট ৪ ভাবে চিহ্নিত করা হয়। যথা :

ক. রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ জলভাগ– নদনদী, খালবিল, হ্রদ।

খ. রাষ্ট্রীয় জলভাগ– আঞ্চলিক সমুদ্রসীমা ১২ নটিকেল মাইল।

গ. রাষ্ট্রীয় জলভাগের বাইরে দূর সমুদ্র– অর্থনৈতিক সমুদ্র এলাকা ২০০ নটিকেল মাইল।

ঘ. মহীসোপান– সমুদ্র তলদেশের ধরন অনুযায়ী সমুদ্র উপকূলীয় এলাকা, যা ৩৫০ নটিকেল মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত।

১৯৮২ খ্রিস্টাব্দের সমুদ্র আইনের অনুচ্ছেদ-৩ অনুযায়ী, সমুদ্রের ভিত্তি রেখা থেকে অনূর্ধ্ব-১২ নটিকেল মাইল পর্যন্ত প্রশস্ত এলাকাই রাষ্ট্রীয় সমুদ্রের সার্বভৌম অঞ্চল। এ অঞ্চলে তার উপকূলীয় রাষ্ট্রের সার্বভৌম কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত। রাষ্ট্র তার তলদেশ, ঊর্ধ্বদেশ যথা ইচ্ছা ব্যবহারে সক্ষম। একটি রাষ্ট্রের সমুদ্র অঞ্চল পরিমাপ করা হয় তার উপকূলীয় রেখা থেকে। এ উপকূলীয় রেখাকে তটরেখা বা ভিত্তি রেখা বলে। যেসব স্থানে উপকূল বরাবর অতি নিকটবর্তী দ্বীপপুঞ্জ রয়েছে সেখানে উপকূলীয় সমুদ্রের সীমানা পরিমাপের জন্য উপকূলীয় উপর্যুক্ত বিন্দুসমূহের মধ্যে সংযোগ করে একাধিক সরলরেখা আঁকার প্রেক্ষিতে তটরেখা নিরূপিত হয়। এ রেখা অভ্যন্তরীণ সমুদ্র এলাকা রাষ্ট্রের এখতিয়ারভুক্ত স্থলভাগের সাথে সংযুক্ত। ভাটার সময় সমুদ্রের যে অংশ পানির ওপর জেগে ওঠে সেখান থেকে ভিত্তি করে রেখা অঙ্কন করা হয় না। এক্ষেত্রে একাধিক অর্থনৈতিক রেখা অঙ্কনান্তে তটরেখা নির্ধারণ করতে হয় যাতে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক স্বার্থ বিঘ্নিত না হয়। বাংলাদেশের তটরেখা ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে এক সরকারি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের উপকূল সমুদ্রের ১০ ফ্যাদম বা ৬০ ফুট গভীরতা তার তটরেখা। আর এ রেখা থেকে ১২ নটিকেল মাইল পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় সমুদ্রসীমা বা অঞ্চল।

সমুদ্র সংলগ্ন উপকূলীয় রাষ্ট্রের সমুদ্র অধিকারসমূহ : জাতিসংঘ সনদ মোতাবেক ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের জেনেভা সনদে সমুদ্র সংলগ্ন উপকূলীয় রাষ্ট্রের সমুদ্র অধিকারগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে। এ অধিকারগুলোকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা :

i) আঞ্চলিক সমুদ্রের ওপর অধিকার।

ii) একচেটিয়া অর্থনৈতিক অঞ্চলের ওপর অধিকার।

iii) কন্টিনেন্টাল সেলফ (মহীসোপান) এর ওপর অধিকার।

নিচে ধারাবাহিকভাবে সমুদ্র সংলগ্ন উপকূলীয় রাষ্ট্রের সমুদ্র অধিকারসমূহ উপস্থাপন করা হলো :

১. উপকূলীয় রাষ্ট্র হোক বা না হোক সকল রাষ্ট্রের আঞ্চলিক সমুদ্রের মধ্য দিয়ে জাহাজের নির্দোষ অতিক্রমণের অধিকার থাকবে।

২. যতক্ষণ পর্যন্ত না অতিক্রমণ উপকূলীয় রাষ্ট্রের শান্তি-শৃঙ্খলা অথবা নিরাপত্তার পক্ষে ক্ষতিকর হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কেবল তা নির্দোষ অতিক্রমণ বলে গণ্য হবে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৩. আঞ্চলিক সমুদ্রে মৎস্য শিকার নিরোধের উদ্দেশ্যে উপকূলীয় রাষ্ট্র কর্তৃক আনীত ও প্রচারিত আইন এবং কোনোরূপ নিয়ম-কানুন পালন না করলে সেক্ষেত্রে বিদেশী মাছ ধরা নৌকার অতিক্রম নির্দোষ বলে বিবেচিত হবে না।

৪. ডুবোজাহাজগুলোকে অবশ্যই জলের উপরিভাগ দিয়ে চলাচল করতে হবে এবং তাদের পতাকা প্রদর্শন করতে হবে।

৫. উপকূলীয় রাষ্ট্র তার আঞ্চলিক সমুদ্রে নির্দোষ অতিক্রমণকে বাধা প্রদান করবে না। উপকূলীয় রাষ্ট্র তার আঞ্চলিক সমুদ্রে জাহাজ চলাচলের পক্ষে কোনো বিপদ সম্পর্কে জ্ঞাত থাকলে সে সম্পর্কে যথাযথ প্রচার করবে।

৬. উপকূলীয় রাষ্ট্র তার আঞ্চলিক সমুদ্রে নির্দোষ নয়, এমন অতিক্রমণ বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

৭. অভ্যন্তরীণ জলরাশির দিকে অগ্রসরমান কোনো জাহাজ কর্তৃক উক্ত জলরাশিতে জাহাজ প্রবেশের শর্তাবলী লঙ্ঘন বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার অধিকারও উপকূলীয় রাষ্ট্রের থাকবে।

৮. উপকূলীয় রাষ্ট্র তার আঞ্চলিক সমুদ্রের কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় বিদেশী জাহাজের নির্দোষ অতিক্রমণ সাময়িকভাবে স্থগিত করতে পারে, যদি সেই রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য তা অত্যাবশ্যক হয়। অনুরূপ স্থগিতকরণ সম্পর্কে যথাযথ প্রচারণার পরই কেবল তা কার্যকর হবে।

৯. কোনো বিদেশী রাষ্ট্রের আঞ্চলিক সমুদ্রে অথবা যেসব প্রণালী উন্মুক্ত সমুদ্রের এক অংশ থেকে অন্য অংশে যাওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক নৌপথ হিসেবে ব্যবহৃত হয়, সেগুলোতে বিদেশী জাহাজের নির্দোষ অতিক্রমণ স্থগিত করা যাবে না।

১০. উপকূলীয় রাষ্ট্রের ভূখণ্ডে কিংবা আঞ্চলিক সমুদ্রে তার বহিঃশুল্ক, রাজস্ব, স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা সম্বন্ধীয় বিধি-বিধান লঙ্ঘন রোধ করতে পারবে। উপকূলীয় রাষ্ট্র তার ভূখণ্ড কিংবা আঞ্চলিক সমুদ্রের অভ্যন্তরে উপরিউক্ত বিধি-বিধানগুলো লঙ্ঘনের জন্য শাস্তি বিধান করতে পারবে।

১১. জেনেভা চুক্তি অনুযায়ী উপকূলীয় রাষ্ট্র উজানে পোতাশ্রয় নির্মাণে বাধা প্রদান করতে পারবে।

১২. অর্থনৈতিক অঞ্চলের ক্ষেত্রে প্রাণী বা প্রাণহীন অন্যান্য সম্পদ অনুসন্ধান, ব্যবহার, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার সার্বভৌম অধিকার প্রত্যেক উপকূলীয় রাষ্ট্রের রয়েছে এবং এক্ষেত্রে প্রাণী সম্পদ সংরক্ষণের জন্য যেরূপ প্রয়োজন, সেরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা অথবা এ ব্যাপারে উপকূলীয় রাষ্ট্রের সাথে সহযোগিতা করা প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই বিশেষ কর্তব্য।

১৩. এরূপ অঞ্চলের ক্ষেত্রে প্রাণিসম্পদের উৎপাদনশীলতা বজায় রাখার ব্যাপারে প্রত্যেক উপকূলীয় রাষ্ট্রের বিশেষ স্বার্থ বা অধিকার রয়েছে।

১৪. একচেটিয়া অর্থনৈতিক অঞ্চলে তার প্রজাগণ মৎস্য শিকারে নিয়োজিত থাকুক বা না থাকুক, উন্মুক্ত সমুদ্রের অনুরূপ এলাকার প্রাণিসম্পদ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যযুক্ত যে কোনো গবেষণা ও নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিতে সমতার ভিত্তিতে অংশগ্রহণের অধিকার প্রত্যেক উপকূলীয় রাষ্ট্রের থাকবে।

১৫. একচেটিয়া অর্থনৈতিক অঞ্চলের সীমারেখা সমুদ্র বক্ষ থেকে ২০০ নটিকেল মাইল বিস্তৃত। এরূপ আঞ্চলিক সমুদ্রের সীমা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে পোতাশ্রয় ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে ব্যবহৃত পোতাশ্রয়ের সর্বাপেক্ষা দূরবর্তী নির্মাণাদি উপকূলের অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

১৬. একচেটিয়া অর্থনৈতিক অঞ্চলে উপকূলীয় রাষ্ট্রের ভূখণ্ডে কিংবা সমুদ্রে তার বহিঃশুল্ক, রাজস্ব, স্বার্থকর ব্যবস্থা সম্বন্ধীয় বিধিবিধান লঙ্ঘন রোধ করার উদ্দেশ্যে অথবা এরূপ বিধিবিধান লঙ্ঘনের জন্য শাস্তি বিধান করার প্রয়োজনে প্রত্যেক উপকূলীয় রাষ্ট্রই আঞ্চলিক সমুদ্রের সংলগ্ন উন্মুক্ত সমুদ্রের নির্দিষ্ট এলাকায় নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রয়োগের বিশেষ অধিকার লাভ করবে।

১৭. একটি উপকূলীয় রাষ্ট্র তার মহীসোপানের ওপর অনুসন্ধান পরিচালনা এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সদ্ব্যবহারের উদ্দেশ্যে সার্বভৌম অধিকার প্রয়োগ করতে পারবে।

১৮. যদি কোনো উপকূলীয় রাষ্ট্র তার মহীসোপানে অনুসন্ধান পরিচালনা অথবা তার প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার না করে, তবুও অন্য কোনো রাষ্ট্র উক্ত উপকূলীয় রাষ্ট্রের সুস্পষ্ট সম্মতি ছাড়া অনুরূপ কাজে হাত দিতে পারে না।

১৯. মহীসোপানের ওপর উপকূলীয় রাষ্ট্রের অধিকারের ফলে উন্মুক্ত সমুদ্র হিসেবে মহীসোপানের ওপরস্থ জলরাশি কিংবা উক্ত জলরাশির ওপরস্থ বায়ুমণ্ডলের আইনগত মর্যাদা প্রভাবিত হবে না।

২০. মহীসোপানের ওপর কোনো উপকূলীয় রাষ্ট্রের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কোনোরকম কার্যকর দখল কিংবা আনুষ্ঠানিক দখল অথবা অন্য কোনোরূপ প্রকাশ্য ঘোষণার প্রয়োজন হয় না।

বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা বিরোধ নিষ্পত্তি : মিয়ানমার-ভারত দুই দেশের সাথেই রয়েছে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা। এই সমুদ্রসীমা বিরোধের সূত্রপাত ১৯৭৪ সাল থেকে। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ 'দি টেরিটোরিয়াল ওয়াটার অ্যান্ড ম্যারিটাইম জোনস অ্যাক্ট ১৯৭৪' নামে একটি আইন পাস করে। আইনের ৩ ধারায় বাংলাদেশের সরকারকে গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় স্থলভাগের পর রাষ্ট্রীয় সমুদ্র অঞ্চল ঘোষণার ক্ষমতা প্রদান করা হয়। পরে নোটিফিকেশন অনুযায়ী বাংলাদেশ ১২ নটিক্যাল মাইল টেরিটোরিয়াল সি এবং তার সাথে আরো ৬ নটিক্যাল মাইল কন্টিজিয়াস জোন দাবি করে। বাংলাদেশ বেজলাইন থেকে ২০০ নটিক্যাল মাইল এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক জোনও দাবি করে। তখন ভারত ও মিয়ানমার বাংলাদেশের ঘোষিত বেজলাইন বা ভিত্তিরেখা ও সমুদ্র অঞ্চলের দাবির বিষয়ে বিরোধিতা করে।

১. **মিয়ানমারের সাথে নিষ্পত্তি :** মিয়ানমারের সাথে সমুদ্রসীমা বিরোধ নিরসনে ১৯৭৪ সালে আলোচনায় একটা অগ্রগতি ঘটে। সে সময় ১২ নটিক্যাল মাইল সমুদ্রসীমা নির্ধারণে বাংলাদেশ ও মিয়ানমার মতৈক্যে পৌঁছে। তবে কোনো আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তি হয়নি। এরপর ১৯৭৫ থেকে ১৯৮৬ সালের মধ্যে সাত-আটবার আলোচনা হয়েছে, কিন্তু কোনো অগ্রগতি হয়নি। এরপর নতুন করে আলোচনা শুরু হয় ২০০৮ সালে। সমুদ্র নিয়ে ২০০৮ সালের ৩১ মার্চ থেকে ২ এপ্রিল ঢাকায় এবং ৪ থেকে ৬ সেপ্টেম্বর ইয়াঙ্গুনে দুই দেশের কারিগরি পর্যায়ের বৈঠক হয়। বৈঠকে উভয় দেশ ১৯৭৪ সালের এডহক সম্মতিপত্র অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ নৌসীমানা সংক্রান্ত দু'দেশের ভৌগোলিক সীমারেখা স্পষ্টকরণে সক্ষম হয়। তবে সামুদ্রিক সীমারেখার ব্যাপারে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে মতবিরোধ থেকেই যায়। পরবর্তীতে বাংলাদেশের সাথে দ্বিপক্ষীয় আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে মিয়ানমার সালিশ থেকে বিষয়টি প্রত্যাহার করে ITLOS-এর মাধ্যমে নিষ্পত্তি প্রস্তাব করে। সে অনুযায়ী ২০০৯ সালের ১৪ ডিসেম্বর সমঝোতার ভিত্তিতে ITLOS-এ মামলা করে মিয়ানমার ও বাংলাদেশ। এরপর ২০১০ সালের ১ জুলাই বাংলাদেশ এবং ঐ বছরই ১

ডিসেম্বর মিয়ানমার নিজেদের দাবির পক্ষে নথিপত্র জমা দেয়। ২০১১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দুই দফায় শুনানি হয়। প্রথম দফায় বাংলাদেশের মৌখিক শুনানি ৮ সেপ্টেম্বর শুরু হয়ে ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলে। আর ১৫ থেকে ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মিয়ানমারের বক্তব্য শোনে ট্রাইব্যুনাল। ২১ সেপ্টেম্বর থেকে ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দ্বিতীয় দফায় আবারো বাংলাদেশ তার যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করে। মিয়ানমার ২৪ ও ২৫ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় দফায় তার বক্তব্য তুলে ধরে। এরপর আদালত ১৪ মার্চ ২০১২ চূড়ান্ত রায় প্রদান করে।

২. **ভারতের সাথে নিষ্পত্তি :** বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সমুদ্রসীমা নিয়ে বিরোধ নিষ্পত্তির আলোচনা শুরু হয় ১৯৭৪ সালে। এরপর প্রায় আড়াই দশক দু'দেশের মধ্যে এ আলোচনা থেমে থাকে। দীর্ঘ বিরতিতে সমুদ্রসীমা বিরোধের আলোচনা পুনরায় শুরু হয় ২০০৮ সালের শুরুতে। কিন্তু কোনো রকম অগ্রগতি না হওয়ায় সালিশি আদালতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় বাংলাদেশ। ৮ অক্টোবর ২০০৯ ভারতের সাথে সমুদ্রসীমা নিয়ে বিরোধ নিষ্পত্তিতে নেদারল্যান্ডস-এর দি হেগ শহরে অবস্থিত স্থায়ী সালিশি আদালতে (PCA) আবেদন করে বাংলাদেশ। পরবর্তীতে জুলাই ২০১২ ভারত লিখিতভাবে পাল্টা যুক্তি উপস্থাপন করে। এর পর ৩১ জানুয়ারি ২০১৩ কাউন্টার মেমোরিয়াল বা যুক্তি তুলে ধরে বাংলাদেশ। ভারত তাদের শেষ লিখিত যুক্তি উপস্থাপন করে ৩১ জুলাই ২০১৩। এরপর ৯-১৮ ডিসেম্বর ২০১৩ স্থায়ী সালিশি আদালতে মামলার চূড়ান্ত শুনানি হয়। ৭ জুলাই ২০১৪ স্থায়ী সালিশি আদালত বাংলাদেশ ও ভারতের সমুদ্রসীমা নির্ধারণ বিষয়ক রায় আনুষ্ঠানিকভাবে দু'দেশের কাছে হস্তান্তর করে। নিয়ম অনুযায়ী, পরদিন ৮ জুলাই ২০১৪ তা প্রকাশ করা হয়।

বাংলাদেশের অর্জন : ভারত ভারত ও মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা নির্ধারণের রায়ের ফলে বাংলাদেশ এক বিপুল অঞ্চলে তার পূর্ণ অধিকার ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। রায় অনুযায়ী দুই দেশের মধ্যে বঙ্গোপসাগরের বিরোধপূর্ণ ২৫,৬০২ বর্গ কিলোমিটারের মধ্যে বাংলাদেশ পাবে ১৯,৪৬৭ বর্গ কিলোমিটার আর ভারত পাবে ৬,১৩৫ বর্গ কিলোমিটার। এ রায়ের ফলে ১,১৮,৮১৩ বর্গ কিলোমিটারের বেশি টেরিটোরিয়াল সমুদ্র, ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত অর্থনৈতিক অঞ্চল ও চট্টগ্রাম উপকূল থেকে ৩৫৪ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত মহীসোপানের তলদেশে অবস্থিত সবধরনের প্রাণিজ ও অপ্রাণিজ সম্পদের ওপর বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

গভীর সমুদ্রে বাংলাদেশের তেল-গ্যাস সম্পদ প্রতিবেশী দেশ ভারত-মিয়ানমার থেকে যতটুকু নিরাপদ : গভীর সমুদ্রে বাংলাদেশের তেল-গ্যাস সম্পদ প্রতিবেশী দেশ ভারত-মিয়ানমার থেকে খুব বেশি নিরাপদ নয়; বরং হুমকির মুখে। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১. **বাংলাদেশের সমুদ্রের তেল-গ্যাসের প্রতি ভারত-মিয়ানমারের লোলুপদৃষ্টি :** বঙ্গোপসাগরে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের ব্যাপারে বাংলাদেশকে বাইরে রেখে ভারত ও মিয়ানমারের মধ্যে গড়ে উঠেছে অশুভ এক আঁতাত। বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারের উদাসীনতা ও নিষ্ক্রিয়তার কারণে বঙ্গোপসাগরের প্রতিবেশী ভারত ও মিয়ানমার অনেক আগেই তেল-গ্যাস অনুসন্ধান কাজ শুরু করে। ১৯৭৪ সালে বিদেশী কোম্পানির মাধ্যমে গভীর সমুদ্রে অনুসন্ধানের উদ্যোগ নেয়া হলে ভারত সমুদ্রসীমা নিয়ে আপত্তি উত্থাপন করে। বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো এরূপ হোঁচট খেলেও পরবর্তীতে কোনো সরকার গভীর সমুদ্রে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান বা সমুদ্রসীমা নির্ধারণ বা সমুদ্র সম্পদ আহরণ এর কোনোটির দিকেই তেমন নজর দেয়নি। বর্তমানে সমুদ্রসীমা বিরোধ নিষ্পত্তির ফলে সরকারকে এ বিষয়ে নজর দিতে হবে।

২. **সমুদ্র সম্পদ সংরক্ষণ সরকারের করণীয় :** সমুদ্রসীমা বিরোধ নিষ্পত্তির পূর্বে বাংলাদেশ সমুদ্র তলদেশের সম্পদ আহরণে কোনো উদ্যোগ নিতে পারেনি। বর্তমানে বিরোধ নিষ্পত্তির প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সে বাধা দূরীভূত হয়েছে। তাই সমুদ্র সম্পদ সংরক্ষণ সরকার সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করতে পারবে। এ জন্য সরকারকে সমুদ্রসীমা সুরক্ষিত রাখতে পার্শ্ববর্তী দেশের সাথে কূটনীতিক সুসম্পর্ক বজায় রাখার পাশাপাশি সার্বভৌমত্ব রক্ষায় শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে। এছাড়াও মহীসোপানের তলদেশে অবস্থিত সবধরনের প্রাণিজ ও অপ্রাণিজ সম্পদের যথাযথ ব্যবহারে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

উপসংহার : আগামী দিনে ভূমি এবং পানি সম্পদই হবে প্রতিটি জাতির নিরাপত্তা এবং স্বাধীন অস্তিত্ব নিয়ে টিকে থাকার মূল অবলম্বন। বাংলাদেশ একদিকে আন্তর্জাতিক নদ-নদীগুলোর পানির ন্যায্য হিস্যা থেকে বঞ্চিত হলেও, আঞ্চলিক মিত্রদের স্বার্থপরতা ও একপেশে মনোভাবের সাথে প্রতিযোগিতায় জয়ী সমুদ্র সীমায় নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে। এগুলো বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের বিষয়। এসব বিষয়ে দেশের রাজনৈতিক শক্তিগুলোর মধ্যে বৃহত্তর জাতীয় ঐকমত্য গড়ে ওঠা প্রয়োজন। আমাদের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে প্রতিবেশী দেশগুলো দ্বিপাক্ষিক বিরোধ জিইয়ে রেখে ফায়দা হাসিলের চেষ্টা করবে। এ চেষ্টা সফল হতে দেয়া যাবে না। মিয়ানমারের ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব এবং সম্ভাবনাময় প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নিজেদের প্রভাব তৈরি করতে গিয়ে যেখানে চীন-ভারত নীরব প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে, সেখানে বাংলাদেশের সমুদ্র সম্পদ রক্ষায় বাংলাদেশকে আরো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

০৫ । বাংলাদেশ-মিয়ানমার সমুদ্রসীমা নির্ধারণী মামলার রায়ের প্রেক্ষাপটের বিবরণ দিন এবং এ মামলার রায় বিশ্লেষণ করুন।

উত্তর : বিগত ১৪ মার্চ ২০১২ জার্মানির হামবুর্গস্থ আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইনবিষয়ক ট্রাইব্যুনাল তথা ইটলস কর্তৃক বঙ্গোপসাগরের বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যকার দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত সমুদ্রসীমা চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হয়েছে। এ রায় কেবল বাংলাদেশের জন্যই নয়; বরং আন্তর্জাতিক আইনের ইতিহাসেও একটি মাইলফলক। ঐতিহাসিক এ রায়ে অর্জিত বাংলাদেশের নতুন সমুদ্র সীমায় তেল-গ্যাসের সন্ধান পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে বিশেষজ্ঞ মহল ধারণা করছে।

মানবসভ্যতার বিবর্তনে সমুদ্র : সমুদ্র ঐতিহাসিক কাল থেকেই মানবসভ্যতার বিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। যোগাযোগ ও ব্যবসা বাণিজ্যের অন্যতম মাধ্যম ছাড়াও জানা-অজানা বিপুল সম্পদের আধার হিসেবেও সমুদ্র বরাবরই জাতিসমূহের বিরোধের কারণ হিসেবে পরিচিত থেকেছে। সমুদ্রের গুরুত্ব উপলব্ধি করেই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এ বিষয়ে সহযোগিতার ক্ষেত্র সম্প্রসারণ এবং বিরোধের সম্ভাবনা সংকোচনের প্রয়াস দীর্ঘকাল ধরে চলে এসেছে। এ প্রয়াসের সাফল্য হিসেবে ১৯৮২ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইন কনভেনশন তথা আনক্লস গৃহীত হয়। এর পূর্বেও রাষ্ট্রসমূহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক এ দ্বিপাক্ষিক চুক্তির সহায়তায় সমুদ্র এলাকা নিয়ে তাদের পারস্পারিক বিরোধ নিষ্পন্ন করেছে এবং নিজস্ব সমুদ্র এলাকা সুনির্দিষ্টকরণের মাধ্যমে সমুদ্রসম্পদের সদ্ব্যবহার করে নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করেছে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

সমুদ্র সীমানা নির্ধারণে বাংলাদেশের প্রয়োজনীয়তা : বাংলাদেশ বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী একটি দেশ; সে হিসেবে সমুদ্রে এদেশের জনগণের নানাবিধ স্বার্থ জড়িত। সমুদ্রসীমা নির্ধারণে বাংলাদেশের প্রয়োজনীয়তা নিচে উল্লেখ করা হলো :

১. **বিরোধ নিরসন :** বাংলাদেশ ছাড়াও বঙ্গোপসাগরে ভারত ও মিয়ানমারের অংশীদারিত্ব রয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে পূর্বে বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের সীমানা নির্ধারিত ছিল না। ফলে সমুদ্রের সীমা নিয়ে বাংলাদেশের সাথে ভারত ও মিয়ানমারের বিরোধ ছিল এক অনিবার্য বাস্তবতা। এ বিরোধ নিরসনের লক্ষ্যেই বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা নির্ধারণ করা আবশ্যক ছিল।

২. **সমুদ্রাঞ্চলে নিরঙ্কুশ অধিকার প্রতিষ্ঠা :** ভারত ও মিয়ানমারের সাথে সম্মতির ভিত্তিতে সীমানা নির্ধারণ ব্যতিরেকে সমুদ্রাঞ্চলে বাংলাদেশের নিরঙ্কুশ অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। সুতরাং সঙ্গত কারণেই বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা নির্ধারণ করা আবশ্যক ছিল।

৩. **সমুদ্র সম্পদ আহরণ :** সীমানা নির্ধারিত না থাকার ফলে বিগত চার দশক যাবত বাংলাদেশের জনগণ সমুদ্রতলদেশের সম্পদ (যেমন– তেল, গ্যাস) আহরণে কোনো উদ্যোগ নিতে পারেনি। এছাড়া সুনির্দিষ্ট সীমানার অভাবে এ দেশের জেলে সম্প্রদায় যেমন মৎস্য আহরণে বাধার সম্মুখীন হয়েছে, তেমনি আমাদের মৎস্য সম্পদ অন্য দেশের জেলেরা অবাধে শিকার করেছে। তাই বাংলাদেশের স্বার্থ রক্ষার জন্যই বঙ্গোপসাগরে সমুদ্রসীমা নির্ধারণ অধিক জরুরি ছিল।

বাংলাদেশ-মিয়ানমার সমুদ্রসীমা নির্ধারণী মামলার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট : নিচে বাংলাদেশ-মিয়ানমার সমুদ্রসীমা নির্ধারণী মামলার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আলোচনা করা হলো :

১. **বাংলাদেশ আঞ্চলিক পানি ও সমুদ্র অঞ্চল আইন প্রণয়ন :** বঙ্গোপসাগরে বহুমাত্রিক বিশাল সম্ভাবনার কথা বিবেচনায় রেখে তৎকালীন মুজিব সরকার 'বাংলাদেশ আঞ্চলিক পানি ও সমুদ্র অঞ্চল আইন ১৯৭৪' (দি টেরিটোরিয়াল ওয়াটারস এ্যান্ড মেরিটাইম জোনস এ্যাক্ট) প্রণয়ন করেন, যার মাধ্যমে একটি গভীরতা ভিত্তিক বেস লাইন নির্ধারণ, ২০০ নটিক্যাল মাইল অর্থনৈতিক অঞ্চল ঘোষণা এবং কন্টিনেন্টাল মার্জিন পর্যন্ত মহীসোপান ঘোষণা করা হয়।

২. **সম্মত কার্যবিবরণী :** ১৯৭৪ সালে সর্বপ্রথম প্রতিবেশী দেশসমূহের সঙ্গে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা নির্ধারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে ১২ নটিক্যাল মাইল অবধি রাষ্ট্রাধীন সমুদ্র এলাকায় সীমানা নির্ধারণে একটি 'সম্মত কার্যবিবরণী' গৃহীত হয়। উক্ত কার্যবিবরণী মোতাবেক বাংলাদেশের সেন্ট মার্টিনস দ্বীপ এবং মিয়ানমারের মূল ভূখণ্ডের মধ্যে সমদূরত্ব পদ্ধতির ভিত্তিতে একটি সীমানারেখা অঙ্কন করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত কার্যবিবরণীটিকে আর চুক্তিতে রূপান্তর করা হয়নি।

৩. **শেখ হাসিনা সরকারের উদ্যোগ :** বঙ্গোপসাগরে তেল গ্যাস প্রাপ্তির সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুপ্রতিম রাষ্ট্র মিয়ানমারের সঙ্গে সমুদ্রসীমা নিয়ে বিরোধ দেখা দিলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার এ বিষয়ের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। সমুদ্র সম্পর্কিত জটিল বিষয়াদি সমাধানের জন্যে তিনি তার প্রজ্ঞা দিয়ে দ্বিপাক্ষিক এবং বহুপাক্ষিক পর্যায়ে সাহসী উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বিগত সময়ে তার সরকার ২০০১ সালের জুলাই মাসে জাতিসংঘের সমুদ্র আইন সম্পর্কিত কনভেনশন তথা আনক্লস-১৯৮২ অনুসমর্থন করে যা বাংলাদেশকে বঙ্গোপসাগরে এদেশের আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি জাতিসংঘের মহীসোপান নির্দিষ্টকরণ সম্পর্কিত কমিশনে (ইউএনসিএলসিএস) পেশ করতে সক্ষম হয়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৪. **বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা সংকোচন :** সমদূরত্ব পদ্ধতিতে বাংলাদেশ-মিয়ানমার এবং বাংলাদেশ-ভারত সীমানা রেখা অঙ্কন করা হলে পূর্ব ও পশ্চিম দিকের সীমানারেখাদ্বয় একটি ত্রিকোণাকৃতি সমুদ্রাঞ্চল তৈরি করে এবং বাংলাদেশকে ১৩০ নটিক্যাল মাইলের মধ্যে আবদ্ধ করে দেয়। ফলে ২০০ নটিক্যাল মাইল অবধি একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল পর্যন্ত এবং এর বাইরে মহীসোপান এলাকায় বাংলাদেশের প্রবেশ অসম্ভব হয়ে পড়ে।

৫. **পাল্টাপাল্টি প্রস্তাব :** বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা সংকোচনের কারণে আনক্লস ১৯৮২-এর অনুচ্ছেদ ৭৪ এবং ৮৩ অনুসরণে বঙ্গোপসাগরের অনুপম ভৌগোলিক ও ভূতাত্ত্বিক বিষয়গুলো আমলে নিয়ে ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তিতে এটি সমাধানের জন্য বাংলাদেশ সমদূরত্বের পরিবর্তে বিকল্প কোনো পদ্ধতি অনুসরণের জন্য সকল দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় প্রস্তাব রাখে। অপরদিকে, ভারত ও মিয়ানমার এই ধরনের বিষয়গুলোকে বিবেচনায় আনতে অস্বীকার করে এবং "কঠোর সমদূরত্ব প্রক্রিয়া" অনুসরণের ওপর তাদের প্রস্তাব অব্যাহত রাখে।

৬. **বাংলাদেশের মহীসোপান এলাকা দাবি ও বিভক্তিকরণ :** আনক্লসের ৭৬ অনুচ্ছেদ মোতাবেক জাতিসংঘের নিকট প্রদত্ত বাংলাদেশের বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশ বঙ্গোপসাগরের তলদেশে ২০০ নটিক্যাল মাইলের উর্ধ্বে বিশাল মহীসোপান এলাকায় নিজস্ব দাবি প্রতিষ্ঠায় সক্ষম। বাংলাদেশের স্বার্থ হুমকির মুখে পড়ে যখন ভারত ও মিয়ানমার জাতিসংঘের নিকট তাদের মহীসোপানের দাবি পেশ করে এবং উভয় দেশের দাবি পর্যালোচনা করে দেখা যায়, দেশ দুটি বাংলাদেশের সমুদ্র এলাকা ২০০ মাইলের অনেক পূর্বেই অবরুদ্ধ হয়ে পড়বে এই ধারণা থেকে বাংলাদেশের দাবিকৃত মহীসোপান এলাকা নিজেদের মাঝে ভাগ করে নেয়।

৭. **সালিশ নিষ্পত্তির নোটিশ :** সরকার দ্রুত গতিতে বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ২০০৯ সালের ৮ অক্টোবর আনক্লস-১৯৮২ এর অধীনে ভারত ও মিয়ানমারকে সালিশ-নিষ্পত্তির নোটিশ দেয়। উভয় প্রতিবেশী দেশ এই সালিশী প্রক্রিয়ার অনুকূলে ইতিবাচকভাবে সাড়া দেয়। তবে আলোচনার দুয়ারও খোলা থাকে। সালিশ-নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণের পর মিয়ানমারের প্রস্তাব ও বাংলাদেশের সম্মতিতে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যকার মামলাটি আনক্লস এর আওতায় প্রতিষ্ঠিত ও জার্মানির হামবুর্গে অবস্থিত স্থায়ী বিচারিক প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল ট্রাইব্যুনাল ফর দি ল অফ দি সি (ইটলস) এ প্রেরণ করা হয়।

৮. **চূড়ান্ত রায় :** মামলায় লিখিত আরজি দাখিলের পর (বাংলাদেশের মেমোরিয়াল ও জবাব এবং মিয়ানমারের কাউন্টার মেমোরিয়াল ও প্রত্যুত্তর দেয়ার পর) ২০১১ সালের ৮ থেকে ২৪ সেপ্টেম্বর সমন্বিত ও দীর্ঘ মৌখিক শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। লিখিত ও মৌখিক কার্যবিবরণী ওয়েবসাইটে (www.itlos.org) দেয়া হয়। চূড়ান্ত রায় দেয়া হয় ১৪ মার্চ ২০১২ সালে।

৯. **মামলায় বাংলাদেশের এজেন্ট :** তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডা. দীপু মনি (এম.পি.) উক্ত মামলাসমূহে বাংলাদেশের এজেন্ট হিসেবে কাজ করেন। তিনি ডেপুটি এজেন্ট রিয়ার এডমিরাল (অব.) মোঃ খুরশেদ আলম-সহ একটি উল্লেখযোগ্য লিগ্যাল টিমের নেতৃত্ব দেন, যাতে আইনজীবী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যুক্তরাজ্যের জেমস ক্রফোর্ড, ফিলিপ স্যান্ডস ও অ্যালান বয়েল, যুক্তরাষ্ট্রের পল রাইখলার ও লরেন্স মার্টিন এবং কানাডার পায়াম আখাভান প্রমুখ।

বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মাঝে সমুদ্রসীমা বিভক্তিকরণ : বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে সমুদ্রসীমা নির্দিষ্ট করার জন্য একে তিনটি অংশে বিভক্ত করা হয়। প্রথমটি হচ্ছে ১২ নটিক্যাল মাইল অবধি দুপক্ষের রাষ্ট্রাধীন সমুদ্রের সীমা নির্ধারণ, দ্বিতীয়টি ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত তাদের একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল ও মহীসোপানের সীমা নির্ধারণ এবং তৃতীয়টি হচ্ছে ২০০ নটিক্যাল মাইলের বাইরে মহীসোপানের সীমা নির্ধারণ করা। বাংলাদেশ তিনটি অংশেই সীমানা নির্ধারণের জন্য ট্রাইব্যুনালের নিকট আবেদন করে। অপরদিকে মিয়ানমার ১২ নটিক্যাল মাইল অবধি রাষ্ট্রাধীন সমুদ্র এবং ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল ও মহীসোপানের সীমা নির্ধারণের জন্য ট্রাইব্যুনালের নিকট আবেদন করে। ২০০ নটিক্যাল মাইলের বাইরে মহীসোপানে সীমানা নির্ধারণের বিষয়ে মিয়ানমার ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ার নিয়ে আপত্তি উত্থাপন করে।

ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক বিবেচ্য বিষয়সমূহ : ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক বিবেচ্য বিষয়সমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

ক. **সমদূরত্ব পদ্ধতি মোতাবেক সমুদ্র সীমা নির্ধারণ :** আনক্লসের অনুচ্ছেদ ১৫ অনুযায়ী ১২ নটিক্যাল মাইল রাষ্ট্রাধীন সমুদ্র এলাকায় ১৯৭৪ সালের সম্মত কার্যবিবরণী মোতাবেক অথবা সমদূরত্ব পদ্ধতি (বিশেষ অবস্থা বা ঐতিহাসিক স্বত্ব বিবেচনা সাপেক্ষে) মোতাবেক সমুদ্র সীমা নির্ধারণ।

খ. **অর্থনৈতিক অঞ্চল ও মহীসোপানের ন্যায়পরতা ভিত্তিক সমুদ্রসীমা নির্ধারণ :** আনক্লসের অনুচ্ছেদ ৭৪ অনুযায়ী ২০০ নটিক্যাল মাইল অবধি একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল ও মহীসোপানে ন্যায়পরতা নিশ্চিত করে সমুদ্রসীমা নির্ধারণ। এক্ষেত্রে সাধারণত অস্থায়ী একটি সীমানারেখা অংকন করে ন্যায়পরতা নিশ্চিতকরণের স্বার্থে ভৌগোলিক ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় বিবেচনা সাপেক্ষে তা পরিমার্জন করা হয়ে থাকে।

গ. **২০০ নটিক্যাল মাইলের বাইরে আইনগত ভিত্তি আছে কিনা :** আনক্লসের ৭৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জাতিসংঘের মহীসোপানের সীমা নির্ধারক কমিশন কর্তৃক সুপারিশ প্রদানের পূর্বে উক্ত এলাকায় সীমানা নির্ধারণের এখতিয়ার রয়েছে কিনা তা নির্ধারণ এবং বাংলাদেশের সমুদ্র এলাকা ২০০ নটিক্যাল মাইলের বাইরে আদৌ সম্প্রসারিত করার আইনগত ভিত্তি রয়েছে কিনা তা নির্ধারণ।

ঘ. **সম্প্রসারিত মহীসোপানের ন্যায়পরতা ভিত্তিক সীমা নির্ধারণ :** এখতিয়ার সংক্রান্ত আপত্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সাপেক্ষে আনক্লসের অনুচ্ছেদ ৮৩ অনুযায়ী ২০০ নটিক্যাল মাইলের বাইরে সম্প্রসারিত মহীসোপানে ন্যায়পরতা নিশ্চিত করে সমুদ্রসীমা নির্ধারণ।

ঙ. **বণ্টনকৃত এলাকা সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা :** সবশেষে উভয় দেশের প্রাসঙ্গিক উপকূল নির্ধারণ করে বণ্টনকৃত সমুদ্র এলাকার সাথে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা নির্ধারণ।

ইটলস-এর রায় : বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে একক সমুদ্রসীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সীমানা নির্ধারণ সংক্রান্ত সাম্প্রতিক মামলাগুলোর গতিধারা অনুসরণ করে ইটলস নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে রায় প্রদান করে :

১. **রাষ্ট্রাধীন সমুদ্রে সীমানা নির্ধারণ :** রাষ্ট্রাধীন সমুদ্রে সীমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও মিয়ানমার পৃথক পৃথক দাবি উপস্থাপন করে। উভয়ের দাবি পর্যালোচনা করে ট্রাইব্যুনাল রায় দেয়। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

ক. **বাংলাদেশের দাবি :** বাংলাদেশ ১২ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত সমুদ্রে সীমানা নির্ধারণের জন্য দুটি বিকল্প প্রস্তাব দেয়, ১৯৭৪ সালে সম্মত কার্যবিবরণী অনুযায়ী অথবা সেন্ট মার্টিনস দ্বীপকে ১২ নটিক্যাল মাইল বরাদ্দ দিয়ে সমদূরত্ব রেখার ভিত্তিতে সীমা নির্ধারণ।

খ. **মিয়ানমারের দাবি :** মিয়ানমার ১৯৭৪ সালের সম্মত কার্যবিবরণীকে একটি বাধ্যতামূলক চুক্তি হিসেবে মানতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। মিয়ানমার বাংলাদেশ প্রস্তাবিত সমদূরত্ব পদ্ধতিতে সীমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সেন্ট মার্টিনস দ্বীপকে Half Effect তথা ০৬ নটিক্যাল মাইল বরাদ্দ দেয়ার প্রস্তাব করে।

গ. **ট্রাইব্যুনালের রায় :** ট্রাইব্যুনাল ১৯৭৪ সালের বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে সম্মত কার্যবিবরণীকে আন্তর্জাতিকভাবে বাধ্যবাধকতামূলক সম্মতি হিসেবে মেনে নেয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাথে দ্বিমত পোষণ করে। তবে ট্রাইব্যুনাল সেন্ট মার্টিন দ্বীপকে একটি তাৎপর্যপূর্ণ সমুদ্রসীমার চিহ্ন হিসেবে বিবেচনার জন্য বাংলাদেশের সাথে একমত পোষণ করে এবং স্বীকার করে যে, সেন্ট মার্টিন দ্বীপের চারপাশে ১২ নটিক্যাল মাইল এলাকার উপকূলীয় সমুদ্র অঞ্চলে এমন অধিকার রয়েছে যেখানে মিয়ানমারের সাথে এ ধরনের একীভূত উপকূলীয় সমুদ্র অঞ্চল নেই। অতএব ট্রাইব্যুনাল দ্বীপটিকে ০৬ (ছয়) নটিক্যাল মাইল উপকূলীয় সমুদ্র অঞ্চলের মধ্যে সীমিত রাখার মিয়ানমারের যুক্তিকে প্রত্যাখান করে। সুতরাং একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, কৌশলগতভাবে এবং রায়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত রাষ্ট্রাধীন সমুদ্র এলাকার আয়তন হিসেবে বাংলাদেশ এই ক্ষেত্রে পুরোপুরি বিজয়ী হয়েছে।

২. **২০০ নটিক্যাল মাইল অবধি একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল ও মহীসোপান :** ২০০ নটিক্যাল মাইল অবধি একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল ও মহীসোপানের সীমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের দাবি এবং ট্রাইব্যুনালের রায় নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

ক. **বাংলাদেশের দাবি :** একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং ২০০ নটিক্যাল মাইলের অভ্যন্তরে অবস্থিত মহীসোপানের একক সীমানা নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রস্তাব ছিল আনক্লসের অনুচ্ছেদ ৭৪ অনুযায়ী ন্যায়পরতা নিশ্চিত করা এবং যেহেতু সমদূরত্ব পদ্ধতি ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশের জন্য ন্যায়পরতা নিশ্চিত করে না, অতএব বিকল্প পদ্ধতি অনুসরণ করা। সে অনুযায়ী বাংলাদেশ কৌণিক দ্বিখণ্ডকরণ (Angle-Bi-sector) পদ্ধতিতে ২১৫ দিগংশ (Azimuth) বরাবর সীমানা নির্ধারণের প্রস্তাব দেয়। প্রাসঙ্গিক বিষয় হিসেবে বাংলাদেশের প্রধান যুক্তি ছিল বঙ্গোপসাগরের এবং বাংলাদেশের উপকূলের অবতলতা (Concavity)। এছাড়া বাংলাদেশ সমুদ্র তলদেশের ভূতাত্ত্বিক গঠন (Bengal Depositional System) এবং সেন্ট মার্টিনস দ্বীপের অবস্থানকেও প্রাসঙ্গিক হিসেবে বিবেচনার জন্য যুক্তি প্রদান করে।

খ. **মিয়ানমারের দাবি :** আলোচ্য বিষয়ে মিয়ানমার সমদূরত্ব বা প্রাসঙ্গিক বিষয় পদ্ধতিতে সমুদ্রসীমা নির্ধারণের প্রস্তাব দেয় এবং অবতলতাকে প্রাসঙ্গিক হিসেবে বিবেচনা করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে কঠিন সমদূরত্ব অনুসরণের প্রস্তাব দেয়। মিয়ানমারের যুক্তি ছিল, কঠোরভাবে অনুসৃত সমদূরত্ব রেখা যদিও বাংলাদেশকে ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত অধিকার চর্চার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে তবুও এটিই হচ্ছে ন্যায়পর।

গ. **ট্রাইব্যুনালের রায় :** বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের দাবির প্রেক্ষিতে ট্রাইব্যুনাল অন্যান্য আন্তর্জাতিক আদালতে অনুসৃত তিন ধাপ পদ্ধতি অনুসরণ করে। এ পদ্ধতিতে প্রথম সমদূরত্বের ভিত্তিতে রেখা টানা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে প্রাসঙ্গিক অবস্থার ভিত্তিতে ন্যায়পরায়ণতার/ন্যায্যতার আলোকে তা নিরীক্ষা করা হয়। সবশেষে অংশীদারিত্বের

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

ভিত্তিতে প্রাপ্ত ফলাফল নিরূপণ করা হয়। প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে ট্রাইব্যুনাল বাংলাদেশের দেয়া অবতল উপকূলের যুক্তিকে গ্রহণযোগ্য মনে করে। ট্রাইব্যুনালের মতানুযায়ী বাংলাদেশের ক্ষেত্রে শুধু উপকূলের অবতলতাই নয় বরং অবতল উপকূলের কারণে সৃষ্ট উপকূলের কৌণিক প্রভাবই বেশি প্রাসঙ্গিক। আর সে অনুযায়ী ট্রাইব্যুনাল সমদূরত্বের ভিত্তিতে সীমানা রেখা সংশোধন করার পক্ষে মত দেয় এবং সংশোধন করে। এতে বাংলাদেশ তার অবতল উপকূলের প্রভাব প্রশমনসহ বিশাল এলাকা জুড়ে ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত প্রবেশাধিকারের সুবিধা অর্জন করে এবং ২০০ নটিক্যাল মাইলের বাইরে বাংলাদেশের জন্য মহীসোপান উন্মুক্ত হয়।

৩. **২০০ নটিক্যাল মাইলের বাইরের মহীসোপান এলাকার সীমানা নির্ধারণ :** ২০০ নটিক্যাল মাইলের বাইরে মহীসোপান এলাকায় সীমানা নির্দিষ্টকরণ ছিল এই ট্রাইব্যুনালের তৃতীয় এবং চূড়ান্ত কাজ। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

ক. **মিয়ানমারের দাবি :** আলোচ্য এলাকায় সীমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনাল প্রথমে মিয়ানমারের এখতিয়ার সংক্রান্ত আপত্তির নিষ্পত্তি করেছে। মিয়ানমার দাবি করে যেহেতু জাতিসংঘ কর্তৃক উভয় দেশের মহীসোপান সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত এখনো বিবেচিত হয়নি এবং অনুচ্ছেদ ৭৬ অনুযায়ী দেশ দুটির সম্প্রসারিত মহীসোপানের ভূতাত্ত্বিক প্রাপ্যতা এখনো নির্ধারিত হয়নি। অতএব উক্ত এলাকায় সীমানা নির্ধারণ ট্রাইব্যুনালের জন্য ঘোড়ার আগে গাড়ি স্থাপনের (Putting the cart before the horse) শামিল হবে। মিয়ানমার আরো দাবি করে যে, ট্রাইব্যুনালের উক্ত এলাকায় সীমানা নির্ধারণের এখতিয়ার থাকলেও বাংলাদেশ-মিয়ানমার মামলার ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হবে না, কেননা, যেহেতু সমদূরত্বের কারণে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা ২০০ নটিক্যাল মাইলের পূর্বেই শেষ হয়ে যায়। অতএব বাংলাদেশের ২০০ নটিক্যাল মাইলের বাইরে কোনো মহীসোপানই নেই।

খ. **বাংলাদেশের দাবি :** মিয়ানমারের দাবির প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ যুক্তি দেয় যে, আনক্লসের ৭৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মহীসোপানের সীমা নির্ধারণের সাথে দ্বিপাক্ষিক সীমানা নির্ধারণের কোনো বিরোধ নেই; বরং যেহেতু জাতিসংঘের মহীসোপানের সীমা নির্ধারক কমিশনের দ্বিপাক্ষিক সীমানার বিষয়ে কারো মন্তব্য করার অধিকার নেই। অতএব ট্রাইব্যুনালের-ই দ্বিপাক্ষিক সীমানা নির্ধারণ করার কথা। অন্যথায় তা অনির্ধারিতকালের জন্য অনিষ্পন্ন থেকে যাবে। বাংলাদেশ আরো যুক্তি দেয়, আনক্লসের অনুচ্ছেদ ৭৬ অনুযায়ী বঙ্গোপসাগরের মহীসোপানে বাংলাদেশের অধিকারের বিষয়টি ভূতাত্ত্বিক তথ্য প্রমাণ অনুযায়ী প্রশ্নাতীত। বাংলাদেশ এ বিষয়ক যাবতীয় বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি প্রমাণ ট্রাইব্যুনালের নিকট উপস্থাপন করে। বাংলাদেশের এ বিষয়ে বেশ কয়েকজন বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী ও ভূতত্ত্ববিদকে প্রয়োজনে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য শুনানিকালে আদালতে উপস্থিত করে।

গ. **ট্রাইব্যুনালের রায় :** ট্রাইব্যুনাল মিয়ানমারের এখতিয়ার সংক্রান্ত যুক্তির পাশাপাশি বাংলাদেশের অবতল উপকূলের কারণে সমদূরত্ব রেখা দ্বারা সৃষ্ট কৌণিক প্রভাবের ফলে (কাট অফ) ২০০ নটিক্যাল মাইলের বাইরে বাংলাদেশের মহীসোপানে কোনো অধিকার নেই; এমন যুক্তিকেও প্রত্যাখ্যান করেছে এবং বাংলাদেশের উপর যে কোনো কৌণিক প্রভাবকে সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখার পক্ষে রায় দিয়েছে।

৪. **আনুপাতিক/ন্যায়পরতার পরীক্ষা (Proportionality test) :** সবশেষে ট্রাইব্যুনাল সীমানা নির্ধারণ শেষে উভয় দেশের প্রাসঙ্গিক উপকূল মোতাবেক বণ্টনকৃত সমুদ্র এলাকার আয়তন আনুপাতিক হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখে। উল্লেখ্য, সমুদ্রসীমা নির্ধারণে উপকূলে প্রাধান্য সর্বজনস্বীকৃত। মিয়ানমার প্রস্তাব করে উভয় দেশের প্রাসঙ্গিক উপকূলের অনুপাত ১:২ (বাংলাদেশের ৩৬৪ কিমি এবং মিয়ানমারের ৭৪০ কিমি)। রায়ে দেখা যায়, ট্রাইব্যুনাল বাংলাদেশের প্রাসঙ্গিক উপকূল নির্ধারণ করেছে ৪১৩ কিমি এবং মিয়ানমারের প্রাসঙ্গিক উপকূল নির্ধারণ করেছে ৫৮৭ কিমি। ফলে ট্রাইব্যুনালের রায় অনুযায়ী বাংলাদেশ ৪০% এবং মিয়ানমার ৬০% সমুদ্র এলাকা পাওয়ার অধিকারী। সে হিসেবে বাংলাদেশ ১,১১,৬৩১ বর্গকিমি এবং মিয়ানমার ১,৭১,৮৩২ বর্গকিমি এলাকা পেয়েছে যা সবশেষে উভয় দেশের জন্য নিজ নিজ উপকূলের দৈর্ঘ্য অনুযায়ী ন্যায়পর সমাধান নিশ্চিত করেছে।

উপসংহার : তেল ও গ্যাস সমৃদ্ধ বঙ্গোপসাগরের দুই প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যকার দীর্ঘদিনের অনিষ্পন্ন সমুদ্রসীমার বিষয়টি সমাধানের জন্য বাংলাদেশ ২০০৯ সালের অক্টোবর মাসে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে মামলা করে, ১৪ মার্চ ২০১২ প্রদত্ত আদালতের রায়ে এ নিষ্পত্তি ঘটে। এ রায়ের ফলে বাংলাদেশ ন্যায়পর (ইকুইটেবল) সমাধান পেয়েছে যা আইনের আশ্রয় নেয়ার পূর্বে দীর্ঘ ৩৮ বছর কূটনৈতিক অচলাবস্থার বেড়াজালে আটকে ছিল। বিগত চার দশকের বাস্তবতা ছিল ১৩০ নটিক্যাল মাইলের অবরুদ্ধ বাংলাদেশের সমুদ্র এলাকা যার আয়তন ৫০,০০০ বর্গকিমি-র ও কম। অন্যদিকে আইনী সমাধানের ফলে বাংলাদেশের অর্জন হয়েছে তার দ্বিগুণেরও বেশি এলাকা। নিঃসন্দেহে এটি বাংলাদেশের জন্য অবিস্মরণীয় একটি অর্জন।

০৬ ‖ রোহিঙ্গা সমস্যা উদ্ভবের কারণ উল্লেখপূর্বক সমাধানের উপায় নির্দেশ করুন। মিয়ানমার থেকে বিতাড়িত রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে আশ্রয় দেয়া উচিত বলে মনে করেন কি?

উত্তর : মিয়ানমারের জাতিগত দাঙ্গায় প্রায়ই জীবন্ত হয়ে ওঠে রোহিঙ্গা ইস্যু। দেশটির পদদলিত সংখ্যালঘু মুসলমান রোহিঙ্গা জাতির ওপর নির্যাতনের ভুলে যাওয়া ইতিহাস মাঝেমধ্যেই জ্বলন্ত হয়ে ওঠে। রোহিঙ্গা এমন একটি ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক গোষ্ঠী, যারা নিজ দেশেও পরবাসী। পরবাসেও আশ্রয়দাতার গলার কাঁটা। শরণার্থী হয়ে বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন অংশে তারা আশ্রয় খুঁজছে বেশ কয়েক দশক ধরে। বিভিন্ন সময়ে দাঙ্গায় দমনাভিযানের শিকার হয়ে লাখ লাখ রোহিঙ্গারা এখনো বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ডে শরণার্থী শিবিরে মানবেতর জীবনযাপন করছে। মিয়ানমারের এ রোহিঙ্গাদের জাতিসংঘ তার এক প্রতিবেদনে 'বিশ্বের সবচেয়ে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী' হিসেবে আখ্যায়িত করেছে।

রোহিঙ্গা কারা : নবম-দশম শতাব্দীতে আরাকান রাজ্য 'রোহান' কিংবা 'রোহাঙ' নামে পরিচিত ছিল। সেই অঞ্চলের অধিবাসী হিসেবেই 'রোহিঙ্গা' শব্দের উদ্ভব। মিয়ানমার সরকার 'রোহিঙ্গা' বলে কোন শব্দের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। রোহিঙ্গারা পূর্বতন বর্মা, অধুনা মিয়ানমারের রাখাইন (আরাকান) রাজ্যের মুসলমান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। আরাকানি মুসলিমরা সেখানে হাজার বছর ধরে বসবাস করে এলেও বাংলাভাষী ও মুসলিম হওয়ার কারণে তারা (রোহিঙ্গারা) মিয়ানমার সরকার ও নাগরিকদের কাছে 'বিদেশি', 'বাঙালি' বা 'অবৈধ অভিবাসী' হিসেবে চিহ্নিত। এ কারণে রোহিঙ্গারা সংখ্যাগরিষ্ঠ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী রাখাইনদের কাছ থেকে চরম বৈরিতার শিকার হয়ে থাকে বিশেষ করে বর্ণবাদী রাখাইনরা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বাসী নয়। মিয়ানমার রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব স্বীকার না করলেও ইতিহাস কিন্তু তাদের পক্ষেই।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

রোহিঙ্গা সমস্যা উদ্ভবের কারণসমূহ : সম্প্রতি মিয়ানমারের পশ্চিমাঞ্চলীয় রাখাইন রাজ্যে সাম্প্রতিক দাঙ্গা শুরু হয় ৩ জুন ২০১২। এ দাঙ্গায় বহু মুসলিম রোহিঙ্গা নিহত এবং হাজার হাজার ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া হয়। উদ্ভূত এ রোহিঙ্গা সমস্যার পিছনে একক কোনো কারণ নিহিত নয়, এর পিছনে রয়েছে একাধিক কারণ ও বহু অতীত ইতিহাস। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১. **বার্মা রাজার আরাকান দখল :** ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দে বার্মার রাজা বোদাফিয়া আরাকান দখল করেন। বর্মীরাজ বোদাফিয়া দীর্ঘ ৪২ বছর বার্মা শাসন করেন। তার দুঃশাসনে মুসলিম রোহিঙ্গারা ধ্বংসের মুখোমুখি এসে পৌছে। তিনি মুসলমানদের শক্তি নিঃশেষ করে দেন এবং মসজিদ, মাদ্রাসা ধ্বংস করে সেখানে গড়ে তোলেন প্যাগোডা, বৌদ্ধবিহার, স্তূপ ইত্যাদি। মুসলমানদের বিতাড়িত করে সর্বোতভাবে আরাকানকে তিনি একটি বৌদ্ধভূমিতে পরিণত করার চেষ্টা করেন। এ সময় বেশ কিছু আরাকানি মুসলমান বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়। ১৮২৩ সালে সাম্রাজ্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী ব্রিটিশ সরকার আরাকান ও বার্মা দখল করে নেয়।

২. **বার্মার স্বায়ত্তশাসন :** ১৯৩৭ সালে বার্মাকে হোম রুল বা স্বায়ত্তশাসন দেয়া হয় এবং ব্রিটিশরা পরিকল্পিতভাবে মুসলমানদের বাদ দিয়ে বর্মিদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেয়। ফলে বার্মায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৩৮ সাল থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত মধ্য ও দক্ষিণ বার্মা বিশেষ করে আরাকানে অসংখ্য দাঙ্গাহাঙ্গামা সংঘটিত হয়। এতে প্রায় এক লাখ মুসলমান নিহত এবং রোহিঙ্গারা অনেকেই নিজ নিজ ঘরবাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়। ব্রিটিশদের তাড়াবার লক্ষ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে বর্মিরা জাপানিদের পক্ষাবলম্বন করে। জাপানিদের আচরণ আরো তিক্ততার মনে হলে তারা মত পরিবর্তন করে ব্রিটিশদের সহায়তা করে। এর বিনিময়ে বার্মা ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি স্বাধীনতা লাভ করে।

৩. **জাতি-উপজাতি বিচ্ছিন্নতার দাবি :** স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে বার্মার সংহতি সমস্যা প্রবল হয়ে ওঠে। বিভিন্ন জাতি-উপজাতিগুলো বিচ্ছিন্নতার দাবি তোলে। ১৯৫৮ সালে আন প্রদেশের কেরন সম্প্রদায় রাজধানী রেঙ্গুনের পতন অনিবার্য করে তোলে। ভারতের সাহায্য সহযোগিতায় সে বিদ্রোহ দমন করা হয়। এ সময় আরাকানি বৌদ্ধরা ক্ষমতা সংহত করার উদ্দেশ্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে নির্মূল অভিযান পরিচালনা করে।

৪. **নে উইনের ক্ষমতা দখল :** ১৯৬২ সালে সামরিক শাসক নে উইন মিয়ানমারের ক্ষমতা দখল করেন। ক্ষমতা গ্রহণ পরবর্তী পর্যায়ে সেনাপ্রধান নে উইন রোহিঙ্গা মুসলমানদের প্রতি কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেন এবং ইতোপূর্বে স্বীকৃত অধিকার ও সুবিধাসমূহ বানচাল করে দেন। নে উইন বার্মার প্রচলিত বহু দলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাও বাতিল করে দেন। একমাত্র দল বার্মা সোশ্যালিস্ট প্রোগ্রাম পার্টির নেতৃত্বে দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। এর ফলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রোহিঙ্গাদের কথা বলার যে সুযোগটুকু অবশিষ্ট ছিল তাও তিরোহিত হয়।

৫. **১৯৪২ সালে রোহিঙ্গা হত্যা :** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গোড়ার দিকে, ১৯৪২ সালে, জাপানিরা ব্রিটিশদের কাছ থেকে দখল করে নেয়। স্থানীয় রাখাইনরা এ সময় জাপানিদের পক্ষ নিয়ে ব্রিটিশদের কাছ থেকে সুযোগ-সুবিধাপ্রাপ্ত জনগণকে আক্রমণ করে। তাদের আক্রমণের শিকার হয় মূলত (রোহিঙ্গা) মুসলমানরা। ১৯৪২ সালের ২৮ মার্চ রাখাইন অধ্যুষিত মিমবিয়া ও ম্রোহাং টাউনশিপে প্রায় পাঁচ হাজার রোহিঙ্গাকে হত্যা করে রাখাইনরা।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৬. **রোহিঙ্গাদের পাল্টা প্রতিশোধ :** রোহিঙ্গা হত্যার পাল্টা প্রতিশোধ হিসেবে রোহিঙ্গারা উত্তর রাখাইন অঞ্চলে প্রায় ২০ হাজার রাখাইনকে হত্যা করে রোহিঙ্গারা। সংঘাত তীব্র হলে জাপানিদের সহায়তায় রাখাইনরা রোহিঙ্গাদের কোণঠাসা করে ফেলে। ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত মিয়ানমার জাপানিদের দখলে থাকে। এ তিন বছরে কমপক্ষে ২০ হাজার রোহিঙ্গা মিয়ানমার ছেড়ে তৎকালীন বাংলায় চলে আসে। সে যাত্রা এখনো থামেনি। ১৯৪৫ সালে ব্রিটিশরা আবারও মিয়ানমার দখল করে নেয়। এই দখলে তাদের সহায়তায় এগিয়ে আসে রোহিঙ্গারা। ব্রিটিশরা এ সময় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে সহায়তার বিনিময়ে উত্তর রাখাইনে মুসলমানদের জন্য আলাদা একটি রাজ্য গঠন করে দেবে তারা। কিন্তু আরো অনেক প্রতিশ্রুতির মতোই ব্রিটিশরাজ এ প্রতিশ্রুতিও রাখেনি।

৭. **পূর্ব পাকিস্তান ও আরাকান রাজ্য সংযোগের প্রচেষ্টা :** ১৯৪৭ সালে ভারত উপমহাদেশ ভাগের সময় রোহিঙ্গাদের একটি বড় অংশ আরাকান রাজ্যকে পূর্ব পাকিস্তানের সাথে নিয়ে আসার চেষ্টা করে। এ নিয়ে জিন্নাহর সাথে যোগাযোগ করেন রোহিঙ্গানেতারা। রোহিঙ্গারা একটি বড় সশস্ত্র গ্রুপও তৈরি করে এবং মংডু ও বুথিধাং এলাকাকে পূর্ব পাকিস্তানের সাথে সম্পৃক্ত করতে উদ্যোগ নেয়। অনেক পর্যবেক্ষক মনে করেন, রোহিঙ্গাদের এ উদ্যোগ ছিল আত্মঘাতী এবং মিয়ানমারে বৈষম্যের শিকার হওয়ার পেছনে এটি একটি বড় কারণ। মিয়ানমারের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা সেই সময়কার রোহিঙ্গা উদ্যোগকে বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবে চিহ্নিত করে এসেছে।

৮. **১৯৮২ সালে নাগরিকত্ব আইন পাশ :** ১৫ অক্টোবর ১৯৮২ সালে মিয়ানমারের সামরিক জান্তা নাগরিকত্ব আইন প্রকাশ করে। এ আইনে মিয়ানমারে তিন ধরনের নাগরিকত্বে বিধান রাখা হয়– পূর্ণাঙ্গ, সহযোগী এবং অভিবাসী। এ নতুন আইনে বলা হয়, ১৮২৩ সালে মিয়ানমারে ব্রিটিশ শাসন শুরু হওয়ার পূর্ববর্তী সময়ে মিয়ানমারে বাস করা ১৩৫টি গোত্রভুক্ত মানুষই মিয়ানমারের পূর্ণাঙ্গ নাগরিক হিসেবে গণ্য হবে। রোহিঙ্গাদের গোত্র হিসেবে অস্বীকার করে সামরিক সরকার। আইনে 'সহযোগী নাগরিক' হিসেবে শুধু তাদের নাগরিকত্ব দেয়া হয়, যারা ১৯৪৮ সালের নাগরিকত্ব অ্যাক্টে ইতিমধ্যেই আবেদন করেছে। এছাড়া 'অভিবাসী নাগরিক' (মিয়ানমারের বাইরে জন্ম নিয়েছে এমন মানুষদের নাগরিকত্ব) হিসেবে কয়েকটি শর্তের কথা উল্লেখ করা হয়, যেগুলো 'যথাযোগ্যভাবে প্রমাণসাপেক্ষ' বলে বলা হয়, যারা মিয়ানমারের স্বাধীনতার আগে (৪ জানুয়ারি ১৯৪৮) এ দেশে প্রবেশ করেছে, মিয়ানমারের রাষ্ট্রীয় ভাষায় দক্ষ এবং যাদের সন্তান মিয়ানমারে জন্মগ্রহণ করেছে, তারাই এ ধারায় নাগরিকত্ব পেতে পারে।

৯. **নাগরিক কার্ড থেকে বঞ্চিত :** ১৯৮৯ সাল থেকে মিয়ানমার তিন ধরনের নাগরিক কার্ডের প্রচলন করে। পূর্ণাঙ্গ নাগরিকদের জন্য গোলাপি, সহযোগী নাগরিকদের জন্য নীল এবং অভিযোজিত নাগরিকদের জন্য সবুজ রঙের কার্ড দেয়া হয়। চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য, পড়াশোনা-চিকিৎসাসেবাসহ সব ধরনের কাজকর্মে এ কার্ডের ব্যবহার শুরু হয়। কিন্তু রোহিঙ্গাদের কোনো ধরনের কার্ড দেয়া হয় না। এর ফলে রোহিঙ্গাদের পক্ষে মিয়ানমারে টিকে থাকা দুরূহ হয়ে পড়ে।

১০. **নির্দিষ্ট গ্রামে বন্দি :** মিয়ানমার জান্তা রোহিঙ্গাদের নাগরিক হিসেবে স্বীকার করে না। আর তাই 'বহিরাগত' হিসেবে চিহ্নিত এসব রোহিঙ্গাকে রাখা হয়েছে কারাগারে। না, আট লাখ রোহিঙ্গাকে বন্দি করার মতো বড় কারাগার মিয়ানমার তৈরি করতে পারেনি, তাই রোহিঙ্গারা নিজ গ্রামেই বন্দি। মিয়ানমারের অন্য কোনো অঞ্চলে যাওয়ার কথা তো দূরূহ, পাশের গ্রামে যাওয়ারও কোনো অনুমতি নেই তাদের। নিজ গ্রামের বাইরে যেতে হলে তাদের সীমান্তরক্ষী বাহিনী নাসাকার কাছ থেকে ট্রাভেল পাস নিতে হয়। এ ট্রাভেল পাস নিয়েই তারা গ্রামের বাইরে যেতে পারে। কিন্তু ট্রাভেল পাস পাওয়া কঠিন বিষয়। এ জন্য নাসাকাকে দিতে হয় বড় অঙ্কের ঘুষ। তার পরও রক্ষা নেই। যদি ট্রাভেল পাসে উল্লিখিত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিজ গ্রামে ফিরতে ব্যর্থ হয় কোনো রোহিঙ্গা, তা হলে তার নাম কাটা যায় এ গ্রামের তালিকাভুক্তি থেকে। সে তখন নিজ গ্রাম নামের কারাগারেও অবৈধ হয়ে পড়ে। তাদের ঠাঁই হয় জান্তা সরকারের জেলখানায়।

১১. **বিয়েতে বাধা :** ১৯৯০ সালে আরাকান রাজ্যে স্থানীয় আইন জারি করা হয়। আইনটিতে উত্তর আরাকানে বাস করা মুসলিম জনগোষ্ঠীর বিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা এই আইন অনুযায়ী এ অঞ্চলে বাস করা রোহিঙ্গাদের বিয়ের আগে সরকারি অনুমোদন নেয়া বাধ্যতামূলক করা হয়।

১২. **জন্মনিয়ন্ত্রণ :** ২০০৫ সালে নাসাকা বাহিনী পুনর্গঠন করা হয়। এ সময় দীর্ঘদিন বিয়ে সংক্রান্ত আবেদন গ্রহণ করা বন্ধ করে দেয় নাসাকা। পরের বছর যখন আবার আবেদন গ্রহণ চালু হয়, তখন নিয়মকে করা হয় আরো কঠোর। তখন থেকে আবেদনের সাথে নবদম্পতিকে মুচলেকা দিয়ে বলতে হয় যে এ দম্পতি দুইয়ের অধিক সন্তান নেবে না।

১৩. **চিকিৎসা ও শিক্ষায় সীমিত অধিকার :** রোহিঙ্গাদের জন্য মিয়ানমারের নাগরিক অধিকার অনেক দূরের ব্যাপার। সরকারি চাকরি তাদের জন্য নিষিদ্ধ। উত্তর আরাকানের সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে রোহিঙ্গাদের জন্য নিয়ন্ত্রিত স্বাস্থ্যসেবা চালু আছে। কিন্তু এসব স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রাখাইন এবং বার্মিজ নাগরিকরা স্থানীয় রাখাইন ভাষায় কথা বলার কারণে রোহিঙ্গারা সেখানে গিয়ে পূর্ণ চিকিৎসা নিতে পারে না। সরকারি বড় হাসপাতালে তাদের প্রবেশ পদ্ধতিগতভাবে নিষিদ্ধ। আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থাগুলো পর্যন্ত রোহিঙ্গাদের জন্য কোনো স্বাস্থ্যসেবার উদ্যোগ নিতে পারে না। এমনকি রোহিঙ্গা মহিলাদের জরুরি ধাত্রীবিদ্যা শেখানোর উদ্যোগ নিয়েও মিয়ানমার সরকারের কাছে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে সেবা সংস্থাগুলো।

১৪. **সাম্প্রতিক ধর্ষণের অভিযোগ ও রোহিঙ্গা হত্যা :** ২০১১ সাল থেকেই নতুন করে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত প্রচারণা চালানো হচ্ছে। তাদের প্রায়ই রোহিঙ্গা, বার্মিজ মুসলমান, কালার, মুসলিম গোষ্ঠী ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হতে থাকে। ২০১২ সালের ১ এপ্রিল উপনির্বাচনে অং সান সু চির জয়ের পর থেকে রোহিঙ্গাবিরোধী তৎপরতা বাড়তে থাকে। সু চির জয়ের দুই সপ্তাহ পরে কচিন রাজ্যের হপকান্তে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা একটি মসজিদ গুঁড়িয়ে দেয়। মধ্য মিয়ানমারে মগবি অঞ্চলে দাঙ্গাবাজরা আরেকটি মসজিদ গুঁড়িয়ে দেয় এবং স্থানীয় মুসলমানদের সম্পত্তি লুটপাট করে। এবারের নৃশংসতা শুরু হয়েছে এক বৌদ্ধ নারীর ধর্ষণ ও হত্যার অভিযোগকে কেন্দ্র করে। তিন রোহিঙ্গা ঐ নারীকে হত্যা করেছে বলে প্রচার করা হয় ১ জুন ২০১২। তবে পরে জানা যায়, ঐ ঘটনার সাথে তাদের কোনো সম্পৃক্ততা নেই। কিন্তু হামলা চালানোর জন্য একদল লোক মুখিয়ে ছিল। তারা এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে নিধনযজ্ঞ শুরু করে ৩ জুন ২০১২। হত্যা, বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়া, মসজিদ গুঁড়িয়ে দেয়াসহ নানাভাবে রোহিঙ্গাদের ওপর নির্যাতন চালানো শুরু হয়।

রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানের উপায় : শুধু মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ সমস্যা হিসেবেই নয়, মানবিক দৃষ্টিকোণ ও বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থের দিকে লক্ষ্য করে হলেও রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধান করা জরুরি। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ নেয়া জরুরি বলে আমি মনে করি :

১. **কূটনৈতিক তৎপরতা জোরদার :** রোহিঙ্গা সমস্যাকে জাতীয় সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করে বাংলাদেশ ও মিয়ানমার উভয়দেশের কূটনৈতিক তৎপরতা জোরদার করা উচিত। এক্ষেত্রে ভারত ও চীনের সহযোগিতা নিয়ে বাংলাদেশ রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরত পাঠানোর উদ্যোগ নিতে পারে।

২. **দ্বিপাক্ষিক আলোচনা :** রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানের উত্তম হাতিয়ার হলো দ্বিপাক্ষিক আলোচনা। উভয় দেশ নিজ নিজ সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হয়ে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে সহযোগিতামূলক মনোভাব নিয়ে রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে তৎপর হতে পারে।

৩. **রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব প্রদান :** মিয়ানমারের সামরিক জান্তা সরকার ১৯৮২ সালে নাগরিকত্ব প্রদান সম্পর্কিত যে কালো আইন প্রণয়ন করে তাতে রোহিঙ্গারা নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত হয়। তাই রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব প্রদানের লক্ষ্যে হয় ১৯৮২ সালের আইন বাতিল করতে হবে নতুবা আইনটির সংস্কার করতে হবে।

৪. **জাতিসংঘ কর্তৃক মিয়ানমারের উপর চাপ প্রয়োগ :** সুদীর্ঘকাল থেকে জিইয়ে থাকা রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে জাতিসংঘ কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। এক্ষেত্রে জাতিসংঘ মিয়ানমারকে আইনের আওতায় এনে রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানের চাপ প্রয়োগ করতে পারে।

৫. **নাসাকা বাহিনীর সদয় মনোভাব :** মিয়ানমারের সীমান্তরক্ষী বাহিনী নাসাকা জান্তা সরকারের নির্দেশে রোহিঙ্গাদের উপর প্রতিনিয়ত নির্যাতনের স্টিম রোলার চালায়। নাসাকা বাহিনী এ নিষ্ঠুর মনোভাব থেকে বেরিয়ে সদয় মনোভাবের আশ্রয় নিলেও অনেকাংশে রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধান হতে পারে।

৬. **সামরিক জান্তার মানবিক উদ্যোগ :** মিয়ানমারের সামরিক জান্তা সরকার মানবিক হয়ে স্বৈরাচারের খোলস থেকে বেরিয়ে আসলেও রোহিঙ্গা সমস্যা সহজেই সমাধান হতে পারে।

৭. **রোহিঙ্গাদের সম্পদে পরিণত :** সামরিক জান্তা সরকার রোহিঙ্গাদের সমস্যা না ভেবে তাদের সম্পদ হিসেবে গণ্য করে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে পারে।

৮. **বন্দিত্বের অবসান :** মিয়ানমারের সামরিক জান্তার রোষানলে পড়ে রোহিঙ্গারা আরাকান রাজ্যের একটি নির্দিষ্ট গ্রামে বন্দি অবস্থায় আছেন দীর্ঘদিন। রোহিঙ্গাদের এ বন্দীদশা থেকে মুক্তি দিয়েও রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধান করা যেতে পারে।

মিয়ানমার থেকে বিতাড়িত রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে আশ্রয় দেয়া উচিত কিনা : মিয়ানমার থেকে বিতাড়িত রোহিঙ্গাদেরকে বাংলাদেশে কোনোভাবেই আশ্রয় দেয়া উচিত হবে না। কেননা ১৯৭৭ সালে মিয়ানমারের সামরিক সরকার শুরু করে 'অপারেশন নাগামিন' বা 'ড্রাগন রাজ'। এ অপারেশনে অবৈধ অভিবাসীদের চিহ্নিত করার নামে রোহিঙ্গাদের ওপর ব্যাপক নির্যাতন চালায় মিয়ানমার সেনাবাহিনী ও স্থানীয় রাখাইনরা। এতে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ১৯৭৮ সালের মে মাসের মধ্যে কমপক্ষে দুই লাখ রোহিঙ্গা মিয়ানমার ছেড়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। যার বোঝা বাংলাদেশ আজো বয়ে বেড়াচ্ছে। এ রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুরা দেশের জনগোষ্ঠীর সাথে মিশে বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড করছে। পরিচয় গোপন করে বাংলাদেশের পাসপোর্ট গ্রহণ করে রোহিঙ্গারা বিদেশে যাচ্ছে। তাই শুধু ভাষা, ধর্ম কিংবা নৃতাত্ত্বিক গঠনের সাদৃশ্য থাকার কারণেই মিয়ানমারের ২০ লাখ রোহিঙ্গাদের দায় বাংলাদেশ নিতে পারে না। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার সীমান্ত প্রহরা শিথিল না করায় সাহসী ও প্রশংসনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

অনুসন্ধান ও অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে যে, বাংলাদেশে মিয়ানমারের বিতাড়িত রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিলে নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। যেমন–

১. জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধি পাবে,
২. অর্থনৈতিক সংকট বৃদ্ধি পাবে,
৩. মিয়ানমারের সাথে বৈরী সম্পর্ক সৃষ্টি হবে,
৪. দেশে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাবে,
৫. মাদক ও চোরাচালানের ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে,
৬. সার্বিক আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হবে ইত্যাদি।

উপসংহার : রোহিঙ্গা সমস্যা সাথে বাংলাদেশ কোনোভাবেই যুক্ত হতে পারে না। ইতিমধ্যে যে বিপুলসংখ্যক রোহিঙ্গা এ দেশে অনুপ্রবেশ করেছে তাদের ফেরত পাঠানোর ব্যাপারে বাংলাদেশকে মিয়ানমারের সাথে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক জোরদার করতে হবে এবং নিজ জন্মভূমিতে যাতে নাগরিক হিসেবে রোহিঙ্গারা রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি পায়, সে বিষয়ে নিতে হবে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কূটনৈতিক উদ্যোগ।

০৭। জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ সম্পর্ক আলোচনা করুন।
***অথবা,* 'বাংলাদেশ ও জাতিসংঘ' শিরোনামে একটি নিবন্ধ রচনা করুন।**

উত্তর : ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে স্বাধীন সত্তা হিসেবে বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের সরব ভূমিকা রয়েছে। বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সদস্য হিসেবে সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃতি লাভ করে। বাংলাদেশ বিশ্বের দরবারে যথাযথ স্থান লাভ করে এবং জাতির কষ্টার্জিত রক্তরঞ্জিত স্বাধীনতা আরো অর্থবহ হয়ে ওঠে। ক্রমান্বয়ে গঠনমূলক কর্মকুশলতা ও যথাযথ কর্মতৎপরতার মাধ্যমে বাংলাদেশ জাতিসংঘে মর্যাদার আসনে সমাসীন হয়। ফলে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নিরাপত্তা পরিষদসহ জাতিসংঘের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংগঠনের প্রধান বা সদস্য নির্বাচিত হয়। সব মিলিয়ে জাতিসংঘে বাংলাদেশের যোগদান অনেকখানি সার্থক ও ফলপ্রসূ হয়েছে।

জাতিসংঘের জন্ম : ১৯৪৫ সালের ২৫ এপ্রিল থেকে ২৬ জুন পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রান্সিসকোতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে ৫০টি দেশের প্রতিনিধিরা জাতিসংঘের সনদ রচনা করেন। ১৯৪৪ সালের আগস্ট মাস থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত ওয়াশিংটনের ডাম্বার্টন ওকসের বৈঠকে চীন, ফ্রান্স, সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গের গৃহীত প্রস্তাবসমূহের ওপর ভিত্তি করেই সনদ রচিত হয়। ১৯৪৫ সালে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী ৫০টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা ১৯৪৫ সালের ২৬ জুন সনদটি অনুমোদন ও স্বাক্ষর করেন। পোল্যান্ড সম্মেলনে উপস্থিত না থাকলেও পরে এতে স্বাক্ষর করে প্রথম স্বাক্ষরকারী ৫১টি রাষ্ট্রের ১টিতে পরিণত হয়। ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর অধিকাংশ স্বাক্ষরকারী দেশের অনুমোদনের মধ্য দিয়ে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়।

সনদ অনুযায়ী জাতিসংঘের ছয়টি মূল অঙ্গ রয়েছে। এগুলো হচ্ছে :

১. সাধারণ পরিষদ (General Assembly)
২. নিরাপত্তা পরিষদ (Security Council)
৩. অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (Economic & Social Council)
৪. অছি পরিষদ (Trusteeship Council) *[১৯৯৪ সালে অছি পরিষদের কর্মকাণ্ডের সফল পরিসমাপ্তি ঘটে]*
৫. আন্তর্জাতিক আদালত (International Court of Justice)
৬. সচিবালয় (Secretariat)

জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ : জাতিসংঘ হচ্ছে বিশ্বের স্বাধীন দেশসমূহের স্বেচ্ছাচালিত একটি সংস্থা। জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী প্রত্যেক শান্তিপ্রিয় দেশ যারা জাতিসংঘের নিয়ম-কানুন মেনে চলতে আগ্রহী তারা ইচ্ছা করলে জাতিসংঘের সদস্য হতে পারে। তবে সদস্য হওয়ার জন্য নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশ এবং সাধারণ পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশের ভোট প্রয়োজন। বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর থেকেই জাতিসংঘের সদস্যপদ প্রাপ্তির জন্য সচেষ্ট ছিল। ১৯৭২ সালের আগস্ট মাসে সর্বপ্রথম বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ প্রাপ্তির আবেদন করে। নিরাপত্তা পরিষদে বাংলাদেশের সদস্যসংক্রান্ত আবেদনটি উত্থাপন করলে চীন এর বিরোধিতা করে এবং এর বিরুদ্ধে ভোট প্রদান করে (২৫ আগস্ট ১৯৭২)। কিন্তু জাতিসংঘে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির জন্য নেতৃবৃন্দের জোর কূটনৈতিক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। ১৯৭৪ সালের ৯ এপ্রিল বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বন্দিবিনিময় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ফলে বাংলাদেশের সাথে পাকিস্তানের সম্পর্কের কিছুটা উন্নতি ঘটে। একই বছর (ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪) লাহোরে অনুষ্ঠিত ওআইসি সম্মেলনে বাংলাদেশ আমন্ত্রিত হয় এবং মুসলিম দেশসমূহের কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ-পাকিস্তান পরস্পর পরস্পরকে স্বীকৃতি প্রদান করে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। পাকিস্তানের স্বীকৃতির ফলে বাংলাদেশের জাতিসংঘে অন্তর্ভুক্তি জোরালো ভিত্তি লাভ করে। এ সময় কাউন্সিলের ভেতরে এবং বাইরে বাংলাদেশ দক্ষ কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। অবশেষে ১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ সর্বসম্মতভাবে ১৩৬তম সদস্য হিসেবে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তি সংক্রান্ত প্রস্তাব গ্রহণ করে। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হলেও তার বহু আগেই বাংলাদেশ জাতিসংঘের অন্যান্য অঙ্গ সংগঠন যেমন— UNCTAD, WHO, IMF, IBRD ইত্যাদিতে যোগদান করে। কাজেই বলা যায়, বাংলাদেশের সাথে জাতিসংঘের সম্পর্ক স্বাধীনতার পর থেকেই শুরু। এ সূত্র ধরেই বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য হিসেবে সাবলীলভাবে কার্যক্রম শুরু করে।

জাতিসংঘে প্রথম বাংলা ভাষণ : প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর সর্বপ্রথম জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বাংলাদেশের সরকারপ্রধান হিসেবে ভাষণ দান করেন। মাতৃভাষা বাংলায় তিনি এই ভাষণ দান করেন। তার এ ভাষণে বাংলাদেশ যেমন স্বাধীন সত্তা হিসেবে বিশ্বব্যাপী আনুষ্ঠানিক পরিচিতি পায়, তেমনি বাংলা ভাষাও বিশ্বব্যাপী মর্যাদার আসনে সমাসীন হয়। প্রথম ভাষণে তিনি স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি জানানোর জন্য বিশ্ববাসীকে ধন্যবাদ জানান। জাতিসংঘের সনদসমূহের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে তিনি বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তার কথা বলেন, তিনি কেবল বাংলাদেশের পক্ষে নয়, গোটা তৃতীয় বিশ্বের প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্বপূর্ণ বক্তৃতা রাখেন।

জাতিসংঘের উচ্চপদে বাংলাদেশ : বাংলাদেশ জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হয়েছে এবং দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছে। এর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিচে বর্ণনা করা হলো :

- হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী ১৯৮৬-৮৭ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৪১তম অধিবেশনের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।
- বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী Human Rights Commission-এর চেয়ারম্যান হিসেবে ১৯৮৫-৮৬ মেয়াদে দায়িত্ব পালন করেন।
- শাহ এ এম এস কিবরিয়া ESCAP-এর নির্বাহী সচিবের পদমর্যাদায় ১৯৮১-৯১ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন।
- বিচারপতি টি এইচ খান International Criminal Tribunal-এর সদস্য হিসেবে ১৯৯৪ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

- মেজর জেনারেল মোঃ আব্দুস সালাম UN Peacekeeping Mission-এর কমান্ডার হিসেবে ১৯৯২-৯৫ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন।
- মিসেস সালমা খান CEDAW-এর কার্যকরী পরিষদের সদস্য হিসেবে ২০০০ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন এবং ২০০২ সালের আগস্টে তিনি পুনরায় নির্বাচিত হন।
- পূর্ব তিমুরে জাতিসংঘ মিশনের প্রধান সামরিক লিঁয়াজো অফিসার পদে ব্রিগেডিয়ার রিজাউল হায়দার দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আব্দুল হাফিজ ক্রোয়েশিয়া ও আইভরি কোস্টে প্রধান সামরিক লিঁয়াজো অফিসারের দায়িত্ব পালন করেন।
- জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের প্রশাসন ও বাজেট সংক্রান্ত পঞ্চম কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে আনোয়ারুল করিম চৌধুরী দায়িত্ব পালন করেন।
- ড. ইফতেখার আহমেদ চৌধুরী জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের দ্বিতীয় কমিটির (ইকোনোমিক অ্যান্ড ফিন্যান্সিয়াল) চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন।
- ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ৫৬তম সম্মেলনে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।
- ২৮ জুন ২০১০ নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মাধ্যমে ইসমাত জাহান CEDAW কার্যকরী পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।
- ২৮ এপ্রিল ২০১০ অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বাংলাদেশ এশিয়ান গ্রুপ থেকে ২০১১-২০১৩ সাল পর্যন্ত ৩ বছরের জন্য UNDP-এর নির্বাহী বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হয়।
- ১০ নভেম্বর ২০১০ দুই বছরের জন্য বাংলাদেশ UN Women-এর নির্বাহী বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হয়।

পরবর্তীতে এগুলো ছাড়াও বেশ কয়েকটি সংগঠন বা সংস্থার উল্লেখযোগ্য কিছু পদে বাংলাদেশ নির্বাচিত হয় এবং সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালন করে।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশ : জাতিসংঘ ১৯৪৮ সাল থেকে শান্তিরক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এ দায়িত্ব পালনকালে ১৬৫০-এর মতো শান্তি সেনা মারা গেছে। এদের জনবল, সরঞ্জাম ও রসদ যোগান দিয়েছে বিশ্বের ১৮০টি দেশ। শান্তি মিশনে সৈন্য প্রেরণকারী শীর্ষ পাঁচটি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়। এই মহান কর্তব্য পালন করতে গিয়ে বাংলাদেশের প্রায় ৮৪ জন শান্তি সেনা প্রাণ হারিয়েছে।

বাংলাদেশের উন্নয়ন ও জাতিসংঘ : ১৯৭১ সাল থেকেই বাংলাদেশ জাতিসংঘ কার্যক্রমের লক্ষ্যবিন্দু। এ দেশের মানুষের দুর্ভোগ লাঘব এবং বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তুদের সাহায্যকল্পে ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে জাতিসংঘ মানবিক তৎপরতা শুরু করে। সরকারি ও বেসরকারি সাহায্য সংস্থার সহযোগিতায় বাংলাদেশে জাতিসংঘের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে জাতিসংঘ ব্যবস্থার ১১টি মিশন (UNDP, WFP, UNFPA, UNICEF, WHO, FAO, ILO, World Bank, IMF, UNHCR, UNESCO) বাংলাদেশে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত আছে। ১৯৮০ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বিশ্ব থেকে গুটিবসন্তের উচ্ছেদ ঘোষণা করে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সমন্বয়ে বাংলাদেশসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশে ১৩ বছরব্যাপী কর্মসূচি চালানোর পর এ সাফল্য অর্জিত হয়। এছাড়া জাতিসংঘ সম্পর্কিত তথ্য প্রদানের দায়িত্ব পালন করেছে UNIC (United Nations Information Centre)।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

লাগসই মানব উন্নয়ন নিশ্চিত করা : বাংলাদেশে উন্নয়ন সাহায্য প্রদানকারী সংস্থাগুলোর মধ্যে জাতিসংঘ সংস্থাসমূহের অবস্থান উল্লেখ করার মতো। দারিদ্র্য বিমোচন, পরিবেশ সংরক্ষণ, চাকরির সুযোগ সৃষ্টি, নারী উন্নয়ন, সুশাসন প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিতকরণের মতো বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বারোপসহ বাংলাদেশে জাতিসংঘ সংস্থাসমূহের ২০১০-১১ অর্থবছরে সাহায্যের পরিমাণ ১৬০.৩২ মিলিয়ন ডলার। এগুলোর মূলকথা হলো লাগসই মানব উন্নয়ন নিশ্চিত করা। সরকারি, বেসরকারি, উন্নয়ন সংস্থা এবং অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় জাতিসংঘ সংস্থাসমূহ কার্যক্রম পরিচালনা করে।

বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি : খাদ্য ঘাটতি লাঘব এবং জরুরি কার্যক্রমে সাহায্য প্রদানের অঙ্গীকার নিয়ে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (WFP) ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু করে। এ পর্যন্ত বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ও জরুরি ত্রাণকাজে WFP প্রায় ৪০০ কোটি টাকার অধিক মূল্যের খাদ্য সাহায্য প্রদান করেছে। বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে WFP-এর দুটি উন্নয়ন প্রকল্প চালু আছে—একটি পল্লী উন্নয়ন এবং অন্যটি দুস্থ পরিবার উন্নয়ন। সেই সাথে জনসংখ্যা কার্যক্রমের উন্নয়নে ১৯৭৪ সাল থেকেই কাজ করে যাচ্ছে জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (UNFPA)।

শিশু অধিকার সংরক্ষণে UNICEF-এর ভূমিকা : বাংলাদেশ সরকার, স্থানীয় কমিটি ও অন্যান্য অংশীদারের সাথে স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, পরিবেশ উন্নয়ন, নারী ও শিশুদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যাপক পদক্ষেপের মাধ্যমে UNICEF কার্য পরিচালনা করছে। UNICEF হচ্ছে জাতিসংঘের একমাত্র সংস্থা, যা একান্তভাবে শিশুদের প্রয়োজনে নিয়োজিত। শিশুদের পক্ষে কথা বলা এবং শিশুদের অধিকার সংরক্ষণ UNICEF-এর কাজ। সম্প্রসারিত টিকাদান পদ্ধতির আওতায় অনূর্ধ্ব ১ বছর বয়সী সকল শিশুকে টিকা দানের কৃতিত্ব UNICEF-এর। UNICEF বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একটি যৌথ কর্মসূচিতে বিশ্বের শতকরা ৮০টি শিশুকে ঘাতক ব্যাধি পোলিও, ধনুষ্টংকার, হাম, হুপিংকাশি, ডিপথেরিয়া ও যক্ষ্মার টিকাদানের ফলে প্রতি বছর ৩০ লাখের বেশি শিশুর জীবন রক্ষা পাচ্ছে।

বাংলাদেশে FAO ও WHO-এর ভূমিকা : ১৯৭৮ সাল থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত বাংলাদেশে FAO-এর প্রকল্পের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে দেড় শতাধিক। একই সময়ে বাংলাদেশ ৮টিরও বেশি FAO-এর আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক প্রকল্পে অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশে FAO-এর থানাভিত্তিক উন্নত খাদ্য উৎপাদন, প্রযুক্তি হস্তান্তর, সমন্বিত শস্য বালাই প্রতিরোধ কার্যক্রম, শস্যবীজ ও ফল উৎপাদন বৃদ্ধি, পশুসম্পদ, বন ও পরিবেশ উন্নয়নে ২৭টির বেশি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশে সবার জন্য স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার অঙ্গীকার নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে WHO।

রোহিঙ্গা শরণার্থীদের পুনর্বাসন : বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের পুনর্বাসনে অত্যন্ত সাফল্যের সাথে কাজ করে যাচ্ছে জাতিসংঘ শরণার্থীবিষয়ক দপ্তর UNHCR।

বাংলাদেশের ILO-এর কার্যক্রম : জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থাগুলোর মধ্যে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) বাংলাদেশে সর্বপ্রথম কার্যক্রম শুরু করে। গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা, খেটে খাওয়া মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং বিশেষ করে নারী ও শিশুর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার কাজে ILO-এর অবদান উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশে UNESCO-এর ভূমিকা : প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, শান্তির ক্ষেত্র নির্মাণ ও পরিবেশ রক্ষায় বাংলাদেশে UNESCO নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ১৯৯৭ সালের ৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের সুন্দরবন এলাকা World Heritage Site-এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তাছাড়া এ তালিকায় বাগেরহাটের ষাট গম্বুজ মসজিদ ও নওগাঁর পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারও স্থান পায়। এ কৃতিত্বের

দাবিদার UNESCO-এর World Heritage Committe। ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা (UNESCO)-এর সাধারণ পরিষদে বাংলাদেশের ভাষা শহীদ দিবসকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে উদযাপনের একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করা হয়। ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০০ থেকে বিশ্বের ১৯৩টি রাষ্ট্রে প্রতি বছর একুশে ফেব্রুয়ারি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে পালিত হচ্ছে। এছাড়াও World Bank এবং IMF-ও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রেখে চলেছে।

জাতিসংঘ মিলেনিয়াম শীর্ষ সম্মেলন ও বাংলাদেশ : ৮ সেপ্টেম্বর ২০০০ তিন দিনব্যাপী 'জাতিসংঘ মিলেনিয়াম শীর্ষ সম্মেলন' শেষ হয়। জাতিসংঘের ৫৫তম সাধারণ অধিবেশন উপলক্ষে আয়োজিত এই সম্মেলনে জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত ১৫০টি দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান অংশগ্রহণ করেন। 'একুশ শতকে জাতিসংঘের ভূমিকা : দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী বিশ্বের ১০০ কোটি মানুষের জন্য ২০১৫ সাল নাগাদ কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের অঙ্গীকার'—এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে জাতিসংঘের নিউইয়র্কস্থ সদর দপ্তরে ৬ সেপ্টেম্বর ২০০০ এই শীর্ষ সম্মেলন শুরু হয়। যে কোনো বিবেচনায় এ সম্মেলনের গুরুত্ব ছিল অনেক বেশি। এই সম্মেলন ছিল শুধু জাতিসংঘের নয়, বরং ইতিহাসের এ যাবৎকালের সর্ববৃহৎ কূটনৈতিক সমাবেশ বা বিশ্ব নেতৃবৃন্দের মহা মিলনমেলা। এ সম্মেলনে বাংলাদেশের তৎকালীন ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও ভাষণ দেন এবং তিনি তার ভাষণে মানুষের কল্যাণে জাতিসংঘকে আরো শক্তিশালী ও কার্যকর ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান। বাংলাদেশে ডেঙ্গুজ্বর ও খাবার পানিতে আর্সেনিক সমস্যার উল্লেখ করে তিনি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

এদিকে জাতিসংঘের মিলেনিয়াম শীর্ষ সম্মেলনের পাশাপাশি ৭ সেপ্টেম্বর ২০০০ পনের সদস্যবিশিষ্ট নিরাপত্তা পরিষদের বিশেষ শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলন ছিল নিরাপত্তা পরিষদের ইতিহাসে দ্বিতীয়বারের মতো বৃহৎ রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধান পর্যায়ের সম্মেলন। এর আগে ১৯৯২ সালে নিরাপত্তা পরিষদের প্রথম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ সম্মেলনে বাংলাদেশের তৎকালীন ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার ভাষণে জনগণের ভোটে নির্বাচিত কোনো সাংবিধানিক সরকারকে অসাংবিধানিক উপায়ে উৎখাত করে ক্ষমতা দখলকারীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন, এ ব্যাপারে কমনওয়েলথের অনুরূপ ভূমিকা নেয়া যেতে পারে। তার মতে শান্তি, গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য এটি অপরিহার্য।

একুশ শতকের জাতিসংঘ ও বাংলাদেশের দৃষ্টিভঙ্গি : অর্ধশতাব্দীর অধিককাল আগে প্রতিষ্ঠিত জাতিসংঘের সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এমন এক বিশ্ব প্রতিষ্ঠা করা, যেখানে কোনো হানাহানি, অবিচার, অন্যায় থাকবে না। জাতিসংঘ সনদের মূল কথাই ছিল বিবাদসমূহের শান্তিপূর্ণ সমাধান এবং যে কোনো বিশ্ব সংঘাত এড়ানোর জন্য এর সম্পদ এবং শক্তিসমূহ ব্যবহার করা। কালের বিবর্তনে জাতিসংঘ দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে বর্তমান সময়ে পৌঁছেছে। অনেক রকম বিতর্ক রয়েছে জাতিসংঘের ভূমিকার ব্যাপারে। সবকিছু মিলিয়ে জাতিসংঘের অস্তিত্বকে আজও অপরিহার্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। একুশ শতকে জাতিসংঘের ভূমিকা কি হওয়া উচিত এ সম্পর্কে উন্নয়নশীল দেশের প্রতিনিধি হিসেবে বাংলাদেশ নিম্নোক্ত দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে :

১. **শান্তি প্রতিষ্ঠা :** জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় বাংলাদেশ সক্রিয়

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

ভূমিকা পালন করে। বিশ্বশান্তি রক্ষার প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণে বিশ্বাসী এবং এর জন্য যথাসাধ্য কাজ করে যাবে। বাংলাদেশ ইতিমধ্যে NPT এবং CTBT-তে স্বাক্ষর করেছে। এছাড়াও বাংলাদেশ CWC (Chemical Weapons Convention) এবং BTWC (Convention on Biological and Toxic Weapon)-এও স্বাক্ষর করেছে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ২০০০ সালকে Year of the Culture and peace এবং ২০০১-২০১০ সাল পর্যন্ত দশককে The Decade of Culture of Peace হিসেবে ঘোষণার আহবান জানান। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষায় অবদান রাখার জন্য তিনি UNESCO পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রম বাংলাদেশ কার্যকরীভাবে অংশগ্রহণ করছে।

২. **মানবাধিকার :** মানবাধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে বাংলাদেশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অবসানের পর বিশ্বব্যাপী মানবাধিকারের বিষয়টি মুখ্য হিসেবে দেখা দিয়েছে। বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্রের চর্চা এবং একনায়কতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রের উচ্ছেদে বাংলাদেশ একনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাবে। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, নারী ও শিশু নির্যাতন রোধের বিষয়ে জাতিসংঘ কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে বাংলাদেশ আশা করে।

৩. **উন্নয়নের অধিকার প্রতিষ্ঠা :** উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশ উন্নয়নের অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। বাংলাদেশ জাতিসংঘে এ বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য চলতি শতাব্দীতে সর্বতোভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে।

৪. **অর্থনৈতিক উন্নয়ন :** অর্থনৈতিক বিষয়ই হবে একুশ শতকের মূল চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশের দায়িত্ব হবে উন্নয়নশীল দেশের প্রতিনিধি হিসেবে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক বিষয়গুলো উত্থাপন করা। একুশ শতকে বিভিন্ন দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক অসমতার বিষয়টি গুরুত্ব পাবে। Least Developed Countries-এর জন্য বিষয়টি দারুণ খারাপ অবস্থার সৃষ্টি করবে। Official Development Assistance (ODA)-এর হ্রাসমান প্রভাব এবং ঋণের সুদ প্রদানের বিষয়টি অত্যন্ত খারাপ হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে। অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন দরিদ্র দেশসমূহকে প্রান্তিক পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছে। একুশ শতকে জাতিসংঘকে এ বিষয়ে উদার এবং কার্যকরী ভূমিকা রাখতে হবে। প্রতিটি উন্নত দেশ যেন তাদের GNP-এর ০.৭% উন্নয়নশীল দেশের জন্য বরাদ্দ করে তা নিশ্চিত করতে হবে।

৫. **দারিদ্র্য বিমোচন :** জাতিসংঘ দারিদ্র্য বিমোচনে যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছে। তবুও দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র প্রতিহত করা বেশ কঠিন কাজ। একুশ শতকে দারিদ্র্যমুক্ত পৃথিবী গঠনের জন্য জাতিসংঘকে দ্বিগুণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। সাক্ষরতা বৃদ্ধি, শিক্ষার মানোন্নয়ন, স্বাস্থ্য সেবা প্রদান এবং চিত্তবিনোদন ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করতে হবে।

৬. **পরিবেশ ইস্যু :** নতুন শতকে পরিবেশগত বিষয়টি সবচেয়ে বিপজ্জনক বিষয় হিসেবে বিশ্বে আবির্ভূত হবে। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ, মাদকদ্রব্য চোরাচালান এবং মাদকদ্রব্যের ব্যবহার-রোধও জাতিসংঘের অন্যতম দায়িত্ব হিসেবে বিবেচিত হবে।

৭. **নারীর ক্ষমতায়ন ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা :** নারীর ক্ষমতায়নে জাতিসংঘ ইতিমধ্যে অনেক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। তবুও অনেক কিছুই করার বাকি রয়েছে। নারী নির্যাতন, নারী পাচার, শোষণ ইত্যাদি বিষয় অনেক জটিল আকার ধারণ করেছে। এর জন্য প্রয়োজন সামাজিক সচেতনতা। এ বিষয়ে জাতিসংঘকে বিশেষ ভূমিকা রাখতে হবে।

উপসংহার : বাংলাদেশ-জাতিসংঘ সম্পর্কের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো উন্নয়নের জন্য উভয়ের অংশীদারিত্ব। জাতিসংঘের বহু সংস্থা ও বিশেষায়িত এজেন্সির সঙ্গে বাংলাদেশের সক্রিয় সংশ্লিষ্টতা রয়েছে এবং অনেকগুলোর কার্যনির্বাহী পরিষদে বাংলাদেশ একাধিকবার নির্বাচিত হয়েছে। অপরপক্ষে বাংলাদেশে এসব সংস্থা ও এজেন্সির মিশন রয়েছে। তবে বাংলাদেশ একুশ শতকে এ আন্তর্জাতিক সংস্থাকে আরো বিশাল অবয়বে দেখতে চায়। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা, দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, পরিবেশ রক্ষা, মানবাধিকার ও সমতাভিত্তিক উন্নয়নে জাতিসংঘ একুশ শতকে অধিক মাত্রায় কার্যকরী ভূমিকা রাখবে বলে বাংলাদেশ প্রত্যাশা করে।

০৮ । জাতিসংঘ ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

উত্তর : বাংলাদেশ একটি দারিদ্র্যপীড়িত স্বল্পোন্নত দেশ। দেশটির বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা ও আন্তর্জাতিক শক্তি কাঠামোতে অবস্থান বিবেচনা করলেও মোটের ওপর দুর্বল অবস্থান সুস্পষ্ট। তথাপি বাংলাদেশ তার জন্মের পর থেকে আন্তর্জাতিক রাজনীতি, শান্তি ও সহযোগিতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাধ্যমতো ভূমিকা পালন করে আসছে। বিশেষ করে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা সংক্রান্ত নীতি ও কর্মসূচিতে সমর্থনদান এবং বিভিন্ন শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমকে জোরদার করতে বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এর মধ্যে কুয়েতে স্থলমাইন অপসারণ এবং সিয়েরা লিওনের শান্তিরক্ষা ও পুনর্গঠনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ভূমিকা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নিকট ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হচ্ছে। অন্যদিকে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের অবস্থান তুলে ধরতে জাতিসংঘ গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। বিশেষ করে UNDP, UNICEF, UNESCO সহ বিভিন্ন জাতিসংঘ সংস্থা বাংলাদেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিশু ও নারী উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, তথ্যপ্রযুক্তি উন্নয়ন ও বিকাশ, সাংস্কৃতিক উন্নয়নসহ নানা গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সহায়তা দিয়ে আসছে।

বাংলাদেশের জাতিসংঘের সদস্যপদ প্রাপ্তি : ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন দেশের অভ্যুদয় হয়। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ প্রাপ্তির ব্যাপারে আবেদন করলে চীন নিরাপত্তা পরিষদে ভেটো দেয়। চীনের যুক্তি ছিল উপমহাদেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে না আসায় বাংলাদেশ সদস্যপদ পেতে পারে না। ১৯৭৩ সালেও চীন আর একবার ভেটো প্রদান করে। অতঃপর পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশ একটি চুক্তি স্বাক্ষর করলে পরিস্থিতির উন্নতি হয়। ১৯৭৪ সালে পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় এবং শেখ মুজিবুর রহমান লাহোরে অনুষ্ঠিত ইসলামী ঐক্য সংস্থার শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান করেন। অতঃপর ১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ ১৩৬তম সদস্য হিসেবে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে।

নিরস্ত্রীকরণ, সাম্রাজ্যবাদ ও বর্ণবাদ নিরসনে বাংলাদেশের ভূমিকা : বাংলাদেশ 'যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই' নীতিতে বিশ্বাসী। বাংলাদেশ সংবিধানের ২৫ নং ধারায় আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সংহতির কথা এবং সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ, বর্ণবৈষম্যের বিরোধিতার কথা বলা হয়েছে। আরো বলা হয়েছে মুসলিম দেশগুলোর প্রতি সংহতি ও সম্পর্ক জোরদার করার কথা। ৬০ নং ধারায় যুদ্ধের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখা হয়েছে। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যে পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল জাতিসংঘ তা বন্ধ করতে পারেনি। ১৯৬৩ সালে জাতিসংঘের উদ্যোগে প্রথম নিরস্ত্রীকরণ

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৬৮ সালে স্বাক্ষরিত এনপিটি (NPT) চুক্তি ১৯৭০ সালে কার্যকর হয়। ১৯৭৯ সালের আগস্ট মাসে বাংলাদেশ উক্ত চুক্তিতে স্বাক্ষর করে নিরস্ত্রীকরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ১৯৯৬ সালে পারমাণবিক নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কিত CTBT (Comprehensive Test Ban Treaty) চুক্তি স্বাক্ষর করে বাংলাদেশ। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ১৯৭৩ সালে ঢাকায় একটি শান্তি সম্মেলন আয়োজন করে এবং একই বছর আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনেও ভূমিকা রাখে। উভয় সম্মেলনেই বাংলাদেশ নিরস্ত্রীকরণের আহ্বান জানায়। ভারত মহাসাগরকে শান্তির এলাকা হিসেবে ঘোষণার দাবি জানায় বাংলাদেশ। পরে এ সম্পর্কিত জাতিসংঘ কমিটিতে বাংলাদেশ অন্তর্ভুক্ত হয়।

স্বল্পোন্নত দেশগুলোর ক্ষেত্রে ভূমিকা : বাণিজ্য ও উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত জাতিসংঘ সম্মেলন বা আঙ্কটাডের চারটি অঙ্গের একটি হচ্ছে গ্রুপ-৭৭। উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্য ক্ষমতা ও রপ্তানি বৃদ্ধি এর প্রধান লক্ষ্য। বাংলাদেশ এই গ্রুপের সক্রিয় সদস্য। বাংলাদেশ গ্রুপ ৭৭-এর পক্ষে বরাবরই বক্তব্য রেখেছে। ৩০ নভেম্বর, ১৯৯৯ যুক্তরাষ্ট্রের সিয়াটলে অনুষ্ঠিত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মন্ত্রীপর্যায়ের সম্মেলনে এবং ২০০৩ সালে মেক্সিকোর কানকুনে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মুখপাত্র হিসেবে তাদের সমস্যা তুলে ধরে। বাংলাদেশ শুল্কমুক্ত বাজারে প্রবেশাধিকার, টেক্সটাইল পণ্য রপ্তানি ক্ষেত্রে কোটা পদ্ধতি ২০০৪ সালের পর আরো পাঁচ বছর অব্যাহত রাখার দাবি জানায়।

পরিবেশ সংরক্ষণে ভূমিকা : জাতিসংঘের উদ্যোগে বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত পরিবেশ সংক্রান্ত শীর্ষ সম্মেলনগুলোতে বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করে। ১৯৯২ সালের রিও ডি জেনেরিওতে অনুষ্ঠিত ধরিত্রী সম্মেলন, ১৯৯৭ সালের কিয়োটো সম্মেলন এবং ২০০২ সালের বিশ্ব টেকসই উন্নয়ন সম্মেলনসহ প্রতিটিতে যোগ দেয় বাংলাদেশ। রিওতে অনুষ্ঠিত প্রথম ধরিত্রী সম্মেলনে স্বাক্ষরিত আবহাওয়া পরিবর্তন কনভেনশন এবং জীববৈচিত্র্য কনভেনশন উভয় চুক্তি কার্যকর করে বাংলাদেশ এবং ১৯৯৪ সালে তা অনুমোদন করে। এছাড়া এজেন্ডা ২১-এ বাংলাদেশ স্বাক্ষর করে। ১৯৮৭ সালে ওজোন স্তর ক্ষয়রোধ সংক্রান্ত মন্ট্রিল প্রোটোকলে বাংলাদেশ স্বাক্ষর করে। কিয়োটো সম্মেলনে যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয় তাতে গ্রিন হাউস গ্যাসের মাত্রা বিশেষ করে কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃসরণ হ্রাসের ব্যাপারে একটি ঐকমত্য হয়। বাংলাদেশ এতেও স্বাক্ষর করে।

সমুদ্র সংক্রান্ত আইন প্রণয়নে : সমুদ্র আইন বিষয়ক জাতিসংঘ কনভেনশনে অংশগ্রহণ এবং সমুদ্র বিষয়ক আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়নে বাংলাদেশের স্পষ্ট ভূমিকা ছিল। বাংলাদেশ ১২ নটিক্যাল মাইলের নিজস্ব সীমানার ব্যাপারে বক্তব্য উপস্থাপন করে এবং সমুদ্র সংক্রান্ত সম্মেলনে ফিলিস্তিনকে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি ও স্থলবেষ্টিত দেশগুলোর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানায়। কনভেনশনে সমুদ্র বিষয়ক যে আন্তর্জাতিক আইন গৃহীত হয় তা অনেকাংশ বাংলাদেশের দাবির প্রতিফলন। উল্লেখ্য, এই কনভেনশন আঞ্চলিক সমুদ্র সীমা ১২ নটিক্যাল মাইল নির্ধারিত হওয়ার পাশাপাশি উপকূলবর্তী দেশসমূহ ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত 'একচেটিয়া অর্থনৈতিক অঞ্চলে' বিদ্যমান সম্পদের ওপর অধিকার ভোগ করবে এবং মহাদেশীয় সোপানে বিদ্যমান সম্পদের ক্ষেত্রে ২০০ নটিক্যাল মাইল আওতার বাইরেও রাষ্ট্রসমূহের অধিকার বজায় থাকবে।

অভ্যন্তরীণ সমস্যা নিরসনে : মিয়ানমার থেকে আগত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সাময়িক আশ্রয়দান এবং মিয়ানমারে পুনরায় প্রত্যাবর্তনের বিষয়টি জাতিসংঘের সহায়তায় ও দু'দেশের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে সফলভাবে মোকাবিলা করতে সচেষ্ট হয়েছে বাংলাদেশ। দীর্ঘদিনের পার্বত্য

চট্টগ্রামের উপজাতি সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করে এবং ভারতে অবস্থানরত প্রায় ৫০ হাজার চাকমা শরণার্থীকে দেশে ফিরিয়ে আনে। এছাড়া দীর্ঘদিনের গঙ্গার পানি বণ্টন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ১৯৭৬ সালে জাতিসংঘের ৩১তম অধিবেশনে উক্ত সমস্যাটি উত্থাপন করে কিন্তু সেনেগাল, অস্ট্রেলিয়া ও শ্রীলঙ্কার অনুরোধে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের রাজনৈতিক কমিটি বিষয়টি নিজেদের মধ্যে মীমাংসার জন্য অনুরোধ জানায়। মিশর, আলজেরিয়া, লিবিয়া এবং গায়ানার উপস্থিতিতে বাংলাদেশ ও ভারত ফারাক্কা প্রশ্নে ঢাকায় একটি বৈঠকে বসতে রাজি হয়। ২০ নভেম্বর ১৯৭৬ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ এক বিবৃতিতে উক্ত উদ্যোগকে স্বাগত জানায় এবং ফলাফল জাতিসংঘকে জানাতে অনুরোধ করে। ১৯৯৩ সালেও বাংলাদেশ পুনরায় উক্ত ইস্যুটি জাতিসংঘে উত্থাপন করে। অতঃপর ১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর গঙ্গার পানি বণ্টন বিষয়ে ভারত-বাংলাদেশ ৩০ বছর মেয়াদি একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে এবং জাতিসংঘের মহাসচিব তা সমর্থন করেন।

আন্তর্জাতিক সংকট নিরসনে : ২০ আগস্ট, ১৯৮৮ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করে। শুরু থেকে বর্তমান পর্যন্ত (জুন ২০১১) জাতিসংঘের ৪৫টি শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশ। জাতিসংঘে শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের পাঠানো সেনাবাহিনীর সংখ্যা বর্তমানে প্রথম। কুয়েতে স্থল মাইন অপসারণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী যথেষ্ট প্রশংসিত। ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বরে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক আফগানিস্তানের আগ্রাসন এবং ১৯৭৮ সালে ভিয়েতনাম কর্তৃক কম্পুচিয়া দখলের পর বাংলাদেশ জাতিসংঘে এই আগ্রাসনের নিন্দা জানায়।

জাতিসংঘে বরাবরই বাংলাদেশ ফিলিস্তিনি স্বার্থের পক্ষে মতো দিয়েছে। ফিলিস্তিনি স্বায়ত্তশাসন বিষয়ে বক্তব্য আরব বিশ্বে বাংলাদেশের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে এবং এ কারণে ফিলিস্তিন সংক্রান্ত কমিটিতে বাংলাদেশ অন্তর্ভুক্ত হয়। জাতিসংঘে ফিলিস্তিন সংক্রান্ত বিষয়ে বাংলাদেশের ভূমিকা অপরিবর্তিত রয়েছে।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ভূমিকা : জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ও তহবিলে বাংলাদেশের অবদান খুবই নগণ্য। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে অবদান মাত্র মোট বাজেটের ০.০১ শতাংশ। তবে বাংলাদেশ মনে করে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ধনী ও দরিদ্র দেশগুলোর ব্যবধান কমিয়ে আনার লক্ষ্যে ধনী দেশগুলোর ঋণের পরিমাণ বাড়ানো উচিত এবং ধনী দেশগুলো তাদের জিএনপির ৭ শতাংশ গরিব দেশগুলোকে সাহায্য হিসেবে দেয়া উচিত। জাতিসংঘের উদ্যোগে এ ব্যাপারে সম্মেলন করারও আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ। অত্যন্ত গরিব দেশগুলোর ঋণের পরিমাণ এবং কিস্তি পুনর্নির্ধারণেরও দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ। বিশেষ করে সাম্প্রতিককালে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মুখপাত্র হিসেবে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থায় বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দক্ষ ও আধাদক্ষ শ্রমের অবাধ যাতায়াত, উন্নত দেশগুলোর বাজারে গরিব ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর পণ্যের অবাধ প্রবেশাধিকার, উন্নত দেশগুলোর কৃষিতে ভর্তুকি হ্রাসসহ নানা ইস্যুতে বাংলাদেশ জোরালো ভূমিকা রাখছে। কানকুন সম্মেলনে এ সকল দাবিতে বাংলাদেশের অবস্থান সুদৃঢ়ই ছিল। তাছাড়া বাংলাদেশ মানবাধিকার সম্পর্কিত পশ্চিমা ধারণাকে সমর্থন করেনি। আশির দশকে জাতিসংঘে দেয়া বক্তব্যে বাংলাদেশ বলেছে, মানবাধিকারের মধ্যে একটি অর্থনৈতিক উপাদান রয়েছে। এটিকে বাদ দিয়ে মানবাধিকারের কথা চিন্তা করা যায় না।

জাতিসংঘ ও বাংলাদেশের উন্নয়ন : যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সাংস্কৃতিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করতে জাতিসংঘ ও সহযোগী সংস্থাগুলো স্বাধীনতার পর থেকেই এখানে কাজ করে যাচ্ছে। যেমন—

ক. যুদ্ধ-পরবর্তী পুনর্গঠনে সহায়তা : বাংলাদেশে জাতিসংঘের কার্যক্রম দেশটির জন্মলগ্ন থেকেই শুরু হয়। যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের জনগণের দুঃখ দুর্দশা লাঘবে ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা ও বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তুর সহযোগিতায় এগিয়ে আসে জাতিসংঘ। এ লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে গঠিত হয় UNROD যা পরে UNROB বা বাংলাদেশে জাতিসংঘের বিশেষ ত্রাণ দপ্তর নামে পরিচিতি লাভ করে। ধ্বংসস্তূপে পরিণত বাংলাদেশের পুনর্গঠনের জন্য জাতিসংঘ ১.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রয়োজন বলে মতামত ব্যক্ত করে। এবং বিভিন্ন দেশ ও সংস্থার সহযোগিতায় এ অর্থ সংগ্রহ কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। ফলে ১৯৭৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর বাংলাদেশ প্রায় ১.৩২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ ও প্রকল্প সাহায্য লাভ করে, যা কেবল জাতিসংঘের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও সহযোগিতার কারণেই সম্ভব হয়েছে।

খ. গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন : বাংলাদেশের অবকাঠামো উন্নয়নে জাতিসংঘের সহযোগী সংস্থা বিশ্বব্যাংক বিপুল পরিমাণ ঋণ ও প্রকল্প সাহায্য দিয়ে আসছে। তাছাড়া গ্রামীণ মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে UNDPসহ অন্যান্য সংস্থা ব্যাপক অর্থনৈতিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে।

গ. অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন : জাতিসংঘ তার অন্যান্য সদস্যের মতো বাংলাদেশেও দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে মানুষের জীবনমানের উন্নয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। UNICEF দেশের সরকার, সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠী ও অন্যান্য সংস্থা সংগঠনের সাথে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, পরিবেশ উন্নয়ন ও সংরক্ষণ এবং নারী ও শিশু উন্নয়নে একযোগে কাজ করছে। এ সকল ক্ষেত্রে UNDP বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করে তাতে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে জনগণকে সরাসরি সেবা ও উপকরণ বিতরণসহ জনসচেতনতা সৃষ্টিতে ব্যাপক অবদান রাখছে। সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নে কাজ করছে UNICEF এবং সবার জন্য স্বাস্থ্য—এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে কাজ করছে WHO। তাছাড়া জাতিসংঘ মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল অর্জনে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফসহ বিভিন্ন সংস্থা সহায়তা করছে।

ঘ. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ : অতিরিক্ত জনসংখ্যা বাংলাদেশে সকল সমস্যার মূল কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশে কাজ করছে UNFPA। এ লক্ষ্যে সংস্থাটি জনগণের মাঝে জনসংখ্যা ও জন্ম নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে জনসচেতনতা সৃষ্টি, পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম বাস্তবায়নে সরকার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করে যাচ্ছে। আশার কথা হলো, বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করছে।

ঙ. সাংস্কৃতিক বিকাশ ও ঐতিহ্য রক্ষা : বাংলাদেশের জনগণের সাংস্কৃতিক বিকাশ ও ঐতিহ্য রক্ষায় সহায়তা দিচ্ছে UNESCO। ১৯৯৭ সালের ৬ ডিসেম্বর UNESCO সুন্দরবনকে World Heritage Sight ঘোষণা করে। তাছাড়া বাগেরহাটের ষাট গম্বুজ মসজিদ ও পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারও এ তালিকায় স্থান পায়। ২০০১ সালে UNESCO একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা দিলে বাংলা ভাষা আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভ করে, যা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। তাছাড়া UNEP বাংলাদেশে পরিবেশ রক্ষায় কাজ করছে।

চ. অন্যান্য : উপরে বর্ণিত ক্ষেত্র ও সংস্থা ছাড়া জাতিসংঘের আরো কতিপয় সংস্থা ও সংগঠন বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। যেমন—জাতিসংঘ সংক্রান্ত তথ্যসহ অন্যান্য তথ্য প্রদানে সেবা দিচ্ছে UNIC। রোহিঙ্গা শরণার্থীদের পুনর্বাসনে অত্যন্ত সফলতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে UNHCR। FAO বাংলাদেশে কৃষি উন্নয়নে নানাভাবে সহায়তা করছে। WFP বাংলাদেশে ১৯৭৪ সালে কার্যক্রম শুরু করে এবং তখন থেকে আজ পর্যন্ত সংস্থাটি বাংলাদেশকে বিপুল পরিমাণ খাদ্য সাহায্য দিয়ে আসছে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

উপসংহার : জাতিসংঘের বিভিন্ন ইস্যুতে বাংলাদেশ যে ভূমিকা রেখেছে তার স্বীকৃতিও পেয়েছে দেশটি। ১৯৭৯-৮০ এবং ২০০০-২০০১ সময়ের জন্য বাংলাদেশ নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যপদে নির্বাচিত হয়। এছাড়া ১ জুন ২০০১ বাংলাদেশ এক মাসের জন্য জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত হয়। ১৯৮৬-৮৭ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৪১তম অধিবেশনে সাবেক স্পিকার হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী সভাপতিত্ব করেন। ১৯৮৪ সাল থেকে জাতিসংঘের কার্যপ্রণালীতে বাংলা ভাষার ব্যবহার আমাদেরকে গৌরবান্বিত করেছে। বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘে প্রথম বাংলা ভাষায় ভাষণ দিয়ে বাংলা ভাষাকে বিশ্বের কাছে পরিচিত করে তোলেন। সর্বোপরি বাংলাদেশ জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী বিশ্বশান্তি রক্ষা, অস্ত্র প্রতিযোগিতা রোধ, বিবাদের শান্তিপূর্ণ সমাধান, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং বিভিন্ন জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল থেকে এসব বাস্তবায়নের চেষ্টা করে আসছে। এছাড়া জাতিসংঘ বাংলাদেশের উন্নয়নমূলক বিভিন্ন প্রকল্পে অংশগ্রহণ করে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবেশ উন্নয়ন, নারী ও শিশুদের উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে।

০৯ ॥ বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের বিভিন্ন দিক আলোচনা করে এক্ষেত্রে বিদ্যমান বিবদমান ইস্যুগুলো চিহ্নিত করুন।

***অথবা,* সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের বিস্তারিত আলোচনা করুন।**

***অথবা,* বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের সাম্প্রতিক গতিবিধি ব্যাখ্যা করুন এবং বিদ্যমান বিবদমান ইস্যুগুলো চিহ্নিত করুন।**

উত্তর : এশিয়া মহাদেশের একটি অংশে চীন ও ভারত ক্ষমতাশালী দেশ হিসেবে পরিচিত। চীনের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব না থাকায় বন্ধুপ্রতিম রাষ্ট্রের ওপর প্রভাব বিস্তার করে তার উন্নয়নে অন্তরায় সৃষ্টি করে না। মিয়ানমারের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই এই দিকটি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব। মিয়ানমার চীনের দীর্ঘদিনের বন্ধু এবং চীন মিয়ানমারকে বিভিন্ন দিক থেকে সহায়তা প্রদান করে থাকে। এক্ষেত্রে ভারতের সঙ্গে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সম্পর্ক যে মধুর এই উক্তি করা সম্ভব হবে না।

প্রতিবেশী দেশগুলোর ভারতের সাথে সম্পর্ক স্থাপন : প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলো ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্কই প্রতিষ্ঠা করতে ইচ্ছুক। বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান ও শ্রীলঙ্কার দিকে তাকালে এই দিকটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ধর্মীয় ঐক্য রাষ্ট্রগুলোকে যে অভিন্ন সম্পর্কে বাঁধতে পারে না মধ্যপ্রাচ্যের দিকে তাকালে তা যেমন স্পষ্ট হয়, ভারত ও নেপালের দিকে দৃষ্টিপাত করলেও এই সত্য প্রতিভাত হয়। ভারত ও নেপালের অধিবাসীদের মধ্যে হিন্দুত্বের সম্পর্ক থাকলেও এই দু দেশের যেভাবে বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া উচিত ছিল, সেই বন্ধন বর্তমানে অনেকাংশেই অস্থিতিশীল পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। ভারত যেভাবে নেপালের ওপর একাধিপত্য প্রতিষ্ঠায় ইচ্ছুক নেপালের জনসাধারণ সেই বন্ধন মান্য করতে আগ্রহী নয় বলে দু দেশের অতীত সম্পর্কের মধ্যে বর্তমানে ফাটল ধরেছে।

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের বিভিন্ন দিক : বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ১৯৭১ সালের পর যে গভীর বন্ধনে আবদ্ধ ছিল পরবর্তীকালে তা ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে। এর কারণ, সার্বিকভাবে ভারতের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রণ। যে দেশ একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে অসংখ্য জীবন বিসর্জন দিয়ে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করেছে সে দেশ ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্ব চায়, কিন্তু সার্বিক ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ নয়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

বাংলাদেশ চেয়েছিল স্বাধীনতার পর একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন দেশ হিসেবে নিজেদের গঠন করে পৃথিবীর বুকে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে। এই কারণে ক্রমশ ভারতের নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে এসে বাংলাদেশ স্বাধীনভাবে পথ পরিক্রম করার চেষ্টা করেছে।

কিন্তু তার পথ কুসুমাস্তীর্ণ হয়নি। তার কারণ, বাংলাদেশ ও ভারত শুধু পাশাপাশি অবস্থিত নয়, দু দেশের ভৌগোলিক প্রকৃতি আন্তঃবিনিময়ের ক্ষেত্রেও নির্ভরশীল। বাংলাদেশ যখন অর্থনৈতিক, পররাষ্ট্রনীতি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে অগ্রসর হতে চেষ্টা করছে তখনই অন্য প্রান্ত থেকে আকর্ষণের কারণে বাংলাদেশের অগ্রসরণ সম্ভব হয়নি। মুখ থুবড়ে না পড়লেও সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি।

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের বিবদমান বিষয়সমূহ : বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক নানা বিষয়ে প্রচুর মতপার্থক্য থাকলেও এক্ষেত্রে কতিপয় বিষয় রয়েছে যেগুলো বর্তমানে দু দেশের মধ্যকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রচণ্ড রকম সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। যেমন—

ক. পানি বন্টন সমস্যা : স্বাধীনতা লাভের পরই বাংলাদেশ প্রথম যে সমস্যার সম্মুখীন হয় তা হলো পানি বন্টন সমস্যা। বাংলাদেশের সব নদীর প্রবাহই ভারতের ভেতর দিয়ে এসেছে বলে পানি প্রবাহের ক্ষেত্রে ভারতের ওপর এ দেশ নির্ভরশীল। ভারত ইচ্ছা করলেই বিভিন্ন নদীর প্রবাহের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম। বাংলাদেশের জন্য নদীর পানি কৃষিকাজ, শিল্প-কারখানা, নদীপথে যাতায়াত ও প্রাকৃতিক ভারসাম্যের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। এই নদীরও মূল পথ নেপালে বলে যখন পানি সমস্যার দিকটি প্রকট হয়ে উঠেছিল তখন বাংলাদেশ শুধু ভারতকে নিয়ে নয়, নেপালকে নিয়েও তিন দেশের সমন্বয়ে যৌথ নদী কমিশনের প্রস্তাব দিলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি।

ভারত ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ করার ফলে পদ্মার প্রবাহ স্থবির হয়ে পড়ে। অথচ আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুযায়ী কোনো দেশের মধ্য দিয়ে নদী অন্য দেশে প্রবাহিত হলে তার নিয়ন্ত্রণ সিদ্ধ নয়। ভারত এই নিয়ম মান্য করে প্রতিবেশী বাংলাদেশের মতো ছোট একটি দেশকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে অগ্রসর হয়নি। যে ফারাক্কা বাঁধ নিয়ে এত বিতর্ক, বর্তমানে তা স্তিমিত হয়ে পড়লেও সম্প্রতি ভারত তার অভ্যন্তরস্থ নদীগুলোর প্রবাহ খাল কেটে অন্যদিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় অগ্রসর হওয়ার পর বাংলাদেশ আরো বিপন্ন হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশের এ সম্পর্কিত প্রতিবাদ ভারতের মনঃপুত হয়নি। ভারতের প্রস্তাবিত নদী আন্তঃসংযোগ প্রকল্প বাংলাদেশের জন্য ভয়ানক এক দুঃসংবাদ। ভারত এই প্রকল্পে অগ্রসর হলে বাংলাদেশ মরুভূমিতে পরিণত হবে। সাম্প্রতিক সময়ে মণিপুর রাজ্যে ভারত জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বরাক নদীর ওপর টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

খ. গ্যাস রপ্তানি বিতর্ক : নদীর পানি সমস্যার পর বাংলাদেশকে দ্বিতীয় একটি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এ সমস্যা হলো গ্যাস রপ্তানি সংক্রান্ত সমস্যা। কিন্তু বাংলাদেশে যে পরিমাণ গ্যাস রক্ষিত আছে তা বহির্বাণিজ্যের জন্য কোনো অংশেই অনুকূল নয়। অথচ গ্যাস রপ্তানির জন্য বাংলাদেশের ওপর অবিরাম চাপ সৃষ্টি করে বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল এক পর্যায়ে ঠেলে দেয়া হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সব সময় চায় ছোট দেশগুলো দরিদ্র থেকে তাদের দয়ার ওপর নির্ভরশীল থাকুক। তাহলে ছোট দেশগুলোকে নিয়ে পুতুলের মতো খেলা করা সম্ভব হবে। বাংলাদেশ ভারতে তেল রপ্তানির ক্ষেত্রে সম্মত না হলে বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক অর্থ ফান্ড যে কোনো সময়ে তাদের ঋণ বন্ধ করে দিতে পারে। আমেরিকা তার দেশে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি বন্ধ করে দিয়ে হাজার হাজার নর-নারীর জীবনে বেকারত্ব সৃষ্টি করতে সক্ষম।

আমেরিকার নতুন রাষ্ট্রদূত যখন ঢাকায় এসে গ্যাস রপ্তানির পক্ষে ওকালতি করেন, তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না যে আমেরিকা কিভাবে অন্যদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে শুধু হস্তক্ষেপ নয়, নিয়ন্ত্রণ করতেও ইচ্ছুক। বাংলাদেশ ভারতের মতো বড় দেশ হলে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত এ মন্তব্য করতে পারতেন না। একটি গরিব দেশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কাছে যে কতখানি বিপন্ন বাংলাদেশের অবস্থা তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

গ. মুক্তবাণিজ্য চুক্তি : বাংলাদেশ তৃতীয় বিপদের সম্মুখীন হয়েছে যখন দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন সংকট অতিক্রম করে কিছু ভালো কাজের মাধ্যমে দেশে বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে। এই সমস্যাটি হলো ভারতের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা। এক্ষেত্রে দেশের অর্থনৈতিক অবকাঠামো ও শিল্পোন্নয়নের দিকটি গভীরভাবে বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়া প্রয়োজন।

তার কারণ, মুক্ত বাণিজ্য সমশ্রেণীর দুটি দেশের মধ্যে প্রচলন যত সুবিধাজনক, অসম দুটি দেশের ক্ষেত্রে সেই সুবিধা আশা করা কঠিন। ভারত শিল্পোন্নত দেশ বলে সেখানে যে পরিমাণ পণ্য প্রস্তুত হয়, বাংলাদেশ তা থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। বাংলাদেশ বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী হওয়ার সঙ্গে যে অতিরিক্ত ও গুণসম্পন্ন পণ্য উৎপাদন করে তা দেশের বাইরে কয়েকটি দেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে।

বর্তমানে দেশের বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠান যে পণ্য উৎপাদন করে তা দেশের চাহিদা মেটাতে প্রায় সক্ষম। ভারতকে বাংলাদেশে মুক্তভাবে পণ্যের প্রবেশাধিকার দিলে বাংলাদেশের উৎপাদিত পণ্য অবিক্রীত থাকবে এবং তার ফলে শিল্প কারখানার যে ক্ষতি হবে তার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়বে কারখানায় কর্মরত কর্মচারীদের ওপর।

বাংলাদেশ দীর্ঘদিন থেকে ভারতের বাজারে শুল্কমুক্ত পণ্য প্রবেশের অধিকার চাইলেও ভারতের পক্ষ থেকে তা স্বীকৃত হয়নি। এক্ষেত্রে মুক্তবাজার সৃষ্টির পর বাংলাদেশের পণ্য ভারতে কিভাবে প্রবেশ করবে সে দিকও বিবেচনার প্রয়োজন। বর্তমানে বাংলাদেশ যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে মুক্তবাজার সৃষ্টির অর্থ দেশের শিল্পকে বিপন্ন করা। দেশ শুধু গুটিকতক ব্যবসায়ীর নয়, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণেরও। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কথা চিন্তা করেই মুক্তবাজার অর্থনীতি সম্পর্কে ভাবা প্রয়োজন।

ঘ. ট্রানজিট ও ট্রান্সশিপমেন্ট : বাংলাদেশ ভারতের তুলনায় ছোট দেশ হলেও ভৌগোলিক বিবেচনায় ভারত বাংলাদেশের নিকট একটি ক্ষেত্রে আটক রয়েছে। ভারতের যে পূর্বাঞ্চলীয় ৭টি রাজ্য রয়েছে এগুলো বাংলাদেশের ভূমি দ্বারা মূল ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন। এ সাতটি রাজ্য হলো ত্রিপুরা, আসাম, মেঘালয়, মণিপুর, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড ও অরুণাচল। এ রাজ্যগুলোতে একদিকে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে এবং সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে এ সকল সম্পদের যথাযথ ব্যবহার যেমন করা যাচ্ছে না তেমনি এ সকল অঞ্চলের যথাযথ উন্নয়নও সাধিত হচ্ছে না। তাছাড়া বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের অস্তিত্ব প্রায় প্রতিটি রাজ্যেই সমানভাবে বিদ্যমান রয়েছে। এমতাবস্থায় বিচ্ছিন্নতাবাদ দমন, অভ্যন্তরীণ সহজতর এবং দ্রুত যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার জন্য ভারত বাংলাদেশের ওপর দিয়ে এ সাতটি রাজ্য বা সেভেন সিস্টারসে যাওয়ার একটি ট্রানজিট দাবি করে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। অন্যদিকে বাংলাদেশও তার ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব এবং অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়াসহ নানাবিধ আশঙ্কায় এ জাতীয় ভারতীয় দাবির প্রতি ইতিবাচক সাড়া দিতে পারছে না। ফলে যখনই ভারতের সাথে বাংলাদেশের কোনো দ্বিপাক্ষিক আলোচনার প্রশ্ন এসেছে ভারত তখনই এ বিষয়টিকে আলোচনার মূল এজেন্ডায় এনে দরকষাকষির চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। ফলে এ বিষয়টিতে বাংলাদেশ ছাড় না দেয়ায় ভারত বাংলাদেশকে বেকায়দায় ফেলার নানা ফন্দি আঁটতে কখনোই ভুল করেনি।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

ঙ. **সীমানা নির্ধারণ ও ছিটমহল :** বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের ক্ষেত্রে আরেকটি বিবদমান ইস্যু হলো দুই দেশের সীমান্ত চিহ্নিতকরণ ও ছিটমহল সমস্যা। বাংলাদেশের ভেতরে ভারতের রয়েছে ১১১টি ছিটমহল আর ভারতের অভ্যন্তরে বাংলাদেশের রয়েছে মোট ৫১টি ছিটমহল। এ ছিটমহলগুলোর অধিবাসীদের অনেকটা বিচ্ছিন্ন হয়েই দিন কাটাতে হয়। তাছাড়া দু দেশের মধ্যকার সীমান্ত সংঘর্ষও নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে, যার মধ্যে রৌমারীতে সংঘটিত সংঘর্ষটি ছিল সবচেয়ে মারাত্মক।

চ. **বাংলাদেশে সন্ত্রাসী ও জঙ্গিদের ঘাঁটি সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য :** ভারত দীর্ঘদিন ধরেই বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদী জঙ্গিগোষ্ঠী ও আইএসআই-এর ঘাঁটি রয়েছে বলে অভিযোগ করে আসছে। বাংলাদেশ সরকারও তাদের সে অভিযোগকে চ্যালেঞ্জ করে এ বিষয়ে যথাযথ প্রমাণাদি উপস্থাপনের আহ্বান জানিয়ে আসছে। এ প্রসঙ্গে ২০০১ সালের ৭ নভেম্বর হরিয়ানায় অনুষ্ঠিত 'অল ইন্ডিয়া পুলিশ গেমস'-এর অনুষ্ঠানে ভারতের তৎকালীন উপ-প্রধানমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদভানি বাংলাদেশে আল কায়েদা ও আইএসআই-এর ঘাঁটি রয়েছে বলে মন্তব্য করেন। এমনকি ভারতের মুম্বাইতে যে ভয়াবহ বোমা হামলা হয় তাতেও বাংলাদেশকে জড়ানোর চেষ্টা চালায় ভারতীয় কর্তৃপক্ষ। ভারতীয় দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের এ জাতীয় তৎপরতা বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রায়ই টানাপড়েন সৃষ্টি করছে। সাম্প্রতিক সময়ে ভারত-বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ে অনুষ্ঠিত বৈঠকে দু দেশের মধ্যে সন্ত্রাসী তালিকা বিনিময় হয়।

ছ. **পুশইন ও পুশব্যাক :** ভারতের আধিপত্য নীতি, সীমান্তে বিডিআর ও বাঙালি হত্যা এবং পুশইনের ঘটনা নতুন নয়। চলতি পুশইনের ঘটনাটি শুরু হয় গত ৭ জানুয়ারি ভারতের উপ-প্রধানমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদভানির একটি বিতর্কিত বিবৃতির পর থেকেই। আদভানি ঐ বিবৃতিতে বলেন, ভারতে ২ কোটির মতো অবৈধ বাংলাদেশী রয়েছে। বলা হয়, ঐ সব বাংলাদেশী ভারতের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ। তাই ভারত বাংলাভাষী মুসলিম নাগরিকদের বিভিন্ন সীমান্ত পয়েন্ট দিয়ে বাংলাদেশে ঠেলে পাঠাচ্ছে। ভারত বিভিন্ন সময়ে সে দেশে কথিত অবৈধ বাংলাদেশীদের সংখ্যা প্রকাশ করছে। ১৯৯৮ সালে আনন্দবাজার পত্রিকা বলেছিল, ভারতে প্রায় ১ কোটি ৮০ লাখ অবৈধ বাংলাদেশী রয়েছে। এদের মধ্যে ১ কোটি ২০ লাখই নাকি পশ্চিমবঙ্গে বসবাস করছে। বাকি ৬০ লাখ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে।

জ. **সমুদ্রসীমা বিরোধ :** ১৪ মার্চ ২০১২ মিয়ানমারের সাথে বিরোধ নিষ্পত্তির পর ৭ জুলাই ২০১৪ নিষ্পত্তি হয় ভারতের সাথে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা বিরোধ। এ বিরোধ নিষ্পত্তির ফলে বাংলাদেশ এক বিপুল অঞ্চলে তার পূর্ণ অধিকার ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। রায় অনুযায়ী দুই দেশের মধ্যে বঙ্গোপসাগরের বিরোধপূর্ণ ২৫,৬০২ বর্গ কিলোমিটারের মধ্যে বাংলাদেশ পাবে ১৯,৪৬৭ বর্গ কিলোমিটারের আর ভারত পাবে ৬,১৩৫ বর্গ কিলোমিটার। এ রায়ের ফলে ১,১৮,৮১৩ বর্গ কিলোমিটারের বেশি টেরিটোরিয়াল সমুদ্র, ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত অর্থনৈতিক অঞ্চল ও চট্টগ্রাম উপকূল থেকে ৩৫৪ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত মহীসোপানের তলদেশে অবস্থিত সবধরনের প্রাণিজ ও অপ্রাণিজ সম্পদের ওপর বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। বহুল আলোচিত দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ এলাকাটি এ রায়ের ফলে ভারতের মধ্যে পড়েছে।

উপসংহার : ভারতের সাথে বাংলাদেশের যে কয়টি বিবদমান ইস্যু রয়েছে সেগুলো খুবই জটিল। এ বিষয়গুলোর সাথে জাতীয় নিরাপত্তা এমনকি স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন জড়িত। বিশেষ করে নদীর পানি বণ্টন, গ্যাস রপ্তানিসহ মুক্তবাণিজ্য এলাকা গঠনের মতো বিষয়গুলোতে সিদ্ধান্ত নিতে বাংলাদেশকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পা ফেলতে হবে। নদীর পানি বণ্টন নিয়ে ভারত যে সর্বনাশা খেলায় মেতেছে সেক্ষেত্রে ভারতের মোকাবিলার জন্য বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক কূটনৈতিক তৎপরতা ও আইনী লড়াইয়ের মাধ্যমে বিষয়টিকে আন্তর্জাতিক ইস্যুতে রূপান্তরিত করার জোরালো প্রয়াস চালানো জরুরি। যে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়কে সর্বাগ্রে বিবেচনায় আনতে হবে। বহিরাগত কোনো পরামর্শ বা চাপের কাছে অবনত হওয়ার অর্থ হবে জাতীয় স্বার্থকে বিকিয়ে দেয়ার নামান্তর। তাছাড়া মুক্তবাণিজ্য নিয়ে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার সুযোগ রয়েছে। সেক্ষেত্রে ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি ও বাংলাদেশের সুদূরপ্রসারী লাভালাভের বিবেচনায় কৌশলে যথাযথ সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

০৯ । বৈদেশিক সাহায্য কি? বাংলাদেশে কি কি উপায়ে বৈদেশিক সাহায্য আসে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।

উত্তর : বর্তমান সময়ে বিশ্বের সকল রাষ্ট্রকর্তৃক কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণা দারুণভাবে সমাদৃত। আর সেজন্য উন্নয়নমূলক বাজেট প্রণয়নও এখন রাষ্ট্রগুলোর কর্তব্যে পরিণত হয়েছে। উন্নয়ন বাজেট প্রণয়ন করতে গিয়ে বিশ্ব মোড়ল যুক্তরাষ্ট্র যখন ঘাটতি বাজেট প্রণয়ন করতে শুরু করলো, তখন আমাদের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে ঘাটতি বাজেট প্রণয়ন করা একটা নিয়মে পরিণত হয়ে গেল। বাংলাদেশের মত দরিদ্র দেশগুলোর উচ্চভিলাসী বাজেটের অর্থ যোগান দেওয়ার জন্য দেশীয়ভাবে সম্ভব না হওয়ায় বিদেশি দাতা সংস্থা বা দেশগুলোর সাহায্যের উপর নির্ভর করতে হয়। বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভর করে দরিদ্র দেশগুলোতে উৎপাদনশীল খাতগুলোতে বিনিয়োগের চেয়ে সৌন্দর্য্য বর্ধনমূলক খাতে বেশি বিনিয়োগের ফলে উৎপাদন না বাড়ায় বিদেশি সাহায্যের নির্ভরশীলতা থেকে দরিদ্র দেশগুলো বের হয়ে আসতে না পারায় ধনী দেশিগুলোর করোদ রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

বৈদেশিক সাহায্য : বৈদেশিক সাহায্য নামক ব্যাপারটির সাথে আমরা সবাই কম-বেশি পরিচিত। উন্নত দেশ ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রদত্ত আর্থিক ও দ্রব্য সহায়তাই হলো মূলত বৈদেশিক সাহায্য। সাধারণত ঐসব দেশে অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য এসব সাহায্য প্রদান করা হয়।

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা অনুযায়ী—Foreign aid, the international of transfer of capital, goods or services from a country or international organization for the benefit of the recepient country or its population. Aid can be economic military, or emergency humanitarian (e.g. aid given following natural disasters)

বাংলাদেশে প্রচলিত মানরীতি অনুযায়ী বৈদেশিক সাহায্য বলতে কেবল রেয়াতি শর্তাবলিতে প্রাপ্ত ঋণ ও দান বোঝায়। বাংলাদেশে বিদেশি ঋণদাতাদের মধ্যে রয়েছে বিশেষ বিশেষ দেশ, বহুজাতিক অর্থ সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক এজেন্সি ও প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশে বৈদেশিক সাহায্যের শ্রেণিকরণ হয় সাহায্যের শর্ত উৎস ও ব্যবহার ইত্যাদির ভিত্তিতে। নানা ধরনের বৈদেশিক সাহায্য হলো ঋণ ও অনুদান। দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক সাহায্য, অথবা খাদ্যসাহায্য, পণ্যসাহায্য, প্রকল্প সাহায্য এবং কারিগরি সাহায্য।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

বাংলাদেশে কী কী উপায়ে বৈদেশিক সাহায্য আসে?

গুরুতর আর্থিক ক্ষয়-ক্ষতির মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। স্বাধীনতার উষালগ্নে দেশটির শিল্প উৎপাদন প্রায় বন্ধই ছিলো; কৃষি উৎপাদানে দারুন অবনতি হয়েছিল এবং স্বাভাবিক বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড প্রকৃতপক্ষে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাহায্য ও বিপুল বৈদেশিক সাহায্যের ধারাবাহিক প্রবাহ ব্যতীত একটা নতুন জাতির অস্তিত্ব রক্ষা করা ও টিকে থাকা প্রায় অসম্ভব।

বাংলাদেশে বৈদেশিক সাহায্য প্রধানত দুভাবে আসে। যথা - (i) ঋণ ও (ii) অনুদান।

(i) **ঋণ :** বাংলাদেশের বাজেট ঘাটতি হ্রাস, অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও শিল্পায়নের জন্য বিভিন্ন ধনী দেশ ও দাতা সংস্থাগুলো ফেরতযোগ্য স্বল্প সুদে বা নামমাত্র সুদে যে অর্থ সাহায্য দেয় প্রকৃতপক্ষে তা-ই ঋণ। বৈদেশিক ঋণকে বৈদেশিক সাহায্য বলার কারণ হলো— দেশের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান যেহেতু সুদশর্তে হলেও কোনো না কোনো সংস্থা বা দেশ থেকে পাওয়া যায় এবং দেশের উন্নয়ন কাজকে ত্বরান্বিত করা যায়।

(ii) **অনুদান :** ধনী দেশ ও দাতা সংস্থাগুলো শর্তহীন, অফেরতযোগ্য, সুদহীন যে সাহায্য বাংলাদেশের উন্নয়নকল্পে দেয় তাকে বৈদেশিক অনুদান বলে।

বাংলাদেশের বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণের ইতিহাস শুরু হয় স্বাধীনতার কিছুকাল পর হতে। বাংলাদেশে বৈদেশিক সাহায্য মূলত তিনটি চ্যানেলের মাধ্যমে আসে। এগুলো হলো— ১. খাদ্য সাহায্য, ২. পণ্য সাহায্য ও ৩. প্রকল্প সাহায্য।

১. **খাদ্য সাহায্য :** স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বাংলাদেশ খাদ্য সাহায্য ও দুর্যোগকালে ত্রাণ সাহায্যরূপে ব্যাপকভাবে বৈদেশিক সাহায্য পেতে শুরু করে। দেশের উন্নয়নের প্রয়োজন আরো বেশি অনুভূত হওয়ায় সাহায্য ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং পরিমাপের বৃদ্ধি অনুযায়ী সাহায্যও বিভিন্নমুখী হয়ে পড়ে।

১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ খাদ্য পেয়েছিল ১৮২.৫৫ মিলিয়ন ডলারের। এটা দু বছরের মধ্যেই দ্বিগুণ হয়ে যায় এবং এ প্রবৃদ্ধি ১৯৮০ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। ঐ বছরেই খাদ্যসাহায্যের নিম্নমুখী প্রবণতা দেখা যায় এবং এ খাতে বাৎসরিক সাহায্য প্রবাহ ২০০ মিলিয়ন ডলারের নিচে নেমে যায়। ১৯৭২ থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত ২৭ বছরে মোট খাদ্য সাহায্য ছিল বাংলাদেশের সকল ধরনের বৈদেশিক সাহায্যের পুঞ্জীভূত পরিমাণের ১৬.৮%। ১৯৮১/৮২ সাল থেকে ১৯৯৯/২০০০ সাল পর্যন্ত ১৯ বছরের সময়কালের পরিসংখ্যান থেকে এ ধারণা পাওয়া যায় যে, গড়পড়তা, প্রতি বছরে ২.০৯ মিলিয়ন মেট্রিক টন খাদ্য বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়েছিল এবং এর ৫০% খাদ্যসাহায্য হিসেবে এসেছিল। বাংলাদেশে খাদ্য সাহায্যের প্রায় পুরোটাই (৯৯%-এরও বেশি) ছিল গম এবং প্রতিশ্রুত ও প্রাপ্ত খাদ্য সাহায্যের সবটাই ছিলো অনুদান। খাদ্যসাহায্য প্রদানের দাতাসংস্থা ও দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে ইউএন সিস্টেম (প্রধানত, বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি যুক্তরাষ্ট্র, ইইউ, কানাডা, জাপান ও অস্ট্রেলিয়া।

২. **পণ্য সাহায্য :** পণ্য সাহায্য ব্যবহৃত হয়েছে মূলত লেনদেনের ভারসাম্যহীনতা দূরীকরণে এবং স্থানীয় মুদ্রা সরবরাহের মাধ্যমে উন্নয়ন প্রকল্পের ব্যয় মেটাতে। বাংলাদেশে ১৯৭২-৯৯ সাল পর্যন্ত সময়কালে মোট পণ্যসাহায্যের প্রতিশ্রুতি ছিল ১০.৩৯ বিলিয়ন ডলারের পাওয়া গিয়েছিল ১০.০৯ বিলিয়ন এবং ঐ সময়ের মধ্যে পণ্যসাহায্য ছিল মোট সাহায্যর ২৯%। পণ্যসাহায্য ১৯৯৪ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে থাকে, তারপর এর হ্রাস ঘটে। বাংলাদেশে পণ্য সাহায্য অনুদান ও ঋণ হিসেবে প্রায় সমানভাবে এসেছে এবং ১৯৯০-এর দশকে পণ্যসাহায্য ঋণের গড় বার্ষিক অংশ ছিল ৪৮%। বাংলাদেশে পণ্যসাহায্যদাতা প্রধান দেশের মধ্যে রয়েছে জাপান, জার্মানি, নেদারল্যান্ডস্, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র।

৩. **প্রকল্প সাহায্য :** বাংলাদেশে বৈদেশিক সাহায্য প্রবাহের বৃহদাংশ হলো প্রকল্প সাহায্য। ১৯৭২-৯৯ সাল পর্যন্ত সময়কালে বাংলাদেশে ২৬.১৭ বিলিয়ন ডলারের প্রকল্প সাহায্যর প্রতিশ্রুতি ছিলো। এর মধ্যে ১৮.৮৪ বিলিয়ন ডলার পাওয়া যায়। ঐ সময়ের মধ্যে বাংলাদেশে পুঞ্জীভূত বৈদেশিক সাহায্যের মধ্যে প্রকল্প সাহায্যের অংশ ছিল ৫৪.১৯%। একই সময়ে কারিগরি সহযোগিতা ছিল মোট সাহায্যের প্রায় ৪%। গড় বার্ষিক প্রকল্প সাহায্যের ৬৩% ভাগ ঋণ হিসেবে পাওয়া গিয়েছিল, বাকিটা অনুদান হিসেবে। এডিবি, আইডিএ, ইফাদ ও ওপেক হলো প্রধান বহুপাক্ষিক দাতা গোষ্ঠীর একক নেতা। অন্য দাতা দেশগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ফ্রান্স, সৌদি আরব ও চীন।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রাপ্ত ঋণ ও অনুদান : ঋণ ও অনুদান এ দুটি হচ্ছে বৈদেশিক সাহায্যর মূল উৎস। বৈদেশিক উৎস থেকে প্রাপ্ত সম্পদের ধারা পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, বিভিন্ন অর্থবছরে অনুদানের পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটেছে। নিচে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রাপ্ত বৈদেশিক ঋণ ও অনুদানের একটা সারণি দেওয়া হলো—

অর্থবছর	ঋণ ও অনুদান গ্রহণ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)		
	অনুদান	ঋণ	মোট
২০১০-১১	৭৪৫	১০৩২	১৭৭৭
২০১১-১২	৫৮৮	১৫৩৮	২১২৬
২০১২-১৩	৭২৬	২০৮৫	২৮১১
২০১৩-১৪	৩১৮	১৫০৯	১৮২৭

[উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৪ (ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত)]

উপসংহার : বাংলাদেশে এখন বৈদেশিক সাহায্য পাওয়ার ক্ষেত্রে ক্রমাগত প্রতিযোগিতামূলক অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। সাহায্যপ্রার্থী দেশের সংখ্যা বেড়ে যাওয়াতে দাতাগোষ্ঠীগুলোকে তাদের বাজেট করার সময় প্রায়শ বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাঙ্গার পর এ অবস্থার সৃষ্টি হয়। দাতা গোষ্ঠীগুলোর অনুদানের তুলনায় শর্তাধীন ঋণের পরিমাণ যে হারে বাড়ছে তাতে বিষয়টা যা দাড়ায় তা হলো ঋণের ভারে জর্জরিত থাকা। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে দেশীয় অর্থায়নের মাধ্যমে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার চেষ্টা করতে হবে।

১০ । বাংলাদেশ বর্তমানে যেসব আন্তর্জাতিক সংস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে তার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।

অথবা, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় বাংলাদেশের ভূমিকা উল্লেখ করুন।

উত্তর : দীর্ঘ ২৩ বছর পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শাসন-শোষণের অবসান ঘটিয়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পৃথিবীর মানচিত্রে অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের। স্বাধীনতার পর থেকেই বঙ্গবন্ধুর দক্ষ ও সুকৌশলী নেতৃত্বে বাংলাদেশ বিভিন্ন দেশের স্বীকৃতি ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে। অতঃপর সেসব সংস্থায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা পালন করে কুড়িয়েছে বিশ্ববাসীর প্রশংসা এবং অর্জন করেছে বাংলাদেশের জন্য বিরল সম্মান। মুজিব-পরবর্তী সময়েও বিভিন্ন সরকারের আমলে এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে। শুধু ২০১৪ সালেই বাংলাদেশ ১১টি আন্তর্জাতিক সংস্থার নির্বাচনে বিজয় লাভ করেছে। তার আগের বছরগুলোতে জাতিসংঘের গুরুত্বপূর্ণ ডজনখানেক সংস্থাসহ ৩০-৩২টি ফোরামে বাংলাদেশ নেতৃত্ব প্রদান করেছে, যা নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অর্জন।

বাংলাদেশ বর্তমানে যেসব আন্তর্জাতিক সংস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে : বাংলাদেশ একটি দরিদ্র ও উন্নয়শীল দেশ হলেও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় গৌরবময় ভূমিকা রাখার দরুন বিশ্ব দরবারে এ দেশের অবস্থান অনেক উচ্চ আসনে। জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা (যেমন—CEDAW, UNHCR, UNFPA, UNICEF ইত্যাদি), IMSO, HFA প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সংস্থায় বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলছে। বাংলাদেশ বর্তমানে যেসব আন্তর্জাতিক সংস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে নিচে সে সম্পর্কে বর্ণনা করা হলো :

১. **ইউএনপিকেও (UNPKO) :** বাংলাদেশ বর্তমানে যেসব আন্তর্জাতিক সংস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখছে United Nations Peacekeeping Operations (UNPKO) সংস্থায়। ১৯৮৮ সালে ইরান-ইরাক শান্তি মিশনে (United Nations Iran-Iraq Military Observer Group—UNIIMOG) বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ১৫ জন সদস্যের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের পথ চলা শুরু হয়। এরপর থেকে বর্তমান পর্যন্ত এ অগ্রযাত্রা চলমান রয়েছে। সর্বশেষ (২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫) তথ্যানুযায়ী জাতিসংঘের চলমান ১৬টি মিশনের মধ্যে বাংলাদেশ ১০টি মিশনে অংশগ্রহণ করেছে। এগুলো হলো UNIFIL, MINURSO, UNMIL, UNOCI, MINUSTA, UNMID, MONUSCO, UNMISS, MINUSMA, MINVSCA। চলমান এসব মিশনে বাংলাদেশ অংশ নিয়ে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর সমস্যা সমাধানে কাজ করে যাচ্ছে।

২. **সিডো (CEDAW) :** দীর্ঘকাল থেকে নারীর প্রতি যে বৈষম্য চলে আসছে তা দূর করার জন্য ১৯৭৯ সালের ১৮ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয় নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য দূরীকরণ বিষয়ক সনদ Convention on the Eleminitation of all Forms of Discrimination Aganist Women (CEDAW)। দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ১৯৮৪ সালে এ দলিলে স্বাক্ষর করে। CEDAW এর সদস্য পদে ২০১১-২০১৪ প্রথম মেয়াদে দায়িত্ব পালন করেন বাংলাদেশের জ্যৈষ্ঠ নারী কূটনীতিক ইসমাত জাহান। পরবর্তীতে ২০১৪ সালে দ্বিতীয়বারের মতো নির্বাচিত হয়ে ইসমাত জাহান বাংলাদেশকে গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত করেন।

৩. **আইপিইউ (IPU) :** বিশ্বের ১৬৪টি দেশের আইনসভার সংগঠন Inter Parliamentary Union (IPU). সুইজারল্যান্ডের রাজধানী জেনেভায় ২০১৪ সালের ১২-১৬ অক্টোবর পাঁচদিনব্যাপী আইপিইউএর সম্মেলন (আইপিইউ-এর ১৩১তম সাধারণ অধিবেশন) অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে তিনজন প্রার্থীকে (ইন্দোনেশিয়ার সংসদ সদস্য নুরহায়াতি আলী আসিগাফ, মালদ্বীপের আইনসভার সাবেক স্পিকার আবদুল্লাহ শহীদ ও অস্ট্রেলিয়ার পার্লামেন্টের স্পিকার ব্রনউইন বিশপ) পরাজিত করে আওয়ামী লীগের ঢাকা-৯ আসনের সংসদ সদস্য সাবের হোসেন চৌধুরী আইপিইউ-এর প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হন। সাবের হোসেন চৌধুরী নির্বাচনে ১৬৯ ভোট পেয়ে প্রথম বাংলাদেশী হিসেবে আইপিইউ-এর প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। নির্বাচনে সাবের হোসেন চৌধুরীর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী অস্ট্রেলিয়ার পার্লামেন্টের স্পিকার ব্রনউইন বিশপ পান ৯৫ ভোট। সংসদীয় গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রায় মাইলফলক অর্জনকারী সংস্থা IPU-এর দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ বিশ্বদরবারে উজ্জ্বল ভূমিকা রাখছে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৪. **সিপিএ (CPA) :** ১৯১১ সালে Commonwealth Parliamentary Association (CPA) এর যাত্রা শুরু হয়। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ সিপিএ-এর সদস্যপদ লাভ করে ১৯৭৩ সালে। কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর গণতন্ত্র, সুশাসন, রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ, ক্ষমতায়ন, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ক্ষেত্রে কাজ করে থাকে সিপিএ। বর্তমানে ৫৩টি দেশের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য মিলিয়ে ১৭৫টি পার্লামেন্ট এই এসোসিয়েশনের সদস্য। ২০১৪ সালের ২ অক্টোবর সিপিএ-এর ৬০তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ক্যামেরুনের রাজধানী ইয়াওন্দেতে। এই সম্মেলনে সরাসরি ভোটে ৭০টি ভোট পেয়ে প্রথম বাংলাদেশী হিসেবে স্পিকার ড. শিরিন শারমিন চৌধুরী সিপিএ'র চেয়ারপার্সন নির্বাচিত হন। ৩ বছর মেয়াদি এই পদে ড. শিরিন শারমিন চৌধুরীর একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ক্যারিবীয় অঞ্চলের কেইম্যান আইল্যান্ডসের স্পিকার জুলিয়ানা ও'কনর। তিনি পান ৬৭টি ভোট। বাংলাদেশের বর্তমান রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ এডভোকেট ডেপুটি স্পিকার থাকাকালে সিপিএ'র নির্বাহী কমিটির সদস্য পদে দায়িত্ব পালন করেন।

৫. **ইউএনএইচআরসি (UNHRC) :** ২০১৪ সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদ United Nations Human Rights Council (UNHRC) এর সদস্য নির্বাচিত হয়। এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে ২০১৫-২০১৭ মেয়াদের জন্য ১৪৯ ভোটে ভারত, ইন্দোনেশিয়া, কাতার ও আইল্যান্ডকে হারিয়ে বাংলাদেশ ২০১৫-২০১৭ মেয়াদের দুই বছরের জন্য এই মানবাধিকার সংস্থার (UNHRC) সদস্য নির্বাচিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে এই ভোট অনুষ্ঠিত হয়। মানবাধিকার পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ করে আসছে।

৬. **ইন্টারপোল (INTERPOLE) :** ইন্টারপোল হলো আন্তর্জাতিক পুলিশ সংস্থা। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে থাকা সন্ত্রাসী ও অপরাধীদের সনাক্ত ও ধরিয়ে দিতে এ সংস্থার বিকল্প নেই। ১৯২৩ সালে মাত্র ১৯টি দেশের প্রতিনিধি নিয়ে এ সংস্থাটি গঠিত হয়। বাংলাদেশ এর সদস্যপদ লাভ করে ১৯৭৬ সালে। ইন্টারপোলের সদস্যভুক্তির পর বাংলাদেশ পুলিশের উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন সময়ে এ সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশের ভূমিকা ও প্রচেষ্টা ইন্টারপোলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বাংলাদেশ ১৯৮৮ সালে এ সংস্থার নির্বাহী কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়। এরপর থেকে বিভিন্ন মূল্যবান পরামর্শ ও নতুন পরিকল্পনা দিয়ে সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রমে বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

৭. **এইচএফএ (HFA) :** বিশ্বব্যাপী প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা, প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস এবং এ বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ বিষয়ক সংস্থা Hyogo Framework for Action (HFA)। বাংলাদেশ আগামী ৫ বছরের জন্য হিউগো ফ্রেমওয়ার্ক ফর অ্যাকশন (এইচএফএ) কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়। বিগত দিনে বাংলাদেশ এ সংস্থার সদস্য হিসেবে ছিল। ১৪ মার্চ ২০১৫ জাপানের সেন্ডাই নগরীতে জাতিসংঘের দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস বিষয়ক তৃতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বাংলাদেশকে মনোনয়নের এ সিদ্ধান্ত জানানো হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ হিউগো ফ্রেমওয়ার্কের সব শর্ত পূরণে অঙ্গীকারবদ্ধ। এ শর্ত পূরণে আইনগত, উন্নয়ন পরিকল্পনা, দুর্যোগ হ্রাস বিষয়ক পরিকল্পনা ইত্যাদি সকলক্ষেত্রে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

৮. **আইএমএসও (IMSO) :** আন্তর্জাতিক নৌসংস্থার (আইএমও) আওতায় প্রতিষ্ঠিত যুক্তরাজ্যভিত্তিক International Mobile Satellite Organization (IMSO)। এটি একটি আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংস্থা, যা ১৯৭৭ সাল থেকে যাত্রা শুরু করে। IMSO মূলত স্যাটেলাইট যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে সমুদ্র পরিবহনের নিরাপত্তা, বিপদের পূর্বাভাস, বিপদ বা দুর্যোগ কবলিত সমুদ্র পরিবহনের সন্ধান ও উদ্ধার কাজের সমন্বয়, সামুদ্রিক নিরাপত্তা বিষয়ক তথ্য সম্প্রচার ইত্যাদি সেবা প্রদান, পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। বাংলাদেশ ১৯৯৩ সালে আইএমএসও এর সদস্যপদ লাভ করে। ইউরোপের বাইরে এশিয়ার প্রথম ব্যক্তি হিসেবে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের নির্বাহী পরিচালক (প্রযুক্তি) ক্যাপ্টেন মঈন আহমদ ২০১৫ সালে আইএমএসও এর মহাপরিচালক পদে নির্বাচিত হন।

৯. **আইটিইউ (ITU) :** ১৭ মে ১৮৬৫ International Telecommunication Union (ITU) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংস্থাটি মূলত বিভিন্ন দেশের টেলিযোগাযোগ সম্পর্কিত সমঝোতার উপর ভিত্তি করে মান অনুমোদন করে। এই সমঝোতা স্বাক্ষরকারী দেশগুলো এইসব নিয়ম বা অনুমোদিত মান মেনে চলার ক্ষেত্রে আইনগত বাধ্য থাকে। বাংলাদেশ এ সংস্থার সদস্য নির্বাচিত হয় ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩। ২০১৪ সালের ২৭ অক্টোবর দক্ষিণ কোরিয়ার বুসানে আইটিইউর বার্ষিক সম্মেলনে আইটিইউ সংস্থার নির্বাচনে বাংলাদেশ বিজয়ী হয়ে কাউন্সিল সদস্যপদ লাভ করে। নির্বাচনে ১৬৭ ভোটের মধ্যে ১১৫ ভোট পেয়ে বিশাল ব্যবধানে দ্বিতীয় বারের মতো ৪ বছর মেয়াদে সংস্থাটির কাউন্সিলর নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশ উক্ত সংস্থাটিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

১০. **উইটসা (WITSA) :** তথ্য অধিকার নিয়ে সরব বিশ্ব প্রতিষ্ঠান World Information Technology Services Alliance (WITSA)। ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৪ মেক্সিকোর গুয়াদাজারায় অনুষ্ঠিত জেনারেল অ্যাসেম্বলিতে WITSA-এর গ্লোবাল ট্রেড কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন বাংলাদেশের মো. সবুর খান। মো. সবুর খান চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে WITSA-এর উদ্দেশ্য (যেমন-শিল্পের বৃদ্ধি ও উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও আইটি পণ্য এবং পরিসেবার বিনিয়োগ সুবিধা বৃদ্ধি ইত্যাদি) বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।

১১. **আইএলও (ILO) :** আন্তর্জাতিক শ্রমমান নির্ধারণ, সামাজিক সুরক্ষা, কাজের সুযোগ সৃষ্টি ইত্যাদি লক্ষ্যকে সামনে রেখে ১৯১৯ সালে International Labour Organization (ILO) প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ এর সদস্য পদ লাভ করে ২২ জুন ১৯৭২। সম্প্রতি (জুন ২০১৪) বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা পরিচালনা পর্ষদের ডেপুটি মেম্বার নির্বাচিত হয়। ২০১৪ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত ৩ বছর মেয়াদে বাংলাদেশ এ দায়িত্ব পালন করবে। বাংলাদেশ এ পদে নির্বাচিত হয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষায় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

১২. **এসিইউ (ACU) :** আন্তর্জাতিক লেনদেন নিষ্পন্নকারী সংস্থা Asian Clearing Union (ACU) প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৪ সালের ৯ ডিসেম্বর। বাংলাদেশ এর সদস্যপদ লাভ করে ১৯৭৬ সালে। ২৩ মে ২০১৪ ইরানের কিশ দ্বীপে অনুষ্ঠিত ACU-এর পরিচালনা পর্ষদের ৪৩তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত সংস্থাটির সভাপতি নির্বাচিত হয়। সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক ACU-এর উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সদস্য দেশগুলোর কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর মধ্যে আঞ্চলিক লেনদেনে ভারসাম্য বজায় রাখা, পেমেন্ট ব্যবস্থা সহজীকরণে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ও স্থানান্তর খরচের ক্ষেত্রে মিতব্যয়িতা ইত্যাদি কাজ করে যাচ্ছে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

১৩. **সাউথ-সাউথ কো-অপারেশন ব্যুরো :** সাউথের সাথে সাউথের দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্য সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৭৮ সালে জাতিসংঘ তার সহযোগী সংস্থা হিসেবে সাউথ-সাউথ কো-অপারেশন প্রতিষ্ঠা করে। ১৯ মে ২০১৪ নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে জাতিসংঘের সহযোগী সংস্থা সাউথ-সাউথ কো-অপারেশনের উচ্চ পর্যায়ের এক বৈঠকে সাউথ-সাউথ কো-অপারেশন ব্যুরোর সভাপতি নির্বাচিত হয় বাংলাদেশ। দুই বছরের জন্য সভাপতির দায়িত্ব পালন করবে জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন। সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, পরিবেশ ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

১৪. **আইওএসসিও (IOSCO) :** ১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় International Organization of Securities Commision (IOSCO)। এর প্রয়োগ ও সহযোগিতা বিষয়ক (এনফোর্সমেন্ট অ্যান্ড কো-অপারেশন) উপদেষ্টা পদে নিয়োগ লাভ করেন বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (BSREC) নির্বাহী পরিচালক ফরহাদ আহমেদ। IOSCO-এর নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে নিয়োগ পাওয়া তিনিই প্রথম বাংলাদেশী নাগরিক।

১৫. **এপিআরএসিএ (APRACA) :** ১৯ মে ২০১৪ Asia-Pacific Rural and Agricultural Credit Association (APRACA)-এর ১৯তম সাধারণ সভায় দুই বছরের জন্য চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর এসকে সুর চৌধুরী। বর্তমানে নতুন চেয়ারম্যান APRACA এর সদস্য দেশগুলোর মধ্যে ক্ষুদ্র কৃষকদের জন্য টেকসই আর্থিক সহযোগিতা, গ্রামীণ অভিজ্ঞতা বিনিময় ইত্যাদি ক্ষেত্রে কাজ করে যাচ্ছে।

উপসংহার : আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থায় বাংলাদেশের অংশগ্রহণ ও নেতৃত্বদান দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর পিছনে রয়েছে বাংলাদেশের সুকৌশলী নেতৃত্ব। যার দরুন বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় নেতৃত্বদানের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ বহির্বিশ্বে দেশের সুনাম বৃদ্ধি করছে এবং অগ্রগতির পথে ধাবমান হচ্ছে। বর্তমান সরকার আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এ সুনাম বৃদ্ধি তথা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় নেতৃত্ব দানের প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে বদ্ধপরিকর।

১২ । এ পর্যন্ত জাতিসংঘের কতটি শান্তিরক্ষী মিশন গঠিত হয়েছে? বর্তমানে বাংলাদেশ কোন কোন মিশনে শান্তিরক্ষায় কাজ করছে?

উত্তর : পৃথিবী জুড়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অল্প কিছুকাল পর অর্থাৎ ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশন। United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO) মিশনের মধ্য দিয়ে ১৯৪৮ সালের মে মাসে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশন তার যাত্রা শুরু করে। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত তা অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশ ১৯৮৮ সালে ১৫ জন সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা নিয়ে United Nations Iran-Iraq Military Observer Group (UNIIMOG) মিশনে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশনে যাত্রা শুরু করে।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশন : ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকে বর্তমান (২০১৪ এপ্রিল) পর্যন্ত জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশন ৭২টি মিশন গঠন করে বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

৭২টি মিশনের মধ্যে ৬৩টি মিশন সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে। বাকি ১৯টি মিশন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সংঘাত-কলহ দূর করে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। নিচে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশন কর্তৃক সমাপ্ত ও চলমান মিশনগুলোর তালিকা ছকে উল্লেখ করা হলো :

ক. সমাপ্ত মিশনসমূহ :

জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী মিশন কর্তৃক ৬৩টি সমাপ্ত মিশনের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিচে ছকের আকারে দেখানো হলো :

মিশনের নাম	শুরুর তারিখ	সমাপ্ত তারিখ
First United Nations Emergency Force (UNEFI)	নভেম্বর ১৯৫৬	জুন ১৯৬৭
United Nations Operation in the Congo (ONUC)	জুলাই ১৯৬০	জুন ১৯৬৪
United Nations Observer Mission in Georgia (UNOMIG)	আগস্ট ১৯৯৩	জুন ২০০৯
United Nations Observer Mission in Liberia (UNOMIL)	সেপ্টেম্বর ১৯৯৩	সেপ্টেম্বর ১৯৯৭
United Nations Mission in Bosnia and Harzegovina (UNMIBH)	ডিসেম্বর ১৯৯৫	ডিসেম্বর ২০০২
United Nations Observer Mission in Sierra Leone (UNOMSIL)	জুলাই ১৯৯৮	অক্টোবর ১৯৯৯
United Nations Transitional Administration in East Timor (UNTAET)	অক্টোবর ১৯৯৯	মে ২০০২
United Nations Operation in Burundi (ONUB)	জুন ২০০৪	ডিসেম্বর ২০০৬
United Nations Mission in the Sudan (UNMIS)	মার্চ ২০০৫	জুলাই ২০১১
United Nations Mission in the Central African Republic and Chad (MINURCAT)	সেপ্টেম্বর ২০০৭	ডিসেম্বর ২০১০

খ. চলমান মিশনসমূহ :

বর্তমানে (এপ্রিল ২০১৪) বিশ্বব্যাপী ১৯টি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের কাজ চলমান রয়েছে। নিচে এগুলো ছকের আকারে উল্লেখ করা হলো :

মিশনের নাম	শুরুর তারিখ
United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO)	মে ১৯৪৮
United Nations Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP)	জানুয়ারি ১৯৪৯
United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP)	মার্চ ১৯৬৪
United Nations Disengagement Observer Force (UNDOF)	জুন ১৯৭৪
United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL)	মার্চ ১৯৭৮
United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO)	এপ্রিল ১৯৯১
United Nations Interim Administration Mission in KOSOVO (UNMIK)	জুন ১৯৯৯
United Nations Mission in Liberia (UNMIL)	সেপ্টেম্বর ২০০৩
United Nations Operation in Cote d'Ivoire (UNOCI)	এপ্রিল ২০০৪
United Nations Stabilization in Haiti (MINUSTAH)	জুন ২০০৪
African Union United Nations Hybrid Operation in Darfur (UNAMID)	জুলাই ২০০৭
United Mission in Nepal (UNMIN)	২০০৭
United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo (MOUSCO)	জুলাই ২০১০

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

মিশনের নাম	শুরুর তারিখ
United Nations Organization Interim Security Force for Abyei (UNISFA)	জুন ২০১১
United Nations Mission in the Republic of South Sudan (UNMISS)	জুলাই ২০১১
United Nations Multidimensional Integrated Stabilizasion Mission in Mali (MINUSMA)	এপ্রিল ২০১৩
United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic (MINUSCA)	এপ্রিল ২০১৪
United Nations Logistic Base (UNLB)	–
United Nations Headquarter (UNHQ)	–

বর্তমানে বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের যেসব মিশনে কাজ করছে : ১৯৮৮ সালে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ অংশ নিয়ে এ পর্যন্ত (২০১৪ সাল) ৬৩টি মিশনে অংশ নিয়েছে এবং ৩৭টি মিশন সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য মিশন হলো– UNAMA (আফগানিস্তান), UNSMA/UNGOMAP (আফগানিস্তান-পাকিস্তান), UNBIH (বসনিয়া), BINUB (বুরুন্ডি), UNMEE (ইথিওপিয়া/ইরিত্রিয়া), UNMIK (কসোভো) ইত্যাদি। ৩৭টি মিশনে বাংলাদেশের ১,২১,৪০৭ জন শান্তিরক্ষী অংশ নেন। এর মধ্যে সেনাবাহিনীর ১,০২,৪৯৯ জন, নৌবাহিনীর ২,৭৬৭ জন, বিমানবাহিনীর ৩,৫৯০ জন এবং পুলিশবাহিনীর ১২,৫৫১ জন অংশ নেন এসব মিশনে। বর্তমানে (২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তথ্যানুযায়ী) বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের চলমান ১৬টি মিশনের মধ্যে ১০টি মিশনে কাজ করছে। নিচে এগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

ক্রমিক নং	দেশ	মিশনের নাম	মোট (জন)
১.	লাইবেরিয়া	UNMIL	৫৪২
২.	আইভরি কোস্ট	UNOCI	২,৩৭৩
৩.	দক্ষিণ সুদান	UNMISS	৩০৩
৪.	ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গো	MONUSCO	২,৯৫৩
৫.	সুদান (দারফুর)	UNAMID	৯৩২
৬.	লেবানন	UNIFIL	৩২৬
৭.	পশ্চিম সাহারা	MINURSO	২৯
৮.	মালি	MINUSMA	১৮৫
৯.	হাইতি	MNUSTAO	৩২৩
১০.	নেপাল	UNMIO	১
		মোট	৭,৯৬৭

১. **UNMIL (লাইবেরিয়া) :** ১৯৮৯ ও ১৯৯০ সালে লাইবেরিয়ার সরকার ও বিরোধী দলের মাঝে সংঘাতের দরুন অসংখ্য লোক প্রতিবেশী দেশে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং দেশ সংঘাতময় পরিস্থিতির দিকে এগিয়ে যায়। তাছাড়া প্রতিনিয়ত মৃতের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এহেন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন United Mission in Liberia

(UNMIL) নামে একটি মিশন গঠন করে ২০০৩ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর। পরবর্তীতে UNMIL মিশনটি লাইবেরিয়ায় প্রেরণ করে। এতে বাংলাদেশের ৫৪২ জন সদস্য অংশ নেন।

২. **UNOCI (আইভরি কোস্ট) :** আইভরি কোস্টের জাতিগত সংঘাতের দরুন বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা যখন বিঘ্নিত হওয়ার উপক্রম, ঠিক সেই মুহূর্তে জাতিসংঘ সনদের চ্যাপ্টার VII অনুযায়ী ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ সালে গঠন করা হয় United Nations Operation in cote d'Ivoire (UNOCI) মিশন। এ মিশনের প্রাথমিক সময়সীমা ছিল এপ্রিল ২০০৪ থেকে ১২ মাস পর্যন্ত। কিন্তু এ সময়ের মধ্যে আইভরি কোস্টের সংঘাতের অবসান না হওয়ায় এর সময়সীমা বৃদ্ধি পায়। UNOCI মিশনে বাংলাদেশের ২,৩৭৩ জন নিয়োজিত রয়েছে। চলমান মিশনগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যক বাংলাদেশী সদস্য রয়েছে এ মিশনে।

৩. **UNMISS (দক্ষিণ সুদান) :** ৯ জুলাই ২০১১ দক্ষিণ সুদান নামক দেশ পৃথিবীর বুকে জন্ম নেওয়ার একদিন আগে অর্থাৎ ৮ জুলাই ২০১১ সালে জাতিসংঘ নিরাপত্তা কাউন্সিল রেজুলেশন ১৯৯৬ (২০১১) অনুযায়ী United Mission in South Sudan (UNMISS) মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। নবগঠিত দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা এবং দেশের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে মিশনটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ মিশনে বাংলাদেশের ৩০৩ জন সদস্য কাজ করছেন।

৪. **MONUSCO (ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গো) :** ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গোর সংঘাত নিরসনে ৩০ নভেম্বর ১৯৯৯ প্রতিষ্ঠা করা হয় United Nations Mission in the Democratic Republic of Congo (MONUC)। ২০১০ সালে এসে এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় The United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo (MONUSCO)। ৯ এপ্রিল ২০১৫ গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের শান্তি মিশনে যোগ দিতে ঢাকা ত্যাগ করে বাংলাদেশ নারী পুলিশের দ্বিতীয় কনটিনজেন্ট (১২৫ সদস্য)। এ মিশনে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সংখ্যক সদস্য নিয়োজিত রয়েছেন। নিয়োজিত সদস্যের সংখ্যা ২,৯৫৩ জন।

৫. **UNAMID (সুদান, দারফুর) :** আফ্রিকার অন্যতম সংঘাতপূর্ণ স্থান সুদানের দারফুর। এ সংঘাতপূর্ণ স্থানে শান্তি স্থাপনের লক্ষ্যে United Nations Security Council Resolution 1769 অনুসারে ২০০৭ সালের ৩১ জুলাই গঠন করা হয় United Nations-African Union Mission in Darfur (UNAMID)। এ মিশনে বাংলাদেশের ৯৩২ জন সদস্য কর্মরত রয়েছেন।

৬. **UNIFIL (লেবানন) :** লেবানন থেকে ইসরাইলের সৈন্য প্রত্যাহারের লক্ষ্যে United Nations Security Council Resolution 425 and 426 অনুযায়ী ১৯ মার্চ ১৯৭৮ সালে গঠিত হয় United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL)। মিশনের উদ্দেশ্য সাধিত না হওয়ার দরুন এখনো এ মিশন কাজ করে যাচ্ছে। UNIFIL মিশনে বাংলাদেশের ৩২৬ জন সদস্য কর্মরত রয়েছেন।

৭. **MINURSO (পশ্চিম সাহারা) :** পশ্চিম সাহারার বিবদমান সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে United Nations security Council Resolution 690 অনুযায়ী ২৯ এপ্রিল ১৯৯১ গঠিত হয় United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO)। এ মিশনে বাংলাদেশের ২৯ জন সদস্য কর্মরত রয়েছেন।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৮. **MINUSMA (মালি) :** সংঘাত জর্জরিত দেশগুলোর মধ্যে মালি অন্যতম। মালির সংঘাত নিরসনে United Nations Security Council Resolution 2100 অনুসারে ২৫ এপ্রিল ২০১৩ গঠিত হয় United Nations Multidimentional Integrated Stabilization Mission in Muli (MINUSMA)। এ মিশনে বাংলাদেশের ১৮৫ জন সদস্য কর্মরত রয়েছেন।

৯. **MNUSTAH (হাইতি) :** আফ্রিকার আরেকটি সংঘাতপূর্ণ ও অশান্ত দেশের নাম হাইতি। হাইতির সংঘাত নিরসনে United Nations Stabilization Mission in Haiti (MNUSTAH) মিশন গঠিত হয় ১ জুন ২০০৪ সালে। United Nations Security Council Resolution 2180 অনুসারে এ মিশনের মেয়াদকাল ১৪ অক্টোবর ২০১৪ হতে ১৫ অক্টোবর ২০১৫ পর্যন্ত। এ মিশনে বাংলাদেশের ৩২৩ জন সদস্য কর্মরত রয়েছেন।

১০. **UNMIN (নেপাল) :** ২০০৬ সালের ২১ নভেম্বর, 'Comprehensive Peace Agreement' স্বাক্ষরের মাধ্যমে নেপাল সরকার ও মাও বিদ্রোহীদের সংঘাতের অবসান ঘটে। অতঃপর নেপালে মাওবিদ্রোহীদের নিরস্ত্রীকরণ ও সাংবিধানিক পরিষদ নির্বাচন ২০০৭ এর প্রস্তুতিতে সহায়তা ও অন্যান্য বিষয়ে সহযোগিতার লক্ষ্যে United Nations Mission in Nepal (UNMIN) গঠিত হয় ২৩ জানুয়ারি ২০০৭। UNMIN মিশনে বাংলাদেশের ১ জন সদস্য কর্মরত রয়েছেন।

উপসংহার : জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশনে শান্তিরক্ষী পাঠানোর ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান শীর্ষে। বিশ্বের সংঘাতপূর্ণ প্রতিটি দেশে প্রেরিত বাংলাদেশের এসব শান্তিরক্ষীরা যেমন সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সমস্যা সমাধানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন তেমনি বয়ে এনেছেন দেশের জন্য সুনাম। পাশাপাশি দেশে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক রিপোর্ট মতে, বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর প্রায় ২ হাজার সদস্য জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের অধীনে প্রায় ১০টি দেশে কর্মরত থেকে বছরে প্রায় ৪০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আয় করেছেন। আবার ১৯৮৯-২০১৩ পর্যন্ত জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে মোট ১১২ জন সদস্য নিহত এবং ১৫৪ জন সদস্য আহত হয়েছে। মোটের উপর জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের অবদান অপরিসীম।

১৩। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশনে বাংলাদেশের সফলতা আলোচনা করুন।
***অথবা,* জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশনে অংশ নিয়ে বাংলাদেশ এ পর্যন্ত যেসকল মিশন সফলভাবে সম্পন্ন করেছে তার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি আলোচনা করুন।**

উত্তর : বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার অংশ হিসেবে জাতিসংঘের নেতৃত্বে বিরোধপূর্ণ স্থানগুলোতে শান্তিরক্ষী মিশন প্রেরণ করা হয়। যুদ্ধ কিংবা বিরোধপূর্ণ স্থানগুলোতে ভারসাম্য আনয়নে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। জাতিসংঘের নিজস্ব কোনো বাহিনী নেই। এর সদস্য দেশগুলো থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে শান্তিরক্ষী মিশনে প্রেরণ করা হয়। বাংলাদেশ থেকে প্রথম শান্তিরক্ষী মিশনে সৈন্য নেওয়া হয় ১৯৮৮ সালে। এ পর্যন্ত (এপ্রিল ২০১৪) বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের ৬৩টি মিশনে অংশ নিয়ে সফলতার স্বাক্ষর রেখেছে এবং বিশ্বব্যাপী দেশের জন্য সুনাম বয়ে এনেছে।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশনে বাংলাদেশের সফলতা : ১৯৮৮ সালে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশনে বাংলাদেশ ১৫ জন সেনাবাহিনীর সদস্য নিয়ে যাত্রা শুরু করে। এ পর্যন্ত (২০১৪) বাংলাদেশ

জাতিসংঘের ৭২টি মিশনের মধ্যে ৬৩টি মিশনে অংশ নিয়ে ৩৭টি মিশন সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। ৩৭টি মিশনে বাংলাদেশের ১,২১,৪০৭ জন শান্তিরক্ষী অংশ নেন। এর মধ্যে সেনাবাহিনীর ১,০২,৪৯৯ জন, নৌবাহিনীর ২,৭৬৭ জন, বিমানবাহিনীর ৩,৫৯০ জন এবং পুলিশবাহিনীর ১২,৫৫১ জন অংশ নেন এসব মিশনে। নিচে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশনে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য সফলতাসমূহ আলোচনা করা হলো :

ক. **সেনাবাহিনী :** জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যরা নীল হেলমেট মাথায় নিয়ে প্রচণ্ড সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অসামান্য সাফল্যের ইতিহাস তৈরি করেছেন। নিচে এর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি তুলে ধরা হলো :

১. **সাবেক যুগোশ্লাভিয়া :** ১৯৯৪ সালে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষী বাহিনী বিহাচে (Bihac) পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। এমনকি বসনিয়া ও ক্রোয়াট বাহিনী দ্বারা বেশ কয়েক সপ্তাহ অবরুদ্ধ থাকার পরও বাংলাদেশী সেনা সদস্যরা বিহাচে সততা ও দৃঢ়তার সাথে তাদের অর্পিত দায়িত্ব পালন করে জাতিসংঘের ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ন রাখতে সক্ষম হন।

২. **সোমালিয়া :** ১৯৯৫ সালে সোমালিয়ায় জাতিসংঘের মিশন ইউনোসোম (UNOSOM) জটিল অবস্থার সম্মুখীন হয়। এ সময় বাংলাদেশী শান্তিরক্ষী বাহিনীর সদস্যরা তাদের সাহস ও মনোবলের মাধ্যমে শান্তিমিশন শেষ হওয়া পর্যন্ত জাতিসংঘের বেসামরিক কর্মীদের এবং অন্যান্য সামরিক কন্টিনজেন্টের জন্য নিরাপদ প্রস্থানের পরিবেশ নিশ্চিত করেন।

৩. **কঙ্গো প্রজাতন্ত্র :** ২০০৩ সালে যখন ব্যাপক ও বিস্তৃত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে কঙ্গোর ইতুরি প্রদেশে হাজার হাজার মানুষ মারা যায়, তখন বাংলাদেশের শান্তিরক্ষী বাহিনীর সদস্যরা তৎক্ষণাৎ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সচেষ্ট হন। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ কঙ্গোর ইতিহাসে সবচেয়ে বড় সেনা অভিযানকে সাফল্যমণ্ডিত করে। কঙ্গোর মামবাসা অঞ্চলে বিদ্রোহীদের (মাই মাই সিমবা) প্রতিহত করে শহর থেকে তাদের বিতাড়ন করায় ফোর্স কমান্ডার বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের ভূয়সী প্রশংসা করেন। কঙ্গোর সরকারি বাহিনীকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয়টি সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে।

৪. **আইভরি কোস্ট (ইউনোসি) :** আইভরি কোস্টে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন-পরবর্তী উদ্ভূত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে সবচেয়ে গোলযোগপূর্ণ এলাকা আবিদজান, ডালোয়া, মান এবং বহুল আলোচিত গালফ হোটেলে অবস্থানরত আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত প্রেসিডেন্ট আলাসান ওয়াতারার নিরাপত্তার দায়িত্বে সাফল্যের সঙ্গে নিয়োজিত ছিলেন। আবিদজানে নিয়োজিত বাংলাদেশী কন্টিনজেন্টগুলো বিভিন্ন দেশের দূতাবাসের ৬০ জনেরও বেশি কূটনীতিককে উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার দায়িত্বও সফলভাবে সম্পন্ন করে। ফোর্স দপ্তরের সামরিক ও বেসামরিক সব সদস্যের নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্বও সাফল্যের সঙ্গে নিশ্চিত করেন বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা।

৫. **দক্ষিণ সুদান (আনমিস) :** দক্ষিণ সুদানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জুবা অঞ্চলে নিয়োজিত বাংলাদেশী কন্টিনজেন্টগুলো তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে জাতিসংঘ কর্তৃক আয়োজিত গণভোট সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করে। এটি দক্ষিণ সুদানের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করতে বিশেষ অবদান রেখেছে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৬. **লাইবেরিয়া (আনমিল) :** আইভরি কোস্টের গোলযোগপূর্ণ পরিস্থিতি চলাকালে লাইবেরিয়ায় নিয়োজিত বাংলাদেশী কন্টিনজেন্টগুলো প্রত্যক্ষভাবে শরণার্থী পরিস্থিতি মোকাবিলায় সীমান্ত অঞ্চলে নিয়োজিত ছিল। শরণার্থী নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশী কন্টিনজেন্ট কুটুও নামক স্থানে একটি নতুন ক্যাম্প স্থাপন করে। সামগ্রিকভাবে লাইবেরিয়ার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট উন্নয়নে বাংলাদেশ প্রত্যক্ষ ভূমিকা রেখে চলেছে। বিশেষ করে কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও প্রকৌশল সহায়তায় বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের ইতিবাচক ভূমিকায় স্থানীয় জনগণ ও সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে। এছাড়া লাইবেরিয়ার সেনাবাহিনীকে বাংলাদেশ ব্যানইঞ্জিনিয়ার কম্পানির প্রশিক্ষণের বিষয়টি ওই দেশের সরকার বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছে।

৭. **অন্যান্য :** বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর শান্তিরক্ষীরা ইরিত্রিয়া, অ্যাঙ্গোলা ও সুদানে মাইন নিষ্ক্রিয়করণ, সোমালিয়ায় উদ্বাস্তুদের নিরাপদে স্থানান্তর এবং সিয়েরা লিওনে স্কুল ও চিকিৎসাসেবা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় কাজ করেছেন। এছাড়া মোজাম্বিক, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ইথিওপিয়া, ইরিত্রিয়া, কসোভো, পূর্ব তিমুর প্রভৃতি দেশে শান্তিরক্ষা মিশনে সেনাবাহিনীর সদস্যরা ঈর্ষণীয় সাফল্য দেখিয়েছেন।

খ. **নৌবাহিনী :** ২০০৫ সালে সুদানে ইউএনএমআইএসএস (UNMISS) মিশনের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ফোর্স রিভারাইন ইউনিটকে (বিএএনএফআরইউ-BANFRU) একটি স্বতন্ত্র ইউনিট হিসেবে মোতায়েন করা হয়। UNIFIL-এর আওতায় ফর্মড মেরিটাইম টাস্কফোর্সের (এফএমটিএফ) অংশ হিসেবে ২০১০ সালে লেবাননে বিএনএস ওসমান ও বিএনএস মধুমতি মোতায়েন করা হয়। জাহাজগুলো এক বছর সাফল্যের সঙ্গে দায়িত্ব পালন শেষে তাদের কাজের মেয়াদ আরো একবছর বাড়ানো হয়। জাতিসংঘের ২৫টি শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে (ইউএনপিকেও) এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ১ হাজার ৫১৬ জন অফিসার ও নাবিক অংশ নিয়েছেন। বর্তমানে ৮টি ইউএনপিকেওতে ৫২৬ জন অফিসার ও নাবিক পর্যবেক্ষক, এসও ও কন্টিনজেন্ট সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

গ. **বিমানবাহিনী :** ১৯৯৩ সালে বসনিয়া হার্জেগোভিনায় UNPOROFOR-এ অংশ নেওয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশ বিমানবাহিনী জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের সাথে যুক্ত হয়। এরপর ১৯৯৫ সালে ইউনিফমে বাংলাদেশ বিমানবাহিনী হেলিকপ্টারসহ অংশ নেয়। আট-বছর ধরে ওই অভিযানটি অব্যাহত ছিল। ২০০৩ সালে পূর্ব তিমুরে UNMISET-তে বিমানবাহিনীর আরো একটি কন্টিনজেন্ট মোতায়েন করা হয়। অত্যন্ত ভিন্ন পরিবেশ সত্ত্বেও বিমানবাহিনীর শান্তিরক্ষীরা সাফল্যের সঙ্গে বিশ্ব শান্তিরক্ষায় সহায়তা করেন। ২০০৩ সালে এ বাহিনী MONUC-তে পাঁচটি এমআই-১৭ হেলিকপ্টার এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রীসহ এয়ারফিল্ড সার্ভিসেস কন্টিনজেন্ট পাঠায়। এরপর ২০০৯ ও ২০১০ সালে শাদে তিনটি বেল-২১২ হেলিকপ্টারসহ একটি এয়ার কন্টিনজেন্ট এবং মুভমেন্ট কন্ট্রোল প্লাটুন পাঠানো হয়। ২০১১ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত ২১টি দেশে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর ২,৬৫৯ জন সদস্য সাফল্যের সঙ্গে দায়িত্ব সম্পন্ন করেন।

ঘ. **পুলিশবাহিনী :** ১৯৮৯ সাল থেকে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অন্যান্য বাহিনীর পাশাপাশি বাংলাদেশ পুলিশের সদস্যরা অংশ নিচ্ছেন। নির্বাহী ও পর্যবেক্ষণ মিশনে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি বাংলাদেশ পুলিশবাহিনীর সদস্যরা বিভিন্ন জটিল দায়িত্ব সাফল্যের সঙ্গে পালন করেছেন। নিরাপত্তা রক্ষার পাশাপাশি টেকসই পুলিশ ব্যবস্থা উন্নয়ন, স্থানীয় তদন্তকারীদের উৎসাহিত করতে সহায়তা, মানুষের ঝুঁকি প্রশমন ছিল তাদের অন্যতম কাজ। উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার জন্য জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ পুলিশের চাহিদা বাড়ছে। বাংলাদেশ

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

পুলিশবাহিনীর সাফল্যের কারণে ২০১৪ সাল নাগাদ জাতিসংঘ তার শান্তিরক্ষা মিশনগুলোতে বাংলাদেশী নারী পুলিশ সদস্যের সংখ্যা ২০ শতাংশে উন্নীত করে।

অন্যান্য : সফলভাবে সমাপ্তকারী মিশন, চলমান মিশনে অংশ নেওয়া বাংলাদেশের বিভিন্ন বাহিনীর সদস্যসংখ্যার পরিসংখ্যান, আহত ও নিহতদের পরিসংখ্যান নিচে ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো :

১. **সমাপ্ত মিশনে অংশগ্রহণকারী সদস্য সংখ্যা :** বাংলাদেশ এ পর্যন্ত (এপ্রিল ২০১৪) ৬৩টি মিশনে অংশ নিয়ে ৩৭টি মিশন সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। নিচে ৩৭টি মিশনে বাংলাদেশের বিভিন্ন বাহিনীর সদস্যদের অংশগ্রহণের পরিসংখ্যান দেখানো হলো :

ক্রমিক নং	বাহিনী	সেনা	নৌ	বিমান	মোট
১.	সশস্ত্রবাহিনী	১,০২,৪৯৯	২,৭৬৭	৩,৫৯০	১,০৮,৮৫৬
২.	পুলিশবাহিনী	-	-	-	১২,৫৫১
				সর্বমোট	১,২১,৪০৭

২. **চলমান মিশনে অংশগ্রহণকারী সদস্য সংখ্যা :** বর্তমানে (২০১৪ পর্যন্ত) বিভিন্ন দেশে চলমান মিশনগুলোর মধ্যে ১২টি মিশনে অংশ নিয়ে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষা বাহিনীর সদস্যরা কাজ করছে। নিচে এদের পরিসংখ্যান দেখানো হলো :

ক্রমিক নং	বাহিনী	সেনা	নৌ	বিমান	মোট
১.	সশস্ত্রবাহিনী	৫,২৩২	৪০৫	৫০৬	৬,১৪৩
২.	পুলিশবাহিনী				১,৮২৪
				মোট	৭,৯৬৭

৩. **নিহত সদস্য সংখ্যা :** ১৯৮৯ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ শান্তিরক্ষী বাহিনীর ১১২ জন সদস্য প্রাণ হারান। নিচে এদের পরিসংখ্যান দেখানো হলো :

ক্রমিক নং	বাহিনীর নাম	মোট
১.	বাংলাদেশ সেনাবাহিনী	৯১
২.	বাংলাদেশ নৌবাহিনী	০১
৩.	বাংলাদেশ বিমানবাহিনী	০৪
৪.	বাংলাদেশ পুলিশবাহিনী	১৬
	মোট	১১২

৪. **আহত সদস্য সংখ্যা :** ১৯৮৯ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে শান্তিরক্ষী বাহিনীর ১৫৪ জন সদস্য আহত হন। নিচে এদের পরিসংখ্যান দেখানো হলো :

ক্রমিক নং	বাহিনীর নাম	মোট
১.	বাংলাদেশ সেনাবাহিনী	১৩৯
২.	বাংলাদেশ নৌবাহিনী	০১
৩.	বাংলাদেশ বিমানবাহিনী	০৫
৪.	বাংলাদেশ পুলিশবাহিনী	০৯
	সর্বমোট	১৫৪

উপসংহার : সংঘাত নিরসন ও সংঘাত নিরসন পরবর্তী সময়ে সংশ্লিষ্ট দেশে উন্নয়ন ঘটাতে বাংলাদেশ শান্তিরক্ষী বাহিনী আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের শান্তিরক্ষী বাহিনীরা বিশ্বের সর্বত্র দক্ষতা, সততা ও পেশাদারিত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে বাংলাদেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরিতে সাহায্য করছে। পাশাপাশি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশনে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের অর্জিত আয় বাংলাদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখছে। মোটকথা, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনীর সফলতা বিদেশে যেমন প্রশংসিত, তেমনি দেশেও সর্বত্র প্রশংসিত।

১৪ ॥ স্বাধীনতা-উত্তরকাল থেকে সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অর্জনগুলো সম্পর্কে আলোচনা করুন।

ভূমিকা : ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ ছিল পশ্চিমা শাসকবর্গের শাসন-শোষণের ফল। নির্যাতিত, শোষিত, বঞ্চিত ও নিগৃহীত বাঙালির মুক্তির আকাঙ্ক্ষা থেকে আত্মত্যাগ ও ভারত-সরকারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতার চূড়ান্ত প্রতিফলন বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন। স্বাধীনতাউত্তরকাল থেকে সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নানা ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্জন ঈর্ষণীয়। আর এ ধারা এখনো অব্যাহত রয়েছে।

স্বাধীনতা উত্তরকাল থেকে সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অর্জনসমূহ : কূটনীতি, বৈদেশিক নীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, খেলাধুলা, শিক্ষা, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় সদস্যপদ লাভ ও প্রতিনিধিত্ব প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্জন আশাতীত। নিচে স্বাধীনতা উত্তরকাল থেকে সাম্প্রতিক সময়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের অর্জনসমূহ আলোচনা করা হলো :

১. **ভারতীয় সেনা প্রত্যাহার :** স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে শেখ মুজিব সরকারের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ ছিল বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সেনা প্রত্যাহার করা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করে দেশে ফেরার পথে শশাংক শেখর ব্যানার্জির সাথে আলোচনা ও পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে আলোচনা করে বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সেনা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিতে রাজি করান। সেই সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৭-১৯ মার্চ ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ থেকে সকল ভারতীয় সেনা প্রত্যাহার করা হয়।

২. **বিভিন্ন দেশের স্বীকৃতি :** স্বাধীনতা লাভের পূর্বে বাংলাদেশ শুধুমাত্র ভারত (৬ ডিসেম্বর ১৯৭১) এবং ভুটান (৭ ডিসেম্বর ১৯৭১) এর স্বীকৃতি লাভ করে। বড় বড় পরাশক্তির নিকট থেকে তাই স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করা বাংলাদেশের জন্য জরুরি হয়ে পড়ে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কূটনৈতিক দক্ষতায় ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট পর্যন্ত বাংলাদেশ ১১৬টি দেশের স্বীকৃতি লাভ করতে সক্ষম হয়। বর্তমান পর্যন্ত বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী দেশের সংখ্যা ১১৯টি। বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম আরব দেশ ইরাক (৮ জুলাই ১৯৭২), প্রথম মুসলিম এবং আফ্রিকান দেশ সেনেগাল (১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২) এবং প্রথম আমেরিকান দেশ বার্বাডোস।

৩. **মুসলিম বিশ্বসহ অন্যান্য দেশগুলোর সাথে সুসম্পর্ক :** স্বাধীনতা উত্তরকালে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের আরেকটি বড় সাফল্য হলো মুসলিম বিশ্বসহ অন্যান্য দেশগুলোর সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন । শেখ মুজিব, জিয়া, এরশাদ, খালেদা জিয়া এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ বাংলাদেশের সকল রাষ্ট্রনায়কই কমবেশি বিদেশের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেছেন। যার দরুন বিশ্ব পরিমণ্ডলে বাংলাদেশ আজ ব্যাপকভাবে পরিচিত।

৪. **বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ লাভ :** স্বাধীনতার পর থেকেই বঙ্গবন্ধুর দক্ষ ও কৌশলী নেতৃত্বে বাংলাদেশ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে। মুজিব পরবর্তী সময়েও বিভিন্ন সরকারের আমলে এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশ ১৯৭২ সালে কমনওয়েলথ, ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘ, ওআইসি ও আইডিবির সদস্যপদ লাভ করে। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ CEDAW, UNHCR, UNFPA, UNICEF, IMO, HFA, UNPKO, IPU, ITU, CPA, INTERPOLE, IMSO, WITSA, ILO, ACO প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে।

৫. **বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় প্রতিনিধিত্ব :** স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ শুধুমাত্র বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদই লাভ করেনি, পাশাপাশি বিভিন্ন সংস্থায় প্রতিনিধিত্ব করেও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের সুনাম বৃদ্ধি করছে। অতীতে যেমন বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিত্ব করেছে বাংলাদেশ, ঠিক তেমনি বর্তমানকালেও তা অব্যাহত রয়েছে। যেমন– ২০১৪ সালে CEDAW এর সদস্য পদে দ্বিতীয়বারের মতো নির্বাচিত হন ইসমাত জাহান। ২০১৪ সালে বিশ্বের ১৬৪টি দেশের আইনসভার সংগঠন আইপিইউ এর প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন সাবের হোসেন চৌধুরী। বিশ্ববাসীকে অবাক করে বাংলাদেশের দশম সংসদের স্পিকার ড. শিরিন শারমিন চৌধুরী সিপিএ এর ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাহী কমিটির প্রথম বাঙালি নারী হিসেবে চেয়ারপারসন নির্বাচিত হন। এছাড়া ইউরোপের বাইরে এশিয়ার প্রথম ব্যক্তি হিসেবে ক্যাপ্টেন মঈন আইএমএসও এর মহাপরিচালক নির্বাচিত হন ২০১৫ সালে।

৬. **জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে সাফল্য :** জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছে। ১৯৮৮ সালে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশনে বাংলাদেশ ১৫ জন সেনাবাহিনীর সদস্য নিয়ে যাত্রা শুরু করে। বিশ্বের বিভিন্ন সংঘাতপূর্ণ এলাকায় শান্তি স্থাপনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিভিন্ন মিশনে অংশ নিয়ে এ পর্যন্ত ৩৭টি মিশন সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। বাংলাদেশ বিশ্বের ৩৯টি দেশের ৫৪টি মিশনে এ পর্যন্ত অংশগ্রহণ করে। বর্তমানে ১০টি চলমান মিশনে বাংলাদেশ কাজ করছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সাফল্যের দরুন সিয়েরালিওন বাংলাকে দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

৭. **মাতৃভাষা আন্তর্জাতিকীকরণ :** মাতৃভাষা বাংলার দাবিতে ১৯৫২ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন হয়। এ আন্দোলনে সালাম, জব্বার, রফিক, বরকত প্রমুখ ব্যক্তির বলিদানে বাংলাভাষা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পায়। তাই বাংলাভাষাকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয় বাংলাদেশ। যা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। আর তাই এ বিরল ঘটনার স্বীকৃতিস্বরূপ জাতিসংঘের UNESCO কর্তৃক ১৭ নভেম্বর ১৯৯৯ সালে ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার মর্যাদা দেয়া হয়। মাতৃভাষার এ আন্তর্জাতিকীকরণ বাংলাদেশের জন্য এক বিরাট সাফল্য।

৮. **সমুদ্র বিজয় :** দ্বিপাক্ষিক পর্যায়ে শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ঈর্ষণীয় ও অনুকরণীয় সাফল্য অর্জন করেছে, যা আন্তর্জাতিক সম্পর্কে বিরল। প্রতিবেশী রাষ্ট্র মিয়ানমার ও ভারতের সঙ্গে দীর্ঘদিনের সমুদ্রবিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্বের সামনে আঞ্চলিক ও দ্বিপাক্ষিক শান্তি প্রতিষ্ঠার নতুন নজির স্থাপন করেছে। আন্তর্জাতিক আইনের ওপর আস্থা রেখে এবং সমুদ্রে বাংলাদেশের নায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় সর্বশক্তি প্রয়োগ করে ইন্টারন্যাশনাল ট্রাইব্যুনাল অব ল অব দি সি (ITLOS, ১৪ মার্চ ২০১২) এবং পার্লামেন্ট কোর্ট অব আরব্রিট্রেশন (CPA, ৮ জুলাই ২০১৪)-এর রায়ে

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

বাংলাদেশের ঐতিহাসিক সমুদ্র বিজয় রচিত হয়। এই রায় অনুযায়ী বাংলাদেশ ভারতের সঙ্গে ১ লাখ ১৮ হাজার ৪১৩ বর্গকিমি এবং মিয়ানমারের সঙ্গে ১ লাখ ১১ হাজার বর্গকিমি সমুদ্র অঞ্চলে বাংলাদেশের অধিকার নিশ্চিত করেছে। এই সমুদ্র বিজয়ের ফলে বাংলাদেশ বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগর অঞ্চলে ব্যাপক সম্পদ আহরণের পাশাপাশি নতুন নেতৃত্ব প্রদানের সুযোগ পেয়েছে।

৯. **এমডিজির আংশিক লক্ষ্য পূরণ :** বাংলাদেশ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জনে প্রশংসনীয় সাফল্য লাভ করেছে। এমডিজির মোট ৮টি লক্ষ্যের মধ্যে ৪, ৫ ও ৬নং লক্ষ্য অর্থাৎ শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস, মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস, এইচআইভি এইডস ও ম্যালেরিয়া দমনে বাংলাদেশ সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে। এছাড়া ১, ২, ও ৩নং লক্ষ্য যথা– দারিদ্র্য বিমোচন ও ক্ষুধা নিবারণ, সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা এবং নারী-পুরুষের বৈষম্য দূরীকরণ ও নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশের সাফল্য এমডিজির লক্ষ্য অর্জনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

১০. **আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ :** গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ড. ইউনুস ২০০৬ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করে বিশ্বে বাংলাদেশের মুখ উজ্জ্বল করেন। ২০১০ সালে ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা ফজলে হাসান আবেদ যুক্তরাজ্যের নাইট উপাধি লাভ করেন। এছাড়া জাতিসংঘ কর্তৃক ২০১০ সালে বাংলাদেশ এমডিজি অ্যাওয়ার্ড, ২০১৪ সালে ডিজিটাল ব্যবস্থায় বাংলাদেশের অগ্রগতি ও শিক্ষার প্রসারে ভূমিকার জন্য সাউথ সাউথ পুরস্কার ও ২০১৩ সালে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য সাউথ সাউথ (আইওএসএসসি) পুরস্কার লাভ করে। এছাড়া আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আরো নানাবিধ পুরস্কার প্রাপ্তি বাংলাদেশকে সম্মানজনক স্থানে আসীন করেছে।

১১. **পোশাক রপ্তানিতে সাফল্য :** বাংলাদেশের তৈরি পোশাক বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশের ব্যাপক সুনাম বয়ে এনেছে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের ক্রেতা। বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্বে তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে ৪% রপ্তানি করে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আছে। বিশ্লেষকদের মতে, ২০২০ সাল নাগাদ বাংলাদেশ তৈরি পোশাক রপ্তানিতে ১০% এ উন্নীত হতে পারে।

১২. **আবিষ্কার :** ডা. মাকসুদুল আলমের নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ডেটাসফটের একদল উদ্যমী গবেষকের যৌথ প্রচেষ্টায় ২০১০ সালের মাঝামাঝি সময়ে সফলভাবে উন্মোচিত হয় পাটের জিনোম সিকোয়েন্স বা পাটের জীবনরহস্য।

বাংলাদেশের সোনালি আঁশ খ্যাত পাটের জীবনরহস্য উন্মোচন করে বিশ্বজুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেন এই বিজ্ঞানী। ২০ বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াইয়ে বসবাস করেন তিনি। পাট ছাড়াও তিনি যুক্তরাষ্ট্র সরকারের হয়ে পেঁপে, মালয়েশিয়ার হয়ে রাবারসহ মোট আটটি উদ্ভিদের জীবনরহস্য উন্মোচন করেন। ২০১০ সালের ১৬ জুন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আনুষ্ঠানিকভাবে পাটের জীবনরহস্য আবিষ্কারের ঘোষণা দেন।

১৩. **খেলাধুলা :** আন্তর্জাতিক ক্রীড়া অঙ্গনে বাংলাদেশের অর্জন কম নয়। ৩১ মার্চ ১৯৮৬ সালে প্রথম একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচে অংশগ্রহণ (পাকিস্তানের বিরুদ্ধে), ১৯৯৭ সালে একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে স্বীকৃতি, আরো পরে ২০০০ সালে আইসিসি'র ১০ম পূর্ণ সদস্য হিসেবে টেস্ট মর্যাদা লাভ করে। ২০১১ সালে বিশ্বকাপ এবং ২০১৪ সালে টি২০ বিশ্বকাপ ক্রিকেটের আসর বসে বাংলাদেশে। জিম্বাবুয়ে, নিউজিল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং সর্বশেষ ২০১৫ সালে পাকিস্তানকে বাংলাদেশ

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

হোয়াইট ওয়াশ (বাংলা ওয়াশ) করে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট অঙ্গনে বাংলাদেশের সুনাম বৃদ্ধি করে। ৩৮তম জাতীয় দাবা চ্যাম্পিয়নশিপে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অর্জন করেছে যথাক্রমে গ্র্যান্ডমাস্টার নিয়াজ মোরশেদ, গ্র্যান্ডমাস্টার জিয়াউর রহমান এবং গ্র্যান্ডমাস্টার রিফাত বিন সাত্তার। এছাড়া অ্যাথলেট, ব্যাডমিন্টন ও গলফ খেলাতেও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছে।

১৪. **জাতিসংঘের অধিবেশনে অংশগ্রহণ ও ভাষণ :** ১৯৭৪ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সর্বসম্মত অনুমোদনক্রমে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে। এর কয়েকদিন পর ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ২৯তম অধিবেশনে প্রথমবারের মতো বাংলায় বক্তৃতা করেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৯তম অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ফলে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি আরো উজ্জ্বল হয়। এতে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব সংহতকরণের সুযোগও সৃষ্টি হয়। পররাষ্ট্রমন্ত্রী এএইচ মাহমুদ আলী বলেন, সার্বিক বিবেচনায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৯তম অধিবেশনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ বিদেশে দেশের ভাবমূর্তি সংহতকরণে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সরকারের সাফল্য তুলে ধরার ক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ২৭ সেপ্টেম্বর সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বিশ্বব্যাপী ভঙ্গুর নিরাপত্তা পরিস্থিতি, ধর্মীয় জঙ্গিবাদের উত্থান এবং বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে চরমপন্থীদের সহিংসতায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

১৫. **এভারেস্ট জয় :** ২০১০ সালের ২৩ মে প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ জয় করেন মুসা ইব্রাহিম। এরপর ২০১১ সালের ২১ মে দ্বিতীয় বাংলাদেশি হিসেবে এভারেস্ট জয় করেন এম এ মুহিত। ২০১২ সালের ১৯ মে নিশাত মজুমদার এবং সর্বশেষ ওয়াসফিয়া নাজনীন ২০১৩ সালের ২৬ মার্চ সর্বকনিষ্ঠ বাংলাদেশি হিসেবে এভারেস্ট চূড়া জয় করেন। মুসা ইব্রাহিম, মুহিত, নিশাত মজুমদার এবং ওয়াসফিয়া নাজনীন বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ এভারেস্ট জয় করে দেশের জন্য সম্মান বয়ে এনেছেন।

উপসংহার : আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের প্রাপ্তির পাল্লা অপ্রাপ্তির চেয়ে অনেক বেশি ভারী। ব্যর্থতাগুলোকে জয় করে সফলতা ছিনিয়ে আনতে পারলে তা বাংলাদেশের এগিয়ে চলার পথকে আরও মসৃণ করে তুলবে। মোটকথা বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা হ্রাস ও জনসচেতনতা বাড়াতে পারলে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের সুনাম বৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে। যার জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালানো জরুরি।

১৫ ॥ অভ্যন্তরীণ নানামুখী প্রতিবন্ধকতার পাশাপাশি বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের জন্য চ্যালেঞ্জসমূহের বর্ণনা দিন।

উত্তর : বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এর অভ্যন্তরীণ প্রেক্ষাপটে যেমন নানামুখী প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান, তেমনি বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটেও নানামুখী চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। এ সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা এখন সময়ের দাবি। কেননা সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে বিশ্ব যেভাবে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, সে অগ্রসরমান মাত্রার সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশ যদি সম্মুখপানে অগ্রসর না হয় তবে অচিরেই দেশ বিপর্যয়ের মুখে পতিত হবে। সুতরাং সঙ্গত কারণেই অভ্যন্তরীণ নানামুখী প্রতিবন্ধকতার পাশাপাশি বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের জন্য চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করে তা সমাধানের উদ্যোগ নেয়া জরুরি।

অভ্যন্তরীণ নানামুখী প্রতিবন্ধকতার পাশাপাশি বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের জন্য চ্যালেঞ্জসমূহ : বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে অতিরিক্ত জনসংখ্যা, দুর্নীতি, প্রশাসনে অস্বচ্ছতা, পরিবেশ দূষণ, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, দারিদ্র্য, শিল্পে অনগ্রসরতা, কম মাথাপিছু আয় ইত্যাদি সমস্যা বিদ্যমান। অভ্যন্তরীণ এসব সমস্যার পাশাপাশি বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটেও বাংলাদেশের জন্য নানাবিধ চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১. **জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা :** জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা করা বর্তমানে বাংলাদেশের এক নম্বর বৈশ্বিক সমস্যা। বিশ্বব্যাপী তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটছে। এ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যেসকল দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে বাংলাদেশ তার মধ্যে অন্যতম। বিজ্ঞানীদের ধারণা মতে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা দেড় মিটার বাড়লে বাংলাদেশের প্রায় ২২ হাজার বর্গকিলোমিটার বা প্রায় ১৬% এলাকা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। জলবায়ুর এ পরিবর্তন অব্যাহত থাকলে আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে সমুদ্র ১২০ কি.মি. এলাকার মধ্যে ঢুকে যাবে। এছাড়া নানাবিধ সমস্যার মুখে পতিত হবে বাংলাদেশ। সুতরাং এ ভয়াবহ বিপর্যয় মোকাবিলা করে জনগণকে নিরাপদ আশ্রয় দান বাংলাদেশের জন্য বিরাট চ্যালেঞ্জ।

২. **জঙ্গি মোকাবিলা :** দক্ষিণ এশিয়ায় যে হারে আন্তর্জাতিক জঙ্গিগোষ্ঠীর উত্থান ঘটছে তাতে বাংলাদেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আজ হুমকির সম্মুখীন। আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে তালেবান, আল-কায়েদা ও আইএস জঙ্গিগোষ্ঠীর উত্থান এবং ভারতে আসামের উলফা গোষ্ঠীর উত্থান ও এদের ধ্বংসযজ্ঞের প্রভাব ঐ সকল দেশ ছাপিয়ে বাংলাদেশেও আঘাত হানছে। তালেবান, আল-কায়েদা ও উলফার জঙ্গিরা বাংলাদেশেও নানা কায়দায় হামলা চালিয়ে দেশের পরিস্থিতি ঘোলাটে করতে ব্যস্ত। সুতরাং আন্তর্জাতিক এসব জঙ্গিগোষ্ঠীর মোকাবিলা করা বাংলাদেশ সরকারের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ।

৩. **এমডিজির লক্ষ্য পূরণ :** জাতিসংঘ ঘোষিত মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল অর্জন করতে বাংলাদেশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এমডিজির ৮টি লক্ষ্য ২০১৫ সালের মধ্যে পূরণ করার কথা। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার এ পর্যন্ত মাত্র ২টি লক্ষ্য সম্পূর্ণভাবে পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে। এ দুটি হলো- ক. মাতৃমৃত্যু হ্রাস ও খ. শিশুমৃত্যু হ্রাস। বাকি ৬টি লক্ষ্য পূরণে বাংলাদেশ আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অতএব, বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় এমডিজির লক্ষ্য পূরণ করাও বাংলাদেশের জন্য বিরাট চ্যালেঞ্জ।

৪. **ভারতের সাথে পানি চুক্তির বাস্তবায়ন :** ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং ১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনা সরকার ভারতের সাথে ফারাক্কার পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদন করে। চুক্তি অনুযায়ী প্রতি বছর বাংলাদেশ পানির যে ন্যায্য হিসাব পাবার কথা তা পাচ্ছে না। ফলে খরা মৌসুমে বাংলাদেশের চাষাবাদ ব্যবস্থা ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। অতএব, এটা স্পষ্ট যে, ভারতের সাথে পানি চুক্তির বাস্তবায়ন করে দেশের উত্তরাঞ্চলের চাষাবাদ ব্যবস্থায় সুবিধা আনয়ন করা জরুরি।

৫. **ভূমিকম্প মোকাবিলা :** ভূমিকম্প একটি ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ। বিজ্ঞানীদের মতে, ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। বাংলাদেশে ৭ রিখটার স্কেলের উপরে ভূমিকম্প হলে ঢাকা শহরের অর্ধেকের বেশি ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। অথচ এ ভূমিকম্প মোকাবিলায় বাংলাদেশের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেই বললেই চলে। প্রস্তুতির অভাবের পাশাপাশি রয়েছে উন্নত যন্ত্রপাতির অপ্রতুলতা।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৬. **বৈদেশিক সাহায্য :** বৈদেশিক সাহায্য তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর অনুন্নয়নের অন্যতম কারণ। তথাপি তারা বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ না করে পারে না। কিন্তু এর বিরাট অংশ পুনরায় দাতাদেশের পকেটে ফেরত চলে যায়। বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, আইডিবি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান সাহায্য প্রদানের সাথে সাথে তাদেরও স্বার্থ উদ্ধারকারী নানা শর্ত চাপিয়ে দেয়, তা গ্রহীতা দেশের জন্য যতই প্রতিকূল হোক না কেন বাংলাদেশও এ প্রভাব থেকে এখন পর্যন্ত বেরিয়ে আসতে পারেনি।

৭. **আমদানি নির্ভরতা :** বহির্বাণিজ্য দেশের অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থা মোটেই সুবিধাজনক নয়। বাংলাদেশ যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী রপ্তানি করে তার চেয়ে অনেক বেশি বিদেশ থেকে আমদানি করে। ফলে আন্তর্জাতিক লেনদেনের ভারসাম্য বাংলাদেশের প্রতিকূলে চলে যায়। কাজেই দেখা যাচ্ছে, বৈদেশিক বাণিজ্য বাংলাদেশের আরেকটি বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ।

৮. **রপ্তানি বৃদ্ধি :** বর্তমানে মুক্তবাজার অর্থনীতিতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো বাণিজ্যিক ভারসাম্য সর্বদাই বাংলাদেশের প্রতিকূলে। অর্থাৎ বাংলাদেশ যে পরিমাণ দ্রব্য রপ্তানি করে তার চেয়ে অনেক বেশি আমদানি করে। তাই বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির চাকা সচল রাখতে রপ্তানি বৃদ্ধির বিকল্প নেই। পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, চীন, জাপানসহ দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার প্রায় সব দেশের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি রয়েছে। এ বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে এনে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি করা বাংলাদেশের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ।

৯. **বিনিয়োগ বৃদ্ধি :** কোনো একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে বৈদেশিক বিনিয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিনিয়োগের ফলে নতুন শিল্প কারখানা স্থাপিত হয়, সৃষ্টি হয় নতুন কর্মসংস্থান, বৃদ্ধি পায় উৎপাদন। এছাড়া বিদেশি বিনিয়োগের ফলে নতুন প্রযুক্তির আদান প্রদান ঘটে। যা দেশের উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বিদেশী বিনিয়োগসহ দেশীয় বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ খুব একটা বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে লক্ষ্য করা যায় না। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়াসহ প্রভৃতি দেশ বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার মাধ্যমে তাদের অর্থনীতিতে অনেক উন্নত পর্যায়ে নিতে সক্ষম হয়েছে।

১০. **প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার :** অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রাকৃতিক সম্পদের অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রাকৃতিক সম্পদ একদিকে যেমন শিল্পের কাঁচামাল যোগায় তেমনি রপ্তানির মাধ্যমে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও সাহায্য করে। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য না থাকলেও এর অবস্থা একেবারে খারাপও নয়। আমাদের রয়েছে প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, চুনাপাথর, কঠিনশিলা, কাঁচ বালি, খনিজ বালি প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদ। আমাদের প্রয়োজনীয় প্রযুক্তির বড় অভাব। এগুলো উত্তোলন করতে প্রায়শই আমাদের বিদেশী প্রযুক্তির উপর নির্ভর করতে হয়।

১১. **আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনায় কৌশলগত অবস্থান :** একবিংশ শতাব্দীর বিশ্ব হলো মুক্ত বাণিজ্যের বিশ্ব। বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিশ্ব আজ সীমাবিহীন একক বাজারে পরিণত হয়েছে। এমতাবস্থায় একবিংশ শতাব্দীর অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাংলাদেশসহ স্বল্পোন্নত দেশগুলো আজ শঙ্কিত। এ পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার যেমন আশঙ্কা রয়েছে, তেমনি সুযোগ রয়েছে লাভবান হওয়ার। কিন্তু বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনায় কৌশলগত ব্যবস্থাপনার দিক থেকে বেশ দুর্বল বিধায় চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় হিমশিম খাচ্ছে।

১২. **যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল আমদানি :** দারিদ্র্যের পঙ্কিল আবর্তে নিমজ্জিত বাংলাদেশে মূলধন গঠনের হার অত্যন্ত কম। ফলে শিল্পের প্রয়োজনীয় উন্নয়নে যন্ত্রপাতির জন্য বিদেশের ওপর নির্ভর করতে হয়। বাংলাদেশে শিল্পোন্নয়নের গতি বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, কাঁচামাল বিদেশ থেকেই সংগ্রহ করা হয়। সুতরাং যন্ত্রপাতি ও কাঁচামালের আমদানি নির্ভরতা কমানোও বাংলাদেশের জন্য চ্যালেঞ্জ।

১৩. **প্রযুক্তি বিদ্যার আমদানি :** বর্তমান যুগ হচ্ছে তথ্যপ্রযুক্তির যুগ। তথ্যপ্রযুক্তিতে যে যত উন্নত সে তত এগিয়ে। তাই প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে বাংলাদেশের উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে বাণিজ্যের মাধ্যমে নিত্য নতুন প্রযুক্তি আমদানি করে দেশকে সময়ের সাথে যুগোপযোগী করে তোলা যায়।

১৪. **খাদ্য ঘাটতি পূরণ :** খাদ্য ঘাটতি বাংলাদেশের একটি নিয়মিত ঘটনা। খাদ্য ঘাটতি পূরণে বাংলাদেশ প্রতিবছর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী আমদানি করে থাকে। বৈদেশিক বাণিজ্য ছাড়াও বিপুল পরিমাণ খাদ্য ঘাটতি বাংলাদেশের পক্ষে পূরণ করা সম্ভব নয়। কাজেই বিদেশ থেকে পণ্যসামগ্রী আমদানি করে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ঘাটতি পূরণ বাংলাদেশের সরকারের জন্য বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ।

১৫. **আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রসার :** বৈদেশিক বাণিজ্যের দ্বারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাথে ভাব ও সংস্কৃতি আদান-প্রদান ঘটে। ফলে বাণিজ্যরত দেশসমূহের মধ্যে সহযোগিতা ও বন্ধুত্বের মনোভাব সৃষ্টি হয়। এভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে ভাব ও সংস্কৃতির আদান-প্রদান একে অপরকে পরিচিত করে এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়।

উপসংহার : বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে নানাবিধ সমস্যা বিদ্যমান থাকলেও উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে এদেশের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সফলতা অনেক। দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নয়নে রোল মডেল হিসেবে দেখা হয়। তাই বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের জন্য বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ দূর করতে পারলে অচিরেই এদেশ আলোর মুখ দেখবে এবং জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাবে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-০১ বাংলাদেশ কখন জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে?

উত্তর : বাংলাদেশ জন্মলগ্ন থেকেই জাতিসংঘের প্রতি আস্থাশীল। স্বাধীনতা লাভের পর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনে জাতিসংঘ বিরাট অবদান রাখে। কিন্তু চীনের বিরোধিতার কারণে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভে বাংলাদেশের বিলম্ব ঘটে। পরবর্তীতে ১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর ১৩৬তম সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে।

প্রশ্ন-০২ কত সালে সার্ক গঠিত হয়? এর উদ্যোক্তা কে?

উত্তর : আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতার প্রেক্ষাপটে দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নশীল প্রতিবেশী সাতটি দেশ পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতি অর্জনের লক্ষ্যে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (সার্ক) গঠন করে। ১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ভারত, নেপাল, পাকিস্তান ও শ্রীলংকা সফরকালে এ ধরনের একটি আঞ্চলিক সহযোগিতা গড়ে তোলার সম্ভাবনা ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন। এ প্রচেষ্টার আশাব্যঞ্জক সাড়া পেয়ে তিনি দক্ষিণ এশিয়ার ৬টি দেশ তথা পাকিস্তান, নেপাল, মালদ্বীপ, শ্রীলংকা ও ভুটান সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানদের একটি পত্র লেখেন ও বিশেষ দূত পাঠান। এরই ফলশ্রুতিতে ১৯৮৩ সালের ২ আগস্ট দিল্লি বৈঠকে সার্কের ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হয়। এরপর ১৯৮৫ সালের ৮ ডিসেম্বর ঢাকায় সার্ক সনদ স্বাক্ষরের মাধ্যমে এর জন্ম হয়। সার্ক গঠনে বাংলাদেশের সাবেক প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউর রহমান অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। বর্তমানে আফগানিস্তানসহ সার্কের সদস্য সংখ্যা ৮।

প্রশ্ন-০৩ বাংলাদেশ কবে সিডও সনদ স্বাক্ষর করে?

উত্তর : সিডও (CEDAW) হচ্ছে জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত নারী অধিকারের একটি দলিল। সিডও (CEDAW)-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women. ১৯৮৪ সালের ৬ নভেম্বর বাংলাদেশ এ দলিল অনুমোদন ও স্বাক্ষর করে।

প্রশ্ন-০৪ অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের মহাসচিবের নাম কি?

উত্তর : অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল হচ্ছে লন্ডনভিত্তিক একটি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা। বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার রক্ষায় এটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের বর্তমান মহাসচিবের নাম সলিল শেঠী (ভারত)।

প্রশ্ন-০৫ বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার ও মার্কিন রাষ্ট্রদূতের নাম লিখুন।

উত্তর : বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার হচ্ছেন রবার্ট ডব্লিউ গিবসন আর বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন বর্তমান রাষ্ট্রদূত মার্সিয়া স্টিফেন্স ব্লুম বার্নিকার্ট।

উল্লেখ্য, ব্রিটিশ কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহের কূটনীতিকদের বলা হয় হাইকমিশনার। আর কমনওয়েলথ বহির্ভূত দেশসমূহের কূটনীতিকদের বলা হয় রাষ্ট্রদূত।

প্রশ্ন-০৬ বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূলনীতিগুলো কি?

উত্তর : সাধারণত কোনো রাষ্ট্র যে নীতির মাধ্যমে বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে তাকে বিদেশ নীতি বা পররাষ্ট্রনীতি বলে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির কতগুলো বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা গত তিন দশক ধরে কূটনৈতিক ক্ষেত্রে দিক নির্দেশকের ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূলনীতিগুলো হলো :

১. জাতিসংঘের সনদ ও নীতিমালা, রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা, সকল জাতির সার্বভৌমত্ব ও সকল বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান নীতির প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধতা।
২. জাতিসংঘ, EEC, EU, ASEAN, OPEC, OIC, GCC, আরব লীগ, কমনওয়েলথ প্রভৃতি সংস্থার সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন।
৩. জোট নিরপেক্ষতা।
৪. সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে শত্রুতা নয়।
৫. অর্থনৈতিক কূটনীতির (Economic Diplomacy) ওপর গুরুত্বারোপ।
৬. বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে সমর্থন করা।
৭. মুসলিম দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক জোরদার করা।

প্রশ্ন-০৭ জাতিসংঘে বাংলাদেশের ভূমিকা লিখুন।

উত্তর : বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে জাতিসংঘের তেমন কোনো সহায়ক ভূমিকা না থাকলেও স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশ জাতিসংঘের নীতি ও আদর্শের প্রতি গভীর আস্থা ও আনুগত্য প্রকাশ করে। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভের জন্য আবেদন করে। কিন্তু চীনের ভেটো প্রদানের কারণে সদস্যপদ লাভে ব্যর্থ হয়। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ পুনরায় আবেদন করে এবং কোনো ভেটো না পড়ায় ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪ বাংলাদেশ ১৩৬তম দেশ হিসেবে সদস্যপদ লাভ করে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে থাকে। ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান সাধারণ পরিষদে প্রথম মাতৃভাষা বাংলায় ভাষণ প্রদান করেন। ১০ নভেম্বর, ১৯৭৮ বাংলাদেশ জাপানকে পরাজিত করে নিরাপত্তা পরিষদের ১৯৭৮-৭৯ সালের জন্য অস্থায়ী সদস্য নির্বাচিত হয়। ১৯৮৬-৮৭ সালে বাংলাদেশ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সাধারণ পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হয়। তৎপরবর্তী বাংলাদেশ জাতিসংঘের একাধিক সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ পদে সমাসীন হয়। ২০০০-২০০১ সালের জন্য বাংলাদেশ পুনরায় নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য নির্বাচিত হয়। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে বাংলাদেশ দ্বিতীয় সর্বাধিক সৈন্য সরবরাহকারী দেশ। বিশ্বব্যাপী জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছে। এছাড়াও বাংলাদেশ জাতিসংঘের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্থার বিভিন্ন সময় সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়। এ সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রমেও বাংলাদেশ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে।

প্রশ্ন-০৮ বাংলাদেশের আসিয়ান (ASEAN) জোটে অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয়তা লিখুন।

উত্তর : আসিয়ান দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর একটি আঞ্চলিক সহযোগিতামূলক সংগঠন। মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, মিয়ানমার সদস্য রাষ্ট্রগুলো ইতোমধ্যেই তাদের পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রকে অনেক দূর সম্প্রসারিত করতে সমর্থ হয়েছে। অন্যদিকে বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি দেশের আঞ্চলিক সংগঠন সার্কের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

পড়েছে। এমতাবস্থায় দেশের কূটনীতিক মহলের অভিজ্ঞ অনেকেই বাংলাদেশের আসিয়ানের সাথে সহযোগিতা বৃদ্ধি, এমনকি এতে যোগদানের কথাও বলছেন। ভারত ইতোমধ্যেই আসিয়ানের ডায়ালগ পার্টনার হয়েছে এবং চীনও মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল গঠনের ব্যাপারে চুক্তি করেছে। এদিকে বাংলাদেশ আসিয়ানের সদস্যপদ চাইলে থাইল্যান্ড, মিয়ানমারসহ কতিপয় দেশ ইতোমধ্যেই সমর্থন দানের কথা ব্যক্ত করেছে। এমতাবস্থায় যারা বাংলাদেশের আসিয়ানে যোগদানের কথা বলছেন তাদের যুক্তি হলো, প্রথমত, সার্ককে কার্যকর করার ব্যাপারে ভারতের অনীহা হেতু সার্ককে কার্যকর করার বাংলাদেশের প্রচেষ্টা তেমন সফল হবে না। তাই বাংলাদেশকে সার্কের বিকল্প হিসেবে আসিয়ানে যোগদান করা উচিত। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশ সবসময়ই অর্থনৈতিক কূটনীতিকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। আর এশিয়ার উদীয়মান ব্যাঘ্র হিসেবে খ্যাত অধিকাংশ দেশ এ অঞ্চলে অবস্থিত বলে বাংলাদেশ আসিয়ানে যোগ দিলে আমাদের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা আরো উজ্জ্বল হবে। তৃতীয়ত, ভারতের আঞ্চলিক আধিপত্যবাদকে পাশ কাটিয়ে আসিয়ানভুক্ত দেশগুলোর সাথে সহযোগিতা জোরদার করা এখন সময়ের দাবি।

প্রশ্ন-০৯ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের ভূমিকা লিখুন।

উত্তর : জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশ সক্রিয় অংশীদার। বিশ্বব্যাপী সংঘাত নিরসনে জাতিসংঘ কার্যক্রমের সাথে বাংলাদেশ ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং অত্যন্ত সাফল্যের সাথে এ মহান দায়িত্ব পালন করে আসছে। উল্লেখ্য, ১৯৮৮ সালে জাতিসংঘ ইরান-ইরাক সামরিক পর্যবেক্ষণ (UNIIMOG) মিশনে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর ১৫ জন সামরিক পর্যবেক্ষক প্রেরণের মাধ্যমে শান্তিরক্ষা মিশনে তার পদযাত্রা শুরু। পরবর্তীতে ১৯৯১ সালে উপসাগরীয় যুদ্ধে যৌথ বাহিনীতে অংশগ্রহণকৃত বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর অংশগ্রহণ ত্বরান্বিত করে। এরপর থেকে বিশ্বব্যাপী বহুজাতিক বাহিনী এবং জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে ব্যাপক হারে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর অফিসার এবং সৈন্য প্রেরণ শুরু হয়। শান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী হিসেবে বিগত ২৭ বছরে বাংলাদেশের ভূমিকা দেশে ও বিদেশে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। বাংলাদেশ চলমান ১০টি মিশনসহ মোট ৬৪টি শান্তিরক্ষী মিশনে অংশগ্রহণ করেছে। শুধু তাই নয়, ইতোমধ্যে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনীতে সৈন্য যোগানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সর্বোচ্চ সৈন্য প্রেরণকারী দেশ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলসমূহের গঠন, আদর্শ ও ভূমিকা

Political Parties Structure, Ideology and Roles in Bangladesh

Syllabus *Political Parties : Historical development : Leadership: Social Bases; Structure; Ideology and programmes; Factionalism; Politics of Alliances; Inter and Intra-Party Relations; Electoral Behaviour; Parties in Government and Opposition.*

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১. *'সরকারি দলের সহনশীলতা ও বিরোধী দলের দায়িত্বশীলতা উভয়ই গণতন্ত্র বিকাশের জন্য অপরিহার্য।'—যুক্তিসহ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আলোচনা করুন। [২৪তম বিসিএস]*
অথবা, বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও গণতন্ত্র বিকাশে সরকারি ও বিরোধী দলের ভূমিকা আলোচনা করুন।

০২. *গণতান্ত্রিক পরিবেশ উন্নয়নে রাজনৈতিক দলসমূহের ভূমিকা কি হওয়া উচিত? গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি চর্চায় সিভিল-সেনাবাহিনী সম্পর্ক কতটা প্রয়োজনীয়? আলোচনা করুন। [৩১তম বিসিএস]*

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

০৩. *সংসদীয় রাজনীতিতে সরকারি দল ও বিরোধী দলের ভূমিকা এবং এক্ষেত্রে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর আচরণ সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ রচনা লিখুন।*

০৪. *'বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি দেশীয় উন্নয়নে সহায়ক নয়'—উক্তিটির পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি প্রদান করুন।*

০৫. *স্বাধীনতা-উত্তর বিভিন্ন সময়ে কারা কিভাবে এ দেশে অবৈধ উপায়ে ক্ষমতা দখল করেছিল তা বর্ণনা করুন। ভবিষ্যতে এরূপ অসাংবিধানিক প্রক্রিয়া বন্ধের কার্যকর পদক্ষেপ সম্পর্কে আলোচনা করুন।*

০৬. *জোট রাজনীতি কি? বাংলাদেশে জোট রাজনীতির বৈশিষ্ট্যাবলি বর্ণনা করুন।*

০৭. *কোয়ালিশন সরকার বলতে কি বুঝায়? বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকট দূরীকরণে কোয়ালিশন সরকারের গঠন নিয়ে আপনার মতামত উপস্থাপন করুন।*

০৮. *বাংলাদেশের প্রধান কয়েকটি রাজনৈতিক দলের আদর্শ ও কার্যাবলী বর্ণনা করুন।*

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

০১. বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির সাম্প্রতিক প্রবণতা সম্পর্কে লিখুন।
০২. গণতন্ত্র বিকাশে রাজনৈতিক দলসমূহের ভূমিকা লিখুন।
০৩. বাংলাদেশের দলব্যবস্থাকে কি দ্বিদলীয় বলা যায়?
০৪. রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা কি?
০৫. বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংহতির সমস্যাগুলো তুলে ধরুন।
০৬. অসাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় ক্ষমতা দখল বন্ধের কার্যকর পদক্ষেপগুলো কি হতে পারে?

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১। 'সরকারি দলের সহনশীলতা ও বিরোধী দলের দায়িত্বশীলতা উভয়ই গণতন্ত্র বিকাশের জন্য অপরিহার্য।'– যুক্তিসহ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আলোচনা করুন। *[২৪তম বিসিএস]*
অথবা, **বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও গণতন্ত্র বিকাশে সরকারি ও বিরোধী দলের ভূমিকা আলোচনা করুন।**

উত্তর : গণতন্ত্র তথা সংসদীয় রীতি-পদ্ধতির জন্য বাংলাদেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আন্দোলন দীর্ঘদিনের। ১৯৭১ সালে স্বাধীন ও সার্বভৌম জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভের পর বাংলাদেশের জনগণ প্রত্যাশিত সংসদীয় গণতন্ত্রের পথেই প্রথম যাত্রা শুরু করে। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় গণতন্ত্রের সমাপ্তি ঘটে। পরবর্তীকালে ১৯৭৭ সালে পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে পুনরায় বহুদলীয় গণতন্ত্রের পথে যাত্রা শুরু হলেও ১৯৮১ সালের সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে দেশে আবার গণতন্ত্রের যাত্রা রুদ্ধ হয়ে যায়। অতঃপর দীর্ঘ আন্দোলনের পর ১৯৯১ সালে অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের মাধ্যমে পঞ্চম জাতীয় সংসদে সংসদীয় সরকারব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। সম্মিলিতভাবে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী গ্রহণ করতে গিয়ে সংসদের ভেতরে ও বাইরে রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয় সেটিই ছিল এ দেশে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার ভিত্তিমূল। ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে স্থায়ীভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে গণতন্ত্রের পথে আরেক ধাপ অগ্রগতি হয় বাংলাদেশের। কিন্তু কেবল নিরপেক্ষ নির্বাচনই গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার একমাত্র নিয়ামক নয়। এর জন্য প্রয়োজন সরকারের সদিচ্ছা, বিরোধী দলের প্রতি সহনশীল আচরণ এবং বিরোধী দলের দায়িত্বশীল মনোভাব। মূল আলোচনায় যাবার পূর্বে গণতন্ত্র সম্পর্কে আলোকপাত করা দরকার।

গণতন্ত্র : রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায় গণতন্ত্রের সংজ্ঞা নিরূপণে অনেক মত ও মতপার্থক্য রয়েছে। স্থান-কাল-পাত্রভেদে এ মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের 'Democracy is a government of the people, by the people and for the people' (গণতন্ত্র হচ্ছে জনগণের, জনগণ দ্বারা গঠিত এবং জনগণের জন্য সরকার) মর্মবাণীই হচ্ছে গণতন্ত্রের মূল এবং একমাত্র উপজীব্য বিষয়।

Oxford Advanced Learner's Dictionary-তে গণতন্ত্র সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'Government which encourages and allows rights of citizenship such as freedom of speech, religion, opinion and association.'

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

অর্থাৎ গণতন্ত্র বলতে বোঝায় কোনো সরকারের তার দেশের নাগরিকদের মতামত প্রদান, ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন, বক্তব্য দেয়ার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা প্রদান এবং সভা-সমিতির ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদানকে।

Joseph Sehumpeter তার 'Capitalism, Socialism and Democracy (1942) গ্রন্থে বলেন, 'গণতন্ত্র হলো একাধিক রাজনৈতিক দলের মধ্যে ভোট অর্জনের প্রতিযোগিতা, যার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জিত হয়।' তার মতে, 'Democracy is a corner stone of Election.'

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অধ্যাপক ড. মাহবুব উল্লাহ এক নিবন্ধে গণতন্ত্রকে নিম্নোক্তভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন, 'গণতন্ত্র হলো সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গঠিত সরকারব্যবস্থা, প্রশাসনের হস্তক্ষেপমুক্ত স্বাধীন বিচারব্যবস্থা, মত ও চিন্তার উদারনৈতিক স্বাধীনতা, নির্বাচনে শাসক দল পরাজিত হলে বিজয়ী দলের হাতে দ্বিধাহীন শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর, সংখ্যালঘিষ্ঠের সামরিক বাহিনীর ওপর বেসামরিক কর্তৃত্বের নিরঙ্কুশ আধিপত্য।'

সুতরাং গণতন্ত্র হচ্ছে জনগণের দ্বারা গঠিত একটি সরকারব্যবস্থা, যেখানে চূড়ান্ত ক্ষমতা ন্যস্ত হয়েছে জনগণের ওপর, সে ক্ষমতা প্রয়োগ করেন জনগণের প্রতিনিধিরা, যারা নির্বাচিত হন একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে।

গণতন্ত্র বিকাশে রাজনৈতিক দলসমূহের ভূমিকা : বাংলাদেশের গণতন্ত্র বিকাশের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলসমূহের ভূমিকা অপরিসীম। রাজনৈতিক দলসমূহের সময়োচিত ও সুচিন্তিত পদক্ষেপ এ দেশের গণতন্ত্র বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। রাজনৈতিক দল বলতে ক্ষমতাসীন এবং বিরোধী সব দলের কথাই বলা হয়ে থাকে। গণতন্ত্রের ওপরের সংজ্ঞার আলোকে বাংলাদেশের গণতন্ত্র বিকাশের জন্য সরকারি দলের সহনশীলতা ও বিরোধী দলের দায়িত্বশীলতা সম্পর্কে নিচে আলোকপাত করা হলো :

সরকারি দলের সহনশীলতা : বাংলাদেশের মতো দেশের শিশু গণতন্ত্র বিকাশের ক্ষেত্রে সরকারি দলের নিম্নোক্ত সহনশীল বিষয়সমূহের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে :

১. **নমনীয়তা :** সরকারি দলকে মনে রাখতে হবে, শুধু তাদের নিয়েই নয়, বরং তাদের ও বিরোধী দল উভয়কে নিয়েই রাষ্ট্রযন্ত্র ও সরকার এবং এটিই গণতন্ত্রের শিক্ষা। সুতরাং সরকারি দলকে গণতন্ত্র মানতে হবে, হতে হবে অন্যের মতের প্রতি সহিষ্ণু এবং তাদের জবাবদিহি করতে হবে জনগণের কাছে। প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে জনকল্যাণের কাজে লাগাতে হবে, জনদমনে নয়। এজন্য নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরও জনকল্যাণকামী প্রতিনিধি হিসেবে গড়ে উঠতে হবে।

২. **দমননীতি পরিহার করা :** বাংলাদেশে প্রায়ই দেখা যায় নির্বাচনোত্তর সরকারি দল বিরোধী দলের ওপর অন্যায়ভাবে অহেতুক দমননীতি প্রয়োগ করে থাকে, যা গণতন্ত্রের সাথে সামঞ্জস্যহীন। এতে যেমন সরকারি দলের ভাবমূর্তি নষ্ট হয় তেমনি গণতন্ত্রের বিকাশ ব্যাহত হয়।

৩. **একচেটিয়াত্ব বর্জন করা :** বাংলাদেশে প্রায়শ নির্বাচনোত্তর সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী দল রাষ্ট্রের সর্বত্র একচেটিয়া কর্তৃত্ব কায়েম করতে সচেষ্ট হয়। এতে করে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারি দল গণতন্ত্র থেকে বহু দূরে সরে যায়। রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমসমূহকে তারা নিজস্ব দলীয় সম্পত্তি হিসেবে ব্যবহার করে। বিগত সরকারের ভালো-মন্দ সকল কাজকর্মকে মুছে দিয়ে নিজেদের ক্রিয়াকলাপ প্রচারে ব্যস্ত থাকে। রাষ্ট্রীয় সকল প্রচার মাধ্যমে প্রতিনিয়ত 'বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার' বাক্যটি উচ্চারিত হয়। এর দ্বারা তারা প্রমাণ করতে চায় যেন অতীতের কোনো সরকারই গণতান্ত্রিক ছিল না। এর দ্বারা তাদের নিম্ন রাজনৈতিক সংস্কৃতির (Low political culture) পরিচয় পাওয়া যায় এবং গণতন্ত্রের বিকাশ ব্যাহত হয়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

বিরোধী দলের দায়িত্বশীলতা : বাংলাদেশের গণতন্ত্রের বিকাশ ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে বিরোধী দলসমূহকে নিম্নোক্ত দায়িত্বশীল বিষয়সমূহের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে :

১. **গঠনমূলক সমালোচনা :** গণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থায় বিশেষত সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিরোধী দলকে বিকল্প সরকার বলা যায়। এ দলের প্রধান কাজ সরকারি দলের কাজকর্মের গঠনমূলক সমালোচনা করে সরকার যন্ত্রকে স্থিতিশীল রাখা। বিরোধী দল সরকারি দলের গঠনমূলক সমালোচনা না করলে এবং সরকারি দলের ভুল-ত্রুটি জনসম্মুখে তুলে না ধরলে সরকারি দল নিজস্ব দলীয় স্বার্থ নিয়েই ব্যস্ত থাকে এবং অনেকটা স্বৈরতান্ত্রিক হয়ে ওঠে। এমতাবস্থায় জনগণের সর্বজনীন কল্যাণ ব্যাহত হয় এবং গণতন্ত্রের বিকাশ সম্ভব হয় না। তাই দায়িত্বশীল বিরোধী দলের নিজস্ব দলীয় স্বার্থে, সর্বস্তরের জনগণের স্বার্থে এবং গণতন্ত্রের বিকাশের স্বার্থে সরকারি দলের কাজকর্মের গঠনমূলক সমালোচনা করতে হবে।

২. **বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা নয় :** বিরোধী দল বলেই বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা করা দায়িত্বশীল বিরোধী দলের পরিচয় বহন করে না। সরকারি দলের যেসব কাজকর্মে সর্বজনীন কল্যাণ নিহিত থাকে, বিরোধী দলকে সরকারের সেসব কাজকর্মের প্রতি সমর্থন জানাতে হবে। ফলে সরকারি দল বিরোধী দলের দাবি বাস্তবায়ন করতেও উৎসাহিত হবে এবং এতে গণতন্ত্রের বিকাশ ত্বরান্বিত হবে।

সার্বিক আলোচনা : বাংলাদেশে গণতন্ত্র বিকাশের ক্ষেত্রে সরকারি দলের সহনশীলতা এবং বিরোধী দলের দায়িত্বশীলতা সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো :

১. **আপোষকামী মনোভাব :** গণতন্ত্র বিকাশের জন্য সরকারি দল এবং বিরোধী দলকে আপোষকামী মনোভাব সম্পন্ন হতে হবে। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে হবে। এ ক্ষেত্রে উভয় দল বা দলগুলোকে কিছুটা ছাড় দিতে হবে। অনমনীয় মনোভাব নিয়ে আলোচনা করলে কোনো লাভ হবে না। তাই উভয় দলকে আপোষকামী মনোভাব নিয়েই আলোচনায় বসতে হবে। এতে সমস্যার যেমন সমাধান হবে, তেমনি গণতন্ত্রের বিকাশও ত্বরান্বিত হবে।

২. **পরমতসহিষ্ণুতা :** বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা অতিমাত্রায় ক্ষমতাকেন্দ্রিক হওয়ায় এখানে পরমতসহিষ্ণুতা ও যুক্তিসঙ্গত সমঝোতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। কিন্তু গণতন্ত্র চর্চার সফলতা এবং বিকাশের অন্যতম প্রধান শর্ত হচ্ছে পরমতসহিষ্ণুতা এবং সমঝোতা। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান কেবল তখনই কাজ করতে পারে, যখন রাজনৈতিক নেতারা পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা এবং যুক্তিসঙ্গত সমঝোতায় রাজি থাকেন। তাই বাংলাদেশের সরকারি এবং বিরোধী দলসমূহকে আরো অধিকমাত্রায় পারস্পরিক মতামতের প্রতি সহিষ্ণু ও শ্রদ্ধাবান হতে হবে।

৩. **কাদা ছোড়াছুড়ি বন্ধ করা :** সংসদীয় গণতন্ত্র বিকাশের স্বার্থে বাংলাদেশের সরকারি ও বিরোধী দলসমূহকে পারস্পরিক কাদা ছোড়াছুড়ি বন্ধ করে গঠনমূলক সমালোচনার আশ্রয় নিতে হবে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ব্যক্তিজীবন নিয়ে গবেষণা না করে তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করতে হবে। এতে করে প্রতিটি দল তাদের নিজেদের কার্যক্রমের ও দায়িত্বের ব্যাপারে সচেতন হবে এবং সুচিন্তিত জনহিতকর পদক্ষেপ গ্রহণে উৎসাহিত হবে, যা গণতন্ত্রের বিকাশের জন্য খুবই প্রয়োজন।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৪. **সংসদীয় সংস্কৃতি গড়ে তোলা :** সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংসদে বসেই সরকারি এবং বিরোধী দলের সকল বিরোধ-বিতর্কের অবসান ঘটাতে হবে। অর্থাৎ সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু হবে জাতীয় সংসদ। সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে বিরোধী দলের কোনো যৌক্তিক দাবি অগ্রাহ্য করলে চলবে না। বরং বিরোধী দলকে সম্পৃক্ত করতে হবে সকল জাতীয় কর্মকাণ্ডে। সংসদকে অধিকতর কার্যকর করতে হবে। এক কথায় একটি সুস্থ সংসদীয় সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে।

৫. **ঐকমত্য অর্জন করতে হবে :** বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এখন পর্যন্ত রাজনৈতিক বিরোধিতা সহ্য করার মতো ধৈর্য ও পরিপক্বতা অর্জন করতে পারেনি। সরকারি দল বিরোধী দলকে পাশ কাটিয়ে কোনো কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে এবং কোনো কোনো সিদ্ধান্ত জোর করে চাপিয়ে দিচ্ছে। আর বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা করা যে কোনো বিরোধী দলে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে। তাই ক্ষমতাসীন দলকে দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করে বিরোধী দলকে সাথে নিয়ে জাতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট ইস্যুতে ঐক্যবদ্ধভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, আরো সহনশীল হতে হবে। তদ্রূপ সংসদকে প্রাণবন্ত করতে এবং জাতীয় ইস্যুতে বিরোধী দলকে আরো দায়িত্বশীল হতে হবে।

উপসংহার : সুতরাং বাংলাদেশের গণতন্ত্র বিকাশের ক্ষেত্রে সরকারি এবং বিরোধী উভয় দলেরই সমগুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাই উভয় দলকে দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্রের চর্চা করতে হবে। উভয় দলকে রাজনৈতিক সহিংসতা বর্জন করতে হবে। রাজনৈতিক সহিংসতা গণতন্ত্র বিকাশের ক্ষেত্রে অন্যতম বাধা। সর্বোপরি উভয় দলকে আরো অধিকমাত্রায় সহনশীল ও দায়িত্বশীল হতে হবে।

০২। গণতান্ত্রিক পরিবেশ উন্নয়নে রাজনৈতিক দলসমূহের ভূমিকা কি হওয়া উচিত? গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি চর্চায় সিভিল-সেনাবাহিনী সম্পর্ক কতটা প্রয়োজনীয়? আলোচনা করুন। *[৩১তম বিসিএস]*

উত্তর : পুঁজিবাদ আর বিশ্বায়নের এ আধুনিক বিশ্বে রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে গণতন্ত্রই সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা। আধুনিক এ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রধান এবং আবশ্যকীয় উপাদান হলো রাজনৈতিক দল। প্রতিষ্ঠিত এবং কার্যকর রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি ব্যতীত কোনো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই টিকে থাকতে পারে না। গণতান্ত্রিকব্যবস্থার মূল কেন্দ্রবিন্দু সংসদকে কার্যকর করার জন্য সরকারি দল এবং বিরোধী দলের পাশাপাশি অবস্থান জরুরি। কেননা সরকারি দল ক্ষমতা দখলের পর ক্ষমতার আতিশয্যে ভুল করার সমূহ সম্ভাবনা থাকে যেখানে বিরোধী দল কার্যকর ও গঠনমূলক বিরোধিতার মাধ্যমে সরকারকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো একদিকে সরকারি দলকে যেমন বিরোধী দলের যৌক্তিক মতামতকে গুরুত্ব দিতে হবে অন্যদিকে বিরোধী দলকেও তার বিরোধিতার যথার্থতা সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে।

গণতান্ত্রিক পরিবেশ উন্নয়নে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা যেমন হওয়া উচিত : আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম কতিপয় মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ সকল মূলনীতি যথাযথভাবে অনুসৃত না হলেই গণতন্ত্র তার মৌলিকত্ব হারাতে বাধ্য। গণতান্ত্রিক পরিবেশ উন্নয়নে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা যেমন হওয়া উচিত তা নিচে আলোচনা করা হলো :

১. **পরমতসহিষ্ণুতা :** পরমতসহিষ্ণুতা গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র। গণতন্ত্র মানেই হলো গণমানুষের বিক্ষিপ্ত মত ও পথকে একটি ব্যবস্থার আওতায় এনে সামগ্রিক কল্যাণের পথ খুঁজে বের করা। এক্ষেত্রে সকলের

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

মতের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থাকা অত্যাবশ্যক। তাই সংসদীয় গণতন্ত্রে সরকারি দল ও বিরোধী দলকে অবশ্যই পরস্পরের মতের মূল্যায়ন করতে হবে। বিরোধী দলকে তার মতামত প্রদানের সময় মনে রাখতে হবে কেবল সরকারকে ঘায়েল করার জন্য নয়, বরং মতামত হবে যৌক্তিক ও জনগণের কল্যাণের উদ্দেশ্যে। অপরদিকে সরকারি দলকে মনে রাখতে হবে সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে বিরোধী দলের সকল মতামতকে উপেক্ষা করা অনুচিত এবং গণতান্ত্রিক চেতনার বিরোধী।

২. **গঠনমূলক বিরোধিতা :** বিরোধী দলের বিরোধিতা সংসদীয় গণতন্ত্রের একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। বিরোধী দলের কার্যকর বিরোধিতা সরকারি দলের স্বেচ্ছাচারী ভূমিকার ক্ষেত্রে একটি নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করে। তাই সংসদের ভেতরে ও বাইরে বিরোধীদের দমন-পীড়নের পরিবর্তে তাদের রাজনৈতিক ভূমিকা পালনের সুযোগ দান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে কার্যকর করার অন্যতম পূর্বশর্ত। অন্যদিকে বিরোধী দলের বিরোধিতা যখন কেবলই বিরোধিতার জন্য হয় তখন তা গণতন্ত্রকে ভিন্ন পথে পরিচালিত করে।

৩. **নিয়মতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা :** প্রতিযোগিতা গণতন্ত্রের মৌলিক স্পৃহা থেকেই উৎসারিত। কেননা রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের জন্য এ সকল দলের মধ্যকার নিয়মতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা গণতান্ত্রিক রাজনীতিরই অংশ। কিন্তু এ প্রতিযোগিতা যখন নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে না হয়ে প্রতিহিংসায় রূপ নেয় তখন তা পুরো রাজনীতিকে অস্থিতিশীল করে তোলে এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে। তাই গণতান্ত্রিক পরিবেশের উন্নয়নে নিয়মতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা আবশ্যক।

৪. **গঠনমূলক আলোচনা :** সংসদীয় গণতন্ত্রের আরেকটি মূলমন্ত্র হলো সংঘর্ষ নয় আলোচনা। এখানে সকল প্রকার রাজনৈতিক মতবিরোধকে সংসদে আলোচনা করে সমাধান করতে হবে। এজন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে পরস্পরের প্রতি সহনশীল ও যৌক্তিক আচরণ করতে হবে এবং পাশাপাশি সংসদে আলোচনার পরিবেশও বজায় রাখতে হবে।

৫. **সরকারি দলের সমর্থকদের সুবিধা পরিহার :** নির্বাচন যেহেতু সংসদীয় গণতন্ত্রের অন্যতম অনুষঙ্গ, তাই নির্বাচনকালে বিভিন্ন গোষ্ঠী ও উপদলের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করাটাই স্বাভাবিক। তাই নির্বাচনের পর বিজয়ী সরকারি দলের সমর্থকদের প্রতি বিশেষ সুবিধা দেয়ার ব্যাপারটিও স্বাভাবিক। কিন্তু সংসদীয় গণতন্ত্রকে কার্যকর করতে হলে এই নীতি পরিহার করা আবশ্যক। বরং নির্বাচনে সমর্থনের বিষয়টি বাদ দিয়ে দল-মত নির্বিশেষে সকলের প্রতি সমান আচরণ করাই গণতান্ত্রিক সরকারের কাছে জনগণের দাবি।

৬. **আপোষকামিতা :** সংসদীয় রাজনীতিতে সকল দলের মধ্যে আপোষকামিতার গুণ থাকা জরুরি। কেননা প্রতিটি দল যদি পরস্পরকে শত্রু ভেবে নিজ অবস্থান থেকে সরে এসে কোনো প্রকার ছাড় দিতে রাজি না হয় তাহলে কোনো সমস্যার সমাধানই সম্ভব নয়।

৭. **কাজের স্বীকৃতি :** রাজনীতিতে প্রত্যেক দলেরই কোনো না কোনোভাবে অবদান থাকতে পারে। তাই রাজনৈতিক দলগুলোকে এ সত্যটি স্বীকার করে নিয়ে একে অপরের ভূমিকার স্বীকৃতিদানের মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে।

৮. **বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা না করা :** সরকারের গণবিরোধী ও অযৌক্তিক কার্যকলাপের বিরোধিতা করার জন্য বিরোধী দলকে গণতন্ত্রের জন্য অপরিহার্য মনে করা হয়। তাই বলে বিরোধী দলের ভূমিকা কেবল বিরোধিতার মাঝেই সীমিত থাকবে এমন নয়। বরং গঠনমূলক বিরোধিতার পাশাপাশি সরকারি ইতিবাচক কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতি দানও বিরোধী দলের ভূমিকাকে আরো ভাস্বর করতে পারে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৯. **রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু হবে সংসদ :** গণতান্ত্রিক পরিবেশ উন্নয়নের আরেকটি মূলমন্ত্র হলো সকল রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু হবে সংসদ। সংসদকে বাদ দিয়ে তথা প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতিকে পাশ কাটিয়ে অপ্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতির ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল হয়ে পড়লে গণতন্ত্রের কার্যকারিতা বিনষ্ট হতে বাধ্য।

গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিচর্চায় সিভিল-সেনাবাহিনী সম্পর্কের প্রয়োজনীয়তা : গণতান্ত্রিক রীতিনীতি ও আচার-আচরণই গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি। আর এই গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রে সিভিল-সেনাবাহিনীর সম্পর্কের প্রয়োজনীয়তা আবশ্যক। কেননা সিভিল-সেনাবাহিনী দুই ধাঁচে গড়ে ওঠা দুটি ভিন্ন প্রতিষ্ঠান। তাই এদের কাজকর্ম হলো দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়াদি নিয়ে। আর সেনাবাহিনীর কাজ হলো দেশের প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত। কিন্তু উভয়ের মাঝে সমন্বয়ের প্রকট অভাব বিদ্যমান। ফলে গণতান্ত্রিক দেশগুলোকে গণতন্ত্রচর্চা ব্যাহত হয়। যেমন— সিভিল জনগণ কারণে-অকারণে দেশে হরতাল, অবরোধ, ধর্মঘট, সহিংস কার্যকলাপ, মারামারি, সন্ত্রাস, টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, রাজনৈতিক খুন, গুম ইত্যাদি কার্যকলাপ বাধিয়ে দেশের গণতান্ত্রিক পরিবেশ বিঘ্নিত করে। যেখানে সিভিল জনগণ গণতন্ত্রচর্চায় উদাসীন ও নিম্ন রাজনৈতিক সংস্কৃতির গেঁড়াকলে ঘুরপাক খায়, সেখানে সেনাবাহিনী গণতন্ত্রচর্চা সম্পর্কে উদাসীন থাকবে এটাই স্বাভাবিক। আর সিভিল জনগণের গণতন্ত্রচর্চার অভাবের সুযোগ নিয়ে রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করে দেশের শাসনক্ষমতায় যমের মতো খুঁটি গেঁড়ে বসে। অথচ সিভিল-সেনাবাহিনী সম্পর্ক থাকলে এবং সঠিক গণতন্ত্রচর্চা থাকলে সেনাবাহিনীর রাজনীতিতে হস্তক্ষেপের ঘটনা ঘটে না। যার ভুরি ভুরি উদাহরণ আছে। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত এর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। মোটকথা, সিভিল-সেনাবাহিনী সম্পর্ক গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিচর্চা বাড়ায়। তাই গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিচর্চায় সিভিল-সেনাবাহিনী সম্পর্কের প্রয়োজনীয়তা ব্যাপক।

উপসংহার : গ্রিক দার্শনিক প্লেটো যেখানে গণতন্ত্রকে নিকৃষ্ট শাসনব্যবস্থা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন, সেখানে আজকের আধুনিক বিশ্বে গণতন্ত্রের জয়জয়কার। কেননা গণতান্ত্রিকব্যবস্থা হচ্ছে মন্দের ভালো। তাই গণতান্ত্রিক পরিবেশ উন্নয়নের জন্য বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশগুলো আজ মরিয়া। এজন্য রাজনৈতিক দলগুলোর যেমন ভূমিকা রাখা উচিত তেমনি সিভিল-সেনাবাহিনী সুসম্পর্ক বজায় রাখা উচিত।

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

০৩। সংসদীয় রাজনীতিতে সরকারি দল ও বিরোধী দলের ভূমিকা এবং এক্ষেত্রে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর আচরণ সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ রচনা লিখুন।

উত্তর : পুঁজিবাদ আর বিশ্বায়নের এ আধুনিক বিশ্বে রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে গণতন্ত্রই সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা। আধুনিক এ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রধান এবং আবশ্যকীয় উপাদান হলো রাজনৈতিক দল। প্রতিষ্ঠিত এবং কার্যকর রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি ব্যতীত কোনো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই টিকে থাকতে পারে না। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূল কেন্দ্রবিন্দু সংসদকে কার্যকর করার জন্য সরকারি দল এবং বিরোধী দলের পাশাপাশি অবস্থান জরুরি। কেননা সরকারি দল ক্ষমতা দখলের পর ক্ষমতার আতিশয্যে ভুল করার সমূহ সম্ভাবনা থাকে যেখানে বিরোধী দল কার্যকর ও গঠনমূলক বিরোধিতার মাধ্যমে সরকারকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো একদিকে সরকারি দলকে যেমন বিরোধী দলের যৌক্তিক মতামতকে গুরুত্ব দিতে হবে অন্যদিকে বিরোধী দলকেও তার বিরোধিতার যথার্থতা সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

সরকারি দল ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্ক ও কার্যক্রমের কতিপয় মূলনীতি : আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকারি দল ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্ক ও কার্যক্রম কতিপয় মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ সকল মূলনীতি যথাযথভাবে অনুসৃত না হলেই সংসদীয় ব্যবস্থা তার মৌলিকত্ব হারাতে বাধ্য।

প্রথমত, পরমতসহিষ্ণুতা গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র। গণতন্ত্র মানেই হলো গণমানুষের বিক্ষিপ্ত মত ও পথকে একটি ব্যবস্থার আওতায় এনে সামগ্রিক কল্যাণের পথ খুঁজে বের করা। এক্ষেত্রে সকলের মতের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থাকা অত্যাবশ্যক। তাই সংসদীয় গণতন্ত্রে সরকারি দল ও বিরোধী দলকে অবশ্যই পরস্পরের মতের মূল্যায়ন করতে হবে। বিরোধী দলকে তার মতামত প্রদানের সময় মনে রাখতে হবে কেবল সরকারকে ঘায়েল করার জন্য নয়, বরং মতামত হবে যৌক্তিক ও জনগণের কল্যাণের উদ্দেশ্যে। অপরদিকে সরকারি দলকে মনে রাখতে হবে সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে বিরোধী দলের সকল মতামতকে উপেক্ষা করা অনুচিত এবং গণতান্ত্রিক চেতনার বিরোধী।

দ্বিতীয়ত, বিরোধী দলের বিরোধিতা সংসদীয় গণতন্ত্রের একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। বিরোধী দলের কার্যকর বিরোধিতা সরকারি দলের স্বেচ্ছাচারী ভূমিকার ক্ষেত্রে একটি নিয়ন্ত্রণ হিসেবে কাজ করে। তাই সংসদের ভেতরে ও বাইরে বিরোধীদের দমন-পীড়নের পরিবর্তে তাদের রাজনৈতিক ভূমিকা পালনের সুযোগ দান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে কার্যকর করার অন্যতম পূর্বশর্ত। অন্যদিকে বিরোধী দলের বিরোধিতা যখন কেবলই বিরোধিতার জন্য হয় তখন তা গণতন্ত্রকে ভিন্ন পথে পরিচালিত করে।

তৃতীয়ত, প্রতিযোগিতা গণতন্ত্রের মৌলিক স্পৃহা থেকেই উৎসারিত। কেননা রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের জন্য এ সকল দলের মধ্যকার নিয়মতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা গণতান্ত্রিক রাজনীতিরই অংশ। কিন্তু এ প্রতিযোগিতা যখন নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে না হয়ে প্রতিহিংসায় রূপ নেয় তখন তা পুরো রাজনীতিকে অস্থিতিশীল করে তোলে এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে।

চতুর্থত, সংসদীয় গণতন্ত্রের আরেকটি মূলমন্ত্র হলো আলোচনা, সংঘর্ষ নয়। এখানে সকল প্রকার রাজনৈতিক মতবিরোধকে সংসদে আলোচনা করে সমাধান করতে হবে। এজন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে পরস্পরের প্রতি সহনশীল ও যৌক্তিক আচরণ করতে হবে এবং পাশাপাশি সংসদে আলোচনার পরিবেশও বজায় রাখতে হবে।

পঞ্চমত, নির্বাচন যেহেতু সংসদীয় গণতন্ত্রের অন্যতম অনুষঙ্গ, তাই নির্বাচনকালে বিভিন্ন গোষ্ঠী ও উপদলের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করাটাই স্বাভাবিক। তাই নির্বাচনের পর বিজয়ী সরকারি দলের সমর্থকদের প্রতি বিশেষ সুদৃষ্টি দেয়ার ব্যাপারটিও স্বাভাবিক। কিন্তু সংসদীয় গণতন্ত্রকে কার্যকর করতে হলে এই নীতি পরিহার করা আবশ্যক। বরং নির্বাচনে সমর্থনের বিষয়টি বাদ দিয়ে দল-মত নির্বিশেষে সকলের প্রতি সমান আচরণ করাই গণতান্ত্রিক সরকারের কাছে জনগণের দাবি।

ষষ্ঠত, সংসদীয় রাজনীতিতে সকল দলের মধ্যে আপোষকামিতার গুণ থাকা জরুরি। কেননা প্রতিটি দল যদি পরস্পরকে শত্রু ভেবে নিজ অবস্থান থেকে সরে এসে কোনো প্রকার ছাড় দিতে রাজি না হয় তাহলে কোনো সমস্যার সমাধানই সম্ভব নয়।

সপ্তমত, রাজনীতিতে প্রত্যেক দলেরই কোনো না কোনোভাবে অবদান থাকতে পারে। তাই রাজনৈতিক দলগুলোকে এ সত্যটি স্বীকার করে নিয়ে একে অপরের ভূমিকার স্বীকৃতিদানের মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

অষ্টমত, সরকারের গণবিরোধী ও অযৌক্তিক কার্যকলাপের বিরোধিতা করার জন্য বিরোধী দলকে গণতন্ত্রের জন্য অপরিহার্য মনে করা হয়। তাই বলে বিরোধী দলের ভূমিকা কেবল বিরোধিতার মাঝেই সীমিত থাকবে এমন নয়। বরং গঠনমূলক বিরোধিতার পাশাপাশি সরকারি ইতিবাচক কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতি দানও বিরোধী দলের ভূমিকাকে আরো ভাস্বর করতে পারে।

নবমত, সংসদীয় রাজনীতির আরেকটি মূলমন্ত্র হলো সকল রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু হবে সংসদ। সংসদকে বাদ দিয়ে তথা প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতিকে পাশ কাটিয়ে অপ্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতির ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল হয়ে পড়লে সংসদীয় গণতন্ত্রের কার্যকারিতা বিনষ্ট হতে বাধ্য।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে সরকারি দল ও বিরোধী দলের ভূমিকা : ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পরই বাংলাদেশে প্রথম সংসদীয় সরকারব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। কিন্তু সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় সরকারব্যবস্থার পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। তারপর দীর্ঘ প্রায় পনের বছর যাবৎ সামরিক রাজনীতির যাঁতাকলে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থা তার মৌলিকত্ব হারাতে বসেছিল। কিন্তু ১৯৯০ সালের গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে এরশাদ সরকারের পতনের পর বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু হয়। তারপর ১৯৯১ সালে সর্বপ্রথম নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে একটি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসে এবং সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় সরকারব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন করে। তারপর ১৯৯৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতাসীন হয় এবং ২০০১ সালে মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে অষ্টম সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিরোধী দল এবং বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় ঐক্যজোটের সরকার ক্ষমতায় আসে। আর সর্বশেষ ২৯ ডিসেম্বর ২০০৮-এর নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন হয় আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার। রাজনীতির এ পালাবদলের মাঝে একটি বিষয় সুস্পষ্ট ছিল— কোনো দলই সংসদীয় রাজনীতির মৌলিক চেতনা ও রীতিনীতির প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিল না এবং বর্তমানে এক্ষেত্রে তেমন কোনো অগ্রগতি হচ্ছে বলে মনে হয় না।

১. বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের রাজনীতির আলোকে দেখা গেছে, সরকারি দল এবং বিরোধী দলের কোনোটাই পরস্পরের যৌক্তিক ও গণমুখী দাবিকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করেনি। বরং রাজনৈতিক একগুঁয়েমি ও জেদের বশে একে অপরের যে কোনো মত ও নীতির যেনতেনভাবে বিরোধিতা করার হীনম্মন্যতা ছিল তাদের রাজনীতির মূল চরিত্র। তাই দেখা গেছে সরকারি দল যেমন বিরোধী দলের উত্থাপিত কোনো যৌক্তিক দাবিকেও অস্বীকার করে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে একটার পর একটা বিল পাস করে, তেমনি বিরোধী দলও সংসদে সরকারি দলের যে কোনো বিল ও প্রস্তাবের বিরোধিতা করে। এর অন্যতম উদাহরণ হলো সংসদে যখন বাজেট উত্থাপিত হয় এবং পাস হয় তখন বিরোধী দলের হরতাল আহ্বান একটি নিয়মতান্ত্রিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে জননিরাপত্তা আইনের মতো জনগুরুত্বপূর্ণ আইন কিংবা পার্বত্য শান্তিচুক্তির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও সরকার বিরোধীদের মতামত গ্রহণের প্রয়োজন অনুভব করেনি। অন্যদিকে তৎকালীন বিরোধী দল বিএনপিও যে এ ব্যাপারে খুব বেশি আন্তরিক ছিল তা-ও বলা যাবে না।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

২. আমাদের রাজনীতির আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো আপোষহীনতা। 'আমাদের সংগ্রাম চলবেই'— ব্রিটিশ ও পাকিস্তানবিরোধী আন্দোলনের সময়কার এ জনপ্রিয় স্লোগানটি আমাদের রাজনীতিবিদদের চেতনাকে ভালোভাবেই গ্রাস করেছে। একটি স্বাধীন-সার্বভৌম গণতান্ত্রিক দেশের সরকার আর একটি পরাধীন, উপনিবেশিক রাজনীতির যে ভিন্ন চরিত্র তা এখনো আমাদের রাজনীতিবিদরা সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারছে না। এমতাবস্থায় তাদের মাঝে আপোষকামিতার যে গণতান্ত্রিক বোধ তা অনুপস্থিত। অথচ গণতন্ত্রের দাবি হলো—সমাজ ও রাজনীতিতে সক্রিয় প্রতিটি ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মতামতই বিবেচনার দাবি রাখে। তাই বিবদমান দলগুলোর পারস্পরিক আলোচনা এবং সমঝোতার মাধ্যমেই ভিন্ন ভিন্ন মত ও দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয় সাধন করতে হবে। অথচ আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো আলোচনায় বসতেই নারাজ। এরা কেউই নিজেদের অবস্থান থেকে এক চুল পরিমাণ নড়তে নারাজ। এক্ষেত্রে অবশ্য এক ধরনের হীনম্মন্যতাও কাজ করে। কেননা তারা মনে করে কোনো রকম ছাড় দেয়া তাদের অসামর্থ্যের প্রমাণবহ এবং এটা তাদের জন্য অপমানকর।

৩. প্রতিযোগিতা নয়, প্রতিহিংসাই আমাদের রাজনীতির মৌলিক বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। যখন যে সরকার ক্ষমতায় তখন বিরোধীদের দমন, পীড়ন, প্রতিশোধ, প্রতিরোধ এবং হয়রানিই যেন তাদের মূল কাজে পরিণত হয়। এটা এখন একটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় পরিণত হয়েছে। মিথ্যা মামলা, পুলিশি হয়রানি, চাকরিচ্যুতি থেকে শুরু করে নামবদল, ছবিবদল, পরিকল্পনা বদল ও স্থগিতকরণসহ প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার যতরকম পদ্ধতি রয়েছে সবই সরকার করে থাকে। অন্যদিকে সরকারকে হেনস্থা করা ও বেকায়দায় ফেলার জন্য যত রকমের অপকৌশল রয়েছে তার সবগুলোই বিরোধী দল করে থাকে।

৪. আমাদের সরকারি দল ও বিরোধী দলের আরেকটা প্রবণতা হলো এরা কখনোই একে অপরের অবদানকে স্বীকৃতি দেয়ার উদারতা দেখাতে চায় না। সরকারি দল ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় যত ভালোই করুক না কেন বিরোধী দল তার স্বীকৃতি দেয় না বরং এর যত ধরনের খুত রয়েছে তা খুঁজে খুঁজে বের করে। অনেক ক্ষেত্রে নামবদল, সংস্কার বা ইতিহাসের ছেঁড়া পাতা ঘেঁটে এর কৃতিত্ব নিজেরা নেয়ার অপচেষ্টাও তারা করে। তাই একই সম্মেলন কেন্দ্র, ব্রিজ কিংবা ছাত্রাবাসের দু-তিন বার উদ্বোধন ও নামবদলের ঘটনাও ঘটতে দেখা যায়। তারা একে অপরের বিরুদ্ধে অপবাদ, মিথ্যাচার ও কুৎসা রটনার মতো অপকর্মগুলো পবিত্র সংসদে দাঁড়িয়েই করে থাকেন। এক্ষেত্রে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকার বিষয়টিকে আওয়ামী লীগ গুরুত্ব দিয়ে আপন ভাগে কৃতিত্ব এবং জামায়াতকে হেনস্থা করার চেষ্টা করে থাকে। অন্যদিকে বিএনপি ও তার সমমনা দলগুলো স্বাধীনতা-পরবর্তী শেখ মুজিব সরকারের ব্যর্থতার বিষয়টিকে টেনে আনতে চায়। পাশাপাশি বিএনপি দেশ গড়া ও গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় জেনারেল জিয়ার অবদানকে উর্ধ্বে তুলে ধরতে চাইলে সামরিক শাসনের ছুঁতো দেখিয়ে আওয়ামী লীগ জিয়াউর রহমানের ভূমিকাকে খাটো করতে চায়। এমনকি বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক-বিতর্কও এক্ষেত্রে উল্লেখ্য। এভাবে দেখা যায়, রাজনৈতিক দলগুলো কেউই একে অপরের অবদানকে স্বীকৃতি দিতে চায় না। ফলে সংসদে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেবলই এ সকল বিষয় নিয়ে বিতর্ক হয় কিন্তু এ বিতর্কের ফল দাঁড়ায় শূন্য।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৫. বাংলাদেশের রাজনীতির আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো রাজনীতিতে পোষক-পোষিতের সম্পর্কের উপস্থিতি। এ জাতীয় প্রবণতা রাজনৈতিক দলগুলোর আচরণে সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে যেহেতু নির্বাচন, জনগণের অংশগ্রহণ, রাজনৈতিক দলব্যবস্থা প্রভৃতি বিদ্যমান, তাই সকল নাগরিক একই রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করবে এটা ভাবা ঠিক নয়। কোনো দল যদি এমনটা ভাবে তাহলে সে দলকে কোনো অর্থেই গণতান্ত্রিক ভাবা যায় না। বরং বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠী যখন তাদের পছন্দমতো দলকে সমর্থন করার সুযোগ পাবে তখনই গণতন্ত্র অর্থবহ হবে। কিন্তু আমাদের দেশে রাজনৈতিক দলগুলোর আচরণ দেখলে মনে হয় যে, তাদেরকে সমর্থন করা যেন অত্যাবশ্যক। তাই কোনো দল যখন ক্ষমতায় আসে তখন তাকে যে দল বা গোষ্ঠী সমর্থন দিয়েছিল তাদের জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রদান অপরিহার্য বিবেচনা করে। পক্ষান্তরে যে সকল দল বা গোষ্ঠী সমর্থন করেনি বলে ধারণা করে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণও অপরিহার্য বিবেচনা করে। অথচ একটা গণতান্ত্রিক দেশের সরকারের উচিত দল-মত নির্বিশেষে প্রতিটি নাগরিককে সমান চোখে দেখা। কেননা ভিন্নমত পোষণ করার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে। এ অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানো সরকারের অবশ্য করণীয়। উল্লেখ্য, আমাদের দেশে অঞ্চলভিত্তিক বিশেষ সুবিধা প্রদানের রীতিও সুবিদিত। বিশেষ করে যে এলাকায় যত শক্তিধর মন্ত্রী, সে এলাকায় তত উন্নয়ন—এ প্রবণতা সুষম উন্নয়ন বানচাল করে দিয়ে অঞ্চলভিত্তিক বৈষম্য বৃদ্ধি করছে।

৬. আমাদের বিরোধী নেতারা সবসময় সরকারের সকল কিছুর বিরোধিতা করাকেই তাদের প্রধান কাজ বলে মনে করেন। তারা মনে করেন, সরকারের সকল কাজের বিরোধিতা করতে না পারলে তাদের মান যাবে। অথচ এ জাতীয় ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। বরং সরকারি দলের ভালো কাজে সমর্থন যুগিয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রাজনীতি করলে বিরোধীদলীয় প্রধানের মর্যাদা বৃদ্ধি পাওয়া ছাড়া কমে না। অন্যদিকে সরকারি দলের প্রধানও বিরোধীদলীয় প্রধানের রাজনৈতিক অবস্থানের গুরুত্বকে স্বীকার করতে চান না। তিনি সরকারি ক্ষমতার বলে জনগণের একটা বিরাট অংশের সমর্থনপুষ্ট বিরোধী দলকেও তোয়াক্কা করতে চান না। তখন অনেক সময় বাধ্য হয়েই বিরোধী দলকে সংসদ ছেড়ে রাস্তায় নেমে আসতে হয়। এ প্রবণতা আমরা যেমন ১৯৯১–৯৬ সাল পর্যন্ত দেখেছি, তেমনি ১৯৯৬–২০০১ সময়কালেও দেখেছি। এ অবস্থার জন্য কোনো পক্ষকেই এককভাবে দায়ী করা যায় না। কেননা এমনও দেখা যায় যে, কেবল একগুঁয়েমি এবং হীনম্মন্যতার কারণেও বিরোধী দল সংসদ বর্জন করে থাকে। এমনটি আমরা যেমন বিএনপির ক্ষেত্রে দেখেছি, তেমনি ২০০১ সালের নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগের ক্ষেত্রেও দেখছি। নবম সংসদের প্রথম অধিবেশনেও একই দৃশ্য দেখা যায়।

৭. আমাদের রাজনীতিবিদদের আচরণ দেখলে মনে হয় যে, তারা তাদের নিজেদের অবস্থান সম্পর্কেই যেন সচেতন নন। তাই তারা একে অপরকে সম্মান করার যে ন্যূনতম সৌজন্যবোধ সেটাও দেখাতে পারেন না। অথচ আত্মসম্মানবোধ, আত্মোপলব্ধি এবং একে অপরকে সম্মান করার মৌলিক নীতির ওপরই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নির্ভরশীল। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমাদের নেতা-নেত্রীদের সংসদে দাঁড়িয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা, এমনকি কুৎসিত মন্তব্য করতেও শোনা যায়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৮. রাজনৈতিক ব্যবস্থা যা-ই হোক না কেন, রাজনীতিবিদদের অবশ্যই সকল কিছুর ঊর্ধ্বে জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে হবে। মনে রাখতে হবে জাতীয় স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে যে রাজনীতি করে, সে আর যাই হোক দেশপ্রেমিক রাজনীতিবিদ হতে পারে না। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো, আমাদের দল, নেতা-নেত্রীরা প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য জাতীয় স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না। পলাশীর প্রান্তরে ইংরেজদের সাথে আঁতাত করার জন্য আমরা মীরজাফরকে দোষ দিয়ে থাকি, কিন্তু আজকের অনেক মীরজাফরকেই আমরা চিনি না। বিশেষ করে জাতীয় বিষয়কে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে তুলে নিয়ে গিয়ে বিদেশীদের কাছে ধর্না দেয়ার ঘৃণ্য মানসিকতা আমাদের রাজনীতিবিদদের বহু দিনের।

৯. নিয়মতান্ত্রিক নির্বাচন, সংসদ ও সংবিধানের প্রতি আস্থা রেখে প্রতিটি রাজনৈতিক দল তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবে—এটাই সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার দাবি। অথচ আমাদের দেশের রাজনীতির দিকে তাকালেই বোঝা যাবে এখানে সংসদীয় গণতন্ত্রের এ দাবিগুলো কতটা পূরণ হচ্ছে। জনগণ যাদের ভোট দিয়ে সংসদে তাদের জন্য কথা বলতে পাঠায় তারা সংসদে না গিয়ে দলীয় রাজনীতির নোংরা খেলায় মেতে থেকে সংসদ বর্জনকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। সংসদ সদস্যদের অনুপস্থিতির কারণে সংসদে প্রায়ই কোরাম সংকট দেখা দেয়। নানা ছুতোয় সংসদ বর্জন আমাদের সংসদের একটা রীতিতে পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে সরকারি দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে বিরোধী দলকে হেয় করা, কথা বলতে না দেয়া এবং যে কোনো যুক্তি ও দাবি কেবল বিরোধী দলের বলে অগ্রাহ্য করার সংস্কৃতিও আমাদের সংসদে চালু হয়েছে।

আমাদের রাজনীতির আরেকটি দিক হলো, যে বিষয়, নীতি বা সিদ্ধান্তকে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের স্বার্থের অনুকূল বলে মনে করবে কেবল সেটাকেই তারা মেনে নেবে, নতুবা সব অগণতান্ত্রিক, অস্বচ্ছ বা গণবিরোধী বলে চালিয়ে দেবে। যেমন কোনো নির্বাচনে যে দল হেরে যায়, তা দেশীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত হলেও সে দল এখানে কারচুপির অভিযোগ কোনো না কোনো ভাষায় উত্থাপন করবেই।

সুতরাং এ দেশে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থাকে যদি কার্যকর করতে হয় তাহলে রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছা, পারস্পরিক সম্মানবোধ ও সংসদীয় সংস্কৃতির চর্চার কোনো বিকল্প নেই। এজন্য নিচের বিষয়গুলো বিবেচনা করা যেতে পারে :

প্রথমত, সরকারি এবং বিরোধী দল উভয়কেই একে অপরের যৌক্তিক ও গণমুখী দাবিকে সমর্থনের সৎ সাহস দেখাতে হবে।

দ্বিতীয়ত, সরকারি দল এবং বিরোধী দল উভয়কেই সংসদকে সকল রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করার চেষ্টা করতে হবে। সেজন্য নানা ছুতোয় যেমন সংসদ বর্জন করা যাবে না, তেমনি সংসদে আলোচনার পরিবেশ সৃষ্টিতেও সরকারি দলকে সহনশীল ও যৌক্তিক হতে হবে।

তৃতীয়ত, বিরোধী দলকে যেমন বিরোধিতার জন্য বিরোধিতার মানসিকতা পরিহার করতে হবে, তেমনি সরকারি দলকেও যৌক্তিক ক্ষেত্রে বিরোধী দলের দাবি মেনে নিতে হবে। আপোষ করার মানসিক প্রস্তুতি উভয় দলেরই থাকতে হবে।

চতুর্থত, রাজনৈতিক দলগুলোকে পারস্পরিক অবদানের স্বীকৃতি প্রদানের মতো উন্নততর মানসিকতা পোষণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে একে অপরকে স্বীকৃতি না দিলে কারো অবদানের মহিমাই উজ্জ্বল হয় না।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

পঞ্চমত, পরস্পরকে বিশ্বাস করার যে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি তার চর্চা করতে হবে। রাজনীতিতে প্রতিহিংসা পরিহার করে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে হবে। তাহলে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার পরিবর্তে উন্নয়ন হবে, গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার বিকাশ ঘটবে।

ষষ্ঠত, সর্বোপরি সকল কিছুর ঊর্ধ্বে থাকবে জাতীয় স্বার্থ। তাই গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছতে হবে। নতুবা কোনো জাতীয় সমস্যারই সমাধান হবে না।

সুতরাং যতদিন না আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো সংসদীয় রাজনীতির এ সকল মৌলিক বিষয়ের চর্চা করবে, ততদিন পর্যন্ত সংসদীয় গণতন্ত্র যেই তিমিরে আছে সেই তিমিরেই থেকে যাবে।

০৪। 'বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি দেশীয় উন্নয়নে সহায়ক নয়'– উক্তিটির পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি প্রদান করুন।

উত্তর : রাজনীতি একটি অত্যন্ত মহৎ পেশা। জনগণের সেবা ও খেদমত করার সুযোগ ও পরিবেশ এর চেয়ে বেশি আর কিছুতে নেই। আগেকার দিনে বাংলাদেশের রাজনীতি যারা করতেন তারা জীবনকে উৎসর্গ করেছেন মানুষের কল্যাণে। জীবনের ব্রত হিসেবে তারা রাজনীতিকে গ্রহণ করেছিলেন। ত্যাগ, তিতিক্ষার ভেতর দিয়ে তারা নিঃস্বার্থভাবে সারাজীবন সাধারণ মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন। কিন্তু আজ বাংলাদেশের রাজনীতি হয়ে যাচ্ছে রাতারাতি ভাগ্য উন্নয়নের পরশপাথর। এর স্পর্শে এলেই রাতারাতি লাখপতি, কোটিপতি হওয়া সময়ের ব্যাপার মাত্র। বাংলাদেশের রাজনীতি এখন ভ্রান্ত, অভিশপ্ত, রাহুগ্রস্ত; এক অন্ধকার অমানিশায় ঘুরপাক খাচ্ছে। মাঝে মাঝে উঁকি দিচ্ছে মুহূর্তের জন্য সোনালি সূর্য। তবে তা ক্ষণস্থায়ী।

রাজনৈতিক সংস্কৃতি কাকে বলে? : রাজনৈতিক সংস্কৃতি হচ্ছে সাধারণ সংস্কৃতির সেই অবিচ্ছেদ্য অংশ যা একজন নাগরিকের মূল্যবোধ, বিশ্বাস, ধারণা, অনুভূতি ও ঐতিহ্যের সমষ্টি; কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনীতির প্রতি ব্যক্তি ও সদস্যগণের মনোবৃত্তি ও দৃষ্টিভঙ্গির নমুনা। রাজনৈতিক সংস্কৃতি হলো কতকগুলো অন্তর্গত প্রবণতা ও মাত্রাবোধ।

সিডনী ভারবা বলেন, 'রাজনৈতিক সংস্কৃতি হচ্ছে বাস্তবভিত্তিক বিশ্বাস, প্রকাশযোগ্য প্রতীক ও মূল্যবোধের সমষ্টি; এগুলো সেই পরিস্থিতি বা পরিবেশকে নির্দেশ করে যেখানে রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্ম অনুষ্ঠিত হয়।'

লুসিয়ান পাই বলেন, 'রাজনৈতিক সংস্কৃতি হচ্ছে কতকগুলো মনোবৃত্তি, বিশ্বাস ও অনুভূতির সমষ্টি। এগুলো কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থায় আচরণ নিয়ন্ত্রণকারী ধারণা ও বিধি বিধানকে নির্দেশ করে।'

উপরিউক্ত সংজ্ঞার আলোকে বলা যায়, যে প্রক্রিয়ায় একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সংঘটিত হয়, সে সম্পর্কে একটি জাতির রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির সমষ্টিকে রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলা হয়।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি দেশীয় উন্নয়নে সহায়ক কি না? : বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিশ্লেষণ করলে এর দুটি দিক পরিলক্ষিত হয়। এগুলো হলো : ক. ইতিবাচক দিক, খ. নেতিবাচক দিক।

ইতিবাচক দিক : ইতিবাচক দিকগুলোর মধ্যে রয়েছে—

১. **গণতন্ত্রকামী মানুষ :** এদেশের মানুষের চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এরা গণতন্ত্রের জন্য অজস্র লড়াই করেছে। যেমন– ১৯৫২, '৬২, '৬৬, '৬৮, '৬৯, '৭০, '৭১, '৯০ সালে এরা গণতন্ত্র উদ্ধারে আত্মাহুতি দিয়েছে। ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই নিয়েছে সালাম, বরকত, আসাদ, মতিউর, নূর হোসেনরা।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

২. **নিয়মিত নির্বাচন :** ১৯৯১ থেকে একটি ধারাবাহিক ও নিয়মিত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে, যা রাজনীতির একটি শুভ দিক। রাজনীতিতে নির্বাচন হচ্ছে প্রাণ।

৩. **জবাবদিহিতা বৃদ্ধি :** ১৯৯১-পরবর্তী সময়ে জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলোকে তাদের অন্যায় আচরণের জন্য ক্ষমা চাইতে হচ্ছে অথবা ভুল স্বীকার করতে হচ্ছে।

৪. **বিচার বিভাগের স্বাধীনতা :** বহু প্রতীক্ষিত বিচার বিভাগ এখন স্বাধীন। কাজেই কেউ অন্যায় করলে এখন পার পাওয়া সহজ নয়। উজির-নাজির সবাইকে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে অন্যায়কারী হলে। আইনের চোখে সকলেই সমান বলে বিবেচিত হবে।

৫. **স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন :** বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির একটি উল্লেখযোগ্য দিক স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন। দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শাস্তি পেতে হচ্ছে। রাজনীতি থেকে দুর্নীতি এভাবে ধীরে ধীরে মুক্ত হবে আশা করা যায়।

৬. **জনসচেতনতা বৃদ্ধি :** বাংলাদেশের মানুষ এখন অত্যন্ত রাজনীতিসচেতন। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে তারা দৈনন্দিন রাজনৈতিক ক্রিয়া-কর্ম সম্পর্কে অবগত হচ্ছে। নিজেদের ভালমন্দ বুঝতে শিখেছে।

৭. **বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি :** একটি দেশের অর্থনীতি ও রাজনীতি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। অর্থনীতি সফল হলে রাজনীতিও স্বচ্ছ হয়। আর রাজনীতি স্বচ্ছ হলে অর্থনীতি চাঙ্গা হয়। সাম্প্রতিক পৃথিবীর বহু দেশ ও বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে বিনিয়োগের জন্য এগিয়ে এসেছে, যা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিকে বেগবান করবে এবং রাজনীতি আরো স্বচ্ছ, জবাবদিহিপূর্ণ হবে।

৮. **গণমাধ্যমের স্বাধীনতা :** পূর্বের তুলনায় বাংলাদেশের গণমাধ্যমগুলো এখন অনেক বেশি স্বাধীনতা ভোগ করছে। সরাসরি সরকারের ভালো কাজের প্রশংসা করছে। মন্দ কাজের নিন্দা করছে। এরূপ গণমাধ্যমের স্বাধীনতা রাজনৈতিক দলগুলোকে আরো বেশি স্বচ্ছ ও স্পষ্ট হতে বাধ্য করছে।

৯. **শিক্ষার হার বৃদ্ধি :** শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। স্বাধীনতা-পরবর্তী উত্তরোত্তর বাংলাদেশে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। শিক্ষিত মানুষ বুঝতে বা উপলব্ধি করতে সক্ষম হচ্ছে রাজনৈতিক দল ও নেতাদের চরিত্র। ভালোমন্দ বিচার করতে সক্ষম হচ্ছে। যা বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ রাজনীতিকে আলোর সন্ধান দেবে।

১০. **অর্থনৈতিক উন্নয়ন :** বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু আয় বেড়েই চলেছে। মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়ন ঘটছে। শিশু মৃত্যুহার হ্রাস পাচ্ছে, গর্ভকালীন মৃত্যুহার হ্রাস পাচ্ছে, নারী স্বাধীনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রভৃতি অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ইঙ্গিত করছে। এরূপ ধারাবাহিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির ইতিবাচক স্বাক্ষর বহন করে।

১১. **তৃণমূল পর্যায়ে রাজনৈতিক সংগঠন :** বাংলাদেশের বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলোর তৃণমূল পর্যায়ে রাজনৈতিক দল রয়েছে। যারা নিত্য জনগণকে সচেতন করে চলেছে।

১২. **অন্যান্য :** এছাড়াও স্বাধীন নির্বাচন কমিশন গঠন, ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব, মানব সম্পদ বৃদ্ধি প্রভৃতি বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির ইতিবাচক দিক হিসেবে বিবেচিত।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

নেতিবাচক দিক : প্রফেসর রেহমান সোবহান স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির যে সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করেছেন সেগুলো নিম্নরূপ :

১. মতদ্বৈতিক চিরাচরিত শাসন, ২. প্রাতিষ্ঠানিক ত্রুটি, ৩. নিম্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, ৪. অসুস্থ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, ৫. অগণতান্ত্রিক নীতি।

নিচে ধারাবাহিকভাবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির নেতিবাচক দিকগুলো উপস্থাপন করা হলো :

১. **নির্বাচন সমস্যা :** নির্বাচন গণতন্ত্রের প্রাণ। আমাদের দেশে নির্বাচন ব্যবস্থার গ্রহণযোগ্যতা ও বিশ্বস্ততা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। নির্বাচনে কারচুপি, জাল ভোট, অর্থ ব্যবহার, আইন ও পেশীশক্তির ব্যবহার রয়েছে। শিক্ষিত-বিশ্বস্ত জনপ্রিয়রা দল থেকে মনোনয়ন পাচ্ছেন না। মনোনয়নে গুরুত্ব দেয়া হয় পুঁজিপতি ও পেশীশক্তির অধিকারীদের। নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয় রাজনৈতিক স্বার্থে।

২. **রাজনৈতিক দলের ব্যর্থতা :** রাজনৈতিক দলসমূহ নির্বাচনের পূর্বে বড় বড় প্রতিশ্রুতি দিয়ে নির্বাচনী বৈতরণী পার হলে তা ভুলে যায়। যারা নেতৃত্বে আছেন তারা সর্বদা নেতৃত্বে থাকতে চান। সিদ্ধান্তগ্রহণে দলের প্রধানের প্রাধান্য দেখা যায়। জনগণের পৃষ্ঠপোষক ও ভাগ্য নিয়ন্ত্রক না হয়ে রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নে গুরুত্ব দেয়। দলীয় কোন্দল, রাজনৈতিক হত্যা, ক্ষমতাসীন কর্তৃক বিরোধীদের কোণঠাসা করে রাখা, বিরোধী দলগুলোর অরাজকতা সৃষ্টি করে সরকারকে বিপর্যস্ত করা বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে।

৩. **অস্থিরতা ও অসহিষ্ণুতা :** জনচরিত্রের দিক দিয়ে আমরা একটা অস্থির জাতি। তার প্রমাণ রাজনৈতিক দলগুলোর স্লোগানে– 'অ্যাকশন, অ্যাকশন, ডাইরেক্ট অ্যাকশন' অথবা 'জ্বালো জ্বালো আগুন জ্বালো...', '... গদিতে আগুন জ্বালো একসাথে'। এরূপ স্লোগান রাজনৈতিক অপসংস্কৃতিরই নামান্তর।

৪. **অরাজকতা ও অনৈতিকতা :** বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মারামারি, লাঠালাঠি, ভাংচুর, জ্বালাও পোড়াও, বোমাবাজি, গুলি, হত্যা, লুটতরাজ, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি নিত্যনৈমত্তিক এবং স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। স্লোগান ওঠে— 'বুবুজান অথবা ভাবীজান..... বাংলা ছেড়ে চলে যান।' কিংবা 'ধইরা ধইরা জবাই কর।'

৫. **সমঝোতার অভাব :** বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে ঐকমত্যের প্রশ্নে বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। যার ফলে আজও সমাধান হয়নি বাঙালি-বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ দ্বন্দ্ব, স্থানীয় সরকার কাঠামো, পররাষ্ট্রনীতি। জাতীয় ঐকমত্যের অভাবেই সৃষ্টি হয়েছে গণতন্ত্র ও রাষ্ট্রের ভাঙন। পারেনি স্বাধীনতার শক্তি ও স্বাধীনতার বিরোধী শক্তিকে চিহ্নিত করতে। ব্যর্থ হয়েছে রাজাকার, আল বদর, আল শামসদের শাস্তি দিতে।

৬. **ক্ষমতার অপব্যবহার :** বাংলাদেশের রাজনীতিবিদরা ক্ষমতার মোহে মত্ত হয়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি রাজনৈতিক নেতাদের ক্ষমতার অপব্যবহারের ফলে দিন দিন আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। পুলিশকে সরকারি দলের সম্পত্তি হিসেবে ব্যবহার করছে। ক্ষমতাবানরা ভুলেই যান ভবিষ্যতে তাদের ক্ষমতার বাইরে যেতে হবে বা হতে পারে।

৭. **রাবার স্ট্যাম্প পার্লামেন্ট :** বাংলাদেশের পার্লামেন্ট কমবেশি রাবার স্ট্যাম্পে পরিণত হয়েছে। কারণ পার্লামেন্টের কাজ আইন প্রণয়ন, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হলেও প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

কোনো আইন সংসদে গৃহীত হয় না। পার্লামেন্টকে পাশ কাটিয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও নীতি প্রণীত হয়। তাছাড়া পার্লামেন্ট কমিটিগুলোতে রয়েছে সরকারি দলের প্রাধান্য, বিরোধী দলের বয়কট সংস্কৃতি, নিয়মিত মিটিংয়ের অভাব।

৮. **দ্বন্দ্ব-বিদ্বেষ ও ভাবাদর্শের সংঘাত :** বাংলাদেশের রাজনীতিতে রয়েছে দ্বন্দ্ব-বিদ্বেষ ও ভাবাদর্শগত সংঘাত। ভাবাদর্শগত সংঘাত হিসেবে দেখা যায় ১৯৭২ সালের সংবিধানের মূলনীতি পরিবর্তন, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রকে ধর্মীয় রাষ্ট্রে পরিণত করা, সমাজতন্ত্র-পুঁজিবাদ দ্বন্দ্ব। একে অপরকে গালি দিচ্ছে ভারতের-চীনের দালাল বলে, যা কখনো সুস্থ রাজনৈতিক সংস্কৃতি হতে পারে না।

৯. **ধর্মীয় ও উত্তরাধিকার রাজনীতি :** বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার ব্যাপক। এ দেশের মানুষ ধার্মিক, কিন্তু ধর্মান্ধ নয়। ধর্মকে ব্যবহার করছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্নভাবে। যেমন– ডানপন্থিরা স্লোগান দিচ্ছে– 'নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার', বামপন্থিরা 'আল্লাহু আকবার' বলে। নির্বাচনকালীন রাজনৈতিক নেতারা হজে যান। মাথায় কাপড় দেন, সমাবেশে আসসালামু আলাইকুম, খোদা হাফেজ, ইনশাল্লাহ, মাশাল্লাহ শব্দ ব্যবহার করে জনগণকে ধোকা দেয়ার চেষ্টা করেন। উত্তরাধিকারসূত্রে রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা গ্রহণ করে চলেছে। নেতৃত্বে দেখা দিয়েছে শূন্যতা।

১০. **যুদ্ধংদেহী দৃষ্টিভঙ্গী :** এ দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মনোভাব যুদ্ধংদেহী। এখানে সবাই রাজা। কেউ প্রজা হতে চায় না। কেউ কাউকে মানতে চায় না। সবাই যেন সর্বদা এক অসুস্থ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত।

১১. **স্ববিরোধিতা ও বিরোধিতার খাতিরে বিরোধিতা করা :** বাংলাদেশ হচ্ছে স্ববিরোধিতার চ্যালেঞ্জে ভরা একটি দেশ। রাজনৈতিক দলের সন্ত্রাসীরা শ্লোগান দেয় হাতে অস্ত্র নিয়ে— 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়তে হবে একসাথে' অথবা 'অস্ত্র ছাড় কলম ধর, শিক্ষাজীবন রক্ষা কর' প্রভৃতি। অথচ চোখের সামনেই কোমরে গোঁজা পিস্তল বা চাদরের আড়ালে বেরিয়ে পড়া রাইফেলের বাট দেখা যাচ্ছে। অন্যদিকে, রাজনৈতিক দলগুলো বিরোধিতার খাতিরে বিরোধিতা করে চলেছে। তারা বিরোধীদের ভালোকে ভালো বলতে ভুলে গেছে।

১২. **শাসকগোষ্ঠীর দুর্বলতা :** বাংলাদেশের নির্ভরশীল শাসকশ্রেণী অথর্ব ও মেরুদণ্ডহীন। জনগণের স্বার্থে তাদের কোনোকিছুই করার ক্ষমতা নেই। কারণ তাদের রয়েছে অভ্যন্তরীণ ও বহিঃশক্তির চাপ। কোনো নীতি নির্ধারণে দাতাগোষ্ঠীর মতামতকে প্রাধান্য দিতে হয়। এজন্য ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতাহীনরা একের পর এক ভুয়া বা ফাঁকা ইস্যু নিয়ে পরস্পরের প্রতি কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি করে। তাদের প্রচারমাধ্যমগুলো এ নিয়েই ব্যাপকভাবে ঢেঁড়ি পেটায়। এ দিয়ে কেবল রাজনৈতিক আবহাওয়াই উত্তপ্ত হয়, জনগণের উপকারে কিছুই আসে না।

উপসংহার : বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে অভিজ্ঞমহল অভিহিত করেছেন খণ্ডিতরূপে। সুস্থ রাজনীতি চর্চার মাধ্যমে গড়ে উঠবে সুস্থ রাজনৈতিক সংস্কৃতি। দেশ ও জনতা আশাবাদী— গণতন্ত্রের বন্ধুর পথ যাত্রার মধ্য দিয়ে আমাদের সম্মিলিত লক্ষ্য নির্ধারিত হবে। কোটি কোটি মুক্তি উদ্বেল মানুষ 'যত মত তত পথের' মাঝেও খুঁজে পাবে অভীষ্ট গন্তব্য।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

০৫ ॥ স্বাধীনতা-উত্তর বিভিন্ন সময়ে কারা কিভাবে এ দেশে অবৈধ উপায়ে ক্ষমতা দখল করেছিল তা বর্ণনা করুন। ভবিষ্যতে এরূপ অসাংবিধানিক প্রক্রিয়া বন্ধের কার্যকর পদক্ষেপ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

উত্তর : বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের ইতিবৃত্তের অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে অবৈধ ক্ষমতা দখলের ঘৃণ্য প্রচেষ্টার অশুভ ছায়া। স্বাধীনতা পরবর্তীকালীন রাষ্ট্রযন্ত্র বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে ক্ষমতা লিপ্সু কিছু ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর অধীনে বারবার পিষ্ট হয়েছে, যা পরবর্তী রাজনৈতিক পটভূমিকে কলুষিত করেছে, বিঘ্নিত করেছে গণতান্ত্রিক চর্চাকে, কলঙ্কিত করেছে স্বাধীনতার চেতনা, যে চেতনা এ দেশের জনগণ লালন করে আসছে সযত্নে, সগর্বে। ১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধানের প্রাণকেন্দ্র ছিল সংসদীয় গণতন্ত্র। এ ব্যবস্থার স্নায়ুকেন্দ্র ছিল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান 'জাতীয় সংসদ'। কিন্তু ১৯৭৫ সালের প্রথম থেকেই বাংলাদেশের রাজনৈতিক মঞ্চে দ্রুত পট পরিবর্তিত হতে থাকে। তখনকার চলমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে স্নায়ুযুদ্ধের নেতিবাচক প্রভাব এসে পড়ে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে এবং রাজনৈতিক অঙ্গনে সামরিক হস্তক্ষেপের পথ প্রশস্ত হয়। বাংলাদেশও এ অশুভ প্রভাব থেকে রক্ষা পায়নি। এ দেশের রাষ্ট্র পরিচালনায় অবৈধ সামরিক হস্তক্ষেপ বা ক্ষমতা দখলের ঘৃণ্য প্রয়াস রাজনৈতিক ইতিহাসের বৃহৎ জায়গা দখল করে নিয়েছে।

স্বাধীনতার চেতনাকে লালন করে এ দেশে ১৯৭২ সালে রাষ্ট্র পরিচালনার সর্বোচ্চ দলিল হিসেবে সংবিধান প্রণয়ন করা হয়েছিল, যার মূলনীতি হিসেবে গণতন্ত্রের চর্চাকে ত্বরান্বিত করার শপথ নিয়েছিল রাষ্ট্রের কর্তাব্যক্তিরা। এমন একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা ছিল, যেখানে রাষ্ট্রের সার্বিক কার্যক্রমে জনগণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে, সকল জনমানুষের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও মতামতের ভিত্তিতে একটি স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবে। কিন্তু এ চেতনা বা আদর্শের মূলমন্ত্রকে উপেক্ষা করে কিছু ব্যক্তি বা গোষ্ঠী তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক, দলীয়, অর্থনৈতিক স্বার্থকে চরিতার্থ করার অভিপ্রায়ে সংবিধানের মৌলিক নীতিকে পায়ে ঠেলে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষমতাকে হস্তগত করেছে। আর এ প্রক্রিয়ার মূল ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল সামরিক বাহিনী। মূলত সংবিধানকে সুস্পষ্ট লঙ্ঘন করে যারা সামরিক ক্ষমতায় আসীন হয়েছিল তারাই অবৈধ ক্ষমতার দখলদার, গণতন্ত্রকে পদদলিত করে রুগ্নকরণের মূল খলনায়ক।

এ দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে অবৈধ উপায়ে ক্ষমতা দখলের ইতিহাস পর্যালোচনার পূর্বে যেটি প্রথমত আলোচনার দাবি রাখে, কোন কোন অবস্থান সামরিক বাহিনীর ক্ষমতায় আরোহণকে প্রলুব্ধ করেছিল বা সামরিক বাহিনীর বেসামরিক অঙ্গনে হস্তক্ষেপের শর্তগুলো বা কারণগুলো কি কি?

প্রথমত, সামরিক বাহিনীর সংগঠনে বিদ্যমান শৃঙ্খলা, পদসোপান, ঐক্যবদ্ধ নির্দেশ দান কাঠামো এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে ঐক্য এসবকিছুই সামরিক বাহিনীর শ্রেষ্ঠত্ব। ফলে, সামরিক বাহিনী সকল সুবিধার কারণে ঝটিকা বেগে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের কাজ সম্পন্ন করতে পারে।

দ্বিতীয়ত, প্রাতিষ্ঠানিক বা সামরিক বাহিনীর সার্বিক স্বার্থ সংরক্ষণই অধিকাংশ ক্ষেত্রে সামরিক বাহিনীকে ক্ষমতা দখলে উদ্বুদ্ধ করে।

তৃতীয়ত, রাজনৈতিক ব্যবস্থায় যদি অস্থিতিশীলতার লক্ষণ বিদ্যমান থাকে অথবা ক্ষমতাশূন্যতা বিরাজ করে অথবা ক্ষমতা প্রয়োগকারী গোষ্ঠীর জনপ্রিয়তা না থাকে তবেই সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখলে উদ্ধত হয়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

এ কারণগুলোর প্রেক্ষিতে, বিভিন্ন শাসন আমলে বাংলাদেশে সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপ বা অবৈধ ক্ষমতা দখলের কিছু কারণ সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন– সেনা ও সিভিলিয়ানদের মধ্যে দ্বন্দ্ব, প্রচুর অবৈধ অস্ত্র ও তার ব্যবহার, দেশী বিদেশী ষড়যন্ত্র, শাসন ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা, রাজনৈতিক দলগুলোর ক্ষমতার অপব্যবহার, বেসামরিক প্রশাসনের দুর্বলতা, সেনাবাহিনীর ক্ষমতার লোভ, বেসামরিক ক্ষমতার প্রতি অনাস্থা প্রভৃতি কারণ এবং তখনকার সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি অবৈধ উপায়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলকে উদ্বুদ্ধ করেছে।

স্বাধীনতা-উত্তর এ দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে এ যাবৎ চারটি সামরিক শক্তি অবৈধ উপায়ে ক্ষমতা দখল করেছে। নিচে তা আলোকপাত করা হলো :

১. **খন্দকার মোশতাক আহমেদের ক্ষমতা দখল :** ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয় এবং ১৫ আগস্ট ভোর রাতে সামরিক বাহিনীর বিপথগামী ২৫ জন মেজর ও ক্যাপ্টেনসহ প্রায় ১৫০০ সেনা সদস্য এক অভ্যুত্থান ঘটায়। মূলত একে অভ্যুত্থান বলা চলে না এ প্রেক্ষিতে যে, এর সাথে বাহিনীর প্রাতিষ্ঠানিক কোনো সংশ্রব বা যোগসূত্র ছিল না। কেননা, সামরিক বাহিনীতে চাকরিরত এবং বিভিন্ন অভিযোগে চাকরিচ্যুত পথভ্রষ্ট কিছু সেনা অফিসার এর সাথে যুক্ত ছিল। এই ষড়যন্ত্রের মূলে ছিল ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব বা ক্রোধ এবং বিদেশী শক্তির পর্দার অন্তরালের প্ররোচনা। এই তথাকথিত অভ্যুত্থানের মাধ্যমে খন্দকার মোশতাক আহমেদ ক্ষমতায় আসীন হয় আর বেসামরিক ব্যক্তির সামরিক প্রশাসক হিসেবে ২০ আগস্ট ১৯৭৫ থেকে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম সামরিক আইন কার্যকর করে তার অবৈধ ক্ষমতা দখলের ঐতিহাসিক নজির স্থাপন করেন।

২. **আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েমের ক্ষমতা দখল :** বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম ৮ নভেম্বর ১৯৭৫ এ জারিকৃত এক আদেশ বলে দেশে সামরিক আইন জারি করেন এবং নিজেকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে ঘোষণা করেন। আর এর মাধ্যমেই দেশের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলের ইতিহাসে দ্বিতীয়বারের মতো নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। অবশ্য এ ঘটনার নেপথ্যে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছিলেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ডেপুটি চিপ অব স্টাফ ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ। ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ ও তার অনুগত একটি গোষ্ঠী ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর একটি অতি অল্পকালীন উত্থান ঘটায় এবং তৎকালীন সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে বন্দি করে ক্ষমতা কব্জা করেন, পরপরই ৪ নভেম্বর নিজেকে সেনাপ্রধান ঘোষণা করেন। বঙ্গভবনে খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে কতিপয় সেনা অফিসার গৃহবন্দি খন্দকার মোশতাককে দিয়ে ঘোষণা জারি করান যে, ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফকে মেজর জেনারেল পদে উন্নীত করে সেনাপ্রধানের পদে নিয়োগ দান করা হয়েছে। খালেদ মোশাররফ তার নীল নকশা বাস্তবায়নে বঙ্গভবনে একটি নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন। কিন্তু তখনকার একটি বিশেষ মহলের নিকট তার কার্যক্রম আওয়ামী লীগকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার চক্রান্ত বলে বিবেচিত হয় এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া আরও তীব্রতর হয়। তাছাড়া খালেদ মোশাররফের পক্ষে তার পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী কোনো আওয়ামী লীগ নেতাকে প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত করা কঠিন হয়ে পড়ে। অতঃপর তিনি তার অবস্থান থেকে পিছু হটে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এ.এস.এম. সায়েমকে প্রেসিডেন্ট পদে আসীন

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

করেন। খালেদ মোশাররফ ও তার অনুসৃত সেনা অফিসারদের অব্যাহত চাপে অবশেষে ৫ নভেম্বর এক ঘোষণায় প্রেসিডেন্ট মোহম্মদ মোশতাক আহমেদ তার দায়িত্বভার হস্তান্তরের ইচ্ছা পোষণ করেন। বিচারপতি এ. এস. এম সায়েম প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করেন ৬ নভেম্বর। আর এভাবেই দ্বিতীয় সামরিক সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করে।

৩. **মেজর জেনারেল জিয়ার ক্ষমতা দখল :** সেনাপ্রধান খালেদ মোশাররফের একচেটিয়া ক্ষমতার অপব্যবহারকে কিছু সেনা কর্মকর্তা মেনে নেননি, যার মধ্যে কর্নেল তাহের অন্যতম এবং এ গোষ্ঠী ৬ নভেম্বর গৃহবন্দি মেজর জিয়াকে উদ্ধার করে। ঐ রাতেই খালেদ মোশাররফসহ আরো তিনজন সেনা কর্মকর্তা বিরোধী সেনাসদস্যদের হাতে নিহত হন। ৬ নভেম্বর রাতে জেনারেল জিয়াউর রহমান সংক্ষিপ্ত বেতার ভাষণে সকল সংকটের অবসানের ঘোষণা দেন। ৭ নভেম্বর ১৯৭৫ সেনা সদস্য বা সিপাহীরা বিজয়োল্লাস করতে করতে রাস্তায় নেমে পড়ে। পরবর্তীতে ২৯ নভেম্বর ১৯৭৬ জিয়াউর রহমান তার পূর্বসূরিদের পথ অবলম্বনে সামরিক আইন জারি করেন এবং প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের ক্ষমতা গ্রহণ করেন এবং ৬ এপ্রিল ১৯৭৯ পর্যন্ত তা বলবৎ থাকে। ১৯৭৮ সালে ৩ জুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে জিয়াউর রহমান ৭৬.৬৩ ভাগ ভোটে জয়ী হন। মূলত সামরিক শাসনাধীনে অনুষ্ঠিত অসম নির্বাচনে প্রধানত সরকারি নীল নকশার বাস্তবায়ন ঘটে। আবার ১৯৭৯-এর ১৮ ফেব্রুয়ারি জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে ২০৭টি আসন পেয়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল জয়লাভ করে। কিন্তু নির্বাচনের ফলাফল ভোটারদের ইচ্ছার প্রতিফলন বলা ঠিক নয়। কেননা, সামরিক শাসনকে বৈধতা দানের প্রয়োজন থেকেই ফলাফল এভাবে সাজানো ছিল সে সময়ের রীতি। যা হোক ২ এপ্রিল নির্বাচিত সরকারের প্রথম অধিবেশন ও ৬ এপ্রিল সামরিক শাসন প্রত্যাহার করা হয় এবং পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে তার ক্ষমতা গ্রহণকে বৈধতা দানের চেষ্টা করেন।

৪. **লে. জেনারেল এরশাদের ক্ষমতা দখল :** জিয়াউর রহমান নিহত হওয়ার পর ভাইস প্রেসিডেন্ট আব্দুস সাত্তার সংবিধানের ষষ্ঠ সংশোধনীর মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত হয়ে কিছুকাল দেশ পরিচালনা করেন। ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এরশাদ এক রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সাত্তার সরকারকে অপসারিত করে ক্ষমতা দখল করেন। ১৯৮২ সালে চতুর্থ বারের মতো সামরিক আইন জারি করা হয় এবং ১৯৮৬ সালের ১০ নভেম্বর পর্যন্ত সামরিক আইন কার্যকর থাকে। তিনিও লোক দেখানো নির্বাচনের ব্যবস্থা করে প্রহসনমূলক একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থার জন্ম দেন সংবিধানকে স্থগিত রেখে।

অসাংবিধানিক প্রক্রিয়া বন্ধের কার্যকর পদক্ষেপ : এ ধরনের অসাংবিধানিক প্রক্রিয়া, বন্ধের জন্য যেসব কার্যকর পদক্ষেপ ফলপ্রসূ হতে পারে, নিচে সেগুলো আলোচনা করা হলো :

১. **সুষ্ঠ রাজনৈতিক সংস্কৃতিচর্চার পরিবেশ তৈরি করা :** এ দেশের স্বাধীনতার প্রায় চার দশক পরেও গণতান্ত্রিক চেতনার যে পরিপূর্ণরূপ বা রাজনৈতিক কার্যক্রমের যে প্রশংসনীয় রূপ সেটি খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক দলকেই বৃহত্তর ও জাতীয় স্বার্থে ঐকমত্যে পৌঁছাবার সংস্কৃতির চর্চা করতে হবে। তা হলেই রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা তৈরি হবে, যেটি সেনাবাহিনী বা অন্য কোনো মহলকে অবৈধ ক্ষমতা দখলের সুযোগ তৈরি করে দেবে না বা একটি প্রতিরোধক অবস্থা তৈরি হবে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

২. **প্রশাসনিক ক্ষমতা কাঠামোর সংস্কার :** আমাদের দেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পদ্ধতি অনেকটা দলীয় নীতির আওতায়। অর্থাৎ সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকারি দলের পক্ষের কোনো ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। দেশের সর্বোচ্চ পদের ব্যক্তিকে নির্দলীয় বা নিরপেক্ষতা রক্ষা করে চলার জন্য তার নির্বাচন পদ্ধতির সংস্কার দরকার। তাহলে সকল দলের প্রতি তার কার্যক্রমের জবাবদিহিতা বাড়বে এবং বিভিন্ন সমন্বয় জারিকৃত জরুরি অবস্থার মাধ্যমে জনগণের মৌলিক অধিকার মুখ থুবড়ে পড়বে না।

৩. **সামরিক ও বেসামরিক সম্পর্ক :** পর্দার অন্তরালে থেকে উন্নয়নশীল বিশ্বের মতো আমাদের দেশেও সামরিক বাহিনী সরকারের ওপর অনেক বেশি চাপ প্রয়োগ করতে সুযোগ পায়, যেটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে। তাই সামরিক বাহিনীর সাথে একটি চেক অ্যান্ড ব্যালান্স সম্পর্ক থাকা দরকার, যার মাধ্যমে সেনাবাহিনীর অসাংবিধানিক কার্যক্রমের অভিপ্রায়কে প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে।

৪. **সংসদ কার্যকর করা :** সরকার ও বিরোধী দল—দুটি দলকেই গণতান্ত্রিক আদর্শের জায়গাতে একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে পতিত হতে হবে, যাতে সংসদ অনেক বেশি গণতান্ত্রিক, কার্যকর ও জনগণের প্রত্যাশা উত্থাপনের জায়গা হয়ে উঠতে পারে।

৫. **বিচারের সম্মুখীন করা :** এ পর্যন্ত অনেকবার এ পবিত্র সংবিধানকে সুস্পষ্টভাবে লঙ্ঘনের মাধ্যমে এর পবিত্রতা এবং মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করা হয়েছে। যারা এ অসাংবিধানিক কার্যক্রমের সাথে যুক্ত তাদেরকে বিচারের সম্মুখীন করা সম্ভব হলে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে না।

৬. **রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি :** তৃণমূল পর্যায় থেকে রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি হলেই কেবল জবাবদিহিতার ক্ষেত্রগুলো তৈরি হবে। সর্বোপরি, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালীকরণ, সুস্থ রাজনৈতিক সংস্কৃতির চর্চা, সঠিক নেতৃত্বের সংকট উত্তরণ, জনগণের অংশগ্রহণ, অর্থনৈতিক কাঠামোর সংস্কার, দুর্নীতিরোধ, বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালীকরণ, বিচার বিভাগের প্রকৃত স্বাধীনতা নিশ্চিত করা প্রভৃতির মাধ্যমেই কেবল এ ধরনের অসাংবিধানিক ক্ষমতা দখলের অশুভ ছোবল থেকে আমরা বের হয়ে আসতে পারবো।

উপসংহার : ১৯৭১ সালের স্বাধীনতার পর বিগত প্রায় চার দশকে আমাদের সংবিধানকে উপেক্ষা করে বিভিন্ন ব্যক্তি অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করেছে এবং আমাদের গণতান্ত্রিক চেতনাকে বার বার গলাটিপে হত্যা করার হীন প্রয়াস পেয়েছে, যা মোটেও কাম্য ছিল না। আজ গণতন্ত্রের পথে যাত্রা করার একটি সুন্দর সময় এসেছে, যদি এ গণতন্ত্র রক্ষা করতে, সংবিধানের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে হয়, তবে অবশ্যই যেটি অপরিহার্য তা হলো, দেশের গণতান্ত্রিক ও রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে গণতান্ত্রিকীকরণের আওতায় আনতে হবে, তবেই গণতন্ত্র রক্ষা পাবে, দেশ হায়নার হাত থেকে মুক্ত হয়ে গণতন্ত্রের মূর্ত প্রতীক হয়ে উঠবে।

০৬ ॥ জোট রাজনীতি কি? বাংলাদেশে জোট রাজনীতির বৈশিষ্ট্যাবলি বর্ণনা করুন।

উত্তর : বাংলাদেশে বর্তমানে ৪১টি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল রয়েছে। প্রতিটি দলেরই আলাদা আদর্শ ও নীতি রয়েছে। কিন্তু দেশের অধিকাংশ রাজনৈতিক দলগুলোই দুটি রাজনৈতিক জোটে আজ বিভক্ত। শুধু বাংলাদেশ নয় বিশ্বের অনেক দেশেই জোট রাজনীতি বা কোয়ালিশন সরকার ব্যবস্থা চালু রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের জোট রাজনীতি পৃথিবীর অন্যান্য দেশের জোট রাজনীতির তুলনায় নানা দিক থেকে ভিন্ন প্রকৃতির। স্বাধীনতার পরে কয়েকবার রাজনৈতিক দলের ঐক্যফ্রন্ট গঠন করা হলেও মূলত ৯০ দশকের পর থেকে বাংলাদেশে জোট রাজনীতি জোড়ালোভাবে প্রকাশ পেতে থাকে। বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে একটি জোট এবং দেশের অন্যতম বৃহৎ রাজনৈতিক দল বিএনপির নেতৃত্বে আরেকটি জোট বাংলাদেশের রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ ও পর্যায়ক্রমে সরকার গঠন করে আসছে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

এ দেশের মানুষের অধিকার রক্ষায় ও জনকল্যাণে রাজনৈতিক দলসমূহের ভূমিকা এবং পরবর্তীতে জোট রাজনীতির ভূমিকা নিয়ে রয়েছে নানা রকম বিশ্লেষণ। নিচে বাংলাদেশে জোট রাজনীতির পরিচয় ও বৈশিষ্ট্যসমূহ তুলে ধরা হলো :

জোট রাজনীতি ও বাংলাদেশ : একাধিক রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গঠিত হয় রাজনৈতিক জোট। সাধারণত নির্বাচনকে সামনে রেখে ক্ষমতাসীন দলকে মোকাবিলায় বিরোধী দলগুলোর জোটবদ্ধ আন্দোলন এবং অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ক্ষমতায় যাওয়ার লক্ষ্যে গঠিত হয় জোট রাজনীতি। আবার অনেক সময় নির্বাচনে কোনো দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলে সরকার গঠনের জন্য কয়েকটি রাজনৈতিক দল জোট গঠন করতে পারে। তখন ঐ সরকারকে বলা হয় কোয়ালিশন সরকার বা জোট সরকার। কোয়ালিশন সরকার ও জোট রাজনীতি এক নয়। সাধারণত পৃথিবীর অন্যান্য দেশে নির্বাচন পরবর্তী সরকার গঠনের ক্ষেত্রে জোট রাজনীতি লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচনের পূর্বে জোট রাজনীতির কার্যক্রম বেশ লক্ষণীয়। বাংলাদেশের জোট রাজনীতির প্রচলন বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে যুক্তিযুক্ত মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে জোট রাজনীতি বাংলাদেশের জনগণের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারেনি। এটির দ্বারা কেবল ক্ষমতার পালাবদল হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে দুটি প্রধান রাজনৈতিক জোট রয়েছে। একটি হলো মহাজোট বা ১৪ দলীয় জোট যা ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গঠিত এবং অন্যটি বিএনপির নেতৃত্বে ২০ দলীয় জোট। জোট রাজনীতি বাংলাদেশের ইতিহাসে নতুন কিছু নয়। বাংলাদেশের গত ৪৪ বছরের রাজনীতিতে জোটের রাজনীতি প্রথম দিকে গুরুত্ব না পেলেও ১৯৯০ সালের গণঅভ্যুত্থান ও ৯১ সালে পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর থেকেই এ জোট রাজনীতির গুরুত্ব পেয়েছে বেশি।

শুরুটা হয়েছিল ১৯৭৩ সালে। দেশের প্রথম জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সরকার গঠন হয়। একই বছরের অক্টোবরে তৎকালীন সরকারের ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ অন্য দুটি দল ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ও সিপিবিকে নিয়ে 'গণ ঐক্যজোট' নামে একটি রাজনৈতিক জোট তৈরি করে। যা পরবর্তীতে সম্প্রসারিত হয়ে বাকশালে রূপ নেয়। তারপর ১৯৭৯ সালে দ্বিতীয় সংসদ নির্বাচনে মুসলিম লীগ ও ইসলামী ডেমোক্রেটিক লীগের সমন্বয়ে রাজনৈতিক জোট গঠন হলেও পরবর্তীতে তা কোনোরূপ প্রভাব বিস্তার ছাড়াই ভেঙ্গে যায়। ১৯৯১ ও ১৯৯৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার আগে ও পরে জোটের উপস্থিতি কিছুটা লক্ষণীয় ছিল। কিন্তু ২০০১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন থেকে জোট রাজনীতি আরো সক্রিয় হয়ে উঠে। বিএনপির নেতৃত্বে গঠিত হয় চারদলীয় ঐক্যজোট। নির্বাচনে ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে (৩০০টির মধ্যে ২১৬টি আসন) বিএনপির নেতৃত্বে জোট সরকার গঠিত হয়। ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আবারো দৃশ্যপট পাল্টে যায়। চারদলীয় জোট জোটবদ্ধভাবে নির্বাচন করে বিজয়ী হয় মাত্র ৩৩ আসনে ও ১টি স্বতন্ত্র আসন ছাড়া বাকি সব আসনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট বা ১৪ দলীয় জোট বিজয়ী হয়। দেশের ৪১টি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের মধ্যে—৩৪টি দল-ই বর্তমানে দুটি রাজনৈতিক জোটে বিভক্ত।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

বাংলাদেশে জোট রাজনীতির বৈশিষ্ট্য : বাংলাদেশের জোট রাজনীতিতে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ লক্ষ্য করা যায়।

১. **মধ্য বামপন্থি ও মধ্য ডানপন্থি ভাবধারার জোট :** বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে যে ১৪ দলীয় জোটটি রয়েছে সেটির অধিকাংশ দলই বামপন্থি ভিত্তিক। আওয়ামী লীগ নিজে ধর্ম নিরপেক্ষ দল হিসেবে পরিচিত। তবে মার্কসবাদী সমাজতন্ত্রকেও দলটি পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করেনি। ফলশ্রুতিতে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে জোটটি বামঘেষা রাজনীতি করে। অন্যদিকে বিএনপির নেতৃত্বে ২০ দলীয় যে জোটটি রয়েছে সেখানে কিছু ইসলামপন্থি দল রয়েছে। তাছাড়া বিএনপি ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শে বিশ্বাসী নয়। আবার কট্টর ডানপন্থি ভাবাদর্শনও লালন পালন করে না। ফলে এই জোটটি মধ্য ডানপন্থি হিসেবে পরিচিত।

২. **জোটের রাজনীতি দুটি দলকেন্দ্রিক :** বাংলাদেশে জোটের রাজনীতি দুটি প্রধান রাজনৈতিক দলকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হচ্ছে। ১৯৯১ সালে বিএনপি জামায়াতকে সাথে নিয়ে জোট সরকার গঠন করেছিল।

সেখানে আওয়ামী লীগ ন্যাপ ও সিপিবিকে সাথে নিয়ে জোটবদ্ধভাবে নির্বাচন করেছিল। আবার ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টিকে সাথে নিয়ে জোট সরকার গঠন করে। যেখানে বিএনপি ও জামায়াত পৃথকভাবে নির্বাচন করে। ২০০১ সালে বিএনপির নেতৃত্বে ৪ দলীয় জোট ক্ষমতায় আসে। কিন্তু ২০০৮ সালে আবারো দৃশ্যপট পাল্টে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মহাজোট ক্ষমতায় আসে এবং ৪ দলীয় জোটের ভরাডুবি হয়। বর্তমানে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের জোটটি ১৪ দলীয় জোট ও বিএনপির নেতৃত্বের জোটটি ২০ দলীয়। সুতরাং পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি উভয় দলই বাংলাদেশের জোট রাজনীতির নেতৃত্ব দিয়ে আসছে।

৩. **নির্বাচন কেন্দ্রিক :** এ দেশের বর্তমান জোট রাজনীতি কেবল নির্বাচন কেন্দ্রিক। নির্বাচনের পূর্বেই জোটবদ্ধ হয়ে রাজনৈতিক দলগুলো আন্দোলন করে। নির্বাচনের পরে এদেশে জোট গঠন হয়েছে কমই। যা অন্যান্য দেশের জোট রাজনীতির সাথে আমাদের দেশের জোট রাজনীতিকে পৃথক করে রেখেছে। ফলে জোট রাজনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে নাগরিকদের মধ্যে সংশয় দেখা দেয়।

৪. **আদর্শহীন রাজনীতি :** এ দেশের জোট রাজনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো আদর্শহীন রাজনীতি। প্রতিটি রাজনৈতিক দলেরই পৃথক পৃথক দলীয় নীতি ও রাজনৈতিক এজেন্ডা থাকে। কিন্তু জোটবদ্ধ হয়ে রাজনীতি করলে দলীয় আদর্শ বজায় থাকে না। অথচ রাজনৈতিক দল গঠিত হয় নীতি ও আদর্শকে ভর করে। জনগণ যাদের নীতি ও আদর্শকে পছন্দ করবে, সেই দলগুলোই জনগণ কর্তৃক সমর্থন পাবে। কিন্তু জোট গঠন করলে জনগণের অপছন্দের প্রার্থীরাও নির্বাচিত হয়ে যায়। ফলে জোটবদ্ধ রাজনৈতিক দলগুলোর দ্বারা কেবল ক্ষমতার স্বাদ নেয়ার ভাবধারাই প্রকাশ পায়। নিজ দলের আদর্শ ও নীতির আলোকে জনসাধারণের কল্যাণ কিংবা জনগণের পছন্দের প্রার্থীর মূল্যায়ন প্রকাশ পায় না।

৫. **নামসর্বস্ব :** জোটবদ্ধ রাজনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এর অধিকাংশ দলগুলোই নাম সর্বস্ব। শুধু মিডিয়া কাভারেজের জন্য, এলাকায় জনভিত্তি নেই শুধু ঢাকায় একটি দলীয় অফিস রয়েছে, দেশের অন্য কোথায়ও নেই, থাকলেও নগন্য, লোকজনে চেনে না জানে না এমন অনেকগুলো দল রয়েছে যারা জোটের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং অনেক সময় একে রাজনৈতিক জোট না বলে বরং এটাকে রাজনৈতিক জটও বলা চলে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৬. **বহুদলীয় গণতন্ত্রের অনুপস্থিতি :** গণতান্ত্রিক দেশে বহুদলীয় গণতন্ত্রের উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়। কিন্তু আমাদের দেশে অধিকাংশ রাজনৈতিক দলগুলো কেবল দুটি জোটে বিভক্ত হওয়ায় এবং নিজ দলের আদর্শ ও নীতিকে বিসর্জন দেয়ায় কার্যত দেশে বহুদলীয় গণতন্ত্র নেই বরং বলা চলে দ্বি-দলীয় গণতন্ত্র।

৭. **ক্ষমতার লিপ্সা :** বড় দলগুলো ক্ষমতায় যাওয়ার সম্ভাবনা রাখে কিন্তু ছোট দলগুলোর ক্ষমতায় যাওয়ার সম্ভাবনা না থাকায় তারাও ক্ষমতার স্বাদ নিতে কোনোভাবেই পিছিয়ে থাকে না। ফলে দলীয় আদর্শ ও নীতিকে বাদ দিয়ে তারা জোটে শরীক হয়। ফলে রাজনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সাথে জনগণও তাদের দেশের আদর্শ প্রতিনিধি পায় না।

৮. **তোষামোদি করা :** জোটবদ্ধ হওয়ার পরে বড় দলগুলোর নিকট ছোট দলগুলো বিক্রি হয়ে যায়। ক্ষমতা ও রাজনৈতিক বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা নিতে তারা বড় রাজনৈতিক দলকে তোষামোদি শুরু করে এবং বৃহৎ দলের সকল অন্যায় আচরণকে তারা মেনে নেয়।

৯. **ক্ষমতার ভারসাম্যের অভাব :** জোটবদ্ধ রাজনীতির কারণে জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হয় না। যে জোট-ই ক্ষমতায় আসে তারা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে আসে। ফলে যে কোনো সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রে বিরোধী দলকে তোয়াক্কা করতে হয় না। গত দুটি জাতীয় নির্বাচনে যথা-অষ্টম ও নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তাই দেখা গিয়েছে। ২০০১ সালে অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির নেতৃত্বাধীন ৪ দলীয় জোট নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসে।

অনুরূপভাবে ২০০৮ সালে বাংলাদেশের নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৬৫টিরও বেশি আসনে বিজয়ী হয়ে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করে। যা কেবল জোট রাজনীতির দ্বারা ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতাকেই প্রকাশ করে।

১০. **আতাতের রাজনীতি :** জোটবদ্ধ রাজনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো আদর্শের দিক থেকে না মিললেও কেবল রাজনৈতিক হীন স্বার্থে শত্রুকে বন্ধু মনে করা। ক্ষমতা অর্জনের জন্য যদি আতাতের রাজনীতি করতে হয় জোট রাজনীতি তাও শিক্ষা দেয়। আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টির রাজনীতির আদর্শের কোনো মিল নেই অথচ বহুদিন ধরে তারা রাজনৈতিক জোট। তেমনি জামায়াত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তি হিসেবে পরিচিত অথচ বিএনপি তাদের সাথে দীর্ঘদিন ধরে জোট করে আসছে।

উপসংহার : জোট রাজনীতি পৃথিবীর বহু দেশে রয়েছে। সাধারণত অন্যান্য দেশে নির্বাচনের পরে সরকার গঠনের ক্ষেত্রে জোট রাজনীতির উপস্থিতি বেশি লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু আমাদের দেশে নির্বাচনের পূর্বেই জোট রাজনীতি বেশি লক্ষণীয়। জোট রাজনীতি এদেশের মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তি কতটুকু দিয়েছে নাকি এটি রাজনৈতিক দলসমূহের দেউলিয়াত্ব প্রকাশ করে তা নিয়ে যথেষ্ট আলোচনার দাবি রাখে। তবে এতটুকু বলা যায় রাজনীতি বাংলাদেশে ক্ষমতা বদলের অন্যতম হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছে কিন্তু গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় এটি রাজনৈতিক দলসমূহের দেউলিয়াত্ব ও দুর্বলতাই প্রকাশ করেছে। গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রায় শুধু ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য নির্বাচন পূর্ব জোট রাজনীতি সমর্থন পেতে পারে না।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

০৭। কোয়ালিশন সরকার বলতে কি বুঝায়? বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকট দূরীকরণে কোয়ালিশন সরকারের গঠন নিয়ে আপনার মতামত উপস্থাপন করুন।

উত্তর : কোয়ালিশন সরকার হলো সমঝোতার ভিত্তিতে কয়েকটি রাজনৈতিক দলের সম্মিলিত সরকার। অনেক সময় কোয়ালিশন সরকারের জোট সরকার বা মৈত্রী সরকারও বলা হয়। সাধারণত সাধারণ নির্বাচনে যখন কোনো রাজনৈতিক দল এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পায় তখন দুই বা ততোধিক রাজনৈতিক দলের মধ্যে সমঝোতার ভিত্তিতে যে সরকার গঠন হয় সে সরকারকে কোয়ালিশন সরকার বলে, আবার এর ব্যতিক্রমও আছে। অনেক সময় কোনো রাজনৈতিক দল এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েও সরকার গঠন করতে ব্যর্থ হয়। তখন দেশের সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় বিরোধী দল কিংবা অন্যান্য রাজনৈতিক দলকে সাথে নিয়ে সরকার গঠন করলে সেটিকেও কোয়ালিশন সরকার বলা হয়। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বহুদেশে কোয়ালিশন সরকার গঠনের নজির রয়েছে।

কোয়ালিশন সরকার কি : কোয়ালিশন সরকারের ইংরেজি রূপ হলো Coalition Government. ইংরেজি শব্দ Coalition এর অর্থ হলো– নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য গঠিত একটি অস্থায়ী গ্রুপ বা একাধিক দলের অস্থায়ী মৈত্রী। আর Government এর অর্থ হলো সরকার। সুতরাং Coalition Government হলো নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য একাধিক রাজনৈতিক দলের অস্থায়ী মৈত্রী সরকার।

Mac Willan Dictionary মতে, কোয়ালিশন সরকার হলো বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে একটি অস্থায়ী মৈত্রী যারা যৌথভাবে একটি সরকার গঠনে সম্মত থাকে।

Collins Dictionary মতে, কোয়ালিশন সরকার হলো এমন একটি সরকার যে সরকারে দুই বা ততোধিক রাজনৈতিক দলের অন্তর্ভুক্তি থাকে। কিন্তু প্রায়োগিক অর্থে কোয়ালিশন সরকার তখনই গঠন হয় যখন সাধারণ নির্বাচনে কোনো দল এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে ব্যর্থ হয় অথবা সার্বিক শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করা সত্ত্বেও বিরোধী দল কিংবা অন্যান্য রাজনৈতিক দল কিংবা বিরোধী দলসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মধ্যে সরকার গঠনে সমঝোতা সৃষ্টি হয়। তবে গুণগত বিচারে রাজনৈতিক দলগুলো জোটবদ্ধভাবে নির্বাচন করে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সম্মিলিত সরকার গঠন করলে সে সরকারকে কোয়ালিশন সরকার বলা যায় না বরং জোট সরকার বলা যায়। সুতরাং সব জোট সরকার-ই কোয়ালিশন সরকার নয় বরং সব কোয়ালিশন সরকার-ই জোট সরকার।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কোয়ালিশন সরকার : বর্তমানে পৃথিবীর বহুদেশে কোয়ালিশন সরকার ক্ষমতাসীন রয়েছে। অতীতেও অনেক অনেক দেশে কোয়ালিশন সরকার ক্ষমতায় ছিল। তাই কোয়ালিশন সরকার বিষয়টি নতুন কিছু নয়।

বর্তমানে যুক্তরাজ্য, বেলজিয়াম, জার্মানি, গ্রীস, আফগানিস্তান, মালয়েশিয়া, লেবানন, ইরাক, অস্ট্রিয়াসহ প্রভৃতি দেশে কোয়ালিশন সরকার ক্ষমতায় রয়েছে।

যুক্তরাজ্যের সর্বশেষ নির্বাচনে কোন একক দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন না করায় কনজারভেটিভ পার্টির সাথে লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির সমঝোতার ভিত্তিতে কোয়ালিশন সরকার গঠন হয়েছে। যার প্রধানমন্ত্রী হলেন কনজারভেটিভ পার্টির প্রধান ডেভিড ক্যামেরুন ও উপ-প্রধানমন্ত্রী হলেন লিবারেল ডেমোক্রেটিক দলের প্রধান নিক ক্লেগ।

অন্যদিকে ২০১৪ সালে আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রথম দফায় কোনো প্রার্থী সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট না পাওয়ায় দ্বিতীয় দফা নির্বাচনে আশরাফ ঘানি সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলে সে দেশের নির্বাচন

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

কমিশন আশরাফ ঘানিকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত ঘোষণা করে। কিন্তু অপর প্রার্থী আব্দুল্লাহ আব্দুল্লাহ নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ এনে ফলাফল প্রত্যাখ্যান করলে আফগানিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। ফলশ্রুতিতে সংকট দূরীভূতে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন কেরির মধ্যস্থতায় এই দুই প্রার্থীর মধ্যে সমঝোতার মাধ্যমে জাতীয় ঐক্য সরকার বা কোয়ালিশন সরকার গঠন হয়।

সমঝোতা অনুযায়ী কোয়ালিশন সরকারের প্রেসিডেন্ট হন আশরাফ ঘানি ও প্রধানমন্ত্রির পদমর্যাদায় (CEO) পদে নিযুক্ত হন আব্দুল্লাহ আব্দুল্লাহ। তেমনিভাবে সর্বশেষ নির্বাচনগুলোতে জার্মানি, ইসরাইল, ভারত, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশে নির্বাচনের পূর্বেই রাজনৈতিক জোট গঠন করে নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের মাধ্যমে জোট সরকার বা ঐক্য সরকার গঠন করে।

বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে কোয়ালিশন সরকার : বাংলাদেশেও বিগত সময়ে একাধিকবার কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়েছে। ১৯৭৩ সালের মার্চ মাসে বাংলাদেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৩০০টি আসনের বিপরীতে ২৯২টি আসনেই বিজয়ী হয়। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সরকার গঠিত হওয়ার পরপরই আওয়ামী লীগ, ন্যাপ ও সিপিবি মিলে একটি ত্রিদলীয় ঐক্যজোট গঠিত হয়। তৎকালীন সময়ে আওয়ামী লীগের হাতে রাষ্ট্রপরিচালনার সর্বময় বৈধ ক্ষমতা থাকার পরেও দেশকে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ বিরোধী দলগুলোকে নিয়ে ঐক্য আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করে।

কিন্তু তা এক সময় জাতীয় সরকার তথা বাকশাল সরকারে রূপান্তর হলে বিভিন্নভাবে এ সরকারের গঠন নিয়ে আলোচনা ও সমালোচনা তৈরি হয়। তারপর ১৯৭৯ সালের জাতীয় নির্বাচনে বিএনপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে এককভাবে সরকার গঠন করে। দৃশ্যমান অর্থে কোয়ালিশন সরকার বাংলাদেশে গঠিত হয় ১৯৯১ ও ১৯৯৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে। ১৯৯১ সালের পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি ১৪১টি আসনে, আওয়ামী লীগ ৮৮টি আসনে, জাতীয় পার্টি ৩৫টি আসনে ও জামায়াতে ইসলামি ১৮টি আসনে বিজয়ী হয়। ন্যূনতম ১৫১টি আসন কোনো দল-ই না পাওয়ায় কোয়ালিশন সরকার গঠন অবধারিত ছিল। ফলে ঐ পরিস্থিতিতে সর্বোচ্চ (১৪১টি) আসন প্রাপ্ত বিএনপি জামাতে ইসলামি (১৮টি আসন প্রাপ্ত) কে সাথে নিয়ে গুণগত দিক বিবেচনায় দেশের প্রথম কোয়ালিশন সরকার গঠন করে তেমনি ১৯৯৬ সালের সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সর্বোচ্চ ১৪৬টি আসনে বিজয়ী হয়। পক্ষান্তরে বিএনপি ১১৬টি, জাতীয় পার্টি ৩২টি ও জামাতে ইসলামি ৩টি আসনে বিজয়ী হয়। আওয়ামী লীগের সাথে জাতীয় পার্টির সুসম্পর্ক থাকায় তৎকালীন সময়ে জাতীয় পার্টিকে সাথে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন কোয়ালিশন সরকার গঠন হয়। পরবর্তীতে ২০০১ সালের অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ও বিএনপির নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট ও ২০০৮ সালের নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট ক্ষমতায় আরোহণ করে জোট সরকার গঠন করলেও প্রকৃত অর্থে তা কোয়ালিশন সরকার নয়।

কোয়ালিশন সরকার সাধারণত দুটি প্রেক্ষাপটে গঠিত হয়। তন্মধ্যে একটি হলো যখন কোনো দল সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী হতে ব্যর্থ হয়। অর্থাৎ সরকার গঠনে প্রয়োজনীয় সংখ্যক আসনে কোনো দল বিজয়ী না হলে অন্য এক বা একাধিক রাজনৈতিক দলের সাথে সমঝোতার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় আসন নিশ্চিত করে কোয়ালিশন সরকার গঠন করা যায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় বাংলাদেশে ৩০০টি সংসদীয় আসন রয়েছে। কোনো দলের জন্য এখানে সরকার গঠন করতে হলে ন্যূনতম ১৫১টি আসনে বিজয়ী হতে হয়। কোনো দল ১৫১টি আসনে জয়ী না হলে অপর দলের সাথে জোট

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

করে যদি ১৫১টি আসন নিশ্চিত করে সরকার গঠন করে তাহলে ঐ সরকারকে কোয়ালিশন সরকার বলা যাবে। কোয়ালিশন সরকার গঠনের অন্য পদ্ধতিটি হলো দেশের কোনো অদ্ভুত পরিস্থিতিতে অথবা জাতীয় সার্বিক শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর সমন্বয়ে কোয়ালিশন বা সম্মিলিত সরকার গঠন। কোয়ালিশন সরকার গঠনের প্রথম পদ্ধতিটি বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অনেক দেশেই বিদ্যমান ছিল বা আছে। কিন্তু দ্বিতীয় পদ্ধতিটি যুদ্ধ-বিধ্বস্ত, রাজনৈতিক গোলযোগপূর্ণ, অরাজক পরিস্থিতিতে কোনো দেশে সাময়িক সময়ের জন্য কার্যকর হওয়াটা মঙ্গলজনক হতে পারে। কোয়ালিশন সরকার মূলত একটি অস্থায়ী সরকার। বিশেষ প্রেক্ষাপট বিবেচনায় কোয়ালিশন সরকার একটি সমাধান হতে পারে। বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে (মার্চ ২০১৫ শেষে) কোয়ালিশন সরকার গঠনের তেমন আবশ্যকতা দেখছি না। কেননা একদিকে যেমন বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিবেশ শান্ত হয়ে আসছে, অন্যদিকে ৫ জানুয়ারি ২০১৫ পরবর্তী সময়ে যে অরাজকতা দেশজুড়ে চলছে কোয়ালিশন সরকার গঠন করলেই তার সমাধান সম্ভব তেমনটা আশা করা যায় না। বরং রাজনৈতিক পরিবেশ উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন সরকারি দলের সহিষ্ণুতা দেখানো এবং বিরোধী দলসমূহের উচিত সহিংসতা পরিহার করা। এছাড়া সরকারি ও বিরোধী দলগুলোর মধ্যকার গঠনমূলক আলোচনাও বাংলাদেশের বর্তমান অচল অবস্থা নিরসন ও গণতান্ত্রিক উন্নয়নে জোর ভূমিকা রাখতে পারে।

উপসংহার : কোয়ালিশন সরকার হলো এমন একটি সরকার, রাষ্ট্র পরিচালনায় যে সরকারে একাধিক রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ থাকে। সাধারণত নির্বাচনের পরবর্তী সময়ে কোনো তৃতীয় বা চতুর্থ দলের সাথে সমঝোতার মাধ্যমে বৃহৎ দলের কোয়ালিশন সরকার গঠন হয়। বাংলাদেশে প্রকৃত অর্থে কোয়ালিশন সরকার গঠন হয়েছিল ১৯৯১ সালে পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পরে এবং ১৯৯৬ সালে সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরবর্তী সময়ে। ২০০১ সাল ও ২০০৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পরেও কোয়ালিশন সরকার গঠন হয়েছিল। কিন্তু তা ছিল কেবল আক্ষরিক অর্থেই। সংবিধানের আলোকে অনেক সময় সরকার গঠনের ক্ষেত্রে কয়েকটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে কোয়ালিশন করা আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়। আবার বিশেষ প্রেক্ষাপট বিবেচনায় যেমন– আফগানিস্তানে, ইরাকে, লিবিয়াতে প্রভৃতি দেশে বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলো মিলে সম্মিলিত সরকার বা কোয়ালিশন সরকার গঠনের মাধ্যমে দেশ পরিচালনা করছে। বাংলাদেশের পরিস্থিতি উপরের দেশগুলোর তুলনায় অনেক ভালো এবং বাংলাদেশে বর্তমানে যে রাজনৈতিক সংকট চলছে তা থেকে উত্তরণের জন্য কোয়ালিশন নয় বরং দরকার রাজনৈতিক সংস্কার ও রাজনীতিবিদদের মন-মানসিকতার পরিবর্তন তথা উন্নতি। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস ও দেশের প্রতি প্রেম রাজনৈতিক সংকট উত্তরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

০৮ ॥ বাংলাদেশের প্রধান কয়েকটি রাজনৈতিক দলের আদর্শ ও কার্যাবলি বর্ণনা করুন।

উত্তর : বাংলাদেশের রাজনৈতিক ধারা বহু ঘটনা ও ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান রূপলাভ করেছে। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশরা ক্রমান্বয়ে সাম্রাজ্যের বিস্তার, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক শোষণ ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মাধ্যমে ভারতবাসীর স্বাধীন কর্তৃত্ব কেড়ে নেয়। ফলে সব শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ব্রিটিশবিরোধী বিপ্লবী চেতনা গড়ে ওঠে, যা কালক্রমে ঘৃণা, ক্ষোভ, বিদ্রোহ ও সশস্ত্র সংগ্রামের রূপ লাভ করে। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের মাধ্যমে ইংরেজবিরোধী ক্ষোভ বিস্ফোরিত হয়। এরপর প্রায় চার দশককাল তেমন শক্তিশালী রাজনৈতিক শক্তির আবির্ভাব ঘটেনি। অতঃপর ১৮৮৫ সালে ভারতীয় উপমহাদেশের জনগণের

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ সিভিলিয়ান অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউমের উদ্যোগে 'ভারতীয় কংগ্রেস' নামে একটি রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠিত হয়। কংগ্রেসে হিন্দু-মুসলিম সব ধর্মের লোকের সমাবেশ ঘটে। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যে কংগ্রেসের হিন্দুপ্রীতি প্রকাশ পাওয়ায় মুসলমানদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। ফলে মুসলমানদের অধিকার প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার নিয়ে ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ' নামে একটি রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মুসলিম লীগের পূর্বাংশের নেতৃবৃন্দের সাথে পশ্চিমাংশের নেতাদের মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়। ফলে ১৯৪৯ সালে পূর্ববঙ্গে মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেয়া হয়। এছাড়াও স্বাধীনতার পূর্ববর্তীকালে রাজনৈতিক দল হিসেবে ভাসানীর 'ন্যাপ' ও কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় ভূমিকা ছিল। ১৯৭৫ সালে শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ প্রধান রাজনৈতিক দল ছিল। অতঃপর জাসদ, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি), জাতীয় পার্টি প্রভৃতি দলের জন্ম ও বিস্তার ঘটে। পরবর্তীতে এসব দল থেকে আরো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের সৃষ্টি হয়।

রাজনৈতিক দলের সংখ্যা ও কর্মকাণ্ড

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলের ব্যাপক হারে সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছে। এক জরিপ থেকে দেশে ১৬১টি দলের অস্তিত্বের কথা জানা যায়। ২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১-এ অনুষ্ঠিত পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৯০টি রাজনৈতিক দল বিভিন্ন প্রতীক নিয়ে অংশ নেয়। ১৯৯৬ সালে সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৮১টি রাজনৈতিক দল অংশ নিয়েছিল। কাজেই দেখা যাচ্ছে, দেশে রাজনৈতিক দলগুলোর সঠিক পরিসংখ্যান নিয়ে বিভ্রান্তি রয়েছে। অবশ্য এখন রাজনৈতিক দলের রেজিস্ট্রেশন চালু করায় সংখ্যাগত বিভ্রান্তি আর রইল না। দেশে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের সংখ্যা ৪১টি। জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য নিবন্ধন এখন বাধ্যতামূলক।

বাংলাদেশের অধিকাংশ দলই নামসর্বস্ব এবং এদের অনেকেরই স্থায়ী কোনো অফিস নেই। আবার অনেক দলের শুধু সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক আছেন। এদের কার্যাবলী শুধু পত্রপত্রিকায় বিবৃতি দেয়ার মধ্যেই সীমিত। বেশির ভাগ দলের স্থায়ী কোনো দলীয় মেনিফেস্টোও নেই। শুধু আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলামী, কমিউনিস্ট পার্টি, জাসদসহ কয়েকটি দলের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি আছে এবং সারা দেশে কমবেশি সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড রয়েছে।

প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর পরিচয়, আদর্শ ও কর্মসূচি

১. বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

আওয়ামী লীগ বর্তমানে বাংলাদেশের বৃহৎ ও সর্বাপেক্ষা পুরাতন রাজনৈতিক দল। ১৯৪৯ সালে গঠিত বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা এই দলটি ৬-দফা কর্মসূচি প্রচারের মাধ্যমে ব্যাপক জনসমর্থন নিয়ে ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দলটি ১৯৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালনা করে। ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর পাক হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের মাধ্যমে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। এ সময় ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ের কারণে আওয়ামী লীগ স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম সরকার গঠন করে। ১৯৭২-এর ১০ জানুয়ারি দলের প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিব বন্দি অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে দেশে ফিরে আসেন। পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ দেশে বহুদলীয় ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে একদলীয় সরকার 'বাকশাল' কায়েম করে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট সামরিক অভ্যুত্থানে শেখ মুজিব সপরিবারে নিহত হলে দেশে আওয়ামী লীগের শাসনের অবসান ঘটে। পরবর্তীতে রাজনৈতিক দলবিধি ১৯৭৬-এর মাধ্যমে আওয়ামী লীগ নামে দলটির আবির্ভাব ঘটে। ১৯৭৯ সালের সংসদ নির্বাচনে দলটি অংশ নিয়ে সংসদে প্রধান বিরোধী দলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ বিএনপি সরকার ক্ষমতাচ্যুত হলে আওয়ামী লীগ ৮ দলীয় ঐক্যজোট গঠন করে এরশাদবিরোধী আন্দোলনে অংশ নেয়। ১৯৯০-এর গণঅভ্যুত্থানে এরশাদ সরকারের পতন হলে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ১৯৯১-এর পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৮৮টি আসনে বিজয়ী হয়ে প্রধান বিরোধী দলের মর্যাদা অর্জন করে। ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বিজয়ী হয়ে ২১ বছর পর আবার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন হয়। তারপর ২০০৮ সালের নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশভাবে বিজয়ী হয়ে পূর্ণ মেয়াদে সরকার পরিচালনা করে। সর্বশেষ ২০১৪ সালের দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়লাভের মাধ্যমে দলটি দেশ পরিচালনা করে আসছে।

আওয়ামী লীগের মতাদর্শ ও কর্মসূচি

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ চারটি মূলনীতিতে বিশ্বাসী। এগুলো হচ্ছে জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র। আওয়ামী লীগের প্রাক্তন সভাপতি মরহুম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ চারটি মৌল আদর্শের প্রবক্তা এবং তারই নামানুসারে এদের সমষ্টিকে মুজিববাদ হিসেবে অভিহিত করা হয়েছিল। আওয়ামী লীগ এই চার মূলনীতিকে নিম্নরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছে :

১. **জাতীয়তাবাদ** : জাতি হিসেবে দেশের ওপর জনগণের পূর্ণ কর্তৃত্বের অধিকার।
২. **গণতন্ত্র** : রাষ্ট্র শাসনের অধিকার।
৩. **ধর্মনিরপেক্ষতা** : জনগণের স্ব স্ব চেতনার আলোকে নিজ নিজ ধর্মপালনের অবাধ অধিকার।
৪. **সমাজতন্ত্র** : জাতীয় সম্পদের ওপর জনগণের মালিকানা কায়েমের অধিকার।

২. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)

বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান, যিনি ১৯৭৫-এর ৭ নভেম্বরে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন হয়েছিলেন। বিএনপির প্রথম নাম ছিল জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল (জাগদল)। জাগদলই পরবর্তীতে বিএনপি নামে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৭৯ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলটি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল। ১৯৮১ সালের ৩০ মে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে সেনাবাহিনীর একাংশের বিদ্রোহে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান নিহত হলে দলের চেয়ারম্যান হয়েছিলেন সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তার। পরবর্তীতে বিচারপতি সাত্তার দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ রক্তপাতহীন সামরিক অভ্যুত্থানে বিচারপতি সাত্তার তথা বিএনপি সরকার ক্ষমতাচ্যুত হয়। এরপর দেশের অন্য দলগুলোর সঙ্গে যুগপৎ আন্দোলনের মাধ্যমে মরহুম জিয়াউর রহমানের পত্নী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি এরশাদ সরকার বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়। খালেদা জিয়ার সে সময়কার বলিষ্ঠ নেতৃত্বের কারণে বিএনপি অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করে। বিরোধী দলের আন্দোলনের মুখে ১৯৯০-এর ডিসেম্বরে গণঅভ্যুত্থানের মুখে এরশাদ প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের কাছে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। এরপর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

বিএনপি সরকারের মূল লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠা এবং প্রেসিডেন্ট জিয়ার ১৯ দফা কর্মসূচির মাধ্যমে দেশকে স্বনির্ভরতার দিকে নিয়ে যাওয়া। ১৯৯৬ সালে অনুষ্ঠিত সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি ১১৪টি আসনে বিজয়ী হয়। সর্বশেষ ১ অক্টোবর, ২০০১ অনুষ্ঠিত অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি ১৯৫টি আসনে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করে পূর্ণ মেয়াদে দেশ পরিচালনা করেছিল।

বিএনপির ১৯ দফা কর্মসূচির প্রধান প্রধান দফা হচ্ছে :

১. সর্বতোভাবে দেশের স্বাধীনতা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা।
২. শাসনতন্ত্রের চারটি মূলনীতি অর্থাৎ সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি সর্বাত্মক আস্থা ও বিশ্বাস, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে প্রতিফলিত করা।
৩. নিজেদের একটি আত্মনির্ভরশীল জাতি হিসেবে গড়ে তোলা।
৪. প্রশাসনের সর্বস্তরে উন্নয়ন কার্যক্রমে এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে জনসাধারণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

৩. জাতীয় পার্টি

১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ রক্তপাতহীন এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সেনাপ্রধান এরশাদ বিএনপি সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। সারা দেশে সামরিক আইন জারি করে রাজনৈতিক দলগুলোর তৎপরতার ওপর বিধিনিষেধ জারি করা হয়। পরে ক্ষমতায় টিকে থাকা এবং বিরোধী দলকে মোকাবিলার জন্য এরশাদ রাজনৈতিক দল গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করেন। এর মধ্যে রাজনৈতিক দলগুলোর তৎপরতার ওপর থেকে বিধিনিষেধ তুলে নেয়া হয়। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আহসানুল্লাহ চৌধুরীর নেতৃত্বে ১৯৮৩ সালে জনদল গঠন করা হয়। জনদলে যোগদানকারী দলগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল আওয়ামী লীগ (মিজান গ্রুপ), বিএনপির একাংশ, জাতীয় লীগ, ডেমোক্রেটিক লীগ (শাহ মোয়াজ্জেম গ্রুপ), ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (নাসের), ইউপিপি (কাজী জাফর), গণতান্ত্রিক পার্টি (জাহিদ)। এ দলগুলোর সমন্বয়ে গঠিত জনদল পরবর্তীতে ১৯৮৬ সালে জাতীয় পার্টি নামে আত্মপ্রকাশ করে। এই দলের চেয়ারম্যান হন প্রেসিডেন্ট এরশাদ নিজেই। ক্ষমতালিপ্সু ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা 'জাতীয় পার্টি' ১৯৮৬ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিয়ে ব্যাপক কারচুপির মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু দলটি তাদের সংগঠনকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে এবং সরকারবিরোধী আন্দোলনের মুখে বিকল্প কর্মসূচি প্রদান করতে ব্যর্থ হয়। ১৯৯০-এ বিরোধী দলের ডাকে এরশাদবিরোধী গণঅভ্যুত্থানের মুখে এরশাদ ক্ষমতাচ্যুত হলে জাতীয় পার্টিও ক্ষমতা থেকে অপসারিত হয়। ১৯৯১-এ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিয়ে জাতীয় পার্টি ৩৫টি আসন লাভ করে সংসদে তৃতীয় বৃহত্তম দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জাতীয় পার্টি ৩০টি আসন পেয়ে আওয়ামী লীগের 'ঐকমত্যের' সরকারে যোগ দেয়। প্রথমে সংসদ অধিবেশনে যোগ দেয়ার সুবিধার্থে দুর্নীতিসহ একাধিক মামলায় আটক জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান এরশাদকে সংসদের পাশে একটি বাড়িতে (পরে সাবজেলে রূপান্তরিত) বন্দি হিসেবে রাখা হয়। ১৯৯৭-এর ৮ জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্টে সর্বশেষ মামলায় জামিন পেয়ে দীর্ঘ ছয় বছর পর এরশাদ জেল থেকে মুক্তি পান। বর্তমানে জাতীয় পার্টি তিনটি ভাগে বিভক্ত। এরশাদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টি বর্তমান দশম জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করছে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

আদর্শ ও কর্মসূচি

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের মতো জাতীয় পার্টিও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা হিসেবে নিজেদের দাবি করতে থাকে। জিয়াউর রহমানের ১৯ দফা কর্মসূচির মতো এরশাদও জাতীয় পার্টির জন্য ১৮ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে সারা দেশে তা বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা শুরু করেন।

১৮ দফা কর্মসূচির প্রধান দফাগুলো হচ্ছে :

১. পল্লী উন্নয়ন।
২. কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন।
৩. শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি করা।

৪. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

জামায়াত একটি ইসলামভিত্তিক রাজনৈতিক দল। প্রতিষ্ঠাতা পাকিস্তানের মাওলানা আবুল আলা মওদুদী। ১৯৪১ সালের ২৫ আগস্ট জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠিত হয়। এ দলটি একটি আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক দল। শ্রীলংকা, ভারত, পাকিস্তানসহ বিভিন্ন দেশে জামায়াতে ইসলামীর সংগঠন রয়েছে। আওয়ামী লীগের সাথে রাজনৈতিক মতপার্থক্যের কারণে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ভূমিকা পালন না করার কারণে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই দেশে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়। এতে জামায়াতের কর্মতৎপরতা বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্টের পটপরিবর্তনের পর জিয়াউর রহমান ক্ষমতাসীন হলে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নেয়া হয়। এরপর থেকে জামায়াত বাংলাদেশে প্রকাশ্যে রাজনীতি শুরু করে। স্বৈরাচার এরশাদবিরোধী আন্দোলনে ক্যাডারভিত্তিক, ধর্মীয় ভাবাদর্শে বিশ্বাসী জামায়াতে ইসলামী তাদের দলীয় শক্তি বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়, যার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৮৬ ও ১৯৯১-এর সংসদ নির্বাচনে দলটি যথাক্রমে ১০ ও ২০টি আসনে নির্বাচিত হয়। কিন্তু ১৯৯৬-এ অনুষ্ঠিত সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৩০০ আসনে প্রার্থী দিয়ে মাত্র তিনটি আসনে তারা জয়লাভ করে। জামায়াতে ইসলামী ২০০১ সালের নির্বাচনে ১৭টি আসন লাভ করে বিএনপির নেতৃত্বে জোট সরকারের অংশীদার হয়েছিল। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতাযুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধে সম্পৃক্ত থাকার অভিযোগে দলটির নিবন্ধন বাতিল হয়ে যায়। ফলে এখন থেকে জাতীয় নির্বাচনে জামায়াত আর অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : জামায়াতে ইসলামীর মূল লক্ষ্য দেশে কুরআন ও সুন্নাহর আইন প্রতিষ্ঠা করা।

কর্মসূচি

১. আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন প্রতিষ্ঠা।
২. খাদ্য, বস্ত্র, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা
৩. অর্থনৈতিক সমবন্টনের লক্ষ্যে ইসলামী অর্থব্যবস্থা চালুকরণ।
৪. ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রবর্তন।

৫. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)

সমাজতান্ত্রিক বিধিবিধান সম্পর্কে তৎকালীন আওয়ামী সরকারের সাথে মতদ্বৈধতাহেতু ১৯৭২ সালের ৩১ অক্টোবর জাসদের জন্ম হয়। দলের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে দেশ গড়ার আহ্বান জানানো হয়। ছাত্রলীগের দুদলের অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে জাসদের জন্ম। অবশেষে ছাত্রলীগের তৎকালীন

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

ডাকসাইটে নেতা আ.স.ম. আবদুর রব ও শাহজাহান সিরাজ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল গঠন করেন। মেজর (অব) এম.এ. জলিল দলের যুগ্ম আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করেন। দলের অভিমত অনুসারে গণতান্ত্রিক রীতি-নীতির আওতায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। তাদের অভিমত অনুসারে 'শ্রেণী সংগ্রাম' ও সামাজিক বিপ্লবে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব। ১৯৭৩ সালে সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলেও জাসদ ৩০০টির মধ্যে মাত্র ২টি আসন লাভ করতে সমর্থ হয়। তারা ১৯৭৪ সালের মধ্যে সরকারকে বিপ্লবের দ্বারা উৎখাতের পরিকল্পনা এবং গণবাহিনী নামে সশস্ত্র কর্মীবৃন্দ গড়ে তোলার পরিকল্পনা করে এবং দলের লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য একটি সৈনিক সংস্থাও গঠন করে। ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর সিপাহী অভ্যুত্থানে জাসদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাদের ইচ্ছা ছিল জেনারেল জিয়াকে রাষ্ট্রক্ষমতায় রেখে 'সামাজিক বিপ্লব' সম্পন্ন করা। পরে মনোমালিন্যহেতু জিয়া দলের প্রধান নেতা ও গণবাহিনীর প্রধান কর্নেল তাহেরকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন এবং মেজর জলিল ও আবদুর রবসহ অনেক নেতাকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। ১৯৭৬ সালে জাসদ নিষিদ্ধ ঘোষিত হলেও ১৯৭৮ সালের এপ্রিল মাস থেকে পুনরায় রাজনৈতিক প্রক্রিয়া চালু করার অনুমতি পায়। ১৯৭৯ সালে জাসদ সহিংস বিপ্লবের পথ পরিহার করে জাতীয় গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার মানসে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গণআন্দোলন গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেয়। ১৯৮০ সালে জিয়াবিরোধী যে ১০টি দল জোটবদ্ধ হয় জাসদ ছিল তার একটি। জাসদের মূল কৌশল সম্পূর্ণ পরিবর্তনের কারণে ১৯৮১ সালে অপেক্ষাকৃত বিপ্লবীরা দলত্যাগ করে বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) গঠন করে।

পরবর্তীতে জাসদ (রব) এরশাদ সরকারকে সকল প্রকার সাহায্য প্রদান করে এবং ১৯৮৬ সালে আওয়ামী লীগের সাথে নির্বাচনে অংশ নিয়ে মাত্র ৪টি আসন লাভে সমর্থ হয়। সে সময়ে জাসদ ছিল একটি আনুগত্যশীল বিরোধী দল। কারণ তারা সকল ক্ষেত্রে সরকারকে সমর্থন করতো। ১৯৮৮ সালে সংসদ নির্বাচনে জাসদ (রব)-এর নেতৃত্বে গঠিত সম্মিলিত বিরোধী দল ১৯টি আসন লাভ করে। এরশাদের পতনের পর জাসদ (রব) প্রায় নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। ১৯৯১ সালের সংসদ নির্বাচনে ১৬১ জন প্রার্থী মনোনয়ন দান করলেও একটিও আসন লাভে সমর্থ হয়নি। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে ১টি আসন পায় এবং শেখ হাসিনার জাতীয় সরকারে জাসদের প্রধান আবদুর রবকে নৌপরিবহন মন্ত্রী নিয়োগ করা হয়। ২০০১ সালের নির্বাচনে এ দলটি কোনো আসন পাননি।

দলীয় মতবিরোধ ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট কারণে জাসদ বিভিন্ন সময় ভাঙনের মুখে পড়ে এবং বিভিন্ন উপদল সৃষ্টি হয়। ভিন্ন আদর্শ ও সংগ্রামী ভূমিকার জন্য ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত যে দল আওয়ামী লীগের প্রধান প্রতিপক্ষ ছিল নানা কারণে ও আদর্শচ্যুতিতে আজ তা লুপ্তপ্রায়। বর্তমানে আওয়ামী লীগের টিকিটে জাসদ প্রধান হাসানুল হক ইনু সরকারের একটি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেছে।

৬. বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি

এটি বাংলাদেশের একটি কমিউনিস্ট দল (লেনিনবাদী), যা বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ এবং অন্য একটি গ্রুপ থেকে ১৯৮০ সালে গঠিত হয়। অমল সেন ছিলেন এটির প্রতিষ্ঠাতা মহাসচিব। ১৯৮৪ সালে দলটি দুটি ভাগে বিভক্ত হয় এবং দুই পক্ষই একই নাম ব্যবহার করতে থাকে। একটি গ্রুপের নেতৃত্ব দেন অমল সেন এবং অন্য গ্রুপের নজরুল ইসলাম। ১৯৯২ সালে দলটি পুনরায় একত্রিত হয়। ক্ষমতাসীন দলের শরীক দল হিসেবে দলটির বর্তমান সভাপতি রাশেদ খান মেননও বর্তমান সরকারের একজন মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

বাংলাদেশের [illegible] । সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের তাশখন্দ শহরে ১৯২০ সালের ১৭ অক্টোবর এই রাজনৈতিক দলের জন্ম। ১৯২২ সালের মাঝামাঝি ভারতবর্ষের কলকাতা, মুম্বাই, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশে কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ১৯৪৮ সালের ৬ মার্চ নতুন করে গঠিত হয় দলটি। প্রথমে সারা পাকিস্তানে একটি কেন্দ্রীয় কমিটি ও পলিটব্যুরোর অধীনে তৎপরতা অব্যাহত থাকে। পরে পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির পূর্ববঙ্গ শাখা প্রায় স্বতন্ত্রভাবেই কাজ শুরু করে। মধ্য ষাটের দশকে এসে কমিউনিস্ট আন্দোলনের মত ও পথ নিয়ে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের মধ্যে যে মতদ্বৈধতা দেখা দেয়, তারই জের হিসেবে কমিউনিস্ট পার্টি দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। কমিউনিস্টদের একটি গ্রুপ এ সময় থেকে 'মস্কোপন্থী' এবং অপরটি 'পিকিংপন্থী' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

১৯৭১ সালে মস্কোপন্থীরা মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা পালন করে। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে মস্কোপন্থী দলটির নামকরণ করা হয় 'বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি' ইংরেজিতে Communist Party of Bangladesh (CPB)।

মধ্য আশির দশকে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নসহ পূর্ব ইউরোপের দেশে কমিউনিস্ট সরকারের পতনের ঘটনা এ দলটির ওপরও প্রভাব ফেলে। '৯০-এর দশকে গোড়ার দিকে মস্কোপন্থী আবার দুভাগে বিভক্ত হয়। একটি গ্রুপ 'বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি' (সিপিবি) নাম বজায় রাখে এবং এখনো এ নামেই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। আর অপর অংশটি কমিউনিস্ট আদর্শ ত্যাগ করে নিষ্ক্রিয় অথবা অন্য রাজনৈতিক দলে যোগদান করেছে। এছাড়াও কমিউনিস্ট ভাবাদর্শে বিশ্বাসী অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল বিভিন্নভাবে তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে।

জাসদ, বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি ও সিপিবি তিনটি দল-ই রাজনৈতিক অবস্থানে বামপন্থি। এর মধ্যে জাসদ দলটি সমাজতন্ত্রে এবং ওয়ার্কাস পার্টি ও কমিউনিস্ট পাটি সাম্যবাদ, মার্কসবাদ-লেলিনবাদ মতাদর্শে বিশ্বাসী। জাতীয় স্বার্থে বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে দলগুলো বাংলাদেশের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

এছাড়া বাংলাদেশে আরো বেশি কিছু রাজনৈতিক দল রয়েছে। বর্তমানে দেশে ৪১টি রাজনৈতিক দল নিবন্ধিত রয়েছে। যারা বিভিন্নভাবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে ভূমিকা রাখছে।

উপসংহার : বাংলাদেশে ৪১টি রাজনৈতিক দল থাকলেও দুটি বৃহৎদল অর্থাৎ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও বিএনপি-ই বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশে সরকার গঠন ও দেশ পরিচালনা করে এসেছে। তবে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক, রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশের অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকাও অনস্বীকার্য। বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বাধীনতা অর্জন অতঃপর স্বৈরচার পতন আন্দোলন সবগুলোতেই রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা ছিল উল্লেখ করার মত। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিন্নতা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়নি। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো দুটি রাজনৈতিক মতাদর্শে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। একদিকে মধ্য বামপন্থি এবং অন্যদিকে মধ্য ডানপন্থি। সাম্প্রতিক সময়ের রাজনৈতিক সহিংসতা, পরস্পরে কাদা ছোড়াছুড়ি ও রাজনৈতিক বিভক্তি বাংলাদেশে নতুন রাজনৈতিক মেরুকরণ তৈরি করেছে। রাজনৈতিক মতাদর্শে ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় ও দেশের উন্নয়নে রাজনৈতিক দলগুলোকে পরস্পরে কাদা ছোড়াছুরি বাদ দিয়ে অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-০১ বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির সাম্প্রতিক প্রবণতা সম্পর্কে লিখুন।

উত্তর : বাংলাদেশের বিগত ৪৪ বছরের ইতিহাস এ দেশে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির অনুপস্থিতিই প্রমাণ করে। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ১৯৭৩ সালে দেশে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট এক বিয়োগান্ত ঘটনার মধ্য দিয়ে নির্বাচনে বিজয়ী সরকারের অবসান ঘটে। এরপর থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত কোনো সরকারই গ্রহণযোগ্য উপায়ে ক্ষমতাসীন হয়নি। ১৯৯১ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত সরকারের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন না থাকলেও ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত নির্বাচন আবার বিতর্কের জন্ম দেয়। এ নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত সরকার রাজনৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য হয়নি। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি বিতর্কিত নির্বাচনের মাধ্যমে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার একটি ঐকমতেছর সরকার গঠন করে। কিন্তু ২০ দলীয় জোটের প্রধান শরিক দল, বিএনপি এই সরকারকেএকটি অগণতান্ত্রিক, অনির্বাচিত ও অবৈধ সরকার হিসেবে অভিহিত করে এবং সরকার হটানোর জন্য আন্দোলনের নামে তারা মানুষ হত্যার সংস্কৃতির পথ অনুসরণ করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ক্ষমতা অর্জনের গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি অনুসরণ না করা, সন্দেহ, অবিশ্বাস, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের অভাব এবং গণতান্ত্রিক রীতিনীতির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য। এর দ্বারা আর যাই হোক গণতান্ত্রিক সমাজ গঠন করা যায় না। তবে একটি কথা বলা যায়, সম্প্রতি নির্বাচন, সংবিধানের ধারাবাহিকতা ইত্যাদি প্রসঙ্গ বারবার আলোচিত হচ্ছে। এটি অবশ্যই ভালো লক্ষণ। তবে সবচেয়ে যা বেশি জরুরি তা হলো আচরণে গণতন্ত্রমনস্ক হওয়া। এটি এখনো অনর্জিত রয়ে গেছে। উত্তম রাজনৈতিক সংস্কৃতির সবশেষ কথা গণতান্ত্রিক সমাজে অনৈক্য থাকবে, তবে তা কখনো সংঘাতমুখর পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে না।

প্রশ্ন-০২ গণতন্ত্র বিকাশে রাজনৈতিক দলসমূহের ভূমিকা লিখুন।

উত্তর : বাংলাদেশের গণতন্ত্র বিকাশের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলসমূহের ভূমিকা অপরিসীম। রাজনৈতিক দলসমূহের সময়োচিত ও সুচিন্তিত পদক্ষেপ এ দেশের গণতন্ত্র বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। রাজনৈতিক দল বলতে ক্ষমতাসীন এবং বিরোধী সব দলের কথাই বলা হয়ে থাকে। গণতন্ত্রের সংজ্ঞার আলোকে বাংলাদেশের গণতন্ত্র বিকাশের জন্য সরকারি দলের সহনশীলতা ও বিরোধী দলের দায়িত্বশীলতা সম্পর্কে নিচে আলোকপাত করা হলো :

সরকারি দলের সহনশীলতা : বাংলাদেশের মতো দেশের শিশু গণতন্ত্র বিকাশের ক্ষেত্রে সরকারি দলের নিম্নোক্ত সহনশীল বিষয়সমূহের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে :

১. **নমনীয়তা :** সরকারি দলকে মনে রাখতে হবে, শুধু তাদের নিয়েই নয় বরং তাদের ও বিরোধী দল উভয়কে নিয়েই রাষ্ট্রযন্ত্র ও সরকার এবং এটিই গণতন্ত্রের শিক্ষা। সুতরাং সরকারি দলকে গণতন্ত্র মানতে হবে, হতে হবে অন্যের মতের প্রতি সহিষ্ণু এবং তাদের জবাবদিহি করতে হবে জনগণের কাছে।

২. **দমননীতি পরিহার করা :** বাংলাদেশে প্রায়ই দেখা যায় নির্বাচনোত্তর সরকারি দল বিরোধী দলের ওপর অন্যায়ভাবে অহেতুক দমননীতি প্রয়োগ করে থাকে, যা গণতন্ত্রের সাথে সামঞ্জস্যহীন।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৩. **একচেটিয়াত্ব বর্জন করা :** বাংলাদেশে প্রায়শ নির্বাচনোত্তর সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী দল রাষ্ট্রের সর্বত্র একচেটিয়া কর্তৃত্ব কায়েম করতে সচেষ্ট হয়। এতে করে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারি দল গণতন্ত্র থেকে বহু দূরে সরে যায়। রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমসমূহকে তারা নিজস্ব দলীয় সম্পত্তি হিসেবে ব্যবহার করে। এর দ্বারা গণতন্ত্রের বিকাশ ব্যাহত হয়।

বিরোধী দলের দায়িত্বশীলতা : বাংলাদেশের গণতন্ত্রের বিকাশ ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে বিরোধী দলসমূহকে নিম্নোক্ত দায়িত্বশীল বিষয়সমূহের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে :

১. **গঠনমূলক সমালোচনা :** গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় বিশেষত সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিরোধী দলকে বিকল্প সরকার বলা যায়। এ দলের প্রধান কাজ সরকারি দলের কাজকর্মের গঠনমূলক সমালোচনা করে সরকার যন্ত্রকে স্থিতিশীল রাখা। তাই দায়িত্বশীল বিরোধী দলের নিজস্ব দলীয় স্বার্থে, সর্বস্তরের জনগণের স্বার্থে এবং গণতন্ত্রের বিকাশের স্বার্থে সরকারি দলের কাজকর্মের গঠনমূলক সমালোচনা করতে হবে।

২. **বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা নয় :** বিরোধী দল বলেই বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা করা দায়িত্বশীল বিরোধী দলের পরিচয় বহন করে না। সরকারি দলের যেসব কাজকর্মে সর্বজনীন কল্যাণ নিহিত থাকে, বিরোধী দলকে সরকারের সেসব কাজকর্মের প্রতি সমর্থন জানাতে হবে। ফলে সরকারি দল বিরোধী দলের দাবি বাস্তবায়ন করতেও উৎসাহিত হবে এবং এতে গণতন্ত্রের বিকাশ ত্বরান্বিত হবে।

প্রশ্ন-০৩ বাংলাদেশের দলব্যবস্থাকে কি দ্বিদলীয় বলা যায়?

উত্তর : নিম্নতর রাজনৈতিক সংস্কৃতির নবীন গণতান্ত্রিক দেশ বাংলাদেশ। বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পর্যালোচনায় যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্রের মতো বাংলাদেশে দ্বিদলীয় ব্যবস্থা গড়ে উঠার সম্ভাবনা লক্ষণীয়। নির্দলীয়-নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত ১৯৯১, ১৯৯৬, ২০০১ ও ২০০৮ সালের সংসদ নির্বাচনে দেশের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল 'বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও 'বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল' (বিএনপি)-এর মধ্যে ক্ষমতার হাত বদল ঘটে। ২০০১ সালের নির্বাচনেও বিএনপির নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় আসে। চারদলীয় জোট হলেও মূলত সরকারের মূল শক্তি ও নীতি নির্ধারক বিএনপি। তেমনি ২০০৮ সালেও ক্ষমতায় আসে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ১৯৯১ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত নির্বাচনে দুটি প্রধান দলই ক্ষমতায় এসেছে। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশে তৃতীয় কোনো দলের একার পক্ষে সরকার গঠন সম্ভবপর মনে হয় না। তাই বলা যায়, বাংলাদেশের দলব্যবস্থা দ্বিদলীয় ব্যবস্থার দিকে ধাবিত হচ্ছে।

প্রশ্ন-০৪ রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা কি?

উত্তর : রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা কোনো একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত। সাধারণত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা বলতে বোঝায় সুস্থ রাজনৈতিক সংস্কৃতি অনুসরণের মাধ্যমে নির্দিষ্ট মেয়াদে সরকারের পরিবর্তন। কিন্তু বাংলাদেশের অধিকাংশ রাজনৈতিক দল সর্বদাই ধ্বংসাত্মক রাজনীতিতে মত্ত। এরা সামান্য কারণে হরতাল, ধর্মঘট তথা জ্বালাও পোড়াও আন্দোলন করে জনজীবন ও রাষ্ট্রীয় পরিবেশ দুর্বিষহ করে তোলে। ফলে বাংলাদেশের রাজনীতিতে অস্থিতিশীলতা দেখা দেয় এবং জাতীয় অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হয়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

প্রশ্ন-০৫ বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংহতির সমস্যাগুলো তুলে ধরুন।

উত্তর : নব্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা এখনো একটি শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়াতে পারেনি। ফলে রাজনৈতিক সংস্কৃতি, প্রতিষ্ঠান, সংগঠন ও জনগণের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সর্বক্ষেত্রেই রয়েছে ব্যাপক দুর্বলতা। যেমন—

প্রথমত, বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি মূলত কর্তৃত্ববাদী। এখানে শাসকশ্রেণীর মানসিকতায় রয়েছে পরনির্ভরশীলতার প্রভাব। দীর্ঘদিনের পরাধীনতা আমাদেরকে এ বিষয়ে নানা নেতিবাচক উপসর্গে অভ্যস্ত করে তুলেছে। পূর্বতন শাসকদের মতো স্বাধীন বাংলাদেশের শাসকদেরও খোলামেলা সমালোচনা অপছন্দনীয় এবং সবসময় জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট হওয়ার ভয়ে তারা বিব্রত। এমতাবস্থায় শাসকশ্রেণী যেমন জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের দাবি ও সংগ্রামকে সহজভাবে নিতে পারে না, তেমনি জনগণও সরকারকে সম্পূর্ণরূপে সহযোগিতা ও গণতান্ত্রিক রীতিনীতির সাথে পরিচিত নয়। ফলে উভয় শ্রেণীর সমন্বয় ও সহযোগিতার ক্ষেত্র তেমন প্রসারিত হচ্ছে না।

দ্বিতীয়ত, দেশের রাজনীতিতে সামরিক ও বেসামরিক আমলাদের সম্মিলিত পদচারণা ও আধিপত্য রাজনীতিতে শক্তিশালী দল, উপদল ও গোষ্ঠীর বিকাশকে নানাভাবে বাধাগ্রস্ত করছে। ফলে রাজনীতির যে সুশীল চরিত্র সেটা প্রস্ফুটিত হতে পারছে না। জনগণের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ হয়ে পড়েছে সীমিত। তাছাড়া সরকারের গণমুখী রাজনীতির বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়ে ক্রমশ আমলানির্ভর ও গণবিমুখ হয়ে পড়ছে। ফলে সরকার ও জনগণের মধ্যকার পারস্পরিক সহযোগিতা ও ঘনিষ্ঠতা দুর্বল হওয়ার পাশাপাশি জাতীয় ঐক্যের বিষয়টিও দুর্বল হয়ে পড়েছে।

তৃতীয়ত, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বাংলাদেশের রাজনীতির আরেকটি অন্যতম নেতিবাচক উপসর্গ। ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, শাসকশ্রেণীর স্বেচ্ছাচারিতা, সন্ত্রাস, আদর্শগত মতবিরোধ প্রভৃতি এ দেশের রাজনীতিকে সবসময়ই অস্থিতিশীল করে রাখে। ফলে রাজনৈতিক ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার কোনো প্রচেষ্টাই সফল হয় না। এজন্য অবশ্য নিম্ন রাজনৈতিক সংস্কৃতিই অধিকাংশ ক্ষেত্রে দায়ী।

চতুর্থত, গণতন্ত্রের মতো একটি সর্বজনীন মতবাদে বিশ্বাস ও এর ঐকান্তিক অনুসরণ জাতীয় ঐক্য ও সংহতিকে অনেক মজবুত করতে পারে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমাদের দেশে গণতান্ত্রিক আদর্শ ও মূল্যবোধের প্রতি বিশ্বাসের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। বিশেষ করে এ দেশের মানুষ দীর্ঘদিনের ঔপনিবেশিক এবং পাকিস্তানি শাসন ও শোষণের ফলে গণতান্ত্রিক চর্চার সুযোগ তেমন পায়নি। এমনকি স্বাধীনতার পর প্রায় চার যুগ অতিক্রান্ত হতে চললেও গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু হয়েছে মাত্র এক যুগ আগে। তাই গণতন্ত্রের শক্ত ভিত এ দেশে এখনো সেভাবে স্থাপিত হয়নি। ফলে এ দেশের রাজনীতিতে সবসময়ই সংকটাপন্ন অবস্থায় দেখা যায়।

পঞ্চমত, বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কোনোটিই মজবুত নয় এবং এগুলো জনগণের ব্যাপক আস্থা অর্জন করতেও সমর্থ হয়নি। জনগণ এ দেশের সংসদ, নির্বাচন ব্যবস্থা, দল ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থাসহ সকল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যবস্থার কার্যকারিতা ও বিশ্বাসযোগ্যতার ব্যাপারে সন্দিহান। ফলে দেখা যায়, এদের কোনোটিই জাতীয় ঐক্য ও সংহতির প্রতীক হিসেবে জনগণকে ব্যাপকভাবে ঐক্যবদ্ধ করতে সমর্থ হয় না।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

ষষ্ঠত, স্বাধী... ক তাদের সম্মোহনী নেতৃত্বের দ্বারা ঐক্যবদ্ধ করতে পেরেছিলেন, স্বাধীনতা পরবর্তীকালে আর তেমন দেখা যায়নি। বিশেষ করে, স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় এ দেশের জনগণ যেভাবে একটি সমন্বিত নেতৃত্বের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করেছিল পরবর্তীকালে সে নেতৃত্ব যেমন পূর্বতন অবস্থান বজায় রাখতে পারেনি, তেমনি জনগণও তাদের ডাকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার যুক্তি খুঁজে পায়নি। ফলে এ দেশের রাজনীতিতে নেতৃত্বের সংকট লেগেই আছে। আর এ সংকট জাতীয় সংহতিকে করেছে আরো বেশি সংকটাপন্ন।

প্রশ্ন-০৬ অসাংবিধানিক প্রক্রিয়ার ক্ষমতা দখল বন্ধের কর্যকর পদক্ষেপগুলো কি হতে পারে?

উত্তর : অসাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় ক্ষমতা দখল বন্ধের জন্য যেসব কার্যকর পদক্ষেপ ফলপ্রসূ হতে পারে, নিচে সেগুলো আলোচনা করা হলো :

১. **সুষ্ঠু রাজনৈতিক সংস্কৃতিচর্চার পরিবেশ তৈরি করা :** এ দেশের স্বাধীনতার প্রায় চার দশক পরেও গণতান্ত্রিক চেতনার যে পরিপূর্ণরূপ বা রাজনৈতিক কার্যক্রমের যে প্রশংসনীয় রূপ সেটি খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক দলকেই বৃহত্তর ও জাতীয় স্বার্থে ঐকমত্যে পৌছাবার সংস্কৃতির চর্চা করতে হবে। তা হলেই রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা তৈরি হবে, যেটি সেনাবাহিনী বা অন্য কোনো মহলকে অবৈধ ক্ষমতা দখলের সুযোগ তৈরি করে দেবে না বা একটি প্রতিরোধক অবস্থা তৈরি হবে।

২. **প্রশাসনিক ক্ষমতা কাঠামোর সংস্কার :** আমাদের দেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পদ্ধতি অনেকটা দলীয় নীতির আওতায়। অর্থাৎ সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকারি দলের পক্ষের কোনো ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। দেশের সর্বোচ্চ পদের ব্যক্তিকে নির্দলীয় বা নিরপেক্ষতা রক্ষা করে চলার জন্য তার নির্বাচন পদ্ধতির সংস্কার দরকার। তাহলে সকল দলের প্রতি তার কার্যক্রমের জবাবদিহিতা বাড়বে এবং বিভিন্ন সময় জারিকৃত জরুরি অবস্থার মাধ্যমে জনগণের মৌলিক অধিকার মুখ থুবড়ে পড়বে না।

৩. **সামরিক ও বেসামরিক সম্পর্ক :** পর্দার অন্তরালে থেকে উন্নয়নশীল বিশ্বের মতো আমাদের দেশেও সামরিক বাহিনী সরকারের ওপর অনেক বেশি চাপ প্রয়োগ করতে সুযোগ পায়, যেটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে। তাই সামরিক বাহিনীর সাথে একটি চেক অ্যান্ড ব্যালান্স সম্পর্ক থাকা দরকার, যার মাধ্যমে সেনাবাহিনীর অসাংবিধানিক কার্যক্রমের অভিপ্রায়কে প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে।

৪. **সংসদ কার্যকর করা :** সরকার ও বিরোধী দল—দুটি দলকেই গণতান্ত্রিক আদর্শের জায়গাতে একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে পতিত হতে হবে, যাতে সংসদ অনেক বেশি গণতান্ত্রিক, কার্যকর ও জনগণের প্রত্যাশা উত্থাপনের জায়গা হয়ে উঠতে পারে।

৫. **বিচারের সম্মুখীন করা :** এ পর্যন্ত অনেকবার এ পবিত্র সংবিধানকে সুস্পষ্টভাবে লঙ্ঘনের মাধ্যমে এর পবিত্রতা এবং মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করা হয়েছে। যারা এ অসাংবিধানিক কার্যক্রমের সাথে যুক্ত তাদেরকে বিচারের সম্মুখীন করা সম্ভব হলে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে না।

সর্বোপরি তৃণমূল পর্যায় থেকে রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি হলেই কেবল জবাবদিহিতার ক্ষেত্রগুলো তৈরি হবে। সর্বোপরি, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালীকরণ, সুষ্ঠু রাজনৈতিক সংস্কৃতির চর্চা, সঠিক নেতৃত্বের সংকট উত্তরণ, জনগণের অংশগ্রহণ, অর্থনৈতিক কাঠামোর সংস্কার, দুর্নীতিরোধ, বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালীকরণ, বিচার বিভাগের প্রকৃত স্বাধীনতা নিশ্চিত করা প্রভৃতির মাধ্যমেই কেবল এ ধরনের অসাংবিধানিক ক্ষমতা দখলের অশুভ ছোবল থেকে আমরা বের হয়ে আসতে পারবো।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

বাংলাদেশের নির্বাচন
Elections in Bangladesh

Syllabus *Elections in Bangladesh. Management of Electoral Politics : Role of the Election Commission; Electoral Law; Campaigns; Representation of People's Order (RPO); Election Observation Teams.*

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১. অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে কমিশনের ভূমিকা কি? বাংলাদেশে নির্বাচন কমিশনের দুর্বল দিকগুলো আলোচনা করুন। [৩৩তম বিসিএস]

০২ সংবিধানের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন গঠন ও এর কার্যাবলী আলোচনা করে এতে কোনো পরিবর্তন সুপারিশ করেন কি? [৩২তম বিসিএস]
অথবা, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা করুন। একে অধিকতর কার্যকর করতে আপনার প্রস্তাবনা উপস্থাপন করুন।

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

০৩. নির্বাচনী আইন কি? জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

০৪. বাংলাদেশের নির্বাচনের ক্ষেত্রে নির্বাচন পর্যবেক্ষক দলসমূহের ভূমিকা উল্লেখ করুন।

০৫. গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও) কি? ২০১৩ সালে পাসকৃত 'গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) বিল ২০১৩' এর উল্লেখযোগ্য ধারাগুলো আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

০১. বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন কতজন সদস্য নিয়ে গঠিত? বর্তমান প্রধান নির্বাচন কমিশনারের নাম কি?

০২. সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসমূহ কি কি?

০৩. নির্বাচন কমিশনের দায়িত্বাবলি বর্ণনা করুন।

০৪. সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর পর জাতীয় নির্বাচনকালে সরকারের রূপরেখা লিখুন?

০৫. নির্বাচন কমিশনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারদের কে নিয়োগ প্রদান করেন? এ পদগুলোকে সাংবিধানিক পদ বলা হয় কেন?

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১ । অবাধ, সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে কমিশনের ভূমিকা কি? বাংলাদেশে নির্বাচন কমিশনের দুর্বল দিকগুলো আলোচনা করুন। *[৩৩তম বিসিএস]*

উত্তর : বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন একটি সাংবিধানিক সংস্থা। সাংবিধানিকভাবে এটি স্বতন্ত্র, নিরপেক্ষ এবং স্বাধীন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৮নং অনুচ্ছেদের ১নং ধারায় উল্লেখ আছে, 'প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া এবং রাষ্ট্রপতি সময়ে সময়ে যেরূপ নির্দেশ করিবেন সেরূপ সংখ্যক অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া বাংলাদেশের একটি নির্বাচন কমিশন থাকিবে ....।' বাংলাদেশের যে কোনো পর্যায়ের নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের ওপর ন্যস্ত।

নির্বাচন কমিশন : একটি স্বাধীন সাংবিধানিক সংস্থা হিসেবে জাতীয় ও স্থানীয় সরকার পর্যায়ের সকল নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা, নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ, ভোটার তালিকা তৈরি, ভোটগ্রহণ তত্ত্বাবধান, নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা এবং নির্বাচনী অভিযোগ-মোকদ্দমা মীমাংসার লক্ষ্যে নির্বাচনী ট্রাইবুনাল গঠন করা নির্বাচন কমিশনের কাজ। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের সপ্তম ভাগে নির্বাচন কমিশনের গঠন-কাঠামো, ক্ষমতা ও দায়িত্ব নির্ধারণ করা আছে। বাংলাদেশের সংবিধানে বলা হয়েছে যে, 'প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া এবং রাষ্ট্রপতি সময়ে সময়ে যেরূপ নির্দেশ করিবেন, সেই রূপ সংখ্যক অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া বাংলাদেশের একটি নির্বাচন কমিশন থাকিবে এবং উক্ত বিষয়ে প্রণীত কোনো আইনের বিধানাবলী-সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়োগ দান করিবেন।' স্বাধীন সংস্থা হিসেবে নির্বাচন কমিশন প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি, সংসদ ও স্থানীয় সরকার পর্যায়ে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান নিশ্চিত করতে সাংবিধানিকভাবে শপথের দ্বারা দায়বদ্ধ। নির্বাচন কমিশন সব রাজনৈতিক দলের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও যোগাযোগ রক্ষা করে। নির্বাচনী তফসিল, নির্বাচনী প্রক্রিয়া ও নির্বাচনের সামগ্রিক আয়োজনের ব্যাপারে সব রাজনৈতিক দলের সাথে আলাপ-আলোচনার উদ্যোগ নেয়া হয়। ভোটার নিবন্ধন, ভোটার তালিকা তৈরি ও হালনাগাদ করা ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়েও নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে নির্বাচন কমিশন আলাপ আলোচনা করে।

অবাধ, সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা : নির্বাচন হলো গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার ভিত্তি। অবাধ, সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় যোগ্য, উপযুক্ত ও জনগণের পছন্দনীয় প্রার্থী সরকার পরিচালনার দায়িত্ব লাভ করে। বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থায় স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের দায়িত্ব পালন করে থাকে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন। বাংলাদেশ সংবিধানের ১১৯(১) ও ১১৯(২) নং অনুচ্ছেদে নির্বাচন কমিশনের কার্যাবলী সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। নিচে অবাধ, সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান আয়োজনে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা আলোচনা করা হলো :

১. **নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ :** বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন অবাধ জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠান আয়োজনের লক্ষ্যে সমগ্র বাংলাদেশকে ৩০০টি নির্বাচনী এলাকায় বিভক্ত করেছে। সমগ্র দেশের প্রাপ্তবয়স্ক জনগণ যাতে তাদের মূল্যবান ভোট প্রদান করতে পারে এ জন্যে এই বিভাজন। যোগাযোগ ব্যবস্থা, ভৌগোলিক অবস্থান ও জনসংখ্যার পরিমাণকে ভিত্তি করে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী এলাকা বিভাজন করে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

২. **নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা :** নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠ নির্বাচন অনুষ্ঠান আয়োজনের লক্ষ্যে নির্দিষ্ট সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা প্রদান করে। এতে করে প্রার্থী ও ভোটাররা নির্বাচন সম্পর্কে অবগত হয় এবং সে অনুযায়ী প্রস্তুতি নিতে পারে। নির্বাচনের নিয়ম-কানুন, ভোটদানের নিয়ম, প্রার্থীর যোগ্যতা প্রভৃতি বিষয় 'নির্বাচনী তফসিলে' অন্তর্ভুক্ত থাকে।

৩. **ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও তত্ত্বাবধান :** স্বচ্ছ নির্বাচন অনুষ্ঠান আয়োজনের লক্ষ্যে দেশের স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের সব নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রণয়ন এবং তত্ত্বাবধান ও নির্দিষ্ট সময় অন্তর হালনাগাদকরণের দায়িত্ব পালন করে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যেই নির্বাচনে স্বচ্ছতা আনয়ন ও জালভোট প্রতিরোধে ভোটারদের জন্যে ছবিযুক্ত জাতীয় পরিচয়পত্রের ব্যবস্থা করেছে।

৪. **নির্বাচন প্রক্রিয়া পরিচালনা ও পর্যবেক্ষণ :** নির্বাচন কমিশন কর্তৃক 'নির্বাচনী তফসিল' ঘোষণার পর থেকেই নির্বাচনী প্রক্রিয়া শুরু হয়। এ পর্যায়ে প্রার্থীর মনোনয়নপত্র গ্রহণ ও যাচাই-বাছাই করে নির্বাচন কমিশন যোগ্য প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করে। এ সময় প্রার্থীদের প্রচারণা, নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি প্রভৃতি বিষয় সুশৃঙ্খল নির্বাচনের স্বার্থে নির্বাচন কমিশন গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে থাকে।

৫. **কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দান ও নির্বাচনী দায়িত্ব বণ্টন :** নির্বাচন হলো একটি প্রক্রিয়া; যেখানে প্রার্থী মনোনয়ন, প্রচার, ভোট দানের রীতি-নীতি থেকে ফলাফল প্রকাশ পর্যন্ত নির্দিষ্ট নিয়ম-নীতির মাধ্যমে অগ্রসর হতে হয়। তাই এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্যে নির্বাচন কমিশন তার অধীনে কর্মকর্তাদের নির্বাচন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। পরবর্তীতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা বিভিন্ন নির্বাচনী কেন্দ্রে রিটার্নিং ও পোলিং অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

৬. **ব্যালট পেপার ও ব্যালট বাক্স সরবরাহ :** নির্বাচনে ভোটার যে মাধ্যমে তার মতামত প্রকাশ করবে তার অন্যতম অনুষঙ্গ হলো ব্যালট পেপার। প্রার্থী বাছাইয়ের সুবিধার্থে ব্যালট পেপারে প্রার্থীর নাম বা প্রতীক অংকিত থাকে। ভোটার তার পছন্দের প্রার্থীর প্রতীক চিহ্নিত করে ব্যালট পেপার ব্যালট বাক্সে রাখেন। এক্ষেত্রে অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠান আয়োজনের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী কেন্দ্রে ব্যালট পেপার ও ব্যালট বাক্স সরবরাহ করে। বর্তমানে অবশ্য স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স ব্যবহৃত হচ্ছে। ভোটদান প্রক্রিয়ায় আরও গতিশীলতা আনয়নের জন্য নির্বাচন কমিশন বর্তমানে ভোট সংগ্রহে ইভিএম (ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন) পদ্ধতি ব্যবহারের পক্ষপাতী।

৭. **বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা প্রয়োগ :** নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের বিচার সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বর্তমান। নির্বাচন অনুষ্ঠানের শৃঙ্খলা রক্ষা, নির্বাচনী সহিংসতা রোধ ও নিরাপত্তার স্বার্থে নির্বাচন কমিশনকে বিচার সংক্রান্ত দায়িত্বও পালন করতে হয়। প্রার্থীর প্রার্থীতা বাতিল থেকে শুরু করে, জালভোট প্রদান এবং নির্বাচন অনুষ্ঠানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনের অধীনে কর্তব্যরত শাসনবিভাগের কর্মকর্তা তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিতে পারেন।

৮. **পর্যবেক্ষকদের সহযোগিতা প্রদান :** স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের আয়োজনে নির্বাচন কমিশন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ লক্ষ্যে কমিশন নির্বাচন চলাকালে বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক দলকে নির্বাচন পর্যবেক্ষণে সহযোগিতা প্রদান করেন। ফেমা (FEMA), ইইউ (EU) প্রভৃতি পর্যবেক্ষক দলের নির্বাচন পরবর্তী প্রতিবেদন নির্বাচনী স্বচ্ছতা সম্পর্কে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

সর্বোপরি নির্বাচন কমিশন হলো নির্বাচন কেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠান, গণতন্ত্রের স্বার্থে স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠান আয়োজনের মধ্যেই প্রতিষ্ঠানটির ভূমিকা ও সার্থকতা নিহিত।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের দুর্বল দিক : গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার এক পর্যায়ে নির্বাচন কমিশন একটি দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থায় জাতীয় নির্বাচনকালীন সময়ে নির্বাচিত সরকারের মেয়াদ না থাকায় বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন গুরুদায়িত্ব পালন করে। তৎকালীন সময় এই নির্বাচন কমিশনের যথাযথ দায়িত্ব পালনের ওপর দেশের প্রকৃত, উপযুক্ত ভবিষ্যৎ সরকারের ভাগ্য নির্ধারিত হয়। কিন্তু বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের বেশ কিছু দুর্বল দিক রয়েছে, যা প্রতিষ্ঠানটিকে অবাধ, স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। নিচে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের দুর্বল দিকসমূহ আলোচিত হলো :

১. **দলীয় লেজুড়বৃত্তি :** বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের সবচেয়ে ক্ষতিকর ও প্রশ্নবিদ্ধ বিষয় হলো কমিশনের সদস্যদের বিশেষ কোনো রাজনৈতিক দলের হয়ে কাজ করা। কমিশন সদস্যরা যদি বিশেষ কোনো রাজনৈতিক দলের হয়ে কাজ করেন তবে সেক্ষেত্রে নির্বাচন অনুষ্ঠান কলুষিত হতে বাধ্য। কলুষিত নির্বাচনে নির্বাচিত শাসক বা সরকার দেশ ও জাতির জন্যে কোনো কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না।

২. **অপর্যাপ্ত ও প্রশিক্ষণবিহীন জনবল :** নির্বাচন কমিশন একটি দেশের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। কিন্তু আমাদের দেশে নির্বাচন কমিশনের জনবল পর্যাপ্ত নয়। সহকারী নির্বাচন কমিশনারের সংখ্যা নিতান্তই অপ্রতুল। তাছাড়া নির্বাচন কমিশনে যে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী রয়েছেন তারাও যথাযথভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নন। সুতরাং অপর্যাপ্ত ও প্রশিক্ষণবিহীন জনবল বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের বিশেষ দুর্বল দিক।

৩. **সেকেলে কারিগরি যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তিজ্ঞানের স্বল্পতা :** বর্তমান যুগ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ। বিজ্ঞানের সুবাদে মানুষের কল্যাণে সর্বত্রই এখন চোখে পড়ছে নিত্যনতুন প্রযুক্তি ও কারিগরি যন্ত্রপাতি। অথচ আমাদের দেশে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়সহ বিভিন্ন শাখা অফিসে এখনও চোখে পড়ে মান্ধাতার আমলের টাইপরাইটার। ভোটগ্রহণের ক্ষেত্রে এখনও আমরা ইভিএম পদ্ধতিকে সাদরে গ্রহণ করতে পারছি না। তাছাড়া কম্পিউটার কিংবা ইভিএম পদ্ধতি গ্রহণের ক্ষেত্রে কর্মকর্তাদের মাঝে রয়েছে প্রযুক্তিজ্ঞানের স্বল্পতা।

৪. **অর্থনৈতিক সংকট :** অর্থনৈতিক সংকট বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ দুর্বল দিক। অপ্রতুল অর্থনৈতিক বরাদ্দ প্রাপ্তির কারণে নির্বাচন কমিশন তাদের নীতি সঠিক সময়ে বাস্তবায়ন করতে পারে না। পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থের অভাবে কমিশন আধুনিক যন্ত্রপাতি যেমন ক্রয় করতে পারে না, তদ্রূপ অর্থের অভাবে কর্মকর্তাদের আধুনিক প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণও দিতে পারে না।

৫. **সমন্বয়হীনতা :** সমন্বয়হীনতা বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের অন্যতম ত্রুটি। কাজের ক্ষেত্রে দলীয় আদর্শের ভিন্নতার কারণে কমিশনের সদস্যদের মাঝে প্রায়ই সমন্বয়হীনতা দেখা দেয়। নির্বাচন কমিশনের কেন্দ্র ও বিভিন্ন শাখার মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কাজের ক্ষেত্রেও সমন্বয়হীনতা রয়েছে। তাছাড়া নির্বাচন চলাকালীন সময়ে সমন্বয়হীনতার কারণে শাসন বিভাগের সহায়তা পেতেও নির্বাচন কমিশনকে বেগ পেতে হয়।

৬. **প্রচার বিমুখ :** সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান আয়োজনের লক্ষ্যে নির্বাচনের নীতিমালা সম্পর্কিত প্রচারণার প্রয়োজন রয়েছে। পোস্টার, লিফলেট এবং বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে নির্বাচনী নীতিমালা প্রচারের মাধ্যমে ভোটার এবং প্রার্থীর মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করা যায়। কিন্তু বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের মাঝে এ সম্পর্কিত প্রচারণার প্রবণতা কম লক্ষ্য করা যায়।

৭. **স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব :** বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের কাজের মধ্যে স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে। কমিশনের কর্মকর্তারা কোনো কোনো সময় বিশেষ কোনো প্রার্থীর হয়ে কাজ করেন। ভোটার সংখ্যা, কাস্টিং ভোট, নির্বাচনী ফলাফল প্রভৃতি বিষয়ের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন সম্পর্কে জনগণের প্রায়ই অভিযোগ থাকে। তাছাড়া, কমিশনের সদস্য ও কর্মকর্তাদের কাজের জবাবদিহিতার বিষয়টি স্পষ্ট নয়।

উপসংহার : সর্বোপরি নির্বাচন অনুষ্ঠানের আয়োজনের দায়িত্বলাভ একটি মহান দায়িত্ব। কাজেই নির্বাচন কমিশনকে এ মহান দায়িত্ব পালনের জন্যে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত হওয়া প্রয়োজন।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

০২। সংবিধানের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন গঠন ও এর কার্যাবলী আলোচনা করে এতে কোনো পরিবর্তন সুপারিশ করেন কি? *[৩২তম বিসিএস]*

***অথবা,* বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা করুন। একে অধিকতর কার্যকর করতে আপনার প্রস্তাবনা উপস্থাপন করুন।**

উত্তর : বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন একটি সাংবিধানিক সংস্থা। সাংবিধানিকভাবে এটি স্বতন্ত্র, নিরপেক্ষ এবং স্বাধীন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৮নং অনুচ্ছেদের ১নং ধারায় উল্লেখ আছে, 'প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া এবং রাষ্ট্রপতি সময়ে সময়ে যেরূপ নির্দেশ করিবেন সেরূপ সংখ্যক অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া বাংলাদেশের একটি নির্বাচন কমিশন থাকিবে ....।' বাংলাদেশের যে কোনো পর্যায়ের নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের ওপর ন্যস্ত।

নির্বাচন কমিশন : একটি স্বাধীন সাংবিধানিক সংস্থা হিসেবে জাতীয় ও স্থানীয় সরকার পর্যায়ের সকল নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা, নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ, ভোটার তালিকা তৈরি, ভোটগ্রহণ তত্ত্বাবধান, নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা এবং নির্বাচনী অভিযোগ-মোকদ্দমা মীমাংসার লক্ষ্যে নির্বাচনী ট্রাইবুনাল গঠন করা নির্বাচন কমিশনের কাজ। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের সপ্তম ভাগে নির্বাচন কমিশনের গঠন-কাঠামো, ক্ষমতা ও দায়িত্ব নির্ধারণ করা আছে। বাংলাদেশের সংবিধানে বলা হয়েছে যে, 'প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া এবং রাষ্ট্রপতি সময়ে সময়ে যেরূপ নির্দেশ করিবেন, সেই রূপ সংখ্যক অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া বাংলাদেশের একটি নির্বাচন কমিশন থাকিবে এবং উক্ত বিষয়ে প্রণীত কোনো আইনের বিধানাবলী-সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়োগ দান করিবেন।' স্বাধীন সংস্থা হিসেবে নির্বাচন কমিশন প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি, সংসদ ও স্থানীয় সরকার পর্যায়ে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান নিশ্চিত করতে সাংবিধানিকভাবে শপথের দ্বারা দায়বদ্ধ। নির্বাচন কমিশন সব রাজনৈতিক দলের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও যোগাযোগ রক্ষা করে। নির্বাচনী তফসিল, নির্বাচনী প্রক্রিয়া ও নির্বাচনের সামগ্রিক আয়োজনের ব্যাপারে সব রাজনৈতিক দলের সাথে আলাপ-আলোচনার উদ্যোগ নেয়া হয়। ভোটার নিবন্ধন, ভোটার তালিকা তৈরি ও হালনাগাদ করা ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়েও নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে নির্বাচন কমিশন আলাপ আলোচনা করে।

নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা : দেশের জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের সকল নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের ওপর ন্যস্ত হওয়ায় এ সংস্থাকে সর্বাত্মকভাবে স্বাধীন হওয়া জরুরি। আর এ উদ্দেশ্যেই দেশে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের লক্ষ্যে ২৯ জানুয়ারি ২০০৮ উপদেষ্টা পরিষদ স্বাধীন নির্বাচন কমিশন সচিবালয় গঠনের অধ্যাদেশ অনুমোদন করে। এরপর প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে নির্বাহী কর্তৃত্ব দিয়ে নির্বাচন কমিশন (ইসি) সচিবালয় অধ্যাদেশ ২০০৮ জারি করা হয়। ৯ মার্চ ২০০৮ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জারিকৃত অধ্যাদেশের ফলে নির্বাচন কমিশন প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়। এর ফলে নির্বাচন কমিশনের আর্থিক ও প্রশাসনিক কাজ সরকার নিয়ন্ত্রণ মুক্ত হয়। কমিশনের সচিব হন সচিবালয়ের প্রশাসনিক প্রধান এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনার হন নির্বাহী প্রধান।

নির্বাচন কমিশনের গঠন : একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং কয়েকজন নির্বাচন কমিশনার নিয়ে নির্বাচন কমিশন গঠিত। প্রণীত আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারগণকে নিয়োগ দান করেন। নির্বাচন কমিশনারের পদের মেয়াদ তার কার্যভার গ্রহণের তারিখ থেকে পাঁচ বছর। তবে কোনো নির্বাচন কমিশনার রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদত্যাগ করতে পারেন। গুরুতর অসদাচরণের জন্য দোষী হয়েছেন অথবা

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনে অযোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন এরূপ রিপোর্টে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন কমিশনারকে অপসারিত করতে পারেন। প্রধান নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব পালন করার পর কোনো ব্যক্তি প্রজাতন্ত্রের কোনো কর্মে নিয়োগ লাভ করতে পারবেন না। তবে কোনো নির্বাচন কমিশনার প্রধান নির্বাচন কমিশনারের পদে নিযুক্ত হতে পারবেন।

নির্বাচন কমিশনের কার্যাবলী : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৯(১) ও ১১৯(২)নং অনুচ্ছেদে নির্বাচন কমিশনের কার্যাবলী উল্লেখ করা আছে। নির্বাচন কমিশন নিম্নলিখিত কার্যাবলী সম্পাদন করে :

১. দেশের স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের সব নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও তত্ত্বাবধান।
২. জাতীয় সংসদ, পৌর কর্পোরেশন, জেলা পরিষদ, পৌরসভা এবং ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের নির্বাচন পরিচালনা।
৩. নির্বাচনের পূর্বে নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ।
৪. সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনার জন্য রিটার্নিং অফিসার ও পোলিং অফিসার নিয়োগ।
৫. এছাড়া নির্বাচন কমিশন আধা বিচারসংক্রান্ত কিছু ক্ষমতা ভোগ করে, যেমন—
   ক. সংসদ সদস্যদের অন্যান্য স্তরের নির্বাচনের জন্য গৃহীত মনোনয়নপত্র বাছাই করার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের ওপর ন্যস্ত। কমিশন কর্তৃক বাছাইকৃত মনোনয়নপত্র সংক্রান্ত বিতর্ক দেখা দিলে কমিশন উক্ত বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।
   খ. কোনো ব্যক্তি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর তার সদস্যপদের অযোগ্যতা সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন বা বিতর্ক দেখা দিলে বিষয়টি নির্বাচন কমিশনের নিকট প্রেরিত হয়। কমিশন উক্ত বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং তা চূড়ান্ত বলে গণ্য হয়।
৬. এসব দায়িত্ব ছাড়াও কমিশন সংবিধান অনুযায়ী এবং আইনের দ্বারা অর্পিত অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করে।

প্রধান নির্বাচন কমিশনারগণ : বাংলাদেশের বর্তমান প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী রকিব উদ্দীন আহমেদ। এ পর্যন্ত নিয়োগপ্রাপ্ত ১১ সিইসির মধ্যে ৭ জনই বিচারপতি। বিচারপতির বাইরে যে চার জন প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তারা হলেন মোহাম্মদ আবু হেনা (সপ্তম সিইসি), এম এ সাঈদ, ড. এ টি এম শামসুল হুদা এবং কাজী রকিবউদ্দিন আহমেদ। স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত যে ১১ জন সিইসি নিযুক্ত হয়েছেন। তারা হলেন :

নাম	মেয়াদকাল
১. বিচারপতি এম ইদ্রিস	৭ জুলাই ১৯৭২-৭ জুলাই ১৯৭৭
২. বিচারপতি এ কে এম নূরুল ইসলাম	৮ জুলাই ১৯৭৭-১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫
৩. বিচারপতি এ টি এম মাসুদ	১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫-১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০
৪. বিচারপতি সুলতান হোসেন খান	১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০-২৪ ডিসেম্বর ১৯৯০
৫. বিচারপতি এম এ রউফ	২৫ ডিসেম্বর ১৯৯০-১৮ এপ্রিল ১৯৯৫
৬. বিচারপতি এ কে এম সাদেক	২৭ এপ্রিল ১৯৯৫-৬ এপ্রিল ১৯৯৬
৭. মোহাম্মদ আবু হেনা	৯ এপ্রিল ১৯৯৬-৮ মে ২০০০
৮. এম এ সাঈদ	২৩ মে ২০০০-২২ মে ২০০৫
৯. বিচারপতি এম এ আজিজ	২৩ মে ২০০৫-২১ জানুয়ারি ২০০৭
১০. ড. এ. টি. এম শামসুল হুদা	৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৭-৫ ফেব্রুয়ারি ২০১২
১১. কাজী রকিবউদ্দিন আহমেদ	৯ ফেব্রুয়ারি ২০১২-বর্তমান

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

অধিকতর কার্যকর নির্বাচন কমিশনের জন্য প্রস্তাবনা : বাংলাদেশে নির্বাচন, নির্বাচন প্রক্রিয়া এবং নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে বিতর্ক খুবই গভীর। এজন্য দেশবাসী নিজেদের কাছে নিজেরা লজ্জিত, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছেও হেয়প্রতিপন্ন হয়েছে। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে এ ধরনের অবাঞ্ছিত বিতর্কের কারণ খুঁজে বের করে অবশ্যই নিষ্পত্তি করতে হবে। বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন এবং গ্রহণযোগ্য ও বিতর্কহীন নির্বাচনী ফল বৈধ সরকার গঠনের পূর্বশর্ত। একইভাবে নির্বাচন কমিশনের ওপর আস্থা ও নির্বাচন কমিশনের বিশ্বাসযোগ্যতা হলো সুষ্ঠু, অবাধ, বিশ্বাসযোগ্য ও বিতর্কহীন নির্বাচনের পূর্বশর্ত। তাই নির্দলীয়, নিরপেক্ষ ও ন্যায়ানুগ নির্বাচন কমিশন অতি আবশ্যক। একটি বিশ্বাসযোগ্য ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন গঠনের জন্য প্রস্তাব হলো :

১. কমিশনকে অবশ্যই পক্ষপাতহীন, নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ হতে হবে।
২. একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য অর্থাৎ ন্যূনতম সাত (৭) বছরের জন্য কমিশন সদস্যরা নিযুক্ত হবেন। মেয়াদ শেষে নির্বাচন কমিশনের কোনো সদস্যকে সরকারি কোনো লাভজনক পদে নিয়োগ দেয়া যাবে না।
৩. রাষ্ট্রপতি, সংসদ নেতা, বিরোধীদলীয় নেতা এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সাথে পরামর্শ করে কমিশনের সব সদস্যদের নাম সংসদে প্রস্তাব করবেন। সংসদে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে প্রস্তাব অনুমোদিত হতে হবে।
৪. যদি কোনো সদস্যের ব্যাপারে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা ও বিরোধী দলীয় নেতা একমত না হতে পারেন অথবা রাষ্ট্রপতি চেষ্টা চালিয়েও দু পক্ষের সমর্থিত সদস্য না পান তাহলে রাষ্ট্রপতি সুশীল সমাজের সাথে পরামর্শক্রমে যে কারো নাম সংসদে প্রস্তাব করতে পারবেন। তবে সেক্ষেত্রে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে তার প্রস্তাব অনুমোদিত হতে হবে।
৫. কমিশনের কোনো সিদ্ধান্ত এককভাবে নেয়া যাবে না, সব সিদ্ধান্ত অবশ্যই সমষ্টিগতভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে, প্রয়োজনে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে গৃহীত হতে হবে।
৬. চেয়ারম্যানের মর্যাদা হবে প্রধান বিচারপতির সমপর্যায়ের এবং সদস্যদের মর্যাদা হবে হাইকোর্টের বিচারক পর্যায়ের।
৭. নির্বাচন কমিশনের প্রয়োজনীয় পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রদান নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় নতুন আইন প্রণয়ন করতে হবে। আইনের আওতায় কমিশনকে তার ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। অসঙ্গত কাজের জন্য উচ্চ আদালতের বিচারপতিদের অপসারণের জন্য যেরূপ ব্যবস্থা আছে, কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের জন্যও সেরূপ ব্যবস্থা থাকতে হবে।
৮. আইনে নির্বাচন কমিশনের নির্বাচন সংক্রান্ত কার্যকলাপ উপজেলা, এমনকি ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করার জন্য সব রাজনৈতিক দলসহ সুশীলসমাজে গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সমন্বয়ে পর্যবেক্ষক কমিটি থাকতে হবে। এ কমিটি ইউনিয়ন পরিষদ স্তর অবধি নির্বাচন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত অভিযোগসমূহ দৈনন্দিন ভিত্তিতে লিপিবদ্ধ করবে এবং নির্বাচন কমিশনকে বিহিত ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সুপারিশ করবে।
৯. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত নির্বাচন পর্যবেক্ষকরা যাতে পর্যবেক্ষক কমিটির অংশ হতে পারে তারও বিধান রাখতে হবে।

উপসংহার : সর্বোপরি নির্বাচনের দায়িত্বে নিয়োজিত সরকারি প্রশাসনের সব স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ওপর নির্বাচন কমিশনের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং নির্বাচন তদারকিতে সরকারি প্রশাসনের গাফিলতি, পক্ষপাতিত্ব, অদক্ষতা ইত্যাদির জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও ব্যক্তিবর্গকে সরাসরি তাৎক্ষণিক ও চূড়ান্ত শাস্তি দেয়ার ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনের ওপর ন্যস্ত করতে হবে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

০৩। নির্বাচনী আইন কী? জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

উত্তর : নির্বাচন হলো গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার ভিত্তি। অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় যোগ্য, উপযুক্ত ও জনগণের পছন্দনীয় প্রার্থী সরকার পরিচালনার দায়িত্ব লাভ করে। বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থায় স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের দায়িত্ব পালন করে থাকে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন। নির্বাচন কমিশন একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন করার লক্ষ্যে নির্বাচনী তফসিল, নির্বাচনী প্রক্রিয়া ও নির্বাচনের সামগ্রিক আয়োজনের ব্যাপারে সব রাজনৈতিক দলের সাথে আলাপ আলোচনা করে থাকে। অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করতে নির্বাচন কমিশন সাংবিধানিকভাবে শপথের দ্বারা দায়বদ্ধ। সে লক্ষ্যে কমিশন কিছু নির্দিষ্ট বিধিমালা প্রয়োগ করে থাকেন। নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালার মধ্যে প্রধান দুটি হচ্ছে নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা ২০০৮ এবং ২০১৩ সালে সংশোধিত রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা ২০০৮।

নির্বাচনী আইন : নির্বাচনী আইন নির্বাচন সংক্রান্ত আইনবিধান। সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করা, প্রার্থী এবং প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচন কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীদের আচরণ ব্যাখ্যা এবং এ সম্পর্কিত বিধিবিধান লঙ্ঘন করলে লঙ্ঘনকারীদের শাস্তির বিধান নিশ্চিত করা নির্বাচনী আইনের লক্ষ্য।

বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধানে নির্বাচন কমিশন গঠনের বিধান রাখা হয়। রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ দান করেন। নির্বাচন কমিশন সংবিধান ও আইনের আওতায় দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন। সংবিধানের ১১৯ অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী সংসদ নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুত ও তত্ত্বাবধান, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ এবং নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত। নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব পদ্ধতি নির্ধারণ এবং কার্যক্রম পরিচালনার স্বার্থে উল্লেখ্য গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২, নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা ১৯৭২ এবং আচরণ বিধিমালা ১৯৯৬ এর কিছু কিছু ধারা সংশোধিত হয়ে বর্তমানে এই বিধিমালাগুলো যথাক্রমে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধনী) ২০১৩, নির্বাচন পরিচালনা (সংশোধনী) ২০০৮ এবং রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের আচরণ বিধিমালা ২০০৮ নামে পরিচিত। এসব আদেশ ও বিধিমালার সমন্বয়েই নির্বাচনী আইনবিধান গঠিত।

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা : বিধিমালা অনুযায়ী দেশের সকল নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারে। সেক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন যে নির্বাচনী আচরণ বিধিমালা প্রয়োগ করে থাকে, তা প্রতিটি রাজনৈতিক দল ও নির্বাচনী প্রার্থীকে মেনে চলতে হয়। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালার উল্লেখযোগ্য ধারাগুলোর বর্ণনা নিম্নরূপ—

১. **কোনো প্রতিষ্ঠানে চাঁদা, অনুদান ইত্যাদি প্রদান নিষিদ্ধ :** কোনো প্রার্থী কিংবা তার পক্ষ থেকে অন্য কোনো ব্যক্তি নির্বাচনপূর্ব সময়ে উক্ত প্রার্থীর নির্বাচনী এলাকার মধ্যে বা অন্যত্র অবস্থিত কোনো প্রতিষ্ঠানে প্রকাশ্যে বা গোপনে কোনো প্রকার চাঁদা বা অনুদান প্রদান করতে বা প্রদানের অঙ্গীকার করতে পারবেন না।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

২. **সার্কিট হাউজ, ডাক-বাংলো ইত্যাদি ব্যবহার :** সরকারি ডাক-বাংলো, রেস্ট হাউজ, সার্কিট হাউজ বা কোনো সরকারি কার্যালয়কে কোনো দল বা প্রার্থীর পক্ষে বা বিপক্ষে প্রচারের স্থান হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। তবে নির্বাচন পরিচালনার কাজে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ সরকারি ডাক-বাংলো, রেস্ট হাউস ও সার্কিট হাউজ ব্যবহারে অগ্রাধিকার পাবেন।

৩. **সভা সমিতি অনুষ্ঠান সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ :** কোনো নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা তার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্রপ্রার্থী কিংবা তাদের পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি নির্বাচনী প্রচারণার ক্ষেত্রে সমান অধিকার পাবে। তবে প্রতিপক্ষের সভা, শোভাযাত্রা এবং অন্যান্য প্রচারাভিযানে কোনো প্রকার বাধা দেয়া যাবে না।

কোনো রাজনৈতিক দল সভা করতে চাইলে প্রস্তাবিত সভার কমপক্ষে ২৪ ঘণ্টা পূর্বে তার স্থান ও সময় সম্পর্কে স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে। তবে জনগণের চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে এমন কোনো সড়কে জনসভা বা পথসভা করা যাবে না। জনসভা অনুষ্ঠানে বাধাদানকারী বা কোনো প্রকার গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভার আয়োজন করা কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না করে পুলিশের শরণাপন্ন হবেন।

৪. **পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ :** কোনো প্রার্থী কিংবা তার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি সমগ্রদেশে অবস্থিত সরকারি বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের স্থাপনাসমূহে কোনো প্রকার পোস্টার বা হ্যান্ডবিল লাগাতে পারবেন না। সিটি কর্পোরেশন এবং পৌর এলাকায় অবস্থিত কোনো দালান, দেয়াল, গাছ, বিদ্যুৎ ও টেলিফোনের খুঁটিসহ সমগ্রদেশে কোনো প্রকার যানবাহনে পোস্টার লাগানো যাবে না। তবে দেশের যে কোনো স্থানে পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ঝুলিয়ে রাখা যাবে।

কোনো প্রার্থীর পোস্টার, লিফলেট, হ্যান্ডবিল ইত্যাদির ওপর অন্য কোনো প্রার্থীর পোস্টার, লিফলেট হ্যান্ডবিল লাগানো যাবে না এবং উক্ত পোস্টার বা লিফলেটের কোনো প্রকার ক্ষতিসাধন করা যাবে না। পোস্টারে নিজ ছবি ও প্রতীক ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তির ছবি বা প্রতীক ছাপানো যাবে না। তবে প্রার্থী কোনো নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল থেকে মনোনীত হলে সেক্ষেত্রে তিনি তার বর্তমান দলীয় প্রধানের ছবি পোস্টারে ছাপাতে পারবেন। তবে কোনো অনুষ্ঠান, মিছিলে নেতৃত্বদান, প্রার্থনারত অবস্থা ইত্যাদি ভঙ্গিমায় ছবি পোস্টারে ছাপানো যাবে না। প্রার্থীর ব্যবহৃত ছবির আয়তন ২৩″ × ১৮″ এর এবং নির্বাচনী প্রতীকের সাইজ, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা উচ্চতা তিন মিটারের অধিক করা যাবে না।

৫. **যানবাহন ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ :** কোনো নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা তার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাদের পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি বাস, ট্রাক, মোটরবাইকসহ কোনো ধরনের যান্ত্রিক যানবাহন সহকারে মিছিল কিংবা কোনোরূপ শোডাউন করতে পারবেন না। মনোনয়নপত্র দাখিলের সময়ও কোনো প্রকার মিছিল কিংবা শোডাউন করা যাবে না। নির্বাচনী প্রচার কাজে হেলিকপ্টার বা অন্য কোনো আকাশযান ব্যবহার করা যাবে না। তবে দলীয় প্রধানের যাতায়াতের ক্ষেত্রে তা ব্যবহার করা যাবে কিন্তু যাতায়াতের সময় হেলিকপ্টার থেকে লিফলেট বা অন্য কোনো প্রকার প্রচার সামগ্রী প্রদর্শন বা বিতরণ করা যাবে না।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৬. **গেইট বা তোরণ নির্মাণ, প্যান্ডেল বা ক্যাম্প স্থাপন ও আলোকসজ্জাকরণ সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ :** কোনো নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা তার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাদের পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি নির্বাচনী প্রচারণায় কোনো গেইট বা তোরণ নির্মাণ কিংবা চলাচলের পথে কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবেন না। নির্বাচনী প্রচারণার অংশ হিসেবে বিদ্যুতের সাহায্যে কোনো প্রকার আলোকসজ্জা এবং ৪০০ বর্গফুটের অধিক স্থান নিয়ে কোনো প্যান্ডেল তৈরি করা যাবে না। কোনো সড়ক কিংবা জনগণের চলাচল ও সাধারণ ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত স্থানে কোনো নির্বাচনী ক্যাম্প স্থাপন করা যাবে না। নির্বাচনী প্রচারণার জন্য প্রার্থীর ছবি বা প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণামূলক কোনো বক্তব্য বা কোনো শার্ট, জ্যাকেট, ফতুয়া ইত্যাদি ব্যবহার করা যাবে না। নির্বাচনী ক্যাম্পে ভোটারগণকে কোনো প্রকার কোমল পানীয় বা খাদ্য পরিবেশন বা কোনোরূপ উপঢৌকন প্রদান করা যাবে না।

৭. **উস্কানিমূলক বক্তব্য বা বিবৃতি প্রদান, উচ্ছৃঙ্খল আচরণ এবং বিস্ফোরক বহন সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ :** কোনো নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা তার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থীর কিংবা তাদের পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি নির্বাচনী প্রচারণাকালে ব্যক্তিগত চরিত্র হনন করে বা কোনো ধরনের উস্কানিমূলক, সাম্প্রদায়িকতা বা ধর্মানুভূতিতে আঘাত হানে এমন কোনো বক্তব্য প্রদান করতে পারবেন না। মসজিদ, মন্দির, গির্জা বা অন্য কোনো ধর্মীয় উপাসনালয়ে কোনো প্রকার নির্বাচনী প্রচারণা চালানো যাবে না এবং নির্বাচন উপলক্ষে কোনো নাগরিকের স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির কোনোরূপ ক্ষতিসাধন করা যাবে না। নির্বাচন কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি ভোটকেন্দ্রের নির্ধারিত সীমানার মধ্যে অস্ত্র বা কোনো প্রকার বিস্ফোরক দ্রব্য বহন করতে পারবেন না।

৮. **প্রচারণার সময় :** কোনো নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা তার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাদের পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি ভোট গ্রহণের জন্য নির্ধারিত দিনের তিন সপ্তাহ সময়ের পূর্বে কোনো প্রকার নির্বাচনী প্রচার শুরু করতে পারবেন না।

৯. **মাইক ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ :** কোনো নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা তার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাদের পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি কোনো নির্বাচনী এলাকায় মাইক বা শব্দের মাত্রা বর্ধনকারী অন্যবিধ যন্ত্রের ব্যবহার দুপুর ২টা থেকে রাত ৮টার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

১০. **নির্বাচনী ব্যয়সীমা সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ :** কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নির্ধারিত নির্বাচনী ব্যয়সীমা কোনো অবস্থাতেই অতিক্রম করতে পারবেন না।

১১. **ভোটকেন্দ্রে প্রবেশাধিকার :** ভোটকেন্দ্রে নির্বাচনী কর্মকর্তা-কর্মচারী, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, নির্বাচনী এজেন্ট, নির্বাচনী পর্যবেক্ষক, কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তির এবং কেবল ভোটারদের প্রবেশাধিকার থাকবে। কোনো রাজনৈতিক দল বা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর কর্মীরা ভোটকেন্দ্রের অভ্যন্তরে ঘোরাফেরা করতে পারবেন না এবং পোলিং এজেন্টগণ তাদের নির্ধারিত স্থানে উপবিষ্ট থেকে নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করবেন।

১২. **দেয়াল লিখন সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ :** কোনো নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা তার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাদের পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি দেয়ালে লিখে কোনো প্রকার নির্বাচনী প্রচারণা চালাতে পারবেন না। কালি বা রং দ্বারা বা অন্য কোনোভাবে দেয়াল ছাড়াও কোনো দালান, খুঁটি, বাড়ি বা ঘরের ছাদ, সেতু, সড়ক দ্বীপ, রোড ডিভাইডার, যানবাহন বা অন্য কোনো স্থাপনায় প্রচারণামূলক কোনো লিখন বা অংকন করতে পারবেন না।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

১৩. **সরকারি সুবিধাভোগী কতিপয় ব্যক্তির নির্বাচনী প্রচারণা সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ :** সংসদের কোনো শূন্য আসনে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে সে ক্ষেত্রে সরকারের কোনো মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপ-মন্ত্রী কিংবা উক্ত মন্ত্রীদের পদমর্যাদাসম্পন্ন সরকারি সুবিধাভোগী কোনো ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকায় নির্বাচন-পূর্ব সময়ের মধ্যে কোনো সফর বা নির্বাচনী প্রচারণায় যেতে পারবেন না। তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি উক্ত নির্বাচনী এলাকার ভোটার হলে কেবল ভোট প্রদানের জন্য উক্ত এলাকায় যেতে পারবেন। অন্যদিকে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর নির্বাচনী এলাকায়, সংশ্লিষ্ট জেলায় বা অন্য কোথাও কোনো নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা তার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাদের পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি নির্বাচনী কাজে সরকারি প্রচার যন্ত্রের, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, সরকারি যানবাহন এবং রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা ভোগ বা ব্যবহার করতে পারবেন না।

১৪. **বিধিমালার বিধান লঙ্ঘন শাস্তিযোগ্য অপরাধ :** কোনো প্রার্থী বা তার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি নির্বাচন-পূর্ব সময়ে এই বিধিমালার কোনো বিধান লঙ্ঘন করলে অনধিক ছয় মাসের কারাদণ্ড অথবা পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। অন্যদিকে কোনো নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলও নির্বাচন-পূর্ব সময়ে এই বিধিমালার কোনো বিধান লঙ্ঘন করলে অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে।

উপসংহার : একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে নির্বাচনী আচরণ বিধিমালা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রণীত এসব আচরণ বিধিমালা রাজনৈতিক দল ও নির্বাচনী প্রার্থীর উদ্দেশ্যে রচিত। ১৯৭২ সালের গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনকে আচরণ বিধিমালা লঙ্ঘনকারীর বিরুদ্ধে সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। আচরণ বিধিমালা লঙ্ঘন করলে নির্বাচন কমিশন যে কারও বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, সংবিধান ও গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ সুষ্ঠু, স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনকে যে ক্ষমতা দিয়েছে প্রকৃত অর্থে নির্বাচন কমিশন তার ক্ষমতা সেরূপ প্রয়োগ করছে না। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক শোনা যায়। অতএব একটি স্বাধীন ও সাংবিধানিক সংস্থা হিসেবে নির্বাচন কমিশনকে জনগণের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্যে আর বেশি দক্ষ, বলিষ্ঠ ও ত্রুটিমুক্ত হতে হবে।

০৪ ❙ বাংলাদেশে নির্বাচনের ক্ষেত্রে নির্বাচন পর্যবেক্ষক দলসমূহের ভূমিকা উল্লেখ করুন।

উত্তর : গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ নির্বাচন। ত্রয়োদশ শতকে ইংল্যান্ডে সংসদীয় ব্যবস্থা গড়ে ওঠার মধ্য দিয়ে নির্বাচনী প্রক্রিয়া সূচিত হয়। এরপর ধীরে ধীরে বিভিন্ন নির্বাচনী প্রক্রিয়া সূচিত হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন নির্বাচনী আইনের (যেমন ১৬৯৪ সালের ট্রিনিয়াল অ্যাক্ট এবং ১৭১৬ সালের সেপ্টেনিয়াল অ্যাক্ট) মাধ্যমে এর নিয়মিতকরণ এবং উনিশ শতকে প্রণীত সংস্কার বিলগুলোর মাধ্যমে ভোটাধিকারের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয়। ১৮৭২ সালে গোপন ব্যালট পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়। ১৯২৮ সালে সর্বজনীন ভোটাধিকারের বিধান চালু হয়। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে নির্বাচনের গুরুত্ব অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলাদেশে নির্বাচনের ক্ষেত্রে নির্বাচন পর্যবেক্ষক দলসমূহের ভূমিকা তাই অনস্বীকার্য। সুষ্ঠু নির্বাচন একটি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং অগ্রযাত্রাকে ত্বরান্বিত করে। নরওয়ের Los-sentert University, Bergon-এর অধ্যাপক Mr.Valdersin-এর মতে Local Government is the yardstick of Good Governance.'

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

পর্যবেক্ষক : পর্যবেক্ষক হচ্ছে পর্যবেক্ষণকারী বা পরিদর্শক। পর্যবেক্ষক দলসমূহের সদস্যই হলো পর্যবেক্ষক। পর্যবেক্ষক দলসমূহ দেশি-বিদেশিদের সমন্বয়ে গঠিত হতে পারে। বিভিন্ন বিদেশি সংস্থা বা পর্যবেক্ষক দল এদেশের প্রকৃত নাগরিকদের নিয়ে পরিচালিত হয়। নির্বাচনের সময় তারা নিবিড়ভাবে নির্বাচনের কার্যক্রমের চিত্র তুলে ধরেন। শুধুমাত্র নির্বাচন কমিশন অনুমোদিত পর্যবেক্ষণ সংস্থার পর্যবেক্ষকগণই নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করতে পারবে। পর্যবেক্ষক সংস্থা বা দলসমূহের সদস্যই হচ্ছে পর্যবেক্ষক। পর্যবেক্ষক হিসেবে নিয়োগ লাভের জন্য একজন ব্যক্তির কিছু যোগ্যতা থাকা আবশ্যক। প্রথমত, বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে, বয়স পঁচিশ বা তদূর্ধ্ব হতে হবে। দ্বিতীয়ত, শিক্ষাগত যোগ্যতা এস. এস. সি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। তৃতীয়ত, কোনো নির্বাচনে প্রার্থী হবার অযোগ্য হতে পারবে না। চতুর্থত, নিবন্ধিত বা নির্বাচন কমিশন থেকে অনুমোদিত পর্যবেক্ষক সংস্থা থেকে মনোনীত হতে হবে। পঞ্চমত, কোনো রাজনৈতিক দল বা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী কোনো প্রার্থীর সাথে ব্যক্তিগত স্বার্থ সংশ্লিষ্টতা থাকতে পারবে না। সর্বত একজন পর্যবেক্ষক পর্যবেক্ষকদের নীতিমালা ও নির্বাচন সংশ্লিষ্ট আইন মেনে চলতে বাধ্য থাকবে। পর্যবেক্ষকরা সফলভাবে তাদের কাজ সম্পন্ন করলে পর্যবেক্ষক সংস্থাগুলোর কার্যক্রম সফল হবে।

পর্যবেক্ষক দলসমূহের প্রয়োজনীয়তা : নির্বাচন চলাকালীন সময়ে পর্যবেক্ষক দলসমূহের ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। পর্যবেক্ষক দলসমূহের তদারকির কারণেই নির্বাচন আরো সুষ্ঠু ও সুন্দর হয়। নির্বাচন কেন্দ্রগুলোতে তাদের সরব উপস্থিতি নির্বাচন প্রক্রিয়াকে সহায়তা করার লক্ষ্যে পর্যবেক্ষক দলসমূহ কাজ করে যায়। পর্যক্ষেকগণ নিরপেক্ষভাবে কাজ করে দেশের সম্মান অটুট রাখে এবং নির্বাচনকে গতিশীল করতে প্রভূত সাহায্য করে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রায়শ সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে ফলে দেশ ও জাতি গভীর সংকটে পড়ে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ নির্বাচন আর নির্বাচনকে ফলপ্রসূ করার জন্য সার্বিক প্রক্রিয়ার অন্যতম একটি মাধ্যম হচ্ছে পর্যবেক্ষক দলসমূহের কার্যক্রম। সামরিক সরকারের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এ সরকার ক্ষমতাগ্রহণের পর তারা প্রায় সকলেই নিজেদের দেশপ্রেমিক ও নিরপেক্ষ হিসেবে জনগণের কাছে বিশ্বস্ত রাখতে চায়। সময়ের প্রেক্ষাপটে এ সরকার নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এমনকি রাজনৈতিক দলও গঠন করেন। নির্বাচনের প্রয়োজন হলে তারা অনেকে জয়লাভ করার জন্য কারচুপির আশ্রয় নেয় ফলে নির্বাচন হয়ে ওঠে তামাশার। সবধরনের নির্বাচনকে গ্রহণীয় করে তোলার জন্য সার্থক নির্বাচন প্রয়োজন। সুষ্ঠু ও সুন্দর নির্বাচনের প্রয়োজনে পর্যবেক্ষক দলসমূহের ভূমিকা ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে পর্যবেক্ষক দল : বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীনতার পর প্রথম জাতীয় নির্বাচন হয়েছিল ১৯৭৩ সালে। দ্বিতীয় জাতীয় নির্বাচনটি হয়েছিল ১৯৭৯ সালে। নির্বাচনের দিক থেকে এ নির্বাচনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ ১৯৭৫ সালের আগস্ট মাসে সামরিক সরকার আগমনের পর এ নির্বাচন গণতন্ত্র উত্তরণের চূড়ান্ত পর্যায়, সেসময় দেশ গভীর নেতৃত্ব সংকটে পড়ে তখন নির্বাচন জরুরি হয়ে পড়ে কিন্তু রাজনৈতিক অপশক্তি মাথা চাড়া দিয়ে ক্ষমতা আকড়ে থাকতে চায় সেই সঙ্গে ক্ষমতা দখল করে রাখতে চায়। ১৯৭৫ সালের সামরিক অভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশের রাজনীতিতে পট পরিবর্তন দেখা দেয় বঙ্গবন্ধুর হত্যার পর খোন্দকার মোশতাক আহমদ রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ৩ নভেম্বর ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে আরেকটি অভ্যুত্থান ঘটে। ৫ নভেম্বর খালেদ মোশাররফ মোশতাক আহমদকে বিচারপতি এস এম সায়েমের

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে বাধ্য করেন। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে বারো বছরের মধ্যে দুইবার সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। এ সময় মেজর জিয়াউর রহমান সামরিক আইন জারি করে ক্ষমতা দখল করেন। পরে তিনি হ্যাঁ/না ভোট গ্রহণ করে রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। সামরিক অভ্যুত্থানে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর আব্দুস সাত্তার রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত হন। জেনারেল এরশাদ ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ ক্ষমতা দখল করেন। রাষ্ট্রপতি এরশাদ তার ক্ষমতাকে বৈধ করার উদ্দেশ্যে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার (Electoral Process) ব্যবস্থা নেন এবং সিরিজ আকারে বিভিন্ন নির্বাচন যেমন— ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন, পৌরসভা নির্বাচন, উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচন, জাতীয় সংসদ নির্বাচন, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন এমনকি গণভোটও অনুষ্ঠিত করেন। বাংলাদেশের রাজনীতিতে এরশাদ দীর্ঘ নয় বছর ক্ষমতায় থাকেন। জেনারেল এরশাদ ক্ষমতায় থাকায় সময় বিভিন্ন পদক্ষেপ ও কৌশল অবলম্বন করেন। তিনি জনসমর্থন আদায়ের জন্য নানা পদ্ধতি অবলম্বন করেন। তার সে পদ্ধতি বা প্রদত্ত নির্বাচনসমূহ জনগণের কাছে কখনও অবাধ নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হিসেবে গ্রহণযোগ্য হয়নি। নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে ১৯৮৬ সালের ৭ মে তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হলে বিরোধী দলসমূহ এ নির্বাচনকে প্রহসনমূলক নির্বাচন বলে আখ্যায়িত করেন।

নির্বাচনে ব্যাপক সন্ত্রাস সৃষ্টি এবং ভোট ডাকাতির অভিযোগ উত্থাপিত হয়। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা এ নির্বাচনকে প্রহসনমূলক ও ভোট ডাকাতির নির্বাচন বলে ক্ষান্ত হননি তিনি অভিযোগ করেন এটা মিডিয়া ক্যু। এরশাদ সরকারের আমলে যতগুলো নির্বাচন হয়েছিল তার সবগুলোই ছিল প্রহসনমূলক নির্বাচন। এ তথ্যগুলো পাবার জন্য পর্যবেক্ষকদলসমূহ অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করেন। এরশাদ সরকার স্বীয় শাসনামলকে বৈধ করার লক্ষ্যে নির্বাচন দেয় আর এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করতে গিয়ে তিনি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে চরমভাবে উপেক্ষা করেন। ভোট কারচুপি হতে শুরু করে নিজস্ব দল জাতীয় পার্টি চর দখলের ন্যায় ভোট কেন্দ্রগুলো দখল করে নির্বাচনী ফলাফল তাদের অনুকূলে আনয়ন করে। ফলে জনগণ নির্বাচনের প্রতি অনেকটা বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে। এ ধরনের নির্বাচনে মিডিয়ার পাশাপাশি পর্যবেক্ষক দল নির্বাচনের সঠিক তথ্য জনসম্মুখে তুলে ধরার প্রয়াস পায়। যার ফলশ্রুতিতে সরকার বা নীতি নির্ধারকরা সঠিকভাবে নির্বাচন গ্রহণের প্রচেষ্টা করেন। সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে তাই পর্যবেক্ষকদলসমূহের ভূমিকা আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। প্রত্যেক পর্যবেক্ষক সংস্থা প্রতি দলে অনধিক পাঁচজন করে একাধিক ভ্রাম্যমান পর্যবেক্ষক দল নিয়োগ করতে পারবে। এভাবে গঠিত দল নির্ধারিত ইউনিটের সকল ভোটকেন্দ্রের প্রতি বুথে স্বল্প সময়ের জন্য অবস্থান ও কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করতে পারবে। তাই বলা যায় বাংলাদেশের নির্বাচন পর্যবেক্ষণে পর্যবেক্ষক দলসমূহের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বিভিন্ন নির্বাচনে পর্যবেক্ষক দলসমূহের ভূমিকা : বাংলাদেশে বিভিন্ন নির্বাচন ছাড়াও এ যাবত দশটি জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ৭ মার্চ ১৯৭৩ সালে, দ্বিতীয়টি ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯ সালে, তৃতীয়টি ৭ মে ১৯৮৬ সালে, চতুর্থটি ৩ মার্চ ১৯৮৮ সালে, পঞ্চমটি ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ সালে, ষষ্ঠটি ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬ সালে, সপ্তমটি ১২ জুন ১৯৯৬ সালে, অষ্টমটি ১ অক্টোবর ২০০১ সালে, নবমটি ২৯ ডিসেম্বর ২০০৮ সালে এবং দশম নির্বাচনটি অনুষ্ঠিত হয় ৫ জানুয়ারি ২০১৪ সালে। প্রায় প্রতিটি নির্বাচনই ত্রুটিযুক্ত হওয়ায় পর্যবেক্ষক দলসমূহের ভূমিকা আরো বেড়ে যায়। পর্যবেক্ষক দলসমূহ বিভিন্ন জায়গার তথ্যভিত্তিক রিপোর্ট প্রদান করেন। এর ফলে নির্বাচনের সার্বিক দিক স্বচ্ছতার সাথে উঠে আসে অল্প কথায় বলতে গেলে

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

নির্বাচনের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয় পর্যবেক্ষক দলসমূহের নিজস্ব প্রচেষ্টায়। তবে পর্যবেক্ষকেরা কোনোভাবেই নির্বাচনকে প্রভাবিত করে না। নির্বাচন কমিশন নির্বাচনকে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করার প্রাণান্ত চেষ্টা করেন। পর্যবেক্ষকগণ নির্বাচন পর্যবেক্ষণের সময় অবশ্যই ভোটারের ভোট প্রদানের অধিকারের প্রতি এবং দক্ষতার সাথে নির্বাচন পরিচালনার জন্য নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তাদের কাজের বিষয়ে মনোযোগী থাকবেন। পর্যবেক্ষণগণ নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করেন না এবং যেখানে অবস্থান করলে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় কোনো বাধার সৃষ্টি হবে না ভোটকেন্দ্রের ভিতর এমন জায়গায় অবস্থান করে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করবেন।

বিভিন্ন প্রকার পর্যবেক্ষক দলসমূহ : বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিদেশি বিভিন্ন দেশ, সংস্থা পর্যবেক্ষক দলসমূহ প্রেরণ করেন। তারা সরেজমিনে নির্বাচনের সার্বিক তথ্য তুলে ধরার চেষ্টা করেন। বাংলাদেশে বিভিন্ন নির্বাচনে বিভিন্ন সময়ে যেসব দেশ বা সংস্থা কাজ করেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে জাতিসংঘ নির্বাচন সহায়ক সচিবালয়, এশিয়ান নেটওয়ার্ক ফর ফ্রি ইলেকশন্‌স, জার্মানির পর্যবেক্ষক গ্রুপ বিদেশি পর্যবেক্ষক মিশন, ভোট অবজারভেশন ফর ট্রান্সপারেন্সি এ্যান্ড এমপাওয়ারমেন্ট (VOTE), ইউরোপীয় ইউনিয়ন পর্যবেক্ষক টিম, সার্ক ফোরাম, কমনওয়েলথ, মার্কিনভিত্তিক এনডিআই এশিয়া ফাউন্ডেশন, নরওয়ে জিয়াস ইত্যাদি। বাংলাদেশের স্থানীয় অনেক NGO পর্যবেক্ষক দলসমূহের সঙ্গে কার্যক্রম পরিচালনা করেন এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে— ব্রাক, প্রশিকা, আশা, ওয়েভ, খান ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশের মানবাধিকার কমিশনসহ আরও অনেক প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশের বিভিন্ন নির্বাচনে তারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

পর্যবেক্ষক দলসমূহের কার্যক্রম : পর্যবেক্ষকরা পর্যবেক্ষণ করে তাদের নির্দিষ্ট ফরম জমা দিবে। ভোট গ্রহণ সম্পন্ন হলে এক মাসের মধ্যে পর্যবেক্ষক সংস্থা পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ফরম EO-4 পূরণ করে নির্বাচন পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে একটি সামগ্রিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে। ঐ প্রতিবেদনে ভবিষ্যতে নির্বাচন ব্যবস্থাপনা কিভাবে আরও উন্নত করা যায় সে সম্পর্কে সুপারিশমালা থাকবে। তবে এই প্রতিবেদনের কারণে সংশ্লিষ্ট সংস্থা তাদের নিজস্ব পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক অন্যান্য প্রতিবেদন প্রস্তুতে কোনোভাবেই বাধাগ্রস্ত হবে না। পর্যবেক্ষক সংস্থার দেওয়া তথ্যগুলো নির্বাচনের হালচাল তুলে ধরে। যেকোনো জাতি তথা সমাজের উন্নতির ক্ষেত্রে নির্বাচনের ভূমিকা অপরিসীম। সুষ্ঠু নির্বাচন সেক্ষেত্রে আরো জরুরি। পর্যবেক্ষক সংস্থা ন্যায়নিষ্ঠ সমালোচনার মধ্য দিয়ে নির্বাচনের দোষ-ত্রুটি সংশোধনের পথ দেখাতে পারে তেমনি জাতীয় উন্নতির জন্য যুক্তিসংগত সুপারিশও রাখতে পারে। সুতরাং এজন্য সরকারের উদার ও সহিষ্ণু নীতি থাকা প্রয়োজন। পর্যবেক্ষক মোতায়েনের একক ইউনিট হবে উপজেলা। মেট্রোপলিটন থানা অথবা সংসদীয় নির্বাচনী এলাকা এবং এর ভিত্তিতেই পর্যবেক্ষক নিয়োগের মাত্রা (Scale) নির্ধারণ করা হয়।

উপসংহার : পর্যবেক্ষক দলসমূহ নিরপেক্ষ থেকে নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে। গণতন্ত্রের ধারা অব্যাহত থেকে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা লাভের প্রত্যাশা পর্যবেক্ষক দলসমূহের। স্বাভাবিক নির্বাচন জনগণের সরকার উপহার দেয়। যে কোনো নির্বাচন সুষ্ঠু সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হলে জনগণ তার সুফল ভোগ করে। নির্বাচন প্রক্রিয়া ব্যাহত হলে দেশ ও জাতি গভীর সংকটে নিপতিত হয়। দেশের অর্থনীতি বাধাপ্রাপ্ত হয়ে সকল অগ্রগতিকে থামিয়ে দেয়। সরকার এবং জনগণের মধ্যে সেতু হিসেবে নির্বাচন বড় ভূমিকা পালন করে। তাই সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে পর্যবেক্ষক দলসমূহের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

০৫। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (RPO) কি? ২০১৩ সালে পাসকৃত গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধনী) বিল-২০১৩ এর উল্লেখযোগ্য ধারাগুলো বর্ণনা করুন।

উত্তর : গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ বা The Representation of the Peoples Order (RPO) হলো একটি দেশের প্রতিনিধি নির্বাচন সংক্রান্ত বিধিমালা। কোনো কোনো দেশে এটি গণপ্রতিনিধিত্ব আইন বা আরপিএ নামে পরিচিত। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের স্থপতি রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক নির্বাচন সংক্রান্ত একটি আদেশ দ্য রিপ্রেজেন্টেশন অব দ্য পিপল অর্ডার (আরপিও), ১৯৭২ বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে আইন হিসেবে ব্যবহার হয়ে আসছে। তবে এর কিছু কিছু ধারা বিভিন্ন সময়ে জাতীয় সংসদে পাস হয়ে পরিবর্তিত হয়েছে। সর্বশেষ ২০১৩ সালে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধনী) বিল, ২০১৩ জাতীয় সংসদে পাসের মাধ্যমে আরপিও এর সংশোধন হয়। তবে বাংলাদেশের অন্যান্য নির্বাচন যেমন ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও সিটি করপোরেশন নির্বাচনের ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক বিধিমালা তথা জাতীয় সংসদে পাসকৃত পূর্ণাঙ্গ আইন থাকলেও জাতীয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে এখনো পূর্ণাঙ্গ আইন তথা এ্যাক্ট হয়নি। বরং ১৯৭২ সালে প্রণীত রাষ্ট্রপতির আদেশ বলেই দেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রতিটি জাতীয় নির্বাচন। তবে সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির আদেশ বা অধ্যাদেশও আইনের স্বীকৃত হওয়ায় এবং ১৯৭৩ সালে জাতীয় সংসদে এটি অনুমোদিত হওয়ায় গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশও যে আইন তা নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই। কয়েকবার এই আদেশটিকে এ্যাক্ট এ রূপান্তর করার চেষ্টা করা হলেও রাষ্ট্রপতির আদেশের ঐতিহ্য অক্ষুণ্ন রাখতে এবং এর কারণে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোনোরূপ সমস্যা না হওয়ায় এখন পর্যন্ত নির্বাচনের এই আইনটি আদেশ নামেই বহাল রয়েছে।

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও) : গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ এর ইংরেজি রূপ হলো দ্য রিপ্রেজেন্টেশন অব দ্য পিপল অর্ডার যা সংক্ষেপে আরপিও নামে পরিচিত। জাতীয় সংসদে প্রতিনিধি বাছাইয়ে নির্বাচন সংক্রান্ত বিধিমালাই হলো আরপিও। বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই বিধিমালাটি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জারি হওয়ায় এটি গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ বা আরপিও নামে পরিচিত। আর যদি জাতীয় সংসদে এটি পাস হতো তাহলে এটি গণপ্রতিনিধিত্ব আইন বা আরপিএ নামে পরিচিত পেত। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত ও পাকিস্তানে এই বিধিমালাটি আরপিএ নামে পরিচিত।

১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির জারি করা এই আদেশনামাটি ১৯৭৩ সাল থেকে এখন পর্যন্ত এদেশে যতগুলো জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রতিটিতেই এটি আইন হিসেবে ব্যবহার হয়ে আসছে।

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এ যে ধারাগুলো বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলোর মধ্য থেকে মূল ধারাগুলোর বর্ণনা নিম্নরূপ।

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এ আদেশের ৩ ধারায় উল্লিখিত বিধান সাপেক্ষে নির্বাচন কমিশন তার নিজস্ব পদ্ধতি নির্ধারণ করবেন। আদেশের ৫ ধারা বলে নির্বাচন কমিশন যে কোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে তার যেরূপ দায়িত্ব পালন এবং যেরূপ সহায়তা প্রদানের প্রয়োজন সেরূপ দায়িত্ব বা সহায়তা প্রদানের নির্দেশ দিতে পারেন। নির্বাচনের সঙ্গে জড়িত কোনো কর্মকর্তা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে বাধা দান বা নির্বাচনী ফলাফলকে প্রভাবিত করার মতো কোনো কাজ করলে, নির্বাচন কমিশন যে কোনো সময় নির্বাচনের দায়িত্ব থেকে তাকে বা তাদের অব্যাহতি দিতে পারবেন এবং প্রয়োজনে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে নির্দেশ দিতে পারবেন।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৭ ধারা অনুসারে নির্বাচন কমিশন এক বা একাধিক এলাকায় সংসদ সদস্য নির্বাচনের জন্য একজন রিটার্নিং অফিসার ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য নির্বাচনের জন্য একজন রিটার্নিং অফিসার ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহকারি রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করতে পারবেন।

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের ১১ ধারায় মনোনয়নপত্র দাখিল ও বাছাইয়ের তারিখ নির্ধারণ ও প্রচারে নির্বাচন কমিশনকে প্রজ্ঞাপন জারির ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। ১২(১) ধারায় জাতীয় সংসদের সদস্যপদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা সদস্য হওয়ার যোগ্যতা বর্ণিত হয়েছে। ১৩ ধারায় মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় প্রার্থী স্বয়ং কিংবা বিধিতে বর্ণিত ব্যক্তিদের মাধ্যমে নির্দিষ্ট অঙ্কের জামানত প্রদানের কথা বলা হয়েছে। ১৪ ধারায় মনোনয়নপত্র বাছাই করার ক্ষমতা রিটার্নিং অফিসারের উপর অর্পিত হয়েছে। ১৬(১) ও ১৬(২) ধারা অনুসারে বৈধভাবে মনোনীত যে কোনো প্রার্থী তার নিজ স্বাক্ষরে লিখিত নোটিসের মাধ্যমে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে প্রার্থীতা প্রত্যাহার করতে পারবেন। আদেশের ১৭(১) ধারায় বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীর মৃত্যুজনিত কারণে সংশ্লিষ্ট এলাকায় নির্বাচন বাতিলের কথা বলা হয়েছে। ১৯ ধারায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার শর্ত বর্ণিত হয়েছে। ২০ ধারায় নির্বাচনী এলাকায় একাধিক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ক্ষেত্রে প্রার্থীদের পছন্দ অনুসারে প্রতীক বরাদ্দের বিধান রয়েছে।

২৭(২) ধারা অনুসারে ভোটার তালিকা অধ্যাদেশ ১৯৮২ এর ৮ ধারায় (২), (৩) অথবা (৪) উপধারায় বর্ণিত ভোটারদের জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পোস্টাল ব্যালটে ভোটদানের অধিকার দেওয়া হয়েছে।

আদেশের ৩৭ ধারায় প্রত্যেক নির্বাচনী এলাকার ফলাফল একত্র করা এবং ৩৭(৫) ধারায় প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর বা তার প্রতিনিধির অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ভোট পুনঃগণনার বিধান রয়েছে। ৩৯(১) ধারা অনুসারে রিটার্নিং অফিসার গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নির্বাচিত প্রার্থীর নাম ঘোষণা করবেন। ৪৪(ক) ধারার (১) উপধারা অনুসারে প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষদিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরবর্তী ৭ দিনের মধ্যে রিটার্নিং অফিসার প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়ের উৎস-বিবরণী দাখিলের নির্দেশ দিবেন। ৪৯(১) ধারা অনুসারে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী যে কোনো প্রার্থী নির্বাচনের বৈধতা সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করে অভিযোগ দাখিল করতে পারবেন।

আদেশের ৭৩ ধারায় ৪৪(ক) ও ৪৪(খ) এর বিধান লঙ্ঘন, ঘুষ গ্রহণ, ছদ্মবেশ ধারণ, নির্বাচনে অসঙ্গত প্রভাব খাটানো, কোনো প্রার্থীর নির্বাচনী সাফল্যে বিঘ্ন সৃষ্ট বা তার নিজস্ব বা আত্মীয়স্বজনের ব্যক্তিগত চরিত্র সম্পর্কে মিথ্যা বিবৃতিদান, কোনো প্রার্থীর প্রতীক বা প্রার্থিতা প্রত্যাহার সম্পর্কে মিথ্যা বিবৃতিদান, কোনো প্রার্থীর বিশেষ সামাজিক বা ধর্মীয় অবস্থানের পক্ষে বা বিপক্ষে ভোটদানের আহ্বান বা প্ররোচিতকরণ, ভোটার উপস্থিতিতে বা ভোট প্রদানে বাধা দান এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ঘুষ গ্রহণকে দুর্নীতিমূলক অপরাধ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ৭৪ ধারায় বেআইনি আচরণের ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে এবং এর জন্য জরিমানাসহ সর্বোচ্চ ৭ বছর ও সর্বনিম্ন ২ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। ৭৮ ধারায় ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠানের দিবাগত মধ্যরাত থেকে পূর্ববর্তী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে নির্বাচনী এলাকাভুক্ত সকল স্থানে জনসভা আহ্বান, অনুষ্ঠান ও তাতে যোগদান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে।

৮১(১) ধারায় ব্যালট চুরি, জালভোট দান, সীলমোহর ভেঙ্গে ফেলা, নির্বাচন পরিচালনায় বাধাদান প্রভৃতি অবৈধ হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে জরিমানাসহ সর্বোচ্চ ১০ বছর ও সর্বনিম্ন ৩ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে।

আরপিও এর ৮৪ ধারায় আরো উল্লেখ রয়েছে, নির্বাচন পরিচালনায় নিয়োজিত কর্মকর্তা বা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কোনো সদস্য কোনো প্রার্থীর পক্ষে বা বিপক্ষে কাজ করলে জরিমানাসহ সর্বোচ্চ ৫ বছর এবং সর্বনিম্ন ১ বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৯১ ধারা অনুসারে বল প্রয়োগ, ভয় প্রদর্শন এবং চাপসহ অন্যায় আচরণমূলক কার্যকলাপ চালু থাকার কারণে সুষ্ঠু ও আইনসম্মতভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠান নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি বলে মনে হলে নির্বাচন কমিশন সে পর্যায়ে যে কোনো ভোটকেন্দ্রের ভোটগ্রহণ বন্ধ ঘোষণা করতে পারেন। এছাড়া গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৯১(খ) ধারাবলে নির্বাচন কমিশন নির্বাচন আচরণ বিধিমালা ও নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা নামে দুটি বিধিমালা প্রণয়ণ করে।

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ সংশোধন বিল-২০১৩ : গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ বিধিমালাটির কিছু কিছু ধারার সংশোধনীর লক্ষ্যে সর্বশেষ ২০১৩ সালের অক্টোবরে 'দ্য রিপ্রেজেন্টেশন অব দ্য পিপল (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট-২০১৩ নামের একটি বিল জাতীয় সংসদে পাস হয়। এতে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও) ১৯৭২ এর কিছু কিছু ধারা সংশোধিত হয়ে রাষ্ট্রপতির ঐ আদেশগুলো পূর্ণাঙ্গ আইনে পরিণত হয়।

সংশোধিত এসকল ধারাগুলোর মধ্যে কয়েকটির ব্যাপারে রাজনৈতিক সচেতন মহলে যথেষ্ট বিতর্ক সৃষ্টি করলেও বাকীগুলোর বিষয়ে আইনপ্রণেতারা প্রশংসা করেছেন। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের যে সকল ধারা ২০১৩ সালে সংশোধিত হয়েছে সেগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা হলো নিম্নরূপ—

- আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধী আদালতে একাত্তরের মানবতাবিরোধী অপরাধের সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা সংসদ নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা।
- নির্বাচনে প্রার্থীদের ব্যয় ১৫ লাখ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২৫ লাখ টাকা নির্ধারণ। তবে দলীয় প্রধানদের নির্বাচনী ভ্রমণ ব্যয় এই হিসাবের বাইরে রাখা হয়েছে।
- নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলে ব্যক্তির অনুদানসীমা ১৫ লাখ থেকে বৃদ্ধি করে ২৫ লাখ টাকা এবং কোনো কোম্পানির অনুদানসীমা সর্বোচ্চ ৫০ লাখ টাকায় উন্নীত।
- প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নির্বাচন কমিশনে জামানতের পরিমাণ ১০ হাজার টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ২০ হাজার টাকায় উন্নীত।
- নির্বাচনকালীন সময়ে নির্বাচন কমিশনের প্রয়োজন মাফিক সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বদলির নির্দেশ দ্রুত কার্যকর করা।
- একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও সর্বাধিক চারজন নির্বাচন কমিশনার নিয়ে নির্বাচন কমিশন গঠন। যা পূর্বে সিইসিসহ অনির্দিষ্টসংখ্যক নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের বিধান ছিল।
- অন্যদিকে একটি ধারাকে বিলুপ্ত করা হয়েছে। যেখানে পূর্বে বলা ছিল দলীয় প্রার্থী হওয়ার জন্য ন্যূনতম ৩ বছর ঐ দলের সদস্য থাকার আবশ্যকতা। ধারাটি বিলুপ্ত হওয়ায় যে কোনো লোক দলে যোগ দিয়েই দলীয় প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে।

উপসংহার : গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও) ১৯৭২ বিধিমালা নির্বাচন কমিশনকে যথেষ্ট ক্ষমতা দিয়েছে। ১৯৭২ সালের পর থেকে এদেশে অনুষ্ঠিত সবগুলো সংসদ নির্বাচন গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও) ১৯৭২ বিধিমালা এর আওতায় হয়েছে। তাই গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ সংসদ নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও সার্থক করার লক্ষ্যে একটি দিকনির্দেশক ও আইন হিসেবে ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে। সর্বশেষ সংশোধনীতে কয়েকটি ব্যতীত সংশোধিত বাকিগুলো সময়োপযোগী পরিবর্তন হয়েছে। আরপিও প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নির্বাচন কমিশন নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা ও নির্বাচনী আচরণ বিধিমালা নামে দুটি পৃথক বিধিমালা প্রণয়ন করেছে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-০১ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন কতজন সদস্য নিয়ে গঠিত? বর্তমান প্রধান নির্বাচন কমিশনারের নাম কি?

উত্তর : বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন একটি সাংবিধানিক সংস্থা। ১৯৭২ সালে ১১৮ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন গঠিত। রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ১১৮(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ প্রদান করেন। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন পাঁচ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। বর্তমান প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী রকিবউদ্দীন আহমেদ (০৯.০২.২০১২-বর্তমান)।

প্রশ্ন-০২ সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসমূহ কি কি?

উত্তর : সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে প্রজাতন্ত্রের আইন প্রণয়ন ক্ষমতা সংসদের উপর ন্যস্ত রয়েছে। একক আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকা থেকে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের সদস্য হওয়ার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা সম্পর্কে বাংলাদেশের সংবিধানের পঞ্চম ভাগের ১ম পরিচ্ছেদে ৬৬নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে–

৬৬। (১) কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক হইলে এবং তাঁহার বয়স পঁচিশ বছর পূর্ণ হইলে এই অনুচ্ছেদের (২) দফায় বর্ণিত বিধান-সাপেক্ষে তিনি সংসদের সদস্য নির্বাচিত হইবার এবং সংসদ-সদস্য থাকিবার যোগ্য হইবেন।

(২) কোন ব্যক্তি সংসদের সদস্য নির্বাচিত হইবার এবং সংসদ-সদস্য থাকিবার যোগ্য হইবেন না, যদি

(ক) কোন উপযুক্ত আদালত তাঁহাকে অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষণা করেন;

(খ) তিনি দেউলিয়া ঘোষিত হইবার পর দায় হইতে অব্যাহতি লাভ না করিয়া থাকেন;

(গ) তিনি কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করেন কিংবা কোন বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা বা স্বীকার করেন;

(ঘ) তিনি নৈতিক স্খলনজনিত কোন ফৌজদারী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া অন্যূন দুই বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং তাঁহার মুক্তিলাভের পর পাঁচ বৎসরকাল অতিবাহিত না হইয়া থাকে;

(ঙ) তিনি ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ যোগসাজশকারী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশের অধীন যে কোন অপরাধের জন্য দণ্ডিত হইয়া থাকেন;

(চ) আইনের দ্বারা পদাধিকারীকে অযোগ্য ঘোষণা করিতেছে না, এমন পদ ব্যতীত তিনি প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন; অথবা;

(ছ) তিনি কোন আইনের দ্বারা বা অধীন অনুরূপ নির্বাচনের জন্য অযোগ্য হন।

প্রশ্ন-০৩ নির্বাচন কমিশনের দায়িত্বাবলি বর্ণনা করুন।

উত্তর : নির্বাচন কমিশনের উল্লেখযোগ্য দায়িত্বাবলি নিচে প্রদান করা হলো :

ক. বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচন অনুষ্ঠান পরিচালনা করা।

খ. জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

গ. নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রণয়ন, তত্ত্বাবধান ও নির্দেশ প্রদান।

ঘ. সংসদ নির্বাচনের জন্য এলাকার সীমা নির্ধারণ।

ঙ. সঠিক নিরপেক্ষ নির্বাচন কাজের জন্য রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ।

চ. রাষ্ট্রপতি ও সংসদ সদস্য নির্বাচনের জন্য গৃহীত মনোনয়নপত্র গ্রহণ ও বাছাই করা এবং মনোনয়ন সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন।

ছ. আইন কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য নির্বাচিত পরিচালনা (যেমন– ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ নির্বাচন)।

জ. নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা।

প্রশ্ন-০৪ সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর পর জাতীয় নির্বাচনকালে সরকারের রূপরেখা লিখুন?

উত্তর : ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪ সংবিধানের সর্বশেষ ষোড়শ সংশোধনী পাস হয়। বিচারপতিদের অভিশংসন বা অপসারণের পদ্ধতি পরিবর্তন করতেই সংবিধানের এ সংশোধনী। এর পূর্বে ৩০ জুন ২০১১ জাতীয় সংসদে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী পাস হয়। যাতে সংবিধানের প্রস্তাবনা, মূলনীতি, নির্বাচন ব্যবস্থা ও তফসিলসহ অনেকগুলো ধারায় ব্যাপক ও মৌলিক পরিবর্তনের বিধান সংবলিত সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন ২০১১-এর উল্লেখযোগ্য সংশোধন, সংযোজন, প্রতিস্থাপন, বিলুপ্ত ও নতুন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

নিচে নির্বাচন ব্যবস্থা সম্পর্কিত অংশটুকু আলোচনা করা হলো :

তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিলুপ্ত : পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বিলুপ্তি ঘটে ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে প্রবর্তিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা। এজন্য বিলুপ্ত করা হয় ৫৮ক অনুচ্ছেদ, চতুর্থ ভাগের ২-ক পরিচ্ছেদের ৫৮-খ-৫৮ঙ এবং সংশোধন করা হয় অনুচ্ছেদ ৬১, অনুচ্ছেদ ১৪৭ ও অনুচ্ছেদ ১৫২। এছাড়া সংবিধানের তৃতীয় তফসিলও সংশোধন করা হয়।

নির্বাচন : সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর ফলে ৫ জানুয়ারি ২০১৪ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় রাজনৈতিক সরকারের অধীনে। আগে মেয়াদ শেষ হওয়ার পরবর্তী ৯০ দিনে নির্বাচন করার বিধান ছিল। কিন্তু দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন থেকে মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্ববর্তী ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচনের বিধান করা হয়। এ ৯০ দিনে সংসদ থাকলেও অধিবেশন বসবে না। এজন্য সংবিধানের ১২৩ নং অনুচ্ছেদ সংশোধন করা হয়।

প্রশ্ন-০৫ নির্বাচন কমিশনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারদের কে নিয়োগ প্রদান করেন? এ পদগুলোকে সাংবিধানিক পদ বলা হয় কেন?

উত্তর : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৮(১) অনুচ্ছেদ অনুসারে নির্বাচন কমিশনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ প্রদান করেন রাষ্ট্রপতি। এ পদগুলো সংবিধানে বর্ণিত সুস্পষ্ট বিধি মোতাবেক গঠিত বলে এ পদগুলোকে সাংবিধানিক পদ বলা হয়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

সমকালীন যোগাযোগ
Contemporary Communication

Syllabus *Contemporary Communication; ICT, Role of Media; Right to information (RTI), and E-Governance.*

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১. *দারিদ্র্য বিমোচন ও মানবসম্পদ উন্নয়নে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন? এক্ষেত্রে শিক্ষা ও তথ্যপ্রযুক্তির ভূমিকা মূল্যায়ন করুন।*
অথবা, বাংলাদেশের মানবসম্পদ উন্নয়নে তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষার গুরুত্ব নিরূপণ করুন।[২৮তম বিসিএস]

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

০২. *'তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলা ভাষার ব্যবহার জীবনকে করেছে সহজ'– আলোচনা করুন।*

০৩. *বাংলাদেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও দায়বদ্ধতা কিরূপ? সংবাদপত্রের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখপূর্বক সমাজজীবনে এর স্বাধীনতার বিরূপ প্রভাব নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।*

০৪. *জনগণের ক্ষমতায়নে তথ্য অধিকার আইনের ভূমিকা বর্ণনা করুন।*

০৫. *ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে সরকারের এ পর্যন্ত গৃহীত পদক্ষেপসমূহ আলোচনা করুন।/৩৬।*
অথবা, ডিজিটাল বাংলাদেশ বলতে কি বোঝায়? ডিজিটাল বাংলাদেশ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন।

০৬. *ব্লগ কি? ব্লগের প্রকারভেদ আলোচনাপূর্বক ব্লগার হওয়ার নিয়মসহ বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে ব্লগিং ধারণা সম্পর্কে আলোচনা করুন।*

০৭. *আউটসোর্সিং বা ফ্রি ল্যান্সিং কি? বাংলাদেশে এই খাতের সম্ভাবনা উল্লেখপূর্বক এর সমস্যাগুলো চিহ্নিত করুন।*

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

০১. *ICT এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে লিখুন।*

০২. *সরকারের চতুর্থ অঙ্গ হিসেবে বাংলাদেশের সংবাদ মাধ্যম কি ধরনের ভূমিকা পালন করছে?*

০৩. *তথ্য অধিকার কি?*

০৪. *ই-গভর্নেন্স কি?*

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১। দারিদ্র্য বিমোচন ও মানবসম্পদ উন্নয়নে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন? এক্ষেত্রে শিক্ষা ও তথ্যপ্রযুক্তির ভূমিকা মূল্যায়ন করুন।
অথবা, বাংলাদেশের মানবসম্পদ উন্নয়নে তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষার গুরুত্ব নিরূপণ করুন। *[২৮তম বিসিএস]*

উত্তর : দারিদ্র্যের দিক থেকে শীর্ষস্থানে অবস্থানকারী বিশ্বের কয়েকটি দেশের একটি বাংলাদেশ। এডিবি তাদের এশীয় উন্নয়ন আউটলুকে বলেছে, বাংলাদেশের প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহের মধ্যে যে দুটি বিষয়ে নজর দেয়া অব্যাহত রাখতে হবে তা হচ্ছে দ্রুত দারিদ্র্য কমিয়ে আনা এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত করা। প্রতিবেদনে বলা হয়, দারিদ্র্যের ওপর সত্যিকার আঘাত করতে বাংলাদেশ জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার ৭% হওয়া প্রয়োজন। বাংলাদেশের বর্তমান সরকার দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশে দারিদ্র্যের কারণ : নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. অমর্ত্য সেনের মতে, 'মানব সমাজে দারিদ্র্য ও অনুন্নয়নের মূল কারণ সামাজিক বৈষম্য।'

প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ড. সেলিম জাহানের মতে, 'Unequal income disagreement causes the poverty.'

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুসারে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের প্রধান কারণগুলো হচ্ছে : নিম্ন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, অসম আয় বণ্টন, উৎপাদনশীল সম্পদের অসম বণ্টন, বেকারত্ব ও অর্ধ বেকারত্ব, জনসংখ্যার উচ্চ প্রবৃদ্ধির হার, নিম্ন পর্যায়ের মানবসম্পদ উন্নয়ন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং গণসেবায় সীমিত প্রবেশাধিকার।

দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারের প্রয়াস : দারিদ্র্য বিমোচন বর্তমান সরকারের অন্যতম প্রধান অর্থনৈতিক কর্মসূচি। সরকার বৃক্ষরোপণ, মৎস্য চাষ, প্রাথমিক ও নারী শিক্ষা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, গ্রন্থাগার উন্নয়ন, শিশু অধিকার, বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা, দুস্থদের জন্য আবাসন ইত্যাদি কর্মসূচি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারের গৃহীত উল্লেখযোগ্য কর্মসূচিগুলোর কয়েকটি হলো :

১. **কৃষি উন্নয়ন :** দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে কৃষি উৎপাদন উৎসাহিত করতে বর্তমান বাজেটে সরকার টিএসপি ও এসএসপি সারের কাঁচামাল, ব্লক সালফার, ব্লক ফসফেট ও পলিথিন প্লেটের আমদানির ওপর মূল্য সংযোজন কর প্রত্যাহার করেছে। এছাড়া পশুখাদ্য তৈরির জন্য ব্যবহৃত প্রোভিটামিনস ও ভিটামিনের মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতির প্রস্তাব করা হয়।

২. **বয়স্ক ভাতা :** সরকার বাংলাদেশে ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছর থেকে অসহায় দরিদ্র বয়স্কদের ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা চালু করে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এজন্য ব্যয় বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৯৮০.১০ কোটি টাকা, যা প্রায় ২৮ লক্ষ বয়স্ক দরিদ্র ব্যক্তি ভোগ করেন। প্রতিটি ওয়ার্ডে ৫ জন মহিলাসহ ১০ জন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি প্রত্যেকে মাসে ৩০০ টাকা ভাতা পাবেন। জাতীয় উৎপাদন, প্রবৃদ্ধি ও রাজস্ব আয় বাড়ার সাথে সাথে এ ভাতার পরিধিও সম্প্রসারণ করা হবে।

৩. **কর্মসংস্থান ব্যাংক :** সরকার বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ১৯৯৮ সালে কর্মসংস্থান ব্যাংক স্থাপন করে। এ ব্যাংক বিভিন্ন লাভজনক ও উৎপাদনমুখী প্রকল্পে বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে অর্থের যোগান দিচ্ছে। কেন্দ্রীয় ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের সহযোগিতায় এ ব্যাংক পরিচালিত হচ্ছে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৪. **গৃহায়ন তহবিল :** বিশেষ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর গৃহায়ন সমস্যা লাঘবের জন্য ২০১৩-১৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত ২৬১.৬৬ কোটি টাকা গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়। এ তহবিল থেকে এনজিও এবং স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে গৃহহীন দরিদ্র ও নিম্নবিত্তদের গৃহায়নের জন্য ঋণ ও অনুদান প্রদান করা হয়। ঢাকা ও অন্যান্য শহরের মহিলা শ্রমিকদের বাসস্থান ও নদীভাঙনে গৃহহীনদের এ কর্মসূচিতে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে।

৫. **ভিক্ষুকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি :** বাংলাদেশ সরকার বাজেটে (২০০৯-১০) ভিক্ষাবৃত্তির অবসান ঘটাতে ভিক্ষুকদের পুনর্বাসন ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রস্তাব করে। এ উদ্দেশ্যে প্রথম ২০১০ সালে ভিক্ষুক জরিপের কাজ শুরু করে। ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান কর্মসূচিসমূহের অনুকূলে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ১.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়।

৬. **কাজের বিনিময় খাদ্য (কাবিখা) কর্মসূচি :** গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কারের জন্য খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়াধীন কাজের বিনিময় খাদ্য (কাবিখা) কর্মসূচির আওতায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৫০ লক্ষ জনমাসের জন্য ১,৪৫৬.৯৮ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়।

৭. **একটি বাড়ি একটি খামার কর্মসূচি :** একটি বাড়িকে একটি স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক ইউনিট হিসেবে গড়ে তোলা, গ্রাম উন্নয়ন নিশ্চিত করা–এ মুখ্য উদ্দেশ্য নিয়ে গ্রহণ করা হয়েছে 'একটি বাড়ি, একটি খামার কর্মসূচি'। এ কর্মসূচির আওতায় ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত মোট তহবিল দাঁড়িয়েছে ১,৩৫২ কোটি টাকা।

৮. **সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী :** দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সব ধরনের অভিঘাত থেকে সুরক্ষার জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সম্প্রসারিত করা হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে সরকার সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ খাতে ১৫,১৯৭ কোটি টাকা বরাদ্দ রেখেছে, যা মূল বাজেটের ৬.১ শতাংশ।

এছাড়া সরকার দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি, টেস্ট রিলিফ কর্মসূচি, ভিজিএফ কার্ড প্রকল্প, আশ্রয়ণ প্রকল্প, দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প প্রভৃতি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে চলছে।

মানবসম্পদ উন্নয়ন : মানবসম্পদ উন্নয়ন বলতে আমরা কর্মক্ষম মানুষের স্বাস্থ্য, জ্ঞান, দক্ষতা এবং সফলতা বৃদ্ধিকে বুঝে থাকি। সমাজবিজ্ঞানীগণ Human Resource Development বলতে বোঝান, 'It is a process of increasing knowledge, skill and capacity of a people in the society.' উন্নয়নের ক্ষেত্রে মানবসম্পদই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে। অর্থনীতিবিদদের ভাষায়, উৎপাদন প্রক্রিয়ায় মানব পুঁজির কার্যকর ব্যবহারের নামই মানবসম্পদ উন্নয়ন।

মানবসম্পদ উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা : অর্থনীতিবিদদের ভাষায়, 'Quality human Capital is key to services, information and innovation which have a multiplier effect on production of goods and services.' অর্থাৎ 'যোগ্য মানব পুঁজি সেবা, তথ্য ও উদ্ভাবনের চাবিকাঠি, যা দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনের ক্ষেত্রে গুণকের প্রভাব রাখে।' দেশের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিকসহ সকল ক্ষেত্রে দক্ষ ও যোগ্য মানবসম্পদের অভাবে মানসম্পন্ন দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন দারুণভাবে ব্যাহত হয়। এমনকি যথাযথ দক্ষ, শিক্ষিত ও যোগ্য মানবসম্পদের অভাবে উৎপাদন স্থবির হয়ে যেতে পারে। এজন্যই বলা হয়, 'Human factors playing the leading role in any development effort.'

দারিদ্র্য বিমোচন ও মানবসম্পদ উন্নয়নে করণীয় : স্বাধীনতার পর থেকেই বাংলাদেশ সরকার দারিদ্র্য বিমোচনের ওপর ব্যাপক গুরুত্ব দিয়ে আসছে। আন্তর্জাতিক সাহায্যদাতা দেশগুলোও বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনের বিভিন্ন কর্মসূচিতে আর্থিক ও অন্যান্য সহায়তা দিয়ে আসছে। বাংলাদেশে উন্নয়ন সাহায্য

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

প্রদানকারী সংস্থাসমূহের মধ্যে UNDP অন্যতম। UNDP বাংলাদেশে যে পাঁচটি মৌলিক বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করে উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে থাকে, তার মধ্যে দারিদ্র্য বিমোচন প্রধান। তাছাড়া এনজিওসমূহ বাংলাদেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। এতদসত্ত্বেও দারিদ্র্য বিমোচন ও মানবসম্পদ উন্নয়নের চিত্র সন্তোষজনক নয়। সুতরাং এক্ষেত্রে আরো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও কর্মপন্থা গ্রহণ করতে হবে। এ পর্যায়ে যেসব সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে, তা হলো :

১. **শিক্ষার প্রসার :** দারিদ্র্য বিমোচন ও মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষার ভূমিকা সর্বাধিক। শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করে অধ্যাপক মার্শাল শিক্ষাকে পুঁজি বিনিয়োগের সর্বোৎকৃষ্ট ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বলা হয়েছে, 'Education is the basic need for the socio-economic transformation and advancement of a country. It is the prime ingredient of human resources development.' অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৪ অনুসারে, দেশে বর্তমানে সাক্ষরতার হার ৫৭.৯% (৭ বছর+)। দেশে বর্তমানে গণশিক্ষা, খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা ও উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম চলছে।

২. **বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ :** বাংলাদেশের মতো কৃষিনির্ভর ও শিল্পাকাঙ্ক্ষিত দেশের জন্য সবসময় উন্নত প্রযুক্তির লাগসই ব্যবহার উন্নয়নের ক্ষেত্রে অনুঘটকের (Development Catalyst) ভূমিকা পালন করতে পারে। নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক রবার্ট শোলো প্রমাণ করেছেন যে, দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে পুঁজি ও শ্রমের অবদানের তুলনায় প্রযুক্তি উন্নয়ন এবং এর যথোপযুক্ত ব্যবহারের অবদান অনেক বেশি। পুঁজি ও শ্রমের বর্ধিত দক্ষতার সাথে প্রযুক্তির সার্বিক প্রয়োগ না থাকলে উন্নয়নের গতি মন্থর হতে বাধ্য। তাই বাংলাদেশকে একবিংশ শতাব্দীর দারিদ্র্য বিমোচনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করতে হবে।

৩. **সম্ভাবনাময় তথ্যপ্রযুক্তি খাত :** তথ্যপ্রযুক্তিই হতে পারে বাংলাদেশের সমৃদ্ধির মহাসড়ক। সম্প্রতি ইন্টারনেট প্রযুক্তির ফলে গোটা বিশ্ব একটা গ্রাম বা 'Global Village'-এ পরিণত হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে গোটা বিশ্বকে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছাকাছি এনে তাদের সৃজনশীলতার মাধ্যমে দারিদ্র্য থেকে মুক্তিলাভের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ইতোমধ্যেই বাংলাদেশে রেলভিত্তিক ফাইবার অপটিক স্থাপিত হয়েছে। আর এই ভিত্তির সুবাদে বাংলাদেশ অচিরেই তথ্যপ্রযুক্তিতে বিশ্বমানের দেশে পরিণত হবার সাথে সাথে দারিদ্র্যবিমোচন ও মানবসম্পদ উন্নয়নে সংযোজন করতে পারে নতুন অধ্যায়ের।

৪. **গ্রামীণ উন্নয়ন :** দারিদ্র্যবিমোচনের প্রথম শর্ত হচ্ছে গ্রামীণ তথা পল্লী উন্নয়ন। আর পল্লী উন্নয়ন বা গ্রামীণ উন্নয়নে আমাদের একমাত্র উপায় হচ্ছে বর্ধিত হারে সম্পদ সৃষ্টি করা। অর্থাৎ ক্রমবর্ধিষ্ণু হারে উদ্বৃত্ত সম্পদ তৈরিই গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের চাবিকাঠি।

৫. **গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ :** গ্রামীণ অবকাঠামো তৈরিতে (সড়ক নির্মাণ, বিদ্যুৎ সরবরাহ, সেচ ও ঋণ সুবিধা ছাড়াও কাজের বিনিময়ে খাদ্য সাহায্য, প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা, দুর্বল জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে খয়রাতি সাহায্য) সরাসরি রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয়। এতে প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে সাম্যও বজায় থাকে, অপরদিকে মানবসম্পদেরও গুণগত উৎকর্ষ সাধন সম্ভব হয়।

৬. **রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা :** অর্থনৈতিক উন্নয়নে একটি দরিদ্র দেশের ভাগ্য পরিবর্তন হতে পারে না, যদি সে দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং উপযোগী রাজনৈতিক নেতৃত্ব না থাকে। রাজনৈতিক দলসমূহের জাতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট নয় এমন ইস্যুতে ঘন ঘন হরতাল, ধর্মঘট, অবরোধ

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

জাতীয় অর্থনীতি ও সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার মারাত্মক ক্ষতিসাধন করছে। দারিদ্র্য বিমোচন যেহেতু একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া, তাই এক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলসমূহকে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৭. **বেসরকারি খাতের সম্প্রসারণ :** গ্রামীণ অর্থনীতিতে বেসরকারি খাতের এগিয়ে আসা প্রয়োজন। দারিদ্র্য বিমোচন ও মানবসম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি অর্থনীতিতে ক্রমে শক্তিশালী হয়ে ওঠা বেসরকারি খাতেরও দায়িত্ব রয়েছে। বাংলাদেশে কর্মসংস্থানের বিরাট খাত হচ্ছে কৃষি। এ খাতে কর্মচাঞ্চল্য না থাকলে শিল্পপণ্য বিক্রি কমে যাবে। তাই কৃষি খাতে ব্যাপকভাবে বিনিয়োগ বাড়ানো প্রয়োজন। বিনিয়োগ বাড়লে উৎপাদন বাড়বে। শ্রমনির্ভর মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। যারা গরিব তারা নিজেদের পায়ে ভর করে জীবিকা নির্বাহের একটা সুযোগ লাভ করতে পারবে। তাই দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য গ্রামীণ অর্থনীতির বিভিন্ন অংশে বেসরকারি বিনিয়োগ অপরিহার্য।

৮. **নারী উন্নয়ন নীতিমালার বাস্তবায়ন :** প্রখ্যাত নারীবাদী লেখিকা Easter Boserup (1970) তার বিখ্যাত 'Women's Role in Economic Development' গ্রন্থে নারীর অন্যতম শত্রু হিসেবে দারিদ্র্যকে নির্দেশ করেছেন। তাই দারিদ্র্য বিমোচন ব্যতীত নারী উন্নয়ন সম্ভব নয়। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। এ ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে পেছনে রেখে দারিদ্র্য বিমোচন, মানবসম্পদ উন্নয়ন তথা সামগ্রিক উন্নয়ন আশা করা যায় না। তাছাড়া বাংলাদেশ সরকার সাংবিধানিকভাবে নারী-পুরুষের সমান অধিকারের ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই জাতীয় নারী উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের পশ্চাদমুখী ধারণা পরিহার করা উচিত।

৯. **সুষ্ঠু নীতিমালা ও উন্নয়ন কৌশল :** দারিদ্র্য বিমোচনের সংগ্রাম একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ার জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু নীতিমালা ও সার্বিক উন্নয়ন কৌশল। দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য এমন একটি কর্মসূচি নিতে হবে, যে কর্মসূচি হবে Action Oriented. এ কর্মসূচি নতুন কিছু উদ্ভাবনের মাধ্যমে মানুষের অভাব মোচনের ক্ষমতা যোগাবে। কেননা দারিদ্র্য নিরসনের জন্য উৎপাদন ও প্রবৃদ্ধি অর্জনই একমাত্র উৎস নয়। অর্জিত প্রবৃদ্ধির সুষম বণ্টন ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সৃষ্ট অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা ও অদক্ষতার সংস্কার করে সম্পদের অপব্যবহার রোধ করে অতিরিক্ত সম্পদ সৃষ্টির প্রচেষ্টা করতে হবে। গ্রামীণ সমাজ কাঠামোর অনাবশ্যক বিধিনিষেধের অবলুপ্তি ঘটিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রকৃত চালিকাশক্তি জনশক্তিকে মানবসম্পদে রূপান্তরের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ অতীব জরুরি। এ ব্যাপারে আমাদের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিতে হবে।

১০. **জনউদ্যোগ সৃষ্টি :** অধ্যাপক অর্মত্য সেনের ভাষায়, সমন্বিত জনউদ্যোগ ও জনক্রিয়া, যা দরিদ্র মানুষের অবস্থানকে সুসংহত করে। দারিদ্র্য পরিস্থিতির উন্নতিকল্পে এরূপ গ্রামীণ জনউদ্যোগ বিকাশোপযোগী পরিবেশ তৈরি করতে হবে। জনউদ্যোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাতে হলে নীতি ও কৌশল নির্ধারণ, পুঁজি ও প্রযুক্তির সরবরাহ, সেবা প্রদান ও উৎপাদিত পণ্য বিপণন এবং উপযুক্ত প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিদ্যমান জটিলতা কাটিয়ে উঠতে হবে। এর ফলে দেশীয় তৃণমূল পর্যায়ে গ্রামীণ অর্থনীতিতে নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরির মাধ্যমে হতদরিদ্র সমাজ সংগ্রাম করে বেঁচে থাকার প্রেরণা খুঁজে পাবে।

উপসংহার : দারিদ্র্য বিমোচন ও মানবসম্পদ উন্নয়ন একটি চলমান দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নগামী পরিবর্তনশীল সমাজে এ পথ বেশ জটিল। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রশিক্ষণসহ উপরিউক্ত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন সম্ভব। দারিদ্র্য বিমোচন ও মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে দেশ সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধির উচ্চ শিখরে আরোহণ করতে পারবে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

০২। 'তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলা ভাষার ব্যবহার জীবনকে করেছে সহজ'— আলোচনা করুন।
অথবা, 'তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলা ভাষার ব্যবহার'— এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখুন।

উত্তর : প্রযুক্তির সুফল জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে প্রয়োজন প্রযুক্তিতে মাতৃভাষার ব্যবহার। বিশ্বে তথ্যপ্রযুক্তি উদ্ভাবন ও প্রয়োগে এগিয়ে থাকা প্রতিটি দেশ প্রযুক্তিতে মাতৃভাষা ব্যবহার করছে। ভাষাপ্রেমী প্রযুক্তিবিদরা দীর্ঘদিন ধরেই তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিয়ে কাজ করছেন। বিশ্বের অন্যান্য ভাষার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এখন বাংলাতেই সম্ভব হচ্ছে কম্পিউটারে লেখালেখি, বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশ, গবেষণা, ওয়েবসাইট নির্মাণ, তথ্য ও ছবি অনুসন্ধান, ই-মেইল আদান-প্রদান, ব্লগিং ইত্যাদি।

কম্পিউটারে বাংলা ভাষা : ঠিক কবে, কে কম্পিউটারে প্রথম বাংলা ভাষা ব্যবহারে সক্ষম হন, তার সঠিক তথ্যটি পাওয়া যায় না। তবে ১৯৭৭ সালে সুইডেনের এক বাঙালি প্রথম একটি বাংলা নিউজ লেটার প্রকাশ করেন বলে জানা যায়। ওই সময়েই বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) কম্পিউটারে বাংলা ব্যবহার নিয়ে একটি প্রকল্প চালু হয়। প্রায় ৬ বছরের চেষ্টায় তারা গ্রাফিক্স মোডে লেখার সফটওয়্যারের বদলে বাংলা বর্ণমালা সমর্থিত একটি হার্ডওয়্যার ডিভাইস তৈরি করতে সক্ষম হয়। পরবর্তীতে সাইফুদ্দোজা শহিদ ১৯৮৩ সালে ম্যাক সিস্টেমের জন্য ফন্ট এবং কিবোর্ড ডিজাইনের কাজ শুরু করেন। ১৯৮৪ সালে আপল'র রিসোর্স এডিটরের সহায়তায় বিটম্যাপ নির্ভর ফন্টে তিনি তৈরি করেন 'শহীদলিপি', যাকে কম্পিউটারের প্রথম বাংলা ফন্ট বলা যায়।

এর ধারাবাহিকতায় ম্যাকিন্টোশের জন্য প্রথম বাংলা লেজার ফন্টটি তৈরি করে কলকাতার রাহুল কমার্স কোম্পানি। তাদের ফন্টের নাম ছিল 'বঙ্কিম'। কলকাতায় তৈরি হলেও এ ফন্টটি তৈরি করেছিলেন বাংলাদেশেরই গৌতম সেন। প্রথম এই লেজার ফন্টটিও ছাপার উপযোগী ছিল না। মানের দিক থেকে প্রথম মানসম্মত বাংলা ফন্ট বলা যায় মইনুল লিপিকে যা উন্মুক্ত হয় ১৯৮৬-৮৭ সালে। এটি দিয়ে আনন্দপত্র নামের একটি প্রকাশনাও বের হয়। এর পরেই আসে জব্বারলিপি (১৯৮৭)। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য এ সময় পর্যন্ত কম্পিউটারে বাংলা লেখার জন্য কোনো ইনপুট সফটওয়্যার ছিল না। ফলে কম্পিউটারে বাংলা টাইপ করার সুবিধা থাকলেও টাইপিং ছিল অত্যন্ত ধীরগতির। এই সমস্যার সমাধান প্রথমবারের মতো নিয়ে আসেন প্রযুক্তিবিদ মোস্তাফা জব্বার। 'বিজয়' নামে তিনি নিয়ে আসেন প্রথম বাংলা ইনপুট সফটওয়্যার। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৮৮ যাত্রা শুরু করে এই বিজয়। ম্যাক অ্যাসেম্বলি ল্যাংগুয়েজ ব্যবহার করে তৈরি করা বিজয় প্রথমবারের মতো কম্পিউটারে যুক্তাক্ষর ব্যবহারের সুবিধা প্রদান করে।

ম্যাক দিয়ে যাত্রা শুরু হলেও পরবর্তীতে আইবিএম-এর ব্যবহার শুরু হয়ে গেলে আইবিএম পিসির জন্যও তৈরি হয় বাংলা সফটওয়্যার। ১৯৯২ সালে প্রথম তৈরি হয় 'বর্ণ' নামের একটি ওয়ার্ড প্রসেসিং সফটওয়্যার। ১৯৯৩ সালে 'বিজয়'ও আসে আইবিএম-এর জন্য। নব্বই দশকের মাঝামাঝি থেকে উইন্ডোজ জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকলে উইন্ডোজের জন্যও বাংলা সফটওয়্যার তৈরির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এদিক থেকে প্রথম বাজারে আসে 'অনির্বাণ ৩.০'। পরবর্তীতে প্রশিকা এবং লেখনীও বাজারে নিয়ে আসে উইন্ডোজের জন্য টাইপিং সফটওয়্যার এবং বাংলা ফন্ট। এরই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে আরও অনেক ফন্ট তৈরি হয় বাংলায় লেখার জন্য।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

নব্বইয়ের দশকে উইন্ডোজের ব্যবহার বাড়তে থাকায় প্রয়োজন হয় উইন্ডোজের জন্যও বাংলা ফন্ট ও টাইপিং সিস্টেমের। উইন্ডোজের জন্য প্রথম বাংলা টাইপিং সফটওয়্যার অনির্বাণ ৩.০। পরে প্রশিকা ও লেখনি উইন্ডোজের জন্য ফন্ট ও টাইপিং সফটওয়্যার তৈরি করে। এর পরপরই বাজারে আসে আরো দুটি প্রোগ্রাম 'আশা' ও 'প্রবর্তনা'। পরে বিজয়ও সফলভাবে চালু হয় উইন্ডোজের জন্য।

২০০৩ সালে বাংলাকে সব মহলে সহজে জনপ্রিয় ও ব্যবহার উপযোগী করতে চালু হয় ইউনিকোড-নির্ভর সফটওয়্যার 'অভ্র'। এর মাধ্যমে বাংলা শব্দের জন্য ইংরেজি বর্ণেই টাইপ করা যায়। যেকোনো শব্দ ইংরেজি অক্ষরে উচ্চারণটি লিখলেই কম্পিউটারে বাংলা শব্দটি পাওয়া যায় সহজেই। যেমন কি-বোর্ড AMAR লিখলেই পর্দায় লেখা উঠবে 'আমার'।

ইউনিকোড : ইউনিকোড বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত আন্তর্জাতিক বর্ণ সঙ্কেতায়ন ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থার মূলে রয়েছে ইউনিকোড কনসোর্টিয়াম। এ কনসোর্টিয়াম একটি বহুজাতিক সংস্থা, যা কমপিটারে বিভিন্ন ভাষালিপির আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত প্রমিত মানের ব্যবস্থা করে। বাংলাদেশ ইউনিকোড কনসোর্টিয়ামের প্রাতিষ্ঠানিক সদস্যপদ লাভ করে ৩০ জুন ২০১০। ফলে বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তিতে ব্যবহৃত বাংলা লিপি প্রমিতকরণে এবং প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, সংযোজন করার ক্ষেত্রে ভোটাধিকার লাভ করল।

আমার বর্ণমালা : ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে উন্মুক্ত হয় ইউনিকোডে প্রমিত বাংলা ফন্ট 'আমার বর্ণমালা'। সরকারি উদ্যোগে তৈরি হয়েছে ইউনিকোড বাংলা ফন্ট। সবার জন্য উন্মুক্ত 'আমার বর্ণমালা' ফন্ট তৈরিতে কাজ করছে বাংলা একাডেমি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাফিক্স ডিজাইন বিভাগ ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অ্যাকসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম। ইন্টারনেটে আর কম্পিউটারে যখন বাংলা অনেকটা জায়গা দখল করে নিতে সমর্থ হয়েছে, তখন দেরিতে হলেও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয় একটি ইউনিকোড ফন্ট তৈরির। এর আগে নির্বাচন কমিশন একটি ফন্ট তৈরি করলেও তাতে কিছু কিছু বিষয়ে সমস্যা ছিল। এসব সমস্যা দূর করে পূর্ণাঙ্গ একটি ফন্ট তৈরি করতেই গত বছরের শেষের দিকে সরকার এই উদ্যোগ গ্রহণ করে। মূলত বাংলা একাডেমির নেতৃত্বে এই ফন্ট তৈরির কাজ শুরু হয়। এর পেছনে আর্থিক সহায়তা প্রদান করছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অ্যাকসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই)। আর এতে কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাফিক্স ডিজাইন বিভাগ।

ই-বুকে বাংলা : ই-বুক মানে ইলেকট্রনিক বুক। নাম শুনেই বোঝা যায় এ বই পড়ার জন্য কম্পিউটার দরকার। উন্নত বিশ্বে ই-বুক এখন বেশ জনপ্রিয়। বাংলাদেশও পিছিয়ে নেই। ২৪ এপ্রিল ২০১১ দেশে ই-বুক চালু হয়। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম-এর উদ্যোগে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তকের ই-বুক তৈরির কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে। ইতোমধ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকসমূহ ই-বুক-এ রূপান্তর করা হয়েছে এবং ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক, গবেষক বিনামূল্যে যে কেউ যেকোনো সময় অনলাইনে ই-বুক দেখতে পারবেন এবং প্রয়োজনে ডাউনলোড করে প্রয়োজন মেটাতে পারবেন। প্রবাসী বাংলাদেশী নাগরিকদের সন্তানদের বাংলা মাধ্যমে পড়াশুনার জন্য বিদেশে পাঠ্যপুস্তক প্রয়োজন হয়ে থাকে। কেননা, বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী এবং জেএসসি ও এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে থাকে। এ ধরনের শিক্ষার্থীরা সহজেই তাদের প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক এই ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

ই-বুক অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে তৈরি করা হয়েছে, যেখানে খুব সহজেই যে কোনো শ্রেণির বই খুঁজে পাওয়া যাবে, জুম করে বড় আকারে দেখা যাবে। কম্পিউটার/ল্যাপটপ, ই-বুক রিডার, মোবাইল ফোন (ফ্ল্যাশ সাপোর্টেড), টাচ স্ক্রীন প্রযুক্তির ট্যাবলেট পিসি ব্যবহার করেও এগুলো পড়া যাবে। এ উদ্যোগের ফলে সকল পাঠ্যপুস্তক নিয়ে একটি আর্কাইভ করা সম্ভব যা ভবিষ্যতে শিক্ষক, শিক্ষা গবেষক, শিক্ষাবিদ, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ এবং নীতি-নির্ধারকদের বিভিন্নভাবে সহায়তা করবে।

গুগল ট্রান্সলেটে বাংলা : গুগল ট্রান্সলেট হচ্ছে গুগলের একটা অনলাইন সার্ভিস, যা দিয়ে এক ভাষার লেখাকে অন্য ভাষায় ভাষান্তরিত করা হয়। জুন ২০১১ গুগল ট্রান্সলেটে (অনুবাদ) বাংলা ভাষা যুক্ত হয়। ফলে বাংলা ভাষাভাষী ব্যক্তিরা সহজেই বাংলা ভাষাকে বিশ্বের ৭২টি বিভিন্ন ভাষায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভাষান্তরিত করতে পারছে।

সামাজিক যোগাযোগ : বাংলা ভাষার অগ্রগতি ছড়িয়ে পড়েছে। সামাজিক যোগাযোগের জনপ্রিয় মাধ্যম ফেসবুক ও টুইটারে। টুইটার বাংলা ভাষা চালু করে ১৯ আগস্ট, ২০১৪। বিশ্বের বিভিন্ন ভাষার পাশাপাশি থেকে মাইক্রো ব্লগ টুইটারে এখন থেকে টুইটারের মূল ওয়েবসাইট, মোবাইল ওয়েবসাইট ও স্মার্টফোন অ্যাপসে বাংলায় টুইট করা যায়। ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ চালু হয় বাংলা ভাষার প্রথম সামাজিক যোগাযোগের সাইট 'বেশতো'। ফেইসবুক-টুইটারের আদলে সাইটটির প্রকাশিত কোনো লেখাতেই হস্তক্ষেপ করা হয় না। ব্যবহারকারীরাই সাইটটির মূল চালিকাশক্তি। তবে সাইটের নীতিমালাবিরোধী কোনো পোস্ট বা অবাঞ্ছিত ভাষার ব্যবহার কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। প্রয়োজনে ব্যবহারকারীর অ্যাকাউন্টও বাতিল করা হয়। আর এসব কারণে অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগের সাইটের মতো এখানে অশ্লীল বিষয়াদির কোনো স্থান নেই।

মোবাইল ফোনে বাংলা : বাংলায় তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারে ফেব্রুয়ারি ২০১২ থেকে সব ব্র্যান্ডের মোবাইল হ্যান্ডসেটে পূর্ণাঙ্গ বাংলা কি-প্যাড সংযোজন বাধ্যতামূলক করা হয়। ফলে মোবাইল ফোনেও বাংলাতেই সংক্ষিপ্ত বার্তা (এসএমএস) আদান-প্রদান করা যাচ্ছে। পাশাপাশি মোবাইল হ্যান্ড সেটে বাংলা কি-প্যাড থাকা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ফেব্রুয়ারি ২০১৪, দেশে প্রথমবারের মতো চালু হয় মোবাইলে বাংলা ভাষায় তাৎক্ষণিক বার্তা আদান প্রদানের সুবিধা। আর ভাষার মাসকে স্মরণীয় করে রাখতে ইনস্ট্যান্ড ম্যাসেজার হিসেবে পরিচিত 'বাংলা আইএম' সেবা চালু করে মোবাইল অপারেটর রবি।

বিশ্বব্যাপী শীর্ষ প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলো যখন একের পর এক হাই অ্যান্ড স্মার্টফোন বাজারে এনে চমকে দিচ্ছে সবাইকে, তখন সীমিত ক্রয়ক্ষমতার মানুষদের জন্য স্বল্পমূল্যে স্মার্টফোন নিয়ে আসার পরিকল্পনা গ্রহণ করে মজিলা ফাউন্ডেশন। ফায়ারফক্স ব্রাউজারের নির্মাতা প্রতিষ্ঠান মজিলা ফাউন্ডেশন মূলত একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। তাদের ফায়ারফক্স ব্রাউজার তাই যেমন বিনামূল্যে সেবা প্রদান করে আসছে, তেমনি তাদের মোবাইল অপারেটিং সিস্টেমকেও গড়ে তোলা হয়েছে ওপেন সোর্স হিসেবে। এই মোবাইল অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করে তৈরি তাদের স্মার্টফোনগুলোও যতটা সম্ভব কম দামের হিসেবে তৈরি করা হয়েছে। 'ফায়ারফক্স ওএস' মোবাইল অপারেটিং সিস্টেমে এর আগেও বেশ কিছু মোবাইল ফোন তৈরি করা হয়েছে। বাংলাদেশের বাজারের জন্য মজিলা ফাউন্ডেশন দেশীয় মোবাইল ফোন নির্মাতা প্রতিষ্ঠান সিম্ফনির সাথে তৈরি করেছে তাদের 'গোফক্স এফ ১৫' মডেলের স্মার্টফোনটি। আর এই স্মার্টফোনটি বাজারজাত করা হচ্ছে গ্রামীণফোনের সাথে।

গোফক্স এফ১৫ স্মার্টফোনটির একটি বিশেষ চমক হচ্ছে এটি পূর্ণাঙ্গভাবে বাংলা সমর্থন করে। ফায়ারফক্স অপারেটিং সিস্টেমে বাংলা ভাষার সমর্থনের কারণেই এটি সম্ভব হয়েছে। গোটা স্মার্টফোনটির সব ধরনের ফিচার এবং অ্যাপ্লিকেশনের যাবতীয় কাজ বাংলাতেই পরিচালনা সম্ভব। শুধু

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

তাই নয়—অ্যান্ড্রয়েড, আইওএস কিংবা উইন্ডোজ ফোনে যেখানে বাংলা লেখার জন্য আলাদা করে বাংলা কিবোর্ড অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করে নিতে হয়, ফায়ারফক্সের এই মোবাইলে সেই ঝামেলা নেই একেবারেই। কেননা এতে বিল্ট-ইন হিসেবে রয়েছে বাংলা কিবোর্ড।

অনলাইনে বাংলা পত্রিকা : বাংলা ভাষাভাষীদের কাছে দ্রুতগতিতে খবরাখবর পৌঁছে দিতে বর্তমানে সকল বাংলা পত্রিকা ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া অনলাইন সেবা চালু করেছে। ফলে যেকোনো খবর মুহূর্তের মধ্যে সকলে জানতে পারছে। এছাড়া ভিনভাষীদের সম্প্রচার মাধ্যম যেমন—ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং করপোরেশন বা বিবিসি, যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সম্প্রচার মাধ্যম ভয়েস অব আমেরিকা— ভোয়া, জার্মানির আন্তর্জাতিক রেডিও ডয়েচে ভেলে, জাপানের আন্তর্জাতিক বেতার এনএইচকে ওয়ার্ল্ড রেডিও, চীনে আন্তর্জাতিক বেতার, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের রেডিও রাশিয়া, ইরান ইসলামী প্রজাতন্ত্র-এর রেডিও তেহরান অনলাইনে বাংলায় খবরাখবর প্রচার করছে।

সার্চ ইঞ্জিনে বাংলা : জনপ্রিয় সার্চ ইঞ্জিন গুগল বাংলা সেবা চালু করেছে। ১৩ এপ্রিল ২০১৩ চালু হয় দেশের প্রথম বাংলা সার্চ ইঞ্জিন 'পিপীলিকা'। পিপীলিকা বাংলাদেশের প্রথম সার্চ ইঞ্জিন যা বাংলা ও ইংরেজি দুই ভাষাতেই কাজ করতে সক্ষম। এই উন্মুক্ত ওয়েব সার্ভিসটি সারা দেশের সাম্প্রতিক গ্রহণসাধ্য তথ্য অনুসন্ধান করতে সহায়তা করে। এটি দেশের প্রধান বাংলা ও ইংরেজি পত্রিকার সংবাদ, বাংলা ব্লগ, বাংলা উইকিপিডিয়া ও সরকারি তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিশ্লেষণ ও সংরক্ষণ করে।

প্রযুক্তিতে মাতৃভাষার খারাপ দিক : সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে শব্দের বিকৃত বানান ও উচ্চারণ চলছে। যেমন— বেসম্ভব (অসম্ভব), নাইচ (নাইস), কিন্যা (কিনে), গেসে (গেছে), দ্যাশ (দেশ) এ রকম অসংখ্য বিকৃত ব্যবহার চলছে সব সময়ই। বাক্য বা শব্দগুচ্ছ একত্র ও সংক্ষিপ্ত করার প্রবণতা— ভাল্লাগসে (ভালো লেগেছে), মুঞ্চায় (মন চায়), মাইরালা (মেরে ফেলো) ইত্যাদি। বাংলা, হিন্দি, ইংরেজি মিলিয়ে বহুভাষিক পরিস্থিতি তৈরি করা— মাগার, টাক্সিভূত, হতভম্ব, সম্ভাবিলিটি, বিন্দাস প্রভৃতি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত শব্দ।

ভাষা ব্যবহারে সচেতনতা : ভাষায় নতুন শব্দ আসবে, ভাষার পরিবর্তন হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ভাষার জন্য যা ক্ষতিকর তা হলো, একই সঙ্গে দুটি বা তার চেয়ে বেশি ভাষার মিশ্রণে কথা বলা বা লেখা। ভাষাবিজ্ঞানী রফিকুল ইসলাম বলেন, 'অন্তর্জালে বাংলা ভাষার যে মিশ্রণ তা ভয়াবহ। প্রমিত বাংলার সঙ্গে আঞ্চলিক, ইংরেজির সঙ্গে হিন্দি, বাংলালিপির সঙ্গে রোমানলিপি। এভাবে মিশ্রণের ফলে যে জগাখিচুড়ি ভাষা সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলোতে ব্যবহার হচ্ছে—তা দুঃখজনক।' ইন্টারনেট এখন যোগাযোগের অত্যন্ত শক্তিশালী মাধ্যম। আর ইন্টারনেটের সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলোর ব্যবহারও কেবল বিনোদনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক বিতর্ক, জনমত তৈরি, দাবি আদায়সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে এখন ব্যাপকভাবে ভূমিকা রাখছে এটি। সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমের প্রভাবে পাল্টাতে শুরু করেছে আমাদের সামগ্রিক জীবনযাত্রা। ফেসবুক, ব্লগ প্রভৃতিতে চলছে বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চাও। ইন্টারনেটে একদিকে যেমন বাংলার বিকৃত ব্যবহার বাড়ছে অন্যদিকে প্রমিত ও শুদ্ধ বাংলার ব্যবহারও রয়েছে। এভাবেই ভালো-মন্দে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে যাচ্ছে ইন্টারনেটের বাংলা ভাষা।

ভাষা ব্যবহারে তাই আমাদের সবারই সচেতন হওয়া প্রয়োজন। আর এটাও অনুধাবন করা দরকার যে, ভাষার বিতর্কটা কেবলই তথাকথিত 'শুদ্ধ' বা 'অশুদ্ধ' রীতির নয়। একটা দেশে, সমাজে বা সারা দুনিয়ায় কোন কোন ভাষায় কেমন রীতিতে মানুষ কথা বলবে, লিখবে সেই প্রশ্নটা একই সঙ্গে খুবই রাজনৈতিক। ফলে আমাদের ভাষাচর্চা শেষ বিচারে কোন সংস্কৃতিকে কোন রাজনীতিকে এগিয়ে নিচ্ছে, কোনটাকে পিছিয়ে দিচ্ছে—তাও ভাবা দরকার সবারই।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

প্রযুক্তিতে বাংলা ভাষার ব্যবহার আরো বাড়াতে হবে : তথ্য ও জ্ঞানের ভাণ্ডার এখন কম্পিউটারকেন্দ্রিক। সারাবিশ্ব ভাষাগত অবস্থানে বাংলা সপ্তম হলেও কম্পিউটারের মাতৃভাষা ইংরেজি। তাই প্রয়োজন পরিপূর্ণ ইউনিকোড সমর্থিত উইন্ডোজ ও লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেম সমর্থনে বাংলা অপারেটিং সিস্টেম। তাদের মতে, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে হলে প্রযুক্তিতে বাংলার ব্যবহার আরো বাড়ানো প্রয়োজন। আর বাংলা ভাষার সমৃদ্ধি এবং বাংলা কম্পিউটিং নিশ্চিত করতে বিশাল পরিসরে বাংলা ডিকশনারি প্রস্তুত করা জরুরি। এছাড়াও প্রয়োজন ইংরেজি থেকে বাংলা, বাংলা থেকে ইংরেজি করার ভালো ট্রান্সলেশন সিস্টেম।

২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে হলে তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলার ব্যবহার আরো বাড়াতে হবে। এজন্য সরকারকেই প্রথমে এগিয়ে আসতে হবে।

০৩। বাংলাদেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও দায়বদ্ধতা কিরূপ? সংবাদপত্রের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখপূর্বক সমাজজীবনে এর স্বাধীনতার বিরূপ প্রভাব নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

উত্তর : সংবাদপত্র আধুনিক জীবনের অনিবার্য সঙ্গী। অজানাকে জানানো বা অজানা বিশ্বকে হাতের মুঠোয় এনে দেয় সংবাদপত্র। সংবাদপত্র বর্তমান সভ্যতার একটি প্রধান অঙ্গ, দেশ-বিদেশের সংবাদ ব্যতীত আমাদের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হয় না। নানা দেশের বিচিত্র সংবাদ, নানারকম রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক আলোড়ন এবং উন্নয়ন প্রভৃতির সংবাদ যেমন আমরা সংবাদপত্রের মাধ্যমে পাই, তেমনি পাই নিজের দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের খবর। তাই সংবাদপত্র আমাদের বর্তমান জীবনের এক অপরিহার্য সঙ্গী; এক পরমাত্মীয়।

ঐতিহাসিক পটভূমি : সংবাদপত্র ঠিক কবে কোন দেশে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল তা সুস্পষ্টভাবে বলা মুশকিল। তবে এ কথা সত্য যে, এ সংবাদপত্র একদিনে উদ্ভব হয়নি। সর্বপ্রথম ভেনিসে সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছিল বলে জানা যায়। একাদশ শতাব্দীতে চীন দেশে এক প্রকার সংবাদপত্র মুদ্রিত হয়। ইংল্যান্ডের রানী প্রথম এলিজাবেথের রাজত্বকালে সর্বপ্রথম মুদ্রিত সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় এ কথা সর্বজন স্বীকৃত। উপমহাদেশে আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে সর্বপ্রথম বাংলা সংবাদপত্র চালু হয়। ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজ মিশনারিরা শ্রীরামপুরে সর্বপ্রথম বাংলা সংবাদপত্র চালু করেন। 'সমাচার দর্পণ' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসেবে এ পত্রিকাটি সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯৪০ থেকে ১৯৪৪ সালের কোনো এক সময় ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম মুদ্রিত ইংরেজি সংবাদপত্র 'ইন্ডিয়ান গেজেট' প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশের প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র 'আজাদ'। পূর্বে সংবাদপত্র হাতে হাতে লিখে কিংবা লিথো করে প্রচার করা হতো। এখন উন্নত ধরনের মুদ্রণ যন্ত্রে, বিশেষত রোটারি অফসেটে হাজার হাজার সংবাদপত্র অতি অল্প সময়ে ছাপানো সম্ভব হচ্ছে।

বিভিন্ন প্রকার সংবাদপত্র : সংবাদপত্র বিভিন্ন রকমের হতে পারে। বর্তমান পৃথিবীর সভ্য দেশগুলোতে দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, বার্ষিক বিভিন্ন ধরনের পত্রিকা পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে প্রকাশিত হয়ে থাকে।

সংবাদপত্রের প্রয়োজনীয়তা : পৃথিবীতে শিক্ষা ও জ্ঞান-বিস্তারের যতগুলো পন্থা আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে সংবাদপত্রের আসন সর্বশ্রেষ্ঠ। সংবাদপত্র পাঠ না করলে কারো জ্ঞান পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হয় না। সংবাদপত্রকে বলা হয় জীবনযাত্রার চলমান অভিধান। এটি বর্তমান সভ্যতার অন্যতম স্তম্ভ।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

সংবাদপত্রের মাধ্যমে দূর-দূরান্তের সংবাদ আমাদের কাছে পৌঁছাতে পারে। বর্তমান যুগে মানুষের জীবনে যতই জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে, সংবাদপত্রের প্রয়োজন ও গুরুত্ব তত তীব্রভাবে অনুভূত হয়েছে। কারণ সমস্যাসঙ্কুল জীবনের সমস্যা সমাধানেও সংবাদপত্র পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করতে পারে। সংবাদপত্রের বড় বৈশিষ্ট্য এই যে, সকল শ্রেণীর মানুষের জীবনেই এর প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। সকল রুচিসম্পন্ন মানুষ যেমন এর মধ্যে মনের প্রশ্নের উত্তর পান, তেমনি সাধারণ মানুষ অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য আহরণ করে সেগুলোর দ্বারা নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন। আমরা সংবাদপত্রের মাধ্যমে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সচেতনতা গড়ে তুলতে পারি। এছাড়া দেশের অর্থনীতি, শিল্প ক্ষেত্রের উৎপাদন, আমদানি, রপ্তানি প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে জনসাধারণের পক্ষে সচেতন হয়ে ওঠা সম্ভব হয়। সংবাদপত্র আমাদের নানা রকমের কৌতূহল নিবৃত্ত করে। সংবাদপত্রের মাধ্যমেই আমরা নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি পেয়ে বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্ত হই।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতার প্রেক্ষিত বাংলাদেশ : সংবাদপত্র জনমত গঠন ও রাষ্ট্রশাসন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। কেননা একটা দেশের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা, রাষ্ট্রশাসন সংক্রান্ত নানা তথ্য সংবাদপত্রে পরিবেশন করা হয়। কখনো কখনো বিভিন্ন ধরনের সমস্যার ইঙ্গিত ও তা সমাধানের উপায় নির্দেশ করা হয় সংবাদপত্রে। এতে করে জনগণ দেশ সম্পর্কে সচেতন হতে পারে। এজন্য সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সংবাদপত্র সঠিক সংবাদকে যাতে প্রকাশ করতে পারে তার ব্যবস্থা থাকা দরকার। অবশ্য সংবাদপত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে বিশেষত সাংবাদিককে স্মরণ রাখতে হবে যে তার স্বাধীনতা আছে বলেই তিনি সর্বদা সব সত্য তুলে ধরতে পারেন না। কিংবা নিজের খেয়াল খুশিমত কোনো সংবাদ পরিবেশন করতে পারেন না। সংবাদ বা প্রতিবেদন রচনার ক্ষেত্রেও কিছু নিয়মবিধি আছে। এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটলে সংবাদপত্রের চরিত্র ভ্রষ্ট হয়। এ ধরনের সাংবাদিকতাকে সাম্প্রতিককালে হলুদ সাংবাদিকতা (yellow journalism) নামে অভিহিত করা হচ্ছে। সংবাদপত্র হচ্ছে লোক শিক্ষক। জনকল্যাণের জন্য তা যেন সঠিকভাবে কাজ করে সেদিকে সংবাদপত্র মালিক, সাংবাদিক সবাইকে আন্তরিক হতে হবে। তাহলে সাংবাদপত্র তার সঠিক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে।

সংবাদপত্রে যেমন আছে সৎ, নির্ভীক সাংবাদিক, তেমনি আছেন অসৎ সাংবাদিক। অথচ নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশনই সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকের কর্তব্য। সংবাদপত্র দেশের রাজনীতি তথা সামগ্রিক ক্ষেত্রে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। সংবাদপত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্যই একে অভিহিত করা হয়েছে 'The fourth estate'। সংবাদপত্রের শক্তির প্রাচুর্য ও জনমানসে তার প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়ার কথা ভেবেই দেশের রাজনৈতিক শক্তিগুলো এর সুযোগ গ্রহণ করতে চায় এবং দলের কাজে ব্যবহার করতে চায়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সাম্প্রতিককালের সংবাদপত্রগুলো প্রায়ই কোনো না কোনো দলের মুখপত্র হয়ে উঠেছে। অথবা পরোক্ষ কোনো বিশেষ দল বা নীতির প্রতি সমর্থন জুগিয়ে চলেছে। তাই বর্তমানে সংবাদপত্রের মাধ্যমে খাঁটি ও পক্ষপাতহীন সংবাদ পরিবেশন খুব কম ক্ষেত্রেই পাওয়া যায়। আবার নির্ভীক, সৎ সংবাদ পরিবেশনের জন্য নির্ভীক সাংবাদিকের অপমৃত্যু ঘটে মুষ্টিমেয় ক্ষমতালোভী স্বার্থান্বেষী মানুষের হাতে। এ বিষয়টি নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে বিশাল বাধা। সংবাদপত্র ও সাংবাদিকের নিরাপত্তা বিধান করার দায়িত্ব সরকারসহ আমাদের সবার। একজন সাংবাদিক আমাদেরই লোক এ ধ্রুব সত্যটি সবাইকে উপলব্ধি করতে হবে। সাংবাদিকের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য জনসাধারণকে সংবাদপত্রের মাধ্যমে সত্যের পথে পরিচালিত করা, ব্যক্তিবোধের উন্মেষ ঘটানো এবং

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

ব্যক্তির শুভবুদ্ধিকে উদ্দীপ্ত করা। নিজেদের ব্যক্তিগত কিংবা দলগত স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে সংবাদ পরিবেশন করতে গেলে জনসাধারণের প্রতি অবিচার করা হয়। সাংবাদিককে সত্যনিষ্ঠ, নিরাসক্ত, নির্ভীক ও কঠোর সমালোচক হতে হবে। এক বিচারে, সাংবাদিক প্রকৃতপক্ষে জাতির শিক্ষক, জাতিকে যথার্থপথে পরিচালনার দায়িত্ব তারই। সংবাদপত্রকে কেন্দ্র করে নানাভাবে মত বিনিময়ের সুযোগ থাকতে পারে– মতপার্থক্য সত্ত্বেও সত্যের অবিচল প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়; এই সত্য প্রতিষ্ঠাই প্রকৃত সাংবাদিকতার লক্ষ্য। সংবাদপত্রের মাধ্যমে বিনিময়ের বা দৃষ্টিভঙ্গির সত্যতা প্রকাশের সুযোগ থাকে বলে অনেকে সংবাদপত্রকে 'Second Parliament of the nation' বলে অভিহিত করে থাকেন।

সাংবাদিকতার নীতিমালা : গণতান্ত্রিক সমাজে সংবাদপত্রে যেসব নীতি মেনে চলা হয়, সাংবাদিকতার নীতিমালা বলতে আমরা তাই বুঝি। দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার আলোকে ক্রমান্বয়ে বিবর্তনের মাধ্যমে এই নীতিমালা সৃষ্টি হয়েছে। নীতিমালা মূলত উপলব্ধির ব্যাপার। বিভিন্ন দেশে সাংবাদিকগণ উপলব্ধি করেছেন যে, জনস্বার্থে, সংবাদপত্রের স্বার্থে এবং সাংবাদিকদের নিজেদের স্বার্থেও কিছু নীতি মেনে চলতে হবে। নৈতিক কারণেই তা মেনে চলা জরুরি। জনসাধারণের যা জানার অধিকার আছে তাদেরকে তা জানাতে হবে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন সংশ্লিষ্ট যেসব বিষয় তাদেরকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করতে পারে, সে বিষয়গুলো তাদেরকে অবহিত করতে হবে। তাছাড়া জনগণকে নির্ভুল ও বস্তুনিষ্ঠ বিষয়গুলো জানাতে হবে। কাজেই যেসব সংবাদ পরিবেশন করা হবে তা শুধু নির্ভুল, সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ হলেই চলবে না। তা সম্পূর্ণ সত্য হতে হবে, তাতে ভারসাম্য থাকতে হবে, তা এমনভাবে পরিবেশন করতে হবে যেন জনগণ তা সঠিক অর্থে গ্রহণ করেন এবং তা সঠিক প্রেক্ষাপটে তুলে ধরতে হবে। একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে যে, কোনো ঘটনা, কোনো বক্তব্য অথবা কোনো পরিস্থিতিকে পক্ষপাতিত্বের ঊর্ধ্বে উঠে দেখতে না পারলে পরিবেশিত সংবাদে এই গুণগুলো রক্ষা করা যাবে না। পরিবেশিত সংবাদটিতে—

১. যদি কোনো সাংবাদিকের নিজস্ব কল্পনাপ্রসূত কিছু যুক্ত না হয়ে থাকে।
২. তথ্য যদি উপযুক্ত সূত্র থেকে পাওয়া গিয়ে থাকে।
৩. সেসব যদি যথাযথভাবে যাচাই করা হয়ে থাকে।
৪. পূর্ববর্তী ঘটনাবলী এবং বিরাজমান পরিস্থিতি থেকে তা যদি বিচ্ছিন্ন করে না দেখানো হয়ে থাকে এবং
৫. বিষয়টি বিতর্কিত হলে যদি সব দিক তুলে ধরা হয়ে থাকে তাহলে পরিবেশিত সংবাদটিতে উপরে উল্লিখিত গুণাবলী থাকবে বলে আশা করা যায়। নৈতিক কারণে সংবাদপত্রের যেসব কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে তা নিম্নরূপ :

ক. রাষ্ট্রবিরোধী কিছু লেখা যাবে না ও এ রকম কাজে উৎসাহ দেয়া যাবে না।
খ. আদালত অবমাননা করা যাবে না।
গ. আদালতে অপরাধ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত কাউকে অপরাধী বলা যাবে না।
ঘ. কারো মানহানি করা চলবে না।
ঙ. কোনো সম্প্রদায় অথবা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়ানো চলবে না।
চ. কোনো সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করা চলবে না।
ছ. কোনো গুজব ছড়ানো চলবে না।
জ. সংবাদপত্রে কোনো কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দেয়া চলবে না।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

ঝ. জীবনের কোনো দিকই উপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু অশ্লীলতাকে বর্জন করতে হবে।

ঞ. কারো ব্যক্তিগত জীবনের কোনো গোপন দিক যা জনগণের জানার অধিকার নেই তা ফাঁস করে তাকে বিব্রত করা চলবে না। অর্থাৎ কারো প্রাইভেসিতে হানা দেয়া চলবে না।

ট. কারো দেশপ্রেমের প্রতি কটাক্ষ করা চলবে না। কোনো প্রমাণ ছাড়া কাউকে বিদেশী এজেন্ট বা এ জাতীয় বিশেষণে ভূষিত করা যাবে না।

ঠ. কোনো বিজ্ঞাপনকে সংবাদের ছদ্মবেশ দেয়া যাবে না ইত্যাদি।

সাংবাদিকতা ও সংবাদপত্রের দায়বদ্ধতা : সাংবাদিকতার অর্থ হচ্ছে একজন প্রত্যক্ষদর্শী, প্রত্যক্ষসাক্ষী। সাংবাদিকতা একটি মহান পেশা এবং সাংবাদিকেরা দেশের সম্পদ। এই কারণেই যে কোনো পরিস্থিতিতে তাদের সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকা প্রয়োজন। সাংবাদিকদের প্রধান ও একমাত্র দায়িত্ব হচ্ছে সত্যের সংরক্ষণ ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করা। জ্ঞানী-গুণী, কবি-সাহিত্যিকরা বলেন, সাংবাদিকদের কলমের ক্ষমতা তরবারির চেয়ে ধারালো ও শক্তিশালী। সহজেই অনুমেয় যে, কলম এমন একটি অস্ত্র যা সর্বাধুনিক মারণাস্ত্রের চেয়েও মারাত্মক। এই কলমের সামান্যতম দু ফোটা কালি পৃথিবীর সমস্ত ধন-সম্পদের চেয়েও বেশি মূল্যবান। সেই কলম যখন কোনো সাংবাদিকের হাতের অস্ত্র হয় তখন তার ক্ষমতাও বেড়ে যায় অন্তহীনভাবে। সাংবাদিকগণ সমাজের ও দেশের ভীষণ প্রয়োজনীয় ও অত্যাবশ্যকীয় শ্রেণী। সব পেশার একটি নির্দিষ্ট গণ্ডি আছে, আছে সংরক্ষিত সীমানা। কিন্তু একজন সাংবাদিকের পেশার নির্দিষ্ট কোনো গণ্ডি নেই। অন্তহীন তার বিচরণের ক্ষেত্র। তারা ত্রিভুবনের যেকোনো বিষয় লেখার অধিকার রাখে। যারা এ পেশায় এসে কলম হাতে নেন সে মুহূর্তে নিজের অজান্তেই সমাজ ও দেশের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব কাঁধে নিয়েই কাজ করছেন বলে বিবেচিত হবে।

সাংবাদিকরা পরিচয়পত্র অর্থাৎ অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড বহন করেন। এ কারণে তারা যে কোনো স্থানে প্রবেশাধিকার রাখেন। এমনকি বিশেষ সংরক্ষিত এবং নিরাপত্তাবেষ্টিত জায়গায় প্রবেশাধিকার থাকতে পারে, যা সমাজের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তির থাকে না। তারা দেশের বাইরেও যে কোনো স্থানে বিশেষ ব্যক্তিত্বের পরিচয়ে পরিচিত হন এবং সম্মানিত হয়ে থাকেন। দেশের এবং দেশের বাইরে কোথায় কি ঘটছে জনগণ তা জানার জন্য তৃষ্ণার্ত থাকে এবং তাদের তৃষ্ণা মেটায় সাংবাদিকদের কলমের কালি। কখনো কখনো তাদের অজান্তে একেবারে নিষিদ্ধ ও বিপজ্জনক কোনো তথ্য তাদের হাতে এসে যায়। সেটি ইচ্ছে করলে দেশের মঙ্গলের জন্য ব্যবহার করা যায়, আবার সেটাই দেশের সার্বভৌমত্বকে হুমকির মুখে ঠেলে দেয়ার জন্য সহজেই ব্যবহার করা যথেষ্ট হতে পারে।

স্বাভাবিকভাবেই তাই সাংবাদিকরা খুব স্পর্শকাতর পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। আবার দুঃখজনক হলেও সত্যি, কেউ কেউ নিজ স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে দেশের স্বার্থ বিরোধী কাজ করার সাংবাদিকতার সুযোগ নিয়ে থাকেন। এরা মহান পেশায় থেকে দেশকে কলঙ্কিত করতে পারে। সংখ্যাগরিষ্ঠ নিবেদিত সাংবাদিকরা, যারা দেশের জন্য যে কোনো ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত তাদেরই উচিত, এসব মুখোশধারী ব্যক্তি, যারা সংবাদিকতার কলঙ্ক, তাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া।

বলাবাহুল্য, মানব সভ্যতার এক অনন্য দীপ্তি এবং গণমানুষের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হচ্ছে সংবাদপত্র। এটি পাঠককে দেশ-বিদেশ ও পারিপার্শ্বের নাগরিক জীবনকে প্রভাবিত কিংবা আপন করে তুলতে পারে। পাঠক শ্রোতাকে নির্ভরযোগ্য বস্তুনিষ্ঠ তথ্য দূর নিকটে কোথায় কি হচ্ছে তা ছাপার অক্ষরে তুলে ধরে থাকে। বার বার পড়ার সুযোগ থাকে। ফলে পাঠক হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হন।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

কিন্তু সংবাদপত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে রেডিও, টেলিভিশন, ইলেকট্রনিক মিডিয়া, ই-মেইল ও ইন্টারনেটের আবির্ভাব ঘটেছে। এসব চ্যানেল বা মাধ্যম পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের মানুষকে জানিয়ে দেয় কোথায় কি হচ্ছে বিজ্ঞানের এ সাফল্য উভয়ের গৌরব আরো বৃদ্ধি করেছে।

অনেক সময় বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করতে গিয়ে সংবাদপত্রের সম্পাদক ও সাংবাদিকরা প্রাণ হারাচ্ছেন, বিকলাঙ্গ হচ্ছেন। সংবাদপত্র জগতের এমন বিপন্নতা প্রতিরোধ অবশ্যই জরুরি। প্রত্যেক মানুষের মতো একজন সাংবাদিকেরও নিজস্ব মত ও চিন্তা আছে। আর থাকাটাই স্বাভাবিক। সংবাদপত্রের কাছে পাঠকের বস্তুনিষ্ঠ দাবি অত্যন্ত প্রবল। এ সাংবাদিকদের স্বাধীনতার প্রতি হুমকি ও অপশক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে তাদের কলমযুদ্ধ অবিরত চালিয়ে যাবেন— এ প্রত্যাশা সকলের।

স্বাধীনতার বিরূপ প্রভাব : সংবাদপত্র জনসংযোগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সংবাদপত্র জনগণের শিক্ষকও বটে। দেখা গেছে পৃথিবীর অধিকাংশ শিক্ষিত লোক সংবাদপত্র ছাড়া এর বেশি কিছু পড়েন না। সংবাদপত্রের মাধ্যমে তারা শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, রাজনীতি ইত্যাদির সমকালীন ধারা সম্বন্ধে নিজেদের অবহিত রাখেন। সুতরাং সংবাদপত্রকে যথার্থই জনগণের বিশ্ববিদ্যালয় বলা যেতে পারে। অথচ জনগণের সংবাদপত্র আজ অন্যতম এক শিল্প আঙ্গিক। সাংবাদিকরা অনেক সময় স্বাধীনতার আতিশয্যে তাদের দায়-দায়িত্বের কথা ভুলে যান। তখন তারা সংবাদ পরিবেশনে পক্ষপাতিত্বের পক্ষ নেন। দেশ, সমাজের তখন মারাত্মক ক্ষতি হয়। অথচ বাংলাদেশের সংবিধানেও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার বিষয়টি স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ৩৯ নম্বর অনুচ্ছেদে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং জনগণের ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। এ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে :

৩৯ (১) চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল। (২) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জ্ঞান শৃঙ্খলা, শালীনতা বা নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ সাপেক্ষে।

ক. প্রত্যেক নাগরিকের বাক ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের;

খ. সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল।

উপর্যুক্ত অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সহজেই অনুমেয় যে, স্বাধীনতার সঙ্গে পরাধীনতার বিষয়টিও জড়িত। অর্থাৎ একজন সৎ, নিষ্ঠাবান সাংবাদিক কখনো তার দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যবোধকে আইন ও নৈতিকতার বিরোধী হিসেবে প্রয়োগ করতে পারে না। আর যখন তিনি এই অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয়ের আশ্রয় নেন তখন সাংবাদিকতার স্বাধীনতা নামক বিষয়টি পরাভূত হয়। এ অবস্থায় সংবাদপত্রকে বলা হয় বিপজ্জনক প্রতিষ্ঠান। অবশ্য এর মূল কারণ বোঝা দুঃসাধ্য নয়। ব্যবসায়িক স্বার্থ ও মুনাফার মৃগয়া যেখানে অবাধ উদ্যম; যেসব দেশে জ্ঞান বিজ্ঞান প্রভৃতি পর্যন্ত সে বিকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে প্রযুক্ত হয়– ধর্ম এবং দেবতাও নিস্তার পায় না। 'মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা' কথাটা কার্যত হয়েছে স্বত্বাধিকারী মহামালিকদের যদৃচ্ছ আত্মপ্রচারের উদ্দেশ্য সিদ্ধির স্বাধীনতা। তখন সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব হয়। সংবাদপত্রে ইয়েলো জার্নালিজম বলে একটা কথা প্রচলিত আছে– যা সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অতিরঞ্জিতের ফসল। মি. জোসেফ পুলিৎজার জার্মানিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আর্থিক অবস্থার কারণে জার্মানি ছেড়ে চলে যান। তিনি খুব লেখাপড়া জানতেন না। কিন্তু তাকে আমেরিকার প্রথম সাংবাদিকতায় অংশগ্রহণ করতে হয়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

তিনি মেধা ও প্রজ্ঞা দিয়ে পরে তিনটি সংবাদপত্রের মালিক হন। বিশেষ করে সংবাদপত্রে আগে মহিলা কলাম লেখা, দুর্নীতি ও সাংস্কৃতিক ইত্যাদি বিষয়ে পত্রিকায় সংবাদ হিসেবে তিনিই প্রথম স্থান করে দেন। তিনি বাহ্যিকভাবে লাভবান হওয়ার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে বাজে শিরোনাম, সংবাদে যৌন আবেদন, তথ্য বিভ্রাট, রসবোধ, লেখনীর মাধ্যমে সংবাদ ছাপাতে শুরু করেন। এর ফলে ব্যবসা দ্রুত বৃদ্ধিসহ অর্থনৈতিকভাবে ধনকুবের হয়ে উঠেন।

১৮৯০ সাল থেকে মি. জোসে সংবাদের ভাষা ছবির কার্টুনের মাধ্যমে শুরু করেন। এই কার্টুনে হলুদ রং ব্যবহার শুরু করেন। এর নাম দেয়া হয় 'ইয়েলো কিড'। তিনি ১৮৯০ সাল থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত বিবেকবর্জিত ও বেপরোয়াভাবে সংবাদপত্রের পাতায় নানা ধরনের বৈচিত্র্যময় অর্থনৈতিক সংবাদ, ছবি, কার্টুন, স্ক্যান্ডালিং সবকিছু ছাপানো শুরু করেন। কথায়, মানুষ বলে হলুদ সাংবাদিকতা শুরু হয়েছে। অর্থাৎ সংবাদ বা খবরে উপযুক্ত অর্থনৈতিক হলুদ লাগালে খবরটি অসুস্থ হয়ে পড়ে। তখন সংবাদ আর সংবাদ থাকে না। সাংবাদিকদের স্বাধীনতার অপব্যবহার ও অতিরঞ্জিত ব্যবহারের ফসল এই ইয়েলো জার্নালিজম এর ফলে জনগণ বিভ্রান্ত হয়, তথ্য সন্ত্রাস ও বিভ্রান্তি ঘটে, পক্ষপাতিত্বের দাবানলে প্রতিপক্ষ ঘায়েল হয় এবং অযাচিত ঘটনার সূত্রপাত ঘটে।

উপসংহার : সংবাদপত্রের স্বাধীনতার কুফল ও সুফল উভয় দিক পরিলক্ষিত হলেও এ কথা সত্য যে, সংবাদ ও সাংবাদিকের স্বাধীন মত প্রকাশে এর বিকল্প নেই। একজন সাংবাদিক সমাজেরই মানুষ, কাজেই সামাজিক মানুষ হিসেবে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য তার লেখায় প্রতিফলিত হবে এটা অবান্তর কিছু নয়। কিন্তু সেই সামাজিক অধিকার প্রয়োগ করতে গিয়ে তিনি স্বেচ্ছাচারিতার আশ্রয় গ্রহণ করলে তা দেশ ও সমাজে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে। অন্যদিকে, সংবাদ পরিবেশনে হুমকি বা বিধি-নিষেধ আরোপ করা হলে তাও দেশের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াবে। তাই সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য সরকার ও বিরোধী দলগুলোর একত্রে অবস্থান জরুরি। এ স্বাধীনতা নিশ্চিত হলে সংবাদ ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে আমাদের সাবলীল পথচলা সুগম হবে।

০৪ ‖ জনগণের ক্ষমতায়নে তথ্য অধিকার আইনের ভূমিকা বর্ণনা করুন।

উত্তর : তথ্য প্রাপ্তির অধিকার জনগণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হিসেবে বিবেচিত হয়। প্রত্যেক নাগরিক তার সমাজ, দেশ ও সরকারের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তথ্য পাওয়ার অধিকার রাখে। যথাযথ তথ্যের অভাবে সরকারের কর্মকাণ্ডের সমন্বয় ও নাগরিকের অধিকার নিশ্চিত হয় না। সমাজ ও রাষ্ট্রের সকলক্ষেত্রে সব নাগরিকের সুযোগ-সুবিধা, অধিকার নিশ্চিত করা ও অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করার মাধ্যমেই তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হয়। যেহেতু জনগণ প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক। তাই জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য তথ্য অধিকারের বিষয়টির ভূমিকা অগ্রগণ্য। বাংলাদেশের জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ সরকার তথ্য অধিকার কমিশন গঠন করে, যা জনগণের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল।

তথ্য অধিকার কি? যে সব তথ্য সাধারণ নাগরিকের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার অর্জনে সহায়ক, যার অভাবে এ অধিকারগুলো অর্জন করা কঠিন হয়ে পড়ে, রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় নাগরিক নিরবিচ্ছিন্নভাবে বা বাধাহীনভাবে অংশ নিতে পারে না, সেসব তথ্য পাওয়ার অধিকারকে সাধারণভাবে তথ্য অধিকার বলে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

তথ্য অধিকার কমিশন : দেশের সকল নাগরিকের জন্য তথ্যসেবা নিশ্চিত করতে ১ জুলাই ২০০৯ থেকে 'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯' কার্যকর হয়। ২০০৯ সালের ১৫ মার্চ জাতীয় সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে তথ্য অধিকার আইন পাস হয়। বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় ২০০৮-এ 'তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ' জারি হয়। যেখানে নয়টি ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য কোনো তথ্য প্রদানে অস্বীকৃতি জানালে, বিকৃত, ভুল তথ্য দিলে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাকে সর্বোচ্চ ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে।

নিষিদ্ধ ৯টি তথ্য : রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব, সম্মান, পররাষ্ট্রনীতি, প্রতিরক্ষা এবং কোনো বিদেশী রাষ্ট্র বা সংস্থার সাথে বিদ্যমান সম্পর্ক ক্ষুণ্ন করে, সরকারি কোনো কর্তৃপক্ষের বাণিজ্যিক স্বার্থ, কৌশলগত বৈজ্ঞানিক স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে, সরকারের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে বিঘ্নিত বা কোনো বিশেষ ব্যক্তি, সংস্থাকে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে এমন তথ্য প্রদান করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

জনগণের ক্ষমতায়নে তথ্য অধিকার আইন : সংবিধানে নাগরিকের তথ্য অধিকারের বিষয়টি নিশ্চিত করা হলেও জনগণ সে অধিকার থেকে বরাবরই বঞ্চিত হয়ে আসছে। জনগণের প্রাপ্য অধিকারের বিষয়টি সম্পর্কে প্রতিটি সরকার ও সরকারি আমলারা তথ্য প্রদানে অনীহা প্রকাশ করে আসছে। কিন্তু তথ্য অধিকার আইন দেশের জনগণের তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সে সুযোগ সৃষ্টি করে। যার মাধ্যমে জনগণ তাদের অধিকার কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হতে পারছে এবং জনগণ তাদের প্রকৃত ক্ষমতায়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। তথ্য অধিকার জনগণের ক্ষমতায়নে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে তা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো থেকে সহজে বোঝা যায়।

i. **নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে :** তথ্য জানার অধিকার থেকে বাংলাদেশের জনগণ এতদিন বঞ্চিত হলেও তথ্য অধিকার আইনটি নাগরিকদের তথ্য প্রাপ্তির আইনি অধিকারকে জোরালো করেছে। এ আইনে নাগরিকের প্রকৃত অধিকারের বিষয়টি জানার নিশ্চিয়তা থাকার মাধ্যমে রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মূল উৎস হিসেবে তার প্রকৃত ক্ষমতার বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত হতে পারবে।

ii. **সুশাসন নিশ্চিত হওয়ার মাধ্যমে :** সুশাসনে নাগরিক অধিকারের বিষয়টি মোটামুটি নিশ্চিত থাকে। নির্দিষ্ট করে বললে সুশাসন বিষয়টির সাথে রাষ্ট্রের জনগণের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকারের নিশ্চয়তা থাকে। তথ্য অধিকারের মাধ্যমে নাগরিকরা তাদের যাবতীয় প্রাপ্য অধিকারের অপ্রকাশিত অবস্থা থেকে মুক্তি পায় এবং এর ফলে প্রজাতন্ত্রের কর্তা ব্যক্তিরা যথাযথ তথ্য প্রদানে বাধ্য থাকে আর তাতে জনগণের প্রকৃত অধিকারের নিশ্চয়তার মাধ্যমে তাদের ক্ষমতার সীমাটিও নিশ্চিত হয়।

iii. **দুর্নীতি হ্রাসের মাধ্যমে :** অপ্রকাশিত তথ্যের অবাধ প্রবাহের নিশ্চয়তা থাকলে জনগণ দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার ও প্রশাসনের উপর দুর্নীতি রোধে চাপ প্রয়োগ করতে পারে। প্রশাসনের কোনো দুর্নীতির বিষয়ে জনগণ তথ্য পেয়ে যেতে পারে এই ভয়ে ভীত হয়ে সরকার ও প্রশাসনের কর্মকর্তাদের মধ্যে দুর্নীতি করার প্রবণতা হ্রাস পায়। জনগণের অধিকার লঙ্ঘিত হলে তথ্য অধিকার প্রাপ্তির ক্ষমতার মাধ্যমে জনগণ তা প্রতিরোধ করার সুযোগ পাবে। এতে করে সরকার ও প্রশাসনের কর্মকর্তা কর্মচারীদের স্বেচ্ছাচারিতা হ্রাস পায় এবং বিপরীতে জনগণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

iv. **প্রশাসনের গতিশীলতা আনয়নের মাধ্যমে :** বাংলাদেশে সরকারি চাকরিরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে একটি বিষয় খুব স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়, তা হলো কাজে ফাঁকি দেওয়া, সময়ের কাজ সময়ে না করা, লালফিতায় আবদ্ধ রাখা। মোটকথা দায়িত্বশীলতার জায়গায় একেবারে উদাসীন ও দায়সারা গোছের। কিন্তু সরকার কর্তৃক তথ্য অধিকার আইন পাশের মাধ্যমে জনগণ সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পায়। এতে করে সরকারে থাকা এবং প্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে অবহেলা করার কোনো সুযোগ পায় না। ফল হিসেবে প্রশাসনের গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়, যা কেবল সম্ভব হয় জনগণের ক্ষমতায়নের কারণে।

v. **জনগণ ও সরকারের মধ্যে দূরত্ব কমার মাধ্যমে :** সরকারের কার্যক্রম, নীতিমালা, উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে জানার জন্য দেশের প্রতিটি নাগরিকের মধ্যে অন্যরকম একটি আগ্রহ কাজ করে। উপর্যুক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে জনগণ যথাযথ তথ্য পেলে এবং তথ্যানুযায়ী কার্যক্রম পরিচালিত হলে সরকারের উপর জনগণের আস্থা বৃদ্ধি পায়। সরকারের গৃহীত কোনো পদক্ষেপ জনকল্যাণমুখী না হলে জনগণ তার বিরুদ্ধবাদ করতে পারে। এতে সরকার জনগণের মতামত সম্পর্কে অবহিত হতে পারে। তথ্য জানা বা পাবার বিষয়টি অবাধ না হলে সরকার ও জনগণের মধ্যে একটি দূরত্বের সৃষ্টি হয়। তথ্য অধিকার আইন জনগণের ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকার ও জনগণের ক্ষমতায় ভারসাম্য আনয়নে দু'য়ের মাঝে সেতুবন্ধন তৈরি করে।

vi. **তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করার মাধ্যমে :** তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে সরকারের কাজের অপ্রকাশিত সব তথ্যাদি সম্পর্কে দেশের জনগণ জানতে পারবে। এখানে অপ্রকাশিত শব্দটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সচরাচর প্রকাশিত কোনো তথ্য এ আইনের আওতায় পড়ে না। কারণ প্রকাশিত তথ্য জানার জন্যে অধিকার প্রয়োগ করে আদায় করতে হয় না। তথ্য অধিকার বলবৎকরণের মাধ্যমে এর প্রবাহকে অবাধ রাখতে হবে এবং সঠিক তথ্যের প্রবাহকেও নিশ্চিত করতে হবে। তথ্যের অবাধ প্রবাহের মাধ্যমে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তাদের কাজ সম্পর্কে সাবধান ও ভীত থাকে পক্ষান্তরে যথাযথ তথ্য জানার মাধ্যমে জনগণের সুযোগ-সুবিধা ও অধিকারের জায়গাগুলো নিশ্চিত এবং অন্যের দ্বারা বিশেষ করে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দ্বারা প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যায়। সহজ কথায় প্রজাতন্ত্রের প্রকৃত ক্ষমতার মালিক জনগণের ক্ষমতা তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে অনেকগুণ বৃদ্ধি পায় কেবল এর যথাযথ প্রবাহের মাধ্যমে।

উপসংহার : তথ্য অধিকার বিষয়টি কার্যকরী করার জন্য তথ্য কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামোকে জোরদার করে কমিশনের কার্যকরী ভূমিকা নিশ্চিত করতে হবে। সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় ও গণমাধ্যমের সর্বাত্মক সহযোগিতা এবং তথ্য কমিশনকে সমৃদ্ধ করতে এর সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রকে বাড়াতে হবে। তথ্য সর্বস্তরের মানুষের মাঝে পৌছানোর জন্য অদৃশ্য যে প্রতিবন্ধকতা আছে সেগুলো দূর করতে হবে এবং তা কেবল সম্ভব তথ্য কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো আরো সুদৃঢ় ও শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে। আমরা যদি দেশকে সমৃদ্ধশালী, দুর্নীতিমুক্ত করতে চাই তাহলে তথ্য অধিকারের অবাধ প্রবাহের কোনো বিকল্প নেই। সর্বোপরি জনগণের তথ্য অধিকারের বিষয়টি নিশ্চিত করার মাধ্যমে, দেশের প্রকৃত ক্ষমতার মালিক জনগণের ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বারে বারে পরিবর্তনশীল সরকার চায় কি-না, তার উপরই নির্ভর করে তথ্য অধিকার আইনের সার্থকতা।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

০৫। ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে সরকারের এ পর্যন্ত গৃহীত পদক্ষেপসমূহ আলোচনা করুন।
অথবা, **ডিজিটাল বাংলাদেশ বলতে কি বোঝায়? ডিজিটাল বাংলাদেশ সম্পর্কে বিস্তারিত অলোচনা করুন।**

উত্তর : 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' ভিন্ন কোনো জগৎ নয়। আমাদের এ জগৎটিকে আরো বেশি উন্নত, আরো বেশি গতিশীল এবং আরো বেশি সংবেদনশীল করাই হচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশ। আবার ভিন্নজনের নিকট এটি ভিন্ন জগৎও বটে। একজন ছাত্রের কাছে তার উন্নত মানের শিক্ষা পাওয়ার নিশ্চয়তা, একজন কৃষকের কাছে বাজারের নিশ্চয়তা, একজন রোগীর কাছে দীর্ঘ লাইনে না দাঁড়িয়ে সুচিকিৎসা পাওয়ার নিশ্চয়তা, একজন পেনশনভোগীর কাছে, একজন মুক্তিযোদ্ধার কাছে ও একজন বিধবার কাছে তার পেনশনের টাকাটা সময়মতো স্বচ্ছতার সাথে পাওয়ার নিশ্চয়তা অর্থাৎ প্রতিটি মানুষের চাহিদামতো সেবা তার দোরগোড়ায় পৌছে দেয়ার সুযোগই হচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশ। বিশ্বে তথ্যপ্রযুক্তির অনেক উন্নতি হয়েছে গত কয়েক বছরের মধ্যে। বাংলাদেশও বিশ্ব তথ্যপ্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে স্বীয় উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়েছে। এ প্রসঙ্গে বহুবিধ কর্মপরিকল্পনার প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন হয়েছে বা হচ্ছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ : ডিজিটাল বাংলাদেশ হচ্ছে কম্পিউটার ও উন্নততর তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে সেবাকে মানুষের দোরগোড়ায় পৌছে দেয়া এবং জবাবদিহিতার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা। এটি একটি যুগোপযোগী, কিছুটা ব্যাপকভিত্তিক ও সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা; এ পরিকল্পনার মাধ্যমে ই-গভর্নেন্স, ই-কৃষি, ই-স্বাস্থ্য, ই-বাণিজ্য, ই-ভূমি মালিকানা, ই-শিক্ষাসহ প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক সেবা নিশ্চিত করাই হলো ডিজিটাল বাংলাদেশের মূল লক্ষ্য। এর ফলে প্রশাসনসহ সকল স্তরে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গতিশীলতা আসবে। এ ব্যবস্থা মানুষের কাজকে সহজ করবে, মানুষের কষ্ট লাঘব করবে ব্যয় হ্রাস করবে, সময় অপচয় রোধ করবে। এ ব্যবস্থায় দেশের প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ঘটবে। মানুষ দক্ষ ও অভিজ্ঞ হয়ে উঠবে। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে কাজ করার অবারিত সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। এক কথায় ডিজিটাল বাংলাদেশ হচ্ছে বাংলাদেশের সকল স্তরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করে আধুনিক, যুগোপযোগী সেবা প্রদান করা।

ডিজিটাল বাংলাদেশ ধারণার উদ্ভব : নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এর নির্বাচনী ইশতেহার 'দিন বদলের সনদ'-এর অংশ হিসেবে ২০২১ সালের মধ্যে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার স্বপ্ন থেকেই 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' ধারণার উদ্ভব। ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত নির্বাচনকে সামনে রেখে ২০০৮ সালের ১২ ডিসেম্বর এ ঘোষণা দেয়া হয়। যদিও এ এজেন্ডায় একটি তারিখ যুক্ত করা হয়, তবুও এর ব্যাখ্যায় একে একটি টার্গেট হিসেবে না দেখে বরং একটি দীর্ঘমেয়াদী রূপকল্প হিসেবে দেখা হয়। এ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ধারণা দ্রুত জনগণের ভাবনায় পরিণত হয় এবং গোটা নির্বাচনী ইশতেহারের মুখ্য অংশ হয়ে ওঠে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ ও অতীত কর্মসূচি : ডিজিটাল বাংলাদেশ কথাটি ২০০৮ সালের ১২ ডিসেম্বর থেকে এ দেশের মানুষের মুখে মুখে শোনা গেলেও এটি নতুন কিছু নয়। ১৯৯১ সালের দিকে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো জাতিসংঘের ইউএনডিপি ও ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড সেন্টার-এর সহায়তায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বাজার সম্ভাবনা উদ্‌ঘাটনের উদ্যোগ নেয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় তার আরেকটি প্রকল্পের আওতায় ইউএনডিপি ও ইউনিডার সহযোগিতায় ১৯৯২ সালে সমস্যার

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করতে এবং বাংলাদেশের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি রপ্তানির সুপারিশমালা তৈরির কাজে নিয়োজিত হয়। এর মধ্যে একটি বহুল স্বীকৃত উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় ১৯৯৭ সালে। অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরীকে আহ্বায়ক করে তখন একটি কমিটি গঠন করা হয় বাংলাদেশ রপ্তানিমুখী সফটওয়্যার শিল্পের রপ্তানি সম্ভাবনা উদ্ঘাটনের জন্য। এ কমিটিতে প্রতিনিধিত্ব ছিল সরকার, শিল্পখাত ও শিক্ষাবিদদের। এ কমিটি ১৯৯৭ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর এর প্রতিবেদন পেশ করে। এ কমিটির বেশ কিছু সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়, যা বিভিন্নভাবে বাংলাদেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির আধুনিক রূপ গড়ে তোলে। বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস)-এর প্রতিষ্ঠা, ২০০০ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে তথ্য ও যোগাযোগ কমিটি টাস্ক ফোর্স গঠন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি পণ্য আমদানির ওপর সরকারি লেভি উল্লেখযোগ্য মাত্রায় নামিয়ে আনা ইত্যাদির উল্লেখ ছিল উল্লিখিত রিপোর্টে। কমিটির রিপোর্ট সচরাচর জেআরসি রিপোর্ট নামেই আখ্যায়িত হয়। এ রিপোর্ট নাগরিক ও সরকারের সাধারণ ভাবনা-চিন্তাকেই ধারণ করে, যা পরবর্তীতে আসা সরকারগুলোর মধ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কে নবায়িত রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতির জন্ম দিয়েছিল।

২০০০ সালে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে জাতিসংঘ ও শিল্পায়িত দেশসমূহের সংগঠন জি-৮ ICT for Development (ICT4D)-কে বিশ্ব উন্নয়নের একটি হাতিয়ার হিসেবে ঘোষণা করে। এর দ্বারা জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ উদ্বুদ্ধ হয়ে ২০০১ সালের ২১ ডিসেম্বরের ৫৬/১৮৩ নম্বর প্রস্তাব পাস করে World Summit on the Information Society (WSIS) আয়োজনের সমর্থন জানায়। প্রথম পর্যায়ে শীর্ষ সম্মেলন আয়োজিত হয় জেনেভায় ২০০৩ সালের ১০-১২ ডিসেম্বর এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তিউনিসে ২০০৫ সালের ১৬-১৮ নভেম্বরে। WSIS-এ বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী, যিনি অনুসমর্থন জানান WSIS ১১ দফা এজেন্ডার প্রতি এবং বাংলাদেশের ইচ্ছে প্রকাশ করেন ২০০৬ সালের মধ্যে তথ্যসমাজে পরিণত করার। ২০০৫ সালে দ্বিতীয় শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেন তৎসময়ের বিজ্ঞান ও তথ্য এবং যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রী। তিনিও ইচ্ছা প্রকাশ করেন এ এজেন্ডা অনুসরণ করে চলার।

ডিজিটাল বাংলাদেশ ও কর্মপরিকল্পনা : ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে ১০ দফা কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এর মধ্যে বিকল্প সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপন, উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ফাইবার অপটিক নেটওয়ার্ক স্থাপন ও গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত কম্পিউটার পৌছানোর ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ কর্মপরিকল্পনায় রয়েছে– সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং এ বিষয়ে গৃহীত সব প্রকল্প বাস্তবায়নে নিবিড় পর্যবেক্ষণ করা; বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাক্রমে কম্পিউটার শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা; জনগণের মাঝে শিক্ষা ও কম্পিউটার ব্যবহারের সচেতনতা সৃষ্টি ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান; জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে কম্পিউটারের তথ্যাদি ও তার ব্যবহার সম্পর্কে সমন্বয় সাধন করা; পর্যাপ্ত অর্থের বরাদ্দ প্রদান ও বরাদ্দকৃত অর্থের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করা; প্রতিটি উপজেলায় সাইবার ক্যাফে, কল সেন্টার ইত্যাদি স্থাপন করা; সব উন্মুক্ত দরপত্র অনলাইনে প্রকাশের ব্যবস্থা নেয়া; কম্পিউটার সফটওয়্যারের মাধ্যমে বিভিন্ন লাইসেন্স ফি গ্রহণ ও নবায়ন; ই-কমার্স প্রচলন ও পোস্ট-ই সেন্টার স্থাপন; ই-মানি অর্ডার ও মোবাইল মানিঅর্ডার চালু; আইপি টেলিফোন এবং ভিডিও কনফারেন্সের ব্যবস্থা প্রবর্তন; দেশে ওয়াইম্যাক্স, থ্রিজি এবং ফাইবার অপটিক অ্যাকসেস নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সাবমেরিন ক্যাবলের ব্যান্ডউইথ ব্যবহার নিশ্চিত করা;

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ ও ব্রডব্যান্ড চার্জ কমানো; দেশের জন্য একটি বিকল্প সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপন করা; দেশে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ফাইবার অপটিক অ্যাকসেস নেটওয়ার্ক স্থাপন করা। কর্মপরিকল্পনায় বেশি সংখ্যক লোককে প্রযুক্তিভিত্তিক সুবিধা পৌছে দিতে মোবাইল ফোন, পিএসটিএন ও বিটিসিএলের যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে শুল্ক কাঠামো পুনর্বিন্যাসের প্রস্তাব করা হয়েছে। ট্রান্সমিশন ও রিসিভিং এপারেটাস (বিটিএস), বেইজ স্টেশন্স (বিএসসি) এবং টেলিফোনিক অ্যান্ড টেলিগ্রাফিক সুইচিং এপারেটাসের (এমএসসি) শুল্ক আসন্ন বাজেটের আগেই ৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৩ শতাংশে নামিয়ে আনা, সিমকার্ডের ওপর বিক্রয় কর ৮শ টাকা থেকে কমিয়ে শূন্য করা, সব ধরনের হ্যান্ডসেটের ওপর ১২ শতাংশের পরিবর্তে ১০০ টাকা কর ধার্যের প্রস্তাব করা হয়েছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে সরকারের এ পর্যন্ত গৃহীত পদক্ষেপ : ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে সরকার এ পর্যন্ত যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তা নিচে উল্লেখ করা হলো :

১. **ই-গভর্নেন্স চালুর উদ্যোগ :** ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে সরকার ইউএনডিপির সহায়তায় ই-গভর্নেন্স চালুর উদ্যোগ নিয়েছে। সরকারি এ সেবা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এ ব্যবস্থার ফলে সরকারি বিভিন্ন তথ্য জানতে বা সেবা নিতে অফিসে বা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে দৌড়াদৌড়ি করতে হবে না। সব ধরনের হয়রানি বন্ধের পাশাপাশি ব্যয় ও সময় বাঁচবে, প্রশাসনিক স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গতিশীলতা আসবে। ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে সহজেই বাসায় বসে বা টেলিসেন্টারে গিয়ে তথ্য সেবা নিশ্চিত করা যাবে। সরকার ই-গভর্নেন্স চালু করতে এ পর্যন্ত বিভিন্ন পদক্ষেপ চালু করেছে। যেমন– বিভিন্ন মন্ত্রণালয় নিজস্ব ওয়েবসাইট চালু করেছে। মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান করছে।

২. **ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়ন :** দেশের সবচেয়ে বড় তথ্য ও যোগাযোগ উদ্যোগ হিসেবে ২০০৭-০৮ সাল সময় পরিধিতে ছবি সম্বলিত প্রযুক্তিগত ভোটার তালিকা তৈরির কাজ বাস্তবায়িত হয়। ইউএনডিপির কারিগরি সহায়তায় এ কাজটি করা হয়। যাতে একটি নির্ভরযোগ্য ভোটার তালিকা প্রণয়ন সম্ভব হয়। এ প্রকল্পের সময়ে দেশের সাধারণ নাগরিকের বেশির ভাগই তাদের জীবনে এই প্রথম প্রযুক্তিগত যন্ত্রাংশ দেখতে পায় এবং স্বাগত জানায় এর ব্যাপক সম্ভাবনাকে। একইভাবে ৫০ হাজার তরুণ-তরুণীকে প্রশিক্ষিত করে তোলা হয়েছিল অভিজাত সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশন সিস্টেম চালনার ব্যাপারে এবং এরা প্রকল্পের অনেক কর্মকাণ্ডে অংশ নেয়।

৩. **মোবাইলে কৃষি সেবা :** আমাদের অর্থনীতিতে কৃষি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মোট জনসংখ্যার সিংহভাগ এখনো এ পেশার সাথে সম্পৃক্ত। উপযুক্ত তথ্যের অভাবে অনেক সময়ই কৃষকের পক্ষে আশানুরূপ উৎপাদন বা সঠিক মূল্যে বিপণন করা সম্ভব হয় না। যেমন– কোন জমিতে কী ফসল লাগাবে, সার কোন সময়ে কী পরিমাণ দিতে হবে বা পোকায় ধরলে কোন কীটনাশক ব্যবহার করতে হবে– এ তথ্যগুলো কৃষকের কাছে সর্বদাই গুরুত্বপূর্ণ। এ অবস্থায় কৃষি পুরোপুরি চালু হলে কৃষকদের বিশেষ উপকার হবে। বাংলাদেশে বর্তমানে ৫ কোটি মানুষ মোবাইল ব্যবহার করছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন মোবাইল কোম্পানি কৃষি সেবার জন্য কৃষকদের বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিচ্ছে। ফলে দিন দিন মোবাইলের ব্যবহার জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে বা ই-মেইলের মাধ্যমে যে কেউ বিশেষজ্ঞদের কাছে যে কোনো সমস্যার সমাধান পেতে পারে। সরকারি কৃষিবিদরা এখন অফিস থেকে সরাসরি কৃষকদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। মোবাইলের

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

আরেকটা সুবিধা হলো, কোথা থেকে ফোনটা করা হয়েছে অর্থাৎ অক্ষাংশ দ্রাঘিমাংশসহ জিও লোকেশন এখন বের করা সম্ভব। মৃত্তিকা জরিপের মাধ্যমে বাংলাদেশের একটা মানচিত্র তৈরি করা হয়েছে যাতে বিভিন্ন এলাকার মাটির ধরন চিহ্নিত করা হয়েছে। এতে কৃষকদের অবস্থান জেনে কোন ফসলটা ঐ খামারে ভালো হবে তা বলা যাবে। আরেকটা সুবিধা, মোবাইলে এখন ক্যামেরা যুক্ত হয়েছে। ফলে রোগাক্রান্ত পাতা বা পোকার ছবি দেখে বিশেষজ্ঞরা বলে দিতে পারবেন, তাদের জন্য কোন কীটনাশক উপযোগী। এছাড়া সঠিক পরিমাণ সার ও সেচের পানি ব্যবহার নিশ্চিত করে সার ও পানির অপব্যবহারও কমবে।

৪. **টেলিমেডিসিন সেবা :** স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। অথচ আমাদের দেশে অজস্র শিশু অপুষ্টিতে ভুগছে। আমাদের দেশের স্বাস্থ্য কাঠামো অত্যন্ত দুর্বল। এখানে ই-সেবা সহজলভ্য করা সম্ভব হলে গ্রামের লোকজন বিশেষভাবে উপকৃত হবে। অনেক হাসপাতালই টেলিমেডিসিন সেবা চালু করেছে বিভিন্ন মোবাইল অপারেটরও টেলিফোনে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা দিচ্ছে। সব রোগের সেবা দেয়া সম্ভব না হলেও কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে যেমন চর্মরোগের সেবা ক্যামেরাযুক্ত মোবাইলের মাধ্যমে দেয়া সম্ভব। টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে চিকিৎসা সেবাও নিশ্চিত করা যায়।

৫. **ই-শিক্ষা :** ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ই-শিক্ষা। অবশ্য এখনো এর ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়নি। একবার শুরু করা গেলে ছাত্রছাত্রীরা খুবই উপকৃত হবে। ই-শিক্ষা ছাত্রছাত্রী, শিক্ষকদের জ্ঞানের রাজ্যে বিচরণের অবাধ দ্বার উন্মুক্ত করে দেবে। সরকার ইতোমধ্যেই মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল ইন্টারনেটে প্রকাশ করা শুরু করেছে। তাছাড়া মাধ্যমিকের টেক্সট বইও এখন ইন্টারনেটে পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া পিএসসি গৃহীত বিভিন্ন চাকরি সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন ও ফলাফল বেশ কয়েক বছর হতে ইন্টারনেটে প্রকাশ করছে। কাজেই এখন আর ফলাফলের জন্য পরবর্তী দিনের সংবাদপত্রের জন্য অপেক্ষা করতে হয় না বা সংবাদপত্র অফিস ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করতে হয় না। ইতোমধ্যে সরকার আগামী কয়েক বছরের মধ্যে উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ইন্টারনেট সেবা পৌঁছে দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

৬. **ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সরকারি প্রতিষ্ঠানের সেবা :** বাংলাদেশের প্রায় সব সরকারি প্রতিষ্ঠানেই এখন ওয়েবসাইট আছে। ব্রিটিশ আমল থেকে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে যত আইন হয়েছে, সে ডকুমেন্টগুলো ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। ফলে এখন আর জনগণকে কষ্ট ও সময় অপচয় করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে গিয়ে সেবার জন্য ঘুরতে হয় না।

৭. **অনলাইনে আয়কর রিটার্ন জমা :** আয়কর প্রদানে করদাতাদের হয়রানি বন্ধ করতে সরকার অনলাইনে আয়কর রিটার্ন জমা দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। অভিন্ন টেলিযোগাযোগ স্থাপনের জন্য সরকার দেশের বিভিন্ন স্থানে ফাইবার অপটিক ক্যাবল স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। মূল্য সংযোজন কর ফাঁকি রোধ করা এবং আদায় বাড়ানোর জন্য রাজধানী এবং সকল বিভাগীয় শহরের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ইলেকট্রনিক্স ক্যাশ রেজিস্ট্রার (ECR) বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের কার্যক্রম আরো গতিশীল করার উদ্দেশ্যে সোনালী ব্যাংকের ৬শ শাখা অটোমেশন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ঢাকা মহানগরীতে বাস রুট ফ্রান্সাইচ পদ্ধতিতে বাস সার্ভিস চালু হয়েছে, যার টিকেট বিক্রি করা হচ্ছে ডিজিটাল পদ্ধতিতে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৮. **ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু :** ভূমি নিবন্ধনে ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু করা হয়েছে। এতে ভূমি সংক্রান্ত সকল তথ্য কম্পিউটারে সংরক্ষণ করা হবে। পাসপোর্ট করার ক্ষেত্রে ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু হওয়ায় জনগণ ১ ঘণ্টার মধ্যে নতুন পাসপোর্ট পাচ্ছে। কম্পিউটারে সকল তথ্য সংরক্ষণ করার ফলে এক ব্যক্তির একাধিক পাসপোর্ট রাখার সম্ভাবনা দূর হয়েছে। প্রতিবন্ধীদের স্বাস্থ্যসেবা ও সহায়ক উপকরণ সরবরাহ করার লক্ষ্যে ওয়ান স্টপ সার্ভিস প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

৯. **হাইটেক পার্ক ও কম্পিউটার ভিলেজ স্থাপন :** কম্পিউটারের ওপর শুল্ক হ্রাস, আইটি শিল্পের বিকাশে ১০০ কোটি টাকার বিশেষ তহবিল গঠন, আইসিটি খাতে টাস্কফোর্স গঠন, দেশের বিভিন্ন স্থানে হাইটেক পার্ক, আইসিটি ইনকিউবেটর এবং কম্পিউটার ভিলেজ স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

১০. **পুলিশ বাহিনীতে এটিসি থ্রি এক্স প্রযুক্তি চালু :** বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীতে ডিজিটাল পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটানো হয়েছে। এখানে এটিসি থ্রি এক্স (কমান্ড কন্ট্রোল অ্যান্ড কমিউনিকেশন সিস্টেম) পদ্ধতিতে কন্ট্রোল রুমের কার্যক্রম চালু হয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় সিসি টিভি, ইলেক্ট্রনিক্স ট্রাফিক সাইনবোর্ড, কল ট্রেনিং সুবিধা এবং অত্যাধুনিক ওয়াকিটকি থাকবে।

১১. **সার্ভার কেন্দ্র স্থাপন :** ভোটার তালিকা হালনাগাদ করতে নির্বাচন কমিশন ৫০২টি সার্ভার কেন্দ্র স্থাপন করেছেন। দেশের গ্রন্থাগারগুলোকে ইন্টারনেটের আওতায় আনার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।

১২. **কাস্টমস হাউজে অটোমেশন পদ্ধতি চালু :** চট্টগ্রাম কাস্টম হাউজের পর এখন ঢাকা কাস্টম হাউজকেও অটোমেশন পদ্ধতির আওতায় আনা হয়েছে।

১৩. **ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ই-কমার্স চালু :** দেশে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় প্রথম ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে বাণিজ্যিক লেনদেন (ই-কমার্স) ব্যবস্থা চালু হয়েছে। ঘরে বসেই ব্যাংক লেনদেন, বিল পরিশোধসহ স্থানীয় মুদ্রায় ক্রেডিট কার্ডে লেনদেন করা যাবে।

১৪. **অন্যান্য পদক্ষেপ :** ডিজিটাল বাংলাদেশের প্রধান অবকাঠামো হিসেবে ন্যাশনাল আইটি ব্যাকরণ তৈরির জন্য ৩০০ কোটি টাকার চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। ঢাকার বিভিন্ন স্থানে ৩১টি ইলেক্ট্রনিক্স ট্রাফিক সাইন বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং ৫৯টি পয়েন্টে ১৫৫টি সিসি টিভি স্থাপন করা হয়েছে। গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম বা জিপিএস পদ্ধতি ব্যবহার করে গাড়ির গতিবিধি শনাক্ত করা হচ্ছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার জন্য দেশের মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলোকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। উচ্চগতির তারহীন ইন্টারনেটে ওয়াইম্যাক্স চালু হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর সাথে নেটওয়ার্ক বাড়াতে টেরিস্ট্রিয়াল লিঙ্ক চালুর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। পোস্ট অফিসগুলোকে টেলিসেন্টারে রূপান্তর করা হচ্ছে। অনলাইনে টেন্ডার আহ্বান ও জমার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। গ্রাম পর্যায়ে কল সেন্টার এবং টেলিসেন্টার স্থাপন করা হবে।

উপসংহার : প্রযুক্তির মূল উদ্দেশ্য মানুষের জীবনযাত্রা সহজ করা। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিই বর্তমান বিশ্বে সকল প্রকার উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মূল হাতিয়ার। যে জাতি তথ্যপ্রযুক্তিতে যত বেশি দক্ষ তাদের সার্বিক অবস্থাও তত বেশি উন্নত। তথ্যপ্রযুক্তি বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে দ্রুত প্রসারমান ও মূল্যবান শিল্প। কিন্তু আমাদের দেশে এখনো তথ্যপ্রযুক্তির পর্যাপ্ত ও যথাযথ বিকাশ ঘটেনি। তাই তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বেকারত্ব দূর করার জন্য আমাদেরকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। তবেই সম্ভব হবে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

০৬। ব্লগ কি? ব্লগের প্রকারভেদ আলোচনাপূর্বক ব্লগার হওয়ার নিয়মসহ বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে ব্লগিং ধারণা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

উত্তর : আধুনিকতার ছোঁয়ায় সামাজিক জীবনে বর্তমানে যে বিষয়টি বেশি প্রভাব ফেলছে, সোস্যাল নেটওয়ার্ক বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম হলো তার মধ্যে অন্যতম। ব্লগিং হলো সোস্যাল নেটওয়ার্কের একটি অংশ। আবার বলা যায় এটি এমন একটি শক্তিশালী মিডিয়া যা রাজনৈতিক এবং সামাজিক বিভিন্ন ব্যাপারে অভাবনীয় পরিবর্তন আনতে সক্ষম। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে শুরু করে এমনকি বাংলাদেশ পর্যন্ত সামাজিক , রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অনেক বিষয়ের উপর আলোচনা ও মন্তব্যের মাধ্যমে ব্লগিং ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। তবে এর কিছু কিছু বিষয়ে জনমনে নেতিবাচক ধারণা তৈরি হতেও দেখা যায়।

ব্লগ : ব্লগ শব্দটি ইংরেজি Blog এর বাংলা প্রতিশব্দ, যা এক ধরনের অনলাইন জার্নাল। ইংরেজি Blog শব্দটি আবার Weblog এর সংক্ষিপ্ত রূপ। যিনি ব্লগে পোস্ট করেন তাকে ব্লগার বলা হয়। ইংরেজি Blog শব্দের অর্থ Oxford Dictionary তে বলা হয়েছে— Blog is a personal record that somebody puts on their website giving an account of their activities and opinions and discussing places on the Internet they have visited. ব্লগাররা প্রতিনিয়ত তাদের ওয়েবসাইটে কনটেন্ট যুক্ত করেন আর ব্যবহারকারীরা সেখানে তাদের মন্তব্য করতে পারেন। এছাড়াও সাম্প্রতিককালে ব্লগ ফ্রি-ল্যান্স সাংবাদিকতার একটা মাধ্যম হয়ে উঠছে। সাম্প্রতিক ঘটনাসমূহ নিয়ে এক বা একাধিক ব্লগাররা এটি নিয়মিত আপডেট করেন। বেশিরভাগ ব্লগই কোনো একটা নির্দিষ্ট বিষয়সম্পর্কিত ধারাবিবরণী বা খবর জানায়; অন্যগুলো আরেকটু বেশিমাত্রায় ব্যক্তিগত পর্যায়ের অনলাইন দিনপত্রী/অনলাইন দিনলিপিসমূহ। একটা নিয়মমাফিক ব্লগ লেখা, ছবি, অন্য ব্লগ, ওয়েব পেজ আর এ বিষয়ের জন্য মাধ্যমের লিংকের সমাহার/সমষ্টি। তবে ভালো মানের 'Static websites' বা স্থির প্রতিক্রিয়াশীল যা, ব্লগে আসা অতিথিদের মন্তব্য করার সুযোগ দেয়, উইজেটের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে বার্তা পাঠানোর সুযোগ দেয়, এবং সবসময় আপডেটেড থাকে। অনেক ব্লগ আছে যা একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর গঠিত হয়ে থাকে। সেখানে শুধুমাত্র সেই একটি বিষয়ের উপরই আলোচনা, মন্তব্য করা হয়ে থাকে। প্রায় ব্লগই মূলত লেখায় আকীর্ণ, কিছু কিছু আবার জোর দেয় শিল্প (Art blog), ছবি (Photo blog), ভিডিও (Video blog), সঙ্গীত (Mp3 blog) আর অডিওর (Podcasting) ওপর। আরেকটি হলো Microblogging, যা কেবল ছোট-খাট পোস্ট বা লেখা নিয়ে তৈরি।

ব্লগ শুরুর ইতিহাস : ১৭ ডিসেম্বর ১৯৯৭ 'Jorn Barger' নামক এক ব্যক্তি সর্বপ্রথম 'weblog' শব্দটির উদ্ভাবন করেন। পরবর্তীতে Peter Merholz'- যিনি তার নিজস্ব ব্লগ Peterme. com-এ একরকম কৌতুক করেই 'weblog' শব্দটিকে ভাগ করে 'blog' বলে সম্বোধন করেন ১৯৯৯ এর এপ্রিল বা মার্চের দিকে। তারপর থেকে 'blog' শব্দটির ব্যবহার বেড়ে যেতে থাকে। Even Williams নামক এক ব্যক্তি blog শব্দটিকে যথাক্রমে 'বিশেষ্য' ও 'ক্রিয়াপদ'- দুভাবেই কাজে লাগান। তিনিই 'blogger' কথাটির উদ্ভাবন করেন। 'ব্লগিং'-এর জনপ্রিয়তার পূর্বে 'ডিজিটাল কমিউনিটি' বা 'অনলাইন যোগাযোগ'-এর অন্য জনপ্রিয় মাধ্যমগুলো ছিল Usenet, GEnie, BiX, CompuServe, BBS ইত্যাদি। তখনকার জন্য এগুলো জনপ্রিয় হলেও এগুলোর সাহায্যে খুব কষ্ট করেই Running conversation-এর কাজগুলো করা হতো। কিন্তু আধুনিক ব্লগিং এর সুবাদে মানুষ এখন খুব সহজেই সামাজিক যোগাযোগ রক্ষা করতে পারছে। ব্লগিং মানুষকে দিয়েছে তার নিজস্ব একটি পরিচয়। ব্লগাররা সাধারণত নিজেদেরকে 'Diarists' বা 'Journalers' ও বলতে পারে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

১৯৯৯ থেকে ব্লগিং-এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। Bruce Ableson নামক এক ব্যক্তি ১৯৯৮ সালের অক্টোবরে 'ওপেন ডায়েরি' নামক একটি ব্লগ খোলেন এবং রাতারাতি তার ব্লগের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। হাজার হাজার ব্লগার তার ব্লগের সাথে যুক্ত হন এবং এটিই সর্বপ্রথম ব্লগ কমিনউনিটি যেখানে অন্যান্য ব্লগারদের শেখার মন্তব্য করার সুযোগ দেয়া হয়। এছাড়া Evan Williams এবং Meg Hourihan যারা Pyra Labs-এ কাজ করতেন, ১৯৯৯ সালে তারা চালু করেন তাদের নিজস্ব ব্লগ সাইট 'blogger.com', যা ২০০৩ এর ফেব্রুয়ারিতে Google কিনে নেয়।

ব্লগের প্রকারভেদ : কোন ব্লগে কি ধরনের পোস্ট দেয়া হয় তার উপর ভিত্তি করে ব্লগকে ভাগ করা হয়েছে। এদের মধ্যে কয়েকটি হলো :

১. **ব্যক্তিগত ব্লগ :** এখানে ব্যক্তি কোন একটি বিষয়ের উপর তার মতামত পোস্ট আকারে তুলে ধরেন এবং পাঠকদের সাথে এর উপর মতামত আদান প্রদান করেন। এই ধরনের ব্লগে সাধারণত কোনো ব্যক্তি তার প্রতিদিনের জীবনযাত্রা এবং তার নিজস্ব মতামত প্রকাশ করে। ব্যক্তিগত ব্লগ বর্তমানে সবচেয়ে জনপ্রিয়। এ ধরনের ব্লগ ব্লগার তার নিজের শখ থেকে করে থাকে। তাদের ব্লগ কেউ পড়ুক বা না পড়ুক এতে তাদের কোনো কিছু আসে যায় না। নিজের আনন্দ লাভ করা এ ধরনের ব্লগের মূল উদ্দেশ্য।

২. **সামাজিক ব্লগ :** সামাজিক ব্লগ হলো এমন ব্লগ সাইট যেখানে বিভিন্ন ব্যক্তি তাদের মতামত বা মুক্ত চিন্তা তুলে ধরতে পারে। একজন ব্যক্তি একটি পোস্ট দেবার পর উক্ত ব্লগের অন্যান্য ব্লগাররা তার পোস্টের উপর মন্তব্য করতে পারে। যেমন— সামহয়্যারইন ব্লগ, আমার ব্লগ ইত্যাদি সামাজিক ব্লগের অন্তর্ভুক্ত।

৩. **ব্যবসায়িক ব্লগ :** কোম্পানি/প্রতিষ্ঠান তাদের কোনো পণ্য বা সেবার উপর নতুন নতুন তথ্য প্রদান করেন এবং পাঠক তাদের মতামত প্রদান করতে পারেন। এ ধরনের ব্লগ সাধারণত কোনো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান তাদের পণ্যের প্রচার বা গ্রাহকদের সাথে যোগাযোগ রক্ষার্থে করে থাকে। যেমন— গুগল ব্লগ, অপেরা ডেস্কটপ টিম ইত্যাদি।

৪. **প্রশ্ন ব্লগ :** প্রশ্ন ব্লগে ব্লগার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকেন। এই প্রশ্ন কোন ফর্ম বা ই-মেইলের মাধ্যমে ব্লগারদের কাছে পৌছান হয়। যেমন : ইয়াহু এনসার হলো প্রশ্ন ব্লগ।

৫. **খবর ব্লগ :** যে সকল ব্লগে বিভিন্ন সাম্প্রতিক খবরের উপর বিশ্লেষণ স্থান পায় তাদেরকে খবর ব্লগ বা News Blog বলে।

আরো কয়েক ধরনের ব্লগ বর্তমানে খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে যেমন মাইক্রো ব্লগ, টুইটার এমন একটি ব্লগ। এটি ব্যক্তিগত ব্লগের ভেতরেও পরে। এখানে কোনো ব্লগার এখন কি করছেন বা ভাবছেন তা অতি সংক্ষিপ্ত আকারে লিখে থাকেন। যেমন : আমার টুইটার ব্লগ।

ব্লগ ওয়েবসাইটে একাউন্ট খোলা এবং ব্যবহারের নিয়ম : সামাজিক ব্লগিংয়ের নিয়ম কানুন নিয়ে আলোচনা করা হলো। ব্লগিং করতে যা যা প্রয়োজন : (১) ব্লগিং করতে আপনার অবশ্যই যা প্রয়োজন তা হলো আপনার কম্পিউটারে ইন্টারনেট কানেকশন। (২) একটা ইমেইল একাউন্ট। (৩) নির্দিষ্ট ব্লগের সাইটে আপনার একটা ব্লগ একাউন্ট। ৪. আপনার কম্পিউটারে অভ্র, বিজয় কিংবা যে কোনো বাংলা টাইপিং সফটওয়্যার ইন্সটল থাকতে হবে। ৫. ব্লগ সাইটের কিছু শব্দের সাথে পরিচিত হতে হবে এবং ব্লগের নীতিমালাগুলো জানা থাকতে হবে। এছাড়াও ব্লগ একাউন্টে লগইন করার জন্য প্রয়োজন হবে একটা Username এবং Password এর। এমন একটি Username হতে হবে যা

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

ঐ ব্লগ সাইটে আর কারো দ্বারা ব্যবহৃত হচ্ছে না। ব্লগ একাউন্ট সফলভাবে খোলার পর নিজের দেয়া নির্দিষ্ট Username এবং Password দিয়ে লগইন করে একাউন্টে ঢোকার পর নতুন ব্লগ বা নতুন পোস্ট করা এবং তা ব্লগে প্রকাশ করা যাবে। এভাবে নিজের লেখনী, অভিমত, শেয়ারিং প্রভৃতি করার মাধ্যমে আপনি ব্লগার বনে যাবেন।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ব্লগিং : বাংলা ভাষায় প্রথম ব্লগিং চালু হয় ২০০৫ সালের মে মাসে। সামহোয়ার ইন নামের একটি ব্লগিং সাইট এর মাধ্যমে প্রথমে বাংলা ব্লগের যাত্রা শুরু হলেও বর্তমানে বাংলাদেশে পাঁচশোরও বেশি বাংলা ব্লগ এবং লক্ষাধিক ব্লগার রয়েছে। ২০০৭ সাল থেকে বাংলাদেশে ব্লগের জনপ্রিয়তা ও ব্লগারের সংখ্যা বাড়তে থাকলেও বর্তমানে কয়েকজন ব্লগার হত্যা ও তাদের আপত্তিকর মন্তব্যের কারণে ব্লগ সম্পর্কে সাধারণ জনমনে নেতিবাচক ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। ব্লগার মানেই নাস্তিক এবং ব্লগিং মানেই নাস্তিকবাদের কার্যক্রম এমন ধারণাই অনেকের নিকট তৈরি হয়েছে। এর কিছু যৌক্তিক কারণও আছে। যে কেউ ব্লগিং করতে পারে এবং ব্লগার হতে পারে। বাংলাদেশের সরকারের পক্ষ থেকে ব্লগারদের বিষয়ে তেমন কোনো নীতিমালা না থাকায় অনেক ব্লগার যেমন খুশি তেমন লিখছে, কাউকে ব্যক্তিগত বিষয়ে আক্রমণ করছে, আবার কারো ধর্ম নিয়ে কটাক্ষ করছে। অনেকের বিশ্বাসের অনুভূতিতে চরমভাবে আঘাত হানে এমন জঘন্য মন্তব্যও ব্লগে লিখতে দেখা যায়। অথচ ব্লগিং থেকে এই নেতিবাচক অংশটি বাদ দিলে বলা যায় এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক মাধ্যম এবং জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র। এখানে স্বাধীনভাবে ব্যক্তিগত অভিমত, সংবাদ বিশ্লেষণ, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ, ছড়া, কবিতা, প্রবন্ধ, ছবি, ভিডিও ইত্যাদি কোনোরূপ হস্তক্ষেপ ছাড়াই প্রকাশ করা যায়। বাংলাদেশে অনেকগুলো যোগাযোগ মাধ্যমের মধ্যে সামাজিক ব্লগ অনেকটা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে তরুণ লেখকদের নিকট ব্লগ একটি জনপ্রিয় সামাজিক ও মননশীল নেটওয়ার্ক।

উপসংহার : সামাজিক ব্লগগুলো একজন ব্লগারের স্বাধীন মতামত প্রকাশের অন্যতম একটি জায়গা। মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা আছে বলেই যেকোনো ধরনের আপত্তিকর লেখা পোস্ট করা যাবে না। ব্লগে সাধারণত সমসাময়িক বিষয়গুলো নিয়েই বেশি লেখালেখি হয়ে থাকে। এছাড়াও ব্লগে ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রযুক্তি, সরকারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণমূলক লেখা, ছবি পোস্ট, ব্যক্তিগত অনুভূতি টিপস পোস্ট, টেকনোলজি বিষয়ক সহযোগিতামূলক পোস্টসহ বিভিন্ন ধরনের লেখা পোস্ট করা যায়। এছাড়াও কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস, কলাম ইত্যাদি ব্লগে লেখা যায়।

০৭। আউটসোর্সিং বা ফ্রিল্যান্সিং কি? বাংলাদেশে এই খাতের সম্ভাবনা উল্লেখপূর্বক এর সমস্যাগুলো চিহ্নিত করুন।

উত্তর : ঘরে বসেই তথ্য-প্রযুক্তির সাহায্যে বৈশ্বিক কাজের বাজার ঘুরে বেড়ানোর ক্ষেত্রে পরিচিত একটি নাম অনলাইন আউটসোর্সিং। তথ্য-প্রযুক্তিনির্ভর এই যুগে কাজের পরিধি এখন নিজ দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্বব্যাপী উন্মুক্ত। উন্নত বিশ্বের কোনো প্রতিষ্ঠানের কাজগুলো যখন ইন্টারনেটের মাধ্যমে কোনো প্রতিষ্ঠান অথবা ব্যক্তির মাধ্যমে করানো হয়ে থাকে, তাকেই মূলত আউটসোর্সিং হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে। অনেক কাজ আছে যেগুলো প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে করা যায় না। যদিও করানো যায় তবে তার খরচ অনেক বেশি পড়ে এবং কখনও কখনও সময়ও বেশি লাগে। সেই প্রতিষ্ঠানগুলো তখন ওই কাজগুলো বাইরে থেকে করিয়ে নেয়। যেসব দেশে শ্রম অপেক্ষাকৃত কম

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

সেসব দেশের পেশাজীবীরা ফ্রিল্যান্সার হিসেবে কাজগুলো করে দেন। অনেক সময় পর্যাপ্ত সময়, শ্রম অথবা প্রযুক্তির অভাবেও আউটসোর্সিং করা হয়। আমেরিকা-ইউরোপের যেসব কোম্পানি তথ্য-প্রযুক্তি ক্ষেত্রে কাজ করে, তারা তাদের কাজের বড় একটা অংশ অন্য দেশের কর্মীদের দিয়ে করিয়ে থাকে। কারণ অন্য দেশের কর্মীদের কম অর্থ দিয়েই কাজ করানো যায়। তুলনামূলকভাবে পারিশ্রমিকের মূল্য কম থাকার কারণে বাংলাদেশের জন্য আউটসোর্সিং নতুন সম্ভাবনার হাতছানি দিচ্ছে।

অনলাইন আউটসোর্সিং ও ফ্রিল্যান্সিং : অনলাইন আউটসোর্সিংয়ের সঙ্গেই জড়িয়ে থাকা আরেকটি বহুল পরিচিত শব্দ হলো ফ্রিল্যান্সিং (Freelancing)। ফ্রিল্যান্সিং বলতে 'মুক্ত পেশা' বোঝানো হয়। এখান থেকেই ফ্রিল্যান্সার বা মুক্ত পেশাজীবী কথাটা এসেছে। প্রতিষ্ঠানিকভাবে না করে ব্যক্তিগতভাবে যখন কেউ আউটসোর্সিংয়ের কাজ করেন তখন তাদের ফ্রিল্যান্সার বলা হয়। তবে এটা যে কোনো পেশার ক্ষেত্রে হতে পারে। সাধারণত যেসব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অনলাইনের মাধ্যমে কাজ করে তাদের ফ্রিল্যান্সার বলে। ফ্রিল্যান্সাররা দেশ-বিদেশের সবার সঙ্গে কাজ করে সম্পূর্ণ নিজের স্বাধীনতায়। গতানুগতিক চাকরির বাইরে নিজের ইচ্ছামত কাজ করার স্বাধীনতা থাকে ফ্রিল্যান্সিংয়ে। ফ্রিল্যান্সার হচ্ছেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি কোনো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী চুক্তি ছাড়া কাজ করেন। এখানে একদিকে যেমন রয়েছে যখন ইচ্ছা তখন কাজ করার স্বাধীনতা, তেমনি রয়েছে কাজের ধরন বাছাই করার স্বাধীনতা। হতে পারে তা ওয়েবসাইট তৈরি, থ্রিডি এনিমেশন, ছবি সম্পাদনা, ডাটা এন্ট্রি বা শুধু লেখালেখি করা। অর্থাৎ গতানুগতিক ৯টা-৫টা অফিস সময়ের মধ্যে ফ্রিল্যান্সারদের সীমাবদ্ধ থাকতে হয় না। ইন্টারনেট সংযোগ থাকলে যে কোনো জায়গাতে বসেই ফ্রিল্যান্স আউটসোর্সিংয়ের কাজগুলো করা যায়। তবে এখনও বিষয়টা বেশিরভাগের কাছে পরিষ্কার না হওয়ায় আউটসোর্সিংয়ের বিশাল বাজারে ভারত বা ফিলিপাইনের মতো আমরা সেভাবে প্রবেশ করতে পারিনি।

বাংলাদেশে আউটসোর্সিংয়ের সম্ভাবনা : বিশ্বব্যাপী আউটসোর্সিংয়ের বিশাল বাজারের শীর্ষভাগ আমাদের পাশের দেশ ভারতের হাতে। আউটসোর্সিং সার্ভিসে ভারতের পাশাপাশি ফিলিপাইন, পাকিস্তান, নেপাল, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ইউক্রেন, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, চীন, রাশিয়া, পানামা, মিসর এবং আরও অনেক দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। আউটসোর্সিংয়ের জগতে বাংলাদেশ অনেক দেরিতে প্রবেশ করলেও স্বপ্ন দেখার মতো বিষয় হচ্ছে, আউটসোর্সিংয়ে আমরা ধীরে ধীরে হলেও এগিয়ে যাচ্ছি। সম্ভাবনাময় দেশের কাতারে চলে এসেছে বাংলাদেশ। তাই আউটসোর্সিংয়ের মতো শিল্প হয়ে উঠছে বেকার সমস্যা সমাধান এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের অন্যতম উপায়। ইন্টারনেটে আউটসোর্সিং কাজ পাওয়ার একটা বড় জায়গা হলো ওডেস্ক। বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্ম যারা ফ্রিল্যান্সিং আউটসোর্সিং কাজের সঙ্গে জড়িত তাদের কাছে ওডেস্ক খুব পরিচিত একটি নাম। ওডেস্ক সাইটে আউটসোর্সিংয়ের কাজে শীর্ষস্থানে এখন আছে ফিলিপাইন। এরপর আছে ভারত। তৃতীয় স্থানেই আছে বাংলাদেশ। অর্থাৎ ওডেস্কে বাংলাদেশের অবস্থান বেশ ভালো। বাংলাদেশের ফ্রিল্যান্সাররা খুব ভালো কাজ করছেন, দ্রুত তাদের উন্নতি হচ্ছে। ২০০৯ সালে বাংলাদেশ থেকে কাজ পাওয়ার হার উল্লেখ করার মতো কিছু ছিল না। মাত্র তিন বছরে ওডেস্কে বাংলাদেশ শীর্ষ তালিকার তৃতীয় স্থানে উঠে গেছে। এছাড়া ওডেস্কে মোট কাজের ১২ শতাংশ বাংলাদেশীরাই সম্পন্ন করছে। এটা খুব বড় ধরনের উন্নতি। ওডেস্কের তথ্য মতে, বাংলাদেশের বিশেষ করে ঢাকার ফ্রিল্যান্সারদের এই সফলতার পেছনে রয়েছে সস্তা শ্রম এবং ইংরেজিতে দক্ষতার বিষয়টি। এছাড়াও গত বছর সারা বিশ্বের তথ্য-প্রযুক্তি আউটসোর্সিং কাজ করা দেশগুলোর শীর্ষ ৩০-এর তালিকায় বাংলাদেশের নাম যুক্ত হয়। বিশ্বখ্যাত

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

তথ্য-প্রযুক্তি গবেষণা ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠান গার্টনারের এক সমীক্ষায় এ তথ্য জানানো হয়। যেসব কোম্পানি আউটসোর্সিংয়ের জন্য লোক খুঁজে, তারা বাংলাদেশকেও তাদের অন্যতম পছন্দের তালিকায় রাখছে এখন। গার্টনারের মতে, সস্তা শ্রম আর পর্যাপ্ত জনশক্তি— এই দুটি কারণে বাংলাদেশ আউটসোর্সিংয়ের জন্য সম্ভাবনাময় একটি দেশ। জানা গেছে, এখন পর্যন্ত যেসব কোম্পানি বাংলাদেশ থেকে আউটসোর্সিং করিয়ে নিয়েছে তারা বাংলাদেশি তরুণদের কাজে সন্তুষ্ট। সুতরাং এই তরুণদের যদি ভালোভাবে প্রশিক্ষণ দেয়া যায় তাহলে আউটসোর্সিং থেকে বাংলাদেশ অনেক অর্থ আয় করতে পারবে। বর্তমানে বাংলাদেশে ৫০০ নিবন্ধিত আউটসোর্সিং কোম্পানি রয়েছে। যেখানে কাজ করছেন লক্ষাধিক লোক। এর অধিক বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসের (বেসিস) সূত্রমতে, ২০১০ থেকে ২০১৪ সালের প্রথম প্রান্তিক পর্যন্ত বিভিন্ন মার্কেটপ্লেস থেকে বাংলাদেশি ফ্রিল্যান্সারদের আয় হয়েছে ৪২৫ কোটি টাকা। ২০১২ থেকে ২০১৩ সালের মধ্যে আয়ের পরিমাণ প্রায় ৩৫ শতাংশ বেড়েছে। ২০১৮ সাল নাগাদ এই আয় এক বিলিয়ন ডলারে পৌঁছবে বলে আশা করা হচ্ছে। বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটপ্লেস 'ইল্যান্স-ওডেস্ক'-এর মতে ইল্যান্স-ওডেস্কের কার্যক্রম রয়েছে প্রায় ১৮০টি দেশে। এর মধ্যে ফ্রিল্যান্সারদের সংখ্যা ও উপার্জন, দুইদিক থেকেই বাংলাদেশের অবস্থান সপ্তম। ২০১৩ সালেই বাংলাদেশি ফ্রিল্যান্সাররা ইল্যান্স-ওডেক্স থেকে আয় করেছে প্রায় ১৬৮ কোটি টাকা। ২০১৪ সালের জুলাই মাসের তথ্য অনুযায়ী ২০১০ সাল থেকে এই পর্যন্ত মার্কেটপ্লেস থেকে বাংলাদেশে এসেছে প্রায় ৫০৮ কোটি টাকা।

আউটসোর্সিংয়ে কাজের পরিধি : আউটসোর্সিং বর্তমান সময়ে বাংলাদেশসহ বিশ্বের অনেক দেশে অর্থনৈতিক চালিকা শক্তির অন্যতম ভিত্তি, বিশেষ করে তরুণদের কাছে যারা পড়াশোনার পাশাপাশি নিজের পকেট খরচ চালানোর পথ হিসেবে আউটসোর্সিং গ্রহণ করলেও পরে অনেকেই ভবিষ্যতের আয়-উন্নতির স্থায়ী পথ হিসেবে এটিকে গ্রহণ করছেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন আইটি ফার্ম এবং ফ্রিল্যান্সারদের পরিশ্রমের ফসল হচ্ছে আউটসোর্সিংয়ে বাংলাদেশের আজকের সম্মানজনক অবস্থান। কয়েক বছর আগেও আউটসোর্সিংয়ের বৈশ্বিক মানচিত্রে বাংলাদেশের নাম ছিল না। সেখানে এই পরিস্থিতির উন্নতি ঘটেছে। ছাত্ররাও ফ্রিল্যান্সিংয়ের মাধ্যমে পড়ালেখার পাশাপাশি বাড়তি আয়ের একটা ব্যবস্থা করতে পারেন। আউটসোর্সিংয়ে কাজের শেষ নেই। দিন যত যাচ্ছে নতুন নতুন কাজ তৈরি হচ্ছে। প্রযুক্তির বদৌলতে কাজেরও ভিন্নতা আসছে। ডাটা এন্ট্রি, মেডিকেল ট্রান্সক্রিপশনের পর এখন সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট, ওয়েব আইপি অ্যাপ্লিকেশন, প্রিন্টিং ওয়ার্ক, ক্রুশিয়ার ডিজাইন, প্রোগ্রামিং, ডাটাবেজ, গ্রাফিক্স ডিজাইন, এনিমেশন, গেমস তৈরি, প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট, সফটওয়্যার টেস্টিং, আর্কিটেকচারাল ওয়ার্ক, সফটওয়্যার পরীক্ষা, নিবন্ধ লিখন, অনুবাদ, গেম ডেভেলপ করা, সার্ভার রক্ষণাবেক্ষণ পরামর্শ প্রদান, ইন্টারনেট মার্কেটিং, সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন, হিসাবরক্ষণ, পরিসংখ্যান, গবেষণাসহ নানা ধরনের কাজ আসছে বাংলাদেশে। বাংলাদেশে ফ্রিল্যান্সিংয়ে সবচেয়ে বেশি যে কাজটি হয় সেটি হলো সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন (এসইও)। এর পরই আছে ডাটা এন্ট্রি, ওয়েব ডেভেলপমেন্ট ইত্যাদি।

এ খাতের সমস্যাগুলো : আউটসোর্সিংয়ে আমাদের পিছিয়ে পড়ার কিছু সমস্যা রয়েছে। এসব সমস্যা সমাধানের জন্য এই সেক্টরের উদ্যোক্তারা দীর্ঘদিন যাবত দাবি তুললেও তেমন সমাধান হয়নি। রয়েছে সঠিক দিকনির্দেশনারও অভাব। তাই সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসা দরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখা সরকারকে। দেশের তথ্য-প্রযুক্তি খাতের বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশের

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

ফ্রিল্যান্সারদের একটা বড় সমস্যা ধীরগতির ইন্টারনেট। ভালো মানের ইন্টারনেট ঢাকাকেন্দ্রিক। ঢাকার বাইরে ইন্টারনেটের জন্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মোবাইলের ওপর নির্ভরশীল থাকতে হয়। সুলভ মূল্যে দ্রুতগতির ইন্টারনেট সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া সম্ভব হলে দ্রুত সমৃদ্ধ হবে আমাদের আউটসোর্সিং সংস্কৃতি। আরও একটা বড় সমস্যা হলো, আউটসোর্সিংয়ে কাজ করে পাওয়া টাকা দেশে নিজের একাউন্টে নিয়ে আসা। ফ্রিল্যান্সারদের জন্য বিশেষ কোনো ব্যাংকিং ব্যবস্থা নেই। উপার্জিত অর্থ ফ্রিল্যান্সারদের বাংলাদেশে আনতে হয় বিভিন্ন অনুমোদনহীন মাধ্যমে। বাংলাদেশের সরকারের এ ব্যাপারে ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। আউটসোর্সিংয়ে আরেকটি বড় বাধা হচ্ছে বিদ্যুৎ সমস্যা। নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সঙ্কটের কারণে সময়মত কাজ ডেলিভারি দেয়া সম্ভব হয় না অনেক সময়। এছাড়াও ছোট ছোট কোম্পানিগুলোর বিকাশের জন্য সরকারের উপরিউক্ত ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। বিশেষভাবে প্রয়োজন নতুন নতুন টেকনোলজির ওপর প্রফেশনাল ট্রেনিং।

পরিশেষে : ধীরগতির ইন্টারনেট কানেকশন আর লোডশেডিংয়ের মতো বড় বাধার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাংলাদেশ আজ যে অবস্থানে এসেছে তা নিয়ে ভবিষ্যতের অনেক স্বপ্ন দেখতেই পারি। তবে এই স্বপ্নকে ব্যবহার করে কিছু নামসর্বস্ব প্রতিষ্ঠান আউটসোর্সিংয়ের ট্রেনিং ও কর্মশালার নামে আগ্রহীদের কাছ থেকে অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে প্রতিনিয়ত। চটকদারি বিজ্ঞাপনগুলোর কারণে আউটসোর্সিং সম্পর্কে ধারণা নেই এরকম অনেকের মনে বিরূপ ধারণা তৈরির মাধ্যমে ক্ষতি করছে আমাদের এই সম্ভাবনাময় খাতকে। মনে রাখতে হবে আউটসোর্সিং এ কাজের দক্ষতা মূল্যায়ন করেই পারিশ্রমিক প্রদান করা হয়। আর বিনা পরিশ্রমে ঘরে বসে কথাটি যারা বলছে, তাদের উদ্দেশ্য যে প্রতারণা এ সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে।

যে পেশাই হোক না কেন, পরিশ্রম ছাড়া কোনো কিছুতেই সফলতা আসে না। আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে খুলে যাবে বাংলাদেশের নতুন দিগন্ত সে প্রত্যাশা কামনাই করা যায়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-০১ **ICT এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে লিখুন।**

উত্তর : ICT (Information and Communication Technology) বা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বর্তমান বিশ্বের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে থাকে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে পৃথিবীর প্রতিটি দেশের উন্নয়নে তথ্যসমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২০০৩ সালে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় প্রথম তথ্যপ্রযুক্তি শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে বাংলাদেশ 'গ্লোবাল সলিডারিটি ফান্ড' গঠনের প্রস্তাব করে। বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তি খাতের উন্নয়ন করে একটি ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। এর ফলে ই-কমার্স, ই-ব্যাংকিংসহ বিভিন্ন অর্থনৈতিক কার্যক্রমে তথ্যপ্রযুক্তির ছোঁয়া লাগার ফলে সময় ও শ্রমের ব্যাপক সাশ্রয় হবে, যা অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে।

প্রশ্ন-০২ **সরকারের চতুর্থ অঙ্গ হিসেবে বাংলাদেশের সংবাদ মাধ্যম কি ধরনের ভূমিকা পালন করছে?**

উত্তর : আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের পাশাপাশি সংবাদ মাধ্যমকেও সরকারের একটা অঙ্গ হিসেবে মনে করা হয়। সংবাদ মাধ্যম দু ধরনের হতে পারে :

ক. **প্রিন্ট মিডিয়া :** সংবাদপত্র, সাময়িকী, ক্ষুদে পত্রিকা, সাপ্তাহিকী, গ্রন্থ, পুস্তিকাসহ বিভিন্ন মুদ্রণ মাধ্যম।

খ. **ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া :** রেডিও, টেলিভিশন ও অন্যান্য টেলিযোগাযোগ মাধ্যম।

বাংলাদেশে সংবাদ মাধ্যমের ভূমিকা :

ক. **জনমত গঠনে :** জাতীয় সমস্যা বা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলোতে জনমত গঠনে সংবাদ মাধ্যমের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে উপস্থাপনের মাধ্যমে জনমত গঠন করা সম্ভব। দেশের রাজনৈতিক অবস্থা, অর্থনৈতিক অবস্থা ও সামাজিক সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করে সমাধানের উপায় সম্পর্কে প্রচারণার মাধ্যমে দেশ ও জাতির উন্নয়নে সংবাদ মাধ্যমগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

খ. **গণতন্ত্র বিকাশে সংবাদপত্র :** জনগণকে তাদের রাজনৈতিক অধিকার সচেতন করে তুলে সংবাদপত্র গণতন্ত্র বিকাশের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করে সংবাদ মাধ্যম সঠিক দল ও প্রার্থী নির্বাচনে সহায়তা করে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদান করে।

গ. **দেশ-বিদেশের খবরাখবর সরবরাহ :** দেশ-বিদেশের চলমান সংবাদ ও ঘটনা সংবাদ মাধ্যমে সরবরাহ করে গণমানুষের জ্ঞানের ও জানার পরিধির বিস্তৃতি ঘটায়।

ঘ. সাহিত্য সংস্কৃতি, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, অর্থনীতি, রাজনীতি, খেলাধুলা প্রভৃতি বিষয়ে আলাদা আলাদা বিভাগে সাপ্তাহিক ভিত্তিতে উপস্থাপন করে পাঠক ও দর্শকদের উপরিউক্ত বিষয়ে জ্ঞান বিকাশ করে।

বাংলাদেশের সংবাদ মাধ্যমের উপরিউক্ত গঠনমূলক ভূমিকা ছাড়াও অপপ্রচার বা হলুদ সাংবাদিকতার যথেষ্ট নজির রয়েছে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

প্রশ্ন-০৩ **তথ্য অধিকার কি?**

উত্তর : যে সব তথ্য সাধারণ নাগরিকের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার অর্জনে সহায়ক, যার অভাবে এ অধিকারগুলো অর্জন করা কঠিন হয়ে পড়ে রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নাগরিক নিরবিচ্ছিন্নভাবে বা বাধাহীনভাবে অংশ নিতে পারে না, সে সব তথ্য পাওয়ার অধিকারকে সাধারণভাবে তথ্য অধিকার বলে। বাংলাদেশ সংবিধানে চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতা নাগরিকগণের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত এবং তথ্য প্রাপ্তির অধিকার চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতার অবিচ্ছেদ্য অংশ। অন্যদিকে সংবিধান অনুযায়ী দেশের জনগণ হলো সকল ক্ষমতার মালিক। কাজেই জনকল্যাণ বাধাগ্রস্থ হয়, মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ন হয় এমন কাজ সংবিধান অনুমোদন করে না। রাষ্ট্রের সেবক অর্থাৎ রাজনীতিবিদ, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী সবাই জনস্বার্থে নিয়োজিত। সাধারণত জনগণ রাষ্ট্রের এই সেবকদের কাছ থেকে জনস্বার্থবিষয়ক যে কোনো তথ্য পাওয়ার অধিকার রাখে এবং প্রজাতন্ত্রের নিয়োজিত কর্মচারীরা এই তথ্য দিতে সাংবিধানিকভাবে বাধ্য। সুতরাং যে সকল তথ্য গোপন রাখলে জনকল্যাণ হ্রাস হয়, দুর্নীতি-অনিয়মের চর্চা হয়, সুশাসন ব্যাহত হয়, জনগণের ক্ষমতায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়, মৌলিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার ক্ষুণ্ন হয়, মুষ্টিমেয় কতিপয় লোকের কাছে রাষ্ট্র এবং নাগরিকগণ জিম্মি হয়ে পড়ে, সে সকল বিষয়ের তথ্য পাওয়ার অধিকারকে তথ্য অধিকার বলে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ সরকার জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ২০০৯ সালে। 'তথ্য অধিকার আইন-২০০৯' নামে একটি আইন জাতীয় সংসদে পাস করে।

প্রশ্ন-০৪ **ই-গভর্নেন্স কি?**

উত্তর : ই-গভর্নেন্স হলো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে বহুল জনপ্রিয় বিষয়। সরকারি ও প্রশাসনিক কাজে গতি আনয়নে ই-গভর্নেন্সের কোনো জুড়ি নেই। বর্তমানে উন্নয়নশীল বিশ্বসহ সমগ্র পৃথিবীতেই এর জনপ্রিয়তা ও প্রয়োজনীয়তা ক্রমশই বেড়ে চলেছে।

এটি একদিকে যেমন কাজের উৎপাদনশীলতা বাড়ায় তেমনি অন্যদিকে সময় ও অর্থ সাশ্রয়ে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। প্রশাসনে স্বচ্ছতা আনয়নে, দুর্নীতি ও অনিয়ম রোধে, রাষ্ট্রের কর্মশালায় জন সাধারণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে ই-গভর্নেন্স হলো কার্যকর মাধ্যম। সুতরাং সরকারি-আধা সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, কেন্দ্রীয়, স্থানীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রশাসনিক কাজে এনালগ পদ্ধতির পরিবর্তে ডিজিটাল পদ্ধতি তথা তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার-ই হলো ই-গভর্নেন্স। ই-গভর্নেন্সের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে অনেকে এটিকে আধুনিক রাষ্ট্র গঠনের পূর্বশর্ত হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। বাংলাদেশ ক্রমশ ই-গভর্নেন্সের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়ন এবং এর দৈনন্দিন কাজে এর ব্যবহার বৃদ্ধি করতে ই-গভর্নেন্সকে প্রাধান্য দিয়ে ইতোমধ্যে অনেক প্রকল্প গ্রহণ করেছে। হাই-টেক পার্ক, সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, আইসিটি ইনকিউবেটর স্থাপন, ইন্টারনেট সুবিধা সম্প্রসারণ, অনলাইনে আবেদন ফরম পূরণ ও বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল জানার সুবিধা, গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলোর নিজস্ব ওয়েবসাইট ও প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহের সুবিধা প্রভৃতি বাংলাদেশে ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠায় অনবদ্য ভূমিকা রাখছে। ই-গভর্নেন্সের প্রচুর সুবিধা থাকার পরেও একটি বড় অসুবিধা হলো এর উপকার নিরক্ষর মানুষরা কমই পায়। তাই নিরক্ষরতা দূর করে ই-গভর্নেন্সের উপকার সকল পর্যায়ে পৌঁছানো বাঞ্ছনীয়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

অনানুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান : সুশীল সমাজ, স্বার্থবাদী গোষ্ঠী ও বাংলাদেশের এনজিও
Non-formal Institutions : Civil Society, Interest Group & NGO in Bangladesh

Syllabus	*Non-formal Institutions; Role of Civil Society; Interest Groups; and NGOs in Bangladesh.*

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১. *NGO কি? বাংলাদেশের মানবাধিকার ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে NGO-এর ভূমিকা আলোচনা করুন। [৩০তম বিসিএস]*
অথবা, বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এনজিও'র ভূমিকা আলোচনা করুন। [৩০তম বিসিএস]
অথবা, "বাংলাদেশের গ্রামীণ উন্নয়নে এনজিও'র ভূমিকা" প্রসঙ্গে বাস্তবভিত্তিক আলোচনা করুন।
০২. *বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রমে এনজিওদের ভূমিকা লিখুন। [৩১তম বিসিএস]*
০৩. *সিভিল সোসাইটির বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখুন। সিভিল সোসাইটির সাথে সরকারের সম্পর্ক কি হওয়া উচিত? বর্ণনা করুন। [৩১তম বিসিএস]*
অথবা, সিভিল সোসাইটি কি? এর বৈশিষ্ট্যসমূহসহ লিখুন। বাংলাদেশে সিভিল সোসাইটির সঠিক রূপ, কার্যক্রম এবং সরকারের সাথে এর সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা করুন এবং এর কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা বাংলাদেশে কি হতে পারে বলে আপনি মনে করেন তাও উল্লেখ করুন। [৩৪তম বিসিএস]
০৪. *বাংলাদেশে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে সুশীল সমাজের ভূমিকা আলোচনা করুন। [২৭তম বিসিএস]*
অথবা, বাংলাদেশে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটি নিবন্ধ রচনা করুন। [১৫তম বিসিএস]
০৫. *সুশাসন বলতে কি বোঝায়? বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অন্তরায়সমূহ আলোচনা করুন। [৩০তম বিসিএস]*

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

০৬. *বাংলাদেশে কর্মরত একটি এনজিও'র সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মসূচি পর্যালোচনা করুন।*
অথবা, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে 'ব্র্যাক'-এর ভূমিকা পর্যালোচনা করুন।
০৭. *'এনজিওরা দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন নয়, জনগণকে বাঁচিয়ে রেখে শোষণ করে'– এ বক্তব্যের আলোকে এনজিওদের উন্নয়ন কার্যক্রম মূল্যায়ন করুন।*

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

০১. *NGO কি?*
০২. *বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এনজিওর ভূমিকা কি?*
০৩. *পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) কি?*
০৪. *এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কি?*
০৫. *ব্র্যাক (BRAC) কি?*
০৬. *ব্র্যাকের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যগুলো কি কি?*
০৭. *কেয়ার (CARE) কি?*
০৮. *অন্যান্য বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর সাথে গ্রামীণ ব্যাংকের পার্থক্য কি?*
০৯. *সুশীল সমাজ বলতে কি বোঝেন? [২৭তম বিসিএস]*

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১। NGO কি? বাংলাদেশের মানবাধিকার ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে NGO-এর ভূমিকা আলোচনা করুন। *[৩০তম বিসিএস]*
***অথবা,* বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এনজিও'র ভূমিকা আলোচনা করুন।**
***অথবা,* "বাংলাদেশের গ্রামীণ উন্নয়নে এনজিও'র ভূমিকা" প্রসঙ্গে বাস্তবভিত্তিক আলোচনা করুন।**

উত্তর : আমাদের দেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত ও দরিদ্র দেশগুলোতে 'বেসরকারি সাহায্য সংস্থা' বা এনজিও (Non-Government Organisation) একটি সর্বাধিক আলোচিত বিষয়। বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে NGO-গুলো সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে চলেছে। তাছাড়া বন্যা, খরা, অতিবৃষ্টি এবং শীতে দেশের সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের এনজিওরা সাহায্য সহযোগিতা করে চলেছে। বাংলাদেশে কর্মরত বেসরকারি সাহায্য সংস্থার অধিকাংশই বিদেশী ধনী রাষ্ট্রগুলোর আর্থিক সাহায্যে পরিচালিত হয়। এসব সেবাসংস্থার মধ্যে ব্র্যাক, আশা, প্রশিকা, স্বনির্ভর বাংলাদেশ, টিএমএসএস, কারিতাস, আরডিআরএস, বিইউআরও এবং শক্তি ফাউন্ডেশন প্রধান। এগুলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশ সরকারের নীতিমালা অনুসরণ করে এ দেশের দরিদ্র জনসাধারণের সেবায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে তাদেরকে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করা। বাংলাদেশে কর্মরত এনজিওগুলোর কর্মক্ষেত্র ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এনজিও কি? : সাধারণভাবে, সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নয় এমন যে কোনো সংস্থাই এনজিও। তবে বিগত তিন দশকে এনজিও কার্যক্রমের ধারা থেকে বর্তমানে এনজিও-র যে রূপ দাঁড়িয়েছে তাতে বলা যায় এনজিও হচ্ছে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত অমুনাফাভিত্তিক এক ধরনের বিশেষ স্বেচ্ছাসেবী সামাজিক সংগঠন। এনজিও-র আওতায় পড়ে অনানুষ্ঠানিক বিভিন্ন সমিতি, সীমিত দায়ের আনুষ্ঠানিক সমবায় সমিতি এবং নিবন্ধিত বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা। উন্নয়ন-এনজিও নামেও একটি ধারণা গড়ে উঠেছে। এগুলো গ্রাম ও শহর এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য নানা কার্যক্রম পরিচালনা করে। এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে অনেকে বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়ন সংস্থা বা শুধু স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়ন সংস্থা নামে অভিহিত করে। এদের কার্য তালিকায় থাকে উন্নয়নের আর্থ-সামাজিক নানা কার্যক্রমসহ পরামর্শ সেবা, আইনি সহায়তা ও ত্রাণ তৎপরতা।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

এনজিও প্রতিষ্ঠার পটভূমি : বাংলাদেশে এনজিওসমূহের সৃষ্টি ও তাদের কর্মতৎপরতার প্রসার শুরু হয় ১৯৭১-এ স্বাধীনতা লাভের প্রায় পরপরই। এসব সংস্থার প্রধান কাজ ছিল যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটির ত্রাণ ও পুনর্বাসনে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান। এক সময় ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজ কমে এলে এসব সংস্থার অনেকগুলোই গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্যদানের কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে আসে। এভাবেই দেশে উন্নয়নে অংশীদারিত্বের একটি নতুন ধারা সৃষ্টি হয়। এনজিওগুলো এখন প্রধান যেসব ক্ষেত্রে কার্যক্রম পরিচালনা করছে সেগুলো হচ্ছে দারিদ্র্য বিমোচন, পল্লী উন্নয়ন, লৈঙ্গিক সমতা, পরিবেশ প্রতিরক্ষা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং মানবাধিকার। বাংলাদেশে এনজিওসমূহের সংখ্যাধিক্য ও কর্মতৎপরতার ব্যাপক বৃদ্ধির একটি অন্যতম কারণ হচ্ছে দারিদ্র্য সমস্যার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সরকারের সীমাবদ্ধতা। তবে দেশে এখন কতটি এনজিও কাজ করছে তার সঠিক কোনো পরিসংখ্যান নেই।

এনজিও সহায়ক সংস্থা : বাংলাদেশে দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নে, বিশেষ করে দারিদ্র্য বিমোচন ও সমাজসেবা কার্যক্রমে স্থায়ী অগ্রগতি অর্জনে সরকার এনজিওগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নে বেশ কিছু কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছে; যেমন– পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এবং সরকার-এনজিও পরামর্শ পরিষদ গঠন।

১. **পিকেএসএফ :** পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ১৯৯০ সালের মে মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্য দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনায় নিয়োজিত সম্ভাবনাময় এনজিওসমূহের অর্থসংস্থান করা। পিকেএসএফ নিজে কোম্পানি আইনের অধীনে নিবন্ধিত একটি অমুনাফাভিত্তিক সংস্থা।

২. **এনজিও বিষয়ক ব্যুরো :** এনজিও বিষয়ক ব্যুরো প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯০ সালের জুলাই মাসে। এটি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ছিল এনজিওসমূহের কার্যক্রমের গুণগত উৎকর্ষ সাধন এবং সরকারের নিকট এনজিওসমূহের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ। এ লক্ষ্যে পরিচালিত এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর কার্যাবলী হচ্ছে এনজিওসমূহের নিবন্ধন প্রদান, তাদের প্রকল্পসমূহ প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন; এনজিওগুলোতে বিদেশী কর্মকর্তা ও পরামর্শক নিয়োগ ও কার্যকাল অনুমোদন; এনজিও কার্যক্রমসমূহ সমন্বয়সাধন, পরিবীক্ষণ, পরিদর্শন ও মূল্যায়ন; এনজিওসমূহের প্রতিবেদন ও বিবরণীসমূহ পর্যালোচনা ও সেগুলোর ওপর মন্তব্য প্রদান, এনজিওগুলো থেকে ফিস/সার্ভিস চার্জ আদায়; তাদের আয়-ব্যয় বিষয়ে মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন পরিচালনা এবং এনজিও ও দাতা সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয় ও যোগাযোগ রক্ষা।

৩. **সরকার-এনজিও পরামর্শ পরিষদ :** সরকার এবং এনজিওসমূহের মধ্যে সরাসরি সংলাপ পরিচালনার ফোরাম হিসেবে সরকার-এনজিও পরামর্শ পরিষদ গঠিত হয় ১৯৯৬ সালে। এর লক্ষ্য সরকার ও এনজিওসমূহের মধ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্রে যেসব বাধা আছে সেগুলো চিহ্নিত করা এবং আলোচনার মাধ্যমে সরকার-এনজিও সহযোগিতার জন্য উন্নত তথা কার্যোপযোগী নীতি প্রণয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশ সৃষ্টি করা। এছাড়া, এ সংস্থার আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে, জাতীয় নীতি নির্ধারণ ও সরকারের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে এনজিওসমূহের ব্যাপক অংশগ্রহণের পদ্ধতি উদ্ভাবন, এনজিওগুলোর কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণের যে সরকারি ব্যবস্থা আছে সহজ করার মাধ্যমে তার উন্নতিবিধান এবং এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ক্ষমতা শক্তিশালীকরণ।

মানবাধিকার ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে এনজিও'র ভূমিকা : বাংলাদেশে কর্মরত এনজিওগুলো গ্রামীণ অর্থনীতি উন্নয়ন ও মানবাধিকার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এ দেশের বিপুল জনগোষ্ঠী ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও বেকারত্বের শিকার। দিনভর হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেও এখানকার বেশির ভাগ মানুষ

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

জীবনের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতে অক্ষম। এমতাবস্থায় ক্ষুধা, দারিদ্র্য আর অপুষ্টি তাদের নিত্যসঙ্গী। এনজিওগুলো খুব সহজেই সেবার হাত প্রসারিত করে অসহায় মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। বাংলাদেশে কর্মরত সংস্থাগুলোর অসংখ্য প্রধান ও শাখা অফিস রয়েছে। প্রত্যেকটি শাখা শিক্ষা, চিকিৎসা ও খাদ্যসহ নানানরকম সেবা মানুষের দ্বারে পৌঁছে দেয়। এসব সংস্থায় কর্মরত রয়েছে বাংলাদেশের লক্ষাধিক জনশক্তি। সুতরাং দেশের বেকারত্ব ঘুচাতেও এনজিওগুলোর কার্যকর ভূমিকা রয়েছে। এক কথায়, আমাদের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে এনজিওগুলো বৃহত্তর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আমেরিকা, সুইডেন, নরওয়ে, কানাডা, ফ্রান্স প্রভৃতি ইউরোপ-আমেরিকার ধনী রাষ্ট্রসহ মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম ধনী রাষ্ট্রগুলো এ দেশে বেসরকারিভাবে তাদের সেবাকার্য অব্যাহত রেখেছে। এ দেশে যেসব এনজিও কাজ করে যাচ্ছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– আশা, কেয়ার, প্রশিকা, ব্র্যাক, সিডা, সৌদি আরবের রাবেতা আলম-আল ইসলাম প্রভৃতি। এনজিওগুলো সারা দেশে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে আপামর জনসাধারণের মাঝে সেবাকার্য পরিচালনা করে আসছে। এছাড়াও দেশীয় কিছু এনজিও প্রতিষ্ঠান দেশের দরিদ্রপীড়িত মানুষের অবস্থার উন্নয়নে কার্যক্রম গ্রহণ করছে। বাংলাদেশের জনমানুষের দারিদ্র্য, অশিক্ষা, কুসংস্কার ও অসঙ্গতিগুলো এনজিওসমূহের কার্যক্রমকে ব্যাপক করে তুলেছে। বিদেশী রাষ্ট্রগুলো এবং সাহায্যদাতা সংস্থাগুলো বাংলাদেশ সরকারকে সরাসরি সাহায্য না দিয়ে এনজিওর মাধ্যমে দিতে চায়। সেজন্য বাংলাদেশে এনজিওসমূহের ব্যাপক প্রসারতা ও ব্যস্ততা লক্ষ্য করা যায়। নিচে বাংলাদেশের মানবাধিকার ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে এনজিও'র ভূমিকা আলোচিত হলো :

১. **ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম :** দারিদ্র্য বিমোচনে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে NGOগুলো সহায়তা করে চলেছে। ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহের পর্যবেক্ষণ ও তদারকির জন্য মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ) ক্ষমতাবান ও দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান। এমআরএ কর্তৃক এ পর্যন্ত (জুন, ২০১৩) মোট ৬৯৮টি প্রতিষ্ঠানকে ক্ষুদ্রঋণ পরিচালনার সনদ প্রদান করা হয়েছে। ৩০ জুন ২০১৩ পর্যন্ত সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের মাঠপর্যায়ে ক্ষুদ্রঋণ স্থিতির পরিমাণ ২,৫৭,০১০ মিলিয়ন টাকার অধিক এবং সদস্যদের থেকে আহরিত সঞ্চয়ের স্থিতির পরিমাণ ৯৩,৯৯০ মিলিয়ন টাকা। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে এনজিওগুলো দেশের দারিদ্র্য বিমোচন, বেকারত্ব লাঘব, নারীর ক্ষমতায়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

২. **সরকারি উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান :** বাংলাদেশে বর্তমানে যে উন্নয়ন-কৌশল অনুসরণ করা হচ্ছে তার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হচ্ছে– দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্য, সুবিধার সুষম বণ্টন এবং উন্নয়নে জনগণের অংশগ্রহণ। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার পুনর্বিন্যাস, জাতীয় উন্নয়ন প্রয়াস ও কর্মকাণ্ডসমূহে গ্রামীণ সকল এলাকার পূর্ণতর ঐকাত্ম্যকরণ, গ্রামীণ এলাকায় অধিকতর কর্মসংস্থান ও উপার্জনের সুযোগ সৃষ্টি এবং কৃষক সমিতি, সমবায় সমিতি ও প্রাথমিক উৎপাদনকারী ও গ্রামীণ শ্রমিকদের স্বায়ত্তশাসিত স্বেচ্ছাসেবী গণতান্ত্রিক নানা সংগঠনের বিকাশ। গ্রামীণ এলাকার সব সমস্যা এত ব্যাপক ও জটিল যে জনগণের পূর্ণ সমর্থন ও অংশগ্রহণ ছাড়া সরকার বা কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার পক্ষে সেগুলোর সমাধান প্রায় অসম্ভব। এর অর্থ, সরকারি উন্নয়ন-উদ্যোগ যথাযথ বাস্তবায়িত হবার জন্য জনগণের দ্বারা গঠিত সংস্থা-সংগঠনের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন। এক্ষেত্রে এনজিও নামে পরিচিত বিভিন্ন ধরনের সমবায় সমিতি, ইউনিয়ন, কৃষক সমিতি, শ্রমিক সমিতি, মহিলা সমিতি ও অন্যান্য বেসরকারি সমিতি সংগঠন সরকারের উপরিউক্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সহায়তা করে থাকে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৩. **স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম পরিচালনা :** কার্যক্রমের ক্ষেত্র বিবেচনায় দেখা যায়, কোনো কোনো স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা কৃষি, পশুসম্পদ, ক্ষুদ্র শিল্প, সেচ, বনায়ন, স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিভিন্ন খাতের কোনো একটি বা কয়েকটি খাতে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। আবার অনেক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা কয়েকটি খাতের সমন্বিত কার্যক্রম চালাচ্ছে। এভাবেই, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোর কোনোটি স্বাস্থ্য সংগঠন, কোনোটি কৃষি সংগঠন, কোনোটি শিক্ষা সংগঠনরূপে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বেশ কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন পরিবেশ বা মহিলাবিষয়ক কর্মসূচিতে নিয়োজিত থাকায় বা বিশেষায়নের কারণে সংশ্লিষ্ট বিষয় নামে বা শ্রেণিরূপে চিহ্নিত হচ্ছে। বস্তিবাসীদের জন্য এনজিও, গ্রামীণ বেকারদের জন্য এনজিও, মাদকাসক্ত পুনর্বাসনের জন্য এনজিও ইত্যাদি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন মূলত আমাদের দেশে মানবাধিকার বাস্তবায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

৪. **সরকারি নীতিতে প্রভাব বিস্তার :** নানারকম পরীক্ষামূলক ও উদ্ভাবনী পদক্ষেপ এবং কার্যক্রমগত পদ্ধতি প্রয়োগের কারণে বাংলাদেশের অনেক এনজিও সমগ্র বিশ্বে সুপরিচিতি অর্জন করেছে। প্রশিকা, ব্র্যাক ও আশা বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণ, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং প্রাথমিক চিকিৎসা-সেবার ক্ষেত্রে যেসব সফল মডেল প্রয়োগ করে আসছে সেগুলো এখন অনেক উন্নয়নশীল দেশেই প্রয়োগের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি বিশেষ বিশেষ ইস্যুতে ও সাধারণভাবে নীতি ও কৌশল প্রণয়নে এনজিওসমূহ সরকারের পরামর্শক ও দেন-দরবারকারীর ভূমিকায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। এনজিওদের চেষ্টা ও অব্যাহত চাপে সরকার দরিদ্র জনগণের জন্য এবং পরিবেশ উন্নয়নে সহায়ক হয় এমন সব নীতি, পরিকল্পনা ও প্রকল্প গ্রহণে বাধ্য হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত শিক্ষা কমিশন ও স্থানীয় সরকার কমিশনকে এনজিওগুলো যথেষ্ট সহায়তা দিয়েছে। স্থানীয় সরকার নির্বাচনের সময়সূচি ও পদ্ধতি সম্পর্কে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধিতে এবং কৃষি, খাসজমি বিতরণ ইত্যাদি বিষয়ক নীতি প্রণয়নে এনজিওগুলো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। সর্বোপরি মানবাধিকার বাস্তবায়নে এনজিওগুলো সরকারি নীতিতে প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

৫. **জনগণের সার্বিক জীবন-মান উন্নয়ন :** বিগত তিন দশকে বাংলাদেশে এনজিও কার্যক্রমসমূহ বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে সুসংগঠিতভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে। এগুলো হচ্ছে তৃণমূল পর্যায়ে কার্যকর গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রচলন, দারিদ্র্য বিমোচন, নারী অধিকার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা এবং পরিবেশ। বাংলাদেশে এনজিও তৎপরতা বস্তুত উন্নয়ন উপযোগিতা আছে এমন সকল খাতেই বিস্তৃত। দেশের এনজিওসমূহ নানা নবোদ্ভাবনার জন্য বিশ্ব জুড়ে পরিচিতি লাভ করেছে। উল্লেখযোগ্য নবোদ্ভাবনার মধ্যে আছে ক্ষুদ্রঋণ, অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবায় গ্রামীণ ব্যাংক, ব্র্যাক ও আশা-র অনুসৃত মডেলসমূহ। এনজিওসমূহ এখন সমাজজীবনে পরিবর্তন আনয়নে সক্ষম এমন অনেক নতুন নতুন কার্যক্রম ও কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে আসছে, নানারকম নতুন ধারণা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছে।

৬. **সরকারি সংস্থার সম্পূরক হিসেবে এনজিও :** বাংলাদেশে বিরাজমান অসংখ্য সামাজিক সমস্যার মোকাবিলা করা সীমিত সম্পদ দ্বারা সরকারের একার পক্ষে দুষ্কর। স্থানীয় সম্পদের সদ্ব্যবহার এবং সমস্যাগুলো স্থানীয় পর্যায়ে মোকাবিলার প্রয়োজনে এনজিওগুলো সরকারি সংস্থার সম্পূরক হিসেবে কাজ করে থাকে। এছাড়া বাংলাদেশের বৈদেশিক সম্পদ বিভাগের মাধ্যমে এসব সংস্থা বিদেশ থেকে মোটা অঙ্কের অর্থ সাহায্য পেয়ে থাকে। এসব সাহায্য সরকারিভাবে প্রাপ্ত সাহায্যের বিকল্প নয়, সম্পূরক হিসেবে এনজিওগুলোকে দেয়া হয়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

এনজিওর কার্যক্রমের কুফল : এনজিওগুলোর ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আওতায় নির্মম শোষণ প্রক্রিয়ার কদর্য রূপও ধরা পড়েছে। গ্রামের অসহায় দরিদ্র মানুষদের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে এরা অত্যন্ত চড়া হারে সুদ নিয়ে থাকে। এনজিওগুলো দারিদ্র্য বিমোচনের নামে শোষণ ও দারিদ্র্যের মাত্রা বৃদ্ধির কাজটিই করছে বলে সচেতন মহলের অভিমত। এনজিওদের ঋণ পরিশোধে অপারগ অসংখ্য মানুষ চিরতরে গ্রাম ত্যাগ করে শহরবাসী হয়েছে, আবার কেউ কেউ আত্মহত্যাও করেছে। আমাদের দেশের কেন্দ্র থেকে প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত সর্বত্র এনজিওর এক বিরাট নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছে। এ নেটওয়ার্ক দিন দিন শক্তিশালী হচ্ছে। বাণিজ্য করতে আসা ব্রিটিশ বেনিয়াগোষ্ঠীর মতো সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব কিছু কিছু এনজিওর কার্যকলাপে ইতোমধ্যেই লক্ষ্য করা গেছে। এরা দেশের রাজনীতিতেও হস্তক্ষেপ করছে। গ্রামীণ উন্নয়নের নামে এসব এনজিও বাংলাদেশের রাজনীতিতে কালো থাবা বিস্তার করছে— যা দেশের জন্য মোটেও কল্যাণকর নয়। এছাড়া জনসাধারণের দারিদ্র্য, অসহায়ত্ব ও সরলতার সুযোগ নিয়ে বিদেশী এনজিওগুলো তাদের মধ্যে বিজাতীয় শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ধ্যানধারণার অনুপ্রবেশ ঘটাচ্ছে এবং প্রভুত্ব বিস্তারের চেষ্টা চালাচ্ছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। অনেক এনজিও জনসেবার নামে মানুষকে ধর্মান্তরিত করছে এবং ইসলামী কৃষ্টি-কালচার ও মূল্যবোধকে ধ্বংস করছে বলেও অভিযোগ রয়েছে।

উপসংহার : বিভিন্ন ধরনের বিপক্ষচারিতা এবং আলোচনা-সমালোচনা সত্ত্বেও বাংলাদেশে এনজিও কার্যক্রম ক্রমেই সম্প্রসারিত হচ্ছে। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে সরকারি কার্যক্রম বাস্তবায়নের দায়ও এখন এনজিওর কাঁধে অর্পণ করা হচ্ছে। উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে এনজিওসমূহ আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়েছে। সরকারের তরফ থেকেও দেশের সার্বিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বেসরকারি উদ্যোগের গুরুত্বের কথা বিশেষভাবে বলা হচ্ছে। এনজিওসমূহের কার্যক্রমে চটজলদি তৎপরতা গ্রহণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণে দ্রুততা–এসব নানাবিধ বিষয়াদির কথা বলে অনেক দাতা সংস্থা তাদের অর্থ এনজিওসমূহের মাধ্যমে ব্যয় এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের ওপর প্রাধান্য দিচ্ছে। অর্থাৎ সবকিছু মিলিয়ে আজ বাংলাদেশের জাতীয় অবস্থায় এনজিওর ভূমিকা ও অবস্থানের বাস্তবতাকে অস্বীকার করার কোনো উপায় এখন আর নেই। বর্তমানে আর্থিক ভিত্তি ও কর্মসূচির প্রসারতার কারণে এনজিওগুলো দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সরকারের পাশাপাশি তাদের অপরিহার্যতাকে প্রমাণ করেছে।

০২ । বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রমে এনজিওদের ভূমিকা লিখুন। *[৩১তম বিসিএস]*

উত্তর : তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত ও দরিদ্র দেশগুলোতে 'বেসরকারি সাহায্য সংস্থা' বা এনজিও সর্বাধিক আলোচিত বিষয়। এনজিও বলতে বোঝায়, সরকারি অনুমোদন প্রাপ্ত কিন্তু স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান। এসব এনজিওগুলো তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণের সেবার লক্ষ্যে কাজ করে। ফলে দেশে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ে উঠে। বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রমে এনজিওগুলো অনুরূপ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী : সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর সর্বজনীন কোনো সংজ্ঞা নেই। এটি একেক দেশে একেক রকম। যেমন– বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী বলতে চাকরির ক্ষেত্রে চাকরিজীবীদের প্রদেয় বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্যাবস্থা নিরসন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার ও এনজিও কর্তৃক গৃহীত নানা কর্মসূচিকে বোঝায়। সুতরাং বলা যায়, নারী, শিশু, প্রতিবন্ধীসহ সকল সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূলধারার সাথে সম্পৃক্ত করাই সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রমে এনজিওদের ভূমিকা : নিরাপত্তার বিস্তৃত খাতকে অন্তর্ভুক্ত করে সামাজিক নিরাপত্তা। বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সব ধরনের অভিঘাত থেকে সুরক্ষায় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এটি দারিদ্র্য নিরসন, দরিদ্রদের ক্ষমতায়ন, কর্মসংস্থান ইত্যাদি সৃষ্টির অপরিহার্য উপাদান। এনজিওগুলো এর আওতায় নানাবিধ ভূমিকা পালন করে থাকে। এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১. **দারিদ্র্য বিমোচন :** বাংলাদেশের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো দারিদ্র্য বিমোচন। বাংলাদেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জনগোষ্ঠী দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– দিনমজুর, রিকশা-ভ্যান চালক, জেলে, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, কৃষক, প্রান্তিক কৃষক প্রভৃতি। বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে এনিজিওগুলো নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করছে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী গঠনে সহায়তা করছে। এসব কর্মসূচির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– ঋণদান, তহবিল গঠন, সচেতনতা বৃদ্ধি, পুষ্টি কার্যক্রম ইত্যাদি।

২. **কর্মসংস্থান সৃষ্টি :** এনজিওগুলো কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ততার মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে উৎসাহিত করে। তাছাড়া এনজিওগুলো তাদের সংশ্লিষ্ট সংস্থায় জনবল নিয়োগের মাধ্যমেও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে। সর্বোপরি এনজিওগুলো কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে উৎসাহ প্রদান করে এবং ব্যবস্থাপনামূলক সহায়তা করে অন্যদের কর্মসংস্থান তৈরিতে সহায়তা করে। তারা এ লক্ষ্যে নিম্নের কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করে—

i) সেচ প্রকল্প,
ii) পুকুরে মৎস্য চাষ এবং উপকূলে মৎস্য শিকার,
iii) ভূমিহীন কৃষকদের যন্ত্রপাতি দিয়ে সাহায্য করা,
iv) হস্তশিল্প, তাঁতশিল্প,
v) নার্সারি প্রকল্প প্রভৃতি।

৩. **নারীদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত :** নানা প্রতিকূলতার মাঝে বাংলাদেশের নারীরা এখনো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করতে পারেনি। এ বিষয়টি উপলব্ধি করে বাংলাদেশে কর্মরত এনজিওগুলো পিছিয়ে পড়া নারীদের অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের ব্যুরো অব এনজিও-এর তালিকাভুক্ত এনজিওগুলোর ৭০% সুবিধাভোগীই নারী। পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের ৮৯.৭৫% নারী ঋণ গ্রহীতা রয়েছে। এনজিওগুলো নারীদের প্রতি যে গুরুত্ব প্রদান করেছে তা গ্রামীণ দারিদ্র্য দূর করা এবং অর্থনৈতিক অবস্থায় উন্নতি অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

৪. **ক্ষুদ্র ঋণ :** গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে ক্ষুদ্র ঋণের বিকল্প নেই। বাংলাদেশে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মাঝে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করে গরীবদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নে ভূমিকা রাখার পাশাপাশি এনজিওগুলো বিশ্বজুড়ে সুনাম অর্জন করেছে। ১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত গ্রামীণ ব্যাংক সারা দেশে জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করে গ্রামীণ জনগণকে স্বাবলম্বী করার প্রতিফল হিসেবে ২০০৬ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করে। ড. ইউনূসের ক্ষুদ্র ঋণের মডেল এখন সারা বিশ্বে অনুসরণ করা হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকারও এ কার্যক্রমে পিছিয়ে নেই। যেমন– সরকার পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেছে এবং এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন এনজিওকে তাদের কার্যাবলি পরিচালনার জন্য প্রচুর ঋণ প্রদান করেছে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৫. **খাদ্য ও পুষ্টি সহায়তা :** বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগণ খাদ্য ও পুষ্টির চরম অভাবে নিমজ্জিত। বেশির ভাগ লোক স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি সুবিধাসমূহ থেকে বঞ্চিত। এ লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত নানা প্রশিক্ষণ সচেতনতামূলক কার্যক্রমের উদ্যোগ নেয় এনজিওগুলো। তাছাড়া ডায়রিয়া নিয়ন্ত্রণ, ৬টি মারাত্মক রোগের টীকা, স্বাস্থ্য সচেতনতা সংক্রান্ত প্রচারণা বিশুদ্ধ পানি এবং পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, পরিবার পরিকল্পনা প্রভৃতি কার্যক্রম এনজিওগুলো পরিচালনা করছে।

৬. **খাস জমিতে কৃষি ও মৎস্য চাষ :** বাংলাদেশে এনজিওগুলো সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীমূলক কার্যক্রম হিসেবে সরকারি মালিকানাধীন খাস জমিতে কৃষিকাজ এবং মৎস্যচাষের সুযোগ সৃষ্টি করতে সহায়তা করছে। এনজিওর সহায়তায় সরকারের খাস জমিগুলো ভূমিহীন গরীব কৃষকরা ব্যবহার করছে। তাছাড়া এনজিওগুলো নানা উপকরণ সরবরাহ করে কৃষি ও মৎস্যচাষে সহায়তা করছে। এর মধ্যে কৃষি গভীর, অগভীর পানির কল স্থাপন, বীজ সরবরাহ উল্লেখযোগ্য। মোটকথা, এনজিওগুলো কৃষি ও মৎস্যচাষের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সহযোগিতামূলক কার্যক্রম চালাচ্ছে।

৭. **শিক্ষা কার্যক্রম :** বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে এনজিওগুলো আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, গ্রামীণ এলাকায় এনজিওগুলো স্কুল প্রতিষ্ঠা করে বিনা খরচে গরিব ছেলেমেয়েদের শিক্ষা প্রদান করছে। যেমন– ব্র্যাক স্কুল, আনন্দ স্কুল প্রভৃতি। এর দ্বারা অসংখ্য গরিব শিক্ষার্থী শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে।

৮. **ত্রাণ বিতরণ ও পুনর্বাসনমূলক কাজ :** বাংলাদেশ একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ। ফলে বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগে শত শত জীবন ও বিশাল সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। বাংলাদেশে বহুসংখ্যক এনজিও দুর্যোগকালীন সময় দুস্থদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করে তাদের কষ্ট লাঘব করে থাকে। এছাড়া এনজিওগুলো খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান প্রভৃতি সরবরাহের মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে থাকে।

৯. **কৃষি পদ্ধতির উন্নয়ন :** বিশ্বব্যাপী কৃষিখাতে আধুনিক যন্ত্রপাতির জয়জয়কার চললেও বাংলাদেশ কৃষিখাত উন্নয়ন থেকে এখনো পিছিয়ে। এক্ষেত্রে এনজিওগুলো নানাভাবে সহায়তা করে। যেমন– বড় বড় সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে ট্রাক্টর, পানির পাম্প, উন্নত মানের বীজ ও সার সরবরাহ এবং কৃষকদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদান ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এর ফলে একদিকে কৃষকের অবস্থার উন্নয়ন হয়, অন্যদিকে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

১০. **কুটির শিল্প স্থাপনে সহায়তা :** কুটির শিল্প দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের হাতিয়ারগুলোর একটি। তাই কুটির শিল্প স্থাপনের লক্ষ্যে সরকারের পাশাপাশি এনজিওগুলো বিভিন্ন উপায়ে সহায়তা করে থাকে। যেমন– ঋণদান, বিনিয়োগের আকর্ষণ, লজিস্টিক সাপোর্ট ইত্যাদি। আর এনজিওগুলোর সহায়তা পেয়ে দেশের কুটির শিল্প গতিশীলতার দিকে ধাবিত হচ্ছে।

১১. **বেকার যুবকদের প্রশিক্ষণ :** বাংলাদেশের মোট শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর এক বিশাল অংশ বেকার। এ বেকার জনগোষ্ঠী উপযুক্ত যোগ্যতা ও মেধা থাকা সত্ত্বেও চাহিদানুযায়ী কাজ না পেয়ে নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশে কর্মরত এনজিওগুলো বেকার যুবকদের জন্য নানা প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করে থাকে। এর যথাযথ প্রশিক্ষণ শেষে যুবকরা সহজেই কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের সুযোগ পায়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

১২. **এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের সহায়তা :** অশিক্ষিত ও বখাটে যুবক কর্তৃক এসিড নিক্ষেপের ঘটনা বাংলাদেশে সর্বত্রই হরহামেশা ঘটে। পাশাপাশি প্রতিবন্ধী নির্যাতনের ঘটনাও চোখে পড়ার মত। বাংলাদেশে এনজিওগুলো এসিডদগ্ধ নারী-পুরুষ ও নির্যাতিত অবহেলিত প্রতিবন্ধীদের অর্থ দিয়ে, চিকিৎসা দিয়ে সহায়তা করে থাকে।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রমে এনজিওদের ভূমিকা অপরিসীম। বাংলাদেশে কর্মরত দেশী-বিদেশী এনজিওগুলো তাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ে তুলতে সহায়তা করছে। তবে এক্ষেত্রে তারা কখনো কখনো বাঁধার সম্মুখীন হচ্ছে। এ সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে সরকারের পাশাপাশি জনগণকে সচেতন হওয়া জরুরি।

০৩। সিভিল সোসাইটির বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখুন। সিভিল সোসাইটির সাথে সরকারের সম্পর্ক কি হওয়া উচিত? বর্ণনা করুন। *[৩১তম বিসিএস]*

অথবা, **সিভিল সোসাইটি কি? এর বৈশিষ্ট্যসমূহসহ লিখুন। বাংলাদেশে সিভিল সোসাইটির সঠিক রূপ, কার্যক্রম এবং সরকারের সাথে এর সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা করুন এবং এর কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা বাংলাদেশে কি হতে পারে বলে আপনি মনে করেন তাও উল্লেখ করুন।** *[৩৪তম বিসিএস]*

উত্তর : সিভিল সোসাইটি বা সুশীল সমাজের ধারণাটি নতুন হলেও এর প্রচ্ছন্ন ধারণা পাওয়া যায় জন লক, রুশোসহ আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তাবিদদের লেখনীতে। তবে এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশি স্পষ্ট আলোচনা পাওয়া যায় এন্টোনিও গ্রামসির লেখায়। বিশেষ করে সমাজতন্ত্রের পতনের প্রাক্কালে পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সুশীল সমাজকে আপনরূপে বিকশিত হতে দেখা যায়। কেননা এ অঞ্চলের সমাজতান্ত্রিক সরকারের নির্যাতন, নিপীড়ন ও কড়া বিধি-নিষেধের কারণে সেখানে কোনো রাজনৈতিক ও বেসরকারি ব্যবসায়িক কিংবা বাণিজ্যিক সংগঠন গড়ে উঠতে পারেনি। সুশীল সমাজের ধর্ম হলো এরা সরকার ও প্রাইভেট সেক্টর উভয় ক্ষেত্রেই তাদের প্রভাব বিস্তার করতে পারে। এরা সরকারকে সহযোগিতাও করতে পারে আবার সরকারবিরোধী অবস্থান নিয়ে সরকারের ভিতও নাড়িয়ে দিতে পারে।

সিভিল সোসাইটির বৈশিষ্ট্যসমূহ : নিচে সিভিল সোসাইটির বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করা হলো :

- সুশীল সমাজের সদস্যগণ সুশিক্ষিত ও সচেতন নাগরিক।
- এদের প্রভাব ব্যাপক। এরা সরকারে থাকে না আবার কর্পোরেট গ্রুপেও থাকে না। এরা সরকার ও প্রাইভেট সেক্টরের মাঝামাঝি একটি গ্রুপ।
- বিশিষ্ট লেখক, কবি-সাহিত্যিক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা, সমাজ-সংস্কারক, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, অবসরপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তাগণ নিয়ে সাধারণত সিভিল সোসাইটি গঠিত হয়।
- সিভিল সোসাইটি জনগণের কল্যাণে সবসময় কাজ করে। সরকারকে অলাভজনক বা ক্ষতিকর প্রকল্পসমূহ গ্রহণে বাধা দেয় এবং জনহিতকর প্রকল্প বা কর্মসূচী গ্রহণে পরামর্শ দেয়, বাধ্য করে, অনেকসময় জনস্বার্থে সরকারের বিপক্ষে আন্দোলন করে।
- সিভিল সোসাইটির সদস্যগণ সাধারণত কলমসৈনিক। তারা বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমে লেখনীর দ্বারা বা বক্তৃতার মাধ্যমে জনগণকে সরকারি কার্যকলাপের পরিণতি সম্পর্কে অবহিত করেন।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

- সিভিল সোসাইটির সদস্যগণ ধর্ম, বর্ণ কিংবা রাজনৈতিক মতবাদের উর্ধ্বে থেকে সরকারের পক্ষে বা বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেন।
- সিভিল সোসাইটি কোনো ব্যবসায়িক কিংবা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে কাজ করেন না। তবে জনকল্যাণে দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় বা সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে অপ্রাতিষ্ঠানিকভাবে কাজ করেন।

সিভিল সোসাইটি ও সরকার একটি কাঙ্ক্ষিত সম্পর্ক : সিভিল সোসাইটির সাথে সরকারের সম্পর্ক যেরূপ হওয়া উচিত তা নিচে আলোচিত হলো :

১. **পরামর্শদাতা :** সুশীল সমাজ বলতে বোঝায় সেই সুসংগঠিত সমাজ যারা জাতি ও দেশের অভিভাবক ও পরামর্শদাতা। তারা সরকার, রজনীতিক বা দেশের কর্ণধারদের ক্ষমতার বাইরে থেকে ভুলত্রুটি ধরিয়ে দেন এবং ভবিষ্যত সমৃদ্ধির জন্য পরামর্শ দিয়ে থাকেন। একটি দেশে জনস্বার্থ রক্ষা করতে হলে সিভিল সোসাইটিকে সরকারের সুপরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করতে হবে।

২. **মধ্যস্থতাকারী :** সিভিল সোসাইটির প্রশাসনিক, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক ক্ষমতা না থাকলেও এগুলোকে পরোক্ষভাবে তারা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ফলত রাজনৈতিক দল তথা সরকার ও রাষ্ট্রের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা থাকে। সরকার ও জনগণের মধ্যকার যোগাযোগের ক্ষেত্রে সিভিল সোসাইটিকে আরো কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে।

৩. **সতর্ককারী :** সমাজের সকল বিবেকবান মানুষই সুশীল সমাজের সদস্য। সুশীল সমাজ সরকারকে তাদের কার্যকলাপের ব্যাপারে সতর্ক করে জনস্বার্থ রক্ষাকারী কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে উপদেশ দিয়ে থাকে।

৪. **নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তাকারী :** সংবিধানের ধারা সংশোধন, নতুন আইন প্রণয়ন, আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ গ্রহণ, পররাষ্ট্রনীতি, বাণিজ্যনীতি প্রভৃতি নীতিমালা যাতে জনস্বার্থে প্রণীত হয় সে ব্যাপারে সুশীল সমাজ সরকারকে সহায়তা করবে।

৫. **তথ্য প্রদানকারী :** সিভিল সোসাইটি সরকারকে দেশের জনগণের বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত দিয়ে সহায়তা করবে। অনেক সময় সরকারী কর্মচারী কর্তৃক গৃহীত তথ্যে গরমিল পরিলক্ষিত হয়। কাজেই এ তথ্য অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করলে তা জনগণের কাজে না আসার সম্ভবনাই বেশি থাকে। এ ক্ষেত্রে সুশীল সমাজ সরকারকে প্রকৃত তথ্য দিতে পারে বা প্রকৃত তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা দিতে পারে।

৬. **সহনশীল সরকার :** বর্তমানে অনেক দেশেই রাষ্ট্র বা রাজনৈতিক সরকার সিভিল সমাজের চিন্তা-চেতনা, অনুভূতি ও কল্যাণের তোয়াক্কা না করে স্বৈরাচারী ও স্বেচ্ছাচারীমূলক আচরণ করে থাকে। এক্ষেত্রে সরকার ও সুশীল সমাজ উভয়কে যৌক্তিক আচরণ করতে হবে। কেবল বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা করা যেমন সুশীল সমাজের কর্তব্য হতে পারে না তেমনি সুশীল সমাজের গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শও সরকারের অবহেলা করা উচিত নয়। দেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখার ক্ষেত্রে সুশীল সমাজকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে কাজ করতে হবে। সরকার ও সুশীল সমাজের মাঝে আলোচনার পরিবেশ বজায় রাখতে হবে।

উপসংহার : দেশে সুষ্ঠু রাজনৈতিক পরিবেশ বজায় রাখা এবং আদর্শ গণতন্ত্রের স্বাদ জনগণের কাছে বিতরণের ক্ষেত্রে সুশীল সমাজ জনগণের অভিভাবকরূপে কাজ করে। তবে বর্তমানে সুশীল সমাজের সদস্যদের মধ্যেও কিছুটা রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তি কাজ করে। যা জনগণকে সুশীল সমাজের মতাদর্শের প্রতি অনেক সময়ে সন্দিহান করে তোলে। তাই একদিকে সুশীল সমাজের দায়িত্ব যেমন জনকল্যাণে নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখা তেমনি সরকারেরও কর্তব্য সুশীল সমাজের পরামর্শ সুবিবেচনা করা।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

০৪। বাংলাদেশে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে সুশীল সমাজের ভূমিকা আলোচনা করুন। *[২৭তম বিসিএস]*
***অথবা,* বাংলাদেশে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটি নিবন্ধ রচনা করুন।** *[১৫তম বিসিএস]*

উত্তর : যে কোনো সমাজ এবং রাষ্ট্র মানেই এখানে বিভিন্ন পেশার সম্প্রদায়, যোগ্যতা ও মর্যাদার অধিকারী লোক থাকবে। এরা সবাই একই সমাজ ও রাষ্ট্রে বসবাস করলেও সকলের ভূমিকা সমান হবে এমনটা আশা করা যায় না। তবে কাছাকাছি যোগ্যতা, ধ্যান-ধারণা ও মর্যাদার অধিকারী লোকদের ভূমিকার ক্ষেত্রে অনেক সময় সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে দেখা যায়, কোনো দেশের সুশিক্ষিত ও সচেতন নাগরিকদের চিন্তা-চেতনা ও কর্ম হয় অনেকটা নিরপেক্ষ, নির্দেশনামূলক ও উন্নয়নকামী। এরা সরকার কিংবা বেসরকারি পুঁজিপতির চিন্তা ও কর্মের মাঝে একটা মধ্যবর্তী শ্রেণী হিসেবে অবস্থান করে। ফলে সরকারের বিপথগামিতা বা প্রাইভেট সেক্টরের অতিমাত্রায় আত্মকেন্দ্রিকতা ও বাজারমুখিতার মাঝামাঝি থেকে তারা উভয়কে চরম অবস্থানের ব্যাপারে সজাগ করে দেয় এবং অনেক ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ করে। এতে দেখা যায়, জাতীয় উন্নয়ন, অগ্রগতি ও দুর্যোগ মোকাবিলায় তাদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেয়। বিশেষ করে উন্নত বিশ্বের দেশগুলোতে সুশীল সমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উন্নয়নশীল ও অনুন্নত বিশ্বের সুশীল সমাজ ততটা বিকশিত না হলেও তাদের ভূমিকাও কম নয়। বাংলাদেশেও দেখা যায়, স্বাধীনতার চার দশকে এসেও সুশীল সমাজ তার সুদৃঢ় অবস্থান গড়ে নিতে পারেনি। তবে বিভিন্ন সময়ে তারা যে ভূমিকা রেখেছেন তার বিবেচনায় বলা যায়, দেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও বৈদেশিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বিশেষ করে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে সুশীল সমাজ অনুঘটকের ভূমিকা পালন করতে পারে।

সুশীল সমাজের ধারণা : সুশীল সমাজের ধারণাটি নতুন হলেও এর প্রচ্ছন্ন ধারণা পাওয়া যায় দার্শনিক জন লক, রুশোসহ আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তাবিদদের লেখনীতে। তবে এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশি স্পষ্ট আলোচনা পাওয়া যায় এন্টোনিও গ্রামসির লেখায়। বিশেষ করে সমাজতন্ত্রের পতনের প্রাক্কালে পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সুশীল সমাজকে আপনরূপে বিকশিত হতে দেখা যায়। কেননা এ অঞ্চলের সমাজতান্ত্রিক সরকারের নির্যাতন, নিপীড়ন ও কড়া বিধি-নিষেধের কারণে সেখানে কোনো রাজনৈতিক ও বেসরকারি ব্যবসায়িক কিংবা বাণিজ্যিক সংগঠন গড়ে উঠতে পারেনি। কমিউনিজমকে টিকিয়ে রাখার জন্য কমিউনিস্ট মডেলে সাংস্কৃতিক বিনির্মাণের চেষ্টাও করা হয় দীর্ঘকাল। কিন্তু কোনো কিছুতেই শেষ রক্ষা হয়নি। কমিউনিস্টবিরোধী আন্দোলনে এক সময় লাখ লাখ লোক রাস্তায় নেমে আসে। তখনই প্রশ্ন আসে, কোন শক্তি তাদেরকে এতো বাধা-নিষেধ আর নির্যাতনের পরও ঐক্যবদ্ধ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে সাহায্য করলো? এটি মূলত সুশীল সমাজ। এরা সরকারে থাকে না, আবার কর্পোরেট গ্রুপেও থাকে না। এরা সরকার এবং প্রাইভেট সেক্টরের মাঝামাঝি একটি গ্রুপ। এদের ধর্ম হলো এরা সরকার ও প্রাইভেট সেক্টর উভয় ক্ষেত্রেই তাদের প্রভাব বিস্তার করতে পারে। এরা সরকারকে সহযোগিতাও করতে পারে আবার সরকারবিরোধী অবস্থান নিয়ে সরকারের ভিতও নাড়িয়ে দিতে পারে।

বাংলাদেশের সুশীল সমাজ : দীর্ঘদিনের ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ, পাকিস্তানি শাসন আর সামরিক শাসনের যাঁতাকলে বাংলাদেশে সুশীল সমাজ তেমন বিকাশ লাভ করতে পারেনি। বরং বিভিন্ন সময়ে সুশীল সমাজ যখনই মাথাচাড়া দিতে চেয়েছে, তখনই রাজনৈতিক সরকারগুলো নানা অপকৌশলে এদের গোড়া কেটে দিয়েছে। বিশেষ করে সুশীল সমাজের প্রভাবশালী সদস্যদের হালুয়া-রুটির লোভ দেখিয়ে কিংবা রাজনৈতিক পদ লাভের টোপ দিয়ে আপন ভূমিকা থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কৌশল অনুসৃত হয়েছে দীর্ঘকাল। ফলে দেখা গেছে সুশীল সমাজ তার আপন ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার পরিবর্তে রাজনৈতিক সমাজে লীন হয়ে গেছে এবং এরা একসময় রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হিসেবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে অবস্থান

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

নিয়েছে। ফলে আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবী নামের যে শ্রেণীটা রয়েছে তারাও নানাভাবে কলুষিত হয়ে পড়েছে। কেউ কেউ সরাসরি রাজনীতিতে অংশ নিচ্ছে আবার কেউ কেউ ক্ষমতাশালীদের খুঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। যেখানে অন্যায়ের বিরুদ্ধে কলম ধরার কথা, সেখানে নেতা কিংবা নেত্রীর বাঁশিতে তারা সুর তুলে দিচ্ছেন। ফলে সুশীল সমাজের রাজনৈতিক বিভক্তিও আজ সুস্পষ্ট।

বাংলাদেশের সামনে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ : নতুন শতাব্দীতে পা রেখে বাংলাদেশ অনেক স্বপ্ন দেখলেও তাকে অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হচ্ছে এবং হবে। উন্নয়ন, ক্ষমতায়ন, আন্তর্জাতিক বিশ্বে নিজেদের অবস্থানকে উন্নতকরণ এবং আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সমতা প্রতিষ্ঠাসহ অনেক ক্ষেত্রেই বাংলাদেশকে বেশ কিছু কঠিন চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হচ্ছে। যেমন—

প্রথমত, বাংলাদেশের সামনে সবচেয়ে কঠিন চ্যালেঞ্জ হলো দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্তি লাভ। দেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জনগোষ্ঠী এখনো দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করছে। মাথাপিছু আয়ে এখন সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৬ষ্ঠ। খাদ্য নিরাপত্তা, বিশুদ্ধ পানি আর স্যানিটেশন সুবিধা থেকে এ দেশের অধিকাংশ জনগণই বঞ্চিত।

দ্বিতীয়ত, মানব উন্নয়ন রিপোর্ট ২০১৪ অনুযায়ী বাংলাদেশের শতকরা প্রায় ৪২.৩ ভাগ মানুষ নিরক্ষর। যারা শিক্ষিত তাদের অধিকাংশই কেবল অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন। আবার শিক্ষার যে নীতি, কৌশল ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা তা-ও হাজারো সমস্যা ও ত্রুটিতে ভরা। এমতাবস্থায় দেশের প্রতিটি মানুষকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলাই জাতির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ।

তৃতীয়ত, নতুন শতাব্দী হলো গণতন্ত্র আর উন্নয়নের। অথচ আজ পর্যন্ত আমরা এ দুটির কোনোটিই অর্জন করতে পারিনি। রাজনৈতিক অনৈক্য বিশৃঙ্খলা আমাদের প্রতিনিয়ত বাধাগ্রস্ত করছে। জাতীয় উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য এ মুহূর্তে রাজনৈতিক ঐক্য ও সংহতির কোনো বিকল্প নেই।

চতুর্থত, এ মুহূর্তে জাতি দুটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন—সন্ত্রাস ও দুর্নীতি। আমরা উন্নয়ন আর সমৃদ্ধির পথে এক পা এগুলে দুর্নীতি আর সন্ত্রাসের কারণে পরক্ষণেই এক পা পিছিয়ে পড়তে হচ্ছে। সন্ত্রাস এবং দুর্নীতিবিরোধী অনেক স্লোগান আর কর্মসূচির কথা শোনা গেলেও কোনোটিই কার্যকরভাবে এগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না।

পঞ্চমত, বাংলাদেশের সামনে এ মুহূর্তে আরেকটি চ্যালেঞ্জ হলো আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নিজের অবস্থান ধরে রাখা। প্রতিবেশী শক্তিধর রাষ্ট্রের বৈরী আচরণ ও অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা জাতিকে এক বিব্রতকর পরিস্থিতিতে ফেলেছে। এমতাবস্থায় দেশের ভাবমূর্তি ধরে রেখে সবার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখাই একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে।

ষষ্ঠত, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন মোকাবিলা করে নিজস্ব সংস্কৃতির বিকাশ এবং উন্নয়ন জাতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা মুক্ত আকাশ সংস্কৃতির চর্চা আর আধুনিকতার ঢাকঢোলে দেশীয় সংস্কৃতির এখন খুবই বেহাল অবস্থা।

সপ্তমত, সবার জন্য সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার যে কঠিন কাজ তা-ও আমাদের করতে হবে। এ ক্ষেত্রে দেশের প্রায় সবকটি জেলায় আর্সেনিকের বিস্তার, এইডসের বিস্তারসহ অন্যান্য মারণব্যাধির হাত থেকে জনগণকে রক্ষার কঠিন চ্যালেঞ্জ তো আমাদের সামনে রয়েছেই।

চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সুশীল সমাজের করণীয় : বাংলাদেশের সামনে একুশ শতকের যে চ্যালেঞ্জগুলোর কথা বলা হচ্ছে এগুলো মোকাবিলা করে জাতিকে উন্নতির শিখরে রাতারাতি পৌঁছে দেয়া সরকার কিংবা অন্য কোনো শ্রেণী বা গোষ্ঠীরই একার পক্ষে সম্ভব নয়। আবার এক্ষেত্রে সকলের সমান ভূমিকা থাকবে তেমনটাও নয়। বরং প্রতিটি ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও কর্তৃপক্ষ নিজ নিজ অবস্থানে থেকে সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করতে এগিয়ে এলেই কেবল জাতিকে একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ উপহার দেয়া

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

সম্ভব। এ ক্ষেত্রে জাতির বিবেক আর সমাজের মগজ বলে খ্যাত বুদ্ধিজীবী ও বিবেকবান সুশীল সমাজের ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যেমন—

১. **দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন :** দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য সরকারি ও বেসকরারি উভয় প্রকার উদ্যোগ ও কর্মসূচি গ্রহণ আবশ্যক। এ ক্ষেত্রে সুশীল সমাজের অংশ বলে দাবিদার এনজিওগুলো ইতোমধ্যেই তাদের অবদানের কথা জানান দিয়েছে। এভাবে সমাজের বিভিন্ন অংশ ও স্তরে বিদ্যমান বিবেকবান ও প্রসারিত চিন্তার অধিকারী ব্যক্তিরা যদি এগিয়ে আসে তাহলে দারিদ্র্য বিমোচনের মতো কঠিন কাজটিও সহজতর হতে বাধ্য। এক্ষেত্রে সুশীল সমাজ একদিকে নিজেরা স্বনির্ভর জীবন গড়ার আন্দোলনের ডাক দিতে পারে এবং সরকারি ডাকে সাড়া দেয়ার জন্যও জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার ব্যাপারে তারা পথ-নির্দেশকের ভূমিকা পালন করতে পারে। সিপিডিসহ কতিপয় সংস্থা ইতোমধ্যে দিক-নির্দেশনামূলক নানা সভা-সেমিনার-আলোচনার মাধ্যমে এক্ষেত্রে কিছুটা ভূমিকা রেখে চলেছে।

২. **সর্বজনীন শিক্ষার প্রসার :** দেশের প্রায় ১৫.৫৮ কোটি মানুষকে শিক্ষিত করে তোলার যে মহান ব্রত তা সরকারের একার পক্ষে কোনো মতেই সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে বিভিন্ন এনজিও, সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন এবং সমাজ সচেতন ব্যক্তিবর্গের ভূমিকা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা সমাজ অভ্যন্তরে থেকে সমাজের মানুষের মাঝে নিবিড়ভাবে জ্ঞান বিতরণের মহতী কর্তব্য তারা অত্যন্ত নৈপুণ্যের সাথে পালন করতে পারে। একদিকে তারা নিজেরা যেমন বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তার করতে পারে, তেমনি শিক্ষার বিষয়ে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণেও সুশীল সমাজ ভূমিকা রাখতে পারে। আবার সরকারি শিক্ষা কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নে সুশীল সমাজের অংশীদারিত্ব ও সহযোগিতা একান্তভাবে প্রয়োজন।

৩. **রাজনৈতিক অস্থিরতা নিরসন :** ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর কিছুদিন যেতে না যেতেই ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন সাধিত হয়। তারপর অনেক উত্থান-পতন আর ঘটন-অঘটনের মধ্য দিয়ে পনেরটি বছর পেরিয়ে যাবার পর ১৯৯০ সালে স্বৈরশাসক এরশাদের পতনের মধ্য দিয়ে দেশে গণতন্ত্রের নতুন যাত্রা শুরু হয়। এরপর ছয়টি গণতান্ত্রিক ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও দেশ তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছুতে পারেনি। দেশের রাজনীতির আকাশে অবিশ্বাস, অনৈক্য আর দুর্যোগের যে ঘনঘটা তা দিনদিন কেবল গাঢ়ই হচ্ছে।

রাজনৈতিক দলগুলো কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না। জাতীয় উন্নতি-অগ্রগতির তুলনায় দলীয় রেষারেষিই তাদের কাছে মুখ্য। এমতাবস্থায় দেশের সুশীল সমাজ রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে ক্রমাগত সংলাপের আয়োজন, জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ক্ষেত্রে ঐক্য প্রচেষ্টা এবং এ বিষয়ে জনগণকে সচেতন করে রাজনীতিবিদদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বিশেষত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যকার ভুল বোঝাবুঝির অবসান ও দূরত্ব ঘোচাতে সুশীল সমাজ প্রধান সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন করতে পারে।

৪. **দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠন :** আমাদের প্রতিটি সরকার দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনের অঙ্গীকার করলেও দুর্নীতিতে এক নম্বর হওয়ার জাতীয় লজ্জা আমাদেরই। এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে যে শক্তিধর আন্দোলন দরকার তা জনতার মাঝ থেকে শুরু করতে হবে। দুর্নীতি প্রতিরোধ বিষয়ে জনগণকে সচেতন করে সম্মিলিতভাবে এর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে না পারলে কোনো সরকারই এজন্য এগিয়ে আসবে না। আর সেক্ষেত্রে দুর্নীতিবিরোধী যে সামাজিক আন্দোলন তা সুশীল সমাজ থেকেই শুরু করতে হবে। সমাজদেহের নিগড়ে দুর্নীতির যে মূল আছে তা উপড়ে ফেলতে সুশীল সমাজকেই এগিয়ে আসতে হবে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৫. **বৈদেশিক সম্পর্কের টালমাটাল অবস্থা দূরীকরণ :** বাংলাদেশে বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বর্তমানে যে টালমাটাল অবস্থা বিরাজ করছে তা থেকে উত্তরণের জন্য জাতিকে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রচেষ্টা চালাতে হবে। রাজনৈতিক, ব্যক্তিগত, দলীয় সকল স্বার্থ ও দ্বন্দ্ব ভুলে জাতীয় স্বার্থেই আমাদের রাজনৈতিক দল, সুশীল সমাজ ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। আর এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে সুশীল সমাজ। বিদেশে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার জন্য বুদ্ধিজীবীদের লেখনী অত্যন্ত শক্তিশালী ভূমিকা পালন করতে পারে। তাছাড়া আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তারা বিভিন্ন দেশের সুশীল সমাজের সাথে লিয়াজোঁ রক্ষা এবং দেশের ভাবমূর্তি রক্ষার জন্য লবিং করতে পারে। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন দেশের সাথে অবনতিশীল সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য তারা সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ হিসেবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও আলোচনা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরতে পারে। তাছাড়া দেশের রাজনৈতিক দলগুলোকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনার টেবিলে এনে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও সুশীল সমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

৬. **সন্ত্রাস দমন :** সন্ত্রাস দমন আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। সন্ত্রাসের কালো থাবা আমাদের জাতীয় উন্নয়ন, অগ্রগতি আর নিরাপত্তাকে চরমভাবে বিপর্যস্ত করছে। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকাও রহস্যজনক। মুখে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কথা বললেও দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে সন্ত্রাসবিরোধী অবস্থান গ্রহণের সৎসাহস অনেক রাজনৈতিক দলেরই নেই। এমতাবস্থায় সুশীল সমাজের সন্ত্রাসবিরোধী অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমাজে সন্ত্রাসবিরোধী প্লাটফরম তৈরি করে সন্ত্রাসীদের সামাজিক ভিতকে তারা দুর্বল করে দিতে পারেন।

৭. **হিন্দু-মুসলিম সুসম্পর্ক তৈরি :** আমাদের দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য বিদ্যমান থাকলেও সাম্প্রতিককালে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের বিষয়টি রাজনৈতিক রূপ পাওয়ায় এক্ষেত্রে বেশ বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরার ক্ষেত্রে সুশীল সমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। আবার যেসব ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুরা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে তাদের এসব নির্যাতন ও শোষণবিরোধী অবস্থান নিয়েও সুশীল সমাজ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে।

উপসংহার : সর্বোপরি একটি শোষণমুক্ত, উন্নত ও প্রগতিশীল আধুনিক সমাজ গঠনে সুশীল সমাজ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। আমাদের সুশীল সমাজ আজ যে ভূমিকায় অবতীর্ণ তা জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতির বিবেচনায় খুবই নগণ্য। তাদের প্রকৃত ভূমিকা পালনের জন্য আরো বেশি সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

০৫। সুশাসন বলতে কি বোঝায়? বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অন্তরায়সমূহ আলোচনা করুন। *[৩০তম বিসিএস]*

উত্তর : সুশাসন এমন একটি প্রক্রিয়া। যে প্রক্রিয়ায় সরকারের বৈধতা, শাসনকার্যে জনগণের অংশীদারিত্ব শাসিতের সম্মতির ওপর নির্ভরশীল। সুশাসন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর স্বাধীনতা, অধিকার ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করে, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কার্যকলাপের কাঠামো রচনা করে। সুশাসন রাষ্ট্রীয় খাতের সামর্থ গড়ে তোলে— সেই সাথে গড়ে তোলে বিধি-বিধান ও প্রতিষ্ঠান তৈরি হয় রাষ্ট্রীয় ও বেসরকারি লেনদেনের যথার্থ পরিচালন ব্যবস্থা। সে কারণেই বস্তুতপক্ষে সুশাসন হলো উন্নয়নের গতি দ্রুততর করার প্রক্রিয়া— যাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জীবনযাত্রার উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়। সুশাসন

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

নাগরিকদের আত্মমর্যাদা ও উপলব্ধিতে সমর্থন যোগায়, আর্থ-সামাজিক রূপান্তরে সহায়তা করে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য সুশাসনের প্রাসঙ্গিকতা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। আজকে বাংলাদেশের উন্নয়নে যে সংকট চলছে তার মাঝে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের জীবনধারার সংকট প্রতিফলিত। এ কারণে, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সুশাসনভিত্তিক এক নতুন রাজনীতি অত্যাবশ্যক যাতে করে বর্তমান সময়ের নিম্নমুখী বা প্রায় স্থবির গড় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব হয়। এ ধরনের উন্নয়নমূলক প্রশাসন জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থাকে শাসনের প্রধান বিষয় বলে গণ্য করে ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় গণমানুষের অধিকার ও উপকার প্রাপ্তির বিষয়ে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে।

সুশাসন (Good Governance) বলতে যা বোঝায় : সুশাসন বলতে রাষ্ট্র পরিচালনা পদ্ধতি, জনগণ ও সরকারের মধ্যকার সম্পর্ক নিরূপণ, আইনের শাসন, মানবাধিকারের নিশ্চয়তা, সিদ্ধান্ত গ্রহণে সকলের মতামত ও অংশগ্রহণ, পছন্দের স্বাধীনতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা প্রভৃতি ইঙ্গিত করে। ১৯৯০-এর দশকের গোড়ার দিক থেকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাবিকাঠি হিসেবে 'সুশাসন' প্রত্যয়টিকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হচ্ছে। 'সুশাসন' শব্দটি ব্যক্তি মানুষের জ্ঞানগত পরিমণ্ডলের ব্যাপ্তির ভিত্তিতে নানা জনের কাছে নানা অর্থ ও তাৎপর্য বহন করে। ফলে এখন পর্যন্ত বিশ্বের কোনো একাডেমিক মহল থেকে বিভিন্ন দেশের উন্নয়ন অভিজ্ঞতার আলোকে সুশাসনের কোনো গ্রহণযোগ্য ও সর্বজনীন তত্ত্ব বা সংজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ফলে সুশাসনের ধারণাটি সর্বজনীন নয়। ভৌগোলিক অবস্থান, শিক্ষার হার, জীবনযাত্রার মান, সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ভিন্নতার কারণে পশ্চিমা বিশ্বের সুশাসনের ধরনের সাথে উন্নয়নশীল বিশ্বের সুশাসনে মাত্রাগত ও গুণগত পার্থক্য রয়েছে।

সংজ্ঞার্থ : সাধারণভাবে সুশাসন বলতে এমন একটি ব্যবস্থাকে বোঝায়, যে ব্যবস্থায় দেশের সীমিত সম্পদকে কার্যকরিভাবে ব্যবহার করে জনগণকে অধিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে অধিক কল্যাণ নিশ্চিত করা যায়।

অধ্যাপক Caplan ও John Harris বলেন, "Good governance is as the provision of universal roles and institution that enforce them and predictable mechanism to regulate conflict over rules and enforcement."

অন্যভাবে বলা যায় যে, দক্ষতা বৃদ্ধিতে দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়াবলী এবং লভ্য সম্পদসমূহের যথার্থ ব্যবস্থাপনা। সুশাসন শব্দটি যেহেতু উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত, সেহেতু সুশাসন হলো রাষ্ট্র, জনসাধারণ, সুশীল সমাজ ও বেসরকারি খাতে উন্নয়ন। আর এ উন্নয়নের জন্য সুশাসন দেশের আর্থ-সামাজিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় ক্ষমতাকে অনুশীলন করে। বলিষ্ঠ ও ন্যায়ানুগ উন্নয়নকে পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্য সুশাসন একটি সুষ্ঠু নীতিমালার মাধ্যমে অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে এবং সে পরিবেশকে টেকসই করে অব্যাহতভাবে বজায় রাখে।

বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অন্তরায়সমূহ : বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশ। এ দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এ দেশের উন্নয়নে জনশক্তি, সম্পদ, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, ধর্মীয় সহিষ্ণুতা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, নিয়মিত নির্বাচন প্রভৃতি থাকলেও সুশাসনের অভাবজনিত কারণে এ দেশ উন্নয়নের আলো থেকে বঞ্চিত। বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কতকগুলো বিষয় অন্তরায় হিসেবে কাজ করছে। নিচে ধারাবাহিকভাবে এসব অন্তরায়সমূহ উপস্থাপন করা হলো :

১. **প্রাতিষ্ঠানিক সংকট :** ঔপনিবেশিক শাসনামলে ব্রিটিশরা তাদের স্বার্থ ব্যতীত কোনো আধুনিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেনি। ১৯৪৭ পরবর্তীতেও কোনো প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হয়নি। সামরিক শাসনে রাজনৈতিক দল, প্রতিষ্ঠান, চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী এতই দুর্বল ছিল যে, আইয়ুব খান এসব

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

প্রতিষ্ঠানকে নিজ উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহার করেছে। বাংলাদেশ এ দুর্বল প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিয়ে স্বাধীনতা লাভ করে এবং ব্যাপক অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হয়। স্বাধীনতা পরবর্তী প্রায় চার দশক পার হতে চললেও বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি কোনো শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। বরং পুরনো প্রতিষ্ঠানগুলোকে দলীয়করণ, আত্মীয়করণ, বাণিজ্যিকীকরণ করে ধ্বংসযজ্ঞে লিপ্ত রয়েছে। যার ফলে বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ হয়নি কোনো প্রতিষ্ঠানের। কাজেই বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হলো প্রাতিষ্ঠানিক সংকট।

২. **দরিদ্রতা বা অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা :** বাংলাদেশের মূল সমস্যা দরিদ্রতা। এ সমস্যার সমাধান আজও হয়নি। কবে নাগাদ হবে তা নির্দিষ্ট করে বলাও মুশকিল। কেননা এ সমস্যার সমাধানে তেমন কোনো তৎপর্যপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা যেমন প্রণয়ন করা হয়নি, তেমনি কার্যকর কোনো উদ্যোগও গ্রহণ করা হয়নি। গত প্রায় চার দশকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত প্রতিটি সরকারের খাজনা তোলার প্রবণতায় প্রশাসন কর্তৃপক্ষ সমস্যার সমাধান খুঁজতে অক্ষম হয়েছে। সে কারণেই সমাজের কাঠামোগত পরিস্থিতির মর্মমূলে দরিদ্রতার চিরাচরিত স্বভাবও অপ্রতিরোধ্য গতিধর্ম খুঁজে পেয়েছে এবং টিকে থাকার শক্ত খুঁটি গেড়েছে। এমনও শোনা যায়, কোনো ক্ষমতাসীনরাই চায় না দারিদ্র্য দূর করতে। দারিদ্র্য দূর হলে জনগণ সচেতন হবে। আর জনগণ সচেতন হলে তাদের প্রভাব ও কর্তৃত্ব হ্রাস পাবে। ক্ষমতাসীনদের চারিত্রিক দুর্বলতা জনসম্মুখে প্রকাশ হয়ে যাবে। রাজনীতি ও অর্থনীতি পরস্পর সম্পর্কিত যেমন, তেমনি সুশাসন ও অর্থনীতি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যতীত সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা তথা দারিদ্র্য সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বড় ধরনের অন্তরায়।

৩. **স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতা ও দায়িত্বশীলতার অভাব :** বাংলাদেশে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দায়িত্বশীলতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাবে সৃষ্টি হয় বনের রাজা ওসমান গণির মতো প্রশাসকের। এরূপ হাজারো প্রশাসক বাংলাদেশে রয়েছে, যারা জনগণের সম্পদ ও অধিকার লুট করে রাতারাতি কোটিপতি বনে গেছেন। তাছাড়া রয়েছে ক্ষমতার ঔদ্ধত্য ও অপব্যবহার, কর্মের দীর্ঘসূত্রিতা, লাল ফিতার দৌরাত্ম্য, সংসদীয় কমিটিগুলোর ব্যর্থতা, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে গণতন্ত্র চর্চার অভাব। প্রশাসনিক দায়িত্বশীলতা ও ক্ষমতার অপব্যবহারে আজ দেখা দিচ্ছে বিদ্রোহ, এমনকি জেএমবির মতো তালেবান সংগঠনগুলোও জন্ম হচ্ছে। এ সবকিছুর মূলে রয়েছে প্রবঞ্চনা, অনিয়ম, হতাশা, দুর্নীতি। এরূপ অস্থিতিশীলতা দেশের সমৃদ্ধির পথকে বা গতিধারাকে ব্যাহত করছে। যা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় মারাত্মক প্রতিবন্ধকতা হিসেবে বিবেচিত হয়।

৪. **রাজনৈতিক নেতৃত্বের দুর্বলতা :** সুশাসন প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজন দক্ষ, যোগ্য, জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব। অথচ বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের অধিকাংশই অদক্ষ, অযোগ্য, জনবিচ্ছিন্ন। বাংলাদেশে রাজনৈতিক নেতৃত্ব সৃষ্টি হয় ব্যক্তিকেন্দ্রিক, উত্তরাধিকার সূত্রে, অর্থনৈতিক প্রতিপত্তির জোরে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের অবস্থা ঠিক এরকম– 'মাটিতে যাদের পা পড়ে না তারাই মাটির মালিক হন' অর্থাৎ যাদের সাথে জনগণের সম্পৃক্ততা নেই তারাই জনগণের প্রতিনিধি। তাছাড়া রয়েছে নেতাদের চারিত্রিক দুর্বলতা, আদর্শগত দীনতা, নীতির প্রশ্নে অটল থাকা, নিজের বা অন্যের প্রতি প্রদর্শিত অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হওয়া, অন্যায় নির্দেশ অগ্রাহ্য করা, ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো প্রভৃতি চারিত্রিক সবলতা নেতাদের মাঝে খুব কমই দেখা যায়। বরং এর বিপরীত দিকটিই বেশি দৃষ্টিগোচর হয়। রাজনৈতিক নেতাদের রয়েছে আদর্শিক দোদুল্যতা। যে নীতি তারা গ্রহণ করেন তা তারা বিশ্বাস করেন না। মনে ও প্রাণে ধারণ করেন না। আর যে নীতি তারা বিশ্বাস করেন সে নীতি তারা গ্রহণ করেন না। রাজনৈতিক নেতৃত্বের এরূপ দুর্বলতা সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথে বড় বাধা।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৫. **বহিঃশক্তি ও দাতাগোষ্ঠীর ওপর নির্ভরশীলতা :** বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বিদেশী শক্তি ও সাহায্যদাতা দেশগুলোর ওপর নির্ভর করে ক্ষমতা চর্চা করেন। দেশীয় অন্তঃকোন্দল বা দ্বন্দ্বে বিদেশী শক্তির হস্তক্ষেপ কামনা করেন। যার ফলে বিদেশী প্রভুরা দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অযাচিত নাক গলায়, নানা নির্দেশ ও পরামর্শ দেয়, অনধিকার হস্তক্ষেপ করে। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলে। বাংলাদেশকে 'বাফার স্টেট' বলে অভিহিত করে। যা কখনোই কাম্য নয়। বিদেশী বিভিন্ন দাতাগোষ্ঠী বা সাহায্যগোষ্ঠীর ওপর অধিক নির্ভরশীলতার কারণে কোনো সরকারের পক্ষেই স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। কাজেই নীতি নির্ধারণে সাহায্য দানকারীগোষ্ঠী বা দাতাগোষ্ঠীর মতামতকে প্রাধান্য দিতে হয়। এরূপ অবস্থা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বাধাস্বরূপ।

৬. **রাজনৈতিক ঐকমত্যের অভাব :** বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে ঐকমত্যের প্রশ্নে বাধার সম্মুখীন। যার ফলে আজও সমাধান হয়নি বাঙালি জাতীয়তাবাদ, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ দ্বন্দ্ব, স্বাধীনতার জনক-ঘোষক সমস্যা, স্থানীয় সরকার কাঠামোর সঠিক ও সুনির্দিষ্ট রূপরেখা, পররাষ্ট্রনীতি পূর্বমুখী না পশ্চিমমুখী হবে এ দ্বন্দ্ব। ফলে দেখা যায় যখন যে রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় আসে, তখন সে রাজনৈতিক দল তাদের নীতি, আদর্শ ও সুবিধা অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। কাজেই বারবার একই ক্ষেত্রে বিভিন্ন নীতিমালা পরিবর্তন করা হয়। ফলে উন্নয়ন হয় ব্যাহত। বরং নির্দিষ্ট সময় পর পর চলে নীতিমালা নিয়ে টানাহেচড়া। এরূপ জাতীয় ইস্যুতে রাজনৈতিক ঐকমত্যের অভাব সুশাসন প্রতিষ্ঠায় চরম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

৭. **শক্তিশালী বিরোধী দলের অভাব :** গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় প্রয়োজন শক্তিশালী বিরোধী দল। কেননা শক্তিশালী বিরোধী দল সরকারকে সকল অনিয়ম, অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে। সরকারের অন্যায়-অনিয়মের বিরোধিতা করে। জনগণকে সচেতন করে তোলে। অথচ বাংলাদেশে স্বাধীনতা পরবর্তী কোনো সময়ই শক্তিশালী বিরোধী দল পাওয়া যায়নি। যখনই যারা ক্ষমতায় এসেছে তখনই তারা শক্তিশালী বিরোধী দলের অভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠের জোরে নিজেদের ইচ্ছেমতো আইন পাস করিয়ে নিয়েছে, বিরোধী দলকে ঘায়েল করতে নানা প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে। এরূপ অবিচার সহ্য করেনি বলেই পরবর্তী নির্বাচনে জনগণ গণরায় দিয়ে বিরোধী দলকে ক্ষমতায় বসিয়েছে। কিন্তু তারাও অতীত ইতিহাস ভুলে গিয়ে পূর্বের সকল অনিয়মই অনুসরণ করেছে। পৃষ্ঠপোষকতা করেছে দুর্নীতি, অপসংস্কৃতির। জনগণ যোগ্য বিকল্প খুঁজে না পাওয়ায় বারবার দুদলের মধ্যে ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটাতে বাধ্য হয়েছে। এরূপ শক্তিশালী বিরোধী দলের অভাব ও যোগ্য রাজনৈতিক দলের শূন্যতা বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় প্রতিবন্ধকতাস্বরূপ।

৮. **স্থানীয় সরকার কাঠামোর দুর্বলতা :** একটি শক্তিশালী, কার্যকর, দক্ষ, স্বায়ত্তশাসিত, জনপ্রতিনিধিত্বশীল স্থানীয় সরকার সুশাসনের অন্যতম শর্ত। যে দেশে স্থানীয় সরকার কাঠামো যত শক্তিশালী ও জনপ্রতিনিধিত্বশীল, সে দেশে গণতন্ত্র ততটাই বিকশিত। অথচ বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার সময়ের বিবর্তনের সাথে সাথে নানারূপ পরিগ্রহ করলেও কোনো পদ্ধতি কাঙ্ক্ষিত প্রত্যাশা পূরণে সক্ষম হয়নি। এর মূলে রয়েছে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার দুর্বলতা যেমন– অবকাঠামোগত পশ্চাৎপদতা, স্থানীয় প্রতিনিধি নির্বাচনে উত্তরাধিকার নীতি, পেশীশক্তির ব্যবহার, কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর নির্ভরশীলতা, স্থানীয় পরিকল্পনার অভাব, আর্থিক দুর্বলতা প্রভৃতি। গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হলে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় স্থানীয় সরকারের দুর্বলতা রোধ ছাড়া সম্ভব নয়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৯. **আমলাতান্ত্রিক জটিলতা :** বাংলাদেশের রাজনৈতিক দুর্বলতার সুযোগে আমলারাও কর্তৃত্বপরায়ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। নিয়মের বাহুল্য দেখিয়ে অনেক জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে আমলারা বিলম্ব করে। সামান্যতম বিষয়ও ফাইল ও নোটে লিপিবদ্ধ করা হয়। সকল বিষয়ে নির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। কখনো কখনো ফাইলের দীর্ঘ বৃত্তাকার পথ সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই সিদ্ধান্তের গুরুত্ব শেষ হয়ে যায়। আনুষ্ঠানিকতা ও নিয়ম-কানুনের কারণে জনগণের উপকার না হয়ে ক্ষতি সাধিত হয়। অফিস ফাইলের লাল ফিতার দৌরাত্ম্যে প্রকৃত জনকল্যাণ এক অফিস থেকে অন্য অফিসে এবং একই ঘরের এক টেবিল থেকে অন্য টেবিলে ঘুরপাক খেতে থাকে। আমলাতন্ত্র একটি অপ্রতিবেদনশীল সংগঠন হওয়ার কারণে সমাজের পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও মূল্যবোধের সাথে সঙ্গতি রক্ষা করতে পারে না। সুযোগ-সুবিধা, আচার-ব্যবহার ও মর্যাদাগত দিক থেকে আমলাগণ নিজেদেরকে সমাজের অন্যান্য লোক থেকে আলাদা শিক্ষিত ও উন্নত শ্রেণী বলে মনে করেন এবং ঔপনিবেশিক মানসিকতা পোষণ করে নিজেদেরকে জনগণের সেবকের পরিবর্তে প্রভু বলে মনে করেন। তাদের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা না থাকার কারণে ক্ষমতার অপব্যবহার করে অনবরত স্বেচ্ছাচারিতা কায়েম করে। এরূপ আমলাতান্ত্রিক জটিলতা সুশাসনের পথে অন্তরায়স্বরূপ।

১০. **আইন-শৃঙ্খলার অবনতি :** সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আইন-শৃঙ্খলার স্থিতিশীলতা একান্ত জরুরি। কিন্তু বাংলাদেশে দিন দিন আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটছে। আর এ অবনতি ঘটছে রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় কখনো প্রত্যক্ষ আবার কখনো পরোক্ষভাবে। অথবা বেকারত্ব, হতাশা, সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয়, মাদকের বিস্তার প্রভৃতির কারণে। সরকারি দলের সংগঠনগুলো টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজিতে ব্যস্ত। বিরোধী দলের সংগঠনগুলোর অনুসারীদের ভীতসন্ত্রস্ত করছে নানাভাবে। নির্বাচনে জয়ের পর এক ভীতি ও অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে তোলে জয়ী দল। আর বিরোধী দল বারবার বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে অভিযোগ তোলে। প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন, যারা অপকর্মের সাথে জড়িত তারা যে দলেরই হোক না কেন তাদেরকে আইনের সম্মুখীন হতে হবে। তারপরও বিশৃঙ্খলার সুরাহা হয় না। সৃষ্টি হয় জেএমবি, বাংলা ভাই, শায়েখ আবদুর রহমান। তাণ্ডব চলে মধ্যযুগীয় কায়দায়, যেন এসব প্রশাসনের অগোচরে। প্রশাসন দেখেও না দেখার ভান ধরে। ছিনতাই, হত্যা, রাহাজানি, ধর্ষণ, নারী নির্যাতন, বোমা বিস্ফোরণ বাংলাদেশের নিত্যকার ঘটনায় পরিণত হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির এরূপ অবনতি বিদেশী বিনিয়োগকে ব্যাহত করছে, উন্নয়ন স্থবির করে দিচ্ছে। যা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বাধাস্বরূপ।

পরিশেষ : সুশাসন কোনো ছেলের হাতের মোয়া নয় যে ইচ্ছে করলেই তা প্রতিষ্ঠা করা যায়। সুশাসন প্রতিষ্ঠা একটি দীর্ঘ প্রচেষ্টা ও চর্চার ফসল। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়া অর্জনে দরকার ব্যাপক ত্যাগ, তিতিক্ষা, সহনশীলতা, সহিষ্ণুতা, ধৈর্য, দক্ষতা, সমঝোতা, ঐকমত্য, পরিপক্বতা। এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল একটি জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংকল্প নিয়ে। কিন্তু নানা কারণে তা ব্যর্থ হয়েছে। স্বাধীনতার চেতনাকে সমুন্নত করতে প্রয়োজন দল-মত নির্বিশেষে একত্রিত হয়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করে বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশকে উন্নত রাষ্ট্রের সারিতে দাঁড় করানো। তবেই সার্থক হবে স্বাধীনতা প্রাপ্তির মূল্য।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

০৬। বাংলাদেশে কর্মরত একটি এনজিও'র সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মসূচি পর্যালোচনা করুন।
***অথবা,* আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে 'ব্র্যাক'-এর ভূমিকা পর্যালোচনা করুন।**

উত্তর : আমাদের দেশে যেসব বেসরকারি সংস্থা আর্থ-সামাজিক, বিশেষ করে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে তৎপর ভূমিকা পালন করছে তার মধ্যে ব্র্যাক (BRAC) অন্যতম। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিপর্যয়মূলক পরিস্থিতির মোকাবিলা ও আর্ত-মানবতার সেবার মহান ব্রত নিয়ে যেসব স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এই বাংলাদেশে গড়ে উঠেছে তার মধ্যে সবচেয়ে বৃহৎ ও প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান (এনজিও) হচ্ছে এই ব্র্যাক। এর প্রতিষ্ঠাতা ফজলে হাসান আবেদ। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে বিধ্বস্ত সাল্লা নামক স্থানে ত্রাণ ও পুনর্বাসনমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে ব্র্যাকের অগ্রযাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে এটা বিশাল এলাকাব্যাপী ব্যাপক কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে। বিশাল জনগোষ্ঠীর মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে আত্মোন্নয়ন করা এর প্রধান উদ্দেশ্য।

ব্র্যাকের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য : গ্রামীণ দারিদ্র্য দূরীকরণ ও শ্রমজীবী মানুষের ভাগ্যের উন্নয়ন সাধন করাই ব্র্যাকের প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মৌল প্রয়োজন, চাহিদা, সম্পদ ও পরিবর্তিত অবস্থার সাথে সঙ্গতি বিধানের প্রতি লক্ষ্য রেখে ব্র্যাকের বহুমুখী ও প্রগতিশীল কতিপয় উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। ব্র্যাকের গতিশীল ও বহুমুখী উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যগুলো নিম্নরূপ :

১. গ্রামীণ দরিদ্র, দুঃস্থ, অসহায় ও নির্ভরশীল জনগণকে Target group হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের মাঝে সচেতনতাবোধ জাগ্রত করা, যাতে তারা ব্র্যাকের সাহায্য ও সহযোগিতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোগ করতে পারে।
২. লক্ষ্যদল (Target group) যাতে নিজেরাই নিজস্ব সম্পদ ও সামর্থ্যের দ্বারা আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারে তার জন্য সর্বাত্মক সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করা।
৩. লক্ষ্যদলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে নিয়ে কার্যক্রম সংগঠন গড়ে তোলার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত পরিবর্তন ও বিবর্তন আনয়নে সহায়তা করা।
৪. সহজ শর্তে ঋণ বিতরণের মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান ও উপার্জনের বাঞ্ছিত সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা।
৫. সমাজ থেকে নিরক্ষরতার মূলোৎপাটনের লক্ষ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণ কার্যক্রম চালু ও বাস্তবায়ন করা।
৬. স্বাস্থ্যবিধির ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে জনগণের মাঝে স্বাস্থ্য সচেতনতাবোধ জাগ্রত করা।
৭. ব্র্যাকের লক্ষ্যদলের দরিদ্রদের ব্যবস্থাপনা, দক্ষতা এবং নেতৃত্বের বিকাশ সাধনের জন্য বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
৮. উদ্ভূত সমস্যা, গৃহীত কার্যক্রমের যথার্থতা যাচাই, কার্যক্রমের সার্বিক মূল্যায়ন প্রভৃতির লক্ষ্যে ধারাবাহিক গবেষণা কার্যক্রম চালু করা।
৯. গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে এমনভাবে স্বনির্ভর করে গড়ে তুলতে হবে, যাতে তাদের নির্যাতন ও শোষণ প্রতিরোধকল্পে নিজেরাই বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে পারে।
১০. লক্ষ্যদলের মাঝে উদার ও আন্তরিক মন-মানসিকতা গড়ে তোলা, যাতে তারা সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলার পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

বিশেষ উদ্দেশ্য

১. গ্রামীণ দরিদ্র শ্রেণীকে প্রয়োজন ও সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা।
২. গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর অবস্থার পরিবর্তনকল্পে সংস্থানমূলক প্রকল্প নির্বাচন, নকশা প্রণয়ন এবং বাস্তবতা প্রয়োগে সহায়তা করা।
৩. উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণকারীদের উৎপাদনে সহায়তা করা।
৪. প্রকল্প বাস্তবায়নে সামর্থ্য অর্জনে প্রাতিষ্ঠানিক (Capacity building and institutional development) সহায়তা প্রদান করা।

ব্র্যাকের উপরোক্ত উদ্দেশ্যাবলীর আলোচনার মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে যে, গ্রামীণ দারিদ্র্য, জনগণের বঞ্চনা, নির্যাতন ও শোষণের অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে ব্র্যাকের ব্যাপকভিত্তিক কার্যক্রম রয়েছে। এসব উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়নের মাধ্যমেই ব্র্যাকের কার্যক্রমের সফলতা নির্ভর করে।

ব্র্যাকের বর্তমান কর্মসূচি : ব্র্যাকের মহৎ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য একে বহুমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হয়। ব্র্যাকের সাধারণ কার্যক্রমগুলোকে প্রধান চারটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন— ১. পল্লী উন্নয়নমূলক কার্যক্রম, ২. শিক্ষামূলক কার্যক্রম, ৩. স্বাস্থ্যবিষয়ক কার্যক্রম এবং ৪. সমর্থনমূলক ও অন্যান্য বহুমুখী কার্যক্রম। নিচে ব্র্যাকের সাধারণ ও বহুমুখী কার্যক্রমগুলো আলোচনা করে দেখানো হলো :

১. **পল্লী উন্নয়নমূলক কার্যক্রম :** গ্রামীণ ভূমিহীন, দুঃস্থ, দরিদ্র ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত করে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। ব্র্যাকের প্রশাসনিক কাঠামোর সর্বনিম্নস্তরের কর্মীদের (Grass roots worker) অভিজ্ঞতার আলোকে এ কার্যক্রমের কর্মকৌশল নির্ধারণ করা হয়। ব্র্যাকের পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম সাতটি অঞ্চলে বিভক্ত। ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত সংস্থাটির মোট ঋণ বিতরণের পরিমাণ ৮১,৬১০.৪৯ কোটি টাকা। বিতরিত ঋণের সুবিধা ভোগীর সংখ্যা ৫৬,৪০,৬৮৪ জন। যার মধ্যে মহিলা সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৫০,৭৪,১৮১ জন। একজন এরিয়া ম্যানেজার ও একজন সংগঠক পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের সার্বিক দায়িত্ব পালন করছেন। ব্র্যাক পল্লী উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের আওতায় দরিদ্রদের দলীয় ভিত্তিতে ঋণদান করে থাকে।

ব্র্যাকের পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম দুটি ধারায় সম্পন্ন হয়। যেমন—Rural Development Programme (RDP) এবং Rural Credit Project (RCP)-এর মাধ্যমে। এ দুটি কর্মসূচি একটি অপরটির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য দূরীকরণ, মৌলিক চাহিদা পূরণ, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করা হয়।

নিম্নলিখিত কর্মসূচির মাধ্যমে RDP এবং RCP আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়তা করে :

ক. **সেচ (Irrigation) :** এক্ষেত্রে RDP এবং RCP দুই প্রকারের ঋণ প্রদান করে; যথা : ক. টিউবওয়েল ক্রয়ের জন্য Capital loan এবং খ. জ্বালানি ও মজুরি পরিশোধের জন্য Operating loan।
খ. **রেশম (Sericulture) :** রেশম শিল্পের উন্নয়নের জন্য ব্র্যাক ঋণ প্রদান করে থাকে।
গ. **সামাজিক বনায়ন (Social Foresty) :** এক্ষেত্রে নার্সারি কর্মীদের প্রশিক্ষণ এবং বীজ প্রদান করে উন্নত বনায়ন সৃষ্টির ব্যবস্থা করে। একজন নার্সারি কর্মী এর মাধ্যমে বাৎসরিক সর্বোচ্চ ৬,০৩৬ টাকা আয় করে।
ঘ. **মৎস্য চাষ (Fishery or Pisciculture) :** এক্ষেত্রে মানিকগঞ্জ, জামালপুর ও সাল্লা নামক স্থানে ১৬টি পুকুরের সমন্বয়ে ১ হাজার একর জমিতে সমন্বিত মৎস্য চাষ করা হয়েছে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

ঙ. **পশুপালন ও হাঁস-মুরগী খামার (Livestock and Poultry) :** পশুপালন শিক্ষা, টিকাদান, উন্নতজাতের পশু সৃষ্টি, হাঁস-মুরগি পালন ইত্যাদি এর আওতাভুক্ত।

চ. **গ্রামীণ লেনদেন (Rural Trading) :** এটা ব্র্যাকের ঋণ প্রদানের বৃহত্তম খাত। এক্ষেত্রে ১,০২৫ মিলিয়ন টাকা প্রদান করা হয়।

ছ. **গ্রামীণ পরিবহন (Rural Transport) :** ব্র্যাক রিকশা, নৌকা, ঠেলাগাড়ি, ভ্যান ইত্যাদি ১৬টি ক্ষেত্রে ২৪,৩৬৪টি যানবাহন প্রদান করে এবং ৮৭ মিলিয়ন টাকা প্রদান করে। এর মধ্যে রয়েছে ৬৬% মহিলা।

জ. **পশম শিল্প (Cottage Industries) :** রাইস মিল, হ্যান্ডলুম, বরফ কল, ইটের ভাটা, বাঁশ এবং বেত শিল্প প্রভৃতি ৬৬টি ক্ষেত্রে ৯২ মিলিয়ন টাকা প্রদান করা হয়েছিল।

ঝ. **খাদ্য ও গুদাম (Food Processing) :** ধানের খোসা, কলাই এবং তেলবীজ fried and puffed rice, data juice, chick and cattle feed ইত্যাদি ক্ষেত্রে ৩৪৬ মিলিয়ন টাকা প্রদান করা হয়। এটা প্রধানত মহিলাদের জন্য।

২. **শিক্ষামূলক কার্যক্রম :** ব্র্যাকের মৌলিক কার্যক্রমের অন্যতম কর্মসূচি হচ্ছে শিক্ষামূলক কার্যক্রম। ব্র্যাকের শিক্ষা কার্যক্রমের দুটি বিশেষ দিক রয়েছে। যেমন– ক. উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা, যা বিশেষ করে গ্রামীণ দরিদ্র পরিবারের শিশুদের শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করে। এ শিক্ষা বিশেষ করে মেয়েদের শিক্ষিত করে তোলার ওপর বেশি জোর দিয়ে থাকে। খ. ব্যবহারিক শিক্ষা, মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশেষভাবে পরিচালিত বয়স্কদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দান, নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও সামাজিক সচেতনতা অর্জন এর মূল লক্ষ্য। এ প্রকল্পের আওতায় শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ মেয়েদের শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়েছে। বর্তমানে ৩০ হাজার ৫০০ উপানুষ্ঠানিক স্কুলে ৯ লাখ ১৫ হাজার দরিদ্র পরিবারের শিশু শিক্ষা লাভ করছে।

ব্র্যাক মনে করে, শিক্ষার মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সামাজিক সচেতন করা এবং সাংস্কৃতিক মান বৃদ্ধির মাধ্যমে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন সম্বন্ধে ধারণা দেয়াই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। দু'ধরনের পদ্ধতির মাধ্যমে এই কর্মসূচি পরিচালনা করা হয়ে থাকে। যথা :

ক. **অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা (Informal Education) :** যেসব শিশুরা স্কুল ত্যাগ করেছে এবং যারা স্কুলে একেবারেই যায় না, তাদেরকে অক্ষরজ্ঞান দানের জন্যই তারা স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছে। শিক্ষক এবং শিশুদের মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হয়। এর সাথে সাথে তাদেরকে স্বাস্থ্য, টিকা, পুষ্টি এবং সামাজিক সচেতনতা সম্পর্কে জ্ঞান দান করে থাকে।

খ. **প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা (Functional Education) :** এক্ষেত্রে 'Paulo Frive'-এর মনো-সামাজিক পদ্ধতির অনুসরণে ব্র্যাক এই কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে তাদের সমস্যা চিহ্নিতকরণ, সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কে শিক্ষাদানের সাথে সাথে বাস্তবধর্মী সচেতনতা সৃষ্টি এবং আত্মনির্ভরশীল হওয়ার শিক্ষাদান করা।

৩. **স্বাস্থ্যবিষয়ক কার্যক্রম :** ব্র্যাকের স্বাস্থ্যবিষয়ক কার্যক্রমও এর মৌলিক ও সাধারণ কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। এ কার্যক্রমের আওতায় রয়েছে খাবার স্যালাইন সম্প্রসারণ কর্মসূচি (Oral therapy Extension Programme)। এ কর্মসূচির মাধ্যমে স্যালাইন তৈরির বিশেষ প্রশিক্ষণও দেয়া হয়। দেশের প্রায় ১ কোটি ২০ লাখ পরিবার এ কর্মসূচির আওতায় রয়েছে। শিশুস্বাস্থ্য ও মাতৃমঙ্গল কর্মসূচি, যার আওতায় রয়েছে টীকাদান, ভিটামিন 'এ' বিতরণ, স্যালাইন তৈরি প্রশিক্ষণ এবং বিতরণ। স্বাস্থ্য কার্যক্রম তিনভাগে বিভক্ত। যেমন–

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

ক. ডায়রিয়া প্রতিষেধক কর্মসূচি : ১৯৭৯ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত প্রায় ২ কোটি পরিবারের কমপক্ষে ১ জন করে মহিলাকে সহজ উপায়ে ডায়রিয়া নিরাময় ও প্রতিকার ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

খ. **প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা :** এক্ষেত্রে টিকাদান, পুষ্টি শিক্ষা, ধাত্রী প্রশিক্ষণ, নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, পরিবার পরিকল্পনা এবং সামাজিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

গ. **মহিলা স্বাস্থ্য উন্নয়ন :** এর মূল কথা, স্বাস্থ্য মায়ের জন্য এবং মায়ের দ্বারা। বগুড়া, দিনাজপুর এবং ময়মনসিংহে Comprehensive Health and Development Programme (CHDP)-এর মাধ্যমে ১৬,৯৪,৯৬০ জনকে এর আওতায় আনা হয়েছে। শিশুদের ক্ষেত্রে OTEP-এর অভিজ্ঞতার আলোকে Child Survival Program (CSP) গ্রহণ করা হয়।

৪. **ব্র্যাক ব্যাংক প্রকল্প :** গ্রামীণ ভূমিহীন, দুস্থ, দরিদ্র শ্রেণীকে প্রাতিষ্ঠানিক সেবার আওতায় ব্র্যাক ব্যাংক প্রকল্প স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান করে থাকে। লক্ষ্যদলের মূলধন সমস্যার সমাধানকল্পে ১৯৯০ সালের জানুয়ারি মাসে ব্র্যাক ব্যাংক প্রকল্প চালু করে। এটা অনেকটা গ্রামীণ ব্যাংকের অনুসরণে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।

৫. **দুস্থ মহিলাদের আয় উপার্জনকারী কার্যক্রম :** বাংলাদেশ সরকারের ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির (WFP) সহায়তায় পরিচালিত দুস্থ মহিলাদের খাদ্য বিতরণ কর্মসূচির অধীনে সাহায্যপ্রাপ্তদের সহায়তাদানের লক্ষ্যে এ কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। WFP-এর খাদ্য বিতরণ কর্মসূচির কার্ডধারী মাতাদের সাহায্যার্থে ১৯৮৫ সালে এই কর্মসূচি চালু করা হয়। এ কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্যই হচ্ছে প্রশিক্ষণদানের মাধ্যমে কার্ডধারী মহিলাদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দান করা, যাতে তারা স্বনির্ভরতা অর্জনের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হতে পারে।

৬. **হস্তশিল্প উন্নয়ন ও বাজারজাতকরণ কার্যক্রম :** কুটির শিল্পের উন্নয়ন, হস্তশিল্পের বিকাশ এবং উৎপাদিত কুটির শিল্পপণ্যের যথাযথ বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে ব্র্যাকের এ কার্যক্রমের আওতায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৫টি বিক্রয় কেন্দ্র এবং ঢাকায় একটি রপ্তানি কেন্দ্র রয়েছে। বিক্রয় কেন্দ্রগুলো আড়ং নামে পরিচিত। এজন্য আড়ং ব্র্যাকের অন্যতম আলোচিত বিষয়, যা গ্রামীণ মহিলাদের হস্তজাত দ্রব্যাদি, তাঁত শিল্পে উৎপাদিত দ্রব্যাদি বাজারজাতকরণের একটি অন্যতম সংস্থা। ঢাকায় ৩টি, সিলেট ও চট্টগ্রামে ১টি করে মোট ৫টি বিক্রয় কেন্দ্র রয়েছে। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন বড় বড় শহরে এমনকি লন্ডনেও এর শাখা রয়েছে।

৭. **সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম :** গ্রামীণ ভূমিহীন মহিলা ও পুরুষদের সংগঠিত সমবায়ের মাধ্যমে তাদের সার্বিক উন্নয়ন প্রচেষ্টা চালানোর লক্ষ্যে ব্র্যাকের সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এর প্রায় চারটি সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি রয়েছে।

৮. **সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম :** পল্লী উন্নয়নে নিয়োজিত ব্র্যাক কর্মীদের প্রশিক্ষণ দান ও মানবসম্পদের উন্নয়নের লক্ষ্যে এই কার্যক্রম গৃহীত হয়। ব্র্যাক এ ধরনের ৬টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করে মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। পেশাগত দক্ষতা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন ব্র্যাক প্রশিক্ষণের মানবসম্পদ উন্নয়ন (Occupational Development & Human Development)-এর বিশেষ দুটি দিক।

৯. **আইনগত সেবা প্রদান কার্যক্রম :** বাংলাদেশের অধিকাংশ গ্রামীণ মহিলা ও দরিদ্র মানুষ অজ্ঞ, অশিক্ষিত ও অসচেতন। অথচ মহিলা, শিশু ও দরিদ্র কৃষকদের জন্য অনেক ভালো ভালো আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। ব্র্যাক তার আইনগত সেবা প্রদান কার্যক্রমের মাধ্যমে এসব গ্রামীণ অজ্ঞ ও অসচেতন দরিদ্র জনগণকে তাদের আইনগত অধিকার আদায়ে বিশেষভাবে সহায়তা করে যাচ্ছে। গ্রামীণ দরিদ্র লক্ষ্যদলকে আইনগত সেবা প্রদানের মাধ্যমে তাদের অধিকার সচেতন করে তোলাই এ কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

১০. **হাওর উন্নয়ন প্রকল্প :** বাংলাদেশের হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জের হাওর এলাকার ভূমিহীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য ব্র্যাক তার প্রকল্পের মাধ্যমে বিশেষভাবে সহযোগিতা করে যাচ্ছে। উক্ত এলাকার লক্ষ্যদলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়তা করাই ব্র্যাকের এ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য।

১১. **পল্লী উদ্যোগ প্রকল্প :** গ্রামীণ ভূমিহীনদের বাঞ্ছিত ও উন্নত কাজের সন্ধান, ব্যবস্থাপনার দক্ষতা উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানোর লক্ষ্যে ব্র্যাক এ প্রকল্প চালু করেছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের গ্রামীণ দরিদ্রদের এক বিরাট অংশ উপকৃত হবে বলে আশা করা যায়।

১২. **গবেষণা ও মূল্যায়ন কার্যক্রম :** ব্র্যাকের কার্যক্রমের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, সংস্কার ও নতুন কার্যক্রম গ্রহণ ও সার্বিক মূল্যায়নের জন্য এর নিজস্ব গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ রয়েছে। উক্ত বিভাগের মাধ্যমে পল্লী উন্নয়নের নতুন নতুন কৌশল উদ্ভাবন, নিজস্ব কর্মসূচির মূল্যায়ন ও অন্যান্য এনজিওর কর্মসূচির যথার্থতা নিরূপণের জন্য নিয়মিত ও ধারাবাহিক গবেষণা পরিচালনা করা হয়। এছাড়া ব্র্যাকের নিজস্ব প্রিন্টার্স ও হিমাগার রয়েছে। এর মাসিক 'গণকেন্দ্র' পত্রিকা ব্র্যাকের মুখপাত্র হিসেবে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।

উপসংহার : ব্র্যাকের উপরিউক্ত সাধারণ ও বহুমুখী কার্যক্রমের আলোচনার মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে যে, এর কার্যক্রমগুলো বেশ গতিশীল ও বাস্তবসম্মত। উপরিউক্ত প্রধান কার্যক্রম ছাড়া ব্র্যাক আরো কতিপয় অনুষঙ্গী কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে।

০৭। 'এনজিওরা দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন নয়, জনগণকে বাঁচিয়ে রেখে শোষণ করে'– এ বক্তব্যের আলোকে এনজিওদের উন্নয়ন কার্যক্রম মূল্যায়ন করুন।

উত্তর : গ্রামীণ উন্নয়নে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। তবে বাংলাদেশের এনজিও কার্যক্রম খুব বেশি দিনের নয়। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর এনজিওগুলো তাদের কার্যক্রমের সূচনা ঘটায়। নব্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত যুদ্ধবিধ্বস্ত, ক্ষত-বিক্ষত একটি দরিদ্র দেশের নতুন সরকারের একার পক্ষে এক সাথে এত জনগোষ্ঠীর সাহায্য ও পুনর্বাসন করা ছিল দুরূহ ও অসম্ভব ব্যাপার। এ সময়ে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে এগিয়ে আসে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা। বর্তমানে এনজিও কৃষি, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প, ঋণ ও সঞ্চয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, মাতৃমঙ্গল ও শিশু পরিচর্যা, স্যানিটেশন, বনায়ন এবং আরও অনেক সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাজে নিজেদের সম্পৃক্ত করেছে। তবে তাদের বাণিজ্যিক মনোভাব এবং দরিদ্রের নামে মুনাফা লাভের মানসিকতা এনজিওগুলোর ভূমিকাকে বিতর্কিত করে তুলেছে।

বাংলাদেশে এনজিওর ভূমিকা : বাংলাদেশে কর্মরত এনজিওগুলো গ্রামীণ অর্থনীতি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এ দেশের বিপুল জনগোষ্ঠী ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও বেকারত্বের শিকার। কঠোর পরিশ্রম করেও দরিদ্র মানুষ জীবনের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতে অক্ষম। ফলে ক্ষুধা, দারিদ্র্য আর অপুষ্টি তাদের নিত্যসঙ্গী। এসব সংস্থায় কর্মরত আছে বাংলাদেশের লক্ষাধিক জনশক্তি। সুতরাং দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে এনজিওগুলো বৃহত্তর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তবে তারা অসহায় ও দরিদ্র লোকদের বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত করে বিভিন্নভাবে তাদের শোষণ করে চলেছে। এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া। প্রাথমিকভাবে এনজিওগুলোর নেতিবাচক দিক চোখে পড়ে না। তবে দীর্ঘদিন তাদের গ্রাহকদের মাঝ থেকে স্বার্থ উদ্ধারের চেষ্টা করে। ফলে দরিদ্র ও অসহায় মানুষগুলো আরও নিঃস্ব হয়ে পড়ে।

এনজিও'র কার্যক্রমের কুফল : আমাদের দেশের কেন্দ্র থেকে প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত সর্বত্র এনজিও'র এক বিরাট নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছে। এ নেটওয়ার্ক দিনদিন শক্তিশালী হচ্ছে। বাণিজ্য করতে আসা ব্রিটিশ

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

বেনিয়াগোষ্ঠীর মতো সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব কিছু কিছু এনজিও'র কার্যকলাপে ইতোমধ্যেই লক্ষ্য করা গেছে। এরা দেশের রাজনীতিতেও হস্তক্ষেপ করছে, যা দেশের জন্য মোটেও কল্যাণকর নয়। এছাড়া জনসাধারণের দারিদ্র্য, অসহায়ত্ব ও সরলতার সুযোগ নিয়ে বিদেশী এনজিওগুলো তাদের মধ্যে বিজাতীয় শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ধ্যান-ধারণার অনুপ্রবেশ ঘটাচ্ছে এবং প্রভুত্ব বিস্তারের চেষ্টা চালাচ্ছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। অনেক এনজিও জনসেবার নামে মানুষকে ধর্মান্তরিত করছে এবং ইসলামী সংস্কৃতি ও মূল্যবোধকে ধ্বংস করছে বলেও অভিযোগ রয়েছে। এনজিওগুলোর কার্যক্রম এবং এর দীর্ঘমেয়াদি কুফল তুলে ধরা হলো :

১. **ঋণ ও সঞ্চয় :** এনজিওসমূহ গ্রামীণ এলাকার লোকজনের মধ্যে ঋণ প্রদান করে এবং সঞ্চয়ে উৎসাহিত করে। এনজিওগুলো প্রথমে গ্রামের ভূমিহীন ও শ্রমজীবীদের নিয়ে সমিতি গঠন করে। সমিতির সদস্যগণ নিজেরা মাসিক ও সাপ্তাহিক সভা করে সিদ্ধান্ত নেয়। সমিতির সদস্যগণ সমিতির মাধ্যমে এনজিওর কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করে এবং ঋণের টাকা দিয়ে তারা ধান কিনে, গরু কিনে নিজেরা স্বাবলম্বী হতে চেষ্টা করে। কিন্তু এনজিওগুলো যে ঋণ প্রদান করে তা একটি নিয়মিত কিস্তির মাধ্যমে পরিশোধ করতে হয়। প্রতি সপ্তাহে একবার করে কিস্তি দিতে হয় এবং এই কিস্তির টাকাও নেহায়েত কম নয়। তাছাড়া তাদের দেয়া ঋণের সুদ বাড়তেই থাকে। ফলে একবার যে ঋণ নেয় তার পক্ষে কিস্তির মাধ্যমে সে ঋণ শোধ করা আর সম্ভব হয়ে ওঠে না। ফলে দীর্ঘদিন এই ঋণের সুদ টানতে হয়।

২. **শিক্ষা :** শিক্ষা এনজিওদের কার্যক্রমের একটি দিক। শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো গরিব ঘরের ছেলেমেয়েরা এই অধিকার থেকে বঞ্চিত। শিক্ষার সুযোগ যদি দরিদ্রদের দোর গোড়ায় পৌঁছে দেয়া যায় তবে দরিদ্ররাও শিক্ষার প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহী হবে। 'সবার জন্য শিক্ষা' বাস্তবায়ন সরকারের একার পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ বাংলাদেশের বিশাল ছাত্রছাত্রীদের তুলনায় স্কুল ও শিক্ষক এবং শিক্ষার সরঞ্জাম খুবই নগণ্য। তাছাড়া ঝরে পড়া শিক্ষার্থীরা সরকারের 'সবার জন্য শিক্ষা' কার্যক্রমের আওতায় খুব একটা আসছে না। সরকারের এ সীমাবদ্ধতার সুযোগ এনজিওগুলো গ্রহণ করে বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার কাছ থেকে উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের নামে কোটি কোটি ডলার নিয়ে আসছে। এর সিংহভাগ ব্যয় করে তাদের নিজেদের জন্য। গ্রামের হত দরিদ্র ছেলেমেয়ের শিক্ষার জন্য তারা খুব সামান্য পরিমাণে ব্যয় করে।

৩. **গৃহায়ন :** বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে গ্রাম-বাংলার মানুষ প্রায়শই গৃহহীন হয়ে পড়ে। এছাড়া গ্রামে এমন দরিদ্র ও অসহায় মানুষও আছে যাদের গৃহ নির্মাণের সামর্থ্য নেই। এই দরিদ্র ও অসহায় মানুষের মাঝে গৃহ নির্মাণের জন্য এনজিওগুলো ঋণ প্রদান করে। তারা সুনির্দিষ্ট মডেলের ভিত্তিতে গৃহ, গৃহ নির্মাণ সামগ্রী ও কারগরি সহায়তা প্রদানের নামে গ্রামের দরিদ্র ও অসহায় লোকদের ব্যাপক ক্ষতি করে। ঋণের টাকা না দিতে পারলে এরা গোয়ালের গরু নিয়ে যায়। আবার কখনও কখনও ঘরের টিনও খুলে নিয়ে যায়। অনেকে তাদের ঋণ থেকে মুক্তি পেতে যে পাঁচ-দশ কাঠা জমি থাকে তা বিক্রি করে দিয়ে একেবারে নিঃস্ব হয়ে যায়। তাছাড়া এনজিওগুলো উপকূলীয় এলাকায় জরুরি আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণের বরাদ্দের সিংহভাগই গলধকরণ করে থাকে।

৪. **দারিদ্র্য বিমোচন :** দরিদ্র জনগণ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকিং খাত থেকে ঋণ পায় না। কারণ তারা জামানতের নিশ্চয়তা প্রদান করতে পারে না। এই সুযোগে এনজিওগুলো প্রথমে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান করে। কিন্তু দরিদ্র মানুষ তাদের ঋণ নিয়ে একবারে পরিশোধ করতে পারে না। ফলে তারা এনজিওগুলোর চক্রবৃদ্ধি সুদের খপ্পরে পড়ে। এটা এমন একটা চক্র, একবার দরিদ্র জনগণ এর মধ্যে ঢুকলে আর বেরুতে পারে না। কেননা দরিদ্র জনগণ একবারে তাদের ঋণ পরিশোধ করতে পারে না। বিভিন্ন সময়ে কিস্তির মাধ্যমে প্রদান করে। কিন্তু তাদের ঋণ আর শোধ হয় না। তাই এনজিওগুলো দারিদ্র্য বিমোচনের নামে দারিদ্র্য পুনরুৎপাদন করছে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৫. **নারী উন্নয়ন :** বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। নারীকে বাদ দিয়ে ব্যাপক উন্নয়ন সম্ভব নয়। উপরন্তু নারী বঞ্চিত হলে উন্নয়নের ধাপকে পিছন দিকে নিয়ে যায়। এনজিওগুলোর নারী উন্নয়নের কাজের ফলে বাংলাদেশের বঞ্চিত, অবহেলিত নারী সমাজ সংগঠিত হতে শিখেছে। নারীরা কাজ পেয়েছে, শিক্ষা পেয়েছে, নিজেদের কথা বলতে শিখেছে এ কথা সত্য। তবে তারা গ্রামের অসহায় নারীদের মাঝে ভ্রান্ত চিন্তা চেতনায় উদ্বুদ্ধ করছে। ফলে পারিবারিক সুখ-শান্তি যেমন তিরোহিত হচ্ছে তেমনি জাতীয় অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে। নারী মুক্তির নামে তারা গ্রামের সহজ-সরল নারীদের ভ্রান্ত পথে চালিত করে নিজেদের ফায়দা লুটার চেষ্টা করছে। নারীদের ঘরের বাইরে বের করার অজুহাতে তারা নারীদের এমন সব কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে ফেলছে যা দেশ ও জাতির সামগ্রিক উন্নয়নের অন্তরায়।

এনজিও কার্যক্রমের ত্রুটিসমূহ : বাংলাদেশে কর্মরত দেশী-বিদেশী যেসব এনজিও কর্মরত আছে তাদের কার্যক্রমের মাঝে কিছু ত্রুটি লক্ষণীয় যার ফলে এনজিওগুলো জাতীয় পর্যায়ে সুফলের চেয়ে কুফলই বেশি বয়ে আনছে। এনজিও কার্যক্রমের ত্রুটিসমূহ নিম্নরূপ —

১. অনেক অর্থনীতিবিদের মতে, এনজিওগুলোর কার্যক্রম বিশেষত ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের ফলে উৎপাদন যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি সরকারি লোকসান অনেক বেড়ে গেছে।
২. এনজিওগুলো যে ঋণ প্রদান করে তার পরিমাণ খুবই কম। ফলে এর মাধ্যমে উপার্জনে সক্ষম এমন খাতের সৃষ্টি করা সম্ভব হয় না।
৩. সরকারি প্রশাসন ও এনজিও কর্তৃপক্ষের মধ্যে যথাযথ সমন্বয়ের অভাব রয়েছে।
৪. এনজিও কার্যক্রমে শুধু গ্রামের দরিদ্র লোকদের সম্পৃক্ত করা হয়। কিন্তু ধনী কৃষকদেরও এতে সম্পৃক্ত করতে পারলে সুদূরপ্রসারী ফলাফল আসবে।
৫. অনেক ক্ষেত্রেই এনজিওগুলো দেশের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে হস্তক্ষেপ করে।

উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কার্যক্রমের তুলনামূলক আলোচনা : সরকারি ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার কার্যক্রমের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কিনা অথবা উভয়ের লক্ষ্য কি একই এই নিয়ে বেশ আলোচনা ও সমালোচনা রয়েছে। সরকারি সংস্থার মূল লক্ষ্য হলো জনগণের সেবা করা এবং এই সেবার মাধ্যমে জনগণকে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে সম্পৃক্ত করা। আর এনজিওদের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে মুনাফা লাভ। সমাজসেবার নামে এনজিওগুলো কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করে। গ্রামের দরিদ্র জনগণের জন্য তারা যে অনুদান পায় তা তাদের কর্মচারীদের বেতন এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজে বেশি ব্যয় করে। বেসরকারি সাহায্য সংস্থা যদিও উন্নয়নে অবদান রাখছে তথাপি এসব সংস্থা তাদের স্বার্থ সম্পর্কে সজাগ হয়েই তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এছাড়া এসব সংস্থা বিদেশী সাহায্যে পরিচালিত বিধায় বিদেশীদের নির্দেশ মোতাবেক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে। ফলে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।

উপসংহার : এনজিও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা পালন করলেও এর সুদূরপ্রসারী ফলাফল নেতিবাচক। বর্তমানে বাংলাদেশে ব্যাঙের ছাতার মতো প্রতিষ্ঠা লাভ করছে এনজিও। এ বিপুল পরিমাণ এনজিও গড়ে উঠছে শুধু সমাজসেবা বা দরিদ্রের ভাগ্যোন্নয়নে নয়। এর মধ্যে লুকায়িত আছে তাদের প্রচুর মুনাফা লাভের বাসনা। তাছাড়া সম্প্রতি গবেষণায় দেখা গেছে এনজিওগুলো তাদের বরাদ্দের সিংহভাগ আত্মসাৎ করে। এনজিওগুলো বর্তমানে দেশের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ করছে, যা খুবই দুঃখজনক। এনজিওগুলোর মূল উদ্দেশ্য হলো দরিদ্র জনগণের দারিদ্র্য বিমোচন নয়, তাদের দারিদ্র্য কমিয়ে এনে এদেরকে বাঁচিয়ে রেখে শোষণ করা।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-০১ NGO কি?

উত্তর : সাধারণভাবে, সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নয় এমন যে কোনো সংস্থাই এনজিও। তবে বিগত তিন দশকে এনজিও কার্যক্রমের ধারা থেকে বর্তমান এনজিও-র যে রূপ দাঁড়িয়েছে তাতে বলা যায় এনজিও হচ্ছে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত অমুনাফাভিত্তিক এক ধরনের বিশেষ স্বেচ্ছাসেবী সামাজিক সংগঠন। এনজিও-র আওতায় পড়ে অনানুষ্ঠানিক বিভিন্ন সমিতি, সীমিত দায়ের আনুষ্ঠানিক সমবায় সমিতি এবং নিবন্ধিত বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা। উন্নয়ন-এনজিও নামেও একটি ধারণা গড়ে উঠেছে। এগুলো গ্রাম ও শহর এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য নানা কার্যক্রম পরিচালনা করে। এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে অনেকে বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়ন সংস্থা বা শুধু স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়ন সংস্থা নামে অভিহিত করে। এদের কার্য তালিকায় থাকে উন্নয়নের আর্থ-সামাজিক নানা কার্যক্রমসহ পরামর্শ সেবা, আইনি সহায়তা ও ত্রাণ তৎপরতা।

প্রশ্ন-০২ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এনজিওর ভূমিকা কি?

উত্তর : বাংলাদেশে কর্মরত এনজিওগুলো গ্রামীণ অর্থনীতি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এ দেশের বিপুল জনগোষ্ঠী ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও বেকারত্বের শিকার। দিনভর হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেও এখানকার বেশির ভাগ মানুষ জীবনের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতে অক্ষম। এমতাবস্থায় ক্ষুধা, দারিদ্র্য আর অপুষ্টি তাদের নিত্যসঙ্গী। এনজিওগুলো খুব সহজেই সেবার হাত প্রসারিত করে অসহায় মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। বাংলাদেশে কর্মরত সংস্থাগুলোর অসংখ্য প্রধান ও শাখা অফিস রয়েছে। প্রত্যেকটি শাখা শিক্ষা, চিকিৎসা ও খাদ্যসহ নানানরকম সেবা মানুষের দ্বারে পৌঁছে দেয়। এসব সংস্থায় কর্মরত রয়েছে বাংলাদেশের লক্ষাধিক জনবল। সুতরাং দেশের বেকারত্ব ঘুচাতেও এনজিওগুলোর কার্যকর ভূমিকা রয়েছে। এক কথায়, আমাদের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে এনজিওগুলো বৃহত্তর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

প্রশ্ন-০৩ পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) কি?

উত্তর : পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ১৯৯০ সালে মে মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্য দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনায় নিয়োজিত সম্ভাবনাময় এনজিওসমূহের অর্থসংস্থান করা। পিকেএসএফ নিজে কোম্পানি আইনের অধীনে নিবন্ধিত একটি অমুনাফাভিত্তিক সংস্থা। ৩১ ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত পিকেএসএফ তার ২৭২টি সহযোগী সংস্থার অনুকূলে ১৭,৪৫৮.১৮ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করেছে। এ সময়ে মাঠ পর্যায়ে মোট ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা ৭৯.৭৩ লক্ষ জন (মহিলা ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা ৯১ শতাংশ)। আগে পিকেএসএফ কেবল পল্লী ক্ষুদ্রঋণ খাতে সহযোগী সংস্থাসমূহকে ঋণ সহায়তা প্রদান করতো। পরবর্তীতে পিকেএসএফ তার মূলস্রোত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আওতায় আট ধরনের ক্ষুদ্রঋণ প্রদান শুরু করে, যথা (ক) পল্লী ক্ষুদ্রঋণ;

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

(খ) নগর ক্ষুদ্রঋণ; (গ) অতি দরিদ্রদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ; (ঘ) ক্ষুদ্র উদ্যোগ (Microenterprise) ঋণ; (ঙ) মৌসুমী ঋণ; (চ) কৃষিখাত কর্মসূচি; (ছ) বৃহত্তর রংপুর জেলার মঙ্গা কবলিত এলাকায় ক্ষুদ্রঋণ পরিচালনার জন্য "Programmed Initiative for Monga Eradication (PRIME)" শীর্ষক ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম; এবং (জ) দরিদ্র-বান্ধব উদ্ভাবনীমূলক কার্যক্রমে ঋণ সুবিধা প্রদানের জন্য 'Learning and Innovation Fund to Test New Ideas (LIFT)' শীর্ষক কার্যক্রম। মূলস্রোত ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির বাইরে ফাউন্ডেশন দরিদ্রতমদের জন্য কয়েকটি বিশেষ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। বর্তমানে এটি ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার সমন্বয়কারী শীর্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে এশিয়ায় বৃহত্তম ও সবচেয়ে সফল সংস্থা।

প্রশ্ন-০৪ এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কি?

উত্তর : এনজিও বিষয়ক ব্যুরো প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯০ সালের জুলাই মাসে। এটি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ছিল এনজিওসমূহের কার্যক্রমের গুণগত উৎকর্ষ এবং সরকারের নিকট এনজিওসমূহের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ। এ লক্ষ্যে পরিচালিত এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর কার্যাবলী হচ্ছে এনজিওসমূহের নিবন্ধন প্রদান, তাদের প্রকল্পসমূহ প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন; এনজিওগুলোতে বিদেশী কর্মকর্তা ও পরামর্শক নিয়োগ ও কার্যকাল অনুমোদন; এনজিও কার্যক্রমসমূহ সমন্বয়সাধন, পরিবীক্ষণ, পরিদর্শন ও মূল্যায়ন; এনজিওসমূহের প্রতিবেদন ও বিবরণীসমূহ পর্যালোচনা ও সেগুলোর ওপর মন্তব্য প্রদান, এনজিওগুলো থেকে ফিস/সার্ভিস চার্জ আদায়; তাদের আয়-ব্যয় বিষয়ে মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন পরিচালনা, এনজিও ও দাতা সংস্থাসমূহের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা।

প্রশ্ন-০৫ ব্র্যাক (BRAC) কি?

উত্তর : আমাদের দেশে যেসব বেসরকারি সংস্থা আর্থ-সামাজিক, বিশেষ করে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে তৎপর ভূমিকা পালন করছে তার মধ্যে ব্র্যাক (BRAC) অন্যতম। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে বিধ্বস্ত সাল্লা নামক স্থানে ত্রাণ ও পুনর্বাসনমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে ব্র্যাকের অগ্রযাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে এটা বিশাল এলাকাব্যাপী ব্যাপক কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে। বিশাল জনগোষ্ঠীর মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে আত্মোন্নয়ন করা এর প্রধান উদ্দেশ্য। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বিপর্যয়মূলক পরিস্থিতির মোকাবিলা ও আর্ত-মানবতার সেবার মহান ব্রত নিয়ে যেসব স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এই বাংলাদেশে গড়ে উঠেছে তার মধ্যে সবচেয়ে বৃহৎ এবং প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান (এনজিও) হচ্ছে ব্র্যাক। জনাব ফজলে হাসান আবেদ ব্র্যাক প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রশ্ন-০৬ ব্র্যাকের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যগুলো কি কি?

উত্তর : গ্রামীণ দারিদ্র্য দূরীকরণ ও শ্রমজীবী মানুষের ভাগ্যের উন্নয়ন সাধন করাই ব্র্যাকের প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মৌল প্রয়োজন, চাহিদা, সম্পদ ও পরিবর্তিত অবস্থার সাথে সঙ্গতি বিধানের প্রতি লক্ষ্য রেখে ব্র্যাকের বহুমুখী ও প্রগতিশীল কতিপয় উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। ব্র্যাকের গতিশীল, বহুমুখী উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যগুলো নিম্নরূপ :

১. গ্রামীণ দরিদ্র, দুঃস্থ, অসহায় ও নির্ভরশীল জনগণকে Target group হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের মাঝে সচেতনতাবোধ জাগ্রত করা, যাতে তারা ব্র্যাকের সাহায্য ও সহযোগিতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোগ করতে পারে।
২. Target group যাতে নিজেরাই নিজস্ব সম্পদ ও সামর্থ্যের দ্বারা আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারে তার জন্য সর্বাত্মক সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করা।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৩. লক্ষ্যদলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে নিয়ে কার্যক্রম সংগঠন গড়ে তোলার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত পরিবর্তন ও বিবর্তন আনয়নে সহায়তা করা।
৪. সহজ শর্তে ঋণ বিতরণের মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান ও উপার্জনের বাঞ্ছিত সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা।
৫. সমাজ থেকে নিরক্ষরতার মূলোৎপাটনের লক্ষ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণ কার্যক্রম চালু ও বাস্তবায়ন করা।
৬. স্বাস্থ্যবিধির ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে জনগণের মাঝে স্বাস্থ্য সচেতনতাবোধ জাগ্রত করা।
৭. ব্র্যাকের লক্ষ্যদলের দরিদ্রদের ব্যবস্থাপনা, দক্ষতা এবং নেতৃত্বের বিকাশ সাধনের জন্য বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
৮. উদ্ভূত সমস্যা, গৃহীত কার্যক্রমের যথার্থতা যাচাই, কার্যক্রমের সার্বিক মূল্যায়ন প্রভৃতির লক্ষ্যে ধারাবাহিক গবেষণা কার্যক্রম চালু করা।
৯. গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে এমনভাবে স্বনির্ভর করে গড়ে তুলতে হবে, যাতে তাদের নির্যাতন ও শোষণ প্রতিরোধকল্পে নিজেরাই বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে পারে।
১০. লক্ষ্যদলের মাঝে উদার ও আন্তরিক মন-মানসিকতা গড়ে তোলা, যাতে তারা সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলার পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে।

বিশেষ উদ্দেশ্য

১. গ্রামীণ দরিদ্র শ্রেণীকে প্রয়োজন ও সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা।
২. গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর অবস্থার পরিবর্তনকল্পে সংস্থানমূলক প্রকল্প নির্বাচন, নকশা প্রণয়ন এবং বাস্তব প্রয়োগে সহায়তা করা।
৩. উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণকারীদের উৎপাদনে সহায়তা করা।
৪. প্রকল্প বাস্তবায়নে সামর্থ্য অর্জনে প্রাতিষ্ঠানিক (Capacity building and institutional development) সহায়তা প্রদান করা।

ব্র্যাকের উপরিউক্ত উদ্দেশ্যাবলীর আলোচনার মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে যে, গ্রামীণ দারিদ্র্য, জনগণের বঞ্চনা, নির্যাতন ও শোষণের অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে ব্র্যাকের ব্যাপকভিত্তিক কার্যক্রম রয়েছে। এসব উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়নের মাধ্যমেই ব্র্যাকের কার্যক্রমের সফলতা নির্ভর করে।

প্রশ্ন-০৭ কেয়ার (CARE) কি?

উত্তর : কেয়ার একটি আন্তর্জাতিক এনজিও। এর পূর্ণ অভিব্যক্তি হলো Co-Operation for Assistance and Relief Everywhere (CARE)। গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের এ সংস্থাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের মানুষের দারিদ্র্য দূরীকরণ, আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশ সাধন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, সম্পদের সদ্ব্যবহার, আর্ত-মানবতার সেবা প্রভৃতি লক্ষ্যকে সামনে রেখে এ সংস্থাটি বাংলাদেশ জন্মের পর থেকেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। উপরিউক্ত কার্যক্রম ব্যতীত এ সংস্থা বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি, শিশুকল্যাণ, নারীকল্যাণ, যুবকল্যাণ, পঙ্গুকল্যাণ, প্রবীণকল্যাণ, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, চিকিৎসা, বৃত্তিমূলক কার্যক্রম, আত্মকর্মসংস্থান প্রভৃতি কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের সার্বিক উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

প্রশ্ন-০৮ অন্যান্য বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর সাথে গ্রামীণ ব্যাংকের পার্থক্য কি?

উত্তর : গ্রামীণ ব্যাংক পল্লী অঞ্চলের ভূমিহীন দরিদ্র নারী-পুরুষদের জন্য ঋণসুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত একটি বিশেষ ধরনের ব্যাংক। ব্যাংক অধ্যাদেশ, ১৯৮৩-এর অধীনে একটি কর্পোরেট সংস্থা হিসেবে ঐ বছরের অক্টোবরে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। গঠন, উদ্দেশ্য ও কার্যপ্রক্রিয়ার দিক থেকে গ্রামীণ ব্যাংকের সাথে অন্যান্য বেসরকারি ব্যাংকের যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। নিচে কিছু পার্থক্য উল্লেখ করা হলো :

১. গ্রামীণ ব্যাংকের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এটি প্রধানত ভূমিহীনদেরকেই ঋণ প্রদান করে। যেসব কৃষকের আধা একর বা তার চেয়ে কম এবং জমি ব্যতীত মোট সম্পদের মূল্য বর্তমান বাজার দরে এক একর জমির মূল্যের বেশি নয় তারাই কেবল গ্রামীণ ব্যাংক থেকে ঋণ পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু অন্যান্য বাণিজ্যিক/বেসরকারি ব্যাংকে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে এরূপ কোনো নিয়ম নীতি নেই।

২. গ্রামীণ ব্যাংক জামানত ছাড়াই ঋণ প্রদান করে থাকে কিন্তু অন্যান্য বেসরকারি ব্যাংক অধিকাংশ ক্ষেত্রে জামানত ছাড়া ঋণ প্রদান করে না।

৩. গ্রামীণ ব্যাংক যে ঋণ প্রদান করে তা যথাযথভাবে আয় উপার্জনকারী কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা তা তদারক করে থাকে। পক্ষান্তরে, অন্যান্য বেসরকারি ব্যাংক বিভিন্ন প্রজেক্টে ঋণ প্রদান করলেও কঠোরভাবে তদারক করে না।

৪. গ্রামীণ ব্যাংকের কাছে ঋণ গ্রহীতারা আসে না, বরং ব্যাংক কর্মচারীরাই ঋণগ্রহীতাদের কাছে গমন করে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করে। কিন্তু সরকারি-বেসরকারি ব্যাংকগুলোর ক্ষেত্রে এরূপ সেবা দেখা যায় না।

৫. গ্রামীণ ব্যাংক থেকে যারা ঋণগ্রহণ করে তারা গ্রামীণ ব্যাংকের যেমন মক্কেল তেমনি তারা গ্রামীণ ব্যাংকের মালিকও। এ ব্যাংকে ঋণ গ্রহীতারা সক্রিয় অংশগ্রহণকারী সদস্য হিসেবে মর্যাদা পেয়ে থাকে। কিন্তু অন্যান্য ব্যাংকে মক্কেল শুধুই মক্কেল। ব্যাংক পরিচালনা বা অন্য কোনোভাবে তারা ব্যাংকের কার্যক্রমে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

প্রশ্ন-০৯ সুশীল সমাজ বলতে কি বোঝেন?

উত্তর : সুশীল সমাজের ধারণাটি নতুন হলেও এর প্রচ্ছন্ন ধারণা পাওয়া যায় জন লক, রুশোসহ আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তাবিদদের লেখনীতে। তবে এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশি স্পষ্ট আলোচনা পাওয়া যায় এন্টোনিও গ্রামসির লেখায়। বিশেষ করে সমাজতন্ত্রের পতনের প্রাক্কালে পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সুশীলসমাজকে আপনরূপে বিকশিত হতে দেখা যায়। কেননা এ অঞ্চলের সমাজতান্ত্রিক সরকারের নির্যাতন, নিপীড়ন ও কড়া বিধি-নিষেধের কারণে সেখানে কোনো রাজনৈতিক ও বেসরকারি ব্যবসায়িক কিংবা বাণিজ্যিক সংগঠন গড়ে উঠতে পারেনি। কমিউনিজমকে টিকিয়ে রাখার জন্য কমিউনিস্ট মডেলে সাংস্কৃতিক বিনির্মাণের চেষ্টাও করা হয় দীর্ঘকাল। কিন্তু কোনো কিছুতেই শেষ রক্ষা হয়নি। কমিউনিস্টবিরোধী আন্দোলনে এক সময় লাখ লাখ লোক রাস্তায় নেমে আসে। তখনই প্রশ্ন আসে, কোন শক্তি তাদেরকে এতো বাধা-নিষেধ আর নির্যাতনের পরও ঐক্যবদ্ধ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে সাহায্য করলো? এটি মূলত সুশীল সমাজ। এরা সরকারে থাকে না, আবার কর্পোরেট গ্রুপেও থাকে না। এরা সরকার এবং প্রাইভেট সেক্টরের মাঝামাঝি একটি গ্রুপ। এদের ধর্ম হলো এরা সরকার ও প্রাইভেট সেক্টর উভয় ক্ষেত্রেই তাদের প্রভাব বিস্তার করতে পারে। এরা সরকারকে সহযোগিতাও করতে পারে আবার সরকারবিরোধী অবস্থান নিয়ে সরকারের ভিতও নাড়িয়ে দিতে পারে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

বিশ্বায়ন ও বাংলাদেশ
Globalization and Bangladesh

Syllabus *Globalization and Bangladesh : Economic and Political Dimensions; Roles of the WTO, World Bank, IMF, ADB, IDB and other development partners and Multi National Corporations (MNCs).*

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১. বাংলাদেশে ঋণপ্রদানে আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক ও এডিবির সমধর্মী শর্তগুলো কি কি? শর্তযুক্ত ঋণ পরিহার করা সম্ভব কি? যৌক্তিক পরামর্শ দিন। [৩১তম বিসিএস]
অথবা, বাংলাদেশে ঋণ প্রদানে আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক ও এডিবির সমধর্মী শর্তগুলো কি কি? সকল শর্তই কি পরিহার করতে পারলে তা পরিহার করা উচিত এবং শর্তগুলো সঠিক বা আংশিক জনস্বার্থের অনুকূল কি? মতামত দিন। [৩৪তম বিসিএস]

০২. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (IMF) ভূমিকা পর্যালোচনা করুন। [৩০তম বিসিএস]

০৩. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB)-এর ভূমিকা পর্যালোচনা করুন। [৩০তম; ২৭তম বিসিএস]

০৪. বাংলাদেশের সাথে অন্যান্য দেশের কতটি আঞ্চলিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি আছে? বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি নিরসনে আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তিগুলো কি ধরনের ভূমিকা রাখতে পারে? আলোচনা করুন। [৩১তম বিসিএস]

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

০৫. মুক্তবাজার অর্থনীতি সম্পর্কে বিশদ আলোচনাপূর্বক বাংলাদেশে এর গ্রহণযোগ্যতা তুলে ধরে করণীয় কি আলোকপাত করুন।

০৬. সারা বিশ্বে মুক্ত ও উদার বাণিজ্য নীতি প্রবর্তনে বাংলাদেশের শিল্প হুমকির সম্মুখীন হতে পারে। এ পরিস্থিতি মোকাবিলায় কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত—আলোচনা করুন।

০৭. বাংলাদেশের পণ্য বাণিজ্যে বিপুল ঘাটতি কমানোর কার্যকর পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

০৮. উন্নত রাষ্ট্রগুলো বাংলাদেশে উন্নয়ন ও বিনিয়োগের নামে আধিপত্য বিস্তার করছে—আলোচনা করুন।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

০১. আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF) কি?
০২. আইএমএফ-এর গঠন ও ব্যবস্থাপনা বর্ণনা করুন।
০৩. আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ব্যাংক (IBRD) বা বিশ্বব্যাংক কি?
০৪. বিশ্বব্যাংকের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী লিখুন।
০৫. এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB) কি?
০৬. এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী লিখুন।
০৭. ভাসমান মুদ্রা বা ফ্লোটিং এক্সচেঞ্জ রেট বলতে কি বোঝেন?
০৮. বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের সমস্যাগুলো লিখুন।
০৯. বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের সমস্যা ও সম্ভাব্য করণীয় কি?
১০. কোটামুক্ত বিশ্বে তৈরি পোশাক শিল্পের অবস্থা পর্যালোচনা করুন।
১১. শুল্কমুক্ত বিশ্ব বলতে কি বোঝেন?
১২. বাংলাদেশ পুঁজি বিনিয়োগ সংস্থা (ISB) সম্পর্কে কি জানেন?
১৩. সাফটা চুক্তি বাস্তবায়নে বাংলাদেশের কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত?
১৪. বহুজাতিক সংস্থা কি?

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১। বাংলাদেশে ঋণ প্রদানে আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক ও এডিবির সমধর্মী শর্তগুলো কি কি? শর্তযুক্ত ঋণ পরিহার করা সম্ভব কি? যৌক্তিক পরামর্শ দিন। *[৩১তম বিসিএস]*

অথবা, **বাংলাদেশে ঋণ প্রদানে আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক ও এডিবির সমধর্মী শর্তগুলো কি কি? সকল শর্তই কি পরিহার করতে পারলে তা পরিহার করা উচিত এবং শর্তগুলো সঠিক বা আংশিক জনস্বার্থের অনুকূল কি? মতামত দিন।** *[৩৪তম বিসিএস]*

উত্তর : বিশ্বের কোনো রাষ্ট্রই সবদিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, তাই এক রাষ্ট্রকে অন্য রাষ্ট্রের সহায়তা নিতে হয়। বিশেষ করে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহকে উন্নত রাষ্ট্র এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সহায়তা নিতে হয়। বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল রাষ্ট্র। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠন এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য বিভিন্ন ধনী রাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ঋণ সহায়তা গ্রহণ করে। উন্নয়নশীল রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ এখনও আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক ও এডিবির কাছ থেকে ঋণ সহায়তা গ্রহণ অব্যাহত রেখেছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন বৈদেশিক উৎস থেকে ১৮২৭ মিলিয়ন ইউএস ডলার ঋণ গ্রহণ করে। কিন্তু দাতা সংস্থাগুলো ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিভিন্ন জটিল শর্ত জুড়ে দেয়, যার কারণে উন্নয়নশীল দরিদ্র দেশগুলোকে এ জন্যে চরম মাশুল গুণতে হয়।

আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক ও এডিবি : ১৯৪৪-এর জুলাইয়ে ব্রেটন উডস চুক্তি অনুযায়ী ১৯৫৪-এর ডিসেম্বর মাসে IMF বা আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের সূচনা ঘটে। প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র থেকে একজন গভর্নর নিয়ে IMF গভর্নর পরিষদ গঠিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, চীন ও ভারত IMF-এর কার্যকরী পরিচালক পর্ষদের স্থায়ী সদস্য। IMF-এর উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তিগত ও সদস্য রাষ্ট্র থেকে অর্থ সংগ্রহ করে

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

সদস্য রাষ্ট্রসমূহের উন্নয়ন প্রকল্পে কারিগরি সহায়তা প্রদান। বাংলাদেশ ১৯৭২ সালের ১০মে এ সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে। IMF এবং WB-এর প্রতিষ্ঠা একই সময়ের। বলা হয়ে থাকে যে, যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগুলো অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনের উদ্দেশ্যে ব্রেটন উডস চুক্তি অনুযায়ী বিশ্বব্যাংক স্থাপিত হয়।

ADB প্রতিষ্ঠা লাভ করে ১৯৬৬ সালে। এশিয়ার বিভিন্ন দেশের উন্নয়নমূলক কাজে সহায়তা করার উদ্দেশ্যেই এ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়। যদিও বলা হয়ে থাকে যে, IMF, WB, ADB প্রভৃতি সংস্থাগুলো দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ঋণ সহায়তা দিয়ে থাকে কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি এর সম্পূর্ণ বিপরীত। এ সকল সংস্থার ঋণ সহায়তা শেষ পর্যন্ত বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর বিনিয়োগের ক্ষেত্রকে প্রস্তুত করে; এতে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর বাজার প্রস্তুত হয় ও বিস্তৃত হয় এবং বাড়ে বিনিয়োগ ক্ষমতা।

বাংলাদেশে আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক ও এডিবির ঋণ প্রদানের সমধর্মী শর্তসমূহ : বাংলাদেশে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এডিবি নানারকম অনুদান, ঋণ এবং সাহায্যের সাথে শর্ত এবং দেশের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় প্রভাব বিস্তার করে। দাতাসংস্থা এবং দাতা দেশসমূহ সাহায্য ও ঋণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মতো স্বল্পোন্নত দেশে দ্বৈত ভূমিকা পালন করে। আমাদের দেশে বৈদেশিক সাহায্য উপকারের বদলে সৃষ্টি করেছে ঋণের বিশাল দায়। দেশের বিশেষজ্ঞসহ সাধারণ মানুষের দাবি বৈদেশিক সাহায্যকে শর্তমুক্ত করা হোক। নীতি-নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ-এর হস্তক্ষেপ বন্ধ করা হোক।

ঋণের শর্ত বলতে সহজ কথায় বোঝায় দাতা সংস্থা বা দেশ কর্তৃক প্রদত্ত বিধিমালা। তারা এ বিধিমালা দেয় প্রদেয় অর্থের বা সাহায্যের সঠিক ব্যবহারের লক্ষ্যে। কখনো কখনো এ বিধিমালা নির্দিষ্ট দেশের অভ্যন্তরীণ সমস্যা সৃষ্টি করে এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে এ দেশের গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ের নিয়ন্ত্রণও দাবি করে বসে। যেমন অনেক দরিদ্র দেশগুলোতে দাতা সংস্থা ঋণের বিপরীতে বিদ্যুৎ এবং পানি খাত বেসরকারি করার জন্য শর্ত জুড়ে দেয়। আর দাতা সংস্থা/দেশ যখন এসব শর্ত দেয়, তখন তারা কখনোই দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কথা চিন্তা করে দেয় না।

বিগত যে কোনো সময়ের চেয়ে বর্তমানে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর শর্তসমূহ বেশি সমালোচিত হচ্ছে। আইএমএফ তাদের ঋণ সাহায্যের ক্ষেত্রে দুই ধরনের শর্ত চাপিয়ে দিয়ে থাকে। এর মধ্যে একটি হলো সংখ্যা বা পরিমাণবাচক, আরেকটি হলো কাঠামোগত শর্ত। দরিদ্র দেশের সমষ্টিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে সংখ্যাবাচক শর্তগুলো চাপানো হয়। আর কাঠামোগত শর্ত চাপানো হয় প্রাতিষ্ঠানিক এবং নীতি সংস্কারের ক্ষেত্রে। যেমন বেসরকারিকরণ, বাণিজ্য সংস্কার, মূল্য উদারীকরণ ইত্যাদি। বর্তমান সময়ে দরিদ্র দেশগুলোতে এসব শর্ত চাপিয়ে দেয়া হলেও শর্তগুলো নানা কারণে ব্যর্থতার মুখ দেখছে। অনেক সময় দেখা গেছে দাতাদের শর্তসমূহ গ্রহীতা দেশের গণতান্ত্রিক গ্রহণযোগ্যতাকে অসম্মান করছে। নিচে আইএমএফ, বিশ্ব ব্যাংক ও এডিবি-র শর্তগুলোর কাঠামোগত বিন্যাস দেখানো হলো :

অর্থনৈতিক শর্তাবলী :

- **বেসরকারিকরণ :** বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ এবং এডিবি এদের শর্তকাঠামোর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো বেসরকারিকরণ নীতি। এ বেসরকারিকরণের ৫টি আলাদা ধরন রয়েছে। যেমন– : পানি খাত বেসরকারিকরণ, খনিজ সম্পদ বেসরকারিকরণ (গ্যাস), বিদ্যুৎ ও কৃষিখাত বেসরকারিকরণ এবং অন্যান্য।
- **বেসরকারিকরণ সংস্কার :** এ শর্তের অধীনে ঋণ গ্রহীতা দেশসমূহকে ক্ষেত্রবিশেষ তাদের বেসরকারিকরণ নীতিতে পরিবর্তন আনতে হয়।
- **বাণিজ্য উদারীকরণ :** এ শর্তের আওতাধীন বিষয়গুলো হলো : শুল্ক হ্রাস, সংখ্যাগত বাধা দূর করা, পণ্য ও সেবাখাতের নিয়ন্ত্রণ হ্রাস এবং শুল্ক কাঠামোতে পরিবর্তন।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

– বাণিজ্য সংক্রান্ত অন্যান্য শর্ত : অবাণিজ্য বাধা দূর করা, বাজারভিত্তিক বিনিময় মূল্য এবং অভ্যন্তরীণ প্রতিবন্ধকতা দূর করা।

পরিবেশ ও সামাজিক শর্তাবলী :

– **স্বাস্থ্য :** স্বাস্থ্যখাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এখানে গুরুত্বপূর্ণ।
– **শিক্ষা :** শিক্ষানীতি সংস্কার, শিক্ষাখাতের সুশাসন, শিক্ষাখাতের সংস্কার।
– **পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন :** এ খাতেও বিশ্বব্যাংক এবং আইএমএফ'র সুনির্দিষ্ট কিছু শর্ত রয়েছে।
– **পরিবেশ, গ্রাম ও শহর উন্নয়ন :** পরিবেশ সংরক্ষণ নীতির সাথে সম্পর্কিত শর্তসমূহ শহর ও গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত শর্তাবলী।
– **সামাজিক সুরক্ষা :** সামাজিক সুরক্ষা নামেও বিশ্বব্যাংক এবং আইএমএফ নানাবিধ শর্ত চাপিয়ে দেয়।

জনপ্রশাসন খাত সংস্কার সংক্রান্ত শর্তাবলী :

– দুর্নীতি দমন ও জবাবদিহিতা, জনপ্রশাসন সংস্কার, বিকেন্দ্রীকরণ, জনঅর্থনৈতিক খাত ব্যবস্থাপনা, কর প্রশাসন, আইন ও বিচার বিভাগ সংস্কার, সামাজিক সংগঠনসমূহ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি।

আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক ও এডিবির শর্তযুক্ত ঋণ সহায়তার প্রভাব : প্রায়ই দাতারা বাণিজ্য উদারীকরণ এবং বেসরকারিকরণের জন্য তাদের অযাচিত অর্থনৈতিক শর্ত চাপিয়ে দেয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দাতাদের এসব অর্থনৈতিক শর্তে উন্নয়ন হয় না বরং দরিদ্র জনগণ আরো নিঃস্ব হয়ে পড়ে। ১৯৮০ এবং ১৯৯০ এর দশক থেকেই উন্নয়নশীল দেশগুলোতে জোরপূর্বক বাণিজ্য উদারীকরণ ও বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে জোর প্রতিবাদ, প্রতিরোধ আন্দোলন চলে আসছে। বিশ্বব্যাংকের Structural Adjustment Policy Review International বা কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচির ফলে দেশের দারিদ্র্যতার মাত্রা আরও বেড়ে যায়।

দাতাদের চাপিয়ে দেয়া শর্ত দরিদ্র দেশগুলোর সরকারের গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তগ্রহণের ভিতকে দুর্বল করে দেয়। ঋণ সহায়তা নিশ্চিত করার জন্য দরিদ্র দেশগুলোর সরকার দাতাদের নির্দিষ্ট শর্ত মেনে নিতে বাধ্য হয়। এটা করতে যেয়ে একটি গণতান্ত্রিক দেশের সরকার জনপ্রিয়তা হারায়। অনেক সময় দরিদ্র দেশগুলোর সাথে দাতাদের গোপন চুক্তি হয়। এ চুক্তিগুলোতে দেশের সংসদ এবং জনগণের মতামত খুব সামান্যই প্রতিফলিত হয়। দাতারা একদিকে দরিদ্র দেশের সরকারকে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য চাপ দেয় অন্যদিকে দেশের সরকারকে বাধ্য করে গণতান্ত্রিক কাঠামোর বাইরে এসে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে। এসব প্রকৃতপক্ষে, একটি দেশের উন্নয়ন শক্তি এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার জবাবদিহিতাকে নড়বড়ে করে দেয়।

উন্নয়ন সাহায্যে বিভিন্ন আরোপিত শর্ত একটি দেশের নিজস্বতাকে নষ্ট করে দেয় এবং এটা সুস্পষ্টভাবে দেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি। দেশের সরকার যদি মনে করে এ নীতি তার দেশের জন্য ভালো হবে তা হলেই তারা সেটা গ্রহণ করবে। কিন্তু বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ এবং অন্যান্য দাতা দেশগুলো গ্রহীতা দেশের মতামতকে গুরুত্ব না দিয়ে নিজেদের মতামতকে প্রতিষ্ঠা করে।

দাতা সংস্থাসমূহের শর্তযুক্ত ঋণ পরিহার সম্ভব কি না : যদিও বাংলাদেশে বৈদেশিক ঋণ সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা কমছে, কিন্তু কমেনি ঋণের দায়। প্রতি বছর আমরা যে বৈদেশিক সাহায্য পাই, তার বহুগুণ পরিমাণ অর্থ আমাদের আসে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্স থেকে। ১৯৭২ সালে মাথাপিছু ঋণের বোঝা ছিল ৬৭ টাকা। ১৪ জুন ২০১৪ জাতীয় সংসদে দেয়া অর্থমন্ত্রীর তথ্য মতে, সেটা হয়েছে ১২,৭০০ টাকা। যদিও বৈদেশিক সাহায্যের ওপর সামগ্রিকভাবে আমাদের নির্ভরশীলতা কম, তদুপরি

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

কিছু কিছু খাতের প্রকল্প যেমন স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, জনসংখ্যা ইত্যাদি বৈদেশিক সাহায্য নির্ভর। আমাদের বার্ষিক এডিপিতে বৈদেশিক সাহায্যের নির্ভরশীলতা অনেক কমে গেছে। অনেকে মনে করেন রাজস্ব আদায়ে বাংলাদেশ আরো সফল হলে বৈদেশিক সাহায্য কোনোভাবেই দরকার হবে না। কারণ আমাদের মনে রাখতে হবে বৈদেশিক সাহায্যের অনেকটাই আবার দাতা দেশের কাছে চলে যায় পরামর্শক সুবিধাভোগীদের পকেটে। ফলে বৈদেশিক ঋণ সাহায্যের যেসব উদ্দেশ্য কাগজে কলমে থাকে সেসব আদৌ সফল হয় না, আর এ নিয়ে দাতাদেরও তেমন মাথাব্যথা নেই, ঋণ-সাহায্য উপযোগী ও বাস্তবসম্মত কিনা তা যাচাই না করে ঋণ-সাহায্য দেয়া নেয়া আদৌ কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নয়। কারণ দাতাদের উদ্দেশ্য ব্যবসা সফল পরিবেশ তৈরি ও রাষ্ট্রের ওপর হস্তক্ষেপ, কোনো দেশের উন্নতি নয়। এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে আমাদের বোঝা দরকার। দাতাদের আরোপিত নীতি ও শর্ত কোনো দেশের উন্নতি করেছে এমন নজির নেই। বাংলাদেশের মতো স্বল্পোন্নত দরিদ্র দেশের পক্ষে শর্তমুক্ত ঋণ পরিহার করা সম্ভব নয় কিন্তু এ সকল ঋণের কঠিন শর্তসমূহ শিথিল করা যায়। দেশীয় সম্পদের ব্যবহার অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধি, জনগণকে জনশক্তিতে রূপান্তর, আমদানির তুলনায় রফতানি বৃদ্ধি করে বৈদেশিক ঋণগ্রহণের মাত্রা কমানো এবং সেই সাথে ঋণগ্রহণের শর্তকেও শিথিল করা সম্ভব।

ঋণ সাহায্যের শর্তের সংকট মোকাবিলায় করণীয় : উন্নয়নের নামে ঋণ সাহায্য মূলত এক ধরনের উন্নয়ন-বাণিজ্য খেলা। এ খেলার মূল হোতা বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এডিবি এবং অন্যান্যরা। আর এদের সাথে আছে যুক্তরাষ্ট্র এবং নানাবিধ বহুজাতিক কোম্পানি ও এদের স্বার্থের লবি। উন্নয়নের নামে প্রহসনমূলক এসব তৎপরতা রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করে। যার ফলে স্বাধীনতার এত বছর পরও স্বনির্ভর রাষ্ট্র হিসেবে আমরা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারি নি। জাতীয় যে কোনোও সিদ্ধান্তগ্রহণের জনমতকে প্রাধান্য দেয়া উচিত। এক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কিছু সুপারিশ হলো :

১. বিশ্বব্যাংক–এডিবির পরামর্শ ও অর্থায়নে গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্প ও নীতি প্রতিরোধ করতে হবে;
২. তেল-গ্যাস খাতে বিশ্বব্যাংক–এডিবি'র সুপারিশ বাতিল করতে হবে;
৩. পাটসহ পরিবেশসম্মত শিল্পে বিকাশ ঘটাতে হবে;
৪. স্বাধীন কৃষি ও শিল্পনীতি বাস্তবায়ন করতে হবে;
৫. দাতাদের হস্তক্ষেপমুক্ত জাতীয় নীতিমালা তৈরি করতে হবে;
৬. সকল প্রকার বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্য শর্তমুক্ত হতে হবে;
৭. সাহায্যের ক্ষেত্রে চাপিয়ে দেয়া উন্নয়ন দলিলকে বাদ দিতে হবে;
৮. ঋণ সাহায্য, কারিগরি সাহায্য ইত্যাদি সকল প্রকার সিদ্ধান্ত, চুক্তি ও শর্ত সংসদে, জনগণের কাছে এবং গণমাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে বিস্তারিতভাবে;
৯. আন্তর্জাতিক আর্থিক ও কারিগরি সহায়তার ক্ষেত্রে আইএমএফ-বিশ্বব্যাংক-এডিবি'র খবরদারি বন্ধ করতে হবে;
১০. দারিদ্র্য দূরীকরণে সম্পদ সমাবেশের জন্য অগ্রাধিকার ঠিক করতে স্বচ্ছ ও সমতাভিত্তিক কৌশল এবং বিধি ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে;
১১. জনগণের স্বাধীন ও স্বতঃপ্রণোদিত উন্নয়ন প্রক্রিয়ার জন্য একক ও দ্বিপাক্ষিক সকল প্রকার ঋণ-সাহায্যের ক্ষেত্রে একটি কেন্দ্রীয় নীতিমালা মেনে চলা প্রয়োজন যা দাতাদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে, জাতীয় সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সকলের অংশগ্রহণ ও মতামত নিশ্চিত করবে এবং
১২. দাতাদের ওপর নির্ভরশীলতা ধীরে ধীরে বাদ দিতে হবে এবং স্বনিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির রূপরেখা জনগণের সামনে হাজির করতে হবে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

উপসংহার : একটি স্বাধীন দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে পরনির্ভরশীল করে দেয়ার অন্যতম হাতিয়ার হলো ঋণ ব্যবস্থা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান ঋণ দেয়ার নামে তৃতীয় বিশ্বের অর্থনৈতিক বাজার দখল করে নিজেদের উৎপাদিত পণ্যের বাজার সৃষ্টি করে। তাছাড়া IMF, WB, ADB যে সকল শর্তে তৃতীয় বিশ্বে ঋণ প্রদান করে, এতে করে সে সকল দেশের গণতন্ত্র, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়া দারুণভাবে বাধাগ্রস্ত হয়। তাই বাংলাদেশের যথাসম্ভব উচিত ঋণ সহায়তা পরিহার করে নিজেদের উৎপাদিত দ্রব্য ও পণ্য ব্যবহার করে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা।

০২। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (IMF) ভূমিকা পর্যালোচনা করুন। *[৩০তম বিসিএস]*

উত্তর : বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার একেবারে প্রথম দিকেই রিলিফ বা সাহায্যের প্রয়োজন দেখা দেয় এবং তার সূত্র ধরেই বাংলাদেশে প্রথম আবির্ভাব ঘটে নতুন ধরনের বৈদেশিক সাহায্য সংস্থার। সে সময় বিশ্বব্যাংকের সভাপতি 'ম্যাকনামারা'-এর দৃষ্টি অনুন্নত ও পশ্চাদমুখী দেশগুলোর গ্রামাঞ্চলে পড়লে গ্রামের উন্নয়নের জন্য বিশ্বব্যাংক সরকারি ও বেসরকারি নানা কর্মসূচির মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও গ্রামীণ দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য তাদের নতুন নীতি নির্ধারণ করে। স্বাধীনতার পর থেকেই বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশকে সাহায্য দেয়ার শর্ত হিসেবে অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণে মূল ভূমিকা পালন করে আসছে।

তবে বর্তমানে নানা তথ্য প্রমাণ, যুক্তি দিয়ে এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ নিঃস্বার্থভাবে স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য করার জন্য গড়ে ওঠেনি বরং সরাসরি উপনিবেশবাদের অবসান আরম্ভ হওয়ার পর সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর বিশেষত ইউরোপের দেশগুলোর বিপর্যস্ত অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্য, যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউরোপকে পুনর্গঠন করার জন্য এবং অর্থনৈতিক সাম্রাজ্য বজায় রাখা এবং তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর বাজার দখল করে রাখার জন্যই এসব প্রতিষ্ঠান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে গড়ে ওঠে।

বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর পরিচয় : ১৯৪৪-এর জুলাইয়ে ব্রেটন উডস চুক্তি অনুযায়ী ১৯৪৫-এর ডিসেম্বর মাসে আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের সূচনা ঘটে। প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র থেকে একজন গভর্নর নিয়ে IMF গর্ভনর পর্ষদ গঠিত হয়। এটিই (Band of Governors) অর্থ তহবিলের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ। তহবিলের দৈনন্দিন কাজ পরিচালনার জন্য ১৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি কার্যকরী পরিচালক পর্ষদ (Board of Executive Directors) আছে যার স্থায়ী সদস্য হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, চীন ও ভারত। বাংলাদেশ এর সদস্য হয় ১৯৭২ সালের ১০ মে। বলা হয়, যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগুলোর অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও অনুন্নত দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনের উদ্দেশ্যে ব্রেটন উডস চুক্তি অনুযায়ী বিশ্বব্যাংক স্থাপিত হয়। বিশ্বব্যাংক IBRD ও IDA নামক দুটি আর্থিক সংস্থা নিয়ে গঠিত। এর মধ্যে IBRD ১৯৪৪ সালের জুন থেকে কাজ শুরু করে। অন্যদিকে, এ দুটি সংস্থাসহ মোট ৫টি পৃথক সংস্থা নিয়ে বিশ্বব্যাংক গ্রুপ প্রতিষ্ঠিত। তা হলো–

1. IBRD— International Bank for Reconstruction and Development
2. IDA— International Development Association.
3. IFC— International Finance Corporation.

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

4. MIGA— Multilateral Investment Guarantee Agency.
5. ICSID—International Centre for Settlement of Investment Disputes.

IBRD, IDA এবং IFC এ ৩টি সংস্থাই আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ঋণ প্রদান করে থাকে।

১৯৭২ সালে বাংলাদেশে কাজ শুরু করে বিশ্বব্যাংক। বাংলাদেশে বিশ্বব্যাংকের মিশন প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন ইয়ুজড ফাল্যান্ড। বহু রাজনৈতিক আলাপ আলোচনা ও বিতর্কের পর ১৯৭২ সালের সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশ বিশ্বব্যাংকের সদস্য হয়।

ঋণদানে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর শর্ত : সাহায্য গ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহের আমদানি রপ্তানি নীতি, আয়কর, শুল্ক, ভ্যাট, গ্যাস ও বিদ্যুতের মূল্য কি পরিমাণ বাড়াতে হবে তারই একটি নীতি নির্ধারণী রিপোর্ট পেশ করে বিশ্বব্যাংক সেই রাষ্ট্রগুলোর সরকারের কাছে। প্রতিবছর সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রের সরকারগুলোকে তাদের বাজেট তৈরি করতে হয়, না করা হলে দাতাগোষ্ঠীর সাহায্য বন্ধ হয়ে যাবে বলে হুঁশিয়ারী দেয়া হয়। বিশ্বব্যাংক, আইএমএফসহ অন্যান্য দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক সূত্র থেকে এসব ঋণ এসে থাকে। গুণগত ও পরিমাণগত উভয় বিবেচনাতেই এ ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংকের ঋণের পরিমাণ কমেছে শতকরা ০.৬৮ ভাগ হারে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF)-এর ভূমিকা : ১৯৭২-৮৬ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকার ১১৬৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ১৩টি গুরুত্বপূর্ণ Import Program Credits (IPC) এ স্বাক্ষর করেছে। প্রথম ৩টি ঋণ চুক্তি স্বাধীনতা পরবর্তী পুনর্বাসনকে ঘিরে করা হয়েছিল । বাকি সব ঋণই শর্তসাপেক্ষ যেখানে সেক্টরভিত্তিক, সামষ্টিক অর্থনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্গঠনের কথা বলা হয়েছে। সরকার ১৯৮৬-৮৭ সালে আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (IMF) প্রণীত তিন বছরমেয়াদি স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট ফ্যাসিলিটি (SAF) চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। একই সাথে বিশ্বব্যাংকের সাথেও নানা ধরনের সেক্টরভিত্তিক সমন্বয় কর্মসূচি ও বিনিয়োগ ঋণ এর চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। দু' পক্ষের মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে (১৯৮৯, ১৯৯০) বিস্তৃত আলাপ আলোচনার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ IMF প্রবর্তিত তিন বছর মেয়াদি Enhanced Structural Adjustment Facility (ESAF) নামক আরও একটি কর্মসূচিতে চুক্তিবদ্ধ হয়। চুক্তিবদ্ধ ২৯টি দেশের মধ্যে অন্যতম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ১৯৮৭ সালে IMF প্রবর্তিত ESAF-এর অধিভুক্ত হয়েছিল। এর ধারাবাহিকতায় বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের পরামর্শ মতো সর্বশেষ বাংলাদেশ সরকার 'দারিদ্র্য দূরীকরণ কৌশলপত্র' প্রস্তুত করে। আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ধারাবাহিক পরামর্শ গ্রহণের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে বাংলাদেশ নয়া উদারনৈতিক (Neo liberal) অর্থনৈতিক দর্শনের বৃত্তের মধ্যে ঢুকে পড়ে।

এসব নীতিমালার বাস্তবায়ন দরিদ্র দেশগুলোর সমাজ, অর্থনীতি ও জীবনযাত্রায় মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। এসব নীতিমালা কার্যত কথাকথিত বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত ধনীকে আরও ধনী ও দরিদ্র্যকে আরও দরিদ্র করে তুলছে।

বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশে আইএমএফ, এডিবির উন্নয়নের প্রকৃত চিত্র : 'বিদেশি সাহায্য' আসলে কি এবং কাদের প্রতিনিধিত্ব করে এবং তার প্রতিশ্রুতি এবং বাস্তব চেহারা কি তা আমাদের নিকট ধীরে ধীরে প্রকাশিত হচ্ছে। আমরা দেখেছি বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের নামে পুঁজি প্রবাহের পরিমাণ সবসময়ই নিম্নগামী ছিল। এখানে যা কার্যকর রয়েছে তা হলো 'বিদেশী সাহায্য' নামে পুঁজির প্রবাহ। বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে বহুজাতিক বিভিন্ন

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

উপসংহার : একটি স্বাধীন দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে পরনির্ভরশীল করে দেয়ার অন্যতম হাতিয়ার হলো ঋণ ব্যবস্থা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান ঋণ দেয়ার নামে তৃতীয় বিশ্বের অর্থনৈতিক বাজার দখল করে নিজেদের উৎপাদিত পণ্যের বাজার সৃষ্টি করে। তাছাড়া IMF, WB, ADB যে সকল শর্তে তৃতীয় বিশ্বে ঋণ প্রদান করে, এতে করে সে সকল দেশের গণতন্ত্র, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়া দারুণভাবে বাধাগ্রস্ত হয়। তাই বাংলাদেশের যথাসম্ভব উচিত ঋণ সহায়তা পরিহার করে নিজেদের উৎপাদিত দ্রব্য ও পণ্য ব্যবহার করে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা।

০২। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (IMF) ভূমিকা পর্যালোচনা করুন। *[৩০তম বিসিএস]*

উত্তর : বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার একেবারে প্রথম দিকেই রিলিফ বা সাহায্যের প্রয়োজন দেখা দেয় এবং তার সূত্র ধরেই বাংলাদেশে প্রথম আবির্ভাব ঘটে নতুন ধরনের বৈদেশিক সাহায্য সংস্থার। সে সময় বিশ্বব্যাংকের সভাপতি 'ম্যাকনামারা'-এর দৃষ্টি অনুন্নত ও পশ্চাদমুখী দেশগুলোর গ্রামাঞ্চলে পড়লে গ্রামের উন্নয়নের জন্য বিশ্বব্যাংক সরকারি ও বেসরকারি নানা কর্মসূচির মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও গ্রামীণ দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য তাদের নতুন নীতি নির্ধারণ করে। স্বাধীনতার পর থেকেই বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশকে সাহায্য দেয়ার শর্ত হিসেবে অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণে মূল ভূমিকা পালন করে আসছে।

তবে বর্তমানে নানা তথ্য প্রমাণ, যুক্তি দিয়ে এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ নিঃস্বার্থভাবে স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য করার জন্য গড়ে ওঠেনি বরং সরাসরি উপনিবেশবাদের অবসান আরম্ভ হওয়ার পর সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর বিশেষত ইউরোপের দেশগুলোর বিপর্যস্ত অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্য, যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউরোপকে পুনর্গঠন করার জন্য এবং অর্থনৈতিক সাম্রাজ্য বজায় রাখা এবং তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর বাজার দখল করে রাখার জন্যই এসব প্রতিষ্ঠান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে গড়ে ওঠে।

বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর পরিচয় : ১৯৪৪-এর জুলাইয়ে ব্রেটন উডস চুক্তি অনুযায়ী ১৯৪৫-এর ডিসেম্বর মাসে আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের সূচনা ঘটে। প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র থেকে একজন গভর্নর নিয়ে IMF গভর্নর পর্ষদ গঠিত হয়। এটিই (Band of Governors) অর্থ তহবিলের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ। তহবিলের দৈনন্দিন কাজ পরিচালনার জন্য ১৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি কার্যকরী পরিচালক পর্ষদ (Board of Executive Directors) আছে যার স্থায়ী সদস্য হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, চীন ও ভারত। বাংলাদেশ এর সদস্য হয় ১৯৭২ সালের ১০ মে। বলা হয়, যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগুলোর অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও অনুন্নত দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনের উদ্দেশ্যে ব্রেটন উডস চুক্তি অনুযায়ী বিশ্বব্যাংক স্থাপিত হয়। বিশ্বব্যাংক IBRD ও IDA নামক দুটি আর্থিক সংস্থা নিয়ে গঠিত। এর মধ্যে IBRD ১৯৪৪ সালের জুন থেকে কাজ শুরু করে। অন্যদিকে, এ দুটি সংস্থাসহ মোট ৫টি পৃথক সংস্থা নিয়ে বিশ্বব্যাংক গ্রুপ প্রতিষ্ঠিত। তা হলো–

1. IBRD— International Bank for Reconstruction and Development
2. IDA— International Development Association.
3. IFC— International Finance Corporation.

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

4. MIGA— Multilateral Investment Guarantee Agency.
5. ICSID—International Centre for Settlement of Investment Disputes.

IBRD, IDA এবং IFC এ ৩টি সংস্থাই আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ঋণ প্রদান করে থাকে।

১৯৭২ সালে বাংলাদেশে কাজ শুরু করে বিশ্বব্যাংক। বাংলাদেশে বিশ্বব্যাংকের মিশন প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন ইয়ুজড ফাল্যান্ড। বহু রাজনৈতিক আলাপ আলোচনা ও বিতর্কের পর ১৯৭২ সালের সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশ বিশ্বব্যাংকের সদস্য হয়।

ঋণদানে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর শর্ত : সাহায্য গ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহের আমদানি রপ্তানি নীতি, আয়কর, শুল্ক, ভ্যাট, গ্যাস ও বিদ্যুতের মূল্য কি পরিমাণ বাড়াতে হবে তারই একটি নীতি নির্ধারণী রিপোর্ট পেশ করে বিশ্বব্যাংক সেই রাষ্ট্রগুলোর সরকারের কাছে। প্রতিবছর সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রের সরকারগুলোকে তাদের বাজেট তৈরি করতে হয়, না করা হলে দাতাগোষ্ঠীর সাহায্য বন্ধ হয়ে যাবে বলে হুঁশিয়ারী দেয়া হয়। বিশ্বব্যাংক, আইএমএফসহ অন্যান্য দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক সূত্র থেকে এসব ঋণ এসে থাকে। গুণগত ও পরিমাণগত উভয় বিবেচনাতেই এ ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংকের ঋণের পরিমাণ কমেছে শতকরা ০.৬৮ ভাগ হারে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF)-এর ভূমিকা : ১৯৭২-৮৬ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকার ১১৬৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ১৩টি গুরুত্বপূর্ণ Import Program Credits (IPC) এ স্বাক্ষর করেছে। প্রথম ৩টি ঋণ চুক্তি স্বাধীনতা পরবর্তী পুনর্বাসনকে ঘিরে করা হয়েছিল । বাকি সব ঋণই শর্তসাপেক্ষ যেখানে সেক্টরভিত্তিক, সামষ্টিক অর্থনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্গঠনের কথা বলা হয়েছে। সরকার ১৯৮৬-৮৭ সালে আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (IMF) প্রণীত তিন বছরমেয়াদি স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট ফ্যাসিলিটি (SAF) চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। একই সাথে বিশ্বব্যাংকের সাথেও নানা ধরনের সেক্টরভিত্তিক সমন্বয় কর্মসূচি ও বিনিয়োগ ঋণ এর চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। দু' পক্ষের মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে (১৯৮৯, ১৯৯০) বিস্তৃত আলাপ আলোচনার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ IMF প্রবর্তিত তিন বছর মেয়াদি Enhanced Structural Adjustment Facility (ESAF) নামক আরও একটি কর্মসূচিতে চুক্তিবদ্ধ হয়। চুক্তিবদ্ধ ২৯টি দেশের মধ্যে অন্যতম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ১৯৮৭ সালে IMF প্রবর্তিত ESAF-এর অধিভুক্ত হয়েছিল। এর ধারাবাহিকতায় বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের পরামর্শ মতো সর্বশেষ বাংলাদেশ সরকার 'দারিদ্র্য দূরীকরণ কৌশলপত্র' প্রস্তুত করে। আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ধারাবাহিক পরামর্শ গ্রহণের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে বাংলাদেশ নয়া উদারনৈতিক (Neo liberal) অর্থনৈতিক দর্শনের বৃত্তের মধ্যে ঢুকে পড়ে।

এসব নীতিমালার বাস্তবায়ন দরিদ্র দেশগুলোর সমাজ, অর্থনীতি ও জীবনযাত্রায় মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। এসব নীতিমালা কার্যত কথাকথিত বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত ধনীকে আরও ধনী ও দরিদ্র্যকে আরও দরিদ্র করে তুলছে।

বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশে আইএমএফ, এডিবির উন্নয়নের প্রকৃত চিত্র : 'বিদেশি সাহায্য' আসলে কি এবং কাদের প্রতিনিধিত্ব করে এবং তার প্রতিশ্রুতি এবং বাস্তব চেহারা কি তা আমাদের নিকট ধীরে ধীরে প্রকাশিত হচ্ছে। আমরা দেখেছি বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের নামে পুঁজি প্রবাহের পরিমাণ সবসময়ই নিম্নগামী ছিল। এখানে যা কার্যকর রয়েছে তা হলো 'বিদেশী সাহায্য' নামে পুঁজির প্রবাহ। বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে বহুজাতিক বিভিন্ন

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

সংস্থা আর বিদেশি সাহায্যের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করে বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র এবং আইএমএফ এবং বিশ্বব্যাংকের মতো আন্তর্জাতিক লগ্নি সংস্থাসমূহ। নিচে বাস্তবতার প্রেক্ষিতে উন্নয়নশীল বিশ্বে IMF, WB-এর ভূমিকা আলোচিত হলো :

১. **বহুজাতিক সংস্থার বিনিয়োগের ক্ষেত্র প্রস্তুত :** 'বিদেশি সাহায্য' নামের অর্থসংস্থানে শেষ পর্যন্ত বহুজাতিক সংস্থাগুলোর বিনিয়োগ ক্ষেত্রই প্রস্তুত হয়। কারণ, বিভিন্ন রাষ্ট্র ও সংস্থা ঋণ অনুদানের নামে যে অর্থ যোগান দেয় তা দিয়ে মূলত বহুজাতিক সংস্থাগুলোর বাজার প্রস্তুত হয় এবং বিস্তৃত হয়, বাড়ে বিনিয়োগ ক্ষমতা। যেমন– 'সবুজ বিপ্লব' নামের আড়ালে যত বিদেশি সাহায্য এসেছে বিভিন্ন রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে, তা গভীর-অগভীর নলকূপ, সার, কীটনাশক ইত্যাদির বাজার তৈরি করেছে। PL 480 (পিএল ৪৮০) নামের আড়ালে যত খাদ্য সাহায্য এসেছে তা মার্কিন বৃহৎ খামারগুলোর উদ্বৃত্ত খাবার বিক্রির ব্যবস্থাই করেছে।

বিশ্বব্যাংকের আসল উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয় যদি আমরা বিদ্যুৎ খাত উন্নয়নের নামে বিশ্বব্যাংকের বিভিন্ন প্রকল্প, সুপারিশ এবং বিভিন্ন কোম্পানির (বিশেষত মার্কিনি) বিনিয়োগের ধরন ও চুক্তির শর্তাবলীর দিকে লক্ষ করি। আমরা একদিকে গ্যাস খাতে কর্মরত বহুজাতিক বিভিন্ন কোম্পানি থেকে গ্যাস কিনছি যখন ১২০ টাকারও বেশি দামে, তখন বিদ্যুৎ খাতে কর্মরত কোম্পানিগুলো সরকার থেকে গ্যাস কিনছে ৫৪-৫৮ টাকা দরে। চুক্তি অনুযায়ী ২২ বছরের মধ্যে বিদেশি কোম্পানিগুলো বিদ্যুতের দাম বাড়াতে পারবে না বলে এ চুক্তিগুলোকে মহৎ করে তোলা হয়। কিন্তু এ চুক্তির অন্যান্য বিধানগুলো উহ্য রাখা হয় যেখানে বলা আছে যদি গ্যাসের দাম বাড়ে, যদি টাকার অবমূল্যায়ন হয় অথবা যদি সরকারি নীতির পরিবর্তন হয় তাহলে বিদ্যুতের দাম বাড়ানো যাবে।

বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাতের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন সংস্থা এবং বিশ্বব্যাংকসহ বিভিন্ন বিনিয়োগকারী সংস্থার সম্পর্ক পুরনো। ১৯৭৬-৭৭ সাল থেকে বিভিন্ন সংস্থার গঠন, ভাঙন, বিভিন্ন বিনিয়োগ, নীতি, বিভিন্ন বিভাগ তৈরি ইত্যাদি ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র বা বিশ্বব্যাংকের ভূমিকা ছিল মুখ্য। ১৯৯০ সালে ডেসা, ১৯৯৬ সালে ডেসকো, ১৯৯৫ সালে পাওয়ার সেল, ১৯৯৬ সালে পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ এরপর রুরাল পাওয়ার কোম্পানি গঠন প্রক্রিয়ারই ধারাবাহিকতা। ক্রমান্বয়ে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাত বহুজাতিক সংস্থাগুলোর প্রত্যক্ষ আওতায় আসছে। এ প্রক্রিয়াতেই গ্যাস খাতের মতো এখানেও ধীরে ধীরে রাষ্ট্রীয় সংস্থা লোকসানি হয়ে যাচ্ছে।

২. **কৃষিতে নেতিবাচক প্রভাব :** বাংলাদেশের কৃষিকে রপ্তানিমুখী উৎপাদনের দিকে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে বিশ্বব্যাংক কৃষি উন্নয়ন কৌশল নিয়ে বিস্তৃত কাজ শুরু করে ১৯৯৭ সালে। এর মধ্যে বিশ্বব্যাংক, ADB ও USAID 'সামাজিক বনায়ন', 'চিংড়ি প্রকল্প' ইত্যাদি বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ করেছে তা একদিকে পরিবেশ বিপর্যয়ের প্রক্রিয়াকে জোরদার করেছে। অন্যদিকে, কৃষি ভূমিকে সংকুচিত করেছে। বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নের সবুজ বিপ্লবীয় ধারা এমনিতে উৎপাদন বৃদ্ধি করেছে বটে তবে তা হয়েছে কৃষির বৈচিত্রময় ফসলের বিকাশ সম্ভাবনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। আমাদের দেশের নিজস্ব বীজ, যেগুলোর পুষ্টি, স্বাদ বেশি এবং উৎপাদনের খরচের দিক দিয়েও সেগুলোকে ধ্বংস করে তাকে একদা ফসল নির্ভর ব্যবস্থায় পরিণত করে। সার ও কীটনাশক ওষুধের ব্যবহার ফসল পানি ও মাটি সবই বিষাক্ত করেছে। বাংলাদেশে বন্যা বা ফ্লাড একশন প্ল্যান ছিল এসব পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনারই সম্প্রসারিত রূপ যা বিশ্বব্যাংক কর্তৃত্বাধীন পরিকল্পনা। এদের নানা বক্তব্যই

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

সরকারের 'কৃষি নীতি', 'পানি নীতি' নামে বাজারে আছে। অন্যদিকে, বিশ্বব্যাংকের প্রেসক্রিপশনের ফলে সবুজ বিপ্লবের ধারা, বাংলাদেশের আর্সেনিক দূষণ বিস্তার করেছে। এর ফলে দু' কোটি মানুষ এখন বিপদের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে। এ আর্সেনিক দূষণের কারণেও বিশ্বব্যাংক বড় আকারের বিনিয়োগের সুযোগ নিচ্ছে। মার্কিন বিভিন্ন সংস্থাও এর সাথে জড়িত।

৩. **সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ :** বিভিন্ন দাতাগোষ্ঠী, বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ এর পরামর্শ তো বটেই, ক্ষেত্র বিশেষে এদের হুকুম অনুযায়ী সরকারকে চলতে হয়। তাদের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী চলতে হয় বলেই তৎকালীন অর্থমন্ত্রী বলেছিলেন, 'মাটির নিচে গ্যাস পচিয়ে লাভ কী?' এবং ২০০১ সালে চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পরপরই যুক্তরাষ্ট্রের (বিশ্বব্যাংকের অন্যতম নীতি নির্ধারক রাষ্ট্র) বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রদূত মেরি অ্যান পিটার্স বলেছিলেন, 'মাটির নিচে গ্যাস রেখে কোনো লাভ নেই। ' অর্থাৎ বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ ও বিভিন্ন দাতাগোষ্ঠীর চাপের ফলেই যে প্রতিটি সরকার বিভিন্ন নীতি গ্রহণে বাধ্য হন তা বোঝা যায়। এসব দাতাগোষ্ঠীর হুমকির মুখে পড়তে হয় যদি তাদের প্রেসক্রিপশন সরকার মানতে না চায়। স্বল্পোন্নত দেশগুলোর বিভিন্ন খাতে ভর্তুকি বন্ধ করতে, বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান, কলকারখানা বন্ধ করতে এবং ব্যক্তিমালিকানায় ছেড়ে দিতে পরামর্শ দেয় বিশ্বব্যাংক এবং আইএমএফ এর ফলে স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে এখন একে একে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কলকারখানা, বেড়ে যাচ্ছে বেকারত্ব। মন্দা থেকে মন্দাতর হচ্ছে অর্থনৈতিক অবস্থা। শিক্ষাক্ষেত্রে এবং কৃষিক্ষেত্রে ভর্তুকি কমিয়ে দিতে বলার কারণে বেড়ে যাচ্ছে শিক্ষা ও কৃষি উৎপাদন ব্যয়। ফলে নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্তের জন্য শিক্ষা গ্রহণ করাই হয়ে পড়ছে কষ্টসাধ্য, বেড়ে যাচ্ছে কৃষি পণ্যের দাম, কৃষক হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির বদলে তৈরি হচ্ছে বেকারত্ব, শিক্ষার অভাব এবং বৃদ্ধি পাচ্ছে ধনী-গরিবের ব্যবধান। তাই মাথাপিছু আয় বাড়লেও দরিদ্র ও ভূমিহীনের সংখ্যা বাড়ছে।

৪. **প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর প্রভাব বিস্তার :** বিশ্বব্যাংকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকার জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধি করে। একটু খেয়াল করলে দেখবো পেট্রোল ও ফার্নেস ওয়েল উভয়ের দাম বৃদ্ধি করা হলেও দাম বৃদ্ধির হারের ক্ষেত্রে পেট্রোলের চেয়ে ফার্নেস অয়েলের দাম বৃদ্ধি পায় অনেক বেশি। পেট্রোল ব্যবহার করে পুঁজিপতি শ্রেণী যাদের এই দাম বৃদ্ধিতে তেমন কোনো সমস্যা হয় না। অথচ ফার্নেস তেল ব্যবহৃত হয় শিল্পকারখানাগুলোতে ফলে সেই শিল্প কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের দামের সাথে তেলের বর্ধিত মূল্য যোগ হয়ে পণ্যের দাম আরও বৃদ্ধি পায়, যা সাধারণ জনগণকেই কিনতে হয়। আদমজী জুট মিল ও নানা শিল্পকারখানা এই দাতা মুখোশধারী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের পরামর্শ অনুযায়ী বন্ধ করে দিয়েছে সরকার। ফলে ছাটাই হচ্ছে শ্রমিক, বাড়ছে অনিশ্চয়তা, বেকারত্ব এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা, সর্বোপরি অর্থনৈতিক দুর্দশা।

৫. **শোষণের নতুন কৌশল প্রয়োগ :** বিশ্বব্যাংক ও দাতা গোষ্ঠী বাজার অর্থনীতি চালুর মাধ্যমে স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে অসম প্রতিযোগিতায় ঠেলে দিয়েছে। আমরা দেখি এর ফলে আমাদের শিল্প ও পণ্যের বাজার দখল করে নিয়েছে ভারত ও অন্যান্য দেশ। ভারত থেকে প্রতিবছর ৪০০ কোটি ডলারের বেশি পণ্য সামগ্রী অফিসিয়ালি আমদানি করে বাংলাদেশ, বিপরীতে ভারত মাত্র ৫০ কোটি ডলারের মতো পণ্য সামগ্রী বাংলাদেশ থেকে আমদানি করে। তাই বিশ্বব্যাংক ও IMF যে মুক্তবাজার অর্থনীতির কথা বলছে সেখানে বাণিজ্যে সমতা নেই উল্টো বাণিজ্য প্রভুত্ব চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৬. **NGO-র মাধ্যমে শোষণ :** অভিযোগ আছে দারিদ্রের বাণিজ্যিকীকরণের (Commercialigation of Poverty) লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংক ও অন্যান্য দাতাগোষ্ঠী সরকারকে বাদ দিয়ে এনজিও-র মাধ্যমে বাংলাদেশের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডগুলো পরিচালনার জন্য সরকারকে চাপ দিচ্ছে। NGOগুলোর সরকারের কাছে কোনো জবাবদিহিতা নেই। বাজার অর্থনীতি ও বিশ্বায়নের সুবাদে প্রতিবছর বিদেশ থেকে আসা টাকা এনজিও কার্যক্রমের মাধ্যমে কিভাবে জাতীয় উন্নয়নে ব্যয় হয় তার নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ প্রয়োজন। দরিদ্র মানুষকে ক্ষুদ্র ঋণ দিয়ে সাবলম্বী করে তোলার নামে এ এনজিওগুলো ব্যাপক হারে সুদ নিয়ে তাদেরকে প্রচণ্ড শোষণ ও নির্যাতন করছে।

বিভিন্ন দাতা গোষ্ঠী, বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের কাছ থেকে যে ঋণ সাহায্য পাই তাতে আমরা স্বনির্ভর তো হচ্ছিই না বরং দিনকে দিন বাড়ছে ঋণের পরিমাণ।

সুতরাং এসব আলোচনা থেকে আমরা জোর দিয়েই বলতে পারি বিশ্বব্যাংক এবং আইএমএফ এর ভূমিকা মোটেও সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। বরং এসব প্রতিষ্ঠানের কারণেও স্বল্পোন্নত দেশগুলো এখনও তাদের নিজস্ব সম্পদ ও জনশক্তি থাকা সত্ত্বেও দরিদ্রতা দূর করতে পারছে না।

বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ নিজেরা স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার কথা বলে, অথচ এ প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেরাই তা মানে না। যেমন—

– ঋণগ্রহীতা দেশগুলোতে কি ধরনের কার্যক্রম পরিচালিত হবে তার খসড়া পরিকল্পনা বিশ্বব্যাংক কখনো প্রকাশ করে না। এমনকি জি-৭ ভুক্ত দেশগুলোর আবেদনকেও বিশ্বব্যাংক আমলে আনেনি।
– কাঠামোগত দলিল দস্তাবেজ ও এর খসড়া পর্যন্ত বিশ্বব্যাংক কোথাও প্রকাশ করেনি।
– প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে যে রিপোর্ট প্রস্তুত করে সেগুলো বিশ্বব্যাংক কাউকে দেখাতে চায় না।

উপসংহার : বিশ্বব্যাংক এবং IMF যে নিজেরাই নিজেদের কৃতকর্ম নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত এবং তাদের কাজ যে ন্যায় ভিত্তিক নয় এটা জানে এবং সেজন্যই তারা বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠান হিসেবে তাদের সকল কাজের 'দায়মুক্তি' চায় সরকারের কাছে। তাই আমাদের এখন আর সবকিছু জেনে বুঝে চুপ করে থাকলে চলবে না। নিজেদের উন্নতির পথ নিজেদের করে নিতে হবে। দেশীয় সম্পদ ও জনগোষ্ঠীকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের দারিদ্র্য বিমোচনের পথ খুঁজে নিতে হবে।

০৩। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB)-এর ভূমিকা পর্যালোচনা করুন। *[৩০তম; ২৭তম বিসিএস]*

উত্তর : জাতিসংঘের এশিয়া এবং দূরপ্রাচ্য সম্পর্কিত অর্থনৈতিক সহযোগিতা (Economic Co-operation for Asia and Far East—ECAFE)-এর সদস্য দেশের মন্ত্রিবর্গ ১৯৬৩ সালের ডিসেম্বরে ম্যানিলায় অনুষ্ঠিত বৈঠকে এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ১৯৬৫ সালে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার দ্বিতীয় বৈঠকে এ ব্যাংক স্থাপনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করা হয়। ১৯৬৬ সালে এটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তখন থেকে ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলায় (সদর দপ্তর) এর কার্যক্রম শুরু হয়। এটি একটি বহুজাতিক আঞ্চলিক উন্নয়ন ব্যাংক। এর আওতাধীন দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সহযোগিতার লক্ষ্যে এটি স্থাপিত হয়। এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংককে সংক্ষেপে এডিবি (ADB– Asian Development Bank) বলে। বর্তমানে এ ব্যাংকের সদস্য সংখ্যা ৬৭।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের গঠন : এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সাংগঠনিক কাঠামোতে রয়েছে একজন সভাপতি, সহ-সভাপতি এবং একটি বোর্ড অব গভর্নরস। বোর্ড অব গভর্নরস ব্যাংকের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী পরিষদ। এতে প্রত্যেক দেশের প্রতিনিধি রয়েছে। বারজন পরিচালক নিয়ে গঠিত হয়েছে একটি পরিচালনা পরিষদ। এর মধ্যে ৮ জন আঞ্চলিক এবং ৪ জন অ-আঞ্চলিক সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করে। এ পরিষদ ব্যাংকের দৈনন্দিন কার্যাবলী পরিচালনা করে। ব্যাংকের সভাপতি পদাধিকার বলে এ পরিষদের চেয়ারম্যান। সভাপতির অবর্তমানে সহ-সভাপতি তার দায়িত্ব পালন করেন।

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের মূলধন : এ ব্যাংক বন্ড ইস্যু করে এর তহবিল বৃদ্ধি করতে পারে। প্রয়োজনবোধে এর অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণও বাড়াতে পারে। উপরন্তু আন্তর্জাতিক বাজারে বন্ড বিক্রয় করে এ ব্যাংক মূলধন সংগ্রহ করতে পারে।

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী : এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের মুখ্য উদ্দেশ্যগুলো হলো :

১. ECAFE-এর সদস্য দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নে মূলধন বিনিয়োগ করা।
২. সদস্য দেশগুলোতে সরকারি ও বেসরকারি মূলধন কার্যকরভাবে বিনিয়োগে সহায়তা করা।
৩. সদস্য দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক সাহায্য ও সহযোগিতা জোরদার করা।
৪. কম উন্নত দেশের প্রাপ্ত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারে সহযোগিতা করা।
৫. ECAFE ভুক্ত দেশগুলোর মধ্যকার প্রবৃদ্ধিগত বৈষম্য দূর করতে সহায়তা করা।
৬. অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্বল্পোন্নত সদস্য দেশে অধিক মূলধন বিনিয়োগ করা।
৭. উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, অর্থায়ন এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কৌশলগত সহযোগিতা প্রদান করা।
৮. অপেক্ষাকৃত স্বল্প হার সুদে সদস্য দেশগুলোকে ঋণ প্রদান।
৯. সামাজিক খাতের উন্নয়নে বিনিয়োগ পরিচালনা।
১০. সদস্য দেশসমূহে মৌলিক গবেষণা ও উন্নয়নমূলক প্রকল্পে ঋণদান।
১১. বিনিয়োগযোগ্য বিভিন্ন প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই ও প্রাক-মূল্যায়ন।
১২. সদস্য দেশগুলোর বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মধ্যে প্রয়োজন অনুযায়ী সমন্বয় সাধনের ব্যবস্থা গ্রহণ।
১৩. জাতিসংঘ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সহযোগিতা ও সমন্বয় সাধন।

উপরিউক্ত কার্যাবলী সম্পাদনের মাধ্যমে এডিবি সদস্য দেশসমূহের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, তাইওয়ান, হংকং, দক্ষিণ কোরিয়া, বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এডিবির অবদান অনস্বীকার্য।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের ভূমিকা : বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংকের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশ ১৯৭৩ সালে এডিবির সদস্য হওয়ার পর থেকেই আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রকল্পে এডিবি আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে আসছে। এডিবি নিম্নলিখিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট। যথা :

১. কৃষি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ক খাত; যেমন– বনজসম্পদ, পশুসম্পদ, মৎস্যসম্পদ, শস্য উৎপাদন, কৃষি ঋণ, সেচ সুবিধা এবং পানিসম্পদ উন্নয়ন।
২. শক্তিসম্পদ খাতের উন্নয়ন; যেমন– বিদ্যুৎ উৎপাদন, বিতরণ ও সঞ্চালন এবং গ্যাসক্ষেত্রের উন্নয়ন।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৩. পরিবহন ও যোগাযোগ খাতের উন্নয়ন; যেমন– রেলওয়ে, রাস্তা, সেতু, বন্দর উন্নয়ন এবং টেলিযোগাযোগ খাতের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ। বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ সড়ক সেতু 'যমুনা নদীর উপর সেতু' নির্মাণে এ ব্যাংকের আর্থিক সহযোগিতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।
৪. সামাজিক অবকাঠামো খাত; যেমন– শিক্ষা খাতের উন্নয়ন। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক, উচ্চশিক্ষা, অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা, গ্রামীণ প্রশিক্ষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে এ ব্যাংকের সহযোগিতা উল্লেখযোগ্য। 'বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের' প্রতিষ্ঠা এডিবি'র সরাসরি আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতার ফল।
৫. স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা খাতের উন্নয়ন।
৬. নগর উন্নয়ন, নগরীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ এবং বস্তিবাসীদের উন্নয়ন।
৭. দারিদ্র্য বিমোচন এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি।
৮. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থান ও আয় উপার্জনের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে নারীর উন্নয়ন।
৯. বেসরকারি উদ্যোক্তাগণকে সহায়তা প্রদান।

উপসংহার : বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক উপরিউক্ত ক্ষেত্রসমূহে বিভিন্ন প্রকল্পে আর্থিক ও কারিগরী সহায়তা দানের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। যদিও তাদের এ ভূমিকা সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। তারপরও বলা যায় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সহযোগিতা প্রদানে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

০৪ । বাংলাদেশের সাথে অন্যান্য দেশের কতটি আঞ্চলিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি আছে? বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি নিরসনে আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তিগুলো কি ধরনের ভূমিকা রাখতে পারে? আলোচনা করুন। *[৩১তম বিসিএস]*

উত্তর : অ্যাডাম স্মিথের Absolute Advantage Theory এবং ডেভিড রিকার্ডোর Comparative Advantage Theory-র ওপর নির্ভর করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যাপকতা লাভ করে। মুক্তবাজার অর্থনীতিতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে উৎসাহিত করা হলেও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে নিরুৎসাহিত করা হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সূচনালগ্নে পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক উভয় ব্যবস্থাতেই আমদানির ওপর উচ্চহারে শুল্ক আরোপ করা হতো। দ্বিপাক্ষিক ও আঞ্চলিক বাণিজ্যকে সহজীকরণ ও সম্প্রসারণের ফল থেকেই মূলত বিভিন্ন আঞ্চলিক ও ভৌগোলিক অর্থনৈতিক ব্লকের জন্ম।

বাংলাদেশের সাথে অন্যান্য দেশের আঞ্চলিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি : বাংলাদেশের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সূত্রমতে SAFTA হচ্ছে এ অঞ্চলে সম্পাদিত মুক্ত বাণিজ্য সংক্রান্ত একমাত্র চুক্তি যা বাংলাদেশ স্বাক্ষর করেছে। বর্তমানে এটি সব সদস্য দেশের জন্য পুরোপুরি মুক্ত নয়। মুক্ত বাণিজ্যের সুবিধা গ্রহণের জন্য কিছু শর্ত রয়েছে। LDC (Least Developed Country) বা স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ এ অঞ্চলের অন্যান্য দেশে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে শুল্কমুক্ত সুবিধা লাভ করে। কিন্তু পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে আমদানিকৃত পণ্যের উপর শুল্ক বহাল রয়েছে।

ঢাকায় ত্রয়োদশ এবং নয়াদিল্লিতে চতুর্দশ সার্ক সম্মেলনে এবং পরে সার্কভুক্ত দেশসমূহের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনে সার্ভিস বা সেবা বিনিয়োগের ব্যাপারেও একটি চুক্তি স্বাক্ষরের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল। এতে ৩৩টি আর্টিকেল আছে। এ আর্টিকেলগুলো GATS তথা General Agrements on Trade in Services-এর আর্টিকেল এর মতো।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

২০০৮ সালের আগস্ট মাসে এ অঞ্চলে বাংলাদেশের সাথে ভারত, শ্রীলংকা ও পাকিস্তানের দ্বিপাক্ষিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির বিষয়ে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যাতে BFTI তথা Bangladesh Foreign Trade Institute এর প্রধান নির্বাহীকে প্রধান করে অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সম্প্রতি এ কমিটি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর তাদের রিপোর্ট পেশ করেছে।

বাণিজ্য ঘাটতি নিরসনে আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তি : আঞ্চলিক বাণিজ্যিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশ তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহে যে পরিমাণ রপ্তানি করে তার চেয়ে অনেক বেশি আমদানি করে। যদি বাংলাদেশের সাথে অন্যান্য দেশের বিশেষ করে আঞ্চলিক দেশসমূহের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি থাকে তাহলে বাণিজ্য ঘাটতির উপর তার কিরূপ প্রভাব পড়বে তা কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিটি কিভাবে ডিজাইন করা হলো সেটাই আসল কথা।

ভারতের সাথে বাণিজ্য চুক্তি জোরদার করা : বাণিজ্য ঘাটতি নিরসনে আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তি ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। বাংলাদেশে তৈরি কয়েকটি পণ্য যেমন মেলামাইন সামগ্রী, চামড়াজাত দ্রব্য, পান-সুপারি প্রভৃতির ব্যাপক চাহিদা রয়েছে ভারতে। আঞ্চলিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি হলে ভারতসহ প্রতিবেশী দেশসমূহে এসব পণ্য রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। যা বাণিজ্য ঘাটতি নিরসনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। বর্তমানে ভারত তার সংবেদনশীল পণ্য তালিকায় (Sensitive List) এসব পণ্য রাখায় এগুলো পর্যাপ্ত পরিমাণ রপ্তানি করা যাচ্ছে না। তাই মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি হলেও ভারত যদি তখনও এসব পণ্যকে তাদের সংবেদনশীল পণ্য তালিকায় রেখে দেয় তাহলে আঞ্চলিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি বাণিজ্য ঘাটতি নিরসনে উল্টো নেতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে। ভারতের কথা এখানে প্রণিধানযোগ্য এ কারণে যে এ দেশটি এ অঞ্চলে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বাণিজ্য অংশীদার। এ অঞ্চলে ভারতের সাথেই বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি সবচেয়ে বেশি। তাই ভারতের সাথে বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে পারলে বাংলাদেশের মোট বাণিজ্য ঘাটতি বহুলাংশে কমে আসবে।

এখানে উল্লেখ্য যে, ভারত ও মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের যে বৈধ বাণিজ্য তথা Formal Trade হয় তার চেয়ে বেশি হয় অবৈধ পথে চোরাচালানীর মাধ্যমে Informal Trade. মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সঠিকভাবে কার্যকর করে এসব অবৈধ বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করে বাণিজ্য ঘাটতি কমানো সম্ভব।

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি হলে বাংলাদেশের উপর ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় প্রভাবই পড়বে। নেতিবাচক প্রভাবগুলোর মধ্যে রয়েছে– আমাদের দেশীয় Infant Industry যেগুলো উদীয়মান শিল্প হিসেবে আবির্ভূত হতে যাচ্ছে সেগুলো হারাবো। কারণ ভারত থেকে কম মূল্যের নিম্নমানের পণ্য এসে আমাদের বাজার দখল করে আমাদের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধ্বংস করে পরে নিজেদের বাণিজ্যিক স্বার্থ হাসিল করবে। আবার ডাম্পিং এর মাধ্যমেও ভারত বিভিন্ন পণ্যের বাজার দখল করতে চাইবে।

তবে ভারত বর্তমান বিশ্বে একটি বৃহৎ অর্থনৈতিক শক্তি। তাই ভারতের সাথে সুকৌশলে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে যদি আমরা আগাতে পারি তাহলে বাণিজ্য ঘাটতি কমানো সম্ভব হতে পারে। এক্ষেত্রে ভারত-শ্রীলংকা দ্বিপাক্ষিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এ চুক্তিতে শুধু পণ্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে শুল্ক মুক্তির কথা বলা হয়নি বরং ভারতের মুদ্রাবাজারকেও শর্ত শিথিল করে ঋণ প্রদানের কথা রয়েছে। এটি ভারতের সাথে শ্রীলংকার বাণিজ্য ঘাটতি অনেকটা কমিয়ে এনেছে। তাই বাংলাদেশও যদি এ ধরনের চুক্তিতে আঞ্চলিক মুক্ত বাণিজ্যে লিপ্ত হয় তাহলে আশা করা যায় বাণিজ্য ঘাটতি কমবে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

বাণিজ্যে চীনের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা : আঞ্চলিক মুক্ত বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমাদেরকে চীনের কথাও মাথায় রাখতে হবে। কেবল ভারতের সাথে সব ধরনের বাণিজ্য করে অতিনির্ভরশীল না হয়ে আমাদেরকে চীনের সাথেও এ ধরনের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে বাণিজ্য বহুমুখীকরণ করতে হবে। এর ফলে একদিকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংঘটিত ঝুঁকি হ্রাস পাবে অন্যদিকে বাণিজ্য ঘাটতি কমবে। যেহেতু চীন বর্তমান বিশ্বে প্রযুক্তিতে অনেক এগিয়ে রয়েছে তাই চীনের সাথে মুক্ত বাণিজ্যের মাধ্যমে আমাদের দেশে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ সাধন সম্ভব।

উপসংহার : বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বাণিজ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কার্যকর এবং সঠিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে বাণিজ্য ঘাটতি নিরসন সম্ভব। তবে সে লক্ষ্যে দেশের অভ্যন্তরে সঠিক শিল্পনীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন জরুরি।

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

০৫ । মুক্তবাজার অর্থনীতি সম্পর্কে বিশদ আলোচনাপূর্বক বাংলাদেশে এর গ্রহণযোগ্যতা তুলে ধরে করণীয় কি আলোকপাত করুন।

উত্তর : স্নায়ুযুদ্ধোত্তর নতুন বিশ্বব্যবস্থার পরিমণ্ডলে প্রতিনিয়তই ঘটছে পরিবর্তন। এক নতুন পৃথিবীর জন্ম হচ্ছে আমাদের সামনে। শুধু রাজনৈতিক পরিবর্তন নয়, অর্থনৈতিক পরিবর্তনও এর একটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আর এক্ষেত্রে মুক্তবাজার অর্থনীতি এখন বিশ্বের অর্থনৈতিক পরিবর্তন প্রবাহে প্রধান অনুঘটকের ভূমিকা পালন করছে। বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় উৎপাদন এবং দারিদ্র্যের হার যখন সমান্তরালে বেড়ে চলেছে ঠিক তখনই বিশ্ব অর্থনীতিতে আর একটি নতুন অর্থনীতির মাত্রা যোগ হয়েছে। নতুন এ অর্থনীতির নাম মুক্তবাজার অর্থনীতি।

মুক্তবাজার অর্থনীতি : 'মুক্তবাজার অর্থনীতি' বা 'বাজার অর্থনীতি' শব্দবন্ধটি এখন ব্যাপকভাবে আলোচিত হচ্ছে। মুক্তবাজার অর্থনীতি এমন এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে সম্পদের বণ্টন এবং উৎপাদন সম্পর্কিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় মূল্য বা দামের ভিত্তিতে, যা কিনা পক্ষান্তরে নির্ধারিত হয় ভোক্তা, শ্রমিক এবং উৎপাদনের উপকরণসমূহের স্বত্বাধিকারীদের স্বতঃস্ফূর্ত মিথস্ক্রিয়ার ফলে। এই ধরনের ব্যবস্থায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া বিকেন্দ্রীভূত হয়ে থাকে অর্থাৎ সিদ্ধান্তসমূহ প্রণীত হয় কেন্দ্রীয় পরিকল্পনাকারীদের পরিবর্তে অর্থনীতিতে স্বাধীনভাবে কর্মরত গোষ্ঠীসমূহ এবং ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক।

অন্যভাবে বলা যায়, এটি হলো অর্থনৈতিক সংগঠনের এমন এক অবস্থা, যেখানে সংশ্লিষ্ট অর্থনীতিতে কি কি দ্রব্য বা সেবা কি কি পদ্ধতিতে কারবার ভোগের জন্য উৎপাদিত হবে, সেসব প্রশ্নের মীমাংসার ভার বাজারের সরবরাহ ও চাহিদাশক্তির ওপর ছেড়ে দেয়া হয়।'

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এ কথা সহজেই অনুধাবন করা যেতে পারে যে, মুক্তবাজার অর্থনীতি হলো কেন্দ্রীয়ভাবে পরিকল্পিত অর্থনীতির বিপরীত একটি প্রত্যয় যা কিনা অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের নেতৃত্বকে প্রচার করে থাকে। উল্লেখ্য, মুক্তবাজার অর্থনীতিকে পুঁজিবাদী অর্থনীতি এবং কেন্দ্রীয়ভাবে পরিকল্পিত অর্থনীতিকে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি নামেও প্রায়শ অভিহিত করা হয়।

মুক্তবাজার অর্থনীতির উপাদান : মুক্তবাজার অর্থনীতির কয়েকটি প্রধান উপাদান হলো : ১. উদারীকরণ (Liberalization), ২. আন্তর্জাতিকীকরণ (Internationalization), ৩. নিয়ন্ত্রণমুক্তকরণ (Deregulation), ৪. ব্যক্তিমালিকানা প্রবর্তন (Privatization)।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

ওপরের চারটি বিষয়ই হলো মুক্তবাজার অর্থনীতির অনিবার্য উপাদান। এই কয়েকটি বিষয় বাস্তবায়ন ছাড়া কোনো দেশেই মুক্তবাজার অর্থনীতি চালু করা সম্ভব নয়। বস্তুত বাণিজ্য উদারীকরণ, সরকারি বিধিনিষেধ শিথিলকরণ, ব্যক্তি উদ্যোগকে উৎসাহ প্রদান প্রভৃতি পদক্ষেপের সম্মিলিত ব্যবস্থাই হলো মুক্তবাজার অর্থনীতি।

মুক্তবাজার অর্থনীতির স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য : মুক্তবাজার নীতি এবং মুক্তবাজার অর্থনীতি প্রায় সমার্থক। মুক্তবাজার অর্থনীতির সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনই হচ্ছে মুক্তবাজার নীতি। অ্যাডাম স্মিথ অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে এ দর্শন প্রথম উপস্থাপন করেন। অ্যাডাম স্মিথের মতে, বাজারে একটা 'অদৃশ্য হাত' আছে, সেই 'অদৃশ্য হাত' চাহিদা সরবরাহের মাধ্যমে উৎপাদন ও বিতরণ প্রক্রিয়া সঠিকভাবে চালিত করে। প্রত্যেকেই সেই প্রক্রিয়াসমূহে নিজের অবস্থান ও প্রয়োজনভিত্তিক অংশগ্রহণ করবে। বাজারে অবাধ প্রতিযোগিতা থাকবে এবং চাহিদা ও সরবরাহের ভিত্তিতে উৎপাদিত পণ্যের দাম নির্ধারিত হবে। ক্রেতারা তাদের চাহিদা, রুচি ও সামর্থ্যের ভিত্তিতে দ্রব্য ক্রয় করবে।

মুক্তবাজার অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল চালিকাশক্তি হবে ব্যক্তি উদ্যোগ। শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাংকিং, পরিবহন, কৃষি, সেবা প্রভৃতি অর্থনীতির সব খাতেই বেসরকারি উদ্যোগের একচেটিয়া প্রাধান্য থাকবে। সরকারি নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে বেসরকারি উদ্যোগ এবং উদ্যমই নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করবে অর্থনীতির প্রকৃতি ও অগ্রগতি। মুক্তবাজার অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে :

১. আমদানি-রপ্তানিতে কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। যে কোনো দ্রব্য যখন খুশি যতটা ইচ্ছা অবাধে আমদানি করা যাবে। অনুরূপভাবে রপ্তানিতেও কোনো বিধিনিষেধ থাকবে না।
২. কোনো পণ্যের ওপর Tariff protection থাকবে না। এর উদ্দেশ্য হলো ভোক্তারা যেন প্রতিযোগিতামূলক দরে সুলভে ভালো পণ্য পেতে পারে তা নিশ্চিত করা। এর আরেকটি উদ্দেশ্য হলো উন্নত দেশের উন্নত মানের পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতায় দেশীয় পণ্যের মান বাড়ানো।
৩. Market Mechanism-এ প্রতিটি পণ্যের মূল্য নির্ধারিত হবে। সরকার কোনো বিশেষ পণ্যের দর বেঁধে দেবে না বা মূল্য নিয়ন্ত্রণ করবে না।
৪. দেশীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সরকার কোনো কোনো ক্ষেত্রে যে ভর্তুকি দিয়ে থাকে তা থাকবে না।
৫. রপ্তানি বাণিজ্য হবে অবাধ, মুক্ত ও হস্তক্ষেপবিহীন, কোনো রকম বিধিনিষেধ থাকবে না। তেমনি কোনো ধরনের বিশেষ ও আর্থিক আনুকূল্যও থাকবে না।
৬. উৎপাদন ও বাণিজ্যিক কার্যক্রমে সরকার কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ বা নিয়ন্ত্রণ আরোপ করবে না।
৭. বিদেশী পুঁজির অনুপ্রবেশ উৎসাহিত করা হবে। বিদেশী বিনিয়োগকারীদের সব রকম উৎসাহ প্রদান এবং অবাধ সুযোগ দেয়া হবে।

ঐতিহাসিক পটভূমিতে মুক্তবাজার অর্থনীতি : ১৯৭০-এর দশক থেকে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ এই সংস্কার প্রক্রিয়া গ্রহণ করার জন্য বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে শুরু করে। শর্ত দাঁড়ায়, বিশ্বব্যাংক বা অন্যান্য দাতার কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য নিতে হলে ঐ সংস্কারের ভিত্তিতেই নিতে হবে। ঐ সংস্কার প্রক্রিয়া গ্রহণ করলেই সাহায্য পাওয়া যাবে, অন্যথায় নয়। অনেক দেশ, বিশেষ করে আফ্রিকার দেশগুলো ঐসব শর্তে সাহায্য নিতে শুরু করলো। আমাদের দক্ষিণ এশিয়ায় শুধু শ্রীলংকাই ১৯৭৭ সালে এই সংস্কার প্রক্রিয়া গ্রহণ করেছিল। পাকিস্তান আশির দশকের গোড়ার দিকে শুরু করলেও ঐ দশকের শেষের দিক পর্যন্ত তেমন এগোয়নি। বাংলাদেশ সংস্কার প্রক্রিয়া গ্রহণ করে

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

১৯৮৭ সালে, তবে তা জোরেশোরে বাস্তবায়ন করে আসছে ১৯৯১ সাল থেকে। ভারত ১৯৯১ সালে সংস্কার প্রক্রিয়া চালু করে। এই হচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ায় বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ কর্তৃক উদ্ভাবিত সংস্কার প্রক্রিয়া তথা মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রচলনের ইতিবৃত্ত।

মুক্তবাজার অর্থনীতির আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে বিশ্ব পরিস্থিতি পাল্টে যায়। অনেকগুলো উপনিবেশ স্বাধীনতা লাভ করে। আবার বিশ্ব রাজনীতিতে প্রবল শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তারা বিশ্ববাজারে নিজেদের অংশ দাবি করে। নতুনভাবে স্বাধীনতা লাভকারী অনেক দেশই সংরক্ষণবাদী নীতি গ্রহণ করে। এ পরিস্থিতিতে ১৯৪৭ সালে হাভানায় মিত্রশক্তিগুলো মিলিত হয় পারস্পরিক বাণিজ্য বৃদ্ধিতে করণীয় নির্ধারণের লক্ষ্যে। মোট ২৩টি রাষ্ট্র নিজেদের মধ্যে বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা শিথিল করার জন্য এক সাধারণ সমঝোতায় উপনীত হয়, যাকে জেনারেল এগ্রিমেন্ট অন ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ (GATT) বলা হয়। বিশ্বের সোয়াশরও বেশি দেশ এই GATT-এর আওতায় চুক্তিবদ্ধ। দেশগুলো ১৯৯৪ সালে চুক্তিতে স্বাক্ষর করায় ১৯৯৫ সাল থেকে GATT রূপান্তরিত হয়েছে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় (World Trade Organization-WTO) যার লক্ষ্য হচ্ছে সারা বিশ্বের বাণিজ্যকে ক্রমান্বয়ে অবাধ করা, শুল্কহার যথাসম্ভব কমিয়ে আনা এবং ক্রমান্বয়ে মুক্তবাজার অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করা। বর্তমানে WTO-র পাশাপাশি আঞ্চলিকভাবেও কিছু মুক্তবাজার অর্থনীতি চালু হয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন চলে গেছে একক মুদ্রায়, আসিয়ান চলে যাচ্ছে শূন্য শুল্কে। মুক্তবাজারের প্রায় অভিন্ন শর্ত নিয়ে আরো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে NAFTA, SAPTA, LAFTA, APEC ইত্যাদি অর্থনৈতিক গোষ্ঠী।

অর্থনীতিবিদরা মনে করেন, আঞ্চলিক বাধা বা অসমতাগুলো যত দ্রুত কমিয়ে এনে আঞ্চলিক মুক্তবাজারের জোটগুলোকে সাবলীল করা যায়, বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তত দ্রুত মুক্তবাজার অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

মুক্তবাজার অর্থনীতির সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ : প্রতিটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থারই কিছু সুবিধা ও অসুবিধা রয়েছে। আর মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রভাব থেকেই আমরা এর সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ চিহ্নিত করতে পারি। নিচে তা উপস্থাপন করা হলো :

মুক্তবাজার অর্থনীতির সুবিধাসমূহ : ১. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বৃদ্ধি। ২. আন্তর্জাতিকভাবে ভোগ বৃদ্ধি। ৩. দরিদ্র দেশগুলোতে আমদানি বৃদ্ধি। ৪. প্রযুক্তির দ্রুততর হস্তান্তর। ৫. অবাধ তথ্যপ্রবাহ। ৬. পুঁজি ও শ্রমের সহজতর সঞ্চালন। ৭. ভোক্তার সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি। ৮. সর্বত্র প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি। ৯. বিকল্প বিবেচনায় ভোক্তার সুবিধা ও স্বাধীনতা। ১০. আন্তর্জাতিকতাবাদের অনিবার্য বিকাশ। ১১. যোগাযোগ ও পরিবহন খাতের সম্প্রসারণ। ১২. সরকারের সর্বময় ক্ষমতা হ্রাস। ১৩. আন্তর্জাতিকভাবে মনোপলির প্রভাব খর্বকরণ। ১৪. পুঁজিবাজারের আন্তর্জাতিকায়ন। ১৫. আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগের উদ্ভব। ১৬. বিদেশী বিনিয়োগের যাতায়াত। ১৭. শিল্প-সংস্কৃতির বিনিময়, মিশ্রণ ও উপার্জন সুবিধা। ১৮. জনগোষ্ঠীর বিশ্ব পরিভ্রমণ বৃদ্ধি। ১৯. ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বৈশ্বিক নির্ভরতা। ২০. রপ্তানি বাজারের সম্প্রসারণ ও ঝুঁকি হ্রাস।

মুক্তবাজার অর্থনীতির অসুবিধাসমূহ : প্রকৃতপক্ষে, মুক্তবাজার হচ্ছে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দক্ষতা ও সমৃদ্ধির অভিমুখে এক অনিবার্য অভিযাত্রা। সুতরাং এর প্রয়োগে ত্রুটি বা বাধাবিপত্তি যে সকল পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে সেগুলোই সাময়িক দৃষ্টিতে মুক্তবাজার অর্থনীতির অসুবিধা। যেমন—

১. দরিদ্র দেশে প্রাথমিকভাবে শিল্পরুগ্নতা বৃদ্ধি। ২. অদক্ষ খাতে বেকারত্ব বৃদ্ধি। ৩. উন্নত দেশগুলোর প্রভাব বিস্তারের সুযোগ বৃদ্ধি। ৪. উন্নত দেশ কর্তৃক অনুন্নত দেশের বাজার দখল। ৫. শিল্প-সংস্কৃতিতে মিশ্রণ এবং অনেক ক্ষেত্রে দেশীয় ঐতিহ্যের বিলুপ্তি। ৬. সরকারি নিয়ন্ত্রণহীনতা। ৭. যোগ্য ব্যবস্থাপনার অভাবে নৈরাজ্যের সম্ভাবনা। ৮. দুর্বলের নিশ্চিত বিলুপ্তি। ৯. অধিক ঝুঁকি ও সতর্কতা। ১০. অর্থনৈতিক নির্ভরতাকে জিম্মি করার সম্ভাবনা। ১১. জনসাধারণের মাঝে ভোগবাদ বৃদ্ধি। ১২. উৎপাদনের ক্ষেত্রে অনুকরণ প্রবণতা বৃদ্ধি। ১৩. এক দেশের বিপর্যয় দ্রুতগতিতে অন্য দেশে সংক্রমিত হওয়া। ১৪. দরিদ্র দেশের শিল্প বহুমুখিতা (Industrial Diversity) হ্রাস। ১৫. অপেক্ষাকৃত কম মুনাফার উৎপাদনে অনাগ্রহ।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

বাংলাদেশে মুক্তবাজার অর্থনীতির অভিযাত্রা ও গৃহীত পদক্ষেপ : আশির দশকের মাঝামাঝি বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ প্রভাবিত সংস্কার কর্মসূচি বাংলাদেশে মুক্তবাজার অর্থনীতি প্রতিষ্ঠায় এক নব অধ্যায়ের সূচনা করে। আন্তর্জাতিকায়ন, উদারীকরণ, নিয়ন্ত্রণমুক্তি এবং ব্যক্তিগতায়ন প্রভৃতি সংস্কার কর্মসূচি প্রধান স্তম্ভ হিসেবে মুক্তবাজারকে ত্বরান্বিত করে। নব্বইয়ের দশকের শুরু থেকে মুক্তবাজারের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলাদেশ অবাধ বৈদেশিক বিনিয়োগ আহ্বান করে। শেয়ার বাজারও তখন থেকে বিদেশিদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। বাংলাদেশ ১৯৯৪ সালে গ্যাট (GATT)-এ স্বাক্ষর করেছে এবং ১৯৯৫-এর ডিসেম্বর থেকে এ দেশে সাপটা (SAPTA) কার্যকর হয়েছে। ফলে বাংলাদেশ একই সাথে দক্ষিণ এশিয়া এবং বিশ্ব প্রেক্ষাপটে মুক্তবাজার অর্থনীতিতে প্রবেশ করেছে। মুক্তবাজার অর্থনীতির জন্য দেশের অর্থনৈতিক নীতিমালায় সংস্কার কার্যক্রমের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং তা সাম্প্রতিককালে জোরদার করা হয়েছে। সরকারের সামগ্রিক অর্থনৈতিক নীতিমালা বিশেষত সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার প্রতি মনোযোগী ও ব্যক্তি উদ্যোগের প্রতি উদার হওয়ায় দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনা কিছুটা উজ্জ্বল হয়েছে। আমদানি লাইসেন্সের জটিল প্রক্রিয়া ও আমদানি পাসবুক ব্যবস্থা পুরোপুরি উঠিয়ে দেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশে মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রভাব : বাংলাদেশে মুক্তবাজার অর্থনীতির কোনো একমুখী প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। কারণ এ দেশে এখনো সুস্থ ও পূর্ণাঙ্গরূপে মুক্তবাজার চালু হয়নি। এর মূল কারণ সংস্কার কর্মসূচি মাঝপথে থেমে থাকা। নিম্নলিখিত কারণে সংস্কার কর্মসূচি মাঝপথে থেমে আছে। যথা : ১. সিদ্ধান্ত গ্রহণে সরকারের দৃঢ়তার অভাব, ২. রাজনৈতিক ও অস্থিতিশীলতা, ৩. রুগ্নশিল্প ও অদক্ষতা লালনের রাজনৈতিক স্বার্থ, ৪. দুর্বল ব্যক্তিখাত, ৫. ট্রেড ইউনিয়নসমূহের চাপ, ৬. কর্মসূচি সম্পর্কিত বোধগম্যতার সংকট ইত্যাদি।

এ ছাড়া গ্যাট বা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মাধ্যমে আন্তর্জাতিকভাবে বা সাপটার মাধ্যমে আঞ্চলিকভাবে যে মুক্তবাজার চালু হবার কথা ছিল তার গতিও সন্তোষজনক নয়। এটা মূলত জিডিপিতে বাণিজ্যের ক্ষুদ্র অনুপাতের অবদান এবং মুক্ত বাণিজ্য ব্যবস্থায় বাংলাদেশের আঞ্চলিক পশ্চাদপদতার জন্যই হয়েছে।

এতদসত্ত্বেও মুক্তবাজার অর্থনীতির কিছু প্রভাব ধীরগতিতে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পরিলক্ষিত হয় যা নিম্নরূপ :

১. **শুল্ক হ্রাস :** প্রতিটি বাজেটেই ক্রমান্বয়ে আমদানি শুল্ক কমিয়ে আনা হচ্ছে। বাংলাদেশে পূর্বের সর্বোচ্চ ২০০% শুল্কহার কমতে কমতে বর্তমানে সর্বোচ্চ ২৫%-এ নেমে এসেছে।

২. **বাণিজ্য বৃদ্ধি :** মুক্তবাজার ও মুক্ত বাণিজ্যমুখী অভিযাত্রার ফলে বাংলাদেশের আমদানি ও রপ্তানি দুই-ই বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে সরকারের লক্ষ্য রপ্তানি অধিক হারে বৃদ্ধি করা।

৩. **ভোগ বৃদ্ধি :** মুক্তবাজারের বদৌলতে আমদানিকৃত দ্রব্যসমূহের দাম পূর্বাপেক্ষা কমেছে যা ভোক্তার চাহিদা ও ভোগকে বাড়িয়েছে।

৪. **ব্যক্তিখাতের বিকাশ :** মুক্তবাজার অর্থনীতি চালু করার ফলে এ দেশে সরকারি খাতের পাশাপাশি ব্যক্তিখাতে ব্যাংক, বীমা, শিল্প, পরিবহন, যোগাযোগ, টেলিফোন প্রভৃতি বেড়েছে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৫. **অবাধ তথ্যপ্রবাহ :** এর ফলে বাংলাদেশে ডিশ, স্যাটেলাইট টিভি, ইন্টারনেট, ই-মেইল প্রভৃতির প্রসার ঘটেছে এবং দেশবাসী বিশ্ববাজার, শিল্প ও বিনোদন সম্পর্কে অবহিত হচ্ছে।

৬. **শিল্পরুগ্নতা ও বেকারত্ব :** মুক্তবাজারের ধাক্কায় অপেক্ষাকৃত দুর্বল দেশজ শিল্পগুলো রুগ্ন হয়ে পড়ছে। অনেক শিল্প বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং এর ফলে বেকারত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।

৭. **শিল্প থেকে বাণিজ্য :** বড় বড় পুঁজি বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলো এখন নতুন করে শিল্প স্থাপনের চেয়ে বাণিজ্যের মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায় অধিক আগ্রহী হয়ে পড়ছে।

৮. **পুঁজিবাজারের বিকাশ :** মুক্তবাজারের ফলে দেশে পুঁজিবাজারের দ্রুত বিকাশ ঘটেছে। এর ফলে মাত্র কয়েক বছরে বাজার পুঁজি বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে কয়েক বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে।

৯. **সরকারি দায় হ্রাস :** আগে সর্ব ক্ষেত্রেই সরকারি হস্তক্ষেপ চলত। কিন্তু বর্তমানে মুক্তবাজার অর্থনীতির ফলে যে কোনো ক্ষেত্রে (প্রতিরক্ষা, বিচার ও প্রশাসন বাদে) প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সরকারি ও ব্যক্তি উভয় খাত এগিয়ে আসতে সক্ষম। বাংলাদেশে এটা ধীরে হলেও ঘটা শুরু করেছে।

মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের করণীয় : মুক্তবাজার অর্থনীতি নিয়ে যত বিতর্কই হোক না কেন, এটা থেকে পিছিয়ে যাওয়া বা একে বন্ধ করে দেবার উপায় বাংলাদেশের নেই। অতএব বাংলাদেশের উচিত মুক্তবাজারের সুস্থ ও পূর্ণাঙ্গ বিকাশের পথে এগিয়ে যাওয়া। তাই মুক্তবাজার অর্থনীতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য এ মুহূর্তে সরকার তথা বাংলাদেশের করণীয় হলো :

১. আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নত করা। সুশাসন ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা। সমাজের দুর্নীতি কঠোরভাবে দমন করা। ২. সংস্কার কর্মসূচি পূর্ণভাবে অব্যাহত রাখা। ৩. যথাসম্ভব দ্রুত গ্যাট বাস্তবায়নে প্রস্তুতি নেয়া। ৪. বিদেশি বিনিয়োগ প্রকৃত অর্থেই উন্মুক্ত করা। ৫. বাণিজ্যের সরকারি বাধা ও অনুৎপাদনশীল নিয়ন্ত্রণ দূর করা। ৬. ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের রপ্তানি বৃদ্ধিতে সহায়তা করা। ৭. লোকসানি সরকারি খাত বিলুপ্ত করা। ৮. অনুৎপাদনশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল দলীয় ট্রেড ইউনিয়ন বন্ধ করা। ৯. বন্দর, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত উন্নয়ন করা। ১০. গণমাধ্যমে মুক্তবাজার বিষয়টি ব্যাখ্যা করা। ১১. পণ্যের বাজারজাতকরণ ব্যবস্থাকে আরো উন্নত ও গতিশীল করা।

এছাড়া মুক্তবাজারের সুষ্ঠু বিকাশের জন্য দরকার আমলাতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ, সর্বক্ষেত্রে ভর্তুকি পরিহার, শুল্কহার হ্রাস, সরকারি খাতের সংকোচন, প্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং পরিকল্পিত উন্নয়ন ব্যবস্থার প্রবর্তন।

উপসংহার : প্রায় সারা বিশ্ব আজ মুক্তবাজার অর্থনীতির আওতায় চলে এসেছে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোও মুক্তবাজার অর্থনীতির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছে তাদের নবতর অর্থনৈতিক কৌশলের মাধ্যমে। বাংলাদেশে মুক্তবাজার এখনো হামাগুড়ি দিচ্ছে। এর সঠিক বাস্তবায়ন না ঘটলে একদিকে অদক্ষতার মূল্য দিতে হবে, অন্যদিকে মুক্তবাজার সম্বন্ধে জনমনে ভ্রান্ত ধারণা জন্মলাভ করবে। জনগণের সচেতনতা ও সরকারের দায়বদ্ধতা সম্মিলিতভাবে নিশ্চিত করতে পারে মুক্তবাজারের সাফল্য। বাংলাদেশের প্রধান দলগুলো তাদের অর্থনৈতিক ইশতেহারে মুক্তবাজার অর্থনীতি গ্রহণ করেছে। তাই মুক্তবাজার অর্থনীতি নিয়ে কোনো দোদুল্যমানতার অবকাশ নেই। তাই আমাদের উচিত দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর স্বার্থের কথা বিবেচনা করে যথাযথ পদক্ষপ গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে মুক্তবাজার অর্থনীতির সুস্থ ও পূর্ণাঙ্গ বিকাশের পথে এগিয়ে যাওয়া।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

০৬। সারা বিশ্বে মুক্ত ও উদার বাণিজ্য নীতি প্রবর্তনে বাংলাদেশের শিল্প হুমকির সম্মুখীন হতে পারে। এ পরিস্থিতি মোকাবিলায় কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত—আলোচনা করুন।

উত্তর : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৮ সালের ১ জানুয়ারি বিশ্ব পুঁজিবাদের সংকট উত্তরণের লক্ষ্যে জেনারেল এগ্রিমেন্ট অন টেরিফস অ্যান্ড ট্রেড (GATT)-এর জন্ম হয়। একটি বহুপাক্ষিক সংস্থা হিসেবে এটি দ্রব্য, কৃষি, শিল্প ও সেবার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য সমঝোতার কাঠামো তৈরি করতো। গ্যাট (GATT)-এর সমঝোতা চুক্তিগুলো সাধারণত শুল্ক হ্রাস ও অশুল্ক বাধাগুলো দূর করে বা তা কমানোর মাধ্যমে দ্রব্য ও সেবার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে অবাধ করার জন্য পরিচালিত হতো। জেনেভা রাউন্ড দিয়ে শুরু হয়ে গ্যাট সংক্রান্ত আলোচনা পরবর্তীতে এনেসি, টরকোয়ে, জেনেভা, দিলন, কেনেডি, টোকিও এবং পরিশেষে উরুগুয়ে রাউন্ড দিয়ে এ আলোচনার পরিসমাপ্তি ঘটে। এ উদ্দেশ্যে ১৯৯৪ সালের ১৫ এপ্রিল মরক্কোর মারাকাশে চার দিনব্যাপী মন্ত্রীপর্যায়ের সম্মেলনে গ্যাট (GATT) চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং এ চুক্তির মাধ্যমেই গ্যাটের উত্তরসূরি হিসেবে জন্ম নেয় বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা বা World Trade Organisation বা WTO। ১ জানুয়ারি ১৯৯৫ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু করে। মূলত বিশ্ব বাণিজ্য অর্থনীতির উদারীকরণ এবং বিশ্বায়নের লক্ষ্যেই বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (WTO) গঠন ও কার্যক্রম শুরু হয়।

মুক্ত ও উদার বাণিজ্যনীতি প্রবর্তনে বিশ্ব বাণিজ্যের ওপর প্রভাব : ১৯৯১ সালে স্নায়ুযুদ্ধের অবসানে বিশ্বরাজনীতি ও অর্থনীতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পুঁজিবাদি ধারণার রাজনীতি ও অর্থনীতির বিকাশের নতুন মোড় লাভ করে। মুক্ত ও উদার বাণিজ্যনীতি প্রবর্তনে বিশ্ব বাণিজ্যের ওপর যে প্রভাব পড়বে তা নিম্নরূপ :

১. **পুঁজিবাদী ধারণার রাজনীতি ও অর্থনীতির বিকাশ :** স্নায়ুযুদ্ধ ছিল সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার সাথে পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার দ্বন্দ্ব। বস্তুত স্নায়ুযুদ্ধের অবসান ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মহা বিজয়। এর ফলে এক মেরুকেন্দ্রিক নতুন বিশ্বব্যবস্থায় পুঁজিবাদী ধারণার রাজনীতি ও অর্থনীতি বিকশিত হবার সুযোগ লাভ করে। কিন্তু এর ফলে অর্থনৈতিক উদারীকরণ ও শক্তিশালী উন্নত রাষ্ট্রসমূহের অসম বাণিজ্যনীতিতে উন্নয়নশীল দেশসমূহ অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়। মূলত নতুন বিশ্বব্যবস্থায় বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ও উন্নত রাষ্ট্রসমূহের কতিপয় অর্থনৈতিক কৌশল উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহকে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করেছে। এসব কৌশলের মধ্যে রয়েছে অ্যান্টি ডাম্পিং অর্ডার, এমএফএ (MFA), ট্রিম (TRIM), ট্রিপস (TRIPS), ভিইআরএস (VERS), শুল্ক ও অশুল্ক বাণিজ্য বাধা ইত্যাদি।

২. **সারা বিশ্ব এক বাজার :** অর্থনৈতিক উদারীকরণের কারণে অচিরেই দ্বিপাক্ষিক ক্ষেত্রে MFN (Most Favoured Nations Principle) এবং GSP (Generalised System of Preferences) উঠে যাবে, কৃষির ওপর থেকে ভর্তুকি তুলে নেয়া হবে এবং সংরক্ষণবাদী বাণিজ্যিকনীতি প্রত্যাহৃত হবে। অর্থাৎ এতদিনকার প্রতিটি রাষ্ট্রের যে নিজস্ব সত্তার অস্তিত্ব ছিল, তা বিলুপ্ত হয়ে সর্বজনীন অভিন্ন বাণিজ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে উঠবে। সেখানে নিজস্ব বাজার বলতে কিছুই থাকবে না। উদ্ভাবনকারী তার ডিজাইন অথবা প্রযুক্তির ওপর নিজস্ব স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবে। MFN, MFA, GSP ইত্যাদি উঠে যাবার ফলে বিশ্ব বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যা দাঁড়াবে তা হলো সারা বিশ্ব একটি বাজারে পরিণত হবে এবং এ বাজার হবে প্রতিযোগিতাপূর্ণ। এর ফলে সারা বিশ্বের ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রাণসঞ্চার হবে সত্য কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশসমূহ কঠিন প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হবে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৩. **মুক্তবাজার অর্থনীতির আওতাভুক্ত :** বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় অর্থনীতি মূল ভূমিকা পালন করে থাকে এবং এ প্রক্রিয়ায় বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মূল দায়িত্ব হচ্ছে গোটা বিশ্বকে মুক্তবাজার অর্থনীতির আওতাভুক্ত করা। এ লক্ষ্যে বাণিজ্য অর্থনীতির উদারীকরণ, আমদানি ও অন্যান্য বাণিজ্য শুল্ক বিলোপ, বেসরকারিকরণ, কাঠামোগত সংস্কার, কৃষিতে ভর্তুকি বন্ধ ইত্যাদি পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হবে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মাধ্যমে।

৪. **বিনিয়োগ সংক্রান্ত বাধা অপসারণ :** বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নীতিমালায় TRIM (Trade Related Investment Measures) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ফলে এতদিনের প্রচলিত প্রতিটি দেশের বিনিয়োগ সংক্রান্ত নিজস্ব মতবাদ আর থাকবে না। বিনিয়োগ সংক্রান্ত সকল বাঁধা অপসারিত হবে। তবে এতে প্রকৃত অর্থে লাভবান হবে শিল্পোন্নত বিশ্ব। কারণ যাদের GNP (Gross National Product) উদ্বৃত্ত তারাই পুঁজি বিনিয়োগ করবে। ফলে উন্নয়নশীল এবং স্বল্পোন্নত বিশ্ব শুধু বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার সুযোগ গ্রহণ করবে। তাতে উন্নয়নশীল বিশ্বের নিজস্ব উন্নয়নের পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে।

৫. **মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ আইন :** শিল্পোন্নত বিশ্বের অনুকূলে WTO চুক্তির সবচেয়ে বৈষম্যমূলক দিক হলো TRIPS (Trade Related Intellectual Property Rights) বা মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ আইন। অতীতে মেধাস্বত্ব আইন কোনো সহজাত অধিকাররূপে নয়, বরং সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করার বিশেষ সুবিধা হিসেবে প্রচলিত ছিল। কোনো ব্যক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠান কোনো দ্রব্য বা ফর্মুলা আবিষ্কার বা উদ্ভাবন করলে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত Patent আইন অনুযায়ী কেবল ওই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানই উৎপাদনের অধিকার সংরক্ষণ করতো। আগে শুধু দ্রব্য বা প্রক্রিয়ার ওপর Patent Law প্রযোজ্য হতো। কিন্তু WTO চুক্তি মোতাবেক এখন দ্রব্য ও প্রক্রিয়া উভয়ের ওপরই Patent Law প্রযোজ্য। এতে করে সম্পূর্ণ নতুন ও ভিন্ন প্রক্রিয়ায় কোনো প্রচলিত পণ্য উৎপাদন করা যাবে না। মেধাস্বত্ব আইন দ্বারা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা মানুষের মেধাকেও ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর একচেটিয়া দখলিস্বত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছে।

৬. **মুক্তবাজার অর্থনীতি চালু :** WTO চুক্তি স্বাক্ষরের পর মুক্তবাজার অর্থনীতি চালু হয়েছে। চুক্তি স্বাক্ষরকারী দেশগুলো ইচ্ছেমতো প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে এবং প্রতিযোগিতার মাত্রাও বৃদ্ধি পেয়েছে নতুন আঙ্গিকে। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য পণ্যের গুণগত মান বজায় রাখা খুবই জরুরি। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মান নিয়ন্ত্রণ সংস্থা পণ্যের গুণগত মান তদারক করবে। এর ফলেও অর্থনৈতিক ও কারিগরি দিক থেকে পিছিয়ে পড়া স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহ অর্থনৈতিক ও শিল্পায়নের দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। WTO চুক্তিতে সেবা খাতকে 'পণ্য' হিসেবে পরিগণিত করায় পৃথিবীর সকল দেশকে উন্নত সেবা প্রদান করতে সক্ষম উন্নত দেশসমূহের ওপর নির্ভর করতে হবে। ফলে উন্নত দেশসমূহই অধিক লাভবান হবে। অপরদিকে উন্নয়নশীল অঞ্চল নিজস্ব সেবা খাতের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে উৎসাহ হারিয়ে ফেলবে।

মুক্ত ও উদার বাণিজ্য নীতির ফলে বাংলাদেশের সম্ভাব্য ক্ষতিকর দিকসমূহ : বাংলাদেশের অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ, শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী এবং সরকারি কর্মকর্তাদের মতামত অনুযায়ী মুক্ত ও উদার বাণিজ্য নীতির ফলে বাংলাদেশে উদ্ভূত সমস্যা সমূহ।

১. **পোশাক শিল্প কঠিন প্রতিযোগিতার সম্মুখীন :** বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের যে অভাবনীয় অগ্রগতি তা মূলত বাংলাদেশের জন্য সংরক্ষিত কোটা নীতির কারণেই সম্ভব হয়েছে। কিন্তু মুক্ত ও উদার বাণিজ্য নীতির কারণে ২০০৫ সালে বাংলাদেশের জন্য সংরক্ষিত সেই কোটা উঠে যায়। ফলে বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের সিংহভাগ অর্জনকারী তৈরি পোশাক শিল্প প্রতিবেশী দেশসমূহসহ অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের সাথে কঠিন প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

২. **বহু শিল্পের অস্তিত্ব বিপন্ন :** মুক্ত ও উদার বাণিজ্যনীতি প্রবর্তনের ফলে বাংলাদেশের বহু শিল্প প্রতিষ্ঠান অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়েছে। অন্যদিকে বাংলাদেশের শুল্কনীতিও অসামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রয়োজনীয় কাঁচামালের তুলনায় ফিনিশড পণ্যের আমদানি শুল্ক হার কম। কিন্তু কাঁচামালের শুল্ক কম হওয়া উচিত। এর ফলে দেশে রুগ্ন ও বন্ধ শিল্পের সংখ্যা বেড়ে গেছে।

৩. **রপ্তানি আয় হ্রাস :** মুক্ত ও উদার বাণিজ্য নীতির ফলে বাংলাদেশের রপ্তানি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। গ্যাট চালু হবার ফলে বিশ্বব্যাপী শুল্ক হার হ্রাস পেয়েছে। এ শুল্ক কাঁচামাল বা প্রাথমিক পণ্য এবং আধা-প্রক্রিয়াজাত পণ্যের তুলনায় ফিনিশিড পণ্যের ক্ষেত্রে হ্রাস করা হয় বেশি হারে। ফলে উন্নত দেশগুলোর রপ্তানি স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর তুলনায় বেড়েছে।

৪. **খাদ্য দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি :** বাংলাদেশ গম, ভোজ্য তেল, কাপড়, তুলা, পেট্রোলিয়াম, সিমেন্ট, মেশিন ও কাঁচামাল, দুধ, চিনি ও খাদ্যসহ অনেক কৃষিজাত দ্রব্য যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানি করে থাকে। এ সকল দেশ তাদের কৃষিতে প্রচুর ভর্তুকি দিয়ে থাকে বলে বাংলাদেশের আমদানিতে খরচ কম হয়। কিন্তু WTO মোতাবেক আর ভর্তুকি দেয়া যাবে না। ফলে উৎপাদন ব্যয় বেড়ে গেলে তার মূল্যও বেড়ে যাবে। আন্তর্জাতিক বাজারে দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশের আমদানিকৃত দ্রব্যের দামও বাড়বে। বাংলাদেশে যার লক্ষণ ইতোমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে।

৫. **পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া :** WTO সংক্রান্ত আলোচনায় আইনের প্রয়োগ করা হয়েছে সর্বক্ষেত্রে। এর ফলে গাছপালা ও Patent করা হয়েছে। অর্থাৎ Patent করা গাছ অথবা গাছ থেকে কোনো কিছু নিতে হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে অনুমতি নিতে হবে। Patent-এর ফলে ঐ সমস্ত গাছের বীজেরও অধিকারী হবে সংশ্লিষ্ট কোম্পানি। ফলে চাষাবাদের নিজস্ব ধারা ব্যাহত হয় এবং পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ে।

বাংলাদেশের সম্ভাব্য করণীয় : সারা বিশ্বে মুক্ত ও উদার বাণিজ্য নীতি প্রবর্তনের ফলে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পসহ সকল প্রকার শিল্প-কারখানা তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হবে। তবে এর ফলে আগামীতে বিশ্ব বাণিজ্যের পরিমাণও বৃদ্ধি পাবে। তাই বাংলাদেশকে এ রূপ প্রতিযোগিতাপূর্ণ বাজারে টিকে থাকার জন্য বহুবিধ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ এবং সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। নিচে এ সকল প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো :

১. **প্রশাসনিক সংস্কার :** বাংলাদেশের মতো দেশের জনপ্রশাসনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত জনকল্যাণ ও উন্নয়ন। বর্তমানে উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে অর্থনীতির উদারীকরণ এবং মুক্ত বাণিজ্য। সুতরাং জনপ্রশাসনও এ প্রত্যয়সমূহের সাথে পরোক্ষভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছে। বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে উপযোগী অর্থনৈতিক সংস্কার সাধনের জন্য বাংলাদেশে প্রশাসনিক সংস্কার খুবই জরুরি। বাংলাদেশের সিভিল সমাজের পক্ষ থেকে এ দাবি বার বার উচ্চারিত হচ্ছে। তাই বাংলাদেশের প্রচলিত প্রশাসনকে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও জবাবদিহি প্রশাসনে রূপান্তর করতে হবে। একই সাথে সম্পদ বাড়ানোর জন্য বিদ্যমান শুল্ক, কর, বিনিয়োগ নীতি এবং ব্যাংক নীতিরও সংস্কার প্রয়োজন।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

২. **দুর্নীতি নির্মূল করা :** দুর্নীতি বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়। রাষ্ট্র ও প্রশাসন যন্ত্রের শীর্ষ পদ থেকে শুরু করে সর্বস্তরে ব্যাপক দুর্নীতি বিদ্যমান, বেসরকারি হিসাব মতে দুর্নীতির কারণে বাংলাদেশে প্রতি বছর গড়ে ১২০০০ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়। সীমাহীন দুর্নীতির কারণে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল-এর রিপোর্টে এক সময় বাংলাদেশ দুর্নীতিতে পর পর পাঁচবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে (২০১৪) বাংলাদেশের অবস্থান চৌদ্দতম। তাই দুর্নীতি নির্মূলের জন্য বাংলাদেশের বিচার বিভাগ ও স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশনকে আরো বেশি দক্ষ ও নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে হবে।

৩. **উৎপাদন বাড়াতে হবে :** মুক্ত ও উদার বাণিজ্য নীতিকে যথাযথভাবে মোকাবিলা করতে হলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত হলো, বাংলাদেশকে যদি উৎপাদন দিয়ে বাজার দখল করতে হয় তাহলে Technology-র Diversity Sector-কে বাদ দিয়ে Production Volume বাড়াতে হবে। যেমনিভাবে জাপান অতিক্রম করেছিল যুক্তরাষ্ট্রের অটোমোবাইল এবং সুইস ঘড়ি কোম্পানিকে।

৪. **পণ্যের মান বাড়াতে হবে :** আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকতে হলে পণ্যের মান বাড়াতে হবে। আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন ও পণ্যের মান ধরে রাখতে না পারলে বাজার হাত ছাড়া হয়ে যাবে। বস্তুত বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নিজেদের অস্তিত্বের জন্যই গুণগত পণ্য (Quantitative Commodity) উৎপাদনের কোনো বিকল্প নেই।

৫. **অর্থনৈতিক কাঠামো রদবদল করা :** মুক্ত ও উদার বাণিজ্য নীতির কারণে বর্তমানে কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি খাতও WTO-এর আওতাধীন। তাই WTO চুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কাঠামোতে ব্যাপক রদবদল করতে হবে।

৬. **সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ :** WTO-এর ফলে বিশ্ব ব্যবসা-বাণিজ্য বছরে ২৫ হাজার কোটি ডলার থেকে ৩০ হাজার কোটি ডলারে উন্নীত হবে। এর ভাগ কে কতটা পাবে তা নির্ভর করতে সংশ্লিষ্ট দেশের নীতি ও পরিকল্পনার ওপর। তীব্র প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব বাজারে নিজেদের যোগ্য স্থান করে নেয়ার জন্য সরকারের অর্থনৈতিক নীতির ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনতে হবে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থাসমূহকে অর্থনীতির নতুন চাহিদায় উপযোগী করে তুলতে হবে।

৭. **WTO-এর দেয় সহায়তার সর্বোত্তম ব্যবহার :** গ্যাট চুক্তিতে বলা হয়েছে যে, স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহে সহজ শর্তে প্রযুক্তিগত সহায়তা দেয়া হবে। এ সহায়তার লক্ষ্য হলো এ সব দেশের রপ্তানির ভিত্তিকে শক্তিশালী ও জোরদার করা। বাংলাদেশের উচিত হবে WTO সদস্য হিসেবে প্রাপ্ত প্রযুক্তিগত সহায়তার সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা। যাতে রপ্তানি বাড়ানো সম্ভব হয়।

৮. **সরকারের উদারতা প্রয়োজন :** বাংলাদেশ সরকার রাজস্ব আদায়কেই সবার ওপরে স্থান দেয়। শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠার আগেই সরকার রাজস্ব পেতে চায়, যা শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে অন্তরায়। তাই সরকারের এরূপ মানসিকতা পরিবর্তন করে শিল্প বিকাশের ক্ষেত্র সহজ করতে হবে। সরকারের শুল্ক ও কর নীতি এমন হওয়া উচিত যেন জনগণ অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে পণ্য পেতে পারে। বিনিয়োগের লক্ষ্যে সরকারকে আরো উদার হতে হবে।

উপসংহার : সারা বিশ্বে মুক্ত ও উদার বাণিজ্য নীতি প্রবর্তনের ফলে বাংলাদেশের শিল্প ও অর্থনীতি বহু দিক দিয়ে ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। তবে মুক্ত ও উদার বাণিজ্য নীতির কতিপয় সুখকর দিকও রয়েছে। বাংলাদেশ যদি ধারণ ক্ষমতা অনুসারে এর মুখোমুখি হতে পারে তবে এ ব্যবস্থাপনা থেকে উপকৃত হতে পারে। এমতাবস্থায় অবাঞ্ছিত ক্ষতি এড়াতে এবং এ ব্যবস্থাপনা থেকে লাভবান হতে এখন থেকেই বাংলাদেশের উল্লিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

০৭ । বাংলাদেশের পণ্য বাণিজ্যে বিপুল ঘাটতি কমানোর কার্যকর পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

উত্তর : বর্তমান বিশ্বের মুক্তবাজার অর্থনীতির অবাধ প্রতিযোগিতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের গুরুত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাথে বাণিজ্যিক কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। প্রতি বছর জনশক্তি, তৈরি পোশাক, পাটজাত দ্রব্য, মৎস্যজাত দ্রব্য রপ্তানি করে তার অর্থনীতিকে সচল রাখতে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু দুঃখজনক বাস্তবতা হলো, বিভিন্ন সমস্যার কারণে বাংলাদেশের আমদানি ব্যয়ের তুলনায় রপ্তানি আয় অপেক্ষাকৃত অনেক কম এবং এই ব্যবধান প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা আমাদের সার্বিক অর্থনীতির জন্য হুমকি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আমাদের প্রিয় দেশটিকে সক্ষম করে তুলতে হলে বৈদেশিক বাণিজ্য বহুমুখীকরণের মাধ্যমে বিপুল বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস করতে হবে। রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাধাসমূহ দূর করে এবং আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে এনে এই অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে দেশকে বাঁচানো যেতে পারে।

বাণিজ্য ঘাটতি প্রেক্ষিত বাংলাদেশ : যে পরিমাণ পণ্য আমদানি করা হয় রপ্তানির পরিমাণ তার চেয়ে কম হলে আমদানি-রপ্তানির এই ব্যবধানকে বাণিজ্য ঘাটতি বলা হয়। একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে বাণিজ্য ঘাটতি থাকা কাম্য নয়। কিন্তু নির্মম সত্য হলো বাংলাদেশে এই বাণিজ্য ঘাটতি উদ্বেগজনক এবং প্রতিনিয়তই তা নতুন উদ্বেগের জন্ম দিচ্ছে। লেনদেনে ভারসাম্যের অব্যাহত প্রতিকূলতা বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রধান সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে প্রচুর পরিমাণ ভোগ্য পণ্য আমদানি করতে হয়। বিশ্ব বাণিজ্যে এসব পণ্যের দাম ক্রমবর্ধমান। অপরদিকে বাংলাদেশের রপ্তানি ক্ষুদ্র ও অবিকেন্দ্রীকৃত হওয়ায় আমদানি ব্যয়ের ভারসাম্য রক্ষা কঠিন হয়ে দেখা দিয়েছে। বর্তমানে আমাদের আমদানি ব্যয়ের শতকরা ৬০ ভাগ রপ্তানি আয় দ্বারা মেটানো সম্ভব। বাকি ৪০ ভাগ আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যর্থতা। স্বাধীনতার পর থেকে অদ্যাবধি বাংলাদেশ বৈদেশিক বাণিজ্যের ভারসাম্য অব্যাহত প্রতিকূলতার সম্মুখীন। ২০১৩-১৪ (জুলাই-এপ্রিল) রপ্তানির পরিমাণ ২৪,৬৫৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। আমদানির পরিমাণ ২০১৩-১৪ (জুলাই-মার্চ) ২৯,৭৭৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৩-১৪ (জুলাই-জানুয়ারি) বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ ২,৭৮৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বাংলাদেশের বিপুল বাণিজ্য ঘাটতির কারণ : বাণিজ্য ঘাটতির অন্যতম কারণ রপ্তানি বাণিজ্য আজও পশ্চাৎপদ রয়েছে। এ দেশের রপ্তানি বাণিজ্য বিভিন্ন সমস্যায় নিমজ্জিত বলে রপ্তানি বাণিজ্যের সাফল্য এখনো অর্জিত হয়নি। বাংলাদেশের বিপুল বাণিজ্য ঘাটতির পিছনে যেসব বাধাসমূহ প্রতীয়মান হয় তা নিম্নরূপ :

১. **সুষ্ঠ রপ্তানি নীতির অভাব :** বাংলাদেশের বাণিজ্য নীতি সরকার ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তনশীল বিধায় রপ্তানি নীতিও পরিবর্তিত হয়। ফলে স্থায়ী পরিকল্পনা প্রণয়নের অভাবে রপ্তানিকারকগণ বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন হন।

২. **স্বল্প সংখ্যক পণ্য রপ্তানি :** বাংলাদেশ স্বল্প সংখ্যক ও নির্দিষ্ট পণ্য রপ্তানি করে। বিশ্ব বাজারের চাহিদা অনুসারে পণ্য সরবরাহ করতে না পারা বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের অন্যতম প্রধান সমস্যা।

৩. **বাণিজ্য চুক্তির অভাব :** সার্কভুক্ত দেশসমূহ এবং এশিয়া ও ইউরোপ-আমেরিকার কয়েকটি দেশ ছাড়া অনেক দেশের সাথেই বাংলাদেশের বাণিজ্য চুক্তি নেই। তাই অনেক দেশে পণ্য রপ্তানি করা সম্ভব হচ্ছে না।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৪. **পুঁজির স্বল্পতা :** বাংলাদেশের অধিকাংশ রপ্তানিকারকেরই নিজস্ব মূলধন নেই। তারা পর্যাপ্ত সরকারি সহযোগিতা পায় না। অন্যদিকে সরকারি ঋণব্যবস্থা কঠিন শর্তযুক্ত থাকে বলে অনেকেই রপ্তানি বাণিজ্যে আগ্রহী হয় না।

৫. **পণ্যের মানগত দিক :** বাংলাদেশের উৎপাদিত পণ্যের বেশির ভাগই নিম্নমানের বিধায় বৈদেশিক বাজারে এর চাহিদা কম।

৬. **দুর্নীতি ও রাজনৈতিক অস্থিরতা :** বাংলাদেশে প্রবহমান দুর্নীতি ও রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্য এ দেশের পণ্য আমদানিতে অনেক দেশ আগ্রহ দেখায় না।

৭. **আস্থার সংকট :** আস্থার সংকট বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য এবং বাণিজ্য ঘাটতির অন্যতম কারণ।

এছাড়াও চোরাচালান, পরিবহনে সমস্যা, খাদ্য ঘাটতি, মূল্য স্থিতিশীলতার অভাব প্রভৃতি কারণে দেশের রপ্তানি বাণিজ্য সমস্যার মুখোমুখী হচ্ছে, ফলে প্রকট হচ্ছে বাণিজ্য ঘাটতি। বাণিজ্য ঘাটতি দূর করতে এসব সমস্যার আশু সমাধান প্রয়োজন।

বাণিজ্য ঘাটতির প্রভাব : এই বিপুল পরিমাণ বাণিজ্য ঘাটতির প্রভাব আমাদের কাঙ্ক্ষিত পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হচ্ছে। নিচে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো :

- বাণিজ্য ঘাটতির ফলে দেশের বিপুল পরিমাণ সম্পদ বিদেশে চলে যাচ্ছে।
- দেশ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।
- মূলধনের গতিশীলতা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে।
- রপ্তানিকারকগণ আগ্রহ হারাচ্ছেন।
- দেশ আমদানি নির্ভর হয়ে পড়ছে। ফলে দেশের নিরাপত্তা হুমকির মুখে। বর্তমান সময়ে অনেক দেশ চাল রপ্তানি বন্ধ করে দেয়ায় খাদ্য নিরাপত্তা বিনষ্ট হয়ে অস্থিতিশীলতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল।

বাণিজ্য ঘাটতি কমানোর প্রয়োজনীয়তা : বাংলাদেশের বর্তমান বাণিজ্য ঘাটতি লাঘবে সম্ভাব্য করণীয় নিম্নরূপ হতে পারে :

- বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস করে বাংলাদেশী পণ্যের বাজার সৃষ্টির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে তা দেশের উন্নয়নে কাজে লাগানো।
- মূলধনের গতিশীলতা বৃদ্ধি কল্পে বাণিজ্য ঘাটতি কমানো প্রয়োজন।
- দেশের স্বাধীন ও সার্বভৌমত্ব সত্তা বজায় রাখার লক্ষ্যে বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা কমাতে বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস করা জরুরি।
- আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের অবস্থান সুসংহত করতে একটি স্থিতিশীল রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে আমদানি ও রপ্তানির মধ্যে ভারসাম্য থাকা জরুরি।
- বিপুল জনসংখ্যার এদেশের জনশক্তিকে উৎপাদন কাজে নিয়োজিত করতে রপ্তানি বাণিজ্য জোরদার করা প্রয়োজন।
- দেশের অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় এ ঘাটতি হ্রাস করা আবশ্যক।

পণ্য বাণিজ্যে বিপুল ঘাটতি কমানোর কার্যকর পদ্ধতি : রপ্তানি বাণিজ্যের ঘাটতি বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়ন, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে সে কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এই নানাবিধ সমস্যা মোকাবিলা করে তৃতীয় বিশ্বের এই দেশটিতে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

পণ্য বাণিজ্য বিপুল ঘাটতি কমানোর কোনো বিকল্প নেই। এজন্য নানামুখী কার্যকর পদ্ধতির মাধ্যমে এই বিপুল পরিমাণ ঘাটতি মোকাবিলায় উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে নীতি নির্ধারকদের যেমন ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চালানো দরকার তেমনি সকল নাগরিকের উচিত দেশপ্রেম ও সততার ভিত্তিতে এই প্রচেষ্টায় শামিল হওয়া। এক্ষেত্রে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে তা নিম্নরূপ :

১. **কার্যকর রপ্তানি নীতি প্রণয়ন :** সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক নীতিও পরিবর্তিত হয়, যা রপ্তানি বাণিজ্যে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে। তাই বিপুল বাণিজ্য ঘাটতি কমানোর লক্ষ্যে দেশটিকে অবশ্যই কার্যকর রপ্তানি নীতি প্রণয়ন করতে হবে। যা হতে হবে যুগোপযোগী এবং স্থায়ী। এ নীতির মাধ্যমে রপ্তানি প্রক্রিয়ায় আমলাতান্ত্রিক জটিলতা দূর করতে হবে। যতদূর সম্ভব রপ্তানি প্রক্রিয়াকে সহজীকরণ করতে একটি সুষ্ঠু ও যুগোপযোগী রপ্তানি নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে রপ্তানি বাণিজ্যের গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে এবং বাণিজ্য ঘাটতি দূরীভূত হবে।

২. **বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন :** বিদ্যমান বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস করতে হলে সরকারকে উদ্যোগী হয়ে অন্যান্য দেশের সাথে বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করতে হবে। এর মাধ্যমে সহজে বিভিন্ন পণ্য অন্যান্য দেশে রপ্তানি করা যেতে পারে। বাস্তবসম্মত সমঝোতার ভিত্তিতে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে বাণিজ্য চুক্তি কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। সকল চুক্তিই হতে হবে স্বচ্ছ। দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে দেশপ্রেম থেকে বিচ্যুত হয়ে কোনো চুক্তি করলে তা কার্যকর কোনো ফল বয়ে আনবে না। নীতি নির্ধারক মহলকে এ ব্যাপারে সজাগ থাকতে হবে।

৩. **দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার :** বাণিজ্য খাতের প্রসারের লক্ষ্যে বিশ্বের অপরাপর দেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার করতে হবে। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নতির দ্বারা রপ্তানির পরিমাণ বাড়ানো যেতে পারে এবং শুল্কমুক্ত সুবিধা পাওয়া সম্ভব হতে পারে। এভাবে বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আনার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

৪. **পণ্যের উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধি :** বাংলাদেশে কৃষি ও শিল্পজাত পণ্যের উৎপাদন খুবই কম। কৃষিপ্রধান দেশ হওয়া সত্ত্বেও খাদ্যসামগ্রী আমদানি করতে হয়। ফলে বিপুল বাণিজ্য ঘাটতি স্বাভাবিক পরিণতি হয়ে দেখা দিয়েছে। জাতীয় জীবনের এই চরম অভিশাপের হাত থেকে বাঁচতে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করতে হবে কৃষি এবং শিল্প উভয় খাতেই। নিজেদের চাহিদা মিটিয়ে রপ্তানি করতে হবে দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার মানসে। আর যেসব পণ্য বর্তমানে রপ্তানি করা হচ্ছে উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে তার পরিমাণও বাড়াতে হবে।

৫. **পণ্যের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি :** মুক্তবাজার অর্থনীতির এই যুগে মানসম্মত পণ্য ছাড়া প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা সম্ভব নয়। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশি পণ্যের যে বাজার সৃষ্টি হয়েছে তা ধরে রাখতে এবং নতুন বাজার সৃষ্টি করতে হলে পণ্যের উৎকর্ষতা বৃদ্ধির কোনো বিকল্প নেই। তাই বাণিজ্য ঘাটতি রোধকল্পে মানসম্মত পণ্য তৈরি করতে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে সজাগ ও সতর্ক থাকতে হবে ও নিরলসভাবে কাজ করতে হবে।

৬. **দেশিপণ্য ব্যবহারে আগ্রহ সৃষ্টি :** আমাদের দেশের জনগণের দেশপ্রেম অনেকাংশেই প্রশ্নবিদ্ধ। সামান্য ব্লেড থেকে শুরু করে সকল ধরনের ইলেকট্রনিক যন্ত্র, খাদ্যসামগ্রী, কসমেটিকস, আসবাবপত্রসহ সকল প্রয়োজনীয় জিনিসই যা বিদেশি লেবেল লাগানো আমদানিকৃত তাই

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

কিনতে উৎসাহবোধ করি। দেশি পণ্য ব্যবহারে এক ধরনের অনীহা আমাদের মাঝে বিরাজমান। এই অভ্যাসের বিলোপসাধন জরুরি। দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে দেশি পণ্য ব্যবহারের চেষ্টা করতে হবে। দেশি পণ্য ব্যবহারে আগ্রহ সৃষ্টি করতে পণ্যের মান ও প্রচারণা যেমন বাড়াতে হবে তেমনি সরকারেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে হবে যাতে বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস করা যায়।

৭. **ওষুধ রপ্তানিতে গুরুত্ব প্রদান :** বাংলাদেশে উৎপাদিত ওষুধ রপ্তানি করে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। বিকাশমান শিল্পসমূহের মধ্যে ওষুধ শিল্প অন্যতম। সংশ্লিষ্ট মহল গুরুত্ব সহকারে এ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখলে ওষুধ সামগ্রী রপ্তানি করে বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যকে জোরদার করা সম্ভব। মানগত দিক থেকে বাংলাদেশে উৎপাদিত ওষুধ বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার দাবি রাখে। তাই ক্রমবর্ধমান ও সম্ভাবনাময় এই শিল্পের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করতে হবে।

৮. **পোশাক শিল্পে বিদ্যমান সমস্যা দূর করতে হবে :** বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ আসে তৈরি পোশাক শিল্প থেকে। রপ্তানি বাণিজ্যে বিপুল অবদান রাখা এই খাতটি মাঝে মধ্যেই অস্থিতিশীল হয়ে ওঠে। মালিক-শ্রমিক দ্বন্দ্ব বহিঃশক্তির ষড়যন্ত্র, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ইত্যাদি কারণে এ শিল্পটি নানা সমস্যায় জর্জরিত। বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে হলে পোশাক শিল্পখাতে বিদ্যমান সমস্যা দূর করে স্থিতিশীল পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

৯. **বাণিজ্য প্রতিনিধি দল প্রেরণ :** বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাণিজ্য প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে বিশ্ব পরিমণ্ডলে বাংলাদেশি পণ্যের বাজার সৃষ্টি করতে হবে। প্রতিনিধি দলে দক্ষ অভিজ্ঞ ও দেশপ্রেমিক কূটনীতিকদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। যাতে তারা বাস্তবতার আলোকে দেশের স্বার্থ সমুন্নত রেখে বিদেশি বাজারে দেশি পণ্য প্রবেশ করানোর ব্যাপারে ফলপ্রসূ অবদান রাখতে পারেন।

১০. **প্রচারের ব্যবস্থা :** বর্তমান সময়ে বিজ্ঞাপন হলো পণ্যের জনপ্রিয়তা অর্জনের অন্যতম মাধ্যম। তাই বিদেশে বাংলাদেশি পণ্যের চাহিদা সৃষ্টির জন্য যথাযথ প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এবং দেশের মানুষকে স্বদেশী পণ্য ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করতেও যথেষ্ট প্রচেষ্টা চালাতে হবে। আর এজন্য দেশে-বিদেশে বিজ্ঞাপন, প্রদর্শনী, মেলার আয়োজন করতে পারলে পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধি পায়।

১১. **রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা বৃদ্ধি :** প্রতিনিয়ত ক্রমবর্ধমান এই বাণিজ্য ঘাটতি রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা ব্যতীত ব্যবসায়ীদের দ্বারা সম্ভব নয়। রপ্তানি সহজীকরণ, রপ্তানি প্রক্রিয়ায় বাধা দূরকরণ, মূলধন গঠনে স্থিতিশীল পরিবেশ রক্ষায় সরকার ব্যবসায়ীদের সহযোগিতা বৃদ্ধি করলে এই বিপুল পরিমাণ বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস করা সম্ভব।

১২. **রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা :** শুধু বাংলাদেশ নয় উন্নয়নশীল বিশ্বের সকল দেশেই রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বিরাজমান যার ফলে দেশগুলোর সামগ্রিক উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। রাজনৈতিক সংঘাত, হরতাল, হানাহানি আমাদের দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকসহ সকল ক্ষেত্রে চরম অস্থিতিশীল পরিস্থিতির জন্ম দেয়। ফলে ব্যাহত হয় উৎপাদন, আগ্রহ হারায় আমদানিকারকরা এবং বিনিয়োগকারীরা। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সার্বিক বাণিজ্য ব্যবস্থার। তাই বাণিজ্য খাতের উন্নয়ন করে বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে হলে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অবশ্যই প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

১৩. **IMF, WB, ADB-এর প্রভাবমুক্ত হতে হবে :** উন্নয়নশীল দেশগুলোকে উন্নয়ন, বিনিয়োগ ও সহায়তার নামে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে চলছে পরাশক্তির মদদপুষ্ট আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক, এডিবিসহ অনেক আন্তর্জাতিক অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান। প্রভাবশালী মহলের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে উন্নয়নশীল দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে অযাচিতভাবে হস্তক্ষেপ করছে। ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে হলে এসব সংস্থাসমূহের প্রভাববলয় থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

১৪. **রপ্তানি শুল্ক হ্রাস করা :** রপ্তানির ওপর শুল্ক হ্রাস করে শুল্ক প্রত্যাহার করে রপ্তানি প্রক্রিয়া সহজ করলে রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে। এতে বৈদেশিক মুদ্রাও বেশি অর্জিত হবে। ফলে বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস করা সম্ভব হবে।

এছাড়াও পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, চোরাচালান ও দুর্নীতি প্রতিরোধ, মালিক-শ্রমিক সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে দেশের বাণিজ্য ঘাটতি অনেকাংশে লাঘব করা সম্ভব।

সমাপনী : বাংলাদেশের পণ্য বাণিজ্যের বিপুল ঘাটতি যে দেশের অর্থনীতির জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিয়েছে এতে সন্দেহ নেই। এ থেকে মুক্তির একমাত্র পথ রপ্তানি বৃদ্ধি এবং আমদানি হ্রাস করা আর এজন্য বিভিন্ন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে রপ্তানি বাণিজ্যের ব্যর্থতা দূর করে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি করা, এতে একদিকে যেমন অর্থনৈতিক অবস্থা চাঙ্গা হবে অন্যদিকে আমদানি ব্যয় হ্রাস পাবে। ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যের লেনদেনের বিপুল ঘাটতি মেটানো সম্ভব হবে।

০৮ ॥ উন্নত রাষ্ট্রগুলো বাংলাদেশে উন্নয়ন ও বিনিয়োগের নামে আধিপত্য বিস্তার করছে— আলোচনা করুন।

উত্তর : দীর্ঘদিনের ঔপনিবেশিক আমলে এ দেশের মানুষ হয়েছে নির্যাতিত, নিপীড়িত, বঞ্চিত ও লাঞ্ছিত। দুমুঠো ভাতের জন্য আমাদের সংগ্রাম করতে হয়েছে। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশদের ভারত ত্যাগের ফলে ঔপনিবেশিক আমলের অবসান ঘটলেও এ দেশের মানুষের ভাগ্যের তেমন কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়নি। যার ফলে আমাদের সংগ্রাম করতে হয়েছে স্বাধীনতার জন্য। দীর্ঘ ২৩ বছরের আন্দোলন ও নয় মাসের ব্যাপক বিধ্বংসী যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতার সোনালি সূর্য উদিত হয়; কিন্তু দীর্ঘদিনের বঞ্চনার শিকার এবং যুদ্ধকালীন ক্ষতিগ্রস্ততার ফলে দেশের অর্থনীতি ভঙ্গুর হয়ে ওঠে। তাই প্রয়োজন দেখা দেয় রিলিফ বা সাহায্যের। ভৌগোলিক অবস্থান প্রাকৃতিক সম্পদের কারণে বাংলাদেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে আধিপত্যবাদীদের কাছে। সাহায্যের নামে আবির্ভাব ঘটে বৈদেশিক সাহায্য সংস্থার। পশ্চাৎপদ গ্রামের উন্নয়ন, স্বাস্থ্যসেবা, আর্থিক সহায়তার নামে দেশটির অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। স্বাধীনতার পর থেকেই বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশকে সাহায্য দেয়ার শর্ত হিসেবে অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণে মূল ভূমিকা পালন করে আসছে। বাংলাদেশের মন্দা আর্থ-সামাজিক অবস্থার সুযোগ নিয়ে উন্নত রাষ্ট্রগুলো বাংলাদেশে উন্নয়ন ও বিনিয়োগের নামে আধিপত্য বিস্তার করছে।

উন্নত রাষ্ট্রগুলোর আধিপত্য বিস্তার : উন্নত রাষ্ট্রগুলো এবং তাদের স্বার্থে গড়ে ওঠা ঋণ লগ্নিকারী সংস্থা বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ (যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের দেশগুলোর বিপর্যস্ত অর্থনীতি চাঙ্গা করার জন্য, যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপকে পুনর্গঠন করার জন্য, অর্থনৈতিক সাম্রাজ্য বজায় রাখার জন্য এবং তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর বাজার দখল করে রাখার জন্যই গড়ে উঠেছে) প্রভৃতি সংস্থা ও বহুজাতিক কোম্পানি দরিদ্র দেশগুলোতে আধিপত্য বিস্তার করে চলেছে। ২০০০ সালের সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

জাতিসংঘ সহস্রাব্দ সম্মেলনে কিউবার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ফিদেল ক্যাস্ট্রো বলেন, কয়েকটি ধনী দেশ গোটা বিশ্বকে লুটেপুটে খাচ্ছে। তিনি ঐ সম্মেলনে দাতাগোষ্ঠী ও বিশ্বব্যাংকের শত শত কোটি টাকা শোষণের ক্ষতিপূরণও দাবি করেন। নিচে উন্নত রাষ্ট্রগুলোর আধিপত্য বিস্তারের চিত্র তুলে ধরা হলো :

১. **রাজনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনায় হস্তক্ষেপ :** বিনিয়োগ ও সাহায্য করতে আসা এসব আধিপত্যবাদীদের হস্তক্ষেপ রাজনৈতিক অঙ্গন ও রাষ্ট্রপরিচালনায় স্বাধীন সত্তাকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। আমাদের রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে তাদের নগ্ন হস্তক্ষেপ দিন দিন স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে। এমনকি রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরীণ বিষয়েও নির্লজ্জ হস্তক্ষেপ করতে দ্বিধাবোধ করে না তারা। রাজনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনায় এ শক্তির আধিপত্য বিস্তারের চিত্র নিম্নরূপ :

ক. **রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণে :** এসব উন্নত দেশ ও বিভিন্ন দাতা গোষ্ঠী রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণে ব্যাপক হস্তক্ষেপ করে থাকে। তাদের নির্দেশনা মানা না হলে ঐ সরকারকে টিকে থাকার জন্য নানা সংগ্রাম করতে হয়। দাতা গোষ্ঠী সরকারবিরোধী এজেন্ডা বাস্তবায়নে তৎপর হয়ে ওঠে। বিনিয়োগ ও সহায়তার নামে তারা সংশ্লিষ্ট দেশকে তাদের দাসে পরিণত করার প্রয়াস চালায়।

খ. **রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ :** রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার আন্তর্জাতিক রীতিনীতি অমান্য করে এসব উন্নত দেশের প্রতিনিধিরা অযাচিতভাবে হস্তক্ষেপ করছে। নির্বাচন, সরকার গঠন, রাষ্ট্র পরিচালনা, নীতি নির্ধারণ, জরুরি সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে বিনিয়োগ ও উন্নয়নের দোহাই দিয়ে অযাচিত হস্তক্ষেপ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

গ. **তাদের সমর্থনপুষ্ট সরকার প্রতিষ্ঠা :** মুখে গণতন্ত্রের কথা বললেও এ আধিপত্যবাদী শক্তি যে কোনো মূল্যে তাদের মদদপুষ্ট সরকার প্রতিষ্ঠায় নির্লজ্জভাবে চেষ্টা করে এবং তাদের মদদপুষ্ট সরকারের অন্যায় ও অবৈধ কর্মকাণ্ডকে সমর্থন করে অথবা চেপে যায়। মূলত দেশের উন্নয়ন সাধন তাদের মুখ্য বিষয় নয়, তারা চায় তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে তাদের স্বার্থসিদ্ধি হাসিল করতে।

ঘ. **রাজনৈতিক সহিংসতায় ইন্ধন যোগানো :** এসব দেশ উন্নয়নশীল দেশসমূহকে অস্থিতিশীল করে ফায়দা লুটতে চায়। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় ২০০৬ সালের অক্টোবর থেকে ২০০৭ সালের ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনায় এ প্রভু রাষ্ট্রগুলোর ইন্ধন ছিল। ২০০৭ সালের ২২ জানুয়ারির নির্বাচন এসব দেশের প্রতিনিধিদের হস্তক্ষেপে এবং জাতিসংঘের বিরোধিতায় পণ্ড হয়ে যায়। দেশে জারি হয় জরুরি অবস্থা।

ঙ **সন্ত্রাসবাদের ইস্যু তৈরি করে :** বিশ্বব্যাপী তথাকথিত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে এ উন্নত রাষ্ট্রগুলো নিয়োজিত। সন্ত্রাসবাদের ধুয়া তুলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি যেমন বিশ্বের দরবারে ক্ষুণ্ন করছে ঠিক তেমনি সরকারের ওপর আধিপত্য বিস্তারের কৌশল হিসেবে গ্রহণ করছে এ সন্ত্রাসবাদের ইস্যুকে। উন্নয়ন ও বিনিয়োগের নামে এসে সন্ত্রাসবাদকে ইস্যু হিসেবে ব্যবহার করে দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে।

২. **অর্থনীতিতে আধিপত্য বিস্তার :** বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর মতো অর্থলগ্নিকারী সংস্থার উদ্দেশ্য বাংলাদেশসহ কোনো দরিদ্র দেশের উন্নয়ন নয় বরং উন্নয়নশীল দেশের দারিদ্র্যকে পুঁজি করে তাদের

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

বাণিজ্য সম্প্রসারণ করা, আধিপত্য বিস্তার করা দেশিয় অর্থনীতির চাকা অচল করে দেয়া। বিভিন্ন কৌশলে তারা এ প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

ক. **বহুজাতিক কোম্পানির বাজার প্রতিষ্ঠা :** উন্নয়নশীল বিশ্বে বিদেশি সাহায্য ও বিনিয়োগ নামে অর্থসংস্থানে শেষপর্যন্ত বহুজাতিক সংস্থাগুলোর বিনিয়োগক্ষেত্র সুদৃঢ় হয়। কারণ, বিভিন্ন রাষ্ট্র ও সংস্থা অনুদানের নামে যে অর্থের জোগান দেয় তা দিয়ে মূলত বহুজাতিক কোম্পানির বাজার প্রস্তুত হয় এবং বিস্তৃত হয়। যেমন— সবুজ বিপ্লব নামের আড়ালে যত বিদেশী সাহায্য এসেছে বিভিন্ন রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে তা গভীর, অগভীর নলকূপ, সার, কীটনাশক ইত্যাদির বাজার তৈরি করেছে, PL 480 নামের আড়ালে যত খাদ্য সাহায্য এসেছে তা মার্কিন বৃহৎ খামারগুলোর উদ্বৃত্ত খাবার বিক্রির ব্যবস্থাই করেছে। এসবের মাধ্যমে এতদিন যে গবেষণা হয়েছে সেটি জোগান দিয়ে বুদ্ধিভিত্তিক সম্পদ এবং একটি সমর্থক বিশেষজ্ঞ ও পণ্ডিতগোষ্ঠীর ভিত্তি তৈরি করেছে।

খ. **বিনিয়োগের নামে দেশের সম্পদ লুট :** বিনিয়োগের নামে আমাদের দেশের সম্পদ লুটে নিচ্ছে এ আধিপত্যবাদীরা। উদাহরণস্বরূপ বিশ্বব্যাংকের বিভিন্ন প্রকল্প, সুপারিশ এবং বিভিন্ন কোম্পানির (বিশেষত মার্কিনি) বিনিয়োগের ধরন ও চুক্তির শর্তাবলী বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। আমরা একদিকে গ্যাস খাতে কর্মরত বহুজাতিক বিভিন্ন কোম্পানি থেকে গ্যাস কিনছি যখন ১২০ টাকারও বেশি দামে, তখন বিদ্যুৎ খাতে কর্মরত কোম্পানিগুলো সরকার থেকে গ্যাস কিনছে ৫৪-৫৮ টাকা দরে। চুক্তি অনুযায়ী ২২ বছরের মধ্যে বিদ্যুতের দাম বাড়াতে পারবে না বলে চুক্তিকে মহৎ করে তোলা হয়। কিন্তু এ চুক্তির অন্যান্য বিধানগুলো উহ্য রাখা হয় যেখানে বলা হয়েছে— যদি গ্যাসের দাম বাড়ে, যদি টাকার অবমূল্যায়ন হয় অথবা যদি সরকারি নীতির পরিবর্তন হয় তাহলে বিদ্যুতের দাম বাড়ানো যাবে।

গ. **দেশীয় বাণিজ্যের অস্তিত্ব বিলীন করা :** বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাতের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন সংস্থা ও বিশ্বব্যাংকসহ বিভিন্ন বিনিয়োগকারী সংস্থার সম্পর্ক পুরনো। ১৯৭৬-৭৭ সাল থেকে বিভিন্ন সংস্থার গঠন, ভাঙন, বিভিন্ন বিনিয়োগ, নীতি, বিভিন্ন বিভাগ তৈরি ইত্যাদি ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র বা বিশ্বব্যাংকের ভূমিকা ছিল মুখ্য। ১৯৯০ সালে ডেসা, ১৯৯৬ সালে ডেসকো, ১৯৯৫ সালে পাওয়ার সেল, ১৯৯৬ সালে পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ, এরপর রুরাল পাওয়ার কোম্পানি গঠন প্রক্রিয়ারই ধারাবাহিকতা। ক্রমান্বয়ে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাত বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর প্রত্যক্ষ আওতায় আসছে। এ প্রক্রিয়াতেই গ্যাস খাতের মতো এ খাতেও ধীরে ধীরে রাষ্ট্রীয় সংস্থা লোকসান গুনছে। পিডিবি ভেঙে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বেসরকারি কোম্পানিতে পরিণত করার সরকারি চিন্তাভাবনা এরই অংশ।

ঘ. **কৃষি ব্যবস্থায় বিপর্যয় :** বাংলাদেশের কৃষিকে রপ্তানিমুখী উৎপাদনের দিকে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে বিশ্বব্যাংক কৃষি উন্নয়ন কৌশল নিয়ে বিস্তৃত কাজ শুরু করে ১৯৯৭ সালে। এর মধ্যে বিশ্বব্যাংক, ADB ও USAID, 'সামাজিক বনায়ন', 'চিংড়ি প্রকল্প' ইত্যাদি খাতে বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ করেছে তা একদিকে পরিবেশ বিপর্যয়ের প্রক্রিয়াকে জোরদার করেছে, অন্যদিকে কৃষি ভূমিকে সংকুচিত করেছে। অন্যদিকে বিশ্বব্যাংকের প্রেসক্রিপশনের ফলে সবুজ বিপ্লবের ধারা, বাংলাদেশের আর্সেনিক দূষণ বিস্তার করেছে। এর ফলে দু'কোটি মানুষ এখন বিপদের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে। আর্সেনিকের দূষণের কারণেও বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর বড় আকারের বিনিয়োগের ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

ঙ. **দেশি শিল্প বিকাশে অন্তরায় :** উন্নত দেশগুলো উন্নয়ন ও বিনিয়োগের নামে দেশি শিল্প কারখানা বন্ধে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। বিভিন্ন খাতে ভর্তুকি বন্ধ করতে, বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান, কলকারখানা বন্ধ করতে এবং ব্যক্তিমালিকানায় ছেড়ে দিতে পরামর্শ দেয় বিশ্বব্যাংক, IMF সহ বহুজাতিক কোম্পানিগুলো। ফলে এসব দেশে আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কলকারখানা, বেড়ে যাচ্ছে বেকারত্ব। মন্দা থেকে মন্দাতর হচ্ছে অর্থনৈতিক অবস্থা। কৃষি খাতে ভর্তুকি কমানোর ফলে বেড়ে যাচ্ছে কৃষি পণ্যের দাম। কৃষক হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির বদলে তৈরি হচ্ছে বেকারত্ব। তাই মাথাপিছু আয় বাড়লেও দরিদ্র ও ভূমিহীনের সংখ্যাও বাড়ছে।

চ. **দারিদ্র্যের বাণিজ্যিকীকরণ :** অভিযোগ আছে দারিদ্র্যের বাণিজ্যিকীকরণের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংক ও অন্যান্য দাতাগোষ্ঠী সরকারকে বাদ দিয়ে NGO-এর মাধ্যমে বাংলাদেশের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য সরকারকে চাপ দিচ্ছে। NGO-গুলোর সরকারের কাছে কোনো জবাবদিহিতা নেই। দরিদ্র মানুষদের ক্ষুদ্র ঋণ দিয়ে স্বাবলম্বী করে তোলার নামে NGO-গুলো ব্যাপক হারে সুদ নিয়ে তাদেরকে প্রচণ্ডভাবে শোষণ ও নির্যাতন করেছে। বিভিন্ন দাতাগোষ্ঠী, বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর কাছ থেকে যে ঋণ সাহায্য পাই তাতে আমরা স্বনির্ভর তো হচ্ছিই না বরং দিন দিন বাড়ছে ঋণের পরিমাণ। উন্নত দেশগুলো এভাবে দারিদ্র্যের বাণিজ্যিকীকরণ করে আমাদের অর্থনৈতিকভাবে শোষণ করছে।

৩. **সামাজিক ক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার :** এ দেশের মানুষের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে উন্নত দেশগুলো বিনিয়োগ ও সহযোগিতার নামে আমাদের সমাজজীবনে আধিপত্য বিস্তার করে চলছে। তাদের এ আধিপত্য বিস্তার ক্ষতিগ্রস্ত করেছে আমাদের সংহতি, সহযোগিতা-সহমর্মিতার পরিবর্তে পরস্পরকে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে পরস্পরের বিরুদ্ধে। হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও বিনোদন ব্যবস্থা। নিচে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো :

ক. **শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ :** উন্নত দেশগুলো বিনিয়োগের নামে শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণকে শক্তিশালী করেছে। তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে উঠেছে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাইভেট কলেজ, প্রাইভেট স্কুল ইত্যাদি। এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাগ্রহণ অত্যন্ত ব্যয়বহুল হওয়ায় দরিদ্র মানুষের পক্ষে এসব শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে হয়। ফলে শিক্ষা পরিণত হয়েছে এক দামি পণ্যে। এমনকি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সহ শিক্ষাখাতে ভর্তুকি কমানোর জন্য ব্যাপকভাবে চাপ দিয়ে যাচ্ছে সরকারকে, যার মাধ্যমে শিক্ষার পূর্ণ বাণিজ্যিকীকরণ সম্ভব হয়। দেশের অধিকাংশ গরিব মানুষ উচ্চ শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকে যাতে তাদের আধিপত্য স্থায়ী হয়।

খ. **নিজস্ব সংস্কৃতির বিলোপ সাধন :** আমাদের যেমন আছে নিজস্ব সংস্কৃতি তেমনি রয়েছে নিজেদের বিনোদন ব্যবস্থা। উন্নত দেশগুলো সহযোগিতার নামে এসে আমাদের সংস্কৃতি ও বিনোদন ব্যবস্থাকে পুরোপুরি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করে ফেলেছে। পশ্চিমা সংস্কৃতি ও বিনোদন ব্যবস্থা হয়ে উঠেছে আমাদের মূল উপজীব্য। ফলে আমাদের ভুগতে হচ্ছে Identity crisis-এ।

গ. **পরনির্ভরশীল করে তোলা :** উন্নয়ন ও বিনিয়োগের নামে মূলত বাংলাদেশ তথা উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলোকে পরনির্ভরশীল করে তোলা হচ্ছে। নিজস্ব স্বাধীনতা স্বকীয়তা, অবাধ মত প্রকাশের অধিকার সবই কেড়ে নেয়া হচ্ছে। নয়া কৌশলে বর্তমান সময়ের সাম্রাজ্যবাদীরা বিভিন্ন লোভ-লালসা দেখিয়ে আমাদের দিন দিন আরও বেশি পরনির্ভরশীল করে তুলছে। স্বাবলম্বী করার নামে ঋণ দিয়ে আরও বেশি পঙ্গু করে দিচ্ছে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

ঘ. **পরিবার ব্যবস্থায় ভাঙন :** আধিপত্য বিস্তারকারীদের আদর্শ অনুকরণে আমাদের দীর্ঘদিনের পরিবার প্রথা আজ হুমকির মুখে। প্রতিনিয়ত সম্প্রীতির এ প্রতিষ্ঠানটি ভেঙে খান খান হয়ে যাচ্ছে। সন্দেহ, অবিশ্বাস দানা বাঁধছে। ফলে পরিবার ব্যবস্থায় চরম অস্থিরতা বিরাজ করছে, যা আমাদের উন্নতির পথে চরম বাধার সৃষ্টি করছে।

ঙ. **চিকিৎসাক্ষেত্রে আধিপত্য :** উন্নত দেশগুলোর আধিপত্য বিস্তারের বাইরে নেই চিকিৎসা খাতও। মানবিক এ খাতটি নিয়েও তাদের কৌশলের অন্ত নেই। চিকিৎসাক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংকের HPSP-এর অধীন কর্মসূচি আন্তর্জাতিক ওষুধ কোম্পানি ও মার্কিন বীমা সংস্থাগুলোর কৌশলগত পরিকল্পনার সাথে সম্পর্কিত বলে অনেক রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদ ধারণা পোষণ করেন। এগুলোই জনগণের সামনে উপস্থিত হয়েছে সরকারের স্বাস্থ্যনীতি হিসেবে।

এভাবেই উন্নত দেশগুলো বিনিয়োগ আর উন্নয়নের নামে আমাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার করে চলছে।

উন্নত দেশগুলোর আধিপত্য প্রতিরোধের উপায় : উন্নত দেশগুলোর এ আধিপত্য বিস্তারকে প্রতিরোধ করা দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব, নিরাপত্তা টিকিয়ে রাখতে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। উন্নত দেশগুলোর আধিপত্য রোধকল্পে নিচে কতিপয় সুপারিশ পেশ করা হলো :

- ☐ সরকারকে রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণে তাদের প্রভাবমুক্ত থাকতে হবে। একটি স্বাধীন দেশের সরকার হিসেবে তাদেরকে হতে হবে সৎ, বিচক্ষণ, সাহসী ও দূরদর্শী।
- ☐ রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ বরদাশত করা যাবে না।
- ☐ রাজনৈতিক ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সহিংসতা বা সংঘাত নয় আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করতে হবে। দেশের স্বার্থে সকলকে একসাথে কাজ করতে হবে।
- ☐ বিদেশি পণ্য যথাসম্ভব পরিহার করতে হবে এবং দেশি পণ্য ব্যবহারে অভ্যস্ত হতে হবে।
- ☐ বিদেশি কোম্পানির সাথে স্বচ্ছ চুক্তি করতে হবে। এক্ষেত্রে দেশের স্বার্থকে সর্বাগ্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে।
- ☐ প্রাকৃতিক সম্পদের পর্যাপ্ত মজুদ সংরক্ষণ করতে হবে।
- ☐ কৃষি ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে হবে। কৃষিতে ভর্তুকি বাড়াতে হবে।
- ☐ দেশী শিল্প কারখানা রক্ষা করতে হবে। বন্ধ না করে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার চেষ্টা চালাতে হবে।
- ☐ বিশ্ববাজারে টিকে থাকার জন্য মানসম্পন্ন পণ্য তৈরি করতে হবে।
- ☐ NGO-গুলোর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।
- ☐ সকল নাগরিকের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে হবে।

উপসংহার : অবশেষে বলা যায়, আমাদের দারিদ্র্য ও অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে উন্নত বিশ্বের দেশগুলো এবং তাদের মদদপুষ্ট বহুজাতিক কোম্পানি ও সহায়তা সংস্থা আমাদের সংস্কৃতি, চিন্তা-চেতনা, স্বাধীনতাকে বিদূরিত করে আমাদের সমাজব্যবস্থার ওপর তাদের আধিপত্য বিস্তার অব্যাহত রেখেছে। এভাবে চলতে থাকলে বাংলাদেশ পর্যায়ক্রমে উন্নত দেশগুলোর একটি বৃহৎ বাজারে পরিণত হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাই দেশপ্রেম, সততা ও আত্মপ্রত্যয় নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে এ আধিপত্য বিস্তারকে প্রতিহত করতে হবে আমাদের নিজস্ব অস্তিত্ব রক্ষার জন্য। স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য, সকল মতবিরোধের উর্ধ্বে স্থান দিতে হবে দেশের স্বার্থকে, উন্নয়নকে এবং দেশপ্রেমকে। এভাবেই সম্ভব এ অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির মোকাবিলা করার।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-০১ আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF) কি?

উত্তর : ১-২২ জুলাই ১৯৪৪ সালে অনুষ্ঠিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্রেটন উডস সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৪৪ সালের ১ জুলাই 'আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল' (International Monetary Fund) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১ মার্চ ১৯৪৭ IMF কার্যক্রম শুরু করে। IMF-এর সদর দপ্তর যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে। IMF-এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৮৮। ১৮৮তম সদস্য দেশ দক্ষিণ সুদান। IMF-প্রধানের পদবি ব্যবস্থাপনা পরিচালক। মূলত বৈদেশিক বিনিময় হারের স্থিতিশীলতা বজায়, মুদ্রা বিনিময় সংক্রান্ত জটিলতা দূর, লেনদেনের ভারসাম্যহীনতা দূর করার জন্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পদক্ষেপ গ্রহণ, জাতিসংঘভুক্ত সদস্য দেশগুলোর মধ্যে সাহায্য সহযোগিতা বৃদ্ধি ইত্যাদি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এ সংস্থা গঠিত হয়।

প্রশ্ন-০২ আইএমএফ-এর গঠন ও ব্যবস্থাপনা বর্ণনা করুন।

উত্তর : আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের প্রাথমিক তহবিল তার সদস্য দেশগুলোর কাছ থেকে প্রাপ্তচাঁদা নিয়ে গঠিত হয়। সংস্থার বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৮৮।

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের তহবিলে চাঁদা দেয়ার জন্য প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রের চাঁদার কোটা ধার্য করা আছে। প্রত্যেক সদস্য দেশকে তার ধার্যকৃত চাঁদার কোটার শতকরা ২৫ ভাগ সোনা অথবা ডলারের মাধ্যমে এবং বাকি শতকরা ৭৫ ভাগ নিজস্ব মুদ্রায় জমা দিতে হয়।

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার পরিচালনার দায়িত্ব একটি 'বোর্ড অব গভর্নরস'-এর ওপর ন্যস্ত আছে। প্রত্যেক সদস্য দেশের একজন প্রতিনিধি নিয়ে এ বোর্ড গঠিত। এ বোর্ডের কাজ হলো সংস্থার সাধারণ নীতি নির্ধারণ করা। অর্থভাণ্ডারের দৈনন্দিন কাজ পরিচালনার জন্য ২১ জন সদস্য নিয়ে একটি কার্যকরী পরিচালক সমিতি গঠিত হয়েছে। এর মধ্যে ছয় জন স্থায়ী সদস্য রয়েছে। এ স্থায়ী সদস্য দেশগুলো হলো : যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, চীন, রাশিয়া ও ভারত। স্থায়ী সদস্য দেশগুলো বেশি চাঁদা দাতা দেশ।

কার্যকরী পরিচালক সমিতির সদস্যরা একজন ম্যানেজিং ডাইরেক্টর নির্বাচিত করেন। তার তত্ত্বাবধানেই আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সাধারণ কার্যাবলি সম্পাদিত হয়। সংস্থার প্রধান কার্যালয় যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটনে অবস্থিত। বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের একজন সদস্য।

প্রশ্ন-০৩ আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ব্যাংক (IBRD) বা বিশ্বব্যাংক কি?

উত্তর : গত শতকের চতুর্থ দশকে স্বর্ণমানের চূড়ান্ত পতনের পর আন্তর্জাতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে চরম সংকটের সৃষ্টি হয়। এ সময় বিভিন্ন দেশে সংরক্ষণনীতি অনুসরণের ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও লেনদেনের পরিমাণ খুবই সংকুচিত হয়ে পড়ে। ফলে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বিনিময় হারে পরিবর্তন আসে ব্যাপক আকারেই। সব দে শই বিশ্বশান্তির ও সমৃদ্ধির গুরুত্ব উপলব্ধি হয়। এর ফলে ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রের ব্রেটন উডস নামক জায়গায় মিত্রশক্তির অন্তর্গত দেশগুলো একটি সম্মেলনে একত্রিত হয়ে কয়েকটি আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থা স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

১৯৪৪ সালের জুলাইয়ে ব্রেটন উডস চুক্তি অনুযায়ী ১৯৪৫ এর ডিসেম্বর মাসে আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের সূচনা ঘটে। প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রে এক থেকে একজন গভর্নর নিয়ে IMF গর্ভনর পর্ষদ গঠিত হয়। এটিই (Band of Gonerrors) অর্থ তহবিলের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ। তহবিলের দৈনন্দিন কাজ পরিচালনার জন্য ১৭ সদস্যবিশিষ্ট একটি কার্যকরী পরিচালক পর্ষদ (Board of Executive Directors) আছে, যার স্থায়ী সদস্য হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, চীন ও ভারত। বাংলাদেশ এর সদস্য হয় ১৯৭২ সালের ১০ মে। বলা হয়, যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগুলোর অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও অনুন্নত দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনের উদ্দেশ্যে ব্রেটন উডস চুক্তি অনুযায়ী বিশ্বব্যাংক স্থাপিত হয়। বিশ্বব্যাংক IBRD ও IDA নামক দুটি আর্থিক সংস্থা নিয়ে গঠিত। এর মধ্যে IBRD ১৯৪৪ সালের জুন থেকে কাজ শুরু করে এবং IDA ১৯৬০ সালের সেপ্টেম্বর থেকে কাজ শুরু করে। অন্যদিকে, এ দুটি সংস্থাসহ মোট ৫টি পৃথক সংস্থা নিয়ে বিশ্বব্যাংক গ্রুপ প্রতিষ্ঠিত। তা হলো–

1. IBRD— International Bank for Reconstruction and Development
2. IDA— International Development Association.
3. IFC— International Finance Corporation.
4. MIGA— Multilateral Investment Guarantee Agency.
5. ICSID—International Centre for Settlement of Investment Disputes.

IBRD, IDA এবং IFC -এ ৩টি সংস্থাই আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ঋণ প্রদান করে থাকে।

১৯৭২ সালে বাংলাদেশে কাজ শুরু করে বিশ্বব্যাংক। বাংলাদেশ বিশ্বব্যাংকের মিশন প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন ইয়ুজড ফাল্যান্ড। বহু রাজনৈতিক আলাপ আলোচনা ও বিতর্কের পর ১৯৭২ সালের সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশ বিশ্বব্যাংকের সদস্য হয়।

প্রশ্ন-০৪ বিশ্বব্যাংকের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী লিখুন।

উত্তর : বিশ্বব্যাংকের উদ্দেশ্যাবলী : সদস্য দেশের অর্থনীতির পুনর্গঠন বিশেষ করে উন্নয়নের জন্য এ ব্যাংক ঋণ দেয়। এর উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপ :

১. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে সাহায্য প্রদান করা।
২. পৃথিবীর অনুন্নত দেশগুলোর অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদান করা।
৩. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গতি বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণে সাহায্য করা।
৪. গ্যারান্টি প্রদানের মাধ্যমে কোনো দেশকে বেসরকারি ঋণ পেতে সাহায্য করা।
৫. সদস্য দেশগুলোতে বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহে নিজস্ব তহবিল থেকে ঋণদান করা।
৬. সদস্য কোনো দেশের লেনদেনের ভারসাম্যে প্রতিকূলতা থাকলে তা দূর করার ব্যবস্থা করা।

বিশ্বব্যাংকের কার্যাবলী : বিশ্বব্যাংক তার উদ্দেশ্যাবলীর সাথে সঙ্গতি রেখে নিম্নলিখিত কার্যাবলী সম্পাদন করে :

১. অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও উন্নয়নের বিশেষ বিশেষ পরিকল্পনার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এ ব্যাংক ঋণ প্রদান করে।
২. ঋণ প্রদানের পূর্বে ব্যাংকের বিশেষজ্ঞগণ ঋণ গ্রহণকারী দেশ কর্তৃক গৃহীত পরিকল্পনার অর্থনৈতিক সাফল্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন। অর্থাৎ এ পরিকল্পনার জন্য ঋণ নেয়া হবে তা উৎপাদন বৃদ্ধিতে

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

সহায়ক হবে কিনা তা ব্যাংকের বিশেষজ্ঞগণ যাচাই করেন। গৃহীত পরিকল্পনাটি উপযুক্ত বলে বিবেচিত হলে তবেই ব্যাংক ঋণ প্রদান করে।

৩. বেসরকারি খাতের উন্নয়নের জন্য কোনো বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকেও এ ব্যাংক ঋণ দেয়। তবে এ ধরনের ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে সে দেশের সরকারকে ঋণের জন্য গ্যারান্টি প্রদান করতে হয়।

৪. ব্যাংকটি বিদেশে বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিত করে। কোনো ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারী বিদেশে বিনিয়োগ করতে চাইলে বিশ্ব ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান করে।

৫. উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশ্বব্যাংক ক্ষেত্রবিশেষে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এ উদ্দেশ্যে ব্যাংক এইড ইন্ডিয়া ক্লাব, হেলপ পাকিস্তান ক্লাব, কনসালটেটিভ এন্ড এইড গ্রুপস ফর বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ইন্দোনেশিয়া, উগান্ডা, ঘানা, কেনিয়া, তানজানিয়া, কোরিয়া, মরোক্কো এবং তুরস্ক প্রতিষ্ঠিত করেছে।

প্রশ্ন-০৫ এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB) কি?

উত্তর : জাতিসংঘের এশিয়া এবং দূরপ্রাচ্য সম্পর্কিত অর্থনৈতিক সহযোগিতা (Economic Co-operation for Asia and Far East)-এর সদস্য দেশের মন্ত্রিবর্গ ১৯৬৩ সালের ডিসেম্বরে ম্যানিলায় অনুষ্ঠিত বৈঠকে এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ১৯৬৫ সালে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার দ্বিতীয় বৈঠকে এ ব্যাংক স্থাপনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করা হয়। ১৯৬৬ সালে এটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তখন থেকে ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলায় (সদর দপ্তর) এর কার্যক্রম শুরু হয়। এটি একটি বহুজাতিক আঞ্চলিক উন্নয়ন ব্যাংক। এর আওতাধীন দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সহযোগিতার লক্ষ্যে এটি স্থাপিত হয়। এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংককে সংক্ষেপে এডিবি (ADB– Asian Development Bank) বলে। বর্তমানে এ ব্যাংকের সদস্য সংখ্যা ৬৭।

প্রশ্ন-০৬ এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী লিখুন।

উত্তর : এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী হলো :

১. সদস্য দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নে মূলধন বিনিয়োগ করা।
২. সদস্য দেশগুলোতে সরকারি ও বেসরকারি মূলধন কার্যকরভাবে বিনিয়োগে সহায়তা করা।
৩. সদস্য দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক সাহায্য ও সহযোগিতা জোরদার করা।
৪. কম উন্নত দেশে প্রাপ্ত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারে সহযোগিতা করা।
৫. সদস্য দেশগুলোর মধ্যকার প্রবৃদ্ধিগত বৈষম্য দূর করতে সহায়তা করা।
৬. অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্বল্পোন্নত সদস্য দেশে অধিক মূলধন বিনিয়োগ করা।
৭. উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, অর্থায়ন এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কৌশলগত সহযোগিতা প্রদান করা।
৮. অপেক্ষাকৃত স্বল্প হার সুদে সদস্য দেশগুলোকে ঋণ প্রদান।
৯. সামাজিক খাতের উন্নয়নে বিনিয়োগ পরিচালনা।
১০. সদস্য দেশসমূহে মৌলিক গবেষণা ও উন্নয়নমূলক প্রকল্পে ঋণদান।
১১. বিনিয়োগযোগ্য বিভিন্ন প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই ও প্রাক-মূল্যায়ন।
১২. সদস্য দেশগুলোর বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মধ্যে প্রয়োজন অনুযায়ী সমন্বয় সাধনের ব্যবস্থা গ্রহণ।
১৩. জাতিসংঘ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সহযোগিতা ও সমন্বয় সাধন।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

উপরিউক্ত কার্যাবলী সম্পাদনের মাধ্যমে এডিবি সদস্য দেশসমূহের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, তাইওয়ান, হংকং, দক্ষিণ কোরিয়া, বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এডিবির অবদান অনস্বীকার্য।

প্রশ্ন-০৭ ভাসমান মুদ্রা বা ফ্লোটিং এক্সচেঞ্জ রেট বলতে কি বোঝেন?

উত্তর : ফ্লোটিং এক্সচেঞ্জ রেট হলো টাকার অবাধ বিনিময় হার। এ নীতিতে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণের এখতিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিবর্তে বাজারে মুদ্রার যোগান ও চাহিদার ভিত্তিতেই নির্ধারিত হবে। অন্যদিকে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো নিজেরাই বৈদেশিক মুদ্রার দরদাম ঠিক করতে পারবে। বাংলাদেশ ব্যাংক ২৯ মে ২০০৩ এক সার্কুলারের মাধ্যমে টাকাকে ভাসমান মুদ্রা করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। অবশেষে ৩১ মে ২০০৩ আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা তথা আইএমএফ-এর চাপের মুখে সরকার এ ফ্লোটিং রেট চালুর বিষয়টি কার্যকর করে। এদিন টাকার বিনিময়ে মার্কিন ডলারের দাম ছিল ৫৭.৪০ থেকে ৫৮.৪০ টাকা। ১৯৮৫ সাল থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক টাকার বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রার মূল্যমান নির্ধারণ করে আসছিল। বর্তমানে অবশ্য কেবল চলতি হিসাবের ক্ষেত্রেই টাকার মুদ্রামান অবাধ করা হয়েছে। মূলধনী হিসাবে বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের ক্ষেত্রে আগের বেঁধে দেয়া নিয়মানীতি বহাল রয়েছে। এ নতুন ব্যবস্থায় আমদানি ও অন্যান্য চলতি ব্যয়ের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়ের ক্ষেত্রে কোনো বিধি নিষেধ নেই।

প্রশ্ন-০৮ বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের সমস্যাগুলো লিখুন।

উত্তর : বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে প্রধান সমস্যা হচ্ছে সীমিত রপ্তানি পণ্য এবং বাজার। বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি পণ্য তৈরি পোশাক। এর সিংহভাগই রপ্তানি করা হয় ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রে। বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা, আমদানিকারক দেশসমূহ কর্তৃক আরোপিত অযাচিত শর্তারোপ ও পোশাক রপ্তানিতে কিছু কিছু দেশ বাংলাদেশের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠায় তৈরি পোশাক রপ্তানি হ্রাস পাচ্ছে। বিদেশের বাজারে বাংলাদেশি রপ্তানি পণ্যের প্রবেশে বিভিন্ন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়, যেমন– নন ট্যারিফ, প্যারা ট্যারিফ প্রতিবন্ধকতা, স্ট্রিনজিন্ট কোয়ালিটি স্ট্যান্ডার্ড রিকোয়ারম্যান্ট, স্ট্রিনজিন্ট রুলস অব অরিজিন এবং কঠোর শ্রম ও পরিবেশ মানদণ্ড। যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশি পণ্য প্রবেশে কোটা, শ্রম মানদণ্ড, হিয়ামিত খাদ্যের জন্য এইচএসিসিপি-এর মতো কোয়ালিটি রিকোয়ারম্যান্ট, তৈরি পোশাকের ক্ষেত্রে ইকো লেবেলিং-এর মতো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাজারে রুলস অব অরিজিন, কোয়ালিটি স্ট্যান্ডার্ড রিকোয়ারম্যান্ট, ইকো লেবেলিং-এর মতো সমস্যায় পড়তে হয়। জাপান, কানাডা, অস্ট্রেলিয়ার বাজারেও বাংলাদেশের পণ্য প্রবেশে অনুরূপ সমস্যায় পড়তে হয়।

প্রশ্ন-০৯ বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের সমস্যা ও সম্ভাব্য করণীয় কি?

উত্তর : বিনিয়োগে সমস্যা : স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য যত পদক্ষেপ নিয়েছে তার অধিকাংশই সফল হয়নি। এর প্রধান প্রধান কারণ হলো :

- অবকাঠামোগত দুর্বলতা
- ব্যাংক ব্যবস্থাপনায় মাত্রাতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ
- অবনতিশীল আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

- শ্রমিক নেতাদের হঠকারিতা
- রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা
- বিদেশিদের কাছে বাংলাদেশের ইমেজ খুবই নেতিবাচক
- বিরাজমান কর কাঠামো
- আমলাতান্ত্রিক জটিলতা

করণীয় : বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ সংক্রান্ত সরকারি টাস্ক ফোর্সের খসড়া এবং প্রতিবেদনে বিনিয়োগ বৃদ্ধিকল্পে নিম্নলিখিত সুপারিশ করা হয়েছে :

- বিনিয়োগ বোর্ডকে দক্ষ ও দ্রুত সেবা প্রদানকারী সংগঠনে পরিণত করা।
- বিনিয়োগ নীতি ও আইন সংস্কার।
- পুঁজিবাজার সম্প্রসারণ।
- দ্রুত মামলা নিষ্পত্তি করার জন্য ক্ষমতাসম্পন্ন ঋণ ও বাণিজ্য আদালত গঠন।
- আইন-শৃঙ্খলার উন্নয়ন ও চাঁদাবাজি দমন।
- ট্যাক্স হলিডের মেয়াদ সম্প্রসারণ।
- সুদের হার হ্রাস।
- প্রশাসনিক সংস্কার।
- অবকাঠামোগত সুবিধা বৃদ্ধি।
- ইপিজেডের বাইরে অবস্থিত ১০০% রপ্তানিমুখী শিল্পকেও সমান সুবিধা প্রদান।

প্রশ্ন-১০ কোটামুক্ত বিশ্বে তৈরি পোশাক শিল্পের অবস্থা পর্যালোচনা করুন।

উত্তর : বাংলাদেশ এতদিন জিএসপি সুবিধার অধীনে ইউরোপ ও আমেরিকার বাজারে পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে শুল্কমুক্ত সুবিধা পেয়ে আসছে। কিন্তু ২০০৫ সালে এ সুবিধা রহিত হয়। ফলে বাংলাদেশকে চীন, ভারত, শ্রীলঙ্কাসহ পোশাক রপ্তানিকারক অন্যান্য দেশের সাথে প্রতিযোগিতা করেই টিকে থাকতে হচ্ছে। এক্ষেত্রে অবশ্য খুশির কথা হলো ২০০৫ সালের প্রত্যাশায় সম্প্রতি বড় বড় কিছু বিনিয়োগ হয়েছে। এটা ইতিবাচক দিক। তবে সেটা বেশিরভাগই হয়েছে কটন টেক্সটাইলে। আরেকটি বড় পরিবর্তন যেটা হয়েছে সেটা হলো আমরা ওভেন গার্মেন্টস থেকে নিট গার্মেন্টসে চলে এসেছি। নিট গার্মেন্টসে আমাদের ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ থাকায় সেখানে ভ্যালু এডিশন বেশি হয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রেও একটি ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে। তৃতীয়ত যে পজেটিভ পরিবর্তনটা হয়েছে, সেটা হলো বাংলাদেশ ক্রমান্বয়ে যুক্তরাষ্ট্রের নন-কোটা মার্কেটেও কিছু কিছু বাজার সম্প্রসারণ করতে পেরেছে। এছাড়া ইউরোপীয় ইউনিয়নে বাংলাদেশ যেসব পণ্য বিক্রি করছে তা প্রতিযোগিতা করেই বিক্রি করছে। কম্পিউটারের ব্যবহার ক্যাড, ক্যাম, বেটার ম্যানেজমেন্ট, ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে ডাইরেক্ট মার্কেটিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ফলে আজ থেকে ৩/৪ বছর আগে আমরা যতখানি হতাশা নিয়ে এ ব্যাপারে কথা বলতাম এখন তার তুলনায় অনেক কম হতাশা নিয়ে কথা বলি। এটা অনেক বড় পরিবর্তন বা অগ্রগতি। কিন্তু এটার অর্থ এই নয় যে, পুরো সেক্টর বিপদমুক্ত। ক্রমান্বয়ে গার্মেন্টস মালিকদের কাজের পরিবেশ এবং শ্রমের মানের বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এবং তারা ক্রমান্বয়ে বুঝতে শিখেছে শ্রমের মান এবং শ্রমের পরিবেশ উন্নত করা গেলে তাদের উৎপাদনশীলতাও বাড়বে এবং একই সঙ্গে তারা বাজার সুবিধাও পাবে। গুণগতমানের এ পরিবর্তনকে একটি বড় পরিবর্তন বলে মনে করা হয়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, লিড টাইম কমানো বা লেবার স্ট্যান্ডার্ড যাই করা হোক না কেন সব কিছু করার জন্যই অর্থের (বিনিয়োগ) প্রয়োজন হয়। কিন্তু এ ধরনের বিনিয়োগ করার মতো সামর্থ্য সমস্ত প্রতিষ্ঠানের নেই। এক্ষেত্রে সরকারের ব্যাকআপের প্রয়োজন রয়েছে। সরকারকে অবকাঠামো সুবিধা, বন্দর, ব্যাংক, বীমা, কাস্টমস ইত্যাদি বাণিজ্য সমর্থক অবকাঠামো নিশ্চিত করতে হবে। যারা এ ব্যয়টাকে ইন্টারনালাইজ করতে পারছে, অর্থাৎ অর্থনীতির ভাষায় যারা উৎপাদনে এ ব্যয়কে বা বিনিয়োগকে তার অন্যান্য উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত করে নিয়ে আত্মস্থ বা হজম করতে পারবে, তারা টিকে থাকবে।

প্রশ্ন-১১ শুল্কমুক্ত বিশ্ব বলতে কি বোঝেন?

উত্তর : ২০০৫ সালে WTO চুক্তি বিশ্বব্যাপী কার্যকর হলে সমগ্র বিশ্ব পরিণত হয় 'শুল্কমুক্ত বিশ্বে'। 'শুল্কমুক্ত বিশ্ব' বলতে আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে কোনো শুল্কহার থাকবে না। আর থাকলেও তা শূন্যের কাছাকাছি একটি ন্যূনতম হারে নির্ধারণ করা হবে। বর্তমানে আমাদের রাজস্বের একটি বড় অংশ শুল্ক থেকে আসে।

প্রশ্ন-১২ বাংলাদেশ পুঁজি বিনিয়োগ সংস্থা (ISB) সম্পর্কে কি জানেন?

উত্তর : ১৯৭৬ সালের ১ অক্টোবর ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ অধ্যাদেশ নং ৪০, ১৯৭৬ বলে ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (ISB) বা বাংলাদেশ পুঁজি বিনিয়োগ সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সংস্থার মুখ্য উদ্দেশ্য হলো : ক. বিনিয়োগ ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদান ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণ; খ. পুঁজিবাজার উন্নয়নে সাহায্য করা; গ. সঞ্চয় সংগ্রহের মাধ্যমে অর্থ কাজে লাগানো; ঘ. এসব কাজে সকল প্রকার সাহায্য প্রদান করা। দেশের দ্রুত শিল্পায়ন এবং সুসংহত ও সক্রিয় পুঁজিবাজার, বিশেষ করে সিকিউরিটি বাজার উন্নয়নে আইসিবি প্রতিষ্ঠা সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন আর্থিক কার্যক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের মূলধনের স্বল্পতা পূরণ করার লক্ষ্যে এবং জাতীয় নীতিমালায় সঞ্চয়ের হার বৃদ্ধিকল্পে স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে আইসিবির প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন-১৩ সাফটা চুক্তি বাস্তবায়নে বাংলাদেশের কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত?

উত্তর : সাফটা (SAFTA—South Asian Free Trade Area) সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে সম্পাদিত এমন একটি চুক্তি, যার মাধ্যমে এর সদস্য দেশগুলো অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একে অপরের জন্য মুক্তবাণিজ্য অঞ্চলে পরিণত হবে। অর্থাৎ স্বাক্ষরকারী দেশগুলোর পণ্য কোনো রকম শুল্কজনিত বা অন্য কোনো বাধা ছাড়াই আরেকটি দেশে প্রবেশ করতে পারবে। সাফটা চুক্তি বাস্তবায়ন ও এর থেকে সুফল পেতে হলে বাংলাদেশকে নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে হবে :

১. দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ঘাটতি দূর করতে হবে। বিশেষত প্রতিবেশী ভারতের সাথে যে বৃহৎ বাণিজ্য ঘাটতি তা দূর করার জন্য রপ্তানি বাড়াতে হবে।
২. অপ্রচলিত পণ্য ও বহুমুখী বাণিজ্য বৃদ্ধি করতে হবে;
৩. দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করে উৎপাদন বাড়াতে হবে;
৪. আন্তঃসহযোগিতা বৃদ্ধি ও বৈরি সম্পর্কের অবসান ঘটাতে হবে;
৫. টেকসই উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর করতে হবে;
৬. সার্ক সদস্য দেশগুলোর মধ্যে শক্তিশালী ট্রেড ব্লক গড়ে তুলতে হবে;

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৭. কোনো দেশের যে কোনো পণ্যে ডাম্পিং-এর ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে;

৮. দেশীয় শিল্পের বিকাশ ও মানোন্নয়নে সরকারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করতে হবে।

উপরিউক্ত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করলে সাফটা (SAFTA) বাস্তবায়ন ও তা থেকে বাংলাদেশের সাফল্য লাভ করা সম্ভব হবে।

প্রশ্ন-১৪ বহুজাতিক সংস্থা কি?

উত্তর : বহুজাতিক সংস্থা বা Multinational Corporation হলো বিশ্ব বাণিজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা বিশ্ব বাণিজ্যের ৪০ শতাংশেরও বেশি অংশ কেবল ১০০টি বহুজাতিক সংস্থার নিয়ন্ত্রণে। একটি প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার একাধিক রাষ্ট্রে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালিত হলে সেটি বহুজাতিক সংস্থা নামে পরিচিতি পায়। সাধারণত একটি কোম্পানি বা একটি কোম্পানি গ্রুপের মোট রাজস্ব আয়ের এক চতুর্থাংশ বা তার বেশি আয় যদি অন্যান্য দেশ থেকে অর্জিত হয়, তখনই ঐ কোম্পানি বা কোম্পানি গ্রুপকে বহুজাতিক সংস্থা বা Multinational Corporation হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। সাধারণত বিশ্বে চার ধরনের বহুজাতিক সংস্থা রয়েছে। সেগুলো হলো—

১. বহুজাতিক সংস্থা, যার বিকেন্দ্রীকরণের সাথে নিজ দেশে এর শক্ত অবস্থান রয়েছে।

২. এমন কেন্দ্রীভূত বহুজাতিক সংস্থা যা ব্যয় সুবিধা অর্জনের লক্ষ্যে পৃথিবীর যে স্থানে সহজলভ্য সম্পদ রয়েছে সেই স্থান কেন্দ্রীক উৎপাদন কার্য পরিচালনা করে।

৩. এমন আন্তর্জাতিক কোম্পানি যা তার মূল কোম্পানির প্রযুক্তির সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত।

৪. এমন একটি কোম্পানি যা উপরের বর্ণিত তিন কোম্পানির মিশ্রণে পরিচালিত।

বাংলাদেশের কয়েকটি বৃহৎ বহুজাতিক সংস্থা হলো শেভরন, গ্রামীণ ফোন, ইউনিলিভার, স্ট্যান্ডার্ট চার্টারড ব্যাংক প্রভৃতি। সুতরাং একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান একাধিক দেশে তার ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করলে এবং ন্যূনতম মোট রাজস্ব আয়ের এক চতুর্থাংশ বিদেশ থেকে অর্জন করলেই সেটিকে বহুজাতিক সংস্থা/প্রতিষ্ঠান বা Multinational Corporation বলা যাবে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

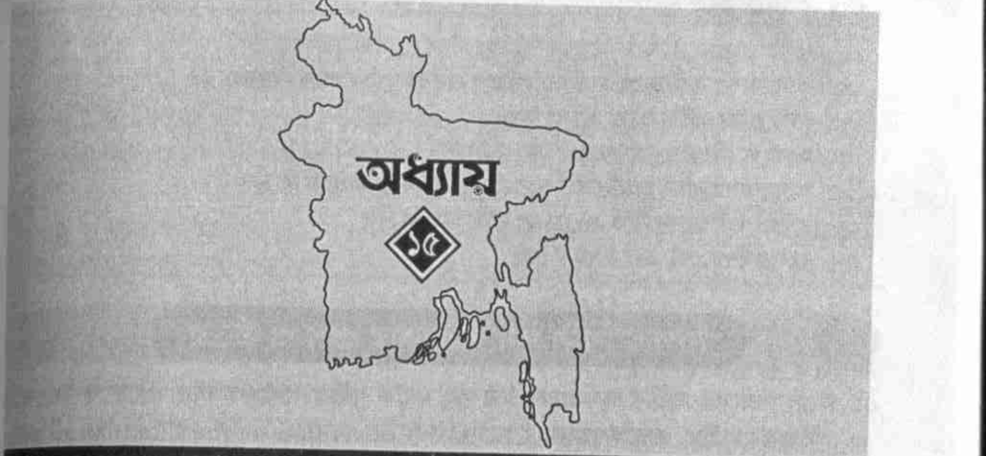

বাংলাদেশের জেন্ডার ইস্যু ও উন্নয়ন
Gender issues and Development in Bangladesh

Syllabus | *Gender issues and Development in Bangladesh.*

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১. *বাংলাদেশের নারীর ক্ষমতায়নে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ সংক্ষেপে উল্লেখ করুন। গৃহীত পদক্ষেপগুলো CEDAW (Convention on the Elimination of Discrimination Against Women) সনদকে সমর্থন করে কি? [৩১তম বিসিএস]*

অথবা, নারীর ক্ষমতায়ন বলতে কি বুঝায়? এ কার্যক্রমে কি কি ব্যবস্থা ফলপ্রসূ অবদান রাখতে পারে বলে মনে করেন? সুপারিশসহ লিখুন। [২৮তম বিসিএস]

০২. *বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়নের প্রধান সীমাবদ্ধতা ও প্রতিকারসমূহ আলোচনা করুন। [১৭তম বিসিএস]*

০৩. *নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপসমূহে সংবিধান ও ধর্ম প্রণীত নারীর অধিকারসমূহের কতটুকু বাস্তবায়ন হয়েছে বলে আপনি মনে করেন। [২৫তম বিসিএস]*

অথবা, সাম্প্রতিক নারী মুক্তি আন্দোলন এবং নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ মূল্যায়ন করুন। [১০ম বিসিএস]

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

০৪. *বাংলাদেশে নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সমস্যা ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সম্পর্কে আলোচনা করুন।*

০৫. *নারী নির্যাতন বলতে কি বোঝায়? নারী নির্যাতনের ধরন উল্লেখপূর্বক ইভটিজিং-এর কারণ ও প্রতিকার বর্ণনা করুন।*

০৬. *বর্তমানে বাংলাদেশে নারী সহায়তাকল্পে কি কি পদক্ষেপ বিদ্যমান রয়েছে? জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১-তে নারীর রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতায়নের উপর কিরূপ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে?*

০৭. *বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উত্থান ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নারীর অবদান মূল্যায়ন করুন।*

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

০১. সার্বিক উন্নয়নে নারীর ক্ষমতায়নের ভূমিকা লিখুন। [২৭তম বিসিএস]
০২. বাংলাদেশের নারীসমাজের এগিয়ে যাওয়ার প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে লিখুন।
০৩. জাতি গঠনে নারীসমাজের ভূমিকা লিখুন।
০৪. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে নারীসমাজের ভূমিকা লিখুন।
০৫. বাংলাদেশের নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণের প্রতিবন্ধকতাগুলো কি কি?
০৬. জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১-এর লক্ষ্যসমূহ কি কি?
০৭. বাংলাদেশের প্রথম নারী স্পিকার কে?

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১। বাংলাদেশের নারীর ক্ষমতায়নে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ সংক্ষেপে উল্লেখ করুন। গৃহীত পদক্ষেপগুলো CEDAW (Convention on the Elimination of Discrimination Against Women) সনদকে সমর্থন করে কি? *[৩১তম বিসিএস]*
***অথবা,* নারীর ক্ষমতায়ন বলতে কি বুঝায়? এ কার্যক্রমে কি কি ব্যবস্থা ফলপ্রসূ অবদান রাখতে পারে বলে মনে করেন? সুপারিশসহ লিখুন।** *[২৮তম বিসিএস]*

উত্তর : বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি দরিদ্র দেশ। এদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। মোট জনসংখ্যার বৃহৎ অংশ অর্থাৎ নারী সমাজকে বঞ্চিত রেখে দেশের প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই দেশের প্রকৃত উন্নয়নের স্বার্থে নারী সমাজের প্রতি সকল প্রকারের বৈষম্য দূর করা উচিত। শুধু বৈষম্য দূর নয় দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন নারীর ক্ষমতায়ন। বাংলাদেশের নারীর ক্ষমতায়নে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ :

১৯৯৭ সালের ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা অনুমোদন নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে অন্যতম বড় অর্জন। এই নীতিমালা জাতীয়, স্থানীয় ও পারিবারিক পর্যায়ে নারী ইস্যুকে মূলধারায় নিয়ে আসার ওপর গুরুত্বারোপ করেছে। আর এ উদ্দেশ্যে যে কৌশলগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে তা হলো :

- জাতীয়, জেলা, উপজেলা ও তৃণমূল পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ গ্রহণ ও তা শক্তিশালীকরণ।
- এনজিও এবং বৃহত্তর সুশীল সমাজের মধ্যে আরো সহযোগিতামূলক সম্পর্ক গঠন।
- জেন্ডার ইস্যু নিয়ে গবেষণা পরিচালনা।
- জেন্ডারকে মূলধারা করতে সহায়তার জন্য প্রকল্প কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সকল স্তরে সক্ষমতা গঠন।
- জেন্ডার ইস্যু সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধিতে সকল পর্যায়ে অ্যাডভোকেসি, লবিং এবং গণতৎপরতা।
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে নেটওয়ার্কিং।
- আর্থিক ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৭৩-১৯৭৮) যে নারী পুনর্বাসন বোর্ড গঠন করা হয় তার উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি ছিল :

ক. স্বাধীনতা যুদ্ধে নির্যাতিত নারী ও শিশুর সঠিক তথ্য আহরণের জন্য জরিপ চালানো এবং এদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

খ. যুদ্ধে নির্যাতিত নারীদের বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান।

গ. বীরাঙ্গনা নারীসহ যেসব পরিবারে উপার্জনক্ষম পুরুষ মুক্তিযুদ্ধে নিহত হয়েছেন সেসব পরিবারের কর্মক্ষম নারীদের চাকরি ও প্রশিক্ষণ প্রদান।

ঘ. নারী পুনর্বাসন বোর্ডের দায়িত্ব ও কর্মপরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৯৭৪ সালে এ বোর্ডকে পুনর্গঠিত করে আইনের মাধ্যমে 'নারী পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউন্ডেশন'-এ উন্নীত করা।

এছাড়া সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় নারীদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয় গণশিক্ষা কার্যক্রম চালু করে। সাভারে মহিলাবিষয়ক অধিদপ্তরের ৩৩ বিঘা জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত গ্রামীণ মহিলাদের জন্য কৃষিভিত্তিক কর্মসূচির কাজ শুরু হয় ১৯৭৩ সালে।

সাংগঠনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ : ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন বোর্ডকে নারী পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউন্ডেশন করার পর ১৯৭৮ সালে মহিলাবিষয়ক স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়। এছাড়া ১৯৭৬ সালে 'জাতীয় মহিলা সংস্থা' গঠন হয়। সরকারের গৃহীত নারী উন্নয়ন কার্যক্রমকে বেগবান করার লক্ষ্যে ১৯৮৪ সালে গঠন করা হয় মহিলাবিষয়ক পরিদপ্তর এবং এ পরিদপ্তরকে ১৯৯০ সালে অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়। এছাড়া জাতীয় পর্যায়ে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, নীতি নির্ধারণ এবং উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও পর্যালোচনার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে সভাপতি করে জাতীয় মহিলা ও উন্নয়ন পরিষদ গঠন করা হয়। ৩০ এপ্রিল ২০১৩ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন বাংলাদেশের প্রথম নারী স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী।

আইনি পদক্ষেপ : নারী নির্যাতন প্রতিরোধ এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সরকার বিভিন্ন রকম আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যেমন–

- মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (সংশোধন করা হয়েছে ১৯৮৬ সালে);
- বিবাহ ও তালাক নিবন্ধীকরণ আইন ১৯৭৪ (১৯৭৫ সালে সংশোধিত);
- যৌতুক নিরোধ আইন ১৯৮০ (১৯৮৬ সালে সংশোধিত);
- বাল্যবিবাহ ১৯২৯ (১৯৮৪ সালে সংশোধিত);
- নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন ১৯৯৫;
- নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০;
- জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ ঘোষণা।

গৃহীত পদক্ষেপসমূহ CEDAW সনদকে সমর্থন করে কি-না : রাষ্ট্র, অর্থনীতি, পরিবার ও সমাজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ডিসেম্বর, ১৯৭৯ সালে জাতিসংঘে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডও) গৃহীত হয় এবং ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৮১ সালে কার্যকর হয়। নারীর জন্য আন্তর্জাতিক বিল অব রাইটস বলে চিহ্নিত এ দলিল নারী অধিকার সংরক্ষণের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ মানদণ্ড বলে বিবেচিত। ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ চারটি ধারায় [২, ১৩(ক), ১৬(ক) ও (চ)] সংরক্ষণসহ এ সনদ অনুসমর্থন করে। পরবর্তীতে ১৯৯৬ সালে ধারা ১৩(ক) এবং ১৬.১(চ) থেকে সংরক্ষণ প্রত্যাহার করা হয়। এই সনদে অনুস্বাক্ষরকারী রাষ্ট্ররূপে বাংলাদেশ প্রতি চার বছর অন্তর জাতিসংঘে রিপোর্ট পেশ করে। সর্বশেষ ষষ্ঠ ও সপ্তম পিরিয়ডিক রিপোর্ট ডিসেম্বর, ২০০৯ সালে জাতিসংঘে প্রেরণ করা হয় ও ২৫ জানুয়ারি ২০১১ তে সিডও কমিটিতে বাংলাদেশ সরকার রিপোর্টটি উপস্থাপন করে।

CEDAW সনদে মোট ৩০টি ধারা (Article) রয়েছে। ১ম Article-এ নারীর প্রতি রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, সামরিক বৈষম্য বিলোপের কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত

পদক্ষেপসমূহ যেমন নারী শিক্ষার হার শতকরা ৫০-এ উন্নীত করা, চাকরিতে মেয়েদের কোটা বৃদ্ধি ইত্যাদির মাধ্যমে বৈষম্য দূরীকরণে প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

দ্বিতীয় Article-এ নারী উন্নয়নে কিছু পলিসি সুপারিশ করা হয়েছে। যেখানে সরকারি নীতি নারীবান্ধব করার কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশে বিদ্যমান নারীনীতি প্রকৃতপক্ষে নারীবান্ধব।

তৃতীয় Article-এ নারীর মৌলিক মানবাধিকার রক্ষার কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানের ২৮(২) নং অনুচ্ছেদে নারীদেরকে সমান অধিকার এবং ১৯(৩) নং অনুচ্ছেদে সুযোগের সমতার কথা বর্ণিত আছে। এছাড়া CEDAW সনদের ২য় অংশে নারীর রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে বলা হয়েছে। বাংলাদেশের সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন সনদের এ অংশকে সমর্থন করে।

CEDAW সনদের ৩য় অংশে (Article 10-14) নারীর মৌলিক কিছু অধিকার যেমন– শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থানসহ গ্রামীণ নারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের কথা বলা হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়নে গৃহীত সরকারি-বেসরকারি সকল পদক্ষেপই CEDAW সনদের এ অংশকে সমর্থন করে।

CEDAW সনদের ৪র্থ অংশে (Article 15-16) নারীর অনুকূল আইন এবং বিবাহে ও পারিবারিক জীবনে নারী অধিকার রক্ষার কথা বলা হয়েছে। সংশোধিত মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৮৬, বিবাহ ও তালাক নিবন্ধীকরণ আইন ১৯৭৪, যৌতুক নিরোধ আইন ১৯৮০ (১৯৮৬ সালে সংশোধিত), নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০, নারী উন্নয়ন নীতি প্রভৃতি পদক্ষেপ CEDAW সনদের এ অংশকে সমর্থন করে। এ ছাড়াও CEDAW সনদের অন্যান্য Articles এর বিধি ও সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ সমর্থিত।

উপসংহার : নারী যুগ যুগ ধরে শোষিত ও অবহেলিত হয়ে আসছে। পুরুষ শাসিত সমাজব্যবস্থায় ধর্মীয় গোঁড়ামি, সামাজিক কুসংস্কার, কূপমণ্ডুকতা, নিপীড়ন ও বৈষম্যের বেড়াজালে তাকে সর্বদা রাখা হয়েছে অবদমিত। গৃহস্থালি কাজে ব্যয়িত নারীর মেধা ও শ্রমকে যথাযথ মূল্যায়ন করা হয়নি। নারী আন্দোলনের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া নারী জাগরণের আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন, 'তোমাদের কন্যাগুলোকে শিক্ষা দিয়ে ছেড়ে দাও, নিজেরাই নিজেদের অন্নের সংস্থান করুক'। তার এ আহ্বানে নারীর অধিকার অর্জনের পন্থা সম্পর্কে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা রয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এ দেশের নারী জাগরণে সাড়া পড়েছিল সাধারণত শিক্ষাগ্রহণকে কেন্দ্র করে। এছাড়া ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে নারী তার অধিকার আদায়ে সচেতন হয়ে ওঠে। বায়ান্ন এর ভাষা আন্দোলন ও উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও স্বাধিকার আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণ ছিল গুরুত্বপূর্ণ। নারীর এসব অমূল্য অবদানের প্রতি লক্ষ্য রেখে সরকার নারীর ক্ষমতায়নে অনেকগুলো উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ সকল পদক্ষেপ CEDAWসহ নারী অধিকার রক্ষায় গঠিত অন্যান্য সকল সংস্থার কার্যাবলীকে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সমর্থন করে।

০২ ▌ বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়নের প্রধান সীমাবদ্ধতা ও প্রতিকারসমূহ আলোচনা করুন। *[১৭তম বিসিএস]*

উত্তর : নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন বলতে বোঝায় নারীর মৌলিক অধিকারসমূহ নিশ্চিতকরণ। সাংবিধানিক নিশ্চয়তাসহ রাষ্ট্রীয় শাসনযন্ত্রের সকল স্তরে তথা পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে নারীর অংশগ্রহণ ও অধিকার নিশ্চিতকরণ। বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়নে রয়েছে বহুবিধ সীমাবদ্ধতা। বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে প্রয়োজন নারী ক্ষমতায়নের সীমাবদ্ধতাসমূহের অবসান, সার্বিক নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা।

বাংলাদেশে নারী ক্ষমতায়নের প্রধান সীমাবদ্ধতাসমূহ : বাংলাদেশে নারী ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে রয়েছে বহুবিধ সীমাবদ্ধতা। নিচে এ সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা হলো :

১. **সামাজিক অবস্থা :** বাংলাদেশে নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করা সত্ত্বেও এখানে নারীর অবস্থা নিতান্তই হতাশাব্যঞ্জক এবং নারী নির্যাতন, যৌতুকের জন্য নারী হত্যা, নারী ও মেয়েশিশু অপহরণ ও পাচার, ধর্ষণ, শ্লীলতাহানি, নারী ও মেয়েশিশুর প্রতি এসিড নিক্ষেপ ও অন্যান্য নারী নির্যাতনমূলক অপরাধ অনেকটা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। গ্রাম্য সালিশের মাধ্যমে ধর্মীয় অপব্যাখ্যা দিয়ে ১০১ দোররা মারা, গর্ত করে ঢুকিয়ে পাথর মারা, পুড়িয়ে মারার ঘটনাও এ দেশে ঘটেছে। নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে একটি উদ্বেগজনক বিষয় হলো পুলিশি নির্যাতন। নিকট অতীতেও পুলিশের হাতে বেশ কিছু নারী নির্যাতিত হয়েছে। এমনকি পুলিশ দ্বারা ধর্ষিত ও নিহত হয়েছে। নারী নির্যাতন মামলাগুলো তদন্তের জন্য যথেষ্ট ফরেনসিক সুবিধা এখনো গড়ে ওঠেনি। এখনো প্রয়োজনীয় নারী পুলিশ কনস্টেবল, হাবিলদার, এএসআই, এসআই, ওসি এবং উচ্চতর পদসোপানে নারী পুলিশ কর্মকর্তা নেই। ফলে নারী বিষয়ের তদন্ত এবং অন্যান্য কাজ পরিচালনায় বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে মামলা দায়ের হয় না এবং বিভিন্ন কারণে বিচারও বিলম্বিত হয়।

২. **দারিদ্র্য :** প্রখ্যাত নারীবাদী লেখিকা Easter Boserup (1970) তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'Women's Role in Economic Development' গ্রন্থে নারীর অন্যতম শত্রু হিসেবে দারিদ্র্যকে নির্দেশ করেন। বাংলাদেশে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ নারী। চাকুরি ও স্ব-কর্মসংস্থান উভয় ক্ষেত্রেই পুরুষের তুলনায় নারী অনেক পিছিয়ে আছে। এখনো পর্যন্ত নারীর অনেক কাজের অর্থনৈতিক মূল্যায়ন হয়নি। সংসারের পরিসরে নারীর শ্রম বিনিয়োগের কোনো মাপকাঠি এখনো উদ্ভাবন করা যায়নি এবং কৃষি অর্থনীতিতে নারীর অবদানের সঠিক মূল্যায়ন নিরূপিত হয়নি বলেই নারী শ্রমশক্তি হিসেবে এখনো চিহ্নিত হয়নি।

৩. **শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসরতা :** জাতিসংঘ চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে বেইজিং ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনায় বলা হয়, 'শিক্ষা একটি মানবিক অধিকার এবং সমতা উন্নয়ন ও শান্তির জন্য অপরিহার্য হাতিয়ার। বৈষম্যহীন শিক্ষা ছেলেমেয়ে উভয়ের উপকার করে। এভাবে শেষ পর্যন্ত নারী-পুরুষের মধ্যে আরো বেশি সমতাভিত্তিক সম্পর্ক গড়ে তোলা যায়। অধিক সংখ্যক নারীকে যদি পরিবর্তনের বাহক হয়ে উঠতে হয় তাহলে শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জনের ক্ষেত্রে সুযোগের সমতা থাকা প্রয়োজন। পরিবারের স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষার মান উন্নয়ন ও সমাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়ার জন্য নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে নারীশিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়।' বাংলাদেশে শিক্ষার সর্বস্তরে পুরুষের তুলনায় নারী অনেক পিছিয়ে আছে।

৪. **সচেতনতার অভাব :** একজন আদর্শ নারীর ওপর একটি দেশ ও জাতি নির্ভর করে। কেননা 'আদর্শ মা মানেই আদর্শ সন্তান' এবং 'আদর্শ সন্তান মানেই আদর্শ জাতি।' বিশ্ববিজয়ী বীর নেপোলিয়ন বলেছিলেন, 'Give me a good mother, I will give you a good nation.' সুতরাং নারীরা অবলা নয়, তারা মহাশক্তিধর। কিন্তু বাংলাদেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠী এখন পর্যন্ত এ সত্যটুকু উপলব্ধি করতে পারেনি। ফলে নারীর ক্ষমতায়ন সম্ভব হচ্ছে না।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৫. **ধর্মীয় গোঁড়ামি :** ইসলাম ধর্মে 'মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত' বলে নারীর মর্যাদাকে সর্বোচ্চ গৌরবে ভূষিত করেছে। হিন্দু পুরাণে বলা হয়েছে, 'নারীরা শক্তির মূল আধার', 'নারীই আদ্যাশক্তি মহামায়া।' কিন্তু বাংলাদেশের এক শ্রেণীর ধর্মব্যবসায়ী রাজনৈতিক হীনস্বার্থে ধর্মের অপব্যাখ্যা দিয়ে নারীদের জাতীয় উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে চার দেয়ালের মাঝেই সীমাবদ্ধ রাখতে চাচ্ছে। তাদের ফতোয়ার বলি হয়েছে বাংলার হাজার হাজার নারী। আর এ জন্য সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক সকল ফতোয়া অবৈধ ঘোষণা বাংলাদেশে নারী ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

৬. **সুশিক্ষার অভাব :** ভারতবর্ষীয় নারীদের প্রতি লক্ষ্য করে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'আমাদের দেশের মেয়েরা শিক্ষিত হোক, সেটা আমি চাই, কিন্তু আদর্শ বিসর্জন দিয়ে নয়।' কথাগুলো বাংলাদেশের নারীদের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। কেননা বাংলাদেশের কিছুসংখ্যক নারী তথাকথিত আধুনিক শিক্ষার নামে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির নেতিবাচক দিকগুলো অনুকরণ করে হাজার বছরের ঐতিহ্যপূর্ণ বাঙালি সংস্কৃতি ও নারীশিক্ষার অবমাননা করছে। এর প্রভাবে রক্ষণশীল মধ্যবিত্ত পরিবারসমূহ নারীদের উচ্চ শিক্ষায় উৎসাহী হচ্ছে না। ফলে নারী ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে।

৭. **সুযোগের অভাব :** মাত্র ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিমি বাংলাদেশের জনসংখ্যা বর্তমানে ১৫.৫৮ কোটি (অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৪)। অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-দশমাংশ বেকার। এর মধ্যে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাও লক্ষাধিক। প্রত্যাশিত সুযোগ না থাকায় উচ্চশিক্ষিত, উদ্যমী তরুণরা যেখানে নিজের কর্মসংস্থানের স্থান করে নিতে হিমশিম খাচ্ছে, সেখানে তীব্র প্রতিযোগিতার মুখে মহিলারা শিক্ষা শেষে বিয়ের পিঁড়িতে চড়ে বসতে পারলেই শেষ রক্ষা বলে মনে করে অনেকটা বাস্তবতা ও বাধ্য হয়েই।

নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে কতিপয় সুপারিশ : নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে বাস্তব কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মূল দায়িত্ব সরকারের। একটি সুসংগঠিত ও সুবিন্যস্ত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমেই এ দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পন্ন করা সম্ভব। তবে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সকল পর্যায়ের কর্মকাণ্ডে নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন প্রেক্ষিত বিষয়ে উদ্যোগী হতে হবে। এ প্রসঙ্গে সম্ভাব্য কতিপয় সুপারিশ তুলে ধরা হলো :

১. **নারী উন্নয়নে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো :** নারীর ক্ষমতা উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে জাতীয় অবকাঠামো যেমন—মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলাবিষয়ক অধিদপ্তর, জাতীয় মহিলা সংস্থা ও বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর প্রশাসনিক কাঠামো শক্তিশালী করতে হবে। পর্যায়ক্রমে দেশের সকল বিভাগ, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে এসব প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক কাঠামো বিস্তৃত করতে হবে এবং নারী উন্নয়নের যাবতীয় কর্মসূচি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের জন্য এ প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।

২. **জাতীয় মহিলা উন্নয়ন পরিষদ :** নারী উন্নয়ন নীতি নির্ধারণ, উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও পর্যালোচনার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে সভাপতি করে যে মহিলা উন্নয়ন পরিষদ গঠন করা হয়েছে তার কার্যপরিধি নিম্নরূপ হতে পারে :

ক. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন ও কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

খ. মহিলাদের আইনগত অধিকার, মহিলা উন্নয়ন এবং মহিলাদের নির্যাতন প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিষয়াবলী সম্বন্ধে নীতি প্রণয়ন।

গ. সকল কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের স্বার্থ সংরক্ষণ, অংশগ্রহণ ও তাদের ভাগ্যোন্নয়ন সম্পর্কে গৃহীত পদক্ষেপ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

৩. **সংসদীয় কমিটি :** বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কর্তৃক গঠিত নারী উন্নয়নবিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গঠন করতে হবে, যা নারী উন্নয়ন কর্মসূচির পর্যালোচনা করে নারী অগ্রগতির লক্ষ্যে সরকারকে সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ গ্রহণ করার পরামর্শ প্রদান করবে।

৪. **নারী উন্নয়ন ফোকাল পয়েন্ট :** বিভিন্ন ফোকাল পয়েন্ট যথা—মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির আলোকে কর্মসূচি গ্রহণ, প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে এবং এ সকল সংস্থার কার্যক্রমে যাতে জেন্ডার প্রেক্ষিত প্রতিফলিত হয় এবং তাদের বিভিন্ন প্রতিবেদন ও দলিলসমূহে জেন্ডার বিষয়ে সুস্পষ্ট ও পর্যাপ্ত তথ্য সন্নিবেশিত হয় সে লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রীকে সভাপতি এবং নারী উন্নয়নে চিহ্নিত ফোকাল পয়েন্ট মন্ত্রণালয় ও সরকারি বেসরকারি নারী উন্নয়নমূলক সংস্থার প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি 'নারী উন্নয়ন বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন কমিটি' গঠন করা যেতে পারে। এ কমিটি নারী উন্নয়ন সম্পর্কিত কর্মসূচি পর্যালোচনা, সমন্বয় ও মূল্যায়ন করবে। কমিটি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থার সমস্যা চিহ্নিত করে ভবিষ্যতে কর্মসূচি দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য পরামর্শ প্রদান করবে।

৫. **উপজেলা ও জেলা পর্যায় :** নারীর অগ্রগতি এবং ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ের প্রশাসন, জেলা পরিষদ, পৌরসভা, স্থানীয় সরকার, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দপ্তর ও এনজিওদের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন ও নারী উন্নয়ন কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

৬. **তৃণমূল পর্যায়ে :** তৃণমূল পর্যায়ে গ্রাম ও ইউনিয়নে নারীকে স্বাবলম্বী দল হিসেবে সংগঠিত করতে হবে। এ দলসমূহকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারি সংস্থার আওতায় নিবন্ধীকৃত সংগঠন হিসেবে রূপ দেয়া যেতে পারে। সরকারি-বেসরকারি উৎস, ব্যাংক, অন্যান্য আর্থিক সংস্থা থেকে প্রাপ্ত সম্পদ আহরণ করে এ সংগঠনগুলোর সাথে ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনসমূহের নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন ও সমন্বয় সাধন করবে এবং তৃণমূল পর্যায়ের সকল সংগঠনের কার্যক্রমের স্থানীয় উন্নয়নের প্রেক্ষিতে অন্তর্ভুক্তির জন্য উৎসাহিত এবং সহায়তা দান করবে।

৭. **নারী উন্নয়নে এনজিও এবং সামাজিক সংগঠনের সাথে সহযোগিতা :** প্রকৃত নারী উন্নয়ন একটি ব্যাপক কাজ। সরকারের একার পক্ষে এ কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা কার্যত অসম্ভব। তাই এ কাজে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগের সমন্বয় ঘটানোর প্রয়াস নেয়া যেতে পারে, যাতে সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। এক্ষেত্রে নিজস্ব কর্মসূচির অতিরিক্ত Catalyst বা সহায়কের ভূমিকা পালন করাই হবে সরকারের মূল দায়িত্ব।

এ লক্ষ্যে নারী উন্নয়নের সকল স্তরে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালনকারী স্বেচ্ছাসেবী ও সামাজিক সংগঠনগুলোকে সম্পৃক্তকরণ ও তাদের কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত নারী সংগঠনসমূহের সাথে সহায়তা ও সমন্বয় বিধান করতে হবে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৮. **নারী ও জেন্ডার সমতাবিষয়ক গবেষণা :** নারী উন্নয়ন ও সমতা বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা পরিচালনার জন্য দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা নিতে হবে। সকল গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে নারী উন্নয়ন, ক্ষমতায়ন এবং নারী ও শিশুদের অধিকার সম্পর্কিত বিষয়ে গবেষণার জন্য উৎসাহিত করতে হবে এবং পৃথক জেন্ডার গবেষণা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উদ্যোগ নিতে হবে।

৯. **নারী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান :** ঢাকায় বিদ্যমান নারী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণসহ বিভাগ, জেলা ও থানায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা যেতে পারে। এসব কেন্দ্রে বিভিন্ন কারিগরি, বৃত্তিমূলক, নারী অধিকার এবং শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

১০. **সামাজিক সচেতনতা :** নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে সামাজিক সচেতনতা কর্মসূচির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। এ কর্মসূচিতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে— ১. আইনবিধি ও দলিলাদি থেকে নারীর মর্যাদাহানিকর বক্তব্য ও মন্তব্য অপসারণ, ২. মন্ত্রণালয় ও সংস্থার কার্যনির্বাহী, আইন ও বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা, নীতিনির্ধারক, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কর্মকর্তা, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দের সচেতনতা এবং ৩. নারী-পুরুষের সম্পর্ক, অধিকার ও নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়াবলী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্তকরণ ইত্যাদি বিষয়ের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

১১. **নারী নির্যাতন প্রতিরোধ :** নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কর্মসূচির ওপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে এ উদ্দেশ্যে সুপরিকল্পিত কর্মসূচি গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে এবং এসব কর্মসূচিতে সচেতনতা, আইনগত পরামর্শ ও শিক্ষা, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা তথা মামলা পরিচালনা করা, মামলা পরিচালনার জন্যে নিরাপদ আশ্রয় ও পুনর্বাসন, আর্থিক সহায়তা ইত্যাদি কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এক্ষেত্রে একটি বিশেষ কৌশল হিসেবে মহিলাবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সেলসহ অন্যান্য নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সেলের কর্মপরিধিকে বিস্তৃত ও শক্তিশালী করা যেতে পারে।

১২. **আর্থিক ব্যবস্থা :** তৃণমূল পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদ, থানা পরিষদ ও জেলা পরিষদে নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে অর্থ বরাদ্দ করতে হবে। জাতীয় পর্যায়ে মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে এবং নারী উন্নয়নে নিয়োজিত মন্ত্রণালয় এবং সংস্থা, যেমন– স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়, শ্রম ও জনশক্তি, কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রভৃতি মন্ত্রণালয়ে নারী উন্নয়নের জন্য লক্ষ্যমাত্রা ও কর্মসূচি চিহ্নিত করে অতিরিক্ত বাজেট বরাদ্দ করতে হবে।

১৩. **সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতা :** নারী উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তৃণমূল পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত সর্বস্তরে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্ভাব্য সহযোগিতার যোগসূত্র গড়ে তুলতে হবে। সরকারের পক্ষ থেকে বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহকে যথোপযুক্ত এবং সময়োপযোগী সহায়তা প্রদান করতে হবে এবং সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে চিন্তাধারা, দক্ষতা ও তথ্যের আদান-প্রদান করতে হবে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ, বৈঠক, কর্মশালা ইত্যাদির মাধ্যমে এই আদান-প্রদান চলবে। ক্ষেত্রবিশেষে সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে নারী উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

১৪. **বহুপাক্ষিক সহযোগিতা :** নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা ও অভিজ্ঞতা এবং প্রযুক্তি বিনিময়ের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতাকে উৎসাহিত করতে হবে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

নারীর সমতা অর্জনের পথে সমস্যা : নারীর ক্ষমতা অর্জন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও এই লক্ষ্য অর্জনের সাথে নানাবিধ বাধা রয়েছে। যেমন– ১. মহিলাদের ওপর অব্যাহত ও ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যের বোঝা; ২. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে অসমতা, অপর্যাপ্ততা এবং অসম প্রবেশাধিকার; ৩. স্বাস্থ্য সেবা এবং সংশ্লিষ্ট সেবার ক্ষেত্রে অসমতা এবং অপর্যাপ্ততা; ৪. নারী নির্যাতন; ৫. বিদেশি দখলাধীনে বসবাসকারীসহ নারীর ওপর সশস্ত্র অথবা অন্যান্য সংঘর্ষের প্রতিক্রিয়া; ৬. অর্থনৈতিক অবকাঠামো এবং নীতি, সকল প্রকার উৎপাদনশীল কার্যাবলী এবং সম্পদের অধিকারে অসমতা; ৭. সকল পর্যায়ে ক্ষমতায় অংশগ্রহণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী-পুরুষের মধ্যে অসমতা; ৮. নারীর অগ্রগতি উৎসাহিতকরণের সকল ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত কাঠামো; ৯. নারীর মানবাধিকারের ক্ষেত্রে শ্রদ্ধার অভাব এবং অপ্রতুল প্রসার ও সংরক্ষণ; ১০. সকল প্রকার যোগাযোগ বিশেষ করে প্রচার মাধ্যমে নারীর সনাতনী প্রচার, প্রবেশ অধিকার এবং অংশগ্রহণে অসমতা; ১১. প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং পরিবেশ সংরক্ষণে নারী-পুরুষের মধ্যে অসমতা; ১২. কন্যাশিশুদের প্রতি অব্যাহত বৈষম্য এবং অধিকার লঙ্ঘন।

উপরিউক্ত চিহ্নিত ১২টি সমস্যার আলোকে বেইজিং ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও গৃহীত হয়েছে। বেইজিং কর্মপরিকল্পনা ও বর্তমান সরকারের নারী উন্নয়নের রাজনৈতিক অঙ্গীকারের ভিত্তিতে মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় নীতি ও কর্মপরিকল্পনার খসড়া প্রণয়ন করেছে। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে এ দুটি মন্ত্রণালয়ের ও সংস্থার ফোকাল পয়েন্ট, এনজিও, নারী সংগঠন সম্পৃক্ত ছিল। একটি বিশেষজ্ঞ দল ১২টি মন্ত্রণালয়ের চাহিদা নিরূপণ করে কর্মপরিকল্পনা খসড়া প্রণয়ন করে।

উপসংহার : বেইজিং প্লাটফরম ফর অ্যাকশন সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে নারী উন্নয়নে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে পথনির্দেশনা দিয়েছে, যা বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে নারীর সার্বিক উন্নয়নে বিরাট ভূমিকা রাখবে। সময়ের চাহিদা অনুযায়ী গণতান্ত্রিক সমাজ গড়ার দায়িত্বে নারীর সম অধিকার, নারীর ক্ষমতায়ন, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে নারীর মর্যাদা প্রদান অপরিহার্য। সুশীল সমাজ গঠনে নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে মানবিক মূল্যবোধের অনুশীলন করার লক্ষ্যে শুধু সরকারি প্রচেষ্টা নয়, বেসরকারি সংস্থাসমূহের দায়দায়িত্বও কম নয়। এ কথা সত্য যে, নারী-পুরুষের ক্ষমতার সুষম বন্টন ছাড়া দেশের তথা সমাজের সার্বিক উন্নয়ন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। কাজেই একবিংশ শতাব্দীর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় যে নারীর ক্ষমতায়ন এতে কোনো সন্দেহ নেই।

০৩। নারী শিক্ষার প্রসার ও নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশে এ যাবৎ কি কি পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে? এ বিষয়ে আপনার কোনো সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব আছে কি? *[২৫তম বিসিএস]*

***অথবা,* সাম্প্রতিক নারী মুক্তি আন্দোলন এবং নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ মূল্যায়ন করুন।** *[১০ম বিসিএস]*

উত্তর : পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। নারীরা এখন আর শুধু অন্তঃপুরবাসী নয়, বরং পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও সমাজের উন্নতি সাধনে কাজ করছে। অথচ বাংলাদেশের নারীসমাজ যুগ যুগ ধরে শোষিত ও অবহেলিত হয়ে আসছে। পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থায় ধর্মীয় গোঁড়ামি, সামাজিক কুসংস্কার, নিপীড়ন ও বৈষম্যের বেড়াজালে নারীদের সর্বদা রাখা হয়েছে অবদমিত। তাদের মেধা ও শ্রমশক্তিকে সমাজ ও দেশ গঠনে সম্পৃক্ত করা হয়নি। নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে গ্রহণ করা হয়নি কোনো বাস্তব পদক্ষেপ। অথচ মানুষের মৌলিক প্রয়োজনগুলো পূরণ করতেও পুরুষের পাশাপাশি সহায়তা করে নারী। দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নারীর সার্বিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

নারীর শিক্ষার প্রসার : একটি জাতির উন্নয়ন ও শিক্ষিত হওয়ার পূর্বশর্ত হলো সে জাতির নারীদের শিক্ষিত করে তোলা। বাংলাদেশ সরকার এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি যথাযথভাবে অনুধাবন করে নারীশিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে এবং নারী শিক্ষা উন্নয়নে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তা সংক্ষেপে আলোচিত হলো :

১. **ছাত্রী উপবৃত্তি প্রকল্প :** নারী শিক্ষা সম্প্রসারণ, নারীদের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৯৪ সাল থেকে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণীর ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান শুরু হয়। এরই ধারাবাহিকতায় উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে নারীশিক্ষাকে উৎসাহিত করা এবং সর্বস্তরে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার ১ আগস্ট ২০০২ উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রী উপবৃত্তি প্রকল্প চালু করে। এর ফলশ্রুতিতে প্রতি ১০০ ছাত্র/ছাত্রীর মধ্যে ৫২ জন মেয়ে এবং ৪৮ জন ছেলে ভর্তি হয়ে থাকে। উপবৃত্তি প্রকল্পসমূহের আওতায় বছরে প্রায় ২৫ লক্ষ ছাত্রীকে উপবৃত্তি, পরীক্ষার ফি, টিউশন ফি ইত্যাদি বাবদ প্রায় ২৫০ কোটি টাকা ব্যয় করা হচ্ছে। কর্মসূচি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রী ভর্তি হার বৃদ্ধি এবং ঝরে পড়া রোধকল্পে এক যুগান্তকারী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। এর ফলে বাল্যবিবাহ রোধসহ নানাবিধ সমস্যা লাঘব হচ্ছে।

২. **মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠা :** নারীদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ আরো সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে প্রতিটি উপজেলায় একটি করে মহিলা কলেজ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

৩. **এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন প্রতিষ্ঠা :** নারীদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক মান অর্জনের জন্য আন্তর্জাতিক সহায়তায় চট্টগ্রামে 'এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন' নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় চালু হয়েছে।

নারীর প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন : নারীর প্রশাসনিক ক্ষমতায়ন তথা উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় নারীকে সম্পৃক্ত করার প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় ১৯৭২ সালে। সরকারি চাকরিতে দশ ভাগ কোটা নারীর জন্য সংরক্ষণ করা হয়। ১৯৭৩ সালে দুজন নারীকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৭৪ সালে নারীকে প্রথম বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক নিয়োগ করা হয়। জাতীয় সংসদের বর্তমান স্পিকার, মহাজোট সরকারের মন্ত্রিসভায় প্রধানমন্ত্রী, কৃষিমন্ত্রী, জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী এবং মহিলা ও শিশুবিষয়ক প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্বে রয়েছেন নারী। বর্তমান সরকারপ্রধান ও বিরোধীদলীয় নেতা দুজনই নারী। দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জনগণের সরাসরি ভোটে ২০ জন নারী সাংসদ নির্বাচিত হন। ১৬ মে ২০০৪ সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী বিল পাসের মাধ্যমে জাতীয় সংসদে নারীদের ৪৫টি আসন সংরক্ষণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে ৩০ জুন ২০১১ সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে যা ৫০ আসনে উন্নীত করা হয়।

ইউনিয়ন পরিষদের ১২টি সদস্যপদের মধ্যে ৯টিতে সরাসরি নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ রাখাসহ সংরক্ষিত ৩টি আসনে নারীর প্রতিযোগিতার সুযোগ রাখা হয়েছে। গ্রাম পরিষদেও ৩০% নারীর অংশগ্রহণ সংরক্ষণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রশাসনে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিব, অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম সচিব, উপসচিব, ডিসি, রাষ্ট্রদূত, বিচারপতি, কাস্টমস কমিশনার, পুলিশ সুপারসহ বিভিন্ন পদে নারী রয়েছেন।

এছাড়াও ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (২০১১-২০১৫) নারী-পুরুষের সমতা আনয়নের লক্ষ্যে যে পদক্ষেপসমূহ পরিকল্পিত হয়েছে তা হলো :

১. সকল স্তরের সিদ্ধান্ত কাঠামো ও ক্ষমতায় নারী-পুরুষের সমতা অর্জন।
২. জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নারীর অধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি ও অধিকার প্রতিষ্ঠা।
৩. জীবনের সর্বক্ষেত্রে নারীর উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে প্রয়োজনীয় সম্পদ, প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা ও কার্যকরী কৌশল প্রতিষ্ঠা।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৪. সকলের জন্য বিশেষ করে নারীর দারিদ্র্য বিমোচন, খাদ্য এবং দৈনিক ন্যূনতম ১৮০০ কিলোক্যালরি পুষ্টি নিশ্চিত করা।
৫. ভূমি, পুঁজি, প্রযুক্তিসহ সকল অর্থনৈতিক সম্পদে নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করা।
৬. অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির প্রয়োজনীয় তথ্য, দক্ষতা ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ বিষয়ক পার্থক্য কমিয়ে আনা এবং নারীর কাজকে দৃশ্যমান করা ও স্বীকৃতি দেয়া।
৭. পেশার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
৮. সবার জন্য স্বাস্থ্য কর্মসূচির আওতায় নারীর পূর্ণ অধিকার নিশ্চিত করা।
৯. নারীর বিরুদ্ধে সকল প্রকার সহিংসতা নির্মূল করা।
১০. নারী ও শিশু পাচার বন্ধ করা।
১১. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চুক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
১২. নারী উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহায়ক সেবা চালু করা।

নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে গৃহীত সরকারি-বেসরকারি পদক্ষেপসমূহ : ১৯৯৭ সালের ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা অনুমোদন নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে অন্যতম বড় অর্জন। এই নীতিমালা জাতীয়, স্থানীয় ও পারিবারিক পর্যায়ে নারী ইস্যুকে মূলধারায় নিয়ে আসার ওপর গুরুত্বারোপ করেছে। আর এ উদ্দেশ্যে যে কৌশলগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে তা হলো :

- জাতীয়, জেলা, উপজেলা ও তৃণমূল পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ গ্রহণ ও তা শক্তিশালীকরণ।
- এনজিও এবং বৃহত্তর সুশীল সমাজের মধ্যে আরো সহযোগিতামূলক সম্পর্ক গঠন।
- জেন্ডার ইস্যু নিয়ে গবেষণা পরিচালনা।
- জেন্ডারকে মূলধারা করতে সহায়তার জন্য প্রকল্প কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সকল স্তরে সক্ষমতা গঠন।
- জেন্ডার ইস্যু সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধিতে সকল পর্যায়ে অ্যাডভোকেসি, লবিং এবং গণতৎপরতা।
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে নেটওয়ার্কিং।
- আর্থিক ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৭৩-১৯৭৮) যে নারী পুনর্বাসন বোর্ড গঠন করা হয় তার উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি ছিল :

ক. স্বাধীনতা যুদ্ধে নির্যাতিত নারী ও শিশুর সঠিক তথ্য আহরণের জন্য জরিপ চালানো এবং এদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।
খ. যুদ্ধে নির্যাতিত নারীদের বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান।
গ. বীরাঙ্গনা নারীসহ যেসব পরিবারে উপার্জনক্ষম পুরুষ মুক্তিযুদ্ধে নিহত হয়েছেন সেসব পরিবারের কর্মক্ষম নারীদের চাকরি ও প্রশিক্ষণ প্রদান।
ঘ. নারী পুনর্বাসন বোর্ডের দায়িত্ব ও কর্মপরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৯৭৪ সালে এ বোর্ডকে পুনর্গঠিত করে আইনের মাধ্যমে 'নারী পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউন্ডেশন'-এ উন্নীত করা।

এছাড়া সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় নারীদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয় গণশিক্ষা কার্যক্রম চালু করে। সাভারে মহিলাবিষয়ক অধিদপ্তরের ৩৩ বিঘা জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত গ্রামীণ মহিলাদের জন্য কৃষিভিত্তিক কর্মসূচির কাজ শুরু হয় ১৯৭৩ সালে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

সাংগঠনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ : ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন বোর্ডকে নারী পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউন্ডেশন করার পর ১৯৭৮ সালে মহিলা বিষয়ক স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়। এছাড়া ১৯৭৬ সালে 'জাতীয় মহিলা সংস্থা' গঠন হয়। সরকারের গৃহীত নারী উন্নয়ন কার্যক্রমকে বেগবান করার লক্ষ্যে ১৯৮৪ সালে মহিলাবিষয়ক পরিদপ্তর এবং এ পরিদপ্তরকে ১৯৯০ সালে অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়। এছাড়া জাতীয় পর্যায়ে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, নীতি নির্ধারণ এবং উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও পর্যালোচনার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে সভাপতি করে জাতীয় মহিলা ও উন্নয়ন পরিষদ গঠন করা হয়।

আইনি পদক্ষেপ : নারী নির্যাতন প্রতিরোধ এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সরকার বিভিন্ন রকম আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যেমন–

- মুসলিম পাবিরারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (সংশোধন করা হয়েছে ১৯৮৬ সালে);
- বিবাহ ও তালাক নিবন্ধীকরণ আইন ১৯৭৪ (১৯৭৫ সালে সংশোধিত);
- যৌতুক নিরোধ আইন ১৯৮০ (১৯৮৬ সালে সংশোধিত);
- বাল্যবিবাহ ১৯২৯ (১৯৮৪ সালে সংশোধিত);
- নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন ১৯৯৫;
- নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০;
- জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ ঘোষণা।

বেসরকারি উদ্যোগ : বাংলাদেশের নারীসমাজের বন্দিজীবন ও দীর্ঘদিনের বৈষম্যের অবসানকল্পে সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। দেশের বিভিন্ন নারী সংগঠন ও এনজিও নারীর সার্বিক নিরাপত্তা এবং সকল প্রকার বৈষম্যের অবসানের লক্ষ্যে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে যাচ্ছে। নারীর আত্মবিকাশের পথ সুগম করতে এসব সংগঠন নিজেদের এই কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি পুরোনো জীর্ণ আইনসমূহের সংস্কার ও নারীর সপক্ষে নতুন আইন প্রণয়ন করতে সরকারের কাছে প্রতিনিয়ত দাবি জানাচ্ছে। বেসরকারি উদ্যোগে যেসব কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে তা সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো :

- দল গঠন/বিভিন্ন প্রকার সংগঠন (নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী নারী সমিতি) গঠনের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ।
- ঋণ ও সঞ্চয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন আয় বৃদ্ধিমূলক কাজ।
- দক্ষতা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় প্রশিক্ষণ।
- স্বাস্থ্যসেবা, পরিবার পরিকল্পনা, বিশুদ্ধ পানি ও স্যানিটেশন সামগ্রী সরবরাহ।
- বয়স্ক, কিশোরী ও শিশুশিক্ষা বৃদ্ধি সংক্রান্ত উন্নয়ন শিক্ষা।
- আইনগত শিক্ষা, সহায়তা ও নির্যাতিত নারীদের আশ্রয় ও পুনর্বাসন।
- অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য প্রচার, জনমত গঠন, সমাবেশ ও আন্দোলনে পরিচালনা করা।
- ফতোয়ার বিরুদ্ধে জনমত গঠন ও প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলা।
- সাংস্কৃতিক দল গঠন ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সচেতনতা।
- সরকার ও রাজনৈতিক দলের সাথে নারীর সপক্ষে আইন ও নীতি প্রণয়নে অ্যাডভোকেসি ও লবিং কার্যক্রমে অংশ নেয়া।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

নারী শিক্ষার প্রসার ও নারীর ক্ষমতায়নে প্রস্তাব : বাংলাদেশ এশিয়ার অনুন্নত দেশসমূহের একটি। দেশটির অনুন্নত থাকার একটি প্রধান কারণ হলো রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবারে নারীর তুলনামূলক দুর্বল অবস্থান। আমাদের সংবিধানে রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষের সমান অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়া হলেও বাস্তবে লক্ষ্য করা যায়, এ দেশের নারীরা সমাজের সর্বস্তরে অধিকার ভোগ ও পদমর্যাদার দিক থেকে পিছিয়ে রয়েছে। যে সমাজে তারা বাস করে সে সমাজের ভালো-মন্দ নির্ধারণে তাদের কোনো ভূমিকা নেই, নেই কোনো নিজস্ব মতামত রাখার সুযোগ। সমাজে নারীর ভূমিকাকে শুধু সন্তান লালন-পালন এবং খাদ্য উৎপাদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করা হয়। অথচ আমরা দেখি সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নারীর উৎপাদন ভূমিকায় এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন এবং পারিবারিক ক্ষেত্র থেকে শুরু করে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর সাফল্যজনক পদচারণা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গিগত কারণে বাংলাদেশে নারী শিক্ষার প্রসার ও নারীর ক্ষমতায়ন বিশেষভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। তাই বাংলাদেশের নারী শিক্ষা প্রসার এবং নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবটি বিশেষভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে :

গণমাধ্যমসমূহের প্রচারণার কৌশলগত পরিবর্তন : গণমাধ্যম হলো একটি জাতির চিন্তাধারা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং জনমত গঠনের ধারক ও বাহক। গণমাধ্যমের শক্তি অপরিসীম। এক কথায়, 'Media moulds the mind of mankind, shapes their destiny either to develop or even to destroy them.'। শক্তি যার অসীম, দায়িত্ব তার ততোধিক। অথচ বাংলাদেশের গণমাধ্যমসমূহে নারী এসেছে কেবল সেভাবেই যেভাবে আসা সম্ভব একটি পুরুষশাসিত সমাজে। বিকৃত চিত্রণে নারী উপস্থাপিত হয়েছে Necessary evil হিসেবে নরকস্য দ্বার এবং আরো অনেক বিশেষণে বিশেষায়িত হয়ে। ছলনা ছাড়া যার আর অন্য কোনো মেধা নেই এবং যাদের মুক্তি ঘটবে একমাত্র পুরুষের অধীনস্ততার মধ্য দিয়ে। এমতাবস্থায় নারী শিক্ষার প্রসার এবং নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়ন এবং উন্নয়নের জন্য আমাদের গণমাধ্যমসমূহকে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। আবহমান পুরুষ নিয়ন্ত্রিত সমাজ ব্যবস্থায় অদ্ভূত নিপুণতায়, কৌশলে নারীর ভূমিকার মিথ্যা ও অবাস্তব যে ছবি আমরা নির্দ্বিধায় মেনে ও এঁকে চলেছি, সে ছবি আজ নতুন করে আঁকতে হবে ভিন্নতর পটভূমিতে, ভিন্নতর ফ্রেমে। গণসংযোগ মাধ্যমের দায়িত্ব আজ নারী চরিত্রের তথা নারীর সার্বিক ভূমিকার প্রকৃত মূল্যায়ন করা এবং একে সঠিকভাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে জনগণকে নারীর প্রতি চিরাচরিত দৃষ্টিভঙ্গি পরিহারে উদ্বুদ্ধ করা। কেননা গণমত প্রভাবিতকরণে গণমাধ্যমসমূহ হতে পারে এক শক্তিশালী হাতিয়ার।

উপসংহার : নারী ক্ষমতায়নের ধারণা বর্তমান বিশ্বব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। সে কারণে বাংলাদেশ বেইজিং-এ নারী উন্নয়ন ও কর্মপরিকল্পনায় যে ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত হয়েছে তা বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করেছে। এ কারণে মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ জাতীয় নারী উন্নয়ন ও কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বেইজিং প্লাটফরম ফর অ্যাকশনে সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে নারী উন্নয়নে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে যে পথ নির্দেশনা দিয়েছে তা বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে নারীর সার্বিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। সুশীল সমাজ গঠনে নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে মানবিক মূল্যবোধের অনুশীলন করার লক্ষ্যে শুধু সরকারি প্রচেষ্টা নয়, বেসরকারি সংস্থাসমূহের দায়দায়িত্বও অনেক। সরকারি-বেসরকারি যৌথ প্রচেষ্টায় নারী উন্নয়ন নীতিমালা ও কার্যক্রম বাস্তবায়নের পথ প্রশস্ত হতে পারে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

০৪ । বাংলাদেশে নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সমস্যা ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

উত্তর : বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমাদের এ বিশাল নারীসমাজ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, প্রশাসনিকসহ জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই পিছিয়ে রয়েছে। এমনকি দেশের দুই প্রধান রাজনৈতিক দল অর্থাৎ ক্ষমতাসীন দল ও বিরোধী দল উভয়েরই প্রধান নারী হওয়া সত্ত্বেও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এ দেশের নারীদের অবস্থান খুবই দুর্বল। সামাজিক কুসংস্কার, ধর্মীয় বিধিনিষেধ, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ও সর্বোপরি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নেতিবাচক সামাজিকীকরণের দরুন এ দেশের নারীরা স্বভাবতই রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ব্যাপারে তেমন আগ্রহী হয় না। এমনকি পার্লামেন্টে নারীদের জন্য আসন সংরক্ষণ, ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা আসন সংরক্ষণসহ নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণের বিশেষ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলেও এসবের দ্বারা তেমন কোনো কার্যকর উন্নতি ঘটেছে বলে মনে হয় না। কিন্তু তাই বলে এক্ষেত্রে প্রচেষ্টা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা যাবে না। জনসংখ্যার প্রায় অর্ধাংশ এ নারী সমাজের রাজনৈতিক অংশগ্রহণের দাবিতে বিভিন্ন নারীবাদী সংগঠন আন্দোলনও চালাচ্ছে। কেউ কেউ আবার নানা প্রস্তাব-পরামর্শ পেশ করছে।

বাংলাদেশে নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সমস্যাবলী : বাংলাদেশে নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সমস্যাবলী বহুমাত্রিক। যেমন—

১. **সামাজিকীকরণের প্রভাব :** ব্যক্তির রাজনীতি বা অন্য কোনো সামাজিক ও জাতীয় ক্ষেত্রেও অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সামাজিকীকরণের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কেননা সামাজিকীকরণের মাধ্যমে যে বিশ্বাস, অভ্যাস ও মূল্যবোধের সৃষ্টি হয় সেটি ব্যক্তিকে তার পরবর্তী জীবনে চলার পথে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। বাংলাদেশের নারীদের সামাজিকীরণের প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে যে সকল উপাদান কার্যকর থাকে, সেগুলো কোনোমতেই নারীকে রাজনীতিতে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে না বরং এ ব্যাপারে নারীসমাজের মাঝে একধরনের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দেয়। কেননা অনুকরণের মডেল হিসেবে আমাদের শিশুরা তাদের মাকেই প্রথম বেছে নিয়ে থাকে এবং সেখানে তারা মায়েদের রাজনীতিতে উদাসীনতা দেখে নিজেদের বেলায়ও রাজনীতিতে অংশগ্রহণকে অপ্রয়োজনীয় মনে করে।

২. **সামাজিক কুসংস্কার :** আমাদের সমাজ কুসংস্কারে ভরা। নানা অজুহাতে এখানে মেয়েদের অন্তঃপুরবাসিনী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। মেয়েরা কেবল ঘরেই থাকবে, বাইরে গেলে, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করলে এটা বেমানান হবে—সমাজের এ চিরাচরিত অন্ধ ও বদ্ধমূল ধারণা অনেক উদ্যমী মেয়ের উদ্যমকেও স্তিমিত করে দিয়ে স্বামী-সংসার আর ঘরের চার দেয়ালের ভেতরে আটকে দেয়। সমাজে নিজের পরিবারের আর বংশের মুখ রক্ষার যে গতানুগতিক দায়বদ্ধতা তা তাকে তার রাজনৈতিক অধিকার ও দায়বদ্ধতা সম্পর্কে উদাসীন করে রাখে।

৩. **পুরুষতান্ত্রিকতার প্রভাব :** বাঙালি সমাজ গোড়া থেকেই পুরুষতান্ত্রিক। যুগ যুগ ধরে এ সমাজের মেয়েরা দেখে আসছে যে, পরিবার, সমাজ, কিংবা রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব করছে পুরুষ। পুরুষরা পরিবারে কখনো স্বামী হিসেবে কিংবা বাবা হিসেবে বা ভাই হিসেবে মেয়েদের ওপর কর্তৃত্ব রেখেছে এবং এ কর্তার কর্তৃত্বকে স্বীকার করে নিয়ে মুখ বুঝে সব সহ্য করাটাই একজন আদর্শ নারী বা গৃহিণীর প্রধান মানদণ্ড হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। তাছাড়া পরিবার কিংবা সমাজের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের একচেটিয়া কর্তৃত্ব রয়েছে পুরুষের হাতে। এমতাবস্থায় মেয়েরা পারিবারিক কিংবা সামাজিক এমনকি নিজেকে শাসন করার ন্যূনতম সুযোগটুকুও পাচ্ছে না। তাই শাসন করার বা শাসন ক্ষমতায় অংশগ্রহণের কলাকৌশল সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞানলাভের উপযুক্ত শিক্ষা বা প্রশিক্ষণের সুযোগও তারা পাচ্ছে না।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৪. **অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা :** আধুনিক রাজনীতি বিশেষ করে নির্বাচনী রাজনীতিতে অর্থ একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাংলাদেশের বর্তমান রাজনীতিতে অর্থের যে ছড়াছড়ি, নির্বাচনে কালো টাকার যে ব্যাপক প্রভাব, সেখানে অর্থ-বিত্তের অধিকারী নয় এমন কেউ রাজনৈতিক সাফল্য লাভের আশা করতে পারে না। এদিকে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থায় নারীদের অর্থনৈতিক সক্ষমতা ও সম্পদের মালিকানা নেই বললেই চলে। তারা বিয়ের পূর্বে বাবা বা ভাইয়ের ওপর এবং বিয়ের পর স্বামীর ওপর নির্ভরশীল থাকে। তাদের এ সার্বক্ষণিক নির্ভরশীলতার কারণে তারা কখনোই স্বাবলম্বী হতে পারে না। তাই নির্বাচনের যে জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন তা এ দেশের নারীরা যোগাড় করতে পারে না। ফলে নির্বাচনী রাজনীতিতে তাদের অংশগ্রহণ থাকে খুবই কম এবং যারা অংশগ্রহণ করেন তারাও অর্থের কাছে হেরে যান।

৫. **নারী সম্পর্কে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি :** আমাদের সমাজে নারীদের কেবলই ঘর-সংসার দেখাশোনা ও সন্তান লালন-পালনের উপযোগী বলে মনে করা হয়। এখানে নারীদের রাজনীতিকে অংশগ্রহণকে অনেক ক্ষেত্রেই দোষণীয় বলে মনে করা হয়। তাই অনেক পুরুষই মেয়েদেরকে রাজনীতি সম্পর্কে নিরুৎসাহিত করে থাকে।

৬. **রাজনৈতিক দলগুলোর নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি :** আমাদের রাজনীতিতে ব্যাপক প্রতিযোগিতা। এখানে রাজনৈতিক দলগুলো নারীদেরকে উপযোগী বলে মনে করে না। বিশেষ করে নির্বাচনের সময় কোনো রাজনৈতিক দল যদি পুরুষ প্রার্থী মনোনয়ন দেয় তখন অন্য দলগুলো তার বিরুদ্ধে কোনো নারী প্রার্থী মনোনয়ন দেয়াকে ঝুঁকিপূর্ণ মনে করে। ফলে অন্যসব যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও অনেক মহিলা কেবল মহিলা হওয়ার কারণেই মনোনয়ন পান না। এক্ষেত্রে দলগুলোর যুক্তি হলো পুরুষ প্রার্থী জনসংযোগ, টাকা খরচ ও প্রভাব-প্রতিপত্তিসহ সব ক্ষেত্রেই স্বাভাবিকভাবে এগিয়ে। তাই পুরুষ প্রার্থীর বিপরীতে পুরুষ প্রার্থী দেয়াটাকেই তারা যৌক্তিক মনে করে।

৭. **রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন :** আমাদের সমসাময়িক রাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো দুর্বৃত্তায়ন। রাজনীতিতে এখন ভালো মানুষের চেয়ে দুর্বৃত্তদের কদর বেশি। স্বাভাবিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার চেয়ে সন্ত্রাস, নৈরাজ্য আর কালো টাকাই রাজনীতির নিয়ন্ত্রক শক্তি হিসেবে চিহ্নিত। এমতাবস্থায় রাজনৈতিক আধিপত্যের প্রধান নির্ধারকে পরিণত হয়েছে পেশীশক্তি। এক্ষেত্রে পুরুষরা নারীদের তুলনায় বহু গুণ এগিয়ে। নারীরা স্বাভাবিকভাবেই শান্তিপ্রিয় এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন প্রক্রিয়ার সাথে তাদের সংযোগ খুবই নগণ্য। এমতাবস্থায় গতানুগতিক রাজনৈতিক দুর্বৃত্তপনায় পুরুষরা অগ্রগামী থাকায় মহিলারা অনেক সময় রাজনৈতিক প্রতিযোগিতায় নামার ব্যাপারে তেমন আগ্রহী হন না।

৮. **ধর্মীয় বিধিনিষেধ :** বাংলাদেশের শতকরা প্রায় ৮৫ জন লোক মুসলমান। এ দেশের মহিলারা আবহমান কাল থেকেই ধর্মভীরু এবং রক্ষণশীল। ফলে বাংলাদেশের অধিকাংশ পরিবারই মেয়েদের খোলামেলা রাস্তায় নেমে রাজনীতিকে সমর্থন করে না। তারা মনে করে, বাংলাদেশে বর্তমানে যে ধরনের রাজনীতি হচ্ছে এ ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে মেয়েদের অংশগ্রহণ

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

অনৈসলামিক। সুতরাং রাজনীতি সম্পর্কে এ ধরনের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনেক ক্ষেত্রেই মেয়েদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ সম্পর্কে নিরুৎসাহিত করে থাকে।

৯. **অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা :** বাংলাদেশের গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা এতই অনুন্নত যে, সেখানে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়ার জন্য অনেক ক্ষেত্রেই পায়ে হাঁটার কোনো বিকল্প থাকে না। বিশেষ করে অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে প্রার্থীর নিজ বাড়ি থেকে বেশি দূর জনসংযোগের জন্য গিয়ে দিনে দিনে ফিরে আসা সম্ভব হয় না। এমতাবস্থায় পুরুষ প্রার্থীরা যেমন যেখানে সেখানে রাত কাটাতে পারে মহিলা প্রার্থীরা অনেক ক্ষেত্রেই তা পারে না। তাই স্বাভাবিকভাবেই পুরুষ প্রার্থীরা মহিলা প্রার্থীদের তুলনায় জনসংযোগের ক্ষেত্রে অনেকদূর এগিয়ে থাকে। এমনকি অনেক পরিবারই কেবল এ বিষয়টি মাথায় রেখে মহিলাদেরকে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ থেকে নিবৃত্ত করতে সচেষ্ট হয়।

১০. **নারীদের অসচেতনতা :** নারীদের নিম্ন রাজনৈতিক অংশগ্রহণের জন্য মূল বাধা হলো নারীদের নিজেদের অসচেতনতা। কেননা নারীরা নিজেরা সচেতন হলে কোনো বাধাই তাদেরকে দাবিয়ে রাখতে পারবে না। আর তাদের অসচেতনতার পেছনে অন্যতম কারণ হলো অশিক্ষা, সামাজিক কুসংস্কার আর ধর্মীয় বিধিনিষেধের প্রভাব।

প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ : বাংলাদেশের রাজনীতির বর্তমান অবস্থা দেখলে সহজেই অনুমান করা যায়, এখানে নারীদের অবস্থা আগের যে কোনো সময় কিংবা বিশ্বের অনেক দেশের তুলনায় ভালো। তবে এটা কোনো অর্থেই যথেষ্ট নয়। এমতাবস্থায় রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণকে আরো বৃদ্ধি করতে হলে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করা জরুরি :

১. **নারীশিক্ষার প্রসার :** নারীদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য নারীশিক্ষার প্রসার অত্যাবশ্যক। কেননা নারীদের শিক্ষিত করে তুলতে পারলে তাদের আপন সত্তার বিকাশ ঘটবে এবং তারা নিজেদের ভালো-মন্দ সম্পর্কে অধিক মাত্রায় সচেতন হবে। তাদের এ সচেতনই তাদের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণের পথ খুঁজে নিতে উদ্বুদ্ধ করবে।

২. **নারীর অর্থনৈতিক উন্নতি :** নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণও অধিকার নিশ্চিত করার জন্য প্রথমেই নারীর অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা অর্জনের বিষয়টি সবিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। সেজন্য নারীদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে আরো সক্রিয় করার পাশাপাশি তাদের সম্পদের মালিকানার বিষয়ে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সংসারের অর্জিত আয়ে পুরুষের পাশাপাশি নারীরও অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষ করে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পক্ষেত্রে এগিয়ে আসার জন্য নারীদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এক্ষেত্রে নারীদেরও সাহসিকতার সাথে এগিয়ে আসতে হবে।

৩. **তৃণমূল পর্যায়ে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি :** রাজনৈতিক অংশগ্রহণের বিষয়টি অনেক ব্যাপক। নির্বাচনে অংশগ্রহণকেই রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বলে ধরে নেয়া যায় না। তাই রাজনীতির সকল ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ ব্যাপকতর করতে হবে। উল্লেখ্য, জাতীয় রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের জন্য যে সকল যোগ্যতা অর্জন দরকার তা যেমন আমাদের নারীদের নেই তেমনি তা অর্জনের সুযোগও সীমিত। এমতাবস্থায় তৃণমূল পর্যায়ে নারীদের অর্থবহ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে না পারলে জাতীয় পর্যায়ে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তুলে আনা যাবে না। বর্তমানে ইউনিয়ন পর্যায়ে নারীদের সংরক্ষিত আসনের যে ব্যবস্থা, এটা প্রশংসনীয়। কিন্তু এ ব্যবস্থাকে ফলপ্রসূ করার জন্য এক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা ও ক্ষেত্র নির্ধারণ করে তার যথাযথ ভূমিকা পালনের সুযোগ দিতে হবে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৪. **প্রার্থী মনোনয়নে নারীদের অগ্রাধিকার প্রদান :** আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মাঝে নারী প্রার্থীদের সম্পর্কে যে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তা দূর করতে হবে। এজন্য মহিলা প্রার্থী মনোনয়ন দানের ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলোকে ঐকমত্যে পৌছতে হবে। যে সকল যোগ্য মহিলা প্রার্থী লবিংয়ের কারণে মনোনয়ন পাচ্ছে না তাদের প্রতি দলকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। সেজন্য দলীয় কমিটিগুলোসহ অন্যান্য কার্যক্রমে মহিলাদের স্থান করে দিতে হবে।

৫. **নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা রোধ :** আতঙ্ক আর ভীতি নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণের পথে একটি অন্যতম বাধা। সেজন্য নারীর বিরুদ্ধে পরিচালিত সকল প্রকার সহিংসতা রোধ করে নিরাপদ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সুযোগ করে দিতে হবে। নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে নারীর নির্বিঘ্ন জীবনধারণ ও চলাফেরার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। তাহলে নারীরা রাজনীতিতেও সক্রিয় ভূমিকা পালনকে নিরাপদ মনে করতে পারবে।

৬. **পারিবারিক পর্যায়ে ভূমিকা নির্ধারণ :** নারীদেরকে পারিবারিক পর্যায় থেকেই রাজনৈতিক শিক্ষা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম করে তুলতে হবে। সেজন্য তাদেরকে পারিবারিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের সুযোগ দিতে হবে।

৭. **পরিশীলিত রাজনীতির চর্চা :** নারীর নিরাপদ রাজনৈতিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য আমাদের রাজনীতিকে দুর্বৃত্তদের কবল থেকে মুক্ত করতে হবে। সেজন্য গণতান্ত্রিক রীতিনীতির ব্যাপক চর্চা ও জনগণের রাজনৈতিক চিন্তাধারার বিকাশ সাধনে সচেষ্ট হতে হবে। এক্ষেত্রে আমাদের রাজনীতিবিদদেরই অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে।

৮. **সিভিল সমাজের ভূমিকা :** নারীদের রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তোলা এবং তাদের রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের সুশীল সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। নির্যাতিত এ নারীসমাজের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সাহস যোগাতে হবে।

উপসংহার : সর্বোপরি, নারীদের রাজনৈতিক অধিকার আদায়, অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা অর্জন এবং মানুষ হিসেবে যথাযথ মর্যাদা লাভের জন্য প্রথমত নারীদেরই এগিয়ে আসতে হবে। বেগম রোকেয়া, নবাব ফয়জুন্নেছা আর প্রীতিলতার উত্তরসুরিদের সংগ্রামী ঝাণ্ডা উড়িয়ে এগিয়ে যেতে হবে। নতুবা পুরুষশাসিত এ সমাজে কেউ কোনোদিন তাদের জায়গা খালি করে দেবে না।

০৫। নারী নির্যাতন বলতে কি বোঝায়? নারী নির্যাতনের ধরন সম্পর্কে আলোচনা করুন। এ প্রসঙ্গে নারী নির্যাতনের কারণ ও প্রতিকারসমূহ উপস্থাপন করুন।

উত্তর : বর্তমান সময়ের প্রধান আলোচ্য বিষয় নারী নির্যাতন। নির্যাতন মূলত অতি প্রাচীন একটি সমস্যা, যা একটি সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। ৮ মার্চ ২০১৫ আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল 'নারীর ক্ষমতায়ন, মানবতার উন্নয়ন পরিতাপের বিষয় প্রতিবছর আমরা বিশ্ব নারী দিবস পালন করি, শত শত কণ্ঠে ধ্বনি তুলি 'নারী নির্যাতন বন্ধ হোক', 'অসহায় মেয়েদের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলবে না' ইত্যাদি। কিন্তু প্রতিদিন এ সমস্যা যেন বেড়েই চলেছে। 'নারী শৈশবে পিতা, যৌবনে স্বামী, বার্ধক্যে পুত্র' এ নীতিতে বড় হয়ে ওঠে আমাদের মেয়েরা। নারীর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সমাজে দিন দিন নির্যাতনের মাত্রা বেড়েই চলেছে, নিত্যনতুন নির্যাতনের কায়দা উদ্ভাবন করা হচ্ছে। পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থায় ধর্মীয় গোঁড়ামি, সামাজিক কুসংস্কার, নিপীড়ন, সামাজিক বৈষম্য ও

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

শোষণের বেড়াজালে নারীদের সবসময় রাখা হচ্ছে অবদমিত করে। তাদের মেধা ও শ্রমশক্তিকে অবহেলা করা হচ্ছে। নারীরা চরমভাবে লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, অত্যাচারিত, অবহেলিত ও ধিকৃত হচ্ছে। একের পর এক ঘৃণিত কর্মকাণ্ড কেবল নারীদের বেলায় চলছে। এ সভ্য সমাজে প্রতিনিয়তই নারীকে কেন্দ্র করে অমানসিক, অসামাজিক, পৈশাচিক কাণ্ড সমাজের বুকে অহরহ চলছে। এ নারী নির্যাতন শুধু নারীদের সমস্যা নয়, একটি জাতীয় সমস্যা।

নারী নির্যাতন : নারী নির্যাতন একটি বহুল আলোচিত ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থার শুরু থেকেই নারী নির্যাতনের সূচনা। নারী নির্যাতন একটি ঘৃণ্য ব্যাপার, যা আমাদের সমাজে প্রতিনিয়ত ঘটছে। অথচ একটি সভ্য, স্বাধীন দেশে এমনটা হওয়ার কোনো যৌক্তিকতা নেই। তা সত্ত্বেও নারী নির্যাতন হচ্ছে এবং এটা অপ্রতিরোধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নারী নির্যাতন একটি সামাজিক ব্যাধি। এ আতঙ্কজনক ব্যাধি অপরাজেয় এইডসের চেয়েও ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে। বিভিন্ন পর্যায়ে নারী নিপীড়ন বেড়েই চলেছে। খুন, ধর্ষণ, অপহরণ, এসিড নিক্ষেপ, ইভটিজিং, যৌতুকের বলি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বর্তমান সময়ে ইভটিজিং নারী নির্যাতনের একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ইভটিজিংয়ের কারণে সিমি, তৃষা, ফাহিমা, মহিমা, ইলোরা, পিংকিসহ অসংখ্য কিশোরী-নারী আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছে। ইভটিজিংয়ের অপরাধে 'নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধনী) ২০০৩', দণ্ডবিধি ৫০৯ ধারায় মামলা করার বিধান রয়েছে। কিন্তু পুলিশ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই 'মহানগর পুলিশ অধ্যাদেশ ১৯৭৬'-এর ৭৬ ধারায় মামলা করছে। ফলে অপরাধীরা সহজেই ছাড়া পেয়ে যাচ্ছে। সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ইভটিজিং একটি অন্যতম সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে।

নারী নির্যাতন একটি ব্যাপক মনস্তাত্ত্বিক ধারণা। নারীর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তার ওপর শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিকসহ যাবতীয় দিক থেকে নারীকে কষ্ট দেয়া বা নারীর ওপর অবিচার করাই হচ্ছে নারী নির্যাতন। নারী নির্যাতন এক ধরনের সামাজিক অবক্ষয়। মানুষের পাশব প্রকৃতি যখন তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তখনই নারী নির্যাতনের প্রাবল্য পরিদৃষ্ট হয়।

নারী নির্যাতনের ধরন : নারী নির্যাতনের ধরনবৈচিত্র্য সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনের সাথে সাথে পাল্টায়। তবে সমসাময়িক সামাজিক প্রেক্ষাপটে যেসব ধরনের নারী নির্যাতন পরিদৃষ্ট তা নিম্নরূপ :

– এসিড নিক্ষেপের মাধ্যমে নারী নির্যাতন;
– ধর্ষণের মাধ্যমে নারী নির্যাতন;
– তালাক প্রদানের মাধ্যমে নারী নির্যাতন;
– বিনা অনুমতিতে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের মাধ্যমে নারী নির্যাতন;
– যৌতুক দাবির মাধ্যমে নারী নির্যাতন;
– অপহরণ ও নারী পাচারের মাধ্যমে নারী নির্যাতন;
– কটূক্তি বা গালিগালাজ দ্বারা নির্যাতন;
– শ্রমশক্তির যথাযথ মর্যাদা প্রদান না করে নারী নির্যাতন;
– বাল্যবিবাহের মাধ্যমে নারী নির্যাতন;
– বিবাহে পাত্রীর মতামত গ্রহণ না করে নির্যাতন;
– পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্ত্রীর মতামত অগ্রাহ্যকরণের মাধ্যমে নির্যাতন;

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

– প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হয়ে এসিড নিক্ষেপসহ নানাবিধ দুষ্কর্মের মাধ্যমে নারী নির্যাতন;
– ইভটিজিংয়ের মাধ্যমে নারী নির্যাতন;
– লিঙ্গ বৈষম্যের মাধ্যমে নারী নির্যাতন;
– ধর্মীয় কুসংস্কারের নামে নারী নির্যাতন;
– নারীকে পণ্য হিসেবে ব্যবহারকরণ;

নারী নির্যাতনের কারণ

১. **পিতৃতান্ত্রিক পরিবার ব্যবস্থা :** আমাদের পিতৃপ্রধান পরিবার ব্যবস্থা নারী নির্যাতনের জন্য দায়ী। এ ধরনের পরিবারের নেতৃত্বে থাকে পরিবারের বয়স্ক পুরুষ। আমাদের সমাজে সন্তানের বিয়ে এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পারিবারিক কার্যক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে খুব কম স্বামীই স্ত্রীর মতামত গ্রহণ করেন। এতে নারীসমাজ বঞ্চিত হয়, অনেক সময় তাদের স্বার্থও ক্ষুণ্ন হয়। আমাদের সমাজে একজন নারীকে বিয়ের পর সাধারণত স্বামীর পিতৃগৃহে নতুন পরিবেশে সবার সাথে মিলেমিশে চলতে হয়। পরিবারের সবার মন যুগিয়ে চলতে না পারলে স্ত্রীকে শুনতে হয় নানা কটূক্তি, এমনকি শারীরিক নির্যাতনও সহ্য করতে হয়।

২. **সামাজিক অস্থিরতা :** বাংলাদেশের সমাজে সামাজিক অস্থিরতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। দারিদ্র্য, বেকারত্ব, চাওয়া-পাওয়ার দ্বন্দ্ব, হতাশা ইত্যাদি সমস্যায় অনেকেই কম-বেশি জর্জরিত। এসবের প্রভাবও পড়ছে নারী সমাজের ওপর। সমাজে দুর্নীতি, প্রতারণা আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সহজ-সরল, সৎ ও কর্তব্যপরায়ণ তথা নিষ্ঠাবান ব্যক্তিরা সমাজের এ অস্থিরতায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে। এদের মনের চাপা অভিব্যক্তি, ক্ষোভ, দুঃখ কর্কশ ভাষায় প্রকাশ পায় গৃহপরিবেশে। সামাজিক অস্থিরতার জন্য ব্যক্তির আচরণ অনেক সময় স্বাভাবিক থাকছে না। ফলে স্ত্রী বা পরিবার পরিজনের সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রেই ভালো আচরণ করতে পারছে না। ফলে অনিচ্ছাকৃতভাবেও নারী নির্যাতিত হচ্ছে।

৩. **অর্থনৈতিক দুর্বলতা :** নারী নির্যাতনের অন্যতম কারণ হলো বাংলাদেশের অধিকাংশ নারীই অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী নয়। অর্থনৈতিকভাবে নারী পিতা, ভাই বা স্বামীর ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় তাদেরকে এদের মুখাপেক্ষী থাকতে হয়। তাই স্বাধীনভাবে তারা কোনো মতামত প্রদান করতে পারে না। আবার মতামত প্রদান করলেও তাদের মতামতের ওপর কোনো গুরুত্বারোপ করা হয় না। অর্থনৈতিক দুর্বলতার কারণেই নারী প্রতারিত হয়ে পাচার হয়ে যায় বা লোভ দেখিয়ে নিষিদ্ধ পল্লীতে বিক্রীত হয়।

৪. **শিক্ষার অভাব :** বাংলাদেশে নারী নির্যাতিত হবার অন্য একটি কারণ হলো শিক্ষার অভাব। এদেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী হলেও অধিকাংশ নারী অশিক্ষিত। যদিও সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করেছে। নারী শিক্ষা বিস্তারে বিএ পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। তবুও আশাজনকভাবে নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে না। নারীর অশিক্ষা অন্যতম একটি কারণ নির্যাতিত হওয়ার। কারণ শিক্ষার আলো না থাকায় নারীরা তাদের অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে কোনো জ্ঞান রাখে না। ফলে হয় নির্যাতিত।

৫. **বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ :** সভ্য দেশের মেয়েরা যে বয়সে বিয়ে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু করে তখন আমাদের দেশের মেয়েরা দিদিমা অথবা ঠাকুরমা হয়ে যায়। ফলে মাত্র অল্প সময় স্কুলে পড়াশোনার সুযোগ পায়। যে বয়সে তাদের পড়াশোনা শুরু করা প্রয়োজন সে বয়সে তাদের বিয়ে

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

হয়ে যায়। এভাবেই আমাদের দেশে অপরিণত বয়সে বিয়ে হয়। যা কেবল শারীরিক, নৈতিক ও বুদ্ধিমত্তার দিক থেকেই ক্ষতিকর নয়, শিক্ষার দিক থেকেও ক্ষতিকর।

৬. **যৌতুকজনিত সমস্যা :** অতীতে পণ দিয়ে মেয়েদের বিয়ে করতে হতো। এখন সে স্থান দখল করেছে যৌতুক। এখন মেয়েকে বিয়ে দিতে হলে ছেলেকে যৌতুক হিসেবে দিতে হয় টাকা ও মূল্যবান উপহার সামগ্রী। যদিও সমাজভেদে যৌতুক শব্দটি এখন উপহার বা গিফট (Gift), খুশি হয়ে দেয়া, সহযোগিতা করা প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের অন্যতম একটি মুখ্য কারণ এই যৌতুক। যৌতুকের কারণে অনেক বিবাহিত নারীকে স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত হতে হয়। স্বামীগৃহে নারীকে নানা অন্যায় অত্যাচার সহ্য করতে হয়। এমনকি গায়ে এসিড দিয়ে পুড়িয়ে, দা দিয়ে কুপিয়ে, গলাটিপে যৌতুকজনিত কারণে হত্যা পর্যন্ত করা হয়।

৭. **ধর্মীয় কুসংস্কার :** বাংলাদেশের এক শ্রেণীর ধর্মব্যবসায়ী ধর্মকে হাতিয়ার করে নানা তাবিজ, কবচ, পানি পড়া, ফুঁ দিচ্ছে। নারীকে সন্তান সম্ভাবা করতে বা স্বামীর ভালোবাসা পেতে হাতিয়ে নিচ্ছে অর্থ। কিংবা পর্দাপ্রথার নামে পরিবারের পুরুষরা নারীকে গৃহে বন্দি রাখছে, শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করছে। ধর্মব্যবসায়ীরা বিভিন্ন রকম ফতোয়া জারি করছে। এসব প্রতারক, ভণ্ড পীর-ফকিরের ফতোয়ায় বলি হচ্ছে বাংলার হাজার হাজার নারী।

৮. **পুরুষকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থা :** আমাদের সমাজব্যবস্থা পুরুষপ্রধান। পুরুষ সমাজের প্রধান ও মাথা। তাই স্বাভাবিকভাবে পরিবারেও স্বামী প্রধান হয়ে থাকেন। স্বামীর আদেশই শিরোধার্য হয় স্ত্রীর। এক্ষেত্রে অনেক স্বামী আছেন যারা মনে করেন স্ত্রীকে কটু কথা বলা বা গালিগালাজ দ্বারা দমিয়ে বা শাসিয়ে রাখতে না পারলে স্ত্রী তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবেন। আবার অনেক স্বামী আছেন স্ত্রীকে কটু কথা বলে কাঁদিয়ে বা দুশ্চিন্তায় ফেলে আনন্দ পান। এভাবে স্বামী বা পরিবারের সদস্যদের কটূক্তি ও গালিগালাজ দ্বারা নারী নির্যাতিত হন।

৯. **স্বামীর একাধিক স্ত্রী গ্রহণ :** বাংলাদেশে অনেক সময় দেখা যায় যে, কোনো দম্পতির সন্তান হচ্ছে না। কিন্তু এর জন্য স্ত্রীকেই দায়ী করা হয় এবং স্ত্রীর অমতে সন্তান লাভের আশায় পুরুষ আবার বিয়ে করে। কিন্তু সন্তান না হওয়ার জন্য দায়ী স্বামীই। অথবা দেখা যায় পরপর দুই বা ততোধিক মেয়েসন্তান জন্ম নিলে পুরুষ ছেলের আশায় আবার বিয়ে করেন। এভাবে সন্তানের আশায় বা ছেলের আশায় বা বিভিন্ন কারণে পুরুষ একাধিক বিয়ে করে নারীকে মানসিকভাবে নির্যাতন করে এমনি তার নায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে।

১০. **সচেতনতার অভাব :** নারী নির্যাতিত হওয়ার অন্যতম কারণ নারীদের অসচেতনতা। আমাদের দেশের অধিকাংশ নারীই অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন। তারা তাদের অধিকার, দায়িত্ব, কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন নয়।

নারী নির্যাতন রোধে করণীয়/সমাধান :

১. **সুশিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে :** নারী নির্যাতন রোধ করতে হলে নারীকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। কেবল স্বাক্ষর দিতে জানে এরূপ শিক্ষা নয়। নারীকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে। যাতে নারী তার অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়।

২. **ধর্মীয় কুসংস্কার বন্ধ করতে হবে :** নারী নির্যাতন রোধ করতে হলে ফতোয়াসহ নানাবিধ ধর্মীয় কুসংস্কার রোধ করতে হবে। এক্ষেত্রে সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। চিহ্নিত করতে হবে ফতোয়াবাজদের।

৩. **সুযোগের সমতা :** নারী-পুরুষ সবাই সমান। সবাই সমান দায়িত্বশীল। কাজেই পুরুষ নারীর প্রতি কোনো বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না। সুযোগ লাভের ক্ষেত্রে সবাই একই নীতি ও কৌশল ভোগ করবে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৪. **পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার পরিবর্তন :** আমাদের দেশের পুরুষের মানসিকতাই ছোট থেকে এভাবে গড়ে উঠেছে যে তারা নারীর ঊর্ধ্বতন। নারী তাদের অধস্তন। জন্মের পর থেকে দাদা বা বাবাকে দেখেছে দাদী বা মায়ের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে, শাসন করতে। সময়ের পরিবর্তন ঘটলেও পুরুষের এরূপ মানসিকতার পরিবর্তন ঘটেনি। কাজেই পুরুষের এরূপ মানসিকতার পরিবর্তন করতে হবে।

৫. **আইনি পদক্ষেপ :** বাংলাদেশে নারী নির্যাতন রোধকল্পে কতিপয় প্রচলিত আইনের সংশোধন ও নতুন আইন প্রণয়ন করতে হবে। এসব আইনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মুসলিম পারিবারিক আইন, যৌতুক নিরোধ আইন, বাল্যবিবাহ রোধ আইন প্রভৃতি।

৬. **নির্যাতিতদের সহযোগিতা করা :** নির্যাতিত নারীদের জন্য পুনর্বাসনকেন্দ্র স্থাপন করার পাশাপাশি আইনজীবীর ফি ও অন্যান্য খরচ বহনে সহায়তা দিতে হবে।

৭. **বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ রোধ :** আমাদের দেশে একটি মেয়ে কোনোকিছু বোঝার আগেই তাকে বিয়ে দিয়ে দেয়া হয়। ফলে সে শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। পারিবারিক জ্ঞান অর্জনে বঞ্চিত হয়। তাছাড়া নানা অজুহাতে পুরুষরা একাধিক বিয়ে করে। এরূপ বাল্যবিয়ে ও বহুবিবাহ রোধ করা গেলে নারী নির্যাতন অনেক কমে যাবে।

৮. **কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি :** বাংলাদেশের নারীরা প্রাথমিকভাবে দুর্বল বলে পরনির্ভরশীল। নারীদের শিক্ষিত ও দক্ষ করে যদি কর্মসংস্থানের সুযোগ আরো বৃদ্ধি করা যায় তাহলে নারীরা স্বাবলম্বী হবে এবং নির্যাতন হ্রাস পাবে।

৯. **সামাজিক সচেতনতা :** নারী নির্যাতন রোধে সামাজিক সচেতনতা কর্মসূচির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। এ সচেতনতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন সভা, সেমিনার ও পাঠ্যপুস্তকে নারীর অধিকার সংক্রান্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

১০. **নারীর ক্ষমতায়ন :** সর্বোপরি নারী নির্যাতন রোধে নারীর ক্ষমতায়ন একান্ত অপরিহার্য। নারীর ক্ষমতায়ন ব্যতীত নির্যাতন রোধ সুদূরপরাহত।

উপসংহার : নারীকুল সমাজে অনভিপ্রেত কোনো বস্তু নয়, এর অংশবিশেষ মাত্র। সে অর্থে সংসার এবং পরিবারের বিশেষ অংশ হলো নারী। নারী ব্যতীত কোনো পরিবার গড়ে উঠতে পারে না। তাই নারীকে বলা হয় গৃহলক্ষ্মী। আর স্রষ্টা নারীদেরকে কোমল, মায়া-মমতা, প্রেম-প্রীতির প্রতীক হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। পুরুষশাসিত সমাজের অবক্ষয়, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতার অভাবে নারী নির্যাতিত হচ্ছে। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। নির্যাতিত এ অর্ধাংশ নারীকে নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। নারীকেই তার অধিকার আদায়ে সহযোগিতা করতে হবে। নির্যাতনমুক্ত সমাজ গড়তে প্রয়োজন সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা।

০৬। বর্তমানে বাংলাদেশে নারী সহায়তাকল্পে কি কি পদক্ষেপ বিদ্যমান রয়েছে? জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১-তে নারীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতায়নের উপর কিরূপ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে?

উত্তর : বাংলাদেশের জনসংখ্যার এক বিশাল অংশ নারী। নারী উন্নয়ন তাই জাতীয় উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত। সকল ক্ষেত্রে নারীর সমসুযোগ ও সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা জাতীয় উন্নয়ন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে একান্ত অপরিহার্য। ১৯৯৬ সালে ১২ জুন জাতীয় নির্বাচনে দেয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার দেশে প্রথমবারের মতো জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ১৯৯৭ প্রণয়ন করে, যার

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

প্রধান লক্ষ্য ছিল যুগ যুগ ধরে নির্যাতিত ও অবহেলিত এদেশের বৃহত্তর নারী সমাজের ভাগ্যোন্নয়ন করা। ১৯৯৭ সালে নারী সমাজের নেত্রীবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে ব্যাপক মতবিনিময়ের মাধ্যমে প্রণীত নারী উন্নয়ন নীতিতে এদেশের নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ আন্দোলনের প্রতিফলন ঘটে।

পরবর্তীতে ২০০৪ সালে তৎকালীন চার দলীয় বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার উক্ত নীতিতে পরিবর্তন ঘটায় ও জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৪ প্রণয়ন করে। ২০০৮ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় সংশোধিত আকারে প্রণীত হয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৮, কিন্তু তার কার্যকর বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নির্বাচনী ইশতেহার ২০০৮-এ নারীর ক্ষমতায়ন, সমঅধিকার ও সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক প্রণীত নারী উন্নয়ন নীতি পুনর্বহাল করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পরিচালিত বর্তমান সরকার নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়নে এবং নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার নিমিত্তে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ প্রণয়ন করছে।

বর্তমান প্রেক্ষাপট : মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার ২০২১ সালের রূপকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা, ক্ষমতায়ন এবং সার্বিক উন্নয়নের মূল ধারায় সম্পৃক্তকরণের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় নারী দারিদ্র্য বিমোচন, নারী নির্যাতন বন্ধ, নারী পাচার রোধ, কর্মক্ষেত্রসহ সকল ক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা বিধান এবং আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডে নারীর পূর্ণ ও সম অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। হতদরিদ্র নারীদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে বিধবা বা স্বামী পরিত্যক্তা মহিলাদের ভাতা প্রদান কর্মসূচি, শহরাঞ্চলে শ্রমজীবী মহিলাদের জন্য আবাসস্থল প্রদান কর্মসূচি, দারিদ্র্য বিমোচন ঋণ প্রদান কর্মসূচি। নারীদের কৃষি, সেলাই, ব্লক-বাটিক, হস্তশিল্প, বিউটিফিকেশন, কম্পিউটার ও বিভিন্ন আয়বর্ধক বিষয়ে ব্যাপক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শ্রমবাজারে ব্যাপক অংশগ্রহণ, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের সহজ শর্তে ও বিনা জামানতে ঋণ সহায়তা প্রদান ও পৃষ্ঠপোষকতার মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

বিশ্বায়নের এই যুগে নারীকে সামষ্টিক অর্থনীতির মূলধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র (National Strategy For Accelerated Poverty Reduction (NSAPR II)-তে বিভিন্ন কার্যক্রম সন্নিবেশিত হয়েছে। এই কৌশলপত্রে দারিদ্র্য নির্মূলের লক্ষ্যে পাঁচটি কৌশল ব্লক চিহ্নিত করা হয়েছে যেখানে দারিদ্র্যবান্ধব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন অন্যতম। যে পাঁচটি সহায়ক কৌশল গৃহীত হয়েছে তন্মধ্যে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সকল জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণসমূহ ক্ষমতায়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। নারী দারিদ্র্য দূরীকরণে গৃহীত বিশেষ কার্যক্রমের মধ্যে এই কৌশলপত্রে রয়েছে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী বলয়ের প্রসারের মধ্য দিয়ে হতদরিদ্র নারীদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা। ১৯৯৮ সালে শুরু হয় বিধবা ও দুস্থ নারীদের ভাতা প্রদান কার্যক্রম। বর্তমানে দেশে ৯,২০,০০০ নারী এই কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। প্রতি মাসে একজন বিধবা নারী ৩০০ টাকা হারে ভাতা পেয়ে থাকেন। সেই সাথে রয়েছে মাতৃত্বকালীন ভাতা। মোট ৮৮,০০০ দারিদ্র্য মা এই কর্মসূচির আওতায় প্রতি মাসে ৩৫০ টাকা ভাতা প্রাপ্ত হন। এছাড়াও বয়স্ক ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রম চলমান যা থেকে নারীরা উপকৃত হন। বিত্তহীন নারীর দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (ভিজিডি)-এর আওতায় খাদ্য নিরাপত্তারূপে ৭,৫০,০০০ দরিদ্র নারীকে প্রতি মাসে ৩০ কেজি চাল বা ২৫ কেজি পুষ্টি আটা বিতরণ করা হয়। কৌশলপত্রে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান বিশেষত আয় বর্ধক প্রশিক্ষণ, কৃষি, কম্পিউটার ইত্যাদি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীকে আত্মনির্ভরশীল ও স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি নারী উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সহজ শর্তে স্বল্প হারে ঋণ প্রদান, বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ, আর্থিক সহায়তা প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বিশেষত টেক্সটাইল, হস্তশিল্প, বয়নশিল্পের বিকাশে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে Home Based Micro Enterprise গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এই কৌশলপত্রের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে সরকারের দীর্ঘমেয়াদি প্রেক্ষিতে পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) ও ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১০-২০১৫) প্রণয়ন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির লক্ষ্য :

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১-এর উল্লেখযোগ্য লক্ষ্যসমূহ নিম্নরূপ :

১. বাংলাদেশ সংবিধানের আলোকে রাষ্ট্রীয় ও গণজীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।
২. রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
৩. নারীর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও আইনগত ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা।
৪. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূল ধারায় নারীর পূর্ণ ও সম অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
৫. নারীকে শিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ রূপে গড়ে তোলা।
৬. নারী সমাজকে দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত করা।
৭. নারী ও কন্যা শিশুর প্রতি সকল প্রকার নির্যাতন দূর করা।
৮. নারী ও কন্যা শিশুর প্রতি বৈষম্য দূর করা।
৯. রাজনীতি, প্রশাসন ও অন্যান্য কর্মক্ষেত্রে, আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ড, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া এবং পারিবারিক জীবনের সর্বত্র নারী পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করা।
১০. নারীর স্বার্থের অনুকূল প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও আমদানি করা এবং নারীর স্বার্থ বিরোধী প্রযুক্তির ব্যবহার নিষিদ্ধ করা।
১১. নারীর সুস্বাস্থ্য পুষ্টি আশ্রয় ও গৃহায়ন নিশ্চিত করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করা।
১২. প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও সশস্ত্র সংঘর্ষে ক্ষতিগ্রস্ত নারীর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।
১৩. প্রতিবন্ধী নারী, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি নারীর অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা।
১৪. বিধবা, বয়স্ক, অভিভাবকহীন, স্বামী পরিত্যাক্তা, অবিবাহিতা ও সন্তানহীন নারীর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা।
১৫. মেধাবী ও প্রতিভাময়ী নারীর সৃজনশীল ক্ষমতা বিকাশে সহায়তা করা।

নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন :

১. রাজনীতিতে অধিকহারে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্যে প্রচার মাধ্যমসহ রাজনৈতিক দলসমূহকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা।
২. নারীর রাজনৈতিক অধিকার অর্জন ও প্রয়োগ এবং এর সুফল সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা।
৩. রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরে পর্যায়ক্রমে ৩৩ শতাংশ নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা।
৪. নির্বাচনে অধিকহারে নারী প্রার্থী মনোনয়ন দেয়ার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে অনুপ্রাণিত করা।
৫. নারীর রাজনৈতিক অধিকার আদায় ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভোটাধিকার প্রয়োগে সচেতন করা এবং তৃণমূল পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত ভোটার প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৬. রাজনীতিতে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণের তাগিদ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে নারী সংগঠনসহ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রচার অভিযান গ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা।
৭. জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংখ্যা ৩৩ শতাংশে উন্নীত করা ও বর্ধিত সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচনের উদ্যোগ গ্রহণ করা।
৮. স্থানীয় সরকার পদ্ধতির সকল পর্যায়ে বর্ধিত সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা।
৯. সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার উচ্চ পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী নিয়োগ করা।

নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন : নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে জরুরি বিষয়াদি :

১. স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, জীবনব্যাপী শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ, তথ্য ও প্রযুক্তিতে নারীকে পূর্ণ ও সমান সুযোগ প্রদান করা।
২. উপার্জন, উত্তরাধিকার, ঋণ, ভূমি এবং বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অর্জিত সম্পদের ক্ষেত্রে নারীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রদান করা।

নারীর প্রশাসনিক ক্ষমতায়ন :

১. প্রশাসনিক কাঠামোর উচ্চ পর্যায়ে নারীর জন্য সরকারি চাকরিতে প্রবেশ সহজ করার লক্ষ্যে চুক্তিভিত্তিক এবং পার্শ্ব প্রবেশের (Lateral entry) ব্যবস্থা করা।
২. প্রশাসনিক, নীতি নির্ধারণী ও সাংবিধানিক পদে অধিকহারে নারীদের নিয়োগ প্রদান করা।
৩. জাতিসংঘের বিভিন্ন শাখা ও অঙ্গ সংগঠনে এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংগঠনে রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি বা প্রার্থী হিসেবে নারীকে নিয়োগ/মনোনয়ন দেয়া।
৪. নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে প্রবেশ পর্যায়সহ সকল পর্যায়ে, গেজেটেড ও নন-গেজেটেড পদে কোটা বৃদ্ধি করা।
৫. সকল ক্ষেত্রে নারীর জন্য নির্ধারিত কোটা পূরণ সাপেক্ষে কোটা পদ্ধতি চালু রাখা।
৬. কোটার একই পদ্ধতি স্বায়ত্বশাসিত ও বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে প্রযোজ্য করা এবং বেসরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহকেও এই নীতি অনুসরণের জন্য উৎসাহিত করা।
৭. জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সুপারিশ অনুসারে সরকারের নীতি নির্ধারণী পদসহ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সকল স্তরে নারীর সম ও পূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শতকরা ৩০ ভাগ পদে নারী নিয়োগের উদ্দেশ্যে সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা।

উপসংহার : ঘোষিত নারী নীতির অনেক দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও দেশের নারী সমাজ এটিকে মন্দের ভালো হিসেবে মেনে নিয়েছে। এ ব্যাপারে সরকারকে দুর্বল হলে চলবে না। নারী উন্নয়ন নীতি দেশ ও সমাজের জাতীয় উন্নয়ন নীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই এর বাস্তবায়নে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে যার যার অবস্থান থেকে কাজ করতে হবে।

০৭। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উত্থান ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নারীর অবদান বর্ণনা করুন।

উত্তর : ভূমিকা : পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। নারীরা এখন আর শুধু অন্তঃপুরবাসী নয়, বরং পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও সমাজের উন্নতি সাধনে কাজ করছে। অর্ধেক জনশক্তি হিসেবে দেশের উন্নয়নে নারীর অবদানকে কোনোক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। প্রাচীনকাল থেকেই সভ্যতা গড়ে ওঠার পেছনে পুরুষের পাশাপাশি নারীরা সমান ভূমিকা পালন করছে। সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে জীবিকার প্রয়োজনে ও আর্থসামাজিক কারণে নারীরা কর্মক্ষেত্রে অংশ নিচ্ছে। রাজনীতি ও ক্ষমতা

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

কাঠামোর ক্ষেত্রেও নারীর অংশগ্রহণ ছাড়া প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় না। কাজেই দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে নারীসমাজের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বর্তমানে নারীর অবস্থা : অতীতে নারীকে অমর্যাদা ও অবহেলার চোখে দেখা হলেও বর্তমানে নারীরা সমাজে তাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানে, দর্শনে, শিক্ষাদীক্ষায় নারীরা পুরুষের পাশাপাশি সমান যোগ্যতায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে। আজ বিশ্বের অনেক দেশেই নারীরা নেতৃত্ব দিচ্ছে। নতুন যুগের নব নব কাজে নারীর জয়গান ঘোষিত হচ্ছে আজ। এখন আর নারী পুরুষের গলগ্রহ নয়। ঘরে-বাইরে সবক্ষেত্রে নারীরা তাদের কাজের দক্ষতা প্রমাণ করেছে। বাংলাদেশের নারীরাও আজ দেশের অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ নাগরিক তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নারী : ১৯৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধে পুরুষের পাশাপাশি নারীদের অবদানও ছিল অপরিসীম। এই যুদ্ধে নারীর ভূমিকা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, নারী তার সর্বাত্মক শক্তি নিয়োগ করেছিল স্বাধীনতার মতো একটি বড় অর্জনে। পুরুষের পাশাপাশি নারীর অংশগ্রহণ ছিল তার জীবনবাজি রাখার ঘটনা। কাঁকন বিবি, তারামন বিবি, শিরিন বানু মিতিল, আশালতা, রওশন আরার মতো অনেক নারী সরাসরি সম্মুখ যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন, পাকিস্তানী হানাদারদের গুলি করে মেরেছেন। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের গোবরা ক্যাম্পে সশস্ত্র প্রশিক্ষণ নিয়েছেন অনেক নারী। ভারতে শরণার্থী শিবিরে ডাক্তার, নার্স এবং স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে অসংখ্য নারী যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শরণার্থীদের সেবা করেছেন। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী হিসেবে অংশ নিয়েছেন অনেক নারী শিল্পী। এরা ছিলেন যুদ্ধের প্রেরণা। আবার দেশের অভ্যন্তরে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী, শান্তিকমিটি, রাজাকার বাহিনীর রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে এদেশের গ্রামে, গঞ্জে, শহরে, বন্দরে অসংখ্য নারী মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করেছেন। তারা মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়েছেন, যুগিয়েছেন খাদ্য, অস্ত্র বহন করেছেন, লুকিয়ে রেখেছেন, গোপন সংবাদ আনা নেয়া করেছেন। এসময় বিদেশেও বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গঠনে কাজ করেছেন অনেক নারী। নূরজাহান মুর্শিদ, আতিয়া বাগমারের মতো উচ্চশিক্ষিত নারীর প্রবাসে বাংলাদেশের পক্ষে কূটনৈতিক তৎপরতা চালিয়েছেন, তহবিল সংগ্রহের কাজ করেছেন।

পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসর রাজাকার, আলবদরের হাতে নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়েছেন এদেশের প্রায় তিন লাখ নারী। তারা ধর্ষিত হয়েছেন, নৃশংস নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। এদের মধ্যে অনেকেই শহীদ হয়েছেন, অনেকে মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণা সহ্য করেও প্রাণে বেঁচে গেছেন। মরণের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও এরা তাদের স্বামী, পুত্র, ভাইকে ধরিয়ে দেননি শত্রুর হাতে। এরা পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়েছেন কিন্তু কখনো নৈতিকভাবে পরাজিত হননি।

বাংলাদেশের সংবিধানে নারী : উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই এ উপমহাদেশে নারী জাগরণের উন্মেষ ঘটে। ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন, পাকিস্তান আমলে ভাষা আন্দোলন, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান এবং স্বাধিকার আন্দোলনেও নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল অসাধারণ। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও অসামান্য অবদান রাখে। মুক্তিযুদ্ধের এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই বাংলাদেশের নারীরা আত্মনির্ভরশীল ও সচেতন হয়ে ওঠে। শিক্ষা গ্রহণ ও কর্মসংস্থানের প্রত্যাশা এবং নিজেদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় নারীসমাজের মধ্যে বিপুল সাড়া জাগে। এতে দেশে নারী উন্নয়নের এক বিরাট সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। ফলে দেশের জাতীয় উৎপাদনে নারীর অংশগ্রহণ আবশ্যক হয়ে ওঠে। এ প্রেক্ষাপটে ১৯৭২ সালে নবগঠিত রাষ্ট্র বাংলাদেশের সংবিধানে নারীর অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করার বিধান সন্নিবেশিত হয়। সংবিধানের ২৭ ধারায় উল্লেখ করা হয়, 'সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান ও

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।' ২৮(১) ধারায় রয়েছে, 'কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবে না।' ২৮(২) ধারায় বলা হয়েছে, 'রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করবেন।' ২৮(৩)-এ উল্লেখ আছে, 'কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদে বা বিশ্রামের কারণে জনসাধারণের কোনো বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোনো নাগরিককে কোনোরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাবে না।' ২৮(৪)-এ উল্লেখ আছে, 'নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের কোনো অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হতে এই অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করবে না।' ২৯(১)-এ রয়েছে, 'প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকবে।' ২৯(২)-এ বলা হয়েছে, 'কেবল ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী, নারী-পুরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মের নিয়োগ বা পদলাভের অযোগ্য হবেন না কিংবা সেক্ষেত্রে তার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাবে না।' ৬৫(৩) ধারায় নারীর জন্য জাতীয় সংসদে আসন সংরক্ষিত রাখা হয়েছে এবং এ ধারার অধীনে স্থানীয় শাসনসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হয়েছে।

রাষ্ট্র গঠনে নারীর অবদান : বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। যেখানে দেশের অর্ধেক অংশই নারী সেখানে নারীকে বাদ দিয়ে দেশের সামগ্রিক উন্নতির কথা কল্পনাও করা যায় না। বর্তমানে বিশ্বে সেসব দেশই উন্নত যেসব দেশে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও সকল কাজে এগিয়ে এসে দেশের উন্নয়নে নিজ দায়িত্ব পালন করতে পারছে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে জাতীয় উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারছে। বর্তমানে বাংলাদেশেও জাতির সামগ্রিক উন্নয়নে ও কল্যাণে নারীসমাজ বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। বর্তমানে বিভিন্ন কল-কারখানায়, অফিস-আদালতে, ব্যবসা বাণিজ্যে প্রায় সব ক্ষেত্রেই পুরুষের পাশে নারী অসামান্য ভূমিকা পালন করে চলেছে। নারীরা তাদের যোগ্যতা প্রমাণ করেছে সর্বক্ষেত্রে।

কৃষিখাতে নারী : বাংলাদেশে রপ্তানি যোগ্য কৃষিজ পণ্যের কথা উঠলে প্রথমেই উঠে আসে চা শিল্পের কথা। চা বাংলাদেশের একটি অন্যতম অর্থকরী ফসল। বর্তমানে বাংলাদেশ বিশ্বের দশম চা উৎপাদনকারী দেশ। দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে চা রপ্তানি করে প্রতিবছর একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছে বাংলাদেশ যার অধিকাংশ শ্রমিকই নারী। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এই চা শিল্পের অবদানের কৃতিত্বই হলো নারীদের। বর্তমানে অনেক কৃষি কাজেই নারীরা প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করে কৃষি উৎপাদনে অবদান রাখছে যা আমাদের অর্থনীতিকে একটি দৃঢ় অবস্থানে দাঁড় করাতে সাহায্য করছে।

শিল্পখাতে নারী : বাংলাদেশের শিল্পখাতে নারীদের উপস্থিতি লক্ষণীয়। বাংলাদেশের প্রধান শিল্পখাত হলো গার্মেন্টস শিল্প। গার্মেন্টস শিল্প ৯০-এর দশক থেকে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে নেতৃত্ব দিয়ে আসছে। গার্মেন্টস শিল্প বা তৈরি পোশাক বর্তমানে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধান খাত হিসেবে স্বীকৃত। বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত গার্মেন্টস শিল্প বাংলাদেশের বৈদেশিক অর্থনীতির প্রধান খাত হিসেবে স্থান করে নিয়েছে। এই গার্মেন্টস শিল্প একচ্ছত্রভাবে নারীদের দ্বারা পরিচালিত। একটি জরিপে দেখা গেছে গার্মেন্টস শিল্পে বিদ্যমান শ্রমের প্রায় ৯০ শতাংশই নারী। এই শিল্পে জড়িত নারীরা বেশিরভাগই গ্রামীণ স্বল্প শিক্ষিত নারী। তারা গার্মেন্টস শিল্পে অবদানের পাশাপাশি নিজেদের দারিদ্র্যাবস্থা দূরীকরণ করছে। এতে দেশে-দারিদ্র্যের সংখ্যা যেমন কমছে তেমনি বাড়ছে রপ্তানি আয়। বর্তমানে বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয়ের সিংহভাগই যোগান দিচ্ছে তৈরি পোশাক শিল্প। ২০১২-১৩ অর্থবছরে এ খাতের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পরিমাণ ছিল ১১০৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা মোট বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের ৪০.৮ শতাংশ। এই খাতের সার্বিক কৃতিত্বই নারীদের দেয়া যায়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

শিশুপালনে নারী : নারী মায়ের জাতি। পুরুষের পাশাপাশি সকল কাজে সমান অংশীদার হয়েও মা হিসেবে সন্তান ধারণ ও লালনে নারীর ভূমিকা কোনো কিছুর সাথেই তুলনীয় নয়। শিশুর চরিত্র গঠনে মায়ের শিক্ষাই প্রধান। আগামী দিনের নাগরিক গঠনের গুরুদায়িত্ব পালন করে নারী। একজন মা হিসেবে সার্থকভাবে শিশুকে মানুষ করতে পারলে জাতির উন্নতির পথ সুগম হয়। মায়ের শিক্ষাদানের ধরনই সন্তানের ভবিষ্যৎ কর্মতৎপর জীবনের সোপান। মা যেভাবে তার সন্তানকে মানুষ করবে সেভাবেই সে গড়ে উঠবে ভবিষ্যতের জন্যে।

শিক্ষাক্ষেত্রে নারী : জাতির বৃহত্তর স্বার্থে নারী সমাজকে শিক্ষিত হতে হবে-এ সচেতনতাবোধ নারীদের মধ্যেই জাগ্রত হয়েছে। নারীকে সভ্যতার আলোকবর্তিকা হিসেবে দেখাতে বাঙালি নারী বেগম রোকেয়া প্রতিষ্ঠিত করেছেন নারী বিদ্যালয়। নারীদের জন্য শিক্ষার দ্বার খুলে দিলেন কবি বেগম সুফিয়া কামাল। শত-সহস্র কুসংস্কারের বাঁধ ভেঙ্গে চিকিৎসাসেবায় অবদান রাখলেন অধ্যাপক ড. জোহরা বেগম কাজী। বিশ্বজুড়েই শিক্ষাক্ষেত্রে নারীর প্রভাব ও সফলতা মানবসভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। নারীকে যোগ্যতাসম্পন্ন হয়ে দেশোন্নয়নে অবদান রাখতে হলে অবশ্যই শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। নারীকে রাষ্ট্রপরিচালনার বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণের জন্য সর্বপ্রকার শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। একজন সুশিক্ষিত মাতা তার সন্তানকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে পারে। শিক্ষাক্ষেত্রে নারীর প্রভাব সম্বন্ধে বলতে গিয়ে নেপোলিয়ন বলেন, 'আমাকে একজন শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাদের একটি শিক্ষিত জাতি উপহার দিব।' বর্তমানে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষকতায় নিয়োজিত আছেন প্রায় পঞ্চাশ শতাংশেরও বেশি নারী।

গৃহস্থালি কাজে নারী : গৃহস্থালি কাজে নারীর শ্রমদানকে কোনোভাবেই খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। ঘরের বাইরে কর্মক্ষেত্রে পরিশ্রমের পাশাপাশি গৃহস্থালি কাজে আমাদের মা, বোন, স্ত্রী বা অন্যান্য আত্মীয়ারা যে শ্রম দেন সেটার বিনিময়ে কোনো অর্থের লেনদেন হয় না, হলে সেটাও 'জিডিপি'তে অন্তর্ভুক্ত হতো এবং তাতে 'জিডিপি'র পরিমাণ বেড়ে যেত। নারীর গৃহস্থালির শ্রমদান 'জিডিপি'তে অন্তর্ভুক্ত না হলেও মজুরিবিহীন এ কাজ-কর্ম সংসারের পরিচর্যা আর্থিক সাশ্রয়ের অন্যতম সঞ্চয়।

প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নারী : নারীর প্রশাসনিক ক্ষমতায়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর্যায়ে নারীর অন্তর্ভুক্তি তথা উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় নারীর প্রথম প্রকাশ ঘটে ১৯৭২ সালে। ১৯৭৩ সালে দুজন নারী মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত হন এবং ১৯৭৪ সালে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক পদেও নিয়োগ লাভ করেন একজন নারী। বর্তমান সরকারের মন্ত্রিসভায় চারজন নারী রয়েছেন। বর্তমান সরকার প্রধান ও সংসদের বিরোধীদলীয় নেত্রী দুজনই স্বনামধন্য নারী। বাংলাদেশের প্রধান বিরোধীদলীয় নেত্রীও একজন নারী। দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিশজন নারী সাংসদ নির্বাচিত হয়েছেন, যারা দেশ ও জাতির কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছেন। প্রশাসনের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে সচিব, অতিরিক্ত সচিব, যুগ্মসচিব, উপসচিব পদেও অনেক নারী কর্মরত রয়েছেন, যারা নীতি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। এছাড়াও রাষ্ট্রদূত, বিচারপতি, কাস্টমস কমিশনার, ডিসি, পুলিশ সুপারসহ সরাসরি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক পদে অসংখ্য নারী কর্মরত রয়েছেন।

উপসংহার : পরিবার থেকে শুরু করে রাষ্ট্রপরিচালনা পর্যন্ত দেশের সামগ্রিক কল্যাণেই নিহিত একটি জাতির বা দেশের উন্নয়ন। নারীরা পরিবার থেকেই সেই উন্নয়নের কাজে বিশেষ ভূমিকা রেখে চলেছে। সমাজকে সুশৃঙ্খল করে রাখতে, সমাজে উদার মানসিকতা সৃষ্টিতে নারীসমাজের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। নারী সমাজ শিক্ষিত হলে জাতীয় উন্নয়নে তারা আরো বেশি ভূমিকা রাখতে পারবে। তাই নারীশিক্ষার ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে এবং সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের কর্মসংস্থানের সুব্যবস্থা করতে হবে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-০১ **সার্বিক উন্নয়নে নারীর ক্ষমতায়নের ভূমিকা লিখুন।**

উত্তর : ১৯৭২ সালে নবগঠিত রাষ্ট্র বাংলাদেশের সংবিধানে নারীর অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করার বিধান সন্নিবেশিত হয়েছে। সংবিধানের ২৭ ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে, 'সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান ও আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী'। বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে নারীর ক্ষমতায়ন নিম্নলিখিতরূপে সহায়ক হতে পারে : ১. রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা, ২. দারিদ্র্য বিমোচন ও জীবনযাত্রার মান উন্নত করা, ৩. মানব সম্পদের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করা, ৪. নারী শিক্ষা ও সার্বিক শিক্ষার প্রসার ঘটানো, ৫. উন্নয়ন পরিকল্পনার মূল স্রোতধারায় ভূমিকা রাখা, ৬. সাংগঠনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক উত্তরণ ঘটানো, ৭. প্রশাসনিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা, ৮. লিঙ্গবৈষম্য দূর করা, ৯. নারীর মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা, ১০. নারীর প্রতি সকল প্রকার নির্যাতন দূর করা এবং ১১. জাতীয় অর্থনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

প্রশ্ন-০২ **বাংলাদেশের নারীসমাজের এগিয়ে যাওয়ার প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে লিখুন।**

উত্তর : বাংলাদেশের নারীসমাজ যুগ যুগ ধরে অবহেলিত ও বঞ্চিত হয়ে আসছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীকে যথোপযুক্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও অর্থনৈতিক পরাধীনতা বাংলাদেশের নারী সমাজের এগিয়ে যাবার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। অজ্ঞতা ও অশিক্ষার কারণে বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ এখনও মনে করে নারীর কর্মপরিধি শুধু গৃহাঙ্গনের মধ্যে সীমিত থাকা উচিত। মূলত বাল্যাবস্থা থেকেই মেয়েশিশু ছেলেশিশুর তুলনায় বঞ্চনার শিকার হয়ে আসছে। অথচ নারী ও পুরুষের মধ্যে যে উৎপাদনমুখী তেমন কোনো পার্থক্য নেই বা নারী ও পুরুষের সমানাধিকারের সাংবিধানিক গ্যারান্টি সেটাও দৃষ্টিভঙ্গিগত কারণে পুরোপুরি কাজে আসছে না। বাংলাদেশের বর্তমান ও বিগত সরকার নারী সমাজের এগিয়ে যাবার জন্য বহুবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। তথাপি আমরা সমাজের সর্বস্তরে পুরুষের সংখ্যানুপাতিক নারীর প্রতিনিধিত্ব দেখছি না। মনে রাখতে হবে বিশ্বায়নের এ যুগে লিঙ্গবৈষম্য পশ্চাৎপদতাকেই ডেকে আনবে। যে দেশের চলমান দুই দশক ধরে প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধীদলীয় নেত্রী উভয়ই নারী সে দেশের নারীদের এ অবস্থা কিছুতেই মেনে নেয়া যায় না। এমতাবস্থায় বাংলাদেশের নারীসমাজের সার্বিক অগ্রগতির জন্য সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির গুণগত সংস্কার অতীব জরুরি।

প্রশ্ন-০৩ **জাতি গঠনে নারীসমাজের ভূমিকা লিখুন।**

উত্তর : বিশ্বের মোট জনসংখ্যার মতো বাংলাদেশেরও মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। তাই নারীসমাজকে বাদ দিয়ে জাতীয় জীবনের উন্নতি ও অগ্রগতি কল্পনা করা যায় না। জাতি গঠনের ক্ষেত্রে নারীসমাজের সহযোগিতা অবশ্যই কাম্য। বাংলাদেশের নারীসমাজ সে সহযোগিতা দিতেও প্রস্তুত। কিন্তু কেবল সুযোগ-সুবিধার অপর্যাপ্ততার কারণে নারীসমাজ জাতি গঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারছে না। তাই নারীসমাজকে যদি পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়, প্রাপ্য মর্যাদা ও অধিকার দেয়া হয়, প্রশিক্ষণ দেয়া হয়, যথার্থ শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা যায় তবে পুরুষের মতো তারাও জাতি গঠনে

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। জাতি গঠনে নারীসমাজের ভূমিকা রাখার ব্যাপারে যে আগ্রহ আছে তা ১৯৪৭ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাপ্রবাহে তাদের স্মরণীয় ভূমিকা থেকে উপলব্ধি করা যায়। আশার কথা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধীদলীয় নেত্রী উভয়ই নারী। মন্ত্রিপরিষদ, বিশ্ববিদ্যালয়, সচিবালয়, পুলিশ বাহিনী, সামরিক বাহিনী ও অফিস-আদালতে নারীসমাজের পদচারণা ঘটছে। তাছাড়া সম্প্রতি শিল্প-সাহিত্যেও নারীসমাজ স্মরণীয় অবদান রাখছে। তাই আমরা যদি সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে দক্ষ নারীসমাজ গড়ে তুলতে পারি, তবে আশা করা যায় আমাদের বিপুল নারীসমাজ জাতি গঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

প্রশ্ন-০৪ **জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে নারীসমাজের ভূমিকা লিখুন।**

উত্তর : পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের চেয়েও ভয়াবহতা নিয়ে বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যা আমাদের আতঙ্কিত করে তুলেছে। দেশের সার্বিক উন্নয়ন আজ জনসংখ্যার চাপে পিষ্ট। তাই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা আজ আমাদের প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য। আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। তাই এ ভয়াবহ সমস্যা মোকাবিলায় যদি প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠীর কোনো ভূমিকা না থাকে তাহলে সমস্যার সমাধান কঠিন হয়ে পড়বে। তাই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে আমাদের নারীসমাজের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে নারীসমাজ নিম্নলিখিত উপায়ে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে—

ক. নিজেদের অধিক সন্তান ধারণ থেকে বিরত রাখা।

খ. চিত্তবিনোদনের বিকল্প ব্যবস্থার মাধ্যম তৈরি করা।

গ. পরিবার পরিকল্পনা ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ঘ. পরিবার পরিকল্পনা ব্যবস্থা প্রচার করার দায়িত্ব নেয়ার মাধ্যমে। কারণ আমাদের সমাজে এখনো কিছু সামাজিক ও ধর্মীয় গোঁড়ামির কারণে পুরুষ মাঠকর্মীর চেয়ে মহিলা মাঠকর্মীরা সহজে অশিক্ষিত ও দরিদ্র মহিলাদের পরিবার পরিকল্পনা ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে সহজে উদ্বুদ্ধ করতে পারে।

প্রশ্ন-০৫ **বাংলাদেশের নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণের প্রতিবন্ধকতাগুলো কি কি?**

উত্তর : বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকই নারী। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমাদের এ বিশাল নারীসমাজ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, প্রশাসনিকসহ জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীদের পিছিয়ে থাকাটা অপেক্ষাকৃত বেশি প্রকট। নিচে বাংলাদেশের নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণের প্রতিবন্ধকতাগুলো উল্লেখ করা হলো :

ক. **সামাজিকীকরণের প্রভাব :** ব্যক্তির রাজনৈতিক বা অন্য কোনো সামাজিক ও জাতীয় ক্ষেত্রে অংশগ্রহণে সামাজিকীকরণের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বাংলাদেশে নারীদের সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে যেসব উপাদান কার্যকর থাকে সেগুলো কোনো মতেই নারীকে রাজনীতিতে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে না বরং এ ব্যাপারে নারী সমাজের মধ্যে এক ধরনের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দেয়।

খ. **সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কার :** সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কারের কারণে বাংলাদেশের নারীরা খোলামেলাভাবে চলাফেরা ও মেলামেশা করতে পারে না। যার ফলে তাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণও প্রসারতা লাভ করে না।

গ. **পুরুষতান্ত্রিকতার প্রভাব :** বাঙালি সমাজ গোড়া থেকেই পুরুষতান্ত্রিক। যুগ যুগ ধরে এ সমাজের নারীরা দেখে আসছে যে, পরিবার, সমাজ বা রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব করছে পুরুষ। এমতাবস্থায় নারীরা পারিবারিক কিংবা সামাজিক এমনকি নিজেদের শাসন করার ন্যূনতম সুযোগ বা পরিবেশও পাচ্ছে না।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

ঘ. রাজনৈতিক দলগুলোর নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি : বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো প্রার্থী মনোনয়নের জন্য সামাজিক, পারিপার্শ্বিকসহ বিভিন্ন কারণে নারী প্রার্থীর চেয়ে পুরুষ প্রার্থীদের বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকে। এটিও নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করছে।

এছাড়া অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা, রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, নারীদের অসচেতনতা প্রভৃতি কারণে নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করছে।

প্রশ্ন-০৬ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১-এর লক্ষ্যসমূহ কি কি?

উত্তর : জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১-এর লক্ষ্যসমূহ নিম্নরূপ :

- বাংলাদেশ সংবিধানের আলোকে রাষ্ট্রীয় ও গণজীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।
- রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
- নারীর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও আইনগত ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা।
- নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা।
- আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূল ধারায় নারীর পূর্ণ ও সম অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
- নারীকে শিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ রূপে গড়ে তোলা।
- নারীসমাজকে দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত করা।
- নারী-পুরুষের বিদ্যমান বৈষম্য নিরসন করা।
- রাজনীতি, প্রশাসন ও অন্যান্য কর্মক্ষেত্র, আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ড, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া এবং পারিবারিক জীবনের সর্বত্র নারী-পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করা।
- প্রতিবন্ধী নারী, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী নারীর অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা।
- বিধবা, বয়স্ক, অভিভাবকহীন, স্বামী পরিত্যাক্তা, অবিবাহিত ও সন্তানহীন নারীর প্রতিফলিত করা।
- গণমাধ্যমে নারী ও কন্যাশিশুর ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরাসহ জেন্ডার প্রেক্ষিত প্রতিফলিত করা।
- মেধাবী ও প্রতিভাময়ী নারীর সৃজনশীল ক্ষমতা বিকাশে সহায়তা করা।
- নারী উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহায়ক সেবা প্রদান করা।
- নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা।

প্রশ্ন-০৭ বাংলাদেশের প্রথম নারী স্পিকার কে?

উত্তর : বাংলাদেশের প্রথম নারী স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী। ৩০ এপ্রিল ২০১৩ তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় স্পিকার নির্বাচিত হন এবং একই দিনে তিনি স্পিকার হিসেবে শপথ ও দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশের ১১তম ব্যক্তিত্ব যিনি স্পিকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। একই সাথে সংসদ সদস্য না হয়েও সংরক্ষিত আসন থেকে নির্বাচিত প্রথম এবং দেশের ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ স্পিকার।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

অধ্যায় ১৬

মুক্তিযুদ্ধ ও এর পটভূমি
The Liberation War & Its Background

Syllabus

The Liberation War and its Background: Language Movement 1952, 1954 Election, Six-Point Movement 1966, Mass Upsurge 1968-69, General Elections 1970, Non-cooperation Movement 1971, Bangabandhu's Historic Speech of 7th March. Formation and Functions of Mujibnagar government, Role of Major Powers and of the UN, Surrender of Pakistani Army, Bangabandhu's return to liberated Bangladesh. Withdrawal of Indian armed forces from Bangladesh.

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১. *'বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়' শিরোনামে একটি নিবন্ধ রচনা করুন। [১১তম বিসিএস]*
অথবা, ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন এবং ১৯৭১-এর স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র রয়েছে— আলোচনা করুন।
অথবা, ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন বাঙালির সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণ ও আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের বীজ বপনে কি ভূমিকা রেখেছিল? [৩১তম বিসিএস]
অথবা, 'ভাষা আন্দোলনই ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি।'—উক্তরের সপক্ষে মতামত প্রদান করুন।

০২. *বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে ছয় দফা কর্মসূচির ভূমিকা ও গুরুত্ব মূল্যায়ন করুন। [১৩তম বিসিএস]*

০৩. *বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে ভাষা আন্দোলন ও ছয় দফা কর্মসূচির ভূমিকা আলোচনা করুন। [১৮তম বিসিএস]*
অথবা, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিভিন্ন পর্যায়ের ওপর আলোকপাত করুন। [২৮তম বিসিএস]
অথবা, বাংলাদেশের জনগণের স্বাধীনতার স্পৃহা, ক্রমবিকাশমান স্বাধীনতার চেতনা, রাজনৈতিক সংঘটন, ১৯৪৭ হতে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ পর্যন্ত এবং বিশেষভাবে ২৬ মার্চ ১৯৭১ এর ঘটনাপ্রবাহ সমন্বিত করে কিভাবে স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটলো তা বর্ণনা করুন। [২৯তম বিসিএস]
অথবা, সংক্ষেপে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি বর্ণনা করুন। মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি রচনায় ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব কতটুকু? সংক্ষেপে ভাষা আন্দোলনের পটভূমি ব্যাখ্যা করুন। [২৯তম বিসিএস]

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

০৪. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের বৈরী মনোভাবের কারণ কি ছিল? আমাদের পররাষ্ট্রনীতির মূল বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন। [৩৩তম বিসিএস]
অথবা, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পরাশক্তির ভূমিকা আলোচনা করুন।
অথবা, স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে বিশ্ব সমাজের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করুন। [৩০তম বিসিএস]

০৫. জনগণের নেতা বলতে কি বোঝায়? বিশ্বের অন্য আরো অন্তত ২ জন নেতার সাথে তুলনা করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জননেতা এবং সফল স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতীক হিসেবে বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করুন। [২৯তম বিসিএস]

০৬. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের এগারটি সেক্টরের অবস্থান ও সেক্টর কমান্ডারদের নাম লিখুন। [৩০তম বিসিএস]

০৭. যুদ্ধাপরাধ কি? যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য কয়টি ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছে? যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের যৌক্তিকতা বর্ণনা করুন। [৩৩তম বিসিএস]

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

০৮. বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের পটভূমি আলোচনা করুন এবং সেই সাথে বাংলা ভাষার বিশ্বায়ন সম্পর্কে আলোচনা করুন।

০৯. ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা উল্লেখ করুন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয়ের কারণ কী?

১০. ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের কারণ ও ফলাফল আলোচনা করুন।
অথবা, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের এবং স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ভূমিকা আলোচনা করুন।

১১. ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফল ও গুরুত্ব আলোচনা করুন।

১২. ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ কেন অপরিহার্য ছিল? এ যুদ্ধে কি প্রমাণিত হয়েছিল?

১৩. বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের মূল বিষয়বস্তুর আলোচনা করুন।

১৪. মুজিবনগর সরকারের গঠন প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন।

১৫. মুজিবনগর সরকারের কার্যাবলী আলোচনা করুন।

১৬. বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করুন।

১৭. বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রত্যাহার কার্যক্রম আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

০১. লাহোর প্রস্তাব কি? এটি কে উত্থাপন করেন?

০২. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে কোন দল জয়ী হয়?

০৩. ভাষা আন্দোলন/অমর একুশে কি?

০৪. '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

০৫. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে কয়টি ব্রিগেড গঠিত হয়?

০৬. স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে বিশ্ব জনমতের ভূমিকা কি ছিল?

০৭. অসহযোগ আন্দোলন ১৯৭১ সম্পর্কে লিখুন।

০৮. মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের ভূমিকা বিশ্লেষণ করুন।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

বিগত বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

০১। 'বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়' শিরোনামে একটি নিবন্ধ রচনা করুন। [১১তম বিসিএস]
অথবা, ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন এবং ১৯৭১-এর স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র রয়েছে— আলোচনা করুন।
অথবা, ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন বাঙালির সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণ ও আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের বীজ বপনে কি ভূমিকা রেখেছিল? [৩১তম বিসিএস]
অথবা, 'ভাষা আন্দোলনই ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি।'–উত্তরের সপক্ষে মতামত প্রদান করুন।

উত্তর : দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ধর্মীয় কারণে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান একটি ইসলামী রাষ্ট্র হলেও এর সমাজ ব্যবস্থার একক আদর্শগত কোনো যোগসূত্র ছিল না। এর কারণ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার ভাষাগত বিরোধ। এ কারণে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ পাকিস্তানের মৌলিক আদর্শের সাথে কোনো দিন একাত্মতা অনুভব করতে পারেনি। আর এ কারণেই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরে ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পূর্ব বাংলার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ অধ্যাপক আবুল কাসেমের নেতৃত্বে 'তমুদ্দুন মজলিস' নামক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের মাধ্যমে ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। এর প্রভাব বাংলার সুদীর্ঘ রাজনৈতিক ইতিহাসের পরতে পরতে দেখতে পাওয়া যায় এবং এর সার্থক পরিণতি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

ভাষা আন্দোলনের ঐতিহাসিক পটভূমি : বাংলার জাতীয় ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনার বীজ রোপিত হয় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই যখন নিখিল পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মাতৃভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক উপায়ে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেয়ার প্রচেষ্টা চালানো হয়। এরই প্রেক্ষিতে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার মাত্র ১৭ দিনের মাথায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ অধ্যাপক আবুল কাসেমের নেতৃত্বে ১৯৪৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর ৩ সদস্যবিশিষ্ট 'তমুদ্দুন মজলিস' গঠিত হয়। এ সংগঠনের অপর সদস্যদ্বয় ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং শামসুল আলম। জন্মলগ্ন থেকেই সংগঠনটি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি উত্থাপন করে আসছিল। কিন্তু এ দাবি পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ কিছুতেই মেনে নিতে রাজি ছিলেন না। প্রকৃতপক্ষে পূর্ব পাকিস্তানে ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয় ভাষা সম্পর্কে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর একতরফা সিদ্ধান্ত এবং উক্ত সিদ্ধান্তকে জোরপূর্বক বাঙালিদের উপর চাপিয়ে দেয়ার ইচ্ছা এবং তৎপরতার মধ্য দিয়ে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দুকে গ্রহণ করতে সচেষ্ট হন; যদিও বাস্তবে উর্দু ভাষাভাষী লোকের অনুপাত ছিল অনেক কম। নিচের ছকের মাধ্যমেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বাংলা	৫৪.৬%	উর্দু	৬%
পাঞ্জাবি	২৭.১%	সিন্ধী	৪.৮%
পশতু	৬.১%	ইংরেজি	১.৪%

এমতাবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যায় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলায় তিন পর্যায়ে আন্দোলন পরিচালিত হয় :

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্যায় : নভেম্বর ১৯৪৭-এ করাচিতে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে একটি শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত হয়। ফলে পূর্ব বাংলায় এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিবাদ শুরু হয়। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে এ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে ঢাকায় সর্বপ্রথম 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করা হয় এবং কতিপয় দাবিতে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের নীতি গৃহীত হয়। এ পরিষদের দাবি ছিল নিম্নরূপ :

ক. বাংলা ভাষা হবে পূর্ব বাংলার একমাত্র শিক্ষার বাহন এবং অফিস-আদালতের প্রধান মাধ্যম।

খ. পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে দুটি—বাংলা ও উর্দু।

ভাষা আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় : ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে কংগ্রেস দলীয় সদস্য, বিশেষত কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ইংরেজি ও উর্দুর পাশাপাশি বাংলা ভাষা ব্যবহারের দাবি জানান। কিন্তু পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এই দাবির বিরোধিতা করেন। ফলে ঢাকায় ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী মহলে চরম অসন্তোষ দেখা দেয় এবং ২৬ ফেব্রুয়ারি সর্বত্র ধর্মঘট পালিত হয়। এভাবে সংগ্রাম পরিষদ ১৫ মার্চ পর্যন্ত ধর্মঘট ও হরতাল পালনের মধ্য দিয়ে দেশব্যাপী আন্দোলন অব্যাহত রাখে। অবশেষে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন বাংলা ভাষার দাবি সমর্থনের আশ্বাস দিলে আন্দোলন প্রশমিত হয়। কিন্তু ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় এবং কার্জন হলের এক সমাবর্তন অনুষ্ঠানে 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা' হিসেবে ঘোষণা দিলে আন্দোলন পুনরায় চাঙ্গা হয়ে ওঠে এবং দেশব্যাপী তীব্র প্রতিবাদ শুরু হয়।

ভাষা আন্দোলনের তৃতীয় ও শেষ পর্যায়

ক. **নাজিমুদ্দিনের ঘোষণা :** ১৯৫০ সালে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এবং ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি খাজা নাজিমুদ্দিন পুনরায় একই ঘোষণা দেন যে, 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।' ফলে ছাত্র-বুদ্ধিজীবী মহলে দারুণ ক্ষোভ ও হতাশার সৃষ্টি হয় এবং আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। এ আন্দোলনের অংশ হিসেবেই ৩০ জানুয়ারি ঢাকায় ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়।

খ. **রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি :** উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার প্রতিবাদে রাষ্ট্রভাষা বাংলা আন্দোলনকে আরো তীব্রতর করার লক্ষ্যে ১৯৫২ সালের ৩০ জানুয়ারি এক জনসভায় 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি' গঠন করা হয়। এতে ২১ ফেব্রুয়ারিকে ভাষা দিবস হিসেবে পালন করা হয় এবং দেশব্যাপী হরতাল পালনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

গ. **ঐতিহাসিক মিছিল ও ১৪৪ ধারা ভঙ্গ :** ২১ ফেব্রুয়ারির উক্ত কর্মসূচিকে বানচাল করার জন্য তৎকালীন গভর্নর নূরুল আমীন সরকার ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে। কিন্তু সংগ্রাম পরিষদ এ নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মিছিল বের করলে পুলিশের সাথে ছাত্র-জনতার এক মারাত্মক সংঘর্ষ বাঁধে। এক পর্যায়ে পুলিশ মিছিলের ওপর গুলি চালালে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ অনেকে প্রাণ হারান এবং আহত হন বহুসংখ্যক ব্যক্তি। এর ফলে সারা বাংলায় আন্দোলন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ঢাকায় এ ঘটনার প্রতিবাদে তিন দিন লাগাতার হরতাল পালিত হয় এবং দেশব্যাপী প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ অব্যাহত থাকে।

ঘ. **রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ :** অবশেষে তীব্র বিক্ষোভের মুখে সরকার নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয় এবং সাময়িকভাবে প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীন বাংলাকে অন্যতম জাতীয় ভাষা করার সুপারিশ সম্বলিত একটি প্রস্তাব প্রাদেশিক পরিষদে উত্থাপন করেন। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। অতঃপর ১৯৫৬ সালের সংবিধানের ২১৪ নং অনুচ্ছেদে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মর্যাদা দিলে বাঙালি জাতির বিজয় অর্জিত হয়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব : রেহমান সোবহান তাঁর 'বুর্জোয়া রাষ্ট্রব্যবস্থার সংকট' নামক প্রবন্ধে বলেন, 'বস্তুত যে অন্তর্নিহিত দুর্বলতা পাকিস্তানের ভাঙন এবং স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মূল কারণ, তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে।' উল্লিখিত বক্তব্য থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পেছনে মূল হাতিয়ার ছিল ভাষা আন্দোলন। এ আন্দোলন পূর্ব বাংলার গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে একধাপ এগিয়ে দেয়। জনগণের মধ্যে এ আন্দোলনে এক নতুন জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটে এবং এ চেতনার মাধ্যমেই ক্রমে ক্রমে বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশ লাভ করে। জনগণের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে বহুগুণে বাড়িয়ে দেয় এ আন্দোলন। তাই ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন ছিল বাংলাদেশের গণচেতনার প্রথম বহিঃপ্রকাশ এবং স্বাধিকার আন্দোলনের এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে এ আন্দোলন নিম্নোক্তভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল :

১. **'৫৪-এর নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের জয়লাভ :** '৫৪-এর নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী মেনিফেস্টো ২১-দফার প্রথম দফাই ছিল বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি। এ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত ২৩৭টি আসনের ২২৩টি আসন লাভ করে। শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করে। এপ্রিল ১৯৫৪ সালে আইন পরিষদের অধিবেশনে মুসলিম লীগ পর্যন্ত বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে মত পোষণ করে। এটি ছিল বাঙালি জাতির '৫২-র ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা জাতীয় ঐক্যের প্রতিফলন।

২. **'৫৬ সালের সংবিধানে স্বীকৃতি :** মার্চ ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান গৃহীত হয়। ১৯৫৪ সালের প্রথম আইন পরিষদে গৃহীত ভাষা ফর্মুলা এ সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এটা ছিল বাংলা ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত বিজয়। সংবিধানের ২১৪ নং অনুচ্ছেদে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা এবং ইংরেজিকে পরবর্তী ২০ বছরের জন্য সরকারি ভাষা হিসেবে চালু রাখার কথা উল্লেখ করা হয়।

৩. **রাজনৈতিক স্বাধিকার আন্দোলনে ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা :**

ক. ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাঙালি জাতি সর্বপ্রথম অধিকার সচেতন হয়ে ওঠে।

খ. ভাষা আন্দোলনই সর্বপ্রথম রক্তের বিনিময়ে জাতীয়তাবাদী গণদাবি আদায়ের শিক্ষা ও প্রেরণা দান করে।

গ. ভাষা আন্দোলন বাঙালিদের ঐক্যের দুর্ভেদ্য প্রাচীর গঠন এবং অধিকার আদায়ে ইস্পাত কঠিন শপথে বলীয়ান করে তোলে।

ঘ. এ আন্দোলন বাঙালি 'এলিট' এবং জনসাধারণের মধ্যে সেতুবন্ধনে সহায়তা করে।

ঙ. ১৯৫২ সাল থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের মুক্তি আন্দোলনের প্রতিটি স্তরে প্রেরণা যুগিয়েছে এই ভাষা আন্দোলনের রক্তরাঙা ইতিহাস।

৪. **পরবর্তীকালের ঘটনাপ্রবাহে ভূমিকা :** '৫২-এর একুশের চেতনায় ভাস্বর বাঙালি জাতি রাজনৈতিক অধিকার বা স্বাধিকার আন্দোলনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে স্বাধিকার অর্জনের দিকে এগুতে থাকে। '৬২-র 'হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট'-এর বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলনে ছাত্র সমাজ ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৬২ 'শিক্ষা দিবস' ঘোষণা করে। ১৯৬৫-র পাক-ভারত যুদ্ধ বাঙালি জাতিকে এমন একটি ধারণা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে যে, পাকিস্তানিরা আমাদের শুধু নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য ব্যবহার করবে। তাই অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬ সালে লাহোরে শেখ মুজিব ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবি উত্থাপন করেন। ভাষা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা ঐক্যবদ্ধ বাঙালি জাতি ছয় দফাকে জাতীয় মুক্তির প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

'৬৯-এর ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থান এবং '৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের জয়লাভের পেছনে প্রেরণা ও শক্তি যুগিয়েছিল '৫২-র ভাষা আন্দোলন। '৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পূর্ব বাংলার ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮২টি আসন লাভ করে এবং একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। নির্বাচনের ফলাফল অনুযায়ী শেখ মুজিবের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর ছিল আইনসঙ্গত। কিন্তু তা না করে শুরু হয় প্রাসাদ ষড়যন্ত্র। প্রহসনমূলক আলোচনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় শেখ মুজিবের হাতে ক্ষমতা দেয়া হবে না, প্রয়োজনে বাঙালি জাতিকে ধ্বংস করে দেয়া হবে। সাংবাদিক অ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাস এটাকে 'বিশ শতকের সর্বাধিক জঘন্যতম প্রবঞ্চনা' বলে আখ্যায়িত করেন। আলোচনার নামে কালক্ষেপণ করে ২৫ মার্চ ১৯৭১ মধ্যরাত থেকে 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে বাঙালি নিধন অভিযান শুরু হয়ে যায়। ফলে সকল ধরনের অহিংস তৎপরতার সুযোগ নস্যাৎ হয়ে যায়। এমতাবস্থায় শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন। এটি ছিল মহান ভাষা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা ঐক্যবদ্ধ বাঙালি জাতির কাছে প্রত্যাশার চূড়ান্ত প্রাপ্তি। সে কারণে বাঙালি জাতি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর কবল থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করতে মুক্তিযুদ্ধ শুরু করে। আর এতে প্রেরণা যুগিয়েছে একুশের চেতনা। সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ হানাদার বর্বর পাকিস্তান বাহিনীকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করে বাংলার বীর জনতা।

উপসংহার : বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন পূর্ব বাংলার জনগণের মধ্যে এক নতুন জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটায় এবং এ চেতনাই ক্রমে ক্রমে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটায়। ১৯৮০ সালের 'জিজ্ঞাসা'র একুশে সংকলনে ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য সম্পর্কে বলা হয় 'পূর্ব পাকিস্তানের ইতিহাসে ভাষা আন্দোলন এক নতুন দিকদর্শন। এই আন্দোলন বাঙালিদের মনে যে বৈপ্লবিক চেতনা ও ঐক্যের উন্মেষ ঘটায় তা আমাদের পরবর্তী সকল আন্দোলনে প্রাণশক্তি ও অনুপ্রেরণা যোগায়।' এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ছাত্র-জনতা যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সূচনা করে তা ক্রমশ শক্তিশালী হতে থাকে। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের ঐতিহাসিক বিজয়, ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের স্বাধিকার আন্দোলন, ১৯৬৮-৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের নির্বাচন এবং সর্বোপরি ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে বিশেষভাবে প্রেরণা যুগিয়েছে এ ভাষা আন্দোলন।

০২ ॥ বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে ছয় দফা কর্মসূচির ভূমিকা ও গুরুত্ব মূল্যায়ন করুন। *[১৩তম বিসিএস]*

উত্তর : পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অব্যাহত বৈষম্য ও দীর্ঘ শোষণনীতির ফলে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধিকার প্রশ্নে ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি সাবজেক্ট কমিটির মিটিংয়ে প্রথম ছয় দফা কর্মসূচির কথা ঘোষণা করেন এবং ২১ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটিতে ছয় দফা প্রস্তাব ও তার জন্য আন্দোলনের কর্মসূচি পেশ করেন। ভাষা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা ঐক্যবদ্ধ বাঙালি জাতি ৬ দফাকে জাতীয় মুক্তির প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করে। পাকিস্তানের স্বৈরশাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এটি ছিল মারণাস্ত্রস্বরূপ।

ছয় দফা আন্দোলনের পটভূমি : যে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬৬ সালের ঐতিহাসিক ৬ দফা কর্মসূচিভিত্তিক আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল তা নিচে আলোচনা করা হলো :

১. **পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর অব্যাহত শোষণ :** ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়, যা পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান নামে দু ভাগে বিভক্ত ছিল। ভৌগোলিক, ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক ব্যাপক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও শুধু ধর্মের

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

ওপর ভিত্তি করে পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাজনৈতিক অভ্যুদয় হয়। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পর থেকেই পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী বাঙালিদের প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণ, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শোষণ, নির্যাতন, জাতিগত নিপীড়ন ও প্রশাসনিক বঞ্চনার সূচনা করে, যা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ ও অসন্তোষের সৃষ্টি করে।

২. **শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন :** পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী কেন্দ্রকে শক্তিশালী করে তৎকালীন পূর্ব বাংলা স্বায়ত্তশাসনের অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখে রাজনৈতিক কর্মধারাকে জোর করে স্তব্ধ করার চেষ্টা চালায়। বাঙালিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে ছিল বঞ্চিত। ফলে পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশে পরিণত হয়।

৩. **অর্থনৈতিক বৈষম্য :** পাকিস্তানের প্রায় সকল অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, স্টেট ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংক, বীমা ও বৈদেশিক মিশনসমূহ পশ্চিমাংশে থাকার কারণে অর্থের মজুদও গড়ে ওঠে সেখানে। পূর্বাঞ্চলের পাট থেকে অর্জিত প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিমাংশে ব্যয় করা হতো। পূর্বাংশের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়ের নিজস্ব ক্ষমতা নেই—এ অজুহাতে সকল বৈদেশিক মুদ্রাই পশ্চিমাংশে চলে যেত। ফলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সৃষ্টি হয় অর্থনৈতিক বৈষম্যের গগনচুম্বী প্রাচীর।

৪. **চাকরির ক্ষেত্রে বৈষম্য :** পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই বাঙালিদের প্রতি বিশেষ উদাসীন নীতি পরিলক্ষিত হয়। কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিসের চাকরির ক্ষেত্রে ১৬% এবং সামরিক বাহিনীতে ১০%-এর বেশি পূর্ব পাকিস্তানি ছিল না। স্থল, নৌ, বিমান ও কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরির সকল সদর দপ্তর পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত ছিল। আইয়ুব সরকারের আমলে এ বৈষম্য ও বঞ্চনা তীব্র আকার ধারণ করে।

৫. **পূর্ব বাংলায় তীব্র অসন্তোষ :** ১৯৫৪-৫৫ সালের নির্বাচনে বিজয় লাভের পর আইয়ুব সরকার ও তার সহযোগী মৌলিক গণতন্ত্রী আমলা, কনভেনশন ও মুসলিম লীগের সদস্যদের দৌরাত্ম্য ও অত্যাচার পূর্ব বাংলার জনজীবনে যথেষ্ট মানসিক চাপ ও অসন্তোষের সৃষ্টি করে।

৬. **সামরিক অসহায়ত্ব :** পাকিস্তান সৃষ্টির পর পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষার কোনো কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। অথচ ভৌগোলিক কারণে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা স্বয়ংসম্পূর্ণরূপে গড়ে তোলা উচিত ছিল। কিন্তু সকল সামরিক দপ্তর, অস্ত্র দপ্তর ও অস্ত্র কারখানা পশ্চিম পাকিস্তানেই স্থাপন করা হয়। আইয়ুব খানের যুক্তি ছিল যে, পূর্ব পাকিস্তানের রক্ষা ব্যবস্থা পশ্চিম পাকিস্তানে নিহিত রয়েছে। কিন্তু ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ আইয়ুবের এই যুক্তির অসারতা প্রমাণ করে।

৭. **১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ :** ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময় থেকে বাঙালিরা নিজেদের অসহায়ত্ব বুঝতে পারে এবং নিজেদের নিরাপত্তা শক্তির ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। এ যুদ্ধ বাঙালি জাতিকে এমন একটি ধারণা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে যে, পাকিস্তানিরা শুধু নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য আমাদের ব্যবহার করবে। তাই অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬ সালে লাহোরে শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি উত্থাপন করেন।

ছয় দফা কর্মসূচি : ছয় দফা কর্মসূচি পেশ করার সময় শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফাকে পূর্ব পাকিস্তানের বাঁচার দাবি বলে উল্লেখ করেন। ঐতিহাসিক এ ছয় দফা কর্মসূচিতে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সংবিধানের এক সুস্পষ্ট পরিকল্পনা তুলে ধরা হয়। নিচে ছয় দফা কর্মসূচির বিবরণ দেয়া হলো :

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

প্রথম দফা :

শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ও রাষ্ট্রীয় প্রকৃতি : ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে সত্যিকার ফেডারেশন ধরনের সংবিধান রচনা করতে হবে। তাতে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার থাকবে এবং সকল নির্বাচন সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হবে। আইনসভার সার্বভৌমত্ব থাকবে।

বিশ্লেষণ : লাহোর প্রস্তাব ছিল অবিভক্ত ভারতবর্ষে মুসলমানদের প্রাণের দাবি। লাহোর প্রস্তাবে নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে সকল বিধান উল্লেখ ছিল তার ভিত্তিতে ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে পাকিস্তানের মুসলমানগণ রায় দিয়েছিল। আবার ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের মূলে ছিল এই লাহোর প্রস্তাব। সুতরাং শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফার প্রথম দফায় যে প্রস্তাব করেছেন তা নতুন কোনো প্রস্তাব ছিল না, যা পাকবাহিনীর মনঃপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা, সর্বজনীন ভোটাধিকার ও সার্বভৌম আইন পরিষদ—এই ছিল প্রথম দফার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য।

দ্বিতীয় দফা :

কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা : দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্র সংক্রান্ত বিষয়সমূহ থাকবে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। অবশিষ্ট সকল ক্ষমতা থাকবে প্রাদেশিক সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন।

বিশ্লেষণ : কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্র সংক্রান্ত ক্ষমতা দিয়ে এক অর্থে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবিকেই তুলে ধরা হয়েছে। এই দফা প্রসঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমান নিজেই বলেছেন, 'এই প্রস্তাবের জন্যই কায়েমি স্বার্থের দালালরা আমার ওপর সর্বাপেক্ষা বেশি চটেছে। আমি নাকি পাকিস্তানকে দু টুকরো করার প্রস্তাব দিয়েছি।'

তৃতীয় দফা :

মুদ্রা ও অর্থবিষয়ক ক্ষমতা : ১. পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের জন্য দুটো আলাদা অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রার প্রচলন এবং দুটো স্টেট ব্যাংক স্থাপন করতে হবে।

২. দুই অঞ্চলে কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে দুই মুদ্রা থাকবে। পূর্ব পাকিস্তান থেকে মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হতে পারবে না, একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকের অধীনে দুই অঞ্চলে দুটি রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে।

বিশ্লেষণ : তৃতীয় দফার বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমান নিজেই বলেন যে, আমার এই প্রস্তাবের মর্মার্থ হলো এই যে, উপরিউক্ত দুটো বিকল্পের দ্বিতীয়টি গৃহীত হলে মুদ্রা কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে থাকবে। সে অবস্থায় উভয় অঞ্চলের একই নকশার মুদ্রা বর্তমানে যেমন আছে তেমন থাকবে। পার্থক্য শুধু এই যে, পূর্ব পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের রিজার্ভ ব্যাংক থেকে ইস্যু করা হবে এবং তাতে পূর্ব পাকিস্তান বা সংক্ষেপে ঢাকা লেখা থাকবে। তদ্রূপ পশ্চিম পাকিস্তানেও থাকবে। মূলত এ মুদ্রা ব্যবস্থায় পূর্ব পাকিস্তানকে নিশ্চিত অর্থনৈতিক মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করাই উদ্দেশ্য ছিল।

চতুর্থ দফা :

কর ও শুল্কবিষয়ক ক্ষমতা : সকল প্রকার কর ও শুল্ক ধার্য এবং তা আদায়ের ক্ষমতা থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। আদায়কৃত রাজস্বের নির্ধারিত অংশ ফেডারেল তহবিলে জমা হবে।

বিশ্লেষণ : এই দফার সুবিধা অনেক। যেমন—

১. কেন্দ্রীয় সরকারকে কর আদায়ের কোনো ঝামেলা পোহাতে হবে না।

২. কর ধার্য ও আদায়ের জন্য কোনো দপ্তর বা কর্মকর্তার প্রয়োজন হবে না।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৩. কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলোর জন্য কর ধার্য ও আদায়ের মধ্যে কোনোরূপ দ্বৈততা থাকবে না। এতে অপচয় ও অপব্যয় রোধ হবে।

৪. এর ফলে কর ধার্য ও আদায়ের একত্রীকরণ সহজ হবে।

পঞ্চম দফা :

বৈদেশিক বাণিজ্যবিষয়ক ক্ষমতা : এ দফায় বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যাপারে নিম্নলিখিত শাসনতান্ত্রিক বিধানের সুপারিশ করা হয় :

১. দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক ব্যবস্থা থাকতে হবে।

২. রাজ্য সরকার নিজেদের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা নিজেদের এখতিয়ারে রাখবে।

৩. ফেডারেশনের প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা সমানভাবে বা সংবিধানে নির্ধারিত হার অনুযায়ী আদায় করা হবে।

৪. দেশে উৎপাদিত পণ্য বিনা শুল্কে উভয় অঞ্চলে আমদানি-রপ্তানি হবে।

৫. বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি, ট্রেড মিশন স্থাপন ও আমদানি-রপ্তানির অধিকার রাজ্য সরকারকে দিতে হবে।

বিশ্লেষণ : পঞ্চম দফার যৌক্তিকতা প্রসঙ্গে ছয় দফার প্রবক্তাগণ বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার সাহায্যে পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হচ্ছে। সে কারণে পূর্ব পাকিস্তানে মূলধন গড়ে না উঠায় পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশি মুদ্রা ব্যবহারের ক্ষমতা পূর্ব পাকিস্তানের নেই—এ অজুহাতে পূর্ব পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা হচ্ছে। ফলে পূর্ব পাকিস্তান অনুন্নতই থেকে যাচ্ছে।

ষষ্ঠ দফা :

আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠনের ক্ষমতা : পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষার জন্য নিজস্ব গণবাহিনী বা আধা সামরিক বাহিনী গঠন করার ক্ষমতা দিতে হবে।

বিশ্লেষণ : ষষ্ঠ দফার যৌক্তিকতা প্রসঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমান নিজেই বলেন যে, এ দাবি অন্যায়ও নয় নতুনও নয়। কারণ যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা ভিত্তিক দাবির মধ্যে আনসার বাহিনীকে ইউনিফর্মধারী সশস্ত্র বাহিনীতে রূপান্তরিত করার দাবি করা হয়েছিল।

ছয় দফা আন্দোলনের গুরুত্ব : পাকিস্তানের স্বৈরশাসক গোষ্ঠীর শোষণ, নির্যাতন ও অবিচারের বিরুদ্ধে ছয় দফা ছিল বাঙালির মুক্তির সনদ। এ প্রসঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমান বলেছেন যে, ছয় দফা বাংলার কৃষক, শ্রমিক, মজুর মধ্যবিত্ত তথা গোটা বাঙালির মুক্তি সনদ এবং বাংলার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার নিশ্চিত পদক্ষেপ। শোষকের হাত থেকে শোষিতের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের হাতিয়ার হচ্ছে ছয় দফা। এ আন্দোলন মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান সবাইকে নিয়ে গঠিত বাঙালি জাতির আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের চাবিকাঠি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে এ ছয় দফা আন্দোলন পালন করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। নিচে ছয় দফা আন্দোলনের গুরুত্ব আলোচনা করা হলো :

প্রথমত, বাঙালি জাতির স্বাধিকার আন্দোলনের ইতিহাসে ছয় দফা আন্দোলন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এক কথায় ছয় দফা দাবি ছিল পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় 'মুক্তির সনদ'।

দ্বিতীয়ত, ছয় দফা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জাগ্রত বাঙালি পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের ঔপনিবেশিক শাসন থেকে স্বায়ত্তশাসন অর্জনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে। ড. মুহাম্মদ হান্নান বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস গ্রন্থে বলেন, 'প্রকৃতপক্ষে ছয় দফা বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রথম স্মারক, যেখানে বাঙালিদের মুক্তি সংগ্রাম নতুনভাবে গতি লাভ করেছিল।'

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

তৃতীয়ত, ছয় দফা বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সংগ্রামী শক্তি যোগায়। ছয় দফা কর্মসূচি বাঙালিদের কাছে পাঞ্জাবি শাসকগোষ্ঠীর শোষণ ও অবিচারের বিরুদ্ধে মুক্তির সনদ হিসেবে দেখা দেয়।

চতুর্থত, ছয় দফা আন্দোলন এর আগের আন্দোলনগুলোর তুলনায় অধিকতর গণমুখী ছিল। এতে সাধারণ মানুষও অধিকমাত্রায় অংশগ্রহণ করে। তাছাড়া এ আন্দোলন জনগণের সংগ্রামী মনোভাবকে দৃঢ়তর করে।

পঞ্চমত, ছয় দফা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালিরা প্রথমবারের মতো সরাসরি সরকারি কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে। সংগ্রামী জনতা পুলিশের সাথে সরাসরি সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এভাবে ছয় দফা আন্দোলন প্রচ্ছন্নভাবে ভবিষ্যতে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হবার প্রেরণা যোগায়।

উপসংহার : পাকিস্তানি স্বৈরশাসক গোষ্ঠীর বৈষম্যমূলক শাসনের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন দাবির পটভূমিতে আওয়ামী লীগের ছয় দফা কর্মসূচির গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। ছয় দফা দাবি ছিল পূর্ব বাংলার জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার এক মূর্ত প্রতীক। ড. মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ ভূঁইয়া বলেন, 'ছয় দফা আন্দোলনই পরবর্তীকালে একাত্তরের স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপ নেয়।' তাই যথার্থই বলা হয়ে থাকে, ছয় দফার মধ্যেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার বীজ নিহিত ছিল।

০৩ । বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে ভাষা আন্দোলন ও ছয় দফা কর্মসূচির ভূমিকা আলোচনা করুন। *[১৮তম বিসিএস]*
অথবা, **বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিভিন্ন পর্যায়ের ওপর আলোকপাত করুন।** *[২৮তম বিসিএস]*
অথবা, **বাংলাদেশের জনগণের স্বাধীনতার স্পৃহা, ক্রমবিকাশমান স্বাধীনতার চেতনা, রাজনৈতিক সংঘটন, ১৯৪৭ হতে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ পর্যন্ত এবং বিশেষভাবে ২৬ মার্চ ১৯৭১-এর ঘটনাপ্রবাহ সমন্বিত করে কিভাবে স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটলো তা বর্ণনা করুন।** *[২৯তম বিসিএস]*
অথবা, **সংক্ষেপে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি বর্ণনা করুন। মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি রচনায় ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব কতটুকু? সংক্ষেপে ভাষা আন্দোলনের পটভূমি ব্যাখ্যা করুন।** *[২৯তম বিসিএস]*

উত্তর : ত্রিশ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে আর লাখো মা-বোনের সম্ভ্রমহানির মাধ্যমে অর্জিত যে স্বাধীনতা তা একদিনে আমাদের করায়ত্ত হয়নি। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে তবেই অর্জন করেছি আমরা এ স্বাধীনতা। তাই মুক্তিযুদ্ধের তাৎপর্য বুঝতে হলে আমাদেরকে এর পটভূমি জানা দরকার। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ভাস্কর্য হলো জাতীয় স্মৃতিসৌধ, যা সম্মিলিত প্রয়াস নামেও পরিচিত। এ স্মৃতিসৌধের রয়েছে সাতটি ফলক, যা স্বাধীনতা আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ সাতটি পর্যায়ের নিদর্শনস্বরূপ। তাই বিস্তৃত আলোচনায় না গিয়ে এ সাতটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ের ধারাবাহিক বর্ণনার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক পটভূমি আলোচনা করা যায়।

মুক্তিযুদ্ধের এ সাতটি পর্যায় হলো– ১. ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ২. ১৯৫৪ সালের নির্বাচন, ৩. ১৯৫৮-এর সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন, ৪. ১৯৬২ সালের ছাত্র আন্দোলন বা শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন, ৫. ১৯৬৬ সালের ছয়দফা আন্দোলন, ৬. ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান এবং ৭. ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ। এ সাতটি পর্যায়ের ইতিহাস নিম্নরূপে আলোচনা করা যায় :

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন : পাকিস্তান-পূর্ব ভাষা বিতর্ক বাদ দিলে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে দুইটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। প্রথম পর্যায় হচ্ছে ১৯৪৭-৪৮। এ সময়ে ভাষার প্রশ্নে বিতর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে তা প্রতিবাদ বিক্ষোভে রূপ নেয়। জিন্নাহর ঢাকা ঘোষণা এবং এর বিরুদ্ধে ছাত্রদের প্রতিবাদ ছিল মুখ্য ঘটনা। দ্বিতীয় বা চূড়ান্ত পর্যায় হচ্ছে ১৯৫২ সাল। এ সময়ে সংঘটিত হয় অমর একুশে ফেব্রুয়ারি।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

ভাষা আন্দোলন : প্রথম পর্ব (১৯৪৭-৪৮)

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার যে উদ্যোগ গৃহীত হয় তার বিরোধিতা করে বাংলা ভাষাকে উর্দুর পাশাপাশি পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতির দাবিতে বাঙালিদের যে আন্দোলন গড়ে ওঠে তা-ই ভাষা আন্দোলন।

আন্দোলনের সূচনা : পাকিস্তান পূর্ব ভাষা বিতর্কের ধারাবাহিকতায় নতুন রাষ্ট্রের রাজধানী করাচিতে ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় শিক্ষা সম্মেলনে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে প্রস্তাব গৃহীত হয়। এর ফলে পূর্ব বাংলার ছাত্র-বুদ্ধিজীবী মহলে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদে কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উর্দু এবং ইংরেজির পাশাপাশি বাংলাকে পরিষদের ব্যবহারিক ভাষা হিসেবে গ্রহণের প্রথম আনুষ্ঠানিক দাবি উত্থাপন করেন। কিন্তু তা প্রত্যাখ্যাত হয়। এর বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলায় বিক্ষোভ, সমাবেশ, ছাত্র ধর্মঘট, প্রাদেশিক আইন পরিষদ ঘেরাও ইত্যাদি কর্মসূচি শুরু হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে ওঠে আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল।

বিভিন্ন সংগঠন প্রতিষ্ঠা : পাকিস্তানে বাঙালিরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। তা সত্ত্বেও পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করতে সম্মত ছিল না বরং উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল। তাদের এ অগণতান্ত্রিক, পক্ষপাতমূলক ভাষানীতি ও রাজনীতির বিরুদ্ধে শুরু থেকেই পূর্ব বাংলার ছাত্র, যুবক, রাজনৈতিক কর্মী, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এগিয়ে আসে। প্রতিষ্ঠা লাভ করে বিভিন্ন সংগঠন। এর মধ্যে কামরুদ্দীন আহমদকে আহ্বায়ক করে গঠিত গণ-আজাদ লীগ (জুলাই ১৯৪৭); তসাদ্দক আহমদ চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন গণতান্ত্রিক লীগ (সেপ্টেম্বর ১৯৪৯); ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক আবুল কাসেমের নেতৃত্বে গঠিত তমুদ্দিন মজলিস (সেপ্টেম্বর ১৯৪৭); একই বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক নূরুল হক ভূঁইয়াকে (পরবর্তীকালে শামসুল আলম) আহ্বায়ক করে গঠিত রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ (অক্টোবর ১৯৪৭) এবং তৎকালীন যুবনেতা শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্যোগে গঠিত পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ (৪ জানুয়ারি ১৯৪৮) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভাষা আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে এসব সংগঠন বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে।

ভাষা আন্দোলনের দ্বিতীয় বা চূড়ান্ত পর্ব (১৯৫২)

নাজিমুদ্দীনের ঘোষণা ও দ্বিতীয় পর্বের ভাষা আন্দোলন শুরু : বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার ব্যাপারে ছাত্রসমাজের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তি ভঙ্গ করে ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি ঢাকার পল্টন ময়দানে খাজা নাজিমুদ্দীন উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার নতুন ঘোষণা দেন। তার এ ঘোষণাকে কেন্দ্র করে শুরু হয় আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্ব।

একুশে ফেব্রুয়ারি–ভাষার জন্য বাঙালির আত্মদান : পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন কর্তৃক উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার নতুন ঘোষণা দেয়ার (২৬ জানুয়ারি ১৯৫২) সাথে সাথে পূর্ব বাংলার ছাত্রসমাজ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। একুশে ফেব্রুয়ারি সমগ্র পূর্ব বাংলায় সাধারণ ধর্মঘট ও বিক্ষোভ সমাবেশ পালনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। নতুন করে ছাত্র আন্দোলন দেখা দেয়ায় পূর্ব বাংলার নূরুল আমীন সরকার চিন্তিত হয়ে পড়ে। তখন চলছিল প্রাদেশিক আইনসভার অধিবেশন। সরকার কর্তৃক একুশে ফেব্রুয়ারির আগের দিন ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করে সভা সমাবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী ছাত্ররা একুশে ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে সমাবেশ অনুষ্ঠান ও মিছিল বের করার চেষ্টা করে। বর্তমান ঢাকা মেডিকেল কলেজের

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

সম্মুখে অনুষ্ঠিত এমনই এক সমাবেশে পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। শহীদ হন সালাম, বরকত, জব্বারসহ আরো অনেকে। বাঙালির জাতীয় ইতিহাসে রচিত হলো এক রক্তাক্ত অধ্যায়। এরপর পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নিতে বাধ্য হয়। ১৯৫৬ সালের সংবিধানে তা স্বীকৃত হয়।

ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য : ভাষা আন্দোলন পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাঙালিদের প্রথম বিদ্রোহ। আমাদের জাতীয় ইতিহাসে এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। ভাষা আন্দোলন বাঙালির চেতনা মূলে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে দেয়। ভাষা আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গ যুক্তফ্রন্ট হয়ে '৫৪-এর নির্বাচনে উপচে পড়ে, পূর্ব বাংলায় ভরাডুবি ঘটে ক্ষমতাসীন দল মুসলিম লীগের। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন শুধু ভাষার আন্দোলন ছিল না, বাঙালির অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক তথা সার্বিক স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রশ্নও এর সাথে জড়িত ছিল। ভাষা আন্দোলনের অসাম্প্রদায়িক জাতীয় চেতনা দিনে দিনে প্রবল হয়ে '৭১-এর স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টি করে।

১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন : ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রাপ্ত ভোটাধিকারের ভিত্তিতে তা অনুষ্ঠিত হলেও, পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা তখনও কার্যকর ছিল। প্রাদেশিক পরিষদের মোট আসন সংখ্যা ছিল ৩০৯। এর মধ্যে ২৩৭টি আসন (৯টি নারী আসনসহ) মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য এবং ৭২টি আসন (৬টি নারী আসনসহ) অমুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। ১৫টি নারী আসনের মধ্যে ৯টি মুসলমান নারী, ১টি বর্ণ হিন্দু নারী এবং ২টি তফসিলি হিন্দু নারী, ১টি পাকিস্তানি খ্রিষ্টান নারী এবং ২টি বৌদ্ধ নারীদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়। '৫৪-এর এ নির্বাচনে ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্টের আত্মপ্রকাশ ঘটে এবং এ ফ্রন্টের হাতে মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয় হয়।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনের ফলাফল (মুসলিম আসন)

দলের নাম	আসন লাভ	ভোটপ্রাপ্তি (প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার)
যুক্তফ্রন্ট	২২৩	৬৪.০০%
মুসলিম লীগ	৯*	২৭.০০%
খেলাফত রব্বানী	১	৯.০০%
স্বতন্ত্র	৪	-
সর্বমোট	২৩৭	১০০.০০%

** নির্বাচনের পর একজন স্বতন্ত্র সদস্য মুসলিম লীগে যোগ দেন।*

যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন এবং নির্বাচন উত্তর ঘটনাবলীর গুরুত্ব ও তাৎপর্য : ১৯৫৪ সালের পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকারের শুধু ভরাডুবিই ঘটেনি, রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে পূর্ব বাংলা থেকে বস্তুত এ দলের উচ্ছেদ ঘটে। ২১ দফা কর্মসূচির ১৯ নম্বর দফায় বর্ণিত পূর্ব বাংলার পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন, আত্মরক্ষায় স্বয়ংসম্পূর্ণ করা ইত্যাদি দাবি আরো জোরদার হয়ে ষাটের দশকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক পেশকৃত ঐতিহাসিক ছয় দফা কর্মসূচিতে তা সুনির্দিষ্ট রূপ নেয়। '৫৪-এর নির্বাচনে পূর্ব বাংলায় শোচনীয় পরাজয়ের পর পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নিয়ে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে সচেষ্ট হয়। এরই অংশ হিসেবে মাত্র ৫৬ দিনের মাথায় কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল ঘোষণা করা হয়। এ ঘটনা বাঙালিদের প্রচণ্ডভাবে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। '৫৪-এর নির্বাচনের পূর্বাপর ঘটনা বাঙালিদের স্বতন্ত্র জাতিসত্তার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন ও পাকিস্তানে সংসদীয় গণতন্ত্রের অবসান : ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা দেশে সামরিক শাসন জারি করেন। একই সাথে কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণের কথা ঘোষণা করা হয়। সেগুলো হচ্ছে— ১. সংবিধান বাতিল, ২. কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার বরখাস্ত, ৩. জাতীয় সংসদ ও প্রাদেশিক আইন পরিষদ ভেঙে দেয়া, ৪. সকল রাজনৈতিক দল এবং রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ, ৫. জেনারেল আইয়ুব খানকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগ।

সামরিক শাসনের কারণ : সামরিক শাসনের পরপরই প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা উদ্ভূত পরিস্থিতি তুলে ধরে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে এক ভাষণ দেন। তিনি একের পর এক সরকার গঠন এবং তার অস্থায়িত্ব, অবাধ দুর্নীতি, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে চরম বিভেদ, সংবিধান অকার্যকর হওয়া, নির্বাচনের মাধ্যমে পরিস্থিতির কোনো উন্নতি ঘটার সম্ভাবনা না থাকা প্রভৃতি বিষয়কে সামরিক শাসনের কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন। পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সম্ভাবনা যতই উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল, ততই সামরিক, বেসামরিক, আমলাগোষ্ঠী ও তাদের প্রতিভূ ইস্কান্দার মির্জা শঙ্কিত হয়ে পড়েন। বিশেষ ব্যবস্থা ও বৈশিষ্ট্যের কারণে পাকিস্তান রাষ্ট্রে আমলাতন্ত্র বনাম সিভিলিয়ান দ্বন্দ্ব কার্যত বাঙালি বনাম পাঞ্জাবি দ্বন্দ্বে রূপ নেয়। এ দ্বন্দ্বের ফলে সৃষ্টি হয় পূর্ব পাকিস্তানে তুমুল আন্দোলনের, যা পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধের পথকে অনেকখানি ত্বরান্বিত করে। আন্দোলনের ফলে ইস্কান্দার মির্জা সরকারের ভিত নড়ে ওঠে। বাঙালি বৃহত্তর আন্দোলনের প্রস্তুতি নিতে থাকে।

১৯৬২-এর ছাত্র আন্দোলন : ৩টি প্রধান বিষয়কে কেন্দ্র করে '৬২-এর আইয়ুব শাসন বিরোধী ছাত্র আন্দোলন গড়ে ওঠে। বিষয়গুলো হচ্ছে– ১. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী গ্রেপ্তার, ২. '৬২-এর আইয়ুবী শাসনতন্ত্র ও ৩. শরিফ কমিশন রিপোর্ট।

১. **সোহরাওয়ার্দী গ্রেপ্তার ও ছাত্র সমাজের প্রতিক্রিয়া :** ১৯৬২ সালের ৩০ জানুয়ারি আইয়ুব সরকার আকস্মিকভাবে করাচিতে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেপ্তার করে। সোহরাওয়ার্দীর গ্রেপ্তারকে কেন্দ্র করে প্রথম প্রকাশ্যে আইয়ুব সামরিক শাসন বিরোধী বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। লৌহ মানব আইয়ুব এত ব্যাপক ছাত্র আন্দোলন গড়ে ওঠার কথা ভাবতে পারেনি। এ ছাত্র আন্দোলন তার ক্ষমতার ভিত কাঁপিয়ে দেয়। ১৯ আগস্ট (১৯৬২) সোহরাওয়ার্দীকে মুক্তি দেয়া হয়।

২. **আইয়ুবী শাসনতন্ত্র বিরোধী ছাত্র আন্দোলন :** ১৯৬২ সালের ১ মার্চ আইয়ুব খান মৌলিক গণতন্ত্রের আলোকে নতুন সংবিধান প্রণয়ন করেন। নতুন সংবিধানের আওতায় জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন যথাক্রমে ২৮ এপ্রিল ও ৬ মে (১৯৬২) মৌলিক গণতন্ত্রীদের ভোটে অনুষ্ঠিত হয়। আইয়ুব প্রবর্তিত এ ব্যবস্থায় রাজনৈতিক এলিটদের অংশগ্রহণের প্রায় সকল সুযোগই বন্ধ হয়ে যায়। নতুন শাসনতন্ত্র জারি হওয়ার সাথে সাথে পূর্ব বাংলায় আইয়ুব বিরোধী ছাত্র আন্দোলন নতুন রূপ পরিগ্রহ করে। ছাত্র সমাজ এ শাসনতন্ত্র প্রত্যাখ্যান করে। রাজবন্দিদের মুক্তি এবং একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান দাবিতে তারা সোচ্চার হয়।

৩. **শরিফ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বিরোধী ছাত্র আন্দোলন :** একটি জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ১৯৫৯ সালের ৫ জানুয়ারি আইয়ুব খান শিক্ষা সচিব ও আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক এস এম শরিফকে প্রধান করে ১১ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিশন গঠন করেন। ১৯৬২ সালের মধ্যবর্তী সময়ে এ কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয় এবং সরকার এর সুপারিশ গ্রহণ করতে চেষ্টা চালায়। চলমান আইয়ুব বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে একটি নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংযোজিত হয়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

কমিশনের সুপারিশ : এ রিপোর্টে বলা হয় ষষ্ঠ থেকে ডিগ্রি পর্যন্ত ইংরেজি পাঠ বাধ্যতামূলক, উর্দুকে জনগণের ভাষায় পরিণত করা, জাতীয় ভাষার জন্য একটি সাধারণ বর্ণমালা প্রবর্তনের চেষ্টা এবং সেক্ষেত্রে আরবির গ্রহণযোগ্যতা বিবেচনা করা, রোমান বর্ণমালার সাহায্যে পাকিস্তানি ভাষাসমূহকে অক্ষরান্তের প্রচেষ্টা, শিক্ষাব্যয়কে বিনিয়োগ হিসেবে দেখে শিক্ষার্থীর তা বহন করা, অবৈতনিক শিক্ষার ধারণাকে 'অবাস্তব কল্পনা' বলে উল্লেখ করা, ডিগ্রি কোর্সকে তিনবছর মেয়াদি করা ইত্যাদি।

ছাত্র আন্দোলন : শরিফ কমিশন রিপোর্টকে ছাত্রসমাজ গণবিরোধী, প্রতিক্রিয়াশীল, শিক্ষা সংকোচন, শিক্ষাকে পণ্য হিসেবে গণ্য, ব্যয়বহুল, বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে নতুন ষড়যন্ত্র হিসেবে আখ্যায়িত করে তা প্রত্যাখ্যান করে। এ রিপোর্ট বাতিলের দাবিতে পূর্ব বাংলার ছাত্ররা ব্যাপক সভা-সমাবেশ, প্রচারণা, মিছিল, ধর্মঘট চালিয়ে যেতে থাকে। দ্রুত এ আন্দোলন দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় নির্বিশেষে সর্বস্তরের ছাত্ররা এতে অংশগ্রহণ করে। আন্দোলন সর্বদলীয় রূপ নেয়। অতঃপর সরকার শরিফ কমিশন রিপোর্ট বাস্তবায়ন স্থগিত রাখার ঘোষণা দেয়। ছাত্র অভ্যুত্থানের কারণেই সরকার তা করতে বাধ্য হয়।

৬ দফা কর্মসূচি ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ : পাকিস্তানে আইয়ুব শাসন আমলে পূর্ব বাংলার বাঙালিদের মধ্যে যে স্বাধীনতার ভাবনা উদ্ভব হয় সেই পটভূমিতে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে লাহোর কনভেনশনে শেখ মুজিবুর রহমান তার ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবি উত্থাপন করেন। ৬ দফার দাবিগুলো ছিল নিম্নরূপ :

১. লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তান ফেডারেশন।
২. ফেডারেশন সরকারের হাতে থাকবে দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত ক্ষমতা; অবশিষ্ট বিষয়সমূহ থাকবে প্রদেশের হাতে।
৩. দুই প্রদেশের জন্য পৃথক কিন্তু সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রার প্রচলন করতে হবে।
৪. সকল প্রকার কর ধার্য ও আদায় করার ক্ষমতা থাকবে প্রাদেশিক সরকারের হাতে।
৫. দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক হিসাব রাখতে হবে এবং
৬. পূর্ব পাকিস্তানে প্যারামিলিটারি বাহিনী গঠন করতে হবে।

এ ৬ দফার প্রতি আইয়ুব সরকারের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ছিল অত্যন্ত কঠোর। জেনারেল আইয়ুব ৬ দফাকে বিচ্ছিন্নতাবাদী, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী এবং ধ্বংসাত্মক বৃহত্তর বাংলা প্রতিষ্ঠার কর্মসূচি বলে আখ্যায়িত করেন এবং কর্মসূচির প্রবক্তা মুজিবকে পাকিস্তানের ১ নম্বর দুশমন হিসেবে চিহ্নিত করে ৬ দফাপন্থিদের দমনে অস্ত্রের ভাষা প্রয়োগের হুমকি দেন। কিন্তু আওয়ামী লীগ এবং এর কর্ণধার মুজিব আইয়ুব সরকারের এ হুমকিতে পিছু হটেননি। এ কর্মসূচি সমগ্র বাঙালির চেতনামূলে বিস্ফোরণ ঘটায়। এতে প্রত্যক্ষভাবে স্বাধীনতার কথা বলা হয়নি বটে, তবে ৬ দফা বাঙালিদের স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত করে তোলে।

১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান : আইয়ুব সরকার কর্তৃক ১৯৬৮ সালে আগরতলা মামলা দায়ের করার পর বাঙালিরা বুঝতে পারে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী তাদের জাতি হিসেবে চিরদিন পদানত করে রাখতে চায়। এ দিকে ছাত্রসমাজ শেখ মুজিবের ৬ দফা দাবির সাথে একতা ঘোষণা করে তারা নিজেরা ১১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে। এভাবে জাতীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, জাতীয় রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ ধারণসহ একটি বিস্তৃত কর্মসূচি গ্রহণ করে এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার এবং সকল রাজবন্দিদের মুক্তির দাবিতে

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

দেশব্যাপী ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রাত্যহিক কার্য বিবরণী যতই বিভিন্ন দৈনিকে প্রকাশিত হতে থাকে, বাঙালিরা ততই বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। পূর্ব বাংলার আপামর জনতা ১৪৪ ধারা লঙ্ঘন; কারফিউ ভঙ্গ; পুলিশ, ইপিআর, সেনাবাহিনী উপেক্ষা করে রাস্তায় ক্ষোভে ফেটে পড়ে। ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি পুলিশের গুলিতে ছাত্রনেতা আসাদের মৃত্যু, ২৪ জানুয়ারি পুলিশের গুলিতে নবকুমার ইনস্টিটিউটের দশম শ্রেণীর ছাত্র মতিউরের মৃত্যু, ১৫ ফেব্রুয়ারি বন্দি অবস্থায় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হকের গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হওয়া, ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. শামসুজ্জোহার শাহাদতবরণ ইত্যাদি মর্মান্তিক ঘটনা সমগ্র পূর্ব বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত বিদ্রোহের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে দেয়। আইয়ুব শাসন বিরোধী ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান চূড়ান্ত রূপ নেয়। এর ফলে ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ জেনারেল আইয়ুব খান ক্ষমতার মঞ্চ থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় নিতে বাধ্য হয়।

মুক্তিযুদ্ধ ও চূড়ান্ত বিজয় : ইয়াহিয়া-ভুট্টো চক্রের ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করার জন্য বঙ্গবন্ধুর আহূত অসহযোগ আন্দোলন যখন সারা বাংলায় অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে তখন ইয়াহিয়া ভুট্টো চক্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সাথে আলোচনার জন্য ১৯৭১ সালের ১৫ মার্চ ঢাকায় আসেন। শুরু হয় ষড়যন্ত্রের বেড়াজালে ঘেরা তাদের প্রহসনমূলক আলোচনা। অতঃপর ২৫ মার্চ রাতে আলোচনার সমাপ্তি ঘোষণা না করেই ইয়াহিয়া-ভুট্টো রাতের আঁধারে পশ্চিম পাকিস্তানে পলায়ন করেন। ২৫ মার্চ কালো রাতেই শুরু হয় নিরস্ত্র বাঙালির ওপর জল্লাদ বাহিনীর বর্বরোচিত নগ্ন হামলা। বন্দি হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করে সকলকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর মোকাবিলা করার আহ্বান জানান।

বাঙালি জনসাধারণ অসীম সাহসিকতার সাথে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে দুর্বার প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলে। লক্ষ নিরস্ত্র বাঙালি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হিংস্রতা থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য মৃত্যুর দুর্জয় শপথ নিয়ে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকে। তারা বিভিন্ন স্থানে ব্যারিকেড সৃষ্টি করে রেললাইন, ব্রিজ ধ্বংস করে প্রতি পদক্ষেপে পাকিস্তানি বাহিনীকে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন করতে থাকে। স্বৈরাচার ইয়াহিয়া খানের জল্লাদ বাহিনী যখন বাংলাদেশে নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে যেতে থাকে ঠিক তখনই কুষ্টিয়ার মেহেরপুরে (বর্তমান মুজিবনগর) বাংলার রাজনৈতিক নেতৃবর্গ সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে স্বাধীন বাংলার নতুন সরকার গঠন করেন। অতঃপর জাতীয় পরিষদ সদস্য অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল এম এ জি ওসমানীকে স্বাধীন বাংলার সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করা হয়। মুজিবনগর সরকার নবগঠিত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করে যুদ্ধ পরিচালনার নির্দেশ দেন। এমতাবস্থায় পাকিস্তান সরকার উপায় না দেখে আকস্মিকভাবে ভারতের অমৃতসর, যোধপুর, পাঠানকোট এবং আগ্রায় বিমান হামলা চালায়। ফলে বাধ্য হয়ে ভারত ১৯৭১ সালের ৪ ডিসেম্বর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এরপর ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেন এবং পরে অন্যান্য দেশ বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। অতঃপর মুক্তিবাহিনী এবং ভারতীয় বাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত হয় যৌথ কমান্ড। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ওপর আক্রমণ পরিচালিত হয় আকাশ পথ, স্থলপথ এবং জলপথে। অতঃপর ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ইয়াহিয়ার জল্লাদ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক এ কে নিয়াজী ৯৩ হাজার সৈন্যসহ যৌথ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক জগজিৎ সিং অরোরার নিকট আত্মসমর্পণ করেন। অবশেষে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্থায়ী আসন লাভ করে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

উপসংহার : যে কোনো বিষয়ের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আলোচনা অতি গুরুত্বপূর্ণ। পটভূমি না জানলে সে বিষয়ে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করাও দুরূহ। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের রয়েছে এক মহান ইতিহাস। এ ইতিহাস পুরোপুরি একটি রচনার পরিসরে আলোচনা করা সম্ভব নয়। তাছাড়া কোনো বিষয়ের ঐতিহাসিক পটভূমি লিখতে যাওয়া মানে নতুন করে আবার ইতিহাসের ছাত্র হওয়া। এটি যেমন কঠিন তেমনি দুরূহ। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সঠিক পটভূমি জেনে সে অনুযায়ী অর্থাৎ তাদের আদর্শ অনুযায়ী দেশ গড়ার অঙ্গীকার করা বাঙালি হিসেবে আমাদের কর্তব্য। তাই সকল হানাহানি ভুলে মুক্তিযুদ্ধের যে চেতনা, যে অঙ্গীকার, যে দৃপ্ত শপথ সে অনুযায়ী দেশ গড়ার অঙ্গীকার হওয়াই সকল বাঙালির প্রত্যাশা। তবেই আমরা জাতি হিসেবে বিশ্বের দরবারে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারব।

০৪ ॥ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের বৈরী মনোভাবের কারণ কি ছিল? আমাদের পররাষ্ট্রনীতির মূল বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন। *[৩৩তম বিসিএস]*

অথবা, **বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পরাশক্তির ভূমিকা আলোচনা করুন।** *[৩০তম বিসিএস]*

উত্তর : ১৯৭১ সালে বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ছিল একটু অন্যরকম। বিশ্বে স্নায়ুযুদ্ধ চলাকালীন বিভাজন প্রক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া এ ক্ষুদ্র ভূখণ্ডের ওপরেও প্রভাব ফেলে। দুই পরাশক্তির একটি তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন জানায়। অন্যদিকে পরাশক্তির অন্য অংশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে। সে সময় প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতসহ বহু রাষ্ট্র বাংলাদেশকে সমর্থন জানায় কিন্তু সমাজতান্ত্রিক চীন বিরোধিতা করে এ রাষ্ট্রের।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে চীন, যুক্তরাষ্ট্র, ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন তথা বিশ্ব সমাজের ভূমিকা : ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যা ও নির্মম ধ্বংসযজ্ঞের রিপোর্ট বিভিন্ন পশ্চিমা গণমাধ্যমে প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথে বিশ্বজনমত বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী মানুষের পক্ষে চলে আসে। কিন্তু এ কথা স্পষ্ট এবং পরিষ্কার যে, যেসব রাষ্ট্র এবং পরাশক্তি শাসকগোষ্ঠী তাদের নিজস্ব হিসাব-নিকাশ এবং স্বার্থ বুঝেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে-বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিল। নিচে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা আলোচিত হলো :

ক. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈরী ভূমিকার কারণ : মুক্তিযুদ্ধের সূচনা লগ্নেই পাকিস্তানের সপক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার নীতি ঘোষণা করে। তারা গণতন্ত্রকামী বাংলাদেশের জনগণের সমর্থনে এগিয়ে আসেনি। তারা দাঁড়িয়েছে পাকিস্তানের অখণ্ডতার নামে স্বৈরাচারী সামরিক জান্তা অগণতান্ত্রিক শক্তির সপক্ষে। তৎকালীন নিক্সন-কিসিঞ্জার নিয়ন্ত্রিত মার্কিন নীতি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে পরিচালিত হয়। মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের বৈরী ভূমিকার কারণ সম্পর্কে আলোচিত হলো :

১. **কমিউনিজম রোধ ও মুক্ত বিশ্ব ব্যবস্থা গঠন :** মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সন আশঙ্কা করছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানে ভারতের আগ্রাসনের ফলে ওই অঞ্চলে সোভিয়েত রাজত্ব কায়েম হবে, যা কিনা বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্র ও তার সম্ভাব্য নতুন মিত্র চীনের আঞ্চলিক অবস্থানের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষতি সাধন করবে। ১৯৫৩ সালের পূর্ব পর্যন্ত দক্ষিণ এশিয়ার ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তেমন আগ্রহ ছিল না। ভারতের সাথে সোভিয়েত ইউনিয়নের সু-সম্পর্কের কারণে যুক্তরাষ্ট্র এ অঞ্চলের ব্যাপারে উৎকণ্ঠিত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের মাধ্যমে বাংলাদেশ যদি স্বাধীনতা লাভ করে তাহলে এ রাষ্ট্রটি কম্যুনিজম শাসন ব্যবস্থার অধীনে চলে যেতে পারে। তাই দক্ষিণ এশিয়াতে এ ব্যবস্থা রোধ করা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুক্ত বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য তারা মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানকে সহযোগিতা করে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

২. **এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রভাব বিস্তার :** ১৯৫৩ সালে যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের সাথে যোগাযোগ শুরু করে। ১৯৫৪ সালের ১৯ মে করাচিতে পাকিস্তান ও যুক্তরাষ্ট্র একটি সাহায্য ও নিরাপত্তা চুক্তি স্বাক্ষর করে। এছাড়া সমাজতন্ত্রের বিস্তার রোধ করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র এশিয়া ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াকে কেন্দ্র করে ১৯৫৪ ও ১৯৫৫ সালে দুটি প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর করে। এ দুটি মৈত্রী জোটের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিল পাকিস্তান। তাই যুক্তরাষ্ট্র তার একজন বিশ্বস্ত মিত্রকে রক্ষা করতেই পাকিস্তানের পক্ষে সমর্থন দেয়। অন্যদিকে ১৯৫৪ সালে মার্কিন ও পাকিস্তান সামরিক সম্পর্ক শুরু হয়, যা ১৯৬৫ সালে এসে ব্যাপক আকার ধারণ করে। এই ১১ বছরের ব্যবধানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা বাজেটে ১.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে অনুদান দেয়। এসব কিছুর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে হাত করে এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তাদের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা অব্যাহত রাখে।

৩. **সোভিয়েত বিরোধী জোট গঠন :** ২৫ মার্চ ১৯৭১ রাত থেকে শুরু করে ১০ জুলাই ১৯৭১ পর্যন্ত সময়কালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পূর্ব পাকিস্তানের যুদ্ধে না জড়িয়ে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করে। ১০ জুলাই থেকে শুরু করে সেপ্টেম্বরের শেষদিক পর্যন্ত সময়কালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সন ও জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা হেনরি কিসিঞ্জার গোপনে পাকিস্তানের সহায়তায় চীন সফর করেন। ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মৈত্রী চুক্তির প্রতিপক্ষ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যকার সম্পর্কের উন্নয়ন হয়। এ সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ সমস্যার কূটনীতিক সমাধানের উপর গুরুত্বারোপ করে এবং ভারতকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপ না গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানায়।

৪. **জাতিসংঘে সোভিয়েত-মার্কিন বিরুদ্ধ অবস্থান :** ৪ ডিসেম্বর ১৯৭১ ওয়াশিংটনে হেনরি কিসিঞ্জার নিরাপত্তা পরিষদের আহূত অধিবেশনে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধবিরতি ও সৈন্য প্রত্যাহারের দাবি সংবলিত মার্কিন প্রস্তাব পেশ করার প্রস্তুতি নেয়। নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশন শুরু হওয়ার পর মার্কিন প্রতিনিধি জর্জ এইচ বুশ অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা, ভারত ও পাকিস্তানের সৈন্য স্ব স্ব সীমান্তের ভেতরে ফিরিয়ে নেয়া এবং সেই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার উদ্দেশ্যে জাতিসংঘ মহাসচিবকে ক্ষমতা প্রদান করার জন্য এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতিনিধি এই প্রস্তাবকে 'একতরফা' বলে অভিহিত বলে ভেটো প্রয়োগ করেন। পোল্যান্ডও প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেয়। ফ্রান্স ও ব্রিটেন ভোট দানে বিরত থাকে। পরদিন ৫ ডিসেম্বর নিরাপত্তা পরিষদের পুনরায় যে অধিবেশন বসে তাতে সোভিয়েত ইউনিয়নের এক প্রস্তাবে বলা হয় পুরো পাকিস্তানে এমন এক 'রাজনৈতিক নিষ্পত্তি' প্রয়োজন যার ফলে বর্তমান সংঘর্ষের অবসান নিশ্চিতভাবেই ঘটবে এবং পাকবাহিনীর যে সহিংসতার দরুন পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে তাও অবিলম্বে বন্ধ করা প্রয়োজন। একমাত্র পোল্যান্ড প্রস্তাবটি সমর্থন করে। চীন ভোট দেয় বিপক্ষে। অন্য সকল সদস্য ভোটদানে বিরত থাকে। ঐদিন আরো আটটি দেশের পক্ষ থেকে যুদ্ধবিরতি ও সৈন্য প্রত্যাহারের পক্ষে নিরাপত্তা পরিষদে আরেকটি প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। এবার সোভিয়েত ইউনিয়ন তার দ্বিতীয় ভেটো প্রয়োগ করে। একই সময়ে বার্তা সংস্থা 'তাস' মারফত এক বিবৃতিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন সরকার 'পূর্ব বাংলার জনগণের আইনসঙ্গত অধিকার ও স্বার্থের স্বীকৃতির ভিত্তিতে' সংকটের রাজনৈতিক সমাধানের দাবি জানান। এই সংঘর্ষ সোভিয়েত ইউনিয়ন সীমান্তের সন্নিকটে সংঘটিত হওয়ায় 'এর সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত' বলে উল্লেখ করে এবং পরিস্থিতির অবনতি রোধকল্পে বিবদমান পক্ষদ্বয়ের যে কোনোটির সঙ্গে জড়িত হওয়া থেকে বিরত থাকার জন্য বিশ্বের সকল দেশের প্রতি আহ্বান জানান।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৫. **বাংলাদেশের বিপক্ষে নৌবহর প্রেরণ :** জাতিসংঘের মাধ্যমে যুদ্ধবিরতি ও সৈন্য প্রত্যাহার করা যাচ্ছে না দেখে যুক্তরাষ্ট্র তখন নৌ কূটনীতির আশ্রয় নেয়। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ভারতকে যুদ্ধবিরতি মানতে বাধ্য করা, পাকিস্তানকে রক্ষা করা, মুক্তিযুদ্ধকে ধ্বংস করা। ৯ ডিসেম্বর প্রেসিডেন্ট নিক্সন ইউএসএস এন্টারপ্রাইজকে বঙ্গোপসাগরে মোতায়েন করে, যা ভারতীয়রা পারমাণবিক যুদ্ধ শুরু করার হুমকি বলে উল্লেখ করে। এন্টারপ্রাইজ ১৯৭১ সালের ১১ ডিসেম্বর গন্তব্যে পৌঁছায়। যুক্তরাষ্ট্রের এই হুমকির জবাব হিসেবে সোভিয়েত নৌবাহিনী ৬ ও ১৩ ডিসেম্বর পারমাণবিক মিসাইলবাহী দুটি ডুবোজাহাজ ভ্লাদিভস্টক থেকে বঙ্গোপসাগরে প্রেরণ করে; যারা ইউএস টাস্কফোর্স ৭৪ কে ১৮ ডিসেম্বর থেকে ৭ জানুয়ারি ১৯৭২ পর্যন্ত ভারত মহাসাগরে তাড়া করে বেড়ায়। আমেরিকা সম্ভাব্য নৌযুদ্ধ পরিহার করার জন্য সপ্তম নৌবহর বঙ্গোপসাগর থেকে প্রত্যাহার করে নেয়। সেদিন যদি সোভিয়েত ইউনিয়ন নৌবহর প্রেরণ করে আমেরিকাকে সপ্তম নৌবহর প্রত্যাহারে বাধ্য না করতে পারত তাহলে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের জয়লাভ অনিশ্চিত হয়ে পড়ত। বাংলাদেশ হতো ভিয়েতনাম অথবা নাইজেরিয়ার স্বাধীনতাকামী বায়াফ্রার মতো।

খ. **চীনের বৈরী ভূমিকা :** ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে চীন সরকার এ রকম মতামত প্রকাশ করে– 'ভারত সরকারের দাবি পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের জাতীয় প্রত্যাশা পূরণ করার জন্য ভারত যুদ্ধ শুরু করেছে। ভারতের এই ধরনের দাবি প্রকৃতপক্ষে অযৌক্তিক। কারণ বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্রেই অভ্যন্তরীণ সমস্যা রয়েছে, যেগুলো সঠিক ও যৌক্তিকভাবে জনগণের প্রত্যাশা অনুযায়ী সমাধান করা দরকার। কিন্তু অন্য রাষ্ট্রের কোনো হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই। কিন্তু ভারত পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা যুদ্ধে সেনাবাহিনী প্রেরণ করে পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেছে।' এ ধরনের বক্তব্য থেকে ধারণা করা যায় যে, চীন ছিল আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধী। নিচে স্বাধীনতা যুদ্ধে চীনের বৈরী ভূমিকা আলোচিত হলো :

১. **জাতীয়তাবাদী চেতনা রোধ :** চীনের অভ্যন্তরে ছিল বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর লোক। অনুরূপভাবে পাকিস্তানের অভ্যন্তরে ছিল বিভিন্ন জাতি বা গোষ্ঠীর লোক। পাকিস্তানের বিভিন্ন জাতি যদি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করে ফেলে তাহলে চীনের অভ্যন্তরেও বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী নিজেদের জন্য স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য অনুপ্রেরণা পাবে। পাকিস্তান যাতে ভেঙে না যায় এবং চীনের জনগণের মধ্যে যাতে গোষ্ঠীভিত্তিক জাতীয়তাবাদের চেতনা সৃষ্টি না হয় তার জন্য চীন পাকিস্তানকে সহায়তা করে।

২. **শক্তিসাম্য বজায় রাখা :** এশিয়া মহাদেশে সোভিয়েত ইউনিয়নের মিত্র ছিল ভারত। অপরদিকে পাকিস্তানের মিত্র ছিল চীন। তাদের দ্বৈত সম্পর্কের কারণে শক্তিসাম্য ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। কিন্তু পাকিস্তানের একটি অংশ যদি ভেঙে ভারত ও রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণে চলে যায় তাহলে শক্তিসাম্যের দিক দিয়ে চীন ও পাকিস্তান দুর্বল হয়ে যাবে এবং লাভবান হবে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন।

৩. **চীন-সোভিয়েত দ্বন্দ্ব :** ১৯৬০ দশকের শেষ দিকে ইউশোরি নদী নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের মধ্যে উত্তেজনা শুরু হয়। তখন থেকেই দুটি রাষ্ট্র ভিন্ন মেরুতে অবস্থান করতে শুরু করে। যার প্রেক্ষিতে দেখা যায়, সোভিয়েত ইউনিয়ন যে রাষ্ট্রকে সহযোগিতা করত চীন তার বিপরীত রাষ্ট্রকে সহযোগিতা করত। ১৯৬২ সালে চীন-ভারত সীমান্ত যুদ্ধ শুরু হয়। এই সীমান্ত যুদ্ধে চীন একটি সমাজতান্ত্রিক দেশ হিসেবে ধারণা করেছিল, আরেকটি সমাজতান্ত্রিক দেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে সুবিধা পাবে। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন চীনকে সমর্থন না করে ভারতকে সহযোগিতা করে। এর ফলে চীন বুঝতে পারে আদর্শের চেয়ে জাতীয় স্বার্থ গুরুত্বপূর্ণ। তাই চীন তার জাতীয় স্বার্থ পূরণ করার জন্য পাকিস্তানকে সহযোগিতা করে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৪. **বাণিজ্যিক স্বার্থরক্ষা :** ১৯৫২ সাল থেকেই পাকিস্তান ছিল চীনের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক অংশীদার। পাকিস্তানের স্থিতিশীলতার উপরে চীনের অর্থনৈতিক অগ্রগতি অনেকটা নির্ভর করত। তাই পাকিস্তানের অবস্থা যাতে অস্থিতিশীল না হয় এবং দ্বিখণ্ডিত না হয় সে অবস্থা নিশ্চিত করতে চীন পাকিস্তানের পক্ষ নেয়।

৫. **নিরাপত্তা ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা বজায় রাখা :** ১৯৭১ সালের এপ্রিলে চীন তার প্রথম প্রতিক্রিয়ায় পূর্ব-পশ্চিম দ্বন্দ্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ সমস্যা বলে আখ্যায়িত করে এবং পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অন্য কারো হস্তক্ষেপ চীন সহ্য করবে না বলে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে। ১৯৭১ সালের নভেম্বর মাসে চীনের সমর্থন আদায়ে ভুট্টো চীন সফর করেন। ভুট্টো মনে করত চীন এ যুদ্ধে জড়ালে তাদের ক্ষমতা বাড়বে। এ সময় চীন পাকিস্তানকে অভ্যন্তরীণভাবেই সমস্যার সমাধান করতে বলে। ২১ নভেম্বর ভারতীয় বাহিনী বাংলাদেশে ঢুকে পড়ে এবং সম্মুখযুদ্ধ শুরু হয়। এ সময় চীন জাতিসংঘে ভারতকে দায়ী করে। ভারত-সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্প্রসারণ নীতি নিয়ে চীন অনেক চিন্তিত ছিল। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর শেষ বিবৃতিতে চীন বলে– ভারত দক্ষিণ এশিয়ায় যে সমস্যা সৃষ্টি করছে তার ফল সে ভোগ করবে। তবে আপাতদৃষ্টিতে ১৯৭১ সালে চীনকে পাকিস্তান ঘেঁষা মনে হলেও আসলে তা ছিল তার নিরাপত্তা ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষার নীতি।

গ. **ভারতের ভূমিকা :** ১৯৭১ সালে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে একটি আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে ভারত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে ভারত রাজনৈতিক, ভৌগোলিক ও মতাদর্শগত কারণেই মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশকে সহায়তা করে। নিচে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সহযোগিতামূলক ভূমিকার কারণ তুলে ধরা হলো :

১. **পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যের নিরাপত্তা বিধান :** ১৯৪৭ সালে ভারত-পাকিস্তান বিভক্ত হওয়ার পর ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর সাথে যোগাযোগ করার জন্য শিলিগুড়ি করিডোর ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু এই সীমিত যোগাযোগের পরিসরটিও ভারতের জন্য নিরাপদ ছিল না এই কারণে যে, এই অঞ্চলটি যে কোনো সময় চীন দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কার মধ্যে ছিল। তাই ভারত মনে করেছিল যদি বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে পৃথক হয় তাহলে ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর সাথে বাংলাদেশের উপর দিয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর হবে। তাদের এই উদ্বিগ্নতার কারণ ছিল ১৯৬২ সালে চীন-ভারত যুদ্ধের সময় এই অঞ্চলটি চীন কর্তৃক আক্রান্ত হয়।

২. **রাজনৈতিক মতাদর্শের মিল থাকায় সাহায্য প্রদান :** ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী দল আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক মতাদর্শ ছিল ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও অর্থনৈতিক সমাজতন্ত্র, যা ভারতের তৎকালীন ক্ষমতাসীন কংগ্রেসের রাজনৈতিক মতাদর্শের সাথে ছিল সঙ্গতিপূর্ণ। এজন্য ভারত মনে করে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আওয়ামী লীগের মতো একটি দল ক্ষমতায় আসলে তাদের সাথে কাজ করা সহজ হবে এবং দক্ষিণ এশিয়ায় তাদের রাজনৈতিক ও সামরিক প্রতিপক্ষ পাকিস্তানকে দুর্বল করা সম্ভব হবে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৩. **ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠনে সহায়তা :** ১৯৪৭ সালে ভারত-পাকিস্তান বিভক্ত হয়েছিল মূলত দ্বিজাতি তত্ত্ব বা ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে, যা প্রথম থেকেই ভারতীয় কংগ্রেস মেনে নিতে পারেনি। কংগ্রেস চেয়েছিল জিন্নাহর দ্বি-জাতিতত্ত্বের অসাড়তা প্রমাণিত হোক। ভারত এ ধরনের সুযোগ পায় ১৯৫২ সালে যখন ধর্মের চেয়ে ভাষা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের নিকট গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনায় বাংলাদেশকে যাতে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে পারে এ লক্ষ্যে ভারত মুক্তিযুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানকে সহায়তা করে।

৪. **জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সমর্থন :** ভারতের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন দান বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের ছিল। মার্চ মাসের শেষ থেকে এপ্রিল মাসের শেষদিক পর্যন্ত সময়কালে ভারত বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামরিক ব্যক্তিকে আশ্রয়দানের সুযোগ দেয়। কলকাতায় একটি প্রবাসী সরকার গঠনের ব্যবস্থা করে। এছাড়া পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার জন্য স্বল্প পরিমাণে সামরিক সহায়তা দিতে থাকে এবং মুক্তিযুদ্ধের অনুকূলে আন্তর্জাতিক সমর্থন পাওয়ার জন্য ভারত কূটনৈতিক প্রচারণা অব্যাহত রাখে। মে মাসের প্রথমদিক থেকে জুনের শেষ পর্যন্ত সময়কালে বাংলাদেশের প্রায় এক কোটি শরণার্থী ভারতে প্রবেশ করে। যার কারণে ভারতীয় সরকার পূর্ব বাংলার মুক্তি আন্দোলন নিয়ে ব্যাপকভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। এই সময়ে ভারত পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে সমর্থন দিতে থাকে।

৫. **কূটনৈতিক ও সামাজিক সহযোগিতা প্রদান :** জুলাই থেকে নভেম্বর পর্যন্ত সময়ে ভারত পূর্ব বাংলার সমস্যার প্রত্যাশিত সমাধানের জন্য কূটনৈতিক ও সামরিক প্রচেষ্টা জোরদার করে। এ সময় ভারত বিদ্যমান সমস্যা যাতে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় এবং ভারতে বসবাসরত বাংলাদেশী শরণার্থীরা যাতে নিজ দেশে ফিরে যেতে পারে সে ব্যাপারে প্রচেষ্টা চালায়। ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটি দল পূর্ব বাংলায় মোতায়েন করা হয়। ভারত কর্তৃক প্রেরিত তিনটি সৈন্যবহরের দুটি ছিল সপ্তম পদাতিক, একটি ছিল নবম পদাতিক, যাদেরকে ভারত পূর্ব বাংলার সীমান্ত এলাকায় মোতায়েন করে। এ সময় ভারত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সব ধরনের সমর্থন দানে সোভিয়েত ইউনিয়নের নিকট থেকে কার্যকর কূটনৈতিক ও নৈতিক সমর্থন পায়।

ঘ. **সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা :** যুক্তরাষ্ট্র ও চীনকে হীনবল প্রতিপন্ন করার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশকে সমর্থন দেয়। নিচে স্বাধীনতা যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচিত হলো :

১. **এশিয়ায় প্রভাব বৃদ্ধি ও চীনের শক্তিকে খর্ব করা :** বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বেশ কয়েকটি কারণে সোভিয়েত ইউনিয়ন পূর্ব পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বন করে। একটি পরাশক্তি হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়ন ইউরোপে তার প্রভাব বলয়ের মতো এশিয়াতেও তার প্রভাব বৃদ্ধি করার জন্য ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। ১৯৬০ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন এশিয়ার জন্য তার যে নীতি প্রণয়ন করে তার ধারাবাহিকতা রক্ষা করাই ছিল সোভিয়েতের এ যুদ্ধে জড়ানোর অন্যতম কারন। সোভিয়েত ইউনিয়ন চাইত না মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার ধারক নীতির মাধ্যমে এশিয়ায় প্রভাব বৃদ্ধি করুক। এছাড়াও ক্রমবর্ধমান হারে সামরিক, কূটনৈতিক এবং মতাদর্শগতভাবে শক্তিশালী চীন যাতে করে কিছুতেই দক্ষিণ এশিয়ায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে না পারে সেজন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশের পক্ষাবলম্বন করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন মনে করে একটি পরাশক্তি হিসেবে বিশ্বের যে কোনো স্থানে হস্তক্ষেপ করার অধিকার তাদের রয়েছে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

২. **সামষ্টিক নিরাপত্তা বলয় তৈরি :** পূর্ব পাকিস্তানকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের সামষ্টিক নিরাপত্তার ধারণাও কাজ করেছে। ১৯৬০ সালের শেষ দিকে ইউশোরি নদীকে কেন্দ্র করে চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়, যে দ্বন্দ্বের প্রেক্ষিতে চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সীমান্ত এলাকায় চরম উত্তেজনা বিরাজ করতে থাকে। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময় পাকিস্তান চীনের সহযোগিতা পাওয়ার কারণে সোভিয়েত ইউনিয়ন তাদের সামষ্টিক নিরাপত্তার ধারণাকে মেনে নেয়নি। ১৯৬৭-১৯৬৮ সালে পাকিস্তান, চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একত্রিত হয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের একটি সাধারণ শত্রুতে পরিণত হয়। এমতাবস্থায় সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতের সাথে মৈত্রীবদ্ধ হয়ে বাংলাদেশের পক্ষাবলম্বন করে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে নিরাপত্তা বলয় গড়ে তুলতে সক্ষম হয়।

৩. **পরাশক্তি হিসেবে বিজয় অর্জন :** ১৯৭১ সালের জুলাই পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন নিরপেক্ষতা বজায় রাখে। জুলাই মাসে কিসিঞ্জারের চীন সফরের ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভিত দুর্বল হয়ে পড়ে পাকিস্তান-চীন-যুক্তরাষ্ট্র একীভূত হয়ে গেছে ভেবে। এ সম্পর্ক সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহজ হয়। ৯ আগস্ট ভারত-সোভিয়েত সমষ্টিগত নিরাপত্তার নীতির আওতায় মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। ১৯৭১ এর সেপ্টেম্বর মাসে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী মস্কো সফর করে মস্কোর নিকট বাংলাদেশের যুদ্ধের পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেন। এরপর সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশের পক্ষাবলম্বন করে ব্যাপকভাবে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। ১-১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছিল প্রধান আলোচ্য বিষয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে তিনবার ভেটো দেয়। কারণ সোভিয়েত ইউনিয়ন চূড়ান্ত বিজয়ের মধ্য দিয়ে বিজয়ী হতে যাচ্ছিল। পরাশক্তি হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়নই প্রথম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূল বৈশিষ্ট্য : *(নবম অধ্যায় দেখুন)।*

উপসংহার : উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারি যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ কেবল পাকিস্তানের দুটি অংশের বিরোধ ও বৈষম্যের ফসল নয়, এর সাথে আন্তর্জাতিক রাজনীতি ওতোপ্রতভাবে জড়িত। সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ভারত বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য যেমন অস্ত্র ও সৈন্য সরবরাহ করেছে তেমনি পশ্চিম পাকিস্তানকে সাহায্য করেছে চীন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোর সমর্থন বা বিরোধিতা যতটা না ছিল বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল তাদের জাতীয় স্বার্থ রক্ষার্থে।

০৫ ॥ জনগণের নেতা বলতে কি বোঝায়? বিশ্বের অন্য আরো অন্তত ২ জন নেতার সাথে তুলনা করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জননেতা এবং সফল স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতীক হিসেবে বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করুন। *[২৯তম বিসিএস]*

উত্তর : "Some are born great, some achieve greatness, some have greatness thrust upon them." — William Shakespeare.

মানুষ বয়সে বাঁচে না, বাঁচে কর্মে। পার্থিব জীবনে মানুষ তার কাজের মধ্য দিয়ে হয়ে ওঠে মহান, চিরস্মরণীয় ও বরণীয়। পৃথিবীতে অজস্র মানুষের আসা-যাওয়া চলছে। কিন্তু ক'জনকেই মানুষ মনে

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

রেখেছে? যখন কোনো ব্যক্তি, সংস্থা বা সংগঠন জনগণের প্রত্যাশা বা চাহিদা পূরণে নিজের সবকিছু জলাঞ্জলি দিয়ে অবিরত কাজ করে তখন তিনিই জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন; পরিণত হন জনগণের নেতায়। বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র সৃষ্টিতে এমনই একজন জননেতা ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাংলার স্বায়ত্তশাসন, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও শোষণ-বৈষম্যহীন একটি সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেছেন এবং এজন্য বহু নির্যাতন ভোগ করেছেন। তাঁর অদম্য নেতৃত্বে বাংলাদেশ নামক একটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে।

জনগণের নেতা : আবহমান কাল ধরেই বিভিন্ন দেশে নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষের মুক্তি অথবা পরাধীনতার নাগপাশ হতে দেশকে স্বাধীন করার জন্য যেসব নেতা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন তাদেরকেই বলা যায় মহান নেতা, অথবা দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান। এসব নেতার নৈতিক চরিত্র, সাহসিকতা, ব্যক্তিত্ব, দূরদর্শিতা, নিঃস্বার্থপরায়ণতা দেখে মানুষ মুগ্ধ হয়েছে, মানুষ তাদেরকে ভালোবেসেছে। আর এভাবেই তারা জনগণের নেতায় পরিণত হয়েছেন। জনগণের নেতা হিসেবে মাও সেতুং, জর্জ ওয়াশিংটন, সাইমন বলিভার, চে গুয়েভারা, মার্শাল জোসেফ টিটো, সান ইয়াত সেন, কামাল আতাতুর্ক, ইয়াসির আরাফাত, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক প্রমুখ ব্যক্তিত্বের নাম উল্লেখযোগ্য ।

বিশ্বের ২ জন জননেতার সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের তুলনা : কালে কালে দেশে দেশে নেতা অনেকেই জন্মান। তবে কেউ ইতিহাসের একটি পঙ্ক্তি, কেউ একটি পাতা, কেউবা এক অধ্যায়। কিন্তু কেউ আবার সমগ্র ইতিহাস। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের নায়ক শেখ মুজিবুর রহমান, মিসরের জামাল আবদেল নাসের, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনক জর্জ ওয়াশিংটনের সাথে তুলনীয়। শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। উনিশ শতকীয় জাতীয়তাবাদী চিন্তায় তিনি বিশ শতকের প্রাগ্রসর মুক্তচিন্তার অগ্নিস্ফুলিঙ্গের যোগ ঘটিয়েছেন। তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের অবিসংবাদিত নেতায়। তিনি ইতিহাসের মানস-সন্তান।

নবীন মিসরে অনেক নেতা জন্মেছেন। জগলুল পাশা থেকে নাহাশ পাশা। তাঁরা নতুন জাতীয়তাবাদী চেতনায় অনুপ্রাণিত করেছেন মিসরবাসীকে। ১৯৫২ সালে মিসরে মধ্যযুগীয় দুর্নীতিগ্রস্ত রাজতন্ত্রের উচ্ছেদে নেতৃত্বের আসনে ছিলেন জেনারেল নজিব। কিন্তু এঁরা কেউ মিসরের ইতিহাস নয়, ইতিহাসের অংশ। কিন্তু ইতিহাস বলতে যাকে বোঝায় তিনি জামাল আবদুল নাসের। মিসরের রাজা ফারুকের সেনাবাহিনীর কর্নেল থেকে নাসের হন নবীন মিসরের স্রষ্টা। মিসর এখন পরিচিত 'নাসেরের মিশর' নামে। নাসের আর মিসর নামটি আজ পরস্পরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একটি নামকে আরেক নাম ছাড়া ভাবাই যায় না। যেমন বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ছাড়া বাংলাদেশের ইতিহাস কল্পনা করা যায় না।

গোপালগঞ্জ দেওয়ানি আদালতের সেরেস্তাদার লুৎফর রহমানের চার কন্যা ও দুই ছেলে সন্তানের মধ্যে বঙ্গবন্ধু ছিলেন তৃতীয়।

পঞ্চাশের দশকের শুরুতেই পশ্চাৎমুখী ধর্মীয় জাতীয়তার নিগড় ভেঙে মিসরে আরব জাতীয়তাবাদের নবজন্মের মতো বাংলাদেশে বাঙালি জাতীয়তাবাদের নবজন্ম লক্ষণীয়। নাসেরের মধ্যে চরিতার্থ হয়েছে আরব জাতির- বিশেষ করে মিসরবাসীর কয়েক শতাব্দীর পুনর্জাগরণের স্বপ্ন। অন্যদিকে শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে চরিতার্থ হয়েছে বাংলাদেশের কয়েক শতাব্দীর রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জাগরণের স্বপ্ন।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

শেখ মুজিবের রাজনৈতিক খ্যাতি শুরু পঞ্চাশের দশকের সূচনায়। একই সময়ে নাসেরের ক্ষমতারোহণ। নাসেরের রাজনীতির জাদুমন্ত্র হচ্ছে আরব জাতীয়তাবাদ আর মুজিবের রাজনীতির জাদুমন্ত্র হলো বাঙালি জাতীয়তাবাদ। দুজনেই মধ্যযুগীয় জীর্ণ অতীতের খোলস ভেঙেছেন। নাসের ফারাও আর পিরামিডের মিসরকে জাগাতে চেয়েছেন। মুজিব চেয়েছেন তিতুমীর, সূর্যসেন আর ক্ষুদিরামের বাংলাকে জাগাতে। নাসেরকে যুদ্ধ করতে হয়েছে প্রতিক্রিয়াশীল সামন্তস্বার্থ, পশ্চাৎমুখী ধর্মান্ধতা ও সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের বিরুদ্ধে। মুজিবও ধর্মান্ধতা, প্রতিক্রিয়াশীল সামন্তস্বার্থের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। তিনি এই সামন্তস্বার্থের পৃষ্ঠপোষক পশ্চিম পাকিস্তানের উদীয়মান ধনবাদী স্বার্থ এবং তার পৃষ্ঠপোষক ডলার সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভূমিকা গ্রহণে বাধ্য হয়েছেন। নাসের তাঁর জাতীয়তাবাদী সংগ্রামে এশিয়ার সর্ববৃহৎ কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রের সহানুভূতি অর্জনে সক্ষম হননি; বরং মিসরীয় কম্যুনিস্ট নেতা খালেদ বাগদাস পিকিংয়ের সভামঞ্চ থেকে প্রকাশ্যে নিন্দা করেছেন নাসেরের। তেমনি মুজিবও তাঁর দেশের জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামে গেরিলা মুক্তিযুদ্ধের প্রবর্তক এশীয় কমিউনিস্ট দেশটির সহানুভূতি অর্জনে সক্ষম হননি, বরং বিরূপ সমালোচনা ও বিরাধিতার সম্মুখীন হয়েছেন। এদিক থেকেও প্রায় একই বয়সী নাসের ও মুজিব প্রায় অভিন্ন। দুজনেই আত্মপ্রত্যয়ী ও সাহসী। কিন্তু তাঁদের রাজনৈতিক শিক্ষা, মানস গঠন ও লক্ষ্য এক নয়। মুজিবের রাজনৈতিক চরিত্র গঠনের পটভূমিতে রয়েছে গোখলে, নওরোজী গান্ধী, দেশবন্ধুর রাজনীতির নিয়মতান্ত্রিক প্রভাব। নাসেরের রাজনৈতিক শিক্ষার পটভূমিতে রয়েছে অভ্যুত্থান ও পাল্টা অভ্যুত্থানের সশস্ত্র সংঘর্ষের কৌশল। নাসের সামরিক কৌশলে বিশ্বাসী। মুজিব গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিশ্বাসী। নাসের আরব জাতীয়তাবাদ সম্প্রসারণবাদী। মুজিব বাঙালি জাতীয়তাবাদ আত্মপ্রতিষ্ঠাবাদী। নাসেরের আন্দোলন সশস্ত্র। তাই তিনি আঘাতকারী ও সহসা বিজয়ী। মুজিবের আন্দোলন নিরস্ত্র। তাই তিনি অসহযোগী এবং বারবার নির্যাতিত।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতাযুদ্ধের সেনাপতি ও প্রথম প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটনের কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না। পিতা ও বড় ভাইয়ের কাছে লেখাপড়া শেখেন। এক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত। বঙ্গবন্ধু গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুল থেকে মেট্রিকুলেশন এবং কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ থেকে বিএ পাস করেন।

যুব বয়সে ওয়াশিংটন সার্ভেয়ার হিসেবে কাজ শুরু করে অল্পসময়ে প্রভূত দক্ষতা অর্জন করেন। যুব বয়সে বঙ্গবন্ধু রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন এবং অল্পতেই নিজস্ব সক্রিয়তা ও বুদ্ধিবৃত্তির জোরে দলীয় গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হন। জর্জ ওয়াশিংটন ২০ বছর বয়সে সামরিক বাহিনীতে যোগ দেন এবং যুদ্ধের বিরল অভিজ্ঞতা ও অসামান্য সফলতা লাভ করেন। ২৭ বছর বয়সে মার্থাকে বিয়ে করেন এবং প্রভূত সম্পত্তির মালিক হন, যা তাকে ভার্জিনিয়ার সবচেয়ে সম্পদশালী ব্যক্তিতে পরিণত করে। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনাপ্রধান নিযুক্ত হয়ে অত্যন্ত কৌশলী নীতি গ্রহণ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে রক্ষা করে স্বাধীনতা এনে দেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা-পরবর্তীতে সর্বসম্মতিক্রমে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তিনি দুই মেয়াদ প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করে রাজনীতি হতে অবসর গ্রহণ করেন। অপরদিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গণতন্ত্রের দাবিতে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের অধিকার আদায়ে সময়োপযোগী একের পর এক সফল কর্মসূচি দেন, যা জনগণ স্বাগত জানায়। যেমন– ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনের পর ১৯৬২-র শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬-র ছয় দফা, ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ পরিকল্পনা প্রভৃতি। এরূপ নীতি ও পরিকল্পনা বঙ্গবন্ধুকে জননেতায় পরিণত করে। আর তাই তিনি ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ ও জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেন, যা বিশ্বের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা বলে স্বীকৃত এবং আব্রাহাম লিংকনের গেটিসবার্গের ভাষণের সাথে তুলনীয়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

সফল স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতীক হিসেবে বঙ্গবন্ধুর বৈশিষ্ট্য :

১. **দূরদর্শী :** বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন অত্যন্ত দূরদর্শী। তিনি মাওলানা ভাসানীর কথায় স্বাধীনতার ঘোষণা না দিয়ে অত্যন্ত ধীরে, পরিবেশ-পরিস্থিতি উপলব্ধি করে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। যা তাঁর দূরদর্শিতারই পরিচয় বহন করে।

২. **ব্যক্তিত্বসম্পন্ন :** বঙ্গবন্ধু ছিলেন প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। একজন সফল নেতার যেসব গুণ থাকা দরকার তার সবই বঙ্গবন্ধুর ছিল। তিনি অযথা অপ্রাসঙ্গিক কথা বলতেন না বা জনগণকে মিথ্যা আশ্বাস দিতেন না। তিনি যা বলতেন তা অক্ষরে অক্ষরে পালনের চেষ্টা করতেন।

৩. **ন্যায়পরায়ণ ও নির্লোভ :** বিচারক হিসেবে বঙ্গবন্ধু ছিলেন সত্যের ক্ষেত্রে সহজ ন্যায়ানুগ আর মিথ্যার ক্ষেত্রে ছিলেন কঠোর ও কঠিন। তিনি নিজে যেমন অন্যায় করতেন না, তেমনি অন্যায়কে পছন্দও করতেন না এবং প্রশ্রয়ও দিতেন না। তিনি ছিলেন নির্লোভ। ইচ্ছা করলেই তিনি পাকিস্তানের শ্রেষ্ঠ ধনী ও সর্বাধিক ক্ষমতাশালী ব্যক্তি হতে পারতেন। পাকিস্তানের গভর্নর বা প্রধানমন্ত্রী হতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা হননি। তিনি জনগণের সাথে ওয়াদা খেলাপ করেননি।

৪. **মানবতার প্রতীক :** একজন সফল জননেতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তিনি হন মানবতাবাদী। বঙ্গবন্ধুও তেমনি সফল জননেতা হিসেবে মানবতাবাদের প্রতীক। তিনি যেখানেই অন্যায়, অবিচার, শোষণ দেখেছেন তার বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। এজন্য তাকে বারবার শাসকগোষ্ঠীর কড়া শাসনে পড়তে হয়েছে। রাজনৈতিক জীবনের অর্ধেক সময় তাকে জেল খাটতে হয়েছে। তবুও তিনি ছিলেন অনড়, দৃঢ়।

৫. **সাহসী :** বঙ্গবন্ধু ছিলেন অত্যন্ত সাহসী। তার প্রমাণ পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রে বসবাস করে ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং নতুন রাষ্ট্রের দাবি, যা তার যথেষ্ট সাহসিকতার পরিচয় বহন করে। তিনি যদি জনপ্রিয় না হতেন, তার আন্দোলন যদি বেগবান না হতো তাহলে তাকে এর জন্য চরম পরিণতি ভোগ করতে হতো। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ তাকে পালাতে বলা হলেও তিনি পালাননি বাংলার জনগণকে বিপদে রেখে।

উপসংহার : ধর্মীয় দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে বিভক্ত পাকিস্তান রাষ্ট্র যে ঠিক ছিল না তার প্রমাণ পূর্ব পাকিস্তানের জনগোষ্ঠীর ওপর পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকচক্রের শোষণ, বঞ্চনা, লাঞ্ছনা। তারা বাংলা ভাষা এবং বাঙালির সংস্কৃতিকে মুছে দেয়ার এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে। আর এ থেকে মুক্তির জন্যে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের মন্ত্রে দারুণভাবে উজ্জীবিত করে তোলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি বাঙালিদের মাঝে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করেন, বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার মন্ত্রে স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেন। বাঙালি জাতিকে সংগঠিত করেন স্বাধীনতার মন্ত্রে। বঙ্গবন্ধু পরিণত হন বাঙালির অবিসংবাদিত জননেতায়, সাড়ে সাত কোটি বাঙালির নয়নের মণিতে, বাঙালি জাতির ত্রাতায়।

০৬ । বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের এগারটি সেক্টরের অবস্থান ও সেক্টর কমান্ডারদের নাম লিখুন। *[৩০তম বিসিএস]*

উত্তর : ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশদের কাছ থেকে ভারত ও পাকিস্তান নামের দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। পাকিস্তানে দুটি ভূখণ্ড একটি পশ্চিম পাকিস্তান এবং অপরটি পূর্ব পাকিস্তান। পশ্চিম পাকিস্তানিরা পূর্ব পাকিস্তানিদের (বাংলাদেশীদের) উপর শুরু থেকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক নানাদিক থেকে বৈষম্যমূলক আচরণ করতে থাকে। বিভিন্ন পট-পরিক্রমায় ১৯৭১ সালে শুরু হয় বাঙালিদের স্বাধীনতা সংগ্রাম। তাই মহান মুক্তিযুদ্ধে জাতি-ধর্ম-বর্ণ, বেসামরিক-সামরিক, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, কৃষক-মজুর

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

সবাই অংশগ্রহণ করে। মুক্তিযুদ্ধ সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য সারা বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টর এবং পরে সামরিক বাহিনী সুসংগঠিত করার মাধ্যমে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য তিনটি ব্রিগেড গঠন করা হয়। নিচে মুক্তিযুদ্ধে গঠিত ব্রিগেড ও সেক্টর সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

মুক্তিযুদ্ধের ব্রিগেড : মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিকটা ছিল গেরিলাভিত্তিক। কিন্তু এভাবে গেরিলা যুদ্ধ পাকিস্তানি বাহিনীর সুশিক্ষিত সৈন্যদের পদানত করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে পারছিল না। ফলে যুদ্ধক্ষেত্রে গতিশীলতা আনয়ন ও মুক্তাঞ্চল গঠনের লক্ষ্যে সেনাবাহিনীর গঠন বিন্যাসের পরিবর্তন আনার পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এপ্রিল মাসে মুজিবনগর সরকার গঠিত হলে প্রধান সেনাপতি কর্নেল এম এ জি ওসমানী সেনাবাহিনীর সদস্যদের নিয়ে নিয়মিত ব্রিগেড গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। সম্মুখসমরে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঙ্গে লিপ্ত হওয়ার জন্য তিনটি নিয়মিত ব্রিগেড গঠন করা হয়। ব্রিগেডসমূহ হচ্ছে : ক. জেড ফোর্স, খ. কে ফোর্স, গ. এস ফোর্স।

ক. **জেড ফোর্স :** লে. কর্নেল জিয়াউর রহমানের নামানুসারে ১৯৭১ সালের ৭ জুলাই গঠিত হয় এই ব্রিগেড, যার নাম করা হয় জেড ফোর্স। এই ফোর্সের অন্তর্ভুক্ত ছিল ১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ৩ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ২ ফিল্ড ব্যাটারি আর্টিলারি ও একটি সিগন্যাল কোম্পানি। জুলাই ১৯৭১ থেকে সেপ্টেম্বর ১৯৭১ পর্যন্ত জেড ফোর্স ময়মনসিংহ, জামালপুর, শেরপুর ও রৌমারী এলাকায় যুদ্ধরত থাকে। অক্টোবর থেকে চূড়ান্ত বিজয় পর্যন্ত তারা সিলেট, সুনামগঞ্জ ও মৌলভীবাজার এলাকায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। জেড ফোর্সের উল্লেখযোগ্য যুদ্ধসমূহ ছিল কামালপুর যুদ্ধ, বাহাদুরাবাদ ঘাট অপারেশন, দেওয়ানগঞ্জ থানা আক্রমণ, নকসী বিওপি আক্রমণ, চিলমারীর যুদ্ধ, হাজীপাড়ার যুদ্ধ, ছোটখাল, গোয়াইনঘাট, টেংরাটিলা, গোবিন্দগঞ্জ, লামাকাজি, সালুটিকর বিমানবন্দর, ধলই, ধামাই চা বাগান, জকিগঞ্জ, আলী ময়দান, সিলেট এমসি কলেজ, ভানুগাছা, কানাইঘাট, ফুলতলা চা বাগান, বড়লেখা, লাতু, সাগরনাল চা বাগান, ছাতক ও রাধানগরযুদ্ধ।

খ. **কে ফোর্স :** লে. কর্নেল খালেদ মোশাররফের নামানুসারে সেপ্টেম্বর ১৯৭১ সালে গঠিত হয় এই ব্রিগেড, যার নাম করা হয় কে ফোর্স। এই ফোর্সের অন্তর্ভুক্ত ছিল ৪ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ৯ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ১০ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ১ ফিল্ড ব্যাটারি (মুজিব ব্যাটারি) আর্টিলারি ও একটি সিগন্যাল কোম্পানি। কে ফোর্সের উল্লেখযোগ্য যুদ্ধসমূহ ছিল দেউশ মন্দভাগ অভিযান, শালদানদী অভিযান, পরশুরাম, চিতলিয়া, ফুলগাজী, নিলক্ষীর যুদ্ধ, বিলোনিয়ার যুদ্ধ, চাপিলতার যুদ্ধ, কুমিল্লা শহরের যুদ্ধ, নোয়াখালীর যুদ্ধ, কসবার যুদ্ধ, বারচরগ্রাম যুদ্ধ, মিয়াবাজার যুদ্ধ, গাজীপুর যুদ্ধ, সলিয়াদীঘি যুদ্ধ, ফেনী যুদ্ধ, চট্টগ্রাম বিজয় ও ময়নামতি বিজয়।

গ. **এস ফোর্স :** লে. কর্নেল কে এম সফিউল্লাহর নামানুসারে ১৯৭১ সালের অক্টোবরে গঠিত হয় এই ব্রিগেড, যার নাম করা হয় এস ফোর্স। এই ফোর্সের অন্তর্ভুক্ত ছিল ২ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ১১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট। এস ফোর্সের উল্লেখযোগ্য যুদ্ধসমূহ ছিল ধর্মগড় আক্রমণ, মনোহরদী অবরোধ, কলাছড়া অপারেশন, বামুটিয়া অপারেশন, আশুগঞ্জ অপারেশন, মুকুন্দপুর যুদ্ধ, আখাউড়া যুদ্ধ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া যুদ্ধ, ভৈরব ও আশুগঞ্জ যুদ্ধ, কিশোরগঞ্জ যুদ্ধ, হরশপুর যুদ্ধ, নরসিংদী যুদ্ধ ও বিলোনিয়ার যুদ্ধ।

মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর : ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার সামরিক কৌশল হিসেবে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সমগ্র ভৌগোলিক এলাকাকে ১১টি সেক্টর বা রণাঙ্গনে ভাগ করা হয়। প্রতি সেক্টরে একজন সেক্টর কমান্ডার (অধিনায়ক) নিয়োগ করা হয়। যুদ্ধ পরিচালনার সুবিধার জন্য প্রতিটি সেক্টরকে কয়েকটি সাব-সেক্টরে বিভক্ত করা হয় এবং প্রতিটি সাব-সেক্টরে একজন করে কমান্ডার নিয়োজিত হন। নিচে সংক্ষেপে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সেক্টরসমূহের আলোচনা করা হলো :

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

- **১নং সেক্টর :** চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা এবং নোয়াখালী জেলার মুহুরী নদীর পূর্বাংশের সমগ্র এলাকা নিয়ে গঠিত। এ সেক্টরের হেডকোয়ার্টার ছিল হরিনাতে। সেক্টর প্রধান ছিলেন প্রথমে মেজর জিয়াউর রহমান এবং পরে মেজর রফিকুল ইসলাম। এই সেক্টরের পাঁচটি সাব-সেক্টর ও তাদের কমান্ডারদের নাম হচ্ছে : ঋষিমুখ (ক্যাপ্টেন শামসুল ইসলাম); শ্রীনগর (ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান এবং পরে ক্যাপ্টেন মাহফুজুর রহমান); মনুঘাট (ক্যাপ্টেন মাহফুজুর রহমান); তবলছড়ি (সুবেদার আলী হোসেন); এবং ডিমাগিরী (জনৈক সুবেদার)। এই সেক্টরে ইপিআর, পুলিশ, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত বাহিনীতে সৈন্য সংখ্যা ছিল প্রায় দুই হাজার এবং গণবাহিনীর সংখ্যা ছিল প্রায় আট হাজার। এই বাহিনীর গেরিলাদের ১৩৭টি গ্রুপে দেশের অভ্যন্তরে পাঠানো হয়।
- **২নং সেক্টর :** ঢাকা, কুমিল্লা, ফরিদপুর এবং নোয়াখালী জেলার অংশ নিয়ে গঠিত। সেক্টর কমান্ডার ছিলেন প্রথমে মেজর খালেদ মোশাররফ এবং পরে মেজর এটিএম হায়দার। এই সেক্টরের অধীনে প্রায় ৩৫ হাজারের মতো গেরিলা যুদ্ধ করেছে। নিয়মিত বাহিনীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৬ হাজার। এই সেক্টরের ছয়টি সাব-সেক্টর ও সেগুলোর কমান্ডারদের নাম হচ্ছে : গঙ্গাসাগর, আখাউড়া ও কসবা (মাহবুব এবং পরে লেফটেন্যান্ট ফারুক ও লেফটেন্যান্ট হুমায়ুন কবীর); মন্দভাগ (ক্যাপ্টেন গাফফার); শালদানদী (আবদুস সালেক চৌধুরী); মতিনগর (লেফটেন্যান্ট দিদারুল আলম); নির্ভয়পুর (ক্যাপ্টেন আকবর এবং পরে লেফটেন্যান্ট মাহবুব) এবং রাজনগর (ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম এবং পরে ক্যাপ্টেন শহীদ ও লেফটেন্যান্ট ইমামুজ্জামান)।
- **৩নং সেক্টর :** উত্তরে সিলেটের চূড়ামনকাঠি (শ্রীমঙ্গলের নিকট) এবং দক্ষিণে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সিঙ্গারবিল পর্যন্ত এলাকা নিয়ে গঠিত হয়। সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর কে. এম শফিউল্লাহ এবং পরে মেজর এ. এন. এম নূরুজ্জামান। এই সেক্টরের অধীনে ১৯টি গেরিলা ঘাঁটি গড়ে উঠেছিল। নভেম্বর মাস পর্যন্ত গেরিলার সংখ্যা দাঁড়ায় ৩০ হাজারের মতো। এই সেক্টরের দশটি সাব-সেক্টর ও সেগুলোর কমান্ডারদের নাম হচ্ছে : আশ্রমবাড়ি (ক্যাপ্টেন আজিজ এবং পরে ক্যাপ্টেন এজাজ); বাঘাইবাড়ি (ক্যাপ্টেন আজিজ এবং পরে ক্যাপ্টেন এজাজ); হাতকাটা (ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান); সিমলা (ক্যাপ্টেন মতিন); পঞ্চবটী (ক্যাপ্টেন নাসিম); মনতলা (ক্যাপ্টেন এম.এস.এ ভূঁইয়া); বিজয়নগর (এম.এস.এ ভূঁইয়া); কালাছড়া (লেফটেন্যান্ট মজুমদার); কলকলিয়া (লেফটেন্যান্ট গোলাম হেলাল মোরশেদ); এবং বামুটিয়া (লেফটেন্যান্ট সাঈদ)।
- **৪নং সেক্টর :** উত্তরে সিলেট জেলার হবিগঞ্জ মহকুমা থেকে দক্ষিণে কানাইঘাট পুলিশ স্টেশন পর্যন্ত ১০০ মাইল বিস্তৃত সীমান্ত এলাকা নিয়ে গঠিত। সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর চিত্তরঞ্জন দত্ত এবং পরে ক্যাপ্টেন এ রব। হেডকোয়ার্টার ছিল প্রথমে করিমগঞ্জ এবং পরে মাসিমপুরে। সেক্টরে গেরিলার সংখ্যা ছিল প্রায় ৯ হাজার এবং নিয়মিত বাহিনী ছিল প্রায় ৪ হাজার। এই সেক্টরের ছয়টি সাব-সেক্টর ও সেগুলোর কমান্ডারদের নাম হচ্ছে : জালালপুর (মাসুদুর রব শাদী); বড়পুঞ্জী (ক্যাপ্টেন এ. রব); আমলাসিদ (লেফটেন্যান্ট জহির); কুকিতুল (ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট কাদের এবং পরে ক্যাপ্টেন শরিফুল হক); কৈলাশ শহর (লেফটেন্যান্ট উয়াকিউজ্জামান); এবং কমলপুর (ক্যাপ্টেন এনাম)।
- **৫নং সেক্টর :** সিলেট জেলার দুর্গাপুর থেকে ডাউকি (তামাবিল) এবং এর পূর্বসীমা পর্যন্ত এলাকা নিয়ে গঠিত। সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর মীর শওকত আলী। হেড কোয়ার্টার ছিল বাঁশতলাতে। এই সেক্টরের ছয়টি সাব-সেক্টর ও সেগুলোর কমান্ডারদের নাম হচ্ছে : মুক্তাপুর (সুবেদার নজির হোসেন এবং সেকেন্ড ইন কমান্ড এফ.এফ. ফারুক); ডাউকি (সুবেদার মেজর

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

বি.আর চৌধুরী); শেলা (ক্যাপ্টেন হেলাল; সহযোগী কমান্ডার লেফটেন্যান্ট মাহবুবার রহমান এবং লেফটেন্যান্ট আবদুর রউফ); ভোলাগঞ্জ (লেফটেন্যান্ট তাহের উদ্দিন আখঞ্জী; সহযোগী কমান্ডার লেফটেন্যান্ট এস.এম খালেদ); বালাট (সুবেদার গনি এবং পরে ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন ও এফ.এফ এনামুল হক চৌধুরী); এবং বড়ছড়া (ক্যাপ্টেন মুসলিম উদ্দিন)।

- **৬নং সেক্টর :** রংপুর জেলা এবং দিনাজপুর জেলার অংশবিশেষ নিয়ে গঠিত হয়। সেক্টর কমান্ডার ছিলেন উইং কমান্ডার এম.কে বাশার। সেক্টরের হেডকোয়ার্টার ছিল পাটগ্রামের নিকট বুড়ীমারিতে। জুন মাসে সেক্টরের সৈন্যসংখ্যা ছিল ৭০০ এবং এদের প্রায় সবই ছিল ইপিআর বাহিনীর সদস্য। ডিসেম্বর পর্যন্ত সেক্টরের সৈন্যসংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ১১ হাজার। এই সেক্টরের পাঁচটি সাব-সেক্টর ও সেগুলোর কমান্ডারদের নাম হচ্ছে : ভজনপুর (ক্যাপ্টেন নজরুল এবং পরে স্কোয়াড্রন লীডার সদরউদ্দিন ও ক্যাপ্টেন শাহরিয়ার); পাটগ্রাম (প্রথমে ইপিআর-এর কয়েকজন জুনিয়র কমিশন্ড অফিসার কমান্ড করেন। পরে ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান এই সাব-সেক্টরের দায়িত্ব নেন, সাহেবগঞ্জ (ক্যাপ্টেন নওয়াজেশ উদ্দিন); মোগলহাট (ক্যাপ্টেন দেলওয়ার); এবং চিরাহাটি (ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট ইকবাল)।
- **৭নং সেক্টর :** রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া ও দিনাজপুর জেলার অংশবিশেষ নিয়ে গঠিত হয়। সেক্টর প্রধান ছিলেন মেজর নাজমুল হক এবং পরে সুবেদার মেজর এ.রব ও মেজর কাজী নূরুজ্জামান। এই সেক্টরের হেডকোয়ার্টার ছিল তরঙ্গপুর। প্রায় ১৫ হাজার মুক্তিযোদ্ধা এই সেক্টরে যুদ্ধ করে। নিয়মিত বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল প্রায় ২,৫০০ এবং ১২,৫০০ ছিল গণবাহিনীর সদস্য। এই সেক্টরের আটটি সাব-সেক্টর ও সেগুলোর কমান্ডারদের নাম হচ্ছে : মালন (ইপিআর জেসিওগণ এবং পরে ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর); তপন (মেজর নাজমুল হক এবং পরে কয়েকজন ইপিআর জেসিও); মেহেদীপুর (সুবেদার ইলিয়াস এবং পরে ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর); হামজাপুর (ক্যাপ্টেন ইদ্রিস); আঙ্গিনাবাদ (একজন গণবাহিনীর সদস্য); শেখপাড়া (ক্যাপ্টেন রশীদ); ঠোকরাবাড়ি (সুবেদার মোয়াজ্জেম); এবং লালগোলা (ক্যাপ্টেন গিয়াসউদ্দিন চৌধুরী।)
- **৮নং সেক্টর :** এপ্রিল মাসে এই সেক্টরের অপারেশনাল এলাকা ছিল কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা, বরিশাল, ফরিদপুর ও পটুয়াখালী জেলা। মে মাসের শেষে অপারেশন এলাকা সঙ্কুচিত করে কুষ্টিয়া ও যশোর জেলা, খুলনা জেলা সদর, সাতক্ষীরা মহকুমা এবং ফরিদপুরের উত্তরাংশ নিয়ে এই সেক্টর পুনর্গঠিত হয়। এই সেক্টরের প্রধান ছিলেন মেজর আবু ওসমান চৌধুরী এবং পরে মেজর এম.এ. মঞ্জুর। এই সেক্টরের হেডকোয়ার্টার বেনাপোলে থাকলেও কার্যত হেডকোয়ার্টারের একটা বিরাট অংশ ছিল ভারতের কল্যাণী শহরে। সেক্টরের সৈন্যদের মধ্যে ২ হাজারের মতো ছিল নিয়মিত বাহিনী এবং ৮ হাজার ছিল গণবাহিনী। এই সেক্টরের সাতটি সাব-সেক্টর ও সেগুলোর কমান্ডারদের নাম হচ্ছে : বয়রা (ক্যাপ্টেন খোন্দকার নজমুল হুদা); হাকিমপুর (ক্যাপ্টেন শফিক উল্লাহ); ভোমরা (ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দিন এবং পরে ক্যাপ্টেন শাহাবুদ্দীন); লালবাজার (ক্যাপ্টেন এ.আর আযম চৌধুরী); বানপুর (ক্যাপ্টেন মুস্তাফিজুর রহমান); বেনাপোল (ক্যাপ্টেন আবদুল হালিম এবং পরে ক্যাপ্টেন তৌফিক-ই-এলাহী চৌধুরী); শিকারপুর (ক্যাপ্টেন তৌফিক-ই-এলাহী চৌধুরী এবং পরে লেফটেন্যান্ট জাহাঙ্গীর)।
- **৯নং সেক্টর :** বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলা এবং খুলনা ও ফরিদপুর জেলার অংশবিশেষ নিয়ে গঠিত। সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর এম.এ জলিল এবং পরে মেজর এম.এ. মঞ্জুর (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ও মেজর জয়নাল আবেদীন। এই সেক্টরকে টাকি, হিঙ্গলগঞ্জ ও শমসেরনগর তিনটি সাব-সেক্টরে বিভক্ত করা হয়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

⊙ **১০নং সেক্টর :** নৌ-কমান্ডো বাহিনী নিয়ে এই সেক্টর গঠিত হয়। এই বাহিনী গঠনের উদ্যোক্তা ছিলেন ফ্রান্সে প্রশিক্ষণরত পাকিস্তান নৌবাহিনীর আটজন বাঙালি নৌ-কর্মকর্তা। এরা ছিলেন চীফ পেটি অফিসার গাজী মোহাম্মদ রহমতউল্লাহ, পেটি অফিসার সৈয়দ মোশাররফ হোসেন, পেটি অফিসার আমিন উল্লাহ শেখ এম.ই-১ আহসান উল্লাহ, আর.ও-১ এ.ডব্লিউ. চৌধুরী, এম.ই-১ বদিউল আলম, ই.এন-১ এ.আর মিয়া, এবং স্টুয়ার্ড-১ আবেদুর রহমান। এই আটজন বাঙালি নাবিককে ভারতীয় নৌবাহিনীর ব্যবস্থাপনায় দিল্লির পার্শ্ববর্তী যমুনা নদীতে বিশেষ নৌ-প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এর দায়িত্বে ছিলেন ভারতীয় নৌবাহিনীর লেফটেন্যান্ট এস.কে দাস। পরে ভারতীয় কমান্ডার এম.এন সুমন্ত নেতৃত্ব দেন।

⊙ **১১নং সেক্টর :** ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলা নিয়ে গঠিত। সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর এম. আবু তাহের। মেজর তাহের যুদ্ধে গুরুতর আহত হলে স্কোয়াড্রন লীডার হামিদুল্লাহকে সেক্টরের দায়িত্ব দেয়া হয়। মহেন্দ্রগঞ্জ ছিল সেক্টরের হেডকোয়ার্টার। এই সেক্টরে প্রায় ২৫ হাজার মুক্তিযোদ্ধা যুদ্ধ করেছে। এই সেক্টরের আটটি সাব-সেক্টর ও সেগুলোর কমান্ডারদের নাম হচ্ছে : মানকারচর (স্কোয়াড্রন লীডার হামিদুল্লাহ); মহেন্দ্রগঞ্জ (লেফটেন্যান্ট মান্নান); পুরাখাসিয়া (লেফটেন্যান্ট হাশেম); ঢালু (লেফটেন্যান্ট তাহের এবং পরে লেফটেন্যান্ট কামাল); রংরা (ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান); শিববাড়ি (কয়েকজন ইপিআর জেসিও); বাগমারা (কয়েকজন ইপিআর জেসিও); এবং মহেশখোলা (জনৈক ইপিআর সদস্য)

উপসংহার : মহান মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গনে সফলতা অর্জনে পুরো দেশকে ১১টি সেক্টর এবং তিনটি ব্রিগেডে ভাগ করা হয়েছিল। এর ফলশ্রুতিতে যুদ্ধের সামগ্রিক দিকগুলোকে সংগঠিত করা সহজ হয়েছিল এবং আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতাকে অর্জন করতে পেরেছিলাম।

০৭। যুদ্ধাপরাধ কি? যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য কয়টি ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছে? যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের যৌক্তিকতা বর্ণনা করুন। *[৩৩তম বিসিএস]*

অথবা, যুদ্ধাপরাধ বলতে কি বোঝায়? বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারপ্রক্রিয়া সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

উত্তর : যুদ্ধাপরাধ মানবতাবিরোধী এক ঘৃণ্য অপরাধ। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এ বিষয়টি আরো স্পর্শকাতর। কারণ চির সবুজের দেশ বাংলার নিরীহ, নিরস্ত্র, শান্তিপ্রিয় মানুষ মুক্তিযুদ্ধকালীন সুপরিকল্পিতভাবে গণহত্যাযজ্ঞের অসহায় শিকার হয়েছিল। সর্বাধুনিক মারণাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সাড়ে সাত কোটি মানুষের উপর হিংস্র হায়েনার মত ঝাঁপিয়ে পড়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানি ষড়যন্ত্রকারীরা, সৈন্যরা, পশুরা। তাদেরকে সহায়তা করেছিল এ দেশীয় কতিপয় অমানুষ। তাই স্বাধীনতা-পরবর্তী যুদ্ধাপরাধের বিচারের বিষয়টি প্রশাসনিকভাবেই অনিবার্য হয়ে পড়ে। কিন্তু স্বাধীনতা-পরবর্তী ৪২ বছরেও সকল যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকার্য সম্পাদন করা সম্ভব হয়নি। এহেন প্রেক্ষিতে যুদ্ধাপরাধীদের জঘন্য অপরাধের শাস্তি নিশ্চিত করতে বর্তমান সরকার এক মহান উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ উদ্যোগের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে সাম্প্রতিক সময়ে কতিপয় চিহ্নিত ও স্বঘোষিত যুদ্ধাপরাধীকে আইনের হাতে সোপর্দ করে এবং বিচার প্রক্রিয়ার আওতায় নিয়ে আসে।

যুদ্ধাপরাধের সংজ্ঞা : যুদ্ধাপরাধ বলতে কোনো দেশ, জাতি, সামরিক বা বেসামরিক ব্যক্তি কর্তৃক যুদ্ধের প্রথা বা আন্তর্জাতিক নীতিমালা লঙ্ঘন করাকে বোঝায়।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে প্রকাশিত 'দ্য ব্ল্যাক বুক অফ কমিউনিজম : ক্রাইম, টেরর, রিপ্রেশান' গ্রন্থে যুদ্ধাপরাধের সাংজ্ঞিক অর্থ 'যুদ্ধের আইন বা প্রথাকে লঙ্ঘন করা' বলতে হত্যা, নির্যাতন বা

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

সাধারণ নাগরিকদের নির্বাসিত করে অধিকৃত জনপদে ক্রীতদাস শ্রম ক্যাম্পে পরিণত করা, আটককৃতদের হত্যা ও নির্যাতন, অপহৃতদের হত্যা, সামরিক বা বেসামরিক প্রয়োজনীয়তা ছাড়াই দায়িত্বজ্ঞানহীন নগর, শহর ও গ্রামাঞ্চলকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করাকে উল্লেখ করা হয়।

চতুর্থ জেনেভা কনভেনশনের ১৪৭ ধারায় যুদ্ধাপরাধ প্রসঙ্গে বলা হয় : ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা, নির্যাতন বা অমানবিক ব্যবহার এবং কারো শরীর বা স্বাস্থ্যে গুরুতর আঘাত করা বা তার দুর্দশার কারণ তৈরি, অন্যায়ভাবে কাউকে বিতাড়ন বা স্থানান্তর করা বা আটক করা, শত্রুবাহিনীর সেবাদানে বাধ্য করা, যথাযথ ও নিয়মতান্ত্রিক বিচার পাওয়ার অধিকার থেকে কাউকে ইচ্ছাকৃতভাবে বঞ্চিত করা, কাউকে জিম্মি করা, বিপুল পরিমাণে ধ্বংসযজ্ঞ চালানো ও সম্পত্তি আত্মসাৎ করা, সামরিক প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও বেআইনি ও নীতিবিরুদ্ধ ওপরের যে কোনো এক বা একাধিক কর্মকাণ্ড যুদ্ধাপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে। যুদ্ধাপরাধের ধারণার মর্মমূলে ছিল যে, একটি দেশের বা দেশের সৈন্যদের কাজের জন্য একজন ব্যক্তিও দায়ী হতে পারেন। গণহত্যা, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ, সাধারণ নাগরিকদের হয়রানি— এসবই যুদ্ধাপরাধের মধ্যে পড়ে। এসবের মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর হলো গণহত্যা।

সুতরাং যুদ্ধাপরাধ হচ্ছে কোনো যুদ্ধ বা সামরিক সংঘাত চলাকালীন সময়ে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক বেসামরিক জনগণের বিরুদ্ধে সংগঠিত, সমর্থিত নির্দিষ্ট সংজ্ঞায়িত অপরাধ কর্মকাণ্ডসমূহ।

শীর্ষ পাঁচ যুদ্ধাপরাধ : ১৯৭১ সালে পাক হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসররা বাংলাদেশে ১৭ ধরনের যুদ্ধাপরাধ, ১৩ ধরনের মানবতাবিরোধী অপরাধ এবং ৪ ধরনের গণহত্যাজনিত অপরাধসহ মোট ৫৩ ধরনের অপরাধে লিপ্ত ছিল। এ প্রসঙ্গে শীর্ষ পাঁচ যুদ্ধাপরাধ হলো–

(i) ১৯৭১ সালের ২৫ ও ২৬ মার্চ ঢাকায় 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে সেনা অভিযানে নির্বিচারে ৫০ হাজার বাঙালি নিধন। যুদ্ধকালীন সর্বমোট ৩০ লাখ বাঙালিকে নৃশংসভাবে হত্যা।

(ii) লুণ্ঠন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ ও দেশজুড়ে হত্যাকাণ্ড।

(iii) মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পূর্বপরিকল্পিতভাবে বুদ্ধিজীবী এবং বিভিন্ন পেশাজীবী যেমন চিকিৎসক, প্রকৌশলী, আমলা, ছাত্র ও সমাজকর্মীদের হত্যা এবং তাদের গণকবর দেয়া।

(iv) হাজার হাজার বাঙালি নারীকে ধর্ষণ ও নিগ্রহ।

(v) এদেশ থেকে হিন্দু জাতিসত্তাকে নির্মূলের জন্য হত্যা, ধর্ষণ ও নির্যাতন।

বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধের সাথে জড়িত সংগঠন

১. **শান্তি কমিটি :** ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তান প্রশাসনকে সহযোগিতা করার লক্ষ্যে ১০ এপ্রিল তারিখে ঢাকায় শান্তি কমিটি গঠিত হয়। শান্তি কমিটি গঠনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীকে সহায়তা করা এবং দেশকে বিচ্ছিন্নতা থেকে রক্ষা করে পাকিস্তানি হুকুমত বজায় রাখা। ক্রমান্বয়ে সারাদেশে শান্তি কমিটি গঠিত হয়। স্বাধীনতা বিরোধী রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীরা এসব কমিটি গঠন করে মুক্তিযুদ্ধের সময় হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীকে সহযোগিতা করে।

২. **রাজাকার বাহিনী :** ১৯৭১ সালের মে মাসে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সামরিক সরকার তাদের সহায়ক শক্তি হিসেবে 'রাজাকার' নামে একটি আধা-সামরিক বাহিনী গড়ে তোলে। এই বাহিনীর মোট সদস্য সংখ্যা ছিল পঞ্চাশ হাজার। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রধান সহযোগী হিসেবে এই বাহিনী দায়িত্ব পালন করে। বিশেষ করে গ্রাম অঞ্চলে এই বাহিনীর অত্যাচারের চিহ্ন আজো বিদ্যমান।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৩. **আল-বদর বাহিনী :** ১৯৭১ সালের আগস্ট মাসে ময়মনসিংহে এই বাহিনী গঠিত হয়। সম্পূর্ণ ধর্মীয় আদর্শের উপর ভিত্তি করে এই বাহিনীর গঠন ও কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী বিশেষ ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে এই বাহিনীকে ব্যবহার করা হয়। আল-বদর বাহিনীর কার্যকলাপের মধ্যে বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড অন্যতম। মিরপুর বধ্যভূমি এই বাহিনীর হত্যাযজ্ঞের সাক্ষ্য বহন করে।

৪. **আল-শাম্‌স বাহিনী :** ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সহযোগী স্বাধীনতা-বিরোধী এক শ্রেণীর ধর্মান্ধ ও শিক্ষিত তরুণ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় ও ধর্মান্ধ রাজনৈতিক দলের উদ্যোগে আল-শাম্‌স বাহিনী গঠন করে। আল বদর বাহিনীর সঙ্গে মিশে এরা দেশের স্বাধীনতাকামী ব্যক্তিদের এবং স্বাধীনতা লাভের পূর্বক্ষণে বুদ্ধিজীবীদের নির্মমভাবে হত্যা করে।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য গঠিত ট্রাইব্যুনাল : যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ সরকার দুটি ট্রাইব্যুনাল গঠন করে। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

(i) **ট্রাইব্যুনাল-১ :** আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) অ্যাক্ট ১৯৭৩-এর ১৯-এর ৬ নং সেকশনের প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ২০১০ সালের ২৫ মার্চ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ গঠন করা হয়। তখন এর চেয়ারম্যান হিসেবে ছিলেন বিচারপতি নিজামুল হক। কিন্তু স্কাইপ সংলাপের জের ধরে বিচারপতি নিজামুল হক ১১ ডিসেম্বর ২০১২ পদত্যাগ করলে ১৩ ডিসেম্বর ২০১২ ট্রাইব্যুনালের পুনর্গঠন করা হয়। পুনর্গঠিত ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান হন– বিচারপতি এটিএম ফজলে কবির এবং সদস্য হন- বিচারপতি আনোয়ারুল হক ও বিচারপতি জাহাঙ্গীর হোসেন।

(ii) **ট্রাইব্যুনাল-২ :** বিচারপ্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ গঠন করা হয় ২২ মার্চ ২০১২। পুনর্গঠিত ট্রাইব্যুনাল অনুযায়ী ট্রাইব্যুনাল-২ এর বর্তমান চেয়ারম্যান হলেন– বিচারপতি ওবায়দুল হাসান এবং সদস্য বিচারপতি মোঃ শাহিনুর ইসলাম ও বিচারপতি মজিবুর রহমান মিয়া।

ট্রাইব্যুনালের রায় : এ পর্যন্ত (২৭ এপ্রিল ২০১৫) ট্রাইব্যুনাল ১৭টি রায় প্রদান করেন। যুদ্ধাপরাধী ট্রাইব্যুনাল প্রথম রায় প্রকাশ করেন ২১ জানুয়ারি ২০১৩। ট্রাইব্যুনাল-২ এর এ রায়ে যুদ্ধাপরাধী মাওলানা আবুল কালাম আযাদকে ফাঁসির আদেশ প্রদান করা হয়। বর্তমানে তিনি পলাতক আছেন। এরপর যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনাল দ্বিতীয় রায় প্রদান করেন ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৩। ট্রাইব্যুনাল-২ এ রায়ে কাদের মোল্লাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করেন। এরপরই যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনাল তৃতীয় রায় প্রদান করেন ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৩। ট্রাইব্যুনাল-১ এর এ রায়ে মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে ফাঁসির আদেশ প্রদান করা হয়। যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনাল চতুর্থ রায় প্রদান করে ৯ মে ২০১৩। ট্রাইব্যুনাল-২ এর এ রায়ে মুহাম্মদ কামারুজ্জামানকে ফাঁসির আদেশ প্রদান করা হয়।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের যৌক্তিকতা : বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধের প্রকৃতি খুবই ভয়াবহ ও লোমহর্ষক। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানি সশস্ত্র হায়েনা বাহিনী তাদের এদেশীয় কুচক্রী মহল নিয়ে দেশের অভ্যন্তরে হত্যা, লুট, ধর্ষণ, অগ্নিকাণ্ড ও বিভিন্ন ধ্বংসাত্মক তাণ্ডবলীলা চালায়। এরা নির্বিচারে গণহত্যা, গণধর্ষণ, লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগে অংশ নেয়। ভয়াল দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ৩০ লাখ মুক্তিকামী বাঙালি শাহাদতবরণ করে, সম্ভ্রম হারায় ২ লাখ মা-বোন। তাই স্বাভাবিক কারণেই বাংলাদেশে

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের যৌক্তিকতা রয়েছে। এছাড়াও নিম্নোক্ত কারণেও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করার যৌক্তিকতা আছে বলে আমি মনে করি–

১. **আইনভঙ্গ, সনদ ও চুক্তিপত্র অমান্য :** মুক্তিযুদ্ধকালে বর্বর পাকিস্তানিরা আইনভঙ্গ, সনদ ও চুক্তিপত্র অমান্যের সর্বকালের রেকর্ড ভঙ্গ করে। এ সময় ইয়াহিয়া খান ও তার সাঙ্গোপাঙ্গরা বিমান ও নৌবাহিনী ব্যবহারের সংশ্লিষ্ট সকল আইন ভঙ্গ, জাতিসংঘের সনদ পদদলিত, ১৯৪৮ সালের গণহত্যা চুক্তিসভাপত্র অমান্য, ১৯৪৯ সালের চারটি চুক্তিসভাপত্রও অগ্রাহ্য, বিশেষ করে আন্তর্জাতিক নয় এমন এক সশস্ত্র সংঘর্ষকালে যে সকল নিয়ম মানতে প্রতিটি রাষ্ট্র বাধ্য তা অমান্য, নিরাপরাধ লোকের অধিকার হরণ, সংঘর্ষকালে ত্রাণকার্য সম্পর্কিত আইনকানুন অগ্রাহ্য এবং সংস্কৃতি সংরক্ষণ সম্পর্কিত আইনও তারা ভঙ্গ করেছে।

২. **হত্যা ও সম্পত্তি বিনষ্ট :** পাকিস্তানিরা জাতিগত, জাতীয়তাগত, ভাষাগত, ধর্মগত, সংস্কৃতিগত, গোত্রগত, ভেদনীতি গ্রহণ করে অসামরিক নর-নারীকে হত্যা, অসামরিক জনসাধারণের সম্পত্তি বিনষ্ট এবং একটি জাতির সকল অস্তিত্ব ধ্বংসের হীন প্রচেষ্টা চালিয়েছে। আর তাদের এ প্রচেষ্টায় সহায়তা করেছে এদেশীয় ঘৃণ্য দোসররা।

৩. **বিদেশী পত্রিকার প্রতিবেদন ও প্রতিবেদকের মন্তব্যে ধ্বংসযজ্ঞ :** ১৯৭১ সালে সংঘটিত মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহ চিত্র শুধুমাত্র দেশীয় পত্রিকার মাঝে সীমাবদ্ধ ছিল না বরং দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বের নামকরা পত্রিকাগুলোর সচিত্র প্রতিবেদন ও প্রতিবেদকের মন্তব্যেও ফুটে উঠেছে। নিচে এমন কয়েকটি পত্রিকার প্রতিবেদন ও প্রতিবেদকের মন্তব্য উল্লেখ করা হলো–

ক. **টাইমস্ অফ ইন্ডিয়া :** আমেরিকান এইড (AID) কার্যসূচির অধীনে ৩ বছর ঢাকায় ছিলেন জন রোড নামক জনৈক আমেরিকান কর্মকর্তা। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটে বৈদেশিক সম্পর্ক কমিটির সামনে যে জবানবন্দী দেন (টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ২ মে ১৯৭১) তাতে তিনি বলেন যে, পূর্ব বাংলায় জঙ্গলের আইন চালু রয়েছে। সুপরিকল্পিত উপায়ে নিরস্ত্র বেসামরিক জনসাধারণ, বুদ্ধিজীবী হিন্দুদের হত্যা করা হচ্ছে। তিনি ২৯ মার্চ ১৯৭১ রমনা কালীবাড়ি পরিদর্শন করে দেখেন যে, সেখানে ২০০ থেকে ৩০০ লোক হত্যা করা হয়েছে। মেশিনগানের গুলি খেয়ে, আগুনে পুড়ে নর-নারী ও শিশুদের মৃতদেহ পড়ে আছে। সকল জায়গা ধূলিসাৎ করে দেয়া হয়।

খ. **নিউইয়র্ক টাইমস্ :** নিউইয়র্ক টাইমস্ ৩০ মার্চ ১৯৭১ সালে প্রদত্ত রিপোর্টে উল্লেখ করে, সর্বত্র বেসামরিক ব্যক্তিদের সেনাবাহিনী হত্যা করেছে।

গ. **টাইম :** ৩ মে ১৯৭১ নিউইয়র্কের সাপ্তাহিক টাইম পত্রিকায় উল্লেখ করা হয়, একজন যুবক সৈন্যদের কাছে আকুল প্রার্থনা জানায় তাকে যা কিছু করা হোক না কেন, তার ১৭ বছরের বোনটিকে যেন রেহাই দেয়া হয়। তার সামনেই বেয়নেট দিয়ে বোনটিকে হত্যা করে পশুরা।

ঘ. **ল্য এক্সপ্রেস পত্রিকার প্রতিবেদকের মন্তব্য :** ফ্রান্সের 'ল্য এক্সপ্রেস' পত্রিকার সাংবাদিক তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা দেন এভাবে, 'প্রতি রাতেই আমি মেশিনগান ও মর্টারের গুলির শব্দ শুনতাম। বাঙালিদের তাড়িয়ে তাড়িয়ে ধরতো সৈন্যরা, তারপর যানবাহনের পেছনে এমনভাবে বেঁধে দিত যাতে তাদের মাথা মাটিতে বারবার এসে আঘাত হানে।'

ঙ. **সানডে টাইমস :** সানডে টাইমস পত্রিকায় পাকিস্তানস্থ প্রতিনিধি (১৩ জুন ১৯৭১ সংখ্যা) জানিয়েছেন যে, 'পুরান ঢাকায় কয়েকটি এলাকা নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার সময় সান্ধ্য আইনের সময় যে শত শত মুসলমানদের পাকড়াও করা হয়েছিল তাদেরও কোনো চিহ্ন পরবর্তীতে

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

আর মেলেনি।' ১৫ এপ্রিল ১৯৭১ তিনি ঢাকায় ঘোরার সময় দেখেছেন যে, 'ইকবাল হলের (বর্তমান জহুরুল হক হল) দুটি সিঁড়িতে প্রচুর রক্ত তখনও ছড়িয়ে আছে এবং হলের ছাদে চারজন ছাত্রের মাথা তখনও পচছে। দেয়ালে গুলির দাগ এবং রীতিমত ডিডিটি পাউডার ছড়িয়ে দেয়া সত্ত্বেও চারদিকে দুর্গন্ধ। মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে ২৩ জন মহিলা ও শিশুর পচা লাশ সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।'

চ. **সানডে টেলিগ্রাফ :** লন্ডনের সানডে টেলিগ্রাফ পত্রিকা ৪ এপ্রিল ১৯৭১ পাকিস্তানি কুচক্রীদের মানসিকতা ও ষড়যন্ত্র সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা ও মন্তব্যে লেখে, 'গত সপ্তাহে পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাবাহিনী নৃশংসভাবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ হিসেবে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকামী পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা আন্দোলনের জীবনীশক্তি নিঃশেষ করা ছাড়া আর সবই করেছে। পাকিস্তানের জেনারেল ও কর্নেলেরা খুব সাবধানে দু'বছর ধরে যে পরিকল্পনা করেছে তারই ফল এই নৃশংসতা। তাদের অনেকেই ব্রিটিশদের হাতে ট্রেনিংপ্রাপ্ত, অনেকেই চারিত্রিক নম্রতায় না হলেও বাহ্যিক ব্যবহারে 'ব্রিটিশদের চাইতেও ব্রিটিশ'।'

বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়া : ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর প্রায় ৯৩,০০০ সৈন্য ঢাকার রমনা রেসকোর্স (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ময়দানে ভারত ও বাংলাদেশ বাহিনীর যৌথ কমান্ডের নিকট আত্মসমর্পণ করে। আত্মসমর্পণে অন্তর্ভুক্ত ছিল পাকিস্তানের সকল আধা-সামরিক বাহিনী ও বেসামরিক সশস্ত্রবাহিনীসহ স্থল, বিমান ও নৌ বাহিনীর সকল সদস্য। আত্মসমর্পণের দলিলে আনুষ্ঠানিক নিশ্চয়তা প্রদান করা হয় যে, আত্মসমর্পণকারী সকল ব্যক্তির সঙ্গে জেনেভা কনভেনশনের বিধান অনুযায়ী মর্যাদাপূর্ণ ও সম্মানজনক আচরণ করা হবে এবং তাদের নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিশ্চিত করা হবে। নিচে বাংলাদেশের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়া আলোচনা করা হলো :

১. **বিচারের ঘোষণা ও আইন পাস :** ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান থেকে দেশে আসার পর রেসকোর্স ময়দানে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ঘোষণা দেন। Bangladesh Collaborators (Special Tribunals) Order, 1972 নামে বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য প্রথম আইন পাস হয়।

২. **দালাল আইন প্রয়োগ :** ১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতির ঘোষণা দ্বারা প্রবর্তিত দালাল আইনটির প্রয়োগ শুরু হয় ফেব্রুয়ারি মাস থেকে তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু করার মাধ্যমে।

৩. **সংশোধনী ও বিচার আরম্ভ :** ১৯৭২ সালে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য গঠিত আইনটির তিন দফা সংশোধনী হয়। এ আইনের অধীনে ৩৭ হাজারেরও বেশি ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং বিভিন্ন আদালতে তাদের বিচার আরম্ভ হয়।

৪. **সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা :** ১৯৭৩ সালের ৩০ নভেম্বর রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৮ ধরনের অপরাধে জড়িতদের বাইরে রেখে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। এই ১৮ ধরনের অপরাধ হলো— ১. বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানোর চেষ্টা; ২. বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানোর ষড়যন্ত্র; ৩. রাষ্ট্রদ্রোহিতা; ৪. হত্যা; ৫. হত্যার চেষ্টা; ৬. অপহরণ; ৭. হত্যার উদ্দেশ্যে অপহরণ; ৮. আটক রাখার উদ্দেশ্যে অপহরণ; ৯. অপহৃত ব্যক্তিকে গুম ও আটক রাখা; ১০. ধর্ষণ; ১১. দস্যুবৃত্তি; ১২. দস্যুবৃত্তিকালে আঘাত; ১৩. ডাকাতি; ১৪. খুনসহ ডাকাতি; ১৫. হত্যা বা মারাত্মক আঘাতসহ দস্যুবৃত্তি অথবা ডাকাতি; ১৬. আগুন অথবা বিস্ফোরক দ্রব্যের সাহায্যে ক্ষতিসাধন; ১৭. বাড়িঘর ধ্বংসের উদ্দেশ্যে আগুন অথবা বিস্ফোরক দ্রব্য ব্যবহার; ১৮. ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৩৬ ধারা (আগুন অথবা বিস্ফোরক দ্রব্যের সাহায্যে কোনো জলযানের ক্ষতিসাধন) অথবা এসব কাজে উৎসাহ দান।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৫. **সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার প্রভাব :** বঙ্গবন্ধু কর্তৃক সাধারণ ক্ষমা ঘোষণাকালীন কারাগারে ৩৭ হাজার ৪১ জন বন্দি ছিল। ৭৩টি দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল করে তাদের বিচার কাজ চালানো হচ্ছিল। এ সাধারণ ক্ষমার আওতায় ২৫ হাজার ৭১৯ জন অভিযুক্ত ব্যক্তি ছাড়া পেয়ে যায়। সুনির্দিষ্ট অভিযোগে আটক বাকি প্রায় ১১ হাজারের যুদ্ধাপরাধী হিসেবে বিচার চলছিল। ১৯৭৩ সালের অক্টোবর পর্যন্ত ২ হাজার ৮৮৪টি মামলার নিষ্পত্তি হয়। এতে মৃত্যুদণ্ড হয়েছিল ১৯ জনের, বাকিদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। মূলত দালাল আইনেই এ বিচারকার্য পরিচালনা করা হয়।

৬. **যুদ্ধবন্দিদের বিচারের দাবি :** ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ৯৩,০০০ আত্মসমর্পণকারী যুদ্ধবন্দিকে ভারতীয় হেফাজতে নিয়ে যাওয়া হয়। আত্মসমর্পণের পরপরই বাংলাদেশ এ পর্যায়ে ১৯৫ জন পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিকে যুদ্ধাপরাধ ও গণহত্যার অভিযোগে বিচারের জন্য শনাক্ত করে। তবে ১৯৭২ সালের জুলাই মাসে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে সম্পাদিত সিমলা চুক্তি অনুযায়ী যুদ্ধবন্দিদের নিরাপদে পাকিস্তানে ফেরত পাঠানোর সম্ভাবনা দেখা দেয়, এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ১৯৫ জন যুদ্ধবন্দির বিচারের জোর দাবি জানাতে থাকে। প্রস্তাবিত বিচারের বিরুদ্ধে পাকিস্তান আন্তর্জাতিক আদালতে একটি আনুষ্ঠানিক আবেদনও পেশ করে।

৭. **চুক্তি স্বাক্ষর :** যুদ্ধবন্দিদের বিচারের দাবির প্রেক্ষিতে ভারত ও পাকিস্তানের প্রতিনিধিরা ১৯৭৩ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে ইসলামাবাদ ও দিল্লিতে আরেকটি চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য পুনরায় বৈঠকে মিলিত হয়। দুই দেশের মধ্যে সম্পাদিত শেষ চুক্তি অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট গুরুতর যুদ্ধাপরাধের দায়ে অভিযুক্ত ১৯৫ জন ব্যতীত বাকি সকল যুদ্ধবন্দিকে পাকিস্তানে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা চূড়ান্ত হয়।

৮. **যুদ্ধবন্দিদের বিচারের দাবি প্রত্যাহার :** ১৯৭৪ সালে লাহোরে ইসলামী ঐক্য সংস্থার শীর্ষ সম্মেলন এবং পাকিস্তান কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের পর তিনটি দেশ অর্থাৎ পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা নয়াদিল্লিতে পুনরায় বৈঠকে মিলিত হয় এবং দক্ষিণ এশিয়ার শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার স্বার্থে বাংলাদেশকে ১৯৫ জন যুদ্ধবন্দির বিচারের দাবি প্রত্যাহারে রাজি করানো হয়।

৯. **নির্বাচনী ইশতেহারে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার :** ২০০৮ সালের নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সংক্রান্ত বিষয়টি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নির্বাচনী ইশতেহারে অন্তর্ভুক্ত করে এবং জনগণকে এ মর্মে নির্বাচনে প্রতিশ্রুতি দেয় যে, তারা সরকার গঠন করতে পারলে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বাংলার এ মাটিতে নিশ্চিত করবে। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে জয়ী হয়। এরপর সরকার গঠন করে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের লক্ষ্যে আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু করে।

১০. **প্রজ্ঞাপন জারি ও সংশোধনী পাস :** মার্চ ২০১০ যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য ট্রাইব্যুনাল, তদন্ত সংস্থা ও আইনজীবী প্যানেল গঠন করে প্রজ্ঞাপন জারি করে। ২০০৯ সালের ৯ জুলাই জাতীয় সংসদে ১৯৭৩ সালের আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) অ্যাক্টের সংশোধনী পাস করা হয়।

দেশে দেশে যুদ্ধাপরাধ ও বিচার : যুদ্ধাপরাধ একটি আন্তর্জাতিক অপরাধ। এটি এখন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের আওতায় চলে এসেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর শান্তি ও মানবতার বিরুদ্ধে যে কোনো অপরাধকে যুদ্ধাপরাধ হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়েছে। বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দেশে নানা

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

আঙ্গিকে যুদ্ধাপরাধ সংঘটিত হয়েছে। আবার যুদ্ধাপরাধের বিচারে গঠিত হয়েছে বিভিন্ন ট্রাইব্যুনাল ও কোর্ট। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১. **যুদ্ধাপরাধ ও আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালের ধারণা :** ১৮৯৯ সালে ফিলিপাইন-আমেরিকান যুদ্ধকালীন সময়ে শান্তিপূর্ণ সমাধানের উদ্দেশ্যে হল্যান্ডে আয়োজিত Hague Peace Conference-1-এ প্রথমবারের মতো Laws of war এবং War crime-গুলোকে চিহ্নিত করে তা আন্তর্জাতিক আইন হিসেবে গ্রহণ করার জন্য প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা হয়। এখানে প্রথমবারের মতো যুদ্ধাপরাধ ও আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালের কনসেপ্টের সূচনা হয়েছিল।

২. **উল্লেখযোগ্য ট্রাইব্যুনাল :** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যুদ্ধাপরাধ নিয়ে বিশ্বের ছোট বড় দেশগুলো সোচ্চার হওয়ায় বিভিন্ন ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– ন্যুরেমবার্গ ট্রাইব্যুনাল, টোকিও ট্রাইব্যুনাল, যুগোস্লাভিয়া ট্রাইব্যুনাল ও রুয়ান্ডা ট্রাইব্যুনাল। ট্রাইব্যুনালগুলোর পরিচিতি ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো :

দেশে দেশে যুদ্ধাপরাধ ও বিচার

ট্রাইব্যুনাল	প্রতিষ্ঠা	কার্যক্রম শুরু-শেষ	রায় প্রকাশ	অভিযুক্ত	শাস্তি
ন্যুরেমবার্গ ট্রাইব্যুনাল	—	১৮ অক্টোবর ১৯৪৫-	১ অক্টোবর ১৯৪৬	দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়	মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত-১২ জন যাবজ্জীবন
		৩১ আগস্ট ১৯৪৬	—	জার্মানির অভিযুক্ত ২৪ নেতা	কারাদণ্ড-৩ জনএবং কারাদণ্ড-৪ জন
টোকিও ট্রাইব্যুনাল	২০ জুলাই ১৯৪৫	১৯৪৬ সালের মে/জুন মাসে	নভেম্বর ১৯৪৮	জাপানের ২৮ জন যুদ্ধাপরাধী	মৃত্যুদণ্ড ও বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেয়া হয়।
যুগোস্লাভিয়া ট্রাইব্যুনাল	২৫ মে ১৯৯৩-এ গঠিত এবং	৮ নভেম্বর ১৯৯৪-চলমান	—	বসনিয়ার সার্ব নেতা ও	—
	১৭ নভেম্বর ১৯৯৩ প্রতিষ্ঠিত			সামরিক কমান্ডারগণ	
রুয়ান্ডা ট্রাইব্যুনাল	৮ নভেম্বর ১৯৯৪	১৯৯৭	১৯৯৮	রুয়ান্ডা গণহত্যায় জড়িত তুতসিরা	রুয়ান্ডার সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান।

৩. **আইসিসি গঠন :** বিভিন্ন দেশের যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য ২০02 সালে নেদারল্যান্ডের দি হেগ শহরে গঠন করা হয় ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্ট (আইসিসি)। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ইসরাইলসহ বেশ কয়েকটি দেশ এ আন্তর্জাতিক আদালতের বিরোধিতা করে এবং এর সাথে যে কোনো ধরনের সম্পৃক্ততা রাখতে অস্বীকার করে।

৪. **বিশেষ আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা কোর্ট :** যুদ্ধাপরাধের বিচারের জন্য বিভিন্ন দেশে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় আইনের সমন্বয়ে বিশেষ আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা কোর্ট স্থাপিত হয়। যেমন– সিয়েরা লিওনের বিশেষ আদালত, লেবাননের বিশেষ ট্রাইব্যুনাল, পূর্ব তিমুরে দিলি ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট, কম্বোডিয়া ট্রাইব্যুনাল ইত্যাদি।

উপসংহার : ইতিহাসের শিক্ষা হচ্ছে– ক্ষমতাগর্বী, অন্যায়কারী সব সময়ই আত্মধ্বংসী নীতি গ্রহণ করে পৃথিবীর নিরপরাধ মানুষের দুর্দশার কারণ হয়, পরিণামে সে নিজেও ধ্বংস হয়ে যায়। হিটলারের মতো বহু অমানুষেরই শেষ পরিণতি একই। ইয়াহিয়া খানরাও ইতিহাসের হাত থেকে রক্ষা পাবে না। যেমন পায়নি তাদের এদেশীয় দোসররা। যাদেরকে আজ স্বাধীনতার প্রায় ৪২ বছর পর যুদ্ধাপরাধের দায়ে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছে। কেবল বাংলাদেশিই নয়, পাকিস্তানিসহ সকল মানবতাবিরোধী যুদ্ধাপরাধীদের যথার্থ বিচার বাংলাদেশের মানুষ প্রত্যাশা করে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

সিলেবাসের আলোকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

০৮। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের পটভূমি আলোচনা করুন এবং সেই সাথে বাংলা ভাষার বিশ্বায়ন সম্পর্কে আলোচনা করুন।

উত্তর : পাকিস্তান সৃষ্টির শুরু থেকেই পাকিস্তানের জাতীয় নেতৃত্ব সাংস্কৃতিক মিশ্রণের এক কেন্দ্রীভূত নীতি গ্রহণ করে। এ নীতির চাপ অধিকমাত্রায় অনুভূত হয় পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে পূর্ব বাংলায় তথা পূর্ব পাকিস্তানে। শুধু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেই নয়, জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বিমাতাসুলভ আচরণ শুরু করে। এতে পূর্ব পাকিস্তানের যুব সম্প্রদায়, বুদ্ধিজীবী এবং সর্বোপরি আপামর জনসাধারণের মধ্যে চরম হতাশার সৃষ্টি হয়, সৃষ্টি হয় এক চাপা অসন্তোষ। আর এ হতাশা ও অসন্তোষের তীব্র ও ব্যাপক প্রসার ঘটে ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। মূলত দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ধর্মীয় কারণে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান ইসলামী রাষ্ট্র হলেও এর সমাজ ব্যবস্থায় একক আদর্শগত কোনো যোগসূত্র ছিল না। এর কারণ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার ভাষাগত বিরোধ। এ কারণে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ পাকিস্তানের মৌলিক আদর্শের সাথে কোনোদিন একাত্মতা অনুভব করতে পারেনি। আর এ কারণেই পাকিস্তান সৃষ্টির অব্যবহিত পরেই ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পূর্ব বাংলায়ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ অধ্যাপক আবুল কাসেমের নেতৃত্বে 'তমুদ্দুন মজলিস' নামক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের মাধ্যমে ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। এ আন্দোলনের প্রভাব বাংলার সুদীর্ঘ রাজনৈতিক ইতিহাসের পরতে পরতে দেখতে পাওয়া যায় এবং যার সার্থক পরিণতি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

ভাষা আন্দোলনের ঐতিহাসিক পটভূমি : *১নং প্রশ্নের 'ভাষা আন্দোলনের ঐতিহাসিক পটভূমি' অংশ দেখুন।*

ভাষা আন্দোলন এবং বাংলা ভাষার বিশ্বায়ন : ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি এ দেশের আপামর ছাত্র সমাজের বুকের তাজা রক্তের বিনিময়ে যে মাতৃভাষা বাংলা অর্জিত হয়েছে তার গণ্ডি এখন শুধু দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং একুশে ফেব্রুয়ারি এবং ভাষা আন্দোলনের চেতনা আজ ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। ভাষার জন্য বাঙালি জাতির এ আত্মত্যাগ আজ নতুন করে বিশ্বকে ভাবতে শিখিয়েছে, মাতৃভাষার গুরুত্ব সম্পর্কে। ১৭ নভেম্বর ১৯৯৯ জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান এবং সাংস্কৃতিক সংস্থা (UNESCO) সাধারণ পরিষদে আমাদের জাতীয় চেতনার ধারক একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তের মানুষ আজ বাঙালিদের মাতৃভাষার জন্য আত্মত্যাগের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছে। সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত বাংলা ভাষা আজ যে বৈশ্বিক মর্যাদা লাভ করেছে তা মূলত আমাদের জাতীয় চেতনাবোধের বিজয়। ইউনেস্কোর গৃহীত প্রস্তাবে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে বলা হয় যে, "সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে ভাষা সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার। মাতৃভাষার প্রচলন কেবল ভাষাগত বৈচিত্র্য এবং বহু ভাষাভিত্তিক শিক্ষাকেই উৎসাহিত করবে না, তা ভাষাগত এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উন্নয়ন অনুধাবনের ক্ষেত্রে সহায়তা করবে।" বাংলাদেশসহ বিশ্বের মোট ১৯৩টি দেশ বর্তমানে একুশে ফেব্রুয়ারিকে পালন করছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে। বাংলা ভাষা ও বাঙালির জন্য এ প্রাপ্তি সহস্র মর্যাদার প্রতীক।

আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে ২১ ফেব্রুয়ারি এবং এর মাধ্যমে আমাদের ভাষা আন্দোলনের চেতনার সাথে সংযোগ ঘটেছে বিশ্বায়ন এবং আন্তর্জাতিকতাবাদের। আমাদের ভাষা আন্দোলন আজ শুধু বাংলাদেশ বা বাঙালি জাতির ভাষা আন্দোলন নয়, বিশ্বের যে জাতিই মায়ের

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

ভাষায় কথা বলার জন্য আন্দোলন করুক না কেন, সেখানে উৎসাহ যোগাবে বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। অমর একুশের আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি বয়ে এনেছে অসাধারণ গৌরব। '৫২ থেকে '৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত বাঙালি জাতি স্বায়ত্তশাসন, স্বাধিকার ও আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য যে আন্দোলন করেছিল তা আজ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। বিশ্বায়নের এ নতুন শতাব্দীতে আমাদের মহান একুশে ফেব্রুয়ারি যোগ করেছে এক নতুন মাত্রা। ২১ ফেব্রুয়ারি আজ উদযাপিত হচ্ছে নতুন আঙ্গিকে, নতুন মাত্রায়, আন্তর্জাতিকতাবাদের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে। বিশ্বের সকল দেশের কাছে বাংলাদেশ আজ ভাষাভিত্তিক জাতীয় আন্দোলনের মূর্ত প্রতীক।

উপসংহার : উপর্যুক্ত আলোচনার মাধ্যমে এ কথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, পাকিস্তান সৃষ্টির অব্যবহিত পর থেকেই পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানকে তাদের উপনিবেশ হিসেবে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়। যে উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে তারা প্রথমে বাংলা ভাষার ওপরে আঘাত হানে। আর ১৯৫২ সালে রাষ্ট্রভাষার প্রশ্ন নিয়ে বাঙালি জাতি সর্বপ্রথম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত হয়। ভাষা আন্দোলনের সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হয়েই বাঙালি জাতি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর প্রতিটি ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিতে সক্ষম হয়। ১৯৫২ সাল থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতিটি স্তরে প্রেরণা যুগিয়েছে ভাষা আন্দোলনের রক্তরাঙা ইতিহাস। ভাষার জন্য বাংলামায়ের সন্তানদের আত্মত্যাগ দেশের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও আজ স্বীকৃতি লাভ করেছে। UNESCO কর্তৃক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে ঘোষিত হওয়ার পর বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে বাঙালি ও বাংলা ভাষার গৌরব। বর্তমানে বিশ্বের প্রায় ৩০ কোটি লোক বাংলা ভাষায় কথা বলে। এ শুধু বাংলা ভাষার বিশ্বায়নই নয়, বরং বাঙালি জাতির বিজয়। আমাদের শহীদদের আত্মত্যাগের ফলেই আজ আমরা গর্ব করতে পারি। ভাষা আন্দোলনের আদর্শকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত করতে পারলেই বায়ান্নর শহীদদের আত্মদান সার্থক হবে।

০৯ ‖ ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা উল্লেখ করুন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয়ের কারণ কী?

উত্তর : পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ১৯৫১ সালে পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ নানা টালবাহানা করে নির্বাচনে অহেতুক বিলম্ব ঘটায়। কারণ মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ সাধারণ নির্বাচনে জনগণের মুখোমুখি হতে ভীত ছিলেন। কিন্তু আন্দোলনের চাপে অবশেষে পাকিস্তান সরকার ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে পূর্ববাংলা আইন পরিষদের নির্বাচন দিতে বাধ্য হয়। এ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগকে মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে পূর্ববাংলার রাজনৈতিক দলগুলো এ কে ফজলুল হক, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে। যুক্তফ্রন্ট ২১ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে।

১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা কর্মসূচি : পূর্ব পাকিস্তানের নির্যাতিত ও অধিকার বঞ্চিত মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী কর্মসূচি ২১টি দফায় বিন্যস্ত করা হয়। যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা কর্মসূচি ছিল নিম্নরূপ :

১. বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হবে।
২. ক্ষতিপূরণ ব্যতিরেকে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ, ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বণ্টন এবং করের পরিমাণ হ্রাস করা হবে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৩. পাট ব্যবসায়কে জাতীয়করণ ও পাটের ন্যায্য মূল্য প্রদান করা হবে। সেই সাথে মুসলিম লীগ আমলে পাট ব্যবসায়ের দালালদের খুঁজে বের করে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে।
৪. সমবায়ের মাধ্যমে শিল্প প্রতিষ্ঠার দ্বারা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে উন্নতি সাধন করা হবে।
৫. পূর্ববাংলাকে লবণ শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য সমুদ্র উপকূলে কুটির শিল্প ও বৃহৎ শিল্পের লবণ তৈরির কারখানা স্থাপন করা হবে।
৬. শিল্প ও কারিগর শ্রেণীর গরিব বাস্তুহারাদের কাজকর্মের আশু ব্যবস্থা করে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে।
৭. খাল খনন ও সেচের ব্যবস্থা করে দেশের মানুষকে বন্যা ও দুর্ভিক্ষের কবল থেকে রক্ষার ব্যবস্থা করা হবে।
৮. পূর্ববঙ্গে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থার বিধান অনুযায়ী শ্রমিকদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধান করা হবে।
৯. দেশের সর্বত্র অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন ও শিক্ষকদের ন্যায়সঙ্গত বেতন ও ভাতা বৃদ্ধি করা হবে।
১০. সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যকার ব্যবধান দূরীকরণ এবং মাতৃভাষা বাংলার মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে।
১১. বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত সকল কালাকানুন বাতিল ও রহিত করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হবে।
১২. প্রশাসনিক ব্যয় সংকোচন, উচ্চ ও নিম্নপর্যায়ের কর্মচারীদের বেতনে সমতা আনয়ন এবং যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীদের বেতন এক হাজার টাকা নির্ধারণ করা হবে।
১৩. সকল প্রকার দুর্নীতি, ঘুষ ও স্বজনপ্রীতি বন্ধ করা হবে এবং ১৯৪০ সাল উত্তর প্রত্যেক সরকারি অফিসার ও শিল্পপতিদের সম্পত্তির হিসাব গ্রহণ করা হবে।
১৪. জননিরাপত্তা আইন ও অর্ডিন্যান্স কর্তৃক ধৃত সকল বন্দিদের মুক্তিদান এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও বাক্‌স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান করা হবে।
১৫. বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথক করা হবে।
১৬. বর্ধমান হাউসকে (বর্তমান বাংলা একাডেমি) বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণাগারে পরিণত করা হবে।
১৭. ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মরণে একটি শহীদ মিনার নির্মাণ এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারবর্গকে ক্ষতিপূরণ দান করা হবে।
১৮. একুশে ফেব্রুয়ারিকে 'শহীদ দিবস' এবং সরকারি ছুটির দিন পালন করা হবে।
১৯. ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ববাংলার স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা, করাচি থেকে নৌবাহিনীর সদর দপ্তর পূর্ববাংলায় স্থানান্তর, অস্ত্রে স্বনির্ভর হওয়ার জন্য পূর্ববাংলায় অস্ত্র কারখানা স্থাপন এবং আনসার বাহিনীকে সশস্ত্র বাহিনী হিসেবে স্বীকৃতি দান করা হবে।
২০. যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার দ্বারা আইনসভার কার্যকাল বৃদ্ধি করা হবে না এবং নিরপেক্ষ নির্বাচনের সুবিধার্থে সাধারণত নির্বাচনের ছয় মাস পূর্বেই মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করবে।
২১. আইনসভার কোনো সদস্যপদ শূন্য হলে তিন মাসের মধ্যে উপ-নির্বাচনের মাধ্যমে তা পূরণ করা হবে এবং এরূপ উপ-নির্বাচনে যদি যুক্তফ্রন্ট মনোনীত প্রার্থী পর পর তিনটি আসনে পরাজিত হয় তবে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করবে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয়ের কারণ : ১৯৫৪ সালের পূর্ববাংলা আইনসভার নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভিত ধসে পড়ে এবং যুক্তফ্রন্টের বিজয় সূচিত হয়। নিচে মুসলিম লীগের পরাজয়ের কারণসমূহ আলোচনা করা হলো :

১. **মুসলিম লীগের স্বার্থান্বেষী মনোভাব :** পূর্ববাংলার জনগণের স্বার্থের প্রতি মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ চরম অবজ্ঞা প্রদর্শন করে। এ দল বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবির বিরোধিতা করলে পূর্ববাংলার জনগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। কিন্তু মুসলিম লীগ বাঙালিদের বিক্ষোভ উপলব্ধি করেও পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থবাদীদের অনুকূলে কাজ করে। ফলে মুসলিম লীগের পরাজয় এবং যুক্তফ্রন্টের বিজয় অনিবার্য হয়ে ওঠে।

২. **আদর্শগত কোন্দল ও অন্তর্দ্বন্দ্ব :** অভ্যন্তরীণ আদর্শগত কোন্দল ও অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে মুসলিম লীগ পূর্ববাংলায় সাংগঠনিক দিক দিয়ে বেশ দুর্বল হয়ে পড়ে। অপরদিকে, যুক্তফ্রন্টের সাংগঠনিক ক্ষমতা ছিল আকর্ষণীয়। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবে বিভিন্ন অঞ্চলকে স্বায়ত্তশাসন ও সার্বভৌমত্ব দেয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ নানা ছুতোয় লাহোর প্রস্তাবের শর্তাবলি প্রত্যাখ্যান করে। মুসলিম লীগের এ দুর্বলতার সুযোগে যুক্তফ্রন্ট সহজেই জনমতকে তাদের পক্ষে টেনে নেয়। ফলে চুয়ান্নর নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবি হয়।

৩. **একুশে ফেব্রুয়ারির বিয়োগান্ত ঘটনা :** পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার পায়তারা শুরু করে। অথচ পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ ভাগ মানুষের মুখের ভাষা ছিল বাংলা। তাদের এ চক্রান্তের প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' স্লোগান দিয়ে মিছিল বের করে। তখন মুসলিম লীগের দলীয় মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীনের নির্দেশে পুলিশ ছাত্রদের শান্তিপূর্ণ মিছিলে গুলি চালায়। ফলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে সালাম, রফিক, বরকত, জব্বার প্রমুখ সম্ভাবনাময় তরুণ। এ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে দেশের আপামর জনসাধারণ মুসলিম লীগের প্রতি বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, যার দরুন মুসলিম লীগের পরাজয় এবং যুক্তফ্রন্টের বিজয় ত্বরান্বিত হয়।

৪. **স্বায়ত্তশাসনের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন :** পূর্ববাংলার জনগণ স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নে প্রথম থেকেই সচেতন ছিল। লাহোর প্রস্তাবের মূল বক্তব্যই ছিল স্বায়ত্তশাসন। কিন্তু স্বাধীনতার পর মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ স্বায়ত্তশাসন প্রদানের পরিবর্তে পূর্ববাংলার জনগণের ওপর জাতিগত নিপীড়নের পথ বেছে নেয়। ফলে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে বাঙালি জনগণ মুখরিত হয়ে ওঠে, যা যুক্তফ্রন্টের বিজয় এবং মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয় ডেকে আনে।

৫. **নির্যাতনমূলক পদক্ষেপ :** মুসলিম লীগের পরাজয়ের অন্যতম কারণ হলো জনগণের প্রতি নির্যাতনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ। মুসলিম লীগ পূর্ববাংলার বিভিন্ন গণআন্দোলনকে 'দেশদ্রোহী' বলে আখ্যায়িত করে। এ দল নির্বাচনে পরাজয় অনিবার্য জেনে বিরোধী দলীয় নেতা ও কর্মীদের ওপর নির্যাতনের পথ বেছে নেয়। বিরোধী দলের নেতা-কর্মীরা এর প্রতিশোধস্বরূপ ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবি ঘটায়।

৬. **প্রশাসনিক ব্যর্থতা :** মুসলিম লীগ দলীয় সরকার প্রশাসনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। ফলে নির্বাচনের পূর্বেই পূর্ববাংলার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয় ঘটতে থাকে। খাদ্য সংকট, লবণ সংকট ও বন্যা সমস্যা মারাত্মক আকারে দেখা দেয়। এতে পূর্ববাংলার জনগণ মুসলিম লীগ সরকারের প্রতি বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে তারা যুক্তফ্রন্টের পক্ষে এবং মুসলিম লীগের বিপক্ষে রায় প্রদান করে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৭. **সংবিধান প্রণয়নে ব্যর্থতা :** মুসলিম লীগ সরকার ছিল ক্ষমতার রাজনীতিতে বিশ্বাসী। এ দলীয় সরকার ক্ষমতার রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ায় এর নেতৃত্বাধীন গণপরিষদ সংবিধান প্রণয়নে ব্যর্থ হয়। অপরদিকে, যুক্তফ্রন্ট নেতৃবৃন্দ অতি দ্রুত সংবিধান প্রণয়নের প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। তাই ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে এবং যুক্তফ্রন্ট বিজয়ের দিকে এগিয়ে যায়।

৮. **লাহোর প্রস্তাবের অবমাননা :** ১৯৪০ সালে উত্থাপিত লাহোর প্রস্তাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের নিয়ে একাধিক রাষ্ট্র গঠনের কথা উল্লেখ থাকলেও পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলিম লীগ নেতারা একে ছাপার ভুল হিসেবে চিহ্নিত করে ১৯৪৯ সালে তা সংশোধন করেন, যার ফলে পাকিস্তান নামক একটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। পূর্ববাংলার জনগণ এটি মেনে নিতে পারেনি বলে মুসলিম লীগকে সমর্থন দেয়নি।

৯. **পূর্ব বাংলার স্বার্থ উপেক্ষা :** ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থের প্রতি পূর্ণ মাত্রায় সচেতন থাকে। অপরদিকে, পূর্ব বাংলার জনগণের স্বার্থের প্রতি চরম উপেক্ষা দেখায়। এ ব্যাপারে মুসলিম লীগ বাঙালিদের বিক্ষোভ উপলব্ধি করেও পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থবাদীদের প্রতি অনুগত থাকে। ফলে মুসলিম লীগ পূর্ববাংলায় জনপ্রিয়তা হারায় এবং যুক্তফ্রন্ট তা অর্জন করে।

১০. **বৈষম্যমূলক মনোভাব :** মুসলিম লীগ পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ববাংলা এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বৈষম্যের সৃষ্টি করে। এ সরকার সুকৌশলে পূর্ববাংলাকে পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশে পরিণত করে। ফলে পূর্ববাংলার জনগণ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, যা পরবর্তীতে যুক্তফ্রন্টের বিজয় এবং মুসলিম লীগের পরাজয় ডেকে আনে।

১১. **অগণতান্ত্রিক মনোভাব :** ১৯৪৯ সালে টাঙ্গাইলের এক উপ-নির্বাচনে মুসলিম লীগ প্রার্থীর পরাজয়ের কারণে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের মধ্যে ভীতির সঞ্চার হয়। তাই ১৯৫১ সালে অনুষ্ঠেয় পূর্ববাংলার প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন স্থগিত রেখে মুসলিম লীগ প্রাদেশিক আইনসভার মেয়াদ আরো তিন বছর বাড়িয়ে দেয়। এ অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তের ফলে মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা দারুণভাবে হ্রাস পায় এবং যুক্তফ্রন্টের বিজয় সূচিত হয়।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগকে প্রতিহত করার জন্য যুক্তফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ ২১ দফার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। আর এ ২১ দফা দাবিই সারা বাংলায় নতুন জোয়ার এনে দেয়। ফলে নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবি হয় এবং যুক্তফ্রন্ট ঐতিহাসিক বিজয় অর্জন করে। এরপর মুসলিম লীগ আর কোনোদিনই পূর্ববাংলার জনগণকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। তাই ১৯৫৪ সালের নির্বাচন বাংলার ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা।

১০ । ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের কারণ ও ফলাফল আলোচনা করুন।
***অথবা,* ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের এবং স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ভূমিকা আলোচনা করুন।**

উত্তর : পাকিস্তানের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান একটি উল্লেখযোগ্য ইতিহাস। ১৯৬৮ সালের নভেম্বর থেকে ১৯৬৯ সালের মার্চ পর্যন্ত সমগ্র পাকিস্তানে জেনারেল আইয়ুব খানের একনায়কতান্ত্রিক স্বেচ্ছাচারী শাসনের বিরুদ্ধে নজিরবিহীন গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। এ অভ্যুত্থান ছিল ১৯৪৭ সাল থেকে এতদঞ্চলের ওপর পরিচালিত পশ্চিম পাকিস্তানের বৃহৎ পুঁজির ঔপনিবেশিক

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

ফল। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে পূর্ব বাংলার ওপর জাতিগত নিপীড়ন, স্বৈরাচার, অভ্যন্তরীণ উপনিবেশ স্থাপন ইত্যাদির বিস্ফোরণ ঘটে ১৯৪৮-৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে। এর পরের বিস্ফোরণ ছিল ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে শাসক মুসলিম লীগের ভরাডুবির মাধ্যমে। আইয়ুব শাসনের দশক স্বভাবতই পূর্ব পাকিস্তানের কাছে ছিল করুণ ইতিহাস। এ উন্নয়নের দশক উৎসব আইয়ুব খানের মারাত্মক পরিণতির সূচনা করে। ১১ দফা ও ৬ দফা দাবি আদায়ে ১৯৬৯ সালে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র-জনতা প্রচণ্ড আন্দোলন শুরু করে। ক্রমান্বয়ে এ আন্দোলন একটি গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হয়, যা ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান নামে পরিচিত। ১৯৬৯ সালের অভ্যুত্থান ছিল সব ধরনের গণতান্ত্রিক চেতনা ও আন্দোলন বিকাশের ইতিহাসে এক জীবন কাঁপানো সংগ্রাম।

প্রেক্ষাপট ও প্রস্তুতি : আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা : আইয়ুব সরকার যে উদ্দেশ্যে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করেছিল, তা আদৌ সফল হয়নি এবং এটি সরকারের জন্য বুমেরাং হয়ে দেখা দেয়। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর বঙ্গবন্ধুর একাধিক ভাষণ থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে বহু পূর্ব থেকে চিন্তাভাবনা ও গোপন পরিকল্পনা গ্রহণ; সে অর্থে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সত্যতা স্বীকৃত। তবে এ সংক্রান্ত আইয়ুব সরকারের ভাষ্য বাঙালিরা আদৌ বিশ্বাস করেনি। পক্ষান্তরে, তাদের মধ্যে এ ধারণা দৃঢ়মূল হয় যে, এ মামলা ছিল বাঙালি স্বার্থের বিরুদ্ধে আইয়ুবের ষড়যন্ত্রের ফল। আর সে কারণেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ষড়যন্ত্র মামলায় যুক্ত করে এর এক নম্বর আসামি হিসেবে দেখানো হয়। বিশেষ ট্রাইব্যুনালে মামলার বিচারকার্য শুরু হওয়ার পর থেকে এর প্রতিদিনের বিবরণ দৈনিক পত্রিকাসমূহে ফলাও করে প্রচার হতে থাকে। বাঙালিদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনার স্ফুরণে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা বাতিল এবং আইয়ুব খানের পদত্যাগের দাবিতে ডাকসুর তৎকালীন সহসভাপতি তোফায়েল আহমদের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলায় ঐক্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলে। রাজনীতিকদের মধ্যে বর্ষীয়ান ও মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এ সময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসেন। ফলে সংঘটিত হয় '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান। তাতে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা বাতিল হয়, বঙ্গবন্ধু ও অন্যরা নিঃশর্ত মুক্তি লাভ করেন এবং কয়েক দিনের মধ্যে আইয়ুব সরকারের পতন ঘটে।

কেন্দ্রীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ গঠন : আইয়ুব সরকার কর্তৃক আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করার পর বাঙালি মাত্রই কারো বুঝতে বাকি রইলো না যে, পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী তাদেরকে জাতি হিসেবে চিরদিন পদানত করে রাখতে চায়। এদিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও ৬ দফাপন্থী অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ১৯৬৬ সাল থেকে বন্দি অবস্থায় কারাঅভ্যন্তরে থাকলে, বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের নেতৃত্বভার সচেতন ছাত্রসমাজের ওপর বর্তায়। ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথমদিকে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন ও মতিয়া উভয় গ্রুপ), সরকারি ছাত্র পরিষদ, জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের দোলন গ্রুপ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংসদ (ডাকসু) ঐক্যবদ্ধ হয়ে আইয়ুব-বিরোধী কেন্দ্রীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ গঠন করে। ডাকসুর তৎকালীন সহ-সভাপতি ছাত্রলীগ নেতা তোফায়েল আহমদ এর সভাপতি নির্বাচিত হন।

ছাত্রসমাজের ১১ দফা কর্মসূচি : ৬ দফা কর্মসূচির প্রতি সর্বাত্মক সমর্থনসহ ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ ১১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে। এ কর্মসূচি ছিল নিম্নরূপ—

১. হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট এবং বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স বাতিল। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে স্বায়ত্তশাসন প্রদান, ছাত্র বেতন হ্রাস ও ছাত্রদের অন্য সুযোগসুবিধা প্রদান, অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন। বাংলা ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম এবং অফিস আদালতের ভাষা হিসেবে চালু।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

২. সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা। দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার।

৩. ৬ দফার ভিত্তিতে পূর্ব বাংলাকে স্বায়ত্তশাসন প্রদান।

৪. পশ্চিম পাকিস্তানের বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধুসহ সব প্রদেশকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রদান করে দেশের পশ্চিম অংশে একটি সাব-ফেডারেশন গঠন।

৫. ব্যাংক, বীমা, ইন্স্যুরেন্স ও বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ।

৬. কৃষকের ওপর থেকে খাজনা ও ট্যাক্সের বোঝা হ্রাস, বকেয়া খাজনা ও ঋণ মওকুফ, সার্টিফিকেট প্রথা বাতিল।

৭. শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি ও বোনাস প্রদান।

৮. পূর্ব বাংলার বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং পানিসম্পদের সার্বিক ব্যবহারের ব্যবস্থা।

৯. জরুরি অবস্থা, নিরাপত্তা আইন ও অন্যান্য নিবর্তনমূলক আইন বাতিল।

১০. সিয়াটো, সেন্টো, পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিল এবং জোট বহির্ভূত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ।

১১. সকল রাজবন্দির গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ও হুলিয়া প্রত্যাহার এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাসহ সকল রাজনৈতিক মামলা বাতিল ঘোষণা।

এভাবে কেন্দ্রীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ জাতীয় রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ ধারণসহ একটি বিস্তৃত কর্মসূচি গ্রহণ করে এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসে। ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার এবং বঙ্গবন্ধুসহ সকল রাজবন্দির মুক্তির দাবিতে দেশব্যাপী ছাত্র আন্দোলন শুরু করে। বস্তুত ১৯৬৮ সালের নভেম্বর থেকে ১৯৬৯ সালের মার্চ পর্যন্ত এ পাঁচ মাস সমগ্র পূর্ববাংলায় গণবিদ্রোহ দেখা দেয়। একই সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানেও আইয়ুব বিরোধী ছাত্র আন্দোলন গড়ে ওঠে।

ডাক (DAC) গঠন : পাকিস্তানি শাসন, শোষণ, নির্যাতন নিষ্পেষণ পূর্ব বাংলার জনগণের ওপর যতই বৃদ্ধি পেতে থাকে, ৬ দফা কর্মসূচিভিত্তিক আন্দোলন তত দ্রুত বিস্তার লাভ করে। এ আন্দোলন দমনে আইয়ুব সরকারের আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার (১৯৬৮) আশ্রয় গ্রহণ এক বিস্ফোরনুখ পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটায়। পূর্ব বাংলায় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ গঠিত হওয়ার পর ১৯৬৯ সালের ৮ জানুয়ারি ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ (৬ দফাপন্থী), ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ), নিজামে ইসলাম পার্টি, জমিয়ত-উল-উলামা-ই-ইসলাম, নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগ (মমতাজ, দৌলতানা), ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট, জামায়াতে ইসলামী, পাকিস্তান আওয়ামী লীগ (নওয়াবজাদা নুরুল্লাহ খান)— এ আট রাজনৈতিক দল আট দফা দাবিতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটি (DAC-ডাক) গঠন করে। আট দফা দাবিনামার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাধীনে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার প্রতিষ্ঠা, প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠান, অবিলম্বে জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার এবং মুজিবসহ সকল রাজবন্দির মুক্তি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত ছিল।

আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে এতদিন আন্দোলনে মূলত ছাত্রসমাজের প্রাধান্য ছিল। কিন্তু ১৯৬৯ সালের মাঝামাঝিতে অন্যান্য গোষ্ঠী বিশেষত কৃষক, শিল্পশ্রমিক, রাজনৈতিক কর্মী সকলেই আন্দোলনে নিজেদের সম্পৃক্ত করে। ফলে আইয়ুব বিরোধী গণ আন্দোলন গণঅভ্যুত্থানের রূপ পরিগ্রহ করে।

মজলুম জননেতা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর হরতাল আহ্বান : ১৯৬৮ সালের ৭ ডিসেম্বর মওলানা ভাসানী হরতাল ঘোষণা করেন। ঢাকাসহ সারা দেশে হরতাল প্রতিপালিত হয়। সকল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, ছাত্র সংগঠন, বুদ্ধিজীবী মহল, কৃষক, শ্রমিক এবং সাংবাদিকগণ হরতাল পালনে শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। হরতালে পুলিশ গুলিবর্ষণ করলে ৪ জন নিহত, ৩০ জন আহত এবং শতাধিক লোক গ্রেপ্তার হয়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মুক্তি : আইয়ুব-বিরোধী গণঅভ্যুত্থান যখন চূড়ান্ত পর্বে উন্নীত, তখন দিশেহারা হয়ে জেনারেল আইয়ুব খান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে প্যারোলে মুক্তিদানে তার সম্মতির কথা ঘোষণা করেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু তাতে রাজি হলেন না। অবশেষে ২২ ফেব্রুয়ারি জেনারেল আইয়ুব তাকে নিঃশর্ত মুক্তিদান ও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারে বাধ্য হন। পরের দিন অর্থাৎ ২৩ ফেব্রুয়ারি ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) লাখো ছাত্রজনতার স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে শেখ মুজিবুর রহমানকে ঐতিহাসিক গণসংবর্ধনা দেয়া হয়। এ অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের সভাপতি ও ডাকসুর সহ-সভাপতি তোফায়েল আহমদ কর্তৃক কারামুক্ত শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

১৯৬৯ সালের অভ্যুত্থানের চূড়ান্ত রূপ : ১৯৬৯ সালের জানুয়ারিতে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়নের দুটি গ্রুপ এবং জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে যে সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়েছিল তারা জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের জন্য তাদের ১১ দফার সাথে আওয়ামী লীগের ৬ দফা সম্মিলিত হয়ে পূর্ব বাংলার মুক্তির সনদ রূপে পূর্ণাঙ্গ রূপ গ্রহণ করে। ১১ দফার দাবিতে ১৮ জানুয়ারি থেকে ছাত্ররা আন্দোলন শুরু করে। এদিকে পুলিশি নির্যাতনও পুরো মাত্রায় চলতে থাকে। ২০ জানুয়ারি ছাত্র বিক্ষোভের তৃতীয় দিন। এর আগেই আইয়ুব সরকার পূর্ব পাকিস্তানে সভা-সমাবেশ, মিছিল নিষিদ্ধ করে ১ মাসের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করে।

২০ জানুয়ারি ঢাকায় ছাত্র-জনতার ওপর পুলিশের জুলুম চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়। পূর্ব বাংলার আপামর জনতা ১৪৪ ধারা লঙ্ঘন, কারফিউ ভঙ্গ, পুলিশ, ইপিআর, সেনাবাহিনী উপেক্ষা করে রাস্তায় ক্ষোভে ফেটে পড়ে। এদিকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রাত্যহিক কার্যবিবরণী যতই বিভিন্ন দৈনিকে প্রকাশিত হতে থাকে, বাঙালিরা ততই বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। চতুর্দিক প্রকম্পিত করে ধ্বনিত হতে থাকে গগনবিদারী স্লোগান। ক্রমান্বয়ে এ ছাত্র আন্দোলন একটি গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হয়। শেষ পর্যন্ত গণবিক্ষোভ দমনে শাসকগোষ্ঠী সেনাবাহিনী তলব করে। ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি সেনাবাহিনী প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে গুলি চালিয়েও জনগণের এ দুর্বার আন্দোলন স্তব্ধ করে দিতে সক্ষম হয়নি। এ সময় পশ্চিম পাকিস্তানেও আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন শক্তিশালী হয়।

অবশেষে একনায়ক আইয়ুব খান বাধ্য হয়ে ফেব্রুয়ারিতে গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করেন। তিনি ঢাকার নেতৃবৃন্দের সাথে সমস্যা নিয়ে আলোচনার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু শেখ মুজিব তখনও আগরতলা মামলায় আটক। সুতরাং তাকে ছাড়া আলোচনা বৈঠক অনর্থক। এদিকে মওলানা ভাসানী গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব প্যারোলে আলোচনায় অংশ নিতে অস্বীকার করেন। ইতোমধ্যে গণআন্দোলন আরো তীব্রতর হয়। এদিকে ২০ জানুয়ারি পুলিশের গুলিতে ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান (আসাদ)-এর মৃত্যু, ২৪ জানুয়ারি পুলিশের বুলেটে নবকুমার ইনস্টিটিউশনের দশম শ্রেণীর ছাত্র মতিউর রহমানের মৃত্যু, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হককে ১৫ ফেব্রুয়ারি বন্দি অবস্থায় ক্যান্টনমেন্টে গুলি করে হত্যা স্বাধীনতা সংগ্রামকে আরো একধাপ এগিয়ে নেয়। জনতা ঐদিন এতই ক্ষিপ্ত হয় যে, মামলার প্রধান প্রধান বিচারকসহ কয়েকজন মন্ত্রীর বাড়ি, গাড়ি ও গণস্বার্থ বিরোধী পত্রিকা অফিসে অগ্নিসংযোগ করে। পরদিন খবর পাওয়া যায় যে, সেনাবাহিনী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও রসায়ন বিভাগের শিক্ষক ড. শামসুজ্জোহাকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। এ সংবাদে সারাদেশে বিক্ষোভের আগুন আরো তীব্রভাবে জ্বলে ওঠে। শেষ পর্যন্ত জেনারেল আইয়ুব খান আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করতে

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

বাধ্য হন। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা হতে মুক্তি লাভের পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে রমনার তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে ২৩ ফেব্রুয়ারি এক গণসংবর্ধনা দেয়া হয়। বঙ্গবন্ধু তার বক্তৃতায় জনগণের প্রতি তার কৃতজ্ঞতা ও অকৃত্রিম ভালবাসার কথা ব্যক্ত করেন। তিনি আরো ঘোষণা করেন যে, প্রস্তাবিত আলোচনা বৈঠকে তিনি সমস্যার সমাধানে আগ্রহী। যদি তার উত্থাপিত দাবি অগ্রাহ্য হয় তাহলে তিনি দেশব্যাপী শান্তিপূর্ণ আন্দোলন গড়ে তুলবেন।

গোলটেবিল বৈঠক : পাকিস্তানের রাজনৈতিক সমস্যা নিরসনের জন্য প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান সকল রাজনৈতিক দলের নেতৃবর্গকে রাওয়ালপিন্ডিতে গোলটেবিল বৈঠকে আহ্বান করেন। পিন্ডির বৈঠকে শেখ মুজিব অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ ৬ দফা দাবি গোল টেবিল বৈঠকে প্রাধান্য লাভে ব্যর্থ হওয়ায় তিনি বৈঠক ত্যাগ করে পূর্ব বাংলায় ফিরে আসেন। গণআন্দোলনের জোয়ার আরো তীব্রতর হলে ২০ মার্চ আইয়ুব খানের তাবেদার গভর্নর মোনায়েম খান অপসারিত হন। দেশের বিভিন্ন স্থানে অরাজনৈতিক কার্যকলাপ ও হত্যাকাণ্ড শুরু হয়। আইন ও শাসনব্যবস্থা বিকল হয়ে পড়ে। দেশের পরিস্থিতির ক্রমাবনতি রোধ করার জন্য শেষ পর্যন্ত আইয়ুব খান সামরিক বাহিনীর প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়ার শরণাপন্ন হন। ২৫ মার্চ তিনি সকল ক্ষমতা ইয়াহিয়ার নিকট হস্তান্তরের কথা ঘোষণা করেন। এভাবে আইয়ুব-মোনায়েম চক্র পূর্ব বাংলার সংগ্রামী জনতার আন্দোলনের মাধ্যমে অপসারিত হন। জেনারেল ইয়াহিয়া ২৫ মার্চ রাতে সারা দেশে দ্বিতীয়বারের মতো সামরিক শাসন আইন জারি করেন। সাথে সাথে দেশে ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্র ও জাতীয় পরিষদ বাতিল ঘোষিত হয়।

গণঅভ্যুত্থানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান ছিল পাকিস্তানের ২৩ বছরের ইতিহাসে অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ছাত্রসমাজের ১১ দফা এবং আওয়ামী লীগের ৬ দফার ভিত্তিতে শিক্ষা সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, সংসদীয় গণতন্ত্র প্রবর্তন, জরুরি আইন প্রত্যাহার প্রভৃতির দাবিতে ছাত্র জনতার আন্দোলন শুরু হয়। কিন্তু তৎকালীন পাকিস্তান সরকার ছাত্র সমাজের ১১ দফা এবং জনতার ৬ দফা দাবিকে রাষ্ট্রবিরোধী দাবি বলে ঘোষণা করে এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা সাজিয়ে অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তার করে। এর ফলে সমগ্র পূর্ব বাংলার ছাত্র জনতা আন্দোলনের রুদ্ররোষে ফেটে পড়ে এবং ধীরে ধীরে এ আন্দোলন গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হয়। এ আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ ছিল নিম্নরূপ—

১. গণতন্ত্রের পূর্ণ বাস্তবায়ন
২. স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা
৩. সকল গণবিরোধী ও অশুভ শক্তির মূলোৎপাটন
৪. সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্রের কর্তৃত্ব লোপ
৫. সকল মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও রাজবন্দিদের মুক্তি এবং
৬. পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যে বিরাজমান বৈষম্য দূরীকরণ

গণঅভ্যুত্থানের কারণ : গণতন্ত্রের পূর্ণ বাস্তবায়ন, পাকিস্তানি সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্রের কর্তৃত্বের বিলোপ, পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যকার বিরাজমান অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ ইত্যাদি লক্ষ্য সামনে রেখে ১৯৬৯ সালে যে গণঅভ্যুত্থান সূচিত হয় তার প্রধান কারণসমূহ ছিল—

১. ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসনের ফলে পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়। পাকিস্তানি সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্রের বিষাক্ত আঁচড়ে পূর্ব বাংলার জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা পর্যুদস্ত হয়। অবরুদ্ধ জনতা বিদ্রোহে ফেটে পড়ে, সূচিত হয় গণঅভ্যুত্থান।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

২. পূর্ব বাংলার বাঙালিদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়ার প্রতি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর চরম ঔদাসীন্য ও বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি বাঙালিদের প্রান্তিকীকরণ করে। ফলে সৃষ্টি হয় গণঅভ্যুত্থান।

৩. পাকিস্তানে গণবিরোধী ও অশুভশক্তির বিশেষত মৌলিক গণতন্ত্রীদের ক্রমাগত ক্ষমতা বৃদ্ধি ও ক্ষমতার অপব্যবহার, রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় জনগণের সত্যিকারের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের সুযোগ বন্ধ ইত্যাদি গণঅভ্যুত্থানকে ত্বরান্বিত করে।

৪. পাকিস্তান রাষ্ট্রে পূর্ব বাংলার বাঙালিদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বকীয়তা বজায় রাখা দুরূহ হয়ে পড়ে, যা কার্যত উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের মুখ্য কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়।

৫. বাঙালিদের স্বার্থের আপোষহীন প্রতিনিধি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও অপর ৩৪ জনের বিরুদ্ধে আইয়ুব সরকারের আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের এবং বিশেষ ট্রাইব্যুনালে তাদের বিচার অনুষ্ঠান '৬৯-এর অভ্যুত্থানকে অনিবার্য করে তোলে।

৬. আইয়ুব খানের দশ বছরের সামরিক শাসনে যে প্রবৃদ্ধি ঘটে তা পশ্চিম পাকিস্তানের ২২টি পরিবারের হাতেই সম্পদের সমাবেশ ঘটায়। ফলে এ সম্পদ পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে কোনো কাজেই আসেনি।

৭. ১৯৫৯ সালের শেষের দিকে সৃষ্ট আইয়ুব খানের দুরভিসন্ধিমূলক রাজনৈতিক সুবিধাভোগী মৌলিক গণতন্ত্রীদের দুর্নীতি এ দেশকে একদিকে যেমন অর্থনৈতিক বৈষম্যের দিকে ঠেলে দিয়েছে অন্যদিকে তেমনি রাজনৈতিক দালালদের তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলার মাটিতে মীরজাফর সৃষ্টি করে তাদের সহায়তায় বাঙালি জনগণকে পদানত রাখার চেষ্টা করা হয়েছে , তা ছলে-বলে কৌশলে যেভাবেই হোক না কেন। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খান তাদেরই প্রতিনিধি হিসেবে বাঙালি স্বার্থবিরোধী চক্রের শীর্ষস্থানীয় হয়ে উঠেছিল।

'৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের ফলাফল : ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের প্রত্যক্ষ ফলাফল ছিল অনেক। এর মধ্যে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার, শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দির মুক্তি, আইয়ুব সরকারের পতন, দ্বিতীয়বার সামরিক শাসন জারি এবং জেনারেল ইয়াহিয়ার ক্ষমতা দখল ইত্যাদি। এছাড়াও এ গণঅভ্যুত্থানের কতিপয় সুদূরপ্রসারী ফলাফল ছিল, যা নিচে আলোচনা করা হলো :

১. ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষিতে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ক্রমোন্নয়নমূলক বিকাশ ঘটে।

২. সরাসরি সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার দাবি স্পষ্টতম ঐক্য হিসেবে সামনে আসে।

৩. পাকিস্তানি রাষ্ট্র কাঠামোর বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার আপামর জনতার গণ রায় পরিষ্কার হয়।

৪. নভেম্বর ১৯৬৮ থেকে মার্চ ১৯৬৯ পর্যন্ত আইয়ুববিরোধী আন্দোলন এবং ব্যাপক গণঅভ্যুত্থানের কারণে পাকিস্তানের সামরিক বেসামরিক আমলাতান্ত্রিক এলিটদের মনোবল ভেঙে যায়।

৫. ব্যাপক গণআন্দোলনের ফলে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর ভিত নড়ে ওঠে এবং তারা বাধ্য হয়ে ১৯৭০ সালে নির্বাচনের ঘোষণা দেয়।

৬. এ অভ্যুত্থানের ভেতর দিয়ে শ্রেণী ও অঞ্চলগত দ্বিবিধ শোষণের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠতম চেতনার অভিব্যক্তিও লাভ করে।

৭. এ আন্দোলনকে ভিত্তি করে ব াঙালি জাতি স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হয় এবং মাত্র দু'বছর পরেই সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ করে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৮. ১৯৬৮-৬৯ সালের বৈপ্লবিক গণঅভ্যুত্থানের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম, হরতাল ঘেরাও আন্দোলনের দিনগুলো সে সময় এবং ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালে শ্রেণীক ও আঞ্চলিক বৈষম্য ও শোষণের অপসারণ ঘটিয়ে পূর্ব বাংলায় পৃথক রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করতে উল্লেখযোগ্য প্রভাব রেখেছিল।

৯. এ অভ্যুত্থান ছিল শোষকের কাছ হতে শোষিতের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের হাতিয়ার স্বরূপ।

১০. '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান পুরো সমাজের ও জনগণের চেতনায় নজিরবিহীন প্রভাব বিস্তার করে ও স্থায়ী ছাপ রেখে যায়।

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের তাৎপর্য : গণঅভ্যুত্থানের প্রচণ্ড বেগে দেশের শাসনব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙে পড়ে। আমলাশাহী ব্যর্থ হলো, কয়েক বার সান্ধ্য আইন জারি করে দেখা গেল সামরিক কর্তৃত্ব অচল হয়েছে। কেননা এতদিনে মানুষ মরতে শিখেছে। আইন-শৃঙ্খলা নিঃশেষ হয়েছে। শেখ মুজিবকে ফাঁসি দেয়ার স্বপ্নসাধ ভেঙে গেল। আইয়ুব-মোনায়েমের সাজানো মামলা সাধের সাজানো বাগানের মতো শুকিয়ে গেল। যাকে দেশদ্রোহী রূপে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, তাকে মুক্তি দিয়ে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করলেন এবং সর্বদলীয় নেতাদের নিয়ে দেশের এ অচল অবস্থা দূর করার পন্থা খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু কিছুতেই আর তিনি ক্ষমতায় থাকতে পারলেন না। এভাবে পাকিস্তানের এককালের লৌহমানব আইয়ুব খানের পতন হলো। ইয়াহিয়ার হাতে ক্ষমতা অর্পণ করে ইতিহাসের বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেলেন। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান সমগ্র পাকিস্তানে সংঘটিত হয়। পশ্চিম পাকিস্তানে অভ্যুত্থান ছিল জেনারেল আইয়ুবের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে গণঅভ্যুত্থান ছিল আইয়ুব খানের শাসনের উচ্ছেদের মাধ্যমে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম।

সেই সাথে এ সংগ্রাম ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি বৃহৎপুঁজির ও ঔপনিবেশিক শোষণের হাত থেকে মুক্তির সংগ্রাম। যখন পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্যের পাহাড় রচিত হয়েছিল, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যখন পূর্ব বাংলা একটি উপনিবেশ তুল্য হয়েছিল এবং সামাজিক ক্ষেত্রে যখন পূর্ব বাংলা উৎপীড়ন ও বঞ্চনার কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয়েছিল, তখন পূর্ব বাংলায় এ সংগ্রাম হয় পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক, সামরিক চক্র, আমলাতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী দেশীয় সামন্তদের শ্রেণীক ও আঞ্চলিক শোষণে নিষ্পেষিত, এ অঞ্চলের ছাত্র জনতা ও সাধারণ মানুষের সংগ্রাম। তাই দেখা যাচ্ছে এ অভ্যুত্থানের প্রভাব ও গুরুত্ব ছিল সুদূরপ্রসারী।

পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রে ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান তাই কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। ১৯৪৭ সাল থেকে পূর্ব বাংলার মানুষের ওপর যে শোষণ চলছিল তারই বিরুদ্ধে একের পর এক প্রতিবাদ বিক্ষোভ আন্দোলন ও সংগ্রামের একটা নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে পরিপক্ব হয়ে ১৯৬৮-৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছিল। পূর্বের সংগ্রামগুলোর ধারাবাহিকতায় এ সংগ্রাম সংঘটিত হলেও এটি সেগুলো অপেক্ষা বেশি ব্যাপকতা নিয়ে বৈপ্লবিক শক্তিরূপে দেখা দিয়েছিল। গুণগত দিক থেকে এ অভ্যুত্থান ছিল পূর্বাপেক্ষা ভিন্নতর এবং এটি বাংলার গণচেতনায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিল। তাই পাকিস্তানি শোষণ থেকে বাঙালিদের মুক্তির ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই বলা যায়, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান ছিল দীর্ঘ ২২ বছরের শোষণ, অত্যাচার ও অবহেলার প্রত্যক্ষ ফল।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, ইতিহাসের অমোঘ বিধান দেরিতে হলেও আত্মপ্রকাশ করে ঝড়ের বেগে এবং নির্মমভাবে, যখন আইয়ুব খান তার শাসনের এক দশকের মহিমা কীর্তনের জন্য মধ্যযুগীয় জাঁকজমকে চোখ ঝলসানো আলোর ডালা সাজিয়েছেন ঠিক তখনই হয় বাংলাদেশের গণশক্তির প্রচণ্ডতম অভ্যুত্থান এবং তা চতুর্দিক ভাসিয়ে দেয় বিদ্রোহের জোয়ারে। আইয়ুবী স্বপ্নসাধ ধূলিসাৎ হলো। পশ্চিম পাকিস্তানেও এ ঢেউ আছড়ে পড়লো। সারা পাকিস্তানব্যাপী অভ্যুত্থান আইয়ুব খানের ক্ষমতার ভিত্তি ভাসিয়ে নিয়ে গেল। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায়, বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের গুরুত্ব অপরিসীম। গণঅভ্যুত্থানের ফলেই সামরিক শাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খান ১৯৭০ সালে সমগ্র পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন দিতে বাধ্য হন। এ নির্বাচনই ছিল বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের প্রাথমিক পদক্ষেপ। বস্তুত ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানই পরবর্তীতে অসহযোগ আন্দোলনের ভিত্তি সুদৃঢ় করে। যার ফলে এ পথ ধরেই ১৯৭১ সালে অর্জিত হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব। জন্ম নেয় বিশ্বের মানচিত্রে আর একটি স্বাধীন দেশ— বাংলাদেশ।

১১ ‖ ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফল ও গুরুত্ব আলোচনা করুন।

উত্তর : ১৯৭০ সালের নির্বাচন পাকিস্তানের ইতিহাসে এক অনন্য সাধারণ নির্বাচন। এ নির্বাচন ছিল বাঙালি জাতির সুদীর্ঘ আন্দোলনের ফসল। অবিভক্ত পাকিস্তানের সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ সাধারণ নির্বাচন ১৯৭০ সালের নির্বাচন। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ক্ষেত্রে এ নির্বাচনের প্রভাব অসামান্য। কেননা এ নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে বাঙালি জাতি প্রথমবারের মতো নিজেদের সম্মিলিত শক্তি প্রদর্শন করার ক্ষমতা অর্জন করে।

নির্বাচনের পটভূমি : সামরিক শাসক আইয়ুব খান পাকিস্তানের ক্ষমতা দখলের পর 'মৌলিক গণতন্ত্র' চালু করেন। কিন্তু 'মৌলিক গণতন্ত্র' ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। আইয়ুব খানের শাসনামল থেকে পূর্ব পাকিস্তানে স্বাধিকার আন্দোলন শুরু হয়। পাকিস্তানে একটি কার্যকর সংবিধান প্রণয়নে ব্যর্থতা, আইয়ুব খানের সামরিক শাসন জারি, ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবি এবং '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের পর সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে স্বাধীনতা আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করে। এমতাবস্থায় পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী সরকার বিরোধী আন্দোলন দমনের জন্য জনগণের উপর নির্যাতন শুরু করে। এর ফলশ্রুতিতে আন্দোলন আরো বেগতিক রূপ ধারণ করে। এ সময় ৮টি বিরোধী দলের সমন্বয়ে গঠিত হয় 'গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ'। এ পরিষদ আন্দোলনকে জোরদার করে এবং সরকারও যে কোনো ধরনের আন্দোলনকে প্রতিহত করার জন্য সচেষ্ট হয়ে ওঠে। এক পর্যায়ে শাসকগোষ্ঠীর পরিকল্পনা নষ্ট হয়ে যায়। তারা তখন শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে দায়ের করা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে নেয় এবং তার সাথে গোলটেবিল বৈঠকে বসতে সম্মত হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে আইয়ুব খান জারি করেন 'আইনগত কাঠামো আদেশ'। এ আদেশের ফলে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পটভূমি রচিত হয়। 'One man-One vote' এ নীতি অনুসারে প্রত্যেক প্রদেশকে জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব প্রদান করা হয়।

নির্বাচনের ঘোষণা : ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে আইয়ুব খানের পতনের পর জেনারেল ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা দখল করেন। ইয়াহিয়া খান ১৯৭০ সালের ১ জানুয়ারি থেকে পূর্ণ রাজনৈতিক কার্যকলাপ শুরু করার অনুমতি প্রদান করেন। তিনি ৫ অক্টোবর জাতীয় পরিষদের নির্বাচন এবং ২২ অক্টোবর প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন। সময়মতো নির্বাচন না হওয়ায় নির্বাচনের তারিখ ৭

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

ডিসেম্বর এবং প্রাদেশিক পরিষদের ১৭ ডিসেম্বর পুনর্নির্ধারিত হয়। কিন্তু ১২ নভেম্বর পূর্ব বাংলায় প্রলয়ঙ্করী জলোচ্ছ্বাসের কারণে ৩০টি আসনে ১৯৭১ সালের ১৭ জানুয়ারি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

নির্বাচনের ফলাফল : ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল ছিল অভূতপূর্ব। এ নির্বাচনে ২৫টি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের আওয়ামী লীগ এবং পশ্চিম পাকিস্তানের পিপলস পার্টি প্রধান। আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদের পূর্ব পাকিস্তান অংশের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন লাভ করে। বাকি ২টি আসনের মধ্যে ১টি পিডিপি প্রধান নূরুল আমীন এবং অপর আসনটি নির্দলীয় প্রার্থী ত্রিদিব রায় চৌধুরী লাভ করেন।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের (জাতীয় পরিষদ) দলভিত্তিক ফলাফল

রাজনৈতিক দলের নাম	সাধারণ আসন		সংরক্ষিত	উপজাতীয়	প্রাপ্ত মোট
	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান	মহিলা আসন	এলাকার আসন	আসনসংখ্যা
আওয়ামী লীগ	১৬০		৭		১৬৭
পিপলস পার্টি		৮৩	৫		৮৮
মুসলিম লীগ (কাইয়ুম)		৯			৯
মুসলিম লীগ (কাউন্সিল)		৭			৭
ন্যাপ (ওয়ালী)		৬	১		৭
মুসলিম লীগ (কনভেনশন)		২			২
জামায়াতে ইসলামী		৪			৪
জমিয়তে উলামা-ই-পাকিস্তান		৭			৭
জমিয়তে উলামা-ই-ইসলাম		৭			৭
পিডিপি	১	-			১
স্বতন্ত্র/নির্দলীয়	১	৬		৭	১৪
সর্বমোট	১৬২	১৩১	১৩	৭	৩১৩

১৯৭০ সালের নির্বাচনের তাৎপর্য : ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মহান বিজয় অর্জনের পিছনে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ভূমিকা ছিল উল্লেখ করার মতো। মূলত পাকিস্তানের রাজনৈতিক মৃত্যু ঘটে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের মধ্য দিয়েই। নিচে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের তাৎপর্য আলোচনা করা হলো :

১. **বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিজয় :** বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ভাষা ও সংস্কৃতিভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার যে বীজ অঙ্কুরিত হয় তা ১৯৫৪ সালের নির্বাচন, ১৯৬৬ সালের ছয় দফা, ১৯৬৯ সালের এবং সর্বশেষ ১৯৭০ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের বাঙালি জাতীয়তাবাদের অনুপ্রেরণাই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে শক্তি যোগায়।

২. **শোষণ থেকে মুক্তির চেতনা অর্জন :** ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার জনগণের উপর বিমাতাসুলভ আচরণ শুরু করে। এহেন শোষণের প্রেক্ষাপটে ১৯৭০ সালে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচন বাঙালি জনগণকে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসন শোষণ থেকে মুক্তির আগ্রহকে বলিষ্ঠতর করে তোলে। নির্বাচনের ফলাফল এ চেতনাকে আরো সুপ্রতিষ্ঠিত করে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৩. **পশ্চিম পাকিস্তানের কর্তৃত্ব হ্রাস :** ১৯৭০ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে নির্বাচিত হলে পূর্ব পাকিস্তানের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব হ্রাস পেতে থাকে। পূর্ব পাকিস্তান তখন শেখ মুজিবের নির্দেশে পরিচালিত হতে থাকে, যা পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর জন্য ছিল চরম অবমাননাকর ও ঈর্ষণীয়।

৪. **সংগ্রামী মনোভাবের সৃষ্টি :** ১৯৭০ সালে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে ইয়াহিয়া ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানা শুরু করেন। এর ফলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ সংগ্রামী হয়ে পড়ে। শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। যা শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপ নেয়।

৫. **রাজনৈতিক নেতৃত্বের সৃষ্টি :** ১৯৭০ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক নেতৃত্বের সৃষ্টি হয়। শেখ মুজিবের রাজনৈতিক নেতৃত্ব বিকাশ লাভ করে। জনগণ তাকে ব্যাপকভাবে সমর্থন করে।

৬. **আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল সৃষ্টি :** রাজনৈতিক নেতৃত্ব যে কোনো জাতি গোষ্ঠীর জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনে ভালো ফল করেছে। অপরদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে শুধু সেখানকার রাজনৈতিক দলগুলো ভালো করেছে। ১৯৭০ সালের নির্বাচন ছিল প্রকৃতপক্ষে আঞ্চলিক নির্বাচন এবং এ নির্বাচনকে নিয়ন্ত্রণ করেছে আঞ্চলিক দলসমূহ।

৭. **স্বাতন্ত্র্যবোধের বহিঃপ্রকাশ :** পাকিস্তানের উভয় অংশের শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনৈতিক ভিন্নতা প্রভৃতির ভিত্তিতে যে স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান ১৯৭০ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে তা প্রতিভাত হয়ে ওঠে। ফলে বাঙালিরা নিজেদের আলাদা করে ভাবতে শিখে।

৮. **পাকিস্তানের মৃত্যুর বার্তা বাহক :** ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফলের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, আওয়ামী লীগ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কোনো আসন লাভ করতে পারেনি আবার পিপলস্ পার্টি পূর্ব পাকিস্তানের কোনো আসনই লাভ করতে পারেনি। তাই বলা যায়, এই নির্বাচন যুক্ত পাকিস্তানের মৃত্যু বার্তা বহন করে।

৯. **পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর প্রত্যাশা ব্যর্থ :** পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর ধারণা ছিল আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেয়ে অন্যান্য দলের সাথে কোয়ালিশন গঠনে বাধ্য হবে। কিন্তু আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ফলাফল পাকিস্তানিদের প্রত্যাশা ব্যর্থ করে দেয়।

১০. **প্রকাশ্য দ্বন্দ্ব সৃষ্টি :** ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত দুই পাকিস্তানের মাঝে আড়ালে আবডালে যে দ্বন্দ্ব বিদ্যমান ছিল তা প্রকাশ্যে রূপ নেয় নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের অভূতপূর্ব সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকবর্গ পূর্ববাংলার জনগণের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য দ্বন্দ্বে মেতে উঠে।

১১. **আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি :** শোষিত-লাঞ্ছিত, নির্যাতিত ও নিপীড়িত পূর্ববাংলার জনমনে ১৯৭০ সালের নির্বাচন আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করে। আর এ আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়েই বাঙালিরা স্বাধিকার আদায়ের সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

১২. **অধিকার আদায় :** পূর্ববাংলার জনগণ ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত শিক্ষাদীক্ষা, চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য সকল ক্ষেত্রেই বঞ্চিত ছিল। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জয়লাভের মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলার অধিকার বঞ্চিত জনগণ অধিকার আদায়ের সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগই শুধু বিজয়ী হয়নি সেই সঙ্গে বিজয়ী হয়েছে পূর্ব বাংলার মানুষের মুক্তির চেতনা। পাকিস্তানের উভয় অংশের বৈসাদৃশ্য ঢেকে রাখার যে প্রবণতা ছিল তা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় এই নির্বাচনের ফলাফলে। তাই বাঙালি জাতির ইতিহাসে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের গুরুত্ব ব্যাপক।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

১২ । ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ কেন অপরিহার্য ছিল? এ যুদ্ধে কি প্রমাণিত হয়েছিল?

উত্তর : ১৯৪০ সালের ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের আলোকে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের জন্য মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়। ফলে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট ভারতবর্ষে পাকিস্তান নামে যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় তার দুটো অংশ– একটি পূর্ব পাকিস্তান অপরটি পশ্চিম পাকিস্তান। পূর্ব বাংলা বা পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মাঝখানে ছিল ভারত এবং এ দুই অংশের ব্যবধান ছিল প্রায় দেড় হাজার মাইল। পাকিস্তানের এ দুই অঞ্চলের ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, লোকাচার ও জীবন জীবিকার মাঝে কখনও সু-সম্পর্ক ও সুভ্রাতৃত্ব গড়ে উঠতে পারেনি। ভৌগোলিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈসাদৃশ্যের মতো দুই অঞ্চলের অর্থনৈতিক বৈষম্যও ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মুক্তিযুদ্ধের সূচনা হলেও পটভূমি তৈরি হয়েছিল পাকিস্তানি শাসন-শোষণের ২৩ বছর ধরে। '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের অপরিহার্যতা বুঝতে হলে মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি সৃষ্টির ঐতিহাসিক পর্যায়গুলো গভীরভাবে অনুধাবন করতে হবে। পাকিস্তানের জাতির পিতা কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ কখনোই পূর্ব পাকিস্তানকে সমমর্যাদাপূর্ণ একটি দেশ মনে করেননি। এছাড়া কতিপয় মুসলিম লীগ নেতা সুকৌশলে সমৃদ্ধশালী পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশ তথা করদ রাজ্যে পরিণত করার প্রয়াসে লিপ্ত হন। কিছুদিনের মধ্যেই তাদের প্রকৃতরূপ ধরা পড়ে। বাঙালিরা তার যথাযথ জবাব দিতে দেরি করেনি। ফলে পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে বাঙালিদের প্রতিক্রিয়া ধাপে ধাপে বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকশিত হতে থাকে। বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ তথা ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি পর্যায়গুলো নিম্নরূপ :

১. **পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়ন :** এমন হতাশা ও মোহমুক্তির প্রেক্ষাপটে পাকিস্তানের সংবিধানের খসড়া প্রণয়নের জন্য গণপরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত মূলনীতি কমিটির প্রথম খসড়ার বিরুদ্ধে বিক্ষোভের মাধ্যমে বাঙালির রাজনৈতিক সচেতনতা অর্জনের প্রথম পর্যায় সূচিত হয়। খসড়া সংবিধানে বাঙালি সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে বিবেচনায় নেয়া হয়নি। এ রিপোর্টের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের কারণে এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, যা থেকে সৃষ্টি হয় দুটি পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক সংগঠন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ (৪ জানুয়ারি ১৯৪৮) এবং পূর্ব মুসলিম পাকিস্তান আওয়ামী লীগ (২৩ জুন ১৯৪৯)। দুটি সংগঠনই পরে তাদের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেয়।

২. **ভাষা আন্দোলন :** বাঙালি জাতিসত্তার দ্বিতীয় রাজনৈতিক স্ফুরণ ঘটে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে (১৯৪৮-৫২) কেন্দ্র করে। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার শাসন ক্ষমতার কেন্দ্রমূলে অধিষ্ঠিত নিতান্ত সংখ্যালঘু এলিট শ্রেণীর ভাষা উর্দুকে শতকরা ৫৪ ভাগ অ-উর্দুভাষী সংখ্যাগরিষ্ঠের ওপরে চাপিয়ে দেয়ার উদ্যোগ থেকে ভাষা আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছিল। বদরুদ্দীন ওমর এ আন্দোলনকে 'বাঙালি মুসলমানদের ঘরে ফেরার পালা' হিসেবে অভিহিত করেছেন। এটা কিন্তু পুরোপুরি ঘরে ফেরা ছিল না। বরং এর আয়োজন মাত্র; ঘরে ফেরা সম্পন্ন হয় একাত্তরে। বাঙালির সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য চেতনায় ভাষা আন্দোলনের বিশেষ প্রভাব ছিল বলেই '৭১-এর ২৬ মার্চ পাকিস্তানি সেনাবাহিনী শহীদ মিনার ধূলিসাৎ করে দিয়েছিল।

৩. **স্বায়ত্তশাসনের দাবি :** ১৯৫৪ সালে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের মাধ্যমে তৃতীয় পর্যায়ের সূচনা হয়। নির্বাচনের পটভূমিতে আওয়ামী লীগ ও কতিপয় ক্ষুদ্র দল একত্রিত হয়ে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে একটি যুক্তফ্রন্ট গঠন করে। যুক্তফ্রন্ট একুশ দফা দাবি নিয়ে নির্বাচনে অবতীর্ণ হয় এই একুশ দফার একটি দফায় পূর্ব বাংলার জন্য পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দাবি এবং বাংলাকে

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করার দাবি (১নং) পুনর্ব্যক্ত করা হয়। এ নির্বাচনে ৩০৯টি আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট লাভ করে ২২৩টি আসন (মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত ২৩৭টি আসনের মধ্যে) এবং মুসলিম লীগ পায় ৯টি আসন। এভাবে বাঙালি মুসলিম লীগকে প্রত্যাখ্যান করে। এ পর্যায়েই বাঙালির মুখপাত্র হিসেবে আওয়ামী লীগের অবস্থান নিশ্চিত হয়।

৪. **গোপন নিউক্লিয়াস গঠন :** ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৯ পর্যন্ত ছিল আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের সময়। এ সময়ের ঘটনাবলী বাঙালির স্বতন্ত্র চেতনাকে শাণিত করে এবং '৬২-র সংবিধান বিরোধী ও শিক্ষা কমিশন বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে। এ সময় পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সিরাজুল আলম খানের নেতৃত্বে একটি গোপন নিউক্লিয়াস গঠিত হয় স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে। পরবর্তীকালের প্রতিটি আন্দোলনে এই নিউক্লিয়াসটি ছিল তৎপর।

৫. **ছয়দফা উপস্থাপন :** ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ এবং এর ফলে পূর্ব বাংলার নিরাপত্তা সংক্রান্ত অসহায়ত্ব বাঙালির জাতীয়তাবাদী চেতনাকে তীব্র করে। অন্যদিকে '৬৩-তে সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যু হলে সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগকে গণভিত্তিক দল হিসেবে পুনরুজ্জীবিত করেন। পাক-ভারত যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই তিনি ঘোষণা করেন, 'যুদ্ধের পর স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্ন আরো গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে। পূর্ব পাকিস্তানকে সকল দিক দিয়ে আত্মনির্ভরশীল করার সময় এসেছে।'

এ বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি যে রাজনৈতিক কর্মসূচির ইঙ্গিত করেছিলেন তা ছয় দফা হিসেবে উপস্থাপিত হয়। দফাগুলো ছিল—

১. লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তান ফেডারেশন।
২. ফেডারেশন সরকারের হাতে থাকবে দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত ক্ষমতা; অবশিষ্ট বিষয়সমূহ থাকবে প্রদেশের হাতে।
৩. দুই প্রদেশের জন্য পৃথক কিন্তু সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রার প্রচলন করতে হবে।
৪. সকল প্রকার কর ধার্য ও আদায় করার ক্ষমতা থাকবে প্রাদেশিক সরকারের হাতে।
৫. দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক হিসাব রাখতে হবে এবং
৬. পূর্ব পাকিস্তানে প্যারামিলিটারি বাহিনী গঠন করতে হবে।

৬. **গণঅভ্যুত্থান :** ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি ভাসানীপন্থি ছাত্রনেতা আসাদ পুলিশের গুলিতে নিহত হন। তাঁকে শহীদ ঘোষণা করা হয় এবং এগারো দফা দাবি আদায়ের শপথ নিয়ে ২৪ জানুয়ারি 'গণ-অভ্যুত্থান দিবস' বলে ঘোষণা করা হয়। ১৫ ফেব্রুয়ারি আগরতলা মামলার আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হক সামরিক হাজতে বন্দি অবস্থায় নিহত হন। ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. শামসুজ্জোহা নিহত হন। ফলে গণঅভ্যুত্থান আরো জোরদার হয়। '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করা হয়, শেখ মুজিবও মুক্তি পান। কারাগারে মুক্ত শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ঘোষণা করা হয়। বঙ্গবন্ধু বাঙালির আন্দোলনের অগ্রগতি লক্ষ করে অভিভূত হয়ে পড়েন এবং নিজের অবস্থান দেখতে পান আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে। ১৯৬৯ গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে বাঙালি স্বাধীনতার স্বপক্ষে তাদের অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন।

৭. **১৯৭০-এর নির্বাচন :** গণঅভ্যুত্থানের সফল পরিসমাপ্তিতে আইয়ুব খানের বিদায় ঘণ্টা বেজে ওঠে। তবে আইয়ুব খানের স্থলাভিষিক্ত হয়ে আসেন সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান। তিনি

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

পাকিস্তানের উভয় প্রদেশের বিস্ফোরণমুখী রাজনীতিকে ধামাচাপা দেয়ার উদ্দেশ্যে তড়িঘড়ি ঘোষণা করলেন '৭০-এর অক্টোবরে সাধারণ নির্বাচন। ১৯৭০ সালের ৭-১৭ ডিসেম্বর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। আওয়ামী লীগ পায় ১৬৭টি আসন। এর মধ্যে ১৬০ সাধারণ + ৭টি মহিলা সংরক্ষিত আসন। পাকিস্তান পিপলস্ পার্টি ৮৩ + ৫টি মহিলা = ৮৮টি আসন এবং জামায়াত ৪ + ০ মহিলা = ৪টি আসন পায়। মোট আসন ৩১৩টি। কথা ছিল ১৫৭টি আসন পেলে সে দল সরকার গঠন করবে। কিন্তু আওয়ামী লীগ ১৬৭টি আসন পেলেও ইয়াহিয়া খান নানাভাবে ছলচাতুরী করতে থাকে। ১ মার্চ ১৯৭১ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করে। বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। ১৬ থেকে ২৪ মার্চ প্রহসনমূলক আলোচনা বৈঠক করেন ইয়াহিয়া খান। ২৫ মার্চ বাঙালির ওপর 'অপারেশন সার্চলাইট' নামক নৃশংস হত্যাযজ্ঞ চালানোর আদেশ দিয়ে ঢাকা ত্যাগ করেন ইয়াহিয়া খান। ২৫ মার্চ ১২ : ৩০ মিনিট ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক গ্রেপ্তার হওয়ার আগে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা বার্তা ওয়ারলেস যোগে চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরীকে প্রেরণ করেন। চট্টগ্রাম বেতার থেকে আওয়ামী লীগ নেতা এম এ হান্নান বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার বাণী স্বকণ্ঠে প্রচার করেন। পরে ২৭ মার্চ চট্টগ্রামে অবস্থিত অষ্টম ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের মেজর জিয়াউর রহমান ঐ ঘোষণা পুনঃপাঠ করেন। বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করে করাচিতে নিয়ে যাওয়া হয়। ফলে শুরু হয় বহু প্রতিক্ষিত মুক্তিযুদ্ধ।

উপরিউক্ত পর্যায়গুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সবক্ষেত্রে বাঙালির মনে অসন্তোষের কারণ বৈষম্য। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রতি যে সকল বৈষম্যের কারণে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা সংগ্রাম তথা মুক্তিযুদ্ধ অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল সেগুলো নিম্নরূপ :

সাংস্কৃতিক বৈষম্য : পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী সর্বপ্রথম আঘাত হানে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর। কোনো জাতির মাতৃভাষা কেড়ে নেয়ার প্রথম কালো নজির সৃষ্টি করে পশ্চিম পাকিস্তান। বাংলার জাতীয় ইতিহাসে অবিস্মরণীয় ঘটনার বীজ রোপিত হয়, যখন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই নিখিল পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মাতৃভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক উপায়ে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেয়ার প্রচেষ্টা চালানো হয়। এ আন্দোলনের অংশ হিসেবেই ১৯৫২ সালের ৩০ জানুয়ারি ঢাকায় ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। এতে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, ২১ ফেব্রুয়ারিকে ভাষা দিবস হিসেবে পালন এবং দেশব্যাপী হরতাল পালন করা হবে। ২১ ফেব্রুয়ারি উক্ত কর্মসূচিকে বানচাল করার জন্য তৎকালীন গভর্নর নুরুল আমীন ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করেন। কিন্তু জনতা দীপ্ত শপথ নিয়ে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ কর বুকের তাজা রক্ত ঢেলে রাজপথ রাঙিয়ে মৃত্যুকে হাসিমুখে আলিঙ্গন করে বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করে। পাশাপাশি পাকিস্তানি স্বৈরাচারীদের কাছে প্রমাণ করে যে, বাঙালি জাতি ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় জীবন উৎসর্গকে তুচ্ছ ব্যাপার মনে করে। ছাত্র সমাজের এ আত্মত্যাগ বাঙালি জাতির আন্দোলনের প্রথম সোপান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

অর্থনৈতিক বৈষম্য : ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতার সময় পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যবধানের মাত্রা ছিল খুব কম। চা উৎপাদন এবং বস্ত্র উৎপাদনে পূর্ব পাকিস্তান সামান্য এগিয়ে ছিল, যদিও চিনি এবং ধাতব দ্রব্যের উৎপাদন ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের কিছু বেশি সুবিধা ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের সেচ পরিকল্পনা ছিল উন্নততর, যদিও ব্যাংক ব্যবস্থায় পূর্ব পাকিস্তানের সুযোগ ছিল সামান্য বেশি। মোটের ওপর, ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের উভয় অংশ মোটামুটিভাবে একই পর্যায়ে

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করার দাবি (১নং) পুনর্ব্যক্ত করা হয়। এ নির্বাচনে ৩০৯টি আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট লাভ করে ২২৩টি আসন (মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত ২৩৭টি আসনের মধ্যে) এবং মুসলিম লীগ পায় ৯টি আসন। এভাবে বাঙালি মুসলিম লীগকে প্রত্যাখ্যান করে। এ পর্যায়েই বাঙালির মুখপাত্র হিসেবে আওয়ামী লীগের অবস্থান নিশ্চিত হয়।

৪. **গোপন নিউক্লিয়াস গঠন :** ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৯ পর্যন্ত ছিল আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের সময়। এ সময়ের ঘটনাবলী বাঙালির স্বতন্ত্র চেতনাকে শাণিত করে এবং '৬২-র সংবিধান বিরোধী ও শিক্ষা কমিশন বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে। এ সময় পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সিরাজুল আলম খানের নেতৃত্বে একটি গোপন নিউক্লিয়াস গঠিত হয় স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে। পরবর্তীকালের প্রতিটি আন্দোলনে এই নিউক্লিয়াসটি ছিল তৎপর।

৫. **ছয়দফা উপস্থাপন :** ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ এবং এর ফলে পূর্ব বাংলার নিরাপত্তা সংক্রান্ত অসহায়ত্ব বাঙালির জাতীয়তাবাদী চেতনাকে তীব্র করে। অন্যদিকে '৬৩-তে সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যু হলে সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগকে গণভিত্তিক দল হিসেবে পুনরুজ্জীবিত করেন। পাক-ভারত যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই তিনি ঘোষণা করেন, 'যুদ্ধের পর স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্ন আরো গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে। পূর্ব পাকিস্তানকে সকল দিক দিয়ে আত্মনির্ভরশীল করার সময় এসেছে।'

এ বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি যে রাজনৈতিক কর্মসূচির ইঙ্গিত করেছিলেন তা ছয় দফা হিসেবে উপস্থাপিত হয়। দফাগুলো ছিল—

১. লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তান ফেডারেশন।
২. ফেডারেশন সরকারের হাতে থাকবে দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত ক্ষমতা; অবশিষ্ট বিষয়সমূহ থাকবে প্রদেশের হাতে।
৩. দুই প্রদেশের জন্য পৃথক কিন্তু সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রার প্রচলন করতে হবে।
৪. সকল প্রকার কর ধার্য ও আদায় করার ক্ষমতা থাকবে প্রাদেশিক সরকারের হাতে।
৫. দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক হিসাব রাখতে হবে এবং
৬. পূর্ব পাকিস্তানে প্যারামিলিটারি বাহিনী গঠন করতে হবে।

৬. **গণঅভ্যুত্থান :** ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি ভাসানীপন্থি ছাত্রনেতা আসাদ পুলিশের গুলিতে নিহত হন। তাঁকে শহীদ ঘোষণা করা হয় এবং এগারো দফা দাবি আদায়ের শপথ নিয়ে ২৪ জানুয়ারি 'গণ-অভ্যুত্থান দিবস' বলে ঘোষণা করা হয়। ১৫ ফেব্রুয়ারি আগরতলা মামলার আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হক সামরিক হাজতে বন্দি অবস্থায় নিহত হন। ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. শামসুজ্জোহা নিহত হন। ফলে গণঅভ্যুত্থান আরো জোরদার হয়। '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করা হয়, শেখ মুজিবও মুক্তি পান। কারাগারে মুক্ত শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ঘোষণা করা হয়। বঙ্গবন্ধু বাঙালির আন্দোলনের অগ্রগতি লক্ষ করে অভিভূত হয়ে পড়েন এবং নিজের অবস্থান দেখতে পান আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে। ১৯৬৯ গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে বাঙালি স্বাধীনতার স্বপক্ষে তাদের অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন।

৭. **১৯৭০-এর নির্বাচন :** গণঅভ্যুত্থানের সফল পরিসমাপ্তিতে আইয়ুব খানের বিদায় ঘণ্টা বেজে ওঠে। তবে আইয়ুব খানের স্থলাভিষিক্ত হয়ে আসেন সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান। তিনি পাকিস্তানের উভয় প্রদেশের বিস্ফোরণমুখী রাজনীতিকে ধামাচাপা দেয়ার উদ্দেশ্যে তড়িঘড়ি ঘোষণা করলেন '৭০-এর অক্টোবরে সাধারণ নির্বাচন। ১৯৭০ সালের ৭-১৭ ডিসেম্বর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। আওয়ামী লীগ পায় ১৬৭টি আসন। এর মধ্যে ১৬০ সাধারণ + ৭টি মহিলা সংরক্ষিত আসন। পাকিস্তান পিপলস্ পার্টি ৮৩ + ৫টি মহিলা = ৮৮টি আসন এবং জামায়াত ৪ + ০ মহিলা = ৪টি আসন পায়। মোট আসন ৩১৩টি। কথা ছিল ১৫৭টি আসন পেলে সে দল সরকার গঠন করবে। কিন্তু আওয়ামী লীগ ১৬৭টি আসন পেলেও ইয়াহিয়া খান নানাভাবে ছলচাতুরী করতে থাকে। ১ মার্চ ১৯৭১ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করে। বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। ১৬ থেকে ২৪ মার্চ প্রহসনমূলক আলোচনা বৈঠক করেন ইয়াহিয়া খান। ২৫ মার্চ বাঙালির ওপর 'অপারেশন সার্চলাইট' নামক নৃশংস হত্যাযজ্ঞ চালানোর আদেশ দিয়ে ঢাকা ত্যাগ করেন ইয়াহিয়া খান। ২৫ মার্চ ১২ : ৩০ মিনিট ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক গ্রেপ্তার হওয়ার আগে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা বার্তা ওয়ারলেস যোগে চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরীকে প্রেরণ করেন। চট্টগ্রাম বেতার থেকে আওয়ামী লীগ নেতা এম এ হান্নান বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার বাণী স্বকণ্ঠে প্রচার করেন। পরে ২৭ মার্চ চট্টগ্রামে অবস্থিত অষ্টম ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের মেজর জিয়াউর রহমান ঐ ঘোষণা পুনঃপাঠ করেন। বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করে করাচিতে নিয়ে যাওয়া হয়। ফলে শুরু হয় বহু প্রতিক্ষিত মুক্তিযুদ্ধ।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

উপরিউক্ত পর্যায়গুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সবক্ষেত্রে বাঙালির মনে অসন্তোষের কারণ বৈষম্য। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রতি যে সকল বৈষম্যের কারণে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা সংগ্রাম তথা মুক্তিযুদ্ধ অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল সেগুলো নিম্নরূপ :

সাংস্কৃতিক বৈষম্য : পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী সর্বপ্রথম আঘাত হানে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর। কোনো জাতির মাতৃভাষা কেড়ে নেয়ার প্রথম কালো নজির সৃষ্টি করে পশ্চিম পাকিস্তান। বাংলার জাতীয় ইতিহাসে অবিস্মরণীয় ঘটনার বীজ রোপিত হয়, যখন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই নিখিল পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মাতৃভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক উপায়ে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেয়ার প্রচেষ্টা চালানো হয়। এ আন্দোলনের অংশ হিসেবেই ১৯৫২ সালের ৩০ জানুয়ারি ঢাকায় ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। এতে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, ২১ ফেব্রুয়ারিকে ভাষা দিবস হিসেবে পালন এবং দেশব্যাপী হরতাল পালন করা হবে। ২১ ফেব্রুয়ারি উক্ত কর্মসূচিকে বানচাল করার জন্য তৎকালীন গভর্নর নুরুল আমীন ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করেন। কিন্তু জনতা দীপ্ত শপথ নিয়ে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ কর বুকের তাজা রক্ত ঢেলে রাজপথ রাঙিয়ে মৃত্যুকে হাসিমুখে আলিঙ্গন করে বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করে। পাশাপাশি পাকিস্তানি স্বৈরাচারীদের কাছে প্রমাণ করে যে, বাঙালি জাতি ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় জীবন উৎসর্গকে তুচ্ছ ব্যাপার মনে করে। ছাত্র সমাজের এ আত্মত্যাগ বাঙালি জাতির আন্দোলনের প্রথম সোপান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

অর্থনৈতিক বৈষম্য : ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতার সময় পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যবধানের মাত্রা ছিল খুব কম। চা উৎপাদন এবং বস্ত্র উৎপাদনে পূর্ব পাকিস্তান সামান্য এগিয়ে ছিল, যদিও চিনি এবং ধাতব দ্রব্যের উৎপাদন ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের কিছু বেশি সুবিধা ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের সেচ পরিকল্পনা ছিল উন্নততর, যদিও ব্যাংক ব্যবস্থায় পূর্ব পাকিস্তানের সুযোগ ছিল সামান্য বেশি। মোটের ওপর, ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের উভয় অংশ মোটামুটিভাবে একই পর্যায়ে

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের অবশ্য মাথাপিছু আয় ছিল সামান্য বেশি। কিন্তু স্বাধীনতা উত্তর কালে সরকারি নীতির ফলে পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যে বৈষম্যের এক পাহাড় গড়ে ওঠে। যেমন : ১৯৪৯-৫০ অর্থবছরে পশ্চিম এবং পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মাথাপিছু আয় ছিল যেখানে যথাক্রমে ৩৩৮ টাকা এবং ২৮৭ টাকা অর্থাৎ বৈষম্য ১৯%; অথচ ১৯৬৯-৭০ অর্থবছরে তা হয় ৫৩৩ এবং ৩৩১ টাকা অর্থাৎ বৈষম্য গিয়ে দাঁড়ায় ৬১%-এ।

পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য দ্বিগুণ অর্থ ব্যয় করা হয়। এমনিভাবে দেশের সম্পদের ও বৈদেশিক সাহায্যের সিংহভাগ পশ্চিম পাকিস্তানে বিনিয়োগ করে শিল্প কারখানা, কৃষি, সেচ, ব্যবসা বাণিজ্যের প্রভৃত ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল সেখানে। বিদ্যুৎ উৎপাদন, সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করে অনাবাদি বিশাল অঞ্চলকে শস্যভাণ্ডারে পরিণত করা হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় প্রশাসন, ব্যবসা-বাণিজ্যের সমুদয় কর্মকাণ্ড কেন্দ্রীভূত করে সেখানকার অর্থে কোনো ধরনের উন্নয়নমূলক পরিবর্তন হয়নি বললেই চলে। রাজস্ব উন্নয়ন বাজেটের বরাদ্দে উভয় অংশের মধ্যে মারাত্মক বৈষম্য করা হয়। যেমন : পশ্চিম পাকিস্তানের মোট উন্নয়ন ব্যয় যেখানে ছিল ৬১৯৮ কোটি টাকা সেখানে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ছিল মাত্র ২৯৯৬ কোটি টাকা।

আবার, পূর্ব পাকিস্তানের রপ্তানি আয় যেখানে ছিল ১৯৯৯৬ কোটি টাকা (৫৭%), অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের রপ্তানি আয় ছিল ১৫৬২৪ কোটি টাকা (৪৩%)। কিন্তু এ আয়ের সিংহভাগই ব্যয় করা হতো পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নের জন্য।

পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে যে শিল্পায়ন ও জনগণের জীবনমান ও মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে বৈষম্য দেখা যায় তা বাঞ্ছনীয় নয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় মূলত উভয় প্রদেশের শিল্প প্রতিষ্ঠায় বৈষম্যমূলক নীতির জন্য।

অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের মাত্রাতিরিক্ত অর্থনৈতিক বঞ্চনামূলক নীতি গ্রহণের ফলে দুই অঞ্চলের মধ্যে বিরাজমান অর্থনৈতিক বৈষম্য এত প্রকট হয়ে উঠে যে, সাধারণ বাঙালিরা পর্যন্ত এ অবস্থার প্রতিকারের জন্য সোচ্চার হয়ে ওঠে। এর ফলেই ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান এবং সর্বোপরি ১৯৭১ সালের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সর্বস্তরের জনগণেরও সামগ্রিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পেছনে চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে। আর এ থেকেই সূচিত হয় বিপ্লবের এবং জন্ম হয় বাংলাদেশের।

সামরিক বৈষম্য : পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তার ব্যাপারটি ছিল যেমন অনিশ্চিত, তেমনি সামরিক ক্ষেত্রে বৈষম্য ছিল সীমাহীন। পাকিস্তানের দেশরক্ষা বাহিনীর ৩টি সদর দপ্তরই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। সমরাস্ত্র কারখানাও ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। দেশরক্ষা বাহিনীর উচ্চপদে বাঙালিদের কোনো স্থান ছিল না। দেশরক্ষা বাহিনীতে চাকরির ক্ষেত্রেও পশ্চিম পাকিস্তানিদের স্থান ছিল একচেটিয়া। কেবল সেনাবাহিনীতেই পশ্চিম পাকিস্তানের স্থান ছিল শতকরা ৯৫ ভাগ, পূর্ব পাকিস্তানের স্থান ছিল মাত্র ৫ ভাগ। প্রতিরক্ষা খাতের মোট বাজেটের ৯৫% ব্যয় করা হতো পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য যেখানে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ব্যয় করা হতো মাত্র ৫%। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময় এ সত্যতা সকলের উপলব্ধি হয়েছে প্রত্যক্ষভাবে। সামরিক বৈষম্যের কারণেই ছয় দফাতে প্যারামিলিশিয়া গঠনের দাবি জানানো হয়েছিল। মূলত ধীরে ধীরে বাঙালিরা তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

রাজনৈতিক বৈষম্য : পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের অব্যবহিত পর থেকেই পূর্ব বাংলায় রাজনৈতিক বৈষম্যের শিকার হতে শুরু করে। পাকিস্তানের তখন দুটি গুরুত্বপূর্ণ পদই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের দখলে। পূর্ব বাংলার জননেতা শেরে বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হকসহ এ অঞ্চলের সকল জনপ্রিয় নেতৃবৃন্দকে রাজনৈতিকভাবে নিষ্ক্রিয় করে রাখার চেষ্টা করা হয়। জনসংখ্যার দিক থেকে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাধিক্য থাকা সত্ত্বেও প্রায় সকল ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বৈষম্য নীতি অনুসরণ করা হয়। এমনকি আইন পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানকে সংখ্যা সাম্যনীতি মানতে বাধ্য করা হয়। প্রকৃত অর্থে পাকিস্তান তার জন্মলগ্ন থেকেই পূর্ব পাকিস্তানকে রাজনৈতিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করতে থাকে। পাকিস্তানের এসব বৈষম্যমূলক নীতির প্রতিবাদে যখন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকারের দাবি তোলে, তখন পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকচক্র গণতান্ত্রিক রীতিনীতির কথা ভুলে গিয়ে ন্যায্য দাবি দাওয়াকে দমানোর চেষ্টা শুরু করে।

পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের আন্তরিকতা এবং সহযোগিতা সত্ত্বেও পাকিস্তানি শাসকদের নির্যাতন, শোষণ আর অহমিকার জন্য এ দেশের জনগণ বিচ্ছিন্ন হতে বাধ্য হয়। বাঙালিদের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানিদের অর্থনৈতিক বৈষম্য, সামরিক বৈষম্য, সাংস্কৃতিক বৈষম্য শুরু হলে পূর্ব বাংলার জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিপ্লব দানা বাঁধতে থাকে এবং এরই সূত্র ধরে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে স্বাধীনতার জাগরণ সৃষ্টি হয়, যা পরবর্তীতে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠাকে ত্বরান্বিত করে।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার দ্বারা বোঝা যায় যে, ন্যায্য অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে পূর্ব বাংলার জনগণের জন্য স্বাধীনতা সংগ্রাম অপরিহার্য ছিল এবং এ যুদ্ধ এটাই প্রমাণ করে যে জোর করে অন্যায়ভাবে জনগণকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যায় না। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর দীর্ঘ ২৪ বছরের শাসন, শোষণ আর নির্যাতনের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার জনসাধারণ এক সময় বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয় এবং ঝাঁপিয়ে পড়ে মুক্তির উল্লাসে, ত্রিশ লক্ষ তাজা প্রাণ ঢেলে দেয় তাদের বুকের তাজা রক্ত; একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের বুকে আত্মপ্রকাশ ঘটে বাংলাদেশের।

১৩ । বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের মূল বিষয়বস্তু আলোচনা করুন।
অথবা, ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করুন।
অথবা, 'বঙ্গবন্ধু ও ৭ মার্চের ভাষণ' এ বিষয়ে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখুন।

উত্তর : বিভিন্ন জাতির জীবনে কোনো কোনো নেতার ভাষণ ইতিহাস পাল্টে দেয়। যেমন— আব্রাহাম লিংকনের 'গেটিসবার্গ অ্যাড্রেস' (১৮৩৩), মার্টিন লুথার কিং-এর 'আই হ্যাভ এ ড্রিম' (১৯৬৩) উল্লেখযোগ্য ভাষণ। কিন্তু বাঙালি জাতির মুক্তির বিবেচনায় বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের (১৯৭১) ভাষণকে শ্রেষ্ঠ ভাষণগুলোর অন্যতম ভাষণ বলা হয়। এ ভাষণকে বাঙালি জাতির মুক্তির সনদও বলা হয়। বাঙালি শত শত বছর ধরে যে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছে তাকে ভাষা দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ৭ মার্চের ভাষণের মাধ্যমেই শেখ মুজিব স্বাধীনতা, বাঙালি জাতির মুক্তির জন্য করণীয় নির্দেশ করেছেন।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের মূল বিষয়বস্তু : তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর দেয়া ভাষণের সময় ছিল মাত্র ১৯ মিনিট। এ ১৯ মিনিটের ভাষণে বাঙালি জাতির জন্য করণীয় ও পশ্চিমা শাসকবর্গের অতীত শাসন-শোষণের ইতিহাস তুলে ধরেছেন চমৎকারভাবে। যেন সাজানো-গোছানো উপস্থাপনার সুস্পষ্ট নির্দেশনা। নিচে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের মূল বিষয়বস্তু তুলে ধরা হলো :

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

১. **শোষণ ও বৈষম্য চিত্র উন্মোচন :** শেখ মুজিব তার ভাষণের প্রথম দিকে বাঙালির উপর ২৩ বছরে পাকিস্তান সরকারের শোষণের চিত্র তুলে ধরেন। তিনি বলেন, '১৯৫২ সালে আমরা রক্ত দিয়েছি, ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয় লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারি নি। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খাঁন মার্শাল ল জারি করে ১০ বছর আমাদের গোলাম করে রেখেছে। ১৯৬৬ সালে ৬-দফা আন্দোলনের সময় আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।' তাছাড়া বাঙালির প্রতি পাকিস্তান সরকারের বৈষম্য চিত্রও বাদ যায় নি তাঁর বক্তব্যে।

২. **আওয়ামী লীগের সংবিধান রচনার প্রচেষ্টার চিত্র :** সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের প্রচেষ্টার কথা শেখ মুজিব তার ভাষণে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, 'নির্বাচনে বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে ও আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল এসেম্বলি বসবে। আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈরি করব এবং এ দেশকে আমরা গড়ে তুলবো।' তাছাড়া ভাষণের আরো কয়েক জায়গায় সংবিধান রচনার কথা উল্লেখ করেন তিনি ।

৩. **অত্যাচারের ইতিহাস স্মরণ :** শেখ মুজিব তার অল্প সময়ের ভাষণে পাক সরকারের অত্যাচারের ইতিহাস জনগণকে স্মরণ করিয়ে দেন। ফলে জনমনে ক্ষোভের আগুন তীব্রতর হয়। তিনি বলেন, '... দুঃখের বিষয় আজ দুঃখের সাথে বলতে হয়, ২৩ বছরের করুণ ইতিহাস, বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস, ২৩ বছরের ইতিহাস, মুমূর্ষু নর-নারীর করুণ আর্তনাদের ইতিহাস। এ দেশের মানুষের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।'

৪. **ইয়াহিয়ার স্বৈরাচারী মুখোশ উন্মোচন :** শেখ মুজিব তার ভাষণে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিকট ইয়াহিয়ার ক্ষমতা হস্তান্তরের অনিহার কথা তুলে ধরেন। এক্ষেত্রে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দিতে ইয়াহিয়ার তালবাহানার কথা স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। শেখ মুজিব বলেন, 'প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সাথে দেখা করেছি। আমি শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবে তাকে অনুরোধ করেছিলাম, ১৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে আমাদের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন। তিনি আমার কথা রাখলেন না, রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা।'

৫. **ইয়াহিয়া-ভুট্টো চক্রের ষড়যন্ত্র ফাঁস :** সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগকে পাশ কাটিয়ে কিভাবে ভুট্টোর সাথে ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে রাখতে ষড়যন্ত্র করেছেন তা শেখ মুজিব তার ভাষণে তুলে ধরেন। ইয়াহিয়ার ঘোষণা মতো ১৯৭১ সালের মার্চের প্রথম সপ্তাহে ৩৫ জন জাতীয় পরিষদ সদস্য ঢাকায় অধিবেশনে যোগ দিতে আসেন। কিন্তু ভুট্টোর ঘোষণা অধিবেশনে যোগ দিলে পরিষদ 'কসাইখানা' হবে হুমকির প্রেক্ষিতে ইয়াহিয়া পিছুটান দেন। এভাবে ইয়াহিয়া-ভুট্টো চক্রের ষড়যন্ত্র জনসম্মুখে ফাঁস করেন বঙ্গবন্ধু।

৬. **ইয়াহিয়াকে অত্যাচারের চিত্র দেখার আহ্বান :** ইয়াহিয়ার নির্দেশে পাক সেনারা বাংলার নিরীহ জনগণকে পাখির মত গুলি করে মেরেছে, নির্যাতন করে বর্বরদের কায়দায়। তাই মুজিব তার ভাষণে ইয়াহিয়াকে তার লেলিয়ে দেয়া সেনাদের অত্যাচারের চিত্র স্বচক্ষে দেখার আহ্বান জানান। ভাষণের এক পর্যায়ে মুজিব বলেন, 'জেনারেল ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট। দেখে যান, কিভাবে আমার গরিবের উপর, আমার বাংলার মানুষের উপর গুলি করা হয়েছে। কিভাবে মায়ের কোল খালি করা হয়েছে, কী করে মানুষ হত্যা করা হয়েছে। আপনি আসুন, দেখুন।'

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৭. **সামরিক শাসন অবজ্ঞা ও অধিবেশনে যোগদানের শর্ত :** বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার ঐতিহাসিক ভাষণে ইয়াহিয়ার সামরিক শাসনকে অবজ্ঞা করেন এবং জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের ক্ষেত্রে ৪টি শর্ত জুড়ে দেন। এগুলো হলো– সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে, সমস্ত সেনাবাহিনীর লোকদেরকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে এবং জনগণের প্রতিনিধির নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

৮. **শত্রুর মোকাবিলা :** বঙ্গবন্ধু শোষিত, নির্যাতিত ও নিগৃহীত বাঙালিকে রক্ষায় আজীবন সংগ্রাম করেছেন। তাই তিনি তার ৭ মার্চের ভাষণে জনগণকে শত্রুর মোকাবিলা করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি ভাষণের এক পর্যায়ে বাঙালিদের অভয় দিয়ে বলেন, 'প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে।'

৯. **দেশবাসীর করণীয় নির্ধারণ :** বঙ্গবন্ধু তার ঐতিহাসিক ভাষণে দেশবাসীর জন্য করণীয় নির্ধারণ করেন। তিনি বলেন, 'আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট-কাছারি, আদালত, ফৌজদারি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে, সেজন্য যেসমস্ত অন্যান্য জিনিসগুলি আছে সেগুলি হরতালকালে চলবে। রিকশা, গরুর গাড়ি, রেল চলবে। শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিমকোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমি-গভর্নমেন্ট দপ্তর, ওয়াপদা-কোনো কিছুই চলবে না। ২৮ তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন।'

১০. **পাকিস্তান সরকারের শাসনকে চ্যালেঞ্জ :** বঙ্গবন্ধু তার ভাষণে বলেন, 'মনে রাখবেন, রেডিও যদি আমাদের কথা না শোনে, তাহলে কোনো বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না। যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয়, তাহলে টেলিভিশনে যাবেন না। দুই ঘণ্টা ব্যাংক খোলা থাকবে; যাতে মানুষ তাদের মায়না-পত্র নিতে পারে। পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন-টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ব বাংলায় এবং বাংলাদেশের নিউজ বাইরে পাঠানো চলবে।' এর মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান সরকারের শাসনকে চ্যালেঞ্জ করেন।

১১. **ট্যাক্স প্রদান বন্ধ ঘোষণা :** একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র পরিচালিত হয় জনগণের ট্যাক্স ও খাজনায়। বঙ্গবন্ধু তার ভাষণে বলেন, 'যে পর্যন্ত আমার এ দেশের মুক্তি না হচ্ছে ততদিন খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো। কেউ দেবেন না।' এর দ্বারা বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান সরকারের অর্থনৈতিক উৎসে আঘাত হানেন।

১২. **সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি :** বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক পুরোধা। ৭ মার্চের ভাষণেও তিনি এর পরিচয় রেখেছেন। তিনি তার ভাষণে বলেন, 'বাংলার হিন্দু-মুসলমান সবাই ভাই ভাই, অবাঙালি যারা তাদের রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের ওপর।' এভাবে তিনি ৭ মার্চ থেকে বাঙালি-অবাঙালি (বিহারি) দাঙ্গার বিরুদ্ধে অবস্থান নেন।

১৩. **যুদ্ধের প্রস্তুতি :** বঙ্গবন্ধু সশস্ত্র প্রক্রিয়ায় স্বাধীনতার জন্য জাতিকে প্রস্তুত হতে তার বক্তৃতায় আহ্বান জানান। বক্তৃতার কয়েক লাইনে মূর্ত হয়ে ওঠে তার আহ্বান। 'প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায়, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলো এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাক। মনে রাখবা রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দিব। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ।'

১৪. **মুক্তির ডাক :** বঙ্গবন্ধুর ভাষণের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে বাঙালিকে যুদ্ধ, স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্য প্রস্তুত করেন। তিনি সমস্ত ভাষণে 'মুক্ত', 'মুক্তি' শব্দটি বারবার ব্যবহার করেন। ভাষণের ৪র্থ লাইনে 'আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়' এবং ৮ম লাইনে আবার 'এদেশের মানুষ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে' বলেন তিনি।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

১৫. পরোক্ষ স্বাধীনতার ঘোষণা : বঙ্গবন্ধু একজন বিজ্ঞ রাজনীতিবিদ ছিলেন। তাই রেসকোর্সে সরাসরি স্বাধীনতা ঘোষণা করলে পাকবাহিনী তাৎক্ষণিক কোনো চরম ব্যবস্থা নিতে পারে, এমনকি সেনা ও বিমান হামলা চালাতে পারে এমন আশঙ্কা বোধ করেন। এ বিষয়টি উপলব্ধি করে বঙ্গবন্ধু কৌশলে পরোক্ষ স্বাধীনতার ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

একজন সফল নেতার বড় গুণ তার ভাষণ বা বক্তৃতা। বঙ্গবন্ধু এক্ষেত্রে শতভাগ সফল। তিনি ৭ মার্চের ভাষণের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতিকে শোষণ থেকে মুক্তির লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক দেন। এ ডাকে আপামর জনসাধারণ সাড়া দেয়। ফলে দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতি ছিনিয়ে আনে স্বাধীনতার লাল-সবুজের পতাকা।

১৪। মুজিবনগর সরকারের গঠন প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন।
***অথবা,* মুজিবনগর সরকারের গঠন সম্পর্কে আলোচনা করুন।**

উত্তর : ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে পাক হানাদার বাহিনী ঘুমন্ত, নিরীহ ও নিরস্ত্র বাঙালির উপর হামলা চালিয়ে অসংখ্য মানুষ হত্যা করে। হামলার পরদিন অর্থাৎ ২৬ মার্চ থেকে বাংলার মানুষ পাক হায়েনাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তোলে। আর এ প্রতিরোধ সংগ্রামকে চূড়ান্ত রূপ দিতে এক নতুন সরকারের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এ প্রয়োজনীয়তা থেকেই গঠিত হয় মুজিবনগর সরকার।

মুজিবনগর সরকারের গঠন প্রক্রিয়া : বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হলো মুজিবনগর সরকারের গঠন। এই সরকার পরিচিত ছিল 'প্রবাসী সরকার' নামে। নিচে মুজিবনগর সরকারের গঠন প্রক্রিয়া আলোচনা করা হলো :

১. **তাজউদ্দীন ও আমিরুলের ভারত গমন :** ২৬ মার্চ ১৯৭১ থেকে বাংলাদেশে প্রতিরোধ সংগ্রাম তীব্রতর হতে থাকে। এ সময় ভারত সরকারের সাহায্যের প্রত্যাশায় ১ এপ্রিল তাজউদ্দীন আহমদ এবং ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সিনিয়র অফিসারদের সহায়তায় ভারতীয় গোয়েন্দা পরিবেষ্টিত অবস্থায় দিল্লি পৌঁছেন। অতঃপর ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর সাথে সাক্ষাতের জন্য দিনক্ষণ খুঁজতে থাকেন।

২. **তাজউদ্দীন কর্তৃক সরকার গঠন :** দিল্লিতে কয়েকদিন অবস্থানের পর তাজউদ্দীন ও ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলামের সাথে ইন্দিরা গান্ধীর বৈঠক হয়। বৈঠকে ইন্দিরা গান্ধী তাদের বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শুনেন। কিন্তু ভারতের সাহায্য প্রার্থনা করার জন্য কোনো আইনগত অধিকার তাজউদ্দীনের ছিল না। সেজন্য মিসেস গান্ধীর সাথে বৈঠকের পর তিনি দিল্লিতে বসে নিজেকে প্রধানমন্ত্রী বানিয়ে একটা সরকার গঠন করেন এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তার প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেন। তাজউদ্দীন আহমদ গঠিত এই সরকারকে ভারত সমর্থন করে এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সহযোগিতার সবুজ সংকেত পাওয়া যায়।

৩. **ভাষণ রেকর্ড :** তাজউদ্দীন আহমদ ও ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম দিল্লিতে ৭ দিন অবস্থান করেন। দিল্লিতে অবস্থানকালেই তাজউদ্দীন আহমদ ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় বেতার মাধ্যমে জনগণের উদ্দেশ্যে প্রচারের জন্য একটি ভাষণ রেকর্ড করেন এবং জনৈক গোলক মজুমদারের কাছে ক্যাসেটটি হস্তান্তর করা হয়। দিল্লি থেকে তাজউদ্দীন আহমদ ও ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম এপ্রিলের ৮/৯ তারিখের দিকে কলকাতা আসেন।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৪. **কলকাতায় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের আগমন :** ১৯৭১ সালে এপ্রিল মাসের গোড়ার দিকে কলকাতায় আওয়ামী লীগের অনেক শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের আগমন ঘটে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন– শেখ ফজলুল হক মনি, তোফায়েল আহমেদ, কামারুজ্জামান প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। অধিকাংশ নেতাই কলকাতার প্রিন্সেস স্ট্রিটের এম.এল.এ. হোস্টেলে উঠেন। তাজউদ্দীন ও ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম উঠেন বিএসএফ এর লর্ড সিনহা রোডের একটি অফিসে। কলকাতায় আগত নেতৃবৃন্দ তাজউদ্দীন কর্তৃক সরকার গঠন নিয়ে কানাঘুষা শুরু করে।

৫. **তাজউদ্দীন সরকারকে মানতে অস্বীকৃতি :** প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ অনেকটা বাধ্য হয়ে একক সিদ্ধান্তে সরকার গঠন করেন। কিন্তু কলকাতায় আগত আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ তাজউদ্দীন কর্তৃক একক সিদ্ধান্তে মন্ত্রিপরিষদ গঠন ও মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের নামের তালিকা ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা সহজে মেনে নিতে পারেন নি। ফলে শুরু হয় গ্রুপ বৈঠক। তবে এএইচএম কামারুজ্জামান ছিলেন ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পক্ষে।

৬. **লর্ড সিনহা রোডে বৈঠক :** এএইচএম কামারুজ্জামানের প্রচেষ্টায় ৯ এপ্রিল ১৯৭১ রাতে তাজউদ্দীন কর্তৃক গঠিত সরকার নিয়ে সৃষ্ট জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যে লর্ড সিনহা রোডে বৈঠক বসে। এতে উপস্থিত ছিলেন– তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, এএইচএম কামারুজ্জামান, আমিরুল ইসলাম, মিজানুর রহমান চৌধুরী, শেখ ফজলুল হক মনি, তোফায়েল আহমেদসহ আরো অনেকে। বৈঠকে শেখ মনি একটি বিপ্লবী কাউন্সিল গঠনের ব্যাপারে দৃঢ়মত ব্যক্ত করেন। বৈঠকে উপস্থিতদের মধ্যে অধিকাংশই শেখ মনির বক্তব্য সমর্থন করেন।

৭. **তাজউদ্দীন ঘোষিত মন্ত্রিপরিষদ সমর্থিত :** লর্ড সিনহা রোডের বৈঠকে অসমঝোতামূলক প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম যুক্তি দেখান যে, ইন্দিরা গান্ধীর সাথে তাজউদ্দীন আহমদ দলের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে কথা বলেছেন। দলের সভাপতি বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে কথা বলার এখতিয়ার তার আছে। তিনি আরো যুক্তি দেখান যে, তারা ভারত সরকারকে মন্ত্রিপরিষদের তালিকা উপস্থাপন করার পর আর তা পরিবর্তন করা সমীচীন হবে না। এসব যুক্তির প্রেক্ষিতে শেষ পর্যন্ত বৈঠকে মন্ত্রিপরিষদ সমর্থিত হয়।

৮. **রেকর্ডকৃত ভাষণ প্রচার :** শেখ ফজলুল হক মনির বিরোধিতা সত্ত্বেও ১০ এপ্রিল রাত ৯.৩০ মিনিটে অল ইন্ডিয়া রেডিওর শিলিগুড়ি কেন্দ্র থেকে তাজউদ্দীন আহমদ এর প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গঠন সম্পর্কিত রেকর্ডকৃত ভাষণ প্রচার করা হয়। শিলিগুড়ি কেন্দ্রের একটি অতিরিক্ত ট্রান্সমিটার এজন্য ব্যবহার করা হয়েছিল। ট্রান্সমিটারের নাম ঘোষণা করা হয়েছিল 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র'।

৯. **নেতৃবৃন্দের আগরতলা গমন :** ১০ এপ্রিল ১৯৭১ প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, শেখ ফজলুল হক মনি এবং তোফায়েল আহমেদ ভারতীয় বিমান বাহিনীর একটি কার্গো প্লেনে আগরতলার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। যাত্রাপথে শিলিগুড়ি বিরতি নেন। ময়মনসিংহ সীমান্ত ঢালু পাহাড়ের নিচে সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও টাঙ্গাইলের আব্দুল মান্নান আশ্রয় নিয়েছিলেন। খবর পাঠিয়ে তাদেরকে ডেকে আনা হয়। সৈয়দ নজরুল ইসলাম তাজউদ্দীনকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মেনে নেন। এই দুজনসহ প্রধানমন্ত্রীর টিম ১১ এপ্রিল আগরতলা পৌঁছে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

১০. **তাজউদ্দীন গঠিত মন্ত্রিসভা বহাল :** আগড়তলা সার্কিট হাউজে খন্দকার মোশতাক আহমেদ, আব্দুস সামাদ আজাদ, জহুর আহমেদ চৌধুরী প্রমুখ অবস্থান করছিলেন। মোশতাক ছিলেন প্রধানমন্ত্রী পদের মূল প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু ইতোমধ্যে তাজউদ্দীন আহমদের অবস্থান শক্তিশালী হওয়ায় মোশতাক আহমেদ তাজউদ্দীনকে মেনে নেন এই শর্তে যে, তাকে পররাষ্ট্র দপ্তর দিতে হবে। এভাবে শেষ পর্যন্ত তাজউদ্দীন গঠিত মন্ত্রিসভাই বহাল থাকে। আগরতলাতে মন্ত্রীদের মাঝে নিম্নোক্তভাবে দপ্তর বন্টন করা হয়—

দায়িত্বপ্রাপ্ত দপ্তর/মন্ত্রণালয়	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি
রাষ্ট্রপতি	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
উপরাষ্ট্রপতি/অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি	সৈয়দ নজরুল ইসলাম
প্রধানমন্ত্রী	তাজউদ্দীন আহমদ
পররাষ্ট্র দপ্তর	খন্দকার মোশতাক আহমদ
স্বরাষ্ট্র দপ্তর	এএইচএম কামারুজ্জামান
অর্থ দপ্তর	ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী

১০ এপ্রিল ১৯৭১ ভারতে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়। অতঃপর কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার ভবেরপাড়া গ্রামের বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে এ সরকার ১৭ এপ্রিল শপথ গ্রহণ করে। পরবর্তীতে বৈদ্যনাথতলার নাম করা হয় মুজিবনগর। এরপর থেকেই প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার মুজিবনগর সরকার নামে পরিচিত হয়। মুজিবনগর সরকার গঠনের পর বাংলাদেশের নামকরণ করা হয় 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার', যা একটি স্মরণীয় ঘটনা।

১৫ । মুজিবনগর সরকারের কার্যাবলী আলোচনা করুন।

অথবা, **মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর সরকারের ভূমিকা আলোচনা করুন।**

অথবা, **১৯৭১ সালে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের অবদান উল্লেখ করুন।**

অথবা, **'মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর সরকারের ভূমিকা ছিল ঈর্ষণীয়।' –ব্যাখ্যা করুন।**

উত্তর : মুজিবনগর সরকার বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের এক উজ্জ্বল অধ্যায়। মুক্তিযুদ্ধকালীন গঠিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার অর্থাৎ প্রবাসী সরকার, মুজিবনগর সরকার নামে পরিচিত। বাঙালির মুক্তির বাসনাকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সমর্থনের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করা ছিল মুজিবনগর সরকারের বড় সাফল্য। মুজিবনগর সরকার গঠিত হয় ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল এবং শপথ গ্রহণ করে ১৭ এপ্রিল। প্রথমদিকে বাংলাদেশ সরকারের দপ্তর মুজিবনগরে স্থাপিত হলেও পরবর্তীতে এর দাপ্তরিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতো কলকাতার ৮নং থিয়েটার রোডের অফিসে।

মুজিগনর সরকারের কার্যাবলী : মুজিবনগর সরকারের কার্যাবলী ছিল উল্লেখ করার মতো। এ সরকারের সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা বলে বাংলার মুক্তিপাগল জনতা স্বাধীনতার স্বাদ আস্বাদন করতে সক্ষম হয়। মুক্তিযুদ্ধকালীন মুজিবনগর সরকারের কার্যাবলী আলোচনা করা হলো :

১. **রাজনৈতিক নেতৃত্ব দান :** মুজিবনগর সরকার গঠনের পূর্বে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে বেগবান করতে রাজনৈতিক নেতৃত্বদানকারী প্রতিষ্ঠানের অভাব ছিল। মুজিবনগর সরকার গঠনের পর এ অভাব দূরীভূত হয়। এ সরকার মুক্তিবাহিনীকে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে এদেরকে একটি সাংগঠনিক কাঠামোতে আনে। অতঃপর এ বাহিনীতে পদসোপানিক নেতৃত্ব সুনির্দিষ্ট করে দেয়। তাছাড়া যুদ্ধকে সুষ্ঠু ও সুনিপুণভাবে পরিচালনার প্রয়াসে এ সরকার সারাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

২. **দেশকে শত্রুমুক্ত :** মুক্তিযুদ্ধের নয়মাস মুজিবনগর প্রশাসনের সকল স্তরের সদস্য (কর্মকর্তা, কর্মচারী, সচিব,মন্ত্রী প্রমুখ) নানা সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও তাদের দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন। তারা অতি সামান্য বেতনভাতা গ্রহণ করেছেন। কষ্টে দিনাতিপাত করেছেন। ফলে মুজিবনগর সরকার অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে এবং সফলতার সঙ্গে তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে মাত্র নয় মাসের মধ্যে দেশকে শত্রুমুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে।

৩. **কৌশলে যুদ্ধ পরিচালনা :** যুদ্ধ জয়ের মূলমন্ত্র হলো কৌশল অবলম্বন করা। মুজিবনগর সরকার এ মন্ত্রকে কাজে লাগিয়ে পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করে। অর্থাৎ মুজিবনগর সরকার চেইন অব কমাণ্ড বিন্যস্ত করে সুশৃঙ্খলভাবে সামরিক কৌশল রপ্ত করে বিশেষ কৌশলে যুদ্ধ পরিচালনা করে। ফলে পাক বাহিনীরা আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত হওয়া সত্ত্বেও পিছু হঠতে বাধ্য হয়।

৪. **অস্ত্র ও রসদ সরবরাহ :** মুক্তিবাহিনীর যুদ্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্র ও রসদ ছিল না বললেই চলে। এক্ষেত্রে মুজিবনগর সরকার প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করে। ভারত সরকারের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় অস্ত্র ও রসদ সরবরাহ করার লক্ষ্যে মুজিবনগর সরকার আপ্রাণ চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে ভারত সরকারও উদারভাবে সহায়তা করে। মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ৮ এপ্রিল ১৯৭১ ভারতের কাছে অস্ত্র সাহায্য চেয়ে আবেদন করেন। আবেদনের প্রেক্ষিতে ভারত সরকারও সাধ্য মোতাবেক অস্ত্র সাহায্য দেয়।

৫. **বিশ্ব জনমত সৃষ্টি :** মুজিবনগর সরকারের ঈর্ষণীয় কার্যক্রম ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে বিশ্ব জনমত সৃষ্টি। এ লক্ষ্যে মুজিবনগর সরকার পাক হানাদার বাহিনীর বর্বর গণহত্যা, লুণ্ঠন, অমানবিক নির্যাতন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি লোমহর্ষক ঘটনাসমূহ বিশ্ববাসীর নিকট তুলে ধরে। উদ্যোগ গ্রহণ করে বিভিন্ন দেশে ও জাতিসংঘে প্রতিনিধি প্রেরণের। ফলে বিশ্ব বিবেক জাগ্রত হয় এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষাবলম্বন করে।

৬. **মুক্তিবাহিনীদের প্রশিক্ষণ :** প্রশিক্ষিত পাক বাহিনীর সাথে প্রশিক্ষণবিহীন মুক্তিবাহিনীরা যখন যুদ্ধ করতে হিমশিম খাচ্ছিলেন ঠিক সেই সময় মুজিবনগর সরকার মুক্তিবাহিনীদের প্রশিক্ষণ গ্রহণের বন্দোবস্ত করে। ভারত সরকারের সহায়তায় ভারতের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ক্যাম্পে প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেয়া হয়। প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করে মুজিবনগর সরকার। মুজিবনগর সরকারের 'Office of the Director General, Youth camps'-এর এক তালিকায় দেখা যায়, ৬ নভেম্বর ১৯৭১ সর্বমোট ২৩ শিবিরের অধীনে ২০,৯৬৪ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে।

৭. **অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য :** মুজিবনগর সরকারের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন সময় অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের উজ্জীবিত করেছেন। আর এতে অনুপ্রাণিত হয়ে আপামর জনসাধারণ প্রিয় মাতৃভূমির জন্য জীবন বাজি রাখতেও প্রস্তুত হন (যেমন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ এক বেতার ভাষণে বলেন, "আমরা তিতুমীর সূর্যসেনের বংশধর, স্বাধীনতার জন্য যেমন জীবন দিতে পারি, তেমনি আমাদের দেশ থেকে বিদেশি শত্রুসেনাদের চিরতরে হঠিয়ে দিতে আমরা সক্ষম।"

৮. **করণীয় নির্দেশমালা প্রচার :** দিকপাল হারা মুক্তিপাগল বাঙালি জনতার উদ্দেশ্যে করণীয় নির্দেশমালা প্রচার করে মুজিনগর সরকার মুক্তিযুদ্ধকালে সঠিক পথের দিশা দেখিয়েছে। যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করেছে সর্বস্তরের জনগণের সাথে। ফলে জনগণ উদ্দীপ্ত ও উজ্জীবিত হয়ে মুক্তির অন্বেষায় যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ে জয় ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হয়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৯. **বহির্বিশ্বে মিশন স্থাপন :** বহির্বিশ্বে মুজিবনগর সরকারের তৎপরতার অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হচ্ছে কলকাতা, দিল্লি, লন্ডন, ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক ও স্টকহোমসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশ সরকারের মিশন স্থাপন করা। এছাড়া ঐসব স্থানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি নিয়োগ করে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে প্রচারণা ও সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করা হয়।

১০. **আনুগত্য প্রকাশের আহ্বান :** মুজিবনগর সরকার বিশ্ববাসীর নিকট আনুগত্য প্রকাশের আহ্বান জানান। মুজিবনগর সরকারের আহ্বানে সাড়া দিয়ে এপ্রিল মাস থেকে পাকিস্তান দূতাবাসের অনেক কর্মকর্তা পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করেন। ৩০ জুন ওয়াশিংটনে পাকিস্তান দূতাবাসের ইকনমিক কাউন্সিলর এ.এম.এ. মুহিত, ৪ আগস্ট নিউইয়র্কস্থ জাতিসংঘের উপ-স্থায়ী প্রতিনিধি এস. আনোয়ারুল করিম, ওয়াশিংটনের মিনিস্টার এনায়েত করিম, নিউইয়র্কে অবস্থিত জাতিসংঘ সদর দপ্তরে পাকিস্তান মিশনের মোট ১৫ জন বাঙালি কূটনীতিক একযোগে পদত্যাগ করে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন।

১১. **প্রভাবশালী দেশের সমর্থন কামনা :** মুজিবনগর সরকার বাংলাদেশের নাগরিক এবং সহানুভূতিশীল ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, সুইডেন, জাপান ও অন্যান্য প্রভাবশালী দেশের সমর্থন লাভে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চালায়। ফলে ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়নসহ বিশ্বের অনেক প্রভাবশালী দেশের সমর্থন পায় বাংলাদেশ, যা পাকিস্তানের জন্য চপেটাঘাতস্বরূপ ছিল।

১২. **বিপদ মোকাবিলা :** মুজিবনগর সরকারের বড় চ্যালেঞ্জ ছিল অসভ্য, বর্বর পাক বাহিনীর নানামুখী চাপ ও বিপদ মোকাবিলা করে যুদ্ধের গতিকে বেগবান করা। এ সরকার নিজ দক্ষতা, যোগ্যতা, কৌশল ও ভারতের সহায়তায় পাক বাহিনীর সম্মুখ বিপদ ও আশু বিপদ মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়।

১৩. **আইনশৃঙ্খলা রক্ষা :** মুক্তিযুদ্ধের শেষের দিকে বাংলাদেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি খারাপ হতে থাকে। মুক্তিযোদ্ধা ও স্থানীয় জনসাধারণ রাজাকার ও দেশদ্রোহীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে নিজেদের হাতে আইন তুলে নিতে থাকলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। এ সময় মুজিবনগর সরকার স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে ঘোষণা করে, "আপনারা নিজের হাতে আইন তুলে নেবেন না। ভুলে যাবেন না, আমাদের যুদ্ধ হলো গণতন্ত্র আর আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য, শান্তি আর অগ্রগতির জন্য।" মুজিবনগর সরকারের সময়োপযোগী সিদ্ধান্তে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

১৪. **বেসামরিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠা :** বেসামরিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠা মুজিবনগর সরকারের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাজ। প্রশাসনে শূন্যতা রোধ ও মুক্ত অঞ্চলে শাসনব্যবস্থা নিশ্চিতের লক্ষ্যে মুজিবনগর সরকার বেসামরিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করে। তাছাড়া ভারতে অবস্থান গ্রহণকারী শরণার্থীদের দেখাশুনা ও যুব শিবিরগুলো পরিচালনার ক্ষেত্রেও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করে মুজিবনগর সরকার।

১৫. **উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন :** মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে এক কোটিরও বেশি লোক ভিটেমাটি হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। যুদ্ধের পর তাদের পুনর্বাসন করা ছিল সত্যিকার অর্থেই কষ্টসাধ্য। ভারত সরকারের সহযোগিতা, জাতিসংঘ ও অন্যান্য বিদেশিদের সহায়তা দিয়ে মুজিবনগর সরকার অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পুনর্বাসন সমস্যার সমাধান করে।

উপসংহার : মুক্তিযুদ্ধে গঠিত মুজিবনগর সরকারের কার্যক্রম বাঙালি জাতির জন্য যেমনই আশাব্যঞ্জক ও সুখকর ছিল, ঠিক তেমনই তা পাক বাহিনীর জন্য ছিল হতাশাব্যঞ্জক ও হৃদয় ভঙ্গের পদধ্বনি। মুজিবনগর সরকার পুরো নয় মাস এমনকি ১৯৭২ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত সতর্কতা ও চতুরতার সাথে তার সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। ফলশ্রুতিতে বাঙালি পেয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশ, মুক্ত হয়েছে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

১৬ ॥ বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করুন।
অথবা, **'স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর প্রত্যাবর্তন' এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখুন।**
অথবা, **'স্বদেশ প্রত্যর্বতন ও বঙ্গবন্ধু' এ বিষয়ে একটি নাতিদীর্ঘ রচনা লিখুন।**

উত্তর : বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও চমকপ্রদ ঘটনা। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেফতার হলেও গ্রেফতার পরবর্তী নয়মাস এমনকি ১৬ ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও কেউ জানতেন না বঙ্গবন্ধু কোথায় আছেন, জীবিত না মৃত। ফলে স্বাধীনতার আনন্দে বাঙালি জাতি উদ্বেলিত হলেও বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতি তাদেরকে বিষিয়ে তোলে। আপামর জনতা তাদের প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধুর প্রকৃত অবস্থা ও অবস্থান জানার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। এ ব্যাকুলতা বঙ্গবন্ধুকে কাছে না পাবার, হৃদয়ের গভীর থেকে উৎসারিত ভালবাসার, স্বাধীনতার প্রকৃত স্বাদ বঙ্গবন্ধু বিহীন নিরস মনে আস্বাদন করার।

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন : বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রকৃত হদিস না পাওয়া পর্যন্ত পুরো জাতি উৎকণ্ঠিত ছিলেন। বঙ্গবন্ধুকে কাছে না পাওয়া পর্যন্ত এ উৎকণ্ঠার যেন শেষ ছিল না। নিচে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

১. **বঙ্গবন্ধুর অবস্থান জানার দাবি :** ত্রিশ লক্ষ শহীদের আত্মত্যাগ ও বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতির দরুন বাংলার জনমনে বিজয়োল্লাসে ভাটা পড়ে। স্বাধীনতার জ্বলন্ত সূর্যে বাঙালির হৃদয়ের চকচকে ভাব ও আত্মবিশ্বাসের যে ছাপ ফুটে উঠেছিল তাকে পুঁজি করে তারা বঙ্গবন্ধুর প্রকৃত অবস্থান জানার জন্য তৎপর হয়। সেই সাথে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলোও বঙ্গবন্ধুর প্রকৃত অবস্থান জানার জন্য তৎপর হয়। ফলে ইয়াহিয়া সরকার নড়েচড়ে বসে।

২. **জীবিত সাপেক্ষে বঙ্গবন্ধুর মুক্তি দাবি :** বঙ্গবন্ধু জীবিত নেই কিংবা বঙ্গবন্ধুকে স্বাধীন দেশের মাটিতে বীরের বেশে প্রত্যাবর্তন করা দেখতে পাবেন না এমনটা কখনোই বাঙালি জাতি ভাবেন নি কিংবা মন থেকে মেনে নেন নি। জনমনে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা থাকলেও তারা বঙ্গবন্ধুকে জীবিত কাছে পাবেন এমনটাই ধারণা পোষণ করতেন আর এই ধারণা থেকেই বঙ্গবন্ধুকে জীবিত পাওয়া সাপেক্ষে জনগণ তার মুক্তির দাবি জোরালোভাবে করে।

৩. **মুক্তি এবং অন্তরীণ :** জুলফিকার আলী ভুট্টো পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন ১৯৭১ সালের ২০ ডিসেম্বর। দায়িত্ব গ্রহণের পর বঙ্গবন্ধুর অবস্থান সম্পর্কে জানানোর ব্যাপারে তিনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চাপের মুখে পড়েন। চাপের মুখে পড়ে ভুট্টো বঙ্গবন্ধুর জীবিত থাকার কথা স্বীকার করেন। সেইসাথে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেওয়ার বিষয়ে আশ্বাস দেন। ২১ ডিসেম্বর ১৯৭১ নিউইয়র্ক টাইমস বঙ্গবন্ধুর মুক্তির ব্যাপারে পাকিস্তানের ঘোষণা প্রকাশ করে। ২২ ডিসেম্বর একই পত্রিকা মারফতে বিশ্ববাসী জানতে পারে যে, ভুট্টো বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিয়ে একটি অজ্ঞাত স্থানে অন্তরীণ করে রেখেছে।

৪. **বঙ্গবন্ধুর সাথে ভুট্টোর ঐক্যের প্রচেষ্টা :** প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া জুলফিকার আলী ভুট্টোর নিকট ক্ষমতা তুলে দেবার প্রাক্কালে পিছনের তারিখ দিয়ে বঙ্গবন্ধুকে ফাঁসি দেয়ার প্রস্তাব দেন। কিন্তু বিজ্ঞ রাজনীতিবিদ হিসেবে ভুট্টো ফাঁসির পরিবর্তে বঙ্গবন্ধুকে চাপ প্রয়োগ করে পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে ঐক্যের সর্বশেষ প্রচেষ্টা করেন। এ লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুকে রাওয়ালপিণ্ডিতে আনেন জুলফিকার আলী ভুট্টো।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৫. **বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তান রক্ষার আহ্বান :** পাকিস্তানের কারাগারে অন্তরীণ বঙ্গবন্ধুর সাথে জুলফিকার আলী ভুট্টোর দু দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় যথাক্রমে ১৯৭১ সালের ২৭ ও ২৯ ডিসেম্বর। দুটি বৈঠকেই ভুট্টো বঙ্গবন্ধুকে যেকোনো মূল্যে পাকিস্তান রক্ষার আহ্বান জানান। এ বৈঠকের উল্লেখ পাওয়া যায় মার্কিন, ব্রিটিশ ও জাপানি পত্রিকায়। এ বৈঠকের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া না গেলেও বঙ্গবন্ধুর সাক্ষাৎকার, ভুট্টোর জীবনীকার স্টেনলি উলপার্ট ও সাংবাদিক রবার্ট পেইনের লেখায় অনেক তথ্য পাওয়া যায়।

৬. **বঙ্গবন্ধুর কৌশলী জবাব ও ভুট্টোর প্রস্তাব :** বঙ্গবন্ধু একজন বিজ্ঞ রাজনীতিবিদ ছিলেন। তাই তিনি ভুট্টোর পাকিস্তান রক্ষার আহ্বানের প্রেক্ষিতে কৌশলী জবাব দেন। তিনি বলেন, দেশে ফিরে জনগণের সাথে কথা না বলে কোনো প্রতিশ্রুতি দিতে পারব না। বঙ্গবন্ধুর এ জবাবের প্রেক্ষিতে ভুট্টো পাকিস্তানের দুটি অংশের মধ্যে অন্তত কনফেডারেশনের প্রস্তাব দেন। একই সঙ্গে তিনি বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণেরও প্রস্তাব দেন। কিন্তু ভুট্টো যে বঙ্গবন্ধুকে ব্ল্যাকমেইল করার লক্ষ্যে এসব প্রস্তাব দিয়েছেন তা স্টেনলি উলপার্ট স্বীকার করেন।

৭. **ভুট্টোর রাজনৈতিক সমঝোতার আশাবাদ :** রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ও লক্ষ লক্ষ তাজা প্রাণ হারানোর পরও জুলফিকার আলী ভুট্টো পূর্বপাকিস্তানের সাথে সমঝোতার প্রচেষ্টা করেন। তাই শেখ মুজিবের সাথে বৈঠকের পর এবং শেখ মুজিবের পাকিস্তানে অবস্থানকালেই ১ জানুয়ারি ১৯৭২ ভয়েজ অব আমেরিকাকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে ভুট্টো পাকিস্তানের দু অংশের মধ্যে ঐক্য এবং রাজনৈতিক সমঝোতার ব্যাপারে তার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। ফলে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির পথ প্রশস্ত হয়।

৮. **গৃহবন্দি থেকে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তির সিদ্ধান্ত :** পাকিস্তানের নীতি নির্ধারকদের সাথে ২ জানুয়ারি ১৯৭২ জুলফিকার আলী ভুট্টো করাচিতে এক বৈঠকে মিলিত হন। নীতি নির্ধারকদের এ বৈঠকে শেখ মুজিবকে গৃহবন্দী থেকে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ওই দিনই মার্কিন সাময়িকী টাইমস ভুট্টোর বক্তব্যের বরাত দিয়ে জানায়, এ সিদ্ধান্তের পিছনে পাকিস্তানের উভয় অংশের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমঝোতা কাজ করেছে। কিন্তু রবার্ট পেইন পরিষ্কার মন্তব্য করেন যে, শেখ মুজিবের সঙ্গে বৈঠকে যেকোনো চুক্তি বা এ জাতীয় কোনো সুবিধা আদায়ে ব্যর্থ হয়ে ভুট্টো মুজিবকে মুক্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তবে মুক্তির ঘোষণা দিলেও সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির তারিখ ঘোষনা করেন নি।

৯. **ভুট্টোর ঢাকা সফরের ঘোষণা :** বিভিন্ন পত্রিকার তথ্য মতে, চূড়ান্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ভুট্টো সমঝোতার আশা ছাড়েন নি। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানে থাকাকালীন সময়ে গণমাধ্যমে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে ভুট্টো ৬ জানুয়ারি ১৯৭২ 'দুই পাকিস্তানের ঐক্যের স্বার্থে' খুব শিগগির ঢাকা সফরের ঘোষণা করেন। কিন্তু নানামুখী চাপের মুখে তার এ পরিকল্পনা ভেস্তে যায়।

১০. **বঙ্গবন্ধুর চূড়ান্ত মুক্তি :** শেখ মুজিবের মুক্তির জন্য বিশ্বনেতৃবৃন্দ, এমনকি পাকিস্তানের প্রগতিশীল রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীরা ভুট্টোকে চাপ দিতে থাকেন। চাপের মুখে ৮ জানুয়ারি ১৯৭২ বঙ্গবন্ধুকে জুলফিকার আলী ভুট্টো চূড়ান্ত মুক্তি দেন। এ সময় ভুট্টো বঙ্গবন্ধুকে তুরস্ক বা ইরানে যাওয়ার প্রস্তাব দেন। ভুট্টোর এ প্রস্তাব বঙ্গবন্ধু প্রত্যাখ্যান করেন।

১১. **বঙ্গবন্ধুর লন্ডন যাত্রা :** বঙ্গবন্ধুর ইরান বা তুরস্কে যাওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের প্রেক্ষিতে ভুট্টো মুক্তির দিনই (৮ জানুয়ারি ১৯৭২) বঙ্গবন্ধুকে আকস্মিক লন্ডনে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন। সিদ্ধান্ত মোতাবেক পিআইএ এর একটি বিশেষ বিমানে (বোয়িং ৭০৭) বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ড. কামাল হোসেনকে লন্ডনে পাঠান। লন্ডনের হিথরো বিমানবন্দরে বঙ্গবন্ধুকে অভূতপূর্ব সংবর্ধনা দেওয়া হয়। যেখানে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী ও সাংবাদিকদের সঙ্গে বৈঠকে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান বাহিনীর গণহত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ তুলে ধরে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি, পুনর্গঠনে সহায়তা ও জাতিসংঘের সদস্যভুক্তির আহ্বান জানান।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

১২. **দিল্লিতে যাত্রা বিরতি :** ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথের অনুরোধে ব্রিটেনের একটি রাজকীয় বিমানে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের উদ্দেশে রওয়ানা দেন ৯ জানুয়ারি, ১৯৭২। অতঃপর ১০ জানুয়ারি, ১৯৭২ দিল্লির পালাম বিমানবন্দরে সংক্ষিপ্ত যাত্রাবিরতি দেন। বিরতিকালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতিসহ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক এবং জনসভায় ভাষণ দিয়ে বাংলাদেশকে সার্বিক সহযোগিতা করার আহ্বান জানান এবং মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতা করার জন্য ভারতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

১৩. **বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন :** ১০ জানুয়ারি দুপুর ১.৪৫ মিনিটে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে ব্রিটিশ রাজকীয় বিমানটি ঢাকার তেঁজগাও বিমানবন্দরে অবতরণ করে। একুশবার তোপধ্বনি আর লাখো মানুষের কণ্ঠে জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু আনন্দ ধ্বনির মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধুকে তার প্রিয় স্বদেশবাসী বরণ করে নেয়। অতঃপর বিমানবন্দর থেকে ৫ কিলোমিটার পথ জনারণ্য ঠেলে মোটর শোভাযাত্রা সহকারে ২ ঘণ্টা পর রেসকোর্স ময়দানে পৌছে বঙ্গবন্ধু আবেগ আপ্লুত হয়ে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন।

উপসংহার : বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি মাইলফলক। ১৯৪৮ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু যতবার কারাভোগ করেছিলেন তা ছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে। কিন্তু ১৯৭১ সালের পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন, কারাবন্দী হিসেবে তিনি ছিলেন পাকিস্তানের লায়ালপুর ও মিয়ানওয়ালী কারাগারের নির্জন সেলে। এখানে প্রহসনের বিচার করে শত চেষ্টা করেও আন্তর্জাতিক চাপের মুখে ইয়াহিয়া বঙ্গবন্ধুকে ফাঁসি দিতে পারেন নি। অবশেষে সব বাধা অতিক্রম করে ১০ জানুয়ারি, ১৯৭২ বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশে বীরের বেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

১৭। বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রত্যাহার কার্যক্রম আলোচনা করুন।
***অথবা,* মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রত্যাহার কার্যক্রমগুলো বর্ণনা করুন।**

উত্তর : ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ ছিল পশ্চিমা শাসকবর্গের শাসন-শোষণের ফল। নির্যাতিত, শোষিত, বঞ্চিত ও নিগৃহীত বাঙালির মুক্তির আকাঙ্ক্ষা থেকে আত্মত্যাগ ও ভারত সরকারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতার চূড়ান্ত প্রতিফলন বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন। ভারত সরকার বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অস্ত্র, প্রশিক্ষণ, আশ্রয় ও সৈন্য দিয়ে ঠিক যেভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়েও সে সহযোগিতা অব্যাহত রাখে। যার বাস্তব উদাহরণ হলো বঙ্গবন্ধুর অনুরোধে বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রত্যাহার।

বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রত্যাহার : স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করা একটি চমকপ্রদ ও উল্লেখযোগ্য ঘটনা। নিচে বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রত্যাহার কার্যক্রম আলোচনা করা হলো :

১. **রাজ্যসভা ও লোকসভায় ইন্দিরা গান্ধীর ভাষণ :** ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ পাক বাহিনী আত্মসমর্পণ করার সংবাদ জানিয়ে ইন্দিরা গান্ধী বিকেল সাড়ে ৫টায় রাজ্যসভায় ভাষণ দেন। সেখানে তিনি

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

বলেন, "Our Objectives were limited-to assist the gallant people of Bangladesh and their mukti bahini to liberate their country from a reign of terror and to assist aggression on our land. Indian Armed Forces will not remain on Bangladesh any longer than is necessary." ভারত সরকারের পক্ষ থেকেও বলা হয়, "তাদের সৈন্যবাহিনীকে বাংলাদেশ সরকার যতদিন রাখার প্রয়োজন মনে করবে তার চেয়ে বেশিদিন বাংলাদেশে রাখা হবে না।" [তথ্যসূত্র : ৭১ এর দশমাস - রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী]

২. **মানেকশর ঘোষণা :** ভারতীয় সেনাপ্রধান মানেকশও বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের ব্যাপারে ঘোষণা দেন। তিনি ২৭ ডিসেম্বর ১৯৭১ ঘোষণা করেন যে, "বাংলাদেশ থেকে ২৫ হাজার সৈন্য ফিরিয়ে নেওয়া প্রায় সম্পন্ন হবার পরে, আরো ২৫ হাজার সৈন্য ১৫ জানুয়ারি ১৯৭২ নাগাদ ভারতে ফিরে যাবে। মোট ৭ ডিভিশন সৈন্যের অবশিষ্টাংশ আরো কিছুকাল বাংলাদেশে অবস্থান করবে।" [তথ্যসূত্র : স্টেটসম্যান, ২৮ ডিসেম্বর ১৯৭১]

৩. **তাজউদ্দিন ও ডিপি ধরের বৈঠক :** ২৭ ডিসেম্বর ১৯৭১ ঢাকায় প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন ও ইন্দিরা গান্ধীর উপদেষ্টা ডিপি ধরের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে এই ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয় যে, শেখ মুজিবের মুক্তির সম্ভাবনাসহ আন্তর্জাতিক ঘটনাধারা ক্রমশ যেভাবে বাংলাদেশের অনুকূলে অগ্রসর হয়ে চলেছে, তার ফলে এবং বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীকে দ্রুত সংগঠিত করার পরিকল্পনা কার্যকর করার পর আগামী দুই থেকে তিন মাসের মধ্যে অবশিষ্ট ভারতীয় সৈন্য ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। দেশের আইনশৃঙ্খলার দায়িত্ব বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর কাছে দ্রুত হস্তান্তরিত করার লক্ষ্যে এইসব বাহিনী সম্প্রসারণের জন্য অফিসারের প্রশিক্ষণের প্রয়োজন সর্বাগ্রে। এই উদ্দেশ্যে ২৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ বাংলাদেশ মন্ত্রিসভা জাতীয় দেশরক্ষা একাডেমি প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

৪. **হিথ ও মুজিব আলোচনা :** ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চাপের মুখে ৮ জানুয়ারি ১৯৭২ বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিয়ে লন্ডনে পাঠানো হয়। সেখানে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথের সাথে বঙ্গবন্ধুর এক আলোচনা সভা হয়। উক্ত আলোচনা সভায় এডওয়ার্ড হিথ বঙ্গবন্ধুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য কখন ফিরে যাবে। এটি বঙ্গবন্ধুর কাছেও ছিল মিলিয়ন ডলারের প্রশ্ন। তখন পর্যন্ত ভারত ও ভুটান ব্যতীত আর কোনো রাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় নি। তাই হিথের প্রশ্নের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু উপলব্ধি করেন, বাংলাদেশকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করতে ও প্রভাবশালী দেশসমূহের স্বীকৃতি পেতে বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার করতে হবে।

৫. **বঙ্গবন্ধু কর্তৃক শেখর ব্যানার্জির নিকট সহযোগিতা কামনা :** ৯ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে লন্ডনের হিথ্রো এয়ারপোর্ট হতে ভারতের নয়াদিল্লি হয়ে বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে একটি ব্রিটিশ রাজকীয় বিমানে বঙ্গবন্ধু যাত্রা করেন। সফরসঙ্গী ছিলেন ভারতীয় সাবেক কূটনৈতিক শশাংক শেখর ব্যানার্জি। বিমানে আলোচনাকালে দিল্লিতে ইন্দিরার সাথে বৈঠকের আগেই বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় মিত্রবাহিনীর সদস্যদের ৩১ মার্চ ১৯৭২ এর মধ্যে ফেরত পাঠানোর বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে জানানোর জন্য শশাংক শেখরকে বঙ্গবন্ধু অনুরোধ করেন। এ অনুরোধ রক্ষা করার আশ্বাস দেন শশাংক শেখর।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৬. **আব্দুস সামাদ আজাদের ভারত সফর :** বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুস সামাদ আজাদ ভারত সফরে যান। সময়কাল ছিল ৫-৯ জানুয়ারি ১৯৭২। সেখানে ৯ জানুয়ারি ঢাকা-দিল্লি যুক্ত ইশতেহারে বলা হয়, "বাংলাদেশ চাইলেই ভারতীয় সৈন্য ফিরে যাবে।" মোটকথা, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার কার্যক্রমের বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়।

৭. **ইন্দিরা-মুজিব বৈঠক :** ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ বঙ্গবন্ধু লন্ডন থেকে ঢাকা ফেরার পথে দিল্লি যাত্রা বিরতি করেন। সেখানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে ৩৫ মিনিট একান্ত বৈঠককালে বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহারের আবেদন জানান। উপস্থিত সাংবাদিকদের প্রশ্নোত্তরের রিপোর্টেও অনেকটা এমনই ছিল। রিপোর্টে বলা হয়, "That he was confident that she would recall The Indian troops from Bangladesh the day that he asked for to do so."

৮. **ঢাকায় ফিরে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা :** দিল্লিতে যাত্রা বিরতির পর ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ তারিখেই ব্রিটিশ রাজকীয় বিমানে বঙ্গবন্ধু ঢাকার তেজগাঁও বিমানবন্দরে অবতরণ করেন। সেখানে ফুলেল ভালবাসায় সিক্ত হয়ে মাত্র ৫ কিলোমিটার পথ ২ ঘন্টায় জনসমুদ্র পাড়ি দিয়ে ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে পৌঁছেন। ঐতিহাসিক এই রেসকোর্স ময়দানে লাখো জনতার উপস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু বলেন, "আমি যখনই বলব, ভারতীয় সেনাবাহিনী তখনই ফেরত যাবে। এখনই আস্তে আস্তে অনেককে পাঠানো হচ্ছে।"

৯. **বাংলাদেশ-ভারত গোপন চুক্তি প্রত্যাখ্যান :** ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে বাংলাদেশ-ভারত গোপন চুক্তির কথা শোনেন। ১৯৭১ সালে অস্থায়ী মুজিবনগর সরকার কর্তৃক এই চুক্তির উল্লেখযোগ্য কয়েকটি স্পর্শকাতর দিকগুলি ছিল—

ক. বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভারতীয় সৈন্য বাংলাদেশে অবস্থান করবে (কতদিন অবস্থান করবে, তার সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়নি)। ১৯৭২ সালের নভেম্বর মাস থেকে আরম্ভ করে প্রতি বছর এ সম্পর্কে পুনরীক্ষণের জন্য দুদেশের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

খ. বাংলাদেশের কোনো নিজস্ব সেনাবাহিনী থাকবে না।

গ. অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য মুক্তিবাহিনীকে কেন্দ্র করে একটি প্যারামিলিশিয়া বাহিনী গঠন করা হবে ইত্যাদি।

শেখ মুজিব চুক্তির উল্লিখিত শর্তগুলো শুনে অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সেনা প্রত্যাহারের উদ্যোগ নেন।

১০. **বঙ্গবন্ধুর কলকাতা সফর :** ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতা সফরে গিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাধারণ কথাবার্তার মাঝে প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধীকে অপ্রস্তুত করে দিয়ে বলেন, "আমার দেশ থেকে আপনার সেনাবাহিনী ফেরত আনতে হবে।" বঙ্গবন্ধু এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে এত সহজভাবে তুলতে পারেন, ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী তা ভাবতেও পারেনি। আর তার ঐ অপ্রস্তুত অবস্থার সুযোগ নিয়ে বঙ্গবন্ধু নিজের কথার পুনরাবৃত্তি করে বলেন, "এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর আদেশই যথেষ্ট।" অস্বস্তিকর অবস্থা পাশ কাটাতে মিসেস ইন্দিরা গান্ধীকে রাজি হতে হয় এবং জেনারেল মানেকশকে বাংলাদেশ থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের দিনক্ষণ নির্ধারণের নির্দেশ দেন।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

১১. **ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিদায়ী কুচকাওয়াজ :** বঙ্গবন্ধুর ঐকান্তিক প্রচেষ্টার পর ভারত সরকার বাংলাদেশ থেকে তাদের সৈন্য প্রত্যাহারে সম্মত হয়। এ লক্ষ্যে ১৯৭২ সালের ১১ মার্চ ঢাকা স্টেডিয়ামে ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিদায়ী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়। এরপর থেকেই আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় সেনারা বাংলাদেশ থেকে নিজের দেশে যাত্রা শুরু করে।

১২. **সেনা প্রত্যাহার :** বিজয়ের তিনমাস পরও স্বাধীন বাংলাদেশ ভারতের নিয়ন্ত্রণে থাকে। এমনকি বিভিন্ন সরকারি পদে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের লোকেরা দায়িত্ব গ্রহণ করে। অবস্থার গুরুত্ব অনুধাবন করে মুক্তিযুদ্ধের সকল সেক্টরকে ডিমোবিলাইজড করে ভারতীয় সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার নির্দেশ জারি করা হয়। অতঃপর বঙ্গবন্ধু ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নিকট ভারতীয় সেনাবাহিনীর দ্রুত নিঃশর্ত প্রত্যাহার দাবি করেন। এরপর দুই দিনের মধ্যে ১৭-১৯ মার্চ ১৯৭২ বাংলাদেশ থেকে সকল ভারতীয় সেনা প্রত্যাহার করা হয়।

উপসংহার : স্বাধীনতা উত্তর শেখ মুজিবুর রহমানের অন্যতম সাফল্য ছিল বাংলাদেশের মাটি থেকে ভারতীয় সেনা প্রত্যাহার করা। বঙ্গবন্ধুর সুনিপুণ রাজনৈতিক কৌশলের দরুন ভারত তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করেছে। চাপের মুখে বাংলাদেশ থেকে সৈন্য প্রত্যাহারে বাধ্য হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করে ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি জৈল সিং কলকাতা থেকে প্রকাশিত অধুনালুপ্ত 'সানডে' (২৭ জুলাই ১৯৮৭) সাময়িকীর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ থেকে দ্রুত সৈন্য প্রত্যাহার সুবিবেচনা প্রসূত ছিল না। এ ধরনের প্রত্যাহার ভারতের স্বার্থের পরিপন্থী ছিল বলে মন্তব্য করে তিনি বলেন, 'We could not protect the interest of country withdrawing troops hurriedly.' (দ্রুত সৈন্য প্রত্যাহার করে আমরা দেশের স্বার্থ রক্ষা করতে পারি নি)।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-০১ লাহোর প্রস্তাব কি? এটি কে উত্থাপন করেন?

উত্তর : ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে লাহোর প্রস্তাবের গুরুত্ব অত্যধিক। ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ লাহোরে মুসলিম লীগের যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে বাংলার কৃতি সন্তান শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক যে ঐতিহাসিক প্রস্তাব উত্থাপন করেন তাই লাহোর প্রস্তাব নামে খ্যাত। এ প্রস্তাবের প্রধান ধারাগুলো হলো :

ক. ভৌগোলিক দিক দিয়ে পাশাপাশি অবস্থিত এলাকাগুলোর সমন্বয়ে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রসমূহ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

খ. উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব ভারতের যেসব এলাকায় মুসলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাদের সমন্বয়ে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করতে হবে।

গ. এ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলো সম্পূর্ণরূপে স্বায়ত্তশাসিত হবে।

ঘ. সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষার সার্বিক ব্যবস্থা সংবিধানে থাকতে হবে।

মূলত লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতেই পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার বীজও এ লাহোর প্রস্তাবের মধ্যেই নিহিত ছিল।

প্রশ্ন-০২ ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে কোন দল জয়ী হয়?

উত্তর : ১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলায় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে কয়েকটি দল, যেমন– আওয়ামী লীগ, কৃষক প্রজা পার্টি, নেজামে ইসলাম ও গণতন্ত্রী দল একজোট হয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে। যুক্তফ্রন্ট ২১ দফা কর্মসূচি নিয়ে নির্বাচনী প্রচারণা চালায়। শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট পূর্ব বাংলার আইন পরিষদের ৩০৯টি আসনের মধ্যে ২৩৬টি (মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত থেকে ২২৩ এবং অমুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত থেকে ১৩টি) আসন লাভ করে বিজয়ী হয়।

প্রশ্ন-০৩ ভাষা আন্দোলন/অমর একুশে কি?

উত্তর : ভাষা আন্দোলন পৃথিবীর ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। নিখিল পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ ভাগ জনগণের মাতৃভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক উপায়ে পূর্ব পাকিস্তানে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেয়ার প্রচেষ্টা চালানো হয়। ১৯৪৭ সালের শিক্ষা সম্মেলনে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব গৃহীত হলে পূর্ব বাংলায় এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিবাদ শুরু হয়। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে ঢাকায় সর্বপ্রথম 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করা হয় এবং কতিপয় দাবিতে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের নীতি গৃহীত হয়।

১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে উর্দু ও ইংরেজির পাশাপাশি বাংলাকে গণপরিষদের ভাষা হিসেবে প্রস্তাব করলে মুসলিম লীগ এর তীব্র বিরোধিতা করে। ফলে ঢাকায় ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী মহলে চরম অসন্তোষ দেখা দেয় এবং ২৬ ফেব্রুয়ারি সর্বত্র ধর্মঘট পালিত হয়। এভাবে সংগ্রাম পরিষদ ১৫ মার্চ পর্যন্ত ধর্মঘট ও হরতাল পালনের মধ্য দিয়ে দেশব্যাপী আন্দোলন

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

অব্যাহত রাখে। অবশেষে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন বাংলা ভাষার দাবি সমর্থনের আশ্বাস দিলে আন্দোলন প্রশমিত হয়। কিন্তু ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় এবং কার্জন হলের এক সমাবর্তন অনুষ্ঠানে 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা' ঘোষণা দিলে পুনরায় আন্দোলন চাঙ্গা হয়ে উঠে এবং দেশব্যাপী তীব্র প্রতিবাদ শুরু হয়। ১৯৫০ সালে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এবং ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি খাজা নাজিমুদ্দিন পুনরায় একই ঘোষণা দেন যে, 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।' ফলে ছাত্র-বুদ্ধিজীবী মহলে দারুণ ক্ষোভ ও হতাশা সৃষ্টি হয় এবং আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। ভাষা আন্দোলনকে আরো তীব্রতর করার লক্ষ্যে ৩০ জানুয়ারি এক জনসভায় 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি' গঠন করা হয়। এতে ২১ ফেব্রুয়ারিকে ভাষা দিবস হিসেবে পালন ও দেশব্যাপী হরতাল পালনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ২১ ফেব্রুয়ারির উক্ত কর্মসূচিকে বানচাল করার জন্য তৎকালীন গভর্নর নূরুল আমীন ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে। কিন্তু সংগ্রাম পরিষদ এ নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মিছিল বের করলে পুলিশের সাথে ছাত্র-জনতার এক মারাত্মক সংঘর্ষ বাধে। এক পর্যায়ে পুলিশ মিছিলের ওপর গুলি চালালে জব্বার, বরকত, সালামসহ অনেকে প্রাণ হারান এবং আহত হন বহুসংখ্যক। এর ফলে সারা বাংলায় আন্দোলন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ঢাকায় এ ঘটনার প্রতিবাদে দেশব্যাপী প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ অব্যাহত থাকে। অবশেষে সরকার নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয় এবং সাময়িকভাবে প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রী বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব গ্রহণ করেন। অতঃপর ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের সংবিধানে বাংলা অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মর্যাদা লাভ করে।

ভাষা আন্দোলনে এক নতুন জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটে এবং এ চেতনাই ক্রমে ক্রমে বাঙালি জাতীয়তাবাদের জন্ম দেয়। তাই ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন ছিল বাংলাদেশের গণচেতনার প্রথম বহিঃপ্রকাশ এবং স্বাধিকার আন্দোলনের এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

প্রশ্ন-০৪ '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

উত্তর : ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান বাঙালি জাতির ইতিহাসে অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ছাত্রসমাজের ১১ দফা এবং আওয়ামী লীগের ৬ দফার ভিত্তিতে শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, সংসদীয় গণতন্ত্র প্রবর্তন, জরুরি আইন প্রত্যাহার প্রভৃতি দাবিতে ছাত্র-জনতার আন্দোলন শুরু হয়। কিন্তু তৎকালীন পাকিস্তান সরকার ছাত্রসমাজের ১১ দফা এবং জনতার ৬ দফা দাবিকে রাষ্ট্রবিরোধী দাবি বলে ঘোষণা করে এবং আগরতলা ষড়যন্ত্রমূলক মামলা সাজিয়ে শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তার করে। এর ফলে সমগ্র বাংলাদেশে ছাত্র-জনতা আন্দোলনের রুদ্ররোষে ফেটে পড়ে এবং ধীরে ধীরে এ আন্দোলন গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হয়।

ছাত্র-জনতার ১১ দফা ও আওয়ামী লীগের ৬ দফা দাবি উপেক্ষিত হলে ১৯৬৯ সালে সমগ্র দেশব্যাপী তীব্র আন্দোলন শুরু হয়। সরকার এ আন্দোলনকে নস্যাৎ করার জন্য সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে জরুরি অবস্থা ও ১৪৪ ধারা জারি করে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্র-জনতা একে অমান্য করে রাস্তায় নেমে পড়লে শুরু হয় প্রচণ্ড আন্দোলন ও বিক্ষোভ মিছিল। এ সময়ে সরকারি নির্দেশে মিছিলের ওপর গুলি চালালে আসাদুজ্জামানসহ নিহত হয় বহু সাধারণ মানুষ। ফলে আন্দোলন আরো তীব্র আকার ধারণ করে এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলও এ মৌলিক অধিকার আদায়ের শপথ নিয়ে ৮ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে 'গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করে। এমনকি পূর্ব পাকিস্তানের মতো পশ্চিম পাকিস্তানেও

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

আইয়ুববিরোধী আন্দোলন গড়ে উঠে। ফলে দেশের সর্বত্র চলতে থাকে আইয়ুববিরোধী গণআন্দোলন। এভাবে প্রচণ্ড আন্দোলনের ফলে আইয়ুব খান বাধ্য হয়ে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে নেয়। পরবর্তীতে রাজনৈতিক সংকট নিরসনের লক্ষ্যে আইয়ুব খান এক গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করেন। শেখ মুজিব বৈঠকে যোগ দেন; কিন্তু পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবি না মানায় তিনি এ বৈঠক বর্জন করেন। ফলে পুনরায় শুরু হয় তীব্র আন্দোলন ও গণবিক্ষোভ। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান দেশের সার্বিক পরিস্থিতির ক্রমাবনতি রোধ করতে ব্যর্থ হয়ে ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ সমস্ত ক্ষমতা প্রধান সেনাপতি ইয়াহিয়া খানের হাতে অর্পণ করে ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ান। দ্বিতীয়বার দেশে জারি হয় সামরিক আইন। এভাবে '৬৯ সালে গণআন্দোলন গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হয় এবং এর পথ ধরেই '৭১ সালে অর্জিত হয় বাংলার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব।

প্রশ্ন-০৫ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে কয়টি ব্রিগেড গঠিত হয়?

উত্তর : ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য সমগ্র বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়। আর মুক্তিবাহিনীর জন্য গঠিত হয় তিনটি ব্রিগেড। মুক্তিবাহিনীর তিনজন শ্রেষ্ঠ সেক্টর কমান্ডারের নামানুসারে তিনটি ফোর্সের নামকরণ করা হয়। জিয়াউর রহমানের নামানুসারে 'জেড ফোর্স', কে এম শফিউল্লাহ নামানুসারে 'এস ফোর্স' এবং খালেদ মোশাররফের নামানুসারে গঠিত হয় 'কে ফোর্স'।

প্রশ্ন-০৬ স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে বিশ্ব জনমতের ভূমিকা কি ছিল?

উত্তর : বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সারা বিশ্বকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। ফলে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে বিশ্ব জনমতের ভূমিকা ছিল অতীব গুরুত্বপূর্ণ। যুক্তরাষ্ট্র মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে অবস্থান নিলেও সে দেশের জনগণ, রাজনীতিবিদ, শিল্পী-সাহিত্যিক এবং বুদ্ধিজীবীরা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অবস্থান নেন। ১৪ এপ্রিল ১৯৭১ ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকায় পুরো পৃষ্ঠা জুড়ে ইয়াহিয়াকে গণহত্যা বন্ধ করতে আহ্বান জানায়। সেপ্টেম্বর ১৯৭১ নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয় একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন। সম্মেলনে ৩৩টি দেশের শতাধিক প্রতিনিধি অংশ নেন। এর মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী দেশের প্রতিনিধিও ছিল। এ সম্মেলনে ফরাসি সাহিত্যিক আঁদ্রে মারলো অংশ নিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন। ফলে সেপ্টেম্বর '৭১-এর পর মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্ব জনমত ক্রমশ বাড়তে থাকে। মুক্তিযুদ্ধে ভারতবাসীর সহযোগিতামূলক ভূমিকা ছিল রীতিমতো বিস্ময়কর। ফলশ্রুতিতে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়েছে ত্বরান্বিত।

প্রশ্ন-০৭ অসহযোগ আন্দোলন ১৯৭১ সম্পর্কে লিখুন।

উত্তর : ১৯৭০ সালের জাতীয় নির্বাচন এক ব্যক্তি, এক ভোট এই নীতির ভিত্তিতে সর্বপ্রথম জাতীয় নির্বাচন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ধার্য করেন ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ। কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যেন ক্ষমতায় না আসতে পারেন তাই পশ্চিমা শিল্পপতি, আমলা ও সেনানায়কগণ ঘৃণ্যষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। পাকিস্তানের পিপলস্ পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো এবং মুসলিম লীগ নেতা খান আবদুল কাইয়ুম খান ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। ১৯৭১ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি ভুট্টো ঘোষণা করেন "পশ্চিম পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্যদেরকে ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করতে দেওয়া হবে না। এরপরও জাতীয় পরিষদ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হলে তা 'কসাইখানায়' পরিণত হবে।" অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানে স্বাধীনতার দাবি উচ্চারিত হতে থাকে। চতুর্দিকে জয় বাংলা, পদ্মা-মেঘনা-যমুনা, তোমার আমার ঠিকানা, জনগণের একদফা-

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

বাংলার স্বাধীনতা, তোমার দেশ আমার দেশ বাংলাদেশ, বাংলাদেশ এ রকম নানা শ্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে। এ গণজোয়ারকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য ২ ও ৩ মার্চ সান্ধ্য আইন জারি করলে জনগণ তা ভঙ্গ করে এবং পুলিশের গুলিতে বহু নিরীহ লোক হতাহত হয়। জনগণ ২ ও ৩ মার্চ স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালন করেন। ৩ মার্চ ঢাকার পল্টন ময়দানে আহুত জনসভায় অসহযোগ আন্দোলনের' ডাক দেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি বলেন—"খুনী ইয়াহিয়া সরকারের হটকারী ও পাশবিক অত্যাচারের প্রতিবাদে আজ থেকে শান্তিপূর্ণ 'অসহযোগ আন্দোলন' চলতে থাকবে। কল-কারখানা বন্ধ থাকবে। অফিস-আদালত বন্ধ থাকবে, রেলগাড়ির চাকা বন্ধ থাকবে, খাজনা-ট্যাক্স দেওয়া চলবে না এবং অফিস-আদালত ব্যাংক বন্ধ থাকবে।" বাংলার এই মুকুটহীন সম্রাট শেখ মুজিবুর রহমান এর ডাকে সাড়া দেন। অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি সর্বত্র শান্তিপূর্ণভাবেই পালিত হয়।

প্রশ্ন-০৮ মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের ভূমিকা বিশ্লেষণ করুন।

উত্তর : বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের ভূমিকা ছিল খুবই বন্ধুত্বসুলভ। মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকেই মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে ভারত বিপুলসংখ্যক শরণার্থীদের আশ্রয়দান, তাদের ভরণপোষণ, মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র সরবরাহ, বহির্বিশ্বে এবং জাতিসংঘে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শুধু শরণার্থীদের পিছনেই ভারতের খরচ হয়েছে ৭০০ মিলিয়ন ডলার। এভাবে সরকারি ভূমিকার পাশাপাশি ভারতবাসী, রাজনৈতিক দল ও পেশাজীবীদের ভূমিকা ছিল রীতিমতো বিস্ময়কর। ফলে বাঙালির বিজয় ত্বরান্বিত হয়েছিল। পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হলে উভয় রণাঙ্গনে ভারতের ব্যাপক বিমান হামলা পাকিস্তানি বাহিনীকে চরমভাবে পর্যুদস্ত করে। ফলে মাত্র ১৩ দিনের মাথায় পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

১. বাংলাদেশের ভূগোল : প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ও এর পরিবর্তন

◆ ডিজিটাল ভূ-প্রাকৃতিক মানচিত্র

দেশে প্রথমবারের মতো ডিজিটাল ভূ-প্রাকৃতিক মানচিত্র তৈরি করা হচ্ছে। মানচিত্রটি পারমাণবিক বিষয়ক প্রকল্প, এক্সপ্রেসওয়ে, স্কাইরেল, ড্রেনেজ পদ্ধতি, হাইওয়ে, সাবওয়ে ও দীর্ঘ সেতুর মতো জটিল প্রকল্পে ব্যবহার করা হবে। এতে প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন সহজ হবে। 'ইমপ্রুভমেন্ট অব ডিজিটাল ম্যাপিং সিস্টেম সার্ভে অব বাংলাদেশ (আইডিএমএস)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ডিজিটাল মানচিত্র তৈরি হচ্ছে। জাপান আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা 'জাইকা'র প্রযুক্তিগত সহায়তার মাধ্যমে দেশের একমাত্র এ ভূ-প্রাকৃতিক মানচিত্র তৈরি হচ্ছে। ২০০৭ সালে এ প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। মানচিত্রটি তৈরি করতে সারা বাংলাদেশকে ১৩টি ব্লকে ভাগ করা হয়েছে। ২০১৬ সালের মধ্যে এ মানচিত্র তৈরির কাজ শেষ হবে। বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর মানচিত্র তৈরির কাজ বাস্তবায়ন করছে। দেশের সঠিক ও বিস্তারিত তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপনের লক্ষ্যে প্রথমবারের মতো ডিজিটাল ভূ-প্রাকৃতিক মানচিত্র তৈরির কাজ চলছে। প্রকল্পের আওতায় মিরপুরের দামালকোটে ডিজিটাল মানচিত্র সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।

◆ ছিটমহল

ভারতের মধ্যে বাংলাদেশের ও বাংলাদেশের মধ্যে ভারতের কিছু ভূখণ্ডই ছিটমহল। বাংলাদেশ ও ভারতের এ ধরনের ১৬২টি ভূখণ্ড এক একটি ছিটমহল হিসেবে পরিচিত। এর মধ্যে ১১১টি ভারতীয় ছিটমহল বাংলাদেশে এবং ৫১টি বাংলাদেশী ছিটমহল ভারতের অভ্যন্তরে অবস্থিত। এ ১৬২টি ছিটমহলের অধিবাসীরা 'ছিটের মানুষ' বলে পরিচিত। মূল ভূখণ্ডের সাথে যোগাযোগ থাকলেও ছিটমহলবাসীর কোনো দেশ নেই, নেই কোনো পরিচয়। বাংলাদেশ যেমন এদের নাগরিকত্ব দেয়নি, দেয়নি ভারতও। পড়াশুনা, জীবিকা, সবকিছুতেই তারা পরনির্ভরশীল। ব্রিটিশ শাসকদের খেয়াল-খুশির বলি দেশহীন, পরিচয়হীন এসব মানুষ। সীমান্তের ঘেরাটোপে বন্দিশালার মানুষ তারা। বাংলাদেশের

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

ভূ-খণ্ডে থেকেও বাংলাদেশের ঘেরাটোপে বন্দি থাকা মানুষ। ছিটমহলের মানুষ কখনোই ভালো থাকে না, থাকতে পারে না। মানুষের সৃষ্ট অদ্ভুত এক সীমানা বিভাজনের কারণে জীবনের প্রতিটি পদে, প্রতিটি মুহূর্তে এখানে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়। এখানে দিন-যাপন গ্লানিকর। নিজ দেশে পরবাসী ছিটমহলবাসীর নেই কোনো আইনি সুরক্ষা। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসাসহ মৌলিক সুবিধা সুবিধাবঞ্চিত ছিটমহলবাসী বেঁচে আছে কেবল দয়া আর করুণানির্ভর জীবন নিয়ে। দুঃসহ জীবনযাত্রার নির্মম ভয়াবহতার শিকার সবচেয়ে বেশি বাংলাদেশি ছিটমহলবাসীরা। তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রিত হয় ভারতের বিএসএফ ও বেসামরিক লোকজন দ্বারা। বাংলাদেশি হলেও রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা ও নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত তারা। সার্বিকভাবে আইনগত সীমাবদ্ধতা এবং ভৌগোলিক জটিলতায় ছিটমহলবাসীরা উন্নয়ন ও অগ্রগতির মুখ দেখে না। নানা জটিলতায় আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কোনো পরিকল্পনা নেয়া সম্ভব হয় না বাংলাদেশ কিংবা ভারতের পক্ষে। ফলশ্রুতিতে অনুন্নয়নের বেড়াজালে পশ্চাৎপদ ও অবহেলিত হয়েই থাকতে হয় ভাগ্যবিড়ম্বিত ছিটমহলবাসী মানুষগুলোকে।

♦ দহগ্রাম-আঙ্গরপোতা ছিটমহল ও করিডোর

ভারতের অভ্যন্তরে অবস্থিত বাংলাদেশের লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলার অন্তর্গত আন্তর্জাতিকভাবে বহুল আলোচিত ছিটমহলের নাম দহগ্রাম-আঙ্গরপোতা। মূলত দহগ্রাম ও আঙ্গরপোতা দু'টি গ্রাম নিয়ে এ ছিটমহলটি গঠিত, যার আয়তন ৩৫ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ১৫ হাজারের বেশি। এ ছিটমহল দু'টিকে মূল ভূখণ্ডের সাথে যুক্ত করেছে তিন বিঘা আয়তনের একটি প্যাসেজ ডোর বা করিডোর। এ কারণে এটি 'তিন বিঘা করিডোর' নামে পরিচিত। ১৭৮ মিটার দৈর্ঘ্য এবং ৮৫ মিটার প্রস্থের তিন বিঘা করিডোরের মাধ্যমে দহগ্রাম-আঙ্গরপোতার মানুষ দেশের মূল ভূখণ্ডের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে। ১৯৮৫ সালের পর থেকে দহগ্রাম ও আঙ্গরপোতা ছিটমহল পাটগ্রাম উপজেলার একটি স্বতন্ত্র ইউনিয়ন 'দহগ্রাম ইউনিয়ন' হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৮৯ সালের ১৯ আগস্ট দহগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদের উদ্বোধন হয়। এরপর দু'দেশের পররাষ্ট্র পর্যায়ে আবারো এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর ১৯৯২ সালের ২৬ জুন ইজারার মাধ্যমে তিন বিঘা করিডোর বাংলাদেশকে প্রদান করা হয়। ইজারা পাওয়া এ দিনটি দহগ্রাম-আঙ্গরপোতার স্বাধীনতা দিবস রূপে পালিত হয়। এ চুক্তির আগে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত করিডোরটি বন্ধ থাকায় বাংলাদেশ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল এ ভূ-খণ্ডটি। তবে ১৯৯২ সালের চুক্তির পর থেকে পর্যায়ক্রমে ২ ঘণ্টা, ৬ ঘণ্টা ও ১২ ঘণ্টা পর্যন্ত করিডোরটি খোলা রাখার ব্যবস্থা করা হয়। এর মধ্য দিয়ে দহগ্রাম-আঙ্গরপোতাবাসী গেট-ফেইলের বৃত্ত বন্দি জীবন থেকে কিছুটা হলেও মুক্তি লাভ করে। সর্বশেষ ৮ সেপ্টেম্বর ২০১১ থেকে করিডোরের গেট ২৪ ঘণ্টা খোলা রাখার সিদ্ধান্তে ১৯৪৭ সাল থেকে দীর্ঘ অবরুদ্ধ জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে দহগ্রাম-আঙ্গরপোতা ছিটমহলবাসীর।

♦ সীমান্ত বিরোধ

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ছিটমহল সমস্যা ও সীমান্ত বিরোধ দীর্ঘদিনের জট পাকানো একটি জটিল সমস্যা। ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি পৃথক রাষ্ট্রের জন্ম-পরবর্তী সময়ে দুই দেশের মানচিত্র বিভাজনে ব্রিটিশ আইনজীবী র‍্যাডক্লিফের আঁকা সীমান্ত মানচিত্র থেকেই ছিটমহল সমস্যার উদ্ভব ঘটে। ১৯৫৮ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ফিরোজ খান নুন-এর মধ্যে প্রথম সীমান্ত চুক্তি সম্পাদিত হলেও এ ছিটমহল সমস্যার' সুরাহা হয়নি। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সাথে সাথে উত্তরাধিকার সূত্রে এ সমস্যাটি যুক্ত হয়

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

বাংলাদেশের সাথে। একই সালে নেহেরু-নুন চুক্তিতে সীমান্তের বিভিন্ন সেক্টরে সীমানা নির্ধারণে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী অসঙ্গতি দূর করা, দক্ষিণ বেরুবাড়ির ১২ নম্বর ইউনিয়নের সমস্যা সমাধান এবং সীমান্তের সীমানা নির্ধারণের পর সে অনুযায়ী ভূখণ্ড বিনিময়-বিষয়গুলো দীর্ঘসূত্রিতাসহ নানা কারণে অমীমাংসিত থেকে যাওয়ায় সেগুলোও যুক্ত হয় বাংলাদেশের সাথে। ভারতের সাথে ৪১৫৬ কিলোমিটার দীর্ঘ আন্তর্জাতিক সীমানার কারণে এ সমস্যাগুলো তাই উত্তরাধিকার সূত্রে জড়িয়ে পড়ে বাংলাদেশের সাথে।

স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর ছিটমহল সমস্যা ও সীমান্ত বিরোধ জটিল আকার ধারণ করে। তাই ১৯৭৪ সালের ১৬ মে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সীমানা নির্ধারণ, অপদখলীয় ভূমির নিষ্পত্তি এবং ছিটমহল সমস্যা সমাধানে দুই দেশের তৎকালীন সরকার প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ইন্দিরা গান্ধী 'ভূমি সীমানা চুক্তি ১৯৭৪' স্বাক্ষর করেন। বাংলাদেশ সরকার একই বছরের ২৩ নভেম্বর সংবিধানের তৃতীয় সংশোধনীর [সংবিধান (তৃতীয় সংশোধনী) বিল ১৯৭৪] মাধ্যমে এ চুক্তিটি অনুমোদন করে। কিন্তু ভারতীয় পার্লামেন্টে এ চুক্তিটি আজও অনুমোদিত হয়নি। ১৯৯০ সালে ভারত বাংলাদেশকে তিন বিঘা করিডোরটি ব্যবহারের অনুমতি দেয়। পরবর্তীতে ১৯৯২ সালে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে আরেকটি চুক্তির মাধ্যমে দহগ্রাম-আঙ্গরপোতা ছিটমহল সমস্যার একটি সাময়িক সমাধান হয়। সর্বশেষ ১০-১১ নভেম্বর ২০১০ তারিখে নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত যৌথ সীমান্ত কার্যদলের (জেবিডব্লিউজি) ছিটমহল সমস্যা নিরসনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হয়। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সীমান্ত বিরোধ এবং ছিটমহল সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সম্প্রতি স্বাক্ষরিত হয়েছে সীমান্ত প্রটোকল ও স্ট্রিপম্যাপ। ২০ আগস্ট ২০১১ থেকে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের সূক্ষ্ম রেখাভিত্তিক মানচিত্র বা স্ট্রিপম্যাপে যৌথ স্বাক্ষর শুরু হয়। এরপর ৬ সেপ্টেম্বর ২০১১ স্বাক্ষরিত হয় স্থল সীমান্ত বিষয়ক প্রটোকল। ১৯৭৪ সালের ১৬ মে সম্পাদিত সীমানা নির্ধারণ চুক্তির অবিভাজ্য অংশ বলে পরিগণিত এ প্রটোকলে বিভিন্ন স্থানে সীমানা রেখা পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু দীর্ঘ চার দশকেও ছিটমহল ও অপদখলীয় জমি বিনিময়ের পাশাপাশি সাড়ে ছয় কিমি সীমানা অচিহ্নিত থেকে যায়। প্রটোকলে বাংলাদেশের ভেতরকার ১১১টি ভারতীয় ছিটমহল এবং ভারতে বাংলাদেশের ৫১টি ছিটমহল বিনিময় করা হবে বলে উল্লেখ করে বলা হয়েছে, এক্ষেত্রে যেটুকু বাড়তি ভূমি বাংলাদেশের হাতে যাবে তার জন্য কোনো ক্ষতিপূরণের দাবি তোলা হবে না। এ প্রটোকলে প্রতিবেশী দেশ দু'টিতে একে অপরের অংশে অপদখলীয় ভূমির ক্ষেত্রেও স্থায়ী সীমানা নির্ধারণের রূপরেখা দেয়া হয়েছে। কিন্তু ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ঘেরাটোপে সীমান্ত চুক্তির বাস্তবায়ন নিয়ে সংশয় কাটছে না।

♦ দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ

সাতক্ষীরা জেলার দক্ষিণে সীমান্ত নদী হাড়িয়াভাঙ্গা ও রায়মঙ্গল নদীর মোহনায় জেগে ওঠা দ্বীপটি দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ নামে পরিচিত। ভারত এর নাম দিয়েছে পূর্বাশা বা নিউমুর। কারণ দ্বীপটির মালিকানা ভারতও দাবি করেছে এবং তার আধিপত্য বিস্তারে সর্বাত্মক চেষ্টা চালু রাখছে। ১৯৭৮ সালে ভাটার সময় এই দ্বীপের আয়তন ছিল প্রায় ৫ বর্গকিলোমিটার। এ নতুন দ্বীপটি হাড়িয়াভাঙ্গা নদীর মূল খালের পূর্বদিকে জেগে ওঠায় তা স্পষ্টতই বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ডের অন্তর্গত। কারণ এই মূল খালের মধ্যপ্রান্ত হচ্ছে উভয় দেশের সীমানা। তা সত্ত্বেও ভারত একতরফাভাবে দ্বীপের মালিকানা দাবি করে। ফলে ১৯৭৯ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সফরকালে বিষয়টি উল্লিখিত হয় এবং বাংলাদেশের পক্ষ থেকে যৌথ জরিপের প্রস্তাবের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টার কথা বলা হয়। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী প্রস্তাবে সম্মত হলেও ১৯৮০ সালে ভারতের পক্ষ থেকে উপগ্রহ থেকে তোলা দ্বীপটির কিছু

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

ছবি তুলে তা বাংলাদেশের কাছে হস্তান্তর করে ও দ্বীপটির একতরফা মালিকানা দাবি করে। কিন্তু বাংলাদেশ এ দাবি প্রত্যাখ্যান করে। ১৯৮০ সালের আগস্ট মাসে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশ সফরকালে সমস্যাটির শান্তিপূর্ণ সমাধানের আশ্বাস দিলেও ভারত তাদের সম্প্রসারণবাদী নীতি গ্রহণ করে দ্বীপটিকে একতরফাভাবে দখল করে তাতে রণতরী প্রেরণ ও ক্ষেপণাস্ত্র স্থাপন করে।

♦ ভূমিকম্প ও বাংলাদেশ

ভূ-অভ্যন্তরে দ্রুত বিপুল শক্তি বিমুক্ত হওয়ায় পৃথিবীপৃষ্ঠে যে ঝাঁকুনি বা কম্পনের সৃষ্টি হয় তাকে ভূমিকম্প বলে। একটি শান্ত পুকুরে ঢিল ছুঁড়লে ঢিলটি পানিতে যে ঢেউয়ের সৃষ্টি করে তা পুকুরের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। একইভাবে ভূমিকম্পের ক্ষেত্রেও ভূ-অভ্যন্তরে যেখানে শক্তি বিমুক্ত হয় সেখান থেকে পানির ঢেউয়ের মতো শিলায় ঢেউ বা তরঙ্গের সৃষ্টি হয় এবং তা দ্রুত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ভূ-অভ্যন্তরে যেখানে শক্তি বিমুক্ত হয় তাকে কেন্দ্র বলে। কেন্দ্র থেকে লম্বালম্বিভাবে ভূপৃষ্ঠের উপরিস্থ বিন্দু উপকেন্দ্র (Epicentre) নামে পরিচিত। ভূবিজ্ঞানীগণ মনে করেন, ভিত্তিশিলা চ্যুতি বা ফাটল বরাবর আকস্মিক ভূ-আলোড়ন হলে ভূমিকম্প হয়। তা ছাড়া আগ্নেয়গিরির লাভা প্রচণ্ড শক্তিতে ভূ-অভ্যন্তর থেকে বের হয়ে আসার সময়ও ভূমিকম্পের সৃষ্ট হয়। ভূ-ত্বক তাপ বিকিরণ করে সংকুচিত হলে ভূনিম্নস্থ শিলাস্তরে ভারের সামঞ্জস্য রক্ষার্থে ফাটল ও ভাঁজের সৃষ্টির ফলে ভূকম্পন অনুভূত হয়। ভূ-আলোড়নের ফলে ভূত্বকের কোনো স্থানে শিলা ধসে পড়লে বা শিলা চ্যুতি ঘটলে ভূমিকম্প হয়। ৬২ বছরের মধ্যে বাংলাদেশ সংলগ্ন এলাকায় সবচেয়ে তীব্র মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয় ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১১। সর্বশেষ ১৯৫০ সালে ভারতের আসাম এলাকায় ৮.৩ মাত্রার একটি ভূমিকম্প হয়েছিল। ১৯৯৯ সালে বান্দরবানে ৬.১ মাত্রার ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়। ২০১০ সালের আগস্টে ৬.৪ মাত্রার আরেকটি ভূমিকম্প ভারতের আসাম এলাকায় সৃষ্টি হয়। ১৯৯৯ সালের ভূমিকম্পে চট্টগ্রামের একটি ভবন ধসে ৩০ জনের মতো মারা যায়। বাংলাদেশকে কাঁপিয়ে দেয়া ২০১১ সালের ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল নেপাল সীমান্তবর্তী ভারতের সিকিম রাজ্যের রাজধানী গ্যাংটক থেকে ৬৪ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে। সিকিমে আঘাত হেনেছে ৬.৮ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প। এটি হিমালয়ের পাদদেশে সংঘটিত হয়েছে। ভারতীয় প্লেট ও ইউরেশিয়ান প্লেটের মধ্যে সৃষ্ট সংঘর্ষের কারণে এ ভূ-কম্পনের সৃষ্টি হয়। এর কেন্দ্র ছিল (এপি সেন্টার) ভূপৃষ্ঠের ২০.৭ কিলোমিটার গভীরে। ২৫ এপ্রিল ২০15 নেপালে আঘাতহানা ৭.৮ মাত্রার ভূমিকম্পে ৩ থেকে ৫ মাত্রার কম্পন অনভূত হয়, যার উৎপত্তিস্থল বাংলাদেশ থেকে ৭৪৫ কিমি দূরে। বাংলাদেশে কম্পনের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে দীর্ঘক্ষণেও আতঙ্ক কাটছিল না।

২. জনমিতিক বৈশিষ্ট্য : নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য

♦ স্বাস্থ্যনীতি *[৩০তম বিসিএস]*

সবার জন্য মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে সুনির্দিষ্ট তিনটি উদ্দেশ্য আর বাস্তবায়নে ১৮টি চ্যালেঞ্জ নিয়ে ৬ মার্চ ২০১২ জাতীয় সংসদে বহুল আলোচিত 'জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০১১' উপস্থাপন করা হয়। আর এ স্বাস্থ্যনীতির মূল স্লোগান রাখা হয়েছে 'সুস্বাস্থ্য উন্নয়নের হাতিয়ার'। স্বাস্থ্যনীতিতে ১৯টি বিষয়কে মূল লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া স্বাস্থ্যনীতি কার্যকর করতে ৩৯টি কর্মকৌশল নির্ধারণ করেছে সরকার। স্বাস্থ্যনীতি বাস্তবায়নে সরকারপ্রধান তথা প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি জাতীয় স্বাস্থ্য কাউন্সিল গঠন করা হবে। এ কাউন্সিলে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সহ বেসরকারি খাতের

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

স্টেকহোল্ডার ও এ সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। কাউন্সিল স্বাস্থ্যনীতি বাস্তবায়নে দিকনির্দেশনা প্রদান করবে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য বিষয়ে কাউন্সিলের কাছে দিকনির্দেশনা চাওয়া হবে। উল্লেখ্য, ২০০০ সালে প্রথম স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়ন করা হয়েছিল। স্বাস্থ্যনীতির প্রধান লক্ষ্যসমূহ হচ্ছে– সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে সংবিধান অনুযায়ী ও আন্তর্জাতিক সনদ অনুসারে চিকিৎসাকে অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য চিকিৎসার মৌলিক উপকরণ পৌঁছে দেয়া, পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর জন্য মানসম্পন্ন ও সহজলভ্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা, বিকল্প চিকিৎসা (ইউনানি, আয়ুর্বেদীয় ও হোমিওপ্যাথি) পদ্ধতি ও শিক্ষার মানোন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ, ২০২১ সালের মধ্যে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য দৈনিক ন্যূনতম ২,১২২ কিলো-ক্যালরীর বেশি খাদ্যের সংস্থান করা, আয়ুষ্কাল ৭০-এর কোঠায় উন্নীতকরণ, গ্রামীণ জনপদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে এমবিবিএসের ইন্টার্নিশিপ বিদ্যমান এক বছরের পরিবর্তে ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় অর্থপ্রাপ্তি নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে পর্যায়ক্রমে দুই বছরে উন্নীত করে তার মধ্যে অন্তত এক বছর গ্রামপর্যায়ের স্বাস্থ্যকেন্দ্রসমূহে তাদের কার্যসম্পাদন বাধ্যতামূলক করা, ও বিদেশ থেকে প্রত্যাগতদের মাধ্যমে মারাত্মক সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব রোধে স্থল, জল ও বিমানবন্দরসমূহে প্রত্যাগতদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা রাখা ইত্যাদি।

♦ পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি *[২৯তম বিসিএস]*

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর সংবিধান প্রণয়ন করার সময় পার্বত্য উপজাতীয় নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য বিশেষ মর্যাদা ও স্বায়ত্তশাসনের দাবি জানিয়ে ব্যর্থ হন এবং শান্তিবাহিনী নামক জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র শাখা গঠন করেন। এরপর শান্তিবাহিনী দীর্ঘদিন বাঙালি ও সেনাবাহিনীর মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘাত চলতে থাকে। এ সংঘাত অবসানকল্পে মোট ২৬টি বৈঠক শেষে সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে ২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ সালে ঐতিহাসিক শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন তৎকালীন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির চেয়ারম্যান আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ ও জনসংহতি সমিতির পক্ষে জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা)। শান্তিচুক্তির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হলো : চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য কমিটি গঠন, ভূমি প্রসঙ্গে সমঝোতা, পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ গঠন, পুনর্বাসন ও সাধারণ ক্ষমার বিধান, পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীন বিষয়গুলো চিহ্নিতকরণ প্রভৃতি। চুক্তির প্রধান প্রধান দিকগুলো হলো– পার্বত্য চট্টগ্রামকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে বিবেচনা করা, স্বাক্ষরের পর থেকে চুক্তি বলবৎ, বিডিআর ও স্থায়ী সেনাবাহিনী ব্যতীত সামরিক বাহিনী, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার করা, পার্বত্য চট্টগ্রামে সকল সরকারি, আধা-সরকারি, পরিষদীয় ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরে নিয়োগে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন এবং একজন উপজাতীয়কে এ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী করা, পরিষদের মুখ্য কর্মকর্তা হবেন একজন উপসচিব পর্যায়ের ব্যক্তি। এ ক্ষেত্রে উপজাতি প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে; পার্বত্য জেলা স্থানীয় পরিষদের নাম হবে পার্বত্য জেলা পরিষদ; প্রতি জেলা পরিষদের তিনটি মহিলা আসনের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ অ-উপজাতীয়দের জন্য সংরক্ষণ করা হবে। পরিষদের সাথে আলোচনা ছাড়া সরকার কোনো জমি, পাহাড় ও বনাঞ্চল অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর করতে পারবে না। মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা চালুকরণ। তিন জেলার সমন্বয়ে ২২ সদস্য বিশিষ্ট পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা, যার মেয়াদ হবে ৫ বছর। পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবেন। তার পদমর্যাদা হবে একজন প্রতিমন্ত্রীর সমকক্ষ এবং তিনি হবেন উপজাতি।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

◆ সম্প্রদায় ও সাম্প্রদায়িক *[২৭তম বিসিএস]*

সম্প্রদায় বলতে এমন একটি জনগোষ্ঠীকে বোঝায় যাদের বাসস্থান, স্বার্থ এবং জীবনপ্রণালী এক ও অভিন্ন। বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে সম্প্রদায়ের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার (MacIver) তার 'Society : Its Structure and Changes' নামক গ্রন্থে সম্প্রদায় বলতে এমন একটি জনগোষ্ঠীকে বুঝিয়েছেন, যার বাসস্থান, স্বার্থ এবং জীবনধারা এক ও অভিন্ন। তিনি সম্প্রদায়ের উদাহরণ হিসেবে গ্রাম, শহর, আদিম জনগোষ্ঠী এবং আধুনিককালের জাতিকে বুঝিয়েছেন। তবে ম্যাকাইভার ও পেজ তাদের 'Society' নামক গ্রন্থে সম্প্রদায়ের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, 'সম্প্রদায় হচ্ছে এমন একটি জনগোষ্ঠী যারা সাধারণত একটি নির্দিষ্ট এলাকায় বসবাস করে এবং যারা সমজাতীয় জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। ম্যাকাইভার সম্প্রদায়ের দুটি মৌল ভিত্তির কথা উল্লেখ করেন। যথা ক. সম্প্রদায় এলাকা ও খ. সাম্প্রদায়িক মানসিকতা। সাম্প্রদায়িক বলতে সাধারণত সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান, বিশ্বাস ইত্যাদির প্রতি অতিমাত্রায় অনুরক্ত বোঝায়। যেমন— সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বলতে বোঝায় দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে নিজ নিজ ধর্মীয় বিশ্বাস, আচার অনুষ্ঠান, প্রথা, রীতিনীতি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার লড়াই। পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, একই বাসস্থান ও সামাজিক সংহতি যেখানে আছে এরূপ আঞ্চলিক জনগোষ্ঠীকে সম্প্রদায় বলা যায়।

◆ জনবিজ্ঞান *[২৭তম বিসিএস]*

যে সামাজিক বিজ্ঞান জনসংখ্যা সম্পর্কে পঠন-পাঠন এবং গবেষণা করে তার নাম জনবিজ্ঞান বা Demography। জনবিজ্ঞান অন্যতম প্রাচীন সামাজিক বিজ্ঞান। বস্তুত, অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীতে জনবিজ্ঞান অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের উদ্ভব ও বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রথমদিকে জনবিজ্ঞান অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের সাথে এবং পরবর্তীকালে উনবিংশ শতাব্দী থেকে সমাজবিজ্ঞানের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছে। জনবিজ্ঞান সাধারণত প্রজনন, উর্বরতা, মৃত্যু ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত জাতিসংঘের 'Multilingual Demographic Dictionary' নামক গ্রন্থে জনবিজ্ঞানের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে : 'জনবিজ্ঞান হলো মানবগোষ্ঠীর বিজ্ঞানসম্মত সমীক্ষা— বিশেষ করে মানবগোষ্ঠীর সংখ্যা গঠন এবং বিকাশ সম্পর্কিত সমীক্ষা।' ১৬৬২ সালে জন গ্রান্টের (John Graunt) 'Natural and Political Observations on the Bills of Mortality' নামক গ্রন্থের প্রকাশকে জনবিজ্ঞানের প্রকৃত সূচনা মনে করা হয়।

◆ জুমচাষ *[১৭তম ও ১০ম বিসিএস]*

বাংলাদেশের পাহাড়ি অঞ্চলে প্রচলিত চাষাবাদ পদ্ধতি। এর প্রকৃত অর্থ হলো স্থান পরিবর্তনের মাধ্যমে চাষাবাদ করা। এ ধরনের চাষাবাদে শুষ্ক মৌসুমে বনভূমি কেটে বা পুড়িয়ে স্বল্পসময়ের জন্য (১-৩ বছর) ফসল চাষাবাদের পর প্রাকৃতিক বনভূমির পুনর্জন্ম ও মৃত্তিকার উর্বরতার ক্ষয়পূরণের জন্য দীর্ঘসময় (১০-৪০ বছর) পতিত রাখা হয়। জুম বা স্থানান্তর চাষাবাদ সাধারণভাবে 'সুইডেন চাষাবাদ' বা 'জঙ্গল পরিষ্কার ও পোড়ানো চাষাবাদ' হিসেবে পরিচিত। এ ধরনের প্রাচীন চাষাবাদ অধিকাংশ উপজাতীয় অধিবাসীদের অতি পরিচিত। সংরক্ষিত বনাঞ্চলের বাইরে ঢালু পাহাড়ের ওপর জুমচাষ করা হয়। বর্তমানে প্রতি বছর প্রায় ২০,০০০ হেক্টর ভূমি জুমচাষের আওতায় নিয়ে আসা হচ্ছে, এতে প্রতি হেক্টর ভূমিতে ১০০ থেকে ২৫০ মে. টন মাটি ক্ষয় হয়। জুমচাষের নিবিড়তা বৃষ্টিপাত, ভূমির বন্ধুরতা, অভিগম্যতা ও জনসংখ্যার ঘনত্বের পার্থক্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন হয়। এ চাষপদ্ধতির নির্ভরতার ওপর ভিত্তি করে জুমিয়া পরিবারকে প্রধানত তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় ১. সার্বিকভাবে নির্ভরশীল, ২. আংশিকভাবে নির্ভরশীল ও ৩. প্রান্তিকভাবে নির্ভরশীল। জুম উপজাতীয়দের জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হওয়ায় জুমচাষে তাদের অনুসৃত পদ্ধতি স্থানভেদে এবং কৃষকদের শ্রেণীভেদেও পৃথক হয়। মূলত চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলের উপজাতীয়দের জীবন ও সংস্কৃতি বহুলাংশে জুমচাষের ওপর নির্ভরশীল। এছাড়া সিলেটের পাহাড়ি অঞ্চলেও কিছু কিছু জুমচাষ হয়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

◆ জাতীয় গৃহায়ন নীতি ১৯৯৩ *[১৭তম বিসিএস]*

১৯৮৮ সালের নভেম্বরে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত '২০০০ সাল নাগাদ সকলের জন্য আবাসন' নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী কিছু গুরুত্বপূর্ণ কলাকৌশল গৃহীত হয়েছিল। এই কলাকৌশলের লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা সম্বলিত জাতীয় গৃহায়ন নীতি প্রণয়ন করার জন্য জাতিসংঘের আওতাভুক্ত সকল দেশের সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। বাংলাদেশের জাতীয় গৃহায়ন নীতি ১৯৯৩-কে এ চিন্তার ফসল হিসেবে উল্লেখ করা যায়। ১৯৮৮ সালে জাতিসংঘের সিদ্ধান্তের সূত্র ধরে বিশ্বের অনেক দেশেই জাতীয় গৃহায়ন নীতি প্রস্তুত ও তার বাস্তবায়নের কাজ শুরু করা হলেও ১৯৯৩ সালের আগে আমাদের দেশে তা সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। ১৯৯২ সালে রিও ডি জেনিরোতে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ পরিবেশ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত সম্মেলনে মানব বসতি উন্নয়ন বিষয়ক সুপারিশমালা বাস্তবায়নের জন্য সকল দেশের সরকারের প্রতি পুনরায় আবেদন জানানো হয়, কারণ মানব বসতি উন্নয়নের ওপর পরিবেশের ভারসাম্য বহুলাংশে নির্ভরশীল। এই সুপারিশমালা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৯৯০-৯৫ সালে প্রণীত চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মানব বসতি উন্নয়নের ওপর বাংলাদেশ সরকার বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করার প্রেক্ষাপটে 'জাতীয় গৃহায়ন নীতি' প্রণয়ন করা হয়। এই নীতিমালায় কি কি কৌশলগত পন্থা অবলম্বনে বাংলাদেশের পল্লী ও নগরীয় জনগোষ্ঠীর আবাসন সমস্যা নিরসন করা যাবে, তার জন্য কতিপয় দিকনির্দেশনা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এই নীতির বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিকগুলোর মধ্যে দেশের গৃহায়ন সংকট নিরসনকল্পে সরকারের ভূমিকা হবে গৃহ উন্নয়নে অনুকূল ও সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা, জনগণকে উৎসাহ প্রদান, উদ্বুদ্ধকরণ, যথাযথ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা। শুধু স্বল্পবিত্ত, বিত্তহীন, দুর্দশাগ্রস্ত, সহায়-সম্বলহীন ও আশ্রয়হীনদের জন্য সরকারি ও বেসরকারি খাতে বিশেষ গৃহায়ন প্রকল্প হাতে নেয়া ছাড়া অন্য সব ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা সহায়কধর্মী হবে বলে উল্লেখ করা হয়।

উল্লেখ্য, পূর্ত সচিবের নেতৃত্বে প্রায় ৩৫ সদস্যের একটি জাতীয় কমিটির মাধ্যমে জাতীয় গৃহায়ন নীতি ১৯৯৩-এর রূপরেখা তৈরি করা হয়। জাতীয় কমিটিতে চার সদস্যের একটি ড্রাফটিং উপ-কমিটি রূপরেখার ভিত্তিতে পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা রচনা করেন। খসড়া নীতিমালাটি জাতীয় ভিত্তিতে সেমিনারে আলোচিত হয় এবং অতঃপর মন্ত্রণালয় কর্তৃক চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়।

◆ গারো উপজাতি *[১৩তম বিসিএস]*

বাংলাদেশে বসবাসকারী ১৫,৮৬,১৪১ উপজাতির মধ্যে গারো সম্প্রদায় অন্যতম প্রধান উপজাতি। এরা প্রধানত ময়মনসিংহ, জামালপুর ও টাঙ্গাইল জেলার গারো পাহাড় এলাকা এবং মধুপুর ও ভাওয়ালের গড়, রংপুর ও সিলেটের চা বাগান এলাকায় বসবাস করে। ময়মনসিংহের গারো পাহাড়ের নামানুসারে এদেরকে 'গারো' বলা হয়। আদিবাসীদের মধ্যে এদের বসবাস সেই সুদূর প্রাচীনকাল থেকে। বর্তমানে এ দেশে গারো উপজাতীয় লোকের সংখ্যা প্রায় ২ লাখ। গারোদের অনেকে পাহাড়ে আবার অনেকে সমতল ভূমিতে বাস করে। পাহাড়ি গারোরা 'অচিছক' ও সমতলের গারোরা "লামদানী" নামে পরিচিত।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

গারোদের সমাজ মূলত মাতৃপ্রধান। গারো সমাজে একই গোত্রের নারী-পুরুষের বিবাহের কোনো রীতি নেই। এ রীতি ভঙ্গ করলে তাকে কঠিন সাজা দেয়া হয়। এমনকি মৃত্যুদণ্ড প্রধান করা হয়। গারোরা সামাজিক রীতি নীতি কঠোরভাবে পালন করে থাকে। অচিছক গারোগুলো মাচাঙ পদ্ধতিতে কাঠ ও শন দিয়ে তৈরি ঘরে বসবাস করে। গারোদের আদি নিবাস ছিল ভারতের মেঘালয় রাজ্যের পশ্চিম অংশ জুড়ে। তাদের ভাষার নাম মান্দি ভাষা। তবে এতে কোনো লিপি বা অক্ষর নেই। সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর প্রত্যেক সন্তানকেই মাহারী বা পদবি গ্রহণ করতে হয়। মাহারী অর্থাৎ 'মার বংশ'। এ পর্যন্ত মোট ১৭৮টি মাহারীর সন্ধান পাওয়া গেছে। মাহারীগুলো প্রধান ৫টি গোত্রে বিভক্ত। তাহলো ১. সাংমা, ২. মারাক, ৩. মমিন, ৪. আরেং এবং ৫. সিরা। গারোদের ধর্মের নাম 'সংসারেক'। তবে বর্তমানে অনেকেই খ্রিস্টধর্ম ও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। গারোরা বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করে এবং তাদের প্রধান দেবতার নাম 'তাতারা বারুগা'। তাদের বিশ্বাস এই দেবতার আদেশেই পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে। গারোদের মধ্যেও শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে তারা বাংলায়ও কথা বলা শিখছে।

♦ চাকমা উপজাতি *[১১তম বিসিএস]*

বাংলাদেশের বৃহত্তম উপজাতি চাকমা (২ লাখ ৫৩ হাজার)। চাকমারা পার্বত্য চট্টগ্রামের সংখ্যাগরিষ্ঠ। তারা নিজেদের চাঙমা বলতে অধিক স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষায় ও কর্মক্ষেত্রে চাকমারাই অগ্রগামী। পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাড়া ভারতের ত্রিপুরা, মিজোরাম, মিকিরহিল ও অরুণাচলে চাকমা সম্প্রদায় বাস করে। চাকমারা মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর লোক। চাকমাদের একজন রাজা রয়েছেন। তিনি বংশানুক্রমিকভাবে রাজা। তিনি চাকমা রাজা নামে পরিচিত। চাকমারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। বৌদ্ধ ধর্মের অনুশাসনের প্রতি তারা খুবই শ্রদ্ধাশীল। তাদের প্রধান উৎসব বিজু উৎসব। বাংলা বছরের শেষ দুই দিন এবং বাংলা বছরের প্রথম দিন এই তিন দিন ধরে বিজু উৎসব উদযাপিত হয়। এছাড়াও ভাতদ্যা, হালপালনী, মানমানা, ধর্মকাম নামে তাদের আরো কিছু উৎসব রয়েছে। চাকমারা পাহাড়ি নদীর তীরে, ছোট ছোট পাহাড়ের ওপর খোলামেলা জায়গায় বসবাস করতে পছন্দ করে। তারা গ্রামকে 'আদাম' এবং ঘরেকে 'ঘরই' বলে। চাকমাদের বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা বেশ চমৎকার। তাদের মৃতদেহ দাহ করা হয়। তবে কেউ কলেরা, বসন্তসহ অন্যান্য দুরারোগ্য ব্যাধিতে মারা গেলে তাকে কবর দেয়া হয়। মৃত শিশুকে তারা কবর দিয়ে থাকে। চাকমারা জীবিকার্জনের জন্য সাধারণত 'জুম' চাষের ওপর নির্ভরশীল ছিল। পাহাড়ের ঢালু অঞ্চলের বনজঙ্গল পরিষ্কার করে এ চাষ করা হতো। তবে বর্তমানে জুম চাষের চেয়ে তারা বাঙালিদের মতো চাষাবাদে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেছে।

♦ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে নারী সমাজ

পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের চেয়েও ভয়বহতা নিয়ে বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যা আমাদের আতঙ্কিত করে তুলেছে। দেশের সার্বিক উন্নয়ন আজ জনসংখ্যার চাপে পিষ্ট। তাই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা আজ আমাদের প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য। আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। তাই এ ভয়াবহ সমস্যা মোকাবিলায় যদি প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠীর কোনো ভূমিকা না থাকে তাহলে সমস্যার সমাধান কঠিন হয়ে পড়বে। তাই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে আমাদের নারী সমাজের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে নারী সমাজ নিম্নলিখিত উপায়ে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে বলে আমি মনে করি :

ক. নিজেদের অধিক সন্তানধারণ থেকে বিরত রাখা।

খ. পরিবার পরিকল্পনা ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

গ. নিজেরা শিক্ষিত হয়ে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব অনুধাবন করা এবং তা অন্যকে বোঝানো।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

ঘ. চিত্তবিনোদনের জন্য বিকল্প মাধ্যম তৈরি করা।

ঙ. পরিবার পরিকল্পনা ব্যবস্থা প্রচার করার দায়িত্ব নেয়া। কারণ আমাদের সমাজে এখনো কিছু সামাজিক ও ধর্মীয় গোঁড়ামীর কারণে পুরুষ মাঠকর্মীর চেয়ে মহিলা মাঠকর্মীরা সহজে অশিক্ষিত ও দরিদ্র মহিলাদের পরিবার পরিকল্পনা ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে সহজে উদ্বুদ্ধ করতে পারে।

♦ রোহিঙ্গা সমস্যা

রোহিঙ্গা এমন একটি ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক গোষ্ঠী, যারা নিজ দেশেও পরবাসী। পরবাসেও আশ্রয়দাতার গলার কাঁটা— শরণার্থী হয়ে বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন অংশে তারা আশ্রয় খুঁজছে বেশ কয়েক দশক ধরে। বিভিন্ন সময়ে দাঙ্গায় দমনাভিযানের শিকার হয়ে লাখ লাখ রোহিঙ্গারা এখনো বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ডে শরণার্থী শিবিরে মানবেতর জীবন যাপন করছে। মিয়ানমারের এ রোহিঙ্গাদের জাতিসংঘ তার এক প্রতিবেদনে 'বিশ্বের সবচেয়ে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী' হিসেবে আখ্যায়িত করেছে।

মিয়ানমার অবশ্য 'রোহিঙ্গা' নামে কোনো জনগোষ্ঠীকে স্বীকার করে না। এর কারণ হিসেবে তুলে ধরা হয় ১৫ অক্টোবর ১৯৮২ সালে সামরিক জান্তা প্রকাশিত একটি আইনের সীমাবদ্ধতাকে। আইনটিতে মিয়ানমারে তিন ধরনের নাগরিকত্বের বিধান রাখা হয়, যেখানে ১৩৫টি গোত্রভুক্ত মানুষকে মিয়ানমারের পূর্ণাঙ্গ নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। তবে তিন ধরনের নাগরিকত্ব আইনের কোনোটিতেই 'রোহিঙ্গা' নামের কোনো জাতিকে স্বীকৃতি দেয়া হয়নি। তাদের মতে, রোহিঙ্গারা মুসলিম সম্প্রদায়ের বহিরাগত অংশ। এরা বাংলাদেশের মানুষ, বিভিন্ন সময় কাজের সন্ধানে মিয়ানমারে প্রবেশ করে বসতি স্থাপন করেছিল মাত্র। রোহিঙ্গাদের সাধারণত স্থানীয়ভাবে 'কালারস' নামে অভিহিত করা হয়।

♦ শ্রমশক্তি : জরিপ ২০১৩

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (BBS) শ্রমশক্তি জরিপ ২০১৩-এর প্রাথমিক খসড়া প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী— বর্তমানে কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা ৬ কোটি ৫ লাখ ৮০ হাজার, যা মোট জনগোষ্ঠীর ৩৯ শতাংশ। বিভিন্নভাবে কাজের মধ্যে রয়েছেন বা কর্মরত আছেন ৫ কোটি ৮০ লাখ মানুষ; পুরুষ ৪ কোটি ১২ লাখ ও নারী ১ কোটি ৬৮ লাখ। অর্ধ-বেকার : ২ কোটি ১৫ লাখ। বেকার : ২৫ লাখ ৮০ হাজার; নারী ও পুরুষ বেকারের সংখ্যা সমান। নানা প্রতিবন্ধকতার কারণে শ্রমশক্তির বাইরে রয়ে গেছে সোয়া চার কোটি মানুষ। আর মোট জনশক্তির বাকি অংশ ১৫ বছরের নিচে শিশু।

- আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (ILO) সংজ্ঞা অনুযায়ী, ১৫ বছরের উর্ধ্বে এক ব্যক্তি গত এক মাসে কাজ খুঁজেছে কিন্তু পায়নি, গত এক সপ্তাহে কাজের জন্য প্রস্তুত ছিল, সে সময়ও কাজ জোটেনি, বর্তমানে সে ব্যক্তি কোনো ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত নয়, তাকে বেকার বলে অভিহিত করা হয়েছে। ১৫ বছরের উর্ধ্বে কোনো ব্যক্তি যদি গত এক সপ্তাহে এক ঘণ্টাও কাজ করে থাকে, আইএলও'র সংজ্ঞা অনুযায়ী তাকে বেকার বলা যাবে না।
- কোনো একটি রাষ্ট্র জনসংখ্যা পরিবর্তনে সুযোগ একবারই পেয়ে থাকে। এ সময়টাকে বলা হয় জনসংখ্যার 'ডিভিডেন্ড' বা 'বোনাসকাল'। অর্থাৎ এ সময়ে দেশের জনগোষ্ঠীর সবচেয়ে বেশি থাকে ১৫-৬৪ বছরের মধ্যে। ১- ১৫ বছরের নিচে বয়সী সংখ্যাও কমতে থাকে। একই সাথে ৬৪ বছরের ওপর জনসংখ্যা থাকে সবচেয়ে কম। বাংলাদেশেও এখন সবচেয়ে কম নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী বসবাস করছে।
- আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী, বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে প্রতি ১% প্রবৃদ্ধি হলে কর্মসংস্থান হওয়ার কথা আড়াই লাখ লোকের।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

◆ জনসংখ্যা ও বাংলাদেশ

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম জনবহুল দেশ। এ দেশের আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার। আয়তনের দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বের ৯০তম রাষ্ট্র। অল্প আয়তনের এ ছোট ভূ-খণ্ডের জনসংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি। পঞ্চম আদমশুমারি ২০১১ অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ১৪ কোটি ৯৭ লাখ ৭২ হাজার ৩৬৪ জন। নারী-পুরুষের অনুপাত ১০০ ঃ ১০৩। বিশ্বের অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ বাংলাদেশের প্রতি বর্গকিমি এলাকায় ১০১৫ জন বা প্রতি বর্গমাইলে ২৫২৮ জন লোকের বসবাস। জনসংখ্যায় বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান অষ্টম। বর্তমানে দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৭ শতাংশ। সময়ের পরিক্রমায় দেশের জনসংখ্যাও বেড়েছে বেশ দ্রুততার সাথে। ১৯০১ সালে এ অঞ্চলের মোট জনসংখ্যা ছিল প্রায় তিন কোটি। সর্বশেষ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৪ অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ১৫ কোটি ৫৮ লাখে। বাংলাদেশের জনসংখ্যাধিক্য এখন এক নম্বর সমস্যায় পরিণত হয়েছে। সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টিতে জনসংখ্যাধিক্যের দায় অনেক। জনসংখ্যাধিক্যের প্রভাবে দেশে সৃষ্টি হয় নানাবিধ সমস্যা। যেমন— খাদ্য ঘাটতি, মৌল মানবিক প্রয়োজন অপূরণ, বাসস্থান সমস্যা, অশিক্ষা ও নিরক্ষরতার হার বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য সমস্যা ও চিকিৎসা সেবার ঘাটতি, নির্ভরশীলতার হার বৃদ্ধি, আবাদি জমির উপর চাপ বৃদ্ধি, বেকারত্ব, পরিবহন ও যোগাযোগে চাপ বৃদ্ধি, সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও অপরাধ প্রবণতা, ভিক্ষাবৃত্তি, পুষ্টিহীনতা, মূলধন গঠন ও শিল্পায়নে প্রতিবন্ধকতা তৈরি ইত্যাদি। মোটকথা, জনসংখ্যার আধিক্য বাংলাদেশের সকল উন্নয়ন প্রয়াসকে স্থবির করে দিয়েছে।

◆ বাংলাদেশের জনসংখ্যা সুবিধা ও বোনাস যুগ

একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনো দেশে সর্বোচ্চ কর্মক্ষম জনসংখ্যা 'জনসংখ্যার বোনাস' যুগ। এ সময়ে জনগোষ্ঠীর সবচেয়ে বেশি সংখ্যা থাকে ১৫ থেকে ৬৪ বছর বয়সের মধ্যে। কমতে থাকে ১ থেকে ১৫-এর নিচে বয়সী জনসংখ্যা। একই সাথে কমতে থাকে ৬৪-এর উপর বয়সী জনসংখ্যা। অর্থাৎ যখন কোনো দেশের কর্মক্ষম লোকের সংখ্যা আনুপাতিক হারে সবচেয়ে বেশি থাকে তখন একটি দেশ 'জনসংখ্যার বোনাস' যুগে প্রবেশ করে। কোনো একটি রাষ্ট্র জনসংখ্যার এ সুযোগ একবারই পেয়ে থাকে। এ যুগ ৩০ থেকে ৪০ বছর পর্যন্ত বিরাজমান থাকে। অন্যদিকে জনসংখ্যার মধ্যে তরুণের সংখ্যাধিক্য ঘটলে তাকে 'জনসংখ্যা সুবিধা' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। অর্থাৎ কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই তরুণ হয়। বাড়ন্ত তারুণ্যে নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর সংখ্যা হ্রাস পায়। আর কোনো দেশে যখন কর্মক্ষম মানুষের উপর নির্ভরশীল কর্মহীন মানুষের সংখ্যা কমে যায়, তখন সেই দেশ জনসংখ্যার দিক দিয়ে দারুণ সুবিধাজনক জায়গায় চলে যায়। বাড়ে জাতীয় সঞ্চয় এবং সচল হয় দেশের অর্থনীতির চাকা। পৃথিবীর সর্বাধিক ঘনবসতির দেশ বাংলাদেশ। ২০১২ সালে এ দেশটি জনসংখ্যার বোনাস যুগে প্রবেশ করেছে। সম্প্রতি প্রকাশিত জাতিসংঘের বিশ্ব জনসংখ্যা প্রতিবেদনে জনসংখ্যা সুবিধার বিষয়কে বেশ স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ তরুণ জনগোষ্ঠী। ১০ থেকে ২৪ বছর বয়সী দেশের তরুণের সংখ্যা ৪ কোটি ৭৬ লাখ। দেশে প্রতি তিনজনে দু'জন উপার্জনক্ষম। আগামী ২৫ থেকে ৩০ বছর তরুণরাই জনসংখ্যার বড় অংশ হিসেবে উৎপাদনশীলতায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। এ সময় পার হওয়ার পর ক্রমান্বয়ে দেশে তরুণ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকবে। ২০৫০ সাল নাগাদ মোট জনসংখ্যার ১০ থেকে ১৯ ভাগ হবে ১০ থেকে ২৪ বছর বয়সী। বর্তমানে বাংলাদেশ জনসংখ্যার ক্ষেত্রে যে সোনালী অধ্যায়ে পা দিয়েছে তা যে কোনো জাতির জন্য কাঙ্ক্ষিত। জনসংখ্যা ও উন্নয়ন বিশেষজ্ঞদের মতে, একটি জাতি জনসংখ্যা সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে দ্রুত এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়। যার উজ্জ্বল উদাহরণ— চীন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া প্রভৃতি দেশ। অন্যান্য দেশের মত জনসংখ্যার আধিক্যের মধ্যেও জনসংখ্যাকে কাজে লাগানোর সুবর্ণ সুযোগের হাতছানি বাংলাদেশের সামনে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

◆ জনসংখ্যা সুবিধার দিক

বিপুল জনসংখ্যার বেশিরভাগ অংশ কর্মক্ষম বা তরুণ জনগোষ্ঠী হওয়ায় বহুমুখী সুবিধা ও সম্ভাবনার সামনে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ। উর্বর মাটি, সস্তা শ্রম, তথ্য-প্রযুক্তির উন্মুক্ত ব্যবহার, উপার্জন পিয়াসী কর্ম আকাঙ্ক্ষা, দক্ষ-অদক্ষ জনগোষ্ঠীর কর্মে নিযুক্তির পর্যাপ্ত সুযোগ ও পরিবেশ, বন্ধুত্বপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতি ও সহযোগিতামূলক পারস্পরিক মনোভাবের কল্যাণে জনশক্তি রফতানিসহ নানা দিকে জনসংখ্যা সুবিধার সম্ভাবনা বিস্তৃত। যেমন—

তথ্য-প্রযুক্তির বাজার দখল : বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং বাজারের সমন্বয় ও সম্প্রসারণের এক বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে তথ্য-প্রযুক্তির ক্রমবিকাশমান বাজার। আউটসোর্সিং, ফ্রি-ল্যান্সিং, সফটওয়্যার উন্নয়ন ও রফতানি, ইন্টারনেট সার্ভিস তথ্য-ব্যবস্থাপনা এবং ই-বিজনেসসহ তথ্য-প্রযুক্তির বহুমুখী আত্মকর্মসংস্থানে সম্পৃক্ত হয়ে দক্ষ তরুণ জনগোষ্ঠী অর্থনৈতিক উন্নয়নকে এগিয়ে নিচ্ছে বড় পরিসরে। এক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই বাংলাদেশের তরুণ দক্ষ মেধাবীরা। বাড়ন্ত তরুণ্যের সুবিধা এ সম্ভাবনাকে করেছে আরও উজ্জ্বল।

জনশক্তি রফতানি ও প্রবাসী আয় : বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম নিয়ামক প্রবাসী আয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মরত লাখ লাখ প্রবাসী বাংলাদেশির কল্যাণে বিশ্বে প্রবাসী আয়ে বাংলাদেশ এখন সপ্তম অবস্থানে। জনশক্তি রফতানি তালিকার দেশসমূহের মধ্যেও সমানতালে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। জনসংখ্যা সুবিধায় বিশাল এ খাতের আরও সুবিস্তৃত ফলাফল এখন হাতের দোরগোড়ায়। জনসংখ্যাকে মানবসম্পদে রূপান্তরিত করার মাধ্যমে চীন, তাইওয়ান, কোরিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশের মতো বিশ্ব অর্থনীতিতে আমাদের দেশের অবস্থান আরও উন্নত করা সম্ভব।

তৈরি পোশাক শিল্প : বাংলাদেশে জনসংখ্যা সুবিধার সর্বোচ্চ ব্যবহারের অন্যতম খাত তৈরি পোশাক বা গার্মেন্টস শিল্প। শিল্পায়নের অভিজ্ঞতা থেকে এটা স্পষ্ট যে, বিশ্বের অধিকাংশ দেশের শিল্পায়নের যাত্রা বস্ত্র শিল্প থেকেই। শিল্পায়নের এই প্রথম ধাপে প্রভূত উন্নতি সাধন করেছে বাংলাদেশ। বস্ত্র ও তৈরি পোশাক শিল্পে বাংলাদেশের প্রায় ৫০ লক্ষাধিক জনবল নিয়োজিত আছে। বর্তমানে এ খাতটি বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয়।

মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী : বাংলাদেশের জনসংখ্যা সুবিধার আরেকটি বড় দিক হলো দেশের মোট জনসংখ্যার দুই ভাগের এক ভাগ নারী। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা— ২০১৪ অনুযায়ী, ১৫+ বছরের বয়সী মোট শ্রমশক্তির মধ্যে নারী সংখ্যা ১ কোটি ৬২ লাখ। এর বেশিরভাগই পোশাকখাতে নিয়োজিত। সাম্প্রতিক সময়ে নারী জনশক্তি রপ্তানিতেও এগিয়েছে বাংলাদেশ। তারুণ্যময় নারী জনগোষ্ঠীকে দক্ষভাবে গড়ে তুলে যথোপযুক্ত কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত করতে পারলে জনসংখ্যা সুবিধার বড় সাফল্য অর্জিত হবে।

◆ জনসংখ্যা সুবিধার চ্যালেঞ্জ

সাধারণ ও কর্মমুখী শিক্ষা : জনসংখ্যা সুবিধার প্রধান চ্যালেঞ্জ গুণগত সাধারণ শিক্ষা ও কর্মমুখী শিক্ষার নিশ্চিতকরণ। কেননা মৌলিক শিক্ষার প্রসার ছাড়া উন্নত কিংবা উন্নয়নশীল নির্বিশেষে কোনো দেশের পক্ষেই অর্থনৈতিক কাঠামোর ইতিবাচক রূপান্তর করা সম্ভব নয়।

স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা : বাড়ন্ত তারুণ্যের জনসংখ্যা সুবিধার সুযোগ কাজে লাগানোর অন্যতম চ্যালেঞ্জ হলো স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা। শিশু ও মাতৃ মৃত্যুহ্রাস, খাদ্যে ভেজাল রোধ, পুষ্টি নিশ্চিতকরণসহ স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তির শতভাগ নিশ্চয়তা বিধান এক্ষেত্রে অপরিহার্য। কেননা সুস্বাস্থ্য দক্ষ মানব উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন : জনসংখ্যা সুবিধার সুযোগ লাভে নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন এবং লিঙ্গ বৈষম্য দূরীভূত করা প্রধান চ্যালেঞ্জ বলে উল্লেখ করেছে জাতিসংঘ। এক্ষেত্রে শিক্ষা, সুবিধা, সম্মান, পারিশ্রমিক সমঅধিকার নিশ্চিত করতে হবে। বাল্যবিবাহ রোধসহ স্বাস্থ্য সুরক্ষাও নিশ্চিত করতে হবে।

পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS) পরিচালিত জাতীয় শ্রমশক্তি জরিপ ২০১০ অনুসারে দেশে মোট বেকারের সংখ্যা ২৬ লাখ। এর মধ্যে পুরুষ ১৬ লাখ ও নারী ১০ লাখ। নারী-পুরুষ মিলিয়ে মোট শহরে বেকার ৯ লাখ আর গ্রামীণ বেকার ১৭ লাখ। বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রকৃতভাবে দেশে বেকারের সংখ্যা আরও অনেক বেশি। জনসংখ্যা সুবিধাকে কাজে লাগাতে হলে বিশাল তরুণ ও উপার্জনক্ষম জনগোষ্ঠীকে উপার্জনকারীতে পরিণত করতে হবে। এক্ষেত্রে পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান নিয়ে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। শিল্প বান্ধব উদ্যোগসহ আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

দক্ষ মানব উন্নয়ন : জনসংখ্যা সুবিধাকে পূর্ণরূপে কাজে লাগাতে সর্বোতভাবে দক্ষ মানব উন্নয়ন ঘটাতে হবে। জ্ঞান, শিক্ষা, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এ উন্নয়ন প্রক্রিয়া এগিয়ে নিতে হবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, জনশক্তি রপ্তানির ক্ষেত্রে দক্ষতার উন্মেষ ঘটাতে হবে এবং বাড়াতে হবে শ্রমিক দক্ষতা। মনে রাখতে হবে, দক্ষ মানব শ্রেণীই দেশে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ক্রমবর্ধিষ্ণুভাবে বলিষ্ঠ অবদান রাখতে পারে এবং মানবীয় শক্তি সামর্থ্যের সর্বোত্তম বিকাশে সক্ষম হয়ে উঠতে পারে।

এসব চ্যালেঞ্জসমূহ জয় করার সাথে যুগপৎভাবে সুশাসন, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখাসহ বাস্তবিকই দেশের কল্যাণ প্রত্যাশী এবং সে অনুযায়ী কার্যকরী সব উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে আসবে দায়িত্বশীল প্রতিটি অঙ্গ— এ প্রত্যাশা আমাদের সবার।

৩. বাংলাদেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতি : প্রাচীন থেকে বর্তমান

◆ রামসাগর *[৩৩তম বিসিএস]*

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত রামসাগর দীঘি দিনাজপুর জেলায় অবস্থিত। এর গভীরতা গড়ে ১০ মিটার। দিনাজপুরের বিখ্যাত জমিদার রামনাথ এ দীঘিটি খনন করেন। এটি খনন করা হয় ১৭৫০ থেকে ১৭৫৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। এ দীঘির প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামনাথ ছিলেন দিনাজপুর রাজবংশের শ্রেষ্ঠ নৃপতি। আজও খরা মৌসুমে এ জেলার নদ-নদী, খাল-বিল শুকিয়ে গেলেও রামসাগর শুকায় না। পাড়ভূমিসহ এ দীঘির মোট পরিমাণ ১৬ লক্ষ ২৮ হাজার ১২০ বর্গফুট। এটি উত্তর-দক্ষিণে লম্বা। জল ভাগের আয়তন ৬০ একর। রামসাগরে একটি চিড়িয়াখানা স্থাপন করা হয়েছে, যা দর্শক ও শিশু-কিশোরদের মনে প্রচুর আনন্দ দেয়।

◆ হযরত খান জাহান আলী (র) *[৩৩তম বিসিএস]*

হযরত খান জাহান আলী (র) ছিলেন বিখ্যাত ইসলাম প্রচারক ও শাসক। তিনি সুলতানী আমলে এ দেশে (বাংলাদেশ) আসেন। তিনি প্রথমে যশোর এবং পরে বাগেরহাটে ইসলাম প্রচার করেন এবং বাগেরহাটের নাম 'খলিফাতাবাদ' রাখেন। তার জনহিতকর কাজের মধ্যে অন্যতম অমর কীর্তি বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদ। তিনি ১৪৫৯ খ্রিস্টাব্দে বাগেরহাটে মৃত্যুবরণ করেন। তার কবর বা মাজার ষাট গম্বুজ মসজিদের অদূরে দীঘির পাড়ে অবস্থিত।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

◆ জাতীয় প্রতীক *[৩১তম বিসিএস]*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় প্রতীক ১৯৭২ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি কেবিনেট মিটিং-এ গৃহীত হয়। ভাসমান শাপলার দু'পাশে ধানের শীষ, শাপলার উপরে তিনটি যুক্ত পাটপাতা এবং পাতাগুলোর দু'পাশে দুটি করে মোট চারটি তারকা। চার তারকা সংবিধানের চার মূলনীতির বহিঃপ্রকাশ। জাতীয় প্রতীকের নকশাকার হলেন কামরুল হাসান। সংবিধানের ৪(৩) নং অনুচ্ছেদে জাতীয় প্রতীক এর বর্ণনা দেয়া আছে। রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী এ প্রতীক ব্যবহারের অধিকার রাখেন। ২০০২ সালের BANGLADESH NATIONAL EMBLEM RULES, 1972 (Amended up to January, 2002) অনুযায়ী, রাষ্ট্রপতি এবং তার অফিস, প্রধানমন্ত্রী এবং তার অফিস, জাতীয় সংসদের স্পিকার, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি, বিদেশের বিভিন্ন মিশনে নির্দিষ্ট বিধি অনুযায়ী এ প্রতীক ব্যবহার করা যাবে। তবে রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় প্রতীক ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রতীকের নিচে যথাক্রমে রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী লেখা থাকতে হবে। উপরোক্ত ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠান ছাড়া কেউ জাতীয় প্রতীক ব্যবহার করতে পারেন না। এছাড়া এই সংশোধনীতে জাতীয় প্রতীকের মর্যাদা ও সম্মান রক্ষার্থে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। জাতীয় প্রতীক বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং জনগণের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন।

◆ লালন শাহ *[৩১তম বিসিএস]*

লালন শাহের জন্ম হরিশপুর গ্রাম, ঝিনাইদহে, ১ কার্তিক ১১৭৯ (১৭৭২ খ্রি.); মতান্তরে ভাঁড়রা গ্রাম, কুমারখালী, কুষ্টিয়া। তিনি বাউল সাধক ও বাউল কবি। প্রবাদ আছে– এক হিন্দু কায়স্থ পরিবারে তার জন্ম। কোনো এক সময় তিনি এক বাউল দলের সঙ্গী হয়ে গঙ্গাস্নানে যান। পথিমধ্যে বসন্ত রোগাক্রান্ত হলে সঙ্গীরা তাকে নদীর তীরে ফেলে যান। সিরাজ শাহ নামক জনৈক মুসলমান বাউল সাধক তাকে কুঁড়িয়ে নেন এবং শুশ্রূষা করে বাঁচিয়ে তোলেন। অতঃপর সিরাজ শাহের কাছেই লালিত-পালিত হন। সিরাজ শাহের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে মরমি সাধনায় আত্মনিয়োগ। সিরাজ শাহের সঙ্গে পালকি বহনের কাজ করে জীবন ধারণ। সিরাজ শাহের মৃত্যু হলে কুষ্টিয়ায় গমন এবং ছেউরিয়া গ্রামে আখড়া স্থাপন। এখানেই তার প্রতিভার বিকাশ ঘটে। প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যালাভ না করলেও নিজের সাধনায় হিন্দু-মুসলমান শাস্ত্র সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান ও ব্যুৎপত্তি লাভ। বাউলসাধক ও বাউল সঙ্গীত রচয়িতাদের মধ্যে তার স্থান শীর্ষে। তার গান অধ্যাত্মভাব, মরমি রসব্যঞ্জনা ও শিল্পগুণে সমৃদ্ধ। তার রচিত গানের সংখ্যা সহস্রাধিক। রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম লালনের ২৯৮টি গান সংগ্রহ করে ২০টি গান 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশ করেন। বাঙালি বিদ্বৎসমাজের কাছে লালনকে পরিচিত করার প্রথম কৃতিত্ব রবীন্দ্রনাথের। রবীন্দ্রনাথের অনেক গানে লালনের প্রভাব লক্ষ করা যায়। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি মুক্ত এক সর্বজনীন ভাবরসে ঋদ্ধ বলে লালনের গান বাংলার হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কাছে সমানভাবে জনপ্রিয়। তার 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি', 'বাড়ির কাছে আরশী নগর', 'আমার ঘরখানায় কে বিরাজ করে', 'নানা বরণ গাভীরে ভাই, একই বরণ দুধ' ইত্যাদি গান বাউল-তত্ত্ব সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। তার মৃত্যু ছেউরিয়ায় (কুষ্টিয়া), ১ কার্তিক, শুক্রবার, ১২৯৭ (১৭.১০.১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দ)।

◆ তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা *[৩১তম বিসিএস]*

ব্রিটিশ শাসিত ভারতীয় উপমহাদেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে শহীদ তিতুমীরের অবদান অবিস্মরণীয়। ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে তিনিই প্রথম বাঙালী শহীদ। শহীদ তিতুমীরের আসল/প্রকৃত নাম সৈয়দ মীর নিসার আলী। তিনি ১৭৮২ সালে চব্বিশ পরগনা জেলার চাঁদপুর গ্রামে

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

জন্মগ্রহণ করেন। ছেলেবেলা থেকেই ছিলেন তীক্ষ্ণ মেধা, উন্নত ব্যক্তিত্ব এবং অসাধারণ শরীরিক শক্তির অধিকারী। তিনি ছিলেন সাহসী এবং চিন্তাশীল। ধর্মীয় বিষয়ের পাশাপাশি অন্যান্য বিষয়েও শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিতুমীরের সময়ে হিন্দু জমিদার ও ইউরোপীয় নীলকর সাহেবরা প্রজাদের ওপর অকথ্য অত্যাচার করতেন। সে সময়ে অত্যাচার বন্ধের জন্য তিনি মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করলেন, এতে জমিদাররা তার উপর ক্ষেপে উঠলেন। কয়েকজন জমিদার মিলিত হয়ে তিতুমীরকে আক্রমণ করলেন। কিন্তু তিতুমীরের নিকট তারা পরাজিত এবং বিতাড়িত হন।

মাত্র ৪০ বছর বয়সে ১৮২২ সালে তিনি হজব্রত পালন করেন। হজব্রত পালনকালে তিনি মুক্তি সংগ্রামের পথপ্রদর্শক সৈয়দ আহমদ বেরেলভী শহীদের সংস্পর্শে আসেন এবং তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। দেশে ফিরে তিনি ইসলাম প্রচারে ব্রতী হন। তিতুমীরের প্রচারকার্য হিন্দু জমিদারদের এবং ইউরোপীয় সাহেবদের বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ইসলামের সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ তিতুমীরের অনুসারীদের একতা ছিল লক্ষণীয়। তিতুমীরের স্বাধীনতা মন্ত্রে উদ্দীপ্ত হয়ে আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র কায়েমের জন্য কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েন তারা। তিতুমীর মনে প্রাণে চেয়েছিলেন দেশকে ইংরেজদের হাত থেকে স্বাধীন এবং মুক্ত করতে। এ উদ্দেশ্যে ১৮২৫ সালে চব্বিশ পরগনার নদীয়া জেলা এবং ফরিদপুরের কিয়দংশ সংযুক্ত করে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগী হন এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এটি বারাসাতের বিদ্রোহ নামে পরিচিত। এতে ইংরেজ সরকার কর্তৃক প্রেরিত বাহিনী তিতুমীরের নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। এ সময় মিসকিন খাঁ মন্ত্রী, গোলাম মাসুম খাঁ সেনাপতি হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। জমিদাররা এবং নীলকুঠি সাহেবরা ইংরেজ সরকারের কাছে তিতুমীরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে তিনি সবকিছুর প্রকৃত ব্যাখ্যা তাদের কাছে তুলে ধরেন। কিন্তু সরকার তার ব্যাখ্যা আমলে না নিয়েই তাকে বিদ্রোহী ঘোষণা করে। ব্রিটিশ বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য তিনি তার প্রধান সহকারী ও বিশ্বস্ত শিষ্য গোলাম মাসুম খাঁয়ের প্রচেষ্টায় নারিকেল বাড়িয়া গ্রামে একটি বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেন। যা 'তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা' নামে পরিচিত। ১৯ নভেম্বর ১৮৩১ মেজর স্কটের নেতৃত্বে ইংরেজ বাহিনী তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা আক্রমণ করেন। কিন্তু ব্রিটিশ বাহিনীর আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের কাছে তিতুমীরের দেশী প্রযুক্তির বাঁশের কেল্লা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। তথাপি তিতুমীর তার শিষ্যদের সহযোগিতায় বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে শেষ পর্যন্ত শহীদ হন এবং তার অনেক অনুচর ও শিষ্য বন্দি হন। তিতুমীরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার অনুচর বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং বন্দি ১৪০ জনের কারাদণ্ড হয়। সেনাপতি মাসুম খাঁকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

নারিকেল বাড়িয়ার যুদ্ধের মাধ্যমে তিতুমীর শহীদ হলেও তার আন্দোলন বাঙালির স্বাধীনতার ইতিহাসে এবং পরবর্তী অন্যায়, অত্যাচার ও জুলুমের বিরুদ্ধে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে। এটাই বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের পথে প্রথম অনন্য পদক্ষেপ। তার বলিষ্ঠ ও তেজে দীপ্ত সংগ্রামী কার্যক্রম বাঙালি জাতিকে যুগ যুগ ধরে প্রেরণা দিয়ে যাচ্ছে।

◆ বাংলা একাডেমি *[৩০তম বিসিএস]*

বাংলা ভাষা সংক্রান্ত সর্ববৃহৎ গবেষণা প্রতিষ্ঠান। ১৯৫৫ সালের ৩ ডিসেম্বর (১৩৬২ বঙ্গাব্দের ১৭ অগ্রহায়ণ) ঢাকার বর্ধমান হাউসে বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৭ সালের ৩ এপ্রিল পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদে The Bengali Academy Act ১৯৫৭ গৃহীত হয়। এই আইনে বাংলা একাডেমিকে একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা প্রদান করা হয়। ১৯৫৭ সালের ১০ আগস্ট উক্ত

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

আইন বলবৎ হয়। বাংলা একাডেমি কাজ শুরু করে গবেষণা বিভাগ, অনুবাদ বিভাগ, সংকলন ও প্রকাশনা বিভাগ এবং সংস্কৃতি বিভাগ নামের চারটি বিভাগ নিয়ে। ১৯৫৭ সালের ১৮ মে অনুষ্ঠিত দশম সভায় আয়োজক সমিতি বিভাগসমূহের পুনর্বিন্যাস করে ৬টি বিভাগ গঠন করে। বিভাগগুলো হলো : (১) গবেষণা বিভাগ, (২) অনুবাদ বিভাগ, (৩) সংকলন বিভাগ, (৪) প্রকাশনা ও বিক্রয় বিভাগ, (৫) সংস্কৃতি বিভাগ এবং (৬) গ্রন্থাগার বিভাগ। বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জনের পর ১৯৭২ সালের ১৭ মে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি The Bangla Academy Order 1972 জারি করেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মযহারুল ইসলাম বাংলা একাডেমীর প্রথম মহাপরিচালক নিযুক্ত হন। ১৯৭২ সালের আদেশে বাংলা একাডেমির বিভাগসমূহ পুনর্বিন্যস্ত করে মোট ৭টি বিভাগ গঠন করা হয়। বিভাগগুলো হলো : (১) প্রাতিষ্ঠানিক বিভাগ, (২) গবেষণা ও সংকলন বিভাগ, (৩) অনুবাদ বিভাগ, (৪) সংস্কৃতি বিভাগ, (৫) প্রকাশনা, বিক্রয় ও প্রেস বিভাগ, (৬) পাঠ্যপুস্তক বিভাগ এবং (৭) ফোকলোর বিভাগ। এরপর ১৯৭৮ সালের ৬ জুন The Bangla Academy Ordinance, 1978 জারি করা হয়। বর্তমানে বাংলা একাডেমি উক্ত অধ্যাদেশ অনুযায়ী পরিচালিত হলেও ১৯৮৩ সালের ২৫ মে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের এক আদেশবলে একাডেমীর বিভাগসমূহের সংখ্যা ৪টিতে নিয়ে আসা হয় এবং গ্রন্থাগারকে পৃথক করা হয়। বর্তমানে বাংলা একাডেমীতে ৪জন পরিচালকের নিয়ন্ত্রণাধীনে ৪টি বিভাগ রয়েছে এবং পরিচালকের সমমর্যাদাসম্পন্ন প্রধান গ্রন্থাগারিকের নিয়ন্ত্রণাধীনে রয়েছে গ্রন্থাগার।

বাংলা একাডেমির ৪টি বিভাগের নাম হলো : (১) গবেষণা, সংকলন ও ফোকলোর বিভাগ, (২) ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও পত্রিকা বিভাগ, (৩) পাঠ্যপুস্তক বিভাগ এবং (৪) প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ। বর্তমানে বাংলা একাডেমি থেকে 'বাংলা একাডেমী পত্রিকা' 'উত্তরাধিকার', 'ধান শালিকের দেশ', 'বাংলা একাডেমী বিজ্ঞান পত্রিকা' ও 'বাংলা একাডেমি জার্নাল' নামে মোট ৫টি পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

◆ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ *[২৯তম বিসিএস]*

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। ১৯৭২ সালে প্রশাসনিক আদেশ বলে বাংলাদেশ ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ সংস্থার উত্তরসূরি হিসেবে ১৯৭৪ সালে জাতীয় সংসদে পাসকৃত আইন বলে বাংলাদেশ ক্রীড়া পরিষদ গঠিত হয়। ১৯৭৬ সালে এক অধ্যাদেশ বলে কতিপয় পরিবর্তন এনে জাতীয় ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড গঠিত হয়। ১৯৯১ সালে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ নামটি আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয়। এটি যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীন। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ বাংলাদেশের ক্রীড়া কার্যক্রমের উন্নয়ন ও সমন্বয়করণ, অন্যান্য ক্রীড়া সংস্থাকে স্বীকৃতি প্রদান, ক্রীড়ার মান আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণে ব্যবস্থা গ্রহণ, ক্রীড়ার মান উন্নয়ন প্রশিক্ষণসহ নানাবিধ কার্যাবলি সম্পন্ন করে থাকে। এর পরিচালনা কমিটিতে রয়েছে ১ জন চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, ট্রেজারার, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় প্রদত্ত একজন প্রতিনিধি, চেয়ারম্যান প্রদত্ত প্রতিনিধি। ২০০৪ সালে এ সংস্থার মাধ্যমে মোঃ কাজী আবদুল আলিম UNESCO পুরস্কার লাভ করেন প্রথম বাংলাদেশী হিসেবে।

◆ ওয়ারি-বটেশ্বর *[২৮তম বিসিএস]*

বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থানের নাম ওয়ারি-বটেশ্বর। নরসিংদী জেলার বেলাব উপজেলা থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত ওয়ারি এবং বটেশ্বর নামক দুটি গ্রাম। প্লাইস্টোসিন যুগে গঠিত মধুপুরগড়ের পূর্ব সীমান্তে গ্রাম দুটি অবস্থিত। বিভিন্ন সময় অনুসন্ধানের ফলে আবিষ্কৃত হয়েছে

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

যে, ওয়ারি-বটেশ্বর গ্রাম দুটির অধিকাংশ স্থান জুড়ে প্রাচীন বসতি ছিল। জমিচাষ, পুকুর খনন, বৃষ্টির কারণে ভূমির উপরি ভাগের ক্ষয় প্রভৃতি কারণে এখানে দীর্ঘ দিন ধরে প্রচুর পরিমাণে পাথরের পুঁথি, কাচের পুঁথি, লৌহনির্মিত প্রত্নবস্তু, ছাপাঙ্কিত রৌপ্য মুদ্রাসহ আরো অনেক ধরনের প্রত্নবস্তু পাওয়া গেছে। পরবর্তীতে সীমিত আকারে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন থেকে রুলেটেড মৃৎপাত্র, নব মৃৎপাত্র, উত্তর ভারতীয় কালো মসৃণ মৃৎপাত্র, পাথরের ফ্লেক, চিলতা, স্বল্পমূল্য পাথরের পুঁথি, কাচের-পুঁথি, লৌহবস্তু এবং লৌহ গলানোর ফলে তৈরি বল জাতীয় বস্তু, মাটির দেয়ালের অংশ এবং পোড়ানো কার্যক্রমের চিহ্ন পাওয়া যায়। ওয়ারি-বটেশ্বরে স্বল্পমূল্য পাথরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিলকা এবং ফ্লেক এ সাক্ষ্য বহন করে যে, ওয়ারিতে একটি পাথরের পুঁথি তৈরির কারখানা ছিল। ওয়ারি খননে একটি মাটির দেয়ালের অংশবিশেষ পাওয়া গেছে, যা কিনা উত্তর ভারতীয় কালো মসৃণ মৃৎপাত্রের সমসাময়িক। ওয়ারি-বটেশ্বরের ভৌগোলিক অবস্থানের গুরুত্ব বিবেচনা করে মনে করা হয় এ অঞ্চলের সাথে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং রোমান সাম্রাজ্যের যোগাযোগ ছিল। ওয়ারি-বটেশ্বর সম্ভবত এ অঞ্চলে প্রথম নগরায়নের চিহ্ন বহন করে। এটি একটি নদী বন্দর ছিল এবং এর সাথে তৎকালীন অন্যান্য বন্দরের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। অনুমান করা হয় যে, ওয়ারি-বটেশ্বর ছিল মৌর্য সাম্রাজ্যের সর্বপূর্ব সীমানা।

♦ ঢাকাই মসলিন *[১৭তম বিসিএস]*

মসলিন 'ঢাকাই মসলিন' নামে বিশ্বব্যাপী খ্যাত সূতিবস্ত্র। ঢাকা শহর ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় স্থানীয় কারিগরদের দ্বারা স্থানীয়ভাবে উৎপন্ন সুতা থেকে এ মসলিন তৈরি হতো। মুঘল আমলে বাংলার রাজধানী ঢাকা স্থানান্তরিত হওয়ার পর থেকে ঢাকাই মসলিনের খ্যাতি বেড়ে যায় এবং তা দূর-দূরান্তের বিদেশী ক্রেতাদের আকৃষ্ট করে। মুঘল সম্রাট ও অভিজাতগণ ঢাকার মসলিন শিল্পের প্রসারে পৃষ্ঠপোষকতা করেন। সম্রাট, প্রাদেশিক শাসনকর্তা এবং পদস্থ কর্মকর্তা ও অভিজাতদের ব্যবহারের জন্য প্রচুর পরিমাণে সূক্ষ্মতম মসলিন বস্ত্র সংগ্রহ করা হতো। ১৮৫১ সালে লন্ডনের বিশাল প্রদর্শনীতে ঢাকাই মসলিন বিশেষ প্রাধান্য পায় এবং বিপুল সংখ্যক দর্শককে মুগ্ধ করে। ব্রিটিশ পত্রপত্রিকা ঢাকাই মসলিন বস্ত্রের উৎকর্ষ ও সূক্ষ্মতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে। মসলিন শিল্পের অবনতি ও চূড়ান্ত বিলুপ্তির প্রধান কারণ ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লব এবং আধুনিক বাষ্পশক্তি ও যন্ত্রপাতির আবিষ্কার। এভাবে ইংল্যান্ডের শিল্প-কারখানায় উৎপাদিত সস্তা দামের পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতায় হেরে যায় ঢাকাই মসলিনের মতো দামি সূতিবস্ত্র।

♦ আহসান মঞ্জিল *[১৫তম বিসিএস]*

রাজধানী ঢাকার সুপ্রাচীন স্থাপত্য ও পুরাতন ভবনগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বুড়িগঙ্গার তীরে অবস্থিত আহসান মঞ্জিল। ঐতিহাসিক সূত্র অনুযায়ী, সম্ভবত ১৭৪০ খ্রিষ্টাব্দে ফরাসি নাগরিক নন্দভোজ মি. চামেউজ এখানে একটি কারখানা তৈরি করেন। তার কাছ থেকে ঢাকার নবাবদের পূর্বপুরুষ খাজা আলীমুল্লাহ ১৮৩৫ সালে এ কারখানাটি ক্রয় করেন। অতঃপর তার পুত্র আবদুল গণি ১৮৭২ সালে এখানে একটি বিশাল ভবন নির্মাণ করেন এবং প্রিয় পুত্র আহসান উল্লাহর নামানুসারে এর নামকরণ করেন আহসান উল্লাহ মঞ্জিল। কিন্তু ভবনটি আহসান মঞ্জিল নামেই ব্যাপক পরিচিতি পায়।

আহসান মঞ্জিল ভবনটি অত্যন্ত মনোরম এবং বিশেষ কারুকার্য ও অপূর্ব নকশায় তৈরি। এটি ছিল অনেকটা বিলাসবহুল রাজপ্রাসাদের মতো। কিন্তু কালের বিবর্তনে নবাব পরিবারের প্রতিপত্তি কমে গেলে আহসান মঞ্জিলও তার জৌলুস হারিয়ে ফেলে। ফলে একসময় তা অযত্ন, অবহেলা আর অব্যবহারে ধ্বংসের মুখোমুখি এসে পৌছায়। তদুপরি ১৮৮৮ সালে ভয়াবহ টর্নেডোতে আহসান মঞ্জিল

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

ক্ষতিগ্রস্ত হয় ঐতিহাসিক এ ভবনটির ভগ্নদশা দেখে তৎকালীন সরকার ১৯৮৫ সালে একে জাদুঘরে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অতঃপর ১৩ কোটি ৫৭ লাখ ৯৪ হাজার টাকা ব্যয়ে ভবনটির সংস্কার করে ১৯৯২ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে একে জাদুঘরে পরিণত করা হয়। ভবনের ২২টি কক্ষ প্রদর্শনীর জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। কক্ষগুলোতে রয়েছে নবাবদের ব্যবহার্য ঢাল-তলোয়ার, সিংহাসন, তৈজসপত্র, গ্রন্থাবলী, আসবাবপত্র, কারুকার্যখচিত বিভিন্ন সামগ্রী, সিন্ধুকসহ নানা সামগ্রী। এছাড়া রয়েছে নবাবদের প্রতিকৃতি ও ইতিহাস। আহসান মঞ্জিল শুধু দর্শনীয় স্থানই নয়, বরং অতীত ইতিহাস যেনো এখানে জীবন্ত হয়ে আছে।

♦ জাতীয় আর্কাইভস *[১৫তম বিসিএস]*

জাতীয় আর্কাইভস হলো জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দলিল-দস্তাবেজ ও প্রামাণ্য গ্রন্থাদি সংরক্ষণের প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ জাতীয় আর্কাইভস ১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর কার্যালয় ঢাকার আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ বেতার কেন্দ্রের পূর্বদিকে অবস্থিত। জাতীয় আর্কাইভস সরকারের আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের অধীনে একজন পরিচালকের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। তিনি সরকার কর্তৃক সরাসরি নিয়োগকৃত। প্রতিষ্ঠানটির প্রধান কাজ হলো ঐতিহাসিক দলিলপত্রাদি সংরক্ষণ, গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় বইপত্র ও উপাদান সংরক্ষণ ও প্রয়োজনে সরবরাহ করা এবং মূল্যবান দলিলপত্র ও পুস্তক সংগ্রহ করা। জাতীয় আর্কাইভস-এ একটি বৃহৎ লাইব্রেরি রয়েছে, যাতে অর্থনীতি, রাজনীতি, শিল্পকলা, ইতিহাস ও সমাজ বিষয়ক প্রচুর গ্রন্থ রয়েছে।

♦ ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব (১৯৪০) *[১৩তম বিসিএস]*

পাকিস্তান সৃষ্টির ইতিহাসে লাহোর প্রস্তাব অপরিসীম গুরুত্বের দাবিদার। ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ লাহোরে মুসলিম লীগের অধিবেশনে যে 'পাকিস্তান প্রস্তাব' গৃহীত হয়, সেটিই ঐতিহাসিক 'লাহোর প্রস্তাব' নামে পরিচিত। শেরে বাংলা একে ফজলুল হক কর্তৃক উত্থাপিত এই প্রস্তাবে বলা হয় : নিম্নলিখিত মৌলিক নীতির ভিত্তিতে গৃহীত না হলে কোনো শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনাই এই দেশে কার্যকর হবে না অথবা মুসলমানদের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। প্রয়োজনবোধে সীমানার পুনর্বিন্যাস সাধন করে সীমানার ভৌগোলিক দিক থেকে পরস্পর নিকটবর্তী সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলোর সমন্বয় সাধন করে, যেমন– উত্তর, পশ্চিম ও পূর্ব ভারতে স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ গঠন করা হোক। এর অঙ্গরাজ্যগুলো সার্বভৌম ও স্বায়ত্তশাসিত হবে। এ প্রস্তাবে আরো বলা হয়, এসব অঙ্গরাজ্যে সংখ্যালঘুদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, শাসনতান্ত্রিক ও অন্যান্য অধিকারসমূহ রক্ষাকবচের নির্দিষ্ট পন্থা শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত থাকতে হবে।

প্রস্তাবটি বিশ্লেষণ করলে এর নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় :

প্রথমত, ভৌগোলিক দিক দিয়ে পাশাপাশি অবস্থিত এলাকাগুলোর সমন্বয়ে ভারতে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রসমূহের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দ্বিতীয়ত, উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব ভারতের যেসব এলাকায় মুসলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাদের সমন্বয়ে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করতে হবে। তৃতীয়ত, এ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলো সম্পূর্ণরূপে স্বায়ত্তশাসিত হবে। চতুর্থত, সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষার সার্বিক ব্যবস্থা সংবিধানে থাকতে হবে। প্রকৃতপক্ষে লাহোর প্রস্তাবের গুরুত্ব অত্যধিক। এ প্রস্তাবের ফলেই ভারতের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক আন্দোলনে এক নতুন মাত্রা যোগ হয়। এই প্রস্তাবকে সামনে রেখে মুসলমানরা ১৯৪২ সালের ক্রীপস প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে, ১৯৪৬ সালের মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা বর্জন করে এবং এরই ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালে 'ভারত শাসন আইন' প্রণীত হলে ভারত ও পাকিস্তান– এ দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

◆ পাহাড়পুর *[১১তম বিসিএস]*

ভারতীয় উপমহাদেশের সবচেয়ে বিশালায়তনের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হলো সোমপুর বিহার। রাজশাহী বিভাগের নওগাঁ জেলায় অবস্থিত এই বিহার বাংলাদেশের বৌদ্ধ ও হিন্দু সংস্কৃতির এক আকর্ষণীয় নিদর্শন। বগুড়ার মহাস্থানগড় থেকে ২৯ মাইল উত্তর-পশ্চিমে ও জালালগঞ্জ থেকে ৩ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত সোমপুরের ধ্বংসাবশেষ। এর বর্তমান নাম পাহাড়পুর। অনুমান করা হয় অষ্টম শতাব্দীতে পাল রাজত্বের প্রথম দিকে ধর্মপাল পিতৃভূমিতে এক বিশাল ও সুউচ্চ মন্দির স্থাপনের লক্ষ্যে পাহাড়পুরের সোমপুর বিহার নির্মাণ করেন। ১৯২৩ সালে এর খনন কাজ সমাপ্ত হলে দেখা যায় যে, এর মধ্যে মোট ১৮৯টি কুঠুরী আছে, যার ৯৮টিতে পূজার জন্য উঁচু বেদী রয়েছে। কুঠুরীর পাথরনির্মিত দেয়ালের গায়ে হিন্দু ও বৌদ্ধ দেব-দেবীর ৬৩টি মূর্তি খোদাই করা আছে। সোমপুর বিহারটি উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ৯২২ ফুট এবং পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় ৯১৯ ফুট লম্বা। এর চারপাশে রয়েছে ১৭৭টি আবাসিক কক্ষ, প্রবেশ পথ এবং ছোট ছোট অনেক স্তূপ ও মন্দির। বিহারের অভ্যন্তরে সবচেয়ে উঁচু ঢিবিতে অবস্থিত মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে উত্তর-দক্ষিণে ৩৫৬ ফুট ৬ ইঞ্চি এবং প্রস্থে পূর্ব-পশ্চিমে ৩১৪ ফুট ৩ ইঞ্চি।

◆ ময়নামতি *[১১তম বিসিএস]*

কুমিল্লা জেলার অদূরে অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক স্থান ময়নামতি। মধ্যযুগে বৌদ্ধ রাজত্বের রাজধানী ছিল এই স্থানটি। ঐতিহাসিকদের মতে, রাজা মানিকচন্দ্রের স্ত্রী রানী ময়নামতির নামানুসারে এই অনুচ্চ পাহাড়ি এলাকার নাম রাখা হয় ময়নামতি। কুমিল্লা জেলার অধিকাংশ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাদি এখানে অবস্থিত। শালবন বিহার, আনন্দ বিহার প্রভৃতি দেশের বৃহত্তম ধ্বংসাবশেষ ময়নামতিতে অবস্থিত। এসব বৌদ্ধবিহারে প্রাচীন বৌদ্ধ সভ্যতার বহু নিদর্শনাদি পাওয়া গেছে। ১৯৫৫ সালে এখানে যখন খননকার্য শুরু হয় তখন এসব নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া যায়। বৌদ্ধ সভ্যতা ছাড়া এখানে অনেক জৈন ও হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তিও পাওয়া গেছে। এছাড়া এখানকার আবিষ্কৃত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাদি সংরক্ষণের জন্য একটি প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘরও স্থাপিত হয়েছে। বর্তমানে ময়নামতিতে একটি সেনানিবাস রয়েছে, যেটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশদের একটি যুদ্ধঘাঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। ময়নামতি ছাড়া এটি লালমাই ও হিলটিয়া নামেও পরিচিত।

◆ ষাটগম্বুজ মসজিদ *[১১তম বিসিএস]*

বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদটি সুলতানি আমলে নির্মিত। খান জাহান আলী কর্তৃক মসজিদটি নির্মিত হয়। মসজিদের নির্মাণকাল পঞ্চদশ শতক বলে ধারণা করা হয়। কারণ ঐ শতকেই খান জাহান আলী যশোর-খুলনায় ইসলাম প্রচার ও জনহিতকর কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। বাংলাদেশের প্রাচীন আমলের মসজিদগুলোর মধ্যে এটি বৃহত্তম 'ষাটগম্বুজ' নাম হলেও এই মসজিদের গম্বুজসংখ্যা ৮১টি। ওপরে ৭৭টি এবং চারকোণে ৪টি। এটি বাগেরহাট জেলায় অবস্থিত বিখ্যাত স্থাপত্যকীর্তি। মসজিদের বাইরের আয়তন ১৬০×১০৪ এবং ভেতরের আয়তন ১৪৩×৮৮। চার কোণায় দ্বিতল গোলাকার মিনার। মূল অবকাঠামো ইটের তৈরি। দেয়ালগুলো অত্যন্ত পুরু ও মজবুত। ৭৭টি গম্বুজের ৭টি এ দেশীয় রীতিতে তৈরি চৌচালা গম্বুজ। পূর্ব দিকে ১১টি খিলানযুক্ত প্রবেশপথ এবং উত্তর-দক্ষিণে আলো-বাতাস প্রবেশের জন্য ৭টি করে প্রবেশ পথ রয়েছে। পশ্চিম দেয়ালের প্রধান মিহরাব পাথরের ওপর নকশাকৃত হলেও অন্যান্য মিহরাবে রয়েছে টেরাকোটা বা পোড়ামাটির ফলকচিত্র। ষাটগম্বুজ মসজিদ পরিচ্ছন্ন গঠনশৈলী ও আয়তনের কারণে এখনো বিস্ময় সৃষ্টি করে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

◆ নবাব সলিমুল্লাহ *[১১তম বিসিএস]*

নবাব স্যার সলিমুল্লাহ (১৮৭১-১৯১৫) ব্রিটিশ বঙ্গের প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ, সমাজসেবক ও শিক্ষানুরাগী। ঢাকার নবার পরিবারে তার জন্ম। তার পিতামহ নবাব আবদুল গনি ও পিতা নবাব খাজা আহসানউল্লাহ। সলিমুল্লাহ পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের হাতে স্থানীয় শাসন ক্ষমতা আনার উদ্দেশ্য পূর্ববঙ্গ ও আসাম নিয়ে স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠনের জন্য ব্রিটিশ পরিকল্পনা সহযোগী ও সমর্থক হিসেবে কাজ করেন। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ সেই পরিকল্পনারই ফসল। এর বিরুদ্ধে প্রধানত শিক্ষিত হিন্দু সমাজের ব্যাপক আন্দোলনের কারণে পরে বঙ্গবিভাগ রহিত করা হয় (১৯১১)। তিনি ছিলেন ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের (All India Muslim League) অন্যতম রূপকার। পূর্ববঙ্গ ও আসাম মুসলিম লীগেরও তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পেছনে তার চেষ্টা ও অবদান ছিল যথেষ্ট। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য তিনি জমি দান করেন। অবশ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তার মৃত্যুর পর প্রতিষ্ঠিত হয় (১৯২১)। সহিমুল্লাহ একাধিক মক্তব, মাদ্রাসা, মসজিদ, স্কুল-প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এতিম ছেলে-মেয়েদের লালন-পালন ও শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ঢাকায় একটি এতিমখানা গড়ে তোলেন–বর্তমানে যা 'সলিমুল্লাহ মুসলিম এতিমখানা' নামে পরিচিত। ১৯১৫ সালের ১৬ জানুয়ারি তিনি মাত্র ৪৪ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

◆ লালমাই পাহাড় *[১০ম বিসিএস]*

জেলা শহর কুমিল্লার অদূরবর্তী এলাকায় লালমাই পাহাড় অবস্থিত। এই পাহাড়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর মাটি সম্পূর্ণ লাল। পাহাড়ের গায়ে প্রচুর পরিমাণে পেয়ারা ও লেবু গাছ জন্মে। এই পাহাড়ের কাছেই ময়নামতি সেনানিবাস অবস্থিত। স্থানীয় চাষীরা পাহাড়ের ঢাল কেটে ধান, গম ও অন্যান্য শস্য উৎপাদন করে। এর ধাপ কেটে কেটে মাটির মজবুত রাস্তাও তৈরি করা হয়েছে। লালমাই পাহাড় প্লাইস্টোসিনকালের সোপান অঞ্চলের অন্তর্গত। লালমাই থেকে ময়নামতি পর্যন্ত পাহাড়টি বিস্তৃত। এর আয়তন ৩৩.৬৫ বর্গ কি. মি. এবং গড় উচ্চতা ২১ মিটার। তবে স্থান বিশেষে এর উচ্চতা ৪৫ মিটার পর্যন্ত দেখা যায়। লালমাই পাহাড়টি প্রায় ২৫ হাজার বছর পূর্বে গঠিত হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। এই পাহাড়ে দেশী-বিদেশী পর্যটকরা আগমন করে। ফলে এর আকর্ষণ আগের চেয়ে আরো বাড়ানো হয়েছে।

◆ দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা

ভারতীয় উপমহাদেশে 'দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা' প্রবর্তন ছিল একটি দুঃখজনক ঘটনা। এ শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে কার্যত বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা সম্পূর্ণরূপে ইংরেজ শাসনাধীনে চলে যায় এবং বাংলার নবাবগণ ইংরেজদের হাতের ক্রীড়নকে পরিণত হন। ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে রবার্ট ক্লাইভ বাংলার দেওয়ানি লাভ করে 'দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা' প্রবর্তন করেন। এ নতুন ব্যবস্থা অনুযায়ী রাষ্ট্রের রাজস্ব আদায়ের ভার কোম্পানির হাতে চলে যায় এবং শাসন বা কর্তৃত্ব থাকে নবাবের হাতে। নবাব তার শাসনকার্য পরিচালনার জন্য কোম্পানির আদায়কৃত রাজস্ব থেকে নিয়মিত বার্ষিক ৫৩ লক্ষ টাকা পেতেন এবং এ অর্থ দিয়ে তিনি শাসন কাজ পরিচালনা করতেন। দেওয়ানি ও শাসনব্যবস্থা— এ দ্বিবিধ শাসনকার্যের ভাগাভাগিকেই ইতিহাসে 'দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা' বলা হয়। ইংরেজদের দেওয়ানি লাভের পূর্বে নবাব ছিলেন একাধারে বাংলার নাজিম ও দেওয়ান। নাজিম হিসেবে তিনি শাসন ও বিচারকার্য সম্পাদন করতেন এবং দেওয়ান হিসেবে রাজস্ব আদায় করতেন। কিন্তু দেওয়ানি লাভ ও 'দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা' প্রবর্তনের ফলে রাজস্ব আদায়ের প্রকৃত অধিকার ইংরেজ কোম্পানি লাভ করলে দেশের শাসনকার্য ইংরেজদের মর্জির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং নবাব শুধু বৃত্তিভোগী শাসকে পরিণত হন। এ শাসনব্যবস্থায় কোম্পানি ক্ষমতা লাভ করলো কিন্তু কোনো দায়দায়িত্ব থাকলো না। পক্ষান্তরে, নবাবের দায়িত্ব রইলো কিন্তু কোনো ক্ষমতা

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

থাকলো না। মূলত এ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের মূল উদ্দেশ্য ছিল ব্যবসায়ে অধিক মুনাফা অর্জন এবং পর্যায়ক্রমে বাংলার রাজনৈতিক ক্ষমতা কুক্ষিগতকরণ। দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার ফলে বাংলার শাসনকার্যে চরম অরাজকতার সৃষ্টি হয়। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী রাজস্ব আদায়ের সব দায়-দায়িত্বে থেকে ইংরেজরা মুক্তি পায়। কিন্তু রাজস্ব আদায়ের হার নির্বাচন ক্ষমতা তাদের হাতেই থেকে যায়। ফলে অন্যায়ভাবে রাজস্ব হার বৃদ্ধিতে দেশবাসীর দুঃখ দুর্দশা চরম আকার ধারণ করে। অন্যদিকে, রাজ্য পরিচালনায় অর্থের জন্য কোম্পানির দয়ার ওপর নবাবকে নির্ভর করতে হতো। এ অবস্থায় কোম্পানির শাসন ও শোষণে দেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে পড়ে এবং দেশব্যাপী দেখা দেয় চরম অভাব-অনটন ও দুর্ভিক্ষ।

♦ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

বাংলার বড়লাট লর্ড কর্নওয়ালিসের আমলে ভূমি ও রাজস্ব সংস্কারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সংস্কার ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন। ১৭৮৬ সালে লর্ড কর্নওয়ালিস বড়লাট হয়ে বাংলায় এসে রাজস্ব সংস্কারের লক্ষ্যে একজন বিশেষজ্ঞ জন শোরকে দায়িত্ব দেন। ১৭৮৬-৮৯ পর্যন্ত দীর্ঘ গবেষণা শেষে তার রিপোর্টের ভিত্তিতে কর্নওয়ালিস ১৭৯০ সালে একটি দশসালা বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন। এ দশসালার ওপর ভিত্তি করে তিনি ১৭৯৩ সালের ২২ মার্চ একে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হিসেবে ঘোষণা করেন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মূল বৈশিষ্ট্য হলো : ১. জমিদারগণকে বাৎসরিক নির্দিষ্ট হারে রাজস্বের বিনিময়ে জমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দেয়া হয়। ২. জমির ওপর জমিদারদের মালিকানা, ক্ষমতা এবং আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ৩. জমিদারগণ যে কোনো শর্তানুসারে জমি ইজারাদানের ক্ষমতা লাভ করে। ৪. জমির রাজস্বের কিস্তি নির্দিষ্ট দিনে সূর্যাস্তের পূর্বে দিতে অসমর্থ হলে জমি নিলামে বিক্রি করার অধিকার সরকারের হাতে থাকে (এ নিয়ম 'সূর্যাস্ত আইন' নামে পরিচিত)। ৫. তবে রাজস্ব আদায় ও বিচার ক্ষমতা সরকারের হাতে ন্যস্ত ছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলার জনগণের জন্য ছিল অভিশাপস্বরূপ। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে শোষণ ও তোষণ নীতি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।

♦ অসহযোগ আন্দোলন

ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের ইতিহাসে অসহযোগ আন্দোলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯২০ সালে শুরু হওয়া অসহযোগ আন্দোলনের জনক ছিলেন মহাত্মা গান্ধী। গান্ধী অহিংসা, অসহযোগ, আইন অমান্য আন্দোলন, স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণ ও বিদেশী পণ্য বর্জনে বিশ্বাসী ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ সরকারের সাথে দেশবাসীর অসহযোগিতার মাধ্যমে অচলাবস্থা সৃষ্টি করে জনগণের দাবি মেনে নিতে বাধ্য করা। অসহযোগ আন্দোলনের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল সরকার প্রদত্ত খেতাব ও পদক ত্যাগ, স্কুল-কলেজ বর্জন, আদালত বর্জন, বিলাতি বস্ত্র বর্জন ও দেশীয় বস্ত্র ব্যবহার, মাদকদ্রব্যাদি পরিহার, শান্তিপূর্ণ পিকেটিং, অভিযুক্ত হলে আত্মপক্ষ সমর্থন না করে কারাবরণ। অসহযোগ আন্দোলনের এক পর্যায়ে কয়েকটি হিংসাত্মক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধীজী ১৯২২ সালে এ আন্দোলন বন্ধ ঘোষণা করেন।

♦ ফরায়েজী আন্দোলন

পলাশীর যুদ্ধের পর সমাজজীবনে নানা কুসংস্কার ও ইসলামবিরোধী কার্যকলাপ অনুপ্রবেশ করে মুসলমানদের নৈতিক শক্তিকে দুর্বল করে ফেলেছিল। এ সময় হাজী শরীয়তুল্লাহ মুসলমানদের অনৈসলামিক রীতিনীতি পরিত্যাগ করে ইসলামী জীবনবিধান প্রতিপালনের জন্য এক আন্দোলন পরিচালনা করেন। তার এ আন্দোলনকে 'ফরায়েজী আন্দোলন' বলা হয়। 'ফরজ' (অবশ্য কর্তব্য) শব্দ থেকে ফরায়েজী শব্দের উৎপত্তি।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

মূলত ফরায়েজী আন্দোলন ছিল একটি সংস্কার আন্দোলন। এর উদ্দেশ্য ছিল প্রধানত দুটি : (১) ধর্মীয় অনাচার ও কুসংস্কার দূরীকরণ এবং (২) রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন। ফরিদপুর ছিল এ আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু। কিন্তু ধীরে ধীরে এর ব্যাপকতা সমগ্র বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে এবং মুসলিম জনগণের মধ্যে অভূতপূর্ব সাড়া জাগে। এতে পীরপূজা, কবরপূজা ও বিভিন্ন বেদআতি কাজকর্মে আচ্ছন্ন মুসলমানদের প্রতি ইসলামে যা নিষিদ্ধ এবং যা ইসলামী শিক্ষার বিরোধী এমন সব বিশ্বাস, আচার ও অনুষ্ঠান বর্জন করে ইসলামের অবশ্য কর্তব্য বা ফরজগুলো পালনের জন্য আহ্বান জানানো হয়। হাজী শরীয়তুল্লাহ ফরজগুলো পালনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন বলেই তার এ আন্দোলনকে ফরায়েজী আন্দোলন বলা হয়। এ আন্দোলন পরিচালনা করতে গিয়ে তিনি ভারতবর্ষকে 'দারুল হরব' বা বিধর্মীর রাজ্য বলে ঘোষণা করেন। এ আন্দোলনের ফলে মুসলমানদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগ্রত হয়, সমাজজীবনে আসে গতিশীলতা এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আসে নতুনের প্রতি অসীম আগ্রহ। মুসলমানগণ দলে দলে ফরায়েজী আন্দোলনে যোগ দেয় এবং তাদের নেতার বিপ্লবী মতবাদ বাংলার সর্বত্র পৌঁছে দেয়। ফলে কালক্রমে এটি একটি সুষ্ঠু জাতীয়তাবোধে পরিণত হয়।

♦ বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি উন্নততর গবেষণা এবং মানুষ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান অনুসন্ধানের লক্ষ্যে গড়ে উঠেছে। এটি একটি আন্তর্জাতিক অরাজনৈতিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। জ্ঞানী ও বিদ্বান ব্যক্তিদের সমন্বয়ে এ সংগঠনটি ১৭৮৪ সালে তৎকালীন কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। কলকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন জর্জ স্যার উইলিয়াম জোনস এর প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভক্তির পর ১৯৫২ সালের ৩ জানুয়ারি 'পাকিস্তান এশিয়াটিক সোসাইটি' গঠিত হয়। ১৯৭১ সালে সংস্থার নামকরণ করা হয় 'বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি'। স্বাধীনতা-উত্তরকালে এ প্রতিষ্ঠানটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় স্থানান্তরিত হয়। ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে যে কোনো বিদ্বান লোকের জন্য এর সদস্য হওয়ার দ্বার উন্মুক্ত। বাংলাদেশে গবেষণাকর্মকে উত্তরোত্তর পরিপূর্ণতা দানের জন্য এ প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন জার্নাল, গবেষণা, সাময়িকী, প্রবন্ধ, অনুবাদকর্ম প্রভৃতি বাংলা ভাষায় প্রকাশ করে থাকে।

♦ বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (BKSP)

বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা BKSP ঢাকা শহর থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরে সাভারের জিরানীতে অবস্থিত। জাতীয় ক্ষেত্রে খেলাধুলার মানোন্নয়ন এবং বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে বাংলাদেশের অবস্থানকে সম্মানজনক স্তরে উন্নীত করার লক্ষ্যে ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব স্পোর্টস (BIS) নামে প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। ১৯৮৬ সালের ১৪ এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে এর উদ্বোধন করা হয় এবং নাম পরিবর্তন করে 'বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান' রাখা হয়। প্রায় ৩০০ মিলিয়ন টাকা ব্যয়ে নির্মিত প্রতিষ্ঠানটি ১০০ একর সমতল জমি জুড়ে বিস্তৃত। এখানে আধুনিক ও উন্নত ব্যবস্থায় অ্যাথলেটিক্স, ফুটবল, ভলিবল, হকি, ক্রিকেট, সাঁতার ও টেনিস প্রশিক্ষণের সাথে সাথে শিক্ষার্থীদের সপ্তম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ রয়েছে।

বিকেএসপিতে প্রতিটি খেলার জন্য দেশ-বিদেশের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশিক্ষক রয়েছে। এখানে ফুটবলের জন্য ৫টি, হকির জন্য ২টি, ক্রিকেটের জন্য ২টি, ভলিবলের জন্য ২টি, টেনিসের জন্য ২টি এবং বাস্কেটবলের জন্য ১টি মাঠ আছে। ১৯৮৬ সালে মাত্র ৬০ জন ছাত্র নিয়ে এ প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

হয়। ক্রীড়াক্ষেত্রে দেশের প্রতিভাবান ও সম্ভাবনাময় ছেলেদের বাছাই করে বিকেএসপিতে ভর্তি করা হয় এবং উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। খেলাধুলার যাবতীয় আধুনিক সরঞ্জাম দিয়ে বিকেএসপিকে সাজানো হয়েছে। বিকেএসপির কৃতী ক্ষুদে ফুটবল খেলোয়াড়রা ১৯৯০ সালে ডেনমার্কের আন্তর্জাতিক ডানা কাপ এবং সুইডেনের আন্তর্জাতিক গোথিয়া কাপে চ্যাম্পিয়ন হয়ে দেশের জন্য অভূতপূর্ব সম্মান বয়ে এনেছিল। ষষ্ঠ সাফ গেমসে দ্রুততম মানব বিমল চন্দ্র তরফদার বিকেএসপির একজন কৃতী ছাত্র।

♦ বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম তথা উত্তরবঙ্গের সর্ববৃহৎ জাদুঘর বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর। বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর বাংলাদেশের গৌরবময় অতীত ইতিহাসের নিদর্শনসমূহ সংরক্ষণ ও গবেষণার ব্যাপারে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বঙ্গজ ভাস্কর্য শিল্পের শ্রেষ্ঠ সংরক্ষণাগার এ জাদুঘরের সূচনা ঘটে ১৯১০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। বাংলাদেশের ইতিহাসে এ সমিতি প্রথম জাদুঘর কার্যক্রম শুরু করে।

বরেন্দ্র অঞ্চল এবং বাংলার ইতিহাস, শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম, সমাজ প্রভৃতি বিষয়ে প্রামাণ্য তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য জমিদার কুমার শরৎকুমার রায়ের ব্যক্তিগত অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর অদম্য জ্ঞানপিপাসা এবং পুরাতত্ত্বের প্রতি গভীর অনুরাগ এ প্রচেষ্টাকে সার্থক রূপ দিতে সহায়তা করেছিল। তিনি নিজ ব্যয়ে এ জাদুঘর ভবন নির্মাণ করেন। ১৯১৬ সালের ১৩ নভেম্বর বাংলার গভর্নর লর্ড কারমাইকেল এ জাদুঘর উদ্বোধন করেন।

১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর জাদুঘরের অবস্থা অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক দিক দিয়ে শোচনীয় হয়ে পড়ে। বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান হিসেবে গৃহীত হয়েছে ১৯৬৪ সালের ১০ অক্টোবর। প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই জাদুঘরটি জ্ঞানান্বেষীদের আকৃষ্ট করে আসছে। ক্রমে এর সংগ্রহের গুণগত ও পরিমাণগত সমৃদ্ধি সাধিত হয়েছে। এর বিভিন্ন প্রদর্শনী কক্ষগুলোতে রয়েছে সিন্ধু সভ্যতা, মহাস্থানগড়, নালন্দা ও পাহাড়পুরের বহু নিদর্শন, বাংলাদেশের প্রাক-ইসলামী যুগের শিলালিপি, মুদ্রা, তাম্রলিপি, দলিল, ফরমান ও ভাস্কর্য। এছাড়া রয়েছে একটি দুষ্প্রাপ্য পুস্তক ও পত্রিকা সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার।

বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর প্রাচীন ভাস্কর্য, ধাতব মূর্তি, মুদ্রা, পাণ্ডুলিপি প্রভৃতিতে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। বর্তমানে এখানে সংগ্রহের পরিমাণ রয়েছে ভাস্কর্য ৯ হাজার, পাণ্ডুলিপি ৪ হাজার, ১ হাজার ১০০ প্রস্তর ও ধাতব মূর্তি, ৬১টি প্রাচীন লেখচিত্র, ১ হাজার ৩০০ প্রাচীন মুদ্রা, ৯০০ পোড়ামাটির ভাস্কর্য, ৩২টি অস্ত্র, ২১টি আরবি-ফার্সি দলিল। প্রদর্শন ব্যবস্থার উন্নয়ন, আবহমান বাংলা ও মুসলিম ঐতিহ্য কক্ষের সংযোজন, একটি অত্যাধুনিক সংরক্ষণশালা নির্মাণের মাধ্যমে ৪৫০০ বাংলা, সংস্কৃত পুঁথি সংরক্ষণের ব্যবস্থা ইত্যাদি। এখানে আছে আব্বাসীয়, মোঘল, সুলতানী, নবাবী আমলের অসংখ্য নিদর্শন, কুরআন শরীফ, মুসলিম নবাব ও সুলতানদের হাতে লেখা ফরমান, মুসলিম পুঁথি, শিলালিপি, পেইন্টিং, অলংকৃত ধাতবপত্র, যুদ্ধাস্ত্র, কামান, তলোয়ার, নানা মূর্তি ছাড়াও আরো অনেক কিছু। জাদুঘরে একটি নতুন গ্যালারি 'আবহমান বাংলা' উদ্বোধন করা হয়েছে। গ্রামবাংলার লোকঐতিহ্যকে অত্যন্ত নিপুণভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে আবহমান বাংলা গ্যালারিতে। এছাড়া বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতি ও উপজাতির নানা ধরনের নিদর্শন, বাদ্যযন্ত্র, অস্ত্রশস্ত্র ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি রয়েছে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

পুরাকীর্তির নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে মুসলিম রাজা-বাদশাহের ছবি, জীবনালেখ্য, হস্তলিপি, তৈলচিত্র, দুর্লভ চিঠিসহ মূল্যবান আরবি ও ফার্সি দলিলপত্র, শিলালিপি এবং বিভিন্ন মুসলিম ঐতিহাসিক ব্যক্তির স্মৃতিচারণমূলক দ্রব্যাদি, পোশাক, টুপি, কলম, বর্ম, তলোয়ার, জুতা প্রভৃতি। বর্তমানে জাদুঘরে ২১টি আরবি ও ফার্সি দলিল, ১৬১৬টি শিলালিপি, ৬১টি বাংলা পাণ্ডুলিপি, ৩২টি তাম্র শিলালিপি, ১০৫০০টি অস্ত্রশস্ত্র, ১৪০০ পুস্তক-পুস্তিকা, ৯২৭টি পোড়ামাটির ভাস্কর্য, পাত্রফলক ও প্রাচীন মুদ্রা, ২৫৩০টি সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি, ১১০০ রকম ধাতবমূর্তি, ৩০০টি পোশাক ও হস্তলিপি প্রভৃতি সংগৃহীত আছে।

♦ অমর একুশে বইমেলা

বইমেলার ইতিহাস প্রাচীন। খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের স্টুরব্রিজের বইমেলাকে প্রথম আনুষ্ঠানিক বইমেলা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ১৮০২ সালে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত আমেরিকার কোম্পানি অব বুক সেলার্সের বইমেলাটি ছিল পূর্ণাঙ্গ বইমেলা। ১৯৪৯ সালে ফ্রাঙ্কফুর্টে অনুষ্ঠিত বইমেলাই হচ্ছে বিশ্বের বৃহত্তম বইমেলা। বাংলাদেশে বইমেলার ঐতিহ্য বেশিদিনের নয়। স্বাধীনতার পর ১৯৭৪ সালে মুক্তধারা ও পুঁথিঘর-এর স্বত্বাধিকারী চিত্তরঞ্জন সাহার উদ্যোগে প্রথম বইমেলা শুরু। ১৯৭৮ সালে বাংলা একাডেমীর উদ্যোগে প্রাতিষ্ঠানিক বইমেলার সূচনা হয়। ১৯৮৫ সাল থেকে বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত বইমেলার নাম দেয়া হয় 'অমর একুশে গ্রন্থমেলা'। ১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলন বাঙালি জাতির সাংস্কৃতিক চেতনাকে শাণিত করেছে। এ আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালি জাতি ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের কবল থেকে ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদে উন্নীত হয়। এর ফলে একুশের বইমেলায় যুক্ত হয়েছে বাঙালির সাংস্কৃতিক আবেগ। বই জ্ঞানের প্রতীক। বলা হয় মানুষ বই দিয়ে অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে সাঁকো বানিয়ে দিয়েছে। তাছাড়া কোনো জাতির জ্ঞানের ভাণ্ডার শূন্য থাকলে তার ধনের ভাণ্ডারও পূর্ণ থাকে না। কাজেই বইকে নিত্যসঙ্গী করতে না পারলে মানুষের জ্ঞানচর্চার স্ফূর্তি ঘটে না। বইমেলার মাধ্যমে অনেকগুলো বইয়ের সমারোহ গড়ে তোলা হয়। দর্শক-ক্রেতারা মেলায় এসে নানা জাতীয় বই দেখে তাদের প্রয়োজনীয় ও পছন্দমাফিক বইটি কিনতে পারেন। মেলায় বিশেষ কমিশনও প্রদান করা হয়। এতে ক্রেতা সাধারণের কিছু আর্থিক সাশ্রয়ও হয়ে থাকে। তাছাড়া মেলা উপলক্ষে যেসব সাংস্কৃতিক কর্মসূচি ঘোষণা করা হয় এবং অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয় এর ফলে সাংস্কৃতিক চেতনার মানও বৃদ্ধি পায়। একুশের বইমেলা পুস্তক প্রকাশন, প্রদর্শনী ও বিক্রয়ের সাথে সাথে আমাদের জাতীয় মননচর্চার ক্ষেত্রেও ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে চলেছে। এ মেলায় গমন করে, বই কিনে এবং সহযোগিতা করে এরূপ জাতীয় কাজকে এগিয়ে নেয়া সবার কাম্য।

♦ ২১'র জাতিসংঘ স্বীকৃতি

ইউনেস্কোর পর জাতিসংঘও একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। ৫ ডিসেম্বর ২০০৮ জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে এ স্বীকৃতি দেয়া হয়। ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর জাতিসংঘের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ইউনেস্কো প্রথম একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। পররাষ্ট্র দফতর 'শান্তির জন্য সংস্কৃতি' শীর্ষক একটি রেজুলেশন জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশন তুলে ধরে। ভারত, জাপান, সৌদি আরব, কাতারসহ বিশ্বের ১২৪টি দেশ এ রেজুলেশনটি সমর্থন করে। এ রেজুলেশনে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে এবং 'শান্তির জন্য সংস্কৃতি' ও 'সংস্কৃতির সাথে সংস্কৃতির সংলাপ'কে উৎসাহিত করতে মাতৃভাষাগুলোর অবদানের স্বীকৃতি দেয়ার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

♦ লোকগীতি *[৩৪তম বিসিএস]*

লোকসঙ্গীত বা লোকগীতি বাংলা লোকসাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। এসব লোকসঙ্গীতের মধ্যে গ্রামবাংলার আবেগ-অনুভূতি, তাদের দুঃখ-বেদনা-আনন্দ লুকিয়ে আছে। এসব গানের সুরের মূর্ছনা এখনও আমাদের পাগল করে।

মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে
আমি আর বাইতে পারলাম না।
আবার বিরহের গান, যেমন—
বিদেশ গিয়া বন্ধু তুমি আমায় ভুইলো না
কিংবা হালকা রসের গান–
বন্ধু তিনদিন তোর বাড়িত গেলাম
দেখা পাইলাম না। বন্ধু তিন দিন–

এসব গান আমাদের মনকে নাড়া দেয়। এরপর রয়েছে বাংলার জারি, সারি, মুর্শিদি, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, বাউল, গাজীর গান। এগুলো লোকসাহিত্যের ভাণ্ডারকে করেছে সমৃদ্ধ। দীর্ঘদিন ধরে এসব রচনা লোকচিত্তে আনন্দের সামগ্রী হয়ে রস যুগিয়ে আসছে।

♦ ললিতকলা *[৩৪তম বিসিএস]*

গীতবাদ্য বা নৃত্য, চিত্রাঙ্কন, সাহিত্য রচনা বিশেষ করে কাব্য-নাটকাদি প্রভৃতি চারুকলা বা চারুশিল্পের অধীন। ললিতকলা একটি শিল্পকলা, যার মধ্যে রয়েছে সঙ্গীত, আবৃত্তি, অভিনয়, নৃত্য ইত্যাদি। বহু সুধীজনের মতে ললিতকলা চারু ও কারুকলার অন্তর্ভুক্ত। ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত পাঁচটি ললিতকলা হলো– ১. অঙ্কন, ২. ভাস্কর্য, ৩. স্থাপত্য, ৪. সঙ্গীত ও ৫. কাব্য (যার মধ্যে রয়েছে মঞ্চনাটক এবং নৃত্য)। অঙ্কন ও চিত্রকলাকে বলা যায় বস্তু-আশ্রিত মানস ফসল যেমন– আলপনা, পটচিত্র, ঘটচিত্র, দেয়ালচিত্র, অঙ্গচিত্র প্রভৃতি। ভাস্কর্য শিল্পের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পোড়ামাটি, পাথর, কাঠ, হাড়ে তৈরি শিল্পই ভাস্কর্য। তাছাড়া বিভিন্ন ধাতব ভাস্কর্য (মূর্তি) দেখা যায়। স্থাপত্য প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত। গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্য একটি দেশের শিল্পরুচির পরিচয় বহন করে। সঙ্গীত সারা বিশ্বে একটি জনপ্রিয় গণমাধ্যম। গীত, বাদ্য ও নৃত্য এই তিনের সমন্বিত রূপই হচ্ছে সঙ্গীত। কাব্য নাটক বিশেষ করে মঞ্চনাটকে নৃত্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গণমাধ্যম। খ্রিস্টপূর্বেও গ্রিক সভ্যতায় নাট্যচর্চা লক্ষ্য করা যায়। মঞ্চনাটক অভিনয়ের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নাটক একটি যৌথ শিল্প। নাটকের একটি বড়গুণ উৎকণ্ঠা অর্থাৎ দর্শককে উৎকণ্ঠিত করে রাখবে বিভিন্ন কলা-কৌশলে। একটি পূর্ণাঙ্গ নাটকে পাঁচটি পর্যায় থাকে। যেমন– প্রারম্ভ, প্রবাহ, উৎকর্ষ (Action), গ্রন্থিমোচন ও উপসংহার। নাটকে যন্ত্রসঙ্গীত খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তাই বর্তমানে অত্যাধুনিক যন্ত্রাদি অবাধে ব্যবহার হচ্ছে। তাছাড়া উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে অত্যাধুনিক যান্ত্রিক কলাকুশলতার সহায়তা গ্রহণ করা হয়। সংস্কৃতিচর্চা, কণ্ঠসঙ্গীত, যন্ত্রসঙ্গীত, নৃত্যকলা, নাট্যকলা বিশেষ করে শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীত ললিতকলার মূল উপজীব্য। বর্তমানে চলচ্চিত্র, ফটোগ্রাফি, ধারণাগত শিল্প ও পেইন্ট মেকিং যুক্ত হয়েছে ললিতকলায়।

♦ নগরসভ্যতা *[৩৪তম বিসিএস]*

সভ্যতা হলো সংঘবদ্ধ মানুষের আচার-আচরণ, ভাষা- সংস্কৃতি, উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রভৃতির মিলন। প্রাগৈতিহাসিক যুগ হলো ইতিহাসের পূর্বের যুগ অর্থাৎ যখনকার ইতিহাস জানা যায়, তারও পূর্বের যুগ। প্রাগৈতিহাসিক যুগের অবসানের মধ্য দিয়ে সভ্যতার সূত্রপাত হয়। সভ্যতার যুগের দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রথমটি ছিল লিপির আবির্ভাব। মানুষ তাদের জীবন আচরণের কথা লিখে রাখত পাথরের গায়ে, কাদার শ্লেটে এবং আরও পরে কাগজে। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, এ সময় গ্রাম সংস্কৃতির অবসান ঘটিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে মানুষ গড়ে তুলতে থাকে নগর সভ্যতা ও সংস্কৃতি। তাই নগর সভ্যতা হলো গ্রাম সংস্কৃতির অবসান ঘটিয়ে নদীর তীরে শহরকেন্দ্রিক সভ্যতা, যেখানে ছিল উন্নত অবকাঠামো আধুনিক পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ও উন্নত জীবনযাত্রা। খ্রিস্টপূর্ব ৫০০০ অব্দে প্রাচীন সভ্যতা তথা নগর সভ্যতার সূত্রপাত হয়। মেসোপটেমীয় সভ্যতা, মিশরীয় সভ্যতা, সিন্ধু সভ্যতা, গ্রীক সভ্যতা প্রভৃতি ছিল নগরসভ্যতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

♦ জাতীয় সংস্কৃতি *[৩১তম বিসিএস]*

সংস্কৃতি সমাজ ও রাষ্ট্রের দর্পনস্বরূপ। প্রতিটি রাষ্ট্রেরই নিজস্ব সংস্কৃতি থাকে। এ সংস্কৃতিই বিশ্বের দরবারে একটি জাতির গৌরব-অগৌরবের জানান দেয়। আমাদের সংবিধান তাই জাতীয় সংস্কৃতিকে করেছে আরো সুসংহত। বাংলাদেশের সংবিধানের ২৩নং অনুচ্ছেদে বাংলাদেশের জাতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে বলা হয়েছে : 'রাষ্ট্র জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার রক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং জাতীয় ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পকলাসমূহের এমন পরিপোষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন, যাহাতে সর্বস্তরের জনগণ জাতীয় সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে অবদান রাখিবার ও অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারেন।'

♦ মানব পতাকার বিশ্ব স্বীকৃতি

মহান বিজয়ের ৪২তম বর্ষপূর্তিতে বাংলাদেশের তৈরি মানব পতাকাটিকে গিনেজ ওয়ার্ল্ড রেকর্ড কর্তৃপক্ষ আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। ৪ জানুয়ারি ২০১৪ এ স্বীকৃতির খবর প্রকাশ করা হয় গিনেজ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে। সেনাবাহিনীর সহায়তায় মোবাইল ফোন অপারেটর রবি আজিয়াটা লিমিটেড ১৬ ডিসেম্বর ২০১৩ শেরে বাংলা নগরের জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে এ মানব পতাকা প্রদর্শন করে, যাতে ২৭,১১৭ জন মানুষ অংশ নেন। বিশ্ব রেকর্ডের জন্য মানব পতাকাটি ৫ মিনিট ধরে দেখানোর কথা থাকলেও বাংলাদেশ এটি ৬ মিনিট ১৪ সেকেন্ড ধরে প্রদর্শন করে। সর্বশেষ সবচেয়ে বড় মানব পতাকার রেকর্ডটি গড়ে ভারত। ২০১৪ সালের ৭ ডিসেম্বর ৪৩,৮৩০ জন অংশগ্রহণকারীর মাধ্যমে তারা বিশ্বের বৃহত্তম মানবপতাকা তৈরির নতুন বিশ্বরেকর্ড গড়ে।

♦ গিনেজ বুকে সোনার বাংলা

বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় সশস্ত্র বাহিনীর সহায়তায় ২৬ মার্চ ২০১৪ দেশের ৪৩তম মহান স্বাধীনতা দিবসে আয়োজন করে 'লাখো কণ্ঠে সোনার বাংলা' শিরোনামে এক সাথে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষের জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার বিশ্বরেকর্ড গড়ার আয়োজন। ঐ দিন ঢাকার শেরে-বাংলা নগরের জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে যান্ত্রিক গণনা অনুসারে, লাখো কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত গাইতে সমবেত হয়েছিলেন ২,৫৪,৬৮১ জন। এ ঘটনার ১৪ দিন পর অর্থাৎ ৯ এপ্রিল ২০১৪ গিনেজ বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস কর্তৃপক্ষের নিজস্ব ওয়েবসাইটে একসাথে সবচেয়ে বেশি মানুষের জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার বিশ্বরেকর্ড-এ বাংলাদেশের নাম ঘোষণা করা হয়। বিশ্বরেকর্ড করার জন্য সম্মিলিত কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার ঐ আয়োজনে ২,৫৪,৫৩৭ জন অংশ নেন বলে গিনেজ বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের স্বীকৃতিতে উল্লেখ করা হয়। বাংলাদেশের আগে এ রেকর্ড ছিল ভারতের। ৬ মে ২০১৩ ভারতের লক্ষ্ণৌতে সাহারা গ্রুপের আয়োজনে ১,২১,৬৫৩ জন এক সাথে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার বিশ্বরেকর্ড গড়েছিল।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৪. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাহিত্যবিষয়ক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন

♦ ডেসটিনি ২০০০ লি. *[৩৩তম বিসিএস]*

বাংলাদেশে পরিচালিত একটি এমএলএম (মাল্টি লেভেল মার্কেটিং) কোম্পানি 'ডেসটিনি ২০০০ লি.'। ২০০০ সালে 'ডেসটিনি' ও 'নিওয়ে' এমএলএম কোম্পানিরূপে ব্যবসায় শুরু করে। ২০০২ সালে কোম্পানিটি RJSC থেকে নিবন্ধন নেয়। সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও ডেসটিনি শেষ পর্যন্ত বিতর্কিত ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ে। নতুন সদস্য ভর্তির উপর কমিশন প্রাপ্তিসহ নানা উদ্ভট ও কঠিন সব শর্তের বেড়াজালে আবদ্ধ এ নিষিদ্ধ এমএলএম কোম্পানির প্রধান বৈশিষ্ট্য। নিজে সদস্য হওয়ার পর অন্যকে সদস্য করানোর বিনিময়ে কমিশন প্রাপ্তি পদ্ধতি 'ডেসটিনি ২০০০ লি'. এর মূল বিষয়। নানা অপ্রয়োজনীয় বিলাসী দ্রব্য বা সেবাসামগ্রীর মার্কেটিং এর জোর চেষ্টায় এর প্রতি সৃষ্টি হয়েছে জনআস্থার প্রবল সংকট। এর সাথে নগদ অর্থের বিনিময়ে তথাকথিত সাইকেলভিত্তিক কমিশন প্রদান এ ব্যবসাকে আরও বিতর্কিত করেছে।

♦ হলমার্ক গ্রুপ লি. *[৩৩তম বিসিএস]*

বর্তমানে বাংলাদেশে 'হলমার্ক গ্রুপ লি.' একটি বড় ধরনের কেলেঙ্কারি হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। বাংলাদেশে ব্যাংকিং সেক্টরের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় অর্থ কেলেঙ্কারি সোনালী ব্যাংকের রূপসী বাংলা হোটেল শাখা থেকে হলমার্ক গ্রুপের নামে টাকা আত্মসাৎ। হলমার্ক গ্রুপসহ ৬টি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা আত্মসাতের ঘটনা ২০১২ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের এক প্রতিবেদনে বেরিয়ে আসে। প্রতারণার মাধ্যমে ব্যাংক থেকে ৩,৬০৬ কোটি ৪৮ লাখ টাকা হাতিয়ে নেয় হলমার্ক গ্রুপসহ ৬টি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। এর মধ্যে শুধু হলমার্ক গ্রুপই অবৈধভাবে উত্তোলন করে ২,৬৬৮ কোটি ৩৮ লাখ টাকা।

♦ আয়কর মেলা *[৩৩তম বিসিএস]*

মানুষকে কর প্রদানের উৎসাহ এবং কর প্রদান সংস্কৃতি গড়ে তুলতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আয়কর মেলার আয়োজন করে। ২০১৪ সালে সপ্তমবারের মতো আয়োজিত হয় এ মেলা। দেশের আটটি বিভাগীয় শহরে ৭ দিনব্যাপী এবং প্রথমবারের মতো ৫৪টি জেলা শহরে ৪ দিনব্যাপী এবং তিনটি পার্বত্য জেলায় দুইদিন করে আয়কর মেলা ২০১৪ শুরু হয় ১৬ সেপ্টেম্বর। এবারের মেলার উদ্দেশ্য ছিল করদাতাদের অনলাইনে আয়কর প্রদানে উৎসাহ প্রদান করা। রাজস্ব আদায়ে নতুন রেকর্ডের মধ্য দিয়ে শেষ হয় আয়কর মেলা ২০১৪। মেলায় রাজস্ব আদায় হয় ১,৬৯৫ কোটি ৩০ লাখ ৭৩ হাজার ৪৫১ টাকা। এছাড়া এবারের মেলায় আয়কর বিবরণী দাখিল করেন ১ লাখ ৪৯ হাজার ৪০ জন করদাতা। আর কর শনাক্তকরণ নম্বর (TIN) নেন ১৫ হাজার ৯০৭ জন নতুন কর দাতা এবং কর সংক্রান্ত সেবা নিতে মেলায় আসেন ৬ লাখ ৪৯ হাজার ৩০৯ জন ব্যক্তি।

♦ ষষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা *[৩১তম বিসিএস]*

সাতটি অগ্রাধিকার খাত ও অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা দলিল চূড়ান্ত হওয়ার পর ২২ জুন ২০১১ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (ECNEC) বৈঠকে তা অনুমোদিত হয়। এ পরিকল্পনার মেয়াদকাল ২০১০ সালের জুলাই থেকে ২০১৫ সালের জুন পর্যন্ত। তবে এটি কার্যকর হয় ২০১১ সালের জুলাই থেকে। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ১৩ লাখ ৪৭ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে গণখাত বা সরকারি বিনিয়োগ ৩ লাখ ১০ হাজার কোটি টাকা এবং ব্যক্তি খাত থেকে আসবে মোট বিনিয়োগের ৭৭ শতাংশ বা ১০ লাখ ৩৯ হাজার ৩৬০ কোটি টাকা। প্রতিবছর গড়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৭.৩%। মেয়াদ শেষে অর্থাৎ ২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি ৮%।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

লক্ষ্যমাত্রা ➤ আয় বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য হ্রাস ⊙ মানবসম্পদ উন্নয়ন (শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি) ⊙ নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ⊙ জ্বালানী ও অবকাঠামো ⊙ নারী-পুরুষের সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন ⊙ পরিবেশের ভারসাম্য ⊙ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি।

লক্ষ্যসমূহ ➤ দারিদ্র্য হার : ২২ শতাংশ ⊙ শিশু মৃত্যুর হার : হাজারে ৩১ জন ⊙ মাতৃমৃত্যুর হার : লাখে ১৪৪ জন ⊙ অপুষ্টিতে ভোগা শিশুর হার : ২.২% ⊙ বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ : ৯৬% জনগোষ্ঠীর কাছে ⊙ স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগারের ব্যবস্থা করা : ৯০% জনগণের জন্য ⊙ বিদ্যুৎ উৎপাদন (২০১৫ সালে) : ১৫,৩৫৭ মেগাওয়াট ⊙ উচ্চ শিক্ষায় ছাত্রী ও ছাত্র অনুপাত : ৪০ ঃ ৬০ ⊙ উৎপাদনশীল বনভূমির হার : ১৫ শতাংশ ⊙ ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগের হার : ৩০% ⊙ টেলি ঘনত্বের হার : ৭০%।

♦ উৎসে আয়কর *[৩১তম বিসিএস]*

কর সংগ্রহের একটি জনপ্রিয় মাধ্যম উৎসে কর কর্তন। বাংলাদেশে আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪-তে এ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন সালের বাজেটের মাধ্যমে এর আওতা ও পরিধি পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত ও সংশোধিত হয়। আয়কর অধ্যাদেশের ৪৮ ধারা থেকে ৫৩ ধারার শেষ পর্যন্ত উৎসে আয়কর সম্বন্ধে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ২০১১-১২ অর্থ বছরে প্রণীত বাজেটে সরকার তার রাজস্ব সংগ্রহের জন্য আয়কর বিধিতে উৎসে আয়কর সংগ্রহ সংক্রান্ত কতিপয় পরিবর্তন এনেছে যা ১ জুলাই ২০১১ থেকে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়।

আয়কর অধ্যাদেশের ৪৯(৩) সংশোধনের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের বিচারক/কর্মকর্তা, সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি থেকে উৎসে কর কর্তনের বিধান প্রবর্তন করা হয়। অধ্যাদেশের ৫০ ধারা অনুযায়ী সাধারণ হারে এই কর কর্তন করা হবে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ, মন্ত্রী পর্যায়ের উপদেষ্টাগণ, সুপ্রিম কোর্টের বিচারকগণের আয়ের উপর করমুক্ত সুবিধা প্রত্যাহার করা হয়েছে। মহান জাতীয় সংসদের সদস্যগণ সরকার থেকে এক অর্থ বছরে প্রাপ্ত সম্মানী থেকে সাধারণ হারে উৎসে কর কর্তনের জন্য অধ্যাদেশে নতুন ধারা ৫০ (B) সংযোজন করা হয়েছে। এর ফলে মাননীয় সাংসদগণ যে সম্মানী পাবে তা থেকে উৎসে কর কর্তন প্রযোজ্য হবে। অধ্যাদেশে বিদেশ থেকে প্রাপ্ত সার্ভিস চার্জ বা কনসালটেন্সি ফি এর উপর ১০% হারে উৎসে কর কর্তনের জন্য নতুন ধারা ৫২(Q) সংযোজিত হয়েছে। নতুন ধারা ৫২(P) অনুযায়ী কনভেনশন হলে, কনফারেন্স সেন্টারকে ভাড়া প্রদানকালে উৎসে কর কর্তন করতে হবে। পূর্বতন ধারা ৫৩ (D) সম্পূর্ণরূপে প্রতিস্থাপিত হয়েছে যাতে রেডিও/ টিভি কর্তৃক অনুষ্ঠান ক্রয়কালে বা অভিনেতা/অভিনেত্রী, সঙ্গীত শিল্পীদের সম্মানী থেকে উৎসে কর কর্তনের বিধান প্রবর্তিত হয় এবং সকল ক্ষেত্রে ১০% কর হার আরোপ করা হয়েছে। ৫২(N) ধারা সংশোধিত করে উৎসে কর কর্তনের ক্ষেত্রে রেন্টাল পাওয়ারকে প্রদত্ত ৩ বছরের সময়সীমা প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং যে কোনো সময় বিদ্যুৎ কেনার পরিপ্রেক্ষিতে অর্থ পরিশোধনকালে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক উৎসে কর কর্তন প্রযোজ্য হবে।

৫২(A) ধারাতে প্রফেশনাল সার্ভিস এর পরিধি বিস্তৃত করা হয়েছে। এ সংশোধনী অনুযায়ী পেশাগত জ্ঞান প্রয়োজন হয় এমন যে কোনো সেবার বিপরীতে প্রদেয় অর্থের বিপরীতে ১০% হারে উৎসে কর কর্তন করতে হবে। অধিকন্তু, ৫২(AA) ধারায় বিভিন্ন সেবা (ইন্ডেটিং কমিশন, শিপিং এজেন্সি কমিশন, ডাক্তারদের সার্ভিস, ডায়মন্ড কার্টিং, সিনেমা, নাটক, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি) এর বিপরীতে অর্থ প্রদানকালে ১০% হারে উৎসে কর কর্তন করতে হবে। ৫৩(C) সংশোধনী অনুযায়ী কোনো প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি যে কোনো পণ্য নিলামে বিক্রি করলে প্রাপ্ত আয়ের উৎসে কর কর্তন করতে হবে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৫৩(H) সংশোধনের মাধ্যমে জমি, বাড়ি ইত্যাদি বিক্রয়কালে উৎসে আয়কর কর্তনের পরিধি বিস্তৃত করা হয়েছে। ৫৩(J) ধারার সংশোধনী অনুযায়ী খালি জায়গা বা প্লান্ট মেশিনারী ভাড়ার ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তন প্রযোজ্য হবে। ৫২(D) ধারাতে সঞ্চয়পত্রের সুদের আয়ের উপর কর ১০% থেকে কমিয়ে ৫% করা হয়েছে। ৫৩(BB) ধারাতে গার্মেন্টসসহ কতিপয় রপ্তানির উপর কর কর্তনের হার ০.৫০% থেকে ০.৬০% করা হয়েছে। শেয়ার ব্রোকারের কমিশন থেকে কর কর্তনের হার ০.০৫% থেকে বৃদ্ধি করে ০.১০% নির্ধারণ করা হয়েছে। সকল রপ্তানির উপর উৎসে কর কর্তনের হার ০.৫০% থেকে বাড়িয়ে ০.৭০% করা হয়েছে। কমিশন, ডিসকাউন্ট বা ফি এর উপর উৎসের কর কর্তনের হার ৭.৫% থেকে বাড়িয়ে ১০% করা হয়েছে। এছাড়াও রিয়েল এস্টেট বা ভূমি উন্নয়ন ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে উৎসে কর কর্তনের হার যৌক্তিক করা হয়েছে।

আয়কর অধ্যাদেশে আয়ের প্রকারের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া রয়েছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশ সরকারও উৎসে আয়কর সংগ্রহের জন্য ২০১১-১২ সালের বাজেটে এ বিষয়ে ব্যাপক পরিবর্তনের মাধ্যমে রাজস্ব বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে যা সরকারের আয় বৃদ্ধির গতিকে ত্বরান্বিত করবে।

♦ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (PPP) *[৩১তম ও ২৯তম বিসিএস]*

সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নের জন্য সরকার ২০০৯-১০ অর্থবছরে প্রথমবারের মতো বাজেটে রাজস্ব ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (ADP) সাথে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব খাত সংযোজন করে এর নাম দেয় 'অবকাঠামো বিনিয়োগ তহবিল'। প্রথমবারে এ খাতে ২৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল। বর্তমানে Bangladesh Infrastructure Finance Fund (BIFF)-কে কোম্পানিতে রূপান্তর করা হয়েছে। এর কাজকে আরো গতিময় করার জন্য অফিস স্থাপিত হয়েছে এবং জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে। পিপিপি'র আওতায় বিনিয়োগের জন্য বেশ কয়েকটি খাতকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, যোগাযোগ অবকাঠামো (সড়ক, রেল, বন্দর, বিমান পোত ও নৌপরিবহন), বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ ও পয়নিষ্কাশন, তথ্য প্রযুক্তি, শিল্প, শিক্ষা ও গবেষণা, পর্যটন, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, আবাসন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

দেশের প্রথম সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি) ভিত্তিক প্রকল্প হিসেবে সরকার বহুল আলোচিত এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে বা উড়াল সেতু বা দ্বিতল সড়ক নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়। ৩০ এপ্রিল ২০১১ দেশের সর্ববৃহৎ পিপিপি প্রকল্প Dhaka Elevated Expressway বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে। এর নির্মাণ কাল ধরা হয়েছে আট বছর। ৩৩ কিলোমিটারের এই দ্বিতল সেতু শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে শুরু হয়ে শনির আখড়ায় শেষ হবে। এছাড়া মেয়র হানিফ ফ্লাইওভার (যাত্রাবাড়ী-গুলিস্তান) পিপিপি'র আওতায় নির্মিত হচ্ছে। ২০১১-১২ অর্থবছরে পিপিপির জন্য ৩০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ২৫০০ কোটি টাকা BIFF এর জন্য। এর মধ্যে ১৬০০ কোটি টাকা BIFF-এর পরিশোধিত মূলধন যার অনুমোদিত মূলধন ১০ হাজার কোটি টাকা। ৪০০ কোটি টাকা ভায়াবিলিটি গ্যাপ ফান্ডের জন্য এবং ১০০ কোটি টাকা পিপিপি প্রকল্পের কারিগরি সহায়তার জন্য।

উল্লেখ্য, আশির দশকের শেষ দিকে বিভিন্ন দেশের সরকারের সাথে বেসরকারি খাতের অংশীদারিত্বে অবকাঠামো নির্মাণ শুরু হয়। কানাডা, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জার্মানি, জাপান, পর্তুগাল, অস্ট্রেলিয়া, ইতালির পাশাপাশি চীন, ভারত, ব্রাজিল, ফিলিপাইন, দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ কোরিয়া, চিলি প্রভৃতি দেশ পিপিপি'র মাধ্যমে অবকাঠামো নির্মাণ করছে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

♦ জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিলের নির্বাহী কমিটি (ECNEC) *[৩০তম বিসিএস]*

১৯৮২ সালে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির গঠন কাঠামো ও কার্যাবলী নিরূপণ করা হয়। ১৯৮২ সালে অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রীকে আহ্বায়ক করে এ কমিটি গঠন করা হয়। ১৯৮২ সালের পর থেকে একনেকের কাঠামো ও কার্যাবলীতে অনেক পরিবর্তন ঘটে। যেমন– ১৯৮৬ সালের জুলাই মাস থেকে আহ্বায়ক পদে উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের স্থলাভিষিক্ত হন উপ-প্রধানমন্ত্রী। ১৯৯১ সালে একনেকের সভাপতি হন অর্থমন্ত্রী। সর্বশেষ ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী একনেকের সভাপতি ও অর্থমন্ত্রী বিকল্প সভাপতি। সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, খাদ্যমন্ত্রী, পানিসম্পদ মন্ত্রী, শিল্পমন্ত্রী, বাণিজ্যমন্ত্রী, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী, কৃষিমন্ত্রী এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী। যেসব মন্ত্রণালয়ের বিষয় কমিটিতে আলোচনা করা হয় সেসব দপ্তরের মন্ত্রীরাও একনেকের সদস্য থাকেন। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব, বৈদেশিক সম্পদ বিভাগের সচিব, পরিকল্পনা সচিব, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সদস্যবর্গ ও সচিবগণকে একনেকের কাজে সহায়তা করতে হয়।

একনেকের (ECNEC) কার্যাবলী :

১. সকল প্রকল্পের পরিকল্পনাপত্র যাচাই ও অনুমোদন ।
২. প্রকল্প মূল্যায়ন সংক্রান্ত বিশেষ কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত ৫ কোটি টাকার উর্ধ্ব ব্যয় সাপেক্ষ সকল প্রকল্প যাচাই ও অনুমোদন।
৩. উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা।
৪. বেসরকারি ও যৌথ উদ্যোগে গৃহীত বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহ যাচাই।
৫. দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড তত্ত্বাবধান ও নীতিমালা পর্যালোচনা।
৬. সরকারি বিধিবদ্ধ কর্পোরেশনের আর্থিক কর্মসূচি পর্যালোচনা।
৭. সরকারি প্রতিষ্ঠানের উৎপন্ন পণ্যাদির মূল্য এবং সরকারি সেবা খাতের রেট, ফি ইত্যাদি নির্ধারণ।
৮. বৈদেশিক সাহায্য ও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপ বিবেচনা এবং জনশক্তি রপ্তানির ব্যাপারে বিদেশে বাংলাদেশ মিশনসমূহের লক্ষ্য নির্ধারণ ও এসব ক্ষেত্রে অগ্রগতি পর্যালোচনা।

♦ জাতীয় শিশু দিবস *[৩০তম বিসিএস]*

১৭ মার্চ স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম দিন। ১৯২০ সালের এই দিনে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ার সম্ভ্রান্ত শেখ পরিবারে তার জন্ম। জাতি এই দিনটিকে জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে উদযাপন করে থাকে। ১৯৯৬ সাল থেকে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার ১৭ মার্চকে জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে পালন করে আসছে এবং দিবসটিতে সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়। ২০০১ সালে পরবর্তী সরকার এসে এ দিবসের সরকারি ছুটি ও জাতীয় শিশু দিবস বাতিল করে। পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এসে ২০০৯ সালে পুনরায় দিবসটিকে জাতীয় শিশু দিবস ও সরকারি ছুটি উদযাপন করে আসছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে দিবসটির তাৎপর্য ও গুরুত্ব নিহিত। বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে হয়তো বাঙালিদের স্বাধীন বাংলাদেশ পেতে আরও কয়েক যুগ লেগে যেত বা সম্ভবই হতো না। তার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাঙালি আজ স্বাধীন বাংলাদেশ উপহার হিসেবে পেয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের অবিসংবাদিত নেতা। তার সাহসী ও আপসহীন নেতৃত্বে অনুপ্রাণিত হয়েই পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়েছিল বাঙালি জাতি। শিশুদের প্রতি বঙ্গবন্ধুর দরদ ছিল অপরিসীম। তাই তার জন্ম দিবসকে শিশুদের জন্য উৎসর্গ করে

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

জাতীয় শিশু দিবস ঘোষণা করা হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে দেশের প্রধান প্রধান দৈনিক পত্রিকাগুলোতে ক্রোড়পত্র ও নিবন্ধ প্রকাশ করা হয়ে থাকে। রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী পৃথক পৃথক বাণী প্রদান করে থাকেন। তাছাড়া উল্লেখযোগ্য কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে জাতির জনকের সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা, রেডিও-টেলিভিশনে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানমালা সম্প্রচার, বইমেলা, শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, বঙ্গবন্ধুর ওপর প্রামান্য চিত্র প্রদর্শন, আলোচনা সভা, স্বেচ্ছায় রক্তদান, বিনামূল্যে চিকিৎসা, পুরস্কার বিতরণ ও মিলাদ মাহফিলসহ আরো কর্মসূচি পালন। বিদেশে বাংলাদেশের দূতাবাসগুলোতেও আলোচনা সভা, প্রামাণ্য চিত্র ও পোস্টার প্রদর্শনসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে।

আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার অঙ্গীকারে শিশুদের উজ্জীবিত করা ও বঙ্গবন্ধুর চেতনা ও আদর্শকে শিশুদের মাঝে তুলে ধরাই হচ্ছে দিবসটির মূল লক্ষ্য। বঙ্গবন্ধু যে সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন তা বাস্তবায়নের জন্য আমাদের নতুন প্রজন্মকে সোনার মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। বাংলাদেশকে শিশুদের নিরাপদ আবাস ভূমি হিসেবে পরিণত করার জন্য সবাইকে জাতীয় শিশু দিবসে শপথ নিতে হবে। এসব তাৎপর্য ও গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে বাংলাদেশ সরকার দিবসটিকে জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে। দিবসটির তাৎপর্য প্রতিটি শিশুর মাঝে তুলে ধরা আমাদের সকলের দায়িত্ব। জাতীয় শিশু দিবসে প্রতিটি আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সামনে রেখে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে একটি সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকারে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এটাই হোক জাতীয় শিশু দিবসের মূল তাৎপর্য।

♦ খাদ্য নিরাপত্তা *[২৯তম বিসিএস]*

খাদ্য মানুষের প্রধান মৌলিক চাহিদা। বাংলাদেশের কৃষিনির্ভর অর্থনীতিতে খাদ্যের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশের জনগণ তাদের আয়ের বেশিরভাগ খাদ্যের জন্য ব্যয় করে। রাষ্ট্রের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব হলো সকল সময়ে সবার জন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ১৫(ক)নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব নাগরিকের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা করা। কিন্তু ক্রমাগত প্রাকৃতিক দুর্যোগ, খাদ্য উৎপাদন ও চাহিদার সমন্বয়হীনতার অভাবে ক্রমশই প্রকট হয়ে উঠেছে খাদ্য সংকট। এ সংকট মোকাবিলা করতে শস্যের বহুমুখীকরণ এখন সময়ের দাবি। সবার জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ বর্তমানে বাংলাদেশের জন্য অন্যতম চ্যালেঞ্জ। নির্দিষ্ট এলাকায় নির্দিষ্ট সময়ে একই ধরনের ফসল উৎপাদনের কারণে খাদ্য সংকট আরো প্রকট হয়ে উঠছে। কেননা বছরের ঐ নির্দিষ্ট সময়ে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলে খাদ্য উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। ফলে প্রকট হয়ে ওঠে খাদ্য সংকট। খাদ্য সংকট মোকাবিলার জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা অতীব জরুরি : ১. কৃষি বহুমুখীকরণ, প্রয়োজন উন্নত প্রযুক্তি ও গবেষণা; ২. খাদ্যশস্য বহির্ভূত (শাকসবজি, তেলবীজ, ডাল ও ফলমূল) ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি; ৩. শস্য বহুমুখীকরণে সহজ শর্তে কৃষিঋণ প্রদান; ৪. কৃষিতে দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ। দেশে খাদ্য সংকট কমাতে এবং শস্যের বহুমুখীকরণে কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ ও কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। দেশে সুষম ফসলের চাষ বৃদ্ধিতে ২০০১ সাল থেকে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্প হাতে নিয়েছে সরকার। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ১৬টি জেলার ৬২টি উপজেলায় এ প্রকল্প চালু আছে। গাজীপুরে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এ পর্যন্ত দানা শস্যের ৪৮টি, তেলবীজের ৩৬টি, ডালের ২৭টি, আলুর ৪৬টি, সবজির ৫৭টি, মসলার ১৫টিসহ ২৭০টি নতুন

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

জাত উদ্ভাবন করেছে। এছাড়া ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ৪৭টি নতুন প্রজাতির ধান, ধান চাষে ১৯টি আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করেছে। খাদ্য সংকট মোকাবিলা তথা খাদ্য নিরাপত্তার জন্য সরকারের এ অর্জনই যথেষ্ট নয়। কৃষির সাথে যারা জড়িত তাদের উৎসাহ দিতে হবে এবং তাদের স্বার্থকে বড় করে দেখতে হবে। এছাড়া কৃষকদের বিভিন্ন অপ্রধান শস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং ব্যবহারে কৃষকদের উৎসাহিত করতে হবে। খাদ্য সমস্যা কবলিত এ দেশে শস্যের বহুমুখীকরণের বিকল্প নেই। জোরদার করতে হবে কৃষি সম্প্রসারণ ব্যবস্থাকেও। তদুপরি এসব কৃষিপণ্যের উৎপাদন, বাজারজাতকরণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের লক্ষ্যে গড়ে তোলা প্রয়োজন এলাকাভিত্তিক কৃষক সংগঠন। তাতে কৃষি বহুমুখীকরণ ত্বরান্বিত হবে।হ্রাস পাবে খাদ্যের ভয়াবহ সংকট।

♦ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা *[২৯তম ও ১১তম বিসিএস]*

রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা বা ইপিজেড হলো কোনো দেশের এমন অঞ্চল যেখানে স্বল্পমূল্যে উন্নতমানের রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদনের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদেশী উদ্যোক্তাদের আকৃষ্ট করে বিনিয়োগ ও উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বারা শিল্পায়নের গতিকে ত্বরান্বিত করে কর্মসংস্থান ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের লক্ষ্যেই ইপিজেড প্রতিষ্ঠা করা হয়। আর এ ক্ষেত্রে ইপিজেড সংশ্লিষ্ট দেশসমূহ বিদেশী কোম্পানিকে বিভিন্ন রকম সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে থাকে। বাংলাদেশে রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (BEPZA) আইন পাস করা হয় ১৯৮০ সালে। যা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন। এর গভর্নর বোর্ডের চেয়ারম্যান বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। বর্তমানে বাংলাদেশে চালুকৃত সরকারি ইপিজেড ৮টি। যথা– ঢাকা, চট্টগ্রাম, মংলা, ঈশ্বরদী, উত্তরা, নীলফামারী, কুমিল্লা, আদমজী ও কর্ণফুলী। বাংলাদেশে প্রথম ইপিজেড চালু হয় ১৯৮৩ সালে চট্টগ্রামের দক্ষিণ হালিশহরে। বাংলাদেশে বেসরকারি ইপিজেড আইন সংসদে পাস হয় ২০০১ সালে। দেশের প্রথম বেসরকারি ইপিজেড হলো কোরিয়ান ইপিজেড (KEPZ)। এটি চট্টগ্রামে অবস্থিত। এছাড়াও বর্তমানে ফেনী ইপিজেড ও মেঘনা ইপিজেড (মুন্সিগঞ্জ) নামে দুটি ইপিজেড নির্মাণাধীন রয়েছে।

♦ দুর্নীতি দমন কমিশন *[২৯তম বিসিএস]*

দুর্নীতি দমন করে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকার ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ দুর্নীতি দমন কমিশন আইন সংসদে পাস করে। তিনজন কমিশনারের সমন্বয়ে দুর্নীতি দমন কমিশন গঠিত হয়। এ আইন অনুযায়ী পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট বাছাই কমিটির সুপারিশে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক কমিশনারগণ নিযুক্ত হবেন। এ আইনের ধারাবাহিকতায় রাষ্ট্রপতি ২১ নভেম্বর, ২০০৪ বিচারপতি সুলতান হোসেন খানকে চেয়ারম্যান এবং অধ্যাপক ড. মনিরুজ্জামান মিঞা ও মনিরউদ্দীন আহমেদকে স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশনের সদস্য নিয়োগ করে এর বাস্তব রূপ দেন। দুর্নীতি দমন কমিশনের বর্তমান ও তৃতীয় চেয়ারম্যান গোলাম রহমান। দুর্নীতি দমন কমিশন দুর্নীতিমূলক অপরাধসমূহ অনুসন্ধান ও তদন্ত পরিচালনা, মামলা দায়ের ও পরিচালনা, দুর্নীতি প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ, রাষ্ট্রপতিকে সুপারিশ প্রদান ও গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

♦ দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র *[২৯তম বিসিএস]*

১৯৯৯ সালে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নের জন্য দেশভিত্তিক PRSP বা Poverty Reduction Strategy Papers কার্যক্রম গ্রহণ করে, যার বাংলা করা হয়েছে দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র। এখানে ২০০০ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত 'মিলেনিয়াম ডেভেলপেমেন্ট গোল বা এমডিজি' যেসব লক্ষ্যমাত্রা পূরণের টার্গেট নিয়েছে তার বাস্তবায়নের পথ সুগম করার কথা

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

বলা হয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র একটি সুসংবদ্ধ পরিকল্পনা, যা মূলত সামাজিক উন্নয়নের নিশ্চয়তা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি স্থায়ীকরণ এবং দারিদ্র্য দূরীকরণের বিভিন্ন পদক্ষেপের ওপর জোর দেয়। এটি মূলত ৮টি বিষয়ের ওপর জোর দেয়, যা উন্নয়নশীল বিশ্বের বড় সমস্যা। এগুলো হলো : ১. কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ২. পুষ্টি, ৩. কারিগরি শিক্ষা, ৩. কারিগরি শিক্ষা, ৪. সুশাসন, ৫. মাতৃ স্বাস্থ্য, ৬. পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, ৭. দুর্নীতি দমন, ৮. সবসময় তদারক করা (ওপরের বিষয়গুলো)। প্রথম দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রটির মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে পরবর্তীতে ২৩ অক্টোবর ২০০৮ শিক্ষা ও কৃষি খাতকে গুরুত্ব দিয়ে দ্বিতীয় দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র (পিআরএসপি) অনুমোদন করে সরকার। এ পিআরএসপির মেয়াদ তিন বছর, অর্থাৎ ২০০৯-২০১১ সাল পর্যন্ত। তিন বছর মেয়াদি এ দলিলকেই উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের দিকনির্দেশক জাতীয় পরিকল্পনার বা দারিদ্র্য বিমোচনের দলিল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বর্তমানে সংশোধিত দ্বিতীয় দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র বাস্তবায়নের পর জুলাই ২০১২ থেকে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া চলছে।

◆ জাতীয় আয়কর দিবস *[২৯তম বিসিএস]*

প্রত্যক্ষ করের মধ্যে আয়কর রাজস্ব আয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস। করদাতার পরিশোধ করার ক্ষমতার ওপর আয়কর নির্ধারিত হয়। যে বেশি আয় করবে সে বেশি কর দেবে– এটিই আয়কর নির্ধারণের মূলনীতি। এ নীতি সমাজে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করে। সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান কর পরিশোধে বাধ্য যদি তার আয় সরকার নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করে। বাংলাদেশ সরকার জনগণকে কর প্রদানে উদ্বুদ্ধ করতে ২০০৮ সালে প্রথমবারের মতো ১৫ সেপ্টেম্বর জাতীয় আয়কর দিবস পালন করে থাকে। এরপর থেকে প্রতিবছর জাতীয় আয়কর দিবস পালন করা হয়। এই একই দিনে সর্বোচ্চ এবং নিয়মিত করদাতাকে জেলা ও জাতীয় পর্যায়ে পুরস্কৃত করা হয়। বাংলাদেশে আয়কর হার সর্বোচ্চ ৩০%, যৌথ কর হার ২৭.৫%, বিক্রয় কর বা ভ্যাট ১৫%। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছর অনুযায়ী পুরুষ করদাতাদের ক্ষেত্রে ২ লাখ ২০ হাজারের উপরে এবং বছরে ৫ লাখ ২০ হাজার টাকার মধ্যে আয়কারী ব্যক্তিকে ১০%, পরবর্তী ৪ লাখ টাকা পর্যন্ত বছরে আয়কারী ব্যক্তিকে ১৫%, পরবর্তী ৭ লাখ টাকা পর্যন্ত বছরে আয়কারী ব্যক্তিকে ২০%, পরবর্তী ৩০ লাখ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের ২৫% এবং তদূর্ধ্ব আয়কারী ব্যক্তিকে ৩০% কর দিতে হবে। মহিলা, ৬৫ বছর ও তার বেশি বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি, অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ২ লাখ ৭৫ হাজার টাকার বেশি হলে কর দিতে হয়। প্রতিবন্ধী করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা ৩,৫০,০০০ টাকা করা হয়েছে।

◆ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য *[২৮তম বিসিএস]*

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল এবং অনুন্নত রাষ্ট্রগুলোর উন্নতির লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF)-এর গৃহীত সংস্কার কর্মসূচি ব্যর্থ হওয়ার প্রেক্ষিতে এসব দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ২০০০ সালের সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘ আয়োজিত 'সহস্রাব্দ শীর্ষ বৈঠক' অনুষ্ঠিত হয়। এতে ২০১৫ সালের মধ্যে ৮টি লক্ষ্য পূরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। যা 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য' (Millennium Development Goal) নামে পরিচিত। মিলেনিয়াম লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে ২০০২ সালে মেক্সিকোর মন্টেরে শহরে 'উন্নয়নের জন্য অর্থায়ন' শীর্ষক বৈঠকে ধনী ও দরিদ্র দেশগুলোর আলোচনার প্রেক্ষিতে একটি সর্বসম্মত রাজনৈতিক রূপরেখা প্রণীত হয়। ধনী দেশগুলো অর্থায়নের ব্যাপারে একমত পোষণ করে থাকে। বাংলাদেশ সরকার দেশের উন্নয়নের স্বার্থে এবং 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য' অর্জনের জন্য জাতীয় বাজেট সহ সব ধরনের উন্নয়ন কর্মসূচিতে এ লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে এবং

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

সাফল্য লাভের ব্যাপারে আশাবাদী। কিন্তু গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো যেমন– CPD সহ অন্যান্যরা সরকারের গৃহীত ব্যবস্থা এবং চলমান পরিস্থিতিতে এ লক্ষ্য অর্জন আশানুরূপ নয় বলে মনে করেন। জাতিসংঘ গৃহীত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যের ৮টি লক্ষ্য রয়েছে। লক্ষ্যসমূহ হলো :

লক্ষ্য-১ : চরম দারিদ্র্য এবং ক্ষুধা দূর করা।

লক্ষ্য-২ : সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন।

লক্ষ্য-৩ : নারী-পুরুষের বৈষম্য দূর করা।

লক্ষ্য-৪ : শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস।

লক্ষ্য-৫ : মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নতি।

লক্ষ্য-৬ : এইডস, ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগের বিস্তার রোধ করা।

লক্ষ্য-৭ : টেকসই উন্নয়ন নীতিমালা এবং পরিবেশ নিশ্চিত করা।

লক্ষ্য-৮ : উন্নয়নে বিশ্বব্যাপি অংশীদারিত্ব তৈরি করা।

◆ আর্সেনিক সমস্যা *[২৮তম বিসিএস]*

আর্সেনিক একটি বিষাক্ত খনিজ পদার্থ। এর কোনো স্বাদ বা গন্ধ নেই। এটি যখন মৌলিক পদার্থ হিসেবে থাকে তখন পানিতে দ্রবীভূত হয় না এবং বিষাক্তও থাকে না। কিন্তু বাতাসে জারিত হয়ে অক্সাইড গঠনের পর এটি বিষাক্ত হয়ে ওঠে। আমাদের দেশে আর্সেনিকের মূল উৎস হলো নলকূপের পানি। একসময় ধারণা ছিল, প্রতি লিটার পানিতে ০.০৫ মিলিগ্রাম পর্যন্ত আর্সেনিক মানুষের দেহের জন্য গ্রহণযোগ্য মাত্রা কিন্তু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) রিপোর্টে বলা হয়েছে, প্রতি লিটার পানিতে ০.০১ মিলিগ্রামের বেশি হলে তা খুবই ক্ষতিকর। বেশি মাত্রায় আর্সেনিক গ্রহণ করলে ধীরে ধীরে মানুষ বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে রক্তশূন্যতা, চর্মরোগ, ক্ষুধামান্দ্য, যকৃতের স্ফীতিসহ নানা ধরনের অসুখে ভোগে। এমনকি ত্বকের ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। ইউনিসেফের (UNICEF) সহযোগিতায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের এক জরিপের মাধ্যমে সারা দেশের ২৫ হাজার নলকূপের পানি পরীক্ষার মাধ্যমে দেখা গেছে দেশের প্রায় সবকটি জেলাই আর্সেনিক দূষণে আক্রান্ত। বিশেষজ্ঞদের মতে, আর্সেনিক বিষক্রিয়ার কোনো চিকিৎসা নেই। তবে প্রাথমিক অবস্থায় শনাক্ত হলে আর্সেনিকের উৎস নলকূপের পানি ব্যবহার বন্ধ করে দিতে হবে। শুধু প্রতিরোধ ও সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমেই আর্সেনিক দূষণ মোকাবিলা সম্ভব।

◆ সমাজ *[২৭তম বিসিএস]*

সমাজ শব্দটির কোনো নির্দিষ্ট বা সর্বজনস্বীকৃত সংজ্ঞা পাওয়া যায় না। বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী সমাজকে নানাভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজ বলতে আমরা মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের সংগঠিত রূপকে বুঝে থাকি। Gisbert তার 'Fundamentales of Sociology' গ্রন্থে সমাজের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, 'সমাজ হলো সামাজিক সম্পর্কের জটিল জাল, যে সম্পর্কের দ্বারা প্রত্যেক মানুষ তার সঙ্গীদের সাথে সম্বন্ধযুক্ত থাকে।' ম্যাকাইভার (MacIver) সমাজের সংজ্ঞায় বলেন, 'যেসব সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে আমরা জীবন-যাপন করি তাদের সংগঠিত রূপই সমাজ।' বস্তুত, সমাজ বলতে বুঝায় পারস্পরিক সম্পর্ক সূত্রে আবদ্ধ অথবা পারস্পরিক সম্পর্কনির্ভর এক জনসমষ্টি। সমাজবিজ্ঞানী এফএইচ গিডিংস বলেন, 'সমাজ হলো সাধারণ স্বার্থপ্রণোদিত এমন একদল লোকের সমাবেশ, যার সদস্যরা তাদের অভিন্ন সাধারণ স্বার্থ সম্পর্কে জানে এবং তা অর্জনের জন্য

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

পরস্পর পরস্পরকে সহযোগিতা করে।' উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে বলা যায়, বেঁচে থাকা এবং জীবনকে আরো উন্নত করার জন্য মানুষ সর্বদা প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। তাই মানুষ কতগুলো রীতিনীতি ও আদর্শ মেনে চলে। ফলে সৃষ্টি হয়েছে সহযোগিতাপূর্ণ সামাজিক সম্পর্ক, যার অন্য নাম সমাজ।

◆ জিএনপি *[৩৪তম; ২৭তম বিসিএস]*

একটি নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে একটি দেশে মোট যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা উৎপাদিত হয় তার অর্থমূল্যকে মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP—Gross National Product) বলে। মোট জাতীয় উৎপাদনের মধ্যে বিদেশে অবস্থানরত দেশী নাগরিকদের দ্বারা সৃষ্ট উৎপাদন বা আয় অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু দেশে অবস্থানরত বিদেশী নাগরিক কর্তৃক সৃষ্ট উৎপাদন বা আয় মোট জাতীয় উৎপাদনে ধরা হয় না। অর্থাৎ মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) = মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন + বিদেশে দেশীয় নাগরিকদের আয় – দেশে বিদেশী নাগরিকদের আয়। মোট জাতীয় উৎপাদন বা জিএনপির প্রবৃদ্ধির হার একটি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থানের প্রাথমিক নির্দেশক। মোট জাতীয় উৎপাদন মূলত দুই দিক থেকে বিবেচনা করা যায়। যথা– ১. ব্যয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে এবং ২. আয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে। ব্যয়ের দিক থেকে জিএনপি হলো চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবার উপর ব্যয়ের যোগফল। যেমন : ক. ভোগ ব্যয়, খ. বিনিয়োগ ব্যয়, গ. সরকারের ক্রয়/ব্যয়, ঘ. রপ্তানি/বিদেশীদের ক্রয়। অন্যদিকে আয়ের দিক থেকে জিএনপি হলো নিম্নোক্ত উপাদানসমূহের যোগফল– ক. শ্রমিক ও উদ্যোক্তার মজুরি ও বেতন, খ. অর্থনৈতিক খাজনা, গ. মূলধন ব্যবহারের জন্য প্রদত্ত সুদ, ঘ. অর্জিত মুনাফা, ঙ. পরোক্ষ কর, চ. মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি বাবদ বা ব্যবহারজনিত এলাউন্স, ছ. হস্তান্তর পাওনা।

◆ গার্মেন্ট শিল্পপার্ক

মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া উপজেলার বাউশিয়ার গজারিয়ায় গার্মেন্ট শিল্পপার্ক স্থাপনে ৫০০ একর অধিগ্রহণযোগ্য জায়গা নির্বাচন করেছে সরকার। ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় শিল্পপার্ক স্থাপন বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এক সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। শিল্পপার্কটি বেসরকারি উদ্যোগে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়। জমি অধিগ্রহণ করে তৈরি পোশাক মালিকদের বড় সংগঠন বিজিএমইএ-কে তা দেয়া হবে। জমির অধিগ্রহণ মূল্য ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ব্যয় বিজিএমইএ বহন করবে। এ ক্ষেত্রে বেপজা সরকারের পক্ষে রেগুলেটরি কার্যক্রম পরিচালনা করবে। ২০০৬ সাল থেকেই গার্মেন্ট পল্লী স্থাপনে আলোচনা শুরু হয়। প্রকল্প নিয়ে সরকার এর মধ্যে একাধিকবার সিদ্ধান্ত বদল করেছে। মুন্সিগঞ্জের গজারিয়াতে গার্মেন্ট পল্লী স্থাপনের বিষয়ে বাণিজ্য সচিবের কাছে ২০০৬ সালের ১৩ মে প্রথম অনুরোধ জানায় বিজিএমইএ। গার্মেন্টপল্লী প্রকল্প প্রণয়নের জন্য সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র কুটির শিল্প করপোরেশন (BSCIC) ও বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (BGMEA)-এর মধ্যে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ২০১০ সালের ৪ জুলাই প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় গার্মেন্টস শিল্পের জন্য একটি বিশেষ গার্মেন্ট জোন বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়। ৭৪৫ কোটি ৫০ লাখ টাকা ব্যয় ধরে বাউশিয়া গার্মেন্ট শিল্পপার্ক প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (ADP) পিপিপি'র আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ প্রকল্পে ডাইং, ওয়াশিং ও ফিনিশিং শিল্পের জন্য ৯৭৬টি শিল্প প্লট থাকবে। প্রকল্পের আওতায় সিইটিপি, ডাম্পিং ইয়ার্ডসহ আধুনিক শিল্পপার্কের সব সুবিধা থাকবে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

◆ জিএসপি

GSP-এর পূণরূপ Generalized System of Preferences, যার বাংলা অর্থ অগ্রাধিকারমূলক প্রবেশাধিকার সুবিধা। ১৯৬৪ সালে UNCTAD তার সম্মেলনে উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য বিশেষ বাণিজ্যিক সুবিধা প্রদান ব্যাপারটি আলোচনা করে। উক্ত আলোচনার সূত্র ধরে জিএসপি তৈরির সুপারিশ করা হয়, যার আওতায় শিল্পোন্নত দেশগুলো উন্নয়নশীল দেশগুলোকে স্বেচ্ছায় ও প্রতিদানের প্রত্যাশা না করেই (non-reciprocal) বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সুবিধাদি প্রদান করবে। স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ইউরোপীয় ইউনিয়ন বা ইইউ ভুক্ত দেশগুলোতে পণ্য রপ্তানীর ক্ষেত্রে ট্যারিফ সুবিধা পেয়ে আসছে। অবশ্য এ সুবিধা অর্জন করতে হলে রপ্তানী পণ্যের জন্য প্রযোজ্য রুলস অব অরিজিন (Rules of Origin)-এর শর্তাবলী মিটাতে হয়। ইইউ সর্বপ্রথম জিএসপি বাস্তবায়ন করে। ইইউ-এর জিএসপি ১৯৭১ সালে চালু হয়। শুরুতে তা শিল্পজাত পণ্য ও প্রায় সব কৃষি পণ্যের জন্য প্রযোজ্য ছিল। ২০০১ সালের মার্চ মাস হতে জিএসপি সুবিধা অস্ত্র, গোলাবারুদ ও মাদকদ্রব্য ছাড়া (Everything But Arms-EBA) সব পণ্যের জন্য প্রযোজ্য হচ্ছে। জিএসপি সুবিধা বাংলাদেশ ছাড়াও ভারত, পাকিস্তান, চীন, থাইল্যান্ড ইত্যাদি উন্নয়নশীল দেশগুলো ভোগ করে। পার্থক্য হচ্ছে স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ও আরও ৪৮টি দেশের পণ্য জিএসপি-র আওতায়, রুলস অব অরিজিন মান্যতা সাপেক্ষে, সম্পূর্ণ শুল্ক মুক্ত প্রবেশাধিকার পায়। অন্যদিকে উন্নয়নশীল দেশগুলো রুলস অব অরিজিন মান্যতা সাপেক্ষে ১৫% শুল্ক রেয়াত পায়। ২০০৫ সালের ১ জানুয়ারি থেকে এ জিএসপি সুবিধা উঠে যায়। এখানে উল্লেখ্য যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জিএসপি সুবিধা বাংলাদেশের পণ্যের জন্য প্রয়োজন নেই, কেননা সেখানে রপ্তানীর কোটা রয়েছে। বাংলাদেশ অবশ্য কঠোর রুলস অব অরিজিন এর কারণে ইইউ-র জিএসপি স্কীম এর আওতায় খুব কম পণ্যের ক্ষেত্রেই সুবিধা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে।

ইউরোপে জিএসপি : ১৯৭১ সাল থেকে স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে শুল্ক সুবিধা দিয়ে আসছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন। বর্তমানে যে জিএসপি চলছে, তা প্রণীত হয়েছে ২০০৮ সালে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলো তাদের দেশে আমদানির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারমূলক প্রবেশাধিকার সুবিধা বা জিএসপি (Generalized System of Preferences– GSP) সংশোধন করেছে। ২০১৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে নতুন এ জিএসপি বাস্তবায়ন শুরু হবে। বর্তমানে ১৭৬টি উন্নয়নশীল, স্বল্পোন্নত দেশ ও ভূখণ্ড ইইউ'তে অগ্রাধিকার সুবিধা পায়। নতুন স্কিমে এখন থাকছে ৮৯টি দেশ। এর মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশসহ ৪৯টি স্বল্পোন্নত দেশ এবং ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কাসহ ৪০টি উন্নয়নশীল দেশ। বাকি ৮৭টি দেশ ও ভূখণ্ডের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হওয়ায় ইইউ (EU) তাদের অগ্রাধিকার সুবিধা দেয়ার তালিকা থেকে বাদ দিয়েছে। তবে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য সব সুবিধা আগের মতোই থাকবে। অর্থাৎ জিএসপি সুবিধার আওতায় অস্ত্র ছাড়া সবকিছুই ইইউতে রপ্তানি করতে পারবে স্বল্পোন্নত দেশগুলো। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে কিছু নতুন করে পরীক্ষা-নিরীক্ষার শর্ত দিয়েছে ইইউ। যেমন, শ্রম ইস্যুতে ইইউ এখন থেকে কেবল আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আইএলও-র মানদণ্ডের ওপরই নির্ভর করবে না, নিজেরাও পর্যবেক্ষণ করবে। তার ভিত্তিতে জিএসপি সুবিধা দেয়া হবে।

◆ ট্রেড ইউনিয়ন

শ্রমিকদের কল্যাণে নিয়োজিত এবং শ্রমিকদের নিয়ে গঠিত সংঘ বা সংস্থাকে বলা হয় ট্রেড ইউনিয়ন। এটি শিল্প-কারখানা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারীদের এমন একটি সংগঠন, যার মাধ্যমে শ্রমজীবী জনগোষ্ঠী তাদের নিজস্ব অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার তুলে ধরতে এবং তা আদায় ও সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনে লড়াই-সংগ্রাম করতে পারে। বিশ্বের যে কোনো গণতান্ত্রিক দেশে

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তুলে পেশাজীবীদের ন্যায়সম্মত দাবি আদায় করার বিষয়টি 'জাতিসংঘ মানবাধিকার সনদ' এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার অন্যতম ঘোষিত মূলনীতি।

বিশ্বের প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে ওঠে লন্ডনে; ১৬৬৭ সালে। পাক-ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন 'অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস'। পাকিস্তান জন্মের পর প্রথম গঠিত ট্রেড ইউনিয়ন 'পাকিস্তান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন'; গঠিত ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭। বাংলাদেশের ট্রেড ইউনিয়ন শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ ১৯৬৯ [Industrial Relations Ordinance 1969]-এর সাথে জড়িত। বাংলাদেশ সরকারের শ্রম পরিদপ্তরের নিবন্ধিত ট্রেড ইউনিয়ন ২২টি।

◆ তৃতীয় জাতীয় শ্রমনীতি

১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ব্যাংক, বীমা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, অধিকাংশ শিল্প ও সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করা হয়। জাতীয়করণের পর এসব প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় নানা অসুবিধা দেখা দেয়। এসব দূর করতে বাংলাদেশ সরকারের প্রথম শ্রমমন্ত্রী জহুর আহমেদ চৌধুরী ১৯৭২ সালে দেশে প্রথম শ্রমনীতি ঘোষণা করেন। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ও প্রগতির লক্ষ্যে শিল্পে শান্তি বজায় রাখাই ছিল এ নীতির মূল উদ্দেশ্য। এরপর ১৯৮০ সালে তৎকালীন শ্রম ও শিল্পমন্ত্রী রেয়াজ উদ্দিন আহমেদ (ভোলা মিয়া) দেশের দ্বিতীয় শ্রমনীতি ঘোষণা করেন। এ নীতির উল্লেখযোগ্য দিক ছিল বেসরকারি খাতের শ্রমিকদের যে কোনো সমস্যা সরকার, মালিকপক্ষ ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের অর্থাৎ ত্রিপক্ষীয় প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে সমাধান করতে হবে। এতে শ্রমিকদের কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ, শিল্প সম্পর্ক ও শ্রম কল্যাণের ব্যাপারে দিকনির্দেশনা ছিল। এরপর দীর্ঘ ৩২ বছরেও কোনো শ্রমনীতি ঘোষিত হয়নি। কিন্তু শ্রমবাজারের প্রেক্ষাপটে ঘটেছে অনেক পরিবর্তন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ২০১০ সালের ১৪ নভেম্বর জাতীয় শ্রমনীতি ২০১০-এর খসড়া সবার মতামতের জন্য প্রকাশ করে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। ৭ মে ২০১২ মন্ত্রিপরিষদ সম্মেলন কক্ষে মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে জাতীয় শ্রমনীতি (National Labour Policy) ২০১২-এর খসড়া চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়া হয়। এ শ্রমনীতির উদ্দেশ্য বিনিয়োগ সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে সকল কর্মক্ষম নাগরিকের জন্য উৎপাদনশীল, বৈষম্যহীন, শোষণমুক্ত, শোভন, নিরাপদ এবং স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা এবং সকল ক্ষেত্রে শ্রমিকের অধিকার ও শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা।

◆ বাংলাদেশের সবুজ অর্থনীতি

পরিবেশের প্রতি নির্দয় ও বিরূপ আচরণে সবুজ সংকটের এক উচ্চ ঝুঁকির মুখে দাঁড়িয়ে আছে বর্তমান বাংলাদেশ। অপ্রিয় হলেও সত্য, মানুষের নির্বিচার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ফলেই এ সার্বিক সবুজ সংকট। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে খাতভিত্তিকভাবে যার অবদানও উল্লেখযোগ্য। কিন্তু কেবল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বা উন্নতি দেশের টেকসই উন্নয়ন নয়। প্রকৃতি, পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এর সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একটি আরেকটির পরিপূরক। তাই একদিকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বা উন্নয়ন, অন্যদিকে তার সাথে পরিবেশ সংরক্ষণ— দুই-ই দেশের জন্য অপরিহার্য। এমন প্রেক্ষাপটে 'সবুজ অর্থনীতি'ই হতে পারে যুগপৎ উন্নয়নের শ্রেষ্ঠ বিকল্প মাধ্যম। মধ্যম আয়ের দেশের পথে আগুয়ান সবুজ সংকটে জর্জরিত দেশের জন্য বরং সবুজ অর্থনীতি এক অসাধারণ উপায়রূপে আবির্ভূত হয়েছে। আর এ পথে অনেকটাই ধাবিত বাংলাদেশ। গৃহীত কার্যক্রমগুলো হলো : পরিবেশবান্ধব প্রয়োজনীয় নীতিমালা, কৌশল, কর্মপরিকল্পনা, আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন ও জারি ⊙ নবায়নযোগ্য জ্বালানি কর্তৃপক্ষ আইন অনুমোদন ⊙ নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবস্থার প্রসার, যেমন— সৌর বিদ্যুৎ ও

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের দ্রুত সম্প্রসারণ কর্মসূচি ⊙ নবায়নযোগ্য জ্বালানির বাণিজ্যিক উৎপাদনের উপর থেকে পাঁচ বছরের জন্য আয়কর মওকুফকরণ ⊙ উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী গড়ে তোলা কার্যক্রম ⊙ পরিবহনে তুলনামূলক কম দূষণকারী জ্বালানি ব্যবহার বৃদ্ধি ⊙ পৌর বর্জ্য থেকে কমপোস্ট বা জৈব সার তৈরির সিডিএম প্রকল্প চালু এবং ইতোমধ্যেই এর কার্বন ক্রেডিট লাভ ⊙ ইটভাটা থেকে সৃষ্ট মারাত্মক বায়ু দূষণের হ্রাসের লক্ষ্যে এগুলোকে পরিবেশবান্ধব উন্নত প্রযুক্তিতে রূপান্তরের প্রক্রিয়া চালুকরণ ⊙ Polluters Pay Principle-এর আওতায় পরিবেশগত ছাড়পত্রের শর্তানুসারে শিল্পসমূহের দূষণ নিয়ন্ত্রণে এনফোর্সমেন্ট ও মনিটরিং কার্যক্রম জোরদারকরণ ⊙ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১১ তারিখে Green Banking-এর নীতিমালা জারি ইত্যাদি।

◆ স্বাস্থ্য খাতের নতুন পঞ্চবার্ষিক কর্মসূচি

বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতে ২০১১-১৬ সালের জন্য তৃতীয় কর্মসূচি স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টিখাত উন্নয়ন কর্মসূচি (HPNSDP)। ২৩ আগস্ট ২০১১ এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের পরিকল্পনা একনেকে অনুমোদন পায়। সম্প্রতি সরকার ও বিশ্বব্যাংকের মধ্যে এ কর্মসূচি বিষয়ে একটি চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়। HPNSDP'র উল্লেখযোগ্য লক্ষ্য হচ্ছে–২০১৬ সালের মধ্যে শিশু মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৫২ থেকে ৩১-এ হ্রাসকরণ, পাঁচ বছরের নিচে শিশু মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৬৫ থেকে ৪৮-এ হ্রাসকরণ, নবজাতকের মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৩৭ থেকে ২১-এ হ্রাসকরণ, মাতৃ মৃত্যুর হার প্রতি হাজার জীবিত জন্মে ১৯৪ থেকে ১৪৩-এ হ্রাসকরণ, দক্ষ প্রসবকারীর মাধ্যমে প্রসবের হার ২৬ থেকে ৫০ শতাংশে উন্নীতকরণ, জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের হার ৬১.৭ থেকে ৭২ শতাংশে উন্নীতকরণ, স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে অতিরিক্ত তিন হাজার ধাত্রী নিয়োগ, রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের সংখ্যা ৫৩ হাজার ৬৩ থেকে ৭০ হাজারে বৃদ্ধিকরণ, সেবিকার সংখ্যা ২৭ হাজার থেকে ৪০ হাজারে উন্নীতকরণ, কমিউনিটি ক্লিনিকের সংখ্যা ১৩ হাজার ৫০০-তে বৃদ্ধিকরণ, সব উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৩১ থেকে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ ইত্যাদি।

◆ জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০

সাম্প্রদায়িক এবং ধর্মনিরপেক্ষতার বদলে অসাম্প্রদায়িক চেতনাবোধ নিয়ে অনুমোদন হয় জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০। ১৯৭৫ সালের ড. কুদরত-ই-খুদা এবং ১৯৯৭ সালের অধ্যাপক শামসুল হক শিক্ষা কমিশনের সুপারিশের ওপর ভিত্তি করে প্রণীত হয় এ শিক্ষানীতি। ২০০৯ সালের ৮ এপ্রিল জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীকে প্রধান করে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন পর্যায়ে মতবিনিময় ও সংযোজন-বিয়োজন করে ১ জুন অনুমোদন পায় জাতীয় এ শিক্ষানীতি। পরবর্তীতে ২০১০ সালের ৭ ডিসেম্বর জাতীয় সংসদে গৃহীত হয় শিক্ষানীতি। শিক্ষানীতির উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো হচ্ছে : তিনটি জাতীয় স্তরে বিভক্ত করা হয় শিক্ষাব্যবস্থাকে। প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক স্তর। নবম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মাধ্যমিক স্তর। পরবর্তী স্তরকে উচ্চ শিক্ষার স্তরে বিভক্ত করা হয়। O এবং A- লেভেলের জন্য বাংলাদেশ স্টাডিজ বিষয়টি আবশ্যিক করা হয়। আদিবাসীদের জন্য আদিবাসী শিক্ষক ও পাঠ্যপুস্তকের ব্যবস্থা করা। সাধারণ শিক্ষার মতো মাদ্রাসা শিক্ষার শিক্ষকদের বেতন-ভাতা, উচ্চতর প্রশিক্ষণ ও গবেষণার সুযোগ সমানভাবে উন্মুক্ত রাখা। কওমি মাদ্রাসার জন্য আলাদা শিক্ষা কমিশন করা হবে। পাঁচ বছর বয়স্ক শিশুদের জন্য প্রাথমিকভাবে এক বছরমেয়াদি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু। যেসব গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই, সেসব গ্রামে কমপক্ষে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা। পঞ্চম শ্রেণী শেষে উপজেলা/থানা পর্যায়ে অভিন্ন সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। অষ্টম শ্রেণী শেষে পাবলিক পরীক্ষা

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

অনুষ্ঠিত হবে (JSC)। দশম শ্রেণী শেষে জাতীয় ভিত্তিতে পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে (SSC)। দ্বাদশ শ্রেণী শেষে আরো একটি পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে (HSC)। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের এক মাসের মধ্যে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।

◆ উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা

আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জন এবং বিশেষ শিক্ষণ চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে আলাদাভাবে সমন্বিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে পরিচালিত কার্যক্রমই হলো উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগবঞ্চিত নির্দিষ্ট বয়সের শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের জন্য মৌলিক শিক্ষালাভের দ্বিতীয় সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি বৃত্তিমূলক শিক্ষার মাধ্যমে ভবিষ্যতে বৃত্তি গ্রহণে ইচ্ছুক এবং বর্তমানে কোনো বৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীকে দক্ষ জনসম্পদে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশে উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। উল্লেখ্য, উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় দু'ধরনের বয়সের শিক্ষাবঞ্চিতদের শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। ১১ থেকে ১৪ বছর বয়স্ক কিশোর-কিশোরী এবং ১৫-৩৫ বা তদূর্ধ্ব বয়স্কদের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করাই এর লক্ষ্যে। এ শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো : (১) এটি নমনীয় শিক্ষাব্যবস্থা। শিক্ষালাভের সময়, স্থান, বিষয়বস্তু, পদ্ধতি, কৌশল পূর্বনির্ধারিত হলেও শিক্ষার্থীদের সুবিধা অনুসারে পরিবর্তনের সুযোগ থাকে। (২) এ শিক্ষা স্থানীয় কোনো লক্ষ্য অর্জন ও বিশেষ যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করার লক্ষ্যে পরিকল্পিত ও পরিচালিত হয়। (৩) জীবনের যে কোনো বয়সে এ শিক্ষা লাভের সুযোগ থাকে।

◆ ইভটিজিং

'ইভটিজিং' শব্দটি যৌন হয়রানির একটি অমার্জিত (Slang) ভাষা, যা সৃষ্টি বিবরণে পবিত্র কুরআন ও বাইবেলে বর্ণিত প্রথম নারী 'হাওয়া' ও 'ইভ'কে নির্দেশ করে। আমাদের উপমহাদেশে প্রচলিত এ শব্দটির শাব্দিক বাংলা প্রতিশব্দ 'উত্ত্যক্ত করা'। শব্দটি দ্বারা নারীকে উত্ত্যক্ত করা বোঝায়। তবে এর মধ্যেই 'ইভটিজিং' শব্দটির গূঢ়ার্থ সীমিত নয়; বরং এটি মূলত এক ধরনের ইউফেমিজম (Euphemism); অর্থাৎ উত্ত্যক্ত করার আড়ালে থাকে যৌন প্রবৃত্তির নির্লজ্জ মোড়ক উন্মোচন। যেসব কাজ বা আচরণ ইভটিজিং-এর অন্তর্ভুক্ত, সেগুলো হচ্ছে— লম্পট চাহনী, টিটকারি, ব্যঙ্গবিদ্রূপ, অশালীন মন্তব্য, অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি, শিস বাজানো, উস্কানিমূলক তালি বাজানো, গায়ে ধাক্কা দেয়া, সম্মতির বিরুদ্ধে নারীর অঙ্গ স্পর্শ করা, উদ্দেশ্যমূলকভাবে যৌন আবেদনময়ী গান গাওয়া, হুমকি প্রদান, যৌন অর্থবাহী ছবি বা ভিডিও দেখানো, পিছু নেয়া, যৌন ইঙ্গিতমূলক ভাষা ব্যবহার করে ঠাট্টা বা উপহাস করা, মুঠোফোনে বারবার মিসড কল দেয়া, যৌন ইঙ্গিতবাহী মেসেজ পাঠানো, প্রেম ও যৌন সম্পর্ক স্থাপনে চাপ প্রয়োগ, ব্ল্যাকমেইল অথবা চরিত্র হননের উদ্দেশ্যে স্থির বা চলমান চিত্র ধারণ করা, যৌন নিপীড়ন বা হয়রানির কারণে খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক, প্রাতিষ্ঠানিক এবং শিক্ষাগত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করা ইত্যাদি।

ইভটিজিং থেকে রেহাই পাওয়া নারীর সংখ্যা শূন্যের কোঠায়। প্রত্যেক নারী তার জীবনের কোনো না কোনো সময় যেমন কৈশোরের আহ্লাদিত সময়, তারুণ্যের চপলতা, যৌবনের উচ্ছলতা বা মধ্যবয়সের ভাবগাম্ভীর্যের সময়েও এ নির্যাতনের শিকার হন। কলেজ ছাত্র, বেকার যুবক থেকে শুরু করে ফেরিওয়ালা, রিক্সাচালক, বাসচালক, সহযাত্রী, সহকর্মী ও তত্ত্বাবধায়কসহ সবাই এ অপরাধের সাথে জড়িত। ইভটিজিং রোধে সুনির্দিষ্ট কোনো আইন নেই। তবে দেশে বিদ্যমান কয়েকটি আইনে এ সম্পর্কিত ধারা উল্লেখ আছে। যথা : ১. 'দণ্ডবিধি' (বাংলাদেশের অপরাধ সংক্রান্ত প্রধান আইন গ্রন্থ)– ধারা ৫০৯; ২. নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০৩ (সংশোধনী)-এর ১০ নং ধারা এবং ৩. মহানগর পুলিশ অধ্যাদেশ ১৯৭৬-এর ৭৬ নং ধারা।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

◆ কালো টাকা

সাধারণত করযোগ্য অর্থের কর ফাঁকি দিয়ে অবৈধ আয়ের যে অংশ নগদ টাকায় গচ্ছিত রাখা হয় তাকে কালো টাকা বলে। কালো টাকা মূলত হিসাববহির্ভূত ও জাতীয় অর্থস্রোত-বহির্ভূত অর্থ। কর ফাঁকি দেয়ার জন্য এ টাকার হিসাব সরকারের কাছে গোপন রাখা হয় বলে এই টাকা হিসাববহির্ভূত। কালো টাকা সাধারণত অবৈধ উপায়ে যেমন- কালোবাজারি, অবৈধ পাচার, চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই ইত্যাদির মাধ্যমে আয় করে থাকে। ফলে কালো টাকার মালিক জনসম্মুখে তার সম্পদের প্রকাশ করতে এবং সরকারকে হিসাব দিতে ভয় পায়। কিছু সামাজিক অপরাধী ব্যবসার ছদ্মবেশেও কোটি কোটি কালো টাকা আয় করে থাকেন, তাদের কর্মকে আড়াল করতে এবং লোকচক্ষুকে ফাঁকি দিতে তারা সময় সময় বিভিন্ন দাতব্য প্রতিষ্ঠান, এতিমখানা, মাদ্রাসা, মসজিদে বড় অংকের দান করে থাকে। অনেকে তাদের এই অবৈধ টাকা বিভিন্ন লাভজনক ব্যবসা যেমন অ্যাপার্টমেন্ট ব্যবসা, গার্মেন্টস, জনশক্তি রপ্তানি ইত্যাদি খাতে বিনিয়োগ করে থাকে। তাই কালো টাকার মালিকদের চিহ্নিত করা খুবই কষ্টকর। তবে যে কোনো ব্যক্তির আয়ের সাথে তার সম্পদের হিসাব মিলিয়ে অবৈধ আয় বের করা যায়। তাই কালো টাকা বর্জন করা যেমন সবার কর্তব্য তেমনি কর্তব্য কালো টাকার মালিকদের সামাজিকভাবে পরিহার করা। কারণ এরা দেশ ও জাতির শত্রু।

◆ রূপকল্প ২০২১

২০২১ সাল নাগাদ বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের ও প্রযুক্তিনির্ভর ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার চূড়ান্ত সময়কাল হচ্ছে 'রূপকল্প ২০২১'। এগারো বছর মেয়াদি (২০১০-২০২১) একটি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (Perspective plan) এবং এর ওপর ভিত্তি করে ষষ্ঠ ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত এ রূপকল্প অর্জিত হবে। রূপকল্পের বাংলাদেশ একটি অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল ও উদার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্বপ্ন। যেখানে সম্ভাব্য উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম একটি দ্রুত বিকাশমান অর্থনীতি দারিদ্র্যের লজ্জা ঘুচিয়ে মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ নিশ্চিত করবে। এটি একটি প্রকৃত অংশীদারিত্বমূলক সহিষ্ণু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, যেখানে নিশ্চিত হবে সামাজিক ন্যায়বিচার, নারীর অধিকার ও সুযোগের সমতা, আইনের শাসন, মানবাধিকার, সুশাসন, দূষণমুক্ত পরিবেশ। সেই বাংলাদেশে স্থিতিশীল থাকবে দ্রব্যমূল্য, আয়-ব্যয় ও দারিদ্র্য নেমে আসবে ন্যূনতম পর্যায়ে, সবার জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিত হবে, ব্যাপকভাবে বিকশিত হবে মানুষের সৃজনশীলতা ও সক্ষমতা, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা পাবে, হ্রাস পাবে সামাজিক বৈষম্য, প্রতিষ্ঠা পাবে জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট বিপর্যয় মোকাবেলার সক্ষমতা। তথ্যপ্রযুক্তিতে বিকশিত হয়ে সেই বাংলাদেশ পরিচিত হবে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' হিসেবে।

◆ কাব্যসাহিত্য *[৩৪তম বিসিএস]*

কবিতাকে কেন্দ্র করে যে সাহিত্য রচনা হয় তাই কাব্যসাহিত্য। কবির মনের ভাবকল্পনা যখন অনুভূতিরঞ্জিত যথাবিহিত শব্দ সম্ভারে বাস্তব সুষমামণ্ডিত চিত্রাত্মক ও ছন্দোময় রূপ লাভ করে তখনই তাকে কবিতা বলে। অন্যদিকে চিন্তাধারা ও কল্পনার সুবিন্যস্ত ও সুপরিকল্পিত রূপ হলো সাহিত্য। বাংলা সাহিত্য বলতে এক সময় কেবল কাব্য সাহিত্যকেই বুঝানো হতো। কাব্য সাহিত্যের ইতিহাস হাজার বছরেরও অধিক। এ ইতিহাসকে তিনভাগে ভাগ করা হয়। প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগ। প্রাচীন যুগের পাওয়া যায় বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন চর্যাপদ। মধ্যযুগে রচিত হয়েছে বড় বড় কাব্য সাহিত্য। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও মঙ্গলধারার কাব্য গ্রন্থগুলো বাংলা কাব্য সাহিত্যকে অনেকগুণে সমৃদ্ধ

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

করেছে। আধুনিক যুগে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ছিল গদ্যের রাজত্ব। তারপর মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা কবিতায় নিয়ে আসেন আধুনিকতা। রবীন্দ্রনাথ ও তার পরবর্তী কবিদের দ্বারা আমাদের কাব্য সাহিত্য বিশ্বময় পরিচিতি লাভ করে। বাংলার অপরূপ প্রকৃতি আর্থ-সামাজিক অবস্থা, নারীর প্রেম, বাংলা ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা হলো বাংলা কাব্য সাহিত্যের মূল উপজীব্য বিষয়।

◆ বাজার অর্থনীতি *[২৯তম বিসিএস]*

বাজার অর্থনীতি হলো এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বাজারকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়। অর্থাৎ বাজার শক্তির মাধ্যমে উৎপাদন, বণ্টন, দাম নির্ধারণ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ নির্ধারিত হয়। এ ধরনের অর্থনীতিতে ভোগ, উৎপাদন প্রভৃতি বিষয়ে অর্থনৈতিক এককগুলোর অবাধ স্বাধীনতা বিরাজমান বলে ধরে নেয়া হয়। অর্থনীতিতে কতটুকু উৎপাদন হবে, উৎপাদিত দ্রব্যের দাম কি হবে ইত্যাদি এককগুলোর ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। বাজারে বিদ্যমান চাহিদা ও সরবরাহের পরিমাণই বাজার অর্থনীতির নির্দেশক হিসেবে কাজ করে। এগুলো (উৎপাদন, ভোগ, বিনিময়) ঠিক করে দেয়ার জন্য পৃথক কোনো কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের প্রয়োজন হয় না।

◆ কুমিল্লা মডেল *[১৭তম বিসিএস]*

কুমিল্লা জেলার কোটবাড়ী নামক স্থানে ১৯৫৯ সালে স্বনামখ্যাত সমাজকর্মী অধ্যক্ষ আখতার হামিদ খান ব্যক্তিগত উদ্যোগে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (BARD) নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। বাংলাদেশের পল্লী এলাকার দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন পরিকল্পনার যে উদ্যোগ নেয়া হয় তা থেকে BARD-এর সৃষ্টি। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল গ্রামের কৃষকদের দ্বি-স্তরবিশিষ্ট সমবায় সমিতির মাধ্যমে সংগঠিত করা এবং স্বল্পমূল্যে কৃষি উপকরণ ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে কৃষি উৎপাদন ও কৃষকের আয় বৃদ্ধি করা। এছাড়াও একাডেমীর গৃহীত পদক্ষেপ ও কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকারি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পরীক্ষামূলক প্রকল্প পরিচালনা এবং পল্লী উন্নয়নের ওপর সেমিনার-আলোচনা ইত্যাদির আয়োজন করা। প্রশিক্ষণের সুবিধার্থে এখানে প্রশিক্ষণ প্রার্থীদের আবাসিক ব্যবস্থা, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ওয়ার্কশপ, ক্যান্টিন প্রভৃতি সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। BARD-এর বহুমুখী অবদান ও কার্যকলাপের জন্য একে 'কুমিল্লা মডেল' নামেও অভিহিত করা হয়। প্রথম দিকে এটি ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত হলেও বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি একজন পরিচালক এবং নির্দিষ্ট সংখ্যক সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সমন্বয়ে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত হচ্ছে।

◆ আইসিডিডিআর,বি *[১১তম বিসিএস]*

International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh (ICDDR,B) বা আন্তর্জাতিক উদরাময় রোগ গবেষণা কেন্দ্র ১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি ঢাকার মহাখালীতে অবস্থিত। ICDDR,B একটি অলাভজনক স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। আন্তর্জাতিক সাহায্যে পরিচালিত এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ হচ্ছে উদরাময় সংক্রান্ত যাবতীয় রোগের গবেষণা করা এবং সহজলভ্য ওষুধ উদ্ভাবন ও চিকিৎসা সুবিধা বৃদ্ধি করা। চাঁদপুর জেলার মতলব থানায় এর একটি ফিল্ড স্টেশন রয়েছে। ঢাকা ও মতলবে অবস্থিত হাসপাতালে বিনা পয়সায় উদরাময়ের চিকিৎসা প্রদান করা হয়। প্রথমে ICDDR,B-এর মেয়াদ ২০০৩ সাল পর্যন্ত থাকলেও ১৯৯৮ সালে জাতীয় সংসদে আইন পাসের মাধ্যমে এর মেয়াদ ২০২৮ সাল পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। ICDDR,B-এর পূর্ব প্রতিষ্ঠান Cholera Research Laboratory স্থাপিত হয় ১৯৬৪ সালে। এ প্রতিষ্ঠানই ১৯৬৮ সালে ওরস্যালাইন আবিষ্কার করে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

◆ জাতীয় অর্থনীতিতে হরতালের প্রভাব

প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে হরতালের ব্যবহার শুরু হলেও, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে হরতাল শব্দটি আতঙ্কের নাম। প্রাণহানি, বোমাবাজি, অগ্নিসংযোগ, ভাংচুর, গ্রেপ্তার, হামলা-পাল্টা হামলা প্রভৃতি হরতালের সাধারণ চিত্র। হরতালে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় দেশের অর্থনীতি। আমাদের দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব একটা ভালো নয়। বর্তমানে এ অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার প্রধান হাতিয়ার হিসেবে দেখা দিয়েছে হরতাল। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর ঘন ঘন হরতালে দেশের অর্থনীতি এখন ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে। হরতালের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, উৎপাদন, বৈদেশিক বিনিয়োগসহ নানাবিধ খাত। একদিনের হরতালে দেশের কোটি কোটি টাকার লোকসান হয়। কলকারখানা সব বন্ধ থাকে। জনগণের দুর্ভোগ পোহাতে হয়। হরতালের ফলে বিদেশীরা এ দেশে বিনিয়োগ করতে আগ্রহ প্রকাশ করে না। এতে আমাদের অর্থনীতি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

◆ পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ৭ নং আইন)-এর ধারা ৪ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে ৩১ আগস্ট ২০১৪। যা গেজেট আকারে প্রকাশিত হয় ২ সেপ্টেম্বর ২০১৪। ২ জুলাই ২০১৪ পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক আইন জাতীয় সংসদে পাস হয়, যাতে রাষ্ট্রপতি সম্মতি দেন ৮ জুলাই। পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের মালিকানা থাকবে 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্পের সুবিধাভোগী সমিতিগুলোর হাতে ৪৯% এবং সরকারের হাতে ৫১%। এ পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য সংখ্যা হবে ১৫ জন। তাদের আটজন সরকার মনোনীত ও বাকি সাতজন সমিতিগুলো থেকে আসবেন। সদস্যদের মধ্য থেকেই একজনকে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেবে পর্ষদ। তবে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন নিতে হবে। পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধন হবে এক হাজার কোটি টাকা। অনুমোদিত মূলধন প্রতিটি ১০০ টাকার ১০ কোটি সাধারণ শেয়ারে সমভাবে বিভক্ত হবে। ব্যাংক সরকারের অনুমোদনক্রমে সময়ে সময়ে মূলধন বৃদ্ধি করতে পারবে। ব্যাংকের পরিশোধিত শেয়ার মূলধন হবে ২০০ কোটি টাকা, যার ৫১ ভাগ সরকার এবং ৪৯ ভাগ সমিতি কর্তৃক পরিশোধ করা হবে। ঋণগ্রহীতা শেয়ারহোল্ডার তার শেয়ার সমশ্রেণির অপর ঋণগ্রহীতার কাছে হস্তান্তর করতে পারবেন। পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক নামে প্রথমে দেশের ৪৮৫ উপজেলায় শাখা নিয়ে যাত্রা শুরু করবে ব্যাংকটি। মূলত ভিন্নভাবে গ্রামীণ মানুষের সঞ্চয় সংগ্রহ ও তাদের মধ্যে ঋণ বিতরণের জন্য গ্রামে গ্রামে শাখা খুলবে। ১৯৯৬ সালে প্রথমবারের মতো চালু হয় 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্প। পরবর্তীতে প্রকল্পটি বন্ধ করে দেয়া হলেও ২০১০ সালে তা আবারো চালু হয়। এরপর ২০১১ সালের সেপ্টেম্বর থেকে নতুন আঙ্গিকে ক্ষুদ্র সঞ্চয় কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়। এর ফলে দেশব্যাপী সমিতি গঠিত হয় ১৭,৩০০টি যেখানে উপকৃত পরিবারের সংখ্যা ১০ লাখ ৩৮ হাজার এবং উপকারভোগী মানুষের সংখ্যা ৫০ লাখ। এখন এরা সবাই পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের সদস্য হবেন।

◆ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত ছয়টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক (২০১১-১৫) পরিকল্পনার মেয়াদ শেষ হবে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে। আর ২০১৫-১৬ অর্থবছরে শুরু হবে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

পাঁচ বছর মেয়াদি এ পরিকল্পনায় সর্বোচ্চ গুরুত্ব পাচ্ছে কর্মসংস্থানসহ ৬টি বিষয়। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছর মেয়াদে বাস্তবায়ন করা হবে। সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্য আয়ের দেশে পরিণত করতে 'প্রেক্ষিত পরিকল্পনা' নামে একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। এ পরিকল্পনাটি মূলত দুটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হচ্ছে। একটি হচ্ছে চলমান ষষ্ঠ এবং অপরটি হবে সপ্তম (প্রক্রিয়াধীন) পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে বাস্তবায়ন করা হবে।

অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ৬ খাত

- বিদ্যুৎ ও জ্বালানি নিরাপত্তা
- মানবসম্পদ উন্নয়ন
- ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ
- আইসিটি খাতের ব্যাপক প্রয়োগ
- জলবায়ু পরিবর্তন
- আয় ও আঞ্চলিক বৈষম্য কমিয়ে আনা

৫. বাংলাদেশের পরিবেশ ও প্রকৃতি এবং চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা : রক্ষণাবেক্ষণ, সংরক্ষণ ও টেকসইকরণ

◆ সামাজিক বনায়ন *[২৮তম বিসিএস]*

জনসাধারণ, বিশেষ করে পল্লীর জনগণ এবং দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের অর্থনৈতিক, বাস্তুসংস্থানিক ও সামাজিক সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সাধারণ মানুষকে সম্পৃক্ত করে পরিচালিত বনায়ন। সামাজিক বনায়নের লক্ষ্য কেবল 'গাছ নয়, গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীও'। এ ধরনের সহায়তার লক্ষ্য শুধু গাছ লাগানো ও সেসব গাছের যত্ন নেয়ার জন্য নয়, বরং গাছ রোপণকারীরা যাতে লাগানো গাছের সুফল পাওয়ার আগ পর্যন্ত সসম্মানে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে তারও নিশ্চয়তা বিধান। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা প্রদত্ত সামাজিক বনায়নের সংজ্ঞা হচ্ছে, 'বনায়ন কার্যক্রমে জনগণকে সরাসরি সম্পৃক্তকরণের যে কোনো পরিস্থিতি।' এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থসাহায্যে গৃহীত গোষ্ঠী বনায়ন প্রকল্প থেকেই মূলত সামাজিক বনায়নের কর্মসূচি শুরু। এ প্রকল্পে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের সাতটি বৃহত্তর জেলা অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ প্রকল্পের কার্যক্রম ১৯৮১ থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত চলে। গোষ্ঠীভিত্তিক বনায়ন প্রকল্পের সফলতার পরিপ্রেক্ষিতে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক 'থানা বনায়ন ও নার্সারি উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন করে। এ প্রকল্প সুন্দরবন ও বৃহত্তর চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলের জেলাগুলো ছাড়া সারা দেশে বিস্তৃত ছিল। আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক ১৯৯২-৯৩ সালে শুরু হওয়া ৭ বছর মেয়াদি প্রকল্পে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার বন বিভাগে বন ব্যবস্থাপনার দুটি অংশগ্রহণমূলক মডেল উন্নয়ন অন্তর্ভুক্ত ছিল। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী নামে আরেকটি শরিকানামূলক সামাজিক বনায়ন প্রকল্প থানা বনায়ন ও নার্সারি উন্নয়ন প্রকল্পের ধারণার ভিত্তিতে ১৯৯৪-৯৫ সালে শুরু হয়। উপকূলীয় ১০টি জেলা এ প্রকল্প অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। উল্লেখ্য বর্তমানে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচির সাথে ৫ লক্ষের বেশি উপকারভোগীকে সম্পৃক্ত করা হয় এবং ইতোমধ্যেই নগদ ১৫৬ কোটি ৩৭ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা ৯৪,৯৬৫ জন দরিদ্র উপকারভোগীর মধ্যে বিতরণ করা হয়। এ কার্যক্রমটি সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

◆ ঘূর্ণিঝড় 'মহাসেন'

১৬ মে ২০১৩ বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় আঘাত হানে ঘূর্ণিঝড় 'মহাসেন'। আঘাত হানার আগে সরকারি ও বেসরকারিভাবে নানা প্রস্তুতি নেয়ায় প্রাণহানির সংখ্যা কম হলেও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল অপূরণীয়। ভারত মহাসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপ ১০ মে ২০১৩ দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় সামান্য উত্তর-পশ্চিম দিকে সরে গিয়ে আরো ঘনীভূত হয়ে ঘূর্ণিঝড় 'মহাসেন'-এ রূপ নেয়, যা আবহাওয়াবিদদের কাছে 01B নামে পরিচিত ছিল। ১৬ মে ২০১৩ পটুয়াখালী জেলার খেপুপাড়ায় আঘাত হানার মাধ্যমে উপকূল অতিক্রম করতে শুরু করে। এরপর তা ভোলা, বরগুনাসহ বিভিন্ন এলাকায় বৃষ্টি ঝরিয়ে মেঘনা মোহনা হয়ে নোয়াখালী এবং চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড দিয়ে স্থলভাগ অতিক্রম করে। ২৭৭-৩০৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সিংহল দ্বীপ (বর্তমানে শ্রীলংকা) শাসন করা বৌদ্ধ রাজা মহাসেনের নামে নামকরণ করা হয় এ ঘূর্ণিঝড়টির। সমুদ্রবেষ্টিত শ্রীলংকাবাসীর পানীয় জলের কষ্ট দূর করতে বহুসংখ্যক দীঘি খনন করে তিনি প্রজাদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। তিনি ছিলেন দেশের বৃহৎ সেচ সংরক্ষণাগার নির্মাণের পথিকৃৎ।

◆ ভয়াবহতম ভবন ধস ও সাভার ট্রাজেডি

ইতিহাসের বীভৎসতম ভবন ধসের ঘটনার সাক্ষী সাভারের রানা প্লাজা। ২৪ এপ্রিল ২০১৩ সাভার বাজার বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন ৯ তলা রানা প্লাজা ধসে পড়ে। এ ঘটনায় প্রাণ হারান ১১২৯ জন যাদের প্রায় সবাই ছিলেন গার্মেন্টি শ্রমিক। ধ্বংসস্তূপে উদ্ধার অভিযান চালিয়ে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে ২৪৩৮ জনকে যাদের অধিকাংশই আহত কিংবা পঙ্গুত্ব বরণ করেছে। এছাড়া নিখোঁজ রয়েছে আরো ৩ শতাধিক মানুষ। ২৪ এপ্রিল হঠাৎ বিকট শব্দ করে কয়েক মিনিটের মধ্য পুরো নয়তলা ভবনটি ধসে দোতলার সমান হয়ে যায়। তিনতলা থেকে নয়তলা পর্যন্ত ভবনে মোট চারটি গার্মেন্টস ছিল এবং নিচতলা ও দোতলায় ছিল শপিং সেন্টার ও ব্যাংক। রানা প্লাজা ধসের পরপরই স্থানীয় জনগণ, পথচারী ও হতাহতদের স্বজনেরা ছুটে যান উদ্ধার কাজে। এছাড়া ছাত্র-শিক্ষক, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য, সরকারি-বেসরকারি উদ্ধারকর্মীসহ সর্বস্তরের নারী-পুরুষ যোগ দেয় এ উদ্ধার কাজে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ইট-সুরকির ধ্বংসাবশেষের ভেতরে চাপা পড়া মানুষদের তারা একে একে উদ্ধার করে আনতে থাকে। ধ্বংসস্তূপে হারানো স্বজনদের খুঁজে ফেরা মানুষ নিদ্রাহীন ক্লান্ত চোখে হাজারো প্রিয়জনের খোঁজে তাকিয়েছিল সাভারের ঐতিহাসিক দুর্ঘটনা কবলিত রানা প্লাজার ধ্বংসস্তূপের দিকে। হাসপাতাল, মর্গ, অধরচন্দ্র হাইস্কুল, ধ্বংসস্তূপ প্রভৃতি স্থানে দিকবিদিক ছোটাছুটি করছিল নিহত-আহতদের স্বজনেরা। দুরুদুরু বুকে দীর্ঘ প্রতীক্ষা, কখন দেখা মিলবে নিখোঁজ প্রিয়জনের। এমনি হাজারো উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় দুর্ঘটনার ২১ দিন পর রানা প্লাজার অভিযান শেষ হয় ১৪ মে ২০১৩।

◆ হাওর মহাপরিকল্পনা

হাওর অঞ্চলের সম্পদ উন্নয়নে সরকার হাওর এলাকার জন্য ২০ বছরের এক মহাপরিকল্পনা অনুমোদন করেছে। এতে জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে এ সমাজসেবায় পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা থাকবে এবং আয় ও সম্পদের সমবণ্টন নিশ্চিত করা হবে। ৩ মে ২০১২ বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ডের তৃতীয় বৈঠকে এ অনুমোদন দেয়া হয়। বৈঠকে নেত্রকোনা ও হবিগঞ্জ জেলায় বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ডের জেলা অফিস স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়। তিন পর্যায়ে এটি বাস্তবায়িত হবে। ২০১২-১৩ আর্থিক বছর থেকে এর বাস্তবায়ন কাজ শুরু এবং ২০৩১-৩২ আর্থিক বছরে এটি শেষ হবে। বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে প্রায় ২০ লাখ হেক্টর আয়তনের হাওর এলাকা রয়েছে। এ এলাকায়

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

প্রায় দুই কোটি লোক বসবাস করে এবং রয়েছে চমৎকার জলজ প্রতিবেশগত বৈশিষ্ট্য। সমন্বিতভাবে গৃহীত এ পরিকল্পনায় রয়েছে– বন্যা ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ সংরক্ষণ, ফসল উৎপাদন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সংরক্ষণ, শিক্ষা, বসতি স্থাপন, স্বাস্থ্য সুবিধা, স্যানিটেশন, শিল্পকারখানা, বনায়ন, খনিজ সম্পদের ব্যবহার এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি উৎপাদন।

◆ কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত

বঙ্গোপসাগরের তীরে অবস্থিত কক্সবাজার বাংলাদেশ তথা পৃথিবীর অন্যতম মনোরম ও স্বাস্থ্যকর স্থান। কক্সবাজারের সমুদ্র সৈকত পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত। সৈকতের দৈর্ঘ্য ১২০ কিলোমিটার। কক্সবাজারের মতো সুদীর্ঘ বালুকাময় সমুদ্র সৈকত পৃথিবীর খুব কম স্থানেই রয়েছে। এই সুদীর্ঘ সৈকতের মনোরম দৃশ্য দেশী-বিদেশী পর্যটকদের কাছে খুবই আকর্ষণীয়। এখানকার মনোরম দৃশ্য উপভোগ করার জন্য দেশী-বিদেশী হাজার হাজার পর্যটক বেড়াতে আসেন। ১৭৯৭ সালে বার্মার (মায়ানমার) আরাকান অঞ্চলে গোলযোগ দেখা দিলে আরাকান এলাকা থেকে বাঙালিদের তাড়িয়ে দেয়া হয়। এই বিতাড়িত ছিন্নমূল বাঙালিরা বর্তমান কক্সবাজার, উখিয়া, গুনডুম প্রভৃতি এলাকায় আশ্রয় নেয়। ঐ সময় ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একজন দূত ক্যাপ্টেন কক্স বার্মার রাজদরবারে কাজ করতেন। তিনি কোম্পানির নির্দেশে এখানকার শরণার্থীদের তদারকি ও ত্রাণসামগ্রী বিতরণের জন্য কক্সবাজারে ছুটে আসেন। তখন এখানকার সমগ্র এলাকা মশা ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল এবং বিশুদ্ধ পানির অভাবের দরুন মানুষ বসবাসের অযোগ্য ছিল। ক্যাপ্টেন কক্স এমন পরিবেশে দারুণ অস্বস্তিবোধ করলেও শরণার্থীদের ফেলে চলে গেলেন না বরং তাদের জন্য কাজ করতে থাকেন। তখন এই সাগরতীরের নাম ছিল 'পালংকি'। অবশেষে ১৮০২ সালে ক্যাপ্টেন কক্স এখানেই মারা যান এবং তাঁর নামানুসারেই এই স্থানটির নামকরণ করা হয় 'কক্সবাজার'।

বর্তমানে কক্সবাজার আধুনিক সাজে সজ্জিত এবং বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় পর্যটন কেন্দ্র। এখানে কয়েকটি অত্যাধুনিক পর্যটন হোটেল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের ৮/১০ কিলোমিটার দক্ষিণে হিমছড়ি অবস্থিত। এই স্থানটি চলচ্চিত্র শুটিং স্পট হিসেবে খুবই প্রসিদ্ধ। এছাড়াও কক্সবাজারের আশেপাশে বৌদ্ধ যুগের অনেক প্রাচীন কীর্তি এখনো বিদ্যমান। এখানকার প্যাগোডাগুলো খুবই দর্শনীয়। এখানে একটি আবহাওয়া অফিস ও একটি বাতিঘর আছে। এখানে মারমা ও রাখাইনসহ অনেক উপজাতির বসবাস রয়েছে।

◆ সেন্টমার্টিন দ্বীপ

কক্সবাজার জেলার টেকনাফের সমুদ্র উপকূল থেকে ৪৮ কিলোমিটার দূরে বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত একটি ছোট প্রবাল দ্বীপ সেন্টমার্টিন। এটিই বাংলাদেশের একমাত্র সামুদ্রিক প্রবাল দ্বীপ। চারদিকে সমুদ্র সৈকত দ্বারা পরিবেষ্টিত রাশি রাশি পাথর আর শৈল জমে তৈরি হয়েছে এই প্রবাল দ্বীপ। এর আয়তন ৮ বর্গ কিলোমিটার এবং আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ ৫০০ একর। লোকসংখ্যা প্রায় ৪ হাজার। দ্বীপটিতে রয়েছে অসংখ্য নারিকেল গাছ, কেয়াবন ও কাঁটাযুক্ত গুল্মের ঝোঁপ। তাই দ্বীপটির আঞ্চলিক নাম হয়েছে নারিকেল জিঞ্জিরা। দ্বীপটিতে ৪৯০টি পরিবার, ৬টি গ্রাম, ৩টি ওয়ার্ড, ১টি প্রাইমারি স্কুল, ১টি জুনিয়র হাই স্কুল এবং ১টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র রয়েছে। এখানে রয়েছে প্রচুর চুনাপাথর ও নুড়ি পাথর। তাছাড়া খনিজ সম্পদের জন্য অর্থনৈতিক দিক থেকে দ্বীপটির রয়েছে প্রচুর সম্ভাবনা। এর চারপাশে সমুদ্র তলদেশে প্রচুর প্রবাল রয়েছে, যেগুলো প্রক্রিয়াজাত করে বিদেশে রপ্তানি করা যেতে পারে। দ্বীপের অধিবাসীদের প্রায় ৯৫% মৎস্যজীবী এবং একমাত্র যোগাযোগ ব্যবস্থা হলো নৌ-পথ। দ্বীপটিকে একটি পর্যটন স্পট হিসেবে গড়ে তোলার উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

◆ ম্যানগ্রোভ অরণ্য *[৩৪তম বিসিএস]*

লোনা পানি বা কাদার মধ্যে জেগে থাকা খুঁটির মতো এক ধরনের শ্বাস গ্রহণকারী শিকড়বিশিষ্ট উদ্ভিদকে ম্যানগ্রোভ বলে। আর যে বনে প্রচুর পরিমাণে এ ধরনের গাছ জন্মে সে বনকে ম্যানগ্রোভ বন বলে। ম্যানগ্রোভ বন বিশ্বের গ্রীষ্মমণ্ডলীয় উপকূলে জন্মায়। শান্ত সাগর, খাড়ি ও নদীর মোহনা এ বনের উপযুক্ত স্থান। ম্যানগ্রোভ বনে গাছপালা-লতাগুল্ম লবণাক্ত সাগরের তীরে আপনা আপনিই গড়ে ওঠে। এবং গাছপালা-লতাগুল্মের রয়েছে বিশেষ বৈশিষ্ট্য। গাছের বীজ থেকে প্রায় ৩০ সেন্টিমিটার লম্বা মূল গজায়। জলে বা ডাঙায় বীজ পড়েই মূলকে ওপর দিকে রাখে। কাদা বা মাটি পেলে মূল বীজের সহায়তায় জীবন্ত প্রাণীর মতো তা আঁকড়ে ধরে। মূল কাজ করে শ্বাসমূল হিসেবে। স্রোতে বালুকণা ভেসে যাবার সময় শ্বাসমূল বালু ও পলি জমা করে। ম্যানগ্রোভ এভাবে ভূখণ্ড তৈরি করে। গাছের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কিছু শিকড় মাটির তলায়, কিছু ওপর দিকে থাকে। একে বলে 'শূল'। এটি খুব ধারালো। বিশ্বের সেরা প্রজাতির গাছপালাসমৃদ্ধ ম্যানগ্রোভ জঙ্গলকে বলা হয় লাল ম্যানগ্রোভ (Rhitophoramangle)। এ বন রয়েছে ফ্লোরিডা থেকে শুরু করে দক্ষিণ আমেরিকা ও পশ্চিম আফ্রিকা উপকূলে। এ বনে গুল্ম ও ফার্ন জাতীয় ছোট গাছ জন্মে। কিছু প্রজাতির গাছ ২৫ মিটার লম্বা হয়। গাছের বাকলে ট্যানিক এসিড থাকে। এটি চামড়া ট্যান করতে ব্যবহৃত হয়। সুন্দরবন পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন।

◆ বিপন্ন প্রাণীকুল *[৩৪তম বিসিএস]*

মানুষ, প্রাণী ও উদ্ভিদজগৎ, মাটি, পানি, বায়ু, নদী, সাগর ইত্যাদি সবকিছু নিয়েই পরিবেশ। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় উপরের প্রতিটি উপাদানেরই ভূমিকা অনস্বীকার্য। বলা যায় এসব পরিবেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং একটি অন্যটির সাথে গভীরভাবে যুক্ত। কিন্তু আজ নানাভাবে পরিবেশের ক্ষয়সাধন হওয়ায় বিশেষভাবে উদ্ভিদজগতের উপর বিভিন্ন ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের কারণে প্রাণীকুল আজ অস্তিত্বের হুমকির সম্মুখীন। নির্বিচারে বনাঞ্চল ধ্বংসসাধন, পাহাড় কর্তন, নদী দূষণসহ পরিবেশের উপর নানা বিরূপ কর্মকাণ্ডের ফলে ইতোমধ্যেই অনেক প্রাণীর পৃথিবী থেকে বিলুপ্তি ঘটেছে, অনেক প্রাণী বিলুপ্তির সম্মুখীন। বিশ শতকের শুরুতে পৃথিবীতে বাঘের সংখ্যা ছিল লক্ষাধিক। কিন্তু পরিবেশের উপর নানা বিরূপ কর্মকাণ্ড ও বাঘ শিকারের কারণে আজ বাঘের সংখ্যা সারা বিশ্বে ছয় হাজারেরও কম। বাংলাদেশে বনাঞ্চল ও পাহাড়ি ভূমি কমে যাওয়া ও মানুষের হাতে নির্বিচারে মারা যাওয়ায় বাঘ, হাতি, হরিণের মতো প্রাণীর সংখ্যা দিন দিন কমছে। খাদ্যের খোঁজে এই প্রাণীগুলো লোকালয়ে নেমে আসছে এবং মানুষের হাতে নির্বিচারে মারা পড়ছে।

◆ পর্ণমোচি বৃক্ষের বন *[৩৪তম বিসিএস]*

যে বনাঞ্চলের উদ্ভিদগুলোর পাতা বছরের কোনো না কোনো সময় ঝরে পড়ে, সে বনাঞ্চলকে ক্রান্তীয় পর্ণমোচী বা পত্রঝরা বনাঞ্চল বলা হয়। এ বনের প্রধান বৃক্ষ হলো শাল। প্লাইস্টোসিন যুগে উত্থিত বাংলাদেশের বরেন্দ্রভূমি, মধুপুর গড় ও লালমাই পাহাড়ে পত্রঝরা বনাঞ্চল দেখা যায়। চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী, নওগাঁ, জয়পুরহাট ও দিনাজপুরের অংশবিশেষ নিয়ে বরেন্দ্রভূমি গঠিত। টাঙ্গাইল, জামালপুর, গাজীপুর, ঢাকা ও নরসিংদীর কিছু অংশ নিয়ে মধুপুর গড় গঠিত। লালমাই পাহাড় কুমিল্লায় অবস্থিত।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

◆ স্পারসো (SPARRSO) *[১৭তম বিসিএস]*

Space Research and Remote Sensing Organisation (SPARRSO) বা মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন কেন্দ্র প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি প্রতিষ্ঠান। এটি ঢাকার আগারগাঁওয়ে অবস্থিত। SPARRSO কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে বিভিন্ন কাজ করে থাকে। স্পারসোর 'LAND SAT' ও 'NOA' নামের কৃত্রিম উপগ্রহ ভূমি জরিপ কাজে নিয়োজিত। সাভারে অবস্থিত Sattelite Ground Receiving Station খরা ও বন্যায় ক্ষতির পরিমাপ, ভূমি জরিপ, ভূমিক্ষয়, মাটির লবণাক্ততা নির্ণয়, বন শ্রেণীবিভাগ, সমুদ্রে পানির উচ্চতা, পুকুরের সংখ্যা নির্ণয়, বোরো ধান চাষাবাদের এলাকা পরিমাপ করা, চিংড়ি চাষ এলাকা, ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল ও বঙ্গোপসাগরের ক্লোরোফিলপূর্ণ এলাকা পরিমাপ করে। বর্তমানে ঢাকাতে আছে জিও স্টেশনারি 'Metrological Sattelite.' এটা দুই ঘণ্টা পর পর ঝড়, সাইক্লোন, মেঘ, বৃষ্টি ইত্যাদি আবহাওয়ার পূর্বাভাসের রিপোর্ট দিচ্ছে।

◆ তামাক নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা ২০১৫

দেশে তামাকজনিত ক্ষতি হ্রাসে সরকার ১৬ জুন ২০০৩ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার উদ্যোগে গৃহীত আন্তর্জাতিক চুক্তি WHO Framework Convention of Tobacco Control (WHOFCTC) স্বাক্ষর করে। এ চুক্তির বিধানাবলি প্রতিপালনে এবং ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্যের উৎপাদন, ব্যবহার, ক্রয়-বিক্রয় ও বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণের লক্ষে সরকার 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫' প্রণয়ন করে। ২০০৬ সালে প্রণীত হয় এ সংক্রান্ত বিধিমালা। কিন্তু কিছু দুর্বলতার কারণে আইনটি কার্যকর ভূমিকা রাখতে না পারায় ২০১৩ সালের মে মাসে আইনটি যুগোপযোগী করে সংশোধিত আকারে পাস করা হয়। নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে ২৩ মাস পর সংশোধিত আইনের আলোকে প্রণীত বিধিমালাটি ১২ মার্চ ২০১৫ গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়। আইনের ধারা ৪ অনুযায়ী, 'পাবলিক প্লেস' ও 'পাবলিক পরিবহনে' ধূমপান সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়। আইনে ২৪ ধরনের স্থানকে 'পাবলিক প্লেস' হিসেবে ঘোষণা করা হয়— শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি অফিস, আধা-সরকারি অফিস, স্বায়ত্তশাসিত অফিস ও বেসরকারি অফিস, গ্রন্থাগার, লিফট, আচ্ছাদিত কর্মক্ষেত্র, হাসপাতাল ও ক্লিনিক ভবন, আদালত ভবন, বিমানবন্দর ভবন, সমুদ্রবন্দর ভবন, নৌবন্দর ভবন, রেলস্টেশন ভবন, বাস টার্মিনাল ভবন, প্রেক্ষাগৃহ, প্রদর্শনী কেন্দ্র, থিয়েটার হল, বিপণি ভবন, চতুর্দিকে দেয়াল দ্বারা আবদ্ধ রেস্টুরেন্ট, পাবলিক টয়লেট, শিশুপার্ক, মেলা বা পাবলিক পরিবহনে আরোহনের জন্য যাত্রীদের অপেক্ষার নির্দিষ্ট সারি, খেলাধুলা ও অনুশীলনের জন্য নির্ধারিত আচ্ছাদিত স্থান, জনসাধারণ কর্তৃক সম্মিলিতভাবে ব্যবহার্য অন্য কোনো স্থান। আর 'পাবলিক পরিবহন' হিসেবে ঘোষণা করা হয় ৮ প্রকার যানবাহনকে— মোটরগাড়ি, বাস, রেলগাড়ি, ট্রাম, জাহাজ, লঞ্চ, যান্ত্রিক সব রকম জনযানবাহন, উড়োজাহাজ। এসব 'পাবলিক প্লেস' ও 'পাবলিক পরিবহনে' ধূমপান করলে অভিযুক্ত ব্যক্তি অনধিক ৩০০ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৬. বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ : টেকসই ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা

◆ ফ্লাড অ্যাকশন প্ল্যান (FAP) *[১৭তম বিসিএস]*

বাংলাদেশে নদীশাসন কার্যক্রমের একটি প্রকল্প হলো বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প (Flood Action Plan-FAP)। ১৯৯০ সালের দিকে পরীক্ষামূলকভাবে FAP-এর কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে গাইবান্ধায় ৩ কি. মি. দীর্ঘ বেড়ীবাঁধ ও ৬টি গ্রোয়েন নির্মাণ করা হয়। এর ফলে যমুনা নদীর গতি পরিবর্তিত হয়েছে সত্য কিন্তু তাতে নদী তীরবর্তী প্রায় ৬ লক্ষাধিক মানুষ এবং সারা দেশের প্রায় ২৬ লক্ষ মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রকল্পাধীন বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি থানার কালিতলায় ৫৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে গ্রোয়েন উন্নয়ন, ব্রহ্মপুত্র ও বাঙালী নদী একত্রীকরণ রোধ এবং বগুড়ার মাথুরাপাড়ায় সিরাজগঞ্জে নদী তীরসংলগ্ন এলাকা সংরক্ষণের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। ১৯৯৫ সালের বন্যায় গাইবান্ধায় FAP-এর শাসন প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়লে এ প্রকল্পটি পানি উন্নয়ন বোর্ড ও ওয়াটার রিসার্চ অ্যান্ড প্লানিং অর্গানাইজেশন (WRPO)-এর অধীনে ন্যস্ত হয়।

◆ গঙ্গা-কপোতাক্ষ *[১০ম বিসিএস]*

গঙ্গা-কপোতাক্ষ প্রকল্প দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সেচ প্রকল্প। ১৯৪৫ সালে তৎকালীন সরকার কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করতে কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারায় গঙ্গা-কপোতাক্ষ বা জিকে প্রকল্প স্থাপন করে। এ প্রকল্পের আওতায় প্রধানত ধান উৎপন্ন করা হয়। কুষ্টিয়া, যশোর, মাগুরা, ঝিনাইদহ ও চুয়াডাঙ্গার ২ লাখ ২ হাজার জমি এই প্রকল্পের আওতাধীন। ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত খরিপ–১ ও খরিপ–২ মৌসুমে যথাক্রমে আউশ ও আমন ধানের সেচ দেয়া হতো। কিন্তু নদীতে পানির পরিমাণ কমে যাওয়ার ফলে কিছুদিনের জন্য আউশ ধান উৎপাদন স্থগিত রাখা হয়। পরবর্তীতে পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় এখন উভয় মৌসুমেই ধান চাষ করা হচ্ছে। কিন্তু প্রকল্পের দুটি বড় পাম্প অচল থাকায় সেচকার্যে চরম ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়েছে। তারপরও দক্ষিণবঙ্গের কৃষকদের এক বড় অংশের শেষ অবলম্বন হিসেবে জিকে প্রকল্প তার কার্যক্রম যথাযথভাবে চালিয়ে যাবার চেষ্টা করছে এবং জাতীয় উৎপাদনে বিরাট ভূমিকা রাখছে।

◆ নিরাপদ পানি

পৃথিবীর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তরল পদার্থ হলো পানি। পানি ছাড়া এ পৃথিবীতে প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের অস্তিত্ব কল্পনা করাও অসম্ভব। কেননা পানির অপর নাম জীবন। এটা ছাড়া জীবজগৎ বাঁচতে পারে না। নিরাপদ পানি মানবদেহের জন্য খুবই উপকারী কিন্তু বর্তমান বিশ্বজুড়ে বিশুদ্ধ পানি হ্রাস পাচ্ছে এবং পানি দূষণের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পৃথিবীর প্রায় চার ভাগের তিন ভাগ জুড়েই রয়েছে পানি। পানিতেই জীবনের প্রথম আবির্ভাব ঘটে। আবার অধিকাংশ জীবদেহের ৬০ শতাংশই পানি। তাই পানির ব্যবহারে নিরাপদ পানি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। নিরাপদ পানির চাহিদা বিস্তৃত ও ব্যাপক। কৃষি, গৃহস্থালি ও শিল্পের প্রয়োজনে পানির রয়েছে ভোগ্য (Consumptive) চাহিদা। আবার নৌচলাচল, মৎস্য, লবণাক্ততা নিয়ন্ত্রণ, দূষণ হ্রাসকরণ প্রভৃতি প্রয়োজনে রয়েছে পানির অ-ভোগ্য (Non-consumptive) চাহিদা। প্রতিবেশগত প্রতিরক্ষা এবং জলাভূমি সংরক্ষণে পানির প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। বাংলাদেশে পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার কতকগুলো জটিল ও দুরূহ ক্ষেত্র রয়েছে। এসবের মধ্যে প্রধান হচ্ছে বর্ষা মৌসুমে বন্যা ও শুষ্ক মৌসুমে খরার সমস্যা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধির সাথে সঙ্গতি রেখে ক্রমবর্ধমান পানির চাহিদা মোকাবিলা, নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন,

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

হয়। ক্রীড়াক্ষেত্রে দেশের প্রতিভাবান ও সম্ভাবনাময় ছেলেদের বাছাই করে বিকেএসপিতে ভর্তি করা হয় এবং উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। খেলাধুলার যাবতীয় আধুনিক সরঞ্জাম দিয়ে বিকেএসপিকে সাজানো হয়েছে। বিকেএসপির কৃতী ক্ষুদে ফুটবল খেলোয়াড়রা ১৯৯০ সালে ডেনমার্কের আন্তর্জাতিক ডানা কাপ এবং সুইডেনের আন্তর্জাতিক গোথিয়া কাপে চ্যাম্পিয়ন হয়ে দেশের জন্য অভূতপূর্ব সম্মান বয়ে এনেছিল। ষষ্ঠ সাফ গেমসে দ্রুততম মানব বিমল চন্দ্র তরফদার বিকেএসপির একজন কৃতী ছাত্র।

◆ বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম তথা উত্তরবঙ্গের সর্ববৃহৎ জাদুঘর বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর। বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর বাংলাদেশের গৌরবময় অতীত ইতিহাসের নিদর্শনসমূহ সংরক্ষণ ও গবেষণার ব্যাপারে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বঙ্গজ ভাস্কর্য শিল্পের শ্রেষ্ঠ সংরক্ষণাগার এ জাদুঘরের সূচনা ঘটে ১৯১০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। বাংলাদেশের ইতিহাসে এ সমিতি প্রথম জাদুঘর কার্যক্রম শুরু করে।

বরেন্দ্র অঞ্চল এবং বাংলার ইতিহাস, শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম, সমাজ প্রভৃতি বিষয়ে প্রামাণ্য তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য জমিদার কুমার শরৎকুমার রায়ের ব্যক্তিগত অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর অদম্য জ্ঞানপিপাসা এবং পুরাতত্ত্বের প্রতি গভীর অনুরাগ এ প্রচেষ্টাকে সার্থক রূপ দিতে সহায়তা করেছিল। তিনি নিজ ব্যয়ে এ জাদুঘর ভবন নির্মাণ করেন। ১৯১৬ সালের ১৩ নভেম্বর বাংলার গভর্নর লর্ড কারমাইকেল এ জাদুঘর উদ্বোধন করেন।

১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর জাদুঘরের অবস্থা অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক দিক দিয়ে শোচনীয় হয়ে পড়ে। বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান হিসেবে গৃহীত হয়েছে ১৯৬৪ সালের ১০ অক্টোবর। প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই জাদুঘরটি জ্ঞানান্বেষীদের আকৃষ্ট করে আসছে। ক্রমে এর সংগ্রহের গুণগত ও পরিমাণগত সমৃদ্ধি সাধিত হয়েছে। এর বিভিন্ন প্রদর্শনী কক্ষগুলোতে রয়েছে সিন্ধু সভ্যতা, মহাস্থানগড়, নালন্দা ও পাহাড়পুরের বহু নিদর্শন, বাংলাদেশের প্রাক-ইসলামী যুগের শিলালিপি, মুদ্রা, তাম্রলিপি, দলিল, ফরমান ও ভাস্কর্য। এছাড়া রয়েছে একটি দুষ্প্রাপ্য পুস্তক ও পত্রিকা সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার।

বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর প্রাচীন ভাস্কর্য, ধাতব মূর্তি, মুদ্রা, পাণ্ডুলিপি প্রভৃতিতে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। বর্তমানে এখানে সংগ্রহের পরিমাণ রয়েছে ভাস্কর্য ৯ হাজার, পাণ্ডুলিপি ৪ হাজার, ১ হাজার ১০০ প্রস্তর ও ধাতব মূর্তি, ৬১টি প্রাচীন লেখচিত্র, ১ হাজার ৩০০ প্রাচীন মুদ্রা, ৯০০ পোড়ামাটির ভাস্কর্য, ৩২টি অস্ত্র, ২১টি আরবি-ফার্সি দলিল। প্রদর্শন ব্যবস্থার উন্নয়ন, আবহমান বাংলা ও মুসলিম ঐতিহ্য কক্ষের সংযোজন, একটি অত্যাধুনিক সংরক্ষণশালা নির্মাণের মাধ্যমে ৪৫০০ বাংলা, সংস্কৃত পুঁথি সংরক্ষণের ব্যবস্থা ইত্যাদি। এখানে আছে আব্বাসীয়, মোঘল, সুলতানী, নবাবী আমলের অসংখ্য নিদর্শন, কুরআন শরীফ, মুসলিম নবাব ও সুলতানদের হাতে লেখা ফরমান, মুসলিম পুঁথি, শিলালিপি, পেইন্টিং, অলংকৃত ধাতবপত্র, যুদ্ধাস্ত্র, কামান, তলোয়ার, নানা মূর্তি ছাড়াও আরো অনেক কিছু। জাদুঘরে একটি নতুন গ্যালারি 'আবহমান বাংলা' উদ্বোধন করা হয়েছে। গ্রামবাংলার লোকঐতিহ্যকে অত্যন্ত নিপুণভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে আবহমান বাংলা গ্যালারিতে। এছাড়া বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতি ও উপজাতির নানা ধরনের নিদর্শন, বাদ্যযন্ত্র, অস্ত্রশস্ত্র ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি রয়েছে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

পুরাকীর্তির নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে মুসলিম রাজা-বাদশাহের ছবি, জীবনালেখ্য, হস্তলিপি, তৈলচিত্র, দুর্লভ চিঠিসহ মূল্যবান আরবি ও ফার্সি দলিলপত্র, শিলালিপি এবং বিভিন্ন মুসলিম ঐতিহাসিক ব্যক্তির স্মৃতিচারণমূলক দ্রব্যাদি, পোশাক, টুপি, কলম, বর্ম, তলোয়ার, জুতা প্রভৃতি। বর্তমানে জাদুঘরে ২১টি আরবি ও ফার্সি দলিল, ১৬১৬টি শিলালিপি, ৬১টি বাংলা পাণ্ডুলিপি, ৩২টি তাম্র শিলালিপি, ১০৫০০টি অস্ত্রশস্ত্র, ১৪০০ পুস্তক-পুস্তিকা, ৯২৭টি পোড়ামাটির ভাস্কর্য, পাত্রফলক ও প্রাচীন মুদ্রা, ২৫৩০টি সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি, ১১০০ রকম ধাতবমূর্তি, ৩০০টি পোশাক ও হস্তলিপি প্রভৃতি সংগৃহীত আছে।

◆ অমর একুশে বইমেলা

বইমেলার ইতিহাস প্রাচীন। খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের স্টুরব্রিজের বইমেলাকে প্রথম আনুষ্ঠানিক বইমেলা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ১৮০২ সালে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত আমেরিকার কোম্পানি অব বুক সেলার্সের বইমেলাটি ছিল পূর্ণাঙ্গ বইমেলা। ১৯৪৯ সালে ফ্রাঙ্কফুর্টে অনুষ্ঠিত বইমেলাই হচ্ছে বিশ্বের বৃহত্তম বইমেলা। বাংলাদেশে বইমেলার ঐতিহ্য বেশিদিনের নয়। স্বাধীনতার পর ১৯৭৪ সালে মুক্তধারা ও পুঁথিঘর-এর স্বত্বাধিকারী চিত্তরঞ্জন সাহার উদ্যোগে প্রথম বইমেলা শুরু। ১৯৭৮ সালে বাংলা একাডেমীর উদ্যোগে প্রাতিষ্ঠানিক বইমেলার সূচনা হয়। ১৯৮৫ সাল থেকে বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত বইমেলার নাম দেয়া হয় 'অমর একুশে গ্রন্থমেলা'। ১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলন বাঙালি জাতির সাংস্কৃতিক চেতনাকে শাণিত করেছে। এ আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালি জাতি ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের কবল থেকে ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদে উন্নীত হয়। এর ফলে একুশের বইমেলায় যুক্ত হয়েছে বাঙালির সাংস্কৃতিক আবেগ। বই জ্ঞানের প্রতীক। বলা হয় মানুষ বই দিয়ে অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে সাঁকো বানিয়ে দিয়েছে। তাছাড়া কোনো জাতির জ্ঞানের ভাণ্ডার শূন্য থাকলে তার ধনের ভাণ্ডারও পূর্ণ থাকে না। কাজেই বইকে নিত্যসঙ্গী করতে না পারলে মানুষের জ্ঞানচর্চার স্ফূর্তি ঘটে না। বইমেলার মাধ্যমে অনেকগুলো বইয়ের সমারোহ গড়ে তোলা হয়। দর্শক-ক্রেতারা মেলায় এসে নানা জাতীয় বই দেখে তাদের প্রয়োজনীয় ও পছন্দমাফিক বইটি কিনতে পারেন। মেলায় বিশেষ কমিশনও প্রদান করা হয়। এতে ক্রেতা সাধারণের কিছু আর্থিক সাশ্রয়ও হয়ে থাকে। তাছাড়া মেলা উপলক্ষে যেসব সাংস্কৃতিক কর্মসূচি ঘোষণা করা হয় এবং অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয় এর ফলে সাংস্কৃতিক চেতনার মানও বৃদ্ধি পায়। একুশের বইমেলা পুস্তক প্রকাশন, প্রদর্শনী ও বিক্রয়ের সাথে সাথে আমাদের জাতীয় মননচর্চার ক্ষেত্রেও ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে চলেছে। এ মেলায় গমন করে, বই কিনে এবং সহযোগিতা করে এরূপ জাতীয় কাজকে এগিয়ে নেয়া সবার কাম্য।

◆ ২১'র জাতিসংঘ স্বীকৃতি

ইউনেস্কোর পর জাতিসংঘও একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। ৫ ডিসেম্বর ২০০৮ জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে এ স্বীকৃতি দেয়া হয়। ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর জাতিসংঘের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ইউনেস্কো প্রথম একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। পররাষ্ট্র দফতর 'শান্তির জন্য সংস্কৃতি' শীর্ষক একটি রেজুলেশন জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশন তুলে ধরে। ভারত, জাপান, সৌদি আরব, কাতারসহ বিশ্বের ১২৪টি দেশ এ রেজুলেশনটি সমর্থন করে। এ রেজুলেশনে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে এবং 'শান্তির জন্য সংস্কৃতি' ও 'সংস্কৃতির সাথে সংস্কৃতির সংলাপ'কে উৎসাহিত করতে মাতৃভাষাগুলোর অবদানের স্বীকৃতি দেয়ার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

◆ লোকগীতি *[৩৪তম বিসিএস]*

লোকসঙ্গীত বা লোকগীতি বাংলা লোকসাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। এসব লোকসঙ্গীতের মধ্যে গ্রামবাংলার আবেগ-অনুভূতি, তাদের দুঃখ-বেদনা-আনন্দ লুকিয়ে আছে। এসব গানের সুরের মূর্ছনা এখনও আমাদের পাগল করে।

মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে
আমি আর বাইতে পারলাম না।
আবার বিরহের গান, যেমন—
বিদেশ গিয়া বন্ধু তুমি আমায় ভুইলো না
কিংবা হালকা রসের গান–
বন্ধু তিনদিন তোর বাড়িত গেলাম
দেখা পাইলাম না। বন্ধু তিন দিন–

এসব গান আমাদের মনকে নাড়া দেয়। এরপর রয়েছে বাংলার জারি, সারি, মুর্শিদি, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, বাউল, গাজীর গান। এগুলো লোকসাহিত্যের ভাণ্ডারকে করেছে সমৃদ্ধ। দীর্ঘদিন ধরে এসব রচনা লোকচিত্তে আনন্দের সামগ্রী হয়ে রস যুগিয়ে আসছে।

◆ ললিতকলা *[৩৪তম বিসিএস]*

গীতবাদ্য বা নৃত্য, চিত্রাঙ্কন, সাহিত্য রচনা বিশেষ করে কাব্য-নাটকাদি প্রভৃতি চারুকলা বা চারুশিল্পের অধীন। ললিতকলা একটি শিল্পকলা, যার মধ্যে রয়েছে সঙ্গীত, আবৃত্তি, অভিনয়, নৃত্য ইত্যাদি। বহু সুধীজনের মতে ললিতকলা চারু ও কারুকলার অন্তর্ভুক্ত। ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত পাঁচটি ললিতকলা হলো– ১. অঙ্কন, ২. ভাস্কর্য, ৩. স্থাপত্য, ৪. সঙ্গীত ও ৫. কাব্য (যার মধ্যে রয়েছে মঞ্চনাটক এবং নৃত্য)। অঙ্কন ও চিত্রকলাকে বলা যায় বস্তু-আশ্রিত মানস ফসল যেমন– আলপনা, পটচিত্র, ঘটচিত্র, দেয়ালচিত্র, অঙ্গচিত্র প্রভৃতি। ভাস্কর্য শিল্পের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পোড়ামাটি, পাথর, কাঠ, হাড়ে তৈরি শিল্পই ভাস্কর্য। তাছাড়া বিভিন্ন ধাতব ভাস্কর্য (মূর্তি) দেখা যায়। স্থাপত্য প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত। গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্য একটি দেশের শিল্পরুচির পরিচয় বহন করে। সঙ্গীত সারা বিশ্বে একটি জনপ্রিয় গণমাধ্যম। গীত, বাদ্য ও নৃত্য এই তিনের সমন্বিত রূপই হচ্ছে সঙ্গীত। কাব্য নাটক বিশেষ করে মঞ্চনাটকে নৃত্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গণমাধ্যম। খ্রিষ্টপূর্বেও গ্রিক সভ্যতায় নাট্যচর্চা লক্ষ্য করা যায়। মঞ্চনাটক অভিনয়ের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নাটক একটি যৌথ শিল্প। নাটকের একটি বড়গুণ উৎকণ্ঠা অর্থাৎ দর্শককে উৎকণ্ঠিত করে রাখবে বিভিন্ন কলা-কৌশলে। একটি পূর্ণাঙ্গ নাটকে পাঁচটি পর্যায় থাকে। যেমন– প্রারম্ভ, প্রবাহ, উৎকর্ষ (Action), গ্রন্থিমোচন ও উপসংহার। নাটকে যন্ত্রসঙ্গীত খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তাই বর্তমানে অত্যাধুনিক যন্ত্রাদি অবাধে ব্যবহার হচ্ছে। তাছাড়া উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে অত্যাধুনিক যান্ত্রিক কলাকুশলতার সহায়তা গ্রহণ করা হয়। সংস্কৃতিচর্চা, কণ্ঠসঙ্গীত, যন্ত্রসঙ্গীত, নৃত্যকলা, নাট্যকলা বিশেষ করে শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীত ললিতকলার মূল উপজীব্য। বর্তমানে চলচ্চিত্র, ফটোগ্রাফি, ধারণাগত শিল্প ও পেইন্ট মেকিং যুক্ত হয়েছে ললিতকলায়।

◆ নগরসভ্যতা *[৩৪তম বিসিএস]*

সভ্যতা হলো সংঘবদ্ধ মানুষের আচার-আচরণ, ভাষা- সংস্কৃতি, উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রভৃতির মিলন। প্রাগৈতিহাসিক যুগ হলো ইতিহাসের পূর্বের যুগ অর্থাৎ যখনকার ইতিহাস জানা যায়, তারও পূর্বের যুগ। প্রাগৈতিহাসিক যুগের অবসানের মধ্য দিয়ে সভ্যতার সূত্রপাত হয়। সভ্যতার যুগের দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

ছিল। প্রথমটি ছিল লিপির আবির্ভাব। মানুষ তাদের জীবন আচরণের কথা লিখে রাখত পাথরের গায়ে, কাদার শ্লেটে এবং আরও পরে কাগজে। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, এ সময় গ্রাম সংস্কৃতির অবসান ঘটিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে মানুষ গড়ে তুলতে থাকে নগর সভ্যতা ও সংস্কৃতি। তাই নগর সভ্যতা হলো গ্রাম সংস্কৃতির অবসান ঘটিয়ে নদীর তীরে শহরকেন্দ্রিক সভ্যতা, যেখানে ছিল উন্নত অবকাঠামো আধুনিক পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ও উন্নত জীবনযাত্রা। খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০০ অব্দে প্রাচীন সভ্যতা তথা নগর সভ্যতার সূত্রপাত হয়। মেসোপটেমীয় সভ্যতা, মিশরীয় সভ্যতা, সিন্ধু সভ্যতা, গ্রীক সভ্যতা প্রভৃতি ছিল নগরসভ্যতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

◆ জাতীয় সংস্কৃতি *[৩১তম বিসিএস]*

সংস্কৃতি সমাজ ও রাষ্ট্রের দর্পনস্বরূপ। প্রতিটি রাষ্ট্রেরই নিজস্ব সংস্কৃতি থাকে। এ সংস্কৃতিই বিশ্বের দরবারে একটি জাতির গৌরব-অগৌরবের জানান দেয়। আমাদের সংবিধান তাই জাতীয় সংস্কৃতিকে করেছে আরো সুসংহত। বাংলাদেশের সংবিধানের ২৩নং অনুচ্ছেদে বাংলাদেশের জাতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে বলা হয়েছে : 'রাষ্ট্র জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার রক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং জাতীয় ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পকলাসমূহের এমন পরিপোষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন, যাহাতে সর্বস্তরের জনগণ জাতীয় সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে অবদান রাখিবার ও অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারেন।'

◆ মানব পতাকার বিশ্ব স্বীকৃতি

মহান বিজয়ের ৪২তম বর্ষপূর্তিতে বাংলাদেশের তৈরি মানব পতাকাটিকে গিনেজ ওয়ার্ল্ড রেকর্ড কর্তৃপক্ষ আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। ৪ জানুয়ারি ২০১৪ এ স্বীকৃতির খবর প্রকাশ করা হয় গিনেজ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে। সেনাবাহিনীর সহায়তায় মোবাইল ফোন অপারেটর রবি আজিয়াটা লিমিটেড ১৬ ডিসেম্বর ২০১৩ শেরে বাংলা নগরের জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে এ মানব পতাকা প্রদর্শন করে, যাতে ২৭,১১৭ জন মানুষ অংশ নেন। বিশ্ব রেকর্ডের জন্য মানব পতাকাটি ৫ মিনিট ধরে দেখানোর কথা থাকলেও বাংলাদেশ এটি ৬ মিনিট ১৪ সেকেন্ড ধরে প্রদর্শন করে। সর্বশেষ সবচেয়ে বড় মানব পতাকার রেকর্ডটি গড়ে ভারত। ২০১৪ সালের ৭ ডিসেম্বর ৪৩,৮৩০ জন অংশগ্রহণকারীর মাধ্যমে তারা বিশ্বের বৃহত্তম মানবপতাকা তৈরির নতুন বিশ্বরেকর্ড গড়ে।

◆ গিনেজ বুকে সোনার বাংলা

বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় সশস্ত্র বাহিনীর সহায়তায় ২৬ মার্চ ২০১৪ দেশের ৪৩তম মহান স্বাধীনতা দিবসে আয়োজন করে 'লাখো কণ্ঠে সোনার বাংলা' শিরোনামে এক সাথে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষের জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার বিশ্বরেকর্ড গড়ার আয়োজন। ঐ দিন ঢাকার শেরে-বাংলা নগরের জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে যান্ত্রিক গণনা অনুসারে, লাখো কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত গাইতে সমবেত হয়েছিলেন ২,৫৪,৬৮১ জন। এ ঘটনার ১৪ দিন পর অর্থাৎ ৯ এপ্রিল ২০১৪ গিনেজ বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস কর্তৃপক্ষের নিজস্ব ওয়েবসাইটে একসাথে সবচেয়ে বেশি মানুষের জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার বিশ্বরেকর্ড-এ বাংলাদেশের নাম ঘোষণা করা হয়। বিশ্বরেকর্ড করার জন্য সম্মিলিত কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার ঐ আয়োজনে ২,৫৪,৫৩৭ জন অংশ নেন বলে গিনেজ বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের স্বীকৃতিতে উল্লেখ করা হয়। বাংলাদেশের আগে এ রেকর্ড ছিল ভারতের। ৬ মে ২০১৩ ভারতের লক্ষ্ণৌতে সাহারা গ্রুপের আয়োজনে ১,২১,৬৫৩ জন এক সাথে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার বিশ্বরেকর্ড গড়েছিল।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৪. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাহিত্যবিষয়ক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন

♦ ডেসটিনি ২০০০ লি. *[৩৩তম বিসিএস]*

বাংলাদেশে পরিচালিত একটি এমএলএম (মাল্টি লেভেল মার্কেটিং) কোম্পানি 'ডেসটিনি ২০০০ লি.'। ২০০০ সালে 'ডেসটিনি' ও 'নিওয়ে' এমএলএম কোম্পানিরূপে ব্যবসায় শুরু করে। ২০০২ সালে কোম্পানিটি RJSC থেকে নিবন্ধন নেয়। সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও ডেসটিনি শেষ পর্যন্ত বিতর্কিত ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ে। নতুন সদস্য ভর্তির উপর কমিশন প্রাপ্তিসহ নানা উদ্ভট ও কঠিন সব শর্তের বেড়াজালে আবদ্ধ এ নিষিদ্ধ এমএলএম কোম্পানির প্রধান বৈশিষ্ট্য। নিজে সদস্য হওয়ার পর অন্যকে সদস্য করানোর বিনিময়ে কমিশন প্রাপ্তি পদ্ধতি 'ডেসটিনি ২০০০ লি'. এর মূল বিষয়। নানা অপ্রয়োজনীয় বিলাসী দ্রব্য বা সেবাসামগ্রীর মার্কেটিং এর জোর চেষ্টায় এর প্রতি সৃষ্টি হয়েছে জনআস্থার প্রবল সংকট। এর সাথে নগদ অর্থের বিনিময়ে তথাকথিত সাইকেলভিত্তিক কমিশন প্রদান এ ব্যবসাকে আরও বিতর্কিত করেছে।

♦ হলমার্ক গ্রুপ লি. *[৩৩তম বিসিএস]*

বর্তমানে বাংলাদেশে 'হলমার্ক গ্রুপ লি.' একটি বড় ধরনের কেলেঙ্কারি হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। বাংলাদেশে ব্যাংকিং সেক্টরের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় অর্থ কেলেঙ্কারি সোনালী ব্যাংকের রূপসী বাংলা হোটেল শাখা থেকে হলমার্ক গ্রুপের নামে টাকা আত্মসাৎ। হলমার্ক গ্রুপসহ ৬টি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা আত্মসাতের ঘটনা ২০১২ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের এক প্রতিবেদনে বেরিয়ে আসে। প্রতারণার মাধ্যমে ব্যাংক থেকে ৩,৬০৬ কোটি ৪৮ লাখ টাকা হাতিয়ে নেয় হলমার্ক গ্রুপসহ ৬টি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। এর মধ্যে শুধু হলমার্ক গ্রুপই অবৈধভাবে উত্তোলন করে ২,৬৬৮ কোটি ৩৮ লাখ টাকা।

♦ আয়কর মেলা *[৩৩তম বিসিএস]*

মানুষকে কর প্রদানের উৎসাহ এবং কর প্রদান সংস্কৃতি গড়ে তুলতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আয়কর মেলার আয়োজন করে। ২০১৪ সালে সপ্তমবারের মতো আয়োজিত হয় এ মেলা। দেশের আটটি বিভাগীয় শহরে ৭ দিনব্যাপী এবং প্রথমবারের মতো ৫৪টি জেলা শহরে ৪ দিনব্যাপী এবং তিনটি পার্বত্য জেলায় দুইদিন করে আয়কর মেলা ২০১৪ শুরু হয় ১৬ সেপ্টেম্বর। এবারের মেলার উদ্দেশ্য ছিল করদাতাদের অনলাইনে আয়কর প্রদানে উৎসাহ প্রদান করা। রাজস্ব আদায়ে নতুন রেকর্ডের মধ্য দিয়ে শেষ হয় আয়কর মেলা ২০১৪। মেলায় রাজস্ব আদায় হয় ১,৬৯৫ কোটি ৩০ লাখ ৭৩ হাজার ৪৫১ টাকা। এছাড়া এবারের মেলায় আয়কর বিবরণী দাখিল করেন ১ লাখ ৪৯ হাজার ৪০ জন করদাতা। আর কর শনাক্তকরণ নম্বর (TIN) নেন ১৫ হাজার ৯০৭ জন নতুন কর দাতা এবং কর সংক্রান্ত সেবা নিতে মেলায় আসেন ৬ লাখ ৪৯ হাজার ৩০৯ জন ব্যক্তি।

♦ ষষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা *[৩১তম বিসিএস]*

সাতটি অগ্রাধিকার খাত ও অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা দলিল চূড়ান্ত হওয়ার পর ২২ জুন ২০১১ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (ECNEC) বৈঠকে তা অনুমোদিত হয়। এ পরিকল্পনার মেয়াদকাল ২০১০ সালের জুলাই থেকে ২০১৫ সালের জুন পর্যন্ত। তবে এটি কার্যকর হয় ২০১১ সালের জুলাই থেকে। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ১৩ লাখ ৪৭ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে গণখাত বা সরকারি বিনিয়োগ ৩ লাখ ১০ হাজার কোটি টাকা এবং ব্যক্তি খাত থেকে আসবে মোট বিনিয়োগের ৭৭ শতাংশ বা ১০ লাখ ৩৯ হাজার ৩৬০ কোটি টাকা। প্রতিবছর গড়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৭.৩%। মেয়াদ শেষে অর্থাৎ ২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি ৮%।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

লক্ষ্যমাত্রা ➢ আয় বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য হ্রাস ⊙ মানবসম্পদ উন্নয়ন (শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি) ⊙ নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ⊙ জ্বালানী ও অবকাঠামো ⊙ নারী-পুরুষের সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন ⊙ পরিবেশের ভারসাম্য ⊙ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি।

লক্ষ্যসমূহ ➢ দারিদ্র্য হার : ২২ শতাংশ ⊙ শিশু মৃত্যুর হার : হাজারে ৩১ জন ⊙ মাতৃমৃত্যুর হার : লাখে ১৪৪ জন ⊙ অপুষ্টিতে ভোগা শিশুর হার : ২.২% ⊙ বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ : ৯৬% জনগোষ্ঠীর কাছে ⊙ স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগারের ব্যবস্থা করা : ৯০% জনগণের জন্য ⊙ বিদ্যুৎ উৎপাদন (২০১৫ সালে) : ১৫,৩৫৭ মেগাওয়াট ⊙ উচ্চ শিক্ষায় ছাত্রী ও ছাত্র অনুপাত : ৪০ ঃ ৬০ ⊙ উৎপাদনশীল বনভূমির হার : ১৫ শতাংশ ⊙ ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগের হার : ৩০% ⊙ টেলি ঘনত্বের হার : ৭০%।

♦ উৎসে আয়কর *[৩১তম বিসিএস]*

কর সংগ্রহের একটি জনপ্রিয় মাধ্যম উৎসে কর কর্তন। বাংলাদেশে আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪-তে এ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন সালের বাজেটের মাধ্যমে এর আওতা ও পরিধি পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত ও সংশোধিত হয়। আয়কর অধ্যাদেশের ৪৮ ধারা থেকে ৫৩ ধারার শেষ পর্যন্ত উৎসে আয়কর সম্বন্ধে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ২০১১-১২ অর্থ বছরে প্রণীত বাজেটে সরকার তার রাজস্ব সংগ্রহের জন্য আয়কর বিধিতে উৎসে আয়কর সংগ্রহ সংক্রান্ত কতিপয় পরিবর্তন এনেছে যা ১ জুলাই ২০১১ থেকে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়।

আয়কর অধ্যাদেশের ৪৯(৩) সংশোধনের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের বিচারক/কর্মকর্তা, সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি থেকে উৎসে কর কর্তনের বিধান প্রবর্তন করা হয়। অধ্যাদেশের ৫০ ধারা অনুযায়ী সাধারণ হারে এই কর কর্তন করা হবে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ, মন্ত্রী পর্যায়ের উপদেষ্টাগণ, সুপ্রিম কোর্টের বিচারকগণের আয়ের উপর করমুক্ত সুবিধা প্রত্যাহার করা হয়েছে। মহান জাতীয় সংসদের সদস্যগণ সরকার থেকে এক অর্থ বছরে প্রাপ্ত সম্মানী থেকে সাধারণ হারে উৎসে কর কর্তনের জন্য অধ্যাদেশে নতুন ধারা ৫০ (B) সংযোজন করা হয়েছে। এর ফলে মাননীয় সাংসদগণ যে সম্মানী পাবে তা থেকে উৎসে কর কর্তন প্রযোজ্য হবে। অধ্যাদেশে বিদেশ থেকে প্রাপ্ত সার্ভিস চার্জ বা কনসালটেন্সি ফি এর উপর ১০% হারে উৎসে কর কর্তনের জন্য নতুন ধারা ৫২(Q) সংযোজিত হয়েছে। নতুন ধারা ৫২(P) অনুযায়ী কনভেনশন হলে, কনফারেন্স সেন্টারকে ভাড়া প্রদানকালে উৎসে কর কর্তন করতে হবে। পূর্বতন ধারা ৫৩ (D) সম্পূর্ণরূপে প্রতিস্থাপিত হয়েছে যাতে রেডিও/ টিভি কর্তৃক অনুষ্ঠান ক্রয়কালে বা অভিনেতা/অভিনেত্রী, সঙ্গীত শিল্পীদের সম্মানী থেকে উৎসে কর কর্তনের বিধান প্রবর্তিত হয় এবং সকল ক্ষেত্রে ১০% কর হার আরোপ করা হয়েছে। ৫২(N) ধারা সংশোধিত করে উৎসে কর কর্তনের ক্ষেত্রে রেন্টাল পাওয়ারকে প্রদত্ত ৩ বছরের সময়সীমা প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং যে কোনো সময় বিদ্যুৎ কেনার পরিপ্রেক্ষিতে অর্থ পরিশোধনকালে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক উৎসে কর কর্তন প্রযোজ্য হবে।

৫২(A) ধারাতে প্রফেশনাল সার্ভিস এর পরিধি বিস্তৃত করা হয়েছে। এ সংশোধনী অনুযায়ী পেশাগত জ্ঞান প্রয়োজন হয় এমন যে কোনো সেবার বিপরীতে প্রদেয় অর্থের বিপরীতে ১০% হারে উৎসে কর কর্তন করতে হবে। অধিকন্তু, ৫২(AA) ধারায় বিভিন্ন সেবা (ইন্ডেটিং কমিশন, শিপিং এজেন্সি কমিশন, ডাক্তারদের সার্ভিস, ডায়মন্ড কার্টিং, সিনেমা, নাটক, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি) এর বিপরীতে অর্থ প্রদানকালে ১০% হারে উৎসে কর কর্তন করতে হবে। ৫৩(C) সংশোধনী অনুযায়ী কোনো প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি যে কোনো পণ্য নিলামে বিক্রি করলে প্রাপ্ত আয়ের উৎসে কর কর্তন করতে হবে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৫৩(H) সংশোধনের মাধ্যমে জমি, বাড়ি ইত্যাদি বিক্রয়কালে উৎসে আয়কর কর্তনের পরিধি বিস্তৃত করা হয়েছে। ৫৩(J) ধারার সংশোধনী অনুযায়ী খালি জায়গা বা প্লান্ট মেশিনারী ভাড়ার ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তন প্রযোজ্য হবে। ৫২(D) ধারাতে সঞ্চয়পত্রের সুদের আয়ের উপর কর ১০% থেকে কমিয়ে ৫% করা হয়েছে। ৫৩(BB) ধারাতে গার্মেন্টসসহ কতিপয় রপ্তানির উপর কর কর্তনের হার ০.৫০% থেকে ০.৬০% করা হয়েছে। শেয়ার ব্রোকারের কমিশন থেকে কর কর্তনের হার ০.০৫% থেকে বৃদ্ধি করে ০.১০% নির্ধারণ করা হয়েছে। সকল রপ্তানির উপর উৎসে কর কর্তনের হার ০.৫০% থেকে বাড়িয়ে ০.৭০% করা হয়েছে। কমিশন, ডিসকাউন্ট বা ফি এর উপর উৎসের কর কর্তনের হার ৭.৫% থেকে বাড়িয়ে ১০% করা হয়েছে। এছাড়াও রিয়েল এস্টেট বা ভূমি উন্নয়ন ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে উৎসে কর কর্তনের হার যৌক্তিক করা হয়েছে।

আয়কর অধ্যাদেশে আয়ের প্রকারের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া রয়েছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশ সরকারও উৎসে আয়কর সংগ্রহের জন্য ২০১১-১২ সালের বাজেটে এ বিষয়ে ব্যাপক পরিবর্তনের মাধ্যমে রাজস্ব বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে যা সরকারের আয় বৃদ্ধির গতিকে ত্বরান্বিত করবে।

♦ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (PPP) *[৩১তম ও ২৯তম বিসিএস]*

সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নের জন্য সরকার ২০০৯-১০ অর্থবছরে প্রথমবারের মতো বাজেটে রাজস্ব ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (ADP) সাথে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব খাত সংযোজন করে এর নাম দেয় 'অবকাঠামো বিনিয়োগ তহবিল'। প্রথমবারে এ খাতে ২৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল। বর্তমানে Bangladesh Infrastructure Finance Fund (BIFF)-কে কোম্পানিতে রূপান্তর করা হয়েছে। এর কাজকে আরো গতিময় করার জন্য অফিস স্থাপিত হয়েছে এবং জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে। পিপিপি'র আওতায় বিনিয়োগের জন্য বেশ কয়েকটি খাতকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, যোগাযোগ অবকাঠামো (সড়ক, রেল, বন্দর, বিমান পোত ও নৌপরিবহন), বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ ও পয়নিষ্কাশন, তথ্য প্রযুক্তি, শিল্প, শিক্ষা ও গবেষণা, পর্যটন, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, আবাসন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

দেশের প্রথম সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি) ভিত্তিক প্রকল্প হিসেবে সরকার বহুল আলোচিত এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে বা উড়াল সেতু বা দ্বিতল সড়ক নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়। ৩০ এপ্রিল ২০১১ দেশের সর্ববৃহৎ পিপিপি প্রকল্প Dhaka Elevated Expressway বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে। এর নির্মাণ কাল ধরা হয়েছে আট বছর। ৩৩ কিলোমিটারের এই দ্বিতল সেতু শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে শুরু হয়ে শনির আখড়ায় শেষ হবে। এছাড়া মেয়র হানিফ ফ্লাইওভার (যাত্রাবাড়ী-গুলিস্তান) পিপিপি'র আওতায় নির্মিত হচ্ছে। ২০১১-১২ অর্থবছরে পিপিপির জন্য ৩০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ২৫০০ কোটি টাকা BIFF এর জন্য। এর মধ্যে ১৬০০ কোটি টাকা BIFF-এর পরিশোধিত মূলধন যার অনুমোদিত মূলধন ১০ হাজার কোটি টাকা। ৪০০ কোটি টাকা ভায়াবিলিটি গ্যাপ ফান্ডের জন্য এবং ১০০ কোটি টাকা পিপিপি প্রকল্পের কারিগরি সহায়তার জন্য।

উল্লেখ্য, আশির দশকের শেষ দিকে বিভিন্ন দেশের সরকারের সাথে বেসরকারি খাতের অংশীদারিত্বে অবকাঠামো নির্মাণ শুরু হয়। কানাডা, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জার্মানি, জাপান, পর্তুগাল, অস্ট্রেলিয়া, ইতালির পাশাপাশি চীন, ভারত, ব্রাজিল, ফিলিপাইন, দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ কোরিয়া, চিলি প্রভৃতি দেশ পিপিপি'র মাধ্যমে অবকাঠামো নির্মাণ করছে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

♦ জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিলের নির্বাহী কমিটি (ECNEC) *[৩০তম বিসিএস]*

১৯৮২ সালে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির গঠন কাঠামো ও কার্যাবলী নিরূপণ করা হয়। ১৯৮২ সালে অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রীকে আহ্বায়ক করে এ কমিটি গঠন করা হয়। ১৯৮২ সালের পর থেকে একনেকের কাঠামো ও কার্যাবলীতে অনেক পরিবর্তন ঘটে। যেমন– ১৯৮৬ সালের জুলাই মাস থেকে আহ্বায়ক পদে উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের স্থলাভিষিক্ত হন উপ-প্রধানমন্ত্রী। ১৯৯১ সালে একনেকের সভাপতি হন অর্থমন্ত্রী। সর্বশেষ ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী একনেকের সভাপতি ও অর্থমন্ত্রী বিকল্প সভাপতি। সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, খাদ্যমন্ত্রী, পানিসম্পদ মন্ত্রী, শিল্পমন্ত্রী, বাণিজ্যমন্ত্রী, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী, কৃষিমন্ত্রী এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী। যেসব মন্ত্রণালয়ের বিষয় কমিটিতে আলোচনা করা হয় সেসব দপ্তরের মন্ত্রীরাও একনেকের সদস্য থাকেন। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব, বৈদেশিক সম্পদ বিভাগের সচিব, পরিকল্পনা সচিব, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সদস্যবর্গ ও সচিবগণকে একনেকের কাজে সহায়তা করতে হয়।

একনেকের (ECNEC) কার্যাবলী :

১. সকল প্রকল্পের পরিকল্পনাপত্র যাচাই ও অনুমোদন।
২. প্রকল্প মূল্যায়ন সংক্রান্ত বিশেষ কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত ৫ কোটি টাকার উর্ধ্ব ব্যয় সাপেক্ষ সকল প্রকল্প যাচাই ও অনুমোদন।
৩. উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা।
৪. বেসরকারি ও যৌথ উদ্যোগে গৃহীত বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহ যাচাই।
৫. দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড তত্ত্বাবধান ও নীতিমালা পর্যালোচনা।
৬. সরকারি বিধিবদ্ধ কর্পোরেশনের আর্থিক কর্মসূচি পর্যালোচনা।
৭. সরকারি প্রতিষ্ঠানের উৎপন্ন পণ্যাদির মূল্য এবং সরকারি সেবা খাতের রেট, ফি ইত্যাদি নির্ধারণ।
৮. বৈদেশিক সাহায্য ও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপ বিবেচনা এবং জনশক্তি রপ্তানির ব্যাপারে বিদেশে বাংলাদেশ মিশনসমূহের লক্ষ্য নির্ধারণ ও এসব ক্ষেত্রে অগ্রগতি পর্যালোচনা।

♦ জাতীয় শিশু দিবস *[৩০তম বিসিএস]*

১৭ মার্চ স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম দিন। ১৯২০ সালের এই দিনে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ার সম্ভ্রান্ত শেখ পরিবারে তার জন্ম। জাতি এই দিনটিকে জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে উদযাপন করে থাকে। ১৯৯৬ সাল থেকে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার ১৭ মার্চকে জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে পালন করে আসছে এবং দিবসটিতে সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়। ২০০১ সালে পরবর্তী সরকার এসে এ দিবসের সরকারি ছুটি ও জাতীয় শিশু দিবস বাতিল করে। পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এসে ২০০৯ সালে পুনরায় দিবসটিকে জাতীয় শিশু দিবস ও সরকারি ছুটি উদযাপন করে আসছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে দিবসটির তাৎপর্য ও গুরুত্ব নিহিত। বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে হয়তো বাঙালিদের স্বাধীন বাংলাদেশ পেতে আরও কয়েক যুগ লেগে যেত বা সম্ভবই হতো না। তার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাঙালি আজ স্বাধীন বাংলাদেশ উপহার হিসেবে পেয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের অবিসংবাদিত নেতা। তার সাহসী ও আপসহীন নেতৃত্বে অনুপ্রাণিত হয়েই পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়েছিল বাঙালি জাতি। শিশুদের প্রতি বঙ্গবন্ধুর দরদ ছিল অপরিসীম। তাই তার জন্ম দিবসকে শিশুদের জন্য উৎসর্গ করে

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

জাতীয় শিশু দিবস ঘোষণা করা হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে দেশের প্রধান প্রধান দৈনিক পত্রিকাগুলোতে ক্রোড়পত্র ও নিবন্ধ প্রকাশ করা হয়ে থাকে। রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী পৃথক পৃথক বাণী প্রদান করে থাকেন। তাছাড়া উল্লেখযোগ্য কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে জাতির জনকের সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা, রেডিও-টেলিভিশনে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানমালা সম্প্রচার, বইমেলা, শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, বঙ্গবন্ধুর ওপর প্রামান্য চিত্র প্রদর্শন, আলোচনা সভা, স্বেচ্ছায় রক্তদান, বিনামূল্যে চিকিৎসা, পুরস্কার বিতরণ ও মিলাদ মাহফিলসহ আরো কর্মসূচি পালন। বিদেশে বাংলাদেশের দূতাবাসগুলোতেও আলোচনা সভা, প্রামাণ্য চিত্র ও পোস্টার প্রদর্শনসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে।

আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার অঙ্গীকারে শিশুদের উজ্জীবিত করা ও বঙ্গবন্ধুর চেতনা ও আদর্শকে শিশুদের মাঝে তুলে ধরাই হচ্ছে দিবসটির মূল লক্ষ্য। বঙ্গবন্ধু যে সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন তা বাস্তবায়নের জন্য আমাদের নতুন প্রজন্মকে সোনার মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। বাংলাদেশকে শিশুদের নিরাপদ আবাস ভূমি হিসেবে পরিণত করার জন্য সবাইকে জাতীয় শিশু দিবসে শপথ নিতে হবে। এসব তাৎপর্য ও গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে বাংলাদেশ সরকার দিবসটিকে জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে। দিবসটির তাৎপর্য প্রতিটি শিশুর মাঝে তুলে ধরা আমাদের সকলের দায়িত্ব। জাতীয় শিশু দিবসে প্রতিটি আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সামনে রেখে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে একটি সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকারে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এটাই হোক জাতীয় শিশু দিবসের মূল তাৎপর্য।

◆ খাদ্য নিরাপত্তা *[২৯তম বিসিএস]*

খাদ্য মানুষের প্রধান মৌলিক চাহিদা। বাংলাদেশের কৃষিনির্ভর অর্থনীতিতে খাদ্যের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশের জনগণ তাদের আয়ের বেশিরভাগ খাদ্যের জন্য ব্যয় করে। রাষ্ট্রের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব হলো সকল সময়ে সবার জন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ১৫(ক)নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব নাগরিকের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা করা। কিন্তু ক্রমাগত প্রাকৃতিক দুর্যোগ, খাদ্য উৎপাদন ও চাহিদার সমন্বয়হীনতার অভাবে ক্রমশই প্রকট হয়ে উঠেছে খাদ্য সংকট। এ সংকট মোকাবিলা করতে শস্যের বহুমুখীকরণ এখন সময়ের দাবি। সবার জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ বর্তমানে বাংলাদেশের জন্য অন্যতম চ্যালেঞ্জ। নির্দিষ্ট এলাকায় নির্দিষ্ট সময়ে একই ধরনের ফসল উৎপাদনের কারণে খাদ্য সংকট আরো প্রকট হয়ে উঠছে। কেননা বছরের ঐ নির্দিষ্ট সময়ে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলে খাদ্য উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। ফলে প্রকট হয়ে ওঠে খাদ্য সংকট। খাদ্য সংকট মোকাবিলার জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা অতীব জরুরি : ১. কৃষি বহুমুখীকরণ, প্রয়োজন উন্নত প্রযুক্তি ও গবেষণা; ২. খাদ্যশস্য বহির্ভূত (শাকসবজি, তেলবীজ, ডাল ও ফলমূল) ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি; ৩. শস্য বহুমুখীকরণে সহজ শর্তে কৃষিঋণ প্রদান; ৪. কৃষিতে দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ। দেশে খাদ্য সংকট কমাতে এবং শস্যের বহুমুখীকরণে কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ ও কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। দেশে সুষম ফসলের চাষ বৃদ্ধিতে ২০০১ সাল থেকে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্প হাতে নিয়েছে সরকার। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ১৬টি জেলার ৬২টি উপজেলায় এ প্রকল্প চালু আছে। গাজীপুরে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এ পর্যন্ত দানা শস্যের ৪৮টি, তেলবীজের ৩৬টি, ডালের ২৭টি, আলুর ৪৬টি, সবজির ৫৭টি, মসলার ১৫টিসহ ২৭০টি নতুন

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

জাত উদ্ভাবন করেছে। এছাড়া ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ৪৭টি নতুন প্রজাতির ধান, ধান চাষে ১৯টি আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করেছে। খাদ্য সংকট মোকাবিলা তথা খাদ্য নিরাপত্তার জন্য সরকারের এ অর্জনই যথেষ্ট নয়। কৃষির সাথে যারা জড়িত তাদের উৎসাহ দিতে হবে এবং তাদের স্বার্থকে বড় করে দেখতে হবে। এছাড়া কৃষকদের বিভিন্ন অপ্রধান শস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং ব্যবহারে কৃষকদের উৎসাহিত করতে হবে। খাদ্য সমস্যা কবলিত এ দেশে শস্যের বহুমুখীকরণের বিকল্প নেই। জোরদার করতে হবে কৃষি সম্প্রসারণ ব্যবস্থাকেও। তদুপরি এসব কৃষিপণ্যের উৎপাদন, বাজারজাতকরণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের লক্ষ্যে গড়ে তোলা প্রয়োজন এলাকাভিত্তিক কৃষক সংগঠন। তাতে কৃষি বহুমুখীকরণ ত্বরান্বিত হবে।হ্রাস পাবে খাদ্যের ভয়াবহ সংকট।

◆ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা *[২৯তম ও ১১তম বিসিএস]*

রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা বা ইপিজেড হলো কোনো দেশের এমন অঞ্চল যেখানে স্বল্পমূল্যে উন্নতমানের রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদনের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদেশী উদ্যোক্তাদের আকৃষ্ট করে বিনিয়োগ ও উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বারা শিল্পায়নের গতিকে ত্বরান্বিত করে কর্মসংস্থান ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের লক্ষ্যেই ইপিজেড প্রতিষ্ঠা করা হয়। আর এ ক্ষেত্রে ইপিজেড সংশ্লিষ্ট দেশসমূহ বিদেশী কোম্পানিকে বিভিন্ন রকম সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে থাকে। বাংলাদেশে রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (BEPZA) আইন পাস করা হয় ১৯৮০ সালে। যা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন। এর গভর্নর বোর্ডের চেয়ারম্যান বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। বর্তমানে বাংলাদেশে চালুকৃত সরকারি ইপিজেড ৮টি। যথা– ঢাকা, চট্টগ্রাম, মংলা, ঈশ্বরদী, উত্তরা, নীলফামারী, কুমিল্লা, আদমজী ও কর্ণফুলী। বাংলাদেশে প্রথম ইপিজেড চালু হয় ১৯৮৩ সালে চট্টগ্রামের দক্ষিণ হালিশহরে। বাংলাদেশে বেসরকারি ইপিজেড আইন সংসদে পাস হয় ২০০১ সালে। দেশের প্রথম বেসরকারি ইপিজেড হলো কোরিয়ান ইপিজেড (KEPZ)। এটি চট্টগ্রামে অবস্থিত। এছাড়াও বর্তমানে ফেনী ইপিজেড ও মেঘনা ইপিজেড (মুন্সিগঞ্জ) নামে দুটি ইপিজেড নির্মাণাধীন রয়েছে।

◆ দুর্নীতি দমন কমিশন *[২৯তম বিসিএস]*

দুর্নীতি দমন করে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকার ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ দুর্নীতি দমন কমিশন আইন সংসদে পাস করে। তিনজন কমিশনারের সমন্বয়ে দুর্নীতি দমন কমিশন গঠিত হয়। এ আইন অনুযায়ী পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট বাছাই কমিটির সুপারিশে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক কমিশনারগণ নিযুক্ত হবেন। এ আইনের ধারাবাহিকতায় রাষ্ট্রপতি ২১ নভেম্বর, ২০০৪ বিচারপতি সুলতান হোসেন খানকে চেয়ারম্যান এবং অধ্যাপক ড. মনিরুজ্জামান মিঞা ও মনিরউদ্দীন আহমেদকে স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশনের সদস্য নিয়োগ করে এর বাস্তব রূপ দেন। দুর্নীতি দমন কমিশনের বর্তমান ও তৃতীয় চেয়ারম্যান গোলাম রহমান। দুর্নীতি দমন কমিশন দুর্নীতিমূলক অপরাধসমূহ অনুসন্ধান ও তদন্ত পরিচালনা, মামলা দায়ের ও পরিচালনা, দুর্নীতি প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ, রাষ্ট্রপতিকে সুপারিশ প্রদান ও গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

◆ দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র *[২৯তম বিসিএস]*

১৯৯৯ সালে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নের জন্য দেশভিত্তিক PRSP বা Poverty Reduction Strategy Papers কার্যক্রম গ্রহণ করে, যার বাংলা করা হয়েছে দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র। এখানে ২০০০ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত 'মিলেনিয়াম ডেভেলপেমেন্ট গোল বা এমডিজি' যেসব লক্ষ্যমাত্রা পূরণের টার্গেট নিয়েছে তার বাস্তবায়নের পথ সুগম করার কথা

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

বলা হয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র একটি সুসংবদ্ধ পরিকল্পনা, যা মূলত সামাজিক উন্নয়নের নিশ্চয়তা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি স্থায়ীকরণ এবং দারিদ্র্য দূরীকরণের বিভিন্ন পদক্ষেপের ওপর জোর দেয়। এটি মূলত ৮টি বিষয়ের ওপর জোর দেয়, যা উন্নয়নশীল বিশ্বের বড় সমস্যা। এগুলো হলো : ১. কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ২. পুষ্টি, ৩. কারিগরি শিক্ষা, ৩. কারিগরি শিক্ষা, ৪. সুশাসন, ৫. মাতৃ স্বাস্থ্য, ৬. পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, ৭. দুর্নীতি দমন, ৮. সবসময় তদারক করা (ওপরের বিষয়গুলো)। প্রথম দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রটির মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে পরবর্তীতে ২৩ অক্টোবর ২০০৮ শিক্ষা ও কৃষি খাতকে গুরুত্ব দিয়ে দ্বিতীয় দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র (পিআরএসপি) অনুমোদন করে সরকার। এ পিআরএসপির মেয়াদ তিন বছর, অর্থাৎ ২০০৯-২০১১ সাল পর্যন্ত। তিন বছর মেয়াদি এ দলিলকেই উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের দিকনির্দেশক জাতীয় পরিকল্পনার বা দারিদ্র্য বিমোচনের দলিল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বর্তমানে সংশোধিত দ্বিতীয় দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র বাস্তবায়নের পর জুলাই ২০১২ থেকে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া চলছে।

◆ জাতীয় আয়কর দিবস *[২৯তম বিসিএস]*

প্রত্যক্ষ করের মধ্যে আয়কর রাজস্ব আয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস। করদাতার পরিশোধ করার ক্ষমতার ওপর আয়কর নির্ধারিত হয়। যে বেশি আয় করবে সে বেশি কর দেবে– এটিই আয়কর নির্ধারণের মূলনীতি। এ নীতি সমাজে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করে। সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান কর পরিশোধে বাধ্য যদি তার আয় সরকার নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করে। বাংলাদেশ সরকার জনগণকে কর প্রদানে উদ্বুদ্ধ করতে ২০০৮ সালে প্রথমবারের মতো ১৫ সেপ্টেম্বর জাতীয় আয়কর দিবস পালন করে থাকে। এরপর থেকে প্রতিবছর জাতীয় আয়কর দিবস পালন করা হয়। এই একই দিনে সর্বোচ্চ এবং নিয়মিত করদাতাকে জেলা ও জাতীয় পর্যায়ে পুরস্কৃত করা হয়। বাংলাদেশে আয়কর হার সর্বোচ্চ ৩০%, যৌথ কর হার ২৭.৫%, বিক্রয় কর বা ভ্যাট ১৫%। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছর অনুযায়ী পুরুষ করদাতাদের ক্ষেত্রে ২ লাখ ২০ হাজারের উপরে এবং বছরে ৫ লাখ ২০ হাজার টাকার মধ্যে আয়কারী ব্যক্তিকে ১০%, পরবর্তী ৪ লাখ টাকা পর্যন্ত বছরে আয়কারী ব্যক্তিকে ১৫%, পরবর্তী ৭ লাখ টাকা পর্যন্ত বছরে আয়কারী ব্যক্তিকে ২০%, পরবর্তী ৩০ লাখ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের ২৫% এবং তদূর্ধ্ব আয়কারী ব্যক্তিকে ৩০% কর দিতে হবে। মহিলা, ৬৫ বছর ও তার বেশি বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি, অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ২ লাখ ৭৫ হাজার টাকার বেশি হলে কর দিতে হয়। প্রতিবন্ধী করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা ৩,৫০,০০০ টাকা করা হয়েছে।

◆ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য *[২৮তম বিসিএস]*

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল এবং অনুন্নত রাষ্ট্রগুলোর উন্নতির লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF)-এর গৃহীত সংস্কার কর্মসূচি ব্যর্থ হওয়ার প্রেক্ষিতে এসব দেশের উন্নয়ন তরান্বিত করার লক্ষ্যে ২০০০ সালের সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘ আয়োজিত 'সহস্রাব্দ শীর্ষ বৈঠক' অনুষ্ঠিত হয়। এতে ২০১৫ সালের মধ্যে ৮টি লক্ষ্য পূরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। যা 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য' (Millennium Development Goal) নামে পরিচিত। মিলেনিয়াম লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে ২০০২ সালে মেক্সিকোর মন্টেরে শহরে 'উন্নয়নের জন্য অর্থায়ন' শীর্ষক বৈঠকে ধনী ও দরিদ্র দেশগুলোর আলোচনার প্রেক্ষিতে একটি সর্বসম্মত রাজনৈতিক রূপরেখা প্রণীত হয়। ধনী দেশগুলো অর্থায়নের ব্যাপারে একমত পোষণ করে থাকে। বাংলাদেশ সরকার দেশের উন্নয়নের স্বার্থে এবং 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য' অর্জনের জন্য জাতীয় বাজেট সহ সব ধরনের উন্নয়ন কর্মসূচিতে এ লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে এবং

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

সাফল্য লাভের ব্যাপারে আশাবাদী। কিন্তু গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো যেমন– CPD সহ অন্যান্যরা সরকারের গৃহীত ব্যবস্থা এবং চলমান পরিস্থিতিতে এ লক্ষ্য অর্জন আশানুরূপ নয় বলে মনে করেন। জাতিসংঘ গৃহীত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যের ৮টি লক্ষ্য রয়েছে। লক্ষ্যসমূহ হলো :

লক্ষ্য-১ : চরম দারিদ্র্য এবং ক্ষুধা দূর করা।
লক্ষ্য-২ : সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন।
লক্ষ্য-৩ : নারী-পুরুষের বৈষম্য দূর করা।
লক্ষ্য-৪ : শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস।
লক্ষ্য-৫ : মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নতি।
লক্ষ্য-৬ : এইডস, ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগের বিস্তার রোধ করা।
লক্ষ্য-৭ : টেকসই উন্নয়ন নীতিমালা এবং পরিবেশ নিশ্চিত করা।
লক্ষ্য-৮ : উন্নয়নে বিশ্বব্যাপি অংশীদারিত্ব তৈরি করা।

◆ আর্সেনিক সমস্যা *[২৮তম বিসিএস]*

আর্সেনিক একটি বিষাক্ত খনিজ পদার্থ। এর কোনো স্বাদ বা গন্ধ নেই। এটি যখন মৌলিক পদার্থ হিসেবে থাকে তখন পানিতে দ্রবীভূত হয় না এবং বিষাক্তও থাকে না। কিন্তু বাতাসে জারিত হয়ে অক্সাইড গঠনের পর এটি বিষাক্ত হয়ে ওঠে। আমাদের দেশে আর্সেনিকের মূল উৎস হলো নলকূপের পানি। একসময় ধারণা ছিল, প্রতি লিটার পানিতে ০.০৫ মিলিগ্রাম পর্যন্ত আর্সেনিক মানুষের দেহের জন্য গ্রহণযোগ্য মাত্রা কিন্তু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) রিপোর্টে বলা হয়েছে, প্রতি লিটার পানিতে ০.০১ মিলিগ্রামের বেশি হলে তা খুবই ক্ষতিকর। বেশি মাত্রায় আর্সেনিক গ্রহণ করলে ধীরে ধীরে মানুষ বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে রক্তশূন্যতা, চর্মরোগ, ক্ষুধামান্দ্য, যকৃতের স্ফীতিসহ নানা ধরনের অসুখে ভোগে। এমনকি ত্বকের ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। ইউনিসেফের (UNICEF) সহযোগিতায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের এক জরিপের মাধ্যমে সারা দেশের ২৫ হাজার নলকূপের পানি পরীক্ষার মাধ্যমে দেখা গেছে দেশের প্রায় সবকটি জেলাই আর্সেনিক দূষণে আক্রান্ত। বিশেষজ্ঞদের মতে, আর্সেনিক বিষক্রিয়ার কোনো চিকিৎসা নেই। তবে প্রাথমিক অবস্থায় শনাক্ত হলে আর্সেনিকের উৎস নলকূপের পানি ব্যবহার বন্ধ করে দিতে হবে। শুধু প্রতিরোধ ও সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমেই আর্সেনিক দূষণ মোকাবিলা সম্ভব।

◆ সমাজ *[২৭তম বিসিএস]*

সমাজ শব্দটির কোনো নির্দিষ্ট বা সর্বজনস্বীকৃত সংজ্ঞা পাওয়া যায় না। বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী সমাজকে নানাভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজ বলতে আমরা মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের সংগঠিত রূপকে বুঝে থাকি। Gisbert তার 'Fundamentales of Sociology' গ্রন্থে সমাজের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, 'সমাজ হলো সামাজিক সম্পর্কের জটিল জাল, যে সম্পর্কের দ্বারা প্রত্যেক মানুষ তার সঙ্গীদের সাথে সম্বন্ধযুক্ত থাকে।' ম্যাকাইভার (MacIver) সমাজের সংজ্ঞায় বলেন, 'যেসব সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে আমরা জীবন-যাপন করি তাদের সংগঠিত রূপই সমাজ।' বস্তুত, সমাজ বলতে বুঝায় পারস্পরিক সম্পর্ক সূত্রে আবদ্ধ অথবা পারস্পরিক সম্পর্কনির্ভর এক জনসমষ্টি। সমাজবিজ্ঞানী এফএইচ গিডিংস বলেন, 'সমাজ হলো সাধারণ স্বার্থপ্রণোদিত এমন একদল লোকের সমাবেশ, যার সদস্যরা তাদের অভিন্ন সাধারণ স্বার্থ সম্পর্কে জানে এবং তা অর্জনের জন্য

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

পরস্পর পরস্পরকে সহযোগিতা করে।' উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে বলা যায়, বেঁচে থাকা এবং জীবনকে আরো উন্নত করার জন্য মানুষ সর্বদা প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। তাই মানুষ কতগুলো রীতিনীতি ও আদর্শ মেনে চলে। ফলে সৃষ্টি হয়েছে সহযোগিতাপূর্ণ সামাজিক সম্পর্ক, যার অন্য নাম সমাজ।

♦ জিএনপি *[৩৪তম; ২৭তম বিসিএস]*

একটি নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে একটি দেশে মোট যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা উৎপাদিত হয় তার অর্থমূল্যকে মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP—Gross National Product) বলে। মোট জাতীয় উৎপাদনের মধ্যে বিদেশে অবস্থানরত দেশী নাগরিকদের দ্বারা সৃষ্ট উৎপাদন বা আয় অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু দেশে অবস্থানরত বিদেশী নাগরিক কর্তৃক সৃষ্ট উৎপাদন বা আয় মোট জাতীয় উৎপাদনে ধরা হয় না। অর্থাৎ মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) = মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন + বিদেশে দেশীয় নাগরিকদের আয় – দেশে বিদেশী নাগরিকদের আয়। মোট জাতীয় উৎপাদন বা জিএনপির প্রবৃদ্ধির হার একটি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থানের প্রাথমিক নির্দেশক। মোট জাতীয় উৎপাদন মূলত দুই দিক থেকে বিবেচনা করা যায়। যথা– ১. ব্যয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে এবং ২. আয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে। ব্যয়ের দিক থেকে জিএনপি হলো চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবার উপর ব্যয়ের যোগফল। যেমন : ক. ভোগ ব্যয়, খ. বিনিয়োগ ব্যয়, গ. সরকারের ক্রয়/ব্যয়, ঘ. রপ্তানি/বিদেশীদের ক্রয়। অন্যদিকে আয়ের দিক থেকে জিএনপি হলো নিম্নোক্ত উপাদানসমূহের যোগফল– ক. শ্রমিক ও উদ্যোক্তার মজুরি ও বেতন, খ. অর্থনৈতিক খাজনা, গ. মূলধন ব্যবহারের জন্য প্রদত্ত সুদ, ঘ. অর্জিত মুনাফা, ঙ. পরোক্ষ কর, চ. মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি বাবদ বা ব্যবহারজনিত এলাউন্স, ছ. হস্তান্তর পাওনা।

♦ গার্মেন্ট শিল্পপার্ক

মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া উপজেলার বাউশিয়ার গজারিয়ায় গার্মেন্ট শিল্পপার্ক স্থাপনে ৫০০ একর অধিগ্রহণযোগ্য জায়গা নির্বাচন করেছে সরকার। ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় শিল্পপার্ক স্থাপন বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এক সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। শিল্পপার্কটি বেসরকারি উদ্যোগে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়। জমি অধিগ্রহণ করে তৈরি পোশাক মালিকদের বড় সংগঠন বিজিএমইএ-কে তা দেয়া হবে। জমির অধিগ্রহণ মূল্য ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ব্যয় বিজিএমইএ বহন করবে। এ ক্ষেত্রে বেপজা সরকারের পক্ষে রেগুলেটরি কার্যক্রম পরিচালনা করবে। ২০০৬ সাল থেকেই গার্মেন্ট পল্লী স্থাপনে আলোচনা শুরু হয়। প্রকল্প নিয়ে সরকার এর মধ্যে একাধিকবার সিদ্ধান্ত বদল করেছে। মুন্সিগঞ্জের গজারিয়াতে গার্মেন্ট পল্লী স্থাপনের বিষয়ে বাণিজ্য সচিবের কাছে ২০০৬ সালের ১৩ মে প্রথম অনুরোধ জানায় বিজিএমইএ। গার্মেন্টপল্লী প্রকল্প প্রণয়নের জন্য সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র কুটির শিল্প করপোরেশন (BSCIC) ও বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (BGMEA)-এর মধ্যে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ২০১০ সালের ৪ জুলাই প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় গার্মেন্টস শিল্পের জন্য একটি বিশেষ গার্মেন্ট জোন বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়। ৭৪৫ কোটি ৫০ লাখ টাকা ব্যয় ধরে বাউশিয়া গার্মেন্ট শিল্পপার্ক প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (ADP) পিপিপি'র আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ প্রকল্পে ডাইং, ওয়াশিং ও ফিনিশিং শিল্পের জন্য ৯৭৬টি শিল্প প্লট থাকবে। প্রকল্পের আওতায় সিইটিপি, ডাম্পিং ইয়ার্ডসহ আধুনিক শিল্পপার্কের সব সুবিধা থাকবে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

♦ জিএসপি

GSP-এর পূণরূপ Generalized System of Preferences, যার বাংলা অর্থ অগ্রাধিকারমূলক প্রবেশাধিকার সুবিধা। ১৯৬৪ সালে UNCTAD তার সম্মেলনে উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য বিশেষ বাণিজ্যিক সুবিধা প্রদান ব্যাপারটি আলোচনা করে। উক্ত আলোচনার সূত্র ধরে জিএসপি তৈরির সুপারিশ করা হয়, যার আওতায় শিল্পোন্নত দেশগুলো উন্নয়নশীল দেশগুলোকে স্বেচ্ছায় ও প্রতিদানের প্রত্যাশা না করেই (non-reciprocal) বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সুবিধাদি প্রদান করবে। স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ইউরোপীয় ইউনিয়ন বা ইইউ ভুক্ত দেশগুলোতে পণ্য রপ্তানীর ক্ষেত্রে ট্যারিফ সুবিধা পেয়ে আসছে। অবশ্য এ সুবিধা অর্জন করতে হলে রপ্তানী পণ্যের জন্য প্রযোজ্য রুলস অব অরিজিন (Rules of Origin)-এর শর্তাবলী মিটাতে হয়। ইইউ সর্বপ্রথম জিএসপি বাস্তবায়ন করে। ইইউ-এর জিএসপি ১৯৭১ সালে চালু হয়। শুরুতে তা শিল্পজাত পণ্য ও প্রায় সব কৃষি পণ্যের জন্য প্রযোজ্য ছিল। ২০০১ সালের মার্চ মাস হতে জিএসপি সুবিধা অস্ত্র, গোলাবারুদ ও মাদকদ্রব্য ছাড়া (Everything But Arms-EBA) সব পণ্যের জন্য প্রযোজ্য হচ্ছে। জিএসপি সুবিধা বাংলাদেশ ছাড়াও ভারত, পাকিস্তান, চীন, থাইল্যান্ড ইত্যাদি উন্নয়নশীল দেশগুলো ভোগ করে। পার্থক্য হচ্ছে স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ও আরও ৪৮টি দেশের পণ্য জিএসপি-র আওতায়, রুলস অব অরিজিন মান্যতা সাপেক্ষে, সম্পূর্ণ শুল্ক মুক্ত প্রবেশাধিকার পায়। অন্যদিকে উন্নয়নশীল দেশগুলো রুলস অব অরিজিন মান্যতা সাপেক্ষে ১৫% শুল্ক রেয়াত পায়। ২০০৫ সালের ১ জানুয়ারি থেকে এ জিএসপি সুবিধা উঠে যায়। এখানে উল্লেখ্য যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জিএসপি সুবিধা বাংলাদেশের পণ্যের জন্য প্রয়োজন নেই, কেননা সেখানে রপ্তানীর কোটা রয়েছে। বাংলাদেশ অবশ্য কঠোর রুলস অব অরিজিন এর কারণে ইইউ-র জিএসপি স্কীম এর আওতায় খুব কম পণ্যের ক্ষেত্রেই সুবিধা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে।

ইউরোপে জিএসপি : ১৯৭১ সাল থেকে স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে শুল্ক সুবিধা দিয়ে আসছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন। বর্তমানে যে জিএসপি চলছে, তা প্রণীত হয়েছে ২০০৮ সালে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলো তাদের দেশে আমদানির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারমূলক প্রবেশাধিকার সুবিধা বা জিএসপি (Generalized System of Preferences– GSP) সংশোধন করেছে। ২০১৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে নতুন এ জিএসপি বাস্তবায়ন শুরু হবে। বর্তমানে ১৭৬টি উন্নয়নশীল, স্বল্পোন্নত দেশ ও ভূখণ্ড ইইউ'তে অগ্রাধিকার সুবিধা পায়। নতুন স্কিমে এখন থাকছে ৮৯টি দেশ। এর মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশসহ ৪৯টি স্বল্পোন্নত দেশ এবং ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কাসহ ৪০টি উন্নয়নশীল দেশ। বাকি ৮৭টি দেশ ও ভূখণ্ডের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হওয়ায় ইইউ (EU) তাদের অগ্রাধিকার সুবিধা দেয়ার তালিকা থেকে বাদ দিয়েছে। তবে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য সব সুবিধা আগের মতোই থাকবে। অর্থাৎ জিএসপি সুবিধার আওতায় অস্ত্র ছাড়া সবকিছুই ইইউতে রপ্তানি করতে পারবে স্বল্পোন্নত দেশগুলো। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে কিছু নতুন করে পরীক্ষা-নিরীক্ষার শর্ত দিয়েছে ইইউ। যেমন, শ্রম ইস্যুতে ইইউ এখন থেকে কেবল আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আইএলও-র মানদণ্ডের ওপরই নির্ভর করবে না, নিজেরাও পর্যবেক্ষণ করবে। তার ভিত্তিতে জিএসপি সুবিধা দেয়া হবে।

♦ ট্রেড ইউনিয়ন

শ্রমিকদের কল্যাণে নিয়োজিত এবং শ্রমিকদের নিয়ে গঠিত সংঘ বা সংস্থাকে বলা হয় ট্রেড ইউনিয়ন। এটি শিল্প-কারখানা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারীদের এমন একটি সংগঠন, যার মাধ্যমে শ্রমজীবী জনগোষ্ঠী তাদের নিজস্ব অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার তুলে ধরতে এবং তা আদায় ও সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনে লড়াই-সংগ্রাম করতে পারে। বিশ্বের যে কোনো গণতান্ত্রিক দেশে

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তুলে পেশাজীবীদের ন্যায়সম্মত দাবি আদায় করার বিষয়টি 'জাতিসংঘ মানবাধিকার সনদ' এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার অন্যতম ঘোষিত মূলনীতি। বিশ্বের প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে ওঠে লন্ডনে; ১৬৬৭ সালে। পাক-ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন 'অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস'। পাকিস্তান জন্মের পর প্রথম গঠিত ট্রেড ইউনিয়ন 'পাকিস্তান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন'; গঠিত ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭। বাংলাদেশের ট্রেড ইউনিয়ন শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ ১৯৬৯ [Industrial Relations Ordinance 1969]-এর সাথে জড়িত। বাংলাদেশ সরকারের শ্রম পরিদপ্তরের নিবন্ধিত ট্রেড ইউনিয়ন ২২টি।

◆ তৃতীয় জাতীয় শ্রমনীতি

১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ব্যাংক, বীমা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, অধিকাংশ শিল্প ও সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করা হয়। জাতীয়করণের পর এসব প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় নানা অসুবিধা দেখা দেয়। এসব দূর করতে বাংলাদেশ সরকারের প্রথম শ্রমমন্ত্রী জহুর আহমেদ চৌধুরী ১৯৭২ সালে দেশে প্রথম শ্রমনীতি ঘোষণা করেন। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ও প্রগতির লক্ষ্যে শিল্পে শান্তি বজায় রাখাই ছিল এ নীতির মূল উদ্দেশ্য। এরপর ১৯৮০ সালে তৎকালীন শ্রম ও শিল্পমন্ত্রী রেয়াজ উদ্দিন আহমেদ (ভোলা মিয়া) দেশের দ্বিতীয় শ্রমনীতি ঘোষণা করেন। এ নীতির উল্লেখযোগ্য দিক ছিল বেসরকারি খাতের শ্রমিকদের যে কোনো সমস্যা সরকার, মালিকপক্ষ ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের অর্থাৎ ত্রিপক্ষীয় প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে সমাধান করতে হবে। এতে শ্রমিকদের কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ, শিল্প সম্পর্ক ও শ্রম কল্যাণের ব্যাপারে দিকনির্দেশনা ছিল। এরপর দীর্ঘ ৩২ বছরেও কোনো শ্রমনীতি ঘোষিত হয়নি। কিন্তু শ্রমবাজারের প্রেক্ষাপটে ঘটেছে অনেক পরিবর্তন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ২০১০ সালের ১৪ নভেম্বর জাতীয় শ্রমনীতি ২০১০-এর খসড়া সবার মতামতের জন্য প্রকাশ করে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। ৭ মে ২০১২ মন্ত্রিপরিষদ সম্মেলন কক্ষে মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে জাতীয় শ্রমনীতি (National Labour Policy) ২০১২-এর খসড়া চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়া হয়। এ শ্রমনীতির উদ্দেশ্য বিনিয়োগ সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে সকল কর্মক্ষম নাগরিকের জন্য উৎপাদনশীল, বৈষম্যহীন, শোষণমুক্ত, শোভন, নিরাপদ এবং স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা এবং সকল ক্ষেত্রে শ্রমিকের অধিকার ও শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা।

◆ বাংলাদেশের সবুজ অর্থনীতি

পরিবেশের প্রতি নির্দয় ও বিরূপ আচরণে সবুজ সংকটের এক উচ্চ ঝুঁকির মুখে দাঁড়িয়ে আছে বর্তমান বাংলাদেশ। অপ্রিয় হলেও সত্য, মানুষের নির্বিচার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ফলেই এ সার্বিক সবুজ সংকট। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে খাতভিত্তিকভাবে যার অবদানও উল্লেখযোগ্য। কিন্তু কেবল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বা উন্নতি দেশের টেকসই উন্নয়ন নয়। প্রকৃতি, পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এর সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একটি আরেকটির পরিপূরক। তাই একদিকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বা উন্নয়ন, অন্যদিকে তার সাথে পরিবেশ সংরক্ষণ— দুই-ই দেশের জন্য অপরিহার্য। এমন প্রেক্ষাপটে 'সবুজ অর্থনীতি'ই হতে পারে যুগপৎ উন্নয়নের শ্রেষ্ঠ বিকল্প মাধ্যম। মধ্যম আয়ের দেশের পথে আগুয়ান সবুজ সংকটে জর্জরিত দেশের জন্য বরং সবুজ অর্থনীতি এক অসাধারণ উপায়রূপে আবির্ভূত হয়েছে। আর এ পথে অনেকটাই ধাবিত বাংলাদেশ। গৃহীত কার্যক্রমগুলো হলো : পরিবেশবান্ধব প্রয়োজনীয় নীতিমালা, কৌশল, কর্মপরিকল্পনা, আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন ও জারি ⊙ নবায়নযোগ্য জ্বালানি কর্তৃপক্ষ আইন অনুমোদন ⊙ নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবস্থার প্রসার, যেমন— সৌর বিদ্যুৎ ও

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের দ্রুত সম্প্রসারণ কর্মসূচি ⊙ নবায়নযোগ্য জ্বালানির বাণিজ্যিক উৎপাদনের উপর থেকে পাঁচ বছরের জন্য আয়কর মওকুফকরণ ⊙ উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী গড়ে তোলা কার্যক্রম ⊙ পরিবহনে তুলনামূলক কম দূষণকারী জ্বালানি ব্যবহার বৃদ্ধি ⊙ পৌর বর্জ্য থেকে কমপোস্ট বা জৈব সার তৈরির সিডিএম প্রকল্প চালু এবং ইতোমধ্যেই এর কার্বন ক্রেডিট লাভ ⊙ ইটভাটা থেকে সৃষ্ট মারাত্মক বায়ু দূষণের হ্রাসের লক্ষ্যে এগুলোকে পরিবেশবান্ধব উন্নত প্রযুক্তিতে রূপান্তরের প্রক্রিয়া চালুকরণ ⊙ Polluters Pay Principle-এর আওতায় পরিবেশগত ছাড়পত্রের শর্তানুসারে শিল্পসমূহের দূষণ নিয়ন্ত্রণে এনফোর্সমেন্ট ও মনিটরিং কার্যক্রম জোরদারকরণ ⊙ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১১ তারিখে Green Banking-এর নীতিমালা জারি ইত্যাদি।

◆ স্বাস্থ্য খাতের নতুন পঞ্চবার্ষিক কর্মসূচি

বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতে ২০১১-১৬ সালের জন্য তৃতীয় কর্মসূচি স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টিখাত উন্নয়ন কর্মসূচি (HPNSDP)। ২৩ আগস্ট ২০১১ এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের পরিকল্পনা একনেকে অনুমোদন পায়। সম্প্রতি সরকার ও বিশ্বব্যাংকের মধ্যে এ কর্মসূচি বিষয়ে একটি চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়। HPNSDP'র উল্লেখযোগ্য লক্ষ্য হচ্ছে—২০১৬ সালের মধ্যে শিশু মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৫২ থেকে ৩১-এ হ্রাসকরণ, পাঁচ বছরের নিচে শিশু মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৬৫ থেকে ৪৮-এ হ্রাসকরণ, নবজাতকের মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৩৭ থেকে ২১-এ হ্রাসকরণ, মাতৃ মৃত্যুর হার প্রতি হাজার জীবিত জন্মে ১৯৪ থেকে ১৪৩-এ হ্রাসকরণ, দক্ষ প্রসবকারীর মাধ্যমে প্রসবের হার ২৬ থেকে ৫০ শতাংশে উন্নীতকরণ, জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের হার ৬১.৭ থেকে ৭২ শতাংশে উন্নীতকরণ, স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে অতিরিক্ত তিন হাজার ধাত্রী নিয়োগ, রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের সংখ্যা ৫৩ হাজার ৬৩ থেকে ৭০ হাজারে বৃদ্ধিকরণ, সেবিকার সংখ্যা ২৭ হাজার থেকে ৪০ হাজারে উন্নীতকরণ, কমিউনিটি ক্লিনিকের সংখ্যা ১৩ হাজার ৫০০-তে বৃদ্ধিকরণ, সব উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৩১ থেকে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ ইত্যাদি।

◆ জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০

সাম্প্রদায়িক এবং ধর্মনিরপেক্ষতার বদলে অসাম্প্রদায়িক চেতনাবোধ নিয়ে অনুমোদন হয় জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০। ১৯৭৫ সালের ড. কুদরত-ই-খুদা এবং ১৯৯৭ সালের অধ্যাপক শামসুল হক শিক্ষা কমিশনের সুপারিশের ওপর ভিত্তি করে প্রণীত হয় এ শিক্ষানীতি। ২০০৯ সালের ৮ এপ্রিল জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীকে প্রধান করে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন পর্যায়ে মতবিনিময় ও সংযোজন-বিয়োজন করে ১ জুন অনুমোদন পায় জাতীয় এ শিক্ষানীতি। পরবর্তীতে ২০১০ সালের ৭ ডিসেম্বর জাতীয় সংসদে গৃহীত হয় শিক্ষানীতি। শিক্ষানীতির উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো হচ্ছে : তিনটি জাতীয় স্তরে বিভক্ত করা হয় শিক্ষাব্যবস্থাকে। প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক স্তর। নবম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মাধ্যমিক স্তর। পরবর্তী স্তরকে উচ্চ শিক্ষার স্তরে বিভক্ত করা হয়। O এবং A- লেভেলের জন্য বাংলাদেশ স্টাডিজ বিষয়টি আবশ্যিক করা হয়। আদিবাসীদের জন্য আদিবাসী শিক্ষক ও পাঠ্যপুস্তকের ব্যবস্থা করা। সাধারণ শিক্ষার মতো মাদ্রাসা শিক্ষার শিক্ষকদের বেতন-ভাতা, উচ্চতর প্রশিক্ষণ ও গবেষণার সুযোগ সমানভাবে উন্মুক্ত রাখা। কওমি মাদ্রাসার জন্য আলাদা শিক্ষা কমিশন করা হবে। পাঁচ বছর বয়স্ক শিশুদের জন্য প্রাথমিকভাবে এক বছরমেয়াদি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু। যেসব গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই, সেসব গ্রামে কমপক্ষে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা। পঞ্চম শ্রেণী শেষে উপজেলা/থানা পর্যায়ে অভিন্ন সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। অষ্টম শ্রেণী শেষে পাবলিক পরীক্ষা

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

অনুষ্ঠিত হবে (JSC)। দশম শ্রেণী শেষে জাতীয় ভিত্তিতে পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে (SSC)। দ্বাদশ শ্রেণী শেষে আরো একটি পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে (HSC)। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের এক মাসের মধ্যে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।

◆ উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা

আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জন এবং বিশেষ শিক্ষণ চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে আলাদাভাবে সমন্বিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে পরিচালিত কার্যক্রমই হলো উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগবঞ্চিত নির্দিষ্ট বয়সের শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের জন্য মৌলিক শিক্ষালাভের দ্বিতীয় সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি বৃত্তিমূলক শিক্ষার মাধ্যমে ভবিষ্যতে বৃত্তিগ্রহণে ইচ্ছুক এবং বর্তমানে কোনো বৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীকে দক্ষ জনসম্পদে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশে উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। উল্লেখ্য, উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় দু'ধরনের বয়সের শিক্ষাবঞ্চিতদের শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। ১১ থেকে ১৪ বছর বয়স্ক কিশোর-কিশোরী এবং ১৫-৩৫ বা তদূর্ধ্ব বয়স্কদের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করাই এর লক্ষ্যে। এ শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো : (১) এটি নমনীয় শিক্ষাব্যবস্থা। শিক্ষালাভের সময়, স্থান, বিষয়বস্তু, পদ্ধতি, কৌশল পূর্বনির্ধারিত হলেও শিক্ষার্থীদের সুবিধা অনুসারে পরিবর্তনের সুযোগ থাকে। (২) এ শিক্ষা স্থানীয় কোনো লক্ষ্য অর্জন ও বিশেষ যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করার লক্ষ্যে পরিকল্পিত ও পরিচালিত হয়। (৩) জীবনের যে কোনো বয়সে এ শিক্ষা লাভের সুযোগ থাকে।

◆ ইভটিজিং

'ইভটিজিং' শব্দটি যৌন হয়রানির একটি অমার্জিত (Slang) ভাষা, যা সৃষ্টি বিবরণে পবিত্র কুরআন ও বাইবেলে বর্ণিত প্রথম নারী 'হাওয়া' ও 'ইভ'কে নির্দেশ করে। আমাদের উপমহাদেশে প্রচলিত এ শব্দটির শাব্দিক বাংলা প্রতিশব্দ 'উত্ত্যক্ত করা'। শব্দটি দ্বারা নারীকে উত্ত্যক্ত করা বোঝায়। তবে এর মধ্যেই 'ইভটিজিং' শব্দটির গূঢ়ার্থ সীমিত নয়; বরং এটি মূলত এক ধরনের ইউফেমিজম (Euphemism); অর্থাৎ উত্ত্যক্ত করার আড়ালে থাকে যৌন প্রবৃত্তির নির্লজ্জ মোড়ক উন্মোচন। যেসব কাজ বা আচরণ ইভটিজিং-এর অন্তর্ভুক্ত, সেগুলো হচ্ছে— লম্পট চাহনী, টিটকারি, ব্যঙ্গবিদ্রূপ, অশালীন মন্তব্য, অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি, শিস বাজানো, উস্কানিমূলক তালি বাজানো, গায়ে ধাক্কা দেয়া, সম্মতির বিরুদ্ধে নারীর অঙ্গ স্পর্শ করা, উদ্দেশ্যমূলকভাবে যৌন আবেদনময়ী গান গাওয়া, হুমকি প্রদান, যৌন অর্থবাহী ছবি বা ভিডিও দেখানো, পিছু নেয়া, যৌন ইঙ্গিতমূলক ভাষা ব্যবহার করে ঠাট্টা বা উপহাস করা, মুঠোফোনে বারবার মিসড কল দেয়া, যৌন ইঙ্গিতবাহী মেসেজ পাঠানো, প্রেম ও যৌন সম্পর্ক স্থাপনে চাপ প্রয়োগ, ব্ল্যাকমেইল অথবা চরিত্র হননের উদ্দেশ্যে স্থির বা চলমান চিত্র ধারণ করা, যৌন নিপীড়ন বা হয়রানির কারণে খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক, প্রাতিষ্ঠানিক এবং শিক্ষাগত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করা ইত্যাদি।

ইভটিজিং থেকে রেহাই পাওয়া নারীর সংখ্যা শূন্যের কোঠায়। প্রত্যেক নারী তার জীবনের কোনো না কোনো সময় যেমন কৈশোরের আহ্লাদিত সময়, তারুণ্যের চপলতা, যৌবনের উচ্ছলতা বা মধ্যবয়সের ভাবগাম্ভীর্যের সময়েও এ নির্যাতনের শিকার হন। কলেজ ছাত্র, বেকার যুবক থেকে শুরু করে ফেরিওয়ালা, রিক্সাচালক, বাসচালক, সহযাত্রী, সহকর্মী ও তত্ত্বাবধায়কসহ সবাই এ অপরাধের সাথে জড়িত। ইভটিজিং রোধে সুনির্দিষ্ট কোনো আইন নেই। তবে দেশে বিদ্যমান কয়েকটি আইনে এ সম্পর্কিত ধারা উল্লেখ আছে। যথা : ১. 'দণ্ডবিধি' (বাংলাদেশের অপরাধ সংক্রান্ত প্রধান আইন গ্রন্থ)– ধারা ৫০৯; ২. নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০৩ (সংশোধনী)-এর ১০ নং ধারা এবং ৩. মহানগর পুলিশ অধ্যাদেশ ১৯৭৬-এর ৭৬ নং ধারা।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

◆ কালো টাকা

সাধারণত করযোগ্য অর্থের কর ফাঁকি দিয়ে অবৈধ আয়ের যে অংশ নগদ টাকায় গচ্ছিত রাখা হয় তাকে কালো টাকা বলে। কালো টাকা মূলত হিসাববহির্ভূত ও জাতীয় অর্থস্রোত-বহির্ভূত অর্থ। কর ফাঁকি দেয়ার জন্য এ টাকার হিসাব সরকারের কাছে গোপন রাখা হয় বলে এই টাকা হিসাববহির্ভূত। কালো টাকা সাধারণত অবৈধ উপায়ে যেমন- কালোবাজারি, অবৈধ পাচার, চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই ইত্যাদির মাধ্যমে আয় করে থাকে। ফলে কালো টাকার মালিক জনসম্মুখে তার সম্পদের প্রকাশ করতে এবং সরকারকে হিসাব দিতে ভয় পায়। কিছু সামাজিক অপরাধী ব্যবসার ছদ্মবেশেও কোটি কোটি কালো টাকা আয় করে থাকেন, তাদের কর্মকে আড়াল করতে এবং লোকচক্ষুকে ফাঁকি দিতে তারা সময় সময় বিভিন্ন দাতব্য প্রতিষ্ঠান, এতিমখানা, মাদ্রাসা, মসজিদে বড় অংকের দান করে থাকে। অনেকে তাদের এই অবৈধ টাকা বিভিন্ন লাভজনক ব্যবসা যেমন অ্যাপার্টমেন্ট ব্যবসা, গার্মেন্টস, জনশক্তি রপ্তানি ইত্যাদি খাতে বিনিয়োগ করে থাকে। তাই কালো টাকার মালিকদের চিহ্নিত করা খুবই কষ্টকর। তবে যে কোনো ব্যক্তির আয়ের সাথে তার সম্পদের হিসাব মিলিয়ে অবৈধ আয় বের করা যায়। তাই কালো টাকা বর্জন করা যেমন সবার কর্তব্য তেমনি কর্তব্য কালো টাকার মালিকদের সামাজিকভাবে পরিহার করা। কারণ এরা দেশ ও জাতির শত্রু।

◆ রূপকল্প ২০২১

২০২১ সাল নাগাদ বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের ও প্রযুক্তিনির্ভর ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার চূড়ান্ত সময়কাল হচ্ছে 'রূপকল্প ২০২১'। এগারো বছর মেয়াদি (২০১০-২০২১) একটি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (Perspective plan) এবং এর ওপর ভিত্তি করে ষষ্ঠ ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত এ রূপকল্প অর্জিত হবে। রূপকল্পের বাংলাদেশ একটি অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল ও উদার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্বপ্ন। যেখানে সম্ভাব্য উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম একটি দ্রুত বিকাশমান অর্থনীতি দারিদ্র্যের লজ্জা ঘুচিয়ে মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ নিশ্চিত করবে। এটি একটি প্রকৃত অংশীদারিত্বমূলক সহিষ্ণু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, যেখানে নিশ্চিত হবে সামাজিক ন্যায়বিচার, নারীর অধিকার ও সুযোগের সমতা, আইনের শাসন, মানবাধিকার, সুশাসন, দূষণমুক্ত পরিবেশ। সেই বাংলাদেশে স্থিতিশীল থাকবে দ্রব্যমূল্য, আয়-ব্যয় ও দারিদ্র্য নেমে আসবে ন্যূনতম পর্যায়ে, সবার জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিত হবে, ব্যাপকভাবে বিকশিত হবে মানুষের সৃজনশীলতা ও সক্ষমতা, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা পাবে, হ্রাস পাবে সামাজিক বৈষম্য, প্রতিষ্ঠা পাবে জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট বিপর্যয় মোকাবেলার সক্ষমতা। তথ্যপ্রযুক্তিতে বিকশিত হয়ে সেই বাংলাদেশ পরিচিত হবে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' হিসেবে।

◆ কাব্যসাহিত্য *[৩৪তম বিসিএস]*

কবিতাকে কেন্দ্র করে যে সাহিত্য রচনা হয় তাই কাব্যসাহিত্য। কবির মনের ভাবকল্পনা যখন অনুভূতিরঞ্জিত যথাবিহিত শব্দ সম্ভারে বাস্তব সুষমামণ্ডিত চিত্রাত্মক ও ছন্দোময় রূপ লাভ করে তখনই তাকে কবিতা বলে। অন্যদিকে চিন্তাধারা ও কল্পনার সুবিন্যস্ত ও সুপরিকল্পিত রূপ হলো সাহিত্য। বাংলা সাহিত্য বলতে এক সময় কেবল কাব্য সাহিত্যকেই বুঝানো হতো। কাব্য সাহিত্যের ইতিহাস হাজার বছরেরও অধিক। এ ইতিহাসকে তিনভাগে ভাগ করা হয়। প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগ। প্রাচীন যুগের পাওয়া যায় বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন চর্যাপদ। মধ্যযুগে রচিত হয়েছে বড় বড় কাব্য সাহিত্য। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও মঙ্গলধারার কাব্য গ্রন্থগুলো বাংলা কাব্য সাহিত্যকে অনেকগুণে সমৃদ্ধ

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

করেছে। আধুনিক যুগে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ছিল গদ্যের রাজত্ব। তারপর মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা কবিতায় নিয়ে আসেন আধুনিকতা। রবীন্দ্রনাথ ও তার পরবর্তী কবিদের দ্বারা আমাদের কাব্য সাহিত্য বিশ্বময় পরিচিতি লাভ করে। বাংলার অপরূপ প্রকৃতি আর্থ-সামাজিক অবস্থা, নারীর প্রেম, বাংলা ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা হলো বাংলা কাব্য সাহিত্যের মূল উপজীব্য বিষয়।

♦ বাজার অর্থনীতি *[২৯তম বিসিএস]*

বাজার অর্থনীতি হলো এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বাজারকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়। অর্থাৎ বাজার শক্তির মাধ্যমে উৎপাদন, বন্টন, দাম নির্ধারণ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ নির্ধারিত হয়। এ ধরনের অর্থনীতিতে ভোগ, উৎপাদন প্রভৃতি বিষয়ে অর্থনৈতিক এককগুলোর অবাধ স্বাধীনতা বিরাজমান বলে ধরে নেয়া হয়। অর্থনীতিতে কতটুকু উৎপাদন হবে, উৎপাদিত দ্রব্যের দাম কি হবে ইত্যাদি এককগুলোর ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। বাজারে বিদ্যমান চাহিদা ও সরবরাহের পরিমাণই বাজার অর্থনীতির নির্দেশক হিসেবে কাজ করে। এগুলো (উৎপাদন, ভোগ, বিনিময়) ঠিক করে দেয়ার জন্য পৃথক কোনো কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের প্রয়োজন হয় না।

♦ কুমিল্লা মডেল *[১৭তম বিসিএস]*

কুমিল্লা জেলার কোটবাড়ী নামক স্থানে ১৯৫৯ সালে স্বনামখ্যাত সমাজকর্মী অধ্যক্ষ আখতার হামিদ খান ব্যক্তিগত উদ্যোগে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (BARD) নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। বাংলাদেশের পল্লী এলাকার দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন পরিকল্পনার যে উদ্যোগ নেয়া হয় তা থেকে BARD-এর সৃষ্টি। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল গ্রামের কৃষকদের দ্বি-স্তরবিশিষ্ট সমবায় সমিতির মাধ্যমে সংগঠিত করা এবং স্বল্পমূল্যে কৃষি উপকরণ ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে কৃষি উৎপাদন ও কৃষকের আয় বৃদ্ধি করা। এছাড়াও একাডেমীর গৃহীত পদক্ষেপ ও কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকারি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পরীক্ষামূলক প্রকল্প পরিচালনা এবং পল্লী উন্নয়নের ওপর সেমিনার-আলোচনা ইত্যাদির আয়োজন করা। প্রশিক্ষণের সুবিধার্থে এখানে প্রশিক্ষণ প্রার্থীদের আবাসিক ব্যবস্থা, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ওয়ার্কশপ, ক্যান্টিন প্রভৃতি সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। BARD-এর বহুমুখী অবদান ও কার্যকলাপের জন্য একে 'কুমিল্লা মডেল' নামেও অভিহিত করা হয়। প্রথম দিকে এটি ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত হলেও বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি একজন পরিচালক এবং নির্দিষ্ট সংখ্যক সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সমন্বয়ে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত হচ্ছে।

♦ আইসিডিডিআর,বি *[১১তম বিসিএস]*

International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh (ICDDR,B) বা আন্তর্জাতিক উদরাময় রোগ গবেষণা কেন্দ্র ১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি ঢাকার মহাখালীতে অবস্থিত। ICDDR,B একটি অলাভজনক স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। আন্তর্জাতিক সাহায্যে পরিচালিত এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ হচ্ছে উদরাময় সংক্রান্ত যাবতীয় রোগের গবেষণা করা এবং সহজলভ্য ওষুধ উদ্ভাবন ও চিকিৎসা সুবিধা বৃদ্ধি করা। চাঁদপুর জেলার মতলব থানায় এর একটি ফিল্ড স্টেশন রয়েছে। ঢাকা ও মতলবে অবস্থিত হাসপাতালে বিনা পয়সায় উদরাময়ের চিকিৎসা প্রদান করা হয়। প্রথমে ICDDR,B-এর মেয়াদ ২০০৩ সাল পর্যন্ত থাকলেও ১৯৯৮ সালে জাতীয় সংসদে আইন পাসের মাধ্যমে এর মেয়াদ ২০২৮ সাল পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। ICDDR,B-এর পূর্ব প্রতিষ্ঠান Cholera Research Laboratory স্থাপিত হয় ১৯৬৪ সালে। এ প্রতিষ্ঠানই ১৯৬৮ সালে ওরস্যালাইন আবিষ্কার করে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

♦ জাতীয় অর্থনীতিতে হরতালের প্রভাব

প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে হরতালের ব্যবহার শুরু হলেও, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে হরতাল শব্দটি আতঙ্কের নাম। প্রাণহানি, বোমাবাজি, অগ্নিসংযোগ, ভাংচুর, গ্রেপ্তার, হামলা-পাল্টা হামলা প্রভৃতি হরতালের সাধারণ চিত্র। হরতালে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় দেশের অর্থনীতি। আমাদের দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব একটা ভালো নয়। বর্তমানে এ অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার প্রধান হাতিয়ার হিসেবে দেখা দিয়েছে হরতাল। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর ঘন ঘন হরতালে দেশের অর্থনীতি এখন ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে। হরতালের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, উৎপাদন, বৈদেশিক বিনিয়োগসহ নানাবিধ খাত। একদিনের হরতালে দেশের কোটি কোটি টাকার লোকসান হয়। কলকারখানা সব বন্ধ থাকে। জনগণের দুর্ভোগ পোহাতে হয়। হরতালের ফলে বিদেশীরা এ দেশে বিনিয়োগ করতে আগ্রহ প্রকাশ করে না। এতে আমাদের অর্থনীতি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

♦ পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ৭ নং আইন)-এর ধারা ৪ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে ৩১ আগস্ট ২০১৪। যা গেজেট আকারে প্রকাশিত হয় ২ সেপ্টেম্বর ২০১৪। ২ জুলাই ২০১৪ পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক আইন জাতীয় সংসদে পাস হয়, যাতে রাষ্ট্রপতি সম্মতি দেন ৮ জুলাই। পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের মালিকানা থাকবে 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্পের সুবিধাভোগী সমিতিগুলোর হাতে ৪৯% এবং সরকারের হাতে ৫১%। এ পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য সংখ্যা হবে ১৫ জন। তাদের আটজন সরকার মনোনীত ও বাকি সাতজন সমিতিগুলো থেকে আসবেন। সদস্যদের মধ্য থেকেই একজনকে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেবে পর্ষদ। তবে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন নিতে হবে। পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধন হবে এক হাজার কোটি টাকা। অনুমোদিত মূলধন প্রতিটি ১০০ টাকার ১০ কোটি সাধারণ শেয়ারে সমভাবে বিভক্ত হবে। ব্যাংক সরকারের অনুমোদনক্রমে সময়ে সময়ে মূলধন বৃদ্ধি করতে পারবে। ব্যাংকের পরিশোধিত শেয়ার মূলধন হবে ২০০ কোটি টাকা, যার ৫১ ভাগ সরকার এবং ৪৯ ভাগ সমিতি কর্তৃক পরিশোধ করা হবে। ঋণগ্রহীতা শেয়ারহোল্ডার তার শেয়ার সমশ্রেণির অপর ঋণগ্রহীতার কাছে হস্তান্তর করতে পারবেন। পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক নামে প্রথমে দেশের ৪৮৫ উপজেলায় শাখা নিয়ে যাত্রা শুরু করবে ব্যাংকটি। মূলত ভিন্নভাবে গ্রামীণ মানুষের সঞ্চয় সংগ্রহ ও তাদের মধ্যে ঋণ বিতরণের জন্য গ্রামে গ্রামে শাখা খুলবে। ১৯৯৬ সালে প্রথমবারের মতো চালু হয় 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্প। পরবর্তীতে প্রকল্পটি বন্ধ করে দেয়া হলেও ২০১০ সালে তা আবারো চালু হয়। এরপর ২০১১ সালের সেপ্টেম্বর থেকে নতুন আঙ্গিকে ক্ষুদ্র সঞ্চয় কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়। এর ফলে দেশব্যাপী সমিতি গঠিত হয় ১৭,৩০০টি যেখানে উপকৃত পরিবারের সংখ্যা ১০ লাখ ৩৮ হাজার এবং উপকারভোগী মানুষের সংখ্যা ৫০ লাখ। এখন এরা সবাই পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের সদস্য হবেন।

♦ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত ছয়টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক (২০১১-১৫) পরিকল্পনার মেয়াদ শেষ হবে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে। আর ২০১৫-১৬ অর্থবছরে শুরু হবে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

প্রায় দুই কোটি লোক বসবাস করে এবং রয়েছে চমৎকার জলজ প্রতিবেশগত বৈশিষ্ট্য। সমন্বিতভাবে গৃহীত এ পরিকল্পনায় রয়েছে– বন্যা ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ সংরক্ষণ, ফসল উৎপাদন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সংরক্ষণ, শিক্ষা, বসতি স্থাপন, স্বাস্থ্য সুবিধা, স্যানিটেশন, শিল্পকারখানা, বনায়ন, খনিজ সম্পদের ব্যবহার এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি উৎপাদন।

♦ কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত

বঙ্গোপসাগরের তীরে অবস্থিত কক্সবাজার বাংলাদেশ তথা পৃথিবীর অন্যতম মনোরম ও স্বাস্থ্যকর স্থান। কক্সবাজারের সমুদ্র সৈকত পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত। সৈকতের দৈর্ঘ্য ১২০ কিলোমিটার। কক্সবাজারের মতো সুদীর্ঘ বালুকাময় সমুদ্র সৈকত পৃথিবীর খুব কম স্থানেই রয়েছে। এই সুদীর্ঘ সৈকতের মনোরম দৃশ্য দেশী-বিদেশী পর্যটকদের কাছে খুবই আকর্ষণীয়। এখানকার মনোরম দৃশ্য উপভোগ করার জন্য দেশী-বিদেশী হাজার হাজার পর্যটক বেড়াতে আসেন। ১৭৯৭ সালে বার্মার (মায়ানমার) আরাকান অঞ্চলে গোলযোগ দেখা দিলে আরাকান এলাকা থেকে বাঙালিদের তাড়িয়ে দেয়া হয়। এই বিতাড়িত ছিন্নমূল বাঙালিরা বর্তমান কক্সবাজার, উখিয়া, গুনডুম প্রভৃতি এলাকায় আশ্রয় নেয়। ঐ সময় ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একজন দূত ক্যাপ্টেন কক্স বার্মার রাজদরবারে কাজ করতেন। তিনি কোম্পানির নির্দেশে এখানকার শরণার্থীদের তদারকি ও ত্রাণসামগ্রী বিতরণের জন্য কক্সবাজারে ছুটে আসেন। তখন এখানকার সমগ্র এলাকা মশা ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল এবং বিশুদ্ধ পানির অভাবের দরুন মানুষ বসবাসের অযোগ্য ছিল। ক্যাপ্টেন কক্স এমন পরিবেশে দারুণ অস্বস্তিবোধ করলেও শরণার্থীদের ফেলে চলে গেলেন না বরং তাদের জন্য কাজ করতে থাকেন। তখন এই সাগরতীরের নাম ছিল 'পালংকি'। অবশেষে ১৮০২ সালে ক্যাপ্টেন কক্স এখানেই মারা যান এবং তাঁর নামানুসারেই এই স্থানটির নামকরণ করা হয় 'কক্সবাজার'।

বর্তমানে কক্সবাজার আধুনিক সাজে সজ্জিত এবং বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় পর্যটন কেন্দ্র। এখানে কয়েকটি অত্যাধুনিক পর্যটন হোটেল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের ৮/১০ কিলোমিটার দক্ষিণে হিমছড়ি অবস্থিত। এই স্থানটি চলচ্চিত্র শ্যুটিং স্পট হিসেবে খুবই প্রসিদ্ধ। এছাড়াও কক্সবাজারের আশেপাশে বৌদ্ধ যুগের অনেক প্রাচীন কীর্তি এখনো বিদ্যমান। এখানকার প্যাগোডাগুলো খুবই দর্শনীয়। এখানে একটি আবহাওয়া অফিস ও একটি বাতিঘর আছে। এখানে মারমা ও রাখাইনসহ অনেক উপজাতির বসবাস রয়েছে।

♦ সেন্টমার্টিন দ্বীপ

কক্সবাজার জেলার টেকনাফের সমুদ্র উপকূল থেকে ৪৮ কিলোমিটার দূরে বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত একটি ছোট প্রবাল দ্বীপ সেন্টমার্টিন। এটিই বাংলাদেশের একমাত্র সামুদ্রিক প্রবাল দ্বীপ। চারদিকে সমুদ্র সৈকত দ্বারা পরিবেষ্টিত রাশি রাশি পাথর আর শৈল জমে তৈরি হয়েছে এই প্রবাল দ্বীপ। এর আয়তন ৮ বর্গ কিলোমিটার এবং আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ ৫০০ একর। লোকসংখ্যা প্রায় ৪ হাজার। দ্বীপটিতে রয়েছে অসংখ্য নারিকেল গাছ, কেয়াবন ও কাঁটাযুক্ত গুল্মের ঝোঁপ। তাই দ্বীপটির আঞ্চলিক নাম হয়েছে নারিকেল জিঞ্জিরা। দ্বীপটিতে ৪৯০টি পরিবার, ৬টি গ্রাম, ৩টি ওয়ার্ড, ১টি প্রাইমারি স্কুল, ১টি জুনিয়র হাই স্কুল এবং ১টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র রয়েছে। এখানে রয়েছে প্রচুর চুনাপাথর ও নুড়ি পাথর। তাছাড়া খনিজ সম্পদের জন্য অর্থনৈতিক দিক থেকে দ্বীপটির রয়েছে প্রচুর সম্ভাবনা। এর চারপাশে সমুদ্র তলদেশে প্রচুর প্রবাল রয়েছে, যেগুলো প্রক্রিয়াজাত করে বিদেশে রপ্তানি করা যেতে পারে। দ্বীপের অধিবাসীদের প্রায় ৯৫% মৎস্যজীবী এবং একমাত্র যোগাযোগ ব্যবস্থা হলো নৌ-পথ। দ্বীপটিকে একটি পর্যটন স্পট হিসেবে গড়ে তোলার উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

♦ ম্যানগ্রোভ অরণ্য *[৩৪তম বিসিএস]*

লোনা পানি বা কাদার মধ্যে জেগে থাকা খুঁটির মতো এক ধরনের শ্বাস গ্রহণকারী শিকড়বিশিষ্ট উদ্ভিদকে ম্যানগ্রোভ বলে। আর যে বনে প্রচুর পরিমাণে এ ধরনের গাছ জন্মে সে বনকে ম্যানগ্রোভ বন বলে। ম্যানগ্রোভ বন বিশ্বের গ্রীষ্মমণ্ডলীয় উপকূলে জন্মায়। শান্ত সাগর, খাড়ি ও নদীর মোহনা এ বনের উপযুক্ত স্থান। ম্যানগ্রোভ বনে গাছপালা-লতাগুল্ম লবণাক্ত সাগরের তীরে আপনা আপনিই গড়ে ওঠে। এবং গাছপালা-লতাগুল্মের রয়েছে বিশেষ বৈশিষ্ট্য। গাছের বীজ থেকে প্রায় ৩০ সেন্টিমিটার লম্বা মূল গজায়। জলে বা ডাঙায় বীজ পড়েই মূলকে ওপর দিকে রাখে। কাদা বা মাটি পেলে মূল বীজের সহায়তায় জীবন্ত প্রাণীর মতো তা আঁকড়ে ধরে। মূল কাজ করে শ্বাসমূল হিসেবে। স্রোতে বালুকণা ভেসে যাবার সময় শ্বাসমূল বালু ও পলি জমা করে। ম্যানগ্রোভ এভাবে ভূখণ্ড তৈরি করে। গাছের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কিছু শিকড় মাটির তলায়, কিছু ওপর দিকে থাকে। একে বলে 'শূল'। এটি খুব ধারালো। বিশ্বের সেরা প্রজাতির গাছপালাসমৃদ্ধ ম্যানগ্রোভ জঙ্গলকে বলা হয় লাল ম্যানগ্রোভ (Rhitophoramangle)। এ বন রয়েছে ফ্লোরিডা থেকে শুরু করে দক্ষিণ আমেরিকা ও পশ্চিম আফ্রিকা উপকূলে। এ বনে গুল্ম ও ফার্ন জাতীয় ছোট গাছ জন্মে। কিছু প্রজাতির গাছ ২৫ মিটার লম্বা হয়। গাছের বাকলে ট্যানিক এসিড থাকে। এটি চামড়া ট্যান করতে ব্যবহৃত হয়। সুন্দরবন পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন।

♦ বিপন্ন প্রাণীকুল *[৩৪তম বিসিএস]*

মানুষ, প্রাণী ও উদ্ভিদজগৎ, মাটি, পানি, বায়ু, নদী, সাগর ইত্যাদি সবকিছু নিয়েই পরিবেশ। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় উপরের প্রতিটি উপাদানেরই ভূমিকা অনস্বীকার্য। বলা যায় এসব পরিবেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং একটি অন্যটির সাথে গভীরভাবে যুক্ত। কিন্তু আজ নানাভাবে পরিবেশের ক্ষয়সাধন হওয়ায় বিশেষভাবে উদ্ভিদজগতের উপর বিভিন্ন ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের কারণে প্রাণীকুল আজ অস্তিত্বের হুমকির সম্মুখীন। নির্বিচারে বনাঞ্চল ধ্বংসসাধন, পাহাড় কর্তন, নদী দূষণসহ পরিবেশের উপর নানা বিরূপ কর্মকাণ্ডের ফলে ইতোমধ্যেই অনেক প্রাণীর পৃথিবী থেকে বিলুপ্তি ঘটেছে, অনেক প্রাণী বিলুপ্তির সম্মুখীন। বিশ শতকের শুরুতে পৃথিবীতে বাঘের সংখ্যা ছিল লক্ষাধিক। কিন্তু পরিবেশের উপর নানা বিরূপ কর্মকাণ্ড ও বাঘ শিকারের কারণে আজ বাঘের সংখ্যা সারা বিশ্বে ছয় হাজারেরও কম। বাংলাদেশে বনাঞ্চল ও পাহাড়ি ভূমি কমে যাওয়া ও মানুষের হাতে নির্বিচারে মারা যাওয়ায় বাঘ, হাতি, হরিণের মতো প্রাণীর সংখ্যা দিন দিন কমছে। খাদ্যের খোঁজে এই প্রাণীগুলো লোকালয়ে নেমে আসছে এবং মানুষের হাতে নির্বিচারে মারা পড়ছে।

♦ পর্ণমোচি বৃক্ষের বন *[৩৪তম বিসিএস]*

যে বনাঞ্চলের উদ্ভিদগুলোর পাতা বছরের কোনো না কোনো সময় ঝরে পড়ে, সে বনাঞ্চলকে ক্রান্তীয় পর্ণমোচী বা পত্রঝরা বনাঞ্চল বলা হয়। এ বনের প্রধান বৃক্ষ হলো শাল। প্লাইস্টোসিন যুগে উত্থিত বাংলাদেশের বরেন্দ্রভূমি, মধুপুর গড় ও লালমাই পাহাড়ে পত্রঝরা বনাঞ্চল দেখা যায়। চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী, নওগাঁ, জয়পুরহাট ও দিনাজপুরের অংশবিশেষ নিয়ে বরেন্দ্রভূমি গঠিত। টাঙ্গাইল, জামালপুর, গাজীপুর, ঢাকা ও নরসিংদীর কিছু অংশ নিয়ে মধুপুর গড় গঠিত। লালমাই পাহাড় কুমিল্লায় অবস্থিত।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

♦ স্পারসো (SPARRSO) *[১৭তম বিসিএস]*

Space Research and Remote Sensing Organisation (SPARRSO) বা মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন কেন্দ্র প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি প্রতিষ্ঠান। এটি ঢাকার আগারগাঁওয়ে অবস্থিত। SPARRSO কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে বিভিন্ন কাজ করে থাকে। স্পারসোর 'LAND SAT' ও 'NOA' নামের কৃত্রিম উপগ্রহ ভূমি জরিপ কাজে নিয়োজিত। সাভারে অবস্থিত Sattelite Ground Receiving Station খরা ও বন্যায় ক্ষতির পরিমাপ, ভূমি জরিপ, ভূমিক্ষয়, মাটির লবণাক্ততা নির্ণয়, বন শ্রেণীবিভাগ, সমুদ্রে পানির উচ্চতা, পুকুরের সংখ্যা নির্ণয়, বোরো ধান চাষাবাদের এলাকা পরিমাপ করা, চিংড়ি চাষ এলাকা, ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল ও বঙ্গোপসাগরের ক্লোরোফিলপূর্ণ এলাকা পরিমাপ করে। বর্তমানে ঢাকাতে আছে জিও স্টেশনারি 'Metrological Sattelite.' এটা দুই ঘণ্টা পর পর ঝড়, সাইক্লোন, মেঘ, বৃষ্টি ইত্যাদি আবহাওয়ার পূর্বাভাসের রিপোর্ট দিচ্ছে।

♦ তামাক নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা ২০১৫

দেশে তামাকজনিত ক্ষতি হ্রাসে সরকার ১৬ জুন ২০০৩ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার উদ্যোগে গৃহীত আন্তর্জাতিক চুক্তি WHO Framework Convention of Tobacco Control (WHOFCTC) স্বাক্ষর করে। এ চুক্তির বিধানাবলি প্রতিপালনে এবং ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্যের উৎপাদন, ব্যবহার, ক্রয়-বিক্রয় ও বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে সরকার 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫' প্রণয়ন করে। ২০০৬ সালে প্রণীত হয় এ সংক্রান্ত বিধিমালা। কিন্তু কিছু দুর্বলতার কারণে আইনটি কার্যকর ভূমিকা রাখতে না পারায় ২০১৩ সালের মে মাসে আইনটি যুগোপযোগী করে সংশোধিত আকারে পাস করা হয়। নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে ২৩ মাস পর সংশোধিত আইনের আলোকে প্রণীত বিধিমালাটি ১২ মার্চ ২০১৫ গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়। আইনের ধারা ৪ অনুযায়ী, 'পাবলিক প্লেস' ও 'পাবলিক পরিবহনে' ধূমপান সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়। আইনে ২৪ ধরনের স্থানকে 'পাবলিক প্লেস' হিসেবে ঘোষণা করা হয়— শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি অফিস, আধা-সরকারি অফিস, স্বায়ত্তশাসিত অফিস ও বেসরকারি অফিস, গ্রন্থাগার, লিফট, আচ্ছাদিত কর্মক্ষেত্র, হাসপাতাল ও ক্লিনিক ভবন, আদালত ভবন, বিমানবন্দর ভবন, সমুদ্রবন্দর ভবন, নৌবন্দর ভবন, রেলস্টেশন ভবন, বাস টার্মিনাল ভবন, প্রেক্ষাগৃহ, প্রদর্শনী কেন্দ্র, থিয়েটার হল, বিপণি ভবন, চতুর্দিকে দেয়াল দ্বারা আবদ্ধ রেস্টুরেন্ট, পাবলিক টয়লেট, শিশুপার্ক, মেলা বা পাবলিক পরিবহনে আরোহনের জন্য যাত্রীদের অপেক্ষার নির্দিষ্ট সারি, খেলাধুলা ও অনুশীলনের জন্য নির্ধারিত আচ্ছাদিত স্থান, জনসাধারণ কর্তৃক সম্মিলিতভাবে ব্যবহার্য অন্য কোনো স্থান। আর 'পাবলিক পরিবহন' হিসেবে ঘোষণা করা হয় ৮ প্রকার যানবাহনকে— মোটরগাড়ি, বাস, রেলগাড়ি, ট্রাম, জাহাজ, লঞ্চ, যান্ত্রিক সব রকম জনযানবাহন, উড়োজাহাজ। এসব 'পাবলিক প্লেস' ও 'পাবলিক পরিবহনে' ধূমপান করলে অভিযুক্ত ব্যক্তি অনধিক ৩০০ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৬. বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ : টেকসই ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা

♦ ফ্লাড অ্যাকশন প্ল্যান (FAP) *[১৭তম বিসিএস]*

বাংলাদেশে নদীশাসন কার্যক্রমের একটি প্রকল্প হলো বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প (Flood Action Plan-FAP)। ১৯৯০ সালের দিকে পরীক্ষামূলকভাবে FAP-এর কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে গাইবান্ধায় ৩ কি. মি. দীর্ঘ বেড়ীবাঁধ ও ৬টি গ্রোয়েন নির্মাণ করা হয়। এর ফলে যমুনা নদীর গতি পরিবর্তিত হয়েছে সত্য কিন্তু তাতে নদী তীরবর্তী প্রায় ৬ লক্ষাধিক মানুষ এবং সারা দেশের প্রায় ২৬ লক্ষ মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রকল্পাধীন বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি থানার কালিতলায় ৫৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে গ্রোয়েন উন্নয়ন, ব্রহ্মপুত্র ও বাঙালী নদী একত্রীকরণ রোধ এবং বগুড়ার মাথুরাপাড়ায় সিরাজগঞ্জে নদী তীরসংলগ্ন এলাকা সংরক্ষণের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। ১৯৯৫ সালের বন্যায় গাইবান্ধায় FAP-এর শাসন প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়লে এ প্রকল্পটি পানি উন্নয়ন বোর্ড ও ওয়াটার রিসার্চ অ্যান্ড প্লানিং অর্গানাইজেশন (WRPO)-এর অধীনে ন্যস্ত হয়।

♦ গঙ্গা-কপোতাক্ষ *[১০ম বিসিএস]*

গঙ্গা-কপোতাক্ষ প্রকল্প দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সেচ প্রকল্প। ১৯৪৫ সালে তৎকালীন সরকার কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করতে কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারায় গঙ্গা-কপোতাক্ষ বা জিকে প্রকল্প স্থাপন করে। এ প্রকল্পের আওতায় প্রধানত ধান উৎপন্ন করা হয়। কুষ্টিয়া, যশোর, মাগুরা, ঝিনাইদহ ও চুয়াডাঙ্গার ২ লাখ ২ হাজার জমি এই প্রকল্পের আওতাধীন। ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত খরিপ-১ ও খরিপ-২ মৌসুমে যথাক্রমে আউশ ও আমন ধানের সেচ দেয়া হতো। কিন্তু নদীতে পানির পরিমাণ কমে যাওয়ার ফলে কিছুদিনের জন্য আউশ ধান উৎপাদন স্থগিত রাখা হয়। পরবর্তীতে পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় এখন উভয় মৌসুমেই ধান চাষ করা হচ্ছে। কিন্তু প্রকল্পের দুটি বড় পাম্প অচল থাকায় সেচকার্যে চরম ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়েছে। তারপরও দক্ষিণবঙ্গের কৃষকদের এক বড় অংশের শেষ অবলম্বন হিসেবে জিকে প্রকল্প তার কার্যক্রম যথাযথভাবে চালিয়ে যাবার চেষ্টা করছে এবং জাতীয় উৎপাদনে বিরাট ভূমিকা রাখছে।

♦ নিরাপদ পানি

পৃথিবীর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তরল পদার্থ হলো পানি। পানি ছাড়া এ পৃথিবীতে প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের অস্তিত্ব কল্পনা করাও অসম্ভব। কেননা পানির অপর নাম জীবন। এটা ছাড়া জীবজগৎ বাঁচতে পারে না। নিরাপদ পানি মানবদেহের জন্য খুবই উপকারী কিন্তু বর্তমান বিশ্বজুড়ে বিশুদ্ধ পানি হ্রাস পাচ্ছে এবং পানি দূষণের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পৃথিবীর প্রায় চার ভাগের তিন ভাগ জুড়েই রয়েছে পানি। পানিতেই জীবনের প্রথম আবির্ভাব ঘটে। আবার অধিকাংশ জীবদেহের ৬০ শতাংশই পানি। তাই পানির ব্যবহারে নিরাপদ পানি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। নিরাপদ পানির চাহিদা বিস্তৃত ও ব্যাপক। কৃষি, গৃহস্থালি ও শিল্পের প্রয়োজনে পানির রয়েছে ভোগ্য (Consumptive) চাহিদা। আবার নৌচলাচল, মৎস্য, লবণাক্ততা নিয়ন্ত্রণ, দূষণ হ্রাসকরণ প্রভৃতি প্রয়োজনে রয়েছে পানির অ-ভোগ্য (Non-consumptive) চাহিদা। প্রতিবেশগত প্রতিরক্ষা এবং জলাভূমি সংরক্ষণে পানির প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। বাংলাদেশে পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার কতকগুলো জটিল ও দুরূহ ক্ষেত্র রয়েছে। এসবের মধ্যে প্রধান হচ্ছে বর্ষা মৌসুমে বন্যা ও শুষ্ক মৌসুমে খরার সমস্যা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধির সাথে সঙ্গতি রেখে ক্রমবর্ধমান পানির চাহিদা মোকাবিলা, নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন,

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

আর্সেনিক, নদীর তলদেশ ভরাট হয়ে যাওয়া এবং নদীভাঙন। এছাড়া পানি সম্পদকেন্দ্রিক পরিবেশ ভারসাম্য রক্ষা বিশেষ করে, মৎস্য সম্পদের এলাকাসমূহ এবং জলাভূমি এলাকার পরিবেশ রক্ষার বিষয়টি ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে সরকার বা ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণের বাইরের বিভিন্ন বিষয় যেমন, জলবায়ু পরিবর্তন ও সমুদ্রস্তরের উচ্চতা বৃদ্ধি, বহির্দেশীয় নদী বা নদী-অববাহিকায় পরিবর্তন ইত্যাদি বাংলাদেশের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কাজকে খুবই জটিল করে তুলছে। মানুষের কল্যাণ, প্রাণী ও উদ্ভিদ বৈচিত্র্য রক্ষা তথা নিরাপদ পানির জন্য অবিলম্বে আমাদেরকে পানি দূষণ রোধকল্পে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।

♦ তিতাস গ্যাসক্ষেত্র *[৩৪তম বিসিএস]*

তিতাস গ্যাসক্ষেত্রটির অবস্থান ঢাকা থেকে উত্তর-পূর্বদিকে ১০০ কিমি দূরে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায়। এটি বাংলাদেশের বৃহত্তম গ্যাসক্ষেত্র। যেখানে ৮.০৫ টিসিএফ পরিমাণ গ্যাস মওজুদ রয়েছে। এখান থেকে প্রতিদিন ৪৫০ মিলিয়ন কিউবিক ফিটেরও বেশি গ্যাস উত্তোলন করা হচ্ছে, যা সমগ্র দেশে গ্যাস উত্তোলনের ২০শতাংশ। ঢাকা শহরের বিতরণকৃত গ্যাসের অধিকাংশই তিতাস গ্যাস থেকে সরবরাহকৃত। তিতাস গ্যাসক্ষেত্রটি আবিষ্কার হয় ১৯৬২ সালে। কিন্তু বাণিজ্যিকভাবে গ্যাস উত্তোলন শুরু ১৯৬৮ সালে। দেশের অর্থনীতিকে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে তিতাস গ্যাসের ভূমিকা অপরিসীম।

♦ ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশন *[১৫তম বিসিএস]*

বাংলাদেশে প্রবাহিত অধিকাংশ নদীরই উৎপত্তিস্থল ভারতে। ফলে এ দেশে প্রবাহিত নদীগুলোর গতিপথ, পানি প্রাপ্তি ইত্যাদি বিষয়ে ভারতের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। বিশেষ করে বন্যা, প্লাবন ইত্যাদি সমস্যার হাত থেকে স্থায়ী সমাধান পাওয়ার লক্ষ্যে ১৯ মার্চ ১৯৭২ সালে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশন গঠন করা হয়। এ কমিশন গঠনের প্রধান উদ্দেশ্য হলো উভয় দেশের নদ-নদী থেকে সর্বাধিক সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এছাড়া আরো যে সকল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এ কমিশন গঠন করা হয়েছে তা হলো উভয় দেশের পানিসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্পসমূহের পর্যালোচনা করা। এ উদ্দেশ্যে কমিশন এ পর্যন্ত যে সকল পদক্ষেপ নিয়েছে সেগুলো হলো : ১. গঙ্গা নদীর যৌথ জরিপ; ২. তিস্তা বাঁধ জরিপ; ৩. নদীর ধারপথের উন্নতি সাধন; ৪. বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানিসম্পদ উন্নয়নের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন; ৫. শীতকালে নদীর পানিপ্রবাহ বৃদ্ধির সম্ভাবনা পরীক্ষা; ৬. সীমান্ত নদী সম্পর্কে আলোচনা ও সমস্যা সমাধানের উপায় উদ্ভাবন।

♦ বাংলাদেশের সমুদ্র জয়

বাংলাদেশ-মিয়ানমার সমুদ্রসীমা বিরোধ মামলার রায় দেয়া হয় ১৪ মার্চ ২০১২। জার্মানির হামবুর্গে অবস্থিত সমুদ্র আইন বিষয়ক আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল (ITLOS) এ রায় দেয়। সমুদ্রসীমা নিরসনে মিয়ানমারের দাবি 'সমদূরত্ব পদ্ধতি' ও বাংলাদেশের দাবি 'ন্যায্যতা পদ্ধতি-কে বিচার-বিশ্লেষণ করে আদালত ন্যায্যতা পদ্ধতি (Equitable Principle) অনুযায়ী রায় ঘোষণা করেন। ফলে বাংলাদেশ তার সমুদ্রসীমা দাবিতে জয়ী হয়। এ রায়ের মাধ্যমে তেল-গ্যাস সমৃদ্ধ বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যকার দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত সমুদ্রসীমা চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হয়েছে। ঐতিহাসিক এ রায়ের ফলে ২০০ নটিক্যাল মাইলের একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল (EEZ), ১২ নটিক্যাল মাইল রাষ্ট্রীয় বা আঞ্চলিক সমুদ্র অঞ্চল (Territorial Sea), EEZ-এর পরে বর্ধিত মহীসোপানে নিরঙ্কুশ অধিকারের

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

বৈধতা, সমুদ্রবক্ষে তেল গ্যাসসহ সম্পদ আহরণের অধিকার, গভীর সাগরে ও সমুদ্র তলদেশের সম্পদে অধিকার। ইটলস-এর রায়ে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলের দৈর্ঘ্য ৪১৩ কিমি এবং মিয়ানমারের ৫৮৭ কিমি, যার আনুপাতিক হার ১ ঃ ১.৪২। সে অনুযায়ী সমুদ্র এলাকায় বাংলাদেশের প্রাপ্য ১,১১,৬৩১ বর্গকিমি এবং মিয়ানমার পাবে ১,৭১,৮৩২ বর্গকিমি। বাংলাদেশের প্রাপ্য এ সমুদ্রসীমা যেন আরেকটি বাংলাদেশ। কেননা বাংলাদেশের মোট আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিমি। বাংলাদেশে সমুদ্রে নির্ধারিত ২৮টি ব্লকে তেল, গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনে কর্মপন্থা নির্ধারণ করলেও মিয়ানমার ও ভারতের অব্যাহত মালিকানা দাবির পরিপ্রেক্ষিতে এতদিন কর্মপন্থা প্রয়োগ করা যায়নি। বাংলাদেশের দাবি করা ২৮টি ব্লকের ২৭টিই দু'দেশে তাদের নিজেদের বলে দাবি করে। এ রায়ের ফলে অন্তত ১৮টি ব্লকের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হল। বাকি ১০টি ব্লক নিয়ে ভারতের সাথে মতপার্থক্য রয়েছে, যা অনুরূপ রায়ের মধ্য দিয়ে ফয়সালা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

♦ জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

৩ আগস্ট ২০১৪ নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন (National River Protection Commission) গঠন করা হয়। ১৪ জুলাই ২০১৩ জাতীয় নদীরক্ষা কমিশন আইন জাতীয় সংসদে পাস হয়। ২২ জুলাই ২০১৩ রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে। ৩ সেপ্টেম্বর ২০১৪ জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের কার্যক্রম শুরু হয়। নদীর অবৈধ দখল, পানি ও পরিবেশ দূষণ, শিল্প-কারখানা কর্তৃক সৃষ্ট নদী দূষণ, অবৈধ কাঠামো নির্মাণ ও নানাবিধ অনিয়ম রোধকল্পে এবং নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ পুনরুদ্ধার, নদীর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ এবং নৌ-পরিবহনযোগ্য হিসেবে গড়ে তোলাসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নদীর বহুমাত্রিক ব্যবহার নিশ্চিত করার প্রয়োজনে। নদীর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় বা বিভাগের কার্যাবলির মধ্যে সমন্বয় সাধন ⊙ নদীর পানি দূষণমুক্ত রাখা ⊙ বিলুপ্ত বা মৃত প্রায় নদী খনন ⊙ নদীর পরিবেশগত ভারসাম্য ও টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ ⊙ নদী রক্ষাকল্পে স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন পরিকল্পনা গ্রহণ ⊙ দেশের খাল, জলাশয় এবং সমুদ্র-উপকূল দখল ও দূষণমুক্ত রাখা।

♦ প্রথম পানি জাদুঘর

২৯ ডিসেম্বর ২০১৪ পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার নীলগঞ্জ ইউনিয়নের পাখিমারায় উদ্বোধন করা হয় দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম পানি জাদুঘর। নদ-নদী ও পানিসম্পদ রক্ষায় নীতিনির্ধারকদের আরো উদ্যোগী করে তোলা এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্য নিয়ে গড়ে তোলা হয় এ পানি জাদুঘর। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) সহযোগিতায় এ জাদুঘরের নকশা প্রণয়নসহ বিভিন্ন কাজ করা হয়। এর নির্মাণের উদ্যোক্তা অ্যাকশন এইড বাংলাদেশ। পানি জাদুঘরে এ দেশের নদ-নদীগুলোর নাম-পরিচয়, হারিয়ে যাওয়া নদী ও বর্তমান নদীর ছবি, নদীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত তথ্য জানা যাবে। এখানে রাখা হয়েছে পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, বুড়িগঙ্গা, আন্ধারমানিকসহ ১০টি নদীর পানির নমুনা। বাংলাদেশের সাথে ৫৭টি আন্তর্জাতিক অভিন্ন নদীর পানির নমুনা রাখার পরিকল্পনা আছে ভবিষ্যতে। এছাড়া হাঁড়ি-পাতিল, মাটির তৈরি সামগ্রী আছে জাদুঘরে। একসময় ঘরে ঘরে কাঁসার জিনিসপত্রের যে তৈজসপত্র ছিল, তাও দেখা যাবে এখানে। আছে মাছ ধরার জাল, চাঁইসহ বিভিন্ন উপকরণও। পানি জাদুঘরের সামনেই আছে একটি নৌকা। এটি অর্ধেক বালুতে ডোবানো। নদী মরে যাওয়ার গল্পের প্রতীক এটি। এখন নদীপাড়ের মানুষের জীবনও শুকিয়ে যাচ্ছে। বালুতে আটকে যাওয়া এ নৌকার মাধ্যমে তা তুলে ধরা হয়েছে। নৌকার বুকে বিঁধে আছে দু'টি গজাল, যা নদীমাতৃক এ দেশকে মেরে ফেলার চেষ্টার প্রতীক।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৭. বাংলাদেশের সংবিধান

◆ ন্যায়পাল *[৩৩তম, ৩২তম, ৩০তম ও ২৮তম বিসিএস]*

সুইডিশ শব্দ 'Ombudsman'-এর বাংলা প্রতিশব্দ ন্যায়পাল। ন্যায়পাল বা 'Ombudsman'-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, 'An experienced person having authority to inquire into pronounce upon grievances of citizens against public authorities.' অর্থাৎ 'দুর্নীতিবাজ প্রশাসনযন্ত্রের কবল থেকে নাগরিক অধিকার রক্ষার জন্য যে ব্যক্তি অভিযোগ গ্রহণকারী কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করেন তাকে ন্যায়পাল বলে। ১৮০৯ সালে প্রথমে সুইডেনে ওমবুডসম্যান বা ন্যায়পাল নিয়োগ করা হয়। ন্যায়পাল একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হলেও দেশভেদে এর কার্যক্রমে ভিন্নতা রয়েছে। যেসব দেশে এখনও ন্যায়পাল বা ওমবুডসম্যান পদ সৃষ্টি করা হয়নি সেসব দেশেও এ প্রতিষ্ঠান বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। অসমতা, আমলাতান্ত্রিকতা, মানবাধিকার লঙ্ঘন, নানাবিধ দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনা দূর করতে এবং আকীর্ণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সচল রাখতে সুশাসন ও আইনের কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে ন্যায়পাল পদ সৃষ্টি করা হয়। ন্যায়পাল হলো এ সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তার পদবি। এসব দিক বিবেচনা করে বাংলাদেশের সংবিধানেও ন্যায়পাল গঠনের বিধান রাখা হয়েছে। সংবিধানের ৭৭ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে :

১. সংসদ আইনের দ্বারা ন্যায়পালের পদ প্রতিষ্ঠার জন্য বিধান করতে পারবেন।
২. সংসদ আইনের দ্বারা ন্যায়পালকে কোনো মন্ত্রণালয়, সরকারী কর্মচারী বা সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের যে কোনো কাজ সম্পর্কে তদন্ত পরিচালনার ক্ষমতাসহ যেরূপ ক্ষমতা কিংবা যেরূপ দায়িত্ব প্রদান করবেন, ন্যায়পাল সেরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করবেন।
৩. ন্যায়পাল তাঁর দায়িত্ব পালন সম্পর্কে বার্ষিক রিপোর্ট প্রণয়ন করবেন এবং অনুরূপ রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপিত হবে।

◆ সার্বভৌমত্ব *[২৭তম বিসিএস]*

রাষ্ট্রের চরম ও চূড়ান্ত ক্ষমতাকে সার্বভৌমত্ব বলে। ফরাসি দার্শনিক জাঁ বোঁদা-এর মতে, 'আইনের দ্বারা অনিয়ন্ত্রিত নাগরিক ও প্রজাদের ওপর রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতাই হচ্ছে সার্বভৌমত্ব।' বিশিষ্ট আইনজ্ঞ জন অস্টিন-এর মতে, 'যদি কোনো নির্দিষ্ট উর্ধ্বতন ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি অপর কোনো উর্ধ্বতনের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ না করে সেই সমাজের বেশিরভাগ লোকের স্বভাবজাত আনুগত্য লাভ করে, তখন সেই নির্দিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সেই সমাজের সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের অধিকারী এবং উক্ত সমাজ একটি রাজনৈতিক ও স্বাধীন সমাজ।' রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হব্‌স বলেন, 'সার্বভৌম ক্ষমতা হলো ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টির সেই ক্ষমতা, যা যুদ্ধের অবস্থা থেকে শান্তি ও শৃঙ্খলার অবস্থায় পৌঁছার জন্য মানুষ পারস্পরিক চুক্তি করে পদাধিকারীর হাতে তুলে দিয়েছে।' রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রুশোর মতে, 'সার্বভৌম ক্ষমতা হলো সেই চরম ক্ষমতা, যা সামাজিক চুক্তি বা রাজার সর্বগ্রাসী ক্ষমতা নয়। এ ক্ষমতা গণইচ্ছার প্রকাশ। এ ক্ষমতা অবিভাজ্য, অহস্তান্তরযোগ্য ও অজ্ঞাত।' সুতরাং সার্বভৌমত্ব হলো রাষ্ট্রের চূড়ান্ত, স্থায়ী, অবিভাজ্য, অহস্তান্তরযোগ্য এবং সর্বজনীন ক্ষমতা। এ ক্ষমতার বলে রাষ্ট্র তার অধীন সকলকে আদেশ ও নির্দেশ দান করে এবং সকলের নিকট থেকে আনুগত্য লাভ করে। অন্যভাবে বলা যায়, সার্বভৌমত্ব হলো রাষ্ট্রের সেই চূড়ান্ত ক্ষমতা যার গুণে রাষ্ট্র অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব বজায় রাখে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অপর রাষ্ট্র থেকে নিয়ন্ত্রণমুক্ত থাকে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

◆ মানবাধিকার *[২৭তম বিসিএস]*

আধুনিক সমাজ ও সভ্যতায় মানবাধিকার অনিবার্যভাবেই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিবর্তনশীল সমাজ প্রতিনিয়তই বদলাচ্ছে। যে সভ্যতা ও প্রগতিকে লালন করছে মানুষ সেখানে মানবাধিকার সুস্থ সমাজের প্রতিশ্রুতি, আইনের শাসন, গণতন্ত্রায়ন, শিল্প ইত্যাদি বিষয় আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো। মানবাধিকার সংরক্ষণ ও ঘোষণার ইতিহাস বেশ দীর্ঘ। মানবসভ্যতার সেই প্রথম পর্যায়ে মানবতাবাদ ছিল চেতনানির্ভর। রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থায় তার উপস্থিতি ছিল নগণ্য বা কার্যত অনুপস্থিত। ১২১৫ সালে রাজা জনের স্বাক্ষরিত 'The Magna Carta' বিশ্বের ইতিহাসের প্রথম মানবাধিকার সনদ। তবে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সর্বশেষ ফসল এবং মানবজাতির গুরুত্বপূর্ণ সনদ 'The Universal Declaration of Human Rights বা সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা। এই সনদটি ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত হয়। মানুষ সমান মর্যাদা ও সমান অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং সকল মানুষই যে কোনো প্রকার পার্থক্য যেমন– জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, নারী-পুরুষ, ভাষা, জন্ম, রাজনৈতিক বা অন্য মতাদর্শ, জাতীয় ও সামাজিক উৎপত্তি, জন্ম বা অন্য মর্যাদা নির্বিশেষে সমান এবং সকল ধরনের অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগের অধিকারী —এটিই মানবাধিকারের মূলকথা।

◆ সংযুক্ত তহবিল *[৩২তম, ৩০তম ও ২৯তম বিসিএস]*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৮৪ নং অনুচ্ছেদের (১) দফায় বলা হয়েছে, "সরকার কর্তৃক প্রাপ্ত সকল রাজস্ব, সরকার কর্তৃক সংগৃহীত সকল ঋণ এবং কোন ঋণ পরিশোধ হইতে সরকার কর্তৃক প্রাপ্ত সকল অর্থ একটি মাত্র তহবিলের অংশে পরিণত হইবে এবং তাহা 'সংযুক্ত তহবিল' নামে অভিহিত হইবে।" বাংলাদেশ সরকারের তথা রাষ্ট্রের সকল অর্থ দুটি তহবিলে জমা হয়– (ক) সংযুক্ত তহবিল এবং (খ) প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব (Public Account of the Republic)। তিন ধরনের অর্থ সংযুক্ত তহবিলের জমা হয়। যথা–

১. সরকার কর্তৃক প্রাপ্ত সকল রাজস্ব;
২. সরকার কর্তৃক সংগৃহীত সকল ঋণ; এবং
৩. ঋণ পরিশোধ থেকে সরকার কর্তৃক প্রাপ্ত অর্থ।

এই তিন ধরনের অর্থ ব্যতীত অন্য সকল ধরনের অর্থ যা সরকার প্রাপ্ত হয় তা প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবে জমা হয়। সংযুক্ত তহবিল থেকে সরকার যে অর্থ ব্যয় করে তাকে দু'ভাগে ভাগ করা যায় :

(i) যে সকল ব্যয়ের উপর সংসদের ভোট গ্রহণ করা হয় না বা অনুমোদন প্রয়োজন হয় না (Non votable expenditure)। এ ব্যয়কে সংযুক্ত তহবিলের উপর দায়যুক্ত বা ধার্য ব্যয় বলা হয়।
(ii) যে সকল ব্যয় অনুমোদন সাপেক্ষ বা যেগুলোর উপর ভোট গ্রহণ করা হয় (Votable expenditure)।

◆ ধর্মীয় স্বাধীনতা *[৩২তম বিসিএস, ৩১তম ও ২৮তম বিসিএস]*

ধর্মীয় স্বাধীনতা বলতে এমন নীতিকে বোঝায়, যা কোনো ব্যক্তি বা সম্প্রদায় সরকারি বা বেসরকারিভাবে তার ধর্মীয় কার্যক্রম ও বিশ্বাস, শিক্ষা ও চর্চার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ভোগ করে। ধর্মীয় স্বাধীনতা ধারণাটি ধর্ম পরিবর্তন করা অথবা কোনো ধর্মের অনুসারী না হওয়ার সাথেও সংশ্লিষ্ট। বাংলাদেশ সংবিধানের ৪১(১) ক তে বলা হয়েছে, প্রত্যেক নাগরিকের যে কোনো ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার রয়েছে, (খ) প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায় ও উপ-সম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন, রক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার অধিকার রয়েছে। পরিশেষে বলা যায়, সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে মানুষের চিন্তা-চেতনার নতুন নতুন দ্বার উন্মোচন হওয়ার ফলে আধুনিক উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় ধর্মীয় স্বাধীনতার ক্ষেত্র প্রসারিত হচ্ছে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

◆ সম্পূরক মঞ্জুরি *[৩২তম, ৩১তম ও ২৮তম বিসিএস]*

অর্থশাস্ত্রে সম্পূরক ও অতিরিক্ত মঞ্জুরি বলতে বোঝায় কোনো নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা কাজের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ কম বা বেশি ব্যয় হলে তা যদি উক্ত অর্থবছরের বাজেটে অন্তর্ভুক্ত না হয় তবে তা সংযুক্ত তহবিল থেকে ব্যয়নির্বাহকে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ৯১ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, কোনো অর্থবছর প্রসঙ্গে যদি দেখা যায় যে— (ক) চলতি অর্থবছরে নির্দিষ্ট কোনো কর্মবিভাগের জন্য অনুমোদিত ব্যয় অপর্যাপ্ত হয়েছে কিংবা ঐ বছরের বার্ষিক আর্থিক বিবৃতিতে অন্তর্ভুক্ত হয়নি, এমন কোনো নতুন কর্মবিভাগের জন্য ব্যয় নির্বাহের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। অথবা (খ) কোনো অর্থবছরে কোনো কর্মবিভাগের জন্য মঞ্জুরিকৃত অর্থের অধিক অর্থ ঐ বছরে উক্ত কর্মবিভাগের জন্য ব্যয়িত হয়েছে তাহলে সংবিধানের দ্বারা বা অধীন সংযুক্ত তহবিলের ওপর একে দায়মুক্ত করা হোক বা না হোক, সংযুক্ত তহবিল থেকে এ ব্যয় নির্বাহের কর্তৃত্ব প্রদান করার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকবে এবং রাষ্ট্রপতি ক্ষেত্রমতো এ ব্যয়ের অনুমিত পরিমাণ সংবলিত একটি সম্পূরক আর্থিক বিবৃতি কিংবা অতিরিক্ত ব্যয়ের পরিমাণ সংরক্ষিত একটি অতিরিক্ত আর্থিক বিবৃতি সংসদে উপস্থাপনের ব্যবস্থা করবেন এবং বার্ষিক আর্থিক বিবৃতির ন্যায় উপরিউক্ত বিবৃতির ক্ষেত্রে (প্রয়োজনীয় উপযোগীকরণসহ) এ সংবিধানের ৮৭ থেকে ৯০ পর্যন্ত অনুচ্ছেদসমূহ প্রযোজ্য হবে।

◆ অর্থ বিল *[৩২তম, ৩০তম, ২৯তম ও ২৮তম বিসিএস]*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৮১(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে– এই ভাগে 'অর্থবিল' বলিতে কেবল নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের সকল বা যে কোনো একটি সম্পর্কিত বিধানাবলী সংবলিত বিল বুঝাইবে :

ক. কোনো কর আরোপ, নিয়ন্ত্রণ, রদবদল, মওকুফ বা রহিতকরণ;
খ. সরকার কর্তৃক ঋণগ্রহণ বা কোনো গ্যারান্টি দান, কিংবা সরকারের আর্থিক দায়-দায়িত্ব সম্পর্কিত আইন সংশোধন;
গ. সংযুক্ত তহবিলের রক্ষণাবেক্ষণ, অনুরূপ তহবিলে অর্থ প্রদান বা অনুরূপ তহবিল হইতে অর্থ দান বা নির্দিষ্টকরণ;
ঘ. সংযুক্ত তহবিলের উপর দায় আরোপ কিংবা অনুরূপ কোনো দায় রদবদল বা বিলোপ;
ঙ. সংযুক্ত তহবিল বা প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব বাবদ অর্থ প্রাপ্তি, কিংবা অনুরূপ অর্থ রক্ষণাবেক্ষণ বা দান, কিংবা সরকারের হিসাব-নিরীক্ষা;

(৩) নং দফায় বলা হয়েছে– রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য তাঁহার নিকট পেশ করিবার সময়ে প্রত্যেক অর্থবিলে স্পিকারের স্বাক্ষরে এই মর্মে একটি সার্টিফিকেট থাকিবে যে, তাহা একটি অর্থবিল এবং অনুরূপ সার্টিফিকেট সকল বিষয়ে চূড়ান্ত হইবে এবং সেই সম্পর্কে কোনো আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

◆ সম্পত্তির অধিকার *[৩১তম বিসিএস]*

সম্পত্তি মানুষের একটি সামাজিক অধিকার। বাংলাদেশের সংবিধান দ্বারা এটি বিশেষভাবে সংরক্ষিত। বাংলাদেশের সংবিধানের ৪২নং অনুচ্ছেদে এ ব্যাপারে বলা হয়েছে :

(১) আইনের দ্বারা আরোপিত বাধা নিষেধ-সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর বা অন্যভাবে বিলি-ব্যবস্থা করিবার অধিকার থাকিবে এবং আইনের কর্তৃত্ব ব্যতীত কোন সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্ত বা দখল করা যাইবে না।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

(২) এই অনুচ্ছেদের (১) দফার অধীন প্রণীত আইনে ক্ষতিপূরণসহ বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্তকরণ বা দখলের বিধান করা হইবে এবং ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ কিংবা ক্ষতিপূরণ নির্ণয় ও প্রদানের নীতি ও পদ্ধতি নির্দিষ্ট করা হইবে; তবে অনুরূপ কোন আইনে ক্ষতিপূরণের বিধান অপর্যাপ্ত হইয়াছে বলিয়া সেই আইন সম্পর্কে কোন আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

(৩) ১৯৭৭ সালের ফরমানসমূহ (সংশোধন) আদেশ, ১৯৭৭ (১৯৭৭ সালের ১নং ফরমানসমূহ আদেশ) প্রবর্তনের পূর্বে প্রণীত কোন আইনের প্রয়োগকে, যতদূর তাহা ক্ষতিপূরণ ব্যতীত কোন সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্তকরণ বা দখলের সহিত সম্পর্কিত, এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই প্রভাবিত করিবে না।

◆ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল *[৩১তম বিসিএস]*

বাংলাদেশ সংবিধানে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা এক অভিনব পদক্ষেপ। বাংলাদেশ সংবিধানের ১১৭ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে :

(১) ইতঃপূর্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহ সম্পর্কে বা ক্ষেত্রসমূহ হইতে উদ্ভূত বিষয়াদির উপর এখতিয়ার প্রয়োগের জন্য সংসদ আইনের দ্বারা এক বা একাধিক প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবেন :

(ক) নবম ভাগে বর্ণিত বিষয়াদি এবং অর্থদণ্ড বা অন্য দণ্ডসহ প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের কর্মের শর্তাবলী;
(খ) যেকোন রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগ বা সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষের চালনা ও ব্যবস্থাপনা এবং অনুরূপ উদ্যোগ বা সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষে কর্মসহ কোন আইনের দ্বারা বা অধীন সরকারের উপর ন্যস্ত বা সরকারের দ্বারা পরিচালিত কোন সম্পত্তির অর্জন, প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা ও বিলি-ব্যবস্থা;
(গ) যে আইনের উপর এই সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের (৩) দফা প্রযোজ্য হয়, সেইরূপ কোন আইন।

(২) কোন ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদের অধীন কোন প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠিত হইলে অনুরূপ ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ারের অন্তর্গত কোন বিষয়ে অন্য কোন আদালত কোনরূপ কার্যধারা গ্রহণ করিবেন না বা কোন আদেশ প্রদান করিবেন না :

তবে শর্ত থাকে যে, সংসদ আইনের দ্বারা অনুরূপ কোন ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা বা অনুরূপ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীলের বিধান করিতে পারিবেন।

◆ গ্রেফতার ও আটক সম্পর্কে রক্ষাকবচ *[৩০তম বিসিএস]*

গ্রেফতার ও আটক সম্পর্কে সংবিধানের ৩৩ নং অনুচ্ছেদে স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। এটি একজন নাগরিকের মৌলিক অধিকার। কোনো ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের কারণ না জানিয়ে আটক রাখা যাবে না। কোনো ব্যক্তিকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আদালতে হাজির করতে হবে এবং আদালতের নির্দেশ ব্যতীত তাকে আটক রাখা যাবে না। অবশ্য সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনীতে বলা হয় সরকার বিনা বিচারে রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে আটক রাখতে পারবে। বিদেশী শত্রুর এই অধিকার প্রযোজ্য নয়। ৩৩ নং অনুচ্ছেদে গ্রেফতারকৃত নাগরিককে মৌলিক রক্ষাকবচের নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। একজন ব্যক্তিকে দণ্ডযোগ্য ফৌজদারি অপরাধ করার অভিযোগে পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতার করা যায়। অতঃপর গ্রেফতারের কারণ যথাসম্ভব শীঘ্র তাকে না জানিয়ে পুলিশ প্রহরায় আটক রাখা যায় না। আইনজীবীর পরামর্শ ও আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হয়। আটককৃত ব্যক্তি দণ্ডবিধির একাধিক অপরাধে যুক্ত হলে তাকে আটক রাখার উদ্দেশ্য হচ্ছে বিচারের জন্য আদালতে তার উপস্থিতি নিশ্চিত করা এবং বিচারকালে সে আটক না মুক্ত থাকবে তা নির্ভর করবে তার অপরাধের মাত্রার ওপর। অপরাধ জামিনযোগ্য হলে ম্যাজিস্ট্রেট নিজ বিবেচনায় জামিন দিবেন। অপরাধ অজামিনযোগ্য হলে ম্যাজিস্ট্রেট নিজ বিবেচনায় হয় জামিন

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

দেবেন বা জেল হাজতে পাঠাবেন এবং সেক্ষেত্রে বিচার কার্যক্রম দ্রুত নিষ্পত্তি হওয়া আটককৃত ব্যক্তির অধিকার হবে। ৩৫নং অনুচ্ছেদে বিচার ও দণ্ড বিষয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে এবং তৎপূর্বে তার গৃহে প্রবেশ, তল্লাশি ও আটক বিষয়ে ৪৩নং অনুচ্ছেদে রক্ষাকবচ দেয়া হয়েছে। দণ্ডযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত নন, কিন্তু নিবর্তনমূলক আইনে আটক নাগরিকের রক্ষাকবচ ৩৩নং অনুচ্ছেদের ৪, ৫ ও ৬ দফায় দেয়া আছে। যেমন– যথাশীঘ্র আটকাদেশের কারণ জানতে দেয়া, আটকাদেশের বিরুদ্ধে বক্তব্য দেয়ার যথাশীঘ্র সুযোগ দেয়া এবং আটককৃত ব্যক্তির লিখিত ও মৌখিক বক্তব্য শুনানি শেষে উপদেষ্টা পর্ষদের রিপোর্ট ছাড়া ছয় মাসের অধিক সময় আটক না রাখা। এরূপ আটকাদেশের বিরুদ্ধে আর একটি রক্ষাকবচ হচ্ছে আটকাদেশটি আইনানুগ কিনা আদালত কর্তৃক তা পরীক্ষা করার বিধান।

♦ গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লব *[৩০তম বিসিএস]*

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় অর্জন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংবিধান উপহার দেয়া। ১৯৭২ সালে প্রবর্তিত সংবিধানের ১৫৩নং অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ ৮নং থেকে ২৫নং অনুচ্ছেদে সংযোজন করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৬নং অনুচ্ছেদে 'গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লব' শিরোনামে বলা হয়েছে, "নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করিবার উদ্দেশ্যে কৃষি বিপ্লবের বিকাশ, গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিকরণের ব্যবস্থা, কুটিরশিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের আমূল রূপান্তর সাধনের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।" 'গ্রামীণ উন্নয়ন' বলতে গ্রামীণ অবকাঠামোগত উন্নয়ন তথা রাস্তা-ঘাট, সেতু, হাসপাতাল, দালানকোঠা, ঘরবাড়ি, পানি ও শক্তিসম্পদ, প্রশাসনিক ব্যবস্থা, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশ ত্বরান্বিত করাকে বোঝায়। অপরদিকে, 'কৃষি বিপ্লব' বলতে কৃষি ক্ষেত্রে উন্নত বীজ ও সার সরবরাহ, ভূমি চাষে উন্নত ও আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার, নদী ভাঙন রোধ, জমির উর্বরতা বৃদ্ধি ও উন্নয়ন, কৃষির যথাযথ মূল্য নির্ধারণ, সঠিক কৃষিনীতি ঘোষণা ও ভূমির সঠিক মালিকানা নির্ধারণ প্রভৃতি ব্যবস্থাকে বোঝায়।

♦ সাংবিধানিক সংস্থা *[৩০তম বিসিএস]*

সংবিধানে বর্ণিত সুস্পষ্ট বিধি মোতাবেক গঠিত প্রতিষ্ঠানকে সাংবিধানিক সংস্থা বলে। বাংলাদেশের সাংবিধানিক সংস্থাগুলো হচ্ছে—

১. **মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক :** এ সংক্রান্ত বিধান রয়েছে সংবিধানের অষ্টম ভাগের ১২৭ থেকে ১৩২নং অনুচ্ছেদ পর্যন্ত।
২. **নির্বাচন কমিশন :** এ সংক্রান্ত বিধান রয়েছে সংবিধানের সপ্তম ভাগের ১১৮-১২৬ নং অনুচ্ছেদ পর্যন্ত।
৩. **সরকারি কর্ম কমিশন :** বাংলাদেশ সংবিধানের নবম ভাগের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ১৩৭ থেকে ১৪১ নং অনুচ্ছেদ পর্যন্ত রয়েছে সরকারি কর্ম-কমিশন সংক্রান্ত বিধানাবলী।
৪. **প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল :** ষষ্ঠ ভাগের তৃতীয় পরিচ্ছেদের ১১৭ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল গঠিত।
৫. **অ্যাটর্নি জেনারেল :** সংবিধানের চতুর্থ ভাগের পঞ্চম পরিচ্ছেদের ৬৪ নং অনুচ্ছেদে রয়েছে অ্যাটর্নি জেনারেল সংক্রান্ত বিধান।

এছাড়াও রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, জাতীয় সংসদের স্পিকার-ডেপুটি স্পিকার, প্রধান বিচারপতির পদও সাংবিধানিক পদ।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

♦ প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব *[২৯তম বিসিএস]*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৮৪ নং অনুচ্ছেদের (২) দফায় বলা হয়েছে, "সরকার কর্তৃক বা সরকারের পক্ষে প্রাপ্ত সকল সরকারি অর্থ প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবে জমা হইবে।"

♦ সুযোগের সমতা *[২৮তম বিসিএস]*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ১৯নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে,

১. সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হবেন।
২. মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধাদান নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

♦ চুক্তি ও দলিল *[২৮তম বিসিএস]*

বাংলাদেশ সংবিধানের ১৪৫ অনুচ্ছেদে 'চুক্তি ও দলিল' সম্পর্কে বলা হয়েছে :

১. প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী কর্তৃত্বে প্রণীত সকল চুক্তি ও দলিল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত বলে প্রকাশ করা হবে এবং রাষ্ট্রপতি যেরূপ নির্দেশ বা ক্ষমতা প্রদান করবেন, তাঁর পক্ষে সেরূপ ব্যক্তি কর্তৃক ও সেরূপ প্রণালীতে তা সম্পাদিত হবে।
২. প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী কর্তৃত্বে কোনো চুক্তি বা দলিল প্রণয়ন বা সম্পাদন করা হলে উক্ত কর্তৃত্বে অনুরূপ চুক্তি বা দলিল প্রণয়ন বা সম্পাদন করার জন্য রাষ্ট্রপতি কিংবা অন্য কোনো ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হবেন না, তবে এ অনুচ্ছেদ সরকারের বিরুদ্ধে যথাযথ কার্যধারা আনয়নে কোনো ব্যক্তির অধিকার ক্ষুণ্ন করবে না।

♦ পদের শপথ *[২৮তম বিসিএস]*

বাংলাদেশ সংবিধানের ১৪৮ অনুচ্ছেদে 'পদের শপথ' সম্পর্কে বলা হয়েছে–

১. তৃতীয় তফসিলে উল্লিখিত যে কোনো পদে নির্বাচিত বা নিযুক্ত ব্যক্তি কার্যভার গ্রহণের পূর্বে উক্ত তফসিল অনুযায়ী শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা (অনুচ্ছেদে 'শপথ' বলে অভিহিত) করবেন এবং অনুরূপ শপথপত্রে বা ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর দান করবেন।
২. এ সংবিধানের অধীন নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির নিকট শপথ গ্রহণ আবশ্যক হলে অনুরূপ ব্যক্তি যেরূপ ব্যক্তি ও স্থান নির্ধারণ করবেন, সেরূপ ব্যক্তির 'নিকট' সেরূপ স্থানে শপথ গ্রহণ করা যাবে।
৩. এ সংবিধানের অধীনে যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির পক্ষে কার্যভার গ্রহণের পূর্বে শপথ গ্রহণ আবশ্যক, সেক্ষেত্রে শপথ গ্রহণের অব্যবহিত পর তিনি কার্যভার গ্রহণ করেছেন বলে গণ্য হবে।

♦ নাগরিকত্ব *[২৮তম বিসিএস]*

নাগরিক হলো একটি রাষ্ট্রের স্থায়ী বাসিন্দা, যারা রাষ্ট্র প্রদত্ত সকল সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করে এবং রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে তারাই নাগরিক। নাগরিকদের সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকে এবং অনুরূপভাবে রাষ্ট্রেরও নাগরিকদের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকে। বাংলাদেশ সংবিধানের ৬(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হবে। এবং ৬(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলে পরিচিত হবে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

♦ জনশৃঙ্খলা রক্ষা *[২৮তম বিসিএস]*

আভিধানিক অর্থে 'শৃঙ্খলা' বলতে শিকল, জিঞ্জির, নিগড়, রীতি, নিয়ম, বিন্যাস, সুব্যবস্থা, ধারা প্রভৃতিকে বোঝায়। আর জনশৃঙ্খলা রক্ষা বলতে জনগণের নিরাপত্তা রক্ষা নিয়ম, রীতি, ধারা প্রভৃতি পালন বা রক্ষা করতে বাধ্য করা বা সাহায্য করাকে বোঝায়। আর এ কর্মপ্রচেষ্টা বা দায়িত্ব পালন করে রাষ্ট্রে নিয়োজিত শৃঙ্খলাবাহিনী ও বিভিন্ন প্রকার প্রশাসনিক কর্মীবৃন্দ। যাতে কোন প্রকার অপরাধ, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড প্রভৃতি সংগঠিত না হতে পারে, স্বাভাবিক জনজীবন বিঘ্নিত না হতে পারে তার জন্যে এরা নিরলস কাজ করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ৩৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, জনশৃঙ্খলা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষ শান্তিপূর্ণভাবেও নিরস্ত্র অবস্থায় সমবেত হবার এবং জনসভা বা শোভাযাত্রায় যোগদান করার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকবে। ৩৯(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা বা নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত-অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তাদান করা হলো।

♦ সংবিধান প্রণয়নের ইতিহাস

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালের ১১ এপ্রিল অস্থায়ী সংবিধান আদেশ জারি করে আপাতত দেশ পরিচালনার একটি অস্থায়ী আইন প্রণয়ন করা হয়। তার আগে ২৩ মার্চ জারি করা হয় বাংলাদেশ গণপরিষদ অধ্যাদেশ। এ অধ্যাদেশে বলা হয়, কেন্দ্রীয় ১৬৯ আসন এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০ আসনের সদস্যদের নিয়ে বাংলাদেশ গণপরিষদ গঠিত হবে এবং তারা বাংলাদেশের জন্য সংবিধান রচনা করবেন। গণপরিষদ গঠনকালীন ৪৬৯ জন সদস্যের মধ্যে মৃত্যু, দেশত্যাগ, দল থেকে বহিষ্কার, অন্য দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ ইত্যাদি কারণে ৬৬ জনকে বাদ দিয়ে ৪০৩ জনকে নিয়ে গণপরিষদের কার্যক্রম শুরু হয়। এই ৪০৩ জনের মধ্যে ৪০০ জনই আওয়ামী লীগের সদস্য ও বাকি তিন জন অন্য দলের। ১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে। এ অধিবেশনে ৩৪ সদস্যবিশিষ্ট একটি 'সংবিধান কমিটি' গঠন করা হয়। তৎকালীন আইনমন্ত্রী ড. কামাল হোসেনকে এই খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সভাপতি নির্বাচন করা হয়। কমিটি ৭১টি অধিবেশনে মিলিত হয়ে খসড়া সংবিধান প্রণয়ন সম্পন্ন করে এবং ১৯৭২ সালের ১২ অক্টোবর গণপরিষদে সংবিধানের খসড়া পেশ করে। ৩ নভেম্বর গভীর রাত পর্যন্ত গণপরিষদের অধিবেশন চলে। ঐ অধিবেশনে ১৫৩টি অনুচ্ছেদ পাস হয়। এই অনুচ্ছেদগুলোতে মোট ১৩৪টি সংশোধনী প্রস্তাব গণপরিষদে উত্থাপিত হয়। এর মধ্যে ৬১টি সংশোধনী গৃহীত হয়। ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর স্পিকার মোহাম্মদ উল্লাহর সভাপতিত্বে গণপরিষদের অধিবেশনে বাংলাদেশের সংবিধান গৃহীত হয়। উল্লেখ্য, ঐ দিন দুপুর ১টা ১৭ মিনিটে গণপরিষদের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানসহ উপস্থিত ৪০৩ জন সদস্যের সবাই 'হ্যাঁ' সূচক ধ্বনি দিয়ে সংবিধান অনুমোদন করেছিলেন। সংবিধান অনুমোদনের বিপক্ষে একটিও 'না' ধ্বনি উচ্চারিত হয়নি। সংবিধান কার্যকর হয় ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ বিজয় দিবসের প্রথম বার্ষিকী দিবসে। এর আগে ১৪ ও ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭২ গণপরিষদের ৩৮৬ জন সদস্য গৃহীত সংবিধানে স্বাক্ষর করেন। সংবিধানের মূল কপির শেষে এই ৩৮৬টি স্বাক্ষর আছে। প্রথম স্বাক্ষরকারী শেখ মুজিবুর রহমান এবং ক্রমান্বয়ে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমেদসহ ১৩ নম্বর ক্রমিকে স্বাক্ষর করেন সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সভাপতি ড. কামাল হোসেন।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

♦ সংবিধান প্রণয়ন কমিটি

১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে। এ অধিবেশনে ৩৪ সদস্যবিশিষ্ট একটি সংবিধান কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটির সভাপতি ছিলেন আইন ও সংসদীয় মন্ত্রী ড. কামাল হোসেন। এ কমিটির দায়িত্ব ছিল সংবিধানের খসড়া প্রণয়ন করা। কমিটি ৭১টি অধিবেশনে মিলিত হয়ে স্বীয় দায়িত্ব পালন করে এবং ১৯৭২ সালের ১২ অক্টোবর গণপরিষদে সংবিধানের খসড়া পেশ করে যা ৪ নভেম্বর গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয় এবং ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হয়।

এ কমিটির সদস্য (সরকারী দলীয়) হলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমেদ, খোন্দকার মুশতাক আহমেদ, এ এইচ এম কামরুজ্জামান, এম আবদুর রহীম, আবদুর রউফ, মোঃ লুৎফর রহমান, আবদুল মমিন তালকুদার, অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, মোঃ বায়তুল্লাহ, ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম, বাদল রশীদ (বার-এট-ল'), খন্দকার আব্দুল হাফিজ, মোঃ নুরুল ইসলাম মঞ্জুর, শওকত আলী খান, মোঃ হুমায়ুন খালিদ, আসাদুজ্জামান খান, মোশাররফ হোসেন আখন্দ, আবদুল মমিন, শামসুদ্দিন মোল্লা, শেখ আবদুল রহমান, ফকির সাহাবুদ্দিন আহমদ, আবদুল মুনতাকীম চৌধুরী, অধ্যাপক খুরশীদ আলম, অ্যাডভোকেট সিরাজুল ইসলাম, দেওয়ান আবদুল আব্বাস, হাফিজ হাবিবুর রহমান, মোঃ আবদুর রশিদ, নুরুল ইসলাম চৌধুরী, মুহাম্মদ খালিদ, ডা. ক্ষিতীশচন্দ্র মণ্ডল, বেগম রাজিয়া বানু এবং সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত (একমাত্র বিরোধী দলীয় সদস্য)

♦ প্রথম সংশোধনী

সংবিধান (প্রথম সংশোধনী) বিল, ১৯৭৩ শিরোনামে বাংলাদেশ সংবিধানের প্রথম সংশোধনী ১২ জুলাই ১৯৭৩ তদানীন্তন আইনমন্ত্রী শ্রী মনোরঞ্জন ধর সংসদে উত্থাপন করেন। সংসদে উপস্থিত ২৫৭ জন সদস্যের মধ্যে ২৫৪ জন সংশোধনীর পক্ষে ভোট দেন। বিপক্ষে ভোট না পড়লেও ৩ জন সদস্য ভোটদানে বিরত ছিলেন। ১৫ জুলাই ১৯৭৩ সংসদ কর্তৃক গৃহীত হওয়ার পর এ দিনই রাষ্ট্রপতি কর্তৃক তা অনুমোদিত হয়। এ সংশোধনীর মূল বিষয় ছিল যুদ্ধাপরাধীসহ গণবিরোধীদের বিচারের বিধান করা। সংবিধান প্রবর্তনের ৭ মাস পরেই এই সংশোধনী আনীত ও গৃহীত হওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে আটককৃত পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিদের বিচারের জন্য সরকারকে যথোপযুক্ত ক্ষমতা প্রদান করা। এর দ্বারা সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদকে সংশোধন করে নতুন একটি দফা এবং ৪৭-ক নামক একটি নতুন অনুচ্ছেদ সংযোজন করা হয়।

♦ দ্বিতীয় সংশোধনী

সংবিধান (দ্বিতীয় সংশোধনী) বিল, ১৯৭৩ শিরোনামে বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনী ১৯৭৩ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর তদানীন্তন আইনমন্ত্রী শ্রী মনোরঞ্জন ধর কর্তৃক সংসদে উত্থাপিত হয়। সংসদে উত্থাপিত এ বিলের পক্ষে ২৬৭টি ভোট পড়ে। বিপক্ষে কোনো ভোট না পড়লেও স্বতন্ত্র ও বিরোধী সাংসদরা সংসদ থেকে ওয়াকআউট করেন। ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ সংসদ কর্তৃক গৃহীত হওয়ার পর ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ তা রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করে। এ সংশোধনীর মূল বিষয় ছিল জরুরি আইনের বিধান। দ্বিতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতিকে বিশেষ কিছু অবস্থায় জরুরি অবস্থা ঘোষণার ক্ষমতা দেয়া হয় এবং এ সময় বলবৎকালীন জনগণের মৌলিক অধিকারসমূহ স্থগিত রাখার বিধানও করা হয়। তবে জরুরি অবস্থা জারির শর্ত এই যে— ক. ঘোষণার জন্য প্রধানমন্ত্রীর স্বাক্ষরের প্রয়োজন হবে। খ. পরবর্তী কোনো ঘোষণার মাধ্যমে প্রত্যাহার করা যাবে। গ. সংসদে অনুমোদনের জন্য পেশ করতে হবে। ঘ. ঘোষণার ১২০ দিনের মধ্যে সংসদের প্রস্তাব দ্বারা অনুমোদিত না হলে উক্ত সময়ের অবসানে কার্যকর থাকবে না।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

♦ তৃতীয় সংশোধনী

সংবিধানের (তৃতীয় সংশোধনী) বিল, ১৯৭৪ শিরোনামে ২১ নভেম্বর ১৯৭৪ সালে আইনমন্ত্রী শ্রী মনোরঞ্জন ধর সংবিধানের তৃতীয় সংশোধনী সংসদে উত্থাপন করেন। সংশোধনীর পক্ষে ২৬১ ও বিপক্ষে ৭ ভোট পড়ে। ১৯৭৪ সালের ২৩ নভেম্বর এ সংশোধনী সংসদ কর্তৃক গৃহীত হওয়ার পর ২৭ নভেম্বর তা রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করে। চুক্তি অনুযায়ী বেরুবাড়িকে ভারতের কাছে হস্তান্তরের বিধান সংশোধনীর মূল বিষয়। ১৬ মে ১৯৭৪ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যে স্বাক্ষরিত দিল্লি চুক্তি অনুসারে বেরুবাড়ি ইউনিয়ন ভারতের কাছে হস্তান্তরের বাধা অপসারণের জন্য এই সংশোধনী সংসদে উত্থাপিত হয়। চুক্তি অনুসারে বেরুবাড়ি হস্তান্তরের বিনিময়ে আঙ্গোরপোতা-দহগ্রাম পাওয়ার কথা উল্লেখ আছে।

♦ চতুর্থ সংশোধনী

১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি আইনমন্ত্রী শ্রী মনোরঞ্জন ধর জাতীয় সংসদে সংবিধান (চতুর্থ সংশোধনী) বিল, ১৯৭৫ উত্থাপন করেন। সংশোধনীর পক্ষে ২৯৪ জন সাংসদ ভোট দেন। বিপক্ষে কেউই ভোট দেননি। উত্থাপনের দিনই তা জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয় এবং ঐদিনই রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করে। একদলীয় শাসন ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা চালুকরণ এ সংশোধনীর মূল বিষয়। বাংলাদেশের ইতিহাসে একদিনেই একটি বিল পাস হওয়ার প্রথম ঘটনা ছিল এটি। এ সংশোধনী অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি সংসদ কর্তৃক পরোক্ষভাবে নির্বাচিত না হয়ে ভোটারদের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে ৫ বছরের জন্য নির্বাচিত হবেন।

♦ পঞ্চম সংশোধনী

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের সামরিক অভ্যুত্থানের পর থেকে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল পর্যন্ত সামরিক সরকার যত ফরমান, সামরিক আইন, প্রবিধান ইত্যাদি জারি করে এর সবকিছু বৈধ করে নেয়ার জন্য শাহ আজিজুর রহমান জাতীয় সংসদে সংবিধান (পঞ্চম সংশোধনী) বিল, ১৯৭৯ শিরোনামে একটি সংশোধনী বিল উত্থাপন করেন ৪ এপ্রিল ১৯৭৯। জাতীয় সংসদ কর্তৃক ৫ এপ্রিল ১৯৭৯ এটি গৃহীত হওয়ার পর ৬ এপ্রিল ১৯৭৯ তা রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করে। পঞ্চম সংশোধনীর প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ হলো : ক. সংবিধানের প্রারম্ভে প্রস্তাবনার শুরুতে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' সংযুক্ত করা হয়। খ. ধর্মনিরপেক্ষতার পরিবর্তে সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালার ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচারকে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি করা হয়। গ. বাঙালি জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে 'বাংলাদেশী' জাতীয়তাবাদের ধারণা আনা হয়। এছাড়া প্রস্তাবনায় 'মুক্তি সংগ্রাম' শব্দগুচ্ছের পরিবর্তে 'স্বাধীনতা যুদ্ধ' শব্দগুচ্ছ সন্নিবেশ করা হয়। ঘ. পঞ্চম সংশোধনীর দ্বারা সংবিধানের সংশোধন সংক্রান্ত জাতীয় সংসদের ক্ষমতা সংকুচিত করা হয়। সংবিধানের প্রস্তাবনাসহ অনুচ্ছেদ ৮, ৪৮, ৮০, ৯২ ও ১৪২ সংশোধনকল্পে সংসদে দুই-তৃতীয়াংশে ভোটের পাশাপাশি গণভোটেরও প্রয়োজন পড়বে এই মর্মে বিধান করা হয়। ঙ. ১৯৭৫ সালের 'ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ' সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে বৈধ করে নেয়া হয়।

♦ ষষ্ঠ সংশোধনী

শাহ আজিজুর রহমান ১৯৮১ সালের ১ জুলাই সংবিধান (ষষ্ঠ সংশোধনী) বিল, ১৯৮১ শিরোনামে জাতীয় সংসদে উত্থাপন করনে। উপরাষ্ট্রপতির পদ থেকে রাষ্ট্রপতির পদে নির্বাচন সংক্রান্ত এ সংশোধনী ২৫২-০ ভোটে সংসদ কর্তৃক ৮ জুলাই ১৯৮১ গৃহীত হয় এবং ৯ জুলাই তা রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করে। তদানীন্তন উপরাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তারকে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনে অংশ নেয়ার সুযোগ করে দেয়ার জন্যই এ বিল আনীত হয়। এই সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদের ২২ দফার 'কেবল রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী' শব্দ ও কথাগুলো প্রতিস্থাপিত করে প্রধানমন্ত্রী পদের সাথে রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি পদসমূহকে 'অলাভজনক' বলে ঘোষণা করা হয়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

♦ সপ্তম সংশোধনী

আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রী বিচারপতি এ কে এম নুরুল ইসলাম ১৯৮৬ সালের ১০ নভেম্বর সংবিধান (সপ্তম সংশোধনী) বিল, ১৯৮৬ সংসদে উত্থাপন করেন। মাত্র পাঁচ ঘণ্টার ব্যবধানে এ সংশোধনী বিলটি গৃহীত হয় এবং ১১ নভেম্বর তা রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করে। ২২৩-০ ভোটে বিলটি গৃহীত হলে আওয়ামী লীগ সংসদ বর্জন করে। ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ তারিখে লে. জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে যেসব ফরমান জারি করেন সেসব ও উক্ত ফরমান দ্বারা ঘোষিত সামরিক আইন বলবৎ থাকাকালীন সময়ে প্রণীত সকল ফরমান, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের আদেশ, অধ্যাদেশ ও তড়িঘড়ি করে পাস করা অন্যান্য আইন এই সংশোধনীর মাধ্যমে অনুমোদন করা হয়। এই সংশোধনীর মাধ্যমে উপরিউক্ত ফরমান, আদেশ, অধ্যাদেশ ইত্যাদি ট্রাইব্যুনাল কর্তৃপক্ষের কাছে যে কোনো কারণে যে কোনো প্রশ্ন উত্থাপনের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। অপরদিকে, উক্ত সময়ের মধ্যে প্রয়োগকৃত সকল আদেশ ও আইনের বৈধতার মধ্য দিয়ে আদালত বা ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রমকে স্বীকৃতি প্রদান করা হয় এবং উক্ত সময়ের মধ্যে সংবিধানে উল্লিখিত কোনো পদে সকল নিয়োগও বৈধ করা হয়। এছাড়া সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৬২ থেকে ৬৫ বছরে বৃদ্ধি করা হয়।

♦ অষ্টম সংশোধনী

সংবিধান (অষ্টম সংশোধনী) বিল, ১৯৮৮ জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হয় ১১ মে ১৯৮৮। উত্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ। ২৫৪-০ ভোটে ৭ জুন ১৯৮৮ সংসদ কর্তৃক এ বিল গৃহীত হওয়ার পর ৯ জুন তা রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করে। সংবিধানের অষ্টম সংশোধনীর উদ্দেশ্য ও কারণ ছিল ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান; কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, যশোর, রংপুর ও সিলেটে হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চ প্রতিষ্ঠা এবং বীরত্বের জন্য রাষ্ট্রীয় পুরস্কার ও শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিভার স্বীকৃতি প্রদান ছাড়াও বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ খেতাব, সম্মান ও পদক বৈধ করা। এছাড়াও এ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের ইংরেজি লিপিঃ অনুচ্ছেদ ৩ ও ৫ (১)-এ যথাক্রমে BANGALI শব্দের পরিবর্তে BANGLA এবং DACCA-র পরিবর্তে DHAKA শব্দগুলো প্রতিস্থাপন করা হয়। সংসদ সদস্যদের জন্য ৬৮ নং অনুচ্ছেদ এবং এর উপ-অনুচ্ছেদে বর্ণিত 'বেতন' শব্দের পরিবর্তে 'সম্মানী' করা হয়।

♦ নবম সংশোধনী

ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ কর্তৃক সংবিধান (নবম সংশোধনী) বিল, ১৯৮৯ জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হয় ৬ জুলাই ১৯৮৯। ২৭২-০ ভোটে বিলটি সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয় ১০ জুলাই ১৯৮৯। রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করে ১১ জুলাই ১৯৮৯। লে. জেনারেল এইচ এম এরশাদ তার ৮ বছরের শাসনামলে একটি গণভোট, একটি রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, দুটি সংসদ নির্বাচন ও একাধিকবার স্থানীয় সরকারসমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন। এতদসত্ত্বেও তার সরকারের বৈধতা প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় দেশে-বিদেশে তিনি গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য চাপের সম্মুখীন হন। সংবিধানের নবম সংশোধনীর প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো : ক. উপরাষ্ট্রপতি প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক নির্বাচিত হবেন। (চতুর্থ সংশোধনীতে উপরাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হওয়ার বিধান ছিল) খ. রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন একই সাথে একই সময়ে হবে এবং তা পাঁচ বছর স্থায়ী হবে। গ. একাধিক্রমে দু' মেয়াদের অধিক সময় কোনো ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন না।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

♦ দশম সংশোধনী

১৯৯০ সালের ১০ জুন আইন ও বিচারমন্ত্রী হাবিবুল ইসলাম সংবিধান (দশম সংশোধনী) বিল, ১৯৯০ জাতীয় সংসদে উত্থাপন করেন। ১২ জুন ১৯৯০ সংসদে ২২৬-০ ভোটে গৃহীত হওয়ার পর ২৩ জুন ১৯৯০ তা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত হয়। রাষ্ট্রপতির কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে ১৮০ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সংক্রান্ত সংবিধানের ১২৩ (২) অনুচ্ছেদের বাংলা ভাষ্য পরিবর্তন এবং সংসদে মহিলাদের সংরক্ষিত ৩০টি আসন আরো ১০ বছর কালের জন্য সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সংবিধানের দশম সংশোধনী আনা হয়। উল্লেখ্য, ১৯৭২ সালের সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচিত সংসদ সদস্য কর্তৃক ১৫ জন মহিলা সদস্য নির্বাচিত করার বিধান রাখা হয়। সংবিধান প্রবর্তন থেকে ১৫ বছরকাল অতিবাহিত হওয়ার অব্যবহিত পরবর্তীকালে সংসদ ভেঙ্গে না যাওয়া পর্যন্ত তা বহাল থাকার বিধান ছিল। ১৯৭৫ সালে পঞ্চম সংশোধনীর দ্বারা উক্ত সদস্য সংখ্যা ৩০ জনে উন্নীত করা হয়। ইতোমধ্যে উক্ত ১৫ বছর মেয়াদকাল উত্তীর্ণ হওয়ার কারণে মহিলাদের জন্য কোনো আসন সংরক্ষিত ছিল না। দশম সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের ৬৫ নং অনুচ্ছেদ সংশোধন করে তা আবারো ১০ বছরের জন্য বাড়ানো হয়। সপ্তম সংসদের বিলুপ্তির মাধ্যমে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ৩০ আসনের ১০ বছর মেয়াদকাল শেষ হয়।

♦ একাদশ সংশোধনী

আইন ও বিচারমন্ত্রী মীর্জা গোলাম হাফিজ ১৯৯১ সালের ২ জুলাই সংবিধান (একাদশ সংশোধনী) বিল, ১৯৯১ সংসদে উত্থাপন করেন। ২৭৮-০ ভোটে ৬ আগস্ট ১৯৯১ সংসদে গৃহীত হওয়ার পর ১০ আগস্ট ১৯৯১ এটি রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করে।

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের স্বপদে ফিরে যাওয়ার বিধান করার লক্ষ্যে সংবিধানের একাদশ সংশোধনী বিল আনা হয়। এরশাদ সরকারের পতনের প্রাক্কালে সাংবিধানিক উপায়ে না হলেও আন্দোলনকারী জোট ৩ দলের অনুরোধে ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর রাষ্ট্রের লাভজনক পদে থেকেও বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ প্রথমে উপরাষ্ট্রপতি এবং পরে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির শাসনভার গ্রহণ করেন এই শর্তে যে, গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তিনি তার স্বপদে ফিরে যাবেন। এজন্য ১৯৯১ সালের সংসদ নির্বাচনের পর উপরাষ্ট্রপতি হিসেবে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের নিয়োগ ও ক্ষমতা প্রয়োগ বৈধকরণ এবং প্রধান বিচারপতি হিসেবে তার পূর্বপদে প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল।

উপরিউক্ত কারণে একাদশ সংশোধনী দ্বারা সংবিধানের চতুর্থ তফসিলে একটি নতুন অনুচ্ছেদ সংযোজন করে বলা হয় যে, ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক উপরাষ্ট্রপতি হিসেবে বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ ও শপথ প্রদান এবং উক্ত উপরাষ্ট্রপতি কর্তৃক অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে প্রয়োগকৃত সকল ক্ষমতা, প্রণীত সকল আইন ও গৃহীত সকল ব্যবস্থা এতদ্বারা অনুমোদিত ও সমর্থিত হলো। এতে আরো বলা হয় যে, সংবিধান অনুযায়ী নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়ে কার্যভার ও দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারবেন এবং উপরাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালনের সময়কাল বিচারপতি হিসেবে তার প্রকৃত কর্মকাল বলে গণ্য হবে।

♦ দ্বাদশ সংশোধনী *[১৫তম বিসিএস]*

১৯৯১ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভের মাধ্যমে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে প্রবর্তিত হলো নতুন সরকার পদ্ধতি প্রক্রিয়াকরণের কার্যকরী অধ্যায়। তৎকালীন সংসদ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া কর্তৃক ২ জুলাই '৯১ সংসদে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার প্রবর্তন বিল উত্থাপিত হলে বিনা ভোটাভুটিতে ৬ আগস্ট তারিখে সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয় এবং সংসদীয় পর্যায়ক্রমিক ধারা অতিবাহিত করে ১৮ সেপ্টেম্বর প্রেসিডেন্টের অনুমোদন লাভের মাধ্যমে বিলটি আইনে পরিণত হয়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

১৯৭৫ সালে চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে সরকার পদ্ধতির পরিবর্তন করে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার পদ্ধতি প্রবর্তন ও বহুদলীয় রাজনীতির পরিবর্তে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। ১৯৯১ সালে দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে পুনরায় সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা প্রণয়ন করা হয়।

দ্বাদশ সংশোধনীর মূল বিষয়বস্তু

১. **মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার পদ্ধতি পুনঃপ্রতিষ্ঠা :** মন্ত্রিসভার মাধ্যমে সরকার পরিচালিত হবে এবং মন্ত্রিসভার প্রধান থাকবেন প্রধানমন্ত্রী। রাষ্ট্রপতি হবেন রাষ্ট্রের প্রধান অর্থাৎ সরকারপ্রধান বা প্রধান নির্বাহী। রাষ্ট্রপ্রধান সংসদের আস্থাভাজন সদস্যকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করবেন। মন্ত্রিসভা যৌথভাবে তাদের সকল কর্মকাণ্ডের জন্য সংসদের নিকট দায়বদ্ধ থাকবেন।

২. **প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা :** প্রজাতন্ত্রের সকল নির্বাহী ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রিসভার ওপর ন্যস্ত করা হয়। যে সংসদ সদস্য সংখ্যাগরিষ্ঠ সাংসদের আস্থাভাজন হবেন রাষ্ট্রপতি তাকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ দান করবেন। প্রধানমন্ত্রীর সাথে পরামর্শ করে রাষ্ট্রপতি অন্যান্য মন্ত্রীকে নিয়োগ দান করবেন।

৩. **রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা :** সংসদ সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। তার মেয়াদ পাঁচ বছর। রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে সকলের উর্ধ্বে অবস্থান করবেন। প্রধানমন্ত্রী এবং প্রধান বিচারপতি নিয়োগ ছাড়া অন্যান্য সকল দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী পালন করবেন।

৪. **সাংসদদের দলীয় শৃঙ্খলা ও দায়িত্ব :** একজন সাংসদ নিম্নলিখিত কারণগুলোর যে কোনো একটির ফলে তার সদস্যপদ হারাবেন : ক. যদি কোনো সাংসদ তার নিজ রাজনৈতিক দল ত্যাগ করেন। খ. যদি কোনো সাংসদ তার নিজের দলের বিপক্ষে ভোট প্রদান করেন। গ. যদি কোনো সাংসদ দলের নির্দেশ অমান্য করে সংসদে অনুপস্থিত থাকেন অথবা ভোটদানে বিরত থাকেন। ঘ. যদি কোনো সাংসদ তার সংসদীয় দলের অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে সংসদে কোনো উপদল গঠন করেন এবং সেই উপদল যদি সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে ব্যর্থ হয় তবে তার ও অন্যান্য সহযোগীদের সদস্যপদ বাতিল হবে।

♦ ত্রয়োদশ সংশোধনী

দেশে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের কাজে নির্বাচন কমিশনকে সাহায্য ও সহায়তা প্রদান এবং সংবিধানের অধীন অর্পিত দায়িত্ব পালনের জন্য নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের লক্ষ্যে সংবিধানের কিছু বিধানে অধিকতর সংশোধনের জন্য সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী বিল পাস করা হয়। ১৯৯৬ সালের ২১ মার্চ তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী জমিরউদ্দিন সরকার কর্তৃক এটি সংসদে উত্থাপিত হয় এবং ২৭ মার্চ '৯৬ তা ২৬৮-০ ভোটে গৃহীত হয়। সংসদীয় কার্যক্রম শেষে ২৮ মার্চ '৯৬ তা রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করে।

ত্রয়োদশ সংশোধনীর প্রধান প্রধান দিক

১০ জন উপদেষ্টা একজন প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকার পরিচালনা করবেন। সংসদ ভেঙ্গে যাওয়ার পর তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করবে এবং যতদিন পর্যন্ত নতুন প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতা গ্রহণ না করেন ততদিন পর্যন্ত এই সরকারের ক্ষমতা থাকবে। প্রেসিডেন্টের কাছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য দায়বদ্ধ থাকবে। সংসদ ভেঙ্গে গেলে বা মেয়াদ শেষ হলে পরবর্তী ৯০ দিনের মধ্যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

প্রধান উপদেষ্টা এবং উপদেষ্টাগণ যথাক্রমে প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীর মর্যাদা ভোগ করবেন। প্রেসিডেন্ট কর্তৃক প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করা হবে। প্রধান উপদেষ্টা বাংলাদেশের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিগণের মধ্যে

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

যিনি সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত হয়েছেন তিনি হবেন। তবে এরকম প্রধান বিচারপতি না পাওয়া গেলে অথবা তিনি সম্মত না হলে প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশের সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির অব্যবহিত পূর্বের বিচারপতিকে প্রধান উপদেষ্টার পদে নিয়োগ দেবেন। যদি তিনিও সম্মত না হন বা এরকম পাওয়া না যায় তবে আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারকগণের মধ্যে যিনি সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত হয়েছেন তাকে মনোনীত করেবেন। যদি এক্ষেত্রেও পূর্বানুরূপ হয়, তবে প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশের কোনো বিশিষ্ট নাগরিক, যিনি প্রধান উপদেষ্টা হওয়ার যোগ্যতা রাখেন তাকে ঐ পদে মনোনয়ন দেবেন।

সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য নন, আসন্ন সংসদ সদস্য নির্বাচনে প্রার্থী হবেন না এই শর্তসাপেক্ষে বাহাত্তর বছর বা এর কম বয়সের ব্যক্তিবর্গের মধ্য থেকে উপদেষ্টা নিয়োজিত হবেন প্রেসিডেন্ট কর্তৃক প্রধান উপদেষ্টার পরামর্শ অনুসারে।

প্রধান উপদেষ্টা প্রেসিডেন্টের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষর করা পত্রযোগে পদত্যাগ করতে পারেন। প্রেসিডেন্ট প্রধান উপদেষ্টা বা পরিষদের যে কোনো সদস্যের নিয়োগ অবসান করতে পারেন, যদি কোনো সদস্য তার যোগ্যতা হারিয়েছেন বলে প্রেসিডেন্ট মনে করেন। উপদেষ্টা পরিষদের কার্যকাল সংসদ গঠিত হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণের মধ্য দিয়ে শেষ হবে। আর উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হবে সংসদ ভেঙ্গে যাওয়ার ১৫ দিনের মধ্যেই।

সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনকে প্রয়োজনীয় সর্বাত্মক সহায়তা প্রদান করবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং নির্বাচনের ব্যয় বহন করার জন্য সংযুক্ত তহবিল থেকে অর্থ প্রত্যাহারের কর্তৃত্ব প্রদানের জন্য প্রেসিডেন্টকে প্রধানমন্ত্রী বা প্রধান উপদেষ্টার পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে না (৫৮ খ (১) অনুচ্ছেদ)।

♦ চতুর্দশ সংশোধনী

নারীদের জন্য ৪৫টি আসন সংরক্ষণ, সরকারিভাবে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ছবি সংরক্ষণ, সংসদ সদস্যদের শপথ গ্রহণ সংক্রান্ত নতুন বিধান, অর্থবিলের সংজ্ঞা সহজীকরণ, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি, মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এবং সরকারি কর্মকমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের অবসর গ্রহণের বয়সসীমা বৃদ্ধির বিষয়টি সংযোজন করে 'সংবিধান (চতুর্দশ সংশোধন) বিল, ২০০৪' পাস করা হয়। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ ২৭ মার্চ ২০০৪ প্রথমবার ও ২৮ এপ্রিল ২০০৪ সংশোধিত আকারে দ্বিতীয়বার বিলটি উথাপন করেন। ১৬ মে ২০০৫ এটি সংসদে ২২৬-১ ভোটে পাস হয়। নিচে সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনীর বিষয়বস্তুগুলো সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরা হলো :

৪৫টি নারী আসন : সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদে তিন দফার পরিবর্তে নতুন একটি দফা সংযোজন করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, এই আইন প্রবর্তনকালে বিদ্যমান সংসদের অব্যবহিত পরবর্তী সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ থেকে শুরু করে ১০ বছর অতিবাহিত হওয়ার অব্যবহিত পরবর্তীকালে সংসদ ভেঙে না যাওয়া পর্যন্ত মহিলাদের জন্য ৪৫টি আসন সংরক্ষিত থাকবে। সংসদে রাজনৈতিক দলের নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতিতে এসব আসনে নির্বাচন হবে। এ সংশোধনের পরও সরাসরি নির্বাচনে যে কোনো আসনে নারীরা অংশ নিতে পারবেন।

সংবিধানে নতুন অনুচ্ছেদ (২৩) সংযোজন করে বলা হয়েছে, বর্তমান সংসদ থেকেই এ আইন কার্যকর হবে এবং অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য পূর্বে উল্লিখিত পদ্ধতিতে ৪৫টি নারী আসনে নির্বাচন হবে।

প্রতিকৃতি সংরক্ষণ : বিলে সংবিধানে নতুন একটি অনুচ্ছেদ (৪ক) বহাল করা হয়েছে। 'প্রতিকৃতি' শিরোনামে বলা হয়েছে- (১) রাষ্ট্রপতির প্রতিকৃতি রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও স্পিকারের কার্যালয় এবং বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাস ও মিশনসমূহে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করতে হবে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

(২) (১) দফার অতিরিক্ত কেবলমাত্র প্রধানমন্ত্রীর প্রতিকৃতি রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও স্পিকারের কার্যালয় এবং সকল সরকারি ও আধা-সরকারি অফিস, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের প্রধান ও শাখা কার্যালয়, সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাস ও মিশনসমূহে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করতে হবে।

অর্থবিল : সংবিধানের ৮২ অনুচ্ছেদে অর্থবিল সম্পর্কিত বাংলা সংস্করণে 'সরকারি অর্থ ব্যয়ের প্রশ্ন জড়িত রয়েছে, এমন কোনো অর্থবিল বা বিল' শব্দগুলো ও কমার পরিবর্তে 'কোনো অর্থবিল, অথবা সরকারি অর্থ ব্যয়ের প্রশ্ন জড়িত রয়েছে এমন কোনো বিল' শব্দগুলো ও কমা প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

সংসদ সদস্যদের শপথ : সংবিধানের ১৪৮ অনুচ্ছেদ সংশোধনের প্রস্তাব করে বলা হয়েছে, 'সংসদ নির্বাচনের ফল সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হওয়ার পরবর্তী তিনদিনের মধ্যে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের স্পিকার শপথ বাক্য পাঠ করাতে ব্যর্থ হলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এই শপথ পাঠ পরিচালনা করবেন।'

বিচারপতিদের অবসরের বয়স : সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের অবসর বয়সসীমা ৬৫ বছর থেকে বাড়িয়ে ৬৭ বছর করা হয়েছে।

পিএসসি চেয়ারম্যান ও সদস্যদের অবসরের বয়স : সংবিধানের ১৩৯ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে সরকারি কর্মকমিশনের (পিএসসি) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের অবসর বয়সসীমা ৬২ বছর থেকে বাড়িয়ে ৬৫ করা হয়েছে।

সিএজির অবসরের বয়স : সংবিধানের ১২৯ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে নতুন নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদ যুক্ত করা হয়েছে-'(১) এই অনুচ্ছেদের বিধানাবলী-সাপেক্ষে মহা-হিসাব নিরীক্ষক তাহার দায়িত্ব গ্রহণের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসর বা তাহার পয়ষট্টি বৎসর পূর্ণ হওয়া ইহার মধ্যে যাহা অগ্রে ঘটে, সেই কাল পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকবেন।'

♦ পঞ্চদশ সংশোধনী

সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধনী) আইন, ২০১১ জাতীয় সংসদে পাস হয় ৩০ জুন ২০১১ এবং এতে রাষ্ট্রপতি সম্মতি জ্ঞাপন করে ৩ জুলাই ২০১১। পঞ্চদশ সংশোধনীর উল্লেখযোগ্য সংশোধনীসমূহ হলো :

১. প্রস্তাবনা সংশোধন।
২. রাষ্ট্রধর্ম ও অন্যান্য ধর্ম এবং ধর্মের অপব্যবহার রোধ।
৩. জাতির পিতার স্বীকৃতি ও প্রতিকৃতি।
৪. জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব।
৫. অবৈধ ক্ষমতা দখলকারীদের বিরুদ্ধাচরণ।
৬. সংবিধানের মৌলিক কাঠামো সংক্রান্ত বিধানাবলী।
৭. '৭২-এর সংবিধানের মূলনীতি বহাল।
৮. পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।
৯. জাতীয় জীবনে মহিলাদের অংশগ্রহণ।
১০. উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি।
১১. তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলুপ্ত।
১২. সংরক্ষিত নারী আসন বৃদ্ধি।
১৩. দালাল আইনের পুনরুজ্জীবন।
১৪. নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা বৃদ্ধি।
১৫. পররাষ্ট্রনীতিতে পরিবর্তন।
১৬. অন্তবর্তী সরকার ও দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

১৭. ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ সংযোজন।
১৮. স্বাধীনতার ঘোষণা সংযোজন।
১৯. স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র সংযোজন।
২০. সংবিধান সংশোধনে গণভোট বাতিল।
২১. সপ্তম, একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ এ চার সংশোধনী বাতিল।
২২. বাকশাল গঠন সংক্রান্ত বিধান বিলুপ্ত।

◆ ষোড়শ সংশোধনী

১৮ আগস্ট ২০১৪ মন্ত্রিসভায় সংবিধান (ষোড়শ সংশোধন) বিল অনুমোদিত হওয়ার পর ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪ সংবিধান (ষোড়শ সংশোধন) বিল-২০১৪ জাতীয় সংসদে উত্থাপন করেন আইনমন্ত্রী অ্যাডভোকেট আনিসুল হক। এরপর বিভিন্ন ধাপসম্পন্ন হওয়ার পর ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪ আইনমন্ত্রী অ্যাডভোকেট আনিসুল হক জাতীয় সংসদে বিলটি পাসের জন্য দ্বিতীয়বার উত্থাপন করেন। বিলটি উত্থাপনের পর তা সর্বসম্মতক্রমে পাস হয়। বিলের পক্ষে ভোট পড়ে ৩২৭টি; বিপক্ষে কোনো ভোট পড়েনি। পরবর্তীতে বিচারপতিদের অভিশংসন বা অপসারণের ক্ষমতা জাতীয় সংসদের উপর অর্পণ বিষয়ক এই সংশোধনীতে ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৪ সম্মতি দেন রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ এডভোকেট। এরপর গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে তা আইনে পরিণত করা হয়।

৮. সরকারের অঙ্গ-সংগঠন : আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ

ক. আইন বিভাগ

◆ এসিড অপরাধ দমন আইন

৬ মার্চ ২০০২ অষ্টম জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশনে 'এসিড অপরাধ দমন আইন ২০০২' শীর্ষক বিলটি উত্থাপন করেন আইনমন্ত্রী। ১৩ মার্চ আইনটি সংসদে পাস হয়। ১৭ মার্চ রাষ্ট্রপতি বিলে সম্মতি দেন। 'এসিড অপরাধ দমন আইন ২০০২'-এ পৃথক ট্রাইব্যুনালে দ্রুততর সময়ে বিচার নিষ্পন্ন করাসহ এসিড নিক্ষেপের ঘটনাকে আমলযোগ্য, অআপোষযোগ্য এবং অজামিনযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। আইনে ৩০ দিনের মধ্যে অভিযোগের তদন্ত সম্পন্ন, একটানা ৯০ দিনের মধ্যে বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্নের বিধান রাখা হয়েছে। এসিড অপরাধ দমন বিল-২০০২ অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি এসিড দ্বারা অন্য কোনো ব্যক্তির মৃত্যু ঘটালে দায়ী ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে। এর অতিরিক্ত অনূর্ধ্ব ১ লাখ টাকা জরিমানা করা হবে। এসিডে কোনো ব্যক্তির দৃষ্টিশক্তি বা শ্রবণশক্তি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে নষ্ট হলে বা মুখমণ্ডল, স্তন বা যৌনাঙ্গ বিকৃত বা নষ্ট হলে দায়ী ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন। এর অতিরিক্ত অনূর্ধ্ব ১ লাখ টাকার অর্থদণ্ডেও তাকে দণ্ডিত করা হবে।

এসিড নিক্ষেপে শরীরের কোনো অঙ্গ, গ্রন্থি বা অংশ বিকৃত বা নষ্ট হলে বা শরীরের কোনো স্থান আঘাতপ্রাপ্ত হলে দায়ী ব্যক্তি অনধিক ১৪ বছর, কিন্তু অন্যূন ৭ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে এবং এর অতিরিক্ত ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে। কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তির ওপর এসিড নিক্ষেপ করলে বা নিক্ষেপের চেষ্টা করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি শারীরিক, মানসিক বা অন্য কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হলেও দায়ী ব্যক্তি অনধিক ৭ বছর, কিন্তু অন্যূন ৩ বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং অনূর্ধ্ব ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে। কেউ এসিড নিক্ষেপের মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করলে অনধিক ৭ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

◆ সংসদীয় কার্যাবলি *[৩১তম বিসিএস]*

বাংলাদেশের আইনসভার নাম জাতীয় সংসদ। প্রজাতন্ত্রের সব আইন প্রণয়নের ক্ষমতা জাতীয় সংসদের ওপর ন্যস্ত। ১৯৭২ সালের সংবিধানের জাতীয় সংসদ ছিল রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের উৎস। পরবর্তীতে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী আইনে সংসদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়। দ্বাদশ সংশোধনী আইনে জাতীয় সংসদ আবারো ফিরে পেয়েছে তার পূর্ব গৌরব। নিচে সংসদীয় কার্যাবলীর উল্লেখযোগ্য দিকগুলো তুলে ধরা হলো :

১. **আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত :** আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত যাবতীয় ক্ষমতা জাতীয় সংসদের ওপর ন্যস্ত। এটা শাসনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের সকল প্রকার আইন প্রণয়ন এবং প্রচলিত আইনের পরিবর্তন ও সংশোধন করতে পারে। সংসদ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে কোনো সংস্থা বা কর্তৃপক্ষকে আদেশ প্রদান, বিধি, উপবিধি ও বিধান প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ করতে পারে।

২. **অর্থ সংক্রান্ত :** জাতীয় সংসদ বাংলাদেশের সরকারি অর্থ তহবিলের নিয়ন্ত্রক ও রক্ষক হিসেবে কাজ করে। সংসদের অনুমোদন প্রদান বা তা হতে অর্থ প্রত্যাহার এবং উপরিউক্ত বিষয়সমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় জাতীয় সংসদের আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সংসদ প্রত্যেক অর্থ বছরের শুরুতে সরকারের সম্ভাব্য আয়-ব্যয়ের খতিয়ান সম্বলিত বাজেট পেশ করে। কিন্তু অর্থ ব্যয়সংক্রান্ত কোনো বিল বা মঞ্জুরির দাবি সংসদে উপস্থাপনের পূর্বে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের প্রয়োজন হয়।

৩. **নির্বাহী বিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ :** দ্বাদশ সংশোধনী অনুসারে বাংলাদেশে সংসদীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। সংসদীয় ব্যবস্থায় আইনসভার প্রাধান্য সর্বত্র স্বীকৃত। প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির নামে পরিচালিত হলেও প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রিসভার হাতে প্রকৃত ক্ষমতা ন্যস্ত। তবে প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রিসভা ব্যক্তিগত ও যৌথভাবে জাতীয় সংসদের নিকট দায়ী থাকেন। সংসদের অনাস্থা পেলে প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হয়। সংসদ মুলতবি প্রস্তাব, নিন্দা প্রস্তাব, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, বাজেটের ওপর বিস্তৃত আলোচনা, ন্যায়পালের মাধ্যমে যে কোনো মন্ত্রণালয়, বিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ এবং সরকারি কর্মকর্তাদের কার্য সম্পর্কে তদন্ত অনুষ্ঠান ও অনাস্থা প্রস্তাবের দ্বারা শাসন বিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে।

৪. **বিচার সংক্রান্ত :** জাতীয় সংসদের কিছু কিছু বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা রয়েছে। সংবিধানের কোনো ধারা লঙ্ঘন বা গুরুতর অপরাধ বা অসদাচরণের জন্য অথবা দৈহিক ও মানসিক অসামর্থ্যের অভিযোগে জাতীয় সংসদ রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসনের মাধ্যমে অপসারিত করতে পারেন। তবে এর জন্য সংসদ সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন প্রয়োজন হয়।

৫. **নির্বাচন সংক্রান্ত ক্ষমতা ও কার্যাবলী :** জাতীয় সংসদ বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার ও সংসদের বিভিন্ন কমিটির সদস্য নির্বাচন করে থাকেন। ন্যায়পাল নির্বাচন করার দায়িত্বও সংসদের ওপর ন্যস্ত। তাছাড়া সংসদের ৫০টি সংরক্ষিত নারী আসনের নারী সদস্যরা সংসদ কর্তৃক নির্বাচিত হয়ে থাকেন।

৬. **সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত :** সংবিধানের বিধান সাপেক্ষে জাতীয় সংসদ সংবিধানের সংশোধন করতে পারে। সংশোধনের জন্য সংসদের মোট সদস্য সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের প্রয়োজন হয়।

৭. **বিতর্কসভা :** বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ একটি বিতর্কসভা হিসেবে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। এটা মহাহিসাব নিরীক্ষক ও সরকারি কর্মকমিশনের বার্ষিক রিপোর্ট এবং বাজেট নিয়ে বিতর্ক করে থাকে। রাষ্ট্রপতির বাণী ও ভাষণ নিয়েও সংসদ ব্যাপক আলোচনায় রত থাকে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৮. **চাকরি সংক্রান্ত :** প্রজাতন্ত্রের কার্যবিভাগ ও প্রশাসনিক কাঠামোর পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত ক্ষমতাও সংসদের হাতে ন্যস্ত। প্রতিরক্ষা ও শৃঙ্খলা বিভাগের লোক নিয়োগ সংসদের হাতে ন্যস্ত।

৯. **অধ্যাদেশ সংক্রান্ত :** সংসদ অধিবেশন বন্ধ থাকা অবস্থায় রাষ্ট্রপতি যেসব অধ্যাদেশ জারি করেন সেগুলো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সংসদে পেশ করতে হয়। পেশকৃত অধ্যাদেশ সংসদের অনুমোদন না পেলে কার্যকারিতা হারায়।

১০. **বিবিধ :** জাতীয় সংসদ সুপ্রিম কোর্ট ব্যতীত অন্যান্য অধঃস্তন আদালত প্রতিষ্ঠার জন্য আইন প্রণয়ন করতে পারে। যুদ্ধ ঘোষণা ও আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুমোদন করার ক্ষমতা সংসদের হাতে ন্যস্ত। স্থানীয় শাসনসংক্রান্ত বিধি ও প্রবিধি প্রণয়ন করা সংসদের এখতিয়ারভুক্ত।

♦ বাংলাদেশের প্রথম নারী স্পীকার

ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী বাংলাদেশের প্রথম নারী স্পীকার। একই সাথে সংসদ সদস্য নির্বাচিত না হয়েও সংরক্ষিত আসন থেকে নির্বাচিত প্রথম এবং দেশের ইতিহাসের সর্বকনিষ্ঠ স্পীকার। ২৪ এপ্রিল ২০১৩ দেশের ২০তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন নবম জাতীয় সংসদের স্পীকার মো. আবদুল হামিদ এডভোকেট। ২৫ এপ্রিল ২০১৩ সংসদ সচিবালয় তার সংসদীয় আসন শূন্য ঘোষণা করে। সংবিধান অনুযায়ী স্পীকার কিংবা ডেপুটি স্পীকারের পদ শূন্য হলে সাত দিনের মধ্যে তা পূরণ করতে হয়। তারই ধারাবাহিকতায় ২৯ এপ্রিল ২০১৩ আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের বৈঠকে সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য ড. শিরীন শারমিন চৌধুরীকে স্পীকার পদে মনোনয়ন দেয়া হয়। নবম জাতীয় সংসদে ৩০ এপ্রিল ২০১৩ তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় স্পীকার নির্বাচিত হন এবং একই দিনে স্পীকার হিসেবে শপথ ও দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দশম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের উদ্বোধনী দিনে ২৯ জানুয়ারি ২০১৪ তিনি স্পীকার পদে পুনর্নির্বাচিত হন। তিনি বাংলাদেশের ১১তম ব্যক্তিত্ব, যিনি স্পীকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

তিনি ১৯৮৩ সালে ঢাকা বোর্ড থেকে মানবিক বিভাগে সম্মিলিত মেধাতালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করে এসএসসি, ১৯৮৫ সালে ঢাকা বোর্ড থেকে মানবিক বিভাগে সম্মিলিত মেধাতালিকায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে এইচএসসি পাস করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৮৯ সালে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে এলএলবি (অনার্স) এবং ১৯৯০ সালে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে এলএলএম ডিগ্রি অর্জন করেন। এছাড়া কমনওয়েলথ স্কলারশিপ নিয়ে ২০০০ সালে যুক্তরাজ্যের এসেক্স ইউনিভার্সিটি থেকে 'রাইট টু লাইফ' মানবাধিকার ও সাংবিধানিক আইন বিষয়ে পিএইচডি (আইন) ডিগ্রি লাভ করেন। ২৪ মার্চ ২০০৯, নবম জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসন নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী হিসেবে সংসদীয় আসন ৩৩১ ও মহিলা আসন ৩১ থেকে সংসদ সদস্য মনোনীত হন এবং মহিলা ও শিশুবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী হিসেবে ৩১ জুলাই ২০০৯–৩০ এপ্রিল ২০১৩ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন।

♦ ব্লাসফেমি আইন

ব্লাসফেমি (Blasphemy) শব্দের আভিধানিক অর্থ 'ধর্ম নিন্দা' বা 'ঈশ্বর নিন্দা'। সামন্ত রাজাদের আমলে রাজা-বাদশাদের বলা হতো ঈশ্বরের প্রতিনিধি। তাই তাদের বিরুদ্ধে কিছু বলা মানে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বলা। হিসেবে দাবি করা হতো। সে সময় রাজা-বাদশাদের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে যাতে কোনো আন্দোলন গড়ে উঠতে না পারে সেজন্য 'ব্লাসফেমি' নামের এ আইন তৈরি করা হয়েছিল। উইকিপিডিয়া, আল জাজিরা ও পাকিস্তানের প্রভাবশালী দৈনিক *দ্য ডন*-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী ১৪৫০ বছর আগে রোমের সামন্ত রাজারা খ্রিষ্টান ক্যাথলিক চার্চের যাজকদের সহায়তায় জনগণের ওপর ধর্মের নামে যে অত্যাচার করেছিল, তার নামই দেয়া হয় 'ব্লাসফেমি'। গবেষণা প্রতিষ্ঠান *পিউ*-এর ২০১২ সালের ডিসেম্বরের এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইউরোপের ৪৫টি দেশের মধ্যে ৮টিতে ব্লাসফেমি আইন রয়েছে। ৩৫টি দেশে রয়েছে ধর্ম অবমাননা রোধে আইন। *পিউ*-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, মুসলিম বিশ্বে ব্লাসফেমি আইনের প্রয়োগ বেশি। মধ্যপ্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকায় ২০টি দেশের মধ্যে ১৩টিতে এ আইন রয়েছে। এশিয়ার ৯টি দেশেও রয়েছে ঈশ্বর নিন্দা রোধে ব্লাসফেমি আইন।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

♦ গণপরিষদ

নতুন সংবিধান রচনা বা প্রণয়নের প্রস্তাব করার লক্ষ্যে নির্বাচিত প্রতিনিধিমূলক সংস্থাকে বলা হয় গণপরিষদ। এই পরিষদ গঠন করার তত্ত্বগত ভিত্তি হলো- জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস এবং শাসিতের সম্মতির ওপরই শাসনব্যবস্থা নির্ভরশীল। আধুনিক ধারণা মতে, গণপরিষদ গঠিত হবে সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে এবং তাকে হতে হবে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। সপ্তদশ শতকে ব্রিটেনে গণপরিষদের সূচনা হয়। ফ্রান্সে এ ধরনের পরিষদ গঠিত হয় ১৭৮৯ সালের ১৭ জুন। উদ্দেশ্য ছিল সম্রাট ষোড়শ লুইয়ের স্বৈরশাসনের অবসান ঘটিয়ে নিয়মতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হওয়ার পর বর্তমান বাংলাদেশ পূর্ব পাকিস্তান হিসেবে নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন অনুযায়ী নবগঠিত পাকিস্তানের জন্য একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়নের উদ্দেশ্যে সেই বছরই একটি গণপরিষদ গঠন করা হয়। এটাই ছিল পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদ। ১৯৫৫ সালে পাকিস্তানের জন্য দ্বিতীয় গণপরিষদ গঠনের আদেশ জারি করা হয়। ১৯৫৬ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র অনুমোদনের জন্য শেষ বিতর্ক অনুষ্ঠিত হওয়ার পর সামান্য পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মাধ্যমে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র গৃহীত হয়।

বাংলাদেশের জন্য একটি স্থায়ী সংবিধান রচনার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে রাষ্ট্রপতি ১৯৭২ সালের ২৩ মার্চ 'বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশ' একটি আদেশ জারি করেন। পরে ১৯৭২ সালের ৭ এপ্রিল 'বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশ (সংশোধনী)' নামে একটি আদেশ জারি করেন। এ অধ্যাদেশে বলা হয়, কেন্দ্রীয় ১৬৯ আসন এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০ আসনের সদস্যদের নিয়ে 'বাংলাদেশ গণপরিষদ' গঠিত হবে। এই আদেশ অনুসারে ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর থেকে ১৯৭১ সালের ১ মার্চ পর্যন্ত সাবেক পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ ও পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদের আসনসমূহে বাংলাদেশ থেকে নির্বাচিত সকল সদস্যের সমন্বয়ে গণপরিষদ গঠিত হয়। নির্বাচিত সদস্যের সংখ্যা ৪৬৯ জন হলেও শেষ পর্যন্ত এ সংখ্যা দাঁড়ায় ৪০৩ জনে। ১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে। এর প্রথম স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার ছিলেন যথাক্রমে শাহ আবদুল হামিদ ও মোহাম্মদ উল্লাহ। এই গণপরিষদই বাংলাদেশ সংবিধান প্রণয়ন করে।

খ. শাসন বিভাগ

♦ রাষ্ট্রপতির দায়মুক্তি *[৩২তম ও ২৮তম বিসিএস]*

বাংলাদেশ সংবিধানের ৪৬ নং অনুচ্ছেদে 'দায়মুক্তি-বিধানের ক্ষমতা' প্রসঙ্গে বলা হয়েছে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি বা অন্য কোনো ব্যক্তি জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের প্রয়োজনে কিংবা বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে যে কোনো অঞ্চলে শৃঙ্খলা রক্ষা বা পুনর্বহালের প্রয়োজনে কোনো কাজ করে থাকলে সংসদ আইনের দ্বারা সে ব্যক্তিকে দায়মুক্ত করতে পারবেন কিংবা ঐ অঞ্চলে প্রদত্ত কোন

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

দণ্ডাদেশ, দণ্ড বা বাজেয়াপ্তির আদেশকে কিংবা অন্য কোন কাজকে বৈধ করে নিতে পারবেন।

বাংলাদেশ সংবিধানের ৫১ অনুচ্ছেদে 'রাষ্ট্রপতির দায়মুক্তি'-র নীতিতে বলা হয়েছে—

১. এ সংবিধানের ৫২ অনুচ্ছেদের হানি না ঘটিয়ে বিধান করা হচ্ছে যে, রাষ্ট্রপতি তাঁর দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কিংবা অনুরূপ বিবেচনায় কোনো কাজ করে থাকলে বা না করে থাকলে সেজন্য তাঁকে কোনো আদালতে জবাবদিহি করতে হবে না। তবে এ দফা সরকারের বিরুদ্ধে কার্যক্রম গ্রহণে কোনো ব্যক্তির অধিকার ক্ষুণ্ন করবে না।

২. রাষ্ট্রপতির কার্যভারকালে তাঁর বিরুদ্ধে কোনো আদালতে কোনো প্রকার ফৌজদারি কার্যধারা দায়ের করা বা চালু রাখা যাবে না এবং তাঁর গ্রেফতার বা কারাবাসের জন্য কোনো আদালত থেকে পরোয়ানা জারি করা যাবে না।

♦ রাষ্ট্রপতির অভিশংসন *[৩১তম বিসিএস]*

এ ব্যাপারে বাংলাদেশ সংবিধানের ৫২নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে :

(১) এই সংবিধান লংঘন বা গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগে রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসিত করা যাইতে পারিবে; ইহার জন্য সংসদের মোট সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের স্বাক্ষরে অনুরূপ অভিযোগের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া একটি প্রস্তাবের নোটিশ স্পীকারের নিকট প্রদান করিতে হইবে; স্পীকারের নিকট অনুরূপ নোটিশ প্রদানের দিন হইতে চৌদ্দ দিনের পূর্বে বা ত্রিশ দিনের পর এই প্রস্তাব আলোচিত হইতে পারিবে না; এবং সংসদ অধিবেশনরত না থাকিলে স্পীকার অবিলম্বে সংসদ আহবান করিবেন।

(২) এই অনুচ্ছেদের অধীন কোন অভিযোগ তদন্তের জন্য সংসদ কর্তৃক নিযুক্ত বা আখ্যায়িত কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা কর্তৃপক্ষের নিকট সংসদ রাষ্ট্রপতির আচরণ গোচর করিতে পারিবেন।

(৩) অভিযোগ বিবেচনাকালে রাষ্ট্রপতির উপস্থিত থাকিবার এবং প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার থাকিবে।

(৪) অভিযোগ-বিবেচনার পর মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে অভিযোগ যথার্থ বলিয়া ঘোষণা করিয়া সংসদ কোন প্রস্তাব গ্রহণ করিলে প্রস্তাব গৃহীত হইবার তারিখে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইবে।

(৫) এই সংবিধানের ৫৪নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী স্পীকার কর্তৃক রাষ্ট্রপতির দায়িত্বপালনকালে এই অনুচ্ছেদের বিধানাবলী এই পরিবর্তন-সাপেক্ষে প্রযোজ্য হইবে যে, এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় স্পীকারের উল্লেখ ডেপুটি স্পীকারের উল্লেখ বলিয়া গণ্য হইবে এবং (৪) দফায় রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইবার উল্লেখ স্পীকারের পদ শূন্য হইবার উল্লেখ বলিয়া গণ্য হইবে; এবং (৪) দফায় বর্ণিত কোন প্রস্তাব গৃহীত হইলে স্পীকার রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালনে বিরত হইবেন।

♦ অধ্যাদেশ *[৩০তম বিসিএস]*

যখন সংসদ অধিবেশন থাকে না অথবা সংসদ যখন বিলুপ্ত তখন জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য রাষ্ট্রপতি যে আইন প্রণয়ন ও জারি করেন তাকে অধ্যাদেশ বলে। বাংলাদেশ সংবিধানের ৯৩(১) উপ-অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি দু' অবস্থায় অধ্যাদেশ জারি করতে পারেন। প্রথমত সংসদের অধিবেশন না থাকলে কোনো জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য তিনি অধ্যাদেশ জারি করতে পারেন। দ্বিতীয়ত, সংসদ ভেঙ্গে যাওয়া অবস্থায় রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ জারি করতে পারেন। কোনো অধ্যাদেশ জারির পর যদি তা ইতঃপূর্বে বাতিল না হয় তাহলে সংসদের পরবর্তী অধিবেশনে সেটি উপস্থাপিত হতে হবে এবং উপস্থাপনের

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৩০ দিনের মধ্যে সংসদ অনুমোদন না দিলে অধ্যাদেশটি আপনা-আপনি বাতিল হয়ে যাবে। অধ্যাদেশ প্রণয়নের ক্ষেত্রে তিনটি শর্ত অবশ্য বিবেচনায় রাখতে হবে। সেগুলো হলো—

এই দফার অধীনে কোনো অধ্যাদেশের

– এমন কোনো বিধান করা হবে না যা সংসদের আইন দ্বারা আইনসঙ্গত করা যায় না।
– সংবিধানের কোনো বিধান পরিবর্তিত বা রহিত হয়ে যায় এমন কোনো অধ্যাদেশ প্রণয়ন করা যাবে না।
– পূর্বে প্রণীত কোনো অধ্যাদেশের যে কোনো বিধানকে অব্যাহতভাবে বলবৎ করা যায় এমন কোনো অধ্যাদেশ করা যাবে না।

সংবিধান কর্তৃক উপরিউক্ত তিনটি শর্ত সাপেক্ষে অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারির ক্ষমতা দেয়ায় যে কোনো অধ্যাদেশের বৈধতার প্রশ্ন তুলে তার সিদ্ধান্তের জন্য আদালতে যাওয়ার ক্ষেত্রে কোনো আইনি বাধা নেই।

♦ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার *[২৯তম বিসিএস]*

রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ ১৯৯০ সালের ডিসেম্বর মাসে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা ধারণার জন্ম দেয়। দেশে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের আয়োজন করার কাজে নির্বাচন কমিশনকে সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান এবং সংবিধানের অধীনে অর্পিত দায়িত্ব পালনের জন্য নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের লক্ষ্যে সংবিধানের কিছু বিধান অধিকতর সংশোধনের জন্য সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী বিল পাস করা হয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা হলো একটি নির্দলীয় বা নিরপেক্ষ সরকারব্যবস্থা। এক কথায় যখন জাতীয় নির্বাচনের সময় ঘনিয়ে আসে তখন সেই নির্বাচনের সমস্ত দায়দায়িত্ব একটি নিরপেক্ষ উপদেষ্টা পরিষদের হাতে তুলে দিয়ে ক্ষমতাসীন সরকারের পদত্যাগ ব্যবস্থাকেই বলা হয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বা Caretaker Government System। ১৯৯১ সালের পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। নিরপেক্ষতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ।

১৯৯৬ সালে ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের চতুর্থ ভাগের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের পর সন্নিবেশিত পরিচ্ছেদ অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গঠন ও উপদেষ্টাদের নিয়োগ পদ্ধতি বর্ণিত হয়। বাংলাদেশ সংবিধানের ৫৮ (খ) (গ) ও (ঘ) নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকার, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গঠনপ্রকৃতি ও কার্যাবলী নিম্নরূপ :

১. সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার পর বা মেয়াদ অবসানের কারণে ভঙ্গ হবার পর যে তারিখে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা কার্যভার গ্রহণ করেন ঐ তারিখ থেকে সংসদ নির্বাচন হওয়ার পর নতুন প্রধানমন্ত্রী তার পদের কার্যভার গ্রহণ করার তারিখ পর্যন্ত মেয়াদে একটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার থাকবে।

২. নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার যৌথভাবে রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ী থাকবেন।

৩. (১) দফার উল্লিখিত মেয়াদে প্রধান উপদেষ্টা কর্তৃক বা তার কর্তৃত্বে এ সংবিধান অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা, ৫৮ ঘ (১) নং অনুচ্ছেদের বিধানাবলী সাপেক্ষে প্রযুক্ত হবে এবং নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পরামর্শ অনুযায়ী তৎ-কর্তৃক এটি প্রযুক্ত হবে।

৪. ৫৫ (৪), (৫) ও (৬) নং অনুচ্ছেদের বিধানাবলী (প্রয়োজনীয় অভিযোজন সহকারে) (১) দফায় উল্লিখিত মেয়াদে একইরূপ বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হবে।

উল্লেখ্য, ২০১১ সালে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করা হয়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

♦ মন্ত্রিসভা *[২৯তম ও ২৮তম বিসিএস]*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ ভাগের ২য় পরিচ্ছেদের ৫৫নং অনুচ্ছেদে 'মন্ত্রিসভা' শিরোনামে (১) থেকে (৬) নং দফায় নিম্নরূপ বলা হয়েছে –

(১) প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের একটি মন্ত্রিসভা থাকিবে এবং প্রধানমন্ত্রী ও সময়ে সময়ে তিনি যেরূপ স্থির করিবেন, সেইরূপ অন্যান্য মন্ত্রী লইয়া এই মন্ত্রিসভা গঠিত হইবে।

(২) প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বা তাঁহার কর্তৃত্বে এই সংবিধান অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রযুক্ত হইবে।

(৩) মন্ত্রিসভা যৌথভাবে সংসদের নিকট দায়ী থাকিবেন।

(৪) সরকারের সকল নির্বাহী ব্যবস্থা রাষ্ট্রপতির নামে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করা হইবে।

(৫) রাষ্ট্রপতির নামে প্রণীত আদেশসমূহ ও অন্যান্য চুক্তিপত্র কিরূপে সত্যায়িত বা প্রমাণীকৃত হইবে, রাষ্ট্রপতি তাহা বিধিসমূহ দ্বারা নির্ধারণ করিবেন এবং অনুরূপভাবে সত্যায়িত বা প্রমাণীকৃত কোন আদেশ বা চুক্তিপত্র যথাযথভাবে প্রণীত বা সম্পাদিত হয় নাই বলিয়া তাহার বৈধতা সম্পর্কে কোন আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

(৬) রাষ্ট্রপতি সরকারি কার্যাবলী বণ্টন ও পরিচালনার জন্য বিধিসমূহ প্রণয়ন করিবেন।

♦ জরুরি অবস্থা *[২৮তম বিসিএস]*

সংবিধানের ১৪১(ক) অনুচ্ছেদে ১ দফায় বর্ণিত হয়েছে যে, রাষ্ট্রপতির নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এমন জরুরি অবস্থা বিদ্যমান রয়েছে যাতে যুদ্ধ বা বহিরাক্রমণ বা অভ্যন্তরীণ গোলযোগের দ্বারা বাংলাদেশের বা এর যে কোনো অংশের নিরাপত্তা বা অর্থনৈতিক জীবন বিপদের সম্মুখীন, তাহলে তিনি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারবেন।

এরূপ ঘোষণা ১২০ দিনের মধ্যে সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। এ সময়ের মধ্যে অনুমোদিত না হলে উক্ত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর আর কার্যকর থাকবে না। এছাড়া পরবর্তী কোনো ঘোষণার মাধ্যমেও জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করা যায়।

♦ ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণ *[২৭তম বিসিএস]*

কোনো দেশের সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণ তার ক্ষমতার অবস্থান ও হস্তান্তর প্রক্রিয়ার দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত হয়। এক্ষেত্রে দুটি বিকল্প হতে পারে—প্রশাসনিক ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ বা বিকেন্দ্রীকরণ। বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র ও সমাজে এ উভয় অবস্থাই কমবেশি পরিলক্ষিত হয়। তবে সাধারণত আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ও উন্নয়নমুখী কর্মপরিকল্পনার প্রাধান্যের ফলে বিকেন্দ্রীকরণই তুলনামূলকভাবে জনপ্রিয়। বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এর প্রয়োজনীয়তা তুলনামূলকভাবে বেশি। সাধারণভাবে বলা যায়, কোনো প্রশাসনিক সংস্থার দায়িত্ব ও কাজ যখন কোনো কেন্দ্র বা কেন্দ্রীয় সংস্থায় নিয়োজিত না রেখে অধস্তন সংস্থাসমূহের বা কেন্দ্র থেকে প্রদেশ অথবা স্থানীয় ও আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয় তখন সেখানে বিকেন্দ্রীকরণের নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে ধরা হয়। তবে বিভিন্ন লেখক এর সংজ্ঞা দিয়েছেন বিভিন্নভাবে। ডুয়াইট ওয়ালডো (Dweight Waldo) বলেন, Decentralization denotes a tendency where administration and responsibility are delegated from the central authority to regional and local units to suit the particular local conditions. (বিকেন্দ্রীকরণ বলতে স্থানীয় কোনো বিশেষ অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে কেন্দ্রীয় প্রশাসন ও দায়িত্বকে আঞ্চলিক ও স্থানীয় সংস্থার নিকট হস্তান্তরকে বোঝায়।)

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

এল ডি হোয়াইটের ভাষায়, The process of transfer of administrative authority from a lower to a higher level of government is called centralization, the converse decentralization.

Prof. Allen-এর মতে 'কেন্দ্র থেকে প্রয়োগ করা সম্ভব এমন ক্ষমতা ব্যতীত অপর ক্ষমতা সর্বনিম্ন স্তরে ভারার্পণের নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে বিকেন্দ্রীকরণ বলা হয়।'

সুতরাং বিকেন্দ্রীকরণ এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে ওপর থেকে ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তব্যকে একটি সুনির্দিষ্ট চ্যানেলের মাধ্যমে নিম্নতর পর্যায়ে ক্রমে হস্তান্তর করা হয়। এ প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত প্রতিটি স্তর একে অপরের সাথে কোনো না কোনোভাবে জড়িত থাকে এবং সার্বিক প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় এদের সকলের কাজের সমন্বয় জরুরি বলে বিবেচিত হয়।

♦ আমলাতন্ত্র *[২৭তম বিসিএস]*

প্রশাসকবর্গকে অথবা প্রশাসনের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গকে ও প্রশাসন কার্যবিধি বোঝাতে পদটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মসকা (Gaetano Mosca) তাঁর গ্রন্থ The Ruling Class-এ আমলাতন্ত্রের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। বৃহৎ সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থায় আমলাতন্ত্রকে মস্‌কা এতই গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন যে তিনি সমস্ত প্রকার রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে সামন্ততান্ত্রিক অথবা আমলাতান্ত্রিক– এই দু'ভাগে বিভক্ত করেন। মিচেলস (Robert Mitchels) রাষ্ট্র থেকে রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রেও প্রত্যয়টিকে সম্প্রসারিত করেন। তিনি যুক্তি দেখান যে বৃহৎ সংগঠন পরিচালনার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক প্রয়োজনীয়তা থেকেই আমলাতন্ত্রের উদ্ভব হয়েছে এবং রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরস্থ কতিপয় ব্যক্তি (পরিচালনা পরিষদের সদস্যগণ) ক্ষমতার ভিত্তিকে সুদৃঢ় করেছে।

আমলাতন্ত্রের মূল অর্থ (অর্থ প্রাক-শিল্প যুগের সাম্রাজ্যাধি পতিগণের কর্মচারীবৃন্দ) মোটামুটি ঠিক রেখে ম্যাক্স ওয়েবার (Max weber) ১৯২১ সালে প্রকাশিত তাঁর Wristschaft and geselschaf নামক গ্রন্থের মাধ্যমে আমলাতন্ত্রের আধুনিক সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষার সূত্রপাত করেন। ওয়েবার এর আদর্শ-নমুনার (ideal type) আওতায় আমলাতন্ত্রের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যাবলী উল্লেখযোগ্য :

আইন ও বিধি দ্বারা সংরক্ষিত কর্মচারীবৃন্দের সুনির্দিষ্ট অধিকার ক্ষেত্রে; কর্তৃত্বের সুস্পষ্ট ক্রমোচ্চ বিন্যাসের ভিত্তিতে সংগঠিত দপ্তর; লিখিত দলিলের ভিত্তিতে এবং কার্যবিধি (যার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রয়োজন হয়) অনুসারে প্রশাসন পরিচালনা; বিশেষ পারদর্শীতার ভিত্তিতে নিযুক্ত এবং ব্যক্তিগতভাবে স্বাধীন কর্মচারীবৃন্দ; কঠোর নিয়মানুবর্তিতা ও পূর্ণকালীন ভিত্তিতে নিযুক্ত কর্মচারীগণ কর্তৃক দপ্তর কিংবা প্রশাসনিক মাধ্যম হস্তাগতকরণ এখানে অসম্ভবত; কর্মচারীবৃন্দের জন্য একটি বৃত্তি বা পেশা যেখানে জ্যেষ্ঠত্ব ও মেধানুসারে পদোন্নতি দেয়া হয় এবং যেখানে পদমর্যাদা অনুযায়ী নির্দিষ্ট হারে বেতন (এবং সাধারণত অবসর ভাতা বা পেনশন) প্রদান করা হয়।

♦ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা *[২৭তম বিসিএস]*

আধুনিককালে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। আগের দিনে রাজা বা রানীই সমগ্র দেশকে এককেন্দ্রিক এবং এককভাবে শাসন করতেন। তখন আঞ্চলিক তথা স্থানীয় সরকারের তেমন গুরুত্ব ছিল না। কিন্তু বর্তমানে দেশে বিকেন্দ্রীকরণ নীতি গৃহীত হওয়ায় স্থানীয় সরকারের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বেড়েছে। স্থানীয় সরকার বলতে স্থানীয় পর্যায়ে সরকার ব্যবস্থা অর্থাৎ কর্পোরেশন, জেলা, উপজেলা, পৌরসভা, ইউনিয়ন, গ্রাম ও অপরাপর সংস্থার কর্মতৎপরতাকে বুঝায়। বাংলাদেশ সংবিধানের বিধানাবলীর মধ্যে স্থানীয় শাসন সম্পর্কিত বিধানসমূহ অন্যতম। সংবিধানের

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ভাগের ৯নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'রাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রতিনিধিগণ সমন্বয়ে গঠিত স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহদান করবেন এবং এ সকল প্রতিষ্ঠানসমূহে কৃষক, শ্রমিক ও মহিলাদেরকে যথাসম্ভব বিশেষ প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হবে।'

বর্তমানে দেশে গ্রামাঞ্চলে তিন স্তরবিশিষ্ট এবং শহরাঞ্চলে দুই স্তরবিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা রয়েছে। স্তরগুলো হলো :

গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল
প্রথম স্তর : ইউনিয়ন পরিষদ	প্রথম স্তর : সিটি কর্পোরেশন
দ্বিতীয় স্তর : উপজেলা পরিষদ	দ্বিতীয় স্তর : পৌরসভা
তৃতীয় স্তর : জেলা পরিষদ।	

বিগত চারদলীয় সরকার ক্ষমতায় আসার পর গ্রাম সরকার গঠন করে। যা বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে ১ জুন ২০০৮ গ্রাম সরকার (রহিতকরণ) অধ্যাদেশ ২০০৮ জারির মাধ্যমে বাতিল করা হয়।

♦ পিএটিসি (PATC) *[১৭তম বিসিএস]*

Public Administration Training Centre (PATC) বা লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বাংলাদেশ কর্ম কমিশন কর্তৃক বাছাইকৃত ক্যাডারদের প্রশিক্ষণের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান। ১৯৮৪ সালে রাষ্ট্রপতির ২৬নং আদেশবলে সাবেক Bangladesh Administrative Staff College (BASC), National Institute of Public Administration (NIPA), Civil Officers Training Academy (COTA) এবং Staff Training Institute (STI)—এই চারটি প্রতিষ্ঠানকে একীভূত করে একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়, যা PATC নামে পরিচিত। ঢাকার অদূরে সাভারে PATC-এর অবস্থান। এর প্রধান হলেন রেক্টর, যিনি একজন সচিব পদমর্যাদার সমতুল্য। PATC-এর প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে সাধারণ ও মৌলিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ দান।

♦ উপজেলা পরিষদ *[১১তম বিসিএস]*

৭ নভেম্বর, ১৯৮২ থেকে কার্যকর স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা পুনর্গঠন) অধ্যাদেশ ১৯৮২ বলে প্রথমে উন্নীত থানা পরিষদ গঠন করা হয় এবং থানা পর্যায়ে বিকেন্দ্রীভূত প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। পরবর্তীতে উন্নীত থানা পরিষদকে উপজেলা পরিষদে রূপান্তরিত করা হয়। থানা পর্যায়ে সমস্ত কার্যাবলীকে মূলত (ক) সংরক্ষিত ও (খ) হস্তান্তরিত দুই বিষয়ে ভাগ করা হয়। দশটি বিষয়কে হস্তান্তরিত বিষয় হিসেবে এবং তেরটি দায়িত্ব সংরক্ষিত রাখা হয়। একটি থানায় বসবাসকারী প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান নির্বাচিত করার বিধান করা হয়। উপজেলার আওতাধীন ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার চেয়ারম্যানগণ উপজেলা পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে থাকতেন। উপজেলা পর্যায়ে প্রতিটি বিভাগের কার্যক্রমকে সম্প্রসারিত করে প্রায় ২০ জন প্রথম শ্রেণীর সরকারি কর্মকর্তাকে উপজেলায় পোস্টিং দেয়া হয়। তিনজন মহিলা সদস্য উপজেলার অধিবাসীদের মধ্য থেকে সদস্য হতেন। একজন উর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তাকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়, যিনি উপজেলা পরিষদের সকল কার্যক্রম সম্পাদন করতেন। কর আরোপ করাসহ ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্পাদনের সার্বিক দায়িত্বে উপজেলা পরিষদে অর্পণ করা হয়। ১৯৯১ সালে বিএনপি সরকার ক্ষমতায় এলে ১৯৯২ সালের ২৬ জানুয়ারি উপজেলা বাতিল বিল পাস হয়। ১৯৯৬ সালে জাতীয় পার্টির সমর্থনে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে ১৯৯৮ সালের ৩

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

ডিসেম্বর সংসদে উপজেলা বিল পাস করে। এ বিল পাসের মাধ্যমে ১৯৯২ সালে বাতিল করা উপজেলা ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯৯ সালের ১ ফেব্রুয়ারি গেজেটের মাধ্যমে উপজেলা আইন কার্যকর হয়। ২০০০ সালের ২০ এপ্রিল সরকার দেশের সকল প্রশাসনিক থানাকে 'উপজেলা' হিসেবে অভিহিত করার নির্দেশ জারি করে। সর্বশেষ বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে ৩০ জুন ২০০৮ রাষ্ট্রপতি স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ) অধ্যাদেশ ২০০৮ জারির মাধ্যমে তৃতীয় উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠানের পথ সুগম করে এবং ২২ জানুয়ারি ২০০৯ অনুষ্ঠিত হয় তৃতীয় উপজেলা পরিষদ নির্বাচন। পরবর্তীতে জাতীয় সংসদে আইন পাসের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকার সংসদ সদস্যকে উপজেলা পরিষদের উপদেষ্টা করা হয়। চতুর্থ উপজেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২০১৪ সালে।

♦ পিপার স্প্রে

এটি একটি অতি আধুনিক কাঁদুনে গ্যাস। এর প্রধান উপাদান মরিচের গুঁড়া। পিপার স্প্রে'র বৈজ্ঞানিক নাম 'অলিউরেজিন ক্যাপসিকাম'। এ স্প্রে সংক্ষেপে 'ওসি গ্যাস' নামে পরিচিত। এটি সাধারণ কাঁদুনে গ্যাসের চেয়ে অনেক বেশি কার্যকর। পিপার স্প্রে প্রয়োগে কোনো ব্যক্তি ১৫ থেকে ৩০ মিনিটের মতো চোখে দেখতে পান না। ৩ থেকে ৫ মিনিট পর্যন্ত শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। প্রায় এক ঘণ্টার মতো শরীরে যন্ত্রণা থাকে। 'অলিওরেজিন ক্যাপসিকাম' ও 'ক্যাপসিকাম স্প্রে' নামেও পরিচিত। এ পিপার স্প্রে'র ল্যাকরিমেটরি এজেন্ট এমন এক ধরনের রাসায়নিক মিশ্রণ, যা চোখে ঝাঁজ লাগিয়ে পানি বের করে, ব্যথা সৃষ্টি করে। এতে আক্রান্ত ব্যক্তির স্থায়ী অন্ধ হয়ে যাওয়ারও আশঙ্কা রয়েছে। এ ঝাঁজালো স্প্রে তৈরি করা হয় ইথানলের মিশ্রণে। উচ্চ কার্যকরী তরল ক্রোমোটোগ্রাফি (এইচপিএলসি) মেথডে এ স্প্রেতে মরিচের মিশ্রণ ঠিক রাখা হয়। তবে কেমিক্যাল ওয়েপন কনভেনশনের ১.৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী যুদ্ধে প্রতিপক্ষ দমনে পিপার গ্যাস স্প্রে ব্যবহার নিষিদ্ধ।

গ. বিচার বিভাগ

♦ সুপ্রিম কোর্টের আসন *[২৮তম বিসিএস]*

বাংলাদেশ সংবিধানের ১০০ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, রাজধানীতে সুপ্রিম কোর্টের স্থায়ী আসন থাকবে, তবে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন নিয়ে প্রধান বিচারপতি সময়ে সময়ে অন্য যে স্থান বা স্থানসমূহ নির্ধারণ করবে, সে স্থান বা স্থানসমূহে হাইকোর্ট বিভাগের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হতে পারবে।

♦ এটর্নি জেনারেল *[২৮তম বিসিএস]*

বাংলাদেশ সংবিধানের ৬৪(১, ২, ৩ ও ৪) নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে—

১. সুপ্রীম কোর্টের বিচারক হওয়ার যোগ্য কোনো ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেল পদে নিয়োগ দান করবেন।

২. অ্যাটর্নি জেনারেল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত সকল দায়িত্ব পালন করবেন।

৩. এটর্নি জেনারেলের দায়িত্ব পালনের জন্য বাংলাদেশের সকল আদালতে তাঁর বক্তব্য পেশ করার অধিকার থাকবে।

৪. রাষ্ট্রপতির সন্তোষানুযায়ী সময়সীমা পর্যন্ত এটর্নি জেনারেল স্বীয় পদে বহাল থাকবেন এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত পারিশ্রমিক লাভ করবেন।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

◆ গ্রাম সরকার *[১৩তম বিসিএস]*

সরকার গ্রাম-বাংলার উন্নয়ন ও স্থানীয় প্রশাসনকে আরো তৃণমূল পর্যন্ত বিস্তৃত করার লক্ষ্যে এবং গ্রাম পরিষদ আইনের বাধ্যবাধকতা ও দলীয় অঙ্গীকার পূরণের লক্ষ্যে 'গ্রাম সরকার' গঠনের নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ২০০২ সালের ১২ আগস্ট স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের এক বৈঠকে গ্রাম সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত হয় এবং ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ জাতীয় সংসদে গ্রাম সরকার বিল পাস হয়। ১ জুন ২০০৮ বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে গ্রাম সরকার (রহিতকরণ) অধ্যাদেশ ২০০৮ জারির মাধ্যমে গ্রাম সরকার ব্যবস্থাটি বাতিল করা হয়।

গঠন ও কাঠামো : প্রত্যেক ওয়ার্ডে একটি করে গ্রাম সরকার গঠিত হবে। সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের নামের পর ওয়ার্ড নম্বরের সূচকে গ্রাম সরকারের নামকরণ হবে। এটি সংবিধানের ১৫২ (১) অনুচ্ছেদে সংজ্ঞায়িত প্রশাসনিক একাংশ হিসেবে গণ্য হবে না, তবে ইউনিয়ন পরিষদের সহায়ক সংগঠন হবে। একজন গ্রাম সরকার প্রধান, একজন উপদেষ্টা ও ১৩ জন সদস্য সমন্বয়ে প্রত্যেক ওয়ার্ডে একটি করে গ্রাম সরকার গঠিত হবে। সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের জন্য ইউপি সদস্য গ্রাম সরকার প্রধান হবেন এবং ইউপি'র সংরক্ষিত আসনের সদস্য সংশ্লিষ্ট গ্রাম সরকারের উপদেষ্টা হবেন। একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি, গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর তিন জন মহিলা সদস্য, একজন পুরুষ সদস্য, একজন কৃষক, দু'জন ভূমিহীন কৃষক, একজন সমবায় সমিতির সদস্য, একজন মুক্তিযোদ্ধা, একজন শিক্ষক, একজন ব্যবসায়ী এবং একজন ডাক্তার বা পেশাজীবী এর সদস্য হবেন। সমঝোতার ভিত্তিতে সদস্য মনোনীত হবে। এক বা একাধিক ক্ষেত্রের প্রতিনিধি পাওয়া না গেলে উক্ত স্থলে কৃষক প্রতিনিধি নেয়া হবে।

সদস্য মনোনয়ন : গ্রাম সরকারের সদস্য মনোনয়ন হবেন ইউএনও'র মাধ্যমে। তিনি বা তার প্রতিনিধি ভোটারদের সভা ডেকে সমঝোতার ভিত্তিতে সদস্য মনোনীত করবেন। তবে সমঝোতা না হলে ইউএনও'র সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

সভা : গ্রাম সরকারের দু'মাসে অন্তত একটি সভা এবং ৬ মাসে একবার সাধারণ সভা হবে। ওই সভায় চলমান উন্নয়ন কার্যক্রমের অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে। সভার সিদ্ধান্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের কাছে পাঠাতে হবে।

কার্যাবলী : জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে, বিয়ে-বিচ্ছেদ ইত্যাদি কাজ গ্রাম সরকার করবে আর তার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজ, কলম, কালি, রেজিস্টার ও আনুষঙ্গিক খরচ বাবদ বাজেট দিতে হবে ইউনিয়ন পরিষদের কাছে। ইউনিয়ন পরিষদ পরীক্ষা করে নিজস্ব তহবিল থেকে অর্থের সংস্থান করবে। এছাড়া গ্রামের রাস্তাঘাট, কালভার্ট ইত্যাদি উন্নয়নে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও অগ্রগতি পর্যালোচনা, অধিক খাদ্য উৎপাদন, নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও শিক্ষাবিস্তার, জন্ম নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার-পরিকল্পনা, স্বাস্থ্যসেবা, সমবায় সমিতি, ক্ষুদ্র শিল্প, হাঁস-মুরগি, মৎস্য ও পশু খামার প্রতিষ্ঠাসহ বৃক্ষরোপণ, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সহায়তা, ভিজিএফ ও ভিজিডি কাজ তদারক, মহিলা ও শিশুকল্যাণ, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি এবং পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিচ্ছন্নতায় গ্রাম সরকার ভূমিকা পালন করবে। প্রয়োজনে গ্রাম সরকার সাব-কমিটি বা বিষয়ভিত্তিক কমিটি করতে পারবে। বর্তমানে দেশে ৪,৫৬২টি (পঞ্চম আদমশুমারি) ইউনিয়ন পরিষদ রয়েছে।

◆ বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (ADR)

বাংলাদেশের প্রথাগত বিচারব্যবস্থা এখনো পর্যন্ত মামলার মাধ্যমে বিবদমান পক্ষদ্বয়ের মধ্যকার বিরোধ নিষ্পত্তির প্রচলিত উপায়। দীর্ঘসূত্রিতা, বিলম্বিত বিচারসহ নানাবিধ জটিলতার আবর্তে বন্দি 'আদালত' নিয়ে জনসাধারণের মধ্যে ভীতি এখন তুঙ্গে। এহেন পরিস্থিতিতে সামনে চলে এসেছে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির (এডিআর) ধারণা। আদালতের জয়-পরাজয়ের বিপরীতে এটি একটি বিকল্প পদ্ধতি।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

ADR হল Alternative dispute Resolution-এর সংক্ষিপ্ত রূপ, বাংলায় যার অর্থ বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি। আদালতে প্রথাগত পদ্ধতিতে মামলা নিষ্পত্তির ধারণার বিপরীতে আদালতের বাইরে কিংবা ক্ষেত্রবিশেষে আদালতের ভেতরে সমঝোতার ভিত্তিতে দ্রুততম সময়ের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তি করার প্রক্রিয়া বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি বা এডিআর নামে পরিচিত। সাধারণত তিন পদ্ধতিতে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি করা যায়— ১. Negotiation (আপোস বা পারস্পরিক সমঝোতা), ২. Mediation (মধ্যস্থতা) এবং ৩. Arbitration (সালিশ)।

১. আপোস : এ পদ্ধতিতে বাদী ও বিবাদী অন্য কারো মধ্যস্থতা ছাড়া নিজেরাই নিজেদের মধ্যে আপোসে বিরোধ নিষ্পত্তি করতে পারে। এখানে তৃতীয় পক্ষের ভূমিকা থাকে না। তবে তৃতীয় পক্ষ প্রয়োজনে বিবদমান পক্ষদ্বয়কে এক টেবিলে বসানোর আয়োজন করতে পারে।

২. মধ্যস্থতা : মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি অর্থাৎ তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতি। এখানে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা মুখ্য। তৃতীয় পক্ষ বিবদমান পক্ষদ্বয়কে বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মামলার নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রিতাসহ নানাবিধ সমস্যার কথা বোঝাবেন। অতঃপর আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করবেন। এটাকে আমাদের দেশে গ্রাম্য সালিস বলা হয়।

৩. সালিশ : এ পদ্ধতিতে আদালতের মাধ্যমে সালিশকার বা ফ্যাসিলিটেটর (মধ্যস্থতাকারী) নিয়োগ করা হয়। তিনি নির্দিষ্ট আইনের মাধ্যমে উভয়পক্ষের সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে বিবদমান পক্ষগণের সমঝোতার একটি ভারসাম্য তৈরি করে বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে রায় দিবেন। উভয়পক্ষ এ রায় মানলে বিরোধটি নিষ্পত্তির পর্যায়ে চলে যাবে। তবে কোনো এক পক্ষের আপত্তি থাকলে তিনি চাইলে বিষয়টি নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হতে পারবেন। ফ্যাসিলিটেটরের রায় মানতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। উল্লেখ্য, সালিশের মধ্য দিয়ে প্রাপ্ত প্রতিকারকে 'অ্যাওয়ার্ড' বা 'রোয়েদাদ' বলা হয়।

৯. বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি ও বহিঃসম্পর্ক

◆ সার্কের সাফল্য *[২৭তম বিসিএস]*

SAARC-এর পূর্ণরূপ South Asian Association for Regional Co-operation। দক্ষিণ এশিয়ার ৮টি দেশ নিয়ে সংস্থাটি গঠিত। ১৯৮৫ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে দীর্ঘ সোয়া দুই দশকে সার্ক সীমিত কিন্তু প্রশংসনীয় কিছু কাজ করেছে। উদাহরণস্বরূপ— সন্ত্রাস দমনে সমঝোতা দলিলে স্বাক্ষর; আঞ্চলিক খাদ্য নিরাপত্তা সৃষ্টি; পরিবহন ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে সহযোগিতা; জৈব প্রযুক্তি, পরিবেশ, আবহাওয়া, বনজসম্পদ এবং গণমাধ্যম সেক্টরে পারস্পরিক সহযোগিতা; আঞ্চলিক দারিদ্র্য প্রোফাইল প্রস্তুতকরণ; সাপটা (SAPTA) ও সাফটা (SAFTA) গঠন ইত্যাদি। তাছাড়া সার্ক কৃষি তথ্য কেন্দ্র, সার্ক যক্ষ্মা সেন্টার, সার্ক ডকুমেন্টেশন সেন্টার, সার্ক আবহাওয়া গবেষণা কেন্দ্র, সার্ক জ্বালানি কেন্দ্র ইত্যাদি সার্কের সাফল্যের প্রতীক। সার্কের ইতিবাচক দিকের মধ্যে আরো আছে সার্ক শীর্ষ সম্মেলন প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হওয়া (যদিও বিভিন্ন কারণে কয়েক বছর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়নি), মন্ত্রিপর্যায়ের বিভিন্ন নিয়মিত সভা, সদস্য দেশসমূহের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে পারস্পরিক অভিমত বিনিময়ও সহযোগিতার নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। এরূপ উচ্চপর্যায়ের সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার ফলে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে একে অপরের দৃষ্টিভঙ্গি অনুধাবন, বৃহত্তর সমঝোতা এবং পারস্পরিক বিশ্বাস অর্জন সম্ভব হচ্ছে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

♦ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)

SDGs এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Sustainable Development Goals যার বাংলা অর্থ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা। এটি এমডিজি বা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার মতো জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত আরেকটি উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, যা ২০১৫ সালের পর এমডিজি'র স্থলে প্রতিস্থাপিত হবে। এমডিজি'র মূল উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় ক্ষুধা-দারিদ্র্য হ্রাস, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নয়ন থাকলেও আসছে এসডিজিতে দরিদ্র মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠাভিত্তিক পরিকল্পনা থাকছে। ১৯৯২ সালের ৩-১৪ জুন ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরিওতে অনুষ্ঠিত ধরিত্রী সম্মেলনের ২০ বছর পূর্তি হয় ২০১২ সালের জুনে। এ লক্ষ্যে ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরিওতে ২০১২ সালের ২০-২২ জুন অনুষ্ঠিত হয় 'রিও +২০' (Rio +20) বা 'আর্থ সামিট ২০১২' (Earth Summit 2012) সম্মেলন, যার অফিসিয়াল নাম ছিল 'বিশ্ব টেকসই উন্নয়ন সম্মেলন'। এ সম্মেলনে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (Millennium Development Goals–MDGs)'র ওপর ভিত্তি করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য বা সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস (SDGs) গ্রহণ করা হয়। ২০১৫ সালের পর থেকে এসডিজি (SDGs)'র বাস্তবায়ন শুরু হবে এবং তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ সাল পর্যন্ত।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের প্রস্তাব অনুসারে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) প্রণয়নের লক্ষ্যে ২০১৩ সালের ২২ জানুয়ারি ৩০ সদস্যবিশিষ্ট ওপেন ওয়ার্কিং গ্রুপ (OWG) গঠন করা হয়। তারা রিও +২০'র ডকুমেন্ট 'The Future We Want' অনুসারে SDGs-এর দলিল তৈরি করে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৮তম অধিবেশনে (সেপ্টেম্বর ২০১৩–সেপ্টেম্বর ২০১৪) উপস্থাপন করে। এ গ্রুপের প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ১৪-১৫ মার্চ ২০১৩।

SDG-এর খসড়া : বাংলাদেশে এসডিজির জন্য ৯টি খাতে সাফল্য অর্জনের জন্য ৪৭টি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের এসডিজি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে রয়েছে— নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং শিশু শ্রমিকদের সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনা, নারীর প্রতি সহিংসতা ৭৫ শতাংশ কমিয়ে আনা, শতভাগ শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টিসহ স্কুল থেকে ঝরে পড়া শিশুদের সংখ্যা ১০ শতাংশে নামিয়ে আনা, শিক্ষা খাতের মোট বরাদ্দের ২০ শতাংশ কারিগরি ও প্রশিক্ষণ খাতে বরাদ্দ, মোট জাতীয় আয়ের ৫ শতাংশ স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় করা মোট শ্রম শক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ ৫০ শতাংশে উন্নীত করা, দারিদ্র্যসীমার নিচে বাসকারীদের সবাইকে সামাজিক নিরাপত্তাবলয়ে নিয়ে আসা, ২০৩০ সালের মধ্যে দেশের চরম দরিদ্র মানুষের সংখ্যা দুই-তৃতীয়াংশ হ্রাস, প্রবাসে নিয়োজিত বিপুল পরিমাণ জনশক্তির উন্নয়ন, দেশ থেকে ম্যালেরিয়া ও যক্ষ্মা নির্মূল করা, শতভাগ মানুষের জন্য বিশুদ্ধ পানি ও স্যানিটেশন নিশ্চিত করা প্রভৃতি।

♦ টেকসই উন্নয়ন ও বাংলাদেশ

২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (NEC) দেশের প্রথম জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশলপত্র অনুমোদন করে। আগামী ১০ বছরের মধ্যে সুখী-সমৃদ্ধ ও আলোকিত বাংলাদেশ গড়াই এ কৌশলপত্রটির মূল লক্ষ্য। পরিবেশকে ভিত্তি করে সংঘটিত আর্থ-সামাজিক উন্নয়নই হলো টেকসই উন্নয়ন। অর্থাৎ পরিবেশকে গুরুত্ব দিয়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন হলো টেকসই উন্নয়ন (Sustainable Development)। মোটকথা, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ব্যতীত বিশ্বের উন্নয়ন সম্ভব নয়। আবার পরিবেশকে অবিবেচ্য রেখেও পৃথিবীর অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। এ দুইয়ের যথাযথ সমন্বয়

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

সাধনের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সাথে পরিবেশের প্রতি গুরুত্ব আরোপ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নিরাপদ বিশ্ব সংরক্ষণ করে যে উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা যায় সেটাই 'টেকসই উন্নয়ন'। জাতিসংঘ পরিবেশের বিষয়ে মুখ্য অধিবক্তা এবং 'টেকসই উন্নয়ন'-এর নেতৃত্বস্থানীয় প্রচারকের দায়িত্ব পালন করছে। আন্তর্জাতিক আলোচ্যসূচিতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিবেশের অবনতির সম্পর্কের বিষয়টি প্রথম উপস্থাপিত হয় ১৯৭২ সালের ৫-১৬ জুন সুইডেনের স্টকহোমে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ মানব পরিবেশ সম্মেলনে (United Nations Conference on the Human Environment)। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক বিশ্ব কমিশন। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের কাছে এ কমিশনের ১৯৮৭ সালের প্রতিবেদনেই উন্মুক্ত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বিকল্প পথ হিসেবে টেকসই উন্নয়নের ধারণা উপস্থাপিত হয়। এ প্রতিবেদন বিবেচনা করে সাধারণ পরিষদ জাতিসংঘ পরিবেশ ও উন্নয়ন সম্মেলন আহ্বান করে।

১৯৯২ সালের ৩-১৪ জুন ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরিওতে অনুষ্ঠিত পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক জাতিসংঘ সম্মেলন (United Nations Conference on Environment and Development–UNCED) বা ধরিত্রী সম্মেলনে (Earth Summit) অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহ জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশলপত্র প্রণয়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়। এ সম্মেলনে এজেন্ডা ২১ (Agenda 21) গৃহীত হয়। ১৯৯৭ সালের ২৩-২৭ জুন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হয় পরিবেশ বিষয়ক বিশেষ ধরিত্রী সম্মেলন + ৫ (Earth Summit + 5)। এ সম্মেলনে টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশল একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার বলে সরকার প্রধানরা পুনরায় নিশ্চিত করেন। ২০০২ সালের ২৬ আগস্ট–৪ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে অনুষ্ঠিত বিশ্ব টেকসই উন্নয়ন সম্মেলনে (World Summit on Sustainable Development— WSSD) রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানরা এজেন্ডা ২১ (Agenda 21) বর্ণিত টেকসই উন্নয়নের নীতি এবং অন্যান্য বিধিমালার বিষয়ে পুনরায় ঐকমত্য হয়। ২০১২ সালের ২০–২২ জুন ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরিওতে অনুষ্ঠিত ধরিত্রী বা রিও+২০ সম্মেলনেও বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়।

♦ টিকফা

TICFA-এর পূর্ণরূপ Trade and Investment Co-operation Framework Agreement বাংলায় 'বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সহযোগিতা সংক্রান্ত কাঠামোগত সমঝোতা চুক্তি'। ২০০০ সালে যুক্তরাষ্ট্র প্রথম বাংলাদেশকে এ ধরনের চুক্তির প্রস্তাব দেয়। দু'দফায় বিভিন্ন কারণে দুই দেশের মধ্যে এ চুক্তি স্বাক্ষর হয়নি। এর পর ২০১১ সালের অক্টোবরে দু' দেশের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যাপারে ঐকমত্য হয়। ২০১২ সালের ৮ এপ্রিল পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. দীপু মণি জানান, দু' দেশের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

♦ শান্তির সংস্কৃতি

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জনগণের ক্ষমতায়ন এবং 'শান্তির সংস্কৃতি' শীর্ষক দুটি প্রস্তাব জাতিসংঘে পেশ করার মধ্য দিয়ে 'শান্তিকেন্দ্রিক উন্নয়নের' যে মডেল তুলে ধরেছিলেন, তা সর্বসম্মতিক্রমে পাস হয় ১৭ ডিসেম্বর ২০১২ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৭তম অধিবেশনে। ১৯৩টি সদস্যরাষ্ট্র সাধারণ অধিবেশনে ২৯ নম্বর এজেন্ডা হিসেবে প্রস্তাব দুটি সমর্থন করে। এরপর রেজ্যুলেশন আকারে তা পাস করা হয়। প্রস্তাব দুটির প্রথমটি 'জনগণের ক্ষমতায়ন' মডেল ২০১১ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৬৬তম অধিবেশনে তুলে ধরা হয়। এরপর ঐ

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

বছর ২৩ অক্টোবর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৬৬তম অধিবেশনের উচ্চপর্যায়ের সভায় প্রধানমন্ত্রীর একই বছরের সর্বসম্মতিক্রমে রেজ্যুলেশন আকারে গৃহীত হয়। পরবর্তীতে একই বছর ২২ ডিসেম্বর 'জনগণের ক্ষমতায়ন এবং উন্নয়ন' শিরোনামে ঐ প্রস্তাব গৃহীত হয়।

'শান্তির সংস্কৃতি' প্রস্তাবটি আওয়ামী লীগ সরকারের আগের মেয়াদের শেষ দিকে ২০০১ সালে প্রথম উপস্থাপিত হয়। ২০০১ থেকে প্রতিবছর জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী মিশন এ প্রস্তাবটি উপস্থাপন করে আসছে এবং তা প্রতিবছরই সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়ে আসছে। ২০১২ সালের প্রস্তাবে 'শান্তির সংস্কৃতি' বিষয়ে একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক প্রতিবছর আয়োজন করার বিধান রাখা হয়।

♦ বাংলাদেশ-ভারত নৌ ট্রানজিট চুক্তি

নৌপথে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিদ্যমান বাণিজ্য ও ট্রানজিট বিষয়ক Protocol on Inland Water Transit and Trade চুক্তিটি নবায়নের লক্ষ্যে দু'দেশের সচিব পর্যায়ের বৈঠক ২০০৯ সালের ২৩ মার্চ ঢাকায় শুরু হয়। দু'দিনের এ বৈঠক শেষে কোনো ধরনের পরিবর্তন বা সংশোধন ছাড়াই চুক্তিটিতে নতুন করে স্বাক্ষর করেন উভয় দেশের নৌপরিবহন মন্ত্রণলয়ের শীর্ষ কর্মকর্তারা। বিদ্যমান চুক্তিটির মেয়াদ ৩১ মার্চ শেষ হয়ে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে এর নবায়ন করা হয়। ১৯৭২ সালের ১ নভেম্বরে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে নৌপথে বাণিজ্য ও ট্রানজিট চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। এর পর থেকে এ পর্যন্ত ১১ বার চুক্তিটিকে নবায়ন করা হয়। ১৯৭২ সালের ৪ অক্টোবর বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে স্বাক্ষরিত বাণিজ্য চুক্তির ৫ নম্বর ধারা অনুযায়ী ওই বছরের ১ নভেম্বর চুক্তিটি প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তীকালে ১৯৮০ সালে বাণিজ্য চুক্তিটি নবায়ন করা হলে সে চুক্তির ৮ নম্বর ধারা অনুযায়ী বিদ্যমান প্রটোকলটিও নবায়ন হয়ে আসছে। ৯ ফেব্রুয়ারি ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রণব মুখার্জি বাংলাদেশ সফরে এলে ১৯৮০ সালের পর আবারো বাণিজ্য চুক্তিটি নবায়ন করা হয়। এর সূত্র ধরেই নবায়ন করা হয় নৌপথে বাণিজ্য ও ট্রানজিট বিষয়ক প্রটোকলটি যা কার্যকর থাকে ২০১১ সাল পর্যন্ত। পরবর্তীতে ২০১২ এটার মেয়াদ ২০১৪ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত বাড়ানো হয়।

চুক্তি অনুসারে বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জ, মংলা, খুলনা ও সিরাজগঞ্জ নৌবন্দরে পোর্ট অব কল (বন্দর ব্যবহারের সুবিধা) সুবিধা পায় ভারত। একইভাবে ভারতের কলকাতা, হলদিয়া, করিমগঞ্জ ও পাণ্ডুতে পোর্ট অব কল সুবিধা পায় বাংলাদেশ। এছাড়া জলপথে পণ্য পরিবহনের এ প্রটোকল অনুসারে দু'দেশ আটটি রুটে একে অপরের পণ্যবাহী কার্গোকে ট্রানজিট সুবিধা দিয়ে থাকে। এ আটটি রুট হলো– ১. কলকাতা-হলদিয়া-রায়মঙ্গল-চালনা-খুলনা-কাউখালি-বরিশাল-হিজলা-চাঁদপুর-নারায়ণগঞ্জ-আরিচা-সিরাজগঞ্জ-বাহাদুরাবাদ-চিলমারী-ধুবড়ি-পাণ্ডু। ২. একইভাবে পাণ্ডু-ধুবড়ি-চিলমারী থেকে চালনা হয়ে হলদিয়া-কলকাতা। ৩. কলকাতা-হলদিয়া-রায়মঙ্গল-মংলা-কাউখালি-বরিশাল-হিজলা-চাঁদপুর-নারায়ণগঞ্জ-ভৈরববাজার-আজমিরীগঞ্জ-মারকুলি-শেরপুর-ফেঞ্চুগঞ্জ-জকিগঞ্জ-করিমগঞ্জ। ৪. একইভাবে করিমগঞ্জ থেকে কলকাতা। ৫. রাজশাহী-গোদাগাড়ী-ধুলিয়া। ৬. ধুলিয়া-গোদাগাড়ী-রাজশাহী। ৭. করিমগঞ্জ-জকিগঞ্জ-ফেঞ্চুগঞ্জ-আজমিরিগঞ্জ-ভৈরববাজার-নারায়ণগঞ্জ-চাঁদপুর-আরিচা-সিরাজগঞ্জ-বাহাদুরাবাদ-চিলমারী-ধুবড়ি-পাণ্ডু। ৮. একইভাবে পাণ্ডু থেকে সিরাজগঞ্জ হয়ে করিমগঞ্জ।

♦ ঢাকায় BIMSTEC সচিবালয়

১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৪ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাত দেশের জোট বে অব বেঙ্গল ইনিশিয়েটিভ ফর মাল্টি সেক্টরাল টেকনিক্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক কো-অপারেশনের (BIMSTEC) স্থায়ী সচিবালয় ঢাকার

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

গুলশানে উদ্বোধন করা হয়। এটি হলো ঢাকায় স্থাপিত প্রথম কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থার পূর্ণাঙ্গ সচিবালয়। ১-৪ মার্চ ২০১৪ মিয়ানমারের নাইপিদোতো অনুষ্ঠিত বিমসটেকের তৃতীয় সম্মেলনে স্থায়ী সচিবালয় ঢাকায় স্থাপনের ব্যাপারে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এতদিন জোটভুক্ত বিভিন্ন দেশে কার্যক্রম পরিচালিত হলেও ২০১৪ সালের জুন থেকে ঢাকায় এ জোটের দাপ্তরিক কার্যক্রম শুরু হয়।

৬ জুন ১৯৯৭ থাইল্যান্ডের ব্যাংককে বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলংকা ও থাইল্যান্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিমসটেক গঠিত হয়।

♦ IPU'র প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ

১৬ অক্টোবর ২০১৪ জাতীয় সংসদ সদস্য সাবের হোসেন চৌধুরী বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আইনসভার আন্তর্জাতিক সংগঠন ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়নের (IPU) প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। IPU'র ১২৫ বছরের ইতিহাসে সাবের হোসেন চৌধুরী প্রথম বাংলাদেশি, যিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ১২-১৬ অক্টোবর ২০১৪ সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় IPU'র ১৩১তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার শেষ দিন ১৬ অক্টোবর তিনি নির্বাচিত হন। ঐদিনই তিনি IPU'র ২৮তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

নির্বাচনে সাবের হোসেন চৌধুরী ছাড়াও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন ইন্দোনেশিয়ার সংসদ সদস্য নুরহায়াতি আলী আসিগাফ, অস্ট্রেলীয় আইনসভার স্পিকার ব্রনউইন বিশপ ও মালদ্বীপের আইনসভার সাবেক স্পিকার আবদুল্লাহ শহীদ। সাবের হোসেন চৌধুরী এ নির্বাচনে ভোট পান ১৬৯টি। আর তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ব্রনউইন বিশপ ভোট পান ৯৫। সাবের হোসেন চৌধুরী দক্ষিণ এশিয়া থেকে নির্বাচিত IPU'র তৃতীয় প্রেসিডেন্ট। তার আগে দক্ষিণ এশিয়া থেকে ভারতের গুরুদয়াল সিং ধিলন (১৯৭৩-৭৬) ও নাজমা হেপতুল্লাহ (১৯৯৯-২০০২) IPU'র প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন।

♦ CPA'র চেয়ারপার্সন বাংলাদেশ

জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশনের (CPA) নির্বাহী কমিটির নতুন চেয়ারপার্সন। ৯ অক্টোবর ২০১৪ ক্যামেরুনের রাজধানী ইয়াওন্দেতে সিপিএ'র ৬০তম সম্মেলনে (২-১০ অক্টোবর ২০১৪) তিন বছর মেয়াদি এ পদের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে তিনি তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী পশ্চিম ক্যারিবীয় সাগরের কেইম্যান দ্বীপপুঞ্জের আইনসভার স্পিকার জুলিয়ানা ও'কনর-কন্নোলিকে ৭০-৬৭ ভোটে পরাজিত করে নির্বাচিত হন। ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী সিপিএ'র প্রথম বাংলাদেশি ও প্রথম বাঙালি নারী চেয়ারপার্সন। সিপিএ'র গঠনতন্ত্র অনুযায়ী তিনি তিন বছর ৩৫ সদস্যবিশিষ্ট নির্বাহী কমিটির চেয়ারপার্সনের দায়িত্ব পালন করবেন। তার পূর্বে ১৯৮৪-৮৭ মেয়াদে ভারতের এমপি বালরাম ঝাকার এবং ২০০৫-২০০৮ মেয়াদে পশ্চিমবঙ্গের এমএলএ হাশিম আবদুল হালিম সিপিএ'র চেয়ারপার্সনের দায়িত্ব পালন করেন।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

১০. বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলসমূহের গঠন, আদর্শ ও ভূমিকা

◆ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

আওয়ামী লীগ বর্তমানে বাংলাদেশের বৃহৎ ও সর্বাপেক্ষা পুরাতন রাজনৈতিক দল। ১৯৪৯ সালে গঠিত বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা এই দলটি ৬-দফা কর্মসূচি প্রচারের মাধ্যমে ব্যাপক জনসমর্থন নিয়ে ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দলটি ১৯৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালনা করে। ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর পাক হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের মাধ্যমে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। এ সময় ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ের কারণে আওয়ামী লীগ স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম সরকার গঠন করে। ১৯৭২-এর ১০ জানুয়ারি দলের প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিব বন্দি অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে দেশে ফিরে আসেন। পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ দেশে বহুদলীয় ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে একদলীয় সরকার 'বাকশাল' কায়েম করে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট সামরিক অভ্যুত্থানে শেখ মুজিব সপরিবারে নিহত হলে দেশে আওয়ামী লীগের শাসনের অবসান ঘটে। পরবর্তীতে রাজনৈতিক দলবিধি ১৯৭৬-এর মাধ্যমে আওয়ামী লীগ নামে দলটির আবির্ভাব ঘটে। ১৯৭৯ সালের সংসদ নির্বাচনে দলটি অংশ নিয়ে সংসদে প্রধান বিরোধী দলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ বিএনপি সরকার ক্ষমতাচ্যুত হলে আওয়ামী লীগ ৮ দলীয় ঐক্যজোট গঠন করে এরশাদবিরোধী আন্দোলনে অংশ নেয়। ১৯৯০-এর গণঅভ্যুত্থানে এরশাদ সরকারের পতন হলে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ১৯৯১-এর পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৮৮টি আসনে বিজয়ী হয়ে প্রধান বিরোধী দলের মর্যাদা অর্জন করে। ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বিজয়ী হয়ে ২১ বছর পর আবার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন হয়। তারপর ২০০৮ সালের নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশভাবে বিজয়ী হয়ে পূর্ণ মেয়াদে সরকার পরিচালনা করে। সর্বশেষ ২০১৪ সালের দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়লাভের মাধ্যমে দলটি দেশ পরিচালনা করে আসছে।

আওয়ামী লীগের মতাদর্শ ও কর্মসূচি

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ চারটি মূলনীতিতে বিশ্বাসী। এগুলো হচ্ছে জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র। আওয়ামী লীগের প্রাক্তন সভাপতি মরহুম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ চারটি মৌল আদর্শের প্রবক্তা এবং তারই নামানুসারে এদের সমষ্টিকে মুজিববাদ হিসেবে অভিহিত করা হয়েছিল। আওয়ামী লীগ এই চার মূলনীতিকে নিম্নরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছে :

১. **জাতীয়তাবাদ :** জাতি হিসেবে দেশের ওপর জনগণের পূর্ণ কর্তৃত্বের অধিকার।
২. **গণতন্ত্র :** রাষ্ট্র শাসনের অধিকার।
৩. **ধর্মনিরপেক্ষতা :** জনগণের স্ব স্ব চেতনার আলোকে নিজ নিজ ধর্মপালনের অবাধ অধিকার।
৪. **সমাজতন্ত্র :** জাতীয় সম্পদের ওপর জনগণের মালিকানা কায়েমের অধিকার।

◆ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)

বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান, যিনি ১৯৭৫-এর ৭ নভেম্বরে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন হয়েছিলেন। বিএনপির প্রথম নাম ছিল জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল (জাগদল)। জাগদলই পরবর্তীতে বিএনপি নামে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৭৯ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলটি

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল। ১৯৮১ সালের ৩০ মে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে সেনাবাহিনীর একাংশের বিদ্রোহে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান নিহত হলে দলের চেয়ারম্যান হয়েছিলেন সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তার। পরবর্তীতে বিচারপতি সাত্তার দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ রক্তপাতহীন সামরিক অভ্যুত্থানে বিচারপতি সাত্তার তথা বিএনপি সরকার ক্ষমতাচ্যুত হয়। এরপর দেশের অন্য দলগুলোর সঙ্গে যুগপৎ আন্দোলনের মাধ্যমে মরহুম জিয়াউর রহমানের পত্নী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি এরশাদ সরকার বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়। খালেদা জিয়ার সে সময়কার বলিষ্ঠ নেতৃত্বের কারণে বিএনপি অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করে। বিরোধী দলের আন্দোলনের মুখে ১৯৯০-এর ডিসেম্বরে গণঅভ্যুত্থানের মুখে এরশাদ প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের কাছে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। এরপর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে আবার ক্ষমতায় ফিরে আসে।

বিএনপি সরকারের মূল লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠা এবং প্রেসিডেন্ট জিয়ার ১৯ দফা কর্মসূচির মাধ্যমে দেশকে স্বনির্ভরতার দিকে নিয়ে যাওয়া। ১৯৯৬ সালে অনুষ্ঠিত সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি ১১৪টি আসনে বিজয়ী হয়। সর্বশেষ ১ অক্টোবর, ২০০১ অনুষ্ঠিত অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি ১৯৫টি আসনে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করে পূর্ণ মেয়াদে দেশ পরিচালনা করেছিল।

বিএনপির ১৯ দফা কর্মসূচির প্রধান প্রধান দফা হচ্ছে :

১. সর্বতোভাবে দেশের স্বাধীনতা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা।
২. শাসনতন্ত্রের চারটি মূলনীতি অর্থাৎ সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি সর্বাত্মক আস্থা ও বিশ্বাস, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে প্রতিফলিত করা।
৩. নিজেদের একটি আত্মনির্ভরশীল জাতি হিসেবে গড়ে তোলা।
৪. প্রশাসনের সর্বস্তরে উন্নয়ন কার্যক্রমে এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে জনসাধারণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

◆ জাতীয় পার্টি

১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ রক্তপাতহীন এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সেনাপ্রধান এরশাদ বিএনপি সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। সারা দেশে সামরিক আইন জারি করে রাজনৈতিক দলগুলোর তৎপরতার ওপর বিধিনিষেধ জারি করা হয়। পরে ক্ষমতায় টিকে থাকা এবং বিরোধী দলকে মোকাবিলার জন্য এরশাদ রাজনৈতিক দল গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করেন। এর মধ্যে রাজনৈতিক দলগুলোর তৎপরতার ওপর থেকে বিধিনিষেধ তুলে নেয়া হয়। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আহসানুল্লাহ চৌধুরীর নেতৃত্বে ১৯৮৩ সালে জনদল গঠন করা হয়। জনদলে যোগদানকারী দলগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল আওয়ামী লীগ (মিজান গ্রুপ), বিএনপির একাংশ, জাতীয় লীগ, ডেমোক্রেটিক লীগ (শাহ মোয়াজ্জেম গ্রুপ), ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (নাসের), ইউপিপি (কাজী জাফর), গণতান্ত্রিক পার্টি (জাহিদ)। এ দলগুলোর সমন্বয়ে গঠিত জনদল পরবর্তীতে ১৯৮৬ সালে জাতীয় পার্টি নামে আত্মপ্রকাশ করে। এই দলের চেয়ারম্যান হন প্রেসিডেন্ট এরশাদ নিজেই। ক্ষমতালিপ্সু ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা 'জাতীয় পার্টি' ১৯৮৬ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিয়ে ব্যাপক কারচুপির মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু দলটি তাদের

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

সংগঠনকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে এবং সরকারবিরোধী আন্দোলনের মুখে বিকল্প কর্মসূচি প্রদান করতে ব্যর্থ হয়। ১৯৯০-এ বিরোধী দলের ডাকে এরশাদবিরোধী গণঅভ্যুত্থানের মুখে এরশাদ ক্ষমতাচ্যুত হলে জাতীয় পার্টিও ক্ষমতা থেকে অপসারিত হয়। ১৯৯১-এ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিয়ে জাতীয় পার্টি ৩৫টি আসন লাভ করে সংসদে তৃতীয় বৃহত্তম দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জাতীয় পার্টি ৩০টি আসন পেয়ে আওয়ামী লীগের 'ঐকমত্যের' সরকারে যোগ দেয়। প্রথমে সংসদ অধিবেশনে যোগ দেয়ার সুবিধার্থে দুর্নীতিসহ একাধিক মামলায় আটক জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান এরশাদকে সংসদের পাশে একটি বাড়িতে (পরে সাবজেলে রূপান্তরিত) বন্দি হিসেবে রাখা হয়। ১৯৯৭-এর ৮ জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্টে সর্বশেষ মামলায় জামিন পেয়ে দীর্ঘ ছয় বছর পর এরশাদ জেল থেকে মুক্তি পান। বর্তমানে জাতীয় পার্টি তিনটি ভাগে বিভক্ত। এরশাদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টি বর্তমান দশম জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করছে।

আদর্শ ও কর্মসূচি : বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের মতো জাতীয় পার্টিও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা হিসেবে নিজেদের দাবি করতে থাকে। জিয়াউর রহমানের ১৯ দফা কর্মসূচির মতো এরশাদও জাতীয় পার্টির জন্য ১৮ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে সারা দেশে তা বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা শুরু করেন। ১৮ দফা কর্মসূচির প্রধান দফাগুলো হচ্ছে :

১. পল্লী উন্নয়ন।
২. কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন।
৩. শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি করা।

♦ বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

জামায়াত একটি ইসলামভিত্তিক রাজনৈতিক দল। প্রতিষ্ঠাতা পাকিস্তানের মাওলানা আবুল আলা মওদুদী। ১৯৪১ সালের ২৫ আগস্ট জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠিত হয়। এ দলটি একটি আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক দল। শ্রীলংকা, ভারত, পাকিস্তানসহ বিভিন্ন দেশে জামায়াতে ইসলামীর সংগঠন রয়েছে। আওয়ামী লীগের সাথে রাজনৈতিক মতপার্থক্যের কারণে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ভূমিকা পালন না করার কারণে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই দেশে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়। এতে জামায়াতের কর্মতৎপরতা বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্টের পটপরিবর্তনের পর জিয়াউর রহমান ক্ষমতাসীন হলে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নেয়া হয়। এরপর থেকে জামায়াত বাংলাদেশে প্রকাশ্যে রাজনীতি শুরু করে। স্বৈরাচার এরশাদবিরোধী আন্দোলনে ক্যাডারভিত্তিক, ধর্মীয় ভাবাদর্শে বিশ্বাসী জামায়াতে ইসলামী তাদের দলীয় শক্তি বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়, যার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৮৬ ও ১৯৯১-এর সংসদ নির্বাচনে দলটি যথাক্রমে ১০ ও ২০টি আসনে নির্বাচিত হয়। কিন্তু ১৯৯৬-এ অনুষ্ঠিত সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৩০০ আসনে প্রার্থী দিয়ে মাত্র তিনটি আসনে তারা জয়লাভ করে। জামায়াতে ইসলামী ২০০১ সালের নির্বাচনে ১৭টি আসন লাভ করে বিএনটির নেতৃত্বে জোট সরকারের অংশীদার হয়েছিল। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতাযুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধে সম্পৃক্ত থাকার অভিযোগে দলটির নিবন্ধন বাতিল হয়ে যায়। ফলে এখন থেকে জাতীয় নির্বাচনে জামায়াত আর অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : জামায়াতে ইসলামীর মূল লক্ষ্য দেশে কুরআন ও সুন্নাহর আইন প্রতিষ্ঠা করা।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

কর্মসূচি

১. আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন প্রতিষ্ঠা।
২. খাদ্য, বস্ত্র, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা
৩. অর্থনৈতিক সমবণ্টনের লক্ষ্যে ইসলামী অর্থব্যবস্থা চালুকরণ।
৪. ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রবর্তন।

♦ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)

সমাজতান্ত্রিক বিধিবিধান সম্পর্কে তৎকালীন আওয়ামী সরকারের সাথে মতদ্বৈধতাহেতু ১৯৭২ সালের ৩১ অক্টোবর জাসদের জন্ম হয়। দলের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে দেশ গড়ার আহ্বান জানানো হয়। ছাত্রলীগের দুদলের অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে জাসদের জন্ম। অবশেষে ছাত্রলীগের তৎকালীন ডাকসাইটে নেতা আ.স.ম. আবদুর রব ও শাহজাহান সিরাজ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল গঠন করেন। মেজর (অব) এম.এ. জলিল দলের যুগ্ম আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করেন। দলের অভিমত অনুসারে গণতান্ত্রিক রীতি-নীতির আওতায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। তাদের অভিমত অনুসারে 'শ্রেণী সংগ্রাম' ও সামাজিক বিপ্লবে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব। ১৯৭৩ সালে সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলেও জাসদ ৩০০টির মধ্যে মাত্র ২টি আসন লাভ করতে সমর্থ হয়। তারা ১৯৭৪ সালের মধ্যে সরকারকে বিপ্লবের দ্বারা উৎখাতের পরিকল্পনা এবং গণবাহিনী নামে সশস্ত্র কর্মীবৃন্দ গড়ে তোলার পরিকল্পনা করে এবং দলের লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য একটি সৈনিক সংস্থাও গঠন করে। ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর সিপাহী অভ্যুত্থানে জাসদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাদের ইচ্ছা ছিল জেনারেল জিয়াকে রাষ্ট্রক্ষমতায় রেখে 'সামাজিক বিপ্লব' সম্পন্ন করা। পরে মনোমালিন্যহেতু জিয়া দলের প্রধান নেতা ও গণবাহিনীর প্রধান কর্নেল তাহেরকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন এবং মেজর জলিল ও আবদুর রবসহ অনেক নেতাকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। ১৯৭৬ সালে জাসদ নিষিদ্ধ ঘোষিত হলেও ১৯৭৮ সালের এপ্রিল মাস থেকে পুনরায় রাজনৈতিক প্রক্রিয়া চালু করার অনুমতি পায়। ১৯৭৯ সালে জাসদ সহিংস বিপ্লবের পথ পরিহার করে জাতীয় গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার মানসে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গণআন্দোলন গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেয়। ১৯৮০ সালে জিয়াবিরোধী যে ১০টি দল জোটবদ্ধ হয় জাসদ ছিল তার একটি। জাসদের মূল কৌশল সম্পূর্ণ পরিবর্তনের কারণে ১৯৮১ সালে অপেক্ষাকৃত বিপ্লবীরা দলত্যাগ করে বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) গঠন করে।

পরবর্তীতে জাসদ (রব) এরশাদ সরকারকে সকল প্রকার সাহায্য প্রদান করে এবং ১৯৮৬ সালে আওয়ামী লীগের সাথে নির্বাচনে অংশ নিয়ে মাত্র ৪টি আসন লাভে সমর্থ হয়। সে সময়ে জাসদ ছিল একটি আনুগত্যশীল বিরোধী দল। কারণ তারা সকল ক্ষেত্রে সরকারকে সমর্থন করতো। ১৯৮৮ সালে সংসদ নির্বাচনে জাসদ (রব)-এর নেতৃত্বে গঠিত সম্মিলিত বিরোধী দল ১৯টি আসন লাভ করে। এরশাদের পতনের পর জাসদ (রব) প্রায় নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। ১৯৯১ সালের সংসদ নির্বাচনে ১৬১ জন প্রার্থী মনোনয়ন দান করলেও একটিও আসন লাভে সমর্থ হয়নি। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে ১টি আসন পায় এবং শেখ হাসিনার জাতীয় সরকারে জাসদের প্রধান আবদুর রবকে নৌপরিবহন মন্ত্রী নিয়োগ করা হয়। ২০০১ সালের নির্বাচনে এ দলটি কোনো আসন পাননি।

দলীয় মতবিরোধ ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট কারণে জাসদ বিভিন্ন সময় ভাঙনের মুখে পড়ে এবং বিভিন্ন উপদল সৃষ্টি হয়। ভিন্ন আদর্শ ও সংগ্রামী ভূমিকার জন্য ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত যে দল আওয়ামী লীগের প্রধান প্রতিপক্ষ ছিল নানা কারণে ও আদর্শচ্যুতিতে আজ তা লুপ্তপ্রায়। বর্তমানে আওয়ামী লীগের টিকিটে জাসদ প্রধান হাসানুল হক ইনু সরকারের একটি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেছে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

♦ বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি

বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি বাংলাদেশের একটি কমিউনিস্ট দল (লেনিনবাদী), যা বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ এবং অন্য একটি গ্রুপ থেকে ১৯৮০ সালে গঠিত হয়। অমল সেন ছিলেন এটির প্রতিষ্ঠাতা মহাসচিব। ১৯৮৪ সালে দলটি দুটি ভাগে বিভক্ত হয় এবং দুই পক্ষই একই নাম ব্যবহার করতে থাকে। একটি গ্রুপের নেতৃত্ব দেন অমল সেন এবং অন্য গ্রুপের নজরুল ইসলাম। ১৯৯২ সালে দলটি পুনরায় একত্রিত হয়। ক্ষমতাসীন দলের শরীক দল হিসেবে দলটির বর্তমান সভাপতি রাশেদ খান মেননও বর্তমান সরকারের একজন মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

♦ বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি

বাংলাদেশের আরেকটি ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন দল হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের তাশখন্দ শহরে ১৯২০ সালের ১৭ অক্টোবর এই রাজনৈতিক দলের জন্ম। ১৯২২ সালের মাঝামাঝি ভারতবর্ষের কলকাতা, মুম্বাই, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশে কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ১৯৪৮ সালের ৬ মার্চ নতুন করে গঠিত হয় দলটি। প্রথমে সারা পাকিস্তানে একটি কেন্দ্রীয় কমিটি ও পলিটব্যুরোর অধীনে তৎপরতা অব্যাহত থাকে। পরে পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির পূর্ববঙ্গ শাখা প্রায় স্বতন্ত্রভাবেই কাজ শুরু করে। মধ্য ষাটের দশকে এসে কমিউনিস্ট আন্দোলনের মত ও পথ নিয়ে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের মধ্যে যে মতদ্বৈধতা দেখা দেয়, তারই জের হিসেবে কমিউনিস্ট পার্টি দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। কমিউনিস্টদের একটি গ্রুপ এ সময় থেকে 'মস্কোপন্থী' এবং অপরটি 'পিকিংপন্থী' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। ১৯৭১ সালে মস্কোপন্থীরা মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা পালন করে। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে মস্কোপন্থী দলটির নামকরণ করা হয় 'বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি' ইংরেজিতে Communist Party of Bangladesh (CPB)। মধ্য আশির দশকে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নসহ পূর্ব ইউরোপের দেশে কমিউনিস্ট সরকারের পতনের ঘটনা এ দলটির ওপরও প্রভাব ফেলে। '৯০-এর দশকে গোড়ার দিকে মস্কোপন্থী আবার দুভাগে বিভক্ত হয়। একটি গ্রুপ 'বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি' (সিপিবি) নাম বজায় রাখে এবং এখনো এ নামেই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। আর অপর অংশটি কমিউনিস্ট আদর্শ ত্যাগ করে নিস্ক্রিয় অথবা অন্য রাজনৈতিক দলে যোগদান করেছে। এছাড়াও কমিউনিস্ট ভাবাদর্শে বিশ্বাসী অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল বিভিন্নভাবে তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে।

বাংলাদেশের নির্বাচন

♦ নির্বাচন কমিশন

বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন একটি সাংবিধানিক সংস্থা। সাংবিধানিকভাবে এটি স্বাধীন, স্বতন্ত্র এবং নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান। দেশের সকল নির্বাচন পরিচালনার জন্য নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়। একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং কয়েকজন কমিশন সদস্য নিয়ে এই কমিশন গঠিত হয়। প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অন্যান্য সদস্যদের রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করে থাকেন। নিয়োগকৃত কমিশনারদের কার্যমেয়াদ পাঁচ বছর। নির্বাচন কমিশনারবৃন্দ অসদাচরণ কিংবা দায়িত্ব পালনে অসামর্থ্যের কারণে দায়িত্ব থেকে অপসারিত হতে পারেন। তারা স্বেচ্ছায় রাষ্ট্রপতির কাছে পদত্যাগপত্র পেশ করেও পদত্যাগ করতে পারেন। নির্বাচন কমিশনের সদস্যগণ দায়িত্ব পালনের পর অন্য কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠানে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না। তবে কমিশনের সদস্যগণ প্রধান নির্বাচন কমিশনার হতে পারবেন।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

নির্বাচন কমিশনের প্রধান কার্যাবলী

১. প্রজাতন্ত্রের সকল নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও তত্ত্বাবধান করা। ২. রাষ্ট্রপতি, জাতীয় সংসদ, পৌর কর্পোরেশন, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা এবং ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠান পরিচালনা করা। ৩. সংসদ নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী এলাকার সীমা নির্ধারণ করা। ৪. সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনার জন্য রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করা। ৫. বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা ভোগ। যেমন— (ক) রাষ্ট্রপতি ও সংসদ সদস্যদের নির্বাচনের জন্য গৃহীত মনোনয়নপত্রের বাছাইকৃত মনোনয়নপত্র সংক্রান্ত বিতর্ক দেখা দিলে কমিশন উক্ত বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। (খ) কোনো ব্যক্তি সংসদ সদস্য নির্বাচনের পর তার সদস্যপদের বিষয়টি নির্বাচন কমিশনারের নিকট প্রেরিত হয় এবং কমিশন সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। (গ) এসব দায়িত্ব ছাড়াও কমিশন সংবিধান অনুযায়ী আইনের দ্বারা অর্পিত অতিরিক্ত দায়িত্বও পালন করে থাকে।

♦ নির্বাচনী আইন

নির্বাচনী আইন নির্বাচন সংক্রান্ত আইনবিধান। সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করা, প্রার্থী এবং প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচন কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীদের আচরণ ব্যাখ্যা এবং এ সম্পর্কিত বিধিবিধান লঙ্ঘন করলে লঙ্ঘনকারীদের শাস্তির বিধান নিশ্চিত করা নির্বাচনী আইনের লক্ষ্য। বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধানে নির্বাচন কমিশন গঠনের বিধান রাখা হয়। রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ দান করেন। নির্বাচন কমিশন সংবিধান ও আইনের আওতায় দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন। সংবিধানের ১১৯ অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী সংসদ নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুত ও তত্ত্বাবধান, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ এবং নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত। নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব পদ্ধতি নির্ধারণ এবং কার্যক্রম পরিচালনার স্বার্থে উল্লেখ্য গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২, নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা ১৯৭২ এবং আচরণ বিধিমালা ১৯৯৬ এর কিছু কিছু ধারা সংশোধিত হয়ে বর্তমানে এই বিধিমালাগুলো যথাক্রমে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধনী) ২০১৩, নির্বাচন পরিচালনা (সংশোধনী) ২০০৮ এবং রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের আচরণ বিধিমালা ২০০৮ নামে পরিচিত। এসব আদেশ ও বিধিমালার সমন্বয়েই নির্বাচনী আইনবিধান গঠিত।

♦ নির্বাচন পর্যবেক্ষক দল

নির্বাচন চলাকালীন সময়ে পর্যবেক্ষক দলসমূহের ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। পর্যবেক্ষক দলসমূহের তদারকির কারণেই নির্বাচন আরো সুষ্ঠু ও সুন্দর হয়। নির্বাচন কেন্দ্রগুলোতে তাদের সরব উপস্থিতি নির্বাচন প্রক্রিয়াকে সহায়তা করার লক্ষ্যে পর্যবেক্ষক দলসমূহ কাজ করে যায়। পর্যক্ষেকগণ নিরপেক্ষভাবে কাজ করে দেশের সম্মান অটুট রাখে এবং নির্বাচনকে গতিশীল করতে প্রভূত সাহায্য করে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রায়শ সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে ফলে দেশ ও জাতি গভীর সংকটে পড়ে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ নির্বাচন আর নির্বাচনকে ফলপ্রসূ করার জন্য সার্বিক প্রক্রিয়ার অন্যতম একটি মাধ্যম হচ্ছে পর্যবেক্ষক দলসমূহের কার্যক্রম। সামরিক সরকারের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এ সরকার ক্ষমতাগ্রহণের পর তারা প্রায় সকলেই নিজেদের দেশপ্রেমিক ও নিরপেক্ষ হিসেবে জনগণের কাছে বিশ্বস্ত রাখতে চায়। সময়ের প্রেক্ষাপটে এ সরকার নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এমনকি রাজনৈতিক দলও গঠন করেন। নির্বাচনের প্রয়োজন হলে তারা

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

অনেকে জয়লাভ করার জন্য কারচুপির আশ্রয় নেয় ফলে নির্বাচন হয়ে ওঠে তামাশার। সবধরনের নির্বাচনকে গ্রহণীয় করে তোলার জন্য সার্থক নির্বাচন প্রয়োজন। সুষ্ঠু ও সুন্দর নির্বাচনের প্রয়োজনে পর্যবেক্ষক দলসমূহের ভূমিকা ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিদেশি বিভিন্ন দেশ, সংস্থা পর্যবেক্ষক দলসমূহ প্রেরণ করেন। তারা সরেজমিনে নির্বাচনের সার্বিক তথ্য তুলে ধরার চেষ্টা করেন। বাংলাদেশে বিভিন্ন নির্বাচনে বিভিন্ন সময়ে যেসব দেশ বা সংস্থা কাজ করেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে জাতিসংঘ নির্বাচন সহায়ক সচিবালয়, এশিয়ান নেটওয়ার্ক ফর ফ্রি ইলেকশন্স, জার্মানির পর্যবেক্ষক গ্রুপ বিদেশি পর্যবেক্ষক মিশন, ভোট অবজারভেশন ফর ট্রান্সপারেন্সি এ্যান্ড এমপাওয়ারমেন্ট (VOTE), ইউরোপীয় ইউনিয়ন পর্যবেক্ষক টিম, সার্ক ফোরাম, কমনওয়েলথ, মার্কিনভিত্তিক এনডিআই এশিয়া ফাউন্ডেশন, নরওয়ে জিয়াস ইত্যাদি। বাংলাদেশের স্থানীয় অনেক NGO পর্যবেক্ষক দলসমূহের সঙ্গে কার্যক্রম পরিচালনা করেন এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে— ব্রাক, প্রশিকা, আশা, ওয়েভ, খান ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশের মানবাধিকার কমিশনসহ আরও অনেক প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশের বিভিন্ন নির্বাচনে তারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

♦ গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও)

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ বা The Representation of the Peoples Order (RPO) হলো একটি দেশের প্রতিনিধি নির্বাচন সংক্রান্ত বিধিমালা। কোনো কোনো দেশে এটি গণপ্রতিনিধিত্ব আইন বা আরপিএ নামে পরিচিত। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের স্থপতি রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক নির্বাচন সংক্রান্ত একটি আদেশ দ্য রিপ্রেজেন্টেশন অব দ্য পিপল অর্ডার (আরপিও), ১৯৭২ বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে আইন হিসেবে ব্যবহার হয়ে আসছে। তবে এর কিছু কিছু ধারা বিভিন্ন সময়ে জাতীয় সংসদে পাস হয়ে পরিবর্তিত হয়েছে। সর্বশেষ ২০১৩ সালে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধনী) বিল, ২০১৩ জাতীয় সংসদে পাসের মাধ্যমে আরপিও এর সংশোধন হয়। তবে বাংলাদেশের অন্যান্য নির্বাচন যেমন ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও সিটি করপোরেশন নির্বাচনের ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক বিধিমালা তথা জাতীয় সংসদে পাসকৃত পূর্ণাঙ্গ আইন থাকলেও জাতীয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে এখনো পূর্ণাঙ্গ আইন তথা এ্যাক্ট হয়নি। বরং ১৯৭২ সালে প্রণীত রাষ্ট্রপতির আদেশ বলেই দেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রতিটি জাতীয় নির্বাচন। তবে সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির আদেশ বা অধ্যাদেশও আইনের স্বীকৃত হওয়ায় এবং ১৯৭৩ সালে জাতীয় সংসদে এটি অনুমোদিত হওয়ায় গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশও যে আইন তা নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই। কয়েকবার এই আদেশটিকে এ্যাক্ট এ রূপান্তর করার চেষ্টা করা হলেও রাষ্ট্রপতির আদেশের ঐতিহ্য অক্ষুণ্ন রাখতে এবং এর কারণে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোনোরূপ সমস্যা না হওয়ায় এখন পর্যন্ত নির্বাচনের এই আইনটি আদেশ নামেই বহাল রয়েছে। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ এর ইংরেজি রূপ হলো দ্য রিপ্রেজেন্টেশন অব দ্য পিপল অর্ডার যা সংক্ষেপে আরপিও নামে পরিচিত। জাতীয় সংসদে প্রতিনিধি বাছাইয়ে নির্বাচন সংক্রান্ত বিধিমালাই হলো আরপিও। বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই বিধিমালাটি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জারি হওয়ায় এটি গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ বা আরপিও নামে পরিচিত। আর যদি জাতীয় সংসদে এটি পাস হতো তাহলে এটি গণপ্রতিনিধিত্ব আইন বা আরপিএ নামে পরিচিত পেত। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত ও পাকিস্তানে এই বিধিমালাটি আরপিএ নামে পরিচিত।

১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির জারি করা এই আদেশনামাটি ১৯৭৩ সাল থেকে এখন পর্যন্ত এদেশে যতগুলো জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রতিটিতেই এটি আইন হিসেবে ব্যবহার হয়ে আসছে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

১২. সমকালীন যোগাযোগ

♦ মানবসম্পদ উন্নয়ন ও তথ্যপ্রযুক্তি *[৩০তম বিসিএস]*

কোনো দেশের জনসংখ্যা যদি গুণগত দিক থেকে উন্নতমানের হয় তাহলে সে দেশের জনসংখ্যা অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হবে। কোনো দেশের জনসংখ্যার গুণগত দিক বলতে বোঝায় জনসংখ্যার শিক্ষা, দক্ষতা, কর্মঠ ও উদার দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন গুণকে। এরূপ গুণসম্পন্ন জনসংখ্যা সম্পদে পরিণত হয়। আর মানবসম্পদের গুণগত মানোন্নয়নই হলো মানবসম্পদ উন্নয়ন। অন্যদিকে তথ্য সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, ব্যবস্থাপনা এবং বিতরণের জন্য ব্যবহৃত প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির সমন্বয়কে তথ্যপ্রযুক্তি বলা হয়। কম্পিউটিং, মাইক্রো ইলেকট্রনিক্স, টেলিকমিউনিকেশন ইত্যাদি বিষয় তথ্যপ্রযুক্তির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। তথ্যপ্রযুক্তি যে বিষয়গুলোকে সম্পৃক্ত করে সেগুলো হলো—

- তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে যতই আমরা সামনের দিকে এগুচ্ছি ততই উৎপাদন খরচ কমছে।
- তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে লেনদেন ও তথ্য যোগাযোগ দ্রুত পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে।
- তথ্যপ্রযুক্তি চিকিৎসা, শিক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডের গতিকে ত্বরান্বিত ও সহজ করে।
- উৎপাদনের সকল ক্ষেত্রে অপচয় হ্রাস করে।
- ব্যবসা-বাণিজ্যে লাভজনক প্রক্রিয়া সৃষ্টি করে।
- উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ সাধনে সহায়তা করে।

বিশ্বায়নের এ যুগে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে আমাদের মানবসম্পদকে অবশ্যই তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানে সমৃদ্ধ হতে হবে। দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন ছাড়া কোনো অবস্থাতেই দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশ সাধন সম্ভব নয়। মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে তথ্যপ্রযুক্তি নিবিড় ভাবে জড়িত। তাই মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে—

- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাথমিকভাবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে কেন্দ্র করে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা।
- বিশ্বায়নের চাহিদার প্রেক্ষিতে তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষার কারিকুলাম দ্রুত নবায়নের ব্যবস্থা করা।
- সরকারি-বেসরকারি সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা।
- ডিগ্রি পর্যন্ত বাধ্যতামূলক কম্পিউটার শিক্ষা চালু করা।
- বেকার জনগোষ্ঠীর জন্য তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা।
- ইংরেজি শিক্ষাকে প্রযুক্তিগত শিক্ষা হিসেবে গুরুত্ব দেয়া।
- বাস্তবভিত্তিক যোগ্যতা অর্জনের জন্য তথ্যপ্রযুক্তি, শিল্প ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।
- ছাত্র ও কর্মজীবীদের জন্য তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা ঋণের ব্যবস্থা করা।
- দ্রুত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ইন্টারনেটভিত্তিক শিক্ষা উপকরণ প্রস্তুতের ব্যবস্থা করা।
- পর্যায়ক্রমে দেশের সব স্কুলে 'কম্পিউটার ল্যাব' চালু করা।
- মৌলিক শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধিতে জরুরি পদক্ষেপ নেয়া।

অতএব আমরা বলতে পারি, দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য তথ্যপ্রযুক্তির বিকল্প নেই। ব্যাংকিং, অর্থনীতি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা, টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা সর্বত্রই উন্নয়ন ঘটাতে হলে দক্ষ মানবসম্পদ প্রয়োজন। আর সে জন্য তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটাতে হবে। তবেই আমরা এ বিশ্বায়নের যুগে টিকে থাকতে পারব এবং মানব শক্তিকে মানবসম্পদে পরিণত করে সামগ্রিক উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হব।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

◆ বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (BCSIR) *[৩০তম বিসিএস]*

Bangladesh Council of Scientific and Industrial Research (BCSIR) হলো বিজ্ঞান ও শিল্পবিষয়ক সর্বাপেক্ষা তথ্যবহুল গবেষণা কেন্দ্র। ১৯৫৫ সালে ঢাকার তেজগাঁও পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। সে সময় এর প্রধান ছিলেন ড. কুদরত-ই-খুদা। পরবর্তীতে স্বাধীনতার পরে এটি সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে স্থানান্তরিত হয়। প্রতিষ্ঠানটি একজন চেয়ারম্যান ও নির্দিষ্ট সংখ্যক সদস্য নিয়ে একটি পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত হয়। ঢাকা ছাড়াও চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে এর পৃথক বিভাগ রয়েছে।

প্রতিষ্ঠানটির প্রধান উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম হলো : ১. দেশজ কাঁচামালের ব্যবহার বহুমুখীকরণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ; ২. বিভিন্ন শিল্প-কারখানার উপজাত দ্রব্যের সদ্ব্যবহার করা; ৩. খাদ্যসম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, খাদ্যের মানোন্নয়ন ও পুষ্টিকর পরিপূরক খাবার উদ্ভাবন; ৪. নতুন ও প্রচলিত ওষুধ উদ্ভাবন, ভেষজ ও সুগন্ধি গাছগাছড়ার অনুসন্ধান ও ব্যবহার; ৫. দেশজ ও লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন; ৬. অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত পদ্ধতি ও দ্রব্যসামগ্রী বাণিজ্যিকীকরণে সহায়তা দান; ৭. স্বল্প ব্যয়ে জ্বালানি সম্পদ উদ্ভাবন এবং জ্বালানি আমদানি হ্রাস; ৮. বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি তথ্যসমূহ বিতরণ ইত্যাদি।

প্রতিষ্ঠানের গবেষণার ক্ষেত্রগুলো হলো : ১. খাদ্যবিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ২. জ্বালানি ও শক্তি, ৩. প্রাকৃতিক সম্পদ, ৪. কাঁচ ও মৃৎশিল্প, ৫. পুষ্টি, ৬. বায়োটেকনোলজি, ৭. পরিবেশ বিজ্ঞান, ৮. রাসায়নিক বিশ্লেষণ, ৯. ফাইবার ও পলিমার, ১০. চামড়া ও জীবজন্তুর উপজাত দ্রব্য, ১১. ফলমূল ও শাকসবজি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ প্রভৃতি।

◆ এশিয়ান হাইওয়ে *[২৮তম বিসিএস]*

এশিয়ান হাইওয়ে সড়ক যোগাযোগের ক্ষেত্রে বহুল আলোচিত পরিকল্পনাধীন একটি নেটওয়ার্ক। জাতিসংঘভুক্ত সংস্থা ESCAP (Economic and Social Commission for Asia and Pacific) এ পরিকল্পনা গ্রহণ করে ১৯৫৯ সালে। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে এশিয়ার ৩২টি দেশের মধ্যে সড়ক নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠিত হবে। এ লক্ষ্যেই ১,৪১,০০০ কিলোমিটার দীর্ঘ এ নেটওয়ার্ক চুক্তি ২৬-২৮ এপ্রিল ২০০৪ চীনের সাংহাইয়ে স্বাক্ষরিত হয়। উল্লেখ্য, ১৯৬০-৭০ দশকে এর অগ্রগতি হলেও ১৯৭৫ সালে বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৯২ সালে ESCAP-এর ৪৮তম অধিবেশনে Asian Land Transport Infrastructure Development (ALTID) প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রস্তাব পুনরায় গ্রহণ করা হয়। একই সাথে প্রকল্পটিকে তিনটি শাখা প্রকল্পে রূপান্তর করা হয়। শাখাগুলো হচ্ছে— এশিয়ান মহাসড়ক (AH), ট্রান্স এশিয়ান রেলওয়ে (TAR) এবং Facilitation of Land Transport. জাতিসংঘের এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশন (ESCAP) ১৯৯২ সালে এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সড়কপথে বাণিজ্য ও পর্যটন সম্পর্ক বাড়াতে এশিয়ান হাইওয়ে প্রকল্পটি হাতে নেয়। ২০০৩ সালে ব্যাংককে অনুষ্ঠিত ESCAP-এর ৫৮তম সম্মেলনে ৩২টি দেশের মধ্যে এ বিষয়ে একটি আন্তঃরাষ্ট্র সমঝোতা হয়। পরবর্তীতে সাংহাই-এ অনুষ্ঠিত বৈঠকে ESCAP-এর ৩২টি দেশের মধ্যে ২৮টি দেশ এ সংক্রান্ত চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। তবে সিঙ্গাপুর, বাংলাদেশ, উত্তর কোরিয়া ও তুর্কমেনিস্তান এতে স্বাক্ষর করেনি। ২১ মে, ২০০৯ বাংলাদেশ সরকারের যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের আন্তঃমন্ত্রণালয়ের বৈঠকে এশিয়ান হাইওয়েতে যুক্ত হওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ নেটওয়ার্কের উদ্দেশ্য হলো আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা। এর প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে এশিয়ান হাইওয়ের সদস্য দেশগুলো এক দেশ যেমন অন্য দেশের রাস্তাঘাট ব্যবহার করবে, তেমনি সেই দেশ তার রাস্তাঘাট অন্য দেশের জন্যও ব্যবহার করতে দেবে। তবে এ চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এক দেশ অন্য দেশের সড়ক ব্যবহারের

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

কোনো অধিকার লাভ করবে না। এজন্য দ্বিপক্ষীয় চুক্তি করতে হবে। চুক্তিতে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর পারস্পরিক সুবিধার জন্য দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় রুট সংশোধনীর সুযোগও রাখা হয়েছে। এছাড়া সদস্য রাষ্ট্রগুলোর বিরোধ নিষ্পত্তিতে বিরোধপূর্ণ রাষ্ট্রসমূহ কোনো সমাধানে না আসতে পারলে জাতিসংঘের মহাসচিবকে একজন সালিশ নিয়োগের জন্য অনুরোধ জানাতে পারবে। এশিয়ান হাইওয়ে বাস্তবায়িত হলে এশিয়া হবে সড়ক সুতায় গাঁথা নানা দেশের, নানা সংস্কৃতির অপূর্ব মিলনকেন্দ্র।

◆ যমুনা সেতু প্রকল্প *[১১তম বিসিএস]*

যমুনা সেতু নির্মাণে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান 'যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ'। যমুনা নদী শত বছর ধরে বাংলাদেশের পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলকে দু' ভাগে বিভক্ত করে রেখেছিল। তাই যমুনা নদীর ওপর একটি সেতু নির্মাণের দাবি ওঠে। ১৯৪৯ সালে মওলানা ভাসানী প্রথম যমুনা নির্মাণের দাবি তোলেন। পরবর্তীকালে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ইশতেহারে যমুনা নদীর ওপর সেতু নির্মাণের দাবি স্থান পায়। পরবর্তীকালে যমুনা সেতু নির্মাণে বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া হলেও বাস্তব কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়নি। যমুনা সেতু নির্মাণের নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয় ১৯৮২ সালে। এ সময় উত্তরবঙ্গে গ্যাস সরবরাহের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি ১৯৮৪ সালে গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহের স্বার্থে একটি সেতু নির্মাণের সুপারিশ করে। ফলে ঐ বছরই মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে যমুনা সেতু নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আর সেতু নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ১৯৮৫ সালে গঠন করা হয় 'যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ'। তখন থেকেই এই সংস্থা সেতু নির্মাণের আনুষঙ্গিক কার্যক্রম শুরু করে। সেতু নির্মাণের অর্থ সংগ্রহের জন্য ঐ বছরই যমুনা লেভি ও সারচার্জ আরোপ করে।

১৯৮৮ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ প্রথম দফা যমুনা সেতুর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। পরে ১৯৯৪ সালে ১০ এপ্রিল তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া যমুনা বহুমুখী সেতুর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। সেতুর বাস্তব কাজ শুরু হয় ১৯৯৪ সালের ১৬ অক্টোবর থেকে।

আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এসে যমুনা সেতু প্রকল্পের কাজ অব্যাহত রাখে। ঠিকাদারদের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী '৯৭ সালের ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বিভিন্ন কারণে প্রকল্পের কাজ প্রায় এক বছর পিছিয়ে পড়ে। অতঃপর ১৯৯৮ সালের জুন মাসের মাঝামাঝি নির্মাণ কাজ শেষ হয় এবং ২৩ জুন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যমুনা সেতুর উদ্বোধন করেন। উল্লেখ্য, বর্তমানে যমুনা সেতুর নাম পরিবর্তন করে 'বঙ্গবন্ধু সেতু' এবং 'যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ' এর নাম পরিবর্তন করে 'বঙ্গবন্ধু সেতু কর্তৃপক্ষ' রাখা হয়েছে।

◆ মেট্রোরেল প্রকল্প

বহুল আলোচিত দেশের প্রথম দ্রুতগতিসম্পন্ন গণপরিবহণ ব্যবস্থা মেট্রোরেল প্রকল্পের কাজ শুরু হতে যাচ্ছে। ঢাকা ট্রান্সপোর্ট কো-অর্ডিনেশন অথরিটি (ডিটিসিএ) এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে। ২০১৩ সালে জুলাই মাসের মাঝামাঝি নাগাদ এ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হবে। মেট্রোরেলের ডিপো নির্মাণের জন্য উত্তরায় রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ৪১ বিঘা জমির মালিকানা ১৯ মে ২০১৩ বুঝে নিয়েছে ডিটিসিএ। মেট্রোরেল প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ২১,৯৮৫ কোটি টাকা। এর মধ্যে ৫,৩৯০ কোটি টাকার সংস্থান করবে সরকার। অবশিষ্ট ১৬,৫৯৫ কোটি টাকা জাপান সরকার প্রকল্প সহায়তা হিসেবে দেবে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নে ফেব্রুয়ারি ২০১৩ সরকারের সাথে জাপানের জাইকার একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর আগে ১৮ ডিসেম্বর ২০১২ জাতীয় অর্থনৈতিক

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

পরিষদের (একনেক) সভায় প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। মেট্রোরেলের দৈর্ঘ্য হবে ২০ কিলোমিটার। আর স্টেশন থাকবে ১৬টি। মেট্রোরেল পল্লবী থেকে রোকেয়া সরণির পশ্চিম পাশ দিয়ে খামারবাড়ি হয়ে ফার্মগেট-হোটেল সোনারগাঁও-শাহবাগ-টিএসসি থেকে দোয়েল চত্বর হয়ে তোপখানা রোড দিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক পর্যন্ত যাবে। উত্তরা মডেল টাউনের তৃতীয় পর্যায়ের এলাকায় মেট্রোরেলের প্রধান ডিপো স্থাপন করা হবে। তবে ডিপো এলাকায় তিনটি স্টেশন থেকেও যাত্রীরা মেট্রোরেলে চড়তে পারবেন। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে প্রতি ঘণ্টায় ৬০ হাজার যাত্রী পরিবহন করা সম্ভব হবে।

◆ বেশতো : প্রথম বাংলা সামাজিক মাধ্যম

দেশের নেটিজেনদের মায়ের ভাষায় নিজের মতামত এবং অনুভূতিগুলো পরস্পরের সাথে বিনিময়ের সুযোগ করে দিতে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ চালু হয় প্রথম বাংলা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম 'বেশতো ডট কম'। খুব সহজেই www.beshto.com ঠিকানার ওয়েবসাইটে নিবন্ধন করে যোগাযোগ শুরু করতে পারেন অন্যদের সাথে। এছাড়া প্রয়োজনীয় নানা ধরনের প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতেও বেশতো হতে পারে কার্যকর মাধ্যম। আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন এ সাইটের ঘোষণা দেয় সাইটটির নির্মাতা বেশতো লিমিটেড। প্রাথমিকভাবে এখানে দুটি সেবা পাওয়া যাবে— বেশতো লাইভ এবং বেশতো প্রশ্ন। 'বেশতো লাইভ' হচ্ছে মূলত ক্ষুদে ব্লগ লেখার সেবা। যেখানে বাংলায় একে অপরের সাথে যোগাযোগ করতে পারা যায় খুব সহজে। শুধু মনের কথাটি লেখা নয়, এখানে ছবিও দেয়া যাবে। এছাড়া বেশতো প্রশ্নের মাধ্যমে নিজের যে কোনো প্রশ্নের উত্তর মিলবে সহজে। নিজের মনের প্রশ্নটি লিখে দেয়ার সাথে সাথে উত্তর দিচ্ছে অন্যরা। আর সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য উত্তরটাই আপনাকে বেছে নিতে সাহায্য করছে 'বেশতো প্রশ্ন'। এখানে প্রশ্নগুলো সাজানো আছে বিষয় অনুসারে। পেশা, শিক্ষা, রাজনীতি, ভ্রমণ ইত্যাদি আছে বিষয়ের তালিকায়। যেহেতু ইংরেজির তুলনায় বাংলায় লিখতে বেশি শব্দ দরকার তাই মাইক্রোব্লগিং-এ ২৫০ শব্দ এবং প্রশ্নোত্তরের ক্ষেত্রে এক হাজার শব্দের পোস্টের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

◆ বিকল্প গণমাধ্যম ব্লগিং

ব্লগ— নাগরিক সাংবাদিকতার অবাধ ক্ষেত্র। মনের ক্ষোভ, আবেগ, স্বপ্ন সবই তুলে ধরা যায় ব্লগে। পরিধি বিস্তৃতিতে ক্রমশই জনপ্রিয় হওয়া ব্লগ এখন সামাজিক আন্দোলন বেগবানেরও বড় অস্ত্র।

ব্লগ-ব্লগিং-ব্লগার : ব্লগ/ Blog শব্দটি ইংরেজি Weblog এর সংক্ষিপ্তরূপ। এর বাংলা প্রতিশব্দ অনলাইনে ব্যক্তিগত দিনলিপি বা ব্যক্তিকেন্দ্রিক পত্রিকা। যিনি ব্লগে লেখা সংযুক্ত বা পোস্ট করেন তাকে বলা হয় ব্লগার। ব্লগাররা প্রতিনিয়ত তাদের ওয়েবসাইটে কনটেন্ট যুক্ত করেন আর ব্যবহারকারীরা সেখানে তাদের মন্তব্য দিতে পারেন। ব্লগ মূলত লেখা, ছবি, অন্য ব্লগ, ওয়েব পেজ বিভিন্ন লিংকের সমষ্টি মাত্র। বেশিরভাগ ব্লগই মূলত লেখনী নির্ভর। তবে লেখনী নির্ভর ব্লগ ছাড়াও কিছু কিছু ব্লগ রয়েছে। যেমন– শিল্প (আর্ট ব্লগ), ছবি (ফটো ব্লগ), ভিডিও (ভিডিও ব্লগিং), সঙ্গীত (এমপিথ্রি ব্লগ) বা অডিও (পডকাস্টিং) নির্ভর। এছাড়াও রয়েছে মাইক্রো ব্লগ; যেখানে খুব ছোট ছোট পোস্ট থাকে।

অনলাইন দিনপত্রী 'ওয়েবলগ' শব্দটি জোম বার্গার ১৭ ডিসেম্বর ১৯৯৭ প্রথম ব্যবহার করেন। শব্দটার ছোট সংস্করণ 'ব্লগ' চালু করেন পিটার মেরহোলজ। তিনি তার ব্লগ পিটারমি.কম (PeterMe.com)-এর সাইডবারে ১৯৯৯ সালে ওয়েবলগ (weblog) শব্দটা ভেঙ্গে উই ব্লগ (We blog) হিসেবে লেখেন। তার ঠিক পরপরই ইভান উইলিয়ামস 'ব্লগ' শব্দটা বিশেষ্য এবং ক্রিয়া দুটো হিসেবেই ব্যবহার করা শুরু করেন এবং ব্লগার শব্দটা জনপ্রিয় করে তোলেন। এ কারণে ইভান উইলিয়ামসকে 'ব্লগিং'-এর জনক বলা হয়।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

ব্যবহার-পরিধি : এক সময় ব্লগ ছিল কেবল ব্যক্তিগত অনুভূতি প্রকাশের মাধ্যম। জনপ্রিয়তা বাড়ার সাথে এটি হয়ে উঠেছে মত প্রকাশ ও বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তর আলোচনা-গবেষণার উন্মুক্ত মঞ্চ। ব্লগিংকে বিশ্বের অনেক মানুষ তাদের উপার্জনের পথ হিসেবেও বেছে নিয়েছে। আবার অনেকেই কেবল গবেষণা ও বিশ্লেষণধর্মী লেখা দিয়ে সাজাচ্ছেন তাদের ব্লগভূমি। বাংলাদেশও এক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই। বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয়াবলির পাশাপাশি তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়েও প্রচুর ব্লগ পোস্ট প্রকাশিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। একসময়ের আন্তর্জালিক ডায়েরিটি আজ আর সে সীমানায় আবদ্ধ নেই। এর ব্যাপক ব্যবহার এবং প্রচার একে বিকল্প গণমাধ্যমের স্বীকৃতি এনে দিয়েছে। এমনকি ব্লগকে ভাবা হচ্ছে নাগরিক সাংবাদিকতার অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র। তত্ত্ব, তথ্য, সাহিত্য এবং সচেতনতার আহ্বান সম্বলিত ব্লগ এখন একটি অনন্য তথ্যভাণ্ডার। সামাজিক যোগাযোগের এ যুগে যোগাযোগের অনেক বড় মাধ্যমের নাম এটি। শুধু যোগাযোগে নয়, সমাজ পরিবর্তনেও বড় ভূমিকা আছে ব্লগের। এর বড় উদাহরণ 'আরব বসন্ত'। যুক্তরাষ্ট্রের করপোরেট দুর্নীতিবিরোধী 'অকুপাই ওয়ালস্ট্রিট' আন্দোলনের সূত্রপাতও তরুণদের হাত দিয়ে এ ব্লগেই। ব্লগের বদৌলতেই পাকিস্তানের মালালা ইউসুফজাঈ আজ বিশ্বে নারী সাহসিকতার উজ্জ্বল নাম। ব্লগাররা অবশ্য ব্লগকে বলেন— বিকল্প গণমাধ্যম। চিরায়ত গণমাধ্যমগুলো যে বিষয়গুলোকে তুলে ধরতে পারে না, সেগুলোকে তুলে ধরছে ব্লগ। জন্ম দিয়েছে 'নাগরিক সাংবাদিকতার'।

◆ নতুন বাংলা ইউনিকোড

বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে প্রস্তুতকৃত ইউনিকোড সুবিধা সংবলিত বাংলা ফন্ট। 'আমার বর্ণমালা' চালু হয় ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৩। বাংলা একাডেমির নেতৃত্বে ইউনিকোড সুবিধাসংবলিত নতুন বাংলা ফন্ট 'আমার বর্ণমালা' তৈরির উদ্যোগ নেয়া হয় ১১ নভেম্বর ২০১২। এ উদ্যোগ বাস্তবায়নে বাংলা একাডেমি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের গ্রাফিক্স ডিজাইন বিভাগ ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অ্যাকসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রামের মধ্যে ১২ নভেম্বর ২০১২ একটি ত্রিপক্ষীয় সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। সেবারই প্রথমবারের মতো সরকারি উদ্যোগে প্রমিত বাংলা ইউনিকোড ফন্ট তৈরি করা হয়। এটি বাংলা একাডেমির তত্ত্বাবধানে বানানো প্রথম ফন্ট। এ ফন্টে ইউনিকোড সুবিধার সাথে প্রমিত বাংলা, যুক্তাক্ষর ও নতুন সংস্করণের প্রযুক্তির সমন্বয় করা হয়।

◆ জাতিসংঘ রেডিও বাংলা

২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয় জাতিসংঘ রেডিও বাংলা। জাতিসংঘের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটের (www.un.org/en) মাধ্যমে রেডিও-লিংক দিয়ে বাংলায় সংবাদ প্রচার করা হয়। সংবাদভিত্তিক বাংলা ওয়েবসাইট চালুর সাথে সাথে ভয়েজ ক্লিপিং যোগ করা এ রেডিও বেতার তরঙ্গ দিয়ে নয়, বরং ওয়েবলিংক দিয়ে চলছে। ক্লিপিং বিনামূল্যে ডাউনলোড করে যে কেউ বাংলায় অনুষ্ঠান শুনতে পারবে। জাতিসংঘ রেডিও বাংলা শুনতে হলে জাতিসংঘের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটের নিচের বাঁ কোণায় থাকা ইউএন রেডিও অপশনে ক্লিক করতে হবে। সেখান থেকে ওপরের ডান কোণায় থাকা বাংলা অপশনে ক্লিক করলেই 'জাতিসংঘ রেডিও' নামের বাংলা ওয়েবসাইটে খবর ও ভয়েজ লিংক পাওয়া যাবে। জাতিসংঘের ছয়টি দাপ্তরিক ভাষা ছাড়াও সোয়াহেলি ও পর্তুগিজ ভাষায় দৈনিক সংবাদভিত্তিক অনুষ্ঠান প্রচার করে থাকে জাতিসংঘ রেডিও। এছাড়া জাতিসংঘ রেডিও বাংলা, হিন্দি, উর্দু এবং ইন্দোনেশীয় ভাষায় সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান প্রচার করে। আর এ চারটি ভাষার মধ্যে এখন কেবল বাংলা ভাষায় আলাদা ওয়েবসাইটে জাতিসংঘ রেডিওর বাংলা অনুষ্ঠান প্রচার শুরু হয়েছে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

জাতিসংঘ রেডিও : সংবাদ সংস্থা, প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি পর্যায়ে জাতিসংঘের বিভিন্ন খবর ও ফিচার অডিও আকারে সরবরাহ করে থাকে জাতিসংঘ রেডিও। এ রেডিও মূলত বিশ্বব্যাপী জাতিসংঘের বিভিন্ন কার্যক্রম এবং সে সম্পর্কিত খবরকেই গুরুত্ব দিয়ে থাকে। জাতিসংঘ রেডিওর খবর, ফিচার বা সাক্ষাৎকারের অডিও ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয় এবং সেখান থেকে যে কোনো সম্প্রচারক প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি বিনা খরচায় নিবন্ধিত হয়ে তা ডাউনলোড করতে পারেন। বিশ্বের বহু রেডিওস্টেশন জাতিসংঘ রেডিওর অনুষ্ঠান পুনঃপ্রচার করে থাকে।

◆ কান্ট্রি ব্র্যান্ডিং ও বিউটিফুল বাংলাদেশ

বাংলাদেশ সম্পর্কে বাইরের বেশির ভাগ মানুষের ধারণা এটি একটি দুর্যোগকবলিত দরিদ্র দেশ। রয়েছে সামাজিক অস্থিরতা, স্বাস্থ্য, পরিবেশসহ নানা সমস্যা। তাই বাংলাদেশের একটি ইতিবাচক ভাবমূর্তি বা ব্র্যান্ড তৈরি করতে হলে দেশের মূল্যবান সম্পদ ও সম্ভাবনার তথ্য তুলে ধরতে হবে, যাতে এ দেশ সম্পর্কে বিদেশিরা একটি ভারসাম্যপূর্ণ ধারণা পায়।

কান্ট্রি ব্র্যান্ডিং কি? : বিভিন্ন দেশ নিজেদেরকে বিশ্ব দরবারে ইতিবাচকভাবে তুলে ধরতে যে প্রচার কর্মসূচি চালায় সেটাই মূলত কান্ট্রি ব্র্যান্ডিং। কান্ট্রি ব্র্যান্ডিংয়ের মূল উপাদানগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মানবসম্পদ, কৃষ্টি, ঐতিহ্য, পর্যটন, বৈদেশিক বিনিয়োগ, অবকাঠামো ও সুশাসন।

বাংলাদেশে কান্ট্রি ব্র্যান্ডিং : ২০০৮ সালে পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় কান্ট্রি ব্র্যান্ডিং-এর জন্য অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদকে চেয়ারম্যান এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম ও শিল্পী হাশেম খানকে সদস্য করে একটি কমিটি গঠন করে। এ কমিটি কান্ট্রি ব্র্যান্ডিং-এর জন্য 'বিউটিফুল বাংলাদেশ' স্লোগান চূড়ান্ত করে। এর বাংলা নাম 'রূপময় বাংলাদেশ' নামটি দেন অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। এর ইংরেজি 'বিউটিফুল বাংলাদেশ' নামটি দেন অধ্যাপক মনজুরুল ইসলাম। লোগোটি তৈরি করেন শিল্পী হাশেম খান। ৬ ডিসেম্বর ২০০৮ এ লোগো ও থিম উদ্বোধনের মাধ্যমে বাংলাদেশের কান্ট্রি ব্র্যান্ডিং-এর আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। এরপর এ কার্যক্রম কিছুটা ঝিমিয়ে পড়ে। প্রায় সাড়ে তিন বছর পরে আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপে 'বিউটিফুল বাংলাদেশ' প্রতিপাদ্যে বাংলাদেশের কান্ট্রি ব্র্যান্ডিং আবারো ব্যাপক প্রচার পায়। তৈরি করা হয় 'বিউটিফুল বাংলাদেশ' নামের এক প্রামাণ্যচিত্র, যা প্রযোজনা ও পরিচালনা করেন গাজী শুভ্র। কিন্তু সমন্বিত কর্মসূচির অভাবে তা আবারো মুখ থুবড়ে পড়ে।

সমস্যা ও সম্ভাবনা : স্বাধীনতা অর্জনের পর নানা খাতে গর্ব করার মতো অনেক অর্জন আমাদের। অথচ স্বকীয় বা একান্ত নিজস্ব কোনো পরিচয় আজও দাঁড়ায়নি বাংলাদেশের। বৈশ্বিক বিনিয়োগকারী, পর্যটক, আমদানিকারকদের দৃষ্টি কাড়ার অনেক উপাদান রয়েছে এ দেশে। সেগুলোকে সুসমন্বিত করে তুলে ধরতে হবে দেশের নতুন পরিচিতি, কান্ট্রি ব্র্যান্ডিং। এটি সরকারের একার কাজ নয়, বেসরকারি খাতকেও এ উদ্যোগে শামিল হতে হবে। এখনই জরুরি ব্যবসা-বাণিজ্য, পর্যটনসহ সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশ্ববাজারে বাংলাদেশকে ইতিবাচকভাবে উপস্থাপন করা। আমাদের দেশ সম্পর্কে বিদেশিদের ধারণা বদলাতে হবে। আর তা পারে যথাযথ কান্ট্রি ব্র্যান্ডিং। কান্ট্রি ব্র্যান্ডিং-এর মূল উপাদানগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মানবসম্পদ, কৃষ্টি, ঐতিহ্য, পর্যটন, বৈদেশিক বিনিয়োগ, অবকাঠামো ও সুশাসন— এ ছয়টি উপাদান যথাযথভাবে মিললেই দেশের ইতিবাচক ইমেজ তৈরি হতে পারে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

◆ বাংলাদেশের প্রথম স্যাটেলাইট

দেশের প্রথম স্যাটেলাইট 'বঙ্গবন্ধু-১' উৎক্ষেপণের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান যুক্তরাষ্ট্রের স্পেস পার্টনারশিপ ইন্টারন্যাশনালের (এসপিআই) সাথে ২৯ মার্চ ২০১২ চুক্তির আনুষ্ঠানিকতা শেষ হয়। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) ঐ প্রতিষ্ঠানের সাথে এ চুক্তি করে। চুক্তির শর্তানুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষরের পর তিন থেকে সাড়ে তিন বছরের মধ্যে স্যাটেলাইটটি উৎক্ষেপণের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান এসপিআই কাঠামো তৈরি, গ্রাউন্ড স্টেশন ব্যবস্থা, বাজার মূল্যায়ন, স্যাটেলাইট বাজারজাতকরণ এবং স্থানীয় বিশেষজ্ঞদের প্রশিক্ষণ দেয়ার পাশাপাশি সব প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করবে। এ প্রকল্পে ব্যয় ধরা হয়েছে ৩ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে এসপিআইকে দিতে হবে প্রায় ৯০ কোটি টাকা। বাকি টাকা সরকারের কাছ থেকে না নিয়ে অন্য কোনো খাত থেকে সংগ্রহ করা যায় কি-না সেটিও পরামর্শকদের কাজের আওতায় থাকবে। প্রস্তাবিত এ স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করতে পারলে বছরে বাংলাদেশের ১ কোটি ১০ লাখ মার্কিন ডলার অর্থ সাশ্রয় হবে। এছাড়া দেশের প্রয়োজন মিটিয়ে এখান থেকে সরকার বছরে ৫ কোটি মার্কিন ডলার রাজস্ব আয়ও করতে পারবে। উল্লেখ্য, দেশের স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেলগুলো, টেলিফোন, রেডিও বিদেশি স্যাটেলাইট ভাড়ায় ব্যবহার করে। এতে প্রতি বছর ভাড়া বাবদ বাংলাদেশকে ১১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার গুনতে হয়। স্যাটেলাইট চালু হলে দেশের চাহিদা মেটানোর পর পার্শ্ববর্তী দেশ নেপাল, ভুটান, মিয়ানমারের মতো দেশগুলোতে ভাড়া দিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব। শুধু তাই নয়, হাওড়-বাওর, পাহাড় এবং সিলেট ও চট্টগ্রামের দ্বীপগুলোসহ দেশের সব জেলা ও উপজেলায় এখন পর্যন্ত সাবমেরিন ক্যাবল নেটওয়ার্ক পর্যাপ্ত নয়। তাই স্যাটেলাইট প্রযুক্তি চালু করা খুবই জরুরি। বিটিআরসি এরই মধ্যে ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়নের (আইটিইউ) কাছে কক্ষপথের ১০২ ডিগ্রি পূর্বে স্লট চেয়েছে। তবে বিটিআরসি'র এ স্লট আবেদনে আপত্তি জানিয়েছে ১৮টি দেশ। আপত্তির বিষয়টিও সমঝোতার দায়িত্ব পরামর্শক প্রতিষ্ঠানটির। ১৯৯০ সালে পাকিস্তান নিজস্ব স্যাটেলাইটের মালিক হয়। ভারত ১৯৭৫ সালে তাদের প্রথম স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করে।

◆ পদ্মা সেতু

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের বহুমুখী উন্নয়নের জন্য বিকল্পহীন উপায় পদ্মা সেতু। বাংলাদেশ সরকারের সাহসী উদ্যোগে ও নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণের উদ্যোগে আজ বাস্তবায়নের পথে পদ্মা সেতু প্রকল্প। সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে ২০১৪ সালের নভেম্বর মাসে পদ্মা সেতুর মূল কাজ শুরু হয়। প্রস্তাবিত পদ্মা সেতুর দৈর্ঘ্য হবে ৬.১৫ কিমি। সেতুটি নির্মিত হলে এটিই হবে বাংলাদেশের সবচেয়ে দীর্ঘতম সড়ক সেতু। মুন্সিগঞ্জের মাওয়া ও শরীয়তপুরের জাজিরা পয়েন্টে পদ্মা সেতু নির্মিত হচ্ছে। পদ্মা সেতুর মূল অংশ নির্মাণের জন্য চীনের 'চায়না মেজর ইঞ্জিনিয়ারিং করপোরেশন লিমিটেড'-এর সাথে ২০১৪ সালের জুনে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। অনুমতি লাভের পরপরই কোম্পানিটি কাজ শুরু করে দেয়। এপ্রিল ২০১৫ পর্যন্ত মূল সেতুর ৫ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়। সেতু নির্মাণের সবচেয়ে কঠিন কাজ হলো নদীতে পাইল বসানো। ইতোমধ্যেই চীনে পাইল তৈরি করা হয়েছে এবং জার্মানিতে তৈরি করা হয়েছে ৩ হাজার টন ওজনের হাইড্রোলিক হ্যামার, যা দিয়ে ১২০ ফুট মাটির গভীর পাইলগুলোকে বসানো হবে। অন্যদিকে পদ্মা সেতু নির্মাণের প্রধান বিষয়টি হলো অর্থায়ন। এ সেতু নির্মাণে আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে ২৫ হাজার কোটি টাকা। যার ৭০ শতাংশ

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

বৈদেশিক মুদ্রায় সংঘটিত হবে। বাংলাদেশের এত বৈদেশিক মুদ্রা খরচের সামর্থ্য নেই এই ভাবনায় বিশ্বব্যাংকসহ অন্যান্য দাতা সংস্থাগুলোর সাথে অর্থায়ন নিয়ে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। কিন্তু বাংলাদেশে অর্থায়নে বিশ্বব্যাংকের নেতৃত্বে সংস্থাগুলো চুক্তি বাতিল করলে পদ্মা সেতু নির্মাণ নিয়ে টানাপোড়েন শুরু হয়। কিন্তু বাংলাদেশ সরকারের সাহসী উদ্যোগ 'নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ' পদ্মা সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নের স্বপ্নকে জিইয়ে রাখে। পদ্মা সেতু নির্মাণে ২.১ বিলিয়ন ডলার বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন পড়বে। বাংলাদেশ ব্যাংকে রিজার্ভের পরিমাণ ২৩ বিলিয়ন ছাড়িয়ে গেছে। তাছাড়া প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স প্রতিবছর ১৪ বিলিয়নের বেশি।

২০১৮ সালের নভেম্বরের মধ্যে নদীশাসনের কাজ শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। পদ্মা সেতুর ভূমি অধিগ্রহণ প্রায় শেষ হওয়ার পথে। প্রকল্পের জন্য ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের কাজও চলছে সমানতালে। এ পর্যন্ত পুনর্বাসনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে ৬৫ ভাগ। পদ্মা সেতু প্রকল্প থেকে বিশ্বব্যাংক নিজেকে প্রত্যাহার করে নেয় কল্পিত দুর্নীতির অভিযোগ তুলে। যেখানে প্রকল্পের জন্য কোনো টাকাই তারা বরাদ্দ দেয়নি, সেখানে দুর্নীতির পরিকল্পনা করা হচ্ছে এমন যুক্তি তুলে তাদের সরে যাওয়া ছিল জাতির জন্য এক বিড়ম্বনার ঘটনা। সরকার নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়ার পর তা যথাসময়ে বাস্তবায়নকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছে। সর্বশেষ নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ বাংলাদেশ সরকারের সাহসী উদ্যোগ। এটি যেমন আমাদের সাহসিকতা ও সামর্থ্যের পরিচয় বহন করে, তেমনি পরনির্ভরশীলতার মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসার এবং স্বাধীনভাবে প্রকল্প গ্রহণ করার সামর্থ্য ও ক্ষমতা প্রকাশ করে, যা পরবর্তীতে আরো বড় বড় প্রকল্প গ্রহণে ও স্বনির্ভর হতে বাংলাদেশকে সাহায্য করবে।

♦ ই-পেমেন্ট

কর পরিশোধের অনলাইনভিত্তিক পদ্ধতি ই-পেমেন্ট। এ পদ্ধতিতে একজন করদাতা ঘরে বসেই তার কর প্রদান সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি সমাধা করতে পারেন। ২৬ মে ২০১২ কর পরিশোধের অনলাইনভিত্তিক নতুন পদ্ধতি ই-পেমেন্ট উদ্বোধন করা হয়। প্রাথমিক অবস্থায় ২৬টি ব্যাংকের মাধ্যমে সপ্তাহের যে কোনো দিন, যে কোনো সময় এ পদ্ধতিতে কর পরিশোধ করা যাবে। এতে সমন্বয়কের ভূমিকায় থাকবে এনবিআর, বাংলাদেশ ব্যাংক, সোনালী ব্যাংক ও মহা হিসাব নিরীক্ষকের অফিস (সিএজি)। অনলাইনে কর পরিশোধ পদ্ধতিতে 'প্রসেসরের' ভূমিকায় থাকবে কিউ-ক্যাশ। এনবিআরের নির্ধারিত ২৬ ব্যাংকের যে কোনো ব্যাংকে ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ড বা ভিসা কার্ডের মাধ্যমে অর্থ পরিশোধ করলে কিউ-ক্যাশ পদ্ধতি যথাযথ নিয়মে তা এনবিআরে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নামে জমা করার ব্যবস্থা করবে। এ পদ্ধতি বাস্তবায়ন করার জন্য অর্থায়ন করছে বিশ্বব্যাংকের সহযোগী প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (আইএফসি)। প্রতিবেশী দেশ ভারতসহ এশিয়ার শ্রীলংকা, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ডসহ পৃথিবীর অনেক দেশে ই-পেমেন্ট পদ্ধতিতে কর পরিশোধ করা হয়ে থাকে।

♦ শিক্ষা বিস্তারে গণমাধ্যম

জনগণকে প্রভাবান্বিত করার সবচেয়ে বড় শক্তি হলো গণমাধ্যম। আমাদের দেশে শিক্ষার সামগ্রিক হার বিবেচনায় শিক্ষা বিস্তারে গণমাধ্যমগুলো অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। শুধু লোকশিক্ষা কেন, প্রথাগত শিক্ষার ক্ষেত্রেও এ গণমাধ্যমগুলো শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ। এগুলো শিক্ষার উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এগুলোর দ্বারা প্রাপ্ত শিক্ষা গ্রন্থগত শিক্ষার পরিপূরক। সুতরাং শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারে এ শক্তি কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। একই মুহূর্তে ব্যাপক সংখ্যক জনগণের সাথে যোগাযোগ

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

স্থাপনের মাধ্যমকে গণমাধ্যম বলা হয়। গণমাধ্যমকে জনসংযোগের উপায় হিসেবেও বিবেচনা করা হয়। বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত গণমাধ্যমের মধ্যে জনপ্রিয় হলো রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র ইত্যাদি। এসব গণমাধ্যম ব্যবহার করে অনেক দূরের মানুষের কাছেও খুব সহজেই বার্তা পৌঁছে দেয়া যায়। অবশ্য গণমাধ্যমের সহায়তায় জনগণের সাথে অনেক ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ সংযোগ সম্ভব নয়। তাই তাৎক্ষণিক মতামতও পাওয়া যায় না। জনগণের ফিডব্যাক পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হয়। তবে বিশেষ ব্যবস্থাধীনে ক্ষেত্রবিশেষে তাৎক্ষণিক মতামত সংগ্রহের ব্যবস্থা করা যায়। গণমাধ্যম জনগণের বিনোদন মাধ্যম হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। গণমাধ্যমে কোনো দেশ, সমাজ, গোষ্ঠীর শিল্প-সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটে। ফলে এক দেশের সংস্কৃতি অন্য দেশে পৌঁছে যায়। বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের বদৌলতে শিক্ষা-বিস্তারে বিশিষ্ট কয়েকটি 'মাস মিডিয়া' বা গণমাধ্যম আমাদের বিশেষ সহায়ক হতে পারে। এসব গণমাধ্যমগুলো হচ্ছে সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন ও সিনেমা। যারা স্বল্পশিক্ষিত বা অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন, সংবাদপত্র তাদের শিক্ষা বা জ্ঞানবুদ্ধির পুঁজিকে বাড়ানোর শক্তি রাখে। আর রেডিও, টেলিভিশন ও সিনেমা —এ তিনটি মাধ্যম দ্বারা সম্পূর্ণ নিরক্ষররাও উপকৃত হতে সক্ষম। শিক্ষার প্রভাব ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ— সর্বক্ষেত্রে সর্বজনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শিক্ষার সুফল বর্তায়। গণশিক্ষার সবচেয়ে বড় ভূমিকা গণমাধ্যমের। এর পাঠ্যক্রমে নির্দিষ্ট গ্রন্থের স্থান নেই। কোনো ক্ষেত্রে পড়া, কোনো ক্ষেত্রে শোনা, কোনো ক্ষেত্রে যুগপৎ শোনা ও দেখার সাহায্যে গণমাধ্যম থেকে শিক্ষণীয় বিষয় মনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণায় ও কৌতূহলে আনন্দাশ্রিত হয়ে বহুজনের হৃদয়ভেদ্য হয়। একেক পশলা বৃষ্টির পানিতে একেক জনপদের বিশাল অঞ্চল যেমন রসসিক্ত হয়ে শস্য-প্রসবিনী হয়ে ওঠে, অনেকটা তেমনই। ব্যষ্টি নিয়ে সমষ্টি হলেও গণশিক্ষায় সমষ্টির শিক্ষাই মুখ্য। উন্নত বিশ্বে জনমত গঠন, সমাজ পরিশোধন ও মুক্ত চিন্তার বিকাশ সাধনে গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ অবদান পালন করে।

♦ নিরাপদ সড়ক

প্রতিদিন সংবাদপত্র খুললেই যে খবরটি আমাদের হৃদয় ভারাক্রান্ত করে তোলে তা হলো সড়ক দুর্ঘটনা। এমন কোনো দিন নেই যেদিন ৫/১০ জন লোক সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ না হারায়। আরো কত লোক যে আহত হয় অথবা সারাজীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে যায় তার ইয়ত্তা নেই। সারা দেশের সড়ক দুর্ঘটনার খবর আমরা জানতে পারি না। এরপরও যতটুকু খবর আমরা পাই তাতেই বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়। যদি এ অবস্থা চলতে থাকে তবে সড়ক দেখেই আমরা ভীত হয়ে পড়বো। অনেকেই সকালে কাজে বেরিয়ে সন্ধ্যায় আর বাড়ি ফিরে আসে না। ছেলেমেয়ে স্কুলে যাওয়ার পথে সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হয়। দেশের একস্থান থেকে অন্যস্থানে যেতেও দুর্ঘটনায় পড়তে হয়। এসব দুর্ঘটনার রয়েছে অনেক কারণ। এর মধ্যে বেপরোয়া গাড়ি চালানো একটি প্রধান কারণ। আমাদের দেশের অধিকাংশ গাড়িচালকের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ নেই। কোনো রকমে ড্রাইভিং শিখেই তারা রাস্তায় গাড়ি নিয়ে বের হয়। ট্রাফিক আইন জানা কিংবা এসব মেনে চলার মতো মনোবৃত্তিও তাদের নেই। এছাড়া অনেক ক্রটিপূর্ণ গাড়িও দুর্ঘটনার কারণ। কিন্তু এর কোনো ব্যবস্থা আমাদের দেশে নেই। তাই এসব দুর্ঘটনা প্রতিরোধে যানবাহন চলাচলের অসুস্থ প্রতিযোগিতাকে নিয়ন্ত্রণ এবং দুর্ঘটনা সৃষ্টিকারী চালকের কঠোর শাস্তির বিধান করতে হবে। অবৈধ দখল উচ্ছেদ করে ফুটপাতকে পথচারীদের চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে। যেসব স্থানে যানবাহনের ভিড় বেশি কিংবা যেখানে অনেক সড়কের মুখ সে স্থানে পথচারীদের পারাপারের জন্য ওভারব্রিজ অথবা ভূ-নিম্নস্থ সুড়ঙ্গ নির্মাণ করতে হবে। সর্বোপরি, জনসাধারণের উচিত পথ চলার নিয়ম-কানুন সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং সতর্ক ও সচেতন হয়ে পথ চলা। বর্তমানে আমাদের দেশে

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে একটি আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠেছে, যার স্লোগান হলো 'নিরাপদ সড়ক চাই'। সংখ্যাহীন, যুক্তিহীন সব সড়ক দুর্ঘটনার প্রতিক্রিয়াতেই এ আন্দোলন। সকল মানুষেরই এটা প্রাণের দাবি। আর সড়ক দুর্ঘটনা নয়, আর অকাল মৃত্যু নয়। পথে বেরিয়ে আমরা যেন নিরাপদে ঘরে ফিরতে পারি— এ কামনায় সকলেই চাই নিরাপদ সড়ক।

◆ বাংলাদেশে মোবাইল ব্যাংকিং

মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের যাবতীয় কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করার সুবিধাযুক্ত সেবার নামই মোবাইল ব্যাংকিং। এর মাধ্যমে নগদ অর্থ উত্তোলন, জমা দান, বিভিন্ন বাণিজ্যিক ও উপযোগ সেবার বিল প্রদান, বেতন উত্তোলন, প্রবাসী আয় প্রেরণ ও গ্রহণ, সরকারি ভাতা ও অনুদান গ্রহণ প্রভৃতি কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে মোবাইল ফোন থেকেই। নির্দিষ্ট ব্যাংক কোনো মোবাইল অপারেটরের সাথে চুক্তি করলে সেই মোবাইল অপারেটর ও ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত এজেন্ট বা মোবাইল ব্যাংকিং সেন্টারে গিয়ে সহজেই ব্যাংক একাউন্টের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে। সেক্ষেত্রে আমাদের দেশের প্রেক্ষিতে মোবাইল অপারেটররা ইউনিয়ন পর্যায়েও তাদের গ্রাহক সেবা কেন্দ্র স্থাপন করতে পারবে। মোবাইল ব্যাংকিং সেবাতে তাই ইউনিয়ন পর্যায়েও কার্যক্রম পরিচালনা সম্ভব। শাখাহীন এ ব্যাংকিং ব্যবস্থায় প্রয়োজন শুধু একটি নিবন্ধিত মুঠোফোনের। মোবাইল ব্যাংকিংয়ে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ইউএসএসডি (আনস্ট্রাকচারড সাপ্লিমেন্টারি সার্ভিস ডাটা) অথবা এসএমএস + আইভিআর (ইন্টার-অ্যাকটিভ ভয়েস রেসপন্স) প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। গ্রাহক নিবন্ধন, নগদ টাকা জমাদান, নগদ টাকা উত্তোলন, মার্চেন্ট পেমেন্ট, (কেনাকাটার বিল পরিশোধ) ইউটিলিটি বিল পরিশোধ, মোবাইলে তাৎক্ষণিক ব্যালেন্স রিচার্জ, ব্যালেন্স জানা, একাউন্টের বিবরণী জানা PIN পরিবর্তন, বৃহৎ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান/শিল্প কারখানা/ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন-ভাতা বিতরণ, সরকারি ভাতা বিতরণ (বয়স্ক/মুক্তিযোদ্ধা ভাতা ইত্যাদি), বিদেশ থেকে প্রেরিত অর্থ বিতরণ, বিভিন্ন মেয়াদি সঞ্চয়ী স্কিম নিরীক্ষা, মিউচুয়াল ফান্ড, চেক বই চাওয়া, সাম্প্রতিক লেনদেন, পেমেন্ট বন্ধ করা, পরিবর্তন অথবা বাতিল করা, তহবিল স্থানান্তর, ব্যাংকের শাখা বা এটিএম বুথের অবস্থান তথ্য ইত্যাদি সেবা পাওয়া যায় মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে।

◆ জাতীয় ই-তথ্যকোষ

বাংলা ভাষার সর্বপ্রথম জীবন ও জীবিকাভিত্তিক তথ্যভাণ্ডার জাতীয় ই-তথ্যকোষের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১১। জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (UNDP) ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একসেস টু ইনফরমেশন (A2I) প্রোগ্রামের উদ্যোগে প্রথম অনলাইন তথ্যকোষ 'জাতীয় ই-তথ্যকোষ' তৈরি করা হয়। সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের তথ্যকে সমন্বিত করার প্রয়াসে এ উদ্যোগটি গৃহীত হয়। এ তথ্যকোষে উল্লিখিত বিষয়গুলো অডিও, ভিডিও, অ্যানিমেশন, তথ্যচিত্র বা লিখিত আকারে পরিবেশন করা হয়েছে। তথ্যকোষে একটি বাংলা সার্চ ইঞ্জিনও যোগ করা হয়েছে, যাতে কোনো তথ্য সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়। ৫০ হাজার পৃষ্ঠার এ তথ্যকোষে চার ঘন্টার অডিও এবং ২২ ঘন্টার ভিডিও ফুটেজ রয়েছে। এসব তথ্য ১৪৮টি সরকারি ও ৫০টি স্থানীয় বেসরকারি সংস্থা এবং বিদেশী প্রতিষ্ঠানের গবেষণাকর্ম থেকে নেয়া হয়েছে। জাতীয় ই-তথ্যকোষের তথ্যগুলোকে মোট ১১টি বিষয়ে সাজানো হয়েছে। বিষয়সমূহ হলো— কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আইন ও মানবাধিকার, নাগরিক সেবা, অকৃষি উদ্যোগ, পর্যটন, পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, শিল্প ও বাণিজ্য এবং কর্মসংস্থান।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

◆ প্রিন্টমিডিয়া *[৩৪তম বিসিএস]*

প্রায় প্রতিটি দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের ভূমিকা অপরিসীম। গণমাধ্যমকে রাষ্ট্রের তৃতীয় স্তম্ভ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সঠিক গণতন্ত্র চর্চায় গণমাধ্যমের কোনো বিকল্প নেই। একই সঙ্গে ব্যাপক সংখ্যক জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমই হলো গণমাধ্যম। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাহিত্য ও দর্শন, শিক্ষা দীক্ষা, ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন ও বিস্তারে গণমাধ্যম অনবদ্য ভূমিকা পালন করে। গণমাধ্যমকে দুভাগে ভাগ করা হয়। ১. প্রিন্টমিডিয়া ও ২. ইলেকট্রনিক মিডিয়া। বর্তমানে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়ছে। কিন্তু প্রিন্ট মিডিয়ার ইতিহাস অনেক পুরোনো এবং সমান জনপ্রিয়। ছাপার অক্ষরে কাগজ, বই, ম্যাগাজিন, সাময়িকী আকারে যে সব সংবাদপত্র প্রকাশ হয় তাকেই প্রিন্টমিডিয়া বলে। দৈনিক পত্রিকা যেমন- প্রথম আলো, যুগান্তর, ইত্তেফাক প্রভৃতি হলো প্রিন্ট মিডিয়া। তেমনিভাবে সাপ্তাহিক, অর্ধ-সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈ-মাসিক, ষান্মাসিকসহ বিভিন্ন ধরনের পত্রিকা, সাময়িকী যা ছাপার অক্ষরে বের হয় তাও প্রিন্টমিডিয়া।

◆ ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার

রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও জনশৃঙ্খলার স্বার্থে ২০০৬ সালে টেলিযোগাযোগ আইন সংশোধনের মাধ্যমে 'ন্যাশনাল মনিটরিং সেন্টার' নামে অস্থায়ীভাবে একটি সংস্থার যাত্রা শুরু হয়। সংস্থাটির পরিবর্তিত পূর্ণ নাম 'ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার' (এনটিএমসি)। প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ ৬ বছর পর স্থায়ী ও প্রাতিষ্ঠানিকরূপে সংস্থাটির যাত্রা শুরু হয় ২০১৩ সালের এপ্রিলে। ডিজিএফআই সদর দপ্তরেই এনটিএমসির যন্ত্রপাতিসহ দপ্তর স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। চিহ্নিত সন্ত্রাসী বা অপরাধী গ্রেপ্তারে এনটিএমসি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ (সংশোধনী) আইন ২০০৬-এ সরকারকে টেলিফোনে আড়িপাতার ক্ষমতা দেওয়া আছে। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বা জনশৃঙ্খলার স্বার্থে এ আইনের ৯৭(ক) ধারায় বলা হয়েছে, 'এই আইন বা অন্য কোনও আইনে ভিন্নতর যা কিছুই থাকুক না কেন, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বা জনশৃঙ্খলার স্বার্থে যে-কোনও টেলিযোগাযোগসেবা ব্যবহারকারীর পাঠানো বার্তা ও কথোপকথন প্রতিহত, রেকর্ড ধারণ বা তৎসম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য সরকার নির্ধারিত সময়ের জন্য গোয়েন্দা সংস্থা, জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থা, তদন্তকারী সংস্থা বা আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে নিয়োজিত সংস্থার কোনও কর্মকর্তাকে ক্ষমতা দিতে পারবে'।

◆ সাইবার ক্রাইম ট্রাইব্যুনাল

সাইবার ক্রাইম বা ই-মেইল হ্যাকিং সংক্রান্ত বিচারের জন্য সরকার সাইবার ক্রাইম ট্রাইব্যুনাল গঠন করতে যাচ্ছে। একজন জেলা ও দায়রা জজের নেতৃত্বে ৬ সদস্যের এ ট্রাইব্যুনাল আপাতত ঢাকায় গঠন করা হবে। সাইবার ক্রাইমের সাথে জড়িত প্রমাণিত হলে এ ট্রাইব্যুনাল অভিযুক্তকে দশ বছরের কারাদণ্ড অথবা এক কোটি টাকা জরিমানা কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করতে পারবে।

আদালত গঠন : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৬৮(১) ধারায় বলা হয়েছে যে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এ আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধের দমন ও কার্যকর বিচারের উদ্দেশ্যে, এক বা একাধিক সাইবার ট্রাইব্যুনাল গঠন করতে পারবে। (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত সাইবার-ট্রাইব্যুনাল সুপ্রিম কোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একজন দায়রা জজ বা একজন অতিরিক্ত দায়রা জজের সমন্বয়ে গঠিত হবে। (৩) এ ধারার অধীন গঠিত সাইবার ট্রাইব্যুনালকে সমগ্র বাংলাদেশের স্থানীয় অধিক্ষেত্র অথবা এক বা একাধিক দায়রা ডিভিশনের অধিক্ষেত্রে প্রদান করা যাবে

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

এবং এ ট্রাইব্যুনাল কেবল এ আইনের অধীন অপরাধের মামলার বিচার করবে। (৬) উপ-ধারায় বলা হয়েছে যে, সরকার আদেশ দ্বারা যে স্থান বা সময় নির্ধারণ করবে, সেই স্থান বা সময়ে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল আসন গ্রহণ করতে পারবে এবং এর কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে।

যারা অভিযুক্ত হবেন : আইনের ৪নং ধারার ১নং উপ-ধারায় বলা হয়েছে যে, যদি কোনো ব্যক্তি বাংলাদেশের বাইরে এ আইনের অধীন কোনো অপরাধ করেন, যা বাংলাদেশে করলে এ আইনের অধীন দণ্ডযোগ্য হতো, তাহলে এ আইন এমনভাবে প্রযোজ্য হবে, যেন অপরাধটি তিনি বাংলাদেশেই করেছেন। একই ধারার ২নং উপ-ধারায় বলা হয়েছে যে, যদি কোনো ব্যক্তি বাংলাদেশের বাইরে থেকে বাংলাদেশে অবস্থিত কোনো কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কের সাহায্যে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এ আইনের অধীন কোনো অপরাধ করেন, তাহলে ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে এ আইনের বিধানাবলি এমনভাবে প্রযোজ্য হবে, যেন ঐ অপরাধের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া বাংলাদেশেই সংঘটিত হয়েছিল। একই ধারার ৩নং উপ-ধারায় বলা হয়েছে যে, যদি কোনো ব্যক্তি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে থেকে বাংলাদেশের বাইরে এ আইনের অধীন কোনো অপরাধ করেন, তাহলে ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে এ আইনের বিধানাবলি এমনভাবে প্রযোজ্য হবে, যেন ঐ অপরাধের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া বাংলাদেশেই সংঘটিত হয়েছিল।

অপরাধ ও শাস্তির বিধান : আইনের ৫৬ ধারায় বলা হয়েছে, জনসাধারণের বা কোনো ব্যক্তির ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে বা ক্ষতি হবে মর্মে জানা সত্ত্বেও এমন কোনো কাজ করেন, যার ফলে কোনো কম্পিউটার রিসোর্সের কোনো তথ্য বিনাশ, বাতিল বা পরিবর্তিত হয় বা তার মূল্য বা উপযোগিতা হ্রাস পায় বা অন্য কোনোভাবে এটাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে— এমন কোনো কম্পিউটার, সার্ভার, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক সিস্টেমে অবৈধভাবে প্রবেশ করার মাধ্যমে এ ক্ষতিসাধান করেন, যাতে তিনি মালিক বা দখলকার নন, তাহলে এটা তার জন্য একটি হ্যাকিং অপরাধ হবে। এ ধরনের হ্যাকিং অপরাধ করলে তিনি অনধিক দশ বছর কারাদণ্ডে বা অনধিক এক কোটি টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। একই আইনের ৫৭নং ধারায় বলা হয়েছে, কোনো ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়েবসাইটে বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক বিন্যাসে এমন কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচার করেন, যা মিথ্যা ও অশ্লীল বা সংশ্লিষ্ট অবস্থা বিবেচনায় কেউ পড়লে, দেখলে বা শুনলে নীতিভ্রষ্ট বা অসৎ হতে উদ্বুদ্ধ হতে পারেন অথবা যার দ্বারা মানহানি ঘটে, আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে বা ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে বা করতে পারে বা এ ধরনের তথ্যের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি বা সংগঠনের বিরুদ্ধে উসকানি প্রদান করা হয়, তাহলে তার এ কাজ হবে একটি অপরাধ। কোনো ব্যক্তি এ অপরাধ করলে তিনি অনধিক দশ বছর কারাদণ্ডে এবং অনধিক এক কোটি টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

♦ বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন

২৩ জুন ২০১৪ বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয় www.bangladesh.gov.bd নামের বিশ্বের সর্ববৃহৎ ওয়েবপোর্টাল। ৬১টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগ, ৩৪৫টি অধিদপ্তর, ৭ বিভাগ, ৬৪ জেলা, উপজেলা, ইউনিয়নসহ মোট ২৫,০০০ ওয়েবসাইট নিয়ে গঠিত এ ওয়েবপোর্টালকে পরিচিত করানো হচ্ছে 'বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন' নামে। সরকারের একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রামের আওতায় তৈরি করা এ ওয়েবপোর্টালের মাধ্যমে ঘরে বসেই সাধারণ মানুষ সরকারের নানাবিধ সেবা গ্রহণ করতে পারবে। সেবাখাত, ব্যবসা-বাণিজ্য, আইন-বিধি, অর্জন, জেলা বাতায়ন (জেলা পরিচিতি), ই-ডিরেক্টরি, ই-সেবা ইত্যাদিসহ বাংলাদেশের সকল তথ্য ও সেবা বিষয়ক এ ওয়েবপোর্টালের ওয়েবসাইটসমূহে ১৫ লাখের বেশি তথ্য আছে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

১৩. অনানুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান : সুশীল সমাজ, স্বার্থবাদী গোষ্ঠী ও বাংলাদেশের এনজিও

♦ সুশীল সমাজ *[৩৪তম বিসিএস]*

সুশীল সমাজের ধারণাটি নতুন হলেও এর প্রচ্ছন্ন ধারণা পাওয়া যায় জন লক, রুশোসহ আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তাবিদদের লেখনীতে। তবে এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশি স্পষ্ট আলোচনা পাওয়া যায় এন্টোনিও গ্রামসির লেখায়। বিশেষ করে সমাজতন্ত্রের পতনের প্রাক্কালে পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সুশীল সমাজকে আপনরূপে বিকশিত হতে দেখা যায়। কেননা এ অঞ্চলের সমাজতান্ত্রিক সরকারের নির্যাতন, নিপীড়ন ও কড়া বিধি-নিষেধের কারণে সেখানে কোনো রাজনৈতিক ও বেসরকারি ব্যবসায়িক কিংবা বাণিজ্যিক সংগঠন গড়ে উঠতে পারেনি। কমিউনিজমকে টিকিয়ে রাখার জন্য কমিউনিস্ট মডেলে সাংস্কৃতিক বিনির্মাণের চেষ্টাও করা হয় দীর্ঘকাল। কিন্তু কোনো কিছুতেই শেষ রক্ষা হয়নি। কমিউনিস্টবিরোধী আন্দোলনে এক সময় লাখ লাখ লোক রাস্তায় নেমে আসে। তখনই প্রশ্ন আসে, কোন শক্তি তাদেরকে এতো বাধা-নিষেধ আর নির্যাতনের পরও ঐক্যবদ্ধ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে সাহায্য করলো? এটি মূলত সুশীল সমাজ। এরা সরকারে থাকে না, আবার কর্পোরেট গ্রুপেও থাকে না। এরা সরকার এবং প্রাইভেট সেক্টরের মাঝামাঝি একটি গ্রুপ। এদের ধর্ম হলো এরা সরকার ও প্রাইভেট সেক্টর উভয় ক্ষেত্রেই তাদের প্রভাব বিস্তার করতে পারে। এরা সরকারকে সহযোগিতাও করতে পারে আবার সরকারবিরোধী অবস্থান নিয়ে সরকারের ভিতও নাড়িয়ে দিতে পারে।

♦ NGO *[২৮তম বিসিএস]*

সাধারণভাবে, সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নয় এমন যে কোনো সংস্থাই এনজিও। তবে বিগত তিন দশকে এনজিও কার্যক্রমের ধারা থেকে বর্তমানে এনজিও-র যে রূপ দাঁড়িয়েছে তাতে বলা যায় এনজিও হচ্ছে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত অমুনাফাভিত্তিক এক ধরনের বিশেষ স্বেচ্ছাসেবী সামাজিক সংগঠন। এনজিও-র আওতায় পড়ে অনানুষ্ঠানিক বিভিন্ন সমিতি, সীমিত দায়ের আনুষ্ঠানিক সমবায় সমিতি এবং নিবন্ধিত বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা। উন্নয়ন-এনজিও নামেও একটি ধারণা গড়ে উঠেছে। এগুলো গ্রাম ও শহর এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য নানা কার্যক্রম পরিচালনা করে। এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে অনেকে বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়ন সংস্থা বা শুধু স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়ন সংস্থা নামে অভিহিত করে। এদের কার্য তালিকায় থাকে উন্নয়নের আর্থ-সামাজিক নানা কার্যক্রমসহ পরামর্শ সেবা, আইনি সহায়তা ও ত্রাণ তৎপরতা।

১৪. বিশ্বায়ন ও বাংলাদেশ

♦ বাংলাদেশে এডিবি-এর ভূমিকা *[২৭তম বিসিএস]*

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক (ADB)-এর ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশ ১৯৭৩ সালে এডিবির সদস্য হওয়ার পর থেকেই আমাদের বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্পে এডিবি আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে আসছে। এডিবি নিম্নলিখিত আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট।

১. কৃষি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ক খাত; যেমন– বনজসম্পদ, পশুসম্পদ, মৎস্যসম্পদ, শস্য উৎপাদন, কৃষি ঋণ, সেচ সুবিধা এবং পানিসম্পদ উন্নয়ন।

২. শক্তিসম্পদ খাতের উন্নয়ন; যেমন– বিদ্যুৎ উৎপাদন, বিতরণ ও সঞ্চালন এবং গ্যাসক্ষেত্রের উন্নয়ন।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৩. পরিবহন ও যোগাযোগ খাতের উন্নয়ন; যেমন– রেলওয়ে, রাস্তা, সেতু, বন্দর উন্নয়ন এবং টেলিযোগাযোগ খাতের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ। বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ সড়ক সেতু 'যমুনা নদীর উপর সেতু' নির্মাণে এ ব্যাংকের আর্থিক সহযোগিতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

৪. সামাজিক অবকাঠামো খাত; যেমন– শিক্ষা খাতের উন্নয়ন। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক, উচ্চশিক্ষা, অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা, গ্রামীণ প্রশিক্ষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে এ ব্যাংকের সহযোগিতা উল্লেখযোগ্য। 'বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের' প্রতিষ্ঠা এডিবি'র সরাসরি আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতার ফল।

৫. স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা খাতের উন্নয়ন।

৬. নগর উন্নয়ন, নগরীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ এবং বস্তিবাসীদের উন্নয়ন।

৭. দারিদ্র্য বিমোচন এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি।

৮. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থান ও আয় উপার্জনের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে নারীর উন্নয়ন।

৯. বেসরকারি উদ্যোক্তাগণকে সহায়তা প্রদান।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক উপরিউক্ত ক্ষেত্রসমূহে বিভিন্ন প্রকল্পে আর্থিক ও কারিগরী সহায়তা দানের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

১৫. বাংলাদেশের জেন্ডার ইস্যু ও উন্নয়ন

♦ নারী শিক্ষা

বহুদিন পূর্বের একটি প্রবন্ধে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন আমাদের দেশের নারীর অনগ্রসরতা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে দুঃখের সাথে লিখেছেন, 'স্বামী যখন পৃথিবী হইতে সূর্য ও নক্ষত্রের দূরত্ব মাপেন, স্ত্রী তখন বালিশের ওয়াড়ের দৈর্ঘ্য প্রস্থ (সেলাই করার জন্য) মাপেন। স্বামী যখন কল্পনার সাহায্যে সুদূর আকাশে গ্রহ-নক্ষত্রমালাবেষ্টিত সৌরজগতে বিচরণ করেন, সূর্যমণ্ডলের ঘনফল তুলাদণ্ডে ওজন করেন এবং ধূমকেতুর গতি নির্ণয় করেন, স্ত্রী তখন রন্ধনশালায় বিচরণ করেন, চাল-ডাল ওজন করেন এবং রাঁধুনীর গতি নির্ণয় করেন।' বস্তুতপক্ষে, সমাজের বা দেশের উন্নতি সাধনের জন্য কেবল পুরুষের শিক্ষাদীক্ষা ও অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করাই যথেষ্ট নয়। সমাজের অপর অংশ নারীর উন্নতির ওপরেই সমাজের প্রকৃত মঙ্গল নির্ভর করে। এ উপমহাদেশে প্রাচীন যুগেও নারী শিক্ষার প্রচলন ছিল। ইসলাম ধর্ম সমাজে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি করে এবং তার অধিকার দান করে। গুলবদন ও জেবুন্নিসার মতো বিদূষী মুঘল রমণীর স্মৃতি ইতিহাস সগৌরবে বহন করছে। ইসলাম নির্দেশিত পর্দাপ্রথা যখন অবরোধ ব্যবস্থায় পরিণত হলো, তখন থেকে মুসলমান নারীর অধ্যয়নের পথ সঙ্কুচিত হলো। মুনি মনুর সমাজব্যবস্থা থেকে নারীর শিক্ষার পথ দুর্গম হয়ে ওঠে। পরে সহমরণ প্রথা প্রভৃতির চাপে তাদের অবস্থার আরো পতন ঘটে। ১৮১৯ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতার গৌরবাড়ির বাঙালি মেয়েদের জন্য প্রথম স্কুল স্থাপিত হয় এবং এতে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত বালিকারাই শিক্ষালাভ করতো। ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দে প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ সিকদার স্ত্রীলোকদের পাঠ্য 'মাসিক পত্রিকা' প্রকাশ করে নারী বিদ্যাচর্চার নতুন সুযোগ করে দেন। বাঙালি মুসলমান সমাজে শিক্ষাবিস্তারে নবাব আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলীর ভূমিকা স্মরণযোগ্য। তাঁদের দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হয়ে মুসলমান সমাজে স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার ঘটে। তবে এক্ষেত্রে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের কৃতিত্বই সর্বাধিক। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেন,

'বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি, চির কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।'

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

এজন্য আমাদের স্বাধীন দেশে নারীকে উপযুক্ত সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে তার শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়া প্রয়োজন। আমাদের দেশে নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক। দেশের অনগ্রসরতা দূর করার জন্য পুরুষের পাশাপাশি জনসংখ্যার অর্ধেক নারী জাতিকেও কাজে লাগাতে হবে। এর জন্য শিক্ষার আশু প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

♦ নারীর ক্ষমতায়ন *[২৭তম বিসিএস]*

১৯৭২ সালে নবগঠিত রাষ্ট্র বাংলাদেশের সংবিধানে নারীর অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করার বিধান সন্নিবেশিত হয়েছে। সংবিধানের ২৭ ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে, 'সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান ও আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী'।

নারীর প্রশাসনিক ক্ষমতায়ন তথা উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় নারীকে সম্পৃক্ত করার প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় ১৯৭২ সালে। সরকারি চাকরিতে দশ ভাগ কোটা নারীর জন্য সংরক্ষণ করা হয়। ১৯৭৩ সালে দুজন নারীকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৭৪ সালে নারীকে প্রথম বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক নিয়োগ করা হয়। বর্তমান সরকারের মন্ত্রিসভায় প্রধানমন্ত্রী, কৃষিমন্ত্রী, জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী এবং মহিলা ও শিশুবিষয়ক প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্বে রয়েছেন ৪ জন নারী। বর্তমান সরকারপ্রধান ও বিরোধীদলীয় নেত্রী দুজনই নারী। দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ২৮টি আসনে ২৭ জন নারী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। একমাত্র নারী প্রার্থী হিসেবে দুই আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা। নির্বাচনে ১৯টি আসনে ১৮ জন নারী এমপি নির্বাচিত হন। এর মধ্যে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন ৮ জন নারী। ১৬ মে ২০০৪ সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী বিল পাসের মাধ্যমে জাতীয় সংসদে নারীদের ৪৫টি আসন সংরক্ষণ করা হয়েছে। সর্বশেষ পঞ্চদশ সংশোধনীতে আরো ৫টি আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদের মেয়র, চেয়ারম্যান, কমিশনার, কাউন্সিলর ও সদস্য পদে সরাসরি নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ রাখাসহ সংরক্ষিত আসনে নারীর প্রতিযোগিতার সুযোগ রাখা হয়েছে। উপজেলা পরিষদে নারীদের জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছে সংরক্ষিত নারী ভাইস চেয়ারম্যান। বাংলাদেশের প্রশাসনে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিব, অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম সচিব, উপসচিব, ডিসি, রাষ্ট্রদূত, বিচারপতি, কাস্টমস কমিশনার, এডিশনাল আইজি, পুলিশ সুপারসহ বিভিন্ন পদে নারী রয়েছেন। সরকার নারীর ক্ষমতায়ন ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য গেজেটেড পদে শতকরা ১০ ভাগ এবং ননগেজেটেড পদে শতকরা ১৫ ভাগ কোটা নির্দিষ্ট করেছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নতুন শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ৬০ ভাগ কোটা নারীদের জন্য সংরক্ষণ করায় শিক্ষিকার আনুপাতিক হার বর্তমানে ৫০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। তাছাড়া সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীতে অফিসার পদে মহিলাদের নিয়োগ বাংলাদেশে নারী ক্ষমতায়নের ইতিহাসে জন্ম দিয়েছে নতুন অধ্যায়ের।

নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে গৃহীত সরকারি-বেসরকারি পদক্ষেপসমূহ : ১৯৯৭ সালের ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে তৎকালীন ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ঘোষিত জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা অনুমোদন নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে অন্যতম বড় অর্জন। এই নীতিমালা জাতীয়, স্থানীয় ও পারিবারিক পর্যায়ে নারী ইস্যুকে মূলধারায় নিয়ে আসার ওপর গুরুত্বারোপ করেছে। আর এ উদ্দেশ্যে যে কৌশলগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে তা হলো :

– জাতীয়, জেলা, উপজেলা ও তৃণমূল পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ গ্রহণ ও তা শক্তিশালীকরণ।
– এনজিও এবং বৃহত্তর সুশীল সমাজের মধ্যে আরো সহযোগিতামূলক সম্পর্ক গঠন।
– জেন্ডার ইস্যু নিয়ে গবেষণা পরিচালনা।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

- জেন্ডারকে মূলধারা করতে সহায়তার জন্য প্রকল্প কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সকল স্তরে সক্ষমতা গঠন।
- জেন্ডার ইস্যু সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধিতে সকল পর্যায়ে অ্যাডভোকেসি, লবিং এবং গণতৎপরতা।
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে নেটওয়ার্কিং।
- আর্থিক ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি।

♦ নারী নির্যাতন

নারী নির্যাতন বলতে সাধারণত জোরপূর্বক নারীর উপর শারীরিক, মানসিক অথবা লিঙ্গভিত্তিক নির্যাতনকে বোঝায়। এ নির্যাতন হতে পারে ব্যক্তিক, পারিবারিক কিংবা দলীয়। নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার ওপর চাপিয়ে দেয়া এমন সব বিষয়, যা তার অধিকারকে খর্ব করে, তাও নারী নির্যাতনের অন্তর্ভুক্ত। পারিবারিক কিংবা সামাজিক পরিমণ্ডলের প্রায় সব ক্ষেত্রেই নারী বহুমাত্রিক রূপে বিস্তৃত পরিসরে নির্যাতন, সহিংসতার শিকার। পারিবারিক পরিমণ্ডলে নারী স্বামীর বহুবিবাহ, পরকীয়া, যৌতুক আকাঙ্ক্ষা, তালাক, জোরজবরদস্তিমূলক অত্যাচার, মৌখিক গালিগালাজ, সামাজিক যোগাযোগ ক্ষেত্র সংকোচন করাসহ পুত্রসন্তান জন্ম না দিতে পারার কারণে দৈহিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। ক্ষেত্র বিশেষে স্বামীর বর্বরোচিত লাঠির আঘাত, বেদম প্রহার কিংবা শ্বাসরোধ এবং শ্বশুরালয়ের লোকজনের দ্বারা অনিয়ন্ত্রিত আঘাতে করুণ মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নির্যাতিত নারীর জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। সামাজিক পরিমণ্ডলে নারী ইভটিজিং, ধর্ষণ, এসিড সন্ত্রাস, যৌন হয়রানি, অপহরণ, পাচার হওয়াসহ নানাবিধ উপায়ে নির্যাতনের শিকার হয়। আর বহুমাত্রিক এ নির্যাতনের মধ্যে গুরুতর হচ্ছে যৌন নির্যাতন বা হয়রানি।

১৬. মুক্তিযুদ্ধ ও এর পটভূমি

♦ ভাষা আন্দোলন/অমর একুশ

ভাষা আন্দোলন পৃথিবীর ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। নিখিল পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ ভাগ জনগণের মাতৃভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক উপায়ে পূর্ব পাকিস্তানে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেয়ার প্রচেষ্টা চালানো হয়। ১৯৪৭ সালের শিক্ষা সম্মেলনে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব গৃহীত হলে পূর্ব বাংলায় এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিবাদ শুরু হয়। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে ঢাকায় সর্বপ্রথম 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করা হয় এবং কতিপয় দাবিতে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের নীতি গৃহীত হয়।

১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে উর্দু ও ইংরেজির পাশাপাশি বাংলাকে গণপরিষদের ভাষা হিসেবে প্রস্তাব করলে মুসলিম লীগ এর তীব্র বিরোধিতা করে। ফলে ঢাকায় ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী মহলে চরম অসন্তোষ দেখা দেয় এবং ২৬ ফেব্রুয়ারি সর্বত্র ধর্মঘট পালিত হয়। এভাবে সংগ্রাম পরিষদ ১৫ মার্চ পর্যন্ত ধর্মঘট ও হরতাল পালনের মধ্য দিয়ে দেশব্যাপী আন্দোলন অব্যাহত রাখে। অবশেষে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন বাংলা ভাষার দাবিতে সমর্থনের আশ্বাস দিলে আন্দোলন প্রশমিত হয়। কিন্তু ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় এবং কার্জন হলের এক সমাবর্তন অনুষ্ঠানে 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা' ঘোষণা দিলে পুনরায় আন্দোলন চাঙ্গা হয়ে ওঠে এবং দেশব্যাপী তীব্র প্রতিবাদ শুরু হয়।

১৯৫০ সালে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এবং ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি খাজা নাজিমুদ্দিন পুনরায় একই ঘোষণা দেন যে, 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।' ফলে ছাত্র-বুদ্ধিজীবী মহলে দারুণ

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

ক্ষোভ ও হতাশা সৃষ্টি হয় এবং আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। ভাষা আন্দোলনকে আরো তীব্রতর করার লক্ষ্যে ৩০ জানুয়ারি এক জনসভায় 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি' গঠন করা হয়। এতে ২১ ফেব্রুয়ারিকে ভাষা দিবস হিসেবে পালন ও দেশব্যাপী হরতাল পালনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ২১ ফেব্রুয়ারির উক্ত কর্মসূচিকে বানচাল করার জন্য তৎকালীন গভর্নর নূরুল আমিন ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করেন। কিন্তু সংগ্রাম পরিষদ এ নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মিছিল বের করলে পুলিশের সাথে ছাত্র-জনতার এক মারাত্মক সংঘর্ষ বাধে। এক পর্যায়ে পুলিশ মিছিলের ওপর গুলি চালালে জব্বার, বরকত, সালামসহ অনেকে প্রাণ হারান এবং আহত হন বহুসংখ্যক। এর ফলে সারা বাংলায় আন্দোলন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ঢাকায় এ ঘটনার প্রতিবাদে দেশব্যাপী প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ অব্যাহত থাকে। অবশেষে সরকার নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয় এবং সাময়িকভাবে প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রী বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব গ্রহণ করেন। অতঃপর ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের সংবিধানে বাংলা অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মর্যাদা লাভ করে।

ভাষা আন্দোলনে এক নতুন জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটে এবং এ চেতনাই ক্রমে ক্রমে বাঙালি জাতীয়তাবাদের জন্ম দেয়। তাই ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন ছিল বাংলাদেশের গণচেতনার প্রথম বহিঃপ্রকাশ এবং স্বাধিকার আন্দোলনের এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

♦ ছয় দফা কর্মসূচি ১৯৬৬ *[২৮তম বিসিএস]*

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে ছয় দফা আন্দোলন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অব্যাহত বৈষম্য ও শোষণনীতির ফলে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধিকার প্রশ্নে ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলগুলোর জাতীয় সম্মেলনের বিষয় নির্বাচনী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় দেশবরেণ্য নেতা ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষার দাবি সম্বলিত ৬ দফাভিত্তিক এক কর্মসূচি প্রথম ব্যক্ত করেন। ইতিহাসে এটিই 'ছয় দফা কর্মসূচি' নামে পরিচিত।

দফাসমূহ :

১. ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করে পাকিস্তানকে একটি সত্যিকারের ফেডারেশন বা যুক্তরাষ্ট্ররূপে গড়তে হবে। এতে পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকার থাকবে এবং আইনগুলো হবে সার্বভৌম। সকল নির্বাচন সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের সরাসরি ভোটে অনুষ্ঠিত হবে।

২. কেন্দ্রীয় বা ফেডারেল সরকারের এখতিয়ারে কেবল দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্র এ দুটি বিষয় থাকবে। অবশিষ্ট সকল বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতা থাকবে প্রাদেশিক সরকারের হাতে।

৩. পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুটি সম্পূর্ণ পৃথক অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা থাকবে। এ ব্যবস্থায় মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আঞ্চলিক সরকারের হাতে থাকবে এবং দুই অঞ্চলের জন্য দুটি স্বতন্ত্র ব্যাংক থাকবে। এ ব্যবস্থায় বিকল্পস্বরূপ দুই অঞ্চলের জন্য কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে একই মুদ্রা থাকতে পারে।

৪. সকল প্রকার কর, খাজনা ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। আঞ্চলিক সরকারের আদায়কৃত রাজস্বের নির্দিষ্ট একটি অংশ কেন্দ্রীয় সরকারকে দেয়ার ব্যবস্থা থাকবে, যা দিয়ে ফেডারেল তহবিল গড়ে উঠবে।

৫. বৈদেশিক বাণিজ্য থেকে আয়কৃত বৈদেশিক মুদ্রা আঞ্চলিক ভিত্তিতে হিসাব রাখতে হবে। এক অঞ্চলের আয়কৃত অর্থ সেই অঞ্চলেই ব্যয় হবে। তবে কেন্দ্র এ আয়ের একটি নির্ধারিত অংশ পাবে।

৬. অঙ্গরাজ্যগুলোর তাদের আঞ্চলিক প্রতিরক্ষার জন্য মিলিশিয়া বা প্যারামিলিটারি রক্ষীবাহিনী গঠনের অধিকার থাকবে।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

ছয় দফা দাবি ছিল পূর্ব পকিস্তানের জাতীয় 'মুক্তির সনদ'। ছয় দফা কর্মসূচি বাস্তবায়িত হলে দুই অঞ্চলের মধ্যে বিরাজমান অসমতা কমে আসত এবং পাকিস্তান একটি শক্তিশালী ফেডারেল রাষ্ট্ররূপে বিকাশ লাভ করতে পারত। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর একগুঁয়েমির ফলে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

◆ একুশ দফা

তৎকালীন পূর্ববাংলায় ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর মুসলিম লীগ শাসনের অবসানের লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ সভাপতি মওলানা ভাসানী, কৃষক-শ্রমিক পার্টির সভাপতি শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী মিলে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য যুক্তফ্রন্ট নামে একটি নির্বাচনী মোর্চা গঠন করেন। হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী কর্মসূচিই 'একুশ দফা' নামে পরিচিত। উল্লেখ্য, এ নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবি হয় এবং যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করে। একুশ দফার কর্মসূচিগুলো হচ্ছে : ১. বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হবে। ২. বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি ও সমস্ত খাজনা আদায়কারী স্বত্ব উচ্ছেদ ও রহিত করে উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিতরণ এবং খাজনা হ্রাস ও সার্টিফিকেট মারফত খাজনা আদায় রহিত করা হবে। ৩. পাট ব্যবসা জাতীয়করণ ও তা পূর্ববঙ্গ সরকারের প্রত্যক্ষ পরিচালনায় আনা এবং মুসলিম লীগ শাসনামলের পাট-কেলেঙ্কারি তদন্ত ও অপরাধীর শাস্তির ব্যবস্থা। ৪. কৃষিতে সমবায় প্রথা প্রবর্তন এবং সরকারি সাহায্যে কুটির শিল্পের উন্নয়ন। ৫. পূর্ববঙ্গকে লবণশিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা এবং লবণ কেলেঙ্কারির তদন্ত ও শাস্তির ব্যবস্থা। ৬. কারিগর শ্রেণীর গরিব মোহাজেরদের কর্মসংস্থানের আশু ব্যবস্থা। ৭. খাল খনন ও সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশে বন্যা ও দুর্ভিক্ষ রোধ। ৮. পূর্ববঙ্গে কৃষি ও শিল্পখাতের আধুনিকায়নের মাধ্যমে দেশকে স্বাবলম্বী করা এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার মূলনীতি মাফিক শ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠা। ৯. দেশের সর্বত্র অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন এবং শিক্ষকদের ন্যায্য বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা। ১০. শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংস্কার, মাতৃভাষায় শিক্ষাদান, সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়ের ভেদাভেদ বিলোপ করে সকল বিদ্যালয়কে সরকারি সাহায্যপুষ্ট প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা। ১১. ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রভৃতি সকল প্রতিক্রিয়াশীল আইন বাতিল এবং উচ্চশিক্ষা সহজলভ্য করা। ১২. শাসনব্যয় হ্রাস, যুক্তফ্রন্টের কোনো মন্ত্রীর এক হাজার টাকার বেশি বেতন গ্রহণ না করা। ১৩. দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও ঘুষ-রিশওয়াত বন্ধের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ। ১৪. জননিরাপত্তা আইন, অর্ডিন্যান্স ও অনুরূপ কালাকানুন বাতিল, বিনা বিচারে আটক বন্দির মুক্তি, রাষ্ট্রদ্রোহিতায় অভিযুক্তদের প্রকাশ্য আদালতে বিচার এবং সংবাদপত্র ও সভাসমিতি করার অবাধ অধিকার নিশ্চিত করা। ১৫. বিচারবিভাগকে শাসনবিভাগ থেকে পৃথক করা। ১৬. বর্ধমান হাউসের পরিবর্তে কম বিলাসের বাড়িতে যুক্তফ্রন্টের প্রধানমন্ত্রীর অবস্থান করা এবং বর্ধমান হাউসকে প্রথমে ছাত্রাবাস ও পরে বাংলা ভাষার গবেষণাগারে পরিণত করা। ১৭. রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে শহীদদের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ ঘটনাস্থলে শহীদ মিনার নির্মাণ করা এবং শহীদদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেয়া। ১৮. একুশে ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস এবং সরকারি ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা করা। ১৯. লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ববঙ্গের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন এবং দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রা ব্যতীত সকল বিষয় পূর্ববঙ্গ সরকারের অধীনে আনয়ন, দেশরক্ষার ক্ষেত্রে স্থলবাহিনীর হেডকোয়ার্টার পশ্চিম পাকিস্তানে এবং নৌবাহিনীর হেডকোয়ার্টার পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপন এবং পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্রনির্মাণ কারখানা স্থাপন ও আনসার বাহিনীকে সশস্ত্র বাহিনীতে পরিণত করা। ২০. কোনো অজুহাতে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা কর্তৃক আইন পরিষদের আয়ু না বাড়ানো এবং আয়ু শেষ হওয়ার ছয় মাস পূর্বে মন্ত্রিসভার পদত্যাগপূর্বক নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা। ২১. যুক্তফ্রন্টের আমলে সৃষ্ট শূন্য আসনে তিন মাসের মধ্যে উপনির্বাচনের ব্যবস্থা করা এবং পর পর তিনটি উপনির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট প্রার্থী পরাজিত হলে মন্ত্রিসভার পদত্যাগ করা।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

◆ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলনকে দমননীতির মাধ্যমে নস্যাৎ করতে না পেরে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এক ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে। সরকার ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে প্রধান আসামি করে ৩৫ জন সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা দায়ের করে। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় যে, তারা ভারতের সহায়তায় সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে পাকিস্তান রাষ্ট্র থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য ভারতের আগরতলায় ষড়যন্ত্র করেছিল। এ মামলার বিচারকার্যের জন্য একটি স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। আসামিরা নিজেদের নির্দোষ দাবি করলে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য তাদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রতিবাদে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুববিরোধী গণআন্দোলন শুরু হয়। এ মামলার অন্যতম আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হক ঢাকা সেনানিবাসে পুলিশের গুলিতে শহীদ হলে আন্দোলন আরো তীব্র রূপ ধারণ করে। এ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন এগার দফার ভিত্তিতে গঠিত সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ। অবশেষে ছাত্র আন্দোলন ও গণআন্দোলনের মুখে সরকার মামলাটি প্রত্যাহার করে।

◆ ঐতিহাসিক এগার দফা

তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে সারা দেশে ব্যাপক সরকারবিরোধী আন্দোলন শুরু হলে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ১৯৬৯ সালের ৬ জানুয়ারি ঐতিহাসিক এগার দফা কর্মসূচি পেশ করে। এই এগার দফা দাবি হচ্ছে : ১. শিক্ষা সমস্যার আশু সমাধান; ২. প্রাপ্তবয়স্ক ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা; ৩. পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন; ৪. পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলোকে স্বায়ত্তশাসন দিয়ে একটি ফেডারেল সরকার গঠন; ৫. ব্যাংক, বীমা, পাটকলসহ সকল বৃহৎ শিল্প জাতীয়করণ; ৬. কৃষকদের ওপর থেকে কর ও খাজনা হ্রাস এবং পাটের সর্বনিম্ন মূল্য ধার্য করা; ৭. শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি, চিকিৎসা, শিক্ষা ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা এবং শ্রমিক আন্দোলনে অধিকার দান; ৮. পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জলসম্পদের সার্বিক ব্যবহারের ব্যবস্থা গ্রহণ; ৯. নিরাপত্তা আইন ও অন্যান্য নির্যাতনমূলক আইন প্রত্যাহার; ১০. সিয়াটো, সেন্টোসহ সকল পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিল এবং জোটবহির্ভূত নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ; ১১. আগরতলা মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিসহ দেশের বিভিন্ন কারাগারে আটক ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক ও রাজনৈতিক কর্মীদের মুক্তি ও অন্যান্যদের ওপর থেকে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা প্রত্যাহার। বস্তুত, এগার দফা আন্দোলন ছিল স্বাধিকারকামী বাঙালি জাতির ন্যায্য দাবির প্রতিফলন।

◆ '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান বাঙালি জাতির ইতিহাসে অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ছাত্রসমাজের ১১ দফা এবং আওয়ামী লীগের ৬ দফার ভিত্তিতে শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, সংসদীয় গণতন্ত্র প্রবর্তন, জরুরি আইন প্রত্যাহার প্রভৃতির দাবিতে ছাত্র-জনতার আন্দোলন শুরু হয়। কিন্তু তৎকালীন পাকিস্তান সরকার ছাত্র-সমাজের ১১ দফা এবং জনতার ৬ দফা দাবিকে রাষ্ট্রবিরোধী দাবি বলে ঘোষণা করে এবং আগরতলা ষড়যন্ত্রমূলক মামলা সাজিয়ে শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তার করে। এর ফলে সমগ্র বাংলাদেশে ছাত্র-জনতা আন্দোলনের রুদ্ররোষে ফেটে পড়ে এবং ধীরে ধীরে এ আন্দোলন গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হয়। ছাত্র-জনতার ১১ দফা ও ৬ দফা দাবি উপেক্ষিত হলে ১৯৬৯ সালে সমগ্র দেশব্যাপী তীব্র আন্দোলন শুরু হয়। সরকার এ আন্দোলনকে নস্যাৎ করার জন্য সমগ্র বাংলাদেশে জরুরি অবস্থা ও ১৪৪ ধারা জারি করে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্র-জনতা তা অমান্য করে রাস্তায় নেমে পড়লে শুরু হয় প্রচণ্ড আন্দোলন ও বিক্ষোভ মিছিল। এ সময়ে সরকারি নির্দেশে মিছিলের ওপর গুলি চালালে আসাদুজ্জামানসহ নিহত হয় বহু সাধারণ মানুষ। ফলে

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

আন্দোলন আরো তীব্র আকার ধারণ করে এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলও এ মৌলিক অধিকার আদায়ের শপথ নিয়ে ৮ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে 'গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করে। এমনকি পূর্ব পাকিস্তানের মতো পশ্চিম পাকিস্তানেও আইয়ুববিরোধী আন্দোলন গড়ে উঠে। ফলে দেশের সর্বত্র চলতে থাকে আইয়ুববিরোধী গণআন্দোলন। এভাবে প্রচণ্ড আন্দোলনের ফলে আইয়ুব খান বাধ্য হয়ে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে নেন। পরবর্তীতে রাজনৈতিক সংকট নিরসনের লক্ষ্যে আইয়ুব খান এক গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করেন। শেখ মুজিব বৈঠকে যোগ দেন, কিন্তু পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবি না মানায় তিনি এ বৈঠক বর্জন করেন। ফলে পুনরায় শুরু হয় তীব্র আন্দোলন ও গণবিক্ষোভ। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান দেশের সার্বিক পরিস্থিতির ক্রমাবনতি রোধ করতে ব্যর্থ হয়ে ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ সমস্ত ক্ষমতা প্রধান সেনাপতি ইয়াহিয়া খানের হাতে অর্পণ করে ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ান। দ্বিতীয়বার দেশে জারি হয় সামরিক আইন। এভাবে '৬৯ সালে গণআন্দোলন গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হয়। এবং এর পথ ধরেই '৭১ সালে অর্জিত হয় বাংলার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব।

◆ '৭০-এর সাধারণ নির্বাচন

'৬৯-এর গণআন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান ১৯৭০ সালে সমগ্র পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন দিতে বাধ্য হন। এই নির্বাচনই ছিল স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের প্রাথমিক পদক্ষেপ। '৭০-এর ৭ ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদের এবং ১৭ ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন সমাপ্ত হয়। তবে বন্যা ও জলোচ্ছ্বাসের কারণে কয়েকটি আসনে '৭১-এর ১৭ জানুয়ারি নির্বাচন হয়। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে। পূর্ব বাংলার ১৬৯টি আসনের ১৬৭টি এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০টি আসনের ২৮২টি আসন দখল করে আওয়ামী লীগ। আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিব মুকুটহীন রাজায় পরিণত হন। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে জনসমর্থন লাভ করে এবং বৈধতার ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে এই নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ নির্বাচনে জনগণ ৬ দফার প্রতি ম্যান্ডেট দান করে এবং বাঙালি জাতি প্রথমবারের মতো স্বশাসন ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ লাভ করে। এমনকি দেশের বাইরে বিশ্ব জনমত সংহত করার ক্ষেত্রেও ১৯৭০ সালের নির্বাচন হয়ে ওঠে এক সুস্পষ্ট মাইলফলক।

◆ অপারেশন সার্চলাইট

২৫ মার্চ ১৯৭১ বাঙালি জাতির জীবনে এক তমসাচ্ছন্ন দিন। বাংলাদেশে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসন কায়েম রাখার জন্য ২৫ মার্চ রাতে যে ঘৃণ্য, বর্বর গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয় সেই ঘটনাকেই বলা হয় অপারেশন সার্চলাইট। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে ২৫ মার্চ ১৯৭১ গণপরিষদের অধিবেশন আহ্বান করা হয়। এর পূর্বে পাকিস্তানি শাসক ইয়াহিয়া খান এক শাসনতান্ত্রিক আলোচনার জন্য ৫ মার্চ ঢাকায় আসেন এবং ১৬ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ আলোচনা চলে। শেষ পর্যন্ত আলোচনা ব্যর্থ হলে ইয়াহিয়া খান ঐদিন ঢাকা ত্যাগ করেন কিন্তু সামরিক বাহিনীকে গোপনে নির্দেশ দিয়ে যান সামরিক অভিযান চালাতে। ফলে ২৫ মার্চ রাত সাড়ে ১০টায় শুরু হয় ইতিহাসের ঘৃণ্যতম হত্যাকাণ্ড। সাংবাদিক অ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাস এই ঘটনাকে 'বিশ শতকের জঘন্যতম প্রবঞ্চনা' বলে আখ্যায়িত করেছেন। ঐদিন পাক সেনাবাহিনী ঢাকা শহরের নিরস্ত্র জনগণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং অসংখ্য নর-নারী-শিশু হত্যা করে। উদ্দেশ্য ছিল দেশের নেতৃবৃন্দ, বুদ্ধিজীবী, ছাত্র-যুবক নির্মূল করা আর বাঙালি জাতিকে ক্রীতদাসে পরিণত করা। শুধু ঢাকাতেই সে রাতে প্রায় ৫০ হাজার নর-নারী নিহত হয়। ঐ রাতেই শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তার করে পাকিস্তানের করাচিতে নিয়ে যাওয়া হয়। বন্দি হবার পূর্বে শেখ মুজিব সশস্ত্র প্রতিরোধের নির্দেশ জারি করে বাংলাদেশকে স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা দেন। ১৯৭১ সালের সেই ২৫ মার্চ কালরাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত এই অভিযানকেই বলা হয় 'অপারেশন সার্চলাইট'।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

◆ অস্থায়ী সরকার/মুজিবনগর সরকার

১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর ক্ষমতা হস্তান্তরে প্রহসন, ২৫ মার্চ রাতে বাঙালিদের ওপর নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞ ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দেয়া হয়। এ সংগ্রামে ছাত্র-যুব-জনতা, সেনা, পুলিশ ও আনসার বাহিনী একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং গঠিত হয় মুক্তিবাহিনী। এ মুক্তিবাহিনী ও মুক্তিযুদ্ধকে পরিচালনা করার জন্যই মুজিবনগরে গঠিত হয় একটি বিপ্লবী সরকার ও উপদেষ্টা পরিষদ। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মেহেরপুরের 'বৈদ্যনাথতলায়' গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়। এ সময় এ স্থানের নতুন নামকরণ হয় মুজিবনগর। তাই এ বিপ্লবী সরকারকে 'মুজিবনগর সরকার' বলে আখ্যায়িত করা হয়। এ সরকারে সর্বসম্মতিক্রমে শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত করা হয় এবং তার অনুপস্থিতিতে সরকারপ্রধানের দায়িত্বভার অর্পিত হয় সৈয়দ নজরুল ইসলামের ওপর। তার নেতৃত্বে বিপ্লবী সরকারের অন্যান্য দপ্তরগুলো নিম্নরূপ:
প্রধানমন্ত্রী : তাজউদ্দীন আহমদ, **পররাষ্ট্র দফতর :** খোন্দকার মোশতাক আহমদ, **অর্থ দফতর :** ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী, **স্বরাষ্ট্র দফতর :** এ এইচ এম কামারুজ্জামান।
পরে এম এ জি ওসমানীকে করা হয় দেশের সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন অধ্যাপক ইউসুফ আলী। এছাড়া এই বিপ্লবী সরকারকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ দেয়ার জন্যই গঠিত হয় একটি উপদেষ্টা পরিষদ। এতে ন্যাপ (ভাসানী), ন্যাপ (মোজাফফর), বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ও কংগ্রেসের একজন করে যথাক্রমে আবদুল হামিদ খান ভাসানী, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, কমরেড মণি সিং, শ্রী মনোরঞ্জন ধর এবং আওয়ামী লীগের ৫ জন সদস্য নিয়ে এ পরিষদ গঠিত হয়। উপদেষ্টা পরিষদ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বিপ্লবী সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিতেন এবং নীতি নির্ধারণে সহায়তা করতেন।

◆ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ *[৩১তম বিসিএস]*

ব্রিটিশ শাসনের ২০০ বছরের নির্যাতন শেষ হতে না হতেই বাঙালির উপর নেমে আসে আরেক অত্যাচারী পাকিস্তানের শাসনামল। দীর্ঘ ২৩ বছর শোষণ-পীড়ন, অবহেলার চরমে পৌঁছে বাঙালি হাতে তুলে নেয় অস্ত্র। স্বাধীনতার জন্য সেই মাহেন্দ্রক্ষণ এসে উপস্থিত হয় ১৯৭১ সালে। ২৬ মার্চ আনুষ্ঠানিক যুদ্ধ ঘোষণা করে দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শেষে ১৬ ডিসেম্বর বাঙালির হাতে ধরা দেয় অনন্তকালে অরাধ্য 'স্বাধীনতা'।
আমরা, বাংলাদেশের জনগণ, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি;
ষষ্ঠ তফসিল
[১৫০ (২) অনুচ্ছেদ]
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
কর্তৃক প্রদত্ত
বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা
১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্য রাত শেষে অর্থাৎ ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত স্বাধীনতার ঘোষণা (অনূদিত)
"ইহাই হয়ত আমার শেষ বার্তা, আজ হইতে বাংলাদেশ স্বাধীন। আমি বাংলাদেশের জনগণকে আহ্বান জানাইতেছি যে, যে যেখানে আছ, যাহার যাহা কিছু আছে, তাই নিয়ে রুখে দাঁড়াও, সর্বশক্তি দিয়ে হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধ করো। পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে বাংলার মাটি হইতে বিতাড়িত না করা পর্যন্ত এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জন না করা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাও।"
শেখ মুজিবুর রহমান
২৬ মার্চ ১৯৭১

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

◆ অসমাপ্ত আত্মজীবনী

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লিখে রাখা খণ্ডিত জীবনী নিয়ে প্রকাশিত গ্রন্থ 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'। ১৯৬৬-৬৯ সালে কারাবন্দি অবস্থায় একটু একটু করে আত্মজীবনী লেখা শুরু করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। কিন্তু তার আরো অনেক কাজের মতো সেই কাজটাও রয়ে যায় অসমাপ্ত। চারটি খাতায় লিখে রাখা সেই খণ্ডিত জীবন নিয়েই ১৮ জুন ২০১২ প্রকাশিত হয় 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'। বইটির প্রকাশক 'ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড' (ইউপিএল)। একই দিনে ভারত ও পাকিস্তান থেকে একযোগে প্রকাশিত হয় এর ইংরেজি অনুবাদ The Unfinished Memoirs। ইউপিএলের সাথে বিশেষ ব্যবস্থায় ভারতে বইটি প্রকাশ করে 'পেঙ্গুইন ইন্ডিয়া' এবং পাকিস্তানে প্রকাশ করে 'অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস পাকিস্তান'। সমকালীন বাংলা আত্মজীবনী সাহিত্যের সবচেয়ে আলোচিত এ বইটিতে রয়েছে আত্মজীবনী লেখার প্রেক্ষাপট, লেখকের বংশ পরিচয়, জন্ম, শৈশব, স্কুল ও কলেজের শিক্ষাজীবনের পাশাপাশি সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, দুর্ভিক্ষ, বিহার ও কলকাতার দাঙ্গা, দেশ ভাগ, কলকাতাকেন্দ্রিক প্রাদেশিক মুসলিম ছাত্রলীগ ও মুসলিম লীগের রাজনীতি, ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগ থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত পূর্ব বাংলার রাজনীতি, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সরকারের অপশাসন, ভাষা আন্দোলন, ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা, যুক্তফ্রন্ট গঠন ও নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন, আদমজীর দাঙ্গা, পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের বৈষম্যমূলক শাসন ও প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের বিস্তৃত বিবরণ এবং এসব বিষয়ে লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বর্ণনা। বইটিতে লেখকের জেল ও জেলের বাইরের জীবন, পিতা-মাতা, সহধর্মিনী, সন্তান-সন্ততি ও পরিবার পরিজনের কথা অত্যন্ত চমৎকারভাবে বর্ণিত হয়েছে।

◆ যুদ্ধাপরাধ

যুদ্ধাপরাধ বলতে কোনো দেশ, জাতি, সামরিক বা বেসামরিক ব্যক্তি কর্তৃক যুদ্ধের প্রথা বা আন্তর্জাতিক নীতিমালা লঙ্ঘন করাকে বোঝায়। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে প্রকাশিত 'দ্য ব্লাক বুক অফ কমিউনিজম : ক্রাইমস, টেরর, রিপ্রেশান' গ্রন্থ অনুযায়ী যুদ্ধাপরাধের সাংজ্ঞিক অর্থ 'যুদ্ধের আইন বা প্রথাকে লঙ্ঘন করা' বলতে হত্যা, নির্যাতন বা সাধারণ নাগরিকদের নির্বাসিত করে অধিকৃত জনপদে ক্রীতদাস শ্রম ক্যাম্পে পরিণত করা, আটককৃতদের হত্যা ও নির্যাতন, অপহৃতদের হত্যা, সামরিক বা বেসামরিক প্রয়োজনীয়তা ছাড়াই দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে নগর, শহর ও গ্রামাঞ্চলকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করাকে উল্লেখ করা হয়। চতুর্থ জেনেভা কনভেনশনের ১৪৭ ধারায় যুদ্ধাপরাধ প্রসঙ্গে বলা হয় : ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা, নির্যাতন বা অমানবিক ব্যবহার এবং কারো শরীর বা স্বাস্থ্যে গুরুতর আঘাত করা বা তার দুর্দশার কারণ তৈরি, অন্যায়ভাবে কাউকে বিতাড়ন বা স্থানান্তর করা বা আটক করা, শত্রুবাহিনীর সেবাদানে বাধ্য করা, যথাযথ ও নিয়মতান্ত্রিক বিচার পাওয়ার অধিকার থেকে কাউকে ইচ্ছাকৃতভাবে বঞ্চিত করা, কাউকে জিম্মি করা, বিপুল পরিমাণে ধ্বংসযজ্ঞ চালানো ও সম্পত্তি আত্মসাৎ করা, সামরিক প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও উপরিউক্ত যে কোনো এক বা একাধিক বেআইনি ও নীতিবিরুদ্ধ কর্মকাণ্ড যুদ্ধাপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে। যুদ্ধাপরাধের ধারণার মর্মমূলে ছিল যে, একটি দেশ বা দেশের সৈন্যদের কাজের জন্য একজন ব্যক্তিও দায়ী হতে পারেন। গণহত্যা, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ, সাধারণ নাগরিকদের হয়রানি— এসবই যুদ্ধাপরাধের মধ্যে পড়ে। এসবের মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর হলো গণহত্যা।

◆ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার

১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে পাকিস্তানি সেনাদের গুলিতে শহীদদের স্মৃতির স্মারক শহীদ মিনার। ১৯৫২ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি সাড়ে দশ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট ও ছয় ফুট প্রস্থবিশিষ্ট স্মৃতিস্তম্ভ শহীদ মিনার তৈরি করা হয় বর্তমান ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ১২ ও ১৩ নম্বর ব্যারাকের মাঝামাঝি শহীদের

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

রক্তমাখা স্থানে। কিন্তু এ স্তম্ভের স্থায়িত্ব ছিল আড়াই দিন। কারণ ২৬ তারিখ পুলিশ হোস্টেল ঘেরাও করে শহীদ মিনার ভেঙে টুকরাগুলো ট্রাকে করে নিয়ে যায়। ১৯৫৬ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি পূর্ববঙ্গের কৃষক শ্রমিক পার্টির শাসনামলে মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের সামনে শহীদ মিনারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। ১৯৫৭-৫৮ সালে শিল্পী হামিদুর রহমানের পরিকল্পনামাফিক কাজ চলে। শিল্পী নভেরা আহমদের ভাস্কর্যসহ শহীদ মিনারের নির্মাণ কাজ আংশিকভাবে সম্পন্ন হয়। ১৯৬২-৬৩ সালে শহীদ মিনার সংক্ষিপ্তরূপে সম্পন্ন করা হয় এবং এ বছর শহীদ আবুল বরকতের মা হাসিনা বেগম এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। ১৯৭১ সালের যুদ্ধে এ মিনার আবার ভেঙে দেয়া হয়। ১৯৭৩ সালে আবার তাড়াহুড়া করে শহীদ মিনার তৈরি করা হয়। আশির দশকে এরশাদ শাসনামলে এর প্রাঙ্গণের বিস্তৃতি ঘটলেও মূল শহীদ মিনার আগের মতোই রয়েছে।

◆ মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ

মেহেরপুর জেলার ভবেরপাড়া গ্রামের বৈদ্যনাথতলার আম্রকানন ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের অস্থায়ী রাজধানী হিসেবে ঘোষিত হয়েছিল। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল এখান থেকেই অস্থায়ী সরকারের ঘোষণা ও ১৭ এপ্রিল অস্থায়ী সরকারের মন্ত্রিবর্গের শপথ পাঠ করানো হয়। তাই এ স্থানটি বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ স্থানের ঐতিহাসিক গুরুত্বের কথা চিন্তা করেই মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়। স্মৃতিসৌধের মূল ভবন ২৩টি কংক্রিট নির্মিত ত্রিকোণাকার স্তম্ভ দ্বারা উদীয়মান সূর্যের প্রতিকৃতিতে নির্মিত। ১৬০ ফুট গোলাকার স্তম্ভের ২০ ইঞ্চি মোটা চওড়া ত্রিকোণ দেয়ালগুলো ক্রমান্বয়ে ২০ ফুট থেকে ৪২ ফুট পর্যন্ত দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট এবং এর উচ্চতা ৯ ফুট থেকে ২৫ ফুট পর্যন্ত। প্রায় ১ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত এ শিল্পকর্মটির শিল্পী তানভীর আহমেদ। এখানে স্মৃতিসৌধ ছাড়াও বিডিআরের সীমান্ত ফাঁড়ি, ডাকবাংলা, প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন রয়েছে। ১৯৮৪-৮৫ সালে শুরু করে ১৯৮৭ সালে সমাপ্ত এ স্মৃতিসৌধটি উদ্বোধন করেন তৎকালীন প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ১৯৮৭ সালের ১৭ এপ্রিল।

◆ শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্য দিয়ে যে যুদ্ধের শুরু, ৩০ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে সে স্বাধীনতা অর্জিত হয় ১৬ ডিসেম্বর। কিন্তু বর্বর পাক হানাদার বাহিনী ১৬ ডিসেম্বর আত্মসমর্পণের পূর্বে ঘৃণ্য চক্রান্ত এবং নীলনকশা অঙ্কন করে এ দেশের সংস্কৃতি, সভ্যতা, শিক্ষাকে চিরদিনের জন্য পঙ্গু করে দেয়ার জন্য তাদের দোসরদের সাহায্যে এ দেশের সাহিত্যিক, শিল্পী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, বুদ্ধিজীবীসহ অসংখ্য গুণী-জ্ঞানী ব্যক্তিকে বাড়ি থেকে অপহরণ করে নিয়ে যায় এবং তাদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করে। ১৪ ডিসেম্বর রাত্রিতে এ হত্যাযজ্ঞ বেশি সংঘটিত হয়। নিহতদের মধ্যে অন্যতম হলেন মুনীর চৌধুরী, ডা. আঃ মতিন, জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা, জিসি দেব প্রমুখ। অমর এ বুদ্ধিজীবীদের স্মৃতি চিরজাগরূক রাখতে এবং তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনার্থে নির্মাণ করা হয় শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ। বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় ১৯৭২ সালের ২২ ডিসেম্বর। ১৯৮৬ সালের ১৪ ডিসেম্বর তৎকালীন প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ এ স্মৃতিসৌধের উদ্বোধন করেন। ঢাকার মিরপুরে অবস্থিত এ স্থাপত্যকর্মটির স্থপতি মোস্তফা হারুন কুদ্দুস।

◆ অপরাজেয় বাংলা

ভাস্কর সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ কর্তৃক নির্মিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের সামনে অবস্থিত ভাস্কর্য অপরাজেয় বাংলা। বাংলার ইতিহাসে ভাষা আন্দোলন এবং তৎপূর্ববর্তী আন্দোলন থেকে শুরু করে সর্বশেষ পর্যন্ত সকল আন্দোলনের সূতিকাগারই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসভায়ই

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

স্বাধীনতার পতাকা প্রথম উত্তোলিত হয়। এসব স্মৃতিকে চিরজাগ্রত ও অম্লান রাখার লক্ষ্যে শিল্পী আবদুল্লাহ খালেদ ১৯৭৩ সালে যে কর্মযজ্ঞের সূচনা করেন তার সফল সমাপ্তি ঘটে ১৯৭৯ সালে। প্রায় ৬ ফুট উঁচু মূল বেদীতে ভাস্কর্যটি অবস্থিত। দু'জন পুরুষ যোদ্ধা অস্ত্র হাতে এবং একজন নারী সহযোদ্ধা প্রাথমিক চিকিৎসা বাক্স নিয়ে যুদ্ধাহতদের চিকিৎসা সেবার মহান ব্রত নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। অপরাজেয় বাংলা মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের চেতনার মূর্ত প্রতীক। এটি তৈরির ব্যয় প্রায় ১ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা। ১৮ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট এ ভাস্কর্যটি ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর উদ্বোধন করা হয়।

◆ শাবাশ বাংলাদেশ

শাবাশ বাংলাদেশ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ভাস্কর্য। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে শিল্পী নিতুন কুণ্ডুর গড়া এ স্থাপত্যটিতে রয়েছে প্রায় আড়াই গুণ বর্ধিত দুটি মানব প্রতিকৃতি। এর একটি মুক্তিযোদ্ধার, অপরটি মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত বিজয়কে সুসংহত ও দৃঢ়ভাবে করায়ত্ত করার দৃঢ় প্রত্যয়। নগ্ন পায়ে লুঙ্গি পরিহিত, বাম হাতে রাইফেল এবং ডান হাতে মুষ্টিবদ্ধ গ্রাম্য মুক্তিযোদ্ধার প্রতিচ্ছবিতে শিল্পী বিজয়োল্লাসের রূপ তুলে ধরেছেন। অপর শিল্পকর্মটিতে প্যান্ট পরিহিত হাতে রাইফেল কিছু ঝুঁকে থাকা শহরের যুবকের প্রতিচ্ছবিতে শিল্পী এঁকেছেন অর্জিত বিজয়কে শক্ত করে ধরে রাখার প্রতিজ্ঞা। শহীদ জননী জাহানারা ইমাম কর্তৃক এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয় ১৯৯২ সালে। শিল্পকর্মটির গায়ে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের কয়েকটি চরণ লেখা রয়েছে এভাবে :

'শাবাশ বাংলাদেশ
এ পৃথিবী অবাক তাকিয়ে রয়
জ্বলে পুড়ে মরে ছারখার
তবু মাথা নোয়াবার নয়।'

◆ জাতীয় স্মৃতিসৌধ

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের স্মৃতিকে চির অম্লান রাখার উদ্দেশ্যে ঢাকা শহর থেকে প্রায় ২০ মাইল দূরে সাভারের নবীনগরে জাতীয় স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়। ৮৪ একর আয়তনের ওপর নির্মিত এ স্তম্ভের স্থপতি সৈয়দ মঈনুল হোসেন। মুক্তিযুদ্ধে আত্মাহুতি দানকারী বীর শহীদদের বিজয় গৌরবকে বুকে ধারণ করে স্মৃতিস্তম্ভটির শীর্ষদেশ যেন নীল আকাশে হারিয়ে যাচ্ছে। ৭টি মিনার সম্বলিত এই স্তম্ভটির উচ্চতা ১৫০ ফুট বা ৪৬.৫ মিটার। ১৯৫২ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত স্বাধীনতা আন্দোলনের সাতটি পর্যায়কে সাতটি মিনারের সঙ্গে তুলনা করা হয়। অনেকে সাতটি মিনারকে সূর্যের সাতটি রঙের সাথে তুলনা করে থাকেন। অর্থাৎ সূর্য যেন সাতটি রঙের বিচ্ছুরণ ঘটিয়ে পৃথিবীতে উদিত হচ্ছে, যা স্বাধীনতা সূর্যের সঙ্গে তুলনা করা হয়। কেউ কেউ সাতকে শুভ সংখ্যা হিসেবে গণ্য করে সাতটি মিনারের সার্থকতা খুঁজে পান। চারদিকে সুন্দর সুন্দর গাছ, নির্মল বায়ু ও পাখিদের কলকাকলিতে পুরো এলাকা এক অপরূপ সৌন্দর্যে সজ্জিত। ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর মরহুম রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। স্তম্ভটির সিংহভাগ কাজ সম্পন্ন হয় পরবর্তী সরকারের সময়ে এবং ১৯৮২ সালের ১৬ ডিসেম্বর সাবেক রাষ্ট্রপতি এরশাদ এর উদ্বোধন করেন।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৩৫তম বিসিএস

মডেল প্রশ্ন

বাংলাদেশ বিষয়াবলি

মডেল প্রশ্ন-০১
মডেল প্রশ্ন-০২
মডেল প্রশ্ন-০৩
মডেল প্রশ্ন-০৪
মডেল প্রশ্ন-০৫

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

বাংলাদেশ বিষয়াবলি

মডেল প্রশ্ন ০১

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ২০০

[দ্রষ্টব্য : প্রার্থীকে ১নং থেকে ১০নং প্রশ্নের মধ্য হতে আটটি এবং অবশ্যই ১১নং ও ১২নং প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।]

১. বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি এবং বাংলাদেশের জলবায়ুতে এর প্রভাব আলোচনা করুন। ২০
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ১৩।

২. জনসংখ্যা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নতির পথে অন্যতম অন্তরায়—উক্তিটি কি সম্পূর্ণভাবে সঠিক? জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়? ২০
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৪২।

৩. বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে সংস্কৃতির অবদান আলোচনা করুন। ২০
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৭৪।

৪. 'কৃষির আধুনিকায়ন জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত, কিন্তু জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার পূর্বশর্ত'–ব্যাখ্যা করুন। ২০
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৩৫২।

৫. বর্তমানে গ্যাস সংকট মোকাবিলায় সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে? সম্প্রতি বাংলাদেশ কর্তৃক সমুদ্র বিজয় এতে কি প্রভাব ফেলবে বলে মনে করেন? ২০
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৩৯৮।

৬. ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সংবিধানে উল্লিখিত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ বা নির্দেশাত্মক নীতিগুলো আলোচনা করুন। ২০
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৪৬৯।

৭. সুশাসন বলতে কি বুঝায়? সুশাসনের সাথে দুর্নীতি দমনের কোনো সম্পর্ক আছে কি? সুশাসন প্রতিষ্ঠায় মৌলিক বিষয়গুলো কি কি– আলোচনা করুন। ২০
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৫৩৩।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৮. 'সরকারি দলের সহনশীলতা ও বিরোধী দলের দায়িত্বশীলতা উভয়ই গণতন্ত্র বিকাশের জন্য অপরিহার্য।'—যুক্তিসহ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আলোচনা করুন। ২০
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৬৮০।

৯. সিভিল সোসাইটির বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখুন। সিভিল সোসাইটির সাথে সরকারের সম্পর্ক কি হওয়া উচিত? বর্ণনা করুন। ২০
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৭৭২।

১০. 'বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়' শিরোনামে একটি নিবন্ধ রচনা করুন। ২০
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৮৬৩।

১১. টীকা লিখুন (যে কোনো পাঁচটি) : ৪ × ৫ = ২০
রামসাগর; জাতীয় প্রতীক; রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা; ছয় দফা কর্মসূচি ১৯৬৬; মেট্রোরেল প্রকল্প; গার্মেন্টস শিল্পপার্ক; ট্রেড ইউনিয়ন।
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৯৪১, ৯৪২, ৯৬০, ১০৩৩, ১০১৯, ৯৬৩, ৯৬৪।

১২. যে কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দিন : ৫ × ৪ = ২০
ক. লোকসাহিত্যের সংজ্ঞা দিন। **উত্তর :** দেখুন পৃষ্ঠা ১১৪।
খ. বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যাগুলো কি কি? **উত্তর :** দেখুন পৃষ্ঠা ৩২৭।
গ. ককাস কি? **উত্তর :** দেখুন পৃষ্ঠা ৫২৮।
ঘ. অসাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় ক্ষমতা দখল বন্ধের কার্যকর পদক্ষেপগুলো কি হতে পারে?
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৭১৪।
ঙ. সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর পর জাতীয় নির্বাচনকালে সরকারের রূপরেখা লিখুন?
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৭৩৩।
চ. পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) কি? **উত্তর :** দেখুন পৃষ্ঠা ৭৮৯।

মডেল প্রশ্ন ০২

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ২০০

[দ্রষ্টব্য : প্রার্থীকে ১নং থেকে ১০নং প্রশ্নের মধ্য হতে আটটি এবং অবশ্যই ১১নং ও ১২নং প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।]

১. বাংলাদেশকে পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ বলা হয় কেন? সংশ্লিষ্ট ভৌগোলিক তথ্যসমূহ উল্লেখপূর্বক বর্ণনা করুন। ২০
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ০৪।

২. বাংলাদেশের প্রধান প্রধান উপজাতি কতটি ও কি কি? প্রধান তিনটি উপজাতি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন। ২০
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৪৭।

৩. বাংলাদেশে সামাজিক মূল্যবোধের পূর্ণ অবক্ষয় ঘটেছে বলে কি আপনি মনে করেন? এর কারণ ও প্রতিকার সম্পর্কে আপনার মতামত দিন। ২০
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ১২৩।

৪. প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিশেষত বন্যা সমস্যা ও এর সম্ভাব্য সমাধান সম্পর্কে আলোচনা করুন। ২০
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৩৪০।

৫. ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে কি বোঝেন? বিভিন্ন শাসনামলে এক্ষেত্রে আনীত পরিবর্তনগুলো পর্যালোচনা করুন। ২০
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৪৯০।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৬. 'বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী অতিমাত্রায় ক্ষমতার অধিকারী'–এ উক্তির পক্ষে ও বিপক্ষে আপনার বক্তব্য উপস্থাপন করুন। ২০
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৫৩০।

৭. বৈদেশিক নীতি কি? বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন সাধিত হয় তা আলোচনা করুন। ২০
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৬১৩।

৮. অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে কমিশনের ভূমিকা কি? বাংলাদেশে নির্বাচন কমিশনের দুর্বল দিকগুলো আলোচনা করুন। ২০
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৭১৬।

৯. সুশাসন বলতে কি বোঝায়? বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অন্তরায়সমূহ আলোচনা করুন। ২০
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৭৭৭।

১০. বাংলাদেশে ঋণপ্রদানে আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক ও এডিবির সমধর্মী শর্তগুলো কি কি? শর্তযুক্ত ঋণ পরিহার করা সম্ভব কি? যৌক্তিক পরামর্শ দিন। ২০
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৭৯৪।

১১. **টীকা লিখুন (যে কোনো পাঁচটি) :** ৪ × ৫ = ২০
ন্যায়পাল; বাংলা একাডেমি; পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি; মানবাধিকার; ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব; জাতিসংঘ রেডিও বাংলা; শ্রমশক্তি জরিপ ২০১৩।
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা : ৯৮০, ৯৪৪, ৯৩৫, ৯৮১, ৯৪৭, ১০২১, ৯৩৯।

১২. **যে কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দিন :** ৫ × ৪ = ২০
ক. কালো সোনা কি? **উত্তর :** দেখুন পৃষ্ঠা ৪৫৯।
খ. সংবিধানের সংজ্ঞা দিন? **উত্তর :** দেখুন পৃষ্ঠা ৫০২।
গ. গ্রাম আদালত কি? **উত্তর :** দেখুন পৃষ্ঠা ৬০৮।
ঘ. এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB) কি? **উত্তর :** দেখুন পৃষ্ঠা ৮২৬।
ঙ. বাংলাদেশের প্রথম নারী স্পিকার কে? **উত্তর :** দেখুন পৃষ্ঠা ৮৬০।
চ. লাহোর প্রস্তাব কি? এটি কে উত্থাপন করেন? **উত্তর :** দেখুন পৃষ্ঠা ৯২৭।

মডেল প্রশ্ন ০৩

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ২০০

দ্রষ্টব্য : প্রার্থীকে ১নং থেকে ১০নং প্রশ্নের মধ্য হতে আটটি এবং অবশ্যই ১১নং ও ১২নং প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।

১. আওয়ামী মুসলিম লীগের নাম কেন আওয়ামী লীগ করা হয়? কত সালে আওয়ামী লীগ নামকরণ করা হয়? ২০
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৬৫।

২. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষিখাতের ভূমিকা আলোচনা করুন। ভবিষ্যতে বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থার ধরন কি হতে পারে বলে আপনি মনে করেন? ২০
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ১৩৮।

৩. বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষায় বাংলাদেশের গৃহীত কার্যক্রম আলোচনা করুন। ২০
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৩৮২।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৪. বাংলাদেশে কয়লা শক্তির মজুদের বিস্তারিত বিবরণ দিন। এ প্রসঙ্গে কয়লার ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করুন। ২০
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৪৩৯।

৫. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে কি কি সংশোধনী আনা যুক্তিযুক্ত বলে আপনি মনে করেন? ২০
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৫০০।

৬. স্থানীয় সরকার বলতে কি বোঝেন? দেশে কয়টি স্থানীয় সরকার গঠন এবং কোন স্তরে কি কি ক্ষমতা ও দায়িত্ব থাকা সমীচীন বলে আপনি মনে করেন? ২০
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৫৫১।

৭. গণতান্ত্রিক পরিবেশ উন্নয়নে রাজনৈতিক দলসমূহের ভূমিকা কি হওয়া উচিত? গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি চর্চায় সিভিল-সেনাবাহিনী সম্পর্ক কতটা প্রয়োজনীয়? আলোচনা করুন। ২০
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৬৮৩।

৮. বাংলাদেশের সাথে অন্যান্য দেশের কতটি আঞ্চলিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি আছে? বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি নিরসনে আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তিগুলো কি ধরনের ভূমিকা রাখতে পারে? আলোচনা করুন। ২০
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৮০৪।

৯. জনগণের নেতা বলতে কি বোঝায়? বিশ্বের অন্য আরো অন্তত ২ জন নেতার সাথে তুলনা করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জননেতা এবং সফল স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতীক হিসেবে বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করুন। ২০
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৮৮১।

১০. বাংলাদেশের পরিবেশ ও অর্থনীতিতে সুন্দরবন ও উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনীর প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করুন। ২০
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৩৫৯।

১১. **টীকা লিখুন (যে কোনো পাঁচটি) :** ৪ × ৫ = ২০
তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা; বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (BCSIR); দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র; ঢাকাই মসলিন; অসমাপ্ত আত্মজীবনী; দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা; যুদ্ধাপরাধ।
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৯৪৩, ১০১৮, ৯৬১, ৯৪৬, ১০৩৮, ৯৪৯, ১০৩৮।

১২. **যে কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দিন :** ৫ × ৪ = ২০
ক. ছিটমহল সমস্যা কি? দহগ্রাম ছিটমহল কোন জেলায় অবস্থিত? **উত্তর :** দেখুন পৃষ্ঠা ৩২।
খ. গম্ভীরা কি? **উত্তর :** দেখুন পৃষ্ঠা ৬৩।
গ. লালনগীতি কি এবং এর প্রভাবই বা কি? **উত্তর :** দেখুন পৃষ্ঠা ১১৩।
ঘ. পিআরএসপি (PRSP) কি? **উত্তর :** দেখুন পৃষ্ঠা ৩৩১।
ঙ. ম্যানগ্রোভ বন কি? **উত্তর :** দেখুন পৃষ্ঠা পৃষ্ঠা ৩৯২।
চ. বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি কোথায়? **উত্তর :** দেখুন পৃষ্ঠা ৪৬০।

মডেল প্রশ্ন ০৪

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ২০০

দ্রষ্টব্য : প্রার্থীকে ১নং থেকে ১০নং প্রশ্নের মধ্য হতে আটটি এবং অবশ্যই ১১নং প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।

১. ক. গ্রিন হাউস ইফেক্ট কি? ৪
খ. ভবিষ্যতে বাংলাদেশে গ্রিন হাউস ইফেক্টের কি কি প্রভাব পড়তে পারে? ৮
গ. গ্রিন হাউস ইফেক্ট প্রতিকারের উপায় কি বর্ণনা করুন। ৮
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ২২।

. ক. অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বলতে কি বোঝায়? ৪
খ. বাংলাদেশে গৃহীত বিভিন্ন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা উল্লেখ করুন। ৮
গ. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সমস্যা ও সমাধানের পথ চিহ্নিত করুন। ৮
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৫৮।

৩. ক. উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষার সুবিধা-অসুবিধা কি কি? ৪
খ. জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মৌলিক সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করুন। ৮
গ. বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবসস্থার মৌলিক সমাজসমূহের সম্ভাব্য প্রতিকারের পরামর্শ দিন। ৮
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ১৮৯।

৪. ক. বাংলাদেশে পরিবেশ সংরক্ষণ নীতি কি? ৪
খ. পরিবেশ সংরক্ষণে কি কি উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে বলে আপনি মনে করেন? ৮
গ. বাংলাদেশের পরিবেশের চ্যালেঞ্জসমূহ সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। ৮
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ১৮৯।

৫. ক. রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস (*CNG*) কি? ৪
খ. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে জ্বালানি সেক্টরের ভূমিকা আলোচনা করুন। ৮
গ. বাংলাদেশের কি গ্যাস রপ্তানি করা উচিত? ৮
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৪১২।

৬. ক. বাংলাদেশ সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি কিরূপ? ৪
খ. বিভিন্ন শাসনামলে সাধিত বাংলাদেশের সংবিধানের সংশোধনীসমূহ আলোচনা করুন। ১৬
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৪৭৬।

৭. ক. বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূলনীতিগুলো কি? ৪
খ. 'সার্ক ও বাংলাদেশ' শিরোনামে একটি নিবন্ধ রচনা করুন। ১৬
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৬১৯।

৮. ক. সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসমূহ কি কি? ৪
খ. সংসদীয় রাজনীতিতে সরকারি দল ও বিরোধী দলের ভূমিকা লিখুন। ৮
গ. সংসদীয় রাজনীতিতে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর আচরণ সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ রচনা লিখুন। ৮
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৬৮৬।

৯. ক. তথ্য অধিকার কি? ৪
খ. দারিদ্র্য বিমোচন ও মানবসম্পদ উন্নয়নে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন? ৮
গ. দরিদ্র বিমোচন ও মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষা ও তথ্যপ্রযুক্তির ভূমিকা মূল্যায়ন করুন। ৮
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৭৩৫।

১০. ক. বাংলাদেশের নারীসমাজের এগিয়ে যাওয়ার প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে লিখুন। ৪
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৮৫৮।
খ. বর্তমানে বাংলাদেশে নারী সহায়তাকল্পে কি কি পদক্ষেপ বিদ্যমান রয়েছে? ৮
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৮৫১।
গ. জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১-তে নারীর রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতায়নের উপর কিরূপ গুরুত্বারোপ করা ৮
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৮৫১।

১১. টীকা লিখুন (যে কোনো আটটি) : ৮ × ৫ = ৪০
ভূমিকম্প ও বাংলাদেশ; অধ্যাদেশ; নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার; এটর্নি জেনারেল; ব্লাসফেমি আইন; রোহিঙ্গা সমস্যা; বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি; অমর একুশে বইমেলা; জনসংখ্যা ও বাংলাদেশ; আহসান মঞ্জিল।
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৯৩৪, ৯৯৮, ৯৯৯, ১০০৩, ৯৯৬, ৯৩৯, ৯৫১, ৯৫৩, ৯৪০, ৯৪৬।

মডেল প্রশ্ন ০৫

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ২০০

দ্রষ্টব্য : প্রার্থীকে ১নং থেকে ১০নং প্রশ্নের মধ্য হতে আটটি এবং অবশ্যই ১১নং প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।]

১. ক. স্বাধীনতা পূর্ববর্তীকালের তুলনায় স্বাধীন বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নয়নের বিবরণ দিন। ১০
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৮৩।
খ. বাংলাদেশের লোকশিল্প সম্পর্কে আলোকপাত করুন। লোকশিল্প সংগ্রহের গুরুত্ব এবং সংগ্রহের সমস্যার ওপর আলোকপাত করুন। ১০
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ১০৫।

২. ক. পদ্মা সেতু নির্মাণের অর্থনৈতিক গুরুত্ব আলোচনাপূর্বক পদ্মা সেতু বাস্তবায়নের অগ্রগতি বিষয়ে আলোকপাত করুন। ৬
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ২৯৫।
খ. পদ্মা সেতু নির্মাণের সাম্প্রতিক পরিস্থিতির বিবরণ দিন। ৭
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ২৯৫।
গ. 'একটি দুর্ঘটনাই সারা জীবনের কান্না।'—এ প্রসঙ্গে সড়ক দুর্ঘটনার কারণসমূহ উল্লেখপূর্বক তা সমাধানের উপায় তুলে ধরুন।/২১৯ ৭
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ২১৯।

৩. ক. বাংলাদেশে নগরায়ন সম্পর্কে আলোচনা করুন। ৬
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ২৩৩।
খ. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নগরায়নের গুরুত্ব ও নগরায়ণের বিভিন্ন সমস্যার উপর আলোকপাত করুন। ৭
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ২৩৩।
গ. 'ঢাকা শহরকে প্রকৃতির সাথে সঙ্গতি রেখে পরিচ্ছন্ন, বাসযোগ্য ও আধুনিক ঢাকায় রূপান্তরের রূপরেখা ডিটেইলড এরিয়া প্ল্যান (ড্যাপ)'—এ প্রসঙ্গে ড্যাপের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আলোচনা করুন। ৭
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ২৩৮।

৪. ক. বাংলাদেশে জাতীয় সংসদের সদস্য হবার যোগ্যতা এবং অযোগ্যতা সম্পর্কে বর্ণনা করুন। ৭
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৫১২।
খ. বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের সমস্যা ও সম্ভাবনা আলোচনা করুন। ৭
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৫১৮।
গ. সংসদ সদস্যদের আসন কেন এবং কখন শূন্য ঘোষণা করা হয়? ৬
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৫১২।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)

৫. ক. সংবিধানের অনুচ্ছেদ উল্লেখপূর্বক সুপ্রিম কোর্টের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে লিখুন। ৬
খ. সুপ্রিম কোর্টের গঠন, কার্যপ্রণালী আলোচনা করুন। ৭
গ. সংবিধানের অনুচ্ছেদ উল্লেখপূর্বক সুপ্রিম কোর্টের এখতিয়ার আলোচনা করুন। ৭
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৫৯০।

৬. ক. রাষ্ট্রীয় সমুদ্রসীমা কিভাবে নির্ধারিত হয়? ৪
খ. সমুদ্র সংলগ্ন উপকূলীয় রাষ্ট্রের সমুদ্র অধিকারগুলো কি কি? ৮
গ. প্রেক্ষাপটে গভীর সমুদ্রে বাংলাদেশের তেল-গ্যাস সম্পদ প্রতিবেশী দেশ ভারত-মিয়ানমার থেকে কতটুকু নিরাপদ? আলোচনা করুন। ৮
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৬২৫।

৭. ক. নির্বাচনী আইন কি? ৪
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৭২২।
খ. জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। ৮
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৭২২।
গ. নির্বাচন কমিশনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারদের কে নিয়োগ প্রদান করেন? এ পদগুলোকে সাংবিধানিক পদ বলা হয় কেন? ৮
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৭৩৩।

৮. ক. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (IMF) ভূমিকা পর্যালোচনা করুন। ১০
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৭৯৮।
খ. বাংলাদেশের চামড়া শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা করুন। ১০
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ২৮৯।

৯. ক. বাংলাদেশের নারীর ক্ষমতায়নে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ সংক্ষেপে উল্লেখ করুন। গৃহীত পদক্ষেপগুলো CEDAW (Convention on the Elimination of Discrimination Against Women) সনদকে সমর্থন করে কি? ১০
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৮৩২।
খ. বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়নের প্রধান সীমাবদ্ধতা ও প্রতিকারসমূহ আলোচনা করুন। *[১৭তম বিসিএস]* ১০
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৮৩৪।

১০. ক. যুদ্ধাপরাধ কি? যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য কয়টি ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছে? ৪
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৮৮৮।
খ. যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের যৌক্তিকতা বর্ণনা করুন। *[৩৩তম বিসিএস]* ৮
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৮৮৮।
গ. বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলা ও ভাস্কর্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতিফলন কতটা? ৮
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৩৩৭।

১১. টীকা লিখুন (যে কোনো আটটি) : $৫ \times ৪ = ২০$
রূপকল্প ২০২১; রাষ্ট্রপতির অভিশংসন; সাংবিধানিক সংস্থা; সুযোগের সমতা; উপজেলা পরিষদ; নারী নির্যাতন; পাহাড়পুর; স্বাস্থ্যনীতি; পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক; বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি
উত্তর : দেখুন পৃষ্ঠা ৯৬৯, ৯৯৮, ৯৮৪, ৯৮৫, ১০০২, ১০৩২, ৯৪৮, ৯৩৪, ৯৭১, ১০০৪।

শুভ নন্দী (০১৯১১-৬১৩১০৩)